বিমল মিত্র
এই নরদেহ
BanglaBook.org
সকল পর্ব একত্রে
BanglaBook.org

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

আমার পাঠক-পাঠিকাবর্গের সতর্কতার জন্যে জানাই যে, গত পঁচিশ বছর যাবৎ অসংখ্য উপন্যাস 'বিমল মিত্র' নামযুক্ত হয়ে প্রকাশিত হয়ে আসছে। ও-গুলি এক অসাধু জুয়াচোরের কাণ্ড। আমার লেখার জনপ্রিয়তার সুযোগ নিয়ে বহু লোক এই নামে পুস্তক প্রকাশ করে আমার পাঠক-বর্গকে প্রতারণা করে আসছে। পাঠক-পাঠিকাবর্গের প্রতি আমার বিনীত বিজ্ঞপ্তি এই যে, সেগুলি আমার রচনা নয়। একমাত্র কড়ি দিয়ে কিনলাম ছাড়া আমার লেখা প্রত্যেকটি গ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠায় আমার স্বাক্ষর মুদ্রিত আছে।

এই নরদেহ
জলে ভেসে যায়
ছিঁড়ে খায় কুক্কুর শৃগাল
কিম্বা চিতা-ভস্ম সম
পবন উড়ায়।
এই নারী
এরও এই পরিণাম
নশ্বর সংসারে...

—'বিল্বমঙ্গল'
গিরিশ চন্দ্র ঘোষ

॥ আলাপ ॥

পৃথিবীর সমস্ত মানুষের জীবনেই এমন একটা সময় আসে, যখন নিজের সমস্ত অতীতটা পরিক্রমা করতে ইচ্ছে হয়। অতীতটা তখনই মানুষের মনে পড়ে, যখন তার কাছে ভবিষ্যৎটা ছোট হয়ে আসে। কম বয়েসে মানুষের কাছে অতীতটা তুচ্ছ। তখন তার কাছে ভবিষ্যৎটাই আসল। তখন সেই কম বয়েসে সব কিছুই সে কামনা করে বসে। কামনা করে সুখ-সমৃদ্ধি-সৌভাগ্য। সব কিছু দুর্লভ কামনা করার মধ্যে একটা বলিষ্ঠ প্রত্যাশা,তাকে সমস্ত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করতে শেখায়, তাচ্ছিল্য করতে শেখায়। কিন্তু যেই আধখানা জীবন ফুরিয়ে যায় তখনই আসে প্রত্যয়। তাই এই পৃথিবীর সব মানুষের জীবনই প্রত্যাশা আর প্রত্যয়ের সমন্বয়। প্রত্যাশাকে অতিক্রম করে প্রত্যয়ে পৌঁছে তবে সে পরিত্রাণ পায়।

কথাগুলো নিবারণকাকার। ছোটবেলায় নিবারণকাকা সন্দীপকে খুব স্নেহ করতেন। বলতেন—কথাগুলোর মানে তুমি এখন বুঝতে পারবে না বাবা। যখন আমার মত বয়েস হবে তখন বুঝবে।

তা এখন কি সন্দীপের বয়েস সেই সেদিনকার নিবারণকাকার মত হয়েছে? ঠিক বলা যায় না। ছোটবেলায় চারদিকের সব মানুষকেই বুড়ো মানুষ বলে মনে হয়। এখন তো নিজেই সে বুড়ো হয়েছে। অন্য লোকদের চোখে সে বুড়োই তো। অথচ নিজের কাছে তো সন্দীপ এখনও ছোটই আছে।

নিবারণকাকা আরো বলতেন—আগে তোমার চল্লিশ বছর বয়েস হোক, তখন আমি যা এখন বলছি তা মনে ভেবো। এখন তোমাদের কেবল আশা করবার বয়েস, এখন কেবল আশা করে যাও—শুধু আশা করে যাও, আর কিছু নয়—

সত্যিই তখন কত কিছুই না আশা করেছিল সন্দীপ! আশা ছিল একদিন বেড়াপোতা স্কুল থেকে বেরিয়ে সে কলকাতার কলেজে পড়তে যাবে। কলেজ থেকে বি-এ পরীক্ষা দেবে। আর তারপর? আর তারপর সে উকিল হবে। কলকাতার কোর্টে গিয়ে ওকালতি করবে। গরীব মানুষদের উপকার করবে।

এখন ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয় যে এত জিনিস থাকতে সে উকিল হতেই বা চেয়েছিল কেন? হয়ত উকিলের পোষাক দেখে। ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, প্রফেসার বা অন্য কোন পেশার লোকদের কোনও রকম ধরা-বাঁধা পোষাক-পরিচ্ছদ থাকে না। তবু উকিলদের গায়ে একটা কালো কোট থাকে। বেড়াপোতার চাটুজ্জে-বাবুদের ছোটছেলে উকিল হয়েছিল। রোজ রেলষ্টেশনে ট্রেন ধরে কলকাতায় যেত ওই কালো কোট পরে। বাড়ি ফিরতো অনেক রাত্রে। সন্দীপ সেই চাটুজ্জে-বাবুদের ছেলের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতো। সে কবে ওই রকম কালো কোট পরে ডেলি প্যাসেঞ্জারি করবে! বেড়াপোতার সমস্ত লোক তার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখবে। আশ্চর্য, কত বিচিত্র সব আকাঙ্খা থাকে মানুষের ছোটবেলায়।

সন্দীপ ভাবতে লাগলো মানুষের ছোটবেলাটাই বোধহয় সব চেয়ে সুখের। তখন কত ভালো লাগতো পৃথিবীর মানুষগুলোকে। পৃথিবী মানে তখন সন্দীপ বেড়াপোতাটাকেই বুঝতো। আর কলকাতা? কলকাতার নামটাই শুধু সে শুনে এসেছিল। কলকাতায় যাবার স্বপ্নই দেখতো। কখনও সশরীরে সে যায়নি সেখানে। অথচ বেড়াপোতা থেকে কতই বা দূর। দু ঘণ্টার মধ্যেই ট্রেনে চড়ে পৌঁছানো যেত কলকাতায়। মাত্র বারো আনা পয়সা খরচ করলেই কলকাতায় যাওয়া যেত। কিন্তু সেই বারো আনা পয়সাই বা তখন কে তাকে দেবে?

মা কাজ করতো চাটুজ্জে বাড়িতে। বারো টাকা মাইনে ছিল মা'র। মাইনের সঙ্গে ছিল মা'র আর ছেলের দু'বেলার খাওয়া। সে যুগে সেটাই কি কিছু?

চাটুজ্জে বাবুরা জমিদার মানুষ।

এক-একদিন সন্দীপও চাটুজ্জে বাড়িতে যেত। কী বিরাট বাড়ি ছিল চাটুজ্জে বাবুদের। কত লোক-জন, কত নায়েব গোমস্তা। ওই চাটুজ্জেবাবুদের ছোট ছেলে কাশীনাথবাবু ছিল উকিল। তার বৈঠকখানায় কত মক্কেল আসতো সন্ধ্যেবেলায়। দূর থেকে সেই দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতো সন্দীপ। মনে হতো যদি কখনও সে ওই কাশীনাথবাবুর মত উকিল হতে পারে তো তার জীবন সার্থক।

কোথায় উকিল আর কোথায় ব্যাঙ্কের ম্যানেজার।

ভাগ্যের কী বিচিত্র পরিহাস।

আলিপুরে সেন্ট্রাল জেলটার দিকে ফিরে তাকালো সন্দীপ। কতগুলো বছর ওখানে কাটলো তার?

কিছুই মনে ছিল না তার। কবে সে সেখানে ঢুকলো আর কতদিন কত বছর পরে সে জেলখানা থেকে বেরুলো, তা হিসেব করতে গেলে তাকে হিমসিম খেয়ে যেতে হবে। আর তা ছাড়া যদি সারা জীবনই তাকে জেলখানার ভেতরে কাটাতে হতো তাতেও তার কোনও আপত্তি ছিল না। আজ ছাড়া পেলেই বা সে কী করবে? সে কোথায় যাবে? কোথায় গিয়ে সে উঠবে?

ট্রাম-রাস্তার ওপর তখন অনেক গাড়ি-বাস ট্রামের রুদ্ধশ্বাস আনাগোনা চলেছে। অথচ আগে তো রাস্তায় এত গাড়ি-ঘোড়ার ভিড় ছিল না। এই কটা বছরের মধ্যেই কি কলকাতার এত পরিবর্তন হয়ে গেছে?

সেই রাস্তার ওপরেই সে চুপ করে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল।

কোথা থেকে কে যেন ডেকে উঠলো—এই সন্দীপ—

সন্দীপ শব্দটার দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখলে। এখানে এত বছর পরে কে তার নাম ধরে ডাকলে। কে তাকে চিনতে পারলে?

যে ভদ্রলোক তাকে ডেকেছিল, সে কাছে এসে বললে—ও সরি, আমার ভুল হয়েছে। আমি সন্দীপ লাহিড়ীকে ডাকছিলুম, কিছু মনে করবেন না।—

সন্দীপ বললে—আমিও তো সন্দীপ, সন্দীপ লাহিড়ী—

ভদ্রলোক বললে—না, সে-সন্দীপ লাহিড়ী আমাদের বঙ্গবাসী কলেজে ইভ্‌নিং সেকসানে ক্লাশ-ফ্রেন্ড ছিল—

সন্দীপ বললে—আমিও তো বঙ্গবাসী কলেজেরই ইভ্‌নিং সেকসানে পড়ে বি-

এ পাশ করেছি —

—তা হতে পারে, কিছু মনে করবেন না --

ভদ্রলোক চলে গেল। আশ্চর্য! সন্দীপও আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল। নামও এক, পদবীও এক, কলেজও এক, সেকসানও এক, এ-রকম সাধারণত বড় একটা হয় না। কিন্তু সন্দীপের জীবনে এত অদ্ভুত-অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটেছে যে তা বললে অনেকে বিশ্বাসও করবে না। অথচ এই যে সেন্ট্রাল জেল থেকে সে বেরিয়ে এল, এর ভেতরেই কি কম বিস্ময়কর ঘটনা ঘটেছে? জেল-সুপার নিজে এসে মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করতেন--কেমন আছেন মিস্টার লাহিড়ী?

জেলের কয়েদীকে জেল-সুপার কেন এত সম্মান দেখাতেন? তবে কি জেল-সুপার সব ঘটনা জানতেন?

কে জানে। অথচ প্রথম থেকে সন্দীপ লাহিড়ী জেলের ভেতরকার সমস্ত আইন কানুন মেনে চলেছে। অন্য কয়েদীদের মত সন্দীপও তো সাধারণ কয়েদী ছাড়া আর কিছু ছিল না। তার ওপর বিশেষ ব্যবহারের দাবীও সে কোনও দিন করেনি। তাকে যা কিছু খেতে দেওয়া হতো তাই-ই সে নির্বিবাদেই খেয়েছে। তাকে যে কাজ করতে আদেশ দেওয়া হতো, তাই-ই সে মাথা নিচু করে করতো। জেলখানার ইতিহাসে এমন অনুগত কয়েদী বোধহয় কেউ কখনও দেখেনি।

এবার কি সে ট্রামে উঠবে? না, পায়ে হেঁটে-হেঁটে যতদূর যাওয়া সম্ভব ততদূরই সে যাবে। টাকা অবশ্য তার পকেটে রয়েছে। অনেক টাকাই রয়েছে। বোধহয় কয়েক শো বা কয়েক হাজার টাকা রয়েছে। জেলখানার অফিসে নিয়ম মাফিক কাজ করার বাবদে যত টাকা সে মাইনে হিসেবে উপায় করেছে, সেই সব টাকাটাই তার নামে এত বছর জমা ছিল। জেলখানার মেয়াদ শেষ হবার পর সেই সমস্ত টাকাগুলোই তার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। চলবার সময় প্যান্টের পকেটের টাকার বাণ্ডিলটা তখনও সে অনুভব করতে পারছে। সন্দীপের মনে হলো ওই টাকার বাণ্ডিলটা যেন টাকার বাণ্ডিল নয়, কাঁটার বাণ্ডিল। টাকাগুলো যেন কাঁটা হয়ে তার শরীরে ফুটছে।

একটা বাড়ির পাশ দিয়ে হেঁটে যেতে-যেতে একটা অদ্ভুত জিনিসের দিকে তার নজর পড়লো। বাড়িটার চওড়া আর লম্বা দেওয়ালে আলকাতরা দিয়ে কী সব লেখা রয়েছে।

সন্দীপ সেখানেই দাঁড়িয়ে লেখাগুলো পড়তে লাগলো। লেখা রয়েছে:

॥ সংগ্রামের আঘাতে আঘাতে স্বৈর শাসকদের
আধা ফ্যাসিবাদী সন্ত্রাসের খড়্গ ভোঁতা করে দাও ॥

কথাগুলো মনে হলো খুব টাট্‌কা লেখা। তখনও ভালো করে আল্‌কাতরার রং শুকোয় নি। সন্দীপ বাড়িটার দিকে আপাদ-মস্তক ভালো করে চেয়ে দেখলে। আহা দেওয়ালে নতুন দামী রং লাগানো হয়েছে। এত ভালো বাড়িটা। এই ক'দিন আগেই বোধহয় অনেক টাকা খরচ করে তৈরি করা হয়েছে। এমন করে আলকাতরা দিয়ে লিখে বাড়িটাকে নষ্ট করে দিলে কারা? লেখাগুলোর নিচে আরো অনেকগুলো শব্দ ছোট ছোট করে লেখা রয়েছে। সেই শব্দগুলোর দিকে চেয়ে

বোঝা গেল না তার মানে কী? শুধু ওই একটা বাড়িতেই নয়, আশে-পাশের প্রায় সব বাড়িগুলোরই ওই এক অবস্থা। কিন্তু সন্দীপের মনে হলো কই, আগে তো কোনও বাড়ির গায়ে এমন সব লেখা থাকতো না। এই ক'বছরের মধ্যে হঠাৎ কারা এমন স্বৈরশাসক হয়ে উঠলো? কোন্ পার্টি?

সন্দীপের মনে পড়লো তাদের বেড়াপোতায় একবার নিবারণকাকারা গিরীশচন্দ্র ঘোষের 'বিল্বমঙ্গল' নাটকটা যাত্রা করেছিল। তার আগে দেওয়ালে-দেওয়ালে হাতে হাতে লেখা পোস্টার আটকে দিয়েছিল। এক-আনা করে টিকিট। বেড়াপোতার চাটুজ্জে-কর্তার নিজের খুব যাত্রা-থিয়েটার করবার সখ ছিল। সরস্বতী আর দুর্গা পুজো হতো চাটুজ্জে বাড়িতে। সেই উপলক্ষ্যে কর্তারা মোটা টাকা চাঁদা দিতেন। দেওয়ালে-দেওয়ালে হাতে লেখা পোস্টার এঁটে দেওয়া হতো। আগামী দুর্গাপুজোর মহা-অষ্টমীর দিনে বেড়াপোতা যাত্রা পার্টির অভিনয় হবে। স্থান স্কুল-বাড়ির মাঠ। টিকিটের দাম মাথা-প্রতি এক আনা। পালা 'বিল্বমঙ্গল'।

মনে আছে চাটুজ্জে মশাই-এর ছেলে কাশীনাথ সেজেছিল চিন্তামণি আর নিবারণকাকা সেজেছিলেন বিল্বমঙ্গল। সে অভিনয় এখনো সন্দীপের মনে আছে। একটা দৃশ্যে থাকো আর চিন্তামণি প্রবেশ করলো। চিন্তামণি জিজ্ঞেস করলে—এই নদী তুমি কী করে সাঁতরে এলে?

বিল্বমঙ্গল বেশী নিবারণকাকা বললেন—এই কাষ্ঠখণ্ড আশ্রয় করে--

চিন্তামণি বেশী কাশীনাথ বললে—এ কী, এ যে শবদেহ—

তখন নিবারণকাকা চমকে উঠেছেন। বললেন—

এই নরদেহ—
জলে ভেসে যায়,
ছিঁড়ে খায় কুকুর-শৃগাল
কিংবা চিতা-ভস্ম পবন উড়ায়
এই নারী—এরও এই পরিণাম
নশ্বর সংসারে,
তবে হায়, প্রাণ দিছি কারে,
কার তরে শবে করি আলিঙ্গন!
দারুণ বন্ধনে ছায়ায় বাঁধিয়া রাখি।
ওই ঊষা—ও-ও ছায়া
মিথ্যা-মিথ্যা-মিথ্যা এ সকলি,
হেরি আজ নিবিড় আঁধার
আমি কার, কে আছে আমার?···

সেই ছোটবেলায় বিল্বমঙ্গলের সেই কথাগুলো শুনতে-শুনতে সে যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। ভুলেই গিয়েছিল যে ও বিল্বমঙ্গল নয়, নিবারণকাকা। নিবারণ-কাকার সেই কথাগুলো সন্দীপের জীবনে আজ এত কাল পরে এমন করে সত্যি হয়ে গেল কী করে? সত্যিই তো—তার জীবনে সবই তো মিথ্যে। মিথ্যে—মিথ্যে—মিথ্যে। এই সব কিছু। এই নারী—এরও এই পরিণাম, নশ্বর সংসারে।

সেদিনকার সেই নিবারণকাকার কথাগুলো এত কাল পরে এমন করে যে সত্যি হয়ে যাবে তা কে জানতো? সত্যিই তো কার জন্যে সে এতকাল এত বছর জেল খাটলো? সত্যিই সব কিছু মিথ্যে। সেই সুজাতা! একলা সেই সুজাতাই যে মিথ্যে তাই-ই নয়, সেই ছোটবাবুও মিথ্যে। ছোটবাবু মানে সেই ঠাকুমা-মণির নাতি সৌম্য মুখার্জি'ও মিথ্যে। সৌম্য মুখার্জি'কেই তখন বাড়ির চাকর, ঠাকুর-ঝি, দরোয়ান সবাই, ছোটবাবু, বলে ডাকতো।

আরো মনে পড়লো মল্লিক-মশাই এর কথা। আজ মনে হলো সেই বিরাট বাড়িটার মত মল্লিক-মশাইও মিথ্যে। অথচ মল্লিক-মশাই দয়া না করলে সে কি একটা গরীব লোকের ছেলে হয়ে এই কলকাতা শহরে এসে আশ্রয় পেত? মা যার পরের বাড়িতে রান্না করে পয়সা উপায় করে, সে যদি গরিব না হয় তো সংসারে আর কে গরীব? মা বড় আশা করতো তার সন্দীপ বড় হয়ে অনেক টাকা উপায় করবে। মা'র স্বপ্ন ছিল তার সন্দীপ উকিল হোক—কারণ উকিল হলে চাটুজ্জে বাড়ির কাশীনাথবাবুর মত অনেক টাকা উপায় করবে। কাশীনাথবাবুর বউ-এর মত সন্দীপেরও একটা সুন্দরী বউ হবে। তখন আর পরের বাড়িতে রাঁধুনীর কাজ করতে হবে না মা'কে।

সেকেণ্ডারি পরীক্ষায় পাশ করবার পরেই কলেজে ঢোকবার পালা।

কিন্তু বেড়াপোতায় তো কলেজ নেই। কলেজে পড়তে গেলে তো কলকাতায় যেতে হবে। কিন্তু থাকবে কোথায় সন্দীপ? কলেজে পড়বার মাইনে কে যোগাবে? কম করে হলেও পাঁচ-ছ'টাকা তো লাগবেই। সে-টাকা কে দেবে? ছেলে পড়িয়ে অবশ্য কিছু টাকা উপায় করা যায়। কিন্তু ছেলে পড়াতে হলেও তো কলকাতায় বাসা করতে হবে। বাসা ভাড়া, খাওয়া খরচ সব কিছুর জন্যেই তো টাকা চাই?

তাহলে ?

প্রথম যেদিন সন্দীপ বিডন্ স্ট্রীটের ওপর 'বারো বাই এ নম্বর বাড়ির ঠিকানা খুঁজে পৌঁছুল তখন মনের মধ্যে কল্পনাও করতে পারেনি যে এই বাড়িটাই তার জীবনের গতি-পথ বদলে দেবে। এই বাড়িটার জন্যেই সে উকিল না হয়ে গেল ন্যাশনাল ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের ম্যানেজার। এই বাড়িটাই তাকে শিখিয়ে দিলে যে বেশি টাকা থাকলেই মানুষ মানুষ হয় না। এই বাড়িটাই তাকে শিখিয়ে দিলে যে টাকার সঙ্গে যেমন সুখের কোনও সম্পর্ক নেই, তেমনি টাকার সঙ্গে মনুষ্যত্বেরও কোন সম্পর্ক নেই। আর মনুষ্যত্বই যদি না থাকলো, তাহলে মানুষের সঙ্গে জানোয়ারের তফাৎটা কোথায় রইল ?

নিবারণকাকার চিঠিটা দিতেই মল্লিক-মশাই সেটা পড়ে বলে উঠলেন—আরে, তুমি বেড়াপোতা থেকে এসেছ ?

তারপর যেন কেমন অসহায়ের মত বললেন—তা বলা-নেই কওয়া-নেই হঠাৎ এসে গেলে ?

মনে আছে সেদিনই প্রথম এই কলকাতাকে অমন গভীর, অমন তীক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে সে দেখেছিল। কলকাতা শহরের বাইরের চেহারাটা দেখে সে সত্যিই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। এই এত বড়-বড় বাড়ি, এই এত চওড়া-চওড়া রাস্তা, এই আলো, এই

লোকজন, এই কর্মব্যস্ততা। এর বাইরের চেহারাটা তাকে বড় নিবিড়ভাবে আকৃষ্ট করেছিল। আর আজ?

আজ শুধু এই শহরই দেখেনি সে। এই শহরের মানুষগুলোকেও তার দেখা হয়ে গেছে। এর অলি-গলি, এর মহত্ত্ব, এর দীনতা, নীচতা, নিষ্ঠুরতা, ভালোবাসা, সব কিছু দেখা শেষ হয়ে গেছে তার। দেখা বাকি ছিল এক জেলখানাটা, তা এখন সেটাও দেখা শেষ হয়ে গেল। এই কলকাতার আর কিছু দেখবার ইচ্ছেও নেই তার। দেখবার লোভও নেই আর এখন।

মল্লিক মশাই বলেছিলেন—তা তুমি তো ভোর চারটেয় ঘুম থেকে উঠে বেড়াপোতা ইস্টিশানে ট্রেণ ধরেছ, তাহলে এখনও তোমার কিছু খাওয়াও হয়নি--

সন্দীপ বলেছিল--না, আমি শেয়ালদা স্টেশনে নেমে খেয়ে নিয়েছি—

--কী খেয়েছ?

—মিষ্টি।

মল্লিক মশাই-এর সামনে ক্যাশ বাক্স খোলা ছিল। বাক্সের ডালাটা সঙ্গে-সঙ্গে বন্ধ করে দিয়ে তাতে চাবি বন্ধ করে নিয়ে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। বললেন--বাড়ি খুঁজতে তোমার কষ্ট হয়নি তো?

সন্দীপ বললে,—না, নিবারণকাকা রাস্তার নাম, বাড়ির নম্বর সব বলে দিয়েছিলেন।

মল্লিক মশাই বললেন—যাই বাড়ির ভেতরে গিয়ে ঠাকুরকে তোমার খাওয়ার কথা বলে আসি গে—

তারপর সন্দীপের বাঁ হাতটার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন—তোমার হাতে ওটা কী?

--ঘি।

—ঘি? ঘি কী জন্যে?

সন্দীপ বললে--এটা আপনার জন্যে। মা বললে-কলকাতায় মল্লিক-মশাই এর কাছে যাচ্ছো, খালি হাতে যেতে নেই। এই সামান্য জিনিসটা সঙ্গে নিয়ে যাও--

একটা কালো রং-এর মাটির ছোট হাঁড়ি। তাতেই ঘি'টা ছিল। মা পরের বাড়ি ঝি-গিরি করে যে-কটা টাকা পেত তাই দিয়েই কিছু দুধ কিনে ঘি তৈরি করে ছিল মল্লিক-মশাই এর জন্যে। সেটাই সন্দীপ সাবধানে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল।

এতদিন পরে আবার সেই বিরাট বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়াল। সেই বারো-বাই-এ বিডন্ স্ট্রীট। আগে এখানে দোকান-ঘর ছিল না। সামনেটা ছিল খোলা মেলা। দরোয়ান রাত ন'টার সময়েই লোহার গেট বন্ধ করে দিত। রাত ন'টার মধ্যে গেটবন্ধ না করলে দরোয়ানের জরিমানা হয়ে যেত। এ-ব্যাপারে ঠাকুমা-মণির ছিল কড়া হুঁশিয়ারি। ঠাকুমা-মণির হুকুম অমান্য করলে নির্ঘাৎ চাকরি চলে যাবার ভয় ছিল।

মনে আছে সেদিন তার মনে পড়েছিল বহুদিন আগে পড়া একটা গল্পের কথা। সে গল্পটার নাম 'সাহেব বিবি গোলাম'। ওই চাটুজ্জে-মশাইদের বাড়ি থেকেই

বইটা সে পড়তে নিয়ে এসেছিল। সেই বইটাতেও ঠিক এই রকম ঘটনা ছিল। ভূতনাথ ফতেপুর গ্রাম থেকে কলকাতায় বহুবাজার স্ট্রীটের একটা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। সেই ভূতনাথের মনেও সেদিন যে-বিস্ময়, যে-কৌতূহল, যে-ভয়, যে- উদ্বেগ আর যে দীনতাবোধের উদ্ভব হয়েছিল, সন্দীপের মনেও সেই একই প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। আশ্চর্য্য সেদিন সেই গল্পটার লেখক নায়কের মানসিকতার বর্ণনা দিয়েছিল, তার সঙ্গে সন্দীপের মানসিকতার পরিচয় এমন হুবহু মিলে গিয়েছিল কী করে?

মল্লিক মশাই মাটির হাঁড়িটার মুখের ন্যাকড়ার ঢাকনিটা খুলে ডান হাতের কড়ে আঙুলটা ভেতরে দিয়ে বাঁ হাতের তালুর উল্টো দিকে খানিকটা ঘষে নিলেন। তারপর সেই জায়গাটা নাকের কাছে এনে শুঁকে দেখে বললেন—তাই তো, এ যে খাঁটি ঘি দেখছি।

সন্দীপ বললে—হ্যাঁ—

মল্লিকমশাই বললেন—তা বেড়াপোতায় এখনও খাঁটি ঘি পাওয়া যায়?

সন্দীপ বললে—হ্যা কাকাবাবু, পাওয়া যায়। এখনও বেড়াপোতার গোয়ালারা মনে প্রাণে বিশ্বাস করে যে দুধে জল মেশালে গরু মরে যায়—

—ভালো ভালো, এই ভেজালের যুগেও যে এত ভালো লোক আছে, এটাই দেশের পক্ষে সুলক্ষন। না যাকগে, তুমি এই তক্তপোষটার ওপর বোস, আমি বার-বাড়ির ঠাকুরকে বলে আসি তোমার খাবারের ব্যবস্থা করতে—

সেই দিন আর আজ! আজ কত তফাৎ! মনে পড়লো জেল-সুপারের একটা কথা। পরদিন চারদিক নিরিবিলি দেখে একদিন তিনি সন্দীপকে জিজ্ঞেস করেছিলেন—আচ্ছা মিস্টার লাহিড়ী, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করবো?

সন্দীপ অবাক হয়ে গিয়েছিল জেল-সুপারের কথা শুনে। সে একজন কয়েদী। তাঁর সঙ্গে অত বড় গভর্মেণ্ট অফিসার অত সমীহ করে কথা বলছেন কেন?

সন্দীপ বললে—বলুন না কী বলবেন—

—জিজ্ঞেস করছি আপনি কি সত্যিই ব্যাঙ্কের একজন ম্যানেজার হয়ে নব্বই লাখ টাকা চুরি করেছিলেন? আপনাকে এত বছর ধরে দেখে আসছি। সত্যিই ব্যাপারটা আমার বিশ্বাস হয় না—

কথাটার সঙ্গে তার মনে পড়ে গিয়েছিল অলকার কথা। অলকাও একদিন তার

কাছে এসে কেঁদে পড়েছিল। কাঁদতে-কাঁদতে অলকার চোখ-নাক-মুখ সব লাল হয়ে উঠেছিল।

সংসারে কেউ আমার নেই। এই বিপদের দিনে তুমি ছাড়া আর কে আমাকে বাঁচাবে বলো! এখন তুমি না বাঁচালে আমি সত্যি বিষ খেয়ে আত্মঘাতী হবো—

সন্দীপ অলকার এ-কথার কোনও জবাব দেয়নি প্রথমে।

অলকা বলেছিল—সত্যিই কি তুমি আমার মরা মুখ দেখতে চাও?

তখনও সন্দীপের মুখে কোনও কথা বেরোয়নি!

অলকা তখন তার পায়ের ওপর মাথা ঠেকিয়ে উপুড় হয়ে কাঁদছে।

সন্দীপ বলেছিল—ওঠো অলকা, ওঠো—

সেই রকম সন্দীপের পায়ের ওপর মাথা ঠেকিয়েই অলকা কাঁদতে-কাঁদতে বলেছিল—আমি কিছুতেই উঠবো না—আগে কথা দাও তুমি আমাকে বাঁচাবে!

সন্দীপ তখন বাধ্য হয়ে অলকার দু'টো হাত ধরে টেনে তোলবার চেষ্টা করেছিল। জীবনে সেই-ই প্রথম অলকার গায়ে হাত দেওয়া। অলকা বলেছিল—আগে বলো তুমি আমাকে বাঁচাবে। আমি যা চাই তুমি তাই-ই আমাকে দেবে?

—কিন্তু···

অলকা সন্দীপের কথা শেষ হতে দেয়নি। বললে—একদিন যে তোমার সঙ্গেই আমার বিয়ে হবার কথা ছিল। সেই সব কথা মনে করেও না হয় তুমি আমাকে বাঁচাও—

সন্দীপ তখনও চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। একটা কথাও তার মুখ দিয়ে বেরোয়নি। অলকা তখন নিজেই তার দুটো পা ছেড়ে তার হাত দুটো ধরে সন্দীপের মুখোমুখি সোজা হয়ে দাঁড়ালো।

বলেছিল—কই, তুমি কিছু কথা বলছো না যে? আমি কি তাহলে তোমার কেউ নই? আমি কি মনে করবো তুমি যা-কিছু এতদিন আমাকে বলেছ সব মিথ্যে? বলো-বলো সন্দীপ, চুপ করে থেকো না, সত্যিই কি সে-সব মিথ্যে?

এতক্ষণে সন্দীপের মুখে কথা বেরোল। বলেছিল—আমি তোমাকে কী বলেছি? আমি তো কোনও দিন কখনও তোমাকে কোনও কথা বলিনি?

অলকা বলেছিল—মুখে হয়ত বলোনি, কিন্তু মুখের কথাটাই কি সব? মুখ দেখে কি মনের কথা বোঝা যায় না?

এ-সব অনেক দিন আগেকার কথা। আগের কথা হলেও আজ এত বছর পরে সন্দীপের সব স্পষ্ট মনে আছে। সেদিন সেই অবস্থায় তখন নিবারণকাকার কথাই মনে পড়েছিল সন্দীপের। সেই 'বিল্বমঙ্গল' নাটকের অভিনয়ে নিবারণকাকার কথাগুলো। মনে পড়েছিল 'চিন্তামণি' আর 'থাকো'র সামনে নিবারণকাকার স্বগতোক্তি···

এই নরদেহ,
জলে ভেসে যায়—
ছিঁড়ে খায় কুক্কুর শৃগাল
কিংবা চিতা-ভস্ম পবন উড়ায়

এই নারী—এরও এই পরিণাম
নশ্বর সংসারে···

সামনে দাঁড়িয়ে ছিল অলকা। কিন্তু সেদিন সন্দীপের মনে হয়েছিল ও অলকা নয়, ও যেন বিশাখাও নয়, ও যেন চিন্তামণি! আর সন্দীপ নিজেও যেন তখন বিল্বমঙ্গল। যেন তারজীবনেও তখন বিল্বমঙ্গলের মত এক দারুণ বিপর্যয় নেমে এসেছে। যেন জীবন মৃত্যুর এক সন্ধিক্ষণ ঘনিয়ে এসেছে।

আলিপুর সেন্ট্রাল জেলখানা থেকে হাঁটতে হাঁটতে তখন সন্দীপ সোজা চলে এসেছে সেই 'বারো-বাই-এ' বিডন্ স্ট্রীটের বাবুদের বাড়িটার সামনে। এতখানি রাস্তা হেঁটে আসতে কতক্ষণ যে সময় লেগেছে, তারও খেয়াল ছিল না সন্দীপের।

এই বাড়িটার ভেতরেই যে একদিন সন্দীপের নিজের জীবনের গন্তব্য-পথ চির কালের মত সুনির্দিষ্ট হয়ে যাবে, তা কি সেদিন জানতো? সেদিন কি এখনকার মত সে একবারও প্রার্থনা করেছিল যে পরম মানবের বিরাটরূপে যাঁর স্বতঃপ্রকাশ আমারই মধ্যে তাঁর প্রকাশ সার্থক হোক?

না সেই অল্প-বয়েসে সেই বঙ্গবাসী কলেজে রাত্রে আই-এ বি-এ পড়বার সময় তার সে জ্ঞান একেবারেই হয়নি। তখন সে জানতো না যে মানুষের দেবতাই মানুষের মনের মানুষ! আমরা জ্ঞানে, কর্মে, ভাবে যে পরিমাণে সত্য হই সেই পরিমাণেই সেই মনের মানুষ পাই। কেবল অন্তরে বিকার ঘটলেই সেই আমার আপন মনের মানুষকে আর সেই মনের মধ্যে দেখতে পাই না।

এ-সব কথা জেলখানার মধ্যে একলা সমস্ত পৃথিবী থেকে বিছিন্ন হয়েই সে উপলব্ধি করতে পারেনি। নিজের কাছে নিজেকে নিজের করে পেতে হলে তাই বোধহয় নিঃসঙ্গ হওয়া দরকার।

আসলে 'অলকা' নামটা তো অলকার নিজের নাম নয়। বাবুদের বাড়ির ঠাকুমা-মণিই ওই নামটা দিয়েছিল। অলকা নামটা-তার গরীব বাপ-মায়ের দেওয়া নাম নয়। তারা নাম রেখেছিল 'বিশাখা'।

ঠাকুমা-মণি বলেছিল—না-না, ও-নামটা ভালো নয়, আমার নাতবউ-এর এমন একটা নাম দিন ঠাকুরমশাই, যে নামটা বড়লোকের বউ-এর মানাবে—

শুধু নাম নয়, ভাবী নাত-বউএর জন্ম-কুণ্ডলীটাও আনিয়ে নিয়েছিলেন ঠাকুমা-মণি। তারপর মল্লিকমশাইকে পাঠিয়েছিলেন বারাণসীতে। বারাণসীতেই মুখুজ্জে-পরিবারের গুরুদেব থাকেন।

গুরুদেব এলে তাঁকে দেখানো হলো কন্যার জন্মকুণ্ডলীটা।

এই জন্মকুণ্ডলীটা দেখে গুরুদেব বললেন—কুমারী বিশাখা গঙ্গোপাধ্যায়।

নামই শুধু নয়, গণ রিষ্টিও দেখলেন।

বললেন—কন্যা পিতৃহন্ত্রী।

ঠাকুমা-মণি বললে—ভালো করে কুণ্ডলীটা দেখুন ঠাকুর-মশাই, আমি এই কন্যার সঙ্গেই আমার নাতি সৌম্যর বিয়ে দিতে চাই—

গুরুদেব বললেন—তাহলে শ্রীমানের কুণ্ডলীটা একটু দেখাও মা। আমি যোটক-বিচার করে দেখি—

ঠাকুমা-মণি সৌম্যর কুণ্ডলীটাও দেখালেন।

যোটক-বিচার করে কী দেখলেন ঠাকুরমশাই?

প্রথমে লগ্নপতির অবস্থান দেখলেন, তারপর দেখলেন অষ্টমপতির অবস্থান এবং অষ্টমভাব। খুব কঠিন বিচার। তারপর সপ্তমপতি এবং সপ্তমভাব। জাতক-জাতিকার পঞ্চম-ভাব দেখাও দরকার। কারণ দম্পতির সন্তান-সন্ততির ভালো মন্দ সবই নির্ভর করে পঞ্চমপতি এবং পঞ্চম-ভাবের ওপর। আর শুধু তো সন্তান-সন্ততি দেখলেই চলবে না, মাতা গৃহ বন্ধু-সুখ বিচার করতে গেলে জাতক-জাতিকার চতুর্থ-স্থানের বলাবলও দেখতে হয়। তারপর দ্বিতীয়-পতি একদিকে যেমন ধন-পতি তেমনি আবার নিধন-পতিও বটে।

প্রথম দিনে বিচার শেষ হলো না। গুরুদেব বললেন—একদিনে হবে না বিচার মা। আরো দু'তিন দিন লাগবে। বড় জটিল কুণ্ডলী—

ঠাকুমা-মণি জিজ্ঞেস করলেন—কার কুণ্ডলী জটিল ঠাকুরমশাই? পাত্রের না পাত্রীর?

গুরুদেব কুণ্ডলী দু'টোর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে দেখতে-দেখতে বললেন—বিংশোত্তরী মতে জাতক-জাতিকা দু'জনের কুণ্ডলীরই রাজ-যোটক ফলাদেশ রয়েছে। কিন্তু অষ্টোত্তরীও তো বিচার করতে হবে। অষ্টোত্তরী মতে জাতকের মধ্য বয়সে রিষ্টির লক্ষণ আছে—

—তার মানে? প্রাণ সংশয় আছে নাকি আমার নাতির?

গুরুদেব বললেন—আজ থাক, পরে বিশ্রাম নিয়ে সবিস্তারে ভেবে বলতে হবে—আর দু'তিন দিন সময় লাগবে—

তা সময় লাগুক তবু দেখতে হবে যদি কোথাও কোনও বাধক থাকে তো তার প্রতিকারও করতে হবে।

শেষকালে দু'দিন ধরে সেই কুণ্ডলী দু'টোর বিচার শেষ করলেন গুরুদেব। তিনি যথারীতি মোটা রকমের প্রণামী এবং দক্ষিণা নিয়ে আবার বারাণসী ফিরে গেলেন। যাবার সময় অন্যান্য প্রতিকারের সঙ্গে একটা কথা শুধু বলে গেলেন। বললেন—এই কন্যা কোথায় থাকেন?

ঠাকুমা-মণি বললে—খিদিরপুরে, মনসাতলা লেনে। নিজের কাকার কাছে।

—কাকার অবস্থা কেমন?

ঠাকুমা-মণি বললে—খুবই গরিব। বিধবা মা এই বিশাখাকে নিয়ে দেওরের কাছে গলগ্রহ হয়ে আছে—

গুরুদেব বললেন—কিন্তু কন্যার একাদশে চতুর্থ-পতি এবং সপ্তম-পতি বৃহস্পতি তুঙ্গে। সুতরাং অর্থ-ভাগ্য ভালো। সেই বৃহস্পতি লগ্নের তৃতীয় স্থানে বৃশ্চিকে দৃষ্টি দিয়ে আত্মীয়-কুটুম্বদের সঙ্গে শুভ সম্পর্ক স্থাপন করবে আর মকরে সপ্তম দৃষ্টি দিয়ে লগ্নের পঞ্চম-মীনে মানে সন্তান-সন্ততির শুভ সূচনা করছে আর মীনে নিজের গৃহে নবম দৃষ্টি দিয়ে স্বামীরও শুভ করবে—

বলে আবার একটু থামলেন। তারপর কী ভেবে নিয়ে আবার বললেন—সপ্তম-পতিই সপ্তমকে দেখছে, এটা খুব শুভ-যোগ—

ঠাকুমা-মণি আবার বললেন—আপনি যে বললেন আমার নাতির মধ্য-বয়সে একটা ফাঁড়া আছে।

গুরুদেব বললেন—এখন তোমার নাতির বয়েস কত মা ?

—সৌম্যের বয়েস ? সে তো এখন সবে ষোল'য় পড়লো। এখনও ইস্কুলেএ পড়ে—

গুরুদেব বললেন—তাহলে তো এখন অনেক দেরি। সে তখন দেখা যাবে। এখন থেকে আর অত পরের কথা ভেবে কী হবে। তবে একটা কথা বলতে চাই—

—কী কথা বলুন ঠাকুর-মশাই ?

—তোমার ওই ভাবী নাত-বউএর 'বিশাখা' নামটা বদলাতে হবে—

—তার বদলে কী নাম দেব বলুন ?

—স্বরবর্ণের প্রথম অক্ষর 'অ' দিয়ে নামকরণ করলে ভালো হয়—

ঠাকুমা-মণি বললে 'অ' অক্ষর দিয়ে আপনিই একটা নামকরণ করুন না—

গুরুদেব বললেন—তাহলে 'বিশাখা'র বদলে 'অলকা' নাম দাও মা—

তা সেই নামই রাখার সিদ্ধান্ত হলো। তখন থেকে নাম হলো 'বিশাখা'র বদলে 'অলকা'।

এ-সব আজ থেকে অনেক দিন আগেকার কথা। মল্লিক-মশাইএর কাছে শোনা এ-সব গল্প। সন্দীপ তখন সবে বেড়াপোতা থেকে এই মুখুজ্জে বাড়িতে মল্লিক-মশাই-এর এক হাঁড়ি ঘি নিয়ে কলেজে পড়তে এসেছিল। ওই লোহার গেটটার বাঁ দিকে ছিল মল্লিক-মশাইএর ঘর। তারই মেঝেতে সন্দীপ রাত্রে শুয়ে থাকতো। আর সারাদিন মল্লিক-মশাইএর ফাই-ফরমাস খাটতো। মল্লিক-মশাই-এর বয়েস হয়ে গিয়েছিল। তার খাটবার ক্ষমতা কমে এসেছিল তখন। ঠাকুমা-মণিকে বলে মল্লিক-মশাই-ই এই ব্যবস্থা করেছিল। ঠাকুমা-মণিও মল্লিক-মশাইএর কথায় রাজি

হয়েছিল। বলেছিল—ঠিক আছে সরকার-মশাই, আপনি যখন বলছেন, তখন আনুন তাকে এখানে।

মল্লিক-মশাই বলেছিল—আমার খুব জানাশোনা ছেলে, তারাও ব্রাহ্মণ। বাপ নেই, মা পরের বাড়িতে রান্না-বান্নার কাজ করে যা পায়, সেই পয়সাতেই ছেলেকে মানুষ করে তুলেছে—

—কী নাম ?

—সন্দীপ কুমার লাহিড়ী।

—তা ঠিক আছে। চোর-ছ্যাঁচোড় না হলে এখানে খাবে, আর মাস গেলে পনেরো টাকা পাবে। তাতে রাজি হবে তো ?

মল্লিক মশাই বলেছিলেন—খুব রাজি হবে। এ-চাকরি পেলে সে বেঁচে যাবে। তার মা'র দুঃখও ঘুচবে—

সেই-ই হচ্ছে সূত্রপাত। সেই সূত্র ধরেই সন্দীপের কলকাতায় আসা এবং এই সামনের বাড়িটার জীবন-প্রবাহের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠা।

মল্লিকমশাই তার দফতরে সন্দীপকে রেখে বার-বাড়ির ভেতরে তার খাওয়ার বন্দোবস্ত করতে চলে গেল। আর সন্দীপ তখন মল্লিকমশাই-এর তক্তপোষটার ওপর বসে ঘরের চারদিকটা দেখতে লাগলো। কত কাগজপত্র কত খেরো খাতা, কত হিসেব নিকেশের বই, র‍্যাকের ওপর যে থরে-থরে সাজানো রয়েছে তার ঠিক নেই। এই এরই মধ্যে তাকে দিনের পর দিন কাটাতে হবে, শুতে হবে আর চাকরি করতে হবে আর রাত্রে বঙ্গবাসী কলেজে গিয়ে পড়তে হবে। পড়ে বি-এ পাশ করতে হবে। তারপরে ল' পাশ করে উকিল হয়ে সে মা'কে নিয়ে এসে এই কলকাতায় বাসা ভাড়া নিয়ে জীবন কাটাবে। এই তার স্বপ্ন, এই স্বপ্নকেই সে বাস্তবে রূপ দেবে, আর তারপর···তারপর···তারপর···

হঠাৎ কা'র গলার শব্দে যেন সে চমকে উঠলো।

—কে মশাই আপনি ? ওপর দিকে চেয়ে কী দেখছেন ?

সব স্বপ্নের জাল যেন ছিঁড়ে ছই-ছত্রাকার হয়ে গেল। সুদূর অতীত-জগৎ থেকে সে এক নিমেষে যেন বর্তমানের কঠোর বাস্তবের পাথরে এসে ছিটকে পড়লো।

কে আপনি ? কী দেখছেন অমন করে ওপর দিকে চেয়ে ?

একে তার এই পোষাক, তার ওপর কয়েক দিন দাড়ি কামানো হয়নি, তাই বোধহয় সকলের সন্দেহ হচ্ছে তাকে। সন্দীপ চেয়ে দেখলে সেদিকে। শুধু একজন নয়, আশে-পাশের কয়েকজন লোকই বোধহয় তাকে সন্দেহী দৃষ্টি দিয়ে দেখছে। তাদের কথার উত্তর না দিয়ে সন্দীপ সেই 'বারো-বাই-এ' নম্বর বাড়িটার সামনে থেকে সরে গেল। ওদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। ওরা এ-যুগের ছেলে। ওরা সে-সব দিনের কথা জানে না। ওই যে বাড়িটার উল্টোদিকে, সোনা-রুপোর গয়নার দোকান হয়েছে, ওখানে আগে একটা খাবারের দোকান ছিল। তখন খুব বিক্রি হতো খাবার। মিষ্টির সঙ্গে সঙ্গে তেলেভাজাও বিক্রি হতো একপাশে। আর ওই যে দেয়ালের গায়ে একটা পান-বিড়ি-সিগারেটের দোকান রয়েছে, ওটা তখন ছিল না। কত কী সব বদলে গেছে এই রাস্তার। ওই ওরা তা জানে না এখানে একদিন

মাঝরাত্রে কী পৈশাচিক একটা কাণ্ড ঘটে গিয়েছিল। তখনকার দিনের লোক যারা ছিল তারা সবাই ওই মুখুজ্জে-বাড়ির সামনে ভীড় করেছিল কাণ্ডটা দেখতে। তারা নিশ্চয়ই এখনও বেঁচে আছে। কিন্তু এখন হয়ত আর রোয়াকে বসে আড্ডা দেবার বয়েস নেই তাদের। এখন যারা এখানকার পাড়ায় দল বেঁধে আড্ডা মারে, ঘটনাটা বললে তারা শুনে চমকে উঠবে। এক-একটা নতুন যুগ আসে আর আগের যুগটা বাতিল হয়ে যায়। কিন্তু সত্যিই কি তা বাতিল হয়? যে-সূর্যটা দিনের পর দিন উদয় হয়ে অস্ত যায় আর রোজ—রোজ নব জন্ম নিয়ে বিরাজ করে তাকে কি কেউ বাতিল করতে পারে? এমন শক্তিধর ব্যক্তি কি প্রতিষ্ঠান কিছু আছে?

না, এই ছেলে-ছোকরারা কেউ সে ঘটনার কথা জানে না। সে ঘটনার কথা জানতে চায়ও না। কিন্তু সন্দীপ সে-ঘটনার কথা চোখে না-দেখলেও কানে শুনেছে, কাগজের পাতায় পড়েছে। আজ ঠিক আন্দাজ করে সেই জায়গাটাতেই এসে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু রাস্তার লোকের অহেতুক কৌতূহলের ঠেলায় বেশিক্ষণ সেখানে দাড়াতে পারলো না সে। অথচ যদি সবাই জানতে পারতো যে সে নিজেও সেই সেদিনকার খুন-খারাবির সঙ্গে জড়িত তাহলে হয়ত অবাক হয়ে যেত তারা।

ঘড়ির কাঁটাতে রাত ক'টা? রাত একটা কি দু'টো কি তিনটেও হতে পারে। কেউ তা সঠিক বলতে পারবে না। কারণ পাড়ার কেউ-ই তখন জেগে ছিল না। যখন জানা গেল তখন ভোর বোধহয় চারটে। শীতকালের ভোর চারটে মানে চার দিকে তখনও জমাট অন্ধকার।

ইনকাম-ট্যাক্স-অফিসার দক্ষিণ ভারতের অধিবাসী মিস্টার বরদারাজন গুরুস্বামী বরাবর ভোর চারটের সময় প্রাতঃ ভ্রমণ করতে বেরোন। সেদিনও তেমনি বেড়াতে বেরিয়েছেন। সেণ্ট্রাল এ্যাভিনিউ-এ তাঁর বাড়ি থেকে বেরিয়ে রোজ বিডন স্ট্রীট ধরে তিনি যেমন কর্ণওয়ালিশ স্কোয়ারে বেড়াতে যান সেদিনও তেমনি বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। হাতে একটা ছড়ি। রাস্তা ফাঁকা। কোথাও কেউ নেই। তিনি আপন মনে নানাকথা ভাবতে-ভাবতে চলেছেন—

হঠাৎ রাস্তার ওপর ভারি লম্বা একটা জিনিস পড়ে থাকতে দেখে তিনি থমকে দাঁড়ালেন। ভালো করে নজর করে দেখতে গেলেন। কী ওটা? ওটা কী পড়ে আছে ওখানে? কে ফেলেছে? কী জিনিস?

কিছুক্ষণ পরেই বুঝতে পারলেন ওটা একটা মানুষ। একটা মানুষ রাস্তার মাঝখানে আড়াআড়ি পড়ে আছে। হয়ত শুয়ে আছে, ঘুমোচ্ছে—

কিন্তু রাস্তার ওপরে কি কেউ অমন করে শুয়ে থাকে? বিশেষ করে এই শীতকালে! মাথাটা নিচু করে স্পষ্টভাবে দেখতে গিয়েই মিস্টার গুরুস্বামী চমকে দু'পা পেছিয়ে এলেন। লোকটা তো মরে গেছে। তখন কী যে তাঁর করণীয় তা তিনি বুঝে উঠতে পারলেন না!

তাঁর চারপাশে তিনি চেয়ে-দেখলেন কেউ কোথাও নেই। সবাই শীতের জড়তায় লেপ-কম্বল মুড়ি দিয়ে জানালা দরজা বন্ধ করে আরাম করে ঘুমোচ্ছে—

হঠাৎ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের দিক থেকে ঠিকরে আসা একটা গাড়ির হেড্-লাইট-এর আলোয় একটু স্পষ্ট হলো সেটা। কিন্তু সে মাত্র সেকেন্ডের জন্যে। তার-

পরেই আবার গাঢ় অন্ধকার।

কিন্তু সেই এক সেকেণ্ডের মধ্যেই তিনি বুঝতে পারলেন ওটা একটা মানুষের মৃতদেহ বটে কিন্তু পুরুষের মৃতদেহ নয়। মৃতদেহ একজন মহিলার।

মিস্টার গুরুস্বামী ওপরের দিকে চেয়ে দেখলেন। যে-বাড়িটার নিচে মৃতদেহটা পড়ে ছিল ঠিক তার ওপরেই একটা তেতলাবাড়ির ঝুল-বারান্দা। ঝুল-বারান্দাটা ফুটপাথের ওপরে তিন-ফুটের মতন বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে। মনে হয় ওখান থেকেই কেউ মৃতদেহটা ফেলে দিয়েছে। কিংবা মহিলাটি ওই ঝুল-বারান্দা থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছে···

মিস্টার গুরুস্বামী তখন এই ভীষণ আবিষ্কারের আতঙ্কে থর থর করে কাঁপছেন। তিনি বাড়িটার সামনের গেটের পাশের থামের ওপর লেখা বাড়ির নম্বরটা দেখে নিলেন। বারো-বাই-এ বিডন স্ট্রীট।

তিনি আর সেখানে দাঁড়ালেন না। সোজা কাছাকাছি পুলিশের থানার সন্ধানে বেরোলেন। তিনি জানতেন কোথায় ও-এলাকার থানাটা।

শেষ রাতের পুলিশের থানা। থানার লোকরাও শীতে জড়সড় হয়ে আছে। যারা ডিউটিতে ছিল তারাও তখন রাত জেগে ক্লান্ত। শীতের জড়তার সঙ্গে অনিদ্রার জড়তাও তাদের মুখে লেগে ছিল। এমন সময় মিস্টার গুরুস্বামীকে দেখে যেন একটু বিরক্ত হয়েছে এমনি তাদের হাব-ভাব।

—ও. সি আছেন ?

একজন জবাব দিলে—তিনি কোয়ার্টারে, ঘুমোচ্ছেন। কেন ?

মিস্টার গুরুস্বামী বললেন—একটা কেস লেখাতে এসেছি।

—কেস ? কী কেস ?

—একটা এ্যাক্সিডেন্টের কেস।

—কী এ্যাকসিডেণ্ট ?

মিস্টার গুরুস্বামী বললেন—এ্যাকসিডেণ্ট, কি মার্ডার, কি সুইসাইড, তা জানি না। তবে আমি যা নিজের চোখে দেখেছি তাই- আপনাদের কাছে রিপোর্ট করতে এলাম।

—আপনার বাড়ি কোথায় ? আপনি কোথায় থাকেন ? আপনার নাম কী ?

মিস্টার গুরুস্বামী নিজের ফ্ল্যাটের ঠিকানা, রাস্তার নাম বললেন। তারপর তিনি কে বা কী কাজ করেন তা বললেন। বললেন—আমি কলকাতার একজন ইনকাম-ট্যাক্স অফিসার—

এতে বোধহয় একটু কাজ হলো। একটু নড়েচড়ে বসলো পুলিশ-ভদ্রলোক। বললে—আপনি বসুন স্যার, বসুন, দাঁড়িয়ে আছেন কেন ? দাঁড়ান ডায়েরি-খাতাটা বার করি—

বলে গরমের কম্বলটা ঝেড়ে ফেলে খাতা টেনে নিয়ে লিখতে লাগলো।

—কী নাম বললেন ?

—বরদারাজন গুরুস্বামী।

—ইনকাম-ট্যাক্স-অফিসার ? কোন ডিভিশন ?

সব লেখা হলো। তারপর কী দেখেছেন মিস্টার গুরুস্বামী তার বিবরণ। বারো-বাই-এ বিডন স্ট্রীটের বাড়ির সামনে একটা মহিলার লাশ।

—কী রকম চেহারা?

—অন্ধকারে তা দেখতে পাইনি ভালো করে।

—কী রকম গায়ের রং?

—তাও দেখতে পাই নি,

—বয়েস?

—যা মনে হয়েছে তাই বলতে পারি। পনেরোও হতে পারে পঁচিশও হতে পারে—আপনারা এখনি গেলেই দেখতে পাবেন। লাশটা নিশ্চয়ই এখনও সেই জায়গাতেই পড়ে আছে—

কাজ শেষ করে মিস্টার গুরুস্বামী থানা থেকে বেরিয়ে পড়লেন। তারপর আর কী হলো, তা তিনি জানতে পারলেন না।

মনে আছে খবরটা পড়ে সন্দীপ চমকে উঠেছিল। কিন্তু অলকাকেও কিছু বলেনি। কারণ বহুদিন আগেকার সেই যাত্রায় দেখা দৃশ্যটা তখনও তার চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল। নিবারণকাকার সেই অভিনয়, বিল্বমঙ্গলের সেই উপলব্ধি, সেই প্রজ্ঞা, সেই সখেদ স্বগতোক্তি, সে কি ভোলার জিনিস? সারাজীবন ধরে কথাগুলো তার মনে গাঁথা আছে। তাই 'বারো-বাই-এ' বিডন স্ট্রীটের বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে সে মনে মনে স্মরণ করতে লাগলো

এই নরদেহ—
জলে ভেসে যায়
ছিঁড়ে খায় কুক্কুর শৃগাল
কিংবা চিতা-ভস্ম পবন উড়ায়
এই নারী-এরও এই পরিণাম
নশ্বর সংসারে।...

॥ বিস্তার ॥

দু'তিন দিনের মধ্যেই সন্দীপ এই নতুন বাড়ির হাল-চাল বুঝে ফেললে। বেড়াপোতায় মা'কেও একটা পোস্টকার্ড লিখে পাঠিয়ে দিলে। চিঠিতে লিখলে—শ্রীচরণেষু, মা, আমি নিরাপদে কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি। মল্লিকমশাই তোমার ঘি পাইয়া খুবই আনন্দিত হইয়াছেন। তুমি আমার জন্য ভাবিও না। আমি এখানে কুশলেই আছি। দু'একদিনের মধ্যে আমি রাত্রিবেলার কলেজে ভর্তি হইব। লেখা-পড়া এখনও আরম্ভ করি নাই। বাবুরা আমাকে মাসে-মাসে পনেরো টাকা মাইনে দিবেন বলিয়াছেন। তুমি আমার প্রণাম জানিবে। ইতি প্রণতঃ—সন্দীপ কুমার লাহিড়ী।' চিঠির মাথায় ঠিকানা ও তারিখ দিয়ে দিলে।

সন্দীপ জানতো মা চিঠি পড়তে পারবে না। চাটুজ্জেবাড়ির কারুকে দিয়ে পড়িয়ে নেবে। কিংবা নিবারণকাকাকে দিয়েও পড়িয়ে নিতে পারে। গ্রামের ক'জনই বা লেখা-পড়া জানে! ক'জনই বা তার মত হায়ার সেকেন্ডারি পাশ!

মল্লিকমশাই বললেন—তুমি মা'কে চিঠি লিখে দিয়েছ?

সন্দীপ বললে—হ্যাঁ—

মল্লিকমশাই বললেন—আজ বঙ্গবাসী কলেজে গিয়ে ভর্তি হবে তো, তোমার কাছে টাকা আছে? ভর্তি হবার সময় তো কিছু টাকা লাগবে—

সন্দীপ বললে—এখন তো হাতে টাকা নেই। মাইনে পেয়ে তবে না-হয় ভর্তি হবো!

—কিন্তু তখন যদি ক্লাশে আর জায়গা না থাকে, তখন? তখন তো একটা বছর নষ্ট হয়ে যাবে তোমার! তার চেয়ে আমি তোমাকে টাকা দিচ্ছি, সেই টাকাতে ভর্তি হয়ে নাও আজই, পরে মাইনে পেয়ে আস্তে-আস্তে শোধ করে দিও—

মল্লিকমশাই তার হাতে তিরিশটা টাকা দিলেন। সন্দীপ টাকা ক'টা হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ বিহ্বল হয়ে রইল। জীবনে একসঙ্গে এত টাকা সে কখনও দেখেনি আগে। মা চাটুজ্জেবাড়ি চাকরি করেও মাসে এত টাকা রোজকার করে না। টাকা ছাড়া অনেক দিন মা ছেলের জন্যে কিছু তরকারি বা কলাটা-মুলোটা হাতে করে নিয়ে আসতো। সন্দীপ তখন থেকেই জানতো বড়লোকেরা কত কী খায়, কত আরামে কাটায়। তাই মাও ভাবতো তার সন্দীপও একদিন চাটুজ্জে-বাড়ির ছোট ছেলে কাশীনাথের মতন উকিল হবে। উকিল হয়ে ছেলে কত টাকা উপায় করবে। সেই সব সুদিনের স্বপ্ন দেখেই সমস্ত কষ্ট মুখ বুজে সহ্য করতো।

মল্লিকমশাই বললেন—জানো সন্দীপ তোমার বাবা, নিবারণ আর আমি এই তিনজনের খুব বন্ধুত্ব ছিল। আমরা সব সময়ে এক সঙ্গে কাটাতুম। আমরা একসঙ্গে সবাই মিলে যাত্রা করতুম। তোমার বাবা "ফিমেলপার্ট" করতো। 'বিল্বমঙ্গল' নাটকে তোমার বাবা সাজতো 'পাগলিনী'। খুব ভালো গান করতো কিনা তোমার

বাবা। ওর গান শুনেই সবাই মুগ্ধ হয়ে যেত। তোমার বাবার গাওয়া গান 'ওঠা নামা প্রেমের তুফানে, টানে প্রাণ যায় রে ভেসে, কোথায় নে যায় কে জানে' গানটা এখনও আমার কানে লেগে আছে—

সন্দীপের আজো মনে আছে মল্লিকমশাই-এর সেই কথাগুলো। মল্লিকমশাই আরো বলেছিলেন—তোমার বাবার তখন খুব অসুখ, আমি আর নিবারণ তাকে দেখতে গেলুম। অত ভারি শরীর তোমার বাবার, তখন ক'দিনের মধ্যেই একেবারে শুকিয়ে রোগা হয়ে গেছে। নিবারণ সামনে গিয়ে মুখের কাছে ঝুঁকে বললে—কেমন আছো হরিপদ ?

তোমার বাবা কিছু বলতে চাইলেও প্রথমে বলতে পারলে না। তারপর অনেক কষ্টে বললে—নিবারণ, সন্দীপ রইল, ওকে তোরা দেখিস—

বাবার সেই শেষ কথা। তারপরে আর কোনও কথা বলতে পারেনি। কী করে যে কী হলো, কেউ জানতে পারলো না, সাতদিন আগেও আমাদের সঙ্গে কথা বলেছে তোমার বাবা। সেই জন্যেই বলে—মানুষের দশ দশা।

কিন্তু এ-সব কিছুই তখন জানতে পারেনি সন্দীপ। সে তখন খুব ছোট। কিছু বোঝবার বয়েসই তখন হয়নি তার। কিন্তু নিবারণ কাকা বাবার কথা রেখেছেন। যখন মল্লিকমশাই চাকরি নিয়ে এই কলকাতায় চলে এসেছেন, তখন নিবারণকাকাই এই সন্দীপের কথা মনে করিয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন—তুমি তো কলকাতায় যাচ্ছো পরমেশ, ওখানে গিয়ে এই সন্দীপের কথা একটু ভেবো—

সেই পরমেশ মল্লিক এই মল্লিকমশাই। মল্লিকমশাই নিবারণকাকার কথা রেখেছেন। মল্লিকমশাই বললেন—তোমার খাওয়ার কথা ভেতরে ঠাকুরকে বলে এসেছি, বুঝলে ? তুমিও খাবে, আর আমিও খাবো—

তারপরে বললেন—তুমি একটু বোস, আমি ঘণ্টা দু'একের মধ্যে একটা কাজ সেরে আসি।

সন্দীপ বললে—আমি একলা বসে-বসে কী করবো, তার চেয়ে আমিও যেতে পারি আপনার সঙ্গে, যদি আপনার আপত্তি না থাকে—

—না, আপত্তি আর কীসের, যেতে চাও তো চলো। পরে তো তোমাকে একলাই এ-সব কাজ করতে হবে। আস্তে-আস্তে আমার বাইরের কাজগুলো তো সব একদিন তোমার ওপরেই ছেড়ে দেব—

তখনই তৈরি হয়ে নিলে সন্দীপ। বিডন স্ট্রীট থেকে বেরিয়ে মল্লিকমশাই সন্দীপকে নিয়ে একটা বাসে উঠলেন। বাসের মধ্যে খুব ভিড়, দাঁড়াবারও জায়গাও নেই কোথাও। তবু তারই মধ্যে মল্লিকমশাই কোনও রকমে একটা দাঁড়াবার মত জায়গা করে নিলেন। সন্দীপও সঙ্গে-সঙ্গে মল্লিকমশাই-এর পাশে দাঁড়িয়ে রইল। বাসের ভাড়া মিটিয়ে দিলেন মল্লিকমশাই। বললেন—দেখে নাও, এই যে বাসটায় আমি উঠলাম, এর নম্বর হচ্ছে দু'নম্বর। মনে রেখে দিও—

সন্দীপ বাইরে চেয়ে দেখবার চেষ্টা করলে। কিন্তু ভিড়ের জন্যে বাইরের কিছুই দেখতে পাওয়া গেল না।

খানিক পরে একটা জায়গায় এসে বাসটা থামতেই মল্লিকমশাই বললেন—নামো,

সন্দীপ, এইখানে আমাদের নামতে হবে। এই জায়গাটার নাম হলো ধর্মতলা। যা বলছি সব মনে রেখে দাও। একদিন আমি আর তোমার সঙ্গে আসবো না। তখন রাস্তা চিনে তোমাকে একলাই আসতে হবে, বুঝলে?

বাস থেকে নেমে সন্দীপ চারদিকে চেয়ে দেখলে। এত ভিড়! এত মানুষের ভিড় এখানে? বেড়াপোতাতে রথের মেলাতেও মানুষের এত ভিড় হয় না। সন্দীপ অবাক হয়ে চারদিকে চেয়ে দেখতে লাগলো।

মল্লিকমশাই এবার বললেন—ওই দেখ, ওই যে দোতলা বাসটা আসছে, ওর মাথায় দেখ লেখা রয়েছে তিন নম্বর। ওই বাসটাতেই আমরা উঠবো। তাড়াহুড়ো করো না—খুব ধীরে সুস্থে উঠবে, তুমি কলকাতায় নতুন এসেছ, এখানকার হাল-চাল আলাদা, এ কলকাতা, এ তোমাদের বেড়াপোতা নয়, এখানকার লোক কেউ কারোর ভালো দেখতে পারে না—

সন্দীপ কথাটা শুনে বুঝতে পারলে না।

জিজ্ঞেস করলে—কেন? কেউ কারো ভালো দেখতে পারে না কেন?

মল্লিকমশাই বললেন—এটা বাঙালীদের চিরকালের স্বভাব। এখানকার সুভাষ বোসকে কত গালাগালি সহ্য করতে হয়েছে তা জানো? এই বাঙালীরাই তাকে সব চেয়ে বেশি গালাগালি দিয়েছে। আর কোনও দেশের লোক তো বাঙালীদের মত এত পরশ্রীকাতর নয়। বাঙালীদের কারোর কিছু ভালো হলে তাদের মাথায় যেন বাজ ভেঙে পড়ে—বাঙালীরাই বাঙালীদের সব চেয়ে বড় শত্রু।

ততক্ষণে বাসটা সামনে এসে গিয়েছিল। সামনে আসতেই কয়েকটা লোক সন্দীপকে কনুইএর গুঁতো দিয়ে রাস্তার ওপর ফেলে দিয়ে বাসে উঠতে লাগলো। দু'একজন লোক তাকে পা দিয়ে মাড়িয়ে তার পিঠে চড়ে বাসে উঠলো।

মল্লিকমশাই হাঁ-হাঁ করে উঠলেন। বললেন—গেল, গেল, গেল—

সন্দীপ অনেক কষ্টে দুই হাতের জোরে কোনও রকমে দাঁড়িয়ে ওঠবার আগেই দোতলা বাসটা ছেড়ে দিলে। মল্লিকমশাই তখন খুব ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। শুধু ব্যস্ত নয়, ভয়ে তিনি তখন কাঁপছেন। শেষকালে সন্দীপের হাত-পা ভেঙে গেল নাকি! তিনি সন্দীপকে তাড়াতাড়ি ধরে ফেললেন।

বললেন—কী সব্বোনাশ, দেখি, বেশি লাগেনি তো?

সন্দীপও তখন থর-থর করে কাঁপছে। জামাটার একজায়গায় ছিঁড়ে গেছে। সে নিজেও তখন নিজের চারদিকে দেখতে লাগলো। এক পলকের মধ্যে যেন একটা মহা-বিপর্যয় ঘটে গেছে। কী করে যে কী হয়ে গেল, তা সে ভেবে উঠতে পারলো না। কেন তাকে সবাই এমন করে ঠেলে ফেলে দিলে? কী অপরাধ করেছিল সে? সে তো কারোর কিছু ক্ষতি করেনি। সবাই যেমন বাসে উঠতে গিয়েছিল, সেও তো তেমনি বাসে উঠতে চেষ্টা করেছিল। আর তো কিছুই করেনি। তবে কেন সবাই তাকে ঠেলে ফেলে দিলে?

মল্লিকমশাই আবার জিজ্ঞেস করলেন—কী হলো? কেমন বুঝছো এখন? খুব ব্যথা হচ্ছে?

সন্দীপ বললে—না—

মল্লিকমশাই বললেন—পরের বাসে উঠতে পারবে ? যদি না উঠতে পারো তো চলো তোমাকে বাড়িতে পৌঁছে দিইগে—

সন্দীপ খুব লজ্জায় পড়ে গিয়েছিল। বললে—না, পারবো—

মল্লিকমশাই বললেন—ওঃ, একটা মস্ত ফাঁড়া কেটে গেল তোমার। তোমাকে তো আগেই বলেছিলুম এ তোমার বেড়াপোতা নয়, এ কলকাতা। এখানে মায়া-দয়া বলে জিনিস কারো নেই। এখানে সবাই সবাইকে টেক্কা মেরে টপ্‌কে আগে যেতে চায়। কেমন বোধ করছো এখন ?

সন্দীপ বললে—ভালো—

—পরের বাসে যেতে পারবে ?

সন্দীপ বললে—পারবো—

পরের বাসটা আসবার আগে মল্লিকমশাই সন্দীপের হাতটা ভালো করে জোরে ধরে রাখলেন, যখন অন্য সব যাত্রীরা বাসের ভেতরে ঢুকে পড়লো, তখন মল্লিকমশাই সন্দীপকে নিয়ে ভেতরে ঢুকলেন। মল্লিকমশাই দাঁড়িয়ে রইলেন সন্দীপের পাশে। জিজ্ঞেস করলেন—কোনও কষ্ট হচ্ছে না তো ?

সন্দীপ বললে—না—

মল্লিকমশাই বললেন—আস্তে-আস্তে দেখবে সবই সহ্য হয়ে যাবে। এখন কলকাতায় নতুন এসেছ কি না, তাই একটু অসুবিধে হচ্ছে। আমি যখন প্রথম কলকাতায় এসেছিলুম, তখন আমারও এমনি অসুবিধে হয়েছিল। এ নিয়ে তুমি মন খারাপ করো না—

সন্দীপ এ-কথার আর কী জবাব দেবে। বললে—আমরা এখন কোথায় যাচ্ছি ?

মল্লিকমশাই বললেন—খিদিরপুরে। আমি তো বরাবর এখানে আসবো না। প্রত্যেক মাসে একবার করে আমি এই খিদিরপুরে আসি। তোমাকে যাতায়াতের রাস্তাটা এবার চিনিয়ে দিচ্ছি। এর পর থেকে প্রত্যেক মাসে একবার করে তোমাকেই এখানে এই খিদিরপুরে আসতে হবে।

সন্দীপ বললে—কেন ? আমাকে এখানে আসতে হবে কেন ?

—বলবো-বলবো, সব বলবো। এই-সব কাজের জন্যেই তো মা-মণিকে বলে তোমাকে আনিয়েছি। আমারও তো বয়েস হচ্ছে, এই বয়েসে কি আর এ-সব কাজ পোষায় ? তোমাকেই এই কাজগুলো এর পর করতে হবে।

সন্দীপ আবার জিজ্ঞেস করলে—কী কাজ ?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, খুব জরুরী কাজ। প্রত্যেক মাসে একশোটা টাকা খিদিরপুরের সাত নম্বর মনসাতলা লেনের বাড়িতে রাজুবালা দেবীকে দিয়ে আসতে হবে।

সন্দীপের মনে হলো সে যেন রূপকথার গল্প শুনছে। কোথাকার কোন বেড়াপোতায় জন্মে কোন ভাগ্যচক্রে সে এসে পড়েছে কলকাতার বিডন স্ট্রীট-এর বিখ্যাত এক বংশধরের বাড়িতে আর কোন ভাগ্যচক্রের খেলায় সে এসে পড়লো খিদিরপুরের সাত নম্বর মনসাতলা লেনের, আর এক বাড়িতে। এই খিদিরপুরের সাত নম্বর মনসাতলা লেনের বাড়িটার একটা মেয়ের সঙ্গে যে তার জীবন একদিন জড়িয়ে একাকার হয়ে যাবে তা কি সেদিন সে কল্পনাই করতে পেরেছিল ? না

কল্পনা করতে পেরেছিল সেদিনকার সেই পরমেশ মল্লিকমশাই !

সত্যিই কোনও দেশের, কোনও জাতির, কোনও সমাজের মত মানুষের জীবনও বোধহয় নানা শৃঙ্খলে বাঁধা পড়ে গিয়ে একটা অনির্দিষ্ট আর অমোঘ পরিণতির দিকে এগিয়ে চলে। আর সেই অনির্দিষ্ট আর অমোঘ পরিণতির দিকে এগিয়ে যাবার সংগ্রাম মানেই হয়ত মানুষের জীবন। এই অমোঘ পরিণতির দিকে এগিয়ে যাবার বীজ কিন্তু লুকিয়ে থাকে মানুষের জন্ম-সূত্র থেকেই। নইলে কেন সে বেড়াপোতা গ্রাম থেকে কলকাতায় এল ? আর যদি কলকাতাতেই এল তো কোন সূত্রে এল মনসাতলা লেনের তপেশ গাঙ্গুলীর ভাইঝি বিশাখা গাঙ্গুলীর কাছে ?

তপেশ গাঙ্গুলীর ভাড়াটে বাড়ি সাত নম্বর মনসাতলা লেন, খিদিরপুরে। তিন নম্বর বাসটা ডিপোয় এসে থামবার পর আর নামতে কোনও কষ্ট হলো না।

মল্লিকমশাই বললেন—এইখানেই এই বাসটা এসে শেষ হলো। এই জায়গার নাম হলো খিদিরপুর। বুঝলে ? জায়গাটা ভালো করে দেখে নাও, ভালো করে চিনে নাও। এইখানে তোমাকে পরের মাস থেকে মাসে একবার করে আসতে হবে। ঠিক চিনতে পারবে তো ? দেখো, যেন ভুল করো না। ভুল করে যার-তার হাতে যেন টাকাটা দিয়ে দিও না। তাহলে তোমার চাকরি চলে যাবে—

—কার হাতে টাকাটা দেব তাহলে ?

—ওই যে বললুম তপেশ গাঙ্গুলীর হাতে—। এই আমার পকেটে নগদ একশো টাকা মা-মণি দিয়েছেন।

বলে নিজের জামার পকেটের দিকে ইশারা করে দেখালেন।

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—কীসের টাকা ?

মল্লিকমশাই বললেন—কীসের টাকা তা জেনে তোমার লাভ কী ? তোমাকে যা বলছি তাই শুনে নাও। প্রতি মাসের পয়লা তারিখে তোমাকে মা-মণির কাছ থেকে এই একশো টাকা নিয়ে এই মনসাতলা লেনের সাত নম্বর বাড়িতে তপেশ গাঙ্গুলী মশাইকে দিয়ে যাবে—

সন্দীপ বললে—টাকাটা দিয়ে সই নেব না ?

—হ্যাঁ, সই তো নেবেই। তপেশবাবু একটা কাগজে লিখে দেবেন যে টাকাটা পেলেন। তাঁর লেখার নিচেয় তিনি নিজের সই দিয়ে দেবেন। সেই সই করা কাগজটা নিয়ে গিয়ে মা-মণিকে দেখাতে হবে। তবেই তোমার ছুটি।

এ এক অভিনব চাকরি ! কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটাই যেন রহস্যময় বলে মনে হলো সন্দীপের কাছে। মনসাতলা লেনের বাড়ির বাসিন্দার নাম তপেশ গাঙ্গুলী, আর বিডন স্ট্রীটের বাড়ির বাসিন্দাদের পদবী হলো মুখার্জি। দেবীপদ মুখার্জি। তিনি কতকাল আগে মারা গেছেন তার ঠিক নেই। তাঁরই বিধবা স্ত্রী হলেন মা-মণি। তিনি কেন মাসে-মাসে একশো টাকা পাঠাতে যাবেন মনসাতলা লেনের তপেশ গাঙ্গুলীকে ?

এ কি দেনা শোধ ? কীসের দেনা ? কেন দেনা ? অত বড় লোকের গৃহিনী কেন টাকা ধার করতে যাবেন মনসাতলা লেনের তপেশ গাঙ্গুলীর কাছে ?

ততক্ষণে সাত নম্বর বাড়িটা এসে গিয়েছিল।

মল্লিকমশাই বললেন —এইদেখ, বাড়ির গায়ে লেখা রয়েছে বাড়ির নম্বর। ভালো করে দেখে নাও, ভালো করে চিনে নাও, এর পর থেকেই তোমাকেই এ-কাজ করতে হবে। যেন ভুল করে অন্য কোনও বাড়িতে যেও না—

সন্দীপ দেখলে বাড়ির গায়ে সাত নম্বরটা আঁটা আছে —মল্লিকমশাই সদর দরজার কড়াটা খটা-খট করে নাড়তে লাগলেন।

কিন্তু এ-সব কথা এখন থাক। এই ঘটনার আগেকার ঘটনা আগে বলে নিই।

বিডন স্ট্রীটের বারো বাই-এ বাড়িটার মালিক মুখার্জি পরিবারের কর্তা একদিনে হন নি। সে সময়ে দেশের মালিক ছিল ইংরেজ। ১৬৯০ সালে যে-ইংরেজরা প্রথম কলকাতার গঙ্গায় বাবুঘাটের কাছে পালতোলা জাহাজ থেকে নেমে কেমন করে আস্তে-আস্তে এখানকার রাজা হয়ে বসলো, সে-কাহিনী আমার 'বেগম মেরী বিশ্বাস উপন্যাসে লিখেছি। এখন তা আর নতুন করে বলবার দরকার নেই। তখন দেবীপদ মুখোপাধ্যায়ের ঊর্ধ্বতন পূর্বপুরুষরা বাঙলাদেশেরই কোন এক বর্ধিষ্ণু গ্রামে বসতি করেছিলেন। অজ্ঞাত, অখ্যাত সেই বংশের ইতিহাস কেউ কোথাও লিখে রাখে নি। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ কোথা দিয়ে কেটে গেছে তা টুকরো-টুকরো ভাবে কত লোক লিখে গেছে। আর তারপর যখন কলকাতার পত্তন হলো, এখানে ইংরেজরা জমিয়ে বসলো, তখন থেকে শুরু হলো ব্যবসা-বাণিজ্য। আর ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে-সঙ্গে দরকার হলো ব্যাঙ্কের। ব্যাঙ্কের মালিকরা থাকে বিলেতে। এখান থেকে যা-কিছু মাল-মশলা বিলেতে যায় তার হিসেব থাকে ব্যাঙ্কের লেজারে। তারপর দিনে-দিনে ইংরেজদের ব্যবসা বাড়তে লাগলো। তখন দরকার হলো কেরানীর। কে কেরানীর কাজ করবে? ডাকো ইন্ডিয়ানদের। তাদের লেখাপড়া শেখাও। লেখাপড়া শিখিয়ে কেরানী তৈরী করতে গেলে চাই স্কুল-কলেজ। স্কুল-কলেজ করতে গেলে আগে চাই মাস্টার। কিছু ইংরেজ মাস্টার এল বিলেত থেকে। তারাই শেখাতে লাগলো লেখাপড়া। ইংরেজদের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যে চাই ডাক্তার বদ্যি, তার জন্যে চাই মেডিকেল কলেজ। কারখানা চালাবার জন্যে চাই ইঞ্জিনীয়ার। সেই সময় থেকেই কলকাতায় এসে হাজির হতে লাগলো দলের পর দল গ্রামের লোক। গ্রামের ছেলেরা কলকাতার রাস্তা-ঘাট-বাজার দেখে অবাক বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেল। তারাও একে-একে ভাল চাকরির পাবার

লোভে স্কুল-কলেজে ভর্তি হলো। কেউ-কেউ মেডিকল কলেজে কিংবা ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে ভর্তি হলো। বেশির ভাগই সব গ্রামের গরীব ছেলে। এই রকম করে কত বছর কেটে গেল। কত যুগ কেটে গেল, কত লাট সাহেব, কত বড়লাট সাহেব এল আর গেল। এমন সময় ভাগ্য পরিবর্তন করার উদ্দেশ্যে এখানে এল আরো একটা ছেলে। তার নাম দেবীপদ মুখার্জি। সেই দেবীপদ মুখার্জি কলেজে পড়ার পর ঢুকলো ইঞ্জিনীয়ারিং পড়তে। হাতে একটা পয়সা নেই, কিন্তু বড় হওয়ার উচ্চাকাঙ্খা আছে। সেই উচ্চাকাঙ্খাটুকু সম্বল করে রোজ চার-পাঁচ মাইল হেঁটে যায় কলেজে, আর একটা মেস-বাড়িতে থেকে কোনও রকমে জীবন কাটায়। আর সঙ্গে-সঙ্গে মেসের ভাঙা তক্তপোষে শুয়ে লাখ লাখ টাকার স্বপ্ন দেখে।

সেই দেবীপদ মুখার্জি। সেই দেবীপদ মুখার্জিই এই আজকের বারো বাই-এর বিডন স্ট্রীটের বাড়ির মালিক।

এ কী করে হলো? এ সম্ভব হলো কী করে?

এর পেছনেও একটা প্রচণ্ড সংগ্রামের ইতিহাস আছে। সেই ছেলে গ্রাম থেকে পাঠানো পাঁচটাকার উপর নির্ভর করে জীবন চালিয়ে যখন ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের ফাইনাল-পরীক্ষা দিলে, তখন ভাবলে তার সংগ্রাম করা বুঝি এতদিনে শেষ হলো।

কিন্তু না, ফাইনাল পরীক্ষায় ফেল করলেন দেবীপদ মুখার্জি।

সে যে কী কষ্ট, সে যে কী নিদারুণ হতাশা, তা কেউ কল্পনা করতে পারবে না। দেশের বাড়িতে নতুন বিয়ে করা বউ আছে। তখন একটা পোস্টকার্ডের দাম এক পয়সা। পয়সার অভাবে তাকে একটা চিঠি পর্যন্ত লিখতে পারেন নি। আর পরীক্ষায় ফেল করার পর তো চিঠি লেখবার প্রশ্নই ওঠে না। দেবীপদ মুখার্জি মেস থেকে বেরিয়ে পড়েন ভোর বেলাতেই। সারা দিন সারা শহরে টো-টো করে ঘোরেন। তারপর যখন মেসে ফেরেন তখন অনেক রাত। আবার ভোর হতে না হতেই বাইরে বেরিয়ে যান। মাঝে-মাঝে ভাবেন আত্মহত্যা করলে কেমন হয়! যে-জীবন দিয়ে কোনও কাজই হবার নয় সে-জীবন রেখেই বা কী লাভ? এক-এক সময় মনে হয় বালিগঞ্জ ষ্টেশন-প্ল্যাটফরমের ওভারব্রীজের ওপর থেকে কোনও চলন্ত ট্রেনের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়বেন। কিন্তু তা করা সম্ভব হয়ে ওঠে না।

এমনি সময় একদিন চিড়িয়াখানার ভেতরে বেড়াচ্ছেন। কোনও কিছু উদ্দেশ্য নেই; শুধু সময় কাটানো ছাড়া আর কিছু করারও নেই। হঠাৎ দেখলেন এক জায়গায় একটা লেকের ওপর একটা লোহার পুল তৈরি হচ্ছে। তিনি সেখানেই দাঁড়িয়ে গেলেন। একজন ওভারশীয়ার কাজের দেখাশোনা করছেন।

তিনি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন তাদের কাজ।

কিন্তু কিছুতেই তারা লোহার একটা বীম লাগাতে পারছে না। আর সেই লোহার বীমটি লাগাতে না পারলে ব্রীজটাও হবে না। তিন-ঘণ্টা কেটে গেল, তবু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। যত কুলী-মজুর সবাই মাথা ঘামাচ্ছে। ওভারশীয়ার ভদ্রলোকটিও অনেক মাথা খাটিয়ে কিছু করতে পারছে না।

যখন বিকেল সাড়ে তিনটে বাজলো তখন দেবীপদ মুখার্জি এগিয়ে গেলেন সামনে। বললেন—আপনারা একটু ভুল করছেন—

ওভারশীয়ার ভদ্রলোক বললেন—কী ভুল ?

দেবীপদ মুখার্জি বললেন—বীমটাকে পাশে না লাগিয়ে মাঝখানে লাগান তাহলেই দেখবেন সব ঠিক হয়ে যাবে।

দেবীপদ মুখার্জি'র কথায় প্রথমে কেউই বিশ্বাস রাখতে পারেন নি। কিন্তু তার কথামত কাজ করতেই অত্যন্ত সহজে কাজটা হয়ে গেল। প্রখর ইঞ্জিনীয়ারিং জ্ঞান না থাকলে এমন হয় না।

খানিক পরেই চিড়িয়াখানার ভেতরে বড় সাহেব এসে হাজির। বললেন—কী, এত দেরি হলো কেন এ-কাজটা করতে ? সকালবেলাই তো আমি এসে দেখে গিয়েছি কাজ অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছে।

ওভারশীয়ার ভদ্রলোক সাহেবকে সেলাম করে বললেন—এই লোহার বীমটা কিছুতেই লাগানো যাচ্ছিল না—

—তাহলে এখন বীমটা লাগানো গেল কী করে ?

ওভারশীয়ার বললেন—এই ভদ্রলোক দেখিয়ে দিলেন বলেই হলো—

বলে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা দেবীপদ মুখার্জীকে দেখিয়ে দিলেন।

সাহেব দেবীপদ মুখার্জি'র দিকে দেখলেন।

বললেন—হু আর ইউ ? তুমি কে ?

দেবীপদ মুখার্জি বললেন—আমার নাম দেবীপদ মুখার্জি—

সাহেব কাজ দেখে নিজেও বুঝেছিলেন সাধারণ লোক এই কাজের মোকাবিলা করতে পারবে না। তাঁর ওভারশীয়ার তাঁর মিস্ত্রী মজুররা আগে অনেক কাজ করেছে। কিন্তু এ-রকম ব্রীজ তারা আগে কখনও করেনি।

সাহেব আবার জিজ্ঞেস করলেন—তুমি কি ইঞ্জিনীয়ার ?

দেবীপদ মুখার্জি বললেন—না স্যার, আমি ইঞ্জিনীয়ার নই—

—তাহলে তুমি কী করে এই টেক্‌নিক্ জানলে ? এ তো আমার ভেটারেন ওভারশীয়ারও জানে না—

দেবীপদ মুখার্জি বললেন—স্যার আমি ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে পড়েছি—

—ও, তুমি ইঞ্জিনীয়ারিং স্টুডেন্ট ?

দেবীপদ মুখার্জি বললেন—না স্যার, আমি ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে পড়েছি, কিন্তু ফাইন্যাল পরীক্ষায় ফেল করেছি—

সাহেব দেবীপদ মুখার্জি'র জামা-কাপড়ের দিকে চেয়ে দেখলেন। বুঝলেন, খুব গরীব লোকের ছেলে এ। জিজ্ঞেস করলেন—তুমি কি আবার পরীক্ষা দেবে ?

দেবীপদ মুখার্জি বললেন—আর একবার পড়বার টাকা নেই আমার—

—তুমি চাকরি করবে ?

দেবীপদ মুখার্জি বললেন—কে আর আমাকে চাকরি দেবে ?

সাহেব বললেন—আমি তোমাকে চাকরি দেব।

বলে পকেট থেকে একটা ছাপানো কার্ড বার করে দেবীপদ মুখার্জি'র দিকে এগিয়ে দিলেন।

দেবীপদ মুখার্জি ছাপানো কার্ডখানা নিয়ে পড়ে দেখলে। বিখ্যাত

ইঞ্জিনীয়ারিং ফার্ম' "স্যাক্সবী ব্রাদার্স লিমিটেড। ইনকরপোরেটেড্ ইন ইংল্যাণ্ড।" তার নীচে ক্লাইভ স্ট্রীটের ঠিকানা আর সাহেবের নিজের নাম লেখা রয়েছে। ম্যাকডোন্যালড্ স্যাক্সবী।

দেবীপদ মুখার্জী তখনও অবস্থাটা ঠিকমত হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন নি। ফ্যাল—ফ্যাল করে চেয়ে দেখছিলেন সাহেবের দিকে। সাহেব বললেন—কাল সকালে ন'টার সময় আমার ওই ঠিকানায় দেখা করতে পারবে ?

দেবীপদ মুখার্জি বললেন—হ্যাঁ স্যার, পারবো—

তারপর সাহেব নিজের স্টাফদের সঙ্গে কাজের কথা বলে চলে গিয়ে বাইরে দাঁড়ানো গাড়িতে গিয়ে উঠলেন।

দেবীপদ মুখার্জি পরদিন ঠিক কাঁটায়-কাঁটায় ন'টার সময় 'স্যাক্সবী ব্রাদার্স লিমিটেড, ইন্‌করপোরেটেড্ ইন ইংল্যাণ্ড' এর অফিসে গিয়ে হাজির। খবর পেয়েই সাহেব ভেতরে ডাকলেন।

দেবীপদ মুখার্জি ঘরে ঢুকতেই সাহেব বললেন—সিট্ ডাউন মুখার্জি—

দেবীপদ মুখার্জি চেয়ারে বসে বললেন—গুড্‌মর্ণিং স্যার, গুড্ মর্ণিং—

—ইয়েস, গুড্‌মর্ণিং। কালকে তোমার কাজ দেখে আমি খুব খুশী। আমি তোমাকে আজই এখুনি চাকরি দিতে পারি। তুমি করবে ?

দেবীপদ মুখার্জি তখন কৃতজ্ঞতায় বিগলিত হয়ে গেছেন। বললেন—স্যার, চাকরি পেলে আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ হয়ে থাকবো। আমি খুব অভাবী লোক—

ম্যাক্‌ডোন্যালড্ সাহেব বললেন—মুখার্জি, একটা কথা তোমায় আমি বলছি। বেশ মন দিয়ে শোন। চাকরি দিলে তোমার আর কতটুকু উপকার হবে। আর কতই বা মাইনে পাবে—ধরো, একশো কি দুশো কি বড় জোর পাঁচশো টাকা মাসে। তার বেশি তো নয়। কিন্তু ধরো যদি আমি প্রথমে তোমাকে একটা ছোট কন্‌ট্র্যাকট্ দিই, তারপরে আস্তে-আস্তে বড় কন্‌ট্র্যাকট্ দিতে-দিতে তুমি শেষে নিজেই একটা ইঞ্জিনীয়ারিং ফার্ম খুলতে পারো। ভাবো তো তখন তুমি মাসে কত হাজার টাকা উপায় করতে পারবে। বেশ ভালো করে ভেবে দেখ চাকরি নেবে, না সাব-কন্‌ট্র্যাকট্ নেবে ?

সেদিন দেবীপদ মুখার্জি চাকরি আর ব্যবসার মধ্যে কোনটা ছোট আর কোনটা বড় তা চিনতে ভুল করেন নি। আর ভুল করেন নি বলেই মুখার্জিদের এত সম্পত্তি আর প্রতিপত্তি। সেই ক্লাইভ স্ট্রীটের ওপরই দাঁড়িয়ে আছে সেই 'স্যাক্সবী ব্রাদার্স লিমিটেড্। ইন্‌করপোরেটেড্ ইন্ ইংল্যাণ্ড।' সে কোম্পানীও এখন আর নেই, সেই ম্যাক্‌ডোন্যালড্ সাহেবও আর নেই। সেই দেবীপদ মুখার্জি'ও এখন নেই। তাঁর ছেলে শম্ভুপদ মুখার্জি'ও এখন আর নেই। সেই কোম্পানীটা কেবল আছে কিন্তু তার নামটা শুধু বদলে গিয়েছে। সেই-জায়গায় নতুন নাম হয়েছে 'স্যাক্সবী-মুখার্জি এ্যাণ্ড কোম্পানী, ইণ্ডিয়া লিমিটেড'। আর তার মালিক হয়েছেন তিনজন। একজন স্বর্গীয় দেবীপদ মুখার্জির বিধবা স্ত্রী শ্রীমতী

কণকলতা দেবী, স্বর্গীয় দেবীপদ মুখার্জি'র দ্বিতীয় পুত্র মুক্তিপদ মুখার্জি এবং স্বর্গীয় দেবীপদ মুখার্জী'র প্রথম পুত্র স্বর্গীয় শক্তিপদ মুখার্জি'র একমাত্র পুত্র শ্রীমান সৌম্য মুখার্জি'।

কিন্তু সৌম্য মুখার্জি' এখন নাবালক। সাবালক হলে সেও কোম্পানির একজন ডাইরেক্টর হবে। শ্রীমতী কণকলতা দেবী সেই সৌম্যের সাবালক হওয়া পর্যন্ত সাগ্রহে অপেক্ষা করছেন। সে সাবালক হলেই ঠাকুমা-মণি তার একটা বিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চান।

এই হচ্ছে বিডন স্ট্রীটের মুখার্জী বাড়ির আদি ইতিহাস। শুধু আদি ইতিহাস নয়, বর্তমান ইতিহাসও বটে। আদি-অন্তহীন মানুষের যে ইতিহাস এই কলকাতায় তিনশো বছর আগে শুরু হয়েছিল তা, বুঝি এতদিন পরে আজ সম্পূর্ণ হতে চলেছে। আজ বেড়াপোতা থেকে হরিপদ লাহিড়ীর ছেলে সন্দীপ লাহিড়ী এই বাড়িতে এসে হাজির হয়েছে।

সন্ধ্যেবেলা সন্দীপ মল্লিকমশাই-এর কাছে শোনা এই কথাগুলোই ভাবছিল। এ কোথায় সে এল? এও বোধহয় আর এক বেড়াপোতা। বেড়াপোতারই আর এক বৃহৎ সংস্করণ!

মল্লিকমশাই বললেন···তুমি একটু বোস, আমি পুজোটা সেরে আসি—

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—কোথায় পুজো করবেন? এ-বাড়িতে কি ঠাকুর আছে নাকি?

—কী যে বলো তুমি! মন্দিরও আছে, ঠাকুরও আছে। ঠাকুর না থাকলে কি ঠাকুমা-মণি এক দণ্ড বাঁচবেন?

মল্লিকমশাই চলে গেলেন আর সঙ্গে-সঙ্গে কোথা থেকে কাঁসর-ঘণ্টা বেজে উঠলো আর তার সঙ্গে শাঁখের আওয়াজ। বেড়াপোতায় চাটুজ্জে বাড়িতেও সন্ধ্যেবেলা ঠিক এই রকম পুজো হতো, কাঁসর-ঘণ্টা বাজতো, শাঁখ বাজতো, মা বাড়ি ফেরবার পর কলাপাতায় করে শশা-কলা-বাতাবি লেবু কি আখ-এর দু-একটা টুকরো আর ভেজা মুগ প্রসাদ নিয়ে আসতো।

মা বলতো—এই পেসাদটা খেয়ে নে, খেয়ে মাথায় হাত ঠেকাবি। ঠাকুরের পেসাদ। এ খেলে পুণ্যি হয়। আর খেতে-খেতে মনে-মনে বল-ঠাকুর আমার ভালো করো—

মা'র কথামত সন্দীপও মনে-মনে তাই বলতো। বলতো—ঠাকুর, আমার ভালো করো—আর সেই ঠাকুরের ইচ্ছেতেই হয়ত কলকাতায় আসার সুযোগ পেয়েছে। এই কলকাতায় না এলে কি এই বিডন স্ট্রীট, এই ধর্মতলা, এই খিদিরপুর মনসাতলা লেন দেখতে পেত!

মনসাতলা লেনের তপেশ গাঙ্গুলী লোকটা কিন্তু ভাল নয়।

সন্দীপ সেই কথাটাই বললে বাড়ি ফেরবার সময়। বললে—মল্লিক কাকা আপনি যা-ই বলুন তপেশ গাঙ্গুলী বাবু লোকটা কিন্তু সুবিধের নয়।

দরজার কড়া নাড়ার শব্দ শুনেই ভেতর থেকে একটা বিকট চিৎকার করে বলে উঠলো। কে? কে দরজা ঠেলে?

মল্লিকমশাই বললেন—আমি তপেশবাবু, আমি—

—আমি মানে? আমিটা কে? 'আমি'র নাম নেই!

মল্লিকমশাই বললেন—আমি পরমেশ মল্লিক, বিডন স্ট্রীটের মুখুজ্যে বাড়ির সরকার। ঠাকুমা-মণির কাছ থেকে এইছি—

—ও—

বলে তপেশ গাঙ্গুলীবাবু দরজা খুলে দিলেন। সন্দীপ দেখলে তপেশবাবুর পরনে একটা গামছা, বোধহয় চান করতে যাচ্ছিলেন, গলায় একটা ময়লা পৈতে।

বললেন—আসুন-আসুন- চলুন, ভেতরে বসবেন চলুন, আমি অনেকক্ষণ ধরে আপনার জন্যে অপেক্ষা করলুম। ভাবলুম, আপনি হয়ত আজ আর এলেন না—শেষকালে চান করতে যাচ্ছিলুম—

মল্লিকমশাই বললেন—সে কি, আজকে তো মাসের পয়লা তারিখ, আমি আসবো না মানে? আমায় ঠাকুমা-মণির কড়া হুকুম আছে, ঠিক মাসের পয়লা তারিখে আপনাকে টাকাটা দিয়ে যেতেই হবে। ঠাকুমা-মণির হুকুম কি ঠেলতে পারি?

তপেশবাবু বলেন—না, একটু দেরি হলো কিনা. তাই ভাবছিলুম······

মল্লিকমশাই ততক্ষণে পকেট থেকে টাকাগুলো বার করতে-করতে বললেন—বাসে যা ভিড় গাঙ্গুলী মশাই সে আর কী বলবো। ধর্মতলার মোড়ে তিন নম্বর বাসে উঠতে গিয়ে এ তো পড়েই গেল। সবাই এর পিঠের ওপর উঠে এক পা দিয়ে মাড়িয়ে দিলে মশাই, এ নতুন কলকাতায় এসেছে, এর তো এরকম ভীড়ের বাসে ওঠার অভ্যেস নেই—

—এটি কে?

মল্লিকমশাই সন্দীপকে দেখিয়ে বললেন—এটি আমার বন্ধুর ছেলে, আমার ভাইপো'র মতন। এর বাবা আমার বন্ধু ছিল—

তপেশ গাঙ্গুলীবাবু জিজ্ঞেস করলেন—ভাই, কী নাম তোমার—

—সন্দীপ কুমার লাহিড়ী।

তপেশ গাঙ্গুলী বললেন—লেখাপড়া কদ্দূর করেছ?

সন্দীপ বললে—হায়ার সেকেণ্ডারি পাশ করে এইবার কলকাতায় বি-কম পড়বো। এখনও ভর্ত্তি হইনি—

মল্লিকমশাই বললেন—এই তো সবেমাত্র ও এসেছে। এখনও কলকাতার কিছুই ও জানেনা। ওই দেখুন না বাসে উঠতে গিয়ে ঠেলা ঠেলিতে কী-রকম জামা ছিঁড়ে গেছে। ওকে আজ আপনার বাড়িটা চিনিয়ে দেবার জন্যে সঙ্গে করে এনেছি।

তপেশ গাঙ্গুলী বললেন—হ্যাঁ, কলকাতা বড় জঘন্য জায়গা হে! আমার তো মনে হয় এ-জাত আর বেশিদিন টিকবে না।

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—কেন?

তপেশ গাঙ্গুলী বললেন—সে তুমি বয়েস হলে বুঝবে। আসলে এ জাতটা বড় হুজুগে হে, বড় হুজুগে। এত হুজুগে জাত বোধ হয় আর দুনিয়ায় নেই। এখানে যদি কেউ উন্নতি করতে চায় তো সবাই তাকে গাঁট্টা মেরে বসিয়ে দেবার চেষ্টা করে। যখন যে পার্টি ক্ষমতায় থাকবে, তখন সবাই সেই পার্টির পা চাটবে। আবার সে পার্টি ক্ষমতা থেকে চলে যাক······

মল্লিকমশাই এ প্রসঙ্গ থামিয়ে দিলেন। বললেন—আপনি চান করতে যাচ্ছেন, আপনাকে আর বেশিক্ষণ আটকে রাখবো না—

বলে পকেট থেকে কয়েকটা নোট বার করে তপেশ গাঙ্গুলীকে দিলেন, বললেন—দেখুন, ভালো করে গুণে নিন—

তপেশবাবু জিভের থুথু আঙুলে লাগিয়ে একটা-একটা করে টাকাগুলো গুনতে লাগলেন। একবার গোনা শেষ হলে আবার গুণতে শুরু করলেন। তখন যেন একটু নিশ্চিন্ত হলেন। কিন্তু একটা এক টাকার নোট নিয়ে বার-বার দেখতে লাগলেন। একবার সামনের দিকে উঁচু করে দেখেন তো আর একবার নিচু করে দেখেন। কিছুতেই যেন সন্দেহ ঘুচতে চায় না। বললেন—এ নোটটা যেন কেমন কেমন মনে হচ্ছে সরকার মশাই—এটা একটু বদলে দিন না—

মল্লিকমশাই বললেন—কই দেখি—

বলে নোটটা নিয়ে তপেশ গাঙ্গুলীর মতই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন।

তারপর দেখে শুনে নিশ্চিন্ত হয়ে বললেন—কই, এ নোটটা তো ঠিকই আছে···আপনি নিশ্চিন্ত মনে নিতে পারেন—

তপেশ গাঙ্গুলী বললেন—না সরকার মশাই, আপনার দেওয়া একটা পাঁচটাকার নোট নিয়ে সেবারে বড় মুশকিলে পড়ে গিয়েছিলুম। কেউ নিতে চায় না। সবাই বললে—এ নোট নেব না—

মল্লিকমশাই বললেন—আমি তো পরের মাসে সে নোটটা বদলে দিয়ে গিয়েছিলাম—সে নোট ভাঙাতে তো আমার কোনও অসুবিধে হয়নি—এক কথায় সে নোট তো সবাই নিয়ে নিলে—

তপেশ গাঙ্গুলী বললেন—আপনাদের কথা আলাদা সরকার মশাই। আপনারা বড়লোক মানুষ। আপনাদের কথা বাজারের লোক শুনবে। আমাদের কথা কে শুনতে যাচ্ছে বলুন—

মল্লিকমশাই বললেন—আচ্ছা, দিন আমাকে নোটটা। আর একটা নোট নিন।

বলে খারাপ নোটটা নিয়ে তার বদলে আর একটা এক টাকার নোট দিলেন।

বললেন—এবার হল তো?

তপেশ গাঙ্গুলী খুশী হলেন। বললেন—এই দেখুন, আপনি আসতে দেরি করলেন বলে আমার আপিসে যেতেও দেরী হয়ে গেল।

মল্লিকমশাই বললেন—কেন আমার আসতে দেরি হলো তা-তো আপনাকে বলেই দিলুম। যাক গে, বউমা কেমন আছে একবার বলুন—

ততক্ষণে মল্লিকমশাই-এর খাতায় তপেশ গাঙ্গুলি টাকার প্রাপ্তি হয়েছে এই মর্মে একটা লেখার নিচেয় স্বাক্ষর করে দিলেন।

তারপর চিৎকার করে ডাকলেন—ও বৌদি, বিডন স্ট্রীট থেকে সরকার মশাই এসেছেন, একবার বিশাখাকে পাঠিয়ে দাও—

ভেতর-বাড়িতে বোধহয় খবরটা পেঁছিয়ে গিয়েছিল। তপেশ গাঙ্গুলীর আওয়াজ পেতেই ভেতর থেকে দু'তিনটি মেয়ে এসে হাজির হলো। সকলেরই বয়েস আট-দশ-বারোর মধ্যে। তাদের মধ্যে একজনকে দেখতে ভারি সুন্দর। অন্য দু'জনকে দেখতে মোটামুটি। বোঝা গেল আগে থেকেই ফর্সা ফ্রক পরিয়ে টরিয়ে তৈরি করে রাখা হয়েছিল।

—করো, নমস্কার করো সরকার মশাইকে—

তপেশ গাঙ্গুলীর কথায় সবাই মল্লিকমশাই-এর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে। ছোট-ছোট মেয়ে সব। সকলেই বেশ চনমনে। তাদের মধ্যে যে মেয়েটি সব চেয়ে সুন্দর সে একটু আলাদা স্বভাবের। কেমন যেন একটা আলগা লজ্জা মেশানো নম্রতার ভাব সারা শরীরে।

মল্লিকমশাই তাকেই জিজ্ঞেস করলেন—কেমন আছো বউমা ?

মেয়েটি ঘাড় নাড়লো। অর্থাৎ—ভালো।

—শরীর ভালো আছে তো তোমার ? আমি বাড়ি ফিরে গেলেই ঠাকুমা-মণি জিজ্ঞেস করবেন অলকা কেমন আছে। তখন তো আমাকে জবাব দিতে হবে। তাই জিজ্ঞেস করছি—

তপেশ গাঙ্গুলী বললেন—তা অলকা বলছেন কেন সরকার মশাই, ওর নাম তো বিশাখা—ওটা আমার দাদার দেওয়া নাম, মানে বিশাখার বাবাই মেয়ের ওই নাম দিয়েছিল—

মল্লিকমশাই বললেন—না, ঠাকুমা-মণি ওর ওই নতুন নাম দিয়েছেন। আমার হিসেবের খাতায় আমি 'অলকা' নামই লিখি। ঠাকুমা-মণির তাই-ই হুকুম।

তারপর অলকাকে জিজ্ঞেস করলেন—তোমার মা ভালো আছেন তো ?

মেয়েটি ঘাড় নাড়লে। অর্থাৎ—হ্যাঁ।

তপেশ গাঙ্গুলী সকলকে বললেন—এবার তোমরা সবাই যাও এখান থেকে—

মল্লিকমশাই জিজ্ঞেস করলেন অলকা লেখাপড়া করছে তো ?

তপেশ গাঙ্গুলী বললেন—করবে না ? লেখাপড়া যদি না করবে তো ইস্কুলে ভর্তি করে দিয়েছি কেন ? টাকা কি অত সস্তা ?

মল্লিকমশাই বললেন—একটু দেখবেন দয়া করে, আমি গেলেই ঠাকুমা-মণি আমাকে বার-বার জিজ্ঞেস করবেন বউমার কথা। আমাকে তো তার জবাব দিতে হবে, তাই জিজ্ঞেস করা। হ্যাঁ, ভালো কথা। ওকে দুধ ফল-টল খেতে দিচ্ছেন তো ?

তপেশ গাঙ্গুলী বললেন -দুধ-ফল-ছানা-এসব খেতে দিচ্ছি না, মাসে একশোটা টাকা কি আমার নিজের গর্ভে ঢালছি ?

—না, সে-কথা বলছি না। আমি মশাই হুকুমের চাকর। আমাকে বাড়িতে যে যে কথার জবাব দিতে হবে, তাই-ই আপনাকে বলছি—

তপেশ গাঙ্গুলী বললেন—তা তো বটেই। তবে একটা কথা আপনাকে বলছি, আপনি আপনার ঠাকুমা-মণিকে গিয়ে নিবেদন করবেন।

—বলুন, কী কথা বলবো ?

তপেশ গাঙ্গুলী বললেন—মাসে-মাসে আমার ভাই-ঝির নামে আপনাকে ঠাকুমা-মণি যে একশো করে টাকা পাঠান তাতে আজকাল আর কুলোচ্ছে না সরকার মশাই। আপনি নিজেও তো সব দেখছেন। দেশের হাল-চাল খুব খারাপ হয়ে যাচ্ছে দিনকে দিন। বাজারে গেলে জিনিস-পত্তরের দাম শুনলে মাথা খারাপ হয়ে যাবার অবস্থা হয়। আমরা আগে আট আনা সের দুধ কিনেছি। সেই দুধই এখন বলে আড়াই টাকা সের। কী করে আপনার বউমা'কে অত দুধ খাওয়াই বলুন তো! যা দুধ কিনি তা সবই আপনাদের বউমা'কেই খাওয়াই। তার ওপরে আছে ফল-মূল। আলু, সামান্য আলু, তা-ই এখন বারো আনা সের। আমাদের মত মানুষ যারা চাকরি করে পেট চালাই, তাদের কী ভয়ানক অবস্থা ভাবুন তো একবার! আমার নিজের ছেলেমেয়েদের না খাইয়ে সবই আপনার বউমা'কে খাওয়াই, আর কাউকে খেতে দিই না। আমার মেয়েরা আপনার বউমা'র খাওয়ার দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকে। বাপ হয়ে তাও আমাকে দেখতে হয়, তা জানেন। তবু আমি বলেছি—সাবধান, বিশাখার খাওয়ার দিকে যেন কেউ না চেয়ে দেখে। কিন্তু বয়েস এখন কম তো, তারা কাঁদে দুধ খাবার জন্যে। তারাও দুধ খেতে চায়। তারাও ছানা খেতে চায়। এই তো অবস্থা। আপনি একটু ঠাকুমা-মণিকে সব বুঝিয়ে বলবেন। বলবেন—আমি এই সব বলতে বলেছি। যদি মাসে টাকাটা একশোর বদলে দেড়শো করে দেন, তাহলে একটু সুবিধে হয়—

মল্লিকমশাই বললেন—ঠিক আছে, আমি এই কথা বলবো গিয়ে ঠাকুমামণিকে—

—হ্যাঁ, বলবেন। যা কিছু তিনি দিচ্ছেন সব তো আপনাদের বউমারই জন্যে। আমার তো কোনও স্বার্থ নেই এতে। দেখুন, দাদা মারা যাবার পর এত বছর ধরে আমিই তো ওদের ভরণ-পোষণ করে আসছি। তারও তো খরচ আছে—

এর পরে আর দাঁড়ালেন না মল্লিকমশাই। উঠলেন। সঙ্গে-সঙ্গে সন্দীপও উঠলো।

বাড়ির বাইরে এসে মল্লিকমশাই বললেন—তা হলে চললুম, এই একে দেখে রাখুন। পরের মাসে আমি আর আসবো না, এ আসবে। এর নাম সন্দীপ কুমার লাহিড়ী—

তপেশ গাঙ্গুলী বললেন—আপনিও আমার কথাটা মনে রাখবেন। ওই একশো টাকাটা যাতে একশো পঞ্চাশ টাকা হয় সেইটে একটু আপনার ঠাকুমা-মণিকে বলবেন—

এর পরে আর দাঁড়াননি মল্লিকমশাই। তিন নম্বর বাস ধরে দু'জনে একসঙ্গে বিডন স্ট্রীটে চলে এসেছিল।
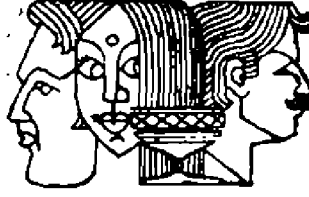
পুজোর কাঁসর ঘণ্টা তখনও বাজছে। মাঝে-মাঝে শাঁখও বাজছে। ঘরের মধ্যে একলা বসে বসে সন্দীপ আকাশ-পাতাল ভাবছিল। এতক্ষণে বেড়াপোতায় মা হয়ত চাটুজ্জে-বাড়ির কাজ সেরে বাড়িতে এসে সন্দীপের কথাই ভাবছে। জীবনে এর আগে সন্দীপকে ছেড়ে মা কখনও একলা থাকেনি। সন্দীপও মা'কে ছেড়ে কখনও এমন করে বাইরে থাকেনি।

এক-সময়ে পুজোর বাজনার শব্দ থেমে গেল। মল্লিকমশাই এসে গেলেন।

বললেন—চলো-চলো সন্দীপ, খেয়ে আসি গে—

খিদেও পেয়েছিল খুব সন্দীপের। বরাবর মল্লিকমশাই একলাই খেয়েছেন, আজ সন্দীপ সঙ্গে এসেছে। দুপুরবেলা পেট ভরে খেয়েছিল সে, তবু আবার খিদে পেয়ে গিয়েছিল। বড়লোকের বাড়ি। কত লোক বাড়িতে খায়। দিনে-রাতে অসংখ্য লোকের জন্যে খাওয়ার আয়োজন হয়। রান্নাঘরের পাশে আর একটা বড় ঘর। সেখানে দরকার হলে একসঙ্গে পঞ্চাশজন খেতে বসতে পারে। একটা করে কাঠের পিঁড়ি পাতা আছে। আর সামনে কলাপাতার ওপর ডাল-ভাত-তরকারী।

খেতে বসে মল্লিকমশাই বললেন—লজ্জা করে খেও না সন্দীপ। যা দরকার হবে চেয়ে নিয়ে খাবে—

সন্দীপ সে-কথার উত্তর দিলে না। মল্লিকমশাই বললেন—কী ভাবছো এত?

সন্দীপ বললে—দেখুন মল্লিককাকা সকালবেলা মনসাতলা লেন-এ যে বাড়িতে গিয়েছিলুম, সেই তপেশ গাঙ্গুলী ভদ্রলোক ভালো নয়—

মল্লিকমশাই বললেন—ও-সব নিয়ে তুমি কিছু মাথা ঘামিও না। লোক ভালো হোক মন্দ হোক, তাতে তোমার কী? তুমি চাকরি করবে, মাইনে নেবে আর হুকুম তামিল করবে। চুকে গেল ল্যাঠা।

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—কিন্তু আপনি ওই ভদ্রলোকের হাতে একশোটা টাকা দিলেন কি জন্যে?

মল্লিক-মশাই বললেন—ঠাকুমা-মণির হুকুম।

—কিন্তু কেন? এরা বড়লোক আর ওরা গরীব। ওদের বাড়িতে ঠাকুমা-মণি টাকা প্রত্যেক মাসে পাঠানই বা কেন?

মল্লিকমশাই বললেন—আস্তে-আস্তে তুমি সব কথাই জানতে পারবে। আজ সারাদিন তোমার খুব খাটুনি গেছে, এখন তুমি খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ো গিয়ে—

মল্লিকমশাই এর ঘরের ভেতরেই সন্দীপের শোবার ব্যবস্থা হয়েছিল। মেঝের ওপর তোষক পাতা। তার ওপর চাদর। আর মাথার দিকে একটা বালিশ —

আস্তে-আস্তে অনেক রাত হলো। বাইরের শব্দ কমে আসতে লাগলো। কখনও কখনও বিডন স্ট্রীট-এর ওপর থেকে চলন্ত গাড়ির হর্ন-এর আওয়াজ আসে। আর তাও অনেক পর-পর।

হঠাৎ ওপরে একজন মহিলা কণ্ঠের আওয়াজ শোনা গেল।

—গিরিধারী—

নিচের একতলা থেকে পুরুষের গলার আওয়াজ উঠলো—জী—হুজুর —

—গেট বন্ধ করো। সঙ্গে-সঙ্গে লোহার গেটটা বন্ধ হওয়ার ঘড়-ঘড় শব্দ হলো

মল্লিকমশাই বললেন—ওই ন'টা বাজলো —

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—ন'টার সময় গেট বন্ধ হলো কেন মল্লিককাকা!

মল্লিকমশাই বললেন—ঠাকুমা-মণির হুকুম ঠিক রাত ন'টার সময় গেট বন্ধ করতে হবে।

—গিরিধারী কে?

—মুখুজ্জে-বাড়ির দারোয়ান। ঠাকুমা-মণির হুকুম কেউ রাত ন'টার পর আর বাড়ির বাইরে থাকতে পারবে না। সে মুক্তিবাবুই হোক আর সৌম্য বাবুই হোক। সকলকে রাত ন'টার মধ্যে বাড়ি ফিরে বিছানায় শুয়ে পড়তে হবে। এ ঠাকুমা-মণির চিরকালের নিয়ম। যদি গিরিধারী রাত ন'টার পর গেট খুলে দেয় তো তার চাকরি খতম হয়ে যাবে—

কে যে মুক্তিবাবু, আর কে যে সৌম্যবাবু, তা সন্দীপ তখনও জানতো না।

খানিক পরেই মল্লিকমশাই-এর নাক ডাকতে লাগলো। বোঝা গেল তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন।

রাত ক্রমে আরো বাড়তে লাগলো। বাইরে চারদিক আরো নিস্তব্ধ হয়ে এল। সমস্ত বাড়িটা যেন ঘুমিয়ে পড়েছে। শুধু সমস্ত বাড়িটাই নয়, সমস্ত কলকাতা শহরটাই যেন আস্তে-আস্তে ঘুমিয়ে পড়লো।

কিন্তু সন্দীপের কী যে হলো, কিছুতেই আর ঘুম আসতে চাইছে না। জেগে-জেগে সে আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলো। বেড়াপোতায় মা-ও বোধহয় এখন জেগে আছে। জেগে-জেগে কেবল সন্দীপের কথাই ভাবছে। মনসাতলা লেনের বাড়িটার কথাও মনে পড়তে লাগলো। তপেশ চন্দ্র গাঙ্গুলি লোকটা ভালো নয়। কেন যে ভালো নয়, তা সে যুক্তি দিয়ে বোঝাতে পারবে না। কিন্তু তার যা মনে হয়েছে তাই সে মল্লিককাকাকে বলেছে। ঠাকুমা-মণি কার জন্য তপেশ গাঙ্গুলী মশাইকে টাকা পাঠায়। সে কি ওই বিশাখার দুধ খাবার জন্যে? ছানা খাওয়ার জন্যে? কিন্তু মেয়েটাকে দেখতে ভারি সুন্দর। একটা আলগা লজ্জার নম্রতা চোখে-মুখে মাখানো।

হঠাৎ কী একটা শব্দে সন্দীপ সচকিত হয়ে উঠলো। কীসের শব্দ ওটা?

কেউ গেট খুলছে নাকি? কিন্তু ন'টার পর তো আর গেট খোলার নিয়ম নেই। ঠাকুমা-মণির কড়া হুকুম। সন্দীপ অবাক হয়ে কান পেতে রইল।

হ্যাঁ, গেট খোলারই তো শব্দ ওটা!

সন্দীপ একবার ডাকলে—মল্লিককাকা—মল্লিককাকা—

কিন্তু মল্লিকমশাই অঘোরে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছেন। সন্দীপের ডাকেও তাঁর নাক ডাকা বন্ধ হলো না। সারাদিন খুব পরিশ্রম গেছে তাঁর।

সন্দীপের কী যেন সন্দেহ হলো। সে নিঃশব্দে বিছানা ছেড়ে উঠলো। উঠে আরো নিঃশব্দে ঘরের দরজার খিলটা খুললে। মল্লিকমশাই তখনও অঘোরে নাক ডাকিয়ে চলেছেন। দরজা খুলে বাইরের উঠোনে গিয়ে পড়লো। সেইখানে পুজোর দালান। সেদিকে যেতে তার ভয় করতে লাগালো, যদি তাকে কেউ দেখে ফেলে? যদি চিনতে পারে। বাঁ দিকে মল্লিকমশাই এর দফতর। তার পাশ দিয়ে সদরে যাওয়ার রাস্তা।

সন্দীপ আস্তে-আস্তে সেইদিকে গিয়ে দেখে দরজাটা খোলা। দরজার ফাঁক দিয়ে সে দেখলে কে যেন একটা গাড়ি চালিয়ে বাইরে যাচ্ছে। লোকটার মুখে একটা জ্বলন্ত সিগারেট। সেই সিগারেটের আলোয় যতটুকু দেখা যায় তাতেই বোঝা গেল লোকটার গায়ের রং ধবধবে ফর্সা। অথচ বয়েস বেশি নয়। বলতে গেলে সন্দীপের মতই বয়েস! সে গাড়িটা চালিয়ে বাইরে যেতেই গিরিধারী লোহার গেট বন্ধ করে দিলে। বন্ধ করে চাবি তালা লাগিয়ে দিলে!

ঠাকুমা-মণির কড়া হুকুম সত্ত্বেও গিরিধারী কেন রাত ন'টার পর গেট খুলে দিলে? এই প্রায় রাত দশটার সময় গাড়িটা যদি বাইরে চলে গেল, তাহলে গাড়িটা ফিরবে কখন? কত রাতে ফিরবে? আর যদি গেলই গাড়িটা তাহলে কোথায় গেল? এত রাত্রে তো কলকাতায় সবাই ঘুমোচ্ছে। কেউ তো আর এখন জেগে নেই। কিন্তু আসল প্রশ্নটা হচ্ছে কে উনি? মুক্তিপদবাবু? মা-মণির ছোট ছেলে? না সৌম্যবাবু? সৌম্য মুখুজ্জে? মা-মণির নাতি? কে?

অনেক ভেবেও সন্দীপ ভাবনার কোনও কুল-কিনারা খুঁজে পেলে না। বাইরে যে বাড়ির এত কড়া নিয়ম-শৃঙ্খলা তার আড়ালে কি এতই অনিয়ম? যদি সৌম্য মুখুজ্জে হয় তো এত কম বয়েসে কোথায় যাবে এত রাত্রে?

সন্দীপ সদর দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে মল্লিকমশাই এর দফতরের পাশের রাস্তা দিয়ে পুজোর দালানে পড়লো। সেখানেও কেউ কোথাও জেগে নেই। সেখান থেকে টিপিটিপি পায়ে সন্দীপ আবার নিজের ঘরের ভেতরে ঢুকলো। তখনও মল্লিকমশাই-এর নাক-ডাকার কামাই নেই। নিঃশব্দে সে ঘরের ভেতর দিকে খিলটা বন্ধ করে নিজের বিছানায় এসে গা এলিয়ে দিলে। তারপর সেই নিঃসীম অন্ধকারের মধ্যে দুটো চোখের পাতা খুলে ওপরের দিকে চেয়ে রইল। তার মনে হলো তার নিজের নিঃসঙ্গ জীবনটার মতই সমস্ত কলকাতাটাও তার দুটো চোখের পাতা খুলে তার দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে!

প্রথম প্রথম একটু অবাক লাগতো সন্দীপের। এত বড় বাড়ি। বেড়াপোতায় এত বড় বাড়ি একটাও নেই। অবশ্য বেড়াপোতার সঙ্গে কলকাতার তুলনা করা উচিত নয়। কলকাতার মত এত লোকই কি বেড়াপোতায় আছে? কলকাতায় কে যে কোথায় যাচ্ছে, কে যে কীসের জন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিছুই বোঝা যায় না। কলকাতায় পাশের বাড়ির লোককেও পাশের বাড়ির লোকরা চেনে না।

নিবারণ কাকা আগে থেকেই সাবধান করে দিয়েছিলেন।

বলেছিলেন—কলকাতায় যাচ্ছো, সেখানে একটু সাবধানে ঘোরা-ফেরা করবে, যেখানে যাবে সব তোমার মল্লিককাকাকে আগে জিজ্ঞেস করে তবে যাবে।

আসবার সময় মা কেঁদে ফেলেছিল। কিন্তু পাছে ছেলের অকল্যাণ হয় তাই চোখের জল আঁচলে মুছে মুখে হাসি আনবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছিল। সন্দীপের চোখ দুটোও ভারি হয়ে এসেছিল বইকি, কিন্তু কলকাতায় যেতে পারার আনন্দে সমস্ত কষ্টই সহ্য করতে পেরেছিল।

বারো-বাই-এ বিডন স্ট্রীটের বাড়িতে কয়েকদিন কাটাবার পরই সন্দীপ বুঝতে পারলে এ-বাড়ির নিয়ম-কানুনগুলো। এ-বাড়ির যিনি মালিক তিনি হলেন ঠাকুমা-মণি। ঠাকুমা-মণির হুকুম মতোই এ-বাড়ির সব কিছু-কাজ-কর্ম চলে। যেন এ বাড়ির ঘড়ির কাঁটাগুলোও ঠাকুমা-মণির হুকুম না পেলে নড়ে না। ঠাকুমা-মণি থাকেন বটে তেতলায় কিন্তু একতলা-দোতলার প্রত্যেকটা প্রাণী তাঁর নির্দেশে ওঠে বসে। একতলা কি দোতলার কলতলায় যদি কেউ জল নষ্ট করে তো তেতলায় ঠাকুমা-মণির টনক নড়ে ওঠে। চিৎকার করে বলবেন—এই কালিদাসী, দোতলার কলঘরে কে জল নষ্ট করে রে?

দোতলার ঝি'দের মাথা হচ্ছে কালিদাসী। দোতলায় কোনও বেআইনী কাজ হলে দায়ী হবে কালিদাসী। আর একতলাটা ফুল্লরার এক্তিয়ারে। একতলার সমস্ত কাজ-অকাজের জন্যে জবাবদিহি করতে হবে ফুল্লরাকে। তেতলা থেকেই ঠাকুমা-মণি চিৎকার করে বলবেন—হ্যাঁ রে ফুল্লরা, একতলার সব ঘরে ধুনো দেওয়া হয়েছে?

আর একতলার পশ্চিম-মুখো যে ঠাকুর-বাড়ি আছে, তার বিগ্রহ হচ্ছে দেবী সিংহবাহিনী। ঠাকুর-বাড়ির সমস্ত কাজকর্ম কামিনী ঝি'র হেফাজতে। নিত্য-পুজোর সব বন্দোবস্ত ঠিক হলো কিনা তা সে দেখবে। পুজোর ফুল-বিল্বপত্র যে যোগান দেয় সে হলো কন্দর্প। কন্দর্পের মতো দেখতে হোক আর না-হোক তার বাপ-মায়ের দেওয়া নাম কন্দর্প। সে ঠিক ফুল-বিল্বপত্র নিয়ম করে রোজ দিচ্ছে কি না তা দেখবার ভার কামিনীর ওপর। যদি না যোগান দেয় তো কামিনী তেতলায় গিয়ে নালিশ করবে ঠাকুমা-মণিকে।

ঠাকুমা-মণি কন্দর্পকে জিজ্ঞেস করবেন—আজ তোমার ফুল-বেলপাতা দিতে দেরি হয়েছে কেন?

কন্দর্প বলবে—আজকে আমাকে মাফ করে দিন ঠাকুমা-মণি, আজকে

ভোরবেলা খুব বৃষ্টি হয়েছিল বলে একটু দেরি হয়েছিল, আর কখনও দেরি হবে না ঠাকুমা-মণি।

ঠাকুমা মণি বলবেন—আর তো তোমাকে ক্ষমা করতে পারি না কন্দর্প, এরকম দেরি তো তোমার আগেও হয়েছে, আগেও তো তুমি মাফ চেয়েছ—

—আজ্ঞে ঠাকুমা-মণি, সেবার আমার অসুখ হয়েছিল—

ঠাকুমা-মণি বলবেন—তা তোমার অসুখ হলে কি ঠাকুর শুনবে? তোমার অসুখ হলে কি ঠাকুর-পুজো বন্ধ থাকবে? আমার ঠাকুর তো তা বলে উপোষ করে থাকবে না। তার নিত্য-পুজো, নিত্য-নিত্য নিয়ম করেই করতে হবে, তা সে বৃষ্টিই পড়ুক আর কারো অসুখই করুক।

কন্দর্প তখন কাকুতি-মিনতি করবে। বলবে—আর কখনও এমন হবে না ঠাকুমা-মণি। আমি মাফ চাইছি—

ঠাকুমা-মণি বলবেন—যদি আবার এমন গাফিলতি হয় তো কী করবে?

কন্দর্প বলবে—এবার অসুখ হলে আমি আমার ছেলেকে পাঠিয়ে দেব—

—তোমার ছেলের কত বয়েস হলো?

—এই দশ বছরে পড়েছে। আমার একই ছেলে। এই ছেলের আগে সব মেয়ে।

ঠাকুমা-মণি বলবেন—ঠিক আছে, এই বারের মত তোমাকে মাফ করলুম বাছা, আবার যদি কোনওদিন গাফিলতি হয় তো তখন কিন্তু আমি অন্য লোক রাখবো, এই তোমাকে বলে রাখছি।

এ-সব তো গেল দোতলা-একতলা আর ঠাকুর-বাড়ির ঝি'দের ব্যাপার। কিন্তু তেতলায়?

ঠাকুমা-মণির খাস-ঝি ঠাকুমা-মণির সঙ্গে তেতলাতেই থাকে। তার নাম বিন্দু। বিন্দু আজ তিরিশ বছর ধরে ঠাকুমা-মণির সেবা করে আসছে। বিন্দু তার অতীত ভুলে গেছে ভবিষ্যতের কথাও সে ভাবে না। শুধু বর্তমান নিয়েই সে ভাবে। শুধু বর্তমান নিয়েই সে খুশী। কবে থেকে যে বিন্দু এ-বাড়িতে ঠাকুমা-মণির সেবা আরম্ভ করেছে তাও তার মনে নেই। মনে রাখবার মত সময়ও তার ধাতে বড় একটা থাকে না। সত্যিই তো, সে কোথায় সময় পাবে? তার কাজ কি একটা? ভোর তিনটের সময় তাকে ঘুম থেকে উঠতে হয়। তাকে ভোর না বলে রাত বলাই ভালো। রাত তিনটের সময় যখন বিন্দু ওঠে তখন সারা কলকাতাই অন্ধকার! ঠাকুমা-মণিও তখন ঘুম থেকে ওঠেন। ঘুম থেকে ঠাকুমা-মণি উঠেই ডাকেন—বিন্দু—

বিন্দু তৈরিই থাকে। এই তৈরি হয়ে থাকাই হচ্ছে বিন্দুর চাকরি। এতকাল ধরে বিন্দু নাকি এমনি তৈরি হয়েই থেকেছে। এমনি তৈরি হয়ে থাকার জন্যেই নাকি এখনও বিন্দুর চাকরি যায়নি।

তেতলার আর একজন ঝি হচ্ছে সুধা। তিনতলাটা সুধার একলার এক্তিয়ার। সে মেজবাবু, মেজগিন্নী আর তাদের ছেলে-মেয়েদের তদারকি করে। সুধা বলে—বিন্দু বেশ আছে, ঠাকুমা-মণির হুকুম তামিল করেই খালাস। আমারই হয়েছে যতো জ্বালা। এতগুলো লোকের ফাই-ফরমাস খাটতে-খাটতেই আমার গতর গেল।

কথাগুলো বিন্দুর কানে যেতেই চেঁচিয়ে ওঠে—চুপ কর হারামজাদী মাগী,

চেঁচামেচি কর তুই, তোর একলারই বুঝি গতর আছে, আর কারুর বুঝি গতর থাকতে নেই ? কথা শুনলে আমার গা জ্বলে যায়—আ মরণ আর কি—

ঠাকুমা-মণির কানে এ-সব কথা যায় না। ঠাকুমা-মণি যখন নিচেয় একতলায় ঠাকুর-বাড়িতে ঠাকুরকে প্রণাম করতে আসেন, তখন বিন্দু আর সুধার গলা সপ্তমে গিয়ে ওঠে। কিন্তু ঠাকুমা-মণির-গলার আওয়াজ কানে পৌঁছতেই সব চুপ।

ঠাকুমা-মণি বললেন—কে রে বিন্দু, কে ? কার সঙ্গে অত কথা বলছিস ?

বিন্দু ঠাকুমা-মণির দিকে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বলে—কই ঠাকুমা-মণি, আমি তো কারো সঙ্গে কথা বলিনি।

তা হবে, ঠাকুমা-মণির বয়েস হচ্ছে, হয়ত দোতলায় কালিদাসীর গলা শুনতে পেয়েছেন। সারা বাড়ি যেন নখদর্পণে। এককালে এই ঠাকুমা-মণি কিছু-না-হোক চল্লিশবার তিন-তলা-এক-তলা করেছেন। তখন বয়স কম ছিল। দেখবার-শোনবার লোকও কম ছিল। স্বামী দেবীপদ মুখার্জি ভোর থেকেই অফিসের কাজে বেরিয়ে যেতেন, তখন বাড়ির দিকে আর নজর দেবার সময়ই ছিল না তাঁর। শাশুড়ীও অল্প বয়েসে মারা গেছেন। শ্বশুর তো তার আগেই চলে গিয়েছিলেন। তখন থেকেই ঠাকুমা-মণি সমস্ত বাড়িটার চাবি-কাঠি নিজের হাতের মুঠোয় রেখে দিয়েছিলেন।

আর এই যে মুখুজ্জে-বাড়ির সরকার মল্লিক-মশাই, ইনিও সেই তখন থেকেই আছেন।

সন্দীপ এ-সব জানতো না, কিন্তু মল্লিক-মশাই-এর এ-সব দেখা ঘটনা! মল্লিক-মশাই-এর বয়েস যখন এই সন্দীপের মতন তখনই এই মুখুজ্জে-বাড়িতে চাকরিতে ঢুকেছিলেন। এখন যেমন সন্দীপ কাজ শিখছে মল্লিক-মশাই এর কাছে, তখন মল্লিক-মশাইও তেমনি কাজ শিখতেন তখনকার সরকার-মশাই এর কাছে। তারপর দেখতে দেখতে মল্লিক-মশাই-এর বয়েস হলো, এ-বাড়ির হালচালও বদলে গেল। একদিন এ-বাড়ির কর্তা দেবীপদ মুখার্জি বলা নেই-কওয়া নেই হঠাৎ মারা গেলেন। তখনই মল্লিক-মশাই এর মনে হয়েছিল এ-বাড়ির পরমায়ু বুঝি শেষ হয়ে গেল, এ-বাড়ির ইতিহাস বুঝি মাঝপথে থেমে গেল।

কিন্তু না, থামলো না। দেবীপদ মুখার্জির দু'টি ছেলে হলো। তারা ততদিনে বড় হয়েছে। প্রথমটির নাম শক্তিপদ, দ্বিতীয়টির নাম মুক্তিপদ। তারাই দেখতে লাগলো বাবার ব্যবসা। স্যাক্‌বি মুখার্জি এ্যান্ড কোং ইন্ডিয়া লিমিটেড্। বিরাট কারবার। কর্মচারীর সংখ্যাও অসংখ্য। বড়-বড় ইঞ্জিনীয়ার থেকে পিওন পর্যন্ত শক্তিপদ আর মুক্তিপদ'র অধীনে। অফিসের আর ফ্যাক্টরির কাজ দেখে ছেলেরা, আর সংসারের কাজ দেখেন ঠাকুমা-মণি। ছেলেদের অধীনে যেমন অফিস আর ফ্যাক্টরির কর্মচারীরা, বাড়িতে ঠাকুমা-মণির অধীনে তেমনি সবাই। সবাই মানে ছেলে, ছেলের বউরা, নাতি, চাকর, ঝি, ঠাকুর, দারোয়ান, মল্লিক-মশাই আর এখন এই সন্দীপ। বাড়িতে সকলের মাথার ওপর ওই একজনই—ওই ঠাকুমা-মণি।

তাই ঠাকুমা-মণিই বাড়ির সকলের হর্তা-কর্তা-বিধাতা। তাই ঠাকুমা-মণির কথা-তেই বাড়ির সবাই ওঠে বসে। তাই ঠাকুমা-মণি যখন ওপর থেকে চিৎকার করেন—'ও কালিদাসী-কালিদাসী, দোতলার কল-ঘরে কে জল নষ্ট করে রে ?'

তখন সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। কিংবা ঠাকুমা-মণি যখন তেতলা থেকে

চেঁচান—'হ্যাঁ রে ফুল্লরা, একতলার সব ঘরে ধুনো দেওয়া হয়েছে ?'

তখনও সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। কাজের গাফিলতির জন্যে ঠাকুমা-মণি যে কাউকেই ক্ষমা করবে না তা সবাই জানে বলেই ঠাকুমা-মণিকে সবাই ভয় পায়।

আর মল্লিক-মশাই ?

মল্লিক মশাইও এই একই নিয়মের অধীন। মল্লিক-মশাই এর কাজের ওপরেও ঠাকুমা-মণির কড়া নজর। প্রতিদিন একটা বাঁধা টাইমে মল্লিক-মশাইকে খাতা নিয়ে যেতে হয় ঠাকুমা-মণির কাছে। বিন্দু ঠাকুমা-মণির পাশেই থাকে সব সময়ে।

মল্লিক-মশাই একতলা থেকে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে একেবারে সোজা চলে যান তেতলায়। সেখানে পৌঁছেই ঠিক বাঁধা সময়ে ডাকেন -বিন্দু-অ-বিন্দু—

বিন্দুর জানা থাকে। জানা থাকে যে ওটা মল্লিক-মশাই এর গলা। ঠাকুমা-মণিও জানেন। ঠাকুমা-মণিও জানেন যে ওই সময়ে মল্লিক-মশাই রোজ হিসেবের খাতা নিয়ে আসেন। আগের দিন কী-কী বাবদে কত খরচ হয়েছে, তা খাতা দেখে সব মল্লিক-মশাই বলে যাবেন। বাজার-খরচ দেড়শো টাকা। দেড়শো টাকার মধ্যে আলু-পটল-বেগুন থেকে আরম্ভ করে মাছ-পান-তেল-নুন দোক্তা-পাতা সবই ধরা হয়। তারপর কোনও দিন রাজ-মিস্ত্রীর কাজ-কর্ম থাকলে সিমেন্ট-ইঁট-চুন, সুরকি-কাঠ কেনার খরচও থাকে। তা ছাড়া মাস-কাবারি খরচও আছে। যেমন এ-বাড়ির লোকজনদের মাইনে। কন্দর্পের ফুল-বেলপাতার হিসেব। কারো কাশির ওষুধ কিম্বা কারো ট্রাম-বাস ভাড়া। এর ওপর আছে পেট্রলের খরচার হিসেব। প্রত্যেকটা খরচের টাকা-আনা-পাই-কড়া-ক্রান্তির নিখুঁত-নির্ভুল বিবরণ। জমার সঙ্গে খরচের যোগ-বিয়োগ করে যা হাতে রইলো তার মোট জমার অঙ্কটার নিচেয় ঠাকুমা-মণি একটা ঢ্যাড়া মেরে সেখানে সই করে দেবেন। এই নিয়মই চলে আসছে কর্তা-মশাই এর মারা যাওয়ার পর থেকে।

সেদিনও মল্লিক-মশাই জমা-খরচের খাতা বগলে করে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—চলো সন্দীপ, আমার সঙ্গে চলো—

সন্দীপ বললে—কোথায় ?

মল্লিক-মশাই বললেন—ঠাকুমা-মণির কাছে। জমা-খরচের হিসেব দেখাতে হবে ঠাকুমা মণিকে--

সেই প্রথম এ-বাড়ি একতলা পেরিয়ে দোতলায়, তারপর দোতলা পেরিয়ে তিনতলায় যাওয়া। একেবারে যাকে বলে অন্দর মহলে। একতলার ঝি ফুল্লরা সরকার মশাইকে ওপরে যেতে দেখে কিছু বললে না। দোতলায় পৌঁছতেই কালিদাসী বলে উঠলো—কে ? কে আসে ?

মল্লিক-মশাই বললেন—আমি রে আমি, সরকার মশাই -

—আজ্ঞে যান—ওপরে যান--

ঝিএরা জানে সব। দোতলা পেরিয়ে তিনতলায় পৌঁছতেই সুধা বলে উঠলো—কে ? কে আসে ?

প্রতিদিনের রুটিন বাঁধা কাজ। তবু জবাবদিহি করতে হয় মল্লিক-মশাইকে। বললেন—আমি রে সুধা -আমি -

জবাবটা শুনেই সুধা ঠাকুমা-মণির খাস ঝি'কে ডাকে—অলো বিন্দু, সরকার

মশাই, আসুন—

মল্লিক-মশাই এর পেছন-পেছন সন্দীপও যাচ্ছিল। সেই-ই প্রথম তার ঠাকুমা-মণিকে চাক্ষুষ দেখা। ঠাকুমা-মণির বয়েস হলেও দেখে বোঝা যায় গায়ে শক্তি আছে পুরো মাত্রায়। ওই শরীর নিয়েই ঠাকুমা-মণি রোজ নিচেয় ঠাকুর বাড়িতে ঠাকুর প্রণাম করতে আসেন। আর পুজোর শেষে আবার তেতলায় গিয়ে ওঠেন। গায়ে তসরের একটা থান আর গায়ের রং-এর সঙ্গে সেই তসরের কাপড়ের রং একাকার হয়ে গেছে এমনই ফরসা ঠাকুমা-মণি।

ঠাকুমা-মণি একটা পশমের আসনের ওপর বসে ছিলেন। মল্লিক-মশাইও গিয়ে সামনে পাতা শতরঞ্চির ওপরে গিয়ে বসলেন। সন্দীপও বসলো পাশে।

সন্দীপকে দেখে ঠাকুমা-মণি জিজ্ঞেস করলেন—এ ছেলেটি কে?

মল্লিক-মশাই বললেন—এই-ই হচ্ছে সেই সন্দীপ, বেড়া-পোতা থেকে এসেছে, যার কথা আপনাকে বলেছিলুম—

তারপর সন্দীপকে বললেন—প্রণাম করো, ঠাকুমা-মণিকে প্রণাম করো—

সন্দীপ ঠাকুমা-মণির সামনে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলে। তারপর দু'টো হাত মাথায় ঠেকিয়ে আবার নিজের জায়গায় বসলো।

ঠাকুমা-মণি জিজ্ঞেস করলেন—কী নাম তোমার?

—সন্দীপকুমার লাহিড়ী—

—বাবা-মা আছেন?

সন্দীপ বললে—বাবা নেই, মা আছে—

মল্লিক-মশাই বাকিটা বললেন। বললেন—বড় গরীব এই ছেলেটা। এর বাবা মারা যাওয়ার পর এর মা পরের বাড়ি কাজ করে একে মানুষ করেছে। আপনাকে তো আগেই সব বলেছি—

এর পর আর বেশি কিছু বলবার দরকার হলো না। হিসেব-নিকেশের খাতা নিয়ে বসলেন মল্লিক-মশাই। ঠাকুমা-মণি সব মন দিয়ে শুনলেন। তারপর জমার ঘরে একটা ঢ্যাড়া দিয়ে সেখানে একটা সই দিয়ে দিলেন। মল্লিক-মশাই এর কাজ হয়ে গেল। মল্লিক-মশাই বললেন—আর একটা কথা ছিল ঠাকুমা-মণি—

—কী?

মল্লিক-মশাই বললেন—কালকে এই সন্দীপকে নিয়ে খিদিরপুরের মনসাতলা লেন-এ তপেশ গাঙ্গুলীর বাড়ি গিয়েছিলুম। এর পরে তো একেই সে-বাড়িতে টাকা দিতে যেতে হবে। তা তপেশ গাঙ্গুলীবাবু একটা কথা বলতে বললেন—

—কী বললেন?

মল্লিক-মশাই বললেন—বললেন জিনিস-পত্তোরের দাম যা বাড়ছে তাতে আপনার দেওয়া ওই মাসে একশো টাকায় আর চলছে না। ওটা একশো টাকার বদলে একশো পঞ্চাশ টাকা করে দেবার জন্যে আপনাকে একটু বলতে বললেন—

ঠাকুমা-মণি বললেন—একশো টাকায় এগারো বছরের মেয়ের চলছে না কেন?

মল্লিক-মশাই বললেন—তপেশবাবু যা বলেছেন, তাই-ই আমি আপনাকে বললুম। এখন আপনি যা বলবেন, তাই-ই করবো—

ঠাকুমা-মণি বললেন—আপনি কী করতে বলেন?

মল্লিক-মশাই বললেন—আপনি মালিক, আপনি যা বলবেন তাই-ই হবে—

ঠাকুমা-মণি বললেন—আচ্ছা ঠিক আছে, যখন বউমার কাকা বলেছে তখন এর পরের মাস থেকে আরো প'চিশ টাকা না-হয় বাড়িয়ে দেবেন। একটা জিনিস লক্ষ্য রাখবেন যেন ওই টাকা বউমার কাকা-কাকিমা নিজের ছেলে-মেয়েদের না খাওয়ায়।

মল্লিক-মশাই বললেন—তা যদি খাওয়ায় তো আমরা আর তা কী করে জানতে পারবো। তাহলে বউমা'কেই জিজ্ঞেস করতে হয়। অন্য লোকদের সামনে তো আর তা জিজ্ঞেস করা যায় না। আবার এও হতে পারে যে বউমাকে জল মেশানো দুধ খাইয়ে খাঁটি দুধটা খাওয়ালো নিজের ছেলে-মেয়েদের।

ঠাকুমা-মণি বললেন—আপনি না-হয় বউমা'কে আড়ালে ডেকেই সব জিজ্ঞেস করবেন। জিজ্ঞেস করবেন সেদিন কী দিয়ে ভাত খেয়েছে। মাছ-মাংস দেয় কি না, ফল-টল দেয় কিনা, তাও জিজ্ঞেস করবেন! খাঁটি দুধ, ফল, মাছ, মাংস, না খেলে স্বাস্থ্য ভালো থাকবে কী করে?

মল্লিক-মশাই বললেন—তা-তো বটেই—

আমি যখন বিশাখাকে ঘরের বউ করে আনবো তখন লোকে বউ দেখে কী বলবে। আমি তো দেখেছি বউমাকে, এত রূপ শরীরে, কিন্তু দেখলেই বোঝা যায় ভালো করে খেতে পায় না। বিধবা মা, দেওরের গলগ্রহ। কে খেতে দেবে? তাই তো ঘি-দুধ-মাছ-মাংস খাওয়াবার জন্যে মাসে-মাসে একশো টাকা বরাদ্দ করে দেবার ব্যবস্থা করেছিলুম। তা আপনি যখন বলছেন তখন না হয় আরো প'চিশ টাকা বাড়িয়েই দেবেন—

সেই কথাই রইল। মল্লিক-মশাই উঠলেন। তাঁর দৈনন্দিন বরাদ্দ কাজও শেষ হয়ে গেছে তখন, সন্দীপও মল্লিক-মশাইএর সঙ্গে উঠলো। তারপর যে রাস্তা দিয়ে তারা তিনতলায় গিয়েছিল ঠিক সেই রাস্তা ধরেই আবার একতলায় মল্লিক-মশাইএর ঘরে এসে পে'ছিল। মল্লিক-মশাই তখন খানিকটা হাল্কা বোধ করছেন। ঠাকুমা-মণির কাছে হিসেব নিয়ে যাওয়াটাই মল্লিক-মশাইএর সারাদিনের সব চেয়ে জরুরী কাজ। সেটাই যখন নির্বিঘ্নে শেষ হয়ে গেল তখন আর ভাবনা কী?

এক সময়ে সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—আচ্ছা মল্লিক-কাকা, তপেশ গাঙ্গুলীবাবুকে আপনি একশো টাকা দিয়ে এলেন কেন? উনি ওই টাকা নিয়ে কী করবেন?

মল্লিক-মশাই তখন আর একটা খাতা নিয়ে বসেছিলেন। বললেন—মাসে-মাসে ওই টাকাটা ও'কে দিয়ে আসতে হয়, ঠাকুমা-মণির তাই-ই হুকুম।

সন্দীপ বললে—কেন? উনিও কি এই বাড়ির কোনও মাইনে করা লোক?

মল্লিক-মশাই বললেন-আরে, না-না। মাইনে করা চাকর হতে যাবেন কেন উনি? উনি তো রেলে চাকরি করেন। ও ও'র ভাই-ঝি'র জন্যে

—ও'র ভাই-ঝি?

—হ্যাঁ, তপেশবাবুর ভাই-ঝি। ও'র ভাই-ঝি'কেই তো ঠাকুমা-মণি এ-বাড়িতে নাত-বউ করে নিয়ে আসবেন।

—তাই নাকি? তা তপেশবাবুর ভাই-ঝি'র বয়েস কত?

—এই ধরো দশ বছর। কি বড় জোর এগারো বছর।

সন্দীপ অবাক হয়ে বললে—এত কম বয়েসের বউ ঘরে আনবেন ঠাকুমা-মণি?

মল্লিক-মশাই বললেন—না, না, এখন তো বিয়ে হবে না।

—কবে বিয়ে হবে ?

—সে এখন অনেক বছর দেরি আছে। এখন থেকে সম্বন্ধ পাকা করে রাখছেন ঠাকুমা-মণি, এখন থেকে মাসে-মাসে একশো টাকা করে দিয়ে যাচ্ছেন, যাতে সেই টাকা দিয়ে ভাই-ঝিকে ভালো জিনিষ খাওয়ানো হয়, যাতে সেই টাকা দিয়ে ভালো মাস্টার রেখে লেখা-পড়া শেখানো হয়। মুখুজ্জে-বাড়ির বউ হয়ে যে আসবে সে যেন সব রকমে এ-বাড়ির যোগ্য হয়, তাকে দেখে কেউ যেন নিন্দে না করে।

মল্লিক-মশাইএর মুখ থেকে কথাগুলো শুনতে-শুনতে সন্দীপ যেন স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে অন্য এক অনাবিষ্কৃত দেশে গিয়ে পৌছিলো। ঠাকুমা-মণির যে-নাতির সঙ্গে তপেশবাবুর ভাই-ঝির বিয়ে সে কোথায় ? তাকে তো সন্দীপ দেখেনি! তাকে কী রকম দেখতে ? তার বয়েস কত ? সে কী করে ? স্কুলে, না কলেজে কোথায় পড়ে ?

তিরিশটা টাকা হাতে নিয়ে পরদিনই সন্দীপ রাস্তায় বেরোল। গিরিধারী গেটের পাশে দাঁড়িয়েছিল। গেটের পাশেই তার ঘর। সেখানেই সে থাকতো, ঘুমোত। সেখানেই সে একটা ছোট্ট উনুনে নিজের খাবার রান্না করতো। আর যখনই একটু ফাঁক পেত, তখনই খেয়ে নিত তাড়াতাড়ি। আর একলা থাকতে-থাকতে যখন একটু নিরিবিলি পেত তখনই সে একখানা পুরনো ময়লা ছাপানো তুলসী দাসের 'রাম-চরিত-মানস' পড়তো। প্রথম-প্রথম গিরিধারী তাকে কিছু বলতো না। কিন্তু যেদিন থেকে বুঝলো যে সন্দীপ মল্লিক-মশাইএর দেশের লোক, আর তার মনিবের কাজ করতেই এসেছে, তখন থেকেই একটু সমীহ করতে লাগলো কারণ, মাসকাবারি মাইনে তাকে নিতে হয় সরকার-বাবুর ঘরে গিয়ে। গিরিধারী দেখেছে সেখানেও সন্দীপ সরকার-বাবুর কাছে থাকে। টাকা গুণে দেয়। সুতরাং এমন লোককে সেলাম করলে তার আখেরে লাভই হবে। তাই তখন থেকেই গিরিধারী সন্দীপকে বাড়ির বাইরে যাতায়াতের সময় সেলাম করতো। সন্দীপ একদিন জিজ্ঞেস করলে—আচ্ছা গিরিধারী, তুমি আমায় দেখলেই সেলাম করো কেন ?

গিরিধারী বললে—হুজুর, আপনি তো বড়া আদমী—

—আমি বড় আদমী ?

গিরিধারী বললে—জরুর। আপনি তো আমার মালিক আছেন হুজুর—

সন্দীপ বললে—না-না, তুমি আমাকে সেলাম করো না। আমি খুব গরিব লোকের ছেলে। পেটের দায়ে কলকাতায় এসেছি চাকরি করতে আর লেখা-পড়া …আমি আর তুমি একই রকম।

তবু গিরিধারী সন্দীপের কথা শুনতো না। বলতো—আপনি হুজুর রাত ন'টার আগেই বাড়ি ফিরবেন। ঠাকুমা-মণির হুকুম রাত ন'টার সময় গেট বন্ধ করতে হবে।

সন্দীপ বললে—রাত ন'টার পর হলে তুমি আর গেট খুলবে না ?

—না, হুজুর। ঠাকুমা-মণির হুকুম।

সন্দীপের মনে পড়লো ঠিক রাত ন'টার সময় ঠাকুমা-মণির সেই গলার আওয়াজ। তেতলা থেকে ঠাকুমা-মণি চেঁচাতেন—গিরিধারী, গেট বন্ধ করো—

গিরিধারীর খেয়াল রাখতে হয় কখন রাত ন'টা বাজলো। সে নিচের থেকে চেঁচায়

—গেট্ বন্ধ্ কিয়া ঠাকুমা-মণি—

তেতলায় ঠাকুমা-মণি গিরিধারীর সেই কথা শুনে নিশ্চিন্ত হন। তখন ঠাকুমা-মণির শুতে যাবার সময় হয়। তখন বিন্দু পায়ের কাছে বসে ঠাকুমা-মণির পা টিপতে সুরু করে। সারাদিনের পরিশ্রমের পর ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে ঠাকুমা-মণির সমস্ত শরীর। সেই শেষ রাত তিনটের সময়ে আবার ঘুম থেকে তাঁকে উঠতে হবে। চব্বিশ-ঘণ্টার মধ্যে মাত্র ছ'ঘণ্টার ঘুমই ওই বয়েসে যথেষ্ট। সেই রাত তিনটের সময়ে ওঠার পরই ঠাকুমা-মণি তৈরি হয়ে নেন। এ তাঁর চিরকালের অভ্যেস। যখন দেবীপদ মুখার্জি বেঁচে ছিলেন তখন থেকেই। সে কতকাল আগেকার কথা। দেবীপদ মুখার্জিকেও তখন ভোর-ভোর উঠতে হতো ঘুম থেকে। তাঁর অনেক কাজ তখন। তখন তিনি 'ম্যাকসুবি মুখার্জি এ্যাণ্ড কোম্পানি, ইণ্ডিয়া লিমিটেড্' তৈরি করেছেন নতুন। বেলুড়ে তাঁর কারখানা, কিন্তু অফিস ডালহৌসি স্কোয়ারে। অত বড় কোম্পানি তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন বললে ভুল হবে। বলতে গেলে ম্যাকডোন্যালড্ সাহেবই কোম্পানিটা তাঁর মাথারওপর চাপিয়ে দিয়ে গেছেন। সে-সব দিনে ভাবনায় তাঁর রাত্রে ঘুম হতো না। সেই সময়ে এই অত বড় সংসার একলা দেখেছেন ঠাকুমা-মণি। একদিকে একতলা-দোতলা-তিনতলা বাড়ির নিয়ম-শৃংখলা বজায় রাখা, আর অন্যদিকে তাঁর ঠাকুর-বাড়ির বিগ্রহ সিংহবাহিনীর পুজো-পাঠ, আর তার সঙ্গে ভোরবেলা বাবুঘাটে গিয়ে গঙ্গা-স্নান। সে ঝড় হোক, বৃষ্টি হোক আর ভূমিকম্পই হোক, রোজ ভোর তিনটের সময় ঘুম থেকে উঠে সকাল পাঁচটার মধ্যে বাবুঘাটে গিয়ে স্নান করতে হবেই।

এই গঙ্গাস্নান করতে গিয়েই হঠাৎ একদিন ঠাকুমা-মণি আবিষ্কার করলেন ওই মেয়েটিকে। ছোট্ট ফুট-ফুটে ফর্সা চেহারা। বয়েস কত আর হবে। বড় জোর নয় দশ কি এগারো। তার বেশি নয়। গাড়ি থেকে নেমে ঠাকুমা-মণি বাবুঘাটের দালানে গিয়ে ঢুকেছেন, তাঁর মাইনে করা পাণ্ডা আছে ঘাটে। দশরথ তাঁকে দেখতে পেলেই অন্য যজমান ছেড়ে ঠাকুমা-মণিকে আগে অভ্যর্থনা করে।

দশরথ সেদিনও বললে রোজকার মত—আসুন ঠাকুমা-মণি, আসুন—

বলে উঠে দাঁড়ালো। অন্য কোনও যজমানকে দেখলে দশরথ এমন করে দাঁড়িয়ে উঠে অভ্যর্থনা করে না। ঠাকুমা-মণির মত এমন শাঁসালো যজমানও তার আর নেই কলকাতায়। সে-সময়ে অন্য যত যজমানই থাক তাকে দশরথ পাশে সরিয়ে দেয়। শুধু যে মাসকাবারি টাকা পায় তাই-ই নয়। বছরে পুজোর সময় দশরথ একবার করে বিডন্-স্ট্রীটের বাড়িতে এসে মল্লিক-মশাই-এর কাছ থেকে একটা ধুতি আর গামছা নিয়ে যায়। আর তা ছাড়া রথের সময়,স্নান-যাত্রার দিনেও চার-পাঁচ টাকা বখশিস পায় সে। এটা তার উপরি। এ-ছাড়াও বিপদে-আপদে হাত পাতলে ঠাকুমা-মণি কখনও তাকে না করেন না।

সেদিন বোধহয় একটা বিশেষ যোগ ছিল, তাই ঘাটে অনেক লোকের ভিড় হয়েছে। তার মধ্যে মেয়েদের ভিড়ই বেশি। দশরথ সেদিনও ঠাকুমা-মণিকে অভ্যর্থনা করেছে। অন্যদিনের মত বিন্দুও ছিল সঙ্গে। দশরথের কাছেই মেয়েটি দাঁড়িয়ে ছিল।

ঠাকুমা-মণি বিন্দুকে বললেন—বিন্দু, দশরথকে জিজ্ঞেস কর তো মেয়েটা কে?

সত্যিই মেয়েটার দিক থেকে চোখ যেন আর ফেরানো যায় না। বিন্দু দশরথকে

কথাটা জিজ্ঞেস করে এসে বললে—ও চেনে না বলছে। বলছে ওর মা নাকি ওকে এখানে রেখে গঙ্গায় চান করতে গেছে। একটু পরেই ওর মা এখানে আসবে—

মেয়েটা দেখতে খুব সুন্দর বটে, কিন্তু দেখে বোঝা যায় গরীব ঘরের মেয়ে। গায়ের ফ্রকটা পুরোন। ঠাকুমা-মণি এবার মেয়েটার সামনে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—খুকী, তোমরা কোথায় থাকো ?

মেয়েটা বললে—খিদিরপুরে—

—খিদিরপুরে কোথায় ? বাড়ির ঠিকানা কী ?

মেয়েটি ভয় পেলে না। বললে—সাত নম্বর মনসাতলা লেন—

ঠাকুমা-মণি আবার জিজ্ঞেস করলেন তোমার নামটা কী বলো তো মা ?

মেয়েটি বললে—প্রথমে আমার নাম ছিল অলকা। ইস্কুলে ভর্তি হবার পর আমার কাকা অলকা নাম বদলে রাখলে বিশাখা—

ঠাকুমা-মণি জিজ্ঞেস করলেন—কেন ?

মেয়েটি বললে—তখন আমার বাবা মারা গেলেন কিনা তাই কাকা আমার নামটা বদলে দিলে—

—তোমার বাবা নেই ?

—না, শুধু মা আছে।

ঠাকুমা-মণি জিজ্ঞেস করলেন—তোমরা কি তোমার কাকার কাছে থাকো ?

বিশাখা বললে—হ্যাঁ—।

—তোমার আর ভাই-বোন কিছু নেই ?

না।

ঠাকুমা-মণি আবার জিজ্ঞেস করলেন—তোমার কাকার ছেলে-মেয়ে কেউ নেই ?

—হ্যাঁ, আমার এক খুড়তুতো বোন আছে, তার নাম বিজলী। যার নামের সঙ্গে নাম মিলিয়ে আমার নাম রাখা হয়েছে বিশাখা।

—তোমাদের বাড়িতে সব সুদ্ধু ক'জন লোক আছে ?

বিশাখা বললে—আমি, আমার মা, আমার কাকা, আমার খুড়তুতো বোন বিজলী, আর আমার কাকীমা, মোট এই পাঁচজন—

—তোমার কাকার নাম কী মা ?

বিশাখা বললে—শ্রী তপেশ কুমার গাঙ্গুলী।

—তোমরা বামুন তাহলে ? তা তোমার কাকা কী করেন ? চাকরি ?

—হ্যাঁ।

—কোথায় চাকরি করেন ?

—রেলের আপিসে।

—কত মাইনে পান ?

বিশাখা বললে— তা জানি না।

তা-তো বটেই, ছোট্ট এইটুকু দুধের মেয়ে, কাকার মাইনের খবর তার জানবার কথাই নয়। সত্যি, কথাটা জিজ্ঞেস করাই উচিত হয়নি ঠাকুমা-মণির। চারদিকে তখন মানুষের ভীড় জমে গেছে। অন্যদিন এত ভীড় হয় না, আর দেরি হলে হয়ত আর স্নান করতেই পারবেন না। চারদিকে মানুষের এত সমস্যা, আর সেই সমস্যা

যত বাড়ছে মানুষের ততই গঙ্গা-স্নান বেড়ে চলেছে। শুধু গঙ্গা-স্নানই নয়, ঠাকুমা-মণি দেখেছেন কালিঘাটের মন্দিরেই হোক আর দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরই হোক সব জায়গাতেই মানুষের পুজো দেওয়ার ভিড় বেড়ে যাচ্ছে। তিনি তারই মধ্যে লোকের ভিড় কাটিয়ে কোনও রকমে স্নান করে নিলেন। তারপর তাড়াতাড়ি স্নান সেরে বিন্দুকে নিয়ে রাস্তায় দাঁড়ানো নিজের গাড়িতে গিয়ে উঠলেন!

বিন্দুকে বললেন--হ্যাঁ রে, দশরথের কাছে সেই মেয়েটাকে তো দেখলুম না! সে কি চলে গেছে নাকি? তুই দেখেছিস?

বিন্দু বললে—হ্যাঁ, চলে গেছে, তার মা'র সঙ্গে চলে গেছে।

সামান্য একটু দর্শন। সেই সামান্য দর্শনেই যেন ঠাকুমা-মণির মনে একটা ছাপ রেখে গেছে মেয়েটা, বাড়িতে সেদিনও সরকার মশাই একতলা থেকে দোতলায় এলেন। কালিদাসী দোতলা থেকে তেতলার সুধাকে খবরটা জানিয়ে দিতেই বিন্দু এসে সরকার মশাইকে ঠাকুমা-মণির কাছে নিয়ে গেল। ঠাকুমা-মণি তৈরি হয়েই বসে ছিলেন। ঠাকুমা-মণির সামনে বসে মল্লিক-মশাই যথারীতি দৈনিক হিসেব-নিকেশের খাতা বার করে পড়ে শোনালেন। অন্যদিনের মত ঠাকুমা-মণিও জমা-খরচের অঙ্কের নিচেয় ঢ্যাড়া মেরে একটা সই করে দিলেন। তারপর মল্লিক-মশাই যথারীতি হিসেবের খেরো খাতাটা বগলে পুরে চলে যাবার উদ্যোগ করছিলেন। কিন্তু ঠাকুমা-মণি যেতে বারণ করলেন। বললেন একটা কথা আছে সরকার-মশাই, আর একটু বসুন—

মল্লিক-মশাই বসলেন। ঠাকুমা-মণি বললেন—আজ সকালে গঙ্গায় চান করতে গিয়ে গঙ্গার ঘাটে একটা মেয়েকে দেখলুম। বড় অপূর্ব রূপ, দেখে আমার মন-প্রাণ ভরে গেল। বয়েস এই দশ কি এগারো। দেখে মনে হলো গরীব ঘরের মেয়ে। আমি নাম জিজ্ঞেস করতে সে বললে—তার নাম বিশাখা। বিশাখা গাঙ্গুলী। শুনে মনে হলে ওরা তো আমাদেরই পাল্টি ঘর। তা ভাবলুম আমার নাতির সঙ্গে ওই বিশাখার বিয়ে দিলে কেমন হয়--

—পাত্রীর বয়েস কত বললেন?

ঠাকুমা-মণি বললেন—এই দশ কি এগারো, তার বেশি নয়। তা বিয়ে আমি তা'বলে এখনই দিচ্ছি না, এখন থেকে কথা বলে রাখছি। যখন শুনলুম যে আমাদেরই পাল্টি ঘর, তখনই কথাটা মনে পড়লো। এমন সুন্দরী মেয়ে পরে হয়ত না-ও পেতে পারি। আর পাত্রীটি যখন বড় হবে তখন হয়ত কেউ তার অন্য কোন বড় লোক ওই রূপ দেখে নিজের ছেলের বউ করে নিয়ে যাবে। তখন? তখন কী হবে? আপনি কী বলেন?

মল্লিক-মশাই বললেন—আমি কি বলবো ঠাকুমা-মণি, আপনি যা ভালো বুঝবেন তাই-ই করবেন—

—তবু আপনার কাছে একটা পরামর্শ চাইছি। আপনি তো এত বচ্ছর এ-বাড়িতে রয়েছেন, আপনি সবই দেখেছেন আর এখনও দেখছেন। বাড়ির কর্তাকেও তো আপনি দেখেছেন। আপনার কাছে এ-বাড়ির কিছুই লুকোনো নেই। আপনিই বলুন না, এখন থেকে পাত্রী পছন্দ করে রাখা ভালো নয়?

মল্লিক-মশাই শুনে কী আর বলবেন, শুধু বললেন—হ্যাঁ নিশ্চয়, খুবই ভালো—

ঠাকুমা-মণি বললেন—কর্তা বেঁচে থাকলে আমি আর এ-সব নিয়ে ভাবতুম না—তাঁর সংসার, তিনি যা ভালো বুঝতেন তাই-ই করতেন। এই দেখুন না, আমার ছোট ছেলে মুক্তি। মুক্তির বিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন, তার কী ফল হলো তা তো আপনি জানেন! কোথায় রইল শক্তি আর শক্তির বউ আর কোথায়ই বা রইল মুক্তি আর মুক্তির বউ। আমার সংসার করবার সাধ চিরকালের মত ঘুচে গেল। এখন আমি এই এত বড় শ্মশানের মধ্যে ধুনি জ্বালিয়ে বসে আছি। তাই ঠিক করেছি এবার আর আমি সে-ভুল করবো না। যা ভুল হয়ে গেছে তা হয়ে গেছে। আমি এবার গুরুদেবকে ডেকে এনে পাত্রীর কুষ্ঠি দেখিয়ে যাচাই করে গরীব ঘর থেকে সুন্দরী মেয়ে এনে সৌমার সঙ্গে বিয়ে দেব। আমি ঠিক করছি না?

মল্লিক-মশাই কী আর বলবেন। মনিব যা বলছেন তার ওপর তো কিছু বলবার অধিকারই নেই তাঁর। তিনি তো এ-বাড়ির পরিবারের মধ্যেকার কেউ নন। তিনি হলেন মাত্র একজন মাস-মাইনের কর্মচারী। তাঁর নিজস্ব কিছু মতামত থাকতেই নেই, বিশেষ করে বিয়ের মত গুরুতর একটা ব্যাপারে।

ঠাকুমা-মণি বললেন—কই, আপনি তো কিছু কথা বলছেন না—

মল্লিক-মশাই বললেন—আপনি যা ভেবেছেন তাই-করুন। ছোটখোকার বিয়েটা খুব ভেবে-চিন্তেই দেওয়া ভালো—নইলে আবার ছোটবাবুর মত ব্যাপার হয়ে যাবে—

ঠাকুমা-মণি বললেন—হ্যাঁ, তাই বলুন। কর্তা যে এমন বিচক্ষণ মানুষ হয়ে ছেলেদের কী-রকম বিয়ে দিয়ে গেল আমার হাড়-মাস একেবারে ভাজা-ভাজা হয়ে গেল। বড়লোকদের ঘর থেকে প্রাণ গেলেও আমি আর মেয়ে আনছি না, এই আমি বলে রাখলুম সরকার মশাই, উঃ কী বউ এনেছিলেন কর্তা, আমার নিজের পেটে ধরা ছেলেকে পর্যন্ত একেবারে পর করে দিলে—

কথা বলতে ঠাকুমা-মণির গলাটা যেন একটু বুজে এল। তবু সেই ধরা গলাতেই বলতে লাগলেন—এমন পিশাচ মা হয়েছে যে নাতি-নাতনিকে একবার এ-বাড়িতে ঠাকুমা-মণিকে দেখতে পর্যন্ত পাঠায় না। বলি আমি যদি না বিয়ে দিতাম তো কোথায় পেতিস অমন সোয়ামী, শুনি? সরকার-মশাই, আপনিই বলুন, আমি কি কিছু অন্যায্য কথা বলেছি? আমারও তো নাতি-নাতনিকে একটু চোখের দেখা দেখতে ইচ্ছে করে। পুজোর সময় পর্যন্ত এ-বাড়ি মাড়ায় না।

মল্লিক-মশাই একটু সান্ত্বনার সুরে বললেন—কিন্তু ছোটবাবু তো আসেন, ছোট-বাবু তো পুজোর সময়ে আপনাকে পেন্নাম করে যান—

ঠাকুমা-মণি বললেন—কে? কার কথা বলছেন? মুক্তি? মুক্তি কেন আসবে না, শুনি? কর্তা ওই কোম্পানি করে গিয়েছিলেন বলেই তো এখনও খেতে পাচ্ছে ওরা, এখনও সবাই লবাবি করতে পারছে। আর শুনেছেন তো ছোটবউমাও আবার একটা গাড়ি কিনেছে। ছেলে-বউ দু'জনেরই দুটো গাড়ি, দুটো করে ড্রাইভার—এ-সব কার দৌলতে হচ্ছে? কে টাকা জোগাচ্ছে? কার জন্যে বাড়ি হলো? কেন, এ-বাড়িতে কি জায়গা ছিল না? এ-বাড়িতে কি থাকবার ঘর ছিল না?

ঠাকুমা-মণির এই জ্বালা, এই রাগ, এ বহুদিনের। যতবার এ-প্রসঙ্গ উঠেছে ততবার ঠাকুমা-মণি মল্লিক-মশাইকে এ-সব কথা শুনিয়েছেন। সরকার মশাইকে

নতুন করে এ-সব কথা শোনানোর তো কোনও দরকার নেই। তিনি এ-বাড়ির কে? তিনি তো মাত্র একজন বেতনভুক কর্মচারী। তিনি তো পর।

মনে আছে যখন মুক্তিপদ'র বাড়ি তৈরি সুরু হলো তখনই ঠাকুমা-মণি রাগে ফেটে পড়েছিলেন। বলেছিলেন—কেন, এ-বাড়িতে কি তোমার জায়গা কুলোচ্ছিল না? নতুন বাড়ি তৈরি করবার মতলব তোমাকে কে দিলে শুনি? ছোট-বউমা?

মুক্তিপদ বলেছিলেন—তুমি বুঝছো না কেন মা, যে প্রপার্টি বাড়ানো ভালো। ব্যাঙ্কে থাকলে টাকার দাম তো বাড়বে না। কদিন টাকার দাম কমতে-কমতে একেবারে পাঁচ পয়সায় নেমে যাবে—তার চেয়ে প্রপার্টিতে ইনভেস্ট করলে টাকা-গুলো তবু লাফিয়ে-লাফিয়ে বাড়বে—

ঠাকুমা-মণি বলেছিলেন—এ-সব কে তোমাকে বলেছে? কে এ বুদ্ধি দিয়েছে শুনি? ছোট-বউমা?

মুক্তিপদ বলেছিলেন—না-না, এ বুদ্ধি দিয়েছে আমাদের সলিসিটার—

ঠাকুমা-মণি বলেছিলেন—তোমার কাছে তোমার সলিসিটারই বড়ো হলো আজ? আর আমি কেউ না? তা তোমার সলিসিটার কি প্রপার্টি করে মা'কে ছেড়ে আলাদা সংসার করতেও বলে দিয়েছে? যাক গে যা ভালো বোঝ তাই করো, দয়া করে আমার কাছে আর ওই মিথ্যে সাফাইগুলো গেয়ো না। তোমরা বাড়ি আর হাঁড়ি দুই-ই আলাদা করতে চাও, এই সোজা কথাটা বললেই হয়।

এর পর থেকে দোতলার সঙ্গে তেতলার আর কোনও মানসিক বা হার্দিক সম্পর্ক রইল না। আর আর্থিক সম্পর্ক? আর্থিক সম্পর্কের কথাই ওঠে না, কারণ বাড়ির কর্তা অনেককাল আগেই সে-বাবস্থা পাকা করে রেখে গিয়েছিলেন। মুখার্জি-বাড়ির কর্তা দেবীপদ মুখার্জি ছিলেন কোম্পানির ম্যানেজিং ডাইরেক্টর। তাঁর স্ত্রী কণকলতা দেবী যেমন একজন ডিরেক্টর, তেমনি ছেলে শক্তিপদ মুখার্জি আর তার স্ত্রী, তারাও ডিরেক্টর, আর ছোট ছেলে মুক্তিপদ মুখার্জি আর তার স্ত্রী, তারাও ডিরেক্টর। সব মিলিয়ে পাঁচজন ডিরেক্টর এই 'স্যাক্সবি মুখার্জি' এ্যান্ড কোং ইন্ডিয়া লিমিটেড'-এর। এই পাঁচজনই এই সম্পত্তির মালিক।

আশ্চর্য, কত স্বপ্নই না দেখে মানুষ, কত স্বপ্নের জালই না বোনে মানুষ নিজের মনে মনে। মল্লিক-মশাই-এর আজও মনে আছে যেদিন ম্যাকডোনাল্ড সাহেব বড়বাবুর হাতে কোম্পানি তুলে দিয়ে বিলেত চলে গেল, সেদিন সাহেবকে বড়বাবু একটা পার্টি দিয়েছিলেন এই বাড়িতে। শুধু একলা সাহেবকে নয়, পুরোন বিলিতি কোম্পানির যত সাহেব ডিরেক্টর ছিল, সবাইকে সেই পার্টিতে নেমন্তন্ন করা হয়েছিল। সাহেবদের সঙ্গে মেমসাহেবদেরও ডাকা হয়েছিল। কেলনার হোটেলের মালিককে দেওয়া হয়েছিল খাবারের অর্ডার। পার্টিতে যে কত রকমের হুইস্কি আর ব্র্যান্ডি আর বিয়ার আর সোডার বোতল এসেছিল তার হিসেব নেই। শুধু মদই নয়, তার সঙ্গে ছিল রকমারি মাংস, চিকেন, মাটন, বীফ, আর বিরিয়ানি, পোলাউ, তন্দুরি প্রন, আর স্যান্ডউইচ, সুপ, পরিজ আর শেষকালে পুডিং। মল্লিক-মশাই সেই ছোট-বেলায় ও সব জিনিসের নামও শোনেননি। আর শুধু কি খানা-পিনা? সঙ্গে ছিল ব্যান্ড-পার্টি। বিডন-স্ট্রীট অঞ্চলের কোনও লোক সেদিন শেষ রাত পর্যন্ত বিলিতি-বাজনার আওয়াজে ঘুমোতেই পারেনি। একদিকে পার্টি চলছে আর

অন্যদিকে আকাশে উড়ছে একটার পর একটা জ্বলন্ত ফানুস। আর তার ওপর আছে বাজি। কোনও বাজি মাটিতে ফাটে, কোনওটা আকাশের ওপর উঠে ফাটে। ফাটবার সঙ্গে-সঙ্গে কেমন তারার মালা হয়ে আকাশে ভেসে ভেসে মাটিতে নামতে থাকে। সে কী বাহার, সে কি রোশনাই।

সেই দেবীপদ মুখার্জি বিলিতি কোম্পানির মালিক হবার পর তাঁর প্রথম ছেলে শক্তিপদ মুখার্জি সাবালক হলো, একদিন তার বিয়েও হলো, ঘরে বউও এল। সে সাবালক হতেই সঙ্গে-সঙ্গে কোম্পানির ডিরেক্টরও হলো, ডিরেক্টর হলো তার বউও।

কিন্তু বউ-এর সঙ্গে বনতো না শাশুড়ির। শ্বশুরের পছন্দ করা বউ শাশুড়ির মনঃপূত হলো না। অশান্তি শুরু হলো বাড়িতে। বাইরে বড়লোকের ঐশ্বর্য আর ভেতরে চাপা আগুন। বাইরে থেকে কেউ বুঝতে পারে না। কিন্তু ক্যানসারের মত তা ভেতরে-ভেতরে সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

এর পর মুক্তিপদ যখন বড় হলো, নিয়ম ম্যাফিক সেও ডিরেক্টর হলো। এবং কাল-ক্রমে তারও বিয়ে হলো। কিন্তু শাশুড়ির সঙ্গে সেই বউ-এরও বনলো না।

তখন ঠিক সেই সময়েই বাড়ির কর্তা দেবীপদ মুখার্জি হঠাৎ মারা গেলেন।

সেই দিন থেকেই সুরু হলো ঠাকুমা-মণির জীবনের অমাবস্যা।

তারপর থেকে এই মুখার্জি বাড়িতে যে-অবিশ্বাস্য কাহিনী সুরু হলো তারই ওপর ভিত্তি করেই রচনা করা হলো "এই নরদেহ"। এই বিরাট উপন্যাস।

কিন্তু সে-কথা এখন নয়। পরে বলা হবে।

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—তারপর?

পরমেশ মল্লিক-মশাইএর বন্ধুর ছেলে এই সন্দীপ। এই সন্দীপ লাহিড়ী। এই সন্দীপ লাহিড়ীও আবার ভাগ্যের কোন্ কলকাঠির টানা-পোড়েনে পড়ে এই মুখার্জি বাড়ির সঙ্গে জড়িয়ে গিয়ে পর্যুদস্ত, ধ্বস্ত, জর্জরিত হয়ে নিঃশেষ হয়ে যাবে, তা কি তখন সে জানতো? জানলে হয়ত দুমুঠো ভাতের জন্যে কলকাতাতেও আসতো না। আর কলকাতাতে এলেও এই অভিশপ্ত বাড়ির ত্রিসীমানাতেও ঢুকতো না।

মল্লিক-মশাই কথা বলতে-বলতে বোধহয় নিজেই অতীতের জালে জড়িয়ে গিয়ে-ছিলেন, তাই একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলেন। হঠাৎ সন্দীপের প্রশ্নে সম্বিত ফিরে পেলেন।

সত্যিই, অতীত-চারণ বড়ই মধুর। সে সুখের অতীতই হোক আর দুঃখের অতীতই হোক, তার, সবটুকুই মধুর। মানুষের বয়েস যতই বাড়ে ততই সে অতীতচারী হতে থাকে। পরমেশ মল্লিক-মশাইএর নিজের সংসার করার সাধ মেটেনি,

নিজের সাধ-আহ্লাদ মেটেনি। তিনি শুধু যে-পরিবারের মধ্যে এসে আপাদমস্তক জড়িয়ে গিয়েছিলেন, সেই পরিবারের উত্থান-পতনের মধ্যে দিয়ে মানুষের জীবনের ইতিহাসের একটা ভগ্নাংশ দেখে গেলেন। আর যেটুকু দেখতে তাঁর বাকি ছিল তা দেখবার জন্যই বেড়াপোতা থেকে কোন এক সন্দীপ লাহিড়ী এসে হাজির হলো বারো-বাই-এ বিডন স্ট্রীটে 'স্যাক্সবী মুখার্জি এ্যান্ড কোং ইন্ডিয়া লিমিটেড'এর বাড়ির অন্দরমহলে।

মল্লিক-মশাইএর কাছে শোনা কথাগুলো এখনও সন্দীপের মনে আছে। মনে আছে মল্লিক-মশাই সেইদিনই বিকেলবেলা বিডন স্ট্রীটের বাড়ি থেকে চলে গিয়েছিলেন খিদিরপুরে। খিদিরপুরে পৌঁছিয়ে মনসাতলা লেন খুঁজে নিতে দেরি হয়নি। সেই রাস্তার সাত নম্বর বাড়িটাও খুঁজে পাওয়া গেল। একটা পুরোন বালি-খসা পাঁউরুটি রং-এর বাড়ি। বাড়ির সদরের দরজার পাল্লা দুটো ফেটে চৌচির হয়ে আছে। দেখলে মনে হয় ধাক্কা দিলেই বুঝি পাল্লা দুটো আলগা হয়ে পড়ে গিয়ে বাড়ির অন্দর-মহলটা রাস্তার পথচারীদের চোখের সামনে একেবারে বে-আব্রু হয়ে যাবে। তবু মল্লিক-মশাই দরজার কড়া নেড়ে খটাখট শব্দ করতে লাগলেন।

ভেতর থেকে কে একজন মেয়েলি গলায় বললে—কে?

মল্লিক-মশাই বললেন—আমি—

অচেনা গলা, তাই ভেতর থেকে দরজাটা কেউ বিনা আত্মপ্রকাশে খুলে দিলে না। উত্তরে শুধু বললে—কে আপনি?

—আপনি আমাকে চিনতে পারবেন না, আমি বিডন স্ট্রীটে মুখার্জিবাবুদের বাড়ি থেকে আসছি।

এবার দরজাটা খুললো। একজন বিধবা মহিলা দরজা খুলে দাঁড়িয়ে রইলেন।

মল্লিক-মশাই আবার বললেন—এ বাড়িতে তপেশ কুমার গঙ্গোপাধ্যায় নামে কেউ থাকেন?

মহিলার মুখটা ঘোমটা দিয়ে আধ ঢাকা। বললেন—হ্যাঁ, তিনি আমার দেওর। তিনি অফিসে গেছেন, এখনও বাড়ি ফেরেন নি।

—কোন অফিসে কাজ করেন তিনি?

মহিলা বললেন—রেলের অফিসে—

—কখন এলে তাঁর দেখা পাওয়া যাবে?

মহিলাটি বললেন—আর একটু পরেই এসে যাবেন। আপনি আর আধঘণ্টা পরে আসবেন—

মল্লিক-মশায় কী করবেন বুঝতে পারলেন না। এতদূর এসে আবার ফিরে যাবেন? কিংবা এখানেই কাছাকাছি কোথাও ঘোরাঘুরি করে না-হয় আধঘণ্টা পরে এলেই হবে। তাই ঠিক করেই তিনি চলে যাবার জন্যে মুখ ঘোরালেন। কিন্তু তার আগেই বাধা পড়লো। পেছন থেকে কে একজন জিজ্ঞেস করলে—কে?

এতক্ষণে মল্লিক-মশাই মুখ ঘুরিয়ে দেখলেন প্যান্ট শার্ট পরা মাঝ-বয়েসী একজন ভদ্রলোক তাঁর দিকে অবাক-দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন। দুজনেই চেয়ে আছেন, তবু কেউ কাউকে চিনতে পারছেন না। ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন—আপনি

কাকে চান ?

মল্লিক-মশাই বললেন—আমি সাত নম্বর মনসাতলা লেনের তপেশ কুমার গাঙ্গুলী বাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি—

ভদ্রলোক বললেন—হ্যাঁ, আমিই তপেশ গাঙুলী। আপনার নাম ?

মল্লিক-মশাই বললেন—আমার নাম পরমেশ চন্দ্র মল্লিক। আর বিডন স্ট্রীটের মুখার্জি বাড়ির ম্যানেজার, মানে সরকার। ওদের পরিবারের সমস্ত খরচ-পত্তোরের হিসেব রাখাই আমার কাজ। আপনি 'স্যাকসবি মুখার্জি' এ্যান্ড কোম্পানি প্রাঃ লিমিটেড'-এর নাম শুনেছেন তো ?

তপেশ গাঙ্গুলী বললেন—হ্যাঁ—

—আমি সেই তাদের ওখান থেকেই আসছি।

তপেশ গাঙ্গুলী বললেন—কিন্তু ওদের বাড়ি তো বেলুড়ে—

মল্লিক-মশাই বললেন—হ্যাঁ, যিনি বেলুড়ে বাড়ি করেছেন তিনি হচ্ছেন মুক্তিপদ মুখার্জি। কর্তা দেবীপদ মুখার্জি মারা যাওয়ার পর বড় ছেলে শক্তিপদ মুখার্জি ম্যানেজিং ডাইরেক্টর হন। কিন্তু তিনি বেশি দিন বাঁচেন নি, বড় ছেলের বউও কিছুদিন পরে মারা যান। তিনি এক ছেলে রেখে যান। তার নাম সৌম্য মুখার্জি। তার বয়েস এখন কম। সেই নাতি আর কর্তার বিধবা স্ত্রী এই বিডন স্ট্রীটের বাড়িতে থাকেন। আমি সেই বাড়ি থেকেই আসছি—

তপেশ গাঙ্গুলী জিজ্ঞেস করলেন—তা মা বেঁচে থাকতেই ছোট ছেলে আলাদা হয়ে গেলেন কেন ?

মল্লিক-মশাই বললেন—দেখুন, ওদের ফ্যাক্টরি তো বেলুড়ে, তাই ফ্যাক্টরির কাছেই বাড়ি করেছেন, যাতে ফ্যাক্টরির কাজ দেখা-শোনার সুবিধে হয়। তা ওই নাতি আর বিধবা ঠাকুমা নিয়েই এই বিডন স্ট্রীটের সংসার। প্রাণী তো মাত্র দু'জন কিন্তু তারই জন্যে হাজারটা লোক-লস্কর, ঝি-ঝিউড়ি, ঠাকুর-চাকর কত কিছু, বড়লোকের বাড়ি হলে যা হয় আর কি। আমি সেই বাড়ি থেকে এসেছি আপনার ভাইঝি'র সম্বন্ধ নিয়ে—

তপেশ গাঙ্গুলী বুঝতে পারলেন না। জিজ্ঞেস করলেন—সম্বন্ধ ? কীসের সম্বন্ধ ?

মল্লিক-মশাই বললেন—বিয়ের—

তপেশ গাঙ্গুলী যেন আকাশ থেকে পড়লেন—বিয়ের সম্বন্ধ ? বলছেন কি মশাই আপনি ? আমার ভাইঝি'র বিয়ের সম্বন্ধ ? আপনি কি পাগল হয়ে গেছেন ? আমার ভাইঝি'র বয়েস কত জানেন ?

মল্লিক-মশাই বললেন—হ্যাঁ, সব জানি। আপনার ভাইঝি'র নাম-বয়েস সব কিছু জানি—

—বলুন তো কী নাম ?

—বিশাখা।

—বয়েস ?

—বয়েস এই দশ কি এগারো—

তপেশ গাঙ্গুলী আরো অবাক হয়ে গেলেন। বললেন—আপনি কী করে এ-সব

জানলেন বলুন তো ?

মল্লিক-মশাই বললেন—আমার ঠাকুমা-মণি কাল বাবুঘাটে গঙ্গাচান করতে গিয়ে আপনার ভাই-ঝি'কে দেখেছেন আর দেখে এত ভালো লেগেছে যে বিশাখার কাছ থেকে তার নাম-ধাম কাকার নাম, সব জেনে আজ সকালেই আমাকে ডেকে বিকেল বেলা আপনার বাড়িতে আসতে বলে দিলেন—

তপেশ গাঙ্গুলী তখনও কিছুই বুঝতে পারছিলেন না। বললেন—তা বিশাখাকে যে তাঁর পছন্দ হলো তা বুঝতে পারলুম, কিন্তু বিয়ের সম্বন্ধ কার সঙ্গে ? পাত্রটি কে ?

মল্লিক-মশাই বললেন—পাত্রটি হলো আর কেউ নয় আমার ঠাকুমা-মণির নাতি, পাত্রের নাম সৌম্য মুখার্জি। ওই স্যাকসবি মুখার্জি এ্যাণ্ড কোম্পানি প্রাঃ লিমিটেড-এর সমস্ত সম্পত্তির একজন অংশীদার—

কথাটা যেন তপেশ গাঙ্গুলীর বিশ্বাস হলো না। আনন্দের আতিশয্যে তাঁর দম বন্ধ হয়ে এল। তিনি হঠাৎ বলে উঠলেন—তা এ-রকম রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছেন কেন ? ছি-ছি, এই গরমে কেউ দাঁড়িয়ে থাকতে পারে ? আপনি ঘেমে উঠেছেন, চলুন-চলুন, ভেতরে চলুন, পাখার তলায় গিয়ে বসবেন চলুন, কী কাণ্ড, ভেতরে চলুন তো।

বলে মল্লিক-মশাই এর হাতটা ধরে টানতে-টানতে একেবারে সদর দরজা পেরিয়ে সামনের এক ফালি উঠোনের ওপর পড়লেন। সেখান থেকেই ডাকতে লাগলেন—ওরে, কোথায় গেলি সব, আমাদের ঘরে দু'কাপ চা দিয়ে যা দিকিনি, ও বউদি, এখ্খুনি দু'কাপ চায়ের জল চড়িয়ে দাও,—

বলে সেখান থেকে মল্লিক-মশাইকে টানতে-টানতে পাশের একটা ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। ঘরের ভেতরে একটা তক্তপোষের ওপরে রাজ্যের বিছানা-পত্র গোল করে পাকানো। মশারিটার এক পাশটা খুলে বাকি অংশটা উল্টো দিকের দেয়ালে ঝুলন্ত অবস্থায় দৃশ্যমান। মল্লিক-মশাই ঘরে তো ঢুকলেন, কিন্তু কোথায় বসবেন ভাবছিলেন। তপেশবাবু ততক্ষণে হন্ত-দন্ত হয়ে ঘরের ইলেকট্রিক পাখাটা ফুল্ ফোর্সে ঘুরিয়ে দিলে। যাতে মল্লিক-মশাই একটু আরাম পান, এত বড় একজন অভিজাত ভদ্রলোককে তিনি রাস্তায় দাঁড় করিয়ে কষ্ট দিয়েছেন, এ-কথাটা ভেবেই তিনি আত্মগ্লানিতে একেবারে মুষড়ে পড়লেন।

মল্লিক-মশাই তাঁর নিজের খাতির বেড়ে যাওয়ায় খুব মজা পাচ্ছিলেন। হয়ত এমনিই হয়। হয়ত কেন, এমনটা হওয়াই তো স্বাভাবিক। তিনি এতে মজাই বা পাচ্ছেন কেন ? এই তপেশবাবুকে তিনি স্বর্গের চাবি এনে দিয়েছেন, এই অবস্থায় পড়লে মল্লিক-মশাই নিজেও তো এমনিই শশব্যস্ত হয়ে উঠতেন !

ততক্ষণে চা এসে গেল। তপেশবাবু নিজের হাতে একটা চা ভর্তি কাপ তাঁর দিকে এগিয়ে দিলেন। বললেন—আগে চা খান, তারপরে কাজের কথা হবে—

মল্লিক-মশাই চায়ের কাপটা হাতে নিলেন বটে, কিন্তু লক্ষ্য করলেন এ-বাড়ির দারিদ্র্য শুধু ঘরের আসবাব-পত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, চায়ের কাপে পর্যন্ত তার স্পর্শ লেগেছে। তাঁর মনে হলো তার এখানে এই বাড়িতে আসা আসল কারণটা নিশ্চয় এতক্ষণে এ-বাড়ির সারা আবহাওয়ায় ছড়িয়ে গেছে। নইলে ভেতরে এত ফুস-

ফুস্‌ গুজ্‌ গুজ্‌ আওয়াজ হচ্ছে কেন ?

মল্লিক-মশাই বললেন—দেখুন তপেশবাবু, আমি কাজের কথাটা বলে চলে যেতে চাই, সেখানে আমার অনেক কাজ পড়ে আছে

তপেশবাবু বললেন—বলুন, কী কাজের কথা বলবেন ?

মল্লিক-মশাই বললেন—আমায় আপনার ভাই-ঝি বিশাখার বাবার নাম, মায়ের নাম আর বিশাখার জন্ম-তারিখ, জন্ম-সময় আর জন্ম-স্থানটা লিখে দিন একটা কাগজে, সেটা নিয়ে আমি চলে যাই—

তপেশবাবু বললেন—দাঁড়ান, আমি আসছি—

বলে তপেশবাবু বাড়ির ভেতরে চলে গেলেন। মল্লিক-মশাই শুনতে পেলেন তপেশবাবু ভেতরে গিয়ে চেঁচাচ্ছেন—বৌদি ও বৌদি, দাও বিশাখার জন্ম-তারিখ, সময় আর বাবার আর তোমার নাম লিখে দাও, কোথায় গেলে তুমি ? অ বৌদি।

মল্লিক-মশাই সেই বন্ধ ঘরের ভেতরে অনেকক্ষণ বসে রইলেন। বাড়ির ভেতরে তখন অনেক মেয়েলি গলার আওয়াজ হচ্ছে। কিন্তু স্পষ্ট করে শোনা গেল না কথাগুলো। খানিক পরে তপেশবাবু একটা কাগজ নিয়ে এলেন। আর তাঁর সঙ্গে পেছন-পেছন দু'টি ছোট্ট ফ্রক পরা মেয়ে। বয়েস দশ এগারোর মধ্যে। কাগজটা দেখে মল্লিক-মশাই নিজের জামার পকেটে রেখে দিলেন। তারপর দাঁড়িয়ে উঠলেন।

তপেশবাবু বললেন—আপনি কাগজটা একটু পড়ে দেখলেন না সরকার মশাই ?

মল্লিক-মশাই বললেন—ও দেখে আমি আর কী বুঝবো। আমি ওটা সোজা আমার মনিবকে গিয়ে দিয়ে দেব, তিনি যা ইচ্ছে হয় তাই করবেন—

তপেশবাবু বললেন—না-না, আমি সে-জন্যে বলছি না। ওতে দু'জনের দু'টো জন্ম-তারিখ দেওয়া আছে। একটা আমার নিজের মেয়ে বিজলীর, আর একটা আমার ভাই-ঝি বিশাখার—

—কেন, আপনার মেয়ের জন্ম-তারিখ তো আমি চাইনি।

তপেশবাবু বললেন—তা না-ই বা চাইলেন, আপনি আমার ভাইঝি'র বিয়েটা ঠিক করে দিলেন, আর ওই সঙ্গে আমার নিজের মেয়েরও একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন না ?

মল্লিক-মশাই বললেন—দেখুন এ তো বিয়ে নয়, এখন থেকে উনি পাত্রী পছন্দ করে রাখতে চান আর কি। তা ছাড়া আর কিছু নয়—

তারপর হঠাৎ একটি মেয়ের হাত ধরে টেনে সামনে দাঁড় করিয়ে দিলেন। বললেন—এই দেখুন, এই আমার মেয়ে বিজলী, এ কি রূপসী নয় ? আমার ভাই-ঝি'র চেয়ে এ কি কম রূপসী ? বিশাখা তো এর পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। একেও দেখুন আর ওকেও দেখুন। আপনিই বিচার করুন কে বেশি রূপসী। মুখে একটু পাউডার-ক্রীম মাখিয়ে দিলেই একেবারে খাঁটি মেমসায়েবের বাচ্চা বলে মনে হবে। বলুন, নিজের চোখে দেখে ভালো করে বিচার করে বলুন। নিজের মেয়ে বলে বলছি না, বিশাখার চেয়ে কি আমার বিজলী কম সুন্দরী ?

মল্লিক মশাই কিছু বলবার আগেই তপেশ গাঙ্গুলী আবার বললেন—আপনার

ঠাকুমা-মণি কি রোজ গঙ্গাচ্চান করতে যান ?

—হ্যাঁ, রোজ।

—কোন্ ঘাটে ?

মল্লিক-মশাই বললেন—বাবুঘাটে—

—ঠিক আছে, আমিও রোজ মেয়েকে নিয়ে নিজে বাবুঘাটে যাবো। যেতে যেতে একদিন-না একদিন দেখা তো হয়েই যাবে।

মল্লিকমশাই আর দাঁড়ালেন না। সেখান থেকে জুতো জোড়া পায়ে গলিয়ে সোজা মনসাতলা লেন ধরে একেবারে বাস-রাস্তায় গিয়ে হাঁফ ছাড়লেন।

আর এদিকে তপেশবাবু বাড়ির ভেতরে ঢুকে চেঁচাতে লাগলেন—কই গো তুমি কোথায় গেলে ! ওরে বিজু, তোর মা কোথায় ?

ভেতরে কোথা থেকে স্ত্রীর গলার আওয়াজ এলো—কী হলো ? এই তো আমি, অত ষাঁড়ের মত চেঁচাচ্ছ কেন ? কী হলোটা কী ?

বিজলী মা'কে খুঁজে বার করলো। বললে—এই যে বাবা, মা এখানে—

তপেশবাবু হঠাৎ গলাটা নিচু করলেন। বললেন—তোমার বড় জা'-এর মেয়ের তো বিরাট বড়লোকের বাড়ি বিয়ের সম্বন্ধ পাকা হয়ে গেল—

তারপর হঠাৎ খেয়াল হলো যে তার মেয়ে বিজলী দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সব শুনছে। বললেন—এই, তুই কী করছিস এখানে ? এ্যাঁ ? যা এখেন থেকে পালা—

চিরকালের অভাবের সংসারের নদীতে হঠাৎ যেন একটা স্বাচ্ছল্যের জোয়ার এসে সব কিছু চঞ্চল করে দিয়েছে। সমস্ত ঘটনাটা বলে তপেশ গাঙ্গুলী হতাশার দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। বললেন—দেখ দিকিনি, তোমার দিদি গঙ্গাস্নান করতে গিয়ে কেমন নিজের একটা কাজ গুছিয়ে ফেললে, আর তুমি ? তুমি যদি একদিনও দিদির সঙ্গে বাবুঘাটে যেতে তাহলে এতদিনে বিজলীরও একটা হিল্লে হয়ে যেত—

তপেশ গাঙ্গুলী কথাগুলো বললেন বটে, কিন্তু ও-পক্ষ থেকে কোনও জবাবই এলো না। যেমন বালিশে মাথা গুঁজে শুয়েছিল, তেমনি শুয়েই রইল। তপেশবাবু আবার জিজ্ঞেস করলেন—ওগো ! কী হলো, অসুখ হলো নাকি আবার ?

তবু কোনও উত্তর নেই বিজলীর মায়ের দিক থেকে। তপেশবাবু বিয়ে হওয়ার পর থেকেই এই অসুস্থ স্ত্রীকে নিয়ে বিব্রত। এতদিন যে তাঁর সংসার চলেছে তা শুধু ওই বৌদির জন্যেই। দাদার মৃত্যুর পর থেকে আরো সুবিধে হয়েছে রাণীর। সংসারের কোনও কাজই আর রাণীকে নিজের হাতে করতে হয় না। রাণী চিরকাল অসুখ নিয়েই ব্যতিব্যস্ত। তাই ডাক্তারের পেছনেই তপেশবাবুর মাসে-মাসে গাদা-গাদা টাকা খরচ হয়ে যায়। তপেশবাবু আবার ডাকলেন—রাণী, কী হয়েছে তোমার, বলো না ! ডাক্তারবাবুকে ডাকবো ? কথার জবাব দাও না—ও রাণী—

বলে রাণীর মাথায় হাত দিয়ে দেখতে চাইলেন শরীর গরম না ঠাণ্ডা ! কিন্তু রাণী এক ঝটকায় তাঁর হাতটা দূরে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বললে—তোমার জ্বালায় তো অস্থির হয়ে গেলাম। একে মাথার জ্বালায় মরছি তার ওপর আবার ঘ্যানোর-ঘ্যানোর····· বলি তুমি কি আমাকে একটু শান্তিতে মরতেও দেবে না ?

বলে রাণী আবার পাশ ফিরে শুলো।

তপেশ গাঙ্গুলী সেখানে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে বিরক্ত হয়ে ঘর ছেড়ে চলে যাচ্ছিলেন। রান্নাঘরের কাছে তখন বৌদি বোধহয় ডাল বাছাই-এর কাজ করছিল।

তপেশবাবু সেখানে দাঁড়ালেন। বললেন—বৌদি, তুমি কি কাল বাবুঘাটে চান করতে গিয়েছিলে?

বৌদি বললে—হ্যাঁ, কাল তোমার দাদার বার্ষিক কাজ ছিল কি না, তাই······

—তা তুমি কি তোমার সঙ্গে বিশাখাকেও নিয়ে গিয়েছিলে?

—হ্যাঁ, কেন?

তপেশবাবু বললেন—এই যে যে-ভদ্রলোক এখন এসেছিল, যাকে চা করে দিতে বললুম, ও-ভদ্রলোক কে জানো? কলকাতার এক কোটিপতি বাড়ির ম্যানেজার। সেই বাড়ির মালিকান বাবুঘাটে তোমার মেয়েকে সেদিন দেখেছে। দেখে খুব পছন্দ হয়েছে, তাই তোমার বিশাখার সঙ্গে নিজের নাতির বিয়ের কথা বলতে লোক পাঠিয়েছিল। সেই জন্যেই তো তোমার মেয়ের জন্মতারিখ-টারিখগুলো দিলুম—

—আমার বিশাখার বিয়ে?

—না, বিয়ে ঠিক নয়, এখন থেকে নাতির জন্যে পাত্রী পছন্দ করে রাখতে চায় আর কি! তোমার কপাল কত ভালো দেখ বউদি, আর তোমার জা?

এ-কথার জবাব কেউ দেয় না, জবাব কেউ প্রত্যাশাও করে না। তপেশবাবু নিজের দুঃখটা প্রকাশ করেই খালাস। তার বেশি তিনি আর কী করতে পারেন! সমস্ত পৃথিবীর ওপর তাঁর রাগ হতে লাগলো। যেন সবাই মিলে তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করে দিয়েছে। তপেশবাবুর দু'চোখ জুড়ে কান্না এসে গেল।

সেদিন রাত্রে ভালো করে ঘুমও হলো না তাঁর। বিছানায় শুয়ে-শুয়ে কেবল এ-ও-পাশ করতে লাগলেন। কখন রাত শেষ হয়েছে টের পান নি। যখন ভোরের দিকে অন্ধকার একটু পাতলা হলো তখন দেখলেন পাশেই রাণী অঘোরে ঘুমোচ্ছে

তিনি আস্তে-আস্তে বিছানা ছেড়ে উঠলেন। কোনও শব্দ করলেন না। পাছে স্ত্রীর ঘুম ভেঙে যায়। অন্যদিন তিনি নিজে উঠেই স্ত্রীকে ডেকে জাগিয়ে দেন। কিন্তু সেদিন কী যে হলো। কোথাকার কোন্ এক বাড়ির কোন এক মল্লিক-মশাই এসে তাঁর ইঞ্চি মাপা জীবন-যাপনের ধরা-বাঁধা গতিতে যেন এক বিস্ময়কর আবেগ আর রোমাঞ্চের তরঙ্গ তুলে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সেদিনও সংসারের দৈনন্দিন কাজ তিনি করলেন বটে, কিন্তু মানুষের মত করে নয়। তিনি কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই যেন মেশিন হয়ে গেছেন। তাড়াতাড়ি কোনও রকমে ভাতগুলো নাকে-মুখে গুঁজে তিনি রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন। অন্যদিন তপেশবাবু পশ্চিম দিকে গিয়ে বাসে ওঠেন। এই-ই তাঁর বহুবছরের নিয়ম। ওই দিকেই রেলের বিরাট অফিস। সেই অফিসেই তাঁর জীবনের অর্ধেকটা তিনি কাটিয়ে দিয়েছেন। মন দিয়ে সেই কাজই তিনি এতদিন করে এসেছেন। এখন মনে হলো তিনি ঠকে গিয়েছেন। ভাগ্যের দেবতা তাঁকে কেবল প্রবঞ্চিতই করে এসেছে। তিনি বাস ডিপোর দিকে গিয়ে খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। মাথার মধ্যে নানা চিন্তা জট্ পাকিয়ে উঠলো। তিনি কোথায় যাবেন? অফিসে?

কিন্তু না, রেলের অফিসে কেউ যদি কাজ না-ও করে তবুও রেল চলবে। তপেশ

গাঙ্গুলীর অভাবে রেলের চাকা বন্ধ হয়ে যাবে না। কিন্তু তাঁর মেয়ের যদি বিশাখার মত ওই রকম একটা বড়লোক পাত্র না জোটে, তাহলে যে তাঁর সংসারের চাকাই অচল হয়ে যাবে। তিনি আর কোনও দিকে না তাকিয়ে একেবারে সোজা ধর্মতলা-গামী একটা বাসের মধ্যে উঠে পড়লেন।

বারো-বাই-এ বিডন্ স্ট্রীটের বাড়িতে তখন প্রাত্যহিক কাজের গাড়ি গড়গড়িয়ে চলতে শুরু করেছে। দেবীপদ মুখার্জির আমল থেকেই এ-কাজ চলে আসছে। মাঝখানে ছোট ছেলে মুক্তিপদ সপরিবারে এ-বাড়ি ছেড়ে বেলুড়ে নতুন বাড়িতে চলে যাওয়ার পরেও তার চলার বেগের কোনও ব্যাতিক্রম হয়নি। একতলার ফুল্লরার সঙ্গে দোতলার কালিদাসীর সেই কথা-চালাচালি, তেতলার সুধার সঙ্গে বিন্দুর সেই ঝগড়া, সবই তখন পুরোমাত্রায় চলছে। কন্দর্প রোজকার মত নিয়ম করে ফুল যোগান দিয়ে গেছে। ঠাকুর-বাড়ির মন্দিরের ঠাকুর-বাড়ির ঝি কামিনী ততক্ষণে মন্দির ধুয়ে-মুছে পরিস্কার করে পাথরের পাটায় রক্ত-চন্দন ঘষতে শুরু করেছে। আর সদরের গেট্ দিয়েই ঢুকেই বাঁ-দিকে প্রথম যে ঘরটা পড়ে, তার ভেতরে বসে মল্লিক-মশাই খেরো খাতায় রোজকার মত জমা-খরচের হিসেব-নিকেশ করতে ব্যস্ত, ঠিক সেই সময়ে কার পায়ের শব্দে মুখ তুললেন। দেখলেন, গিরিধারী।

গিরিধারী বললে—হুজুর, এক আদমী আপনার সঙ্গে মিলতে চায়।

—কে? নাম কী

গিরিধারী বললে—গাঙ্গুলীবাবু—

—কে গাঙ্গুলীবাবু? কোথা থেকে আসছে?

গিরিধারী বললে—খিদিরপুর থেকে—

এতক্ষণে মল্লিক-মশাই বুঝতে পারলেন। মনসাতলা লেন থেকে তপেশ গাঙ্গুলী মশাই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। কিন্তু কালই তো তিনি তাঁর সঙ্গে দেখা করে পাত্রীর জন্ম-সাল তারিখ নিয়ে এসেছেন। সেটা এখনও ঠাকুমা-মণিকে দেখানোই হয়নি। এরই মধ্যে আবার তিনি না বলে-কয়ে এ-বাড়িতে এসে হাজির হলেন কেন?

মল্লিক-মশাই বললেন—ঠিক আছে, তুমি গাঙ্গুলীবাবুকে এখানে নিয়ে এসো—

কথাটা বললেন বটে মল্লিক-মশাই, কিন্তু মনে-মনে ভাবলেন, তপেশ গাঙ্গুলী এই সকালবেলা কেন এলেন? তাঁর কি অফিস নেই? কিন্তু আর কিছু ভাববার আগেই গিরিধারী তপেশবাবুকে সঙ্গে করে তাঁর ঘরে নিয়ে এসেছে।

তপেশবাবু যেন তখন এক নতুন জগতে এসে ঢুকে পড়েছেন। গেট-এর বাইরে থেকেই তিনি বাড়িটার আপাদ-মস্তক দেখে নিয়েছিলেন। কিন্তু ভেতরের বার-বাড়িতে যখন ঢুকলেন তখন মনে হলো আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ যেমন হঠাৎ

কোনও অলৌকিক শক্তিতে একজন মানুষকে জলের তলার প্রাসাদ পুরীতে পৌঁছিয়ে দেয়, এও অনেকটা যেন তেমনি। এক মুহূর্তের মধ্যে তাঁর সাত নম্বর মনসাতলা লেনের ভাড়াটে বাড়িটার সঙ্গে এই বিরাট বাড়িটার একটা তুলনা-সূচক চিন্তা তাঁর মাথায় উদয় হলো! তাঁর নিজের ভাইঝির বিয়ে হবে এই বাড়িতে! কথাটা ভাবতেও যেন কষ্ট হলো একটু!

—কী হলো, আপনি হঠাৎ?

মল্লিক-মশাই-এর গলার আওয়াজে তপেশবাবুর স্বপ্নের জাল যেন ছিঁড়ে গেল।

—আপনার আজ অফিস নেই?

তপেশবাবু ততক্ষণে তক্তপোশের ওপর বসে পড়েছেন। বললেন—আমাদের রেলের অফিস, কাজ তো তেমন নেই, একদিন না গেলেও কিছুই আসে যায় না। এমনি এসে পড়লুম আপনার কাছে। আমার ভাইঝির তো একটা গতি করে দিলেন, ওই সঙ্গে আমার নিজের মেয়েরও একটা গতি করে দিন না?

মল্লিক-মশাই বললেন—আমি কি কারো গতি করে দেবার মালিক? আমি সামান্য লোক, পেটের দায়ে পরের বাড়িতে চাকরি করে জীবন কাটিয়ে দিলুম। আপনি বরং ভগবানকে ডাকুন, তিনিই একটা কিছু গতি করে দেবেন—

তপেশবাবুর চোখে জল এসে যাবার মত হলো। বললেন—তবু আপনি আপনার ঠাকুমা-মণিকে বলবেন, যেন আমার মেয়ের জন্যে একটা কিছু করেন—

মল্লিক মশাইকে বলতে হলো যে তিনি তা করবেন। বললেন—আপনি অত বিচলিত হবেন না, আপনি এখন বাড়ি যান, পরে—

হঠাৎ ওপর থেকে সুধার গলার শব্দ এল—ও লো ফুল্লরা, সরকার মশাইকে ওপরে পাঠিয়ে দে, ঠাকমা মণি ডাকছেন।

একতলার ঝি ফুল্লরা ঘরের সামনে ডাকল—ওপরে ঠাকমা মণি ডাকছেন—

মল্লিক মশাই শশব্যস্ত হয়ে উঠলেন। বললেন—ওই তেতলা থেকে ঠাকমা মণির ডাক এসেছে, আমি চলি গাঙ্গুলীবাবু, আপনাকে আর কষ্ট করে আসতে হবে না, কিছু খবর থাকলে আমি আপনাকে জানিয়ে আসবো, চলি—

তবু তপেশ বাবু বললেন—একটু বসবো?

—না না মিছিমিছি বসে থাকবেন কেন? আপনি এখন আসুন। আমি তো বলছি কিছু খবর থাকলে আমি নিজে গিয়ে আপনাকে জানিয়ে আসবো—আমি চলি—

বলে তিনি আর সেখানে দাঁড়ালেন না, সোজা হিসেবের খাতা-পত্তর নিয়ে ওপরে যাবার জন্যে ঘরের বাইরের দিকে পা বাড়ালেন। ক্যাশ বাক্সের চাবিটা ট্যাকে আছে কিনা একবার দেখে নিলেন আর তার পরেই ওপরে উঠে গেলেন। তপেশ গাঙ্গুলীও কোনও উপায় না পেয়ে সদর পেরিয়ে রাস্তায় গিয়ে পড়লেন।

বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়টা বড় এলোমেলো। তার আগে মোটামুটি এক হাজার বছর শান্তিতেই কেটেছিল। যেটুকু অশান্তি মাঝখানের তিন-চার বছর সৃষ্টি হয়েছিল সেটা নাম মাত্র। তাতে পৃথিবীর হাঁড়িতে খাবারের টান পড়েনি। সেই ম্যাকডোনাল্ড সাহেবের ম্যাকডোনাল্ড স্যাক্সবী' কোম্পানির পুরো ডিভিডেন্ড্ পেতে লন্ডনের শেয়ারহোল্ডারদের কোনও অসুবিধে হয়নি। তাদের ব্রেকফাস্টের টেবিলে ঠিক সময় হল্যান্ড থেকে বাটার পৌঁচেছে, ইণ্ডিয়া থেকে গেছে চা আর ব্রেজিল থেকে কফি। সোরা তৈরির জন্যে মাল মসলা গেছে বার্ণ' কোম্পানির আয়রণ-ওর-এর খনি থেকে যথাসময়ে। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে সোনা গেছে। কিউবা থেকে গেছে চিনি। ক্যালিফোর্নিয়া থেকে অরেঞ্জ গেছে, পেরু থেকে সিলভার। কোথাও কোনও অভাব ঘটেনি ব্রিটিশ এম্পারারের। তাঁর জৌলুসে কোনও খাদ স্পর্শ করেনি। তাঁর সম্মানে কোনও ঘা লাগেনি।

কিন্তু এবার অন্য রকম। এবার সেই ব্রিটেন, সেই 'রুল ব্রিটেনিয়া' খাবারের অভাবে একেবারে থার্ড পাওয়ারে এসে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। পৃথিবীর যেখানে যত কালো চামড়ার লোক মাথা চাড়া দিয়ে-দিয়ে দাঁড়িয়ে বলেছে—অয়ং অহম ভো; অর্থাৎ আমি এসেছি। আমরাও মানুষ, আমাদেরও পেট আছে, আমাদেরও ক্ষিধে আছে। কবেকার সেই কাহিনী সব। ১৯১৮ সালে ১১ই নভেম্বর প্রেসিডেন্ট উইলসন বলেছিলেন—এবার আর ভয় নেই। মাভৈঃ। এবার আর্মিস্টিসই হয়ে গেছে। আমরা সবাই মিলে 'লীগ্ অব্ নেশনস্' তৈরি করেছি। এবার আমাদের মানুষের সংসারে শান্তি আসবে। কিন্তু আশ্চর্য, তখন কি প্রেসিডেন্ট উইলসন জানতেন যে সোভিয়েট রাশিয়ার গোকুলে লেনিন নামে আর এক অখ্যাত-অজ্ঞাত ভদ্রলোক একদিন মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে? কিংবা ১৮১৫ সালে যাকে সবাই মিলে এ্যারেষ্ট করে নিয়ে সেণ্ট্‌হেলেনা দ্বীপে বন্দী করে রেখেছিলাম, সে আবার একদিন ১৯৩৪ সালে জার্মানীর চ্যান্সেলার হয়ে সারা পৃথিবী কাঁপিয়ে তুলবে ১৯৩৯ সালে? এ সব কথা সেদিন তো কেউ কল্পনাও করতে পারেনি যে ব্রিটেন-ফ্রান্স-ইটালির যত কলোনী এশিয়ায় আছে তা হঠাৎ একদিন তাদের হাত ছাড়া হয়ে যাবে।

সে সব ইতিহাসের কাহিনী সন্দীপ বেড়াপোতার চাটুজ্জে বাড়ির লাইব্রেরীতে বসে-বসে পড়তো! অন্য ছেলেরা যখন পাঁচকড়ি দে আর চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস-গল্প পড়তো, সন্দীপ তখন এই সব বই নিয়েই মশগুল হয়ে থাকতো। বার-বার তার মনে হতো কেন চাটুজ্জে বাড়ির লোকেরা বড়লোক, আর কেনই বা তার মা গরিব! কেন তার বিধবা মা চাটুজ্জে বাড়িতে ঝি-গিরি করে!

সে তার মা-কে একদিন জিজ্ঞেস করেছিল—আমরা গরিব কেন মা?

মা ছেলের কথা শুনে অবাক হয়ে যেত। বলতো—ওমা, তোর মাথায় আবার এসব ভাবনা এল কেন? কে তোকে বলেছে এ-সব কথা?

সন্দীপ বলতো—বা রে, বলবে আবার কে? আমি দেখতে পাই না? আমার কি চোখ নেই?

মা বলতো—তোদের ইস্কুলে এই সব কথা পড়ায় বুঝি?

সন্দীপ রাগ করতো। বলতো—ইস্কুলে কেন পড়াবে? আমি তো চাটুজ্জে-

বাবুদের বাড়ি গিয়ে দেখতে পাই সব। ওদের বাড়িতে গিয়ে আমি তো দেখতে পাই সব। ওদের মা'রা কত ফরসা শাড়ি পরে বেড়ায়--

সত্যিই, সন্দীপ চাটুজ্জে-বাড়িতে গিয়ে দেখতো তাদের বাড়িতে ইলেকট্রিক বাতি জ্বলছে, ইলেকট্রিক পাখা চলছে মাথার ওপর। গ্রীষ্মকালে পাখার তলায় বসলে কত আরাম। এতটুকু গরম হয় না। কিন্তু কেন ওদের বাড়িতে অত আলো-পাখা, আর কেনই বা তার নিজের বাড়িতে এত অন্ধকার, এত গরম!

মা বলতো—তুমি ভালো করে লেখাপড়া করো বাবা, ভাল করে লেখাপড়া করলে তোমারও অনেক টাকা হবে, তখন তুমিও চাটুজ্জেদের বাড়ির মত ঘরে আলো-পাখা সব লাগিও। তখন কেউ বারণ করবে না।

তখন মাও জানতো না, সন্দীপও জানতো না যে কেন একজন বড়লোক হয়, আবার সেই সঙ্গে কেন একজন গরিব হয়। দুজনেই জানতো না যে টাকা উপায়ের মূল উৎসটা লেখাপড়ার শাবল দিয়ে খোঁচাবার বস্তু নয়। সেই টাকা উপায়ের উৎসটার মুখ আরো অনেক গভীরে নিহিত আছে। সেটা খুঁজে বার করতে গেলে একেবারে ইতিহাসের সমুদ্রে ডুবে যেতে হয়। কিন্তু সে সমুদ্র কোথায়?

বিডন্ স্টীটের বাড়িতে শুয়ে-শুয়ে সন্দীপ অনেক দিন স্বপ্নের মত বেড়াপোতায় মা'র কাছে গিয়ে পেঁছিতো। বেড়াপোতার বাড়িতে হয়ত তখন চাল দিয়ে বৃষ্টির জল পড়ছে। সেই ঘরের ভেতরে মা হয়ত জেগে-জেগে সন্দীপের কথাই ভাবছে। কলকাতায় আসবার দিন মা খুব কাঁদছিল। বলেছিল—বেশ সাবধানে সেখানে থাকবে বাবা। মল্লিক কাকার কথা শুনবে।

সন্দীপের চোখ দুটোও কি শুকনো ছিল? কিন্তু মার সামনে সন্দীপ একটুও কাঁদেনি। সন্দীপকে কাঁদতে দেখলে মা হয়ত আরও জোরে কেঁদে ফেলতো।

মা'র শেষ কথা ছিল—পেঁছে একটা চিঠি দিস্ বাবা।

কিন্তু তখন ট্রেনটা ছেড়ে দিয়েছে। ট্রেনের চলন্ত চাকার শব্দকে অতিক্রম করে মা'র শেষ কথাগুলো তার কানে এখনও বাজছিল। কেবল শব্দ হচ্ছিল পেঁছে একটা চিঠি দিস্ বাবা—পেঁছে একটা চিঠি দিস্ বাবা--

সেই 'পেঁছে একটা চিঠি দিস্ বাবা' কথাগুলো যেন একলা থাকলেই এখনও সন্দীপের কানে বাজতে থাকে।

সেদিনও সেই রকম একলা শুয়ে-শুয়ে কথাগুলো কানের কাছে বাজছিল। হঠাৎ যেন কোথায় একটা কী-রকম শব্দ হলো। ঘরের ভেতরে আর একটা তক্তপোশে মল্লিক-মশাই ঘুমোচ্ছিলেন। তিনি যে ঘুমোচ্ছিলেন তা তাঁর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনেই বোঝা যাচ্ছিল। তিনি সারাদিন উদয়াস্ত পরিশ্রম করেন, তাঁর ঘুম তো আসবেই।

কিন্তু সন্দীপের কেন অত সহজে ঘুম আসে না? অথচ কলেজ থেকে ফেরবার সময় বড় ঘুম পায়। মনে হয় বাড়িতে গিয়েই ঘুমিয়ে পড়বে। কিন্তু শোবার পর আর ঘুম আসে না। কোথা থেকে হাজার-হাজার ভাবনা-চিন্তা মাথায় ঢুকে পড়ে।

সেদিন কলেজ থেকে ফেরবার পথে মির্জাপুর আর কলেজ স্ট্রীটের মোড়ের কাছে একটা জায়গায় এসে সে থমকে দাঁড়ালো। দেখলে ফুটপাতের ওপর একটা জায়গায়

একটা ফ্রেমে বাঁধানো সাইনবোর্ডের ওপর কী সব কথা যেন লেখা রয়েছে। চারদিক অন্ধকার হয়ে গেছে। ও-দিকটায় কতকগুলো কাপড়-জামার দোকান গজিয়ে উঠেছে। দেশ ভাগের পর যে-সব লোক বাস্তুহারা হয়ে কলকাতায় এসেছে, তারা সার-সার কাপড়-জামার দোকান করেছে। দোকানগুলো সবই বাঁশ আর বাখারি দিয়ে তৈরি। মাথায় তেরপল ঢাকা, বৃষ্টিতে যাতে জল না পড়ে, কিংবা মাথায় রোদ না লাগে।

রাত ন'টার পরই মুখার্জি-বাড়ির গেটে তালা পড়ে যায়। তাই কলেজ থেকে বেরিয়ে এসব বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখবার সময় হয় না। কিন্তু এক-একটা এমন জিনিসও থাকে, যা দেখবার জন্যে না দাঁড়িয়ে পারা যায় না।

কিন্তু একটু দেরি হলেই মল্লিক মশাই জিজ্ঞেস করেন—এতক্ষণ কী করছিলে? তুমি আসছো না দেখে আমি তো ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম! সমস্ত রাস্তাটা হেঁটে এসেছ বুঝি?

সন্দীপ বলে—হ্যাঁ, রাস্তার একটা জায়গায় আটকে গিয়েছিলুম।

—কেন? কী হয়েছিল?

সন্দীপ বললে—একটা জায়গায় অদ্ভুত জিনিস দেখলাম ঠিক মির্জাপুর রোড আর কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে।

—সেখানে কী হচ্ছিল?

মনে আছে সেই রাস্তার মোড়ের ওপরে একটা জায়গায় বেদীর মত তৈরী করা। তাতে একটা ইলেকট্রিকের আলো জ্বলছে। পাশে অনেক ফুল ছড়ানো রয়েছে, আর ধূপদানিতে অনেকগুলো ধূপ জ্বলছে। আর সাইনবোর্ডের ওপর লেখা রয়েছে:

"শ্রী শ্রী জগন্মাতার স্বপ্নাদেশে বিশ্বশান্তি স্থাপনের নিমিত্ত এই দেবস্থানে প্রত্যহ পূজা-পাঠ ও যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইবে। ঈশ্বরের সেই নির্দেশ পালনের হেতু আমাদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন।

সোম—ব্রহ্মা মঙ্গল—বিষ্ণু বুধ—মহেশ্বর
বৃহস্পতি—লক্ষ্মী শুক্র—সন্তোষী মা শনি বারের দেবতা

সেবাইতঃ ভূতনাথ দাস (ভুতো)

সন্দীপ সেইখানে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে লেখাগুলো পড়ছিল। সামনের একটা তামার থালার ওপর অনেক খুচরো পয়সা পড়েছিল। এ-রকম দৃশ্য আগে কখনও দেখেনি সন্দীপ। কলকাতার আজব দৃশ্য আর এ-রকম লেখা সে আগে কোথাও দেখেনি।

জায়গাটা ছেড়ে সে চলে আসছিল, হঠাৎ কোথা থেকে কে একজন সামনে এসে দাঁড়ালো। বেশ ষণ্ডামত চেহারা। হাতে উলকির ছাপ। হাত গোটানো শার্টের বাইরে উলকির ছবিটা দেখা যাচ্ছিল। জায়গাটা থেকে সরেই যাচ্ছিল সন্দীপ, কিন্তু লোকটা বললে—কী হলো দাদা, কিছু সাহায্য দিলেন না?

সন্দীপ বললে—আমি গরিব ছেলে, আমার কিছু সাহায্য দেবার ক্ষমতা নেই।

লোকটা বললে স্বপ্নাদেশপ্রাপ্ত পূজো, বিশ্বশান্তির জন্যেই পূজো হচ্ছে। আমাদের কিছু স্বার্থ নেই এতে, সকলের ভালোর জন্যেই করেছি। দেবতার ক্ষমতা নেই বলে একটা টাকা অন্ততঃ দিন—মাত্র একটা টাকা। কত দিকে কত খরচ হয়ে

যাচ্ছে, আর ভাল কাজের জন্যে একটা টাকা দিতেও আপত্তি ? সিনেমা দেখতেও তো কত পয়সা খরচা হয়ে যায়··

এত বলার পর সন্দীপের কেমন যেন একটু লজ্জা হলো। সে যে সিনেমা দেখে না, এই সামান্য কথাটাও সে জানাতে পারলো না। পকেটে হাত দিয়ে একটা দু'আনি বার করে তামার থালাটার ওপর ফেলে দিয়ে সোজা বাড়ির দিকে পা বাড়িয়ে দিলে।

ঘটনাটা সমস্ত শুনে মল্লিক মশাই বললেন—গেলো তো তোমার দু'আনা পয়সা ? এটা তোমার বেড়াপোতা নয়, এটা কলকাতা। তোমাদের মত গে'য়ো লোকদের ঠকাবার জন্যে গুণ্ডারা সারা শহরে জাল পেতে রেখেছে, এখানে সেদিন দেখলে না বাসে ওঠবার সময় সবাই কী-রকম তোমাকে ঠেলে ফেলে মাড়িয়ে দিলে ! আর তা ছাড়া তুমি তো এখনও মাইনে পাওনি—

সন্দীপ কী আর বলবে। শুধু বললে—আমার মা'র কথা মনে পড়লো বলেই পয়সাটা দিলুম।

—কেন, তোমার মা আবার কি বলেছিল ?

—বলেছিল যখনই বিপদে পড়বি ভগবানকে ডাকবি !

মল্লিক মশাই বললেন তা আমাদের বাড়িতেই তো ভগবান রয়েছে।

সন্দীপ বুঝতে পারলে না। জিজ্ঞেস করলে—এ বাড়িতে ? এ বাড়িতে ভগবান কোথায় ?

মল্লিক মশাই বললেন—কেন, এ বাড়িতে রোজই তো সিংহবাহিনীর পুজো হয়। সিংহ-বাহিনীও তো ভগবান। ভগবান নয় ?

তা বটে ! কথাটা মনে পড়ে গেল। সমস্ত বাড়িটা নিঝুম-নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। সন্দীপ আবার মা'র কথা ভাবতে লাগলো। এখনও বোধহয় মা ঘুমোয়নি। জেগে-জেগে কেবল তার কথাই ভাবছে ! কাল সকাল বেলাই আবার মা'কে একটা চিঠি লিখতে হবে। মা আসবার সময় বলে দিয়েছিল—কলকাতায় পে'ছেই একটা চিঠি দিস্ বাবা—

মা যতগুলো পোস্টকার্ড লিখেছিল সে-সবগুলোই সে যত্ন করে গুছিয়ে রেখে দিয়েছিল। মাঝে-মাঝে মা'র চিঠিগুলো বাক্স থেকে বার করে পড়তো। অথচ কোনও চিঠিটাই মা'র নিজের হাতে লেখা নয়, চাটুজ্জে বাড়ির বউকে দিয়ে মা'র জবানীতে লেখা।

হঠাৎ অন্ধকার আবহাওয়াটা যেন একটু চঞ্চল হয়ে উঠলো।

কে ?

একবার মনে হলো হয়তো তার মনের ভুল ! কিন্তু কয়েকদিন আগেও তো এই রকম শব্দ হয়েছিল। তবে কি আজকেও ছোটবাবু বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে ?

সন্দীপ আস্তে-আস্তে তক্তপোষ ছেড়ে উঠলো। পাশের তক্তপোশের দিকে চেয়ে দেখলে। মল্লিক কাকা অঘোরে ঘুমোচ্ছে। তারপর টিপি-টিপি পায়ে ঘরের দরজাটা খুলে বাইরে বেরোল। ভেতরে সব কিছু অন্ধকার। বারান্দাটায় যেন কোথা থেকে এক ফালি আলো এসে পড়েছে। বারান্দা পেরিয়ে দক্ষিণ দিকে বার বাড়িতে যাবার রাস্তা। সেদিকের সদর দরজাটা ফাঁক কেন ? ওটা-তো বরাবর

খিল এঁটে বন্ধ করা থাকে !

সন্দীপ আস্তে-আস্তে দরজাটা একটু ফাঁক করে বাইরের দিকে উঁকি দিলে। উঁকি দিয়ে দেখলে গিরিধারী লোহার গেটটা খুলে দিয়েছে। আর বাড়ির ছোটবাবু নিজে গাড়িটা ঠেলতে-ঠেলতে রাস্তায় বার করলে। তারপর গাড়ির দরজা খুলে ভেতরে বসে ইঞ্জিন চালিয়ে দিতেই গাড়িটা সোঁ করে চলতে লাগলো। আর গিরিধারী তার আগেই লোহার গেটটা নিঃশব্দে বন্ধ করে দিয়েছে। এমন ভাবে গেটটা বন্ধ করলে যাতে কোনও শব্দ না হয়।

সন্দীপ হতবাক হয়ে সেখানেই খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তার মনে হলো, বোধহয় ছোটবাবু জানতেন যে তিনি একটা অন্যায় কাজ করছেন, তাই এত সাবধানতা ! অথচ ঠাকমা-মণির তো হুকুম ছিল ঠিক রাত নটার সময় গিরিধারী গেট বন্ধ করবে। তা হলে ? তা হলে কী ?

তারপর আবার আগের রাতে যেমন করেছিল তেমনি করল। টিপি টিপি পায়ে আবার বারান্দা পেরিয়ে নিজের ঘরে এসে ঢুকলে। মল্লিক কাকা তখনও অঘোরে ঘুমোচ্ছেন। তিনি কিছুই টের পেলেন না। সন্দীপ আবার তেমনি নিঃশব্দে ঘুমিয়ে পড়ল।

কিন্তু ঘুম—ঘুম কি অত সহজে আসে ? ঠিক তখন নানান্ কথা নানান্ চিন্তা মাথার মধ্যে ঢুকে ভিড় করতে লাগলো। এত রাত্রে ছোটবাবু কোথায় বেরোলেন ? আর বেরোলেন যদি তো বাড়ি ফিরবেন কখন ? কত রাত হবে তাঁর ফিরতে ? আশ্চর্য ! রোজই এই রকম করেন নাকি ছোটবাবু ?

প্রথম দিন যখন ঘটনাটা দেখেছিল সে তখন এই রকমই অবাক হয়েছিল। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে সন্দীপ মল্লিক-কাকাকে জিজ্ঞেস করতে সংকোচ করেছিল। শুধু জিজ্ঞেস করেছিল—আচ্ছা মল্লিক কাকা, সেদিন আপনার সঙ্গে যে খিদিরপুরে মনসাতলা লেনে তপেশবাবুর বাড়ি গিয়েছিলুম, সে বাড়ির মেয়ের সঙ্গে এ বাড়ির কার বিয়ে হবে ?

মল্লিক কাকা বলেছিলেন —এ বাড়ির ছোটবাবুর সঙ্গে।

—ছোটবাবু ? ছোটবাবু কে ?

—এই এ-বাড়ির ঠাকমা-মণির নাতি। ঠাকমা-মণির বড় ছেলের ছেলে।

—বড় ছেলে কোথায় থাকে ?

—বড় ছেলে মারা গেছে। বড় ছেলের বউও মারা গেছে। ওই এক ছেলে ছাড়া আর কেউই নেই তাঁদের।

সন্দীপ তবু বুঝতে পারেনি। জিজ্ঞেস করেছিল—এই ছোটবাবুর নামই কি সৌম্য ? এই ছেলের সঙ্গেই কি খিদিরপুরে সেই বাড়ির মেয়ের বিয়ে হবে ?

এবার মল্লিক কাকা রেগে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন—তোমার এত কথার দরকার কী ? তুমি এখানে চাকরি করতে এসেছ, একমনে চাকরি করে যাও। বাড়ির ভেতরের কথায় তুমি কান দিতে যাও কেন ?

এর পরে আর কোনও কথা বলেনি সন্দীপ। মল্লিক কাকা বলেছিলেন—নাও, এই জমা-খরচের খাতাটা নিয়ে কত জমা, কত খরচ কষে দাও দিকিনি।

ভেতর-বাড়ির কথা নিয়ে মল্লিক কাকাকে সন্দীপ আর বিশেষ কিছু বলেনি বটে, কিন্তু মনে আছে, তার পর থেকেই সে কেমন নিঃশব্দে ওই ছোটবাবু আর ওই বিশাখার জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু সে তো আজ অনেক পরের কথা। যথাসময়ে সে প্রসঙ্গ বলা যাবে! শুধু এইটুকুই এখানে বলা ভাল যে সেদিন সে রাত্রে তার তক্তপোষের ওপর কখন যে সে ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল, তা আর তার খেয়াল ছিল না।

আজ এতদিন পরে সেই সব দিনের কথা ভাবতে গিয়ে সন্দীপের মনে হলো কেনই বা সে অমন করে এই বাড়িটার রন্ধ্রে-রন্ধ্রে নিজেকে বিলীন করে দিয়েছিল, কেনই বা ওই বিডন স্ট্রীটের মানুষদের প্রত্যেকটা রক্তবিন্দুর সঙ্গে সে অমন ভাবে একাকার হয়ে গিয়েছিল? তাতে শেষ পর্যন্ত কী লাভ হয়েছিল তার? তা না হলে তো এতদিন তাকে জেলখানায় নিশ্ছিদ্র পরিবেশে এমন করে যন্ত্রণা ভোগ করতে হতো না।

সেদিন তপেশ গাঙ্গুলী মশাই চলে যাবার পর মল্লিক মশাই উঠলেন। তখন সন্দীপ ও বাড়িতে আসেনি। এ-সব সেই যুগের কথা, সেই দিনকার কাহিনী। গল্প করেছিলেন মল্লিক মশাই। গল্প শুনতে-শুনতে সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—তারপর? তারপর কী হলো কাকা?

সেই বাবুঘাটের পাণ্ডা দশরথের সামনে থেকে যে নাটক শুরু হয়েছিল তারই প্রথম অঙ্ক প্রথম দৃশ্যই তখন চলছে।

মল্লিক মশাই বললেন—তারপর আর কী করবো, তপেশ গাঙ্গুলী মশাই চলে যাবার পরই আমি তেতলায় ঠাকমা-মণির ঘরে গেলুম।

ঠাকমা-মণি বললেন—আপনি গিছলেন?

মল্লিক মশাই বললেন—হ্যাঁ, আমি গিয়েছিলুম।

—কী রকম বাড়ী দেখলেন?

—খুব গরিবের সংসার। তপেশ গাঙ্গুলী মশাই রেলে সামান্য মাইনের চাকরি করেন। তাঁর নিজেরও একটা মেয়ে আছে, তার নাম বিজলী আর এই ভাইঝির নাম বিশাখা। আমি যা শুনলাম তাতে বুঝলাম যে তপেশ গাঙ্গুলীবাবুর মেয়ের নামের সঙ্গে মিলিয়ে ওই মেয়ের নাম বিশাখা রাখা হয়েছে। তারপর বললেন—আরও একটা কারণ আছে। পাত্রীর বৈশাখ মাসে জন্ম। বৈশাখ মাসে সূর্য যখন বিশাখা নক্ষত্রে পূর্ণিমা শেষ হয় তখনই ওই মেয়ের জন্ম হয়। তাই শুনে ভাবলাম খুবই সুলক্ষণা।

ঠাকমা-মণি বললেন—আপনি কন্যার জন্ম তারিখ সময় সব কিছু নিয়ে এসেছেন?

মল্লিক মশাই বললেন—হ্যাঁ, এই নিন। এতে সব লেখা আছে, আমি ওঁদের

মুখে সব শুনে লিখে এনেছি—বলে কাগজটা ঠাকমা-মণির দিকে এগিয়ে দিলেন।

ঠাকমা-মণি বললেন—এটা আমি নিয়ে কি করবো? ওটা আপনিই ভাল করে নিজের কাছে রেখে দিন। তারপর আজই কাশীতে গুরুদেবকে চিঠি লিখে একদিন এখানে আবার আসতে বলে দিন। আর বলে দিন ব্যাপারটা খুবই জরুরী। আর গুরুদেবকে মণি-অর্ডার করে পাঁচশো টাকা পাঠিয়ে দিন রাহা খরচ বাবদ।

মল্লিক মশাই বললেন—আজ্ঞে, তাই-ই করবো—বলে একটু থামলেন। বললেন—আর একটা কথা—

—কী? বলুন?

মল্লিক মশাই বললেন—আপনাকে সব কথা খুলে বলাই ভাল, তাই বলছি। ওদের অবস্থা খুবই খারাপ দেখে এলুম।

—কী রকম?

মাত্র দু'খানা ঘর ওদের। ওই দু'খানা ঘরেই ওরা পাঁচজন প্রাণী গুঁতোগুঁতি করে থাকে। সেই সেকালের তিরিশ টাকা ভাড়া। পুরনো ভাড়াটে বলেই এত সস্তায় বাড়ি পেয়েছে। তপেশ গাঙ্গুলী রেলের অফিসে কাজ করে মাইনেও কম পায়। রেলের অফিসে কেরানী মানুষ, তাই আমাকে বলছিল বিশাখার বদলে ওর মেয়েটিকে যদি আপনি ছোটবাবুর জন্যে পছন্দ করে রাখেন—

ঠাকমা-মণি বললেন, সে কী! আমি যাকে নিজে দেখে পছন্দ করেছি, তাকেই আমি নিজের নাত্-বউ করব।

মল্লিক মশাই বললেন—হাজার হোক অভাবী লোক তো। তাই একটু হিংসে হচ্ছে। আজ সকালেও আমার কাছে এসেছিলেন।

—আজ সকালে? আজ সকালেও এসেছিলেন? এই বাড়িতে?

মল্লিক মশাই বললেন—হ্যাঁ, ঠাকমা-মণি। আমার অফিসে না গিয়ে খিদিরপুর থেকে একেবারে সোজা এই বিডন স্ট্রীট এসেছিলেন।

—কেন? কী দরকার তাঁর?

—আমাকে মনে করিয়ে দিতে এসেছিলেন, পাছে আমি ভুলে যাই, তাই। বড্ড গরিব মানুষ এই বাড়িতে ভাই-এর মেয়ের বিয়ে হয়ে যাবে, একদিন সেই ভাইঝি এই বাড়ির বউ হবে, এটা ভাবতে খুব কষ্ট হচ্ছে আর কি। বলছিলেন, ওঁর মেয়েকেও যেন এই বাড়ির বউ করা হয়।

—তা বললেন না কেন যে আমার একটাই নাতি।

মল্লিক মশাই বললেন—আমি সবই বলেছি; তবু ও নাছোড়বান্দা।

ঠাকমা-মণি বললেন—লোকটা তো ভাল নয় দেখছি।

মল্লিক মশাই বললেন—আসলে কী জানেন ঠাকমা-মণি, অভাবে স্বভাব নষ্ট। ওঁরও তাই হয়েছে।

—তা গরীব ভাইঝিটার একটা হিল্লে হয়ে যাচ্ছে এটা দেখে এত হিংসে? অথচ নিজের মায়ের পেটেরই ভাইতো বটে। ভাইঝির বাপ বেঁচে নেই, সেই জন্যে তো একটু আনন্দ হওয়াই উচিত। যাক গে, আমি সব দরকারী খবর নিয়ে এসেছি, যা যা আমাদের দরকার।

ঠাকুমা-মণি বললেন—তা হলে আমার জবানীতে কাশীতে গুরুদেবের কাছে একটা চিঠি লিখে দিন—আর মণি-অর্ডারে পাঁচশো টাকা পাঠাতে ভুলবেন না। তিনি এলে কন্যার জন্ম কুণ্ডলী তৈরী করে যা বিচার করবেন, তাই-ই করবো। তিনি যদি বলেন যে এ আমার সৌম্যর পাত্রী হবার উপযুক্ত, তাহলে আমি মাসে মাসে পাত্রীদের মনসাতলা লেনের বাড়িতে মেয়ের বিধবা মাকে একশো টাকা করে পাঠাবো, যাতে দুধ-মাখন-ঘি-মাছ-মাংস খাইয়ে শরীর ভাল রাখা হয়! একশো টাকায় হবে না? আপনি কী বলেন?

মল্লিক মশাই বললেন—কেন হবে না? হেসে খেলে একশো টাকায় হয়ে যাবে।

—তবে আগে দেখতে হবে মেয়ের জন্ম কুণ্ডলী কি রকম? তার ওপরেই সব কিছু নির্ভর করছে।

তারপর ঠাকুমা-মণি আবার বললেন—কিন্তু আপনি যে বলেছিলেন আপনার বন্ধুর একটি বিশ্বাসী ছেলে আছে, তাকে আপনি এখানে নিয়ে আসবেন—বলেছিলেন একটি ব্রাহ্মণের ছেলে সে—

মল্লিক মশাই বললেন—হ্যাঁ, আমারই বন্ধুর ছেলে। তরে নাম সন্দীপ লাহিড়ী। তার বাবার নাম হরিপদ লাহিড়ী। অল্প বয়েসে আমার সেই বন্ধু মারা যায়। একটা মাটির ঘর ছাড়া আর কিছুই নেই তার। ছেলেটির মা বেড়াপোতার জমিদার বাড়িতে রান্না-বান্নার কাজ করে ছেলেটিকে মানুষ করছে। ম্যাট্রিক পরীক্ষায় পাস করে এখন দূরের একটা কলেজে আই. এ. পড়ছে। পরীক্ষার পরই তাকে এখানে নিয়ে আসবো। এখানে এসে রাত্তিরে বি. এ. পড়বে আর আমার কাজেরও সাহায্য করবে।

—হ্যাঁ, ঠিক আছে, তাহলে ঠিক সময়েই তাকে আসতে বলে দেবেন। তার কলেজের মাইনেটাও আমি দেব, তার সঙ্গে কিছু হাত খরচ বাবদও পাবে, আর এখানে খাওয়া-থাকার বন্দোবস্ত তো আছেই, তাতে আপনারও অনেক সুরাহা হবে, আর তারও ভাল হবে।

মল্লিক মশাই-এর মনে বড় আনন্দ হলো। এতদিন পরে তিনি হরিপদ'র ছেলের জন্যে কিছু একটা করতে পেরেছেন, এটাই তার আনন্দের কারণ। সেই কথাটাই মল্লিক মশাই বেড়াপোতার নিবারণকে লিখে জানালেন। নিবারণ কাকা চিঠিটা পেয়েই সোজা সন্দীপদের বাড়ি গিয়ে ডাকলেন—ও সন্দীপের মা, সন্দীপের মা, বাড়ী আছো?

সেদিন রবিবার। কলেজের ছুটি। সন্দীপ বাড়িতেই ছিল। সে বাইরে এসে দেখলে নিবারণ কাকা। বললে—মা তো বাড়ীতে নেই কাকাবাবু।

নিবারণ কাকা বললেন—না থাক, তোমাকেই বলে যাই। তুমি কলকাতা যাবে?

কলকাতায়! হঠাৎ যেন হাতে স্বর্গ পাবার মত অবস্থা হলো তার। বললে—কলকাতাতেই তো আমি যেতে চাই, কিন্তু কে আমায় সে সুযোগ দেবে?

নিবারণ কাকা বললেন—আমরা দেব। তোমার বাবার মৃত্যুর সময় আমরা তাকে ভরসা দিয়েছিলুম যে তোমার মাকে আর তোমাকে আমরা দেখবো—নাও, এই দেখ তোমার মল্লিক কাকা আমার কাছে এই চিঠি লিখেছেন—

বলে চিঠিটা দিলেন সন্দীপের হাতে। সন্দীপ চিঠিটা পড়তে-পড়তে কেঁদে ফেললে। নিবারণ কাকা তার কান্না দেখে বিব্রত হয়ে গেলেন।

বললেন—আরে, তুমি কাঁদছো কেন, তুমি কাঁদছো কেন ? এই দেখ দিকিনি—

সন্দীপ কাঁদতে কাঁদতে বললে—আপনারা আমাকে এত ভালবাসেন ? আপনাদের এ ঋণ আমি কী করে শোধ করবো কাকা ?

বলে নিবারণ কাকার পায়ের ধুলো নিতে যাচ্ছিল। নিবারণ কাকা বাধা দিয়ে সন্দীপকে দু'হাত দিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন—ছিঃ কাঁদতে নেই, কাঁদতে নেই, কাঁদবার কী আছে ? যদ্দিন আমরা আছি, তদ্দিন তোমার কিছুছু ভাবনা নেই।

সন্দীপের তখনও কান্নাটা ভাল করে থামেনি।

নিবারণ কাকা তার পিঠে হাত বুলোতে-বুলোতে বলতে লাগলেন—এত কম বয়েসেই ভেঙে পড়লে কি চলে ? সামনে কত বড় ভবিষ্যৎ পড়ে আছে তোমার। এখন কেবল আশা করে যাও! এই কম বয়েসে অতীতটা তুচ্ছ, ভবিষ্যতটাই আসল। যখন তোমার আমার মত বয়েস হবে, তখন অতীতটার কথা ভেবো। এখন কেবল আশা করে এগিয়ে যাও।

তা সেদিনকার সেই চিঠি থেকেই তার এখানে আসার সূত্রপাত।

সেই অন্ধকারের মধ্যে একটা লোকের গানের আওয়াজ কানে এল। লোকটা বোধহয় মাতাল। এই রাতে গান গাইতে-গাইতে চলেছে—

এসেছিলাম ভবে আমি
ভজবো বলে হরিণ চরণ
পড়ে ভুমে মাটি খেয়ে
ভুলে গেল আমার মন।

এই বিডন স্ট্রীট ধরেই লোক নিমতলার শ্মশান-ঘাটে শবদেহ বয়ে নিয়ে যেত। লোকটা বোধহয় নিমতলার শ্মশান-ঘাট থেকে মদ খেয়ে ফিরছিল। সেদিন যে গান-টিকে মাতালের অসম্বদ্ধ প্রলাপ বলে তার মনে হয়েছিল, আজ এত বছর পরে সন্দীপের মনে হলো, তার জীবনে অত বড় সত্যও বুঝি আর কিছু নেই। সেদিনকার সেই মাতালটা যেন অজ্ঞাতে সন্দীপের ভবিষ্যৎ জীবনের চরম দুর্দশার ইঙ্গিত দিতেই তাকে সচেতন করতে চেয়েছিল। সত্যিই তো, সন্দীপ বেড়াপোতা থেকে কী করতেই বা কলকাতায় এসেছিল আর শেষ পর্যন্ত কী করুণ আর ভয়াবহ পরিণতিই তার হয়েছিল! সে কথা কল্পনা করতেও এখন তার হৃদকম্প হয়! এখন মনে হয় কেন সে কলকাতায় এসেছিল? সত্যিই কেন সে মরতে এসেছিল?

ঠাকুমা-মণির চিঠি পেয়ে কাশী থেকে একদিন নাকি মুখোর্জ্জবাড়ির গুরুদেব এসেছিলেন। সে সব কাহিনী মল্লিক মশাই-এর কাছ থেকে সন্দীপের শোনা আছে। কাশীর পণ্ডিত এবং দ্রষ্টা শ্রী-শ্রী মহাগুরু পাণ্ডে ঠাকুমা-মণির গুরুদেব। সাধারণত গুরুদেব কোনও শিষ্যের বাড়ি নাকি যান না। বলতে গেলে কাউকে দীক্ষাও দেন না তিনি। তিনি গঙ্গার ধারে তাঁর আশ্রমের মধ্যেই বছরের পর বছর একলা কাটান। সব শিষ্য তাঁর কাছে যেতেও অনুমতি পায় না। বর্ষায় যখন

গঙ্গার জল বাড়ে, তখনও তিনি নিজের আসন ছাড়েন না। যদি কখনও গঙ্গার জল খুব বাড়ে তখন, তিনি নাকি একটা ভেলার ওপর ওঠেন। এই মহাগুরু পাণ্ডেয়র সঙ্গে ঠাকমা-মণির সাক্ষাৎ হওয়ারও একটা ইতিহাস আছে।

সে অনেক বছর আগের কথা। ঠাকুমা-মণির মনের অবস্থা তখন খুব খারাপ। ঠাকুমা-মণির দুঃখের ইতিহাসটাই সবাই জানতো। জানতো যে তিনি কোটিপতি মানুষের স্ত্রী। তাঁর স্বামী দেবীপদ মুখার্জি বিরাট কর্মবীর পুরুষ। অল্প অবস্থা থেকে বড় হয়েছেন। বেলুড়ে 'স্যাকসবী মুখার্জি ইণ্ডিয়া লিমিটেড' নামের বিরাট কারখানার মালিক। তাঁর কারখানার তৈরি মালপত্র সারা ইণ্ডিয়াতেই শুধু নয়, সারা পৃথিবীতেই চলে। তারপর আছে মিডল ইস্টের বাজার। ইণ্ডিয়া গভর্মেণ্টও এই ফ্যাক্টরির দরুন মোটা রেভিনিউ পায়। সব কিছু মিলিয়ে সার্থক সফল মানুষ যাকে বলে তার নমুনা এই দেবীপদ মুখার্জি। তাঁর ফ্যাক্টরিতে যত লোক কাজ করে, তাদের অন্নদাতা তিনি! তাই সমাজে-সংসারে তিনি ছিলেন সকলের নমস্য

কিন্তু সকলকেই যেমন একদিন সব কিছু শৃঙ্খল-বন্ধন ছেড়ে এই লোক থেকে অন্য লোকে চলে যেতে হয়, তেমনি তাঁকেও একদিন চলে যেতে হলো।

সেদিন ঠাকমা-মণি অত বড় দুর্যোগেও ভেঙে পড়েন নি। বড় ছেলে শক্তিপদ আর তার স্ত্রী যেদিন একটা মাত্র নাবালক ছেলে রেখে মারা গেল সেদিনও তিনি ভেঙে পড়েন নি। কারণ তখনও ভরসা ছিল ছোট ছেলে মুক্তিপদ'র ওপর। তাঁর মনে হয়েছিল মুক্তিপদ থাকতে তাঁর ভয় কী?

কিন্তু মুক্তিপদ'র বিয়ের কয়েক বছর পরেই তারা আলাদা হয়ে তাদের তৈরি নতুন বাড়িতে চলে গেল। এই-ই প্রথম আঘাত পেলেন ঠাকুমা-মণি। তখন সম্বল বলতে মাত্র ওই নাবালক নাতি সৌম্য। কলকাতা তখন ঠাকুমা-মণির কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছিল। সৌম্যর ইস্কুলে তখন গরমের ছুটি হয়েছে। এক মাস ছুটি। তিনি তখন কলকাতা ছাড়তে পারলে বাঁচেন। মনস্থ করলেন নাতিকে সঙ্গে করে কাশীতে যাবেন।

মল্লিক মশাই নিজে কাশীতে গিয়ে বাড়ি ভাড়া করে রেখে এলেন। তারপর একদিন ঠাকুমা-মণি নাতিকে সঙ্গে নিয়ে কাশীতে গিয়ে উঠলেন। সঙ্গে গেল বিন্দু, সুধা, ঠাকুর, চাকর সবাই। সেখানে গিয়ে রোজ ভোরবেলা অসি ঘাটে চান করতে যান। সঙ্গে থাকে বিন্দু। সেইখানেই চান করে ওঠার পর হঠাৎ এই মহাগুরু পাণ্ডেয়র আশ্রমে গিয়ে বাবা বিশ্বনাথের মাথায় গঙ্গাজল ঢালতে গেলেন। সেইখানে হঠাৎ দেখা পেলেন গুরুদেবের। তাঁকে দেখে তাঁর মন থেকে কে যেন বললে—ওরে, তোর ঠাকুর রয়েছে, তাঁকে প্রণাম কর।

পাথরের বিশ্বনাথ মূর্তির মাথায় তিনি জল ঢেলে প্রণাম করলেন। তারপর যথারীতি রোজকার মত বাড়ি ফিরে এলেন।

রাত্রে নাতিকে পাশে নিয়ে বিছানায় শুয়ে আছেন। অঘোর ঘুমে আচ্ছন্ন। হঠাৎ দেখলেন স্বয়ং বিশ্বনাথ তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। ঠাকুমা-মণি স্বচক্ষে দেখলেন বাঘছাল পরা বাবা বিশ্বনাথ-এর মূর্তি। হাতে ত্রিশূল, কপালে ভস্মের

ত্রিবলী, একটা সাপ বাবার গলাটা জড়িয়ে সামনে ঠাক্‌মা-মণির দিকে চেয়ে আছে আর মাঝে-মাঝে জিভ বার করছে।

ঠাক্‌মা-মণি কি বলবেন বুঝতে পারলেন না। বাবার দিকে নির্বাক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। হঠাৎ এক সময়ে বাবা বলে উঠলেন—কী রে, তুই এ কী করলি? সোনা ফেলে আঁচলে গেরো দিলি?

ঠাক্‌মা-মণি তখন কী বলবেন বুঝতে পারলেন না। তাঁর সর্বাঙ্গ তখন থর থর করে কাঁপছিল। শেষকালে অতি কষ্টে মুখ দিয়ে বেরোল একটা কথা, বললেন-আমার মহাঅপরাধ হয়ে গেছে বাবা, কী করতে হবে বলে দিন।

বাবা বললেন—তুই আমার সামনে গিয়ে চলে এলি, আমায় চিনতে পারলি না?

ঠাকুমা-মণি বললেন—আমাকে মাফ করো বাবা। আমি হতভাগিনী—

বাবা তাঁর কথায় বাধা দিয়ে বললেন—তোর কপালে অনেক দুঃখ আছে বেটি! অনেক দুঃখ আছে—

ঠাকুমা-মণি বাবার পায়ের ওপর আছড়ে পড়ে কাঁদতে লাগলেন হাউ-হাউ করে। বাবা এবার ত্রিশূলটা তাঁর দিকে লক্ষ্য করে উঁচু করে ধরলেন।

বললেন—আর যেন বাবাকে চিনতে ভুল করিসনি মা—

বলে তাঁকে ক্ষমা করে চলেই যাচ্ছিলেন। ঠাক্‌মা-মণি তখন বাবার পা দুটো জড়িয়ে ধরলেন। বলতে লাগলেন—আমি কী করে তোমাকে চিনবো বাবা, বলে দিয়ে যান আমাকে।

বাবা যেতে-যেতে বললেন—তুই সিংহ বাহিনীর পুজো করিস তো?

—হ্যাঁ বাবা, করি। রোজই পুজো করি।

—কাল সকাল বেলা গঙ্গায় চান করতে গিয়ে যখন আমার আশ্রমে যাবি মূর্তিতে জল দেবার জন্যে, তখন দেখবি আমার পাথরের মূর্তির সামনে আমি বসে আছি।

ঠাকমা-মণি বললেন—কী দেখে চিনবো তোমাকে?

বাবা বললেন—আমার কপালে দেখবি ত্রিবলী চিহ্ন, আর সামনের বেদীতে একটা শ্বেত পদ্মফুল পড়ে আছে। বুঝবি আমিই সে—

বলে বাবা অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আর সঙ্গে-সঙ্গে ঠাকমা-মণির ঘুম ভেঙে গেল। তিনি অন্ধকারের মধ্যে চারদিক চেয়ে দেখলেন। কেউ কোথাও নেই, শুধু সৌম্য তাঁর পাশে শুয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

সেদিন সারা রাত্রি আর ঘুম এল না। রাত থাকতে-থাকতে তিনি ঘুম থেকে উঠে বিন্দুকে ডাকলেন। বললেন—ওঠ বিন্দু, গঙ্গায় যেতে হবে।

বিন্দু চারদিক চেয়ে বললে—এখনও তো অন্ধকার রয়েছে মা, এখন তো রিক্‌সাওয়ালা আসবে না।

দৈনন্দিন গঙ্গা স্নানের জন্যে সাইকেল-রিক্‌সাওয়ালার সঙ্গে মাসিক বন্দোবস্ত ছিল। সে নিজের গরজেই রোজ ভোর সাড়ে চারটের এসে ঘণ্টা বাজিয়ে হাজিরা দিত। আবার ঠাকমা-মণির স্নান হয়ে গেলে তাঁকে বাড়িতে পৌঁছিয়ে দিয়ে যেত।

কিন্তু সেদিন যখন ঠাকমা-মণি বিন্দুকে ডাকলেন তখন ঘড়িতে চারটেও বাজেনি। মাত্র সাড়ে তিনটে।

তবে ঠাকমা-মণির তাগিদে বিন্দুকে বেরোতেই হলো। ঠাকমা-মণি বললেন—আজ একটু তাড়া আছে, তাই এত সক'লে যাচ্ছি। রাস্তায় যে-কোনও একটা রিক্‌শা পাওয়া যাবে।

তা সত্যিই, তা পাওয়া গেল।

কিন্তু অসি-ঘাট তখন নির্জন, নিরিবিলি। অন্য দিনের মত অত ভিড় নেই।

সেদিন আর বেশিক্ষণ ধরে স্নান করা হলো না। মনে বড় উদ্বেগ। কী হয়, কী হয় ভাব। স্নান সেরে ঘটিতে জল ভরে যখন বাবার মন্দিরে এলেন তখন মনের উত্তেজনা আর চেপে রাখতে পারলেন না তিনি। মন্দিরে কি দেখতে পাবেন, কেবল সেই-ই চিন্তা। যখন মন্দিরে ঢুকলেন তখন নাকে যেন একটা সুগন্ধ এল। ভাবলেন, বোধহয় ভেতরে ধূপ জ্বেলে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কই, কোথাও তো ধূপ জ্বলছে না। তাহলে আজ এত সুগন্ধ এল কোথা থেকে?

তিনি দেখলেন, পূজারী পদ্মাসন হয়ে বসে দু'চোখ বুজে মূর্তির দিকে চেয়ে আছেন। মনে হলো, পূজারীর শুচিশুদ্ধ শরীর থেকেই যেন এই অতীন্দ্রিয় সুগন্ধ আসছে। তারপর পূজারীর সামনের বেদীর দিকে দৃষ্টি পড়তেই ঠাকমা-মণি চমকে উঠলেন। নানা রকম ফুলের মধ্যে একটা আধফোটা শ্বেত পদ্মও রয়েছে।

ঠাকমা-মণি আর দাঁড়াতে পারলেন না। তিনি সেই পূজারীর পায়ে টলে পড়লেন।

পূজারীর ধ্যান ভেঙে গেল। তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন।

—কোন? কে? ক্যায় মাঙতা হ্যায় তু? কী চাস তুই?

ঠাকমা-মণি অজ্ঞান অচৈতন্য। তাঁর কোন, পাপে তাঁর মন্ত্রিপদ সপরিবারে তাঁকে ত্যাগ করে চলে গেছে? যদি সে জন্যে তাঁর নিজের কোনও অপরাধ হয়ে থাকে তো তিনি প্রায়শ্চিত্ত করতে প্রস্তুত। তুমি আমাকে যা শাস্তি দেবে বাবা, দাও। আমি মাথা পেতে সব স্বীকার করে নেব। হয় তুমি আমার মনে একটু শান্তি দাও, আর তা না হয় তো তুমি আমাকে গ্রহণ করো। আমাকে নিয়েই যদি আমার সংসারে সুখ-শান্তি ফিরে আসে তো তুমি আমাকেই নাও।

এর পরে আর তাঁর কোনও জ্ঞান ছিল না। তিনি সেখানেই অচৈতন্য হয়ে পড়েছিলেন। যখন তাঁর জ্ঞান ফিরলো, তখন দেখলেন তিনি তাঁর বাড়িতে নিজের বিছানার ওপর শুয়ে আছেন, আর ডাক্তারবাবু বসে তাঁকে পরীক্ষা করছেন।

এ-সব বহুদিন আগেকার কথা। কিন্তু এ সব কথা আর কারো মনে থাকে আর না-ই থাক, ঠাকমা-মণির মনে আছে আর তাঁর পেয়ারের ঝি বিন্দুরও মনে আছে।

সেই তখনই সেই কাশী থেকে টেলিগ্রাম গেল কলকাতায়। গেল মল্লিক মশাই-এর কাছে। টেলিগ্রাম লেখা হলো, টেলিগ্রাম পাওয়া মাত্র কাশীর ঠিকানায় পঞ্চাশ হাজার টাকা পাঠাবার ব্যবস্থা করবেন। বিশেষ জরুরী প্রয়োজন।

টেলিগ্রাম পেয়েই মল্লিক-মশাই সোজা মেজবাবুর ডালহৌসি স্কোয়ারের হেড-অফিসে চলে গেলেন। টেলিগ্রামখানা মেজবাবুকে দেখাতেই তিনি সোজা কাশীতে একজন লোককে দিয়ে মা-র কাছে পঞ্চাশ হাজার টাকা পাঠিয়ে দিলেন।

ঠাকুমা-মণি টাকাটা পেয়ে সঙ্গে-সঙ্গে মন্দিরের পুরুদেবকে দিয়ে দিলেন।

শ্রী শ্রী মহাগুরু পাণ্ডেয় টাকাটা নিজের হাতে স্পর্শও করলেন না, পাশে আর একজন শিষ্য ছিল, তার হাতে টাকাগুলো তুলে দিয়ে যেন নিশ্চিন্ত হলেন।

বললেন—বাবার পুজোর ভোগ চড়াও।

ঠাকুমা-মণি বললেন—আপনার মন্দিরটা ভেঙে গেছে, এই টাকায় মন্দিরটা সারিয়ে নিন, মন্দিরটা আরো সুন্দর করে গড়ুন—

মহাগুরু বললেন—আমি বাবার মন্দির সারাবার কে রে বেটি? বাবার মন্দির, বাবাই তাঁর মন্দির সারাবার টাকা দিলেন, আবার বাবাই একদিন মন্দির সারিয়ে নেবেন, তুই আমি কে রে বেটি? আমরা সবাই তো সির্ফ হেতু রে বেটি, সিফ' হেতু হ্যায়—

ঠাকুমা-মণি তখন নিজের সমস্ত দুঃখ উজাড় করে দিলেন মহাগুরুর পায়ে।

নিজের সমস্ত জীবনের কাহিনী শুনিয়ে মহাগুরুর কাছ থেকে আশীর্বাদ চাইলেন। তবু মহাগুরু পাণ্ডেয়জীর মনে যেন কোনও রেখাপাত হলো না।

কিন্তু আশ্চর্য, ঈশ্বরের কী লীলা কে জানে, হঠাৎ একদিন তিনি দেহ রাখলেন। শিষ্যরা সবাই কেঁদে আকুল হয়ে উঠলো। কিন্তু পুজারীর আসন তো কখনও শূন্য থাকে না, শূন্য থাকতে নেই। সেই আসনে আর একজন শিষ্য বসলেন। তিনিই হলেন সকলের গুরু। তাঁকেই সবাই মহাগুরু বলে সম্ভাষণ করতে লাগলো। ঠাকমা-মণি একদিন তাঁর কাছে গিয়েই কেঁদে পড়লেন। বললেন —আমার কী হবে গুরুদেব?

মহাগুরু বললেন—দেহ থাকলেই দেহ রেখে একদিন চলে যেতে হয়, এই-ই হচ্ছে ঠাকুরের লীলা।

—কিন্তু আমার যে বরাবর ইচ্ছে ছিল তাঁর কাছে দীক্ষা নেব। বলে নিজের দেখা স্বপ্নের কথা সবিস্তারে বলে গেলেন।

মহাগুরু সমস্ত শুনলেন। তারপর বললেন—তোর যখন দীক্ষা নেবার এত ইচ্ছে তখন আমিই তোকে দীক্ষা দেব। তুই প্রস্তুত?

—হ্যাঁ, আমি প্রস্তুত। বললেন ঠাকমা-মণি।

তারপর একটা শুভ দিন দেখে ঠাকমা-মণি দীক্ষা নিলেন। দীক্ষা নিয়ে তিনি মহাগুরুকে প্রণাম করে বললেন—গুরুদেব, এবার আমি বড় তৃপ্তি পেলাম। আপনি আমাকে আশীর্বাদ করুন—

মহাগুরু বললেন—আমি আশীর্বাদ করবার কে? এই বাবাই তোকে আশীর্বাদ করবেন। বলে তিনি বাবার পাদোদক ঠাকমা-মণির মাথায় ছিটিয়ে দিলেন। ঠাকমা-মণি মহাখুশী। এর পর ছোট নাতির ইস্কুলের গ্রীষ্মের ছুটি শেষ হতেই তিনি তাকে নিয়ে মন্দিরে গেলেন। মহাগুরু জিজ্ঞেস করলেন—এ কৌন হ্যায়?

—আমার বড় ছেলে ছিল, তারই ছেলে এ। আমার ছোট ছেলে তো আমাকে ছেড়ে আলাদা হয়ে গেছে। তাই এই নাতিই হচ্ছে আমার একমাত্র আশা-ভরসা। এর ভবিষ্যতের কথা ভেবেই রাত্তিরে আমার ঘুম হয় না। ভবিষ্যতে এর কপালে কী আছে, আপনি একটু বলে দিন দয়া করে। এর বাবা-মা কেউ নেই, তাই আমার

শুধু ভয় করে—

গুরুদেব সৌম্যর ডান হাতটা নিজের হাতে ধরে খানিকক্ষণ দেখলেন। তারপর সৌম্যর হাতটা ছেড়ে দিয়ে বললেন—ইসকে লিয়ে জেরা হোঁসিয়ার রহনা চাহিয়ে বিটিয়া।

কথাটা শুনে ভয়ে আঁতকে উঠলেন ঠাকমা-মণি। বললেন—কেন বাবা? বলুন না, কী দেখলেন?

গুরুদেব বললেন—ইসকো কুদরত জেরা খতরনাক্ হ্যায়।

ঠাকমা-মণি কেঁদে ফেললেন। কাঁদতে-কাঁদতে বললেন—এ বাঁচবে তো?

গুরুদেব বললেন—জরুর বাঁচে গা তেরা পোতা, লেকিন ইসকো সাদিকা বক্ত মুঝে থোড়া খবর ভেজনা।

তার মানে হলো—এ বাঁচবে, কিন্তু এর বিয়ের সময় আমাকে একটু খবর দিস।

এর পর গুরুদেব আর কিছু বলেন নি। হাজার পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও কিছু বলতে রাজি হননি তিনি। তখন আর বেশি সময়ও ছিল না হাতে। সৌম্যর ইস্কুলের ছুটি ফুরিয়ে গিয়েছিল তাই কাশী ছেড়ে ঠাকমা-মণি সবাইকে নিয়ে কলকাতায় চলে এসেছিলেন। কিন্তু কলকাতাতে এসেও মনের মধ্যে গুরুদেবের কথাগুলো কাঁটার মত খচ্ খচ্ করে বিঁধতে লাগলো। তাই সংসারের দৈনন্দিন কাজের মধ্যেও সব সময়ে গুরুদেবের কথাগুলো তাঁর মনে পড়তো। তিনি সৌম্যকে সব সময় চোখে চোখে রাখতেন। সেই জন্যেই তিনি ঠিক রাত ন'টার সময়ে গিরিধারীকে গেট বন্ধ করতে হুকুম দিতেন। উদ্দেশ্য ছিল, সৌম্য যেন রাত্রে বাড়ির বাইরে না যেতে পারে! আর তা ছাড়া তিনি সৌম্যর ছোটবেলা থেকেই তার বিয়ের একটা পাত্রী পছন্দ করে রাখবার কথা ভাবছিলেন। তাই যখন গঙ্গার বাবুঘাটে গিয়ে একটা সুন্দর মেয়েকে দেখলেন, তখনই ঠিক করলেন যে মেয়েটি যদি তাঁদের পালটি ঘর হয় তো তার সঙ্গে তাঁর নাতির বিয়ে দেবেন। সেই উদ্দেশ্যেই মেয়েটির বাড়িতে গিয়ে সমস্ত কিছু খোঁজখবর নিতে পাঠিয়েছিলেন। তারপর মল্লিক-মশাইকে মেয়েটির জন্ম-সাল, জন্ম-তারিখ, জন্ম-সময় আর জন্ম স্থান উল্লেখ করে গুরুদেবকে চিঠি লিখে দিতে বললেন। আর যাতে সময় নষ্ট না হয়, তাই জন্যে মল্লিক-মশাইকেও কাশীতে পাঠিয়ে দিলেন গুরুদেবকে সঙ্গে করে নিয়ে কলকাতায় আসতে!
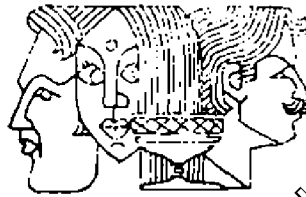
এ-সবই অতীতের গল্প। এই অতীতের গল্পই বলছিলেন মল্লিক-মশাই।

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—তারপর, তারপর কী হল মল্লিক-কাকা?

তারপরের অত কথা কি অত সংক্ষেপে বলা যায়? আর গুরুদেবকেই কি

কলকাতার মাণী-গুণী-বড়লোকের বাড়িতে আনা অত সহজ ? তবু ভাগ্যের কী অসীম কৃপা যে তিনি সশরীরে এই বিডন স্ট্রীটের বারোর-এ নম্বর বাড়িতে তাঁর পদধূলি দিলেন। সারা বাড়িতে তোলপাড় পড়ে গেল। আর বাড়িতে ঠাকমা-মণি আর তাঁর নাতি ছাড়া আর কে-ই বা আছে যে তোলপাড় করবে ? আর যারা এ-বাড়িতে আছে, তারা তো এ-বাড়ির কেউ নয়। সবাই তো মাইনে করা লোক। বেতনভুক। কিন্তু তাদের মাথা ব্যথাও কম নয়। বাড়ির মালিক পক্ষ তো হুকুম করেই খালাস, কাজ কর্ম তো করতে হবে সেই সব বেতনভুক লোকদেরই।

গুরুদেব দয়া করে আসবেন, সুতরাং দেখতে হবে তাঁর সেবায় যেন কিছু ত্রুটি না থাকে। পান থেকে চুন যেন না খসে। গুরুদেবের জন্যে বিশেষ বিছানা পত্র কিনে আনতে হলো নতুন খাট, নতুন গদি, নতুন তোষক, নতুন চাদর, নতুন বালিশ। সবই নতুন। তারপর বাড়িতে নতুন করে ভেতরে বাইরে আগা-পাশ-তলা বাহারি চুনকাম করা হলো রাজমিস্ত্রী লাগিয়ে। তার ওপর আছে পুজোর বাসন পত্র। গুরুদেবের বসবার জন্যে কার্পেট, পশমের ফুলদার আসন। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত কারো বিশ্রাম নেই। সকলেরই দুর্ভাবনা। কখন কী ভুল ত্রুটি ঘটে যায়, কেউ বলতে পারে না। ভুল হলে আর তার ক্ষমা নেই, জানতে পারলে সঙ্গে-সঙ্গে তার চাকরি চলে যাবে। গুরুদেব আর ঈশ্বর কি আলাদা ? গুরুদেব রুষ্ট হলে ঈশ্বরও রুষ্ট হবেন। তেতলা থেকে ঠাকমা-মণির বকলমা বিন্দু দোতলার কালিদাসীকে হুকুম করে। বিন্দুর বদলে সুধাও মাঝে মাঝে হুকুম করে। আবার কালিদাসী হুকুম করে একতলার ফুল্লরাকে সেই হুকুম নিয়ে ঠাকুর-বাড়ির ঝি কামিনীকে গিয়ে দেয়। কামিনী সেই খবর দেয় ঠাকুর-বাড়ির পুরুত মশাইকে। যে কন্দর্প রোজ ঠাকুর-বাড়িতে ভোরবেলা ফুল-বেল পাতা দিয়ে যায়, তার ওপর তম্বি করে পুরুত মশাই। পুরুত-মশাই কন্দর্পকে বলে দিয়েছিল রোজ বেশি-বেশি ফুল, বেল পাতা আর দুর্বো ঘাস আনতে। তবু কন্দর্প কম ফুল দিত !

সেদিন ফুল দেখে পুরুত-মশাই রেগে কাই। বললেন—এ কী হলো কন্দর্প ? ফুল এত কম কেন ? এ-রকম কম ফুল দিলে ঠাকমা-মণিকে নালিশ করবো কিন্তু—তাতে তোমার পয়সা কাটা যাবে, তা বলে রাখছি।

কন্দর্প হাত জোড় করে ক্ষমা চাইলে। বললে—এবার মাফ করে দিন ঠাকুর মশাই, আজ খুব বৃষ্টি পড়ছিল, তাই বাজারে যেতে পারিনি। এবারের মত আমাকে মাফ করে দিন ঠাকুর-মশাই।

ঠাকুর-মশাই বললে—তাহলে আমায় জরিমানা দে! দে জরিমানা!

কন্দর্প গরিব লোক। তিন পুরুষ ধরে এই বাড়িতে ফুল যোগান দিয়ে আসছে। সেই মান্ধাতা আমলের রেট চলে আসছে ফুলের। ফুল যোগানের রেট বাড়াতে বললেই ঠাকুর-মশাই রেগে যায়। তখন সেই পাওনার দস্তুরি দিতে হয় ঠাকুর-মশাইকে। কন্দর্প মাস কাবারি ত্রিশ টাকা পায়। তার থেকে প্রতি মাসে ঠাকুর-মশাইকে পাঁচ টাকা করে ভাগ দিতে হয়। তাতেও খুশি হয়নি ঠাকুর-মশাই। বলেছিল— আর পারছি না ঠাকুর-মশাই, ফুলের বাজার বড় টাইট। আগেকার দামে কেউ আর ফুল দিতে চায় না।

ঠাকুর-মশাই বললে—তাহলে কিন্তু আমার দস্তুরিও বাড়াতে হবে তোকে।

কন্দর্প বলে—কত দস্তুরি দেব বলুন? আরও এক টাকা বাড়ালে হবে তো?

—দূর পাঁঠা, জিনিসপত্তরের আগুন দাম, এক টাকা দিলে কী করে হবে?

—আচ্ছা, তাহলে ক্ষ্যামা-ঘেন্না করে দেড় টাকাই নেবেন।

ঠাকুর-মশাই-এর মন তাতেও গলে না। সত্যিই, টাকার ব্যাপারে ঠাকুর-মশাই বড় দেমাকি। কন্দর্প বললে—আপনি পুরোনো যজমান হয়ে এমন কথা বলছেন? তাহলে আমরা কোথায় যাই ঠাকুর-মশাই? তাহলে আমরা যে মারা যাবো, নির্ঘাত মারা যাবো।

কিন্তু ঠাকুর-মশাই এক কথার মানুষ। তার যে-কথা সেই কাজ। ফুল যোগানের তিরিশ টাকা রেট চল্লিশ টাকা হলো, কিন্তু তার নিজের একেবারে পাঁচ টাকা থেকে আরো বেড়ে দ্বিগুণ হয়ে গেল। ছিল পাঁচ টাকা, কিন্তু তখন থেকে হলো দশ টাকা।

তা এতদিন পরে গুরুদেব যখন বাড়িতে আসছেন তখন ফুল-বেলপাতাও বেশি যোগান দিতে হবে কন্দর্পকে, তখন সে আবার পুরুত-মশাই-এর কাছে তার পাওনা-গণ্ডার অঙ্কটা বাড়াবার আর্জি পেশ করলে।

ঠাকুর-মশাইও বললে—তা সে আমি সরকার-মশাই কলকাতায় ফিরলে তাঁকে বলে-কয়ে বাড়িয়ে দেব, কিন্তু আমার পাওনা-গণ্ডার কথাটাও মনে রাখবি তো?

গুরুদেব আসবার আগেই ঠাকমা-মণির হুকুমে ঝি-চাকর-বাকরকে নতুন কাপড়-গামছাও দেওয়া হয়ে গেল। যেন বাড়িতে বিয়ের উৎসব-পর্ব শুরু হয়েছে। এটা বাড়তি পাওনা। এবারের উপলক্ষ্য, নাতির বিয়ের জন্যে পাত্রী পছন্দ করা।

শেষকালে সত্যি-সত্যিই মল্লিক-মশাই গুরুদেবকে নিয়ে কলকাতায় এলেন। আগেকার বন্দোবস্ত মতো ঠিক সময়ে হাওড়া স্টেশনে গাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। মল্লিক-মশাই গুরুদেবকে নিয়ে প্লাটফরমের ওপর নামলেন আর কাছেই গাড়ি দাঁড়িয়েছিল, তাইতেই গুরুদেবকে নিয়ে উঠলেন।

আর সেদিনই সকালবেলা থেকে বারোর-এ বিডন স্ট্রীটের বাড়ির মাথা থেকে নহবতের সুর বেজে উঠলো। সেদিন সেই নহবতের শব্দ শুনে এ-পাড়ার সমস্ত লোক সাত-সকালেই চমকে উঠলো। সেই সময়ে রাস্তা দিয়েও যারা যাচ্ছিল, তারাও খানিকক্ষণের জন্যে সেখানে থমকে দাঁড়ালো। কী হয়েছে মুখার্জি-বাড়িতে? হঠাৎ এখন নহবত বেজে উঠলো কেন? কারো বিয়ে? না, তা কী করে হয়? পোষ মাসে কি হিন্দু-বাড়িতে বিয়ে হতে আছে? তবে কী? কৌতূহলে সবাই ঠিক খবর জানতে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলো। কোনও পুজো? না, তাই-ই বা কী করে হয়? এ-মাসে তো কোনও পুজো নেই। তবে কি ছেলে-মেয়ের অন্নপ্রাশন? না, তাই-ই বা কী করে হবে? ও-বাড়িতে তো কোনও ছোট ছেলে-মেয়ে নেই? তাহলে?

একটা বাড়িকে ঘিরে পাড়ার সমস্ত মানুষের মনের ভেতরে সেদিন একটা অদম্য প্রশ্ন উৎকণ্ঠায় অস্থির হয়ে নিঃশব্দে ছটফট করতে লাগলো। কে? কী? কেন?

মেষ রাশিতে যখন সূর্য থাকে তখন বিশাখা, নক্ষত্রে পূর্ণিমা শেষ হয়। সেদিন জন্মেছিল বলেই তার নাম হয়েছিল বিশাখা। তবু তাকে নিয়ে বড় ভয় ছিল যোগমায়ার। ও-মেয়ে কি বাঁচবে? ও-মেয়ে তো জন্মেই বাপকে খেয়েছে। ভবিষ্যতে ও-মেয়ের কপালে কী আছে কে জানে? তাই সময়ে-অসময়ে মা দৃশ্য-অদৃশ্য সব দেব-দেবীকে হাত জোড় করে প্রণাম করতো। বলতো—ঠাকুর, আমার কপালে যা হয় হোক, তুমি আমার ওই মেয়েটার একটা গতি করে দাও। তুমি যদি ওকে আমার কোলে দিলে, তবে ওর ভাল-মন্দটাও তুমিই দেখো। আমি বড় অনাথিনী ঠাকুর। ওকে দেখবার কেউ নেই। আমারও তিন কুলে কেউ নেই। আমি দেওরের ঘরে যত ঝাঁটা-লাথিই খাই আর যত কষ্টই পাই, ও যেন সুখে থাকে, ওর সুখই আমার সুখ। আর কিছু চাই না ঠাকুর তোমার কাছে, আর কিছু চাই না।

অথচ বিশাখা জানেও না যে তার মা'র মতন দুঃখী মানুষ সংসারে আর দুটি নেই। কিন্তু সে কথা কারো কাছে মুখ ফুটে বলবারও কোন উপায় নেই।

এক-একদিন মেয়ে এসে মা'র কাছে কান্নায় ভেঙে পড়ে।

যোগমায়া তখন উনুনে কড়ায় ডাল চাড়িয়েছে। মেয়ের কান্নায় রান্নায় বাধা পড়লো। বললে—কাঁদছিস কেন রে?

—আমাকে জিলিপি দেয়নি।

যোগমায়া বললে—কে?

বিশাখা বললে—কাকিমা।

যোগমায়া বললে—না দিক গে, আমি দেব জিলিপি, তুমি কেঁদো না, ছি-কাঁদতে নেই—

—তাহলে দাও তুমি।

যোগমায়া বললে—এখন জিলিপি কোথায় পাবো? পরে তোমাকে দেব।

বিশাখা তবু বায়না করে। বলে—পরে নয়, এখুনি দিতে হবে।

যোগমায়া বলে—না মা, ও-রকম করতে নেই, ছি, এখুনি জিলিপি কোথায় পাবো? পরে আমি তোমায় জিলিপি কিনে দেব। তাহলেই তো হবে?

কিন্তু ঠিক সেই সময়েই বিজলী জিলিপি কামড়াতে-কামড়াতে রান্নাঘরের কাছে এলো। বিশাখাকে দেখিয়ে-দেখিয়ে জিলিপি খেতে লাগলো।

বিশাখা বললে—ওই দেখ মা, বিজলী জিলিপি খাচ্ছে, আমাকে দিচ্ছে না—

বিজলী বললে—আমি কেন জিলিপি দেব তোকে ? এ জিলিপি তো আমার মা কিনে দিয়েছে।

যোগমায়া সেখানে সেইভাবে বসে বসেই মেয়ের মাথাটা শাড়ির আঁচল দিয়ে ঢেকে রাখলে, যাতে মেয়ে বিজলীর জিলিপি খাওয়া দেখতে না পায়। বললে—ছি, ওদিকে দেখতে নেই।

বিশাখা তখন প্রাণপণে শাড়ির আঁচল থেকে নিজের মাথাকে মুক্ত করতে চাইছে। কিন্তু যোগমায়াও তখন জোর করে চেপে ধরে রেখেছে মেয়ের মাথাটাকে। কিন্তু তবু মেয়ে জিলিপির শোক ভুলতে পারছে না।

বললে—তুমি কেন আমাকে জিলিপি দেবে না, আমি কী করেছি…

শেষক'লে যোগমায়া মেয়ের মাথায় জোরে এক চড় মেরে বললে—পোড়ারমুখী, নিজের বাপকে খেয়েছে, এখন আবার আমাকে খেয়ে তবে ছাড়বে…

বিশাখা সেই চড় খেয়ে আরো জোরে কেঁদে উঠলো। এতক্ষণ যে আগুন ধিকি-ধিকি করে জ্বলছিল, তাতে যেন হঠাৎ আরো ইন্ধন পড়লো। সে বাড়ি কাঁপিয়ে তখন কান ফাটানো চিৎকার শুরু করলে।

যোগমায়া তখন বিজলীর দিকে চেয়ে বললে—তুমি এখান থেকে সরে যাও তো মা, ওদিকে আড়ালে সরে যাও। লক্ষ্মী মেয়ে আমার, যাও তো—ওকে জিলিপি দেখিও না।

বিজলীও তেমনি। সঙ্গে-সঙ্গে কাঁদতে-কাঁদতে দৌড়ে গেছে মা'র কাছে। মা তখন মাদুরে শুয়ে-শুয়ে একটা সিনেমা পত্রিকার ছবি দেখছিল। মেয়ের কান্না শুনে আঁতকে উঠলো—কী হয়েছে রে ? কী হয়েছে ? কে মেরেছে ?

—বড়মা…

কান্নায় বিজলীর সব কথাগুলো মুখ দিয়ে বেরোল না।

মা জিজ্ঞেস করলে—বড়মা মেরেছে ? কেন মারতে গেল ? তুই কী করেছিলি ?

বিজলীর চোখ দিয়ে তখন অঝোর ধারায় জল গড়িয়ে পড়ছে। কোনও রকমে তার মুখ দিয়ে বেরোল—আমি কিছুছু করিনি, জিলিপি খাচ্ছিলুম—

মা বললে—শুধু-শুধু জিলিপি খেলে কেউ মারে ?

বিজলী অকপটে বললে—সত্যি কিছুছু করিনি, শুধু জিলিপি খাচ্ছিলুম…

মা মাদুর ছেড়ে এবার অতি কষ্টে উঠে বললে—তোর বড়মা কোথায় রে ?

—রান্নাঘরে—ওই তো—

মা এবার মেয়েকে নিয়ে রান্নাঘরের দিকে গেল। বললে—হাঁ বড়দি, এই বেস্পতিবারের বারবেলায় তুমি আমার মেয়েকে মারলে ?

যোগমায়ার কোলে তখনও বিশাখা মুখ রেখে কাঁদছে। বললে—কই, আমি মারিনি তো বিজলীকে।

—তুমি মারোনি তো বিজলী কি আমার কাছে মিছিমিছি নালিশ করলে ?

যোগমায়া বললে—না দিদি, তুমি বিশ্বাস করো, আমি মারিনি। আমি আমার বিশাখাকে মেরেছি, আমি শুধু বিজলীকে আড়ালে সরে গিয়ে জিলিপি খেতে বলেছি।

—তাহলে কি বলতে চাও আমার বিজলী মিথ্যেবাদী ?

যোগমায়া বললে—তা আমি কেন বলবো দিদি ! সে-কথা বলবার কি আমার জোর আছে ? তা যদি থাকতো, তা হলে ভগবান কি আমার কপাল এমন করে পোড়াতো ?

বলে নিজের শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখ মুছলো যোগমায়া। কিন্তু যোগমায়ার কান্না দেখে রাণী যেন আরো তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলো। বললে—হ্যাঁ, কাঁদো, আরো জোরে-জোরে কাঁদো, যেন গেরস্থর অমঙ্গল হয়, যেন তোমার মতন আমারও কপাল পোড়ে ! তা ছাড়া আর কেউ না জানুক, আমি তো জানি, আমার ওপর তোমার কত হিংসে ! তবে এও বলে রাখছি বড়দি, যদি আমার কপাল পোড়ে তো তুমিও সে-আগুনে রক্ষে পাবে না কিন্তু, আর শুধু তুমি নও, তোমার বিশাখাকেও সে-আগুন থেকে কেউ বাঁচাতে পারবে না—এই বলে রাখলুম—

বলে রাণী যেমন গট্-গট্ করে রান্নাঘরের কাছে এসেছিল, আবার তেমনি গট্-গট্ করে নিজের ঘরের দিকে চলে গেল।

যোগমায়া আর থাকতে পারলে না. বিশাখাকে কোল থেকে এক হাতে সরিয়ে দিয়ে তার পিঠে দুম্-দুম্ করে কিল মারতে লাগলো আর চিৎকার করে-করে বলতে লাগলো—মর, মর তুই, মর। তুই মরতে পারিস নে ? এত লোক মরে আর তোকে মরণ দেখতে পায় না ? তুই তোর বাপকে খেয়েছিস, এবার আমাকেও খা ! আমাকে কেন খাচ্ছিস নে ? তোর এত ক্ষিধে ? এত লোককে যম খায়, আর তোকে খায় না ? যমের চোখ কি কানা ? মর, মর তুই, আর তোকে যদি যম না খায় তো আমাকেও কেন খায় না ?

বিশাখা যত মার খাচ্ছিল, যোগমায়া যেন তত মরীয়া হয়ে উঠছিল। যোগমায়ার চিৎকারে পাড়ার লোকরাও যেন সন্ত্রস্ত হয়ে উঠছিল। হয়ত তারা ঘটনাটা জানবার জন্যে বাড়ির ভেতরেই ঢুকে পড়তো, কিন্তু তার আগেই ছোট জা' এসে বিশাখাকে ধরে ফেলেছে।

বললে—কী করছ বড়দি ? তুমি কি পাড়ার লোকের কাছে আমাদের বে-ইজ্জত করতে চাও ? তোমার মতলবটা কী শুনি ? তুমি বিশাখাকে মেরে আমাকে শিক্ষা দিচ্ছ ? তুমি মনে করেছ আমি কিছু বুঝি নে ?

সাধারণত যোগমায়া খুব শান্ত-প্রকৃতির মানুষ। স্বামীর মৃত্যুর পর যেন আরো নির্বাক হয়ে গেছে। কিন্তু হঠাৎ কী হয়েছিল কে জানে, যোগমায়ার ঘাড়ে যেন ভূত নেমেছিল। সামান্য একটা জিলিপি নিয়ে যে এমন লঙ্কাকাণ্ড বাধবে, তা যেমন ছোট জা' কল্পনা করতে পারেনি, তেমনি বিশাখা, কি বিজলীও তা কল্পনা করতে পারেনি। বিশাখা আর বিজলীকে নিয়ে ছোট জা' তখন তার নিজের ঘরে চলে গেছে।
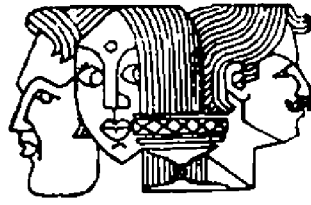
এসব ঘটনা অতীতের। এ সব ঘটনা মাঝে-মাঝে ঘটলেও তা তেমন দীর্ঘস্থায়ী হয়ে ওঠেনি।

কিন্তু মাঝখান থেকে কী করে যে কী হয়ে গেল, বাবুঘাটে গঙ্গায় মেয়েকে নিয়ে স্নান করতে গিয়ে বিশাখা যে কার সুনজরে পড়ে গিয়েছিল তা ভগবানই জানেন। সেদিন বিডন স্ট্রীট-এর বাড়ি থেকে সে-বাড়ির সরকার মশাই এসে বিশাখার জন্ম-সময়-তারিখ চেয়ে নিয়ে গেল, সেদিন থেকেই যেন আবার অন্য দিকে ঘটনার মোড় ঘুরলো।

সেদিন থেকেই ছোট জা-র শরীর আরো খারাপ হতে লাগতো। সেদিন থেকেই যোগমায়া যেন আরো নির্বাক হয়ে গেল। আর সেদিন থেকেই ছোট দেওরের মেজাজ যেন কেমন আরো খিট খিটে হয়ে গেল।

বিশাখা কখনও কখনও বিছানায় শুয়ে ডাকে-ও মা, মা—

যোগমায়া বলে—কী হলো? আমাকে ডাকছিস কেন?

বিশাখা বলে—আমার ঘুম আসছে না—

—ভয় করছে!

—কেন, ভয় করছে কেন?

বিশাখা বলে—তুমি আমাকে জড়িয়ে ধরে থাকো মা, জোরে জড়িয়ে ধরে থাকো

যোগমায়া দু'হাত দিয়ে মেয়েকে জড়িয়ে ধরে আদর করে।

বিশাখার তখনও ঘুম আসে না।

হঠাৎ এক সময়ে বিশাখা বলে—আমার নাকি বিয়ে হবে মা?

যোগমায়া চমকে ওঠে। জিজ্ঞেস করে—তোকে কে বললে?

বিশাখা চুপ করে থাকে। যোগমায়া বললে—বল্, কে তোকে বললে?

বিশাখা ভয়ে এ-প্রশ্নের কোনও জবাব দেয় না। যোগমায়া আবার জিজ্ঞেস করলে—জবাব দিচ্ছিস না যে? বল্, কে তোকে বললে বিয়ের কথা?

বিশাখা বললে—কাকাবাবু।

—কাকাবাবু নিজে তোকে বলেছে?

বিশাখা বললে—না, কাকাবাবু আর কাকিমা দু'জনে কথা বলছিল, আমি শুনতে পেয়েছি।

—কাকাবাবু আর কাকিমা কী কথা বলছিল?

—বলছিল যেখানে আমার বিয়ে হবে, তাদের বাড়ি কাকাবাবু গিয়েছিল। সে নাকি এক মস্ত বড় বাড়ি। তারা নাকি মস্ত বড়লোক, তাদের বাড়িতে মস্ত বড় মোটর গাড়ি আছে। তাদের নাকি অনেক টাকা আছে, অনেক ঝি-চাকর, দরোয়ান,

মন্দির আছে তাদের বাড়িতে, সে মন্দিরে রোজ পুজো হয়—

যোগমায়া জিজ্ঞেস করলে—আর কী বললে?

—বললে কাকাবাবু নাকি তাদের সঙ্গে বিজলীরও বিয়ে দেবার কথা বলেছিল, কিন্তু তারা নাকি রাজি হয়নি। সে জন্যে কাকিমা খুব রেগে গিয়েছে।

যোগমায়া বললে—কার ওপর রেগে গিয়েছে?

—তোমার ওপর।

যোগমায়া বললে—কেন, আমার ওপর রেগে গিয়েছে কেন? আমি কী করেছি?

বিশাখা বললে—না, তাহলে বোধহয় আমি ভুল শুনেছি। বোধহয় তাদের ওপরই রাগ করেছে।

যোগমায়া বললে—তা যে যা-ইচ্ছে করুক, তুমি এবার ঘুমোও।

বিশাখা একটু থেমে বললে—আমি কিন্তু মা তাদের বাড়ি যাবো না।

যোগমায়া বললে—কে তোমায় সেখানে যেতে বলছে? তোমার ইচ্ছে না হয় তো যেও না!

বিশাখা বললে—আমি তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাবো না মা—

যোগমায়া বললে—তুমি মেয়ে হয়ে জন্মেছ, বিয়ের পর তো তোমাকে শ্বশুর-বাড়ি যেতেই হবে মা।

বিশাখা মা-কে আরো জোরে আঁকড়ে ধরলো।

বললে—না মা, আমি তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাবো না—

যোগমায়া বললে—ও-সব কথা তুমি এখন ভেবো না। এখন ঘুমোও।

খানিক পরে বিশাখা নিঃশব্দে ঘুমিয়ে পড়লো। যোগমায়া ঠাকুরকে ডাকতে লাগলেন—ঠাকুর, এই মেয়ে ছাড়া আমার আর কেউ নেই। তুমি তাকে দেখো ঠাকুর—

তারপর নিজেও এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়লো।
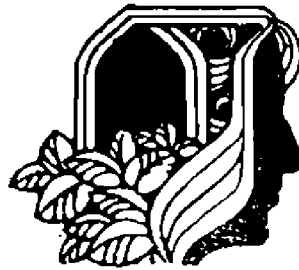
সেদিন সকাল বেলাই সাত নম্বর মনসাতলা লেনের বাড়িতে সদর দরজার কড়া নড়ে উঠলো। ভেতর থেকে তপেশ গাঙ্গুলীবাবু জবাব দিলেন—কে?

—আমি, বিডন স্ট্রীট থেকে আসছি। মল্লিক-মশাই।

তাড়াতাড়ি তপেশ গাঙ্গুলী দরজা খুলে দিলেন। দেখলেন, মল্লিক-মশাই সশরীরে দাঁড়িয়ে। জিজ্ঞেস করলেন—কী ব্যাপার?

মল্লিক-মশাই বললেন—আপনার বৌদি আর ভাইঝিকে নিয়ে যেতে এসেছি। ঠাকমা-মণির গুরুদেব এসেছেন কাশী থেকে, তিনি একবার আপনার ভাইঝিকে

দেখতে চান—

তপেশ গাঙ্গুলী মশাই তখন একেবারে হতবাক। তিনি যেন নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে পারলেন না। তিনি বললেন—আসুন মল্লিক-মশাই আপনি বাইরের রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছেন কেন, ভেতরে আসুন—

মল্লিক-মশাই আগেকার দিনের মতন ভেতরে গিয়ে বসলেন। সেই আগেকার মতন তক্তপোশ, সেই বিছানাটা গোল করে গোটানো। সেই সর্বত্র অগোছালো নোংরার পাহাড়—

—বৌদি, অ বৌদি, বৌদি কোথায়? বিডন স্ট্রীটের বাড়ি থেকে তোমাদের নিতে এসেছেন ও'রা—

কথাগুলো যে বিদ্যুতের গতিতে বাড়ির মধ্যে ছড়িয়ে গিয়ে একটা ঝড়ের আভাস সৃষ্টি করবে, তা তপেশ গাঙ্গুলী কল্পনা করতে পারেন নি। রান্না করতে-করতে যোগমায়ার কানে কথাগুলো যেতেই সে শিউরে উঠলো। ভাবলে, এই বুঝি মাথার ওপর বজ্রাঘাত হলো!

ঘরের ভেতর থেকে রাণী বললে— কী বললে? কে এসেছে?

তপেশ গাঙ্গুলী আবার বললেন—বিডন্ স্ট্রীট-এর মুখুজ্জে বাড়ি থেকে এখানে গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে—

রানী যেন রোগ-ভোগের পর সুস্থ হয়ে উঠলো। বললে—কেন?

তপেশ গাঙ্গুলী বললেন—বৌদিকে আর বিশাখাকে তারা একটুখানির জন্যে নিয়ে যেতে চায়।

—কেন?

—কেন আবার কী? তারা যদি নিয়ে যেতে চায় তো আমি কী বলবো?

রানী বললে—বড়দি গেলে বাড়ির রান্না-বান্না কে করবে? আমি কিন্তু তা পারবো না, তা তোমায় বলে রাখছি—

তপেশ গাঙ্গুলী বললেন—তাহলে মল্লিক-মশাইকে আমি কী বলবো?

— আমি কী বলবো? যা তুমি ভালো বোঝ তাই বলবে।

হঠাৎ পেছন থেকে একটা আওয়াজ এল—ঠাকুর-পো—

তপেশ গাঙ্গুলী দেখলেন রান্নাঘর ছেড়ে বৌদি পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন। রানীও তা দেখলে। তপেশ গাঙ্গুলী কিছু বলবার আগেই যোগমায়া বললে—তুমি বলে দাও ঠাকুর-পো, আমি যাবো না—

—কেন বৌদি, যাবে না কেন?

যোগমায়া বললে—না, আমি যাবো না, সংসারে আমার অনেক কাজ আছে— আমি চলে গেলে কে এ-সব করবে?

—সত্যিই যাবে না?

যোগমায়া বললে—না, সত্যিই যাবো না, তুমি তাই বলে দাও ওদের—

তপেশ গাঙ্গুলী বললেন—কিন্তু ওরা খুব বড়লোক, তা জানো? আমি নিজে ওদের বাড়ি গিয়ে সেদিন দেখে এসেছি, অমন বড়লোকের বাড়ির ছেলের সঙ্গে তোমার মেয়ের সম্বন্ধ হবে, এটাও তো তোমার সৌভাগ্য—

যোগমায়া আর দাঁড়ালো না সেখানে। রান্নাঘরের দিকে চলে যেতে-যেতে বললে—আমার সৌভাগ্য না ছাই, আমার সৌভাগ্য যদি হতো তা হলে কি এমনি করে আমার কপাল পুড়তো?

—কী বললে? কী বললে দিদি? কী বললে তুমি?

বলতে-বলতে বিছানা থেকে উঠে এল রানী। তারপর রান্নাঘরের সামনে রোয়াকে বেরিয়ে এসে বললে—তোমার কেন জ্বালা বলো তো দিদি? এত জ্বালা তোমার কীসের? বারবার পোড়া কপালের দোহাই কেন দাও তা আমি বুঝতে পারি নে ভেবেছ? আমার ওপর যদি তোমার এতই হিংসে তো সংসারের কোনও কাজই আজ থেকে তোমায় করতে হবে না। কে তোমায় এত কাজ করতে বলেছে? ভগবান আমার গতর খেয়েছে বলেই তোমায় আমার এত খোসামোদ। তা যাক্‌গে, আজ থেকে আমিই হাতা-বেড়ি নাড়বো, আমিই জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সবই করবো। নাও, তুমি ওঠো, তুমি বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ো, খাবার সময় তোমাকে ডাকবো, তুমি দয়া করে তখন একটু কষ্ট করে খেয়ে নিয়ে আমায় উদ্ধার কোর—ওঠো, ওঠো বড়দি—ওঠো বলছি—

যোগমায়া তবু যা করছিল, তাই করতে লাগলো।

রাণী বললে—কই উঠলে না যে? ওঠো বলছি—

বলে যোগমায়ার হাত থেকে খুন্তীটা টেনে নেওয়ার চেষ্টা করতেই নিজের হাতে সেটা রেখে যোগমায়া জোর করে উঠে দাঁড়ালো। বললে—দিদি, তুমি কি আমাকে এই সকাল বেলা না কাঁদিয়ে ছাড়বে না? ভগবান সাক্ষী আছেন আমি কখনও তোমাকে হিংসে করিনি দিদি, হিংসে করিনি। যদি কখনও হিংসে করে থাকি তো আমার কপাল যেন এই রকম করে ভাঙে—ভাঙে—ভাঙে—

বলে কেউ কিছু বলবার আগেই পাশের সিমেন্টের দেয়ালে ঠাঁই-ঠাঁই করে মাথাটা ঠুকতে লাগলো, আর সঙ্গে-সঙ্গে কপালটা কেটে গিয়ে টপ্‌-টপ্‌ করে রক্ত পড়তে লাগলো। হয়ত আরো রক্ত পড়তো, কিন্তু তার আগেই তপেশ গাঙ্গুলী বৌদির হাতটা ধরে টেনে নিয়েছেন। বললেন—এ কী করছো বৌদি, তুমি কি পাগল হয়ে গেলে?

যোগমায়া তখন সেখানে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই একহাতে নিজের থান দিয়ে চোখ ঢেকে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছে। তপেশ গাঙ্গুলী বললেন—ওদিকে ঘরের ভেতরে মুখুজ্জে বাড়ির সরকার-মশাই সব শুনতে পাচ্ছেন যে!

রানী বললে—শুনুক না, শুনলে কী হয়েছে? শুনুক যে যাকে নিজেদের বাড়ির নাতির সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ করছে তার মা কত দজ্জাল, কত ঝগড়াটে—নিজের কানেই শুনে যাক্‌ না, তাতে ক্ষতি কী?

তপেশ গাঙ্গুলী বাধা দিয়ে গলা নিচু করে বললেন—আঃ, অত চেঁচিও না গো, চেঁচিও না অত, শুনতে পাবে, ওরা খুব বড়লোক—

রানী কী বলতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগেই পাড়ার স্কুল থেকে বিজলী আর বিশাখা চেঁচাতে-চেঁচাতে বাড়ি ফিরলো। এ-রকম প্রতিদিন বাড়িতে ফেরার সময় তারা মুক্তির আনন্দে চেঁচাতে-চেঁচাতে ফেরে।

কিন্তু বাড়ির সকলকে রান্নাঘরে একসঙ্গে ওই অবস্থায় দেখে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো। তাদের মুখের কথা যেন মুখেই থেকে গেল।

বিশাখা বললে—এ কি মা, তোমার কাপড়ে রক্ত কেন ?

কেউ তার কথার উত্তর দিল না। সবাই যেন তখন বোবা হয়ে গেছে।

—এ কি মা, তোমার কপাল কেটে রক্ত পড়ছে কেন ?

যোগমায়া আর থাকতে পারলে না হঠাৎ যেন রুদ্রমূর্তি হয়ে সে মারমুখী হয়ে উঠলো। এক নিমেষে মেয়ের চুলের মুঠি ধরে টেনে দূরে উঠোনের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিলে। আর সঙ্গে-সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলো—পোড়ারমুখী, মরতে তুই আর জায়গা পাসনি, আমার পেটে কেন জ্বালাতে এলি তুই ? মর তুই, মর—

বিশাখা এই অপ্রত্যাশিত আঘাতে আর অকারণ শাস্তিতে গলা ফাটিয়ে পাড়া কাঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। রানী তাড়াতাড়ি রোয়াক থেকে উঠোনে নেমে বিশাখাকে কোলে তুলে নিয়ে তপেশকে বললে—দেখলে তো, দেখলে তো তোমার বৌদির কাণ্ড। ঝি'কে মেরে বউকে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে! ভেবেছে আমি কিছু বুঝতে পারি না। ওগো, আমিও বুঝি গো, আমিও বুঝি। সংসারে কেউ বোকা নয় বড়দি, কেউ অত বোকা নয়।

কথার মাঝখানে হঠাৎ বাইরের ঘর থেকে মল্লিক-মশাই-এর গলা পাওয়া গেল। মল্লিক-মশাই বলছেন—ও গাঙ্গুলী-মশাই, আর কত দেরি ? আমি যে অনেকক্ষণ ধরে বসে আছি! সেখানে যে আমার অনেক কাজ পড়ে আছে—

তপেশ গাঙ্গুলী বললেন—ওই, ওই মল্লিক-মশাই ডাকছেন—

তারপর মল্লিক-মশাইকে উদ্দেশ্যে করে চেঁচিয়ে বললেন—এই যে, আর দেরী হবে না, যাচ্ছি—

যোগমায়াকে লক্ষ্য করে তপেশ গাঙ্গুলী বললেন—বই বৌদি, তুমি তৈরি হয়ে নাও, বিশাখাকেও একটা ফরসা ফ্রক পরিয়ে দাও, বড়লোকের বাড়ি, অনেক ভাগ্য করলে তবে অমন বাড়িতে মেয়ের সম্বন্ধ হয়—যাও, আর দেরি করো না—

বলে তাড়াতাড়ি বাইরের ঘরে মল্লিক-মশাই-এর কাছে গেল।

যোগমায়া তখনও সেই ভাবে ঠায় দাঁড়িয়ে। আর রানী বিশাখাকে ঘরে নিয়ে গিয়ে একটা ভালো দেখে ফ্রক পরিয়ে দিয়েছে, চুল আঁচড়ে, লাল রং-এর একটা রিবন মাথার চুলে ফুল করে বেঁধে দিয়েছে।

বিজলী বললে—ওকে সাজিয়ে দিচ্ছ আর আমাকে সাজিয়ে দেবে না ?

রানী বললে—দেব-দেব, তোকেও সাজিয়ে দেব। বিশাখা এখুনি চলে যাবে কি না, তাই ওকে আগে সাজিয়ে দিচ্ছি—

বিজলী তবু কিছু বুঝতে পারলে না। জিজ্ঞেস করলে—ও কোথায় যাচ্ছে ?

—ও যাচ্ছে শ্যামবাজারে—

—শ্যামবাজারে—

বলে আর দাঁড়ালো না। ঘর থেকে বেরিয়ে দেখলে বড়দি তখনও সেখানে সেই একই ভাবে ঠায় দাঁড়িয়ে।

বললে—কী হল বড়দি, তুমি তৈরি হওনি এখনও ? তৈরি হও তাড়াতাড়ি—

যোগমায়া এবার প্রথম কথা বললেন। বললে—আমি যাবো না।

—যাবে না? যাবে না কেন?

—আমার ইচ্ছে—

রানী বললে—বুঝেছি, তুমি আমাকে জব্দ করতে চাও। তা বেশ, যদি তাই করতে চাও তো এও আমি বলে রাখছি যে তুমি যদি আমার ওপর রাগ করে সেখানে না যাও তো আমি আজ এ-বাড়িতে জল-গ্রহণ করবো না—আমিও এ-বাড়িতে তোমার চোখের সামনে উপোষ করে মরবো। দেখি, আমাকে তুমি কত রকমে জব্দ করো—

যে-যোগমায়া এতক্ষণ একপাশে পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, সে যেন এ-কথায় একটু সচল হলো। বললে—দিদি, আমি চলে গেলে কে সংসারের কাজ-কম্ম করবে? তোমরা সবাই খাবে কী?

রানী বললে—তুমি মরে গেলে কি ভেবেছ এ-বাড়ির কেউ খেতে পাবে না? তুমি মরে গেলে কি আকাশে সূর্য-চন্দ্র উঠবে না? যদি তখনও তা ওঠে তাহলে তুমি মরে গেলেও এ-সংসার চলবে, তা বন্ধ হবে না, এটা তুমি জেনে রেখো—

এর জবাবে যোগমায়া কিছুই বললে না। শুধু চুপ করে রইল। রানী বললে—যাও, আর কথা বাড়িও না, ভদ্রলোক বসে আছেন, তুমি একটা ফর্সা কাপড় পরে নাও। ওই ময়লা ছেঁড়া কাপড়টা পরে সেখানে গিয়ে তোমার দেওরকে আর বে-ইজ্জৎ করো না—বলে ছোট-জা সেখান থেকে চলে গেল।
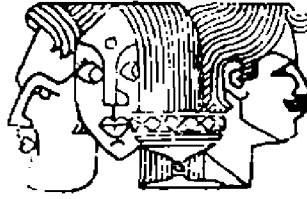
সন্দীপ তখনও জানতো না কাকে বলে সংসার। সে বড়লোকের সংসারই হোক আর ভিখিরির সংসারই হোক। সং সাজাকেই যারা জীবনের সারবস্তু বলে মনে করে, তারাই এ-সংসারে সংসার পাতে। বেড়াপোতাতেও সন্দীপ কত সংসার দেখেছে। চাটুজ্জে-বাড়ির ভেতরেও গিয়েছে সন্দীপ কতবার। চাটুজ্জে-বাড়ির ভেতরে শাশুড়ি-বউদেরও খুঁটিনাটি নিয়ে মন কষাকষি হয়েছে কতবার। মা'কেও কি চাটুজ্জে গিন্নীর কাছে কম বকুনি খেতে হয়েছে? মা'র সব কাজেই খুঁত ধরতো বাড়ির গিন্নী।

চাটুজ্জে গিন্নী বলেছে—হ্যাঁ গা মেয়ে, এ তোমার কী-রকম ধরনের কাজ বাছা?

চাটুজ্জে বাড়ির রান্নাঘরের ভেতরে বসে রাঁধতে-রাঁধতে সন্দীপের মা ভয়ে কেঁপে উঠতো। বলতো—কী করেছি মা?

—কী করোনি তাই আগে আমায় জিজ্ঞেস করো। আঁশের হাতে তুমি দুধের কড়া কী বলে ছুঁলে? তুমি আমার জাত-ধম্ম কিছু আর রাখবে না দেখছি—আমি তো তোমাকে নিয়ে মহা জ্বালায় পড়লুম—

কখন মা আঁশের হাতে দুধের কড়া ছুঁয়েছে, আর কখনই বা আঁশের হাত

করেছে, তা মা'র খেয়াল থাকতো না। কিন্তু তখন আর কী-ই বা করার ছিল!

গিন্নী বলতো—ঠিক আছে, ওই সব দুধ এখন নর্দমায় ঢেলে দাও মা। আমার জাত-ধম্ম আগে বাঁচুক, তারপর তোমার কথা শুনবো—

সত্যি-সত্যিই শেষ পর্যন্ত সেই পাঁচ সের দুধ মা নর্দমায় ঢেলে ফেলে দিয়েছিল। মা'র তখন একটু মায়াও হচ্ছিল। তখনই সন্দীপের কথা মনে পড়তো মা'র। ছেলেকে মা এতটুকু দুধ কোনও দিন খেতে দিতে পারে না, সেই দুধ নর্দমায় ফেলে দিতে মা'র মনে কষ্ট হবে বই কি!

এই ধরনের ঘটনা যে মাত্র একদিন হতো তা নয়, প্রায় রোজই হতো, আর রোজই ছেলের মুখের দিকে চেয়ে মা সব কষ্ট সব অপমান মুখ বুজে সহ্য করে যেত।

আবার ঠিক এর উল্টো ধরনের ঘটনাও ঘটতো মাঝে মাঝে। চাটুজ্জে-গিন্নীর মুখের যেমন ধার ছিল, তেমনি আবার দয়া-মায়াও বলে জিনিসটা বুকের মধ্যে থেকে মাঝে-মাঝে বাইরে প্রকাশ হয়ে পড়তো।

—আচ্ছা, তুমি এ কী রকম মেয়ে বাছা? কাল বাড়িতে অমন পায়েস রান্না হলো, সে-পায়েস বাড়ির কুকুর-বেড়ালও খেয়ে শেষ করতে পারলে না, ফেলে ছড়িয়ে একসা করলে আর তুমি নিজের পেটের ছেলের জন্যে একটু নিয়ে যেতে পারলে না? আমি তো এমন মা ভূ-ভারতে কোথাও দেখিনি বাছা! দশটা নয় পাঁচটা নয়, ওই একটি মাত্তোর ছেলে, তাকেই এত হ্যালা-ফ্যালা?

সত্যিই, মা যেন বোবা ছিল। নিন্দে-প্রশংসা-অভিযোগ, যা-ই হোক না কেন, কোনও কিছুতেই বিচলিত বা বিগলিত হতে যেন মা'র ভাগ্য-দেবতার নিষেধ ছিল। মা'র ভাগ্য-বিধাতা যেন মা'কে জীবনের শুরু থেকেই সাবধান করে দিয়েছিল যে মাথা নিচু করে সব কিছু ন্যায়-অন্যায়-আনন্দ-বিষাদ গ্রহণ করে সামনে এগিয়ে যাবার চেষ্টার নামই হলো জীবন। যদি জয় আসে তাতেও যেমন উল্লসিত হতে নেই, তেমনি যদি পরাজয়ও আসে তাতেও তেমনি হতমান হতে নেই। দুঃখে সুখে, আনন্দে, বিষাদে যে অবিচল থাকতে পারে তাকেই তো বলা হয়েছে স্থিতপ্রজ্ঞ। সন্দীপের মা'ও ছিল তেমনি একজন স্থিতধী মানুষ। আজ যে সন্দীপ জীবনের এই পর্যায়ে এখানে এসে পৌঁছিয়েছে, এতো তার মা'র কাছ থেকেই সে শিখেছে।

সন্দীপ কিন্তু মনে-মনে তখন বড় কষ্ট পেত।

বলতো—মা, তোমাকে ওরা অমন করে কথা শোনায়, আর তুমি তখন ওদের কথার কোনও জবাব দিতে পারো না? তোমার কি খুব ভয় করে নাকি?

মা বলতো—তা তুই কোত্থেকে তা শুনতে পেলি?

সন্দীপ বলতো—আমি তো তখন ওদের বাড়ির ভেতরে লাইব্রেরীতে বসে বই পড়ছিলুম। ওদের বুড়ীটা তোমাকে কী বলছিল সেইসব কথা শুনতে পেয়েছি—

—শুনতে পেয়েছিস বেশ করেছিস।

সন্দীপ বলতো—তোমাকে কেউ কিছু বললে আমার যে খারাপ লাগে, তা তুমি বুঝতে পারো না?

মা বলতো—তুই অত রেগে যাস কেন? না রাগলেই পারিস?

—বা রে, তোমাকে অন্যায় কথা বলবে আর আমার রাগ—হবে না ? তুমি যে আমার মা—

মা বলতো—বলুক গে ওরা, তাতে আমার গায়ে ফোস্কা পড়েনি—

সন্দীপ বলতো—তুমি কিছু বলো না বলেই তো ওরা অত কথা শোনায় তোমাকে। আমি হলে দেখিয়ে দিতুম—

মা তখন ছেলেকে সান্ত্বনা দিত। বলতো—তুই যখন লেখাপড়া শিখে বড় হয়ে অনেক টাকা উপায় করে আমার হাতে দিবি, তখন ওদের সব কথার জবাব দেওয়া হয়ে যাবে। আমি তো রোজ ঠাকুরের কাছে তাই বলি রে। বলি—ঠাকুর তুমি আমার মুখ রেখো ঠাকুর, সন্দীপের আমি ছাড়া আর কেউ নেই। সে যেন বড় হয়ে আমার সব অপমানের সব দুঃখের বোঝা দূর করে দেয়। সবাই যেন তাকে দেখে বলে যে—হ্যাঁ, সন্দীপ একজন ছেলের মত ছেলে হতে পেরেছে। তারা যেন আরো বলে যে—ওর মা পরের বাড়িতে রাঁধুনী গিরি করে ওকে মানুষ করেছে। শুধু মানুষই করেনি, এমন একজন মানুষ হয়েছে সে, যাতে বেড়াপোতার সমস্ত লোকের মুখ আলো করেছে—

এখন ভাবলে সন্দীপের হাসি পায়। মা তো কিছুই জানতো না। আর জানবেই বা কী করে ? সারা জীবন মা সংসারের জন্যে প্রাণ দিয়েছে, আর সন্দীপের বাবা মারা যাওয়ার পর পরের সংসারের কাজ করেই জীবন পাত করেছে। জানবার কোনও সুযোগই পায়নি মা। তাই মা জানতো না যে টাকা হলেই কেউ মানুষ হয় না। মা এটাও জানতো না যে টাকার সঙ্গে মনুষ্যত্বের কোনও সম্পর্ক নেই। অথচ পৃথিবীতে কত বড়-বড় মহাপুরুষ ছিল যাদের কাছে একটা পয়সাও ছিল না। আর তা ছাড়া, একলা মা'কে দোষ দিয়েই বা কী লাভ ? পৃথিবীর সব মানুষেরই তো সে একই ধারণা। আজ পর্যন্ত সন্দীপ যত লোকের সঙ্গে মিশেছে তাদের সকলেরই ধারণা যে টাকাটাই সব। তোমার টাকা থাকলেই আমি তোমাকে খাতির করবো। আমাকে সে-টাকা ধার দিতে হবে না, শুধু একটু খাতির করতে দাও তোমাকে। কারণ তোমার টাকা আছে। অথচ সন্দীপের মা ?

মা সত্যিই জানতো না যে টাকা না- থাকার যন্ত্রণার চেয়ে টাকা থাকার যন্ত্রণা আরো বেশি অসহ্য। এই সামান্য সত্যটা জানতে সন্দীপকে বেড়াপোতা থেকে এই কলকাতায় এসে বিডন স্ট্রীটের মুখুজ্জে-বাড়িতে উঠতে হয়েছিল ! আর তার সমস্ত জীবনটাকে এই বাড়ির মানুষদের সুখ-দুঃখের সঙ্গেও ওতপ্রোতভাবে জড়াতে হয়েছিল। কিন্তু তাতে তার কী লাভ হয়েছিল ?

তবে শুধু একটা সান্ত্বনা এই যে লাভ-ক্ষতির হিসেব-কেতাব নিয়ে জীবন-দেবতার কোনও মাথা-ব্যথা নেই। তার ইচ্ছে হিসেব-কেতাবের নিয়মের বাইরে বলেই তাকে আড়াল থেকে প্রণাম করাই মানুষের একমাত্র কর্তব্য।

তাই সন্দীপ সারা জীবন ধরে সেই অদৃশ্য জীবন-দেবতার সমস্ত নির্দেশই মুখ বুঁজে সহ্য করে এসেছে। আর সহ্য করেছে বলেই সে আজ এই অতীত-চারণ করতে পারছে ! সত্যিই তো কী সে ছিল, আর এখন কী সে হয়েছে ! আসলে জীবনে যে কিছু হতে হবে তার কোনও মানে নেই। সে যে মহামানবের মিছিলের একজন

দারিদ্র শরিকও হতে পেরেছে, এইটেই কি কম কিছু ?

বেড়াপোতায় দেরি করে বাড়ি ফিরলে মা বড় রাগ করতো, বলতো—এতক্ষণ কোথায় ছিলিস রে তুই ? আমি তখন থেকে ভাত কোলে করে বসে আছি—তোর কি এতটুকু জ্ঞান নেই ? কোথায় গিয়েছিলিস ?

আসলে সে তখন চাটুজ্জে-বাবুদের বাড়ির লাইব্রেরীতে বই পড়তে ব্যস্ত থাকতো।

চাটুজ্জে-বাবুদের বাড়িতে যে অত বই আছে তা সে কী করে জানবে ? অনেক দিন মা'কে খোঁজবার জন্যে সে ওই বাড়িতে গিয়ে হাজির হতো। মা বাড়ির একেবারে অন্দরমহলের শেষ প্রান্তে রান্নাঘরে থাকতো। সেখানে রোদ-আলো-হাওয়া কিছুই পেঁছুত না। সদর দরজা দিয়ে অন্দর মহলের রান্নাঘরের দিকে যেতে গেলে বার-বাড়ির বৈঠকখানা, লাইব্রেরী, তোষাখানা পেরিয়ে অনেক মানুষের নজর কাটিয়ে তবে যেতে হতো।

একদিন সে ওই রকম সদর দরজা দিয়ে ঢুকে বৈঠকখানার সামনে দিয়ে যাচ্ছে হঠাৎ পাশের ঘরে দেখলে দেয়াল ভর্তি আলমারিতে থাক-থাক বই সাজানো রয়েছে। চামড়ায় বাঁধানো তার ওপর সোনার জলে নাম লেখা সব বই।

সন্দীপ আর লোভ সামলাতে পারলে না। সে আস্তে-আস্তে ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়লো। একখানা বই নিয়ে সে দেখলে বইটার ওপরে সোনার অক্ষরে লেখা রয়েছে—শ্রী ভৈরবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—বেড়াপোতা। বইটার নাম "সাধক কবি রামপ্রসাদ। লেখক শ্রী যোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত।"

কে এই রামপ্রসাদ ? আর কে-ই বা এই ভৈরবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ?

বই-এর পাতাগুলো খুলতেই দেখলে ভেতরে অনেক পদ্য লেখা রয়েছে। খানিকটা পড়েই মনটা আটকে গেল সেই লেখার মধ্যে। মনে হলো এ যে মা'রই কথাগুলো সাধক কবি লিখেছেন—

"ভাল নাই মোর কোন কালে,
ভালই যদি থাকবে আমার
মন কেন কুপথে চলে ?"

পর আর এক জায়গায় লেখা :

"মন কেন রে ভাবিস এত ?
যেন মাতৃহীন বালকের মত।
ভবে এসে ভাবছো বসে, কালের ভয়ে হয়ে ভীত
ওরে কালেরও কাল যে মহাকাল, সে কাল মায়ের পদানত।"

কথাগুলো যেন সন্দীপের মনে গেঁথে গেল। কত কাল আগে কোন্ এক সাধক কবি রামপ্রসাদ তার মনের কথা কী করে জানতে পারলে ? সন্দীপ নিজেও তো তখন ভাবছিল যে সে গরীবের ঘরে জন্ম নিয়েছে, ভবিষ্যতে তার কী হবে ? চাটুজ্জেবাবুদের বাড়িতে জন্মালে অন্য কথা। কিন্তু সে তো গরীবের ঘরে জন্মেছে। অন্য ছেলেদের সকলের বাবা-কাকা-মামা কত কী আছে। কিন্তু তার যে কেউ নেই, একা মা ছাড়া। আর মা'ও তো পরের বাড়িতে ঝি-গিরি করে পেট চালায়। এমন ছেলের ভবিষ্যৎ কী ? বইটা পড়ে তার মনে যেন একটু শান্তি এল। তারও যেন

বলতে ইচ্ছে হলো 'মন কেন রে ভাবিস এত ? যেন মাতৃহীন বালকের মত ভবে এসে ভাবছো বসে, কালের ভয়ে হয়ে ভীত। ওরে কালেরও কাল যে মহাকাল, সে-কাল মায়ের পদানত।'

পড়তে-পড়তে সন্দীপ সেদিন যেন এক অন্য জগতে চলে গিয়েছিল। সময়েরও খেয়াল ছিল না তার। সময় কি কখনও স্থির থাকে ? এই সূর্য-গ্রহ-চন্দ্র-তারা, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কি কখনও এক মুহূর্তের জন্যেও থেমে থাকে ? এমন কি কখনও হয় যে রাত্রির পর ভোর হলো না, দিন হলো অথচ সূর্য উঠলো না ? তা যদি কখনও হওয়া সম্ভব তো সন্দীপের জীবনে সেইদিনই তা হয়েছিল। সেই-ই প্রথম। কখন যে সন্ধ্যে হয়েছে, রাত হয়েছে, আলো জ্বলেছে, কিছুরই খেয়াল ছিল না।

—কে ? এখানে কে ?

স্বপ্নের জগৎ থেকে কে যেন তাকে ছিটকে পৃথিবীর মাটিতে ফেলে দিলে। তখন যেন তার হুঁশ হলো যে সে চাটুজ্জেদের বাড়িতে লাইব্রেরী-ঘরে বসে আছে।

সন্দীপ চোখ তুলে দেখলে কাশীবাবু। কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

—ওরে দাসু, এ-ঘরে কে বসে আছে ? তোরা কোনও দিকে দেখিস না, যে-সে এসে ঘরে ঢুকে বসে থাকে, তোরা দেখতে পাস না ? ও দাসু, কোথায় গেলি সব ?

কাশীবাবুর চাকর কোথা থেকে মনিবের ডাক পেয়ে দৌড়তে-দৌড়তে এসেছে। তারপর সন্দীপকে দেখে বললে—আজ্ঞে ছোটবাবু, এ আমাদের বামুন-দিদির ছেলে সন্দীপ—

সন্দীপ তখন ভয়ে কাঁপতে-কাঁপতে দাঁড়িয়ে উঠলো।

—তুমি আমাদের বামুনদিদির ছেলে ?

সন্দীপ বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ—

দাসু বললে—ও ওর মা'কে খুঁজতে এসেছে—

—তোমার মা'কে খুঁজতে এসেছ তুমি ?

সন্দীপ বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ—

—কী নাম তোমার ?

সন্দীপ বললে—সন্দীপকুমার লাহিড়ী—

—তোমার বাবার নাম ?

—বাবার নাম ঈশ্বর হরিপদ লাহিড়ী—

— তোমার ক'ভাই বোন ?

সন্দীপ বললে—আমার ভাই বোন কেউ নেই—

—তুমি ইস্কুলে পড়ো-টড়ো ?

—হ্যাঁ

—কোন ক্লাশে ?

—ক্লাশ নাইনে পড়ি—

খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে কাশীবাবু আরো অনেক কথা জিজ্ঞেস করতে লাগলেন। শেষকালে জিজ্ঞেস করলেন—তুমি কী বই পড়ছিলে ?

সন্দীপ হাতের বইটা কাশীবাবুর দিকে এগিয়ে দিলে। কাশীবাবু দেখলেন।

বললেন—তুমি এ-বই পড়ে বুঝতে পারছিলে ?

সন্দীপ বললে—হ্যাঁ—

কাশীবাবু জিজ্ঞেস করলেন—তুমি আরো বই পড়তে চাও ?

সন্দীপ বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ।

কাশীবাবু বললেন—ঠিক আছে, তুমি এবার যখন পড়তে চাইবে, তখন তুমি এই দাসুকে বলবে, বললেই দাসু তোমায় দরজা খুলে দেবে, তারপর তোমার যতক্ষণ ইচ্ছে তুমি পোড়। কেউ তোমায় কিছু বলবে না, যাও, এবার তুমি তোমার মা'র কাছে যাও—তোমার মা রান্নাঘরে আছেন—

দাসু বললে—না ছোটবাবু, বামুনদিদি বাড়ি চলে গেছে—

মা বাড়ি চলে গেছে ! খবরটা শুনে সন্দীপ যেন কেমন চঞ্চল হয়ে উঠলো। তার মুখ দিয়ে আর কোনও কথা বেরলো না। সে দৌড়ে বাড়ির দিকে যাচ্ছিল, কিন্তু কাশীবাবুর কথায় আবার সে দাঁড়িয়ে পড়লো।

—আরে শোনো, আর একটা কথা—

সন্দীপ বললে—কী ?

কাশীবাবু আবার ডাকলেন। জিজ্ঞেস করলেন—বড় হয়ে তুমি কী হতে চাও ?

সন্দীপ প্রশ্নটা শুনে একেবারে নির্বাক হয়ে গেল। সত্যিই তো বড় হয়ে সে কী হবে, তা-তো সে কোনও দিনই ভাবেনি। কিছু হওয়ার জন্যে সে তো মনে-মনে তৈরীও হয়নি। কথাটা তখন তার মাথার মধ্যে ঝড় তুলেছে। সে এক বিচিত্র ঝড়। সাধক কবি রামপ্রসাদের মাথাতেও তেমনি ঝড় উঠেছিল কতবার। রামপ্রসাদের মাথাতেও অনেক প্রশ্নের ঝড় উঠতো। ঝড় এলেই রামপ্রসাদ খাতার পাতাতে লিখে ফেলতো ঃ

মা গো আমার কপাল দোষী।
আমি ঐহিক সুখে মত্ত হয়ে
যেতে নারলাম বারাণসী
নইলে অন্নপূর্ণা মা থাকিতে
মোর ভাগ্যেতে একাদশী—

কাশীবাবু যখন দেখলেন ছোট ছেলেটা তাঁর কথাটার কোনও জবাব দিতে পারছে না, তখন তাকে বেশী পীড়াপীড়ি করলেন না। শুধু বললেন—এখন থেকে ঠিক করে নাও বড় হয়ে কী হবে। একবার সেইটে ঠিক করে নিয়ে তখন থেকে সেই সব বই পড়া শুরু করবে, বুঝলে ?

কা'কে বড় হওয়া বলে আর কাকেই বা ছোট হওয়া বলে, তখন তাই-ই জানতো না সন্দীপ। তাই সেদিন কাশীবাবুর কথার কোনও উত্তরই দিতে পারেনি সে। শুধু ফ্যাল্-ফ্যাল্ করে চেয়ে ছিল কাশীবাবুর মুখের দিকে।

ছেলেটার হতবুদ্ধি চেহারা দেখে কাশীবাবুর বোধহয় একটু মায়া হয়েছিল, তাই বললেন—যাক গে, ও-সব নিয়ে তুমি এখন মাথা ঘামিও না। এখন শুধু তুমি পড়ে যাও, কেবল বই পড়ে যাও—

কথাগুলো বলে কাশীবাবু হয়ত চলেই যাচ্ছিলেন, কিন্তু সন্দীপের কথায় আবার দাঁড়িয়ে পড়লেন। সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—আচ্ছা, এই ভৈরবচন্দ্র

চট্টোপাধ্যায় কে ? যাঁর নাম লেখা রয়েছে এই বই-এর মলাটে ?

—ভৈরবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ?

সন্দীপ বললে- হ্যাঁ—

কাশীবাবু বললেন—ভৈরবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় হচ্ছেন আমার ঠাকুরদাদার বাবা। তিনিই এই সব বই পড়তেন, তিনিই এই সব বই কিনেছিলেন। এই এখন আমাদের যে বাড়ি দেখছো, এ সমস্তই তখন থেকে আরম্ভ হয়েছে। তাঁর আগে এ-সব কিছুই ছিল না। তিনি ছোটবেলায় খুব গরীব ছিলেন। তোমরা এখন যেমন গরীব, আমার ঠাকুর্দার বাবাও ঠিক তেমনি গরীব ছিলেন।

—তারপর ? তারপর কী করে বড়লোক হলেন ?

কাশীবাবু বললেন—মনের জোরে—

— মনের জোরে মানে ?

কাশীবাবু বললেন—আসলে সবই হচ্ছে মন। মনের জোরে মানুষ সব কিছু হতে পারে, তুমি যদি মনে করো তুমি খুব বড় উকিল হবে, তাহলে মনের জোরে খুব বড় উকিল হতে পারবে। কিম্বা তুমি যদি মনে করো তুমি খুব বড় ডাক্তার হবে, তাহলে তুমিও মনের জোরে খুব বড় ডাক্তার হতে পারবে।

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—তা ভৈরব চট্টোপাধ্যায় মশাই কী করে বড় হয়েছিলেন ? তিনি তো খুব গরীব ছিলেন বললেন—

কাশীবাবুর বোধহয় তখন বেশি সময় ছিল না হাতে। বললেন—সে অনেক লম্বা গল্প, সে বলতে গেলে অনেক সময় লাগবে। তুমি অন্য একদিন এসো আমার কাছে, আমি বলবোখন তোমাকে সব—

বলে আর তিনি সেখানে দাঁড়ালেন না। ভেতরের দিকে চলে গেলেন।

সন্দীপ তারপর সেখানে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল। দাসু এসে লাইব্রেরী-ঘরের দরজায় যখন তালা-চাবি লাগিয়ে দিলে তখন যেন তার চৈতন্য হলো। তখনও তার মাথার মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে সাধক-কবি রামপ্রসাদের সেই কথাগুলো ;

> মা গো, আমার কপাল দোষী।
> আমি ঐহিক সুখে মত্ত হয়ে
> যেতে নারলাম বারাণসী
> নইলে অন্নপূর্ণা মা থাকিতে
> মোর ভাগ্যেতে একাদশী—

মল্লিক-মশাই জিজ্ঞেস করলেন—কী হলো সন্দীপ, তুমি ঘুমিয়ে পড়লে নাকি ?

সন্দীপ বললে—না, আমি ঘুমোই নি কাকা, আমি ভাবছি—

—কী ভাবছো ?

সন্দীপ বললে—বেড়াপোতার কথা মনে পড়ছে—

মল্লিক-মশাই বললেন—মা'র জন্য মন কেমন করছে বুঝি ? অত ভেবো না, ভেবে তো কিছু করতে পারবে না তুমি, সারা দিন ধকল গেছে তোমার, এখন ঘুমিয়ে পড়ো—

সন্দীপ বললে—তারপর ? তারপর কী হলো কাকা ?

—কীসের তারপর ?

—ওই যে বললেন মনসাতলা লেন থেকে আপনি বিশাখা আর তার মা'কে এই বিডন স্ট্রীটের বাড়িতে নিয়ে আসতে গিয়েছিলেন। সেই রাজবালা দেবী মেয়েকে নিয়ে এসেছিল শেষ পর্যন্ত ?

মল্লিক-মশাই বললেন- বিশাখার মা'র নাম তো রাজবালা দেবী নয়। তাঁর ঠাকুমা ওই নাম রেখেছিলেন, কিন্তু বাবা নাম রেখেছিলেন যোগমায়া।

—আপনার খেরো খাতায় তো রাজবালাই লেখা আছে।

মল্লিক-মশাই বলেছিলেন—আমার খেরো-খাতায় ওই রাজবালা নামটাই আছে। খেরো খাতাটা খুললে দেখতে পাবে সেখানে 'রাজবালা' নামটাই লেখা আছে, ও-নামটা আর বদলানো হয়নি—

না, সন্দীপও যখন খেরো খাতায় হিসেব লেখার কাজ করতো তখন ওই রাজবালার নামেই বরাবর মাসিক এক শত টাকা খরচ লিখে এসেছে। শেষকালে সেই একশো টাকার অংকটা বাড়তে-বাড়তে পাঁচশো-ছ'শো টাকা পর্যন্ত উঠেছিল। আর শুধু পাঁচশো-ছ'শো টাকাই নয়। কোনও কোনও মাসে একহাজার, দু'হাজার টাকাতে গিয়েও দাঁড়াতো! তখনকার কথাই আলাদা। তখন ওই যোগমায়া দেবীরই বা কত সুখ। তাঁর আর তাঁর মেয়ের গায়ে মাথার জন্যে দামী-দামী সাবান, মেয়ের চুলে মাথার জন্যে জবাকুসুম তেল। খাওয়ার জন্যে দেরাদুনের সরু চাল। আর কত কী দামী-দামী খাবার! সে-সব খাবার তখন জীবনেও খায়নি সন্দীপ। কিন্তু ঠাকমা-মণির হুকুমে সব কিনে দিতে হতো সন্দীপকে।

ঠাকমা-মণি বলতেন—দেখো, ওদের যেন কোনও কষ্ট না হয়, ওদের যেন কোনও অসুবিধে না হয়।

ঠাকমা-মণি আরো বলতেন—দেখ, টাকার জন্যে ভেবো না, যত টাকা লাগে সব আমি দেব—

মনে আছে একদিন মাসিমা বলেছিল—দেখ বাবা, এত আরামে আমাদের রেখেছেন তোমার ঠাকমা-মণি, কিন্তু আমার জামাইকে তো একবার দেখতে পেলাম না—একদিন আমার জামাই বাবাজীকে এখানে নিয়ে আসতে পারো না ?

তা সন্দীপ শেষ পর্যন্ত একদিন সত্যিই ছোটবাবুকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল মাসিমার কাছে। সে এক বিচিত্র ঘটনা।

কিন্তু থাক এখন সে সব কথা, কারণ সে এর অনেক পরের কথা! মল্লিক-মশাই যেদিন রাজবালা দেবী আর বিশাখাকে নিয়ে বিডন স্ট্রীটের বাড়িতে এলেন তখন বেলা এগারোটা। গাড়িটা গেট দিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকতেই মল্লিক-মশাই নামলেন। তারপরে পেছনের দরজা খুলে ধরে বললেন—আসুন মা, আপনারা নেমে আসুন—

বিশাখা যেন স্বপ্ন দেখছিল। সামনের দিকে আকাশে চোখ উঁচু করলে দেখা যায়—এ কতকালের বাড়ি। এত বড় বাড়ি তো সে খিদিরপুরে দেখেনি। আশেপাশে কতকগুলো লোক ঘোরা-ফেরা করছে। হঠাৎ সানাই বেজে উঠলো মাথার ওপর।

বিশাখা মা'কে জিজ্ঞেস করলে —মা, এখানে সানাই বাজছে কেন ? কারো বিয়ে হচ্ছে নাকি ?

মা বললে—তুই চুপ কর—কথা বলিস নি—

মা বিশাখাকে একটা ফর্সা ফ্রক পরিয়ে দিয়েছে।

মল্লিক-মশাই বললে—এদিকে এসো মা, এদিকে—

কোথা দিয়ে কোথায় মল্লিক-মশাই তাদের নিয়ে গেলেন যোগমায়া তা বুঝতে পারলে না। একটা সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় ওঠা, তারপর দোতলা থেকে আর একটা সিঁড়ি দিয়ে একেবারে তেতলায়। তেতলায় কত লোক-জন, কত মেয়েমানুষ।

একটা জায়গায় এসে মল্লিক-মশাই বললেন—ঠাকমা-মণি ওঁদের এনেছি—

ভেতর থেকে শব্দ এল—ওঁদের ভেতরে নিয়ে আসুন—

ভেতরেই গেল যোগমায়া। পেছন-পেছন বিশাখা। বিশাখা যা কিছু দেখে তাতেই আশ্চর্য হয়ে যায়। ঘরের ভেতরে সবাই একজনের দিকে চেয়ে বসে আছে। একজন গেরুয়া-পরা লোক, তার মাথা ন্যাড়া। মেঝেতে গালচে পাতা। চারদিকে ধুপের গন্ধ।

একজন বুড়ি মতন যোগমায়াকে কাছে ডাকলে—মা, তুমিই কি বিশাখার মা?

মা বুড়িটার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে যাচ্ছিল, কিন্তু বুড়িটা বললে—আগে গুরুদেবকে প্রণাম করো মা, তাহলেই আমাকে প্রণাম করা হয়ে যাবে—

যোগমায়া তাই-ই করলে। এ-বাড়ির গুরুদেব তাকে কী বলে যেন আশীর্বাদ করলেন। বিশাখা মা'র দিকে চেয়ে দেখলে মা তখন কাঁদছে।

ঠাকুমা-মণি বললেন—তুমি কাঁদছো কেন মা? কেঁদো না।

মা আঁচল দিয়ে চোখ মুছলো। বিশাখা সেদিন বুঝতেই পারেনি কেন তার মা অত কেঁদেছিল।

সেই ঠাকমা-মণি আবার জিজ্ঞেস করেছিলেন—তোমার নাম কি রাজুবালা?

মা বললে—রাজুবালা আমার ঠাকুরমার দেওয়া নাম। আমার বাবা আমার নাম রেখেছিল যোগমায়া—

—আর তোমার মেয়ের নাম?

—ওর বাবা নাম রেখেছিল অলকা। কিন্তু আমার দেওর ওর নাম রেখেছেন বিশাখা। কারণ ও যেদিন জন্মেছিল সেই দিন বোশেখ মাসের পূর্ণিমার শেষ—

ঠাকমা-মণি গুরুদেবকে সব বুঝিয়ে বললেন। গুরুদেব তখন বিশাখার জন্ম-কুণ্ডলীটা মন দিয়ে দেখছেন আর মাঝে-মাঝে বিশাখাকে দেখছেন। সে বড় জটিল গণনা। ওই জন্মকুণ্ডলীর ভালো-মন্দের ওপর বিডন স্ট্রীটের মুখার্জি বংশের সমস্ত ভালো-মন্দ নির্ভর করছে। আগে কখনও দেবীপদ মুখার্জি তাঁর ছেলেদের বিয়ের সময় পাত্র-পাত্রীদের জন্মকুণ্ডলী বিচার করে দেখবার কথা একবারও ভাবেন নি। তার যা কুফল হয়েছে তা তিনি না দেখে গেলেও এখন তাঁর বিধবা পত্নী কনকলতা দেবী দেখছেন। বড় শক্তিপদ তার বউ ওই একটা নাবালক ছেলে রেখে মারা গিয়েছে। দ্বিতীয় ছেলে আর তার স্ত্রীরা মারা যায় নি বটে, কিন্তু বাড়ি ছেড়ে আলাদা হয়ে গেছে। তারা এ-বাড়ি ছেড়ে নিজেদের আলাদা বাড়ি করে সেখানেই বসবাস করছে। বাকি রইল একমাত্র ওই বাপ-মা মরা একমাত্র নাবালক নাতি সৌম্য। সৌম্যর ভবিষ্যত নিয়েই কনকলতা দেবীর যত মাথা-ব্যথা। সৌম্য বাঁচবে কিনা, সৌম্যর বউ কেমন হবে, তাই-ই তাঁর একমাত্র চিন্তা। এখন কন্যা

তো পছন্দ হয়েছে, জাত-কুলও মিলে গেছে। কিন্তু জন্মকুণ্ডলী বা যোটক-বিচার ?

গুরুদেব বললেন—এই কন্যা কোথায় থাকেন ?

ঠাকমা-মণি বললেন—খিদিরপুরে, মনসাতলা লেনে। নিজের কাকার কাছে।

—পিতা ?

—পিতা বেঁচে নেই—

—কাকার অবস্থা কেমন ?

ঠাকমা-মণি বললেন—কাকা খুবই গরীব। বিধবা মা এই কন্যাকে নিয়ে দেওরের কাছে গলগ্রহ হয়ে আছে-

গুরুদেব আবার বললেন—কিন্তু কন্যার একাদশে চতুর্থ পতি এবং সপ্তম পতি বৃহস্পতি তুঙ্গী। সুতরাং অর্থ ও বন্ধুভাগ্য ভালো। সেই বৃহস্পতি লগ্নের তৃতীয় স্থান বৃশ্চিকে বন্ধু ক্ষেত্রে দৃষ্টি দিয়ে আত্মীয় কুটুম্বদের সঙ্গে শুভ সম্পর্ক স্থাপন করবে আর মকরে সপ্তম দৃষ্টি দিয়ে সন্তান-সন্ততির শুভ সূচনা করছে আর মীনে নিজের গৃহে নবম দৃষ্টি দিয়ে স্বামীরও শুভ করবে—

বলে আবার একটু থামলেন। তারপর কী ভেবে আবার বললেন—সপ্তম পতি সপ্তমকে দেখছে, এটা খুবই শুভ যোগ—

ঠাকমা-মণি বললেন—আপনি যে বললেন আমার নাতির মধ্য-বয়েসে একটা ফাঁড়া আছে ?

গুরুদেব জিজ্ঞেস করলেন—এখন তোমার নাতির বয়েস কত মা ?

—সৌম্যের বয়েস ? সে তো এখন সবে মাত্র ষোল বছরে পড়লো। এখনও ইস্কুলে পড়ে—

গুরুদেব বললেন—তাহলে তো এখন অনেক দেরী। সে তখন দেখা যাবে। আর এখন থেকে অত পরের কথা ভেবে কী হবে ! তবে একটা কথা বলতে চাই—

—কী কথা বলুন ঠাকুর মশাই ?

কিন্তু তারপর হঠাৎ প্রসঙ্গ বদলে মল্লিক-মশাই-এর দিকে চেয়ে বললেন—সরকার মশাই, আপনি এঁদের দুজনকে দোতলায় নিয়ে গিয়ে খাইয়ে নেবার ব্যবস্থা করুন গে—

খাওয়ার কথা কানে যেতেই যোগমায়া কেমন একটু বিচলিত হয়ে পড়লো। কিছু হয়ত বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু ঠাকমা-মণি তার আগেই বলে উঠলেন—মা তোমরা আমার আত্মীয়ের মতন, কিছু আপত্তি করো না, আমার যা-কিছু আয়োজন হয়েছে সমস্তই এই আমার গুরুদেবের প্রসাদ। প্রসাদ খেতে আপত্তি করা উচিত নয় মা। আর তা ছাড়া আর কিছুদিন পরেই তো তোমাদের সঙ্গে আমাদের নিকট আত্মীয়ের সম্পর্ক গড়ে উঠতে চলেছে—

এর পর আপত্তির আর কোনও কথাই উঠতে পারে না।

মল্লিক-মশাই তখন দু'জনকে নিয়ে আবার দোতলায় নেমে এলেন। দোতলার অংশটা পুরোপুরি খালি পড়েই আছে। আগে তেতলায় ছিল বড় ছেলের ঘর। তারা মারা যাবার পর এখন সৌম্য সেই তেতলার ঘরে থাকে।

আর দোতলায় থাকতো মেজ ছেলে। তারা নিজেদের বাড়িতে চলে যাবার পর থেকে কেউ আর সেখানে থাকে না। তবু ঘর-দোর আসবাবপত্র পরিষ্কার রাখার

জন্যে আছে কালিদাসী। কালিদাসীই দোতলাটার জিম্মেদারি পেয়েছে। গুরুদেব বাড়িতে আসার পর অন্যতলার মত এই দোতলাটাও চুনকাম করা হয়েছে। দোতলার জানলা দরজায়ও নতুন করে রং লাগানো হয়েছে অন্য সব তলার মত।

ঘরে ঢুকেই যোগমায়া দেখলে সেখানে শ্বেতপাথরের মেঝের ওপর রুপোর থালা, বাটি, গেলাস সাজানো। কালিদাসী সমস্ত কিছু নিয়ে তৈরি হয়েই ছিল। যোগমায়া আর বিশাখাকে বললে—আসুন মা, হাত ধুয়ে নিন এখানে—

ঘরের লাগোয়া জলের ব্যবস্থা। সঙ্গে সাবান আর তোয়ালে।

যোগমায়া আর বিশাখা এ সব যত দেখছে ততই অবাক হয়ে যাচ্ছে। বিশাখার বাবার কথা মনে পড়তেই যোগমায়ার চোখ দুটো ছল-ছল করে উঠলো। মানুষটা যদি এই সময়ে বেঁচে থাকতো তো শেষ জীবনে একটা সান্ত্বনা পেয়ে যেত!

এত রকমের খাবার বিশাখা জীবনে দেখেনি। মা'র পাশে বসে বিশাখা তখনও থালার দিকে দেখছে। মা'ও চুপ করে খাবারের সামনে বসে আছে।

মল্লিক-মশাই তখনও সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বললেন—কই আরম্ভ করুন—

বিশাখা মা'র দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলে—এ খাবার সব আমার?

মল্লিক-মশাই বললেন—হ্যাঁ-হ্যাঁ বউমা, এ সবই তোমার। লজ্জা করো না, পেট পুরে সব খেয়ে নেবে। দরকার হলে আরও দেওয়া হবে—বুঝলে? শিগ্‌গির শিগ্‌গির খাও, লুচি ঠাণ্ডা হয়ে যাবে—

বিশাখার মাথার ওপর পাখা ঘুরছিল। একটুকু গরম হচ্ছে না। তাদের মনসাতলা লেনের বাড়িতে আলো আছে, কিন্তু পাখা নেই। একটা পাখা আছে, তাও সেটা কাকার ঘরে। বিশাখা মা'র দিকে চেয়ে বললে—পাখার তলায় বসে খেতে খুব আরাম লাগে, তাই না মা?

যোগমায়া খেতে-খেতে বললে—খাবার সময় অত কথা বলতে নেই, চুপ করে খাও—

বিশাখার বড় ভালো লাগছিল লুচি খেতে। কত দিন যে লুচি খায়নি।

হঠাৎ বলে উঠলো—মা, এই দেখ, ডালের মধ্যে কিশমিশ রয়েছে

যোগমায়া বললে—তা থাক, ও-রকম আদেখলের মত কথা বোল না—

মল্লিক-মশাই-এর কানে কথাগুলো গেল। বললেন—আর একটু ডাল নেবে বউমা?

বিশাখা বললে—ডাল নেব না, শুধু কিশমিশ নেব—

যোগমায়া বললে—ছিঃ, তুমি আবার চেয়ে-চেয়ে খাচ্ছো? লজ্জা করে না চেয়ে খেতে? আমি তোমাকে বলিনি যে চেয়ে খেতে নেই?

মল্লিক-মশাই কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে ঠাকুরকে ডালের কিশমিশ এনে দিতে বলেছেন। ঠাকুর তখুনি একটা হাতায় করে একগাদা কিশমিশ বিশাখার থালায় এনে দিল।

বিশাখা খেতে লাগলো। এমন ভাবে খেতে লাগলো যেন কতকাল খায়নি সে।

পাশ থেকে মা কানের কাছে চুপি-চুপি সাবধান করে দিলে। বললে—ও কি অসভ্যের মত খাচ্ছো? আস্তে-আস্তে খেতে পারো না?

আস্তে আস্তে কথাগুলো বললেও কথাটা মল্লিক-মশাই এর কানে গেল। বললেন—ওকে অত বকছো কেন মা? বউমা এখনও ছেলেমানুষ তো, ও যেমন

করে পারুক থাক। এখানে তো বাইরের কোন লোক নেই—আমরা তো সবাই বাড়িরই লোক। আর দু'দিন পরে তো ও আমাদের একেবারে ঘরের বউই হয়ে যাবে—

তারপর একটু থেমে আবার বললেন— আর দু'টো লুচি দেবে মা?

তার উত্তরে বিশাখা বললে—মাছ নেই?

যোগমায়ার বড় লজ্জা করতে লাগলো। এমন মেয়েকে নিয়ে কোনও বাড়িতে খেতে যাওয়াও তো বিপদ দেখছি।

কিন্তু যোগমায়া কিছু বলবার আগেই মল্লিক-মশাই বললেন—না মা, এ তো গুরুদেবের প্রসাদ। তিনি খেয়ে প্রসাদ করে দিয়েছেন, আজকে এ-বাড়িতে সবাই-ই এই প্রসাদই খাবে। আজ ক'দিন ধরে আমরা সবাই নিরিমিষ খাবো—

তারপর একটু পরে আবার বললেন—এবার তাহলে দইটা আনতে বলি—

বিশাখা বললে—দই? দই আছে? মিষ্টি দই?

মল্লিক-মশাই হাসলেন। বললেন—হ্যাঁ, মিষ্টি দই—

বিশাখা বললে—আমি মিষ্টি দই খেতে বড্ড ভালোবাসি—

মল্লিক-মশাই বললেন—আচ্ছা, ঠিক আছে। আমি তোমাকে দু'বাটি মিষ্টি দই দেব যত মিষ্টি দই খেতে পারবে তুমি, তত মিষ্টি দই দেব—

দু'বাটি ভর্তি করে মিষ্টি দই এনে দিলে ঠাকুর।

বিশাখা বাটিতে হাত ডুবিয়ে দই খেতে লাগলো।

তারপরে এল সন্দেশ। সন্দেশের চেহারা দেখে বিশাখা অবাক হয়ে গেল। বললে—কত বড় সন্দেশ দেখ মা, আমাদের খিদিরপুরের সন্দেশ কত ছোট বলো তো?

যোগমায়া মেয়ের কাণ্ড দেখে লজ্জায় আধমরা হয়ে যাচ্ছিল।

বিশাখা বললে—দই দিয়ে সন্দেশ খেতে আমি বড্ড ভালোবাসি—

মল্লিক-মশাই এবার আর অনুমতি না নিয়েই দু'টো সন্দেশ ফেলে দিলেন। বললেন—খাও, যত সন্দেশ তুমি খেতে পারবে খাও—

বিশাখা বললে—তা হলে কিন্তু আরো দই দিতে হবে—

—তা দেব—

বলে মল্লিক-মশাই ঠাকুরকে আরো এক বাটি দই দিতে বললেন।

বিশাখা মা'র দিকে চেয়ে বললে—তুমি আর একটু দই নাওনা মা—

—তুই থাম্, বক্‌বক্ করিসনি তো...তোর জ্বালায় অস্থির হয়ে গেলুম—

এর পর একে একে এল রাজভোগ, পানতুয়া, মিহিদানা। আর শেষে রাবড়ি—

যোগমায়া বলে উঠলো—এত দিচ্ছেন কেন?

মল্লিক-মশাই বললেন—খাও না মা। এতে কিছু খারাপ হবে না, এ ঠাকমা-মণির গুরুদেবের প্রসাদ।

বিশাখা বললে—মা না খাক, আমাকে দিন—

যোগমায়া আর থাকতে পারলে না। বলে উঠলো—এ তোর কী কাণ্ড বল্ দিকিনি, তোর কি লজ্জা-সরমেরও বালাই নেইরে? তুই কি আমাকে বে-ইজ্জৎ না করে ছাড়বি না? তোর পেটে কি রাক্ষস ঢুকেছে?

মা'র বকুনি খেয়ে বিশাখার যেন হুঁশ হলো। মুখ কাঁচুমাচু করে মল্লিক-মশাই এর দিকে চাইলে।

মল্লিক-মশাই বললেন—আর কিছু নেবে তুমি বউমা ? লজ্জা করো না। যা খেতে ইচ্ছে করছে মুখ ফুটে বলো—আমি সব দেব—

—আমাকে আর একটু মিষ্টি দই···

কিন্তু কথা তার শেষ হওয়ার আগেই যোগমায়া বাঁ হাত দিয়ে মেয়ের মাথার চুল ধরে টেনে হিঁচড়ে মাটিতে শুইয়ে ফেলে দিতে যাচ্ছিল। কিন্তু মল্লিক-মশাই যোগমায়ার হাতটা ঠিক সময়েই ধরে ফেলেছেন।

বললেন—ছিঃ মা, ওকে এত মারছো কেন মিছিমিছি ? বউমার বয়েস যখন তোমার মত হবে, তখন দেখবে তোমার মত মুখ দিয়ে আর একটা কথাও বেরোবে না—এতটুকু মেয়ে ও সংসারের আর কতটুকু বোঝে ?

যোগমায়া বললে—না, আপনি জানেন না, তাই বলছেন। দেওরের বাড়িতে কোনও রকমে মুখ বুঁজে বেঁচে আছি। বাড়িতে যে-গঞ্জনা আমাকে সইতে হয় তা শুধু আমিই জানি, আর ভগবান জানেন। কিন্তু তার ওপর বাড়ির বাইরে এসেও যদি ওর জন্যে আমার মাথা হেঁট হয়ে যায়, তাহলে আমি কী করে বাঁচি বলুন ?

তখন বিশাখা আপন মনে কাঁদছে। সে বুঝতেও পারেনি যে কী জন্যে তার ওই শাস্তি! কী এমন অপরাধ সে করেছে যার জন্যে মা তাকে শাস্তিটা দিলে।
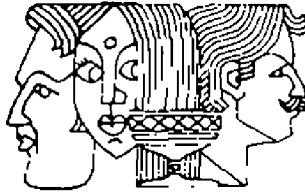
ওদিকে তেতলার ঘরে গুরুদেব তখনও পাত্রীর জন্ম-কুণ্ডলী বিচার করে চলেছেন। গুরুদেব ভাবী পাত্রীর জন্ম-কুণ্ডলী দেখতে দেখতে বললেন—কন্যা পিতৃহন্ত্রী—

ঠাকমা-মণি বললেন—ভালো করে কোষ্ঠিটা দেখুন বাবা। আমি এই কন্যার সঙ্গেই আমার নাতি সৌম্যের বিয়ে দিতে চাই—

গুরুদেব বললেন—তাহলে শ্রীমানের জন্ম-পত্রিকাটাও বিচার করি। অর্থাৎ যোটক-বিচার···

ঠাকমা-মণি আবার জিজ্ঞেস করলেন—যোটক-বিচারে কী দেখলেন ঠাকুর-মশাই ?

গুরুদেব প্রথমে লগ্নপতির অবস্থান দেখলেন, তারপর দেখলেন অষ্টম-পতির অবস্থান এবং অষ্টম ভাব। খুব কঠিন বিচার। তারপর সপ্তমভাব এবং সপ্তম-পতি। জাতক-জাতিকার পঞ্চম ভাবও দেখা দরকার। কারণ দম্পতির সন্তান-সন্ততির ভালো মন্দ সবই নির্ভর করে পঞ্চমপতি আর পঞ্চম ভাবের ওপর। আর শুধু তো সন্তান-সন্ততি দেখলেই চলবে না, মাতা-গৃহ-বন্ধু-সুখ বিচার করতে গেলে জাতক-জাতিকার চতুর্থ-স্থানের বলাবলও দেখতে হয়। তারপর দ্বিতীয়-পতি একদিকে যেমন ধনপতি, তেমনি আবার নিধন-পতিও বটে।

বললেন—একদিনে শেষ বিচার হবে না মা, আরো দু'তিন দিন লাগবে। বড় জটিল কোষ্ঠি—

ঠাকমা-মণি জিজ্ঞেস করলেন—কার কোষ্ঠি জটিল ঠাকুর-মশাই ? পাত্রের না পাত্রীর ?

গুরুদেব বললেন—বিংশোত্তরী মতে জাতক-জাতিকা দু'জনের কুণ্ডলীরই রাজ-যোটক ফলাদেশ রয়েছে। কিন্তু অষ্টোত্তরী মতেও তো বিচার করতে হবে! অষ্টোত্তরী মতে জাতকের মধ্য বয়সে রিষ্টির লক্ষণ আছে—

—তার মানে? প্রাণ সংশয় আছে নাকি আমার নাতির?

গুরুদেব বললেন—আজ থাক, পরে বিশ্রাম নিয়ে সবিস্তারে ভেবে বলতে হবে। আর দু'তিন দিন সময় লাগবে—

—তা সময় লাগুক, কিন্তু দেখবেন যদি কোনও বাধক কোথাও থাকে তো তার প্রতিকারও আপনাকে করতে হবে—

শেষকালে সেই কুণ্ডলী দু'টোর বিচার শেষ করলেন গুরুদেব। তিনি যথারীতি মোটা রকমের প্রণামী এবং দক্ষিণা নিলেন। তারপর মল্লিক-মশাই আবার গুরুদেবকে নিয়ে বারাণসী পৌঁছিয়ে দিয়ে ফিরে এলেন।

যাবার সময় গুরুদেব বললেন—কিছু ভাবিস নি মা, আমি আশ্রমে গিয়ে তোর নাতির কল্যাণের জন্যে হোম-যজ্ঞ করবো—সব ঠিক হয়ে যাবে!
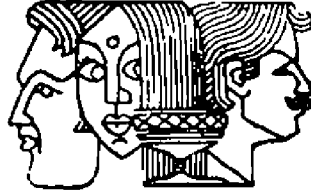
সন্দীপ তখনও একমনে পুরনো দিনের কথা ভাবছিল। জিজ্ঞেস করলে—তারপর?

বিডন স্ট্রীটের মুখার্জি-বাড়ির বাবুরা বলতে গেলে একেবারে প্রথম যুগের লোক। এই মুখার্জি-বাড়ি ধনে-জনে পরিপূর্ণ হওয়ার কিছু কাল পর থেকেই মল্লিক-মশাই এ-বাড়িতে আছেন। দেবীপদ মুখার্জি'র পত্তনটা দেখেন নি। যখন এ-বাড়ির প্রতিষ্ঠা হলো, তখনকার কালও দেখেন নি। যখন এ-বাড়িতে সিংহ-বাহিনীর মূর্তি স্থাপিত হলো তখনও তিনি এ-বাড়িতে আসেন নি। বেড়াপোতায় যে-বছরে খুব বন্যা হলো, ক্ষেত-খামার বাড়ি-বসতি-ইস্কুল-কলেজ সব জলে ডুবে গেল, তখন যে যেদিকে পারলে পালিয়ে প্রাণ বাঁচাতে লাগলো। চাটুজ্জে-বাড়ির লোকেরা পয়সাওয়ালা লোক। বেড়াপোতার বাইরেও তাদের বাড়ি-ঘর আছে। তারা সেখানে গিয়ে জীবন-সম্পত্তি বাঁচালো। কিন্তু যাদের কোথাও মরবার জায়গাও নেই, তারা কোথায় যাবে? তাদের মধ্যে কেউ গেল আসামে চা বাগানে কুলির কাজ করতে, কেউ গেল ঝরিয়ায় কয়লার খনিতে কাজ করতে, আবার কেউ-কেউ বা কলকাতার পথে-পথে ভিক্ষে করতে গেল। আর সে এমন এক সময় যখন কে যে কোথায় গেল তার হিসেবও কেউ রাখতে পারলে না। সেই সঙ্গে কত লোক যে মারা গেল তার সহজ হিসেব রাখার লোকও কোথাও পাওয়া গেল না। সেই সময়ে মল্লিক-মশাই কেমন করে এসে ঢুকে পড়লেন এই বাড়িতে। প্রথমে অল্প মাইনে। কিন্তু তাতে আপত্তি করেন নি।

দেবীপদ মুখার্জি বললেন—কত টাকা মাইনে হলে আপনার চলে?

সেদিন মল্লিক-মশাই মুখার্জি সাহেবের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছিলেন। মাইনের কথা তখন তাঁর মনেও আসেনি। তখন মাথার ওপর একটা ছাদ, আর

দু'বেলা দুটি খাওয়া। এইটুকু পেলেই তিনি তখন খুশী, এমনই তখন তাঁর অবস্থা।

তিনি বলেছিলেন—একটু থাকার আর খাওয়ার বন্দোবস্ত হলেই আমি খুশী হবো, আর কিছু আমি চাই না—

তখন দেবীপদ মুখার্জির সৌভাগ্য-সূর্য জীবনের মধ্য গগনে। ব্যবসা, সুনাম, অর্থ-সামর্থ, স্বাস্থ্য, সব দিক দিয়েই তিনি কলকাতার বাঙালী সমাজে সর্বাগ্রগণ্য। তাঁর কাছে সবাই একটু কৃপা-দৃষ্টি পেলেই ধন্য হয়ে যেত। সেই তাঁর মত লোকের কাছে আশ্রয় পাওয়া নেহাৎই দৈব ছাড়া আর কী বলা যায়?

সুতরাং এই বাড়িতেই তিনি রয়ে গেলেন। প্রথমে গৃহিণীর ফাই-ফরমাজ খাটা আর দরকার হলে মাঝে-মাঝে বাজারে যাওয়া রান্না-বাড়ির দৈনন্দিন কেনা-কাটা করতে। তিনি বাজার করা আরম্ভ করতেই বাজার-খরচ কমতে লাগলো। গৃহিণী বুঝলেন ছেলেটি সৎ। সুতরাং তখন থেকেই কর্তা-গিন্নী সকলেরই মল্লিক-মশাই-এর ওপর আস্থা বাড়তে লাগল। ক্রমে-ক্রমে তিনিই একদিন এই মুখার্জি-বাড়ির সরকারের পদটি পেয়ে গেলেন। আর তখন থেকেই পরিবারের আয়-ব্যয়ের সমস্ত দায়িত্ব পড়লো তাঁরই ওপর।

তারপর কত কাণ্ড ঘটে গেছে এই পরিবারের ইতিহাসে। কত বিপদ, কত দুঃখ, কত শোক, কত দুর্ভাগ্যের ইতিহাস সে-সব। দেবীপদ মুখার্জি মারা গেছেন, তারপর মারা গেছেন বড় ছেলে শক্তিপদ, কিছুদিন পরে মারা গেছেন তার স্ত্রী-ও। এর পর মেজ ছেলে মুক্তিপদও সপরিবারে এ-বাড়ি ছেড়ে নিজের তৈরি বাড়িতে গিয়ে উঠেছে। অর্থাৎ এ-বাড়ির সব সম্পর্ক ছিন্ন করে আলাদা হয়ে গেছে। যে-সংসার একদিন ঠাকমা-মণি নিজের তিল-তিল রক্ত দিয়ে গড়ে তুলেছিলেন, সেই সংসার তিনি বেঁচে থাকতেই তাঁরই চোখের সামনে ভেঙে যেতে দেখেছেন তিনি। কিন্তু তবু তিনি নিজে ভেঙে পড়েন নি। তাঁর কেউ নেই, তিনি আজ একলা। তবু তাঁর সঙ্গে আছেন একমাত্র সাহায্যকারী এই মল্লিক-মশাই।

তাই যখনই কথা উঠতো তখনই তিনি মল্লিক-মশাইকে বলতেন—আমার আর বাঁচতে ইচ্ছে করে না সরকার মশাই। একটা কাজই শুধু আমার বাকি আছে, সেই কাজটা শেষ করতে পারলেই আমার ছুটি—

মল্লিক-মশাই জিজ্ঞেস করতেন—কী কাজ ঠাকমা-মণি?

—আমার ওই সৌম্যর বিয়ে। সৌম্যর একটা ভালো বিয়ে দিতে পারলেই আমার ছুটি সরকার-মশাই, তার পর যেন গুরুদেবের নাম স্মরণ করে সংসার থেকে হাসি-মুখে চলে যেতে পারি—

আশ্চর্য! ঠাকমা-মণি কি তখন একবার ঘুণাক্ষরেও জানতেন যে ওই সৌম্যর বিয়েটাই তার জীবনে একটা চরম বিপর্যয় হয়ে দেখা দেবে! সৌম্যর বিয়ের আগে তিনি কল্পনাও করতে পারেন নি যে আরো কত বিপদ তাঁর জন্যে অপেক্ষা করে আছে। সত্যিই পৃথিবীর বিয়ের ইতিহাসে সেই বিয়ে নিয়ে যে-দুর্ঘটনাটা ঘটলো তা বোধহয় আর কখনও আর কারও বিয়েতে কোথাও ঘটেনি।

কিন্তু সে-কথা এখন থাক।

তার আগে গুরুদেবের বিদায়ের দিনের ঘটনাগুলো বলা দরকার। ঠাকমা-মণি

যথারীতি সেদিনও গঙ্গাজল দিয়ে গুরুদেবের পা দুটো ধুয়ে মাথার চুল দিয়ে মুছে দিলেন। গুরুদেব সেদিনও যথারীতি বিশাখার কুণ্ডলীটা নিয়ে বসেছিলেন। কুণ্ডলীটা দেখতে-দেখতে বলেছিলেন—একটা কথা বলতে চাই বেটি—

—কী কথা, বলুন ঠাকুর-মশাই ?

—তোমার ওই ভাবী নাত-বউ-এর বিশাখা নামটা বদলাতে হবে—

—তার বদলে কী নাম দেব বলুন ?

গুরুদেব বললেন—স্বরবর্ণের প্রথম অক্ষর 'অ' দিয়ে নামকরণ করলে ভালো হয়—

ঠাকমা-মণি বললেন—তা 'অ' দিয়ে আপনিই একটা নামকরণ করে দিন না—

গুরুদেব বললেন—তাহলে 'বিশাখা'র বদলে 'অলকা' নাম দাওনা মা—

তা সেই নামই রাখবে সিদ্ধান্ত হলো। তখন থেকে 'বিশাখা' নামটা বদলে হলো 'অলকা'।

মনে আছে সেদিন মল্লিক-মশাই যখন রাজবালা দেবীকে আর বিশাখাকে বাড়িতে পৌঁছিয়ে দেবার জন্যে দোতলায় গেলেন দেখলেন বিশাখা কাঁদছে—

মল্লিক-মশাই জিজ্ঞেস করলেন—এ কি, বিশাখা কাঁদছে কেন মা ? কী হলো ওর ?

যোগমায়া বললেন- মুখপুড়ীর ওই দশা। আমাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে না খেয়ে ও মেয়ে ছাড়বে না। সারা জীবন আমাকে জ্বালিয়েছে, আবার এখনও জ্বালাচ্ছে—

মল্লিক-মশাই বিশাখার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন—কী হয়েছে বলো তো মা, আমাকে বলো না তুমি কী চাও ?

বিশাখা তখনও কাঁদছে। যোগমায়া বললেন—ও বলছে ও বিয়ে করবে না।

মল্লিক-মশাই বললেন—তা কে তোমায় বলছে বিয়ে করতে ? এখন তো বিয়েটা হচ্ছে না ! তুমি যখন বড় হবে তখন তোমার বিয়ে হবে। সে তো অনেক বছর পরে। এখন ও নিয়ে ভাবছো কেন ? চলো, এবার তোমাদের বাড়িতে পৌঁছিয়ে দিয়ে আসি—গাড়ি তৈরি—

বিশাখা কাঁদতে-কাঁদতেই বললে—আমি মাকে ছেড়ে কোথাও যাবো না—

যোগমায়া মেয়েকে আবার বলতে লাগলেন—মুখপুড়ী, আমি কি তোর সঙ্গে তোর শ্বশুর বাড়িতে যাবো বলতে চাস্ ? কারো মা কখনও মেয়ের সঙ্গে তার শ্বশুর-বাড়িতে যায় ?

বিশাখা বললে—না, আমি চিরকাল তোমার কাছে থাকবো মা, তোমাকে ছেড়ে আমি কোথাও যাবো না—

যোগমায়া রেগে গেলেন। বললেন—বুড়ী ধুমসি মেয়ে হতে চলেছে, এখনও ন্যাকামি গেল না, এই ন্যাকামি দেখলে আমার গা জ্বলে যায়—

মল্লিক-মশাই আর কথা বাড়াতে দিলেন না। বললেন— চলুন-চলুন, আপনাদের দেরি হয়ে যাচ্ছে, শিগ্গির-শিগ্গির আপনাদের বাড়ি পৌঁছিয়ে দিই —চলো মা - চলো—

এর পর সবাই উঠলো। দোতলা থেকে একতলায় নেমে ডান দিকে সিংহবাহিনী দেবীর মন্দির। তার সামনে উঠোন। উঠোনের সামনে বার-বাড়ির দরজা। সেখানে গাড়ি নিয়ে ড্রাইভার অপেক্ষা করছিল—

মল্লিক-মশাই দরজা খুলে দু'জনকে গাড়ির পেছনের সীট-এ বসিয়ে দিয়ে নিজে সামনে গিয়ে ড্রাইভারের পাশে বসলেন। তারপর গাড়ি চলতে লাগলো। ড্রাইভার জানে কোথায় কোন্ অঞ্চলে এদের নিয়ে যেতে হবে। সে গাড়ির ইঞ্জিনে 'স্টার্ট' দিয়ে বড় রাস্তায় গিয়ে পড়লো। আর তার পরে একেবারে সোজা খিদিরপুর বরাবর। গাড়ি চলতেই যোগমায়া নিজের কৌতূহল আর চাপতে পারলেন না। জিজ্ঞেস করলেন—মল্লিক-মশাই বিশাখার কোষ্ঠি দেখে গুরুদেব কী বললেন ?

মল্লিক-মশাই পেছন দিকে মুখ ফেরালেন। বললেন—গুরুদেব ? গুরুদেব তো আপনার মেয়ের কুষ্ঠি দেখে খুব ভালো বললেন।

—খুব ভালো না ছাই। আর কুষ্ঠি যদি ভালোই হবে তো এ মেয়ে জন্মেই বাপকে খেলে কেন ? এর জন্মের পর থেকেই তো আমার কপাল ভাঙলো। আর এই মেয়ের জন্যেই তো আমি দেওরের বাড়িতে ঝি-গিরি করছি—

মল্লিক-মশাই বললেন—তা হোক। কিন্তু আপনার মেয়ের স্বামী-ভাগ্য খুব ভালো—

—কিসে স্বামী ভাগ্য ভালো হলো ?

মল্লিক-মশাই বললেন- কিসে স্বামী ভাগ্য ভালো হলো আমি কী করে জানবো মা ? আমি তো কুণ্ডলী বিচার করতে জানি না। গুরুদেব আমার সামনে যা বললেন, আমি তাই-ই আপনাকে বললুম—

তারপর একটু থেমে আবার বললেন—আর তা ছাড়া আপনি তো নিজের চোখেই দেখলেন আপনার জামাই-এর কত বড় বাড়ি। কত ঠাকুর, কত চাকর, কত ঝি, কত বড় পুজোর দালান। আর বংশের কথা যদি বলেন তো এত বড় ডাক সাইটে বংশ কলকাতায় আর ক'টা আছে, তাই বলুন ? এই সব সম্পত্তির মালিক তো একদিন আপনার মেয়েই হবে ! সেই তখনকার কথা একবার ভাবুন তো ! আপনার মেয়ের ওপরেই বা ঠাকমা-মণির নজর পড়বে কেন ! আর আপনিই বা ঠিক সেই দিনই ঠিক ওই একই ঘাটে একই সময়ে মেয়েকে নিয়ে চান করতেই বা যাবেন কেন ? কলকাতায় কি গঙ্গার আর কোনও ঘাট ছিল না ? বলুন ?

যোগমায়া বললেন—কী জানি কী হবে।

মল্লিক-মশাই বললেন—এত ভাববেন না, যা হবে তা ভালোই হবে ! ভগবানের ওপর ভরসা রাখুন ! তিনি মঙ্গলময়, তিনি যা করেন মঙ্গলের জন্যেই করেন।

হঠাৎ বিশাখা কেঁদে উঠলো। বললে—আমি বিয়ে করবো না মা—

যোগমায়া রেগে উঠে বললেন—তুই চুপ কর তো মুখপুড়ী ! আর মড়া-কান্না কাঁদতে হবে না—

তারপর মল্লিক-মশাই বললেন—তা মেয়ে দেখে আপনার ঠাকমা-মণির পছন্দ হয়েছে তো ?

মল্লিক-মশাই বললেন—আমার ঠাকমা-মণির তো আগেই পছন্দ হয়েছিল। তাই তো আপনাদের খিদিরপুরের মনসাতলা লেনের বাড়িতে আমাকে পাঠিয়েছিলেন পাত্রীর জন্ম-তারিখ, সাল, সব কিছু জানতে। সেই জন্যেই তো কত হাজার টাকা খরচ করে কাশী থেকে গুরু মহারাজকে নিজের বাড়িতে আনিয়েছেন।

যোগমায়া আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার জিজ্ঞেস করলেন—তা কবে বিয়ে হবে ?

মল্লিক-মশাই বললেন—সে এখন অনেক দেরি আছে। এখন ঠাকমা-মণির নাতিও তো ছোট। তার বিয়ের বয়েস আগে হোক, তবে তো! তারপরে পারৈতৃক কার-বারে ঢুকবে। আর ততদিন আপনার মেয়েকেও মুখুজ্জে বাড়ির উপযুক্ত করে লেখা পড়া শিখিয়ে তৈরি করিয়ে নেবেন ঠাকমা-মণি—

যোগমায়া বললেন—লেখা পড়া আর কে শেখাবে ? লেখা পড়া শেখাতে কি কম খরচ আজকাল ? আমার দেওর তাতে রাজি হবে না—

মল্লিক-মশাই বললেন—আপনার দেওর রাজি না হলেই বা, তাঁর তো নিজের পকেট থেকে টাকা খরচ করতে হচ্ছে না। আপনার মেয়ের খাওয়ানো-দাওয়ানো লেখাপড়া শেখানো থেকে শুরু করে ফ্রক-জুতো-মোজা-শাড়ি-ব্লাউজের জন্যে যা-কিছু খরচা হবে সব খরচা দেবেন আমার ঠাকমা-মণি। মুখুজ্জে বাড়ির নাত-বউ যেন ঠিক মুখুজ্জে-বাড়ির যোগ্য হয়, বুঝলেন না ? লোকে যেন বউ দেখে বলতে না পারে যে একটা হা-ঘরের মেয়েকে বাড়ির বউ করে এনেছেন ঠাকমা-মণি। তাঁরও তো একটা ইজ্জৎ আছে! বিয়ের সময় কলকাতার আরো পনেরো-বিশটা বাড়ির বড়লোকেরা তো আসবে। তাদের কাছে যেন তাঁর মাথা হেঁট না হয় তাও তো তাঁকে দেখতে হবে। বিশাখা যদি চায় তো মাস্টার রেখে তাকে গানও শেখাবো।

যোগমায়া মুগ্ধ হয়ে সব কথা শুনছিলেন।

বললেন—তাই নাকি ? আমার মেয়ে গান শিখবে ?

মল্লিক-মশাই বললেন—তাতে আপনার কিসের আপত্তি ? তার জন্যে আপনাকে তো টাকা খরচ করতে হচ্ছে না! ঠাকমা-মণি টাকা দেবেন! ঠাকমা-মণির কি টাকার অভাব ? ঠাকমা-মণি তো মুখার্জি-স্যাকসবি কোম্পানির একজন ডিরেক্টারও। আপনি মুখার্জি-স্যাকসবি কোম্পানির নাম শোনেন নি ?

যোগমায়া বললেন—না--

—ওমা তাহলে আর বলছি কী ? সাবালক হলে আপনার জামাইও তো একজন ডিরেক্টর হবে। আপনার জামাইকেও কারবারের ব্যাপারে কত দেশ-বিদেশে যেতে হবে। সঙ্গে আপনার মেয়েও যাবে—

—আমার মেয়েও যাবে ?

মল্লিক মশাই বললেন—তা যাবে না ? মেজবাবু তো তাঁর বউকে নিয়ে কত জায়গায় যান।

—কোথায়-কোথায় যাবে আমার মেয়ে ?

মল্লিক মশাই বললেন—লণ্ডন, প্যারিস, বার্লিন, সুইজারল্যাণ্ড ও টোকিও সব জায়গায় আপনার জামাই-এর সঙ্গে আপনার মেয়েও যাবে।

—জাহাজে করে যাবে ?

মল্লিক মশাই বললেন—জাহাজে করে কেন ? উড়ো জাহাজে যাবে। মানে এরোপ্লেনে চড়ে যাবে। আজকাল জাহাজে করে বিদেশে যাওয়া তো উঠে গেছে। সে সব আপনি এখন ভাববেন না মা! আগে বিয়ে হোক, তখন সে সব ভাববেন আপনি—

হঠাৎ বিশাখা আবার কেঁদে উঠলো। বললে, আমি বিয়ে করবো না মা, আমি তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাবো না—

যোগমায়া আবার ধমকে উঠলেন—থাম মুখপুড়ি, থাম তুই। আমি কোথায় তোর ভালোর জন্যে ভেবে ভেবে মরছি, আর···

ঠিক সেই সময়ে গাড়িটা এসে খিদিরপুরের সাত নম্বর মনসাতলা লেনের বাড়ির সামনে থেমে গেল। তখন গাড়িটা তার গন্তব্য স্থানে এসে পেঁছেছে।

সন্দীপ একমনে গল্পটা শুনছিল। জিজ্ঞেস করলে—তারপর ?

কিন্তু তার পরেরও তো তারপর আছে। সন্দীপের কলকাতায় আসার আগেকার কথা শুনতে খুব ভালো লাগতো। আগেকার কথা মানেই তো ইতিহাস। বেড়াপোতার চাটুজ্জে বাবুদের বাড়ির লাইব্রেরীতে বসে সন্দীপ সেই ইতিহাসের বইগুলোই বেশি পড়তো।

কিন্তু কেন ও-সব বই তার ভালো লাগতো ?

এই 'কেন'র উত্তর সে নিজেই জানতো না। স্কুলের অন্য ছেলেরা যখন পাঁচকড়ি দে'র লেখা 'নীলবসনা সুন্দরী' আর 'হত্যাকারী কে' পড়তো তখন সে-ভিনসেন্ট্ স্মিথের বই পড়তো, এড্ওয়ার্ড গীবনের বই পড়তো, কটন সাহেবের বই পড়তো, টড্ সাহেবের রাজস্থানের বই পড়তো! তখন তার মনে হতো যেন সে সমস্ত পৃথিবীটাকে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে। তার যে কেন এ-সব পড়তে ভালো লাগতো, তা সে নিজেও বুঝতে পারতো না। কী করে আর কীসের জন্যে একটা জাতের উত্থান হয়, আর কী জন্যেই বা একটা দেশের পতন হয়, তা জানতে পেরে তার যেন রোমাঞ্চ হতো! আর চাটার্জিবাবুরা কেন এত বড়লোক আর সন্দীপরাই বা কেন এত গরীব তা জানতে পেরেও তার ভাল লাগতো। ইতিহাসের পতন-অভ্যুদয়ের এই কাহিনী তার বুকে যেন ঝড়ের মত উত্তাল দোলা দিয়ে যেত!

তা এর পরের বার সন্দীপকেই টাকা নিয়ে যেতে হলো খিদিরপুরের মনসাতলার বাড়িতে। একশো পঁচিশটা টাকা! দশখানা দশ টাকার আর পাঁচটা পাঁচ টাকার নোট। মল্লিকমশাই ভালো করে কাপড়ে কোঁচার খুঁটে বেঁধে দিতেন। বলতেন—খুব সাবধানে যাবে বাবা, এতগুলো টাকা সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছো, যেন হারিয়ে না যায়, দেখো!

সন্দীপ বলতো—না, হারাবে না কাকাবাবু—

মল্লিক-মশাই বলতেন—কলকাতা তোমার বেড়াপোতা নয়, এখানে পথে ঘাটে চোর-জোচ্চোর আর গুণ্ডা বদমাইশদের আড্ডা। এখানকার মানুষ বড্ড খারাপ তা জানো? এখানে কেউ কারো ভালো দেখতে পারে না। যাও—দুর্গা শ্রীহরি—

তখন কলকাতায় ওই একজন মাত্র মানুষই তার হিতৈষী আর শুভাকাঙ্ক্ষী। মল্লিক-মশাই ছাড়া সন্দীপ আর কাউকেই ভালো করে চিনতো না। সে-ও মল্লিক-মশাই-এর অনুকরণে নিঃশব্দে 'দুর্গা-শ্রীহরি' কথাটা উচ্চারণ করলে। যেন 'দুর্গা-শ্রীহরি' কথাটা উচ্চারণ না করলে তার যাত্রা অশুভ হয়ে যাবে।

এখন কথাটা ভাবলে তার হাসি পায়। এই এতদিন পরে সন্দীপ বুঝতে পেরেছে যে সেই দিনের মত অমন অশুভ বোধহয় তার জীবনে আর কখনও হয়নি।

বাড়ি থেকে আগের মাসের মত ধর্মতলায় বাস বদলাতে হলো। কিন্তু এবার আর কেউই তাকে ধাক্কা দিয়ে রাস্তায় ফেলে দিয়ে মাড়িয়ে দিলে না। সে সহজেই বাসে উঠে পড়তে লাগলো। আর বাসটা যখন খিদিরপুরে গিয়ে যাত্রার শেষ বিন্দুতে পৌঁছলো, তখন সে আস্তে-আস্তে বাস থেকে রাস্তায় নামলো। এখানে এসে পৌঁছে বাস আর সামনে এগোবে না। এখানেই তার যাত্রা শেষ। তারপর সেই সাত নম্বর মনসাতলা লেনের বাড়ি। বাড়িটার সামনে যেতেই সন্দীপ দেখলে সেই মেয়েটা দাঁড়িয়ে আছে—সেই বিশাখা।

বিশাখা সন্দীপকে ঠিক চিনতে পারলে। সন্দীপকে দেখে হেসে ফেললে।

সন্দীপ বললে—হাসছো কেন? তুমি আমায় চিনতে পেরেছ বুঝি?

বিশাখা বললে—চিনতে পারবো না? তুমি তো গেল মাসে সেই বুড়োটার সঙ্গে এসেছিলে!

সন্দীপ বললে—বুড়ো বলছো কেন? উনি তো আমার কাকা—

বিশাখা বললে—তোমার কাকা হলো তো আমার বয়ে গেল! বুড়োকে বুড়ো বলবো না তো কী ছেলেমানুষ বলবো?

সন্দীপ বললে—তবু তা বলতে নেই। একদিন তো সবাই-ই বুড়ো হয়ে যাবে। আর তুমিই কি চিরকাল এই রকম খুকী হয়ে থাকবে? একদিন তুমিও তো বুড়ী হয়ে যাবে। একদিন তোমারও বিয়ে হবে—

বিশাখা বললে—তুমি কিছুছু জানো না। আমাকে মা বলেছে আমি এখন যেমন ছোট, পরেও তেমনি ছোট হয়ে থাকবো। মা কি কখনো মিছে কথা বলে? মা বলেছে বিয়ে হলেই মানুষ শ্বশুরবাড়ী চলে যায়—আমি শ্বশুর বাড়ি যাবো না—

সন্দীপ মেয়েটার কথায় হেসে ফেললে। জিজ্ঞেস করলে—তোমার মা কোথায়?

বিশাখা বললে—আমি জানি তুমি কী করতে এসেছ—

—কী করতে এসেছি আমি?

—আমার মাকে টাকা দিতে। তোমাদের বাড়িতে একটা ছেলে আছে, তার সঙ্গে আমার বিয়ে দেবে। আমি সব শুনেছি—

সন্দীপ বললে—তুমি ঠিকই শুনেছ—তা তোমার মা'কে এখন একবার ডেকে দাও। বলো যে আমি বিডন স্ট্রীটের মুখার্জি বাবুদের বাড়ি থেকে এসেছি—

এমন সময় আর একটা অলকারই বয়েসী মেয়ে এসে হাজির হলো সেখানে। বললে—কে রে বিশাখা? কার সঙ্গে কথা বলছিস তুই?

অলকা বললে—এই দ্যাখ্ না, আমার নাম বিশাখা, এরা আমার নাম বদলে দিয়ে রেখেছে অলকা। কী বিচ্ছিরি নাম রেখেছে দেখ্—

মেয়েটা বললে—তোমরা এর নাম অলকা রেখেছ কেন? এর নাম তো বিশাখা।

আর আমার নাম বিজলী —

সন্দীপ বললে—নাম তো আমি বদলাই নি। নাম বদলে দিয়েছেন ঠাকমা-মণির গুরুদেব। তিনি বলেছেন ওই 'অলকা' নাম রাখলে ওর জীবন সুখের হবে !

—সুখের হবে মানে ?

সন্দীপ বললে—সে-সব আমি জানি না, তুমি তোমার মা'কে বলো গিয়ে যে আমি তাঁকে টাকা দিতে এসেছি—

হঠাৎ ভেতর থেকে পুরুষ-মানুষের মতন গলায় বললে—কে রে ? এখানে কার সঙ্গে কথা বলছিস রে তোরা ?

বলে বাইরে আসতেই সন্দীপ দেখলে সেই আগের মাসের দেখা ভদ্রলোক। সেই তপেশ গাঙ্গুলী মশাই। সন্দীপকে ডেকে ভেতরে নিয়ে গেলেন। সেই আগের বারে মল্লিক-মশাই-এর সঙ্গে এসে যে ঘরে বসেছিল, এ সেই ঘর।

সেই দিনকার মতই এ তেমনিই নোংরা, তেমনিই অপরিষ্কার।

তপেশ গাঙ্গুলীর পেছনে-পেছনে বিশাখা আর বিজলী এসে ঘরে ঢুকে পড়েছিল।

তপেশ গাঙ্গুলী বললেন—টাকা এনেছ ভাই ?

সন্দীপ বললে—হ্যাঁ, এনেছি। অলকার মা কোথায় ? রাজুবালা দেবী ?

—কত টাকা এনেছ ?

সন্দীপ বললে—আপনি একশো টাকাটা বাড়িয়ে দেড়শো করে দিতে বলেছিলেন, কিন্তু আমাদের ঠাকমা-মণি পঁচিশ টাকা বাড়িয়ে দিয়েছেন। আমি এনেছি একশো পঁচিশ টাকা। সরকার মশাই আমাকে বলে দিয়েছেন রাজুবালা দেবীর হাতে টাকা দিতে- আর কারো হাতে দিতে বারণ করে দিয়েছেন—

তপেশ গাঙ্গুলী কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। মুখ দিয়ে যেন কোনও কথাই বেরোল না—

তারপর বললেন—কেন ? আমাকে টাকা দিলে আমি সে-টাকা খেয়ে ফেলবো ?

সন্দীপ বললে—তা জানি না, আমাকে সরকার মশাই যা বলে দিয়েছেন, তাই-ই আপনাকে বললাম—

তপেশ গাঙ্গুলী তার জবাবে আর কী বলবেন ! খানিক পরে বিশাখাকে বললেন —এই বিশাখা, তোর মা'কে ডেকে আন তো, বলবি বিডন স্ট্রীটের বাড়ি থেকে নতুন সরকার মশাই মাসকাবারির টাকা নিয়ে এসেছে, তোর মা'কে ডেকে আন—

বিশাখা'র আগেই বিজলীই দৌড়ে ভেতরে চলে গেল।

তপেশ গাঙ্গুলী মশাই বললেন—চা আনবো ? চা খাবে তুমি ?

সন্দীপ বললে—না, আমি গাঁয়ের ছেলে, চা খাই নে—

—ভালো-ভালো, চা না-খাওয়াই ভালো। শুধু চা কেন, কোনও নেশাই করা ভালো নয়। এই দেখ না, আমিও কোনও নেশা করি না ভাই, নেশা করা মানেই যত টাকার ছেরাদ্দ করা। ও-সব বড় লোকদেরই পোষায়—

বলে তপেশ গাঙ্গুলী মশাই ভেতরে চলে গেলেন। সাধারণত মাসের পয়লা তারিখটাই এ-বাড়িটা একটা উৎসবের রূপ ধারণ করে। সেই দিন বিডন স্ট্রীটের মুখার্জি বাবুদের বাড়ি থেকে একশো টাকা আসে। এই একশোটা টাকা একেবারে

ফালতু টাকা। এর জন্যে কোনও দিন কাউকে পরিশ্রম করতে হয় না। কাউকে খোসামোদও করতে হয় না। সত্যিই এ একেবারে ফালতু টাকা। এই মাসের পয়লা তারিখটাতেই তপেশ গাঙ্গুলী মশাইএর বাড়িতে মাংস রান্না হয়, সরু চালের পায়েস হয়। টাকাটা আসে আসলে বিশাখার সূত্রে, কিন্তু তা ভোগ করে সবাই মিলে। তা নিয়ে যোগমায়া কোনও দিন কিছু অনুযোগ করা দূরের কথা, মুখ ফুটে কখনও কিছু বলেও না। একে তো বিধবা মানুষ, তাতে এই বাসাবাড়িতে যে বিনে ভাড়ায় থাকতে পেয়েছে, মা আর মেয়ে যে দু'বেলা দু'মুঠো খেতে পারছে সেইটেই তো যথেষ্ট। বিশাখার দরুন মাসে-মাসে যে এতগুলো টাকা আসছে, তার জন্যে যে কেউ একটু কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে, তা নয়। উল্টে কেন আরো বেশি টাকা আমদানি হচ্ছে না, তাই নিয়েই বরং আরো চাপ সৃষ্টি করতে চাইছে দেওর। যেন যোগমায়া মুখে একটু বললেই টাকার অঙ্কটা বেড়ে যাবে।

তপেশ গাঙ্গুলী মাঝে-মাঝে বলতেন—তুমি একটু বলতে পারো না বৌদি যে যদি আর পঞ্চাশটা টাকা ওরা বাড়িয়ে দেয়, তাহলে একটু সুবিধে হয়। তা সেই কথাটা বললে কী দোষ?

যোগমায়া বলতো—আমার হয়ে না হয় তুমিই বলে দিও, আমি মেয়েমানুষ হয়ে কি কিছু বলা ভালো?

তপেশ গাঙ্গুলী বলতেন—তুমি হলে বিশাখার মা, তুমি নিজে বললে যা হবে তা কি আর আমি বললে হবে? আমি তো অনেকবার বলেছি—

যোগমায়া জানতো যে বুদ্ধিটা আসলে তার দেওরের নয়, ছোট জায়ের। ওই একশোটা টাকা বাড়িতে আমদানি হওয়ার পর থেকেই ছোট জা সংসারের কাজ একেবারে ঢিলে দিয়ে দিয়েছে। তখন থেকেই ছোট জায়ের ঘন-ঘন মাথাধরা হতে শুরু করেছে, তখন থেকেই ছোট জায়ের কোমরে ব্যথা করতে শুরু করেছে। বাড়িতে গলগ্রহ বিধবা বড় জা থাকতে কোন্ ছোট জা-ই বা সুস্থ থাকে? হয় গা ম্যাজ্-ম্যাজ্, নয় তো মাথা টিপ্-টিপ্, একটা কিছুই লেগে থাকাই তো স্বাভাবিক! সে-ব্যাপারে যোগমায়া কোনও দিন মনে-মনে বললেও মুখ ফুটে বলবার ভুল করেনি।

কিন্তু টাকা? টাকার ব্যাপারটা কী করে যে ওদের সরকার মশাইকে বলে? টাকাটা যে মাসে-মাসে দিচ্ছে এইটেই তো যথেষ্ট। যদি কোনও দিন টাকা দেওয়া বন্ধই করে দেয় তো তাতেই বা যোগমায়ার কী বলবার থাকবে? মুখার্জি বাড়ির ঠাকুমা-মণি কি এমন কড়ার করেছে যে নিয়ম করে মাসে-মাসে বছরের পর বছর ধরে এমনি দিয়ে যাবে?

তাই যোগমায়াকে দিয়ে কথাটা বলানোর কোনও চেষ্টাই তপেশ গাঙ্গুলীর সফল হয় নি।

রাণী স্বামীকে বলেছে—কেন বলবে শুনি? কেন কথা বলে মুখ নষ্ট করবে? তুমি তো দুটো মানুষের খাওয়া-পরার খরচ যুগিয়েই যাচ্ছো, তাহলে কেন আবার তা বলে ইজ্জত খোয়াবে? তোমার ইজ্জত না থাকতে পারে, কিন্তু বড়দির তো একটা ইজ্জত আছে—

তপেশ গাঙ্গুলী বলেছেন—তা বটে, বুঝেছি—

রাণী বলেছে—ছাই বুঝেছ, তা আমি মলে তোমার যদি ঘটে একটু বুদ্ধি হয়!

অথচ কম টাকা বলে কখনও টাকাগুলো নিতেও আপত্তি করেনি কেউ। বরং মল্লিক-মশাই মাসের পয়লা তারিখে একশোটা টাকা নিয়ে এলে তাঁকে চা দিয়ে বিস্কুট দিয়ে খাতিরই করা হয়েছে। কারণ শেষকালে যদি টাকার আমদানিটা বন্ধ হয়ে যায়? কিছু না-দেওয়ার চাইতে তো কিছু দেওয়াও ভালো!

কিন্তু সেবারই প্রথম তপেশ গাঙ্গুলী মশাই কথাটা শ্রীহরি'র নাম স্মরণ করে মল্লিক-মশাইকে বলেই ফেলেছিলেন।

তাইতেই তো পঞ্চাশটা টাকা না বাড়িয়ে পঁচিশটা টাকাও বেড়েছে। তা-ই বা কম কী? ওই পঁচিশটা টাকাতে তপেশ গাঙ্গুলী মশাই-এর এক জোড়া চটিও হয়ে যাবে। কিংবা রাণীর একটি দামী ব্লাউজ। যথা লাভ!

তপেশ গাঙ্গুলী মশাই যোগমায়ার কাছে গিয়ে বললেন—এই দেখ বৌদি, তুমি তো টাকার কথা ওদের বললেই না। সেই আমাকেই মুখ নষ্ট করতে হলো শেষ পর্যন্ত। এই দেখ, টাকাটা এবার ঠিক বাড়িয়ে দিয়েছে বুড়ী—

যোগমায়া বললে—কত?

– কত? কত আর? পঁচিশ টাকা। তা পঁচিশ টাকাই বা না কীসে বলো? এক কোপে তো গলা কাটা ঠিক নয়, একটু সইয়ে-সইয়ে গলা কাটতে হয়। তাতে হাতের সুখ হয়। এখন পঁচিশ টাকা বাড়লো, এর পরে সইয়ে-সইয়ে মবলগ দুশো টাকায় গিয়ে তুলবো—

তারপর হাতের কাগজটা আর কলমটা যোগমায়ার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে—নাও, এইখানটায় একটা সই করে দাও—

যোগমায়া অন্যবারের মত কাগজের ওপর যথাস্থানে কোনও রকমে সইটা করে দিলে। সই করার পরই যোগমায়ার কর্তব্য শেষ। তার পরেই আবার নিজের রান্না। ঘরের দিকে যেতে-যেতে বললে—চায়ের জল চড়িয়ে দিয়েছি, ওদের সরকার মশাইকে একটু বসতে বলে এসো ঠাকুরপো—

তপেশ গাঙ্গুলী মশাই বললেন—না-না, চা করতে হবে না, এ কি সেই আগেকার বুড়ো সরকার মশাই, একটা ছোকরা মানুষ। আমি আগেই জিজ্ঞেস করেছি, এর চায়ের নেশা-টেশা নেই--

সামনের বারান্দা দিয়ে যাবার সময়েই রাণীর সঙ্গে দেখা। এই রকম প্রত্যেক মাসের পয়লা তারিখেই রাণী এই টাকাটার অপেক্ষায় থাকে। তপেশ গাঙ্গুলী মশাই কাছে যেতেই রাণী জিজ্ঞেস করলে—কত দিলে?

তপেশ গাঙ্গুলী সমস্ত টাকাগুলো রাণীর হাতে দিয়ে বললে—গুণে নাও, একশো পঁচিশ টাকা আছে। দশ খানা দশটাকার নোট, আর পাঁচ খানা পাঁচটাকার নোট, মোট একশো পঁচিশ—আমার সামনে গোনো—

প্রতিবার এই রকমই হয়। যার নামে টাকা সে কিন্তু এ-টাকার চেহারাও দেখতে পায় না। দেখবার ইচ্ছে হলেও দেখতে চায় না। তার শুধু কাজ। আর কাজ ছাড়া অন্য কিছু চিন্তা করাও যেন তার পাপ। সুতরাং সেই টাকা নিয়ে কী হলো, কী ভাবে তা খরচ করা হলো, তা ভাবতেও চায় না সে! ভগবান যেন তাকে সে-কথা ভাবতেও নিষেধ করে দিয়েছেন।

শুধু রাতটাই তার একলার।

সেই রাতগুলোতেই যোগমায়া যেন নিজেকে খুঁজে পায়। তখন মনে পড়ে সেই মানুষটার কথা। সেই মানুষটাই একদিন বলেছিল—দেখ যোগমায়া, আমি যদি কোনও দিন চলেও যাই তো তোমার কিছু ভাবনা নেই। আমার ভাই তপেশ তো রইল। তাকে আমিই ছোটবেলা থেকে মানুষ করেছি। সে তোমাকে দেখবে—

সেদিন স্বামীর কথাতেও যোগমায়া যেমন কাঁদেনি, আজ সে-মানুষটা চলে যাবার পরও তেমনি কাঁদে না। সুখ-দুঃখ সব সমান ভাবে মাথা পেতে সহ্য করে যায়। তার ঠাকুর যদি কোনও দিন মুখ তুলে চান তো চাইবেন, আর যদি মুখ তুলে না চান তো চাইবেন না! তাতে কারো ওপর কোনও অভিযোগ-অনুযোগ করার ভুল সে করবে না। শুধু এইটুকু বিশ্বাস নিয়েই জীবনের শেষ ক'টা বছর চলবে। ঠাকুর মঙ্গলময়। ঠাকুর যা করেন তা সমস্তই মঙ্গলের জন্যে।

তপেশ গাঙ্গুলী মশাই রাত্রে বললেন—কই, ঘুমোলে নাকি?

—আবার কী?

তপেশ গাঙ্গুলী মশাই বললেন—না, বলছিলুম কি, তুমি তো অনেক দিন ধরে বলছিলে কানের এক জোড়া সোনার ঝুমকো গড়াবে, তা এবার তো কিছু টাকা জমলো, এবার গড়াও না—

রাণী বললে—না-না, অত আদিখ্যেতা করতে হবে না। খুব হয়েছে—

তপেশ গাঙ্গুলী বললেন—অত রাগ করছো কেন? কী এমন রাগের কথা বলেছি?

রাণী মুখ-ঝামটা দিয়ে বলে উঠলো—রাত দুপুরে আর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিতে হবে না। তোমার সঙ্গে যখন বিয়ে হয়েছে তখনই বুঝেছি আমার কপাল পুড়েছে……

তপেশ গাঙ্গুলী স্ত্রীর কথায় বিব্রত হয়ে বললেন—আহা কী করেছি আমি, সেটা বলবে তো!

রাণী বলে উঠলো—দয়া করে এবার চুপ করবে?

তপেশ গাঙ্গুলী বললেন—এ তো মহা মুশকিল হলো দেখছি। আমার কথাও শুনবে না, আবার নিজেও কিছু বলবে না। তাহলে আমি কী করি? আমি কী করবো সেইটে অন্তত তুমি বলে দাও—

—তোমায় কিছু করতে হবে না, তুমি শুধু দয়া করে একটু ঘুমোতে দাও আমাকে—বলে রাণী অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে ঘুমোতে লাগলো।

এ শুধু যে এই-ই প্রথম তা নয়। যেদিন থেকে বিডন স্ট্রীটের বাড়ির মল্লিক-মশাই এসে বিশাখার বিয়ের প্রস্তাবটা দিয়ে গেছেন, সেইদিন থেকেই রাণী এই রকম হয়ে গেছে। ভালো কথা বললেও ঝগড়া করবে। যা-ইচ্ছে তাই বলে মেয়েদের সামনেই তপেশ গাঙ্গুলীকে অপদস্থ করবে। অফিসে গিয়েও যে মন দিয়ে একটু কাজ করবে তারও উপায় নেই। সেখানে কাজ করতে করতেও বাড়ির কথা ভেবে তপেশ গাঙ্গুলী অন্যমনস্ক হয়ে যেতেন। গয়না গড়িয়ে দেবার কথাও শুনবে না, আদর করতে গেলেও ঠেলে ফেলে দেবে!

তবু বৌদি ছিল বলে ঠিক সময়ে রান্না ভাত খেতে পাচ্ছেন তপেশ গাঙ্গুলী। ঠিক সময়ে অফিসে যেতে পারছেন! রেলের অফিস হলেও যত দেরিই হোক চিরকাল তো অফিস কামাই করলে চলে না। দিনে অন্তত একবার কিছুক্ষণের জন্যেও তো

অফিসে যেতে হবে। ওই অফিসের ওপরেই তো তাঁর খাওয়া পরা চলছে, সখ-সৌখিনতা চলছে, লোক-লৌকিকতা চলছে, অফিসটাই তো হলো তাঁর লক্ষ্মী। ওই অফিসটাই তো তাঁর জীবনের সিঁথির সিঁদুর। ওই সিঁদুরের জন্যেই তো তিনি এখনও পৃথিবীতে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। যদি ওটা না থাকত।

সে-কথাটা আর তপেশ গাঙ্গুলী ভাবতে পারেন না, সে-অবস্থার কথাটা ভাবতে গেলেই তাঁর মাথা ধরে যায়। না, আর দরকার নেই সে সব কথা ভেবে। তিনি সকাল বেলার কথাগুলো ভুলতে চেষ্টা করেন। কিন্তু ভোলা কি অত সহজ ? ভুলতে পারলে তো কবে তিনি সংসার ছেড়ে বনে চলে যেতেন। অ র আগেকার মত বনই কি আছে এখন ? এখন তো কলকাতা শহরটাই বন হয়ে গেছে। বনের মধ্যে যেমন বাঘ-সিংহ-ভাল্লুক ঘুরে বেড়ায়, তেমনি এখন কলকাতা শহরের মধ্যেইতো বাঘ-সিংহ ভাল্লুক ঘুরে বেড়াচ্ছে। কলকাতা শহরের বাঘ-সিংহ-ভাল্লুকেরা তো বনের বাঘ-সিংহ-ভাল্লুকের চেয়েও ভয়ানক। প্রত্যেক দিন বাজারে গিয়ে তপেশ গাঙ্গুলীর তাই-ই মনে হয়! তিনি সকলের মুখগুলোর দিকে চেয়ে দেখেন। তারা বাইরে থেকে দেখতে মানুষেরই মতো, কিন্তু ভেতরে ?

পাশে রাণীর নাক ডাকতে লাগলো। তপেশ গাঙ্গুলী বুঝতে পারলেন রাণী ঘুমিয়ে পড়েছে। সত্যিই, বেশ আছে মেয়েরা। যত ঝক্কি পুরুষদের। বউ-এর গয়না যুগিয়ে, মন যুগিয়ে, শাড়ি-ব্লাউজ যুগিয়েও তাদের মন পাওয়া যায় না। যাক্, জাহান্নামে যাক সব, জাহান্নমে যাক সংসার। মানুষ যে কেন সাধ করে সংসার করতে যায় কে জানে! আগে জানলে কোন্ শালা সংসার করতো!

বিডন্ স্ট্রীটের বাড়ির মল্লিক-মশাই এ-বাড়িতে আসবার পর থেকেই তপেশ গাঙ্গুলীর পৃথিবী যেন বিষ হয়ে গিয়েছিল!

কিন্তু কত তুচ্ছ সেই ঘটনাটা! আর কত সামান্য! কত নগণ্য!

এই এতদিন পরে এত কাণ্ডের পর সন্দীপের মনে হলো এই তুচ্ছ সামান্য আর নগণ্য ঘটনাটা কেমন করে তার জীবনের ওপর একটা প্রচণ্ড বিপর্যয়ের সৃষ্টি করলে। আর সন্দীপই বা কেন অকারণে সেই বিপর্যয়ের মধ্যে জড়িয়ে পড়ে একেবারে নিঃশেষ হয়ে গেল! আর শুধু সন্দীপই বা কেন, কে জড়িয়ে পড়েনি ? ওই ঠাকুমা-মণি, ওই সৌম্য মুখার্জি, ওই তপেশ গাঙ্গুলী, ওই রাণী গাঙ্গুলী, ওই বিশাখা বা অলকা, ওই রাজুবালা দেবী বা যোগমায়া, ওই মল্লিক-মশাই, কেউ-ই তো বাদ পড়েনি!

মনে আছে সন্দীপ যখন টাক্ মাথা তপেশ গাঙ্গুলী মশাইকে দিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছিল।

পেছনে তপেশ গাঙ্গুলী মশাই সদর-দরজাটা ভেজিয়ে দিতে এসেছিলেন।

বললেন—আসছে মাসে আবার পয়লা তারিখে আসছো তো ভাই?

সন্দীপ বললে—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আসবো—

—তাহলে ভাই একটু সকাল-সকাল এসো, বুঝলে?

—কেন? আপনার অফিসে যেতে দেরি হয়ে গেল বুঝি?

তপেশ গাঙ্গুলী মশাই বললেন—হ্যাঁ, তবে কী জানো, আমাদের রেলের অফিস তো, কাজ তেমন কিছু নেই বটে, কিন্তু অফিস গিয়ে একবার হাজরে তো দিতে হবে! তাই বলছি, এর পরের বারে একটু সকাল-সকাল আসতে চেষ্টা করো। আর যদি পারো তো ওই টাকাটা একশো পঁচিশ টাকার বদলে একশো পঞ্চাশ করে দিলে ভালো হয়, এইটেই বলো—

তারপর আর কিছু বলেনি সন্দীপ। তপেশ গাঙ্গুলী-মশাই দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। সন্দীপ মনসাতলা লেনের বাড়ি থেকে বেরিয়ে ট্রাম রাস্তার দিকে বাস ধরতে যাচ্ছিল। হঠাৎ বাড়িটার পেছন দিকের গলিটা থেকে কে একজন ডাকলে —এই সন্দীপ, সন্দীপ—

সন্দীপ পেছন ফিরে দেখলে—বিশাখা তাকে ডাকছে।

সেইখানে সেইভাবে বিশাখাকে দেখে সন্দীপ অবাক হয়ে গেল। হঠাৎ ও ওখানে কোথা থেকে এল? তার নাম ধরে তাকে ডাকছে। মেয়েটা খুব পাকা তো! যাকে বলে একেবারে এঁচোড়ে পাকা!

সন্দীপ মেয়েটার কাছে এগিয়ে গেল। জিজ্ঞেস করলে—কী হলো? তুমি আমাকে ডাকছো?

বিশাখা বললে—হ্যাঁ, তোমার নাম তো সন্দীপ—

সন্দীপ বললে—হ্যাঁ—কিন্তু তুমি তা জানলে কেমন করে?

বিশাখা হাসলো। বললে—আমি সব জানি।

—কী জানো?

বিশাখা বললে—তুমি আগের বারে তো সেই বুড়োটার সঙ্গে এসেছিলে! এবার থেকে তো তুমিই এসে মা'কে টাকা দিয়ে যাবে!

সন্দীপ বললে—হ্যাঁ—

বিশাখা বললে—তুমি তো এবারে একশো টাকার বদলে একশো পঁচিশ টাকা দিয়ে গেলে!

সন্দীপ বিশাখার বুদ্ধি দেখে অবাক হয়ে গেল।

বললে—তুমি সবই জানো দেখছি—

—হ্যাঁ, আমি তো বলেইছি যে আমি সব জানি। আর কী জানি বলবো?

সন্দীপ বললে—বলো—

বিশাখা বললে—তুমি যে-টাকা দিয়ে গেলে না, ও টাকা দিয়ে কী হবে, জানো?

—কী? কী হবে?

বিশাখা বললে—তোমাদের দেওয়া সব টাকা কাকীমা নিজের বাক্সোতে জমিয়ে রেখেছে। এখন সেই জমানো টাকা দিয়ে কাকীমার কানের এক জোড়া সোনার ঝুমকো হবে।

—সত্যিই ?

—হ্যাঁ, এখন কানের ঝুমকো হবে। পরে একটা সোনার হার হবে কাকীমার···

কথাগুলো বলেই বিশাখা বললে—একটু নিচু হও—একটু নিচু হওই না—

সন্দীপ কিছুতেই বুঝতে পারলে না কেন বিশাখা তাকে নিচু হতে বলছে।

বললে—কেন, নিচু হয়ে কী করবো ?

বিশাখা বললে—তোমার কানে-কানে একটা কথা বলবো—নিচু হও না—

সন্দীপ এবার সত্যিই নিচু হলো। বিশাখা নিজের দুটো হাত দিয়ে সন্দীপের মাথার দুটো দিক ধরলে। তারপর মাথাটা নিজের মুখের কাছে এনে কানে-কানে ফিস্-ফিস্ করে বললে—কাউকে যেন বলো না, বুঝলে ? বলো, কাউকে বলবে না—

সন্দীপ সেই ভাবেই মাথা নিচু অবস্থায় বললে—না, কাউকে বলবো না—

—আগে দিব্যি গালো ! বলো—মা-কালীর দিব্যি—

সন্দীপ বললে—হ্যাঁ, মা-কালীর দিব্যি গেলে বলছি, কাউকে বলবো না—

—তোমার ঠাক্‌মা-মণিকেও বলতে পারবে না।

—না, ঠাক্‌মা-মণিকেও বলবো না, কথা দিচ্ছি !

বিশাখা বললে—তবে শোন, তোমার ঠাক্‌মা-মণি তো মাসে মাসে এতগুলো টাকা দিচ্ছে। কিন্তু তোমাদের ছোট খোকাবাবুর সঙ্গে আমার বিয়ে হবে না—

সন্দীপ চম্‌কে উঠলো। বললে—সে কী ? কেন ? ছোট খোকাবাবুর সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে না কেন ?

বিশাখা বললে—তা আমি বলবো না। বললে তুমি সকলকে বলে দেবে—

সন্দীপের তখন কথাটা শোনবার জন্যে আগ্রহ আরো বেড়ে গেছে। বললে—না, আমি কথা দিচ্ছি, আমি কাউকেই বলবো না—

—তাহলে আবার মা কালীর দিব্যি গালো।

সন্দীপের হাসি এল বার বার দিব্যি গালার কথা শুনে। বললে—আচ্ছা-আচ্ছা, আবার মা কালীর দিব্যি গালছি, আমি কাউকেই বলবো না—

—তবে শোন—

বলে বিশাখা সন্দীপের মাথাটা আবার দু'হাতে ধরে নিজের মুখের আরো কাছে নিয়ে এসে বললে—আমার বিয়ে হয়ে গেলে তো তোমরা আর কাকাকে টাকা দেবে না—তখন কাকীমা কোন্ টাকা দিয়ে নিজের গয়না গড়াবে ?

কথাটা শেষ হবার আগেই বাড়ির ভেতর থেকে মেয়েলি গলার শব্দ এল—ওরে বিশাখা, কই ? কোথায় গেলি তুই ? ও বিশাখা···

—ওই আমাকে ডাকছে, আমি যাই—

বলে বিশাখা আর সেখানে দাঁড়ালো না। পাই পাই করে এক ছুটে পেছনের খিড়কীর দরজা দিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকে গেল।

সন্দীপ খানিকক্ষণ নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কতক্ষণ সেইভাবে দাঁড়িয়ে রইল কে জানে ! যখন তার জ্ঞান ফিরে এল তখন দেখতে পেলে চারদিকে যে বিরাট ব্রহ্মাণ্ডটা এতক্ষণ নিশ্চল হয়ে স্থির হয়ে স্তব্ধ হয়ে স্থানু হয়ে গিয়েছিল তা যেন আবার তার স্বাভাবিক গতিপথে ঘুরতে শুরু করলো। সন্দীপ দেখতে পেলে সে

খিদিরপুরের সাত নম্বর মনসাতলা লেনের বাড়িটার সামনে একলা দাঁড়িয়ে আছে আর তার সামনের রাস্তা দিয়ে দলে-দলে মানুষ, সাইকেল, গরু, রিক্শা, ঠেলাগাড়ি স্রোতের মত বয়ে চলেছে আপন মনে। এতক্ষণে তার মনে পড়লো সে যে শহরে রয়েছে তার নাম কলকাতা। আর আরো মনে পড়লো তার নাম সন্দীপ, সন্দীপ লাহিড়ী। তার বাবার নাম হরিপদ লাহিড়ী। আরো মনে পড়লো সে বেড়াপোতা থেকে কলকাতা শহরে লেখাপড়া করতে এসেছে। সে যেখানে যে-বাড়িতে আশ্রয় পেয়েছে সে-বাড়ির ঠিকানা বারোর-এ বিডন স্ট্রীট, সেখানে আছে ঠাকুমা-মণি, আছে মল্লিক-কাকা, আর সে নিজেও সেখানে থাকে।

এ এক অদ্ভুত অনুভূতি। সন্দীপের জীবনে এ ধরনের অনুভূতি এই-ই প্রথম। আস্তে-আস্তে সে ট্রাম-রাস্তার দিকে পা বাড়ালে। সেখানে গিয়ে তাকে বাস ধরতে হবে। চলতে-চলতে সে শোনা কথাগুলোই ভাববে। আমার বিয়ে হয়ে গেলে তো তোমরা আর কাকাকে টাকা দেবে না, তখন কাকীমা কোন্ টাকা দিয়ে নিজের গয়না গড়াবে?

কথাগুলো যেন সন্দীপের মস্তিষ্কের মধ্যে গুন-গুন করে গুঞ্জন করতে লাগলো। কখন সে বাসে উঠেছে, কখন সে বাসের ভাড়া দিয়েছে, কখন সে ধর্মতলায় বাস বদলেছে, আবার কখনই বা সে বিডন স্ট্রীটের বাড়িতে পৌঁছেছে কিছুই তার মনে ছিল না। কেবল তার কানের কাছে একটা কথা গুন-গুন করছিল—আমার বিয়ে হয়ে গেলে তো তোমরা আর কাকাকে টাকা দেবে না। তখন কাকীমা কোন্ টাকা দিয়ে নিজের গয়না গড়াবে?
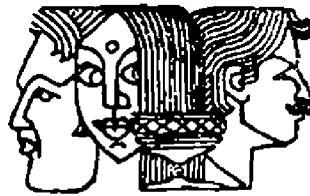
এ পাপ! সরু রাস্তাটা ধরে সন্দীপের অনুভবের ফ্রেমে কেবল একটা কথাই মনে-মনে আঁকা হয়ে গেল। সে-কথাটা হচ্ছে- এ পাপ! সংসারে পাপ কাকে বলে?

সামাজিক ভালো-মন্দের, সামাজিক সুবিধে-অসুবিধের কথা ভেবেই আমরা পাপ-পুণ্যের তারতম্যের বিচার করি। চরিত্রকে আমরা এমন করে গড়ে তুলি যাতে আমরা লোকসমাজের কাছে উঁচু স্তরে থাকি! কিন্তু লোকের চোখের বাইরে কি এমন কোনও গোপন জায়গা নেই যেখানে আমরা সকলের প্রবেশ নিষেধ করে দিয়ে ভাবি আমার আসল আমিকে কেউ দেখতে পাচ্ছে না।

সেদিন খিদিরপুরের মনসাতলা লেন থেকে ফেরার সময় সন্দীপেরও ঠিক সেই রকম মনে হচ্ছিল। সে ভাবছিল এই যে এতগুলো লোক বাসের মধ্যে ফরসা জামা-কাপড় পরে চলেছে কেউ কি বুঝতে পারছে কী অনুতাপের জ্বালায় সে জ্বলছে!

কিন্তু কীসের অনুতাপ? কী পাপ সে করেছে?

অনেক সময়েই সন্দীপের এই রকম আত্মগ্লানি হতো। কীসের জন্যে যে তার আত্মগ্লানি তা সে জানতো না। খুব ছোটবেলাতেও তার এই রকম হতো।

মা, বলতো—কী রে? মুখটা অমন করে আছিস কেন? অসুখ করেছে?

সন্দীপ বলতো—না—

—কেউ কিছু বলেছে তোকে ?

—না।

—তাহলে ? ক্ষিদে পেয়েছে ?

শেষ পর্যন্ত অন্য উপায় দেখতে না পেয়ে সন্দীপ মিথ্যে কথাই বলে উঠতো। বলতো—হ্যাঁ—

—তা ক্ষিদে পেয়েছে তোর, সে কথা বলবি তো!

মা কিন্তু ছেলেকে বুঝতো না। আসলে সন্দীপকে কেউই বুঝতে পারতো না। হয়ত তাকে কেউ বুঝতে চাইতোও না। চাটুজ্জে-বাবুদের বাড়িতেও কেউই বুঝতে পারতো না। তার মত ছেলেকে কেইবা বুঝবে ? সন্দীপকে কেউ মনে করতো—বোকা, কেউ মনে করতো—অহঙ্কারী, আবার কেউ মনে করতো--লাজুক। আসলে সে যে কী তা সে নিজেও জানতো না।

হঠাৎ কে যেন তার নাম ধরে ডাকলে—এই সন্দীপ!

সন্দীপ পেছন ফিরে তাকালো। প্রথমে কেমন একটু সন্দেহ হলো, তারপর ভাবলে সে কী করে সম্ভব হবে!

—আমায় চিনতে পারছিস না ?

—গোপাল! তুই এ-রকম হয়ে গেলি কী করে ?

সত্যিই যেন গোপাল কী রকম হয়ে গেছে। অথচ বেড়াপোতাতে কত সহজ স্বাভাবিক ছিল সে। গোপাল তাকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরেছে। সন্দীপ ভাবতে লাগলো সে বেড়াপোতার গোপালের কথা। কত দিন গোপালের সঙ্গে নদীর ধারে বেড়াতে গিয়েছে। বেড়াতে গিয়ে কখন বিকেল হয়েছে, কখন সন্ধ্যে গড়িয়ে রাত হয়ে গেছে দু'জনের তা খেয়াল থাকতো না তাদের। গোপালই কেবল বলে চলতো। বলতো—জানিস, আমি একদিন পালিয়ে যাবো। তুই কাউকে বলিস্‌নি যেন!

—না কাউকে বলবো না। কিন্তু এখান থেকে পালিয়ে কোথায় যাবি ?

গোপাল বলতো—কলকাতায়—

সন্দীপ বলতো—কলকাতায় গিয়ে কোথায় থাকবি ? কেউ আছে তোর কলকাতায় ?

—না।

—তা যদি না থাকে তো কে তোকে খেতে দেবে ? কোথায় ঘুমোবি রাত্তিরে ? তোর থাকবার তো একটা জায়গা চাই।

গোপাল বলতো—কলকাতায় কি থাকবার জায়গার অভাব আছে রে ? রেলের ইস্টিশান আছে, সেখানে রাতে বেলায় থাকবো, আর খাওয়া ? কলকাতায় গেলে খাওয়ার কোনও অভাব হয় না কারো! কলকাতায় দেদার টাকা। টাকা সেখানে বাতাসে উড়ছে। শুধু কুড়িয়ে নিতে জানলেই হলো।

সন্দীপ অবাক হয়ে শুনতো গোপালের কথাগুলো। কলকাতায় নাকি কেউ না খেতে পেয়ে মরে না। এত টাকা এখানে যে যদি কেউ সমস্ত দিন ঘুমিয়ে থাকে তো হাজার-হাজার টাকা সোঁ-সোঁ করে তার জামার পকেটে ঢুকে পড়ে। ঘুম ভেঙে জেগে উঠে দেখে পকেট দু'টো টাকায় ভরে গেছে। তখন সেই টাকা নিয়ে হোটেলে

গিয়ে যা ইচ্ছে কিনে খেয়ে নাও। কত খাবে খাও না, কেউ তোমায় বারণ করবে না। কেউ তোমায় জিজ্ঞেসও করবে না এত টাকা তুমি কোথায় পেলে!

সন্দীপ জিজ্ঞেস করতো—সেখানে চোর-ডাকাত নেই? কেউ টাকা চুরি করে নেবে না?

গোপাল বলতো—চুরি করতে যাবে কেন? টাকার অভাব থাকলে তবেই তো লোকে টাকা চুরি করে, কারোর তো টাকার অভাব নেই।

সন্দীপও তখন সেই ছোট বয়েসে গোপালের কথাগুলো বিশ্বাস করতো। সন্দীপও যদি কোনও রকমে কলকাতায় যেতে পারে তো তাহলে তার মা'কেও সঙ্গে করে নিয়ে যাবে। তাহলে মা'কে আর পরের বাড়িতে রান্নার কাজ করতে হবে না। সে আর মা দু'জনে হোটেলে গিয়ে ভাত, ডাল-তরকারি কিনে খাবে, আর আরাম করে ঘুমিয়ে থাকবে। আর কিছু করতে হবে না। তখন আর এত কষ্ট করে লেখা পড়া করতে হবে না। আর এগজামিনে কষ্ট করে পাশ করতেও হবে না। খুব আরাম হবে তখন তাদের।

তারপর একদিন গোপালকে দেখে সন্দীপ জিজ্ঞেস করেছিল—কী রে, তুই কলকাতায় গেলি না?

গোপাল বলেছিল- দাঁড়া আগে বাবাটা মরুক—

গোপালের মা ছিল না, কিন্তু বাবা ছিল। বাবার ছিল হাঁপানি রোগ। হাঁফানি-রোগের যে কত কষ্ট তা সন্দীপ জানতো। রাত্তিরে অনেক দিন যখন চারদিকে নিশুতি হয়ে আসতো সেই সময়ে গোপালের বাবার হাঁফানির কাশির শব্দে পাড়ার সব লোকের ঘুম ভেঙে যেত। গোপালের ভাই-বোন কেউ ছিল না। সেই বুড়ো মানুষটা হাটের দিন হাটে গিয়ে মাটির হাঁড়ি-কলসী বেচতো। অন্য দিনে লোকের বাড়ি-বাড়ি গিয়ে কত কী জিনিস ফেরি করতো। অনেকে দয়া করে কিছু কিনতো। যখন যা পেত তাই ফেরি করতো। কোনও বাঁধা-ধরা জিনিস বেচতো না। সব লোকই দয়া-মায়া করতো গোপালের বাবাকে। লোকে ডাকতো—হাজরা বুড়ো—

হাটের পাশে যেখানে বাঁধা দোকান আছে, সেখানে একটা দোকানের দেওয়ালের গা ঘেঁষে চালা তুলে নিয়ে তার তলায় বাপ-বেটায় থাকতো। চেয়ে চিন্তে যা দুটি মেলে তা-ই সময় পেলে নিজের হাতে রান্না করে নিত হাজরা বুড়ো।

ইস্কুলের ছেলেরা বিশেষ ভিড়তো না গোপালের কাছে। মাস্টার মশাইরাও বিশেষ পাত্তা দিত না গোপালকে। গরীব লোকদের কে-ই বা পাত্তা দেয়? সন্দীপ-কেও কেউ পাত্তা দিত না। এতে রাগ করবার কী-ই আছে! এইটেই স্বাভাবিক বলে ধরে নিয়েছিল সন্দীপ। গোপালও তাই-ই ধরে নিয়েছিল। আর এইখানেই এই এক জায়গাতেই ছিল দু'জনের মিল। এই মিলের উপরেই ভিত্তি করে তাদের দু'জনের ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছিল। কিন্তু সন্দীপ যখন কাশীবাবুদের বাড়ির লাইব্রেরীতে বসে বইএর পাতার মধ্যে নিজের জীবনের ব্যর্থতার গ্লানি ভুলতে চাইতো, গোপাল তখন স্বপ্ন দেখতো টাকার। হাজার-হাজার, লক্ষ-লক্ষ টাকার স্বপ্ন, যে টাকা উপার্জন করবার জন্যে কোনও লেখা-পড়া বা কোনও পরিশ্রম করার দরকার হয় না, সেই টাকার স্বপ্ন।

সন্দীপ যে গোপালের সঙ্গে মিশুক এটা সন্দীপের মা'র পছন্দ হতো না, মা বলতো—তুই ওই হাজরা বুড়োর ছেলেটার সঙ্গে অত মিশিস কেন ?

সন্দীপ বলতো—কে বললে আমি হাজরা বুড়োর ছেলের সঙ্গে মিশি ?

—কে আবার বলবে ? সেদিন তো তোকে খুঁজতে আমাদের বাড়িতে এসেছিল।

এর পর সন্দীপ গোপালকে তাদের বাড়িতে আসতে বারণ করে দিয়েছিল। বলেছিল—তুই ভাই আর আসিস নি আমাদের বাড়িতে—

গোপাল জিজ্ঞেস করেছিল—কেন ?

সন্দীপ বলেছিল—না, আমার মা তোর সঙ্গে মিশতে বারণ করে দিয়েছে—

—কেন ? আমি গরীব বলে ?

-হ্যাঁ !

গোপাল বলেছিল—আচ্ছা, ঠিক আছে, একদিন আমি তোর মা'কে দেখিয়ে দেব যে আমিও মানুষ, আমারও টাকা আছে। যদি টাকা থাকাটাই পৃথিবীতে বড় গুণ হয় তো আমি সেই টাকা উপায় করেই তোর মা'কে দেখিয়ে দেব। দেখিয়ে দেব কাকে বলে বড়লোক হওয়া ! আমি একদিন কলকাতাতেই যাবো, দেখে নিস—

তখন কে জানতো যে গোপাল সত্যি-সত্যিই কলকাতাতে চলে যাবে। গরীব বুড়ো বাপকে বেড়াপোতাতে ফেলে রেখে সত্যি-সত্যিই কলকাতাতে চলে যাবে !

আর শেষ পর্যন্ত তাই-ই হয়েছিল।

একদিন গোপালকে আর দেখতে পেলে না কেউ। আর ইস্কুলেও গোপাল এল না তার পর থেকে। তার খোঁজে একদিন সন্দীপ গোপালের বাড়িতেও গিয়েছিল। কিন্তু তখন কেউ ছিল না তাদের বাড়িতে। গোপালের বাবাও ছিল না। বোধহয় বাজারে সওদা বিক্রি করতে গিয়েছিল।

তারপর থেকে আর কখনও গোপালের সঙ্গে দেখা হয়নি তার। সন্দীপের জীবন থেকে গোপাল একেবারে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। সন্দীপ ভেবেছিল তার জীবন থেকে গোপাল চিরকালের জন্যে হারিয়ে গেল। আর গোপালের বাবা ? সেই হাজরা-বুড়ো ?

সেই হাজরা-বুড়োরই বা কী মর্মান্তিক পরিণতি ! একদিন হঠাৎ হাটের দিন বাঁধা দোকানগুলোর দিক থেকে কী রকম একটা দুর্গন্ধ সকলের নাকে এল। কীসের দুর্গন্ধ ? কেউই আন্দাজ করতে পারে না দুর্গন্ধটা কীসের। তারপর দেখা গেল হাজরা-বুড়োর ঘরের ভেতরে লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি পিঁপড়ে সার বেঁধে ঢুকছে। অত পিঁপড়ে ঘরের ভেতরে এমন কী লোভনীয় মুখরোচক খাবারের সন্ধান পেলে ? দরজা ভেতরে থেকে বন্ধ !

হাটের লোকরা শেষ পর্যন্ত দরজা ভেঙে ফেললে শাবলের গুঁতো দিয়ে। পলকা জরাজীর্ণ কাঠের দরজা। একবার ধাক্কা দিতেই ভেঙে দুখানা হয়ে পড়ে গেল। দরজাটা ভেঙে পড়তেই সবাই অবাক হয়ে দেখলে ভেতরে হাজরা-বুড়ো মরে পচে আছে। সারা শরীরটা তার পচে ঢোল হয়ে আছে। তার ওপর লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি পিঁপড়ে মরা শরীরটার ওপর থিক্-থিক্ করছে। কখন হাজরা-বুড়ো মরেছে, কবে মরেছে কেউ-ই তা টের পায়নি।

সন্দীপরাও দল বেঁধে গিয়েছিল দেখতে। তখন সকলের মনে পড়ে গিয়েছিল

গোপালের কথা। গোপাল থাকলে এ-রকম ঘটতে পারতো না। গোপাল থাকলে অন্ততঃ মরবার আগে বুড়োর মুখে একটু জল পড়তো, কিংবা হয়ত ওষুধ-পত্তরের ব্যবস্থা হতো!

কিন্তু তখন আর ও-সব কথা ভাববার সময় ছিল না। যা হওয়ার তা হয়ে গিয়েছিল। সেই দিনই বেড়াপোতার হাটের লোকজন চাঁদা তুলে গোপালের বাবার শেষ সৎকারটুকু করে দিয়েছিল। আর তারপরেই সবাই সে-কথা ভুলে গিয়েছিল। সন্দীপেরও আর মনে ছিল না গোপালের কথা।

সেই গোপালের সঙ্গে এতদিন পরে আবার দেখা হবে এ-যেন বিশ্বাস হবারও কথা নয়। তাই গোপালকে দেখে সে খুব চমকে উঠেছিল।

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—তুই কোথায় থাকিস্, কলকাতায়?

ছোটবেলায় ওই গোপালই বলেছিল—কলকাতায় টাকা উড়ছে, কুড়িয়ে নিতে পারলেই হলো। কলকাতায় হাওড়া স্টেশনের প্ল্যাটফরমে শুয়ে-শুয়েই জীবন কাটিয়ে দেওয়া যায়, বাড়ি ভাড়া করবারও দরকার হয় না। সেই গোপাল কত কাল আগে এখানে এসেছে, নিশ্চয় হাওড়া স্টেশনের প্ল্যাটফরমে থাকে।

গোপাল বললে—তুই কোথায় থাকিস?

সন্দীপ বললে—আমি তো বিডন স্ট্রীটে একটা বাড়িতে থাকি! বারোর এ নম্বর বিডন স্ট্রীট। বেড়াপোতার পরমেশ মল্লিক আমার বাবার বন্ধু ছিলেন, তিনিই ওখানে আমাকে থাকতে দিয়েছেন।

গোপাল বললে—চাকরি? চাকরি করিস?

সন্দীপ বললে—না, ঠিক চাকরি নয় বঙ্গবাসী কলেজে বি. এ পড়ি আর ও-বাড়ির ফাইফরমাজ খাটি। তাই কলেজের মাইনে আর সামান্য হাত-খরচের টাকা, আর থাকা-খাওয়া ফ্রী। কিন্তু তুই কী করিস কলকাতায়? চাকরি?

গোপাল বললে—দূর, চাকরি করলে কি আর বড়লোক হওয়া যায়। আমি ব্যবসা করি—

—ব্যবসা!

বলে সন্দীপ গোপালের দিকে সম্ভ্রমের দৃষ্টি দিয়ে আবার চেয়ে দেখলে। গোপাল যে-ধরনের সার্ট-প্যান্ট্ পরে আছে তা অনেক টাকা না হলে কেনা যায় না। পোষাক-আশাক দেখেই বোঝা যায় গোপাল ব্যবসা করে অনেক টাকা করেছে।

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—কীসের ব্যবসা?

গোপাল জবাব এড়িয়ে গেল। বললে—সে তুই বুঝবি না। সব লাখ-লাখ টাকার ব্যবসা। আমি তো বাসে ট্রামে চড়ি না, আমার তো গাড়ি আছে...

—তোর গাড়ি আছে!

—গাড়ি না থাকলে কলকাতার মতন শহরে যাওয়া-আসা করা যায়? গাড়ি বিগড়েছে তাই সেটা কারখানায় দিয়েছি। যদ্দিন না সেটা মেরামত হয়, তদ্দিন কষ্ট করে বাসে ট্রামে চড়তে হবে।

আর একটু থেমে আবার বললে—আর গাড়িটাও পুরোন হয়ে গিয়েছিল ভাবছি এবার আর একটা নতুন গাড়ি কিনবো—

সন্দীপের গাড়ি সম্বন্ধে কোনও ধারণাও নেই। বোকার মত জিজ্ঞেস করলে—

একটা গাড়ির দাম কত রে ?

গোপাল তাচ্ছিল্যের সুরে বললে—বেশি নয়, এই এগারো-বারো হাজারের মতন !

সন্দীপ কথাটা শুনে আরো চমকে উঠলো। এগারো বারো হাজার টাকার কথাটা এমন ভাবে গোপাল বললে যেন ওই টাকার অংকটা খুব তুচ্ছ তার কাছে।

—তুই তোর ঠিকানাটা বল্, একদিন আমি যাবো তোর বাড়িতে।

গোপাল বললে—তার আগে আমি তোদের বাড়িতে একদিন যাবো। আমি কখন কোথায় থাকি তার তো ঠিক নেই !

সন্দীপ বললে—জানিস্, তোর বাবা মারা গেছে—

গোপাল কথাটা শুনে আশ্চর্য হলো না, শুধু বললে—তাই নাকি ?

সন্দীপ বললে—হ্যাঁ রে, তুই শুনিসনি কিছু ?

গোপাল বললে—না তো—

সন্দীপ বললে—সে খুব দুঃখের ব্যাপার, জানিস—

গোপাল বললে—সেটা আর নতুন কথা কী ! বয়েস হলেই মানুষ মরবে—

সন্দীপ অবাক হয়ে গেল। নিজের বাবার মৃত্যুর খবর শুনেও কেউ এমন নির্লিপ্ত থাকতে পারে ! বললে—শেষকালে কী হয়েছিল, জানিস ?

—কী আর হবে। নিশ্চয়ই রোগ-ভোগ কিছু হয়েছিল ! বুড়ো বয়েসে সকলেরই তো রোগ-ভোগ হয়—

—না তা নয়, সে অন্য রকম ব্যাপার !

গোপাল বললে—সে শুনে আর কী করবো।

—তবু তোর শোনা ভাল—

—কেন ? শোনা ভালো কেন ?

সন্দীপ বললে—হাজার হোক, তোর নিজের বাবা তো !

কথাটা শুনে গোপাল বললে—দ্যাখ, তোকে আমি আগেও বলেছি, এখনও বলছি। সংসারে কেউ কারো নয়। তা সে বাপই হোক, মা-ই হোক আর ভাই-ই হোক আর বোনই হোক, আসল জিনিস হলো···

বলতে গিয়েও গোপাল চারদিকে চেয়ে দেখে নিয়ে থেমে গেল।

সন্দীপ বললে—আসল জিনিসটা কী ?

গোপাল সন্দীপের কানের কাছে মুখটা এনে বললে—সবাই আমাদের কথা শুনছে, তাই চুপি চুপি বলবো, শোন···

বলে অস্ফুট স্বরে বললে—টাকা—

সন্দীপকে কিছু বলতে না দিয়েই গোপাল আবার বললে—ভগবান-টগবান সব বাজে। কোনটাও কিস্সু নয়। টাকা থাকলে সব ব্যাটা জব্দ। টাকা থাকলে বাপ-মা-ভাই-বোন-ব্যাটা-বেটি সবাই তোকে ভালবাসবে !

তখন বাসটা এক জায়গায় এসে থামতেই গোপাল বাইরের দিকে চেয়ে চমকে উঠলো। বললে—আমি চলি রে, এখানেই আমাকে নামতে হবে—

বলে সেখানেই নেমে পড়লো। তারপর রাস্তায় দাঁড়িয়েই বললে—যাবোখন একদিন তোদের বাড়িতে, জানিস। আমি যাবোখন—

ততক্ষণে বাসটা ছেড়ে দিয়েছে। সন্দীপ সেই চলন্ত বাসে বসে-বসেই গোপালের

কথাগুলো ভাবতে লাগলো, সেই হাজরা-বুড়োর ছেলে গোপাল। গোপাল লেখা-পড়া কিছুই শিখলো না, অথচ কলকাতা শহরে টাকা উপায় করছে। আর শুধু টাকাই উপায় করছে না, আবার গাড়িও আছে তার। গাড়ি চালাতে তো অনেক টাকা লাগে। অত টাকা কী করে উপায় করে গোপাল? ব্যবসাই যদি সে করে তো কীসের ব্যবসা? ব্যবসা করতে কে তাকে শেখালে? ব্যবসা করতে গেলেও তো তা হাতে-কলমে শিখতে হয়! অনেক ভেবেও সন্দীপ তার ভাবনার কুল-কিনারা পেলে না, বাসটা তখনও এক মনে সামনের দিকে ছুটে চলেছে—

দু'দিন ধরে সন্দীপ মনে-মনে ভাবতে লাগলো মনসাতলা লেনের বাড়ির কথাটা মল্লিক-কাকাকে সে বলবে কি-না। আর যদি বলেও তো মল্লিক-কাকাই বা কী ভাববে! তার কাজ তো বাড়িতে গিয়ে টাকাগুলো দিয়ে আসা। তার বেশী কিছু করার অধিকার তার নেই। সে শুধু বাহক। তাঁর একমাত্র কাজ টাকাগুলো নিয়ে মনসাতলা লেনের বাড়িতে গিয়ে তপেশ গাঙ্গুলীর হাতে দিয়ে দেওয়া।

কিন্তু সেই সামান্য একটা কাজ যে পরে একটা অসামান্য কাজ হয়ে উঠবে, তা যদি সন্দীপ জানতো, তা যদি সে আগে টের পেত!

মল্লিক-কাকা শুধু জিজ্ঞেস করেছিলেন টাকাটা দিয়ে এসেছ?

সন্দীপ বলেছিল—হ্যাঁ—

—তা হলে সই করা কাগজটা দাও—হিসেবের খাতায় তুলতে হবে—

সন্দীপের কাছ থেকে নিয়ে মল্লিক-কাকা খরচটা হিসেবের খাতায় রাজুবালা দেবীর নামে জমা দিয়ে দিলেন। ওটা খরচ। ওই খরচটা খাতায় তুলতে হবে আর প্রতিদিন অন্যান্য খরচের সঙ্গে মোট খরচটা ঠাকমা-মণিকে গিয়ে শোনাতে হবে। সব জমা সব খরচের খতিয়ানটা শুনে ঠাকমা-মণি জমা-খরচের ওই তারিখের পাতায় ঢ্যাঁড়া সই মেরে দেবেন।

সেদিনও মল্লিক-মশাই যথারীতি তেতলায় জমা-খরচের খাতা নিয়ে গেছেন। ফিরে এসে মল্লিক-কাকা আবার নিজের সেরেস্তার কাজ নিয়ে বসেন। আর সেই সময়টাতে সন্দীপ তার কলেজের বইপত্র নিয়ে পড়তে বসে। তারপর অন্যান্য কাজ সেরে যখন খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা হয় তখন খেয়ে নেয়। কিন্তু সেদিন মল্লিক-কাকা তেতলা থেকে তাড়াতাড়ি ফিরে এলেন। বললেন—ও সন্দীপ, তোমার ডাক পড়েছে—

ডাক পড়েছে! কীসের ডাক পড়েছে তা বুঝতে পারলে না সন্দীপ। সন্দীপের মুখের প্রশ্নবাচক চেহারা দেখে মল্লিক-কাকা বললেন—হাঁ করে দেখছো কী? তোমাকে ঠাকমা-মণি একবার ডাকছেন—

—ঠাকমা-মণি ? আমাকে ডাকছেন ? কেন ?

—বাঃ, তুমি খিদিরপুরে গাঙ্গুলীবাবুর বাড়িতে গিয়ে টাকাগুলো দিয়ে এলে, সে-সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞেস করবেন না ?

সন্দীপ বললে—আমি তো আপনাকে বলেছি সেখানে কাকে গিয়ে টাকাটা দিয়ে এলুম। তপেশবাবুর বউদির হাতের সইও তো আপনার কাছে জমা দিয়েছি—

—তা দিলেই বা। ঠাকমা-মণি তবু সেই কথাটা তোমার মুখে শুনতে চান—

তারপর মল্লিক-মশাই-এর সঙ্গে সন্দীপকেও আবার যেতে হলো। ফুল্লরা কালিদাসী সুধাকে পেরিয়ে একেবারে ঠাকমা-মণির খাস-ঝি বিন্দুর এক্তিয়ারে।

বিন্দু খবর দিতেই ঠাকমা-মণি বসবার ঘরে এলেন। মল্লিক-কাকা আর সন্দীপ দাঁড়িয়ে ছিল। বললেন—বসুন মল্লিক-মশাই, বসুন—

বলে নিজে আগে বসলেন। তাঁকে বসতে দেখে মল্লিক-কাকা আর সন্দীপ তাঁর সামনে বসলো।

মল্লিক-মশাই-ই পরিচয় করিয়ে দিলেন—এই-ই হলো সন্দীপ, মনসাতলা লেনে গিয়ে এই সন্দীপই তপেশ গাঙ্গুলীবাবুর হাতে একশো পঁচিশ টাকা দিয়ে এসেছে। সব আমাদের খরচের খাতায় জমা করে নিয়েছি—

সন্দীপ উঠে ঠাকমা-মণির পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে। সন্দীপের মনে হলো ঠাকমা-মণি তার ব্যবহারে যেন সন্তুষ্ট। জিজ্ঞেস করলেন—তুমিই গিয়ে টাকাটা দিয়ে এসেছো ?

সন্দীপ বললে—হ্যাঁ—

—টাকা পেয়ে বউমা'র কাকা কিছু বললেন ?

সন্দীপ বললে—না,—

ঠাকমা-মণি জিজ্ঞেস করলেন—আমি যে পঁচিশ টাকা বেশি পাঠালাম, তার জন্যে তিনি খুশী ?

সন্দীপ বললে—তা বুঝলাম না—

—একশো টাকার বদলে একশো পঁচিশ টাকা পেয়ে খুশী হলেন না ?

সন্দীপ বললে—মুখে তো কিছু বললেন না। খুশী নিশ্চয়ই। খুশী না হলে তো কিছু বলতেন—

—আমার বউমা তোমার সামনে এসেছিল ? বউমাকে তুমি দেখলে ?

সন্দীপ কী বলবে বুঝতে পারলে না। বাইরের ঘরে বসে গাঙ্গুলীবাবুর ভেতর বাড়ির অনেক কথাই তো সন্দীপ শুনতে পেয়েছিল। তারপর খিড়কীর দরজা খুলে রাস্তায় বেরিয়ে এসে বিশাখা তার কানে-কানে কী কথা বলেছিল, তা-ও তখন তার মনে ছিল। শুধু মনে থাকা নয়, তখনও যেন তার সামনে, শরীরে মনে কথাগুলো গুন্-গুন্ করে গুঞ্জন করছিল। কেবল মনে হচ্ছিল সে যেন তখনও কানে শুনতে পাচ্ছে—জানো আমার কাকা-কাকীমা তোমাদের বাড়ির ছেলের সঙ্গে আমার বিয়ে দেবে না—

সন্দীপ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল—কেন ? বিয়ে দেবে না কেন ?

—বাঃ, বিয়ে হয়ে গেলে তো তোমাদের বাড়ির গিন্নী আর মাসে-মাসে এত টাকা পাঠাবে না। বিয়ের পর তো এই রকম মাসে-মাসে টাকা পাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে—

—তা বন্ধ তো হয়ে যাবেই—

বিশাখা বলেছিল—টাকা পাওয়া বন্ধ হলে কাকীমা কোন্ টাকা দিয়ে সোনার গয়না গড়াবে ?

এর পরে বিশাখার সঙ্গে আর কোনও কথা হয়নি। সন্দীপ বাসে উঠে বাড়িতে চলে এসেছিল। আর সেই দেখা হয়ে গিয়েছিল বেড়াপোতার গোপালের সঙ্গে। সেই গোপালও কলকাতায় চলে এসেছিল টাকা উপায়ের জন্যে। আর মনসাতলা লেনের তপেশ গাঙ্গুলীবাবুও নিজের ভাই-ঝি'র বিয়ের সংবাদে টাকা উপায়ের পথ খুঁজে পেয়েছিল। তা হলে কলকাতার সব লোকই কি টাকার ধান্দায় ঘুরছে ?

ঠাকমা-মণি আবার জিজ্ঞেস করলেন—কী ভাবছো তুমি ? কথা বলছো না যে ? বউমাকে দেখলে তুমি ? বউমা তোমার সামনে এসেছিল ?

সন্দীপ বললে—হ্যাঁ—

—কী রকম দেখলে তুমি তাকে ?

সন্দীপ বললে—দেখলাম তো ভালো—

—তোমার সঙ্গে বউমার কিছু কথা হলো ?

কী বলবে সন্দীপ এ-প্রশ্নের জবাবে ? শুধু বললে—না—

মিথ্যে কথাটা বলতে গিয়ে কথাগুলো যেন জিভে আটকে গেল।

ঠাকমা-মণি বললেন—আচ্ছা যাও, এর পরের মাসের পয়লা তারিখে যখন যাবে তখন তুমি কথা বলবে, বুঝলে ? বউমা কথা বলুক আর না বলুক তুমি নিজে থেকে কথা বলবে—

সন্দীপ হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বললো—আমি কী কথা বলবো ?

—জিজ্ঞেস করবে বউমা কেমন আছে। বলবে, ঠাকমা-মণি জানতে চেয়েছেন দুধ খাচ্ছে কি না, মাছ-মাংস খাচ্ছে কিনা, ফল-টল কিছু খাচ্ছে কিনা, এই সব। আরো জিজ্ঞেস করবে লেখা-পড়া কেমন শিখছে। সব কথা জিজ্ঞেস করবে তুমি. বুঝলে ? ওই সব কথা যদি জিজ্ঞেস না-ই করবে তাহলে তুমি ও বাড়িতে যাচ্ছো কেন ? শুধু কি টাকা দিতেই যাচ্ছো ? তা তো নয়। টাকা তো মনি-অর্ডার করেও পাঠানো যায়, মনি-অর্ডার করে টাকা না পাঠিয়ে তোমার হাত দিয়ে টাকা পাঠানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে তুমি দেখে আসবে বউমাকে, বউমার সঙ্গে কথা বলবে। সব দরকারী কথা জিজ্ঞেস করবে, সেই জন্যেই তোমাকে পাঠানো—বুঝলে ?

সন্দীপ বাধ্য ছেলের মত মাথা নেড়ে বললে—হ্যাঁ, বুঝেছি—

তারপর মল্লিক-কাকার সঙ্গে আবার তেতলার সিঁড়ি বেয়ে একতলার খাজাঞ্চি-খানায় এসে হাজির হলো। নিজের ঘরে এসে মল্লিক-কাকা বললেন—তুমি কী রকম ছেলে গো ? তুমি শুধু টাকাটা দিলে আর চলে এলে ? কিছু বললে না ?

সন্দীপ অপরাধীর মত চুপ করে রইল। কোনও কথাই বললে না। আসলে বিশাখার সঙ্গে সত্যিই যে-সব কথা হয়েছিল, তা-তো অন্য কাউকে বলা যায় না ?

মল্লিক-কাকা আবার বলতে লাগলেন—এই মাসে-মাসে যে এক কাঁড়ি টাকা পাঠানো হচ্ছে বউমার কাছে তো সে-টাকা কাকে খাচ্ছে, না বকে খাচ্ছে, তা দেখতে হবে না ? এসব কথাও কি তোমাকে বলতে শিখিয়ে দেওয়া হবে ? তোমারও তো নিজস্ব একটা বুদ্ধি আছে—তুমি তো আর ছেলেমানুষটি নও—

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—আমি বিশাখার কাকার সামনে ও সব কথা কী করে জিজ্ঞেস করবো? শুনলে বিশাখার কাকা রেগে যাবে না? আমাকে যদি তারা দুটো কড়া কথা শুনিয়ে দেয়?

মল্লিক-কাকা বললেন—তা কড়া কথা যদি বলেই তো তাহলে কি তোমার গায়ে ফোস্কা পড়বে?

সন্দীপ চুপ করে রইল। তারপর বললে—আমার ভুল হয়ে গেছে—

মল্লিক-কাকা বললেন—না-না, তুমি মনে কিছু কোর না। এ-সব কাজ একটু বুদ্ধি খরচ করে করতে হয়—

মল্লিক-কাকার বেশী কথা বলার সময় ছিল না। তিনি আবার হিসেবের গোলক-ধাঁধার মধ্যে ডুবে গেলেন।

স্কট লেনে কলেজ থেকে বেরিয়ে সন্দীপ আমহার্স্ট স্ট্রীটে এসে পড়লো। এই রাস্তা দিয়ে এসে-এসে রাস্তাগুলো সব মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল তার। এ যেন অনেকটা মানুষের জীবনের মত। জন্মাবার পর একটু জ্ঞান হলেই মানুষ অনেক কিছু দেখে অভ্যস্ত হয়ে যায়। একই সময়ে সূর্য ওঠা, একই সময়ে সূর্য ডোবা, গ্রীষ্মে গরমে ঘামে ভিজে যাওয়া, শীতে কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ায় কাঁপা, এ সব ঘটনা মানুষের মনে কোনও রকম প্রভাব বিস্তার করে না। সমস্ত বিশ্বের তাবৎ নিয়ম নীতিগুলো তার চোখে একঘেয়ে ঠেকে।

কিন্তু কিছু-কিছু লোকের মনে প্রশ্ন জাগে কেন সূর্য ওঠে, কেন সূর্য ডোবে, আবার কেনই বা গ্রীষ্মে সূর্য অত আগুন ঢালে, আর শীতকালেই বা সেই সূর্যের আলো আবার কেনই বা অত মিষ্টি লাগে!

যাঁদের মনে এই প্রশ্ন জাগে তাঁরাই হন কোপারনিকাস, গ্যালিলিও। তাঁরাই হন নিউটন, আবার আইনস্টাইন—

সেদিন সন্দীপের মনে এই প্রশ্নটাই কেবল জাগতো। কেন মনসাতলা লেনের বাড়িতে ঠাকমা-মণি মাসে-মাসে অত টাকা পাঠান? ওই বিশাখার মধ্যে এমন কী সৌন্দর্য দেখছেন ঠাকমা-মণি?

আর ওই সৌম্য? সৌম্য মুখার্জি? ঠাকমা-মণির নাতি?

মানুষের সম্বন্ধেও তেমনি কৌতূহল সন্দীপের। একটা মানুষের সঙ্গে আর একটা মানুষের কেন এত তফাৎ? ঠিক এক রকম মানুষ তো দু'জন হয় না, যতগুলো মানুষ তত রকম স্বভাব। এক স্বভাব কেন দু'জনের হয় না? কেন

বেড়াপোতাতে হাজরা-বুড়োর মত মানুষ একজনও আর ছিল না ? ভৈরব চট্টোপাধ্যায়ের বংশধররা সবাই কেন একরকম নয় ? কেউ উকীল, কেউ বসে-বসে টাকার সুদ খায় ? তার মা যেমন চাটুজ্জে বাড়িতে রান্না করতে যেত, পাড়ার মধ্যে আর কারো মা তো পরের বাড়িতে রান্না করতে যেত না।

আর এই যে বারোর এ নম্বর বিডন স্ট্রীটের বাড়িতে যারা থাকে, তারা কেন এত চাকর-বাকর পোষে ?

সেদিন সন্দীপ হঠাৎ খোকাবাবুকে দেখে ফেললে। অত বড় বাড়িটায় রং করা হচ্ছিল। রাজমিস্ত্রীরা বাঁশের ভারা বেঁধে তার ওপর বসে বাড়িটার চেহারা ফিরিয়ে দিচ্ছে। এটা প্রতি বছরে একবার করে করা হয়।

সন্দীপ বাইরে থেকে বাড়ির গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকছিল, পাশে কে একজন দাঁড়িয়ে বোধহয় রাজমিস্ত্রীদের কাজের তদারক করছিল তখন।

সন্দীপকে দেখেই জিজ্ঞেস করলে—কে যায় ? কে ভেতরে যায় ? কে আপনি।

সন্দীপ থমকে দাঁড়ালো। ভদ্রলোককে ভালো করে দেখলে। তারপর বললে—আমি সন্দীপ—

সন্দীপ ! ভদ্রলোক চিনতে পারলেন না। বললে—সন্দীপ ? সন্দীপ মানে ?

গিরিধারী দারোয়ান এগিয়ে এসে বললে—হুজুর, ইনি সরকার মশাইয়ের লোক—

সেই-ই বলতে গেলে খোকাবাবুর সঙ্গে সন্দীপের প্রথম পরিচয়। শুধু প্রথম পরিচয়ই নয়, বলতে গেলে সেই-ই প্রথম মুখোমুখি দেখা।

সন্দীপ বলে উঠলো—আমার পুরো নাম সন্দীপকুমার লাহিড়ী। আমি মল্লিক মশাই-এর কাজকর্ম দেখি আর রাত্তিরে বঙ্গবাসী কলেজে বি. এ. পড়ি. আর মল্লিক-মশাই-এর সঙ্গে থাকি—

—ও—

সন্দীপ ভালো করে দেখে বুঝতে পারলে খোকাবাবুকে সত্যিই সুদর্শন মানুষ বলা চলে। এর সঙ্গে মনসাতলা লেনের বিশাখার বিয়ে হলে সত্যিই ভালোই মানাবে। এমন চমৎকার চেহারার লোক আগে আর কখনও দেখেনি সন্দীপ।

—আপনার দেশ কোথায় ?

সন্দীপ বললে—বেড়াপোতা গ্রামের নাম শুনেছেন ?

—হ্যাঁ।

—বাড়িতে কে-কে আছে আপনার ?

সন্দীপ বললে—আমার এক মা ছাড়া আর কেউ নেই। ছোটবেলায় আমার বাবা মারা গেছেন। আমি বাবাকে দেখিনি।

সৌম্যবাবু আবার জিজ্ঞেস করলেন—বাড়ির অবস্থা ভালো ?

সন্দীপ বললে—আমার মা খুব গরীব, আমাদের গ্রামে চ্যাটার্জি বাড়িতে মা রান্না করে আমাকে লেখা-পড়া করিয়েছে—

—ও—

বলে কী যেন ভাবলেন। তারপর অন্যদিকে চেয়ে আবার রাজমিস্ত্রীদের কাজ দেখতে লাগলেন। কিন্তু সন্দীপ চলে আসার পরেই হঠাৎ আবার জিজ্ঞেস করলেন—

আর একটা কথা শুনুন—

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—আমাকে ডাকছেন?

—হ্যাঁ আপনার নামটা কী বললেন?

—সন্দীপকুমার লাহিড়ী—

সন্দীপ আর সেখানে দাঁড়ালো না। এই এঁরই সঙ্গে বিয়ে হবে মনসাতলা লেনের বিশাখার। যে বিশাখার কাকাকে সন্দীপ মাসোহারা দিয়ে এসেছিল এই সেদিন! এর বিয়ের জন্যেই ঠাকমা-মণির এত দুশ্চিন্তা। এত গুরুদেব ভক্তি, এত টাকা-পয়সা খরচ, এত গঙ্গাস্নান! এই সব ভবিষ্যৎ ভেবেই ঠাকমা-মণির এত উদ্বেগ! এই যা কিছু সম্পত্তি সমস্তরই মালিক এই মানুষটা!

সন্দীপের যেন বিশ্বাসই হচ্ছিল না। যে বিশাখাকে সে খিদিরপুরে গিয়ে টাকা দিয়ে এসেছে, যে বিশাখা তার কানে-কানে বলেছে যে তার কাকা এ বিয়ে হতে দেবে না, সেই বিশাখার সঙ্গে এরই বিয়ে হবে। কথাগুলো ভাবতে-ভাবতে সন্দীপ যেন ভাবনার সমুদ্রে হাবু-ডাবু খেতে লাগলো! সে যদি বেড়াপোতা থেকে এই কলকাতায় না আসতো তাহলে তো এই জিনিস দেখতে পেত না। এতদিন সন্দীপ কলকাতায় এসেছে কিন্তু এই সৌম্য মুখার্জি'র মত এত সুপুরুষ চেহারা তো সন্দীপ আর কাউকে দেখতে পায়নি।

মল্লিক-মশাই তখন বাড়ির চাকর-বাকরদের কাছ থেকে হিসেব বুঝে নিচ্ছিলেন। যে কন্দর্প পুজো-বাড়িতে ঠাকুরের ফুল-বেলপাতা যোগায়, যে দশরথ গঙ্গার বাবুঘাটে ঠাকমা-মণির কপালে চন্দনের ফোঁটা লাগিয়ে দেয়, যে-কামিনী ঠাকুরবাড়ির মেঝে ঝাড় পোঁছ করে গঙ্গাজল দিয়ে যায়, যাদের সকলের দাবী, তাদের সকলের নালিশ রোজই কিছু না কিছু তাঁকে শুনতে হয়। তাদের দাবী যেমন কিছু কিছু মেনে নিতে হয় মল্লিক-মশাইকে, তেমনি আবার তাদের বহু অভিযোগেরও প্রতিকার করতে হয়, কারো মাইনে বাড়াবার দাবী, কারো নালিশের তদন্ত, কারো অসুখের চিকিৎসার ব্যবস্থা। তার ওপর আবার বাড়ি মেরামতের দরুন যথাবিধি চুন-সুরকি-সিমেণ্টের যোগানের ব্যবস্থা করতে হয় তাঁকেই।

সন্দীপ ঘরের একপাশে দাঁড়িয়ে তাই-ই দেখছিল। মল্লিক-মশাইকে কথাগুলো বলবার জন্য একটু সুযোগ খুঁজছিল। যে-মালিকের বিয়ের ব্যাপারে মল্লিক-কাকার এত হেনস্থা, যার বিয়ের ব্যাপারে মল্লিক-কাকাকে কাশীধামে গিয়ে ঠাকমা-মণির গুরুদেবকে কলকাতায় নিয়ে আসবার আর আবার তাঁকে কাশীধামে পৌঁছিয়ে দেবার পরিশ্রম করতে হয়েছিল, সেই সৌম্য মুখার্জি'কে যে সন্দীপ দেখেছে সেই সংবাদটা তাঁকে বলতে ইচ্ছে করছিল।

কিন্তু সকালবেলাটা মল্লিক-কাকার এই রকম ব্যস্ততার মধ্যে কাটে! আর হঠাৎ তাঁর অমনোযোগিতার ফলে যদি কোথাও কিছু ত্রুটি থেকে যায় তো তার জন্যে তো ঠাকমা-মণির কাছে তাঁকেই জবাবদিহি করতে হবে!

সন্দীপ অনেকক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো। এ-সব নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা দেখে-দেখে তার চোখ অভ্যস্থ হয়ে গিয়েছিল। এ বাড়িতে এতদিন একটানা থাকার পর সন্দীপ দেখে বুঝে নিয়েছিল যে যারাই মল্লিক-মশাই-এর কাছে আসে তাদের সঙ্গে মল্লিক-মশাই-এর মাত্র একটাই সম্পর্ক ছিল—আর সে সম্পর্কটা

হলো টাকার। বোধ হয় টাকার শেকল দিয়েই আষ্টে-পৃষ্ঠে সকলের সঙ্গে সকলের গাটছড়া বাঁধা ছিল। আর তখনই সন্দীপ বুঝে নিয়েছিল যে পৃথিবীর তাবৎ মানুষের সঙ্গে তাবৎ মানুষের সম্পর্কের যোগসূত্রটাই হচ্ছে টাকা। আর এই যে সে বেড়াপোতার গ্রাম থেকে বারোর-এ বিডন স্ট্রীটের মুখার্জি বাড়িতে এসেছে আর থাকা-খাওয়া পাচ্ছে এর পেছনেও সেই টাকা। আর শুধু সে-ই নয়, পৃথিবীর সব ছেলে-মেয়েই পরস্পরের সঙ্গে টাকা দিয়েই বাঁধা। নইলে বিশাখার সঙ্গে এ-বাড়ির সৌম্যর কেন বিয়ে হচ্ছে? বিশাখার বিধবা মা তো জানতেও চায়নি যে যার সঙ্গে তার একমাত্র মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে, সে কেমন মানুষ, সে কেমন দেখতে! জামাইকে যোগমায়া দেবী তো দেখতে চায়ও নি। আর দেখা দূরের কথা, দেখতে চাওয়ার অধিকারও হয়ত তার নেই। শুধু এইটুকু জেনেই তাকে খুশী থাকতে হয়েছিল যে ভাবী জামাই-এর অনেক টাকা আছে, আর সেই টাকা থাকাটাই তার সবচেয়ে বড় গুণ। পাত্রের চেহারা কেমন, পাত্রের চরিত্র কেমন, পাত্রের ঠিক বয়েস কত, তা আমার জানবার দরকারও নেই। আমি শুধু এইটুকুই জানতে চাই যে, যে-বাড়িতে, যে-বংশে আমার বিশাখার বিয়ে হবে, সে-বাড়ির বউ হবার পর আমার মেয়ের যেন কখনও অর্থকষ্ট না থাকে। যেন আমার মেয়ে স্বচ্ছলভাবে খেতে-পরতে পায়।

সন্দীপের মনে তখন থেকেই একটা প্রশ্নচিহ্ন বরাবর চোখের সামনে ভাসতো। সেই প্রশ্নচিহ্নটা কেবল তাকে শাসাতো। বলতো—তুমিও এ-বাড়ির অন্য সকলের মত আরো একটা চাকর। তোমার এ-সব জানতে চাওয়ার অধিকার নেই, এ-বাড়ির নাতির সঙ্গে যারই বিয়ে হোক, তাতে তোমার কোনও কৌতূহল থাকা অন্যায়। তোমার কাজ শুধু হুকুম তামিল করা। তুমি শুধু চোখ-মুখ বুঁজে হুকুম তামিল করে যাবে, এইটেই তোমার কপালের লিখন।

কাজের ভিড়ের মধ্যে মল্লিক-মশাইকে প্রশ্নটা করার সুযোগ হলো না। কিন্তু মনের ভেতরে প্রশ্নটা কেবল খোঁচা দিতে লাগলো। সুযোগ মিললো বিকেলের দিকে যখন মল্লিক-কাকা একলা বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। সারা দিনের পরিশ্রমের পর মল্লিক-মশাই তখন বোধহয় ক্লান্ত ছিলেন। সন্দীপ তাঁর সামনে বসে জিজ্ঞেস করলে --মল্লিক-কাকা, সারা বাড়িতে খুব রাজমিস্ত্রী খাটছে কেন?

মল্লিক-কাকা বললেন—এ তো ফি বছরেই হয়। এ-বাড়ির বরাবরের নিয়ম এই।

—এতে তো অনেক টাকা খরচা হয়?

মল্লিক-কাকা বললেন -তা-তো হয়ই। টাকা তো খরচ করবার জন্যেই তৈরি হয়েছে।

সন্দীপ বললে—টাকা থাকলেই কি নষ্ট করতে হবে?

মল্লিক-কাকা বললেন—কে তোমাকে বললে এতে টাকা নষ্ট হয়?

সন্দীপ বললে—বাড়িটা তো নতুনই ছিল, পাঁচ বছর পরে রাজমিস্ত্রী লাগালেই হতো। তাহলে এতগুলো টাকাও বেঁচে যেত।

মল্লিক-কাকা কথাটা শুনে হাসলেন। বললেন—দেখো সন্দীপ, তুমি ছেলে-মানুষ বলেই ও-কথা বললে। যখন তোমার আমার বয়েস হবে তখন বুঝতে পারবে অনেক সময় টাকা খরচ করলেই অনেক টাকা লাভ, এই মুখুজ্জে-বাড়ির এত টাকা যে, এরা যত টাকা নষ্ট করবে তত এদের লাভ হবে।

—তার মানে? টাকা নষ্ট করলে আবার টাকা লাভ হবে কী করে?

—সে সব এখন তুমি বুঝবে না।

—কবে বুঝবো?

মল্লিক-কাকা বললেন—তুমি যখন আরো বড় হবে, যখন সংসারে ঢুকবে, তখন জানতে পারবে 'ইনকাম-ট্যাক্স' বলে আমাদের দেশে একটা জিনিস আছে। সেই 'ইনকাম-ট্যাক্সের' আইনে যত তুমি টাকা খরচ করবে, যত তুমি মদ খাবে, যত টাকা ওড়াবে, তত তুমি গভর্মেণ্টর কাছ থেকে 'ট্যাক্সো'র সুবিধে পাবে, তত তুমি ট্যাক্সো থেকে রেহাই পাবে। রেহাই পাওয়া মানেই লাভ! কথাটা বুঝলে?

সন্দীপ কিছুই বুঝতে পারলে না। বোকার মত চেয়ে রইল মল্লিক-কাকার দিকে। এবার হঠাৎ মনে পড়লো কথাটা। সন্দীপ বললে- মল্লিক-কাকা, আজকে এতদিন পরে এ-বাড়ির খোকাবাবুকে দেখলাম—সৌম্যবাবুকে—

—কোথায়?

—এই যে বাড়িটায় রং লাগানো হচ্ছে, তার সামনে দাঁড়িয়ে মিস্ত্রীদের কাজের তদারকি করছিলেন। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন আমি কে?

—তুমি কী বললে?

সন্দীপ বললে—আমি সব কথা বললুম! আচ্ছা কাকা, এবার খিদিরপুরের মনসাতলা লেনের যে মেয়েটির কাকাকে টাকা দিয়ে এলুম, তার সঙ্গেই বুঝি এর বিয়ে হবে? ভারি চমৎকার দেখতে কিন্তু সৌম্যবাবুকে। দু'জন খুব মানাবে—

কথাগুলো শুনে মল্লিক-কাকা খুশী হতে পারলেন না। বললেন—তুমি ও-সব ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাও কেন? কার সঙ্গে কার বিয়ে হলে কেমন মানাবে, কি মানাবে না, তোমার ও-সব ভেবে লাভ কী?

সন্দীপ বললে—আমি ভাবছি না, শুধু বলছি আপনাকে—

—না, তোমাকে ও-সব কথা বলতেও হবে না আলোচনাও করতে হবে না—

কথাটা বলতে-বলতে মাঝপথে বাধা পড়লো। রাজমিস্ত্রী ঘরে ঢুকে বললে—সরকারবাবু, আরো চার বস্তা সিমেণ্ট চাই।

মিস্ত্রী আরো কী সব কাজের কথা বলতে লাগলো। কিন্তু সন্দীপের সে-সব কথা শুনতে ভালো লাগলো না। সে ঘর ছেড়ে অন্য ঘরে চলে গেল। তার চোখের সামনে তখনও ভাসতে লাগলো সৌম্য মুখার্জি'র চেহারাটা। মানুষ এত সুন্দরও হয়?

কলেজ থেকে সেদিন ঠিক সময়েই ফিরে এসেছিল সন্দীপ, কলেজেও সমস্তক্ষণ কেবল তার মনে পড়ছিল সৌম্য মুখার্জি'র চেহারাখানা। সেদিন গোপালের চেহারা দেখে যেমন হয়েছিল, এও তেমনি। অথচ কত বন্ধু হয়েছিল তার কলেজে ঢুকে।

কত রকমের ছেলে সব। বেশির ভাগই চাকরি করে। দিনের বেলা চাকরি, আর রাত্রে কলেজে পড়ে। কিন্তু তাদের সঙ্গে বেশি কথা বলবার সময় থাকে না। বিডন স্ট্রীটের বাড়িতে রাত ন'টার আগে ফিরতে হয়, নইলে গিরিধারী লোহার গেট বন্ধ করে দেবে।

মল্লিক-কাকা বলেন—আর একটু আগে আসতে পারো না? তোমার জন্যে খাবার ঢেকে রাখতে হয়—

সন্দীপ বলে—তাহলে যে ট্রামে কি বাসে আসতে হয়, মিছিমিছি পয়সা নষ্ট করতে ভালো লাগে না।

কথাটা যুক্তিসঙ্গত। সন্দীপ স্কট লেন থেকে প্রায় দৌড়তে-দৌড়তে আসে। আমহার্স্ট স্ট্রীট ধরে এলে অনেক সময় বাঁচে। আমহার্স্ট স্ট্রীটের ফুটপাত দিয়ে হেঁটে আসতে-আসতে দোকানের ঘড়িগুলোর দিকে চেয়ে দেখে সে। ঘড়ির কাঁটাটা যত ন'টার দিকে যেতে থাকে তত হাঁটার গতির বেগ বাড়িয়ে দেয়। তারপরে বাড়ির গেট পেরিয়ে ভেতরের উঠোনে ঢুকে একটা স্বস্তির দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে।

গিরিধারী বলে—এসে গেছেন বাবুজী?

সন্দীপের সঙ্গে-সঙ্গে যেন গিরিধারীও স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ে। ততক্ষণে সিংহ-বাহিনীর মন্দিরে নিত্যপুজো শেষ হয়ে গেছে। তারপরই খাওয়া। খেতে বেশি সময় লাগে না। কিন্তু তারপরে আর ঘুম আসে না। আলো নিভিয়ে দিয়ে মল্লিক-মশাই শুয়ে পড়েন। সন্দীপও সেই একই ঘরে শোয়। খানিক পরে মল্লিক-কাকার নাক ডাকার শব্দ হয়। কিন্তু সন্দীপের তখনও ঘুম আসতে চায় না। তখন সারা পৃথিবীর রাজ্যের ভাবনা মাথায় চেপে বসে। কখনও মনে পড়ে মা'র কথা। মা বোধহয় এতক্ষণে চাটুজ্জে বাড়ি থেকে ভাত এনে খেয়ে-দেয়ে বাসন-কোসন মেজে বিছানায় শুয়ে পড়েছে।

ওপর থেকে হঠাৎ ঠাকমা-মণির গলার আওয়াজ আসে—গিরিধারী, গেট বন্ধ করে দাও।

আর তারপর লোহার গেট বন্ধ করার ঘড়ঘড় শব্দ। সমস্ত বাড়িটা তখন নিঝুম, নিঃস্তব্ধ হয়ে আসে। তখন সন্দীপের মনে হয় কারোর ইঙ্গিতে যেন এত বড় বাড়িটা একটা মৃত্যুপুরীতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। সে চুপ করে শুয়ে থাকে। তারপর আর কতক্ষণ কেটে যায় কে জানে। হয়ত ঘড়িতে তখন রাত দশটা কি এগারোটা বাজে। ঠিক সেই সময়ে লোহার গেটটা খোলার শব্দ হয় আবার।

সেদিনও আবার সেই একই রকম শব্দ হলো। কিন্তু সেদিন আর সন্দীপ চুপ করে বিছানায় শুয়ে থাকতে পারলো না। পাশেই মল্লিক-কাকার নাক ডাকছে। সে টিপি-টিপি পায়ে বিছানা ছেড়ে উঠলো। তারপর আস্তে-আস্তে দরজার খিল খুলে বাইরে এসে দাঁড়ালো। চারদিক অন্ধকার। দেখলে বাইরের গ্যারেজ-এর দরজা খুলে গিরিধারী একটা গাড়ি ঠেলতে-ঠেলতে গেট-এর বাইরের রাস্তায় বার করে নিয়ে গেল। পাশেই সৌম্যবাবু শার্ট-প্যাণ্ট পরে দাঁড়িয়েছিল। গাড়িটা রাস্তায় বেরোতেই সৌম্যবাবু গাড়িটার ভেতরে গিয়ে বসলো। আর গাড়িটাকে সৌম্যবাবু চালিয়ে নিয়ে চলে গেল—এমন করে চালিয়ে নিয়ে গেল যাতে বেশী শব্দ না হয়!

গিরিধারী আবার গেট বন্ধ করতে যাচ্ছিল, কিন্তু সন্দীপকে দেখে কেমন যেন চমকে উঠলো। সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—গিরিধারী—

গিরিধারী বললে—আপনি সব দেখেছেন নাকি বাবুজী ?

সন্দীপ বললে—ও কে গিরিধারী ? খোকাবাবু গেলেন না ?

গিরিধারী বললে—আপনি এখনও ঘুমোন নি ?

সন্দীপ বললে—আমি তো ঘুমোচ্ছিলুম, কিন্তু হঠাৎ তোমার গেট খোলার শব্দ পেয়েই উঠে পড়লুম।

গিরিধারী আবার গেটটা নিঃশব্দে বন্ধ করে চাবি বন্ধ করে দিলে। বললে—কাউকে যেন বলবেন না বাবুজী। সরকারবাবু যেন জানতে না পারেন—

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—এত রাত্তিরে সৌম্যবাবু কোথায় গেলেন ?

অন্ধকারের মধ্যেই সন্দীপ দেখলে, ভয়ে যেন গিরিধারীর মুখটা শুকিয়ে গিয়েছে। সন্দীপ আবার জিজ্ঞেস করলে—বলো না গিরিধারী, খোকাবাবু এত রাত্তিতে গেলেন কোথায় ?

গিরিধারী ভয় পেয়ে কথার জবাবটা যেন এড়িয়ে যেতে চাইলো। যেন একটা মহা অপরাধ করে ফেলেছে, এমনি তার মুখের চেহারা। সন্দীপ বললে—ঠাকমা-মণি তো রোজ ন'টার সময় তোমাকে দরজা বন্ধ করতে হুকুম করেন ?

গিরিধারী বললে—কী করবো বাবুজী, আমি তো হুকুম কা নোকর, মাঈজী তো ন'টার সময় গেট বন্ধ করবার হুকুম করেন, কিন্তু খোকাবাবু ? খোকাবাবু ভি তো হামার মালিক ! খোকাবাবু হুকুম করলে কি তামিল না করে থাকতে পারি ? উও দোনো হি তো মেরা মালিক—

এর কোনও জবাব সন্দীপের মুখে যোগালো না। আর কী ই বা জবাব ছিল সন্দীপের ? সন্দীপের নিজের অবস্থাটাও আর ওই গিরিধারীর মতই। ঠাকমা-মণিও তার মালিক, আর সৌম্যবাবুও তার মালিক। যেদিন ঠাকমা-মণি থাকবে না তখন তো এই সমস্ত সম্পত্তির মালিক হবে ওই খোকাবাবুই, ওই সৌম্য মুখার্জি'ই। ওই যার সঙ্গে খিদিরপুরের বিশাখার বিয়ের সম্বন্ধ পাকা হয়ে গেছে। তখন ? তখন কী হবে ? তখনকার কথা ভেবেই তো কাজ করতে হবে গিরিধারীকে। শুধু গিরিধারীকেই নয়, সন্দীপকেও তার ভবিষ্যতের কথা ভেবেই তো এখন থেকে কাজ করতে হবে।

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—এখন তো সৌম্যবাবু গেলেন, তা ফিরবেন কখন ?

গিরিধারী বললে—তা কি বাবুজী হামি বলতে পারি ? রাত তিন বাজতেও পারে, কভি-কভি রাত চারটেও বাজতে পারে !

—তাহলে তো তোমাকে পুরো রাতই জেগে থাকতে হয় ?

—তা-তো হয়ই বাবুজী ! লেকিন হামি কী করবো ? আসলি তো হামি লোগ নোকর আছি মালিক কা—

সন্দীপের কৌতূহল আরো বেড়ে গেল। জিজ্ঞেস করলে রাত্তিরে কোথায় যান খোকাবাবু ?

গিরিধারী বললে—খোদা মালুম বাবুজী, খোকাবাবু কোথায় যান—

তা-তো বটেই ! সন্দীপের মনে হলো—সত্যিই তো, খোকাবাবু কোথায় যান

তা গিরিধারী কেমন করে জানবে ! গিরিধারী তো একজন চাকর মাত্র। আর সন্দীপ নিজেও তো একজন চাকর ছাড়া আর কিছুই নয়।

তবু কৌতূহল কি এত সহজে যায় ? বিছানায় শুয়ে-শুয়েও সন্দীপের মনে হতে লাগলো—এত রাত্রে কোথায় যায় সৌম্যবাবু ? রাত্রে তার কী এত কাজ ? এমন কী কাজ থাকতে পারে যাতে ঠাকুমা-মণিকে লুকিয়ে, কাউকে না জানিয়ে, এত বড়লোকের বাড়ির ছেলে রাত দুপুরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় আর রাত কাবার করে সকাল হবার আগেই লুকিয়ে-লুকিয়ে বাড়িতে ফেরে ? কোথায় যায় সৌম্যবাবু ? যায় কোথায় ? যেখানে যায় সেখানে কীসের আকর্ষণ আছে ? টাকার না মেয়েমানুষের ? কে সন্দীপের এই কৌতূহলের জবাব দেবে ?
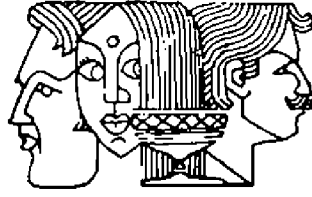
তার পরদিন থেকেই সন্দীপের কেমন যেন এক ধরনের অন্যায় কৌতূহল সারা মনে পরিব্যাপ্ত হয়ে রইল। তাহলে এই-ই হলো খোকাবাবু ! অর্থাৎ এরই নাম সৌম্য। সৌম্য মুখার্জি। মুখার্জি-স্যাকসবি ইন্ডিয়া লিমিটেডের একজন ডাইরেক্টর। এরই বিয়ের জন্যে ঠাকুমা-মণি খিদিরপুর মনসাতলা লেনে পাত্রী পছন্দ করে রেখেছেন ! এরই জন্যে পছন্দ করা পাত্রীকে এত বছর ধরে মাসোহারা টাকা মাসে-মাসে দিয়ে আসছেন ঠাকুমা-মণি !

কেমন যেন খট্‌কা লাগলো সন্দীপের মনে। এই-ই যদি পাত্র হয় তো এ কী-রকম পাত্র ! বাড়ির আইন তো এই যে এ-বাড়িতে রাত ন'টার পর কেউই এ-বাড়িতে ঢুকতেও পারবে না, আবার কেউ এ-বাড়ি থেকে বাইরে বেরোতেও পারবে না। তাহলে ?

যদি এত রাত্রে কেউ এ-বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়, তাহলে এ খবরটা কি ঠাকুমা-মণি জানে ? নাকি ঠাকুমা-মণিকে জানিয়েই বাইরে যায় খোকাবাবু ! বাইরে গেলে কেন বেরোবার সময় গাড়ির শব্দ হয় না ? কেন গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ করে সেটাকে ঠেলে রাস্তায় নিয়ে যাওয়া হয় ?

তাহলে গিরিধারী নিশ্চয়ই সব জানে ! গিরিধারী তো আজ্ঞাবহ চাকর। তার কাছে ঠাকুমা-মণি যেমন মালিক, তেমনি খোকাবাবুও তো তার একজন মালিক। সে কী করে খোকাবাবুর হুকুম অমান্য করে ?

পর-পর কদিনই সন্দীপ এই ঘটনা লক্ষ্য করলে ! মল্লিককাকা যখন বিছানায় শুয়ে নাক ডাকায় তখন সন্দীপ বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে। প্রতি রাত্রেই সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ! প্রতি রাত্রেই সেই অন্ধকারের মধ্যে গিরিধারীর গেট খুলে দেওয়া, তারপর সেই গাড়িটা ঠেলে রাস্তায় পৌঁছিয়ে দেওয়া আর প্রতি রাত্রেই সৌম্যবাবুর সেই গাড়িতে উঠে ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে ধোঁয়া উড়িয়ে চলে যাওয়া।

অথচ সন্দীপ যখন কলেজ থেকে বাড়িতে ফেরে গিরিধারী ~~তখন কত~~ বিনয়ী, কত ভদ্র। যেন ভাজা মাছও উল্টে খেতে জানে না।

বলে—রাম-রাম বাবুজী, রাম-রাম—

সন্দীপও জবাবে বলে—রাম-রাম গিরিধারী, রাম-রাম—

যে গিরিধারী রাত্রে ঘুষ খেয়ে বেআইনী কাজ করে, সকালবেলা তাকে দেখে বোঝাও যায় না যে সে অত গর্হিত অপরাধে অপরাধী। তার মুখে সে-অপরাধের কোনও চিহ্নও থাকে না। সে তখন স্নান করে কাচা কাপড় পরে শুদ্ধ হয়ে তার নিজের কোঠরে বসে তুলসীদাসের 'রামচরিতমানস' পড়ে। সে সুর করে পড়ে—

সীয়ারামময় সব জগ জানি
করহু প্রণাম জোরি যুগ পাণি।

তার গলার সুরে তখন সে কী ভক্তি, সে কী আর্তি! সে যেন তখন ভক্তিতে গদ্‌গদ্ হয়ে কেঁদেই ফেলবে। অথচ রাত্রিবেলাই তার আবার অন্য রূপ। অন্য চেহারা। সে তখন আবার অন্য মানুষ!

সেদিন এক কাণ্ড হয়ে গেল।

সন্দীপ কলেজ থেকে বেরিয়ে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে আসছিল। ন'টার মধ্যে যাতে বিডন্ স্ট্রীটের বাড়িতে পৌঁছতে পারে, তার জন্যেই তার খুব দুশ্চিন্তা ছিল। হঠাৎ আমহার্স্ট স্ট্রীটের কাছে আসতেই চারদিকে হৈ-চৈ শব্দ শুনে সে চমকে উঠলো। রাস্তার ওপরেই অনেক লোকের ভিড়। আশে-পাশে পুলিস লাঠি নিয়ে সকলকে তাড়া করছে। পুলিসের তাড়া খেয়ে একদল ছেলে একদিকে পালাচ্ছে, আর ঠিক তখনই অন্যদিক থেকে আর একদল ছেলে এসে পুলিসের ওপর ঢিল ছুঁড়ছে। একদিকে পুলিস আর অন্য দিকে ছেলের দল। এদের মধ্যে পড়ে গিয়ে সন্দীপ দিশেহারা হয়ে পড়লো। সে রাত ন'টার আগে কী করে বাড়ি ফিরবে? যদি গেট বন্ধ হয়ে যায়? যদি সে বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য হয়? সে কী খাবে? সে কোথায় শোবে? কলকাতা শহরে তার তো এমন কোনও জানা-শোনা বন্ধুর বাড়ি নেই যেখানে গিয়ে সে রাত কাটাতে পারে! তার কাছে কিছু খুচরা পয়সা ছাড়া আর কিছু নেই। রাত্রে খুঁজলে হয়ত কিছু চায়ের দোকান কি পাঞ্জাবীদের হোটেল খোলা পাওয়া যেতেও পারে। কিন্তু দু'তিন টাকা পকেটে না থাকলে সে কোন্ মুখে সেখানে ঢুকবে!

একটা লোক পাশ দিয়ে ছুটে পালাচ্ছিল, তাকে লক্ষ্য করে সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—কী হয়েছে মশাই এখানে?

লোকটা ছুটতে-ছুটতেই বললে—পালিয়ে যান, এখখুনি পুলিস গুলি চালাবে—

কেন পুলিস গুলি চালাবে, তা বললে না লোকটা। কথাটা বলেই লোকটা মুহূর্তের মধ্যে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল। এদিকে-ওদিকে আরো কিছু মানুষের দৌড়োদৌড়ি-হুড়োহুড়ি দেখে সন্দীপেরও কেমন ভয় করতে লাগলো! তাহলে কি আমহার্স্ট স্ট্রীট ছেড়ে সে অন্য রাস্তা দিয়ে যাবে? আশেপাশে উত্তর দিকে যাবার অনেক গলি-ঘুঁজি আছে, সে দেখেছে। কোনও গলিতে সে ঢুকবে নাকি?

কিন্তু এই অন্ধকার রাত্রে অচেনা-অজানা গলিতে ঢুকে যদি সে বিপদে পড়ে, তখন কী হবে? বড় রাস্তায় তবু সব কিছু দেখতে পাচ্ছে সে। সামনে-পেছনে অনেক মানুষ, অনেক ট্রাম-বাসের ভিড়। তার কিছু বিপদ হলেও কেউ-না-কেউ

তাকে বাঁচাতে আসতেও পারে! কিন্তু অন্ধকার বাঁকা-চোরা গলিতে কেউ যদি তাকে খুনও করে যায় তো কে তাকে দেখবে? কেউ দেখবার আগেই তো সে মরে ভূত হয়ে যাবে। তাহলে?

সন্দীপ ঠিক করলে, না, ও-পথে সে যাবে না। শেয়ালদা দিয়ে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রোড দিয়েও বিডন স্ট্রীট-এ যাওয়া যায়। আবার কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট দিয়েও যাওয়া যায়। কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট দিয়ে যাওয়াই ভালো।

হঠাৎ কোথায় বন্দুকের গুলি ছোঁড়ার শব্দ হলো। আর কোথাও বিকট শব্দ হলে যেমন পায়রার ঝাঁক ঝট্-পট্ করে পাখা উড়িয়ে যে যেদিকে পারে পালাতে শুরু করে, রাস্তায় যে-ক'টা মানুষ তখনও যাতায়াত করছিল তারা আর দেরি করলে না, যে যেদিকে রাস্তা পেলে সেইদিকেই ছুটে পালালো। মহাত্মা গান্ধী রোডে তখন আর ট্রাম-বাস কিছু চলছে না। সামনে-পেছনে, উত্তরে-দক্ষিণে কেউ কোথাও নেই। যে-ক'টা সোনার গয়নার দোকান অত রাত্রেও খোলা থাকে, তা-ও গণ্ডগোলের আভাস পেয়ে দোকানের ঝাঁপ ফেলে দিয়েছে। চারদিকের আবহাওয়া দেখে সন্দীপ খুব ভয় পেয়ে গেল! রাত ন'টার আগে সে বাড়িতে পৌঁছতে পারবে না। যদি রাত ন'টার আগে তাকে বাড়ি পৌঁছতেই হয় তো একটা ট্যাক্সি ধরতে হবে। কিন্তু ট্যাক্সি ভাড়ার টাকা কোথায় পাবে? অন্ততঃ চার টাকা কি পাঁচ টাকা তো লাগবেই। হয়ত তার বেশিও লাগতে পারে! সে টাকা সে কোথা থেকে দেবে?

অন্য উপায় না পেয়ে পায়ে হেঁটে মহাত্মা গান্ধী রোড ধরে সোজা কলেজ স্ট্রীটের দিকে চলতে লাগলো। সেখান থেকে বিডন্ স্ট্রীটের দিকে যেতে অন্ততঃ কম করেও কুড়ি মিনিট সময় তো লাগবে! তখনও সমস্ত রাস্তা আতঙ্কে থম্‌থম্ করছে। জন-প্রাণী কম। বলতে গেলে সব রাস্তাতেই লোক চলাচল কমে এসেছে। একটু পরেই একেবারে নির্জন হয়ে যাবে রাস্তাটা। তার আগেই তাকে গিয়ে পৌঁছতে হবে বিডন্ স্ট্রীটের বাড়িতে।

কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে করপোরেশনের বাজারটার সামনে আসতেই একজন লোক তার সামনে এসে জিজ্ঞেস করলে—হ্যাঁ মশাই, ওদিকে কী হয়েছে বলতে পারেন?

সন্দীপ বললে—কী হয়েছে বলতে পারি না, তবে শুনলুম পুলিসের সঙ্গে মারামারি হচ্ছে—

লোকটা বুঝতে পারলে না। জিজ্ঞেস করলে—কী নিয়ে মারামারি হচ্ছে?

সন্দীপ বললে—তা জানি না। তবে ওদিকে না-যাওয়াই ভালো। পুলিস গুলি ছুঁড়তে পারে।

—কেন? কী হয়েছে?

কে একজন লোক পেছন থেকে বলে উঠলো—সরকারী বাসে একটা ছোট ছেলে চাপা পড়েছে, তাই পাড়ার ছেলেরা রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছিল। সেই খবর পেয়েই পুলিস এসেছিল—

—তারপর?

—তারপর গাড়ি-ঘোড়া সব বন্ধ!

যে-ভদ্রলোক শেয়ালদার দিকে যাচ্ছিল, এ-কথা শুনে সে আর ওদিকে যাওয়ার চেষ্টা করলে না। বললে—তাহলে আবার হাওড়াতেই ফিরে যাই—

পেছনের ভদ্রলোক বললে—আরে মশাই, অত ভয় করলে কি আর চলে। কলকাতায় বাস করতে গেলে ও-রকম খুন-জখম তো লেগেই থাকবেই, তা বলে কি লোকে হাত-পা গুটিয়ে বাড়িতে বসে থাকবে? চোর-ডাকাত-সাধু-মোহান্ত সব কিছু নিয়েই তো এই কলকাতা।

কথাটা বলে লোকটা নিজের কাজে চলে গেল। আর যে-লোকটা প্রথম প্রশ্নটা করেছিল সে তার পরে কী করলে, তা আর দেখা হলো না। এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে, তার ওপর যদি আবার সকলের সব কথা শুনতে হয়, তাহলে তো আর কারোর কোনও কাজ-কর্মই করা চলে না।

সন্দীপ সোজা কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট ধরে উত্তর দিকে চলতে লাগলো। আজ যেন বড় তাড়াতাড়ি রাত গভীর হয়ে গেছে। বড় তাড়াতাড়ি যেন রাতটা নিশুতি এসে গেছে। সন্দীপ তাড়াতাড়ি চলতে লাগলো সামনের রাস্তা ধরে।

হঠাৎ পাশ থেকে একটা গাড়ি তার কাছে এসে দাঁড়ালো।

জিজ্ঞেস করলে—কে রে? তুই সন্দীপ না?

সন্দীপ অবাক হয়ে গেল। বললে—কে?

গাড়িটার দিকে চেয়ে দেখলে অন্ধকারে কে ভেতরে বসে রয়েছে। তাকে চিনতে পারলে না সন্দীপ। বললে—কে?

—তুই সন্দীপ তো?

সন্দীপ বললে—হ্যাঁ, আমার নাম সন্দীপ—আপনি কে?

—আরে আমায় তুই চিনতে পারলি না? আমি গোপাল—

গোপাল হাজরা। গোপাল গাড়ি থেকে নেমে পড়লো। তার হাতটা ধরে ফেললে নিজের হাত দিয়ে। অনেক দিন পরে আবার দেখা হয়েছে বলে খুব যেন খুশী হয়েছে।

সন্দীপ এবার জিজ্ঞেস করলে—তুই কোথায় যাচ্ছিস?

গোপাল বললে—আমাকে তো সব জায়গায় ঘুরে-ঘুরে বেড়াতে হয়। একদিন তো তোর সঙ্গে খিদিরপুরের বাসে আমার দেখা হয়েছিল। কিন্তু তুই এদিকে এত রাত্তিরে কোথায় যাচ্ছিস?

সন্দীপ বললে—আমি কলেজ থেকে বাড়ি ফিরছি—

—এত রাত্তিরে?

—রাত্তিরেই তো আমার কলেজ। কিন্তু হঠাৎ বাড়ি ফিরতে গিয়ে রাস্তায় আটকে গিয়েছি। আমহার্স্ট স্ট্রীট দিয়ে বাড়ি ফিরছিলুম, হঠাৎ ওখানে পুলিস গুলি চালাচ্ছে বলে বাড়ি ফিরতে দেরি হয়ে গেল। এদিকে বাস-ট্রামও চলছে না—তাই হেঁটে-হেঁটে বাড়ি যাচ্ছিলুম—

গোপাল বললে—তুই পাড়াগেঁয়ে ছেলে বলে এত ভয় পেয়েছিস। কলকাতায় ক'দিন থাকলেই এ-সব তোর গা-সওয়া হয়ে যাবে। তুই আয়, গাড়িতে উঠে বোস—

—কার গাড়ি?

একটু বোধহয় সংকোচ হচ্ছিল সন্দীপের। তখন মনে পড়লো গোপালের যে গাড়ি আছে, সেদিন তার মুখ থেকেই সন্দীপ শুনেছিল। কথাটা যে সত্যি এখন তার প্রমাণ পাওয়া গেল।

গাড়িটা ছেড়ে দিলে। সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—এত রাত্তিরে কোথায় যাবি ?

গোপাল বললে—আমি তো রোজ রাত্তিরে গাড়ি করে ঘুরে বেড়াই—

—তুই রাত্তিরে ঘুরে বেড়াস কেন ?

গোপাল বললে—রাত্তিরে ঘুরে বেড়ানোই তো আমার কাজ রে—

গোপাল রাত্রে ঘুরে বেড়ায়, এ রকম অদ্ভুত কথা সে আগে কারো মুখ থেকে শোনেনি। জিজ্ঞেস করলে—রাত্তিরে তোর কী কাজ এত ?

গোপাল বললে—চল্ না, দেখবি—নিজের চোখেই সব দেখতে পাবি—

গাড়িটা চলতে-চলতে এক জায়গায় থামলো। চারটে রাস্তার মোড় সেটা। গাড়িটা থামতেই কোথা থেকে একটা পুলিস তাদের কাছে এসে দাঁড়ালো। আর গোপাল তাকে কী যেন বললে। কী বললে তা বুঝতে পারলে না সন্দীপ! কিন্তু একটা কথা ভেবে সন্দীপ বড় সমস্যায় পড়লো। পুলিসদের সঙ্গে গোপালের এত ভাব কীসের ? কেন এত ঘনিষ্ঠতা ?

গাড়িটা আবার সামনের দিকে চলতে লাগলো। সন্দীপের খুব ভালো লাগছিল ঘুরতে। কেবল ভাবছিল সেই বহুদিন আগেকার সেই বেড়াপোতার গোপালের কথা! সেদিনকার সেই গরীব বাপের ছেলে এমন হঠাৎ এত বড়লোক হয়ে উঠলো কী করে ? অথচ লেখা-পড়া তো কিছুই করলে না সে। তাহলে লেখাপড়া না করলেও কি টাকা উপায় করা যায় ? টাকা উপায় করে এই রকম বড়লোকও হওয়া যায় ? তবে যে মা তাকে অন্য কথা বলতো ? তার মা-ই তো তাকে শিখিয়েছিল যে ভালো করে মন দিয়ে লেখা-পড়া শিখলে চ্যাটার্জি'বাবুদের মত তারও অনেক টাকা হবে। সেই টাকা উপায় করে সন্দীপ তার মা'কে এনে কলকাতায় রাখবে। কলকাতায় তখন সন্দীপ বাড়ি ভাড়া করবে। তখন মা আর সে খুব আরাম করে সেই বাড়িতে থাকবে। কিন্তু এতদিন পরে গোপালকে দেখে তার সব স্বপ্ন, সব আদর্শ যেন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

আর একটা চৌমাথার কাছে এসে গাড়িটা আগেকার মত আবার থেমে গেল। গাড়িটা থামতেই কোথা থেকে একটা পুলিস এসে দাঁড়ালো গোপালের পাশে আর গোপাল নিজের পকেটে হাত ঢুকিয়ে এক মুঠো নোট বার করে দিলে পুলিসটার হাতে। পুলিসটা নিঃশব্দে একবার গোপালকে সেলাম করলে। আর তারপর গোপাল আবার গাড়িটা নিয়ে সামনের দিকে চলতে লাগলো।

একটা কথা সন্দীপ কিছুতেই বুঝে উঠতে পারলে না যে পুলিসদের সঙ্গে গোপালের এত ঘনিষ্ঠতা কীসের ? বুঝে উঠতে পারলে না গোপাল এই রাত্তির বেলা সব জায়গায় পুলিসদের টাকা দিচ্ছে কেন ?

শেষকালে সন্দীপ আর থাকতে পারলে না। জিজ্ঞেস করলে—হ্যাঁ রে, পুলিসদের তুই মাঝে-মাঝে গাড়ি থামিয়ে কী দিচ্ছিস ? টাকা ?

—কেন, তুই এ-কথা জিজ্ঞেস করছিস কেন ?

সন্দীপ বললে—আমি তো দেখছি সব, তা তোর সঙ্গে পুলিসদের এত সম্পর্ক কীসের ? ওরা তোর কাছে বার বার টাকা নিচ্ছে কেন ?

গোপাল বললে—ওরা তো খুব কম টাকা মাইনে পায়। ওতে ওদের পেট চলে না। তাই আমি ওদের টাকা দিয়ে প্রায়ই সাহায্য করি—

—তা তোর এত টাকা হলো কোত্থেকে ? তুই কী চাকরি করিস ?

গোপাল বললে—আমি তো চাকরি করি না, ব্যবসা করি—

—কিন্তু সে-ব্যবসায় এত টাকা ?

—আরে, ব্যবসাতেই তো টাকা, চাকরিতে আর ক'টা টাকা উপায় হয়—

—কীসের ব্যবসা তোর ?

গোপাল বললে—সে-সব বলবো তোকে একদিন। তুই যদি নিজে ব্যবসা করিস তো বল্—

সন্দীপ বললে—দূর, ব্যবসা করতেও তো টাকা লাগে। আমি সে-টাকা কোথায় পাবো ? আমাকে কে টাকা দেবে ? তা ছাড়া আমি তো ভালো করে এখনও লেখা-পড়াই শিখিনি—

—লেখা-পড়া ? বলছিস কী তুই ? আমিই বা ঘোড়ার ডিমের কত লেখা-পড়া শিখেছি ? টাকা উপায়ের সঙ্গে লেখা-পড়ার কী সম্পর্ক ?

সন্দীপ যেন নতুন কথা শুনলো। মা' তো তাকে সেই কথাই বরাবর বলে এসেছে যে সে লেখা-পড়া শিখলে তবে বড় চাকরি পাবে, আর বড় চাকরি পেয়ে অনেক টাকা উপায় করবে। গোপাল অন্য কথা বলছে কেন তবে ?

হঠাৎ গোপাল বলে উঠলো—তুই শ্রীপতি মিশ্রের নাম শুনেছিস ?

শ্রীপতি মিশ্র ? সন্দীপ অনেক ভেবেও শ্রীপতি মিশ্রের নাম মনে করতে পারলে না। বললে—শ্রীপতি মিশ্র কে ? কোথাকার প্রফেসার ? কোন্ কলেজে পড়ায় ?

—দূর, তুই কোনওই খবর রাখিস না, তোর দ্বারা কিছুই হবে না।

গোপাল হতাশ হয়ে গেল সন্দীপের ভবিষ্যতের কথা ভেবে। আবার বললে—সত্যিই তোর দ্বারা কিসসু হবে না। আরে, প্রফেসারদের কি টাকাওয়ালা লোক মনে করিস তুই, ওদের আমরা মানুষই মনে করি না।

—কেন ?

—যাদের টাকা নেই তাদের আমরা মানুষই মনে করি না। তারা জানোয়ার—

সন্দীপ তবু কিছু বুঝতে পারলে না। বললে—তাহলে মানুষ কারা ?

—মানুষ হলো শ্রীপতি মিশ্র। শ্রীপতি মিশ্র হলো মালদা জেলার একজন লোক। লেখাপড়া কিছুই শেখেনি। তিন-তিনবার ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছিল আর তিন বারই ফেল করেছিল। দেশের সব লোক তাকে তখন তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেছে। কেউ তার দিকে তখন ফিরেও চায়নি। সে খেতে পেল কি খেতে পেল না তা নিয়েও মাথা ঘামায়নি। শেষকালে যখন ভোটে জিতে মিনিস্টার হলো তখন সবাই মিলে তাকে মাথায় তুলে নাচতে আরম্ভ করলো—

—কেন ? মিনিস্টার হলে কি তার অনেক টাকা হয় ?

—হয় না ? কী বলছিস তুই ?

—কেন, মিনিস্টারদের তো কই মাইনে বেশি হয় বলে শুনিনি। পাঁচশো কি ছ'শো বড় জোর।

গোপাল বললে—তুই একটা পাগল ! আস্ত পাগল !

সন্দীপ বললে—মিনিস্টারদের আন্ডারে যে-সব অফিসার চাকরি করে তারা শুনেছি মাসে দু'হাজার, তিন হাজার কি চার হাজার টাকা মাইনে পায়।

মিনিস্টারদের চেয়ে চার-পাঁচ ডবল বেশি মাইনে পায়—

গোপাল বললে—সে-সব গান্ধীর যুগের কথা তুই ভুলে যা। ও-সব ছেঁদো কথা তুই ছেড়ে দে—

—কেন? এরাও তো কংগ্রেস পার্টির লোক!

—দূর, তিনবার ম্যাট্রিক ফেল করা মালদো জেলার সেই শ্রীপতি মিশ্র মাসে কত টাকা উপায় করে জানিস?

—কত?

—কম করে পঞ্চাশ হাজার টাকা!

সন্দীপ চমকে উঠলো কথাটা শুনে বললে—কী করে? ঘুষ খেয়ে? শ্রীপতি মিশ্র কি ঘুষ খায় নাকি?

—দূর।

কথাটার জবাব দেবার আগেই গাড়িটা আর একটা চৌমাথার পাশে এসে দাঁড়ালো আর ঠিক আগেকার মতই আবার একটা পুলিশ এসে পাশে দাঁড়ালো। গোপালও ঠিক আগের বারের মত এক মুঠো নোট দিলে পুলিসটার হাতে, আর সে গোপালকে সেলাম ঠুকে আবার নিজের জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালো।

সন্দীপ সমস্ত ব্যাপারটা লক্ষ্য করে দেখছিল আর গোপালের মুখ থেকে শোনা কথাগুলো ভাবছিল। কলকাতায় এসে হঠাৎ যেন তার দিব্যচক্ষু খুলে গেল। এতদিন কলকাতায় এসেছে সে কিন্তু এ-সব ব্যাপার তো সে আগে কখনও দেখেনি, আর এ-সব কথাও কখনও আর কারো মুখ থেকে শোনেও নি। তবে কি কলকাতার সব লোকই খারাপ? তবে কি সব লোকই ঘুষ নেয়?

সন্দীপ বললে—একটা কথা বলবি গোপাল? ওই পুলিসগুলোকে তুই টাকা দিচ্ছিস, ওটা কি ঘুষ?

গোপাল বললে—কে বললে তোকে ঘুষ?

—কিন্তু ঘুষ না তো কী? ও-টাকাগুলোর জন্যে কেউ তো কোনও রশিদ তোকে দিলে না। আমি এক ভদ্রলোকের বাড়িতে মাসে-মাসে একশো পঁচিশ টাকা করে দিয়ে আসি। তা তিনি তো তার রশিদ দেন—

গোপাল—যারা বোকা তারাই শুধু রশিদ দেয়, ইনটেলিজেন্ট লোকেরা রশিদ দেয় না।

—কিন্তু আমি তো শুনেছি টাকা দিয়ে রশিদ না নিলে সেটাকে বলে ঘুষ—

গোপাল বললে—তুই কিছুই জানিস না। যেটা দান বলে দিচ্ছি তার রশিদ চাইলে তখন আর দান বলা চলবে না। কালীঘাটের মা-কালীকে যে লোকে কত টাকা প্রণামী দেয়, তার জন্যে কি মা-কালী তাদের রশিদ দেয়? না পান্ডাদের কাছ থেকে কেউ রশিদ চায়?

একটু থেমে গোপাল আবার বললে—আরো কিছুদিন কলকাতায় থাক তুই তখন তোরও দিব্যজ্ঞান হবে! তুই এখনও সেইরকম পাড়াগেঁয়েই আছিস। জানিস এত ভালো হওয়া ভালো নয়, সংসারে ভালো লোকদের অশেষ দুর্গতি—

হঠাৎ যেন এতক্ষণে সন্দীপের নেশার ঘোর কাটলো। গোপালের হাত-ঘড়িটার

উঠেছে। কী হবে?

—হ্যাঁরে, তোর ঘড়িটা ঠিক আছে ?

গোপালও ঘড়িটার দিকে চেয়ে বললে—কেন ? এখন তো সাড়ে এগারোটা। এটা তো ইলেকট্রনিক সিটিজেন কোয়ার্টজ ঘড়ি, দেড় হাজার টাকা দিয়ে কিনেছি এটা, খারাপ হবে মানে ?

সন্দীপ তখন ভয়ে থর-থর করে কাঁপছে। বললে—আমার সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে ভাই—

—কেন ? কী সর্ব্বনাশ হয়েছে তোর ?

—আমাদের বাড়ির সদর-গেট্ যে রাত ন'টার সদর বন্ধ হয়ে যায় ভাই। গিরিধারী দরোয়ান যে ঠিক ন'টার সময় গেটে চাবি বন্ধ করে দেবে। আমি বাড়ির ভেতরে ঢুকবো কী করে ?

ভয়ে কথা বলতে-বলতে সন্দীপ কেঁদে ফেললে।

গোপাল বললে— একটা রাত বাড়িতে না ঢুকলে তোর ক্ষতি কী ?

—আমার খাবার যে ঢাকা রয়েছে। মল্লিক-কাকা যে ভাববে।

গোপাল বললে—কলকাতা শহরে খাওয়ার কি অভাব রে ? কী খাবি তাই আমাকে বল্ না। পাঁঠা, মুরগী, বীফ্, হ্যাম্—টাকা ফেললে কলকাতায় যখন-তখন সব জিনিস খেতে পাওয়া যায়। আর ক্ষিধের চোটে তুই একেবারে কেঁদেই ফেললি ? চল্, এখুনি তোকে চৌরঙ্গীর একটা হোটেলে নিয়ে যাচ্ছি। দেখবি সেখানে আমাকে সবাই কত খাতির করবে। চল্—

বলে গোপাল গাড়িটা ঘুরিয়ে নিয়ে বললে—বল্, কোন্ হোটেলে খাবি ?

সন্দীপের তখন আর গোপালের কথার জবাব দেওয়ার মত ক্ষমতা নেই। সে তখন বিডন্ স্ট্রীটের মুখুজ্জেবাবুদের বাড়ির কথাই ভাবছে। মল্লিক-কাকা নিশ্চয়ই এখন সন্দীপের কথা ভাবছে। এমন দেরি করে বাড়ি ফেরার ঘটনা আগে তো কখনও ঘটেনি! সত্যিই, মল্লিক-কাকা কী ভাবছে ? কলকাতা শহরে তো হামেশাই লোকে গাড়িচাপা পড়ছে, হামেশাই পুলিসের গুলিতে মরছে। তারপরে আছে পথ-অবরোধ। যে-কোনও একটা ছুতো পেলেই যে-কোনও একটা পাড়ার লোক রাস্তার ওপর শুয়ে পড়ে ট্রাম-বাস আসা-যাওয়ার রাস্তা বন্ধ করে দিচ্ছে, আর সঙ্গে-সঙ্গে পুলিস এসে এলোপাথাড়ি গুলি চালাচ্ছে। আর সন্দীপও কলকাতায় নতুন মানুষ। এ-কলকাতাও নিয়ম-কানুন সন্দীপ জানে না। মল্লিক-কাকা তাই সবসময় সন্দীপকে সাবধান করে দিয়েছেন, আর বলেছেন—খুব সাবধানে থাকবে সন্দীপ, খুব সাবধানে কলেজে যাতায়াত করবে। এ কলকাতা শহর, এ তোমাদের বেড়াপোতা নয়, এখেনে কেউ কারোর ভালো দেখতে পারে না। কলেজ থেকে বেরিয়েই আর কোনও দিকে চাইবে না, সোজা বাড়ি চলে আসবে—

আর শুধু কি তাই ? যেখানে-সেখানে খাওয়া সম্বন্ধেও সাবধান করে দিয়েছেন। কখনও কোথাও কোনও দোকানে কিছু খাওয়া উচিত নয়। চায়ের দোকান আর হোটেলের ছড়াছড়ি এখানে। দেখবে রাস্তার ধারেই কত লোক ধুলো-ময়লার মধ্যে বসে রুটি-তরকারি তৈরি করছে, আর কত লোক পাশের বেঞ্চির ওপর বসে সেই সব খাচ্ছে। কলকাতাও একরকম শ্রীক্ষেত্র। কিন্তু তুমি ও-সব খেও না। ক্ষিধে পেলেও যেন ও-সব খাওয়ার নাম কোরো না, বুঝলে ? সব সময়ে মনে রাখবে এ

কলকাতা শহর। কলকাতা শহর বাঙালীদের শহর। আর বাঙালীদের মত হতচ্ছাড়া জাত আর ভূভারতে নেই। এই বাঙালীরাই হচ্ছে বাঙালীদের সবচেয়ে বড় শত্রু। এই বাঙালীরাই একদিন রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে পাগল বলে গালাগালি দিয়েছে, এই বাঙালীরাই একদিন স্বামী বিবেকানন্দকে গরুখোর বলে নিন্দে করেছে। এই বাঙালীরাই সুভাষ বোসকে হিটলারের দালাল বলে প্রচার করেছে······

হঠাৎ গাড়ীটা একটা ঝাঁকুনি দিতেই সন্দীপ যেন আবার বাস্তবের পৃথিবীতে ফিরে এল। সন্দীপ দেখলে একটা বিরাট বাড়ির সামনে এসে গোপাল তার গাড়িটা দাঁড় করিয়েছে। বললে—এখানে নাম তুই সন্দীপ—

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—এ আমরা কোথায় এলুম ভাই ?

গোপাল বললে—তুই যে বললি তোর ক্ষিধে পেয়েছে, তাই তো··

তারপর সন্দীপের দিকে তাকিয়ে গোপাল অবাক হয়ে গেল। বললে- -কীরে, তুই কাঁদছিস ?

সন্দীপ কান্নার চোটে কিছু জবাব দিতে পারলে না। গোপাল বললে --কীরে, কাঁদছিস কেন ?

সন্দীপ বললে—এত রাত হয়ে গেল, এত রাত্তিরে আমি বাড়ি যাবো কী করে ? মল্লিক-কাকাকে আমি কী বলবো ?

গোপাল বললে --আগে তুই ভেতরে ঢুকে খেয়ে নে ; তারপর ও-সব কথা ভাববি। কাঁদিস নি, চোখ মোছ। তোকে কাঁদতে দেখলে হোটেলের সব লোক কী ভাববে বল দিকিনি—

সন্দীপ চোখের জল মুছে বললে—আমি মল্লিক-কাকাকে কী বলবো বলতো ভাই। যখন আমাকে জিজ্ঞেস করবে রাত্তিরে আমি কোথায় ছিলুম তখন কী বলবো ?

—সে-সব পরে ভাবিস, এখন চল্—ভেতরে চল্···

মনে আছে গোপালের সঙ্গে ভেতরে গিয়ে সেদিন সন্দীপের মনে হয়েছিল সে যেন আরব্য উপন্যাসের কোনও এক আশ্চর্য শহরে গিয়ে ঢুকেছে। রাত্রের কলকাতার অন্ধকারের মধ্যে যে এত জাঁকজমক আর রোমাঞ্চ থাকতে পারে তা কি তখন সে কল্পনা করতে পেরেছিল। বিধবা গরীব মায়ের অপোগণ্ড ছেলে হয়ে জন্মাবার অপরাধে তার তো সারাজীবন দুঃখবোধের যন্ত্রণা সহ্য করে অতি কষ্টে বেঁচে থাকারই কথা। তাকে ওই স্বপ্নলোকের পরিবেশের দৃশ্য কেন সেদিন দেখিয়েছিল গোপাল ?

সন্দীপ ভেতরে ঢুকে চারদিকে চেয়ে বিহ্বল হয়ে গেল।

বললে—এ আমাকে কোথায় নিয়ে এলি ভাই তুই ? এ কোন্ হোটেল ?

গোপাল বললে—অত জোরে-জোরে কথা বলিস নি। লোকে শুনতে পাবে।

—কেন ? এখানে কী হয় ?

গোপাল বললে —চল্, ওই ফাঁকা টেবিলটায় গিয়ে বসি—

তখন ভেতরে পুরুষ আর মেয়েদের হুড়োহুড়ি চলছিল। সন্দীপ চেয়ে দেখতে দেখতে ভাবছিল—এ আবার কোন্ কলকাতা ? এ কলকাতার দারিদ্র্যের রূপ সে দেখে এসেছে সাত নম্বর মনসাতলা লেনের বাড়িতে। ঐশ্বর্যের রূপ দেখেছে

বারোর-এ বিডন্ স্ট্রীটের 'মুখার্জি-স্যাক্সবি ইন্ডিয়া লিমিটেড'র বাড়িতে। কিন্তু এটা ? তাহলে কলকাতার ক'টা মুখ ?

আর ওই মেয়েরা ? যারা হুল্লোড় করছে আর লাফাচ্ছে আর চেঁচাচ্ছে আর গেলাস নিয়ে বেটাছেলেদের সঙ্গে কাড়াকাড়ি করছে ? ও-সব গেলাসে লাল-নীল রং-এর ও-সব কী ? কী খাচ্ছে ওরা ?

হঠাৎ গোপালের গলার আওয়াজে সন্দীপের জ্ঞান হলো।

—কীরে ? খা—

এতক্ষণে সন্দীপের নজরে পড়লো টেবিলের সামনে একটা ডিশ্-এ তার জন্যে কী একটা রয়েছে। সন্দীপ বললে—এটা কী ?

—তুই যে বলছিলি তোর খিদে পেয়েছে, তাই তোকে খাবার দিতে বলেছিলুম। তুই তো ছেলেমানুষের মত খিদের জ্বালায় একেবারে কেঁদে ফেলেছিলি—

সন্দীপ বললে—আমি খিদের জ্বালায় কাঁদিনি, কেঁদেছিলুম ভয়ে—

—কীসের ভয় ?

—ওই বাবুদের বাড়ির গেট বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয়ে। রাত ন'টার সময় ওদের বাড়ির গেট বন্ধ হয়ে যায় কি না, তাই—

তারপর ডিশ্টার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলে—এটা কী রে ?

গোপাল বললে—এটা নান্—

গোপাল বললে—নান্ মানে রুটি—

সন্দীপ বললে—এ কী রকম রুটি ?

গোপাল বললে—এ রুটি তুই আগে কখনও খাসনি, এ অন্য রকম রুটি। খেয়ে দেখ্ খুব ভালো খেতে—

—আর এটা কী ? এটা কীসের তরকারি ?

গোপাল বললে—এটা তরকারি নয়, মাংস। মাংসের শিক্-কাবাব—

সন্দীপ তবু দ্বিধা করতে লাগলো। জিজ্ঞেস করলে—কীসের মাংস ?

—কীসের আবার ? চিকেনের—

—চিকেনের মানে ?

গোপাল বললে—তোকে নিয়ে মুশকিলে পড়া গেল। চিকেনের মানে মুরগীর—

সন্দীপ বললে—মুরগী ? মুরগীর মাংস তো আমি খাই না—

—না খাস্ তো একদিন না-হয় খেয়েই দ্যাখ্। মুরগী খেলে তো জাত যায় না। সবাই-ই তো খায়—

সন্দীপ বললে—না ভাই, আমার মা জানতে পারলে খুব বকবে—মা বলেছে বামুনের ছেলে হয়ে মুরগী খেলে তার জাত যায়—

গোপাল এ-কথার কোনও প্রতিবাদ করলে না। শুধু তাচ্ছিল্যের হাসি হাসতে লাগলো। বললে—তোদের মত ছেলে আমাদের দেশে জন্মালে দেশটা উচ্ছন্নে যাবে। নে, শিগ্গির-শিগ্গির খেয়ে নে। আমার আবার তাড়া আছে।

সন্দীপ বললে—সত্যি বলছি ভাই, এ-সব আমি খাবো না। আমি শুধু এই দু'খানা রুটি খাবো। এখানে যদি দুধ পাওয়া যেত তো ভালো হতো—

—কেন, দুধ দিয়ে কী হবে ?

—আমি দুধে রুটিটা ডুবিয়ে ডুবিয়ে খেতুম তাহলে।

গোপাল বললে—এখানে দুধের কথা বললে এরা হাসবে।

—কেন ?

—ওই যে মেয়েগুলো গেলাসে করে ওখানে যা খাচ্ছে, এখানে শুধু ওই জিনিস পাওয়া যায়।

সন্দীপ বললে—ওটা কী ?

—মদ !

সন্দীপ আরও অবাক হয়ে গেল কথাটা শুনে। বললে—মেয়েরাও এখেনে মদ খায় নাকি ?

গোপাল বললে—মেয়েরাই তো আজকাল মদ বেশি খায়—

সন্দীপ কথাটা শুনে গোপালের দিকে চেয়ে বিস্ময়ে হাঁ হয়ে রইল। বললে—সত্যি ?

গোপাল বললে—তুই দেখছি কলকাতার কিছুই দেখিসনি এখনও—

সত্যিই সে কলকাতার কিছুই দেখেনি তখনও। সে বিডন স্ট্রীটের কলকাতা দেখেছিল আর ওদিকে খিদিরপুরের মনসাতলা লেন দেখেছিল। সঙ্গে-সঙ্গে সেখানকার মানুষদেরও কিছু কিছু দেখেছিল। আর যা দেখেনি তা কিছু-কিছু মল্লিক-কাকার কাছ থেকে শুনেছিল। বাকিটুকু দেখেছিল স্কট লেনের বঙ্গবাসী কলেজে যাওয়া-আসার পথে ভিক্ষে-চাওয়ার নতুন ধরনের এক কায়দাও দেখেছিল সে মীর্জাপুর স্ট্রীটে—বিশ্বশান্তি যজ্ঞের নাম করে নানা দেব-দেবীর পুজোর ফন্দী করে। ভেবেছিল তার বুঝি সম্পূর্ণ কলকাতা-দর্শন হয়েই গেছে।

কিন্তু এ-কলকাতা ? এ-কলকাতার এই দৃশ্য কি কখনও বেড়াপোতায় থাকতে সে কল্পনাও করতে পেরেছিল ? এখানে এত রাতে মেয়েমানুষরা হুড়োহুড়ী করে যে মদ খায়, তা কি স্বপ্নেও সে একবার ভাবতে পেরেছিল ?

দুধ যখন এখানে পাওয়া যাবে না, তখন শুধু শুকনো রুটিই সন্দীপ খেতে লাগলো। কিছু না কিছু তো খেতেই হবে।

গোপাল জিজ্ঞেস করলে—তুই শিক-কাবাব খাবি না ?

সন্দীপ বললে—ও খেলে আমার বমি হয়ে যাবে ভাই। বরং তুই-ই ওটা খেয়ে নে—আমি ওটা এঁটো করিনি—

গোপাল বললে—ঠিক আছে, তুই যখন খাবি না তখন আমিই খেয়ে নিই। বাড়িতে গিয়ে তো আমি আমার খাবার খাবোই—

—তোর দেরি হয়ে যাচ্ছে না তো ? বাড়ির দরজা বন্ধ হয়ে যাবে না তো ?

গোপাল বললে—না, আমি নিজেই তো আমার বাড়ির মালিক, আমার যখন ইচ্ছে আমি তখন বাড়ি ফিরবো।

—তুই কি হাওড়া স্টেশনের প্লাটফরমেই রাত কাটাস ?

—দূর ! তোর দেখছি সেই সব ছোটবেলাকার কথা এখনও মনে আছে !

—কিন্তু তুই ওই পুলিসদের অত টাকা দিলি কেন এত রাত্তিরে ? পুলিসদের কেন এত টাকা দিলি ? ওরা তোর কী কাজ করে ?

—সে অন্য একদিন তোকে সব বলবো। ওদের জন্যেই তো সব কিছু হয়েছে।

ওদের জন্যেই আমার গাড়ি হয়েছে, বাড়ি হয়েছে—

তবু সন্দীপ কিছু বুঝতে পারলে না। হাঁ করে চেয়ে দেখতে লাগলো গোপালের দিকে। বললে……

কিন্তু কিছু বলবার আগেই হঠাৎ ঘরের ভেতরের সব আলো নিভে গেল। সমস্ত ঘরময় যত মেয়েমানুষ পুরুষমানুষ সব হৈ-হৈ করে চিৎকার করতে লাগলো। কেউ-কেউ শিস দিচ্ছে, কেউ কাঁচের গেলাস সিমেন্টের দেয়ালে ছুঁড়ে মারতেই কাঁচ ভাঙার ঝন্-ঝন্ শব্দ উঠলো। সে এক বীভৎস কাণ্ড বেঁধে গেল ঘরটার মধ্যে।

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—ভাই, হঠাৎ আলো নিভে গেল কেন? চুরি-ডাকাতি হবে নাকি?

গোপাল বললে—ভয় পাসনি, ও কিছু নয়-

—কিছু না মানে?

গোপাল বললে—ও একটা মজা হচ্ছে। এবার দ্যাখ্ না কী হয়—

কিছুক্ষণ অন্ধকার থাকার পর আবার হঠাৎ আলো জ্বলে উঠলো। সন্দীপ দেখলে সঙ্গে-সঙ্গে যেন সমস্ত ঘরটার আবহাওয়া একেবারে বদলে গেছে। যে যেখানে বসে ছিল সেখানে সে আর নেই। কারোর গায়ে ব্লাউজ নেই, কারোর আবার মাথার চুল উষ্কো-খুষ্কো হয়ে গেছে।

তারই মধ্যে হঠাৎ একটা জায়গা থেকে খুব জোরে একটা চিৎকার উঠেছে। কে যেন মদের নেশায় মেঝের ওপর পড়ে গেছে। সন্দীপ মহা ভাবনায় পড়লো।

গোপাল বললে—ও কিছু না ও রকম কাণ্ড হয় এখানে -

—লোকটা পড়ে গেল নাকি?

গোপাল বললে—ও নিয়ে ভাবিস নি, মাতাল হয়ে গেলে যা হয় তা-ই হয়েছে আর কি। মদ খাওয়া খারাপ নয়, কিন্তু তা বলে অত বেশি খাওয়া কি ভালো।

সন্দীপ বললে—মদ খেয়ে যদি হুঁশই না থাকে তো ও-জিনিসটা লোকে খেতে যায় কেন?

গোপাল বললে—যাদের বাপ-ঠাকুর্দার অনেক টাকা তারা কী করবে? টাকা না উড়িয়ে তারা করবেটা কী?

—কেন, কোনও আশ্রম-টাশ্রমে দান করলেই পারে। রামকৃষ্ণ মিশনে টাকা দিয়ে দিতে পারে, সৎকাজে খরচ হবে—

গোপাল বললে—ওঠ, এবার চল—

সন্দীপও উঠতে যাচ্ছিল, হঠাৎ ভিড়ের দিকে নজর পড়তেই সে কেমন হয়ে গেল। কয়েকজন লোক একটা ভদ্রলোককে তুলে ধরে দাঁড় করিয়েছে। লোকটাকে দেখেই সন্দীপ কেমন নিজের অজান্তেই চমকে উঠলো।

—খোকাবাবু না?

গোপাল বললে—কী দেখছিস ওদিকে? ও-রকম কাণ্ড এখানে রোজ হয়, তুই চলে আয়—

সন্দীপ তাড়াতাড়ি পা ফেলে সামনের দিকে এগিয়ে গেল। গোপালও অগত্যা চলতে লাগলো তার পেছন-পেছন। ভিড়ের কাছে গিয়ে পৌঁছতেই সন্দীপ ভদ্রলোককে গিয়ে ধরে ফেলল।

গোপাল বলে উঠলো—ও কাকে ধরছিস রে ?

সন্দীপ বললে—আমাদের খোকাবাবু—

—খোকাবাবু কে ?

—আমাদের বিডন স্ট্রীটের বাড়ির ঠাকুমা-মণির নাতি—খোকাবাবু। মুখার্জি-স্যাকস্‌বি ইণ্ডিয়া লিমিটেড ডিরেক্টার। আমি তো এদের বাড়িতেই থাকি—কী সর্বনাশ—

এতক্ষণে গোপালও অবাক হয়ে গেল।

বললে—তাহলে তোদের বাড়ির মালিকও এই নাইট্-ক্লাবে আসে নাকি ?

সন্দীপ বললে—আমি তো আগে জানতুম না। ভাগ্যিস তুই আমাকে এখানে নিয়ে এলি, তাই তো দেখতে পেলুম—

আরো অনেক লোক তখন ধরে রয়েছে খোকাবাবুকে। সন্দীপকে দেখে তারা অবাক হয়ে গেছে। জিজ্ঞেস করলে—আপনি কে ? হু আর ইউ ?

সৌম্যবাবুর তখনও জ্ঞান ছিল একটু। সৌম্যবাবু সন্দীপকে দেখে জড়িয়ে জড়িয়ে বললেন—আরে, ব্রাদার, তুমিও এখেনে ?

সন্দীপ তখন দুই হাতে ভালো করে ধরেছে সৌম্যবাবুকে। বললে—চলুন, আপনি আমার সঙ্গে চলুন, আমি আপনাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছি—

সৌম্যবাবু জড়ানো গলায় বললেন—কিন্তু তুমি এখানে কেন ব্রাদার ? তুমিও কি তাহলে ডুবে-ডুবে জল খাও—তুমিও সিংকিং সিংকিং ড্রিংকিং ওয়াটার ? সবাই দেখছি ডুবে ডুবে জল খায়, কলিকালে এ কী হলো ব্রাদার কলকাতার ?

এ-কথার কিছু উত্তর দেওয়া বৃথা। সন্দীপ সৌম্যবাবুকে আরো ভালো করে দুই হাত দিয়ে ধরে সিঁড়ির দিকে টেনে নিয়ে চললো।

গোপাল কিছুক্ষণ ব্যাপারটা দেখলে। তারপর যখন বুঝলো যে সন্দীপ তার বাড়ির মনিবকে নিয়েই বেশি ব্যস্ত, তখন তার আশা ছেড়ে দিয়ে নিজের পথে চলে গেল। থাক্, সন্দীপ তার খোকাবাবুকে নিয়ে থাক, এখন সে নিজের ধান্দা দেখতে পারে, সন্দীপটা দেখছি এখনও সেই আগেকার মতই উজবুক হয়েই আছে। আশ্চর্য, এখন এই বয়েসেও সে নাবালক হয়ে আছে। দুনিয়াদারি যে কত বদলে গেল সে-দিকে খেয়ালই নেই তার। বেড়াপোতা থেকে কলকাতায় এসেও তার এতটুকু উন্নতি হলো না। ধিক, ধিক !!!

সিঁড়ি দিয়ে রাস্তায় নামতেই গোপাল দেখলে সন্দীপ তার মনিবকে ধরে-ধরে তার গাড়িতে উঠিয়ে দিচ্ছে—

গোপাল আর সেখানে দাঁড়ালো না। গাড়ির ইঞ্জিনে স্টার্ট দিয়ে সোজা তার যাবার পথের দিকে চলে গেল।

সন্দীপ তখন তার সৌম্যবাবুকে নিয়েই ব্যস্ত। সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—কী করে বাড়ি যাবেন খোকাবাবু ? গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন কি ?

সৌম্যবাবু তখন হেসে ফেললে। বললে—কী বলছো ব্রাদার ? আমি তো রোজই নিজে গাড়ি চালাই। তা তুমি কি আমার গাড়িতে উঠবে ? ভয় নেই, ব্রাদার, আমি মাতাল বটে, কিন্তু তালে ঠিক আছি, কখনও বেতালা বাজি না—

সন্দীপ বললে—চলুন—

সত্যি মাতাল হলেও সৌম্যবাবুর জ্ঞান ছিল টনটনে। সৌম্যবাবু গাড়ি চালাচ্ছিল বটে, কিন্তু পাশে বসে সন্দীপের বড় ভয় করছিল। যদি হঠাৎ কোনও গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা দেয়। যদি কোনও লোক চাপা পড়ে? তখন কী হবে? সৌম্যবাবুর মুখে তখন জ্বলন্ত সিগারেট, হাতে স্টিয়ারিং।

গাড়িটা চলছিল সোজা! সৌম্যবাবুর পা টলছিল বটে, কিন্তু হাতটা পাকা। সত্যিই পাকা ড্রাইভার সৌম্যবাবু।

সৌম্যবাবু গাড়ি চালাতে-চালাতেই বললে—কী, ভয় করছে নাকি ব্রাদার?

সন্দীপ মনে-মনে যা-ই বলুক, মুখে বললে—না—

—না, ভয় পেও না ব্রাদার, একদিন তো মরতেই হবে। তুমিও মরবে, আমিও মরবো, কারো বেঁচে থাকবার রাইট্ নেই এই দুনিয়ায়। তা মরতে যখন হবেই তবে ফুর্তি করেই মরি। কী বলো, ব্রাদার?

সন্দীপ আর এ-কথার কী জবাব দেবে। সৌম্যবাবু আবার বললে—তা তুমিও কি ব্রাদার ডুবে-ডুবে জল খাও। মানে সিংকিং সিংকিং ড্রিংকিং ওয়াটার?

মনে আছে সৌম্যবাবু সেদিন সোজা নিজে গাড়ি চালিয়ে আসছিল ঠিক পথ চিনে চিনে। আর সন্দীপ তার পাশে বসে বসে ভাবছিল দৈবের এ কী বিধান্! ঠাকুমা-মণি এই নাতির বিয়ের জন্যেই কি এত হাজার-হাজার টাকা খরচ করে কাশী থেকে গুরুদেবকে এনে জন্ম-কুণ্ডলী দেখালেন। এর জন্যেই কি মনসাতলা লেনের বাড়ির বিশাখাকে বেছে নিলেন নিজের নাত-বৌ করবার জন্যে! আর সেই মেয়ের মা'কে তিনি সেই জন্যেই কি মাসে-মাসে একশো পঁচিশ টাকা করে পাঠিয়ে চলেছেন? এই-ই কি সেই নাতি? এই মাতাল সৌম্যবাবুই কি তাঁর বংশে বাতি দেবে? তার বংশের মুখ উজ্জ্বল করবে?

কিন্তু ঠাকুমা-মণি তো তাঁর নিয়ম-কানুন বেঁধে দিয়েছেন। গিরিধারীকে তো তিনি এই জন্যেই রাত ন'টার সময় লোহার গেট বন্ধ করে তালা-চাবি লাগিয়ে দিতে হুকুম করেছেন। কিন্তু তাঁর নাতিই যদি সে-নিয়ম ভেঙে বাড়ির বাইরে গিয়ে রাত কাটায় তো সে জন্যেও কি তিনি দায়ী!

সঙ্গে-সঙ্গে সন্দীপের চোখের সামনে বিশাখার মুখটা ভেসে উঠলো। সন্দীপ যেন কানে শুনতে পেল বিশাখার সেই কথাগুলো—তোমাদের ছোট খোকাবাবুর সঙ্গে আমার বিয়ে হবে না—

—কেন? ছোট খোকাবাবুর সঙ্গে কেন তোমার বিয়ে হবে না?

বিশাখা বলেছিল—আমার বিয়ে হয়ে গেলে তো তোমরা আমার কাকাকে মাসে-মাসে আর এ-টাকা দেবে না। তখন কাকীমা কোন্ টাকা দিয়ে নিজের গয়না গড়াবে?

হঠাৎ গাড়িটা বারোর-এ বিডন্ স্ট্রীটের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালো। দাঁড়াতেই খোকাবাবু গাড়ি থেকে নেমে ভেতরে টলতে টলতে ঢুকে পড়লো। আর গিরিধারী তখন গেট খুলে বাইরে এসে সন্দীপকে দেখেই অবাক।

বললে—বাবুজী, আপ?

কিন্তু তখন আর বেশি কথা বলা বা তার কথার জবাব দেওয়ার সময় নেই। সন্দীপ সৌম্যবাবুকে দুই হাতে ধরে তাকে ভেতর বাড়িতে ঢুকিয়েছে—

সোম্যবাবু তখনও জড়ানো গলায় বলছে—ব্রাদার, তুমিও তাহলে আমাদের দলে ? তুমিও তাহলে মাল খাও ?

বলে মাতালের মত হাসতে লাগলো ফিক্-ফিক্ করে—
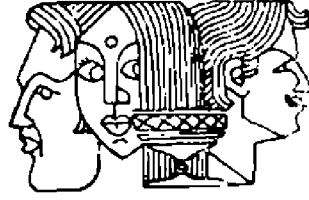
সেদিন ভোরবেলা যোগমায়া তখন গঙ্গার বাবুঘাটে বিশাখাকে নিয়ে গেছে। বিশাখাকে ব্রত করতে শেখাতে হয়। যেদিন থেকে মুখুজ্জে-বাড়ির ঠাকমা-মণির কাছ থেকে বিশাখার নামে-মাসে-মাসে টাকা আসছে সেই দিন থেকেই শুরু হয়েছে বিশাখার এই ব্রত পালন।

বিশাখা বারবার আপত্তি করেছে। বলেছে—আমি ও-সব ছাই-পাঁশ বলবো না—

যোগমায়া বলেছে—মুখপুড়ী, তোর ভালোর জন্যেই আমি বলি, নইলে বলতে আমার দায় পড়েছে—

তারপরে মেয়েকে বলে—বল্—আমার সঙ্গে মুখে মুখে বল্—

সীতার মত সতী হবো
রামের মত পতি পাবো
কৌশল্যার মত শাশুড়ি পাবো
দশরথের মত শ্বশুর পাবো
লক্ষ্মণের মত দেওর পাবো—

বিশাখা মুখ গম্ভীর করে বসে ছিল। কিছুই বলছিল না—

যোগমায়া ধমকে উঠলো। বললে—কী রে মুখপুড়ী, মুখ বুজে আছিস কেন ? বোবা নাকি ? বল্—

বাবুঘাটে চারদিকে লোকের ভিড়। সেদিনও যোগমায়া ঘাটে এসেছে মেয়েকে নিয়ে। বাড়িতে এ-সব ব্রত উদ্‌যাপন করলে নানা কথা ওঠে। তাই যোগমায়া যেদিনই সময় সুযোগ পায় বিশাখাকে নিয়ে গঙ্গার বাবুঘাটে আসে। এখানে এসে ঘাটের এক কোণে বসে মেয়েকে দিয়ে ব্রত করায়। ভগবান যদি মেয়ের কপালে একটা বর জুটিয়ে দিয়েছেন তো মেয়ে যেন কপালদোষে তা না হারায়। সুবিধে-সুযোগ পেলেই যোগমায়া মনে-মনে ভগবানকে ডাকে। বলে—ভগবান, তুমি যদি একবার মুখ তুলে চেয়েছ তো এইটুকু দেখো আমার বিশাখা যেন বিয়ের পর সুখী হয়। আমি ছাড়া বিশাখার তো আর কেউ নেই, তুমি তাকে দেখো ভগবান, তুমি তাকে দেখো—

কিন্তু মেয়েও তেমনি আকাট হয়েছে যোগমায়ার। মায়ের একটা কথাও যদি শোনে মন দিয়ে। বিশাখা বলে—তুমি কেন অত ভগবানকে ডাকো শুনি ? ভগবান কি কানে শুনতে পায় ? তোমার ভগবান তো কালা—

—চুপ কর মুখপুড়ী ! ঠাকুর-দেবতাকে গাল-মন্দ করলে তোর কি ভালো হবে ভেবেছিস ?

বিশাখাও তেমনি। বলে— তোমার ভগবান যদি এত ভালো তাহলে আমার বাবা মরে গেল কেন? কেন তোমাকে কাকীমা অত কথা শোনায়? কেন তাহলে তোমাকে পরের বাড়ী রাঁধুনীগিরি করতে হয়?

—থাম্ মুখপুড়ী, শিলের নোড়া দিয়ে তোর দাঁত ভেঙে দেব! যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা! ভগবান যদি কথা শুনতে না পায় তো কে তোর বিয়ের বর জোগাড় করে দিলে শুনি? কে অত বড়লোকের বাড়ি তোর বিয়ের সম্বন্ধ করলে? কে করলে তাই বল্?

বিশাখা বলে—তুমি ওই আনন্দেই থাকো! আমার বিয়ে হবে নাকি ও-বাড়িতে—কলা হবে—

—কেন? হবে না কেন? ওদের বাড়ি গিয়ে তো তুই দেখেছিস! কাশী থেকে গুরুদেব এসে তোর কুষ্ঠি দেখে বলেছে ওখেনে তোর বিয়ে হবেই—

—ছাই হবে, ছাই—ওখেনে আমার বিয়ে হবে না।

—কে বললে তোকে হবে না?

বিশাখা বলে—কেন হবে? বিয়ে হয়ে গেলেই তো ওরা কাকাকে মাসোহারার টাকা দেওয়া বন্ধ করে দেবে। মাসে-মাসে একশো পঁচিশ টাকা পাওয়া বন্ধ হয়ে গেলে তখন কাকীমা কোত্থেকে নিজের গয়না গড়াবে তাই বলো?

এ-সব কথা শুনতে ভালো লাগে না যোগমায়ার। বলে— এইটুকু মেয়ের কত পাকা-পাকা কথা দেখ। মেয়েমানুষের অত পাকা-পাকা কথা ভালো নয় রে। অত পাকা-পাকা কথা ভালো নয়। বুঝেছি তোর কপালে অনেক দুঃখু আছে—তা আমিই বা আর কী করবো আর আমার ভগবানই বা কী করবে। দেখবি একদিন তোর এই কথার জন্যেই তোকে জ্বলে পুড়ে মরতে হবে, এই তোকে আজ বলে রাখলুম—

তবু হাল ছেড়ে দেয় না যোগমায়া। তবু কোনও কোনও দিন সকাল-সকাল ঘুম ভেঙে গেলেই বিশাখাকে নিয়ে গঙ্গার বাবুঘাটে নিয়ে গিয়ে ব্রত করায়। কত রকমের যে ব্রত আছে তার কি ঠিক আছে। এক-এক মাসে, এক-এক ঋতুতে, এক-এক রকমের ব্রত। বিশাখা বুঝতে পারে না, বুঝতে চায়ও না সে-সব ব্রত-কথার মানে, তবু মায়ের কাছে মার খাবার ভয়ে ব্রত করে যায়। 'পুণ্যিপুকুর ব্রত', 'কুলুকুলুতি ব্রত' 'শিবরাত্রি ব্রত', 'ষাট্ পঞ্চমী ব্রত', 'রামনবমী ব্রত', 'জল সংক্রান্তি ব্রত', 'অক্ষয় তৃতীয়া ব্রত', 'সত্য-নারায়ণ ব্রত', 'হিতসাধিনী ব্রত'—ব্রত-কথার কি শেষ আছে?

সব ব্রতই মা'র মুখস্থ। কিন্তু দেওরের বাড়িতে ব্রত-পাঠ করবার উপায় নেই। নানা লোকের মুখে নানা কথা উঠবে। যোগমায়ার নিজের জীবনে ব্রত-কথা পাঠের কোনও সুফল ফলেনি। তা না ফলুক, বিশাখার জীবনে যেন সে-সুফল ফলে। বিশাখা যেন স্বামী-পুত্র-কন্যা নিয়ে সুখে-শান্তিতে সংসার করতে পারে। যোগমায়া নিজে যে সুখ-সৌভাগ্য পায়নি, তার মেয়ে বিশাখা যেন সে-সুখ-সৌভাগ্য পায়। তাই গঙ্গার বাবুঘাটে যোগমায়া মেয়েকে ব্রত করায়। বলে—বল্, আমার সঙ্গে-সঙ্গে মুখে বল্—

সীতার মত সতী হবো
রামের মত পতি পাবো

কৌশল্যার মত শাশুড়ি পাবো
দশরথের মত শ্বশুর পাবো
লক্ষ্মণের মত দেওর পাবো······

রোজ ভোরবেলা থেকেই বাবুঘাটে স্নান পুজো আহ্নিক জপ-তপ করবার জন্যে লোক জমে যায়। কিন্তু ততক্ষণে ব্রতপাঠ শেষ হয়ে যায় বিশাখার। বিশাখা চারদিকে চেয়ে দেখে বলে—মা, ওরা সবাই দেখছে যে আমাদের—

যোগমায়া বলে—দেখুক গে, তাতে তোমার কী?

বিশাখা বলে—ওরা দেখলে যে আমার লজ্জা করে—

যোগমায়া তবু একই জবাব দেয়। বলে— দেখুক গে—আমি যা বলছি তুইও তাই বল্—

রোজ-রোজ যোগমায়ার স্নান করতে যাবার সুযোগ হয় না। যেদিন বাড়িতে সাংসারিক কাজের তাড়া থাকে সেদিন আর ব্রত পালন করার সময় পায় না যোগমায়া। বাড়িতে কি যোগমায়ার কাজ একটা? খেতে মাত্র সব মিলিয়ে পাঁচটা প্রাণী। তার মধ্যে খাওয়ার লোক পাঁচটি হলেও কাজ করবার মাত্র ওই একটিই লোক। রেশনের দোকান থেকে সপ্তাহে একদিন রেশন আনতে হবে। কে যাবে রেশন আনতে? ওই যোগমায়া। কে আটার কলে গম ভাঙাতে যাবে? ওই যোগমায়া। কেরোসিন তেলের দোকানে লাইন দেবে কে? ওই যোগমায়া। কে মাসকাবারি ইলেকট্রিকের বিলের টাকা জমা দিতে যাবে? ওই যোগমায়া। বাজারটা না হয় কর্তা নিজের হাতে করে, কিন্তু কে তরকারী কুটবে? কে মাছ কুটবে? ওই যোগমায়া। তারপর বাড়ির এতগুলো মানুষের গেঞ্জি, রুমাল, আন্ডারওয়ার, তোয়ালে, বালিশের ওয়াড়, সায়া, ব্লাউজ সাবান-কাচা কে করবে? ওই যোগমায়া। খাবার পর বাসন কোসন-হাতা-খুন্তি-বেড়ি কে মাজবে? ওই যোগমায়া।

এত কাজ করেও ছোট জা'র মন জয় করতে পারে না যোগমায়া। সেই বহুদিন আগে বিশাখার বাবার শেষ কথাগুলো মনে পড়তো।

বিশাখার বাবা যাবার আগে বলে গিয়েছিল— দেখ বড় বউ, আমি তোমার জন্যে কিছু রেখে যেতে পারলুম না বলে কিছু ভাবনা করো না। আমার ভাই তপেশ তো রইল। আমি তপেশকে আমার সর্বস্ব দিয়ে লেখা-পড়া শিখিয়েছি, মানুষ করেছি। বাবা ছেলের জন্যে যা করে, বাবা নেই বলে আমি বড় ভাই হয়ে তার বাবার কাজই করে গেলুম। সরকারী অফিসে তার পাকা চাকরি করে দিলুম, তার বিয়ে দিয়ে দিলুম, সে তোমাকে দেখবে, কিছু ভয় নেই তোমার—

মানুষ চিরকাল থাকে না, একদিন তাকে চলে যেতেই হবে। কিন্তু তা বলে বিশাখার বাবার মত তাকে একলা ফেলে এমন করে যেতে হয়?

স্বামী অনেকেরই থাকে না। স্বামী না থাকলে যোগমায়া শুনেছে সে-কালে তার স্ত্রীকেও সহমরণে যেতে হতো। সেই-ই তো ভালো ছিল! সে যন্ত্রণা তবু খানিকক্ষণের জন্যে; কিন্তু এ যে চিরকাল ধরে জ্বালা। এও কি এক রকমের সতীদাহ নয়?

যত জ্বালা হয়েছে বিশাখাকে নিয়ে। বিশাখা যদি মেয়ে না হয়ে ছেলে হতো! বিশাখা মেয়ে না হয়ে ছেলে হলে তবু একটা ভবিষ্যতের আশা থাকতো। ছেলের

বড় হওয়ার পর তার বিয়ে দিয়ে বউ-এর সেবা পাওয়ার একটা ক্ষীণ ভরসাও থাকতো। কিন্তু মেয়ে ? মেয়ে হয়েছে বলে তার বিয়ে দেওয়ার একটা সমস্যা আছে। সে-সমস্যা কে মেটাবে ?

তাই ছোটবেলা থেকেই যোগমায়া বিশাখাকে দিয়ে গঙ্গার ঘাটে নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে-লুকিয়ে ব্রত করাতো।

প্রথম-প্রথম বিশাখা বলতো – বিজলী তো ব্রত করে না, আমি কেন করবো ?

যোগমায়া বলতো---তা না করুক, তুমি করো।

—আমাদের ইস্কুলের কেউ করে না –বিজলী করে না, শিখা করে না, বাসন্তী করে না, বন্দনা করে না। কেবল আমি কেন করবো ?

যোগমায়া বলতো –তাদের সবাই আছে যে ! তারা কেন করবে ? তাদের বাবা আছে, ভাই আছে, বোন আছে। কিন্তু তোমার যে কেউ নেই মা। যার কেউ নেই তার ভগবান আছে। সেই জন্যেই তোমাকে ব্রত করতে বলি --

--আমার কেউ নেই কেন মা ?

যোগমায়া বলতো—সকলের কি সব থাকে মা ? তুমি ব্রত করে যাও, দেখবে তোমার যখন সংসার হবে তখন তোমার সব হবে। তোমার স্বামী হবে, তোমার শ্বশুর হবে, তোমার শাশুড়ী হবে, তোমার দেওর হবে, তোমার ছেলে হবে, তোমার মেয়ে হবে –ধনে-জনে তোমার লক্ষ্মীলাভ হবে। সোনা-রুপো-হীরে-মুক্তোতে তোমার ঘর উথলে উঠবে--

বিশাখা বলতো – তুমিও ছোটবেলায় ব্রত করেছ ?

—হ্যাঁ, আমার মা'ও আমাকে দিয়ে ব্রত করিয়েছে—

- তাহলে তোমার বিয়ে হয়নি কেন ?

যোগমায়া তখন বলতো—আর কথা বলে না, অনেক রাত হয়েছে। এবার ঘুমিয়ে পড়ো। কাল আবার ভোরবেলা তোমাকে নিয়ে গঙ্গার ঘাটে যাবো। কাল আবার তুমি ব্রত করবে—

এমনিই চলছিল। এমন সময় বিডন স্ট্রীটের মুখুজ্জে-বাড়ির গিন্নীর নজরে পড়ে গেল বিশাখা। ব্রত করার পর যখন বিশাখা একলা দশরথ পাণ্ডার কাছে দাঁড়িয়েছিল তখন বিন্দু ঝি এসে তার নাম, কাকার নাম, বাড়ির ঠিকানা, সব নিয়ে চলে গিয়েছিল। আর তারপরই পরমেশ মল্লিক মশাই এই খিদিরপুরের মনসাতলা লেনের বাড়িতে এসে বিশাখার জন্মকুণ্ডলী চেয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন।

তারপর থেকেই যখন ঘটনাটা জানাজানি হয়ে গেল তখন ঘন-ঘন অসুখ হতে লাগলো ছোট জায়ের। তার গা ম্যাজ্‌ম্যাজ্ করতে লাগলো, তার মাথা টিপ্‌টিপ্ করতে লাগলো। তখন থেকে বিজলীকে দিয়েও ব্রত করাতে লাগলো রাণী ! ব্রত করলেই যদি বড়লোকের বাড়িতে বিয়ের সম্বন্ধ হয় তো বিজলীও ব্রত করুক।

রাণী একদিন বললে – তোমার মেয়ের সঙ্গে যদি বিজলীও ব্রত করে তো কী এমন তোমার ক্ষতি বড়দি ? বিজলীও তো তোমার আপন দেওরের মেয়ে ! আমি না হয় পর হলুম, পরের বাড়ি থেকে এইছি, কিন্তু তোমার দেওর তো আর পরের বাড়ি থেকে আসেনি। সে তো তোমার শ্বশুরেরই আর এক ছেলে, আর বিজলীও

তো তোমার শ্বশুরের নাতনী! সে আর কী এমন দোষ করলে যে তার দিকটা একটু দেখলে না। আর খরচ-পত্তোরের কথা যদি বলো······

যোগমায়া ছোট জা'র কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বললে—অমন কথা বোল না দিদি, ওতে আমার বিশাখার পাপ হবে। ঠাকুরপো আমাদের জন্যে যা করছে সে-ঋণ কি আমি জীবনে শোধ দিতে পারবো? ভগবান কি আমার সে ক্ষমতা দিয়েছেন?

রাণী বললে—অত কেঁদো না বড়দি, অত কেঁদে আর গেরস্ত'র অকল্যাণ করো না, ঢের হয়েছে—

এর পরে আর যোগমায়া ও-কথা উত্থাপন করেনি!

তা একজন ব্রত করাও যা আর দু'জন ব্রত করাও তাই-ই। তাই তার পর থেকে যখন যোগমায়া গঙ্গার বাবুঘাটে গিয়েছে, তখন দু'জনকে নিয়েই গিয়েছে। দু'জনকেই ব্রত করতে শিখিয়েছে। বিশাখার যেমন ভালো বর মিলেছে, বিজলীরও তেমনি মিলুক। তাতে ছোট জা'ও খুশী হবে।

তখন থেকে সকাল বেলাই বাড়িতে তোড় জোড় পড়ে যেত। ছোট জা'ও বিজলীকে সাজিয়ে দিত, আর বিশাখাকে সাজিয়ে দিত বিশাখার মা যোগমায়া। স্বাস্থ্য ভালো থাকলে হয়ত বিজলীকে নিয়ে বিজলীর মা'ও যেত। কিন্তু তা যখন সম্ভব নয়, তখন বড় জা'এর ওপর ভরসা করতে হতো।

স্নান করে বাড়িতে আসতেই রাণী মেয়েকে জিজ্ঞেস করতো--কীরে কেউ কিছু জিজ্ঞেস করেছে তোকে?

বিজলী কিছু বুঝতে পারতো না। বলতো— কী জিজ্ঞেস করবে?

রাণী বলতো—যারা ঘাটে চান করতে গিয়েছিল, তারা কেউ তোকে কিছু জিজ্ঞেস করেনি? জিজ্ঞেস করেনি তোর বাবার নাম কী, কোথায় কোন্ পাড়ায় থাকিস, এই সব কোনও কথাই কেউ জিজ্ঞেস করেনি?

বিজলী বলতো—না···

রাণী বলতো—সে কীরে, তোকে এত ভালো করে সাজিয়ে দিলুম, সিল্কের ফ্রক পরিয়ে দিলুম, তবু কেউ কিছুই জিজ্ঞেস করেনি?

ছোট মেয়ে বিজলী, মায়ের এই প্রশ্নের কারণ বুঝতে পারতো না। প্রত্যেক দিনই বলতো – কেউ কিছুই জিজ্ঞেস না করলে আমি কী করবো?

—কেন, ঘাটে অন্য অনেক লোক ছিল না? বড়লোকের বাড়ির কোন বুড়ী মানুষ চান করতে আসেনি?

বিজলী বলতো—তা আমি দেখিনি!

রাণী রেগে যেত। বলতো – তা কেন দেখবে! যেমন আমার পোড়া কপাল, তেমনি হয়েছে আমার ধিঙ্গী মেয়ে, সবাই মিলে আমাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাবে, তবে ছাড়বে।

বলে অতিষ্ঠ হয়ে বিছানায় গিয়ে চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়তো।
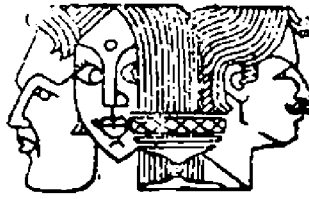
সেদিন সকালবেলা থেকেই মল্লিক-মশাই-এর ঘরে মানুষের ভিড়। মাসকাবারি মাইনের দিন। সবাই এসে একে-একে মাইনে নিয়ে যেত সরকার-মশাই-এর কাছ থেকে। এই মাইনে নেওয়ার পালা শুধু যে সকালবেলাটাতেই সীমাবদ্ধ থাকতো তা নয়। বলতে গেলে দিনভরই সে-পর্ব চলতো। যার যখন অবসর মিলতো ছুটি পেলে, তখনই সে আসতো। মন্দিরের পুরুতমশাই-ই আসতো প্রথম। তার সকালবেলার দিকে কোনও কাজ থাকতো না। যত কাজ বিকেলের পর থেকে। সকালবেলাটায় কন্দর্প আসতো ফুল-বেলপাতা নিয়ে। সে-সব রোজ হিসেব করে নেওয়া ছাড়া তা আবার বেতের চুবড়িতে রেখে কামিনীকে দিয়ে দেওয়া। সে-সব ফুল-বেলপাতা কামিনীর জিম্মায় থাকতো সারাদিন। তার আগে ঠাকুরমশাই সামান্য আরতি-টারতি যা করবার করতো। সেটা পাঁচ মিনিটের কাজ। সে-কাজটা সারা হলেই তখন কামিনীর ঘাড়ে সব ফেলে ঠাকুরমশাই নিজের কাজে চলে যেত। তখন অন্য পাড়ায় অন্য বাড়িতে কিছু খুচরো পুজোর বাবস্থা ছিল। তা থেকেও কিছু বাড়তি আয় হতো তার।

মল্লিক-মশাই সেদিনও একে-একে সকলকে মাসকাবারি মাইনে দিলেন। একে-একে কামিনী এল। এল গিরিধারী। এল একতলার ঝি ফুল্লরা, এল দোতলার ঝি কালিদাসী, এল তেতলার ঝি সুধা, এল ঠাকুমা-মণির খাস ঝি বিন্দু। আসতে আর কারো বাকি রইল না। তারপর অনেক বেলা করে এল বাবুঘাটের পান্ডা দশরথ। যার যা পাওনা-গন্ডা সব মিটিয়ে দিলেন মল্লিক-মশাই। কাজের চাপ যখন একটু কমলো তখন হঠাৎ মনে পড়লো সন্দীপের কথা।

তাই তো, সন্দীপ তো কাল রাতে বাড়ি আসেনি। সন্ধ্যেবেলা সে তো রোজ-কার মত কলেজে চলে গিয়েছিল যেমন যায়। তারপর তো আর আসেনি সে!

পুজোবাড়িতে সন্ধ্যেবেলা সিংহবাহিনীর আরতির সময় তেতলা থেকে ঠাকুমা-মণি নিচেয় এসে রোজকার মত পুজো দেখে ঠাকুরকে প্রণাম করে গেলেন। তারপর সবাই প্রসাদ পেলে। তারপর ঘড়িতে সন্ধ্যে সাতটা বাজলো, আটটা বাজলো, সাড়ে আটটা বাজলো। তারপর রান্নাবাড়ি থেকে দু'জনের খাবার উঠে এল। মল্লিক-মশাই এর আর সন্দীপের খাবার দেওয়া হয়েছে।

মল্লিক-মশাই বললে—ঠাকুর, সন্দীপবাবু তো এখনও আসেনি—বাবু এলে দু'জনে একসঙ্গেই খাবোখন—

ঠাকুর বললে—আপনি খেয়ে না নিলে আমাদের হাত-জোড়া হয়ে থাকে। বাবুর খাবার নাহয় আমি ঢাকা রেখে দেব। তিনি এলে তখন খাবেন—

তা বটে। অনেক ভেবেচিন্তে তিনি একলাই খেয়ে নিয়ে ঠাকুরকে ছুটি দিয়ে দিলেন। কিন্তু মনে ভাবনা রইল। এমন তো কখনও হয় না। বরাবর সন্দীপ

রাত ন'টার মধ্যেই কলেজ থেকে বাড়ি ফেরে। সে জানে যে ঠিক ন'টার সময় গিরিধারী দরজা বন্ধ করে দেয়। তবু কেন তার দেরি হচ্ছে।

শেষকালে তিনি গিরিধারীকে ডাকলেন।

বললেন—গিরিধারী, দেখ আমাদের সন্দীপবাবু তো এখনও ফিরলো না। তা তুমি তো ঠিক ঘড়ি দেখে রাত ন'টার সময় গেট বন্ধ করে দেবে। বাবু যদি তার পরে বাড়ি ফেরে তখন কী হবে ?

গিরিধারী সে-কথার জবাবে কী আর বলবে।

মল্লিক-মশাই বললেন - হয়ত বাবু রাস্তায় কোথাও আটকে গেছে। আজকাল কখন কোথায় কী হয় তা তো বলা যায় না। কেউ কিছু জানতেও পারে না বাইরে থেকে। তা আমি যদি ঘুমিয়েও পড়ি তো একটু গেট্‌টা খুলে দিও। বুঝলে ?

গিরিধারী বললে—জী হুজুর। আমি গেট খুলে দেব—আপ্ চিন্তা মাত্ কীজিয়ে—

বলে গিরিধারী চলে গিয়েছিল। কিন্তু তা হলেও মল্লিক-মশাই কি চিন্তা না করে থাকতে পারেন ? সারাদিনের পরিশ্রমের পর ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসে। শুয়ে পড়লেন বটে, কিন্তু কানটাকে সজাগ রাখলেন। পরের ছেলেকে নিজের কাছে এনে রেখেছেন, তার যদি কোনও বিপদ-আপদ হয় তখন তো তাঁরই ওপর দোষ পড়বে। আজকাল কথায়-কথায় যেমন পট্‌কা বোমা ফাটছে, তাতে কখন কার ভাগ্যে কী ঘটবে, কেউ কিছু আগে-ভাগে বলতে পারে না। নানা কথা ভাবতে ভাবতে কখন তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন তা তাঁর খেয়ালও ছিল না। সকাল থেকে বাড়ির লোকজনদের সকলকে মাইনে দিতে হবে, সে-টাকাগুলো তিনি দুপুরবেলাই ব্যাঙ্ক থেকে তুলে নিয়ে এসেছিলেন।

আর তারপর যখন তাঁর ঘুম ভাঙল, তখন একেবারে সকাল। রাত্রে কিছুই তিনি টের পাননি। একেবারে মড়ার মতন ঘুমিয়েছেন। তারপর তাড়াতাড়ি মুখ-হাত-পা ধুয়ে সকালবেলা সব করণীয় কাজ সেরে যখন সেরেস্তা-ঘরে এসেছেন তখনই কন্দর্প এসে হাজির। তারপর কন্দর্প গেল তো এল ঠাকুর-মশাই। তারপর একে একে কামিনী, ফুল্লরা, কালিদাসী, সুধা, বিন্দু থেকে শুরু করে গিরিধারী পর্যন্ত টিপ্-ছাপ দিয়ে মাসকাবারি মাইনে নিয়ে গেল।

গিরিধারীকে দেখেই মনে পড়ে গেল কথাটা। জিজ্ঞেস করলেন—আচ্ছা গিরিধারী, সন্দীপবাবু কি কাল রাত্তিরে বাড়ি ফিরেছে ?

গিরিধারী কথাটা শুনে সঙ্গে-সঙ্গে কোনও জবাব দিতে পারলে না।

মল্লিক-মশাই আবার জিজ্ঞেস করলেন—ফেরেনি, না ?

বলে একটু চিন্তিত হয়ে পড়লেন। পরের ছেলেকে নিজের কাছে এনে রাখার বিপদই এই। শুধু তো থাকা-খাওয়া-পড়ার ব্যবস্থা করাই নয়, তার ভালো-মন্দ সব কিছুর দায়িত্বই তো নিতে হবে।

তারপর বললেন—কোথায় গেল বলো তো বাবুজী ? এমন তো কখনও হয় না। গাড়ি চাপা পড়লো, না পুলিসে ধরলো, না হাসপাতালে গেল বোমা-গুলি খেয়ে। আজকাল তো কলকাতায় সবই সম্ভব।

এতক্ষণে গিরিধারী বললে— না সরকার বাবু, বাবুজী বাড়ি এসেছে—

—বাড়ি এসেছে ? কোথায় ? কখন ? রাত্তিরে, না সকালে ?

গিরিধারী বললে—কাল রাত দো বাজে—

—রাত দুটোর সময় ?

—জী হুজুর।

—তা তুমি তো আমাকে বলোনি সে-কথা।

গিরিধারী সরকারবাবুর সামনে কথাগুলো বলে অপরাধীর মত দাঁড়িয়ে রইল।

—কোথায় ? সন্দীপবাবু কোথায় ?

গিরিধারী বললে—বাবুজী আমার ঘরে শুয়ে ঘুমোচ্ছেন।

—তোমার ঘরে ? কেন ?

গিরিধারী বললে—মালকিন্ জানতে পারলে গোঁসা করবে, তাই বাবুজীকে চুপি-চুপি আমার ঘরে শুইয়ে রেখেছি হুজুর—

মল্লিক-মশাই কথাটা শুনে অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর যেন একটু সম্বিৎ পেয়ে আবার জিজ্ঞেস করলেন—তা বাড়ি ফিরতে দেরি হলো কেন তা কিছু বলেনি সন্দীপবাবু ?

গিরিধারী বললে—তা পুছিনি হুজুর—

মল্লিক-মশাই জিজ্ঞেস করলেন—তা এখন কোথায় ?

গিরিধারী বললে—এখনও বাবুজী আমার ঘরে ঘুমোচ্ছেন—

মল্লিক-মশাই বললেন—আচ্ছা, ঠিক আছে, এখন জাগাতে হবে না, ঘুম ভাঙলে আমার কাছে পাঠিয়ে দিও—
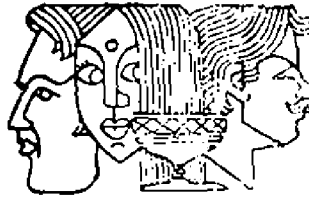
সে-সব কত কাল আগেকার কথা। কিন্তু এখনও প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি ঘটনা পর্যন্ত সন্দীপের মনে আছে। ওই বারোর-এ, বিডন স্ট্রীটের বাড়িতে সে কত দিন কত মাস, কত বছর কাটিয়েছে। কত আনন্দ, কত বেদনা, কত সুখ কত দুঃখ, কত আশা কত ভয় নিয়ে মুহূর্ত যাপন করেছে, সে-সব কথা এখন একে একে তার মনে পড়ছে। সেদিন যখন গিরিধারীর ঘরে তার ঘুম ভাঙলো, তখন চারদিক চেয়ে ধড়মড় করে উঠে বসেছে। মনে হয়েছিল এ কোথায় সে শুয়ে আছে! গিরিধারীর ঘর তেমন বড় নয়। একটা লোক কি বড়জোর দুটো লোক সে-ঘরে থাকতে পারে। ঘরের ভেতরে গিরিধারীর নানা জিনিসপত্রও ছিল। বলতে গেলে একটা ঘরের মধ্যেই তার সংসার। সে শুধু যে সেখানে শোয় তাই-ই নয়, সেখানে সে সংসারও করে। রাঁধে, খায়, রামচরিত পড়ে, বিশ্রাম নেয়। এক কথায় সেই ঘরটাই তার জগৎ। সন্দীপ অনেক দিন গিরিধারীর ঘরে গিয়েছিল। অনেক দিন তার রাম চরিতমানস পড়া শুনেছিল। কিন্তু এমন করে কখনও রাত কাটায়নি সে-ঘরে।

আগের রাতের কথাটা মনে পড়তেই সন্দীপ খুব লজ্জায় পড়ে গেল।

প্রায় সারা রাতটা এ-রকম করে বাড়ির বাইরে কাটানো সেই-ই প্রথম। সৌম্য মুখার্জি'র সঙ্গে মাত্র কয়েকদিন আগেই দেখা হয়েছিল। বাড়িতে রাজমিস্ত্রী খাটছিল সেই কাজ দেখা-শোনা করবার সময়েই সৌম্যবাবু জিজ্ঞেস করেছিলেন—কে আপনি? কী চান?

এই বাড়িতে সন্দীপ এতদিন কাটালো, তবু বাড়ির কর্তাও জানতে পারলে না সন্দীপ কে?

সন্দীপের পরিচয় গিরিধারীই শেষ পর্যন্ত দিয়েছিল। বলেছিল যে সরকার-মশাই-এর দেশের লোক সে। এর পরে সৌম্যবাবু আর কোনও কথা বলেন নি!

কিন্তু কাল রাতে?

কাল রাত্রে সেই একই সৌম্যবাবু যেন একেবারে নতুন মানুষ! যে-লোক বাড়িতে অত গম্ভীর-গম্ভীর ভাব, সেই লোকই আবার নাইট্-ক্লাবে একেবারে অন্য মানুষ।

মনে আছে সৌম্যবাবু বলেছিলেন—এ কি ব্রাদার, আপনিও এখানে? শেষকালে আপনিও সিংকিং-সিংকিং ড্রিংকিং ওয়াটার?

অর্থাৎ—শেষকালে আপনিও ডুবে ডুবে জল খান?

সৌম্যবাবু কী ভাবলেন কে জানে! সন্দীপ যে ঘটনাচক্রের এক অনিবার্য আবর্তে পড়ে ওখানে গিয়েছিল তা কে তাকে বোঝাবে? কলকাতার কোন্ তল্লাটে যে গোপাল তাকে নিয়ে গিয়েছিল, কোন্ তল্লাটে কোন্ নাইট্-ক্লাবে যে গোপাল তাকে খাওয়াবার জন্যে ঢুকিয়ে দিয়েছিল, তা তার একেবারেই মনে নেই। তবে অন্য কিছু মনে না থাকলেও এটা মনে আছে যে সেখানে অনেক মেয়েমানুষ অনেক বেটা-ছেলে ছিল, আর সবাই মিলে হাল্লাগুল্লা করছিল আর মদ খাচ্ছিল। আর যখন হঠাৎ ঘরটাতে আলো নিভে গেল তখন সে কী হাসি, সে কী হুল্লোড়, আর সে কী চিৎকার। মনে হলো যেন সকলের চেঁচামেচিতে ঘরটা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।

সন্দীপ নান্ খেতে-খেতে হঠাৎ খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিল মনে আছে।

সন্দীপ ভয় পেয়ে গোপালকে জিজ্ঞেস করেছিল—এ কী হচ্ছে রে গোপাল? মারামারি হচ্ছে নাকি? আমাদের মারবে না তো?

গোপাল বলেছিল—দূর, এ তো মজা হচ্ছে রে! ওরা মজা করে ওই রকম করছে—

—তা হঠাৎ ঘরের আলো নিভে গেল কেন?

গোপাল বলেছিল—ও তো ইচ্ছে করে ওরা আলো নিবিয়ে দিয়েছে—

—কেন? ইচ্ছে করে আলো নিবিয়ে দিয়েছে কেন?

গোপাল বলেছিল—ওইটেই তো মজা—

—কেন? মজা কেন?

গোপাল বলেছিল—মজাই তো। এখন সবাই ছেলেরা মেয়েদের গায়ে হাত দিচ্ছে। কে কার গায়ে হাত দিচ্ছে, তা তো কেউ দেখতে পাচ্ছে না। কেউ কাউকে চিনতেও পারছে না যে কেউ-কাউকে কিছু বলবে—

—এর পর কী হবে?

গোপাল বলেছিল—একটু পরেই দেখবি একটা হুইসেল্ বেজে উঠবে, আর হুইসেলের শব্দ শুনেই সবাই সাবধান হয়ে যাবে। তখন সবাই আবার সাধু-পুরুষ

সাজবে, যেন কেউ ভাজা মাছ উল্‌টে খেতে জানে না--

আর খানিক পরে ঠিক তাই-ই হলো। অন্ধকারে কোথা থেকে একবার হুইস্‌ল বেজে উঠলো। আর সঙ্গে-সঙ্গে ঘরের সব আলো জ্বলে উঠলো! অন্ধকার হবার সঙ্গে-সঙ্গে ঘরের যে-সব গান-বাজ্‌না চুপ হয়ে গিয়েছিল, তা আবার গম্‌-গম্‌ করে বেজে উঠলো। আর হঠাৎ কোথা থেকে একটা আর্তনাদ সন্দীপের কানে ভেসে এল। সবাই সেই আর্তনাদটার কেন্দ্রস্থানে দৌড়ে গিয়ে দেখলে কে একজন মদের নেশায় ঘরের মধ্যে পড়ে আছে।

সন্দীপ দেখতে যাচ্ছিল ওদিকে কে অমন আর্তনাদ করে উঠলো।

কিন্তু গোপাল বলেছিল—ওদিকে যাস্‌নি-যাস্‌নি ওদিকে--

—কেন? চল্‌ না দেখি গিয়ে কী হলো ওখানে—

গোপাল বলেছিল—দূর, কেউ হয়ত কাউকে ঠেলে ফেলে দিয়েছে। ও-রকম এখানে রোজ হয়, তুই দেখিস্‌নি ও-সব—

কিন্তু সন্দীপ গোপালের কথা শোনে নি। শেষ পর্যন্ত যে-জায়গাটায় সবাই গিয়ে ভিড় করেছিল, সেইখানে গিয়ে উঁকি মারতেই দৃশ্যটা দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল। এ তো তাদের বাড়ির খোকাবাবু! সৌম্যবাবু!!

সৌম্যবাবুকে সেই অবস্থায় দেখে সন্দীপ কী করে চুপ করে থাকে!

বলেছিল—গোপাল, এ যে আমাদের বাড়ির খোকাবাবু রে—

—কে খোকাবাবু? কোথাকার খোকাবাবু?

সন্দীপ বলেছিল—আমি যে-বাড়িতে থাকি, সেই বাড়ির মালিক সৌম্যবাবু। সৌম্য মুখার্জি! ইনি এখানে এসেছেন কেন?

—তুই ছেড়ে দে ওকে। ও-সব যত বড়লোকের বাড়ির বখাটে ছেলেরাই এখানে মদ খেয়ে ফুর্তি করতে আসে—মেয়েদের নিয়ে মাতাল হতে আসে! চলে আয়—

সন্দীপ বলেছিল—না ভাই, তুই বাড়ি যা, আমি সৌম্যবাবুর কাছে থাকি—

বলে সন্দীপ সৌম্যবাবুকে দুই হাতে ধরে কোনও রকমে বাড়িতে নিয়ে এসেছিল। ভাগ্য ভালো যে সৌম্যবাবুর বেশি চোট লাগেনি। বেশি চোট লাগলে হয়ত আর নিজে গাড়ি চালাতে পারতেন না।

তারপর বাড়ির দরজার সামনে আসার পরই গিরিধারী দেখতে পেয়েছিল সব। সে তাড়াতাড়ি গেট খুলে বাইরে এসে খোকাবাবুকে ধরে ভেতরে নিয়ে গিয়েছিল। সন্দীপও ছিল পাশে-পাশে। তারপর গিরিধারী গাড়ীটাকে ঠেলে কোনও রকমে গ্যারেজের ভেতরে পুরে দিয়েছিল।

সন্দীপ তখনও বুঝে উঠতে পারেনি সে কী করবে!

গিরিধারী খোকাবাবুকে তার ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে এসে বললে—বাবুজী, আপনি খোকাবাবুর সঙ্গে কোথা গিয়েছিলেন?

সে-কথার জবাব দেওয়ার আগেই সন্দীপ জিজ্ঞেস করেছিল—সরকার-মশাই কি তোমার কাছে আমার খবর নিয়েছিল গিরিধারী?

গিরিধারী বলেছিল—হাঁ বাবুজী, সরকার-মশাই বহোত্‌ দফে আমাকে আপনার বাত্‌ পুছেছে--

—সরকার-মশাই ঘরের দরজা খুলে রেখে শুয়েছে?

—আচ্ছা, আমি দেখে আসি –

বলে গিরিধারী অন্ধকারের মধ্যেই ভেতরে গিয়ে দেখে এসে বলেছিল—না বাবুজী, দরওয়াজা বন্ধ করিয়ে দিয়েছে—

তা তো বন্ধ করবেনই ! অনেক টাকা থাকে মল্লিক-মশাই-এর কাছে। দরজা খোলা রেখে শুলে টাকা খোয়া যাবার ভয় থাকে! রাত্রে বোধহয় সন্দীপের জন্যে মল্লিক-মশাই অনেক রাত জেগে-জেগে অপেক্ষা করেছেন। তারপর যখন অনেক রাত হওয়ায় পরও সে আসেনি, তখন বুড়ো মানুষ আর জেগে থাকতে পারেন নি। দরজায় হুড়কো লাগিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন।

গিরিধারী তখন বলেছিল—আপনি বাবুজী আমার ঘরে শুবেন ?

সন্দীপ বলেছিল—তোমার এখানে কি জায়গা হবে ?

গিরিধারী বলেছিল—রামজী কিরপা করলে কেন জায়গা হবে না বাবুজী ? লেকিন আপনার থোড়া তক্‌লিফ্ হবে—

শেষ পর্যন্ত কিন্তু কোনও কষ্টই হয়নি সন্দীপের। কখন কোথা দিয়ে যে রাত ভোর হয়ে গিয়েছিল, তা টেরই পায়নি সন্দীপ। সকালবেলার দিকে তন্দ্রার মধ্যেই আগের রাত্রের সব কথা মনে আসছিল। তখনও যেন সৌম্যবাবুর সেই কথাগুলো তার কানে ভাসছিল--এ কি ব্রাদার ? আপনিও এখানে ? আপনিও তাহলে সিংকিং সিংকিং ড্রিংকিং ওয়াটার ? আপনিও ডুবে-ডুবে জল খান ?

তারপর যখন ঘরের জানালার ফাঁক দিয়ে রোদ এসে পড়েছে, তখনই ধড়মড় করে বিছানা ছেড়ে উঠে বসেছে সন্দীপ।

হঠাৎ গিরিধারী এসে সন্দীপকে জেগে বসে থাকতে দেখে বললে—আপনার ঘুম ভাঙিয়েছে বাবুজী ?

সন্দীপ বললে—ছিঃ কত বেলা হয়ে গেল, তুমি আমাকে ডেকে দাওনি কেন গিরিধারী ? মল্লিক-মশাই এখন কী করছেন ?

গিরিধারী বললে, আজকে তো আমাদের মাইনের দিন, তাই সকাল থেকেই সবাই মাইনে নিচ্ছে—

তাই তো বটে ! আজই তো মাসের পয়লা তারিখ। আজই তো খিদিরপুরে যেতে হবে। সেই সাত নম্বর মনসাতলা লেনের বাড়িতে গিয়ে আজই তো বিশাখার টাকাটা তার মাকে দিয়ে আসতে হবে।

সত্যি মনে আছে সেদিন মল্লিক-মশাই খুবই রাগ করেছিলেন। বলেছিলেন—ছিঃ ছিঃ, তোমার এতটুকু দায়িত্বজ্ঞানও নেই ! তুমি একবারও বাড়ির কথা ভাবলে না ! তোমার মা তোমাকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন আর তুমি কিনা কলকাতায় এসে এই রকম বে-আক্কেলের মত বাড়ির বাইরে রাত কাটালে ? তুমি একবার আমার কথাও ভাবলে না ? রাত্তিরে তোমার জন্যে ভেবে-ভেবে আমার কতক্ষণ

ঘুমই হলো না, তা জানো ? শেষকালে কতক্ষণ আর জেগে থাকবো, তাই শেষকালে ঘরের দরজায় খিল বন্ধ করে দিলুম। আমার ক্যাশবাক্সে কত টাকা থাকে, তাও তুমি ভালো করেই জানো। তা ছাড়া আজকে আবার বাড়ির সকলের মাইনের তারিখ। সে সব টাকা ব্যাংক থেকে তুলে এনে ক্যাশ বাক্সে রেখেছিলুম—তা বলো তো কোথায় ছিলে তুমি ? কলেজ থেকে ফিরতে এত দেরিই বা হলো কেন তোমার ? কোথায় গিয়েছিলে ?

সন্দীপ সব ঘটনা খুলে বলেছিল মল্লিক-মশাইকে। মল্লিক-কাকা বরাবরই কম কথার মানুষ। সব শুনে বলেছিলেন—তারপর ?

সন্দীপ বলেছিল—আমহার্স্ট স্ট্রীটে তখন পুলিশের গুলি চলছিল, তাই বাস-ট্রাম সবই বন্ধ। তখন আর কী করবো। ভাবলুম কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট ধরে হেঁটেই আসবো। সেখান দিয়ে হেঁটে হেঁটে আসছি, এমন সময় গোপালের সঙ্গে দেখা। গোপালকে আপনি নিশ্চয়ই চেনেন—

—গোপাল ? কে গোপাল ?

—আমাদের বেড়াপোতায় হাজরা-বুড়ো থাকতো, বাজারে শাক-পাতা বিক্রি করতো। তারই ছেলে। আমাদের সঙ্গে ইস্কুলে একই ক্লাসে পড়তো—

মল্লিক-মশাই বললেন—তা সে কলকাতায় এলো কী করে ?

সন্দীপ বললে—তা জানি না। সে কলকাতায় এসে খুব বড়লোক হয়ে গিয়েছে, অনেক টাকা করে ফেলেছে। একটা গাড়িও কিনেছে সে—

মল্লিক-মশাই বললেন—গাড়ি কিনেছে ? গাড়ির তো অনেক দাম ! অত টাকা সে পেলো কোত্থেকে ?

—তা জানি না।

—তারপর ?

সন্দীপ বলতে লাগলো—তারপর হঠাৎ খেয়াল হলো যে রাত ন'টা বেজে গিয়েছে, জানতুম রাত নটার সময় গিরিধারী বাড়ির গেট বন্ধ করে দেয়। তখন খুব ভাবনায় পড়লুম। সে বললে—ভাবনা কী এখুনি খাবারের ব্যবস্থা করে দিতে পারে সে। বলে আমাকে খাওয়াবার জন্যে একটা হোটেলে নিয়ে গেল—

মল্লিক-মশাই বললেন—সে কী ? সে তোমাকে খাওয়াবার জন্যে হোটেলে নিয়ে গেল আর তুমিও হোটেলে গেলে ? তারপর কী হলো ? তুমি সেখানে খেলে ?

সন্দীপ বললে—হ্যাঁ—

মল্লিক-মশাই বললেন—ছিঃ ছিঃ, তুমি হোটেলে খেলে কী বলে ? আমি তো এতকাল ধরে কলকাতায় আছি, একদিনের জন্যেও হোটেলে খাইনি। হোটেলের ভেতরটা কেমন, তাও কখনও এই বুড়ো বয়েস পর্যন্ত দেখলুম না। তা খেলে কী ?

সন্দীপ বললে—নান্—

—নান্ মানে ? নান্ কী জিনিস ?

—আমিও তো তা জানতুম না। গোপালই বললে নান্ মানে এক রকমের রুটি, ময়দা দিয়ে তৈরি করে—

—তার দাম কত ?

সন্দীপ বললে—তা আমি জানি না।

—দাম তুমি দিলে ?

সন্দীপ বললে—না, আমি পয়সা কোথায় পাবো ? গোপালই আমার হয়ে পয়সা দিলে। তার সঙ্গে মুরগীর মাংসের শিক্‌কাবাব দিয়েছিল, তা আমি খাইনি। সেটা গোপাল খেলে—

—তারপর ?

সন্দীপ বলতে লাগলো—তারপর আমি চলে আসতে যাবো, এমন সময় হঠাৎ চারদিকে একটা গোলমাল উঠলো, ঘর অন্ধকার হয়ে গিয়েছে। আর সেই অন্ধকারের পর যখন আবার আলোগুলো জ্বললো, দেখি একটা জায়গায় অনেকগুলো লোক জড়ো হয়েছে। কী হয়েছে দেখতে গিয়ে যেই কাছে গিয়েছি, তখনই দেখলুম আমাদের বাড়ির খোকাবাবু—

মল্লিক-মশাই কথাটা শুনেই চমকে উঠেছেন। বললেন—খোকাবাবু ? বলছো কী তুমি ? খোকাবাবু ? আমাদের সৌম্য ? এ-বাড়ির ঠাকুমা-মণির নাতি ?

—হ্যাঁ, সৌম্যবাবু—

—তাঁকে তুমি চিনলে কী করে ? তুমি তো কখনও দেখনি তাঁকে—

সন্দীপ বললে—না, আমি তাঁকে আগে দেখেছি—

—কোথায় ? কোথায় দেখেছ ?

—আমাদের এই বাড়িতেই। কিছুদিন আগে তিনি বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে রাজমিস্ত্রী খাটাচ্ছিলেন, তখন আমাকে তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন আমি কে, আমি কী করি এ-বাড়িতে—আরো সব অনেক কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন। আমি তাঁকে সব কথা বলেছিলাম। তারপর থেকে আর কোনও দিন তাঁর সঙ্গে দেখা হয়নি। হঠাৎ কাল ওইখানে দেখা হয়ে গিয়েছিল—

—উনি তোমায় চিনতে পারলেন ?

—কপাল দিয়ে তখন ওর রক্ত বেরোচ্ছিল। মদের ঝোঁকে মেঝের ওপর পড়ে গিয়ে মাথায় হয়ত খুব চোট্ লেগেছিল।

—মদ ? খোকাবাবু মদ খেয়েছিলেন নাকি ?

সন্দীপ বললে—হ্যাঁ, গোপাল বললে ওখানে তো সবাই মদ খেতেই যায়। সমস্ত রাত নাকি ওখানে সবাই মিলে মদ খায়। অনেক মেয়েমানুষও ছিল সেখানে—

—মেয়েমানুষরাও মদ খাচ্ছিল নাকি ?

সন্দীপ বললে—হ্যাঁ!

মল্লিক-মশাই কথাগুলো শুনে, মনে হলো, যেন খুব অবাক হলেন, আবার যেন মনে-মনে খুব কষ্টও পেলেন। অনেকক্ষণ পরে জিজ্ঞেস করলেন—হোটেলটা কোথায় বলো তো, কোন জায়গায় ?

সন্দীপ বললে—তা বলতে পারবো না। আমি তো কলকাতার সব রাস্তা চিনি না। গোপাল গাড়ি চালিয়ে আমাকে নিয়ে গিয়েছিল, তাই গিয়েছিলুম। ও বললে, ওটা নাকি নাইট ক্লাব একটা—

—নাইট-ক্লাব ? নাইট-ক্লাব মানে ?

সন্দীপ বললে—তা আমি জানবো কী করে ? নাইট-ক্লাবে কী হয়, সবাই কেন যায় সেখানে, তাও জানি না—

মল্লিক-মশাই কথাগুলো শুনে আবার যেন খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন। শেষ-কালে জিজ্ঞেস করলেন—তারপর? তারপর নাইট-ক্লাব থেকে বাড়ি এলে কী করে?

—গাড়িতে করে। সৌম্যবাবু কোনও রকমে নিজেই গাড়ি চালিয়ে বাড়িতে এলেন। তারপর গিরিধারী সৌম্যবাবুকে ধরে-ধরে ওপরে নিয়ে গেল। আমি দেখলুম আপনার ঘরের দরজা বন্ধ, তাই গিরিধারী তার ঘরেই শুতে বললে—

মল্লিক-মশাই খানিক পরে বললেন—তুমি খুব অন্যায় কাজ করেছ সন্দীপ, খুব অন্যায় কাজ করেছ। এখানে তোমার মা আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন আমাকে বিশ্বাস করে। এই কলকাতা বড় আজব জায়গা। বিশেষ করে তোমার মত কম বয়েসের ছেলেদের কাছে। এখানে যদি কেউ গোল্লায় যেতে চায় তো তার রাস্তা চির-কালের মত খোলা আছে। আবার এখানে যদি কেউ সৎপথে থেকে নিজের উন্নতি করতে চায় তো তার রাস্তাও খোলা আছে। এ সব নির্ভর করছে নিজের-নিজের মনোবৃত্তির ওপর। তুমি যদি নিজের ভালো চাও তাহলে আমি যা বলবো তাই করবে! তুমি এই মুখুজ্জে-বাড়ির আশ্রিত। এদের মঙ্গলেই তোমার মঙ্গল, এদের ক্ষতিতেই তোমার ক্ষতি। এই কথাটা সব সময় মনে রাখবে। সৌম্যবাবু মদ খান আর যা-ই খান, সেদিকে তোমার দেখবার দরকার নেই। যারা তোমার উপকার করছে তাদের সব সময়ে তুমি মঙ্গল কামনা করবে। এইটুকু জানবে যে এদের ভালোতেই তোমার ভালো আর এদের খারাপ হলে তোমারও খারাপ। তা যদি না করো তো তুমিই হবে নেমক-হারাম। তুমি ভবিষ্যতে এ-বাড়িতে থাকো আর না থাকো, যতদিন তুমি বেঁচে থাকবে ততদিন এ-বাড়ির কল্যাণই কামনা করবে, এ-বাড়ির লোকদের ভালোই চাইবে। তুমি তোমার প্রাণ দিয়েও এ-বাড়ির ইজ্জৎ বাঁচাবার চেষ্টা করবে, বুঝলে? আমার কথাগুলো সারাজীবন মনে রেখো! তোমার মা তোমার ভালোর জন্যেই তোমাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন, তাই তোমাকে এত কথা বলা... আজকে আমার কথাগুলো মনে রাখলে তোমারই ভালো হবে সন্দীপ, তোমারই ভালো হবে, তোমারই ভালো হবে—

জীবনের চার ভাগের তিন ভাগ অতিক্রম করে আজ যদি সন্দীপ পেছন ফিরে দেখতে চায় তো সে কী দেখবে? সে কি বিডন স্ট্রীটের মুখুজ্জে-বাড়ির মঙ্গল চেয়ে এসেছে, না অমঙ্গল চেয়ে এসেছে? যারা দুঃখের দিনে তার উপকার করেছিল, তাকে আশ্রয় দিয়ে অন্ন দিয়ে তার তখনকার দিনগুলোকে সহজ করেছিল, সে কি তাদের ভালো চেয়েছে না মন্দ চেয়েছে? অনেক আঘাত অনেক অপমান সহ্য করেও সে তো তাদের শুভ-কামনাই করে এসেছে বরাবর। সে তো নিজের প্রাণ দিয়েই শুধু নয়, নিজের সর্বস্ব দিয়েই তো তাদের ইজ্জৎ বাঁচিয়ে এসেছে।

মল্লিক-মশাই আজ বেঁচে থাকলে সন্দীপ তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বলতো—মল্লিক-কাকা, আমি আপনার সেদিনকার কথা রেখেছি।

আমার প্রাণই শুধু নয়, আমার সারা জীবনের সর্বস্ব দিয়ে আমি মুখুজ্জে-বাড়ির ইজ্জৎ রেখেছি। এবার বলুন আমি আর কী করতে পারি ? আমি আর কত দিতে পারি ? আমার দিতে আর কত বাকি আছে ?

এখনও মল্লিক-মশাই এর শেষ কথাগুলো তখনও কানে বাজছে—আজকে আমার বলা কথাগুলো মনে রাখলে তোমারই ভালো হবে সন্দীপ, তোমারই ভালো হবে, তোমারই ভালো হবে······

মনে আছে, এর পর মল্লিক-মশাই বলেছিলেন—আজ মাসের পয়লা তারিখ, সেটা তোমার মনে আছে তো ? আজকে আমারও অনেক কাজ ছিল। এ-বাড়ির সকলের মাসকাবারি মাইনে দিয়ে দিয়েছি আজ। আজকে তোমাকে আবার এখুনি খিদিরপুরের মনসাতলা লেনে গিয়ে যোগমায়া দেবীর মাসকাবারি পাওনাটা দিয়ে আসতে হবে। তুমি তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও, দেরি করলে আবার তপেশবাবু অফিসে চলে যাবেন। তাঁর অফিসেও তো আবার আজ মাইনের দিন—

সন্দীপের মনে পড়ে গেল কথাটা। সত্যিই তো আজ আবার সেই গেল মাসের মত বিশাখদের বাড়ি যেতে হবে। সে তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিলে। মল্লিক-মশাই গুণে-গুণে একশো পঁচিশ টাকা সন্দীপের হাতে দিলেন। বললেন—বেশ সাবধানে যাবে বাবা, বুঝলে ? আবার কাল রাত্তিরের মত যেন না-হয়, টাকাটা দিয়ে শিগ্গির-শিগ্গির ফিরে আসবে। তুমি এলে তখন আমরা এক সঙ্গে খেতে বসবো—তুমি না-আসা পর্যন্ত আমি কিন্তু একলা তোমার অপেক্ষায় ছটফট্ করবো—দেরি কোরো না যেন—

তারপর বাড়ি থেকে বেরোবার সময়ও সন্দীপকে সাবধান করে দিলেন। বললেন—এ কলকাতা শহর, এ তোমার বেড়াপোতা নয়, এখানে সবাই চোর-ডাকাত। যদি কেউ একবার গন্ধ পায় যে তোমার কাছে টাকা আছে, তা হলে আর প্রাণ নিয়ে বাড়ি ফিরতে পারবে না—

তারপর অদৃশ্য দেবতার উদ্দেশ্যে বললেন—দুর্গা শ্রীহরি—দুর্গা শ্রীহরি—

সন্দীপ জুতো জোড়া পায়ে গলিয়ে রাস্তার দিকে পা বাড়ালো।

মল্লিক-মশাই ছিলেন ঠিক তাঁর মায়ের মত। সন্দীপের মা'ও সব সময়ে সন্দীপকে সাবধান করে দিত। মা-ও বলতো—খুব সাবধানে যাবে বাবা—

আর অদৃশ্য কোনও দেবতার উদ্দেশ্যে বলতো—দুর্গা শ্রীহরি—

মল্লিক-মশাই আর তার মা যত বড়ই শুভাকাঙ্ক্ষী হোক, সন্দীপের ভাগ্য-বিধাতা যে সে-সব আশীর্বাণী শুনে অলক্ষ্যে যে নিঃশব্দে হাসতেন, তা কে তখন কল্পনা করতে পেরেছিল ? আজ মনে হয় সন্দীপ যদি সেদিন বেড়াপোতা ছেড়ে কলকাতার এই বিডন স্ট্রীটের বাড়িতে না আসতো তা হলে বোধহয় তার জীবনের ধারা অন্য খাতে বইতো। সন্দীপও তাহলে আজ যা হয়েছে তা না হয়ে একেবারে অন্য রকম মানুষ হতো।

খিদিরপুরের সাত নম্বর মনসাতলা লেনের বাড়িতে এমনিতেই মাসের পয়লা তারিখটাতে একটু সোরগোল পড়ে যেত। প্রত্যেক মাসের পয়লা তারিখ যেমন তপেশ গাঙ্গুলী রেলের অফিসে দুপুর-বেলায় মাইনে পেয়ে যেতেন, তেমনি

সকালবেলাতেও মল্লিক-মশাই ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে সময় মিলিয়ে মাসকাবারির পাওনা-টাকাটা তপেশ গাঙ্গুলীর হাতে দিয়ে আসতেন। হাজার ঝড়বৃষ্টি হোক, হাজার কনকনে শীত পড়ুক, পৃথিবীতে হাজার ভূমিকম্প হোক, এই পয়লা তারিখে দুতরফ থেকে টাকা পাওয়াটার কোন ব্যতিক্রম হয়নি। প্রত্যেক মাসের পয়লা তারিখটাতেই তপেশ গাঙ্গুলী সকাল-সকাল বাজার সেরে দাড়ি কামিয়ে স্নান করে মল্লিক-মশাই এর আসার পথের দিকে চেয়ে বসে থাকতেন। এক মিনিট দেরি হলেই সদর দরজাটা খুলে রাস্তার ফুটপাথে গিয়ে ট্রাম রাস্তার দিকে তীর্থের কাকের মত চেয়ে থাকতেন। কত লোক আসতো-যেত, কিন্তু মল্লিক-মশাইকে কখনও দেখা যেত না। অনেকক্ষণ পরে যখন অনেক দূরে মল্লিক-মশাই এর চেহারাটা দেখা যেত, তিনি বাড়ির ভেতরে ঢুকে যেতেন। চিৎকার করে বলতেন—বউদি, মল্লিক-মশাই এসে গেছে—

তখন আনন্দের চোটে তিনি নিজের শোবার ঘরেও ঢুকে পড়তেন। বলতেন—ওগো, ওঠো উঠে বোস, মল্লিক-মশাই আসছে—

রাণী বলতো—মল্লিক-মশাই আসছে তো আমি তার কী করবো? নাচবো?

রাণীর জবাবটা তপেশবাবুর আনন্দের উত্তাপের ওপর কেউ যেন এক বালতি ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিত। আর তিনি যেন হতাশায় ফাটা বেলুনের মত চুপসে যেতেন। বলতেন—আহা, আমার সব কথাতেই তুমি অমন ফোঁস করে ওঠো কেন বলো তো? আমি তোমার কী ক্ষতিটা করেছি।

রাণী সঙ্গে সঙ্গে ফুট্ কাটতো। বলতো—তুমি চুপ করো তো। একে আমার সকাল থেকে মাথা টিপ-টিপ করছে, তার ওপর আবার তোমার ভ্যান্ ভ্যান্

তপেশ গাঙ্গুলী মুখটা চুন করে আবার ঘর ছেড়ে বাইরে চলে যেতেন। এই কথাটা ভেবেই কেবল তাঁর কান্না পেত যে তিনি এত কিছু করেও স্ত্রীকে খুশী করতে পারলেন না। মল্লিক-মশাই-এর দেওয়া পুরো টাকাটা রাণীর হাতে তুলে দিলেও যেমন তার মন পাওয়া যেত না, অফিসের পুরো মাইনেটা তার হাতে তুলে দিয়েও ঠিক তেমনি তার মন পাওয়া যেত না। কী পেলে যে রাণীর মন পাওয়া যেত, তা বোধহয় রাণীর বিধাতা-পুরুষেরও অগোচর ছিল।

সেদিন সকালবেলাই রাণী রান্নাঘরের দাওয়ার সামনে এসে দাঁড়ালো। বললে—হ্যাঁ বড়দি, আমার বিজলী কি তোমার আপন দেওর-ঝি নয়?

যোগমায়া তখন ঠাকুরপো'র অফিসের ভাত-তরকারি রান্না নিয়ে ব্যস্ত। বললে—আমাকে বলছো দিদি?

—তা তোমাকে বলছি না তো কি ও-পাড়ার নাজিরদের বাড়ির মাসীকে বলছি? তা এও বলে রাখছি বড়দি, আমারই বুকের ওপর বসে আমারই নাক কাটবে, তা আমি করতে দেব না—

যোগমায়া বললে—আমি ঠিক বুঝতে পারছি নে দিদি তুমি কী বলছো।

রাণী বললে- তা বুঝতে পারবে কেন? বুঝতে পারলে যে আমার সুখ হবে—

যোগমায়া বললে—একটু খুলে বলো না দিদি, আমি কী অন্যায় করেছি—

— অন্যায় তো তুমি করোনি বড়দি, অন্যায় করেছি আমি। আমি আর জন্মে অনেক অন্যায় করেছিলুম বলেই এ-জন্মে আমার এত ভোগান্তি। নইলে এত

বাড়ি থাকতে আমি এ-বাড়ির বউ হতে যাবো কেন ?

যোগমায়া উনুনের কড়াটা মেঝেতে নামিয়ে বললে—তোমার পায়ে পড়ি দিদি, তুমি আমায় খোলসা করে বলো আমার কী অন্যায়টা হয়েছে। আমি যদি জেনে শুনে কোনও অন্যায় করে থাকি তো নাকে খত দিয়ে তোমার কাছে ক্ষমা চাইবো, আর ভগবানের কাছে হাতজোড় করে বলবো যেন নরকেও আমার ঠাঁই না হয়—

এমন সময় তপেশ গাঙ্গুলী চান করে এসে দাঁড়ালো। বললে—আবার কী হলো তোমাদের ? সকাল থেকেই আজ তোমরা ঝগড়া শুরু করে দিলে ?

রাণী স্বামীকে ধমক দিয়ে উঠলো। বললে—তুমি কেন আমাদের কথার মধ্যে কথা বলতে আসো শুনি ? তুমি অফিস যাচ্ছো যাও না—ব্যাটাছেলে হয়ে তুমি মেয়েছেলেদের কথার মধ্যে নাক গলাও কেন ?

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—আজকে মাসের পয়লা তারিখ সেটা জানো ? মাসের এই পয়লা তারিখটাতেও কি তোমরা আমাকে একটু শান্তি দেবে না ?

রাণী এবার স্বামীকে ধমকে উঠলো—তুমি থামো তো ! তোমার অফিস-কাছারি আছে, তুমি তাই নিয়ে মাথা ঘামাও গে। সংসার জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়েই যাক আর গোল্লায়ই যাক, তাতে তোমার কী ?

তপেশ গাঙ্গুলী বললেন—তা এ সংসার কি শুধু তোমাদের একলারই ? আমার সংসার নয় ? সংসারের যত হ্যাপা কি আমাকেও সইতে হয় না ?

রাণী বলে উঠলো তুমি সংসারের কোন্ হ্যাপাটা সহ্য করো শুনি, কোন্ হ্যাপাটা সহ্য করো ? এই যে তোমার বৌদি নিত্য নিজের মেয়েকে গঙ্গার ঘাটে নিয়ে গিয়ে তাকে দিয়ে ব্রত করায়, সে খবর কি তুমি রাখো ?

--ব্রত ? ব্রত কীসের ?

রাণী বললে—ব্রত যদি না-ই জানবে তো তাহলে সে-কথায় নাক গলাতে আসো কেন ? বিশাখার যাতে ভালো বরে, ভালো ঘরে বিয়ে হয়, তাই তোমার বৌদি লুকিয়ে-লুকিয়ে গঙ্গার ঘাটে গিয়ে ব্রত করায় ! কেন, তোমার নিজের মেয়ে বিজলীর কি ভালো ঘরে ভালো বরে বিয়ে হতে নেই ? সে কি বানের জলে ভেসে এসেছে ? সে কি তোমার বৌদির কেউ নয় ? সে কি পর ?

এতগুলো কথা একসঙ্গে বলে রাণী হাঁফাচ্ছিল। এর জবাবে তপেশ গাঙ্গুলী কী বলবে, কার পক্ষে এবং কার বিপক্ষে বলবে, তা কিছু বুঝতে পারলে না। তাই যোগমায়ার দিকে চেয়ে বললে—বৌদি—

কিন্তু হঠাৎ সদর দরজার কড়া নড়ে উঠলো। তপেশ গাঙ্গুলী বললেন—ওই ওই বোধহয় বিডন স্ট্রীটের মুখুজ্জেদের বাড়ি থেকে টাকা দিতে—

বলে রণভঙ্গ দিয়ে সদর-দরজার দিকে পালিয়ে বাঁচলেন—

বললেন—যাচ্ছি ভাই, যাচ্ছি—

প্রত্যেক মাসের পয়লা তারিখটা তপেশ গাঙ্গুলীর এই রকম করেই কাটে ! ঠিক বুঝে-বুঝে ওই তারিখেই যেন যত রকম উটকো ঝামেলা এসে হঠাৎ উদয় হয়। তাঁর সব সময় কেবল মনে হয় ওই বুঝি মুখুজ্জেবাড়ির থেকে লোক এসে তাঁকে ডেকে-ডেকে না পেয়ে ফিরে গেল।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর প্রতীক্ষা সার্থক হয়। তাঁর প্রার্থিত টাকা তিনি পেয়ে

যান। তাই যখন তাঁর বাড়ির দরজার কড়া নাড়ার শব্দ হলো, তিনি ভেবেছিলেন ও নিশ্চয়ই বিডন স্ট্রীটের বাড়ির লোক। তিনি দরজার দিকে যেতে-যেতেই বলতে লাগলেন—যাচ্ছি যাচ্ছি, এত দেরি কেন আজ ?

কিন্তু না, এ মুখুজ্জে-বাড়ির লোক নয়।

তপেশ গাঙ্গুলী দরজা খুলেই হতাশ হয়ে গেলেন। বললেন—আরে তুমি ? তুমি কি নতুন লোক নাকি ? সদর দরজায় কেন ? খিড়কি দরজা দিয়ে এসো—

আসলে লোকটা কয়লার দোকানের। এক বস্তা কয়লা নিয়ে এসেছিল।

—ও বৌদি, কয়লা নিয়ে এসেছে, খিড়কির দরজাটা খুলে দাও তো—

সংসারের সব কাজের ভারই ওই এক যোগমায়ার ওপর। ঘর ঝাঁট দেওয়া, রান্না করা, বাসন মাজা, কয়লা ভাঙা থেকে আরম্ভ করে তুচ্ছাতিতুচ্ছ কাপড় কাচা, তরকারি কোটা সমস্ত কিছু কাজ।

সেদিন যখন বিশাখার ব্রত করানো নিয়ে এই বাড়িতে তুমুল কাণ্ড হওয়ার উপক্রম হয়েছিল, ঠিক তখনই ঈশ্বর কয়লাওয়ালাকে পাঠিয়ে সেই তুমুল কাণ্ডর ভয়াবহ পরিণতিকে খানিকক্ষণের জন্যেও অন্তত শান্ত করেছিলেন। তপেশ গাঙ্গুলী খেতে-খেতে বলেছিলেন—তা বৌদি, তুমি যেমন বিশাখাকে ব্রত করাচ্ছ তেমনি বিজলীকেও করাও না। খরচ-পত্তোর যা লাগে তা না-হয় আমিই দেব—

যোগমায়া বললে—খরচ-পত্তোরের কথা বলো না ঠাকুরপো, বিশাখা আমার মেয়ে বটে, কিন্তু বিজলীও আমার নিজের মেয়ের মত।

রাণী বোধহয় কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তপেশ গাঙ্গুলী তাকে বাধা দিয়ে বললেন—ওই কথাই রইল বৌদি, তাহলে কাল সকাল-বেলা বিশাখার সঙ্গে তুমি বিজলীকেও নিয়ে যেও। যাবে তো ?

যোগমায়া বললে—ব্রত করতে কষ্ট করে আর গঙ্গার ঘাটে যেতে হবে কেন ঠাকুরপো ? এই বাড়িতে বসেও তো ব্রত হয়—

—তাহলে তুমি বিশাখাকে নিয়ে গঙ্গার ঘাটে যাও কেন কষ্ট করে ?

যোগমায়া বললে—কষ্ট কি আর সাধ করে করি ? বাড়িতে ব্রত করার অনেক ঝামেলা। দিদি যদি বলে তাহলে আমি বাড়িতেই ব্রত করবো। আমার মা তো আমাকে দিয়ে বাড়িতেই ব্রত করাতো—

তপেশ গাঙ্গুলীর খাওয়া তখন হয়ে গিয়েছিল। রাণীর দিকে চেয়ে বললে—কই গো কোথায় গেলে তুমি ?

রাণী তার আগেই চিরাচরিত নিয়মের মত নিজের ঘরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়েছিল। তপেশ গাঙ্গুলী মুখ-হাত-পা ধুয়ে সেই ঘরে গেলেন। বললেন—কী গো, তুমি শুয়ে পড়লে যে ? কথা বললে না কেন ? বিজলী তাহলে বিশাখার সঙ্গে বাড়িতেই ব্রত করবে তো ?

রাণী বললে—কে কোথায় কী করবে, তা আমি কী জানি ? আমি কে ?

তপেশ গাঙ্গুলী বললেন—তুমি কে মানে ? তুমিই তো এবাড়ির আসল গিন্নী। তোমার মত না হলে কি এ-বাড়ির কোনও কিছু চলে ? তুমিই তো সব ?

তপেশ গাঙ্গুলী অনেকক্ষণ সেইখানে দাঁড়িয়ে থেকেও রাণীর কাছ থেকে যখন কোনও জবাব পেলেন না তখন বললেন—কী গো, আমার কথা শুনতে পাচ্ছো ?

বিজলী কী বাড়িতে ব্রত করবে ?

রাণী কথাগুলো শুনতে পেলে কি শুনতে পেলে না, তা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও জানা গেল না —

তপেশ গাঙ্গুলী আবার জিজ্ঞেস করলেন — কী গো, বলো কী বলবে ?

রাণী বললে — আমি এ-সংসারের কে ? তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করছো কেন ? তুমি এ-সংসারের কর্তা, তুমি যা বলবে তা-ই হবে —

তখন আর দাঁড়াবার সময় ছিল না তপেশ গাঙ্গুলীর। আজ অফিসে না-গেলেই নয়। আজ মাইনের দিন। বললেন – ঠিক আছে, আমি তাই বলি গিয়ে —

বলে তিনি রান্নাঘরের দিকে গিয়ে যোগমায়াকে বললেন — বৌদি, তুমি তাহলে বাড়িতেই ব্রত করিও এখন থেকে। আজ মাইনের দিন, আমি অফিসে চলি। যদি বিডন স্ট্রীটের মুখুজ্জেবাড়ি থেকে টাকা দিতে সেই ছোকরা আসে তো তুমি সই দিয়ে টাকাটা নিয়ে নিও। টাকা কিন্তু গুনে নিও। যেন একশো পঁচিশ টাকা ঠিক হয়। আর তোমার ব্রতর জন্যে বাজার থেকে কিছু কিনে আনতে হবে ?

যোগমায়া যখন বললে যে কিছু দরকার নেই, তখন তপেশ গাঙ্গুলী রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন। রাস্তায় পা দিতেই প্রত্যেক দিনের মতন তাঁর মনে হলো কী করতে যে তিনি সংসার করেছিলেন কে জানে ! দাদা জোর করে তাঁর বিয়ে দিয়েই যত সর্বনাশ করে গেছে। এমন জানলে কোন্ শালা বিয়ে করতো !

সামনের দিক থেকে একটা বাস আসতেই তিনি তাতে উঠে পড়লেন। চলন্ত বাসের পা-দানিতে কোনও রকমে আধখানা পা রেখে ঝুলতে লাগলেন। তাঁর মনে হলো এই রকম ঝুলন্ত অবস্থায় বাস থেকে পড়ে গিয়ে যেদিন তিনি চাকার তলায় চেপ্টে মারা যাবেন, সেইদিনই তিনি শান্তি পাবেন। তার আগে নয়। কোথাও এতটুকু শান্তি দেবার কেউ নেই তাঁর। যেমন হয়েছে শালার বউ, তেমনি হয়েছে শালার গভর্মেণ্ট। সব শালাই সমান।

বাসটা তখন সেই ঝুলন্ত তপেশ গাঙ্গুলীকে নিয়ে সামনের দিকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলেছে...

বিশাখা জানতো সেই ছেলেটা সেদিন তাদের বাড়িতে আসবেই। সে কাউকে না জানিয়ে খিড়কির দরজা খুলে রাস্তার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়েছিল।

সন্দীপও বাস থেকে নেমে সাত নম্বর বাড়িটার দিকে এগিয়ে আসছিল। আজকে একটু দেরি হয়ে গেছে তার। আগের দিন রাতটা কেটেছে গিরিধারীর ঘুপচি ঘরে। সেখানে না ছিল হাওয়া আর না ছিল হাত-পা ছড়িয়ে আরাম করে শোবার জায়গা। তা-ও তো বলতে গেলে প্রায় সমস্ত রাতটাই সে কাটিয়েছে নাইট-ক্লাবে।

নাইট-ক্লাব কথাটা আগে কখনও শোনেনি সন্দীপ। ওটা ছিল তার কাছে তখন

নতুন জিনিস। পৃথিবীতে কোথাও যে অমন জিনিস থাকতে পারে, তা তার কল্পনাতেও ছিল না কখনও। সন্দীপ বেঙাপোতার চাটার্জি বাবুদের বাড়ির লাইব্রেরীতে অনেক বই পড়েছে, তা থেকে কত কী সে শিখেছে, কত কী সে জানতে পেরেছে। কিন্তু নাইট-ক্লাব! পৃথিবীর আর কোথাও নাইট-ক্লাব আছে কি না তা সন্দীপ বলতে পারে না। কিন্তু কলকাতার মত শহরে যে তা আছে, তা নিজের চোখে না দেখলে কি সে বিশ্বাস করতো?

সব শুনে মল্লিক মশাই-এর মুখখানা গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল। প্রথমে কিছু বলেন নি। কিন্তু অনেকক্ষণ পরে বলেছিলেন—ওখানে গিয়ে তুমি ভালো করোনি—

কিন্তু সন্দীপ কি নাইট-ক্লাবে ইচ্ছে করে গিয়েছিল? গোপাল জোর করে তাকে নিয়ে না গেলে কি সে যেত?

মল্লিক-মশাই বলেছিলেন—ও-সব জায়গায় ভদ্রলোকেরা যায় না—

—কিন্তু গোপাল যে গিয়েছিল?

মল্লিক-মশাই বলেছিলেন—গোপালকে আমি চিনি না, জানি না সে ভদ্রলোক কি না।

সন্দীপ বলেছিল—কিন্তু তার যে অনেক টাকা—

মল্লিক-মশাই আবার বলেছিলেন—অনেক টাকা থাকলেই, কেউ ভদ্রলোক হয় এ-কথা তোমাকে কে বলেছে? সে কী করে?

সন্দীপ বলেছিল—তা জানি না। তবে দেখছিলাম অনেক রাস্তার সব মোড়ে-মোড়ে পুলিশদের সে টাকা দিচ্ছিল—

—পুলিশদের কেন টাকা দিচ্ছিল? ঘুষ?

সন্দীপ বলেছিল—তা জানি না।

মল্লিক-মশাই বলেছিলেন—তা যখন জানো না তখন তার হয়ে সাফাই গাইতে এসো না। সে নিশ্চয়ই লুকিয়ে-লুকিয়ে গোপনে কিছু অন্যায় করে। নইলে পুলিশদের সে অমন করে টাকা দিতে যাবে কেন? অত রাত্তিরে পুলিশদের টাকা দেওয়ার পেছনে তার উদ্দেশ্য কী? তারা গোপালের কে?

সন্দীপ এ প্রশ্নের কোন জবাব দিতে পারেনি। মল্লিক-মশাই বলেছিলেন—যা হোক এইটে জেনে রেখো যে ওই সব নাইট-ক্লাবে কোনও ভদ্রলোক যায় না—

সন্দীপ বলেছিল—কিন্তু ওখানে না গেলে তো জানতেই পারতুম না যে আমাদের এই বাড়ির ছোটবাবু ওখানে যান। ছোটবাবুও তো······

সন্দীপের কথায় বাধা দিয়ে মল্লিক-মশাই বলেছিলেন—তা ছোটবাবুই কি তোমার আদর্শ? তুমি হলে গরীব বিধবার ছেলে আর ছোটবাবু হলেন কোটিপতি মানুষ। ছোটবাবুর সঙ্গে কি তোমার তুলনা? ছোটবাবু যা করবেন তুমিও কি তাই-ই করবে? ছোটবাবুর টাকা আছে, তিনি যেমন ইচ্ছে টাকা খরচ করবেন, যখন যা ইচ্ছে হবে করবেন। কিন্তু ভুলে যেও না আমরা গরীব, আমরা গরীবের মত থাকবো, তুমি এ-বাড়িতে এসেছ, এখানে থাকতে পাচ্ছো, খেতে পাচ্ছো, এদের নুন খাচ্ছো তুমি, এদের গুণগান করতেই হবে তোমাকে। তা যদি না করো তো সেটা নেমক হারামী হবে জেনে রেখো—

এর পরে সন্দীপ আর কোনও কথা বলেনি। আর মল্লিক-মশাই-এর হাতেও

তখন অনেক কাজ ছিল। কিন্তু সন্দীপেরও কি অনেক কথা বলবার ছিল না? ছিল বইকি। অনেক কথাই বলবার ছিল। বলবার ছিল এই যে মনুষ্যত্বের মাপকাঠিতে বড়লোক আর গরীবদের কি আলাদা আলাদা বিচার হবে? অর্থাৎ বড়লোকদের মনুষ্যত্ব আর গরীবদের মনুষ্যত্ব কি আলাদা রকমের? তা যদি হয় তো তাদের দু'দলের রক্তের রংও আলাদা রকমের, শুধু রক্তই নয়, গায়ের রংও আলাদা হওয়া উচিত। কিন্তু তাহলে চাটার্জিবাবুরাও তো বড়লোক, তাদের গায়ের রং কালো কেন? সৌম্যবাবু বড়লোক বলে যদি তার নাইট-ক্লাবে যাওয়ার অধিকার থাকে তাহলে সন্দীপেরও নাইট-ক্লাবে যাবার অধিকার কেন থাকবে না? নাইট-ক্লাবে যাওয়া যদি অপরাধ হয় তাহলে ছোটবাবু সন্দীপ দু'জনের পক্ষেই সেখানে যাওয়া অপরাধ। আমার শরীর কালো বলে আগুনে পুড়তে বেশি সময় লাগবে, আর ছোটবাবু ফরসা বলে কি তার শরীর আগুনে পুড়তে লাগবে কম সময়?

বিডন স্ট্রীট থেকে বাসে আসতে-আসতে সন্দীপ এই সব কথাই ভাবছিল। ভাবছিল যে যাদের বাড়িতে সে টাকা দিতে যাচ্ছে সেই বাড়ির বিশাখার সঙ্গে কিনা বিয়ে হবে এদের বাড়ির সৌম্যবাবুর, যাকে সে আগের দিন রাত্তিরেই মদ খেয়ে মেয়েমানুষ নিয়ে ফুর্তি করতে দেখেছে। আশ্চর্য! এ বিয়ে কি সুখের হবে? এ বিয়েতে কি বিশাখা সুখী হবে?

কিন্তু আবার তার মনে হলো এসব কথা সে ভাবছে কেন? তার এসব কথা ভাববার দরকার কী? সত্যিই তো, মল্লিক-মশাই তো বলেই দিয়েছেন ছোটবাবু যা ইচ্ছে করুন, যেখানে ইচ্ছে যান, যার সঙ্গে ইচ্ছে বিয়ে হোক, তা নিয়ে তোমার ভাববার দরকার কী? তুমি গরীব বিধবার ছেলে, এই বাড়িতে তুমি থাকতে পাচ্ছো, এই-ই তো যথেষ্ট, তুমি লেখা-পড়া করবে, চাকরি করে মা'কে খাওয়াবে, তুমি তাই নিয়ে ভাবো, অন্য কিছু কথা ভাবা তোমার পাপ।

বাসটা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছিল। সন্দীপ জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে অন্য কথা ভাববার চেষ্টা করলে। তারপর হঠাৎ একটা কাণ্ড ঘটলো। একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে বাসটা হঠাৎ থেমে গেল আর সঙ্গে-সঙ্গে বাসের যত যাত্রী সবাই চমকে উঠেছে! কী হলো? হলো কী? হুড়হুড় করে সবাই বাস থেকে রাস্তায় নেমে পড়লো।

ততক্ষণে হাজার-হাজার লোক জমে গেছে রাস্তায়, তারা বাসটাকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরেছে। সবাই চিৎকার করছে— মারো,-মারো শালাকে—

—শালাকে টেনে নিচেয় নামিয়ে আনুন—

সন্দীপের জামার বুক-পকেটের ভেতর দিকে একশো পঁচিশটা টাকা আছে। মল্লিক-মশাই যথারীতি সাবধানে আসতে বলে দিয়েছেন। বলে দিয়েছেন—এ কলকাতা শহর, এখানে কাউকে বিশ্বাস করো না। বাঙালীরা খুব বদমাইশ জাত। তুমি এখেনে গ্রাম থেকে নতুন এসেছ জানতে পারলেই তারা তোমার পকেট কাটবে। যেখানে ভিড় দেখবে সেদিকে মোটে যাবে না—

কিন্তু তখনকার মত কথাটা বোধহয় ভুলে গিয়েছিল সন্দীপ। নইলে অন্য সকলের মত সেও বাস থেকে রাস্তায় নেমে পড়লো কেন? আর নেমেই যদি পড়লো তাহলে মানুষের ভিড়ের মধ্যে কেন গেল? কেন ভিড় কাটিয়ে সে একেবারে ভেতরের দিকে উঁকি মারতে গেল?

শালাকে নিচেয় নামিয়ে আন্‌—শালা বাস চালাতে জানে না।

—শালা কন্‌ডাকটারটা কোথায়? ওই তো শালা পালাচ্ছে—ধর-ধর—

কয়েকজন মিলে বাসের কন্‌ডাকটারকে ধরে ঘুঁষি মারতে শুরু করলে। কেউ কন্‌ডাকটারের চুল টেনে ধরেছে, কেউ ধরেছে গলা টিপে, আবার কেউ শার্ট ধরে টানছে। আর একজন তারই মধ্যে তার কাঁধ থেকে টাকা-পয়সার ব্যাগটা ছিনিয়ে নিতে গিয়েই টাকা-পয়সা পিচের রাস্তায় ঝন্‌-ঝন্‌ শব্দ করে ছিটকে পড়লো।

কিন্তু কেন যে সবাই মারছে তাদের তা বোঝা গেল একটু পরে। সে-দিকটায় প্রথমে নজরে পড়েনি সন্দীপের, পাশেই আর একটা জটলা হয়েছে আর একটু দূরেই। সন্দীপ সেই দিকে সরে গিয়ে উঁকি মেরে দেখলে। দেখতে গিয়েই তার সমস্ত শরীরটা যেন আতঙ্কে শিউরে উঠলো। দেখলে একটা লোক বাসের চাকার তলায় চেপ্টে গিয়ে একেবারে সারা জায়গাটা রক্তে-রক্তে ভেসে গেছে। আর শরীরটা তার কাদার মত ছড়িয়ে আছে সমস্ত জায়গায়।

কী হয়েছে মশাই? কী হয়েছে?

সকলেরই মুখে ওই একই কৌতূহল। একই কৌতূহল যেন আকাশে-বাতাসে অন্তরীক্ষে ইথারে ভেসে-ভেসে সকলকে পীড়িত করছে, কেবল বলছে—কী হয়েছে মশাই? কী হয়েছে?

আর আশ্চর্য, এতক্ষণ সেদিকে নজর পড়েনি সন্দীপের। সেই দিকটায় রয়েছে আসল জিনিসটা। এত যে মারামারি, এত যে উদ্বেগ, এত যে কৌতূহল, এত যে প্রশ্ন, এত যে কোলাহল, সব কিছুর কেন্দ্রই ছিল সেটা।

সেখানেও উঁকি মেরে দেখলে সন্দীপ। একটা ফুলে-ফুলে ঢাকা দামী খাটের ওপর শোয়ানো একটা মৃতদেহ। শ্মশানে যাওয়ার পথে শবদেহবাহীরা একটু বিশ্রাম করে নেবার জন্যে বোধহয় খাটটা সেই পিচের রাস্তার ওপর সূর্যের আলোয় তলায় বসিয়ে রেখেছে—

—না মশাই, না। এই মড়াটাকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার সময়েই তো ব্যাটা বাসের তলায় চাপা পড়ে মরলো—

—কেন?

আর একজন লোক দয়া করে জিনিসটা ব্যাখ্যা করে দিলে।

—পয়সার লোভ কার না আছে মশাই? সকলেরই তো পয়সার লোভ। দোষটা অমনি পয়সার হয়ে গেল? পয়সার জন্যেই তো দুনিয়াটা চলছে—

তবু কিছু বোঝা যাচ্ছিল না। সন্দীপ একজন শববাহীদের দলের লোকের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে—কী হয়েছে মশাই?

লোকটা সন্দীপের দিকে চেয়ে দেখলে। তারপর জিজ্ঞেস করলে—আপনি কে?

সন্দীপ বললে—আমি এই বাসটায় চড়ে খিদিরপুরে যাচ্ছিলুম। বাসটা থামতেই আমরা সবাই নেমে পড়লুম—

পাশেই একজন দাঁড়িয়ে ছিল। মনে হলো মৃতদেহ তারই কোনও নিকট আত্মীয়ের। বেশ শান্ত গলায় বললে - আমাদের সামনে একজন ছেলে রাস্তায় খই ছড়াতে-ছড়াতে যাচ্ছিল, আর সঙ্গে-সঙ্গে পাঁচ পয়সা দশ পয়সার খুচরোও ছড়ানো

হচ্ছিল, রাস্তার ছেলেরা তাই কুড়োবার জন্যে হুড়োহুড়ি লাগিয়ে দিয়েছে, এমন সময় আপনাদের দোতলা বাসটা এসে···

কথা শেষ হলো না। তখন ওদিকে পুলিশের গাড়িতে চড়ে একদল পুলিশ এসে হাজির হয়েছে—

—এই ভাগো, ভাগো ইঁহাসে—ভাগ্ যাও··

পুলিশের দল জনতার দিকে তেড়ে এল লাঠি নিয়ে। অন্য লোকদের সঙ্গে সন্দীপ সরে গেল। সব জায়গাটা তখন ফাঁকা। সন্দীপ দূর থেকে ভিখিরির চাপা পড়া বিকৃত চেহারার দিকে চেয়ে দেখলে। তখন তার আর চেহারা বলে কিছু নেই। শুধু কয়েক টুকরো মাংস, চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে আর রক্ত। আশ্চর্য, ছেলেটা এক মিনিট আগেও জানতো না ওই পয়সা কুড়োন তার শেষ পয়সা কুড়োন হয়ে যাবে। আর ওই শবদেহটার পেছনে তাকেও শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হবে!

সেই দিকে চেয়ে অন্য কার কী মনে এল কে জানে, কিন্তু সন্দীপের ছেলেবেলায় নিবারণ কাকার সেই বিল্বমঙ্গলের অভিনয়ের দৃশ্যগুলো মনে পড়ে গেল—

এই নরদেহ,
জলে ভেসে যায়
ছিঁড়ে খায় কুক্কুর-শৃগাল
কিংবা চিতা-ভস্ম পবন উড়ায়
এই নারী, এরও এই পরিণাম
নশ্বর সংসারে·····

সেদিন সেই ছোটবেলায় সন্দীপ কথাগুলোর মানে কী বুঝেছিল, কতটুকু বুঝেছিল তা আর মনে নেই। কিন্তু রাস্তায় দামী খাটের ওপর শুইয়ে রাখা ওই মৃতদেহটা আর বাসের তলায় চাপা পড়া ওই ছেলেটার মাংস পিণ্ডটা দেখে তার মনে হলো কথাগুলোর মানে যেন এখন এতদিনে সে ভালো করে বুঝতে পেরেছে। বুঝে নিয়েছে যে, যে শরীরটা নিয়ে মানুষের এত অহংকার, এত দম্ভ, এই অহমিকা তার এই-ই শেষ এই-ই পরিণতি। আগের দিন নাইট-ক্লাবে গিয়ে যা সে দেখেছিল, সেই মানুষগুলোর নারী-মাংস নিয়ে যে লোফালুফি প্রত্যক্ষ করেছিল, তাদেরও এই একই পরিণতি। ওই যে খিদিরপুরের বিশাখা, তারও যেমন একদিন এই পরিণতি হবে, বিডন স্ট্রীটের ওই সৌম্যবাবু, ওরও একদিন এই পরিণতি হবে। এই শ্মশানে এসেই সকলকে একই বিছানায় শুয়ে একদিন নিঃশেষ হয়ে যেতে হবে। ওই যে মায়া-দেবী, উনি তো বিডন স্ট্রীটের মুখুজ্জে-বাড়ির টাকা দেখেই তাঁর মেয়ের বিয়ে দিতে রাজি হয়ে গিয়েছিলেন! কই, একবারও তো খবর নিতে চান নি যে ঠাকুমা-মণির নাতির কেমন স্বভাব-চরিত্র! খবর নিতে চাননি যে ঠাকমা-মণির নাতি কেমন দেখতে! খবর নিতে চাননি যে ঠাকমা-মণির নাতির কেমন স্বাস্থ্য! শুধু টাকা দেখেই তিনি ধন্য মনে করেছিলেন নিজেকে, শুধু টাকা দেখেই তিনি বিশাখার জীবন ধন্য হবে বলে মনে করেছিলেন। কিন্তু, সব কিছুর শেষ তো ওই! যে-বিল্বমঙ্গল কতকাল আগে 'এই নরদেহ'র পরিণতি ভেবে বিচলিত হয়েছিলেন, এরা তো সে-কথা কেউ ভাবে না। এই সামান্য এই তুচ্ছ নরদেহটার তৃপ্তির কথা ভেবেই তো সবাই দিন-রাত হুড়োহুড়ি করে চলেছে। এই সামান্য, এই তুচ্ছ নরদেহটার তৃপ্তির কথা ভেবেই

'বিশাখাদের বাড়িতে দুই জা' হিংসের আগুনে জ্বলছে।

তাহলে ?

হঠাৎ একটা জায়গাতে এসে বাসটা আর চললো না। আর হঠাৎই সন্দীপের খেয়াল হলো বাসের মধ্যে সে একলাই শুধু বসে আছে, আর কেউ নেই। অথচ কখন যে সে বাস বদলে অন্য বাসে উঠেছিল, কিছুই মনে নেই। রাস্তায় মাঝখানে সেই গাড়ি চাপা পড়া মাংসপিণ্ডটা আর দামী খাটের ওপর ফুলে-ফুলে ঢাকা মৃতদেহটা দেখে তার মনে যে-ভাবান্তর হয়েছিল, তার ঘোর যেন এখন কাটালো। সে বুঝতে পারলে বাসটা কখন নিঃশব্দে খিদিরপুরে পৌঁছে গেছে। সে তাড়াতাড়ি বাস থেকে নেমে পড়লো। তপেশ গাঙ্গুলীবাবু হয়ত তার আসার পথ চেয়ে এখনও দাঁড়িয়ে আছেন। পাশের একটা দোকানের ঘড়িটা দেখেই সন্দীপ চমকে উঠলো। এখন যে দুপুর সাড়ে এগারোটা, কী আশ্চর্য। এতক্ষণে তো তপেশ গাঙ্গুলী অফিসে চলে গেছেন। সে তো টেরই পায়নি কখন কোথা দিয়ে এতখানি সময় কেটে গেল!

—বাবাঃ! এতক্ষণে এলে তুমি ?

সন্দীপ একেবারে চমকে উঠেছে। দেখলে বিশাখা। বিশাখা তপেশবাবুর বাড়ির খিড়কি-দরজার সামনে একলা দাঁড়িয়ে আছে।

—কী? কী হয়েছিল তোমার? ঘুমিয়ে পড়েছিলে বুঝি? তোমার জন্য আমার কাকা অনেকক্ষণ বসে-বসে শেষকালে আপিসে চলে গেল। আমরাও ভেবেছি তুমি আজ বুঝি আর টাকা দিতে এলে না।

সন্দীপ বললে – তোমার কাকা নেই? তাহলে আজ টাকাটা কার হাতে দেব ?

বিশাখা বললে—তা কার হাতে টাকা দেবে আমি তার কী জানি ?

—তুমি জানবে না তো আর কে জানবে? এ টাকা তো তোমারই জন্যে।

—ছাই, ছাই, আমার জন্যে না ছাই! ও টাকা তো কাকীমার জন্যে! আমি তো সেবার তা বলেই দিয়েছি—

সন্দীপ বললে—তা টাকাটা যার জন্যেই হোক, আমার ওপর যা হুকুম হয়েছে আমি তাই-ই করবো। সে-টাকা নিয়ে তোমার কাকীমা গয়নাই গড়াক আর যা-ই করুক আমার তা দেখবার দরকার নেই, আমি চাকর মানুষ, আমি টাকা দিয়ে তোমার মা'র হাতের সই নিয়েই খালাস।

বিশাখা চারদিকটা একবার ভালো করে দেখে নিলে। বললে—তুমি অত জোরে কথা বলছো কেন, সবাই শুনতে পাবে যে—

—শুনলে আর আমার কী হবে? আমি তো আর কোনও অন্যায় কাজ করছি না—

—শুনতে পেলে তোমার তো কিছু হবে না, হবে আমারই।

—কেন, তোমার কী হবে ?

বিশাখা বললে—শুনতে পেলে কাকীমা মা'র সঙ্গে আবার ঝগড়া করবে। মা'কে কথা শোনাবে।

—কেন, তোমার মা কী দোষ করলো ?

বিশাখা বললে—মা'রই তো সব দোষ।

—কেন ?

বিশাখা বললে—তা তুমি বোঝ না ? আমি কেন মা'র মেয়ে হলুম, এইটেই তো মা'র আসল দোষ !

সন্দীপ বললে—সে কী ? তুমি তোমার মায়ের মেয়ে হয়েছ তাতে তোমার মায়ের দোষ কী ?

বিশাখা বললে—তুমি ছেলেমানুষ, তাই তুমি বুঝবে না, আগে বড় হও তখন বুঝবে—

সন্দীপ বললে—তুমিও তো ছেলেমানুষ, তাহলে তুমি তা বুঝলে কেমন করে ?

বিশাখা বললে—বয়েস কম হলে কী হবে, বুদ্ধিতে তোমার চেয়ে অনেক বড়—

বেশ আশ্চর্য ব্যাপার তো ! বলে কী মেয়েটা ! মেয়েটা যে কেবল বুদ্ধিতে পাকা তাই-ই নয়, বদমায়েশিতেও পাকা !

সন্দীপ হেসে ফেললে এবার ! বিশাখা বললে—তুমি হাসছো যে বড় ?

সন্দীপ বললে—হাসছি তোমার কথা শুনে। এত কম বয়েসে তোমার এত বুদ্ধি হলো কী করে ?

বিশাখা বললে—তোমার তো মা নেই, তোমার মা থাকলে তোমার বুদ্ধিও আমার মত হতো !

—কে বললে আমার মা নেই ?

—মা আছে ?

—হ্যাঁ, আমার দেশে মা আছে।

বিশাখা বললে—তোমার মা'কে কি তোমার জ্যাঠাইমা খাটিয়ে মারে ? তোমার জ্যাঠাইমা কি তোমার মা'র সঙ্গে ঝগড়া করে ? তোমার মা'র কি আমার মত একটা মেয়ে আছে ? তোমার মা'র তো তবু তুমি আছো, কিন্তু আমি ছাড়া আমার মা'র আর কে আছে বলো তো ?

কথাগুলো বলতে-বলতে বিশাখার চেহারা যেন কেমন করুণ হয়ে উঠলো।

বিশাখা আবার বলতে লাগলো—তোমার বিয়ে হলে তো তুমি বউ নিয়ে নিজের ঘরেই থাকবে, আর আমি ? আমার বিয়ে হলে তো আমি তখন শ্বশুরবাড়ি চলে যাবো। আমার বরের কাছে থাকবো। আর মা ? আমি বরের কাছে চলে গেলে আমার মা কাকে নিয়ে থাকবে ? কে মা'কে দেখবে ? আমার মা'র কত কষ্ট, তা তুমি ভাবতেও পারবে না। জানো, মা যখন একলা থাকে তখন কেবল কাঁদে—

এ-কথারও কোনও জবাব এল না সন্দীপের মুখে। সে হাঁ করে এই মেয়েটার মুখের দিকে চেয়ে রইল শুধু ! ভাবতে লাগলো এরই সঙ্গে কিনা বিয়ে হবে সেই নাইট-ক্লাবে দেখা বিডন স্ট্রীটের সৌম্য মুখার্জি'র সঙ্গে !

এবার হঠাৎ বিশাখা বলে উঠলো—তুমি আমার কথা শুনে রাগ করলে না তো ?

সন্দীপ শুধু বললে—না—

—তবে চুপ করে আছো যে ? তোমাকে বোকা বলেছি বলে তুমি যেন রাগ করো না। মা আমার জন্যে কত ভাবে, তা তুমি ভাবতেও পারবে না। দিনরাত মা আমার কথা ভাবে—

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—কেন?

—বা রে, ভাববে না ? বাপ-মরা মেয়ের জন্যে মা যদি না ভাবে তো কে ভাববে ?

বাবা থাকলে বাবাই ভাবতো, কিন্তু আমার তো বাবা নেই —

সন্দীপ বললে—আমারও বাবা নেই—

—কিন্তু তুমি তো ব্যাটাছেলে! তোমার বাবা না-থাকলেও ক্ষতি নেই। কিন্তু আমি যে মেয়েমানুষ। মা বলে, ছেলে ঘর পূর্ণ করে, আর মেয়ে ঘর শূন্য করে—।

একটুখানি থেমে বিশাখা সন্দীপের মুখের দিকে বোধহয় বুঝতে চাইল কথাগুলো বুঝতে পারছে কি না। তারপর বললে—থাক গে, তুমি মেয়ে হলে এ-সব কথা বুঝতে—আমি সদর দরজা খুলে দিই গে, তুমি মা'কে টাকা দিয়ে যাও।

কথাটা বলে বিশাখা ভেতরের দিকে চলেই যাচ্ছিল, কিন্তু সন্দীপ ডাকলে—শোন, শোন, বিশাখা শুনে যাও— আর একটা কথা শুনে যাও—

বিশাখা মুখ ঘুরিয়ে বললে—অত চেঁচাচ্ছ কেন? সবাই শুনতে পাবে যে—

সন্দীপ বললে—শুনলে দোষ কী?

—আরে তুমি একটা ন্যাকা কিছু বোঝ না। কী বলছিলে বলো?

সন্দীপ বললে—বলছিলুম, যে-জন্যে আমি টাকা দিতে আসি, যার সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে, তার কী-রকম চেহারা তুমি জানো? তাকে তুমি কখনো দেখেছ?

বিশাখা হেসে ফেললে এবার। বললে—ও মা, কী বোকা তুমি, বিয়ের আগে বরকে দেখতে আছে নাকি? একেবারে তো শুভদৃষ্টির সময়ে প্রথম দেখতে হয়—

—তা তোমার দেখতে ইচ্ছে করে না?

বিশাখা বললে—মা বলেছে আমার বর খুব ভালো হবে।

—কেন?

বিশাখা বললে—আমি যে ব্রত করি।

—ব্রত? ব্রত মানে?

—ওমা, তুমি ব্রত ও জানো না? তুমি কোথাকার পাড়াগেঁয়ে ভূত! আমাকে দিয়ে মা তো রোজ ব্রত করায়। দশ পুতুল ব্রত। এই ব্রত আমি ছোটবেলা থেকে করছি। মা বলেছে এই ব্রত করি বলেই তো আমার অত বড়লোকের বাড়িতে বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে।

—কী রকম করে ব্রত করো?

বিশাখা সব বুঝিয়ে বললে: পিটুলি দিয়ে মা দশটা পুতুল এঁকে দেয়, তাতে দুর্বোঘাস দিয়ে আমি মন্ত্র বলি—

—কী মন্ত্র বলো?

বিশাখা বললে—আমি বলি—

> এবার মরে মানুষ হবো, রামের মত পতি পাবো
> এবার মরে মানুষ হবো, সীতার মত সতী হবো
> এবার মরে মানুষ হবো, লক্ষ্মণের মত দেবর পাবো
> এবার মরে মানুষ হবো, কৌশল্যার মত শাশুড়ী পাবো
> এবার মরে মানুষ হবো, কুন্তীর মত পুত্রবতী হবো
> এবার মরে মানুষ হবো, দ্রৌপদীর মত রাঁধুনী হবো
> এবার মরে মানুষ হবো, দুর্গার মত সোহাগী হবো
> এবার মরে মানুষ হবো, পৃথিবীর মত ভার সবো ...

সন্দীপ বললে—তারপর ? থামলে কেন ? তারপর আর নেই ?

বিশাখা বললে- সবটা বলবো না—

—কেন ?

এ ব্রত তো সকালবেলা করতে নেই, বিকেলে করতে হয়। এখনও তো বিকেল হয়নি। এবার থেকে বিকেলেই করবো। এতদিন কেউ দেখতে পাবে বলে মা'র সঙ্গে ভোরবেলা গঙ্গার ঘাটে গিয়ে করতুম। এখন থেকে বাড়িতেই করবো—

সন্দীপ খুব মজা পাচ্ছিল বিশাখার কথা শুনে। বললে—কেন, গঙ্গার ঘাট কী দোষ করলো ?

বিশাখা বললে—গঙ্গার ঘাটে ঠিক ভালো করে ব্রত করা হয় না। ব্রত করতে তো পিটুলি গোলা লাগে। ঘাটে পিটুলি কোথায় পাবে মা ?

—এ ব্রত করলে কী হয় বলছিলে ? ভালো বর হয় ?

—হ্যাঁ।

বলে বিশাখা আবার হাসলো। বললে—ব্রত করে আমার খুব ভালো বর হয়েছে কিনা তাই বিজলীও এখন থেকে আমার মত রোজ ব্রত করবে। এই নিয়ে কাকীমা খুব ঝগড়া করেছে আমার মা'র সঙ্গে—

—কেন ? ঝগড়া করেছে কেন ?

বিশাখা বললে কেন ঝগড়া করবে না ? কাকীমা বলেছে বিজলী কি বানের জলে ভেসে এসেছে ? তার জন্যেও একটা ভালো বর চাই। আমার ভালো বর হয়েছে বলে কাকীমার খুব হিংসে হয়েছে—

—কাকীমার কার উপর হিংসে হয়েছে।

—মা'র ওপর, আবার কার ওপর ? তাই জন্যে আমার মা খুব কেঁদেছে আজকে।

সন্দীপ এবার আসল কথা পাড়লে। বললে- তুমি কি ফল-টল কিছু খাও ? ফল, দুধ, ঘি, মাছ, মাংস এসব তুমি খাও ?

—ওমা, আমি ও-সব খাবো কেন ? কে আমাকে ও-সব খেতে দেবে ?

সন্দীপ বললে—কেন খাবে না ? ওই সব খাবার জন্যেই তো আমাদের ঠাকমা-মণি মাসে তোমার মা'কে এত এত টাকা পাঠায়। আমি বাড়ি ফিরে গেলেই তো ঠাকমা-মণি আমাকে এ-সব কথা জিজ্ঞেস করবে। তখন আমি তার কী জবাব দেব ?

বিশাখা বললে—আমি তো শুধু ভাত, তরকারি, রুটি খাই—

—আর মাছ-মাংস ?

বিশাখা বললে—না, ও-সব আমি খাই না।

—মাছ, মাংস, ফল, দুধ, দই, ঘি কিছুই খাও না ?

—না।

সন্দীপ বাড়ির খিড়কির দরজায় দাঁড়িয়ে এ-সব কথা জিজ্ঞেস করছিল, কিন্তু খুব সাবধানে। কেবল ভয় হচ্ছিল যদি কেউ তাদের দেখে ফেলে! কিন্তু এখানে বিশাখাকে একলা পেয়ে যদি এসব কথা জিজ্ঞেস না করে তো আর কখন করবে ? আর কখন এসব কথা জিজ্ঞেস করার সুযোগ হবে ?

জিজ্ঞেস করলে—তোমার বোন এখন কোথায় ?

বিশাখা বললে—কে? বিজলী? কাকীমা বিজলীকে চান করিয়ে দিচ্ছে—

সন্দীপ আবার জিজ্ঞেস করলে—আর তুমি? তুমি আজকে চান করবে না?

—বা রে, আমি তো সেই ভোরবেলা মা'র সঙ্গে গঙ্গায় গিয়ে চান করে এসেছি, এখন আবার দুবার চান করবো নাকি?

—আর তোমার মা?

—মা তো এখন রান্না করছে! মা তো সমস্ত দিনই কাজ করে। কখনও রান্না করে, কখনও বাসন মাজে, কখনও ঘরদোর ঝাঁট দেয়, কখনও সাবান কাচা করে, বাড়ির সব কাজ মা একলাই করে। মা'র মোটে সময় নেই। এ ছাড়া মা'কে দোকান থেকে রেশন আনতে হয়, কেরোসিন আনতে হয়, কয়লা আনতে হয়—

সন্দীপ বললে—তাহলে আমি যখন বাড়িতে ফিরে যাবো সেখানে ঠাকুমা-মণিকে কী বলবো? ফল, দুধ, মাছ, মাংস, ডিম, ঘি, মাখন কিছুই তুমি খাও না, এসব কথা বলবো তো?

—বলবে বিজলী সব খায়, আর আমি শুধু রুটি, ভাত আর তরকারি খাই—

—আর বিজলী কী খায়?

—আমার জন্যে রাত্তিরে রুটি হয় আর বিজলী আর কাকীমার জন্যে হয় পরোটা—

বেশ কথা হচ্ছিল, হঠাৎ ভেতর থেকে কার গলা শোনা গেল—ওরে ও মুখপুড়ী, কোথায় গেলি?

আর কথা নেই, সঙ্গে-সঙ্গে বিশাখা উধাও।

সন্দীপ আর কী করবে, তাই অনেকক্ষণ সেখানে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ভাবতে লাগলো কী করে এসব কথা ঠাকুমা-মণিকে গিয়ে সে বলবে! আসলে কথা-গুলো বলা উচিত কিনা, তাও সে ঠিক করতে পারলে না। এ-সব কথা শোনবার পর যদি এ-বিয়ের প্রস্তাব ভেঙে যায়? যদি বন্ধ হয়ে যায় এ-সম্বন্ধ? তাহলে ক্ষতি হবে কার? ঠাকুমা-মণির না তপেশ গাঙ্গুলীর? তপেশ গাঙ্গুলীবাবু মাসে-মাসে এতগুলো টাকা পাওয়া থেকে বঞ্চিত হবেন। আর ঠাকমা-মণি কী করবেন? নাতির জন্যে অন্য পাত্রী ঠিক করবেন? নাতির বিয়ে অন্য জায়গায় দেবেন? কিন্তু এত ভালো জন্মকুণ্ডলী আর কোন্ মেয়ের আছে? তাহলে তো তাঁকে আবার অন্য ব্যবস্থা করতে হয়! এত-দিনকার এত আয়োজনের সব সমাধান এখন নির্ভর করেছে শুধু সন্দীপের একটি মাত্র কথার ওপর। তাহলে সে কি বাড়িতে গিয়ে ঠাকুমা-মণির কাছে মিথ্যে কথা বলবে?

মাথার ওপর ঝাঁ-ঝাঁ করছে রোদ্দুর। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত সমস্যাগুলো সমস্ত ভাবনাগুলো যেন একসঙ্গে একযোগে এসে সন্দীপকে আক্রমণ করলো। বিশাখা ভেতরে গিয়ে মা'কে কিছু বলেছিল কিনা কে জানে, কারণ সে দরজার কড়া নাড়তে না নাড়তেই সেটা হঠাৎ খুলে গেল। সেখান দিয়ে দেখা গেল একজন মহিলার মুখ। সে-মুখে একটা কৌতূহলী প্রশ্ন:

—তুমি কি বাবা বিডন স্ট্রীটের মুখুজ্জে-বাড়ি থেকে আসছো?

সন্দীপ বললে—হ্যাঁ—আপনি একটু তপেশবাবুকে বলুন আমি তাঁকে দেবার জন্যে এ-মাসের টাকা এনেছি—

মহিলা বললেন—তিনি তো বাবা তোমার জন্যে অপেক্ষা করে-করে আপিসে চলে গেছেন। আজ তাঁর আপিসে মাসমাইনের দিন কিনা, তাই।

—তাহলে আপনি কে?

—আমার নাম হলো বাবা যোগমায়াদেবী। আমি বিশাখার মা হই-

সন্দীপ বললে—আগে তো বরাবর আপনার নামেই টাকা এসেছে। টাকা যিনি-ই নিন, সই তো দিয়েছিলেন আপনিই—এবারও আপনার নামেই টাকা এনেছি। আপনি টাকাটা নেবেন?

—তাহলে বাবা ভেতরে এসে একটু বোস। আমি আমার জা'কে ডেকে দিই—

সন্দীপ আগেকার মত সেদিনও সেই ঘরটায় তক্তপোশের ওপর বসে পড়লো। সেই তক্তপোশ জোড়া ডাঁই করে রাখা ময়লা বিছানার ওপর। চারদিকে চেয়ে সন্দীপ দেখলে ঘরটার সেই একই দুরাবস্থা। প্রায় দুপুর হতে চলেছে, তবু তখনও ঘরের মেঝে ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করা হয়নি। সংসারের সমস্ত খুচরো কাজ সেরে বিশাখার মা'ই বোধহয় সে-কাজটা করবে। হঠাৎ আর একজন মহিলা সেই ঘরে ঢুকলেন। তাঁর হাতে সোনার চুড়ি, গলায় সোনার হার, কানে সোনার দুল, সিঁথিতে সিঁদুর।

সন্দীপ দাঁড়িয়ে উঠলো। বললে—আপনিই কি বিশাখার কাকীমা?

মহিলাটা বললেন—হ্যাঁ বাবা, তুমি টাকা এনেছ বুঝি? দাও—

সন্দীপ টাকাগুলো সামনে বাড়িয়ে দিয়ে বললে—আর এইখানে মাসিমাকে একটা সই দিতে বলবেন—

সন্দীপ এই-ই প্রথম বিশাখার কাকীমাকে দেখলে। বুঝলো যে এই মহিলাই ঝগড়া করে মাসিমার সঙ্গে। বিশাখার নিজের পাওয়া এই সব টাকা দিয়েই মহিলার গায়ের ওই সোনার গয়নাগাটি তৈরি হয়েছে। ঠাকুমা-মণির কাছ থেকে যত টাকা মাসে-মাসে এসেছে তা দিয়ে এই মহিলা নিজের সমস্ত সাধ-আহ্লাদ মিটিয়েছে। তার মধ্যে একটা টাকাও বিশাখার প্রয়োজনের জন্যে খরচ করা হয়নি।

হঠাৎ বিজলী আর বিশাখা দু'জনেই ঘরে ঢুকলো। বিজলী বললে—তুমি আজ এত দেরি করলে কেন? আমার বাবা খুব রাগ করেছে তোমার ওপর।

সন্দীপ বললে—কেন?

বিজলী বললে—সেই যে-বুড়োটা আগে আসতো সে কত সকাল-সকাল টাকা নিয়ে আসতো—

সন্দীপ বললে—আজকে রাস্তায় আমি যে বাসটায় আসছিলুম সেটা একটা মানুষ চাপা দিয়েছিল বলে অন্য বাস ধরতে একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল—

তারপর মেয়েটা বললে—তুমি দেরি করে এলে বলে আজ আমাদের মাংস খাওয়া হলো না—

সন্দীপের দেরি করে আসার সঙ্গে এ-বাড়ির মাংস খাওয়ার যে কী সম্পর্ক, তা বুঝতে সন্দীপের কোনও অসুবিধে হলো না।

বিজলী বললে—বাবাও মাংস না খেয়ে আপিসে চলে গেল—

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—তোমাদের মাংস খেতে খুব ভালো লাগে বুঝি?

—বারে, মাংস খেতে ভালো লাগবে না? মাংস খেতে তো সকলেরই ভালো লাগে। তোমার কি মাংস খেতে ভালো লাগে না?

সন্দীপ বললে—না—

বিজলী জিজ্ঞেস করলে—ডিম ?

সন্দীপ বললে—না—

বিজলীর পাশে বিশাখা চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। বিজলী তাকে বললে—দেখছিস মাংস, ডিম কিছুই এ লোকটার খেতে ভালো লাগে না—এ লোকটাও ঠিক তোরই মতন—

সন্দীপ বিশাখার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলে—তোমার মাংস ডিম এসব খেতে ভালো লাগে না ?

বিশাখা কিছু বলবার আগে বিজলীই তার জবাব দিলে। বললে— ওরও ও-সব খেতে ভালো লাগে না—বিশাখাও তোমার মত ও-সব কিছু খায় না—

—সে কী, তুমি ওসব খাও না ?

কিন্তু বিশাখার উত্তর শোনবার আগেই তার কাকীমা ঘরে এসে হাজির। বললে—এই, তোরা এখানে গোলমাল করছিস কেন ? যা, পালা এখান থেকে—

বলে টাকার রসিদটা সন্দীপের হাতে দিতেই সে উঠে দাঁড়ালো। তারপর যে-রাস্তা দিয়ে সন্দীপ বাড়ির ভেতরে ঢুকেছিল সেই রাস্তা দিয়েই বাইরের রাস্তায় গিয়ে পড়লো। বাইরে তখন ঝাঁ-ঝাঁ করছে রোদ্দুর। তার মনে হলো বিশাখার সঙ্গে আর একটু কথাবার্তা বলতে পারলে যেন ভালো হতো। যেন ঠিক পুরো ইতিহাসটা শোনা হলো না। কিন্তু সব কথা জানতে তো আরো অনেক সময় লাগবে। অন্ততঃ আর এক মাসের আগে তো আর তার সঙ্গে বিশাখার দেখা হচ্ছে না। তাহলে ? অতদিন তাহলে তাকে অপেক্ষা করে থাকতে হবে ?

—এই, শোন—

সন্দীপ সবে গলিটা ছেড়ে বাইরে বড় রাস্তাটার দিকে একটু পা বাড়িয়েছে, ঠিক তখনই পেছন থেকে বিশাখার গলা শোনা গেল—এই, শোন—

সন্দীপ পেছন ফিরে দেখলে বিশাখা খিড়কির দরজাটার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। সন্দীপ আস্তে-আস্তে সেই দিকে এগিয়ে গিয়ে দেখলে সেই আগেকার সে-বিশাখা যেন আর নয়। এ যেন অন্য এক বিশাখা। মুখটা যেন গম্ভীর-গম্ভীর, চোখ দুটো যেন জলে টস্‌ টস্‌ করছে। কোথায় গেল বিশাখার সেই হাসি-হাসি মুখ, সেই দুষ্টু-দুষ্টু ভঙ্গী !

—কী হলো ? ডাকছিলে কেন ?

বিশাখা বললে—আরো কাছে এসো, চুপি চুপি একটা কথা বলবো—

—বলো।

বিশাখা তেমনি গলা নিচু করে বললে—দেখ, তোমাকে আমি যা বলেছি, সে সব মিথ্যে কথা—আমি সব খাই। কাকীমা আমাকে সব খেতে দেয়। আমি মাছ খাই, মাংস খাই, ডিম খাই, দুধ ঘি-মাখন খাই, আপেল-আঙুর-বেদানা খাই। আর তোমাদের ঠাকমা-মণি যে টাকা পাঠিয়ে দেয় তা দিয়ে কাকীমার সোনার গয়না, কানের ঝুমকো, হাতের চুড়ি, গলার হার, কিছুছু হয় না। সে-টাকায় আমার পরবার শাড়ী-ফ্রক, আমার পায়ের জুতো, আমার খাওয়া-পরা সব কিছু হয়। তোমার ঠাকমা-মণিকে বোল আমার কাকীমা আমাকে খুব ভালোবাসে, আমার

মা'কেও খুব ভালোবাসে···

সন্দীপের মনে হলো সে যেন দিনের বেলাতেও স্বপ্ন দেখছে। বললে—কিন্তু একটু আগেই যে তুমি বললে বিজলীর জন্যে পরোটা হয় আর তোমার জন্য রুটি হয়। তুমি যে বললে মাংস-ডিম কিছুছু তোমার খেতে ভালো লাগে না—

—ওসব মিথ্যে কথা। আমি সব মিথ্যে কথা বলেছি তোমাকে—

বলে বিশাখা দরজাটা নিঃশব্দে বন্ধ করে দিয়ে বাড়ির ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সন্দীপের কানে তখনও বিশাখার শেষ কথাগুলো গুঞ্জন করতে লাগলো—আমি সব খাই, কাকীমা আমাকে সব খেতে দেয়, আমি মাছ খাই, মাংস খাই, ডিম খাই, ফল খাই, দুধ-ঘি-মাখন খাই, আপেল-আঙুর-বেদানা খাই। তোমাদের ঠাকমা-মণি যে-টাকা পাঠিয়ে দেয় তা দিয়ে কাকীমার সোনার গয়না, কানের ঝুমকো, হাতের চুড়ি, গলার হার কিছুছু হয় না। সে-টাকায় আমার পরবার শাড়ী-ফ্রক, আমার পায়ের জুতো, আমার খাওয়া-পরা সব কিছু হয়। তোমার ঠাকমা-মণিকে বলো আমার কাকীমা আমাকে খুব ভালোবাসে, মা'কেও খুব ভালোবাসে···
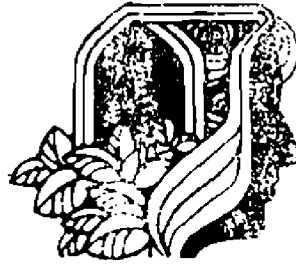
সেদিন যখন বিডন স্ট্রীটের বাড়িতে ফিরলো, তখন সত্যিই বেশ দেরি হয়ে গিয়েছিল। দুপুর প্রায় উতরে গেছে বলা যায়, গ্রীষ্মকালের দুপুর। কলকাতার পিচের রাস্তা সূর্যের তাপে জায়গায়-জায়গায় গলে গেছে। পায়ের জুতো গরম পিচের ওপর পড়তে অনেকবার জুতো আটকে যাচ্ছিল।

বাড়ির সামনে আসতেই সন্দীপ দেখলে একটা নতুন বিরাট গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ির ড্রাইভারের গায়ে খাঁকি ইউনিফর্ম, মাথায় সাদা পাগড়ি। মুখের ওপরে লম্বা-চওড়া গোঁফ। এ কার গাড়ি! এমন গাড়ি আর এমন ড্রাইভার এ বাড়িতে তো আগে কখনও দেখেনি সে। কে এল?

অন্যদিনের মত গিরিধারী ভেতরে ছিল না, একেবারে বাইরে রীতিমত অ্যাটেন-শনের মত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। কী হলো? হঠাৎ এত প্রভুভক্ত হয়ে গেল কেন সে? কার গাড়ি?

তবু সন্দীপকে দেখে গিরিধারী হাত তুলে যথারীতি সেলাম করলে।

সন্দীপও হাত তুলে নমস্কার করে জিজ্ঞেস করলে—এটা কার গাড়ি? বাড়িতে কে এসেছে?

গিরিধারী বললে—বড়া সাহাব বাবুজী, আমার বড়া মালিক—

—বড়া মালিক মানে? বড়া মালিক আবার কে তোমার?

—আপনি জানেন না? বড়া মালিক হাওড়া থেকে এসেছে, ঠাকুমা-মণির ছোট লেড়কা—

ঠাকুমা-মণির ছোট লেড়কা। মানে ঠাকুমা-মণির ছোট ছেলে! তাহলে কি দেবীপদ মুখার্জির ছোট ছেলে মুক্তিপদ মুখার্জি? অর্থাৎ স্যাক্সবী মুখার্জি এ্যান্ড কোম্পানী ইন্ডিয়া লিমিটেডের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর? সৌম্য মুখার্জির কাকা তাহলে! তাঁদের বেলুড়ের কারখানার মালিক। এ বাড়ির এই সমস্ত ঐশ্বর্য আর ঐতিহ্যের মালিক। এরই অন্ন খাচ্ছে সন্দীপ। তার মানে এ বাড়ির এই মল্লিক কাকা থেকে আরম্ভ করে এই কামিনী-ফুল্লরা-কালিদাসী-সুধা-বিন্দু, এই বাড়ির ঠাকুর চাকর, কন্দর্প, বাবুঘাটের দশরথ সকলেরই অন্নদাতা।

অন্নদাতাকে একবার দেখবার ইচ্ছে হলো সন্দীপের। শুধু তাঁর নামই শুনেছে সে। আর শুধু নামই শোনেনি, তাঁর সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনেছে। ঠাকুমা-মণির বড় ছেলে শক্তিপদর পরেই এই ছেলে জন্মেছিল। তখন দেবীপদ মুখার্জির সৌভাগ্য-সূর্য উদিত। পূর্ণ উদিতই বলা যায়। সমাজে কর্মস্থলে চারদিকে তাঁর সম্মান, প্রচার-প্রসার সম্বর্ধনা লাটসাহেবের খাস কামরাতেও তাঁর যখন-তখন এবেলা-ওবেলা নিমন্ত্রণ। কৃপাপ্রার্থীরা তাঁর কৃপাদৃষ্টি প্রত্যাশায় লোলুপ হয়ে আশেপাশে ঘোরে। তার সঙ্গে আছে তাঁর ফ্যাক্টরির ক্রমবর্ধমান উৎপাদন। লন্ডন, ফ্রান্স, জার্মানীতেও তাঁর শাখা অফিস। সেই যুগেও তাঁকে ঘন-ঘন সে-দেশে যেতে হতো। দু-তিন বার ঠাকুমা-মণিও তাঁর সঙ্গে সে-দেশে গেছেন। সেই বংশে পর-পর দুটি ছেলে হওয়ার মত ঘটনা শুধু যে শুভ-সূচক তাই-ই নয়, সঙ্গে-সঙ্গে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়ার মত।

মানুষের সৌভাগ্য যখন আসে, তখন বোধহয় এই রকম বন্যার জল-স্রোতের মতই আসে। একেবারে দুকূল ছাপিয়েই আসে। তখন আর তাকে কোনও মতেই ঠেকানো যায় না। অনেকটা যেন লক্ষ্মীর ঝাঁপি উপচে পড়ার মতই অবস্থা হয়।

শক্তিপদর জন্মের সময়ে কম ঘটা হয়নি। পাড়ায়-পাড়ায় লোকের বাড়িতে বাড়িতে সে-ঘটার স্মৃতি তখনও মুছে যায়নি, লাটসাহেবকে পর্যন্ত সেদিন নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে হয়েছিল সেই পার্টিতে। বিলেতেও ম্যাকডোনাল্ড সাহেবদের পরিবারকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। কলকাতার কোনও সম্ভ্রান্ত পরিবারই সে নিমন্ত্রণে থেকে বাদ পড়েনি।

কিন্তু পরের বার? মুক্তিপদ জন্মাবার পর?

সে-বারের ঘটা প্রথম বারের ঘটাকেও ছাড়িয়ে গেল। একদিন দুদিন নয়, পর পর সাত দিন ধরে চলেছিল সে-উৎসবের ধাক্কা। কলকাতার সব পাড়ার লোকই জানতে পেরেছিল যে বিডন স্ট্রীটের মুখার্জি বংশে দ্বিতীয় পুত্র-সন্তান হয়েছে। তখন কলকাতার জানা মানে সারা ইন্ডিয়ার জানা। মল্লিক-কাকা তখন নতুন এসেছেন এ বাড়িতে। বলেছিলেন—জানো, তখন তো স্বদেশী যুগ, একদিকে সবাই ইংরেজদের বিরুদ্ধে, অন্যদিকে অন্য দল স্বদেশী করছে। সব লোক ইংরেজদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দিতে চাইছে, তোমরা সে সব যুগ দেখোনি—

সন্দীপ দেখেনি বটে, কিন্তু শুনেছে। তখন যে-যুদ্ধ হয়েছিল তাতে নাকি

বোমা পড়েছিল এই কলকাতায়। সে বোমা নাকি জাপানীরা ফেলেছিল। কলকাতায় অনেক লোক নাকি সেই সময়ে কলকাতা থেকে যে-যেখানে পেরেছিল পালিয়ে গিয়েছিল। তারপর দুর্ভিক্ষ হয়েছিল দেশে। সবই শোনা কথা। তারপর হিন্দু আর মুসলমানদের মধ্যে ঝগড়া; মারামারি, কাটাকাটি। সে সমস্তই ইংরেজদের তৈরী করানো। হিন্দু আর মুসলমানদের মধ্যে ঝগড়া লাগিয়ে দিলে ইংরেজদেরই লাভ। তা হলে তখন আর ইংরেজদের এ-দেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে না, এই ছিল তাদের মতলব।

সেই যুগে প্রায় যখন সবাই ইংরেজদের এ দেশ থেকে তাড়িয়ে দিতে তোড়জোড় করছে, সুভাষ বোস যখন কলকাতা থেকে পালিয়ে গিয়ে জাপানের রেডিও থেকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিষ ছড়াচ্ছেন, তখনও এই মুখার্জি বংশের লোকেরা ছিল ইংরেজদের পক্ষে। তখনও এ বাড়ির ঘরের দেওয়ালে-দেওয়ালে ইংরেজ বড়লাট, লাটসাহেবদের ছবি ঝুলছে, ইংরেজী কায়দায় কোট-প্যান্ট পরছে এ বাড়ির পুরুষেরা। তখনও এ বাড়ির লোকেরা মনেপ্রাণে ইংরেজদেরই ভজনা করে চলেছে—

সেই বাড়ির মেজ ছেলে আগেও যেমন ইংরেজদের অনুকরণে আদব-কায়দা চাল-চলন চালাতো, এখনও তেমনি একই কায়দায় সে সব চালিয়ে যাচ্ছে। দেবীপদ মুখার্জি যেমন কথায়-কথায় বিলেত যেতেন, এখন এই যুগে মুক্তিপদ মুখার্জিও কথায়-কথায় বিলেত আমেরিকা, জার্মানী, আফ্রিকা, ইজিপ্ট যাচ্ছে।

সন্দীপ বাড়ির ভেতরে ঢুকলো। ঠাকুর-বাড়ি পেরিয়ে মল্লিক-মশাই-এর ঘরে গিয়ে দেখলে দরজায় তালা ঝুলছে। কোথায় গেলেন তিনি?

হঠাৎ পেছন থেকে কে ডাকলে—আপনি কোথায় ছিলেন বাবু?

সন্দীপ মুখ ফিরিয়ে দেখলে ঠাকুর।

—আমি আপনার দেরী দেখে ভাত ঢাকা দিয়ে রাখলাম—

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—সরকারমশাই কোথায় গেলেন?

ঠাকুর বললে—তিনিও খাননি, আজ মেজবাবু এসেছেন, তিনি ওপরে. তাঁর কাছে তাঁর ডাক পড়েছে

যাক, তাহলে বাড়ি ফিরতে তার দেরি হয়েছে বলে তাকে আর জবাবদিহি করতে হবে না। সত্যি ভালোই হয়েছে। আসলে এটা যখন তার চাকরি তখন প্রত্যেক কাজের জন্য তার কাছে মালিকের জবাবদিহি চাইবার অধিকার আছে বই কি। সেখানে সন্দীপ গিয়ে ঠিকমত টাকাটা ঠিক লোকের হাতে দিয়েছে কিনা, তপেশবাবু কিছু বলেছেন কিনা, বউমা দুধ, ঘি, ফল, দই, মাছ, মাংস খাচ্ছে কিনা, আর যদি খেয়ে থাকে তো তাতে বউমার স্বাস্থ্য ভালো হয়েছে কি না—এই সব নানা কথার জবাব তাকে এখনি দিতে হতো। আর এখন যদি এর জন্যে ডাক নাও পড়ে তো কাল হোক-পরশু হোক এ-সব কথার জবাব দিতেই হবে। তখন?

তখন কী বলবে সন্দীপ? তখন সে কী জবাব দেবে?

ঠাকমা-মণি হয়ত জিজ্ঞেস করবেন—বউমার সঙ্গে কিছু কথা হয়েছে?

তার জবাবে কী বলবে সে? সে 'হ্যাঁ' বলবে, না 'না' বলবে? যদি 'হ্যাঁ' বলে তো ঠাকমা-মণি হয়ত আবার জিজ্ঞেস করবেন—কী কথা হয়েছে?

এর উত্তরেই বা সে কী বলবে? বলতে গেলে তো অনেক কথাই বলতে হয়। বলতে হয় যে বউমা দুবার দু'রকম কথা বলেছে! একবার বলেছে যে একশো পঁচিশ টাকা দিয়ে বাড়ির সকলে মাছ-মাংস-ডিম-দুধ-ঘি-দই-ফল খায়, অন্যরা পরোটা খায় আর সে কিছুই খায় না। বিজলী পরোটা খেলে বিশাখার ভাগ্যে পড়ে রুটি। বিজলীর পাতে মাংস-মাছ পড়লে বিশাখা খায় নিরামিশ তরকারি।

কোনটা বললে ঠাকমা-মণি খুশি হবেন? মিথ্যে কথা বললে, না সত্যি কথা বললে? যদি সন্দীপ বলে দেয় যে তপেশ গাঙ্গুলীমশাই টাকাগুলো নিয়ে নিজেরা ভালো-ভালো জিনিস খান আর নিজের স্ত্রীর সোনার গয়না গড়ান, তাহলে কী হবে? তাহলে কি এ বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙে যাবে? যদি এ-বিয়ে ভেঙে যায় তাহলে বিনা মেহনতে মাসে মাসে এই একশো পঁচিশ টাকার আয় তো তাঁর কমে যাবে। তখন দোষ পড়বে কার ঘাড়ে? তখন তিনি হয়ত ছুটে চলে আসবেন মল্লিক-মশাইয়ের কাছে, আর যখন শুনবেন এই সন্দীপই সব কথা ফাঁস করে দিয়েছে, তখন প্রশ্ন উঠবে সন্দীপ এ-সব খবর জানতে পারলো কী করে? সন্দীপকে এ-সব কথা কে বলেছে? তখন সন্দেহ হবে বিশাখার ওপর। তখন বিশাখার ওপরই যত অত্যাচার শুরু হবে। তখন বিশাখার ওপর প্রতিশোধ নিতে গেলে বিশাখার মা যোগমায়া দেবীর ওপরে আরো অত্যাচার শুরু হবে!

ঠাকুর বললে—খাবার দিয়ে দিয়েছি, আপনি খেতে আসুন বাবু—

রান্নাবাড়ির এক কোণে খেতে-খেতে সন্দীপ অনেক ভাবনার সমুদ্রে ডুবে গেল।

জিজ্ঞেস করলে—আচ্ছা ঠাকুর, তোমার মেজবাবু হঠাৎ এতদিন পরে এ বাড়িতে এলেন কেন?

ঠাকুর বললে—মেজবাবু তো প্রায়ই আসেন। ঠাকমা-মণিও তো কারবারের একজন মালিক, তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করতে এ-বাড়িতে প্রায় আসতেই হয়—

—তোমার বাড়ি কোন্ দেশে ঠাকুর?

ঠাকুর বললে—কটক জিলা—

—কতদিন থেকে এ-বাড়িতে কাজ করছো তুমি?

বাবু, মেজবাবু যখন এ-বাড়ি ছেড়ে চলে গেলেন তার আগের বছর থেকে এ-বাড়িতে আছি। ঠাকমা-মণি যখন জগন্নাথ মহাপ্রভুকে দর্শন করতে গিয়েছিলেন, তখন তিনি আমাকে এখানে নিয়ে এসেছেন—

সত্যি, ঠাকুরটি খুব ভালো লোক। অনেক যত্ন করে সন্দীপকে খাওয়াতো। অনেক সৌভাগ্য থাকলে এমন লোক পাওয়া যায়। ঠাকমা-মণির অনেক সৌভাগ্য তাই দশরথ, কন্দর্প আর এই ঠাকুরের মত এমন সৎ লোক পেয়েছেন। আর শুধু ওরাই নয়, মল্লিক-মশাই কি কম সৎ মানুষ! নইলে ঠাকমা-মণি কি সাধে মল্লিক-মশাই'র হাতে এত হাজার-হাজার টাকার হিসেব ছেড়ে দিতে পেরেছেন?

—আর দু'টি ভাত নেবেন বাবু?

সন্দীপ বললে—না, তা তোমাদের খাওয়া হয়েছে?

—না বাবু, সরকারমশাই খাননি, আপনি খাননি, আমি আগেই খেয়ে নেব?

সন্দীপ বললে—জানো ঠাকুর, তোমরা সবাই ভালো লোক, তুমি ভালো লোক

গিরিধারী ভালো লোক, দশরথ ভালো লোক, কন্দর্প ভালো লোক, সরকার মশাইও ভালো লোক, তোমার ঠাকমা-মণিও ভালো লোক···

ঠাকুর বললে—আপনিও ভালো লোক বাবু, আপনি নিজে ভালো লোক বলে সবাইকে ভালো দেখেন—

সন্দীপ বললে—না ঠাকুর, আমার কথা ছেড়ে দাও, আমি আবার একটা মানুষ। আমরা কত গরীব, তা তুমি জানো না ঠাকুর। বললে তুমি বিশ্বাস করবে না ঠাকুর, আমার মা পরের বাড়িতে তোমার মত রান্না করে আমায় লেখা-পড়া শিখিয়ে বড় করেছে—

বলতে-বলতে সন্দীপের গলাটা বোধহয় একটু গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল, তাই ঠাকুর বললে—বাবু, সব মহাপ্রভু জগন্নাথের দয়া। তাঁর দয়ায় আপনি আরো বড় হবেন বাবু, অনেক বড় হবেন···

তারপর একটু থেমেই আবার বললে—কিন্তু আমার ঠাকমা-মণির অনেক দুঃখু বাবু, অনেক দুঃখু···

—কেন ঠাকমা-মণির অনেক দুঃখু কেন? কীসের দুঃখ ঠাকমা- মণির?

ঠাকুর বললে—সে অনেক কথা বাবু, সে অনেক কথা—

সন্দীপ বললে—কী কথা ঠাকুর? কী কথা? বলো না আমাকে—

ঠাকুর কিছু জবাব দিলে না।

সন্দীপ তবু ছাড়লে না। জিজ্ঞেস করলে—ঠাকমা-মণির দুঃখের কথা তুমি কী করে জানলে ঠাকুর? তুমি তো সারাদিন রান্না-বাড়িতে থাকো—ঠাকমা-মণি দুঃখের কথা তুমি কী করে জানলে? তোমার তো জানবার কথা নয়—

ঠাকুর বললে—ঠাকমা-মণির খাস-ঝি বিন্দু, ও যে আমার আপন বোন হয়—

সন্দীপ অবাক হয়ে গেল কথাটা শুনে। বললে—বিন্দু তোমার আপন বোন?

ঠাকুর বললে—হ্যাঁ আমার দিদি, আমার বিধবা দিদি—আমি এ-বাড়িতে আসবার পর আমি দিদিকে এখানে এনে দিয়েছি। দিদির কাছে আমি শুনেছি ঠাকমা-মণির মনে অনেক দুঃখু বাবু, ঠাকমা-মণির অনেক দুঃখু···টাকা থাকলেই মানুষের সুখ হয় না। ঠাকমা-মণির কপালে তাই অনেক দুঃখু···

স্যাক্সবী মুখার্জি এ্যাণ্ড কোম্পানী ইণ্ডিয়া লিমিটেড-এর প্রাণপুরুষ আগে যিনিই থাকুন, যিনিই এ কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা করে থাকুন না কেন, এখন তার মালিক বলে লোকে যাঁকে জানে তিনি হলেন এই ঠাকমা-মণির মেজ ছেলে এম. পি. মুখার্জি মানে মুক্তিপদ মুখার্জি। স্বর্গীয় দেবীপদ মুখার্জির কাছে যত সহজে স্বয়ং মা

লক্ষ্মী ধরা দিয়েছিলেন, মুক্তিপদের কাছে তিনি অত সহজে ধরা দেননি। কারণ ব্রিটিশ আমলে ব্যবসা করা যত সহজ ছিল, দেশী আমলে তত সহজ আর রইল না। আইনের কড়াকড়িই শুধু নয়, ট্যাক্সের ব্যাপারেও দেশী গভর্মেণ্ট আগেকার চেয়ে আরো অনেক কড়াকড়ির আইন বানিয়ে দিলে। এমন আইন করে দিলে যাতে দেশে বড়লোক আর কেউ না থাকতে পারে। বড়লোকদের নিচেয় নামিয়ে গরীবদের সমপর্যায়ে আনতে হবে। গরীবদের উঁচুতে উঠিয়ে দেবার ক্ষমতা যখন আমাদের নেই, তখন দেশে গণতন্ত্র আনতে গেলে বড়লোকদেরই টেনে নিচেয় নামাও। তাদের ঘাড়ে ট্যাক্সের বোঝা চাপাও। তাদের পেছনে ইউনিয়নের গোলমাল শুরু করে দাও। শ্রমিকদের দিয়ে ধর্মঘট করাও, শ্রমিকদের দিয়ে তাদের ঘেরাও করাও। ঘেরাও করার ফলে, তাদের কারবারে লক্-আউট হোক, ক্লোজার হোক। লক্ষ-লক্ষ ফ্যাক্টরি বন্ধ হয়ে যাক। তাদের পয়সার আমদানি কম হলেই তারা সবাই শ্রমিকদের সঙ্গে একাকার হয়ে যাবে। তাহলেই প্রকৃত গণতন্ত্র আসবে। ইংরেজরা ছিল পুঁজি-পতি, আর আমরা হলুম প্রজাতন্ত্রবাদী, সাম্যবাদী। আমরা ডেমোক্র্যাটিক সোশ্যালিস্ট। আমরা কাউকে বড়লোক হতে দেব না।

সেই আওতার মধ্যে এসে পড়লো স্যাক্সবী-মুখার্জি অ্যান্ড কোম্পানী ইণ্ডিয়া লিমিটেড। সেই আইনের কড়াকড়ির ঢেউ এসে লাগলো সেই কোম্পানীর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর এম. পি. মুখার্জির ওপর। তখন বড় ছেলে এস. পি মুখার্জি আর তাঁর স্ত্রী মারা গেছেন। বেঁচে আছে কেবল তাঁর এক নাবালক শিশু, সৌম্য মুখার্জি। সে যতদিন পর্যন্ত নাবালক থাকবে ততদিন অবশ্য কোম্পানীর ডাইরেক্টর হতে পারবে না, কিন্তু তার অছি থাকবেন কেবল তার বিধবা ঠাকমা শ্রীমতী কনকলতা মুখার্জি। তাদের হয়ে ফ্যাক্টরি আর অফিসের কাজ-কর্ম চালাবেন সৌম্য মুখার্জির কাকা এম. পি. মুখার্জি।

এতদিন কোম্পানীর যত কিছু ঝনঝাট ঝামেলা সব কাঁধের ওপর নিয়ে বইতে হয়েছে একলা সেই মুক্তিপদকেই। যখন ফ্যাক্টরিতে লেবার-ট্রাবল হয়েছে, যখন শ্রমিক-অশান্তি হয়েছে, যখন স্ট্রাইক হয়েছে, যখন ঘেরাও হয়েছে, অফিসের কাজে ইণ্ডিয়ার বাইরে যখন যেতে হয়েছে, তখন মুক্তিপদ মুখার্জি একলাই সব দিক দেখেছে। যখন চেম্বার-অফ্-কমার্সের কনফারেন্স হয়েছে, তখন অনেকবার তাঁকে প্রেসিডেন্ট হতে হয়েছে। ঘরের আর বাইরের সব দিক দেখবার দায়-দায়িত্ব মুক্তিপদ মুখার্জিকেই মাথার ওপর নিয়ে একলা চলতে হয়েছে।

কিন্তু এবার অন্য রকম। এবার সৌম্যপদ মুখার্জী সাবালক হয়েছে। এবার কাকার কাজে তাকে সাহায্য করতে হবে। এবার সৌম্যপদ মুখার্জিকে ফুল-টাইম ডাইরেক্টর হতে হবে।

ঠাকমা-মণি সব শুনলেন। বললেন—তুমি কি এই জন্যেই এসেছ?

মুক্তিপদ বললে—মা, তুমি বুঝতে পারছো না, আমার কত ঝামেলা, মোটেই সময় পাইনি—

ঠাকমা-মণি বললেন— তা একবার টেলিফোন করবারও কি সময় হয় না তোমার? একবার খবর নিতেও কি ইচ্ছে হয় না যে বুড়ো মা বেঁচে আছে কি না? এতই কাজ তোমার!

মুক্তিপদ বললে—আরে, তোমার কেবল সেই একই কথা! আমি কি ছিলুম এখানে যে একবার খবর নেব? তোমার টাকা তো আমি ঠিক সময়ে পাঠিয়ে দিতে বলেছিলুম অফিসে, ও তো স্ট্যান্ডিং-অর্ডার দেওয়া আছে আমার সেক্রেটারীকে—

- রাখ্ তোর স্ট্যান্ডিং-অর্ডার, তুই কি তোর পকেট থেকে আমাকে টাকা দিচ্ছিস? ও তো আমারই টাকা আমাকেই দিচ্ছিস তুই। অত বাজে কথা বলছিস তুই কাকে?

মুক্তিপদ একটু নরম হলো যেন। বললে—ওমনি তুমি রাগ করছো···

ঠাকমা-মণি বললেন—তা রাগ করবো না? তুই কাকে ও-সব কথা শোনাচ্ছিস শুনি? আমি কি কিছু জানি না?

—ওই দেখ, আমি বলছি····

ঠাকমা-মণি বললেন—তুই ও-সব কথা অফিসের অফিসারদের বোঝাস্, আমাকে বোঝাতে আসতে হবে না—

মুক্তিপদ বললে—জার্মানীতে যাবার আগে তো আমি এসেছিলুম—

—সে তো আজ তিনমাস হয়ে গেল—

—তারপর তো ওখান থেকে স্টেটস্-এ যেতে হয়েছিল, সেখান থেকে লন্ডন, প্যারিস হয়ে আবার মিড্‌ল্ ইস্টে গিয়েছিলাম, সেখান থেকে·····

ঠাকমা-মণি বললেন—থাক্-থাক্, অত কাজের ফিরিস্তি দিতে হবে না তোকে। আমিও ওরকম কত ঘুরেছি, কিন্তু তোর মত বাড়ির কথা ভুলে থাকিনি। আমার টেলেক্সেও খবর নিতে পারতিস একটা! তোদের ছোটবেলায় লন্ডন, প্যারিস থেকে খবর নিইনি? এখন কাঁচা টাকা হাতে পেয়ে তুই একেবারে লাটসায়েব হয়ে পড়েছিস। জানিস কার টাকায় তুই খেতে পরতে পারছিস? এখন তুই আমাকে খাওয়াচ্ছিস, না আমি তোকে খাওয়াচ্ছি?

এ-কথার জবাব দেবার আগেই ঠাকমা-মণি বাধা দিলেন।

বললেন—জীবনে কখনও কারো তাঁবে থাকিনি, এখনও থাকবো না। যদ্দিন বেঁচে থাকবো, তদ্দিন কারো দান-দক্ষিণে নিতে চাই না। মনে করিসনি আমি তোদের দয়ার ওপর নির্ভর করে থাকবো কিংবা আর কারোর ওপর আমার পেট চলবে—

—মা, তুমি দয়ার কথা তুলছো কেন?······

—থাম্ তুই। আর কথা বলিস নে—তোরা সবাই কী ভেবেছিস বল্ দিকিনি? ভেবেছিস কর্তা নেই বলে আমি না-খেয়ে মরে যাবো?

মুক্তিপদ বলতে গেল—মা, তুমি····

—থাম্, কথা বলতে লজ্জা করে না তোর? আমি অনেক ব্যাটাছেলে দেখেছি কিন্তু তোর মত বউ-এর ভেড়ুয়া কখনও দেখিনি······

মুক্তিপদ আবার বলতে গেল—এ-রকম করলে আমি কিন্তু চলে যাবো মা··· চলি তাহলে—

—ভাবছিস তুই চলে গেলে আমি উপোস করবো?

—উপোস করবার কথা উঠছে কেন মা···

ঠাকমা-মণি বললেন—তাহলে চলে যাবি বলে ভয় দেখাচ্ছিস কেন ? আমি তোর মা, যখন তুই জন্মেছিলি তখন তোর ওজন ছিল মাত্র পাঁচ পাউণ্ড। ডাক্তার বলেছিল এ ছেলে বাঁচবে না। আমিও জেদী মেয়ে, আমি তখন বলেছিলুম একে আমি বাঁচাবোই। তোর এক বছর বয়েস পর্যন্ত আমি দিনে-রাতে কখনও ঘুমোইনি। কত নার্স, কত ডাক্তার, কত ওষুধ্ সব কিছুর ব্যবস্থা ছিল। নার্সিং-হোমের সব্বাই আমার কাণ্ড দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল। তারা সবাই বলেছে তাদের জীবনে তারা কখনও এমন মা দেখেনি······

একটু থেমে আবার ঠাকমা-মণি বলতে লাগলেন—তা এখন ভাবছি সব ভুল করেছি। ভাবি সেদিন তোর গলা টিপে মেরে ফেললেই ভালো হতো, তাহলে আমি আর এই এত কষ্ট পেতুম না—

মুক্তিপদ এতক্ষণ দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই কথা বলছিল, এবার দুই হাতে মাথাটা চেপে ধরে একটা সোফার ওপরে বসে পড়লো।

ঠাকমা-মণি বললেন—কী হলো আবার তোর ? আমার কড়া কথাগুলো শুনতে ভালো লাগলো না বুঝি ? তোর মাথা ধরে উঠলো ?

মুক্তিপদ এ-কথার কোন জবাব দিলে না। যেমন দুই হাতে নিজের মাথাটা চেপে বসে ছিল তেমনিই বসে রইল। মুক্তিপদের জীবনের এক-এক মিনিট সময়ের দাম কোটি-কোটি টাকা। কিন্তু সেই মুহূর্তে যেন তার মনে হলো কোটি-কোটি টাকা জলে যায় যাক, তার বদলে আরো কয়েক কোটি টাকা সে ঠাকমা-মণির কাছে থেকে উপার্জন করে নিয়ে যাবে !

—কী হলো, মাথা ধরা ছাড়লো না ? মাথায় একটু অমৃতাঞ্জন ঘষে দেব ?

—না—

ঠাকমা-মণি বললেন—কেন, বউমার নামে লাগিয়েছি বলে মাথা ধরলো ?

তখনও মুক্তিপদ কিছু বললে না দেখে ঠাকমা-মণি বিন্দুকে ডাকলেন। বললেন ওলো বিন্দু, আমার অমৃতাঞ্জনের শিশিটা একবার আমাকে দিয়ে যা তো—

বিন্দু অমৃতাঞ্জনের শিশিটা ঠাকমা মণিকে দিতেই ঠাকমা-মণি সেটা থেকে কিছুটা মলম বার করে ছেলের কপালে ঘষতে লাগলেন। যখন মুক্তি ছোট ছিল তখনও ঠিক এমনি করে তার কপালে এইটে ঘষে দিতেন। তখন এই ছেলেই আরাম পেয়ে তার কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়তো। এতদিন পরে এত বয়সেও সেই মুক্তি যেন আবার আগেকার মত ছোট ছেলেটি হয়ে তাঁর কাছে ফিরে এসেছে।

মুক্তিপদ সোফাটার পেছনে মাথা হেলিয়ে রেখেই চোখ দুটো বুঁজে বললে—মা, মল্লিক-মশাইকে একটু ডেকে পাঠাও তো—

—কেন ? আবার তাকে ডেকে কী করবি ?

—একটু হিসেব বুঝে নেব—

বিন্দুর ওপর ভার পড়লো সরকারমশাইকে ডাকবার। বিন্দু খবর দিলে সুধাকে। সুধা খবর দিলে কালিদাসীকে। কালিদাসী খবর দিলে ফুল্লরাকে। ফুল্লরা খবর দিলে একতলার খাজাঞ্চিখানায়।

মুক্তিপদ জিজ্ঞেস করলেন—সৌম্য কোথায় ?

—কেন? তাকে ডেকে কী হবে? সে বোধহয় খেয়ে-দেয়ে নিজের ঘরে রয়েছে।

মুক্তিপদ জিজ্ঞেস করলে—সৌম্য আজকাল কী করে?

— কী করে, মানে?

মুক্তিপদ বললে—মানে একজামিন তো হয়ে গেছে, এখন কী করছে ও?

ঠাকমা-মণি বললেন— খায়-দায় আর ঘুমোয়। রাত ন'টার সময় সদর গেট বন্ধ হয়ে যায়, সে তার আগে বাড়ি এসে খেয়ে-দেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। তা, হঠাৎ তার সম্বন্ধে তু এতই কথা জিজ্ঞেস করছিস কেন? সে বেঁচে আছে কি মরলো, সে সম্বন্ধে এতদিন তো কই কিছু খোঁজ নিস্‌নি—

মুক্তিপদ বললে—এবার তো সে মেজর হয়েছে, এবার তো ওর অফিসে বেরোন উচিত—তাকে একবার ডাকতে পাঠাও না—

ঠাকমা-মণি বললেন—ডাকবো?

—একবার ডাকো তো-দেখি সে কী বলে!

সঙ্গে সঙ্গে তাকে ডাকা হলো। এতদিন বাদে কাকা এসেছেন, এসে তাকে ডাকছেন শুনে সৌম্য তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠে পড়লো। সারা রাত সে যে জেগে কাটায় তা ঠাকমা-মণি জানেন না। সৌম্য সোজা এসে ঠাকমা-মণির ঘরে ঢুকলো।

মুক্তিপদ সৌম্যর দিকে চেয়ে বললেন--এ কী, তোমার এ রকম চেহারা হয়েছে কেন? এত দেরী পর্যন্ত তুমি ঘুমোচ্ছিলে নাকি?

লজ্জায় সৌম্য একটু জড়োসড়ো হবার চেষ্টা করলে। বললে—ঘুমিয়ে পড়েছিলুম একটু।

মুক্তিপদ বললেন—তোমার কোন কাজ নেই বলেই এত ঘুমোও। তোমার ঠাকমা-মণি তো বলছিলেন তুমি নাকি রাত ন'টার পরই ঘুমিয়ে পড়ো। এত ঘুম তোমার কোত্থেকে আসে? তোমার তো ডাক্তার দেখান উচিত! নিশ্চয় কোন অসুখ-টসুখ আছে তোমার—

সৌম্য মাথা নিচু করে বললে—না, আমার কোনও অসুখ নেই—

—কোনও অসুখ নেই তো এতক্ষণ ঘুমোও কী করে? আমি তো রাত বারোটার আগে কোনও দিন শুতে যেতে পারি না। আর এদিকে ভোর চারটের পর আর বিছানায় শুয়ে থাকতে পারি না। আমার এই বয়েসেও আমি দশজন লোকের কাজ একলা করি। এখন আমারও তো বয়েস হচ্ছে, এখন থেকে কাজ কর্ম বুঝে নাও—

সৌম্য কথাগুলো শুনলো কিন্তু কিছু বললে না।

মুক্তিপদ আবার বলতে লাগলো—এই তো আমি সমস্ত পৃথিবী ঘুরে এলুম। চার মাস ধরে আমি এতটুকু বিশ্রাম পাইনি, বাড়ির কারোর খবর রাখবারও সময় পাইনি এ ক'মাস। লণ্ডনে শুধু আমাদের অফিসে কাজ করেছি এক জায়গায় বসে, সেই দু'দিনই বলতে গেলে রাত্তিরে একটু ঘুমিয়েছি। কিন্তু তুমি এ সব কাজগুলো করতে পারলে আমি বেলুড়ের ফ্যাক্টরীটা ভালো করে দেখতে পারি।

তারপর একটু থেমে আবার বললো—তুমি কাল আমাদের হেড-অফিসে যাবে?

সৌম্যর কী আর বলবার থাকতে পারে? বললে—যাবো—

—তা হলে কাল তুমি আমাদের হেড-অফিসে ঠিক সাড়ে ন'টার সময় যাবে।

তারপরে আমি তোমায় বেলুড়ের ফ্যাক্টরিতে নিয়ে যাবো সেখান থেকে। এখন থেকে সব কাজ-টাজ বুঝে নাও। আমার যদি অসুখ-বিসুখ হয় কোনও দিন, তো তুমিই তখন দেখতে পারবে। তুমি এখন মেজর হয়েছ, তুমিও এখন থেকে আমাদের একজন ফুল-ফ্লেজেড্ ডাইরেক্টর—

সৌম্য কাকার সব কথাগুলো শুনছিল, কাকা আবার বললেন—তা হলে তুমি যাও এখন, সবে ঘুম থেকে উঠেছ, আর বেশীক্ষণ তোমায় আটকাবো না, ওই কথাই রইল তাহলে—যাও

সৌম্য উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে পেরেই যেন বাঁচলো।

বিন্দু ঘোমটা দিয়ে ঘরে ঢুকে বললে—বাইরে সরকার মশাই এসে দাঁড়িয়ে আছেন—আসতে বলবো কি?

ঠাকুমা-মণি বললেন—হ্যাঁ পাঠিয়ে দে—

মল্লিক-মশাই এতক্ষণ ঘরের বাইরেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। সকাল থেকে তিনি সন্দীপের অপেক্ষা করছিলেন। খুব সকাল সকালই একশো পঁচিশটা টাকা সন্দীপের হাতে দিয়ে তপেশ গাঙ্গুলীর বাড়িতে পাঠিয়েছিলেন। অফিসে যাবার আগেই যাতে তিনি টাকা পেয়ে যান সেই জন্যেই এই ব্যবস্থা করেছিলেন তিনি। কিন্তু সকাল দশটা বাজলো, এগারোটা বাজলো, বারোটা বাজলো তবু দেখা নেই সন্দীপের। কলকাতায় নতুন এসেছে সে, তাই ভয় হওয়াই স্বাভাবিক। বাস থেকে নামা-ওঠার সময়ে ধাক্কাধাক্কিতে পড়ে যাওয়াও অসম্ভব নয়।

এমনি যখন ভাবছেন, হঠাৎ ঠাকুর এসে খবরটা দিয়ে গেল। বললে—সরকার-মশাই, মেজবাবু এসেছেন—

মেজবাবু! মেজবাবুর আসবার খবর শুনেই মল্লিক-মশাই বুঝতে পারলেন আজ তাঁর দুপুরের খাওয়া শিকেয় উঠলো।

ঠাকুর বললে—আপনি কি এখনই খেয়ে নেবেন?

মল্লিক-মশাই তাড়াতাড়ি একটা জামা গায়ে চড়িয়ে দিলেন। বললেন—না রে বাবা, খাওয়া এখন মাথায় উঠেছে আমার, কখন মেজবাবুর ডাক পড়ে তার কি ঠিক আছে? মেজবাবু চলে যাওয়ার পরই খাবো। আর তাছাড়া আমাদের সন্দীপও তো এখনও আসেনি, সে গাড়ি চাপা পড়লো না কোথায় গেল, তা তো বুঝতে পারছি না। সে এলেই না হয় একসঙ্গেই খাবো—

অনেকক্ষণ থেকে তিনি হিসেবের খাতা-পত্র নিয়ে তৈরী হয়ে ছিলেন। যখন তেতলা থেকে ডাক এলো তখন সঙ্গে সঙ্গে তেতলায় চলে গেলেন। গিয়ে শুনলেন খোকাবাবু ভেতরে ঢুকেছেন। একজন ঘরে থাকতে অন্য একজনের সে ঘরে যাওয়া শিষ্টাচার বিরুদ্ধ। তাই ঘরের বাইরেই অপেক্ষা করতে লাগলেন। তারপর খোকাবাবু যেই বেরিয়ে গেলেন তখনই বিন্দু এসে ডাকলে—আসুন সরকারমশাই আসুন—

মল্লিক-মশাইকে দেখেই মেজবাবু জিজ্ঞেস করলেন—কী খবর? সব ভালো?

মল্লিক-মশাই বললেন—হ্যাঁ, আপনার আশীর্বাদে সবই ভালো—

মেজবাবু সরাসরি কাজের কথাই শুরু করে দিল। বললেন একটা কথা বলার জন্যে আপনাকে ডেকেছি। দু'মাস আগে অফিস থেকে আপনাকে যে ঠাকমার

মণির নামে ক্যাশ এক লাখ টাকা দেওয়া হয়েছিল তা আপনি খাতায় তোলেননি তো ? আমি তাড়াতাড়িতে আপনাকে বলতে ভুলে গিয়েছিলুম—

মল্লিক-মশাই সঙ্গে সঙ্গে হিসেবের খাতার পাতাটা বার করতে করতে বললেন—সে টাকাটা আমি বাড়িতে এসেই ঠাকমা-মণির হাতে তুলে দিয়েছি, দিইনি ?

ঠাকমা-মণি পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। বললেন—হ্যাঁ, আমি সে-টাকা গুনে নিয়েছি—

মল্লিক-মশাই ততক্ষণে হিসেবের খাতার বিশেষ একটা পাতা বার করে সামনে মেজবাবুর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন—এই দেখুন, এইখানে আমি টাকাটা জমার পাতায় জমা করে নিয়েছি—

—না, ওটা কেটে দিন—

বলে নিজের পোর্টফোলিও থেকে ডট্ পেন বার করে সমস্ত লেখাটা ঘষে ঘষে কেটে বাদ দিয়ে দিলে। যখন দেখলে ওপর থেকে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না তখনই যেন নিশ্চিন্ত হলো। তারপর বললো—এবার টোটালটাও কেটে দেবেন, নতুন করে আবার টোটাল দিয়ে দেবেন—খাতা কখন কার নজরে পড়ে বলা যায় না—ইন্‌কাম-ট্যাক্সের লোক দেখে ফেললে—

তারপর মল্লিক-মশাইকে বললে—আচ্ছা, আপনি এখন আসুন, এবার থেকে কোন্ ফিগারটা পোস্টিং করতে হবে আর কোন্‌টা পোস্টিং করতে হবে না, সেটা আমার কাছ থেকে জেনে নেবেন—

মল্লিক-মশাই মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে ঘর থেকে চলে গেলেন।

ঠাক্‌মা-মণির দিকে চেয়ে মুক্তিপদ বললে—যে-দিকটা আমি দেখবো না সেই দিকটাতেই গোলমাল হয়ে যাবে। সেই জন্যেই তো তোমাকে বলছি সৌম্য এখন থেকে ফ্যাক্টরিতে বেরুতে আরম্ভ করুক—

ঠাক্‌মা-মণি চুপ করে রইলেন।

মেজবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললে—আচ্ছা, চলি—আবার আর একদিন আসবো—

ঠাক্‌মা-মণি বললেন—এত বাজে কথা বলিস কেন ?

—বাজে কথা ?

—বাজে কথা না তো কী ? আমি কি তোর কোনও কথা কোনও দিন বিশ্বাস করেছি যে এবার তোর কথায় আমি বিশ্বাস করবো ?

মুক্তিপদ বললে—দেখছি আমার ওপর তোমার রাগ এখনও গেল না—

ঠাক্‌মা-মণি বললেন—রাগ যাবে আমি ম'লে।

—তারপর আবার একটু থেমে বললেন—তবে একটা কথা তোকে বলে রাখি মুক্তি, আমার মরার খবর পেলে একবার দেখতে আসিস—আসতে ভুলিস নে—

—বারে, ওকথা বলছ কেন ?

ঠাক্‌মা-মণি বললেন—কেন বলবো না ? তুই যে রাক্ষসীর হাতে পড়েছিস সে কি তোকে ছাড়বে মনে করেছিস ? উঃ, কর্তা যে কী মেয়ের সঙ্গেই তোর বিয়ের সম্বন্ধ করেছিলেন ! ও মেয়ে একদিন আমার হাড় ভাজা করে দিয়েছিল, এখন দেখবি তোরও হাড়-মাস ভাজা ভাজা করে দিয়ে তবে তোর ঘাড় থেকে নামবে—

এসব পুরনো কথা মুক্তিপদর কাছে পুরনো হয়ে গিয়েছিল তাই বললে—আমি এবার চলি মা—

বলে সত্যিই চলতে আরম্ভ করেছিল, কিন্তু যেন কী একটা কথা মনে পড়ে যাওয়াতে আবার সোফাটায় বসে পড়লো। বললে—হ্যাঁ, একটা জরুরী কথা তোমাকে বলতে ভুলে গেছি। অথচ সেই কথাটা বলতেই আসা। তোমার সৌম্যর বিয়ে দেবে ?

ঠাকুমা-মণি অবাক হয়ে গেলেন। বললেন—বিয়ে! হঠাৎ ?

মুক্তিপদ বললে—না, বলছি সৌম্য তো এখন বড় হয়েছে, এই বয়েসেই বিয়ে হওয়াটা তো ভালো। একটা ভালো পাত্রী আছে, তুমি যদি বলো তো তোমাকে পাত্রী দেখাবার ব্যবস্থা করি।

—তুই সৌম্যর বিয়ের ব্যাপারে এত মাথা ঘামাচ্ছিস যে হঠাৎ ? মতলবটা কী ?

—মতলব আবার কী! দাদা নেই, সুতরাং আমাকেই তো সমস্ত দিক দেখতে হবে। আর তোমারও তো একটা সঙ্গী দরকার। বাড়িতে একটা বউ এলে তোমাকেও তো সব সময় সেবা করতে পারবে—

ঠাকুমা-মণি হাসলেন। হাসিটা ব্যঙ্গের। বললেন—সেবা ? খুব হয়েছে খুব হয়েছে—তোর বউ আমার যে সেবা করেছে তার ঠেলাই আজো আমি সামলে উঠতে পারিনি, এখন নাতবউ এসে নতুন করে আমার সেবা করবে এইটেই আমার কপালে বাকি ছিল—অত সেবা আমার সইবে না রে, অত সেবা আমার ফাটা কপালে সইবে না—তুই বরং যেখানে যাচ্ছিস সেখানে যা—

মুক্তিপদ বললে—না মা, আমি আজ এই কথাটা বলতেই তোমার কাছে এসেছিলুম—

—কেন বল্‌তো ? সৌম্যর বিয়ের ব্যাপারে তোর এত আগ্রহ কেন ?

মুক্তিপদ বললে—একটা নতুন পার্টি মিড্‌ল্‌ ইস্টে পাঁচশো কোটি টাকার কাজের কনট্রাক্ট পেয়েছে। আমাদেরই স্বজাত, তারা চ্যাটার্জি, মেয়েও খুব কোয়ালিফায়েড, এম-এ পাশ করেছে এবার—

ঠাকুমা-মণি অবাক হয়ে বললেন—তা পাঁচশো কোটি টাকার কনট্রাক্ট-এর সঙ্গে বিয়ের কী সম্পর্ক রে ?

—না, পাত্রীর বাবার ব্যাপারটাও তো তোমার জানা দরকার। তাদের কি রকম আর্থিক অবস্থা, তা ওতো আমাদের জানতে হবে—আর তা ছাড়া—

—তা ছাড়া ?

—তা ছাড়া এই বিয়েটা হলে তারা আমাদের ফার্মকে কনট্রাক্টের থার্টি পার্সেন্ট অর্ডার আমাদের 'স্যাক্সবী মুখার্জি'কে'ও দেবে বলেছে। পাঁচশো কোটি টাকার থার্টি পার্সেন্ট কত কোটি টাকা হবে সেটা তুমি একবার ভেবে দেখ—

ঠাকুমা-মণি কিছু বলার আগেই মুক্তিপদ বলতে লাগলো—আরো একটা কথা। সেটা হচ্ছে লেবার, আজকাল লেবার ট্রাবলই হচ্ছে আমাদের বেঙ্গলের সবচেয়ে বড় হেডেক্। চ্যাটার্জিদের বড় ছেলেটা আবার ট্রেড-ইউনিয়ন লীডার। ওরা হাতে থাকলে আমাদেরও কত সুবিধে ভেবে দেখ। এক ঢিলে দুই পাখী মারা যাবে। আমাদের ফার্ম সেদিক থেকে সিকিওর হয়ে গেল—

ঠাকুমা-মণি ছেলের মুখের দিকে খানিকক্ষণ ধরে অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন।

মুক্তিপদ বললে—কী হলো ? কী ভাবছো ?

ঠাকুমা-মণি বললেন—আমি ভাবছি তোর এ কি অবনতি হলো রে ? কর্তা

বেঁচে থাকলে যে তোর গালে থাপ্পড় মেরে বাড়ি থেকে তোকে দূর করে তাড়িয়ে দিতেন—

মুক্তিপদ বললে—বাবার আমল আর আমাদের আমল এক নয় মা। তুমি ঠিক বুঝছো না—

—খুব বুঝছি, তুই থাম্, আর বেশি কথা বললে আমিও তোকে থাপ্পড় মেরে বাড়ি থেকে দূর করে দেব, তা বলছি। ভাইপোর বিয়ে হবে, তাতেও টাকা? তুই আমাকে টাকার লোভ দেখাচ্ছিস, এত বড় তোর আস্পর্ধা?

—মা, তুমি বাড়ির ভেতর থাকো, তাই কিছু জানতে পারো না। আমাকে এই নিয়ে পৃথিবীময় ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে, দিনরাত কোটিপতিদের সঙ্গে কনফারেন্স করতে হচ্ছে, মিনিস্টারদের পার্টি দিতে হচ্ছে। আমার যে কী জ্বালা তা তুমি বুঝতে পারবে না—

ঠাকমা-মণি বললেন—তুই মা'র কাছে মামাবাড়ির গল্প বলিস না। আমি তোর মা, এটা মনে রাখিস—

মুক্তিপদ বললে—যাক্‌গে, তুমি যখন শুনতে চাও না তখন আমি আর বলতে চাই না। তবু বলি আজকাল আমার ঘুম হয় না। ঘুমের বড়ি খেলে তবে ঘুম আসে। তাই পাগলের মত হয়ে তোমার কাছে চলে এসেছি—তুমিও যখন তাড়িয়ে দিচ্ছ তখন আর কী করবো—

ঠাকমা-মণি বললেন—টাকার কথা একটু কম ভাব, তাহলেই ঘুম আসবে—

মুক্তিপদ বললে—এ-সব এখন আর হবে না। এখন বড্ড দেরি হয়ে গেছে—

—তাহলে আমার মত ভোর বেলা গঙ্গায় গিয়ে চান কর—

মুক্তিপদ বললে—না মা, এখন একটা মাত্র উপায় আছে তোমার হাতে—

—কী?

—তুমি সৌম্যর বিয়েটা দাও সেই মিস্টার চ্যাটার্জির মেয়ের সঙ্গে, তাহলে দেখবে তখন আর আমাকে ঘুমের পিল্ খেতে হবে না। টাকাও হবে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে লেবার-ট্রাবলও দূর হয়ে যাবে—

ঠাকমা-মণি বললেন—না, তা কিছুতেই হবে না, আমার দ্বারা তা কিছুতেই হবে না। কর্তা তোদের বিয়ে দিয়ে যে-পাপ করে গেছেন, আমি আর সে-ভুল করবো না!

—তা হলে? তাহলে সৌম্যর বিয়ে দেবে না?

ঠাকমা-মণি বললেন—আমি গরীব লোকের বাড়ী থেকে সৌম্যর বউ নিয়ে আসবো—

—সে কী?

—হ্যাঁ, তোর বউ যেমন আমার কাছ থেকে তোকে ছিনিয়ে নিয়েছে, সৌম্যর বউকে আমি তা করতে দেব না। এমন ঘর থেকে এতি বউ আনবো যে বরাবর আমার তাঁবে থাকবে, যে আমার কাছ থেকে সৌম্যকে ছিনিয়ে নিয়ে আলাদা সংসার করবে না—

মুক্তিপদ বললে—কিন্তু গরীব ঘর থেকে বউ আনলে যদি বউমার গরীব বাপ-মা ভাই-বোন তারা সবাই তোমার ঘাড়ে চেপে বসে?

ঠাকমা-মণি বললেন—তা-ও ভালো, তবু তোর বউ-এর মত তারা তো আমার বুকে দাঁড়িয়ে আমার গলা টিপে ধরবে না—

মুক্তিপদ এবারে চুপ করে গেল—

শুধু বললে—তাহলে তুমি আমার পার্টির সঙ্গে সৌম্যর বিয়ে দেবে না?

ঠাকমা-মণি বললেন—না!

—এই তোমার শেষ কথা?

ঠাকমা-মণি বললেন—হ্যাঁ, এই আমার শেষ কথা।

তারপর একটু থেমে ঠাকমা-মণি ঠাণ্ডা গলায় বললেন—আমি সৌম্যর বিয়ে ঠিক করে ফেলেছি—

মুক্তিপদ যেন আকাশ থেকে পড়লো। বললে—সৌম্যর বিয়ে ঠিক করে ফেলেছ? কোথায়? কবে বিয়ে হচ্ছে?

ঠাকমা-মণি বললেন—আমি মেয়ে দেখে একেবারে পছন্দ করে ফেলেছি।

—পাত্রীর বাবা কী করে?

ঠাকমা-মণি বললেন—পাত্রীর বাপ নেই, বিধবা মা আছে—

তাদের সংসার চলে কী করে?

ঠাকমা-মণি বললেন—তারা মা মেয়ে দেওরের গলগ্রহ হয়ে আছে। দেওর রেলে কেরানীর চাকরি করে—

মুক্তিপদ মুখে চোখে বিরক্তি-ঘৃণা-তাচ্ছিল্যের বলিরেখা ফুটে উঠলো। বললে—সে কী, আমাদের বংশের নাম ডোবাবে তুমি? আমার অফিসের অফিসাররা কী বলবে? তাদের আমি কী করে মুখ দেখাবো? তার চেয়ে আমাকে বললে আমাদের কোম্পানীরও কত অফিসারের মেয়ে ছিল, তাদের সঙ্গে আমি সৌম্যর বিয়ের সম্বন্ধ করতে পারতুম, তাদের কারোর মেয়ের সঙ্গে সৌম্যর বিয়ে দিলে তারা ধন্য হয়ে যেত। সে-বিয়েতে তুমি অনেক যৌতুক পেতে। কিছু ব্ল্যাক টাকা পেয়ে যেতে—

ঠাকমা-মণি চীৎকার করে উঠলেন। আসলে সেটা যেন চীৎকার নয়, মুক্তিপদর মনে হলো ঠাকমা-মণি চীৎকার করলেন না, যেন বিকট একটা আর্তনাদ করে উঠলেন। বললেন—থাম তুই, থাম—

মুক্তিপদ মুখার্জি, স্যাক্সবী মুখার্জি এ্যান্ড কোম্পানী ইণ্ডিয়া লিমিটেডের ম্যানেজিং ডাইরেক্টার, যেন থতমত খেয়ে গেল, যেন সে আর্তনাদ শুনে ভয় পেয়ে গেল। ভয় পেয়ে থর থর করে কাঁপতে লাগলো।

ঠাকমা-মণি আবার চড়া গলায় বলে উঠলেন—থাম তুই, থাম—

তারপর বললেন—লেখাপড়া শিখিয়ে ভেবেছিলুম তুই মানুষ হয়েছিস, এখন দেখছি তুই একটা গাধা হয়েছিস, একটা আস্ত গাধা—যা, আমার বাড়ি থেকে দূর হয়ে যা, আমার মুখের সামনে থেকে দূর হ'—আমি তোর মুখও দেখতে চাই না। বেরো, বেরো আমার সামনে থেকে—

মুক্তিপদ আর সেখানে দাঁড়াতে পারলে না। স্যাক্সবী মুখার্জি এ্যান্ড কোম্পানী ইণ্ডিয়া লিমিটেডের ম্যানেজিং ডাইরেক্টার এম. পি. মুখার্জি সেখান থেকে সোজা বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে তর তর করে নেমে একেবারে একতলায় নিজের গাড়ির মধ্যে ঢুকে আত্মরক্ষা করবার তাগিদে বলে উঠলো—অফিস—

ড্রাইভার গাড়ির ইঞ্জিনে স্টার্ট দিতেই আমেরিকার তৈরি গাড়িটা ঊর্ধ্বশ্বাসে যেন অনেক দূরের উদ্দেশ্যে পালিয়ে বাঁচলো। গিরিধারী যে সাহেবকে একটা লম্বা স্যালুট দিলে তা যেন তার সাহের দেখতেই পেলে না। অপমানে লজ্জায় ঘৃণায় তার সাহেব যে একেবারে মর্মাহত বিধ্বস্ত তা বিহারের ছাপরা কি আরা জেলার তুচ্ছ একটা গ্রামের গিরিধারী সিং বুঝতেও পারলে না।

মল্লিক-মশাই হিসেবের খাতা-পত্র নিয়ে আসতেই ঠাকুর এসে দাঁড়ালো। বললে—আপনি এসে গেছেন? চলুন, খেয়ে নেবেন চলুন—

মল্লিক-মশাই বললেন—কিন্তু সন্দীপবাবু এখনও এল না কেন? এত দেরি তো হবার কথা নয়। এত দেরি কেন হচ্ছে তার?

ঠাকুর বললে—সন্দীপবাবু তো এসে গেছেন, এখন তিনি খাচ্ছেন—

—তাই নাকি? কই?

বলে তিনি ঠাকুরের সঙ্গে-সঙ্গে রান্না বাড়ির দিকে গেলেন? সন্দীপ তখনও খাচ্ছে। মল্লিক-মশাই নিজের জায়গায় বসে জিজ্ঞেস করলেন—তুমি কখন এলে? আমি তোমার জন্যে বসে-বসে অনেকক্ষণই অপেক্ষা করলুম, শেষে মেজবাবু অনেক-দিন পরে এ-বাড়িতে এসেছিলেন। তাঁর ডাকে আমি ওপরে গিয়েছিলুম, এই এখন আসছি, তা তোমার বাড়ি ফিরতে এত দেরি হলো কেন?

সন্দীপ বললে—যে বাসটাতে আমি যাচ্ছিলুম সে বাসটা একটা মানুষকে চাপা দিয়েছিল বলে সবাই আমাদের নামিয়ে দিলে—

—কী সব্বোনাশ! তারপরে?

—তারপরে অন্য বাসে উঠতে আরো একঘণ্টা দেরি হয়ে গেল।

মল্লিক-মশাই খেতে-খেতে বললেন -তা শেষ পর্যন্ত মনসাতলা লেনের বাড়িতে যেতে পেরেছিলে তো?

সন্দীপের খাওয়া তখন হয়ে গিয়েছিল। বললে—হ্যাঁ—

—তপেশ গাঙ্গুলী মশাই-এর সঙ্গে দেখা হয়েছিল?

সন্দীপ বললে—না—

—সে কী? দেখা হয়নি? তাহলে টাকাটা ফেরত নিয়ে এসেছ?

—না। দিয়েছি। তপেশ গাঙ্গুলী মশাই-এর আজকে মাইনের তারিখ, তাই তিনি অফিসে চলে গিয়েছিলেন। টাকাটা বিশাখার মা'র কাছে দিয়ে এসেছি—

—রসিদ এনেছ?

—হ্যাঁ। আমার জামার পকেটে আছে—

—আচ্ছা যাও, তুমি আঁচিয়ে নাও গে, আমি খেয়ে উঠে ঘরে যাচ্ছি।

সন্দীপ কলঘরে গিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে চলে গেল। দুর্ভাবনা হলো তার।

মল্লিক-কাকা যদি সমস্ত কথা জিজ্ঞেস করেন তো তার কী জবাব দেবে সে ? বলতে গেলে তো অনেক কথাই বলতে হয়। মনসাতলা লেনের সাত নম্বর বাড়ির খিড়কির দরজায় দাঁড়িয়ে বিশাখা যে-সব কথা তাকে বলেছিল তাও তো বলতে হয়। বিশাখাকে যে মাছ-মাংস কিছুই খেতে দেওয়া হয় না, ফল দুধ, দই, ঘি তা'ও খেতে দেওয়া হয় না, সে-সব কথাও তো বলেছিল বিশাখা। অথচ বিজলীকে সবই খেতে দেওয়া হয়। যেদিন বাড়িতে সকলের জন্যে রুটি হয় সেদিন বিজলীর জন্যে পরোটা হয় আর তারই পাশে বসে বিশাখা খায় শুখনো রুটি। দুজনের জন্যে দু'রকম ব্যবস্থা। অথচ ঠাকমা-মণি যে টাকা দেন তা তো একলা বিশাখার জন্যেই ! বিজলী বা অন্য কারোর জন্যে নয়। বিশাখা একদিন এ-বাড়ির বউ হয়ে আসবে, বিশাখা একদিন এ-বাড়ির গৃহিণী হবে, তাই বিশাখার স্বাস্থ্য, বিশাখার লেখা-পড়া বিশাখার চাল-চলন সব কিছুর আয়োজনের জন্যে যেন টাকার অভাব না হয়, এইটেই ছিল ঠাকমা-মণির এত টাকা দেওয়ার উদ্দেশ্য। যদি তা না হয় তাহলে টাকা দেওয়ার লাভ কী ?

খাওয়া-দাওয়া সেরে মল্লিক-মশাই ঘরে এলেন। মেজবাবু বাড়িতে এসে ছিলেন বলে খাওয়া-দাওয়া সারতে আজ অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। এসেই বললেন—এবার বলো, তারা কী বললে ? বউমার সঙ্গে দেখা হলো ?

সন্দীপ বললে—হ্যাঁ—

—কিছু কথা হলো ?

সন্দীপ বুঝতে পারলে না কী বললে ভালো হবে। সত্যি কথাও তো অনেক সময়ে অপ্রিয় লাগে অনেক মানুষের ! অপ্রিয় সত্যি বলা কি ভালো ? তাতে যদি মল্লিক-কাকা রেগে যান ? তাতে যদি ঠাকমা-মণি অসন্তুষ্ট হন ? তখন কি তার এই চাকরি থাকবে ? চাকরি চলে গেলে তার লেখা-পড়া কী করে চলবে ? কোথা থেকে সে টাকা পাবে ? আর চাকরি চলে গেলে সে এ-বাড়িতে কি থাকতে পাবে ? তখন তো তাকে বাড়ি ভাড়া করতে হবে। বাড়ি ভাড়া করতে গেলে তো টাকাও লাগবে অনেক। সে-টাকা তার কোথা থেকে আসবে ? গোপালের ঠিকানাটা যদি সে জানতো তাহলে তার কাছে গিয়েই জিজ্ঞেস করে আসতো এত টাকা তার কোথা থেকে আসে। লেখা-পড়া না শিখেও যদি কলকাতায় টাকা উপায় করা যায় তো অত ছেলে তাদের কলেজে পড়ছে কেন ?

মল্লিক-মশাই জিজ্ঞেস করলেন—কী হলো, চুপ করে রয়েছ যে ? কী ভাবছো ?

সন্দীপ বললে—না, কিছু ভাবছি না—

—তাহলে কথার জবাব দিচ্ছ না কেন ? ঠাকমা-মণি আমাকে ডেকে বলে দিয়েছেন তুমি এলে যেন জিজ্ঞেস করি বউমার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে কি না, বউমার সঙ্গে তোমার কিছু কথা হয়েছে কি না, বউমা মাছ-মাংস, দুধ, ফল, দই ছানা খাচ্ছে কি না। বলে দিয়েছেন ঠাকমা-মণির কাছে তোমাকে নিয়ে যেতে। তিনি সব কথা তোমাকে জিজ্ঞেস করবেন—

সন্দীপের খুব ভয় হতে লাগলো। ঠিক এই সব প্রশ্নই যদি ঠাকমা-মণি করেন ? তখন সন্দীপ কী জবাব দেবে তার ?

হঠাৎ ফুল্লরা ঘরে এল। বললে—সরকারমশাই, ঠাকমা-মণি আপনাকে ডেকে

পাঠিয়েছেন—

মল্লিক-মশাই বললেন—ওই শোন, ঠাকমা-মণি ডেকে পাঠিয়েছেন—চলো-চলো, বেশি দেরি কোর না—তোমার জন্যেই উনি বসে আছেন। সারা দিনটা ও'নার খুব ঝঞ্ঝাটের মধ্যে কেটেছে। মেজবাবুর সঙ্গে ঠাকমা-মণির খুব কথা কাটাকাটি হয়েছে সকালে। মেজাজটাও তাই খুব খারাপ হয়ে আছে তাঁর। তাঁর সব কথার ঠিক-ঠাক জবাব দেবে। বুঝলে? যেন বেফাঁস কিছু বোল না--

তারপর জামাটা আবার গায়ে দিয়ে দিলেন। ঘরের দরজায় চাবি দিয়ে বললেন—চলো—

বলে সামনের বারান্দার দিকে পা বাড়ালেন। সন্দীপও পেছন-পেছন চলতে লাগলো। তার মনে হলো সে যেন ফাঁসির আসামী। ফাঁসির আসামী যেমন করে হাড়ি-কাঠের দিকে এগিয়ে যায় সন্দীপও তেমনি সামনের দিকে এগিয়ে চললো।

সন্দীপের এখনও মনে হয় বোধহয় সে নিজে একজন পাপী। পাপই তো সে করেছিল। পাপ না করলে কি এমন হয়? মানুষের চোখের আড়ালে পাপ না করলেই কি তা পাপ নয়? আমরা কেবল মানুষের বাইরেটা দেখেই মানুষকে বিচার করি। কিন্তু ড্রয়িং-রুমের মানুষ কি সত্যিই মানুষ? অন্দর-মহলের মানুষের সঙ্গে সে কি এক গোত্রের?

সেদিনের পর কত দিন কত মাস কত বছর কেটে গেছে, কত সম্মান, কত অপমান, কত প্রশংসা, কত নিন্দে, কত আশা, কত হতাশা তাকে বার-বার আমন্ত্রণও যেমন করেছে তেমনি আবার আক্রমণও করেছে। কিন্তু তাতে কি তার কোনও মৌলিক পরিবর্তন হয়েছে? যখন তার টাকা ছিল না তখন সে যেমন ছিল তার টাকা হওয়ার পর সে কি অন্য রকম হয়ে গিয়েছে, তখন কি সে অন্য গোত্রের হয়ে গিয়েছে? অন্য সম্প্রদায়ের?

সংসার-যাত্রার দৈনন্দিনতায় পৃথিবীতে মাত্র দুটি জাতেরই অস্তিত্ব স্বীকার করে এসেছে সন্দীপ। সে-দুটির একটি হলো মানুষ আর একটি হলো অমানুষ। মানুষের চেহারা নিয়ে যে মানবেতর জীবের মত ব্যবহার করে তাকেই তো আমরা বলি অমানুষ। তারা আকাশ থেকে পড়ে না, তারা গজায়। তারা মানুষের সমাজ থেকে জন্ম নেয় বলেই তাদের বাইরের চেহারাটা মানুষের মত। সেই সব মানুষ ফরসা জামা-কাপড়, পাট করা কোট-প্যাণ্ট পরে বলে সবাই তাদের ভদ্রলোক বলেই চিহ্নিত করে।

সারা জীবন সন্দীপ মানুষ অমানুষের সঙ্গে মিশে এসেছে কিন্তু কখনও অমানুষকে মানুষ বলে ধারণা করার মত অকাট্য ভুল করেনি।

ওই যেমন গোপাল। গোপাল হাজরা। দেদার খরচ করছে, গাড়ি চড়ছে, ভেবেছে টাকা দিয়ে সে দুনিয়ার পাপ-পুণ্য মান-সম্মান সব কিছু নিজের আয়ত্তে আনবে। তা যদি হতো এই বিডন স্ট্রীটের বারো-বাই-এ নম্বরের মালিক আর স্যাল্লাব মুখার্জি এ্যাণ্ড কোম্পানির ডাইরেক্টর সৌম্য মুখার্জির এ দুর্দশা হলো কেন? সেই গোপাল, অশিক্ষিত বেড়াপোতার পিতৃমাতৃহীন গোপালও যা আর এই কোটিপতি শিক্ষিত সম্বংশের সুসন্তান সৌম্য মুখার্জি—দু'জনে একই গোত্রের,

একই পর্যায়ের, একই সম্প্রদায়ের। সন্দীপের কাছে এদের দু'জনের অস্তিত্ব একই স্তরের একই শ্রেণীর।

নইলে ওই গোপাল আর এই সৌম্য মুখার্জির পরিণতি একই রকম হলো কেন?

এই কেন'র উত্তরও সন্দীপের জানা, কিন্তু সে এখন নয় পরে। তার জন্যে এ কাহিনী ধৈর্য ধরে গোড়া থেকে শুনতে হবে। একেবারে শুরু থেকে।

সেই গোড়া থেকেই, সেই শুরু থেকেই বলি এবার ঃ

সেদিন ঠাকমা-মণির খুবই মানসিক ও শারীরিক উৎপীড়ন গেছে। যেমন ভোরবেলা বাবুঘাটে স্নান করতে যান তেমনি গেছেন সেদিনও। তারপর বাড়িতে এসে জপ-তপ-আহ্নিক করেছেন। তারপর যা নিত্য জলযোগ করেন তা-ই করেছেন। সামান্য একটু ফল, ছানা আর দুধ। তারপর সারা বাড়ির কাজ-কর্মের তদ্বির-তদারক করা। সেই সময়ে তাঁকে শুনতে হয়েছে ঝি-দের অভাব অভিযোগ সুবিধে অসুবিধের কথা। শুনে সব কিছুই যথাযথ বিহিত করেছেন। তারপর ঠিক সময়ে সরকার-মশাই এসেছেন হিসেবের খাতা-পত্র নিয়ে জমা খরচের খতিয়ান শোনাতে। তা-ও চুকেছে একসময়ে। এ-সব নিত্য-নৈমিত্তিক কাজের তালিকার মধ্যে পড়ে। তারপরে রান্নাবাড়ি থেকে তাঁর দুপুরের নিরামিষ খাবার নিয়ে পৌঁছিয়ে দিয়ে গেছে ঠাকুর। তাঁর খাওয়াটা ঠিক খাওয়া নয় নিয়ম রক্ষে করা। কিন্তু সেদিন সেই নিয়ম রক্ষের মধ্যেই এসে পড়েছেন মুক্তিপদ!

তারপর মুক্তিপদের সঙ্গে কথা বলতে-বলতে একবার ডেকেছেন সৌম্যকে, একবার ডেকেছেন সরকার মশাইকে। তারপর উঠেছে সৌম্যর বিয়ের প্রসঙ্গ। কখনও মুক্তিপদ-কে আদর করেছেন, মায়ের মতন স্বাভাবিক স্নেহের অধিকারে কপালে অমৃতাঞ্জন ঘষে দিয়েছেন, কখনও আবার বাড়ির কর্ত্রীর মত তিরস্কার করেছেন, মুক্তিপদকে কড়া-কড়া কথা শুনিয়েছেন। শেষকালে বাড়ি থেকে ছেলেকে অপমান করে তাড়িয়েও দিয়েছেন।

এ-সব ঘটনা বা দুর্ঘটনা ঠাকমা-মণির জীবনে কিছু নতুন নয়। ঠাকমা-মণির কড়া শাসনে সমস্ত সংসারটা বরাবরই উঠেছে আর বসেছে। কিন্তু তিনি বিধবা হওয়ার পর থেকেই সেই শাসনের তাপমান যন্ত্রের পারাটা যেন ক্রমে-ক্রমে আরো উঁচু দিকে গিয়ে শেষ বিন্দুতে ঠেকবার মৃদু লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। তাই সমস্ত বাড়িটা তাঁর দাপটে আরো শশব্যস্ত হয়ে উঠেছে অনেকবার।

কিন্তু এত কাজের মধ্যেও তিনি সৌম্যর কথা ভোলেননি। তাঁর মনে পড়ে গেছে যে সেটা মাসের পয়লা তারিখ। মনসাতলা লেনের বাড়িতে গিয়ে মাসকাবারি টাকা দিয়ে আসতে হবে। সে-টাকাটা কি দেওয়া হয়েছে?

বিন্দু এসেই খবরটা দিলে। সরকার-মশাই এখন ঘরের মধ্যে বসে আছেন, সঙ্গে সেই ছেলেটা।

ঠাকমা-মণি ঢুকেই বললেন—কী হলো, টাকা দিয়ে আসা হয়েছে?

সন্দীপ বললে - হ্যাঁ, দিয়ে এসেছি—

—তুমি দিয়ে এসেছ? বউমার কাকা কী বললে?

—কাকার সঙ্গে দেখা হয়নি। তাঁরও তো আজ অফিসের মাইনের তারিখ, তাই তিনি বাড়িতে ছিলেন না। আমি পৌঁছোবার আগেই তিনি অফিসে চলে

গিয়েছিলেন।

ঠাকুমা-মণি জিজ্ঞেস করলেন—তোমার যেতে দেরি হয়েছিল বুঝি?

—হ্যাঁ—

ঠাকুমা-মণি বললেন—কেন, দেরি হলো কেন?

মল্লিক-মশাই সন্দীপের হয়ে বললেন—ও যে বাসে চড়ে যাচ্ছিল সেই বাসটা একটা লোক চাপা দিয়েছিল, তাই বাস বদলাতে দেরি হয়ে গিয়েছিল

ঠাকুমা-মণি জিজ্ঞেস করলেন—তাহলে টাকাটা কাকে গিয়ে দিলে তুমি?

সন্দীপ বললে—বউমার মা'কে—

—বউমা'র মা কিছু বললে? খুশী হলো?

সন্দীপ বললে—হ্যাঁ, চেহারা দেখে মনে হলো বউমা'র মা খুশী হয়েছেন—

—তারপর? বউমাকে দেখলে?

সন্দীপ কী জবাব দেবে বুঝতে পারলে না। কী বললে তার নিজের চাকরি থাকবে অথচ বিশাখার কোন ক্ষতি হবে না, সেটা সে ভেবে ঠিক করতে পারলে না।

হঠাৎ বলে ফেললে—না—

ঠাকুমা-মণি বললেন—সে কী? তুমি এত দূর থেকে গেলে আর বউমাকে না দেখেই ফিরে এলে? তোমাকে তো আমি বলেই দিয়েছিলুম যে তুমি জিজ্ঞেস করবে আমি মাসে-মাসে যে টাকাগুলো পাঠাই, তা দিয়ে ফল, দুধ, মাছ, মাংস, ঘি ছানা-টানা খাচ্ছে কিনা-

সন্দীপ চুপ করে রইল। কী সে বলবে? কী জবাব সে দেবে?

ঠাকুমা-মণি আবার জিজ্ঞেস করলেন—তোমাকে আমি এ-সব জিজ্ঞেস করতে বলিনি?

সন্দীপ বললে—হ্যাঁ—

—তাহলে সে-কথা জিজ্ঞেস করলে না কেন?

সন্দীপ এবার চুপ করে রইল।

—কী হলো? জবাব দিচ্ছ না কেন?

সন্দীপ বললে—আমি জিজ্ঞেস করিনি—

ঠাকুমা-মণি রেগে গেলেন। বললেন—আরে, এ তো আচ্ছা ছেলে দেখছি! বলছি, কেন জিজ্ঞেস করলে না?

সন্দীপ বললে—জিজ্ঞেস করবার সময় পাইনি—

—সময় পাওনি মানে? একটা কথা জিজ্ঞেস করতে কত সময় লাগে? সন্দীপ তখন ঠাকুমা-মণির জেরার চাপে ভেতরে-ভেতরে ঠক্-ঠক্ করে কাঁপছে। বললে—টাকা নিয়েই বউমা'র মা ভেতরে চলে গেলেন, তাই আমি আর অন্য কথা জিজ্ঞেস করবার সময় পেলাম না—

ঠাকুমা-মণি বললেন—তা তাকে তুমি ডাকলে না কেন? কেন বললে না যে তোমার কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করবার আছে—বললে না কেন, ঠাকুমা-মণি জিজ্ঞেস করতে বলেছেন? বলতে তোমার লজ্জা না ভয়, কী হলো?

সন্দীপ একটু ভেবে বললে—লজ্জা হলো।

ঠাকুমা-মণি বললেন—সরকারমশাই, আপনার দেশের এই ছেলেটি তো বড়

লাজুক দেখছি, এর দ্বারা তো আমার কোনও কাজই হবে না—

মল্লিক-মশাই সন্দীপের কথায় নিজেই যেন লজ্জায় পড়ে গেলেন। সন্দীপকে বললেন—তোমার লজ্জা হলো? কেন? কীসের লজ্জা? লজ্জাটা কীসের? এ তো খুব সাধারণ কথা! এ কথা বলতে তো লজ্জা করবার কোন কারণ নেই—তোমার লজ্জা হলো কেন, বলো?

সন্দীপ কোনও উত্তর দিতে পারলে না। মল্লিক-মশাই আবার জিজ্ঞেস করলেন—কথা বলো, চুপ করে রইলে কেন? বলো কেন লজ্জা হলো?

সে-দিনের কথা ভাবলে এখনও সন্দীপের লজ্জা হয়। সত্যিই তখন সে অত লাজুক ছিল কেন? কেন সে সত্যি কথাটা বলতে এত দ্বিধা করেছিল? সে কি বিশাখার আসল কথাগুলো বলতে ভয় পেয়েছিল? যদি ভয়ই পেয়েছিল তো কীসের ভয়? বিশাখার ক্ষতি হবার ভয়? বিশাখার কিছু ক্ষতি হলে তার কী ক্ষতি? বিশাখার সঙ্গে তার কীসের সম্পর্ক? আর যদি লজ্জাই হয় তো কীসের লজ্জা? বিশাখা তো তাকে তাদের বাড়ির সমস্ত কথা মন খুলে বলেই দিয়েছিল! সে-সব কথা বাইরের লোকের কাছে বলাও তো উচিত নয়। তাহলে বিশাখা তার কাছে কেন তাদের পারিবারিক সাংসারিক হাঁড়ির খবর সমস্ত এক নিঃশ্বাসে অকপটে বলে গেল?

সে-সব কথা বলতে বিশাখা তো এতটুকু লজ্জা পেলে না। সে কি তাহলে ভেবেছিল যে সন্দীপ বিশাখার সমস্ত বলা কথাগুলো ঠাকুমা-মণির কাছে হুবহু বলুক? সমস্ত জিনিসটাই সন্দীপের কাছে যেন কেমন রহস্যময় মনে হয়েছিল। সন্দীপের এই ভয় হয়েছিল যে কাকীমার অত্যাচারের কথাগুলো যদি সন্দীপ ঠাকুমা-মণিকে বলে দেয় তাহলে হয়ত এই বিয়ের সম্বন্ধটা ভেঙ্গে যাবে! সন্দীপ যেন চেয়েছিল ঠাকুমা-মণির নাতির সঙ্গে বিশাখার বিয়েটা হোক।

ঠাকুমা-মণির গলার শব্দে সন্দীপের যেন হুঁশ ফিরে এল। ঠাকুমা-মণি মল্লিক-মশাইকে বলতে লাগলেন—আপনি এক কাজ করুন মল্লিক-মশাই, এই ছেলেটাকে দিয়ে কোনও কাজ হবে না—একবার আপনি নিজে যান বউমার বাড়ি।

তারপর নিজের কথা শুধরে নিয়ে আবার বললেন— না না, একে সঙ্গে করেই নিয়ে যান। এরও তো শেখা দরকার কার সঙ্গে কী রকম করে কথা বলতে হয়। আপনি বউমা আর বউমার মাকে আমার কাছে নিয়ে আসুন গিয়ে। আমি নিজেই তাদের জিজ্ঞেস করে দেখবো আমার পাঠানো টাকাগুলো বউমার পেছনে খরচ হচ্ছে, না ভূতের পেছনে খরচ হচ্ছে—

মল্লিক-মশাই প্রস্তাব শুনে একটু অবাক হয়ে গেলেন। বললেন—বউমা আর বউমা'র মা দুজনকেই নিয়ে আসবো তো?

ঠাকুমা-মণি বললেন—হ্যাঁ

—আজই যাবো?

ঠাকুমা-মণি একটু ভাবলেন। তারপর বললেন—না, আজ বেস্পতিবার। বেস্পতিবারের বারবেলা, আজকে গিয়ে কাজ নেই—

—তাহলে কাল যাবো?

ঠাকুমা-মণি আবার একটু ভেবে নিয়ে বললেন—না, কাল আবার আমার

সৌম্য অফিসে যাবে। এখুনি মেজবাবু এসে সৌম্যকে কাল থেকে অফিসে যেতে বলে গেলেন আমি সেই নিয়েই সকালবেলা ব্যস্ত থাকবো। আর পরশু তো শনিবার। শনিবারটা দিন ভালো নয়। আপনি সোমবারে যান। ড্রাইভারকে আগে বলে রাখবেন। সে আপনাদের দু'জনকে নিয়ে যাবে, আবার ওদের মা আর মেয়েকে নিয়ে আসবে। আর এখানেই ওরা খাবে। আর তারপর খাওয়া-দাওয়ার পর সে আবার ওদের পৌঁছিয়ে দিয়ে আসবে—

সব বুঝে নিলেন মল্লিক-মশাই। বললেন—তাহলে আপনি যা বললেন তাই-ই করবো—বলে মল্লিক-মশাই উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। পেছন পেছন সন্দীপও আবার নিচেয় নেমে এল।

আগে থেকেই সব ব্যবস্থা ঠিক ছিল। ঠিক ন'টার সময়ে স্যাক্সবি মুখার্জি কোম্পানির গাড়ি বারো-বাই-এ বিডন স্ট্রীটের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালো। ড্রাইভারের ইউনিফর্মের ওপর লাল সিল্কের সুতোয় এমব্রয়ডারিতে মনোগ্রাম করা দুটো অক্ষর এস্ আর এম্। মানে স্যাক্সবি মুখার্জি এ্যান্ড কোম্পানি।

ঠাকমা-মণি আগে থেকেই নাতিকে বলে রেখেছিলেন। কিন্তু সকালবেলা গঙ্গা থেকে স্নান করে এসে জপ-তপ-আহ্নিক সেরে যখন নাতির ঘরে গেলেন তখন দেখলেন ভেতর থেকে দরজা বন্ধ। ঘড়িতে তখন বেলা সাতটা। সেই রাত ন'টার সময়ে খেয়ে-দেয়ে শুয়েছে আর এখন সকাল সাতটা—এখনও পর্যন্ত কোনও মানুষ ঘুমোতে পারে।

ঠাকমা-মণি জোরে জোরে দরজা ঠেলতে লাগলেন। বললেন—ওরে সৌম্য, ওঠরে-ওঠ—অনেক দরজা ঠেলাঠেলির পর সৌম্য দরজা খুললো।

ঠাকমা-মণি বললেন—কী রে, আর কত ঘুমোবি? তোকে আজ অফিসে যেতে হবে, মনে নেই? সেই কাল রাত্তির ন'টার সময়ে ঘুমোতে গেছিস্ আর এখন উঠলি? ক'টা বেজেছে জানিস?

সৌম্য কী ভাবলে কে জানে! কিন্তু ঠাকমা-মণির মুখের ওপর কিছু বললে না।

ঠাকমা-মণি বিন্দুকে বললেন—বিন্দু, সুধাকে বল্ রান্নাবাড়িতে খবর দিতে খোকাবাবু আজ সকাল সকাল খাবে। সে খেয়েদেয়ে আজ ন'টার সময় অফিসে যাবে—

নাতি কখন খাবে, কখন অফিসে যাবে, সবই দেখতে হবে ঠাকমা-মণিকে। আজ যদি বড় বউমা থাকতো, আজ যদি বড় খোকা থাকতো, তাহলে আর এই বুড়ো

বয়েসে ঠাকমা-মণিকে তা নিয়ে মাথা ঘামাতে হতো না। কপালের দুর্ভোগ, তাই এ-বয়েসেও তাঁকে এই সব কাজ এখনও করতে হচ্ছে। আর জন্মে তিনি বোধহয় অনেক পাপ করেছিলেন, তাই এখন তাঁর এই শাস্তি।

শুধু ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েই কাজ শেষ হয় না। তারপর থেকে কেবল জিজ্ঞেস করেন খোকা চান করেছে কি না, খোকা খেতে গেল কি না, কিংবা খাওয়া শেষ হলো কি না। আর শুধু খেয়ে উঠলেই হবে না, অফিসে বেরোল কিনা তাও বিন্দুকে জেনে নিতে হবে। জেনে বলতে হবে ঠাকমা-মণিকে।

সুধা মনে মনে গজ-গজ করে। মনে মনে নিজের ভাগ্যকে অভিশাপ দেয়। কিন্তু সে সব জানে। সে জানে কত রাত্রে ঠাকমা-মণির নাতি খোকাবাবু বাড়ি ফেরে। তখন সে কী-রকম করে টলতে টলতে বাড়িতে ঢোকে, গিরিধারী তাকে কেমন করে দুহাতে ধরে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে বিছানায় শুইয়ে দেয়। সবই সুধার জানা। কিন্তু মুখে কিছু বলার হুকুম নেই তার। তাই মাঝে মাঝে দুঃখ করে শুধু বিন্দুকে বলে—ওলো সবই জানি, সবই শুনি, কিন্তু সেই যে কথায় বলে—চোখে দেখে কানা হও, কানে শুনে কালা হও, আমারও হয়েছে তাই—

বিন্দু বলে—তোর অত কথায় কাজ কি রে মাগী? কাজ করবি মাইনে নিবি, আর চুপ করে থাকবি। দেখছি আদা শুকনো হলেও ঝাল যায় না—তোর হয়েছে তাই—

কিন্তু ঠাকমা-মণির হুকুম তামিল করতে করতেই সব লোক এমন হয়রান হয়ে যায় যে কারো ঝগড়া করবার ফুরসত্ থাকে না। হাতে যদি কিছু না থাকে তো ঘরগুলো আরও একবার মোছ, জানলা দরজার ধুলোগুলো আরও একবার ঝাড়ো। ঘরদোর ঝক-ঝকে তক্‌তকে না হলেই ঠাকমা-মণি রেগে একেবারে লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়ে বসবেন। এমন চিৎকার গালাগালি শুরু করবেন যাতে সমস্ত বাড়িটা গম্‌গম্ করে উঠবে।

স্যাক্সবি মুখার্জি কোম্পানির অফিসে সেই দিনই সৌম্যর প্রথম পদার্পণ। শুধু অফিসেই নয়, সমস্ত ফ্যাক্টরির লোকই জেনে গেল যে আজ থেকে ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের ভাইপো সৌম্যপদ মুখার্জি নতুন ডিরেক্টর হয়ে এসেছেন, নিজের কাজ বুঝে নিয়েছেন! এর পর থেকে তিনি সকলের কাজ দেখা-শোনা করবেন। তার মানে এবার থেকে তিনি এলেও তাঁকে দেখলে সসম্ভ্রমে সেলাম করতে হবে। একজন আর একজনকে জিজ্ঞেস করলে—কী রকম মেজাজ দেখলি ছোট সায়েবের?

অন্যজন উত্তর দিলে—ভাই ওলাউঠোর নাড়ী, মৌলবীর দাড়ি আর জঙ্গলের গাই, এ তিনকে বিশ্বাস নেই—

—তার মানে?

—তার মানে নিমপাতা ঘি দিয়ে ভাজলেও কি মিষ্টি হয়?

অফিস-ফ্যাক্টরিতে আর ক্যানটিনে ক্যানটিনে এই একই আলোচনা। নতুন সাহেবই আসুক আর পুরোন সাহেবই থাকুক আমাদের কপাল সেই গুয়ের এপিঠ-ওপিঠ—

তবে আশার কথা এই যে এ-সব কথা কখনও কোম্পানির মালিকদের কান পর্যন্ত পেঁছোয় না। কারণ সামনে এসে তো সবাই অন্য কথা বলে। একজন

বলে—স্যার, আমি হচ্ছি এখানকার ডেস্‌প্যাচ সেকশনের বড়বাবু। যদি কোনও ফাইল খুঁজে না পান তো আমাকে ডেকে পাঠাবেন। আমি আজ তিরিশ বছর এখানে কাজ করছি—

সৌম্য সকাল থেকেই এই রকম কথা অনেক লোকের মুখ থেকে শুনলে। কেউ ডেস্‌প্যাচ সেকশনের বড়বাবু, কেউ এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট সেকশনের চিফ-সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্ট, কিংবা কেউ আবার লিগ্যাল ডিভিসনের এ্যাডভাইজার, আবার কেউ ফাইন্যানস্‌ ডিভিসনের চিফ্‌-এক্যাউন্‌টেণ্ট। এমনি আরো অনেক। সকলেরই ওই একই কথা সবাই নতুন ডাইরেক্টরকে কাজে সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দিলে। সবাই এসে নিজের নিজের ফাইল নিয়ে এক এক করে দেখালে। সবাই-ই বলতে চাইলে যে সে একলাই এই অফিসটা চালাচ্ছে। সবাই-ই চলে যাবার সময় তাকে সশ্রদ্ধ উইশ্‌ করে বিদায় নিলে।

এর পরে বেলুডের ফ্যাক্টরি। সে এক বিরাট কর্মযজ্ঞ। ভেতরে এত আওয়াজ যে কানে তালা লেগে যাবার জোগাড়! সৌম্য এ কথাটাও বুঝলে যে তাদের যে-ঐশ্বর্য তার মূলে তার ঠাকুর্দা দেবীপদ মুখার্জি'রই সমস্ত কৃতিত্ব। তিনি সামান্য অবস্থা থেকে কোম্পানিকে এই অবস্থায় উন্নীত করে দিয়েছেন।

মুক্তিপদ তাকে নিয়ে যেখানেই গেলেন সেখানকার সমস্ত কর্মীরা লম্বা করে স্যালিউট্‌ জানালে। যেন সবাই ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির। তারপর তাকে নিজের ঘরে নিয়ে এসে বসলেন।

বললেন—সব দেখলে তো? দেখে তোমার কী মনে হলো?

সৌম্য বললে—ট্রিমেণ্ডাস্‌—

—ওই বাইরে থেকে দেখে তাই-ই মনে হয় বটে। কিন্তু তুমি ব্যালেন্স-শীট দেখলেই ভেতরের আসল অবস্থাটা বুঝতে পারবে। ওটা একদিনে বোঝা যাবে না। অনেক দিন ধরে পড়তে পড়তে তবে কিছু জ্ঞান হবে। আজ তুমি যাদের দেখলে তারা এক-একটা শয়তান। এইটুকু জেনে রাখবে। তারা কেউ তোমার ওয়েল-উইশার নয়। আজকাল লেবার-ট্রাবল যা চলেছে তাতে জানি না আর কতদিন এই ভাবে চালাতে পারা যাবে। কারণ এখানকার গভর্মেন্টই আমাদের এগেন্‌স্টে—। তাদের মতে আমরা হলুম ক্যাপিট্যালিস্টস্‌। তাদের মতে আমরা নাকি ওয়র্কারদের এক্সপ্লয়েট করছি—

এমনি সব আরো অনেক কথা! এটা তার প্রথম দিন, তাই সৌম্য কিছু বুঝলো আর কিছুটা বা বুঝলো না।

কাকা বললেন—এখন তোমার কম বয়েস তাই অতটা বুঝতে পারছো না। কিন্তু আমার কাছ থেকে জেনে নাও যে এই সমস্ত দায়িত্ব একলা কাঁধে নেওয়ার পর থেকে আমি রাত্তিরে ভালো করে ঘুমোতে পারি না। আই অ্যাম নাউ এ্যান্‌ ইন্‌সোম্‌নিয়্যাক। তুমি কল্পনা করতে পারো যে আমাকে এখন ওষুধ খেয়ে ঘুমোতে হয়! সেই জন্যেই আমি তোমাকে নিয়ে এসেছি আমার একটা হেল্‌পিং-হ্যাণ্ড্‌ হবে বলে—

আরো অনেক কথা সেদিন বলেছিলেন মুক্তিপদ মুখার্জি। সে সব কথা পরে আর মনে ছিল না সৌম্য মুখার্জির। কিন্তু যতদিন কোম্পানিতে গিয়েছে ততদিন

অনেকক্ষণ লেগেছে সেই সব কথা বুঝতে। সমস্ত দিন ধরে সব কিছু দেখে এটুকু বোঝা গিয়েছিল যে এই কোম্পানি চালু রাখতে গেলে কাকার সঙ্গে তাকেও অমানুষিক পরিশ্রম করতে হবে। তার বিচক্ষণতা পরিশ্রম আর বৈষয়িক বুদ্ধির ওপরেই নিজের আর পরিবারের সকলের শান্তি আর নিরাপত্তা নির্ভর করবে।

মুক্তিপদ বললেন —এই বিচক্ষণতা পরিশ্রম আর বৈষয়িক বুদ্ধি ছাড়া আরো একটা জিনিস দরকার—

সৌম্য জিজ্ঞেস করলে—সেটা কী?

মুক্তিপদ সৌম্যকে বললেন—সেটা হচ্ছে লোক চিনতে পারা।

—লোক চিনতে পারা মানে?

—তা জানো না? পৃথিবীতে সবচেয়ে কঠিন কাজ হচ্ছে লোক চেনা। সবাই কি লোক চিনতে পারে?

সৌম্য কথাটার মানে ঠিক বুঝতে পারলে না।

মুক্তিপদ বললেন—একদিনে তুমি সব বুঝবে না। আসলে আমরা তো সবাই ভদ্রলোক। কারণ সবাই আমরা কোটপ্যান্ট পরে ঘুরে বেড়াই। কিন্তু তা বলে সবাই কি আমরা ভদ্রলোক? এদের মধ্যে কত লোক ফোর-টুয়েন্টি, কত লোক বিশ্বাসঘাতক, কত লোক ধান্দাবাজ, তার হিসেব রাখা খুব কঠিন কাজ। আমি জীবনে অনেক লোক দেখেছি যারা রামকৃষ্ণ-মিশনে লাখ-লাখ টাকা চ্যারিটি করে। আসলে খোঁজ নিয়ে দেখেছি তারা অনেকেই ব্ল্যাক-মার্কেটিয়ার। আবার এমন লোক দেখেছি যারা জীবনে কখনও মিথ্যে কথা বলেনি কিন্তু খোঁজ নিয়ে দেখেছি তারা নাইট-ক্লাবে গিয়ে রাত কাটায়। আবার এমন লোকও দেখেছি যারা সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ছবির সামনে আধঘণ্টা ধরে জপ করে তবে দিনের কাজ শুরু করে, কিন্তু অফিসে দু'হাতে ঘুষ নেয়···

বিকেলে চা খেতে খেতেই কথা হচ্ছিল।

সৌম্য মন দিয়ে কাকার কথাগুলো শুনছিল। এই তার অফিসে প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা। মুক্তিপদ আবার বলতে লাগলেন—'অনেস্টি' বলে একটা ইংরেজি কথা আছে নিশ্চয়ই জানো তুমি। কিন্তু আমরা হচ্ছি বিজনেস ম্যান। আমাদের 'অনেস্টি'র সঙ্গে সাধারণ লোকের 'অনেস্টি'র অনেক তফাৎ। আমাদের 'অনেস্টি'র সঙ্গে ডিক্সনারির-অনেস্টি'র কোন মিল নেই। তুমি যদি ডিক্সনারির অনেস্টি'র মানে মুখস্থ করে ব্যবসা চালাতে যাও তাহলে কিন্তু তোমার ব্যবসা ফেল মারবে—

সৌম্য সব শুনে গেল। কিছু মন্তব্য করলে না—

মুক্তিপদ বলতে লাগলেন—এর কারণটা কী? কারণটা হচ্ছে ডিক্সনারির সঙ্গে আমাদের জীবনের কোনও মিল নেই। জীবন আমাদের অনেক বদলে গেছে কিন্তু ডিক্সনারি বদলায়নি। তাই জীবনের সঙ্গে জীবনের এত ফারাক। ধরো, তোমার বিজনেসের স্বার্থে একটা বিরাট পার্টিকে তোমাকে এন্টারটেইন করতে হবে, তোমাকে খাওয়াতে হবে। তার কাছ থেকে তুমি দেড় কোটি টাকার কাজ আদায় করে নেবে। সেখানে যদি সেই পার্টি তোমায় হুইস্কি অফার করে, তুমি কি তাকে বলবে তুমি হুইস্কি খাও না? তা বললে কিন্তু তোমার কার্যসিদ্ধি হবে না। ইচ্ছে না

থাকলেও তোমাকে মুখ চোখ নাক টিপে হুইস্কি গিলতে হবে। এরই নাম হচ্ছে 'বিজনেস্ অনেস্টি'—

তারপর মুক্তিপদ আবার বলতে লাগলেন—আর একটা কথা। ঘুষ নেওয়া, বা ঘুষ দেওয়া দুটোই তো বেআইনী। বেআইনী নয় ?

—হ্যাঁ—

—কিন্তু তোমার বিজনেসের স্বার্থে তোমায় ঘুষ তো দিতেই হবে। ঘুষ না দিলে এখনকার পৃথিবীতে তুমি অচল। জানো তো, এই সেদিন জাপানের প্রাইম-মিনিস্টার তানাকা'র চার বছরের রিগারাস ইম্প্রিজনমেণ্ট হয়ে গেল, তার সঙ্গে দু'কোটি ডলার ফাইন—জানো ?

সৌম্য বললে—না—

—সে কী ? তুমি খবরের কাগজটাও পড়ো না ? সকাল ন'টা পর্যন্ত পড়ে পড়ে তুমি ঘুমোবে তাহলে আর এ-সব জানবে কী করে ? খবরের কাগজটা পড়বে। ওটাও একটা এডুকেশন। তানাকা'র আগে কি আর কোনও জাপানের প্রাইম-মিনিস্টার ঘুষ নেয়নি ? নিয়েছে, কিন্তু ধরা পড়েনি, এইটেই যা তফাৎ। ঘুষ এমন ভাবে নিতে হবে আর এমন ভাবে দিতে হবে যাতে ধরা না পড়ো। এখন সারা পৃথিবীর প্রত্যেকটা অফিসিয়াল ঘুষ নেয়। ঘুষ না নিলে কোনও কাজ হাসিল হবে না—এইটে জেনে রাখো—

হঠাৎ মুক্তিপদর কেমন যেন একটা সন্দেহ হলো। জিজ্ঞেস করলেন—এ-সব কথা তোমার শুনতে ভালো লাগছে তো ? ঠিক বলো—

সৌম্যর এ-সব শুনতে ভালো লাগছিল না। তবু বললে—হ্যাঁ, ভালো লাগছে—

মুক্তিপদ বললেন—না থাক, আজকে এ-সব কথা থাক. পরে তুমি কাজ করতে করতে নিজেই সব বুঝতে পারবে—কিন্তু আর একটা কথা বলি, একটা কাজের কথা—

সৌম্য মনোযোগ দিয়ে শুনতে লাগলো।

মুক্তিপদ বললেন—তোমার বিয়ের কথা। দেখ, বিয়েটাও আজকাল একটা বিজনেস্। তুমি হয়ত কথাটা বিশ্বাস না করতেও পারো। কিন্তু ফ্যাক্ট্ ইজ্ ফ্যাক্ট্। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করছি তোমাকে তো একদিন বিয়ে করতেই হবে, তা কী রকম বিয়ে তুমি করতে চাও ? বিজনেসওয়াইজ-ম্যারেজ না ইমোশন্যাল ম্যারেজ ? তোমায় খুলেই বলি তাহলে—আমাদের একটা পার্টি আছে যার মিডল্ ইস্টে একটা প্রায় পাঁচশো কোটি ডলারের মত অর্ডার সিকিওর করেছে। তাঁর একটা ভালো সুশ্রী মেয়ে আছে। আমি চাই তোমার সঙ্গে মেয়েটির বিয়ে হোক, যাতে আমাদের ফার্ম অন্ততঃ সেই অর্ডারের একটা পোরশন পেয়ে যাবে। তার মানে দেড়শো কোটি ডলারের মত প্রফিট্ হবেই আমাদের। যদি এই সামান্য বিয়েটা করলেই আমাদের দেড়শো কোটি টাকার মত প্রফিট্ হয়, সে-প্রফিটের ভাগ তো তুমিও পাবে! হোয়াট ডু ইউ থিংক ? এ-সম্বন্ধে তুমি কী মনে করো ? প্ল্যানটা কেমন ? তুমি কি এটা অ্যাপ্রুভ করো ?

বলে সৌম্যর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন মুক্তিপদ। খানিকক্ষণ চেয়ে থাকবার

পর বললেন—অলরাইট্। এখনই তোমাকে এর রিপ্লাই দিতে হবে না। তুমি একটু ভাবো। তুমি তো এখন থেকে রোজই অফিসে আসছো। তার মধ্যে ভালো করে ভেবে একটা উত্তর দিও। তাড়াহুড়ো নেই তেমন—

ততক্ষণে আফ্‌টারনুন টি খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল। মুক্তিপদ উঠে দাঁড়ালেন এবার, তাঁর অনেক মূল্যবান সময় নষ্ট হয়ে গেছে এরই মধ্যে। টাকার শেকল দিয়ে তাঁর জীবনের সব ঘণ্টাগুলো বাঁধা। রাতটাও টাকার কথা ভাবতে পারলে ভালো হতো, কিন্তু আজকাল না ঘুমোলে তাঁর কষ্ট হয়। সকালবেলা মাথাটা ঝিম-ঝিম করে, তাই ইচ্ছে না থাকলেও শোবার আগে তাঁকে ড্রাগ খেতে হয়। জেগে থাকতে পারলে মুক্তিপদ আরো কয়েক কোটি ডলার উপার্জন করতে পারতেন। কিন্তু ডাক্তারের নিষেধ আছে। ডাক্তার বলেছে টাকার চেয়ে জীবন বড়। কিন্তু সত্যিই কি তাই ?
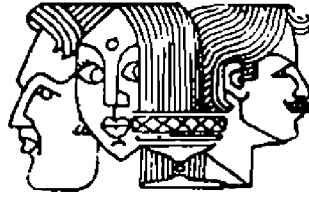
অথচ সবাই তো টাকার পেছনেই দৌড়চ্ছে ! শুধু একলা গোপালের কী দোষ ! ওই স্যাক্সবি মুখার্জি এ্যান্ড কোং ইন্ডিয়া লিমিটেডের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর মুক্তিপদ মুখার্জি'র সঙ্গে বেড়াপোতার গোপালের কি কিছু তফাৎ আছে ? হয় টাকা আর নয় তো ক্ষমতা। আর টাকা মানেই তো ক্ষমতা! যে-লোকটা কলকাতা শহরের বুকে নাইট-ক্লাব চালায় সেও তো টাকার জন্যেই তা চালাচ্ছে! টাকা উপায় করবার জন্যে মুক্তিপদ মুখার্জি যা করছে, নাইট-ক্লাবের মালিকও মেয়েমানুষ আর মদ নিয়ে সেই একই কাজ করছে। বদনাম শুধু নাইট-ক্লাবের মালিকদের। আর বদনাম শুধু তপেশ গাঙ্গুলীবাবুদের মত মানুষদের।

সাত নম্বর মনসাতলা লেনের বাড়িতে সেই দিন থেকেই শুরু হয়েছিল ব্রত-উদ্‌যাপন। আগে গঙ্গার বাবুঘাটে গিয়ে একলা বিশাখাই ব্রত করতো, তার পর থেকে আর অত কষ্ট করতে হয় না যোগমায়াকে। এখন তার ওপর ভার পড়েছে বাড়িতেই ব্রত করানোর। ব্রত একসঙ্গে বিজলী আর বিশাখা করে। ব্রত করতেও কিছু খরচ আছে। যত সামান্য খরচই হোক সেটা তো খরচই বটে। অন্য কোনও খরচের ব্যাপার হলে ছোট-জা'র শরীর খারাপ হতো, গা ম্যাজম্যাজ করতো, মাথা ঝিম-ঝিম করতো, কত রকম বায়নাক্কা হতো। কিন্তু এতে তার স্বার্থ আছে। বিশাখার মত বিজলীর জন্যেও যদি একটা শাঁসালো পাত্র পাওয়া যায় তাহলে সব খরচই তখন সব সার্থক হয়ে উঠবে।

যোগমায়া শেখায় আর বিজলী বিশাখা দুজনেই মা'র কথামত আবৃত্তি করে যায় :

সীতার মত সতী হবো
রামের মত স্বামী পাবো
দশরথের মত শ্বশুর পাবো
কৌশল্যার মত শাশুড়ী পাবো
লক্ষ্মণের মত দেওর পাবো
দুর্গার মত সোহাগী হবো
অন্নপূর্ণার মত রাঁধুনী হবো
কুন্তীর মত মা হবো
গঙ্গার মত শীতল হবো
লক্ষ্মীর মত আদরিণী হবো
শচীর মত ইন্দ্রাণী হবো।
ভক্তি-ভরে পূজি আমি দেবের চরণ,
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করো দেব-দেবীগণ।

সকাল থেকে স্নান করে চাল বাটার পিটুলিতে ভগবতীর পা, হরির পা মহাদেবের পা এঁকে তাঁদের পা পুজো করে দু'জনে। যোগমায়া বলে—এই ব্রত করার পর খাবে। খালি পেটে উপোস করে এই ব্রত করতে হয়—তা জানো তো ?

বিজলী নতুন ব্রত করছে। জিজ্ঞেস করে—এ ব্রত করলে কী হয় বড়মা ?

যোগমায়া কিছু বলবার আগেই বিশাখা গড় গড় করে মুখস্থ বলে যায়—এটা করলে সব কষ্ট দূর হয়ে যায়, বাপের বংশ উজ্জ্বল হয়, ভালো বরে ভালো ঘরে বিয়ে হয়···

ক'দিন ধরে এমনিই চলছিল, হঠাৎ সেদিন সদর দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হতেই বিজলী ভেতর থেকে চেঁচিয়ে উঠলো—কে ?

কে আর, নিশ্চয় বাবা। তপেশ গাঙ্গুলী বাজারে গেছেন, তিনিই হয়ত বাজার থেকে ফিরছেন। দরজা খুলে দিতেই কিন্তু বিজলী অবাক। দেখে সেদিনের সেই বুড়োটা আর তার পেছনে সেই সুন্দর ছেলেটা। সে দৌড়ে ভেতরে গিয়ে বললে—বড়মা, বিশাখার শ্বশুরবাড়ি থেকে সেই তারা এসেছে, সেই বুড়োটা আর সেই সুন্দর ছেলেটা—

রাণীর কানে কথাটা গেছে। কানে যেতেই বললে— কে এসেছে রে ?

বিজলী আবার সেই একই কথাটা বললে—বিশাখার শ্বশুরবাড়ি থেকে বুড়োটা আর সেই সুন্দর ছেলেটা—

রাণীর মুখটা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে উঠলো। বললে—তোর বড়মাকে ডেকে দে। বল্ বাবা বাড়ি নেই, বাজারে গেছে—বড়মাকে দেখা করতে বল্ গে—

যোগমায়া ঘরের কাছে এসে বললে—আমি কী করে যাই দিদি—

রাণী বললে—তোমার কুটুম-বাড়ির লোক এসেছে, তা তুমি যাবে না তো কি আমি যাবো ? আমার দায় পড়েছে যেতে—

যোগমায়া বললে—ঠিক আছে, আমিই যাই—

বলে ময়লা কাপড়টা বদলাবার জন্যে ভেতরে গেল। আর ঠিক সেই সময়েই তপেশ গাঙ্গুলী মশাই বাজারের থলি নিয়ে ঢুকছেন।

দু'জনকে দেখে তপেশ গাঙ্গুলী মশাইয়ের মুখে এক গাল হাসি।

—আরে, আপনারা এসে গেছেন? কী ভাগ্যি আমার। বসুন-বসুন, ভেতরে এসে বসুন। আমি বাজারে গিয়েছিলুম। ওরে, কোথায় রে সব? ও বউদি, চা করো, চা করো। মুখুজ্জে-বাড়ির সব লোকেরা এসে গেছেন —

বলে ভেতরে বাজারের থলেটা ফেলেই বাইরে চলে এসেছেন। বললেন—তা কী খবর বলুন? আপনাদের ঠাকমা-মণি ভালো আছেন তো?

মল্লিক-মশাই বললেন হ্যাঁ, ভগবানের আশীর্বাদে তিনি ভালো আছেন, আজকে একটা বিশেষ কাজে আপনার কাছে এলাম। ঠাকমা-মণি একবার বিশাখা আর তার মা'কে ডেকে পাঠিয়েছেন আমাদের বাড়িতে—

—আপনাদের বাড়িতে? ডেকে পাঠিয়েছেন?

—কেন, হঠাৎ?

মল্লিক-মশাই বললেন—তা কী করে বলবো বলুন? আমরা তো হুকুমের চাকর। ঠাকমা-মণি বললেন অনেক দিন থেকে বউমাকে দেখবার ইচ্ছে হচ্ছে তাঁর। সেই গুরুদেব আসার সময় যা একটু দেখেছিলেন। তাই একবার বউমাকে দেখবার ইচ্ছে হয়েছে তাঁর—

—তা বিশাখাকে না-হয় নিয়ে যান বউদিকে আবার কেন নিয়ে যাওয়া?

মল্লিক-মশাই বললেন—ঠাকমা-মণি বলে দিয়েছেন, বিশাখা ছোট মেয়ে, তাই তার সঙ্গে তার মা'কেও নিয়ে যেতে বলেছেন। আজকে দুপুর বেলা ওঁরা দু'জনেই খাবেন।

তপেশবাবু বললেন—কিন্তু তা'হলে এ-বাড়ির রান্না-বান্নার কাজ রয়েছে যে, সে সব কাজ কে করবে?

মল্লিক-মশাই হঠাৎ এক-কথায় এর উত্তর দিতে পারলেন না শুধু বললেন—দেখুন, আমার ওপর যা হুকুম হয়েছে তাই-ই আপনাকে বললুম। ওঁদের নিয়ে যাওয়ার জন্যে তাই গাড়িও এনেছি সঙ্গে—

তপেশ গাঙ্গুলী বললেন—ঠিক আছে, আমি ভেতরে গিয়ে একবার জিজ্ঞেস করে আসি—

বলে তিনি ভেতরে চলে গেলেন। কিন্তু ভেতরে রাণীর কাছে গিয়ে দেখলেন তার মুখ গম্ভীর, প্রস্তাবটা তার কাছে তুলতেই রাণী বললে—তা আমাকে জিজ্ঞেস করছো কেন? আমি কে? যাকে নিয়ে যেতে ওরা এসেছে, তাকে গিয়ে বলো গে—

ওদিকে রান্নাঘরের দিকে গিয়ে তপেশবাবু বললেন—কই বউদি, তুমি শুনেছ? তোমাকে আর বিশাখাকে নিয়ে যাবার জন্যে ওদের লোক এসেছে, শুনেছ তুমি? ওখানে বিশাখার আর তোমার নেমন্তন্ন, ওখানেই তোমরা খাবে। তোমাদের জন্যে গাড়ি এসেছে—

যোগমায়া শুনতে পেলে কি শুনতে পেলে না তা বোঝা গেল না। তপেশ গাঙ্গুলী আবার বললেন, বউদি, আমি কী বলছি তুমি শুনতে পাচ্ছো না?

যোগমায়া বললে—আমি যাবো না ঠাকুরপো, আমার এখানে অনেক কাজ, আমি গেলে এ-সব কে সামলাবে?

বিশাখাও সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল। সে বলে উঠলো—মা, আমি যাবো, ওরা আমাকে নিয়ে যেতে এসেছে—

যোগমায়া বললে—থাম্, তুই মুখপুড়ী, থাম্—

তারপর দেওরকে উদ্দেশ্য করে বললে তুমি বলে দাও ওদের ঠাকুরপো, আমার যাওয়া হবে না, আমার মেয়েও যাবে না—

রাণী আর থাকতে পারলে না। ঘর থেকে বেরিয়ে এল ঝড়ের বেগে। বললে—তুমি যাবে না কেন বড়দি? তোমার হবু কুটুমের বাড়ি না গিয়ে তুমি আমাদের মুখে চুন কালি লাগাবে, এই বুঝি তোমার মতলোব? আমাদের ওপর যদি তোমার এতই হিংসে তাহলে এই তোমার সামনেই আমি গাল পেতে দিচ্ছি, লাগাও, লাগাও না। তোমার যত ইচ্ছে চুন কালি লাগাও এই গালে, আমি কিছুছুটি বলবো না, লাগাও—

বলে নিজের মুখটা রান্নাঘরের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে ত্রিভঙ্গ মুরারী হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

জিনিসটা তপেশ গাঙ্গুলীরও বোধ করি একটু দৃষ্টিকটু লাগলো, তাই বললে—আঃ, কী যে করো তুমি—

রাণী স্বামীর দিকে চেয়ে ফণা তুলে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। বললে—থামো, তুমি কেমন ধারা পুরুষমানুষ তা আমার ঢের দেখা আছে। কাছা দিয়ে কাপড় পরলেই পুরুষ মানুষ হয় না। বিষের নামে চুঁ-চুঁ, কুলোপানা চক্কোর—

তপেশ গাঙ্গুলীর অন্য যত রকমের বদনামই থাক তার চরম শত্রুও এমন বদনাম দেবে না যে তিনি বড় বদরাগী মানুষ। কিন্তু তিনিও স্ত্রীর কথার উত্তরে বললেন—ঠিক আছে, আমি তাহলে ওদের ওই কথাই বলি গিয়ে যে ওরা যেতে পারবে না—

কিন্তু স্ত্রী তাতেও বাধা দিলে। বললে—যাও যাও, তুমি তাই বলো গে, আমাকে অপমান করে যদি তোমার মান-সম্মান বাড়ে তো তাই করো গে, আমি আর কিছু বলবো না—

তপেশ গাঙ্গুলী বললেন—তা হলে কী করবো তা তো বলবে?

রাণী বললে—তুমি ওদের কী বলবে তাও কি আমাকে বলে দিতে হবে? তাহলে তুমি বেটাছেলে হয়েছিলে কী জন্যে?

তপেশ গাঙ্গুলী বললেন—এ তো আচ্ছা জ্বালা হলো দেখছি! আমি কি বলবো তাও তুমি বলে দেবে না, আবার আমার মর্জিমত কাজও তুমি করতে দেবে না।

—তা তুমি কি কচি খোকা যে আমি তোমাকে কথা বলতে শিখিয়ে দেব? তুমি জানো না কী কথা বললে গেরস্তর মান থাকে?

তপেশ গাঙ্গুলী বললেন—তুমিই বলে দাও না কী বললে গেরস্তর মান থাকে!

রাণী বললে—তাহলে তুমিই বাড়ীর ভেতরে বসে ঘর সংসার সামলাও আর আমি কোট-প্যাণ্ট পরে আপিসে যাই—

তপেশ গাঙ্গুলী কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার আগেই যোগমায়া বললে—না ঠাকুরপো, তুমি ওদের বলে দাও আমরা এখন যেতে পারবো না—

বিশাখা বলে উঠলো—না মা, আমি যাবো—

যোগমায়া মেয়ের মাথায় সজোরে এক ঘুষি মেরে বললে—মর মুখপুড়ী মর তুই—

বিশাখা মার হাতে আঘাত খেয়েই রোয়াক থেকে নিচের উঠোনের ওপর ছিটকে পড়ে গিয়ে চিৎকার করে কেঁদে উঠলো। যোগমায়া তখনও তাকে সমানে গালাগালি দিচ্ছে—কাঁদ, আরো জোরে কাঁদ, কেঁদে কেঁদে পাড়ার লোক জড়ো কর। পাড়ার লোক এসে দেখুক আমার পেটে কী শয়তান জন্মেছে—

রাণী এক নিমেষে উঠোনে নেমে বিশাখাকে দুই হাতে ধরে ফেলেছে। কিন্তু ততক্ষণে বিশাখার কপাল ফেটে টস-টস করে রক্ত ঝরে পড়ছে।

তপেশ গাঙ্গুলী বললেন—কী সব্বোনাশ, এখ্খুনি একটু টিনচার-আইডিন লাগিয়ে দাও ওখানে—শীগ্গির করো—

রাণী বিশাখাকে ঘরের দিকে নিয়ে যেতে যেতে স্বামীকে বললে—দেখলে তো, তোমার নিজের চোখেই তো দেখলে, রাক্ষুসী মায়ের কাণ্ডটা,—আমার কথা তো তোমার বিশ্বাস হয় না—

তারপর বিশাখাকে সান্ত্বনা দিতে দিতে বললে—কাঁদিস নে তুই, থাম্, তোরও যেমন কপাল, অমন রাক্ষুসী মায়ের কাছে কেন যাস তুই? আমার সঙ্গে আয়—

তারপর ঘরের ভেতর থেকেই চেঁচিয়ে বললে—ওগো, এদিকে একটু এসো তো, আমার বাক্স থেকে একটু তুলো বার করে দাও তো—

যোগমায়া তখনও সেই রান্নাঘরের দাওয়ার ওপর পাথরের মত স্থির দাঁড়িয়ে ছিল! টিনচার আইডিনের জ্বালায় বিশাখা তখন আরো জোরে চেঁচাচ্ছে। সে যত চেঁচাচ্ছে যোগমায়া যেন যন্ত্রণায় তত আরো কাঠ হয়ে উঠছে। হঠাৎ রাণী এসে যোগমায়ার সামনে দাঁড়িয়ে বলে উঠলো—হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছো যে বড়? কী ভাবছো? দেওরের মুখে চুন-কালি লাগাতে না পারলে বুঝি তোমার পেটের ভাত হজম হচ্ছে না? যাও, শীগ্গির মুখ হাত পা ধুয়ে নিয়ে পরনের ময়লা থানটা বদলে নাওগে, আর মেয়েটাকেও মাথার চুল-টুল আঁচড়ে একটা ফরসা জামা পরিয়ে দাও।

রাণী আবার বললে—কি হলো? কানে কথা যাচ্ছে না বুঝি? মেয়ের মাথায় রক্তগঙ্গা বইয়ে দিয়েও তোমার হুঁশ হচ্ছে না? তুমি কি মা, না রাক্ষুসী? মেয়েকে যদি মেরে ফেলতেই তোমার এত সাধ তো আমার চোখের সামনে আমার প্রাণ থাকতে আমি তা করতে দেবো না—এই তোমায় আমি বলে রাখলুম। মেয়েকে খুন করতে হয় তো অন্য কোথাও গিয়ে তা করো—এ বাড়িতে কিছুতেই নয়—

যোগমায়া তখনও সেই কথা, বললে—ওদের বাড়িতে আমি যাবো না—

রাণী বললে—আচ্ছা দিদি, বলতে পারো আর কত কষ্ট দেবে তুমি আমাকে? নিজের বাড়ির মধ্যে তুমি যা করো তা করো, কিন্তু কুটুম-বাড়ির চোখের সামনে আমাদের বে-ইজ্জৎ না করলে কি তোমার চলছে না? আমার তো মাত্তোর দুটো হাত, এক হাতে ঢাল, আর এক হাতে তলোয়ার, আমি কোন্ হাতে লড়বো? আমি কি তোমার পায়ে ধরবো বলতে চাও? চাও তো বলো আমি তাই-ই ধরি—

বলে ঝপ্ করে রাণী নিচু হয়ে যোগমায়ার পা জোড়া ছুঁতে যাচ্ছিল—কিন্তু

যোগমায়া তার আগেই রাণীর হাত দুটো ধরে ফেলেছে। বললে—ছিঃ করো কী?

বেশ, তাহলে বলো যাবে?

যোগমায়া বললে—কিন্তু ঠাকুরপোর আফিসের ভাত—সংসারের কত কাজকর্ম—

রাণী বললে—দিদি আমি তো মরিনি এখনও। মরলে তুমি কি একটা খবর পাবে না বলতে চাও?

যোগমায়া বললে—ও-কথা মুখে বলতে নেই দিদি, ছিঃ—
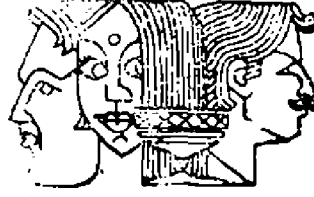
সন্দীপের সব কথা মনে আছে। কিছুই ভুলতে পারে না সে। কে তাকে ভালোবেসেছে, কে তাকে ভর্ৎসনা করেছে, কে তাকে ঠকিয়েছে, কে তাকে সহানুভূতি দেখিয়েছে, কে তাকে যন্ত্রণা দিয়েছে, কে তাকে অবহেলা করেছে, সব মনে আছে তার। এত মনে রাখা কি ভালো? কিন্তু কেন তার মনে থাকে? কেন সে ভুলতে পারে না?

সেদিন ঠাকমা-মণি বিশাখার মাকে যা যা কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন, যোগমায়া দেবী যা যা উত্তর দিয়েছিলেন তাও সন্দীপের মনে আছে। মৃত্যুকে কেউ মনে রাখে না, মেঘকেও কেউ মনে রাখে না, জীবনকেই মনে রাখে, সূর্যকেই মনে রাখে। মৃত্যুকে কেউ মনে রাখে না বলেই জীবন আজো এগিয়ে চলেছে। মেঘকে কেউ মনে রাখে না বলেই আজো সূর্যের চার দিকে পৃথিবী ঘুরে চলেছে। এত মিথ্যে, এত ঘৃণা, এত ভর্ৎসনা, এত যন্ত্রণা, অবহেলা সত্ত্বেও তো সন্দীপ যার শুরু দেখতে পেয়েছিল তার শেষ দেখতে পারছে। মানুষের যে এই দেহ, তার মানে এই নরদেহ, যে দেহটা নিয়ে এত মান, এত অভিমান, এত অহঙ্কার, এত বিবাদ, এত কলহ, এত সমস্যা, সে সব কিছুতো একদিন আগুনে পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যায়, তবু কি মান অভিমান অহঙ্কার বিবাদ কলহ সমস্যা থেমে গেছে?

কিন্তু সেই তখন তো সন্দীপ এত জানতো না, এত বুঝতো না তাই তখন যা কিছু সে দেখেছে তাতেই সে অবাক হয়ে গেছে। অবাক বিস্ময় নিয়েই সে তখন জীবন পরিক্রমা করেছে। জীবন পরিক্রমা করতে একদিন বেড়াপোতা থেকে নদী হয়ে বেরিয়ে আজ এত দিন এত বছর পেরিয়ে সে সমুদ্র হয়ে উঠেছে।

ঠাকমা-মণি জীবনে অনেক যন্ত্রণা সহ্য করে করে ভেবেছিলেন তিনি সব যন্ত্রণার অতীত হয়ে গিয়েছেন। কিন্তু তিনি হয়ত জানতেন না যে সুখের শেষ একদিন থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু যন্ত্রণার কখনও শেষ নেই। জীবনের শেষ দিনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সে মানুষের বোধকে পেছু তাড়া করে চলে।

ঠাকমা-মণি প্রথমেই জিজ্ঞেস করেছিলেন—কপালে তোমার কী হয়েছে বউমা?

যোগমায়া কিছু বলার আগেই বিশাখা বলে উঠেছিল—আমায় মা মেরেছে—

—সে কী? কেন মা তুমি ওকে মেরেছিলে কেন?

যোগমায়া বললে—বড্ড দুষ্টুমি করে যে ও—বড্ড দুষ্টু—

বিশাখার দিকে চেয়ে ঠাকমা-মণি জিজ্ঞেস করলেন—তুমি দুষ্টুমি করেছিলে ?

বিশাখা বলে উঠলো—না আমি দুষ্টুমি করিনি—

যোগমায়া ধমক দিলেন মেয়েকে—তুমি দুষ্টুমি করে আবার এখন বলছো দুষ্টুমি করোনি ? তুমি দুষ্টুমি না করলে আমি কি মিছিমিছি মেরেছি তোমাকে ?

বিশাখা প্রতিবাদ করে উঠলো সঙ্গে সঙ্গে। বললে—বারে, আমি কখন দুষ্টুমি করলুম ? তুমিই তো কাকীমার সঙ্গে ঝগড়া করছিলে !

—কাকীমার সঙ্গে আমি ঝগড়া করছিলুম তো তাতে তোমার কী ?

ঠাকমা-মণি যোগমায়ার দিকে চেয়ে বললেন—তোমার জায়ের সঙ্গে ঝগড়া হয় বুঝি ?

যোগমায়া কিছু বলার আগেই বিশাখা বলে উঠলো—হ্যাঁ, আমার মা'র সঙ্গে কাকীমার রোজ ঝগড়া হয়।

যোগমায়া মেয়েকে হয়ত কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু ঠাকমা-মণি তার আগেই তাকে থামিয়ে দিলেন। বললেন—ও কাঁচ মেয়ে, ওকে কেন বকছো মা তুমি ? ও রকম ঝগড়া সব বাড়িতেই হয়। ননদ-জায়ে, জায়ে-জায়ে ঝগড়া কোন্ বাড়িতে হয় না তাই বলো তো ? আমার বাড়িতেও তো ঝগড়াঝাটি হতো—

যোগমায়া কথাটা শুনে একটু অবাক হয়ে গিয়েছিল।

ঠাকমা-মণি বললেন—তুমি বুঝি আমার কথা শুনে অবাক হয়ে যাচ্ছো মা ?

যোগমায়া বললে—আপনারা কত বড়লোক……

ঠাকমা-মণি বললেন—গরীব বড়লোক নেই মা, ঝগড়ার ব্যাপারে গরীব বড়লোক বলতে কিছু নেই। বড়লোকদের বাড়িতেই তো বেশি ঝগড়াঝাটি। আমার মেজ-বউমার সঙ্গেও আমার অনেক ঝগড়াঝাটি হয়েছে। শেষে বাড়ি করে আলাদা হয়ে যাবার পর এখন বেঁচেছি। আমার হাড়ে বাতাস লেগেছে। তাদের সঙ্গে এখন আমার আর কোনও সম্পর্কই নেই—এই তো আমার অবস্থা—

খানিক থেমে আবার ঠাকমা-মণি বললেন—তা যাক গে বাজে কথা। তোমরা খেয়ে নাও—

খাবার বোধহয় অনেক আগেই তৈরি হয়ে গিয়েছিল। মল্লিক-মশাই তাদের পাশের একটা ঘরে নিয়ে গেলেন। ঠাকমা-মণিও তাদের সামনে গিয়ে বসলেন। বহুদিন পরে বিশাখা এমন খাবার চোখে দেখলে।

খেতে বসেই বিশাখা জিজ্ঞেস করলে—মা, দেখেছ এরা লুচি দিয়েছে—

যোগমায়া বললে—কথা বোল না, চুপ করে খাও—

বিশাখা বললে—আমি কিন্তু অনেক লুচি খাবো—

যোগমায়া ধমক্ দিয়ে উঠলো, বললে—বলছি, কথা বলতে নেই।

কথাটা কানে গেল ঠাকমা-মণির। বললেন—তুমি যত লুচি নেবে তত লুচি দিবে, লজ্জা করে খেও না। আরো লুচি নেবে তুমি ?

বিশাখা বললে—আমি লুচি খেতে খুব ভালোবাসি—

—তা বেশ তো, ঠাকুর, আমার বউমাকে আরো চারখানা লুচি দিয়ে যাও তো—

ঠাকমা-মণির কথা অনুযায়ী আরো লুচি এল। যোগমায়া গলা নিচু করে মেয়েকে বললে—ছিঃ, তুমি অত হ্যাংলা কেন ?

ঠাকুমা-মণি বললেন—তুমি ওকে অত বকছো কেন মা ? ও তো এ-বাড়িরই লোকের মত, পেট ভরে খাক্ না—

বিশাখা বলে উঠলো—আমাদের বাড়িতে রোজ লুচি হয়, মা আমাকে একদিনও খেতে দেয় না। আমাকে মা কেবল রুটি দেয়—

কেন, তোমাকে রুটি দেয় কেন ?

বিশাখা বললে—লুচি খেতে চাইলে মা খালি বলে—ও তোমার খেতে নেই, যত লুচি হয় সব বিজলী খায়—লুচিও দেয় না, মাংসও দেয় না, রাবড়িও দেয় না, সন্দেশ রসগোল্লা কিছুছু দেয় না। ঘি দিয়ে মেখে ভাত খেতে আমার খুব ভালো লাগে, কিন্তু মা আমার ভাতে ঘি দেয় না—

কথাগুলো শুনে ঠাকুমা-মণির মুখটা গম্ভীর হয়ে উঠলো। যোগমায়া'র দিকে চেয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন—কেন মা ? তুমি আমার বউমাকে মাছ-মাংস-ঘি-দুধ রাবড়ি কেন খেতে দাও না ?

বিশাখা বললে—আমি কতবার খেতে চেয়েছি, মা একবারও খেতে দেয় না—

—কেন মা ? তুমি আমার বউমাকে ও-সব খেতে দাও না ? আমি তো মাসে-মাসে টাকা পাঠাই বউমা'র জন্যেই, কেন দাও না খেতে ?

বিশাখা বলে উঠলো—ওসব টাকা দিয়ে কাকীমা গয়না গড়ায় !

—গয়না গড়ায় ? তোমার কাকীমা ? সে কী ?

যোগমায়ার মাথা তখন আরো নিচু হয়ে গিয়েছে। সে যেন তখন মাটির তলায় তলিয়ে আত্মরক্ষা করতে পারলেই বেঁচে যেত, এমনি করুণ তার মুখের ভাব !

ঠাকমা-মণি মল্লিক-মশাইএর দিকে চাইলেন। বললেন—সরকারমশাই, আমি এ-সব কী শুনছি এদের মুখে। আপনি এতদিন ধরে ও-বাড়িতে যাচ্ছেন, এ-সব কথা তো আমার কানে একবারও তোলেন নি ! আমার টাকা কি এতই সস্তা ? আমার টাকা দিয়ে যে ওরা ভূত-ভোজন করাচ্ছে তা তো কই কেউ আমাকে বলে নি ! প্রত্যেক বার আমি আপনাকে বলে দিয়েছিলুম—বউমাকে কেমন দেখলেন জিজ্ঞেস করে এসে আমাকে বলবেন, তা তো আপনি আমাকে জানান নি ! আপনি তো প্রতিবারই আমাকে এসে বলেছেন—হ্যাঁ, বউমা ভালো আছে। তা এই কি ভালো থাকার নমুনা ? এখন এ-সব কী শুনছি ? এসব কথা বউমা আমাকে বলছে কেন ? বউমা না-বললে তো কিছুই আমার কানে আসতো না—

তারপর একটু থেমে সন্দীপের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন—আর তুমি ?

সন্দীপ এতক্ষণ এই ভয়ই করছিল। সে এবার থর-থর করে কাঁপিতে লাগলো।

ঠাকুমা-মণি বললেন—আর তুমি ? তুমিও তো এই নিয়ে দু দুবার গেলে, তুমিও তো কিছু বলো নি আমাকে ! তাহলে তোমাদের কেন পাঠানো বউমাদের বাড়িতে ? তোমরা কি তাহলে ওদের ওখানে হাওয়া খেতে যাও নাকি ? এই খবরগুলো যদি না আনতে পারো তাহলে মণি-অর্ডারে টাকা পাঠালেই পারতুম ! তোমাদের যাতায়াতের ভাড়াও তো আমাকেই গুনতে হয় ! কথার উত্তর দিচ্ছ না কেন ? বলো, কী বলবার আছে তোমার। বলো—

বিশাখা মাঝখান থেকে বলে উঠলো—আমি ওকে বলেছি—

ঠাকুমা-মণি বলে উঠলেন—কী বলেছে ? কাকে বলেছে ?

বিশাখা সন্দীপের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে—ওই ওকে।

—ওকে মানে ? ওই সন্দীপকে ?

বিশাখা বললে—হ্যাঁ—

ঠাকুমা-মণি সন্দীপকে জিজ্ঞেস করলেন—কী ? তোমাকে বলেছে বউমা ?

আগে থেকেই সন্দীপ থর-থর করে কাঁপছিল। এবার সে আরো ভয় পেয়ে গেল। কী জবাব দেবে সে ভেবে না পেয়ে হঠাৎ বলে ফেললে—হ্যাঁ—

ঠাকুমা-মণি এবার রেগে গেলেন। বললেন—সে কী ? তোমাকে বউমা সব বলেছিল আর তুমি আমাকে বলো নি ! এ কী-রকম ছেলে তুমি ?

তারপর মল্লিক-মশাইএর দিকে চেয়ে বললেন—এ আপনি কী রকম লোক দিয়েছেন ! আপনি তো বলেছিলেন ও আপনাদের দেশের ছেলে, খুব সৎ, অভাবী ! আর এই তার কাজের নমুনা—

মল্লিক-মশাই এ-কথার কী জবাব দেবেন বুঝতে পারলেন না, কিন্তু তাকে বিশাখাই বাঁচিয়ে দিলে। বিশাখা বলে উঠলো—না, আমি তো বলিনি। আমি প্রথমে বলেছিলুম আমি ঘি-দুধ-মাংস-মাছ কিছু খাই না, কিন্তু পরে বলেছিলুম—মা আমাকে ঘি-দুধ-মাছ-মাংস সব খেতে দেয়। ওই টাকা নিয়ে আমার কাকীমা গয়না গড়ায় না……

—সে কী ?

ঠাকুমা-মণি যেন দোটানায় পড়ে গেলেন। বললেন—যাক্ গে, আমার অত কথায় দরকার নেই। ও-সব গরীব-গুর্বোর বাড়ির লোক, টাকা পেলে বাজে খরচা তো হবেই। তার চেয়ে এক কাজ করুণ মল্লিক-মশাই—

মল্লিক-মশাই এমনিতেই কিছু বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন। বললেন—কী কাজ করবো বলুন—

ঠাকুমা-মণি বললেন—আমাদের তিন নম্বর রাসেল স্ট্রীটের বাড়িটা তো খালি পড়ে আছে, না ?

মল্লিক-মশাই বললেন—হ্যাঁ। সেই মামলা করে ভাড়াটেদের উঠিয়ে দেবার পর ওটা আর ভাড়া দেওয়া হয়নি। একজন দরোয়ান আছে, সে শুধু পাহারা দেয় ওখানে—

ঠাকুমা-মণি বললেন—ওটাতে আর ভাড়াটে বসাতে হবে না। মেজবাবুকে আপনি বলে দেবেন, আর মুক্তি এলে আমিও তাকে বলে দেব'খন—এর পর থেকে বউমা আর বউমার মা দু'জনে ওখানেই থাকবে। যাতে আরাম করে থাকতে পারে ওরা, তার ব্যবস্থা করে দিন—

মল্লিক-মশাই বললেন—তাহলে ফ্ল্যাটটায় তো একবার কলি ফেরাতে হবে—

—তা তো ফেরাতে হবেই—যা টাকা লাগে তা ক্যাশ থেকে নিন—

মল্লিক-মশাই বললেন—কিন্তু শুধু তো কলি ফেরালেই চলবে না। জানলা-দরজাগুলোতে রংও লাগাতে হবে—

—তা লাগান।

মল্লিক-মশাই আবার বললেন—তা ছাড়া ও'রা শোবে কোথায় ? তার জন্যে

দু'খানা খাটও দরকার। আর আলমারি ড্রেসিং টেবিল, চেয়ার, টেবিল থেকে আরম্ভ করে সংসারের সমস্ত কিছুই লাগবে—

ঠাকুমা-মণি বললেন—যা লাগবে তা তো করতেই হবে। ওরা তো আর দেওরের সংসার থেকে কোনও জিনিসপত্র আনতে পারবে না, তা তারা আনতে দেবেও না। আপনি সমস্ত বাড়িটা সাজিয়ে গুছিয়ে ফেলে তারপরে ওদের নিয়ে এসে ওখানে তুলবেন। বেশি দেরি করবেন না। একমাসের আগেই যেন ওরা সাত নম্বর মনসাতলা লেনের বাড়ি ছেড়ে ওই তিন নম্বর রাসেল স্ট্রীটের বাড়িতে এসে উঠতে পারে।

মল্লিক-মশাই বললেন—যে আজ্ঞে—

ঠাকুমা-মণি আবার বললেন—আর একটা কথা, শুধু তো বাড়ি সাজালেই চলবে না, ঝাঁট-বাট দেওয়া রান্না করার জন্যে তো চাকর-ঝি চাই। সে-সব ব্যবস্থাও করবেন সঙ্গে-সঙ্গে। যেন খুব বিশ্বাসী লোক হয়, চুরি-চামারি না করে, দেখবেন! দেখছি এতদিন মাসে-মাসে মোটা টাকা একেবারে নিছক জলে চলে গেছে—কপালে লোকসান থাকলে কে খণ্ডাবে······

ততক্ষণে বিশাখাদের খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেছে।

ঠাকুমা-মণি মল্লিক-মশাইকে বললেন—যা-যা বললুম সব কথা মনে রাখবেন। যেন ভুলবেন না—এবার এদের গাড়ি করে বাড়িতে পৌঁছিয়ে দিন গিয়ে—যান—

যোগমায়ার তখনও যেন মনের ঘোর কাটেনি। যোগমায়া কী বলবে বুঝতে পারছিল না।

ঠাকুমা-মণি বললেন—এসো মা এসো, এতক্ষণ আমার সরকারকে যা বললুম সব শুনলে তো? এবার থেকে বউমাকে ভালো-ভালো জিনিস খাওয়াবে। মাছ-মাংস-দুধ-দই-ঘি। আর যেন রুটি খাইও না বউমাকে। বউমাকে লুচি করে দেবে—যাও মা, এবার যাও—

যোগমায়ার মুখে তখন কথা আটকে গেছে। তার চোখ দিয়ে তখন ঝর-ঝর করে জল পড়তে শুরু করেছে। বিশাখাকে নিয়ে মল্লিক-মশাইএর পেছন-পেছন সিঁড়ি দিয়ে নিচের দিকে নামতে লাগলো .....
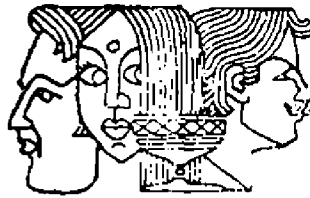
সন্দীপ তখন ছোট। ছোট হলেও খুব ছোট নয়, সে তখন ভালো-মন্দ, গুণ-দোষ, গরীব-বড়লোক, পুণ্য-পাপ সব কিছু বুঝতে শিখেছে। ইস্কুলের অন্য ছেলেরা যখন ফুটবল আর ক্রিকেট নিয়ে মেতে থাকতো, সে তখন হয় একলা একলা কাশীবাবুদের বাড়িতে গিয়ে তাঁদের লাইব্রেরীতে গিয়ে যে-কোনও একটা বই নিয়ে তাতেই মত্ত হয়ে থাকতো। তারপর মা যখন ওদের বাড়ির কাজ-কর্ম সেরে

ভাত-তরকারী নিয়ে বাড়ি আসতো তখন সন্দীপও তার সঙ্গে নিজেদের বাড়িতে চলে আসতো। তখন দু'জনেই একসঙ্গে সেই ভাত-তরকারী খেত।

মা জিজ্ঞেস করতো— কী রে, বাবুদের বাড়িতে অত সব কী পড়িস ? ইস্কুলের পড়ার বই ?

সন্দীপ বলতো—হ্যাঁ -

শুনে মা খুব খুশী হতো। ছেলে লেখাপড়া শিখে চাটুজ্জেবাবুদের মত বড়লোক হবে, ওদের মত ছেলের বাড়ি হবে, ওদের মত গাদা গাদা টাকা রোজগার করবে, ওদের কাশীবাবুর মত উকিল হবে, এর চেয়ে বেশী সুখ আর কী চাই মা'র। শুধু মা'র একটা কামনা এই যে যেন বেঁচে থেকে সেই সুখ, সেই ঐশ্বর্য দেখে যেতে পারে।

মা ছেলের উত্তর শুনে বলতো—হ্যাঁ বাবা, তাই করো, লেখাপড়া করে চাটুজ্জেবাবুদের মত বড়লোক হও।

সন্দীপ সে কথার কোন জবাব দিত না। আসলে সে যে ইস্কুলের বই না পড়ে অন্য আলাদা বই পড়তো তা মা জানতো না।

—আর দেখ বাবা, তুমি ওই ছোঁড়াটার সঙ্গে মিশবে না।

—কোন্ ছেলেটার কথা বলছো ?

—ওই যে, ওই ছোঁড়াটা, হাজরা বুড়োর বখাটে ছোঁড়াটা, গোপাল না কী যেন নাম। ওর সঙ্গে তোমার কীসের এত ভাব ? ও কি তোমায় রাজা করবে ?

মা তো জানতো না যে পৃথিবীতে শুধু মন্দ নেই ভালোও আছে। ভালো-মন্দ গরীব-বড়লোক আছে বলেই পৃথিবী এত সুন্দর এত বিচিত্র। বৈচিত্র্যের মধ্যে যে মানুষ ঐক্য খুঁজে পায় সেই মানুষই তো মহৎ মানুষ। এখানে গোপালও থাকবে, কাশীবাবুও থাকবে, সৌম্যবাবুও থাকবে, মল্লিক-মশাইও থাকবে, তপেশ গাঙ্গুলীও থাকবে। সকলের মধ্যে এক কণাও যদি মনুষ্যত্ব থাকে তবে সেই এক কনা মনুষ্যত্বের দাম দিতে হবে, মর্যাদা দিতে হবে, তবেই তুমি এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকবার অধিকার পাবে।

কাশীবাবু একদিন একখানা বই এগিয়ে দিলেন। বললেন—এই বইটা পড়েছ ?

সন্দীপ চেয়ে দেখলে একটা চটি বই। মলাটের ওপর বইটার নাম লেখা রয়েছে—'ঈশোপনিষদ'।

ভেতরে সংস্কৃত শ্লোক, তার নীচের সংস্কৃত শ্লোকের বাঙলা অনুবাদ। দেখলে একটা জায়গায় লেখা আছে—'নচিকেতা যমকে বলিয়াছিলেন—হে যমরাজ, আপনার বর্ণিত ভোগ্যবস্তুসমূহ কাল পর্যন্ত থাকিবে কিনা তাহা অনিশ্চিত। অধিকন্তু এ সমস্তের ভোগ মনুষ্যের ইন্দ্রিয় সকলের তেজ নষ্ট করে। জীবনও ক্ষণস্থায়ী। অতএব অশ্ব, রথ, নৃত্যগীতাদি যাহা দিতে চাহিতেছেন তাহা আপনারই থাকুক।'

তখন কথাগুলোর মানে বোঝেনি সন্দীপ। কিন্তু এখন এই বয়সে এসে তার মনে হচ্ছে ওই কথাগুলোর মত সাঁচা কথা আর বোধহয় কোথাও লেখা হয়নি, কখনও লেখা হবেও না। এখানে না এলে এই বিডন স্ট্রীটের বাড়িতে না থাকলে কি সে কথাগুলোর মানে এমন প্রত্যক্ষভাবে বুঝতে পারতো ?

আশ্চর্য যে সেদিনই ঠাকমা-মণির হুকুমমত বিশাখাদের তিন নম্বর রাসেল

স্ট্রীটের বাড়িতে উঠিয়ে নিয়ে আসার বন্দোবস্ত পাকা হয়ে গেল। জন্ম থেকে যে-বাড়িতে বিশাখা বড় হয়েছে, সেই সাত নম্বর মনসাতলা থেকে শেকড় তুলে নতুন বাড়িতে নিয়ে আসা কি সহজ কথা ? আর শুধু তো শেকড় নয়, সেই শেকড় থেকে প্রাণরসও তো জড়িয়ে ছিল ওই পরিবেশের সঙ্গে। যে মাটির ওপর এতদিন মা মেয়ে মানুষ হয়েছিল সেই মাটিও তো এর পর থেকে পায়ের তলা থেকে সরে যাবে।

কিন্তু তার চাইতে আরো বড় বড় কথা আছে। সেগুলোর কথাও ভাবা দরকার। প্রতি মাসে বিশাখার খাওয়া পরা, শিক্ষা-দীক্ষার জন্যে যেটা আসে সেটা তখন থেকে অন্যের ভোগে আর আসবে না। তখন পুরো টাকাটাই হাতে পেয়ে যাবে যোগমায়া।

জিনিসটা ভাবতে ভালোই। কিন্তু যখন প্রথম কথাটা উঠবে, তখন ?

ঝড় আসবার আগে কি কেউ কল্পনা করতে পারে ঝড়ের ঝাপটায় কার কতটা সর্বনাশ হবে ?

সন্দীপের এখনও মনে আছে সে সব দিনের কথাগুলো। নতুন জায়গা তিন নম্বর রাসেল স্ট্রীটের বাড়িতে কিছুই ছিল না। না ছিল একটা খাট আর না ছিল একটা বিছানা। সবই তো বাজার থেকে নতুন কিনতে হবে। তাই কেনাও হয়েছিল।

বাড়িটা কর্তা কিনে রেখে গিয়েছিলেন। পুরনো বাড়ি বটে, কিন্তু হলে কী হবে, খুবই মজবুত। তখনকার দিনে বাজার দর হিসেবে সস্তাই পড়েছিল! তিন তলা বাড়ি। শুধু একতলায় কিছু ভাড়াটে থাকতো। তাও বাড়ির একতলার ঘরে নয়, চারদিকের খালি জমিতে। একটা চীনেম্যানদের চুল-ছাঁটাই-এর দোকানও ছিল। তারা কতকাল আগে থেকে ওখানে ছিল তাও কারোর হিসেব ছিল না। বাড়িটা কেনবার পর একটা শুভ তারিখ দেখে গৃহপ্রবেশ পর্যন্ত সেরে রেখেছিলেন ঠাকমা-মণি। কর্তার ইচ্ছে ছিল ওখানে কোনও ব্যবসা-ট্যবসা করবেন। ব্যবসার পক্ষে জায়গাটা ভালো। ওপরের ঘরে থাকবে ম্যানেজারের কোয়ার্টার, আর দোতলায় থাকবে অফিস।

কিন্তু সে সব শেষ পর্যন্ত আর কার্যকরী হয়ে ওঠেনি। কারণ তার পরেই তিনি দেহ রেখেছিলেন। আর তার পর থেকেই ওটা তালা চাবি বন্ধ পড়েছিল। একটার পর একটা দুর্বিপাকে পড়ে ঠাকমা-মণির ও বাড়ির কথা মনে ছিল না।

অপ্রিয় কাজটার ভার পড়েছিল সন্দীপেরই ওপর।

কাঁদতে কাঁদতে যোগমায়া মনসাতলা লেন থেকে যখন বেরিয়ে এসেছিলো তখনও সে জানতো না যে সে স্বর্গে যাচ্ছে না নরকে যাচ্ছে। শুধু যোগমায়া একলাই নয়, কেউই জানতে পারে না সেকথা। অথচ সব মানুষই তো বাড়ি বদলায়। রোজ রোজ বাড়ি না বদলালেও, জীবনে কোনও না কোনও সময়ে সব মানুষই বাড়ি বদলায়। মেয়েরাই তো বেশি বাড়ি বদল করে। বাপের বাড়ি থেকে শ্বশুরবাড়ি। চিরকালের চেনা একটা বাড়িকে কেমন অনায়াসে পেছনে ফেলে রেখে শ্বশুরবাড়িতে চলে যায়। আর তার পরে সেই স্বামীর বাড়িটাই একদিন কেমন চিরকালের চেনা বাড়িতে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

তখন বেশ সাজানো হয়েছে বাড়িটাকে। তখন আর বোঝবার উপায় নেই যে এতদিন সেটা একটা ভূতের বাড়ি ছিল।

যোগমায়ার খুব পছন্দ হয়ে গিয়েছিল। বললে—বাঃ খুব ভালো বাড়িটা তো!

সত্যিই মেরামতের পর বাড়িটা দেখতে ভালো হয়েছিল। সেকালের বড় বড় ঘর। পুরনো সাহেবি আমলের বাড়ি। কাঠের কড়ি-বরগা। সিঁড়িটাও কাঠের তৈরি, কাঠের রেলিং। নতুন রং করা হয়েছিল। বিশাখা চারদিকে ঘুরে ঘুরে দেখছিল। এত বড় বাড়ি সে-ও এমন কখনও দেখেনি, তার মা-ও দেখেনি কখনও। গরীব ঘরে জন্মেছিল বলে মনে কোনও দুঃখ ছিল কিনা কে জানে? উত্তর দিকের বারান্দার রেলিং ধরে চারদিকের কলকাতার চেহারাটা দেখে বললে—উঃ, কলকাতা কত বড় দেখ মা—

মা-ও দেখছিল সব একদৃষ্টে।

বললে—আমার কপালে এত সুখও ছিল বাবা!

তারপরে একটু থেমে আবার বললে—এই মেয়েটার বিয়ে হয়ে গেলে আমার আর মরে যেতেও কোনও দুঃখ নেই বাবা! এ সবই হলো আমার মেয়ের ভাগ্যে! বিশাখার বাবা যদি পরলোক থেকে দেখতে পান তো তাঁরও খুব আনন্দ হচ্ছে নিশ্চয়ই।

সন্দীপ বলেছিল—ঠাকুমা-মণিকে গিয়ে বলবো যে এ-বাড়ি আপনাদের খুব ভালো লেগেছে—

—হ্যাঁ-হ্যাঁ বাবা, তুমি তাঁকে বোল গিয়ে যে তিনি আমাদের যে কী উপকার করলেন তা আমি পোড়ামুখে বলতে পারবো না—

শুধু কি তাই, এত বড় বড় ঘর যে পৃথিবীতে কোনও বাড়িতে থাকতে পারে তা বোধহয় কল্পনা করতেও পারেনি বিশাখার মা। তার যেন বিশ্বাস করতেও ভয় হচ্ছিল। যোগমায়া কি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপন দেখছে, না এই সব কিছুই তার কল্পনা!

সন্দীপ নিজেও অবাক হয়ে যাচ্ছিল বাড়ির এই সব সাজ-সরঞ্জাম দেখে। নাত-বৌয়ের সুখ-সুবিধের জন্যে এত টাকা খরচ? আর তা ছাড়া এত বড় বাড়িটা এত-দিন খালি পড়েই বা ছিল কেন? এমন কত হাজার-হাজার লোক কলকাতায় আছে যারা নিজেদের একটা আশ্রয়ের-অভাবে ফুটপাথে খোলা আকাশের তলায় ঘুমিয়ে রাত কাটায়, আর এই বিডন স্ট্রীটের বাড়ির মুখুজ্জেদের এত টাকা যে এই বাড়িটা এত বছর ধরে খালি রেখে দিয়েছে? এখানে কম করেও অন্তত একশো-দেড়শো লোক আরামে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারে!

বিশাখার মা জিজ্ঞেস করেছিল—আচ্ছা বাবা, এ-বাড়িতে আমাদের কত দিন থাকতে দেবেন তোমাদের ঠাকুমা-মণি?

সন্দীপ বলেছিল—আপনাদের যতদিন ইচ্ছে এখানে থাকুন না—

যোগমায়া বলেছিল—তা এ-বাড়িটা ভাড়া দিলে তো অনেক টাকা আমদানি হয়!

সন্দীপ বলেছিল—তা তো হয়ই। কিন্তু মুখুজ্জে-বাবুদের তো টাকার অভাব নেই। ওদের অনেক টাকা—

যোগমায়া জিজ্ঞেস করেছিল—ওদের কত টাকা আছে বাবা?

সন্দীপ বলেছিল—তা আমি কী করে জানবো মাসিমা, আমি তো নিজেই গরীব

লোকের ছেলে। আমিও তো আপনাদের মতই গরীব।

—সংসারে কে আছে তোমার?

সন্দীপ বলেছিল—আমার শুধু এক বিধবা মা আছে দেশে আর কেউ নেই আমার—

—আর কেউ নেই?

—না—

যোগমায়া জিজ্ঞেস করেছিল—বাবা?

—না, বাবাও নেই। বাবাকে আমি কখনও চোখে দেখিনি, বাবা কবে মারা গিয়েছেন তা ও আমি জানি না—

যোগমায়ার বড় কষ্ট হলো সন্দীপের কথা শুনে। যোগমায়ার মনে হলো ছেলেটি যেন তাদেরই স্বগোত্রের। ছেলেটিও যেন তার নিজের বিশাখার মত। বিশাখারও যেমন বাবা নেই, এই সন্দীপেরও ঠিক তেমনি। তার বিশাখার মতন হতভাগা?

—তোমার মা তাহলে কোথায় থাকেন?

সন্দীপ বললে—বেড়াপোতাতে, আমার দেশে—

—সেখানে কী করে তাঁর চলে?

সন্দীপ বললে—মা আমাদের বেড়াপোতার জমিদার চাটুজ্জেবাবুদের বাড়ি রান্না-বান্না করে, আর তারাই খেতে দেয়। আমি যতদিন বেড়াপোতাতে ছিলাম, আমার দুবেলার খাবারও ওই চাটুজ্জেবাবুদের বাড়ি থেকেই মা নিয়ে আসতো!

—আর এখন? এখনও তোমার মা সেখানে চাকরি করেন?

—হ্যাঁ।

—তুমি মা'কে চিঠি-পত্তর দাও?

সন্দীপ বললে—হ্যাঁ, প্রতি মাসেই দিই। আমার চিঠি না পেলে মা বড় ভাবে।

যোগমায়া বললে—তাতো ভাববেনই। মায়ের প্রাণ, ভাবনা হবে না। তুমি তো তবু ছেলে। বড় হয়ে মা'র কাছেই উঠবে, মা'র কাছেই থাকবে। বিয়ে-থা হলে ছেলে-বউ নিয়ে তোমার মা সংসার করতে পারবেন, তখন আর তোমার মা'কে পরের বাড়িতে রাঁধুনিগিরি করতে হবে না। পরের বাড়িতে 'পরভাতি' হওয়ার যে কী কষ্ট তা তো আমার চেয়ে আর কেউ এত ভালো করে জানে না।

সন্দীপ বললে—কিন্তু এখন থেকে তো আর আপনার সে-দুঃখ থাকবে না। এখন তো আপনার নিজের জামাই-এর কাছে থাকবেন। জামাই তো আর পর না—

যোগমায়া বললে—ও-কথা বোল না বাবা! কথায় আছে জন্-জামাই-ভাগনা তিন নয় আপনা—

সন্দীপ বললে—কিন্তু এ তো আপনার সে-রকম জামাই নয় মাসিমা। এ-রকম বড়লোক জামাই সংসারে আর কার হয় বলুন? এরা এত বড়লোক, আমি তো এতদিন ধরে দেখছি, কত লোক যে এদের বাড়িতে খাচ্ছে তার হিসেবও নেই কারো কাছে। বাড়ির সরকারমশাই ছাড়া আর কেউ তা জানে না। আর তারপর

আপনার জামাই-এর যে কারখানা আছে বেলুড়ে সেখানে হাজার-হাজার লোক যে খেটে খাচ্ছে তাও তো সবই আপনার জামাই-এর দৌলতেই ! আপনার মেয়েও তো সেই কারবারেরই মালিক হবে—

যোগমায়া বললে—ওকথা বোল না বাবা তুমি !

—কেন, ও-কথা বলবো না কেন ? আমি কি কিছু মিথ্যে কথা বলেছি ? আপনিই বলুন—

যোগমায়া খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে — তুমি ও-কথা বোল না বাবা, সত্যিই আমার বড় ভয় করে—

—কেন, আপনার ভয় করে কেন মাসিমা ? আপনার মেয়ে তো সুন্দরী ! আপনার মেয়ে সুন্দরী বলেই তো এত বড় বড়লোকের ছেলের সঙ্গে তার বিয়ে হতে চলেছে—

যোগমায়া বললে—তুমি ছেলেমানুষ কি না তাই ওই কথা বললে বাবা। আমি ছোটবেলা থেকে একটা কথা শুনে আসছি—'অতি চতুরের ভাত নেই, অতি সুন্দরীর ভাতার নেই,' সেই কথা ভেবেই আমার বড় ভয় করে—আর কিছুর জন্যে নয়—

কথাটা শুনে সন্দীপের মনে পড়ে গেল সেই সেদিনকার নাইট-ক্লাবের ঘটনাটা। অতি চতুরের ভাত নেই, অতি সুন্দরীর ভাতার নেই। কিন্তু অনেকে তো আবার বিয়ের পরেও শুধরে যায়। বিয়ের পর থেকে তো অনেক স্বামী বদলেও যায়। গরীব ঘর থেকে মেয়েদের তো বড়লোকেরা সেই জন্যেই নিজেদের ঘরে বউ করে আনে। মল্লিক-কাকা তো সেই কথাই তাকে বলেছে।

সন্দীপ বললে—আপনি এ চিন্তা করবেন না মাসিমা !

যোগমায়া বললে —চিন্তা কি সাধ করে করি বাবা, জীবনে অনেক দেখেছি, অনেক ঠকেছি, অনেক ভুগেছি। তোমার মা'র মত আমার যদি একটি ছেলে থাকতো তাহলে কি আমি চিন্তা করতুম ? জানো তো—মেয়ে ঘর শূন্য করে আর ছেলে ঘর পূর্ণ করে—

—আবার আপনি ওই সব কথা ভাবছেন !

যোগমায়া বললে—আমি ভাববো না তো কে ভাববে বাবা ? বিশাখার কি বাবা আছে, কিংবা একটা ভাই আছে ? আমাদের যে ত্রিভুবনে আর কেউ নেই—

সন্দীপ বললে —আর কেউ না থাকুক, মাথার ওপর তো ভগবান আছেন—

যোগমায়া বললে—যারা আপন বলতে বাড়িতে ছিল, তারা তো কখনও আমাদের ভালো দেখতে পারতো না। তোমাদের ঠাকুমা-মণি কেন যে আমার মত গরীব বিধবার মেয়েকে পছন্দ করলেন কে জানে ! ভগবানের লীলা কে বুঝতে পারে বাবা—

সন্দীপ সান্ত্বনা দিয়ে বললে—তা তো বটেই, এই যে আমি, আমি কোথায় ছিলাম আর ভগবানের কোন ইচ্ছেয় আমি এই কলকাতায় চলে এলাম, এ-কথা ভাবতে গেলেই আমি অবাক হয়ে যাই মাসিমা !

যোগমায়া বললে —তুমি তো বেটাছেলে, তোমার কী ভাবনা বাবা ! আর আমি ? আমার কথা ভাবো তো একবার ! আঠেরো বছর বয়েসে ওই বিশাখাকে নিয়ে বিধবা

হলুম, আর তারপর থেকে ওই দেওরের সংসারে হাঁড়ি-কড়া নাড়ছিলুম আর জা-এর লাথি-ঝ্যাঁটা খাচ্ছিলুম, হঠাৎ ভগবান আমাকে এ কোথায় নিয়ে এলেন। এটা ভালো হলো কি মন্দ হলো তাও বুঝতে পারছি না—

—ভালোই হবে মাসিমা, ভগবান যা করেন তা মঙ্গলের জন্যেই করেন! নইলে আপনি কি কখনও ভেবেছিলেন যে একদিন এখানে এই রাসেল স্ট্রীটের বাড়িতে উঠবেন!'

যোগমায়া বললে—কিন্তু আমার মেয়ে? ওই মেয়েই তো আমার গলার কাঁটা।

সন্দীপ বললে—কিন্তু সেই মেয়েরও তো বিয়ের পাত্র ঠিক হয়ে গিয়েছে! আর কী ভাবনা আপনার?

যোগমায়া বললে—আমাদের দেশে একটা কথা আছে বাবা, তুমি হয়ত জানো—না

—কী কথা বলুন?

যোগমায়া বললে—কথাটা হচ্ছে 'মেয়ের নাম ফেলি, পরে নিলেও গেলি, যমে নিলেও গেলি—'কথাটা ভাবলেই আমার মাথাটা টন্-টন্ করে ওঠে—

মাসিমার কথাটা সেদিন সন্দীপ বুঝতে পারেনি ঠিক। কিন্তু পরে বুঝেছে ও-রকম সত্যি কথা আর পরে কখনও বোঝেনি সন্দীপ! সত্যিই তো, বিশাখা যদি মেয়ে না হয়ে ছেলে হতো তো মাসিমার আর ভাবনার কী ছিল?

এতদিন পরে আজ মনে হচ্ছে মাসিমার কথাটা কতটা মর্মান্তিক সত্যি! এই উপন্যাসের যে কাহিনীটা বলতে বসেছি তা তো বলতে গেলে ওই বিশাখার জীবনেরই মর্মান্তিক সত্যি কাহিনী! শুধু বিশাখার জীবনেরই কাহিনী, তা তো নয়। তার সঙ্গে সন্দীপের জীবনেরও তো মর্মান্তিক সত্যি কাহিনী! কিন্তু একদিন কোন কুক্ষণে বিশাখা সন্দীপের সঙ্গে অঙ্গাঅঙ্গীভাবে জড়িয়ে গিয়েছিল? আর কেনই বা সন্দীপ তার সমস্ত স্বার্থ বিশাখার ভালোর জন্যে জলাঞ্জলি দিতে গিয়েছিল? কে এই 'কেন'র জবাব দেবে? সেই জবাব দেওয়ার জন্যে সে কোন্ দেবতার কাছে তার প্রার্থনা জানাবে?
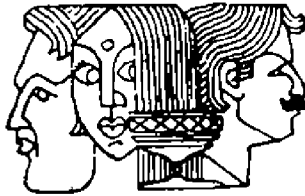
আজ আর সন্দীপের কেউ নেই। সব মানুষের মধ্যে 'আমি' বলে যে কাঙালটা সংসারের সব জিনিসকে নিজের বলে আঁকড়ে ধরতে চায়, সেই আমি'টা এখন বিদায় নিয়েছে বটে, কিন্তু পৃথিবীটা তো রয়েছে, সংসারটা তো রয়েছে। সংসারটা দীর্ঘকাল থাকে, শুধু অহংটা চলে যায়। তাকে কেউ নেয় না। এই এতদিন জেলখানার মধ্যে কাটিয়ে আজ বোধহয় সে অহংমুক্ত হতে পেরেছে। নইলে এত নিস্পৃহ সে হতে পারছে কী করে? নিস্পৃহ দৃষ্টিতেই এই সন্দীপ সেদিনকার সেই সন্দীপকে আজ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে।

সেই দিন থেকে সন্দীপকে আর সাত নম্বর মনসাতলা লেনের তপেশ গাঙ্গুলী

মশাই-এর বাড়িতে যেতে হয়নি। তার জন্যে তার পরিশ্রম যেমন কমেছিল, মানসিক অশান্তিও তেমনি কমেছিল। বিডন স্ট্রীটের বাড়ি থেকে সোজা ধর্মতলার মোড়ে এসে নামলেই চলতো। কিংবা পার্ক স্ট্রীটের মোড়ে এসে নামলেই কাজ চলে যেত। বাকিটা হাঁটা রাস্তা। তাও বেশি দূরে নয় মিনিট পাঁচেকের রাস্তা। তারপর ডান দিকে ঘুরলেই সেই তিন নম্বর রাসেল স্ট্রীটের বাড়িটা! উত্তরমুখো দোতলা তিনতলায় ওঠবার কাঠের সিঁড়ি। সিঁড়ি দিয়ে তেতলায় উঠে গিয়ে ডাকতো—মাসিমা—

শুধু মাসিমা কি বিশাখা নয়, একটা ঝি'ও রাখা হয়েছিল দিন-রাত্তিরের কাজ করবার জন্যে। সেই শৈল-ঝিই অনেক সময় দরজা খুলে দিত। অনেক সময় তার নাম ধরেই ডাকতো সন্দীপ—শৈল, ও শৈল—

স্বামী বেঁচে থাকতেও যোগমায়াকে বরাবর ঝি-এর কাজ করতে হয়েছে, আর তারপর স্বামী মারা যাওয়ার পরও ঝি-এর কাজ থেকে কখনও মুক্তি পায়নি যোগমায়া। সেই মানুষের কপালে যে এত সুখ হবে তা যেন কল্পনা করা যায় না।

প্রথমে মাসিমা একটু অবাক হয়ে গিয়েছিল। বলেছিল—আমার আবার ঝি রাখা কেন বাবা? ভারি তো দুটো মানুষের সংসার, এ কাজ আমি একলাই করতে পারবো—

সন্দীপ বলেছিল—না মাসিমা, ঠাকুমা-মণি বলে দিয়েছে রান্না-বান্না, বাসন-মাজা, ঘর ঝাঁট দেওয়া কত কাজ আছে। তার ওপর কাপড়-কাচা, কাজ কি কম? আপনাকে কোনও কাজই করতে হবে না। ঠাকুমা-মণি আমাকে বলতে বলে দিয়েছে—

মাসিমা বলেছিল—তাহলে আমি সারা দিন বসে-বসে কী করবো? কাজ না করে আমার যে সারা গতরে বাত ধরে যাবে—

সন্দীপ বলেছিল—সারা জীবনই তো খেটেছেন, এখন এই বয়েসে না-হয় একটু আরামই করলেন—

মাসিমা বলেছিল—না বাবা, অত সুখ ভালো নয়, সকলের কপালে কি সব সুখ সয়? আমি গরীব লোক, গরীবের মত চাল-চলনই আমার ভালো—

তা সেই থেকে শৈলই সব করতো। বাজার করা থেকে শুরু করে রান্না, ঘর ঝাঁট দেওয়া, বাসন মাজার মত মোটা-মোটা সব কাজই করতো সে। তার মাস-কাবারি মাইনে আসতো বিডন স্ট্রীটের মুখুজ্জে-বাড়ি থেকে। সন্দীপ টাকাগুলো এনে দিত শৈলকে। শৈল সেটা নিয়ে রসিদের ওপর টিপ ছাপ দিয়ে দিত। সেই রসিদটা মল্লিক-মশাইয়ের সরকারি খরচের খাতায় আবার ঠিক সময়ে জমা পড়তো। আর যোগমায়ার হাতে দিয়ে যেত সংসার খরচের পুরো টাকা। সংসার থাকলেই মোটা খরচ, তা সে দু'জনের সংসারই হোক, আর দশজনের সংসারই হোক। সে খরচও বড় কম নয়। দুধ আছে, কয়লা আছে, চাল-ডাল-আনাজ-তরিতরকারী-মশলাপাতি-কেরোসিন থেকে শুরু করে যাবতীয় জিনিস কিনতে হয়। ছোট সংসার বলে তার আয়োজন যে ছোট হবে তার কোনও মানে নেই। কোনও মাসে তিনশো টাকা আবার কোনও মাসে চারশো।

আর তার ওপর আছে আর একটা মোটা খরচ। সেটা হচ্ছে গাড়ি। ঠাকুমা-

মণির হুকুম দেওয়া আছে বউমা গাড়ি করে ইস্কুলে যাবে আর গাড়ি করে ইস্কুল থেকে বাড়ি ফিরবে। তাই নিয়ম করে ড্রাইভার সদরে এসে হাজির হয়। বউমা হেঁটে-হেঁটে ইস্কুলে যায়, এটা ঠাকমা-মণির পছন্দ নয়। যে একদিন বড় ঘরের বউ হতে চলেছে তার পক্ষে কোথাও পায়ে হেঁটে চলা-ফেরা করা ভালো নয়। তাতে মুখুজ্জে বাড়ির ইজ্জৎ চলে যাবে।

আর এই যে এই নতুন সংসারের দেখা-শোনা করার কাজ, এর সব ভার রইলো সন্দীপের ওপর। বলতে গেলে এ-সংসারের দায় দায়িত্ব সব কিছুরই সে কর্তা। টাকা যা লাগে তা সরকার-মশাইএর কাছ থেকে নাও, কিন্তু এ-বাড়ির ভালো-মন্দর সব জবাবদিহি করতে হবে সন্দীপকে।

আগেকার কাজ ছিল সোজা। মাসের মধ্যে মাত্র একটা দিন মনসাতলা লেন-এ গিয়ে মাসকাবারি টাকা তপেশ গাঙ্গুলীর হাতে তুলে দিয়ে আসা। কিন্তু এ কাজ নিত্য-নৈমিত্তিক। প্রতিদিন ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে তৈরি হয়ে নিয়েই এ বাড়িতে চলে আসতে হয়। এসেই মাসিমাকে জিজ্ঞেস করতে হয় কেমন আছে মাসিমা। কিংবা ঘুম হয়েছে কিনা। কিংবা টাকা কড়ির কিছু দরকার আছে কিনা। সন্দীপ অবশ্য রোজই কিছু-কিছু বাড়তি টাকা পকেটে করে আনতো। মাসিমার দরকার না থাক, বিশাখার কিছু দরকার থাকতে পারে। ইস্কুলে যদি তার ক্ষিধে পায় তো কিছু কিনে খেতে পারে। হয় আইসক্রীম, নয়তো কেক পেস্ট্রি। সন্দীপ বিশাখাকে খারাপ জিনিস কিনে খেতে বারণ করে দিয়েছে। আশে-পাশে বাজে জিনিস খেলে শরীর খারাপ হয়ে যাবে। তখন বিশাখাকে বকুনি খেতে হবে না, ঠাকমা-মণির কাছ থেকে বকুনি খাবে সন্দীপ।

আর শুধু কি তাই? এর ওপর আছে ডাক্তার।

মাসকাবারি মাইনে করা ডাক্তার আছে। তিনি এসে বউমার শরীর পরীক্ষা করে যাবেন। সেদিন বিশাখার জিভ্ পরীক্ষা করবেন, পেট পরীক্ষা করবেন। ওজন নেবেন। পরীক্ষা করে দেখবেন ওজন বাড়ছে না কমছে। যদি ওজন কমে যায় তো একটা ওষুধ প্রেসক্রিপসন করবেন। সে-ওষুধটার দাম পাঁচ টাকাই হোক আর পঞ্চাশ টাকাই হোক তা কিনে খাওয়াতে হবে। মোট কথা, বউমার স্বাস্থ্য ভালো করতেই হবে, যেমন-তেমন করে হোক। আর যদি ডাক্তার বলে যে চেঞ্জে গেলে উপকার হবে, তা তাই-ই করতে হবে। হাতের কাছে পুরী আছে, কিংবা কাশী, কিংবা মধুপুর, দেওঘর তো আছেই। আর কাশী? সেখানে তো গুরুদেবই আছেন। তিনিও যা, ভগবানও তাই। তাঁর কাছে গেলে এক কথায় সব বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি, কোনও অসুবিধে হবে না! বলো তো এখনি সরকারমশাই গুরুদেবকে টেলিগ্রাম করে দিচ্ছে—

সেদিনও সন্দীপ রাসেল স্ট্রীটের বাড়ির তেতলায় উঠে ডাকলে—মাসিমা, ও মাসিমা—

ভেতরে যেন কারা জোরে-জোরে কথা বলছিল। সন্দীপ বুঝতে পারলে না ভেতরে কারা এমন করে কথা বলছে। পুরুষের গলা। অথচ এ-বাড়িতে তো কোনও পুরুষ মানুষ নেই!

শৈলই দরজা খুলে দিলে। দরজাটা খুলতেই সন্দীপ দেখলে তপেশ গাঙ্গুলী-

মশাই ভেতরে বসে আছেন।

সন্দীপকে দেখেই বললেন—কী ভায়া, কেমন আছো?

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—আপনি কেমন আছেন?

তপেশ গাঙ্গুলী বললেন—আরে, আমাদের কথা ছেড়ে দাও। এতকাল একসঙ্গে কাটিয়েছি তো, তাই একটু বউদিকে দেখতে এলুম—তোমার ঠাকুমা-মণি কেমন আছেন?

সন্দীপ বললে—ভালো—তা আজকে আপনার অফিস নেই?

তপেশ গাঙ্গুলী বললেন—আরে আমাদের আপিসের কথা ছেড়ে দাও, আমাদের আপিসে না গেলেও চলে! তুমি তো কলেজে পড়ো? আজকে তোমার কলেজ নেই?

—আমার তো রাত্তিরে কলেজ! সকালবেলা এখানে আমাকে একবার করে রোজ আসতে হয়, এ-বাড়ির সব ব্যাপার দেখা-শোনা করতে হয়। ঠাকুমা-মণি বলে দিয়েছেন রোজ একবার এখানকার খবর দিতে—

—ভালো—ভালো, খুব ভালো। দেখো, সবই কপাল ভায়া, সবই কপাল! নইলে সারা জীবন আমি মাথার ঘাম ফেলে চাকরি করে যা করতে পারলুম না, এদের আজ তাই-ই হবে।

কথাগুলো বলতে-বলতে তপেশ গাঙ্গুলীমশাই-এর চোখ দুটো কেমন যেন ছল্-ছল্ করে উঠলো। যেন বউদির এই সৌভাগ্য দেখে তাঁর মনে খুব কষ্ট হয়েছে।

তারপর বললেন—তা সে যা হোক্ গে, শুনলুম তোমার ঠাকুমা-মণি আমার বউদির জন্যে নাকি অনেক কিছু করছেন—

সন্দীপ বললে—হ্যাঁ, আপনি ঠিকই শুনেছেন—

—এদের এই ঝি'টাকে কত টাকা মাইনে দাও তোমরা?

সন্দীপ বললে—তিরিশ টাকা। তার সঙ্গে খাওয়া-পরা-থাকা, সে সবও আছে!

—তি-রি-শ টা-কা? এত?

সন্দীপ বললে—তার কমে তো আর আজকাল কোনও ঝি-চাকর পাওয়া যায় না!

তপেশ গাঙ্গুলী বললেন—সবই কপাল ভায়া, সবই কপাল। আমি রেলের অফিসে চাকরি করেও আজ পর্যন্ত বাড়ির জন্যে একটা ঝি বা চাকর রাখতে পারলুম না—

সন্দীপ বললে—হ্যাঁ, সত্যি আপনার খুবই কষ্ট!

তপেশ গাঙ্গুলীমশাই সন্দীপের কথায় যেন সান্ত্বনা পেলেন একটু। যেন একটু উৎসাহিত হলেন। বললেন—দুঃখের কথা আর কাকেই বা বলবো, আর কে-ই বা তা বুঝবে! এই বৌদি আমার সব জানে!

যোগমায়া বললে—তুমি অত ভেবো না ঠাকুরপো। অত ভেবো না। এখানে এসে আমারই কি খুব ভালো লাগছে? আমিও সইতে পারছি। এখানে এসেও সব সময় তোমাদের কথাই মনে পড়ে!

তপেশ গাঙ্গুলী বললেন—সে কি আমি জানি না বউদি? এখানে আসবার দিন তুমি কত কেঁদেছিলে, সে সবই আমার মনে আছে। আমি তো তাই তোমার জাকে বলি যে বউদি ছিল আমাদের বাড়ির লক্ষ্মী। সেই বাড়ির লক্ষ্মীই যদি

বাইরে চলে যায় তো সে-বাড়িতে কি শান্তি থাকে ? তুমিই বলো !

যোগমায়া বললে—তোমার শরীরও তো ভালো নেই মনে হচ্ছে !

তপেশ গাঙ্গুলী বললেন—কী করে শরীর ভালো থাকে বলো ? আদ্দেক দিন তো আমার খাওয়াই হয় না—

—কেন ? খাওয়া হয় না কেন ?

তপেশ গাঙ্গুলী বললেন—কী করে খাওয়া হবে ? তুমি যতদিন আমাদের বাড়িতে ছিলে ততদিন কত আরামে ছিলুম। তুমি ঠিক সময়ে আমাকে ভাত রান্না করে দিতে। একদিনও আমার আপিসে যেতে দেরি হয়নি—

যোগমায়ার মুখে-চোখে আতঙ্কের ছায়া ভেসে উঠলো। বললে—এখন কি দেরি হয় ?

তপেশ গাঙ্গুলী বললেন—দেরি হবে না ? বলতে গেলে রোজই তো দেরি হয়। তোমার জা যে সকালে ঘুম থেকে উঠতেই দেরি করে। বাজার করে যখন বাড়ি ফিরে আসি তখনও দেখি তোমার জা নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। মেয়েমানুষের এত ঘুম যে কোত্থেকে আসে তা কে জানে বাবা! তখন আমি নিজে উনুনে কয়লা দিয়ে আগুন জ্বালাই। ওদিকে যখন উনুনে কয়লা গন-গন জ্বলছে তখন দেখি তোমার জা দয়া করে উনুনে চায়ের জল চাপিয়েছে। সেই চা খেয়ে যখন ঘুমের ঘোর কাটবে তখন উনি কল-ঘরে ঢুকবেন। তা তুমিই বলো বউদি, আগে চা, না আগে আমার আফিসের ভাত ? কোনটা আগে তুমিই বলো ?

যোগমায়া বললে—আহা, তাহলে তো তোমার বড় কষ্ট !

তপেশ গাঙ্গুলী বললেন—আমার কষ্টের কথা আর কতটুকুই বা বলেছি তোমাকে ? আরো কত কষ্টের কথা বলবো ? সব বললে সাত কাণ্ড রামায়ণ হয়ে যাবে ! তাই জন্যেই তো বলছিলাম যে তুমি ছিলে আমাদের বাড়ির লক্ষ্মী, তুমি যেদিন থেকে এ-বাড়িতে চলে এসেছ সেই দিন থেকেই আমাদের সংসার লক্ষ্মীছাড়া হয়ে গেছে। মানুষ কতদিন আর না খেয়ে থাকতে পারে বলো ?

যোগমায়ার মুখ থেকে যেন একটা হাহাকার বেরিয়ে এল। বললে—ওমা, তুমি কতদিন না খেয়ে আপিসে যাবে ঠাকুরপো ?

—আর কতদিন! আর বোধহয় বেশিদিন বাঁচবো না। বাঁচতে আর আমার ইচ্ছেও নেই। আমার শুধু একটাই ভাবনা—আমি মরে গেলে ওই বিজুলীটাকে কে দেখবে ? ওর জন্যেই আমার যত ভাবনা—

যোগমায়া বললে—তা এখন—এখন কি তুমি না খেয়েই এসেছ ?

তপেশ গাঙ্গুলী বললেন—খাওয়া ? খেতে আমায় কে দেবে ? বাড়িতে রান্না হলে তবে তো খাবো ! আমার বাড়িতে আপনার-মত লোক কে আছে যে আমার খাওয়ার কথা ভাববে ? আমি খেলুম, কি খেলুম না তা দেখবার মত লোক তো নেই আমার বাড়িতে।

যোগমায়া বলে উঠলো—তাহলে তুমি আজ এখানেই দু'টি খেয়ে যাও—

বলে শৈলকে ডাকলে যোগমায়া। বাইরের দোকান থেকে চারটে রসগোল্লা আনতে বলে দিলে। বললে—এখন হাসিমুখে একটু মিষ্টি খেয়ে নাও, তারপরে আমাদের সঙ্গে তোমাকেও এখানে দু'টি ভাত খেতে হবে—

—না না, তুমি আবার আমার জন্যে এত কষ্ট করতে যাবে কেন ?

যোগমায়া বললে—আমার আবার এতে কষ্ট কীসের ? ওই দেখছ সন্দীপকে। ও বড্ড ভালো ছেলে। ও-ই রোজ আমাদের দেখা-শোনা করে যায়। ও আছে বলেই আমাদের এখানে কোন কষ্ট নেই—

তপেশ গাঙ্গুলী এবার আবার সন্দীপের দিকে চেয়ে বললে—তুমি খুব ভালো কাজ করছ ভায়া। তোমার অনেক পুণ্যফল হচ্ছে। তুমি দীর্ঘজীবী হও, এই প্রার্থনাই করি ভগবানের কাছে—

সন্দীপ বললে—আমাকে আপনি এত কথা বলছেন কেন ? আমি তো কেউ না, যা ঠাকমা-মণি আমাকে করতে হুকুম করেছেন, আমি তা-ই-ই করছি। তার বেশী কিছু নয় !

—তা এটা তো তোমাদের ঠাকমা-মণির নিজেদের বাড়ি ! এ বাড়ির ভাড়া তো দিতে হয় না—

সন্দীপ বললে—না—

তপেশ গাঙ্গুলী আবার জিজ্ঞেস করলেন—তাহলে এই এঁদের জন্যে তোমাদের ঠাকমা-মণির কত খরচ হয় মাসে মাসে ?

সন্দীপ বললে—হিসেব তো আমি রাখি না, সব হিসেব রাখেন আমাদের সরকারমশাই—

—তবু আন্দাজ কত ? দুশো না তিনশো ?

সন্দীপ বললে—না, তার চেয়েও বেশি ! কোন-কোন মাসে পাঁচশো-ছ'শোও হয়ে যায় !

তপেশ গাঙ্গুলী বললেন—সে কী ? পাঁচ-ছ'শো ? আমি তো মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খেটেও মাসে অত টাকা হাতে পাই না—কপাল ভায়া, কপাল—

সন্দীপ বললে—এর পরে তো খরচ আরো বাড়বে—

—কেন ? খরচ বাড়বে কেন ?

সন্দীপ বললে—ঠাকমা-মণি বলেছেন এর পরে একজন মাষ্টার রাখতে হবে বিশাখাকে পড়াবার জন্যে। সে মাষ্টার শুধু বাংলা অঙ্ক আর অন্য বিষয় পড়াবে, আর তার ওপর একজন মেমসাহেব রাখা হবে বিশাখাকে ইংরেজী পড়াবার জন্য। ইংরেজী শেখাবার মেমসাহেব সপ্তাহে দু'দিন আসবে। সে একলাই মাইনে নেবে মাসে তিনশো টাকা—

ততক্ষণে শৈল চারটে রসগোল্লা এনে প্লেটে রেখে দিয়ে গেল। আর এককাপ চা। রসগোল্লা চারটে দেখে তপেশ গাঙ্গুলীর চোখ দুটো যেন জ্বল্ জ্বল্ করে উঠলো। টপ করে একটা রসগোল্লা মুখের মধ্যে পুরে দিয়ে বললে—বাঃ, বাঃ তোমাদের এ-পাড়ার রসগোল্লা খুব মিষ্টি তো।

রসগোল্লা যে কখনও নোনতা কি তেতো হয় না, মিষ্টিই হয়, তা যেন সেই দিন তপেশ গাঙ্গুলী জীবনে প্রথম জানলেন। বললেন—তোমাদের এ পাড়ার দেখছি সবই ভালো। কতদিন যে রসগোল্লা খাইনি তা মনেও নেই—

যোগমায়া তপেশ গাঙ্গুলীর মুখে এ পাড়ার রসগোল্লার প্রশংসা শুনে বললে—আর রসগোল্লা নেবে ঠাকুরপো ?

তপেশ গাঙ্গুলী যেন অনিচ্ছার সঙ্গে বললেন—আরো দেবে ?

এ প্রশ্নের কোনও জবাব না দিয়ে যোগমায়া আরো চারটে রসগোল্লা শৈলকে দিয়ে আনিয়ে দিলে।

তপেশ গাঙ্গুলী বললেন--আঃ, আবার কেন রসগোল্লা আনালে ?

বলেই আবার রসগোল্লাটা মুখে পুরে দিলেন। রসগোল্লাটা খেতে খেতেই বললেন—ভালো রসগোল্লা বলেছি বলে কি এতগুলো রসগোল্লা খেতে হবে ?

বলে আর একটা রসগোল্লা মুখে পুরে দিলেন।

তারপর সন্দীপের দিকে চেয়ে বললেন—তাহলে তো বিশাখার জন্যে তোমার ঠাকমা-মণির অনেক টাকা খরচ হয়ে যাবে—

সন্দীপ বললে—বিশাখাকে তো নিজের নাত-বউ করবেন, তাই তাকে ভালো করে লেখা-পড়াটা শিখিয়ে নিতে চান আর কি—

তারপর একটু থেমে আবার বললে—ওদের অনেক টাকা, আর নাতিও একটা, সেই নাতির বউ করতে হলে টাকা খরচ তো হবেই—

—আচ্ছা, ওদের কত টাকা ভায়া—এত টাকা মানুষের কী করে হয় ? কই, আমাদের তো টাকা হয় না—অথচ আমরা তো টাকার জন্যে হা-পিত্তেস করে মরি—। সত্যি বলো তো ওদের কত টাকা ?

সন্দীপ বললে—তা আমি কি করে বলবো ?

—তবু আন্দাজ কত টাকা ?

সন্দীপ বললে—আমি গরীব লোক, আমি তা কী করে বলবো ?

তপেশ গাঙ্গুলী বললেন—দেখ ভগবানের আক্কেলখানা, আমরা টাকার অভাবের জন্যে বাড়িতে একটা ঝি-চাকর রাখতে পারি না, টাকার অভাবে মেয়েকে ভালো খাওয়াতে-পরাতে কি লেখা-পড়া শেখাতে পারি না আর ভগবান কিনা সব টাকা ওদের বাড়িতে ঢেলে দেন। এ কী-রকম ভগবান বলো তো, কী রকম একচোখো বিচার ?

তখন আর বেশী সময় ছিল না সন্দীপের। সে বললে—আচ্ছা আসি মাসিমা—কাল আবার আসবো—

বলে সদর দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে গেল। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে তার মনে হলো এতক্ষণ সময়টা যেন বড় খারাপ কাটলো। ওই তপেশ গাঙ্গুলীর সঙ্গে কেবল বাজে কথাই বলে এল সে। টাকা দিয়েই যারা মানুষকে বিচার করে, তাদের ওপর সন্দীপের বরাবরের রাগ। তাহলে গোপালের সঙ্গে তপেশ গাঙ্গুলীর কীসের তফাৎ! তফাৎ শুধু এইটুকুই যে গোপালের অনেক টাকা আছে আর তপেশ গাঙ্গুলীর কোনও টাকা নেই। কিন্তু স্বভাব ? মনোবৃত্তি ?

বাড়ি থেকে বেরিয়ে সন্দীপ রাসেল স্ট্রীটে পা দিয়েছে, হঠাৎ পেছন থেকে চীৎকার—

কানে এল—ও ভায়া—ও ভায়া—শুনছো— ?

সন্দীপ পেছন ফিরে অবাক হয়ে গেল। দেখলে তপেশ গাঙ্গুলী তাকে ডাকতে ডাকতেই দৌড়ে কাছে আসছেন।

তপেশ গাঙ্গুলী কাছে এসে হাঁফাতে লাগলেন। বললেন—একটা কথা আছে ভাই তোমার সঙ্গে—

—আমার সঙ্গে ? কী কথা ?

তপেশ গাঙ্গুলী বললেন—খুব গোপনীয় কথা। তুমি যেন কাউকে বোল না—

সন্দীপ বললে—কী কথা তাই বলুন আগে—

—না, আগে তুমি কথা দাও কাউকে বলবে না—

—আচ্ছা, কথা দিলুম কাউকে বলবো না—

তপেশ গাঙ্গুলী বললেন—খুব গোপনীয় কথা, তাই এত করে তোমাকে আমি বলছি। তুমি তো ভায়া আমার অবস্থা ভালো করেই জানো। আমি ভাই মাইনে পাই সব কিছু কেটেকুটে নিয়ে মাত্র সাড়ে তিনশো, তাই দিয়েই আমার সংসার চালাতে হয়। এই যুগে ওই কটা টাকায় সংসার চালানো যায় ? তুমিই বলো। জিনিস-পত্তোরের দাম যে-হারে বাড়ছে তাই দিয়ে কি আজকাল সংসার চালানো যায় বলো ?

সন্দীপ কিছু উত্তর দিলে না।

তপেশ গাঙ্গুলী বললেন—এতদিন তো তোমার ঠাকমা-মণির দেওয়া টাকাগুলো দিয়ে কোনও রকমে জোড়াতালি দিয়ে চালাচ্ছিলুম কিন্তু আর তো চলছে না ভায়া। এখন তো আর চলছে না ভাই।

সন্দীপ বললে—তা আমাকে কী করতে হবে, বলুন ? আমি কী করতে পারি তার জন্যে ?

তপেশ গাঙ্গুলী বললেন—তুমি ? তুমি সব করতে পারো। তুমি আমাকে মারলে মারতে পারো, বাঁচালে বাঁচাতে পারো।

—কী করে ?

তপেশ গাঙ্গুলী বললেন—ওই বিশাখার জন্যে তোমার ঠাকমা-মণি তো মাষ্টার রাখবেন বলছিলে, তো আমাকেই মাষ্টার রাখবার কথা তুমি তোমার ঠাকমা-মণিকে তো বলতে পারো—

—আপনি বিশাখাকে পড়াবেন ? কী পড়াবেন ?

তপেশ গাঙ্গুলী বললেন—যা বলবে তুমি আমি তা-ই পড়াবো। তুমি তো জানো ভায়া আমি বি-এ পাশ করেছি। আমি পড়াতে পারবো না ?

—আপনি ইংরেজী পড়াতে পারবেন ?

—কী যে বলো তুমি ? আমি তো ইংরেজীতেই অনার্স। রেলে চাকরি করি বলে কি একটা বাচ্চা মেয়েকে ইংরেজীটাও শেখাতে পারবো না ?

সন্দীপ বললে—কিন্তু ঠাকমা-মণির ইচ্ছে একজন মেম-সাহেবের কাছে তাঁর বউমা ইংরেজী শিখুক। পরে তো বরের সঙ্গে বিশাখাকে বিলেত-টিলেতেও যেতে হতে পারে—

বিশাখা বিলেত যাবে নাকি ?

সন্দীপ বললে—তা যাবে না ? মুখুজ্জেবাবুদের তো বিলেতেও অফিস আছে। মেমসাহেবের কাছে ইংরেজী শিখলে তখন আর বিশাখার কোনও অসুবিধে হবে না—

কথাগুলো শুনে তপেশ গাঙ্গুলীর মুখ দিয়ে হতাশার একটা দীর্ঘশ্বাস পড়লো। বললেন—তাহলে বাংলা ? ইস্কুলে আমি বাংলায় বরাবর ফার্স্ট হতুম।

বাংলাটা আমি শেখাতে পারি।

সন্দীপ বললে—ইংরেজী ইস্কুলে পড়ে বিশাখা, তাই বাংলা পড়াবার দরকার হবে কিনা আমি বুঝতে পারছি না—

তপেশ গাঙ্গুলী বললেন—আচ্ছা, তা না হয়, না হোক, অঙ্কটা তো সব ইস্কুলেই আছে। আমি অঙ্কটাও ভালো পারি। আমি অঙ্কটা বিশাখাকে ভালো শেখাতে পারি—

সন্দীপ এর জবাবে কী বলবে বুঝতে পারলে না। একটু ভেবে বললে—আচ্ছা, আমি পরে ভেবে বলবো—

তপেশ গাঙ্গুলী বললেন—পরে টরে নয় ভাই। তুমি আমার ছোট ভাই-এর মত, তোমাকে আমার এ-উপকারটা করতেই হবে। নইলে আমি মরে যাবো ভাই, নির্ঘাত মরে যাবো—

সন্দীপ বললে—দেখুন, আমাকে বলা বৃথা। আমি তো মুখুজ্জে বাড়ির একজন চাকর বই তো কেউ নই। আমার কথার কী দাম!

এবার তপেশ গাঙ্গুলী এক কাণ্ড করে বসলেন। একেবারে খপ্ করে সন্দীপের একটা হাত জড়িয়ে ধরে ফেললেন। তারপর কান্নায় দু'চোখ বেয়ে ঝর-ঝর করে জল পড়তে লাগলো! বললেন—তুমি আমাকে বাঁচাও ভাই, নইলে আমি সপরিবারে মারা পড়বো। আর নইলে আমার মেয়ের জন্যেও ঠিক এই রকম একটা পাত্র জুটিয়ে দাও—

মহা মুস্কিলে পড়লো সন্দীপ। বললে—আমি তো বলছি আপনাকে—

তপেশ গাঙ্গুলী হঠাৎ জামার বুক-পকেট থেকে একটা পাঁচ টাকার নোট বের করে সন্দীপের হাতের মধ্যে গুঁজে দিলে।

সন্দীপ হতবাক হয়ে গেছে একেবারে। বললে—এ কী করছেন? এ কী করছেন—

তপেশ গাঙ্গুলী বললেন—ও কিছু না ভাই। ও কিছু না। তুমিও গরীব লোক, আমিও গরীব লোক, তোমাকে পাঁচটা টাকা আমি মিষ্টি খেতে দিচ্ছি, আর কিছু নয়—

সন্দীপ এবার রেগে গেল। বললে—আপনি আমাকে ঘুষ দিচ্ছেন? আমাকে আপনি—

তপেশ গাঙ্গুলী বললেন—না না, তুমি একে ঘুষ মনে করছো কেন? তুমিও তো ভায়া আমার মত ছাপোষা মানুষ! তুমি রেগে যেও না ভাই, তুমি রেগে যেও না—শোন, শোন—

কিন্তু সন্দীপ আর সেখানে দাঁড়ায় নি। আর কোনদিকে না চেয়ে সন্দীপ তপেশ গাঙ্গুলীকে সেই রাসেল স্ট্রীটের ওপর ফেলে রেখে চলে গিয়েছিল। আর একবারও পেছন ফিরে তাকায় নি। শেষকালে তপেশ গাঙ্গুলী কিনা দু'টো টাকার লোভে তাকে ঘুষ দিতে চেয়েছিলেন? সন্দীপ কি অত ছোট, অত নীচ, অত অপদার্থ? সন্দীপ কি—

কিন্তু সে সব কথা পরে হবে!

মনে আছে তখন বিশাখা নতুন ইস্কুলে ভর্তি হয়েছে। তার জন্যে গাড়ির ব্যবস্থা হয়েছে। সকাল বেলা বিডন স্ট্রীটের বাড়ি থেকে ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে এসে তিন নম্বর রাসেল স্ট্রীটের বাড়ির পোর্টিকোর তলায় দাঁড়াতো, আর সেই খবর পেয়েই বিশাখা সেই গাড়িতে চড়ে ইস্কুলে যেত। আবার যতক্ষণ না ইস্কুলের ছুটি হতো ততক্ষণ গাড়ি সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকতো। ইস্কুলের ছুটি হওয়ার পর বিশাখাকে বাড়ি পৌঁছিয়ে দেওয়ার পর তবে ড্রাইভারের ছুটি।

সেই সাত নম্বর মনসাতলা লেনের বাড়ির জীবন-যাপনের সঙ্গে এই তিন নম্বর রাসেল স্ট্রীটের বাড়ির জীবন-যাপনের নিয়ম-কানুন একেবারে সম্পূর্ণ আলাদা। এ বাড়িতে যোগমায়ার আর ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠেই জা'এর চা তৈরি করার ব্যস্ততাও যেমন নেই, দেওরের আপিসের ভাত-ডাল তরকারি রান্নার তাগিদও নেই তেমনি। সবই করে শৈল। এ-বাড়ির ঘর ঝাঁট দেওয়া, বাসন মাজা, কাপড় কাচা থেকে আরম্ভ করে বাজার করা রান্না করা সমস্ত। আর শৈল মানুষটাও বড় ভালো। মাইনে যা পায় তা ঠাকুমা-মণিই দেন ঠিক সময়ে। কিন্তু কাজ করতে তার এতটুকু মুখভার নেই, এতটুকু বেজার হওয়া নেই। আর সবচেয়ে বড় কথা চুরি-চামারির ধার দিয়েও মাড়ায় না সে।

যোগমায়া বলতে বলতে কেঁদে ফেলে। বলে—এত সুখ আমার কপালে সইলে হয় বাবা—

সন্দীপ সান্ত্বনা দিয়ে বলে—আপনি অত ভাববেন না মাসিমা। আমার মা'কেও আমি তাই বলেছি, আমার মাকেও আমি ভাবতে বারণ করেছি। আমার মা-ও আমার কথা বড্ড ভাবে—

বিশাখা গাড়ি করে ইস্কুলে চলে যাবার পর থেকেই যোগমায়ার ভাবনা শুরু হয়। যদি রাস্তায় গাড়িতে-গাড়িতে ধাক্কা লাগে' যদি কোনও দুর্ঘটনা ঘটে। যদি মেয়ের কিছু বিপদ হয়!

কিন্তু ইস্কুল থেকে যতক্ষণ না বিশাখা বাড়ি ফেরে ততক্ষণ মাসিমার আর অস্বস্তি কমে না। যখন বিশাখা শেষ পর্যন্ত বাড়ি ফেরে, তখন যোগমায়া মেয়ের দিকে চেয়ে বলে—তুই এলি, আমি বাঁচলুম মা—

বিশাখা বলে—বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে মা, শিগ্‌গির খেতে দাও।

খাবার তৈরিই থাকে। তবু যোগমায়া বলে—আগে মুখ-হাত-পা ধো, তবে তো খাবি।

কিন্তু বিশাখা মুখ-হাত-পা না ধুয়েই খেতে চায়। শেষকালে যোগমায়াকে নিজে বেসিনের কাছে গিয়ে বিশাখার মুখ-হাত-পা ভালো করে ধুইয়ে দিতে হয়।

বলে—শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে যেন এই রকম দুষ্টুমি কোর না। নইলে সবাই তোমার নিন্দে করবে—বলবে বউমা'র মা মেয়েকে কিছুই শেখায়নি।

বিশাখা বলে—সে যখন বিয়ে হবে তখন দেখা যাবে—

যোগমায়া বলে—ওই বড় দোষ তোমার। বড্ড তক্কো করো তুমি। তক্কো করা তোমার একটা বদ স্বভাব! শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে যখন তক্কো করবে তখন তোমার ঠাকুমা-মণি তো আমাকে দুষবে!

বিশাখা বলে—ঠাকুমা-মণি তো বুড়ী, ও কি আর চিরকাল বেঁচে থাকবে……?

যোগমায়া বলে—ছিঃ, অমন কথা বলতে নেই। মনে রেখো ঠাকুমা-মণি তোমার গুরুজন—গুরুজনদের নিন্দে করতে নেই—

বিশাখা তখনকার মত চুপ করে যায়, কিন্তু ততক্ষণে বিশাখার ইংরেজী সেখাবার মেমসাহেব এসে যায়। তখন বিশাখার শুরু হয়ে যায় লেখাপড়া। মেমসাহেব ভালো বাংলা বলতে পারেন না। ভাঙা হিন্দী আর ভাঙা বাঙলা দিয়ে কাজ চালিয়ে নেয়।

বিশাখা জিজ্ঞেস করেছিল—আপনাকে আমি কি বলে ডাকবো?

মেমসাহেবের নাম মিস্ মেরী। মিস্ মেরী বলেছিলেন—আমি তোমার আণ্টি। আমাকে তুমি আণ্টি বলে ডেকো—

সেই থেকেই এই বাড়িতে সবার কাছেই অ্যাণ্টি মেমসাহেব হয়ে গেল। যোগমায়াও তাকে আণ্টি বলেই ডাকতো। আণ্টি বাড়িতে এলেই তার জন্যে চায়ের ব্যবস্থা হতো। শুধু চা নয়, তার সঙ্গে থাকতো আরও অনেক কিছু খাবার।

কোথায় সেই সাত নম্বর মনসাতলা লেনের বাড়ি আর কোথায় এই তিন নম্বর রাসেল স্ট্রীটের বাড়ি। এ কি যোগমায়া কখনও কল্পনা করতে পেরেছিল? দুঃখের দিনে কে কল্পনা করতে পারে অদৃশ্য ভবিষ্যতের ঐশ্বর্যের সম্ভাবনা! গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদাহের দিনে কে-ই বা কল্পনা করতে পারে শ্রাবণের শ্যাম সমারোহের? কিংবা তার উল্টোটাও অনেক সময়ে ঘটে। রামায়ণের রাম কি কখনও কল্পনা করতে পেরেছিল যে একদিন তাকেই আবার অযোধ্যা ত্যাগ করে বনবাসে যেতে হবে! কিন্তু রাম যদি বনবাসে না যেত তাহলে কি রাবণ বধ হতো? আর রাবণ-বধ না হলে তো আমরা রামায়ণ পড়তে পেতাম না। তাই মনে হয়, রামায়ণ পড়বার সৌভাগ্য হবে বলেই হয়ত রামকে অযোধ্যা ছেড়ে বনবাসের যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছিল। তাই যোগমায়া তার মেয়ে বিশাখাকে নিয়ে এই সাত নম্বর রাসেল স্ট্রীটের বাড়িতে না এলে 'এই নরদেহ' উপন্যাসও হয়ত লেখা হতো না।

একদিন আণ্টি মেমসাহেব রাসেল স্ট্রীটের বাড়ি থেকে বাইরে বেরিয়েছে আর ঠিক সেই সময়েই সন্দীপ সেই বাড়িতে ঢুকছে। মাঝামাঝি রাস্তায় দেখা।

আণ্টি মেমসাহেব সন্দীপকে দেখেই বললে—গুড্ মর্নিং বাবু—

সন্দীপও বললে—গুড্ মর্নিং—

তারপর জিজ্ঞেস করলে—আপনার ছাত্রী কেমন পড়ছে?

আণ্টি মেমসাহেব বললে—ভেরি গুড, খুব ভালো—

তারপর বললে—আচ্ছা বাবু, একটা কথা, ইজ ইট এ ফ্যাক্ট যে বিশাখার নাকি

বিয়ে হয়ে যাবে ?

সন্দীপ বললে—হ্যাঁ, ইট্ ইজ্ এ ফ্যাক্ট !

আণ্টি মেমসাহেব বললে—কেন ? হোয়াই ? এত কম বয়সে কি বিয়ে হওয়া ভালো ? তা কার সঙ্গে বিয়ে হবে ?

সন্দীপ বললে—সে একজন মাল্‌টি মিলিওনিয়ারের সঙ্গে—একজন কোটিপতি সে !

আণ্টি মেমসাহেবের মুখটা শুকিয়ে গেল খবরটা শুনে ! বললে—তাহলে তো আমার চাকরিটাও চলে যাবে বাবু—

মাসে-মাসে দু'শো টাকা মাইনে। এ কি সোজা কথা ! তার দুঃখ হবার মত কথাই বটে !

সন্দীপ সান্ত্বনা দিয়ে বললে—সে বিয়ের এখন অনেক দেরি আছে। আগে বিশাখার বিয়ের বয়েস হোক ! এখন সে-কথা ভাবছেন কেন ?

আণ্টি মেমসাহেব কথাটা শুনে যেন একটু আশ্বস্ত হলো মনে-মনে !

হঠাৎ একটা গাড়ির ভেতর থেকে একজনের গলার আওয়াজ এল—হ্যাল্লো মেরী—

আণ্টি মেমসাহেব সেই গাড়িটার দিকে চেয়ে বললে—হ্যাল্লো—

তারপর আণ্টি মেমসাহেব সেই গাড়িটার দিকেই এগিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই গাড়ি থেকে নেমে এল গোপাল !

গোপালকে দেখে সন্দীপও অবাক হয়ে গেছে। আগের দিন গোপালকে দেখেছিল রাত্রের অন্ধকারের মধ্যে আর আজ খোলা আকাশের তলায় দিনের বেলা।

—কীরে সন্দীপ, তুই আমাকে চিনতে পারছিস না ? আমি গোপাল রে, গোপাল হাজরা—

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—তুই হঠাৎ ?

গোপাল বললে—হঠাৎ কেন ? আমি তো সব জায়গাতেই ঘুরে বেড়াই রোজ। এই মেরীর সঙ্গে তোর আলাপ হলো কী করে ?

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—ও-তো বিশাখাকে ইংরেজী শেখায়—

—বিশাখা ? বিশাখা কে ?

আণ্টি মেমসাহেব সব বুঝিয়ে দিলে। তারপর বললে—এই যে, এই তিন নম্বর বাড়িটায় আমার স্টুডেণ্ট থাকে

গোপাল জিজ্ঞেস করলে—তোর সঙ্গে এ-বাড়ির সম্পর্ক কী ?

সন্দীপ বললে—আমি বিডন স্ট্রীটে যে বাড়িতে থাকি, সেই বাড়ির ছেলের সঙ্গে এই বাড়ির মেয়ের যে বিয়ে হবে।

—সেই সৌম্যর সঙ্গে ? সৌম্য মুখার্জি ?

—হ্যাঁ !

আণ্টি মেমসাহেব বললে—সে একজন মাল্‌টি-মিলিওনিয়ার—

গোপাল বললে—মাল্‌টি-মিলিওনিয়ার হতে পারে, কিন্তু সে তো একটা ডিবচ্, একটা লম্পট। রোজ রাত্তিরে চৌরঙ্গী পাড়ার নাইট্-ক্লাবে মাল খায়, মেমসাহেবদের নিয়ে ফুর্তি করে। তুই তো সেদিন নিজের চোখেই সব দেখেছিস। তা কবে

বিয়ে হবে ?

সন্দীপ বললে—সে হবে অনেক দিন পরে। এখন তাদের টাকাতেই মেয়েটাকে এখানে রেখে লেখা-পড়া শেখানো হচ্ছে, আদব কায়দায় রপ্ত করানো হচ্ছে, গান-বাজনা শেখানো হচ্ছে। খুব গরীবের মেয়ে কি না—

আণ্টি মেমসাহেব বললে—আমি তাকে ইংরেজী শেখাই। বিয়ে হওয়ার পর আর কি সে আমার কাছে ইংরেজী শিখবে ? আমার দুশো টাকা মাইনের চাকরিটাও চলে যাবে। তখন কী হবে ?

গোপাল অভয় দিয়ে বললে—সে তোমায় ভাবতে হবে না, তোমার ভয় কী ? আমি তো আছি—

ততক্ষণে আণ্টি মেমসাহেব আর গোপাল গাড়িতে উঠে বসেছে। গোপাল গাড়ির জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করলে—তুই এখন কি করছিস ?

সন্দীপ বললে—বি-এ একজামিন দিয়ে এখন বসে আছি—

—এবার কী করবি ?

সন্দীপ বললে—কী আর করবো, যদি পাস করি তো—ল'পড়বো আর নয়তো একটা চাকরি-বাকরির চেষ্টা করবো—দেখা যাক কী হয়—

ততক্ষণে গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে। গোপাল সেই চলন্ত গাড়ি থেকেই বললে—মিছিমিছি তোর চাকরি করা, চাকরিতে কি টাকা আছে ? তাতে তোর জীবনটাই তো নষ্ট হয়ে যাবে রে—

তারপর গাড়িটা গোপাল আর আণ্টি মেমসাহেবকে নিয়ে সোজা পার্ক স্ট্রীটের দিকে ধোঁওয়া ছাড়তে ছাড়তে সোঁ করে বেরিয়ে গেল। সন্দীপ দাঁড়িয়ে চেয়ে দেখতে লাগলো গাড়িটার দিকে একদৃষ্টে—

অনেকক্ষণ চেয়ে চেয়ে দেখেও যেন তার বিস্ময়ের ঘোর কাটলো না। শুধু গোপালের জন্যে নয়, আণ্টি মেমসাহেবের জন্যে তার বিস্ময়ের অবধি রইল না। এদের দুজনের সম্পর্কের কথা ভেবেও তার বিস্ময়ের মাত্রা আরো বেড়ে গেল। গোপাল আণ্টি মেমসাহেবের সঙ্গে মেশবার সূত্রটা কোথা থেকে পেলে ? রহস্যটা তার কোথায় ?

আর টাকা ?

তা সত্যিই কি সবাই প্রাণপণে টাকার সন্ধানেই ছুটছে ? জীবনে টাকাটা কি এতই অপরিহার্য ? বিশাখার লেখাপড়া শেখাটা যেন প্রধান নয়। তার বিয়ে হয়ে গেলে আণ্টি মেমসাহেবের দু'শো টাকা মাইনের চাকরিটা চলে যাবে, সেইটেই যেন সব কিছু।

বেড়াপোতাতে যখন সন্দীপ থাকতো তখনও জিনিসটা এমন প্রকট হয়ে তার চোখে পড়েনি। সেই যুগে যখন হাজরা বুড়োর মৃতদেহটা দেখতে লোকের ভিড় হয়েছিল, তখন সকলেরই চোখে একটা প্রশ্ন জেগে উঠেছিল। প্রশ্নটা হচ্ছে—হাজরা বুড়োকে কে মেরে ফেললে ?

কেউ বললে—নিশ্চয়ই কোনও চোর হাজরা বুড়োর ঘরে ঢুকেছিল—

অন্য সবাই হেসে উঠেছিল সে কথায়। হাজরা বুড়োর আছে কী, যে চোর তার ঝুপড়িতে ঢুকবে ?

তাহলে হয়ত সাপে কামড়েছে।

তা অবশ্য সম্ভব! আশে পাশে জঙ্গল যেখানে আছে সেখানে সাপ থাকা অসম্ভব নয়। হয়ত ঝুপড়ির ফাঁক দিয়ে সাপ ঢুকে হাজরা বুড়োকে কামড়েছে।

তা যদি না হয় তো মৃত্যুর আর কী কারণ থাকতে পারে?

মনে আছে, সেদিন সবাই সেই দুর্ঘটনা নিয়ে অনেক মাথা ঘামিয়েছিল। কারোর কোন যুক্তি কেউ শোনেনি। ব্যাপারটা সকলের কাছে রহস্য হয়েই রয়ে গিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত চাটুজ্জে বাবুদের বাড়িতে কাশীনাথবাবুই সব শুনে বলেছিলেন—আমি জানি কে হাজরা বুড়োকে মেরেছে—কে তাকে খুন করেছে—

সন্দীপ জিজ্ঞেস করেছিল কে?

কাশীবাবু খানিকক্ষণ গম্ভীর হয়ে বলেছিলেন, সে কথা তোমরা কেউ বিশ্বাস করবে না—

কথাগুলো রহস্যময় বলে মনে হয়েছিল সন্দীপের কাছে, সে কালীবাবুর দিকে চেয়ে আরো উদগ্রীব হয়ে রইলো। জিজ্ঞেস করলে—বলুন না, কে? কে হাজরা বুড়োকে খুন করেছে?

কাশীবাবু বললেন—যারা মহাত্মা গান্ধীকে খুন করেছিল, তারাই হাজরা বুড়োকে খুন করেছে।

সন্দীপ তবু বুঝতে পারে নি। বলেছিল—কিন্তু মহাত্মা গান্ধীকে তো খুন করেছিল নাথুরাম গডসে তার তো ফাঁসী হয়ে গিয়েছে। সে এখানে হাজরা বুড়োকে মারতে আসবে কী করে?

কাশীবাবু বলেছিলেন—তুমি এই লাইব্রেরীর একটা বই পড়লে সব প্রশ্নের জবাব পেয়ে যাবে।

সন্দীপ জিজ্ঞেস করেছিল—কী বই?

কাশীবাবু বইটার নাম বলেছিলেন—'দি ট্রায়াল এ্যান্ড ডেথ্ অফ্ সোক্রেটিস্' —এই বইটা পড়লেই বুঝতে পারবে যে আমাদের এই পৃথিবী ভালো মানুষদের সহ্য করতে পারে না। The World does not tolerate absolute truth...

সন্দীপ জিজ্ঞেস করেছিল—হাজরা বুড়ো তো সৎ লোক ছিল না—

কাশীবাবু বলেছিলেন—কিন্তু হাজরা বুড়ো তো বদমাইশ লোকও ছিল না। এই পৃথিবীর নিয়মই হচ্ছে এই যে, হয় তুমি সোক্রেটিসের মত এ্যাবসোলিউট্ গুড্ ম্যান হও, আর না হয় তো মহারাজ নন্দকুমারের মত এ্যাবসোলিউট্ ব্যাড্ ম্যান হও। আমাদের মত যারা মাঝখানের মানুষ, তাদের নিয়ে ইতিহাসের কোনও মাথাব্যথা নেই—

সন্দীপ তখন অনেক অল্পবয়েসী ছেলে ছিল। এ-সব কথার মানে বোঝেনি সে তখন। কিন্তু কলকাতায় আসার পর থেকেই দেখতে পেলে পয়সা উপার্জন করার নানান ফন্দি-ফিকির, কেউ রাস্তার ওপর মোড়ের মাথায় ধুপ-ধুনো জ্বালিয়ে "বিশ্বশান্তি যজ্ঞ" করবার আবেদন জানিয়ে পয়সা উপায় করতে চেষ্টা করে, আবার কেউ অশৌচের পোথাক পরে গৃহস্থের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে মাতৃ-দায়ের অজুহাতে টাকা-পয়সা ভিক্ষে করে। টাকা-পয়সা উপায় করবার ফিকির আবিষ্কারের নমুনা দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়।

বারোর এ বিডন স্ট্রীটের বাড়ির সামনেই একদিন এই রকম একটা ঘটনা ঘটেছিল।

সন্দীপ তখন সকালবেলা তিন নম্বর রাসেল স্ট্রীটের বাড়িতে যাবার জন্য বেরিয়েছে, এমন সময় একজন দুঃস্থ লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

—বাবু, একটু দয়া করবেন ?

সন্দীপ চমকে উঠে দেখলে লোকটার দিকে। বয়েস বেশি নয়। মুখে খোঁচা খোঁচা কয়েকদিনের না কামানো দাড়ি, মাথার তৈলহীন চুল এলোমেলো। দেখলেই বোঝা যায় অশৌচের দায় সামলাতে লোকটা বিব্রত।

—আমার বাবা মারা গেছে, যদি কিছু সাহায্য করতেন—

স্বভাবতই সন্দীপের একটু দয়া হয়েছিল। পকেটে হাত দিয়ে দেখেছিল সামান্য কিছু খুচরো পয়সা ছাড়া আর কিছু নেই, সন্দীপ তার নিজের বাবাকে দেখতে পায়নি। বললে—দাঁড়ান একটু, আমি আপনাকে ঘর থেকে টাকা এনে দিচ্ছি—

বলে ভেতরে আসতেই মল্লিক-কাকা দেখতে পেয়েছেন। বললেন—কী গো, আবার ফিরে এলে কেন ?

সন্দীপ বললে—এক ভদ্রলোক ভিক্ষে চাইছে—

—ভিক্ষে ? কিসের ভিক্ষে ?

সন্দীপ বললে—ভদ্রলোকের বাবা মারা গেছে—আমার কাছে টাকা নেই, দু'টো টাকা দিতে পারেন ? পরে ও-মাসে আপনাকে দিয়ে দেব—

মল্লিক-কাকা বললেন—কই, দেখি কী-রকম ভদ্দরলোক—

বলে হাতের কাগজ-পত্র রেখে উঠে বাইরের রাস্তায় এলেন। লোকটা তখনও দাঁড়িয়েছিল ভিক্ষের আশায়। মল্লিক মশাইকে দেখেই লোকটা পালিয়ে যেতে চাইছিল। কিন্তু তার আগেই তিনি তাকে ধরে ফেলেছেন।

বললেন—তোমার বাবা মারা গেছে ? বছরে ক'বার তোমার বাবা মারা যায় শুনি ? বলো-বলো শীগগির—

লোকটা কাকুতি-মিনতি করতে লাগলো—আমাকে ছেড়ে দিন বাবু, আমি আর করবো না, আমাকে ছেড়ে দিন······

কিন্তু মল্লিক-মশাই তাকে ছাড়লেন না। ডাকতে লাগলেন—গিরিধারী, গিরিধারী—

গিরিধারী তখন তার ঘরের ভেতরে খাচ্ছিল। খেতে-খেতে সেই অবস্থাতেই দৌড়ে এসেছে। এসে ধরে ফেলেছে লোকটাকে।

মল্লিক-মশাই বললেন—তুমি কী করছিলে ঘরের ভেতর ? দেখতে পাওনা কে বাড়ির সামনে আসছে যাচ্ছে ?

গিরিধারী বললে—আমি খাচ্ছিলাম হুজুর,—

—খাওয়াটাই তোমার বড় হলো ? আমি যদি এখখুনি ঠাকুমা-মণিকে বলে দিই তখন কি তোমার নোকরি থাকবে ?

গিরিধারী লজ্জায় পড়লো। ভয়ও হলো। বললে—আমার গলতি হয়েগেছে সরকারবাবু আমি মাফি মাংছি······

তারপর লোকটা কী অপরাধ করেছে তা না জেনেই গলা টিপে ধরলে।

কিন্তু মল্লিক-মশাই বাধা দিয়ে বললেন—ছাড়-ছাড় গিরিধারী, গলা ছাড়···

গিরিধারী লোকটার গলা ছাড়তেই সে হুমড়ি খেয়ে পড়লো মল্লিক-মশাই-এর পায়ের ওপর। বলতে লাগলো—আমায় মারবেন না বাবু, মারবেন না আমাকে, আমি আর করবো না—

—জানিস, তোকে পুলিশ দিয়ে ধরিয়ে দিতে পারি—

তারপর বললেন—দাঁড়া, আমি আসছি—

বলে ঘরের ভেতরে গিয়ে একটা টাকা নিয়ে বেরিয়ে এলেন, টাকাটা লোকটার হাতে ফেলে দিয়ে বললেন—নে, রাখ, এবার ভাগ। আর যদি কখনও তোকে এখেনে দেখতে পাই তো পুলিশের হাতে তুলে দেব—যা, ভাগ—

লোকটা মুহূর্তের মধ্যে উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়িয়ে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। মল্লিক-মশাই আর সেখানে দাঁড়ালেন না, গিরিধারীও মুক্তি পেয়ে নিজের ঘরে ঢুকে পড়লো, সন্দীপও আস্তে-আস্তে মল্লিক-মশাই-এর ঘরে এসে ঢুকলো।

মল্লিক-মশাই বললেন—কী হলো, তুমি রাসেল স্ট্রীটে গেলে না?

সন্দীপ বললে—আপানাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করছি, আপনি লোকটাকে টাকা দিলেন কেন?

—টাকা? টাকা কেন দিলুম?

সন্দীপ বললে—হ্যাঁ, লোকটা তো জোচ্চোর। আপনি জেনেশুনে ওকে পুলিশে না দিয়ে একটা টাকা দিলেন?

মল্লিক-কাকা বললেন—দিলুম, কারণ ও গরীব, তাই······

—কিন্তু ও তো জোচ্চোর!

মল্লিক-কাকা বললেন—ও গরীব বলেই তো জোচ্চোর হয়েছে। ও যদি গরীব না হতো তাহলে তো আর জোচ্চোর হতো না—

সন্দীপ তবু মল্লিক-কাকার যুক্তিটা বুঝতে পারলে না—

মল্লিক-কাকা কথাটা বুঝিয়ে দিলেন, বললেন—গরীব হওয়াটা অভিশাপ হতে পারে কিন্তু সেটা তো অপরাধ নয়। ওকে গরীব করেছে কে? বলো, বলো কে ওকে গরীব করেছে?

সন্দীপ কথাটার জবাব দিতে পারলে না।

মল্লিক-কাকা নিজেই-নিজের প্রশ্নটার জবাব দিলেন। বললেন—আমরা।

—তার মানে?

মল্লিক-কাকা বললেন—তার মানে তুমি এখন বুঝবে না। অনেকে বুড়ো বয়সেও কথাটা বোঝে না, তুমি তাড়াতাড়ি যাও—

সন্দীপ তবু দাঁড়িয়ে রইলো স্থির হয়ে।

মল্লিক-কাকা বললেন - কী হলো? তুমি দাঁড়িয়ে রইলে যে? রাসেল স্ট্রীটে যাবে না?

সন্দীপ তবু নড়লো না সেখান থেকে।

মল্লিক-কাকা জিজ্ঞেস করলেন—কী হলো, তুমি কিছু বলবে আমাকে?

সন্দীপ বললে—হ্যাঁ—

—কী কথা, বলো?

সন্দীপ নিজেকে একটু ভালো করে সামলে নিয়ে বললে—ক'দিন আগে একটা ঘটনা ঘটেছে······

—কী ঘটনা? ভালো করে খুলে বলো না? বলতে অত ভয় পাচ্ছো কেন?

—না, ভয় পাচ্ছি না। শুধু ভাবছি কথাটা বলা ভালো হবে কি না—

মল্লিক-কাকা বিরক্ত হলেন সন্দীপের দ্বিধা দেখে। বললেন—তাহলে বোল না—

সন্দীপ বললে—না, আপনাকে বলাই ভালো। কিছুদিন আগে রাসেল স্ট্রীটের বাড়িতে মনসাতলা লেনের তপেশ গাঙ্গুলীবাবু এসেছিলেন, আমার সঙ্গে ওখানেই দেখা হয়ে গেল।

—তারপর?

সন্দীপ বললে—উনি আমাকে টাকা দিতে চাইছিলেন—

—টাকা? কীসের জন্যে টাকা?

সন্দীপ বললে—যাতে আমি আমাদের খোকাবাবুর সঙ্গে বিশাখার বিয়ের বদলে ওঁর মেয়ে বিজলীর সঙ্গে দেবার কথা ঠাকুমা-মণিকে বলি—

—তার মানে ঘুষ?

সন্দীপ যা ভয় করছিল তা-ই হলো। মল্লিক-কাকা কথাটা শুনে খুব রেগে গেলেন।

বললেন—এত বড় আস্পর্ধা ও ভদ্রলোকের? তোমাকে কি না ঘুষ দিতে চায়? মনে করেছে তোমাকে ঘুষ দিয়ে নিজের কাজ গুছিয়ে নেবে? তা তুমি কী বললে?

সন্দীপ বললে—আমি রাজি হইনি—আমি ওঁর টাকা ওঁর হাতেই ফিরিয়ে দিয়ে চলে এলুম—

—এ কতদিন আগেকার কথা?

সন্দীপ বললে—তা পনেরো কুড়ি দিন আগেকার ঘটনা—

—তা এতদিন বলোনি কেন?

সন্দীপ বললে—আমার ভয় করছিল—

—ভয়? কীসের ভয়? সত্যি কথা বলতে তোমার কীসের ভয়? বলো কীসের ভয়?

সন্দীপ বললে—ভয় ঠিক নয়, মানে মনে হয়েছে, যদি বললে আমার চাকরি চলে যায়—

—চাকরি চলে যাবার ভয়টাই তোমার কাছে বড় হলো? যার অধীনে তুমি চাকরি করছো, যিনি তোমার অন্নদাতা, তার ভালোটা আগে দেখবে, না তোমার চাকরিটা যাবার ভয়টা আগে দেখবে? কোন্‌টা বড় হলো তোমার কাছে?

সন্দীপ চুপ করে রইলো।

তারপর মল্লিক-কাকা বললেন—যাও, এখন যাও, তোমার দেরি হয়ে যাবে। ওখান থেকে ফিরে এলে কী করা উচিত তা ঠিক করা যাবে। যাও।

সন্দীপ চলে গিয়ে যেন নিষ্কৃতি পেলে। আবার তাড়াতাড়ি রাস্তায় গিয়ে মানুষের ভিড়ের মধ্যে তলিয়ে গেল।

ম্যাকডোনাল্ড সাহেব কোম্পানি বেচে দেবার সময়ে দেবীপদ মুখার্জীকে বলে গিয়েছিলেন—দেখ মুখার্জী, আমরা চলে যাচ্ছি বটে, কিন্তু মনে কোর না তোমরা শান্তিতে থাকতে পারবে।

দেবীপদ মুখার্জী জিজ্ঞেস করেছিলেন—কেন?

—কারণটা হলো এই, যুদ্ধের পর তোমাদের ঘরে ঘরে আবার অন্য এক রকম যুদ্ধ বাধবে, সে যুদ্ধ হবে গৃহযুদ্ধ। সেই গৃহযুদ্ধ মানে সেই সিভিল-ওয়ার-এর সময়ে আমাদের কথা তোমাদের মনে পড়বে।

—কেন?

—কেন বলবো? তার কারণ হচ্ছে তোমাদের দেশ মালটি-কালচারের দেশ। একদিন আমরাই এই দেশকে বন্দুকের ভয় দেখিয়ে এক দেশ করেছিলাম। কিন্তু আমরা চলে যাবার পর আবার তোমরা মালটি-কালচারের দেশে পরিণত হবে, তখন হিন্দুদের সঙ্গে মুসলমানদের আবার ঝগড়া শুরু হবে। আরব দেশ থেকে পেট্রোডলার আসবে মুসলমানদের হাতে আর আমেরিকা থেকে ডলার আসবে ইন্ডিয়া গভর্মেন্টের হাতে। আর রাশিয়াও তখন চুপ করে বসে থাকবে না। সে রুবল পাঠাবে এখানকার সি-পি-আই-এর লীডারদের হাতে। তখন পৃথিবীর ব্যালেন্স অব-পাওয়ার নষ্ট হয়ে গিয়ে অন্য এক দুরবস্থার সৃষ্টি করবে। তখন ইন্ডিয়ানদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যাবে ডলার-রুবল আর পেট্রোডলার হাতিয়ে নেওয়ার জন্যে। সো বি কেয়ারফুল; তখন তোমাদের এই বিজনেস চালানো মুস্কিল হয়ে যাবে। এই তোমাকে আমি বলে গেলাম মুখার্জী!

ম্যাকডোনাল্ড সাহেব যাবার পর দেবীপদ মুখার্জী তেমন কিছু বিপদের আঁচ পাননি। যেটুকু আঁচ পেয়েছিলেন তার সবটাই আস্তে আস্তে সত্য হতে লাগলো, ইন্ডিয়ার অত দিনকার বন্ধু চায়নার সঙ্গে ইন্ডিয়ার গন্ডগোল শুরু হয়ে গেল। তারপর ইন্ডিয়ার প্রথম প্রাইম মিনিস্টার জহরলাল নেহরুও মারা গেলেন।

একবার লন্ডনে গিয়ে দেখা হলো মিস্টার ম্যাকডোনাল্ড-এর সঙ্গে।

মিস্টার ম্যাকডোনাল্ড জিজ্ঞেস করলেন—কী হলো? আমি যা বলেছিলাম তা ঠিক ঠিক হলো তো?

দেবীপদ মুখার্জী বললেন—হ্যাঁ—

ম্যাকডোনাল্ড বললেন—আমরা আসলে সেই কায়দাই করেছিলাম ইন্ডিয়া ছাড়বার আগে। ওই কাশ্মীরই তোমাদের ইন্ডিয়ার গলায় কাঁটা হয়ে থাকবে চিরকাল। ওই কাশ্মীর ইস্যুটাই হবে ভবিষ্যতের যুদ্ধের প্রধান কারণ! দেখবে, তোমাদের আমরা শান্তি দেব না কোনওদিন।

আর শেষ পর্যন্ত তাই-ই হয়েছিল।

এরপর দেবীপদ মুখার্জী মারা গিয়েছিলেন, শক্তিপদ মাথায় তুলে নিয়েছিলেন

কোম্পানির ভার। তা তিনিও বেশিদিন বাঁচলেন না। তাঁর জায়গায় এলেন মুক্তিপদ। মুক্তিপদ মুখার্জী।

তা বলে ইতিহাস থেমে থাকেনি! ১৯৬৫ সালে যুদ্ধ হলো একটা। ওই ইংলণ্ড আর আমেরিকা থেকেই আর্মস্ কিনতে হলো ইণ্ডিয়াকে। সেদিন সোভিয়েট রাশিয়াই বন্ধুর মত ইণ্ডিয়ার দিকে তার মুক্তহস্ত বাড়িয়ে দিলে।

বাইরে যখন এই যুদ্ধ আর অস্ত্র আদান-প্রদানের লেন দেন চলছে, তখন দেশের মানুষ জিনিসপত্রের দর-দামের চাপে রুদ্ধশ্বাস হয়ে জীবন-যাত্রায় আর এক যুদ্ধের বলি হয়ে চলেছে। চারদিকে হরতাল, লক-আউট আর ক্লোজারের ঠেলায় বড় বড় প্রতিষ্ঠানের সদর দরজা বন্ধ হওয়ার জোগাড়।

তখন রাতারাতি কোথা থেকে সব পার্টি গজিয়ে উঠলো। তারা সবাই মানুষের ভালো করবার ব্রত নিয়ে নেতা হয়ে উঠলো। আগে যা ছিল একটা পার্টি তা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে তিন-চার পার্টিতে পরিণত হলো। আগে যেখানে ছিল একজন লীডার, এর পর ভাগাভাগি হয়ে হাজারটা লীডার। সকলের মুখেই একটা কথা, একটা স্লোগান—মালিকের জুলুম মানবো না মানছি না, মালিকের হুকুম শুনবো না শুনছি না। কোথা থেকে সব দেশের আর দশের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীর দল গজিয়ে উঠলো। রাতারাতি তারা নিজেদেরকে নেতার আসনে বসিয়ে মজুরের কল্যাণকামী হিসেবে আত্মপ্রচার শুরু করে দিলে। পেছন থেকে কে তাদের টাকা জোগাচ্ছে, কাদের টাকায় নেতাদের গাড়ি বাড়ি হচ্ছে, সে-প্রশ্ন একবারও কেউ করলে না। শুধু নেতাদের পেছনে পেছনে মিছিল করে স্লোগান দিয়েই তারা পরমার্থ লাভ করতে লাগলো।

আর তখন মুক্তিপদ কী করছেন?

'স্যাক্সবি মুখার্জী কোম্পানীর মালিক মুক্তিপদ মুখার্জী একবার একটা পার্টির লীডারকে টাকা দিচ্ছেন, আর একবার টাকা দিচ্ছেন অন্য পার্টির আর এক লীডারকে। সবাই আমার আপন, কেউ আমার পর নয়, আমি সকলের দলে। তার মানে আমি কারোর দলে নয়।

এই অবস্থার মধ্যে পড়ে যখন আর ফার্ম সামলাতে পারছেন না, তখন মনে পড়ে গেল সৌম্যর কথা। অফিসের আর যত কর্তা সবাই কর্মচারী। নামে পাঁচ হাজার টাকা মাইনে পাওয়া লোকও কর্মচারী। অথচ কাউকে বিশ্বাস নেই, সবাই চায় আরো টাকা। দেখতে দেখতে আমেরিকার ডলার, ইংলণ্ডের পাউণ্ড, ফ্রান্সের ফ্রাঁ, ইটালির লিরা, জাপানের ইয়েন সব দামে ভারি হতে লাগালো আর ইণ্ডিয়ার টাকার দাম হু-হু করে নামতে নামতে একেবারে ষোল আনার ষাট পয়সায় এসে ঠেকলো।

মুক্তিপদর তখন হুঁশ হলো। কল্ পেয়ে একদিন ডাক্তার এলো বাড়িতে।

ডাক্তার জিজ্ঞেস করলে—কী হলো আপনার?

মুক্তিপদ প্রেসারটা দেখাবার জন্যে বাঁ হাতটা বাড়িয়ে দিলেন।

প্রেসার মেপে ডাক্তার বললে—কী হলো, সিস্টোলিকটা এত বাড়ল কেন?

মুক্তিপদ মুখার্জী বললেন—কদিন থেকে ভালো ঘুম হচ্ছে না—

—কেন ঘুম হচ্ছে না? অফিসের কাজের ঝামেলা চলছিল বুঝি?

মুক্তিপদ মুখার্জী বললেন—কাজ থাকলেই ঝামেলা থাকবে। ঝামেলাও থাকবে

অথচ ঘুম আসবে, এই রকম একটা ওষুধ দিন আমায় ডাক্তার —

ডাক্তার বললে—একটু callous হবার চেষ্টা করুন—

—Callous হবো কী করে ?

ডাক্তার বললে—Callous যদি না হতে পারেন তাহলে দিন-কতক কোথাও ঘুরে আসুন। অবশ্য এটা psychological pressure. যাকে আমরা বলি functional pressure. এর একমাত্র ওষুধ হলো সব কিছু ভুলে যেতে চেষ্টা করা—

মুক্তিপদ মুখার্জী বললেন—ভুলতে চেষ্টা করব কী করে ? এই হাজার হাজার লোক আমাদের কনসার্নে, তাদের কথাও তো আমাকে ভাবতে হয়—

—তা হলে একটা করে 'ক্যাম্পোজ' খান—

মুক্তিপদ মুখার্জী বললেন—আমার ভাইপোটা যদি মেজর হতো তাহলে তার ওপরে কিছু কাজের ভার ছেড়ে দিয়ে —

—তা হলে তা-ই করুন মিস্টার মুখার্জী আপনার বয়েস হচ্ছে, এখন থেকে আস্তে আস্তে সব কিছুর দায়িত্ব ছাড়তে শুরু করা উচিত—

তা, এই-ই হলো সূত্রপাত। অফিসের কাজে কন্টিনেন্টে চলে গেলেন। সব জায়গাতেই বিজনেসের কথা। কেবল টাকা-আনা-পাই আর পাউন্ড-শিলিং-পেন্স। সারাজীবন শুধু এই-ই করে এসেছেন। ইন্ডিয়ার বাইরে গিয়েও তাই-ই করলেন। তারপর একদিন রাত্রে আর ঘুমই এল না। মাথাটা খুব ধরে রইলো কদিন ধরে, ভাবলেন ইন্ডিয়ায় ফিরে যাবেন! কিন্তু তখনও অনেক কাজ বাকি। তারপর গেলেন জার্মানী। সেখান থেকে স্টেটস্। মাথা ধরাটা ছাড়লো না। ডাক্তারকে দেখালেন। এক গাদা ওষুধ খেতে দিলে ডাক্তার। কিন্তু এমন করে আর কতদিন চলবে !

তাই ইন্ডিয়াতে এসেই চলে এলেন বিডন-স্ট্রীটের বাড়িতে। মা'র কাছে। কিন্তু মা-ও যেন কেমন হয়ে গেছেন। যেন পর-পর ভাব, খানিকক্ষণ বসেই আবার বেলুড়ের বাড়িতে। কিছুছু ভালো লাগলো না।

নন্দিতা কাছে এল। বললে—কী হলো ? আজ এখুনি ফিরে এলে যে ?

মুক্তিপদ বললেন—আজকে বিডন স্ট্রীটের বাড়িতে গিয়েছিলুম—

—সে কী ? হঠাৎ ?

—হঠাৎই গেলাম মার কাছে।

নন্দিতা বললে—বুড়ী আমার নামে খুব লাগালো তো ?

—হ্যাঁ সেই একই পুরনো কথা !

নন্দিতা বললে—আমার নামে গালাগালি শুনতে তোমারও খুব ভালো লাগলো বুঝি ?

—না, আমার খুব মাথা ধরে গেল।

নন্দিতা বললে—বেশ হয়েছে। খুব হয়েছে, রাইটলি সার্ভড—আমি তোমাকে বলেছি বুড়ীর কাছে যেও না, তবু তুমি গেলে। আমার গালাগালি শুনতে তোমার ভালো লাগে, তাই ওখানে গিয়েছিলে—

—না, না, তা নয় !

—তা নয় তো গেলে কেন ? ওখানে গেলেই তো তোমার বরাবর মাথা ধরে—

এতো আজ নতুন নয়। অনেক শাশুড়ী দেখেছি বাবা কিন্তু তোমার মা'র মতন অমন শাশুড়ী আর কেউ কখনো কোথাও দেখেনি। বুড়ি আর কতদিন বাঁচবে বলো তো! আর কতদিন জ্বালাবে আমাদের?

মুক্তিপদ বললেন—জানো, একটা নতুন কথা শুনে এলাম মা'র কাছ থেকে। সৌম্যর নাকি বিয়ে দিচ্ছে মা—

—সৌম্যর বিয়ে! কবে? কোথায়? আমাকে জ্বালাতে পারেনি বলে আবার কাকে বাড়িতে এনে জ্বালাবে?

মুক্তিপদ বললেন—সে এক অদ্ভুত কাণ্ড!

—কী রকম?

—মা বললে আগেকার কোনও বউকে পছন্দ হয়নি বলে এবার নিজে পছন্দ করে বউ আনছে—

নন্দিতা বললে—আবার কার কপাল পুড়বে কে জানে, আহা···

· না, এবার একেবারে গরীব ঘর থেকে বউ আনছে। শুনলুম মেয়ের বাপ নেই, মা বিধবা। কাকার সংসারে গলগ্রহ। কাকা রেলের কেরানী—

নন্দিতা কিছু বলবার আগেই মুক্তিপদ বললেন—আমি বললুম আমার একটা পার্টি আছে, সে মিডল্-ইস্টে পাঁচশো কোটি টাকার অর্ডার সিকিওর করেছে, তার মেয়ের সঙ্গে সৌম্যর বিয়ে দিলে আমরা প্রায় থার্টি পার্সেন্ট অর্ডার পেতে পারি. তা মা শুনে রেগে উঠে বললে—তুই আমায় টাকার লোভ দেখাচ্ছিস?···বোঝ কথা। আমি তো আমাদের ফার্মের ভালোর জন্যেই বলেছি, তা ছাড়া মেয়ের কাকা আবার একজন লেবার-ইউনিয়নের লীডার। আজকালকার যুগে একসঙ্গে অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা আর অন্যদিকে লেবার-ইউনিয়নের কো-অপারেশন, এটা কি কম কথা! কিন্তু মা তো বুঝতে চাইলে না, আমি কী বলবো বলো তো? আমি কত ব্ল্যাক টাকা পেয়ে যেতুম, তাতে মারও কত সুবিধে হতো। সেকথা বলতেই মা আমার ওপর ক্ষেপে গেল। বুড়ো হলে বোধহয় মানুষ ওই রকমই হয়, তখন আর নিজের ভালোটা কেউ বুঝতে পারে না—

নন্দিতা বললে—তোমার মা তো বরাবরই ওই রকম! এখন না হয় মা বুড়ী হয়েছে, কিন্তু আমি আগেও তো দেখেছি, চিরকালই তো এক-বগ্‌গা মানুষ। অনেক পাপ করলে তবে মানুষের অমন শাশুড়ী হয়। শাশুড়ী নয় তো যেন খাণ্ডারনী ··আমাকে কী বুড়ী কম জ্বালিয়েছে! অমন শ্বাশুড়ীর ক্ষুরে ক্ষুরে নমস্কার—

মুক্তিপদ বললেন—থাক্ গে কাল থেকে আমি সৌম্যকে অফিসে আসতে বলেছি-

—অফিসে আসতে বলেছ? কেন?

—কেন আবার? এখন তো ও মেজর হয়েছে। ও-ও তো একজন ডাইরেক্টার। ও অফিসে এলে আমি একটু রিলিফ পাই।

—তাহলে তো নাতির কাছ থেকে বুড়ী অফিসের হাঁড়ির সব খবর পেয়ে যাবে!

মুক্তিপদ বললে—তা পেলে পাবে! আমি আর তার কী করবো!

নন্দিতা কী যেন বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই কাছের টেলিফোনটা বেজে উঠলো। মুক্তিপদ টেলিফোনে কার সঙ্গে যেন কথা বলতে লাগলেন। তারপর

বললেন—আচ্ছা, আমি এখনি যাচ্ছি—

নন্দিতা জিজ্ঞেস করলে—এখনি আবার বেরোবে নাকি?

—হ্যাঁ, নাগরাজন ডেকেছিল—

নন্দিতা বললে—আবার কী কাজ?

মুক্তিপদ বললেন—ওই ইনকাম-ট্যাক্সের একটা চিঠি এসেছে, জরুরী, সেই জন্যে···

নন্দিতা বললে—ওই ইনকাম-ট্যাক্সই তোমায় খেয়ে ফেলবে—

মুক্তিপদ বললেন—কী করবো বলো? ওদের এত টাকা খাওয়াচ্ছি, তবু ওদের পেট কিছুতেই ভরছে না। সেই জন্যেই তো সৌম্যকে অফিসে নিয়ে আসছি—আমি আর পারছি না—

বলে আর সেখানে দাঁড়ালেন না, তাড়াতাড়ি নিচেয় এসে গাড়িতে উঠলেন। মুক্তিপদর জীবন মানেই যেন গাড়ি। মুক্তিপদর সমস্ত জীবনটা যেন গাড়ির মতই গড়িয়ে চলেছে। কবে যে তাঁর মাটির ওপর পা পড়েছে তা তাঁর মনেই পড়ে না। যদি মুক্তিপদ কোনও দিন মারা পড়ে তাহলে বোধহয় ওই হাওয়াই জাহাজে, আর নয় তো নিজের মোটর গাড়ির ভেতরেই সে মরে পড়ে থাকবে। জীবনটা মোটা টাকার ইনসিওর করা আছে, আর প্লেনে চড়ে উড়ে যেতে যেতে যদি দম আটকে বা এ্যাক্সিডেন্টে মারা যায় তাহলে রিস্ক কভার করা আছে মোটা টাকায়। সেটা বছর বছর রিনিউ করা হয়। তবু সব সময় একটা ভাবনা থাকে। যদি জিজ্ঞেস করা যায়—কীসের ভাবনায়? তার উত্তরে মুক্তিপদ কিছুই বলতে পারবেন না। টাকার ভাবনা? কিন্তু তা তো নয়।

একবার প্লেনে উড়তে উড়তে সামনের র‍্যাক থেকে একটা পত্রিকা নিয়ে এসে সময় কাটাবার জন্যে বসেছিল। তখন লাঞ্চ হয়ে গিয়েছে। সবাই নিজের নিজের সীটের পেছনে হেলান দিয়ে একটু আরাম করছে। হঠাৎ একটা পাতার ওপর চোখ পড়তেই দৃষ্টিটা সেখানেই আটকে গেল।

একটা কবিতা লেখা রয়েছে একটা ছবির তলায়। ছবিটার ভেতরে একজন বুড়ো মানুষ চুপ-চাপ ইজি-চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছে। ঘড়িতে তখন রাত দু'টো কিন্তু ঘুম আসছে না লোকটার।

মুক্তিপদ একদৃষ্টে লোকটার দিকে চেয়ে দেখলেন। ব্যাঙ্কে লোকটার অনেক টাকা, ঘরের ভেতরে হরেক রকমের দামী ফার্নিচার। বিলাস-ঐশ্বর্যের কোন অভাব নেই, তবু ঘুম আসছে না।

কিন্তু কেন ঘুম আসছে না, তার কারণ ছবিতে কোথাও লেখা নেই—শুধু নিচেয় বড়-বড় অক্ষরে টানা হাতের লেখায় এই কথাগুলো রয়েছে—

By money one can buy bed but not sleep
By money one can buy books but not brains
By money one can buy food but not appetite
By money one can buy finery but not a beauty
By money one can buy house but not a home
By money one can buy medicine but not health
By money one can buy luxuries but not culture

By money one can buy amusement but not happiness
By money one can buy religion but not salvation.

এইখানেই কবিতাটা শেষ হয়েছে।

মুক্তিপদ সেই উড়ন্ত প্লেনের মধ্যে বসেই কথাগুলো ভাবতে লাগলেন অনেকবার করে। সত্যিই তো, টাকা দিয়ে দামী বিছানা কিনতে পাওয়া যায়, কিন্তু ঘুম? ঘুম কি টাকা দিয়ে কেউ কিনতে পারে? টাকা দিয়ে ওষুধ কিনতে পারে সবাই, কিন্তু স্বাস্থ্য? স্বাস্থ্য কি কেউ টাকা দিয়ে কিনতে পারে? ধর্মও টাকা দিয়ে কিনতে পারা যায়, কিন্তু মুক্তি? মুক্তি কোন্ বাজারে কিনতে যাবো?

পড়তে-পড়তে মুক্তিপদর মনে হয়েছিল যে তাঁর শুধু টাকাই হয়েছে, তাঁর শুধু বয়েসই বেড়েছে, জ্ঞান তাঁর কিছুই হয়নি, কিন্তু এ-বয়েসে এ-জ্ঞান হয়ে তাঁর লাভ কী হলো? আরো আগে এ কবিতাটা পড়লে হয়ত তাঁর উপকারই হতো, কিন্তু এখন বড় দেরি হয়ে গেছে।

গাড়িতে যেতে-যেতে মুক্তিপদর বহুদিন আগেকার পড়া এই কবিতাটা মনে পড়লো। গাড়ি নিয়ে যখন ডালহৌসী স্কোয়ারের অফিসে পৌঁছুলো তখন সামনে দেখেন তারা সবাই সেলাম করতে থাকে মাথা নিচু করে।

এই সেলামটাই তাঁর জীবনে কাল হয়েছে। আগে এই সেলামগুলো তাঁর খুব ভালো লাগতো। এই সেদিনও সেলাম পেয়ে তিনি খুশী হয়েছেন। কিন্তু আজ বিডন স্ট্রীটের বাড়িতে গিয়ে মা'র সঙ্গে কথা বলার পর ওই অনেকদিন আগে পড়া কবিতাটার লাইনগুলো মনে পড়তেই সব কিছু বিরস ঠেকলো, যে-টাকায় কোনও দামী জিনিস কিনতে পাওয়া যায় না, কেন তাহলে তিনি সেই তুচ্ছ টাকার পেছনে ছুটে বেড়াচ্ছেন?

নাগরাজন কাগজ-পত্র নিয়ে তৈরিই ছিল। মুক্তিপদ ঘরে ঢুকতেই সে দাঁড়িয়ে উঠলো। মুক্তিপদ বসতে তবে সে বসলো।

মুক্তিপদ চিঠিটা দেখতে দেখতে জিজ্ঞেস করলেন—কানুনগো দেখেছে?

—হ্যাঁ। তিনি দেখে বলেছেন যে এ টাকাটা আমাদের পে করতে হবে—

কানুনগো মানে বিজয়েশ কানুনগো। স্যাক্সবি মুখার্জী এ্যান্ড কোং-এর ট্যাক্স-এ্যাডভাইজার। ইন্ডিয়ার একজন নামকরা ট্যাক্সেশন এক্সপার্ট।

মুক্তিপদ বললেন—একবার টেলিফোনে ডাকো তো কানুনগোকে—

কানুনগোকে ডাকা হলো। মুক্তিপদ বললেন—হ্যাঁ, তুমি নাকি বলেছ যে এই বারো লাখ তিরিশ হাজার টাকাটা আমাদের পে করতে হবে?

ওধার থেকে কানুনগো বললে—হ্যাঁ স্যার, পেমেণ্ট করতে হবে—

মুক্তিপদ জিজ্ঞেস করলেন—কেন? এক্সপেন্ডিচার দেখানো যায় না?

—তাহলে ব্যাক-ডেট দিয়ে সতেরো লাখ টাকার ভাউচার সাবমিট করতে হবে। ওই এ্যামাউণ্টের ভাউচার সাবমিট করলে আমরা পুরো রিলিফ পেয়ে যাবো।

মুক্তিপদ রেগে গেলেন। বললেন—তা সেই কথাটা নাগরাজনকে বলবে তো! আমি বাইরে গিয়েছিলুম বলে কি তোমাদের দিয়ে কিছুই হবে না? এ-ব্যাপারটাও কি ম্যানেজিং ডাইরেক্টরকে দেখতে হবে? তাহলে তোমাদের রাখা হয়েছে কেন?

কানুনগো চুপ! এ-কথার কোনও জবাব নেই তার মুখে!

মুক্তিপদ বললেন—ঠিক আছে, ব্যাক-ডেটেড ভাউচার সাবমিট করা হচ্ছে—এ নিয়ে যেন আর ফারদার কোনও চিঠি না আসে, দেখো—

বলে রিসিভারটা রেখে দিলেন মুক্তিপদ। আর তারপর কয়েকটা জায়গায় টেলিফোন করতে লাগলেন। সতেরো লাখ টাকার ভাউচার যোগাড়ের সব ব্যবস্থা হয়ে গেল দু'ঘণ্টার মধ্যে। সিমেণ্ট, স্টোন চিপস, বালি, লোহার রড, এমনি কয়েক টন মাল কেনার এবং পেমেণ্ট করার পাকা রসিদ। আর তার সঙ্গে আছে মোটা টাকার লেবার-চার্জ। সে-চার্জের কোনও ভাউচার দেখবার দরকার নেই ইনকাম-ট্যাক্স অফিসকে। দু'ঘণ্টার মধ্যে একটা ম্যাজিক দেখানো হয়ে গেল খাতা-কলমে। যে-বিল্ডিং কখনও ভাঙা হয়নি, কাগজে-কলমে দেখানো হয়ে গেল যে সেই বিল্ডিংই পুরনো হয়ে যাওয়ার জন্যে পুরো ভেঙে ফেলে আবার সেই জমির ওপর নতুন বিল্ডিং তৈরি হয়েছে সতেরো লাখ তিরিশ হাজার টাকা খরচ করে।

এও ট্যাক্সেসান-এক্সপার্টের এক আজব ভেল্কি।

মুক্তিপদ সেদিন অফিসের আর কোনও জরুরী কাজে মাথা বসাতে পারলেন না। সিমেণ্ট স্টোন-চিপস, বালি আর আয়রন-রডের ডীলাররা নিজেরা এসে পুরনো তারিখ দিয়ে ভাউচার লিখে দিয়ে গেল, সঙ্গে রেভেন্যু-স্ট্যাম্পের ওপর তাদের সইও করে দিলে। আর তারপর যে টাকাটা তারা বাঁ হাতে পকেটে পুরে নিলে, তার কোনও হিসেব কারোর লেজার বইতে লেখা রইলো না। এমনি করেই বারো লাখ টাকার ট্যাক্স-ডিম্যান্ড নোটিশ সতেরো লাখ তিশ হাজার টাকার খরচের ভুয়ো দলিল দেখিয়ে পুরোপুরি নাকচ হয়ে গেল।

সারাদিন কারো লাঞ্চ করা হলো না।

বাড়ি থেকে নন্দিতা একবার টেলিফোন করেছিল তাগাদা দিয়ে। বলেছিল—কী হলো? তুমি লাঞ্চে আসবে না?

মুক্তিপদ বলেছিলেন—না—

—সে কী? তোমার শরীর খারাপ হয়ে যাবে যে?

মুক্তিপদ তবু বলেছিলেন—আমার এখন মরার সময় নেই, আমাদের এখানে কারো লাঞ্চ হয়নি আজকে, সময় পেলে হোটেলে লাঞ্চ সেরে নেব সবাই মিলে। তুমি খেয়ে নিও, আমার জন্যে বসে থেকো না—

ঘড়িতে তখন রাত আটটা তখনই মুক্তিপদ সারাদিনের মধ্যে প্রথম একটা সিগারেট ধরালেন। ধরিয়ে বুক খালি করে লম্বা একটা ধোঁওয়া ছাড়লেন। মুক্তিপদর মনে হলো, তাঁর যেন এক ফুঁয়ে দশ বছর বয়েস কমে গেল। আঃ, কী আরাম! অথচ এ ব্যাপারটায় গাফিলতি করলে কোম্পানির বারো লাখ টাকার বরবাদ হয়ে যেত!

নাগরাজন-এরও সারাদিন খুব ঝামেলা গেছে, সেও সারাদিন স্যারের সঙ্গে কাজ করেছে। কানুনগো কয়েক ঘণ্টা থেকে এক ক্লায়েণ্টের কাজে চলে গিয়েছিল। সে কারো হোল-টাইম এমপ্লয়ী নয়। তার কাজ পার্টিকে ট্যাক্সেসন বিষয়ে এ্যাডভাইস দেওয়া। দরকার হলে ওপর ওয়ালাদেরও সে হাত করতে পারে। তাকে তার ফিস দিলে সে ট্যাক্সদাতাদের হাতে আকাশের চাঁদও পাইয়ে দিতে পারে।

—একটু ড্রিঙ্ক করবে নাগারাজন?

নাগরাজন কী করবে কী বলবে হঠাৎ বুঝে উঠতে পারলে না। স্যারকে এ-রকম অবস্থায় সে আগে আর কখনও দেখেনি। বললে—স্যার, আপনি বলেছেন, আমি ড্রিংক করতে পারি। কিন্তু আপনার যে লেট হয়ে যাবে বাড়ি যেতে স্যার—

মুক্তিপদ বললেন—তা হোক, এখন আমার বাড়ি যেতে ইচ্ছে করছে না, তোমার যদি বাড়ি যেতে লেট হয়ে যায় তাহলে অবশ্য·····

নাগরাজন বললে—না-না, আমি আপনার কথা ভেবে বলছি—

নাগরাজন ভালো করে স্যারের দিকে চেয়ে দেখলে। কত বছর থেকে সে মিস্টার মুখার্জীকে দেখে আসছে। কিন্তু কোনও দিন মানুষটাকে ভালো করে চিনতে পারেনি। এক একবার মনে হয়েছে মানুষটা খুব স্বার্থপর, আবার কখনো মনে হয়েছে উদার।

মুক্তিপদ বললেন—জানো নাগরাজন, এবার ওয়াশিংটনে গিয়ে খুব অসুখ হয়েছিল আমার, তাই এক ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলুম। সেই ডাক্তার আমাকে পরীক্ষা করে কী বললে জানো? আমার নাকি কোনও অসুখই নেই। যা-কিছু আমার অসুখ, সবই নাকি আমার মনের·····

নাগরাজন বললে—ঠিকই তো, সবই আপনার মনের—

—তুমিও বলছো আমার অসুখটা মনের?

—হ্যাঁ স্যার, আপনার কোনও অসুখই নেই।

মুক্তিপদ বললেন—আমার কী মনে হয় জানো নাগরাজন? আমার মনে হয় চিরকাল তো আমি বাঁচবো না, চিরকাল কেউই বাঁচে না। একদিন না একদিন সবাইকে এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতেই হয়, তাহলে? তাহলে আমি চলে গেলেও কেউ তো আমাকে মনে রাখবে না। আমাকে তো সবাই ভুলে যাবে—

নাগরাজন এ-কথার কোনও উত্তর দিলে না। আর তার উত্তর দেবার আছেই বা কী যে উত্তর দেবে?

মুক্তিপদ বললেন—ডাক্তার শেষকালে আমাকে কী বললে জানো নাগরাজন?

—কী স্যার?

—বলল আমাকে টাকার চিন্তা বন্ধ করতে হবে। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কখনও টাকার চিন্তা করতে পারবো না।···কিন্তু টাকার কথা না ভাবলে আমি সারাদিন কী নিয়ে ভাববো? টাকার কথা যদি না ভাববো তো আমার এই কোম্পানীতে যারা কাজ করছে তাদের কী করে পেট চলবে? কোম্পানীর টাকা আমদানি হলে তবেই তো আমি তাদের মাইনে দিতে পারবো। এই দেখ না, এতদিন পরে আজ বিডন স্ট্রীটে মা'র সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। আমার মা'ও আমাকে টাকার কথা ভাবতে বারণ করলে। অথচ দেখ আজ সকালবেলাই তোমরা একটা ইনকাম ট্যাক্সের ডিম্যান্ড-নোটিশ পেয়ে আমাকে ডেকে পাঠালে আর এমন ভাবিয়ে তুললে যে আজকে আমারও খাওয়া হলো না আর তোমারও খাওয়া হলো না—

নাগরাজন এ-কথারও কোনও উত্তর দিলে না। শুধু সামনে বসে চুপ করে শুনতে লাগলো।

মুক্তিপদ আবার বলতে লাগলেন—এই তো এখন বাড়ি যাবো, সেখানে গিয়েও আমাকে কেবল ওই টাকার কথাই শুনতে হবে। বাড়িতে তো লোকে শান্তিতেই

কাটাতে চায়। টাকা ছাড়া তো অন্য কথা শুনতেও ভালো লাগে। কিন্তু আমার স্ত্রীর মুখেও সেই একই কথা। কেবল টাকা-টাকা আর টাকা। অথচ, দেখ, আমার তো টাকার অভাব নেই। নিজের ফ্যামিলির জন্যে কোনওদিন আমি টাকার কোন অভাব রাখিনি। যে যা চেয়েছে তাই-ই আমি তাকে দিয়েছি। কিন্তু আমি? আমি লোকটার কথা বাইরের তোমরাও যেমন কেউ ভাবো না, তেমনি বাড়ির কেউই ভাবে না—

হঠাৎ আবার টেলিফোন এল।

নাগরাজন রিসিভারটা তুললে—কে?

অপারেটার বললে—মিস্টার মুখার্জীর বাড়ির থেকে রিং এসেছে—

মুক্তিপদ রিসিভারটা নিয়ে বললেন—হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি এখনি আসছি—

টেলিফোন রিসিভারটা দেখে দিয়ে মুক্তিপদ বললেন—দেখলে তো নাগরাজন? দেখলে তো? এই আমার লাইফ। এবার বাড়ি যেতেই হবে—

বলে স্যার উঠলেন, বললেন—জানো নাগরাজন, এই ক্যালকাটায় প্রথম ইমপোর্টেড গাড়ি আসে আমাদেরই বাড়িতে, প্রথম ইনভার্টার আসে আমাদেরই বাড়িতে, পৃথিবীতে যা কিছু লাকসারিজ বাজারে নতুন এসেছে তা সবই কলকাতার প্রথম আসে আমাদেরই বাড়িতে। আমাদের এত টাকা। কিন্তু আমার বাবা দেবীপদ মুখার্জী যখন মারা গেছেন তখন তাঁর বয়েস ছিল পঁয়তাল্লিশ বছর, আমার দাদা যখন মারা গেছেন তাঁর বয়স ছিল পঁচিশ বছর, আর আমি? আমার বয়েস এখন সাঁইত্রিশ, আমি আর ক'দিন বাঁচবো? টাকাই আমাদের সকলকে মেরেছে, এবার টাকা হয়ত আমাকেও মারবে—

ড্রাইভার নিশ্চয় তৈরিই ছিল।

মুক্তিপদ গাড়িতে উঠে বললেন—নাগরাজন, এতক্ষণ আমি তোমাকে কি বলেছি মনে নেই। তবে ফরগেট্ ইট্ অল্, সব ভুলে যাও—

ড্রাইভার গাড়ি ছাড়তে যাচ্ছিল। হঠাৎ মুক্তিপদর মনে পড়ে গেল আসল কথাটা। বললেন—হ্যাঁ, একটা কথা তোমাকে বলতে ভুলে গিয়েছি নাগরাজন, কাল থেকে আমার দাদার ছেলে এস মুখার্জী আমাদের অফিসের ডেপুটি ডাইরেক্টর হিসেবে জয়েন করছে। আমার পাশের ঘরটা খালি করে রাখবে। সব এ্যারেঞ্জমেন্ট যেন ঠিক থাকে। একটা টেলিফোনের লাইনের এক্সটেনশনের ব্যবস্থাও যেন সকালেই হয়ে যায়। আর একটা নেম-প্লেট, তাতে লেখা থাকবে এস মুখার্জী, 'ডেপুটি ডাইরেক্টর', ও-কে?

নাগরাজন বললে—ও-কে স্যার—

কথা শেষ হওয়ার আগেই গাড়িটার ইঞ্জিন আর্তনাদ করে উঠলো আর তারপরেই মিস্টার মুখার্জী অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

তিন নম্বর রাসেল স্ট্রীটের বাড়িতে বড় দেরীতে ভোর হয়। মনসাতলা লেনের বাড়িতে হতো সকাল সকাল। রাত্রে ভালো করে ঘুম হোক আর না হোক, অন্ধকার থাকতে থাকতে উঠতে হতো যোগমায়াকে। তখন বিশাখাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হতো বাবুঘাটের গঙ্গায়। সেখানে গিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব স্নান করে বাড়ি ফিরতে হতো। আগে ছিল মেয়েকে দিয়ে ব্রত করানো। পরে সেটা যদিও বিজলী বিশাখা দুজনকেই বাড়িতে করানোর ব্যবস্থা হয়েছিল, কিন্তু দুধ আনা, রান্না করা, দেওরের জন্যে ঠিক সময়ে ভাত দেওয়া, সারাদিন তার কাজের অন্ত ছিল না।

কিন্তু এই রাসেল স্ট্রীটের বাড়িতে? বাহিরের কাজকর্ম সবই করে শৈল। মেয়ের জন্যে যারা পড়াতে আসে তাদের মাইনে যদিও আসে বিডন স্ট্রীটের বাড়ি থেকে কিন্তু তাদের জলযোগের ব্যবস্থা করতে হয় যোগমায়াকেই। আর পড়ায় কি একজন?

আণ্টি মেমসাহেব আসে ভোরবেলায়। সে বিশাখাকে শেখায় ইংরিজি। তারপরে যখন আণ্টি মেমসাহেব চলে যায় তখন বিশাখাকে তৈরী হয়ে নিতে হয় স্কুলে যাবার জন্যে। স্কুলে নিয়ে যাবার জন্যে তখন বিডন স্ট্রীটের বাড়ি থেকে গাড়ি নিয়ে এসে একতলার পোর্টিকোর তলায় অপেক্ষা করে ড্রাইভার। আর তারপর বিকেল তিনটের সময় আসে অংক শেখাবার দিদিমণি। বিকেল চারটের সময় সে চলে গেলে আসে নাচের মাস্টার। সেও একজন মহিলা। সঙ্গে আসে তবলা বা ঢোলক বাজাবার একটা ছেলে।

বিশাখা যাতে ঠিকমত লেখা-পড়া শেখে, ঠিকমত নাচ শিখতে পারে, তার জন্যে ঠাকমা-মণির চেষ্টার বা টাকা খরচ করবার কোনও কার্পণ্য নেই।

মাঝে মাঝে বিশাখা ক্লান্ত হয়ে পড়তো। তখন তার ঘুম পেতো। সে যোগমায়ার কোলের ভেতর মুখ লুকিয়ে চোখ বুজিয়ে ঘুমোতে চাইত।

যোগমায়া বলতো—কীরে ঘুমোচ্ছিস নাকি?

বিশাখা বলতো—আমার বড় ঘুম পাচ্ছে মা—

যোগমায়া বলতো—না, এখন ঘুমিও না, এখনি তোমার অংকের দিদিমণি আসবে—

বিশাখা বলতো—দিদিমণি এলে তুমি বলে দিয়ো আমি ঘুমিয়ে পড়েছি—

যোগমায়া বলতো—ছি, অমন কথা মুখে আনতে নেই, জানো না তোমার জন্যে ঠাকমা-মণি কত টাকা খরচা করছেন। ভালো করে লেখা-পড়া করলে তবে তো তোমার বর তোমাকে ভালোবাসবে। কত ভালো বর হচ্ছে তোমার বলো তো? অমন বর কারো কপালে আগে হয়েছে?

বিশাখা কিছু জবাব দিত না কথার, তেমনি মায়ের কোলের ভেতরে মুখ গুঁজেই হয়ত অদৃশ্য বরের চেহারাটা কল্পনা করতে চেষ্টা করতো—

বলতো—মা, একদিন চলো না মনসাতলা লেনের বাড়িতে—

—কেন, সেখানে গিয়ে কি হবে তোর? কি করবি তুই সেখানে গিয়ে?

বিশাখা বলতো—বিজলীর সঙ্গে খেলা করবো বেশ—

যোগমায়া বলতো—এখন কি তোমার খেলা করবার বয়েস? তুমি তো এখন বড় হয়েছে?

— বারে, খেলা করবার বয়েস না তো কী করবার বয়েস?

এখন তুমি বড় হয়েছ. দুদিন বাদে যে তোমার বিয়ে হবে। এখন শুধু মন দিয়ে লেখা-পড়া করো, নইলে বিয়ের পর বর এসে যখন দেখবে তুমি লিখতে জানো না, পড়তে জানো না, নাচতে জানো না, তখন যে তোমার নিন্দে করবে—

বিশাখা বলতো—নিন্দে করলে তো আমার বয়ে গেল। আমিও বরের সঙ্গে কথা বলবো না, কেবল ঝগড়া করবো—

—ছি. ও-কথা বলতে নেই, বরের সঙ্গে কি ঝগড়া করতে আছে?

বিশাখা বলতো—কেন, আমার নিন্দে করলে আমি ঝগড়া করবো না?

কথা বলার মাঝখানে অঙ্কের দিদিমণি এসে হাজির হয়। ভদ্রমহিলার বিয়ে হয়নি। সপ্তাহে তিন দিন পড়াতে আসে, তার জন্যে মাইনে বরাদ্দ দুশো টাকা মাসে। অঙ্কের মাষ্টার হলেও অন্য বিষয়ও পড়িয়ে যায়।

প্রথম দিকে এ বাড়িতে এসে ভদ্রমহিলাটি সব শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিল। এমন ঘটনা কারো জীবনে যে ঘটতে পারে তা তার কল্পনারও বাইরে ছিল। বলেছিল—এরকম ঘটনা তো মানুষের জীবনে কখনও ঘটতে শুনিনি। এ তো অনেকটা উপন্যাসের মতই শোনাচ্ছে মাসিমা। আপনি আপনার হবু জামাইকে চোখে দেখেছেন?

যোগমায়া বলেছিল—না মা, দেখবো কী করে? সে তো তখন ছোট ছিল। আমার মেয়েও যেমন তখন ছোট, জামাইও তখন তেমনি ছোট ছিল—

—আর এখন?

—এখন তো মেয়ে বড় হয়েছে। জামাইও নিশ্চয়ই বড় হয়েছে। শুনেছি, এখন নাকি জামাই অফিসে যেতে আরম্ভ করেছে।

দিদিমণির নাম জয়ন্তী। জয়ন্তী বিশাখার মতই একদিন গরীবের ঘরে জন্মেছিল। তারপর নিজের চেষ্টায় লেখা-পড়া শিখেছে, নিজের চেষ্টায় এম-এ পাশ করেছে। কিন্তু বাপ-মা কেউ নেই। অনেকগুলো ছোট ভাই-বোন নিয়ে সংসার। সারাদিন রাত হাড়-ভাঙা খাটুনি খেটে যা টাকা-পয়সা উপায় করে তা সমস্ত তাদের মানুষ করতেই খরচ হয়ে যায়। একটা স্কুলের চাকরি আছে। সেটা নাম মাত্র। সেখানে কাজ কম, ছুটি বেশি, কিন্তু মোটা মাইনে। বছরে প্রায় ছ'মাসের মত ছুটি। তবু বিয়ের কথা ভাববারও সময় হয়নি তার। এক বাড়িতে সকালে বিকেলে ছাত্রী পড়াতে যায় কিন্তু কোথাও এমন নিয়ম করে এত টাকা মাইনেও পায় না, আর অমন জলখাবারও কেউ খেতে দেয় না। শুধু জয়ন্তীই নয়, আণ্টি মেমসাহেবও খুশী, নাচ শেখানোর দিদিমণিও খুব খুশী।

সারাদিন খাটা-খাটুনির রাশ্রে বিশাখা একেবারে ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। তখন যোগমায়া নিজের হাতে মেয়েকে খাওয়াতে বসে। তখন বিশাখা সেই আগেকার বিশাখা হয়ে ওঠে। তখন আর কিছুতেই খেতে রাজি হয় না সে।

বলে—আমার ঘুম পেয়েছে, আর খাবো না—

তখন যোগমায়া তাকে কোলে নিয়ে ভোলাতে বসে। অনেক কষ্টে তার ঘুম ভাঙায়। বলে—ছি, খেতে হয়, না খেলে রোগা হয়ে যাবে যে। তখন বর নিন্দে করবে—

বিশাখা বলে—আমি বিয়ে করবো না—

যোগমায়া বলে—ও কথা বলতে নেই। মেয়েমানুষের বিয়ে না হওয়া কি ভালো। বিয়ে হলে তোমার বর কত ভালো ভালো শাড়ি দেবে, কত ভালো ভালো গয়না দেবে, কত টাকা দেবে—

বিশাখা বলে—দিদিমণি তো বিয়ে করেনি, দিদিমণি যে কত ভালো ভালো শাড়ি পরে, তার বেলায়? তার তো বর নেই।

যোগমায়া মেয়েকে বকে। বলে—তাহলে দিদিমণির মত সারাজীবন তুমিও আইবুড়ো হয়ে থাকো, তাহলে তোমাকেও চিরকাল বাড়ি বাড়ি গিয়ে দিদিমণির মত ছেলে-মেয়েদের পাড়িয়ে টাকা রোজগার করতে হবে—

তারপর একটু থেমে আবার বলে—আর এই যে এত বড় বাড়ি, এই যে এত মাছ-মাংস দই রাবড়ি খেতে পাচ্ছো, এ কার দৌলতে শুনি? কে এর টাকা যোগাচ্ছে?

বিশাখা জানতো না, বলতো—কে?

যোগমায়া বলতো—কেন, জানো না কে যোগাচ্ছে? তোমার বর!

—আমার বর?

—হ্যাঁ-রে মুখপুড়ী হ্যাঁ। তোর বরই সব যোগাচ্ছে—

বিশাখা জিজ্ঞেস করতো—কেন যোগাচ্ছে এত?

—কেন যোগাচ্ছে তা বিয়ে হলেই তুই বুঝবি! বিয়ে হলে তখন বুঝতে পারবি আমি কেন তোর জন্যে এত ভাবতুম। তখন দেখবি তুই আমাকে একেবারে ভুলে যাবি, বরকে ছেড়ে আমার কাছে একবার আসতেও চাইবি না। আর শুধু কি তাই, বরের সঙ্গে তুই তখন কত দেশ-বিদেশে ঘুরবি, উড়োজাহাজে চড়ে কত দূর-দূর জায়গায় যাবি, তখন আমার কথা তোর মনেও থাকবে না, তখন আমাকে তুই একেবারে ভুলেই যাবি—দেখিস—

কথা শুনতে শুনতে কখন বিশাখা নিঃশব্দে ঘুমিয়ে পড়তো তা সে নিজেও টের পেত না। কিন্তু যোগমায়ার তখনও ঘুম আসতো না। অনেকক্ষণ জেগে জেগে বিশাখার কথাই ভাবতো। বিশাখার বাবার কথাও ভাবতো। বিশাখার বাবা মারা যাবার আগে যে কথাগুলো তাকে বলেছিল সেই কথাগুলোই মনে পড়তো। তারপর এক সময়ে কখন নিঃশব্দে ঘুমিয়ে পড়তো।

সকাল বেলা সন্দীপ আসতো এ বাড়ির খোঁজ-খবর নেবার জন্যে। এ বাড়ির যাবতীয় দরকার-অদরকারের সঙ্গে এ বাড়ির ভালো-মন্দের খবর দেওয়াও তার কাজের মধ্যে পড়তো। আর সে খবর দৈনিক গিয়ে দিতে হতো ঠাকমা-মণিকে।

ঠাকমা-মণি জিজ্ঞেস করতেন—এখন বৌমার শরীর কেমন দেখলে?

সন্দীপ বলতো—ভালো—

—আর মাছ মাংস ডিম দুধ ঠিক-ঠিক নিয়ম করে খাচ্ছে তো ?

সন্দীপ বললে—হ্যাঁ—

—এ সপ্তাহে ওজন নেওয়া হয়েছিল ? ওজন একটু বেড়েছে ?

সন্দীপ বলতো—হ্যাঁ আমি ডাক্তারবাবুকে নিয়ে গিয়েছিলুম। তিনি বললেন—এ সপ্তাহে এক কে-জি বেড়েছে।

—আর মাস্টারনীরা কেমন পড়াচ্ছে ?

সন্দীপ বলতো—এবার ক্লাসে তো ফোর্থ হয়েছে—

—কেন, ফার্স্ট হতে পারেনি কেন ? তাহলে মাস্টারনীদেরই দোষ। গাদা গাদা টাকা নিচ্ছে মাসে মাসে, সে-সব কি ভস্মে ঘি ঢালা হচ্ছে ? তুমিই বা তাহলে আছো কী করতে ? তুমি তো মাস্টারনীদের বলতে পারো। তুমি আমার নাম করে তাদের বলে দিও, যদি পরের বার বউমা ফার্স্ট না হতে পারে তো ঝাঁটা মেরে বিদেয় করে দেব। বিদেয় করে অন্য মাস্টারনী রাখবো। তখন মজা টের পাবে। টাকা কি আমার সস্তা পেয়েছে সবাই ?

সপ্তাহে একবার করে ডাক্তারবাবুকে নিয়ে সন্দীপ আসতো বিশাখাকে পরীক্ষা করবার জন্যে। ক্ষিদে হচ্ছে কিনা, হজম হচ্ছে কিনা, ওজন বেড়েছে না কমেছে, এই সব পরীক্ষা করে দেখাই ছিল ডাক্তারবাবুর কাজ। তিনি সব কিছু দেখে পরীক্ষার রিপোর্ট দিলে তা ঠাকমা-মণিকে গিয়ে বলতে হতো।

ডাক্তারবাবু আসতো সপ্তাহে একদিন, কিন্তু সন্দীপকে রোজই একবার করে এই রাসেল স্ট্রীটের বাড়িতে আসতে হতো।

আণ্টি মেমসাহেব একদিন সন্দীপকে জিজ্ঞেস করেছিল—তুমি গোপালকে চিনলে কী করে ?

সন্দীপ বলেছিল—ও যে আমাদের গ্রামের ছেলে। আমরা ইস্কুলে একই ক্লাসে পড়েছি—

তারপর সন্দীপ জিজ্ঞেস করেছিল—তুমি গোপালকে চিনলে কী করে ?

আণ্টি মেমসাহেব বলেছিল—ও, হি ইজ গ্রেট—

গোপাল যে কীসে গ্রেট তা খুলে বলেনি মেমসাহেব। আণ্টি মেমসাহেব চলে যাবার পর যোগমায়া জিজ্ঞেস করলে—তুমি আণ্টি মেমসাহেবের সঙ্গে ইংরেজীতে কী কথা বলছিলে বাবা ?

সন্দীপ বললে—আমার এক বন্ধুর কথা ওকে জিজ্ঞাসা করছিলুম—

যোগমায়া বললে—তোমায় একটা কথা জিজ্ঞেস করবো বাছা ?

সন্দীপ বললে—করুন না জিজ্ঞেস।

যোগমায়া বললে—জানি নে, কথাটা বলা ভালো হবে কি না—

সন্দীপ বললে—আপনি বলুন না, আমি কিছু মনে করবো না—

অনেক দিন থেকেই যোগমায়া জিজ্ঞেস করবে কিনা ভাবছিল। কিন্তু সেদিন আর কথাটা চেপে রাখতে পারলে না।

বললে—কথাটা হচ্ছে এই, যে তুমি তো বাবা আমাদের ভালো-মন্দ সবই দেখছো। আমাদের কোনও অভাবই রাখেননি তোমাদের ঠাকমা-মণি। বুঝতে পারছি

আমাদের জন্য তাঁর হাজার হাজার টাকা জলের মত খরচ হয়ে যাচ্ছে। এখন ভাবলে অবাক হতে হয় কত কষ্ট করে খিদিরপুরের দেওরের বাড়িতে কাটিয়েছি। তা এ তো সবই তোমার ঠাকমা-মণির দয়াতেই সম্ভব হয়েছে—তাই বলছিলুম—

—বলুন না কী বলবেন? আমার কাছে বলতে আপনি কোনও লজ্জা করবেন না মাসিমা, আমাকে আপনি নিজের ছেলের মত মনে করবেন—

যোগমায়া বললে—দেখ বাবা, বিশাখা তো এখন অনেক বড় হয়েছে। কবে যে তার বিয়ে হবে তা তোমার ঠাকমা-মণিই জানেন—শুধু আমার একটা অনুরোধ—

—বলুন না কী অনুরোধ আপনার?

যোগমায়া বললে—আমার জামাইকে একবার দেখতে বড় সাধ হয়!

সন্দীপ বললে—দেখতে সাধ হওয়াইতো স্বাভাবিক—

যোগমায়া বললে—তোমার ঠাকমা-মণি জানতে পারলে যদি আবার রেগে যান তা হলে আবিশ্যি দরকার নেই—

সন্দীপ বললে—আপনি বিশাখার মা, আপনার জামাইকে দেখতে তো ইচ্ছে হবেই—

যোগমায়া বললে—তোমার ঠাকমা-মণি যদি আপত্তি করেন তাহলে আর দরকার নেই বাবা—

সন্দীপ বললে—সৌম্যবাবুকে একবার এ বাড়িতে নিয়ে আসবো?

—তুমি আনতে পারবে বাবা?

সন্দীপ একটু ভেবে বললে—চেষ্টা করে দেখব আমি—

—কিন্তু তোমার ঠাকমা-মণি জানতে পারলে হয়ত তিনি রাগ করবেন। তখন রেগে গিয়ে হয়ত আমাদের এ-বাড়ি থেকেই তাড়িয়ে দেবেন ...তুমি বরং ..

সন্দীপ বললে—সৌম্যবাবু তো এখন রোজই অফিস যাচ্ছেন...

—রোজ অফিসে যাচ্ছেন?

—হ্যাঁ!

যোগমায়া বললে—তাহলে এক কাজ করো না বাবা, জামাই যখন আপিসে যাবে কিংবা যখন আপিস থেকে ফিরবে তখন তুমি এই বাড়ির সামনে দিয়ে যেতে বলে দিও না, আমি তাহলে বাড়ির সামনের রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকবো, আর তখনই এক পলক চোখের দেখা দেখে নেব—

সন্দীপ বললে—তাও মন্দ কথা নয়। কিন্তু আগে থেকে কিছু কথা দিতে পারছি না মাসিমা, বুঝতেই তো পারছেন, আমি তো ও-বাড়িতে চাকরি করি, এমন কিছু করা যাবে না যাতে ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যায়—

যোগমায়া বললে—তোমাকে নিজের ছেলের মত মনে করি বলেই কথাটা বলতে পারলুম বাবা, অন্য কেউ হলে কি আমার বলতে এত সাহস হতো? সাহস হতো না, সবাই জিজ্ঞেস করে কিনা, আমি জামাইকে দেখেছি কিনা, এই সব—

—কে জিজ্ঞেস করে?

—ওই যেমন বিশাখাকে অঙ্ক পড়াতে আসে জয়ন্তী দিদিমণি, তার নিজের এখনও বিয়েই হয়নি। সে-ও জিজ্ঞেস করছিল আমি জামাইকে দেখেছি কিনা।

তাই আমার বড় সাধ হয় বাবা তাকে দেখতে—

সন্দীপ বললে—যদি আপনার জামাইকে এইখানে এনে তুলি? এই বাড়িতে?

যোগমায়া আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়ার মত মুখ করে বললে—তুমি জামাইকে এই বাড়িতে এনে তুলবে! বলছো কী বাবা তুমি? তুমি পারবে?

সন্দীপ যেন মনে মনে কী ভাবতে লাগলো। তারপর চলে যাবার আগে বললে—আচ্ছা আমি ভাবি একটু মাসিমা, আমি একটু ভেবে দেখি, তারপর আমি আপনাকে বলে রাখবো, আগে থেকেই, আমি বলে রাখবো—

যোগমায়া আবার হুঁশিয়ার করে দিয়ে বললে—দেখো বাবা, যেন কেউ জানতে না পারে—

সন্দীপ সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বললে—না না, কেউ জানতে পারবে না, আপনার কোনও ভয় নেই, আমি আগে থেকে আপনাকে সব জানিয়ে যাবো—

বিডন স্ট্রীটের বাড়িতে ফিরে এসেও সন্দীপের মন থেকে কথাটা দূর হলো না। সৌম্যবাবুকে সে কী করে রাসেল স্ট্রীটের বাড়িতে নিয়ে যাবে। সৌম্যবাবু যদি তার কথা না রাখে! সৌম্যবাবুর সঙ্গে তার তো মনিব-ভৃত্যের সম্পর্ক। মনিব কি চাকরের কথা শুনবে?

বাড়িতে আসতেই মল্লিক-কাকা বললেন—তোমার মা তোমাকে চিঠি লিখেছে, এই নাও—

মা'র চিঠি। মা'র কাছ থেকে চিঠি এসেছে শুনেই সন্দীপ একেবারে অনা মানুষ হয়ে গেল। খবরটা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলে।

সামান্য একটা পোস্ট-কার্ডের চিঠি।

মা লিখেছে—"খোকা, তোমার পাশ করার খবর পেয়ে খুব আনন্দিত হইয়াছি। আমি খবরটা পাইয়াই মা শীতলার মন্দিরে গিয়ে পুজো দিয়া আসিয়াছি। তোমার শরীর কেমন জানাইবে। আমি বাবুদের বাড়ি কাজ করিতে গেলে সকলে তোমার কথা জিজ্ঞাসা করে। তুমি পাশ করিয়াছ শুনিয়া বাবুদের বাড়ির সকলেই আনন্দ করিয়াছে। এবার তুমি কী করিবে জানাইয়া পত্র দিও। নিজের শরীরের দিকে নজর রাখিবে। তোমার মল্লিক-কাকাকে আমার প্রণাম জানাইবে। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি তুমি অনেক বড় হও। তোমার উন্নতি হউক। তোমার উন্নতি হইলে আমার মুখ উজ্জ্বল হইবে। ইতি আশীর্বাদিকা—মা।"

মা'র জবানীতে চিঠি লেখা বটে, কিন্তু সন্দীপ জানতো ও চিঠি চাটার্জী বাবুদের বউ-এর লেখা। মা নিজে লেখা-পড়া জানে না, তাই সন্দীপের চিঠি গেলেই মা সেটা নিয়ে বাবুদের বাড়িতে গিয়ে পড়িয়ে নেয়।

মল্লিক-কাকা বললেন—মা'কে একটা চিঠি লিখে দাও এবার। লিখে দিও এখানে তোমার কোনও অসুবিধে হচ্ছে না। আজকেই লিখে দিও।

মনে আছে, সেই ছোটবেলায় মা'র চিঠি পেলে যে তার কী আনন্দ হতো, তা বলে বোঝানো যেত না। সত্যিই, বোধহয় ছোটবেলাটাই মানুষের জীবনের সবচেয়ে ভালো সময়। বড় হয়ে সন্দীপ কত টাকা উপায় করেছে, কত সম্মান পেয়েছে, কিন্তু ছোটবেলায় মার কাছ থেকে সামান্য একটা চিঠি পাওয়ার মধ্যে দিয়ে যে কত সুখ পেয়েছে সন্দীপ, তা আর পরে কখনও সে পায়নি।

সেদিন মাকে চিঠি লিখে সেটা বড় পোস্টাফিসের ডাকবাক্সে ফেলে দিয়ে সন্দীপ যখন বাড়ি এল তখন সিংহবাহিনীর মন্দিরে কাঁসর-ঘণ্টার শব্দের সঙ্গে সাড়ম্বরে রোজকার মত আরতি হচ্ছে। ঠাকমা-মণি নিজে তেতলা থেকে নেমে এসে আরতি দেখলেন। আরতির শেষে প্রণাম করলেন। পাশে বসে বিন্দুও প্রণাম করলে। তারপর সবাই প্রসাদ পেলে।

মল্লিক-কাকার ঘরেও প্রসাদ নিয়ে এল ঠাকুর।

মল্লিক-কাকা জিজ্ঞেস করলেন—চিঠি লিখলে মা'কে ?

সন্দীপ বললে—হ্যাঁ।

মল্লিক-কাকা বললেন—তোমার মা তো জীবনে কাউকে ঠকাননি, কাউকে কষ্টও দেননি। তোমার মা'র ভালোই হবে—দেখে নিও—

কথাটা কি ঠিক ? সন্দীপ নিজেকেও অনেকবার প্রশ্নটা করেছে ! সত্যিই কি যারা জীবনে কোনও দিন কাউকে ঠকায়নি, কাউকে কষ্টও দেয়নি, তাদের ভালোই হয় ?

কিন্তু গোপাল ? গোপাল তো উল্টো কথা বলতো।

গোপাল বলতো—কাউকে না ঠকিয়ে ইতিহাসে কেউ বড়লোক হতে পারেনি।

সন্দীপ তখন গোপালের কথায় অবাক হয়ে যেত। সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সকলের কথা ভাবতো। তখন তো এই বিডন স্ট্রীটের মুখার্জীবাবুদের সে দেখেনি ! বেড়াপোতায় বড়লোক বলতে তখন চ্যাটার্জীবাবুদেরই সে চিনতো। কিন্তু চ্যাটার্জী-বাবুদের বড়লোক হওয়ার ইতিহাস সে জানতো না, জানবার ইচ্ছেও তার হতো না।

মাকে একবার সন্দীপ জিজ্ঞেস করেছিল—মা, চ্যাটার্জীবাবুরা অত বড়লোক কী করে হলো মা ?

মা ছেলের প্রশ্ন শুনে অবাক হয়ে যেত। বলতো—ওরা বড়লোক কেন তা আমি কী করে জানবো ?

সন্দীপ মা'র সে উত্তর শুনে খুশী হতো না। আবার জিজ্ঞেস করতো—তাহলে আমরা কেন গরীব লোক মা ? তোমাকে কেন ওদের বাড়িতে ঝি-গিরি করতে হয় ?

মা ছেলের এ প্রশ্ন শুনে আরো অবাক হয়ে যেত। শেষকালে বিরক্ত হয়ে বলতো—আমি গেল জন্মে অনেক পাপ করেছিলুম, তাই এ-জন্মে এত গরীব হয়েছি।

সন্দীপ মনে মনে নিজেকে প্রশ্ন করতো—পাপ কী ? পাপ কাকে বলে ? মিথ্যে কথা বলা পাপ ? চুরি করা মহাপাপ ? স্কুলের পড়ার বইতে তো তাই লেখা আছে।

গোপাল বলতো—ইস্কুলের বইতে সব মিথ্যে কথা লেখা থাকে। চুরি না করলে কি দেশের রাজারা বড়লোক হতে পারতো ? পরকে ঠকিয়েই জমিদাররা বড়লোক হয়েছে—

সন্দীপ জিজ্ঞেস করতো—তা হলে বইতে মিছে কথা লেখা থাকে কেন ?

গোপাল বলতো—বইগুলো তো গভর্মেণ্টই লেখায়। গভর্মেণ্ট যেমন কথা বইতে লিখতে বলে, লোকরা টাকা পেয়ে সেই সব কথাই লেখে।

সন্দীপ জিজ্ঞেস করতো—গভমেণ্ট মানে কারা রে ?

—এই রে, তুই তাও জানিস না ? আগে যেমন রাজা থাকতো, এখন তেমনি

'গভর্মেণ্ট। এই যে দেখছিস পুলিশ, চৌকিদার দারোগা—এরাই আমাদের গভর্মেণ্ট এরাই সরকার। ওরা যা করতে বলবে তাই-ই আমাদের করতে হবে।

তারপর একটু থেমে গোপাল গলাটা আরো নিচু করে বলতো—এই যে এক বছর আগে বেড়াপোতায় ডাকাতি হয়ে গেল, মনে আছে?

সন্দীপের মনে ছিল। বললে—হ্যাঁ, মনে আছে কেশববাবুদের গুদাম থেকে চল্লিশ হাজার টাকা লুটে নিয়েছিল ডাকাতরা—

গোপাল বললে—কারা ও ডাকাতি করলো বল তো?

—কারা আবার, ডাকাতরা!

—দূর, তুই কিসসু জানিস না।

—তাহলে কারা?

গোপাল বললে—গভর্মেণ্টই চুরি করলে।

সন্দীপ বুঝতে পারলে না। বললে—তার মানে?

গোপাল বললে—তার মানে বুঝলি না? গভর্মেণ্ট মানে তো একজন নয়, গভর্মেণ্ট মানে কয়েকজন লোক। তারা যখন দেশের রাজা হতে চায় তখন তারা দল বাঁধে। তারা দল বেঁধে সবাইকে বলে— তোমরা আমাদের ভোট দাও। কিন্তু টাকা না থাকলে টাকা না উপায় করলে দেশের জন্যে খাটবে কী করে? তাদেরও তো খাওয়া পরার জন্যে টাকা চাই। খালি পেটে তো আর দেশ সেবা চলে না। তখন তারা ডাকাতি করে।

সন্দীপ তখন খুব বোকা ছিল। গোপালের কথা কছুই বুঝতে পারলো না। বললে—কোথায় ডাকাতি করে?

—সব জায়গায়। আগে স্বদেশী যুগে যেমন লোকরা ইংরেজদের খাজনা লুঠ করতো, এখন এই যুগে তেমনি তারা দিশী লোকদের গুদাম লুঠ করে। সেই লুঠ করা টাকা দিয়ে মন্ত্রী হয়। তারা আমাদের মত গরীব লোকদের পকেট কেটে নিজেদের পকেট ভর্তি করে—

—মন্ত্রী? মন্ত্রীরা আমাদের পকেট কাটে?

গোপাল বললে—হ্যাঁরে, বোকা-চন্দর। মন্ত্রীরাই তো এ যুগের রাজা রে। সেই মন্ত্রী হতে গেলেও তো অনেক টাকা খরচ করতে হয়। অনেক গুন্ডা পুষতে হয়। শেষে যখন তারা মন্ত্রী হয় তখন তারা সেই গুণ্ডাদের চাকরি দেয়, চাকরি দিয়ে সেই গুণ্ডাদের পুষতে বাধ্য হয়।

আজ এতদিন পরে মল্লিক-কাকার কথা শুনে আবার তার সেই সব দিনকার গোপালের কথাগুলো মনে পড়লো।

খাওয়া-দাওয়া সেরে সন্দীপ সেদিনও নিজের জায়গায় শুয়ে ছিল। সেই ছোট-বেলাকার গোপালের সঙ্গে যে এতকাল পরে কলকাতায় এসে আবার দেখা হবে তা কি সেদিন সে কল্পনা করতে পেরেছিল! আর এত টাকাই বা কোথা থেকে পেলে যে গাড়িতে চড়ে বেড়াচ্ছে? তবে কি সে মন্ত্রী হয়েছে? তবে কি সে গুণ্ডা হয়েছে? কেন সে রাস্তার মোড়ে-মোড়ে পুলিশদের মুঠো-মুঠো টাকা দিয়ে বেড়ায়? কেন সে নাইট-ক্লাবে মদ খেতে যায়? সৌম্যবাবুর মত বড়লোকদের সঙ্গে কী করে আলাপ হয়? আর যে শ্রীপতি মিশ্র তিনবার ম্যাট্রিক ফেল করে মন্ত্রী হয়েছে, তার সঙ্গেই

বা সে মেশে কী করে? আর ওই যে আশ্টি মেমসাহেব, যে বিশাখাকে ইংরিজী পড়ায় তাকেই বা গোপাল চিনলে কী করে? গোপাল তো ইংরিজীর ফার্স্ট বুকের ঘোড়ার পাতা পর্যন্তও পড়েনি, তবু ইংরেজী জানা মেমসাহেবের সঙ্গে ভাব করে কী করে?

হঠাৎ কানে এল সেই পুরনো শব্দটা। সৌম্যবাবু কি তাহলে এখনও রাত্রে লুকিয়ে-লুকিয়ে বাইরে যায়?

সন্দীপ অন্ধকারের মধ্যে মল্লিক-কাকার দিকে চেয়ে দেখলে। তিনি তখন অঘোরে ঘুমোচ্ছেন, জোরে-জোরে নাক ডাকছে তাঁর। সে আস্তে আস্তে বিছানা ছেড়ে উঠলো। সৌম্যবাবু তো এখন স্যাক্সবি মুখার্জী কোম্পানির ডেপুটি ম্যানেজিং ডাইরেক্টার। সকালবেলা স্নান খাওয়া-দাওয়া সেরে রোজ অফিসে যায়। সারাদিন অফিসেই কাজ-কর্মে ব্যস্ত থাকে। তা সত্ত্বেও আবার রাত্রে বাইরে যাবে? তাহলে কখন ঘুমোবে? না ঘুমিয়ে মানুষ কতদিন থাকতে পারে?

মাসিমার কথাটাও মনে পড়লো। মাসিমা একবার তাঁর জামাইকে দেখতে চেয়েছেন। দেখতে চাওয়াটাই তো স্বাভাবিক।

আর বিশাখা?

বিশাখারও নিশ্চয়ই ইচ্ছে হতো তার বরকে দেখতে। বিশাখাও তো আর সেই আগেকার বিশাখা নেই। সে-ও বুঝতে শিখেছে। সেও জেনে গেছে যে তাদের রাসেল স্ট্রীটের বাড়ি, তাদের সংসার-খরচ, তার বাড়ির দিদিমণিদের মাইনে ইস্কুলে যাবার গাড়ি আর ইস্কুলে পড়বার মাইনে সমস্তই আসে তার ভাবী শ্বশুরবাড়ি থেকে। তারাই তাদের সব কিছুর খরচ যোগায়। অথচ যে-মানুষটার সঙ্গে তার বিয়ে হবে, তাকে সে-ও যেমন দেখেনি, তার মাও তেমনি তাকে দেখেনি।

যোগমায়া একদিন জিজ্ঞেস করেছিল—হ্যাঁ বাবা, যার সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে হওয়ার কথা তাকে তো দেখেছ!

সন্দীপ বলেছিল—তা তো দেখেইছি।

—কেমন ছেলে আমার জামাই?

সন্দীপ কী জবাব দেবে, ঠিক করতে পারেনি। শুধু বলেছিল—ওদের অনেক টাকা। এত টাকা যে আপনি তা কল্পনাও করতে পারবেন না—

—গায়ের রং?

—গায়ের রং ফর্সা।

—আমার বিশাখার গায়ের রং-এর চাইতেও ফর্সা? না কি বিশাখার গায়ের রং-এর চাইতে নিরেস?

এবারও এর জবাবে সন্দীপ কী বলবে বুঝতে পারেনি। খানিক ভেবে বলেছিল—বিশাখার চাইতেও আমাদের ছোটবাবু ফর্সা—

কথাটা শুনে বিশাখা বোধহয় খুশীই হয়েছিল, খুশীও যেমন হয়েছিল তেমনি অবাকও হয়েছিল। বলেছিল—আমার চাইতেও ফর্সা? তাহলে কি সাহেব বাচ্চা নাকি?

কথাটা শুনে মাসিমা বিশাখাকে বকে দিয়েছিল। বলেছিল—চুপ কর পোড়ার-মুখী, যা মুখে বলতে নেই তা-ই বললি? ছিঃ—

সন্দীপ বলেছিল—ওকে বকবেন না মাসিমা, ওর বয়েস কম, কী বলতে কী বলে ফেলেছে—

—তুমি থামো তো!

মাসিমা সন্দীপকে থামিয়ে দিয়েছিল। বলেছিল—তুমি থামো তো বাবা, ওর বয়েস কম? তুমি বলছো কী? ওই বয়েসে যে আমাদের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। কাকে কী বলতে হয় তাও এখনও শিখলো না, বিয়ের পর ওর কী গতি হবে বলো তো! তখন তো আমাকে বদনাম দেবে ওর শ্বশুরবাড়ির লোকেরা। বলবে মা মাগী মেয়েকে সহবৎটাও শেখায়নি, তখন? তখন কী হবে?

বিশাখা বেশ মজা পেয়েছিল। বলেছিল—আমি খারাপটা কী বলেছি, সাহেব বাচ্ছা বলে আমি কী অপরাধ করেছি?

—দেখলে তো বাবা, দেখলে তো! মেয়ে আবার বলছে—কী অপরাধ করেছি! ওরে পোড়ারমুখী, তুই কি আমাকে সারাটা জীবন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খেয়ে তবে আমাকে মুক্তি দিবি? তুই নিজেদের ভালোটাও এখনও বুঝতে শিখলি নে? আর কবে নিজের ভালো বুঝতে শিখবি? বয়েসের তো গাছপাথর নেই, কবে তোর ঘটে বুদ্ধি হবে শুনি? আমি মলে?

এ-রকম ঝগড়া প্রায়ই হতো। আর সন্দীপকেই এসব কথা শুনতে হতো কান পেতে।

বলতো—আপনি অত বকবেন না মাসিমা। ও ছোট মেয়ে, ও কী-ই বা বোঝে?

বলে অনেক সময়ে চলে আসতো।

কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতে ওপর থেকে হঠাৎ বিশাখার গলা শোনা যেত—এই, শোনো।

সন্দীপ ওপর দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করতো—কী হলো? আমাকে কিছু বলবে?

বিশাখা ইঙ্গিত করতো—ওপরে উঠে এসো।

সন্দীপ নিঃশব্দে আবার উপরে উঠতো। বিশাখাও সিঁড়ি দিয়ে দু'তিন ধাপ নিচেয় নেমে এসে নিচু গলায় জিজ্ঞেস করতো—আমার বর কি তোমার চেয়েও ভালো দেখতে?

সন্দীপের চোখ-মুখ-কান লাল হয়ে উঠতো বিশাখার কথাগুলো শুনে। তার কথার কী জবাব দেবে বুঝতে পারতো না। শুধু অবাক হয়ে একদৃষ্টে চেয়ে থাকতো বিশাখার মুখের দিকে।

আর এক মুহূর্তের মধ্যে বিশাখা একটা কাণ্ড করে বসতো। হঠাৎ সন্দীপের গালে একটা আলতো চড় মেরে বলতো—একটা আস্ত বোকা—

বলেই দুড়-দুড় করে ওপরে উঠে গিয়ে সদর দরজাটা দড়াম করে বন্ধ করে দিয়ে ভেতরে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে যেত। আর সন্দীপ সেই সিঁড়ির মাঝখানেই দাঁড়িয়ে থাকতো হাবার মত।

মল্লিক-কাকার নাকটা তখনও ডাকছিল। সন্দীপ সেই অন্ধকারের মধ্যেই জেগে জেগে সেই পুরনো দিনের কথাগুলোই আপন মনে ভাবছিল। কেন বিশাখা তাকে 'আস্ত বোকা' বলেছে? সত্যিই কি সন্দীপ বোকা? সন্দীপ গরীব হতে পারে, কিন্তু সে কী এমন কাজ করলে যাতে তাকে বিশাখা বোকা বললে?

সেদিনও অনেক রাত্রে সেই লোহার গেট খোলার পুরনো ঘড়-ঘড় শব্দটা হলো।

তবে কি সৌম্যবাবু এখনও রাত্রে বাড়ির বাইরে বেরোচ্ছে? এখন তো সৌম্যবাবু স্যাক্সবি মুখার্জী এ্যান্ড কোম্পানির ডেপুটি ম্যানেজিং ডাইরেক্টার। এখন তো সারাদিন সৌম্যবাবু অফিসে গিয়ে কাজ-কর্ম করে। তাহলে রাত্রে আবার বেরোয় কী করে?

সন্দীপ বিছানা ছেড়ে আস্তে-আস্তে উঠলো। তারপর টিপি-টিপি পায়ে ঘরের দরজার খিল খুলে বাইরে এসে দাঁড়ালো। চারিদিকে সেই একই দৃশ্য। সেই ঘুটঘুটে অন্ধকার। সেই নিঃশব্দ খাঁ-খাঁ পরিবেশ। সেই নিরিবিলি আবহাওয়া। সন্দীপ আস্তে আস্তে দেখলে গিরিধারী গাড়িটা ঠেলে বাইরের রাস্তায় নিয়ে যাচ্ছে। আর গাড়িটা রাস্তায় পড়তেই সৌম্যবাবু তার ওপর চড়ে বসলো আর ইঞ্জিনে স্টার্ট দিতেই সেটা গড়-গড় করে চোখের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে গিরিধারী আবার লোহার গেটটা বন্ধ করে দিলে।

কিন্তু অন্ধকারের মধ্যেও সন্দীপ গিরিধারীর দৃষ্টি এড়াতে পারলে না। সন্দীপ দরজাটা বন্ধ করতে যাচ্ছিল, কিন্তু গিরিধারী বললে—কেয়া বাবুজী, আপনি ঘুমোননি?

সন্দীপ বললে—কী, ছোটবাবু এখনও আগেকার মত রাত্তিরে বাইরে থাকে?

গিরিধারী বললে—হ্যাঁ বাবুজী, আপ কিসীকো বাতাইয়ে মাত। মেরা নৌকরী ছুট্ যায়গী···মগর···

'স্যাক্সবি মুখার্জী' এ্যান্ড কোম্পানী ইন্ডিয়া লিমিটেড শুধু ইন্ডিয়ায় নয়, সারা পৃথিবীব্যাপী তার জাল ছড়ানো। আগেকার ইংরেজরা এসে এখান থেকে শুধু এখানকার কাঁচা মালই নিয়ে যায়নি, এখানকার কাঁচা মাল থেকে নানা যন্ত্রপাতি তৈরি করেও তা দেশে-বিদেশে পাঠিয়েছে। যারা গরীব, তাদের কাছে সেই যন্ত্রপাতি বিক্রি করে যে টাকাকড়ি উপায় করেছে, সেই টাকাকড়িও নিজের জন্মভূমিতে পাঠিয়েছে। তাতে তাদের জন্মভূমিই যে শুধু বড়লোক হয়েছে তাই-ই নয়, তার সঙ্গে-সঙ্গে তাদের জন্মভূমির মানুষদের জীবন-যাত্রার মানও বাড়িয়ে দিয়েছে। আগে যারা শুধু শুকনো রুটি খেয়েছে তারা তখন তার সঙ্গে মাখনও খেতে পাচ্ছে। সেই টাকাকড়ি দিয়ে তখন তাদের দেশে কাপড়ের কল তৈরি হয়েছে, সেই কলে তৈরি কাপড়-চোপড় যে জাহাজে চাপিয়ে বিদেশের 'বাজারে বিক্রি করবে, সেই জাহাজও তখন কলের জাহাজে রূপান্তরিত হয়েছে।

অর্থাৎ টাকা-পয়সা বেশি হলে যা হয়, তখন তাদের তাই-ই হয়েছে। অর্থাৎ টাকা বেশি হলেই বেশি টাকা খরচ করার প্রবৃত্তি বাড়ে। তখন বড়লোকদের ইচ্ছে

হয় বাড়িতে বসে বসে পরিশ্রম না করে সেই টাকা ভোগ করতে। ম্যাকডোনাল্ড সাহেবদের আত্মীয়-পরিজনদের তখন আর কাজ করতে ইচ্ছে হয় না, ইচ্ছে হয় কেবল বসে-বসে আরাম করি। টাকাটার সবটাই যেত ইন্ডিয়া থেকে। কিন্তু ততদিনে ইন্ডিয়া আর সেই আগেকার ইন্ডিয়া নেই। যুদ্ধটা যখন বাধলো তখন তাদের নিজের ঘরেও আগুন লেগেছে। ইন্ডিয়াতে তখন এমন কয়েকটা মানুষ জন্মেছেন যাঁরা ইংরেজদের দেশ থেকেই ইংরেজী লেখা-পড়া শিখেছেন আর ইংরেজদের জীবনের আদব কায়দা নিজেদের চোখ দিয়ে দেখে এইটে বুঝতে পেরেছেন যে এই আদব-কায়দা আর আরাম-বিরামের রহস্যটা কোথায়। জানতে পেরেছেন যে এই আরাম-আয়েশের পেছনে আছে ইন্ডিয়ার ওপর তাদের অন্যায় আবদার।

এই শোষণের রহস্যটা তখন কে-কে জানতে পেরেছেন ?

জেনেছেন ইংলন্ডে লেখা-পড়া করতে গিয়ে অরবিন্দ ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, আর সুভাষচন্দ্র বোস প্রমুখরা। তাঁরাই দেশে ফিরে এসে সব রহস্য ফাঁস করে দিলেন। আর সেই খবরটা ফাঁস হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ইন্ডিয়ার মানুষ নিজেদের দেশের দারিদ্র্য-দশার কারণগুলো সম্পূর্ণ বুঝে ফেললে।

এবার তারা সবাই বুক চিতিয়ে রুখে দাঁড়ালো। তারপর যুদ্ধটা শেষ হবার পর যখন ইংরেজরা দেখলে যে পঁয়তাল্লিশ লক্ষ ইন্ডিয়ান সৈন্য তাদের হয়ে লড়াই করছিল তাদের সবাই দল বদল করে ইংরেজদের অবিচারের খবর পেয়ে গেছে তখন ইংরেজ সরকার ইন্ডিয়ায় পাঠালে লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে।

ভাগ হয়ে গেল ভারতবর্ষ আর ভাগ হয়ে গেল ইংরেজদের কারবার। তারপর 'ম্যাকডোনাল্ড স্যাক্সবি' ছেড়ে ম্যাকডোনাল্ড সাহেব কোম্পানি বেচে দিয়ে নিজের দেশে চলে গিয়ে বাঁচলো।

আর দেবীপদ ? দেবীপদ মুখার্জী ?

তিনি ম্যাকডোনাল্ড সাহেবের চেয়ারে উঠে বসলেন।

কিন্তু ততদিনে সাহেবদের রক্ত সাহেবদের আদব-কায়দা মুখার্জী পরিবারের মেদ-মজ্জায় পাকা আসন গেড়ে বসেছে।

দেবীপদ মুখার্জীর পর এসে গেছেন শক্তিপদ মুখার্জী ও মুক্তিপদ মুখার্জী। তারপর এবার এসে গেল সৌম্যপদ মুখার্জী। দেবীপদ মুখার্জীর একমাত্র নাতি! আর তার সঙ্গে সঙ্গে ঢুকলো আয়েশ, ঢুকলো মদ, ঢুকলো মেয়েমানুষের নেশা।

তিন পুরুষের মধ্যেই একটা বাঙালী কোম্পানির নাভিশ্বাস টানবার উপক্রম হতে শুরু করলো।

সেদিন যথাসময়েই সৌম্য অফিসে যাচ্ছিল। একটা ক্রসিংএর মুখে এসে ট্র্যাফিকের লাল সিগন্যাল জ্বলতেই গাড়িতে ব্রেক কষতে হলো। আশে-পাশে পেছনে থেমে গেল আরো অনেকগুলো গাড়ি।

—হ্যালো, মিস্টার মুখার্জী—

সৌম্য সেই দিকে চেয়ে দেখলে অন্য একটা গাড়িতে মিস্টার হাজরা।

মিস্টার হাজরা জিজ্ঞেস করলে—কোথায় ?

সৌম্য বললে—অফিসে।

মিস্টার হাজরা অবাক হয়ে গেল।

জিজ্ঞেস করলে--অফিসে? অফিসে মানে? কোন অফিসে?

—আমাদের নিজেদের অফিসে। স্যাকসবি মুখার্জী কোম্পানির অফিসে।

মিস্টার হাজরা যেন ঠিক বুঝতে পারলে না। মিস্টার মুখার্জী বড়লোকের ছেলে হলেও তাদের সঙ্গেই নাইট ক্লাবে আড্ডা দেয়। সে আবার অফিসে ঢুকলো কবে?

সৌম্য বললে—আমি তো আমার ফার্মের ডেপুটি ম্যানেজিং ডাইরেক্টার—আমার সঙ্গে একদিন দেখা করবেন—

—কোথায়? কোথায় দেখা করবো?

সৌম্য বললে—আমাদের ডালহৌসি স্কোয়ারের অফিসে।

আর বেশিক্ষণ কথা হলো না। হঠাৎ ট্র্যাফিক সিগন্যালের লাল রঙটা সবুজ হয়ে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে সব গাড়িগুলো পড়ি-মরি করে পাঁই-পাঁই শব্দে দৌড়তে শুরু করতেই আর কেউ কাউকে দেখতে পেলে না। দু'জনের ক্লাবের পরিচয় সেইদিন থেকে ঘরোয়া পরিচয়ের গণ্ডীর ভেতরে এসে গেল।

সেই দিনই বিকেল বেলা গোপাল সৌম্যর অফিসে এসে হাজির! স্যাক্সবি মুখার্জী কোম্পানির গেটের ভেতরে ঢুকেই লিফ্‌ট্‌। দেয়ালের গায়ে একটা নির্দেশিকায় লেখা আছে কোন তলায় কোন কোম্পানির অফিস।

লিফ্‌টে উঠে তিনতলায় নামতেই রিসেপশন। সেখানে একটা সুন্দরী মেয়ে বসেছিল।

গোপাল তাকেই জিজ্ঞেস করলে—মিস্টার মুখার্জী আছেন?

—কোন মুখার্জী? সিনিয়ার না জুনিয়ার?

—জুনিয়ার!

একটা স্লিপ্‌ এগিয়ে দিল মেয়েটা। তাতে গোপাল নাম-গোত্র ভর্তি করে দিল, তারপর মিস্টার মুখার্জীর কাছে তার আসার উদ্দেশ্যটাও লিখে দিলে। আর সঙ্গে সঙ্গে ডাক পড়লো গোপালের। ঠাণ্ডা আবহাওয়াতে শরীর যেন জুড়িয়ে গেল।

সৌম্য নতুন অফিসে ঢুকেছে। আস্তে আস্তে কাজ-কর্ম বুঝে নিচ্ছে। বুঝতে না পারলেও তাকে বুঝতে হবে। মিস্টার নাগরাজন সবই শিখিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু হিসেব-নিকেসের কাজ অত সোজা নয়, আর তা বুঝে নেওয়া একদিনের কাজও নয়।

ঠিক এই সময়ে মিস্টার হাজরা গিয়ে হাজির।

—গুড্‌ আফটারনুন!

—গুড্‌ আফটারনুন!

শুধু যে মিস্টার হাজরাই অবাক হয়েছে তাই-ই নয়, মিস্টার মুখার্জীও অবাক হয়ে গেছে। সেই দিনই সকালে রাস্তায় দেখা হয়েছে আর বিকেল বেলাই মিস্টার হাজরা এসে হাজির।

গোপাল বললে—কালকে রাত্তিরেও তো আপনার সঙ্গে ক্লাবে দেখা হয়েছে, তখনও তো কিছু বলেননি আপনি—

সৌম্য বললে—তখন কি আর বলবার মত মেজাজ ছিল?

—তা বটে!

বলে গোপাল একটা সিগারেট ধরালে। বললে—খুব খুশি হলুম আপনাকে এখানে দেখে—তারপরে এখন তো আপনি এ্যাডাল্ট, এখন তো আপনি মেজর, আপনার এখন প্রোগ্রাম কী ?

—প্রোগ্রাম আর কী ? আগেও যেমন ছিলুম, এখনও তাই-ই থাকবো ! এ তো আমার পেটারন্যাল অফিস, এখন থেকে আমিও একজন এর মালিক।

গোপাল বললে—তাহলে তো এই অকেশানটা আজ ক্লাবে সেলিব্রেট করতে হয়—

—তা তো করতে হবেই।

গোপাল বললে—তাহলে উইশ্ ইউ গুড্ লাক ! আমি তো শুনেছিলুম আপনার বউ তৈরি ?

—কে বললে ?

—একজন ভালো লোকের মুখ থেকেই শুনেছি—

সৌম্য জিজ্ঞেস করলে—কে ? কার কাছে শুনেছেন ?

গোপাল বললে—সে আমাদেরই গাঁয়ের একটা ছেলে।

—সে কী করে জানলে ?

গোপাল বললে—সে আপনাদের বাড়িতেই থাকে !

—আমাদের বাড়িতে থাকে ? কে সে ? নাম কী ?

গোপাল বললে—তাকে আপনি চিনবেন না। সে একজন পুওর বয়। ভেরি পুওর বয়।

সৌম্য বললে—সে কী, আমাদের বাড়িতে থাকে অথচ আমি চিনি না ?

—তার নাম সন্দীপ ! আপনি কী করে চিনবেন ? আপনাদের বাড়িতে যত লোক থাকে, তাদের সকলকে কি আপনি চেনেন ?

তা অবশ্য সত্যি। শুধু বাড়িতে নয়, তাদের অফিস, তাদের ফ্যাক্টরি কত জায়গাতে, তাদের কত লোক চাকরি করছে, সব কি সৌম্য জানে ? না জানা সম্ভব ? বললে—সে কী বলেছে ?

গোপাল বললে—আরে ছেড়ে দিন ওসব বাজে কথা। সে আপনাদের বাড়ির চাকরের মতন থাকে।

—বলুন না, সে কী বলেছে ?

গোপাল বললে—তিন নম্বর রাসেল স্ট্রীটে আপনাদের একটা বাড়ি আছে, সেই বাড়িতে সেই মেয়েটি আছে, যার সঙ্গে আপনার বিয়ে হবে—

সৌম্য কথাটা শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বললে—আপনি ঠিক শুনেছেন ?

—ঠিক শুনবো না তো বলছি কেন ?

বলেই বললে—যাকগে এ-সব বাজে কথা, আমি এখন আসি ! আপনি আজকে ক্লাবে যাচ্ছেন তো ? আমি আপনার জন্যে ওয়েট করবো—

বলে উঠলো।

সৌম্য বললে—আপনি উঠলেন কেন ?

গোপাল বললে—না, আমাকে এখন উঠতে হবে। আমাকে একবার মিস্টার মিশ্রের সঙ্গে দেখা করতে হবে।

—কে মিস্টার মিশ্র ?

গোপাল বললে—মিস্টার মিশ্রকে চেনেন না ? শ্রীপতি মিশ্র, আমাদের মিনিস্টার।

—আপনার বন্ধু নাকি ?

গোপাল বললে—হ্যাঁ, একটা সার্টিফিকেট দরকার। সেই জন্যেই তাঁর কাছে যাচ্ছি।

—কীসের সার্টিফিকেট ?

গোপাল বললে—আর বলেন কেন ? একজন বেহারী মুসলমান বাংলাদেশ থেকে ইণ্ডিয়ায় এসেছে, তার একটা রেশন কার্ড দরকার, আমাকে খুব ধরেছে—

সৌম্য বললে—রেশন কার্ড নিয়ে সে কী করবে ?

গোপাল বললে—রেশন কার্ড না হলে তো তাকে কেউ চাকরি দেবে না। রেশন কার্ড দেখিয়ে ভোটার হতে পারবে—এখন এখানে রেশন কার্ডই তো সব—

কথা শেষ হওয়ার আগেই সিনিয়ার মুখার্জী ঘরে ঢুকলেন। সৌম্যর কাকা। এসেই সামনের চেয়ারে বসলেন।

জিজ্ঞেস করলেন—কেমন লাগছে তোমার অফিসে ?

সৌম্য বললে—ভালো।

মুক্তিপদ বললেন—না, ভালো লাগার তো কথা নয়, তবু তোমার ভালো লাগলো কেন ? তুমি সবে কলেজ থেকে বেরিয়েছ, এরই মধ্যে এ-কাজ ভালো লাগা তো ভালো কথা নয় !

কাকার কথাটার মানে সৌম্য বুঝতে পারলে না, অথচ সত্যিই তার কাজটা ভালো লাগেনি। আগের দিন সমস্ত রাত সে জেগে কাটিয়েছে। ভোরের দিকে মাত্র একটু সে ঘুমিয়েছিল। চিফ্ এ্যাকাউনটেণ্ট মিস্টার নাগরাজন তাকে ডেবিট-ক্রেডিট বোঝাতে এসেছিল। কিন্তু সে কিছুই বোঝেনি। কোটি-কোটি টাকার ব্যালেন্স-শীট তার কাছে নিরর্থক মনে হয়েছে। হাজার-হাজার লোক তাদের ফ্যাক্টরিতে চাকরি করে তাদের সংসার প্রতিপালন করছে, এইটেই চরম কথা। প্রফিট্ যা হচ্ছে তা কোম্পানির ডেভেলপমেণ্ট ফাণ্ডে জমা হচ্ছে। কিছু দেওয়া হচ্ছে শেয়ার-হোল্ডারদের। এ-সব জেনে তার কী লাভ হবে ?

মুক্তিপদ বললেন—এর পর একদিন তোমাকে যেতে হবে আমাদের বেলুড়ের ফ্যাক্টরিতে। আজকে প্রথম দিন, এর বেশি আর তোমাকে কাজ করতে হবে না—

বলে উঠলেন। চলে যাবার আগে বলে গেলেন—ইউ ক্যান টেক রেস্ট নাউ। এখন তুমি বাড়িতে গিয়ে বিশ্রাম নিতে পারো।

বলে চিফ্-অ্যাকাউনটেণ্টের ঘরে গেলেন।

জিজ্ঞেস করলেন—নাগরাজন, কী রকম দেখলে আমার ভেপুটিকে ?

নাগরাজন বললেন—জুনিয়ার মুখার্জী খুব ইনটেলিজেণ্ট স্যার।

আবার সেই একই মিথ্যে কথা। আবার সেই একই খোশামোদ। সারা জীবন কর্তাদের খোশামোদ করে করেই নাগরাজন আজ চিফ অ্যাকাউনটেণ্ট হয়েছে। দেবীপদ মুখার্জীর আমলে নাগরাজন ছিল পেটি ক্লার্ক। শক্তিপদ মুখার্জীর আমলে নাগরাজন তাঁকে খোশামোদ করেই প্রমোশন পেয়েছিল। এখন মুক্তিপদ

মুখার্জী'কে খোশামোদ করে করেই চিফ অ্যাকাউনটেণ্ট হয়েছে। আর তারপর এখন সৌম্যকেও খোশামোদ করা শুরু করেছে। এই-ই হলো নাগরাজনের স্বরূপ। অথচ ফার্মের নাড়ি-নক্ষত্র সব জানে সে। তাকে ফাঁকি দেওয়া কারো পক্ষে সম্ভব নয়, তার হাতেই মুক্তিপদ মুখার্জী'র জীয়ন-কাঠি। সে ইচ্ছে করলে কোম্পানির মালিককে ফাঁসাতে পারে। ভেতরকার সব রহস্য সে অডিটারকে জানিয়ে দিতে পারে। তাই সে যা মাইনে চায় তাই-ই দিতে হয় মুক্তিপদ মুখার্জী'কে। নাগরাজন বাঁচাতে চাইলে মুক্তিপদ মুখার্জী বাঁচবেন, নাগরাজনকে মারতে চাইলে মুক্তিপদ মুখার্জী মারা যাবেন। এ এক অদ্ভুত অঙ্কের ভেলকি। এই ভেলকি সামলাতে একদিকে নাগরাজন আর অন্য একদিকে বিজয়েশ কানুনগোর হাতে টাকা গুঁজে দিতে হয়। মোটা-মোটা টাকা। কিন্তু তাতেও শান্তি নেই মুক্তিপদ মুখার্জী'র জীবনে। তার ওপরে আছে নন্দিতার আবদার। কথায় কথায় যাবে কন্টিনেণ্টে। সেখানে গিয়ে মেয়েদের সঙ্গে শপিং করবে। যে-নাইটি ইণ্ডিয়ায় তিনশো টাকায় কিনতে পাওয়া যায়, সেই 'নাইটি'ই স্টেট্সে গিয়ে কিনবে তিন হাজার টাকায়। কাস্টমস-এর বিল চোকাবেন মুক্তিপদ মুখার্জী। লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন। বাইরের লোক ভাবে আমি কত হ্যাপী। এইটেই হচ্ছে ঈশ্বরের সবচেয়ে বড় ইয়ার্কি'।

—হ্যালো—

নাগরাজন টেলিফোনের রিসিভারটা মুক্তিপদর হাতে তুলে দিলে।

—স্যার, আপনার বাড়ির কল্—

মুক্তিপদ যা ভেবেছিল ঠিক তাই। বললে—এখন আমাদের একটা কনফারেন্স চলছে। এখন ভেরি বিজি···আমার যেতে একটু দেরি হবে···

বলে রিসিভারটা যথাস্থানে রেখে দিলে। তারপর নাগরাজনকে জিজ্ঞেস করলে—আচ্ছা নাগরাজন, মানুষ বিয়ে করে কেন বলতে পারো? কী জন্যে মানুষ বিয়ে করে?

এ-কথার কী উত্তর দেবে নাগরাজন। তার মনিবের মুখ থেকে নাগরাজন এ-কথা অনেক বার শুনেছে। তবু সে বললে—আপনি এখন বাড়ি যান স্যার। অফিসের কথা যদি সমস্তক্ষণ ভাবেন তো আপনার শরীর আরো খারাপ হবে—

মুক্তিপদ মুখার্জী নাগরাজনের মুখ থেকে কথাগুলো শুনে বললেন—ঠিক বলেছ নাগরাজন, তুমি ঠিক কথাই বলেছ। তোমরাই সুখে আছো নাগরাজন, যাদের টাকা বেশি আছে, তাদের দুঃখ-কষ্টের শেষ নেই। আমার বাবা অল্প বয়েসে মারা গেছেন, আমার দাদাও অল্প বয়েসে মারা গেছেন। এবার আমার পালা। এর পর সৌম্য অফিসে এসেছে। এরও সেই একই পরিণতি···তুমিই ঠিক বলেছ। এখন আমি বাড়ি যাই—

বলে উঠলেন তিনি।

বড় সাহেব লিফট্ দিয়ে নিচেয় নামবেন। লিফটম্যান তাঁকে দেখেই লম্বা একটা সেলাম করেছে। সে আগে তাঁর বাবাকেও সেলাম করেছে, দাদাকেও করেছে, তাঁকেও সেলাম করছে। এবার সেলাম করবার লোক একজন বাড়লো। এঁরাই পৃথিবীতে সত্যিকারের সুখী।

মুক্তিপদ দেখলে ভেতরে সৌম্য রয়েছে।

জিজ্ঞাসা করলেন—এ কি, তুমি এতক্ষণ অফিসে কী করছিলে ?

সৌম্য বললে—ফাইলগুলো দেখছিলুম।

মুক্তিপদ বুঝলেন তাঁর নিজের যে দশা হয়েছে, একদিন এই সৌম্যর সেই একই দশা হবে। জিজ্ঞেস করলেন—কিছু বুঝলে ফাইলগুলো দেখে ?

সৌম্য বললে—আজকে প্রথম দিন, কিছু বুঝতে পারলুম না।

—আমাদের অডিটারস এ্যানুয়্যাল রিপোর্টটা পড়েছ ? যেটা লাস্ট ইয়ারে সব শেয়ারহোল্ডারদের পাঠানো হয়েছে ?

—দেখেছি।

—কী দেখলে ?

সৌম্য বললে—লাস্ট ইয়ারের চেয়ে এ বছরের প্রফিট কমে গেছে, আগের ইয়ারে ইকুইটি শেয়ারে ডিফিডেণ্ড দেওয়া হয়েছিল পার-শেয়ার একটাকা আশি পয়সা, এবার দেওয়া হচ্ছে একটাকা ষাট পয়সা। প্রোডাকশানে ডিফিসিট্ হয়েছে, লেবার ট্রাবলের জন্যে প্রোডাকশান কমে গেছে ফার্টি পার্সেণ্ট—

মুক্তিপদ জিজ্ঞেস করলেন—প্রোডাকশান কেন কমেছে ?

সৌম্য বললে—মেইন্‌লি লেবার-ট্রাবল; আর তারপর আছে ইলেকট্রিক ফেলিওর—

মুক্তিপদ সৌম্যর উত্তর শুনে খুশী হলেন। বললেন—ভেরি গুড, কিন্তু—

ততক্ষণে লিফট্ গ্রাউণ্ড-ফ্লোর ছুঁয়েছে। মুক্তিপদ কথার জের টেনে বলতে লাগলেন—কিন্তু আসল কারণ অন্য—

সৌম্য কাকার মুখের দিকে চাইলে। অর্থাৎ তার মানে ?

—আসল কারণ হলো ঘুষ!

—ঘুষ ?

মুক্তিপদ বললেন—হ্যাঁ। পরে অবশ্য তুমি সবই জানতে পারবে! তবু এখন শুধু এইটুকুই জেনে রাখো, এর কারণটা হলো পলিটিক্যাল।

সৌম্য আবার জিজ্ঞেস করলে—পলিটিক্যাল কেন ?

মুক্তিপদ বলতে লাগলেন—এখানে আমাদের যতগুলো পলিটিক্যাল পার্টি আছে, তাদের সব লীডারদের ঘুষ দিতে হয়। কলকাতায় ছ' সাতটা পলিটিক্যাল পার্টি আছে। আমাকে সব পার্টির লীডার আর চ্যালাদের ঘুষ দিতে হয়—

সৌম্য জিজ্ঞেস করলে—সব পার্টিকে কেন ঘুষ দিতে হয় ? যে পার্টি ইন্-পাওয়ার, তাকে ঘুষ দিলেই তো চুকে যায় ঝামেলা—

মুক্তিপদ বললেন—তুমি নতুন, তাই ও-কথা বলছো। পুরোনো হলে আর ও কথা বলতে না। কখন কোন পার্টি পাওয়ারে আসে তা তো বলা যায় না, তাই আমরা ভবিষ্যৎ ভেবে সব পার্টিকেই ঘুষ দিই। শুধু আমরা নই, বিড়লা, টাটা, গোয়েঙ্কা, মাহীন্দ্র সবাই-ই তাই করে—

সৌম্য জিজ্ঞেস করলে—অডিট রিপোর্টে ওটা কোন খাতে দেখানো হয় ?

মুক্তিপদ বললেন—ভালো করে নজর করলে দেখতে পাবে Income and expenditure in foreign exchange বলে একটা আইটেম আছে। সেখানে

দেখবে বলা আছে expenditure, technical service and consultation fees, interest and commission, আর others. আসলে ওই জায়গাতেই গোঁজামিলটা দেওয়া সোজা—

তারপর প্রসঙ্গটা থামিয়েই মুক্তিপদ বললেন—এসব তুমি পরে বুঝবে, আজ থাক, আমি চলি—

বলে তিনি চলে গেলেন।

সৌম্যও তার নিজের গাড়িতে গিয়ে উঠলো। তারপর গাড়ি চলতে লাগলো সেণ্ট্রাল এ্যাভিন্যু ধরে। কাকার কথাগুলো মাথার মধ্যে গুঞ্জন করতে লাগলো। সব পার্টির লীডার আর তাদের ফলোয়ারদের ঘুষ দিতে হয়!

গাড়িটা সেণ্ট্রাল এ্যাভিন্যু দিয়ে যাচ্ছিল। সৌম্য দেখলে দেওয়ালে আলকাতরা দিয়ে মোটা মোটা অক্ষরে লেখা রয়েছে—

"হলদিয়াতে জাহাজ নির্মাণ
কারখানা
করতে হবে"

সৌম্য দেখলে আর একটি দেওয়ালে লেখা :

"কেন্দ্রের কলকারখানায় কেন্দ্রীয়
পুলিশ বাহিনী
রাখা চলবে না"

আর একটা জায়গায় লেখা :

"কেন্দ্রের আয়ের শতকরা
পঁচাত্তর ভাগ
রাজ্য সরকারকে দিতে হবে"

এতদিন সৌম্যর এই সব দেওয়াল-লিখনের দিকে নজর পড়েনি। কাকার সঙ্গে কথা বলার পর লেখাগুলোর যেন মানে বুঝতে পারা গেল :

"কংগ্রেসের ওই কালো হাত
কতজনকে খুন করেছে
তা ভুললে চলবে না"

আর এক জায়গায় লেখা :

"খুনী সি-পি-এমকে
আর একটিও ভোট নয়"

সৌম্য এতদিন কলেজে গেছে, নাইট-ক্লাবে ফূর্তি করতে গেছে, কিন্তু এ-সব কথা দেওয়ালে লেখা থাকা সত্ত্বেও কখনও মন দিয়ে এ-সব দিকে দেখেনি। আজ যেন কাকার কথায় সে কলকাতাকে নতুন করে চিনতে পারলো।

মনে পড়লো মিস্টার হাজরার কথা। কোথায় কোন্ এক মিনিস্টার শ্রীপতি মিশ্রের কাছে কাদের রেশন কার্ডের জন্যে সার্টিফিকেট আনতে যাবে। কিন্তু রেশন কার্ডের জন্যে সার্টিফিকেট লাগবে কেন?

মিস্টার হাজরার কথা মনে পড়তেই আরো একটা কথা মনে পড়লো সৌম্যর।

বিডন স্ট্রীটের ভেতরে ঢুকে বারোর-এ নম্বর বাড়িটার ভেতরে গাড়িটা অভ্যস্ত

গাড়িতে ঢুকে পড়লো।

এখানেও সেলাম।

গিরিধারী সিংরা এখনও শৃংখলার প্রতীক। এই জন্যেই তো তাদের বাড়িতে কোনও লেখা-পড়া জানা লোক রাখা হয় না।

গাড়ি থেকে নামতেই সৌম্য সদর গেটের সামনে একটা অচেনা লোককে দেখে সেদিকে ঘাড় ফেরালো। লোকটা তাকে নমস্কার করলে।

—কে?

সৌম্যবাবু যে তাকে চিনতে পারবেন, এমন আশা অবশ্য সন্দীপ করেনি। আর সন্দীপও ক'দিন ধরে ভাবছিল কী করে সৌম্যবাবুর সঙ্গে কথা বলা যায়! বিয়ে তো একদিন হবেই। শুভদৃষ্টির সময়েই বর আর কনে দুজনে দুজনকে প্রথম দেখবে, এইটেই তো বরাবরের নিয়ম।

কিন্তু মাসিমা যদি আগে থেকে জামাইকে দেখতে চায়, তাহলে কি সেটা খুবই অন্যায় আবদার? একমাত্র মেয়ের বিধবা মা। তাঁর জামাইকে তিনি দেখতে চাইবেন এটা তো স্বাভাবিক। দূর থেকে শুধু তিনি দেখবেন। আর তো কিছু নয়। তাতে কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হবে?

—কে?

—সন্দীপ সামনের দিকে একটু এগিয়ে গেল।

—কে আপনি?

—সন্দীপ বললে—আমি এ বাড়িতেই থাকি—

এককালে যে এই সৌম্যবাবুর সঙ্গে নাইট-ক্লাব থেকে একই গাড়িতে রাত তিনটের সময় এই বাড়িতে এসেছিল তা মনে করিয়ে দেওয়া অর্থহীন। তখন কি আর তার স্বাভাবিক অবস্থা ছিল!

যখন এক রাত্রের জন্য সন্দীপ সৌম্যবাবুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েছিল তখন ছিল অন্যরকম। তখন সৌম্যবাবু মদের ঝোঁকে বলেছিল—কী ব্রাদার, তুমিও সিংকিং সিংকিং ড্রিংকিং ওয়াটার? তুমিও ব্রাদার ডুবে ডুবে জল খাও?

সৌম্যবাবুর কথায় সন্দীপ বোধহয় বড় ঘাবড়ে গিয়েছিল। ভালো করে মুখে কথাই যোগায়নি। কিন্তু সৌম্যবাবুর তো তখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাজে লোকের সঙ্গে বাজে কথা বলবার সময় ছিল না। সৌম্যবাবু আর কোনও কথা না বলে সোজা বাড়ির ভেতরে চলে গিয়েছিল।

তা ছাড়া রাত্রে ক্লাবে যেতে হবে, কথা দেওয়া আছে মিস্টার হাজরাকে। তার জন্যেও সন্ধ্যে থেকে তৈরি হওয়া দরকার—

বিপ্লব যখন আসে তখন বোধ হয় এমনি করে নিঃশব্দেই আসে। প্রথমে কেউ তা টের পায় না কিংবা টের পেলেও চোখ বুজে মানুষ সমসাময়িক কালের তালে তাল দিয়ে চলে। তালে তাল দিয়ে চলার অনেক সুবিধে। তাদের মনের কথাটা হচ্ছে—কাজ কী বাপু ঘাঁটিয়ে? যেমন চলছে তেমনই চলুক না! তোমার বিরাগভাজন হয়ে কী লাভ? তোমার শান্তিতে আমি বাধা দেব না, আমার শান্তিতেও তুমি বাধা দিও না। যদি কোথাও কোনও অন্যায় ঘটে, যদি কোথাও কেউ বেআইনী কাজ করে, তাহলে তুমিও চোখ বুজে থাকো, আমিও চোখ

বুজে থাক।

বাঙালী জীবনধারা এইটেই হচ্ছে চিরন্তন ইতিবৃত্ত। এই ইতিবৃত্তটাই আজ বাঙালীর 'ঐতিহ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর ঐতিহ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে বলেই যখনই কোনও বেয়াড়া প্রকৃতির বাঙালী এর ব্যতিক্রম ঘটাতে গেছে তখনই সব বাঙালী মিলে তাকে বিধ্বংস করতে একজোট হয়েছে।

বাঙালীরা জাতি হিসেবে রাস্তার বেওয়ারিশ সারমেয়র স্বভাব পেয়েছে। আকাশের চাঁদের উদয়-অস্তের সঙ্গে তো রাস্তার বেওয়ারিশ কুকুরদের কোনও সম্পর্ক থাকার কথা নয়। কিন্তু তবু দেখা গেছে, রাস্তার সারমেয় দল আকাশে চাঁদ উঠতে দেখলেই ঘেউ-ঘেউ করে তার প্রতিবাদ জানায়, তার বিরোধ করতে চেষ্টা করে। বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, শরৎচন্দ্র, সুভাষ বোস—কেউই বাঙালীদের এই জাতীয়-বিষ-বমন থেকে নিষ্কৃতি পাননি।

এই সন্দীপও তেমনি। সন্দীপ স্মরণীয় ব্যক্তিদের কেউ নয়। সে একটা অতি নগণ্য উপন্যাসের অতি নগণ্য একটা নায়ক। তবু সে-ও এই বিষ বমনের হাত থেকে রেহাই পায়নি।

কোর্টের মধ্যে সরকারী উকিল হাকিমের সামনেই তাকে জেরা করেছিল।

জিজ্ঞেস করেছিল—আপনি ব্যাঙ্কের ম্যানেজার হয়ে নব্বই লাখ টাকা কেন চুরি করলেন ?

সন্দীপ অত্যন্ত শান্ত গলায় বলেছিল—আমার টাকার ওপর লোভ হয়েছিল—

কিন্তু আপনার তো সংসারও নেই, আপনার বাপ-মা-ভাই-বোন-বউ-ছেলে-মেয়ে কেউই নেই, তাহলে টাকার ওপর আপনার এত লোভ হয়েছিল কেন ?

সন্দীপ এ-কথার কী জবাব দেবে ? সে উকিলের জেরার জবাবে কিছুই বলেনি। লোভ কি শুধু বাপ-মা-ভাই-বোন-বউ থাকলেই হয় ? মানুষ তো সংসারে সব কিছুই পেতে চায়। তা সে প্রয়োজন থাকুক আর না-থাকুক। লোভও তো একটা রিপু ছাড়া আর কিছু নয়।

—বলুন, উত্তর দিন আমার কথার ?

সন্দীপ বলেছিল—হিটলারেরও তো কেউ ছিল না, তাহলে তাঁর এত বড় যুদ্ধটা করে এত দেশ জয় করার লোভ হয়েছিল কেন ?

এর পর স্ট্যানডিং কাউন্সিল জিজ্ঞেস করেছিল—আচ্ছা, আর একটা কথা জিজ্ঞেস করছি, ঠিক ঠিক জবাব দেবেন।

—বলুন।

উকিল প্রশ্ন করলে—বিশাখা দেবী ওরফে অলকা দেবীকে কি আপনি চেনেন ?

সন্দীপ বললে—হ্যাঁ।

—আচ্ছা, এবার বলুন তো সেই বিশাখা দেবীর সঙ্গে কি আপনার বিয়ে হয়েছিল ?

সন্দীপের অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ যেন এক ধাক্কায় একেবারে ভিত সুদ্ধ থরথর করে কেঁপে উঠলো।

—এই নিচের জায়গায় তো আপনি আপনার নাম সই করেন নি ?

যেন এক ঝটকায় সন্দীপ স্বপ্নের জগৎ থেকে একেবারে বাস্তব জগতে এসে

ভূমিসাৎ হয়ে গেল। মন এ রকম এলোমেলো হয়ে যায় কেন?

না, এ কোর্ট নয়, ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি। মনে আছে সে ল' কলেজে ভর্তি হবার জন্যে তখন টাকা জমা দিচ্ছিল। তার বরাবর ইচ্ছে ছিল সে ল' পাশ করে বেড়াপোতার কাশীনাথবাবুর মত উকিল হবে। উকিল হয়ে মা'র আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করবে। এতদিনে সে ল' কলেজে ভর্তি হলো। কিন্তু তখনও তার কেবল মনে হচ্ছে সৌম্যবাবু তাকে যখন চিনতেই পারলে না তখন মাসিমাকে সে কী বলবে মানুষ কি তাহলে মদ খেলেই ভালো হয়ে যায় আর মদ না খেলেই মানুষ খারাপ হয়ে যায়? সেদিন রাত্রে তো ওই সৌম্যবাবুই তার প্রাণের বন্ধু হয়ে গিয়েছিল। বলেছিল—আরে ব্রাদার, তুমিও শেষকালে সিংকিং সিংকিং ড্রিংকিং ওয়াটার···

তখন সৌম্যবাবু তার কত অন্তরঙ্গ! আর এদিন চিনতেই পারলে না একেবারে। সৌম্যবাবু তখন সদর দরজা দিয়ে ঢুকে বাড়ির ভেতরে চলে গেছে।

গিরিধারী সমস্ত ঘটনাটাই এতক্ষণ লক্ষ্য করেছিল। সন্দীপের মুখে হতাশার ছাপ দেখে একটু অবাক হয়ে চেয়ে রইল। জিজ্ঞেস করলে—কী হলো বাবুজী?

সন্দীপ বললে—তুমি তো দেখলে গিরিধারী, নিজের চোখেই তো দেখলে—

গিরিধারী আর এর কী উত্তর দেবে!

শুধু বললে—সাহাব লোগোঁ কা বাত যানে দিজিয়ে বাবুজী—

সন্দীপ বললে—না, তা বলছি না। অথচ তুমি তো জানো, সেদিন রাত তিনটের সময় আমিই তো তোমার ছোটবাবুর সঙ্গে একই গাড়িতে বাড়ি ফিরেছি, তখন আমার সঙ্গে তোমার ছোটবাবুর কত গলাগলি ভাব—

—উও বাত যানে দিজিয়ে বাবুজী, হাম লোক তো উনকা নৌকর হ্যায়—

কিন্তু তখনও কি সন্দীপ জানতো, নাকি সৌম্য জানতো যে ভবিষ্যতে একদিন ওই সৌম্যবাবুকেই আবার স্বার্থসিদ্ধির জন্যে এই সন্দীপেরই পা জড়িয়ে ধরতে হবে!

হয়ত এও ঈশ্বরের এক ইয়ার্কি। মানুষের ঈশ্বরও হয়ত মানুষকে নিয়ে এক ধরনের ইয়ার্কি দিতে ভালোবাসেন! নইলে ওই বিশাখাকে নিয়েই বা একদিন সন্দীপকে কেন বিয়ের পিঁড়িতে বসতে হয়। আর সন্দীপকে ঘিরে বিশাখাকেই বা কেন সাত পাক দিয়ে ঘুরতে হয়?

ঈশ্বরের ইয়ার্কি ছাড়া একে আর কী-ই বা বলা যায়?

কোনও একটা বইতে জার্মান কবি ও দার্শনিক গোটে বলেছেন যে ইতিহাসকে দুটো ভাগে ভাগ করা যায়: একটা হচ্ছে বিশ্বাসের যুগ আর অন্যটা অবিশ্বাসের।

বিশ্বাসের যুগ উজ্জ্বল সফল আর গতিশীল। যে যুগে অবিশ্বাসের আধিপত্য তা অনুজ্জ্বল ও বন্ধ্যা। সেই অধ্যায়গুলি ইতিহাসের পশ্চাৎপটে থাকে। লোকে তা ভুলে যায়।

মানুষের বেলাতেও সেই একই নিয়ম।

জীবনে যাঁরা প্রতিষ্ঠালাভ করেছেন তাঁরা সকলেই একটা না একটা কিছু গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে আঁকড়ে ধরেছেন। কোনও কিছুতেই যাঁদের বিশ্বাস নেই তাঁরা ভেসে যান, তলিয়ে যান জীবনের আবর্তে।

কলেজে পড়বার সময় এক বন্ধু তাকে একটা বই পড়তে দিয়েছিল, সেই বইটাতেই ওপরের ওই কথাগুলো লেখা ছিল।

বইটাতে বার্টাণ্ড রাসেলের জীবনের কথা লেখা ছিল সবিস্তারে।

বার্টাণ্ড রাসেলের বই পড়ে অনেক লোক ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতো। কেউ বলতো তিনি স্কেপটিক, সংশয়বাদী, কোনও কিছুতেই তাঁর আস্থা নেই। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরে লোকে বিশ্বাস করেছে যে তাঁর বিশ্বাসের জোরে তিনি পাঠককে অনায়াসে তাঁর বই-এর শেষ লাইন পর্যন্ত আকর্ষণ করতে পারেন।

বইটা পড়ে সন্দীপ নিজেকেও কতবার জিজ্ঞেস করেছে—সে নিজে কী? বিশ্বাসী না অবিশ্বাসী?

মানুষ তো অনেক ছিল পৃথিবীতে, অনেক আছে, আর অনেক থাকবেও? কিন্তু তাদের মধ্যে ক'জন নিজের নিজের অক্ষয় কৃতিত্বে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে?

সন্দীপ একজন সাধারণ নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অতি সাধারণ ঘরের মানুষ। তার দ্বারা কোন্ অক্ষয় কৃতিত্ব সাধন করা সম্ভব?

সন্দীপ এমন এক যুগে জন্মেছে যখন মানুষ যে-কোনও প্রকারে কার্যসিদ্ধি করে টাকা উপার্জন করাটাকেই শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব বলে মনে করে।

আসলে বাইরে থেকে দেখতে গেলে সন্দীপ নিজেও তো একজন তাই, নিজে পরের বাড়ির উচ্ছিষ্ট খেয়ে মানুষ, এখন ল'কলেজে পড়ছে। উদ্দেশ্য সেই একই। একদিন আইন পাশ করে কাশীনাথবাবুর মত ওকালতি করে তাঁর মত টাকা উপায় করে বড়লোক হবে। অন্য সকলের মত একদিন তারও বিয়ে হবে, সন্তান-সন্ততি হবে, সংসার হবে। তারপর কলকাতা শহরে একটা বাড়ি হবে। যা সব বাঙালীর আজন্ম স্বপ্ন।

কিন্তু তারপর?

তারপর একটা গাড়ি!

—কিন্তু তারও পরে?

তারপরেরও যে একটা তারপর আছে, সেটার কথা কেউই তো ভাবে না। কিন্তু ভাববে না কেন? তাহলে কি এই পৃথিবীর আদির কথাও ভাববে না, অন্তের কথাও ভাববে না, শুধু বর্তমানের কথাই ভাববে?

বিকেল চারটের সময় সন্দীপের ক্লাশ আরম্ভ হতো। আর সে ক্লাশ শেষ হতো বিকেল পাঁচটার সময়, মাত্র এক ঘণ্টার ক্লাশ। অর্থাৎ প্রায় সারা দিনটাই ছুটি।

বিডন স্ট্রীট থেকে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত পায়ে হেঁটে যেতে এমন কিছু শক্ত কাজ নয়। হাঁটতে হাঁটতেই সন্দীপ কলেজে যেত আর হাঁটতে হাঁটতেই

কলেজ থেকে সে বাড়ি আসতো।

যেদিন কোনও মিছিল যেত রাস্তা দিয়ে সেদিন সন্দীপ ফুটপাথের ওপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেদিকে চেয়ে চেয়ে দেখতো। কীসের মিছিল? কাদের মিছিল?

কোথায় কিছু অন্যায় বা অবিচার হলে তবেই তো মিছিল হয়। লাল কাপড়ের ওপর লেখা থাকে মিছিলের উদ্দেশ্য! লাল কাপড়টা দুটো লাঠি দিয়ে বেঁধে উঁচু করে ধরা হয়।

একজন ভদ্রলোককে পাশে দেখতে পেয়ে সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—হ্যাঁ মশাই, এ কীসের মিছিল, বলতে পারেন?

ভদ্রলোক বললেন—আবার কাদের? কমিউনিস্টদের··

বলে যেন বিরক্ত হয়ে অন্য দিকের অন্য ভিড়ের মধ্যে মিলিয়ে গেলেন।

মিছিলের সামনের লোকটা তখন চিৎকার করছে—

স্বৈরতন্ত্রী আমেরিকা ভিয়েৎনাম ছাড়ো—

ছাড়ো ছাড়ো ভিয়েৎনাম ছাড়ো

আর দলের সবাই সেই সুরে সুর মিলিয়ে চেঁচাচ্ছে:

ভিয়েৎনাম ছাড়ো।

ভিয়েৎনাম ছাড়ো॥

ছাড়ো ছাড়ো ভিয়েৎনাম ছাড়ো।।।

আশ্চর্য, সন্দীপ সত্যিই অবাক হয়ে গেল। এই ক'বছর আগেই সন্দীপ তাদের বেড়াপোতায় অন্য কথা শুনেছিল। সে তার ছোটো বেলাকার কথা। তখন একবার একটা গান-বাজনার ফাংশান হয়েছিল সেখানে। কলকাতার একটা দল তখন বেড়াপোতায় গিয়ে "নবান্ন" নামে একটা থিয়েটার করেছিল। তারপর একটা কোরাস গান গেয়েছিল তারা:

"কমরেড্ ধরো হাতিয়ার—ধরো হাতিয়ার
স্বাধীনতা সংগ্রামে নহি আজ একলা
বিপ্লবী সোভিয়েট। দুর্জয় মহাচীন
সাথে আছে ইংরেজ নির্ভীক মার্কিন···"

এ কী করে হলো? এককালের বন্ধু 'নির্ভীক মার্কিন' হঠাৎ আজ এই ক'বছরের মধ্যেই 'স্বৈরতন্ত্রী আমেরিকা' হয়ে উঠলো কেন? কী করে?

যাক্ গে, চুলোয় যাক্ গে ও-সব। সন্দীপ ভিড় কাটিয়ে আবার একমনে রাস্তা দেখে দেখে চলতে লাগলো কলেজের দিকে। বাইরের জগতের ঝড়-ঝাপটা দেখে ভয় পেলে তার চলবে না। তার নিজের পথ তাকে নিজেকেই করে নিতে হবে। এক মা ছাড়া তার আর কেউ নেই পৃথিবীতে। তার জীবনের এইটেই সার কথা। দল বেঁধে হুজুগ করা যায়, দল বেঁধে হয়ত যুদ্ধও করা যায়। কিন্তু মানুষ হওয়া? মানুষ হতে গেলে তো তাকে একলাই চলতে হবে। দল বেঁধে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও হওয়া যাবে না, দল বেঁধে স্বামী বিবেকানন্দও হওয়া যাবে না। দল বেঁধে কেউ সোক্রেটিস্ও হতে পারেনি, দল বেঁধে কেউ যিশুখ্রীষ্টও হতে পারেনি। পরে অবশ্য তাঁদের নামে দল সৃষ্টি হয়েছে। পরে সবাই দল বেঁধে কখনও স্বামী বিবেকানন্দের কখনও বা যিশু খ্রীষ্টের জয়গান গেয়েছে।

এই-ই তো ইতিহাসের শিক্ষা। ইতিহাসের এই শিক্ষা যে গ্রহণ করেছে সে-ই একলা চলার ব্রত উদ্‌যাপন করেছে।

সেই দিনই ঘটনাটা ঘটলো।

কলেজ থেকে বেরিয়ে আবার সেই একই পথ মাড়িয়ে সন্দীপ চলেছে। হঠাৎ রাস্তার মোড়ের মাথায় একটা পানের দোকানের সামনে কয়েকটা কথা তার কানে এল।

—কাল তো তুমকো পাঁচ রুপাইয়া দিয়া—

আর একজন বললে—জী হাঁ—

—তো আজ ভি পাঁচ রুপাইয়া রাখো।

একজন বলে উঠলো—লেকিন উ লোগ্ আট রুপাইয়া মাংতা হ্যায়—

—উ বাত্ পিছে হোগা, আজ পাঁচ রুপাইয়া লেও—

তখন আবছা-আলো আবছা-অন্ধকার চারদিকে। হঠাৎ লোকটার দিকে চেয়ে সন্দীপ চমকে উঠলো। গোপাল না?

গোপালও সন্দীপের দিকে চেয়ে চমকে উঠেছে

—আরে, তুই?

গোপাল যেন বহুরূপী। বিচিত্র রূপে, বিচিত্র পোষাকে তাকে দেখে সন্দীপ আগেও অবাক হয়ে গিয়েছিল। আজকে আবার তার একেবারে অন্য এক পোষাক। আগাগোড়া খদ্দরের পাঞ্জাবি আর খদ্দরের ধুতি। যেন কংগ্রেসের কোনও লীডার।

সন্দীপকে দেখে গোপাল তার হাত ধরে টেনে নিয়ে সামনের দিকে চললো।

জিজ্ঞেস করলে—কোত্থেকে তুই?

সন্দীপ বললে—আমিও তো তাই-ই জিজ্ঞেস করছি, তুই কোত্থেকে?

গোপাল বললে—আমি আর কোত্থেকে? ঘুরছি ধান্দায়—

—কীসের ধান্দায়?

—টাকা ছাড়া আর কীসের ধান্দায় ঘোরে মানুষ বল্? সব ব্যাটা তো কেবল টাকার ধান্দাতেই চিরকাল ঘোরে। মানুষের তো টাকা ছাড়া আর কোনও ধান্দা নেই—

সন্দীপ গোপালের কথায় আরো আগ্রহী হয়ে উঠলো।

বললে—সত্যিই আর কোনও ধান্দা নেই মানুষের?

গোপাল বললে—না, আর কোনও ধান্দা নেই কারো। যে উকিল সে কেবল টাকার ধান্দাতেই ওকালতি করে, যে ডাক্তার সে কেবল টাকার ধান্দাতেই ডাক্তারি করে যে পলিটিক্যাল লীডার সেও কেবল টাকার ধান্দাতেই দেশ সেবা করে...

তারপর নিজের কথা থামিয়ে বললে—থাক্ গে, তুই এখন কী করছিস বল্?

সন্দীপ বললে—আমি এখন ল'কলেজে পড়ছি, এখন সেখান থেকেই আসছি—

গোপাল বললে—ওই দ্যাখ্, তুইও সেই একই টাকার ধান্দায় ওকালতি পড়ছিস্—

সন্দীপ একটু লজ্জায় পড়ে গেল। তার মুখে কোনও জবাব এল না।

তারপর বললে—তুই পানের দোকানে কী করছিলি?

গোপাল বললে—পানওয়ালা ব্যাটাকে টাকা দিচ্ছিলুম—

—টাকা দিচ্ছিলি ? কেন ? ধার ছিল বুঝি ?

—দূর ! আজকাল কি কেউ ধার দেয় যে ধার শোধ করতে যাবো···

সন্দীপ বললে—আগে-আগে তো রাত্তিরে রাস্তার মোড়ে-মোড়ে পুলিশকে টাকা দিতিস ! আমার সব মনে আছে—

গোপাল হাসলো। বললে—এখন পুলিশরা আর রাত্তিরে রাস্তায় টাকা নেয় না—

—কেন ?

—ওতে ওদের খুব বদনাম হচ্ছিল। তাই ওরা এখন অন্য ব্যবস্থা করেছে। এখন প্রত্যেক রাস্তার বড়-বড় মোড়ে এক-একটা পানের দোকানে টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমি যে-পানওয়ালাকে টাকা দিয়ে এলুম, তারা রাত্তিরে এক সময়ে এসে ওদের কাছ থেকে সব টাকা হিসেব করে নিয়ে চলে যাবে। বরাবর সব পানওয়ালাদের পাঁচ টাকা করেই দিতুম, কিন্তু কী আবদার দ্যাখ, এখন আবার রোজ আট টাকা করে চাইছে—

সন্দীপ বললে—কিন্তু তুই টাকা দিস কেন ? পুলিশকে টাকা দিয়ে তোর কী লাভ হয় ? কই, আমি তো কাউকে টাকা দিই না—

গোপাল বললে—আমার যে-কারবার তাতে পুলিশকে টাকা না দিলে যে কারবার চলে না—

—কী কারবার তোর ?

গোপাল বললে—আরে, কারবার কি আর আমার একটা ? হাজারটা কারবার আমার। দেখছিস না, দিনে রাতে সব সময়ে চরকীর মত ঘুরতে হয় গাড়ি নিয়ে নিয়ে—

সন্দীপ বললে—তাই তো দেখছি ! তোর সঙ্গে আমাদের বাড়ির সৌম্যবাবুরও যেমন ভাব, তেমনি আবার রাসেল স্ট্রীটের আণ্টি মেমসাহেবেরও ভাব !

গোপালের যেন হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল।

হাতের ঘড়িটার দিকে চাইতেই সে সাপ দেখে ভয় পাওয়ার মত করে লাফিয়ে উঠলো।

বললে—ওই যাঃ ! তোর সঙ্গে কথা বলতে-বলতে একদম ভুলে গেছি।

—কী ভুলে গেছিস ?

—আরে আমার আজকে শ্রীপতিবাবুর সঙ্গে সন্ধ্যা ছ'টার সময়ে এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট। যাঃ, সব গোলমাল হয়ে গেল—

সন্দীপ তবু ছাড়লে না তাকে। জিজ্ঞেস করলে—কিন্তু আমার কথাটার জবাব দিয়ে যা ভাই তুই। রাসেল স্ট্রীটের আণ্টি মেমসাহেবের সঙ্গেও তোর যেমন ভাব, আবার তেমনি বিডন স্ট্রীটের সৌম্যবাবুর সঙ্গেও তেমনি—এটা কী করে হলো, তুই বল্ ভাই—

যেন হঠাৎ একটা ভুলে যাওয়া কথা তার এখন মনে পড়ে গেছে। এমনি ভাবে গোপাল বললে—একটা কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেছে। তোকে বলতে ভুলে গেছি···

—কী কথা ?

—তোদের বিডন স্ট্রীটের সৌম্যবাবুর অফিসে সেদিন গিয়েছিলুম রে, তোদের

সৌম্যবাবু তো এখন স্যাকসবী মুখার্জি' কোম্পানির ডেপুটি ম্যানেজিং ডাইরেকটার রে !

সন্দীপ বললে—সে তো জানি—

—ছোঁড়াটার লাক্ ভালো। অনেক টাকা মাইরি ওদের! সব চোরাই টাকা!

সন্দীপ অবাক হয়ে গেল। জিজ্ঞেস করলে—চোরাই টাকা? চোরাই টাকা মানে?

গোপাল বললে—চোরাই টাকা না হলে অত টাকা পার্টিদের দেয়?

—কোন্ পার্টিদের দেয়?

—সব পার্টিদের দেয়। এখানে যত পার্টি আছে সব পার্টিকেই দেয়! কোন্ পার্টি কখন পাওয়ারে আসে তা তো আগে থেকে বলা যায় না। তাই এখন থেকে সব পার্টিকেই মোটা-মোটা টাকা খাওয়ায়···

তারপরে একটু থেমে আবার বললে—যাক্গে সে-সব কথা। তোদের সৌম্যবাবুকে সেদিন আমি তোর কথা বললুম—

—আমার কথা বললি?

—হ্যাঁরে। বললুম ওদের রাসেল স্ট্রীটের বাড়িতে একটা মেয়েকে রাখা হয়েছে। শুনেছি তার সঙ্গেই নাকি আপনার বিয়ে হবে!

তারপরে আমাকে জিজ্ঞেস করলে কথাটা আমি জানলুম কার কাছ থেকে! আমি তোর কথা বললুম! তা তোকে চিনতেই পারলে না রে—

সন্দীপ বললে—আমাকে চিনবে কী করে? আমার মত তো অনেক লোক ও-বাড়িতে থাকে। ক'জনকে চিনবে? কিন্তু মনে আছে তোর সেই যে একদিন নাইট-ক্লাবে সৌম্যবাবুকে আমি ধরে-ধরে গাড়িতে তুলে দিয়ে বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলুম......

—হ্যাঁ-হ্যাঁ, খুব মনে আছে!

সন্দীপ বললে—জানিস, সেই বিশাখার মা একদিন জামাইকে দেখতে চাইছিল...

—কেন?

সন্দীপ বললে—মেয়ের মা তো, জামাই-এর চেহারা কেমন তা একবার দেখবে ইচ্ছে হবে না? তুই একবার সৌম্যবাবুকে নিয়ে ওদের তিন নম্বর রাসেল স্ট্রীটের বাড়িতে যেতে পারিস?

গোপাল বললে—চেনা নেই শোনা নেই আমি ওকে সে-বাড়িতে নিয়ে যাবো?

·তাতে কী?

গোপাল বললে—তুই নিজেই তো সৌম্যবাবুকে একদিন কথাটা বলতে পারিস—

সন্দীপ বললে—ভাই আমার বলতে লজ্জা করে, তা ছাড়া আমার কথা সৌম্যবাবু শুনবেই বা কেন? আমি কে? একদিন বলতে গিয়েছিলুম, কিন্তু আমি ভয় পেয়ে গেলুম, এমন ভাব দেখালে যেন আমাকে চিনতেই পারলে না—

তারপর একটু থেমে আবার বললে—রাত ন'টার পর তো সৌম্যবাবু রোজই লুকিয়ে-লুকিয়ে গাড়ি নিয়ে তোদের ক্লাবে যায়। একদিন তুই-ই সৌম্যবাবুকে বলিস না—

গোপাল বললে—ঠিক আছে, আমি বলবো—

বলে আবার হাতের ঘড়িটা দেখেই চমকে উঠলো।

বললে—যাই, শ্রীপতিবাবুর বাড়িতে যাই—অনেক দেরি হয়ে গেছে—বলে গাড়িতে উঠে চলে গেল। চলে যাবার পর হঠাৎ সন্দীপের মনে পড়লো কথাটা। আণ্টি মেমসাহেবের সঙ্গে গোপালের কী করে পরিচয় হলো সেটা তো আর জিজ্ঞেস করা হলো না।

কিন্তু তখন আর সময় নেই, তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। গোপালের গাড়িটা তখন অনেক দূরে দৃষ্টির বাইরে অদৃশ্য হয়ে গেছে…
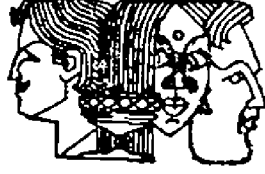
সেদিন রাসেল স্ট্রীটের বাড়িতে যেতেই মাসিমা জিজ্ঞেস করলেন—কী বাবা, আমার জামাইকে দেখাবার কী হলো? তাকে তো একদিন কই আমাদের কাছে নিয়ে এলে না—

সন্দীপ বললে—আমি চেষ্টা করছি, আপনি কিছু ভাববেন না—

মাসিমা বললে—জানো বাবা, কাল একটা বড় খারাপ স্বপ্ন দেখেছি—

—স্বপ্ন?

মাসিমা বললে—না বাবা, আমি স্বপ্নের কথা কাউকে বলবো না। তাই মনটা বড় খারাপ হয়ে আছে! তোমার আসার জন্যে পথ চেয়ে বসেছিলাম—

কতদিন যে মাসিমা সৌম্যবাবুকে দেখতে চেয়েছে তার ঠিক নেই। নিজের জামাইকে দেখতে কোন শাশুড়ি না চায়? যার হাতে নিজের সর্বস্ব তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে হবে তাকে একবার চোখের দেখা দেখতে চাওয়ার মধ্যে অন্যায়টা তো কিছু নেই।

অথচ সন্দীপ অনেক চেষ্টা করেও সে-ব্যবস্থা করতে পারছিল না। তার জন্যে মনে মনে তার একটা দুঃখ-বোধও ছিল।

মল্লিকমশাই একদিন জিজ্ঞেস করলেন—তোমাকে অত মনমরা দেখছি কেন সন্দীপ? কী হয়েছে তোমার? শরীর ভালো আছে তো?

সন্দীপ বলেছিল—ভালো—

—তা হলে কি তোমার মা-র জন্যে মন কেমন করছে?

সন্দীপ সে-কথার কোনও উত্তর দেয়নি।

মল্লিকমশাই বলেছিলেন—তাহলে কলেজের ছুটির সময়ে একবার গিয়ে দেখা করে এসো না—অনেক দিন তোমার মা তো তোমাকে দেখেনি—

সন্দীপ বলেছিল—তাহলে রাসেল স্ট্রীটের বাড়িতে কে যাবে?

কথাটা সত্যি। সন্দীপের তো ওটা একটা নিত্য-কর্ম পদ্ধতি। তাকে সেখানে রোজ একবার করে যেতে হবে। রোজ রাসেল স্ট্রীটের বাড়িতে গিয়ে বিশাখা আর তার মা'র সঙ্গে দেখা করতে হবে। দৈনন্দিন সংসার যাত্রায় কাজ তো কম নয়।

ঠিক সময়ে ঠিক জায়গা থেকে দুধ আনতে হবে। যে-সে দুধ হলে চলবে না। একেবারে খাঁটি দুধ চাই। খাঁটি দুধ না হলে বউমার আবার শরীর খারাপ হয়ে যাবে। ঠাকমা-মণির হুকুম আছে গরুকে বাড়ির সামনে এনে দাঁড় করিয়ে শৈলর চোখের সামনে দুধ দুইতে হবে। তা না হলে গোয়ালারা দুধে জল মিশিয়ে দেবে।

আর শুধু কি দুধ? বাজার থেকে যে শাক-সবজিই কিনে আনা হবে তা যেন ভালো করে নুন-জল দিয়ে ধুয়ে তবে রান্না করা হয়। ফিনাইল দিয়ে রোজ ঘর ধোওয়া মোছা করতে হবে। বাথরুম রোজ জমাদার এসে ব্লিচিং পাউডার দিয়ে পরিষ্কার করবে।

আর এ-সব নিয়ম-কানুন ঠিক ঠিক মেনে চলা হচ্ছে কিনা তা দেখবার ভার সন্দীপের ওপর।

রাসেল স্ট্রীট থেকে ফিরে এসে সন্দীপ একটা বাঁধা সময়ে গিয়ে ঠাকমা-মণিকে রিপোর্ট দেয়।

ঠাকমা-মণি জিজ্ঞেস করেন—গরুর দুধ দোওয়ার সময় শৈল দাঁড়িয়ে থাকে তো?

সন্দীপ বলে—হ্যাঁ—

—আর ঘর-দোর সব ফিনাইল দিয়ে পরিষ্কার করা হয় তো?

সন্দীপ বলে—হ্যাঁ—

—ডাক্তার কাল এসে বউমার শরীর পরীক্ষা করেছে তো? ওজন নিয়েছে? সব কথাতেই সন্দীপ 'হ্যাঁ' বলে যায়। আর ঠাকমার কথাগুলো ঠিক-ঠিক যাতে মানা হয় তার জন্যে সন্দীপের চেষ্টারও কোন ত্রুটি থাকে না। সন্দীপ প্রতিদিন ও-বাড়িতে সে-সব খুঁটিয়ে দেখতো।

কাজ করবার লোক তো মাত্র ওই একটা। সে ওই শৈল। আর একটা লোক রাখলে অবশ্য ভালো হয়। কিন্তু পুরুষ মানুষ চাকর লোক রাখলে তো চলবে না। পুরুষ মানুষ চাকর রাখতে ঠাকমা-মণির আপত্তি।

ঠাকমা-মণি বলতেন—না, বাড়িতে বেটাছেলে নেই, আর একজন ঝি রাখলে তবু চলতে পারে—

কিন্তু তেমনি আর একজন বিশ্বাসী মেয়েলোক কোথায় পাওয়া যাবে?

টাকাটা বড় কথা নয়। বিশ্বাসী যেমন হওয়া চাই, তেমনি আবার কাজের মানুষও হতে হবে! এ-রকম লোক কে কোথায় দেখেছে?

মাসিমা আগে মনসাতলা লেনের বাড়িতে অনেক পরিশ্রম করেছে। বাজার-করাটাই শুধু করেছে তপেশ গাঙ্গুলীমশাই। কারণ অন্য লোককে বাজার করতে দিলে অপব্যয় হওয়ার ভয়। কিন্তু দোকান থেকে রেশন আনা আর কয়লা, ঘুটে, কেরোসিন থেকে আরম্ভ করে ঘর ঝাঁট দেওয়া, রান্না করা, বাসন মাজা পর্যন্ত সবই ছিল মাসিমার কাজের তালিকার অন্তর্ভুক্ত।

কিন্তু এ-বাড়িতে?

ঠাকমা মণি বলে দিয়েছিলেন—ও-সব কাজ বউমার মা'কে করতে হবে না। বউমা'কে দেখা-শোনা করাই তার মা'র হবে প্রধান কাজ।

মাসিমা জিজ্ঞেস করতেন—তা হলে কি শুধু পটের বিবি সেজে চুপচাপ বসে

থাকবো ? তাহলে যে আমার হাতে পায়ে কোমরে বাত ধরে যাবে—

সন্দীপ বলতো—আপনি চুপ-চাপ বসে থাকবেন কেন, বিশাখাকে দেখা-শোনা করাও তো একটা কাজ ! সে কী খাবে, কোন শাড়ি পরে ইস্কুলে যাবে, ইস্কুল থেকে ফিরে এসে কী শাড়ি পরবে, সে-সব ব্যবস্থা করাও তো একটা কাজ⋯ কাজ কি আপনার একটা মর্গসমা ? আর যারা কাজ করবে, তাদের কাজের তদারকি করবার জন্যেও তো একজন লোকের দরকার। আপনি না হয় সেই কাজটাই করলেন ⋯

এত আরামের মধ্যে থেকেও যোগমায়ার এক-একদিন রাত্রে ঘুম আসে না। যোগমায়া যেন বিশ্বাস করতে পারে না এই সব সুখের কথা। আগেকার মত ভোর রাত্রে ঘুম থেকে ওঠবার দরকার নেই আর। সবই শৈল করে। শৈলই সকালবেলা নিচেয় নেমে গিয়ে গোয়ালার সামনে দাঁড়িয়ে গরুর দোওয়া দুধ নিয়ে আসে। তারপর সে-ই উনুনে আগুন দেয়।

শৈল ডাকে—মা, এবার উঠুন—

রাত্রে যখন বিশাখাও ঘুমোয় শৈলও ঘুমোয়, তখন যোগমায়ার এক-একদিন ঘুম আসে না। ঘুম না এলে সেই সব আগেকার জীবনের কথা মনে পড়ে যায়। যাবার আগে মানুষটা বোধহয় বুঝতে পেরেছিল যে তার চলে যাবার সময় হয়ে এসেছে। তখনই বলেছিল—বউ, তুমি কিছু ভেবো না, আমার মায়ের পেটের ভাই ভূপেশ রইলো, সে তোমাকে দেখবে। আমিই তার চাকরি করে দিয়েছি, আমিই তার বিয়ে দিয়েছি। সে রইলো, তোমার ভাবনা কী ? তা কোথায় চলে গেল সেই মানুষটা, কোথায় চলে গেল সেই তার বড় আদরের দেওর—। আজকে আবার কোথাকার কোন বিডন স্ট্রীটের বাড়ির গিন্নী, তারাই তার আপন-জন হয়ে গেল। ভাগ্যের এও বিচিত্র খেলা

কিন্তু তার জামাই ? বিশাখার সঙ্গে যার বিয়ে হবে সেই সৌম্য ! সৌম্যপদ মুখার্জি ! যার টাকার শেষ নেই, যে নাকি নিজেদের কোম্পানির কাজে বছরে বছরে বিলেত যায়। তার সঙ্গেই বিশাখার বিয়ে হবে। বিয়ে হওয়ার পর নাকি তার বিশাখাও জামাই-এর সঙ্গে বিলেতে যাবে !

এ সব সুখের কথা কি কল্পনা করা যায় ?

তবু এ-সব সুখের কথা কল্পনা করতে ভালো লাগে যোগমায়ার। মনে হয়, ভগবান আছেন। যোগমায়া যে এতদিন ধরে বিশাখাকে দিয়ে অত ব্রত করিয়েছে, এ হয়ত তারই ফল।

সকাল থেকেই বিশাখার নানা কাজ থাকে। তাই যোগমায়াই বিশাখাকে ডেকে ডেকে ঘুম থেকে জাগায়। বলে—ওঠো মা, ওঠো, তোমার ইস্কুলের দেরী হয়ে যাবে, ওঠো ⋯

অত সহজে কি মেয়ের ঘুম ভাঙে ?

কিন্তু ওই রকম করেই বিশাখাকে তখনও রোজ ঘুম থেকে ওঠাতে হয়। এই রকম করেই বিশাখাকে খাইয়ে দিতে হয়। বিডন স্ট্রীটের বাড়ির ঠাকমা-মণি মেয়েকে যা-যা খাওয়াতে বলেছিলেন তাই-ই খাওয়ানো হয়। আগে মনসাতলা লেনে যে-মেয়ে লুচি খাওয়ার জন্যে পাগল হয়ে যেত সেই মেয়েরই আবার লুচি খেতে খেতে লুচির ওপর একদিন অরুচি ধরে যায়। দুধ-দই-রাবড়ির ওপর যে-মেয়ের

অত লোভ ছিল সেই মেয়েকেই আবার সেধে এই দুধ-দই-রাবড়ি গিলিয়ে খাইয়ে দিতে হয়।

তা হোক, বিশাখা যে বড় হয়েছে, বিশাখা যে স্কুলে লেখা-পড়া শিখছে, ইংরিজী শিখছে, অঙ্ক শিখছে, নাচ শিখছে, এও তো কম কথা নয়। মনসাতলা লেনে দেওরের বাড়িতে থাকলে কি এইটুকুও হতো। পাড়ার অন্য সব বাড়ির গরীব লোকের বাড়ির মেয়েদের মত হয়ত চিরকাল মুখ্যু হয়ে থাকতো। আর তারপর অনেক কষ্টে হয়ত একটা গরীব বরের গলায় তাকে বেঁধে ঝুলিয়ে দিতে হতো। একটা সহায়-সম্বলহীন বিধবার পক্ষে এর চেয়ে ভালো পাত্র আর কোথায়ই বা জুটতো?

একদিন তার দেওর তপেশ গাঙ্গুলী আবার এসেছিল।

হাজার হোক নিজেরই তো দেওর, বিধবা হওয়ার পর থেকে ওই দেওরই তো তাকে আশ্রয় দিয়েছেন।

তপেশ গাঙ্গুলী আসার সঙ্গে সঙ্গে তার জন্যে শৈলকে যেতে হলো বাজারে মিষ্টি কিনে আনতে।

যোগমায়া জিজ্ঞেস করলে—বাড়ির সব খবর কী ঠাকুরপো, ভালো তো?

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—ভালো, আর কী করে বলি? তুমি চলে আসার পর থেকেই তো তোমার জা আরো খিট্‌খিটে হয়ে উঠেছে। আমার আর ভাল্লাগে না বউদি। আমার আর বাঁচতেও ইচ্ছে করে না। ভাবি, কাদের জন্যে সংসার করছি! কেন যে তখন মরতে বিয়ে করেছিলুম। এক-এক সময় আমার আত্মঘাতী হতে ইচ্ছে করে বউদি, তোমায় আমি সত্যি কথাই বলছি—আমার আর বাঁচতে ইচ্ছে করে না—

যোগমায়া তপেশ গাঙ্গুলীকে পেট ভরে খাওয়ালে সামনে বসিয়ে।

বললে—অত ভেবো না ঠাকুরপো, অত ভাবলে শেষে তোমার নিজের শরীরই ভেঙে পড়বে—

—ভাবি কি সাধে বউদি—

জীবনের ওপর তপেশ গাঙ্গুলীর বরাবরের বিতৃষ্ণা। কারণ একটাই। সেটা হচ্ছে অর্থাভাব। অর্থের জন্যে শুধু স্ত্রীর কাছেই নয়, অন্য সব লোকের কাছ থেকেও তাকে কেবল গঞ্জনাই শুনতে হয়েছে। তার ওপর দাদার মৃত্যুতে বিধবা বউদি আর তার নাবালক মেয়ের ভার তার ওপর পড়াতে সেই অভাব আরো তীব্র হয়েছিল।

কিন্তু কয়েকটা বছরের জন্যে শুধু ভাগ্যের দাক্ষিণ্য তার কপালে জুটেছিল।

খেতে খেতে তপেশ গাঙ্গুলী জিজ্ঞেস করলে—বিশাখা কোথায়?

যোগমায়া বললে—সে তো ইস্কুলে গেছে—

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—অনেক দিন তাকে দেখিনি, এখন কত বড় হলো?

যোগমায়া বললে—বয়েস তো কারো থেমে থাকে না ঠাকুরপো। সে ফ্রক পরা ছেড়ে এখন শাড়ি ধরেছে—

—তাহলে তো বিজলীরই মতো বিজলীও এখন শাড়ি পরে। কিন্তু শাড়ির দামের কথা শুনে তো আমি একেবারে থ হয়ে গেছি বউদি—একটা ছোট মেয়ের

শাড়ির দাম কিনা বলে তিরিশ টাকা—

যোগমায়া বললে—আজকাল তো সব জিনিষেরই দাম বাড়ছে—

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—দাম তো বাড়ছে, কিন্তু আমাদের মাইনে তো আর সেই রেটে বাড়ছে না—

যোগমায়া বললে—সেদিন ও-বাড়ি থেকে বিশাখার জন্মদিনে শাড়ি আর ব্লাউজ দিয়ে গেল, আমি জিজ্ঞেস করতে বললে—ও শাড়িটার দাম নাকি দেড়শো টাকা। শুনে তো আমি আকাশ থেকে পড়লুম।

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—তুমি গেল জন্মে অনেক পুণ্যি করেছিলে বউদি, তাই—

যোগমায়া বললে—ও কথা বোল না ঠাকুরপো—আমার মত অভাগী যেন কেউ না জন্মায়। জন্মেই বাপকে খেয়েছিলুম, শেষকালে তোমার দাদাকেও খেলুম—

বলতে বলতে যোগমায়া চোখ দিয়ে টস্‌ টস্‌ করে জল পড়তে লাগলো।

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—তা হোক, তোমার ভগবান তো তবু তোমার দিকে মুখ তুলে চাইলে, কিন্তু আমার ভগবানের কাণ্ডটা একবার দেখ তো! আমি ভগবানকে তো কত ডাকি, কই, আমার ভগবান তো একবারও আমার দিকে মুখ তুলেও চায় না—

—আর দুটো রসগোল্লা নেবে ঠাকুরপো?

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—তুমি তো জানো বউদি, আমি রসগোল্লা খেতে খুব ভালোবাসি। কিন্তু তার চেয়েও আমি বেশি ভালোবাসি আর একটা জিনিস—

যোগমায়া হাসলো। বললে—কী সেটা? টাকা?

তপেশ গাঙ্গুলীও হেসে ফেলল। বললে—কী করে বুঝলে তুমি বউদি?

যোগমায়া উঠে ঘরের কোণের দিকে রাখা আলমারির পাল্লাটা চাবি দিয়ে খুলে ফেললে। তারপর ভেতর থেকে গোটা কয়েক টাকা নিয়ে এসে তপেশ গাঙ্গুলীর হাতে দিয়ে বললে—এই টাকা কটা নাও ঠাকুরপো···আর রসগোল্লাও দিচ্ছি, একটু দাঁড়াও—

বলে পাশের ঘর থেকে আরো দুটো রসগোল্লা এনে সেই প্লেটটার ওপর রাখলে।

বললে—এবার খুশী তো?

তপেশ গাঙ্গুলী তখন টাকাগুলো 'গুনছে', গুনে দেখে বললে—পঞ্চাশ টাকা দিলে? রসগোল্লা আমি খাচ্ছি। তোমাকে সত্যি কথাই বলি, আজকে তোমার জা রান্নাই করেনি—

যোগমায়া অবাক হয়ে গেল। জিজ্ঞাসা করলে—সে কী, কেন? দিদি রান্না করেনি কেন?

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—তুমি চলে আসার পর থেকে মাসের আদ্দেক দিনই আমি ভাত না খেয়েই আপিসে যাই।

যোগমায়া বললে—তা এ কথা আগে বলবে তো? তাহলে তুমি আজ এখানে খেয়ে যাও—আমি তোমাকে আজ আর ছাড়ছি না। আজ তোমাকে আমার বাড়িতে খেয়ে যেতেই হবে—

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—আমাকে আজ মাপ করো বউদি, আমি বরং অন্যদিন এসে খেয়ে যাবো। তার চেয়ে তোমার কাছে আমি অন্য একটা জিনিস চাই! বলো

দেবে ?

—বলো না, কী জিনিস ?

—আগে বলো তুমি দেবে ?

—জিনিসটা কী, না জানলে আমি কী করে দেব ?

তপেশ গাঙ্গুলীর মুখটা এবার বড় করুণ হয়ে উঠলো।

বললে—তুমি তো জানো না বউদি, আমার কী কষ্টটা। জানো আজকাল মাসের পয়লা তারিখে মাইনেটা পুরো তোমার জা'এর হাতে তুলে না-দিলে তোমার জা আর সেদিন রান্নাই করে না।

যোগমায়া বললে—রান্না না করলে তোমরা সবাই খাও কি ?

তপেশ গাঙ্গুলী এবার সত্যি সত্যিই কেঁদে ফেললে।

বললে—তোমার জা আর বিজলী দোকান থেকে খাবার কিনে এনে খায়—

—আর তুমি ? তুমি কী খাও ?

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—আমি ? হাতে পয়সা থাকলে তবে তো খাবো! বিনা পয়সায় তো খাবারের দোকানীরা খাবার দেয় না। আজকাল তো তাদের সব নগদের কারবার—আমি উপোষ করে থাকি—

তারপর একটু থেমে তপেশ গাঙ্গুলী আবার বললে—তোমার জা আমাকে কেবল জিজ্ঞেস করে আমার মাইনে এত কম কেন ? আচ্ছা বউদি, আমি এর কী জবাব দেব বলো তো ?

কথাগুলো শুনে যোগমায়ার বড় কষ্ট হলো। বললে—তুমি একটু বোস ঠাকুরপো—বলে আবার আলমারির পাল্লা খুলে কিছু টাকা বার করে এনে তপেশ গাঙ্গুলীর হাতে দিলে। বললে—এগুলোও তুমি রাখো ঠাকুরপো—

তপেশ গাঙ্গুলী এবার আর থাকতে পারলে না। একেবারে যোগমায়ার পায়ের ওপর ঝপ্ করে উপুড় হয়ে পড়ে নিজের মাথা ঘষতে লাগলো। আর তপেশ গাঙ্গুলীর চোখের জলের ধারায় তখন যোগমায়ার পা দুটো ভিজে জবজবে হয়ে গেল।

যোগমায়া বললে—ওঠো ঠাকুরপো, ওঠো, ওঠো, করো কী ? করো কী···

কিন্তু তপেশ গাঙ্গুলী দাঁড়িয়ে ওঠবার আগেই একটা কাণ্ড ঘটে গেল। নিচের দরোয়ান সোজা ঘরের ভেতরে এসে ঢুকলো আর পেছন-পেছন ঢুকলো দুজন অচেনা মানুষ।

দরোয়ান ডাকলে—মাঈজী, এই আমাদের ছোটবাবু আ গয়া···

ছোটবাবু! কথাটা যোগমায়ার কানে গেল বটে কিন্তু ঠিক চিনতে পারলে না।

তপেশ গাঙ্গুলী বুঝেছিল যে যারা ঘরে ঢুকেছিল তারা দুজনেই যোগমায়ার অচেনা। সে তাদের ঢুকতে দেখেই হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠলে, জিজ্ঞেস করলে—ছোটবাবু ? আপনারা কে ? তার জবাবে দরোয়ান বললে—

—ইনি আমাদের ছোটবাবু, ছোট হুজুর,

—ছোট হুজুর ? ছোট হুজুর মানে ?

তপেশ গাঙ্গুলী সহজে ছাড়বার পাত্র নয়। বললে—কোথাকার ছোট হুজুর ?

ব্যাপারটা তাতেও স্পষ্ট হলো না।

একজন ভদ্রলোক সামনে এগিয়ে এসে পরিচয় করিয়ে দিলে। বললে—ইনি হচ্ছেন বিডন স্ট্রীটের মুখার্জিবাবুদের বাড়ির সৌম্যপদ মুখার্জি···ঠাকমা-মণির নাতি—

অমাবস্যার ঘোর অন্ধকার রাতে আকাশে হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকালে যেমন লোকের চোখে ধাঁধাঁ লেগে যায়, এও যেন তেমনি। যোগমায়া তখন বোবা হয়ে গেছে আর তপেশ গাঙ্গুলী একবার যোগমায়ার দিকে দেখছে আর একবার সৌম্যপদ মুখার্জির মুখের দিকে। তবু কিছুই বুঝতে পারছে না। জীবনে আর কখনও সে যেন এত চমকে ওঠেনি।

—আর আপনি?

ভদ্রলোক বললে—আমি? আমি এই সৌম্যবাবুর বন্ধু—

—আপনার নাম?

ভদ্রলোক বললে—আমার নাম গোপালচন্দ্র হাজরা—

কিন্তু তাতেও ব্যাপারটা মোটেই স্পষ্ট হলো না। তপেশ গাঙ্গুলী তখন বউদির দিকে চাইলে। অর্থাৎ বউদি যদি এই রহস্যের ওপর কিছু আলোক পাত করতে পারে। দু'জনের কেউই দু'জন অচেনা লোকদের চিনতে পারছে না।

গোপালচন্দ্র হাজরা তখন বললে—আচ্ছা, এ বাড়িতে বিশাখা বলে কেউ থাকে?

যোগমায়া বললে—হ্যাঁ, সে তো আমারই মেয়ে!

গোপাল বললে—তা, তার সঙ্গেই তো আমার এই বন্ধু সৌম্যবাবুর বিয়ে হবে। ইনিই হচ্ছেন সেই আপনার হবু জামাই···

যোগমায়ার মনে হলো যেন সে চোখের সামনে বায়োস্কোপ দেখছে। বহু বছর আগে বিশাখার বাবার সঙ্গে একবার টিকিট কেটে বায়োস্কোপ দেখেছিল। আজকের এই দৃশ্যও যেন ঠিক সেই বহুকাল আগেকার দেখা বায়োস্কোপের মতন। যে জামাইকে দেখবার জন্যে তিনি এতদিন ধরে ছটফট করেছিলেন, এই কি সেই জামাই? এত সুন্দর? জামাই নয়, যেন রাজপুত্র।

যোগমায়া কী করবে আর কী বলবে বুঝে উঠতে পারছিল না। তারপর মুখ দিয়ে শুধু একটা কথা বেরিয়ে গেল—আপনারা বসুন, বসুন—

গোপাল সৌম্যকে ধরে একটা সোফার ওপর বসালো।

বললে—আমাদের 'আপনি-আজ্ঞে' বলছেন কেন মাসিমা? আমরা তো আপনার ছেলের মতন!

তারপর তপেশ গাঙ্গুলীর দিকে ইঙ্গিত করে জিজ্ঞেস করলে—ইনি কে?

যোগমায়া তখনও অস্বস্তিতে থরথর করে কাঁপছে। কোনও রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে বললে—ইনি আমার দেওর, এঁর নাম তপেশচন্দ্র গাঙ্গুলী। বিশাখার বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে এতদিন ইনিই আমাদের দেখা-শোনা করে আসছিলেন।

তপেশ গাঙ্গুলী বলে উঠলো ··আপনারা ওঁর মেয়েটিকে গ্রহণ করলেন, কিন্তু আমারও একটি আইবুড়ো মেয়ে আছে, সেও ওই বিশাখার বয়েসী, আপনারা তার একটা বিলি-ব্যবস্থা করতে পারেন না?

যোগমায়ার কানে দেওরের কথাগুলো বড় খারাপ লাগছিল। দেওরের কথা শেষ হওয়ার আগেই বললে---আপনাদের জন্যে একটু জল-খাবারের ব্যবস্থা করি ··

এবার সৌম্যই বলে উঠলে---না না, ও-সব করবেন না---

যোগমায়া বলে উঠলো---কেন বাবা, আপত্তি করছো কেন? এই যা-কিছু দেখছো, এ-সবই তো তোমার ঠাকমা-মণির দেওয়া। বিশাখাকে তো তোমার ঠাকমা-মণিই তোমার সঙ্গে বিয়ে হবে বলে পছন্দ করে রেখেছেন। তাঁর দৌলতেই তো আমরা খেতে পাচ্ছি।

তপেশ গাঙ্গুলীও বলে উঠলো---হ্যাঁ হ্যাঁ। বউদি তো ঠিক কথাই বলেছে। তোমার ঠাকমা-মণি রোজ গঙ্গাচান করতে যেতেন আমার বউদিও যেত, সেখানেই তো আমার ভাইঝি'কে দেখে তাকে নাত-বউ করবার জন্যে তোমার ঠাকমা-মণি পছন্দ করে রেখে দিয়েছেন---

আর তারপর একটু থেমে আবার বললে---আর এই যে আমি রসগোল্লা খাচ্ছি, এও তো তোমার ঠাকমা-মণির দেওয়া টাকাতেই কেনা---

যোগমায়া বললে---শুধু কি তাই? এই যে বাড়িটা, এটাও তো তোমাদেরই বাড়ি, এই বাড়িটাতে তোমার ঠাকমা-মণি থাকতে দিয়েছেন বলেই তো এখানে আমরা মাথা গুঁজে আছি। এই খাট-সোফা-আলমারি বাসন-কোসন আয়না যা-কিছু দেখছো, সবই তো তোমাদের। তোমরা বাবা সামান্য কিছু খেতে আপত্তি কোর না---

সৌম্যপদর হয়ে গোপাল হাজরাই বললে---এখন কিছু খাবো না মাসিমা, এই একটু আগেই সৌম্যপদবাবু খেয়ে বেরোচ্ছিলেন, আমি এঁকে জোর করে নিয়ে এলুম, শুধু আপনি আপনার জামাইকে দেখতে চেয়েছিলেন বলে---

যোগমায়া জিজ্ঞেস করলে---তা তোমরা কী করে জানলে বাবা যে আমি আমার জামাইকে দেখতে চেয়েছি?

গোপাল বললে---আপনার এখানে সন্দীপ বলে একটা ছেলে থাকে, তার কাছেই প্রথম শুনেছিলুম যে আপনি আপনার জামাইকে দেখতে চান---

যোগমায়া বললে---তা বাবা, আমি তো বাপ-মরা মেয়ের মা, আমার তো জানতে ইচ্ছে করে যার হাতে আমার মেয়েকে দিচ্ছি সে কেমন ছেলে, তাকে কেমন দেখতে---

গোপাল বললে---তা এখন তো তাকে দেখলেন? এখন আপনার পছন্দ হলো?

যোগমায়া বললে---আমি বড় দুঃখী মানুষ বাবা, আমার তো বিশ্বাসই হচ্ছে না যে আমার মত গরীব মায়ের এমন রাজপুত্তুরের মত জামাই হবে---আমার মেয়ে আর জন্মে অনেক পুণ্যি করেছিল, তাই এমন ঘরে এমন বরের সঙ্গে সম্বন্ধ হচ্ছে---

গোপাল বললে---আপনার জামাই যে রূপেই রাজপুত্তুর, তা-ই নয়, গুণেও আপনার জামাই রাজপুত্তুর--

যোগমায়ার চোখ দিয়ে টস্ টস্ করে জল পড়তে লাগলো। আঁচলের খুঁট দিয়ে চোখ মুছে কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই তপেশ গাঙ্গুলী বললে---আরে, তুমি কাঁদছো কেন বউদি? তোমার তো এখন আনন্দ করবার কথা। তোমার জামাই বাড়িতে এসেছে আর এখন কিনা তুমি কাঁদছো? কাঁদলে মেয়ে জামাই-এর

অমঙ্গল হয়, তা জানো না ?

যোগমায়া এবার আরো জোরে কে'দে উঠলো। তার কান্নার বেগ সে আর কিছুতেই আটকে রাখতে পারলেন না। তারপর নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বললে—তোমার দাদা আমার এত সুখ দেখে যেতে পারলে না, এ যে কী দুঃখ তা তুমি বুঝবে না ঠাকুরপো—।

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—তা কাঁদতে হয় তুমি পরে কে'দো! ঘরে তোমার জামাই বসে রয়েছে আর তার সামনে তুমি কাঁদছো। ওরা চলে গেলে তুমি তখন যত ইচ্ছে কে'দো না, তখন কেউ তোমায় বারণ করতে যাবে না—তখন পেটভরে কে'দো—এখন কুটুম বাড়ির লোক এসেছে, তাদের কিছু মিষ্টি-মুখ করাও—তুমি এত কেপ্পোন শাশুড়ি কেন ?

গোপাল বললে—না, না, অমন করলে কিন্তু আমরা উঠে যাবো মাসিমা—

তপেশ গাঙ্গুলী বলে উঠলো—আরে ভায়া, অত লজ্জা করবার কী আছে ? তোমাদের নাম করে আমিও কিছু পেতুম ! মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ—

কথাগুলো কারোরই শুনতে ভালো লাগলো না। কিন্তু তপেশ গাঙ্গুলীর লজ্জা নেই কিছুতেই।

বললে—এ সব তো তোমাদেরই টাকায় হচ্ছে ভায়া, এতে তো লজ্জা করবার কিছু নেই—

কিন্তু সৌম্যপদ গোপালকে বললে—চলুন, যাই—

গোপাল বললে—যে জন্যে আসা তা তো হলো না মিস্টার মুখার্জি—

তারপর যোগমায়ার দিকে চেয়ে বললে—কই, সন্দীপকে তো দেখছি না। সন্দীপ কোথায় ? সে কখন আসে ?

যোগমায়া বললে—সে তো অন্যদিন এর অনেক আগেই আসে, আজকে তো এখনও এলো না, বোধহয় কোনও কাজে আটকে গেছে কোথাও—

গোপাল বললে—সে এলে বলে দেবেন—গোপাল সৌম্যপদ বাবুকে নিয়ে আজ এখানে এসেছিল—

তপেশ গাঙ্গুলীর তখন খুব দেরি হয়ে যাচ্ছিল। তাকেও একবারের জন্যে অন্ততঃ অফিসে যেতে হবে। রেলের অফিস হলেও বেশি তো কামাই করা যাবে না।

সে উঠলো। বললে—আমি তাহলে উঠি ভায়া। আমাকে একবার অন্ততঃ অফিসে মুখটা দেখিয়ে আসতে হবে—

তপেশ গাঙ্গুলী চলে যাচ্ছিল। যোগমায়া বললে—আবার এসো ঠাকুরপো—

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—নিশ্চয়ই আসবো, না এসে যাব কোথায় ? এখন তুমিই তো আমার ভরসা—

বলে দরজা খুলে বাইরে চলে গেল।

এর পরে যোগমায়া বললে—বাবা, তোমাদের ঠাকুমা-মণি আমাদের জন্যে যা করেছেন তা কেউ কারোর জন্যে কখনও করে না। আমার মেয়ে আর জন্মে বোধহয় অনেক পুণ্যি করেছিল, তাই বোধহয় ভগবান আমাদের কপালে এত সুখ দিলেন—

সৌম্যপদ বললে—তাহলে এবার আমরা চলি—

যোগমায়া বললে—তোমরা তো কিছু মুখেও দিলে না, আর খানিকটা বসলে না। তোমাদেরও কাজের খুব ক্ষতি করে দিলুম। আর একটু বসবে না বাবা তোমরা? আমার বিশাখা হয়ত এখুনি এসে পড়বে—

গোপাল বললে—আমরা তো বসতে পারতুম, কিন্তু সৌম্যপদবাবু তো কাজের লোক—

বলতে না বলতেই হঠাৎ এক ঝলক মৌসুমী হাওয়ার মত ঘরে ঢুকলো বিশাখা। সমস্ত শরীরটা তার ঘামে ভিজে গেছে। গরম লেগে লাল হয়ে গেছে সারা মুখটা। সকাল বেলা সামান্য জল খাবার খেয়ে বেরিয়েছিল এখন তার খুব খিধে পেয়ে গেছে। রোজই এই রকম ক্লান্তিতে অবসন্ন হয়ে সে বাড়ি আসে। বাড়ি এসেই সে মার কোলে শুয়ে পড়ে। মার কোলে খানিকক্ষণ না শুলে তার ক্লান্তি কাটে না। তখন তার জন্যে এক প্লাস ঠাণ্ডা সরবৎ কিংবা ডাবের জল বরাদ্দ থাকে। শৈল আগে থেকেই তার ব্যবস্থা করে রাখে।

সেদিনও কোনও দিকে না চেয়ে সে মা'র কোলে এসে শুয়ে পড়লো।

শৈল তৈরিই ছিল। সে একটা প্লাসে ডাবের জল এনে তার সামনে ধরলো। যোগমায়া তার গায়ের শাড়িটা গুছিয়ে ভালো করে তাকে ঢেকে দিলে। বললে—এইবার ডাবের জলটা খেয়ে নাও মা—

বিশাখা তখনও মা'র কোলের ভেতরে চোখ বুজে শুয়ে আছে।

যোগমায়া তাকে জাগিয়ে দিলে। বললে—দেখ না, কারা এসেছে। দেখ-দেখ, চোখ তুলে দেখ তুমি—

বিশাখা চোখ বুজিয়েই জিজ্ঞেস করলে—কে? কাকা?

—না-না, কাকা নয়, অন্য লোক। তুমি ওঠো, উঠে বোস, উঠে বসে দেখ না—

তখন কী যে হলো, এতক্ষণে চোখ মেলে চাইলে। দেখলে ঘরে দু'জন অচেনা লোক বসে আছে।

যোগমায়া বিশাখার গায়ের শাড়িটা গুছিয়ে দিয়ে বললে—পেন্নাম করো মা ওদের, পেন্নাম করো—

বিশাখা অবাক হয়ে গেল। জানা নেই শোনা নেই, তাদের সে প্রণাম করবে কেন বুঝতে পারলে না।

জিজ্ঞেস করলে—ওরা কে মা?

যোগমায়া বললে—ওই তোমার এক বদ স্বভাব, সব কথায় কেবল তক্কো আর তক্কো—যা বলছি তাই করো, যাও পেন্নাম করো—

তবু বিশাখা কিছু বুঝতে পারলে না। আর কখনও তো মা এমন করে কাউকে প্রণাম করতে বলে না—

ততক্ষণে ডাবের জলটা খাইয়ে শৈল গেলাসটা নিয়ে ভেতরে চলে গেছে।

যোগমায়া আবার বললে—কই, যাও—পেন্নাম করো—

বিশাখা দু'জনের দিকে আবার ভালো করে চাইলে।

বললে—ওরা কারা মা? কারা ওরা?

যোগমায়া বললে—ওরা তোমার শ্বশুর-বাড়ির লোক। তোমাকে ওরা দেখতে এসেছেন। ওরা তোমার গুরুজন! যাও, পেন্নাম করো গিয়ে, পেন্নাম করতে হয়—

'গুরুজন' কথাটা শুনে বিশাখা যেন হঠাৎ কেমন অন্য-রকম হয়ে গেল।

যোগমায়ার কানের কাছে মুখ এনে চুপি-চুপি বললে—আমার সঙ্গে যার বিয়ে হবে? তারা?

—হ্যাঁ।

বিশাখা আবার চুপি-চুপি জিজ্ঞেস করলে—কোনটা আমার বর? ফর্সা মতন লোকটা?

যোগমায়া বললে—হ্যাঁ, যাও এবার, পেন্নাম করো গে—পায়ে হাত দিয়ে পেন্নাম করো—

এবার আর বিশাখা আপত্তি করলে না। সোজা গিয়ে সৌম্যপদর পায়ে হাত দিয়ে মাথায় ঠেকালো। আর তারপর গোপালকেও প্রণাম করতে যাচ্ছিল—কিন্তু গোপাল আপত্তি করে উঠলো। বললে—আরে না-না, আমাকে প্রণাম করতে হবে না। আমি কেউ নই—

যোগমায়া বললে—না-না, করুক বাবা তোমাদের পেন্নাম করলে ওর পুণ্যি হবে—

প্রণামটা কোনও রকমে সেরেই লজ্জায় যোগমায়ার কোলের ভেতরে আবার নিজের মুখটা ঢেকে ফেললে।

গোপাল বললে—আপনার মেয়ে খুব লাজুক মাসিমা!

যোগমায়া মেয়ের অপরাধটা ঢেকে দেওয়ার জন্যে বললে—আমার মেয়ে তো বাইরের কারোর সঙ্গে মেশে না বাবা, তাই একটু লজ্জা পাচ্ছে—

গোপাল বললে—ভালো-ভালো, খুব ভালো, লজ্জাই তো মেয়েদের ভূষণ—

যোগমায়া বললে বিয়ে হওয়ার পর তখন সব ঠিক হয়ে যাবে। এখন তো বয়েস বেশি নয় বাবা তাই একটু আড়ষ্ট হয়ে আছে—

গোপাল বললে—বিয়ে হওয়ার পর তো আপনার জামাই-এর সঙ্গে আপনার মেয়েকেও আমেরিকা, জার্মানী, জাপান, ইংলন্ড, ফ্রান্স—সব দেশে প্লেনে করে ঘুরে বেড়াতে হবে—

যোগমায়া বললে—সেই জন্যেই তো আমার মেয়েকে ইংরিজী শেখানো হচ্ছে, নাচ শেখানো হচ্ছে, কাঁটা-চামচ দিয়ে খাওয়া শেখানো হচ্ছে। ঠাকমা-মণি আমার মেয়েকে এই সব শেখানোর জন্যে মাস্টার রাখবার হাজার হাজার টাকা যোগাচ্ছেন—

গোপাল বললে—ও-সব না শেখালে তো মুখুজ্জে বাড়ির বউ হতে পারবে না মাসিমা। কত সাহেব-মেমসাহেবকে হোটেলে নিয়ে গিয়ে পার্টি দিতে হবে। তখন তো আর আপনার মেয়ের তো লজ্জা করলে চলবে না—

সৌম্যবাবু এতক্ষণ একটা কথাও বলে নি। যা বলার কথা তা সবই বলছে গোপাল। বলতে গেলে সন্দীপের অনুরোধে গোপালই তাকে ডেকে এনেছিল। এবার একবার হাতের ঘড়ির দিকে চেয়ে উঠে দাঁড়ালে।

বললে—চলুন মিস্টার হাজরা, বড্ড দেরি হয়ে গেল—

গোপালও বলে উঠলো—হ্যাঁ, চলি মাসিমা—

যোগমায়া বললে—বড় ভালো লাগলো বাবা, অনেক দিন ধরে আমার সাধ ছিল যার টাকায় খাচ্ছি পরছি তাকে একবার বিয়ের আগে চোখের দেখা দেখবো। তা তুমি আমার সে-সাধ পূর্ণ করলে বাবা। কিন্তু আমার মনে একটা দুঃখ রয়ে গেল,

তোমরা এত কষ্ট করে এলে আর আমার বাড়িতে একটু মিষ্টিমুখও করলে না—

গোপাল বলে উঠলো—আপনার মিষ্টি কথা শুনলুম, তাতেই আমাদের মিষ্টি মুখ করা হয়ে গেছে।

বলে নিজের রসিকতাতে নিজেই হো-হো করে হেসে উঠলো। তারপর সিঁড়ি দিয়ে তারা নিচের দিকে নামবার উপক্রম করতেই যোগমায়া বললে—আবার এসো বাবা, মাসিমাকে ভুলে থেকো না—

গোপাল বলে উঠলো—সন্দীপকে বলবেন আমরা এসেছিলুম—

যোগমায়া দরজায় খিল লাগিয়ে দিলে।

এতক্ষণ সময়টা যে কোথা দিয়ে কেটে গিয়েছিল তা যোগমায়া বুঝতে পারেনি। এতদিনের স্বপ্ন যোগমায়ার সফল হবে এ কথা আজকে ঘুম থেকে ওঠবার সময়েই কি কেউ কল্পনা করতে পেরেছিল? কথাগুলো ভাবতে ভাবতে কখন যে যোগমায়া ভাবনার ফ্রেমে নির্জীব একটা ছবি হয়ে উঠেছিল তা সে বুঝতে পারেনি। বুঝলো বিশাখার ডাকে—

—ওমা, আমাকে খেতে দেবে না? আমার বুঝি খিদে পায় না?

এতক্ষণে যোগমায়ার মনে পড়লো—তাই তো! বিশাখা ইস্কুল থেকে অনেকক্ষণ এসেছে, এতক্ষণ একটু ডাবের জল ছাড়া আর কিছুই খায়নি।

তাড়াতাড়ি শৈলকে খাবার দিতে বলা হলো। শৈলই বাজার করে, শৈলই রান্না করে। আর শুধু বাজার করা আর রান্না করাই নয়। সংসারের অন্য সব কাজই করে শৈল। বিশাখা কী কী খেতে ভালোবাসে না, তা সব শৈল জানে। তার সঙ্গে এটুকুও জানে যে তার মাসকাবারি মাইনে, তার খাওয়া-থাকার খরচের সব দায়-দায়িত্ব বিডন স্ট্রীটের বাড়ির ঠাকমা-মণির হলেও, লক্ষ্য হচ্ছে ওই এক ফোঁটা মেয়ে—বিশাখা! বিশাখা এই এত বড় বাড়ির একদিন মালিক হবে। সুতরাং বিশাখার ভালো-মন্দের সঙ্গে তাদের সকলের ভালো-মন্দ একাকার হয়ে আছে। তাই বিশাখা যা-যা খেতে ভালোবাসে, শৈল তাই-ই বাজার থেকে আনে আর তাই-ই রান্না করে দেয়।

বিশাখার খাওয়ার সামনে বসে একসময়ে যোগমায়া জিজ্ঞেস করলে—আজকে তোমার বরকে দেখলে তো মা? ওর সঙ্গেই তোমার বিয়ে হবে, বুঝলে?

বিশাখা কোনও উত্তর দিলে না। একমনে খেতে লাগলো।

যোগমায়া আবার জিজ্ঞেস করলে—বরকে কেমন দেখলে? ভালো?

বিশাখা বললে—ভালো না ছাই!

—কেন? ভালো নয় কেন?

বিশাখা বললে—আমি পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলুম তো একটা আশীর্বাদ পর্যন্ত করলে না—

যোগমায়া বললে—ওমা, মেয়ের এ কী কথার ছিরি! আশীর্বাদ না করলেই মানুষ খারাপ হয়ে গেল? দু'দিন বাদে যার সঙ্গে বিয়ে হবে তাকে আবার আশীর্বাদ কী করবে শুনি! তোর চৌদ্দ-পুরুষের ভাগ্যি যে অমন বরের সঙ্গে তোর বিয়ে হচ্ছে! তোর বোন বিজলী অমন বর পেলে বর্তে যেত তা জানিস?

বিশাখা বললে—যাও-যাও, আমিও ফ্যালনা মেয়ে নই! বিয়ে করে ও কি আমার

সাত জন্ম উদ্ধার করবে নাকি ?

যোগমায়া মেয়ের কথা শুনে অবাক হয়ে গেল।

বললে—কী বললি, আর একবার বল, কী বললি ?

বিশাখা বললে—বিয়ে করে ও কি আমার সাত জন্ম উদ্ধার করবে নাকি ?

যোগমায়া বললে—এ সব কথা তোকে কে বলতে শেখালে রে মুখপুড়ী ? বিলিতি ইস্কুলে লেখাপড়া শিখে এই তার ফল ?

বিশাখা বললে—আমাকে বারবার ওই মুখপুড়ী বলে গালাগালি দাও কেন বলো তো ?

যোগমায়া বললে—কেন যে তোকে গালাগালি দিই তা যদি তুই একবার বুঝতিস —তুই যখন আবার মা হবি তখন বুঝবি বাপ-মরা মেয়ের মা হওয়ার কত জ্বালা !

কথাটা বলেই যোগমায়া বোধহয় নিজের ভুল বুঝতে পেরে নিজের অপরাধ লাঘব করবার জন্যেই বলে উঠলো—ওরে কী বলতে আমি কী বলে ফেলেছি, তুই কিছু মনে করিস না মা। আমি তোকে যা কিছু বলেছি, তুই সব ভুলে যা। সব তুই ভুলে যা। আমি তোকে আশীর্বাদ করছি মা, তুই সুখী হোস, আমার কপালে যা কষ্ট হয়েছে হোক, তোর যেন কোনও…

কথা শেষ হওয়ার আগেই দরজার কলিং বেলটা বেজে উঠলো।

শৈল দরজা খুলে দিতেই সন্দীপ ঢুকলো। সন্দীপ যোগমায়াকে দেখে অবাক ! বললে—এ কি মাসিমা, আপনার কী হলো ? শরীর খারাপ নাকি আপনার ? চোখ মুখ এমন ফোলা-ফোলা দেখছি কেন ?

বিশাখা বললে—মা আমার সঙ্গে ঝগড়া করছিল—

—ঝগড়া ? কেন ? কী করেছিলে তুমি ?

—তা ওই মা'কেই জিজ্ঞেস করো না তুমি।

যোগমায়া বলে উঠলো আজকে তোমাদের বাড়ির ঠাকমা-মণির নাতি এসেছিল—

— কে ? সৌম্যবাবু ?

যোগমায়া বললে হ্যাঁ, আর তার সঙ্গে তোমার এক বন্ধু গোপালও এসেছিল—

সন্দীপ চমকে উঠেছে। সে যেন বিশ্বাসই করতে চায় না। বললে—কে ? গোপাল ? গোপাল হাজরা ? আমাদের সৌম্যবাবুকে নিয়ে এসেছিল ? তারপর ? তারপর কী হলো ?

বিশাখা বলে উঠলো—তোমাদের ছোটবাবু কিন্তু বড় অহঙ্কারী মানুষ, তুমি যাই বসো আর তাই বলো—

—কেন ? অহঙ্কারী কেন ?

বিশাখা বললে—আমি কি কচি খুকী যে লোক চিনতে পারবো না ? তোমাদের বাড়ির সেই বুড়ীটার যে নাতি, সে ভেবেছে তারা বড়লোক বলে আমাদের মাথা একেবারে কিনে নিয়েছে—

—কেন, কেন ? কী হলোটা কী ? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

যোগমায়া বললে—তুমি ওর কথা শুনো না তো বাবা। ওর কথা শুনো না। অনেক মেয়ে দেখেছি বাবা, কিন্তু আমি বাপের জন্মে এমন মেয়ে দেখিনি !

সন্দীপ তবু কিছু বুঝতে পারলে না। বললে—কেন, বলুন না কী করেছে ও ?

যোগমায়া বললে—দেখ বাবা, ওরা তো হঠাৎ এসে হাজির হলো। আমার তখন মাথায় বজ্রাঘাত হয়েছে। ওদের অনেক করে বললুম, তা ওরা বললে ওরা খেয়ে এসেছে। তারপরেই এই বিশাখা হঠাৎ ইস্কুল থেকে এসে হাজির হয়েছে—

—তারপর ?

—আমি শুধু মেয়েকে বলার মধ্যে বলেছি পাত্রকে পেন্নাম করতে। দুদিন বাদেই যার সঙ্গে বিয়ে হবে, তাকে পেন্নাম করতে বলে আমি কী এমন অন্যায়টা করেছি বলো তো?

সন্দীপ বললে—অন্যায় কেন বলছেন ? আপনি তো ভালো কথাই বলেছেন ! যাক গে, এখন বলুন, জামাই কেমন হয়েছে ? আপনার পছন্দ তো ?

যোগমায়া বললে—আমার তো পছন্দ অপছন্দের কথাই ওঠে না বাবা। আমার মেয়েকে যে ওরা দয়া করে ঘরে নিয়ে যাচ্ছে, এতেই তো হাতে স্বর্গ পেইচি, কিন্তু আমার বিশাখাকে ওদের কেমন লাগলো সেইটেই আমার জানতে ইচ্ছে হচ্ছে বাবা।

—ওরা কিছু বলে গেল ?

—না।

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—আর গোপাল ? গোপাল কিছু বলেনি ?

যোগমায়া বললে—গোপাল তো তোমারই বন্ধু। তুমিই না হয় গোপালের সঙ্গে দেখা করে একবার খবরটা নাও যে আমার জামাই-এর কেমন লাগলো বিশাখাকে—

সন্দীপ বললে—ঠিক আছে, আমি যত শিগ্‌গির পারি একবার গোপালের সঙ্গে দেখা করে খবরটা নেবার চেষ্টা করবো—

—হ্যাঁ, তাই কোর বাবা। আমি খবরটার জন্যে হাঁ করে থাকবো কিন্তু—

এর পরে সন্দীপের আর কোনও কাজ ছিল না। অন্য দিনের চেয়ে সন্দীপ একটু দেরি করেই এসেছে। মল্লিকমশাই-এর জরুরী কাজে তাকে একবার বাজারেও যেতে হয়েছিল।

বললে—তা হলে আমি আসি মাসিমা, কাল আবার ঠিক সময়ে আসবো—

সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে নামতে সন্দীপের বেড়াপোতার কথা মনে পড়ছিল। অনেক দিন মা'র কাছ থেকে কোনও চিঠি পায়নি। চিঠি দিতে মা তো কখনও এমন দেরি করে না! কিংবা হয়ত চিঠি লেখবার ঠিক মত লোক পাচ্ছে না। ক'দিন থেকেই মা'কে তার খুবই দেখতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু কলেজের ছুটি থাকলেও মল্লিকমশাই-এর কাজের তো শেষ নেই। এখন মল্লিকমশাই-এর আরো অনেক বয়েস হয়েছে, এখন আর আগেকার মত দৌড়ঝাঁপ করতে পারেন না। তাই ঠাকমা-মণি বলে দিয়েছেন, মল্লিকমশাই এর অন্য অনেক কাজের ভারও সন্দীপের ওপর চাপিয়ে দিতে।

—এই, শোন—

হঠাৎ ওপর থেকে বিশাখার গলার আওয়াজ পেয়েই সন্দীপ থমকে দাঁড়ালো। উঁচু দিকে চেয়ে দেখলে বিশাখা রেলিং এর ওপর থেকে ঝুঁকে তার দিকে চেয়ে আছে।

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—আমাকে কিছু বলছো ?

বিশাখা তর-তর করে নেমে এসে তার সামনে দাঁড়িয়ে বললে—তুমি একটা হাঁদা গঙ্গারাম—

বলে আর দাঁড়ালো না। যেমন তর-তর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসেছিল, আবার তেমনি করে সিঁড়ি দিয়ে তর-তর করে ওপরে উঠে গিয়ে দরজাটা দড়াম করে বন্ধ করে দিয়ে ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সন্দীপ সেইখানে সেই সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে আকাশ পাতাল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত অঞ্চল খুঁজে বেড়াতে লাগলো। বিশাখার এই অপ্রত্যাশিত ব্যবহারের রহস্যজাল সে কিছুতেই কোন ক্রমেই ভেদ করতে পারলে না—

সেদিনকার বিশাখার কথাগুলো তারপর তাকে অনেক ভাবিয়েছে, অনেক যন্ত্রণা দিয়েছে, অনেক বিনিদ্র রাত কাবার করে দিয়ে তাকে বিপর্যস্ত করে দিয়েছে। কিন্তু অনেক ভেবে ভেবেও সন্দীপ ভাবনার কোনও কূল-কিনারা পায়নি।

কেন তাকে বিশাখা অমন করে আঘাত দিলে ? কেন তাকে অমন করে আক্রমণ করলে ? কী অপরাধ সে করেছে তার ওপর ?

এ-কথা অনেকবার বিশাখাকে জিজ্ঞেস করতেও ইচ্ছে হয়েছে তার। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে-কথা তার মুখ দিয়ে আর কখনও আদায় করা যায়নি।

বিশাখা জিজ্ঞেস করেছিল—কই, তুমি কিছু বলছো না যে !

সন্দীপ বলেছিল—কী বলবো ?

বিশাখা বলেছিল—তুমি যে বলেছিলে আমার সঙ্গে তোমার কী একটা কথা আছে !

সন্দীপ বলেছিল—তা আমার তো এখন কিছু আর মনে পড়ছে না—বলেছিলুম নাকি ?

বিশাখা সে-কথা শুনে হেসে ফেলেছিল। বলেছিল—এই ভুলো মন নিয়ে তুমি ওকালতি করবে কী করে, বলো দিকিনি ?

সন্দীপ সেদিন এ-কথারও কোনও জবাব দিতে পারেনি। চোখ নিচু করেই বাড়ি চলে এসেছিল। কিন্তু মল্লিক-মশাইএর চোখ সে এড়াতে পারেনি।

মল্লিক-মশাই জিজ্ঞেস করেছিলেন—তোমার কী হয়েছে বলো তো সন্দীপ ?

ক'দিন ধরে দেখছি তুমি যেন সব সময়ে কেমন অন্যমনস্ক হয়ে মনে মনে কী ভাবো ? কেন, মা'র জন্যে তোমার মন কেমন করছে নাকি ?

সন্দীপ তার মনের অবস্থার কথা কাকে বলবে ? কে বুঝবে তার মনের কথা ? সে নিজেই তো নিজেকে বুঝতে পারে না ! সে নিজেই তো নিজেকে চেনে না। সে পরের দয়ার ওপর বেঁচে আছে, তার আবার সুখ-দুঃখ কী ? সে তো এ-বাড়ির চাকর। এরা যেদিন তাকে এ-বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবে সেই দিনই তাকে এই সব কিছু ছেড়ে চলে যেতে হবে। আবার হয়ত তাকে সেই বেড়াপোতায় গিয়ে আবার পরের অন্নদাস হয়ে জীবন কাটাতে হবে। এখানে এই বাড়িতেও সে অন্নদাস, আবার সেখানে বেড়াপোতাতেও সে সেই একই অন্নদাস হওয়া। তার চেয়ে তো এই-ই ভালো, এই বিডন স্ট্রীটের বাড়ি।

এই বিডন স্ট্রীটের বাড়িতে এসেছিল বলেই তো সে জীবনের এই এত জটিলতা দেখতে পেলে। কোথাকার কোন্ এক বিশাখা। এখানে না এলে কি সে বিশাখাকে দেখতে পেত! নাকি এমন করে বিশাখার সঙ্গে এত অঙ্গাঙ্গীভাবে সে জড়িয়ে পড়তো।

অথচ বিশাখা তার কে ?

দু'তিন দিন বাদে সন্দীপ আবার রাসেল স্ট্রীটের বাড়িতে গেল। প্রথমে একটু সঙ্কোচ হয়েছিল। এই দু'তিন দিনের অনুপস্থিতির কৈফিয়ত সে কেমন করে দেবে সেইটেই ছিল তার প্রধান দুর্ভাবনা।

তাই মাসিমার প্রশ্নের উত্তরে সন্দীপ বললে—আমার শরীরটা একটু খারাপ হয়েছিল—

—শরীর খারাপ হয়েছিল ? বলো কী ? ডাক্তার দেখিয়েছিলে ?

সন্দীপের শরীর খারাপ হওয়ার ব্যাপারে মাসিমার উদ্বেগ দেখে সে অবাক হয়ে গিয়েছিল। তার নিজের মা ছাড়া সংসারে এমন করে তার শরীর সম্বন্ধে আর কে এত দুশ্চিন্তা করেছে ?

সন্দীপ বলেছিল—সে তেমন কিছু নয়, সামান্য অসুখ। ডাক্তার ডাকতে হয়নি—

মাসিমা বলেছিল—তবু বাবা একটু সাবধানে থাকবে। তোমার শরীর খারাপ হলে আমাদের কে দেখবে ? তুমি দেখাশোনা করো বলেই তো আমরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারি। তোমার ভরসাতেই তো এখানে আমাদের পড়ে থাকা—

সন্দীপ বললে—মল্লিক-কাকা জিজ্ঞেস করছিলেন জামাই কি আপনার পছন্দ হয়েছে ?

মাসিমা ভয় পেয়ে গেল। জিজ্ঞেস করলে—তোমার মল্লিক-কাকা জামাই আসার কথা কী করে জানলেন ?

—আমি বলেছি।

মাসিমা বললে—তা হলে তোমার ঠাকমা-মণিও এ-কথা জেনে গেছেন নাকি ?

—না না, তিনি কী করে জানবেন ? ও তো গোপালই সৌম্যবাবুকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল। গোপাল আমাদের বেড়াপোতার ছেলে। গোপাল সৌম্যবাবুরও বন্ধু। তা জামাইকে আপনার পছন্দ হয়েছে কিনা বলুন ?

মাসিমা বললে—পছন্দ হওয়ার কথা বলছো? আকাশের চাঁদ হাতে পেয়ে কারো পছন্দ না হয়ে পারে?

সন্দীপ কথাটা শুনে খুশী হলো। খুশী হলেও মনের মধ্যে একটা কাঁটা যেন খচ্ করে বিঁধে রইল। কীসের কাঁটা? কেন কাঁটা? তবে কি সৌম্যবাবুকে মাসিমার পছন্দ হওয়াটা সন্দীপের অপছন্দ?

মাসিমা বললে—এত সুখ আমার কপালে সইলে হয় বাবা। এতদিনে মনে হয় আমার ভগবানকে ডাকা, আমার ব্রত করা-টরা সব সার্থক হয়েছে। আমার আর চাইবার কিছুই নেই—

সন্দীপ বললে—জীবনে তো আপনি কারো ক্ষতি করেননি। কারো সর্বনাশও করেননি আপনি, আপনার ভালো হবে না তো কার ভালো হবে?

সবই ঈশ্বরের ইচ্ছে। যোগমায়া জীবনে অনেক দুঃখ পেয়েছে। সে-সব এমন দুঃখ যা কখনও ভুলতে পারা যায় না। বিশাখার বাবার মৃত্যুর আঘাতটাই ছিল তার মধ্যে সবচেয়ে দুর্বহ। তবে একটা সৌভাগ্য এই যে তার বাবাকে সে দুঃখ দেখে যেতে হয়নি। বিশাখার বাবার মৃত্যুর আগেই যোগমায়ার বাবা মারা গিয়েছিল।

যোগমায়া বললে—আমার মেয়েকে তোমার সৌম্যবাবুর পছন্দ হয়েছে কিনা জানতে পারলে কিছু?

সন্দীপ বললে—সে কথা তো আমি সরাসরি সৌম্যবাবুকে জিজ্ঞেস করতে পারি না—

যোগমায়া বললে—তা তো বটেই, তুমি সরাসরি জিজ্ঞেস করলে কথাটা পাঁচ কান হয়ে যাবে। তা না হওয়াই ভালো। তা ছাড়া...

সন্দীপ বললে—তা ছাড়া কী?

যোগমায়া বললে—দেখ বাবা, শুভ কাজে বাগড়া দেওয়ার লোকের কখনও অভাব হয় না, আমার দেওরকে তো তুমি চেনো—পর-শত্তুরের চেয়ে ঘর-শত্তুর আরো খারাপ—

সন্দীপ বললে—আমি তো সবই জানি মাসিমা, আমাকে আর আপনি কী বলবেন, উনিই আমাকে বিজলীর জন্যে কতবার একটা পাত্রের ব্যবস্থা করতে বলেছেন—

যোগমায়া বললে—থাক বাবা, ও-সব পুরনো কাসুন্দি ঘেঁটে আর কোনও লাভ নেই। আমি তো ভগবানের কাছে তাই বলি—ভগবান, তুমি সকলের ভালো করো, সকলকে সুখী করো, সকলের অভাব দূর করে দিও—সকলের ভালো হলেই আমি খুশী—

সন্দীপ বললে—আপনি নিজে ভালো বলেই তাই সকলের ভালো চান—সংসারে তো সবাই আপনার মতো নয় মাসিমা। আমার মা'ও ঠিক আপনার মতো—

যোগমায়া বললে—তোমার মা'কে একবার নিয়ে এসো না, আমি একবার তাঁকে দেখবো।

সন্দীপ বললে—মাসিমা, আমাদের বেড়াপোতায় আমার মা যে চাটুজ্জে-বাড়িতে রান্না করে, সেই বাড়িতে অনেক বই আছে, সেইখানে একটা বইতে আমি একটা কথা পড়েছিলুম। কথাটা হচ্ছে এই যে যতদিন মানুষের দুঃখ অনুভব করবার ক্ষমতা

থাকবে, ততদিন তার সুখ অনুভব করবার ক্ষমতাও থাকবে, কথাটা তখন আমার খুব ভালো লেগেছিল, তাই এখনও ওটা আমার মনে আছে—আপনাকে দেখে তাই কথাটা আমার মনে পড়লো।

যোগমায়া বললে—আমি তো বেশি লেখা-পড়া শিখিনি বাবা, আমি মনে মনে যা ভালো বুঝি, তাই করি—

তারপর একটু থেমে জিজ্ঞেস করলে—ও বাড়ির সব খবর কী বাবা? সবাই ভালো আছে তো? তোমাদের ঠাকমা-মণি?

সন্দীপ বললে—এই তো আপনাদের এখান থেকে ও-বাড়ি যাবো, সেখানে গিয়ে ঠাকমা-মণিকে গিয়ে সব রিপোর্ট দেব। এখানে আপনার সঙ্গে আমার যা-যা কথা হলো তা সব তাঁকে বলবো। বিশাখা কেমন আছে, তার লেখা-পড়া কেমন হচ্ছে তাও তাঁকে জানাতে হবে। সপ্তাহে সপ্তাহে ডাক্তার তাকে দেখে কী রিপোর্ট দিয়েছে তাও তাঁকে বলতে হবে। আর এই যে এখন বিশাখা এগ্‌জামিন দিচ্ছে, এর ফলাফলও তাঁকে জানাতে হবে। রোজ তাঁকে এ-সব খবর দিলে তবে আমার ছুটি—

যোগমায়া এ-সব কথা জানে। সন্দীপ বললে—ঠাকমা-মণিকে আজ আর কী কথা বলতে হবে, বলুন তো?

যোগমায়া বললে—বলবার মতো নতুন কোনও কথা তো আর আমার মনে পড়ছে না বাবা—কালও তো তুমি আসছো, যদি নতুন কথা কিছু মনে পড়ে তো তখন তোমাকে বলবোখন—

তারপরই বললে—তবে একটা কথা তোমাকে বলে রাখি বাবা, আমার জামাই যে এ-বাড়িতে এসেছিল তা যেন তোমার ঠাকমা-মণি জানতে না পারেন, আর মল্লিক-কাকাও যেন তাকে না বলেন—

সন্দীপ বললে—আপনি অত ভয় পাচ্ছেন কেন মাসিমা? সৌম্যবাবুর সঙ্গে বিশাখার এ-বিয়ে হবেই—

যোগমায়া বললে—কী জানি বাবা, আমার বড় ভয় করে কেবল। আমার কপাল তো মন্দ। যতক্ষণ না ওদের দুহাত এক হচ্ছে ততক্ষণ আমার বিশ্রাম নেই কিছুতে—

কথার মধ্যিখানেই হঠাৎ বিশাখা ঘরে ঢুকলো।

সন্দীপ আর যোগমায়া দুজনেই অবাক হয়ে গেছে বিশাখাকে দেখে। যোগমায়া বললে—কীরে, এত সকাল-সকাল তোর ছুটি হয়ে গেল?

সন্দীপও জিজ্ঞেস করলে—এত আগেই যে চলে এলে?

বিশাখা বললে—তোমাদের সৌম্যবাবুকে আজ দেখলুম—

—সৌম্যবাবু? আমাদের বিডন স্ট্রীটের সৌম্যবাবু? তাকে কোথায় দেখলে?

—স্কুল থেকে বেরোচ্ছি, তখন···

তারপর যোগমায়াকে বললে—আমার বড় ক্ষিধে পেয়েছে মা, খেতে দাও—বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে আমার—

যোগমায়া উঠে দাঁড়ালো। বললে—দিচ্ছি বাবা, দিচ্ছি, একটু পাখার তলায় বসে জিরো, জামা-কাপড় বদলে নে, তবে খেয়ো—

বিশাখা বললে—কী শাড়ি পরবো তা বলবে তো?

যোগমায়া বললে—এত বড় ধিঙ্গী মেয়ে হয়েছে, কোন্ শাড়িটা পরবি, তা আমাকে এখনও বলে দিতে হবে ? এ মেয়েকে নিয়ে আমি কী করি ?

বলে উঠতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই বিশাখা তার ঘরে ঢুকে শাড়ি বদলাবার জন্যে দরজার খিল বন্ধ করে দিলে।

সন্দীপ বললে—শুনলেন মাসিমা, বিশাখা কী বললে ?

—কী বললে ?

—আপনি শুনলেন না বিশাখার কথা ? ও-বাড়ির ছোটবাবুর সঙ্গে নাকি বিশাখার দেখা হয়ে গিয়েছিল আজকে—

যোগমায়া যেন আকাশ থেকে পড়লো। বললে—সে কী ? আমার জামাই-এর সঙ্গে ? বিশাখার দেখা হয়ে গিয়েছিল ? কোথায় ? কখন ?

সন্দীপ বললে—আপনি শুনতে পেলেন না। বিশাখা তো ঘরে ঢুকেই তাই বললে—

যোগমায়া বললে—দেখছি সাত ঝামেলায় পড়ে আমার কানটাও কালা হয়ে গেছে কিন্তু কোথায় দেখা হলো ?

ততক্ষণে শৈল বিশাখার খাবার নিয়ে এসেছে। এটা জলখাবার। ভাত খাওয়ার পাট পরে একটু বেলায় হবে। খাবারটা রেখে শৈল তার নিজের কাজে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে বিশাখাও শাড়ি বদলে এসে পড়েছে। এসেই খেতে বসলো।

যোগমায়া জিজ্ঞেস করলে—কীরে ? কী শুনলুম সন্দীপের কাছে ? বিডন স্ট্রীটের ছোটবাবুর সঙ্গে নাকি আজ তোর দেখা হয়েছে ?

বিশাখা বললে—হ্যাঁ—

—কোথায় ? কখন ? রাস্তায় আসতে আসতে ? তুই যখন বাড়ি আসছিলি তখন ? কিছু কথা হলো ?

বিশাখা বললে—রাস্তায় নয়, আমার স্কুলের সামনে—

—তোর ইস্কুলের সামনে ছোটবাবু কেন গিয়েছিল ?

বিশাখা বললে—কী কাণ্ড দেখ তো সন্দীপদা, ছোটবাবু আমাদের স্কুলের সামনে কেন গিয়েছিল তা আমি কী করে জানবো ? পরের মনের কথা আমি বলবো কেমন করে ? আমি কি ম্যাজিক জানি ?

যোগমায়া সন্দীপকে লক্ষ্য করে বললে—দেখেছ তো বাবা, আমি কী জিজ্ঞেস করছি আর ও কী-কথার কী জবাব দিচ্ছে—

তারপর মেয়ের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলে—বল্ না মুখপুড়ী, ও-বাড়ির ছোটবাবু তোদের ইস্কুলে এসেছিল কেন ? তোকে দেখতে ?

বিশাখা বললে—আমাকে দেখতে আসবে কেন ? আমাকে তো আগেই দেখেছে আমাদের বাড়িতে। স্কুলে এসেছিল আমার সঙ্গে কথা বলতে—

—ও মা, কী কাণ্ড ! তোর সঙ্গে কথা বলতে এসেছিল ?

বিশাখা বললে—বলছি তো তোমার জামাই আমার সঙ্গে কথা বলতে এসেছিল। নইলে আবার কী করতে আসবে ?

—তা তোর সঙ্গে কী কথা হলো ?

—আমাকে তোমার জামাই জিজ্ঞেস করলে আমার কী রকম লেখাপড়া হচ্ছে।

আমি বললাম—ভালো।

—তারপর ?

বিশাখা বললে—তারপর আমাকে তার গাড়িতে উঠে বেড়াতে যেতে বললে।

যোগমায়া জিজ্ঞেস করলে—তা তুই কি বললি ?

—আমি বললুম আমার মা'কে না জিজ্ঞেস করে আমি কোথাও যাবো না।

যোগমায়া জিজ্ঞেস করলে—তুই বললি ওই কথা ?

বিশাখা বললে—তা বলবো না ? আমি কি কাউকে ভয় করি নাকি ?

—সে কীরে ? তুই আমার জামাই-এর মুখের ওপর ওই কথা বললি ? তোর মুখে একটু আটকালো না ?

বিশাখা বললে—তা তুমিই বলো না, তোমাকে না জিজ্ঞেস করে কি তোমার জামাই-এর সঙ্গে আমি যেতে পারি ?

এবার যোগমায়া কথাটা একটু ভাবলো। তারপর সন্দীপের দিকে চেয়ে বললে—তুমিই বলো না বাবা, যেতে এমন কিছু দোষ আছে ?

সন্দীপের কিছু বলবার আগেই যোগমায়া বললে—তা ও-বাড়ির ছোটবাবুর সঙ্গে তোর বিয়ে তো হবেই, সে-কথা তো পাকাই হয়ে গেছে। এখন জামাই-এর কথা শুনতে তোর দোষ কী ? আর তা হলে সে তো আর পর নয়। সেদিন এই বাড়িতে তোকে দেখে খুব পছন্দ হয়ে গেছে, তার মানেই তাই, না হলে তোদের স্কুলে জামাই যাবেই বা কেন ? বলো বাবা, তুমি কী বলো ? পছন্দ হয়নি— ?

সন্দীপও স্বীকার করলে কথাটা। বিশাখাকে পছন্দ হয়েছে বলেই তো সৌম্য-বাবু বিশাখাদের স্কুলে গিয়ে হাজির হয়েছে।

যোগমায়া মেয়েকে জিজ্ঞেস করলে—তা তোর কথা শুনে জামাই কী বললে ?

বিশাখা বললে—কী আবার বলবে। আমি অত সস্তা নাকি। তোমার জামাই যা বলবে আমিও তাই শুনবো ? এখন কি আমাদের বিয়ে হয়েছে যে তার কথায় আমি উঠবো বসবো ?

যোগমায়া বললে—ওরে অত অহংকার ভালো নয় রে, অত অহংকার ভালো নয়। মেয়েমানুষের অত অহংকার ভালো নয়। অত বড় লংকেশ্বর রাবণ, সেই মানুষকেও তার অহংকারের জন্যে শেষকালে কত কষ্টে প্রাণত্যাগ করতে হয়েছিল। আর এই যে যে-বাড়িতে এখন তুই বসে আছিস এ-বাড়িও তো আমার জামাই-এরই। এই যে তুই যে-গাড়ি চড়ে ইস্কুলে রোজ পড়তে যাস এও তো জামাই-এরই গাড়ি। এই যে তুই দুধ সন্দেশ খাচ্ছিস, এও তো সবই জামাই-এর পয়সাতেই কেনা।

সন্দীপের দিকে চেয়ে যোগমায়া বললে—তুমি কী বলো বাবা ? আমি কি কিছু অন্যায্য বলেছি ? তুমি কিছু কথা বলছো না কেন ?

সন্দীপ এ-কথার কী জবাব দেবে ! যোগমায়ার এত স্বপ্ন এত আশা এত সাধ, তাতে সে কী করে বাদ সাধবে ?

বিশাখার খাওয়া তখন হয়ে গিয়েছিল। সে উঠছিল। যোগমায়া বললে—কীরে, কিছু বলছিস নে যে ?

বিশাখা বললে—বারে, আমি কী বলবো ?

যোগমায়া বললে—একটা 'হ্যাঁ' কি 'না', যা হোক কিছু একটা কথা বলবি তো? কাল যদি জামাই আবার তোদের ইস্কুলে আসে, আবার যদি তোকে বেড়াতে যেতে বলে তো তখন কী বলবি?

বিশাখা বললে—সে কালকের কথা কালকে ভাবা যাবে, আজ থেকে সেই কথা ভেবে ভেবে মরবো নাকি?

—ওমা, শোনো মেয়ের কথা! শুনলে বাবা শুনলে? আমার মেয়ের কথা শুনলে?

সন্দীপও কোন কথারই জবাব দিলে না।

যোগমায়া বললে—আমি মেয়ের কথা ভেবে ভেবে মরছি আর মেয়ে বলে কিনা কাল ভাববে! শোনো আমার ধিঙ্গী মেয়ের কথা।

সন্দীপের দেরি হয়ে যাচ্ছিল।

বললে—আমি এখন উঠি মাসিমা—

যোগমায়া বললে—তা তুমি তো আবার এক্ষুণি বাড়ি গিয়ে ঠাকমা-মণির সঙ্গে দেখা করে এখানকার সব কথা বলবে—

সন্দীপ বললে—সে তো আমাকে রোজই বলতে হয়! না বললে ঠাকমা-মণি আবার বিন্দুকে দিয়ে ডেকে পাঠাবেন—

—এই আজকের এই কথাটাও কি বলবে নাকি? তুমি কী বলো, এই বিশাখার ইস্কুলে তোমাদের সৌম্যবাবুর বিশাখার সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার কথাটা বলা কি উচিত হবে? তুমি কী মনে করো?

সন্দীপ খানিকক্ষণ ভাবতে লাগলো। তারপর বললে—আপনি কী বলেন? আপনি যদি বলতে বলেন তো তাঁকে বলবো—আর··

হঠাৎ জয়ন্তী দিদিমণি ঘরে ঢুকলো। জয়ন্তী এ-বাড়িতে সন্দীপকে অনেকবার দেখেছে। ওই সন্দীপই প্রতি মাসে তার মাইনেটা যথাস্থান থেকে এনে তার কাছে পৌঁছে দেয়।

জয়ন্তীকে দেখেই যোগমায়া মেয়েকে ডাকলে—ওরে বিশাখা, আয়, তোর দিদিমণি এসেছে—

সন্দীপ আর সেখানে দাঁড়ালো না। সিঁড়ি দিয়ে একেবারে নিচে নেমে এল। প্রতিদিনের মত তখনও সেখানে দরোয়ানটা ডিউটি দিচ্ছিল। সন্দীপকে দেখে আর একবার সেলাম দিলে। সন্দীপ তাকে নামমাত্র একটা সেলাম করে বাইরের রাস্তায় এসে নামলো। তার কানে তখনও কথাগুলো বাজছিল। সৌম্যবাবু বিশাখার স্কুলে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করেছে, তাকে নিয়ে বেড়াতে যেতে অনুরোধ করেছে।

এটা কী রকম হলো?

রাসেল স্ট্রীট দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মাসিমার কথাগুলো তার মনের তারে বার বার ঝংকার দিতে লাগলো। সৌম্যবাবু কেন বিশাখার স্কুলে যেতে গেল? কীসের আকর্ষণে? তবে কি বিশাখাকে তার ভাল লেগেছে? বিশাখাকে কি তবে সৌম্যবাবুর পছন্দ হয়েছে?

কিন্তু সন্দীপ এ-সব কথা ভাবছে কেন? তার কীসের স্বার্থ? কার সঙ্গে

কার বিয়ে হলো, কার বিয়ে হলো না, তা ভেবে তার কী লাভ ? তার আপন বলতে তো একজনই আছে, সে তার মা। মায়ের ভালোমন্দ নিয়েই তো তার সমস্তক্ষণ ভাবা উচিত, মা'ই তো তার সব কিছু।

সামনে একটা বাস আসতেই সন্দীপ তাতে উঠে পড়লো।
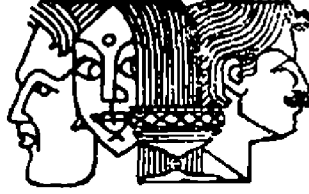
আজ না হয় সন্দীপের বয়েস হয়েছে, কিন্তু তখন তো সন্দীপ ছোট ছিল। জীবন সম্বন্ধে তখন তো সন্দীপের সঠিক কোনও ধারণা ছিল না, তখন সন্দীপ ভাবতো মানুষের জীবনের চরম সার্থকতা বুঝি ভোগে! সমস্ত রকমের বিলাসিতার উপকরণ টাকা দিয়ে কেনবার সামর্থের ওপরই মানুষের জীবনের চরম সার্থকতা। যে মানুষের সে-সামর্থ্য নেই সে-ই অমানুষ।

কিন্তু আজ ?

ওই দেবীপদ মুখার্জীর জীবিতকালে বিডন স্ট্রীটের এই বাড়িটার নাকি আরো অনেক ঐশ্বর্য ছিল। বেড়াপোতাতে কাশীনাথবাবুদের পূর্বপুরুষ নাকি আরো বড়লোক ছিল। ওদের বাড়িতে হাতি ছিল, সেই চাটুজ্জেবাবুদের ঐশ্বর্যের ভাগ পেত বেড়াপোতা গ্রামের সর্বসাধারণ। পুজোর সময় গরিব-বড়লোক সমস্ত প্রজাদের নেমন্তন্ন করে খাওয়ানো হতো। সে ক'দিন আর কারো বাড়িতে নাকি রান্নাও হতো না।

কিন্তু তারপর ?

তারপরের কথা সন্দীপ নিজের চোখে দেখেছিল। আর এখন কলকাতায় এসে এই দেবীপদ মুখার্জীর বাড়ির ওই কঙ্কালটাও দেখছে।

প্রত্যেক মানুষের ভেতর একটা মন থাকে, সেটা কেউ দেখতে পায় না। তেমনি প্রত্যেক মানুষের ভেতর আরো একটা জিনিস থাকে, সেটা হচ্ছে কঙ্কাল। সেটাও কেউ দেখতে পায় না।

কিন্তু কেউ কেউ সেটা দেখতে পায়। যেমন চিন্তামণির কথায় দেখতে পেয়েছিল ঠাকুর বিল্বমঙ্গল। যেদিন প্রথম সেটা দেখতে পেয়েছিল সেইদিনই বলে উঠেছিল—

এই নরদেহ
ছিঁড়ে খায় কুক্কুর শৃগাল
কিংবা চিতা-ভস্ম সম পবন উড়ায়
এই নারী, এরও এই পরিণাম
নশ্বর সংসারে—

মনে আছে—এই ঠাকমা-মণিও সেদিন যখন দেখতে পেলেন যে তাঁর এত সাধের সংসার ভেঙে দুমড়ে তছনছ হয়ে গেল তখনই বুঝতে পারলেন যে তাঁর এই সংসার

মায়া ছাড়া আর কিছুই নয়। তখন তিনিও মনে মনে ঠাকুর বিল্বমঙ্গলের মতই বলেছিলেন—

এই নরদেহ
ছিঁড়ে খায় কুকুর শৃগাল
কিংবা চিতা ভস্ম সম পবন উড়ায়
এই নারী, এরও এই পরিণাম
নশ্বর সংসারে—

কিন্তু শেষ দেখবার আগে কেন তাঁর এই কথাগুলো মনে আসেনি ? এই সামান্য কথাটা মনে আসতে কেন তাঁর এত দেরি হয়েছিল ? আগে যখন তিনি রোজ ভোর-বেলায় বিন্দুকে নিয়ে বাবুঘাটে গঙ্গাস্নান করতে যেতেন তখন কেন মনে আসেনি 'এই নরদেহ'-র কথা।

তার একমাত্র কারণ হয়ত এই যে সংসারে সবাই বর্তমানের মধ্যেই বাস করে। কেবল যাদের দূরদৃষ্টি থাকে তারাই বাস করে ভবিষ্যতের মধ্যে। তাই যখন এই বারোর-এ বিডন স্ট্রীটের বাড়িটা একটা মরুভূমির মত অসহনীয় হয়ে উঠলো তখন তিনি চিৎকার করে গালাগালি দিতে লাগলেন। বলতে লাগলেন—বেরো, বেরো সবাই আমার সামনে থেকে—বেরো, বেরো—

সে কী মর্মভেদী দৃশ্য ! ঠাকমা-মণির তখন আরো বয়েস হয়েছে সমস্ত শরীরে মনে একেবারে অথর্ব হয়ে গেছেন, তখনও তেজ কিন্তু তাঁর কমেনি। চোখের সামনে তিনি তাঁর স্বামীর মৃত্যু দেখেছেন, ছেলে, ছেলের বউ-এর মৃত্যু দেখেছেন, ছোট ছেলে অনেক আগেই আলাদা হয়ে গিয়েছিল। সেই ছেলেও তখন অথর্ব, কিন্তু তখনও তেজ যায়নি ঠাকমা-মণির।

যে সব ঝি-ঝিউড়ী অতিথি অভ্যাগত একদিন ঠাকমা-মণিকে মিষ্টি কথা না শুনিয়ে জল-গ্রহণ করতো না, সেই তারাই আবার তখন অন্য রকম হয়ে গেল। আড়ালে তারাই তখন বলতে লাগলো—কালে কালে কত দেখবো, পেত্নীর হাতে রাঙা শাঁখা—

কিন্তু কেন এমন হলো ?

কেন এমন হলো তা জানতে গেলে আরো অনেকদিন অপেক্ষা করতে হবে।

কিন্তু শুরুটা কী করে কেমন করে হলো তা এখানে বলা যেতে পারে।

এমন যে হবে তা কেউ আগে থেকে কল্পনা করতেও পারেনি। কালবৈশাখী যখন আসে তা কি আগে থেকে কখনও জানান দিয়ে আসে ?

এও ঠিক তেমনি।

টেলিফোনটা যখন এল তখন এ বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে অচেতন। মুক্তিপদ একটু দেরী করে এসেছিল সেদিন। সাধারণত দেরি তাঁর হয় না। ডাক্তার তাঁকে দেরি করে ঘুমোতে বারণ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু ফ্যাক্টরির কাজ মুক্তিপদ না দেখলে কে দেখবে ?

- স্যার, আমি নাগরাজন বলছি !

—কী ব্যাপার ? এত রাত্তিরে ?

—স্যার, লণ্ডন অফিস থেকে টেলেক্স এসেছিল—

—টেলেক্স ? কেন ?

স্যার মিস্টার মেঠা মারা গেছে। কমললাল মেঠা।

খানিকক্ষণ চুপচাপ। কোনও দিক থেকেই কারো মুখে কথা নেই। দুজনের মুখেই তালা-চাবি বন্ধ হয়ে গেল।

মুক্তিপদর মনে হলো তাঁর ডায়াস্টোলিক প্রেসারটা যেন বেড়ে গেল হঠাৎ। সমস্ত শরীরের শিরা-উপশিরাগুলো যেন দপ্-দপ্ করে আওয়াজ করতে লাগলো। ওইটেই খারাপ লক্ষণ। এত খাটাখাটির পর হঠাৎ রাতের ঘুমে ব্যাঘাত হলে এই রকমই হয়।

কিন্তু নাগরাজনের দোষ নেই। স্যাণ্ডবি-মুখার্জী কোম্পানীর ফ্যাক্টরি দিনে রাতে, কখনও বন্ধ করবার নিয়ম নেই। সেখানে তিন শিফ্‌টে কাজ হয়। সেখানে চীফ্ ইন্‌জিনিয়ার আছে। তার ডেপুটি আছে। সেখানে রাত-দিন বলে আলাদা কোনও জিনিস নেই। খবরটা সেখানেই প্রথম এসেছিল। সেখান থেকে জানানো হয়েছিল মিস্টার নাগরাজনকে। মিস্টার নাগরাজনকে বলা ছিল তেমন কোনও এস-ও, এস-মেসেজ হলে ম্যানেজিং ডাইরেক্টরকে জানাতে যেন দ্বিধা না করে, তা সে দিনই হোক আর রাত দুপুরই হোক।

ওই কমললাল। বড় শার্প ছেলে। অথচ মাথা ঠাণ্ডা। সবে পাঁচ বছর হলো বিয়ে করেছিল সে। আগে লণ্ডন অফিসটার বদনাম ছিল। বরাবরের লায়াবেলিটি। প্রফিট্ দূরে থাক ডিফিসিট্ চলছিল বরাবর। তারপর মেঠা যেদিন থেকে অফিসের চার্জ নিয়েছিল সেইদিন থেকেই প্রফিট রান করছিল। মুক্তিপদ যখনই লণ্ডনে যেতেন তখনই দেখতেন কমললাল খুব খাটছেন।

মুক্তিপদ একবার জিজ্ঞেস করেছিলেন কমল, তুমি তো কখনও ছুটি নাও না।

কমললাল বলেছিল—রেস্ট্ ?

—হ্যাঁ।

কমললাল বলেছিল—রেস্ট্ কেন নেব স্যার ? কাজই তো আমার রেস্ট্—চুপ করে বসে থাকলেই আমার হেলথ্ উইক্ হয়ে যায়। কাজ করলেই আমি ফিট্ থাকি।

অদ্ভুত ! সবাই যদি কমললাল হতো তাহলে ইণ্ডিয়ার আর ভাবনা ছিল না। মুক্তিপদ দেখেছেন তাদের অফিসে সবাই দেরি করে আসতো। যত কম কাজ করে যত বেশি টাকা কামানো যায়, সেইদিকেই সকলের লক্ষ্য—। এক এক সময়ে মনে হতো ওই কমললালকে যদি কলকাতার অফিসে এনে বসানো যেত তাহলে বোধহয় কিছু কাজ হতো। কিন্তু না, তাহলে লণ্ডনের অফিস কে চালাবে ?

এক এক সময়ে মুক্তিপদর মনে হতো সে যদি কমললালের মত স্বাস্থ্য পেত তাহলে বেশ হতো। এমন স্বাস্থ্য যা হাজার পরিশ্রমেও ভেঙে পড়বে না। ব্লাড প্রেশার হবে না, কলেস্টোরল হবে না, সুগার হবে না। চব্বিশ ঘণ্টা কাজ করেও ঘুম পাবে না। তাহলে মুক্তিপদ কোম্পানিটাকে আবার আগেকার মত দাঁড় করিয়ে দিতেন।

—স্যার, আমার কথা আপনি শুনতে পাচ্ছেন ?

—মুক্তিপদ বললেন—হ্যাঁ ভাবছি···

—কিছু মনে করবেন না স্যার, আপনার ঘুম ভাঙিয়ে খবরটা দিলুম—

মুক্তিপদ বললেন—না না, এখন আমার তরফ থেকে কী করতে হবে বলো তো ? মিসেস মেঠাকে একবার রিং করবে ।?

—আমার মনে হয় রিং না করাই ভালো ।

—কেন ?

—যা করবার তা কাল পরামর্শ করেই করা ভালো। আপনি এখন ঘুমোতে যান স্যার, আমি ছাড়ি ।

—না নাগরাজন, আর আমার ঘুম আসবে না। আমি শুধু একটা কথা ভাবছি, যার হেলথ্ অত ভালো ছিল, যে মানুষ অত পরিশ্রম করতে পারতো, ও-রকম হঠাৎ স্ট্রোক হলো কেন ? কী হয়েছিল ?

—তা তো খবর পাইনি। আমি এমন একটা কেস দেখেছি, চোদ্দ বছর বয়েসের একটা ছেলের স্ট্রোক হয়ে মারা গিয়েছিল ।

—সে কী ?

নাগরাজন বললে—আপনিই তো স্যার একদিন বলে ছিলেন—Life is but an empty dream···যাক গে, আমি লাইন ছাড়ছি। আপনি ঘুমোন—

নন্দিতারও ঘুম ভেঙে গিয়েছিল ততক্ষণে। বললে—কে মারা গেছে ?

মুক্তিপদ বললেন—আমাদের লণ্ডন অফিসের চীফ কল্ললাল মেঠা। বেচারীর মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর বয়েস। বউ রয়েছে, একটা বাচ্চা ।

তারপর একটু ভেবে মুক্তিপদ বললেন আমার এখন ঘুম পেয়ে গেছে, আর বকবক করো না, তুমিও ঘুমিয়ে পড়ো—

নন্দিতা পাশ ফিরে শুলো ।

মুক্তিপদ আর কথা বললেন না। নন্দিতা ও-সব কথা বুঝবে না। ও আবার আগের মত ঘুমিয়ে পড়বে। সত্যি, ওরা বেশ আছে। সবাই বেশ আছে। কারো কোনও দুশ্চিন্তা নেই। সবাই আরামে ঘুমোচ্ছে। শুধু এক এক জন মানুষ ঘুমোতে পারে না। এক একজন মানুষ গাছের ডালে ফুল ফোটবার শব্দ শুনবে বলে জেগে বসে থাকে, আকাশের বুক থেকে একটা তারা খসতে দেখবার আশায় সারারাত চোখ মেলে থাকে। আবার এমন পাগলও আছে যে ঢেউ কখন থামবে তাই দেখবার আশায় সমুদ্রের ধারে বসে জীবন কাটিয়ে দেয়। পৃথিবীর চারদিকে সূর্য ঘুরছে, না সূর্যের চারদিকে পৃথিবী ঘুরছে, তা দেখবার জন্যে তারা জীবনপাত করে দেয়। সবাই তাদের পাগলই বলে ।

এই পৃথিবীতে তারাও যেমন আছে আবার তেমনি নন্দিতারাও আছে। কাদের জন্যে তাহলে পৃথিবীটা চলে ? সেই পাগলদের জন্যে, না এই নন্দিতাদের জন্যে ? চলে ওই সব পাগলদেরই জন্যে। ওই সব পাগলরাই বরাবর এই পৃথিবীটাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে ।

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই নন্দিতা বললে—তোমার চেহারাটা এমন শুকনো শুকনো দেখাচ্ছে কেন ? কী হলো ?

মুক্তিপদ বললেন—কাল সারারাত ঘুমোতে পারিনি—

—ঘুমোতে পারবে কী করে? রাত দুপুর পর্যন্ত জেগে জেগে অফিসের কাজ করলে শরীর তো খারাপ হবেই। তোমার অফিসারগুলোই যত পাজী, তাদের স্যাক্ করে দিতে পারো না? যখন-তখন টেলিফোন করে কেন? যদি কেউ মারাই যায় তাহলে তার জন্যে কি আমাদের ভুগতে হবে? কেউ কোথাও মরলে কি আমাদের পৃথিবী থেমে যাবে?

এ-সব কথার কী জবাব দেবেন মুক্তিপদ। ও-তো জানে না যে সকলে ভালো থাকলেই তবে আমরা ভালো থাকবো? আমাদের স্বার্থেই কমললালদের বাঁচিয়ে রাখা দরকার।

তারপর ভোরবেলা থেকে অনেক টেলিফোন আসা শুরু হলো। একটার পর একটা। সকলের মুখেই সহানুভূতির সুর। যেন কমললালের মৃত্যুতে সবাই শোকে কাতর! হঠাৎ যেন সবাই খুব উদার, খুব দয়ালু, খুব পরোপকারী হয়ে উঠলো। রাতারাতি সবাই সচ্চরিত্র সাধু নিঃস্বার্থপর মানুষ হয়ে পড়লো।

অন্যদিনের চেয়ে সেদিন আরো সকাল সকাল অফিসে গিয়ে পৌঁছলেন মুক্তিপদ। পৌঁছিয়েই নাগরাজনের সঙ্গে দরজা বন্ধ ঘরের ভিতর আলোচনায় বসলেন। পৃথিবীর যত বড় বড় গোপন সিদ্ধান্ত সমস্তই এই দরজা-বন্ধ ঘরে বসেই নেওয়া হয়েছে। যখন জাপানের ওপর এ্যাটম্-বোমা ফেলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো তাও একটা দরজা-বন্ধ ঘরে। চার্চিল, ট্রুম্যান আর স্ট্যালিন, এই তিনজনই দরজা-বন্ধ ঘরে বসে সে-সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। সিদ্ধান্ত হলো ১৯৪৫ সালের ৫ই আগস্ট, রবিবারের সকালবেলা হিরোসিমাতে বোমা ফেলা হবে।

খুব সাবধান, বাইরের কোনও লোক যেন আমাদের সিদ্ধান্তের কথা না জানতে পারে। ট্রুম্যান তখন ডিনার খাচ্ছেন। ওয়াশিংটন টাইম রাত আটটা। হঠাৎ ক্যাপ্টেন ফ্রাংকলিন এইচ গ্রাহাম এসে স্যালিউট করলেন। বললেন—স্যার মেসেজ—

—কী মেসেজ?

ক্যাপ্টেন মেসেজটা সামনে রেখে দিলে। প্রেসিডেন্ট পড়লেন—Big bomb on Hiros'ma, August five, at seven fifteen P. M., Washington time First reports indicate complete success.

কিন্তু কোথায় গেল সেই ট্রুম্যান চার্চিল আর সেই স্ট্যালিন? আজ এত বছর পরে কে তাদের মনে রেখেছে?

কেউ না।

কিন্তু আড়াই হাজার বছর আগে আর এক রাজার ছেলে একদিন রাজ্য-ঐশ্বর্য সুখ-আরাম ত্যাগ করে একটা গাছের তলায় গিয়ে বসলো। গিয়ে বলতে আরম্ভ করলে—আমি সমস্ত পাওয়াকে না-পাওয়া মনে করে সব কিছু ত্যাগ করে পরিত্রাণ পেতে চাইছি। আমি ভেবে দেখেছি আরামের মধ্যেই অসম্মান, তাই যারা কিছু পায়নি, সেই প্রবঞ্চিত পরিত্যক্ত পরাজিতের মধ্যে আমি আমার আপন সত্তাকে খুঁজে পেয়ে তাদের সুখ, তাদের দুঃখ-কষ্ট-বেদনাকে ভাগ করে ভোগ করতে চাইছি। তাই বলছি—

ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং
ত্বকমাস্থি মাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু
অপ্রাপ্য বোধিং বহু কল্প দুর্লভাং
নৈবাসনাৎ কায়মতঃ চলিষ্যে ॥

অর্থাৎ যতক্ষণ না আমার বোধিলাভ হয় ততক্ষণ আমার কোনও শান্তি নেই। ততক্ষণ আমার অন্য কোনও কামনা নেই। ততক্ষণ আমার সাধনার শেষও নেই—

সেই আড়াই হাজার বছর আগেকার গৌতম বুদ্ধকে আজকের লোক মনে রেখেছে, না ওই ট্রুম্যান চার্চিল আর স্ট্যালিনকে মনে রেখেছে? এর সাক্ষী আছে ইতিহাস। ইতিহাসই আজকের মানুষকে জানিয়ে দেবে কে মানুষের কাছে বেশি স্মরণীয়! কারা বেশি স্মরণযোগ্য!

তখন সন্দীপ কলকাতায় নতুন। কিন্তু মল্লিক-কাকা এ-বাড়ির পুরনো মানুষ। সেদিন অন্যদিনের চেয়ে একটু বেশি গম্ভীর দেখাচ্ছিল তাঁকে।

সন্দীপ জিজ্ঞেস করেছিল— আপনার কি শরীর খারাপ মল্লিক-কাকা?

—কই, না তো।

—তাহলে আপনাকে একটু গম্ভীর গম্ভীর দেখছি কেন?

মল্লিক-কাকা বললে— ঠাকমা-মণির লন্ডন অফিসের মেঠা সাহেব হঠাৎ মারা গেছে—

সন্দীপ ব্যাপারটা বুঝতে পারলে না। লন্ডন অফিসের মেঠা সাহেব মারা গেছে তো কী হয়েছে? তাতে মল্লিক-কাকার মুখ গম্ভীর হবে কেন? কারো মৃত্যুতে কি কিছু আটকে থাকে? কারো মৃত্যুতে কি পৃথিবী থেমে যায়?

না, ব্যাপারটা যে সত্যিই গুরুতর তা পরের দিনই সন্দীপ বুঝতে পারলে। সে যথানিয়মে তেতলায় ঠাকমা-মণির ঘরে গিয়ে বিন্দুর মুখে শুনতে পেল— ঠাকমা-মণির আজ সময় নেই, ঠাকমা-মণির শরীর খারাপ। আজ আর ঠাকমা-মণি তার কাছ থেকে রাসেল স্ট্রীটের বাড়ির খবরা খবর শুনবেন না—

—আমি তাহলে কালকে আসবো?

বিন্দু বললে— হ্যাঁ—

বলে সে তার নিজের কাজে চলে গেল।

এ-রকম ঘটনা আগে আর কখনও ঘটেনি। সেই-ই প্রথম।

সন্দীপ ভেবে পেল না লন্ডন অফিসের মিস্টার মেঠার মারা যাওয়ার সঙ্গে এ-বাড়ির ঠাকমা-মণি বা মল্লিক-কাকার মন বা শরীর খারাপ হওয়ার কী যোগসূত্র! আর শুধু ঠাকমা-মণি বা মল্লিক-কাকাই নয়, সমস্ত বাড়ির আবহাওয়াটাই যেন বদলে গিয়েছিল। সেদিন ঠাকমা-মণি আর সন্ধ্যারতির সময়ে নিচেয় নামলেনই না। দুপুরবেলা মেজবাবু একবার শুধু এ-বাড়িতে এসেছিলেন। এসে সোজা ঠাকমা-মণির কাছে তেতলায় চলে গিয়েছিলেন। তারপর দুজনে দরজা-বন্ধ ঘরে বসে নাকি অনেকক্ষণ ধরে কথা বলেছিলেন। এত কী কথা? আগে তো মা'র সঙ্গে মেজবাবু কথা বলবার সময় কখনও এমন দরজা বন্ধ করেননি।

গিরিধারী যে গিরিধারী, অতি সামান্য লোক, সে পর্যন্ত অবাক হয়ে গিয়েছিল। সন্দীপকে দেখে জিজ্ঞেস করেছিল —কী হলো বাবুজী? ক্যায়া হুয়া?

সন্দীপ বলেছিল—আমি কী করে জানবো, গিরিধারী কী হয়েছে। তুমি পুরনো লোক, তুমি তো আমার চেয়ে বেশি জানবে—

—নেহি বাবুজী। আমরা তো ছোট লোগ আছি। বড়ি বড়ি বাতসে হামে ক্যায়া পাতা—

তা বটে। বড়লোকদের বাড়ির ভেতরের কথা তাদের বাড়ির চাকর-বাকর-ঝি-দরোয়ানরা কেমন করে জানবে।

সন্দীপ বললে—শুনলাম বাবুদের বিলেতের অফিসের বড়সাহেব মারা গেছেন—

তাতেও কথাটা কিন্তু স্পষ্ট হলো না গিরিধারীর কাছে। কোনও বাবু মারাই যাক আর বেঁচেই থাকুক, তাতে তাদের কিছু ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই। তাদের চাকরি থাকতেও পারে, আবার না থাকতেও পারে। এক জায়গায় চাকরি গেলে তারা অন্য জায়গায় চাকরি পাবে। তারা তো বিয়েবাড়ির আঁস্তাকুড়ে পড়ে থাকা এঁটো কলা পাতার মতন। হয় ঝড়ে উড়ে যাবে, নয় তো গরুতে চিবিয়ে খাবে।

আর সত্যি কথা বলতে গেলে, সন্দীপ নিজেও তো একজন-তাই। সেও তো এ-বাড়ির একজন নগণ্য উচ্ছিষ্ট ভোজী জীব! এখানে যতদিন আশ্রয় পেয়েছে, ততদিনই তার মেয়াদ। মেয়াদ ফুরিয়ে গেলেই তাকেও একদিন এ-বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে—

ল-কলেজে পড়তে পড়তে একদিন একজন নতুন ছেলের সঙ্গে তা বন্ধুত্ব হলো। মধ্যবিত্ত ঘরের অভাবী মানুষ। দুঃখের সংসারের খবর-টবর রাখে। সে নিজেই তার নামটা বললে—সুশীল। খুব গেরস্ত-পোষা নাম। সুশীল সরকার।

হঠাৎ একদিন কথায় কথায় জিজ্ঞেস করলে—আপনি কোন্ পার্টির মেম্বার? কংগ্রেস?

সন্দীপ প্রশ্নটা শুনে অবাক। এ প্রশ্ন যে কেউ করতে পারে তা সন্দীপ কখনও স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। বললে—আমি তো কোনও পার্টির মেম্বার নই—

—সে কী? কোনও পার্টির মেম্বার নন আপনি?

সন্দীপ বললে—না—

সুশীল বললে—তা হলে চাকরি পাবেন কী করে? কেউ তো আপনাকে চাকরি দেবে না—

সন্দীপ বললে—কেন? পার্টির মেম্বার না হলে চাকরি পাওয়া যাবে না?

সুশীল বললে—না, আপনি বোধহয় গ্রামের মানুষ, তাই জানেন না। আপনার বাড়ি কোথায়?

সন্দীপ বললে—বেড়াপোতায়। এখান থেকে ট্রেনে তিন ঘণ্টার রাস্তা—

সুশীল বললে—আপনি কি বিয়ে করেছেন?

সন্দীপ বললে—কী যে বলেন! আমার নিজের কোনও ইনকাম নেই, তার বিয়ে। বিয়ে করে বউকে খাওয়াবো কী-

সুশীল বললে—আপনি এম-এ পড়লেন না কেন? প্রাইভেটেও তো এম-এ দেওয়া যায়। আজকাল করেসপনডেন্স কলেজ হয়েছে। মাত্র সাত-আটশো টাকা খরচ করলেই এম-এ ডিগ্রী পাওয়া যায়—

সন্দীপ হাসলো। বললে—আমার অত টাকা নেই, আমি গরিব লোক—টাকা

কোথায় পাবো ?

সুশীল বললে—এম-এ পাস করে স্কুল-মাস্টারি করতে গেলেও তো পার্টির মেম্বার হতে হবে আপনাকে—

—কেন ?

সুশীল বললে—তা জানেন না আপনি ? আজকাল স্কুলের চাকরিতেই তো বেশি লাভ—

সন্দীপ জানতো না। বললে—কী লাভ ?

—তা জানেন না বুঝি ? বছরে ছ'মাস ছুটি আর চাকরিতে ঢুকলেই সব মিলিয়ে এক হাজার টাকার মত মাইনে। কিন্তু পার্টি ব্যাকিং চাই—

সন্দীপ বললে—আমি ঠিক করেছি কোর্টে প্র্যাকটিশ করবো, এ্যাড্‌ভোকেট হবো—

—উকিল ? ওকালতিতে তো পয়সা নেই। কে আপনাকে ও পরামর্শ দিয়েছে।

সন্দীপ বললে—বেড়াপোতায় আমার মা যাদের বাড়িতে কাজ করে, তাঁর নাম কাশীনাথ চাটুজ্জে, তিনি হাইকোর্টে প্র্যাকটিশ করেন। প্রথম প্রথম আমি তাঁর জুনিয়ার হয়ে কাজ শিখবো—

ছুটির পর দু'জনেই একসঙ্গে রাস্তায় বেরোল। সুশীল জিজ্ঞেস করলে—আপনি কোন্‌দিকে যাবেন ?

—নর্থের দিকে—

সুশীল বললে—আমি যাবো সাউথের দিকে। চলুন না একটা সিগারেট খাই—

সন্দীপ অবাক হয়ে গেল। বললে—আপনি সিগারেট খান ? সিগারেট খাওয়া তো শুনেছি নাকি শরীরের পক্ষে খুব খারাপ, প্যাকেটের গায়ে লেখা আছে—

সুশীল বললে—ও রকম কত কী তো চারদিকে লেখা থাকে, ও-সব মেনে চললেই হয়েছে—

সন্দীপ বললে—না-ই বা খেলেন। ও তো ভাত নয় যে না খেলে চলবে না।

সুশীল বললে—তা যদি বলেন তো এই যে এত বড় বড় সিগারেট কোম্পানি, সব কি ফেল মেরেছে ? দিব্যি তো রমরমা করে সব চলছে, কত হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোক সে-সব কোম্পানিতে চাকরি করছে। তাদের কারো চাকরিও তো যাচ্ছে না—

বলে একটা সিগারেট সন্দীপের দিকে এগিয়ে দিলে। বললে—খান, খান, একটা সিগারেট খান, একটা খেলে জাত যাবে না। পার্টি মেম্বারও হবেন না, আবার সিগারেটও খাবেন না, তাহলে বেঁচে থেকে কী লাভ ?

সন্দীপ বললে—না, সে জন্যে নয়, মা জানতে পারলে রাগ করবে কিনা, তাই। আমার বাবা নেই তো, আমার এক মা ছাড়া নিজের বলতে পৃথিবীতে আর কেউ নেই। মা'র কাছে আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, আমি কলকাতায় এসে বিড়ি খাবো না, সিগারেট খাবো না, মদ খাবো না—

—তাই নাকি ? তা এত নিয়ম মেনে আপনি কি ওকালতী করতে পারবেন ?

সন্দীপ বললে—সে পরের কথা। আগে উকিল হই—

একটা রাস্তার মোড়ের মাথায় এসে সেই সুশীল বাসে উঠে পড়লো। আর সন্দীপ একটা রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সোজা বিডন স্ট্রীটের দিকে পা বাড়ালে।
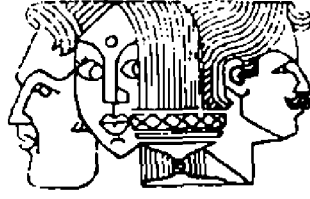
সেই অনেকদিন আগে ১৯৪৫ সালের ১৭ই জুলাই জার্মানীর পট্‌সডাম শহরে একটা দরজা বন্ধ ঘরে তিন ইতিহাস পুরুষ ট্রুম্যান চার্চিল আর স্ট্যালিন মিলে যে সিদ্ধান্তটা নিয়েছিলেন তার ফলেই হিরোসিমা শহরের মাথার ওপর পৃথিবীর প্রথম এ্যাটম বোমাটা ফাটলো।

আর তা নিয়ে সারা পৃথিবীময় সে কী হৈচৈ!

আর স্যাক্সাবি মুখার্জী এ্যাণ্ড কোম্পানির ম্যানেজিং ডাইরেক্টার মুক্তিপদ মুখার্জী আর ডাইরেক্টর শ্রীমতী কনকলতা মুখার্জী ওরফে ঠাকমা-মণি দরজা বন্ধ ঘরে যে সিদ্ধান্তটা নিলেন তা নিয়েও কি কম হৈচৈ হয়েছে?

আর এই সিদ্ধান্তটা হলো বলেই তো সন্দীপের জীবনে সে এক চরম বিপর্যয় নেমে এল অপ্রত্যাশিতভাবে—

তা সে সব কথা এখন থাক, এখন সেই দরজা বন্ধ ঘরের ভেতরে দু'জনে যে-সব কথা হয়েছিল তাই এখানে বলি! এ-বাড়ির ঠাকুরের বোন বিন্দু সেদিন সবই শুনতে পেয়েছিল—

কথা বলতে বলতে মুক্তিপদর নাকি তখন গলা গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল ঠাকমা-মণির কথা শুনে।

বলেছিলেন—তোমার জন্যেই তো আজ সৌম্য এই রকম হয়েছে। তুমি অত আব্দার দিয়ে দিয়েই তো ওর মাথাটা খারাপ করে দিয়েছ—

ঠাকমা-মণি বললেন—তুই তো কেবল আমারই দোষ দেখিস, আর তোর নিজের কথাটা একবার ভাব দিকিনি! তুইও কি মানুষ হয়েছিস? তোর বউ···

মুক্তিপদ বাধা দিয়ে বললেন—দেখ, এখন ওসব কথা শোনবার সময় নেই আমার। আমি তোমাকে যা বলতে এসেছি তাই বলি—আমি চাই সৌম্য ক'দিনের জন্যে লণ্ডনে যাক্—

ঠাকমা-মণি বললেন—ও কেন যাবে? তুই নিজে যা না—

মুক্তিপদ বললেন—তুমি আমাকে যেতে বলছো? আমি কী করে যাই বলোতো! এদিকে আমার এখন ইয়ার্লি বাজেট তৈরি হচ্ছে, আমি ইণ্ডিয়ায় না থাকলে যে সব পণ্ড হয়ে যাবে। কখন আমার দরকার পড়বে, তার কিছু ঠিক আছে? কেন, সৌম্য গেলে দোষটা কী?

ঠাকমা-মণি বললেন—ও তো ছেলেমানুষ, ও বিদেশ-বিভুঁইতে একলা যাবে কী করে?

—কী বলছো তুমি? আমি ওই বয়েসে একলা ঘুরিনি?

ঠাকমা-মণি বললেন—তুই ঘুরেছিস তোর বাবার সঙ্গে, আমার সঙ্গে! ও একলা কী করে যাবে?

মুক্তিপদ বললেন—সৌম্য কোম্পানির ডাইরেক্টার হয়েছে, ওদিকে কমললাল মারা গেছে, এই জন্যে অন্ততঃ একজন ডাইরেক্টারের তো যাওয়া উচিত। তা ছাড়া এখানে থেকে তো ওর কোন লাভ নেই, ও তো অর্ধেক দিন অফিসেই আসে না—

—সে কী ও অফিসে যায় না?

—না। এই দেখ না, আমি আজ ওকে অফিসে খুঁজলুম, নাগরাজন বললে ও আজকে অফিসেই যায় নি। ফ্যাক্টরিতেও যায়নি—

—অফিসে যায় নি তো কোথায় গেল?

মুক্তিপদ বললেন—সে ও-ই জানে। এত বয়েস হলো অথচ এখনও ওর কোনও দায়িত্ব জ্ঞানই হলো না। সেই জন্যেই তো আমি এখন থেকে ওকে অফিসের সব ডিপার্টমেন্টে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কাজ কর্ম দেখাচ্ছি। আমার তো মনে হয় লণ্ডন অফিসে গেলে ও অনেক কাজ শিখতে পারবে।

ঠাকমা-মণি বললেন—ঠিক আছে যাক তাহলে। কিন্তু তার আগে আমি ওর বিয়ে দিয়ে দেব—

—বিয়ে?

মুক্তিপদ চমকে উঠলেন, কি?

—হ্যাঁ, বিয়ে। কনে তো ঠিক করেই রেখেছি। ওর বিয়ে না দিয়ে আমি ওকে লণ্ডন অফিসে পাঠাতে দেব না—

মুক্তিপদ বললেন—কিন্তু সে তো অনেক সময় লাগবে। বিয়ে তো আর একদিনে হয় না। ততদিন আমার লণ্ডন অফিস চলবে কী করে? আমি তো বেশিদিন ওর বিয়ের জন্যে অপেক্ষা করতে পারবো না।

ঠাকমা-মণি বললেন—আমিও বলে দিচ্ছি ওর বিয়ে না দিয়ে আমি ওকে কিছুতেই বাইরে পাঠাতে পারব না—ওর বিয়ে দিয়ে একেবারে বউ নিয়ে ও যাবে—

—কিন্তু ততদিন আমার কাজ চলবে কী করে? বিয়ে তো বললেই হবে না। আর এ মাসে তো আবার বিয়ের তারিখও নেই—। মেঠা মারা গেছে, সেখানে কি হচ্ছে তা-ও তো বুঝতে পারছি না—

ঠাকমা-মণি বললেন—রাজা মরে গেলে কি রাজ্য চলে যায়। তোর বাবা মরে যাওয়াতে কি কোম্পানি উঠে গেছে?

মুক্তিপদ বললেন—দেখ, তোমার সঙ্গে আমি তর্ক করতে চাই না। আমি যা ভালো বুঝেছি তোমাকে তাই-ই বললুম—এখন তোমার যা ইচ্ছে তাই করো—

ঠাকমা-মণি বললেন—আমার শেষ কথা সৌম্যর বিয়ে দিয়ে তবে বউকে সঙ্গে নিয়ে ওকে আমি লণ্ডনে যেতে দোব। তার আগে নয়—

ঠাকমা-মণি আবার বললেন—হ্যাঁ, বউমাকে আমি মেমসাহেব রেখে ইংরিজী শেখাচ্ছি, গান শেখাচ্ছি, লেখা-পড়া শেখাচ্ছি। এ-সব করছি কেন? করছি এই জন্যে যে যাতে দরকার হলে বউমা সৌম্যর সঙ্গে বিলেতে গিয়ে মুশকিলে না পড়ে—

মুক্তিপদ বললেন—তাহলে তাই-ই করো। মোটমাট যা করবে একটু তাড়াতাড়ি করবে। যেন বেশি দেরি না হয়—

ঠাকমা-মণি বললেন—ঠিক আছে, আমি কাশীতে গুরুদেবের কাছে খবর পাঠাই, তিনি যা বলবেন তাই-ই হবে—

তা এই-ই হলো সূত্রপাত। এর পর থেকেই শুরু হলো যত গণ্ডগোল।

একজন সামান্য অফিসারের আকস্মিক মৃত্যুতে যে একটা প্রতিষ্ঠানের ভিত নড়বড়ে হয়ে যায়, তার প্রমাণ এই স্যাক্সবী মুখার্জী কোম্পানীই প্রথম নয়। এর আগেও অনেকবার এ-রকম ঘটেছে। ১৯১৪ সালের প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণটাও তো ছিল এমনি সামান্য একটা ঘটনা। তারপর ১৯৩৯ সালে?

১৯৩৯ সালের যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পরের বছরে এমনি একটা সামান্য ঘটনা ঘটলো ১৯৪০ সালে হল্যাণ্ডে।

তখন জার্মানী আক্রমণ করেছে হল্যাণ্ড। হল্যাণ্ড গরিব দেশ। সে দেশ কখনও কল্পনাও করেনি যে পাশের প্রতিবেশী দেশ জার্মানী তাকে আক্রমণ করবে।

মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু কে? শত্রু তার লোভ নয়, তার বিলাসিতা নয়, তার পাপ নয়, তার বেহিসেবীপনা নয়। এ-সব কিছুই মানুষের শত্রু নয়। মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু হলো মানুষই। জার্মানী নিজে নিজের যত শত্রুতা করেছে, অত শত্রুতা রাশিয়া, আমেরিকা, ব্রিটেন বা ফ্রান্সও তা করেনি।

সেই হল্যাণ্ড এর সেনাপতি তাড়াতাড়ি একটা মিটিং ডাকলেন। সব মিলিটারি অফিসাররা হাজির হলেন সেই মিটিং-এ।

একজন জেনারেল বললেন—জার্মানীর মত অত বড় শত্রুর সঙ্গে লড়াই করবো এত ক্ষমতা আমরা কোথায় পাবো? আর একজন জেনারেল বললেন—আমার তো মনে হয় যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জার্মানীর সঙ্গে আমাদের সন্ধি করে ফেলা উচিত—

তখন আলোচনা করতে করতেই অনেক সময় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তত ভাববার মত সময়ও নেই তখন হাতে। যে-কোনও মুহূর্তেই জার্মানী ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে তাদের রাজধানীতে।

হল্যাণ্ডের প্রধান সেনাপতি তখন চিৎকার করে উঠলেন। বললেন থামুন, থামুন সবাই থামুন—

সবাই চুপ। প্রধান সেনাপতি তখন সকলকে উদ্দেশ্য করে বললেন—প্রাণ দিতে পারবেন কেউ আপনারা? প্রাণ? জীবন?

প্রধান সেনাপতির কথার উত্তরে সবাই চুপ। কারো মুখে আর কোনও কথা নেই। প্রধান সেনাপতি আবার জিজ্ঞেস করলেন—কই? কেউ প্রাণ দিতে রাজি নয়? কেউ রাজি নয় প্রাণ দিতে?

তারপর অনেকক্ষণ নিস্তব্ধতার পরে একজন জেনারেল বললেন—আমি প্রাণ দিতে রাজি—

—কিন্তু আপনারা ? আপনারা কেউ প্রাণ দিতে রাজি নন ?

তখন অন্যান্যরা, অন্য জেনারেলরাও বলে উঠলেন—আমরাও প্রাণ দিতে রাজি—দেশের জন্যে আমরাও প্রাণ দেব—

কিন্তু তখন হল্যাণ্ডের সমস্ত অধিবাসীরা যে যেদিকে পারছে ঘর বাড়ি ছেড়ে পালাতে আরম্ভ করেছে। চারিদিকে নৈরাজ্য, চারিদিকে অচলাবস্থা। রাস্তায় বাস নেই, কোনও যান বাহন নেই। সে এক চরম বিহ্বল অবস্থা চারদিকে।

সেই দুর্যোগের ওপর আর এক চরম দুর্যোগ নেমে এল দেশের মাথায়। হঠাৎ দেশের সমস্ত আলো নিভে গেল মুহূর্তের মধ্যে। বিদ্যুৎ বন্ধ হয়ে গেল সারা দেশে। বিদ্যুৎ বন্ধ হওয়া মানেই সব কিছু বন্ধ হওয়া। অর্থাৎ আলো তো নেই-ই, তার সঙ্গে পাখাও নেই, জলও নেই। হাসপাতাল, অফিস, কারখানা, মিলিটারি ছাউনি—সব অচল, সব অলস।

এমন অবস্থা কেন হলো ? কে করলে ? এও কি জার্মানীর এক অন্তর্ঘাতমূলক শত্রুতা ? তবে কি দেশের মধ্যে কোনও কুইসলিং আছে। কোনও বিভীষণ আছে ?

যদি তেমন কেউ থাকে তো তাদের খুঁজে বার করো, তাদের ধরে শাস্তি দাও। তাদের ফাঁসি দাও।

কিন্তু তবু তাদের কোনও সন্ধান পাওয়া গেল না, তবু তাদের কোনও হদিস পাওয়া গেল না। তবু তারা দেশের কোণে কোণে তল্লাসী চালাতে লাগলো। মহারানীর দেশের এই অন্তর্ঘাত কেউ সহ্য করবে না। যদি অপরাধীকে ধরা না যায় তো পাওয়ার-হাউস মেরামত করবার ব্যবস্থা করা হোক। কারণ আমাদের আলো চাই, হাওয়া চাই, জল চাই। আমরা বাঁচতে চাই। আমরা জার্মানীর সঙ্গে লড়াই করতে চাই--

—তারপর ? তারপর কী হলো ?

মনে আছে বহুদিন আগে বেড়াপোতার কাশীনাথবাবুর কাছ থেকে সন্দীপ একদিন এই গল্প শুনেছিল। কাশীনাথবাবু থামতেই সন্দীপ জিজ্ঞেস করেছিল--তারপর ? তারপর কী হলো ?

কাশীনাথবাবু বলেছিলেন—এইসব ঘটনাই হচ্ছে ইতিহাসের শিক্ষা। এই ইতিহাস থেকে যে-মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করে না তাকেই মানুষ বলে অশিক্ষিত। সে বি-এ, ডি-লিট্ পদবীধারী হলেও অশিক্ষিত। এই জন্যেই জার্মানীর এক কবি বলে গেছেন—It is from history we learn that we do not learn from history.

সন্দীপ তখন হল্যাণ্ডের ঘটনা শোনবার জন্যে কৌতূহলী হয়ে উঠেছে।

—তারপর কী হলো ? আলো এল ?

কাশীনাথবাবু বললেন—সেও এক বিচিত্র কাহিনী। যখন কোথাও কোনও অপরাধীর সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না তখন হঠাৎ টের পাওয়া গেল গলদটা কোথায় ?

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—গলদটা কোথায়, বলুন না ?

—গলদটা খুব সামান্য। দেখা গেল পাওয়ার হাউসের একটা স্ক্রু ঢিলে হয়ে গিয়েছে—

—একটা স্ক্রু ?

কাশীনাথবাবু বলেছিলেন –হ্যাঁ, খুব সামান্য একটা জিনিস ওটা। কিন্তু ওই সামান্য জিনিসটাই সেদিন সেই দেশের সর্বনাশ ডেকে এনেছিল। এই যে আমাদের ইণ্ডিয়া, আজকে যে আমাদের ইণ্ডিয়ার এই দুর্দশা, এর পেছনেও একটা ওই রকম সামান্য কারণ আছে—

সন্দীপ জিজ্ঞেস করেছিল—কী সে কারণটা ?

কাশীবাবু বলেছিলেন—চরিত্র।

—চরিত্র ?

—হ্যাঁ, আমাদের ইণ্ডিয়ার মানুষের চরিত্রটাই নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

সন্দীপ জিজ্ঞেস করেছিল—চরিত্র মানে কী ?

কাশীবাবু সেদিন বলেছিলেন—দেখ, ডিক্সনারিতে 'চরিত্রে'র অনেক রকমের মানে লেখা আছে –'স্বভাব', 'রীতি-নীতি', 'আচার-আচরণ' এই সব মানে। কিন্তু তা নয়। চরিত্রের আসল মানে সমস্ত জীবন ধরে খুঁজলে তবে জানতে পারবে—তার আগে নয়—

এসব কথা বহুদিন আগেকার। তারপরে অনেক বছর কেটে গেছে। সে সেই ছোটবেলাকার বেড়াপোতা ছেড়ে কতদিন আগে কলকাতায় এসেছে। তখন থেকে ভেবে এসেছে 'চরিত্র' কথাটার মানে কী ? যে পরের উপকার করে, যে পরের দুঃখে কাতর হয়, যে সমাজের সেবা করে, তাকেই কি চরিত্রবান মানুষ বলা যায় ? কিংবা যে মদ খায়, যে স্বার্থসিদ্ধির জন্যে মিথ্যে কথা বলে, যে মানুষকে খুন করে, তাকেই কি চরিত্রহীন বলা যায় ?

কিন্তু কাশীনাথবাবু বলে গিয়েছিলেন, সারা জীবন ধরে খুঁজলেই তবেই নাকি 'চরিত্র' কথাটার মানে জানতে পারা যাবে। আজ সন্দীপেরও তো অনেক বয়েস হলো, এখনও কি 'চরিত্র' কথাটার মানে সে বুঝতে পেরেছে ? এখনও যদি সে মানে না বুঝতে পেরে থাকে তো কবে মানে বুঝতে পারবে ?

মনে আছে, সেই মুখার্জী বাড়ির লণ্ডন অফিসের ম্যানেজার কমললাল মেঠোর মৃত্যুর পর থেকেই যেন সমস্ত পরিবারের মধ্যে একটা নতুন আলোড়ন শুরু হয়ে গেল। সৌম্যবাবু কি বিলেতে যাবে ? বিলেত যাওয়ার আগে কি তাহলে বিশাখার সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে যাবে ?

কথাটা মল্লিক-কাকার কানেও এল। ঠাকমা-মণি মল্লিক-কাকাকে একদিন ডেকে পাঠালেন।

মল্লিক-কাকা ঠাকমা-মণির কাছে যেতে তিনি বললেন—আপনাকে একটা কাজ করতে হবে সরকার মশাই ?

মল্লিক-কাকা বললেন—বলুন, কী কাজ ?

—কাশীতে গুরুদেবকে একটা চিঠি লিখতে হবে। খুব জরুরী চিঠি, লিখতে হবে আমার নাতি সৌম্যর বিয়ে দিতে চাই আমি। পাত্রী তো পছন্দ করাই আছে। আপনি সৌম্য আর বউমা দু'জনের দুটো কোষ্ঠী নকল রেখে পাঠাবেন। জানতে চাইবেন সামনে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিবাহের কোনও শুভদিন আছে কিনা ? আর তার সঙ্গে প্রণামী বাবদ পাঁচশো টাকাও পাঠিয়ে দেবেন—

মল্লিক-মশাই ঠাকমা-মণির সঙ্গে অন্যান্য দৈনিক হিসেব নিকেশের কাজ সেরে এসে কাশীতে যথা-বিহিত চিঠি লিখে দিলেন। আর তার সঙ্গে পাঁচশো টাকাও প্রণামী বাবদ পাঠিয়ে দিলেন।

বললেন—তুমি রাসেল স্ট্রীটের বাড়িতে গিয়ে যেন এ-সব কথা কিছু বোল না—বুঝলে ?

এ-কথা বললে যে বিশাখার কী ক্ষতি আর ঠাকমা-মণিরই বা কী লাভ তা সে বুঝতে পারলে না। বললে—বলবো না ?

—না। এত আগে থেকে বলে কী লাভ ? দেখাই যাক না কাশী থেকে গুরুদেব কী লিখে পাঠান ?

মল্লিক-কাকা একটু হেসে আবার বললেন—তা ছাড়া এখনও তো পাকা কথা কিছু হয়নি। ধরো যদি বিয়েটা এখন না-ই হয়—

—কেন ? বিয়েটা হবে না কেন ? সব বন্দোবস্ত তো পাকাই হয়ে গিয়েছে !

মল্লিক-কাকা বললেন—এ-বাড়ির বিয়ে তো তেমন বিয়ে নয় যে কথা দিলুম আর হুট্ করে বিয়ে হয়ে গেল। তোড়-জোড় করতে করতে সকলকে খবর দিতেই তিন-চার মাস সময় লেগে যাবে। কত লোককে যে নেমন্তন্ন করতে হবে তার কি ঠিক আছে ? সারা কলকাতা ঝেঁটিয়ে লোক আসবে। তাও একদিনে সব শেষ হবে না। অন্ততঃ তিন দিন ধরে সব লোক খাবে। আগে তো দেখেছি কিনা। এ অন্য বাড়ির মত বিয়ে নয়। এখানকার বিয়ের দিনে পরবার জন্যে এ-বাড়ির সবাই একখানা করে নতুন কাপড় পাবে। তুমিও একটা নতুন ধুতি পাবে, কিংবা প্যাণ্ট, যা তুমি চাও, সে যখন হবে, তুমি দেখতেই পাবে—

সন্দীপের অনেক কথা ছিল বলবার। বলবার ছিল যে সৌম্যবাবু বিশাখার স্কুলে গিয়ে তার সঙ্গে কথা বলেছে। তাকে নিয়ে বেড়াতে যাওয়ার কথা বলেছে। কিন্তু সে-সব না বলাই ভালো। মল্লিক-কাকা হয়ত কী মনে করবে !

মল্লিক কাকা বললেন—তাহলে তুমি যাও এখন, আমি পোস্টাফিসে গিয়ে মনি-অর্ডারটা করে দিয়ে আসি—

সন্দীপ জামা-প্যাণ্ট পরে বাড়ির বাইরে পা বাড়ালো।

মুক্তিপদ মুখার্জী সেই দিন থেকেই বড় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। পৃথিবীতে চিরকাল কেউ বেঁচে থাকতে আসে না। একদিন তাকে যেতেই হয়।

কিন্তু কমললালের মৃত্যু সে-রকম মৃত্যু নয়। শুধু যে আকস্মিক মৃত্যু বলেই অস্বাভাবিক, তা নয়, কমললাল ছিল এ-কোম্পানির প্রাণ। এক-কথায় প্রাণপুরুষ। কোম্পানী নানাভাবেই কমললালের কাছে ঋণী। কমললাল এ-কোম্পানীকে নানা-ভাবে লাভবান করেছে। সৌম্য লণ্ডনে গিয়ে যে রাতারাতি কোম্পানীর আর্থিক উন্নতি ঘটাতে পারবে সে-আশা নেই। তবু তাকে পাঠানো হচ্ছে এই কারণে যে সে

হাতে-কলমে সব ব্যাপারটা দেখে শুনে বুঝে একটা সঠিক সিদ্ধান্ত নেবে। আর তা ছাড়া এখন থেকে তো সব জিনিসটা সম্বন্ধে একটা আইডিয়া হওয়া ভালো। ব্যবসাদারদের রক্ত আছে গায়ে, সেইটেই সৌম্যর জীবনের সবচেয়ে বড় মূলধন। যাকে বলে বংশ-পরম্পরা। বাকি যেটা সেটা বদলায়, অনেক সময় ধা মুছেও যায়।

মুক্তিপদ সৌম্যর খোঁজ করলেন—ডেপুটি ডাইরেক্টার অফিসে এসেছেন?

—না স্যার!

খবর নিয়ে মুক্তিপদ জানলেন সৌম্য নাকি প্রায়ই অফিস কামাই করে। অথচ মা'র কাছে গিয়ে খবর নিয়ে এসেছেন সে নাকি ঠিক সময়েই গাড়ি নিয়ে অফিসে বেরোয়।

নাগরাজনকে বলতেই সে বললে—কিন্তু মিস্টার মুখার্জী তো ঠিক সময়েই অফিসে, আসেন স্যার। আমি নিজের চোখে দেখেছি। চিঠি পত্র যা আসে আমি তাঁকে সই করবার জন্যে দিই। তিনিও সেগুলো পড়ে সই করে দেন—

—কী রকম দেখছো তাকে?

নাগরাজন বললে—ভেরি ইনটেলিজেন্ট বলে মনে হয় আমার।

—এ কোম্পানী কি সে একলা চালাতে পারবে একদিন?

—নিশ্চয়ই। আমি তো বললাম উনি ভেরি ইনটেলিজেন্ট।

—এই যে তাকে এখন লন্ডনে পাঠাচ্ছি, তাতে সে সেখানকার সব বিজনেস কি একলা ম্যানেজ করতে পারবে?

—কী বলছেন স্যার আপনি? আমি বলছি আপনি দেখবেন সমস্ত ঠিক করে দেবেন উনি—

মুক্তিপদ বললেন—কিন্তু শুনি নাকি সে রোজ নিয়ম করে অফিসে আসে না।

নাগরাজন একটুখানি ভাবলো। কী বলবে তা প্রথমে বুঝতে পারলে না। তারপর বললে—না স্যার. আসেন, তারপর এক-একদিন কিছুক্ষণ থেকে আবার বেরিয়ে যান। আর অফিসে ফেরেন না—

—কোথায় যায়, তা কি তুমি জানো?

নাগরাজন বললে- না স্যার, আমি তা কী করে জানবো? তিনি আমার মাস্টার, আমি তাঁর সারভেন্ট হয়ে সে-কথা কী করে তাঁকে জিজ্ঞেস করি?

নাগরাজনের সঙ্গে সৌম্য সম্বন্ধে আরো অনেক কথা আলোচনা করতে ইচ্ছে হয় মুক্তিপদর। কিন্তু তাঁর সে-সময় কোথায়? এক গাদা লোক সকাল থেকে ম্যানেজিং ডাইরেক্টারের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে অধীর প্রতীক্ষা করে থাকে। মুক্তিপদর কাছে নানা লোকের নানা আর্জি। কেউ চায় কনট্রাক্ট, কেউ চায় এজেন্সি, কেউ চায় চাকরি, কেউ চায় প্রমোশন, কেউ চায় তাঁকে ককটেল পার্টিতে নেমন্তন্ন করতে। কেউ শুধু তাঁকে খোশামোদ করতেই আসে। সকলেরই সম্পর্ক টাকার সঙ্গে। মুক্তিপদর জীবন টাকার গাঁটছড়ার শৃঙ্খলে আষ্টে পৃষ্ঠে বাঁধা।

তার ওপর আছে ফার্মের উন্নতি বিধানের প্রয়াস। সেখানে দরকার কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলা। তার জন্যে অনেক অফিসার আছে। তারা সবাই-ই মোটা মাইনে পায়। মুক্তিপদর নিজের কোনও অভিজ্ঞতা নেই ইস্পাত সম্বন্ধে, কিন্তু যারা ইস্পাত তৈরির কারিগর, তাদের কেমন করে চালাতে হয়—সেটা জানেন মুক্তিপদ। আর সেই

জানাটাই আসল জানা। সে-ব্যাপারে মুক্তিপদ অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

সেদিন শ্রীপতি মিশ্র এলেন।

আগে থেকে খবর দিয়েই এসেছিলেন। সঙ্গে ছিল গোপাল। মুক্তিপদ ব্যস্ত হয়ে উঠলেন মিনিস্টারকে দেখে।

মিস্টার মিশ্র বললেন—আপনার কাছে এলাম একটা বিশেষ কাজে। জানি না কতটা সাহায্য পাবো—

মুক্তিপদ বললেন—সে কী? আমি কি আগে কখনও আপনাদের সাহায্য করিনি? যখন যা করতে বলেছেন তাই-ই তো আমি করেছি।

তারপর গোপাল হাজরার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন—ইনি কে?

মিস্টার মিশ্র বললেন—ইনি আমার পি-এ, মিস্টার গোপাল হাজরা।

গোপাল হাজরা নমস্কার করলে, মুক্তিপদ হাত জোড় করে নমস্কার করলেন। গোপাল বললে—আপনার ভাইপো মিস্টার সৌম্য মুখার্জী আমার বন্ধু—

শ্রীপতিবাবু বললেন—আপনি তো জানেন সামনে আমাদের জেনারেল ইলেকশান আসছে, আর আমাদের ভলান্টিয়াররা সবাই হাঁ করে আমাদের মুখের দিকে চেয়ে বসে আছে। পার্টি-ফান্ডের অবস্থাও খুব ভালো নয়। জানেন তো কত বড় একটা ফ্লাড্ গেল। সেন্টার থেকেও আমরা যতটা হেলপ পাবার আশা করেছিলাম তা পাইনি।

মুক্তিপদ বললেন—কত টাকা আপনার চাই তাই-ই বলুন না, আমি তো হেলপ্ করবার জন্যে তৈরি—

শ্রীপতিবাবু বললেন—না, সব ব্যাপারটা আপনাকে বুঝিয়ে না বললে আপনি ঠিক বুঝতে পারবেন না। এতদিন যারা আমাদের কাজ করে এসেছে তাদের সবাইকে আমরা এখনও কোনও এমপ্লয়মেন্ট্ দিতে পারিনি। তার ওপর হাজার হাজার লোক বাঙলাদেশ থেকে রোজ বর্ডার পেরিয়ে ওয়েস্টবেঙ্গলে আসছে তাদের নিয়ে মহা সমস্যায় পড়েছি—

মুক্তিপদ বললেন—একটু বসুন, আমি আসছি—

বলে যা আগে কখনও করেননি তাই-ই করলেন। পাশের ঘরে অ্যাকাউনটেন্ট নাগরাজনের কাছে গেলেন। নাগরাজন ম্যানেজিং ডাইরেক্টারকে দেখে অবাক হয়ে গেল।

জিজ্ঞেস করলে—কী স্যার, আপনি?

মুক্তিপদ বললেন—ওই স্কাউন্ড্রেলটা আবার এসেছে—

—কে? কে স্কাউন্ড্রেল?

—ওই বাস্টার্ড শ্রীপতি মিশ্রটা। ব্যাটা তিন বার ম্যাট্রিক ফেল করে মিনিস্টার হয়েছে বলে যেন একেবারে আমার মাথা কিনে নিয়েছে।

মুক্তিপদ তখন রাগে একেবারে থর থর করে কাঁপছেন। বললেন—আমাদের রেজিস্টারটা একবার দেখ তো, আগে কত টাকা ওদের পার্টিকে দেওয়া হয়েছে?

নাগরাজন পুরনো খাতা-পত্র দেখে বললে—এই তো লেখা রয়েছে স্যার। তিন লাখ সত্তর হাজার টাকার এন্ট্রি রয়েছে—

—কোন্ তারিখে?

—গেল আগস্টের তিরিশ তারিখে।

মুক্তিপদ বললেন—এরই মধ্যে আবার পার্টি-ফণ্ডের চাঁদা চাইতে এল। এত বড় হারামজাদা। কেন যে লোকে এদের ভোট দেয় তা বুঝি না—

নাগরাজন বললে—স্যার, আপনি মাথা গরম করবেন না। মাথা গরম করলে ওদের তো কোনও ক্ষতি হবে না। মাঝখান থেকে শুধু আপনারই ব্লাড্-প্রেশার বেড়ে যাবে।

মুক্তিপদ বললেন—তুমি ঠিক বলেছ নাগরাজন। কিন্তু কী করি বলো তো! যাকে ভোট দেব সেই-ই যদি এই রকম স্কাউণ্ড্রেল হয় তাহলে আমরা ফ্যাক্টরি চালাবো কী করে? যাক্ গে—যা হবার তা হবে--

নাগরাজন জিজ্ঞেস করলে—কত লিখবো স্যার?

মুক্তিপদ বললে—এবার এক লাখই দাও—ক্রস্ কোর না—

চেক লেখা হয়ে গেলেই সেটা নিয়ে মুক্তিপদ নিজের চেম্বারে এসে শ্রীপতিবাবুর হাতে দিলেন।

শ্রীপতিবাবু চেকের ওপরকার অঙ্কটা দেখে মনে মনে অখুশী হলেন খুব। কিন্তু কিছু বললেন না। চেয়ার ছেড়ে সোজা উঠে দাঁড়ালেন। বললেন—আসি, আমার আবার একটা জরুরী কাজ আছে—

গোপালও উঠে পেছন পেছন বাইরে গেল।

শ্রীপতিবাবু গাড়িতে উঠেই বললেন—দেখেছ গোপাল, তোমার বন্ধুর কোম্পানীর মালিক কত বড় একটা স্কাউণ্ড্রেল।

গোপাল জিজ্ঞেস করলে—কত দিলে স্যার?

-মাত্র এক লাখ! আমি নিজে এলুম, তবু বেশি দিলে না। একটু চক্ষুলজ্জাও নেই এই ক্যাপিট্যালিস্ট্‌দের।

তারপর একটু থেমে জিজ্ঞেস করলেন—স্যাকস্‌বীতে ইউনিয়ন ক'টা গোপাল?

—তিনটে স্যার—

শ্রীপতিবাবু বললেন—একটা লেবার ট্রাবল্ করিয়ে দিতে পারো না?

গোপাল বললে—খুব পারি স্যার, আপনি বললেই সব করিয়ে দিতে পারি। আপনি একবার হুকুম দিয়েই দেখুন না, করতে পারি কি না?

শ্রীপতিবাবু বললেন—তুমি তাই করিয়ে দাও গোপাল। তা না হলে এরা শায়েস্তা হবে না—

গোপাল বললে—ঠিক আছে স্যার—

শ্রীপতিবাবু বললেন—আর একটা কথা, আর কেউ সার্টিফিকেট নিতে আসছে না তো? বাঙলাদেশ থেকে লোক আসা কি বন্ধ হয়ে গেল নাকি?

গোপাল বললে—কে বললে স্যার বন্ধ হয়ে গেল? আমি স্যার এ-ক'দিন এ-দিকটা দেখতে গিয়ে ও-দিকটায় বেশি নজর দিতে পারিনি।

শ্রীপতিবাবু বললেন—এখন সার্টিফিকেটের রেটটা একটু বাড়িয়ে দাও—। এখন সব জিনিসের দাম বাড়ছে, আর আমার সার্টিফিকেটের দাম তিরিশ টাকা থাকবে—এটা ঠিক নয়। এখন থেকে ওর রেট করে দাও পঞ্চাশ টাকা। যারা তিরিশ টাকা দিতে পারে তারা পঞ্চাশ টাকাও দিতে পারবে। ওই সার্টিফিকেটটা

পেলে তারা র‍্যাশন্ কার্ড পাবে, এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে নাম রেজিস্ট্রি করতে পারবে। ভোটারদের লিস্টে নামও ওঠাতে পারবে। ওতে ওদের কম সুবিধে। আর ইলেকশানের সময়ে ওরা আমাদেরই ভোট দেবে—। তাই ও-দিকটায় তুমি নজর রাখবে—

ততক্ষণে গাড়িটা রাইটার্স বিল্ডিং-এর সামনে এসে গিয়েছিল। শ্রীপতিবাবু নামতেই চার পাঁচজন পুলিশ লম্বা করে সেলাম ঠুকলে। গোপালকে নিয়ে গাড়িটা উল্টোদিক দিয়ে বড় রাস্তার ওপরে গিয়ে পড়লো। শ্রীপতিবাবুর পি-এর অনেক কাজ। শুধু যে পার্টির চাঁদা আদায় করা কাজ, তাই-ই নয়। হাজারটা লোকের সঙ্গে দেখা করা, কথা বলা ছাড়াও রাস্তের কাজটাও কম জরুরী নয়। তখন সে রাস্তার মোড়ের মাথায় পুলিশদের হাতে টাকা দিয়ে বেড়ায়। আবার কখনও কখনও নাইটক্লাবেও গিয়ে ঢু মারে। বিচিত্র লোক গোপাল হাজরা। তা না হলে আণ্টি মেমসাহেবের সঙ্গে তার আলাপ-পরিচয়ই বা হলো কী করে?

রাস্তায় গাড়িতে যেতে যেতে এক জায়গায় গিয়ে গাড়িটা থামাতে বললে গোপাল।

অন্য দিকের ফুটপাথের ওপর দিয়ে সন্দীপ আপন মনে হাঁটতে হাঁটতে যাচ্ছিল। তাকেই ডাকলে গোপাল। চিৎকার করে বললে—এই সন্দীপ এই সন্দীপ—এই—

গোপালকে দেখেই সামনে এগিয়ে এল সন্দীপ। গোপাল বললে—কীরে, কোথায় যাচ্ছিস?

সন্দীপ বললে—কলেজে—

—আয়, গাড়িতে এসে ওঠ্—

সন্দীপ গাড়িতে উঠতেই গাড়ি আবার চলতে লাগলো।

গোপাল জিজ্ঞেস করলে—কেমন আছিস?

—ভালো, তুই?

গোপাল বললে—আজকে তো তোর বাবুদের অফিসে গিয়েছিলুম রে। এই এখন সেখান থেকেই তো আসছি—

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—কী করতে গিয়েছিলি?

গোপাল বললে—আমার মিনিস্টারকে নিয়ে গিয়েছিলুম—

—কে মিনিস্টার?

—যার কথা বলেছিলুম তোকে। সেই শ্রীপতি মিশ্র। পার্টি-ফান্ডের চাঁদা চেয়ে নিয়ে এলুম।

—কীসের পার্টি-ফান্ড!

গোপাল বললে—সে তুই ছেলেমানুষ, বুঝবি না। যাক্ গে, তোর কী খবর, বল্? সেই রাসেল স্ট্রীটে আর গিয়েছিলি? সেই আণ্টি মেমসাহেব কেমন আছে? এখনও তার চাকরি আছে?

সন্দীপ বললে—আছে, কিন্তু আর বেশিদিন চাকরি থাকবে না ভাই। বিশাখার বিয়ে হয়ে যাচ্ছে—

গোপাল বললে—বিশাখা? বিশাখা কে?

—আরে মনে নেই? সেই যে সৌম্যবাবুর সঙ্গে যার বিয়ে হওয়ার কথা। সেই

বিয়ে তো এবার হচ্ছে—

গোপাল বললে—বিয়ে হচ্ছে ? ওই লম্পটটার সঙ্গে ? সব্বোনাশ করেছে।

সন্দীপ বললে—কেন ? তার সঙ্গে তো বিয়ে হওয়ার কথা আগে থেকেই পাকা হয়ে ছিল—

গোপাল বললে—মেয়েটার কপালে অনেক দুঃখ আছে রে—

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—কেন ?

—কেন জানিস না ? তুই সেই চৌরঙ্গীর নাইট-ক্লাবে গিয়ে নিজের চোখেই তো সব দেখেছিস ! তবে দেখবি বিয়ের পরে মেয়েটা ঠিক শেষকালে সুইসাইড্ করবে, এই আমি বলে দিচ্ছি—মেয়েটা নির্ঘাৎ আত্মহত্যা করবে, দেখে নিস—

গোপালের দিকে চেয়ে সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—কেন ?

গোপাল বললে—সুন্দরী মেয়েরা জীবনে কখনও সুখী হয় না রে, এটা জেনে রাখিস—

—কেন ?

—এটা ভগবানের এক অভিশাপ। জানিস না, মেয়েলি ছড়ায় আছে—অতি চতুর না পায় ভাত, অতি সুন্দরী না পায় ভাতার—

কথাটা শুনে সন্দীপের মুখ দিয়ে অনেকক্ষণ কোনও কথা বেরোল না। তারপর বললে—কিন্তু ঠাকমা-মণির গুরুদেব যে বিশাখার কোষ্ঠী দেখে বলেছেন এ মেয়ে সুখী হবে। এর সঙ্গে বিয়ে হলে সৌম্যবাবুরও ভালো হবে—

গোপাল বললে—ও-সব কুষ্ঠি-ফুষ্ঠির কথা রাখ্ তুই। ও-সব স্রেফ্ বুজরুকি। তুই দেখ্ না শেষ পর্যন্ত কী হয়।

—শেষ পর্যন্ত কী হবে ? বিয়ে হবে না ?

গোপাল বললে—বিয়ে হোক আর না-হোক, সেটা বড় কথা নয়। ওদের কোম্পানীটাই শেষ পর্যন্ত থাকে কি না তাই দেখ্ আগে।

—কোম্পানীটা থাকবে না মানে ?

গোপাল বললে—সে অনেক কাণ্ড। পরে তুই সব দেখতে পাবি সব জানতে পারবি—

—এখনই বল্ না তুই। তুই-ই তো ছোটবাবুকে নিয়ে রাসেল স্ট্রীটে গিয়েছিলি। ছোটবাবুকে নিয়ে পাত্রীকে দেখিয়েও এনেছিলি। তা পাত্রী পছন্দ হয়েছে ছোটবাবুর ?

—পছন্দ হবে না মানে ? কী বলছিস তুই ? অমন আগুনের ফুলকির মত মেয়ে, ওকে কার না পছন্দ হবে ? এখন ওই বিশাখাকে দেখবার জন্যে ছোটবাবু তো কেবল ছুঁক-ছুঁক করছে। দেখবি আবার একদিন ছোটবাবু একলাই ওই মেয়ের টানে রাসেল স্ট্রীটের বাড়িতে গিয়ে হাজির হবে !

সন্দীপ কথাটা শুনে চুপ করে রইল। তার এ-সব কথার মধ্যে থাকা উচিতও নয়। থাকা ন্যায়সঙ্গতও নয়। সে সামান্য একজন গরিবের ছেলে, পরের বাড়ির অন্নদাস। পরের হুকুম পালন করতেই সে এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছে। এর বাইরে কোনও ব্যাপারে আগ্রহ থাকা তার পক্ষে তো অপরাধ।

গোপাল হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে—কীরে, কী ভাবছিস ?

সন্দীপ বললে—কিছু না—

গোপাল বললে—কোনও পার্টি'র মেম্বার-টেম্বার হয়েছিস তুই ?

সন্দীপ বললে—না।

—সে কীরে ? এখনও কোনও পার্টি'র মেম্বার হোস্‌নি ? তাহলে তো তোর ফিউচার একেবারে ডার্ক। তাহলে তুই চাকরি পাবি কী করে ?

সন্দীপ বললে—আমাদের ল' ক্লাসের একটা ছেলে আছে, সেও আমাকে ওই কথা বলেছে—সেও বলছিল কোনও পার্টি'র মেম্বার না হলে নাকি এ-যুগে চাকরি পাওয়া যাবে না।

—ঠিক কথাই তো বলেছে। যে-কোনও পার্টি'র মেম্বার হলেই হলো। তবে যদি কখনও কোনও পার্টি'র মেম্বার হোস্ তো শাঁসালো পার্টি দেখে হবি, যাতে নিজের আখের গুছিয়ে নিতে পারিস—

সন্দীপ বললে—কিন্তু আমি তো চাকরি করবো না—

—চাকরি করবি না তো কী করবি ?

—হাইকোর্টে' ল' প্র্যাকটিশ করবো—

—তাতে টাকা হবে তোর ?

সন্দীপ বললে—তা জানি না। বেড়াপোতার কাশীবাবু বলেছেন আমাকে তিনি তাঁর জুনিয়ার করে নেবেন।

গোপাল বললে—সেখানেও পার্টি-মেম্বার হতে হবে তোকে। কাশীবাবু কোন্ পার্টি'র লোক ?

সন্দীপ বললে—তা জানি না।

গোপাল বললে—হাইকোর্টে'ও খুব পার্টি'বাজি চলে রে। তা যাক্ গে, তুই যা ভালো বুঝবি তাই করবি, আমি আর কী বলবো। তবে একটা কথা তোকে বলে রাখছি, এখন থেকে তোর কাজ-কর্ম সব গুছিয়ে নে, তোদের বিডন স্ট্রীটের মুখুজ্জেদের আর বেশি দিন নয়—

—বেশি দিন নয়, মানে ?

গোপাল বললে—সেই কথায় আছে না, অতি বাড় বেড়ো না ঝড়ে উড়ে যাবে, ওদেরও তাই হবে ! অত বাবুআনি, অত বিলেত-টিলেত ঘোরা, অত নাইট-ক্লাবে যাওয়া, ও সব কি চিরদিন চলে রে ? চিরদিন চলে না। তাই আগে থেকে তোকে সাবধান করে দিচ্ছি—সময় থাকতে থাকতে নিজের আখের গুছিয়ে নে—

সন্দীপ ভয় পেয়ে গেল গোপালের কথা শুনে। জিজ্ঞেস করলে—তার মানে ? আমাকে ও-বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে ? বাড়ি ছেড়ে দিতে হলে আমি যাবো কোথায় ? আর শুধু তো আমি নয় ! আমার মত আরো অনেক গরিব মানুষ-জন আছে, তারাই বা কোথায় যাবে ? আর আমাদের বেড়াপোতার প্রকাশ-কাকাও তো আছেন। তাঁর কী হবে ?

গোপাল বললে—তাদের কথা তোকে ভাবতে হবে না, তুই তোর নিজের কথা ভাব। আপনি বাঁচলে বাপের নাম।

—কিন্তু কী হবেটা কী ? কী হতে পারে ? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না ! ওদের এত টাকা, ওদের এত বড় ব্যবসা, বিলেত আমেরিকা জড়িয়ে এত বড়

কারবার, সব নষ্ট হয়ে যাবে ? তা হলে বিশাখার কী হবে ? ও-বাড়িটার অবস্থা যদি খারাপ হয়ে যায় তাহলে ছোটবাবু আর বিশাখা কী করবে ? ওদের খরচ-খরচা তাহলে চলবে কী করে ?

ততক্ষণে গাড়িটা কলেজের কাছাকাছি এসে গেছে।

গোপাল বললে—তুই তো এখানে নামবি, এই তো তোর কলেজ—

সন্দীপ তখনও নড়লো না সেখান থেকে। বললে—সত্যি বল্ না, ওদের কী সর্বোনাশ হবে ?

গোপাল বললে—আরে, এ তো দেখছি মহা মুশকিল হলো আমার ! ওদের সর্বোনাশ হলে তোর কী ক্ষতি ? তুই ওদের জন্যে অত ভাবছিস্ কেন ? তুই ওদের কে ? তোর সঙ্গে ওদের ভালো মন্দের কী সম্পর্ক ? তুই সময় থাকতে থাকতে নিজের কাজ গুছিয়ে নে না—

সন্দীপ তখনও নড়লো না। রাস্তায় নেমে যেমন দাঁড়িয়ে ছিল, তেমনিই দাঁড়িয়ে রইল। মুখটাও তার তখনও অন্ধকার হয়ে রইল। বললে—সত্যিই ভাই, ওদের জন্যে আমার খুব ভয় লাগছে—

গোপাল বললে—তোর ভয় হবার কারণটা কী ?

সন্দীপ বললে—ওদের যদি সর্বোনাশ হয় তা হলে কী হবে ?

—কী আবার হবে, সর্বোনাশ হলে হবে। তাতে তো তোর কোনও ক্ষতি হচ্ছে না—

সন্দীপ বললে—কিন্তু মাসিমার যে নিজের বলতে কেউ নেই। বিশাখার সর্বোনাশ হলে মাসিমা কার কাছে গিয়ে দাঁড়াবে ?

গোপাল বললে—তোর সঙ্গে রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বক্-বক্ করবার সময় নেই আমার, আমি যাই—

বলে ড্রাইভারকে গাড়ি চালাতে বলে দিলে। আর সঙ্গে সঙ্গে গোপালের গাড়িটাও সন্দীপের চোখের সামনে থেকে সামনের দিকে চলতে চলতে কখন দূরে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। কিন্তু সন্দীপ তখনও পাথরের মত স্থির হয়ে সেই জায়গাতেই ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। তার চোখের সামনে তখন বিশাখার শীর্ণ দীর্ণ একখানা কঙ্কালসার নিষ্প্রাণ চেহারা যেন বাতাসের তাড়নায় একবার এদিকে একবার ওদিকে দুলতে লাগলো।

সেসব দিনের কথা ভাবলে সন্দীপের এখন হাসিই পায়। সত্যিই, কত ছেলেমানুষ যে সে ছিল তখন ! মনে আছে তখন সে কিছুই বুঝতো না। কিন্তু তবু সে কী করে যেন বুঝে গিয়েছিল যে যারা পার্টিতে থাকে তাদের নিজেদের কোনও স্বাধীন সত্তা থাকে না। সে আরো এইটে বুঝেছিল যে সব পার্টির লীডাররাই চায় যে তাদের দলের মেম্বাররা যেন কখনও স্বাধীনভাবে চিন্তা না

করে। যারা সকলের তালে তাল দিয়ে চলতে পারে তারাই এ-পৃথিবীতে যত সব সুবিধেগুলো ভোগ করে। তারা জীবনে তেমন কিছু কষ্ট পায় না। তারাই কোনও না কোনও পার্টি'র খাতায় তাদের নাম লিখিয়ে নিশ্চিন্ত হয়!

কিন্তু ভবিষ্যৎ পৃথিবীর কেউই কি তাদের মনে রাখে?

মনে রাখে তাদেরই যারা সকলের তালে তাল না দিয়ে নিজের পথ ধরে চলে। তাদের জন্যেই পৃথিবী কয়েক ধাপ এগিয়ে যায়। আর সেই তারাই উত্তরসূরীদের পথ দেখায় চিরকাল ধরে।

কিন্তু নিজেদের স্বাধীন চিন্তার জন্যে তাদের কষ্টের আর শেষ থাকে না কোনও দিন। তাদের কষ্ট তাদের যন্ত্রণা তাদের আত্মাহুতিই শেষ পর্যন্ত ইতিহাস হয়ে যায়। তারাই অমর হয়ে বেঁচে থাকে ইতিহাসের পাতায়।

কিন্তু এরা ছাড়াও আরো তো একদল লোক থাকে যারা কোন দলে তো থাকেই না, আবার কোনও দলের বাইরে থাকলেও তারা কারো কাছে কোনও সহানুভূতি স্নেহ-ভালবাসা মায়া বা মমতাও পায় না। তার ওপর কালের ইতিহাসের পাতাতেও তাদের বড় স্থানাভাব হয়।

এদের অবস্থাই সবচেয়ে শোচনীয়। এই যারা কোন দলে থাকে না।

সন্দীপ লাহিড়ীও এদের শ্রেণীর একটি শোচনীয় উদাহরণ। তার নিজের দোষেই সে গোপাল হাজরাও হতে পারেনি, কিংবা সুশীল সরকারও হতে পারেনি; আর সৌম্য মুখার্জী হওয়া তো আরো দূরের কথা! সে এই আমাদের কোনও শ্রেণীতেই একজন কেষ্ট বিষ্টুও হতে পারেনি। মাত্র একটা ব্যাঙ্কের একটা সামান্য শাখার সামান্য একজন ম্যানেজার হয়েই জীবন কাটিয়েছে। এর জন্যে কে দায়ী? সে নিজে না বিশাখা, কে?

সেদিন সকালে রাসেল স্ট্রীটের বাড়িতে অন্য দিনের মতই যথারীতি বিশাখা স্কুলে গিয়েছিল।

রোজকার মত শৈল তার সকালবেলার জলখাবার করে দিয়েছে। যোগমায়া তার আগেই ঘুম থেকে উঠে স্নান সেরে সমস্ত কিছু যোগাড় করে রেখে দিয়েছিল। কোন্ ব্লাউজ আর কোন্ শাড়ি সে পরবে, কোন্ জুতো সে পরবে, তাও যোগমায়া রোজ সামনে সাজিয়ে রেখে দেয়, এ বহুকালের নিয়ম যোগমায়ার। আর শুধু কি তাই? মেয়েকে সাজিয়ে গুছিয়ে স্কুলে পাঠাবার জন্যে যত রকম বিলাসিতার উপকরণ বাজারে কিনতে পাওয়া যায় তার সব ব্যবস্থাও ঠাকমা-মণি করে দিয়েছে।

তারপর মেয়েকে ডেকেছে—ওরে, ওঠ্‌, ওঠ্‌—দেরি হয়ে যাবে—ওঠ্‌ মা, ওঠ্‌—

সেই অত বড় ধাড়ি মেয়েকে ঘুম থেকে উঠিয়ে তখন আবার স্নান করার জন্য গরম জলের ব্যবস্থা করেছে। তারপর আছে খাওয়ার পাট। আর খওয়াটাও ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী। যোগমায়া তার বাপের জন্মেও অমন খাওয়ার আয়োজন দেখেনি। কর্ন-ফ্লেকস্ কিংবা ওটস্-পরিজ দিয়ে ব্রেকফাস্ট আরম্ভ। তার সঙ্গে কোয়ার্টার বয়েলড্ দুটো অণ্ডাফ্রাই, তার সঙ্গে কিছু ফ্রুটস্। তাতে কোনও দিন কলা, কোনও দিন আঙুর কি বেদানা। তার সঙ্গে টোস্ট আর বাটার। কিংবা কখনও কখনও বাটারের বদলে জ্যাম বা জেলি। আর তারপর বড় কাপের এক কাপ দুধ। চা একেবারে নয়।

তা খেতে কি চায় মেয়ে! বিশাখার পছন্দ লুচির সঙ্গে কিছু ভাজা। কিন্তু সে-সব খাবার ডাক্তারের ডায়েট্ তালিকায় নেই। ওটা নাকি অত ভাল নয়। ইচ্ছে হলে দুটো টোস্টের বদলে চারটে টোস্ট খাও, কিন্তু কখনও ও সব খেয়ো না। কারণ আজকাল ঘি বা তেল কোন জিনিষটাই খাঁটি নয়। টোস্টের মধ্যে ওসব ভেজাল দেওয়ার উপায় নেই।

এর পরে নিচে গাড়ি নিয়ে এসে হাজির হবে ড্রাইভার। গাড়ির আসার খবরটা ওপরে এসে দারোয়ান জানিয়ে দিয়ে যাবে। ড্রাইভার অরবিন্দ। বুড়ো মানুষ। ঠাকমা-মণি ছোকরা ড্রাইভার পাঠান না। ড্রাইভার বুড়ো মানুষ হলে নিরাপদ। সে বিশাখাকে স্কুলে পৌঁছিয়ে দিয়ে স্কুলের বাইরে গাড়ি নিয়ে বসে থাকবে। আবার ছুটির পর বিশাখাকে নিয়ে বাড়িতে পৌঁছিয়ে দিয়ে চলে যাবে। এই তার রোজকার ডিউটি।

স্কুলের ছুটির পর বিশাখা বাড়িতে এসে ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে মা'র কোলে শুয়ে পড়বে। তখন এক গ্লাস ডাবের জল খেতে হয়। তারপর আসবে আণ্টি মেমসাহেব ইংরেজী পড়াতে। আণ্টি মেমসাহেব পড়িয়ে চলে যাবার পর দুপুরের খাওয়া। এই দুপুরের খাওয়ারও একটা ডায়েট্-মেনু করে দিয়েছে ডাক্তার। সেই মেনু ছাড়া অন্য কোনও খাওয়া চলবে না।

তারপরে একটু ন্যাপ্। মানে তন্দ্রা। ভাত-ঘুম। ওটা মাস্ট।

তারপরে আসবে জয়ন্তী দিদিমণি। বাংলা পড়াবে, অঙ্ক কষাবে, হিস্ট্রী পড়াবে। আরো যা যা সিলেবাসে আছে তাই পড়াবে। এ ছাড়া সপ্তাহে একদিন নাচ শেখানোর মাস্টারনী আসবে। আর রবিবার দুপুর বেলা ওয়ার্ক-এডুকেশন। তখন বিশাখাকে নিজের হাতে ছবি আঁকতে হয়।

তারপর সন্ধ্যের আগে লাইট্ রিফ্রেশ্‌মেণ্ট্। হালকা জলযোগ।

আর তারপর?

তারপর আর কোনও কাজ নেই। তখন গল্প করো। রেডিও শোন কিংবা কেউ বেড়াতে এলো তো তার সঙ্গে গল্প করো।

তারপর রাত আটটায় ডিনার। সেই ডিনারেরও চার্ট আছে। কোন্‌টা খেলে ফ্যাট্ হবে না, কোন্‌টা খেলে কোলেস্টরল হবে না, কোন্‌টা খেলে সুগার হবে না—অথচ কোন্‌টা খেলে শরীরে শক্তি বাড়বে, আর সঙ্গে সঙ্গে ব্রেনও ভালো থাকবে, তারই নিখুঁত ব্যবস্থা।

সেদিনও যথারীতি ব্রেকফাস্ট খেয়ে বিশাখা স্কুলে গেছে। অরবিন্দ রোজকার মত সেদিনও ঠিক সময়ে এসে বিশাখাকে যথাস্থানে নিয়ে গেছে। তার অন্য সব ব্যবস্থাও করে রেখেছেন যোগমায়া। শৈল বাজার করে আনবার সময় রোজকার মত একটা ডাবও কিনে এনে ফ্রিজের মধ্যে রেখে দিয়েছিল।

কিন্তু দশটা বাজলো, এগারোটা বাজলো, তখনও বিশাখা ফিরলো না।

কী হলো আজ? বিশাখা এখনও স্কুল থেকে ফিরলো না কেন?

শৈলও এসে জিজ্ঞেস করলে—খুকুদিদি তো এখনও এলো না মা—

যোগমায়াও সেই কথা ভাবছিল। বললে—আমিও তো তাই ভাবছি—

তারপর বললে—একবার দারোয়ানকে জিজ্ঞেস করে এসো তো অরবিন্দ এসেছে

কিনা—

না, দারোয়ানও বললে—সে গাড়ি তখনও ফিরে আসেনি—

—তাহলে কী হবে ? আগে তো কখনও এমন হয়নি—

কী হবে কে জানে ! যোগমায়ার মনে বড় ভয় হতে লাগলো। গেল কোথায় বিশাখা ?

তারপর বেলা আরো বাড়লো, আণ্টি মেমসাহেব এসে সব শুনতে পেলে !

বললে—তাহলে আমি কতক্ষণ অপেক্ষা করবো ?

তাও তো বটে ! সে তো এক জায়গাতেই কাজ করে না। তাকে আরো দশটা বাড়িতে গিয়ে ইংরিজী শেখাতে হয়। এখানে বসে-বসে আর কতক্ষণ সে তার সময় নষ্ট করবে ? সকলেরই তো সময়ের দাম আছে। সুতরাং······

সুতরাং আণ্টি মেমসাহেব চলে গেল।

যোগমায়ার খাওয়াও হলো না। মেয়ে বাড়িতে এল না আর মা নিজে খেয়ে নেবে, এটা কী করে সম্ভব। আর যোগমায়া যখন খেলে না, শৈলই বা খেয়ে নেয় কী করে ?

যোগমায়া শৈলকে বললে—তুমি খেয়ে নাও বাছা, তুমি কেন মিছিমিছি উপোস করে থাকবে ? খেয়ে নাও তুমি—

কিন্তু শৈল খেলে না।

সমস্ত বাড়িটা একেবারে খাঁ-খাঁ করতে লাগলো। বেলা করে আসে জয়ন্তী দিদিমণি। সেও এসে সব শুনে অবাক হয়ে গেল। জিজ্ঞেস করল—পুলিশে খবর দিয়েছেন ?

যোগমায়া তখন কাঁদতে শুরু করেছে। বললে—কে খবর দেবে মা ? আমার তো লোকজন কেউ নেই—

জয়ন্তী বললে—কেন, সেই যে সন্দীপবাবু আসতেন, তাকে একবার খবর দিন না—

যোগমায়া বললে—সেও তো আজকে সারাদিন আসেনি। অন্যদিন তো সকালবেলার দিকেই এসে যায়—

—তা আপনাদের বিডন স্ট্রীটের বাড়িতে একবার টেলিফোন করে না-হয় খবরটা জানিয়ে দিন—এ-রকম চুপ করে বসে থাকা তো ঠিক নয়—

যোগমায়া বললে—তা তো বুঝলুম মা, কিন্তু কে টেলিফোন করে। আর এ-বাড়িতে তো আমাদের টেলিফোনও নেই—

জয়ন্তী বললে—কিন্তু ও-বাড়িতে তো একটা খবর দেওয়া উচিত। তাদের বউ তারাই তো খোঁজ-খবর করবে। আর তাদের খোঁজ-খবর করবার মত লোকেরও তো অভাব নেই—

জয়ন্তী আর কতক্ষণই বা ছাত্রীর জন্যে অপেক্ষা করবে। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও যখন তার ছাত্রী এল না তখন উঠলো। বললে—তাহলে এখন আমি আসি মাসিমা—আবার কাল আসবো—

এ ছাড়া আর কী-ই বা তাদের করবার আছে। যোগমায়া বললে—হ্যাঁ, মা, তুমি আর মিছিমিছি বসে থেকে কী করবে তুমি এসো—

যোগমায়া তেতলার ঘর থেকে রাসেল স্ট্রীটের দিকে চেয়ে দেখলে। রাস্তা দিয়ে অনেক লোক অনেক গাড়ি চলেছে। কেউ যাচ্ছে উত্তর দিকে, কেউ দক্ষিণ দিকে। অথচ কোনও গাড়িই তাদের তিন নম্বর বাড়িটার সামনে থামছে না।

হঠাৎ নিচের দারোয়ান ওপরে এসে ডাকলে—মাইজী—

যোগমায়া দৌড়ে এসে বললে—কী দরোয়ান ?

দরোয়ান বললে—ড্রাইভার এসেছে মাইজী—এই যে—

ড্রাইভারের মুখটা তখন শুকিয়ে গেছে। যোগমায়া বললে—কী হলো বাবা, আমার মেয়ে কই ? আমার সমস্ত দিন নাওয়া নেই খাওয়া নেই। তোমার পথ চেয়ে বসে আছি—কী হয়েছিল তোমার ?

অরবিন্দ অপরাধীর মত ভঙ্গি করে বললে—মা, আমারও তো খাওয়া হয়নি, আমি তো সারাদিন গাড়ি নিয়ে ইস্কুলের সামনে বসেছিলুম—

—কেন ? আমার মেয়ের ইস্কুলের ছুটি হয়নি ?

—হ্যাঁ, হয়েছে মা, ইস্কুলের ছুটির পর খুকু দিদিমণি আমার গাড়ির দিকে আসছিল, হঠাৎ ছোট হুজুর এসে গেল।

—ছোট হুজুর ? ছোট হুজুর কে ? তোমাদের সৌম্যবাবু ?

অরবিন্দ বললে—হ্যাঁ মা, ছোট হুজুর খুকু দিদিমণিকে নিয়ে তাঁর নিজের গাড়িতে তুললে, তারপর আমাকে সেখানে গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে বললে, আমি তাই সেখানেই এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলুম—

যোগমায়া বললে—তা আমার মেয়ে এখন কোথায় ?

অরবিন্দ বললে—তা তো জানি না মা—আমি এতক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করে করে যখন দেখলুম যে খুকু দিদিমণি আর ফিরছে না তখন এখানে চলে এলুম। সারাদিন আমার কোনও কাজই হয়নি। নাওয়া হয়নি, খাওয়া হয়নি, কিছুই হয়নি আমার—

যোগমায়া এ-কথার পর আর কী বলবে বুঝতে পারলে না। তবু বললে—তা হঠাৎ তোমার ছোট হুজুর ইস্কুলে আসতে গেলেনই বা কেন ?

—তা কী করে জানবো মা ? আমরা তো ছোট হুজুরের চাকর। তিনি কিছু বললে আমরা কি 'না' বলতে পারি, বলুন ?

যোগমায়া বললে—তা তো বটেই বাবা, তোমরাই বা তার কী করবে ?

তারপর আবার বললে—কিন্তু আমি তো মেয়ের মা, আমার তো ভাবনা হয় বাবা। তোমারও তো বাড়িতে বউ-ছেলে-মেয়ে আছে। তুমি তো আমার মনের কষ্ট বুঝতে পারো। তুমিই বলো, এখন এই অবস্থায় আমি কী করি ! আমি মা হয়ে চুপ করে বসে থাকতে পারি ?

অরবিন্দ আর কী বলবে !

যোগমায়া বললে—তুমি তো এখন ও-বাড়িতে যাচ্ছো, তুমি একবার সন্দীপবাবুকে এই খবরটা গিয়ে দিয়ে আসতে পারবে ? দেখা করে বলে দিও যেন আমার এখানে একবার সে আসে ! সে ছাড়া আমার তো নিজের বলতে এখানে আর কেউ নেই—

হঠাৎ পেছন থেকে তপেশ গাঙ্গুলী এসে পৌঁছুলেন।

—এ কী বউদি, কী ব্যাপার ? এখানে দাঁড়িয়ে যে ? এরা কারা ?

যোগমায়া বললে- তুমি এসেছ ? ভালোই হয়েছে। এই হচ্ছে আমার এ-বাড়ির দারোয়ান, আর এ হচ্ছে অরবিন্দ, আমার মেয়ের গাড়ির ড্রাইভার—

তপেশ গাঙ্গুলী ওদের দিকে চেয়ে বললেন – এরা কী চায় ?

যোগমায়া বললে আমার ভীষণ বিপদ হয়েছে ঠাকুরপো, তোমাকে একটা কাজ করতে হবে। আমাদের ওই বিডন স্ট্রীটের বাড়িতে একটা খবর দিতে হবে। বলতে হবে যে বিশাখা সকালবেলা ইস্কুলে গিয়েছিল, এখনো পর্যন্ত সে বাড়ি ফেরেনি।

—কেন, ফেরেনি কেন ? কারো সঙ্গে পালালো নাকি বিশাখা ?

যোগমায়া বললে—ওই তো ড্রাইভার দাঁড়িয়ে আছে, ওকেই জিজ্ঞেস করো না তুমি। ও বলছে সকালবেলা নাকি ও-বাড়ির ছোটবাবু ইস্কুলে এসে বিশাখাকে নিয়ে কোথায় চলে গেছে, তারপর······

—ছোটবাবু কে ?

—ওই যে যার সঙ্গে আমার বিশাখার বিয়ে হবে।

তপেশ গাঙ্গুলী চমকে উঠলো--সে কী ! বিয়ে হওয়ায় আগেই কনেকে নিয়ে বর পালিয়ে গেল ? এখন কী হবে ?

যোগমায়া বললে—আমিও তো তাই ভাবছি। জানো, সারাদিন আমাদের খাওয়া হয়নি। আমিও খাইনি, আর শৈলও খায়নি। বিশাখা না খেয়ে রইল আমরা কী করে খাই, বলো ! তুমি এলে, তবু একটু বাঁচলুম। সব তো শুনলে, এখন কী করি তাই বলো তো ?

তপেশ গাঙ্গুলী বললেন—পুলিশে খবর দিয়েছ ?

যোগমায়া বললে—পুলিশে খবর দেওয়া কি ভালো হবে ?

—কেন ? ভালো হবে না ? তোমার মেয়ের তো এখনও বিয়ে হয়নি। বিয়ে হওয়ার আগেই যদি জামাই তোমার মেয়েকে নিয়ে পালায় তাহলে তো কিডন্যাপিং এর চার্জে তোমার জামাই-এর জেলও হয়ে যেতে পারে। আমার জানা ভালো উকিল আছে, তুমি যদি বলো তাহলে সেই উকিলের কাছে তোমাকে নিয়ে যেতে পারি, যাবে ? তুমি যাবে ?

যোগমায়া বললে—না ঠাকুরপো, আমার জামাই তো ড্রাইভারকে জানিয়ে শুনিয়েই নিয়ে গেছে ! লুকিয়ে চুরিয়ে তো আর নিয়ে যায়নি। আমার তো মনে হয় এ-ব্যাপারটা পুলিশকে না জানানোই ভালো—

তপেশ গাঙ্গুলী বললেন—কিন্তু তুমি বুঝতে পারছো না বউদি ! আমি এ-রকম কেস অনেক দেখেছি। ধরো তোমার মেয়ে কাল কি পরশু বাড়ি ফিরে এল। তখন যদি তোমার জামাই তোমার মেয়েকে বিয়ে করতে রাজি না হয়, তখন ? তখন যদি তোমার জামাই বলে যে তোমার মেয়ে ক্যারেক্টারলেস, সেই গ্রাউণ্ডে যদি বিয়ে না করে ?

দেওরের কথা শুনে যোগমায়া ভয়ে দুর্ভাবনায় থর থর করে কাঁপতে লাগলো।

তপেশ গাঙ্গুলী আবার বলতে লাগলেন—ভগবান না করুন, যদি তেমন ঘটনা ঘটে, তখন তুমি কী করবে ? তুমি একলা বিধবা মানুষ, আমিও কাছে নেই, নিজের বলতে এক আমি ছাড়া তো তোমার পৃথিবীতে আর কেউ নেই, তখন ? তখনকার

কথা একবার ভাবো ?

যোগমায়া কী বলবে বুঝতে পারলে না।

তপেশ গাঙ্গুলী আবার বলতে লাগলেন—এই জন্যেই তো বলি বউদি যে বড়োর পীরিত বালির বাঁধ ! তুমি তখন বড়লোকের ছেলের সঙ্গে বিয়ে হবে শুনে দু হাত তুলে একেবারে ধেই-ধেই করে নেচে উঠলে ! গট্‌গট্ করে গাড়ি চড়ে আমার বাড়ি ছেড়ে চলে এলে। আমি কিছুছু বলিনি। বুঝলে বউদি ? আমি তখন ভাবছিলাম—দেখি কোথাকার জল কোথায় গড়ায়। আমি জানতুম একদিন এই-ই হবে।

অরবিন্দ আর দারোয়ান তখনও দরজার বাইরে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। এতক্ষণে তপেশ গাঙ্গুলীর খেয়াল গেল সেদিকে। বললেন—তোমরা এখানে আর দাঁড়িয়ে আছো কেন ভাই ? তোমরা কী শুনছো ? তোমরা নিজের নিজের কাজে যাও না। আমরা দেওর-ভাজে কথা বলছি। তার মধ্যে তোমরা কেন নাক গলাচ্ছো ভাই ? তোমাদের এমন স্বভাব তো ভালো নয়- - ।

এ কথার পর দরোয়ান আর অরবিন্দ দু'জনেই নিচেয় নেমে গেল।

তপেশ গাঙ্গুলী দরজায় খিল লাগিয়ে দিলে। বললে—দেখলে তো বউদি, দেখলে তো ? এদের আক্কেলখানা একবার দেখলে তো ? আমরা দু'জনে প্রাইভেট কথা বলছি, আর ওরা কিনা দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সেই কথা শুনে মজা মারছে।

যোগমায়া বললে—ওদের কথা তুমি ছেড়ে দাও ঠাকুরপো, ওরা চাকর-বাকর মানুষ, ওদের কথা শুনিয়ে লাভ কী ?

তপেশ গাঙ্গুলীও সে কথায় সায় দিয়ে বললেন—ঠিক বলেছ তুমি বউদি, ঠিক বলেছ, এই না হলে আমার বউদি তুমি ! কিন্তু তুমিই বলো তো, আমি কি অন্যায্য কথা বলেছি ? ওরা বড়লোক হতে পারে, কিন্তু আমরাও কি ভিখিরি ? বড়লোক জামাই বলে কি তার সাতখুন মাফ ?

যোগমায়া তখনও বিশাখার কথা ভেবে অস্থির হচ্ছিল। বললে তুমি একটু চুপ করো ঠাকুরপো, আমার মাথায় এখন কোনও কথা ঢুকছে না। আজ পর্যন্ত কখনও তো বিশাখা দেরি করে না ! আমি কি করবো তা বুঝতে পারছি না—

তপেশ গাঙ্গুলী বলে উঠলেন—তুমি একটু ধৈর্য ধরো বউদি, আমি এখখুনি থানায় গিয়ে পুলিশের কাছে তোমার জামাই-এর নামে ডায়েরী করে আসছি—

যোগমায়া তাকে নিরস্ত করলে। বললে—না ঠাকুরপো, আমায় একটু ভাবতে সময় দাও। আমার মাথা ঘুরছে। পোড়ারমুখী যে আমাকে এমন করে জ্বালাবে তা যদি আমি আগে জানতে পারতুম তো আমি ওকে আঁতুড় ঘরেই গলা টিপে মেরে ফেলতুম। আর...

যোগমায়ার কথা শেষ হওয়ার আগেই দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হলো !

—কে ?

দরজা খুলতেই দেখা গেল সন্দীপ। সন্দীপের হাসি-হাসি মুখ। বললে—মাসিমা, একটা সুখবর আছে। সৌম্যবাবুর সঙ্গে বিশাখার বিয়ে হবে। সব পাকা হয়ে গেছে। কাশীর গুরুদেবের কাছে সরকারমশাই আজ চিঠি লিখেছেন, তার সঙ্গে পাঁচশো টাকা প্রণামীও পাঠিয়ে দিয়েছেন মানি-অর্ডার করে—

যোগমায়া যেন কথাটা বিশ্বাস করতে পারলে না। জিজ্ঞেস করলে—বিয়ে হবে? কবে?

সন্দীপ বললে—এখনও দিন-ক্ষণ স্থির হয়নি। গুরুদেব যে-তারিখ যে-সময় লিখে দেবেন, সেই তারিখেই বিয়ে হবে।

কথাটা শুনে তপেশ গাঙ্গুলীর মুখটা শুকিয়ে যেন আমসি হয়ে গেল!

জিজ্ঞেস করলেন—সত্যিই বিয়ে হবে, না গুল্ দিচ্ছ ভায়া?

কথাটা সন্দীপের ভালো লাগলো না। জিজ্ঞেস করলে— ও—কথা কেন বলছেন?

তপেশ গাঙ্গুলী বললেন—ভাই, অনেক বড়লোক আমার দেখা আছে কিনা। সব ব্যাটা মুখে বারফট্টাই করে। কাজের বেলায় কাজি, কাজ ফুরোলেই পাজি। আমি তখনই বউদিকে বলেছিলাম, বউদি বড়লোকের কথায় ভুলো না, বউদি তো তখন গরীবের কথা শুনলে না, এখন তাই পস্তাচ্ছে—

সন্দীপ বললে—মুখুজ্যে-বাড়ির কর্তারা সে-রকম বড়লোক নয় তপেশবাবু, এরা কথা দিয়ে কথা রাখে। আপনি মিছিমিছি ভয় পাচ্ছেন। বিয়ে এখানে হবেই—

—হলে তো ভালোই ভায়া। আমি কি চাই না যে বিশাখার বিয়ে এখানে না হয়? আমি তো বিশাখার কাকা, বিশাখার গুরুজন। এখন এদিকে কী হয়েছে শুনেছ?

—কী?

—তোমাদের ছোটবাবু তো সকালবেলা বিশাখাকে নিয়ে বেপাত্তা!

সন্দীপ আকাশ থেকে পড়লো। বললে—তার মানে?

তপেশ গাঙ্গুলী বললেন—তার মানে আমার এই বউদিকেই তুমি জিজ্ঞেস করো। বিশাখা সেই সকাল বেলা ইস্কুলে গেছে এখনও সে বাড়িতে ফেরেনি—

—সে কী?

তপেশ গাঙ্গুলী বললেন—তুমি অমন অবাক হচ্ছো কেন ভায়া?

সন্দীপ বললে—তাতে আপনার অত আনন্দ হচ্ছে কেন বলুন তো? বড়লোকের বাড়িতে আপনার ভাইঝির বিয়ে হচ্ছে বলে আপনার মনে কি খুব কষ্ট হচ্ছে?

তপেশ গাঙ্গুলী বললেন—ঠিক আছে, আমার সম্বন্ধে যদি তোমার এই ধারণাই হয় তাহলে আমি চলে যাচ্ছি। তবে এও বলে যাচ্ছি, এর শেষ দেখে যাবো তবে আমি মরবো। তার আগে নয়—

বলে আর দাঁড়ালেন না। সেইদিনই প্রথম তপেশ গাঙ্গুলী না-খেয়ে মো-টাকা নিয়ে প্রথম এ-বাড়ি থেকে বাইরে চলে গেলেন।

যোগমায়া বললে—কেন তুমি আমার দেওরকে ও-সব কথা বলতে গেলে বাবা? হাজার হোক আমারই দেওর তো ও। ওকে চটিয়ে দিয়ে কি ভালো হলো?

সন্দীপ বললে—আপনার ভয় কী? আমি তো আছি। আপনি আমার নিজের মায়ের মত। আমি যদি দুবেলা দুমুঠো খেতে পাই তো আপনি আর বিশাখাও উপোস করে থাকবেন না। আমি এই আপনাকে বলে রাখলুম—

যোগমায়ার চোখ দুটো জলে ভরে এল। অচেনা মানুষের কাছ থেকে এমন নিঃস্বার্থ ভালোবাসা যোগমায়া জীবনে কখনও পায়নি। অথচ এও তো অকারণ। যোগমায়াকে খুশী করে সন্দীপের কী লাভ?

তারপর নিজেকে একটু সামলে নিয়ে যোগমায়া বললে—যাক গে ও-সব কথা, এখন কী করি তাই বলো তো বাবা, এখন বিশাখাকে কোথায় খুঁজে পাব? কে বিশাখাকে খুঁজে আনবে?

সন্দীপ বললে—কিন্তু যে-ড্রাইভার বিশাখাকে নিয়ে রোজ স্কুলে যায়, সে কোথায়?

যোগমায়া বললে—সে-ই তো একটু আগে খবর দিয়ে গেল যে আমার জামাই নাকি নিজে ইস্কুলে গিয়ে বিশাখাকে নিয়ে কোথায় চলে গিয়েছে।

সন্দীপ অবাক হয়ে গেল শুনে। বললে—সৌম্যবাবু? সৌম্যবাবু বিশাখাকে নিয়ে চলে গিয়েছেন?

যোগমায়া বললে—গাড়ির ড্রাইভার অরবিন্দ তো এখন তাই-ই বলে গেল—

তারপর একটু থেমে আবার বললে—এখন কী করি বলো তো বাবা? বিয়ের আগে কি জামাই-এর এই মেলামেশা ভালো? আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না। তুমি আজকে ছিলে না তাই আমি সমস্ত ক্ষণ কেবল বিশাখার কথা ভেবেছি আর তোমার কথা ভেবেছি। ভেবে-ভেবে আমার মাথাটা ব্যথায় টন্-টন্ করছে তখন থেকে সারাদিন এক গেলাস জল পর্যন্ত পেটে পড়েনি—

সন্দীপ বললে—আপনি এখন একটু খেয়ে নিন, আপনি না-খেয়ে থাকলেই কি আপনার বিশাখা বাড়ি ফিরবে?

যোগমায়া বললে—তুমিও এই বলছো? মেয়ে সারাদিন না খেয়ে, বাড়ির বাইরে রইল আর আমি মা হয়ে ভাত গিলবো? আমার গলা দিয়ে কি ভাত নামবে? তুমি নিজে মেয়ের মা হলে কি তা করতে পারতে?

সন্দীপ বললে—দাঁড়ান, আমি একটু ভেবে দেখি কী করা যায়···

যোগমায়া বললে—এ-রকম হবে জানলে কি আমি আমার দেওরের বাড়ি ছেড়ে এখানে এসে উঠতুম? তুমি তো আমার দেওরকে দেখলে, আমার অবস্থা দেখে মুখে কেমন এক গাল হাসি বেরিয়েছে দেখতে পেলে না?

সন্দীপ বললে—তা ঘুঁটে পুড়লে গোবর তো হাসবেই মাসিমা, কিন্তু তপেশবাবু এখনও আমাকে জানেন না বলেই ওই কথা বলে গেলেন। তবে আমিও বলে রাখছি মাসিমা যে, যতক্ষণ না আমি এর শেষ দেখছি ততক্ষণ জীবনপাত করে লড়াই করে যাবো। বিশাখার কোনও ক্ষতি হলে মনে করবো সেটা আমারই ক্ষতি। বিশাখার ভালো হলে মনে করবো আমারই ভালো, বিশাখার মন্দ হলে মনে করবো আমারই মন্দ—এই আজকে আপনার কাছে আমি বলে রাখলাম—

সন্দীপের কথায় যোগমায়া আনন্দে চোখের জল আর চাপতে পারলে না। বললে—তুমি এত বড় কথা আমাকে বললে, এ আমি যতদিন বাঁচবো ততদিন মনে রাখবো। কিন্তু একটা অনুরোধ আমি তোমাকে করি বাবা, আমাকে যেন আবার সেই দেওরের খিদিরপুরের বাড়িতে গিয়ে জা-এর খোঁটা না খেতে হয়। তাহলে আমি আর বাঁচবো না। আমি বড় মুখ করে এখানে চলে এসেছিলুম, ভগবান যেন আমার সে মুখ রাখেন, এর চেয়ে বড় কামনা আর আমার নেই—

সন্দীপ বললে—আমি দেখি মাসিমা, কী করতে পারি—

বলে বাইরে চলে যাচ্ছিল। যোগমায়া বললে—কোথায় যাচ্ছো তুমি বাবা ?

—আমি জানি না কোথায় যাবো, কিন্তু হাত-পা গুটিয়ে এখানে বসে থাকলেও তো কোনও লাভ নেই। একটা-না-একটা কিছু ব্যবস্থা করেই আমি আবার আসছি—

সন্দীপ চলে যাওয়ার পর যোগমায়া দরজা বন্ধ করে দিয়ে আবার পুব দিকের জানলায় এসে দাঁড়ালো। এখান থেকে রাসেল স্ট্রীটটা স্পষ্ট দেখা যায়। যোগমায়া দেখলো সন্দীপ বাড়ি থেকে বেরিয়ে সোজা উত্তরে পার্ক স্ট্রীটের দিকে চলতে লাগলো। যতক্ষণ না সে উত্তর দিকের জনারণ্যে হারিয়ে গেল ততক্ষণ একদৃষ্টে তার দিকে চেয়ে রইল যোগমায়া। তখনই মনে হলো বিশাখা তার মেয়ে না হয়ে যদি ছেলে হতো তাহলে কি তার আজ এত ভাবনা হতো ! ভগবান যোগমায়াকে মেয়ে না দিয়ে একটা ছেলে দিলেন না কেন ? কেন বিশাখা তার মেয়ে হয়ে জন্মালো ?

বিডন স্ট্রীটের বাড়িতে ঠাকমা-মণি বিকেল থেকেই বিন্দুর কাছে জানতে চাইছিলেন খোকা বাড়ি এসেছে কিনা। খোকাকে তাঁর বড় দরকার। লণ্ডন অফিসের কমললাল মারা গেছে। খবরটা জেনে পর্যন্ত ঠাকমা-মণির মনে বড় কষ্ট হচ্ছিল। আহা, এমন করে যে সে হঠাৎ চলে যাবে তা ঠাকমা-মণি ভাবতেও পারেননি। বহুকাল আগে ঠাকমা-মণি যখন লণ্ডনে গিয়েছিলেন তখন সেখানেই ছেলেটিকে দেখেছিলেন তিনি। সে তখন সবে চাকরিতে ঢুকেছে। সেই দিন থেকেই তার ওপর তাঁর মায়া পড়ে গিয়েছিল।

মনে আছে, ইণ্ডিয়াতে এসে ঠাকমা-মণি কমললালকে এদেশের আমসত্ত্ব আর বড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। খেয়ে কমললালের খুব ভালো লেগেছিল। সে-কথা সে একটা লম্বা চিঠিতে লিখেও পাঠিয়েছিল।

বিন্দুকে ঠাকমা-মণি বললেন—ওরে, ও-বাড়িতে মুক্তিকে একবার টেলিফোন কর তো—

ঠাকমা-মণি সাধারণত নিজের হাতে কখনও টেলিফোন করেন না—বিশেষ করে মুক্তির বাড়িতে। মুক্তির বাড়িতে যদি বউমা টেলিফোন ধরে তো তার সঙ্গে কথা বলতে হবে। তিনি বউমার সঙ্গে পারতপক্ষে কথা বলতে চান না। এক কথায় বউমার মুখও দেখতে চান না তিনি। বলেন—ওই বউ মাগীটার জন্যেই মুক্তি আমার পর হয়ে গেল।

বিন্দু বললে—মেজবাবু বাড়িতে নেই ঠাকমা-মণি

ঠাকমা-মণি জিজ্ঞেস করলেন—কে ধরেছিল রে তোর টেলিফোন ?

—আপনার বউমা।

—ঠিক আছে, এবার মুক্তির আপিসে টেলিফোন করে দ্যাখ—

সেখানকার নম্বরও বিন্দুর জানা। না, মেজবাবু আপিসেও নেই।

ঠাকুমা-মণি বললেন—তাহলে বেলুড়ে ফ্যাক্টরিতে টেলিফোন কর—

শেষ পর্যন্ত ফ্যাক্টরিতে তাঁকে পাওয়া গেল। ঠাকুমা-মণি এবার টেলিফোন ধরলেন। বললেন—কে রে? মুক্তি?

ওধার থেকে মুক্তিপদ বললেন—হ্যাঁ মা, আমি মুক্তি। কিছু বলবে?

ঠাকুমা-মণি বললেন—হ্যাঁরে, সৌম্য এখন বাড়ি এল না কেন রে? সে কি এখনও অফিসে রয়েছে?

মুক্তিপদ বললেন—সৌম্য তো আজ অফিসে আসেনি। কেন মা?

ঠাকুমা-মণি বললেন—তাকে খুঁজছিলুম। অন্যদিন তো সে এতক্ষণে বাড়ি এসে যায়। আমি শুনলুম সে এখনও বাড়ি আসেনি। তা সে অফিসে যায়নি কেন? বাড়ি থেকে তো সে ঠিক সময়েই বেরিয়েছিল। অফিসে যায়নি তো সে কোথায় গেল?

মনে হলো মুক্তি যেন মা'র টেলিফোন পেয়ে খুব বিরক্ত হয়েছেন। বললেন, তোমার নাতি কোথায় গেল তা তোমার নাতিই জানে! আমি তা কী করে জানবো? সে কি আমাকে বলে গেছে কোথায় সে যাবে?

এধার থেকে ঠাকুমা-মণি চেঁচিয়ে উঠলেন—তা তোর হয়েছে কী বল্ তো? অত রেগে রেগে কথা বলছিস কেন? কাকে অত রাগ দেখাচ্ছিস?

মুক্তিপদ বললেন—আমার এখানে খুব ট্রাবল চলছে—

—কীসের ট্রাবল?

—আবার কীসের ট্রাবল; লেবার ট্রাবল! একটা ইউনিয়ন স্ট্রাইকের ভয় দেখাচ্ছে—

ঠাকুমা-মণি রেগে গেলেন। বললেন—তোর ফ্যাক্টরিতে লেবার ট্রাবল হচ্ছে তো আমাকে চোখ রাঙাচ্ছিস্ কেন? আমাকে চোখ রাঙালে কি তোর লেবার ট্রাবল মিটবে? ঠিক আছে, আমি ছাড়ছি—

মুক্তিপদ চেঁচিয়ে উঠলেন। বললেন—মা, শোন শোন, মা—

কিন্তু ততক্ষণে এদিক থেকে ঠাকুমা-মণি লাইন ছেড়ে দিয়েছেন। মুক্তিপদও হতাশ হয়ে রিসিভারটা রেখে দিলেন। তারপর ঘর থেকে বেরোলেন। মিটিং-এর টেবিল থেকে টেলিফোন ধরতে এ-ঘরে চলে এসেছিলেন মুক্তিপদ, আবার পাশের ঘরে গিয়ে বসলেন। তখনও বাইরে থেকে সমবেত কোরাসের ধ্বনি আসছে—ইনক্লাব জিন্দাবাদ। মুক্তিপদ মুখার্জী মুর্দাবাদ, মুর্দাবাদ·····

ওয়েলফেয়ার অফিসার ভার্গব খুব কড়া স্বভাবের লোক। এই বছর ধরে যখনই কোম্পানিতে শ্রমিক অসন্তোষ হয়েছে তখনই ভার্গবের চেষ্টায় তা মিটে গেছে। লণ্ডন অফিসের যেমন কমললাল মেটা ছিল, এই কারখানারও তেমনি আছে যশোবন্ত ভার্গব। শুধু ওয়েলফেয়ার অফিসার ভার্গবই নয়, ওয়ার্কস্ ম্যানেজার কান্তি চ্যাটার্জীও অনেক কাজের লোক।

মুক্তিপদ বললেন—এইবার যে-কথা হচ্ছিল, আমি তো বরাবর অন্য জায়গার চেয়ে বেশি বোনাস দিয়ে আসছি। তবু ওরা এই স্ট্রাইক নোটিশ দিয়েছে কেন?

কান্তি চ্যাটার্জী বললে—বাজারে সব জিনিসের প্রাইস্ লেভেল বেড়ে গেছে,

'তাই এবার ওদের বোনাসের পার্সেন্টেজও বাড়াতে হবে—

মুক্তিপদ বললেন—বোনাসের পার্সেন্টেজ বাড়াতে বললেই কি বাড়াতে হবে? এ কি মামার বাড়ি যে ওরা যা আবদার করবে তাই-ই দিতে হবে?

চ্যাটার্জী বললে—ওদের ইউনিয়ন আমাকে যা বলেছে তা-ই আমি আপনাকে বললুম স্যার—

মুক্তিপদ বললেন—ঠিক আছে, আমিও দেখে নিতে চাই ওদের কতদূর দৌড়—

চ্যাটার্জী বললে—আপনি একবার ঘোষালের সঙ্গে দেখা করবেন স্যার?

মুক্তিপদ বললেন—যদি সে দেখা করতে চায় তো আমার কোনও আপত্তি নেই—

ঘোষাল। ঘোষাল পাকা সমাজসেবী। অন্তত সে নিজে সবাইকে তাই বলে। সমাজ সেবার জন্যে সে যে কত স্বার্থ-ত্যাগ করেছে তা দেশের সবাই জানে। অনেক বড় বড় অফিসের অনেক বড় বড় ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট সে। অফিসের কর্মচারীদের মঙ্গল কামনায় সে জীবন-যৌবন বলি দিয়েছে। বরদা ঘোষালকে শুধু 'ঘোষাল' বললেই একডাকে সবাই চিনে নেবে। বাঙলা খবরের কাগজে নানা কারণে তার নাম ছাপা হয়ে থাকে। সেই সুবাদে সে একজন বিখ্যাত লোকও বটে। রীতিমত মান্য-গণ্য।

এ হেন লোককে অশ্রদ্ধা করবে এমন লোক কলকাতার শিল্পপতি সমাজে নেই বললেই চলে।

কলকাতার বঞ্চিত-শোষিত-পীড়িত শ্রমিক সমাজ তাদের দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণা দূর করবার জন্যেই ঘোষালকে তাদের নেতা বলে মেনে নিয়েছে। ঘোষাল সেই শোষিত শ্রমিক সমাজের নিয়ামক এবং ত্রাণকর্তা দুই-ই। তাকে খবর দিলেই যে সে আসবে তত সময় তার নেই। তার স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যে শ্রমিকরা তাকে বাড়ি দিয়েছে, গাড়ি দিয়েছে, টেলিফোন দিয়েছে, টেলিভিশন দিয়েছে, ভিডিও দিয়েছে।

আশ্চর্য, অত যে কাজের লোক ঘোষাল, সেও দয়া করে ফ্যাক্টরিতে আসতে রাজি হলো। যদি শ্রমিক সমাজের কিছু উপকার হয় তো তার জন্যে ঘোষাল সব কিছু দিতে প্রস্তুত।

ঘোষাল আসবার সঙ্গে সঙ্গে বাইরে শ্রমিক-ভাইদের স্লোগান ছোঁড়া বন্ধ হলো। ঘরের মধ্যে তখন কান্তি চ্যাটার্জী, যশোবন্ত ভার্গব, নাগরাজন, মুক্তিপদ সবাই আছেন।

ঘোষাল ঘরে ঢুকতে ঢুকতেই সকলের দিকেই তার সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলে। হাসিমুখ। এক মুখ পান।

একটা চেয়ারে বসে বললে—কী সব গোলমাল হচ্ছে শুনেছি আপনাদের এখানে—

ওয়াকস্ ম্যানেজার চ্যাটার্জী বললে—সবই তো আপনি জানেন—

ঘোষাল বললে—আমার তো শুধু একটা ইউনিয়ন নিয়ে থাকলে চলবে না। আমার এইটেই মুশকিল হয়েছে, আমি নিজে যেদিকে না দেখবো সেই দিকই বানচাল হয়ে যাবে—

মুক্তিপদ বললেন—আমাদের এটা তো কলকাতার সবচেয়ে পুরনো ফার্ম, আমরা

তো সকলের চেয়ে বেশি বোনাসই দিই, তবু ওরা বারবার আমাদের এখানেই বেশি গোলমাল করে!

ঘোষাল হো-হো করে অমায়িক হাসি হাসলো। বললে—মিস্টার মুখার্জী, সেইটেই তো নিয়ম। বড় গাছেই তো ঝড় ঝাপটা বেশি লাগে। বড় হওয়ার তো এই-ই দোষ—

মুক্তিপদ বললেন—আপনারা বেঙ্গলে আর বড়দের থাকতে দিচ্ছেন কই? বড়রা যারা ছিল সব তো অন্য স্টেটে কারখানা সরিয়ে নিয়ে গেল, বাঙালী ছেলেদের তো আর বেঙ্গলে চাকরি হবে না—

ঘোষাল বললে—আমি তা জানি না ভাবছেন? আমি তো সব সময়ে এই কথাটাই ভাবি, ভাবি আমাদের বাঙালীদের কী হবে? বাঙালী ছেলেরা বাঙলা দেশেও চাকরি পাবে না বাঙলার বাইরেও চাকরি পাবে না, তা হলে তারা যাবে কোথায়?

ওয়ার্কস্ ম্যানেজার কান্তি চ্যাটার্জী বললে—আমাদের কথা একটু একটু ভাববেন স্যার! আমরাও তো মানুষ!

ঘোষাল বললে—জানেন, ও-ব্যাটাদের বুঝিয়ে বুঝিয়ে আমি আর পারি না। আমি তো ওদের তাই বলি—ওরে, যাদের আশ্রয়ে তোরা আছিস তাদের কথাও একটু ভাবিস। ওরা এত আহাম্মক যে কী বলবো। আহাম্মক না হলে ওরা ওইভাবে অভদ্র স্লোগান দেয়? এর নামই হলো সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়—

মুক্তিপদ বললেন—তা আপনি ওদের এই কথাগুলো বোঝাতে পারেন না?

ঘোষাল বললে—কী বলছেন আপনি? আপনি কি ভাবছেন আমি এ-কথা ওদের বলিনি?

মিস্টার ভার্গব বললে—তাহলে আমাকে ওরা চব্বিশ ঘণ্টা কেন ঘেরাও করে রেখেছিল? পুলিশকে খবর দেওয়া হয়েছিল, তবু কেন পুলিশ আসেনি—কে পুলিশকে আসতে বারণ করেছিল?

ঘোষাল বললে—তাই নাকি? পুলিশ আসেনি? আশ্চর্য তো! তাহলে দেশে কি গভর্মেণ্ট নেই? আমি তো আপনাদের কথা শুনে আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি! আপনারা কোম্পানি লক-আউট করে দিন। হ্যাঁ, লক-আউট করে দিন। যেখানে ওয়ার্কাররা ওপরওয়ালার কথা শোনে না, সেখানে কারখানায় লক-আউট করে দিলে ব্যাটারা ঠিক জব্দ হয়ে যাবে। আমি বলছি আপনারা কারখানা লক-আউট করে দিন। ব্যাটারা জব্দ হোক—

ততক্ষণ চা-কফি স্ন্যাকস্ এসে গিয়েছিল।

ঘোষাল বললে—আবার এ-সব করতে গেলেন কেন?

যশোবন্ত ভার্গব বললে—এ সামান্য জিনিস—একটু খানি নিন—

ঘোষাল বললে—এর আগে তিনবার চা হয়ে গেছে, আমি এবার উঠবো। আরো কয়েক জায়গায় আমাকে যেতে হবে।

মুক্তিপদ জিজ্ঞেস করলেন—তাহলে ওদের বোনাসের কী হবে?

ঘোষাল বলে উঠলো—ওই লাস্ট-ইয়ারে যে বোনাস দিয়েছেন এ-বছরেও তাই-ই দেবেন, এ কি মামার বাড়ির আবদার পেয়েছে নাকি যে যা চাইবে তাই-ই দিতে হবে। কিছুতেই বেশি দেবেন না—কিছুতেই না—এই আমি বলে রাখলুম—

বলে বরদা ঘোষাল তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নিচেয় নেমে গেল। নিচেয় তার গাড়ি অপেক্ষা করছিল। বরদা ঘোষাল গাড়িতে উঠতেই গাড়ি ছেড়ে দিলে। ঘোষাল বললে—চলো কলকাতা—

বরদা ঘোষালের চা-কফি-স্ন্যাকস্ সব পড়ে ছিল। একটা দানাও সে মুখে দেয়নি। ওয়ার্কস্ ম্যানেজার, ওয়েলফেয়ার অফিসার, চীফ্ অ্যাকাউন্টেন্ট, সবাই মুক্তিপদর মুখের দিকে চাইলে। কারোর মুখে কোনও কথা নেই।

হঠাৎ বাহিরে থেকে আবার কোরাস শুরু হলো—ইনক্লাব জিন্দাবাদ, মুক্তিপদ মুখার্জী—মুর্দাবাদ—মুর্দাবাদ—

ওদিকে বরদা ঘোষালের গাড়িটা তখন বেলুড় ছেড়ে হু-হু বেগে কলকাতার দিকে ছুটে চলেছে। অনেক কাজ বরদা ঘোষালের। সারা দেশের বঞ্চিত-শোষিত মানুষের ত্রাণকর্তা বরদা ঘোষাল। এতগুলো মানুষের ভালো-মন্দের দায়িত্ব যার মাথায় তার তো বিশ্রাম করা চলে না। দুঃখী লোকদের কথা ভেবে ভেবে তার কোনও রাত্তেই ঘুম আসে না। কিন্তু উপায় নেই। নিজের ভালো-মন্দের চেয়ে দুঃখী মানুষদের ভালো-মন্দের কথাই তাকে আগে ভাবতে হবে।

বরদা ঘোষালের গাড়ির পেট্রল খরচা দৈনিক পনেরো থেকে কুড়ি লিটার। তা হোক, টাকার কথা ভাবলে চলবে না। সকলের আগে মানুষ। মানুষ বাঁচলে তবে সমাজ বাঁচবে, সমাজ বাঁচলে তবে দেশ বাঁচবে। দেশ বাঁচলে তবে পৃথিবী বাঁচবে। তাই এই পৃথিবীর মানুষের দায়িত্ব নিয়েছে বরদা ঘোষাল। এই পেট্রল খরচের কথা ভাবলে বরদা ঘোষালের চলবে না। চলো, যতদূর ইচ্ছে চলো, তার গাড়ির পেট্রল যোগাবে মানুষ।

গাড়িটা গিয়ে যে-বাড়ির সামনে পৌঁছুলো তার সামনে দু'জন পুলিশ তখন পাহারা দিচ্ছে। রোজই যে একই পুলিশ পাহারা দেয়, তা নয়। তাদের ডিউটি বদলায়। একজোড়া পুলিশের বদলে আবার অন্য জোড়া পুলিশ ডিউটি দিতে আসে। তাতে অসুবিধে হবার কথা নয়। তাই বরদা ঘোষালের গাড়ি যখন বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালো তারা চ্যালেঞ্জ করলে না। তাকে স্যালিউট্ দিয়ে অভ্যর্থনা করলে।

ভেতরের ঘরে যেতেই আর একজন লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। প্রথমে চিনতে পারা যায়নি। তারপর বললে আরে গোপালবাবু না?

গোপাল হাজরাও দেখতে পেয়েছে এতক্ষণে।

—আরো আপনি? স্যার কোথায়?

গোপাল বললে—চলুন চলুন, ঠিক সময়েই এসে গেছেন। স্যার একলা আছেন—

এ-বাড়িটার দুটো মহল আছে। স্যার থাকেন বাইরের মহলে, ভেতরের মহলে তাঁর ফ্যামিলি, সামনের মহলে স্যার তখন একটা টেবিলের সামনে বসে টেলিফোনে কথা বলছিলেন।

বরদা ঘোষাল আর গোপাল হাজরা দুজনে গিয়ে সামনের দুটো খালি চেয়ারে বসে পড়লো।

স্যার তখনও কথা বলে চলেছেন—না না, ও-সব হিসেবের ব্যাপার আমি শুনতে

চাই না। টাকা দিলে কিনা তাই বলো—

তারপর একটু পরে বললে—এই যে বরদা এখন আমার সামনে বসে আছে, ওর সঙ্গে কথা বলো—

বলে রিসিভারটা বরদা ঘোষালের দিকে এগিয়ে দিলেন।

বরদা ঘোষাল বললে—হ্যাঁ, কী হলো? আমি তো আগেই বলেছিলুম, টাকা যদি দেয় তবে কথা বলতে পারি, টাকা দেবার নাম করে আগে থেকে কথা আদায় করে নেওয়ার চেষ্টা, এটা ভালো নয়। আমি আগে টাকা চাই, তারপর কথা—

তারপর একটু থেমে আবার বলতে লাগলো—কী বললে? ওই কথা বলছে? তাহলে বলে দিও 'স্যাক্সবী'র যে-অবস্থা করেছি, ওদেরও সেই অবস্থা করে ছেড়ে দেব। আমাদের সে-রকম পাওয়ার। এ হচ্ছে ওয়েস্ট-বেঙ্গল, এ বিহার নয়, এ কর্ণাটক নয়। এখানে আমরা ঘণ্টায়-ঘণ্টায় দল-বদল করি না। এখানে চালাকি করলে আমরা হরতাল ডেকে ছাড়বো। কী বললে? হরতাল ডাকলে গরিব লোকদের কষ্ট? হোক কষ্ট। গরিব লোকদের কবে কষ্ট হয়নি? কবে কষ্ট ছিল না? সেই হিন্দু আমলেও কষ্ট ছিল। মোগল আমলেও কষ্ট ছিল, ইংরেজ আমলেও কষ্ট ছিল। ওদের কষ্ট চিরকাল ছিল, চিরকালই থাকবে, তা বলে আগে পার্টির কথা ভাববো, না আগে গরিব লোকদের কথা ভাববো? রাখো তোমার সব বাজে কথা। ও-সব কথা আমার শোনবার সময় নেই এখন। আমি ছাড়ছি—

বলে বরদা ঘোষাল ঝপ করে রিসিভারটা রেখে দিল। তার মনের সব রাগটা ঘোষাল যেন টেলিফোনের ওপরেই ঝেড়ে ফেলে দিলে।

শ্রীপতি মিশ্র এতক্ষণ অপেক্ষা করছিলেন।

বললেন—কী হলো?

ঘোষাল বললে—দেখুন না, বলছে কিনা হরতাল ডাকলে ফেরিওয়ালা রিকশাওয়ালাদের কষ্ট হবে। দেখুন তো কী সব ইডিয়টদের মত কথা বলে?

শ্রীপতি মিশ্র বললেন—টাকার কথার ব্যাপারে কী বললে?

—বললে টাকা নেই।

—টাকা নেই? বললে ওই কথা? বলতে জিভটা একটু কাঁপলোও না। তাহলে শেষ পর্যন্ত আমাদের ইউনিয়ানের হেলপ্ নিতে হবে। স্ট্রাইক না-করালে দেখছি ওদের শিক্ষা হবে না—

ঘোষাল বললে—সেটা আমার ওপর ছেড়ে দিন স্যার—

—আর মুখার্জী'রা কী বললে?

বরদা ঘোষাল বললে—মুক্তিপদ মুখার্জী'রও ওই একই কথা। বললে আমরা ফ্যাক্টরি হায়দ্রাবাদে সরিয়ে নিয়ে যাবো। তবু বোনাস বাড়াবো না।

শ্রীপতি মিশ্র বললেন—ওরা কি ভেবেছে আমাদের পার্টি মরে গেছে।

বরদা ঘোষাল বললে—আমিও তাই ওদের বলে এলুম। বলে এলুম আমাদের পার্টি কি মরে গেছে? আমাদের হাতে গভর্নমেন্ট, আমরা যা ইচ্ছে তাই করবো। তাতে দিল্লীর কিছু বলবার নেই—

শ্রীপতি মিশ্র বললেন—ঠিক করেছ। আমিও দেখে নেব ওরা কী করে আমাদের বুকে বসে আমাদেরই দাড়ি ওপড়ায়। গোপাল—

গোপাল বললে—বলুন স্যার—

—তোমার মনে আছে তো, মুক্তিপদ সেদিন আমাদের সঙ্গে কী রকম ব্যবহার করলে। আমরা যেন ভিখিরি। পার্টি ফাণ্ডের চাঁদার জন্যে গিয়েছি, আমি নিজে সশরীরে গিয়েছি, তবু আমাকে মাত্র এক লাখ টাকা দিলে—। স্কাউণ্ড্রেলটার একবার লজ্জাও করলো না—তা ঠিক আছে। গোপাল, তোমাকে যা বলেছি তাই আরম্ভ করে দাও। তোমার বন্ধু বলে যেন আবার চক্ষুলজ্জা কোর না—

গোপাল বললে—কি বলছেন স্যার, আমি করবো চক্ষুলজ্জা ?

শ্রীপতিবাবু বললেন—না, আমাদের কাছে আগে আমাদের পার্টি, তারপর বন্ধুত্ব! শেষকালে যেন বন্ধুত্বের জন্যে পার্টির কাজে হেলা-ফেলা না হয়। তুমি তো শুনেছি আবার মুক্তিপদর ভাইপো'র সঙ্গে খুব ঘোরাফেরা করো। সেদিন যেন তাকে নিয়ে তুমি রাসেল স্ট্রীট না কোন্ স্ট্রীটে কাদের বাড়িতে গিয়েছিলে ?

গোপাল লজ্জায় পড়লো। বললে—না না, সে তিন নম্বর রাসেল স্ট্রীট। সেখানে মুক্তিপদ মুখার্জীর ভাইপো সৌম্যপদর সঙ্গে সে-বাড়ির একটা মেয়ের বিয়ে হবে, সে সেই মেয়েটাকে দেখতে গিয়েছিল, তাই······

—ওসব কৈফিয়ৎ তোমার দিতে হবে না গোপাল। কে তোমার কাছে কৈফিয়ৎ চাইছে ?

বরদা ঘোষাল এবার উঠলো। বললে—আমি উঠি স্যার আমাকে আবার আর একটা ক্লায়েণ্টের বাড়ি যেতে হবে—

গোপাল বললে—আমিও তাহলে উঠি স্যার—

ওদিকে শ্রীপতিবাবুর টেলিফোনের ঘণ্টা আবার বেজে উঠলো। শ্রীপতিবাবু রিসিভারটা তুলে বললেন—হ্যালো—

বেলুড়ের ফ্যাক্টরিতে তখন আর একটা লোক গাড়ি নিয়ে গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকলো। গেটের দরোয়ান দেখতে পেয়ে সেলাম ঠুকলো সাহেবকে।

দরোয়ানের ছেলেটা বাপের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। জিজ্ঞেস করলে—ও কৌন হ্যায় বাবুজী ?

দরোয়ান বললে—ও চ্যাটার্জী সাহাবকা ডেপুটি—অর্জুনবাবু

হ্যাঁ, অর্জুন সরকারের ওই-ই পরিচয়। সে ওয়ার্কস ম্যানেজার কান্তি চ্যাটার্জীর ডেপুটি। ডেপুটি ওয়ার্কস ম্যানেজার অর্জুন সরকার। সে শুধু কান্তি চ্যাটার্জীর ডেপুটিই নয়, মুক্তিপদ মুখার্জীর একজন বিশ্বস্ত সংবাদ-সংগ্রহকারীও বটে। কারখানার কে কোথায় কী করছে, কে কী কথা বলছে, কে কোন্ পার্টির লোক, সব খবর অর্জুন সরকারের নখদর্পণে। বরদা ঘোষাল বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সেও পেছন পেছন গাড়ি নিয়ে দূর থেকে তাকে অনুসরণ করেছিল।

মুক্তিপদ এতক্ষণ তার জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন। অর্জুন সরকার এসেই ম্যানেজিং ডাইরেক্টারের ঘরে ঢুকলো।

মুক্তিপদ জিজ্ঞেস করলেন—কী হলো ? গিয়েছিলে ?

অর্জুন সরকার বললে—হ্যাঁ স্যার—

—তারপর ?

—এখান থেকে বেরিয়ে বরদা ঘোষাল সোজা শ্রীপতি মিশ্রের বাড়িতে গেলেন।

এক ঘণ্টা সেই বাড়িতে থেকে তারপর বেরিয়ে এলেন গোপাল হাজরাকে নিয়ে।

মুক্তিপদ বললেন—বুঝতে পেরেছি! ওই শ্রীপতি মিশ্রই ঘোষালকে এখানে পাঠিয়েছিল। আচ্ছা, ঠিক আছে, তুমি যাও, পরে তোমাকে খবর দেব। ইতিমধ্যে যদি কোনও খবর পাও তো আমাকে জানিও—

অর্জুন চলে গেল। মুক্তিপদ মনে মনে ভাবতে লাগলেন। তাঁর প্ল্যানমত যদি কাজ হতো তা হলে এ-সব কোনও গণ্ডগোলই হতো না। সেই চ্যাটার্জীরা মিডল ইস্টে পাঁচশো কোটি টাকার কাজের কনট্রাক্ট পেয়েছিল, তাদের মেয়েটাও এম-এ পাস করেছিল। তার সঙ্গে সৌম্যর বিয়ে দিলে টাকার দিক থেকেও লাভ হতো, আবার লেবার ট্রাবলটাও থাকতো না। তাদের ছেলেটা একজন ট্রেড্‌ইউনিয়ন লীডার বলে সেদিক থেকেও মুক্তিপদ মুক্তি পেত। কিন্তু মার যেমন কাণ্ড! কোথা থেকে একটা বিধবার বাপ-মরা মেয়ের সঙ্গে সৌম্যর বিয়ের বন্দোবস্ত করে ফেলেছে--

বেলুড় থেকে আর মুক্তিপদ নিজের বাড়ি গেলেন না।

বললেন—একবার বিডন স্ট্রীটে চল্ রে—

বিডন স্ট্রীটের বাড়িতে মা তখন সবে সিংহবাহিনীর সন্ধ্যারতি সেরে ওপরে উঠছেন, হঠাৎ মুক্তিপদ এসে হাজির। ঠাকমা-মণি অবাক দেখে।

বললেন—কীরে, তুই? কী করতে?

—তোমার সঙ্গে একবার দেখা করতে এলুম।

—কী ব্যাপারে?

মুক্তিপদ বললেন—সৌম্যর বিয়ের ব্যাপারে।

ঠাকমা-মণি বললেন—সৌম্যর বিয়ে মানে?

মুক্তিপদ বললেন -তুমি যদি আমার চেনা পার্টির মেয়ের সঙ্গে সৌম্যর বিয়ে দাও তাহলে আমাদের কোম্পানির খুব সুবিধে হবে—

ঠাকমা-মণি বললেন—সে তো তুই আমাকে বলেছিস, আজ আবার সে-কথা পাড়ছিস কেন?

—পাড়ছি এই জন্যে যে আমাদের কোম্পানিতে আবার নতুন করে গোলমাল শুরু হয়েছে—

—কীসের গোলমাল?

মুক্তিপদ বললেন—আবার কীসের? বোনাস নিয়ে গোলমাল। আজকে লেবার-লীডার ঘোষাল আবার এসেছিল, মুখে আমাদের আশ্বাস দিয়ে গেল, কিন্তু ভেতরে-ভেতরে মিনিস্টারদের সঙ্গে স্ট্রাইক করবার মতলব আঁটছে। তাদের জ্বালায় আমি একেবারে নাজেহাল হয়ে গেলাম। আমি বোধহয় আর বাঁচবো না—

ঠাকমা-মণি বললেন—এ-সব তো চিরকাল ছিল, চিরকালই থাকবে। তোর বাবার আমলেও ছিল। তা বলে বাঁচবি না কেন? কারবার করতে গেলে এ সব ঝামেলা তো থাকবেই, তা বলে শরীর খারাপ করতে যাবি কেন? এ নিয়ে শরীর খারাপ করলে তো লেবারদেরই সুবিধে!

মুক্তিপদ বললেন--তোমার সঙ্গে এ-সব আলোচনা করতে চাই না। তুমি ঠিক বুঝবে না। সেকালের সঙ্গে এ-কালের কোনও তুলনা কোর না। এখন আমি

সৌম্যর বিয়ের কথা বলতেই এসেছি—

ঠাকমা-মণি বললেন—সৌম্যর বিয়ের কথা আবার নতুন করে কী বলবি ? সে-কথা তো আগেই পাকা হয়ে গেছে ।

মুক্তিপদ বললেন—তুমি কি তাদের একেবারে পাকা কথা দিয়ে দিয়েছ ?

ঠাকমা-মণি বললেন—তার মানে ? তুই তো জানিস নাত-বউ করবো বলে আমি তাদের তিন নম্বর রাসেল স্ট্রীটের বাড়িতে রেখে তাদের মা-মেয়েকে আমি পুষছি । তাদের জন্যে আমি মাসে মাসে হাজার-হাজার টাকা খরচ করছি, এখন কি তা বদলানো যায় ?

মুক্তিপদ বললেন—না, তা বলছি না, কিন্তু বলছি এদের এখানে বিয়ে না দিয়ে আমার পার্টির মেয়ের সঙ্গে সৌম্যর বিয়ে দিলে আমারও উপকার হতো তোমারও উপকার হতো—

—তা আমার কী উপকার হতো শুনি ?

মুক্তিপদ বললেন—তোমাকে তো আগেই আমি সব বলেছি মা । আমার ভালো আর তোমার ভালো কি আলাদা ? আমার ভালো হওয়া মানেই তো তোমার ভালো হওয়া আর তোমার ভালো হওয়া মানেই তো আমার ভালো হওয়া । তাতে আমাদের কোম্পানির আরো বেশি প্রফিট হতো, আর আমাদের এখন যে লেবার-ট্রাবল চলছে তাও চলতো না—

ঠাকমা-মণি বললেন—দ্যাখ্‌ মুক্তি, আমি বারবার এক-কথার লোক । একবার আমি যা বলি তার আর নড়-চড় করি না । তুই বলছিস্‌ তাই আমি শুনছি । কিন্তু এটা জেনে রাখ, আমি আমার মত আর পাল্টাবো না—আমি সে-রকম বাপের মেয়ে নই—

মুক্তিপদ এ-কথা শোনার পর অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন । তারপর উঠলেন । বললেন—তাহলে উঠি—

হঠাৎ বিন্দু দরজার বাইরে থেকে জানালে—ঠাকমা-মণি, খোকাবাবু বাড়ি এসেছেন—

—ওই খোকা এসেছে—

বলে বিন্দুকে ডেকে দিতে বললেন সৌম্যকে । মুক্তিপদ খবরটা শুনে আবার বসে পড়লেন ।

সৌম্য আসতেই বললেন—কী হলো, আজকে তুমি অফিসে যাওনি কেন ?

সৌম্য বললে—কেন আমি তো গিয়েছিলুম । তুমিই তো ছিলে না ।

—হ্যাঁ, অবশ্য আজকে আমি সমস্ত দিনই ফ্যাক্টরিতে ছিলুম । কিন্তু হেড-অফিসে আমি একবার টেলিফোনও করেছিলুম, কিন্তু তুমি যে অফিসে গিয়েছ তা তো আমাকে কেউ বলেনি—

সৌম্য বললে—আমি অফিস থেকে অন্য একটা কাজে বাইরে বেরিয়ে গিয়েছিলুম—

মুক্তিপদ বললেন—আজকে ফ্যাক্টরিতে খুব হাঙ্গামা করেছে আমার লেবাররা । সেই বরদা ঘোষাল এসেছিল, তাকেও সব বুঝিয়ে বললাম । কালকে ফ্যাক্টরিতে গেলে তুমি সব জানতে পারবে ।

তারপর প্রসঙ্গ বদলে মা'র দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন—মা, তাহলে সৌম্যর লণ্ডন যাওয়ার কী ঠিক করলে ?

ঠাকুমা-মণি বললেন—আমার গুরুদেবের চিঠি এলেই আমি সব ঠিক করবো। আর তোকে তো আমি বলেই রেখেছি সৌম্যর বিয়ে না দিয়ে ওকে বিলেতে পাঠাবো না—

কথাটা শুনে মুক্তিপদ যেন একটু নিরাশ হলেন! উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—থাক্, তুমি যা ভালো বুঝবে তাই করবে, ও ব্যাপারে আমার আর কিছু বলবার নেই—

তারপর যাওয়ার সময় সৌম্যর দিকে চেয়ে বললেন—কাল ফ্যাক্টরিতে যেও একবার—

বলে আর দাঁড়ালেন না মুক্তিপদ।

একেবারে তিনতলার সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে নেমে একতলায় পৌঁছুলেন। তারপর একতলার বাঁদিকে সিংহবাহিনীর মন্দির। সেখানে তখন সন্ধ্যারতির আয়োজন চলছে। সেদিকে না চেয়ে দেখে বাইরে যাওয়ার রাস্তাটা ধরে সোজা নিজের গাড়িতে গিয়ে উঠলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে গাড়িটা মুক্তিপদ মুখার্জীকে নিয়ে সোজা বেলুড়ের দিকে চললো।

বিডন স্ট্রীটের বাড়িতে যখন এই দৃশ্য তখন রাসেল স্ট্রীটের বাড়িতে আর এক দৃশ্যের অবতারণা চলছে। যোগমায়া সারাদিন খায়নি। আর যোগমায়া যখন সারাদিন উপোষ করে আছে তখন শৈলই বা খায় কী করে ?

হঠাৎ দরজায় কড়া নাড়ার শব্দে যোগমায়া তাড়াতাড়ি গিয়ে দরজা খুলে দিলে।

সন্দীপ ঘরে ঢুকে বললে—বিশাখা এসেছে ?

—না বাবা, এখনও তো আসেনি।

সন্দীপ বললে—ও-বাড়িতে খুব হৈ-হৈ হচ্ছে দেখে এলুম আবার। মুক্তিপদবাবু এসেছিলেন আজ ঠাকুমা-মণির কাছে। ওদের ফ্যাক্টরিতে আজ খুব গোলমাল হয়েছে। তারপরে সৌম্যবাবু এসে হাজির হলেন—

—তা ও-বাড়িতে তোমার সৌম্যবাবু ফিরে এল, তাহলে আমার বিশাখা ফিরলো না কেন এখনও? দু'জনে তো একসঙ্গেই বেরিয়েছিল। একজন যখন ফিরলো তখন আর একজন কোথায় গেল ? বিশাখাও তো এখন বাড়ি ফিরবে—। কী জানি বাবা কী হবে! আমার বড় ভয় করছে—

সন্দীপও ভাবনায় পড়লো। কলেজ থেকে ফিরে যখন সে বিডন স্ট্রীটের বাড়িতে ফিরেছিল তখনই মল্লিক-কাকা বলেছিল—আজ মেজবাবু এ-বাড়িতে এসেছেন—

সন্দীপ জিজ্ঞেস করেছিল—কেন ?

—ওঁদের কারখানায় হামলা শুরু হয়েছে।

সন্দীপ আবার জিজ্ঞেস করেছিল—তাহলে কী হবে ?

মল্লিক-কাকা বলেছিলেন—কী আর হবে ? কিছুই হবে না। প্রত্যেক বছরেই এই রকম একটা-না-একটা ব্যাপার নিয়ে হামলা হয়। কিন্তু শুনছিলুম মেজবাবুর শরীর তেমন ভালো যাচ্ছে না।

তারপর সন্দীপ যখন খবর পেলে যে ছোটবাবু বাড়ি এসেছে তখন দৌড়ে

এসেছে রাসেল স্ট্রীটের বাড়িতে। এসে যখন শুনলো বিশাখা তখনও আসেনি তখন কী করবে বুঝতে পারলে না।

বললে—তাহলে থানায় একটা খবর দিয়ে আসবো মাসিমা ?

এ-কথার উত্তরে যোগমায়া কী বলবে ? এমন বিপদে তো যোগমায়া আগে কখনও পড়েনি। কলকাতা শহরের হালচাল তো যোগমায়া কখনও দেখেনি।

সন্দীপ আর দাঁড়ালো না। বললে—যাই, আমি একবার থানাতেই যাই। পুলিশকে একবার খবরটা জানিয়ে আসা ভালো। খবরটা জানিয়েই এখুনি আসছি—

বলে সন্দীপ বেরিয়ে গেল। থানাটা পার্ক স্ট্রীটের ওপর। আগে কোনও থানাতেই সন্দীপ ঢোকেনি। থানার ভেতর একজন কনস্টেবলকে দেখতে পেয়ে সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—থানার বড়বাবু আছে ?

কনস্টেবলটা বললে—বড়বাবু বেরিয়ে গেছেন। আপনার কী চাই ?

সন্দীপ বললে—একটা মেয়ে রাসেল স্ট্রীট থেকে হারিয়ে গেছে। সেইজন্যে ডায়েরী করবো—

—তাহলে ওই দিকের ঘরে যান, ওখানে এস-আই বাবু আছেন—

সন্দীপ তার নির্দেশমত সেই ঘরেই গেল। যেতেই একজন উর্দি'পরা ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন—কী চাই ?

সন্দীপ বললে—একটা মেয়ে হারিয়ে গেছে তাই ডায়েরী করবো—

ভদ্রলোক একটা খাতা বের করলেন। খাতার পাতাটা খুলে জিজ্ঞেস করলেন—বলুন কী নাম মেয়েটার ?

—বিশাখা গাঙ্গুলী।

—বয়েস কত ?

বয়েস, কোন্ স্কুলে পড়ে, বাড়ির ঠিকানা, সব কিছু লেখার পর ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন—কাউকে আপনার সন্দেহ হয় ?

সন্দীপ বললে—না—

—পাড়ার কোনও ছেলেদের সঙ্গে তার ভাব-টাব ছিল ?

সন্দীপ আবার বললে—না—তবে একজনের সঙ্গে তার বিয়ে হওয়ার কথা ছিল—

—সে কে ? তার ঠিকানা কী ?

সন্দীপ বললে—তার নাম সৌম্যপদ মুখার্জী, ঠিকানা বারো-বাই-এ বিডন স্ট্রীট। আজকেও বিশাখা সকালে ইস্কুলে গিয়েছিল। ড্রাইভার রোজ তাকে গাড়িতে করে ইস্কুলে পৌঁছিয়ে দিত, তারপর আবার ইস্কুলের ছুটির পর তাকে গাড়িতে করে তিন নম্বর রাসেল স্ট্রীটের বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে আসতো—কিন্তু আজ ড্রাইভার খালি গাড়ি নিয়ে ফিরে এল। সে বললে যে বিশাখা তার গাড়িতে আসেনি, সৌম্যপদবাবু নাকি বিশাখাকে নিয়ে কোথায় চলে গেছেন।

ভদ্রলোক বললেন—যার সঙ্গে বিয়ে হবে সেই-ই তো বিশাখাকে নিয়ে চলে গেছে। তাহলে আর আপনাদের ভাববার কী আছে ?

সন্দীপ বললে—এখনও তো বিয়ে হয়নি তাদের। এখন কি তাদের মেলামেশা ভালো ? তা ছাড়া যদি কোনও বিপদ ঘটে যায় ?

—কী বিপদ ?

সন্দীপ বললে—বলা তো যায় না, ছেলে মেয়েও তো হয়ে যেতে পারে। তখন কি আর সৌম্যপদবাবু তাকে বিয়ে করবেন ?

থানার সাব্-ইনস্পেক্টার ভদ্রলোক বললেন—আজকাল তো আকছার এ-সব ঘটনা ঘটছে। এ-সব ব্যাপারে থানায় ডায়েরী করতে এসেছেন কেন ?

সন্দীপ বললে—কেন ডায়েরী করতে এসেছি তা তো আপনাকে বললুম। শেষকালে যদি সৌম্যপদবাবু বিশাখাকে বিয়ে না করে ? তখন তো মেয়েটা ভেসে যাবে—

সাব্-ইনস্পেক্টার ভদ্রলোক বললেন—এ রকম কত মেয়েই তো ভেসে গেছে। তা নিয়ে আজকাল কি আর কেউ ভাবনা করে ?

তারপর বললে—তা ঠিক আছে। আপনি এখানে একটা সই করে দিন-

কিন্তু তার পরেই কি মনে করে ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন—কিন্তু আপনি কে ? মানে মেয়েটির কে হন ?

সন্দীপ বললে—আমি কেউ না—

—কেউ না মানে ?

সন্দীপ বললে—কেউ না মানে মেয়েটির সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই—

সাব্ ইনস্পেক্টার ভদ্রলোক আরো অবাক হয়ে গেলেন। বললেন—সে কী মশাই, মেয়েটি যদি আপনার কেউ না হবে তাহলে আপনি কেন এখানে ডায়েরী করতে এসেছেন ? আপনি কি তাহলে মেয়েটির পাড়ার লোক ?

সন্দীপ বললে—না। মেয়েটির বাড়িতে কোন পুরুষ মানুষ না থাকাতে আমাকেই থানায় আসতে হয়েছে—

ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন—তাহলে আপনি কোথায় থাকেন ?

সন্দীপ বললে—আমি থাকি বারো-বাই-এ বিডন স্ট্রীটের বাড়িতে, ওই যেখানে সৌম্যপদ মুখার্জী থাকেন।

—তাহলে আপনি যার নামে কমপ্লেন করছেন তাদেরই বাড়িতে আপনি থাকেন ?

সন্দীপ বললে—হ্যাঁ, আমি ও বাড়িতে থাকি খাই আর এই তিন নম্বর রাসেল স্ট্রীটের বিশাখা আর তার মা'র দেখাশোনা করি। এই কাজটা করাই আমার চাকরি—বলতে গেলে আমি এই বাড়ির মা আর মেয়ের গার্জিয়ান।

সাব্-ইনস্পেক্টার ভদ্রলোক বললেন—ঠিক আছে, আপনি এখানে এই ডায়েরীর পাতায় একটা সই করে দিন—

ওদিকে যখন সন্দীপ পুলিশের থানায় গিয়ে কথা বলছে, তখন এদিকে তিন নম্বর রাসেল স্ট্রীটের বাড়ির দরজায় কড়া নড়ে উঠলো। যোগমায়া দৌড়ে গিয়ে বিশাখাকে দেখে আকাশ থেকে পড়লো।

বললে—তুই ?

বিশাখার মুখ চোখ তখন শুকিয়ে একেবারে আমসি হয়ে গেছে। দেখে মনে হলো যেন তার ওপর দিয়ে তুমুল ঝড় বয়ে গেছে। সে আর তখন ঠিকমত সোজা হয়ে দাঁড়াতেও পারছে না। মার বুকের ওপরেই সে ঢলে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে যোগমায়া তাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরেছে। সেইভাবে মেয়েকে জড়িয়ে ধরে শোবার ঘরে নিয়ে

গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিলে। বিছানায় শুয়েই বিশাখা নিজের চোখ দুটো বুজিয়ে ফেললে।

যোগমায়ার নাকে কী রকম যেন একটা উৎকট খারাপ গন্ধ এল।

যোগমায়া জিজ্ঞেস করলে—কীরে, কোথায় ছিলি এতক্ষণ, বল্‌? বল্‌ কোথায় ছিলি?

বিশাখা কিছু জবাব দিলে না, যেমন চোখ বুজে শুয়েছিল তেমনি শুয়েই রইল।

যোগমায়া আবার জিজ্ঞেস করলে—কই, কথা বলছিস্‌ না যে? বল্‌ কোথায় ছিলি এতক্ষণ? আমি আর শৈল দুজনেই না খেয়ে উপোস করে আছি, আমাদের কথা এতক্ষণ তোর মনেই ছিল না? বল্‌ কোথায় গিয়েছিলি? আন্টি মেমসাহেব জয়ন্তী দিদিমনি, ডাক্তারবাবু, সবাই এসে তোকে না পেয়ে ফিরে গেল। বল্‌, কে তোকে নিয়ে গিয়েছিল?

তবু বিশাখার মুখে কোন কথা নেই।

যোগমায়া মেয়েকে ঠেলে ঠেলে বিরক্ত করতে লাগলো। বলতে লাগলো—কথার জবাব দিবি নে? দিবিনে কথার জবাব? মুখ দিয়ে কিসের গন্ধ বেরোচ্ছে, বল্‌? কীসের গন্ধ?

এতক্ষণে বিশাখার মুখে একটু কথা বেরোল। বললে—মদের—

- মদের? মদের গন্ধ? তুই মদ খেয়েছিস?

বিশাখা আবার চুপ হয়ে গেল। যোগমায়া আবার জিজ্ঞেস করলে—মুখপুড়ী, তুই আমার পেটের মেয়ে হয়ে আমার এমনি করে মুখ পোড়ালি? বল্‌, কেন মদ খেতে গেলি? কে তোকে মদ খেতে বললে? কে তোকে মদ খাওয়ালে বল্‌?

বিশাখা অস্ফুট স্বরে বললে—তোমার জামাই—

—আমার জামাই? আমার জামাই তোকে মদ খাওয়ালে আর তুই সেই মদ খেলি? তোর লজ্জা করলো না মদ খেতে?

বিশাখা নিজেও তখন কেঁদে ফেলেছে। তার চোখ দিয়ে তখন ঝর ঝর করে জল গড়িয়ে পড়ছে।

যোগমায়া নিজের আঁচল দিয়ে মেয়ের চোখ মুছিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলে—কেন মদ খেতে গেলি তুই? আমার জামাই তোকে জোর করে মদ খাওয়ালে?

—হ্যাঁ।

যোগমায়া বললে—আমার জামাই তোকে কোথায় নিয়ে গিয়ে মদ খাওয়ালে? দোকানে?

বিশাখা কাঁদতে কাঁদতে বললে—না, হোটেলে!

যোগমায়া বললে—জামাই তোকে হোটেলে নিয়ে গিয়েছিল? হোটেলে গিয়ে কোথায় উঠলি তোরা?

বিশাখা তখনও কাঁদছে। কাঁদতে কাঁদতে কোনও রকমে বললে—হোটেলের একটা ঘরে—

—সে কী? হোটেলের একটা ঘরে তোকে নিয়ে উঠলো? সে ঘরে আর কে ছিল? বল্‌, আর কে ছিল সে ঘরে? বল্‌, তোরা ছাড়া আর কে ছিল সে ঘরে?

বিশাখা বললে—আর কেউ ছিল না—

—আর কেউ ছিল না ? তারপর ?

বিশাখা চুপ। যোগমায়া আবার জিজ্ঞেস করলে—তারপর ? তারপর কী করলি বল্ ?

বিশাখা এবারও কোনও উত্তর দিলে না।

যোগমায়া এবার মেয়ের খোঁপাটা ধরে নাড়া দিতে লাগলো। বললে—বল্ বিনে মুখপুড়ী, জবাব দিবি নে ? তাহলে দ্যাখ্ আমি তোর কী করি।

বলে বাইরে গিয়ে ভাঁড়ার ঘর থেকে একটা বঁটি নিয়ে এল। বঁটি নিতে দেখে শৈলও কী একটা ভয়ঙ্কর আতঙ্কের আঁচ পেয়ে পেছন-পেছন এসে বলতে লাগলো —ও কী করছো মা, ও কী করছো ? মেয়েকে খুন করবে নাকি ?

যোগমায়া বলে উঠলো—তুই নিজের কাজ করগে—

বলে ভেতর থেকে দরজার খিল বন্ধ করে দিল। শৈল তখন বাইরে থেকে চেঁচাতে লাগলো—মা, ওকে মেরো না, ও ছোট মেয়ে, কী করতে কী করে ফেলেছে, ওকে মেরো না মা, দরজা খোল--

যোগমায়া তখন ভেতরে মেয়েকে নিয়ে পড়েছে। বাইরের শব্দ তখন আর যোগমায়ার কানে আসছে না, বলছে—বল্, হোটেলের ঘরে ঢুকে কী করলি তোরা ? কী করলি বল্ ?

বিশাখা মা'র হাতের বঁটিটা দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছে। ভয়ে-ভয়ে বললে— আমাকে মেরো না তুমি, আমাকে মেরো না—

—তাহলে শিগ্‌গির বল ঘরে ঢুকে তোরা কী করলি ?

—আমরা খেলুম !

—কী খেলি ?

বিশাখা বললে—ভাত, মাংস, মাছ···

—আর কী ? আর কী খেলি ?

বিশাখা বললে—কাটলেট···

—আর ?

বিশাখা থমকে রইল। চুপ করে শুধু কাঁদতে লাগলো।

—বল্ আর কী খেলি ?

বিশাখা বললে—আর কিছু না—

যোগমায়া জিজ্ঞেস করলে—ঘরে খাট ছিল ?

—হ্যাঁ—

যোগমায়া জিজ্ঞেস করলে—খাটে শুয়েছিলি ?

বিশাখা অনেকক্ষণ পরে বললে—হ্যাঁ—

—মদ কখন খেলি ?

বিশাখা বললে—তখন—

—শুয়ে-শুয়ে খেলি, না মদ খাবার পর শুলি ?

বিশাখা বললে—শোবার আগে—

—তারপর ?

বিশাখা উত্তর দিচ্ছে না দেখে যোগমায়া আবার ধমক দিয়ে উঠলো—বল্, মুখপুড়ী, তারপর কী হলো? বল্—

কিছুতেই আর বিশাখার মুখ থেকে কোনও জবাব বেরোল না।

—কই, কিছু জবাব দিচ্ছিস নে যে? এবার জবাব না দিলে এই বঁটি দিয়ে তোকে দু'খানা করে ফেলবো। বল্, তারপর কী হলো?

বিশাখা বঁটি দেখে ভয় পেয়ে বললে—আমাকে মেরো না মা, মেরো না মা আমাকে—

যোগমায়া বললে—তাহলে বল তারপর কী হলো—জামাই তোকে কী করলে, বল্—

বিশাখা বিছানায় মুখ লুকিয়ে কিছু বলতে গেল, কিন্তু বলতে পারলে না।

—বল্, জামাই কী করলে? .

—আমাকে চুমু খেল—

—তারপর?

ওদিকে দরজায় তখন হঠাৎ কড়া নাড়ার শব্দ হতেই শৈল দরজা খুলে দেখে সন্দীপবাবু এসেছে।

সন্দীপ ভেতরে ঢুকে জিজ্ঞেস করলে—বিশাখা বাড়ি এসেছে?

শৈল বললে—হ্যাঁ, ওই ঘরে—

—আর মাসিমা? মাসিমা কোথায়?

—মাসিমাও ওই ঘরে। ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে।

সন্দীপ মাসিমার শোবার ঘরের দরজায় ধাক্কা দিতে লাগলো। শৈলকে জিজ্ঞেস করলে—মাসিমা ঘরের খিল বন্ধ করে দিয়ে কী করছে?

শৈল বললে—বিশাখাকে মারছে

সন্দীপ বললে—কেন, বিশাখাকে মারছে কেন মাসিমা? বিশাখা কী করেছে? বিশাখা সমস্ত দিন কোথায় ছিল?

তারপর বাইরে থেকেই জোরে-জোরে ডাকতে লাগলো—মাসিমা, মাসিমা, আমি সন্দীপ, আমি থানায় গিয়ে ডায়েরী করে দিয়ে এসেছি। দরজা খুলুন। মাসিমা—
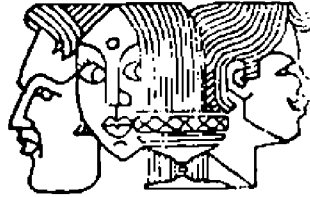
কিন্তু তখনও কি সন্দীপ জানতো যে দৈনন্দিন বাস্তব অঙ্কের সঙ্গে জীবনের অঙ্কের এত গরমিল? দুই আর দুই মিলে যে চার হয় এটা যেমন সত্য তেমনি দুই আর দুই মিলে যে পাঁচও হয়, সেটাও কি তেমনি সমান সত্য নয়?

খবরের কাগজে যে-খবর ছাপা হয়ে বেরোয় সেটা মিথ্যে নয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তা সত্য। কিন্তু সেই খবরটাই আবার ইতিহাসের পাতা থেকে নিয়ে যখন

চার্লস ডিকেন্স 'এ টেল্ অব্ টু সিটিজ্' নামে উপন্যাস লেখেন তখন তা হয়ে ওঠে আরো বড় সত্য। ফরাসী বিদ্রোহ একটা ঐতিহাসিক সত্য, কিন্তু সেই একই ফরাসী বিদ্রোহ নিয়ে লেখা 'এ টেল্ অব্ টু সিটিজ্' আরো-আরো গভীর, আরো নিবিড় সত্য হয়ে ওঠে।

এতদিন পরে সন্দীপের মনে হয় জীবন যেমন সত্য তেমনি সত্য মৃত্যুও। তবু মৃত্যু সত্য জেনেও জীবনের ওপর মানুষের কেন অত মায়া? সৌম্যবাবু কি জানতেন না যে জীবন নিয়ে তিনি অত ছিনিমিনি খেললেন তা জীবন নয়, জীবনের মাত্র একটা ভগ্নাংশ? সে অনেকটা গানের মতন। গান যখন শুরু হয় তখনই বোঝা যায় না গানের স্বরূপটা কী। তার একটা অংশ যখন সম্পূর্ণ হয়ে সমে ফিরে আসে তখনই বোঝা যায় রাগিণীটা কী এবং সেই গানের অন্তরাটা কোন্ দিকে গতি নেবে আর তার পরিণতিটাই বা কেমন হবে।

সৌম্যবাবুর জীবনটাও কি সেই রকম নয়?

গোপাল হাজরা সেই বহুদিন আগে তাকে চৌরঙ্গীর নাইট ক্লাবে না নিয়ে গেলে কী সন্দীপই সৌম্যবাবুর সঠিক চরিত্রটার আঁচ পেত?

কিন্তু তখন সন্দীপের মনে হয়েছিল ওটা কম বয়সের ধর্ম। বয়েসটা একটু বাড়লে ওটা হয়ত কমবে।

সন্দীপ সারাদিন নিজের মনেই নিয়ম করে কাজ করে যেত। সে যেমন নিয়ম করে সব কাজ করে যেত তেমনি চাইতো সবাই-ই সব কাজ সেই রকম নিয়ম করে করুক। ছোটবেলা থেকেই মা তাকে তাই-ই করতে বলতো। সন্দীপের মা-ই ছিল তার আদর্শ। মা যে তাকে সেই সব কথা মুখে-মুখেই শেখাতো তা-ই নয়, মা নিজেও তার সব কাজ নিয়ম করে করতো। কোথাও কিছু বেনিয়ম দেখলেই মা'র খারাপ লাগতো।

কলকাতায় এসে সন্দীপ দেখলে এখানে সবাই বেনিয়ম করে। কলকাতায় যেন সকলের বেনিয়ম করাটাই নিয়ম। কলেজে যারা পড়তো তারাও কেউ নিয়ম করে কলেজে আসতো না। ছেলেরাও তাই। এটা ভালো লাগতো না সন্দীপের।

মা বলতো—লোকে যা করে করুক, তুমি একমনে নিজের কাজ নিয়ম করে, করে যেও বাবা, পরের কথা শুনো না—

মা'র কথা মনে পড়লেই সন্দীপের আর কোনও হুঁশ থাকতো না। মার চিঠি আসতে দেরি হলে কেমন মনটা ছটফট করতো। মাকে লিখতো—মা তুমি এত দেরি করে চিঠির উত্তর দাও কেন? তোমার চিঠি না পেলে রাত্রে আমার ঘুম আসে না। রাত্রে কলেজের বই পড়তে-পড়তে কেবল তোমার মুখখানা মনে পড়ে। এবার একটু তাড়াতাড়ি করে জবাব দিও—

মা'ও তেমনি। ছেলের চিঠি এলেই মা সেটা নিয়ে ছুটতো চাটুজ্জে-বাড়ির বউ-এর কাছে। বলতো—সন্দীপের চিঠিটা একটু পড়ে দাও না দিদি—

তারপর চেনাশোনা যার সঙ্গেই দেখা হতো তাকেই মা বলতো—জানো বাবা, আমার খোকা বি-এ পাশ করেছে—

সন্দীপ বি-এ পাশ করলো কি করলো না তা নিয়ে বেড়াপোতার কারোরই মাথা ঘামাবার দরকার হতো না। আর শুধু সন্দীপের পাস করার ব্যাপারই না,

পৃথিবীর কারো কোনও ব্যাপারেই মাথা ঘামাবার দরকার হতো না কারো। সবাই নিজের নিজের সমস্যা নিয়ে তখন এত ব্যস্ত ছিল যে কে কী করছে, তা ভাববারও সময় বা ইচ্ছে হতো না কারো। তবু মা'র কী যে স্বভাব সকলকে ডেকে-ডেকে মা সন্দীপের খবর জানিয়ে তৃপ্তি পেত।

একবার মা লিখেছিল—সন্দীপকে দেখতে বড় ইচ্ছে করছে।

সন্দীপ উত্তরে লিখেছিল—এখন আমি এখানে নানা ব্যাপারে খুব ব্যস্ত রয়েছি। আমি এখানে না থাকলে এ-বাড়ির খুব ক্ষতি হবে। তুমি আমার কথা বেশি ভেবো না মা, আমি ভালো আছি। তুমি নিজের শরীরের দিকে নজর রাখবে। সামনেই আমার পরীক্ষা। দিনের বেলায় অনেক কাজ থাকায় পড়াশোনা করবার তেমন সময় পাই না, তাই রাত জেগে পড়াশোনা করতে হয়। একটু সময় পেলেই আমি বেড়াপোতায় গিয়ে তোমাকে সমস্ত কথা সবিস্তারে বলবো। আমার সম্বন্ধে তুমি বেশি দুশ্চিন্তা কোর না। নিজের শরীরের দিকে নজর রাখবে। বিনতঃ—সন্দীপ।

সত্যিই তখন সন্দীপ খুবই ব্যস্ত। কারণ তখন মল্লিক-মশাই কলকাতায় নেই। তিনি গিয়েছেন কাশীতে গুরুদেবের কাছে। গুরুদেবের চিঠির জন্যে ঠাকমা-মণি অনেক দিন থেকেই অপেক্ষা করছিলেন। শেষকালে অধৈর্য হয়ে মল্লিক-মশাইকে বললেন—আপনি একবার নিজেই যান সেখানে। গিয়ে আমার সমস্যার কথা নিজের মুখেই সব বুঝিয়ে বলুন তাঁকে। নইলে তিনি হয়ত ঠিক বুঝতে পারবেন না আমার কথা।

শেষ পর্যন্ত তা-ই ব্যবস্থা হলো। মল্লিক-মশাই একদিন 'দুর্গা-দুর্গা' বলে কলকাতা ছেড়ে কাশী রওনা হলেন। আর তখন থেকেই সন্দীপের কাজের ব্যস্ততা বেড়ে গেল। কলেজের পড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রাত্যহিক কাজের নিয়মানুবর্তিতার প্রতিযোগিতা চলতে লাগলো। তার ওপর আছে হিসেব। বিরাট সংসারের প্রাত্যহিক আয়-ব্যয়ের হিসেব। আয়ের হিসেব লেখবার আলাদা নিয়ম, ব্যয়ের হিসেব লেখবার নিয়ম আলাদা। সে-সব লেখবার কায়দা যাবার আগে শিখিয়ে দিয়েছিলেন মল্লিক কাকা। বলে গিয়েছিলেন—মেজবাবু যদি কোনও দিন অফিসে ডাকেন তো তুমি যাবে, বুঝলে ?

কথাটা শুনে সন্দীপের ভয় লেগেছিল। মেজবাবুর সামনে সে কী করে দাঁড়াবে ?

কিন্তু সেই যে কথায় আছে 'যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যে হয়', তাই-ই হলো সন্দীপের বেলায়। সেই মেজবাবুই সেদিন ডেকে পাঠালেন মল্লিক-মশাইকে।

ওপর-তলা থেকে ডেকে পাঠালেন ঠাকমা-মণি। বললেন—মেজবাবুর টেলিফোন এসেছিল অফিস থেকে, তোমাকে একবার যেতে হবে সেখানে—মেজবাবুর অপিসে—

—কখন ?

ঠাকমা-মণি বললেন—এই এখুনি। মল্লিক-মশাই তো নেই, তাই তোমারই ডাক পড়েছে। মেজবাবু যা দেবেন তুমি তা নিয়ে আসবে, এনে আমাকে দেবে

—বন্ধলে ?

তখনও খাওয়া হয়নি সন্দীপের। না হোক, মেজবাবুর সঙ্গে দেখা করার পর খেলেই চলবে— সন্দীপ সেদিন তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিলে। তৈরি হয়ে নেওয়া মানে প্যাণ্ট-শার্ট পরে নেওয়া আর জুতো পরা। সঙ্গে একটা ব্যাগও নিয়ে নিলে। মল্লিক-কাকা যখনই বাইরে কোথাও যান, ওই ব্যাগটা সঙ্গে নিয়ে যান। ব্যাগের ভেতরে কিছু থাকুক আর না-থাকুক ব্যাগটা সঙ্গে থাকা চাই।

সকালবেলাই স্নান করা হয়ে যায় রোজ। বেরোবার মুখে মল্লিক-কাকার মত সেও 'দুর্গা-দুর্গা' শব্দ উচ্চারণ করলে। কী জানি কী কথা হবে মেজবাবুর সঙ্গে। মুখোমুখি তো কখনও দেখা বা কথা হয়নি আগে! তাই ভয়ও হতে লাগলো।

রাসেল স্ট্রীটের বাড়িতে সেদিন যাওয়া হলো না। মেজবাবুর সঙ্গে দেখা করে ফেরার সময় গেলেও চলবে।

কিন্তু ঠিকানা খুঁজে ডালহৌসীতে 'স্যাকসবি মুখার্জী' কোম্পানীর অফিসের সামনে গিয়ে সন্দীপ অবাক হয়ে গেল! এত ভিড়, এত লোক! চারদিকে গিজ-গিজ করছে মানুষ। তাদের সকলের হাতে বড়-বড় পোস্টার। দূর থেকে পোস্টারের লেখাগুলো পড়ে দেখলে। তাতে লেখা রয়েছে—"স্যাকসবি মুখার্জী মুর্দাবাদ।" কোনওটাতে লেখা রয়েছে—"শ্রমিক মেরে মুনাফা লোটা চলবে না, চলবে না।" যে-সব কথাগুলো পোস্টারে লেখা রয়েছে সেই কথাগুলোই তারা চড়া গলায় স্লোগান দিয়ে হাওয়া গরম করছে। আর তাই দেখতে কলকাতার কর্মমুখর অঞ্চলে অনেক অকর্মা লোকের সমাগম হয়েছে। সেই অকর্মা লোকদের সমারোহ দেখতে ক্রমে-ক্রমে আরো অনেক কর্মহীন লোক এসে সেখানে জুটছে। আশ্চর্য! সন্দীপ দেখে অবাক হয়ে গেল যে কলকাতায় এত লোক কর্মহীন! এত লোকের কাজ নেই এই কাজের শহরে ?

সন্দীপ ভিড় এড়িয়ে একটু অপেক্ষাকৃত নিরাপদ দূরত্বে গিয়ে দাঁড়ালো, অথচ তার তো এখান থেকে চলে গেলে চলে না, তাকে তো আজ মেজবাবুর সঙ্গে দেখা করতেই হবে।

ততক্ষণে ভিড় বাড়তে-বাড়তে সমস্ত অঞ্চলটা একেবারে অচল হয়ে দম বন্ধ হওয়া অবস্থায় রূপান্তরিত হয়ে উঠলো। চারদিকে শুধু মানুষের মাথা আর মাথা। যেন ইচ্ছে করলে মানুষের মাথার ওপর দিয়ে হেঁটে সহজেই রাস্তার এপার থেকে ওপারে চলে যাওয়া যায়। গাড়ি-চলাচল অনেকক্ষণ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বাসও নেই। মানুষ কী করে ? তাহলে কি শহরে কাজের লোকের চেয়ে অকাজের লোকের সংখ্যাই বেশি ?

—ইনক্লাব জিন্দাবাদ! ইনক্লাব জিন্দাবাদ—

মানুষের ভিড়ের সঙ্গে কান ফাটানো চিৎকারের শব্দে পাড়াটা অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো। কেউ কোনও অফিসে ঢুকতে পারে না, আবার কেউ কোনও অফিস থেকে বেরোতেও পারে না। যারা ফুটপাথে নানারকম খাবার ফিরি করতে বসে তারাও ভয় পেয়ে দোকান-পাট-সওদা-পত্র নিয়ে সরে যেতে আরম্ভ করলো।

পাশের একজন দর্শককে সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—কী চায় মশাই এরা ?

লোকটা বললে—দেখছেন না, কোম্পানীর ইউনিয়ন ঘেরাও করতে এসেছে কোম্পানীর মালিককে—

—কোন্ কোম্পানী? স্যাক্স্‌বি মুখার্জী কোম্পানী?

—হ্যাঁ।

—তা কাকে ঘেরাও করবে ওরা?

কাকে আবার, কোম্পানীর মালিককে। মুক্তিপদ মুখার্জী কোম্পানীর ম্যানেজিং ডাইরেক্টার। তিনি তো ভেতরে আছেন। তাই তো ওদের অত ভিড় এখানে। এখানেই তো কোম্পানীর হেড-অফিস।

সন্দীপ বললে—কিন্তু এখানে তো আরো অফিস আছে, তারাও তো ঘেরাও হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে। তাদের কেন কষ্ট দিচ্ছে এরা?

—নইলে তো হুঁশ হবে না কারো। তাহলে কেউ আর লেবারকে ঠকাতে সাহস পাবে না।

তাহলে সন্দীপ কী করবে? মেজবাবুর সঙ্গে দেখা না করে আবার বাড়ি ফিরে যাবে? তা হলে ঠাকমা-মণি কী ভাববেন? সামান্য একটা কাজও কি হবে না সন্দীপকে দিয়ে? তাহলে তাকে রেখে কী লাভ? একটা মানুষের খেতে কি কম খরচ হয় আজকাল?

সন্দীপের মনে হলো সমস্ত কলকাতা যেন এসে জমেছে এই ডালহৌসী স্কোয়ারে। পাশের লোকটা কোথায় কখন অন্য দিকে অদৃশ্য হয়ে গেছে। কেউ আর এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। এত লোকের ভিড়, এত রকমের বিশৃঙ্খলা, তবু একটা পুলিশ নেই কোথাও। পুলিশ থাকে না কেন?

হঠাৎ কোথা থেকে আর একদল ছেলে সেখানে দৌড়ে এসে হাজির হলো। তাদের মুখে মার-মার শব্দ। তারাও দলে কম ভারি নয়। দু'দলে মারামারি কাটাকাটি বেঁধে গেল। সন্দীপ কোন্ দিকে পালাবে বুঝতে পারলে না। তারই মধ্যে হঠাৎ একটা বোমা ফাটার শব্দ। শব্দটা হতেই ধোঁয়ায়-ধোঁয়া হয়ে গেল জায়গাটা। যারা এতক্ষণ দূরে দাঁড়িয়ে মজাটা দেখছিল এবার তারা প্রাণ বাঁচাবার জন্যে পালাতে আরম্ভ করলে।

কে একজন তাকে উদ্দেশ্য করে বললে—পালিয়ে যান মশাই, পালিয়ে যান—

সন্দীপ কথাটা শুনে পালাতে লাগলো। জিজ্ঞেস করলে—এরা কারা মশাই? কারা এরা?

দৌড়তে-দৌড়তে লোকটা বললে—এরা দু'নম্বর ইউনিয়ন—

—দু'নম্বর ইউনিয়ন মানে?

এর উত্তর দেবার মত নির্বোধ নয় লোকটা, যারা 'দু'নম্বর ইউনিয়নে'র মানে জানে না তারা কলকাতা শহরের আবর্জনা।

সত্যিই তখন সন্দীপ জানতো না দু'নম্বর ইউনিয়নের মানে। তা সে তো অনেক পরের কথা। তখন সন্দীপের পায়ের তলা দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গেছে তখন সে ব্যাঙ্কে চাকরি করছে সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে। চাকরিতে উন্নতি করবার আগ্রহে সে তখন দিন আর রাতের পার্থক্য বোঝেনি। সেই ব্যাঙ্কের চাকরিতেও তখন দু'নম্বর ইউনিয়ন তৈরি হয়েছিল।

জীবনের দীর্ঘ পথ-পরিক্রমায় একটা চরম সত্য সে বুঝে নিয়েছিল। সেটা এই যে যারা সব দিক থেকে শুধু সত্যকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকতে চায় মানুষের সমাজ তাদের নির্বোধ মনে করে। সন্দীপকেও তাই এতদিন ধরে সবাই নির্বোধই মনে করে এসেছে। কিন্তু নিজে সে তো জানে সে কী? নিজেকে ভালো করে জানতে হলে যে সংসারে নির্বোধ সেজে থাকার ভান করতে হয় এ-কথা সন্দীপ কাকে বোঝাবে, কে-ইবা তা বুঝবে? আর নিজেকে জানার চেয়ে বড় জানা সংসারে আর কী আছে? নিজেকে জানলে তবেই তো নিজের চেয়ে যে বড় তাকে জানা যায়!

কিন্তু এ-সব কথা এখন কেন বলছি? তার আগে সেদিনকার সেই দুর্যোগের ঘটনার কথা আগে বলাই ভালো। মনে আছে অনেক দূর থেকেও বোমা ফাটানোর বিকট শব্দগুলো কানে আসছিল। বোমার শব্দ নয় তো, যেন কামান, কামানের শব্দ। কামানের শব্দ কখনও শোনেনি সন্দীপ। কিন্তু লোক-মুখে কামানের শব্দের বিকটতা সম্বন্ধে একটা ধারণা ছিল সন্দীপের মনে।

দূরে ডালহৌসী পাড়ার কেন্দ্র থেকে তখন প্রচন্ড ধোঁয়া উড়ছে। লোকজনের আলোচনা থেকেই বোঝা গেল পুলিশ এসে গোলমাল থামিয়ে দিয়েছে ওখানে। এখন সব নাকি শান্ত—

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—কী করে শান্তি হলো? গুলি চালিয়েছে বুঝি পুলিশ?

লোকটা বললে—না, যে দুটো ইউনিয়ন এতক্ষণ গোলমাল করছিল, তাদের পুলিশ ঠান্ডা করে দিয়েছে—

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—এখন তাহলে ওদিকে যাওয়া যাবে?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, সব নরম্যাল—

সন্দীপ আস্তে আস্তে রাস্তায় পা বাড়ালে। কোথাও আর কোনও বোমার আওয়াজ নেই। দেখা গেল, আবার দু' একটা গাড়ি আসা-যাওয়া করতে শুরু করেছে। প্রথমে যা ভাবা গিয়েছিল তা নয়। একটু আগেই যে খানিক দূরে বোমা-গুলি চলেছে তা এখন আর বোঝা যায় না। সব স্বাভাবিক। আবার বড় রাস্তা দিয়ে বাস চলতে আরম্ভ করেছে।

হাঁটতে হাঁটতে আবার সে মেজবাবুর অফিসের সামনে এসে দাঁড়ালো। আগেকার সেই মানুষের ভিড় আর নেই। সন্দীপ অফিসটার সামনে এসে সদর গেট পেরিয়ে একেবারে লিফটের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই লিফ্‌ট্‌টা একতলায় নামলো। সেখানে তখন আরো অনেক লোক দাঁড়িয়েছিল। তাদের পেছন-পেছন সন্দীপও ভেতরে গিয়ে উঠলো।

চারতলায় পৌঁছোবার আগেই সন্দীপ বলে উঠলো—আমি চারতলায় নামবো—

চারতলায় পৌঁছুতেই লিফট থেমে গেল। সন্দীপ লিফট থেকে নেমে বাইরে বেরোতেই সুশীলকে দেখে অবাক হয়ে গেল। সুশীল লিফটের ভেতরে উঠতে যাচ্ছিল। সন্দীপকে দেখে সেও অবাক হয়ে গেছে।

বললে—আপনি এখানে?

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—আপনি এখানে কী করতে?

সুশীল বললে—আমি একটা চাকরির খোঁজে এসেছিলাম। কিন্তু আপনি?

সন্দীপ তার নিজের কাজের কথা বললে।

সুশীল বললে—আপনি তাহলে 'স্যাকসবি মুখার্জী' 'কোম্পানী'তে একটা চাকরি যোগাড় করে নিলেই পারেন। বিকেল বেলা ল' পড়বেন আর দুপুরবেলা এদের অফিসে চাকরি করবেন!

সন্দীপ বললে—এখানে চাকরি করলে আমি অন্য কাজগুলো কখন করবো? আমাকে রাসেল স্ট্রীটের একটা বাড়িতে যেতে হয়, সেখানেও আমার অনেক কাজ। সেই কাজের জন্যেই তো আমাকে ওরা রেখেছে--

—কী কাজ?

সন্দীপ সবই বললে। বিশাখার কথা বললে, সৌম্যবাবুর কথা বললে, যোগমায়া দেবীর কথা বললে। তারপর বললে—এই দেখুন না, এখানে যে এখন এসেছি, এও আমার একটা কাজ। মল্লিকমশাই কাশী চলে গেছেন, তাঁর সব কাজগুলো এখন আমাকেই করতে হচ্ছে। কাজ কি কম? কাজ না করলে কি ওরা আমাকে বসিয়ে বসিয়ে খেতে দিচ্ছে থাকতে দিচ্ছে—

সন্দীপের সঙ্গে সুশীলের এতদিনের পরিচয়, কিন্তু এ-সব খবর জানতো না সে।

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে--কিন্তু আপনি?

সুশীল বললে—আমি এখানে এসেছিলুম চাকরির খোঁজে। চাকরি না করলে আমার আর চলছে না। আমাকে একজন কথা দিয়েছিল চাকরি পাইয়ে দেবে। তার সঙ্গে দেখা করতেই এসেছিলুম। তার কথাতেই আমি তাদের পার্টিতে ঢুকেছিলুম, তা এখানে এসে হঠাৎ বোমা-মারামারিতে আটকে গিয়েছিলুম। অথচ যার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলুম, তিনি আজ অফিসেই আসেননি। আমি তিন বছর ধরে পার্টির দাদাদের কাছে ঘোরাঘুরি করছি, কিন্তু কাজের কিছুই হচ্ছে না। কী যে করি বুঝতে পারছি না। আপনি বাবুদের বলে আমাকে একটা চাকরি জুটিয়ে দিন না, অত বড়লোকদের বাড়িতে রয়েছেন, আপনি একটু মুখ ফুটে বললেই হয়ে যায়—

সন্দীপ হাসলো। বললে—আপনি ঠিক লোককেই ধরেছেন দেখছি। আমি আবার একটা মানুষ, তার আবার কথা। আপনি তো বললেন আপনি পার্টির মেম্বার হয়েছেন—

—হয়েছি তো। তিন বছর ধরে পার্টির অফিসে ব্যাগারও খাটছি, কিন্তু একটা পয়সাও পাই না।

—কী কাজ করতে হয় আপনাকে?

সুশীল বললে—রাস্তায় ঘাটে লোকের কাছে ভিক্ষে করে করে পার্টির জন্যে চাঁদা তুলি। সেই চাঁদা পার্টির অফিসে জমা দিই—

—তার বদলে পার্টি কী দেয়?

—কী আবার দেবে? যখন পার্টি পাওয়ারে আসবে তখন আমরাই বড় বড় চাকরি পাবো। আর তা ছাড়া ইলেকশানের সময়ে আমরা অনেক হাত-খরচ পাই।

—তাতে আপনাদের চলে?

সুশীল বললে—চলেই তো না। তারপর পাড়ায় আমরা সার্বজনীন দুর্গাপুজো

কালীপুজো করি, সেই সময়ে দু'তিনটে মাস হেসে-খেলে চলে যায়। এই দেখুন না আজকে এখানে এসেছিলুম চাকরির চেষ্টায়, কিন্তু বোমাবাজির জ্বালায় মিছি-মিছি সময়টা নষ্ট হয়ে গেল। কোনও কাজ হলো না—

হঠাৎ কথা বলতে গিয়েও কথা বলতে পারলে না সন্দীপ। যেন আগুনের ওপর জল পড়লো।

সুশীল অবাক হয়ে গেছে সন্দীপের হাব-ভাব দেখে। জিজ্ঞেস করলে—কী হলো? কাকে দেখছেন? ওদিকে কে?

সন্দীপ তখনও ভূত দেখছে, বললে—ওই মেজবাবু······

—মেজবাবু মানে?

সুশীলও চেয়ে দেখলে। মাঝবয়েসী প্যান্ট-কোট দুরুস্ত একজন ভদ্রলোক ভেতরের কোন্ ঘর থেকে বেরিয়ে হন্‌হন্ করে লিফটে গিয়ে উঠলো। উঠতেই লিফটম্যান তাঁকে সেলাম করে লিফট নিয়ে নিচেয় নেমে গেল।

সন্দীপের মুখে-চোখে তখন আতঙ্কের ছাপ। সুশীল সেটা লক্ষ্য করে জিজ্ঞেস করলে—উনি কে?

সন্দীপ বললে—উনিই তো 'স্যাকসবি মুখার্জী' কোম্পানী'র ম্যানেজিং ডাইরেক্টার মুক্তিপদ মুখার্জী, ও'র সঙ্গে দেখা করতেই তো আমি এখানে এসেছিলুম। এখন কী হবে?

সন্দীপ ভয়ে শিটিয়ে উঠলো। সুশীল সান্ত্বনা দিয়ে বললে—বলবেন অফিসের সামনে বোমাবাজির জন্যে আপনি ঠিক সময়ে আসতে পারেননি।

সন্দীপ সে কথার কিছু উত্তর দিলে না, সুশীল বললে—আপনি ওঁকে বলে এ-অফিসে একটা চাকরি যোগাড় করে নিন না—আপনার তো হাতের কাছে এত বড় সুবিধে রয়েছে—

কিন্তু সে-কথায় কোনও সান্ত্বনা না-পেয়ে সন্দীপ লিফটের দিকে না গিয়ে সোজা সিঁড়ি দিয়েই নিচেয় নামতে লাগলো। তার কেবল মনে হতে লাগলো—এখন কী হবে? যদি তার চাকরিটা চলে যায়! ঠাকমা-মণি যদি তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়? তখন সে কোথায় থাকবে? কী খাবে? তাহলে মা'র আশা কী করে সে সার্থক করবে?

মুক্তিপদ মুখার্জি গাড়িতে উঠেই ড্রাইভারকে হুকুম দিলেন চল, বেলুড়—

মুক্তিপদ মুখার্জী যেদিন থেকে কোম্পানীর হাল ধরেছেন সেইদিন থেকেই শুরু হয়েছে তাঁর যুদ্ধ। কিন্তু মুক্তিপদ জানতেন না যে ব্যক্তিবোধ বড়, কিন্তু

তার চেয়েও বড় পরিবার-বোধ। আর ব্যক্তিবোধ বা পরিবার-বোধের চেয়ে যে জিনিসটা আরো বড় তার নাম হলো বিশ্ববোধ। এই বিশ্ববোধই মানুষকে নিজের তুচ্ছ সংকীর্ণতা থেকে আরো ঊর্ধে তুলে তাকে সুস্থ করে, তাকে সবল করে, তাকে শক্তিমান করে।

নন্দিতাও তাকে প্রায়ই বলে—তুমি বড্ড ভীতু, অত নরম স্বভাব হলে কি কারবার করা চলে? তুমি আরো কড়া হতে পারো না?

মুক্তিপদ বলতেন—তুমি মেয়েমানুষ, সে-সব তুমি ঠিক বুঝবে না—

নন্দিতা বলতো—একবার আমার ওপর ভার দিয়ে দেখ না আমি চালাতে পারি কি না—! আমি তোমার চেয়ারে বসলে এক-কথায় সকলকে স্যাক্ করে দিতুম—

মুক্তিপদ বললেন—সে-সব দিন চলে গিয়েছে। এখন চোখ রাঙিয়ে কোনও কাজ করানো যায় না। সে-সব ইংরেজদের আমলে চলতো, এখন ও-সব অচল—

নন্দিতা বলতো—তার চেয়ে বলো মালিক হওয়ার যোগ্যতা তোমার নেই—

এর পর নন্দিতার সঙ্গে কথা বলবার আর কোনও প্রয়োজন বোধ করেন না মুক্তিপদ। নন্দিতার সঙ্গে বরং অন্য কথা বলা ভালো। নতুন শাড়ি বা নতুন প্যাটার্নের কোন গয়না, বা হাউস্-কোট্, এই সব বললেই নন্দিতা বুঝবে।

আর পিক্নিক?

ঠাকমা-মণি প্রথমে আদর করে নাত্নীর নাম রেখেছিলেন 'প্রীতিময়ী'। কিন্তু নন্দিতার পছন্দ হয়নি নামটা। বলেছিল—ও আবার কী নাম?

তাই 'প্রীতিময়ী' বদলে নন্দিতা রেখেছিল 'পিপি'। সেকালের বুড়ী আজ-কালকার মেয়েদের নামের মাহাত্মা কী বুঝবে? স্কুলে ভর্তি হওয়ার সময় সেটা হয়ে গেল 'পিক্নিক', পিক্নিক, মুখার্জী'। নন্দিতা নিজে পিপিকে স্কুলে ভর্তি করবার পর থেকে ওই নামটাই পাকা হয়ে রইল।

শাশুড়ি আর বউতে আগে থেকেই মন-কষাকষি চলছিল, তার ওপর নাম বদলে এই তুচ্ছ সামান্য কারণটা হঠাৎ একটা অসামান্য কারণে রূপান্তরিত হয়ে গেল। বোমা যত ছোট আর যত বড়ই হোক, তার বিস্ফোরণের জন্যে একটা তুচ্ছ দেশলাই-এর কাঠিই যথেষ্ট।

তখন থেকেই নন্দিতা মুক্তিপদকে কেবল বলতো—তুমি একটা আলাদা বাড়ি করো—

মুক্তিপদ তখন সবে স্বাধীনভাবে কোম্পানীর হাল ধরেছেন, সেই সময় থেকেই নন্দিতার আবদার শুরু। ঘুরে-ফিরে কেবল ওই একটাই কথা—তুমি একটা আলাদা বাড়ি করো--

শেষকালে অতিষ্ঠ হয়ে মুক্তিপদ জিজ্ঞেস করেছিলেন—আলাদা বাড়ি করবো কেন? তোমার কি এ-বাড়িতে থাকতে কষ্ট হচ্ছে?

নন্দিতা বলেছিল—কষ্ট হচ্ছে কি হচ্ছে না, তুমি তো তা বুঝবে না। তোমাকে তো সারাদিন বাড়ির মধ্যে কাটাতে হয় না—

—কেন, বাড়িতে কাটাতে তোমার কী কষ্ট হয়?

নন্দিতা বলতো—আমি তো বলেছি তা তুমি বুঝবে না—

অনেক পীড়াপীড়ি করলেও নন্দিতা কিছু বলতো না।

কিন্তু বার-বার নন্দিতার কাঁদুনি শোনার চেয়ে আলাদা বাড়ি করাই ভালো। মুক্তিপদ শেষ পর্যন্ত একটা আলাদা বাড়িই করলেন ফ্যাক্টরির কাছাকাছি। ঠাকমা-মণি প্রথমে খুব বকা-ঝকা করেছিলেন। কিন্তু ছেলে বড় হয়েছে, ছেলের বিয়েও হয়েছে। তার ওপর নাত্নীও হয়েছে। তারও বয়েস হচ্ছে। ঠাকমা মণি তো আর চিরকাল সংসার আগলে থাকতে আসেননি। তাঁকেও তো একদিন এই সংসার ছেড়ে চলে যেতে হবে। সুতরাং বড় নাতি সৌম্যকে নিয়েই থাকতে লাগলেন। সৌম্যকে নিজের মনের মতো করে মানুষ করতে লাগলেন। মনে মনে ভাবলেন, সৌম্যর বিয়ে দেবার সময়ে ভেবে চিন্তে জন্ম-কুন্ডলী দেখিয়ে রাজ-যোটক মিলিয়ে বিয়ে দেবেন। তাহলে আর সৌম্যর বউ মেজ-বউ-এর মত বাড়ি ছেড়ে যাবে না। বাড়ি ছেড়ে আলাদা হবে না—

এই জন্যেই ঠাকমা-মণি নিজের মনের মত পাত্রী খুঁজে বেড়িয়েছেন। তারপর যখন সে-পাত্রী পাওয়া গেছে তখন একটু নিশ্চিন্ত হয়েছেন।

ঠিক এই সময়েই লন্ডন অফিস থেকে খবর এল সেখানকার ম্যানেজার কমল মেটা মারা গেছে। এই অবস্থায় এখানকার কাউকে-না-কাউকে লন্ডনে যেতে হয়। কিন্তু কে যাবে ?

মুক্তিপদ বলেছিলেন—আমি যেতে পারবো না, এখানে এখন আমার অনেক কাজ—

ঠাকমা-মণি বলেছিলেন—তাহলে সৌম্য কী করে যায় ? সে কী-ই বা কাজের বোঝে ?

—খুব বোঝে, খুব বোঝে—। তুমি ভাবছো তোমার নাতি বুঝি সেই আগেকার মত ছোটই আছে। কিন্তু মেঘে মেঘে যে অনেক বেলা হয়েছে, তা তো তুমি বুঝতে পারছো না—

কিন্তু সে ব্যাপারেও সৌম্যর বিয়ে না দিয়ে ঠাকমা-মণি তাকে বিলেতের অফিসে পাঠাবেন না। পাঠালে হয়ত ঠাকমা-মণির সমস্ত স্বপ্ন-সৌধ ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। তার চেয়ে বড় দুর্ঘটনা আর কী হতে পারে ঠাকমা-মণির জীবনে, সেই জন্যেই সরকার-মশাইকে পাঠানো হয়েছে কাশীতে।

গাড়িতে যেতে-যেতে মুক্তিপদ এই সব কথাই ভাবছিলেন। যদি সৌম্য লন্ডনে না যেতে পারে তাহলে কে সেখানে যাবে ? একজনকে তো যেতে হবেই। অফিসের কাজ-কর্ম তো বন্ধ রাখলে চলবে না।

বাড়িতে আসতেই নন্দিতা অবাক হয়ে গেছে।

বললে—এ কী, তুমি যে বললে আজকে বাড়িতে খেতে আসতে পারবে না—

—না, অফিসে আজ এক কান্ড হয়েছে—

—আবার কী কান্ড ?

—সে আর বোল না। সেই একই কান্ড। আবার ওরা ঘেরাও করেছিল আমাকে।

—কারা ? কোন্ ইউনিয়ন ?

মুক্তিপদ বললেন—এক নম্বর ইউনিয়ন—

—তা তোমাদের তো তিনটে ইউনিয়ন আছে। অন্য ইউনিয়ন অবস্থা সামলাতে

পারলে না ?

মুক্তিপদ বললেন—সেই দুনম্বর ইউনিয়নই তো শেষ পর্যন্ত এসে সামলালে—

তারপর একটু থেমে বললেন—আর পারি না। জানো, ওদিকে লন্ডন অফিসে যে কাকে পাঠাবো তা ভেবে পাচ্ছি না। মা তার নাতিকে বিয়ে না দিয়ে পাঠাবে না, আর আমার এখানেও এই ঝনঝাট। একা কোন্ দিক সামলাই বলো ? আমার যে কী বিপদ তা কেউ বুঝবে না। এর চেয়ে রাস্তায় ভিক্ষে করে খাওয়াও ভালো —দাও, খাবার দিতে বলো, এখুনি আবার একবার ফ্যাক্টরিতে যেতে হবে। ফ্যাক্টরি থেকে কেউ টেলিফোন করেছিল ?

নন্দিতা বললে—না—

মুক্তিপদ বললেন—দেখ কান্ড! হেড-অফিসে এত বড় একটা ব্যাপার হয়ে গেল, কেউ একবার খবরও নিলে না ? তাহলে অত টাকা মাইনে দিয়ে লোক পুষে কি লাভ আমার ?

ততক্ষণে খাবার এসে গেল।

মুক্তিপদ জিজ্ঞেস করলেন—পিপি এখনও আসেনি ?

নন্দিতা বললে—এইবার আসবে। তুমি এখন খেয়ে নাও। পিপি এলে আমি তার সঙ্গেই খাবো—

তারপর বললে—বিকেলে তোমার সময় হবে ?

—কেন ?

নন্দিতা বললে—আজকে 'লাইট-হাউসে' একটা ফিলম্-শো আছে বিকেল সাড়ে পাঁচটার সময়ে—

মুক্তিপদ বললেন—তুমি একলাই যেয়ো, আর নয় তো পিপিকে সঙ্গে নিয়ে যেও—

নন্দিতা বললে—এই বয়েসে কি পিপির এ-সব দেখা ভালো ? আর ওরও তো নিজের পড়াশোনা আছে—

মুক্তিপদ বললেন—আজকাল তো সবাই-ই সব দেখছে। কেউ তো কোনও জিনিস দেখতে বাকি রাখছে না। রাস্তায় যেসব পোস্টার দেখি, তাতে আমারই লজ্জায় চোখ বুজে আসে। অথচ লক্ষ্য করি রোজই তো 'হাউস-ফুল'। বাচ্ছা ছেলেমেয়েরা যদি না-ই দেখে তো 'হাউস-ফুল' হয় কী করে ?

নন্দিতা বললে—সেই জন্যেই তো তোমাকে সঙ্গে যেতে বলছি—

মুক্তিপদ বললেন—দয়া করে আমাকে তুমি একটু মুক্তি দাও, আমি আর পারছি না। দেখবে কোন্ দিন হয়তো 'সেরিব্রাল-হেমারেজ' হয়ে মারা যাবো। আর কত ট্র্যাঙ্কুইলাইজার খাবো ? আর আমিও তো মেশিন নই, মানুষ একটা—

নন্দিতা বললে—সেইজন্যেই তো বলছি তোমার একটু রিল্যাক্স করা দরকার—ডাক্তার তো তোমাকে তাই-ই করতে বলছে—

মুক্তিপদ বললেন—ডাক্তারদের কী ? তারাও আজকাল তেমনি হয়ে গেছে। যা হোক একটা হলো আর সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রেসক্রিপশন্ লিখে দিলুম। ডিউটি খতম্। আর একটু কিছু বাড়াবাড়ি হলেই বলবে—নার্সিং-হোমে যাও—। ওই একটা ব্যবসা হয়েছে আজকাল ডাক্তারদের—

খাওয়ার মাঝপথেই টেলিফোনের ঘণ্টা বেজে উঠলো। নন্দিতা রিসিভারটা ধরতে যাচ্ছিল, কিন্তু মুক্তিপদ বললেন—না, ধোর না, বাজুক। সারাজীবন যদি টেলিফোনই ধরতে হয় তাহলে জীবন যে নরক হয়ে যাবে—

কিন্তু ততক্ষণে টেলিফোনটা ধরলে বাড়ির কাজের লোক।

নন্দিতা জিজ্ঞেস করলে—কে রে? কে টেলিফোন করছে?

লোকটা বললে—রং নাম্বার—

বাঁচা গেল! মুক্তিপদ আবার নিজের খাওয়ার দিকে নজর দিলেন। খেয়ে নিয়েই আবার ফ্যাক্টরিতে দৌড়তে হবে। সেখানে এখন কী কাণ্ড হচ্ছে কে জানে! তেমন কিছু হলে নাগরাজন একটা খবর দিতই।

হঠাৎ হুড়-মুড় করে এসে হাজির হলো পিপি। হাঁফাচ্ছে তখনও। রোজই এই সময়ে সে আসে। আজকে এ-সময়ে বাবাকে বাড়িতে দেখে সে অবাকও হলো, আবার তার আনন্দও হলো।

বললে—বাবা, আজকে কাজিনকে দেখলুম! কাজিন-ব্রাদার—

—কাজিন? কাজিন মানে?

পিপি বললে—মানে তোমার ব্রাদারের ছেলে!

—কে? সৌম্য? কোথায় দেখলে তাকে?

—আমাদের স্কুলে।

—সে কী? কেন?

মুক্তিপদ পিপিদের স্কুলে সৌম্যকে যেতে শুনে অবাক হয়ে গেলেন। এখন তো সৌম্যর ফ্যাক্টরিতে থাকার কথা। এমন সময়ে সে মেয়েদের স্কুলে যায় কেন? মেয়েদের স্কুলে তার কী কাজ?

পিপি বললে—আমাদের স্কুলে যে স্টুডেন্টটা পড়ে তার সঙ্গে আমার কাজিন-ব্রাদার দেখা করতে এসেছিল—

—কে স্টুডেন্ট তোমাদের স্কুলে পড়ে? নাম কী তার?

পিপি বললে—মিস্ বিশাখা গাঙ্গুলী—

—সে কে?

পিপি ঘাড় নাড়লো। বললে—তা আমি কী জানি। তার সঙ্গেই আমার কাজিন-ব্রাদারের বিয়ে হবে। এখন এনগেজমেণ্ট চলছে—

সে কী? এনগেজমেণ্ট চলছে! মুক্তিপদর হঠাৎ মনে পড়ে গেল মা'র কথা। সৌম্যর সঙ্গে যার বিয়ে হবে, তাকেই তো স্টেট্ থেকে সব খরচ-পত্র দেওয়া হচ্ছে, এ-কথা তো মা-ই তাকে বলেছিল। রাসেল স্ট্রীটের তিন নম্বর বাড়িটাতে তো তাদেরই মা-মেয়েকে পোষা হচ্ছে। সেই জন্যেই তো মাসে-মাসে এতগুলো টাকা খরচ হচ্ছে। সৌম্য তাহলে কি অফিস কামাই করে পিপিদের স্কুলেই যায়?

নন্দিতা মেয়েকে জিজ্ঞেস করলে—কী রকম দেখতে রে মেয়েটাকে?

পিপি চোখ বড়-বড় করে বললে—নাইস্, ভেরি নাইস্—ভেরি স্মার্ট—

মুক্তিপদ জিজ্ঞেস করলেন—তা তোমাকে কে বললে যে মিস্ গাঙ্গুলীর সঙ্গে তোমার কাজিন-ব্রাদারের বিয়ে হবে?

পিপি বললে—কে আবার বলবে? মিস্ গাঙ্গুলীই বলেছে।

মুক্তিপদ জিজ্ঞেস করলেন—মিস্ গাঙ্গুলী তোমাকেই বলেছে, না স্কুলের সবাইকেই বলেছে ?

পিপি বললে—সবাই-ই জানে। আণ্টিরাও জানে—মিস্ গাঙ্গুলী সবাইকেই বলেছে—

নন্দিতা মুক্তিপদকে বললে—দেখেছ কাণ্ড ? দেখ, দেখ, তোমার মা'র কাণ্ডটা দেখ—

মুক্তিপদ গম্ভীর হয়ে খাওয়া ছেড়ে উঠলেন। তাঁর কিছু ভালো লাগলো না। এদিকে রাত ন'টার আগে সৌম্যকে বাড়িতে ফিরতে হুকুম করে দিয়েছে মা আর ওদিকে দিনের বেলা অফিস কামাই করে সেই সৌম্য মেয়েদের স্কুলে গিয়ে ফূর্তি করে ?

নন্দিতা বললে—এই জন্যেই তো বিডন স্ট্রীটের বাড়ি থেকে চলে এলুম। ওখানে থাকলে পিপিও ওই তোমার ভাইপো'র মত হয়ে যেত—

পিপি বললে—জানো, আমার কাজিন্ রোজ স্কুলের সামনে গিয়ে গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে—

—তারপর ?

—তারপর মিস্ গাঙ্গুলীকে গাড়িতে তুলে নিয়ে কোথায় চলে যায় কেউ দেখতে পায় না—

মুক্তিপদ বললেন—আর মিস্ গাঙ্গুলীর যে-গাড়ি যায় সেটার কী হয় ? সেই ড্রাইভার কী করে ?

—তা জানি না—

মুক্তিপদ আর দাঁড়ালেন না। কোটটা আবার গায়ে গলিয়ে দিয়ে বাইরের দিকে এগোলেন। সমস্ত পৃথিবীটা'র ওপর যেন রাগ হলো মুক্তিপদর। শুধু ব্যক্তি-সত্তার ওপর রাগ নয়, শুধু পারবার-সত্তার উপরও রাগ নয়, যেন সমস্ত বিশ্বসত্তার ওপরই রাগ হলো তাঁর। পৃথিবীর সবাই-ই যেন মুক্তিপদর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করে দিয়েছে।

নন্দিতা পেছনে এসে দাঁড়ালো। বললে—কী হলো, আজকে ইভনিং-এ লাইট-হাউসে যাবে ?

মুক্তিপদ মুখ দিয়ে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে নিজেকে অনেক কষ্টে সামলে নিলেন। বললেন—সত্যিই তোমরা বেশ আছো—

নন্দিতা এ-কথার কী জবাব দেবে বুঝতে পারলে না। ততক্ষণে মুক্তিপদ চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছেন। মুক্তিপদ ততক্ষণে বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িতে গিয়ে উঠে পড়েছেন।

ড্রাইভার তৈরিই ছিল। সাহেব হুকুম দিলেন—চলো ফ্যাক্টরি—

কোন্ দিকটা দেখবেন মুক্তিপদ ? হেড-অফিস, না ফ্যাক্টরি, না ফ্যামিলি, না বিডন স্ট্রীট, না লণ্ডন-অফিস ? একা মানুষ জীবনের ক'টা দিক সামলাতে পারে ? একটা মানুষের তো দশটা হাত নেই, দশটা মাথাও নেই। পরমায়ুও মানুষের ধরা-বাঁধা। দেবীপদ মুখার্জীর মৃত্যু হয়েছে বিয়াল্লিশ বছর বয়েসে, দাদা শক্তিপদ মুখার্জীর মৃত্যু হয়েছে পঁচিশ বছর বয়েসে। এখন মুক্তিপদর নিজের বয়স হলো

চল্লিশ। আর কতদিন এই মেশিনটাকে বয়ে বেড়াবেন মুক্তিপদ ? আর কতদিন ?

গাড়িটা সোজা ফ্যাক্টরির দিকেই যাচ্ছিল, কিন্তু মুক্তিপদ বাধা দিলেন।

বললেন—ওরে, না না, বিডন স্ট্রীটের বাড়ির দিকে চল্, এখন আর ফ্যাক্টরিতে যাবো না—

গাড়ি আবার মুখ ঘোরালো। পশ্চিম থেকে একেবারে সোজা পুবে।
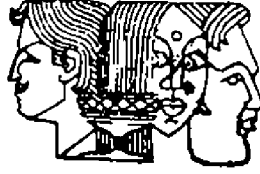
ঠাকমা-মণি দুপুর থেকেই ছটফট করছেন।

বলছেন—বিন্দু অ বিন্দু, কোথায় গেলি রে ?

বিন্দু কাছেই ছিল। সামনে এসে বললে—কী ঠাকমা-মণি, এই তো আমি—

ঠাকমা-মণি রেগে যান। বলেন—কোথায় থাকিস তোরা ? ডেকে ডেকে সাড়া পাওয়া যায় না—

বিন্দু বলে—আমি নিচেয় খবর পাঠিয়েছিলাম।

—কেন ? নিচেয় তোর কী কাজ ?

বিন্দু বলে—আপনিই তো বললেন নিচেয় খবর নিয়ে দেখতে সরকারমশাই এসেছে কিনা—

—সরকারমশাই ? সরকারমশাইকে ডাকতে তোকে কখন বললুম ? সরকারমশাই তো কাশীতে গেছে—

বিন্দু বলে—বুড়ো সরকারমশাই নয়, ছোট সরকার মশাই। আপনি তো বললেন ছোট সরকার মশাইকে ডাকতে—

—তা ছোট সরকারমশাই এলো না কেন ?

বিন্দু বলে—বাঃ, বাড়িতে নেই যে, কী করে আসবে ?

তা বটে, মুক্তি ডেকে পাঠিয়েছিল সরকারমশাইকে, তাই সন্দীপকে যেতে বলেছিলেন ঠাকমা-মণি। কিন্তু এত দেরি হচ্ছে কেন ? সামান্য যাবে আর আসবে, তাতেই এত দেরি। মনে মনে ক্ষুণ্ণ হলেন ঠাকমা মণি। কোনও কাজ কি কেউ ঠিকমত করবে না ? করলেও ঠিক সময়ে খবরটা দেবে না—

হঠাৎ বিন্দু আবার এল। বললে—ঠাকমা-মণি, মেজবাবু এসেছেন—

মেজবাবু ! ঠাকমা-মণি হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন। বলা নেই, কওয়া নেই মুক্তি আবার হঠাৎ আসতে গেল কেন ? মেজবাবু এ বাড়িতে আসা মানে যে কী তা এ-বাড়ির সবাই জানে।

মেজবাবু বরাবর এ বাড়িতে এলে যা হয় এবারও তাই হলো। চারিদিকে সাজ সাজ রব পড়ে গেল। গিরিধারী লম্বা স্যালুট দিলে। মেজবাবু গাড়ি থেকে নেমে গটগট করে ওপরে চলে গেলেন।

ঠাকমা-মণি তৈরিই ছিলেন। ছেলেকে দেখে বললেন—কী রে, তুই হঠাৎ ?

মুক্তিপদ বললেন—এলুম তোমার কাছে। কেন, আসতে নেই ?

ঠাকমা-মণি বললেন—তোর আবার এ কী কথা ? তুই তো কাজ ছাড়া আমার কাছে আসিস না, নেহাৎ দরকার না থাকলে কি তুই আসিস ?

মর্ত্তিপদ বললেন—তুমি তো আমার জ্বালাটা বুঝবে না—

ঠাকমা-মণি বললেন—রাখ, তোর জ্বালার কথা ! জ্বালা সংসারে কার নেই শুনি ? আমার নিজের জ্বালা নেই ? সব জ্বালা বুঝি একলা তোরই ?

বাড়ির নিচেয় সদর দরজার কাছে আসতেই সন্দীপের নজর পড়লো মেজবাবুর গাড়িটার ওপর। গিরিধারী সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গেট পাহারা দিচ্ছিল।

সন্দীপকেও সেলাম করলে গিরিধারী।

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—মেজবাবু এসেছেন বুঝি গিরিধারী।

—হাঁ, হুজুর—

—কতক্ষণ এসেছেন ?

গিরিধারী বললে—থোড়া পহেলে—

আর দেরি করা উচিত নয়। মেজবাবু বোধহয় সন্দীপের ওপর খুবই রাগ করেছেন।

সে যথারীতি খবর দিয়ে ওপরে গেল। ঠাকমা-মণির ঘরের সামনে বিন্দু পাহারা দিচ্ছিল। সন্দীপকে দেখে বললে—দাঁড়াও বাছা, এই একটু আগেই মেজবাবু এসে ভেতরে ঢুকেছেন—

সন্দীপ সেই বারান্দার সামনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো। ভেতরে ঠাকমা-মনির সঙ্গে মেজবাবুর কথা-বার্তা কানে আসতে লাগলো। সন্দীপ এক মনে শুনতে লাগলো কথাগুলো।

মেজবাবু বললে—জানো মা, আজকেও ইউনিয়নের লোক আমাকে হেড্-অফিসে ঘেরাও করেছিল—

—তা তোদের তো তিনটে ইউনিয়ন আছে ? তোদের কোম্পানীর ইউনিয়ন কিছু বাধা দিলে না ?

মেজবাবু বললেন—শেষ পর্যন্ত তারা বাধা দিলে বলেই তো ছাড়া পেলুম! সেই জন্যেই তো সকালবেলাটা কোনও কাজ হলো না—

ঠাকমা-মণি বললেন—এ নিয়ে অত মাথা ঘামাস কেন ? যদ্দিন ফ্যাক্টরি থাকবে তদ্দিন তো এ-সব হবেই। তোর বাবাকেও ওরা কতবার ঘেরাও করেছে। ওদের খাটিয়ে টাকা উপায় করবি আর তারা তোকে এমনি ছেড়ে দেবে ? সেই জন্যেই তো তোর বাবা অত তাড়াতাড়ি চলে গেলেন—

মেজবাবু বললে—দেখ মা, তুমি আমার নিজের মা বলেই তোমাকে এই সব কষ্টের কথা বলি। তা তুমিও যদি আমার দুঃখের কথা না শোন তো কে শুনবে আমার কথা, আর কাকেই বা এ-সব শোনাবো ? এমন কি তোমার বউমাও শুনতে চায় না এ-সব কথা। সে কেবল শিখেছে টাকা খরচ করতে, টাকা উপায় করবার যন্ত্রণার ভাগ নিতে চায় না—

ঠাকমা-মণি বললেন—কেন নেবে সে তোর যন্ত্রণার ভাগ ? তার কীসের দায় পড়েছে ? তোর টাকা দেখেই তো তোর শ্বশুর তোর সঙ্গে নিজের মেয়ের বিয়ে দিয়েছে। আমি তখন তোর বাবাকে ওখানে বিয়ে দিতে পই-পই করে বারণ করে-

ছিলুম, কিন্তু তোরা যেমন আমার কথা শুনিস না, তেমনি তোর বাবাও আমার কথা কখনও শোনেনি। এখন বোঝ ঠ্যালা—

মেজবাবু বললেন—আজকে অফিস থেকে ফিরে বাড়ি আসতেই তোমার বউমাকে সব ঘটনা বলতে তোমার বউমা কী বললে তা জানো?

—কী?

—বললে 'লাইট-হাউসে' সন্ধ্যেবেলা কী একটা হিন্দী ছবির শো আছে, সেইটে দেখতে তার সঙ্গে আমাকে যেতে হবে! ভাবতে পারো?

ঠাকমা-মণি বললে—থাক-থাক, আর বলতে হবে না। যথেষ্ট হয়েছে। আমার এখানে থেকে ও-সব বাঁদরামি চলতো না বলেই তোকে নিয়ে আলাদা সংসার করলে। তা আমার আর কী ক্ষতি করবে সে! এখন তুই বোঝ তোর কপালে অনেক কষ্ট আছে, আমি কী করতে পারি?

—হ্যাঁ, আর একটা কথা। তোমাকে আমি যে টেলিফোনে বলেছিলুম আমার অফিসে সরকারমশাইকে পাঠাতে, তার কী হলো? যায়নি তো আজ—

ঠাকমা-মণি বললেন—সে কী? যায়নি?

—না!

ঠাকমা-মণি চমকে উঠলেন। বললেন—আশ্চর্য, কাউকে একটা কাজের ভার দিয়েও কি নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে না!

তারপর ডাকলেন—বিন্দু

মেজবাবু বললেন—থাক, এখন বিন্দুকে আর ডাকতে হবে না, আমি টাকা এনেছি সঙ্গে করে, এই নাও—

বলে একটা বাণ্ডিল বাড়িয়ে দিলেন ঠাকমা-মণির দিকে। বললেন—এতে পঞ্চাশ হাজার ক্যাশ আছে—

তারপর বললেন—শোন মা, আমার পিপি আজকে একটা কথা বলছিল। পিপি যে স্কুলে পড়ে সেই স্কুলেই নাকি তোমার বউমা পড়ে—

—আমার বউমা? আমার 'বউমা' মানে?

মেজবাবু বললেন—তোমার 'বউমা' নেই। দু'দিন পরে সেই মেয়েই তো তোমার নাত্-বউ হবে। যাকে তুমি আমাদের রাসেল স্ট্রীটের বাড়িতে পুষছো। সেই তার কথা বলছি—

ঠাকমা-মণি বললেন—হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝেছি। বিশাখা! সৌম্যর সঙ্গেই তো বিয়ে হবে, তা তার কী হয়েছে?

—সে আর পিপি একই স্কুলে পড়ে। তা পিপি কী বলছিল জানো?

—কী?

মুক্তিপদ বললেন—সেই স্কুলে নাকি সৌম্য রোজ যায়।

—আমার সৌম্য? সে বিশাখাদের ইস্কুলে যায়?

মুক্তিপদ বললেন—তাই-ই তো পিপি বললে। আমার এ্যাকাউনটেণ্ট নাগরাজন বলছিল সৌম্য নাকি আজকাল নিয়ম করে অফিসেও যায় না। এখন বুঝতে পারছি সৌম্য অফিস থেকে বেরিয়ে কোথায় যায়!

ঠাকমা-মণির মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল।

মুক্তিপদ আবার বলতে লাগলেন—তুমি তো নিয়ম করে দিয়েছো রাত ন'টার সময় গিরিধারী সদর-গেট বন্ধ করে দেবে, যাতে তোমার নাতি তার আগে বাড়িতে ঢুকে পড়ে। তা তো হলো, কিন্তু দিনের বেলায় সে কী করছে তা তো তুমি চোখে দেখতে পাচ্ছো না। এখন এই অবস্থায় তুমি কী করবে বলো?

এবারও ঠাকমা-মণির গলা শোনা গেল না। সন্দীপ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ সব কথা শুনছিল। এবার তার কেমন অস্বস্তি হতে লাগলো। তার ভয় করতে লাগলো। যদি হঠাৎ কেউ তাকে এই অবস্থায় দেখে ফেলে! যদি হঠাৎ ধরা পড়ে যায় সে! লুকিয়ে লুকিয়ে বাড়ির মালিকদের কথা শোনা তো পাপ! আর তা ছাড়া, সৌম্যবাবু যে বিশাখাদের স্কুলে যায়, বিশাখাকে গাড়িতে তুলে নিয়ে অন্য জায়গায় যায়, তা তো সন্দীপ জানে। যদি জানে সে তো সে-কথা ঠাকমা-মণিকে জানায়নি কেন? তার কাজই তো রাসেল স্ট্রীটের বাড়ির সব খবর রোজ এসে ঠাকমা-মণিকে জানানো। কিন্তু সে তো তা জানায়নি। সে তো তার কাজে গাফিলতি করেছে!

হঠাৎ বিন্দু এসে বললে—সরকারবাবু, ঠাকমা-মণি আপনাকে ভেতরে ডাকছেন—

সন্দীপের মাথা থেকে পা পর্যন্ত সর্বাঙ্গ থর থর করে কেঁপে উঠলো? বলির পাঁঠার মত সে ভেতরে গিয়ে হাজির হলো।

মুক্তিপদ তাকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন—এই যে তুমিই সরকারমশাই-এর কাজ দেখা শোনা করছো?

সন্দীপ মাথা নাড়লো। বললে—হ্যাঁ—

—তা আজকে সকালে তো তোমার যাওয়ার কথা ছিল আমার হেড অফিসে? যাওনি কেন?

সন্দীপ বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ, গিয়েছিলুম—

মুক্তিপদ বললেন—আবার মিথ্যে কথা বলছো? তুমি যাও নি—

সন্দীপ বললে—আমি যখন গিয়েছিলুম তখন ওখানে খুব বোমা মারামারি চলছিল, গাড়ি, বাস, ট্রাম সব কিছু বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সব লোক পালাচ্ছিল চারদিকে—তাই—

ঠাকমা-মণি কথার মাঝখানে বলে উঠলেন—এই বয়সেই এত মিছে কথা বলতে শিখে গেছ? একটা কাজ কি তোমাদের কাউকে দিয়ে হবে না? যদি কাজ করতে ইচ্ছে না থাকে তো এ কাজ ছেড়ে দাও। আমি কাউকে জোর করে—

মুক্তিপদ বললেন—হ্যাঁ, আমার অফিসের সামনে বোমা মারামারি হচ্ছিল বটে, তুমি কি সেই সময় গিয়েছিলে?

ঠিক কথার মাঝখানেই বিন্দু আবার ঘরে ঢুকলো। বললে—ঠাকমা-মণি, সরকারমশাই কাশী থেকে ফিরে এসেছেন।

ঠাকমা-মণি বললেন—সে কী? কে বললে?

—ওই তো দোতলার কালিদাসী এখুনি বললে—

ঠাকমা-মণি জিজ্ঞেস করলেন—তা কালীদাসী কার কাছ থেকে শুনলে?

বিন্দু বললে—একতলার ফুল্লরা খবর দিয়েছে ওকে—

—তা কাশীর ট্রেন এই দুপুর বেলায় কলকাতায় এল কেন?

সে কথার উত্তর বিন্দু বা কালিদাসী কিংবা ফুল্লরা কী করে দেবে ?

মুক্তিপদ জিজ্ঞেস করলেন—সরকারমশাইকে কোথায় পাঠিয়েছিলে ?

ঠাকমা-মণি বললেন—কাশীতে—

—কেন ?

ঠাকমা-মণি বললেন—ওমা, তুই কিছুই জানিস নে ? তোকে আমি আগেই বলেছিলুম, তোর মনে নেই। কাশীতে আমার গুরুদেবকে চিঠি লেখা হয়েছিল সৌম্যর বিয়ের তারিখ, সময়, লগ্ন ঠিক করতে। সেখান থেকে উত্তর আসতে দেরি দেখে আমি মল্লিক-মশাইকে পাঠিয়েছিলাম। সেই তিনি কাশী থেকে এখন এলেন—

তারপর বিন্দুকে বললেন—যা বিন্দু, ফুল্লরাকে বলতে বল, যেন সরকারমশাই সোজা ওপরে চলে আসেন। মেজবাবুও এখানে বসে আছেন—

মুক্তিপদ ঠাকমা-মণিকে জিজ্ঞেস করলেন—তাহলে কি শেষ পর্যন্ত তোমার সৌম্যের সঙ্গে ওই মেয়েরই বিয়ে দেবে ?

ঠাকমা-মণি বললেন—তা বিয়ে দেব না কি মিছিমিছি আমি এত হাজার-হাজার টাকা খরচ করে ওই পাত্রীকে পুষছি। পয়সা কি আমার এত সস্তা ?

সন্দীপের বুকটা তখনও দুরু-দুরু করছিল।

মুক্তিপদ সন্দীপকে বললেন—তুমি আর মিছি-মিছি দাঁড়িয়ে আছ কী করতে ? তুমি এখন এসো—

সন্দীপ যেন ছাড়া পেয়ে বাঁচলো। মনে আছে তার নিজেরও তখন জানতে ইচ্ছে করছিল কাশীর গুরুদেব কী বলেছেন ? সৌম্যবাবুর বিয়ের ব্যাপারে তিনি কী রায় দিলেন। বিলেত যাওয়ার আগে সৌম্যবাবুর বিয়ে কি হবে ?

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে দোতলার সিঁড়ির মধ্যে দেখা হয়ে যায় মল্লিক-কাকার সঙ্গে।

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—কী কাকা, এত দেরি করে এলেন যে ?

মল্লিক-কাকা বললেন—আরে, বলো কেন, ট্রেন আট ঘণ্টা লেট—

বলে ওপরের দিকে উঠতে লাগলেন।

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—সৌম্যবাবুর বিয়ের তারিখ ঠিক হলো ?

মল্লিক-কাকা বললেন—সে তোমায় পরে বলবো—আমি আসছি—

বলে তিনি যেমন ওপরে উঠছিলেন তেমনিই উঠতে লাগলেন।

তপেশ গাঙ্গুলী তখনও হাল ছাড়েনি। মাঝে মাঝে বউদির কাছে আসে, রসগোল্লা পান্তুয়া খায় আর বসে বসে নিজের বাড়ির দুঃখ-দারিদ্র্যের কথা সবিস্তারে বলে যায়।

বলে—আমি অনেক পাপ করেছি বউদি, তাই আমার এই কষ্ট। তুমি যদ্দিন আমার কাছে ছিলে ততদিন আমার কোনও কষ্ট ছিল না। দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা দিইনি, তাই আজ আমার এই ভোগান্তি—

যোগমায়া দেওরকে সান্ত্বনা দেয়। বলে—না ঠাকুরপো, তুমি কিছু দুঃখ করো না। আমার বিশাখার বিয়েটা হয়ে গেলেই আমি আবার তোমার সংসারে চলে যাবো! তখন তো আমি ঝাড়া হাত-পা মানুষ। আমি আবার তোমার সংসারে গিয়ে সব ভার নিজের মাথায় তুলে নেব—

তপেশ গাঙ্গুলী যোগমায়ার পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় ঠেকাতো।

বলতো—আমার মা নেই বউদি, তুমি আমায় আশীর্বাদ করো আমার যেন অফিসে মাইনে বাড়ে—

যোগমায় বলতো—আমি কে ঠাকুরপো, ভগবানকে ডাকো, ডাকার মত ডাকতে পারলে ভগবান সাড়া না দিয়ে থাকতে পারেন না—দাঁড়াও তোমাকে কিছু খেতে দিই—

তপেশ গাঙ্গুলী যেদিনই আসতো কিছু-না-কিছু না-খেয়ে যেত না। রসগোল্লা আসতো, কখনও নোনতো খাবার।

তপেশ গাঙ্গুলী বলতো—তোমার বাড়িতে আজ কী রান্না হয়েছে বউদি?

যোগমায়া বলতো—আমাদের শৈলই তো বাজার করে। সে যা বাজরে পায় তাই-ই আনে। আজকে ভেটকী মাছ এনেছিল, তারই কালিয়া করেছিলাম। তুমি খাবে?

তপেশ গাঙ্গুলী বলতো—তুমি নিজের হাতে তুলে যা দেবে তাই-ই আমার কাছে অমৃত। তবে বিশাখার মাছ কম পড়বে না তো?

যোগমায়া বলতো—না, না, বিশাখা না হয় একটা দিন মাছ কমই খেল। ও তো আদ্দেক দিন খেতেই চায় না, আমি জোর করে গিলিয়ে গিলিয়ে খাওয়াই—

তপেশ গাঙ্গুলী বলতো—ঠিক করো, তুমি ঠিক করো। আগে স্বাস্থ্য, তার পরে সব। আর তুমি তো আমাকেও গিলিয়ে খাওয়াও—

যোগমায়া বলতো—দাঁড়াও, আমি তোমাকে মাছের কালিয়া দিচ্ছি, তার পরে তোমার জন্যে একটু মিষ্টি—

এ-বাড়িতে যতদিন তপেশ গাঙ্গুলী এসেছে ততদিন কিছু না-কিছু খেয়ে গেছেই। একদিনও যোগমায়া দেওরকে না খাইয়ে ছাড়েনি।

তপেশ গাঙ্গুলী বলতো—আহা, কী চমৎকার রান্না তোমার মাছের কালিয়া—

—আর দুটি ভাত নেবে ঠাকুরপো?

তপেশ গাঙ্গুলী বলতো—তোমার ভাতে কম পড়বে না তো?

যোগমায়া বলতো—কী বলছো তুমি ঠাকুরপো, তোমার ক্ষিধে পেয়েছে, তুমি মুখ ফুটে খেতে চাইছো আর আমি তোমাকে না-খাইয়ে ছেড়ে দেব?

—না, মানে তোমাদের তো মাপা ভাত, তার থেকে একজন লোক খেলে তো তোমাদের কম পড়ে যেতে পারে!

যোগমায়া বলতো—কী যে বলো তুমি ঠাকুরপো তার ঠিক নেই। ভাত কম পড়লে না-হয় আবার ভাত রাঁধবো।

তারপর বলতো—তা পেট ভরে তোমার খাওয়া হয় না-ই বা কেন ঠাকুরপো ? আমি থাকতে তো কোনদিনও তোমাকে না-খেয়ে থাকতে হয়নি।

তপেশ গাঙ্গুলী বলতো—সে সব পুরোন কথা থাক বউদি। যে-যেমন কপাল করে এসেছে তাই-ই তো তার হবে। পেট ভরে খাওয়া আমার কপালে না-থাকলে আমি কী করবো ?

তারপর তপেশ গাঙ্গুলীর সামনে ভাতের থালা আসতো, নতুন করে আর একটা মাছের টুকরোও আসতো। আর তপেশ গাঙ্গুলী তা চেটে-পুটে খেয়ে ফেলতো।

যোগমায়া জিজ্ঞেস করতো—তুমি আজ আপিস যাবে না ?

তপেশ গাঙ্গুলী বলতো—যাবো বইকি। তবে সরকারী আপিস তো! দেরি করে আপিসে গেলে আমাদের কোনও ক্ষতি হয় না—

তারপর বাথরুম থেকে হাত মুখ ধুয়ে এসে নিজের জায়গায় বসে বলতো—বিশাখার বিয়ের কদ্দুর বউদি ? কথাবার্তা এগুচ্ছে ?

যোগমায়া বলতো—শুনছি তো এগুচ্ছে! তা সবই তো ভগবানের ইচ্ছে ঠাকুরপো, আমি আর কি বলবো ? তাঁর যদি ইচ্ছে হয় তো হবে! এদিকে তোমার বিজলী কেমন আছে ?

তপেশ গাঙ্গুলী বলতো—বিজলীর কথা আর কি বলবো বউদি, মেয়ে যত বাড়-বাড়ন্ত হচ্ছে আমার বুক তত ভয়ে দুর-দুর করে কাঁপছে—কী হবে বুঝতে পারছি না—

যোগমায়া বলতো—তাঁকে ডাকো, সব ঠিক হয়ে যাবে—

—তুমি তো বলেই খালাস! আমার যে কী জ্বালা সে আমিই জানি। আমি মেয়ের মুখের দিকে আর চেয়ে দেখতে পারি না।

যোগমায়া বলতো—মেয়ের বাপ যখন হয়েছ তখন জ্বালা তো তোমাকে সহ্য করতে হবেই—

তপেশ গাঙ্গুলী সেদিন এসে বললে—তুমি আমার একটা কাজ করবে বউদি ?

—কী কাজ বলো ?

কথাটা বলে তপেশ গাঙ্গুলী নিজের ব্যাগ থেকে একটা কৌটো বার করলে।

—এটা কী !

—এ একটা টিনের কৌটো। এই দেখ কৌটোর মাথার ওপর একটা গর্ত আছে, দেখেছ ?

—হ্যাঁ, দেখেছি—

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—আমার মেয়ের বিয়ের জন্যে আমি এই কায়দাটা করেছি—বলে তার কায়দাটা বুঝিয়ে দিলে। বললে—এই টিনের কৌটোটার মুখের ঢাকনাটা রাংঝাল দিয়ে এঁটে দিয়েছি—

যোগমায়া তবু ব্যাপারটা ঠিক স্পষ্ট বুঝতে পারলে না। বললে—এতে কী হবে ?

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—এর মাথায় একটা লম্বা ফুটো আছে দেখতে পাচ্ছো তো ?

যোগমায়া বললে—তা তো দেখতে পাচ্ছি—

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—এই ফুটো দিয়ে আমি এর ভেতরে যত ইচ্ছে টাকা-পয়সা-নোট ফেলবো। এর ঢাকনা না ভাঙলে তো আর এই সব টাকা-পয়সা ভেতর থেকে বার করা যাবে না। তার মানে টাকা গুলো সব জমবে, ইচ্ছে করলেও খরচ করা যাবে না। ধরো রোজ যদি এর ভেতরে কিছু কিছু টাকা ফেলি, তাহলে কিছুদিন পরে অনেক টাকা জমে যাবে। এক মাসে যদি পঞ্চাশ টাকাও জমে তাহলে বছরে মোট কত টাকা হয়? বছরে হয় ছ'শো টাকা। তা হলে বছরে ছ'শো টাকা হলে পাঁচ বছরে মোট কত টাকা হবে? হবে তিন হাজার টাকা! হবে না?

যোগমায়া অত হিসেব-টিসেব বোঝে না। বললে—তা তো হবেই—

—তাহলে আর পাঁচ বছর পরেও যদি বিজলীর বিয়ে দিই, তাহলে তিন হাজার টাকা যবলগ আমার হাতে এসে গেল। গেল না?

যোগমায়া বললে—তা তো এসে গেলই—

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—তাহলে বুঝে দেখ ওই তিন হাজার টাকার জন্যে কারোর কাছে আর আমাকে হাত পাততে হলো না। এটা কি আমার কম লাভ? বলো?

যোগমায়া স্বীকার করতে বাধ্য হলো যে এটা কম লাভ নয়।

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—আমি ক'মাস ধরে রাতে বিছানায় শুয়ে শুয়ে কেবল ভাবতুম আমি মেয়ের বিয়ের টাকা কোথেকে যোগাড় করবো? কে আমায় টাকা ধার দেবে? শেষকালে ভগবানের জুগিয়ে দিলে! তারপরেই আজ সকাল বেলা দোকানে গিয়ে এই কৌটোটা বানিয়ে নিয়ে তোমার কাছে এলুম—। এখন বলো আমার কায়দাটা কেমন? ভালো নয়?

যোগমায়াও জানিয়ে দিলে যে দেওরের কায়দাটা ভালো।

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—কিন্তু তোমার ছোট জা' যে-রকম আখ্‌খুটে মানুষ, বাড়িতে এ কৌটো রাখলে কোন্‌দিন এটা ভেঙে টাকা বার করে নেবে। আর তাই দিয়ে নিজের একটা-না-একটা গয়না গড়িয়ে ফেলবে, তখন আমি কিছু বলতে পারবো না। তাই ভেবেছি এটা আমি তোমার এখানে রেখে যাবো—

যোগমায়া বললে—তা রেখে যাও না—

—হ্যাঁ, মানে তুমিও এই ফুটোর মধ্যে সুবিধে মতন টাকা পয়সা যা বাড়তি হাতে থাকবে ফেলতে পারবে। হাজার হোক, বিজলী তো তোমার পর নয়, তোমার নিজের দেওর-ঝি। তার বিয়েতে তো তোমারও কিছু আশীর্বাদী দিতে হতো। বলো ঠিক কি না—

যোগমায়া বললে—তা তো ঠিকই, বিজলীও তো আমার নিজের পেটের মেয়ের মতন—

কথাটা শুনে তপেশ গাঙ্গুলীর মুখে হাসি আর ধরে না। বললে—কেমন ভগবান বুদ্ধিটা মাথায় জুগিয়ে দিলে বলো তো বউদি? বিজলীর বিয়ের সময় তোমারও আশীর্বাদী দিতে কিছু গায়ে লাগবে না আমাকেও আর অফিসের কো-অপারেটিভ থেকে টাকা ধার করতে হবে না—

যোগমায়া জিজ্ঞেস করলে—বিজলীর পাত্র খুঁজছো নাকি তুমি?

—খুঁজছি মানে? গরু খোঁজা করে বেড়াচ্ছি। খবরের কাগজে বক্স-নাম্বার

দিয়ে বিজ্ঞাপনও দিচ্ছি—কিন্তু আমার কপাল কি আর তোমার মতন বউদি ?

ততক্ষণে তপেশ গাঙ্গুলীর কার্যসিদ্ধি হয়ে গেছে।

তপেশ গাঙ্গুলীরা সারা দিন কার্যসিদ্ধির উদ্দেশ্য নিয়েই ঘোরাঘুরি করে আর কার্যসিদ্ধি হয়ে গেলেই তাদের অন্তর্ধান হয়ে যায়। তপেশ গাঙ্গুলীর খাওয়াও হয়ে গিয়েছিল আর তার সঙ্গে অর্থ-প্রাপ্তির একটা সুনিশ্চিত পন্থাও সে আবিষ্কার করে তার একটা সুসমাধানও করে ফেলেছিল। সুতরাং তার আর উপস্থিতির প্রয়োজন ছিল না।

—বুঝলে বউদি, আসছে অনেক পাত্র, কিন্তু সব অন্য জাত। বামুনের পাত্র-গুলো সব কোথায় গেল বলো তো ?

তারপর একটু থেমে বললে—যাহোক, তুমি কিন্তু বউদি এখন থেকেই ওই কৌটোটার ফুটো দিয়ে টাকা পয়সা ফেলতে আরম্ভ করে দাও, বুঝলে ?

পেছন থেকে শৈল এসে বলাল—মা, আর এক হাঁড়ি ভাত চাড়িয়ে দেব ?

যোগমায়া বললে—কেন, ভাত কি সব ফুরিয়ে গেল না কি ?

শৈল বললে—হ্যাঁ, ভাত আমাদের কম পড়বে—

তপেশ গাঙ্গুলীর কানে কথাগুলো যেতেই বললে—সে কি ? আমি তোমাদের সব ভাত ফুরিয়ে দিয়ে গেলুম নাকি ? তোমাদের আর ভাত নেই ?

যোগমায়া বললে—না না, তোমার খিধে পেয়েছিল, তুমি খেয়েছ। ভাত না হয় আবার চড়ানো হবে, তাতে কী ?

—ছি ছি, কী কাণ্ড দেখ দিকিনি! আমাকে বলবে তো যে তোমাদের ভাতে কম পড়বে। তাহলে আমি খেতুম না—

যোগমায়া শৈলকে বললে—এ কী রকম আক্কেল গা তোমার মেয়ে ? আমার দেওরের সামনে ভাতের কথা বলতে হয় ? কথাটা পরে বললে চলতো না ?

এ-কথার পর শৈল আর সেখানে দাঁড়ালো না।

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—তাহলে তো তোমার খুব ক্ষতি করে দিলুম বউদি ! আহা, আমার মোটে খেয়ালই ছিল না—ছি ছি—

ঠিক সেই সময়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এল সন্দীপ।

—কী ভায়া, খবর সব ভালো তো ?

সে কথার উত্তর না দিয়ে সন্দীপ বললে—মাসিমা, খবর আছে·····

তপেশ গাঙ্গুলীর আর যাওয়া হলো না। বললে—কী খবর ভায়া ? বিশাখার বিয়ের খবর ?

সন্দীপ বললে—হ্যাঁ—

বলে ভেতরে ঢুকলো। তপেশ গাঙ্গুলীরও যাওয়া হলো না। এত বড় খবরের পুরোটা না শুনে সে যেতে পারে না—

যোগমায়া সব কিছু শোনবার জন্যে উদগ্রীব হয়েই ছিল। বললে—খবরটা কী খুলে বলো বাবা, বিয়ে হবে তো— ?

সন্দীপ বললে—না।

—না মানে ? বিশাখার বিয়ে হবে না ? কী আশ্চর্য এত কাণ্ডের পর······

তপেশ গাঙ্গুলী তখন বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। বিশাখার বিয়ের ব্যাপারে

যেন আর সকলের চেয়ে তপেশ গাঙ্গুলীরই বেশি দায়। বললে—সত্যিই বিশাখার বিয়ে হবে না ও-বাড়িতে ? সত্যি বলছো ? তাহলে তো তুমি আমাকে বড় ভাবনায় ফেললে ভায়া—

সন্দীপ বললে—না, ওখানেই বিয়ে হবে।

—তার মানে ?

সন্দীপ বললে—ঠাকমা-মণি সরকার মশাইকে কাশীতে পাঠিয়েছিলেন তাঁর গুরুদেবের মতামত আনতে। তা এখন সরকার মশাই সেই গুরুদেবের মতামত নিয়ে এসেছেন—

তপেশ গাঙ্গুলী জিজ্ঞেস করলেন—কী মতামত দিয়েছেন গুরুদেব ? বিয়ে হবে না ?

সন্দীপ বললে—না, হবে না—

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—আমি তখনই জানতুম! তোমাকে তো আমি পই-পই করে বলেছিলুম বউদি যে বড়লোকদের কথায় ভুলো না তুমি, বড়লোকদের কথার কখনও ঠিক থাকে না। বলিনি ?

সন্দীপ বললে—বিয়ে হবে না কে বলেছে ? বিয়ে তো হবে।

—বিয়ে হবে ?

সন্দীপ বললে—হ্যাঁ, আলবৎ হবে। গুরুদেব নিজে কুষ্ঠি দেখে বিচার করে দেখেছেন, বলেছেন এ বিয়ে হলে বর কনে দুজনেরই সুখের হবে! কিন্তু পাত্রের কুষ্ঠিতে একটা খারাপ যোগ আছে, তাই বছর দেড়েক দেরি করতে বলে দিয়েছেন—

—দেড় বছর বাদে ?

যোগমায়ার মুখটা শুকিয়ে গেল খবরটা শুনে। আরো দেড় বছর বাদে ? ততদিন কি যোগমায়া বাঁচবে ? ততদিন কি ঠাকমা-মণিই বাঁচবেন ? দেড় বছরে পৃথিবীর কত কী পরিবর্তন ঘটে যেতে পারে। কত ভূমিকম্পতে কত দেশ ধ্বংস হয়ে যেতে পারে, কত আগ্নেয়গিরিতে আগুন লেগে কত জনপদ নিশ্চিহ্ন হতে পারে আকাশে কত নক্ষত্র স্থানচ্যুত হয়ে কত উল্কাপাত ঘটাতে পারে। দেড় বছর কি অল্প সময় ?

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—তা হলে আর বিয়ে হচ্ছে না, এ তুমি দেখে নিও—। বড়লোকের খেয়াল, হতেও যেমন যেতেও তেমনি—

সন্দীপ অভয় দিলে—না মাসিমা, আপনি ভাববেন না। সৌম্যবাবু বিলেত থেকে ফিরে এলেই বিয়ে হবে। ঠাকমা-মণি নিজে কথা দিয়েছেন—

তপেশ গাঙ্গুলী তখনও দাঁড়িয়ে ছিল। বললে—ভায়া, আমারও তো বয়েস কম হলো না, আমিও অনেক দেখেছি। কথায় আছে না যে 'বড়র পিরিতি বালির বাঁধ', এও হয়েছে তাই—

সন্দীপ আর থাকতে পারলে না, বললে—আপনার তো আপিস আছে, আপনি অফিসে যাবেন না ?

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—আমার তো ভাই সরকারী আপিস, আমাদের আপিসে অনেক লোক, আমি না গেলেও গাড়ির চাকা চলবে—

সন্দীপ বললে—এই আপনাদের জন্যেই তো আজ রেল গাড়ি ঠিক সময়মত চলে না, আপনাদের জন্যেই তো রেলে এত এ্যাকসিডেন্ট্ হয়—দোষ তো আপনাদেরই, আর আপনারা গভর্মেণ্টের দোষ দেন কথায়-কথায়—

তপেশ গাঙ্গুলী হয়ত সন্দীপের এ-কথার একটা জবাব দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু যোগমায়া মাঝখানে বাধা দিয়ে বলে উঠলে—হ্যাঁ ঠাকুরপো, সত্যিই তো, আমাদের জন্যে তুমি কেন আপিস কামাই করবে, তুমি আপিস যাও, তোমার দেরি হয়ে যাচ্ছে—। আমাদের কপালে যদি দুঃখু থাকে তো তুমি কী করবে?

এর পর তপেশ গাঙ্গুলী বাধ্য হয়ে চলে গেল।

যেন এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হলো সন্দীপ। বললে—আপনার দেওরের জন্যে এতক্ষণ ভালো করে কথাই বলতে পারছিলুম না। আপনাদের খিদিরপুরের বাড়ি থেকে চলে এসেও দেখেছি এদের কাছ থেকে আপনাদের রেহাই নেই।

যোগমায়া বললে—ওদের কথা ছেড়ে দাও তুমি বাবা, বিশাখার বিয়ের সম্বন্ধে কী-কী শুনে এলে তাই বলো তুমি—

সন্দীপ সবিস্তারে সবই বলে গেল। মেজবাবু বড্ড ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন তাঁর কারবার নিয়ে। লণ্ডন অফিসের একজন বড় অফিস্যার হঠাৎ মারা যাওয়াতে সেখানে দেখবার তেমন লোক নেই। মেজবাবুরই সেখানে গেলে ভালো হতো, কিন্তু এদিকে কলকাতার অফিস নিয়েও মহা গোলমাল বেধেছে। ইউনিয়নে-ইউনিয়নে খুব ঝগড়া-মারামারি, বোমাবাজি চলছে। মেজবাবুকে ইউনিয়নের লোক তার অফিসে কয়েক ঘণ্টা ঘেরাও করে রেখেছিল। তাতে মেজবাবুর শরীরও খুব খারাপ। সৌম্যবাবুকে শেষ পর্যন্ত লণ্ডনে পাঠানোর স্থির হয়েছে। ঠাকমা-মণি তো চেয়েছিলেন সৌম্যবাবুর বিয়ে দিয়ে তবে লণ্ডনে পাঠাবেন। কিন্তু গুরুদেবের অনুমতি না পেয়ে তো তিনি কিছু করতে পারেন না—

যোগমায়া জিজ্ঞেস করলে—তা গুরুদেব কুষ্ঠিতে কী দোষ পেয়েছেন?

সন্দীপ বললে—সৌম্যবাবুর কুষ্ঠিতে নাকি 'কাল-সর্প-যোগ' আছে। তাই এখন বিয়ে দিতে বারণ করেছেন—

—'কাল-সর্প-যোগ' মানে?

—মানে আমি কি করে জানবো মাসিমা? মল্লিকমশাই-এর মুখ থেকে যা শুনেছি তাই আমি আপনাকে বললুম—

—কবে সেই যোগ কাটবে?

– দেড় বছর বাদে। এখন থেকে দেড় বছর বাদে বিয়ে হলে নাকি সব দোষ কেটে যাবে।

দেড় বছর! যোগমায়ার মুখটা শুকিয়ে গেল। বললে—তাহলে আর বিশাখার বিয়ে হয়েছে! আমি তো আগেই বলেছিলুম আমার কপালে কি অত সুখ আছে? আর জম্মে আমি কত পাপ করেছিলুম ভগবানের কাছে, তাই এ জম্মে আমার এত দুর্ভোগ!

সন্দীপ হঠাৎ বললে—তা আজ বিশাখার ইস্কুল থেকে আসতে এত দেরি হচ্ছে কেন মাসিমা? ওর তো আসার সময় হয়ে গেছে—

যোগমায়া বললে—আজকাল প্রায়ই ওর এমনি দেরি হয়।

—হ্যাঁ, একটা কথা—

বলে সন্দীপ বললে—আর একটা কথা শুনে এলুম ও বাড়ি থেকে—

—কী কথা ?

হঠাৎ দরজার কলিং-বেলটা বেজে উঠলো। যোগমায়া বললে— ওই বোধহয় ও এসেছে—

কিন্তু দরজাটা খুলে দিয়ে দেখা গেল—না, বিশাখা নয়, অরবিন্দ। বিশাখার ভাই তার।

অরবিন্দ আগের দিনের মত সেদিনও বললো—মা ছোটবাবু খুকুদিদিকে নিয়ে গেছেন, আমি বাড়ি যাচ্ছি, ছোটবাবু পরে নিজেই খুকুদিদিকে বাড়ি পেঁছে দেবেন—

সন্দীপ সব শুনলো। বললে—এই রকম রোজ হয় নাকি মাসিমা ?

যোগমায়া বললে—হ্যাঁ বাবা, আর একদিন হয়েছিল—

সন্দীপ কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বললে—সেই কথাই তো শুনে এলুম ও বাড়ি থেকে—

—কী শুনে এলে বাবা ?

সন্দীপ বললে—মেজবাবু সব ব্যাপারটা জেনে গেছেন—

—কী রকম ?

সন্দীপ বললে—মেজবাবু ঠাকমা-মণিকে এই কথাই বলছিলেন। মেজবাবুর মেয়ে যে ইস্কুলে পড়ে বিশাখাও সেই একই ইস্কুলে পড়ে। মেজবাবুর মেয়ে বাবাকে বলে দিয়েছে যে সৌম্যবাবু নাকি রোজই ওদের ইস্কুলে গিয়ে বিশাখাকে গাড়িতে তুলে নিয়ে কোথায় যায়—

—কোথায় যায় ?

—হোটেল-টোটেল কোথাও বোধহয় নিয়ে গিয়ে বিশাখার সঙ্গে কথা-টথা বলে। বিশাখা কিছু বলেছে আপনাকে ? আপনি কিছু জানেন ?

যোগমায়া বললে—হ্যাঁ, এই আগের দিন বিশাখা বলছিল আমাকে। আমি তো শুনে খুব ভয় পেয়ে গেছি বাবা। শেষকালে বিয়েটা যদি আটকে যায় ? তা তোমার ঠাকমা-মণি শুনে কী বললেন ?

সন্দীপ বললে—তা আমি শুনতে পাইনি। আমিও তো তাই আপনাকে জিজ্ঞেস করছি। রোজ সৌম্যবাবুর সঙ্গে লুকিয়ে লুকিয়ে মেলামেশা করা কি ভালো, আপনিই বলুন ?

যোগমায়া বললে—আমিও তো তাই ভাবছি। পোড়ারমুখী নিজের ভালো বুঝতে শেখেনি, এমন বোকা মেয়ে নিয়ে আমি কি করি বলো তো বাবা ?

সন্দীপ নিজেও সেই একই কথা ভাবছিল। সেদিন গোপাল হাজরার সঙ্গে নাইট-ক্লাবে গিয়ে দেখা দৃশ্যটার কথাও তার মনে পড়লো। সেই সৌম্যবাবুর সঙ্গে বিয়ে হলে কি বিশাখা সুখী হবে ? যে লোক মদ খেয়ে মাতলামি করে আর অত রাতে বাড়ি ফেরে, তার স্ত্রীর জীবন কি সুখের হবে ?

তাহলে 'চরিত্র' কথাটার মানে কী ? মদ খাওয়া, মদ খেয়ে মাতলামি করা, নাইট-ক্লাবে গিয়ে অর্ধ-উলঙ্গ মেয়েদের সঙ্গে স্ফূর্তি করা কি চরিত্রহীনতা

নয় ? সন্দীপ কি জেনে শুনে সৌম্যবাবুর সঙ্গে বিশাখার এই বিয়ে অনুমোদন করবে ?

তারপর আবার তার মনে হলো—দরকার কী তার এসব ব্যাপারে জড়িয়ে পড়বার, সে পরের বাড়িতে অন্নদাস, তার বিধবা মা দেশে পরের বাড়িতে রান্না করে জীবিকা চালায়, সে বলতে গেলে পৃথিবীতে অনাথ। তার এসব ব্যাপারে মাথা ঘামানোর দরকারটা কী ? সে তো নিজের পায়ের ওপর দাঁড়াবার চেষ্টা করতেই প্রাণান্ত। সে তো গোপাল হাজরা নয় যে সৎ অসৎ-বিচার না করে বড় বড় মিনিস্টারদের সঙ্গে মেলামেশা করাকেই জীবনের পরমার্থ বলে মনে করবে। কিংবা সে সুশীল সরকারও নয় যে যে কোনও একটা পার্টির মেম্বার হয়ে জীবনে উন্নতি করবার প্রথম দৃঢ় সোপান বলে মনে করবে! তাহলে তার নিজের পথটা কী ? কোন্ পথে সে যাবে ? কোন্ পথকে সে সংসারে শ্রেষ্ঠ পথ বলে বরণ করে নেবে ? কোন্ পথে গেলে সে আদর্শ 'চরিত্র' খুঁজে পাবে ?

কাশীবাবু বলেছিলেন—এই যে আমাদের ইন্ডিয়ায় ওই দুর্দশা, এর পেছনেও একটা সামান্য কারণ আছে। কী সে কারণটা ? কারণটা হচ্ছে 'চরিত্র'। বিরাট মেসিনের মধ্যে একটা ছোট 'স্কু'র মতো—

সন্দীপ প্রশ্ন করেছিলেন—চরিত্র মানে ?

কাশীবাবু বলেছিলেন—আসলে আমাদের ইন্ডিয়ার মানুষদের চরিত্রটাই নষ্ট হয়ে গেছে, কী ওপরের তলায়, কী নিচের তলায়। সব জায়গাতেই ওই জিনিসটার অভাব। ডিক্সনারিতে 'চরিত্রে'র অনেক রকম মানে লেখা আছে দেখবে। যেমন 'স্বভাব' 'রীতি-নীতি' 'আচার-আচরণ'। 'চরিত্রের' আসল মানে কিন্তু তা নয় : মদ খেলেই চরিত্র নষ্ট হয় না, চুরি করলে কি ঘুষ খেলেও চরিত্র নষ্ট হয় না। তাহলে 'চরিত্র' কথাটার মানে কী ? পরের উপকার করা ? পরের দুঃখে কাতর হওয়া ? পরের সেবা করা ?

তাও না। তা হলে ?

'চরিত্র' কথাটির মানে বুঝতে গেলে নাকি সারা জীবন ধরে তাকে খুঁজে বেড়াতে হবে। এখন তো সে ছোট। কম বয়েস তার। এখন সে কোন্ পথ বেছে নেবে ? সকলের তালে তাল দিয়ে যে-কোনও একটা পার্টিতে ঢুকে পড়লে সারা জীবন নিশ্চিন্ত হয়ে কাটিয়ে দেওয়া যায়। তাই-ই সে করবে নাকি ? গোপাল হাজরা যা করছে এতকাল আর সুশীল সরকার যা করতে চাইছে, কিন্তু করতে পারছে না, তাই-ই করবে ? আর নয়তো অন্য একটা পথও আছে। সে পথটা হচ্ছে সকলের তালে তাল না দেওয়া। সকলের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে আমরণ সংগ্রাম করে যাওয়া।

হঠাৎ আবার সদর দরজার কলিং-বেলটা বেজে উঠলো।

ওই বোধহয় বিশাখা এসেছে!

যোগমায়াই দরজা খুলে দিলে। আর যা ভেবেছে তা-ই। মেয়ে এসেছে।

কিন্তু এ কী চেহারা হয়েছে মেয়ের ?

—কী রে, এত দেরি ?

সোনার বর্ণ বিশাখার দেহ রোদ্দুরে পুড়ে যেন কালো বিবর্ণ হয়ে গেছে।

—কী রে, কথার জবাব দিচ্ছিস নে যে ?

বই খাতা ব্যাগ সব ছঁুড়ে ফেলে দিয়ে বিশাখা কোনও রকমে বললে—একটু জল দাও—

শৈল তৈরিই ছিল। তাড়াতাড়ি ঠান্ডা ডাবের জলটা এনে দিতেই বিশাখা সেটা এক চুমুকে খেয়ে নিলে। তারপর নিজের ঘরে ঢুকে গেল। যোগমায়াও সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে গিয়ে মেয়েকে ধরেছে। বললে—কী রে, এতক্ষণ কোথায় ছিলি তুই ? অরবিন্দ খালি গাড়ি নিয়ে ফিরে এল। বল্ কোথায় ছিলি ?

ঘরের ভেতরের মা মেয়ের কথা কানে আসছিল।

—কথার জবাব দিচ্ছিস না যে ? কোথায় গিয়েছিলি বল্ ?

মা'র কথার জবাবে বিশাখা বললে—তোমার জামাই আমাকে নিয়ে গিয়েছিল—

—কোথায় নিয়ে গিয়েছিল ?

—হোটেলে।

—তুই কেন হোটেলে গেলি ?

বিশাখা বললে—বা রে, আমি কি করবো ? আমাকে জোর করে নিয়ে—

—তোর মনে নেই যে তোর এখনও বিয়ে হয়নি ? বিয়ে হওয়ার আগে কি বরের সঙ্গে কোথাও যেতে আছে ? লেখাপড়া শিখেও কি তোর এই বুদ্ধিটা হলো না ?

তারপর একটু থেমে আবার যোগমায়া বললে—তোর মুখে এটা কিসের দাগ ?

এ-কথার কোনও উত্তর এলো না বিশাখার মুখ থেকে।

—বল্ এটা কীসের দাগ তোর মুখে ?

তবু বিশাখার দিক থেকে কোনও উত্তর নেই।

—বল, কথার জবাব দে। তোর গাল থেকে রক্ত পড়ছে কেন, বল্ ? তোর গালে কি হল ? কেউ আঁচড়ে দিয়েছে ?

তবু বিশাখা চুপ।

যোগমায়া মেয়ের পিঠে বোধহয় গুম্ গুম্ করে কিল্ মারতে লাগলো। তারপর বোধহয় মেয়ের চুলও টানতে লাগতো। সঙ্গে সঙ্গে সন্দীপের কানে এল বিশাখার কান্না, বিশাখা বলতে লাগলো—আঃ, চুল টানছো কেন ? লাগছে, বড্ড লাগছে,.. উঃ, ছাড়ো, ছাড়ো···মা ছাড়ো···

সন্দীপের একবার মনে হলো সে ঘরের ভেতরে ঢুকে গিয়ে বিশাখাকে যোগমায়ার অত্যাচার থেকে বাঁচায়। অসহায় মেয়েকে একান্তে পেয়ে মা তাকে মারবে এ সে কেমন করে সহ্য করবে। তার মনে হলো যোগমায়া যেন বিশাখাকে মারছে না, যোগমায়া যেন বিশাখার চুল টানছে না, যেন সমস্ত আঘাতটা সন্দীপের শরীরেই এসে প্রত্যাঘাত করছে। যেন বিশাখা নয়, সন্দীপই যেন অসহ্য যন্ত্রণার শিকার হয়ে চিৎকার করে উঠছে—লাগছে, বড্ড লাগছে, উঃ, ছাড়ো···ছাড়ো···মা ছাড়ো···

—বল্ পোড়ারমুখী বল্ কে আঁচড়ে দিয়েছে ? বল্···?

বিশাখা বললে—আঁচড়ায়নি···

—আঁচড়ে দেয়নি তো রক্ত বেরোচ্ছে কেন তোর গাল দিয়ে ?

কোন উত্তর নেই বিশাখার দিক থেকে।

যোগমায়া আবার চিৎকার করে উঠলো—বল্, কেন রক্ত বেরোচ্ছে তোর গালে

দিয়ে ?

বিশাখা কাঁদতে কাঁদতে বললে—আমার গাল কামড়ে দিয়েছে ও—

সন্দীপ এবার আর বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলে না। তার মাথা ঘুরতে লাগলো। সঙ্গে-সঙ্গে সে ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরে সিঁড়ির কাছে এসে এক মুহূর্ত দাঁড়ালো। আর তারপর সোজা তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে একেবারে রাসেল স্ট্রীটের ওপরে গিয়ে পড়লো। কাশীবাবুর কথাটা তার মনে পড়লো। 'চরিত্র'! কোন্ পথে সে যাবে ? কোন্ পথকে সে জীবনের শ্রেষ্ঠ পথ বলে বরণ করে নেবে ? কোন্ পথে গেলে সে আদর্শ চরিত্র খুঁজে পাবে ?

তখন এক-এক সময় সন্দীপের মনে হতো যে ভগবানের সঙ্গে জরুরী কথাবার্তা বলবার জন্যে একটা হট্-লাইন্ থাকলে বোধহয় ভালো হতো। হঠাৎ দরকার পড়লে তাঁকে জিজ্ঞেস করা যেত যে এমন হলো কেন ? জিজ্ঞেস করা যেত যে এমন হওয়ার দরকার পড়লো কেন ? আরো জিজ্ঞেস করা যেত যে এর জন্যে কে দায়ী ? কীসের দরকার ছিল খিদিরপুরের মনসাতলা লেন থেকে যোগমায়া দেবীকে তাঁর মেয়ে বিশাখাকে নিয়ে তিন নম্বর রাসেল স্ট্রীটের বাড়িতে নিয়ে আসার ? কে ঠাকমা-মণিকে মাথার দিব্যি দিয়েছিল এত খরচপত্র করে তাঁর রাসেল স্ট্রীটের বাড়িতে রাখার ? তাতে বিধাতা-পুরুষের মনের কোন্ শুভ ইচ্ছেটা পূরণ হয়েছিল।

আর যদি তেমন শুভ ইচ্ছে ছিলই তো কেন তা ঠিক সময়মত পূরণ হলো না ? কেন এবং কার ইঙ্গিতে ঠিক সেই সময়েই মুখুজ্জে বাড়ির লণ্ডন অফিসের কর্তা কমললাল মেহতার মৃত্যু হলো ?

কমললাল মেহতার মৃত্যু না হলে তো আর সৌম্য মুখার্জী'কে অত তাড়াতাড়ি বিলেতে ছুটতে হতো না। সৌম্যবাবুকে বিলেত যেতে হলো বলেই তো সন্দীপের জীবনে অমন অসময়ে কাল-রাত্রি নেমে এল! আর কাল-রাত্রি নেমে এল বলেই তো সন্দীপ এত বছর ধরে জেল খাটার পর আজ এখানে এসে পৌঁছিয়ে বলতে পারছে 'চরিত্র' জিনিসটা কী ?

মনে আছে সেদিন দুপুর বেলা রাসেল স্ট্রীটের রাস্তায় দাঁড়িয়ে সন্দীপ আকাশ-পাতাল তোলপাড় করে কেবল ভেবেছিল এর প্রতিকার কী ? কিন্তু কীসের প্রতিকার ? সৌম্যবাবুর সঙ্গে যদি বিশাখার বিয়ের কথা পাকাপাকি হয়ে গিয়েই থাকে তো তাহলে এই মেলামেশায় অন্যায়টা কোথায় ?

না, আবার নিজের মনের মধ্যেই তার উত্তরটাও পেয়ে গিয়েছিল সে। মানুষ নিজেই তো সমাজ সৃষ্টি করেছে, সেই মানুষই সমাজের একজন মানুষের সঙ্গে অন্য

একজন মানুষের সম্পর্কের রীতি-নীতিও তো সৃষ্টি করেছে। যে-মানুষ মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের রীতি-নীতি সৃষ্টি করতে পেরেছে সেই মানুষের সেই সব রীতি-নীতি বদলাবার বা সংশোধন করবারও তো পূর্ণ অধিকার আছে। তাহলে তার এত ভাবনা কীসের?

আসলে ব্যাপারটা অন্য জাতীয়। আমাদের যারা ভালোবাসে, যারা আমাদের স্নেহ করে, যারা আমাদের ভালো চায় তাদের মনে রাখার দায় আমাদের নেই। আমরা শুধু মনে রাখি তাদেরই যারা আমাদের অবহেলা করে, যারা আমাদের নিন্দে করে, যারা আমাদের হিংসে করে।

পৃথিবী মানুষের সমাজের এ এক অদ্ভুত মানসিকতা।

সেদিন সুশীল সরকারও তাকে দেখে চমকে উঠলো বললে—এ কী, আপনার কী হয়েছে? আপনার চেহারা এ-রকম হলো কেন?

সন্দীপ বললে—কই, আমার তো কিছু হয়নি—

—না, দেখে মনে হচ্ছে রাত্তিরে আপনার ভালো ঘুম হয়নি!

সন্দীপ চুপ করে রইল, কোনও উত্তর দিলে না। তারপর বললে—আপনার কোথাও চাকরি-টাকরি হলো?

সুশীল সরকারেরও মনটা বহুদিন ধরে খারাপ ছিল। বললে—এই সামনে ইলেকশন আসছে, তাতে হয়ত কিছু পয়সা আসতে পারে। যে-কটা টাকা পাই এই ক'দিনে, তার পর তো আবার যে-কে-সেই—

—আচ্ছা, ইলেকশনে আপনাদের মাথা-পিছু কত টাকা করে হয়?

সুশীল বললে—সে ঠিক হয় কাজ হিসেবে—

—কী কী কাজ?

সুশীল বললে—কাজ কী কম? যারা ষণ্ডা গুণ্ডা চেহারার ছেলে, একটু লেকচার-টেকচার দিতে পারে, তাদের রাস্তার মোড়ে মোড়ে মীটিং করতে পাঠানো হয়। সে মীটিং-এ লীডাররা থাকে না। তাদের রেট্ একটু বেশি। দিনে আট-দশ টাকা পর্যন্ত পায় তারা।

—আর অন্যরা?

—অন্য ছেলে-মেয়েরা মই আর আর আঠার হাঁড়ি নিয়ে দেয়ালের গায়ে পোস্টার সাঁটতে যায়। তাদের খাটুনি বেশি। ভোর চারটের সময় ঘুম থেকে উঠেই বেরিয়ে পড়তে হয়। তারা পায় মাথা-পিছু চার টাকা করে। অথচ তাদের কাজটা সোজা নয়—

—আর আপনি? আপনাকে কী কাজ দেবে?

—আমার কাজ দেয়ালে লেখা। লীডাররা স্লোগান বলে দেয় আর আমরা বাড়ির দেয়ালে দেয়ালে সেগুলো রঙ-তুলি দিয়ে লিখি—

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—কী লেখেন?

সুশীল বলে—সেসব তো আপনারা দেখেছেন—রসা রোডের দেওয়ালে যত ছড়া লেখা দেখবেন, সব আমার লেখা—

—একটা নমুনা বলুন না—

—তবে শুনুন—

বলে সুশীল আবৃত্তি করতে লাগলো :

"রাস্তার মোড়ে লালবাতি জেলে
শকুনেরা দেয় সন্ধে।
জোড়া-বলদকে দেওয়ালে লটকে
ঠোঁট চেটে বলে ভোট দে ॥"

সন্দীপ শুনে বললে—বাঃ, চমৎকার। এ-সব কারা লেখে?

সুশীল বললে—আমাদের পার্টির ভাড়া করা কবি আছে, তারা লেখে। এ রকম আরো আছে, শুনবেন?

"আয় লো অলি কুসুমকলি
বাবুর বাগানে,
জোড়া-বলদে ভোট দিলে
চাকরি পাবি সবাই মিলে
গাড়ি বাড়ি যা কিনবি
এই নে টাকা, নে ॥"

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—এই সব ছড়ার জন্যে কত টাকা পার্টি দেয়?

সুশীল বললে—কত দেওয়া হয় তা ঠিক জানি না। যারা আমাদের পার্টিতে লেখে তারা আবার অন্য পার্টির হয়েও লিখে দেয়। তারা ভাড়া করা পোয়েট সব।

তারপর একটু থেমে বললে—আর তা ছাড়া ভোট তো আর রোজ রোজ হয় না। পাঁচ বছরে একবার হলো তো বাস, তারপর তো শুধু বসে থাকা। তারপর কবে দুর্গাপুজো, কবে সরস্বতী পুজো, কবে কালীপুজো, আর বড় জোর একবার হয়তো সন্তোষী মার পুজো, এই করেই তো আমাদের জীবন কাটে।

কথা বলে সুশীল গম্ভীর হয়ে রইল।

সুশীলের কথা শুনে সন্দীপের মনে কষ্ট হলো। এত কাণ্ড করেও কিনা সুশীল একটা চাকরি পাচ্ছে না। ঠিক সন্দীপের মতই অবস্থা সুশীলের।

সুশীল বললে—না, আপনার অবস্থা তবু আমাদের চেয়ে একটু ভালো। কিন্তু আমার অবস্থার কথা একটু ভাবুন তো! আমার মত কত ছেলে যে চাকরির জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে তার ঠিক নেই। এই যে দেখছেন আমাদের কলেজে ছেলেরা পড়ছে, এরা কেন পড়ছে জানেন? চাকরি পায় না বলে সবাই বাড়িতে বসে বসে কী করবে, তাই পড়ছে। আর যারা লেখাপড়া শিখতে পারনি তারা গুণ্ডা হয়ে পাড়ায় পাড়ায় বোমাবাজি করে হাজি-মস্তান হচ্ছে—

—অথচ দেখুন—

বলে সুশীল একটু থেমে আবার বললে—এসব কথা তো পার্টির দাদাদের বলা যায় না। দাদারা ভরসা দিচ্ছে এবার ইলেকশনে জিতলে সকলকে চাকরি করে দেব, কিন্তু কতবার ইলেকশন হলো, দাদারা জিতলোও, কিন্তু কই, কারো চাকরি তো হলো না—

সন্দীপ নিজের সঙ্গে সুশীলদের ভাগ্য তুলনা করে দেখলে। সে তো ওদের চেয়ে ভালোই আছে। তার নিজের অবস্থা তো সুশীলদের অবস্থার চেয়েও

ভালো ! তাকে তো নিজেকে দৈনন্দিন গ্রাসাচ্ছাদনের দুর্ভোগ সইতে হয় না। তাকে তো বুড়ো অথর্ব বাপ-মা'র ভার বইতে হয় না। তার তো সুশীলদের মত অবিবাহিত বোনের বোঝা বইবার দায় নেই। তাহলে কেন তার মনে এত অশান্তি ? সে অশান্তি কি তার নিজের অক্ষমতার কথা ভেবে, না সমস্ত দেশের সমস্ত সুশীলদের কথা কল্পনা করে ?

সেদিন হাতীবাগানের বাজারের পাশ দিয়ে আসতে আসতে সন্দীপ আবার দেখতে পেলে রাস্তার মোড়ের ওপরে একটা জায়গায় বেদীর মত তৈরি করা। তাতে একটা ইলেকট্রিকের আলো জ্বলছে। পাশে অনেক রকম ফুল ছড়ানো রয়েছে, আর ধূপদানিতে ধূপ জ্বলছে অনেকগুলো। আর তার মাথায় সাইন-বোর্ডের ওপর লেখা রয়েছে ঃ

শ্রী শ্রী জগন্মাতার স্বপ্নাদেশে
বিশ্বশান্তি স্থাপনের নিমিত্ত
এই দেবস্থানে প্রত্যহ
পুজো-পাঠ ও যাগযজ্ঞ
অনুষ্ঠিত হইবে।
ঈশ্বরের সেই নির্দেশ পালনের হেতু
আমাদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন।
সেবাইত ঃ শ্রী ললিত কুমার মাইতি (লালটু)

আগের বারে এই রকম সাইনবোর্ড টাঙানো ছিল মির্জাপুর স্ট্রীটে, আর এবার সেই একই রকম সাইনবোর্ড রয়েছে এই হাতীবাগানের বাজারের মোড়ে। সেবারেও বেদীর ওপর কিছু খুচরো আধুলি-সিকি দশ-নয়া পাঁচ-নয়া ছড়ানো ছিল, এবারও সেই একই রকম খুচরো ছড়ানো। তফাতের মধ্যে হচ্ছে সেবারে সেবাইত ছিল শ্রীভূতনাথ দাস (ভুতো) আর এবারে শ্রীললিত কুমার মাইতি (লালটু)।

সন্দীপ অনেকক্ষণ ধরে মন দিয়ে সাইনবোর্ডটা দেখতে লাগলো। অবিকল একই চেহারা, একই স্টাইলের লেখা। সেই একই বিশ্বশান্তির জন্যে যাগযজ্ঞ, সেই একই জগন্মাতার স্বপ্নাদেশ, সেই একই ঈশ্বরের নির্দেশ পালনের জন্যে যথাসাধ্য সাহায্যের আবেদন। সবই হুবহু এক। ব্যতিক্রম শুধু সেবাইতের নামের। সেবারকার সেবাইত শ্রীভূতনাথ দাস (ভুতো) আর এবারকার সেবাইত শ্রীললিত কুমার মাইতি (লালটু)।

সন্দীপ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লেখাটা পড়ে চলে আসছিল। হঠাৎ একটা ছেলে ডাকলে—দাদা, অ দাদা—

সন্দীপ পেছন ফিরে দেখলে সেই একই রকম চেহারার একটা ছেলে তার দিকে চেয়ে আছে। ছেলেটা বললে—কই দাদা, কিছু চাঁদা দিলেন না যে ?

সন্দীপ বললে—ভাই, আমিও তোমার মত, আমারও অবস্থা খারাপ, চাকরি-বাকরি কিছু নেই—

ছেলেটা কিন্তু হতাশ হলো না। বরং উৎসাহিত হলো একটু। বললে—আপনারও চাকরি-বাকরি নেই ?

সন্দীপ বললে—না ভাই, নেই—

ছেলেটা বললে—আমারও নেই। তা আপনি কী করেন ?

সন্দীপ বললে—একজনদের বাড়ির কাজ কর্মের দেখা-শোনা করি, তাই সেইখানে থাকা খাওয়াটার জন্যে কোনও খরচা লাগে না। আর ল'কলেজে পড়ি—

—তাহলে তো আপনি বি-এ পাস করেছেন। তবু চাকরি পাচ্ছেন না ?

—না !

ছেলেটা বললে—আপনি এই কাজ করবেন ? এই আমি যা করছি— ?

সন্দীপ বললে—কী কাজ ? কোথায় ?

ছেলেটা বললে—জোড়াসাঁকোর বাজারের মোড়ে একটা ভালো জায়গা এখনও খালি পড়ে আছে, সেখান দিয়ে দিনে-রাতে দশ বারো হাজার লোক রোজ যাতায়াত করে। সেখানে আমি আপনার জন্যে একটা জায়গা করে দিতে পারি। এই রকম একটা সাইনবোর্ড আপনি সেখানে লাগিয়ে দেবেন। এতে দিন গেলে ফেলে ছড়িয়ে আপনি আট-দশ টাকা পেয়ে যাবেন—

—আট-দশ টাকা প্রতিদিন ?

—হ্যাঁ, আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি আপনাকে। অথচ খরচ বেশি নয়। এই সাইনবোর্ডটা আমি আপনাকে পাঁচ টাকার মধ্যে তৈরি করিয়ে দিতে পারি। ওইটেই আবার অন্য জায়গায় তৈরি করতে দিলে তারা আপনার ট্যাঁক থেকে বারো টাকা খসিয়ে নিয়ে ছাড়বে। আর খুব যদি কমে তো বড় জোর দশ টাকা। দশ টাকার কমে কিছুতেই নয়। কিন্তু আমি ওই একই জিনিস পাঁচ টাকাতেই করিয়ে দেব আপনাকে—

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—অত কম টাকায় কী করে করে দেবে তুমি ?

ছেলেটা বললে—সে আমার জানা শোনা ছুতোর-মিস্ত্রী আছে একজন। সে আমার পার্টির লোক—। আমি নিজে সে-ভার নিয়ে নেব। যাতে ভালো কাঠ দেয়, তা আমি দেখবো—

এখানেও পার্টি ! এই লালটুও পার্টি করে ?

সন্দীপ আবার জিজ্ঞেস করলে—তা আর কিছু খরচ লাগবে না ?

লালটু বললে—আর মাত্র পাঁচ টাকা লাগবে—

—আর পাঁচ টাকা লাগবে কীসের জন্যে ?

লালটু বললে—জোড়াসাঁকো বাজার-কমিটির চাঁদা। ওটা আপনাকে মাসে মাসে দিতে হবে না, একবার জায়গাটা দখল করার জন্যে আগাম দিয়ে দিলেই চলবে। আপনি আমাকে দশটা টাকা দিয়ে দেবেন, তাহলে আমিই সব করে দেব। ওই জায়গাটাও আপনার নামে রিজার্ভ হয়ে যাবে—সঙ্গে সঙ্গে এই সাইনবোর্ডটাও—

সন্দীপ বললে—ঠিক আছে, পরে আবার একদিন আসবো, আমি ভেবে দেখি—

বলে চলে আসছিল। লালটু বললে—একটু তাড়াতাড়ি করবেন দাদা, নইলে আরো অনেক লোকের লোভ আছে ওই জমিটার ওপর, বেশি দেরি করবেন না যেন—

সন্দীপ রাজি হয়ে সেখান থেকে চলে এল। অবাক কাণ্ড ! সব জায়গাতেই পার্টি ! এই পার্টিরাই কি সমস্ত দেশটাই দখল করে নেবে একদিন ? সব মানুষই কি একদিন পার্টির ভাড়াটে হয়ে যাবে ? ওই সুশীল, ওই শ্রীভূতনাথ দাস (ভূতো)

ওই শ্রীললিত মাইতি (লালটু), ওরাই কি একদিন এই কলকাতার মালিক হয়ে বসবে? যেমন করে তিন বার ম্যাট্রিক ফেল করা মিনিস্টার শ্রীপতি মিশ্রের পি-এ হয়েছে গোপাল হাজরা, ঠিক তেমনি করে? কলকাতায় এক ইঞ্চি ফাঁকা জমিও আর থাকবে না?

বাড়ির সদর গেটের সামনে আসতেই গিরিধারী রোজকার মত দীসম্পকে সেলাম করলে। সন্দীপও তাকে সেলাম করলে কপালে হাত ঠেকিয়ে। গিরিধারী হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে—আচ্ছা বাবুজী, এক বাত্ পুছু?

সন্দীপ দাঁড়িয়ে পড়লো। জিজ্ঞেস করলে—কী কথা, বলো?

গিরিধারী জিজ্ঞেস করলে—শুনা হ্যায় ছোটাবাবু বিলাইত্ যা রহা হ্যায়? ইয়ে সাচ হ্যায় ক্যা?

সন্দীপ বললে—হ্যাঁ, গিরিধারী, তুমি ঠিকই শুনেছ—

—কিতনে দিনো কে লিয়ে?

সন্দীপ বললে—তা বলতে পারি না গিরিধারী। তবে যা শুনেছ তুমি তা ঠিকই শুনেছ, ছোটবাবু বিলেত যাচ্ছে—

কথাটা শুনে গিরিধারী যেন কেমন বিমর্ষ হয়ে গেল। বিমর্ষ হয়ে যাওয়ার কারণও আছে। এতদিন ধরে বে-আইনী কাজ করে আসছিল সে। রাত ন'টার সময়ে সদর গেটে চাবি লাগিয়ে দেওয়ার হুকুম ছিল তার ওপর। বাড়ির মালকিনের কড়া হুকুম। গিরিধারী সে-হুকুম অমান্য করে সৌম্যবাবুকে রাত ন'টার পরও গেটের তালা খুলে দিত। তার জন্যে সৌম্যবাবু গিরিধারীকে মাসে-মাসে মোটা মাসোহারা দিত। এখন যদি সৌম্যবাবু বিলেতে চলে যায় তো তাতে তার একটা বাঁধা উপরি-আয়ের রাস্তা বন্ধ হয়ে যাবে। সুতরাং তার তো বিমর্ষ হওয়ার কথাই!

গিরিধারী আবার জিজ্ঞেস করলে—তা কতদিনের জন্যে যাবে ছোটবাবু?

সন্দীপ বললে—তা আমি বলতে পারি নে—

বলে সন্দীপ বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়লো।

মার্ক টোয়েন তাঁর একটা বইতে লিখেছিলেন—Be good and you will be lonesome

অর্থাৎ পৃথিবীতে যে ভালোমানুষ হয় সংসারে তাকে নিঃসঙ্গ হয়েই জীবন কাটাতে হয়। সন্দীপেরও তাই কোনও দিন কোনও বন্ধু হয়নি। সে নিঃসঙ্গ বলেই সকলকে দেখবার নিরপেক্ষ দৃষ্টি সে পেয়েছে। শুধু নিরপেক্ষ দৃষ্টিই নয়,

একলা চলবার শক্তিও সে তাই অর্জন করেছে। একলা কে চলতে পারে? ঈশ্বরও একলা, তাই ঈশ্বর অত শক্তিমান। দুর্বলরাই তো দল বাঁধে! নইলে কত অসহ্য ব্যথায়, কত নিদারুণ অত্যাচারে তো সে কখনও সাহস হারায়নি। সেদিন কে তাকে সাহস জুগিয়েছিল? কে তাকে অভয়বাণী শুনিয়েছিল? সে তার নিজের শুভবুদ্ধি। যে নিঃসঙ্গ মানুষ, তার একমাত্র সঙ্গী তার শুভবুদ্ধি। এই শুভবুদ্ধিই সেই নিঃসঙ্গ মানুষকে আমরণ সঙ্গ দিয়ে সজীব রাখে। বরাবর এই শুভবুদ্ধিই ছিল সন্দীপের একমাত্র পাথেয়।

সেদিনও সেই তার শুভবুদ্ধিকে সঙ্গে নিয়েই সন্দীপ তিন নম্বর রাসেল স্ট্রীটের বাড়িতে গিয়েছিল।

এও তো তার একটা কাজ। কাজ মানে দায়িত্ব। এই দায়িত্বের জন্যেই তো তাকে রাখা হয়েছে।

—কে?

ভেতরে কি তাহলে আর কেউ নেই? অন্যদিন তো জবাব দেয় শৈল কিংবা মাসিমা। তারা তাহলে কোথায় গেল?

সন্দীপ বললে—আমি, সন্দীপ।

দরজাটা খুলে যেতেই সন্দীপ একেবারে বিশাখার মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ালো।

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—কী হলো, বাড়িতে তুমি একলা নাকি?

—হ্যাঁ—

—মাসিমা কোথায় গেলেন?

বিশাখা বললে—ওমা, জানো না তুমি, আজ যে মা'র হিতসাধিনী ব্রত, মা তাই শৈলদি'কে নিয়ে গঙ্গায় গেছে!

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—কিসে গেলেন?

বিশাখা বললে—অরবিন্দ গাড়ি নিয়ে এসেছিল, আগে থেকে বলে রাখা হয়েছিল তাকে—

—আর তুমি? তুমি ইস্কুলে যাওনি?

বিশাখা বললে—কী বোকা, আজ পাবলিক হলিডে, তাও জানো না? ওই দেখ ক্যালেণ্ডারটার দিকে চেয়ে দেখ হাঁদারাম, লাল-তারিখ দেখতে পাচ্ছো না?

তাও তো বটে! যে-মানুষ চাকরি করে না সে-মানুষ লাল-তারিখের হিসেব রাখবে কেন? তাহলে তো তার কলেজও ছুটি! আজ তাকে কলেজেও যেতে হবে না তাহলে!

সন্দীপ বললে—তোমাকে একলা রেখে মাসিমা চলে গেলেন?

বিশাখা বললে—কেন, একলা থাকতে কীসের ভয়? দরোয়ান তো রয়েছে নিচেয়—

—তবু দরোয়ানও তো পুরুষ মানুষ!

বিশাখা বললে—কেন, তুমিও তো পুরুষ মানুষ—

—আমি?

বিশাখা তেমনি করেই হাসতে লাগলো। বললে—হ্যাঁ, তুমি বুঝি আমার কোনও ক্ষতি করতে পারো না?

—আমি তোমার ক্ষতি করবো? বলছো কী তুমি?

—হ্যাঁ, পুরুষ মানুষ তো মেয়েদের সব রকম ক্ষতি করতে পারে!

—তা বলে আমি? এতদিন পরে তুমি আমাকে এই কথা বলতে পারলে?

বিশাখা বললে—কেন, আমি অন্যায়টা কী বলেছি?

সন্দীপ বললে—অন্যায় নয়? তোমার দেখা-শোনা করবার জন্যেই তো আমাকে রাখা হয়েছে।

বিশাখা বললে—কিন্তু অনেকে তো রক্ষক হয়েই ভক্ষক সাজে! সাজে না?

—অনেকে সাজে বলে কি আমিও তাই?

বিশাখা বললে—অনেকই যখন ভক্ষক হয় তখন তুমিই বা হবে না কেন? তুমি কি আলাদা?

সন্দীপের মুখটা শুকিয়ে গেল। বললে—এ-কথার পরে আমার আর কিছু বলবার নেই, আমি তাহলে এখন আসি, মাসিমাকে বলে দিয়ো আমি এসেছিলুম—

বিশাখা বললে—মনে করেছ আমি তোমার পথ আটকে দাঁড়াবো? মোটেই না। আমি তেমন মেয়ে নই—। আমি তোমাকে চলে যেতেও বলবো না, থাকতেও বলবো না—

সন্দীপ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে পা বাড়িয়ে বললে—দেখ বিশাখা, একটা কথা তোমাকে বলে যাই। এত চালাক চতুর হওয়া ভালো নয়!

বিশাখা বললে—তা তো বটেই, চালাক-চতুর হলে যে পরের পেটের কথা জেনে ফেলা যায় কি না, তাই ও-কথা বলছো—

সন্দীপ বললে—সত্যি, আমি যত দেখছি তোমাকে ততই অবাক হয়ে যাচ্ছি—দেখ, যে মানুষ সব সময়ে সত্যকে আঁকড়ে ধরে থাকে মানুষের সমাজ তাকে নির্বোধই ভাবে! কিন্তু তা বলে সত্যিই আমি নির্বোধ নই। আমি সব বুঝি—

—সত্যিই তুমি বোঝ?

—বুঝি না? সব বুঝি!

বিশাখা বললে—কিন্তু সব বুঝলে তুমি চুপ করে থাকো কেন? প্রতিবাদ করো না কেন?

কীসের প্রতিবাদ?

—অন্যায়ের প্রতিবাদ!

সন্দীপ কিছু বুঝতে পারলে না। বললে—কীসের অন্যায়?

বিশাখা বললে—অন্যায় কীসের নয়? সব রকম অন্যায়—

সন্দীপ তবু বুঝতে পারলে না। বললে—আমি কিছু বুঝতে পারছি না, ভালো করে স্পষ্ট করে বলো……

বিশাখা বললো—এই যে তুমি বললে তুমি নির্বোধ নও, সব বুঝতে পারো? তাহলে এই যে তোমাকে নিয়ে আমি ঠাট্টা করি, তোমাকে কত কী খারাপ কথা বলি, তুমি তো কই রাগ করো না—প্রতিবাদ করো না—

সন্দীপ চুপ করে স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইল। বললে—তোমার সঙ্গে কি আমার তুলনা হয় বিশাখা?

—কেন, তুলনা হয় না কেন?

সন্দীপ বললে—দেখ, সব মানুষের সব রকম অধিকার থাকে না, আমাকে ঠাট্টা করবার বা গালাগালি দেবার অধিকার তোমার আছে বলেই যে তোমার ওপরেও আমার রাগ করবার বা প্রতিবাদ করবার অধিকার থাকবে, তা তো নয়—আর তা ছাড়া—

—তা ছাড়া কী, বলো ?

সন্দীপ বললে—বললে তুমি রাগ করবে না তো ?

—না, বলো—

সন্দীপ বললে—যার সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে আমি তাঁর চাকর। কিংবা বোধহয় তাঁর চাকরেরও অধম। একদিক থেকে তোমার কাছেও আমি তাই। তোমার ঠাট্টার তোমার গালাগালির আমি প্রতিবাদ করবো এমন আহাম্মক আমাকে ভেবো না, আমি যাই—

বিশাখা হঠাৎ সন্দীপের একটা হাত ধরে ফেললে। ধরে তাকে কাছে টেনে বললে—সরে এসো, এই দেখ, আমার গালে কী হয়েছে দেখ—দেখছো—

সন্দীপ বিশাখার গালটা দেখে চমকে উঠলো। বললে—এ কী, এটা তো আগে দেখিনি, এটা কী করে হলো ?

বিশাখা বললে—তোমার মনিব কামড়ে দিয়েছে—

সন্দীপ হতবাক। বললে—সে কী ? কেন ?

বিশাখা বললে—আদর করে—

হঠাৎ সদরে কলিং-বেলটা বেজে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে বিশাখা সন্দীপকে দূরে ঠেলে দিলে। বললে—সরে যাও, শিগগির সরে যাও, মা এসেছে—

ছোট-ছোট দুঃখ, ছোট-ছোট সুখ, ছোট-ছোট হাসি, ছোট-ছোট কান্না, ছোট-ছোট আনন্দ, ছোট-ছোট বিস্ময় এই নিয়েই তো মানুষের জীবন। কে যেন বলেছিল—সময় হু-হু করে চলে যাচ্ছে। কিন্তু আসলে তা নয়। সময় স্থির হয়ে থাকে, আমরাই চলে যাই—

সক্রেটিস চলে গেছেন, তথাগত বুদ্ধদেব চলে গেছেন, শঙ্করাচার্য, শ্রীচৈতন্য, যীশুখ্রীস্ট, পরমহংসদেব সবাই-ই চলে গেছেন। এমন কি আমার বাবা, মা, ঠাকমা-মণি, মল্লিকমশাই, সবাই-ই চলে গেছেন। কিন্তু সময় সেই আগেকার মত স্থাণু হয়ে আছে। একদিন আমিও তাদের মত চলে যাবো কিন্তু সেদিনও সময় থাকবে! আমরা সবাই চলে যাওয়ার জন্যেই বেঁচে আছি, কিন্তু সময় চলে যাবার নয় বলেই সে বেঁচে আছে।

জেলে বসে বসেই সন্দীপ এই কথাগুলো ভেবেছিল। জেল থেকে বেরিয়েও সন্দীপ এই কথাগুলোই ভাবছে।

স্যাক্সবী মুখার্জী ইণ্ডিয়া লিমিটেড কোম্পানীর ওপর সেদিন সে কী দুর্যোগের অশনিপাত আরম্ভ হলো! একটা নয়, একটার পর একটা। যে মেজবাবু কাজ করতে-করতে কাজের চাপে হিমশিম খেয়ে যেতেন সেই মেজবাবুরই শেষকালে পাগল হয়ে যাওয়ার মত অবস্থা হলো। সব সময়ে কেবল মুখে বলতো —আর পারি না—

নাগরাজন এক-একটা চিঠি নিয়ে দেখাতে আসতো। দিল্লীর জরুরী সব চিঠি। কত রকম হুকুম, কত রকম হুমকি। ওপর নিচ আশ-পাশ, সব দিক থেকেই আসতো সেই হুকুম আর হুমকি।

কিন্তু কেন যে জিনিস পত্রের দাম বাড়ে আর কেন যে স্টাফের মাইনে বাড়াবার দাবি জোরদার হয়, এর সহজ অঙ্কটা দিল্লীও বোঝে না, রাইটার্স বিল্ডিংও বোঝে না।

মেজবাবু বলেন—তুমি লিখে দাও নাগরাজন যে পলিটিক্যাল পার্টির দাদাদের চাঁদার জুলুম যদি বন্ধ করা না হয় তাহলে আমাদের প্রোডাকশানের দাম বাড়বেই—বাড়তে বাধ্য। কেউ তা ঠেকাতে পারবে না।

নাগরাজন বললে না না, ও-কথাটা লিখবেন না স্যার, চাঁদার জুলুম তো নতুন নয়, ও জুলুম তো সব পার্টির আমলেই ছিল, এখনও আছে—থাকবেও চিরকাল—

—কিন্তু তাহলে মার্কেট প্রাইস্ আমরা কী করে ঠিক রাখবো? আমাদের ওপর পার্টির চাঁদার জুলুমও কমবে না, বোনাসের চাপও কমবে না, বাড়তি মাইনের দাবিও কমবে না অথচ প্রাইস্ ফিক্সড্ রাখতে হবে, এ কী করে সম্ভব?

নাগরাজন বললে —স্টীল্ অথরিটি তো এ সব জানে, এর পরও যদি আমরা ওই আর্গুমেন্ট দিই তাহলে আমরা ওদের বিষ নজরে পড়ে যাবো স্যার—

—তাহলে লিখে দাও কলকাতার পাওয়ার শর্টেজের জন্যে প্রাইস্ না বাড়িয়ে আমাদের উপায় নেই—

কিন্তু সেটা লেখাও তো খারাপ। কত ফার্ম তো ওয়েস্ট বেঙ্গল ছেড়ে অন্য স্টেটে কারখানা সরিয়ে নিয়ে চলে গিয়েছে তাতে ক্ষতিটা কার হয়েছে? ক্ষতি তো বেঙ্গলেরই। এখানকার লোক্যাল লোকরা চাকরি পাবে না, এখানকার পারক্যাপিটা ইনকাম কমে যাবে, এখানকার কোনও ডেভেলপমেণ্ট হবে না। সেটা কি ভালো? সারা দেশের শরীরের মধ্যে মাথা কাঁধ পা বুক সব কিছু মজবুত রইল, আর একটা হাত কি একটা পা যদি পঙ্গু হয়ে থাকে, তাহলে কি সেটা দেশের পক্ষে ভালো? সে-দেশের মানুষ কি সুস্থ হয়, সুখী হয়?

নাগরাজনের সঙ্গে ম্যানেজিং ডিরেক্টারের অনেক গোপন আলোচনা হয় এই নিয়ে। কিন্তু কোনও সিদ্ধান্তই নেওয়া হয় না। মাঝখান থেকে শরীর খারাপ হয় মুক্তিপদ মুখার্জীর।

নন্দিতা জিজ্ঞেস করে—কী হলো, তোমার লণ্ডন অফিসের কী খবর?

মুক্তিপদ বলেন—সৌম্য তো লণ্ডন যাচ্ছে—

নন্দিতা বলে—দেখবে, শেষ পর্যন্ত ও যাবে না। শুধু কথার কথা—

—কেন? যাবে না কেন?

নন্দিতা বলে—তোমার মা-ই নানা বায়না করে ওকে যেতে দেবে না—দেখো—

মুক্তিপদ বলেন—না-না, কাশী থেকে তো মা'র গুরুদেব খবর দিয়েছে যে ওর বিয়ে না দিয়েই লণ্ডনে পাঠাতে। এখন নাকি ওর কুষ্টিতে কী একটা খারাপ যোগ আছে, তাতে এখন বিয়ে দিলে ওর ক্ষতি হবে।

নন্দিতা বলে—ওই সব গুরুদেবরাই তোমার মা'র সর্বনাশ করবে, দেখে নিও-

এসব কথা নতুন নয়। আগেও এসব কথা নন্দিতা অনেকবার বলেছে। মুক্তিপদ সে-সব কথায় তেমন কান দেয়নি। কিন্তু যখন সত্যিই সৌম্যর যাওয়ার বন্দোবস্ত পাকা হলো তখন নন্দিতা একটু মুষড়ে পড়লো।

মুক্তিপদ তখন বললেন—কী হলো, তুমি যে বলেছিলে সৌম্য বিলেতে যাবে না?

পিক্‌নিক্ কাছেই ছিল। সে-ই কথাটার জবাব দিলে। বললে—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার কাজিন-ব্রাদার লণ্ডনে যাচ্ছে—

নন্দিতা জিজ্ঞেস করলে—তুই কী করে জানলি?

—আমাকে মিস্ গাঙ্গুলী বলেছে যে—

—তুই তার সঙ্গে কথা বলিস?

পিক্‌নিক্ বললে—হ্যাঁ, মিস্ গাঙ্গুলী খবরটা শুনে খুব গম্ভীর হয়ে গেছে। ভেরি স্যাড্ নিউজ, শুনে গম্ভীর হবে না?

এ-সব কথা শুনতে ইচ্ছে থাকলেও বেশিক্ষণ শোনবার সময় থাকে না মুক্তিপদর। সৌম্য চলে যাবে, তার সব ব্যবস্থা করতে হবে মুক্তিপদকেই। টেলেক্সও করা হয়েছে অনেকবার। শুধু থাকা খাওয়ার ব্যবস্থাই নয় বা তার কাজের প্রোগ্রামই নয়, তাকে ট্রেনিংও দিয়ে দিয়েছেন মুক্তিপদ। তুমি বেশি কথা বলবে না, যারা বেশি কথা বলে তারা ভাবে কম। তুমি ভাববে বেশি, বলবে কম। কারো সঙ্গে বিজনেসের কথা বলবার সময়ে বরাবর একটা বোতল নিয়ে বসবে। বোতল নিয়ে বসলে মাঝে মাঝে গেলাসে সিপ্ দেবে, তাতে তোমার কম কথা বলতে হবে। সেই জন্যেই ইংরিজীতে একটা কথা আছে—They never taste who always drink. They always talk who never think. আর ড্রিঙ্ক করতে-করতে কথা বললে পার্সোন্যালিটিও কমে যায়। কিংবা তার চাইতে আর একটা কাজ করতে পারো—

সৌম্য বললেন- কী?

মুক্তিপদ বললে—তুমি নিশ্চয়ই দেখেছ অনেক লোক সিগ্রেট না খেয়ে পাইপ খায়। পাইপেও পার্সোন্যালিটি বাড়ে, আর তাতে কথাও কম বলতে হয়। তুমি দেখবে যারা পাবলিকের কাছে নিজেদের বাজার-দরটা বাড়াতে চায় তারা সবাই-ই পাইপ টানে। তবে সুবিধেটা এই হয় যে কথার জবাব দিতে দেরি হলে কেউ কিছু মনে করে না, মেপে-মেপে ওজন করে কথা বলা যায়—আর ভাববার জন্যে একটু সময়ও পাওয়া যায়—

এর পর আছে টেবল্ ম্যানার্স।

মুক্তিপদ সৌম্য মুখার্জীর গার্জিয়ান। সুতরাং অভিভাবক হিসেবে সৌম্যকে তাঁর সবই শেখানো উচিত। স্পুন আর ফর্ক দিয়েই সবাই খায় ওখানে। হাত দিয়ে যেন খেয়ো না। প্রথমে দেবে 'সুপ'। 'সুপ' খাওয়া শক্ত খুব, জানো তো? কলকাতার অনেক হোটেলেই তুমি লাঞ্চ-ডিনার খেয়েছ নিশ্চয়ই। বলো তো 'সুপ'

কী করে খাবে ?

সৌম্য জানে না।

—অনেকেই 'সুপ-প্লেটটা' বাঁ হাত দিয়ে ধরে নিজের দিকে ঝুঁকিয়ে খায়। সেটা ব্যাড ম্যানার্স'। প্লেটটা নিজের দিকটা উঁচু করে সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে দিয়ে খাবে! ওটাই নিয়ম—

সৌম্য চুপ করে আঙ্কেলের কথাগুলো শোনে। কথাগুলো সে বোঝে কি বোঝে না, তা জানা যায় না।

এর পর অফিস এ্যাফেয়ার্স'! এই ব্যাপারটাই সবচেয়ে শক্ত! তুমি তো নাগরাজনের কাছে এতদিন সব শিখেছ। ডেবিট ক্রেডিট, ব্যালেন্স-শীট—সব ব্যাপারটাই তো নাগরাজন তোমাকে শিখিয়ে দিয়েছে। আর এ সব শেখবার জিনিসও নয় ঠিক। সাউথ-ইণ্ডিয়ানরা হচ্ছে বর্ণ-ম্যাথামেটিসিয়ান। এ্যাকাউন্টস্‌টা তাদের শিখতে হয় না, ওটা ওদের রক্তের মধ্যে আছে। আমাদের লণ্ডন অফিসেও আমি একজন সাউথ-ইণ্ডিয়ানকে রেখেছি, তার নাম আয়েঙ্গার। আমি আয়েঙ্গারকেও টেলেক্স করে দিয়েছি, সে তোমাকে সব শিখিয়ে দেবে। দেখ, একটা কথা আমার কাছে জেনে রাখো—হোয়াট ইজ ট্যালেণ্ট ?

সৌম্য নিয়ম-মাফিক চুপ করে রইল।

মুক্তিপদ বলতে লাগলেন, ট্যালেণ্টের বাঙলা মানে হচ্ছে প্রতিভা। জীবনে উন্নতি করতে গেলে দুটি জিনিস অপরিহার্য'। একটা হচ্ছে ক্যারেকটার আর একটা ট্যালেণ্ট্। একটা কথা শোন, সেটা শুনলে বুঝতে পারবে ও-দুটো কী জিনিস। কথাটা হলো: Talent is developed in retirement; character is formed in the rush of the world. কথাটা জার্মানীর কবি গ্যেটের। তুমি যদি প্রতিভাবান হতে চাও তো তোমাকে নির্বাসন দণ্ড ভোগ করতে হবে, আর যদি চরিত্রবান হতে চাও তো তোমাকে মানুষের ভীড়ের মধ্যে সময় কাটাতে হবে। অর্থাৎ তোমাকেই ভেবে বার করতে হবে তুমি কোনটা হতে চাও—প্রতিভাবান না চরিত্রবান—

এমনি আরো অনেক কথা বলতে লাগলেন মুক্তিপদ। মুক্তিপদ নিজের জীবনে যে কথাগুলো সব ভেবে ভেবে বার করেছিলেন অথচ নিজের ওপরে তা ভালো করে প্রয়োগ করতে পারেন নি, সেই কথাগুলো ভাইপো'কে শেখাতে চেষ্টা করেছিলেন।
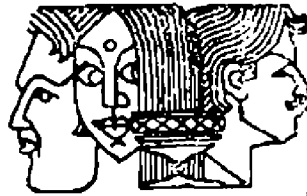
শেষকালে বলেছিলেন—আমি যা জেনেছি যা শুনেছি তাই-ই তোমাকে বলে গেলাম, এখন তুমি নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে যা পারবে করবে, আমি আর কী বলবো! আজ রাত্রে তোমার প্লেন ছাড়বে, সেখানে গিয়েই আমার সঙ্গে ফোনে

কথা বলবে। তুমি যা দেখবে শুনবে আমাকে জানাবে, আমিও তোমাকে আমার এ্যাড্‌ভাইস দেব···

এই পর্যন্তই কথা হয়েছিল সেদিন। আর সেই দিনই রাত্রে মুক্তিপদ সৌম্যকে নিয়ে দমদম এয়ারপোর্টে গিয়ে প্লেনে উঠিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছিল।

মানুষ তো ভাবে অনেক কিছু কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি সব মানুষের সব ইচ্ছে ফলে? এই যে স্যাক্সবী মুখার্জী ইণ্ডিয়া লিমিটেডের ম্যানেজিং ডাইরেক্টার মিস্টার এম মুখার্জী তাঁর ভাইপো কোম্পানীর ডেপুটি ম্যানেজিং ডাইরেক্টার মিস্টার এস মুখার্জীকে এত উপদেশ দিলেন তাও কি সব ফলেছিল?

এর উত্তর এখন পাওয়া যাবে না, উত্তর পাওয়া যাবে তখনই যখন 'এই নরদেহ' উপন্যাস শেষ হবে।

তার আগে অন্য কথা বলে নিই।

সেদিন মল্লিক-মশাই রাত্রে হঠাৎ সন্দীপকে ডাকতে লাগলেন—ও সন্দীপ, ওঠো, ওঠো—

মল্লিক-কাকার ডাকাডাকিতে সন্দীপ জেগে উঠলো। বললে—কী হলো মল্লিক-কাকা, কী হলো?

মল্লিক-কাকা বললেন—ওঠো, ওদিকে সব গোলমাল হয়ে গেছে—

—কী গোলমাল?

মল্লিক-কাকা বললেন—সৌম্যবাবুর লণ্ডন যাওয়া হলো না—

—কেন?

মল্লিক-কাকা বললেন—ঠাকমা-মণি আমাকে ডাকছেন, সৌম্যবাবু দমদম এয়ার-পোর্ট থেকে ফিরে এসেছেন। তাঁর প্লেন আজকে খারাপ হয়ে গেছে, ছাড়বে না। কালকে ছাড়বে—

বলতে বলতে তিনি ওপরে উঠে গেলেন। ওপরে ঠাকমা-মণির কাছে যেতেই তিনি বললেন—জানেন তো সরকার মশাই, খোকা ফিরে এসেছে এয়ারপোর্ট থেকে—

—হ্যাঁ, তাই তো শুনলুম. কিন্তু খোকাবাবু কেন ফিরে এলেন?

ঠাকমা-মণি বললেন—শুনলুম তো যে প্লেন নাকি মেরামত করতে হবে। যাক্ গে, ও-রকম হয় মাঝে-মাঝে; আমি একবার কর্তার সঙ্গে জার্মানী গিয়েছিলুম, সেখান থেকে লণ্ডনে আসবো, ঠিক সেই সময়ে প্লেন খারাপ হয়ে গেল। আমরা একদিনের জন্যে আটকে গিয়েছিলুম। এখন আমি আপনাকে যে জন্যে ডেকেছি—

—বলুন।

—ওদিকে অন্য আর একটা বিপদ হয়েছে—আমাদের বেলুড়ের ফ্যাক্টরিতে নাকি কী একটা মেশিনে আগুন লেগে গেছে। মেজবাবু এখানে এসেছিলেন, টেলিফোনে সেই খবরটা আসতেই তিনি তাড়াতাড়ি গাড়ি নিয়ে সেখানে চলে গেছেন। তাই আপনাকে ভোরবেলা খোকাকে নিয়ে দমদম এয়ারপোর্টে যেতে হবে—

মল্লিক-মশাই বললেন—তা যাবো। কখন বাড়ি থেকে রওনা দিতে হবে বলুন—?

—কাঁটায়-কাঁটায় ঠিক ভোর পাঁচটার সময়। সেখানে গিয়ে পৌঁছিয়ে যতক্ষণ না প্লেন ছাড়ে ততক্ষণ আপনাকে সেখানে অপেক্ষা করতে হবে—

মল্লিক-মশাই বললেন—ঠিক আছে—। আমি তার আগেই তৈরি হয়ে থাকবো—

সত্যিই সে এক বিপরীত পরিস্থিতি। একদিকে ফ্যাক্টরির একটা মেসিনে আগুন লেগে পুড়ে গেল, অন্য দিকে ঠিক সেই দিনই সৌম্যর প্লেনের মেসিন বিগড়ে গেল।

এ কীসের ইঙ্গিত ?

হয়ত এরই নাম জীবন। হয়ত এরই নাম জগৎ। যখন মানুষ আনন্দের আতিশয্যে হাসে তখন সে টেরও পায় না যে তার সামনেই হয়তো কান্না আসছে! কান্না মানুষের অর্থ, খ্যাতি, সম্মান, প্রতিপত্তি কিছুরই পরোয়া করে না। সে তার দাবি ষোল আনা না আদায় করে কাউকে রেহাই দেবে না। সে বড় নির্দয়, সে বড় নিষ্ঠুর।

এই কান্না কিন্তু অমঙ্গলও বটে, কারো কারো ক্ষেত্রে আবার মঙ্গলও বটে। সংসারী লোকের পক্ষে কান্না বড় কষ্টের। অনেক কষ্ট পেলেই তবে সংসারী মানুষ কান্নায় ভেঙে পড়ে, কিন্তু নিরাসক্ত মানুষ এই কান্নাতেই আবার উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। বিষয়ী লোকের কান্না যত বিষাক্ত, ভক্তের কান্না তত পবিত্র। বিষয়ী লোকের কান্নায় ভগবান বিরূপ হন আর ভক্তের কান্নায় ভগবান বিচলিত হন। তাই পরমহংসদেব বলতেন – কাঁদা ভালো, কাঁদলে কুম্ভক হয়।

দু'রকম কান্নাই দেখেছে সন্দীপ। তাই সব দেখে সব কিছু অনুভব করে আজ সে অন্য আর এক সন্দীপ হতে পেরেছে। দোষ কাকে দেবে সে ? সৌম্যবাবুকে, নাকি বিশাখাকে ? আসলে দোষী বোধ করি কেউই নয়, দোষী সন্দীপ নিজেই। তাই সারাজীবন সন্দীপই ওদের চেয়ে বেশি কেঁদেছে।

বাইরে আগুন লাগলে কারো কিছু আসে যায় না, কিন্তু ঘরে যার আগুন লাগে সে-ই বুঝতে পারে দহন জ্বালা কী ভয়ঙ্কর। মেজবাবু মুক্তিপদ মুখার্জি'র সব কিছু থেকেও কিছু ছিল না। চীফ অ্যাকাউনটেণ্ট নাগরাজন ছিল, ওয়েলফেয়ার অফিসার যশোবন্ত ভার্গব ছিল, ওয়ার্কস ম্যানেজার অর্জুন সরকার ছিল। তাকে সাহায্য করতে তার স্টাফের কোনও অভাব ছিল না, এমন কি ট্যাক্সের ব্যাপারে ট্যাক্স স্পেশালিস্ট বিজয়েস কানুনগো থাকা সত্ত্বেও তাকে সব ব্যাপারে জড়িয়ে থাকতে হতো।

সেই অত রাত্রে মুক্তিপদ মুখার্জী নিজে যখন ফ্যাক্টরিতে গিয়ে পৌঁছলেন তখন সবাই-ই সেখানে হাজির! ফায়ার ব্রিগেডকেও সময়-মত খবর দেওয়া হয়েছিল। তারা তখন তার কাজ আরম্ভ করে দিয়েছে।

ওয়ার্কস ম্যানেজার কান্তি চ্যাটার্জী তখন খুব পরিশ্রান্ত। সে এসে দাঁড়াতেই মুক্তিপদ জিজ্ঞেস করলেন—কী হয়েছিলটা কী ?

কান্তি চ্যাটার্জী বললে—ইনভেস্টিগেশন করে তবে আপনাকে রিপোর্ট দেব স্যার—

মুক্তিপদ জিজ্ঞেস করলেন—শর্ট সার্কিট নাকি ?

কান্তি চ্যাটার্জী বললে তা কখনও হতে পারে না স্যার। আমি তো রোজ সব মেসিনগুলোর চেকিং-রিপোর্ট দেখি। আমার স্ট্যাণ্ডিং অর্ডার আছে সেকশান অফিসারের ওপর, তারা রোজ আমাদের চার্ট পাঠায়। কালকেও তো কোথাও কোনও ইরেগুলারিটি দেখতে পাইনি—

—তাহলে কেন এমন হলো ?

কান্তি চ্যাটার্জী বললে—সে স্যার এখন আমি বলতে পারবো না, ইন্‌ভেসটিগেশন না করে কিছুই বলা যাবে না—

মুক্তিপদ সেই দুর্ঘটনার কেন্দ্রস্থলে বসেও নিজেকে স্থির রাখবার চেষ্টা করলেন। কোনও কারণেই বিচলিত হলে চলবে না। যে বিচলিত হয় সে-ই হেরে যায়—

ওয়ার্কস্‌ ম্যানেজারকে ডেকে বললেন—আপনি ইন্‌ভেস্টিগেশন করুন, করে আমায় রিপোর্ট দেবেন—আমি তখন ভাববো কী স্টেপ নেওয়া যায়—

তারপর যশোবন্ত ভার্গবকে ডেকে বললেন—ডে-শিফ্‌টে যে-মেশিন চলেছিল সে-মেসিন হঠাৎ এমন বিগড়োল কেন ? এ শিফ্‌টের ইন্‌-চার্জ কে ? তাকে একবার ডাকুন তো ?

সেই ইন্‌চার্জকে ডেকে আনা হলো। লোকটার নাম বেণুগোপাল।

মুক্তিপদর সামনেই ওয়ার্কস্‌-ম্যানেজার বেণুগোপালকে জিজ্ঞেস করলে—তোমার কত বছর সার্ভিস হলো ?

—কুড়ি বছর স্যার—

—আগে কখনও মেসিনে আগুন লেগেছে ?

—না স্যার !

আবার প্রশ্ন হলো—শিফ্‌ট্‌ সুরু হওয়ার সময় এই মেশিন সম্বন্ধে কি কোনও কমপ্লেন ছিল ?

বেণুগোপাল বললে—না স্যার, যে-ওয়্যারকার এটাতে কাজ করছিল সেও এই মেসিন সম্বন্ধে কোনও কমপ্লেন করেনি—

—আপনি কি রোজ ডিউটিতে এসে সব মেসিন চেক্‌ করেন ?

—হ্যাঁ স্যার করি—

—আজকেও এ মেসিনটা চেক্‌ করেছিলেন ?

—হ্যাঁ স্যার, সেটা আমার ডিউটি। যে-ফোরম্যান যখন ডিউটিতে আসেন তিনিই রোজ সকলের রিপোর্ট পড়ে তবে কাজ শুরু করেন। আমার ডিউটির পর আমিও আমার শিফ্‌টের সব রিপোর্ট দিতাম—

এ সব যান্ত্রিক কাজ। মুক্তিপদ মুখার্জী এ সব কাজের কিছুই বোঝেন না। তাঁর দাদা শক্তিপদ মুখার্জীও কিছু বুঝতেন না, আর বাবা দেবীপদ মুখার্জীও বুঝতেন না কিছু। তবুও তাঁরা কাজ চালিয়ে গিয়েছেন, তখন কোনও গণ্ডগোল ঘটেনি। তখন যে গণ্ডগোলটা ছিল সেটা অন্যরকম। তখন পলিটিক্যাল পার্টি ছিল না, ছিল এজেন্ট, ছিল ব্রোকার। আর ছিল ইন্টার ন্যাশনাল মার্কেট। বার্মা, সিলোন, চায়না, হংকং আরো অনেক মার্কেট। সেখানে এজেন্সি দিলেই কাজ শেষ হয়ে যেত। তবু মাঝে মাঝে সে-সব দেশেও যেতে হতো। আর সেই সঙ্গে ইংলণ্ড, জার্মানী, ফ্রান্স, জাপান—ওখানেও যেতে হতো মার্কেট খুঁজতে, বা মার্কেট এক্সপ্যাণ্ড করতে। তার জন্যে জায়গায় জায়গায় ককটেল পার্টি দিতে হতো। একবার একটা গাড়িও ভেট দিতে হয়েছিল একজন জেনারেল ম্যানেজারকে। আর বাকিটা ইন্টারন্যাল মার্কেট। তার মাঝে দিল্লী, মহারাষ্ট্র, ম্যাড্রাস, কেরল গভর্নমেন্ট। তখন একটা বড় মার্কেট ছিল রেলওয়েজ। রেলওয়েজগুলো কম

মাল কিনতো না 'স্যাক্সবী'র। 'স্যাক্সবী'র তৈরি Fish Plate, Truss, Wagon Components, Track Fittings, Slippers তখন ছিল মনোপলি বিজনেস। তার জন্যে অবশ্য অফিসারদের ঘুষ দিতে হতো, কিন্তু তা নগণ্য। সামান্য খরচ হলেও সেটা প্রোডাকশন-এর আইটেমের মধ্যে পুরে দিলেই চলতো।

ফ্যাক্টরি থেকে চলে আসতে-আসতে রাত কাবার হয়ে এসেছিল। যখন সব গোলমাল মিটে গেল তখন মুক্তিপদ বাড়ি আসবার জন্যে গাড়িতে উঠতেই অর্জুন সরকার এক পাশে বসলো। অর্জুন সরকার মানে কনফিডেনশিয়াল ডেপুটি ওয়ার্কস ম্যানেজার।

—কী ব্যাপার সরকার ?

গাড়ি তখন চলতে আরম্ভ করেছে।

অর্জুন সরকার বললে—স্যার, একটা খবর আছে—

—কী ?

অর্জুন সরকার গলা নিচু করে বললে—এটা স্যার এ্যাক্সিডেন্ট নয়—

—এ্যাক্সিডেন্ট নয় ?

—না, পিওর স্যাবোটাজ।

—স্যাবোটাজ ? তুমি ঠিক জানো ?

—হ্যাঁ, স্যার, আমি প্রমাণ করে দিতে পারি। এটা ওই শিফ্‌ট ইন-চার্জ বেণুগোপালের কাজ ?

—কীসে বুঝলে ?

অর্জুন সরকার বললে—ও এক নম্বর ইউনিয়নের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। ওকে ওদের পার্টি থেকে ইনস্ট্রাকশান দেওয়া হয়েছে। ওর জন্যে ও টাকাও পেয়েছে—

—তার প্রমাণ কী ? ও তো অনেক টাকা স্যালারি পায়।

—তাতে কী হয়েছে স্যার ? টাকার লোভের কি মানুষের শেষ আছে ?

মুক্তিপদ খুব ভাবনায় পড়লেন।

—তুমি প্রমাণ দিতে পারো ?

অর্জুন সরকার বললে—ও এক লাখ টাকা পেয়েছে পার্টির কাছ থেকে—

—প্রমাণ ? ব্যাঙ্কের পাশ বই ?

অর্জুন সরকার বললে—না স্যার, ওরা অত বোকা নয় যে টাকাটা ও ব্যাঙ্কে রাখবে ! ও নিজের বাড়িতেই টাকাটা রেখেছে। কালকের মধ্যেই বাড়ি সার্চ করলে টাকাটা পাওয়া যাবে। দেরি করলেই টাকাটা সরিয়ে ফেলবে।

এটাও বড় গোলমেলে কাণ্ড ! বাড়ি সার্চ করে যদি টাকা না পাওয়া যায়, তখন তখন কী হবে।

অর্জুন সরকার বললে—না স্যার, আমি বলছি, টাকা পাওয়া যাবে।

—কে দিয়েছে তোমাকে খবরটা ? সোর্স কে ?

—ওদের ইউনিয়নের এক মেম্বার !

—কেন সে তোমাকে খবরটা দিলে ?

অর্জুন সরকার বললে—সে আমার একজন ইনফরমার। আমার কাছ থেকে সে রেগুলার টাকা পায়—

মুক্তিপদ নিজের মনেই কিছুক্ষণ ভাবতে লাগলেন। সারা রাত তাঁর ঘুম হয়নি। আর একটু পরেই ভোর হবে। হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন—কিন্তু অর্জুন সার্চ কে করবে ?

অর্জুন সরকার বললে—কেন স্যার, পুলিশ—

মুক্তিপদ বললেন—কিন্তু পুলিশ তো আমাদের পক্ষে নেই—

—তাতে কী ? টাকা দিলেই তারা আমাদের পক্ষে হয়ে যাবে। আর তা যদি না করতে চান তো ইনকাম-ট্যাক্স ডিপার্টমেন্টকেও আমরা ইনফ্লুয়েন্স করতে পারি। তবে যাদের দিয়েই সার্চ করা হোক, কাজটা তাড়াতাড়ি সেরে ফেলতে হবে। একেবারে কালকের মধ্যেই। নইলে একটু সেন্ট পেলেই সব সরিয়ে ফেলবে।

মুক্তিপদ একটু ভেবে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—এত তাড়াতাড়ি ইনকাম-ট্যাক্স অফিস কাজ তুলতে পারবে ?

অর্জুন সরকার বললে—সেটা আমার ওপর ছেড়ে দিন স্যার, দেখি আমি কতদূর কী করতে পারি—

—ঠিক আছে, যা ভালো বোঝ তাই করো। এখন আমি আর কিছু ভাবতে পারছি না, বড্ড টায়ার্ড'...বলে তিনি বাড়ির সামনে নেমে গেলেন। নেমে ড্রাইভারকে বললেন—বিশু, তুই সাহেবকে কোয়ার্টারে পৌঁছিয়ে দিয়ে গ্যারাজে গাড়ি তুলে দিস—

বিশু মানে বিশ্বনাথ। বিশু বললে—কাল সকালে কখন আসবো স্যার ?

—যেমন রোজ আসিস, সকাল আটটায়—

বলে তিনি ভেতরে ঢুকে গেলেন। ঘড়িতে তখন ভোর চারটে বাজে। আটটা বাজতে আর ক'ঘণ্টাই বা বাকি। বিশু গাড়িটা ঘুরিয়ে সরকার সাহেবকে নিয়ে আবার বেলুড়ের দিকে ফিরে চললো।

সরকার সাহেবকে তাঁর কোয়ার্টারে পৌঁছিয়ে দিতেও কিছু সময় লেগে গেল বিশুর। বেলুড়ের ফ্যাক্টরিতে তখন জ্বলন্ত মেশিনের আগুন নিভে গেছে। তখন সবই অন্ধকার। শুধু ফ্যাক্টরির অন্য মেশিনগুলোতে তখন নাইট্-শিফ্‌টের কাজ চলছে। যে মেশিনটাতে আগুন লেগেছিল সেটা পাশেই অকেজো হয়ে পড়ে আছে। সেই মেশিনের স্টাফরাও যে-যার বাড়ি চলে গেছে অনেকক্ষণ। আজকের মত তাদের কাজ বন্ধ। কালকে আবার সেই মেশিন চলবে কি না তার কোনও ঠিক নেই।

বিশু ফ্যাক্টরি থেকে অনেক দূরে একটা অন্ধকার মত জায়গায় গাড়িটা রেখে দিয়ে সেটা লক্ করে দিলে। তারপর আস্তে-আস্তে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে পায়ে-পায়ে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো। সমস্ত শহর ঘুমে আচ্ছন্ন। শেষ রাতের ঘুম বড় গাঢ়। কেউ কোথাও জেগে নেই। যারা জেগেও আছে তাদের সংখ্যা নগণ্য। তবু সাবধানের মার নেই। এমন ভাবে বিশুকে এগোতে হবে যাতে কেউ টের না পায়। টের পেলে সব ভণ্ডুল হয়ে যাবে। তাতে তার চাকরিও চলে যেতে পারে। এ-সব কাজের ঝুঁকি খুব। তবু বিশু আগে অনেকবার এ-রকম ঝুঁকি নিয়েছে। তাতে তার আমদানিও কম হয়নি।

কয়েক পা এগিয়েই ফ্যাক্টরির গেট। চব্বিশ ঘণ্টার দরোয়ান পাহারা দিচ্ছিল।

সে বিশুকে দেখলে, কিন্তু কিছু বললে না। বিশুদের মত লোকদের জন্য ফ্যাক্টরির গেট বরাবর অবারিত দ্বার। গেট পেরিয়ে ডান দিকে ফ্যাক্টরি আর বাঁ দিকে সারি-সারি কোয়ার্টার, কোয়ার্টারের ব্যারাক। ইংরেজদের আমলের সব পাকা ব্যবস্থা এখনও তত কাঁচা হয়নি। সব আগেকার মালিকদের নিয়মেই চলছে।

বেণুগোপালবাবুর কোয়ার্টার বিশুর চেনা।

শিফ্‌ট্‌-ইন্‌-চার্জ বেণুগোপালবাবুর সঙ্গে বিশুর বাইরে বাইরে না থাকলেও ভেতরে ভেতরে ঘনিষ্ঠতা আছে।

ঠিক জায়গাটায় এসে বিশু দাঁড়ালো। কিন্তু ডেপুটি ওয়ার্কস্‌ ম্যানেজার সরকার সাহেবের চর আছে সব জায়গায় ছড়ানো। কে কোথা থেকে কখন তাকে দেখতে পাবে, তার কিছু ঠিক নেই। বাড়ির সামনের দিক থেকে না গিয়ে পেছন দিক থেকে যাওয়া ভালো। তাতে লুকিয়ে-লুকিয়ে কথা বলা যাবে।

শেষ পর্যন্ত বিশু তাই-ই করলে।

একবার কড়া নাড়তেই ভেতর থেকে শব্দ এল—কে ?

বিশু শুধু বললে—দরজটা খুলুন তো একবার—

—কে তুমি ?

বিশু বললে—বেণুগোপাল সাহেব আছেন ?

—হ্যাঁ, আছেন, কিন্তু তুমি কে ?

বিশু এবার গলাটা আরো নামিয়ে বললে—আমি বিশু—

এবার মন্ত্রের মত কাজ হয়ে গেল। দরজার পাল্লা দুটো একটু ফাঁক হতেই মূর্তিটা বললে—এসো, ভেতরে চলে এসো—

সঙ্গে-সঙ্গে দরজাটা আবার বন্ধ হয়ে গেল।

মূর্তিটা বললে—এ কী ? এই অসময়ে ?

বিশু বললে—সায়েব কোথায় ? একটা জরুরী কাজ আছে—

খবরটা ভেতরে যেতেই বেণুগোপাল সাহেব যেমন অবস্থায় ছিল তেমনি অবস্থাতেই বেরিয়ে এসেছে। বিশু এ-বাড়িতে আসা মানে খুব বড়দরের একজন ভি. আই. পি'র আসা। বেণুগোপাল বিশুকে নিয়ে সোজা তার ড্রয়িং রুমে নিয়ে গিয়ে বসলো।

বললে—এত সকালে ?

বিশু বললে—আমার তো এখনই ডিউটি শেষ হলো—

—এখন ? এই ভোরবেলায় ? তাহলে তো তুমি মোটা ওভার-টাইম পেয়ে গেলে।

বিশু বললে—সে জন্যে নয়, একটা জরুরী কথা আছে—

—জরুরী ?

—হ্যাঁ, মুখার্জী সায়েবকে এখুনি বাড়িতে পৌঁছিয়ে দিয়ে এসে এখানে সরকার সাহেবকে ছাড়তে এসেছিলুম। তাই আপনার সঙ্গে দেখা করে গেলুম—

—খবর আছে কিছু ?

বিশু বললে—খবর আছে বলেই তো আপনার কাছে এসেছি স্যার—

বেণুগোপাল খুব কৌতূহলী হয়ে উঠলো—বলো বলো, খবরটা কী ?

তারপর বিশুকে খাতির দেখাবার জন্যে বললে—তুমি চা খাবে ?

বিশু বললে—না স্যার, এখন আমি বাড়িতে গিয়ে একটু ঘুমোব, তার পরেই আবার সকাল আটটায় ডিউটি দিতে হবে—আমার চা খাবার সময় নেই এখন···

—ঠিক আছে, এখন খবরটা কী তাই বলো ?

বিশু এবার একটু দম নিয়ে নিলে। তারপর বললে—খবরটা খুব খারাপ স্যার, আমি তো গাড়ি চালাচ্ছিলাম, পেছনের সিটে মুখার্জী সায়েব আর সরকার সায়েব বসে বসে কথা বলছিলেন। আমি মন দিয়ে সব শুনছিলুম আর গাড়ি চালাচ্ছিলুম—

বেণুগোপাল বললে—তারপর ?

—তারপর সরকার সায়েব বলতে লাগলেন কেন মেশিনটা পুড়লো—

—পোড়বার কারণটা কী বললে সরকার সাহেব ?

বিশু বললে—না স্যার, ঘরের দরজা-জানলাগুলো সব খোলা রয়েছে, এ-অবস্থায় কিছু বলা যাবে না, দেওয়ালেরও তো কান থাকতে পারে কিনা—

ঠিক আছে। বেণুগোপালবাবু ঘরের জানলাগুলো সব বন্ধ করে দিলে। তারপর দরজাতেও খিল লাগিয়ে দিলে।

তারপর তাদের কথা-বার্তা বাইরে থেকে আর কিছু শুনতে পাওয়া গেল না, যখন দরজা খুললো তখন বিশুর মুখে একগাল হাসি। হাতে তখন তার অনেকগুলো নোট। নোটগুলো বিশু বেশ যত্ন করে জামার ভেতর পকেটে রেখে দিলে।

বেণুগোপাল বললে—এখন ওই পাঁচশো টাকাই তোমাকে দিলুম, কিন্তু, পরে আরো পাবে, সেজন্যে কিছু ভেবো না—

বিশু একটু সাবধান করে দিলে বেণুগোপালকে। বললে—দেখবেন স্যার, কথাটা যেন কাক-পক্ষীতেও না জানতে পারে, নইলে স্যার বুঝতেই তো পারছেন, আমার চাকরি নিয়ে—

বেণুগোপাল বিশুর পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললে—আরে, তুমি কি পাগল হলে বিশু, এ-সব কথা কি কাউকে বলতে আছে ?

এ-কথার পর বিশু নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ির বাইরের রাস্তায় গিয়ে পড়লো। আর তারপর ফ্যাক্টরির গেট পেরিয়ে সোজা তার গাড়িটাতে গিয়ে বসলো। আর তারপর স্টিয়ারিংটা ধরে পা দিয়ে এ্যাকসিলাটেলারে চাপ দিতেই গাড়িটা সোঁ-সোঁ করে মুক্তিপদ মুখার্জীর গ্যারাজের দিকে চলতে লাগলো।

বারো বাই এ'র বিডন স্ট্রীটের বাড়িতে সেদিন রাতে ঠাকমামণির আর ভালো করে ঘুম হলো না। খোকা একবার এয়ারপোর্ট থেকে ফিরে এসেছে। আবার রাত তিনটের সময় বাড়ি থেকে বেরোবে।

ঠাকমা-মণি রাত্রেই খোকাকে বলে রেখেছিলেন—তুই শুগে যা, আমি তোকে

ঠিক সময়ে ডেকে ঘুম ভাঙিয়ে দেবখন—তোর কোনও ভাবনা নেই।

এমনিতেই ঠাকমা-মণির ধারণা যে তাঁর খোকা রাত ন'টার আগেই বাড়ি এসে খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। তার ওপর যদি আবার তাকে রাত তিনটের সময় বিছানা ছেড়ে উঠতে হয় তাহলেই যত বিপদ।

কিন্তু মল্লিক-মশাই-এর ভাবনা তার চেয়েও বেশি। চাকরি বলে কথা! তিনি যদি ঘুমিয়ে পড়েন তো তখন কী কৈফিয়ৎ দেবেন?

সন্দীপ বললে—আমি আপনাকে জাগিয়ে দেব, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন—

মল্লিক-মশাই বললেন—তুমি থামো। তোমার বয়েস কম, এখন তো তোমরা ঘুমোবে, আমি বুড়ো মানুষ, আমাদের কি অত ঘুম হয়?

তা শেষ পর্যন্ত সেদিন রাত্রে কারোরই ঘুম হলো না, ওপরে ঠাকমা-মণি জেগে, নিচেয় মল্লিক-মশাই, সন্দীপ, তাদেরও ঘুম নেই।

মল্লিক-মশাই একবার ওঠেন, দরজা খুলে বাইরের দেয়ালে টাঙানো ঘড়িটা একবার দেখেন, তারপর আবার এসে শুয়ে পড়েন।

সন্দীপ জিজ্ঞেস করে—ক'টা বেজেছে কাকা?

মল্লিক-কাকা আর একটু ঘুমোবার চেষ্টা করতে করতে বলেন—এ কী, তুমি এখনও ঘুমোওনি? এখন সবে সাড়ে বারোটা, তুমি ঘুমোও—

সন্দীপ বলে—আমার আর ঘুম আসবে না—

—কেন? তোমার আবার কী হলো? তোমার ঘুম আসবে না কেন?

সন্দীপ বলে—আমার অত সহজে ঘুম আসে না—

—এ কী? এই বয়েসেই তোমার এত কম ঘুম? তাহলে আমাদের বয়েস হলে তুমি কী করবে?

সন্দীপ বলে—এ ভাবে আমার ঘুম হয় না—

মল্লিক-কাকা বলেন—যাক্‌গে, আর কথা বোল না, এবার ঘুমোতে চেষ্টা করো।

বলে মল্লিক-কাকাও আবার একটু ঘুমোতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। খানিক পরে আবার উঠে পড়লেন। আবার বাইরে গিয়ে দেওয়ালের ঘড়িটা দেখলেন। দেড়টা বেজেছে। আবার ঘুমোবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু ঘুম আসা মল্লিক-কাকার অত সোজা নয়। একবার উঠে গিয়ে বাইরের ঘড়ি দেখতে হয়, আর তখনই আবার ফিরে এসে শুতে হয়। এ ঠিক ঘুমও হলো না, আবার জাগাও হলো না। মাঝখান থেকে কেবল বিছানা ছেড়ে একবার ওঠা আর আবার বিছানায় এসে শোওয়া।

শেষকালে সন্দীপ বললে—ড্রাইভারকে তো বলা আছে সে এসে ডেকে জানিয়ে দেবে। আপনি অত ভাবছেন কেন?

—তুমি এখনও জেগে আছো?

আর তারপরেই বললেন—আর না-জেগেই বা করবে কী? একবার দরজা খুললে আর বন্ধ করলে কারো ঘুম আসে? তোমারো কোনও দোষ নেই—

তা কথাটা সত্যি। ওপর-তলায় ঠাকমা-মণিরও সেই একই অবস্থা। ঠাকমা-মণি বার-বার জিজ্ঞেস করেন—ওরে বিন্দু, কটা বাজলো, দ্যাখ তো—

বিন্দু সারাদিনই হুকুম তামিল করে করে হয়রান হয়ে গিয়েছিল। রাত্রে যে সে

একটু ঘুমোবে প্রাণ ভরে, তাও হবার উপায় নেই বুড়ীর জ্বালায়। তাকেও বার-বার উঠতে হতো, আর বার-বার ঘড়ি দেখতে হতো! আর ঠাকমা মণিকে বলতে হতো ক'টা বেজেছে। কখনও ঘড়িতে বেজেছে সাড়ে বারোটা, কখনও দেড়টা, আবার কখনও দু'টো। এক কথায় বলতে গেলে সারারাতই বিন্দু জেগে কাটালো সন্দীপের মতন।

কিন্তু সন্দীপ তখন কাকে বকাবকি করবে? বকাবকি করবে মল্লিক-কাকাকে, না নিজের ভাগ্যকে?

অথচ যে-আরাম যে-নিরাপত্তা সে এ-বাড়িতে পেয়েছিল তার জন্যে তো তার ঠাকমা-মণির বা মল্লিক-কাকার কাছে কৃতজ্ঞই থাকা উচিত ছিল। কিন্তু তবু কেন তার রাগ হলো? আসলে বোধহয় মানুষ তার যোগ্যতার চেয়ে তার দাবীর কথাটাই আগে ভাবে। যোগ্যতা আছে কি নেই সেটা যেন বড় কথা নয়, পৃথিবীর সব কিছু ভোগ আর সব কিছু আর'মের বস্তুর ওপর অধিকার তার যেন জন্মগত, এটাই সে ভেবে নিয়ে মনে মনে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

এতদিন পরে পুরনো সেই ঘটনাগুলোর কথা ভাবলেও তার লজ্জা হয়। সন্দীপ কেবল সকলের কাছে বরাবর দাবীই করে এসেছে। কিন্তু সকলকে কিছু দেবার কথা কি তার কখনও মনে এসেছে?

হায় রে, এ-সংসারে তো সবাই নিতেই জানে! দেওয়ার কথা ক'জন ভাবে! কিছু কিছু লোক নিয়েই কৃতার্থ হয়, আর কিছু কিছু লোক দিয়ে। কিন্তু দিয়ে কৃতার্থ হবার লোক কেন সংসারে এত কমে আসছে? কেন কেউ কাউকে বলছে না —তুমি নিয়েই আমাকে কৃতার্থ করো?

ঠাকমা-মণি সৌম্যকে পাখী-পড়া করে বার-বার বলে দিয়েছিলেন। কিন্তু তবু আবার বার-বার করে বলে দিলেন—সেখানে গিয়েও কলকাতার মতন রাত ন'টার মধ্যে বাড়ি ফিরে এসে খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়বে বাবা, বুঝলে?

সৌম্য বললে– হ্যাঁ, তাই করবো—

—আর সে বড় ঠাণ্ডার দেশ, সব সময়ে গরম-জামা-কাপড় পরে শরীর ঢেকে রাখবে। বুঝলে? একবার ঠাণ্ডা লাগিয়ে তোমার দাদুর খুব নিউমোনিয়া হয়ে গিয়েছিল। তাঁর সে গলাটলা ভেঙে একেবারে একাকার। অনেক ডাক্তার-টাক্তার দেখিয়ে তবে সে-যাত্রা সারে। খুব সাবধানে থাকবে বাবা। আর রোজ আমাকে একটা করে চিঠি লিখবে। আর যদি তা না পারো তো অন্ততঃ একটা টেলেক্স করেও জানাবে আমাকে তুমি কেমন আছো। নইলে আমি খুব ভাববো কিন্তু তোমার জন্যে—

এগুলো হচ্ছে উপদেশ। এ-ছাড়াও সঙ্গে দিলেন গৃহ-বিগ্রহ সিংহবাহিনী দেবীর একটা ছবি।

ছবিটা সৌম্যর ব্যাগের মধ্যে পুরে দিয়ে বললেন—তুই যখন যেখানে যাবি এই ছবিটা সব সময়ে সঙ্গে সঙ্গে রাখবি, এই মা'ই তোকে সব সময় রক্ষে করবে। রোজ ঘুম থেকে উঠে এই ছবিটাকে কপালে ঠেকিয়ে প্রণাম করবি। বুঝলি? দেখবি সব বিপদ কেটে যাবে। আমি যখন যেখানেই গিয়েছি সব সময়েই এটা সঙ্গে নিয়ে গিয়েছি। আর একটা কথা……

বলে একটু থেমে আবার বলতে লাগলেন—আর একটা কথা, ও-দেশের মেয়েগুলো বড্ড গায়ে-পড়া। বড় হ্যাংলা। তাদের সঙ্গে যেন মিশো না বাবা। যদি একবার জনতে পারে যে তুমি বড়লোক, যদি একবার জানতে পারে তোমার টাকা আছে তো তোমাকে ছিঁড়ে খাবে। আমার নিজের চোখে সব দেখা আছে। তাই আমি তোমার দাদুকে কখনও একলা কন্‌টিনেণ্টে পাঠাইনি, যতবার তিনি ওখানে গেছেন, আমি ততবার ওঁর সঙ্গে গিয়েছি। মেয়েমানুষদের কখনও ওঁর ধারে-কাছে ঘেঁষতে দিইনি। নইলে কি আর তারা ছেড়ে কথা কইতো? টাকার লোভে ওঁকে ছিঁড়ে খেত একেবারে! তা ভালোই হয়েছে, তোমার তো আর ওসব দিকে কোনও ঝোঁক নেই—

তারপরে একটু দম নিয়ে আবার বলতে লাগলেন—আর মদ! ওই একটা জিনিস! তুমি অবশ্য মদ-টদ খাওনা, আমি জানি। কিন্তু বাবা, সেই যে কথায় আছে না, 'দশচক্রে ভূত'! আমি সঙ্গে থাকবো না বলেই এত কথা তোমাকে বলা! মদ ওখানে ডাল ভাতের মত। খাওয়ার আগে মদ, খাওয়ার পরেও মদ। জলের বদলে ওরা সবাই মদই খায়। তা যাদের দেশে যে- রেওয়াজ তার ওপর আমি কিছু বলতে চাই না। কিন্তু তুমি বাবা যেন ও-সব ছাই-পাঁশ ঠোঁটেও ঠেকিও না। শুনেছি ও-নেশা নাকি একবার শরীরে ঢুকলে তার আর ছাড়ান-ছোড়ন নেই, ও একেবারে তোমাকে খেয়ে তবে ছাড়বে—

সৌম্য এ-সব কথার আর কী উত্তর দেবে! সে চুপ করেই রইল।

ঠাকমা-মণি বললেন—তা থাক্‌গে, তুমি এখন শুয়ে পড়োগে যাও। আমি ঠিক সময়ে তোমাকে জাগিয়ে দেবখন, যতটুকু সময় পাও, ঘুমিয়ে নাও—

সুতরাং অর্ধেক কথা আগের রাত্রে বলা হয়েই গিয়েছিল। তাই অন্য কোনও কথা বলার ছিল না। একেবারে শেষ রাত্রের দিকে সৌম্যকে বিছানা ছেড়ে জাগিয়ে দেওয়া হলো।

ড্রাইভার, মল্লিক-মশাই সবাই-ই তৈরি। সৌম্য তৈরি হয়ে ঠাকমা-মণির পায়ে হাত দিয়ে মাথায় ঠেকালো। ঠাকমা-মণিও নাতির চিবুকে হাত ছুঁইয়ে চুমু খেলেন। দুর্গা দুর্গা বলে মা'কে একবার স্মরণ করলেন।

তারপর শেষবারের মত বললেন—যা যা বলেছিলুম, তোমার সব মনে আছে তো?

—কী কথা?

—ওমা, এরই মধ্যে সব ভুলে গেলি? অত করে পাখী-পড়া করে মুখস্থ করিয়ে দিলুম যে?

সৌম্য কিছু মনে করতে পারলে না।

জিজ্ঞেস করলে—কী কথা বলো তো? আমি তো ঠিক মনে করতে পারছি না—

ঠাকমা-মণি বললেন—তোর এই রকম ভুলো মন নিয়ে তুই কী করে অফিস চালাবি বল তো? এখন লণ্ডনে যাচ্ছিস, সেখানে কে তোকে দেখবে বল্ দিকিনি? সেখানে তোর কে আছে?

এ-সব প্রলাপ শোনবার মত সময় তখন ছিল না সৌম্যর হাতে। তাকে বহুদিনের জন্যে বিদেশে থাকতে হবে। কিন্তু ঠাকমা-মণির ভরসা বলতে তো কেবল ওই

নাতিটিই। ওই নাতিটি ছাড়া তো তাঁর আর কেউ নেই। ওই নাতির ওপর ভরসা করেই তো তিনি এতদিন বেঁচে আছেন। সৌম্যর বাপ নেই, মা নেই, কেউই নেই। ওই নাতির একটা স্থিতি করে দিতে পারলেই তাঁর ছুটি। তার মানে সৌম্যর একটা বিয়ে। আর সে বিয়ে তিনি এমন একটি মেয়ের সঙ্গে দেবেন যে সৌম্যকে মানুষ করে তুলবে। যে-মেয়ে শুধু সৌম্যকেই দেখবে না, সঙ্গে সঙ্গে তাঁকেও দেখবে, তাঁরও সেবা করবে। তাঁর সংসারে লক্ষ্মী-শ্রী আনবে। তাঁর ভবিষ্যৎ বংশধরের জননী হবে!

এমনি কত আশা ছিল ঠাকমা-মণির মনে, কত সাধ, কত কামনা-বাসনা।

কিন্তু মানুষ ভাবে এক আর হয় অন্য রকম।

মনে আছে মল্লিক-কাকা সেই ভোর রাত্রেই সৌম্যবাবুকে নিয়ে দমদম এয়ারপোর্টে চলে গিয়েছিলেন। যখন ফিরে এলেন তখন বেলা দশটা। সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে —ছোটবাবু চলে গেলেন?

মল্লিক-মশাই বললেন—হ্যাঁ, ঘাড় থেকে একটা দায়িত্ব নামলো—

—প্লেন ঠিক সময়ে ছেড়েছিল?

মল্লিক-মশাই বললেন হ্যাঁ, কোনও অসুবিধে হয়নি—

বলে তিনি ওপরে চলে গেলেন। ঠাকমা-মণি তখন মল্লিক-মশাইএর জন্যে হাঁ করে অপেক্ষা করছিলেন। মল্লিক-মশাই কাছে যেতেই তিনি জিজ্ঞেস করলেন—কী হলো? ঠিক সময়ে পৌঁছেছিলেন?

—হ্যাঁ, কোনও অসুবিধে হয়নি।

ঠাকমা-মণি আবার জিজ্ঞেস করলেন—খোকাকে টেলিগ্রাম করার কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন তো?

মল্লিক-মশাই বললেন—হ্যাঁ—মনে করিয়ে দিয়েছি।

ঠাকমা-মণি বললেন—ঠিক আছে, আপনি এখন আসুন—

বলে উঠে দাঁড়াতেই টেলিফোনের ঘণ্টা বেজে উঠলো। টেলিফোন ধরবার ডিউটি বিন্দুর। সে টেলিফোনের রিসিভারটা রেখে বললে—ঠাকমা-মণি, আপনার ফোন, মেজবাবু ডাকছেন—

মল্লিক-মশাই তখন নিচেয় নেমে গেছেন। ঠাকমা-মণি রিসিভারটা ধরে জিজ্ঞেস করলেন—কী রে, কিছু বলবি?

ওপাশ থেকে মুক্তিপদ বললেন—হ্যাঁ, সৌম্য চলে গেছে?

ঠাকমা-মণি বললেন—হ্যাঁ···তা তোর গলাটা এমন ধরা-ধরা কেন? কী হয়েছে?

মুক্তিপদ বললেন—কাল সারারাত আমার ঘুম হয়নি, তাই···

—কেন? ঘুম হয়নি কেন? শরীর খারাপ?

—না, কাল সারারাত ফ্যাক্টরিতে ছিলুম—

—কেন? সারারাত ফ্যাক্টরিতে ছিলি কেন? আবার লেবার-ট্রাবল?

—হ্যাঁ, লেবাররা কাল একটা মেশিন পুড়িয়ে দিয়েছিল, তাই সেখানে আমাকে থাকতে হয়েছিল। ফায়ার-বিগ্রেড এসেছিল। আগুন নিভতে নিভতে রাত প্রায় তিনটে বেজে গিয়েছিল, সেখান থেকে ফিরে আর ঘুম আসেনি। তখন থেকে জেগেই আছি······

ঠাকমা-মণি বললেন—তা ঘুম তো আমাদের বাড়িরও কারো হয়নি।

—কেন ?

—বাঃ, আবার জিজ্ঞেস করছিস, কেন ? রাত তিনটের সময় তো সৌম্যকে জাগিয়ে দিতে হয়েছে। তাতে ঘুম কারো আসে ? আমারও ঘুম হয়নি, বিন্দুরও ঘুম হয়নি, সরকার-মশাইও ঘুমোননি সারারাত।

—তা সে ঠিক সময়েই গেছে তো ? ঠিক সময়ে প্লেন ছেড়েছিল ?

—হ্যাঁ, সরকার-মশাই এখন এসে খবর দিয়ে গেলেন যে প্লেন ঠিক সময়েই ছেড়েছে—আমি তাকে বলেছি সেখানে পৌঁছিয়েই যেন একটা টেলেক্স করে দেয়। তুইও লন্ডন-অফিসে একটা টেলেক্স করে দিস সময় পেলে, বুঝলি ?

মুক্তিপদ বললেন—সময় বোধহয় আর পাবো না মা—

—কেন ? তোর আবার কী হলো ?

মুক্তিপদ বললেন—তোমাকে সবই তো বলেছি। তুমি তো তা বুঝতেই চাওনা। আমার জ্বালা তুমি যদি না বোঝ তো অন্য লোকে কী করে বুঝবে ? জানো মা, শুনলুম আমাদের ফ্যাক্টরিতে বেণুগোপাল বলে একজন শিফ্‌ট্‌-ইন্‌-চার্জ আছে, সে নাকি কার কাছ থেকে এক লাখ টাকা ঘুষ খেয়ে মেশিনটা পুড়িয়ে দিয়েছে। ভেবে দেখ এই সব লোক নিয়ে আমাকে কাজ চালাতে হচ্ছে।

—তা কে তাকে এক লাখ টাকা ঘুষ দিলে, শুনেছিস কিছু ?

মুক্তিপদ বললেন—কে আবার দেবে, দিয়েছে গভমেণ্ট—

—সে কী ? গভমেণ্ট কখনও ঘুষ দেয় ?

মুক্তিপদ বললেন—দেয় মা, দেয়। আজকাল সবই সম্ভব। গভমেণ্ট কি আর নিজের হাতে ঘুষ দেয় ? দেয় গভমেণ্টের দালালদের হাত দিয়ে। তারাই তো এখন গভমেণ্ট চালাচ্ছে।

—তাতে তাদের কী লাভ ?

মুক্তিপদ বললেন—তারা চায় না কোনও বাঙালী এখানে ব্যবসা চালায়। তারা চায় না বাঙালীর ছেলেরা এখানে চাকরি পায়। তারা চায় এখান থেকে বাঙালী ব্যবসাদাররা কারবার উঠিয়ে নিক—

ঠাকমা-মণি বললেন—কী যা-তা বলছিস তুই ? বাঙালীরা এখানে কারবার না চালালে কোথায় যাবে ?

মুক্তিপদ বললেন—কোথায় আবার যাবে ? জাহান্নমে—

—তুই চুপ কর, তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে, তাই আবোল-তাবোল বকছিস—

মুক্তিপদ বললেন—না মা, না। আমার মাথা খারাপ হয়নি। আমি ঠিক বলছি। লেবার-লীডাররা তাই-ই চায়। তারা চায় যে আমরা ভয় পেয়ে গিয়ে তাদের পকেটে আরো টাকা ঢালি। আর সেই টাকাতে তারা আরো বড়লোক হোক। তুমি জানো না মা, এক-একটা লীডার এখন প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড বাড়ি করে ফেলেছে। আগে তারা টাকার অভাবে খেতে পেত না, আর এখন লেবারদের ক্ষেপিয়ে তারা সব মাল্‌টি-মিলিওনার হয়ে গেছে। তাদের এক-একজনের গাড়িতে রোজ পনেরো-কুড়ি লিটার করে পেট্রল খরচ হয়। এ-সব টাকা তাদের পকেটে আসে কোত্থেকে ? কে দেয় ? তারা একদিকে যেমন গরিবদের মারছে, তার সঙ্গে সঙ্গে আবার আমাদেরও

মারতে চাইছে—আমি কী করি বলো তো—

ঠাকমা-মণি বললেন—তুই সারারাত ঘুমোসনি। এখন একটু ঘুমিয়ে নে। আমারও কাল সারারাত ঘুম হয়নি। পরে কথা বলবো। এখনি ছাড়ি—

বলে রিসিভারটা রেখে দিলেন ঠাকমা-মণি।

ওদিকে মুক্তিপদও রিসিভারটা রেখে অর্জুন সরকারকে টেলিফোন করলেন। অর্জুন সরকার তখন ঘুমোচ্ছিল।

মুক্তিপদ বললেন—কী হলো, বেণুগোপালের সম্বন্ধে কিছু ভাবলে তুমি?

অর্জুন সরকার বললে—হ্যাঁ স্যার, সব পাকা করে ফেলেছি। কালকের মধ্যেই বেণুগোপালের বাড়ি সার্চ করা হবে—

—কালকে? কখন?

অর্জুন সরকার বললে—কাল ভোরের আগেই। আপনি কিছু ভাববেন না স্যার। তারপর যা ডেভেলপমেণ্ট হয় তা আপনাকে আমি ঠিক সময়েই জানিয়ে দেব—

মুক্তিপদ নিশ্চিন্ত হলেন। বললেন—ঠিক আছে, আমি তোমার টেলিফোন-কলের অপেক্ষায় থাকবো—
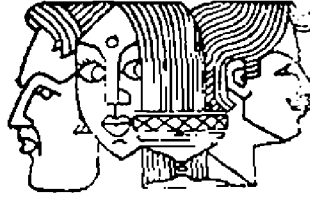
সমুদ্রে যেমন জলের ঢেউ থাকে, ইতিহাসেও তেমনি মানুষের মতবাদের ঢেউ থাকে। একশো দু'শো তিনশো কিম্বা এক হাজার বছর ধরে একটা মতবাদকে আশ্রয় করে মানুষ এগিয়ে যায়। আবার একশো দু'শো তিনশো কিম্বা এক হাজার বছর ধরে অন্য একটা মতবাদকে আশ্রয় করে মানুষ পেছিয়ে আসে।

এই এগিয়ে যাওয়া আর পেছিয়ে এসে আবার সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টার নামই হলো ইতিহাস। সমুদ্র যেমন কখনও থেমে থাকে না, ইতিহাসও তেমনি। সেও কখনও থেমে থাকে না।

একটা মানুষের জীবনও ঠিক তাই।

একটা মানুষ হয়ত এগিয়ে যেতে গিয়ে পেছিয়ে পড়লো, কিন্তু আর একজন মানুষ হয়ত এগিয়ে যেতে গিয়ে সত্যিই আরো খানিকটা এগিয়ে গেল। তারপর সে যখন একদিন থেমে গেল, তখন আরও একজন মানুষ সেখান থেকে হয়ত আবার আরো অনেক দূর এগিয়ে গেল।

মানুষের এই ঢেউ-এর ওঠা-নামা, মতবাদের এই এগোন আর পেছিয়ে যাওয়া যারা দেখতে পায় তারা দেখতে পায়। কিন্তু ক'জন তা দেখতে চায়?

মানুষের মিছিল যখন গড়িয়ে চলে তখন তাকে দু'রকম ভাবে দেখা যায়। এক

—চলমান মিছিলের মধ্যেখানে একাকার হয়ে মিশে থেকে। আর দুই—দূরের একটা বারান্দা থেকে দাঁড়িয়ে। অর্থাৎ কখনও বিযুক্ত হয়ে আবার কখনও বিচ্ছিন্ন হয়ে।

সন্দীপও একদিন বেড়াপোতা থেকে বেরিয়েছিল এই মানুষের মহাযাত্রার মিছিল দেখতে। সে এই দু'ভাবেই মানুষ দেখেছে। কখনও বিযুক্ত হয়ে আবার কখনও বিচ্ছিন্ন হয়ে। বেড়াপোতার কাশীনাথবাবুদের লাইব্রেরীর মধ্যে তার যে মানুষ দেখা তা বিচ্ছিন্ন হয়ে দেখা, পরোক্ষ দেখা। আর কলকাতায় বারোর-এ বিডন্ স্ট্রীটের বাড়িতে এসে যে মানুষ দেখা তা বিযুক্ত হয়ে দেখা, প্রত্যক্ষ দেখা। কলকাতার এই মল্লিক-কাকা, ঠাকমা-মণি, মুক্তিপদ মুখাজী, সৌম্যবাবু আর তার সঙ্গে খিদিরপুরের মনসাতলা লেনের তপেশ গাঙ্গুলী, বিশাখা, যোগমায়া দেবী থেকে আরম্ভ করে সুশীল সরকার, গোপাল হাজরা, বরদা ঘোষাল, শ্রীপতি মিশ্র, আণ্টি মেমসাহেব, জয়ন্তী দিদিমণি, বিন্দু, গিরিধারী দরোয়ান—সবাইকে তার প্রত্যক্ষ রূপে দেখা।

কিন্তু এদের সবাইকে প্রত্যক্ষভাবে দেখে সে মহাজীবনযাত্রার মিছিলে কতদূর এগিয়ে গেল? সত্যিই সে কি এগিয়েছে, না কি পেছিয়েছে? জীবনের হিসেবের খতিয়ানে লাভ-লোকসানের প্লাস-মাইনাসের যোগ-বিয়োগে তার জমার পাতায় কতটুকু সঞ্চয় বাড়লো?

এরও হিসেব একদিন তাকে কড়ায়-ক্রান্তিতে কষে বার করতে হবে। যতদিন বিডন-স্ট্রীটের বাড়িতে সে থেকেছে, যতদিন রাত্রিতে তার ঘুম আসতে দেরি হয়েছে, ততদিন এই প্লাস-মাইনাসের অঙ্কই সে কেবল কষে গিয়েছে।

সৌম্যবাবু বিলেত চলে যাবার পর আর গিরিধারীকে রাত জাগতে হয় না। রাত জেগে সৌম্যবাবুকে দরজা খুলে দিতেও হয় না, আর ভোরের দিকে দরজায় তালা লাগাতেও হয় না।

সন্দীপ ভালো করে চেয়ে দেখতো গিরিধারীর দিকে। ছোটবাবুর কাছ থেকে সে মাসে-মাসে মোটা রকম একটা বখশিস পেত, সেটা বন্ধ হয়ে যাওয়াতে সে যেন আগের চেয়ে একটু গম্ভীর-গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল। মাসকাবারি উপার্জন কমে গেলে কার না মুখ গম্ভীর হয়?

প্রতি মাসে গিরিধারী সন্দীপের কাছে আসতো মাণি-অর্ডার ফর্ম নিয়ে। সেই ফর্ম ভর্তি করতে হতো সন্দীপকে। দ্বারভাঙ্গা জেলার কোন্ এক অজ পাড়াগাঁয়ের ঠিকানায় একজনের নামে গিরিধারী টাকা পাঠাতো। রামাদীন সিং। গ্রাম—ভোজপুর। পোস্টাফিস—গঙ্গানগর।

সন্দীপ প্রথমে একদিন জিজ্ঞেস করেছিল—এই রামাদীন সিং তোমার কে হয় গিরিধারী?

গিরিধারী বলেছিল—আমার লেড়কা বাবুজী।

কিন্তু কোনও মাসে পাঠাতো পঞ্চাশ টাকা, আবার কোনও মাসে ষাট টাকা। আবার হয়ত বা কোনও মাসে চল্লিশ টাকা...

টাকা কম হলে সন্দীপ জিজ্ঞেস করেছে—এবার এত কম টাকা পাঠাচ্ছ কেন গিরিধারী?

গিরিধারী উত্তর দিয়েছে—এ মাসে আমদানী কম হয়েছে যে বাবুজী—

অনেক সময়ে সৌম্যবাবু মদের ঝোঁকে পকেটে যত টাকা থাকতো সবই উপুড় করে ঢেলে দিত গিরিধারীর হাতে। সে-মাসে গিরিধারীর বেশি আমদানী হতো।

তাই সৌম্যবাবু বিলেত যাওয়ার পর থেকেই গিরিধারী একটু বিমর্ষ হয়ে পড়েছিল। তখন যেন তার খেয়েও সুখ নেই, সারারাত ঘুমিয়েও সুখ নেই। তুলসী দাসের দোঁহা আউড়িয়ে সে দুঃখ-কষ্ট-অভাব-অভিযোগ সমস্ত ভুলে থাকবার চেষ্টা করতো।

রাসেল স্ট্রীটের মাসিমাও যেন কেমন, মন-মরা হয়ে গিয়েছিল তার পর থেকে। তখন আর স্কুল থেকে বাড়ি ফিরতে বিশাখার দেরি হতো না। তখন অরবিন্দও ঠিক সময়ে বিশাখাকে স্কুলে নিয়ে যেত, আর ঠিক সময়েই আবার বাড়ি ফিরিয়ে দিয়ে যেত।

সন্দীপ রাসেল স্ট্রীটের বাড়িতে গেলেই যোগমায়া দেবী অনেক আশা নিয়ে বিডন্ স্ট্রীটের বাড়ির খবর জিজ্ঞেস করতো—বলতো—ও-বাড়ির খবর কী বাবা ?

সন্দীপ বলতো—নতুন খবর তো আর কিছু নেই মাসিমা—

—তোমাদের ঠাকমা-মণি কেমন আছেন বাবা ?

সন্দীপ বলতো—ভালোই আছেন।

—আমাদের কথা কিছু জিজ্ঞেস করেন না ?

সন্দীপ বলতো—রোজই তো জিজ্ঞেস করেন। এখানকার খবর তো রোজই তাঁর কাছে গিয়ে আমাকে দিয়ে আসতে হয়—

সন্দীপের এই-ই চাকরি। এই চাকরিই তার শুরু থেকে চলেছে। সকাল বেলা রাসেল স্ট্রীটের বাড়িতে এসে বিশাখাদের খবরা-খবর নিয়ে ঠাকমা-মণিকে দেওয়া আর দরকার হলে মল্লিক-মশাই এর কাজ-কর্মে সাহায্য করা। আর বিকেল বেলায় কলেজে যাওয়া আর সন্ধ্যেবেলা লেখাপড়া করা। এ-ছাড়া কাজ বলতে আর কিছু ছিল না তার।

সেদিন যোগমায়া জিজ্ঞেস করলে—হ্যাঁ বাবা, বিলেত থেকে তোমাদের ছোটবাবু কিছু চিঠিপত্তোর দিয়েছে ?

সন্দীপ বললে—ঠাকমা-মণিও তো সেই জন্যে খুব ভাবছেন—

—কিন্তু এতদিনে তো চিঠি-পত্র কিছু আসা উচিত ছিল সেখান থেকে—

সন্দীপ বললে—ঠাকমা-মণি তো বার-বার সে-কথা সৌম্যবাবুকে বলে দিয়েছিলেন। অন্ততঃ একবার সেখান থেকে তো টেলিফোনও করতে পারতেন। টেলিফোন করলে তো আর নিজের পকেট থেকে পয়সা খরচ করতে হতো না। কোম্পানির সঙ্গে তো কলকাতার অফিসের হরবখত্ টেলিফোনে কথা-বার্তা হচ্ছে—

খবরটা শুনে যোগমায়া দেবী মনে-মনে কষ্ট পেলেন।

বিশাখা পাশে দাঁড়িয়ে শুনছিল। সে বললে—তুমি অত ভাবছো কেন বল দিদিমা ? যে বিলেতে গেছে সে কচি খোকা নাকি ? খবর আবার কী দেবে ? নতুন জায়গায় গিয়ে একটু গুছিয়ে বসতে সময় লাগবে না ?

যোগমায়া বললে—তুই চুপ করতো, তোকে কে কথা বলতে বলেছে ?

বিশাখা বললে—বেশ করেছি কথা বলেছি। আমি কি জলে পড়ে গেছি নাকি যে

কেউ উদ্ধার না করলে আমি একেবারে মরে যাবো ?

যোগমায়া বললে—শুনলে বাবা, মেয়ের কথা ? মেয়ের কথা একবার শুনলে তুমি ?

তারপরে মেয়ের দিকে চেয়ে বলতে লাগলো—ওরে মুখপুড়ী, তোর এত গুমোর কেন শুনি ? এত গুমোর তোর কীসের ? এক আমি ছাড়া তো তোর দুনিয়ায় কেউ নেই তাহলে তোর এত গুমোর কেন ? তবু যদি তোর নিজের বাপ থাকতো ! ...এই যে যে-বাড়িতে তুই আছিস, যে গাড়িতে করে তুই ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছিস, এ কার দৌলতে শুনি ? রোজ যে পিণ্ডিগুলো গিলছিস, এর টাকা কে যোগান দিচ্ছে, তার খেয়াল রাখিস ? সব টাকা কি আকাশ থেকে ঝর্-ঝর্ করে পড়ছে, না ভূতে পাঠিয়ে দিচ্ছে ?...চুপ করে আছিস কেন ? দে, এর জবাব দে ?

সন্দীপ বললে—আপনি চুপ করুন মাসিমা, আপনি চুপ করুন, ও ছেলেমানুষ ওকে এসব কথা কেন শোনাচ্ছেন ?

—ছেলেমানুষ ! তুমি আর আমাকে ছেলেমানুষ চিনিয়ো না বাবা। ওর ওই বয়েসে আমার বিয়ে হয়ে গেছে, তা জানো ? ওই বয়েসে আমি বউ হয়ে ঘোমটা দিয়ে শ্বশুর বাড়ি গেছি। আমাকে তুমি ছেলেমানুষ চিনিয়ো না—

তারপর একটু থেমে মাসিমা আবার বলতে লাগলো—মেয়ের কথা শুনলে ? বলে কিনা ওকে উদ্ধার করবার লোকের অভাব নেই ! তা, বল্ তোকে উদ্ধার করবার লোক ক'টা আছে ? তোর মত বাপ-মরা মেয়েকে কে উদ্ধার করবে, বল্ তুই ? তাদের ডেকে আন্ এখানে, আমি দেখি তাদের।

সন্দীপ আবার বললে—আর কিছু বলবেন না মাসিমা, আপনি থামুন—

মাসিমা বললে—আমার মুখ দিয়ে কি সাধে কথা বেরোয় বাবা ? মেয়ের কথা শুনলে যে আমার পেটের ভাত চাল হয়ে যায়—

হঠাৎ দরজার ঘণ্টা বাজতেই দরজা খুলে দিল সন্দীপ। তপেশ গাঙ্গুলী ঘরে ঢুকেই সন্দীপকে দেখে বললে—কী ভায়া, খবর সব ভালো তো ?

সন্দীপ এ প্রশ্নের কোনও জবাব দিলে না।

তপেশ গাঙ্গুলীর কেমন অস্বস্তি হতে লাগলো। সকলের মুখের দিকে চেয়ে বললে—এ কী সকলের মুখ খুব গম্ভীর গম্ভীর দেখছি যে ? কোনও গোলমাল হয়েছে নাকি ? বিয়ে ভেঙে গেছে ?

তবু কারো মুখে কোনও কথা নেই দেখে তপেশ গাঙ্গুলী বললে—কী ব্যাপার বলো তো বৌদি, আমি এসে তোমাদের কোনও অসুবিধে করে দিলুম নাকি ?

যোগমায়া বললে—না ঠাকুরপো, তুমি বোস।

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—না, আমি এসে যদি তোমাদের কোনও অসুবিধা করে থাকি তো বলো, আমি না-হয় এখুনি চলে যাচ্ছি। আমি এলুম এমনি তোমরা কেমন আছো তাই দেখতে—

যোগমায়া আবার বললে—না-না, কিছু হয়নি, তুমি বোস—। তোমরা সব ভালো আছো তো ?

তপেশ গাঙ্গুলী একটা চেয়ারে বসে পড়ে বললে—আর আমাদের ভালো থাকা বৌদি, তুমিও চলে এসেছ আর আমাদেরও ভালো থাকা ঘুচে গেছে। দেখছো না, আমি কত রোগা হয়ে গেছি। রাত্তিরে আমার ভালো করে ঘুমই হয় না আজকাল,

তা জানো ?

যোগমায়া বললে—তা ডাক্তার-টাক্তার দেখাও না—তোমার নিজের শরীর ভালো থাকলে তবে তো বাড়ির সবাই থাকবে—

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—সে-কথা একমাত্র তুমিই বোঝ বৌদি, সংসারের আর কেউ কিছু বোঝে না। আর কেউ যদি বুঝতো তো আজ আমার এই দুঃখু—

যোগমায়া বললে তুমি কিছু খাবে ঠাকুরপো ?

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—খাওয়ার ব্যাপারে আমি কখনও না বলেছি, বল তুমি ?

এবার যোগমায়া উঠলো। সন্দীপও উঠলো। বললে—আমি এখন যাই মাসিমা, কাল আবার আসবো।

বলে দরজার দিকে পা বাড়ালো। বিশাখা পেছন-পেছন গেল দরজাবন্ধ করতে। বাইরে যেতেই সন্দীপ কার পায়ের শব্দ শুনে পেছন ফিরে দেখলে বিশাখা।

একেবারে সিঁড়ির মুখ পর্যন্ত এসে দাঁড়িয়েছে বিশাখা। সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে —কিছু বলবে আমাকে ?

বিশাখা কিছু উত্তর দিলে না!

সন্দীপের মনে হলো বিশাখা যেন কিছু ভাবছে।

জিজ্ঞেস করলে—কথা বলছো না যে ? কিছু ভাবছো ?

বিশাখা বললে—হ্যাঁ, ভাবছি আমার বিয়ের ব্যাপার নিয়ে আমার চেয়ে তোমাদেরই যেন বেশি মাথা-ব্যথা।

সন্দীপ বললে—মেয়ের বয়েস হলে বাপ-মা ভাববে না তো কে ভাববে ?

বিশাখা বললে—আমার মা ভাবছে ভাবুক, কিন্তু তুমি ? তুমি ভাবছো কেন ? তুমি আমার কে ?

সন্দীপ বললে—আমি আবার তোমার কে ? কেউই না—। তোমার দেখা-শোনা করবার জন্যে খাওয়া-পরা-থাকা আর মাসে-মাসে পনেরো টাকা মাইনে দিয়ে আমাকে রাখা হয়েছে বলেই আমি তোমার কথা ভাবি—

বিশাখা বললে—আমার যখন বিয়ে হয়ে যাবে, তখন ? তখন কী হবে ?

সন্দীপ বললে—তখন আর কী হবে ? তখন আমার চাকরি চলে যাবে—

বিশাখা জিজ্ঞেস করলে—তখন কার কথা ভাববে ?

সন্দীপ এ-কথার কী জবাব দেবে ? একটু ভেবে বললে—তখন কি আর তোমার কথা ভাববার অধিকার আমার থাকবে ? তখন তোমারও বিয়ে হয়ে যাবে, আর তার সঙ্গে আমার চাকরিটাও চলে যাবে—

বিশাখা বললে—তাহলে লন্ডন থেকে তোমাদের ছোটবাবুর চিঠি না আসাতে অত ভাবছো কেন ? সে চিঠি আসতে যত দেরি হয় ততই ভালো—

সন্দীপ বললে—আমি তো নিজের জন্যে ভাবছি না, ভাবছি তোমার জন্যে—

বিশাখা বললে—এ যে সেই রকম হলো—যার বিয়ে তার ঘুম নেই, পাড়া-পড়শির ঘুম নেই। তুমি তোমার চাকরির কথা ভাববে, না পরের বিয়ের কথা ভাববে ?

সন্দীপ বললে—কিন্তু আমার চাকরিটা তো বড় কথা নয়, একটা চাকরি গেলে আমি না হয় আর একটা চাকরি জোগাড় করে নেব। কিন্তু তোমার বিয়ে ? বিয়ে তো কারোর দু'বার হবার নয়। দু'বার হওয়াটা উচিতও নয়, বাঞ্ছনীয়ও নয়—

তারপর একটু থেমে আবার বললে—আর তা ছাড়া তুমি তো আমার পর নও—

বিশাখা বললে—পর নই···?

—না !

বিশাখা বললে—ওমা, আমি তোমার পর নই তো কী ? আপন ?

সন্দীপ এ-কথার কিছু একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই ভেতর থেকে মাসিমার গলার আওয়াজ এল। মাসিমা বলছে—ওরে, বিশাখা, কোথায় গেলি···

মাসিমার গলার শব্দ পেয়েই বিশাখার মুখটা কেমন শুকিয়ে গেল।

সন্দীপ বললে—ওই তোমার ডাক এসেছে, এবার যাও—

বিশাখা বললে—ঠিক আছে, এখন যাচ্ছি, কিন্তু কাল তো তোমাকে আবার চাকরি করতে এখানে আসতেই হবে, তখন এ-কথার জবাব আদায় করবো তবে ছাড়বো—

—কীসের জবাব ?

বিশাখা বললে—ওই যে তুমি একটা কথা বললে—আমি নাকি তোমার পর নই··

ওদিকে মাসিমা আবার ডাকতেই বিশাখা আর দাঁড়ালো না, সোজা ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ে দরজাটা বন্ধ করে দিলে। সন্দীপও আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে নিচেয় নামতে লাগলো—
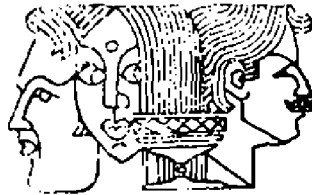
ক'দিন ধরেই লনডন থেকে খোকার কোনও চিঠিও আসছে না, টেলেক্সও আসছে না। ঠাকমা-মণি খোকার জন্য ভেবে ভেবে অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। ভোরবেলা রোজ যেমন তিনি বিন্দুকে নিয়ে গঙ্গায় চান করতে যেতেন, তেমনি যান। বাবুঘাটে দশরথ পাণ্ডা রোজ যেমন ঠাকমা-মণিকে বেলপাতা আর ফুল দিয়ে মন্ত্র পাঠ করতো, তখনও তিনি তেমনি মন্ত্র পড়তেন। সন্ধ্যেবেলা একতলার মন্দিরে যেমন রোজ সিংহবাহিনীর আরতি হতো তখনও তেমনি ঠাকমা-মণি সেখানে এসে প্রণাম করতেন আর প্রসাদ নিয়ে মাথায় ঠেকাতেন। দৈনন্দিন সংসারের কাজ-কর্মে, প্রাত্যহিক নিয়মকানুনের কোথাও কোন ছন্দপতন হতো না।

কিন্তু বাড়ির ঝি-ঝিউড়ি দরোয়ান থেকে মল্লিক-মশাই সন্দীপ পর্যন্ত সবাই জানতো যে এই এখানে এই সংসারযন্ত্রের কেন্দ্রে কোথায় কোন একটা অতি ক্ষুদ্র 'স্ক্রু' যেন আলগা হয়ে গেছে। যন্ত্রটা রয়েছে ঠিকই, কিন্তু তার প্রাণ-স্পন্দন যেন মৃদুগতি। সেখানে যেন কোনও শৃঙ্খলা নেই। সব কিছু থেকেও সে যেন নিরুদ্দেশ।

অথচ সৌম্যবাবু এ-সংসারের কতটুকু ?

এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের যা কিছু চোখে দেখা যায় তার সবই মানুষ দেখেছে। কখনও সাদা চোখে আবার কখনও বা নিউটনের আবিষ্কার করা টেলিস্কোপের সাহায্যে।

কিন্তু মাধ্যাকর্ষণ শক্তি? যার সঙ্গে আমাদের গ্রহ-গ্রহান্তরের জড়-জীব-জন্তুর অস্তিত্বের প্রশ্ন জড়িত? তাকে কি দেখা যায়?

তাই সৌম্যপদবাবুর অস্তিত্বটা চোখে দেখা না গেলেও সমস্ত বাড়িটা সেই অদৃশ্য শক্তিরই আকর্ষণে আবদ্ধ ছিল। তাকে কেন্দ্র করেই সংসারের সুদর্শন-চক্র একটা বিশিষ্ট গতিতে শৃঙ্খলাকৃষ্ট হয়ে আবর্তিত হতো।

কিন্তু সৌম্যবাবুর চলে যাওয়ার পরদিন থেকেই যেন এই সংসার তার গতির তেজ হারালো। তার শৃঙ্খলায় বিঘ্ন ঘটলো। বাইরে থেকে দেখা না গেলেও সন্দীপের চোখে এটা কটুভাবে ধরা পড়তে লাগলো।

সন্দীপ প্রতিদিনের মত তেতলায় গিয়ে ঠাকমা-মণির কাছে রাসেল-স্ট্রীটের বাড়ির রিপোর্ট দিত।

ঠাকমা-মণি রোজকার মতই জিজ্ঞেস করতেন—বউমা কেমন আছে?

সন্দীপ বলতো—ভালো—

ঠাকমা-মণি আবার জিজ্ঞেস করতেন—মাংস ডিম ছানা-টানা সব খাচ্ছে তো?

সন্দীপ বলতো—হ্যাঁ—

—আর, লেখা-পড়া?

সন্দীপ বলতো—হ্যাঁ, লেখা-পড়া করছে ঠিক-ঠিক—

—অরবিন্দ ঠিক সময়ে ইস্কুলে পৌঁছে দেওয়া আর বাড়ি নিয়ে আসা করছে তো? কোনও বেনিয়ম হচ্ছে না?

—না—

এমনি আরো অনেক প্রশ্ন করতেন ঠাকমা-মণি। মাসোহারার টাকা মল্লিক-কাকা নিয়মমত ঠিক ঠিক সন্দীপের হাতে দিয়ে দিতেন। সন্দীপ সেই টাকার রসিদে নিজের নাম সই দিয়ে যার যার পাওনা-গণ্ডা তাকে তা দিয়ে দিত। বিশাখার স্কুলে গিয়ে তার মাসকাবারি টাকাটা মিটিয়ে দিত সেই সঙ্গে। বাড়িতে আন্টি মেমসাহেব আর জয়ন্তী দিদিমণির মাইনেটাও দিয়ে দিত। আর সংসার খরচের সমস্ত টাকাটা তুলে দিত গিয়ে মাসিমার হাতে। দুধের দাম, দৈনিক বাজার খরচ থেকে আরম্ভ করে বিশাখার টুকি-টাকি, তার শাড়ি ব্লাউজ, সাবান, সেন্ট, হেয়ার-অয়েল আর মাসিমার প্রয়োজনীয় সব জিনিসের খরচ-পত্র তার মধ্যেই ধরা থাকতো।

কিন্তু সেদিন সন্দীপ যে-খবরটা শুনলো তাতে সে যেন একেবারে আকাশ থেকে পড়লো।

মল্লিক-মশাই ঠাকমা-মণিকে হিসেব বুঝিয়ে দেবার পর নিচেয় নেমে এসেই সব বললেন। ঠাকমা-মণি নাকি খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। বিছানা থেকে আর নাকি উঠতেই পারছেন না।

সন্দীপও খবরটা শুনে খুব স্তম্ভিত হয়ে গেল। এত বছর ধরে সন্দীপ এ বাড়িতে রয়েছে কিন্তু এর আগে সে ঠাকমা-মণিকে তো কখনও অসুস্থ হতে দেখেনি। অসুস্থ হওয়ার খবরও কখনও শোনেনি সে।

জিজ্ঞেস করলে—কেন এমন হলো ? ছোটবাবুর কোনও চিঠি পাননি বলে ? দুর্ভাবনায় ?

মল্লিক-কাকা বললেন—না, সৌম্যবাবুর চিঠিও পেয়েছেন, ছোটবাবুর সঙ্গে টেলেফোনে কথাও হয়েছে তাঁর—

—তাহলে হঠাৎ শরীর খারাপ হলো কেন ?

মল্লিক-কাকা বললেন—হলো এখানকার ফ্যাক্টরির ব্যাপারে। ফ্যাক্টরিতে ভয়ানক গোলমাল লেগেছে—

ফ্যাক্টরিতে বহুদিন ধরে লেবার-ট্রাবল্ তো চলছিলই, তার ওপরে একদিন নাকি দুর্ঘটনায় একটা দামী মেশিনে আগুন ধরে গিয়েছিল।

—সে তো আমি আগেই শুনেছি। তারপর ? তারপর কী হলো হঠাৎ ?

মল্লিক-মশাই তার পরের ঘটনাটা বললেন। কে একজন শিফ্ট-ইন-চার্জ ছিল, তার নাম বেণুগোপাল। সে নাকি কোন্ পার্টির কাছ থেকে এক লাখ টাকা ঘুষ নিয়ে মেশিনটাতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল……

সন্দীপ বললে—ঘুষ ? এক লাখ টাকা ঘুষ ? কে অত টাকা ঘুষ দিলে ?

মল্লিক-কাকা বললেন—আজকাল যা দিনকাল পড়েছে বাবা, তাতে এক লাখ টাকা ঘুষ তো কিছুই না। এক লাখ টাকা এখন হাতের ময়লা—

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—কেন ঘুষ দিলে ? কে দিলে ?

মল্লিক-কাকা বললেন—তুমি এখন ছোট, এখন তুমি বুঝবে না। আর ছোটই বা তোমাকে বলি কী করে ? আমাদের যুগ হলে তুমি দুই ছেলের বাপ হয়ে যেতে—

একটু থেমে তারপর আবার বললেন—আমি এতদিন আছি এ-বাড়িতে, এরকম কাণ্ড কখনও দেখিনি। ঠাকমা-মণির মনের অবস্থা আগে কখনও এমন হয়নি। কত ঝড়-ঝাপটা গেছে মাথার ওপর দিয়ে, তবু কখনও তাঁকে মাথা নিচু করতে দেখিনি আমি, এমনই তাঁর মানসিক অবস্থা—

মল্লিক-কাকা কথাগুলো বলতে-বলতে আরো গম্ভীর হয়ে গেলেন। সন্দীপও মল্লিক-কাকাকে এমন চঞ্চল মতি কখনও দেখেনি। মনে-মনে সে খুব বিচলিত হয়ে পড়লো। কী এমন ঘটনা ঘটতে পারে যার জন্যে ঠাকমা-মণি মল্লিক-কাকা দুজনেই এত মুষড়ে পড়লেন।

হঠাৎ কোন্ এক অপ্রত্যাশিত দিক থেকে সন্দীপ সব খবর পেয়ে গেল পরের দিনই। খবরটা দিলে সুশীল। সুশীল সরকার। সুশীল সরকার বললে—খবর শুনেছেন ?

—কী খবর ?

—আপনি শোনেন নি কিছু ? আর একটা কোম্পানী তো লালবাতি জ্বাললে আজ !

—লালবাতি জ্বাললে মানে ? কোম্পানী বন্ধ হয়ে গেল ? কোন্ কোম্পানী ?

সুশীল বললে—বেলুড়ের স্যাক্সবী মুখার্জি কোম্পানী।

সন্দীপের মাথা থেকে পা পর্যন্ত থর-থর করে কেঁপে উঠলো। স্যাক্সবী মুখার্জি কোম্পানীতে ক্লোজার হওয়া মানে তো তারও কলকাতা জীবনের সমাপ্তি ! এখন তাহলে কী হবে ? তার চাকরিও কি তা হলে চলে যাবে ? আর বিশাখা ?

বিশাখার বিয়ে ? সৌম্যবাবু তো এখানে নেই। তাহলে একটা কোম্পানী বন্ধ হওয়া মানে তো একলা একজনের ক্ষতি নয়। এর সঙ্গে যে হাজার-হাজার মানুষের জীবন, হাজার-হাজার মানুষের ভরণ-পোষণ, হাজার-হাজার মানুষের বাঁচা-মরার সম্পর্ক জড়িত।

সুশীল সরকার সন্দীপের নিষ্প্রাণ মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলে—কী ভাবছেন ? খবরটা আপনি জানতেন না ? খবরের কাগজে তো বেরিয়েছে—

সন্দীপ আর কী বলবে ! বলবার মত কথা তার কী-ই বা আর থাকতে পারে ! সন্দীপ হতবাকের মত খবরটা শুধু শুনলো আর তারপর প্রফেসার ক্লাশে আসার পরেই দুজনের কথা বলা বন্ধ হয়ে গেল। ক্লাশে যে সে কী পড়ানো হলো তা কিছুই আর তার কানে ঢুকলো না। তার সমস্ত মন পড়ে রইল সেই মুক্তিপদ মুখার্জি'র দুশ্চিন্তা আর দুঃসংবাদের দিকে আর বিশাখার জীবনের দুর্লঙ্ঘ্য সমস্যার দিকে।

ক্লাশের পর জন-মুখর রাস্তায় বেরিয়ে সন্দীপের মনে হলো সারা কলকাতা শহরটা যেন হঠাৎ বড় জন-শূন্য হয়ে গেছে। কোথাও যেন কেউ নেই। সেই জন-বিরল রাস্তায় বিডন স্ট্রীটের বাড়ির দিকে পা বাড়িয়েও তার মনে হলো রাস্তাটা যেন হঠাৎ অন্য দিনের চেয়ে দীর্ঘতর হয়ে গেছে। শহরের রাস্তা তো একটা বাঁধা-মাপের মধ্যে স্থির হয়ে থাকে। সে রাতারাতি ছোটও হয় না, বড়ও হয় না। তাহলে এমন হলো কেন ? বাড়ি পৌঁছতে এত দেরি হচ্ছে কেন ?

হঠাৎ একটা লোক তাকে ডাকলে—শুনছেন ?

সন্দীপ যেন হঠাৎ সম্বিত ফিরে পেলে। চেয়ে দেখলে একটা ছেলে তাকে উদ্দেশ্য করেই কথাটা বলছে। সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—আমাকে ডাকছেন ?

ছেলেটা বললে—হ্যাঁ, কই আপনি তো এলেন না ?

সন্দীপ বললে—আমি তো আপনাকে ঠিক চিনতে পারছি না—কে আপনি ?

ছেলেটা বললে—সেই যে আপনাকে আমি বলেছিলুম 'বিশ্বশান্তি'র একটা সাইন-বোর্ড সস্তায় তৈরি করিয়ে দেব—

সন্দীপ চারদিকে চেয়ে দেখলে। এ তো হাতীবাগান বাজারের মোড়। বিডন স্ট্রীটের বদলে এত দূরে সে এসে পৌঁছলো কী করে ? সামনেই দাঁড় করানো সেই সাইনবোর্ডটা দেখে তার সব মনে পড়ে গেল। সেই সাইনবোর্ডের ওপরে সেদিন-কার মতই লেখা রয়েছে ঃ

শ্রীশ্রী জগন্মাতার স্বপ্নাদেশে
বিশ্বশান্তি স্থাপনের
নিমিত্ত এই দেবস্থানে প্রত্যহ
পূজাপাঠ ও যাগযজ্ঞ
অনুষ্ঠিত হইবে।
ঈশ্বরের সেই নির্দেশ পালনের হেতু
আমাদের যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন।
সোম—ব্রহ্মা
মঙ্গল—বিষ্ণু

বুধ—মহেশ্বর

বৃহস্পতি—লক্ষ্মী

শুক্র—সন্তোষী-মা

শনি—বারের দেবতা

নিচেয় সেবাইতের নাম লেখা আছে। তার পাশে ব্র্যাকেটের মধ্যে ডাক-নাম।

সন্দীপের সমস্ত মনে পড়ে গেল! টাকা উপায় করবার কত রকম ফন্দী আজকাল। মাথা খাটিয়ে খাটিয়ে কত রকম মতলবই বার করেছে ছেলেরা। সামনে একটা তামার থালার ওপর অনেকগুলো টাটকা ফুল পড়ে আছে। তার সঙ্গে কিছু খুচরো পয়সা। মির্জাপুর স্ট্রীটে ঠিক যে-রকম সাইনবোর্ড সে দেখেছিল, এও ঠিক সেই রকম। ঠিক একই কায়দা।

ছেলেটা বললে—আপনি তো চাকরি পাচ্ছেন না বলেছিলেন—

সন্দীপ বললে—হ্যাঁ—

—তাই তো আপনাকে বলেছিলুম জোড়াসাঁকো বাজারের মোড়ের কথা। ওখানেও বাজারের মোড়ে এই রকম একটা খালি জায়গা আছে, খুব সস্তায় আপনাকে একটা এই রকম সাইনবোর্ড করে দিতে পারি, তা আপনি তো···

সন্দীপ আর দাঁড়ালো না। চলে আসবার আগে, শুধু বললে—আচ্ছা, আমি আর একদিন আসবো, আজ আসি···

বলে তাড়াতাড়ি আবার উল্টো ফুটপাত ধরে বাড়ির দিকে এগোতে লাগলো।

তা সত্যিই 'স্যাক্সবী মুখার্জি', কোম্পানীতে তখন অভূতপূর্ব অশান্তির তুফান বয়ে চলেছে।

বেণুগোপাল বহুদিনের শিফ্ট-ইন-চার্জ। অনেক অভিজ্ঞ ইন্‌জিনীয়ার। তার মূল্য কোম্পানী জানে। কিন্তু সে যে এমন বিশ্বাসঘাতকতা করবে তা কেউ-ই কল্পনা করতে পারেনি। এত দিনকার সমস্ত বিশ্বাস সে হারিয়েছে। সুতরাং উচিত শাস্তিই তার পাওয়া উচিত।

অর্জুন সরকার অনেক দিন ধরেই নানা দিক থেকেই খবর পাচ্ছিল। মুখার্জি সাহেবের স্বার্থ দেখবার জন্যেই তাকে মোটা মাইনে দিয়ে রাখা হয়েছিল। কাজটা বড় কঠিন। কিন্তু এতদিন সেই কঠিন কাজটা অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে সে চালিয়ে এসেছে কে তার কাজে গাফিলতি করছে, কে প্রোডাকশান কম করছে, কে অন্যায়-ভাবে ওভারটাইম নিচ্ছে, কে কম্পাউণ্ডের বাইরে বেআইনীভাবে মাল পাচার করছে, এ সমস্তই সরকার সাহেব ধরে ফেলে শাস্তি দিয়ে মালিকের কাছে সুনাম পেয়েছে। কোম্পানীও তাতে প্রচুর লাভবান হয়েছে।

তাই মুক্তিপদ মুখার্জি বহুকাল থেকে দরকারী খবরাখবর পাওয়ার জন্যে অর্জুন সরকারকে এ-সব কাজের ভার দিয়েছিল।

এবারও সেই ব্যবস্থা ঠিক হয়েছিল।

'স্যাক্সবী মুখার্জি' কোম্পানীর স্টাফ-কোয়ার্টারের কেউ জানতে পারেনি যে বেণুগোপালবাবুর বাড়িতে সেদিন হঠাৎ সার্চ হবে। বাড়ির লোক ঘুম থেকে ওঠবার আগেই পুলিশ কখন শাদা-পোশাকে চারদিক ঘিরে ফেলেছে তাও কেউ জানতে পারেনি। সদর দরজার ইলেকট্রিক-ঘণ্টা বাজতেই বাড়ির কাজের লোক দরজাটা খুলে দিয়েছে।

—কে ?

তখনও দরজার বাইরে মানুষের গলার আওয়াজ—দরজা খুলুন, দরজা খুলুন—

ভেতর থেকে দরজা খুলতেই পুলিশের লোক হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকে পড়েছে। বাধার দেবার চেষ্টা যে হয়নি তা নয়। কিন্তু যাদের কাছে পরোয়ানা আছে তাদের কে বাধা দেবে ? বেণুগোপাল খবর পেয়েই ঘুম থেকে উঠে সামনে এসে দাঁড়ালো।

—কী চাই ?

জবাব দেবার মত নজির ছিল পুলিশের হাতে। সেটা দেখানো হলে পর তখন আর বেণুগোপালের কিছু বলবার ছিল না। বিনা বাধাতেই সবাই সব ঘরে ঢুকলো। খাট আলমারি ভাঁড়ার-ঘর, বাথরুম, কিচেন সব তন্ন তন্ন করে খোঁজা হলো। আলমারির ভেতরে কাপড়-জামা ছাড়া কিছু কাগজ-পত্রও ছিল। তাও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা হলো।

ততক্ষণে বাড়ির বাইরে মানুষের জটলা বেঁধে গেছে। প্রথমে অল্প, তারপরে অনেক। তারপর চিৎকার। তারপর স্লোগান। মানুষের সমস্ত অভিযোগের মূলে যখন কেন্দ্র তখন আঘাত আর আক্রমণের খাঁড়া গিয়ে পড়লো অদৃশ্য মুক্তিপদ মুখার্জির মাথার ওপর।

উচ্চ কণ্ঠের স্লোগান উঠলো—মুক্তিপদ মুখার্জি মুর্দাবাদ—মুর্দাবাদ—

সেই সুরে সমবেত শব্দ উঠলো—মুর্দাবাদ—মুর্দাবাদ—

তারপর সেই শব্দ প্রতিধ্বনিত হলো সমস্ত স্টাফ-কোয়ার্টারের রন্ধ্রে রন্ধ্রে, সমস্ত কারখানার আনাচে-কানাচে। যে-যেখানে কাজে-কর্মে ব্যস্ত ছিল তারা সবাই কাজ বন্ধ করে ছুটে এল বেণুগোপালের বাড়ির সামনে। তারাও সমস্বরে সকলের সুরে সুর মেলালো—মুর্দাবাদ—মুর্দাবাদ—

সে এক নরক-গুলজার দৃশ্য।

সবাই একসঙ্গে ঢুকতে চায় বেণুগোপালের বাড়িতে। সবাই সেই অত্যাচারে প্রতিবাদমুখর হয়ে চিৎকারে পাড়া মাত করে। সবাই বলতে চায়—এ অত্যাচার সইবো না, এই অত্যাচার মানবো না, মানছি না—

কোথা থেকে খবর পেয়ে আরো একদল লাঠি-ধারী পুলিশ এসে সকলকে তাড়া করতে শুরু করলো। ভাগো, ভাগো ইঁহাসে—ভাগো—

সঙ্গে সঙ্গে মৌচাকে যেন ঢিল পড়লো। একদিকে লাঠি চললো, অন্যদিকে ইঁট। লাঠিতে, চিৎকারে, স্লোগানে, ইঁটে, জায়গাটা এমন বিপদ-সঙ্কুল হয়ে উঠলো যে পালানো ছাড়া আর কোনও উপায় নেই। শেষকালে সেই লোকারণ্য ফ্যাক্টরির ভেতরেও সংক্রামিত হলো। চূড়ান্ত পরিণতি হলো আর একটা মেশিনে দাউ-দাউ করে আগুন লেগে। ফাঁকা হয়ে গেল ফ্যাক্টরি। যেখানেই মানুষ দেখতে পায় সেখানেই পুলিশ হামলা করে। মানুষ দেখলেই মারো, মানুষ দেখলেই তাড়া করো।

বাড়িতে বসে তখন মুক্তিপদ মুখার্জি টেলিফোনে ওয়ার্কস ম্যানেজারের রিপোর্ট শুনছিলেন। জিজ্ঞেস করলেন—তারপর ? আগুন নেভাবার ব্যবস্থা

হয়েছে ?

—হ্যাঁ স্যার, ফায়ার ব্রিগেডকে খবর দিয়েছি। তারা আসছে—

—আর বেণুগোপালের বাড়িতে ? পুলিশ কিছু পেয়েছে ?

ওয়ার্কস ম্যানেজার বললে—সার্চ এখনও চলছে স্যার, পরে আপনাকে সব জানাবো—

মুক্তিপদ টেলিফোন ছেড়ে দিয়ে আবার চুপ করে বসে রইলেন। সকাল থেকে একবার করে টেলিফোন আসছে আর তিনি একটা করে নতুন দুঃসংবাদ শুনছেন।

মুক্তিপদ একবার মিসেসের বেড-রুমে গিয়ে দেখেছিলেন নন্দিতা বেশ আরামে ঘুমোচ্ছে। তার কোনও চিন্তা নেই। কোথা থেকে টাকা আসছে, কে টাকা দিচ্ছে, কেন দিচ্ছে, এ টাকা কত হাজার-হাজার মানুষের উদয়াস্ত পরিশ্রমের যে ফসল, সব খবর তার জানবার দরকার নেই। তার জানবার ইচ্ছেও নেই। যারা খেটে মাথার ঘাম মাটিতে ফেলে নন্দিতাদের আরামের জন্যে টাকা সাপ্লাই করে যাচ্ছে, তাদের দেখবার জন্য তো গভমেন্টই আছে। গভমেন্ট তো তাদের জন্যেই দাতব্য হাসপাতাল করে দিয়েছে, অসুখ-বিসুখ হলে সেখানে তারা বিনা-পয়সায় ওষুধ পায়, চিকিৎসা পায়। তারপরে আমরা যেসব প্রতিষ্ঠানে চ্যারিটি করি সেই রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, সেখানেও তো তারা বিনা-পয়সায় সেবা পায়। আমরা নিজেরা কেন তাদের দুঃখ-কষ্টের কথা ভেবে নিজেদের রাত্রের ঘুম নষ্ট করবো ? যদি কোনও চ্যারিটেবল্ অর্গ্যানিজেশন আসে আমাদের কাছে, আমরা তো তাদেরও চাঁদা দিই। সেই চাঁদার টাকায় তারা গরীব লোকদের জন্যে কত কী মহৎ কাজ করছে তা কি তোমরা খবরের কাগজের পাতায় দেখতে পাও না ? সে-সব চাঁদার টাকা কোথা থেকে আসছে ? সে তো আমাদেরই দেওয়া টাকা। সে তো আমাদেরই খেটে উপায় করা পয়সা। আমরা যদি একটু আরাম না করি তো কী করে আমাদের শরীর টিকবে ? আর কী করেই বা আমরা তোমাদের সেবার জন্যে চাঁদা যোগাবো ?

মুক্তিপদ নন্দিতার বেড্-রুমে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে তাকে দেখছিলেন আর ভাবছিলেন। বেশ আছে, সত্যিই বেশ আছে নন্দিতারা। সংসারে ওরাই সুখী।

অনেকক্ষণ টেলিফোনের কাছে অপেক্ষা করলেন মুক্তিপদ। তিনি নিজেই ওদের কাউকে টেলিফোন করবেন নাকি ? তিনি টেলিফোন করতে যাচ্ছিলেন এমন সময় টেলিফোনটা নিজে থেকেই বেজে উঠলো।

—ইয়েস ?

ওধার থেকে আওয়াজ এল—আমি সরকার বলছি স্যার—

—বলো ? বলো ? আমি তোমার টেলিফোনের জন্যেই অপেক্ষা করছিলুম —কী খবর ?

অর্জুন সরকার বললে—খুব হৈ চৈ চলছে স্যার এখানে, লেবাররা সবাই ফ্যাক্টরি থেকে বেরিয়ে এসেছে, তারা পুলিশের ওপর ঢিল ছুঁড়ছে। একটা মেশিনে তারা আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল···

—তারপর ? তারপর কী হলো, বলো শিগ্গির ?

অর্জুন সরকার বললে—পুলিশ প্রথমে লাঠি চালিয়েছিল, তারপর যখন লেবাররা পুলিশকে ঢিল ছুঁড়তে আরম্ভ করল তখন পুলিশ ফায়ারিং শুরু করেছে। এখন চারদিকে সমস্ত এলোমেলো, যে যেদিকে পারছে পালাচ্ছে—

মুক্তিপদ জিজ্ঞেস করলেন—কিছু ক্যাজুয়ালটি হয়েছে নাকি?

—এখনও কিছু বলা যাচ্ছে না স্যার। পরে আপনাকে সব খবর দিচ্ছি ···

মুক্তিপদ জিজ্ঞেস করলেন—আগুন নিভেছে?

—হ্যাঁ, এখন ধোঁয়াই বেশি দেখা যাচ্ছে, সমস্ত ফ্যাক্টরিটা ধোঁয়ায় ধোঁয়া হয়ে গেছে একেবারে—

—আর বেণুগোপালের বাড়ি? সার্চ শেষ হয়েছে?

—শুনছি সার্চ শেষ হয়ে গেছে—

—কিছু পাওয়া গেছে?

অর্জুন সরকার বললে—শুনছি নাকি শেষ পর্যন্ত কিছু পাওয়া যায় নি।

—কিছুই পাওয়া যায়নি? সেই এক লাখ টাকা?

অর্জুন সরকার বললে—বুঝতে পারছি না টাকাটা কোথায় সরালে সে। জানি না, হয়ত কেউ আগে ভাগে খবরটা দিয়ে দিয়েছিল···

—কিন্তু কে আর খবর দেবে? তুমি আমি ছাড়া আর কেউ তো জানতো না খবরটা! যদি বাড়ি সার্চ করে শেষ পর্যন্ত টাকা না পাওয়া যায় তাহলে কী হবে?

অর্জুন সরকার অভয় দিলে। বললে—আপনি কিছু ভাববেন না স্যার, যা হয় আমি আপনাকে ঠিক সময়ে জানিয়ে দেব—

—ঠিক আছে—

বলে মুক্তিপদ রিসিভারটা রেখে দিলেন। দরোয়ান এসে জানালে গাড়ির ড্রাইভার এসেছে।

মুক্তিপদ বললেন—ঠিক আছে, তাকে বসতে বলো, আমি পরে যাবো—

বিশু বহুদিনের ড্রাইভার। অল্প টাকায় এই চাকরিতে ঢুকেছিল। এখন তার মাইনে আগের চেয়ে বহু গুণ বেড়েছে। সঙ্গে-সঙ্গে তার ফ্যামিলিও বেড়েছে। জিনিসপত্রের দামও তেমনি সঙ্গে-সঙ্গে বেড়ে চলেছে। মাইনে যদি বাড়ে একগুণ, তো জিনিসের দাম বাড়ে পাঁচ গুণ। বাজারে গিয়ে বিশু কী কিনবে আর কী কিনবে না, তা ভেবে-ভেবে কূলকিনারা পায় না। যে জিনিসটাতে হাত দেয় সেটাই দেখে আগুন।

বহুদিন আগে কারখানার মাঠের সামনে ভোটের মীটিং হচ্ছিল। বিশু তখন গাড়ি রেখে বসেছিল ভেতরে। সাহেব অফিসের ভেতরে কাজে ব্যস্ত। হঠাৎ কতকগুলো কথা তার কানে গেল।

যে লোকটা লেকচার দিচ্ছিল সে তখন বলে চলেছে—ভাই সব, আপনারা ভেবে দেখুন, আপনারা কাকে চান? যারা সরকার চালাচ্ছে তাদের, না আমাদের। যারা সরকার চালাচ্ছে তাদের আপনারা জিজ্ঞেস করুন কেন জিনিস-পত্রের দাম বাড়ে? তারাও যা খায় আপনারাও তাই খান। তারা বড়লোক বলে কি তাদের পেট বড়? আর আপনারা গরীব লোক বলে কী আপনাদের পেট ছোট? তা

তো নয়! মদের দাম বাড়ে বাড়ুক, ঘি-এর দাম বাড়ে বাড়ুক, মটরগাড়ির দাম বাড়ে বাড়ুক, কিন্তু চাল-ডাল-তেল-নুন-কাপড়-জামার দাম বাড়বে কেন? আপনারা-আর আমরা, যারা গরীব লোক, তারা যা খেয়ে বাঁচি তার দাম বাড়বে কেন? এই যে আপনাদের চিফ-মিনিস্টার, যিনি নিজেকে একজন পরম দেশভক্ত বলে জাহির করেন, যিনি বলে বেড়ান যে তিনি দেশ সেবার জন্যে সর্বস্ব ত্যাগ করেছেন, সেই তিনিই সম্প্রতি রাইটার্স বিল্ডিং-এ তাঁর নিজের ঘরের লাগোয়া বাথরুমটা এক লাখ টাকা খরচ করে সাজিয়ে নিয়েছেন। কিন্তু আমরা, যারা মেহনতি মানুষ তারা তাঁকে জিজ্ঞেস করি এই মেহনতি মানুষের এক লাখ টাকায় তাঁর বাথরুম সাজাবার অধিকার তাঁকে কে দিলে? বলুন ভাই সব, সে অধিকার তাঁকে কে দিলে? এবার যদি আপনারা আমাদের ভোট দিয়ে সরকারে বসান তাহলে কথা দিচ্ছি, ক্ষমতা পেয়ে আমাদের প্রথম কাজ হবে ওই বাথরুম ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া···

বিশুর মনে আছে ওই বক্তৃতা শোনবার সঙ্গে-সঙ্গে সমস্ত লোক একসঙ্গে হাততালি দিয়ে উঠেছিল! কিন্তু ভোটে তো শেষ পর্যন্ত জিততে পারেনি বিশ্বনাথরা। তাই সেই কথা রাখার আর দরকারও হয়নি।

কথাগুলো অনেক দিন আগের, তবু বিশুর সমস্ত মনে আছে।

হঠাৎ দরোয়ান এল। বললে—সাহেব এখন বেরোবেন না, পরে বেরোবেন—আভি বইঠো—

সাহেব বেরোন আর না-বেরোন বিশুকে গাড়ি নিয়ে হাজির থাকতেই হবে। সে নিজে একজন মেহনতি মানুষ। তার দুঃখ-দুর্দশার কথা কেউ বুঝবে না। সেদিন সকালেই সে বাজারে গিয়ে আলু কিনেছে দু'টাকা কিলো দরে···

ওপরে তখন মুক্তিপদ টেলিফোন করছে মা'কে।

ঠাকমা-মণি সব শুনে বললেন—তারপর?

মুক্তিপদ বললে—তারপর আর কি, বেণুগোপালের বাড়ি সার্চ করে কোনও টাকা পাওয়া গেল না—

—তারপর?

—তারপর ফ্যাক্টরির স্টাফ ক্ষেপে গেছে। কাজ-কর্ম সব বন্ধ করে দিয়ে লেবাররা স্লোগান দিচ্ছে। তারা বলছে বদনাম দেবার জন্যে মিছিমিছি বেণুগোপালের বাড়ি সার্চ করা হয়েছে। আসলে বেণুগোপাল যে এক লাখ টাকা ঘুষ নিয়ে মেশিনটা পুড়িয়ে দিয়েছিল তার প্রমাণ আছে—

—কী প্রমাণ?

—আমার ডেপুটি ওয়ার্কস ম্যানেজার অর্জুন সরকার খুব ভালো সোর্স থেকে সে খবর পেয়েছিল—

ঠাকমা মণি জিজ্ঞেস করলেন—ঘুষ নেওয়ার সময় কেউ কি প্রমাণ রাখে?

—প্রমাণ যদি না থাকে তো অর্জুন সরকার কি মিছিমিছি আমাকে খবরটা দিলে, মিছিমিছি আমাকে বেণুগোপালের বাড়ি সার্চ করবার কথা বললে?

ঠাকমা-মণি বললেন—যদি বেণুগোপাল ঘুষ নিয়েই থাকে তো সে-টাকা কোথায় গেল? সার্চ করে সে-টাকা পাওয়া গেল না কেন? তাহলে বেণুগোপালকে

নিশ্চয়ই কেউ আগে থেকে কথাটা ফাঁস করে দিয়েছে যে তার বাড়ি সার্চ করা হবে।

মুক্তিপদ বললে—কে আর আগে থেকে কথাটা ফাঁস করে দেবে? কেউ তো কিছুই জানতো না। অর্জুন সরকার তো কথাটা কারোর সামনে বলেনি যখন শেষ রাত্তিরে আমি গাড়িতে বাড়ি আসছিলুম তখনই প্রথম সে আমাকে বললে। তখন তো সেখানে কেউ ছিল না—

ঠাকমা-মণি বললেন—তাহলে এখন কী হবে?

মুক্তিপদ বললে—কী হবে তাই-ই তো ভাবছি। যদি এইরকম করে চলে তো শেষ পর্যন্ত আর কী করবো, ফ্যাক্টরি বন্ধই করে দিতে হবে—

—ফ্যাক্টরি বন্ধ করে দিতে হবে মানে?

মুক্তিপদ বললে—বন্ধ করে দিতে হবে মানে ফ্যাক্টরিতে লক্-আউট ডিক্লেয়ার করতে হবে। দেখি না কতদিন ওরা না খেয়ে থাকতে পারে! লক্-আউট করে দিলে ওরাও তো মাইনে পাবে না—

ঠাকমা-মণি বললেন—তা এতদিনকার ফ্যাক্টরি, বন্ধ করে দিলে গভর্মেণ্টেরও তো লোকসান হবে। গভর্মেণ্ট তো ট্যাক্স পাবে না। এ-ব্যাপারে গভর্মেণ্টের কিছু করবার নেই? গভর্মেণ্ট কি শুধু বসে বসে চুপ করে দেখবে?

মুক্তিপদ বললে—তোমাকে তো সেই জন্যেই বলেছি মা যে মিস্টার চ্যাটার্জি'র মেয়ের সঙ্গে আমাদের সৌম্যর বিয়েটা দিয়ে দিতে—

ঠাকমা-মণি বললেন—গভর্মেণ্টের সঙ্গে তোর চ্যাটার্জি'র মেয়ের কী সম্পর্ক?

—সম্পর্ক নয়?

—বল্, না তুই, কীসের সম্পর্ক?

মুক্তিপদ বললে—ও বিয়েটা দিলে আমাদের ফ্যাক্টরিতে আর লেবার-ট্রাবল্ হবে না! আজকাল লেবারই তো সব। ইণ্ডিয়ার যতগুলো স্টেট্ আছে সকলের চেয়ে ওয়েস্ট-বেঙ্গলই হচ্ছে ইন্‌ডাসট্রির পক্ষে সব চেয়ে সুটেবল্ জায়গা। এই স্টেটেই কয়লা আছে, এই স্টেটেই আছে অফুরন্ত জল, এই শহরের মধ্যেই আছে এত বড় পোর্ট—একসঙ্গে এত সুবিধে আর কোন্ স্টেটে আছে? সেই জন্যেই তো ব্রিটিশরা এত জায়গা থাকতে এই জায়গাটাই বেছে নিয়েছিল। কিন্তু দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সব কিছুই উল্টে গেল। আমাদের এখানকার সব ইন্‌ডাসট্রি আজ রোগে ধুঁকছে, আর অন্য সব স্টেটের সব ইন্‌ডাসট্রির উন্নতি হচ্ছে।

ঠাকমা-মণি জিজ্ঞেস করলেন—কেন?

—কেন হচ্ছে তার কারণ গভর্মেণ্ট—

—তা, গভর্মেণ্টকে তোরা তোদের কথা জানাতে পারছিস না? তোদের তো চেম্বার অব কমার্স রয়েছে, তারা কী করছে? বসে বসে শুধু সভা করছে? তারা গভর্মেণ্টকে বোঝাতে পারছে না যে এতে গভর্মেণ্টের আয় কমছে?

মুক্তিপদ বললে—মা, তুমি ঠিক বুঝছো না। তুমি সে-কালে যা দেখেছ এ-কালে তা নেই মা। চেম্বার অব কমার্স অনেক বলে-কয়েও কিছু করতে পারবে না—

ঠাকমা-মণি বললেন—কিছু যদি না করতে পারবি তাহলে কারবার বন্ধ করে দিলেই হয়।

মুক্তিপদ বললে—তুমি এমন কথা কী করে বলতে পারলে? কারবার বন্ধ

করলে কী হবে কল্পনা করতে পারো ?

ঠাকমা-মণি বললেন—তাহলে গভর্মেণ্টকে বুঝিয়ে বল্ যে তাদের আয় কমে যাচ্ছে—

মুক্তিপদ বললে– তুমি গভর্মেণ্টের মানে জানো ?

—তুই বল্ না গভর্মেণ্টের মানে কী ?

মুক্তিপদ বললে—গভর্মেণ্ট মানে লেবার-লীডার—

—লেবার-লীডার ? তার মানে ?

—হ্যাঁ, আজকাল গভর্মেণ্ট মানেই লেবার-লীডার—

তারপর একটু থেমেই আবার বললে—সেইজন্যেই তো তোমাকে বলেছিলুম সেই মিস্টার চ্যাটার্জির মেয়ের সঙ্গে সৌম্যর বিয়ে দিতে। তার বড় ভাই একজন লেবার-লীডার। মিনিস্ট্রির ওপর তার খুব ইন্‌ফ্লুয়েন্স। তার কথাতেই এখানকার মিনিস্ট্রি ওঠে বসে। তার ওপর ওরা মিড্‌ল্ ইস্টে পাঁচশো কোটি টাকার কাজের কনট্রাক্ট পেয়েছে। ওখানে সৌম্যর বিয়ে দিলে এক ঢিলে দু'পাখী মারা যেতো। তা তখন তো তুমি আমার কথায় রেগে গেলে! বললে তুমি কোন্ এক বাপ-মরা মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ের ঠিক করে ফেলেছ, আর আমাদের রাসেল স্ট্রীটের বাড়িতে তাদের পুষছো⋯

ঠাকমা-মণির দিক থেকে এ-কথার কোনও জবাব এল না।

মুক্তিপদ আবার বলতে লাগলো—তা তাদের তুমি পোষো, তাতে আমার কোনও আপত্তি নেই। তুমি যা ভালো বুঝেছ তাই করেছ, তাতে আমি কী বলবো ? কিন্তু আমাদের এত বড় কোম্পানীর স্বার্থের দিকেও তো তোমাকে দেখতে হবে! এখানকার হাজার হাজার স্টাফের ভবিষ্যৎ কী হবে, তাও তো ভাবতে হবে—

এবারও ঠাকমা-মণির তরফ থেকে কোনও জবাব নেই। মুক্তিপদ আবার বলতে লাগলো—আর এ মেয়ে দেখতেও খুব সুন্দরী, তার ওপর আবার এম-এ পাশ। আর যে-মেয়েকে তুমি রাসেল স্ট্রীটের বাড়িতে পুষছো তাকে দেখতে কেমন জানি না, কিন্তু লেখা-পড়াও তো কিছু জানে না, তার লেখা-পড়ার জন্য তুমি তার পেছনে তো মাসে মাসে হাজার-হাজার টাকা খরচ করছো। তাতে আমাদের কোম্পানীর কী ফয়দা হচ্ছে ?

ঠাকমা-মণি এ-কথারও কোনও উত্তর দিলেন না।

মুক্তিপদ বললে—কী মা, তুমি কোনও কথা বলছো না যে ? কথা বলছো না কেন ? আমাদের চ্যাটার্জির মেয়ের সঙ্গে সৌম্যর বিয়ে দেবে, না তোমার সেই পোষা মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেবে ? কথা বলো ? আমার কথার জবাব দাও—

তাতেও মা'র কোনও জবাব না পেয়ে মুক্তিপদ আবার জিজ্ঞেস করলে—মা, ও মা, কথার জবাব দাও—মা, ও মা, মা⋯⋯

তবু মা'র দিক থেকে কোনও সাড়া নেই।

মুক্তিপদ আবার মা'কে ডাকতে যাচ্ছিল, কিন্তু আর একটা টেলিফোনের ঘণ্টা বাজতেই সেটা তুলে ধরলে মুক্তিপদ। সেটাতে তখন ওয়ার্কস্ ম্যানেজার কান্তি চ্যাটার্জি কথা বলছে—

মুক্তিপদ বললে—কী, বলুন ?

কান্তি চ্যাটার্জি বললে—স্যার, সিচুয়েশন আমার কণ্ট্রোলের বাইরে চলে গেছে, ফায়ার ব্রিগেড আগেই এসেছিল, এবার পুলিশ এসে লাঠি চার্জ করতে আরম্ভ করেছে—

মুক্তিপদ জিজ্ঞেস করলে—বেণুগোপালের বাড়ি সার্চ করে কী পেলে পুলিশ?

চ্যাটার্জি বললে—কিছুছু পায়নি। কিছুছু পায়নি বলে সমস্ত লেবার ক্ষেপে গেছে। আর খবর পেয়ে এসে পড়েছে ওদের লীডার—

—কোন্ লীডার?

কান্তি চ্যাটার্জি বললে—বরদা ঘোষাল—

মুক্তিপদ বললে—ঠিক আছে, এখন ছাড়ছি—

বলে সে-রিসিভারটা রেখে দিয়ে আগের টেলিফোনের রিসিভারটা কানে দিয়ে ডাকতে লাগলো—মা, শুনছো? শুনছো মা? ও···মা,···মা, ও···মা······

মা'র দিক থেকে তখনও কোনও জবাব এল না—
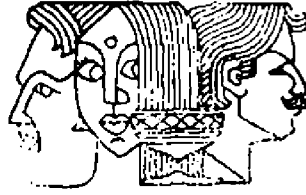
সেসব দিনের কথাও সন্দীপের মনে আছে! দুর্যোগ যখন সত্যি-সত্যিই আসে তার অনেক আগে থেকেই কানে আসে তার আগমনী-বার্তা। রাজনৈতিক-জীবনে যেমন ঘটে, ব্যক্তির জীবনেও ঘটে ঠিক তেমনই। ১৭৮৯ সালের ফরাসী বিদ্রোহ হঠাৎ একদিনে ঘটেনি। তার আগে ১৭৬৪ সালে গ্রেট ব্রিটেনে কাপড়-বোনার কল আবিষ্কার হয়ে গেছে। ১৭৭২ সালের বাইশে জুন তারিখে গ্রেট ব্রিটেন-এ ক্রীতদাস-প্রথা বেআইনী বলে মামলার রায় বেরিয়ে গেছে। ১৭৭৫ সালে ফ্রান্স স্পেন নেদারল্যান্ড সবাই আমেরিকার সঙ্গে একজোট হয়ে গ্রেট ব্রিটেনকে যুদ্ধে হারিয়ে দিয়েছে। এ সবই হচ্ছে ঝরা পাতা। কালবৈশাখীর বৃষ্টি প্রচণ্ড প্রলয়ঙ্কর হয়ে নামবার আগে ঝড়ের দাপটে বাতাসে উড়ে যাওয়া ঝরা-পাতার মতই এই সব ঘটনা। এবার মুখার্জি বাবুদের 'স্যাক্সবী মুখার্জি কোম্পানী'র ফ্যাক্টরিতে এই যে মেশিন পোড়ানো, এই যে পুলিশের লাঠি চার্জ, এই যে লেবার-ট্রাবল্, এ সমস্তই আসন্ন সেই কালবৈশাখীর আগে হাওয়ার দাপটে ঝরা-পাতা ওড়বার মত অকিঞ্চিৎকর দুর্ঘটনা।

প্রথমে যখন খবর টা সুশীল সরকার তাকে দিয়েছিল তখন এ-ঘটনার গুরুত্বটুকু সন্দীপ বুঝতে পারেনি। কিন্তু দু'দিন পরেই মল্লিক-কাকার মুখের দিকে চেয়ে সে চমকে উঠেছিল। প্রথমে মল্লিক-কাকা কিছুই বলতে চান নি। শেষে অনেক পীড়াপীড়ির পর তখন সব বললেন।

সন্দীপ জিজ্ঞেস করেছিল—তাহলে কী হবে?

মল্লিক-কাকা বলেছিলেন—কী আর হবে, যা করা হলে ফ্যাক্টরিটা বাঁচে তাই-ই করা হবে—

—ফ্যাক্টরি কী করে বাঁচবে ?

মল্লিক-কাকা বলেছিলেন—লেবার-ট্রাবল বন্ধ হলেই ফ্যাক্টরি বাঁচবে। চ্যাটার্জি ফ্যামিলির মেয়ের সঙ্গে সৌম্যবাবুর বিয়ে দিলে আর কোনও লেবার ট্রাবল থাকবে না…। কারণ পাত্রীর বড় ভাই-ই তো লেবার-লীডার। লেবার লীডার হাতে থাকলে আর কাকে ভয় করবে মেজবাবু ? লেবার-লীডার মানেই তো গভর্মেণ্ট—

সন্দীপের যেন কান্না পেয়ে গিয়েছিল মল্লিক-কাকার কথা শুনে।

বলেছিল—তা হলে ওদিকে বিশাখাদের কী হবে ?

বেশি কথা বলতে মল্লিক-কাকার তখন ভালো লাগছিল না। বলেছিলেন—তাদের আবার কী হবে, তারা তো বরাবর গরীবই ছিল, আবার তারা গরীব হবে। তারা আবার খিদিরপুরের সেই সাত নম্বর মনসাতলা লেনের বাড়িতে ফিরে যাবে—

এ-কথা শোনার পর সন্দীপের আর কী-ই বা বলার থাকতে পারে ?

সন্দীপ কিন্তু তবু সাহস হারায়নি। জিজ্ঞেস করেছিল—ঠাকমা-মণি কি এই নতুন পাত্রীকে দেখেছেন ? সৌম্যবাবুর সঙ্গে এ-পাত্রীর বিয়ে দিতে রাজি হয়েছেন ?

মল্লিক-কাকা বলেছিলেন—ও-সব বড়লোকদের ব্যাপার নিয়ে তোমার এত দুর্ভাবনা কীসের বলো তো ? তুমি মাইনে পাচ্ছো, ল'কলেজে পড়ছো, তুমি এখন সেই সব নিয়ে ভাবো, এ-সব ব্যাপার নিয়ে তুমি মাথা ঘামাচ্ছো কেন মিছিমিছি ? তোমার চাকরি তো আর তা বলে চলে যাচ্ছে না—

—কিন্তু বিশাখার সঙ্গে যদি সৌম্যবাবুর বিয়ে না হয় তাহলে আমারও তো কোনও কাজ থাকবে না। আমি তখন কী কাজ করবো ? কাজ না থাকলে আমারও তো চাকরি চলে যাবে—

মল্লিক-কাকা বলেছিলেন—সে-কথা তোমাকে ভাবতে হবে না। তোমার চাকরি না গেলেই তো হলো ? আমি কথা দিচ্ছি তোমার চাকরি যাবে না—এ-বাড়িতে এত লোক খায়, এত লোক থাকে, তাতে তোমার মত একটা পনেরো টাকা মাইনের লোক থাকলে খেলে কারোর কিছুই আসবে যাবে না—

মনে আছে কথাটা শুনেও সেদিন সন্দীপের দুশ্চিন্তা কাটেনি। সে কি সেদিন শুধু তার নিজের চাকরি চলে যাওয়ার ভয়েই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়েছিল, আর কিছু নয় ? আর কারো কথা কি সে ভাবেনি ? আর কারো অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ভাবনায় কি সে কাতর হয়নি ? আর কারো ভালো-মন্দের দুশ্চিন্তা কি তাকে নিদ্রাহীন করেনি ?

না, আসলে কালবৈশাখীর প্রচণ্ড বর্ষণের আগের মুহূর্তের কিছু সতর্কবাণী ছাড়া এ আর কিছু নয়। এ সেই ঝরা-পাতা। কালবৈশাখীর বৃষ্টি আসবার আগে এই উড়ে যাওয়া ঝরাপাতাই হয়তো তার কানে সাবধান-বাণী শুনিয়ে দিয়ে গিয়েছিল—সাবধান সন্দীপ, ঝড় আসছে… খুব সাবধান…

কিন্তু কী জন্যে সাবধান হবে সে ? কত সাবধান হবে ? কেন সে সাবধান হবে ?

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

দ্বিতীয় পর্ব

দ্বিতীয় পর্ব

সেদিন যে সন্দীপ সেই সতর্ক-বাণী সত্ত্বেও সাবধান হয়নি তার জন্যে সে নিজেই তো দায়ী। নইলে যেদিন সে কলেজ থেকে পাশ করে বেরোল সেদিনও কেন সে বিডন স্ট্রীটের বাড়ি ছেড়ে তার বেড়াপোতায় ফিরে যায়নি?

বেড়াপোতায় কাশীনাথবাবু তো তাকে প্রথম থেকেই আশ্বাস দিয়েছিলেন। বলেছিলেন—তুমি বি-পাশ করেই আমার সঙ্গে দেখা করবে, আমি তোমার সব ব্যবস্থা করে দেব--

তাহলে কেন সে কাশীনাথবাবুর সঙ্গে দেখা করেনি?

মনে আছে তখন বিডন স্ট্রীটের বাড়িতে খুব দুঃসময় চলছে। মল্লিক-মশাইও খুব চিন্তিত। এতদিনকার সব আয়োজন পণ্ড হওয়ায় দুশ্চিন্তা তো হবেই। হঠাৎ একদিনের মধ্যেই যেন সব কিছু ওলোট-পালোট হয়ে গেল। সমস্ত বাড়িটাতে কেমন এক অভূতপূর্ব বিশৃঙ্খলা। কলের জল পড়ে চলেছে তো পড়ে চলেছেই। কেউ নিষেধ করবার লোক নেই। রঘু বাজার এনেছে, এনে রান্নাবাড়ির ঠাকুরের জিম্মায় দিয়েছে। কিন্তু তা প্রয়োজনের তুলনায় কম না বেশি তা দেখবার লোক নেই। মল্লিক-মশাই-এরও তার হিসেব মিলিয়ে নেওয়ার মত অবসর নেই। তাঁকে ঠাকমা-মণি নানান্ নানান্ নতুন কাজে পাঠান। আগেকার মতন আর তেমন অবসর পান না। সন্দীপ তাঁকে সব সময়ে হাতের কাছে পায়ও না। মল্লিক-মশাই-এর সঙ্গে দেখা করতে এসে অনেক লোক ফিরে যায়।

সন্দীপ একদিন জিজ্ঞেস করলে—আপনি কোথায় যান যখন-তখন?

মল্লিক-কাকা বললেন—কেন?

সন্দীপ বললে—অনেকে এসে আপনাকে না-পেয়ে ফিরে গেল--

—তা ফিরে যাক্ গে, তার যদি গরজ থাকে তো আবার আসবে—

তা বটে! এ-বাড়ির পাওনা-গণ্ডার ওপর কারো কখনও সন্দেহ হয়নি। আর্থিক নিশ্চয়তাই এ-পরিবারের স্থায়ী মূলধন। সেই বুনিয়াদে কখনও যে ফাটল ধরতে পারে তেমন দুশ্চিন্তা হওয়ার কোনও কারণ কখনও ঘটে নি।

কিন্তু গতির অবধারিত নিয়ম-কানুনে ইতিহাসও তো কখনও-কখনও সাময়িক ভাবে পেছু হাঁটে। পেছু হেঁটে একবার দেখে নেয় কতদূর এগোলুম।

সেবারও তাই হয়েছিল। ফ্যাক্টরির গোলমালের সঙ্গে-সঙ্গে এই মুখার্জি-পরিবারের মধ্যেও যেন একটা অদৃশ্য গোলমাল শুরু হয়ে গিয়েছিল। তখন আর নিয়মানুবর্তিতার দিকে কারো তীক্ষ্ণ নজর ছিল না তেমন। প্রাত্যহিক রুটিন-বাঁধা কাজের তালিকার ওপর আরো কয়েকটা বাড়তি কাজ মাথায় চড়ে বসেছিল। আর তার সব দায়িত্ব চেপেছিল ওই বৃদ্ধ মল্লিক-মশাই-এর ওপর। তিনি যে একলা মানুষ এবং তিনি যে বয়েসের ভারে বৃদ্ধ তা কারোর একবার খেয়ালও হয়নি। তিনি একবার কোথায় কী কাজে বেরিয়ে যান, আবার বাড়ি এসে কোনওরকমে নাকে-মুখে ভাত গুঁজেই আবার বেরিয়ে পড়েন।

মল্লিক-মশাইকে সন্দীপ একদিন এক সুযোগে জিজ্ঞেস করেছিল—এত কীসের কাজ আপনার মল্লিক-কাকা? মনে হচ্ছে আপনি আজকাল খুবই ব্যস্ত। এত যান কোথায়?

মল্লিক-মশাই তখন আবার গায়ে জামা চড়িয়ে বেরোচ্ছিলেন। কথা বলবার মত তাঁর সময় ছিল না যেন। বললেন অনেক ঝঞ্ঝাট হয়েছে...

কী ঝঞ্ঝাট, কাকা?

—আরে, ঝঞ্ঝাট কি আর একটা? এক-একবার এক-একরকম, নতুন-নতুন হুকুম হয় আর মাঝখান থেকে আমার হেনস্থা—

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—কী হেনস্থা কাকা?

মল্লিক-কাকা বললেন—তবে বলি তোমাকে, তুমি যেন আবার কাউকে বলো না। বড়লোকের মতি-গতির কোনও ঠিক-ঠাক নেই। আজ এক-রকম কথা, আবার কাল অন্য এক-রকম। এই দেখ না এতদিন ধরে সেই তপেশ গাংগুলীর ভাই-ঝিকে নিয়ে কত রকম খরচ-পত্তোর হয়ে চলেছে, তার ওপর এখন আবার হঠাৎ অন্য রকম হুকুম হলো—

—কী হুকুম হলো?

মল্লিক-কাকা বললেন—আমার হয়েছে জ্বালা। এখানে বালিগঞ্জের কোন্ এক চাটুজ্জে ফ্যামিলি আছে তাদের কাছে আমাকে ছোটাছুটি করতে হচ্ছে—। কোথায় বিডন স্ট্রীট আর কোথায় বালিগঞ্জ! এই বুড়ো বয়েসে আমার এত ছোটাছুটি কি পোষায়?

কেন? সেখানে ছোটাছুটি করছেন কেন?

মল্লিক-কাকা বললেন—সাধ করে কি ছোটাছুটি করি? ওপরঅলার হুকুমে ছোটাছুটি করতে হয়। তাদের বাড়ির মেয়ের সংগে এ-বাড়ির সৌম্যবাবুর বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে।

—সে কী? বিশাখার সংগে যে সৌম্যবাবুর বিয়ের সব পাকা হয়ে গেছে-

মল্লিক-কাকা বললেন—জানো তো, কথায় আছে 'বড়র পীরিতি বালির বাঁধ', এও তাই। পাকা কথা দেবার মালিক কি মানুষ? মানুষ ভাবে এক আর হয় আর এক। এ বয়েসে এ-সব এত দেখেছি যে তাতে আর চমকাই নে। আমি তো সব বুঝি! কিন্তু এখন যে শিরে সর্পাঘাত হয়েছে, এ অবস্থায় কে আর বাঁচাবে?

সন্দীপ মনে মনে অস্থির হয়ে উঠলো, বললে—কিন্তু আমি ওদের কাছে মুখ দেখাবো কী করে?

—কাদের কাছে?

—ওই রাসেল স্ট্রীটের মাসিমার কাছে?

মল্লিক-মশাই এ-কথার কী জবাব দেবেন! শেষকালে অনেক ভেবে বললেন—তুমি আর কী করবে? তুমি তো হুকমের চাকর। তমি আমি দুজনেই তাই। এতে তোমার তো কোনও দোষ নেই। তোমায় যদি ওরা কিছু জিজ্ঞেস করে তো বলবে তুমি কিছু জানো না।

সন্দীপ কী বলবে বুঝতে পারলে না। রাসেল স্ট্রীটের মাসিমাদের সংগে কি তার শুধু মনিব ভৃত্যেরই সম্পর্ক? আর কিছু নয়? মাস মাস কিছু টাকা পায় বলেই তার সব দায়িত্ব ফুরিয়ে নিঃশেষ হয়ে যাবে? সে কি শুধুই চাকর, মালিক নয়?

হঠাৎ তার খেয়াল হলো মল্লিক-কাকা কখন ঘর ছেড়ে নিজের কাজে চলে গেছে, তা সে জানতেও পারেনি। সন্দীপ সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই তার নিজের কর্তব্য

কাজ সম্বন্ধে ভাবতে লাগলো। এখন তার কী করা উচিত? তবে কি সত্যি-সত্যিই মাসিমারা রাসেল স্ট্রীট ছেড়ে আবার সেই খিদিরপুরের মনসাতলা লেনের ভাড়া বাড়িতে চলে যাবে?

মাসিমা মাঝে-মাঝে জিজ্ঞেস করতো—তোমার মুখটা এমন শুকনো শুকনো দেখছি কেন বাবা? শরীর খারাপ না তো তোমার?

সন্দীপ বলতো—কই না তো—

—তাহলে কি বেড়াপোতা থেকে কোনও খবর পাওনি? মা'র চিঠি পেয়েছ?

—হ্যাঁ পেয়েছি।

—মা ভালো আছেন তো?

সন্দীপ শুধু বলতো—হ্যাঁ-

এর বেশি আর কোনও কথা বলতো না সন্দীপ। অথচ আগে সন্দীপ কত গল্প করতো মাসিমার সঙ্গে, বিশাখার সঙ্গে। কত হাসি-ঠাট্টা, কত অভিনয়। সে-সব কেন এত তাড়াতাড়ি নিঃশেষ হয়ে গেল? শুধু নেহাৎ রাসেল স্ট্রীটের বাড়িতে না-গেলে নয়, তাই যেন যাওয়া। মাসে-মাসে যখন বিনা পয়সায় খাওয়া-থাকা মিলছে তখন তার প্রতিদান দিতে হবে সেই জন্যেই যেন যতটুকু না-করলে নয় তা-ই করা। তার বেশি কিছু নয়।
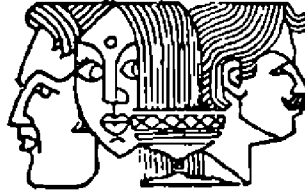
মনে আছে সেদিন কখন যে সে রাস্তায় বেরিয়েছিল, তা নিজেও সে জানতো না। এমন হয় অনেক সময়। নিজের অজ্ঞাতে সব কাজ করে যাওয়া। নিজের আড়ালে নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকা।

কিন্তু কেন এমন হয়?

কেন হয় তা জানতে গেলে প্রথমে নিজেকে জানতে হবে! সে কি অত সহজ? নিজেকে যদি সে অত জানতে পারবে তাহলে কি সে অত সামান্য ঘটনায় অত বিচলিত হতো! যারা সকলের মধ্যে নিজেকে দেখে আর নিজের মধ্যে সকলকে দেখে, তাদেরই এই রকম ভুল হওয়া সম্ভব!

একটা মিছিলের শব্দ কানে আসতেই সে তার বাস্তব জগতে ফিরে এল। কারা তখন চিৎকার করে বলছিল—বলো হরি হরি বোল্‌--

শব্দটা শুনতেই সে রাস্তার এক পাশে সরে এল। কারো শবদেহ নিয়ে চলেছে কয়েকটা ছেলে। সন্দীপ দেখলে প্যান্ট-শার্ট পরা ছেলেরা মৃতদেহটা রাস্তার ওপরেই রাখলে। বোধহয় সবাই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। একটু বিশ্রাম করে নেবে। সন্দীপ সেই দিকে চেয়ে দুই হাত জোড়া করে বুঝি মৃত্যুর উদ্দেশেই একবার প্রণাম করলে। এই মৃত্যু! মৃত মানুষটার দুটো চোখে চশমা লাগানো। চশমা লাগানো কেন? সন্দীপ বুঝতে পারলে না কেন চশমাটা লাগানো রয়েছে চোখে। মানুষটা যখন সব কিছুই পেছনে ফেলে চলেছে তখন ওই চশমাটাই বা কেন লাগানো রয়েছে চোখে! তবে কি মৃত্যুর পর মানুষের দৃষ্টিশক্তি আবার ফিরে আসে? মৃতদেহটার দিকে

দেখতে দেখতে সন্দীপের নিজের বাবার কথাও মনে পড়লো। বাবারও চশমা ছিল। চশমাটা কিন্তু বাবার মৃতদেহের সঙ্গে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়নি। মা রেখে দিয়েছিল। মারা যাবার সময়ে বাবা ঐ চশমাটা ছাড়া আর কিছুই রেখে যেতে পারেন নি। তাঁর স্মৃতি-চিহ্ন হিসেবেই মা রেখে দিয়েছিল সেটা। স্মৃতি-চিহ্ন ছাড়া আর কোনও মূল্যই ছিল না ওটার। মা বলেছিল—ওটা আমি রেখে দিয়েছি রে, ওঁর তো আর কিছু চিহ্ন নেই. একটা ফোটো থাকলে ওটা আমি রাখতুম না—।

তা সত্যি! ওই চশমাটা ছাড়া জীবনে মা'র তো আর কোনও অবলম্বন ছিল না।

সন্দীপ বাবাকে দেখেনি, কিন্তু বাবার সেই চশমাটা দেখেছিল। এতদিন পরে ওই মৃতদেহটার দিকে দেখে তাই তার বাবার কথাটাই সব চেয়ে প্রথমে মনে পড়লো। এই মৃত্যু! মানুষের এই পরিণতি ! অথচ এরই জন্যে মানুষের এত মায়া এত মমতা, এত হিংসে, এত রেশারেশি, এত মামলা-মোকর্দমা, এত অহঙ্কার, এত তেজ! সন্দীপের বাবা একদিন চলে গেছেন. সন্দীপের ঠাকুর্দা'ও একদিন চলে গেছেন। তেমনি আরো কত লোক এসেছে, আবার চলেও গেছে. আবার আরো কত লোক এই পৃথিবীতে আসবে আবার একদিন চলেও যাবে। তাদের আসা-যাওয়ার প্রবাহ কোথাও কোনও ছাপ ফেলে স্থায়ী দাগ রেখে যেতে পারবে না। বড়জোর তাদের ফেলে রেখে যাওয়া জুতো কিম্বা জামা কিম্বা চশমা নিজেদের কাছে রেখে তাদের স্মৃতিকে অক্ষয় অমর করবার আপ্রাণ চেষ্টা করে যাবে। কিন্তু তাইই- বা কতদিন? তারপর? তারপর কী হবে?

--বলো হরি. হরি বোল্—

সেই চলমান জনস্রোতের মধ্যে শবযাত্রীদের কণ্ঠস্বর আবার মুখর হয়ে উঠলো হরিধ্বনিতে! এতক্ষণ যারা শবদেহ কাঁধে নিয়ে হাঁটছিল তাদের বদলে অন্য আর এক দল তখন কাঁধ-বদল করে নিয়েছে!

সন্দীপ লক্ষ্য করলে আগের দলের একজন ছেলে তখন ভারমুক্ত হয়ে পাশের দোকান থেকে একটা সিগারেট কিনে দেশলাই জ্বালিয়ে সেটা ধরালে। তারপর প্যান্টের পকেট থেকে একটু সরু চিরুনি বার করে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের মাথার চুল আঁচড়াতে লাগলো।

একটা জলজ্যান্ত মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াবার সঙ্গে সঙ্গে নিজের চেহারার চাকচিক্য সম্বন্ধে ছেলেটা কেমন করে এত মনোযোগ দিতে পারছে এইটেই সন্দীপ অবাক হয়ে দেখতে লাগলো। এরাও তো মানুষ! এদেরও তো আমরা মানুষ বলেই মনে করি! এদেরও তো একটা করে ভোট আছে!

ছেলেটাকে দেখতে দেখতে সন্দীপ বোধহয় একটু অনামনস্ক হয়ে গিয়েছিল। আর একটু হলেই একটা গাড়ি এসে তাকে প্রায় চাপা দিয়ে ফেলেছিল আর কি! একটুর জন্যে সে বেঁচে গিয়েছে!

কিন্তু পেছন ফিরে দেখে অবাক! অরবিন্দ! গাড়ি চালাচ্ছে অরবিন্দ!

আর পেছনের সীটে?

– এ কী? অমন করে কী দেখছিলে তুমি?

--তুমি? তুমি এখানে হঠাৎ?

বিশাখাকে দেখে হতবাক হয়ে গিয়েছে সন্দীপ! বিশাখা স্কুলের পর গাড়িতে করে বাড়িতে ফিরছে।

বিশাখা গাড়ির দরজাটা খুলে দিয়ে ডাকলে—এসো, এসো. ভেতরে এসো—

সন্দীপ ভেতরে গিয়ে বসতেই অরবিন্দ গাড়ি ছেড়ে দিলে।

বিশাখা জিজ্ঞেস করলে—আর একটু হলেই তো চাপা পড়ে যেতে! কী দেখছিলে

অত মন দিয়ে?

সন্দীপ বললে--তুমি দেখনি?

- কী?

সন্দীপ বললে—দেখলে না, একটা ছেলে ওই মড়া নিয়ে শ্মশানে যেতে যেতে কী করলে?

- কী করলে?

সন্দীপ বললে—ওই পানের দোকানের আয়নাতে গিয়ে নিজের চেহারা দেখতে লাগলো আর পকেট থেকে চিরুনি বার করে নিজের মাথার চুল আঁচড়াতে লাগলো...

বিশাখা বললে—তাই তুমি দেখছিলে?

সন্দীপ বললে -এটা কি দেখবার জিনিস নয়?

—বা রে, ওতে দেখবার কী আছে?

সন্দীপ বললে—কী বলছো তুমি? দেখবার নেই? সামনে মৃত্যু দেখেও মানুষ এমন অমানুষ হয়ে যাবে যে তখন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তার চুলের বাহার দেখবে? এর চেয়ে আর বড় অপরাধ কী হতে পারে আমি তো কল্পনাও করতে পারি না!

বিশাখা বললে- তুমি দেখছি একজন পেসিমিস্ট্—

সন্দীপ হাসলো - বললে- আণ্টি মেমসাহেব দেখছি তোমাকে ভালোই ইংরিজী শেখাচ্ছে—

বিশাখা বললে—তা ভালো ইংরিজী না শিখলে চলবে কেন বলো? তুমিই তো বলেছ মিস্টার মুখার্জির সঙ্গে একদিন আমাকে কনটিনেণ্ট ঘুরতে হবে! তখন ইংরিজী বলতে না পারলে তো মিস্টার মুখার্জিরই নিন্দে হবে—হবে না?

সন্দীপ কথাটা শুনে একটু হাসবার ভান করতে চেষ্টা করলে, কিন্তু তার মুখে হাসি এল না। হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল মল্লিক-কাকার কথাগুলো। মল্লিক-কাকা সেদিন বলেছিল—তুমি আর কী করবে? তুমি আমি দুজনেই তো হুকুমের চাকর। ওরা যদি তোমায় কিছু জিজ্ঞেস করে তো তুমি বলবে তুমি কিছু জানো না—যেন তুমি কিছু জানো না, এই রকম ভাব করবে—

বিশাখা বললে—কী হলো? কী ভাবছো তুমি?

- না, কিছু না—

বিশাখা আর একটু কাছে সরে এসে বললে—বলো না সন্দীপ, কী ভাবছো তুমি? তুমি কি এখনও সেই ডেড্-বডিটার কথা ভাবছো নাকি? একদিন তো সকলকে মরতেই হবে, তাই ভেবে এখন থেকেই পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসবো নাকি?

সন্দীপ বললে—আমার কিন্তু সব সময় সেই কথা মনে থাকে

—কোন্ কথা?

সন্দীপ বললে—সেই ছোটবেলায় আমাদের বেড়াপোতাতে একটা যাত্রা দেখেছিলুম। যাত্রাটার নাম ছিল 'বিল্বমঙ্গল'। তুমি দেখেছ?

বিশাখা বললে—না—

—সেই যাত্রাতে বিল্বমঙ্গল একটা মানুষের ডেড্-বডি দেখে বলেছিল -

> এই নরদেহ
> জলে ভেসে যায়
> ছিঁড়ে খায় কুকুর শৃগাল
> কিম্বা চিতা-ভস্ম সম
> পবন উড়ায়—

আবৃত্তি থামিয়ে সন্দীপ বললে—সেদিন কথাগুলো আমার এত ভালো লেগেছিল

যে কখনও ভুলতে পারি না। সব সময়ে মনে পড়ে যায়। আমি যখনই কোথাও কিছু বিলাসিতা দেখি তখনই মনে হয় সব ফাঁকি। আমরা সবাই আমাদের এই শরীরটার জন্যেই কত কী কাণ্ড করি, এই শরীরটা নিয়েই আমরা সারা জীবন ব্যস্ত থাকি, অথচ এই শরীরটাই কি আমাদের সব?

বিশাখা বললে—ওমা, শরীরটা সব কিছু নয় তো সব কিছু কী? আর কী নিয়ে ব্যস্ত থাকবো?

সন্দীপ বললে—শরীরটা তো একদিন শ্মশানে গিয়ে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে, কিন্তু সংসারে তো আরো অনেক জিনিস আছে যা আগুনে পোড়ে না, যা মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গে শেষ হয়ে যায় না—

বিশাখা বলে উঠলো—ওমা, তুমি দিন-রাত এইসব কথা ভাবো নাকি?

সন্দীপ বললে—হ্যাঁ ভাবিই তো! কেন, এই সব ভাবা খারাপ নাকি?

বিশাখা বললে—তার চেয়ে তুমি একটা বিয়ে করে ফেল। বিয়ে না করলে দিনরাত তোমার মাথায় কেবল এই সব সব ভাবনা ঘুরবে। ভেবে-ভেবে শেষকালে তুমি হয়ত পাগলই হয়ে যাবে—। সত্যি সন্দীপ, তুমি বিয়ে করে ফেলো—

সন্দীপ বললে—দূর, আমাকে কে মেয়ে দেবে, আমার মত গরীব ছেলেকে?

—তা গরীব ছেলেদের কি বিয়ে হয় না? আমিও তো গরীব। আমার সঙ্গে কেন তাহলে মুখুজ্জে-বাড়ির নাতির বিয়ে হচ্ছে?

সন্দীপ বললে—তোমার কথা আলাদা—

—কেন? আলাদা কেন?

সন্দীপ বললে—তোমার টাকা-কড়ি না থাক, তুমি রূপসী তো। টাকার অভাবটা রূপে পুষিয়ে গেছে—

—আমি রূপসী? বলছো কী?

সন্দীপ বললে—রূপসী না হলে ঠাকমা-মণি কলকাতায় এত মেয়ে থাকতে তোমাকেই বা মিছিমিছি পছন্দ করতে গেলেন কেন? কলকাতায় আর কি কোনও মেয়ে ছিল না?

—তা আমি রূপসী বলে তোমার তো কই হিংসে হচ্ছে না! আমার সঙ্গে সৌম্য মুখার্জির বিয়ে হচ্ছে বলে তোমার তো একটু হিংসে হওয়াও উচিত ছিল!

সন্দীপ বললে—কোথায় আমি আর কোথায় সৌম্যবাবু! তাঁর সঙ্গে কি আমার তুলনা?

বিশাখা বললে—তা বাঁদরেরও তো কখনও কখনও মুক্তোর মালা গলায় পরতে ইচ্ছে হয়—

—আমি তেমন বাঁদর নই—

বিশাখা সন্দীপের মুখের দিকে চেয়ে গম্ভীর হয়ে গেল। বললে—তুমি রাগ করলে?

সন্দীপ বললে—এখন চুপ করো, তোমাদের বাড়ি এসে গেছে।

অরবিন্দ বাড়ির সামনে গাড়িটা দাঁড় করাতেই দু'জনেই গাড়ি থেকে নেমে গেল। তারপর সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে উঠতে সন্দীপ বললে—অরবিন্দের সামনে তুমি ও-সব কথা বলছিলে কেন? জানো না ও বাংলা বুঝতে পারে! ও কী ভাবলে বলো তো—

বিশাখা বললে—ভাবলে তো আমার বয়েই গেছে। যা সত্যি কথা তা-ই বলেছি—

—সত্যি কথা কোনটা?

বিশাখা বললে—ওই যে তোমাদের সৌম্যবাবুর সঙ্গে আমার বিয়ে হচ্ছে বলে

তোমার হিংসে হচ্ছে। কথাটা কি মিথ্যে?

সন্দীপ বললে—তুমি ঠিক জানো যে সৌম্যবাবুর সঙ্গে তোমার বিয়ে হচ্ছে?

—কী বলছো তুমি? বিয়ে তো হচ্ছেই! বিয়ের সব ঠিক না হলে কি সৌম্যবাবু আমার স্কুলে গিয়ে অতবার দেখা করে? বিয়ে ঠিক না হলে কি আমাকে ইস্কুলে পৌঁছিয়ে দিতে আর ইস্কুল থেকে নিয়ে আসতে ও-বাড়ি থেকে গাড়ি পাঠিয়ে দেয়?

সন্দীপ বললে—না, বলছি, অনেক সময় বিয়ের পিঁড়ি থেকেও তো বর উঠে যায়—

বিশাখা বললে—তুমি বুঝি সেই আনন্দেই আছো?

—আনন্দ নয়, আমি খারাপ দিকটার কথাও ভাবি—

বিশাখা বললে- আমি বুঝতে পেরেছি, তুমি মনে-মনে চাও আমার এ বিয়েটা ভেঙে যাক্—

তারপর সদর দরজার কাছে আসতেই বিশাখা কলিং-বেল বাজাতে লাগলো।

মাসিমা বোধহয় বিশাখার জন্যেই অপেক্ষা করছিল। দরজা খুলতেই বিশাখা বললে—এই দেখ মা, কাকে নিয়ে এসেছি--

মাসিমাও সন্দীপকে দেখে অবাক, বিশাখা বললে--জানো মা, রাস্তায় সন্দীপ একটা মড়ার দিকে হাঁ করে চেয়ে দেখছিল। আমি দেখতে পেয়ে গাড়িতে তুলে নিয়ে এলুম—

মাসিমা বললে—তা বেশ করেছিস।

তারপর সন্দীপের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলে—তা তুমি মড়ার দিকে দেখছিলে কেন বাবা? তোমার কি কেউ হয়?

জবাবটা দিলে বিশাখা। বললে—বলে কী জানো, বলে এই-ই হলো সকলের শেষ পরিণতি—

তারপর একটু থেমে আবার বললে—আবার বলছে সৌম্যর সঙ্গে যদি আমার বিয়ে না হয়, তখন? অনেক সময়ে নাকি বিয়ের পিঁড়ি থেকেও বর উঠে যায়—

মাসিমা অবাক হয়ে গেল। বললে--ও কি অলুক্ষুণে কথা মা! কেন বাবা, তুমি ওই কথা বলেছিলে নাকি?

এতক্ষণে সন্দীপের মুখে কথা বেরোল। বললে—না, মাসিমা, কে একজন মারা গেছে দেখে আমার কেমন মনটা খারাপ হয়ে গেল। আমি আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলুম। ভাবলুম সকলকেই তো একদিন এইরকম করে চলে যেতে হবে। তখন আমার নিজের বাবার কথাও মনে পড়তে লাগলো। তখন ওদিকে দেখি ওদের দলের একজন ছেলে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের চুলটা আঁচড়াচ্ছে। বলুন তো মাসিমা, ওই সময়ে কারোর নিজের চেহারার কথা মনে পড়ে? আপনিই বলুন?

মাসিমা বললে—না না, ও-সব দেখতে নেই বাবা! ও-সব কথা ভাবতেও নেই।

বলতে বলতে মাসিমার চোখ দুটোও জলে ভিজে এল। চোখ দুটো আঁচল দিয়ে মুছতে মুছতে বললে—তা ওসব কথা এখন থাক বাবা, তুমি অন্য কথা বলো। ও-বাড়ির খবর সব ভালো তো, তোমার ঠাকুমা-মণি বিলেত থেকে নাতির চিঠি পেয়েছেন?

সন্দীপ বললে—হ্যাঁ—

--ওদের কারখানা এখন ঠিক চলছে তো?

সন্দীপ এবারও বললে--হ্যাঁ—

মাসিমা বললে--জানো বাবা আমি ঘর-পোড়া গরু তো, তাই সিঁদুরে মেঘ দেখলেই ভয়ে আঁতকে উঠি। জীবনে অনেক ঠেকেছি, বিশাখার বাবা মারা যাওয়ার পর আমি কল্পনাও করতে পারিনি যে আমি এতদিন বাঁচবো আর আমার সেই বাপ-

মরা মেয়ের এত সুখ হবে—তার আবার এত বড় ঘরে বিয়ে হবে—

বলে মাসিমা আবার আঁচল দিয়ে নিজের চোখ মুছলো।

ততক্ষণে বিশাখা নিজের ঘরে গেছে নিজের ব্লাউজ-শাড়ি বদলাতে। মাসিমা হঠাৎ সন্দীপের সামনে সরে গেল। গিয়ে গলা নীচু করে বললে—হ্যাঁ বাবা, তুমি সত্যি বলছো কোনও খারাপ খবর নেই তো?

সন্দীপ বললে—না মাসিমা—

মাসিমা আবার তেমনি নিচু গলাতেই বললে—আমার জামাই বিলেতে ভালো আছে তো? চিঠি ঠিক সময়ে আসছে তো? আমার কাছে লুকিয়ো না বাবা তুমি, সত্যি করে বলবে—

সন্দীপ বললে—না মাসিমা, আমি সত্যি বলছি, সব খবর ভালো—

মাসিমা যেন তাতেও তেমন খুশী হলো না। তেমনি গলা নিচু করেই বললে—তাহলে তুমি বিশাখার কাছে অমন করে কথা বললে কেন? বিয়ের পিঁড়ি থেকে বর উঠে যাওয়ার কথাই বা আসে কী করতে?

সন্দীপ বললে—বিশাখাকে আমার ক্ষ্যাপাতে ভালো লাগে মাসিমা, ওকে ক্ষ্যাপাবার জন্যে বলি—

মাসিমা বললে—না বাবা, অমন অলুক্ষণে কথা মুখ দিয়ে বার করো না, ও-কথা ভাবলেই আমার বুক কেঁপে ওঠে—

—আচ্ছা-আচ্ছা মাসিমা, আমি আর কখনও ও-কথা বলবো না—

বলে সঙ্গে সঙ্গে সন্দীপ মাসিমার পায়ে হাত দিয়ে মাথায় ঠেকিয়ে ক্ষমা চেয়ে বলে উঠলো—আমাকে ক্ষমা করলেন তো মাসিমা?

মাসিমা ডান হাত দিয়ে সন্দীপের চিবুক ছুঁয়ে চুমু খেল। বললে—আমার ছেলে নেই, তাই তুমিই আমার ছেলের মতন বাবা। ছেলে হাজার দোষ করলেও মা কি কখনও সে-ছেলেকে ভালো না বেসে পারে?

সন্দীপ তখন আর নিজেকেও সামলাতে পারলো না। সঙ্গে সঙ্গে মাসিমার দু' পায়ের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে কাঁদতে লাগলো।

মাসিমা সন্দীপকে ধরে দাঁড় করাতে চেষ্টা করতে লাগলো। বললে—ও কী বাবা, ও কী করছো? ওঠো—ওঠো—

সন্দীপ উঠে দাঁড়ালো। কিন্তু তখন তার দুটো চোখ বেয়ে অঝোর ধারায় জল গড়িয়ে পড়ছে। আর ততক্ষণে পাশের ঘর থেকেও বিশাখা বেরিয়ে এসে অবাক। বললে—ও কি, সন্দীপ কাঁদছে কেন মা? সন্দীপের কী হয়েছে?

সে-কথার উত্তরে মাসিমা কিছু বলবার আগেই সন্দীপ বাইরে বেরোবার দরজা দিয়ে তর-তর করে নেমে গিয়ে একেবারে রাস্তায় এসে হাঁফ ছেড়েছে। তার মনে হলো সে যেন মাসিমার কাছে মিথ্যে কথা বলে নিজেকেই প্রবঞ্চনা করেছে। কিন্তু মিথ্যে কথা না বলে তার উপায়ই বা কী ছিল? মল্লিক-কাকা তো মিথ্যে কথা বলতেই উপদেশ দিয়েছিলেন তাকে। সত্যিই তো, কোন এক চ্যাটার্জিবাবুদের মেয়ের সঙ্গে যখন সৌম্যবাবুর বিয়ের কথা উঠেছেই তখন বিশাখার জীবনে যে দুর্যোগের ঘনঘটা ঘনিয়ে এসেছে এটা তো স্বতঃসিদ্ধ। সুতরাং কোন দিকটা সে দেখবে? কার স্বার্থের দিকে সে নজর দেবে? নিজের চাকরির দিকটা না বিশাখার সুখের দিকটা? তার কাছে কোনটা বড়? কোনটা বড় হওয়া উচিত তার কাছে?

মনে আছে নিজের কাছে হাজার বার প্রশ্ন করেও সন্দীপ সেদিন তার সে-কথার কোনও জবাব পায়নি।

আজ এত বছর পরে মনে হচ্ছে সত্যকে মিথ্যের মোড়ক দিয়ে ঢাকতে গেলে শুধু যে সত্যটাই বিড়ম্বিত হয় তাই-ই নয়, মিথ্যেটাও একটা ভারি পাথরের মত এসে বুকে দ্বিগুণ জোরে আঘাত করে।

সেদিন সন্দীপের ঠিক তাই-ই হয়েছিল। সারা রাস্তাটা তার বড় অস্বস্তিতে কেটেছিল। শেষকালে নিজেকে সে এই বলে সান্ত্বনা দিয়েছিল যে যাদের জন্যে সে এত দুশ্চিন্তা করে তারা তো কেউই তার আপনজন নয়, তাহলে কেন সে এত কষ্ট পায়? তার চেয়ে মার কথা ভাবলেই হয় যে তার সব চেয়ে আপন, সব চেয়ে কাছের। নিজের মা'র চেয়ে অত আপন আর কে আছে তার? মা ভালো আছে, সেইটেই তো তার কাছে বড় সুসংবাদ! বড় সান্ত্বনা! সুতরাং তার কোনও দুঃখ নেই, তার কোনও কষ্ট নেই। সে আর এখন থেকে কারো কথা ভাববে না, কারো সুখ-দুঃখ নিয়ে মাথাও ঘামাবে না। সে যেমন একটা ভালো চাকরির চেষ্টা করে যাচ্ছে, তেমনি চেষ্টা করে যাবে। আর কোনও দিকে কারো দিকে সে ফিরে তাকাবে না।

কিছুদিন আগেই সে একটা চাকরির দরখাস্ত করেছিল। ব্যাঙ্কের চাকরি।

খবরটা দিয়েছিল সুশীল। সুশীল সরকার।

সুশীল বলেছিল- দরখাস্ত করতে দোষ কী? আমি তো রোজ খবরের কাগজ দেখে দেখে একটা দুটো অ্যাপ্লিকেশন ছেড়ে দিই। লাগে তুক্, না লাগে তাক্।

সন্দীপ বলেছিল—কিন্তু আমার চাকরি কী করে হবে? আমি তো কোনও পার্টির মেম্বার নই—

সুশীল বলেছিল—আরে, আমি তো কত পার্টির মেম্বার হলুম আবার কত পার্টির মেম্বারশিপ্ ছাড়লুম, আমার তবু চাকরি হচ্ছে না কেন? আসলে চেষ্টা করতে দোষ কী? তারপর কপালে যা আছে তাই-ই হবে –

সন্দীপ অবাক হয়ে গিয়েছিল সুশীলের কথা শুনে। বললে—আপনারাও তাহলে কপাল মানেন?

—কপাল মানবো না? বলেন কী? কপালই তো সব। শুধু আমি একলাই কপাল মানি না, আমাদের পার্টির সব লীডাররা কপাল মানে। তাদের মধ্যে অনেকে আবার হাতে মাদুলী পরে, জ্যোতিষীদের কাছে গিয়ে নিজেদের হাত দেখায়।

—বলেন কী? জ্যোতিষীদের কথা ফলে?

সুশীল বললে—জ্যোতিষীদের কাছে ওটাও তো তাদের পেশা। অসুখ হলে মানুষ যেমন ডাক্তারদের কাছে যায়, মামলা হলে যেমন মানুষ উকিল-ব্যারিস্টারদের কাছে যায়, তেমনি বিপদে পড়লে মানুষ জ্যোতিষীদের কাছেও যায়। তাতে তো দোষের কিছু নেই-

সন্দীপ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল—আপনি সত্যি বলছেন? আমার তো বিশ্বাসই হচ্ছে না—

আরে, তাহলে আমার কাছে শুনুন। আমি একবার আমাদের পার্টির এক লীডারের বাড়ি গিয়েছিলুম। তিনি বরাবর বলতেন—ভগবান-টগবান কিছু না, ও-সব বোগাস জিনিস। একমাত্র পুরুষকারই মানুষকে মহাপুরুষ করে তোলে। আমরা

ভাবতুম তাই-ই হয়ত হবে। কিন্তু সেদিন তিনি বাড়িতে গেঞ্জি পরে ছিলেন। আমি যে তখন তাঁর বাড়িতে গিয়ে পড়বো, তা তিনি ভাবতেও পারেন নি। তা সেইদিনই হঠাৎ নজরে পড়লো তার এক হাতে একটা মাদুলী লাগানো রয়েছে। সেই দিন থেকেই আমি বুঝে গেলুম যে, লীডার যা মুখে বলে সব গাঁজাখুরী। ওরা সব জোচ্চোর—

—তাহলে এখনও আপনি পার্টিতে রয়েছেন কেন?

সুশীল বললে—শুধু ওই চাকরির জন্যে—পার্টি যখন পাওয়ারে আসবে তখন সকলের আগে আমরাই চাকরি পাবো—

এ-সব কথা অনেকবারই হয়েছিল সুশীলের সঙ্গে। সুশীল তখনই বলেছিল—এ্যাপ্লিকেশন করতে আপনার আপত্তি কীসের? তারপর কপালে যা আছে তাই হবে—

শেষেটা এই ভাবেই হয়েছিল। সময়মত একটা ব্যাঙ্কের চাকরির জন্যে দরখাস্তও করে দিয়েছিল। সে অনেক দিন আগেকার কথা। বলতে গেলে সন্দীপ তার ওপর কোনও গুরুত্বই দেয়নি। কিন্তু সত্যি-সত্যিই যে তার দরখাস্তের কোনও উত্তর আসবে তাও সে ভাবেনি।

তবু সেই দরখাস্তের উত্তরে একটা চিঠি এল।

মনে আছে প্রথমে সে কিছুই টের পায়নি। বাড়িতে এসেই দেখে এলাহি কাণ্ড। বাড়ির সামনে অনেকগুলো বিলিতি গাড়ি দাঁড়িয়ে। হঠাৎ আজ এ-বাড়ির সামনে এত গাড়ি কেন? তাহলে কি মেজবাবু এসেছে? কিন্তু মেজবাবুর গাড়ি তো সে চেনে! মেজবাবুর গাড়ির সঙ্গে এতগুলো গাড়ি কাদের? প্রত্যেকটা গাড়িই ঝক্-ঝকে নতুন। প্রত্যেকটা গাড়ির ড্রাইভারদের সাজ-গোজের খুব চটক। এরা কারা?

গিরিধারী গেটের সামনে এ্যাটেন্‌শনের ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে ছিল। সন্দীপ তাকেই জিজ্ঞেস করলে—এ-সব কাদের গাড়ি গিরিধারী? কারা এসেছে বাড়িতে? মেজবাবুর বন্ধু-বান্ধব?

গিরিধারী বললে—জী হাঁ! সাহাবকা দোস্ত লোক্...

কিন্তু ভেতরে ঢুকে আরো স্পষ্ট হলো জিনিসটা। মল্লিক-কাকা ওপর থেকে নিচেয় নেমে ঘরের দরজার চাবি খুললেন। আবার কী একটা খাতা হাতে নিয়ে ওপরে যাচ্ছিলেন। সেই সময়ে সন্দীপকে দেখে বললেন—তোমার একটা চিঠি আছে গো, আমি এসে তোমায় দিচ্ছি—

বলে আবার সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে যাচ্ছিলেন।

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—বাড়িতে কারা এসেছেন, কাকা?

মল্লিক-কাকার তখন কথা বলবার সময় নেই। শুধু যেতে যেতে বললেন—সেই বালিগঞ্জের চ্যাটার্জিরা—

তারপর বললেন—বোস, আমি কাজটা সেরে আসছি—

বলে সেই যে গেলেন আর আসবার নাম নেই। সন্দীপ একলাই নিজের ঘরে বসে রইল। তাকে আবার কে চিঠি লিখলে? ভেবে ভেবে কিছুই ঠিক করতে পারা গেল না। তাকে তো চিঠি লেখবার কেউ-ই নেই এক তার মা ছাড়া। তা মা'র চিঠি তো একদিন আগেই এসেছে। এর মধ্যে মা আবার তাকে চিঠি লিখতে যাবে কেন?

মানুষ যখন নিজেকে নিয়ে নিজের মধ্যে ব্যস্ত থাকে তখন তার ভাগ্য বিধাতা হয়ত আড়ালে বসে বসে আর এক মতলব আঁটে। কবেকার কত রকম ঋণের জটিল হিসেব যে সেই ভাগ্য বিধাতার জাবদা-খাতায় লেখা থাকে তার ইয়ত্তা নেই। তার আদায়-জমা সব রকমের অঙ্ক দিয়েই সেখানে মানুষের চুল-চেরা বিচার হয়। তখন তার ভাগ্যবিধাতা মাঝে মাঝে তাকে সতর্কও করে দেয়। বলে—সাবধান, ওরে খুব সাবধান—

যারা সে সতর্ক-বাণী শুনতে পায় তারা সাবধান হয়, যারা শুনতে পায় না তারা সন্দীপের মত ধ্বংসের গর্ভের ভেতরে তলিয়ে নিঃশেষ হয়ে যায়।

সন্দীপ যে আজ এই অবস্থায় এসে পৌঁছিয়েছে এর কারণ কি এই যে সে তার ভাগ্য বিধাতার সতর্ক-বাণী শোনেনি বলে?

কিন্তু এ তো অনেক পরের কথা। তার আগের অনেক কথাও তো বলতে বাকি আছে। তাই সেই বালিগঞ্জের চ্যাটার্জিবাবুদের কাহিনীটাই এখানে বলি।

অতুল চ্যাটার্জির পূর্বপুরুষের কুলুজি ঘাঁটলে দেখা যাবে কবেকার কোন্ ফরিদপুরে না পাব্না জেলার কোন্ এক অখ্যাত গ্রামে ততোধিক অখ্যাত এক মানুষ একদিন খোলা আকাশের নিচেয় জন্মগ্রহণ করে এই পৃথিবীটাকেই অভিশাপ দিয়েছিলেন। অভিশাপ দিয়েছিলেন অনাহারের জন্যে, আশ্রয়হীনতার জন্যে, অশিক্ষার জন্যে আর অস্বাস্থ্যের জন্যে।

কিন্তু মানুষের বিধাতা-পুরুষের এ-সব অভিশাপ শোনার অভ্যেস আছে। তাতে তাঁর কিছু আসে যায় না। তাই তিনি সে-অভিশাপেও কোনও উচ্চ-বাচ্য করলেন না। অতুল চ্যাটার্জির ভাগ্য বিধাতা আগেও যেমন নির্বিকার ছিলেন পরেও তেমনি নির্বিকারই হয়ে রইলেন। গ্রামের চৌহদ্দির মধ্যেই সেই অতুল চ্যাটার্জির পূর্বপুরুষরা বংশপরম্পরায় দারিদ্র্য, আশ্রয়হীনতা, অশিক্ষা আর অস্বাস্থ্যের উৎপীড়নে অভিশপ্ত হয়ে জীবন কাটাতে লাগলো।

ঠিক এই সময়েই শুরু হলো এক বিপর্যয়।

ঠিক সেই সময়েই ভারতবর্ষ দু'ভাগ হলো। কার চক্রান্তে যে ভারতবর্ষ দু'ভাগ হলো সে-সব বৃত্তান্ত এখানে অবান্তর। এখানে শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে সেই বিপর্যয়ে পড়ে অতুল চ্যাটার্জিও অন্য সকলের মত সপরিবারে একদিন এই শহরের প্রান্তে এসে আছড়ে পড়লেন। তখন না ছিল তাঁর মাথা গোঁজবার মত একটা নিশ্চিত আশ্রয় আর না ছিল তাঁর নির্ভর করবার মত একটা বাঁধা বরাদ্দ আয়। কোনও রকমে তিন-চারটে পেট চালাবার মত জীবিকা অর্জনের জন্যে শুরু হলো তাঁর অহর্নিশ সংগ্রাম। তারপর হঠাৎ একটা দৈব সুযোগ জুটেও গেল একদিন।

এই কলকাতারই একটি ধনীর সন্তান তখন অনেক দিন ধরেই একটা কিছুকে আঁকড়ে ধরে মাথা তুলে দাঁড়াবার চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন। কিন্তু কিছুতেই আর সে-সব চেষ্টায় সফল হতে পারছিলেন না। টাকা তাঁর ছিল অপর্যাপ্ত, ছিল না শুধু মাথা। শুধু তেল থাকলেই তো আর প্রদীপ জ্বলে না, তার সঙ্গে অনিবার্য হয় অনুকূল আবহাওয়ার। নইলে তো ঝোড়ো হাওয়াতেই প্রদীপ নিভে যাবে।

তখন তিনি পেয়ে গেলেন সেই অনুকূল আবহাওয়া। এই অতুল চ্যাটার্জির মধ্যেই অনুকূল আবহাওয়া খুঁজে পেয়ে তিনি যেন কৃতার্থ হলেন। আজকের এই অতুল চ্যাটার্জিই অনুকূল আবহাওয়া হয়ে তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। আর তখন থেকেই শুরু হলো তাঁদের যুগ্ম জয়-যাত্রা।

মুক্তিপদ মুখার্জির সঙ্গে এই অতুল চ্যাটার্জির প্রথম সাক্ষাৎ হয় মিড্ল ইস্টের

এক ফাইভ্-স্টার হোটেলে। অতুল চ্যাটার্জির জীবন-বৃত্তান্ত শুনতে শুনতে মুগ্ধ বিস্ময়ে মানুষটাকে তিনি একদৃষ্টে দেখছিলেন। সব গল্প শোনবার পর মুক্তিপদ জিজ্ঞেস করলেন—আপনার ফ্যাক্টরিতে লেবার-ট্রাবল হয় না?

অতুল চ্যাটার্জি সগৌরবে বললেন—না—

মুক্তিপদ বললেন—কী করে এটা সম্ভব হলো?

অতুল চ্যাটার্জি বললেন—আমার বড় ছেলে একজন লেবার-লীডার। আমার বড় ছেলেকে আমি সেই জন্যেই লেবার-লীডার করে দিয়েছি—

কথাটা শুনে মুক্তিপদ মুখার্জি নিজের বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার একটা রাস্তা যেন খুঁজে পেলেন। কথাটা তখন থেকেই তাঁর মাথায় ঢুকে রইল। অতুল চ্যাটার্জির সন্তান মাত্র দুটি। বড় ছেলেটি লেবার-লীডার আর ছোটটি মেয়ে। সে এম-এ পড়ছে। সুতরাং সোম্যর সঙ্গে মেয়েটির বিয়ে দিলে অতুল চ্যাটার্জির সম্পত্তির যেমন একটা ভাগ পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তেমনি আত্মীয়তার সূত্রে লেবার-ট্রাবল্ থেকেও উদ্ধার পাওয়া যায় চিরকালের জন্যে।

এমন সুযোগ রোজ-রোজ আসে না আর হয়ত ভবিষ্যতেও কখনও আসবে না।

এর অনেক দিন পরে কথাটা পাড়তেই অতুল চ্যাটার্জি আনন্দের সঙ্গে রাজি হয়ে গেলেন। এতেও মা কোনও উত্তর দেয়নি।

—কিন্তু মা আগে-ভাগে সোমার জন্যে আর একজন অজ্ঞাতকুলশীল পাত্রীর বিয়ে দেবার সব রকম পাকা বন্দোবস্ত করে রেখেছেন!

তবে দেরি হলেও শেষ পর্যন্ত মা যে পাত্রীকে দেখতে রাজী হয়েছে এইটেই যথেষ্ট। মা জিজ্ঞেস করেছিল পাত্রী কী রকম?

মুক্তিপদ বলেছিল—তোমাকে তো বলেছি মা যে পাত্রী এম-এ পাশ—

—এম-এ পাশ নিয়ে কি আমি ধুয়ে খাবো বলতে চাস? আমি কটা পাশ করেছি?

মুক্তিপদ বলেছিল—তা নয়, তোমার ওই খিদিরপুরের পাত্রীর চেয়ে ভালো সেই কথাটাই বলতে চাই আমি—

তাতেও যখন মা কোনও জবাব দিলে না তখন মুক্তিপদ বলেছিল—তুমি একবার দ্যাখোই না মেয়েটিকে—বিয়ে হোক আর না হোক, দেখতে দোষ কী?

মা বলেছিল—আমি তাদের বাড়িতে মেয়ে দেখতে যাবো? তুই বলছিস কী?

মুক্তিপদ বলেছিল—তাদের বাড়িতে না যাও, অন্য জায়গাতে গিয়েও মেয়ে দেখতে পারো। আগের পাত্রীকে দেখতে তো তুমি গঙ্গার ঘাটে গিয়েছিলে, এ পাত্রীকেও তুমি না-হয় গঙ্গার ঘাটে গিয়ে দেখতে পারো। তার ব্যবস্থাও আমি করতে পারি—

এর পর মুক্তিপদ বলেছিল—তা যদি না হয় তো পাত্রীর বাবা নিজেই পাত্রীকে নিয়ে তোমার কাছে আসতে পারে। তাতে তোমার আপত্তি কী?

না! তাতে মা'র আপত্তি ছিল না। শেষ পর্যন্ত মল্লিক-মশাইকে সেই জন্যে কয়েকবার পাত্রীদের বালিগঞ্জের বাড়িতে যেতেও হয়েছিল। মুক্তিপদর ইচ্ছে ছিল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিয়ের আদি-পর্বের ব্যাপারটা চুকে যাক, যাতে 'স্যাক্সবি মুখার্জি কোম্পানি' লেবার-ট্রাবলের হাত থেকে বেঁচে যাবে।

দিন-ক্ষণ আগে থেকেই সব পাকা হয়ে গিয়েছিল। সেই কথা মত পাত্রীর বাবা তাঁর ছেলে আর মেয়েকে নিয়ে এ-বাড়িতে এসেছিলেন। বাড়িতে অতুল চ্যাটার্জি প্রথমেই ঠাকমা-মণি'কে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেন।

ঠাকমা-মণি বললেন—থাক্, বাবা, পায়ে হাত দিতে হবে না—

কিন্তু তা বললে আর কে শোনে? ততক্ষণে অতুল চ্যাটার্জির ছেলেও ঠাকমা-মণির পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে।

ঠাক্‌মা-মণি সেবারও বললেন—থাক্ থাক্ বাবা...কী নাম তোমার ?

—আমার নাম শ্রীসুবীর চ্যাটার্জি—

তৎক্ষণে পাত্রী নিজেও এগিয়ে এসেছে. সেও ঠাক্‌মা-মণির পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে। সেবারও ঠাকমা-মণি বললেন—থাক মা, থাক...তোমার নাম কী মা ?

—আমার নাম বিনীতা··

—বাঃ, চমৎকার নাম তো তোমার। তুমি সুখী হও মা—

মুক্তিপদ সবই দেখছিল তীক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে। অনেক দিন থেকেই মা'কে দেখে আসছিল সে, এখনও দেখতে লাগলো। মনে হলো মা যেন পাত্রীকে দেখে খুশী হয়েছে। মুখে কোথাও বিরক্তি বা বিতৃষ্ণা নেই।

অতুল চ্যাটার্জি সাহেব মানুষ। পূর্বপুরুষরা যা-ই থাকুন, এখন পৃথিবীর সব দেশে তাকে মিস্টার চ্যাটার্জি নামেই ডাকা হয়। অধীনস্থ কর্মচারীরা তাকে 'সাহেব' বলেই চেনে। সারা জীবন যতই কোট-প্যান্ট বা স্যুট্ পরে কাটিয়ে থাকুন, আজ প্রথম পরেছেন ধুতি-পাঞ্জাবী। ঠাকমা-মণি সেকালের লোক, ধুতি-পাঞ্জাবী পরা দেখলেই খুশী হবেন, এইটেই মনের আকাঙ্ক্ষা।

অতুল চ্যাটার্জি খাঁটি বাংলা ভাষাতেই বললেন আমি বাপ হয়ে মেয়ের সম্বন্ধে বেশি বলতে পারি না মা, তবু বলছি আমার মেয়ের মত মেয়ে বাঙালী সমাজে বড় কম দেখা যায়। একদিকে যেমন লেখা-পড়ায় ভালো, তার সঙ্গে আবার তেমনি দেব-দ্বিজে ভক্তি। তেমনি আবার ইংরেজি বলা-কওয়া-লেখতে ফার্স্ট। প্রত্যেক বছরেই ও পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়েছে। ভগবানের অনেক আশীর্বাদে তবে ওই রকম মেয়ে পাওয়া যায় মা। নামেও যেমন বিনীতা, কাজেও তেমনি বিনীতা ও—

মা'র চেহারাটার দিকে মুক্তিপদ তীক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে লক্ষ্য করছিল। এবার বললে—আর ওই যে সুবীর চ্যাটার্জি, ও একজন লেবার-লীডার। ওর আন্ডারে দশ-বারো লাখ লেবার আছে। তারা সবাই ওর কথায় ওঠে বসে। মিস্টার চ্যাটার্জির কোম্পানীতে তাই কখনও লেবার-ট্রাব্‌ল হয় না

মা জিজ্ঞেস করলে—কখনও লেবার-ট্রাব্‌ল হয় না ?

অতুল চ্যাটার্জি বললেন—না মা, পঁচিশ বছরের কোম্পানি আমাদের ; কোম্পানির হিস্ট্রিতে কখনও লেবার-ট্রাব্‌ল হয়নি আমাদের—

মা বললেন—আমাদের কোম্পানিতে বাবা বড্ড গোলমাল করে লেবাররা। ওই তো দেখছো মুক্তিকে, কত রোগা হয়ে গেছে। অথচ কত ভালো স্বাস্থ্য ছিল আগে। এখন লেবার-ট্রাবলের জন্যে ওর ব্লাড-প্রেশার বেড়েছে। রাত্তিরে ভালো করে ওর ঘুমও হয় না। দেখ না, এখন আবার কোম্পানিতে ধর্মঘট আরম্ভ হয়েছে। কী করি বলো তো বাবা ?

সুবীর এতক্ষণ বসে বসে সকলের কথা শুনছিল। সে আমেরিকা থেকে বিজনেস-ম্যানেজমেণ্ট ডিগ্রী পেয়েছে অনার্স নিয়ে। গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ।

সে এবার মুক্তিপদকে জিজ্ঞেস করলে—আপনাদের ইউনিয়ন ক'টা ?

মুক্তিপদ বললে—তিনটে।

—আপনাদের ম্যানেজ্‌মেণ্টের ইউনিয়ন ক'টা ?

-দুটো।

--আর বাকিটার লীডার কে ?

মুক্তিপদ বললে—বরদা ঘোষাল।

সুবীর বললে—ওই একটা রাসকেল। জানেন, কলকাতায় ওর বেনামীতে তিরিশ লাখ টাকার প্রপার্টি আছে, নিজের গাড়ি আছে, রোজ পনেরো-কুড়ি লিটার পেট্রল

খরচ করে, অথচ এমন কায়দা-কানুন জানে যে একটা পয়সা ইনকাম-ট্যাক্স পর্যন্ত দিতে হয় না...

—এ কী করে সম্ভব হয়?

সুবীর চ্যাটার্জি বললে—ইন্ডিয়ার এই কলকাতায় সবই সম্ভব মিস্টার মুখার্জি, সবই সম্ভব। এখানে রেফারেন্স থাকলে মানুষ মার্ডার করেও খালাস পাওয়া যায়। শুধু ট্যাক্ট্ জানা থাকা চাই। আমি মিসেস গান্ধীকে তাই একবার বলেছিলুম আমাদের কলকাতায় তো ডেমোক্রেসী নেই, আছে কেবল একটা জিনিস মবোক্রেসী ! যাকে বলে মস্তান-রাজ—

অতুল চ্যাটার্জি কথার মাঝখানে ছেলের পক্ষ নিয়ে বলে উঠলেন—আমি তো ইন্ডিয়ায় এক মাসের বেশি থাকিও না। এখানে থাকলে আমার চলেই না। এই সুবীর আছে বলেই আমি তবু বাইরে একটু নিশ্চিন্তে থাকি—

সুবীর জিজ্ঞেস করলে—বরদা খোষাল আপনার কাছে এ-পর্যন্ত কত টাকা নিয়েছে?

মুক্তিপদ বললে—কখনও নিজের হাতে নিয়েছে, কখনও গোপাল হাজরার হাত দিয়ে নিয়েছে। সব মিলিয়ে তিরিশ লাখ তো বটেই—

—গোপাল হাজরা? দ্যাট্ ইডিয়ট্ দ্যা গ্রেট? ওকে কখনও বিশ্বাস করবেন না মিস্টার মুখার্জি—

মুক্তিপদ বললে—বিশ্বাস না করে কী করবো? ও-ই তো শ্রীপতি মিশ্রের পি-এ। গোপাল হাজরা রেগে গেলে শ্রীপতি মিশ্রও রেগে যাবে। মিনিস্টার যদি আমার ওপর রেগে থাকে তো আমি ফ্যাক্টরি চালাবো কী করে?

সুবীর বললে—জানেন তো মিস্টার মুখার্জি, শ্রীপতি মিশ্র তিনবার হায়ার-সেকেন্ডারি ফেল?

মুক্তিপদ বললে—শুনেছি তো তাই। মিনিস্টার তিন-বার হায়ার-সেকেন্ডারি ফেল করলে দোষ নেই, কিন্তু তার সেক্রেটারির আই-এ-এস পাশ হওয়া চাই। স্ট্রেঞ্জ—

সুবীর বললে—এ জিনিস নাইজিরিয়া কিম্বা ঘানাতে হতো অবাক হতুম না, কিন্তু এই ইন্ডিয়াতে...

ততক্ষণে জলযোগের বন্দোবস্ত পাকা হয়ে গিয়েছিল। ঠাকমা-মণি বললেন—এইবার ওঠো বাবা, তোমরা একটু মিষ্টিমুখ করে নাও—

মিষ্টিমুখ করতে করতেও ওই একই প্রসঙ্গ। সুবীর চ্যাটার্জি যে ইচ্ছে করলেই স্যাকসবি মুখার্জি কোম্পানির লেবার-ট্রাব্ল মিটিয়ে দিতে পারে, এই কথাটাই কথা-বার্তার মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠলো।

পাত্রী কেমন পছন্দ, তার গুণাবলীর বিবরণ, কোনও কিছুর প্রসঙ্গই উঠলো না। কিন্তু ঠাকমা-মণি যে প্রসন্ন রয়েছেন, এটা মুক্তিপদ কিংবা অতুল চ্যাটার্জি কারোরই বুঝতে দেরী হলো না! সকলেরই মনে হলো 'স্যাকস্‌বী-মুখার্জি কোম্পানী' শিগ্‌গিরই রাহু-গ্রাস থেকে এবার মুক্ত হলো।
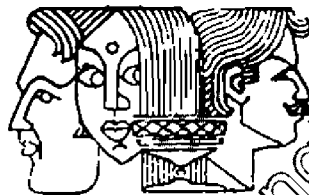
নীচেয় একতলায় সন্দীপ অনেকক্ষণ ধরে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল। শব্দ শুনে টের পাওয়া গেল যারা অভ্যাগত অতিথি হয়ে এতক্ষণ আপ্যায়িত হচ্ছিলেন তারা

সবাই এবার চলে গেলেন যার-যার গাড়ি নিয়ে। তখন মল্লিক-কাকা ছুটি পেয়ে নিজের ঘরে এসে ঢুকলেন।

সন্দীপ মল্লিক-কাকার মুখের দিকে চাইলে। তারপর মল্লিক-কাকার তরফ থেকে কোনও উত্তর না পেয়ে সন্দীপ নিজেই জিজ্ঞেস করলে—কারা এসেছিলেন কাকা?

মল্লিক-কাকার মুখটা গম্ভীর গম্ভীর। বললেন—সেই বালিগঞ্জের চ্যাটার্জিরা।

মল্লিক-কাকা তেমনি গম্ভীর গলাতেই বললেন—অতুল চ্যাটার্জিমশাই তাঁর মেয়েকে নিয়ে ঠাকমা-মণিকে দেখাতে এসেছিলেন—

সন্দীপের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হলো। কিছুক্ষণ তার মুখ দিয়ে কোনও কথাই বেরোল না। তার অনেকক্ষণ পরে জিজ্ঞেস করলে—ঠাক্‌মা-মণি কী বললেন?

মল্লিক-কাকা বললেন—বেশির ভাগ লেবার-ট্রাব্‌লের কথাই হলো। অতুল চ্যাটার্জির ছেলে সুবীর চ্যাটার্জিও সঙ্গে ছিল। সেও একজন লেবার-লীডার। সে বললে সে বরদা ঘোষাল আর গোপাল হাজরা দু'জনকেই চেনে। সে কথা দিলে যে সে—আমাদের কোম্পানীর লেবার-ট্রাব্‌ল ঠিক করে দিতে পারবে—

—তারপর?

—তারপর ঠাকমা-মণিকে দেখে মনে হলো তিনি তার কথা শুনে যেন খুব খুশী হয়েছেন—

সন্দীপের যেন কথাটা বিশ্বাস হলো না। জিজ্ঞেস করলে—ঠাকমা-মণি সত্যিই খুশী হয়েছেন?

মল্লিক-কাকা বললেন—খুশী তো হবারই কথা। এত বড় কোম্পানীর উঠে যাবার মত অবস্থা হয়েছিল, এ-সময়ে এমন ভরসা পেলে কে না খুশী হয়?

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—আর পাত্রী? ঠাক্‌মা-মণির পাত্রী পছন্দ হয়েছে?

—পাত্রী তো অপছন্দ হবার নয়।

—পাত্রীর নাম কী?

—বিনীতা! নামেও যেমন বিনীতা, তেমনি কথা-বার্তাতেও বিনীতা। অত বড় পয়সাওয়ালা বাপের মেয়ে, কিন্তু তবু চালচলনে কোথাও এতটুকু অহঙ্কার নেই তার—

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—তা আমাদের বিশাখা সুন্দরী, না এই বিনীতা? কে বেশি সুন্দরী?

মল্লিক-কাকা বললেন—তা আমি বলতে পারবো না বাপু, আমি বুড়ো মানুষ, আমি কি অত বুঝতে পারি?

তারপর একটু থেমে বললেন—তা তোমার তা নিয়ে অত মাথা-ব্যথা কেন? যার সঙ্গেই সৌম্যবাবুর বিয়ে হোক, তাতে তোমার কী?

সন্দীপেরও তাই মনে হলো, সত্যিই তো, সৌম্যবাবুর বিয়ে যার সঙ্গেই হোক না কেন তাতে তার কী? কিন্তু কথাটা তা নয়। এত বছর ধরে এত টাকা খরচ করে যাদের রাসেল স্ট্রীটের বাড়িতে এনে রাখা হলো, এ-বিয়ে না হ'লে তারা কোথায় যাবে?

মল্লিক-কাকা আবার বললেন—কিন্তু ঠাক্‌মা-মণি ও'দের বলেই দিয়েছেন যে কাশীর গুরুদেব যদি পাত্রীর কুষ্ঠী বিচার করে এ বিয়েতে মত দেন তবেই এ বিয়ে হবে, নইলে নয়—

এ-সব বহুকাল আগেকার কথা। এখন ভাবলে হাসি পায়। সত্যিই ছোটবেলায় মানুষ কত ছেলেমানুষই থাকে। শরীরের সঙ্গে মনও তখন থাকে অপরিণত। সৌম্যবাবুর সঙ্গে বিশাখার বিয়ে হবে না শুনে সন্দীপ যেন আত্মীয়-বিয়োগের শোক পেয়েছিল। অথচ ভাবতে গেলে তেমন কিছুই নয়। বিশাখাও যেমন তার কেউ নয় তেমনি বিনীতাও কেউ নয় তার। কার সঙ্গে কার বিয়ে হলো বা হলো না—

এটা তার মত গরীব পরাশ্রজীবি ছেলের পক্ষে কোনও সমস্যাই নয় বলতে গেলে সমস্যাটা ছিল তার নিজের পায়ের ওপর নিজে দাঁড়ানো।

তা দু'দিন পরেই সেই চিঠি এল। ব্যাংকের চাকরির জন্যে সে যে দরখাস্ত করেছিল, তারই জবাব। তার দরখাস্ত শুধু যে গ্রাহ্য হয়েছে, তাই-ই নয়, একটা নির্দিষ্ট তারিখে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় তাকে পরীক্ষা দেবার জন্যে নির্দেশও এসেছে।

খবরটা শুনে মল্লিক-কাকা খুব খুশী হলেন। বললেন—খুব সুসংবাদ, পরীক্ষা দেবার আগে কালীবাড়িতে গিয়ে পুজো দিয়ে এসো

মনে আছে সে কী উত্তেজনা, সে কী ভয়! আগের রাত্রে ভালো করে ঘুমই হলো না। ঘুমের মধ্যেই বার-বার মা'র মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠলো। মা যেন স্বপ্নের মধ্যেই তাকে আশীর্বাদ করলে কিছু ভয় নেই রে তোর, ভগবানকে ডাক, সব বিপদ কেটে যাবে—

পরীক্ষা দিতে যাবার দিন মল্লিক-কাকার পায়ের ধুলো মাথায় নিলে সন্দীপ। মল্লিক-কাকা বললেন- তোমার কল্যাণ হোক বাবা, কল্যাণ হোক

রাত্রে ভালো করে ঘুমই হয়নি তো ভোরবেলা ঘুম ভেঙে ওঠবার প্রশ্নই ওঠে না। সত্যিই, সারা রাত ঘুমের মধ্যেই যেন সে অঙ্ক কষেছে। কত কঠিন-কঠিন অঙ্ক সব।

ঠনঠনে কালীবাড়ির সামনে গিয়ে সে মা'র দিকে মুখ করে চোখ বুজে প্রণাম করলে। তারপর পকেট থেকে চারটে দশ নয়া ফেলে দিলে পেতলের থালার ওপর প্রণামী হিসেবে!

শুধু যে সে একলাই প্রণামী ফেলেছে তা-ই নয়, আরো অনেকেই ফেলছে। আশ্চর্য, কত লোকের কত রকমের দুঃখ, কত রকমের কামনা, কত রকমের দাবী, তার ঠিক নেই। অন্যদের লাখ-লাখ কামনা-বাসনার সঙ্গে সন্দীপও তার নিজের কামনা-বাসনাটা জুড়ে দিয়ে নিশ্চিত হবার চেষ্টা করলে। তারপর একটা বাস দেখে তাতেই উঠে পড়লো, তারপর সোজা ধর্মতলা! ধর্মতলা থেকে আর একটা বাস ধরে একেবারে খিদিরপুর।

খিদিরপুরে পৌঁছতেই হঠাৎ আবার বিশাখার কথাটা মনে পড়ে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে বিশাখার সেদিনকার কথাটাও মনে পড়ে গেল। বিশাখা বলেছিল—আমার সঙ্গে সৌম্যবাবুর বিয়ে হচ্ছে বলে তোমার খুব হিংসে হচ্ছে বুঝি? না সন্দীপ নিজেকে সংযত করে নিলে। ও-সব চিন্তা এখন মাথায় আসতে নেই। ও-সব চিন্তা মানুষকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। ওসব সে ভাববে না। ধ্বংসের পথ তো চওড়াই, কিন্তু ধ্বংসের দরজা আরো চওড়া। কেউ যদি নিজেকে ধ্বংস করতে চায় তো তার জন্য তাকে ধ্বংস-পুরীর সদর-দরজা ঠেলতেও হবে না, দিন-রাত তো খোলাই পড়ে আছে! ধ্বংসপুরীর সদর-দরজায় কোনও দরোয়ানও থাকে না। যার ইচ্ছে সে নির্বিবাদে ঢুকতে পারে।
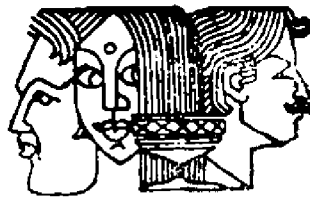
কিন্তু নিয়তি? নিয়তি কার কী কে বলতে পেরে? কলেজের বইতেই সে পড়েছিল। কথাটা বরাবর মনে আছে, বরাবর মনেও থাকবে।

Destiny is a tyrant's authority for crime and a fool's excuse for failure. রাজা যখন অত্যাচার করে তখন সে যুক্তি দেয় ক্ষমতার, আর নির্বোধ যখন পরাজিত হয় তখন সে অজুহাত দেয় নিয়তির।

বিকেল চারটের সময় পরীক্ষা যখন শেষ হলো তখন মাথাটা ঝিম্‌-ঝিম্‌ করছিল। কোথা দিয়ে যে সময়টা কেটে গেছে তা টের পাওয়া যায়নি। বাইরে খোলা আকাশের তলায় এসে একটু আরাম হলো যেন। কিন্তু সুশীলকে তো দেখতে পাওয়া গেল না, সেই সুশীল সরকারকে! সে-ই তো বলতে গেলে এই চাকরির কথাটা তাকে প্রথম বলেছিল। তবে কি তার দরখাস্ত নামঞ্জুর হয়েছে?

হাঁটতে হাঁটতে একটা পান-বিড়ির দোকানের সামনে আসতে দোকানদার ডাকলে—বাবুজী র‍্যাশন-কার্ড করাবেন?

রেশন কার্ড! কথাটা নতুন। দোকানদার রেশন-কার্ড দিতে চাইছে তাকে, এ-রকম ঘটনা তো আগে কখনও ঘটেনি।

সন্দীপ বললে—রেশন-কার্ড নিয়ে আমি কী করবো?

দোকানদার লোকটা লুঙ্গি পরে খালি গায়ে বসে ছিল। সে বললে—আপনি পাকিস্তান থেকে এসেছেন তো? এই রেশন-কার্ড সঙ্গে থাকলে আপনার কোনও অসুবিধে হবে না—

দোকানদারের যে এ-ধারণা কেন হলো তা কে জানে।

সন্দীপ বললে—আমার তো রেশন-কার্ড নেই—

লোকটার উৎসাহ এবার খুব বেড়ে গেল। একটু নড়ে-চড়ে বসে একটা সরকারী সার্টিফিকেট তার দিকে এগিয়ে দিলে।

বললে—এই দেখুন, এতে মিনিস্টারের সই আছে, এই দেখুন—

সন্দীপ সেটা পড়ে দেখতে লাগলো। কে এক মন্ত্রী এই বলে সার্টিফিকেট দিচ্ছে যে তিনি এই ব্যক্তিকে চেনেন, এবং এই লোকটি এই পশ্চিমবাংলাতেই জন্মেছেন। সুতরাং তিনি রেশন-কার্ড পাওয়ার অধিকারী।

সন্দীপ এর আকাশ-পাতাল নাড়ী নক্ষত্র কিছুই বুঝতে পারলে না।

হঠাৎ আর একজন এসে বললে—দেখি, একটা সার্টিফিকেট দেখি—

সঙ্গে সঙ্গে একটা সার্টিফিকেট এগিয়ে দিলে দোকানদার।

লোকটা সেটা নিয়ে পকেট থেকে কয়েকটা টাকা দোকানদারকে দিলে। আর তারপর কোনও কথা না বলে অন্যদিকে চলে গেল।

সন্দীপের দিকে চেয়ে দোকানদার বললে—দেখলেন তো, সবাই আমার কাছেই সার্টিফিকেট নেয়। অন্য অনেক সার্টিফিকেটের দোকান আছে এখানে, কিন্তু তাদের সব জাল সার্টিফিকেট। আমার কাছেই সব খাঁটি সার্টিফিকেট পাবেন—

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে- এ নিয়ে কী হবে?

দোকানদার বললে- এ নিয়ে আপনি রেশন-কার্ড করতে পারবেন—

সন্দীপ বললে -আমি তো একটা বাড়িতে থাকি, সেখানেই খাই, সেখানেই শুই—

দোকানদার বললে—তা হলে রেশন-কার্ডে সস্তায় রেশন নিয়ে বেশি দামে বাজারে বেচে দেবেন। তাতে অনেক লাভ থাকবে আপনার—

সন্দীপ মনে মনে কী যেন ভাবতে লাগলো। দোকানদারটা বললে—আরে মশাই, আপনি তো দেখছি বড্ড বোকা, এটা কাছে থাকলে আপনি যে ভোটও দিতে পারবেন, চাকরিও পাবেন। পাকিস্তান থেকে যত লোক আসছে সবাই-ই তো আমার কাছ থেকে এই সার্টিফিকেট কিনছেন। আপনি নিন্‌ না—

সন্দীপ ওপর দিকে চেয়ে দেখলে। দোকানের কোনও সাইনবোর্ড নেই। বাইরে

থেকে দেখলে মনে হবে পান-বিড়ি-সিগারেটের দোকান। আর কিছু রঙিন ঠান্ডা-জলের বোতল। অথচ ভেতরে এইসব মন্ত্রীর সই করা সার্টিফিকেট বিক্রি হচ্ছে।

—নিন্ না—

সন্দীপ আর দাঁড়ালো না সেখানে। আশ্চর্য, এত লোক পাকিস্তান থেকে এখানে এসে জুটছে। নিজের দেশ ছেড়ে তারা সবাই এখানে আসছে কেন? তাহলে ওখানে কি ওদের কষ্ট হচ্ছিল?

সন্দীপ আবার দোকানটার সামনে এসে দাঁড়ালো। দোকানদারটার মনে এবার আশা হলো। বললে কী হলো? সার্টিফিকেট কি নেবেন আপনি?

সন্দীপ বললে—আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞেস করি আপনাকে এই যে পাকিস্তান থেকে এত লোক এখানে আসছে, এ কীসের জন্যে? পাকিস্তানে কি চাকরি-বাকরি পাওয়া যায় না?

দোকানদারের অত বাজে-কথা বলবার মত সময়ও নেই, ইচ্ছেও নেই। বললে—তা আমি কী করে জানবো মশাই? গভর্মেণ্ট সব জানে, আপনি গভর্মেণ্টকে গিয়েই সব জিজ্ঞেস করুন না—

দোকানদারটার চেহারা আর ভাব-ভঙ্গী দেখেই বোঝা গেল সে রেগে গেছে।

সন্দীপ আবার বাস-রাস্তায় পা বাড়ালো। এখানে মানুষের ভিড় খুব, তার সঙ্গে আছে হকারদের ভিড়। সমস্ত ফুটপাতটা হকারদের দোকানে-দোকানে ভর্তি। সামনে দিয়ে গেলেই তারা ডাকে—আসুন দাদা, আসুন—

আগেও তো সন্দীপ এ-পাড়ায় এসেছে, কিন্তু এমন ভিড় তো ছিল না তখন! এত মানুষও ছিল না, এত দোকানও তো ছিল না।

—দাদা, ফাউনটেন-পেন নেবেন? আমেরিকান পেন? সস্তা দরে পেয়ে যাবেন, বাজারে কোথাও এত সস্তা দরে এ পেন পাবেন না!

এই ক'বছরের মধ্যেই কলকাতার চেহারাটা এত বদলে গেল? হঠাৎ এখানে এত বিলিতি পেন, বিলিতি ট্রানজিস্টার, বিলিতি রিস্ট-ওয়াচ্ কেন এল? কোথা থেকেই বা এল?
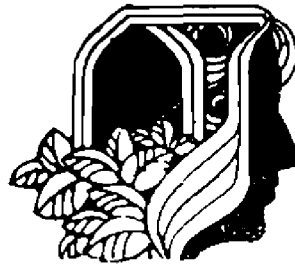
বাড়িতে যেতেই মল্লিক-কাকা বললেন—কী হলো? এত দেরি যে, আমি খুব ভাবছিলুম। কোথায় ছিলে এতক্ষণ? পরীক্ষা কেমন হলো?

কথার উত্তর দিতে গিয়ে সন্দীপের মুখটা কালো হয়ে গেল। মল্লিক-কাকারও সন্দীপের মুখখানা দেখে সন্দেহ হলো। বললেন ভালো হয়নি বুঝি?

সন্দীপ বললে—না—

মল্লিক-কাকা বললেন—তাতে মন খারাপ করছো কেন? জীবনে পাশ-ফেল তো আছেই, ও নিয়ে মুষড়ে পড়তে নেই। আরো চেষ্টা করে যাও—

সন্দীপ বললে—আমি মা'র কথাই ভাবছি—

মল্লিক-কাকা বললেন—মাকে লিখে দাও যে যেন দুশ্চিন্তা না করেন, আবার তুমি পরীক্ষা দেবে। মনের সাহস হারিও না, হতাশ হয়ো না। হতাশ হওয়াটাই পাপ—

বলে তিনি হাতের কাগজ-পত্র সামলাতে লাগলেন। তারপর বললেন—তা পরীক্ষা তো অনেকক্ষণ শেষ হয়ে গিয়েছিল, এতক্ষণ কোথায় ছিলে? এতক্ষণ কী করছিলে?

- ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম।

মল্লিক-কাকা চমকে উঠলেন—ঘুরে বেড়াচ্ছিলে মানে, কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলে?

সন্দীপ সবিস্তারে সব ঘটনা বললে। ফুটপাতে কত গাদা-গাদা দোকান করেছে হকাররা, জিনিস কেনবার জন্যে খুব ধরাধরি করছিল। সার্টিফিকেটও বিক্রি করছিল—

—সার্টিফিকেট? কীসের সার্টিফিকেট? ইউনিভার্সিটির?

--না, রেশন-কার্ডের—

—রেশন-কার্ডের সার্টিফিকেট? তুমি কেনোনি তো?

সন্দীপ বললে—না, আমি কিনবো কেন? আমি তো ইন্ডিয়ান। পাকিস্তান থেকে নাকি অনেক লোক ইন্ডিয়ায় আসছে। তারা ওই সার্টিফিকেট দেখিয়ে ইন্ডিয়ার সিটিজেন হয়ে যাবে আর ভোটার হবে। ভোটার হলে এখানে চাকরিও পেয়ে যাবে!

মল্লিক-কাকা কথাটা শুনে আশ্চর্য হয়ে গেলেন। বললেন—দেখেছ কান্ড! তোমাদের দিনকাল খুব খারাপ আসছে বাবা! তোমাদেরই বিপদ! আমাদের তো তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, আমরা তো কোনওরকমে জীবন শেষ করে এসেছি, কিন্তু তোমরা কী করবে তাই-ই ভাবছি—

তারপর একটু থেমে আবার বলতে লাগলেন—এই এ-বাড়ির ব্যাপারটাই দেখ না, কোথাও কিছু নেই, সব কিছু বেশ চলছিল, হঠাৎ কোথা থেকে লেবার-ট্রাবল্ শুরু হলো, বাবুদের ফ্যাক্টরিতে আর সব কিছু ধ্যান-ধারণা তছ্-নছ্ হয়ে গেল। ঠাক্মা-মণির কত সাধ ছিল নিজের পছন্দমতো পাত্রীর সঙ্গে নিজের নাতির বিয়ে দেবেন, তার জন্যে কত খরচ-পত্রও করলেন। এদিকে কোথা থেকে কোন্ এক অতুল চ্যাটার্জির মেয়ের সঙ্গে নাতির বিয়ের সম্বন্ধ করতে হচ্ছে। এও কপাল...

সন্দীপ বললে নতুন পাত্রীর সঙ্গে বিয়ের সম্পর্ক কি পাকা হয়ে গেছে?

মল্লিক-কাকা বললেন—তার আগে তো কাশীর গুরুদেবের মতামত আনতে হবে—

আপনি কাশীতে কবে যাবেন?

মল্লিক-কাকা বললেন আরে আমি যাবো বললেই কি হুট্ করে যেতে পারি? এখানে আমার কত কাজ বাকি পড়ে আছে, তা জানো? সে-কাজগুলো কে করবে? আসছে মাসের পয়লা তারিখে সকলের মাইনের দিন, আমি চলে গেলে কে তাদের টাকা দেবে? লোক তো আর একটা নয়। এত লোকের মাইনে ছাড়া করপোরেশনের ট্যাক্সো জমা দিতে হবে, ইলেকট্রিকের বিলের টাকা শোধ করা আছে, আরো যত কাজ সব শেষ করে তবে তো কাশী যেতে পারবো! এ-সব কাজ তো আর আমি ছাড়া অন্য কাউকে দিয়ে হবে না—

সেদিন রাত্রে অনেকক্ষণ চুপ করে শুয়ে-শুয়েও সন্দীপের চোখে ঘুম এল না। কলকাতার লোক বাড়ছে, রাস্তায় ফুটপাতে ভিখিরীদের ভিড়। তার ওপর পাকিস্তান থেকে হাজার-হাজার লোক এসে এখানকার জমিই শুধু নয়, এখানকার চাকরিও দখল করে নিচ্ছে। এখানকার কল-কারখানাতেও ধর্মঘট হয়ে লক্ষ-লক্ষ লোক বেকার হয়ে যাচ্ছে, অথচ তারই পাশাপাশি অন্য আর একদল মানুষ আবার অতুল চ্যাটার্জিদের মত ফলে-ফেঁপে রাজা-বাদশা হয়ে বিলিতি শৌখীন জিনিস কিনে লোক-দেখানো বাবুয়ানি করে বাজার গরম করে চলেছে! কোথায় এর পরিণতি? কী এর শেষ? এর মধ্যে সন্দীপ কী করে টিকে থাকবে? তাহলে সেও কি শেষ পর্যন্ত জোড়াসাঁকোর

বাজারের মোড়ের ফুটপাথে "শ্রীশ্রীজগন্মাতার স্বপ্নাদেশে বিশ্বশান্তি স্থাপনের নিমিত্ত..." লেখা সাইন্‌বোর্ড নিয়ে আর সকলের মত লোক ঠকাবে?

মাসিমা সেদিনও জিজ্ঞেস করলেন—কই বাবা, ওদিক থেকে তো আর কোনও খবরাখবর দিচ্ছ না? ওঁরা সবাই ভালো আছেন তো?

সন্দীপ আর কী-ই বা বলবে। প্রশ্নের উত্তরে বললে—হ্যাঁ, সবাই ভালো—

—তোমার ঠাক্‌মা-মণি? তিনি কেমন আছেন?

—ভালো।

—বিলেত থেকে আমার জামাই-এর চিঠি পেয়েছে তো তোমার ঠাক্‌মা-মণি?

মিথ্যে কথা বলা ছাড়া আর কী-ই উপায় ছিল সন্দীপের। বললে—হ্যাঁ, সৌম্য-বাবুর চিঠি পেয়েছেন ঠাক্‌মা-মণি—

তারপর নিয়ম অনুযায়ী সন্দীপ বিশাখার লেখা-পড়ারও খবর নিলে। বিশাখার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে রিপোর্টও নিলে। সব কাজ ঠিক নিয়মমতো চলছে। যেমন আগে চলছিল। সব খবরাখবর নেওয়া শেষ হওয়ার পর সন্দীপ চলে যাবার উদ্যোগ করছিল। মাসিমা পেছন থেকে জিজ্ঞেস করলে—আর একটা কথা বাবা, তুমি পরীক্ষা কেমন দিলে, তা-তো বললে না?

সন্দীপ বললে—ভালো হয় নি মাসিমা। বোধহয় পাশ করতে পারবো না—

মাসিমার মুখটা যেন শুকিয়ে গেল। বললে—তাতে কী হয়েছে বাবা, পাশ-ফেল নিয়েই তো জীবন। ও নিয়ে তুমি মন খারাপ করো না—মনে মনে ভগবানকে ডাকো—

সন্দীপ ভগবানকে ডাকবে? কী বলছে মাসিমা? সন্দীপের একবার বলতে ইচ্ছে হলো—আপনি তো আমাকে ভগবানকে ডাকতে বলছেন, কিন্তু ভগবানকে ডেকে আপনিই কি কিছু ফল পেয়েছেন মাসিমা? ভগবানকে ডেকে ডেকে আপনার কী লাভটা হয়েছে বলতে পারেন? আপনার বিশাখার সঙ্গে কি সৌম্যবাবুর বিয়ে হলো?

কিন্তু কথাগুলো বলতে ইচ্ছে হলেও তার মুখ দিয়ে কথাগুলো বেরোল না। মুখ দিয়ে বেরোল না বটে কিন্তু সেগুলো তখন চোখের জল হয়ে গাল বেয়ে টপ্‌-টপ্‌ করে ঝরে পড়তে লাগলো।

মাসিমা দেখতে পেয়েছে। সন্দীপের কাছে সরে এসে আঁচল দিয়ে তার চোখের জল মুছিয়ে দিতে দিতে বলতে লাগলো—ছি বাবা, কাঁদে না। একবার পরীক্ষা ভালো হয় নি বলে কাঁদতে আছে? ও নিয়ে মন-খারাপ করো না। মনে মনে ভগবানকে ডাকো—

সন্দীপ আর সেখানে দাঁড়াতে পারলে না। মাসিমার হাত থেকে কোনও রকমে নিজেকে মুক্ত করে বাড়ির বাইরের রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ালো। আর কোনও দিকে তখন তার নজর নেই, আর কোনও দিকে তখন তার মনোযোগ নেই। কেবল একটা চিন্তাই

তাকে পেছন থেকে তাড়া করতে লাগলো, কেবল একটা সমস্যাই তার মাথায় বোঝা হয়ে তাকে গ্রাস করতে লাগলো। সে-চিন্তা, সে-সমস্যার কথা সে কাকে বলবে? কাকে তার চিন্তা আর সমস্যার কথা বলে তার মনের বোঝা সে হাল্‌কা করবে?

বাড়িতে আসতেই সন্দীপ দেখলে মল্লিক-কাকা নিজের কাজ নিয়ে মহাব্যস্ত। তাঁর কথা বলবারও সময় নেই তখন। সন্দীপকে দেখেই বললেন—এই নাও তোমার মা'র চিঠি—

মা'র চিঠির কথা শুনেই সন্দীপ যেন নতুন করে আবার প্রাণ ফিরে পেলে। চিঠিতে মা লিখেছে—তোমার চিঠি পাইয়া খুব খুশী হইয়াছি। অনেক দিন তোমাকে দেখি নাই। তোমাকে খুব দেখিতে ইচ্ছা করে। জানি না আর কতদিন বাঁচিয়া থাকিব। তোমাকে জীবনে মানুষ হইতে দেখিয়া মরিতে পারিলে সুখী হইতাম। বোধকরি আমার কপালে সে সুখ নাই। তুমি কেমন আছো জানাইবে এবং পরীক্ষা কেমন দিলে তাহাও জানাইবে। ইতি তোমার হতভাগিনী--মা।

চিঠিখানা নিয়ে সন্দীপ অনেকক্ষণ চুপ করে ভাবতে লাগলো।

মল্লিক-কাকা তার চেহারা দেখে জিজ্ঞেস করলেন—কী হলো? মা কী লিখেছেন?

সন্দীপ বললে—মা আমাকে দেখতে চায়—

মল্লিক-কাকা বললেন—তা-তো বটেই, তোমাকে দেখতে চাওয়াটাই তো স্বাভাবিক।

সন্দীপ বললে—কিন্তু এ বাড়ির এই অবস্থা, ফ্যাক্টরিতে এখন স্ট্রাইক চলছে, তার ওপর আপনি কাশী যাচ্ছেন, আমি চলে গেলে এখানকার কাজ কী করে চলবে?

মল্লিক-কাকা বললেন—মাস না পেরোলে তো আমি কাশী যাচ্ছি না। মাঝখানে তুমি না-হয় একদিনের জন্যে বেড়াপোতা ঘুরে এসো। তোমারও তো মা'র জন্যে মন-কেমন করছে। যাও, তুমি না ফিরলে আমি কোথাও যাচ্ছি না—

—কিন্তু ঠাক্‌মা-মণি কি এই সময়ে ছুটি দেবেন আমাকে?

মল্লিক-কাকা বললেন- তার জন্যে তোমাকে কোনও ভাবনা করতে হবে না, তুমি যাও—একবার মা'র সঙ্গে দেখা করেই আবার সেই দিনই চলে এসো--

তা সেই রকম ব্যবস্থাই হলো। কতদিন পরে আবার সেই বেড়াপোতায় যাওয়া। বেড়াপোতার সঙ্গে কত দিনের সম্পর্ক তার। তার নিঃশ্বাসের সঙ্গে যেন এখনও বেড়াপোতার ধুলোর গন্ধ মিশে আছে। চোখ বুজলেই যেন সে বেড়াপোতার গাছ-গুলোকে পর্যন্ত চোখের সামনে দেখতে পায়। বিশেষ করে হাটতলায় সেই বুড়ো বট গাছটাকে। সেখানে. ওই বটগাছের ঝুরি ধরে কতদিন সে আর গোপাল দু'জনে মিলে দোল খেয়েছে।

সন্দীপ মা'কে কোনও খবর দেয়নি আগে থেকে। মাও হয়ত চমকে যাবে তাকে দেখে। আর তারপর? সন্দীপ কল্পনা করে নিতে পারে, তারপর মা কী করবে। যখন মা'র খুব আনন্দ হয় তখন মা কেঁদে ফেলে। সন্দীপকে দেখে মা হয়ত আনন্দের চোটে কেঁদেই ফেলবে। কান্নায় মা'র চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল গড়িয়ে পড়বে।

যখন বেড়াপোতায় সন্দীপ পৌঁছুলো তখন রাত হয়ে গেছে। কে জানে মা এখন কোথায় আছে। কতদিন পরে সন্দীপ দেশে আসছে। স্টেশন থেকে দূরে হাটতলার

বটগাছের চূড়োটা দেখা যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল এই ক'টা বছরের মধ্যে যেন বটগাছটা আরো অনেক উঁচু হয়ে গেছে। ট্রেন থেকে নেমে ফাঁকা রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সন্দীপের মনে হলো সে যেন তার মা'র কোলে ফিরে এসেছে। ফুর-ফুর হাওয়া দিচ্ছে।

পাশ দিয়ে একটা গরুর গাড়ি যাচ্ছিল। গাড়ির ভেতর থেকে কে যেন জিজ্ঞেস করলে—কে ? কে যায় ?

সন্দীপ বললে—আমি—

—আমি কে ? নাম নেই ?

সন্দীপ বললে—আমার নাম সন্দীপ কুমার লাহিড়ী—

গাড়িটা ততক্ষণে দাঁড়িয়ে গিয়েছে।

ভেতরের যাত্রী জিজ্ঞেস করলে- বাপের নাম কী ?

সন্দীপ বললে—বাবার নাম ঈশ্বর হরিপদ লাহিড়ী—

,ও, তুমি হরিপদ লাহিড়ীর ছেলে ? এখন কোথায় আছো ? কী করছো ?

সন্দীপ তার নিজের সমস্ত খবর দিলে। ভদ্রলোকটি বললে—বেশ বেশ, কল-কাতায় আছো, তা শুনেছি বেড়াপোতার গোপাল হাজরাও ওখানে আছে। তার সংগে দেখা-টেখা হয় ?

সন্দীপ বললে—আজ্ঞে হয়—

—খুব ভালো, খুব ভালো। চেষ্টা করো যাতে তুমি ওই গোপাল হাজরার মত বড় হতে পারো, বেড়াপোতার মুখ উজ্জ্বল করতে পারো—খুব ভালো, খুব ভালো—

কে এত কথা এতক্ষণ বলে গেল তা জানা গেল না। এর পর ভদ্রলোকটির গরুর গাড়ি আবার সামনের দিকে চলতে লাগলো। আগে এই রাস্তা মাটির তৈরি ছিল, এখন পিচ দিয়ে বাঁধানো হয়েছে। আর আগের মত এখন ধুলো ওড়ে না। কত উন্নতি হয়েছে বেড়াপোতার। আগে চারদিকে ফাঁকা মাঠ ছিল। এখন এখানে ওখানে পাকা বাড়ি হয়েছে, রাস্তায় কলকাতা শহরের মত ইলেকট্রিক আলো জ্বলছে।

দেখতে দেখতে হাটতলা এসে গেল। সেই পুরোন হাটতলা। এখন আর যেন সে হাটতলা চেনা যায় না। কিছু কিছু পাকা দোকান ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এদিকে ওদিকে। হাটতলা বলতে গেলে তখন প্রায় ফাঁকা। তারই পাশ দিয়ে চলতে চলতে হঠাৎ সন্দীপ দেখলে সেখানে একটা বিরাট বাড়ি। বাড়িটা তিনতলা!

ও-বাড়িটা আবার কখন হলো ? একবার কৌতূহল হলো দেখতে। আগে তো এ-বাড়িটা ছিল না এখানে।

সন্দীপ চলেই আসছিল, হঠাৎ কে যেন তাকে আবার ডাকলে কে ? কে যায় ?

বেড়াপোতার নিয়মই এই যে নতুন মুখ কাউকে দেখলেই প্রশ্ন হবে—কে ? কে যায় ? কোথায় যাওয়া হবে ? ইত্যাদি ইত্যাদি-

সন্দীপ পেছন ফিরে কাউকেই দেখতে পেলে না। সেদিকে না চেয়ে আবার নিজের বাড়ির দিকে চলতে যাচ্ছিল। হঠাৎ আবার ডাক কে ? কে যায় ?

সন্দীপ দাঁড়ালো। দেখলে হাটেরই ঝাঁপ-বন্ধ একটা দোকানের সামনেকার মাচায় কে একজন শুয়ে আছে। সে-ই ডাকছে তাকে।

সন্দীপ যথারীতি জবাব দিলে আমি

আমি ? আমি কে ? নাম কী ?

সন্দীপ বললে—আমি, সন্দীপ কুমার লাহিড়ী—

সন্দীপের নাম শুনেই লোকটা উঠে বসলো। বললে—আরে সন্দীপ, তুই ?

সন্দীপ আস্তে আস্তে লোকটার দিকে এগিয়ে গেল।

এতক্ষণে স্পষ্ট নজরে পড়লো লোকটা। লোক নয়, তারই বয়সী একটা ছেলে।

ছেলেটা সন্দীপকে দেখে বলে উঠলো—আমাকে চিনতে পারছিস নে? আমি রে। তারক ঘোষ—

সন্দীপও চমকে উঠেছে তারকের নাম শুনে। বললে—এ তোর কী চেহারা হয়েছে রে? অসুখ হয়েছে নাকি তোর?

সত্যিই সেই মোটা-সোটা তারকের এই শরীর হয়েছে! আবার জিজ্ঞেস করলে—এখানে শুয়ে আছিস কেন, তুই?

তারক বললে—কোথায় যাবো? আমার তো বাড়ি-ঘর-দোর কিছু নেই।

—তার মানে? তোদের বাড়ির কী হলো?

তারক বললে—তুই জানিস নে কিছু? আমাদের বাড়ি তো আগুনে পুড়ে গেছে—

—বাড়ি আগুনে পুড়ে গেছে? আর তোর বাবা মা ভাই বোন...তারা?

—তারাও সেই সঙ্গে পুড়ে মারা গেছে।

সন্দীপ বললে—তা বাড়ি পুড়ে গেল কেন? কী হয়েছিল?

তারক কাঁদতে লাগলো। বললে—সে অনেক কথা ভাই, অনেক কথা...

বলে সে হাঁফাতে লাগলো। সন্দীপ বললে—থাক, তোর কষ্ট হচ্ছে, এখন বলতে হবে না—

তারক কি তবু ছাড়ে? বললে—তুই কলকাতায় গেছিস, বেঁচে গেছিস্ ভাই। আমাদের বড় কষ্ট ভাই এখানে। আমাকে তুই কলকাতায় নিয়ে যাবি ভাই? এখানে থাকলে আমি মারা যাবো—

সন্দীপ কী করবে, কী বলবে, বুঝতে পারলে না। সে নিজেই তো পরের বাড়ির অন্নদাস। সে কী করে তারককে কলকাতায় নিয়ে যাবে!

সে আবার জিজ্ঞেস করলে—তা কবে তোদের বাড়িটা পুড়ে গেল?

তারক বললে—সেই যে সেবার গাঁয়ে ভোট হয়েছিল, সেই ভোটের আগেই একদিন রাত্তিরে বাড়িটাতে কারা আগুন লাগিয়ে দিলে. আমরা কিচ্ছু টের পাই নি ভাই। ওই যে দেখছিস মস্ত তিনতলা বাড়ি—

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—হ্যাঁ. ও-বাড়িটা কার? ও-বাড়িটা তো আগে ওখানে ছিল না। ওখানেই তো তোদের বাড়ি ছিল--

তারক বললে—আমাদের সেই জমির ওপরেই এখন ওই বাড়িটা উঠেছে—

তারপরে তারকের মুখে যে-ঘটনা শুনলো তা বড় মর্মান্তিক। হঠাৎ বলা-নেই কওয়া-নেই রাত দুটো কি তিনটের সময় তাদের ঘুম ভেঙে যেতেই আঁতকে উঠেছে সবাই। কিন্তু সব কিছু বোঝবার আগেই হঠাৎ ওপরের চালটা সকলের মাথার ওপর মড়-মড় করে ভেঙে পড়লো। তখন কোথা থেকে যে কখন কী হচ্ছে তারও হদিস পাওয়ার অবসর পায়নি কেউ। তারক ঘরের সামনে দরজার বাইরের দাওয়ায় শুয়ে ছিল বলে কোনও রকমে হামাগুড়ি দিয়ে কখন বাইরে বেরিয়ে পড়েছিল তার ঠিক নেই। আর তারপরেই একেবারে অচৈতন্য। তখন আর কিছুই তার মনে নেই। অনেক দিন পরে যখন তার একটু জ্ঞান হলো তখন জানতে পারলে যে সে আসানসোলের এক হাসপাতালে শুয়ে আছে। আর তার বাপ-মা ভাই-বোন? তারা নাকি সবাই সেই আগুনেই পুড়ে মারা গেছে।

—তারপর?

—তারপর আর কী? তারপর থেকেই এইখানে পড়ে থাকি

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—দিন চলে কী করে?

তারক বললে—দিন কি চলে? দিন চলে না—

—তবু একেবারে না খেয়ে তো চলে না। কিছু তো খেতেই হয় তোকে নিশ্চয়ই...

তারক হাসলো। বললে—খিদে পেলে হাসপাতালে গিয়ে রক্ত বেচে আসি। একবার রক্ত দিয়ে পঁয়তাল্লিশ টাকা পাই, তার সঙ্গে এক কাপ কফি, এক জোড়া কলা। আর একটা সেদ্ধ ডিম—

—কিন্তু...

তারক আবার হাসলো, বললে—আর 'কিন্তু' নেই...ওই যে তিনতলা বাড়িটা দেখছিস? ওই বাড়িটা ছিল বলে তবু এখনও বেঁচে আছি—

—তার মানে? ও-বাড়িটা কার?

তারক বললে- তোর হয়ত মনে নেই ওই বাড়িটা যার সে এককালে আমাদের সঙ্গে এক ক্লাসে পড়তো, কিন্তু কোনওবারই পাশ করতে পারেনি। সে ওখানে অর্ডার দিয়ে গেছে যে আমি যদি কখনও ওদের ওখানে ভিক্ষে করতে যাই তো আমাকে যেন ওরা ফিরিয়ে না দেয়, যেন কুকুর না লেলিয়ে দেয়—

সন্দীপ বললে—লোকটাকে তো খুব ভালো বলতে হবে। লোকটা কে?

তারক বললে—সেই ছেলেটা ভাই, সেই যে-ছেলেটা আমাদের সঙ্গে একই ইস্কুলে পড়তো। সে এখন কলকাতায় গিয়ে ভীষণ বড়লোক হয়েছে। প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ লাখ টাকার মালিক। নিজের গাড়ি চালিয়ে সে এখানে প্রায়ই আসে ভাই, আমাকে দেখতে পেলে মাঝে-মাঝে দু'পাঁচ টাকা ভিক্ষে দেয়—

—তোকে ভিক্ষে দেয় কেন?

তারক বললে—দেবে না? আমাদের জমিটাই তো জবর-দখল করে সে ওখানে ওই নিজের বাড়িটা তুলেছে- হাজার হোক চক্ষু-লজ্জা তো একটু আছেই—

সন্দীপের তখন দেরি হয়ে যাচ্ছিল। বললে—চক্ষুলজ্জা এ-যুগে আর ক'টা লোকেরই বা আছে, তা তোদের জমিটা নিলে, সেই জমিটার ওপর বাড়ি তুললে, তার বদলে তোকে কিছু টাকা-কড়ি দেয়নি?

তারক বললে- টাকা-কড়ি দেবে কেন? ও তো ওদের পার্টির জবর-দখল করা জমি। জবর-দখল জমির দাম কেউ দেয়?

সন্দীপ বললে—এ তো বেশ মামার বাড়ির আবদার! কে? লোকটা কে বল তো? কে?

তারক বললে—তাকে বোধহয় তুই ভুলে গেছিস! তার নাম গোপাল হাজরা—

গোপাল হাজরা!!!
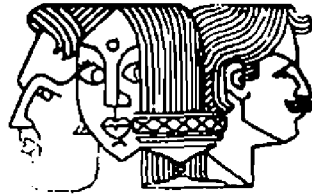
কলকাতায় এসেও সেই সেদিনকার বেড়াপোতার কথা সন্দীপ ভুলতে পারেনি! সত্যি, সমস্ত দেশটা সেই গোপাল হাজরাতেই একদিন ভরে গেল রাতারাতি। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকেই তাদের দোর্দণ্ড রাজত্ব শুরু হয়ে গেল। স্বামী বিবেকানন্দের নামে রাস্তার নাম দেওয়া হলো, বিদ্যাসাগর, মহাত্মা গান্ধীর নামেও রাস্তা নামাঙ্কিত হলো। কিন্তু ওই নামের আড়ালে আরো কত সম্ভাবনা যে অঙ্কুরেই নষ্ট হয়ে গেল, তার হিসেব তো কারো কোনও খাতাতেই রইল না।

মা খুব অবাক হয়ে গিয়েছিল প্রথমে। বলেছিল—ওমা তুই?

বলতে বলতে মা'র যা স্বভাব তাই-ই করে বসলো। আনন্দে মা'র দু'চোখ দিয়ে একেবারে ঝর-ঝর করে জল পড়তে লাগলো।

সন্দীপ মাকে দুই হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলে। বললে—মা, তুমি কাঁদছো কেন? এতদিন পরে আমি তোমার কাছে এলুম আর তুমি কাঁদছো? একটু হাসো মা, তুমি একটু হাসো—

কথাগুলো শুনে মা'র কান্না আরো বেড়ে গেল। বললে—আমার হাসতে তো বড় সাধ হয় বাবা। কিন্তু ভগবান কি আমায় হাসতে দিচ্ছে? আমার যে হাসতেও ভয় করে রে। হাসলেই কেবল মনে হয় এই বুঝি আমার কপাল ভাঙলো—। আমার কপালে আর হাসি নেই—

তারপর এক মুহূর্তেই মা নিজেকে সামলে নিলে। তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়ে চোখ দু'টো মুছে মুখে হাসি বার করলে। বললে—যাক্ গে, তুই কী খাবি বল? কখন কলকাতা থেকে বেরিয়েছিস তাই বল্! সারাদিন তো কিছুই খাসনি তুই?

সন্দীপ বললে—না মা, আমি সকাল বেলা ভাত খেয়েই এসেছি।

—তাহলে বেড়াপোতাতে তো অনেকক্ষণ পৌঁছেছিস। এতক্ষণ কোথায় ছিলি?

সন্দীপ বললে—তারকের কাছে তার গল্প শুনছিলুম—

—তারক? কোন্ তারক? ওই ঘোষেদের বাড়ির ছেলে?

সন্দীপ বললে—হ্যাঁ, ওর খুব কষ্ট মা। ওর কষ্টের কথা শুনতে শুনতেই দেরি হয়ে গেল। ও এককালে আমার সঙ্গে এক ক্লাশে পড়তো।

মা বললে—তুই এতদিন পরে এলি আর হাটতলায় বসে বসে তারকের সঙ্গে গল্প করছিলি? ও-সব ছেলেদের সঙ্গে গল্প করে কী লাভ? ওদের না আছে চাল আর না আছে চুলো। ও-সব বখাটে ছেলের সঙ্গে তোর এত কী গল্প?

সন্দীপ বললে—ওদের বড় বিপদ গেছে মা, খুব বিপদ। ওদের বাড়ি আগুনে পুড়ে গিয়ে ওর বাবা-মা-ভাই-বোন সব মারা গেছে—। তুমি শোনও নি?

সে-সব কথায় কান না দিয়ে মা মাটির কলসী থেকে এক বাটি মুড়ি বার করে দিলে। বললে—এই মুড়ি ক'টা এখন খা, একটু গুড় দিচ্ছি—পরে তোর জন্যে আমি ভাত নিয়ে আসবো—

পরে মা একটা পাথর বাটিতে গুড়ও দিয়ে গেল।

সন্দীপ বললে—তুমি অত ব্যস্ত হচ্ছো কেন মা? আমি এলুম তোমার সঙ্গে কথা বলতে আর তুমি কিনা কেবল আমার খাওয়ার কথা বলছো? আমি কি এখানে খেতে এসেছি?

এত কথা বলার পরও কিন্তু মা রাজি হলো না। বললে—আমাকে তো চৌধুরীজ-বাবুদের বাড়ি রান্না করতে যেতেই হবে। সেই সঙ্গে তোর আর আমার ভাতও নিয়ে আসবো—। আজকে আমার বেশি দেরি হবে না, আমি যাবো আর আসবো—

কিছুতেই মা ছেলের কথা শুনলে না, বাবুদের বাড়ি চলে গেল। সন্দীপ এক মনে মুড়ি খেতে লাগলো। মা চলে যাওয়ার পরই সন্দীপ ভেতর থেকে দরজার খিল তুলে দিয়েছিল। কিন্তু মুড়ি খেতে গিয়েও খেতে পারলো না। মা'র কথা ভেবেই তার কষ্ট হলো। মা এত কষ্ট করে তাকে বড় করে তুলেছে, কিন্তু মা'র জন্যে সে এত বছর বয়েস পর্যন্ত কিছুই করতে পারলে না, মা'র ঋণ সে শোধ করতে পারলে না। বাবার এই বাড়িটা ছিল—

একটু পরেই আবার কে যেন দরজায় ধাক্কা দিতে লাগলো। বাইরে থেকে মা'র গলার শব্দ এলো—ওরে খোকা, দরজা খোল্ রে—

দরজা খুলতেই মা বললে--ওরে, কাশীবাবু তোকে একবার ডাকছেন, তোর সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন--

—কেন?

—তুই অনেক দিন পরে দেশে এসেছিস শুনে তোকে একবার দেখতে চাইলেন, চল্।

মনে আছে অনেক দিন পরে কাশীবাবুর সঙ্গে দেখা করে সন্দীপ অনেক আনন্দ পেয়েছিল, অনেক কিছু শিখতে পেরেছিল। চ্যাটার্জিবাবুদের অত কালের বাড়ি। তখন তাতে একটু একটু করে ধ্বংসের ছাপ পড়ছিল। অনেক জায়গায় দেওয়াল থেকে বালি খসে খসে পড়ছিল। ক'বছরের মধ্যেই কাশীবাবুর যেন বয়েসও অনেক বেড়ে গিয়েছিল। তিনি সন্দীপের সব রকম খবরই নিয়েছিলেন। কলকাতায় সন্দীপের কী কাজ, মুখার্জিবাবুদের লোকজনরা কেমন, সারাদিন সন্দীপ কী করে--সব খবরই সন্দীপের কাছ থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নিয়েছিলেন তিনি। শেষকালে বলেছিলেন দেখ বাবা, তোমাদের কথা ভেবে আমার খুবই কষ্ট হয়। আমরা কোনও রকমে আমাদের জীবনটা কাটিয়ে দিয়ে গেলুম, কিন্তু তোমাদের সামনে অনেক বিপদ! যে দিনকাল চলছে তাতে তোমরা যে কী করবে, তাই-ই আমি ভাবছি—

সন্দীপ বলেছিল—আমি আপনার দেখাদেখি ল' পাশ করেছি—

—কেন, তুমি কি কোর্টে প্র্যাকটিশ করবে?

সন্দীপ বলেছিল হ্যাঁ, আপনিও তো প্র্যাকটিশ করেন। আপনিই তো আমাকে ল' পড়ে প্র্যাকটিশ করতে বলেছিলেন -তাই...

কাশীবাবু বলেছিলেন—না, আমি ভুল করেছিলুম। আমি আজ স্বীকার করছি আমি তোমাকে ল' পড়তে বলে ভুল করেছিলুম। আজকাল যা দেখছি তাতে আমার ধারণা হয়েছে আইন দিয়ে তুমি কারও কোনও উপকার করতে পারবে না—

কাশীবাবুর কথা শুনে সন্দীপ অবাক হয়েছিল। জিজ্ঞেস করেছিল—কেন?

কাশীবাবু বলেছিলেন—তুমি এখন এ-সব কথা বুঝবে না। আমি একদিন তোমাকে 'চরিত্র' কথাটার মানে বুঝিয়ে দিয়েছিলুম, তা তোমার মনে আছে?

-হ্যাঁ।

-আজ তোমাকে বলছি এখন হাইকোর্টও তার 'চরিত্র' হারিয়ে ফেলেছে-

সন্দীপ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলে—কেন?

কাশীবাবু বলতে লাগলেন—সে কথা বলতে গেলে অনেক কথা বলতে হয়, তুমি হয়ত আমার কথাগুলো এ-বয়েসে ঠিকমত বুঝতে পারবে না। কিন্তু যে কথাগুলো বলছি তা সবই সত্যি।

আজ থেকে কত বছর আগেকার সেই কথাগুলো যেন এখনও কানে বাজছে।

কাশীবাবু বলেছিলেন—দেখ, অন্য সকলের মত আমিও স্বদেশী করেছি, দেশ থেকে ইংরেজদের তাড়াবার জন্য আমিও গান্ধীজীর কথায় খদ্দরের জামা-কাপড় পরেছি। কিন্তু এখন দেখছি আমরা ভুল করেছি। দেখছি ইংরেজরা চলে যাওয়ার পর থেকে আমাদের দেশের কেবল সর্বনাশই হয়েছে! কাজ কিছু হয়নি!

সন্দীপ কাশীবাবুর কথাগুলো শুনছিল আর অবাক হয়ে যাচ্ছিল। কাশীবাবু এ-সব কী বলছেন!

কাশীবাবু বলতে লাগলেন—উকিল হয়ো না তুমি। ইচ্ছে থাকলেও তুমি উকিল হয়ে মানুষের কোনও উপকার করতে পারবে না। আমাদের দেশের যে ক'জন গ্রেট ম্যান ছিলেন তাঁদের সবাইকে জন্ম দিয়ে গেছে ইংরেজরা, আর এখন? এখন আমরা জন্ম দিচ্ছি শুধু জানোয়ারদের।

তারপর একটু থেমে আবার বললেন—তুমি তো কলকাতায় থাকো। তুমি দেখেছ নিশ্চয়ই কত ফুচ্‌কার দোকান? দেখেছ তো?

সন্দীপ বললে—হ্যাঁ, দেখেছি···

—কত ফুচ্‌কাওয়ালা আছে বলো তো কলকাতায়? ক'হাজার?

—তা জানি না। গুনে দেখিনি—

কাশীবাবু বললেন- অন্তত কুড়ি হাজার তো হবেই। তাদের মালিক ক'জন জানো?

না।

কাশীবাবু বললেন—জানো না তো শুনে রাখো—চারজন। মাত্র চারজন মালিক ওই কুড়ি হাজার ফুচকাওয়ালাকে কন্ট্রোল করছে। ভাবতে পারো?

সন্দীপ সে কথার কোনও উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইল।

—আর কত পান-সিগারেটের দোকান আছে বলো তো? সব মিলিয়ে হাজার পঞ্চাশের বেশি হবে নিশ্চয়ই। তা তাদের কন্ট্রোল করছে ক'জন জানো? মাত্র বারো জন। বলো তো তারা কারা?

সন্দীপ তাও জানতো না।

কাশীবাবু বলেছিলেন- একটা কথা শুনে রাখো, তারা কেউই বাঙালী নয়। সেই তারাই আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য চালাচ্ছে, আর আমরা তাদের কথাতেই উঠছি বসছি। এটা কার দোষ?

তবু সন্দীপ কোনও জবাব দিতে পারেনি।

কাশীবাবু আবার বলেছিলেন—তুমি কখনও শেয়ালদা স্টেশনের দিকে গেছ?

সন্দীপ বলেছিল—মাঝে মাঝে গিয়েছি--

কাশীবাবু বলেছিলেন ওকে ঠিক যাওয়া বলে না। গিয়ে ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখতে পাবে সেখানে স্কুল ফাইন্যাল, বি এ, এম-এর সার্টিফিকেট বিক্রি হচ্ছে। যে-কোনও লোক সেগুলো পয়সা দিয়ে কিনতে পারে। সেই সব ভেজাল সার্টিফিকেট দেখিয়েই আজকাল ছেলেরা চাকরি পাচ্ছে, তারাই ডাক্তার হচ্ছে, তারাই ইঞ্জিনীয়ার হচ্ছে, তারাই উকিল হচ্ছে। তাই আমাদের দেশের 'চরিত্র' এত খারাপ হয়ে যাচ্ছে··

সন্দীপ এত বছর কলকাতায় থেকেও এ-সব জিনিস দেখেনি, দেখলেও এত কথা ভাবেনি।

কাশীবাবু আবার বলেছিলেন- এই জন্যেই তোমাকে বলেছিলুম যে আমাদের দেশে ইংরেজরাই তবু কয়েকটা যা গ্রেট-ম্যানের জন্ম দিয়ে গিয়েছিল। তাঁরা চলে যাবার পর এখানে একটাও গ্রেট-ম্যানের জন্ম হচ্ছে না, কেবল জানোয়ারের জন্ম হচ্ছে··

এর পর অনেকক্ষণ কাশীবাবু আর কোনও কথা বলেন নি। তাঁর বুকের ভেতরে যে-কষ্টগুলো এতদিন যন্ত্রণা হয়ে নীরবে মাথা কুটে মরছিল, বাইরে বেরোতে না পেরে বোবা হয়ে গুমরোচ্ছিল, সন্দীপকে পেয়ে যেন তারা লাভাস্রোতের মত নির্গত হয়ে সমস্ত আবহাওয়াকে একেবারে ভাসিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে গিয়েছিল।

তারপর অনেকক্ষণ পরে আবার বলেছিলেন—তুমি দেখনি কলকাতায় রাতারাতি লটারির দোকান গজিয়ে গেল। যেদিকে চাও কেবল লটারির দোকান, এত লটারির দোকান কেন হলো বলতে পারো? এ হচ্ছে আমাদের জাতি-ক্ষয়ের লক্ষণ! কিছু কাজ করবো না, অথচ সব কিছু ভোগ করবো। এই অদ্ভুত আকাঙ্ক্ষা থেকেই এই লটারির দোকানের বাড়-বাড়ন্ত। এ-জাতির অধঃপতন হবে না তো কার হবে?

অনেকক্ষণ ধরে কথা হচ্ছিল। কী জানি কেন কাশীবাবু হঠাৎ সেদিন অত মুখর হয়ে উঠেছিলেন। আর তাও কিনা তার মতন অমন একজন অর্বাচীনের সামনে!

কিন্তু সন্দীপেরও ভালো লাগছিল কথাগুলো শুনতে। এ-সব কথা তো এর আগে আর কারো কাছে সে শোনেনি।

—আর একটা কথা শোন। শুনলে তোমার আর উকিল হবার বাসনা হবে না। এখানকার হাট্‌তলার কাছে একঘর গরীব লোক ছিল। একদিন রাত্রে হঠাৎ তাদের বাড়িতে আগুন লেগে গিয়ে পুরো ফ্যামিলিটাই মারা গেল। বেঁচে রইল কেবল তোমাদের বয়সী একটা ছেলে—

সন্দীপ বললে—হ্যাঁ. সে আমাদের সঙ্গে একই ক্লাশে পড়তো, তার নাম তারক ঘোষ—

-ও, তুমি তাকে চেন দেখছি। তা তার কী হলো শোন। আমি তার হয়ে হাইকোর্টে একটা মামলা করলুম!

—আপনি মামলা করেছিলেন? কার বিরুদ্ধে?

—যারা ওদের বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছিল তাদের বিরুদ্ধে। পুলিশও তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের কী হলো জানো?

—কী?

—মামলায় এক বছর ধরে লড়েও আসামীদের বিরুদ্ধে কিছুই প্রমাণ করা গেল না। আসামীরা বেকসুর খালাস পেয়ে গেল। আর তারপর একদিন সেই জমির ওপর পার্টির নামে একটা তেতলা নতুন পাকা বাড়ি উঠলো। এখন সে-বাড়ির মালিক কে জানো? মালিকের নাম গোপাল হাজরা।

—গোপাল হাজরা!!

—হ্যাঁ. সে এই বেড়াপোতারই একটা বখাটে ছেলে। তার বাপ এককালে এখানে হাট্‌তলায় বসে কুমড়ো-টুমড়ো বেচতো। সে লেখা-পড়া কিচ্ছু শেখেনি, কিন্তু শুনেছি সে নাকি এখন কোন্ এক মিনিস্টারের পি-এ। বোঝ কাণ্ড! এই হচ্ছে আমাদের দেশ—

এতক্ষণ পরে মা'র কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল বোধহয়।

কাশীবাবু সেটা দেখতে পেয়ে বললেন—ওই তোমার মা এসে গেছেন. অনেক দিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে খুব ভালো লাগলো...আর একটা কথা...

সন্দীপ উঠতে গিয়েও একটু অপেক্ষা করলে।

- দেখ. আগে আমাদের সময়ে আমরা সকলের আগে মানুষের কথা ভাবতুম. সকলের আগে দেশের কথা ভাবতুম। এখন সকলের আগে পার্টি। মানুষ গোল্লায় যাক, দেশও গোল্লায় যাক, অন্য সব কিছু গোল্লায় যাক. থাকুক শুধু পার্টি—

বাড়ি আসবার পথে মা জিজ্ঞেস করেছিল—কাশীবাবু এতক্ষণ তোর সঙ্গে কী কথা বলছিলেন রে?

সন্দীপের মাথার ভেতরে কাশীবাবুর কথাগুলো তখনও ঘোরা-ফেরা করছিল। সেই সব নিয়েই সে মশগুল হয়ে ছিল। মা'র কথার কোনও উত্তর সে দিলে না।

মা আবার জিজ্ঞেস করলে—কী রে, কী ভাবছিস তুই?

সন্দীপ হঠাৎ বললে—মা, তারকের কী হবে?

—তারক? কোন্ তারক? কোন্ তারকের কথা বলছিস তুই?

—ওই যে আমাদের সঙ্গে পড়তো তারক ঘোষ। যাদের বাড়ি পুড়ে গিয়ে মা-বাবা-ভাই-বোন সব মারা গেছে, এখন শুধু রক্ত বেচে পেট চালায় তারক—। কী হবে তার?

মা রেগে উঠলো। বললে—তোর কেবল যত বাজে চিন্তা। একবার গোপাল হাজরার কথা ভাব্ তো! সেই হাজরা-বুড়োর ছেলে। সে এখন কত বড়লোক

হয়েছে ভাব্ তো! এখন কত টাকা কামাচ্ছে সে। হাট্‌তলার কাছে কত বড় তিন-তলা একটা বাড়ি করেছে, ভাব্ তো!

সন্দীপ বললে—বা রে, এককালে তো তুমিই গোপাল হাজরার সঙ্গে মিশতে আমাকে বারণ করতে! মনে নেই—

মা রেগে গেল—তোর ওই এক কথা, কবে আমি কার সঙ্গে তোকে মিশতে বারণ করেছিলুম সেই সব পুরোন কাসুন্দি তুই এখনও ঘাঁটছিস্। কত বড় বাড়ি করেছে সে সেটা তো একবারও ভাবছিস্ না—

মা আরো কত কথা বলছিল তখন তা আর তার মাথায় ঢুকছিল না। তার তখন কেবল তারক ঘোষের কথাই মনে পড়ছিল। রাত্রেও মা'র পাশে শুয়ে শুয়ে তার অনেকক্ষণ ঘুমই আসছিল না। কেবল তারকের কথা তাকে বিপর্যস্ত করে তুলছিল।

সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠেই আবার ভোরের ট্রেন ধরে তাকে কলকাতায় গিয়ে পৌঁছতে হবে। সমস্ত রাতই তার ঘুম হলো না, ভোর হতে না হতে মা তাকে ডাকতে লাগলো—ওরে খোকা, ওঠ-ওঠ—

ধড়ফড় করে ঘুম থেকে উঠে পড়েছিল সে। তখন চারদিকে অন্ধকার। তাড়াতাড়ি মুখ-হাত-পা ধুয়ে তৈরি হয়ে নিল সে। মা আগের রাত্রের ভাত থেকে কিছুটা জলে ভিজিয়ে রেখেছিল। সেটাই সন্দীপকে দিলে। বললে—ছোটবেলা তুই পান্তাভাত খেতে খুব ভালবাসতিস, তাই তোর জন্যে রেখে দিয়েছিলুম—খা -

খেয়ে উঠে সন্দীপ মায়ের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে। বললে—তুমি নিজের শরীরটার দিকে দেখো মা, আমি চলি, চিঠি দেব—

তখনও চারদিকে বেশ অন্ধকার। পেছন থেকে মা উচ্চারণ করলে—দুর্গা-দুর্গা—

রাস্তায় বেরিয়ে সন্দীপ জামার পকেটে হাত দিয়ে দেখলে। মাত্র পাঁচটা টাকা রয়েছে। ট্রেনের টিকিট কেটেও কিছু টাকা তার হাতে থাকবে। একটা টাকা থাকলেই যথেষ্ট। বাকি টাকাটা?

বাকি টাকাটা সে তারকের হাতে দিয়ে যাবে। দেবার সময় বলবে—এক টাকার কিছু মুড়ি টুড়ি কিনে খাস রে তুই—

তারক হয়ত টাকাটা হাতে পেয়ে খানিকটা চম্‌কে যাবে। সন্দীপ বলবে—কিছু মনে করিস নি তারক। আরো টাকা কাছে থাকলে তোকে দিতুম। পরের বারে যখন আসবো তখন তোকে অনেক টাকা দেব, এখন এর বেশি আর আমার কাছে নেই ভাই, নে- টাকাটা নে -

সন্দীপ যা ভেবেছিল ঠিক তাই। আগের রাত্রে যে-দোকানটার সামনের মাচায় তারক শুয়ে ছিল, ভোরবেলাও সে সেখানেই শুয়ে ছিল। অঘোরে ঘুমোচ্ছিল।

কাছে গিয়ে সন্দীপ ডাকলে—তারক, এই তারক—

তারক কোনও সাড়া দিলে না, একেবারে অঘোরে ঘুমোচ্ছে—

—এই তারক, তারক রে, আমি সন্দীপ, ওঠ্ রে—আমার ট্রেনের টাইম হয়ে যাচ্ছে—ওঠ্...

তবু তারক সাড়া দেয় না। কী ঘুম তারকের। উপোস করে থেকে এত ঘুম কী করে আসে মানুষের!

এবার সন্দীপ হাত দিয়ে তারককে ঠেলতে লাগলো। আর সঙ্গে সঙ্গে তারকের দেহটা মাচা থেকে মাটিতে পড়ে গেল ঝপ্ করে।

—আহা রে!

দুই হাত দিয়ে তারককে ধরে তুলতে গিয়েই সন্দীপ হঠাৎ আতঙ্কে দুই পা পিছিয়ে এল। একেবারে ঠাণ্ডা হিম্ শরীরটা!

তবে কী...

হ্যাঁ, ঠিক তাই। তারকের রক্তহীন শরীরটা তখন জাগতিক প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের ঊর্ধ্বে অন্য এক অলৌকিক লোকে পৌঁছে গিয়েছে—যেখানে গেলে সব চাওয়া-পাওয়া মিথ্যে হয়ে যায়।

আশেপাশে লোকজন কেউ কোথাও নেই। রক্ত বিক্রি করে পঁয়তাল্লিশ টাকা, এক কাপ কফি, একটা কলা আর একটা সেদ্ধ ডিম। এই ছিল তার রক্তের দাম। সামনেই গোপাল হাজরার বিরাট তিন তলা বাড়িটা তখনও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমোচ্ছে, যেন সেটার তখন কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। আর সন্দীপের পায়ের তলায় তখন নিথর নিস্পন্দ তারকের মৃতদেহটা...

এই নরদেহ!

কয়েকজন লোক তখন হঠাৎ সেখানে এসে তারককে ওই অবস্থায় দেখে জড়ো হলো। কিন্তু তাদের জ্বলন্ত প্রশ্নের উত্তর কে দেবে? কার তখন অত সময় আছে? আর প্রশ্ন করবার লোক থাকলেও উত্তর শোনবার লোকই বা সংসারে কোথায়? তাদেরও তো বেঁচে থাকতে হবে, আর বেঁচে থাকতে গেলেই তো তাদের জীবিকা-অর্জনও করতে হবে। তাদের তো মরা মানুষের সামনে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না।

হঠাৎ দূর থেকে একটা ট্রেনের হুইসল্-এর শব্দ কানে এল। সন্দীপ যেন সেই শব্দে একটু সম্বিত ফিরে পেলে। তারপর স্টেশন লক্ষ করে সেই দিকেই ছুটে চলতে লাগলো। আর একেবারে শেষ মুহূর্তে যখন স্টেশনে এসে পৌঁছুল তখন ট্রেনটা সবে মাত্র ছেড়ে দিয়েছে। সন্দীপ তাড়াতাড়ি একটা চলন্ত কামরায় গিয়ে কোনও রকমে উঠে পড়ে যেন নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে পরিত্রাণ পেলে।

কিন্তু নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া কি অত সোজা? কোথায় মৃত্যু নেই? জীবন সীমিত। একটা নির্দিষ্ট বয়েসে এসে সকলকে জীবনের ওপর পূর্ণচ্ছেদ টানতেই হবে। কিন্তু মৃত্যু? মৃত্যু অনন্ত। সব জীবন্ত জিনিসের এক জায়গায় শেষ আছে, কিন্তু একমাত্র মৃত্যুরই মৃত্যু নেই।

মনে আছে কলকাতাতে এসেও সে ক'দিন ধরে বেড়াপোতাকে ভুলতে পারেনি। বেড়াপোতাই তার সমস্ত দিন-রাত্রিকে অসাড় করে রেখেছিল। বেড়াপোতা মানে সেই কাশীবাবু আর তারক। তারক ঘোষ!

তাহলে কি মানুষ থাকবে না, সমাজ থাকবে না, দেশ থাকবে না, শুধু পার্টি! শুধু পার্টিই থাকবে? শুধু ভূতনাথ দাস (ভূতো), শুধু ললিত মোহন মাইতি (লালটু), শুধু সুশীল সরকার, শুধু তিন বার ম্যাট্রিক ফেল মিনিস্টার শ্রীপতি মিশ্র শুধু গোপাল হাজরা? তারাই চিরকাল থাকতে এসেছে আর তারাই চিরকাল থাকবে?

মল্লিক-কাকা কাশী চলে গিয়েছিলেন ঠাকুমা-মণির গুরুদেবের কাছে। এ'দিন

চ্যাটার্জি'র এম-এ পাশ মেয়ে বিনীতার কুষ্ঠী নিয়ে দেখাতে। তাঁর ফিরতে দেরি আছে। ততদিন সন্দীপই সব কাজ চালাচ্ছিল। একবার বাড়ির দৈনন্দিন হিসেব-পত্র নিয়ে ঠাকুমা-মণির কাছে বুঝিয়ে দিয়ে আসা, আর একবার রাসেল স্ট্রীটে গিয়ে বিশাখাদের খবরাখবর নেওয়া, আবার কখনও বা চাকরির সন্ধান করা।

ব্যাঙ্কের চাকরিটা বোধহয় হলো না।

আর উকিল হওয়া তো হবেই না। কাশীবাবু তা ভালো করেই বুঝিয়ে দিয়েছেন। আইন শিখে নাকি নিজেরও ভালো করা যাবে না। আর দেশের ভালো করা সুদূরপরাহত। কারণ ইংরেজরা চলে যাওয়ার পর কোর্টও নাকি তার 'চরিত্র' হারিয়েছে।

সেদিন রাসেল স্ট্রীটের বাড়ি থেকে ফেরার পথে দিনের আলোতেই তার একটা নতুন অভিজ্ঞতা হলো। কাশীবাবুর কথা যে সত্যি তা প্রমাণ হলো।

একটা রাস্তার লোক তাকে ডাকলে। বললে—দাদা, শুনছেন—

সন্দীপ পাশ ফিরে দেখলে। বেশ ফরসা জামা-প্যান্ট পরা একটা লোক তার দিকে চেয়ে আছে। সন্দীপকে দেখে তার কাছে সরে এল। কানের কাছে মুখ এনে নিচু গলায় বললে- সার্টিফিকেট্ নেবেন দাদা?

সেই বহুদিন আগে কোন্ এক মিনিস্টারের সই করা সার্টিফিকেটের কথা তার মনে পড়লো। সেই সার্টিফিকেট দেখালে রেশন-কার্ড পাওয়ার সুবিধের প্রতিশ্রুতি ছিল।

—কীসের সার্টিফিকেট?

—বি-এ, এম-এ'র সার্টিফিকেট- একেবারে খাঁটি সার্টিফিকেট, জাল-টাল নয়। ঢাকা ইউনিভার্সিটির ভাইস-চ্যান্সেলারের সই আছে, যাচাই করে নেবেন—

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—এতে কী হবে?

লোকটা বললে বলছেন কী দাদা, সার্টিফিকেট দিয়ে যা-যা হয় তাই-ই হবে। এইটে দেখালে চাকরি-বাকরি হবে, বিয়েও হবে। অনেকে তো আবার শিক্ষিত লেখা-পড়া জানা জামাই চায় কি না। তা আর কিছু না হোক টিউশ্যানিও হবে একটা—নিন্ না—

তারপরে বললে- এই এ-পাশে একটু সরে আসুন, এখানে খোলা রাস্তায় দেখাতে চাই না একটু আড়ালে আসুন। বেশি দাম নয়, তিরিশ টাকাতেই পেয়ে যাবেন, আসুন, এদিকে আসুন না—

লোকটা না-ছোড় বান্দা। সন্দীপ বললে—না আমার দরকার নেই। আমি তো এমনিতেই বি-এ পাশ করেছি—

—তা হলে এম-এ ডিগ্রীর সার্টিফিকেটও আছে। সেটার দাম একটু বেশি। পঞ্চাশ টাকা। কত সস্তা ভেবে দেখুন। আপনার সময় নষ্ট করতে হচ্ছে না, বই কিনতে হচ্ছে না, পরীক্ষার ফি'ও লাগছে না—বিনা পরিশ্রমে আপনি এম-এ হয়ে যাচ্ছেন

সন্দীপের দোনা-মোনা ভাব দেখে লোকটা বললে—আচ্ছা, ঠিক আছে, আপনাকে আমি স্পেশ্যাল কেস হিসেবে আরো দশটা টাকা কমিয়ে দিচ্ছি, চল্লিশ টাকাতেই আপনি নিন গরীব লোক আপনি, আমিও গরীব লোক, নিয়ে যান, দু'দিন দেরি করলে পস্তাতে হবে, তখন হাজার চেষ্টা করলেও আর আপনি পাবেন না—নিন্

বলে লোকটা তার ঝোলাটার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিলে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত কী হতো বলা যায় না, বাঁচিয়ে দিলে সুশীল সরকার।

—এ কী, আপনি কোথায়?

সন্দীপ বললে—এই এখন রাসেল স্ট্রীট থেকে বাড়ি ফিরছি।

সার্টিফিকেটওয়ালা তখন বেগতিক দেখে সরে পড়েছে। মিছিমিছি তার অনেকটা সময় বাজে খরচ হয়ে গেছে। সে তখন অন্য খদ্দেরের ধান্দায় অন্য দিকে চলে গেল।

সুশীল জিজ্ঞেস করলে—আপনার সেই ব্যাঙ্কের চাকরির পরীক্ষার কী হলো?

-তারপর আর কোনও খবর আসেনি। বোধহয় পরীক্ষায় ফেল করেছি—

সুশীল বললে—আমি তখনই বলেছিলুম আমাদের পার্টিতে ঢুকে পড়ুন. একদিন-না-একদিন একটা কিছু হিল্লে হয়ে যাবেই—

সন্দীপ বললে—আপনি তো একটা পার্টির মেম্বার, তাহলে আপনারই বা হচ্ছে না কেন?

সুশীল বললে—আমাদের পার্টি তো এখনও পাওয়ারে আসেনি। এলে তখন আমারই ফার্স্ট চান্স—। এর পরের বারে আমাদের পার্টি দাঁড়াবেই। আমাদের পার্টির লোক যদি একজনও মিনিস্টার হয় তো তখন আর দেখতে হবে না—

তারপর একটু থেমে বললে—চলুন না কোথাও গিয়ে একটু বসি—

সন্দীপ বললে—আজকে আর বসতে পারবো না। এখন বাড়ি যাচ্ছি। সেখানে আমার এক কাকা একটা কাজ নিয়ে কাশী গেছেন. আজকেই তাঁর কলকাতায় ফেরার কথা। তারপর আমার হিসেব-পত্রের কাজও অনেক বাকি পড়ে আছে। সেগুলোও তার আগে সব আমাকে সেরে ফেলতে হবে. আমি চলি—

বলে সন্দীপ তার গন্তব্যস্থলের দিকে পা বাড়ালো।
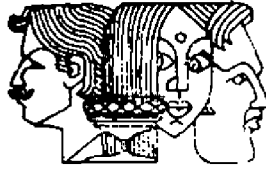
এর পরই সব খবর স্পষ্ট হলো। ঠাকমা-মণির গুরুদেব নতুন পাত্রীর জন্ম-কুন্ডলী বিচার করে জানিয়ে দিলেন যে পাত্রীর স্বামী-ভাগ্য ভালো। তবে কুন্ডলীতে পবিত্রতা. পুত্রবতী আর কুললক্ষ্মী হওয়ার যোগ আছে। কারণ সাধ্বী পত্নী লাভে ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্বিধ ফল লাভ হয়। নচেৎ জীবন মরুসদৃশ, সংসার বিষবৎ প্রতীয়মান হয়।

এই নতুন পাত্রী সর্বগুণসম্পন্না. সর্বসুলক্ষণাযুক্তা। তা ছাড়া এ-পাত্রী এই সংসারে পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গেই গৃহ আনন্দপূর্ণ হয়ে উঠবে।

খবরটা পেয়েই ঠাকমা-মণি মুক্তিপদকে টেলিফোনে জানিয়ে দিলেন খবরটা।

মুক্তিপদ শুনে খুব খুশী। বললেন -তাহলে মিস্টার চ্যাটার্জিকে খবরটা জানিয়ে দিই এখন?

—ঠিক তো? এর পরে তুমি আবার তোমার মত বদলাবে না তো?

—ওমা সে কী? ও-কথা বলছিস কেন? আমি কি কখনও কথা দিয়ে কথার খেলাপ করেছি?

মুক্তিপদ বললেন--না. তা অবশ্য করোনি। কিন্তু তা নয়, বলছি এই জন্যে যে শেষকালে আমাকে যেন লজ্জায় না পড়তে হয়। আমি তা হলে আমাদের তরফ থেকে মিস্টার চ্যাটার্জিকে পাকা কথা দিয়ে দিই?

—হ্যাঁ দিয়ে দে—

মুক্তিপদ মিস্টার চ্যাটার্জিকেও তখনি টেলিফোন করলেন। বললেন—মিস্টার চ্যাটার্জি, একটা সুখবর আছে—

—বলুন, বলুন? কী সুখবর?

মুক্তিপদ বললেন—না, টেলিফোনে হবে না, আমি আপনার কাছে এখুনি যাচ্ছি—

—ঠিক আছে, চলে আসুন, আমি আছি—

কিন্তু না, অফিসে কাজের টেবিলে বসে এ-সব ঘরোয়া কথা ঠিকমত হয় না, মিস্টার চ্যাটার্জি মুক্তিপদকে নিয়ে সোজা গেলেন ক্লাবে। ক্লাবে মিস্টার চ্যাটার্জির যেমন নিজস্ব একটা স্যুট রিজার্ভ করা আছে, তেমনি সেখানে তাঁর জন্যে বিশেষ আয়োজনের ব্যবস্থাও আছে। একান্তে কথা বলার পক্ষে এ একটা আদর্শ জায়গা। কোনও পার্টিকে আপ্যায়ন করতে হলে তিনি তাঁকে এখানে নিয়ে আসেন। ইনকাম্-ট্যাক্সের একান্ত গোপন-কথা আলোচনা করতে হলে তিনি তাঁকেও এখানে নিয়ে আসেন। এখানে সব রকমের আরাম সুরক্ষিত থাকে তাঁর জন্যে। নিজের বাড়ির চেয়েও এই ঘর তাঁর কাছে আরামদায়ক।

মিস্টার চ্যাটার্জি বললেন—কোনও কোল্ড্ ড্রিংকস লাগবে কি না বলুন—

—না, কোনও কিছুর দরকার নেই—

—তাহলে...

মুক্তিপদ বাধা দিয়ে বললেন—আমার কিছুরই দরকার নেই। আমি শুধু আমার কথাটা আপনাকে বলে চলে যাবো—

মিস্টার চ্যাটার্জি বললেন—হ্যাঁ বলুন, সুখবরটা কী?

মুক্তিপদ বললেন—কাশী থেকে মা'র গুরুদেবের গ্রীন সিগ্ন্যাল পাওয়া গেছে, মা এখন এ বিয়ে দিতে রাজি!

—ভেরি গুড্। রিয়্যালি এ ভেরি গুড নিউজ। এর পর? এখন আমার কী করণীয়?

মুক্তিপদ বললেন—আপনি এখন প্রোসীড্ করুন। আর ওদিকে সৌম্যও গেছে আমাদের লন্ডন অফিসে—

—কবে ফিরে আসছে সে?

সামান্য দেরি হবে। আর এদিকে বিয়ে বললেই তো আর বিয়ে হয় না, তারও আবার অনেক রকম অ্যারেঞ্জমেণ্ট করার কাজ আছে। বুঝতেই তো পারছেন আমার মা কোম্পানীর একজন ডিরেক্টর। তার ওপর খুব কন্জারভেটিভ। এককালে লন্ডন, জার্মানী, আমেরিকা সব জায়গাতেই মা বাবার সঙ্গে গিয়েছে। কিন্তু কখনও হোটেলের খাবার খায়নি। সঙ্গে ইন্ডিয়া থেকে বামুন-ঠাকুর নিয়ে গেছে ভাত রাঁধবার জন্যে। তাই পুরুত-মশাই পাঁজি দেখে যে তারিখটা ঠিক করে দেবে সেই তারিখ ছাড়া অন্য তারিখে নাতির বিয়ে দেবে না। জানেন, এখনও মা রোজ ভোরবেলা বাবুঘাটে গিয়ে গঙ্গাস্নান করে আসে। কী-শীত, কী-গ্রীষ্ম কোনও দিন বাদ যাবে না!

—ভেরি স্ট্রেঞ্জ!

মুক্তিপদ বললেন—এই এত বুড়ো বয়সেও আমরা মাকে যমের মত ভয় করি—

—সত্যি, অবাক হয়ে যাবার মত!

মুক্তিপদ বললেন—মা এখনও নির্জলা একাদশী করে। নিয়ম করে সব ব্রত, সব পুজো পালন করে। আমি কোনও আপত্তি করি না। বাবাও যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন কখনও আপত্তি করেন নি—

—আপত্তি না-করাই তো ভালো—

হঠাৎ ঘরের টেলিফোনটা বেজে উঠলো। মিস্টার চ্যাটার্জি টেলিফোনটা ধরলেন—

কে? হ্যাঁ, নাইজেরিয়া থেকে? না, বলে দাও, এখন দেখা হবে না—

—য়াঁ? না, না, কাল আমি হংকং চলে যাচ্ছি। নেকস্ট মাসে আসতে বলো—

বলে রিসিভারটা রেখে দিলেন।

তারপর বললেন—বিনীতা বলছিল ও এবার পি-এইচ-ডিটা দেবে সোসিওলজিতে।

—তা দিক্ না, বিয়েটা তো ফাইন্যালই হয়ে গেল। এখন যত ইচ্ছে পড়ুক না।

—আপনার মা পড়া-শোনাতে আপত্তি করবেন না তো?

মুক্তিপদ বললেন, না না, সেদিকে মা খুব লিবারেল। আজকালকার যুগে লেখা-পড়া না জানলে চলবে কেন? ওকে তো সৌম্যর সঙ্গে বিদেশে যেতে হতে পারে। তখন? লেখা-পড়া না-জানা থাকলেও মা মেম-সাহেব রেখে লেখা-পড়া শিখিয়ে নিতেন। এই দেখুন না আমাদের বিডন্ স্ট্রীটের বাড়িতে রাত ন'টায় মেইন্-গেট বন্ধ করে দেওয়ার অর্ডার দেওয়া আছে দরোয়ানকে। রাত ন'টার পর আর কারো বাড়ির বাইরে যাবার নিয়ম নেই। আমার ভাই-পো সৌম্য, সেও রাত ন'টার মধ্যেই বাড়িতে ঢুকে ডিনার খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে—

—আপনার নেফিউ সে-অর্ডার মানে?

মুক্তিপদ বললেন—মানতে বাধ্য। আমার বাবা পর্যন্ত যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন মা'র হুকুম মত কাজ করে এসেছেন। আমাদের বাড়িটাই চলে আমার মা'র হুকুমে। মা'র হুকুমেই আমাদের বাড়িটা ওঠে-বসে—আগেও তাই ছিল, এখনও তাই--

আবার টেলিফোনটা বেজে উঠলো। মিস্টার চ্যাটার্জি বিরক্ত হয়ে গেলেন। বললেন—ইণ্ডিয়াতে এলেই আমার এই বিপদ। এখানে এসেছি, নিরিবিলিতে একটু কথা বলবো, তারও উপায় নেই- বলে রিসিভারটা তুললেন।

—হ্যালো! হ্যাঁ? আবার কী...

——তোমরা কি আমাকে একটু শান্তিতে থাকতেও দেবে না? আমি কি ক্লাবে এসেও অফিসের কথা ভাববো? তাহলে এত মাইনে দিয়ে তোমাদের রেখেছি কেন?... কী বললে?...না না না, আমি যেতে পারবো না, আমি কালকেই হংকং চলে যাচ্ছি... বলে দিও আমার অত সময় নেই...না না, আমার অত সময় নেই...

বলে রিসিভারটা টেলিফোনের ওপর ঝপাং করে রেখে দিলেন।

তারপর মুক্তিপদর দিকে চেয়ে বললেন—দেখলেন তো মিস্টার মুখার্জি, একটুও শান্তি দেবে না এরা।

মুক্তিপদ হাসলেন। বললেন—ও আর আমাকে কী দেখাচ্ছেন! তবু তো ভালো যে আপনার লেবার-ট্রাবল নেই—

—সেটা সুবীরের জন্যে। ওই সুবীর আছে বলে ওই দিক থেকে আমি সেফ—

মুক্তিপদ বললেন,আমার যদি একটা ছেলে থাকতো তো আমি তাকে লেবার-লীডার করে দিতুম—কিন্তু আমার হয়েছে মেয়ে—

মিস্টার চ্যাটার্জি বললেন—তাতে কী হয়েছে? তার বিয়ে দিয়ে দিন একজন লেবার-লীডারের সঙ্গে--

মুক্তিপদ বললেন—সে তো এখন খুব ছোট, বিয়ের বয়েস এখনও হয়নি।. ততদিন কী করে চালাই?

—আপনাদের কি এখনও ক্লোজার চলছে?

মুক্তিপদ বললেন—কী আর করা যাবে! নইলে তো ওরা আরো মেশিন পুড়িয়ে দেবে। এক বাঁচাতে পারে আপনার সুবীর—

মিস্টার চ্যাটার্জি বললেন—সে ভার আমি নিলুম। আমার ওপরে সে-ভার ছেড়ে দিয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। নিজে তো এককালে খুব গরীব ছিলুম। অনেক

দিন আমি না-খেয়ে কাটিয়েছি, সে-সব দিনের কথা কি আমি ভুলে গিয়েছি বলতে চান? কিন্তু এখন আমার দিন বদলে গিয়েছে, এখন আমার জন্যেই লক্ষ-লক্ষ লোক পেট ভরে খেতে পাচ্ছে। তা আর একটা কথা...

—বলুন কী কথা?

মিস্টার চ্যাটার্জি বললেন—আপনার মা'কে একটা কথা জিজ্ঞেস করা হয়নি। বিয়েতে আমাদের সাইড থেকে কী কী দিতে হবে?

- তার মানে? কী-কী দিতে হবে, মানে কী?

মিস্টার চ্যাটার্জি বললেন—মানে 'ডাউরী' কত দিতে হবে? বা গয়না-টয়না সম্বন্ধেও আগে থেকে আপনার মা'র সঙ্গে কোনও কথাই হয়নি সেদিন! সেটা একটু ক্লীয়ার করে নেওয়া ভালো নয় কি?

মুক্তিপদ বললেন—ও-সব কথা যদি আর একবারও বলেন তাহলে কিন্তু আমাকে এখান থেকে উঠে যেতে হবে...

বলে দাঁড়িয়ে উঠতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু মিস্টার চ্যাটার্জি বাধা দিলেন। বললেন—আচ্ছা, আচ্ছা, ঠিক আছে, আগে থেকে বলছি এই জন্যে যে শেষকালে আবার আমাদের মধ্যে কোনও মিস-আন্ডারস্ট্যান্ডিং না হয়, কোনও ভুল বোঝাবুঝির ফাঁক না থাকে—

মুক্তিপদ আবার বসে পড়লেন। বড় ব্যস্ত মানুষ মিস্টার চ্যাটার্জি। সশরীরে যেখানে যে-দেশেই থাকুন না কেন তাঁর মন পড়ে থাকে সারা পৃথিবীর ওপর। যখন নাইজেরিয়াতে থাকেন তখন সেখানে থেকেও তিনি সেখানে থাকেন না। যেমন কলকাতাতে থেকেও তিনি কখনও কলকাতায় থাকেন না। মেয়ের বিয়েটা হয়ে গেলে তিনি তখন আরো ফ্রী হয়ে যাবেন, তখন আরো সকলের হয়ে যাবেন। ক্লাবের এই ঘরটা বছরের পর বছর ভাড়া নেওয়া থাকে, কিন্তু বছরে ক'দিন তিনি এ-ঘরে ঢোকেন তা তিনি আঙুল গুনেই বলে দিতে পারেন। তাঁর মেয়েকে বিয়ে করতে রাজী নয় এমন কোনও পাত্র পৃথিবীতে খুঁজে পাওয়া যাবে না। পৃথিবীতে তাঁর মেয়ের পাত্রের কি অভাব? তাঁর টাকা আছে, সেইটেই তাঁর মেয়ের সব চেয়ে বড় কোয়ালিফিকেশন্। অবশ্য তাঁর যে কত টাকা আছে, তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি নিজেও তা বলতে পারবেন না। সে-খবর রাখে তাঁর এ্যাকাউন্টেন্টরা। তাও একটা এ্যাকাউন্টেন্ট নয় তাঁর। তাঁর যতগুলো কোম্পানী ততগুলো তাঁর এ্যাকাউন্টেন্ট। নিজেদের কোম্পানীর হিসেবটা তারা রাখে। কিন্তু যে লোক কোম্পানীগুলোর মালিক তাঁকে জবাবদিহি করতে হয় সব কোম্পানীর হয়ে ইন্‌কাম-ট্যাক্সের খোদ মালিকের কাছে। কিন্তু সংসারে যেমন সব খাঁটি জিনিসের মধ্যে ভেজাল থাকে তেমনি সেই জবাবদিহির মধ্যেও যথারীতি ভেজাল থাকে। মজা এই যে সেই ভেজালের হিসেব তাঁর নিজের মাথার মধ্যেই রাখতে হয়। সেইটেই সব চেয়ে শক্ত কাজ। সেই শক্ত কাজের জটিলতা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যেই এই কলকাতার ক্লাবের মত পৃথিবীর সব দেশের সব ক্লাবের মেম্বারই হতে হয়েছে তাঁকে। সব ক্লাবের মধ্যেই তাঁর জন্য একটা রিজার্ভড কামরা থাকে বছরের পর বছর। কখনও নাইজেরিয়া, কখনও হংকং, কখনও বা নিউ-ইয়র্ক, আবার কখনও বা সুইজারল্যান্ড্ বা অন্য কোথাও। তিনি সশরীরে সেখানে যান বটে, কিন্তু মন কখনও তাঁর সেখানে থাকে না। এবার কলকাতায় এসেছেন মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে। এটাও তো তাঁর একটা পবিত্র ডিউটি!

—তাহলে এবার ওঠা যাক্ -

এই ক্লাবে এসে মুক্তিপদ মুখার্জির সঙ্গে বসে যে সব কথা হলো তার হিসেবও লেখা হবে কোম্পানীর হিসেবের খাতায়, লেখা হবে 'স্যাক্সবী মুখার্জি কোম্পানী'র ম্যানেজিং ডিরেক্টারের সঙ্গে লাঞ্চ খাওয়া বাবদ দু'হাজার টাকা খরচ হয়েছে। ইনকাম-

ট্যাক্স অফিস থেকেও সেটার জন্যে রিলিফ দেওয়া হবে যথারীতি।

—আপনি তো কাল হংকং যাচ্ছেন? আবার কবে তাহলে দেখা হবে?

—আমি ইন্ডিয়াতে এসেই তাহলে আপনার সঙ্গে কন্‌ট্যাক্ট্‌ করবো! ইতিমধ্যে টেলেক্সে আপনি সৌম্যপদকে আমাদের ডিসিশনটা জানিয়ে দিন। বলবেন আপনার মাও এ-বিয়েতে রাজি হয়েছেন—

মুক্তিপদ বললেন—তা তো বলবোই। এ-বিয়েটা যত তাড়াতাড়ি হয়ে যায় ততই তো আমার পক্ষে ভালো। আমাদের ফ্যাক্টরিটাও তত তাড়াতাড়ি খুলে যায়। কত যে সাফার করছি—

মিস্টার চ্যাটার্জি বললেন—আপনি কিছু ভাববেন না মিস্টার মুখার্জি, আমার সুবীর সব ঠান্ডা করে দেবে। তার ইউনিয়নের টোট্যাল মেম্বার হলো সাড়ে ছ'লাখ—

মিস্টার চ্যাটার্জির কাছে ভরসা পেয়ে মুক্তিপদ মুখার্জি একটু আশা পেলেন। নিচেয় গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়েছিল বিশ্বনাথ। সাহেব গাড়িতে উঠেই বললেন—একবার বিডন্‌ স্ট্রীটে চল্‌ তো বিশু, পরে ওখান থেকে হয়ে বেলুড়ে যাবো—

সন্দীপের কাছে মল্লিক-কাকা বেড়াপোতার সব খবরই নিলেন। তাঁর নিজেরও বহুদিনের দেশ বেড়াপোতা। বেড়াপোতার সঙ্গে তাঁর বলতে গেলে রক্তের সম্পর্ক। তাঁর শরীরের রক্তের প্রতি কণার সঙ্গে বেড়াপোতার ধুলো মিশে আছে। তিনি সব কথাই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন। ও কেমন আছে, সে কেমন আছে, তিনি কেমন আছেন। সন্দীপের কথাগুলো শুনতে শুনতে তাঁরও মনে হলো তিনি যেন আবার সশরীরে তাঁর জন্মভূমিতে ফিরে গেছেন। শেষকালে কাশীবাবুর কথা উঠলো। কাশীবাবুর কথাগুলো শুনে তিনি প্রথমে কিছু বললেন না।

সন্দীপ বললে—কাশীবাবুর কথাগুলো আমি অনেক ভাবছি। কিছুতেই আমি তার কথাগুলো ভুলতে পারছি না—

মল্লিক-কাকা বললেন—ভাবাই তো স্বাভাবিক—

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—আপনিও কি এ-কথাগুলো কখনও ভেবেছেন?

মল্লিক-কাকা বললেন—ভেবেছি বই কি বাবা! সবাই-ই এ-কথাগুলো ভাবে—

—কী জন্যে ভাবে?

মল্লিক-কাকা বললেন- দেখ, মানুষ জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গেই কেঁদে ওঠে। আমরা সবাই-ই কেঁদেছি। তুমিও কেঁদেছ, আমিও কেঁদেছি। তোমার ওই কাশীবাবুও কেঁদেছেন। এই কান্নার কারণ তখন শিশু বুঝতে পারে না। কিন্তু বোঝে তখন যখন তার বয়েস বাড়ে। বয়েস বাড়লেই তবে তারা বুঝতে পারে কেন তারা জন্মাবার সময় কেঁদেছিল। যে-মানুষ বেঁচে থাকার যন্ত্রণা সহ্য করতে পারে তারা বেশি দিন বাঁচে আর যারা সে-যন্ত্রণা সহ্য করতে পারে না, তারা তাড়াতাড়ি মরে যায়। কাশীবাবু জীবন-যন্ত্রণা সহ্য করতে পারছেন বলেই এখনও বেঁচে আছেন। আমিও তাই। তুমি এখন ছোট, তুমি যতদিন এই বেঁচে থাকার যন্ত্রণা সহ্য করতে পারবে ততদিন বেঁচে থাকবে। একটা কথা মনে রেখো যে, জীবনটা গোলাপ ফুলের বাগান হলেও এতে

কাঁটাও আছে। মানুষের জীবনে গোলাপ যেমন সত্যি, তেমনি সত্যি কাঁটাও—

কতদিন আগেকার কথা এসব। তবু কত নতুন, আবার সঙ্গে সঙ্গে কত পুরনো, সত্য যা তা বোধহয় কখনও পুরনো হয় না। তাই আর সকলের মত সন্দীপের জীবনেও এ-সব চিরকালের সত্য হয়ে আছে আজও। নইলে সৌম্যবাবুকে বাঁচাবার জন্যে সেদিন মাঝরাতে কেন বিশাখা তার পায়ের ওপর কেঁদে আছড়ে পড়েছিল? কেন কাঁদতে কাঁদতে সন্দীপের পা দুটো জড়িয়ে ধরে বলেছিল—তুমি ওঁকে বাঁচাও সন্দীপ, তুমি ওঁকে বাঁচাও। তোমার দুটি পা ধরে তোমাকে আমি মিনতি করছি তুমি বাঁচাও ওঁকে—

কিন্তু তখন তো বিশাখা আর সেই বিশাখা নেই। বিশাখা তো তখন রূপান্তরিত হয়ে অলকা হয়ে গেছে। গুরুদেবের আদেশ। সেও অনেক পরের কথা। অনেক অনেক পরের। তা তাই অনেক পরের কথা অনেক পরে বলাই ভালো। এখন সেই সত্যনারায়ণ পুজোর দিনটার কথা বলি। যেদিন সেই ঘটনাটা ঘটলো।

ঠাকমা-মণির কী যে ইচ্ছে হয়েছিল তিনি সেদিন সত্যনারায়ণ পুজো করবেন। জীবনে শোক-তাপ অনেক পেয়েছেন তিনি। স্বামী দেবীপদ মুখার্জি অকালেই মারা গিয়েছিলেন। তখন পঁয়তাল্লিশ বছর মাত্র বয়েস হয়েছিল তাঁর। ওটা কি আবার একটা বয়েস! ওই বয়েস থেকেই বলতে গেলে মানুষের উন্নতি শুরু হতে আরম্ভ করে। সেই অত অল্প বয়সেই ঠাকমা-মণি অনাথা হলেন। তারপর চলে গেল বড় ছেলে শক্তিপদ। তখন তার বয়েস মাত্র পঁচিশ। আর তারপর সৌম্যপদ'র মা। তখন রইল মুক্তিপদ আর তার বউ। তা তারাও তো আর বেশিদিন এ-বাড়িতে রইল না! বেলুড়ে নতুন বাড়ি করে চলে গেল একদিন। এ-বাড়িতে নিজের বলতে রইল কেবল ওই সৌম্য। অন্ধের নড়ি সেই নাতিকে নিয়েই তিনি তখন দিন কাটাতে লাগলেন। কিন্তু আশ্চর্য, সেই সৌম্যকেও একদিন অফিসের কাজে ঠাকমা-মণিকে ছেড়ে বিদেশে পাড়ি দিতে হলো। তবে কী নিয়ে থাকবেন তিনি?

যার কেউ নেই তার অন্তর্যামী আছেন। তাই ঠাকমা-মণি তখন থেকে তাঁর অন্তর্যামীকেই একমাত্র আরাধ্য করে নিলেন। কখনও গৃহ-দেবতা সিংহবাহিনী, কখনও একাদশী, কখনও তালনবমী ব্রত, আবার কখনও বা কোজাগরী লক্ষ্মী পুজো। সেবার কী হলো তিনি মল্লিক-মশাইকে আগামী পূর্ণিমার দিনে সত্যনারায়ণ পুজোর আয়োজন করতে হুকুম দিলেন। সত্যনারায়ণ পুজো ঠাকমা-মণি আগেও করেছেন। তাঁর সব বিধি-ব্যবস্থা মল্লিক-মশাই-এর জানা আছে। বাড়ির পুরোহিত মশাই-ই পুজোটা করবেন, কিন্তু সমস্ত উপকরণ সংগ্রহের আয়োজন তো মল্লিক-মশাইকেই করতে হবে। মাথাটা তাঁর না হলেও মাথাব্যথাটা তো তাঁরই।

আগের রাত্রেই সমস্ত যোগাড়-যন্তর শেষ হয়ে গিয়েছিল। সকাল থেকেই পুজোর আয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে নৈবেদ্য আর প্রসাদের আয়োজন। মল্লিক-মশাই সমস্ত রকম আয়োজন শেষ করে ফেলেছিলেন। ঘি, ময়দা তো বাড়িতে আছেই। অপর্যাপ্ত আছে। কিন্তু ফল-মূল তো সকালবেলাই বাজার থেকে টাটকা কিনতে হবে। সব রকম ফল চাই। যখনকার যা-যা ফল বাজারে থাকবে সমস্ত কিনতে হবে। তারপর আছে মিষ্টি। তার সঙ্গে দই রাবড়ি। কোনও আমন্ত্রিত অভ্যাগত যেন অভুক্ত বা অর্ধভুক্ত থেকে পুজো-বাড়ি থেকে ফেরত না যায়।

পুরুত-মশাই যথাসময়ে এসে পুজো আরম্ভ করলেন।

চারদিকে ধূপ-ধুনোর সুগন্ধ আর বার-বার ঘণ্টাধ্বনি। চারদিকে নৈবেদ্যের থালা। বিন্দু, কালিদাসী, ফুল্লরা কামিনী সবাই তটস্থ। চাকর-বাকরেরাও বাড়ির

অন্য কাজকর্ম ফেলে আশে-পাশে হুকুম তামিল করবার জন্যে হাজির। বাড়ির ঠাকুরও শেষ-রাত থেকে রান্না-বান্না সেরে নৈবেদ্যের থালা সাজিয়েছে সমস্ত হল্-ঘরটা জুড়ে। ঠাকমা-মণি উত্তরমুখ হয়ে তামার বাসনে তিল, তুলসী, বিপত্র, ফল আর গঙ্গাজল নিয়ে আচমন করলেন।

তারপর ধ্যান, পুষ্পাঞ্জলি আর তারপর প্রণাম-মন্ত্র। সারাদিন ধরেই এই রকম চললো। সন্ধ্যায় ব্রতকথাঃ নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্......

এর পর ব্রতকথা পাঠ। সারাদিন কোথা দিয়ে যে সময় কেটেছে তা কারোরই খেয়াল ছিল না। রাসেল স্ট্রীটের বাড়িতে অরবিন্দ ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে বিশাখাদের আনতে গিয়েছিল। তারাও এসে পড়েছে। যোগমায়া মেয়েকে সাজিয়ে গুজিয়ে এনেছিল। একেবারে সামনের সারিতে বসেছে তারা। আঁচলটা গলায় দিয়ে ভক্তিতে গদগদ হয়ে পাঠ শুনতে লাগলো।

সন্দীপ দেখলে মাসিমা মেয়েকে ফিস-ফিস করে শাড়ির আঁচলটা গলায় দিতে ইঙ্গিত করছে। মা'র কথায় বিশাখা তাই-ই করে একমনে ব্রতকথা শুনতে লাগলো।

তারপর মুক্তিপদ এলেন স্ত্রী আর মেয়েকে নিয়ে। তাঁরাও ভক্তিভরে ব্রতকথা শুনতে লাগলেন। পুজো জম্-জমাট হয়ে গেছে তখন।

সত্যনারায়ণ পদ করিয়া বন্দন
ক্রমে আমি বন্দিলাম যত দেবগণ
কলিকালে সত্যপুজা প্রচার করেন
আবির্ভূত হইলেন দেবনারায়ণ
দরিদ্র ব্রাহ্মণ এক ছিল মথুরায়
সুখ নাহি পায় কভু দুঃখ নাহি যায়
একদিন সেই দ্বিজ ভ্রমিয়া নগর
কিছু না পাইয়া ভিক্ষা হইল কাতর
বৃক্ষতলে বসিলেন বিষাদিত মনে
বহুক্ষণ কাঁদিলেন ভিক্ষার বিহনে
দয়ান্বিত হয়ে দেব সত্যনারায়ণ
ফকিরের রূপ ধরি দিলা দরশন
দ্বিজে কন্ নারায়ণ শুন মহাশয়
কি কারণে কান্দিতেছ বসিয়া হেথায়...

এই সময়েই হঠাৎ একটা কাণ্ড ঘটলো। কারা যেন এল বাড়িতে। কারা এল? কে এল এমন সময়ে? মুক্তিপদই বেশি চঞ্চল হয়ে উঠলেন। তাঁরই যেন বেশি আগ্রহ। তিনি উঠে দাঁড়ালেন। তারপর যা ভেবেছিলেন তাই-ই।

একেবারে সামনে এক ধুতি পাঞ্জাবি পরা সুন্দর চেহারার ভদ্রলোক। তাঁর পেছনে একজন সুন্দরী বিবাহিতা মহিলা। আর তাঁর সঙ্গে তাঁর অবিবাহিতা কন্যা।

মুক্তিপদ মাকে উদ্দেশ্য করে বললেন - মা, এই দেখ কারা এসেছে। এই হলেন সেই মিস্টার চ্যাটার্জি. ইনি মিসেস চ্যাটার্জি. আর এই এঁদের মেয়ে বিনীতা—

ঠাকমা-মণি এতক্ষণ ব্রতকথার মধ্যেই ডুবে গিয়েছিলেন। কিন্তু এঁদের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুখের চেহারা যেন আমূল বদলে গেল। ওঁদের উপস্থিতিতে তিনি যেন মনে মনে কৃতার্থ হয়ে গেছেন মনে হলো। সামান্য ঘটনা. কিন্তু তাতেই যোগমায়া যেন একটু ভাবনায় পড়লেন। বিশাখাও মেয়েটির দিকে চেয়ে বেশ কৌতূহলী হয়ে উঠলো।

মা'র দিকে মুখ ফিরিয়ে ফিস ফিস করে জিজ্ঞেস করলে—ও মেয়েটা কে মা?

যোগমায়া ধমক দিয়ে বললে—চুপ কর তো তুই—

মুক্তিপদ তখন মিস্টার চ্যাটার্জিদের আপ্যায়ন করতেই ব্যস্ত। তাঁরা কোথায় বসবেন, কী রকম করে তাঁদের খাতির করবেন, তাই ভেবেই তিনি আকুল। গণ্যমান্য মানুষদের তো সকলের পেছনে বসতে দেওয়া যায় না। তাঁদের অগ্রাধিকার পাওয়ার হক্ আছে এ বাড়িতে। ঠাকমা-মণি দূর থেকে বলে উঠলেন—এই এখানে এসে বসো মা, আমার কাছাকাছি—

কিন্তু তাঁরা যদি সামনের সারিতে যেতে চান তো তাহলে সামনের অনেককেই ঠাঁই নাড়া হতে হয়। বাড়ির গৃহিণীর আপ্যায়নের বহর দেখে সবাই-ই স্বেচ্ছায় নিজেদের জায়গা ছেড়ে পেছনের দিকে সরে এল।

মুক্তিপদ বললেন—মা, এঁদের বলতেই হয়নি, সত্যনারায়ণ পুজোর নাম শুনেই ওঁরা চলে এসেছেন—

ঠাকমা-মণি বললেন—খুব ভালো করেছ মা, খুব ভালো করেছ। চারদিকে বড্ড খারাপ-খারাপ খবর আসছিল। ফ্যাক্টরি কতদিন হলো বন্ধ হয়ে আছে, সবই তো তুমি জানো বাবা...তাই...

মিস্টার চ্যাটার্জির স্ত্রী বললেন—সবই জানি মা আমরা, আপনার কিছুই ভাবনা নেই, আমার বড় ছেলে সুবীর আছে, সে একজন মস্ত বড় লেবার-লীডার, সে আপনাদের সব গোলমাল ঠিক করে দেবে, আগে ভালোয় ভালোয় দুটো হাত এক হয়ে যাক—

ঠাকমা-মণি বললেন—তাই তো সব সময়ে ভগবানকে ডাকি। আমার তো নিজের বলতে ওই এক নাতি ছাড়া আর কেউই নেই। তাই নাতির বিয়েটা দিয়েই আমি গুরুদেবের কাছে কাশীতে চলে যাবো...সেখানেই আমি দেহ রাখবো—

ওদিকে তখন জোরে জোরে ব্রতকথা চলছে—

> দ্বিজে কন নারায়ণ শুন মহাশয়
> কী কারণে কান্দিতেছ বসিয়া হেথায়
> দ্বিজ কন কি হইবে কহিলে তোমায়
> ফকির বলেন দ্বিজ ক্ষতি কিবা তায়
> ব্রাহ্মণ বলেন নিত্য ভিক্ষা মেগে খাই
> আজ না মিলিল ভিক্ষা দুঃখ ভাবি তাই।
> ফকির বলেন বিপ্র যাহ নিজ ঘরে
> আমাকে পূজহ নিত্য দুঃখ যাবে দূরে।
> দ্বিজ বলে নিত্য পূজি শিলা নারায়ণ
> তাহা ভিন্ন না করিব ম্লেচ্ছ আচরণ—

সন্দীপ দূরে বসে একমনে বিশাখার দিকে দেখছিল।

যোগমায়া তখন কান পেতে শুনছিল ব্রতকথা। কিন্তু ভদ্রমহিলার দিকেও মাঝে-মাঝে চেয়ে দেখছিল উনি কে হতে পারে। ঠাকমা-মণির সঙ্গে ও মহিলার এত খাতির কেন? ওঁর বড় ছেলে এঁদের কারবারের গোলমাল কী করে ঠিক করে দেবে? কার সঙ্গে কার দু'হাত এক হবে!

কখন যে ব্রতকথা পাঠ শেষ হয়ে গেছে তার খেয়াল ছিল না, পুজোর পর প্রসাদ গ্রহণ করার ব্যবস্থা। তখনই লোকজনদের ব্যস্ততা বেড়ে গেল। সব অতিথিই একটা হল্-ঘরের মেঝের ওপর সার-সার বসে পড়লেন। তারপর সামনের পরিষ্কার শ্বেত-পাথরের থালার ওপর প্রসাদ দেওয়া হতে লাগলো।

—ওখানে নয়, এখানে বসুন—

মেজবাবু মিস্টার চ্যাটার্জিকে খুব সসম্মানে নিজের পাশে এনে বসালেন।

সেখানে বিশাখা বসেছিল। মেজবাবু তাকে বললেন—তুমি ও-পাশে সরে যাও তো মা—এখানে আমার মেয়ে বসবে—

যোগমায়া দূরে বসে ছিলেন। মেয়েকে বললেন—আয় বিশাখা, এদিকে আয় রে, আমার কাছে বসবি আয়—

বিশাখা তার নিজের জায়গা থেকে উঠে তার মা'র পাশের আসনে যাওয়ার আগেই বিনীতা তার আসনে গিয়ে বসবার চেষ্টা করতে গিয়ে এক বিপর্যয় ঘটে গেল। বিশাখার পা লেগে তার কাঁচের গেলাসটা টাল খেয়ে পড়ে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে গেলাসের সব জল চারদিকে পড়ে একাকার হয়ে গেল।

সে এক চরম অস্বস্তিকর অবস্থা। ঘরের যেদিকে বিশিষ্ট অতিথিরা বসে ছিলেন গেলাসের সমস্ত জলটা সেইদিকেই গড়িয়ে গিয়ে সব পশমের আসনগুলোকে ভিজিয়ে দিলে। অগত্যা সঙ্গে সঙ্গে অতিথিদেরও উঠে দাঁড়াতে হলো।

—কী হলো? কে জল ফেললে? কে?

মেজবাবুর গলার আওয়াজ! গলার আওয়াজেই বোঝা গেল তিনি বেশ বিরক্ত হয়েছেন। বড় বড় কাঁচের গেলাস। তার ওপর প্রত্যেক গেলাসেই আকণ্ঠ জল দেওয়া হয়েছিল।

সকলকে উঠে দাঁড়াতে দেখে ঠাকমা-মণির বিরক্তির শেষ ছিল না। তিনি এতক্ষণ দুর্ঘটনার শুরুটা দেখেন নি। এদিকে নজর পড়তেই চমকে উঠলেন।

বললেন—কে রে? কে এ-কাজ করলে রে বিন্দু?

বিন্দু তখন ছিল না ঘরে। পুজোর ঘর থেকে প্রসাদ আনতে গিয়েছিল।

ফুল্লরা বললে—বউদি-মণি—

—বউদি-মণি? কে বউদি-মণি?

—আমাদের নতুন বউদি-মণি—

এতক্ষণে যোগমায়ার মুখে কথা ফুটলো। বললে—হ্যাঁ ঠাকমা-মণি, আমার বিশাখাই জলটা ফেলেছে—

ঠাকমা-মণি বললেন—কাঁচ ভেঙেছে নাকি? ...দ্যাখ্ তো—

বিন্দু চারদিকে নজর দিয়ে দেখে বললে—হ্যাঁ, এই তো কাঁচের টুকরো পড়ে আছে ঠাকমা-মণি এখেনে—

এ্যাঁ, কী সব্বোনাশ! এখন কী হবে? কই, দেখি কোথায় কাঁচের টুকরো—

মেজবাবু, মেজগিন্নী, পিক্‌নিক্ সবাই তখন নিজের-নিজের জায়গা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন। মিস্টার চ্যাটার্জিও তখন শশব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। বললেন—কেউ নড়ো না, সবাই যে-যার জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকো—

এত যে সাধের সত্যনারায়ণ পুজোর অনুষ্ঠান সব যেন এক মুহূর্তে সকলের চোখের সামনে অসত্য হয়ে উঠলো। ঠাকমা-মণি আর পারলেন না। বললেন—হাঁ করে দাঁড়িয়ে কী দেখছিস্ লা অমন করে? ন্যাতা-ট্যাতা কিছু নিয়ে আয়—

ঠাকমা-মণিকে ভয় করে না এ-বাড়িতে তেমন কেউ নেই। যেন মন্ত্রের মত কাজ হলো তাঁর কথায়। বিন্দু, ফুল্লরা, কালিদাসী সবাই যে-যেদিকে পারলো ছুটলো ন্যাতা আনতে। বিন্দু একটা ন্যাতা এনে ঘর মুছতে যেতেই ঠাকমা-মণি তার হাতটা ধরে ফেললেন। বললেন—এটা কী এনেছিস? এটা কী?

বিন্দু বললে—ন্যাতা—

—এই ন্যাতা দিয়ে তুই ঘর মুছবি? এটা কোথায় ছিল?

—ভাঁড়ার ঘরে।

ঠাকমা-মণি বললেন—তোর কী আক্কেল লা বিন্দু? বলি তোর আক্কেলখানা কী? এই নোংরা ন্যাতা দিয়ে তুই কী বলে ঘর মুছতে যাচ্ছিস? জানিস না আজকে সত্যনারায়ণের পুজো? এই ময়লা ন্যাতা দিয়ে মোছা ঘরে আমি কী করে ভদ্দর-লোকের ছেলে-মেয়েদের পেসাদ খেতে দিই? তোর কী ভীমরতি হয়েছে?

বিন্দুর হেনস্থা দেখে ফুল্লরা তাড়াতাড়ি কোথা থেকে কার একটা ফরসা কাপড় নিয়ে এসে ঘর মুছতে লাগলো। ঠাকমা-মণি দেখে খুশী হলেন। বললেন—দেখলি? দেখলি তো? ফুল্লরার কেমন জ্ঞান-বুদ্ধি আছে, দেখলি তো তুই? এবার শিখে নে—কাকে বলে তরিবত্—

যতক্ষণ ঘর মোছা হতে লাগলো ততক্ষণই সবাই আলাদা হয়ে সরে দাঁড়ালেন।

কিন্তু বিপর্যয় বাধলো তার পরেই। পিক্‌নিক্ কোথা থেকে হঠাৎ বিশাখার কাছে দৌড়ে এসে বললো—বিশাখাদি, আমায় চিনতে পারছো? আমি পিক্‌নিক্—

জলের গেলাস ফেলে দিতে এমনিতেই সে লজ্জায় পড়ে গিয়েছিল, তার ওপরে এই পরিচিতির আবিষ্কার।

—তুমি এখানে?

—এ তো আমার ঠাকমা-মণির বাড়ি। এই বাড়িতেই তো আমার কাজিন-ব্রাদারের সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে—

কথাটা সকলের কানে গেল বটে, কিন্তু সে-কথার বিস্ময়ের ঘোর কাটাকার আগেই যোগমায়ার আর একটা আর্তনাদে সবাই সচকিত হয়ে উঠলো।

—কী সর্বনাশ. এত রক্ত কোত্থেকে এল রে?

সবাই সেই দিকে চেয়ে চমকে উঠলো! এত রক্ত! এত রক্ত কোথা থেকে এল? কীসের রক্ত?

দেখা গেল বিশাখার পায়ের গোড়ালি থেকে অজস্র রক্ত বেরিয়ে ঘরের মেঝের অনেকটা জায়গা লাল হয়ে গেছে। কিন্তু বিশাখা নিজেও সেটা বুঝতে পারেনি।

সন্দীপ বিশাখার পায়ের রক্ত দেখে কাছে এসে বললে—কীসে পা কাটলো? কাঁচে?

যোগমায়া তখন মেয়ের কাণ্ড দেখে মারমুখী হয়ে উঠেছে। মেয়ের চুল ধরে টেনে বিশাখাকে একেবারে মেঝে পর্যন্ত নুইয়ে দিয়ে পিঠে কিল মারতে লাগলো—পোড়ারমুখী, এত লোক রয়েছে কারো পায়ে গেলাস লাগলো না, আর তোরই পা লেগে কিনা গেলাসটা মাটিতে পড়ে গেল—এত বড়...

যোগমায়ার কাণ্ড দেখে ঘরশুদ্ধ লোক 'আ-হা-হা' করে উঠলো, বললো—করছেন কী, করছেন কী...ওর কী দোষ...ছোট্ট মেয়ে...

—হ্যাঁ, ছোট্ট মেয়ে! পোড়ারমুখী ম'লে আমার হাড় জুড়োয়...ওর জন্যে...

ঠাকমা-মণি বললেন—মেয়েকে এ কী রকম শিক্ষা দিয়েছ মা তুমি। এত ছোট্ট ফুটে কেন ও? তুমি মেয়েকে একটু সহবৎও শেখাও নি? এখন ওকে বকলে কী হবে? ওর কী দোষ?

মিস্টার চ্যাটার্জি মেজবাবুর দিকে একটু ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করলেন—ওরা কারা মিস্টার মুখার্জি?

মুক্তিপদ বললেন—ওই মেয়েটির সঙ্গেই আমার ভাইপোর বিয়ে হবার কথা ছিল—

মিস্টার চ্যাটার্জি কথাটা শুনে অবাক হয়ে গেলেন।

জিজ্ঞেস করলেন—তা ওখানে বিয়ে দেওয়ার কথাটা ক্যান্‌সেলড্ হলো কেন?

মুক্তিপদ বললেন—ক্যান্‌সেলড্ হলো কারণ ওদের টাকাকড়ি কিছু নেই. ওরা বড্ড গরীব—

মিস্টার চ্যাটার্জি বললেন—তা ঠিক করেছেন ক্যান্‌সেল্ করে দিয়েছেন। গরীব

লোকদের ওই একটাই দোষ—ওরা একটু আন্‌কালচার্ড হয়।

মুক্তিপদ বললেন—তা তো বটেই, দেখছেন না, একেবারে ম্যানার্স জানে না। এত লোক তো রয়েছে, আর কারো পায়ে কাঁচ ফুটলো না, ওরই পায়ে কাঁচ ফুটলো। অথচ আপনার মেয়ে বিনীতাও তো রয়েছে, সে তো নড়া-চড়া করছে না একটুও—

ওদিকে তখন সন্দীপ কোথায় কোন্ ফ্রিজ থেকে বরফ এনে ফেলেছে। তারপর বিন্দুকে বলে ডেটল আনিয়ে বিশাখার পায়ের গোড়ালিতে লাগিয়ে দিয়েছে। আর তারপর বিশাখার পা'টা নিজের কোলের ওপর তুলে নিয়ে একটা ফরসা কাপড়ের টুকরো দিয়ে ব্যান্ডেজও বেঁধে ফেলেছে। একজন পাকা নার্সের মত কাজ।

কাজ শেষ করে সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—আর ব্যথা লাগছে?

বিশাখা বললে—না—একটু চিন্-চিন্ করছে শুধু—

সন্দীপ বিশাখার পা'টা ছেড়ে দিয়ে বললে—রাত্তিরে আবার একবার নতুন ব্যাণ্ডেজ বেঁধে নিও। আর পায়ে যেন জল লাগিও না—

সামান্য একটি ঘটনা বটে, কিন্তু সেই সামান্য ঘটনাতেই সত্যনারায়ণ পুজোর মত একটা পবিত্র আবহাওয়া সেদিন যেন এক মুহূর্তেই বিষাক্ত হয়ে উঠেছিল, শুধু যোগমায়াই নয়, মুক্তিপদ, নন্দিতা, মিস্টার চ্যাটার্জি, বিনীতা, পিক্‌নিক্, এমন কি ঠাকমা-মণির মত মানুষের পর্যন্ত যেন বাক্‌রোধ হয়ে গিয়েছিল। এমন বেআক্কেলে, এমন নির্লজ্জ, এমন বেহায়া মেয়েও যে সংসারে থাকতে পারে, তার প্রত্যক্ষ পরিচয়ই যেন তারা সেদিন পেয়ে গিয়েছিল। আর শুধু তারাই নয়, বাড়ির ঝি-চাকর-পোষ্য, তারাও বিশাখার এই অভব্য আচরণে আড়ালে কল-মুখর হয়ে উঠেছিল। ছি ছি, এই মেয়েই কিনা এ বাড়ির বউ হয়ে আসবে, ঠাকমা-মণি কলকাতা শহরে নাত্-বউ করবার মত আর মেয়ে খুঁজে পেলে না, ছিঃ—

বিন্দু বললে—অমন মেয়েকে ক্ষুরে-ক্ষুরে পেন্নাম মা, ক্ষুরে-ক্ষুরে পেন্নাম—

ফুল্লরারও সেই একই মত। কালিদাসীরও তাই। সবাই একই সুরে বলতে লাগলো—এই বউই একদিন এই সংসার জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ঝাঁঝরা করে ছাড়বে, দেখে নিস্, তখন আমাদের ওপরেই যত গায়ের ঝাল ঝাড়বে—

—আবার সাজ-গোজ কত করেছে, দেখেছিস তো? সব তো এই মুখুজ্জে বাড়ির পয়সায়—কথায় আছে না, সজনে শাকে নুন জোটে না, মুশুর ডালে ঘি—এও হয়েছে তাই—

কামিনী বললে—তাই তো বলি, চটি জুতোর আবার ফিতে!

সেদিন মুখুজ্জে-বাড়ির ঝিদের পরনিন্দায় আর পরচর্চায় কোথা দিয়ে যে সময় কেটে গেল, তা আর কেউ টের পেলে না।

বাড়িতে সত্যনারায়ণ পুজোর সুফল কিনা কে জানে, সেদিন হঠাৎ একটা চিঠি এল। চিঠিটা প্রথম মল্লিক-কাকার হাতেই পড়েছিল।

সন্দীপকে ডেকে বললেন—এই নাও তোমার চিঠি—

—আমার চিঠি!

সন্দীপ তো অবাক! এই তো সেদিন বেড়াপোতায় গিয়ে মা'র সঙ্গে দেখা করে এসেছে। এরই মধ্যে আবার মা কেন তাকে চিঠি লিখবে!

তাড়াতাড়ি চিঠিটা দেখেই চমকে উঠেছে।

সেই ব্যাঙ্কের চিঠি! কতদিন আগে পরীক্ষা দিয়ে এসেছিল, তার ফল বেরিয়েছে। তার পরীক্ষার ফল ভালো হয়েছে বলে তাকে ইন্‌টারভিউ দিতে ডেকেছে। স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার ডাক্তার! সোমবার তারিখ পড়েছে। আবার পরীক্ষা!

মল্লিক-কাকা জিজ্ঞেস করলেন—কার চিঠি?

সন্দীপ বললে—আমি সেই ব্যাঙ্কের চাকরির জন্যে পরীক্ষা দিয়েছিলাম, তারই চিঠি এসেছে। আমি পাশ করেছি···

—তাহলে কি তোমার চাকরি হবে?

—তাই-ই তো মনে হচ্ছে, তবে প্রথমে তো মেডিক্যাল পরীক্ষা হবে। তাতে যদি পাশ করতে পারি তখন চাকরি হবে—

—কিন্তু তোমার স্বাস্থ্য তো ভালো। মেডিক্যাল পরীক্ষায় তুমি ফেল হতে যাবে কেন?

সন্দীপেরও আশা হলো মেডিক্যাল পরীক্ষায় সে পাশ হবেই। যখন কারো বিনা সুপারিশে সে টেস্ট্ পরীক্ষায় পাশ করেছে তখন হেলথ্-পরীক্ষাতেও সে নিশ্চয়ই বিনা সুপারিশেই পাশ করবে। কিন্তু সে-ব্যাপারে এখনও অনেক সময় হাতে আছে। তখনকার কথা তখন ভাবলেই চলবে। চাকরি হলে তখন এ-বাড়ির কাজ-কর্ম কখন করবে সে? তখন তো সকাল দশটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত অফিসের কাজের মধ্যেই কাটাতে হবে। তাহলে কখন সে রাসেল স্ট্রীটের বাড়ির কাজ-কর্ম দেখবে?

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—আচ্ছা মল্লিক-কাকা, চাকরি যদি হয় তো তখন কি ঠাকমা-মণি এ-বাড়িতে থাকতে দেবেন?

মল্লিক কাকা বললেন—তা কেন দেবেন না, কিন্তু চিরকালের জন্যে তো তুমি এ-বাড়িতে থাকতে আসোনি! একদিন তো তোমারও নিজের সংসার হবে, একদিন তো তোমার মাকেও তোমার কাছে এনে রাখতে হবে। চিরকাল তো আর তোমার মা নিজের হাত পুড়িয়ে পরের বাড়িতে রান্না করবে না। তা করাটাও উচিত হবে না। আর তা ছাড়া তখন তোমাকেও তো বিয়ে-থা করতে হবে গো—নাকি বিয়ে করবে না?

সন্দীপকেও বিয়ে করতে হবে? বাড়ি ভাড়া করে মাকে কলকাতায় রাখতে হবে?

কথাটা নিজের কাছেও সন্দীপের নতুন লাগলো। এমন কথা তো আগে কখনও মাথায় আসেনি।

সেদিন আর মল্লিক-কাকা এ নিয়ে কোনও কথা বলেন নি। জীবন কত তাড়াতাড়ি কেটে যায়। কত তাড়াতাড়ি সময় এগিয়ে যায়। এই সেদিন সন্দীপ কত আশা নিয়ে, কত স্বপ্ন নিয়ে এই বিডন স্ট্রীটের বাড়িতে এসেছিল। তারপর কত বছর কেটে গেল এখানে। রাসেল স্ট্রীটের বাড়িতে যাবার পথে এই কথাগুলোই তার মাথার মধ্যে ঘোরাঘুরি করছিল। তবে কি আর তাকে এই বিশাখাদের বাড়িতে যেতে হবে না?

সেই সত্যনারায়ণ পুজোর দিনই সবাই যখন যে-যার বাড়ি চলে গিয়েছিল তখন সন্দীপ মল্লিক-কাকাকে একলা পেয়ে জিজ্ঞেস করেছিল—কাকা, তাহলে কি বিশাখাদের বাড়িতে আমাকে আর যেতে হবে না?

মল্লিক-কাকার মুখও তখন যেন কেমন গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল। শুধু মল্লিক-কাকারই নয় যাঁরা যাঁরা বাড়িতে এসেছিলেন সকলেরই মন যেন ওই দুর্ঘটনায় কেমন বিরক্ত হয়ে গিয়েছিল।

সেদিন পুজোর প্রসাদ পাওয়ার পর মাসিমারা আর বেশিক্ষণ দাঁড়ায়নি। বিশাখার আচরণের মধ্যে কোথায় যেন একটা তীক্ষ্ম কাঁটা ছিল যা অলক্ষ্যে সকলের মধ্যে বিঁধে

উৎসবের পবিত্রতাকে একেবারে বিষাক্ত করে দিয়েছিল।

মিস্টার চ্যাটার্জি শুধু ধনী নন, অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত মান্য-গণ্য অতিথিও বটে। তা ছাড়াও তিনি একজন ভাবী কুটুম। তিনি বেশি কথা বলেন না। বেশি কথা বলার সময়ও যেমন তাঁর নেই, স্বভাবেও তিনি তেমনি মিতভাষী। হয়ত তিনি ভাবেন বেশি, তাই তিনি এত মিতবাক্!

তিনি হঠাৎ বললেন—তা হলে এবার যাওয়া যাক মিস্টার মুখার্জি—

মুক্তিপদ মা'র দিকে চাইলেন। বললেন—মা, মিস্টার চ্যাটার্জি বলছেন উনি এবার যাবেন—

ঠাকমা-মণি বললেন—এখনই? আর একটু বসলে হতো না বাবাজী—

মুক্তিপদ বললেন—না মা, ওঁকে আর আটকে রেখো না, উনি অনেক কাজের লোক—

চ্যাটার্জি গৃহিণীও তখন যাওয়ার জন্যে তৈরি। তাঁর মুখ দেখেও মনে হলো তিনিও যেন একটু ব্যাজার হয়েছেন এই আকস্মিক দুর্ঘটনায়। ঠাকমা-মণি তাঁর চিবুক ধরে বললেন—হঠাৎ ঝামেলা হয়ে গেল, সেই জন্যে ভালো করে কথাও বলতে পারলুম না, তুমি আর একটু বসো মা. এখুনি এলে আর এখুনি চলে যাবে, তা হয় না—

যোগমায়া এতক্ষণ এক কোণে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সবই দেখছিল। কত সব বড় বড় লোক এসেছেন। তাঁদের গায়ে কত দামী-দামী হীরে-মুক্তোর গয়না সব। কত দামী-দামী সিল্কের রং-বেরঙ শাড়ি ব্লাউজের বাহার। সে-তুলনায় তার নিজের দারিদ্র্য নিজের চোখেও যেন প্রকট হয়ে উঠেছিল। তার ওপর বিশাখার ওই অস্বস্তিকর আচরণ তার মাথা যেন লজ্জায় অপমানে ধিক্কারে আরো মাটিতে নুইয়ে দিয়েছিল। তাকে কেউ তেমন আন্তরিকভাবে অভ্যর্থনাও যেমন করেনি, আবার তেমনি তাকে কেউ বসতেও পীড়াপীড়ি করছে না। এই অবস্থার মধ্যে হঠাৎ তার নজর পড়েছিল সন্দীপের দিকে।

সন্দীপ নিজেও এই অব্যবস্থায় লজ্জিত আর সঙ্কুচিত ছিল। সন্দীপ মাসিমার এই অসহায়তায় সাহায্য করবার জন্যে কাছে গেল। জিজ্ঞেস করলে—আমাকে কিছু বলবেন মাসিমা?

মাসিমা বললে—কই বাবা, আমাদের যাওয়ার ব্যবস্থার কী হবে? কেউ তো কিছু বলছেন না—

সন্দীপ বললে—আপনারা যাবেন? আর একটু থাকবেন না?

মাসিমা বললে—না বাবা, আর এক মিনিটও আমার এখানে থাকতে ভালো লাগছে না—তুমি এখুনি এখান থেকে আমাকে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করো বাবা—

সন্দীপ বললে—গাড়ি তো তৈরী, অরবিন্দ তো গাড়ি নিয়ে বসে আছে—

মাসিমা বললে—তবে তুমি আমাদের নিয়ে চলো. আমাদের বাঁচাও—

কথাটা করুণ আর্তির মত শোনালো। সন্দীপের বুঝতে অসুবিধে হলো না যে কথাগুলো মাসিমার মনের যন্ত্রণার অভিব্যক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়।

আর তারপর মোটেই দেরি হয়নি। অরবিন্দ তৈরিই ছিল। আগে আগে বিশাখা গাড়িতে গিয়ে বসল আর তার পেছনে পেছনে মাসিমা।

গাড়ি ছাড়বার আগে সন্দীপ বিশাখাকে লক্ষ্য করে একবার শুধু জিজ্ঞেস করলে—পায়ের ব্যথাটা কি একটু কমেছে?

বিশাখা কিছু বলবার আগেই বিশাখার হয়ে মাসিমাই বললে—পোড়ারমুখীর ব্যথা না কমলেই ভালো. ও মরুক, মরুক. ও মরলেই আমি বাঁচি—

আর তারপরেই অরবিন্দ গাড়িটা ছেড়ে দিলে। আর তারপরের কিছু কথা বলাও

গেল না, কিছু শোনাও গেল না।

তারপর ক্রমে রাত হয়েছিল। সমস্ত রাতটা ধরে সেই ঘটনাটার ছবিই কেবল তার চোখের ওপর বার-বার ভেসে উঠেছে। এতদিনের এত টাকা-খরচ, এতদিনের এত যত্ন-আত্তি, এতদিন গুরুদেবকে এত বার পুজো-প্রণাম পাঠানো, গৃহ-দেবতার এত নিত্য-সেবা, আজ সব কিছু যেন একটা সামান্য ঘটনায় একেবারে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়ে গেল। তাহলে কীসের দরকার ছিল বাড়িতে মাস-মাইনে দিয়ে সন্দীপকে রাখার? তাহলে যখন ওই নতুন পাত্রীর সঙ্গে সৌম্যবাবুর বিয়ে হবে তখন সন্দীপ বাড়ির কোন্ কাজ করবে? তখন বিশাখারাই বা কোথায় যাবে? কোন্ নির্দিষ্ট কাজের জন্যে সে মাইনে পাবে?

হঠাৎ মল্লিক-কাকা ডাকলেন—ও সন্দীপ, ওঠো, ওঠো। আর কত ঘুমোবে?

রাত্রে ঘুম আসতে দেরি হওয়াতে ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিল। কিন্তু মুখে সে-কথা সন্দীপ বললে না। তারপর আগের রাত্রের কথাগুলো যখন তার মনে পড়লো আনন্দটাও যেন ম্রিয়মান হয়ে গেল!

আর ঠিক তার খানিকক্ষণ পরেই এল সেই চাকরির চিঠিটা।

কিন্তু বিশাখার কালকের দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার পাশে তার চাকরি পাওয়ার চিঠির আনন্দটা যেন ম্রিয়মান হয়ে গেল!

হঠাৎ চলতে চলতে সন্দীপ দেখলে রাস্তার ধারে এক জায়গায় একজন জ্যোতিষী বসে আছে। জ্যোতিষীর মুখময় দাড়ি-গোঁফ। পাশে একটা সাদা কাগজের ওপর লাল কালিতে বড় বড় অক্ষরে নিচের কথাগুলো লেখা আছেঃ

॥ এখানে আপনার ভাগ্য জেনে যান ॥
॥ বিদেশীদের জন্যে ইংরেজী ভাগ্য ॥

জ্যোতিষীকে কখনও হাত দেখায়নি সন্দীপ। হয়ত দেখাবার দরকারও হয়নি। আর জ্যোতিষীর সামনে তখন কোনও খদ্দেরও নেই।

সন্দীপ কাছে যেতেই জ্যোতিষী জিজ্ঞেস করলে—কী বাবুজী, হাত দেখাবেন?

হাত? তার হাত তো কখনও কাউকে দেখায়নি সন্দীপ। তবে বিশাখার ভাগ্যটা জানতে পারলে ভালো হতো।

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—আপনি অন্য একজনের ভাগ্য বলতে পারবেন?

—কে? কার ভাগ্য?

সন্দীপ বললে—একজন মেয়ের—

—তিনি কোথায়?

—তিনি তাঁর বাড়িতে।

—তাঁকে নিয়ে আসুন না—

সন্দীপ বললে—না, তাঁকে আনা যাবে না। আমি তাঁর নাম চেহারা সব কিছু বললে আপনি তাঁর ভাগ্য বলতে পারবেন?

সকাল থেকে একজন খদ্দেরও জোটেনি জ্যোতিষীর। যদিই বা একজন খদ্দের জুটলো তাও কি শেষকালে হাত-ছাড়া হয়ে যাবে?

বললে—হ্যাঁ, জাতকের হাত না দেখেও আমি তার ভাগ্য বলতে পারি—

—আপনার দক্ষিণে কত?

জ্যোতিষী বললে—অন্য লোকের হাত দেখে আমি পাঁচ সিকে নিই। আপনার কাছে আমি বারো আনাতেই ভাগ্য বলে দেব—

সন্দীপ পকেট থেকে একটা আধুলী বার করে জ্যোতিষীর সামনে রেখে বসে পড়লো।

জ্যোতিষী বললে—আপনার হাতটা দেখি—

অনেকক্ষণ ধরে সন্দীপের ডান হাতটা টিপে টিপে উল্টে-পাল্টে দেখতে লাগলো জ্যোতিষী। সন্দীপের কেমন সন্দেহ হলো। বললে—আরে, আমার ভাগ্য দেখতে বলছি না আমি। আমি বলছি অন্য একজনের ভাগ্য বলতে—

—তা হোক। আপনার হাত দেখেই আমি তার ভাগ্য বলে দেব। আপনি যার ভাগ্য জানতে চান সে কি একজন মেয়ে?

—হ্যাঁ।

জ্যোতিষী বিজ্ঞের মত হাসি হেসে বললে—হ্যাঁ, আমি ঠিক জানি। তার এখনও বিয়ে হয় নি তো?

—না।

জ্যোতিষী আরো খুশী। বললে হ্যাঁ, আমি ঠিক জানি তার বিয়ে হয় নি। আপনি জানতে চান আপনার সঙ্গে তার বিয়ে হবে কিনা—

সন্দীপ বললে—না না, আমার সঙ্গে তার বিয়ে হোক এটা আমি চাই না। তার অন্য জায়গায় অন্য লোকের সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে যে। তারা খুব বড়লোক—

জ্যোতিষী আবার সন্দীপের হাতটা ভালো করে টিপে টিপে উল্টে-পাল্টে দেখতে লাগল। বললে—না, না, আমি বলছি আপনার সঙ্গে তার বিয়ে হবে। আমি ঠিক বলে দিচ্ছি—

সন্দীপ বললে—না, তা হওয়া সম্ভব নয়। আমি অন্য জিনিস জানতে চাইছি।

—মেয়েটির নাম কী?

সন্দীপ বললে—বিশাখা—

—যার সঙ্গে বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে তার নাম কী?

সন্দীপ বললে—সৌম্যপদ। সৌম্যপদ মুখার্জি—খুব বড়লোক তারা—

বলেই আবার বললে—কিন্তু এর মধ্যে আর একজন পাত্রী এসেছে। ঠিক হয়েছে তাকে রেখে অন্য একজন মেয়ের সঙ্গে ওই সৌম্যপদ মুখার্জির বিয়ে হবে—

—তার নাম কী?

সন্দীপ বললে—তার নাম বিনীতা। তারাও খুব বড়লোক—এখন কার সঙ্গে সৌম্যপদবাবুর বিয়ে হবে, এই আমার প্রশ্ন। আপনি বলতে পারবেন কী?

বড় জটিল প্রশ্ন। জ্যোতিষী এবার আরো বেশি মনোযোগ দিয়ে সন্দীপের হাতটা টিপে-টিপে উল্টে-পাল্টে বিচার করতে লাগলো। তারপর একটা স্লেটে কী সব অঙ্ক কষতে লাগলো। যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ সব অঙ্ক।

তারপর বললে—এই বিশাখার সঙ্গে আপনার বিয়ে হবে।

—সে কী?

—হ্যাঁ।

সন্দীপ বললে না না, আমি চাই না আমার সঙ্গে তার বিয়ে হোক। আমি খুব গরীবের ছেলে। আমার বাপ নেই। বিধবা মা পরের বাড়িতে রান্না করে পেট চালায়। আমিও কলকাতায় পরের বাড়িতে অন্নদাস। আমার সঙ্গে বিয়ে হলে বিশাখার খুব কষ্ট হবে। আমি উঠি... আপনি কী-সব যা-তা বলছেন...

সন্দীপ উঠে পড়তে যাচ্ছিল। কিন্তু জ্যোতিষী তার হাতটা টেনে রাখলো। তারপর আবার মাথা তুলে বললে—শুনুন, আমি এক অদ্ভুত কান্ড দেখছি। এই বিশাখার সঙ্গে আপনার বিয়েও হবে, আবার ওই সৌম্যবাবুরও বিয়ে হবে—

—সে কী? একজন মেয়ের সঙ্গে দুজন পুরুষের বিয়ে হবে? তাই কখনও হয় নাকি? আপনি কী পাগল না আপনার মাথা-খারাপ?

জ্যোতিষী কিন্তু সন্দীপের কথায় রাগ করলে না।

বললে—আমার কী দোষ বাবুজী? আমি যা দেখছি তাই বলছি।

সন্দীপ এবার জোর করে তার হাতটা ছাড়িয়ে নিলে।

জ্যোতিষী বললে—আপনাদের দুজনেরই মঙ্গল খুব খারাপ। আপনাদের দুজনেরই জীবন খুব কষ্টের। অনেক কষ্টের মধ্যে দিয়ে আপনাদের দুজনের জীবন কাটবে। খুব সাবধানে থাকবেন বাবুজী—

সন্দীপ বললে—কিন্তু একজন মেয়ের সঙ্গে দুজনের বিয়ে হয় কী করে?

জ্যোতিষী বললে—হয়—হয়। ভাগ্যস্য কুটিলা গতিঃ! শাস্ত্রেই তো লেখা আছে—

কিন্তু ততক্ষণে অন্য আর একজন খদ্দের এসে গিয়েছিল। সন্দীপ আর সেখানে দাঁড়ালো না। তাড়াতাড়ি হন্-হন্ করে সামনের দিকে এগিয়ে চললো।

ক'দিন পরেই মিস্টার চ্যাটার্জির টেলিফোন এল মুক্তিপদ মুখার্জির কাছে।

—হ্যালো! আমি চ্যাটার্জি বলছি—

—ও, হংকং থেকে কবে এলেন?

—এই তো এখনি। মা কেমন আছেন? যাক্, ভালো। আপনি? ...আর সৌম্যপদর কিছু খবর আছে লন্ডন থেকে?

মুক্তিপদ বললেন—কথা তো রোজই হয়। ওর ওখানকার কাজ সবই প্রায় শেষ। ওখানকার আয়েঙ্গারের সঙ্গেও আমার সব কথা হয়ে গেছে। এখন থেকে আয়েঙ্গারই ওখানকার সব কাজ দেখা-শোনা করবে।

—আর আপনাদের ফ্যাক্টরির কী রকম অবস্থা।

—অবস্থা সেই এক রকমই। প্রোডাক্শান বন্ধ। অর্ডারও বন্ধ। কেউ কাজও করছে না, তাই কেউ মাইনেও পাচ্ছে না।

চ্যাটার্জি বললেন—এ-রকম মাইনে-না পেয়ে ওরা কতদিন স্ট্রাইক চালাতে পারবে?

মুক্তিপদ বললেন—শুনছি তো ওরা অনেকে নাকি রাস্তায় রাস্তায় তেলেভাজার দোকান দিয়েছে, কেউ কেউ জিনিস-পত্র ফিরি করছে, আবার কেউ-কেউ বা ভিক্ষেও করছে—

—আর ওরা? ওই আপনার সব এক্জিকিউটিভ্রা?

মুক্তিপদ হাসলেন। বললেন—তাঁদের আমরা ব্যাক্ডোর দিয়ে যতটা পারি মাইনে দিয়ে যাচ্ছি। নইলে তাদেরই বা চলবে কেমন করে বলুন?

—তা তো বটেই—

ব্যস্ত লোক মিস্টার চ্যাটার্জি। তাঁর অনেক কাজ। তবু যে তিনি এত কাজের মধ্যেও মুক্তিপদ মুখার্জির কথা মনে রেখেছেন এই-ই যথেষ্ট।

—আর একটা কথা... বলে মিস্টার চ্যাটার্জি বললেন—সেই যে সেদিন আপনার মা'র সত্যনারায়ণ পুজোর দিনে আপনাদের বাড়িতে এসেছিলেন যাঁরা...

মুক্তিপদ বললেন—হ্যাঁ হ্যাঁ, মা ওই মেয়েটির সঙ্গেই তো সৌম্যর বিয়ের সব ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেছিলেন।

মিস্টার চ্যাটার্জি বললেন—আশ্চর্য! সত্যিই আশ্চর্য। আমিও আমার মিসেস্‌কে তাই বলছিলুম। কোথায় বিনীতা আর কোথায় ওই মেয়েটা! কোনও ম্যানার্স জানে না। ওর লেখাপড়া কদ্দুর?

—লেখা-পড়া কী করে হবে? ওর বাপ নেই তো। কাকার সংসারে গলগ্রহ হয়ে থাকতো, আমার মা একদিন গঙ্গাস্নান করতে গিয়ে ওই মেয়েকে দেখে পছন্দ করে ফেলেন, তারপর ওদের মা-মেয়েকে আমাদের রাসেল স্ট্রীটের বাড়িতে এনে রাখা হয়েছে। ওখানে মেয়েটিকে রেখে স্কুলে লেখাপড়া শেখাচ্ছে। অর্থাৎ উদ্দেশ্য হলো গাধা পিটিয়ে ঘোড়া করা হবে—সবই আমাদের খরচায়—

—ও, তাই বলুন...

মুক্তিপদ বললেন—তা একটা শুধু ভালো খবর এই যে মা এখন তাঁর ভুল বুঝতে পেরেছেন।

—হ্যাঁ, সেদিন ওই মেয়েটা যে-কাণ্ড করে বসলো তাতে আমারই তো লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছিল! তা যাক, ওরা যে শিগ্‌গির বিদায় নিলে তাই-ই বাঁচোয়া—

তারপর বললেন—ঠিক আছে, সৌম্য কবে আসছে সেটা আমায় জানাবেন। তখন আপনার মা'র সঙ্গে পরামর্শ করে একটা বিয়ের দিন-ক্ষণ স্থির করা যাবে—

টেলিফোন ছাড়তেই গৃহিণী এল। জিজ্ঞেস করলে—কী হলো? কা'র সঙ্গে এত আপনি আজ্ঞে করে কথা বলছিলে? নতুন কুটুম?

—হ্যাঁ। কিন্তু তুমি? তুমি সেজে-গুজে কোথায় যাচ্ছো?

—কেন? কোথাও না গেলে কি সাজতে নেই? আমি বাড়ির মধ্যে ও-রকম হা-ঘরের মত থাকতে পারি না। তা তুমি আজ বাড়িতে থাকবে না বেরোবে? ফ্যাক্টরি তো বন্ধ।

মুক্তিপদ বললেন—ফ্যাক্টরি চালু থাকলে তো আর কাজ বেশি থাকে না, ফ্যাক্টরি বন্ধ বলেই তো কাজ বেড়ে গেছে আমার—

—তাহলে তুমি তোমার কাজ নিয়েই থাকো...

বলে নন্দিতা আর দাঁড়ালো না, ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। হয়ত রেগে গিয়েছে। অবশ্য রাগ হওয়াটা অন্যায়ও নয়। স্ত্রীর দিক থেকে যারা সহযোগিতা পায় না তারাই সত্যিকারের হতভাগা। জীবনে তো নন্দিতা কোনও দিনই তাকে সহানুভূতি দেয়নি। কোথা থেকে টাকা আসছে, কেমন করে টাকা আসছে, কিংবা কেন টাকা আসছে না, কেন টাকা কম আমদানি হচ্ছে, এ-সব নিয়ে যে স্ত্রী মাথা ঘামায় না, তারা স্বামীর জীবনে ধিক।

হঠাৎ রঘু এসে বললে—হুজুর, চ্যাটার্জি সাহেব এসেছেন—

নামটা শুনেই লাফিয়ে উঠলেন মুক্তিপদ। এতক্ষণ মনেই ছিল না। কথাটা মনে আসতেই মুক্তিপদ নিজের প্যান্ট-কোট-শার্ট বদলে নিলেন। আর দেরী করবার মত সময় নেই। তাড়াতাড়ি নিচেয় এসে দেখলেন চ্যাটার্জি বসে আছে। বিশ্বনাথকে আগের দিন বলা ছিল। সেও গাড়ি নিয়ে পোর্টিকোতে হাজির। মুক্তিপদ বললেন—চলুন, আমি একেবারে ভুলে গিয়েছিলুম, এত রকমের প্রবলেমস্‌ রয়েছে, লেবার কমিশনারের কথাটা মনেই পড়েনি—

লেবার কমিশনার হরিহর সেন। কে যে তাঁর নাম রেখেছিলেন জানা নেই। কারণ

'হরি' কিংবা 'হর' কারোর সংগেই তাঁর কোনও সম্পর্ক ছিল না।

কিন্তু মুখে তিনি সব সময়েই বলতেন—যারা আইন মেনে চলে তারা ভগবানকে পায়—আইনই ভগবান—

তাই সকালবেলা তিনি জপ-তপ-আহ্নিক সেরে তার দিনের কাজ আরম্ভ করতেন। ওটা যে তিনি শুধু ভক্তিতে করতেন তা নয়। ওটা যে কত সায়েনটিফিক তা কেউ জানে না। ওতে শুধু যে মনই ভালো থাকে তা নয়, স্বাস্থ্যও ভালো থাকে। সেকালের মুনি-ঋষিরা সবাই যে কত বড় বৈজ্ঞানিক ছিলেন তা আজকালকার লোকেরা কেউ জানে না। এইটা ছিল তাঁর প্রধান দুঃখ।

কাঁটায় কাঁটায় সকাল দশটার সময়েই তিনি তাঁর দফ্‌তরে হাজির হতেন। তার আগেই তাঁর জুনিয়ার এসে অফিসে ধুনো-গংগাজল দেওয়া শেষ করতো।

চারদিকের আবহাওয়া পবিত্র হলে তবেই তো বিচার পবিত্র হবে।

তার আসল ক্লায়েন্ট হলো বরদা ঘোষাল। হরিহর সেনের যা কিছু সম্পত্তি বা সম্পদ তার অর্ধেকের বেশি ওই বরদা ঘোষালের জন্যেই। বরদা ঘোষালের আবির্ভাবের পর থেকেই হরিহর সেনের বাড়-বাড়ন্ত শুরু হয়েছে। বলতে গেলে বরদা ঘোষালই হরিহর সেনের জীবনে মা-লক্ষ্মী।

সেদিন ছিল তাঁর দফ্‌তরে 'স্যাক্সবি-মুখার্জি' কোম্পানির লেবার-ডিসপিউটের হিয়ারিং। বরদা ঘোষাল তাঁর দল-বল নিয়ে আগে থেকেই হাজির ছিল। গরীব লেবারদের কিছু উন্নতি করতেই হবে। মালিকের স্বৈরতন্ত্রীতা আর কতদিন সহ্য করবে বরদা ঘোষালের শিষ্যরা।

হরিহর সেন আগেই লেবার-কমিশনারের যথাযোগ্য টাকা পেয়ে গিয়েছিলেন দু'তরফ থেকে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জুনিয়ারও পেয়ে গিয়েছিল তার পাওনা টাকা।

কিন্তু সেটা তো তুচ্ছ। নৈবেদ্যর পাশে দুটো একটা কুচো বেলপাতার মত। তাতে তো দেবতার পেট ভরবে না।

তবু হরিহর সেন মুখ ভার করেন না। দু'পক্ষেরই উকিল হাজির ছিল। তারাও বেশ খুশী খুশী। আগেও কয়েকদিন মামলার শুনানী হয়ে গেছে। কোনও ফয়সালা হয়নি। ফয়সালা হওয়াটা কোনও পক্ষের উকিলই চায় না।

শুনানী যখন আরম্ভ হলো তখন বরদা ঘোষালের তরফের বক্তা বললে—হুজুর, মেহনতী মানুষ চিরকালই শোষিত হয়ে আসছে, এ তো সবাই-ই জানে। তাই এই আর্জি। মেহনতী মানুষরা আর কিছু চায় না, শুধু চায় সুবিচার।

মুক্তিপদ মুখার্জির উকিল বললেন—তাহলে কি বুঝতে হবে, আমরা সুবিচার করিনি। তাছাড়া মেহনতী মানুষরাই তো মালিকদের খাওয়াচ্ছে। তাদের ওপর আমরা অবিচার করবোই বা কেন?

--তা মেহনতী মানুষরাই যদি মালিকদের খাওয়াচ্ছে, তাহলে তাদের ওপর মালিক-দের এত শোষণ কেন? তাদের বাড়িতে পুলিশ দিয়ে এত সার্চ হয় কেন?

--কার কথা বলছেন?

—কেন, শিফ্‌ট-ইন-চার্জ বেণুগোপালের বাড়ি পুলিশ পাঠানো হলো কেন? কেন তার বাড়ি সার্চ করা হলো? বাড়ি সার্চ করে কি কিছু পাওয়া গিয়েছিল?

—কারোর বিরুদ্ধে সেরকম কমপ্লেন থাকলে সার্চ করাই তো নিয়ম।

—মালিক যদি কমপ্লেন পায় তো ফ্যাক্টরির সিকিউরিটি ডিপার্টমেণ্ট তো সার্চ করবেই, তা না হলে সিকিউরিটি অফিসার রাখার নিয়ম আছে কেন?

—না এ-সব হ্যারাসমেণ্ট ছাড়া আর কিছুই নয়।

মুক্তিপদ মুখার্জির উকিল বললেন—কোন্‌টা হ্যারাসমেণ্ট আর কোন্‌টা

হ্যারাসমেণ্ট নয়, তার বিচার কে করবে ?

বরদা ঘোষালের উকিল বললেন—সেইটে বিচার করবার জন্যেই তো লেবার কমিশনারের পোস্টটা তৈরি করা হয়েছে—

—কিন্তু আমাদের কাছে খবর এসেছিল বেণুগোপাল ওয়ার্কশপের একটা মেশিন পুড়িয়ে দেওয়ার জন্যে এক লাখ টাকা ঘুষ পেয়েছিল ইউনিয়নের কাছ থেকে।

বিরোধী পক্ষের উকিল বললেন—স্যার, আপনাকেই বিচার করতে হবে এ যুক্তি কতটা গ্রহণযোগ্য। গরীব মেহনতী মানুষের ইউনিয়ন, নিজেরাই যে মাইনে পায় তাতে তারা নিজেদের পেটই চালাতে পারে না, তারা এক লাখ টাকা ঘুষ কোথা থেকে দেবে ?

মুক্তিপদ মুখার্জির উকিল বললেন—বাইরে থেকে টাকা আসতে পারে—

—বাইরে থেকে মানে ?

—মানে গভর্মেণ্টের কাছ থেকে।

কথাটা বলবার সঙ্গে সঙ্গে দফ্তর আগুন হয়ে উঠলো। চিৎকার, হৈ-হৈ, টেবিল চাপড়ানোর শব্দ, হট্টগোল, গালাগালি...

—অর্ডার—অর্ডার—

হরিহর সেন মুখ গম্ভীর করলেন। বললেন—আমরা এখানে দুপক্ষের বক্তব্য শুনতে সবাইকে ডেকেছি, হট্টগোল করতে নয়—

—স্যার গভর্মেণ্ট মেহনতী মানুষদের ইউনিয়নকে ঘুষ দেয় এ-কথা উনি বললেন কোন্ অধিকারে ? শুধু বললেই চলবে না, প্রমাণ চাই, প্রমাণ দিতে হবে--

—ঘুষের প্রমাণ রেখে কেউ ঘুষ দেয় না।

—কিন্তু গভর্মেণ্ট যে ইউনিয়নকে ঘুষ দেবে, তাতে তার স্বার্থ কী ?

স্বার্থ পার্টি। পার্টি বাঁচলে তবে গভর্মেণ্ট বাঁচবে ! পার্টি চায় তাদের পার্টির গভর্মেণ্ট চলুক, আর গভর্মেণ্ট চায় পার্টি চলুক। এই-ই তাদের স্বার্থ।

তারপর একটু থেমে মুক্তিপদর উকিল আবার বললেন—তাই গভর্মেণ্ট একদিকে চায় মালিক লে-অফ্, লক-আউট, ক্লোজার ডিক্লেয়ার করুক, আবার অন্যদিকে তেমনি চায় মেহনতী মানুষ আন্দোলন করুক, স্ট্রাইক করুক। এই জন্যেই আজ বেঙ্গলে কল-কারখানায় এত অচল অবস্থা, এই জন্যেই এখানে এত বেকার, এই জন্যেই এখান থেকে কল-কারখানা ইণ্ডিয়ার অন্য স্টেটে চলে যাচ্ছে, এই জন্যেই কলকাতা ধ্বংস হতে চলেছে, একদিন ইণ্ডিয়ার ম্যাপ থেকে কলকাতা মুছে যাবে, আর...

এই সময়ে হরিহর সেন বলে উঠলেন--আজ এই পর্যন্ত থাক, অন্য একদিন এ মামলার শুনানী হবে...

দুপক্ষই নিরস্ত হলো। এবার অন্য দল আসবে, এবার সে পার্টির শ্রমিকদের পক্ষে আর বিপক্ষে শুনানী হবে। এখন তোমরা যাও, এখন তোমরা গিয়ে আজকের মত বিশ্রাম করো। যথাসময়ে তোমাদের দিন-ক্ষণ-তারিখ যথাস্থানে জানিয়ে দেওয়া হবে।

মুক্তিপদ আর কান্তি চাটার্জি বাইরে বেরিয়ে গাড়িতে উঠতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় তাঁর উকিল সমীরণবাবু এলেন।

—একটা কথা ছিল স্যার।

একদিকে সরে এলেন মুক্তিপদ। সমীরণবাবু কানের কাছে মুখ এনে বললেন-- সন্ধ্যেবেলা আপনি একটু ফ্রী আছেন স্যার ?

- কেন বলুন তো ?

—একটা কথা ছিল আপনার সঙ্গে, সেখানেই বলবো ভেবেছিলুম...

মুক্তিপদ বললেন—কিছু টাকা দিতে হবে তো লেবার কমিশনারকে ?

সমীরণবাবু কথাটা শুনেই দাঁত দিয়ে জিভ্ কাটলেন।

বললেন—ছি ছি, কী বলছেন আপনি? উনি টাকা ছোঁন না। নামেও উনি হরিহর, কাজেও উনি তাই। আপনার সঙ্গে আমি অন্য কথা বলবো

—বিষয়টা কী, বলুন না—

—সেটা তখনই বলবো—এখন যাই, এখুনি আবার অন্য একটা কেস আছে লেবার কমিশনের কাছে—আমি রাত্তির আটটার সময় আপনার সঙ্গে দেখা করবো—ঠিক রাত আটটায়—

তা রাত আটটা বলতে ঠিক রাত আটটাতেই। এক মিনিট আগেও নয়, কি এক মিনিট পরেও নয়। উকিল সমীরণ দে-সরকার জীবনে কখনও সময়ের অপব্যবহার করেন নি। মুক্তিপদ রাত আটটার সময়ে তৈরিই ছিলেন তাঁর জন্যে। সমীরণ দে-সরকার আসতেই তিনি তাঁকে আপ্যায়ন করে বসালেন। কোথায় কলকাতা আর কোথায় বেলুড়। অনেক কষ্ট করেছেন তিনি আসতে।

তা সে-সব কথা ভাবলে কাজের লোকদের চলে না।

মুক্তিপদ বললেন—বলুন, এবার আপনার কাজের কথাটা বলুন মিস্টার দে-সরকার—

সমীরণবাবু বললেন—কথাটা ওখানেও বলা যেত, কিন্তু তখন আমার হাতে আরো কয়েকটা কেস ছিল, তাই আমার মাথার ঠিক ছিল না। আর টাকার কথাগুলো ওই ওখানে বলাটাও ঠিক হতো না—

—টাকার কথা? তার মানে? আপনি যে বললেন হরিহর সেন টাকা ছোঁন না—

সমীরণ দে-সরকার বললেন—না স্যার, কথাটা এক বর্ণও মিথ্যে নয়। আজ পর্যন্ত এ দুর্নাম ওঁর পরম শত্রুও দিতে পারবে না।

—তাহলে? কীসের টাকা?

—সে আমি এখন আপনাকে বলবো না।

—তার মানে?

সমীরণবাবু বললেন—তার মানে আমি পরে আপনাকে সব বলবো। আপনি আমাকে বিশ্বাস করে টাকা দিতে পারেন, তাতে আপনি ঠকবেন না। আপনি তো আপনার ফ্যাক্টরির ভাল চান?

—তা তো চাই-ই—

—তাহলে বিশ্বাস করুন, আমি নিজেও আপনার ফ্যাক্টরির ভালোই চাই। আমি চাই যে আপনার ফ্যাক্টরির স্টাফদেরও ভালো হোক! এর বেশী আর আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করবেন না। যা বলছি তা করুন। শুধু টাকাটা দিয়ে দিন—

—কত?

—পাঁচ হাজারের মত।

নিঃশব্দে ভেতর থেকে টাকাগুলো নিয়ে এসে সমীরণবাবুকে দিয়ে দিলেন।

সমীরণ দে-সরকারও আর উচ্চ-বাচ্য না করে সোজা বাইরে গিয়ে গাড়িতে উঠে চলে গেলেন।

সমীরণ দে-সরকারও চিরকাল মুক্তিপদর সহযোগিতা করে এসেছেন। এমন কোনও ঘটনা কখনও ঘটেনি যখন সমীরণবাবু তাঁর কাছে অবিশ্বাসী হওয়ার কারণ ঘটিয়েছেন। মুক্তিপদ জানতেন সমীরণবাবুকে চোখ বুজে বিশ্বাস করা চলে। তাই টাকাগুলো তাঁর হাতে তুলে দিয়ে তিনিও নিশ্চিন্ত হলেন।

আর এদিকে সমীরণবাবুর গাড়িও তখন বেলুড় ছেড়ে হু-হু করে এগিয়ে চলেছে কলকাতার উদ্দেশ্যে। ওদিকে রাতও বাড়ছে। কিন্তু বেশি দেরি হওয়ার আগেই তাঁকে যথা-নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছতে হবে। তাই গাড়িটা যখন হরিহর সেনের

বাড়ির সামনে এসে পৌঁছুল তখন তাঁর ঘড়িতে দশটা বাজেনি।

যথারীতি সমীরণবাবু সদর দরজায় কলিং বেলটা বাজালেন। যথারীতি একজন এসে দরজাটা খুলে দিলে আর যথারীতি একজন মহিলা এসে হাসিমুখে হাজির হলেন। সমীরণবাবু যথারীতি তাঁর হাতে টাকার বান্ডিলটা তুলে দিলেন।

মহিলাটি বান্ডিলটা হাতে নিয়ে যথারীতি জিজ্ঞেস করলেন—কত?

সমীরণবাবু বললেন—পাঁচ...

মহিলাটি যথারীতি আর কিছু কথা না বলে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন।

এ যেন ম্যাজিক। কে টাকাটা দিলে, কীসের জন্যে টাকা দিলে, কাকে টাকাটা দেওয়া হলো, মহিলাটি সমীরণবাবুর কাছ থেকে কেন টাকাটা নিলেন, তা কোনও পক্ষই প্রশ্ন ওঠালো না। মহিলাটির সঙ্গে সমীরণবাবুর কী সম্পর্ক, তা জিজ্ঞেস করাও যেন নিরর্থক! এমনি নিঃশব্দেই ঘটনাটা ঘটে গেল।

আর এখানেই সমীরণবাবুর কর্তব্য শেষ। সদর দরজাটা বন্ধ হয়ে যেতেই তাঁরও গাড়িতে উঠে দ্রুত প্রস্থান।

আসল মজা হলো এই যে মুক্তিপদ মুখার্জি নিশ্চিন্ত হলেন এই ভেবে যে লেবার-কমিশনারের দফ্তরে তাঁর জয় নিশ্চিত, সমীরণ দে-সরকার এই ভেবে প্রসন্ন হলেন যে তাঁর প্র্যাকটিস জম্‌জমাট রইলো, আর হরিহর সেনের বাড়ির মহিলাটিও এই ভেবে খুশী হলেন যে তাঁর সংসার-যাত্রার ব্যয় নির্বাহ হওয়ার বাইরে আরো কিছু অতি আবশ্যকীয় বিলাসিতার সামগ্রী বিনা পরিশ্রমে অর্জিত হলো।

আর 'স্যাক্‌সবী মুখার্জি'র মেহনতি মানুষ? তাদের কী হবে?

তাদের কথা ভাবুক সরকার আর তার দালালের দল।
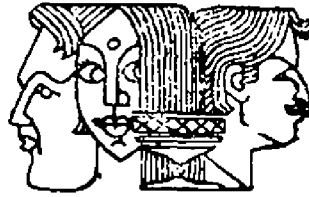
লন্‌ডন্ অফিসের মিস্টার আয়েঙ্গার সেই দিনই টেলেক্সে কথা বললেন মুক্তিপদ মুখার্জি'র সঙ্গে। কমললাল মেটার সমস্ত কাজ বুঝে নিয়েছে আয়েঙ্গার। আয়েঙ্গার বর্ন ম্যাথামেটিসিয়ান। অঙ্কটা সাউথ-ইন্ডিয়ানদের সহজাত। সৌম্যপদও সব কাজ বুঝে নিয়েছে। বিলেতের অফিস কীরকম করে এতদিন চলে এসেছে এবং এখন কী ভাবে চলা উচিত—সে সম্বন্ধেও দুজনের মধ্যে নাকি অনেক আলোচনা হয়েছে।

—কেমন দেখলেন সৌম্যকে? ইন্‌টেলিজেন্ট?

আয়েঙ্গারের ভাবী মালিক যখন সৌম্য তখন তার সম্বন্ধে কী মন্তব্য করতে হয় তা আয়েঙ্গারকে কেউ শিখিয়ে দেয়নি। সহজাত-বুদ্ধি দিয়েই বলেছে-হ্যাঁ স্যার, খুব ইন্‌টেলিজেন্ট—

—ঠিক সময়ে হোটেল থেকে অফিসে আসে তো?

—হ্যাঁ স্যার ভেরি পাঙ্‌চুয়াল আর রেগুলার—

—আর সিগারেট? খুব সিগারেট খাওয়া ধরেছে নাকি?

আয়েঙ্গার বললে—না স্যার, আমি কোনওদিন মিস্টার মুখার্জিকে সিগারেট খেতে দেখিনি—

তারপর একটু থেমে আবার বললো—আমি আচমকা তাঁর হোটেলেও গিয়ে পড়েছি। তখনও দেখেছি তিনি সিগারেট খাচ্ছেন না—

—আর ড্রিংকস্?

আয়েঙ্গার বললে—না স্যার, তাও না।

তিন মিনিটের টেলেক্সে আর কতটুকুই বা কথা বলার ফুরসৎ থাকে। তবু মুক্তিপদ যখনই সময় পান আয়েঙ্গারের সঙ্গে কথা বলেন। প্রসঙ্গটা বেশির ভাগই সৌম্যকে নিয়ে। এটা ভালোই হয়েছে যে সৌম্যকে লন্ডনে পাঠানো হয়েছে। এদিকে ফ্যাক্টরি বন্ধ. তা নিয়ে লেবার-কমিশনারের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক কথা চলছে। তার জন্যে টাকাও খরচ হয়ে যাচ্ছে জলের মতো। অন্যদিকে অতুল চ্যাটার্জিও সৌম্যের জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করে আছেন।

রোজই টেলিফোন করেন—কী হলো, লন্ডনের কিছু খবর আছে?

মুক্তিপদ বলেন—আছে।

· কী খবর?

মুক্তিপদ বলেন—খুব ভালো খবর। আমি আয়েঙ্গারকেই লন্ডন্ অফিসের হেড্ করে দিয়েছি।

—আর সৌম্য?

—সৌম্যই তো এই সব কিছু করলে। তার একটা খবর শুনে আশ্চর্য হয়ে গেলুম। সেখানে গিয়েও সে আমাদের বাড়ির কথা ভোলেনি। আমার মা যেমন ভাবে তাকে থাকতে বলেছিলেন তেমনি ভাবেই সেখানে সে দিন কাটাচ্ছে। শুনলাম সিগারেটও খায় না, ড্রিংকস্‌ও ছোঁয় না। আর একটা কথা শুনলে আপনি অবাক হয়ে যাবেন। আমার মা এখান থেকে যাওয়ার সময় ওর পকেটে একটা সিংহবাহিনীর ছবি দিয়ে দিয়েছিলেন। ও কথা দিয়েছিল যে ও রোজ ছবিটাকে প্রণাম করবে। তা শুনলাম ও নাকি এখনও তাই-ই করে যাচ্ছে –

মিস্টার চ্যাটার্জি বললেন—বাঃ, ভারি চমৎকার কো-ইন্‌সিডেন্স্! বিনীতাও তাই! জানেন বিনীতা এই বয়েসেই রোজ ঠাকুর-ঘরে গিয়ে পুজো করে—

—পুজো? পুজো করে আপনার মেয়ে?

—হ্যাঁ, বিশ্বাস করুন! আমি এতটুকু বাড়িয়ে বলছি না। ওকে নিয়ে কতবার বাইরে গিয়েছি। দেখেছি সেখানে গিয়েও বিনীতা অভ্যেসটা ছাড়েনি। দুজনে মিলবে খুব ভালো!

সত্যিই দুজনে খুব ভালো মিলবে। ঠাকমা-মণিকেও খবরটা জানালেন মুক্তিপদ। ঠাকমা-মণিও শুনে খুব খুশী হলেন। বললেন—সবই খোকার কপাল—

মুক্তিপদ বললেন—আমি যখন তোমাকে বলেছিলাম তখন তো তুমি গ্রাহ্যি করোনি—এখন তো সব শুনলে। এখন তোমার বউমার কপালে যদি আমাদের কারখানাটা আবার দাঁড়ায়—

ঠাকমা-মণি বললেন—এত করে সত্যনারায়ণ পুজো তো সেই জন্যেই দিলুম—

মুক্তিপদ বললেন—তাহলে তোমার রাসেল স্ট্রীটের বাড়িটা ওদের তুমি খালি করে দিতে বলো··

ঠাকমা-মণি বললেন—তা তো খালি করে দিতেই হবে—

—হ্যাঁ, এখনই খালি করে দিতে হবে। আর ক'দিন পরেই তো সৌম্য আসছে—

—কেন. তোকে খোকা চিঠি লিখেছে নাকি?

—হ্যাঁ—

—কবে আসছে?

মুক্তিপদ বললেন—আসছে মাসেই চলে আসছে—

ঠাকমা-মণি বললেন— তাহলে বিয়ের তারিখটা কবে ঠিক করবি?

মুক্তিপদ বললেন—সে তুমিই ঠিক করো। আমি আর কী বলবো? আর মিস্টার চ্যাটার্জির কী মত তাও জিজ্ঞেস করতে হবে। বিয়েটা যত তাড়াতাড়ি হয় আমাদের পক্ষে ততই তো মঙ্গল। আমার ফ্যাক্টরিটাও তো তত তাড়াতাড়ি খুলবে—

—তাহলে একটা কাজ কর। বাড়িটারও একবার কলি করিয়ে নেওয়া দরকার। অনেকদিন তো ওতে হাত পড়েনি -

তা তাই-ই সাব্যস্ত হলো। সঙ্গে সঙ্গে ডাক পড়লো মল্লিক-মশাই-এর। মল্লিক-মশাই এ-কাজ আগেও অনেকবার করেছেন। তাঁর বাঁধা কনট্রাকটার আছে, ঠিকেদার আছে, রাজমিস্ত্রী আছে। টাকা ছাড়লে লোকের অভাব হয় না। বিশেষ করে কলকাতা শহরে। দেখতে দেখতে বাড়ির বাইরে বাঁশের আর লোহার ভারা বাঁধা হলো। চুন, সিমেন্ট, বালির পাহাড় জমে উঠলো বাড়ির সামনে। একসঙ্গে একশো রাজমিস্ত্রী দুশো মজুর এসে কাজে হাত লাগিয়ে দিলে।

রাস্তা দিয়ে যেতে গিয়ে লোকে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো বাড়ির সামনে। জিজ্ঞেস করলে—এ-বাড়িতে মিস্ত্রী লাগছে কেন দাদা?

কেউ জানে না কী কারণ। কিন্তু আস্তে আস্তে সবাই জেনে গেল। একজনের মুখ থেকে সকলের মুখে খবরটা ছড়িয়ে পড়লো। এ-বাড়ির একমাত্র নাতির বিয়ে হবে তারই তোড়জোড় চলছে এখন থেকে।

গিরিধারীও প্রথমে জানতো না, সে ম্যানেজারবাবুকেই চেনে। জিজ্ঞেস করলে —বাড়ি চুনকাম কেঁও হো রহা হুয়া ম্যানেজারবাবু?

মল্লিক-মশাই বললেন খোকাবাবুর সাদি হবে—

—কৌন্ খোকাবাবু?

মল্লিক-মশাই বললেন আরে খোকাবাবু আবার কজন আছে এ-বাড়িতে? খোকাবাবু তো একটাই, যে-খোকাবাবু বিলেতে আছে –

এতক্ষণে গিরিধারী বুঝতে পারে। কথাটা শুনে তার আনন্দ হলো। আনন্দ হলো খোকাবাবুর বিয়ে হচ্ছে বলে নয়, আনন্দ হলো খোকাবাবুর বিয়েতে তাদের নতুন জামা-কাপড় হবে বলে। শুধু যে গিরিধারীই নতুন জামা ধুতি পাবে তা নয়, এ বাড়িতে যারাই আত্মীয়-অনাত্মীয়-আশ্রিত আছে তারা সবাই-ই বিয়ে উপলক্ষে নতুন ধুতি-জামা পাবে। ঠাকমা-মণির খাস ঝি বিন্দু পাবে, তিন-তলার ঝি ফুল্লরা পাবে। সিংহবাহিনী ঠাকুর-বাড়ির ঝি কামিনী পাবে! পুজো করবার পুরুতমশাই পাবে! অরবিন্দ ড্রাইভার পাবে। মেজবাবুর ড্রাইভার বিশ্বনাথ পাবে। ঠাকুর-বাড়ির ফুলে বেলপাতা সাপ্লায়ার কন্দর্প পাবে। গঙ্গার বাবুঘাটের পাণ্ডা দশরথও পাবে। রান্না-বাড়ির ঠাকুর-চাকর তারাও জামা-ধুতি পাবে।

কর্তাদের বিয়ের সময় যেমন-যেমন সবাইকে দেওয়া হয়েছিল, এই নাতির বিয়েতেও তাই-ই দেওয়া হবে সকলকে। কোনও বাদ-বিচার করা হবে না।

আর মিষ্টি?

কেমন করে জানি না খবরটা মিষ্টির দোকানদারদের কানে চলে গিয়েছিল। কলকাতার সব বনেদী নাম-করা মিষ্টির দোকানদার। ভীম নাগ থেকে আরম্ভ করে গাঙ্গুরাম পর্যন্ত এক এক করে সবাই এসে দরবার করলে মল্লিক-মশাই-এর কাছে।

সকলেরই এক কথা। আপনাদের বাড়িতে শুনছি আবার বিয়ে লাগছে?

মল্লিক-মশাই বলেন—হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন, বিয়ে লাগছে –

—তা মিষ্টির অর্ডার দিচ্ছেন কাকে?

মল্লিক-মশাই বলেন—আগে বিয়ের তারিখটা হোক—

—কবে নাগাদ বিয়েটা হবে?

মল্লিক-মশাই বলেন তা ঠিক বলা যায় না। এখনও দিন স্থির হয়নি—

—আন্দাজ? আন্দাজে তো একটা তারিখ বলা যায়?

মল্লিক-মশাই বলেন—আন্দাজেই বা কী করে বলবো? আমি তো হুকুমের চাকর। বাড়ির মালিক আমাকে যেমন-যেমন হুকুম করবে, আমি তেমন-তেমন করবো। আমার কী রে বাপু? আমি কে?

তারা বলে—না, না, আপনিই সব ম্যানেজারবাবু। এর আগের বারে যখন এ-বাড়িতে উৎসব হয়েছিল, তখন তো আপনিই আমাদের মিষ্টির অর্ডার দিয়েছিলেন—

কিন্তু কে কার কথা শোনে! সবাই চলে যায় বটে, কিন্তু আশা কেউ ছাড়ে না। এ-বাড়ির একটা অনুষ্ঠানের অর্ডার পেলেই তারা সারা বছরের মত আয় করে নিতে পারবে। কিন্তু বিয়ে হবে কোন্ বাড়ির মেয়ের সঙ্গে সেইটেই হলো আসল প্রশ্ন। কোন্ সে ভাগ্যবতী মেয়ে?

এ প্রশ্নের কোনও জবাব কেউ-ই পেলে না। আর সে-জবাব পেয়েই বা আমাদের কী লাভ? আমাদের খাওয়া-পরা আর ফুর্তি করাটাই হলো আসল কাজ। এ-ছাড়া আমাদের আর কীসের ভাবনা বলুন? খাওয়া-পরা চুলোয় যাক, আগে টাকা চাই, টাকা চাই সকলের আগে। টাকা পেলেই তবে আমরা ধর্ম-অর্থ-মোক্ষ-কাম সব কিছু পেয়ে যাবো। এই নশ্বর পৃথিবীতে টাকাটাই তো হলো একমাত্র সত্য। আর সব কিছুই তো মিথ্যে।

বারোর-এ বিডন্ স্ট্রীটের বাড়ির সামনে অনেক লোকই এসে রাজমিস্ত্রী খাটার দৃশ্য দেখতে খানিকক্ষণ দাঁড়ায়। ওপরের দিকে চেয়ে দেখে, তারপর আবার যার-যার নিজের গন্তব্যস্থলের দিকে পা বাড়ায়।

কখনও কখনও গিরিধারীকে আবার কেউ-কেউ জিজ্ঞেস করে—দারোয়ানজী, এ-বাড়িতে এত রাজমিস্ত্রী খাটছে কেন গো? কী হবে? পুজো-টুজো কিছু আছে নাকি?

গিরিধারী সকলকে একই জবাব দেয়, বলে খোকাবাবুকা সাদি হোনে-ওয়ালা হ্যায়—

'ও' বলে সবাই যে-যার দিকে চলে যায়।

কিন্তু সেদিন একটা নতুন লোক এসে অন্য কথা জিজ্ঞেস করলে—দরোয়ানজী, এ-বাড়ীতে সন্দীপবাবু নামে কেউ আছে? সন্দীপ লাহিড়ী?

গিরিধারী বললে—নেহি বাবুজী, সন্দীপবাবু আভি ঘরমে নেহি হ্যায়, বাহার নিকাল গয়া

বাইরে গেছে? এত কষ্ট করে এত দূর এসেও দেখা হলো না!

লোকটা বললে—দারোয়ানজী, সন্দীপবাবু বাড়িতে এলে বলে দিও আমি তার সঙ্গে একটা জরুরী কথা বলতে এসেছিলুম—

—আপকা শুভনাম?

—বোল আমি তিন নম্বর মনসাতলা লেন, খিদিরপুর থেকে এসেছিলুম তার সঙ্গে দেখা করতে! আমার নাম শ্রীতপেশচন্দ্র গাঙুলী—

কথাটা বলে তপেশ গাঙুলী বাড়ির সামনে লম্বা-লম্বা বাঁশের ভারা বাঁধা দেখে জিজ্ঞেস করলে—এ সব কী হচ্ছে দারোয়ানজী, এত রাজমিস্ত্রী-মজুর খাটছে কেন? বাড়িতে কোনও বিয়ে-সাদি আছে নাকি?

—জী হা। খোকাবাবুর সাদি হবে।

—খোকাবাবু? কোন্ খোকাবাবু? যে-খোকাবাবু বিলেতে আছে? তার সাদি হবে?

—জী হ্যাঁ!

তপেশ গাঙুলী তাতেও নিরস্ত হলো না। জিজ্ঞেস করলে—কোথায় সাদি হবে? রাসেল স্ট্রীটের বাড়িতে যে মেয়েকে তোমার ঠাকমা-মণি রেখে দিয়েছে সে মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হবে?

দেহাতী দারোয়ান গিরিধারী সে-সব নিয়ে কোনও দিন মাথাও ঘামায়নি কখনও। তার একমাত্র আনন্দ এই ভেবে যে সৌম্যবাবু বিলেত থেকে ফিরে এলে আবার তাকে মদের ঝোঁকে মুঠো মুঠো টাকা বখশিস দেবে। তাহলে আবার সে দেহাতে তার ছেলেকে মোটা টাকা মানি-অর্ডার করে পাঠাতে পারবে!

তপেশ গাঙুলী আবার জিজ্ঞেস করলে—কিছু বলছো না যে দারোয়ানজী, সেই রাসেল স্ট্রীটের বাড়িটার মেয়েটার সঙ্গেই বিয়ে হবে তো?

গিরিধারী আর কী-ই বা বলবে! বললে—জী হাঁ—

কথাটা শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেল তপেশ গাঙুলীর। কপাল রে, সবই কপাল! বউদিরও কপাল আর বিশাখারও কপাল! আর পাশাপাশি তেমনি পোড়া কপাল তার রাণীর আর বিজলীর।

সন্দীপের কাছে এসেছিল একটা মাস্টারির আশায় আর নিজের চোখে দেখে গেল সেই বিশাখার বিয়ের আয়োজন! চোখ দিয়ে টস্-টস্ করে জল পড়ছিল। সেটা রুমাল দিয়ে মুছে ফেললে। লোকে দেখলে ভাববে পাগল!

এবার আর দেরি করা নয়। তপেশ গাঙুলী বড় রাস্তায় এসে একটা দোতলা বাসে উঠে পড়ে একেবারে সোজা বাড়ি এসে হাজির।

ছোটবেলায় তাদের ইস্কুলের বইতে একটা ইংরিজী কবিতা ছিল। কবিতাটা তার প্রায় মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। তখন থেকেই তপেশ গাঙুলীর মনে হতো যদি কোনও দিন বড় হয়ে অনেক টাকা হয় তো সেই টাকা দিয়ে সে অনেক সোনা কিনবে।

কবিতাটা এখনও মনে আছে ঃ

> Gold ! gold ! gold ! gold !
> Bright and yellow, hard and cold,
> Molten, graven, hammer'd and roll'd ;
> Heavy to get, and light to hold ;
> Hoarded, barter'd bought and sold,
> Stolen, borrow'd, squander'd, doled :
> Spurned by the young but hugg'd by the old
> Price of many a crime untold
> Gold ! gold ! gold ! gold . .

সব লাইনগুলো মনে পড়ছে না। ওই একটা জিনিসই মনে-প্রাণে চেয়েছিল তপেশ গাঙুলী। আর মজা এই যে ওই জিনিসটাই সে জীবনে পায়নি। লোকে বলে যে মনে-প্রাণে একান্তভাবে যা চাওয়া যায় তা নাকি পাওয়া যায়ই। ছাই, ছাই পাওয়া যায়। সে তো ছোটবেলা থেকে মনে-প্রাণে টাকাটাই চেয়েছিল, কিন্তু তা কি সে পেয়েছে? কালীঘাটের মন্দিরে গিয়ে কতবার সে মা-কালীর সামনে উপুড় হয়ে পড়ে টাকাই চেয়েছিল। কিন্তু কই, মা তো তাকে টাকা দিলেন না।

বাড়িতে গিয়েই বিজলীকে ডাকলে। স্বামীর গলা শুনে রানী এল।

—কী ব্যাপার? তুমি অফিসে যাওনি?

তপেশ গাঙুলী বললে—আর অফিস! ওদিকে সব্বোনাশ হয়ে গেছে—

—কার সব্বোনাশ? কী সব্বোনাশ?

তপেশ গাঙুলী জিজ্ঞেস করলে—বিজলী কোথায়?

—ওই তো পাশের ঘরে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। কেন? সে কী করবে?

—তাকে ডাকো। এখুনি তোমাদের দুজনকে নিয়ে রাসেল স্ট্রীটে বউদির বাড়িতে যাবো।

রানী বললে—হঠাৎ? সেখানে যাবে কেন?

তপেশ গাঙুলী বললে—ওই যে বললুম সব্বোনাশ হয়ে গেছে।

কী সব্বোনাশ হলো, তা বলবে তো?

তপেশ গাঙুলী বললে—আর বলো কেন? এবার সত্যিসত্যিই বিশাখার বিয়েটা হচ্ছে।

—কী করে জানলে?

তপেশ গাঙুলী বললে—আজকে সেই ছোঁড়াটার খোঁজে তার বিডন্ স্ট্রীটের বাসায় গিয়েছিলুম। গিয়ে দেখি সেখানে এলাহী কাণ্ড চলছে। সমস্ত বাড়িটা রং করা হচ্ছে। সামনের গেটে দরোয়ানটা দাঁড়িয়ে ছিল। তাকে জিজ্ঞেস করতেই সে বললে সে-বাড়ির খোকাবাবু বিলেত থেকে আসছে. কলকাতায় এলেই তার বিয়ে হবে। তাই বাড়ি সাজানো হচ্ছে—

শুনে রানীর মুখটা কেমন যেন শুকিয়ে গেল। তবু যেন তার বিশ্বাস হলো না। জিজ্ঞেস করলে -সত্যি বলছো?

তপেশ গাঙুলী বললে—সত্যি না তো কি মিথ্যে? বউদি এতদিন বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে: তুমি তো একবারও গেলে না। এখন যদি না যাও তো ভাববে তোমার বোধহয় বউদির ওপরে হিংসে হয়েছে। তাই বলছি এখন একবার গেলে বউদি খুব খুশী হবে—চলো না—

রানী কথাগুলো শুনে খানিকক্ষণ ভাবতে লাগলো।

তপেশ গাঙুলী বললে—কী ভাবছো? যাবে?

রানী তখনও কিছু উত্তর দিলে না।

তপেশ গাঙুলী বললে -আবার ভাবছো কী? চলো চলো, আমাদের ভালোর জন্যেই তোমাদের যেতে বলছি। দ্যাখো, বড়লোকদের কাছাকাছি থাকাও ভালো। তাদের ছোঁওয়া লেগে আমাদেরও কিছু ভালো হতে পারে, বলা তো যায় না-

কথাটা রানীর কাছেও যেন যুক্তিযুক্ত বলে মনে হলো। সেও আর সময় নষ্ট না করে তৈরি হওয়ার জন্যে ভেতরে চলে গেল।

তপেশ গাঙুলী বলে দিলে—তোমরা শিগগির তৈরি হয়ে নাও, আমি ট্যাক্সি ডেকে আনছি—
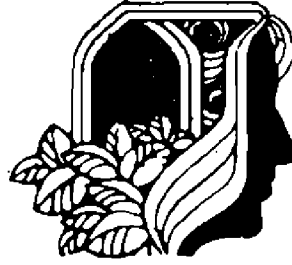
ব্যাঙ্কের চাকরির জন্যে সন্দীপের কোনও দিনই লোভ ছিল না। বরাবর ইচ্ছে ছিল সে কাশীবাবুর মত উকিল হবো, কালো কোট গায়ে কাশীবাবুকে দেখে তার খুব ভালো লাগতো। ভাবতো ওই রকম কালো কোট পরে কবে সে কোর্টে প্র্যাকটিস্ করতে পারবে। কিন্তু ঘটনাচক্রে সে ব্যাঙ্কের পরীক্ষায় পাশ করে গেল!

মনে আছে সেদিন যখন সে ব্যাঙ্কের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো তখন সেখানে অনেক ভিড়। যত লোক পরীক্ষায় পাশ করেছে তাদের সবাইকে ডাকা হয়েছে। এর পর যারা স্বাস্থ্য পরীক্ষায় পাশ হবে তাদের রেখে বাকিদের বাতিল করা হবে।

কেউ কাউকে চেনে না। অল্পক্ষণের মধ্যেই অনেকের সঙ্গেই আলাপ-পরিচয় হয়ে গেল। সন্দীপ একজনকে সামনে পেয়ে জিজ্ঞেস করলে—হেল্থ্‌- পরীক্ষায় কী-কী দেখবে ডাক্তার?

সে ছেলেটি বললে—বেশি করে দেখবে চোখ। আপনার চোখ খারাপ নয় তো?

সন্দীপ বললে -মনে তো হয় আমার চোখ ভালোই আছে—

ছেলেটি বললে—চোখ ভালো থাকলেও টাকা লাগবে -·

– টাকা? কেন? টাকা কীসের জন্যে লাগবে?

—ঘুষ! ডাক্তারকে ঘুষ দিতে হবে না?

সন্দীপ কথাটা শুনে অবাক হয়ে গেল। বললে -টাকা তো আমি আনিনি। কত টাকা লাগবে?

ছেলেটা বললে -তা কি বলা যায়? যদি চোখ ভালো থাকে তা হলে কম টাকা লাগবে। পঞ্চাশ টাকার মধ্যেই হয়ে যাবে। কিন্তু চোখে যদি কিছু দোষ পায় তখন ডবল্ টাকা লাগবে। অন্তত একশো টাকার মতন—

সন্দীপ বড় বিপদে পড়লো। তার পকেটে তো অত টাকা নেই। কী করবে সে?

বললে -আমি তো এসব জানতুম না। টাকা তো সঙ্গে আনিনি আমি।

ছেলেটা বললে -টাকা না দিলে কিন্তু আপনাকে ডাক্তার ফেল করিয়ে দেবে—

অত টাকা এখন কে তাকে দেবে? এদিকে হাতে তখন তার সময়ও নেই। বাড়িতে গিয়ে মল্লিক-কাকার কাছ থেকে টাকা চেয়ে আনা যেতে পারে। ততক্ষণ সময় কি হাতে আছে? একটা ট্যাক্সি ধরে বাড়িতে গিয়ে আবার সেই ট্যাক্সিতেই ফিরে আসতে আধ ঘণ্টার বেশি সময় লাগবার কথা নয়।

ছেলেটিকে সন্দীপ নিজের সমস্যার কথা বলতেই সে বললে—তাই করুন, ডাক্তারকে টাকা দিতেই হবে, সে আপনার চোখ ভালো থাকুক আর না-ই থাকুক—

সেদিন ভাগ্য ভালো যে মল্লিক-কাকা তখন বাড়িতে ছিলেন। টাকাও তাঁর কাছে ছিল। ট্যাক্সিটা দাঁড় করিয়ে রেখে আবার সেই ট্যাক্সিতেই সন্দীপ উঠে বসেছিল।

কিন্তু একটা রাস্তার মোড়ে এসেই একেবারে ট্রাফিক জ্যাম। সার-সার অনেক গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। কিছুতেই আর নড়ে না।

সন্দীপ তখন ছটফট করছে ট্যাক্সির ভেতরে বসে। সামনে অনেক গাড়ি, অনেক বাস, অনেক ঠেলাগাড়ি। কারো এতটুকু নড়বার নাম নেই। ট্রাফিক-সিগন্যালটাও অনেক দূরে। এখান থেকে কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে সন্দীপ এখনই সামনের বাসে উঠতে পারে তাহলে সে অনেক তাড়াতাড়ি ব্যাঙ্কে পৌঁছতে পারে।

পাশের রাস্তার একটা লোককে যেতে দেখে সন্দীপ তাকে উদ্দেশ্য করে জিজ্ঞেস করল– কী হয়েছে মশাই? বলতে পারেন গাড়িগুলো আটকে গেছে কেন?

লোকটা বললে—কে জানে কী হয়েছে- অন্য কাউকে জিজ্ঞেস করুন, আমি জানি না—

বলে লোকটা নির্বিকার ভাবে তার নিজের কাজে চলতে লাগলো।

এ সব কি হলো? কোথাও কি কোনও নিয়ম-শৃংখলা থাকতে নেই? সবাই এত নির্বিকার কেন? কেন কেউ অন্যদের সুখ-দুঃখের কথা ভাবে না। অথচ সকলেরই তো কাজ আছে, সকলেরই তো বিপদ-আপদ আছে। কিন্তু আমরা যদি অন্যদের সুবিধে অসুবিধের কথা না ভাবি তাহলে দেশ কী করে চলবে, পৃথিবী কী করে সামনের দিকে এগিয়ে যাবে?

ট্যাক্সি ড্রাইভারেরও কোনও তাড়া নেই। সে নিশ্চিন্ত মনে স্টিয়ারিং ধরে বসে আছে। সে কেন মিছামিছি দুর্ভাবনা করতে যাবে। তার মিটারের অংক তো ক্রমে ক্রমে বেড়েই চলেছে। সন্দীপ তাকে জিজ্ঞেস করলে—সামনে কী হয়েছে দাদা—?

ট্যাক্সি-ড্রাইভার বললে—কে জানে কী হয়েছে—

সন্দীপ আবার জিজ্ঞেস করলে—একটু খবর নিন না, আমার একটু তাড়া আছে—

তাতেও ট্যাক্সি ড্রাইভারের কোনও মাথা-ব্যথার লক্ষণ প্রকাশ পেল না। সে যেমন হাত গুটিয়ে বসেছিল তেমনি বসেই রইল।

আর একজন লোক রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। সন্দীপ তাকেই ডাকলে—ও দাদা সামনে কী হয়েছে, বলতে পারেন?

লোকটার মেজাজ বোধহয় আগে থেকেই খারাপ ছিল। এবার সন্দীপের কথায় সেই-গরম মেজাজ যেন আরো গরম হয়ে গেল।

বললে—কী জানি শালার কী হয়েছে—যত্তো সব...

পুলিশ কী বলছে?

—পুলিশ আর কী বলবে! শুধু ঘুষ নেওয়া ছাড়া আর কোনও কাজ তো পুলিশ জানে না—

বলতে বলতে লোকটা অদৃশ্য। আরো কাউকে গালাগালি দিতে দিতে অনেক দূরে চলে গেল।

এবার সন্দীপ আর ট্যাক্সির ভেতরে চুপ করে বসে থাকতে পারলে না। সোজা দরজা খুলে ট্যাক্সি থেকে নেমে পড়লো। সামনের বাসগুলোতে যারা পা-দানির ওপর দাঁড়িয়ে ঝুলতে ঝুলতে যাচ্ছিল, তারাও তখন রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে সামনের দিকে কৌতূহলী দৃষ্টি দিয়ে দেখছে। দেখে রহস্য উন্মোচনের চেষ্টা করছে। কেউ কেউ আবার যান-বাহনের আরাম ত্যাগ করে হাঁটা দিতে আরম্ভ করেছে।

সামনে আর একজন ভদ্রলোককে দেখে সন্দীপ তাকে জিজ্ঞেস করলে—হ্যাঁ মশাই, বলতে পারেন ব্যাপারটা কী?

ভদ্রলোক সন্দীপের আপাদ-মস্তক একবার দেখে নিয়ে বললে—কলকাতায় থাকেন?

সন্দীপ বললে—হ্যাঁ, আমি কলকাতাতেই থাকি। কেন? ও-কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন?

ভদ্রলোক বললে—আপনি কলকাতায় থাকেন আর তবু জিজ্ঞেস করছেন রাস্তায় জ্যাম হয়েছে কেন? এখানে তো রোজই এই রকম হয়—তা জানেন না? এখানে কি মানুষ থাকে? বৃষ্টি হলে কলকাতায় ট্রাম-বাস চলে না, এখানে ম্যানহোলের ঢাকনা রোজ রোজ চুরি হয়ে যায়, ফুটপাথে হকারদের ঝুপড়ি, এটা কি শহর না নরক?

বলতে বলতে ভদ্রলোক চলে যাচ্ছিলেন। সন্দীপ আবার জিজ্ঞেস করলে—বলুন না, ব্যাপারটা কী? বলুন না—

ভদ্রলোক বললে—শুনলুম দিল্লী থেকে নাকি প্রেসিডেন্ট এসেছে—

—প্রেসিডেন্ট? প্রেসিডেন্ট এসেছে তো রাস্তা জ্যাম্ হবে কেন?

—আরে সেই কথা বলে কে? প্রেসিডেন্ট যদি আসেই তো রাত্তিরে এলেই হয়। যখন অফিস-কোর্ট-কাছারি বন্ধ থাকে। কখন প্রেসিডেন্ট আসবে তার ঠিক নেই, এত আগে থেকে পুলিশ রাস্তা বন্ধ করে দেয় কেন? আর যদি বন্ধ করেই দেয় তো আগের দিন খবরের কাগজে কি রেডিওতে নোটিশ দেওয়া হয় না কেন? সময় নেই, অসময় নেই, লোকের সুবিধে নেই অসুবিধে নেই, প্রেসিডেন্ট আসে কেন?

এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হলো সন্দীপ। অন্তত ট্র্যাফিক জ্যামের কারণটা জানা গেল। তাহলে আর তার চাকরি হবে না। এতক্ষণে ডাক্তার সকলের হেলথ্ পরীক্ষা শেষ করে হয়ত বাড়ি চলে গেছে। সন্দীপ ট্যাক্সির ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে রাস্তা দিয়ে হন্ হন্ করে সামনের দিকে হেঁটে হেঁটে চলতে লাগলো।

রাসেল স্ট্রীটের বাড়িতে তখন কলিং-বেলটা বেজে উঠতেই শৈল ভেতর থেকে জিজ্ঞেস করলে—কে?

বাইরে থেকে তপেশ গাঙুলী বললে—আমরা খিদিরপুরের মনসাতলা লেন থেকে এসেছি। বউদি আছে?

চেনা গলার আওয়াজ শুনে শৈল দরজা খুলে দিলে। আর সঙ্গে সঙ্গে রানী আর বিজলী ভেতরে ঢুকে পড়েছে।

বিজলীরই বেশি আনন্দ। চিৎকার করে উঠলো- কই রে, বিশাখা কই তুই?

যোগমায়া বিশাখা তারাও এতদিন পরে সকলকে দেখে খুশী হয়ে উঠলো।

বিজলী বললে -ওমা, তুই কত বড় হয়ে গেছিস রে। আমাদের তুই একেবারে ভুলে গেলি ভাই?

যোগমায়া বলে উঠলো—তুমি এলে দিদি. আজকে কিন্তু আমাদের বাড়িতে সকলকে খেয়ে যেতে হবে. তা বলে রাখছি—আমার যে কী আনন্দ হচ্ছে দিদি কী বলবো...

তপেশ গাঙুলী বললে—সে তো রাত্তিরের খাওয়া, এখন কিছু খেতে দাও বউদি. খুবই খিদে পেয়ে গেছে--

যোগমায়া জিজ্ঞেস করলে--তুমি কী খাবে বলো। ঠাকুরপো? তুমি যা খেতে চাইবে তাই-ই আমি তোমাকে খাওয়াবো।

তপেশ গাঙুলী বললে—আর বিশাখার বিয়ের সময় কিন্তু আমরা সবাই সাতদিন

ধরে তোমার এখানে খাবো, তাও এখন থেকে বলে রাখছি—

যোগমায়া বললে—সাত দিন কেন বলছো ঠাকুরপো, বিশাখার বিয়ে হলে সাত মাস ধরে খেও না। সে তো আমার সৌভাগ্য ঠাকুরপো। বিশাখা কি শুধু আমার? বিশাখা তো তোমাদেরও। জানি না ভগবানের কী ইচ্ছে...

তপেশ গাঙুলী বললে—তার মানে?

যোগমায়া বললে—তার মানে আবার কী ঠাকুরপো! ভগবান ছাড়া আমার আর কে আছে বলো না? ভগবানের ইচ্ছে হলে নিশ্চয়ই বিয়ে হবে। আর নয় তো হবে না—

তপেশ গাঙুলী বললে—তুমি অমন ন্যাকা সাজছো কেন বলো তো বউদি? তুমি কি মনে করো আমরা কিছু জানি না? আমরা ঘাস খাই?

যোগমায়া কেমন গম্ভীর হয়ে গেল। বললে—আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না তুমি কী বলছো? সত্যিই তুমি কিছু শুনেছ?

তপেশ গাঙুলী বললে—তুমি কিছু শোনোনি?

—কী শুনবো?

—কেন, বিশাখার বিয়ের কথা?

যোগমায়া যেন আকাশ থেকে পড়লো। বললে—বিশাখার বিয়ের কথা? কিন্তু আমাকে তো কেউ কিছু বলেনি!

তপেশ গাঙুলী বললে—সে কী? আমি তো সেদিন বিডন স্ট্রীট দিয়ে যেতে যেতে দেখলুম তোমার জামাই-এর বাড়িতে বিয়ের সব তোড়-জোড় শুরু হয়ে গেছে—

—কী রকম? সন্দীপ তো আমাকে কিছুই বলেনি!

তপেশ গাঙুলী বললে—বোধহয় তোমাকে চমকে দেবে বলে সুখবরটা তোমার কাছে চেপে রেখেছে—

যোগমায়া বললে—তা তুমি কী দেখেছ বলো না—

তপেশ গাঙুলী বললে—আমি তো বিডন স্ট্রীট দিয়ে যেতে যেতে দেখলুম বিশাখার শ্বশুর-বাড়িটা খুব সাজানো গোজানো হচ্ছে। বাঁশের বিরাট-বিরাট ভারা বাঁধা হয়েছে, তাতে রাজমিস্ত্রী আর মজুররা খাটছে। আমি ওদের দারোয়ানটাকে জিজ্ঞেস করলুম বাড়ি সারানো হচ্ছে কেন ভাইয়া। দারোয়ানটা বললে ও-বাড়ির খোকাবাবু বিলেত থেকে ফিরে আসছে। ফিরে এলেই খোকাবাবুর বিয়ে হবে—

যোগমায়ার চোখ দুটো যেন আনন্দে ঠিকরে বেরিয়ে এল। জিজ্ঞেস করলে—দারোয়ানটা বললে ওই কথা?

তপেশ গাঙুলী বললে—দারোয়ানটা না বললে আমি কোথা থেকে শুনবো?

যোগমায়া বললে—তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক ঠাকুরপো, তোমার কথা যেন সত্যি হয়—

তপেশ গাঙুলী বললে—ফুল-চন্দন মুখে পড়লে তো আর আমার পেট ভরবে না বউদি। এমন একটা খুশি খবর শোনালুম, তুমি আমাদের একটু মিষ্টিমুখ করাও আগে, তারপর ফুল-চন্দন যত ইচ্ছে মুখে পড়ুক আমি কিছু আপত্তি করবো না—

যেদিন সন্দীপ প্রথম চাকরি পেলে সেদিন সন্দীপের যে কী আনন্দ হয়েছিল তার স্মৃতি এত দিন পরে এখন ম্লান হয়ে এসেছে। কিন্তু ম্লান হলেও কিছুটা তার মনে আছে।

চাকরি হওয়া মানে তখন নিজের পায়ে নিজে দাঁড়ানোর ক্ষমতা অর্জন করার স্বাধীনতা। তাকে কারোর কাছে টাকার জন্যে আর হাত পাততে হবে না। কারোর কাছে আর মাথা নিচু করতে হবে না। কারোর কাছে দরকার হলে দেনাও করতে হবে না তাকে। প্রথমেই যার কথা তার মনে পড়েছিল তা তার মা! এখন থেকে তার মাকে আর চ্যাটার্জিবাবুদের বাড়ি গিয়ে গতর খাটাতে হবে না। এবার সে মাকে একটু শান্তি দেবে. একটু বিশ্রাম দেবে।

প্রথম ছুটির দিনই মাকে গিয়ে সে খবরটা দিয়ে মা'র পা দুটো ছুঁয়ে প্রণাম করবে। প্রথমেই সে মাকে বলবে—এবার থেকে তোমাকে আর কোনও কাজ করতে হবে না মা, তুমি শুধু সমস্ত দিন বসে থাকবে--

মা শুনে হয়ত হাসবে। বলবে—হ্যাঁ. বসে থেকে থেকে আমার হাতে-পায়ে বাত ধরে যাক. এটাই তুই চাস ?

সন্দীপ বলবে—না মা, সারা জীবন তুমি অনেক কষ্ট করেছ, আমি তোমাকে আর কষ্ট করতে দেব না—

মা বলবে- তাহলে সংসারের এত কাজ কে করবে শুনি ? সংসারের কাজ কি কম নাকি ? ঘর-ঝাঁট দেওয়া. কাপড় কাচা. রান্না করা, বাসন মাজা সবই তো করতে হবে --

- ও কাজ কি সারা জীবনই তুমি করবে ?

মা বলবে—তা আমি না করলে কে করবে ? তুই তো সকালবেলা খেয়ে দেয়ে আপিসে চলে যাবি। তারপর ? তারপর বাড়ির এতগুলো কাজ করবে কে ?

সন্দীপ বলবে -কাজ করবার জন্যে আমি মাইনে করা লোক রেখে দেব. সে করবে!

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ অন্য দিকে ভাবনাটার মোড় ঘোরে। তাই তো বটে. সন্দীপ শুধু স্বার্থপরের মত নিজের মা'র কথাই ভাবছে! কিন্তু তার মল্লিক-কাকা ? তার মল্লিক-কাকা যদি না থাকতো তো সে কি এই চাকরি পেত ? হঠাৎ মল্লিক-কাকার ঋণের কথাটাই তার মনটা জুড়ে বসলো। সে যে এই এখনও কলকাতা শহরের গোলক-ধাঁধার মধ্যে হারিয়ে যায়নি. হাজার আঘাত আর হাজার প্রলোভনের মধ্যেও পরাজিত হয়নি সে তো মল্লিক-কাকার আশীর্বাদের জন্যেই।

মনে আছে যেদিন ব্যাঙ্কের চাকরির ইন্টারভিউ দিতে গিয়ে বাড়ি ফিরে এসেছিল মল্লিক-কাকার কাছে টাকা চাইতে. তখন হাতে সময়ও বেশি ছিল না। অথচ তখন তার নগদ একশো টাকা চাই-ই চাই। সব শুনে মল্লিক-কাকা নিজের পকেট থেকে নগদ একশো টাকা বার করে দিয়েছিল।

—হঠাৎ একশো টাকার দরকার কিসের জন্যে ?

সন্দীপ বলেছিল—শুনলাম ডাক্তারী পরীক্ষায় নাকি ঘুষ লাগে!

—ঘুষ ?

মল্লিক-কাকা অবাক হয়ে গেলেন। কথাটা যেন তাঁর বিশ্বাস হয়নি কিংবা কথাটা বোধহয় শুনতে ভুল করেছেন। তাই আবার বললেন—ডাক্তারী পরীক্ষাতেও ঘুষ ?

সন্দীপ বললে হ্যাঁ -

মল্লিক-কাকা টাকা কটা দিলেন। দিয়ে হতাশ হয়ে বললেন—হুম্, কী দিনকালই পড়লো। এ দেশের কপালে কী যে আছে! সব কাজেই যদি ঘুষ দিতে হয়, তাহলে মানুষের শেষকালে কী দশা হবে বলো তো ?

তারপর বললেন—যাক্ গে. যে-পুজোর যে নৈবেদ্য. যে-যুগের যা কর্তব্য তা ইচ্ছে থাক আর না থাক. করতেই হবে। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির হলে এ-যুগে তো আর তোমার চলবে না—

আশ্চর্য, সেই ছেলেটি যা বলেছিল তা-ই হলো শেষ পর্যন্ত। যখন সন্দীপের

চোখ-পরীক্ষা হচ্ছিল তখন ডাক্তারবাবু হতাশ ভঙ্গিতে বললে--ইস্, চোখের যে একেবারে বারোটা বাজিয়ে রেখে দিয়েছেন দেখছি -

সন্দীপ বললে--কিন্তু আমার চোখে তো কোনও দোষ নেই—

ডাক্তার বললে—আমি ডাক্তার হয়ে বলছি আপনার চোখের দোষ আছে, আর আপনি বলছেন যে দোষ নেই? আপনি কি আমার চেয়েও ভালো বোঝেন? যান এখন –

সন্দীপ বললে—তাহলে কি আমার চাকরি হবে না?

ডাক্তার বললে--এখন বাজে কথা বলবার সময় নেই আমার—আপনি যান, কম্পাউন্ডারের কাছে যান—বলে অন্য লোকের নাম ডাকলে। সন্দীপ বাধ্য হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। এসে আবার অন্য একটা লাইনে দাঁড়ালো। সেখানেও লম্বা লাইন। সেটা শেষ হতেই প্রায় আধঘণ্টা কেটে গেল। তারপর যখন কম্পাউন্ডারের ঘরে ঢুকলো তখন সন্দীপ তার নিজের নাম দেখতেই কম্পাউন্ডার ভদ্রলোক তার হাতে একটা কাগজ ঠেকিয়ে দিলে। কাগজটার দিকে চেয়ে সন্দীপ কিছুই বুঝতে পারলে না। জিজ্ঞেস করলে- এখানে কী লেখা রয়েছে?

কম্পাউন্ডার বললে—আপনার আই-সাইট খারাপ -

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে--তার মানে আমার চাকরি হবে না?

কম্পাউন্ডার বললে—চোখ খারাপ হলে আপনার চাকরি হবে কী করে?

এর পর আর কিছু কথা বলার থাকে না। সন্দীপ ফিরে বাইরে এসেছিল। মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল তার। এত কষ্ট করে এত টাকা নিয়ে এসেও তার চাকরি হলো না? ঘর থেকে বেরিয়ে এসে কী করবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছিল। পেছন থেকে আগেকার সেই ভদ্রলোক সামনে এসে জিজ্ঞেস করলে—কী হলো, চাকরি হলো না?

সন্দীপ বললে—না—

—টাকা দেন নি?

সন্দীপ বললে—না, কেউ তো টাকা চাইলে না—

—টাকা চাইবে আবার কেন? আপনি টাকা দিলেই পারতেন।

—কাকে টাকা দেব? ডাক্তারকে?

—ডাক্তারকে কেন? ওই কম্পাউন্ডারকে। দেখতেন টাকা দিলেই আপনার চোখ ঠিক হয়ে যেত—

—এখন যাবো?

—যান, গিয়ে দেখুন—

আর সত্যিই তাই হলো। অনেক লোক কাটিয়ে যখন সন্দীপ সে-ঘরে ঢুকলো তখন প্রায় সকলেই ফিট সার্টিফিকেট পেয়ে গেছে। সন্দীপ গিয়ে কম্পাউন্ডারের হাতে পঞ্চাশটা টাকা দিলে, ভদ্রলোক নির্লজ্জের মত টাকাটা পকেটে পুরেই ফিট-সার্টিফিকেট দিয়ে দিলে। যেন ম্যাজিক। ম্যাজিকের মতই সব কাণ্ডটা ঘটে গেল।

কথাটা কাউকেই কোনওদিন বলেনি সন্দীপ। আরও যত ছেলে চাকরি পেয়েছিল তারা কেউই কাউকে এ-কথা বলেনি। কিংবা হয়ত এও হতে পারে এ-কথা কাউকে বলবার মত নয় বলেই বলেনি। সব জিনিসই যেমন একদিন সকলের গা-সওয়া হয়ে যায়, তেমনি এটাও সকলের গা-সওয়া হয়ে গিয়েছিল। তারপর মানুষ নতুন নতুন সমস্যার মুখোমুখি হয়ে সেই নতুন সমস্যার সমাধানের জন্যে এমন ব্যস্ত হয়ে পড়ে যে তখন অতীতের সমস্ত সমস্যার ভয়াবহতার কথা ভুলে যেতেই সে ভালোবাসে।

সন্দীপও ভেবেছিল যে চাকরিটা যখন সে পেয়ে গেল তখন তার জীবনের সমস্ত সমস্যা মিটে গেল।

কিন্তু সন্দীপ নিজেই জানে যে তখন থেকেই যেন তার জীবনে হাজার সমস্যার

শুরু হয়েছিল। সে-সব সমস্যার কথা এই এতদিন পরে ভাবতেও তার ভয় লাগে। এখন মনে হয় কেন সে ব্যাঙ্কের চাকরিটা পেয়েছিল? ব্যাঙ্কের চাকরি না পেলে তো তার জীবনে এর অযাচিত অশান্তি আসতো না। এত বছর জেলও খাটতে হতো না তাকে। আর শুধুই কি জেল? আর কোনও শাস্তি নয়?

জীবন ভোর সে যে-শাস্তি পেয়েছে, তা কি পৃথিবীতে আর কেউ পেয়েছে? প্রায়ই তার মনে পড়তো সেই সব দিনের কথা। সেই তার ব্যাঙ্কের চাকরিতে উন্নতি, বিশাখার সঙ্গে তার সম্পর্ক, সকলের ভালো করবার তার সেই প্রবৃত্তি, তারপর পরের বিপদে তার মানসিক উদ্বেগ,—এই সব নানা ঘটনার প্রভাব পড়ে তার শরীর আর মনে যে প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, তার যে ক্ষতি হয়েছিল, তার কি তুলনা আছে?

সুশীলের সঙ্গে একদিন রাস্তায় দেখা হয়ে গিয়েছিল হঠাৎ সুশীল তার ব্যাঙ্কে চাকরি হওয়ার কথা শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিল। জিজ্ঞেস করেছিল—কী করে চাকরি হলো তোর? তুই তো কোনও পার্টির মেম্বার নোস! কারো সঙ্গে জানাশোনা ছিল তোর?

সন্দীপ বলেছিল—না।

সুশীল তাতেও অবাক হয়ে গিয়েছিল। তারপর জিজ্ঞেস করেছিল—ঘুষ? কাউকে ঘুষ দিতে হয়েছিল?

সন্দীপ বলেছিল—ডাক্তারকে।

সুশীল অবাক হয়ে গিয়েছিল। বলেছিল—সে কী রে? ডাক্তাররাও আজকাল ঘুষ নিতে আরম্ভ করেছে?

তার কথাতে সন্দীপের মনে হয়েছিল যে সুশীলের মনের আজন্মলালিত দৃঢ় বিশ্বাসের মূলেই যেন হঠাৎ আঘাত লেগেছে। পার্টি ছাড়া যে অন্য কোনও প্রবল শক্তি পৃথিবীতে থাকতে পারে এ-কথা যেন সে কখনও কল্পনাও করতে পারেনি। পার্টি ছাড়া অন্য কোনও শক্তি পৃথিবীতে আছে, সেটা জানা থাকলে সে তো এতদিন তাকেই ভজনা করতো।

সন্দীপের তখন একটু তাড়া ছিল। সে আর দাঁড়ালো না সেখানে। সুশীলের সঙ্গে দেখা হওয়ায় একটা জিনিস তার কাছে স্পষ্ট হলো যে তার চাকরি হওয়ায় সুশীলের আনন্দ হয়নি। চাকরি হয়নি বলে জানা-অজানা নানা লোকে তাকে সহানুভূতি দেখিয়েছে। নানা লোকে বলেছে—আহা! নানা লোকে নানা উপদেশ দিয়েছে। বলেছে—কী করবে বলো, বাঙালীরাই বাঙালীদের সব চেয়ে বড় শত্রু। দুঃখ কোর না ভাই, চেষ্টা চালিয়ে যাও, একদিন-না-একদিন তোমার জয় হবেই।

কিন্তু চাকরি হওয়ার পর?

চাকরি হওয়ার পর সকলের স্বরূপ যেন রাতারাতি বদলে গেল। আগে যে-সহানুভূতির আমেজ ছিল মানুষের কথায় ব্যবহারে, তা আর রইল না। তখন যেন সন্দীপও তাদের একজন প্রতিযোগী। তাদের অন্নের সে যেন একজন ভাগীদার।

তখন তারা বলতে লাগলো—ভালোই হলো তুমি চাকরি পেলে। এইবার বুঝবে সংসার কাকে বলে। এইবার বুঝবে কত ধানে কত চাল।

আশ্চর্য মানুষের সমাজ আর আশ্চর্য সেই মানুষের সমাজের রীতিনীতি।

ব্যাঙ্কের যারা পুরনো কর্মী তাদের মধ্যে একজন জিজ্ঞেস করলে—বিয়ে-টিয়ে করা হয়েছে নাকি ভায়া?

সন্দীপ বললে—আমার মতন গরীব ছেলের সঙ্গে কে মেয়ের বিয়ে দেবে?

ভদ্রলোক বললে—কী বলছো ভায়া, ব্যাঙ্কের চাকুরে পাত্র পেলে কত মেয়ের বাবা হাতে স্বর্গ পাবে তা জানো?

যারা ব্যাঙ্কের পুরনো লোক তারা নতুন চাকুরেদের হিংসে করে। অনেকে তখন কত কম মাইনেতে ঢুকে রাত এগারোটা বারোটায় বাড়ি গিয়েছে। আগে ওভার-টাইম্ বলে কিছু ছিল না। যতক্ষণ না লেজার-বই-এর হিসেব মিলছে, ততক্ষণ কারো ছুটি নেই। যত রাতই হোক তোমাকে হিসেবের কড়া-ক্রান্তি মিলিয়ে তবে বাড়ি যেতে পারবে।

এইসব পুরনো কালের গল্প শুনতে শুনতে এক এক সময়ে সন্দীপ নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করতো। কিন্তু যেই অফিস ছুটি হতো তখনই মনে পড়ে যেত বিডন স্ট্রীটের বারো-বাই-এর বাড়িটার কথা, মুক্তিপদ মুখার্জির কথা, মল্লিক-কাকার কথা, বিশাখা আর মাসিমার কথা। আর তাদের কথা মনে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে মনটা বিষন্ন হয়ে যেত। তখন রাস্তার লোক-জন-বাস-ট্রাম-মানুষের ভিড় কোনও কিছুতেই তার মনের বিষণ্নতা আর কাটতো না।

সেদিন মল্লিক-কাকার সঙ্গে দেখা হতেই তিনি বললেন—কী হলো, আজ তোমার বাড়িতে আসতে এত দেরি হলো যে?

সন্দীপ বললে—আজ অফিস থেকে হেঁটে হেঁটে বাড়ি ফিরলুম—

—কেন?

সন্দীপ বললে—বাসে বড্ডো ভিড়, তাই সবাই হেঁটে আসছিল। আমিও তাই তাদের সঙ্গে গল্প করতে করতে হেঁটে চলে এলুম—

মল্লিক-কাকা জিজ্ঞেস করলেন তুমি মুড়ি খাবে?

—মুড়ি?

—আমি নিজে মুড়ি খেয়েছি। ভাবলুম অফিস থেকে তুমি খেটে-খুটে আসছো, হয়ত তোমার খিদে পেতে পারে—

সন্দীপ মল্লিক-কাকার এই স্নেহ-প্রীতির ঋণ কখনও শোধ করতে পারেনি। শুধু তিনি দেখে যেতে পেরেছেন যে সন্দীপ ব্যাঙ্কে চাকরি পেয়েছে, সন্দীপ স্বাধীন। তার পরবর্তী জীবনের ঘটনাগুলো দেখতে পেলে তিনিই সব চেয়ে কষ্ট পেতেন। ভালোই হয়েছে যে তিনি তার আগেই চলে গেছেন। তিনি প্রায়ই বলতেন—দীর্ঘায়ু হওয়া এক অভিশাপ ছাড়া আর কিছুই নয়—

সন্দীপও দেখে গেল যে দীর্ঘায়ু হওয়া সত্যিই এক অভিশাপ। ঠাকমা-মণি যদি দীর্ঘায়ু না হতেন তো তিনি শেষ জীবনে অত কষ্ট পেতেন না। ঠাকমা-মণি যে শেষকালে কী কষ্ট পেয়ে গেলেন সন্দীপ তো নিজের জীবনেই দেখেছে। কখনও তাঁর ঘুম আসতো না। তিনি নিজের মানসিক যন্ত্রণায় কত দিন কত রাত এক নাগাড়ে ছট-ফট করেছেন। কাউকে দেখলেই তিনি কাঁদতে কাঁদতে বলেছেন—তোমরা কেউ আমাকে বিষ এনে দিতে পারো না? আমাকে তোমরা কেউ বিষ এনে দাও না, আমি সেই বিষ খেয়ে মরি। মরে একটু শান্তি পাই। একটু বিষ এনে দাও না—

আর বাড়ির ঝি-ঝিউড়ি-চাকর, যারাই তখন ছিল তারা সবাই তখন বুড়ির কান্ড দেখে হাসতো। বলতো—বুড়ী যেমন দজ্জাল তেমনি জব্দ হয়েছে—

অথচ ঠাকমা-মণি কীই বা দোষ করেছিল! ঠাকমা-মণির একমাত্র অপরাধ হয়েছিল সংসারের শান্তি চাওয়া। কিন্তু সংসারী লোক তো শান্তি চাইবেই। তাতে অন্যায়টা কী হয়েছিল ঠাকমা-মণির? তাহলে কি সংসারের সুখ-শান্তি চাওয়াটা অপরাধ?

মনে আছে মল্লিক-কাকা একদিন বলেছিলেন—তোমার চাকরি হলো, এ-খবরটা ঠাকমা-মণিকে তোমার দিয়ে আসা উচিত। একদিন এক বাক্স মিষ্টি কিনে নিয়ে ঠাকমা-মণির পায়ে দিয়ে পেন্নাম করে আসা উচিত—

তাই সন্দীপ একদিন পাঁচ টাকার মিষ্টি নিয়ে ঠাকমা-মণির কাছে গিয়ে দাঁড়ালো।

সেদিন ব্যাঙ্কের ছুটি। বড় ভয় করতে লাগলো তার। চাকরি পাওয়ার কথা শুনে ঠাকমা-মণি যদি তাকে এ-বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বলেন?

মল্লিক-কাকা অবশ্য তাকে অভয় দিয়েছিল। বলেছিল—এ-বাড়িতে এত লোক খাচ্ছে থাকছে, তাতে আর একটা বাড়তি লোক খেলে ক'টা টাকাই বা বেশি খরচ হবে? তুমি তাতে কিছু ভয় পেয়ো না। তবে মাসে-মাসে তোমার পড়ার খরচা বাবদ যে পনেরোটা করে টাকা দেওয়া হচ্ছে সেটা আর পরের মাস থেকে নিও না—সেইটে ঠাকমা-মণিকে বলে এসো—

ঠাকমা-মণির হাত কখন খালি হয়, কখন পুজো-আহ্নিক জপ-তপ শেষ হয় তা সন্দীপ জানতো। সেই সময়েই সন্দীপ যথারীতি রাসেল স্ট্রীটের বাড়ির সকলের খবরাখবর দিতে যেত। তখন ঠাকমা-মণিকে বিশাখার লেখা-পড়ার খবর, ডাক্তারের হেলথ্-রিপোর্ট—সব কিছু খবর বরাবর দিতে যেতে হতো। কিন্তু এবার অন্য রকম। এবার অন্য খবর। তার চাকরির খবর শুনে ঠাকমা-মণি কী বলবেন জানা ছিল না।

কিন্তু যা ভয় করেছিল সন্দীপ তা হলো না। ঠাকমা-মণি তার চাকরির খবর শুনে বলতে গেলে খুশীই হলেন। বললেন—এ তো ভালোই হলো। এর চেয়ে আনন্দের খবর আর কীই বা হতে পারে। তা তার জন্যে আবার তোমার পয়সা নষ্ট করে মিষ্টি আনা কেন?

সন্দীপ বললে—আপনি আমায় আশীর্বাদ করবেন, তাই...

ঠাকমা-মণি বললেন—আমার আশীর্বাদে আর কাজ হয় না বাবা, এ কলিযুগ। কলিযুগে আশীর্বাদ ফলে না। তুমি তো নিজের চোখে সবই দেখতে পাচ্ছ। আমি আর কী বলবো?

কথাগুলো বড় করুণ, বড় মর্মন্তুদ। কথাগুলো শুনে সন্দীপের চোখে প্রায় জল এসে গিয়েছিল। আর তারপর সেখানে সে দাঁড়ায়নি। মিষ্টির বাক্সটা সেখানে রেখেই সে চোখের জলটা লুকোতে তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে নিচেয় নেমে এসেছিল। নিচেয় নেমে এসে স্বস্তি পেয়েছিল।

তারপর সব কথা খুলে বলেছিল মল্লিক-কাকাকে। মল্লিক-কাকাও সব শুনে খুশী হয়েছিলেন। তারপর বলেছিলেন জীবনটাই এই রকম, জানো সন্দীপ! আমি তো এই বাড়িতে এত দিন থেকে অনেক কিছুই দেখলুম, অনেক কিছুই শিখলুম। এখন মনে হয় আমরা সংসারী লোকরা কেউই সুখী নই। সংসারে ঠাকমা-মণি যে একলাই দুঃখী মানুষ তা নয়। সারা পৃথিবীর বিরাট সংসারে যারাই বেঁচে আছে, তারা সবাই-ই ঠাকমা-মণির মতই দুঃখী।

সন্দীপ মল্লিক-কাকার কথাগুলো মন দিয়ে শুনছিল।

মল্লিক-কাকা বলতে লাগলেন—এর কারণ কী, বলো তো? এর কারণ একটাই। সেই কারণটা হলো—আমাদের এই শরীর। পৃথিবীর যত নষ্টের গোড়াই হলো আমাদের এই শরীরটা। আমরা যা কিছু করি সমস্তই এই শরীরটার জন্যে। দেখ, ডাক্তাররা ডাক্তারি করে পরের রোগ সারাবার জন্যে নয়, নিজের শরীরটার আরামের জন্যে। উকীল ব্যারিস্টাররা ওকালতি করে পরের ঝামেলা দূর করবার জন্যে নয়, নিজের শরীরটার আরামের জন্যে। এ শুধু ওরাই নয়, সারা পৃথিবীর যে যে-পেশাতেই থাকুক তাদের সম্বন্ধেও ওই একই কথা। অথচ যে-শরীরটার আমরা এত কিছু করি তা তো অমর নয়, সেটা তো একদিন শ্মশানে গিয়ে পুড়ে ছাই হয়ে যায়, আর নয় তো কবরের ভেতরে তাকে পুঁতে ফেলতে হয়। এ কথা সবাই জানে! তবু এই শরীরটার ওপর মানুষের কেন এত মায়া? কীসের জন্যে মায়া?

মল্লিক-কাকার বলা সে-সব কথাগুলো এতদিন পরে এখনও স্পষ্ট মনে আছে।

সেই 'বিল্বমঙ্গল' নাটকের সেই বিখ্যাত কথাগুলো 'এই নরদেহ জলে ভেসে যায়, ছিঁড়ে খায় কুক্কুর শৃগাল' এখনও তার কানে বাজছে।

—তাহলে এই শরীরটার চেয়ে বড় জিনিস কী?

মল্লিক-কাকা বলেছিলেন—সেইটেই যদি আমি জানবো তাহলে কি আমি এখানে এই বিডন স্ট্রীটের মুখুজ্জেদের বাড়িতে সরকারের কাজ করি? না ওই ঠাকমা-মণি ওই মেজবাবু মুক্তিপদ মুখার্জি, ওই খোকাবাবু সৌম্যপদ সবাই এত দুঃখ-কষ্টের মধ্যে জীবন কাটান? ওদের সকলকে গিয়ে তুমি জিজ্ঞেস করো ওরা সুখে আছে কিনা, জিজ্ঞেস করে দেখ ওরা কী উত্তর দেয়। দেখবে ওরা কেউই এ-সব কথা একবার ভাবেও নি। দেখবে ওরা সবাই বলবে যে ওরা মোটেই সুখে নেই। সুখ-দুঃখের ব্যাখ্যা ওদের এক-একজনের কাছে এক-এক রকম।

—তাহলে কী পেলে আমি সুখী হবো?

মল্লিক-কাকা বলেছিলেন—এর উত্তরটা তোমাকে নিজেকেই খুঁজে বার করতে হবে। কেউ টাকা পেলে সুখী হয়, কেউ নারী পেলে সুখী হয়, কেউ একটা বাড়ি পেলে সুখী হয়। এই সবগুলোই শারীরিক সুখের ব্যাপার। দেখ তুমি এখন এমন একটা চাকরি পেয়েছো যার মাইনে মাসে পাঁচশো টাকা। কিন্তু একদিন এই মাইনে বাড়তে বাড়তে দেখবে পাঁচ হাজারে গিয়ে পৌঁছিয়েছে, তুমি বিয়ে করেছ, তুমি একটা ভালো বাড়ি করেছ, সংসারী লোক যা-যা চায় তুমি তা সবই পেয়েছো। কিন্তু তখনও দেখবে তোমার মনে আনন্দ নেই। সেই জন্যেই তোমাকে বলছি যে সেই পাওয়াতেই মানুষের চরম আনন্দ যে-পাওয়ার মধ্যে না পাওয়া লুকিয়ে থাকে...

সন্দীপ জিজ্ঞেস করেছিল- সেটা কী জিনিস?

মল্লিক-কাকা বলেছিলেন—সেই জিনিসটা যে কী তা তোমাকে নিজেকেই খুঁজে বের করতে হবে। এটা বলে দেওয়ার জিনিস নয় -

আজ এত দিন পরে এত বছর জেল খাটার পরে এখনও সন্দীপের সমস্ত কথাটা মনে আছে। সমস্ত তার মনে দাগ কেটে দিয়ে গেছে। জেলখানার ভেতরে বসেও সে এই নিয়ে কতবার ভেবেছে, কতবার উত্তরটা পাওয়ার জন্যে কত বিনিদ্র রাত কাটিয়েছে। কিন্তু তার জবাব কি এখনও সে পেয়েছে?

তখন থেকে আর সকাল বেলায় নয়, রাত্রে। সকাল বেলার কাজ সেরে সন্দীপ অফিস থেকে এসে রাত্রে যেত রাসেল স্ট্রীটের বাড়িতে। মাসিমা তার আসার জন্যে ব্যাকুল হয়ে থাকতো।

চাকরি হওয়ার পর যেদিন সন্দীপ প্রথম মাইনেটা হাতে পেয়েছিল সেদিন মাসিমার বাড়িতেও সে এক বাক্স মিষ্টি নিয়ে গিয়েছিল। তারপর তাকে প্রণামও করেছিল। মাসিমা হঠাৎ সন্দীপের ওই প্রণাম করা আর মিষ্টির বাক্সটা দেওয়া দেখে

অবাক হয়ে গিয়েছিল। চাকরি যে তার হয়েছিল সে-খবরটা মাসিমার অবশ্য আগেই শোনা ছিল। কিন্তু মিষ্টির বাক্সটা কী জন্যে? তাহলে কী সন্দীপের বিয়ের কথাও পাকা হয়ে গেল?

মাসিমা জিজ্ঞেস করেছিল তোমার বুঝি বিয়ে পাকা হয়ে গেল বাবা?

—বিয়ে? আমার সঙ্গে কে মেয়ের বিয়ে দিবে? কার এত পোড়া কপাল?

মাসিমা বললে—তা না হলে আমাকে হঠাৎ এই মিষ্টির বাক্স দিতে এলে যে?

সন্দীপ বললে—আমার মা তো কলকাতায় নেই, এখানে আপনিই আমার মায়ের মত। আজকে আমি প্রথম মাইনেটা হাতে পেলুম কিনা তাই আপনাকে মিষ্টি দিতে এলুম আর ও-বাড়িতে ঠাকমা-মণিকেও এক বাক্স মিষ্টি দিয়ে প্রণাম করে এলুম—

মাসিমা বললে—বেশ করেছ বাবা, আশীর্বাদ করি তোমার আরো উন্নতি হোক, তোমারও জয়-জয়কার হোক। এর চেয়ে আমি আর কী-ই বা বলতে পারি বাবা—

বিশাখা পাশের ঘর থেকে এসে সন্দীপকে দেখে বললে—আজ এত সকাল-সকাল যে?

মাসিমা বললে—এই দেখ, সন্দীপ কী এনেছে—

বলে একটা সন্দেশ নিয়ে বিশাখাকে দিলে। বিশাখা সন্দেশটা মুখে পুরে বললে—হঠাৎ সন্দেশ আনলে যে, কী ব্যাপার গো? কোনও সুখবর আছে বুঝি?

মাসিমা বললে—হ্যাঁ, আজকে সন্দীপ প্রথম মাইনে পেয়েছে রে—

বিশাখা বললে—তা হলে আর একটা সন্দেশ খাবো মা, আর একটা দাও না—

মাসিমা বললে—এই তো একটু আগেই এক পেট খেলি, আবার খাবি?

বিশাখা বললে—বা রে, এত বড় একটা সুখবর পেলুম আর মাত্র একটা সন্দেশ খাবো? বলে আর একটা সন্দেশ মুখে পুরে দিল। আর সঙ্গে সঙ্গে সদর-দরজার কলিং-বেলটা বেজে উঠলো। মাসিমা বললে—ওই তোর আণ্টি মেমসায়েব এয়েছে, যা দরজা খুলে দিগে যা—

আর সত্যিই তাই। বিশাখা আণ্টি মেমসাহেবের কাছে পড়তে চলে গেল।

মাসিমা হঠাৎ গলাটা নিচু করে বললে—তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা ছিল বাবা—

সন্দীপ বললে—তা বলুন না কী বলবেন, আপনি অত সঙ্কোচ করছেন কেন বলতে?

মাসিমা বললে—সেদিন আমার দেওর এসেছিল এ-বাড়িতে। বলছিল নাকি তোমাদের বাড়িতে রাজমিস্ত্রী লেগেছে।

—হ্যাঁ হ্যাঁ রাজমিস্ত্রী লেগেছে।

—আমার দেওর বলছিল যে তোমাদের বাড়ির দরোয়ান তাকে বলেছে যে বাড়ির ছোটবাবুর নাকি খুব শিগ্‌গির বিয়ে হবে তাই আগে থেকে রাজমিস্ত্রী লেগেছে! এটা কি সত্যি?

সন্দীপ বললে আমিও তাই শুনেছি, কিন্তু ভেতর-বাড়ির সব ব্যাপার তো, কোনটা সত্যি তা আমি বলতে পারবো না—

মাসিমা বললে—আমারও তাই মনের মধ্যে কেমন খটকা লাগছে। বিশেষ করে সেদিন সেই সত্যনারায়ণ পুজোর দিন কী কাণ্ড ঘটলো বলো তো! ছি ছি পোড়ারমুখীর কাণ্ডকারখানা দেখে তো আমিই লজ্জায় মরি! অতগুলো ভদ্রলোকের সামনে কী কেলেংকারীই না করলে!

তারপর একটু থেমে আবার বললে—তা হ্যাঁ বাবা, ওরা কারা? দেখে মনে হলো ওরা খুব বড়লোক। আমার মেয়ের বয়িসী একটা মেয়েও ছিল ওঁদের সঙ্গে! ওরা কী

করতে এসেছিল ? কে হয় ওঁদের ?

সন্দীপ কী আর বলবে। এতদিন কথাটা সে চেপেই রেখেছিল। তারপর বললে—ওরা ? ওরা হচ্ছেন আমাদের মেজবাবুর বন্ধু। মেজবাবু ওদিন ওঁদের নেমন্তন্ন করেছিলেন পুজো উপলক্ষে—

মাসিমা বললে—কী জানি বাবা! আমি ঘর-পোড়া গরু তো, সিঁদুরে মেঘ দেখলেই আমার কেমন ভয় হয়! সেদিন কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দেখছিলুম! একজন জ্যোতিষীর বিজ্ঞাপন। সেই জ্যোতিষী লিখেছেন যে তিনি নাকি মানুষের কুষ্ঠী দেখে ভূত-ভবিষ্যৎ সব বলে দিতে পারেন। মাত্র তিরিশ টাকা দিলেই সব বলে দেন। আমার ভারি ইচ্ছে একবার পোড়ারমুখীর কুষ্ঠীটা নিয়ে তাঁর কাছে যাই—তুমি একটা ছুটির দিন দেখে আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যেতে পারো ?

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—কতদূরে ?

মাসিমা বললে বেশি দূরে নয়, এই কলকাতা শহরের মধ্যেই। দাঁড়াও তোমাকে আমি কাগজটা দেখাচ্ছি—

বলে মাসিমা পাশের ঘর থেকে একটা পুরনো খবরের কাগজ এনে সন্দীপকে দেখালো। এক অলৌকিক শক্তি-সম্পন্ন যোগী পুরুষের ছবি ছাপা রয়েছে ওপরে কাগজের মাথায়। এক মুখ দাড়ি-গোঁফ। মাথায় জটা।

মাসিমা বললে—বেশি দূর তো নয়, আমাকে নিয়ে যাবে বাবা ? তোমার অফিসের ছুটির দিন দেখে যাবো। বেলেঘাটা কি খুব দূরে ? আর মাত্র তো তিরিশটা টাকা প্রণামী সেটা আমি খরচ-পত্তোর বাঁচিয়ে কোনও রকমে জোগাড় করবোখন্ না হয়। যাবে বাবা আমাকে নিয়ে ?

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—ও-সবে আপনার বিশ্বাস আছে ?

মাসিমা বললে—আমার মনের এখন যা অবস্থা, তাতে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথাই ওঠে না বাবা, শেষ পর্যন্ত পোড়ারমুখীর বিয়েটা হবে কি না সেই ভাবনাতেই আমার পাগল হওয়ার উপক্রম হয়েছে—

সন্দীপ বললে তা যাবোখন! আসছে মঙ্গলবার আমার ব্যাঙ্কের ছুটি আছে, ওই দিন আপনাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবো– আপনি তৈরি হয়ে থাকবেন—

সন্দীপ দাঁড়িয়ে উঠতেই মাসিমা বললে- তুমি ঠিক যাবে তো বাবা ? তুমি কথা দিচ্ছ তো ঠিক ?

মাসিমার মুখের ওপর সত্যি কথাটা বলতে সন্দীপের কেমন যেন বাধা-বাধা ঠেকলো। মাসিমা যে-বিশ্বাস নিয়ে বেঁচে আছে সেই দুর্বল জায়গাটাতে সে আঘাত দেবে কী করে ? যে-কদিন মাসিমা একটু আরাম পায়, একটু স্বস্তি পায় পাক না! সেই কদিনই তো ভালো! সন্দীপ তো জীবনে কাউকে সুখ দিতে পারেনি। কাউকে সুখী করবার ক্ষমতা যখন তার নেই, তখন দুঃখ দেবার অধিকারও তার থাকা উচিত নয়। আর তা ছাড়া এই দুঃখের পৃথিবীতে মিথ্যে ভাষণ করেও সে যদি কাউকে একটু শান্তি দিতে পারে সেইটুকু বা কম কী ? জ্যোতিষীর কাছে যেতে চায় মাসিমা সেই জ্যোতিষীই কি মাসিমার কাছে অপ্রিয় সত্য বলবে ? তারপরে কত রকম রত্ন, কতরকম কবচ-মাদুলী আছে যা সংগ্রহ করা অনেকের পক্ষেই দুর্মূল্য সামগ্রীর মত। কিন্তু দুর্মূল্য সামগ্রী হলেও ঘটি-বাটি বিক্রী করেও তো সবাই তাই-ই জোগাড় করবার চেষ্টা করে। তার ফলাফল কী হবে সেটা বড় কথা নয়। কিন্তু সেই দুদণ্ডের দুমুহূর্তের শান্তি বা সান্ত্বনা কি কম মূল্যবান ?

রাস্তায় বেরিয়েও তখন সন্দীপের চোখ দুটো জলে ভিজে যাচ্ছিল। বিশাখা কিছুই জানে না। এখনও তার ধারণা যে সে মুখুজ্জে বাড়ির বউ হবেই। মাসিমারও

সেই একই রকম ধারণা এতদিন ছিল। কিন্তু এখন বোধহয় সেই বিশ্বাসের মূলে একটু ফাটল ধরেছে। তাই জ্যোতিষীর শরণাপন্ন হতে চাইছেন।

কিন্তু জ্যোতিষ শাস্ত্রটাই কি নির্ভুল সত্য? জ্যোতিষও কি বিজ্ঞান?

সন্দীপ নিজে জ্যোতিষ-শাস্ত্র জানে না। জানতে চায়ও না। জানবার চেষ্টাও কখনও করবে না। কিন্তু মাসিমাকে নিয়ে জ্যোতিষীর কাছে যেতে দোষই বা কী? জ্যোতিষী হয়ত মাসিমাকে প্রিয় কথাই বলবে, জ্যোতিষীর কথা শুনে হয়ত মাসিমা খুশী হবে, মাসিমা হয়ত জ্যোতিষীর কথা শুনে পুরোপুরি বিশ্বাসও করবে। কিন্তু তাতে সন্দীপের কী-ই বা ক্ষতি। মাসিমার খুশী হওয়াটাই বড় কথা, তার নিজের লাভ-লোকসানের কথাটা তো এক্ষেত্রে গৌণ!

রাত্রে বাড়িতে যেতেই মল্লিক-কাকা জিজ্ঞেস করলেন কী খবর? সব ভালো আছে তো?

সন্দীপ বললে—হ্যাঁ, সব ভালোই আছে। কিন্তু...

—আবার 'কিন্তু' কী?

সন্দীপ বললে—মাসিমা আগে একজনের কাছে শুনেছিল যে এ-বাড়িতে যখন রাজমিস্ত্রী খাটছে, তখন বিশাখার বিয়েটাও নিশ্চয়ই তাড়াতাড়ি হতে চলেছে—এইটেই ভেবেছিল—

—তা এখন? এখন কি তার সন্দেহ হচ্ছে?

সন্দীপ বললে—না, তা ঠিক নয়। এখন মাসিমা খবরের কাগজে একজন জ্যোতিষীর বিজ্ঞাপনে দেখেছে যে সেই জ্যোতিষী নাকি কুষ্ঠী দেখেই মানুষের অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ সব কিছু বলতে পারে। আমরা কোনও ছুটির দিনে মাসিমাকে নিয়ে সেই জ্যোতিষীর কাছে যেতে বলছিল, আমি কথা দিয়েছি মাসিমাকে নিয়ে সেখানে যাবো! কিন্তু জ্যোতিষ-শাস্ত্র দিয়ে কি সব কিছু জানা যায়? আমার নিজের তো সন্দেহ আছে—

মল্লিক-কাকা বললেন—সে-কথা আলাদা। যার যেমন বিশ্বাস, তাতে তুমিই বা কী করবে আর আমিই বা কী করবো। অবশ্য মায়ের মন তো, মেয়ের ভবিষ্যতের ভাবনা সব মায়েরই থাকাটা স্বাভাবিক। এই দেখ না আমাদের ঠাকমা-মণির ব্যাপারটা। ঠাকমা-মণি প্রত্যেক কথাতেই আমাকে কাশী পাঠাচ্ছেন। আমি যখন এ-বাড়িতে চাকরি করি, তিনি যা হুকুম করেন তাই-ই আমাকে করতে হয়। আমি জ্যোতিষ বিশ্বাস করি আর না-ই করি মুখ বুজে সব হুকুমই পালন করি। তা তো তুমি দেখেই আসছো—কিন্তু আজকেই একটা ঘটনা ঘটেছে, যেটা তোমাকে বলে রাখা ভালো—

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—কী ঘটনা!

মল্লিক-কাকা বললেন—আজই বিকেল বেলা ঠাকমা-মণির কাছে গিয়ে সব শুনলাম। তিনি আমাকে বললেন মেজবাবু আজকে ঠাকমা-মণিকে টেলিফোন করে জানিয়ে দিয়েছেন যে সৌম্যবাবু এই মাসের মধ্যেই ইন্ডিয়ায় আসছেন—

—এই মাসের মধ্যে? এই মাসের মধ্যে মানে কবে?

—তা কিছু বললেন না। আমি যা শুনে এলুম, তাই তোমাকে জানিয়ে দিলুম।

সন্দীপ বললে—তাহলে মিস্টার চ্যাটার্জির সেই মেয়ের সঙ্গেই কি বিয়ে হবে সৌম্যবাবুর?

মল্লিক-কাকা বললেন—তা ঠিক বলতে পারবো না আমি। আমি তো হুকুমের চাকর, যা এখন শুনে এলুম তাই তোমাকে বললুম। তবে তোমার রাসেল স্ট্রীটের বাড়ির মাসিমাকে এসব কথা বলবার কোন দরকার নেই—

কথাগুলো শুনে সন্দীপ চুপ করে রইল। কী-ই বা তার বলার ছিল। আগে ছিল তার চাকরি পাওয়ার সমস্যা। সে-সমস্যাটা তার ভাগ্যক্রমে মিটে গেছে। আর সে এমন এক চাকরি যাতে শেষ-জীবন পর্যন্ত তার আর্থিক দারিদ্র্য থেকে সে মুক্তি পেয়ে যাবে! আর যার কল্যাণে পরের বাড়ির অন্নদাস হওয়ার দুর্ভাগ্যও তাকে আর সইতে হবে না। বাকি রইল বিশাখা! বিশাখার কী হবে? সৌম্যবাবুর সঙ্গে যদি শেষ পর্যন্ত তার বিয়ে না হয় তাহলে তারা কোথায় যাবে?

হঠাৎ মল্লিক-কাকা বললেন—আর তুমি? এখন তো একটা ভালো চাকরি হলো তোমার। এখন তুমি কী করবে?

সন্দীপ বললে—আমি কিছু ভাবিনি—

মল্লিক-কাকা বললেন—এতদিন তো ভাবোনি, কিন্তু এবার ভাবো। তোমার মা কি সারা জীবনই বেড়াপোতার বাড়ি আগলাবে আর চ্যাটার্জিবাবুদের বাড়িতে ভাত রান্না করে পেট চালাবে? তুমি মায়ের উপযুক্ত ছেলে হয়েছ। মায়ের ওপরেও তো তোমার একটা কর্তব্য আছে! না কী!

সন্দীপ বললে—আমি আমার চাকরি হওয়ার পর মাকে একটা চিঠি লিখে দিয়েছি। তাতে লিখেছি যে আসছে মাস থেকে মাকে আর চাটুজ্জেবাবুদের বাড়িতে ঝি-গিরি করতে হবে না। আমি মাসে মা'র নামে তিনশো টাকা করে পাঠাবো।

মল্লিক-কাকা বললেন—বাঃ, খুব ভালো, খুব ভালো—

সন্দীপ বললে—কিন্তু কাকা সবই আপনার জন্যেই হলো। আপনি না থাকলে আমি কলকাতায় আসতেই পারতুম না, বি-এটা পাশও করতে পারতুম না, আর এই চাকরিও পেতুম না—

মল্লিক-কাকা বললেন—সব উল্লেখযোগ্য সৃষ্টির পেছনেই একটা নিমিত্ত থাকে, তোমার এই কলকাতায় আসা, তোমার এই বি-এ পাশ করা, তোমার এই চাকরি পাওয়াটা এমন কোনও উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব নয়। রামচন্দ্র যখন সাগর পেরিয়ে লঙ্কায় গিয়ে রাবণ-বধ করেছিলেন তখন তাতে কাঠবেড়ালেরও একটা ছোট ভূমিকা ছিল। সেতুবন্ধনের ব্যাপারে সেও কিছু সাহায্য করেছিল। সেই কাঠবেড়ালটা সেদিন যেমন ছিল একটা নিমিত্ত মাত্র, তোমার ব্যাপারে আমিও একটা নিমিত্ত ছাড়া আর কিছুই নই।

এর পর আর সেদিন কোনও কথা হয়নি। খাওয়া-দাওয়া সেরে সন্দীপ মাসিমার কথা ভাবতে ভাবতেই ঘুমিয়ে পড়েছিল।
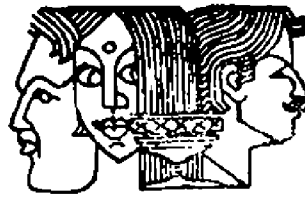
ইতিহাসের গতি বড় বিচিত্র। এই বৈচিত্র্য আছে বলেই তো জীবন এত দুঃখ-যন্ত্রণার মধ্যেও এত সুন্দর। তাই তো জীবনের এত মাধুর্য। নদী যখন চলে তখন দুই কূলের বন্ধনের মধ্যেই সে সামনের দিকে অব্যাহত গতিতে চলে। কিন্তু যদি কখনও সেই চলার বেগে সে এক কূল ভাঙেও তো সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কূল গড়ে। এই ভাঙা-গড়ার বিচিত্র বিড়ম্বনার নামই তো হলো জীবন।

সন্দীপ ইতিহাস পড়ে দেখেছে যে জীবনের মত সেখানেও ভাঙা-গড়ার বিড়ম্বনা অব্যাহত ছিল। একই সময়ে ইংরেজ আমেরিকার কাছে যুদ্ধে হেরেছে আর আবার

সেই একই সময়ে ইণ্ডিয়া ইংরেজের কাছে যুদ্ধে হেরে পরাধীন হয়েছে। একদিন জেনারেল ওয়াশিংটনের কাছে যুদ্ধে যে লর্ডকর্ণওয়ালিশ আমেরিকায় হেরে গিয়েছিল, সে লর্ডকর্ণওয়ালিশই আবার এই ইণ্ডিয়ায় এসে একদিন রাজাধিরাজ রূপে গ্যাঁট হয়ে বসেছিল। এই ভাঙা-গড়ার খেলায় বিড়ম্বনা আছে ঠিকই, কিন্তু তবু কত সুন্দর।

যে-সন্দীপ একদিন সৌম্যপদবাবুর বাড়িতে কৃপার পাত্র হিসেবে কয়েক বছর বাস করেছিল, সেই সন্দীপের কাছেই এসে আবার একদিন সেই সৌম্যপদবাবুকেই কৃপা ভিক্ষা চাইতে হয়েছিল। ইতিহাসের মত জীবনেরও একই অদ্ভুত বিড়ম্বনা। বিড়ম্বনা বটে, কিন্তু কত সুন্দর।

সন্দীপ নিজেও সেদিন অবাক হয়ে গিয়েছিল। সেই সন্দীপের ব্যাংকে এসেই সৌম্যপদবাবুকে নিজের মুখে বলতে হয়েছিল আমাকে কিছু টাকা ওভার-ড্রাফট্ দেবেন মিস্টার লাহিড়ী?

—কত টাকা?

—এই ধরুন সতেরো লাখ?

জীবন সুন্দর হলেও এ সৌন্দর্য বড় করুণ বড় মর্মান্তিক। সন্দীপের চোখে জলের ধারা নেমে এসেছিল সৌম্যপদবাবুর কথা শুনে। সন্দীপ বলেছিল...

না, সে-সব কথা এখন থাক। যখন তার জীবনের এ-কূল গড়ে উঠবে আর মুখার্জি বাবুদের কূল ভাঙবে, তখনই এ কথাগুলো বলা ভালো। ততদিন আপনারা একটু ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করুন।

সেদিন মুক্তিপদ মুখার্জির ক্লাবের ঘরে একটা ইমার্জেন্সী মীটিং ডাকা হয়েছিল। যখন কোনও দিক থেকে কোনও মীমাংসার আশা পাওয়া গেল না তখন ইমার্জেন্সী মীটিং ডাকা ছাড়া আর গতি কী? সেখানে হাজির ছিল সবাইই। যারা ভেতর থেকে গোপনে পে-প্যাকেট পাচ্ছিল তারা সবাই। কোম্পানীর চীফ্ এ্যাকাউনটেণ্ট নাগরাজন ছিল। হাজির ছিল ওয়েলফেয়ার অফিসার যশোবন্ত ভার্গব। ওয়ার্কস্ ম্যানেজার কান্তি চ্যাটার্জি, ডেপুটি ওয়ার্কস্ ম্যানেজার অর্জুন সরকার। আরো অনেক অফিসার হাজির ছিল। সেলস্ এ্যাণ্ড অর্ডার প্রোকিওরমেণ্ট, পারচেজ্ অফিসার, প্রোডাক্শান ডিপার্টমেণ্ট লেবার, সিকিওরিটি, ইনস্পেকশান আর কোয়ালিটি কনট্রোল মেনটেন্যানস্ ডিপার্টমেণ্ট এর অফিসাররা সবাই।

আর ছিল এক মালটি-ন্যাশানাল কোম্পানী চ্যাটার্জি ইনটারন্যাশন্যালের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর মিস্টার অতুল চ্যাটার্জি আর তাঁর ছেলে সুবীর চ্যাটার্জি। তার অধীনে আছে ছ'লক্ষ লেবার। সকলকেই লাঞ্চে ডাকা হয়েছিল। খেতে খেতেই কথা হচ্ছিল।

মিস্টার মুখার্জি সকলকে উদ্দেশ্য করে বললেন—আপনারা সবাই জানেন, আমাদের স্যাক্সবী-মুখার্জি এ্যাণ্ড কোম্পানী কী রকম ক্রাইসিসের মধ্যে দিয়ে দিন কাটাচ্ছে। কত হাজার লোক আইডল্ বসে আছে। আমাদের যাঁরা অফিসার তাঁরা পুরো স্যালারিও পাচ্ছেন না। আর লেবারদের কথা তো ছেড়েই দিলুম। এই ক্রাইসিস্ থেকে আমরা উদ্ধার পাবো কী করে? আপনারাই একটা কিছু পথ বলে দিন—

ওয়ার্কস্ ম্যানেজার কান্তি চ্যাটার্জি বললেন—আমার মতে কোনও দিক থেকেই যখন কোনো মীমাংসা হচ্ছে না, তখন ওয়েস্ট-বেংগল থেকে এ ফ্যাক্টরি বাইরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়াই ভালো—

মুক্তিপদ মুখার্জি বললেন—কোথায় সরিয়ে নিয়ে যাবো?

কান্তি চ্যাটার্জি বললেন—সাউথ-ইণ্ডিয়ার কোনও জায়গায় নিয়ে গেলে বোধহয় ভালো হবে। এখন তারা বাইরের সব ফ্যাক্টরিদের ইনভাইট করছে। তারা বলছে

সেখানে গেলে তারা সব কিছু কন্‌সেশন্‌ দেবে। ট্যাক্সের ব্যাপারেও তারা আমাদের অনেক কিছু রিলিফ্‌ দেবে।

মুক্তিপদ মুখার্জি বললেন—কিন্তু সেখানে গিয়েও যে এই ওয়েস্ট-বেংগলের মত অবস্থা হবে না, তার গ্যারান্টি কী? আজ তারা হয়ত পৌঁছিয়ে আছে, কিন্তু ক'দিন পরে যে তারা নিজ-মূর্তি ধারণ করবে না, তার কী এ্যাস্যুরেন্স আছে? সেখানকার যে-গভর্মেণ্ট এখন আমাদের সেখানে ইন্‌ভাইট করছে, পরে সেই গভর্মেণ্টও তো নাও থাকতে পারে! ভোটে কারা আসবে আর কারা যাবে তা কি বলা যায় আগে থেকে?

কান্তি চ্যাটার্জি সে-কথার কোনও জবাব দিতে পারলে না।

এবার মিস্টার চ্যাটার্জি বলতে আরম্ভ করলেন—আমি আপনাদের কিছু কথা বলতে চাই। আমি ইণ্টারন্যাশন্যাল ইকোনমি বুঝি। আমি ইণ্টারন্যাশন্যাল মার্কেটও বুঝি। আমি সব দিক ভালো করে বুঝে সুঝেই বলছি আপনারা আর কিছুদিন অপেক্ষা করুন। মিস্টার মুখার্জি আমার বন্ধু! আমার এ্যাড্‌ভাইস্‌ যদি শোনেন আপনারা তো আমাকে একটু ভাবতে সময় দিন। দরকার হলে আমি এই স্যাক্সবি-মুখার্জি কোম্পানীর শেয়ার কিনবো, তখন আপনারা দেখবেন এ কোম্পানী কেমন চলে!

কান্তি চ্যাটার্জি বললেন—তখন আপনি এর লেবার-ট্রাবল্‌ কী করে ট্যাকল্‌ করবেন?

মিস্টার চ্যাটার্জি বললেন কী করে ট্যাকল্‌ করবো তা আমার এই ছেলে সুবীর চ্যাটার্জি বুঝিয়ে বলবে! আপনারা নিশ্চয়ই একে চেনেন।

এবার সুবীর চ্যাটার্জির পালা।

সে দাঁড়িয়ে উঠলো। বলতে লাগলো—ইতিহাসের ভাঙাগড়া এক বিচিত্র ফেনোমেনা। সে একদিক যখন ভাঙে, তখন অন্যদিকে আবার গড়ে। সেই ভাঙা-গড়ারও একটা রিদ্‌ম্‌ আছে। তাকে চিনতে হয়, জানতে হয়, ফীল করতে হয়। আমি যে সেই রিদ্‌ম্‌টা চিনতে পেরেছি, জানতে পেরেছি, ফীল করতে পেরেছি, তার গর্ব করবো না। কিন্তু দেখবেন একই দেশে একটা ফ্যাক্টরিতে একেবারে লেবার-ট্রাবল্‌ হচ্ছে না, আবার দেখবেন সেই দেশেই আর একটা ফ্যাক্টরিতে লেবার-ট্রাবল্‌ কেবল লেগেই আছে। এটা কেন হয়? কেন হয় সেটা আমি বুঝিয়ে বলে আপনাদের...

বলে সুবীর চ্যাটার্জি লম্বা ভাষণ দিতে লাগলো। সবাই মন্ত্র-মুগ্ধের মত শুনতে লাগলো তার সেই কথাগুলো।

অনেক বেলা পর্যন্ত যখন মুক্তির টেলিফোন এল না তখন ঠাকমা-মণি ছেলেকে টেলিফোন করতে বললেন। কিন্তু মুক্তি তখনও বাড়ি ফেরেনি। মুক্তির অফিসে টেলিফোন করতে বললেন বিন্দুকে। কোথায়ও পাওয়া গেল না মুক্তিকে।

শেষকালে পুজো-বাড়িতে সিংহবাহিনীর আরতি শেষ হবার পর ঠাকমা-মণি যখন নিজের ঘরে এসেছেন তখন মুক্তিপদর তরফ থেকেই টেলিফোনটা এল।

ঠাকমা-মণি রেগে গিয়েছিলেন। বললেন—এত দেরি করলি কেন টেলিফোন করতে?

মুক্তিপদ বললে—এই এখনই কাজ শেষ করে এলুম। তাই এখন তোমাকে টেলিফোন

করছি। এখনও হাত-মুখ ওয়াশ করা হয়নি—

ঠাকমা-মণি জিজ্ঞেস করলেন—তা মীটিং-এ কী ঠিক হলো?

মুক্তি বললে—মিস্টার অতুল চ্যাটার্জির কথাতেই কাজ হলো!

—কী রকম?

—তিনি বললেন দরকার হলে তিনি আমাদের স্যাক্‌বি-মুখার্জি কোম্পানির শেয়ার কিনে নিয়ে এর এ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশনটা দেখবেন। আর আসল কাজটা হলো তাঁর ছেলের লেকচারে। তার আনডারে ছলাখ লেবার। সে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলাতে সবাই বুঝতে পারলে। আর তা ছাড়া তাদেরও তো স্বার্থ আছে আমাদের কোম্পানীতে। সৌম্যর সঙ্গে তাঁর মেয়ের বিয়ে দিলে একদিন সেই মেয়েও তো কোম্পানীর একজন ডাইরেক্টর হবে!

ঠাকমা-মণি সব কথাগুলো শুনলেন।

বললেন—সবাই বুঝলো?

মুক্তিপদ বললে—বুঝবে না? এই স্ট্রাইকের সঙ্গে তো ওদেরও ভালো-মন্দ জড়িয়ে আছে। অনেকে বলছিল ফ্যাক্টরিটা সাউথ-ইণ্ডিয়াতে সরিয়ে নিয়ে যেতে। মিস্টার চ্যাটার্জির কথায় তারা একটু ঠাণ্ডা হলো। হ্যাঁ ভালো কথা...

বলে একটু থামলো মুক্তিপদ। বললে—একটা কথা তোমায় বলতে ভুলে গিয়েছি। তোমার সৌম্য আসছে...

—সৌম্য? সৌম্য আসছে? কবে?

মুক্তিপদ বললে—লনডন থেকে আয়েঙ্গার টেলেক্স করেছিল আজ। সে বললে সৌম্য এই মাসের মধ্যেই আসছে—

—এই মাসেই? কবে? কোন তারিখে?

মুক্তিপদ বললে—তা বলেনি। এখনও ফ্লাইট বুক করেনি। বুক করলেই জানাবে বলেছে—

—ঠিক আছে। ছাড়ছি—

ঠাকমা-মণির পাশে তখন মল্লিক-কাকা দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনিও কথাটা শুনলেন।

ঠাকমা-মণি টেলিফোনের রিসিভারটা ছেড়ে দিয়ে বললেন—শুনলেন তো? মুক্তির কাছে লনডন অফিসের আয়েঙ্গার টেলিফোন করেছিল। সৌম্য আসছে এই মাসেই—

মল্লিক-কাকা সেই কথা শুনে আর সেখানে দাঁড়ালেন না। পেছন থেকে ঠাকমা-মণি আবার জিজ্ঞেস করলেন—মিস্ত্রীদের কাজ সব শেষ হয়েছে?

মল্লিক-কাকা বললেন—আর দু'একদিনের কাজ বাকি আছে। তারপরেই সব শেষ হয়ে যাবে—

বলে তিনি নিচেয় চলে এলেন।
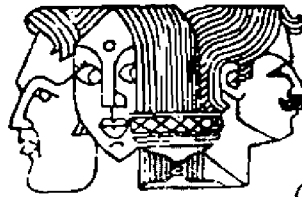
যোগমায়া দেবী রাসেল স্ট্রীটের বাড়িতে তৈরি হয়েই ছিলেন। সন্দীপ এসেই বললে—চলুন মাসিমা, আমি একেবারে ট্যাক্সি নিয়েই এসেছি। চলুন—

আর দেরি করা নয়। ট্যাক্সির পেছনের বসবার জায়গায় একদিকে সন্দীপ আর

একদিকে মাসিমা। মাসিমার মুখে কোনও কথা নেই। তিনি বিশাখার কুষ্ঠিটা যত্ন করে একটা কাগজে পাকিয়ে সঙ্গে করে নিয়েছেন। কী জানি জ্যোতিষী কী বলবে? আর কতদিন তাঁকে এই রকম উদ্বেগের মধ্যে কাটাতে হবে? যদি এখানে মেয়ের বিয়ে না হয় তাহলেই বা কী হবে তাঁর? তখন কোথায় থাকবেন তিনি? কোথায় যাবেন? তখন কে তাঁকে আশ্রয় দেবে?

পৃথিবীর অতীত বর্তমান ও অনাগত কালের সমস্ত মানুষের একমাত্র আগ্রহ তার ভবিষ্যৎ সুখ-দুঃখ-শান্তি-অশান্তিকে কেন্দ্র করে। সে জানতে চায় কোথায় গিয়ে সে পৌঁছোবে, কোন্ কেন্দ্র-বিন্দুতে গিয়ে সে পরিত্রাণ পাবে? এখন থেকে এই যে সুদূর এবং দুর্গম যাত্রার সূত্রপাত হয়েছে তা কি সাফল্যের শিখরে গিয়ে শেষ হবে না অধঃপতনের অন্ধ গুহায় গিয়ে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে?

এ সন্দেহ, এ কৌতূহল অতীতেও ছিল, বর্তমানেও আছে আর ভবিষ্যতেও থাকবে। আমি জানি কোথায় আমার শেষ, কোথায় গন্তব্যস্থল, কোথায় আমার পরিণতি। তুমি শুধু আমাকে জানিয়ে দাও আমার যাত্রাপথের সংগ্রাম শুভ হবে না অশুভ হবে। এই জিজ্ঞাসা অনন্তকাল ধরে জিজ্ঞাসা হয়েই রয়েছে, এর কোনও উত্তর আজো কেউ পায়নি, আর কেউ পাবেও না।

বেলেঘাটা থেকে ফেরবার সময়ে মাসিমা বললে—তিরিশটা টাকা তো দিলুম, কিন্তু তোমার কী রকম মনে হলো সন্দীপ? এ-সব সত্যি?

সন্দীপ কী জবাব দেবে?

মনে আছে বেলেঘাটার সেই জটাজুটধারী জ্যোতিষীর বাড়ির সামনে অনেক ভিড় ছিল। সকলেরই বোধহয় ওই একই সমস্যা। আমার টাকা হবে তো? আমার চাকরি হবে তো? আমার মেয়ের বিয়ে হবে তো? আমার অসুখ সারবে তো?

কত মানুষের কত আকুল জিজ্ঞাসা!

সব কিছু জেনেও সন্দীপ মাসিমার প্রশ্নের কোন স্পষ্ট জবাব দিতে পারেনি।

শুধু মাসিমাকে স্তোকবাক্য শোনাবার জন্যেই বলেছিল নিশ্চয়ই সত্যি হবে, নইলে এত গাদা-গাদা লোক কষ্ট করে এসে এত টাকা খরচ করে যায়?

অলৌকিক শক্তি-সম্পন্ন পুরুষ জ্যোতিষী মহারাজ। অনেকক্ষণ ধরে বিশাখার জন্মকুণ্ডলী মনযোগ দিয়ে দেখেছিল। তারপর বলেছিল—জাতিকা খুব ভাগ্যশালী! সপ্তম পতি লগ্নে বসে সপ্তম স্থানকেই শুধু দেখছে না, সঙ্গে নবম স্থান অর্থাৎ ভাগ্যস্থানকেও দৃষ্টি দিচ্ছে—এর কপালে অনেক সুখ আছে—

তারপর মাসিমার দিকে চেয়ে মহারাজ জিজ্ঞেস করলে—এর কি বিবাহের কথা চলছে?

মাসিমা বললে—হ্যাঁ—

—এক বছর আগে থেকেই এর সম্বন্ধ হয়েছে কি?

হ্যাঁ।

—এই পাত্রের সঙ্গেই আপনার মেয়ের বিয়ে হবে।

—সত্যি হবে?

মহারাজ বললে—আমার বিচার কখনও মিথ্যে হয়নি, মিথ্যে হবেও না—

—সত্যি বলছেন?

মহারাজ বললে—আমি তো বলছি আমার ভবিষ্যদ্বাণী আজ পর্যন্ত কখনও মিথ্যে হয়নি। সপ্তমপতি লগ্নের ওপর রয়েছে। সে একসঙ্গে লগ্নকে দেখছে, পঞ্চম স্থানকে দেখছে আবার তার সঙ্গে ভাগ্যস্থানকেও দেখছে। এ জাতিকার কখনও অমঙ্গল হতে পারে না। তারপরে আবার সপ্তমপতির দশা। শাস্ত্রে আছে—কিং

কুর্বন্তী গ্রহে সর্বা যস্য কেন্দ্রে বৃহস্পতি—আপনি নিশ্চিন্তে বাড়ি চলে যান—

জ্যোতিষী মহারাজের কথাগুলো তখনও সন্দীপের কানে যেন গুঞ্জন করছিল।

—এ মেয়ে আপনার গৃহলক্ষ্মী!

মাসিমা জিজ্ঞেস করেছিল—তাহলে ওর জন্মের পরে ওর বাবা মারা গেলেন কেন?

জ্যোতিষী বললে—সে জাতিকার দুর্ভাগ্যের জন্যে হয়নি। সে-কথা জানতে গেলে জাতিকার পিতার জন্মকুন্ডলী দেখলে বলা যেত। আর এখন সে-কথা জেনেই বা কী লাভ? আপনার কন্যার অনেক সৌভাগ্য আছে কপালে- -

সন্দীপ সে-কথাগুলোও নিজের মনে ভাবছিল।

মাসিমা আবার জিজ্ঞেস করলে—তুমি বাবা কিছু কথা বলছো না যে? জ্যোতিষী মহারাজ যখন বলেছে তখন ভালোই হবে, কী বলো?

সন্দীপ তখনও নিজের মনেই মিস্টার চ্যাটার্জির মেয়ের কথা ভাবছিল। সে এম-এ পাশ, দেখতেও সুন্দরী। তার ওপরে তার বাবার টাকাও আছে অগাধ। শুধু তাই নয়। তার ভাই আবার লেবার ইউনিয়নের লীডার। স্যাক্সবী মুখার্জি কোম্পানীর ফ্যাক্টরির স্বার্থে তার বোনের সঙ্গে সৌম্যপদের বিয়ে দিলে মুক্তিপদ মুখার্জি আর ঠাকমা-মণি দুজনেরই লাভ। সেই পাত্রী ছেড়ে এই বাপ-মরা গরীব পাত্রীর সঙ্গে বিয়ে দিতে যাবে কেন?

কিন্তু সন্দীপ মুখ ফুটে মাসিমাকে সে-কথা কী করে বলে?

মাসিমা আবার বললে—কই, তুমি কিছু বলছো না যে? এখানেই বিশাখার বিয়ে হবে তো?

সন্দীপ উত্তরটা এড়িয়ে গিয়ে বললে—হবে বলেই তো আমার মনে হয় মাসিমা।

মাসিমা আবার বললে—আমার দেওর তো বলে গেল তোমাদের বাড়িতে রাজ-মিস্ত্রী খাটছে, সে তো দেখে এসেছে। তোমাদের দারোয়ানের কাছ থেকে সে শুনে এসেছে। এর পরেও কি বিয়ে আটকাতে পারে?

সন্দীপ বললে সবই তো ভগবানের নির্বন্ধ। এ নিয়ে আপনি অত ভাবছেন কেন? আর যদি এ-বিয়ে না-হবে তো ঠাকমা-মণি আপনাদের রাসেল স্ট্রীটের বাড়িতে রেখেছেন কেন? শুধু তো রাখা নয়, তার সঙ্গে খরচ-পাতিও তো কম হচ্ছে না। মাসে মাসে এত হাজার-হাজার টাকা খরচও তো করছেন আপনাদের জন্যে-

মাসিমাকে অন্য দিনের চেয়ে যেন একটু শান্ত মনে হলো। প্রথমে জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্বাণী, তার ওপর সন্দীপের যুক্তি কোনওটাই অস্বীকার করবার মত নয়। তারপর আছে ভবিতব্য! সত্যিই তো ভবিতব্য কে খন্ডাতে পারে।

রাসেল স্টীটের বাড়ির সামনে এসে ট্যাক্সি থামলো। সন্দীপ ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে বললে- আমি তাহলে এখন আসি মাসিমা, কাল আবার আসবো—

মাসিমা বললে—তোমাকে আর থাকতেই বা বলি কি করে? অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। কাল সন্ধ্যেবেলা তাহলে আবার এসো—

মাসিমা বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়লো।

সন্দীপ রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে জ্যোতিষীর কথাগুলোই ভাবতে লাগলো। জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্বাণী যে আগা-গোড়া মিথ্যে, এ কথা মাসিমাকে কী করে বোঝায় সন্দীপ? ওরাও যে খদ্দেরদের মন রেখে কথা বলে তারই তো প্রমাণ পাওয়া গেল আজ। কাকে বলে 'লগ্ন', কাকে বলে 'সপ্তমপতি', কাকে বলে পঞ্চমপতি আর নবমপতি সে-সব কথার একবর্ণও সন্দীপ বুঝতে পারেনি। আর মাসিমা তো আরোই বুঝতে পারেনি। আর শুধু তারা কেন, পৃথিবীর তাবৎ ভদ্রলোক-ভদ্রমহিলারাও ওই সব কূট বিষয়বস্তুর মানে বুঝতে পারবে না।

হঠাৎ পেছন থেকে কে যেন তাকে ডাকলে—সন্দীপ—

গোপাল হাজরার গলার শব্দ। পেছন ফিরতেই গাড়িটা তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। গাড়ি থেকে মুখ বাড়িয়ে গোপাল জিজ্ঞেস করলে—কী রে, এত রাত্তিরে কোথায় যাচ্ছিস?

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—তুই?

গোপাল বললে—কোথায় যাচ্ছিস তুই, বাড়ি? তাহলে পেছনে উঠে পড়—

সন্দীপ জিপের ভেতরে উঠতেই জিপ আবার চলতে লাগলো, সন্দীপ গোপালের দিকে চেয়ে দেখে অবাক হয়ে ভাবতে লাগলো—গোপাল ঠিক সেই আগেকার মতই আছে। সেই প্রথম দিনে যেমন দেখেছিল সেই একই রকম। একটুকু বদলায়নি।

গোপালই প্রথমে জিজ্ঞেস করলে—কোথা থেকে আসছিস্?

সন্দীপ বললে—সেই রাসেল স্ট্রীট থেকে—

গোপাল বললে—এখনও ওখানে যাস তুই?

সন্দীপ বললে—আমার যে ডিউটি ওখানে যাওয়া। ওই ডিউটি দিই বলেই তো বিডন স্ট্রীটের বাড়িতে এখনও থাকতে পাই, খাওয়া-পরা পাই। ডিউটি না দিলে আমার থাকার জন্যে বাড়িভাড়া করতে হতো, নিজের হাতে রান্না করতে হতো—।

তারপর একটু থেমে বললে—তবে, এখন একটা চাকরি পেয়ে গিয়েছি আমি—

—চাকরি পেয়েছিস? তুই কোথায় চাকরি পেয়েছিস?

সন্দীপ বললে—ব্যাঙ্কে—

—ব্যাঙ্কে? কে চাকরি করে দিলে?

সন্দীপ বললে—কে আবার করে দেবে? আমার তো কেউ নেই যে চাকরি করে দেবে!

—তা তুই যে বলেছিলি তুই চাকরি না করে ওকালতি প্র্যাকটিশ করবি?

সন্দীপ বললে—হ্যাঁ, আমার সেই ইচ্ছেই ছিল, কিন্তু কাশীবাবুই আমাকে বারণ করলেন। বেড়াপোতার কাশীবাবুকে চিনিস তো?

গোপাল হঠাৎ ফস্ করে একটা সিগ্রেট ধরিয়ে নাক মুখ দিয়ে লম্বা ধোঁয়া ছেড়ে বললে কাশীবাবুকে চিনবো না? কী বলছিস তুই? ওই কাশীবাবুই তো আমাকে তিন বছর ধরে মামলায় ফাঁসিয়ে দিতে চেয়েছিল!

সন্দীপ বললে—কীসের মামলা?

গোপাল বললে—আরে সে এক মিথ্যে মামলায় জড়িয়ে ফেলেছিল আমাকে। একেবারে ডাহা মিথ্যে মামলা। তারক ঘোষের কথা তোর মনে আছে? সেই যে আমাদের সংগে এক ক্লাশে পড়তো।

- হ্যাঁ, খুব মনে আছে।

গোপাল বললে—সেই তারক ঘোষদের খড়ের বাড়িটা একদিন আগুনে পুড়ে যায়, সেই সংগে তার বাবা-মা-ভাই-বোন যে-যে ছিল সবাই পুড়ে মরে। শুধু একলা তারক বেঁচে যায়। আমি ভালো-মানুষী করে তারককে কিছু-কিছু করে টাকা দিতুম। হাজার হোক এক গ্রামের ছেলে তো! একসংগে একই ক্লাশে পড়েছি। তার কষ্ট হলে আমি যতটুকু সাধ্য সাহায্য করবো না? তুই কী বলিস?

সন্দীপ এ-কথার কিছু জবাব দিলে না। শুধু বললে—তারপর?

গোপাল বললে—তারপর কী হলো শোন্। দ্যাখ, এই যুগে ভালো মানুষদেরই কপালে যত কষ্ট। আমি কোথায় তারককে মাঝে মাঝে টাকা দিয়ে সাহায্য করতুম, যাতে উপোস করে মরতে না হয় তাকে, আর সেই কাশীবাবু কিনা তারককে ফরিয়াদী করে আমার নামে মামলা ঠুকে দিলে?

সন্দীপ এবারও কিছু কথা বললে না। শুধু বললে—কী জন্যে মামলা করলে?

—কী জন্যে আবার, আমাকে ফাঁসাবার জন্যে! কাশীবাবুর ফরিয়াদ এই যে আমি নাকি ওদের বাড়িটা দখল করবার জন্যে তারকদের বাবা-মা-ভাই-বোন সকলকে পুড়িয়ে মেরেছি। একেবারে পেনাল কোডের ৩০২ ধারা আমার বিরুদ্ধে। আরে, তাই-ই যদি হবে তাহলে তারককে আমি মাসে মাসে অতদিন ধরে অত টাকা দিতে গেলুম কেন? ওর ওপর আমার কীসের দয়া-মায়া? ও আমার কে? তুই-ই বল্?

এবারও সন্দীপ এর কিছু জবাব দিলে না। শুধু বললে—তারপর?

গোপাল বললে—আরে এ-যুগে ভালো মানুষের অনেক কষ্ট। ভালো মানুষ হওয়াটাই পাপ। সেই কাশীবাবু কিনা আমাকে নানা রকম সেক্শানে জড়িয়ে ফেললে। কিন্তু জানে না যে হাইকোর্টের ওপরেও আর এক হাইকোর্ট আছে। ভালো মানুষদের লোকে যতই বোকা ভাবুক তার মাথার ওপরেও একজন ভগবান আছে!

—তারপর কী হলো?

—তারপরে আর কী হবে, আমি সব চার্জ থেকে ছাড়া পেয়ে গেলুম। শেষকালে মবলক ন'শো টাকা মামলার খেসারত পর্যন্ত পেয়ে গেলুম। তাতে তারক বিপদে পড়ে গেল। সে কোথা থেকে টাকা দেবে? শেষে সেই বেড়াপোতার বারোয়ারি-তলার বাজারে একলা একলা শুয়ে পড়ে থাকতো। আর কাশীবাবুও তাকে কিছু কিছু হাতখরচ দিত। কিন্তু তাতে কুলাবে কেন? সে হাসপাতালে গিয়ে নিজের রক্ত বেচে-বেচে পেট চালাতো। শেষকালে একদিন হার্ট-ফেল হয়ে মারাই গেল। যদি তুই কখনও বেড়াপোতায় যাস্ তো দেখবি সেই তারকদের জমিটার ওপর আমাদের পার্টির নামে একটা বিরাট তিন-তলা বাড়ি বানিয়েছি—

গোপাল হাজরার কথা শুনতে শুনতে সন্দীপের চোখে তখন তারকের সেই অন্তিম দিনটার ছবিটাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। এই গোপাল হাজরা! এই গোপাল হাজরাই শেষ পর্যন্ত তারক আর তারকদের সমস্ত ফ্যামিলিকে খুন করেছিল, এ-কথা কি কোনোদিন কোনও পার্টির ইতিহাসে লেখা থাকবে? এই গোপাল হাজরাই হয়তো একদিন আবার এ-দেশের মিনিস্টারও হয়ে যাবে, কিন্তু তখন কি কেউ জানতে পারবে তার মিনিস্টার হয়ে যাওয়ার পেছনকার ইতিকথা?

—তা ব্যাঙ্কে চাকরি না করে ওকালতি করলি না কেন?

সন্দীপ বললে—কাশীবাবু যে বারণ করলেন আমাকে।

—কেন? কেন বারণ করলে?

সন্দীপ বললে—কাশীবাবু আমাকে বললেন যে হাইকোর্ট নাকি তার 'চরিত্র' হারিয়েছে—

—চরিত্র? 'চরিত্র' মানে?

সন্দীপ বললে—মানুষের যেমন 'চরিত্র' থাকে, দেশের যেমন একটা 'চরিত্র' থাকে, সেই 'চরিত্র' যদি একবার নষ্ট হয়ে যায় তো তাহলে তার সব কিছুই হারিয়ে যায়, সব কিছুই নষ্ট হয়ে যায়। তাই কাশীবাবুই আমাকে কোর্টে প্র্যাকটিশ করতে বারণ করেছিলেন।

গোপাল বললে—কাশীবাবুর দেখছি মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে। বুড়ো হলে সক'লরই হয়। আমার বিরুদ্ধে অনেক দিন ধরে মামলা করে করে এখন ওই রকম হয়ে গেছে আর কি।

হঠাৎ একটা গাড়ি চলতে চলতে কাছে এসে দাঁড়ালো। সন্দীপ চিনতে পারলে—বরদা ঘোষাল। সে লেবার-লীডার, গাড়িতে বসেই জিজ্ঞেস করলে—কী রে, কোথায় চলেছিস?

গোপাল বললে—আজকে তো আমাদের মীটিং—

বরদা ঘোষাল বললে—আমিও তো সেখানে যাচ্ছি। আজ শ্রীপতিদা আসছে। স্যাক্সবী মুখার্জী কোম্পানির স্ট্রাইক নিয়ে আজ শ্রীপতিদা রেজোলিউশন্ আনছে—

—তাই নাকি? ও ব্যাটাদের বড় বাড় বেড়েছে—

বরদা ঘোষাল বললে—শুনেছিস ওদিকে নাকি চ্যাটার্জি এণ্ড সনস্-এর সুবীর চ্যাটার্জিটা মুক্তিপদ মুখার্জির সঙ্গে হাত মেলাচ্ছে। ওখানকার লেবার-স্ট্রাইক বানচাল করে দেবার মতলোব আঁটছে—

—তাই নাকি?

—তাই তো আমি শুনলাম। তা যদি করে তো ওদের ওখানেও আমরা হামলা করবো! শ্রীপতিদা বলেছে তাহলে কাউকে আর ছেড়ে কথা বলবে না—

সন্দীপ বললে—মুখার্জিদের ক্ষতি করে তোদের লাভ কী? ওরা তোদের কী করেছে? অত দিনের ফার্ম উঠে গেলে কত লোকের চাকরি চলে যাবে তা জানিস না?

গোপাল বললে—তুই চুপ কর। তুই পলিটিক্সের কী বুঝিস? বুর্জোয়াদের যত শিগগির পতন হয় ততই দেশের পক্ষে মঙ্গল। আমাদের পার্টির পক্ষেও তত সুবিধে। বুর্জোয়ারা বেঁচে থাকতে সাধারণ মেহনতি মানুষের কিছুতেই মুক্তি নেই—

তারপর একটু থেমে আবার বললে—আর তা ছাড়া তোর অত ভয় কীসের? তুই তো ব্যাঙ্কে চাকরি পেয়ে গিয়েছিস!

সন্দীপ বললে—কিন্তু কল-কারখানা বন্ধ হলে ব্যাঙ্কও তো অচল হয়ে যাবে। ব্যাঙ্কে টাকা রাখবে কে? তখন কি আমারই চাকরি থাকবে?

গোপাল বললে লেখা-পড়া শিখেও যে মানুষ আকাট মুখ্যু হয়, তুই-ই তার প্রমাণ। সমাজের বুকে যখন রোগ হয় তখন তার ড্রাসটিক ট্রিটমেণ্ট-এর দরকার হয়। শ্রীপতিদা তাই বলেছে দেশকে পুরো ঢেলে সাজাতে গেলে মানুষের তো প্রথম দিকে কিছু কষ্ট করতেই হবে। কিছু লোককে প্রাণ দিতেই হবে! তুই হিস্ট্রী পড়ে দেখিস রাশিয়ায় যখন রিভোলিউশন্ হলো। তখন লক্ষ লক্ষ মানুষকে রক্ত দিতে হয়েছিল, চায়নাতেও মাও-সে-তুংকে তাই করতে হয়েছিল, তাতে শেষ পর্যন্ত কি খারাপ হয়েছে? এখন ওরা কত পাওয়ারফুল দেশ বল্ তো?

সন্দীপ বললে—কিন্তু দেশে আগুন লাগলে সেই আগুনে তো তোদের পার্টির লোকও পুড়ে মরবে—

গোপাল বললে—শ্রীপতিদা তো তাই বলে আমরা মরি তাতে ক্ষতি নেই, কিন্তু পার্টি বাঁচলেই হলো।

সন্দীপ বললে—এই যে ইণ্ডিয়া পার্টিশন হলো, পাকিস্তান থেকে এত লক্ষ লক্ষ লোক এখানে এল, এতে তোর শ্রীপতিদারা কী বলে?

গোপাল বললে শ্রীপতিদা বলে এতে পার্টি আরো স্ট্রং হলো। এতে আমাদের পার্টির লক্ষ লক্ষ মেম্বার বাড়লো। তুই আমাদের পার্টির অফিস বিল্ডিংটা দেখেছিস্? অত বড় বিল্ডিং ওদের আছে? এককালে তো ওরা একচেটিয়া সব কিছু ভোগ করে এসেছে। দেশের সমস্ত লোকের টাকা ওদের পেটে ঢুকেছে। আর এখন? দেশ ভাগ না হলে তো ওদের আরো বোলবোলা হতো। ওরা আরো বড় বড় অফিস বানাতো! আরো বড় বড় গাড়ি চড়তো। এখন ওদেশ থেকে যত লোক ঘর-বাড়ি ছেড়ে এখানে এসেছে সবাই আমাদের পার্টিতে ভর্তি হলো কেন? নিশ্চয় ওরা বুঝেছে, কাদের জন্যে দেশটা ভাগ হয়েছে, কাদের জন্যে ভিটে-মাটি ছেড়ে এখানে ফুটপাথে এসে ঝুপড়ি বানিয়ে দিন কাটাতে হচ্ছে। ওরা জেনে ফেলেছে আমরাই ওদের আসল লীডার—

খানিক পরে গোপাল বললে— এবার এইখানে তুই নাম। আমি এখান থেকে অন্যদিকে যাবো

সত্যিই সন্দীপের আর গোপালের কথাগুলো শুনতে ভালো লাগছিল না। সে রাস্তায় নেমে পড়লো। গোপাল গাড়ি চালিয়ে উল্টোদিকে চলে গেল। কিন্তু রাস্তায় চলতে চলতে তার কানে তখনও গোপালের কথাগুলো বাজছিল।

সত্যিই তো গোপালের একলারই দোষ কী? কলকাতায় সবাই তো গোপালের মতন। ক্ষমতা তো সকলেরই চাই। ক্ষমতা থাকলে তুমি পৃথিবীতে যা চাও তাই-ই পাবে। যতদিন কংগ্রেসের ক্ষমতা ছিল ততদিন তারা সব কিছু ভোগ করেছে। এখন গোপালরা সে-ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছে, এখন গোপালরা আগেকার লীডারদের মত সব কিছু ভোগ করবে। আগেকার লীডারদের খালি চেয়ারেই যে বসবে তাই-ই নয়, তাদের মত গাড়ি চড়বে, তাদের মত ময়দানে দাঁড়িয়ে ফুলের মালা গলায় দিয়ে লেকচার দেবে। তাদের মত কথায় কথায় ডাক্তার দেখাতে আমেরিকায় বা রাশিয়ায় যাবে। তারা এতদিন যা-যা করেছিল, গোপালরাও ঠিক তাই-তাই-ই করবে। হঠাৎ হঠাৎ আগেকার কংগ্রেস লীডারদের মত হরতাল ডাকবে, আর হঠাৎ হঠাৎ খবরের কাগজের পাতায় বড় বড় ছবি ছাপাবে।

সন্দীপ যখন বাড়িতে পৌঁছুলো তখন নিয়মমত গিরিধারী সেলাম করলে।

মল্লিক-কাকা বোধহয় তার জন্যে ভাবছিলেন। বললেন কী হলো? এত দেরী?

সন্দীপ বললে মাসিমাকে নিয়ে সেই জ্যোতিষীর কাছে গিয়েছিলুম

—জ্যোতিষী কী বললে?

সন্দীপ বললে—কী আর বলবে। গালে চড় মেরে মাসিমার কাছ থেকে তিরিশটা টাকা নিয়ে নিলে। তারপর বললে—মেয়ের বিয়ে সৌম্যবাবুর সঙ্গেই হবে। তবে অনেক বাধাবিঘ্নের পর -

—কীসের বাধা-বিঘ্ন?

সন্দীপ বললে—অত কথা বলার সময় কোথায় জ্যোতিষীর? হাজার-গন্ডা লোক তখন টিকিট নিয়ে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—

মল্লিক-কাকা বললেন—জ্যোতিষী মিছিমিছি তিরিশটা টাকা খসিয়ে নিলে। দেখছি সবাই আজকাল জোচ্চোর হয়ে উঠেছে—

সন্দীপ বললে—মাসিমার ইচ্ছে হলো জ্যোতিষীর বাড়িতে যাবে, আমি আর তার কী করবো। আমার ট্যাক্সির ভাড়ার টাকাটাও মাঝখান থেকে নষ্ট হলো।

মল্লিক-কাকা বললেন যাক্ গে, যা হবার তাই হবে, আমরা আর কী করতে পারি।
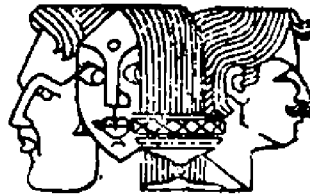
মানুষের মনে বাস্তব-জগতের সঙ্গে তার আর একটা ইচ্ছের জগতও থাকে। বাস্তব-জগতের সঙ্গে সেই তার ইচ্ছের জগতের বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কোনও সামঞ্জস্য থাকে না। যে কবি হতে চায় শেষ পর্যন্ত তাকে কখনও কখনও আবার বাধা হয়ে কেরানীও হতে হয়। যে স্বাধীন ব্যবসা করতে চায় তাকেও ভাগ্যচক্রে আবার কখনও

কখনও পরের অধীনে চাকরি করবার দুর্ভোগ সইতে হয়।

কিন্তু মুখুজ্জে-বাড়ির ঠাকমা-মণির এ দুর্ভাগ্য সইতে হয়নি। জীবনে তিনি যা যা চেয়েছিলেন মোটামুটি তা সবই পেয়েছিলেন। অগাধ ঐশ্বর্য, দেবতুল্য স্বামী, প্রাসাদতুল্য বাড়ি, লোক-জন, দাস-দাসী। কী ছিল না তাঁর? তিনি যখন যা হুকুম করতেন সঙ্গে সঙ্গে তা পেয়ে যেতেন। শুধু হুকুম করারই যা কিছু অপেক্ষা।

কিন্তু কোনও মানুষের জীবন তো কুসুম-শয্যা নয়। দিল্লীশ্বর জগদীশ্বরের জীবনেও কুসুম-শয্যা কণ্টকশয্যাতে রূপান্তরিত হয়েছিল অনেকবার। ইতিহাসের পাতায় যাদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে তাদের জীবন-ইতিহাসও তাই।

তবু মানুষ দুঃখ এড়াতে চায়। অশান্তি থেকে অন্ততঃ খানিকক্ষণের জন্য মুক্তি কামনা করে। সেই অশান্তি এড়াবার জন্যেই তিনি বাড়িতে গৃহদেবতা সিংহ-বাহিনীর পুজো-আরাধনা করতে চেয়েছিলেন। প্রত্যেক দিন ভোরবেলা গঙ্গাস্নানের ফলে পুণ্য অর্জন করতে চেয়েছিলেন।

কিন্তু ঠাকমা-মণি একটা ভুল করেছিলেন।

আমাদের দেশের ঋষিদের একটা কথা আছে—'পঞ্চাশোর্ধে বনং ব্রজেৎ।'

অর্থাৎ পঞ্চাশ বছর বয়েসে সংসার ত্যাগ করে বনে যাবে! কিন্তু সে বন তো অরণ্য নয়, তপোবন। সারা জীবন মানুষ যা সঞ্চয় করলো পঞ্চাশ বছর উত্তীর্ণ হলে দানের দ্বারা সেই সঞ্চয়কে সার্থক করে তুলতে হবে। অর্থাৎ পঞ্চাশ বছর বয়েস পর্যন্ত উপার্জনের যে প্রচেষ্টা মানুষ করে, পঞ্চাশোর্ধে তাকে ত্যাগের দ্বারা পবিত্র আর পরিশুদ্ধ করতে হবে, তবেই তুমি ভব-যন্ত্রণা থেকে পরিত্রাণ পাবে!

কিন্তু এ তত্ত্ব যখন পৃথিবীর কেউই পালন করে না, তখন ঠাকমা-মণিই বা তা পালন করতে স্বীকার করবেন কেন? পৃথিবীর কোনও মানুষই কি জানে যে জীবনেরও একটা পূর্ণতা আছে? কেউ কি জানে যে জীবনের একটা স্তরে এসে থামতে হয়? সেই থামা মানে মৃত্যু নয়। সেই থামা মানে সম্পূর্ণতা। নদী হিমালয় থেকে নামতে নামতে এসে সমুদ্রের সঙ্গে যখন মেশে তখন নদীর কিন্তু শেষ হয় না। সমুদ্রের সঙ্গে মিশে গিয়ে নদী সম্পূর্ণ হয় বলেই তার চলা সার্থক হয়। মানুষের জীবনকেও তেমনি ত্যাগের দ্বারা সার্থক করতে হয়!

কিন্তু এ-সব কথা কে কাকে বলবে, আর কে-ই বা বুঝবে?

মুখার্জি-বাড়ির সবাই তখন হাঁ করে প্রতীক্ষা করে আছে সৌম্যপদর বিলেত থেকে ফিরে এসে অতুল চ্যাটার্জির মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হওয়ার জন্যে, সেই বিয়েটা হয়ে গেলেই এ-সংসারে গতি আবার বেগবান হবে। এ-সংসারের গতি আবার লক্ষ্মীশ্রীতে পরিপূর্ণ হয়ে অনাদি-অনন্তকাল পর্যন্ত অবারিত হবে। মুক্তিপদ আবার চিন্তামুক্ত হবে, 'স্যাক্সবী-মুখার্জি' কোম্পানীর অনুগত কর্মচারীরা আবার নিশ্চিন্ত হবে, ঠাকমা-মণি আবার তাঁর জীবনের হৃত গৌরব ফিরে পাবেন।

আর বরদা ঘোষাল, গোপাল হাজরা, শ্রীপতি মিশ্র, তারা? তারা যে পরাজয় স্বীকার করবে এমন ধাতুতে গড়া মানুষ তারা নয়। দেশে যখন অশান্তি বাড়বে, দেশে যখন অরাজকতা সৃষ্টি হবে, দেশে যখন বেকারত্বের সংখ্যা বৃদ্ধি হবে, ততই তাদের পরাক্রম এবং পসার বৃদ্ধি পাবে!

সেদিন মন্ত্রী শ্রীপতি মিশ্রের বাড়িতে তারই গোপন পরিকল্পনা হচ্ছিল।

সেখানে সবাই হাজির ছিল। বরদা ঘোষাল, গোপাল হাজরা ছাড়াও আরও ছিল বেণুগোপাল। 'স্যাক্সবী-মুখার্জি' কোম্পানীর শিফট ইন-চার্জ ইন্‌জিনীয়ার। বিশেষ আমন্ত্রণে তাকে এখানে ডেকে আনা হয়েছিল। স্যাক্সবী-মুখার্জি কোম্পানীর স্ট্রাইকের পেছনে তার কৃতিত্বই সবচেয়ে বেশি।

চ্যাটার্জি এণ্ড সন্স-এর সঙ্গে মুখার্জি-বাড়ির ঘনিষ্ঠতায় সবাই একটু উদ্বিগ্ন! সেই সমস্যার সমাধানের জন্যেই এ বাড়িতে এই ইমার্জেন্সী মীটিং।

বেণুগোপালকেই প্রথমে তার বক্তব্য বলতে বলা হলো।

বেণুগোপাল বললে—আপনারা সবাই জানেন কোম্পানী আমাকে চরম অপমান করেছে আমার কোয়ার্টার সার্চ করে। অথচ আপত্তিকর কিছুই পাওয়া গেল না। এর বদলা নিতেই আমাদের এই স্ট্রাইক। আর এর প্রতিবাদেই কোম্পানী লক্-আউট ডিক্লেয়ার করেছে। আমি বলতে চাই এ লক্‌আউট আন্-লফুল। আপনারাই এর বিহিত করুন। আমি আপনাদের কাছে এর সুবিচার চাই—

এর জবাবে বরদা ঘোষাল বললে—আপনারা রক্ত দিতে পারবেন? আপনারা রক্ত দিতে তৈরী আছেন? আপনারা যদি রক্ত দিতে তৈরি থাকেন তো আমরা সমস্ত শক্তি দিয়ে আপনাদের বাঁচাবো। বলুন আপনারা রক্ত দিতে তৈরি আছেন কি না—

বেণুগোপাল বললে—আমরা তো রক্ত দিচ্ছিই, দরকার হলে আরো রক্ত দেব।

—তাহলে আমাদের পার্টির তরফ থেকে আমরাও কথা দিচ্ছি আপনারা যাতে ন্যায়বিচার পান তারও গ্যারান্টি দেব!

তারপর একটু থেকে বরদা ঘোষাল আবার বললে—আমি নিজে একজন সর্বহারা। আমি দশ বছর দেশের জন্যে জেল খেটেছি। দরকার হলে আরও অনেক বছর জেল খাটতে তৈরি। কিন্তু আপনারা কথা দিন যে আপনারা আমার পাশে থাকবেন, আপনারা যারা আমার মত মেহনতি মানুষ, তারা আমাদের মদত দেবেন—

বেণুগোপাল বললে রক্ত এখনও দিচ্ছি, দরকার হলে তখনও রক্ত দেব—

বরদা ঘোষাল বললে—খুব ভালো কথা। তাহলে আমিও পার্টির তরফ থেকে বলছি আমি শুধু রক্ত নয়, জীবন দেব। যে-পার্টি পুঁজিপতির দালাল আমরা তাদের খতম করবো। এ-শুধু আমার মুখের কথা নয়, এ আমি কাজেও দেখিয়ে দেব। পুলিশ আমাদের হাতে। আমরা যা বলবো পুলিশ তাই-ই শুনবে। এখন দরকার শুধু একদল কমিটেড্ লোক। পরের মীটিং করবো আমরা শহীদ-ময়দানে। সেখানে প্রকাশ্যেই আমরা আমাদের প্ল্যান ঘোষণা করবো। তারপর একটা বাংলা বন্ধ পালন করবো। সেদিন আমরা সব কিছু অচল করে দেব। দুধ, খবরের কাগজ, হাসপাতাল ছাড়া আর সব কিছু বন্ধ থাকবে। আপনারা সবাই যদি ইউনাইটেড থাকেন তবে কেউ আমাদের বিরোধিতা করতে পারবে না—

সকলের শেষে শ্রীপতিবাবু বলতে আরম্ভ করলেন। তিনি বলতে লাগলেন—দেখুন বিদেশীরা আমাদের দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছে। তারা ছিল আমাদের সকলের শত্রু। কিন্তু বিদেশীরা চলে গেলেই কি আমরা সত্যিকারের স্বাধীন হয়েছি?

গোপাল হাজরা বলে উঠলো—না না, আমরা এখনও স্বাধীন হইনি।

শ্রীপতিবাবু বললেন- হ্যাঁ গোপালবাবু, যা বলেছেন তা ঠিকই বলেছেন। ১৯৪৭ সালে যখন বিদেশী শক্তি ইন্ডিয়া ছেড়ে চলে গেল তখন তারা কাদের হাতে দেশকে তুলে দিয়ে গেল? ইন্ডিয়ার পুঁজিপতিদের হাতে। 'স্যাক্সবী-মুখার্জী' কোম্পানীর মত ক্যাপিটালিস্টদের হাতে। তখনই আমরা জানিয়ে দিয়েছিলাম—এ আজাদী ঝুটা হ্যায়। তখন আমাদের কথা কেউ শুনলে না। তখন বিদেশীদের সঙ্গে লড়াইতে কারা রক্ত দিয়েছিল? কারা রক্ত দিয়ে ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই করেছিল? সে গান্ধী নয়, সে নেহরু নয়, সে বল্লভভাই প্যাটেল নয়। তারা আপনার আমার মত সর্বহারা মানুষ। তারা নিজেরা রক্ত দিলে আর স্বাধীনতা পেলে গান্ধী-নেহরু-প্যাটেলরা। আর আমরা? আমরা যে সর্বহারা মানুষ ছিলুম সেই সর্বহারা মানুষ রয়ে গেলাম। তখন আমরা ইংরেজদের গোলামী করেছি আর এখন গোলামী করছি দিল্লীর হুজুরদের—।

এ বেশীদিন চলতে পারে না। বেশিদিন এ অবস্থা চলতে দেওয়া উচিতও নয়। আমাদের পশ্চিম বাঙলার লক্ষ লক্ষ মেহনতি মানুষ আজ বেকার। সব জুটমিল বন্ধ। এ ষড়যন্ত্র। এ ষড়যন্ত্র কেন? আমরা এই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে আবার মেহনতি মানুষদের মুক্তি দেব। আসুন আমরা এই সংকল্পে ঐক্যবদ্ধ হই। যতদিন না দেশের মেহনতি মানুষদের মুক্তি হয় ততদিন আমাদের বিশ্রাম নেই, ততদিন আমাদের...

মুক্তিপদ মুখার্জি নিজের বাড়ির মধ্যে একমনে প্রতীক্ষা করছিলেন। অন্যদিনের মত সেদিনও তাঁর কোনও ব্যস্ততা নেই। তিনি প্রতীক্ষা করছিলেন আর মাঝে মাঝে হাত-ঘড়িটার দিকে দেখছিলেন। সন্ধ্যে ছটা বেজে গিয়েছে ঘড়িতে। এখনও কোনও খবর নেই। তারপর সাতটা বাজলো, আটটা বাজলো। নন্দিতা ওপরের হল-ঘরে তখনও এক মনে রঙিন টি-ভি দেখছে। পিক্‌নিকও সেখানে। সময়ের ঘণ্টা যেন বড় ধীরগতিতে বাজছে।

হঠাৎ খবর এল অর্জুন এসেছে। মুক্তিপদ লাফিয়ে উঠলেন। জিজ্ঞেস করলেন—কী খবর? শিগগির বলো! ওরা কী ঠিক করলে?

—ঠিক হয়েছে আবার একদিন বাঙলা বন্ধ্ ডাকবে।

—কবে?

—তারিখটা এখনও ঠিক হয়নি।

—কে-কে ওখানে হাজির ছিল?

অর্জুন সরকার বললে- আমার ইনফরমার বললে—সবাই। সবাই হাজির ছিল। যারা যারা আমাদের কাছে এসে টাকা নিয়ে গিয়েছে তারাই আমাদের বিরুদ্ধে। সবাই আমাদের কাছে নুন খেয়ে নেমকহারামী করতে লাগলো—

মুক্তিপদ আশ্চর্য হয়ে গেলেন। বললেন—তুমি তো জানো। ওই বরদা ঘোষাল আমার কাছে এসে বারে বারে কত লাখ টাকা নিয়েছে--

—সেটা জানি বলেই তো বলছি।

—শুধু কি টাকা? ওদের পার্টির কত লোককে আমরা চাকরি দিয়েছি তাও তোমার জানা!

অর্জুন সরকার বললে- স্যার, আমি তো সবই জানি। ওদের বাড়ির ছেলে-মেয়ের বিয়েতে আমরা কতবার কত গাড়ি, আপনি কত বার বাড়ি দিয়েছিলেন। শুধু গাড়ি নয়, পেট্রল, ড্রাইভার সব কিছু দিয়েছেন। আর তাও একদিন নয়, দিনের পর দিন--

মুক্তিপদ বললেন—শুধু লাখ-লাখ টাকাই বলছো কেন? আর গাড়ির কথাই বা বলছো কেন? ওই বরদা ঘোষালের ছেলের যখন অ্যাপেন্ডিসাইটিস হলো তখন নার্সিং- হোমের কুড়ি হাজার টাকা বিল্ কে পেমেন্ট করেছিল?

অর্জুন এর পর আর দাঁড়ালো না। আরো অনেক কাজ তার। মুক্তিপদ বললেন—ঠিক আছে, তুমি এখন যাও। পরে যা-যা খবর হবে আমাকে জানিয়ে যেও—

অর্জুন সরকার চলে যেতেই মুক্তিপদ টেলিফোন করলেন মিস্টার চ্যাটার্জিকে। রাত্রে মিস্টার চ্যাটার্জিকে বাড়িতে পাওয়া যায় না। পাওয়া যেতে পারে, তবে সে রাত একটার পরে। এ-খবর তাঁর বন্ধু-বান্ধব সবাই জানে।

কিন্তু অত রাত্রে কে তাঁকে টেলিফোন করবে? আর বছরের মধ্যে কটা দিনই বা তিনি কলকাতায় থাকেন! কলকাতায় যখন মিস্টার চ্যাটার্জি থাকবেন তখন রাত একটা পর্যন্ত তাঁর ক্লাবে থাকা চাই-ই চাই। নইলে তাঁর শরীর মন দুই-ই খারাপ হয়ে যাবে। বলতে গেলে ওটাই তাঁর একমাত্র বিলাসিতা!

কিন্তু সেদিন মুক্তিপদর ভাগ্য ভালো ছিল। মিস্টার চ্যাটার্জিকে ক্লাবেই পাওয়া গেল। মিস্টার চ্যাটার্জি বললেন—আমি মর্নিং ফ্লাইটেই কলকাতায় এসেছি—

—কোথায় গিয়েছিলেন?

—জাপান! ওখানে একটা বিজনেস ডীল্ ছিল। তা সে-কথা থাক. ওদিকের খবর কী?

—খবর খুবই খারাপ। এখুনি আমার ডেপুটি ওয়ার্কস্ ম্যানেজার খবরটা দিয়ে গেল। ওরা সবাই মিলে লেবার-মিনিস্টারের বাড়িতে নাকি ক্লোজড-ডোর মীটিং করেছে। তাতে ঠিক হয়েছে আমাদের ফ্যাক্টরিটা ওরা কলকাতা থেকে উঠিয়ে ছাড়বেই।

মিস্টার চ্যাটার্জি জিজ্ঞেস করলেন—কী করে ওঠাবে?

মুক্তিপদ বললেন—ওদের সেই পুরনো ট্যাক্‌টিকস্ দিয়ে···

—তার মানে?

মুক্তিপদ বললেন—ওদের তো একটা ট্যাক্‌টিক্‌সই আছে—ওই 'বাংলা বনধ্'!

মিস্টার চ্যাটার্জি হো-হো করে হেসে উঠলেন। বললেন—ওসব অস্ত্র তো এখন ভোঁতা হয়ে গেছে মিস্টার মুখার্জি!

—ভোঁতা হয়ে গেলেও আমরা তো ভুগবো! আর এখনও তো ভুগে চলেছি—

মিস্টার চ্যাটার্জি বললেন—কে বললে আমরা ভুগবো? তাই যদি হয় তা হলে আমি কী করে আমার কারবার দিন-দিন বাড়িয়ে চলেছি? আমার কারেন্ট ফাইন্যান্‌-সিয়াল ইয়ারে তো এখনও প্রফিট রয়েছে পাঁচ কোটি টাকা। আমার অডিটেড্ ব্যালান্স-শীট তো আমি গভর্মেন্টের কাছে সাবমিট করে দিয়েছি...

তারপর একটু থেমে আবার বললেন—আপনি চুপ করে বসে থাকুন তো। ওদের কতদূর দৌড় সেইটে শুধু লক্ষ্য করে যান। উপোসী পেট নিয়ে কেউ কোনওদিন লড়াইতে জিততে পারে না। দেখবেন, ওই ওরাই এসে একদিন আবার আপনার পা চাটতে শুরু করবে! আমার ওপরেই কি ওরা কম অত্যাচার করেছে ভেবেছেন? আসলে নরম মাটি দেখলেই বেড়ালরা আঁচড়াতে চায়। একটু শক্ত হোন, একটু কঠোর হোন, তখন ওরাই এসে আপনার পায়ে পড়তে কিউ দিয়ে দাঁড়াবে।

তারপর একটু থেমে আবার বললেন—আপনি এখন ঘুমোতে যান, কাল সকালেই সুবীর আপনার বাড়িতে গিয়ে দেখা করবে। তাহলে নিশ্চিন্ত হবেন তো?

মুক্তিপদ বললেন ঠিক আছে—বলে টেলিফোন-রিসিভারটা রেখে দিলেন। তারপর একটা পিল্ খেয়ে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লেন।
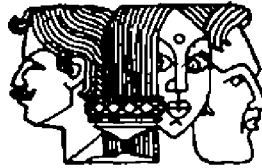
এখনও সেই সুপারভাইজার পরেশদা'র কথা সন্দীপের মনে আছে। পরেশ ধর।

পরেশদা বলতেন—খুব ভালো করে মন দিয়ে কাজ করবে ভাই, তাহলে একদিন তোমরাও আমার মত সুপারভাইজার হতে পারবে—

ও। একটা নেশা ছিল পরেশদার। খাওয়া!

জিজ্ঞেস করতেন—টিফিন খেতে যাচ্ছো? আমার জন্যেও কিছু টিফিন এনো ভাই। তোমাদের কন্‌ফার্মেশনের সময় আমি ভালো করে রেকমেণ্ড করে দেব—

এই রকম রোজই। মানুষটা যে খুব খারাপ তা নয়। তার ওপরে রেকমেণ্ড করার মত ক্ষমতাও তার নেই। কেউ রেকমেণ্ড করুক আর নাই করুক, সকলেরই

কন্‌ফার্মেশন হয়ে যাবেই। সন্দীপের তা ভালো রকমেরই জানা ছিল। সকাল দশটার মধ্যে অফিসে গিয়ে পৌঁছান আর বেলা পাঁচটায় ছুটি।

পরেশদা বলতেন—তোমাদের তো এখন আরামের চাকরি ভাই। যখন ইচ্ছে আসছো আর যখন ইচ্ছে চলে যাচ্ছো! আমাদের সময় আমরা কত খেটেছি জানো? খাটতে খাটতে আমাদের জান্‌ নিক্‌লে গিয়েছে। জানো, রাত দশটা পর্যন্ত খেটেও কাজের কূলকিনারা পাইনি আমরা। তখন ওভারটাইম-ফাইমও ছিল না তোমাদের এখনকার মত। ব্যালেন্সশীট না মিলিয়ে বাড়ি যাবার এক্তিয়ারও ছিল না কারো। রাত্তির ঘুমের মধ্যেও মাঝে মাঝে ভয়ে ঘুম ভেঙে যেত, যোগে ভুল হলো নাকি? স্বপ্নের মধ্যেও আমরা অংক কষে গিয়েছি—

এ-সব পুরনো আমলের গল্প শুনিয়ে পরেশদা ভারি আরাম পেতেন। যত কষ্ট যেন সব তারাই করেছেন, যত পরিশ্রমের কাজ যেন তাদের কপালেই ছিল। সন্দীপরা এ-যুগে জন্মে যেন মহাআরামে জীবন কাটাচ্ছে। রোজকার মত অফিস থেকে বাড়িতে এসেই মল্লিককাকাকে অফিসের কাজের রিপোর্ট দিতে হতো।

—আজ কেমন কাজ হলো? ফিগার মিলেছে?

সন্দীপ বলতো—হ্যাঁ। আজ এক চান্সে মিলে গেছে।

– তাহলে এখন তুমি কিছু খাবে তো?

সন্দীপ আসবার আগেই দোকান থেকে খেয়ে আসতো।

বলতো—না, খেয়ে এসেছি—

—কী খেয়েছ আজ?

—দুটো পরটা আর আলুর দম।

—কত দাম নিল?

এই রকম নানান প্রশ্ন থাকতো মল্লিক-কাকার। অফিস থেকে এসেই মুখ-হাত-পা ধুয়েই সন্দীপ হাঁটতে হাঁটতে চলে যেত রাসেল স্ট্রীটে। সেখানে গিয়েও মাসিমার সেই একই প্রশ্ন—কী বাবা, নতুন কোনও খবর আছে?

সন্দীপ যা জানতো তাই-ই বলতো। সেই ফ্যাক্টরি এখনও খোলেনি. সেই ইউনিয়নের লোকেরা এখনও গেটের সামনে একই ভাবে ধর্মঘট করে চলেছে। এখনও সেই রকম-- ফ্যাক্টরির দরজা খোলেনি। সেই মুক্তিপদবাবু এখনও অস্থির হয়ে একই রকমভাবে ছটফট করে বেড়াচ্ছেন।

—আর তোমাদের ঠাকমা-মণি?

ঠাকমা-মণিও সেই একই রকম ভাবে ভোর রাত্তিরে উঠে গঙ্গায় চান করতে যাচ্ছেন আর সন্ধ্যেবেলা সিংহবাহিনীর আরতির সময় নিচে এসে গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম সেরে ওপরে উঠে যাচ্ছেন। আর মল্লিক-কাকাও সেই একই রকম ভাবে তাঁর হিসেবের খাতা নিয়ে ঠাকমা-মণিকে জমা-খরচের হিসেব বুঝিয়ে দিয়ে আসছেন। এক জাহ্নবী-মুখার্জি কোম্পানীর ফ্যাক্টরি ছাড়া সংসারে যাবতীয় কাজ ঠিক যেমন আগে নিয়ম করে চলছিল তেমনি সব কিছুই নিয়ম করে চলছে।

মাসিমা তখন জিজ্ঞেস করতেন নিজের জামাই-এর কথা। জিজ্ঞেস করতেন—আর তোমাদের সৌম্যপদবাবু, তাঁর খবর কি?

সন্দীপ বলতো—সে তো আপনাকে আগেই বলেছি এই মাসেই তিনি আসছেন।

—এ মাসের তো আজ পনেরো তারিখ হয়েই গেল বাবা, আর কত দেরি হবে? আর তো দেরি সয় না।

—তা হোক. শেষ পর্যন্ত দেখুন না কী হয়। বাড়িটার তো কলি ফেরানো হয়েই গেছে। সবই তো তৈরি, শুধু ছোটবাবুর ফিরে আসার যা অপেক্ষা—

কথাগুলো বিশাখাও শুনতো। বলতো—দেখেছ তো সন্দীপ, মার যেমন কথা, বিয়ের জন্যে আমি যেন একেবারে ছটফট করে মরে যাচ্ছি! কত মেয়ের তো বিয়ে হয় না। আমাদের কলেজের কত টিচারের তো বিয়ে হয়নি। তাতে কি তারা সবাই উপোস করছে?

—তুই থাম্ তো মুখপুড়ী?

বিশাখাও ফোঁস করে উঠতো। বলতো—থামবো কেন আমি? তুমি আমার বিয়ের জন্যে অত খোশামোদ করছো কেন? মেয়েমানুষ হয়ে জন্মেছি বলে কি আমি এতই পাপ করেছি?

মাসিমা বলতো—তুই কী বুঝবি মুখপুড়ী? আমার যে কী জ্বালা তা তুই কী করে বুঝবি? তুই যখন মা হবি, তখন বুঝবি আইবুড়ো মেয়ে থাকলে মায়ের মনে কত জ্বালা হয়—

কথা হওয়ার মাঝপথেই হঠাৎ আন্টি মেমসাহেব পড়াতে আসে আর বিশাখা ঘর ছেড়ে অন্য ঘরে চলে যায়। আর মাসিমা তখন নিচু করে জিজ্ঞেস করলে—হ্যাঁ বাবা, কথাটা আমায় সত্যি করে বলবে? আমার মেয়ের বিয়ে হবে তো ঠিক ও-বাড়িতে?

সন্দীপ বললে—হঠাৎ এত কাণ্ডের পর এ-কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন মাসিমা? হঠাৎ এ-রকম সন্দেহ হলো কেন আপনার?

মাসিমা বললে- সেই যে সেদিন সত্যনারায়ণ পুজো হলো ও-বাড়িতে, সেইদিন থেকেই আমার মনে কেমন সন্দেহ হতে আরম্ভ করেছে। বিশাখার পা কাঁচের গেলাসে লেগে গেলাসটা ভেঙে গেল আর ভাঙা কাচের টুকরো লেগে বিশাখার পা কেটে গেল, তখন থেকেই আমার মনটা কেমন খচ্-খচ্ করছে কেবল—

সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গিতে সন্দীপ বললে—আপনি ওসব নিয়ে ভেবে মিছিমিছি কষ্ট পাবেন না মাসিমা। আপনি তো জীবনে কারো কিছু অনিষ্ট-কামনা করেননি, কারোর কোনও রকম ক্ষতিও করেননি। দেখবেন ভগবান আপনার ভালোই করবেন—

মাসিমা বললে—কিন্তু ওরা কারা বাবা? ওই যে একটা ফরসা মতন মেয়ে এসেছিল। আমার বিশাখার বয়সী। 'বিনীতা' না কী যেন নাম, ও কে?

সন্দীপ বললে—ও আমাদের মেজবাবুর এক বন্ধুর মেয়ে। ওরাও পুজোর পেসাদ নিতে এসেছিল—

মাসিমা বললে—এতদিন কথাটা তোমাকে বলিনি বাবা। কিন্তু সেই দিনটার পর থেকেই আমার মনে কেমন সন্দেহ হচ্ছে, সন্দেহ হচ্ছে বিশাখার বোধহয় ও-বাড়িতে বিয়ে হবে না শেষ পর্যন্ত—সেই জন্যেই তো আমি সেদিন তোমাকে নিয়ে জ্যোতিষী মহারাজের কাছে গিয়েছিলুম—

সন্দীপ এর উত্তরে কী আর বলবে! সে উঠলো। উঠে যাওয়ার সময় বললে—আচ্ছা, আমি এখন যাচ্ছি, এবার আমি ঠিক খবর নিয়ে এসে দেব আপনাকে—

বলে নিচেয় নেমে রাস্তা দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে ভাবতে লাগলো—এমন অপ্রিয় খবরটা সে মাসিমাকে কী করে দেবে? কেমন করে সে এই খবরটা মাসিমার কাছে মুখ দিয়ে উচ্চারণ করবে।

বাড়িতে গিয়ে পৌঁছোতে একটু দেরিই হলো তার। সোজা রাস্তা দিয়ে না গিয়ে অন্য দিক দিয়ে ঘুরে সে মিছিমিছি অনেক সময় নষ্ট করে অনেক দেরি করে বাড়িতে গিয়ে পৌঁছলো।

কিন্তু বাড়িতে ঢোকবার মুখেই সে বাড়ির সামনে অনেক গাড়ি দেখে অবাক হয়ে গেল। এ-সময়ে অন্যদিন তো এত গাড়ি থাকে না ওখানে। গিরিধারী যথারীতি তাকে দেখে সেলাম করলে। সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—এত গাড়ি কার গিরিধারী?

গিরিধারী বললে—মেজবাবু এসেছে, বালিগঞ্জসে চ্যাটার্জি সাহেব ভি এসেছে—

—কেন?

গিরিধারী দারোয়ান মানুষ। এত গাড়ি আসার কোনও কারণ তার জানবার কথা নয়। সে বললে—ক্যা জানে বাবু!

মল্লিক-কাকার ঘরে ঢুকে দেখলে মল্লিক-কাকাও তখন তাঁর ঘরে নেই। এমন কী ঘটনা ঘটলো যে মল্লিক-কাকাও এই সময়ে তাঁর ঘরে নেই? এমন তো সাধারণত হয় না। কিন্তু সে কথার উত্তর পাবার জন্যে মল্লিক-কাকা ফিরে আসা পর্যন্তই অপেক্ষা করতে হবে। অন্যদিন এই সময়ে খাওয়ার ডাক পড়ে। কাকেই বা সে-প্রশ্ন করবে সে আর কে-ই বা সে-প্রশ্নের জবাব দেবে!

অনেকক্ষণ পরে মল্লিক-কাকা এলেন। সন্দীপকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, কী, তুমি এসে গেছ? ভালোই হয়েছে। এদিকে মেজবাবু এসে গিয়েছিলেন, আর বালিগঞ্জ থেকে মিস্টার চ্যাটার্জিরাও এসে গিয়েছিলেন। আজকে একটা খবর আছে—

সন্দীপ বললে- কী খবর?

—কালকেই সকালে সৌম্যবাবু এসে পড়ছেন। তাই এই অসময়েই ওপর থেকে আমার ডাক পড়েছিল। আমাকেও কাল দমদম এয়ার-পোর্টে হাজির থাকতে হবে। ওদিকে মেজবাবুও যাবেন, ঠাকমা-মণিও যাবেন আর মিস্টার চ্যাটার্জি আর তাঁর ছেলে লেবার-লীডার সুবীর চ্যাটার্জিও যাচ্ছেন।

—ক'টার সময় সৌম্যবাবু আসছেন?

মল্লিক-কাকা বললেন, সকাল সাড়ে এগারোটার পর।

সকাল সাড়ে এগারোটার সময় সন্দীপ তো তখন তার অফিসে। বিকেল পাঁচটার পর,বাড়িতে আসতে আসতে যার নাম বিকেল ছটা। ছটার আগে আর সৌম্যপদবাবুকে সন্দীপ দেখতে পাবে না।

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—সৌম্যবাবুর বিয়ের কথা কিছু হলো।

মল্লিক-কাকা বললেন হ্যাঁ, তাও হলো।

—কার সঙ্গে সৌম্যবাবুর বিয়ে হবে?

—ওই চ্যাটার্জিবাবুর মেয়ের সঙ্গেই হবে। কারণ এঁদের ফ্যাক্টরির ধর্মঘট তো চ্যাটার্জিবাবুরাই মিটিয়ে দিতে পারবে। রাসেল স্ট্রীটের ওঁরা তো তা করতে পারবেন না। ওঁদের তো আর সে-ক্ষমতাও নেই।

খবরটা শুনে সন্দীপ নির্বাক হয়ে রইল। তার মনে হলো তার নিজের মাথার ওপরেই যেন বজ্রপাত হলো।

সন্দীপের এখনও মনে আছে সেইদিনকার সেই উত্তেজনার কথা। অনেক রকম উত্তেজনা সব মানুষের জীবনেই কোনও-না-কোনও সময়ে সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর। সকালবেলা খবরের কাগজের পাতার ওপর চোখ পড়লেই

মানুষ উত্তেজনায় ফেটে পড়ে। এক এক সময়ে সন্দীপের মনে হয় খবরের কাগজের সম্পাদকরা বোধহয় পৃথিবীর কোন্ কোণে কোনও উত্তেজনাকর ঘটনা ঘটলো কি না তা নিয়ে গবেষণা করে। যদি কোথাও কোনও সামান্য ঘটনাও ঘটে তো তাকে ঝাল-মশ্লা সহযোগে উত্তেজনাকর করে রং চড়িয়ে ছাপায় পাঠক-পাঠিকাদের আকৃষ্ট করবার জন্যে। কিংবা এও হতে পারে যে, মানুষই হয়তো নিজের অজান্তে উত্তেজিত হতে ভালোবাসে। নিজের পকেটের পয়সা খরচ করেও উত্তেজনা কিনতে চায়। সুস্থ সরল স্বাভাবিক জীবন তারা চায় না।

ন্যাশনল ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের অফিস খোলবার সময় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কাজ আরম্ভ করা নিয়ম। সেই অত সকালেই কাউণ্টারে-কাউণ্টারে এ্যাকাউণ্ট-হোল্ডারদের ভিড় শুরু হয়ে যায়। বিশেষ করে মাসের প্রথম সপ্তাহটায়। তখন যারা চাকরি থেকে রিটায়ার করেছে তারা সবাই একই সময়ে পেনসন্ নিতে আসে। কে আগে নেবে তারই প্রতিযোগিতা লেগে যায় তখন তাদের মধ্যে।

দুপুর দুটোর সময়ে কাউণ্টার বন্ধ হয়ে যায়। তখন টিফিনটাইম। এখন শুধু একটু বিশ্রাম। তাও সকলের বিশ্রাম নয়। পাব্লিকের সঙ্গে যাদের কারবার তাদেরই তখন একটু বিশ্রাম। কিন্তু অন্যদের কাজের কামাই নেই। তারা লেজার খাতার ওপর অঙ্ক কষে চলেছে তো চলেছেই। তবু তারা সময় করে নেয়। তারই মধ্যে একটু সময় করে গল্প-গুজব করে। পাড়ার কথা, ব্যক্তিগত কথা, খেলার কথা, রাজনীতির কথা।

পরেশদা তখনও সেকশন-সুপারভাইজার। সন্দীপকে লক্ষ্য করে বললে—কী হলো হে সন্দীপ, তোমার কি শরীর খারাপ নাকি? আজ এত গম্ভীর-গম্ভীর যে?

সন্দীপ এর কী জবাবই বা দেবে? শুধু মন-রাখা একটা জবাব দিলে—হ্যাঁ, আজ শরীরটা তত ভালো নেই—

—কেন? এত কম বয়েসে শরীর খারাপ হওয়াটা তো ভালো কথা নয় হে। এবার একটা বিয়ে-টিয়ে করে ফেল তুমি। শরীর মন দুই-ই ভালো হয়ে যাবে।

এরই বা কী উত্তর দেবে সন্দীপ তা সে ভেবে পেলে না। পরেশদার কথার জবাব সেদিন দেয়নি সে! কিন্তু বিয়ে করা বা হওয়ার যে যন্ত্রণা তা-তো সন্দীপ অনেক কাল পরে ভালো করেই জেনেছিল। কেন সন্দীপ সেদিন বিয়ে করেছিল বা করতে গিয়েছিল? আর সেটাকে কি সত্যিই বিয়ে করা বলে? এর জবাব সে আজও পায়নি।

তখন সন্দীপ বেড়াপোতা থেকে ডেলী-প্যাসেঞ্জারি করতো। সকাল আটটার সময় বেড়াপোতা থেকে সে ট্রেনে উঠতো আর সকালে দশটার মধ্যে ব্যাঙ্কে ঢুকতো।

তাও মাঝে মাঝে যেদিন হাওড়া ব্রীজের রাস্তায় যান-জট থাকতো সেদিন এক-আধ ঘণ্টা দেরিও হয়ে যেত তার। তখন সন্দীপের চাকরিতে অনেক প্রমোশনও হয়ে গিয়েছিল। সে যে পোস্টে তখন গিয়েছিল তার পরেই পাসিং-অফিসারের পোস্ট।

মা তখন চাটুজ্জে বাড়ির চাকরি ছেড়ে দিয়েছে। ছেলে যার ব্যাঙ্কে বড় চাকরি করছে তার মা কেন পরের বাড়ি রান্না করবে? আর চ্যাটার্জিবাবুদের অবস্থাও তখন আগের চেয়ে অনেক পড়ে গিয়েছিল। দেখতে দেখতে চোখের সামনের পৃথিবী কেমন বদলে যায় তা ভাবলেও অবাক হয়ে যেতে হয়। মনে হতো যেন এই সেদিন। এই তো সেদিন সন্দীপ কাশীবাবুদের বাড়ির লাইব্রেরীতে বসে বসে একমনে বই পড়ছে আর তার মা চাটুজ্জে-বাড়ির অন্দর-মহলে এক মনে রান্না করছে। রান্না শেষ হতে মা'র অনেক দেরি হতো। শেষকালে যখন রান্না শেষ হতো তখন এসে ছেলেকে ডাকতো—ওরে খোকা, চল্ বাড়ি চল্—

মা'র এক হাতে গামছা দিয়ে ঢাকা ভাতের থালা। থালার ভেতরে দুজনের খাবার

মতো ভাত ডাল তরকারি। বাড়িতে গিয়ে সন্দীপ আর তার মা ওই ভাত-ডাল-তরকারি খাবে। এক-একদিন সন্দীপ বলতো—মা, ভাতের থালাটা আমাকে দাও না, তোমার হাতে ব্যথা হবে।

মা বলতো– না রে, আমার কষ্ট হয় না। তুই যখন বড় হবি তখন নিস্। এখন তুই মন দিয়ে লেখা-পড়া কর। তোর বউ এলে তখন সে ভাত-তরকারি রাঁধবে. তখন আর আমাকে পরের বাড়ি হাত পুড়িয়ে রান্না করতে হবে না—

সন্দীপ বলতো—তখন আমি তোমাকে আর কাজ করতে দেব না মা। তখন তুমি শুধু শুয়ে থাকবে আর হুকুম করবে—

মা বলতো—অত সুখ আমার কপালে সইলে হয় রে, যা ফাটা কপাল আমার।

মা সারা জীবন শুধু ভবিষ্যতের সুখের স্বপ্ন দেখেই জীবন কাটিয়ে দিয়েছিল। এতটুকু সুখ সন্দীপ তার মাকে দিতে পারেনি. এ ক্ষোভ আর তার জীবনে যাবে না। সন্দীপ নিজের জীবনে নিজেও যেমন কখনও সুখ পায়নি, মা'কেও তেমনি কখনও সুখী করতে পারেনি। ব্যাঙ্কে যখন সে প্রথম ঢুকলো তখন মাসকাবারে মা'র হাতে গিয়ে ছ'শো টাকা তুলে দিলে। মা তো অতগুলো টাকা একসঙ্গে পেয়ে একেবারে অবাক। মা বললে—হ্যাঁ রে খোকা, এতগুলো টাকা তোকে কে দিলে?

সন্দীপ বললে—কে আবার দেবে মা. আমি এই ছ'শো টাকা মাইনে প্রথম হাতে পেলুম তাই তোমার হাতেই সব টাকাগুলো তুলে দিলুম—

—এত টাকা?

মা'র যেন কথাটা বিশ্বাসই হলো না প্রথমে। বললে—এই ছ'শো টাকা তুই মাইনে পেয়েছিস? সবটাই আমার হাতে তুলে দিলি?

কথাটা বলতে বলতে চোখের জলে মা'র গলা বুজে এল। তারপর সেই ধরা-গলাতেই বললে—যে-মানুষটা তোর এই মাইনের টাকাটা দেখে সব চেয়ে খুশী হতো. সেই মানুষটাই আজ নেই রে—বলে আঁচল দিয়ে চোখ দুটো মুছে নিলে।

সন্দীপ বললে—মা. টাকাগুলো তুমি কোথায় রাখবে? বাবার সেই বাক্সটার মধ্যে তালা চাবি বন্ধ করে রেখে দাও—

মা বললে—না বাবা, এ তোর প্রথম মাসের মাইনে. এ আগে ঠাকুরের পায়ে না ছুঁইয়ে আমি কোথাও রাখতে পারবো না—

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—কোন্ ঠাকুরের পায়ে ছোঁওয়াবে?

মা বললে—কেন. বাবুদের বাড়িতে ঠাকুর-ঘর নেই? আমি এখ্খুনি সেখানে যাই. গিয়ে ঠাকুরের পায়ে ছুঁইয়ে নিয়ে আসি—

আনন্দের আবেগে মা তখন থর-থর করে কাঁপছে। সেই অবস্থাতেই মা টাকাগুলো নিয়ে বাবুদের বাড়ি ছুটলো। সন্দীপও মা'র সঙ্গে সঙ্গে চললো। মা'র যেন আর দেরি সইছিল না। কতক্ষণে টাকাগুলো মা ঠাকুরের পায়ে ছোঁওয়াবে তারই যেন অপেক্ষা। বাবুদের বাড়ির ভেতরে ঢুকেই মা ডাকতে লাগলো—ও বউদিমণি, বউদিমণি কোথায় গো তুমি?

—কে? বামুনদি?

মা বললে—এই দেখ বউদিমণি, আমার খোকা মাইনে পেয়েছে। এই এতগুলো টাকা মাইনে পেয়েছে আমার খোকা—এই যে পেন্নাম কর, বউদিমণিকে পেন্নাম কর—

—ওমা. তাই নাকি? কত টাকা? না না. থাক থাক—

মা বললে—ছ'শো টাকা। তোমাদের ঠাকুরের পায়ে ছুঁইয়ে নিতে এসেছি। প্রথম মাইনে তো! তোমরা আশীর্বাদ করো ও যেন বেঁচে থাকে।

বউদিমণি বললে—তুমি খুব ভাগ্যি করে এসেছিলে বামুনদি! তোমার ছেলের

একটা বিয়ে দিয়ে দাও এবার। তখন আর তোমাকে আমাদের বাড়িতে হাত-পা পুড়িয়ে রান্না করতে হবে না—

মা বললে—তা কি হয় বউদিমণি! এই যা কিছু হয়েছে সবই তো তোমাদের সকলের আশীর্বাদে! সে সব কথা কি আমি ভুলতে পারি?

বলে মা টাকাগুলো বাবুদের বাড়ির ঠাকুরের পায়ে ছুঁইয়ে আনতে গেল। তারপর বাইরে আসতেই বউদিমণি বললে—যাও বামুনদি, আজকে এ-বেলা তোমায় রান্না করতে আসতে হবে না। এত দিন পরে ছেলে এল, তার সঙ্গে বসে বাড়িতে মায়ে-পোয়ে একটু গল্প করো গে—

মা বললে—তা কি হয় বউদিমণি, এতদিন তোমাদের সেবা করবার সুযোগ দিয়েছ, ছেলের চাকরি হয়েছে বলে কি এখন তোমরা আমার পর হয়ে গেলে? আমি ঠিক বিকেল বেলা যেমন আসি তেমনি আসবো—

এই হচ্ছে মাইনে পাওয়ার পর প্রথম মা'র কাছে যাওয়ার ঘটনা। মা কিন্তু প্রথম বারেও মাইনের টাকাগুলো হাতে নেয়নি। মা প্রথম বারেই বলেছিল—আমার টাকার দরকার কী, আমার না আছে বাক্স, না আছে প্যাটরা! আর বাড়িতেই বা আমি থাকি কতক্ষণ। সারা দিনই তো কাটে বাবুদের বাড়ি। রাতটাতেই যা একটু বাড়িতে থাকি। চোর-ডাকাত কত কী আছে দেশে—কার মনে কী আছে কে বলতে পারে—

সন্দীপ বলেছিল—তুমি আর বাবুদের বাড়িতে কাজ করতে না-ই বা গেলে মা!

মা বলেছিল—তা বাড়িতে একলা বসেই বা কী করবো বল্। তাহলে যে হাতে পায়ে বাত ধরে যাবে রে! তার চেয়ে তুই তোদের ব্যাঙ্কে রেখে দিস টাকাগুলো—আমার যখন দরকার হবে তোর কাছে চেয়ে নেব—

কিন্তু শুধু তো টাকা থাকলেই হয় না। কিনবে কী? কাকে সে কী কিনে দেবে? তাই প্রতি সপ্তাহেই মা'র জন্যে সন্দীপ কিছু-না-কিছু কিনে নিয়েই যেত। কোনও বার মা'র জন্যে কাপড়, সেমিজ, গামছা, মাথায় মাখবার গন্ধওয়ালা নারকেল তেল। কখনও কলকাতা থেকে সেরা রসগোল্লা সন্দেশ।

মা বলতো—এত জিনিস কেন আনিস বল্ তো খোকা আমার জন্যে? আমি তো একলা মানুষ। আমি আর কত কাপড় পরবো। এই তো গেল বছরে বউদিমণি একখানা কাপড় দিয়েছিল, সেইটেও এখনও নতুন রয়েছে—

তারপর মা বলতো—এবার তুই একটা বিয়ে কর বাবা, এখন তো তোর চাকরি হয়েছে, আর কতদিন কলকাতায় পরের বাড়িতে পড়ে থাকবি। আমারও তো তোর বিয়ে দেখে যেতে ইচ্ছে করে—

এ-সব কথায় সন্দীপ প্রথম দিকে কিছু কান দিত না। মা কিন্তু নাছোড়বান্দা।

মা বলতো—কী রে, কথার জবাব দিচ্ছিস না যে?

অনেক পীড়াপীড়ির পর সন্দীপ বলতো—মা তুমি জানো না বলেই ওই সব কথা বলছো। আসলে বিয়ের যে কত বড় জ্বালা তা যদি তুমি জানতে! কলকাতায় আমি যাদের বাড়িতে থাকি, সেখান থেকেও আমি অনেক কিছু শিখেছি। তোমার ধারণা যে অনেক টাকা হলেই বুঝি মানুষের সব রকমের সুখ হয়। কিন্তু বেশি টাকা থাকার যে কত জ্বালা তা আমি নিজের চোখে রোজ দেখছি—

মা কথাগুলো বুঝতে পারতো না। বলতো তা কেমন বলছিস? ওই তো এখেনে চাটুজ্জেবাবুরা রয়েছে। ওরা কত সুখে আছে বল তো। ঘরে বিজলী বাতি রয়েছে, অন্ধকারে দেশলাই জ্বালতেও হয় না। ইচ্ছে হলেই ঘর আলোয়-আলো হয়ে যায়। তোর অনেক টাকা হলে তোর বাড়িতেও ওই রকম কল কিনতে পারবি—তখন কত আরাম হবে আমাদের বল্ তো!

সন্দীপ বলতো—ওটা বাইরের খোলস, মা, ওকে সুখ বলে না। ও-সুখ তুমি চেয়ো না মা! টাকা দিয়ে যে-সুখ কিনতে পাওয়া যায় সেটা হলো অহঙ্কারের সুখ। ওকে সুখ বলে না মা- আমার কথা তুমি বিশ্বাস করো মা, ওটা বড় সুখ নয়—

মা ছেলের কথার মাথা মুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারতো না। বলতো- ওমা, ওটা সুখ নয় তো কী তাহলে?

সন্দীপ বলতো—আমি বেড়াপোতাতে যতদিন ছিলুম ততদিন আমিও তোমার মতোই তাই ভাবতুম মা। কিন্তু কলকাতায় গিয়ে আমার চোখ খুলে গেছে, কীসে যে আসল সুখ তা আমি বুঝে গিয়েছি—

মা ছেলের কথার একবর্ণও বুঝতে পারতো না। বলতো ও-কথা কেন বলছিস? আমাদের যদি বাবুদের মত পাকা বাড়ি থাকতো, গাড়ি থাকতো, বিজলী-বাতি থাকতো তো সুখ হতো না?

ছেলে বলতো—মা, আমি যে-বাবুদের বাড়িতে থাকি তাদের সব কিছু আছে মা। তোমার চাটুজ্জে বাবুদের বাড়িতে যা-যা আছে তার হাজার গুণ বেশি আছে তাদের বাড়িতে। ওই গাড়ি-বাড়ি-ইলেকট্রিক বাতি সব কিছু আছে। তবু সে-বাড়ির যে গিন্নী তার চেয়ে দুঃখী মানুষ আমি আর কোথাও দেখিনি—

—ওমা, কেন?

সন্দীপ শুধু বলতো—সে তুমি বুঝবে না মা।

—কেন বুঝবো না? আমাকে বুঝিয়ে দিলে আমি নিশ্চয়ই তা বুঝবো!

সন্দীপ তবু বলতো—না মা তুমি বুঝবে না। কলকাতার লেখা-পড়া জানা লোকেরাও তা বুঝবে না। পৃথিবীর কোনও লোকেই তা বুঝবে না। জানো, সেই বাড়ির গিন্নীর যে মেজ ছেলে, কোটি-কোটি টাকার মালিক, তার ঘুম হয় না—

মা ছেলের কথা শুনে চমকে উঠতো। বলতো—ওমা, সে কী? ঘুম হয় না? আমি তো বিছানায় পড়ি আর মরি—

সন্দীপ বলতো—তোমার টাকা নেই তাই তোমার অত সৌভাগ্য! যাদের বেশি টাকা থাকে, তাদের সব কিছু থাকে। গাড়ি থাকে, বাড়ি থাকে, অসুখ-বিসুখ হলে বড় বড় ডাক্তার ডাকবার ক্ষমতা থাকে, চাকর-ঝি-রাঁধুনি-ড্রাইভার সব থাকে, কিন্তু তাদের ঘুম থাকে না—

-কিন্তু না ঘুমিয়ে তারা বাঁচে কী করে?

—ওষুধ খেয়ে কিংবা মদ খেয়ে।

মদ? মেয়েমানুষরাও মদ খায় নাকি কলকাতায়?

সন্দীপ বলতো— হ্যাঁ মা, মদ খায় আর নয় তো এমন ওষুধ খায় যাতে মদ মেশানো থাকে! আমি তো শুধু বড়লোকদের বাড়িতে আছি বলেই নয়, আমাদের বাড়িতেও তো অনেক লোক আসে যারা লাখপতি, কোটিপতি। তাদের সঙ্গেও কথা বলে দেখেছি! যাদের যত বেশি টাকা তাদের তত বেশি জ্বালা!

মা তবু বুঝতে পারতো না। বলতো—কেন রে? এমন হয় কেন রে?

সন্দীপ বলতো—আমিও তো প্রথমে তোমার মত বুঝতে পারতুম না মা। শেষে অনেক ভেবে দেখলাম কেন এমন হয়? একদিকে কলকাতার রাস্তায় লক্ষ-লক্ষ লোক ফুটপাতের ওপর নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে, আর অন্যদিকে আমাদের মেজবাবুর এয়ার-কনডিশান-করা ঘরের মধ্যে ডানলোপিলোর বিছানায় শুয়েও ঘুম হয় না। আর আমাদের ঠাকমা-মণি? ঘুম হয় না বলে রাত তিনটের সময় উঠে পড়েই ঠাকমা-মণি ঝিকে নিয়ে রোজ গঙ্গাচ্চান করতে যায়!

মা ছেলের এসব কথার বিন্দুবিসর্গও বুঝতে পারতো না। না বুঝুক তবু

সন্দীপ বলতো—তুমি এ-সব নিয়ে বেশি ভেবো না মা। আমি চলি। আবার পরের হপ্তায় ঠিক আসবো—

ছেলে চলে যাওয়ার সময়ে ছেলের মাথায় হাত দিয়ে মা আশীর্বাদ করতো—তুই আরো বড়ো হ' খোকা, চাকরিতে আরো উন্নতি হোক, আরো মাইনে বাড়ুক—

সন্দীপ বলতো—ও আশীর্বাদ করো না মা, বেশি টাকা হওয়ার আশীর্বাদ করো নামা। আশীর্বাদ করো যেন আমি মানুষ হই, মানুষ হয়ে যেন দশ জনের উপকার করতে পারি—

প্রায় প্রত্যেক সপ্তাহেই এমনি। চাকরি হওয়ার পর থেকে এমনি করেই সন্দীপ প্রত্যেক সপ্তাহে শনিবার বিকেলে বেড়াপোতাতে এসে পৌঁছতো আর সোমবার ভোরের ট্রেনে কলকাতায় চলে যেত! ওই দুটো রাত আর দেড়টা দিন মা'র যে কী আনন্দে কাটতো তা বলে শেষ করা যেত না। সেই সোমবার থেকে শুরু করে আবার সেই শনিবার বিকেল পর্যন্ত খোকার চিন্তাতেই মা'র দিনগুলো কাটতো। বাড়ি থেকে দূরে ইস্টিশানের রাস্তার দিকে চেয়ে থাকতো এক দৃষ্টে। কই, কখন সূর্য ডোবে ডোবে, তবু তো খোকাকে দেখা যাচ্ছে না। তবে কি খোকার শরীর খারাপ হলো? এমন তো কখনও হয় না। কিংবা তবে কি রেলগাড়ি আজ আসতে দেরি করছে?

শেষকালে যখন দূরে খোকাকে দেখা যেত, তখন মা'র সে কী স্বস্তি! যতক্ষণ না খোকা কাছে আসছে ততক্ষণ মা হাত তুলে দাঁড়িয়ে থাকতো। তারপর সন্দীপও মা'কে দেখতে পেয়ে দৌড়তে আরম্ভ করতো। কাছে এসেই একেবারে মা'কে দুই হাতে জড়িয়ে ধরতো। তখন মা বলতো—ওরে ছাড় ছাড়, তোর এত দেরি হলো দেখে আমি কেবল ভাবছি...

সন্দীপ বলতো—বা রে, আমি কী করবো' ট্রেন যে লেট-এ এল মা—

প্রায় প্রত্যেকবারই এমনি। প্রত্যেকবারই ছেলে সপ্তাহে শনিবার বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে হলেই বাড়ি আসে আর সোমবার ভোরের গাড়িতেই আবার কলকাতায় চলে যায়।

হঠাৎ একবার এক অঘটন ঘটে গেল।

সন্দীপ এসে বললে—মা, এবার থেকে আমি এখানে তোমার কাছেই থাকবো।

মা অবাক হয়ে গিয়েছিল শুনে। বলেছিল—সে কী রে? এখানে থাকবি কেন?

সন্দীপ বলেছিল—হ্যাঁ মা, এবার থেকে আমি ডেলী প্যাসেঞ্জারী করবো। এখান থেকেই রোজ কলকাতায় যাতায়াত করবো। আর কলকাতায় থাকবো না।

—কেন রে? যে-বাড়িতে তুই থাকতিস, সেই মুখুজ্জেবাবুদের কী হলো? তারা তোকে আর থাকতে দিতে চায় না বুঝি?

সন্দীপ বললে—না মা, তা নয়। এখন ব্যাঙ্কে চাকরি পেয়ে গেছি। এখন আর সেখানে শুধু শুধু থাকতে যাই কেন?

মা জিজ্ঞেস করলে—হঠাৎ এ-সব কথা বলছিস কেন রে? হঠাৎ কী হলো তোর?

সন্দীপ বললে—কেন মা, তুমি কি চাও না যে আমি তোমার কাছে থাকি?

মা বললে—তা কেন চাইবো না। তাহলে তো আমারও খুব ভালো লাগবে।

সন্দীপ বললে—আমি কিন্তু একলা আসবো না মা, আমার সঙ্গে আরো দু'জন আসবে। তাদেরও কিন্তু এখানে থাকতে দিতে হবে—

মা তো হতবাক ছেলের কথা শুনে। বললে—দু'জন? থাকতে দিতে হবে?

সন্দীপ বললে—হ্যাঁ মা—

—কেন রে? তারা কারা? কোন্ দু'জন?

সন্দীপ বললে—তারা দু'জন মা আর মেয়ে।

কথাটা বলবার সঙ্গে সঙ্গে সন্দীপের ঘুম ভেঙে গেছে। সে চোখ খুলে দেখলে সে মল্লিক কাকার ঘরে শুয়ে আছে। সে তাহলে এতক্ষণ ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছিল।

মল্লিক-কাকা বললে—কী হলো? ঘুম ভাঙতে তোমার এত দেরি যে?

তাড়াতাড়ি উঠে পড়লো সে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ওই রকম অদ্ভুত স্বপ্ন দেখছিল কেন সে?

আগের দিনই এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে গেছে মুখার্জিবাবুদের বাড়িতে। এমন যে হবে তা কেউ ভাবতেও পারেনি। সন্দীপ রোজকার মত অফিসে চলে গিয়েছিল। তার দু'ঘণ্টা পরে সৌম্যবাবুর দমদমে পৌঁছবার কথা। ব্যাঙ্ক কাজ করতে করতে তার কেবল মনে পড়ছিল সেই সব কথা। এতক্ষণে বোধহয় পৌঁছে গিয়েছে সৌম্যবাবু। মেজবাবুও বোধহয় এয়ারপোর্টে পৌঁছিয়ে গেছে মল্লিক-কাকাকে নিয়ে। আর ওদিকে মিস্টার চ্যাটার্জিও ছেলে সুবীরকে নিয়ে পৌঁছিয়ে গিয়েছে।

আজ সকলেরই তো আনন্দ করার দিন। সৌম্যপদ আসছে। এবার 'স্যাক্সবী-মুখার্জি' কোম্পানীর লক্-আউট মিটে যাবে। এবার থেকে আবার কোম্পানী চালু হবে। আবার প্রোডাক্শনও শুরু হবে আগেকার। আবার মুখার্জিদের বাড়িতে শান্তি ফিরে আসবে। বাড়ির মেরামতি কাজ-কর্ম তো আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। বিডন স্ট্রীটের রাস্তা দিয়ে গেলে দেখা যায় সমস্ত তেতলা বাড়িটা যেন নতুন হয়ে সেজে উঠেছে। তার ক'দিন পরেই আবার ওই বাড়িতে ম্যারাপ বাঁধা শুরু হয়ে যাবে। তখন সৌম্যবাবুর বিয়ের দিন ঘনিয়ে আসবে। ব্যাঙ্কের সেই চার দেয়ালের মধ্যে বসেই যেন সন্দীপের নাকে লুচি ভাজার গন্ধ ভেসে এল। কানে ভেসে এল নহবতের মিষ্টি সুর। মল্লিক-কাকার কাছ থেকে সন্দীপের সব কথা শোনা আছে। আগে মেজবাবুর বিয়ের সময় যা কিছু হয়েছিল এবার তা-তো হবেই, বরং এবার সৌম্যবাবুর বিয়েতে তার চেয়ে আরো বেশি ঘটা হবে। কারণ এবার পাত্রীপক্ষ আরো বড়লোক। পাত্রপক্ষের চেয়ে পাত্রীপক্ষ আরো বেশি বড়লোক হওয়ার জন্যে জাঁক-জমকের ঘটা আরো বেশি হওয়াটাই স্বাভাবিক।

পরেশদা কাছেই বসেছিল। বললে—কী হে, আজকে তোমার ওই ছোট ফিগার-ওয়ার্কটা করতে এত টাইম লাগছে কেন? আজকে কী হলো? শরীর খারাপ নাকি? রাত্তিরে ঘুম হয়েছিল তো?

সন্দীপ কী করে বোঝাবে পরেশদাকে কেন তার ফিগার-ওয়ার্ক করতে আজ এত দেরি হচ্ছে? ব্যাঙ্কের মধ্যে ঢুকেও কেন যে তার বাড়ির কথা মনে পড়ছে এ-কথা পরেশদা কী করে বুঝবে। আজ যে বাড়িতে এতক্ষণ কী ঘটনা ঘটছে তা জানবার জন্যে সন্দীপের মনের মধ্যে কতখানি কৌতূহল হচ্ছে সে-কথা তো সে ছাড়া বাইরের কেউ-ই বুঝবে না। তারপর যখন ঘড়িতে সাড়ে চারটে বাজলো তখন সন্দীপ আর অপেক্ষা করতে পারলো না। বললে—পরেশদা, আজ একটু সকাল-সকাল যাবো?

—কেন? হঠাৎ কী হলো?

সন্দীপ বললে—আজ বাড়িতে একটু জরুরী কাজ আছে—

—তা যাও—

অনুমতি পাওয়ার যা শুধু অপেক্ষা। সঙ্গে সঙ্গে সন্দীপ টেবিলের ডেস্কের চাবি বন্ধ করে বাইরের রাস্তায় গিয়ে পড়লো। বাইরের রাস্তায় ততক্ষণে মানুষ-ট্রাম-বাসের মিছিল শুরু হয়ে গিয়েছে। শুরু হয়ে গিয়েছে জীবন-সংগ্রামে সকলকে টেক্কা দিয়ে প্রথম হওয়ার প্রতিযোগিতা। সন্দীপও সেই প্রতিযোগিতার মিছিলে সামিল হয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তে লাগলো। সৌম্যবাবু হয়ত এতক্ষণে কলকাতায় পোঁছিয়ে গিয়েছে। বাড়িতেও হয়ত এসে গিয়েছে এতক্ষণে। এতদিন পরে বাড়ির ছেলে বাড়িতে ফিরে এসেছে, সুতরাং আজ বাড়িতেও হয়ত উৎসবের আমেজ লেগেছে। ঠাকমা-মণির এতদিনকার মনের সাধ আজ মিটলো। বাড়িসুদ্ধ লোক তাই সেই উৎসবে মেতে প্রাণপণে সৌম্যবাবুর সেবায় আত্মনিয়োগ করতে আরম্ভ করেছে।

সন্দীপ যখন বাড়িতে পৌঁছলো তখন কিন্তু হতাশ হলো। বাড়ির সামনে গাড়ির জটলা হবে এইটেই আশা করেছিল সন্দীপ। কিন্তু কই? আজ একটা গাড়িও তো বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে নেই। তবে কি এরই মধ্যে সবাই চলে গেল? আদর-আপ্যায়ন-অভ্যর্থনা, সব কিছু কি এরই মধ্যে শেষ হয়ে গেল। সামনে অন্য দিনের মত গিরিধারী দাঁড়িয়ে ছিল, সে যথারীতি সন্দীপকে সেলাম করলে।

সন্দীপ গিরিধারীকে জিজ্ঞেস করলে—ছোটবাবু আজ এসেছে গিরিধারী?

গিরিধারী বললে জী হাঁ, ছোটবাবু আ গয়া—

আরো অনেক কথা তাকে জিজ্ঞেস করার ছিল সন্দীপের। কিন্তু তার দরকার নেই, মল্লিক-কাকাই সব কথা বলবে তাকে।

কিন্তু ভেতরে ঢুকে দেখলে মল্লিক-কাকার ঘরে কেউ নেই। ক্যাশ-বাক্সটায় চাবি বন্ধ করা। মল্লিক-কাকা হয়ত ওপরে ঠাকমা-মণির ঘরে গিয়েছে কোনও নতুন হুকুম তামিল করবার জন্যে! সেইটেই স্বাভাবিক। আজ এত বড় একটা ঘটনা ঘটেছে, সঙ্গে-সঙ্গে মল্লিক-কাকার কাজের দায়িত্বটা তো বাড়বেই।

প্রায় আধ ঘণ্টা সময় এমনি করেই কেটে গেল। সন্দীপের মনের ভেতরে সমস্ত প্রশ্নগুলো তখন জমে জমে পাহাড় হয়ে উঠতে লাগলো। সৌম্যবাবুকে নিজের চোখে একবার দেখতেও ইচ্ছে হতে লাগলো। এখন কি সৌম্যবাবুকে দেখতে আরো সুন্দর হয়েছে? এত দিন বিলেতে কাটিয়ে এসেছে, নিশ্চয়ই সৌম্যবাবু আরো ফরসা হয়েছে—

হঠাৎ মল্লিক-কাকা ঘরে ঢুকলো।

সন্দীপ দেখলে মল্লিক-কাকার মুখটা খুব গম্ভীর-গম্ভীর। যেন অন্য দিনের চেয়ে আরো অনেক গম্ভীর। কেন এত গম্ভীর? এমন কী ঘটলো আজ?

সন্দীপ সোজা জিজ্ঞেস করলে—সৌম্যবাবু এসেছেন?

মল্লিক-কাকা গম্ভীর গলাতেই বললে—হ্যাঁ

বলেই চুপ করে নিজের কাজে মন দিতে লাগলো। হিসেবের খাতা-পত্র নিয়ে কী সব অঙ্ক কষতে লাগলো। সন্দীপ তখন মনে-মনে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। বললো—কাকা আপনারা কী সৌম্যবাবুকে আনতে দমদমে গিয়েছিলেন?

মল্লিক-কাকা বললে—হ্যাঁ

—কে কে গিয়েছিলেন?

—আমি, মেজবাবু, চ্যাটার্জিবাবু, তাঁর ছেলে, আমরা সবাই গিয়েছিলুম—

—তারপর?

মল্লিক-কাকার মুখটা যেন আরো গম্ভীর হয়ে উঠলো।

সন্দীপ আবার জিজ্ঞেস করলে—বলুন না কাকা, তারপর কী হলো? আজকে সারাদিন আমি ব্যাঙ্কে মন দিয়ে কাজ করতে পারিনি। কেবল বাড়ির কথা মনে

পড়ছিল। আমাদের যিনি পাসিং অফিসার তিনি আমাকে আধঘণ্টা আগে ছুটি দিয়ে দিয়েছেন। ভেবেছেন আমার বোধহয় শরীরটা খারাপ হয়েছে!

মল্লিক-কাকা বললে—তা তোমার বাড়ির কথা অত মনে পড়ছিলই বা কেন? সৌম্যবাবু কলকাতায় আসুক বা না-আসুক তাতে তোমার কী এল গেল?

এর জবাবে সন্দীপ কী-ই বা বলবে! সৌম্যবাবুর কলকাতায় ফিরে আসার সঙ্গে যে তার জীবনের কত কিছু সমস্যা জড়িত, তা কী করে সে মল্লিক-কাকাকে বোঝাবে?

সন্দীপ বললে—আমার কি জানতে ইচ্ছে করে না যে সৌম্যবাবুর সঙ্গে কার বিয়ে হবে? জানতে ইচ্ছে করে না যে বিশাখার সঙ্গে সৌম্যবাবুর বিয়ে না হলে মাসিমার কী হবে? তখন তো ওদের ওই রাসেল স্ট্রীটের বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে! তখন কি আর ঠাকমা-মণি ওদের খরচা-পাতির জন্যে মাসে-মাসে অত টাকা খরচ করবে? সেটা জানতে চাওয়া কি আমার পক্ষে এতই অস্বাভাবিক? আমি এত কাল ধরে ও-বাড়িতে ওদের দেখা-শোনা করতে যাচ্ছি, ওদের ওপরেও তো আমার একটা মায়া পড়ে গেছে? ওদের কিছু মন্দ হলে সেটা কি আমার মনে লাগবে না?

অনেকখানি কথা এক সঙ্গে বলে সন্দীপ একটু হাঁফিয়ে উঠেছিল। তারপর একটু দম নিয়ে আবার বললে—বলুন! আমার কথার জবাব দিন! চ্যাটার্জিবাবুরা সৌম্যবাবুকে দেখে কী বললেন? তাদের পছন্দ হয়েছে সৌম্যবাবুকে?

মল্লিক-কাকা এতক্ষণে জবাব দিলে—না!

—না মানে? সৌম্যবাবুকে ওঁদের পছন্দ হয়নি?

মল্লিক-কাকা আবার বললে—না—

সন্দীপ যেন এতক্ষণে একটু ক্ষীণ আশার আলো দেখতে পেলে। মনের ভেতরে কেমন যেন একটা সন্দেহের দোলা লাগলো।

—সত্যিই সৌম্যবাবুকে ওঁদের পছন্দ হলো না?

মল্লিক-কাকা আবার বললেন—না—

—কেন? পছন্দ হলো না কেন? সৌম্যবাবুর মধ্যে কী দেখল ওরা?

মল্লিক-কাকার হাব-ভাব কেমন রহস্যময় হয়ে উঠলো। বললে—তা কী করে বলবো। তবে পছন্দ যে হয়নি তা ওদের হাব-ভাব দেখেই আমি বুঝতে পেরেছি—

—তা হলে মেজবাবু? মেজবাবুর কী হবে? মেজবাবু তো ওঁদের ভরসাতেই বসে ছিলেন এতদিন। মেজবাবুর ফ্যাক্টরি তা হলে খুলবে না?

মল্লিক-কাকা বললেন—সে যা হবার তা হবে। সৌম্যবাবুকে যদি ওদের পছন্দ না হয় তো আমরা আর কী করতে পারি? কপালে যা আছে তা-ই হবে!

সন্দীপের কৌতূহল আরও বেড়ে গেল। হঠাৎ গিরিধারী এসে ঘরে ঢুকলো।

মল্লিক-কাকা তাকে জিজ্ঞেস করলে—কী হলো? ডাক্তারবাবু এসেছেন?

গিরিধারী বললে—জী হাঁ!

গিরিধারীর কথা শুনেই মল্লিক-কাকা ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালো। বললে—চলো চলো, আমি চলি এখন—

মল্লিক-কাকা চলে যেতেই সন্দীপ গিরিধারীকে জিজ্ঞেস করলে—কার অসুখ হলো গিরিধারী? কাকে দেখতে এসেছেন ডাক্তারবাবু?

গিরিধারী বললে—ঠাকমা-মণিকা বেমার হুয়া হুজুর—

—ঠাকমা-মণি? ঠাকমা-মণির অসুখ হয়েছে? কী অসুখ? হঠাৎ ঠাকমা-মণির অসুখ হলো কেন?

গিরিধারী বাইরের বেতন-ভুক লোক। সে কিছুই জানে না। সে কিছু জানতে চায় না। তার কিছু জানবার অধিকারও নেই। বিশ্বাসী হয়ে কাজ করে নিয়ম-মতো

মাইনে পেয়েই সে খুশী। সে বেইমানি করবে না, চুরি করবে না. মনিবকে জান্ দিয়ে সেবা করবে—এই-ই তার জীবনের মূল-মন্ত্র। সে এতকাল ধরে তাই-ই করে আসছে।

তবে বেইমানি কি করেনি সে? করেছে। কিন্তু তাকে বেইমানি বলা ঠিক নয়। ঠাকমা-মণির হুকুম ছিল ঠিক রাত ন'টার সময় সদর-গেট বন্ধ করা।

কিন্তু তা তো সে করেনি। তারই মনিবের নুন খেয়ে তারই আর এক মনিবের বখশিসের লোভে রাত ন'টার সময়ে সদর-গেট বন্ধ করে দিয়েও আবার রাত দশটার সময়ে নিঃশব্দে দরজা খুলে দিয়েছে। আর আবার রাত দুটো কি আড়াইটে তখন সেই মনিবই আবার যখন অপ্রকৃতিস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছে. তখন সদর-গেট খুলে দিয়ে তাকে ভেতরে আসবার নিঃশব্দ সুবিধেও সে করে দিয়েছে।

একে কি বেইমানি বলে?

মানুষের ভাষার অভিধানে 'বেইমানি' শব্দটার যে-অর্থই লেখা থাকুক. দেহাতি মানুষ গিরিধারীর অভিধানে সেই শব্দটার অন্য আর একটা অর্থও আছে– যেটার নাম 'সেবা'। ঠাকমা-মণি তার মনিব বটে কিন্তু সৌম্যবাবুও কি তার মনিব নয়? তাই বিভিন্ন ভাবে এতকাল ধরে দু'জন মনিবকেই সে সেবা করে এসেছে।

সন্দীপ আবার জিজ্ঞেস করলে—ঠাকমা-মণির অসুখ হতে গেল কেন গিরিধারী? এতদিন এ-বাড়িতে আছি ঠাকমা-মণির অসুখ হতে তো কখনও শুনিনি। ব্যাপারটা কী?

গিরিধারী বললে—ক্যা জানে হুজুর!

—তোমার ছোটবাবু বিলায়েত্ সে আয়া?

গিরিধারী মাথা নাড়লে। বললে– জী হাঁ

বলে আর দাঁড়ালো না। বেশিক্ষণ গেট খোলা রাখলে কাজে গাফিলতি হয়ে যাবে. তাই আবার তার ডিউটি সামলাতে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

তখনও মল্লিক-কাকা ফিরছে না। এতক্ষণ ধরে ডাক্তারবাবু ঠাকমা-মণিকে কীসের পরীক্ষা করছে? কোনও খারাপ কিছু হলো নাকি ঠাকমা-মণির? ভেতরে-ভেতরে খুব উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো সন্দীপ! এ-রকম তো কখনও হয়নি আগে। আগে তো ঠাকমা-মণির জন্যে কখনও ডাক্তার ডাকতে হয়নি এ-বাড়িতে!

হঠাৎ গিরিধারী আবার ঘরে ঢুকলো. বললে- হুজুর. এক আদমী আপ সে মুলাকাৎ করনে কে লিয়ে আয়া। এখানে আনবো?

সন্দীপ অবাক হয়ে গেল গিরিধারীর কথা শুনে। এখানে, আবার তার সঙ্গে কে দেখা করতে এসেছে? তাকে কে চেনে এখানে? তবে কি গোপাল হাজরা?

চোখের সামনে তপেশ গাঙ্গুলীকে দেখে আরো অবাক হয়ে গেল। তার সঙ্গে দেখা করতে এ-বাড়িতে এসেছে তপেশ গাঙ্গুলী?

—আপনি?

তপেশ গাঙ্গুলী দাঁত বার করে হাসছে তখন! বললে—কেন ভায়া. আমায় কী আসতে নেই?

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—এদিক পানে একবার এসেছিলুম তাই ভাবলুম এদিকে যখন এসেছি তখন ভায়ার সঙ্গে একবার দেখা করে যাই। আমি বড়দির কাছে শুনে-ছিলুম যে তুমি নাকি ব্যাঙ্কে একটা ভালো চাকরি পেয়েছ। শুনে আমি খুব খুশী হয়েছি ভায়া. খুব খুশী হয়েছি—

সন্দীপ এই সময়ে তপেশ গাঙ্গুলীর আকস্মিক আবির্ভাবে এমনিতেই অখুশী হয়েছিল. তার ওপর অযাচিত এই স্নেহ তার কাছে যেন বিষের মত মনে হচ্ছিল। অভিনয়ের মত মনে হচ্ছিল।

তপেশ গাঙ্গুলীর কথার জবাবে সন্দীপ শুধু বললে—আমি এখখুনি অফিস

থেকে এলুম কিনা তাই খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছি—

তপেশ গাঙ্গুলী বলে উঠলো—আরে ক্লান্ত তো হবেই ভায়া! এ তো আর রেলের অফিস নয় যে কাজ না করে মাইনে নিয়ে নিলুম। ব্যাঙ্কের চাকরিতে কম খাটুনি? আমার এক বন্ধু ব্যাঙ্কে কাজ করে। তার কাছে শুনেছি সে সারা রাত ঘুমের ঘোরেও কেবল অংক কষে যায়! যা হোক, তুমি ভাই গরীব লোকের ছেলে, পরের বাড়িতে পড়ে আছো, খাটুনিকে ভয় করলে তোমার চলবে কেন? এই তো তোমাদের খাটুনির বয়েস। এখন প্রাণ দিয়ে খেটে যাও, দেখবে আখেরে একদিন ম্যানেজার হয়ে বসতে পারবে। কোন্ ব্যাঙ্ক তোমাদের? নাম কী ব্যাঙ্কের?

সন্দীপ ব্যাঙ্কের নামটা বললে—ন্যাশনাল ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক—

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—ওঃ খুব ভালো ব্যাঙ্ক ভাই, একবার কোনও রকমে ম্যানেজার হয়ে গেলে দেখবে তখন দু'হাতে টাকা আসছে, হুড় হুড় করে টাকা আসছে, টাকা তখন তোমার হাতের আঙুল দিয়ে উপচে পড়ছে—

সন্দীপ তবু কিছু বলছে না দেখে তপেশ গাঙ্গুলী বললে—কী ভায়া, আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? তা কেন বিশ্বাস হবে? গরীবের কথা কি না, বাসি হলে তখন ফলবে—

তারপর হঠাৎ যেন কিছু একটা মনে পড়ে গেছে, এমনি ভাবে জিজ্ঞেস করলে—হ্যাঁ ভালো কথা, আজকে তোমাদের সৌম্যবাবুর কলকাতায় এসে পৌঁছুবার কথা না?

সন্দীপ এতক্ষণে বুঝতে পারলে তপেশ গাঙ্গুলী বেছে বেছে আজকেই কেন তার কাছে এল। বললে—কে বললে আপনাকে?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, এ শর্মা সবই খবর রাখে ভায়া। বাইরে বোকা বোকা দেখতে হলে কী হবে, সব খবর রাখে এ শর্মা! সত্যি বলো তো আজকে সৌম্যবাবুর আসার কথা কি না?

কথাটা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মল্লিক-কাকা হন্ত-দন্ত হয়ে ঘরে ঢুকলো। ঢুকেই তপেশ গাঙ্গুলীকে দেখে চিনতে পেরেছে। বললে—কী হলো, এখানে কী মনে করে?

তপেশ গাঙ্গুলীর বাড়িতে অনেক দিন মল্লিক-কাকা গেছে বিশাখার জন্যে মাসোহারার টাকা দিয়ে আসতে। কিন্তু তপেশ গাঙ্গুলী যে কী রকম ধূর্ত মানুষ তা মল্লিক-কাকার জানতে বাকি নেই।

তপেশ গাঙ্গুলী কিছু জবাব দেওয়ার আগেই মল্লিক-কাকা সন্দীপকে বললে—তোমাকে একটা কাজ করতে হবে সন্দীপ, এখুনি একবার ওষুধের দোকানে যেতে হবে--

তপেশ গাঙ্গুলী বুঝতে পারলে দুজনেই তাকে এড়াতে চাইছে। দুজনের মুখে-চোখেই যেন কী-রকম একটা বিরক্তির আভাস। আরো বুঝতে পারলে যে সে এখানে একজন অবাঞ্ছিত মানুষ।

হঠাৎ বললে—আপনারা এখন বুঝি খুব ব্যস্ত মল্লিক-মশাই?

মল্লিক-মশাই বললে—হ্যাঁ, শুনলেই তো আমাদের ঠাকমা-মণির খুব অসুখ। এখন কারো সঙ্গে কথা বলবার ফুরসৎই নেই আমাদের--

—আচ্ছা ঠিক আছে। তা হলে এখন চলি। পরে আবার যদি একদিন আসবো—

বলে তপেশ গাঙ্গুলী উঠলো। তারপর তাড়াতাড়ি পা ফেলে একেবারে সদর গেট পেরিয়ে বিডন স্ট্রীটের ওপরে গিয়ে পড়লো। অফিস থেকে দু'ঘণ্টা আগে বেরিয়েছিল। ভেবেছিল বউদির বেয়াই-বাড়িতে গেলে অন্ততঃ এক কাপ চা কপালে জুটবে। না, ওদেরও দোষ নয়। আজকাল সমস্ত পৃথিবীটাই এই রকম হয়ে

গিয়েছে। আজকাল যেন সবাই-ই সবাইকে এড়িয়ে চলতে চায়। কেউ কারোর ভালো দেখতে পারে না এ-যুগে! অথচ তপেশ গাঙ্গুলী তো কারো পাকা ধানে মই দিতে যায়নি। কারো ক্ষতি করেনি তো সে জীবনে! তোমার মেয়ের সঙ্গে বড় লোকের নাতির বিয়ে হতে চলেছে, সেটা তো ভালো কথা। তাতে তো আমারও আনন্দ। আমি হলুম পাত্রীর কাকা। পাত্রী আমার নিজের ভাইঝি। তার বিয়েতে আমার আনন্দ হবে না? কিন্তু কেউ তা বুঝছে না। পৃথিবীর সব্বাই যেন স্বার্থপর হয়ে উঠেছে। সবাই জানে যে লোকটা অফিস থেকে সোজা এ-বাড়িতে এসেছে, এক কাপ চা অন্ততঃ দে তাকে। তোদের এত টাকা, সে-টাকা সাত ভূতে লুটে-পুটে খাচ্ছে, তার মধ্যে একটা বামুনের ছেলে যদি চা খেতে চায় তো তোদের ক্ষতিটা কী? আসলে, বড়লোক হলে কী হবে, হাড়কিপ্পন! বউদি ভাবছে তার মেয়ে বড়লোকের বাড়িতে পড়ছে, রাণীর আদরে থাকবে। কিন্তু এখনও জানতে পারেনি তো যে বড়লোকরাও কত কিপ্পন হয়। যখন এ-বাড়িতে এসে ক্ষিধে পেলেও খেতে পাবে না তখনই বড়-লোকের বাড়ির ছেলের সঙ্গে বিয়ে হওয়ার মজাটা বুঝবে!

সত্যিই তপেশ গাঙ্গুলীর মাথাটা তখন চায়ের অভাবে টন্-টন্ করতে আরম্ভ করেছে। ঠিক সময়-মতো চা খেতে না পেলেই ওই রকম হয়।

হঠাৎ একটা চায়ের দোকান নজরে পড়লো। আর সঙ্গে সঙ্গে তার ভেতরেই ঢুকে পড়লো তপেশ গাঙ্গুলী।

বললে—চা হবে ভাই? দোকানে তখন আরো দু'একজন চা খাচ্ছে। তপেশ গাঙ্গুলী একটা খালি চেয়ার দেখেই তার ওপরে বসে পড়েছে।

খানিক পরে এক কাপ চা নিয়ে এল একটা ছোক্‌রা। চা-এর চেহারা দেখেই মেজাজ চড়ে গেল তপেশ গাঙ্গুলীর।

বললে—এ কী চা হয়েছে? এত কড়া লিকার কেন হলো? আর একটু দুধ দাও। এত কড়া চা খেয়ে কি মারা যাবো নাকি?

ছোকরাটা আর কী করবে। আরো একটু দুধ এনে ফেলে দিলে চায়ের ওপর।

—আহা-হা-হা-! কী করলে? কী করলে? অত দুধ ঢাললে কেন? এ কি চা হলো? এ তো পাঞ্জাবীদের চা হয়ে গেল! তারপর কাপে চুমুক দিয়ে খেয়ে ফেলে দিয়ে বললে—এইবার এতে আর একটু লিকার দাও ভাই—

অগত্যা ছোকরাটিকে আর একবার লিকার নিয়ে আসতে হলো। লিকার দেওয়ার পর তপেশ গাঙ্গুলী একবার চেখে দেখলে।

বললে—উহুঁ হলো না, আবার চিনি কম হয়ে গেল। আর একটু চিনি নিয়ে এসো ভাই—

অগত্যা ছোকরাটিকে আবার চিনি আনতে দৌড়তে হলো। চিনিটা চায়ে মিশিয়ে চা'টা আবার চেখে দেখলে তপেশ গাঙ্গুলী—

ছোকরা তখনও দাঁড়িয়ে ছিল। বললে—এবার ঠিক হয়েছে বাবু?

তখন চায়ে চুমুক দিয়ে একটু খুশী হলো তপেশ গাঙ্গুলী। একটা চুমুক দিতেই মাথার টন্‌টনানিটা একটু কমলো যেন।

বললে—হ্যাঁ, ঠিক হয়েছে—

তারপর সব চাটুকু খেয়ে যখন মাথাটা ঠাণ্ডা হলো তখন উঠলো। দোকানের মালিক যিনি, তিনি টাকা-পয়সার হিসেব রাখছিলেন। তাঁর কাছে গিয়ে তপেশ গাঙ্গুলী একটা পঁচিশ নয়া ফেলে দিলে।

পাশেই একটা ডিশের ওপর এক গাদা কাঁচা মৌরী ছিল। তপেশ গাঙ্গুলী ডিশে রাখা সব মৌরীগুলো হাতে ঢেলে নিয়ে মুখে পুরে দিয়ে চিবোতে লাগলো। চিবোতে

চিবোতে বাইরে চলে আসছিল।

দোকানদার ভদ্রলোক ডাকলেন—ও দাদা, শুনুন শুনুন—

তপেশ গাঙ্গুলী ফিরলো। বললে—কী হলো?

—আপনি পঁচিশ নয়া দিলেন যে?

তপেশ গাঙ্গুলী যেন আকাশ থেকে পড়লো। বললে—কেন, এক কাপ চায়ের দাম তো বরাবর পঁচিশ নয়াই দিই—

দোকানদার বললে—না-না, আরো পঁচিশ নয়া দিতে হবে—

—কেন? মৌরীর দাম? আপনারা মৌরীরও দাম নেন নাকি? মৌরী তো সবাই ফ্রী-ই দেয়।

দোকানদার ভদ্রলোক বললেন—মৌরীর দাম নয়, আজকাল চা'এর দাম বেড়ে পঞ্চাশ নয়া হয়েছে। আপনি কোথায় থাকেন?

—কোথায় আবার থাকবো, এই কলকাতাতেই থাকি।

—কলকাতার দোকানে আপনি আগে কখনও চা কিনে খেয়েছেন?

—কেন খাবো না? আমাদের রেল-অফিসের ক্যান্টিনে রোজই চা খাই। বরাবর ওই পঁচিশ নয়াই দাম দিই—

দোকানদার বললেন—আপনাদের ক্যান্টিনের কথা ছেড়ে দিন। বাইরে দোকানে পঞ্চাশ পয়সা দাম সবাই-ই দেয়। ওই পুরো দাম না দিলে আপনাকে যেতে দেব না—

তপেশ গাঙ্গুলী রেগে গেল। বললে—তার মানে?

দোকানদার ভদ্রলোক বললেন—আপনি বাংলা ভাষাটাও বোঝেন না? পুরো দামটা ফেলবেন তবে আপনাকে এখান থেকে যেতে দেব! নইলে পুলিশ ডাকবো, তা বলে দিচ্ছি—

তপেশ গাঙ্গুলী দোকানের অন্য খদ্দেরদের দিকে চেয়ে বললে—দেখছেন মশাই আপনারা, দেখছেন? আপনারা সবাই দোকানদারের কথা শুনলেন তো? আমাকে একলা পেয়ে দোকানদার কী রকম করে শাসাচ্ছে?

তারপর দোকানদারের দিকে চেয়ে বললে—জানেন আমি একজন গ্র্যাজুয়েট? ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি থেকে ফার্স্ট ডিভিশনে বি-এ পাশ করেছি? আমায় যা-তা মানুষ ভাববেন না। আমার এই ময়লা জামা-প্যাণ্ট্ দেখে ভাববেন না আমি হেঁজি-পেঁজি লোক। আমারও একটা প্রেসটিজ আছে সোসাইটিতে! পুলিশ দেখিয়ে আমাকে ভয় পাওয়াতে পারবেন না।

অন্য খদ্দেররা আর কী বলবে! তারা তখন চা খেতে খেতে মজা দেখছে!

দোকানদার তখন দাঁড়িয়ে উঠলো। নাম ধরে একজন চাকরকে ডাকল—কার্তিক, দরজাটা বন্ধ করে দে তো, দেখি লোকটা কী করে! দে দরজা বন্ধ করে—

তপেশ গাঙ্গুলী তখন আরো ক্ষেপে গেছে! বললে—কী? আমাকে এখানে আটকে রাখবেন?

—হ্যাঁ, আটকে রাখবো; আপনি বাকি পয়সা না দিয়ে যেতে পারবেন না।

—এত বড় কথা?

তপেশ গাঙ্গুলী এবার খুব রেগে গেল! বললে—খবরদার বলছি, আমাকে ঘাঁটাবেন না। আমি এখখুনি পুলিশ ডাকিয়ে আপনাদের অ্যারেস্ট করিয়ে দিতে পারি? আমার ভাইঝি-জামাই কে জানেন?

নিজেই প্রশ্ন করে নিজেই তার উত্তর দিলে তপেশ গাঙ্গুলী। বললে—আমার ভাইঝি-জামাই হচ্ছে এই আপনাদের পাড়ার স্যাকরা মুখার্জী কোম্পানীর ডিরেক্টর এস পি মুখার্জি, তা জানেন?

এতক্ষণে যেন হঠাৎ ঠাণ্ডা হলেন দোকানদার ভদ্রলোক। তাঁর মুখ চোখের ভাব ঠাণ্ডা হয়ে এল।

জিজ্ঞেস করলেন—কার নাম বললেন ?

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—সৌম্যপদ মুখার্জি, স্যাক্সবী মুখার্জী কোম্পানীর ডিরেক্টার। এই সবে আজ বিলেত থেকে এসেছে। সে আমার ভাইঝি-জামাই। একেবারে আমার আপন বড়দাদার জামাই—তা জানেন ?

দোকানের অন্য খদ্দেররা, যারা এতক্ষণ মজা দেখছিল, তাদের চোখের দৃষ্টিতেও যেন এবার একটু শ্রদ্ধার ভাব ফুটে উঠলো। দোকানদার থেকে আরম্ভ করে খদ্দেররা সবাই ওই মুখুজ্জেদের আড়ম্বর ঐশ্বর্য খানদান সমস্ত কিছু দেখেছে। তারা ও-বাড়ির কুলুজী-ঠিকুজী-পেডিগ্রী-বনেদিআনা সম্বন্ধে সব কিছু জানে। এই তো সবে বাড়িটা রাজমিস্ত্রী লাগিয়ে রং-চং করা হলো। ওরা ইচ্ছে করলে এখখুনি পাড়ার একশোটা বেকার ছেলের চাকরি করে দিতে পারে।

খদ্দেরদের মধ্যে একটা ছেলে দাঁড়িয়ে উঠে বললে— আরে ওকে ছেড়ে দিন দাদা, পঞ্চাশটা পয়সা ও'র কাছে হাতের ময়লা। ছেড়ে দিন—

দোকানদারও ততক্ষণে একটু নরম হয়ে এসেছেন। তিনি আবার তাঁর চেয়ারে বসে পড়লেন।

খদ্দের ছেলেগুলো তখন তপেশ গাঙ্গুলীকে নিয়ে পড়লো। বললে—আর একটু বসুন না দাদা, আর এক কাপ চা খান না ?

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—না ভাই, এত বিশ্রী চা আমি জীবনে খাইনি। এক কাপ চা খেয়েই আমার গা গুলোচ্ছে—

—যাক্ গে, চা খান আর না খান, আমাদের চাকরি করে দিন না আপনার ভাইঝি-জামাই-এর ফ্যাক্টরিতে—

তপেশ গাঙ্গুলী বললে— কবে চাকরি চাই আপনাদের ?

—আজ হলে আজই...

তপেশ গাঙ্গুলী জিজ্ঞেস করলে তা আপনাদের কোয়ালিফিকেসন কী গ্র্যাজুয়েট ?

—না স্যার আণ্ডার-গ্র্যাজুয়েট...

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—ঠিক আছে তোমরা সবাই আমার কাছে একটা করে এ্যাপ্লিকেশন দিয়ে দিও। আমি তোমাদের সব্বাইকে চাকরি দিয়ে দেব—আমি বললেই তোমাদের সকলের চাকরি হয়ে যাবে।

—আপনাকে আবার কোথায় পাবো ?

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—আমার বাড়িতে...

কথাটা বলেই আবার শুধরে নিয়ে বললে—না না, আমার বাড়িতে আবার তোমরা কষ্ট করে যাবে কেন, আমিই একদিন এসে তোমাদের এ্যাপ্লিকেশনগুলো নিয়ে আমার ভাইঝি-জামাইকে দিয়ে দেব—চলি—

বলে রাস্তায় নেমে পড়লো। তখন চারদিকে সন্ধ্যের অন্ধকার বেশ ঘন হয়ে এসেছে। খুব মানুষের ভিড়। তপেশ গাঙ্গুলী সেই মানুষের ভিড়ের অন্ধকারের ভেতরে তলিয়ে গেল। কী বিপদেই পড়া গিয়েছিল। আর একটু হলেই পঁচিশটা নয়া গাঁট-গচ্চা চলে যেত। ভগবান বাঁচিয়ে দিয়েছে। তখনই মনে পড়লো রাসেল স্ট্রীটের বউদির কথা। তপেশ গাঙ্গুলী সেই দিকেই হাঁটা দিতে শুরু করলো। সেখানে গেলে এখুনি চা-এর সঙ্গে অন্য খাবারও মিলে যাবে।
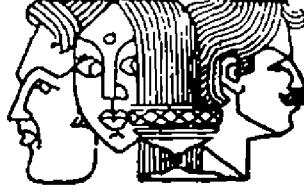
সেদিন সন্দীপ সত্যিই ভাবেনি যে এমন হবে। ভাবেনি যে এমন করে সব কিছু উল্‌টে যাবে। মানুষ ভাবে এক, হয় আর এক। কথাটা কত পুরোন কিন্তু তবু কত নতুন।

যেদিন বেড়াপোতায় সন্দীপ মাকে মাইনের টাকাগুলো দিতে গিয়েছিল সেদিনও কি সন্দীপ ভাবতে পেরেছিল যে এমন কাণ্ড হবে?

কিন্তু রাতের স্বপ্নটা?

মনে আছে সেদিন সন্দীপ মাকে বলেছিল—মা, এবার থেকে আমি এই বেড়াপোতাতে তোমার কাছেই থাকবো। এখান থেকেই আমি ডেলি-প্যাসেঞ্জারী করবো।

মা জিজ্ঞেস করেছিল—কেন রে, কলকাতায় যে-বাড়িতে থাকিস সে-বাড়ি কী দোষ করলো?

সন্দীপ বলেছিল—সে-বাড়ি কিছু দোষ করেনি মা, কিন্তু এখন তো বাইরে চাকরি করছি, এখন আর ওখানে থাকা ভালো দেখাবে না—

তারপর আসবার সময়ে বলেছিল—মা, আমি যদি এখানে আসি তাহলে আমার সঙ্গে কিন্তু আরো দুজন আসবে—

মা কথাগুলো শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিল। বলেছিল—আরো দুজন? আরো দুজন আবার কে?

সে-কথার আর উত্তর দেওয়া হয়নি। তার আগেই তার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। আসলে সে মাসিমা আর বিশাখার কথাই বলতে চেয়েছিল।

কিন্তু স্বপ্নটা যে এমন করে সত্যি হবে তা কি তখন সে জানতো? তপেশ গাঙ্গুলী চলে যাওয়ার পরই আসল ঘটনাটা সে জানতে পারলে। মল্লিক-কাকাই আসল খবরটা তাকে দিলে।

ঠাকমা-মণির যে কেন অসুখ হলো, আর সেই জন্যে ডাক্তারই বা ডাকতে হলো কেন, তাও জানতে পারা গেল তখন।

সে এক মহা বিপজ্জনক আর অস্বস্তিকর ঘটনা। আগে থেকে কেউই তা কল্পনা করতে পারেনি।

সেদিন সৌম্যপদকে আনতে সবাই-ই দমদম্‌ এয়ার-পোর্টে গেছে। বালিগঞ্জ থেকে মিস্টার অতুল চ্যাটার্জি, তাঁর ছেলে সুবীর। আর বেলুড় থেকে মুক্তিপদ মুখার্জি। মুক্তিপদ সৌম্যকে রিসিভ করবার জন্যে নিউ মার্কেট থেকে একটা দামী ফুলের মালা কিনে নিয়ে গেছে।

প্লেন আসার কথা সকাল সাড়ে দশটা। কিন্তু খবর নিয়ে জানা গেল সে প্লেন এক ঘণ্টা লেট।

তার মানে যার নাম সাড়ে এগারোটা। তারপর আছে কাস্টমস্‌-এর চেকিং। তার পর ব্যাগেজ ডেলিভারি। তাতেও অনেক সময় লেগে যাবে।

তা হোক মিস্টার চ্যাটার্জি বললেন—আমারও একটা ফুলের মালা আনা উচিত ছিল মিস্টার মুখার্জি। একেবারে ভুলে গিয়েছি—

মুক্তিপদ বললেন—আমিও ভুলে যাচ্ছিলাম, কিন্তু আমার মা টেলিফোনে আমাকে মনে করিয়ে দিলেন–

—বাই-দ্য-বাই, আপনার মা কেমন আছেন আজকাল?

—খুব ভাল আছেন। এতদিন নাতির জন্যেই তো মনে মনে অপেক্ষা করে ছিলেন। এইবার নাতির বিয়েটা দিতে পারলেই তাঁর শেষ সাধটা পূর্ণ হয়। আমার মা দিন-রাত কেবল সৌম্যর কথাই ভাবেন। জীবনে অনেক শোক-তাপ পেয়েছেন তো, অনেক দুঃখ অনেক কষ্ট পেয়েছেন। আমার বাবা মারা গিয়েছেন এ্যাট দ্য এজ অব্ ফর্টি ফাইভ্, আমার দাদা মারা গিয়েছে পঁচিশ বছর বয়সে। আমরা সবাই অল্পায়ু। আমারও যেরকম সব ঝঞ্ঝাট চলছে তাতে আর বেশি দিন বাঁচবো বলে মনে হয় না। আমার মা-ই এত সব কিছু মুখ বুঁজে সহ্য করে আছেন। জানি না আর কতদিন তিনি বেঁচে থাকবেন- -

মিস্টার চ্যাটার্জি বললেন—এই বার বিনীতার বিয়েটা হয়ে যাক, দেখবেন বিনীতা আপনার মা'কে অনেক দিন বাঁচিয়ে রাখবে! আমার নিজের মেয়ে বলে বলছি না মিস্টার মুখার্জি, কিন্তু আমি লক্ষ্য করে এসেছি যে পরের সেবা করাটা যেন ওর কাছে একটা রিলিজিয়নের মতন।

পেছনে একটু দূরে দাঁড়িয়ে মল্লিক-কাকা সব শুনছিল।

হঠাৎ লাউড্-স্পীকারে ঘোষণা হলো প্লেন এসে পৌছোচ্ছে। একটু পরেই রানওয়েতে নামবে। আর ঠিক তা-ই হলো। লাউঞ্জে যত লোক জড়ো হয়েছিল সবাই উঠে দাঁড়িয়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেল। সবাই-ই আত্মীয়-স্বজন বন্ধুদের স্বাগত অভিনন্দন জানাতে এসেছে। রানওয়েতে প্লেন নেমে ঘুরতে ঘুরতে একটা জায়গায় এসে স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছে। এয়ারপোর্টের স্টাফ্ গাড়ি নিয়ে কাছে গিয়ে হাজির হলো। সিঁড়ি লাগানো হলো সামনের দরজায়। একে একে প্যাসেঞ্জার নামতে লাগলো। কই? ওদের মধ্যে সৌম্যপদ কই?

হ্যাঁ, সৌম্যপদকে এবার দেখা গেল। সে সিঁড়ি দিয়ে ধীরে ধীরে নামছে। তার পেছনে আর একজন মহিলা। তার পেছনে আরো অনেক লোক। সবাই একে একে নামছে। সবাই একে একে এসে সামনে দাঁড়ানো একটা বাসের ভেতরে উঠে বসতেই বাসটা চলতে চলতে কাস্টমস্-এনক্লোজারের সামনে এসে দাঁড়ালো। সব প্যাসেঞ্জার বাস থেকে নেমে ইমিগ্রেশন্-এর জন্য ভিতরে এসে ঢুকলো। প্যাসেঞ্জারদের পাসপোর্ট-ভিসা সব কিছু ওখানে চেকিং হবে। সব সুটকেস খুলে দেখা হবে!

—ওই সৌম্য আসছে, ওই যে -ওই যে একটা মোটা মহিলার সঙ্গে কথা বলছে—

মিস্টার চ্যাটার্জি বললেন—কই?

—ওই তো কার সঙ্গে কথা বলছে—

এবার মিস্টার চ্যাটার্জি দেখতে পেলেন। এই-ই প্রথম মিস্টার চ্যাটার্জির সৌম্যকে চাক্ষুস দেখা। বললেন—ভেরি হ্যান্ডসাম বয়, আমার বিনীতার সঙ্গে খুব মানাবে।

এনক্লোজারের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে সবাই। সবাই সবাইকে আপ্যায়ন করছে, অভ্যর্থনা করছে, অভিনন্দন জানাচ্ছে। মুক্তিপদ হাত তুললেন। সৌম্যও দেখতে পেয়েছে কাকাকে। সেও হাত তুললো। তারপর ভিড় ঠেলে একেবারে রেলিং-এর কাছে এসে দাঁড়ালো। মুক্তিপদ সৌম্যর গলায় মালাটা পরিয়ে দিলেন।

—রাস্তায় কোনও কষ্ট হয়নি তো?

—না, কষ্ট কীসের?

—এঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। ইনি মিস্টার চ্যাটার্জি, দ্য ফেমাস ইন্ডাস্টিয়ালিস্ট্ অব্ ইন্ডিয়া, আর ইনি হচ্ছেন মিস্টার চ্যাটার্জির ছেলে সুবীর চ্যাটার্জি—

সৌম্যপদও পরিচয় করিয়ে দিলে সেই মোটা মহিলার সঙ্গে ইনি হচ্ছেন আমার মিসেস্—মিসেস্ রীটা মুখার্জি—

মহিলাটি হাতটা বাড়িয়েও দিয়েছিলেন হ্যাণ্ডশেক্ করবার জন্যে, কিন্তু তার আগেই সকলের মাথার ওপর যেন বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হয়ে গেল। সবাই স্তম্ভিত, সবাই বিভ্রান্ত, সবাই হতচকিত পুতুলের মত নিথর, নিস্পন্দ!!!

সন্দীপও তখন সবটা শুনে স্তম্ভিত। বললে—তারপর? তারপর কী হলো?

মল্লিক-কাকা বললে—সবাই যে তখন হঠাৎ কে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলেন জানি না। আমি গাড়ি করে সৌম্যপদবাবু আর তার স্ত্রীকে নিয়ে বাড়ি চলে এলাম। ঠাকমা-মণিও খুব আগ্রহ করে অপেক্ষা করছিলেন। তিনি কথাটা শুনেই হঠাৎ সেইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই মাটিতে পড়ে গেলেন। ডাক্তারকে ডেকে পাঠিয়েছিলুম। তিনি এসে পরীক্ষা করে বললেন—স্ট্রোক! যাও যাও, এখ্খুনি তুমি এই ওষুধগুলো কিনে নিয়ে এসো। ওঁকে বোধহয় বাড়িতে রাখা ঠিক হবে না, নার্সিং-হোমে পাঠাতে হবে!

—আর সৌম্যবাবু?

মল্লিক-কাকা বললেন—সৌম্যবাবু আর তার মেমসাহেব বউ এখন তাদের ঘরে। এক বোতল হুইস্কি আনতে বলেছেন আমাকে। গিরিধারীকে দিয়ে আমি হুইস্কি আনাচ্ছি। ড্রাইভার এতক্ষণে চলে গিয়েছে। যাও, তুমি দৌড়ে ওষুধগুলো নিয়ে এসো—

সন্দীপ চাকরি করত বটে, কিন্তু মনটা পড়ে থাকতো দু'জায়গায় একটা জায়গা হলো বেড়াপোতায় মার কাছে। আর একটা জায়গা হলো রাসেল স্ট্রীটের বাড়ি। বুকটা থাকতো রাসেল স্ট্রীটের বাড়িতে আর তার মস্তিষ্কটা পড়ে থাকতো বেড়াপোতাতে। আর ব্যাঙ্কে?

ব্যাঙ্কটা তো তার কর্মক্ষেত্র। কর্মক্ষেত্র মানেই জীবিকা!

তা জীবন আর জীবিকা কি এক? কেবল জীবিকার তাড়নায় সেখানে যেতে হয় তাই যাওয়া, নইলে কোনও আকর্ষণই তার ছিল না সেখানে।

পরেশদা বলতো—কী হে, দিন-দিন এত মন-মরা হয়ে যাচ্ছো কেন? কী হয়েছে তোমার?

সন্দীপ আর কী বলবে। আর আসল কারণটা বললেই কি কেউ তা বুঝবে? ব্যাঙ্কের অন্য সবাই হৈ-হৈ করে দিন কাটাতো। খবরের কাগজ পড়তো, রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করতো। আবার কখনও বা ফুটবল, কখনও ক্রিকেট। তাদের আলোচনা করবার জিনিসের কখনও অভাব হতো না। যেদিন আলোচনা করবার মতো কিছু খবর থাকতো না, সেদিন সবাই ম্রিয়মাণ হয়ে পড়তো। কাউকে গালাগালি বা কাউকে নিন্দে না করলে যেন সকলের মনটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগতো। সকলেই কেবল আশা

করতো পৃথিবীতে একটা কিছু ঘটুক। রাস্তায় কোনও নিরীহ লোক গাড়ি চাপা পড়ুক, কোনও দেশে ভূমিকম্প হয়ে কিছু লোক মরুক, কিংবা দিল্লীর কোনও মিনিস্টারের পতন হোক, কাউকে ক্যাবিনেট থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হোক। অন্ততঃ অন্য কিছু না হোক কলকাতায় কয়েক ঘণ্টা লোড্‌-শেডিং হোক। আর তাই নিয়ে কিছুক্ষণ গভর্মেণ্টের মুণ্ডুপাত করার সুযোগ পাওয়া যাবে।

বাঙালীর ছেলে হয়ে চাকরি পেয়েও যার সুখ হয় না তাঁর নিশ্চয়ই কোনও ব্যাধি আছে। নইলে আমরা সবাই যখন ক্যান্‌টিনে গিয়ে আরাম করে চপ্‌-কাটলেট-চা খেয়ে ফুর্তি করছি, তখন তুমি কেন মুখ ভার করে আলাদা হয়ে থাকবে? আমরা যখন সবাই কাজে ফাঁকি দিয়ে মাসে মাসে নিয়ম করে ঠিক-ঠিক মাইনে পেয়ে যাচ্ছি তখন তুমি কেন মুখ বুজে এক মনে কাজ করে যাবে? তুমি নিশ্চয়ই আমাদের ছোট মনে করো, কিংবা আমাদের নিচু নজরে দেখ!

কিন্তু কে বুঝবে সন্দীপের মনে কী নিদারুণ ঝড়-তুফান বয়ে চলেছে? ঝড়-তুফান যেমন আকাশ-পাতাল, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড তোলপাড় করে দিয়ে মানুষকে বিপর্যস্ত করে তোলে সন্দীপের মনের ভেতরেও তখন তাই ঘটে চলেছে। যারা বাইরের লোক, যারা মাসকাবারি মাইনেটাকেই পরমার্থ মনে করে পরম আনন্দে দিন কাটাতে পারলে নিজেদের পরম সুখী মনে করে, তারা তার দুঃখ কী করে বুঝবে? অন্যরা যখন ইণ্ডিয়া-প্যাকিস্তানের মধ্যে ক্রিকেট খেলার জয়-পরাজয় নিয়ে উন্মত্ত হয়ে থাকাটাকেই পরম পরিতৃপ্তি বলে স্বীকার করে নিয়ে নিশ্চিন্ত আরাম উপভোগ করে, তারা সন্দীপকে অনুকম্পার চোখে তো দেখবেই।

পরেশদা বলতেন—তুমি একটা বিয়ে করে ফেল ভায়া, তোমার সব মেলান্‌কোলিয়া কেটে যাবে!

মল্লিক-মশাই সেই সৌম্যবাবু কলকাতায় আসবার পর থেকেই ব্যতিব্যস্ত! কেবল ডাক্তার আর ঠাকমা-মণিকে নিয়েই ব্যস্ত! শুধু মল্লিক-মশাই-ই নয়, সেই ঠাকমা-মণির খাস-ঝি বিন্দুরও সেই একই অবস্থা।

আর শুধু কি বিন্দু? কে ব্যস্ত নয়? দোতলার ঝি—কালিদাসী, একতলার ঝি—ফুল্লরা। সিংহ-বাহিনী ঠাকুরবাড়ির ঝি—কামিনী, তেতলার ঝি—সুধা সকলেরই যেন বিনা মেঘে মাথায় বজ্রাঘাত হয়েছে।

ঠাকমা-মণি একদিন ছিল এ-বাড়ির সর্বেসর্বা। কোথায় কে কলের-জল নষ্ট করছে, কোথায় কে অকারণে আলো জ্বালিয়ে গৃহস্থ-বাড়ির পয়সা নষ্ট করছে, সব কিছু দেখবার যিনি মালিক তাঁকে দেখবার জন্যেই আজ সবাই তটস্থ। গিরিধারীকে রাত ন'টার সময়ে নিয়ম করে সদর-বাড়ির গেট বন্ধ না করলেও আর বলবার কেউ নেই। আর কেউ তাকে বলবার নেই—গিরিধারী, নটা বেজে গেছে, গেট বন্ধ করে দাও—

সত্যিই বিডন স্ট্রীটের বারোর-এ নম্বর বাড়ির শৃঙ্খলা যেন চিরকালের মতো বিকল হয়ে গিয়েছে। যে যত পারো অকর্ম-কুকর্ম করো, কেউই কিছু বলবে না। মুখার্জি-বংশের আদি পুরুষ দেবীপদ মুখার্জির প্রতিষ্ঠিত সংসার যেন হঠাৎ এতদিন পরে অচল হয়ে গেছে।

সন্দীপও খুব ভাবনায় পড়েছিল। মল্লিক-কাকার সঙ্গে দেখা হলেই জিজ্ঞেস করতো—ঠাকমা-মণি এখন কেমন আছেন কাকা?

মল্লিক-কাকা শুকনো মুখে শুধু জবাব দিত—ভালো না—

তার বেশি জবাব দেওয়ার সময়ও থাকতো না মল্লিক-মশাইএর। কখনও আপন মনে হিসেব লিখতে বসতো এক মনে। আবার তেতলায় ঠাকমা-মণির কাছে চলে যেত। কখনও কখনও মেজবাবু আসতেন, মা'র কাছে গিয়ে খানিকক্ষণ বসতেন।

ঠাকমা-মণি ছেলের দিকে ম্লান দৃষ্টিতে চেয়ে দেখতেন।

মুক্তিপদ জিজ্ঞেস করতেন—কেমন আছো মা?

ঠাকমা-মণি নিস্পৃহ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখতেন ছেলের মুখের দিকে। মুক্তিপদর সত্যিই তখন চরম দশা চলেছে। আবার জিজ্ঞেস করতেন—এখন কেমন আছো মা?

ঠাকমা-মণি মাথা নাড়তেন। তাঁর কথা বলতে কষ্ট হতো। ক্ষুণ কণ্ঠে একবার শুধু বলতো—খোকা কোথায়?

আশ্চর্য ব্যাপার! যে-খোকার জন্যে ঠাকমা-মণির এত কষ্ট তাকে দেখবার জন্যেই ঠাকমা-মণির যেন আগ্রহের সীমা থাকতো না। খোকা হয়ত তখন বাড়িতেই নেই। মাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যে মুক্তিপদ বলতেন—খোকা এখনও তার ঘরে ঘুমোচ্ছে—

এত দেরি পর্যন্ত কেন সৌম্য ঘুমোয় সে-প্রশ্ন মনে হলেও ঠাকমা-মণির মুখে তার প্রকাশ হতো না। শুধু চোখ দিয়ে ঝর-ঝর করে জল পড়তো। মুক্তিপদ আর বেশিক্ষণ বসতেন না। বসবার সময়ও তখন তাঁর বোধহয় থাকতো না।

একটা দেশ বা একটা জাতি, বা একটা সংসারের উত্থান-পতনের নিয়ম একই রকম। একটা গাড়ি চলতে চলতে হঠাৎ একবার হয়ত থেমে যায়। তখন গাড়ির চালক গাড়ি থেকে নেমে গাড়ির কল-কব্জা পরীক্ষা করে তার মেরামত করে চালাতে আরম্ভ করে।

কিন্তু এই মুখার্জি-বাড়ির রথ-যাত্রা সেদিন থেকে যেদিক লক্ষ্য করে চলতে লাগলো তা বড় জটিল, বড় জটিল। মুখার্জি-বাড়ির ইতিহাসে আগে কখনও এমন ঘটনা ঘটে নি। আগেও দেবীপদ মুখার্জি ব্যবসা-সূত্রে বিদেশে গেছেন। আগেও অর্থ উপার্জনের প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। আগেও বিদেশ-যাত্রার শেষে সগৌরবে দেশে ফিরে এসেছেন। এসে সব দিক থেকে লক্ষ্মীশ্রীর কৃপা লাভ করেছেন। আর সঙ্গে-সঙ্গে স্যাক্সবী-মুখার্জি কোম্পানীর শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে।

দম্-দম্ এয়ারপোর্টে পৌঁছোবার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু রথের চাকা যেন আটকে গেল। কিন্তু আটকে গেলে চলবে না। রীটাকে নিয়ে সৌম্যপদ ইণ্ডিয়ায় এসেছিল তার মনোবাসনা চরিতার্থ করতে। রীটা ইণ্ডিয়ার নাম শুনেছিল তার বাবা-মা'র কাছে। শুনেছিল ইণ্ডিয়া নাকি রিচ্-কাণ্ট্রি। সেখানে সে মিসেস মুখার্জি হয়ে যাবে সেটা তো তার কাছে গর্বের বস্তু।

একটা পাব্-এ বসে কথা হচ্ছিল বীয়ার খেতে খেতে। সৌম্যও সেখানে গিয়েছিল সময় কাটাতে। ঘটনাচক্রে আলাপ। সেখানেই দুর্ঘটনাটা ঘটলো।

সৌম্য তখন বীয়ার খেয়ে বেহুঁশ। রীটাও সেখানে গিয়েছিল সময় কাটাতে।

নেশার ঘোরে সৌম্য জিজ্ঞেস করেছিল—তুমি ইণ্ডিয়ায় যাবে?

উত্তরে রীটা আবার দু পেগ্ হুইস্কির অর্ডার দিয়েছিল।

বলেছিল—তুমি আমাকে ইণ্ডিয়ায় নিয়ে যাবে, সত্যি?

সৌম্যপদ বলেছিল—সেটা তো আমার পক্ষে একটা গ্রেট প্লেজার·

আর তারপরে যা হয় তাই-ই হলো। অফিসে আয়েঙ্গার নিজেই বেশির ভাগ

কাজটা করে ফেলতো। বলতে গেলে জুনিয়ার মুখার্জিকে কোনও কাজ করতেই দিত না সে। সৌম্যপদ কলকাতাতেও যেমন ছিল লন্ডনেও তেমনি। রাত দশটার পরই বলতে গেলে শুরু হতো তার দিন। কেউ পাহারা দেবার নেই, ঠাকমা-মণি নেই. গিরিধারীও নেই যে তাকে রোজ ঘুষ দিতে হবে। কোম্পানীর গাড়িটা নিয়েই নিরুদ্দেশ যাত্রায় বেরিয়ে পড়তো সে। তারপর একটা বার-এ গিয়ে বোতল নিয়ে বসলেই হলো। তখন পকেটে টাকা থাকলে তুমি একেবারে প্রিন্স। খাস ইন্ডিয়ান প্রিন্স। লন্ডনে ইন্ডিয়া আর পাকিস্তানি প্রিন্সদের ভারি ইজ্জৎ। একবার তাদের পেলে মদের দোকানের মালিক আর ছাড়তে চায় না। পেগের পর পেগ উড়ে যায়। আর বিশেষ করে যদি তার সঙ্গে কোনও মেয়ে-ক্লায়েন্ট থাকে।

বার-এর মালিকদের তরফ থেকে সে-ব্যবস্থাও পাকা করা আছে। মেয়েরা খদ্দের হয়ে বারেই বসে বসে তার যা-খুশী খায়। তার জন্যে তাদের গাঁটের পয়সা খরচ করতে হয় না। তাদের জন্য সব ফ্রী। কিন্তু শর্ত আছে একটা। মোটা দামের খদ্দের পাকড়াতে হবে। বিশেষ করে ইন্ডিয়ান কিংবা পাকিস্তানি খদ্দের। তারা লন্ডনে আসে টাকা ওড়াতে। সেই রকম যদি কোনও একটা শাঁসালো পার্টি পাকড়াতে পারো তো তোমাদের মাইনে বাড়িয়ে দেব।

রীটা বলতো—আজকে একটু ঠান্ডা পড়েছে, একটু জনিওয়াকার খাওয়াও। তা স্যাক্সবি-মুখার্জি কোম্পানির টাকা কি কিছু কম? কত জনিওয়াকার খাবে খাও না। জনিওয়াকার খাও জিন্ খাও, ব্রান্ডি খাও, যা ইচ্ছে তাই খাও। তোমার জন্যে আমি সব টাকা ওড়াতে পারি—

এই রকম করেই আলাপ হয়েছিল রীটার সঙ্গে। রীটা ওই হোটেলে চাকরি করে যা রোজগার করে তাই দিয়েই তার সংসার চলে। সংসার বলতে শুধু তার একটা বুড়ী মা। আর কেউ নেই।

—তোমাকে বিয়ে করলে আমার বিধবা মা কী খাবে? কী করে তার সংসার চলবে?

সৌম্য বলতো—আমি ইন্ডিয়া থেকে তোমার মা'কে মাসে-মাসে টাকা পাঠাবো।

—কত টাকা পাঠাবে?

—যত টাকা তোমার মা'র দরকার সব পাঠাবো—আমরা ক্যালকাটার রিচেস্ট ফ্যামিলি। আমাদের স্যাক্সবি-মুখার্জি কোম্পানি ক্যালকাটার রিচেস্ট কোম্পানি. আমি তার ডাইরেক্টার। আমার কি টাকার অভাব?

একেই বলে অনর্থ। অর্থ ও যে বেশির ভাগ লোকের কাছে অনর্থ হয়. এই সৌম্যপদ মুখার্জিই তার জলজ্যান্ত উদাহরণ। কলকাতার নাইট-ক্লাব থেকে সুরু করে লন্ডনের কোনও গলিঘুঁজির রেস্তোঁরা বা 'বার' বাদ গেল না। বাদ গেল না কোনও রাস্তার মেয়েও। কিন্তু ততদিনে রীটার চোখ খুলে গেছে। সে বুঝতে পেরেছে যে এই বড়লোকের বখাটে ছেলেটার কাছে নিজেকে উজাড় করে আত্মসমর্পণ করে না দিলে সে ফাঁকে পড়বে। তাই একদিন রীটা সৌম্যকে তার বাড়িতে মা'র কাছে নিয়ে গেল। নিয়ে গিয়ে সব কথা খুলে বললে।

মা বুড়ী মানুষ। স্বামী ছিল বদ্ধ মাতাল। কয়লা-খনিতে কাজ করতো। কিন্তু টাকা-পয়সা যা উপায় করতো তার সিংহ-ভাগটা চলে যেত শুঁড়িখানায়। এক-একদিন রাত্রে বাড়িতেও ফিরতো না লোকটা। তখন স্বামীকে খুঁজতে বেরোত সেই অঞ্চলের সবগুলো শুঁড়িখানায়। শেষকালে যখন তাকে এক জায়গায় পাওয়া যেত তখন সে লোকটা মদের নেশায় অজ্ঞান অচৈতন্য। মা তখন তার জামার পকেট থেকে টাকা-কড়ি যা পেত সব কুড়িয়ে-বাড়িয়ে নিয়ে আসতো। তারপর যখন ওই রীটা বড় হলো তখন তাকে মা পাঠালো হোটেলের চাকরিতে। সে-চাকরিতে স্যালারি কিছু থাক আর না

থাক. কমিশন আছে। যেদিন সে বেশি মদ বিক্রি করে দেবে সেদিন সে বেশি কমিশন পাবে! এই রকম করেই চলছিল।

হঠাৎ কপাল-গুণে মিস্টার মুখার্জি'র সঙ্গে তার পরিচয় হয়ে গেল। তখন থেকেই রীটার কমিশনের অঙ্ক দফায়-দফায় বাড়তে লাগলো। তখন থেকে শুঁড়িখানার মালিকও যত খুশী, রীটাও তত খুশী। আর রীটার মা তো আরো খুশী।

বুড়ী মেমসাহেব সৌম্যকে দেখে খুশী হলো খুব। বললে—আমি ইন্ডিয়ার কথা খুব শুনেছি। ইন্ডিয়া ইজ্ এ গ্রেট্ কান্ট্রি। আই লাভ ইন্ডিয়ানস্—

রীটা কোথা থেকে চা করে এনে খাওয়ালে। চা খেতে খেতে রীটার মার সঙ্গে অনেক গল্প হতে লাগলো। ইন্ডিয়ার গল্প, তার হাজব্যান্ডের গল্প, রীটার গল্প—গল্প করতে করতে মাঝ-রাত হয়ে গেল।

শেষকালে বুড়ী বললে—লুক হিয়ার বয়, রীটা ইজ্ মাই ওন্‌লি আরনিং মেম্বার। রীটাই আমার একমাত্র ভরসা। ও টাকা উপায় করে বলেই আমি এখনও খেতে পাচ্ছি। ও যদি তোমাকে বিয়ে করে ইন্ডিয়ায় চলে যায় তাহলে আমি কী খাবো? কে আমাকে খাওয়াবে? তোমাদের তো অফিস আছে এখানে! তুমি এখানে থাকতে পারো না?

সৌম্য বললে—আমার রীটার জন্যে আমি সব করতে পারি। রীটা ইজ্ সো নাইস গার্ল। বাট্...

—বাট্ কী?

সৌম্য বললে কিন্তু আমি যে স্যাক্সবি-মুখার্জি কোম্পানির একজন ডাইরেক্টার। আর সেখানে আমার ওল্ড গ্র্যান্ড-মাদার রয়েছে। আমি কলকাতায় না গেলে তারা যে আমাকে প্রপার্টি থেকে ডিস্-ওন্ করবে। সেখানে না গেলে আমার ইন্‌কাম কোথা থেকে হবে। তখন আমি নিজেই বা কী খাবো আর রীটাকেই বা কী খাওয়াবো?

বুড়ী বললে—অল্ রাইট, তুমি রীটাকে বিয়ে করবে বলছো, রীটাও তোমাকে বিয়ে করতে চাইছে। আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু বি এ্যান্ অবসাটেকল ইন ইওর ওয়ে। আমি তোমাদের দুজনের মধ্যে বাধা হতে চাই না। কিন্তু আমার মত ওল্ড উইডোর কথাও তো তোমরা ভাববে। রীটা তোমাকে বিয়ে করে ইন্ডিয়ায় চলে গেলে, আমাকে কে খাওয়াবে?

সৌম্য বললে—আমি আপনাকে মাসে মাসে টাকা পাঠাবো।

—কত করে মাসে পাঠাবে? আমার তো এখানে মাসে আড়াইশো পাউন্ড খাওয়া-পরার খরচ লাগবে মিনিমাম্—

সৌম্য বললে—আমি তা পাঠাবো।

—যদি না পাঠাও?

সৌম্য বললে—আমি বন্ডে সই করে দিয়ে যাবো।

বুড়ী বললে তাহলে এখানে সলিসিটার্স ফার্মে গিয়ে সেই কনডিশন্ বন্ডে সই করে দিয়ে যাও। তাতে আমার সলিসিটারও সাক্ষী থাকবে। উইটনেস্ হিসেবে তারও সই থাকবে তাতে। ডু ইউ এগ্রী? তুমি রাজি?

সৌম্য বললে—ইয়েস্ মিসেস্ রিচার্ড, আই এগ্রী—

মিসেস রিচার্ড বললে—আর তাতে লেখা থাকা চাই যে কনডিশন্ ভাঙলে আমি তোমার নামে কম্‌পেনশেসনের মামলা করতে পারবো, খেসারত ক্লেম করতে পারবো। ডু ইউ এগ্রী? তুমি রাজি?

সৌম্য বললে—ইয়েস, আমি রাজি!

তারপর তাই-ই হলো শেষ পর্যন্ত। মিসেস রিচার্ড, মিস্ রিচার্ড আর মিস্টার এস মুখার্জি সলিসিটার্স-এর ফার্মে গিয়ে সেই চুক্তি-পত্রে সই করলে। সাক্ষী হিসেবে

সলিসিটার নিজেও সই করলে সেইখানে। রীতিমত আইনানুগ ব্যাপার। কোনও ফাঁক বা ফাঁকি কোথাও রইল না।

তারপর বাকি রইল ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন। তাতেও সাক্ষীর দরকার। তা পয়সা ফেললে এ-সব ব্যাপারে সাক্ষীর অভাব হয় না। সে অভাব হলো না। বাকি রইল চার্চ। হোক সৌম্য হিন্দু, ক্রিশ্চান হলেই বা তার ক্ষতি কী?

তারপর রাতভোর ডিনার। ডিনার তো নামমাত্র। আসল হলো এ্যাল্‌কোহল। সেদিন সারা রাত এ্যালকোহল্ খরচা হলো কয়েক শো বোতল। তাতে সৌম্যপদ পেছপাও নয়। কোথা দিয়ে পার্টি শেষ হলো তার ঠিক নেই। সে-রাতে ইন্‌ভাইটীরা আর কেউই ঘুমোল না। শুধু এ্যাল্‌কোহল আর নাচ। জোড়ায় জোড়ায় নাচ!

পার্টি যখন শেষ হলো তখন পরের দিন গ্রীনিচ টাইম সকাল দশটা।

হঠাৎ নেশা কাটলো টেলিফোনের বাজনার শব্দে। সৌম্য বিরক্ত হলো খুব। কে আবার এই অসময় তাকে টেলিফোন করলে। তার এত সাধের ঘুমটা ভাঙালে।

—আমি আয়েঙ্গার স্যার।

সৌম্য বললে—এই অসময়ে হঠাৎ কেন?

—স্যার ক্যালকাটা থেকে মিসেস মুখার্জি ফোন করেছেন।

—মিসেস মুখার্জি? ইউ মীন ঠাকমা-মণি?

—ইয়েস স্যার। আমি কল্‌টা আপনার কাছে ট্রান্সফার করে দিচ্ছি। কথা বলুন—

তারপর কলকাতা থেকে সেই ঠাকমা-মণির ভয়েস্।

—কে? খোকা?

সৌম্য একটু সামলে নিলে নিজেকে। বললে—হ্যাঁ ঠাকমা-মণি; আমি তোমার সৌম্য বলছি—

—কেমন আছিস তুই?

সৌম্য বললে—ভালোই—

—গলাটা ভারি-ভারি ঠেকছে কেন? শরীর ভালো আছে তো?

—হ্যাঁ, ভালো আছে।

—খুব সাবধানে থাকবি তুই। ও দেশে বড্ড ঠাণ্ডা। আমার একবার ঠাণ্ডা লেগে খুব জ্বর হয়ে গিয়েছিল। গলায় কম্‌ফোর্টার জড়িয়ে রাখবি সব সময়ে।

সৌম্য বললে—আমি তো সব সময়ে গলায় উলেন স্কার্ফ জড়িয়ে রাখি।

—রোজ গরম জলে চান করবি। আর রাত নটার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়িস তো?

সৌম্য বললে—হ্যাঁ ঠাকমা-মণি, কলকাতায় যেমন রাত নটার মধ্যে বিছানায় শুয়ে পড়তাম, এখানেও ঠিক তাই।

ঠাকমা-মণি আবার বললে—আর একটা কথা। ওদেশের মেয়েরা বড় হ্যাংলা। কালোদের দেশের বড়লোক ছেলেদের দেখলেই বড় ঢলানি করে। তাদের সংগে মিশিস না তো?

সৌম্য বললে—না ঠাকমা-মণি। মেয়েদের মুখের দিকেই আমি চেয়ে দেখি না। কোনও মেয়ে আমার সংগে ভাব করতে এলেই আমি পালিয়ে যাই।

—খুব ভালো, খুব ভালো করিস। তোর জন্যে একটা বিরাট বড়লোকের মেয়ের সংগে বিয়ের সব ব্যবস্থা করে ফেলেছি। তুই এলেই তোর বিয়েটা সেরে ফেলবো। মেয়েটা এম-এ পাশ। দেখতেও খুব ভালো। তোর সংগে খুব মানাবে—

—আর সেই রাসেল স্ট্রীটের বাড়ির মেয়েটা?

ঠাকমা-মণি বললে—তার থেকে এ অনেক ভালো মেয়ে। সে মেয়েটা সত্যনারায়ণ পুজোর দিনে এ-বাড়িতে এসেছিল। বড় নিড়বিড়ে। তার পা লেগে কাচের গেলাসটা

ভেঙে রক্তারক্তি কান্ড বাধিয়ে ফেলেছিল। এখনো সহবৎ শেখেনি ভালো করে। কিন্তু এ বড়লোকের মেয়ে। বাপ-মা-ভাই সব আছে। ভাইটা আবার মস্ত বড় লেবার লীডার।

—আমাদের ফ্যাক্টরিতে নাকি লক-আউট চলছে! আয়েঙ্গার বলছিল!

ঠাকমা-মণি বললে—হ্যাঁ, সেই জন্যেই তো এখানে বিয়ে দিচ্ছি। এখানে বিয়ে দিলে আমাদের ফ্যাক্টরির লক্-আউট উঠিয়ে দেবে মেয়ের ভাই। সে লেবার-লীডার তো। তার হাতে দু লক্ষ লেবার আছে—

তারপর একটু থেমে ঠাকমা-মণি আবার বললে—আর সেই সিংহবাহিনীর ছবিটা! সেটা সব সময়ে পকেটে রাখিস তো?

সৌম্য বললে—হ্যাঁ, সব সময়ে সেটা আমার পকেটে থাকে। ঘুম থেকে উঠেই ছবিটাতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করি—

—হ্যাঁ করবি। দেখবি সিংহবাহিনীর কৃপায় তোর কোনও কষ্ট হবে না—

এখানেই লাইনটা কেটে গেল।

এ-সব অনেক দিন আগেকার কথা। আর আজ ঠাকমা-মণি কিছু জানতেই পারছেন না। এতদিন পরে সেই সৌম্য কলকাতায় ফিরে এসেছে। কিন্তু একে কি ফেরা বলে? সিংহবাহিনীর পুজো দিয়ে, রোজ ভোরবেলা গঙ্গাস্নান করে কি তার এই ফল হলো?

এক এক সময় ঠাকমা-মণির জ্ঞান হয়। তখন চোখ দুটো ঘোলা-ঘোলা দেখায়। দেখে মনে হয় ঠাকমা-মণি কাউকে যেন খুঁজছেন। সব সময় লোক চিনতেও পারেন না। যদি কখনও চিনতে পারেন তো আস্তে আস্তে বলেন—খোকা, খোকা এসেছে?

মল্লিক-মশাই বলেন—খোকাকে ডাকবো?

কিন্তু কোথায় খোকা? খোকা বেশির ভাগ সময়েই বাড়ি থাকে না। সে তার বউকে নিয়ে বাইরে যে কোথায় বেরিয়ে যায় কেউ জানে না। খোকা আসার পর থেকেই তেতলার ঝি সুধাই রীটার কাজকর্ম করে দেয়। ভালো করে বউ-মণির কথা বুঝতে পারে না সে। সুধাও বাংলা ভাষা ছাড়া আর কোনও ভাষা বোঝে না।

সৌম্যর কাছে নতুন বউ বলে—ওই ঝিটা একটা ওয়ার্থলেস্, কোনও কথা বোঝে না আমার। ওকে ছাড়িয়ে দাও ডিয়ার—

কিন্তু এত কালের বাড়ির ঝি, তাকে কি ওমনি তাড়িয়ে দিলেই হলো? আর চাকর-বাকরদের ছাড়াবার মালিক তো সে নয়। ঠাকমা-মণিই এ-বাড়ির মালিক। যত-দিন ঠাকমা-মণি বেঁচে থাকবে ততদিন তার কথার ওপর কথা বলবার ক্ষমতা নেই কারো।

তবু রীটা চাপ দেয়। বলে—না ডিয়ার, ওকে ডিসচার্জ করে দাও—

সৌম্য জিজ্ঞেস করে—কেন, ছাড়াবো কেন? কী করেছে ও?

—আমি যা হুকুম করি তা ও শোনে না। ও আমাকে কেয়ার করে না। এত বড় ডিস্ওবিডিয়েন্ট ওই মাগীটা—

একদিন সুধাকে ডেকে পাঠালে সৌম্য। সুধাকে জিজ্ঞেস করলে—কীরে সুধা, তুই বউ-মণির কথা শুনিস না কেন?

সুধা নিপাট্ ভালোমানুষ লোক। এত কাল এ-বাড়িতে কাজ করছে, কখনও ঠাকমা-মণির কাছে বকুনি খায়নি। সে বললে—কই, আমি তো কিছু দোষ করিনি দাদাবাবু! বউ-মণি যা বলেছে আমি তো তাই-ই করেছি।

রীটা রেগে উঠলো—ও একটা লায়ার। আউট্-রাইট লায়ার—তুমি ওর কথা শুনো না। ডোণ্ট বিলিভ্ হার—

সৌম্য তবু জিজ্ঞেস করলে—কী দোষ করেছে ও তাই বলো না!

রীটা বললে—আমি ওকে বলেছি আমার ওয়ার্ডরোব রোজ সাফ্ করতে, কিন্তু একদিনও ও তা করে না -আমি কি এ-বাড়ির কেউ নই? আমার হুকুমের কি কোনও দাম নেই? আমার হুকুম কেন শুনবে না ও?

সৌম্য সুধাকে জিজ্ঞেস করলে—কীরে, তুই বউ-মণির কাপড়-জামার আলমারি রোজ পরিষ্কার করিস না?

সুধা বললে—না দাদাবাবু, আমি পরিষ্কার করি, আমি মা-কালীর দিব্যি দিয়ে বলতে পারি রোজ রোজ আমি বউ-মণির আলমারি পরিষ্কার করি -

সৌম্য গলা চড়িয়ে জিজ্ঞেস করলে—তাহলে কি তুই বলতে চাস বউ-মণি মিথ্যে কথা বলছে?

রীটা চেঁচিয়ে উঠলো—ওর কথা বিশ্বাস করো না সৌম্য, ও একটা লায়ার, ড্যাম্ লায়ার। ওকে তুমি ডিসচার্জ করে দাও, এখ্খুনি ডিসচার্জ করে দাও ওকে—

সৌম্য বুঝতে পারলে যে ব্যাপারটার মধ্যে কোথাও একটা ভুল বোঝাবুঝি আছে। সুধাকে বললে—যা, তুই এখান থেকে এখন যা, আর কখনও এমন করিসনি।

কিন্তু রীটা তবু শান্ত হলো না। বললে—তুমি ওকে কিছু বললে না? ওকে ফাইন্ করলে না কেন? ওই রকম করলেই কালপ্রিট্রা মাথায় চেপে বসে। তুমি ওকে ফাইন্ করলে না কেন?

সৌম্য বললে—দেখ, এখন তো আমার গ্র্যান্ড-মাদার বেঁচে রয়েছে। ওরা সবাই আমার গ্র্যান্ড-মাদারের স্টাফ্। গ্র্যান্ড-মাদার যতদিন না মারা যায় ততদিন ওদের কাউকে আমি ডিসচার্জও করতে পারি না, ফাইনও করতে পারি না--

রীটা অবাক হয়ে গেল। বললে—সে কী, তুমি তো লন্ডনে আমাকে অন্য কথা বলেছিলে! তুমি তো বলেছিলে 'স্যাক্সবি-মুখার্জি' কোম্পানির ডাইরেক্টর। তুমি যদি কোম্পানির ডাইরেক্টর হও তো তোমার তো সবাইকে ডিসচার্জ করবার ক্ষমতা আছে!

সৌম্য বললে—তা তো আছে। কিন্তু যতদিন আমার গ্র্যান্ড-মাদার বেঁচে আছে ততদিন তো আমি গ্র্যান্ড-মাদারকে না বলে কিছু করতে পারি না।

রীটা বললে—কিন্তু তুমি তো তোমার গ্র্যানির কথা কিছু বলোনি আমাকে লন্ডনে। তুমি বলেছিলে তোমরা খুব বড়লোক, তোমাদের অনেক টাকা আছে! সেই কথা শুনেই তো আমি তোমাকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছিলুম। নইলে তোমাকে ম্যারি করতে আমার বয়ে গিয়েছিল—

সৌম্য বললে—কিন্তু তুমি তো এখানে এসে দেখছ আমরা কত রিচ্ ফ্যামিলি। আমাদের বাড়িতে কত স্টাফ্, আমাদের কত বড় বাড়ি। আমাদের কত গাড়ি। দরোয়ান রয়েছে বাইরের গেটে। আমি তো তোমাকে কোনও ব্লাফ্ দিইনি। লন্ডনে আমাদের অফিস রয়েছে। আমি তো তোমার মাকেও সব কথা খুলে বলেছি। তোমার কাছেও কোনও কথা লুকোইনি।

- তাহলে যখনই আমি গাড়ি চাই তখন গাড়ি পাই না কেন?

সৌম্য বললে—আমার গ্র্যান্ড-মাদারের যে এখন হার্ট-স্ট্রোক হয়েছে, সে জন্যে সব গাড়ি এখন ডাক্তারদের বাড়ি যাতায়াত করছে।

রীটা বললে—তাহলে আমি কী করবো? আমার সমস্ত দিন-রাত বাড়িতে বন্দী হয়ে থাকতে ভালো লাগে? দিনের বেলা যা-হয় হোক, কিন্তু রাত্তিরে? আমি তো জীবনে কখনও রাত্তিরে বাড়িতে কাটাইনি। তোমার এ কী রকম বাড়ি? কলকাতায় কি সবাই রাত্তিরে বাড়িতে ঘুমিয়ে কাটায়?

সৌম্য বললে—তা কেন? শুধু আমাদের বাড়িরই এই নিয়ম। আমার গ্র্যান্ড-মাদারের বরাবরেই এই নিয়ম। আমাদের দরোয়ান ঠিক রাত নটার সময়ে গেট বন্ধ করে দেবে। তারপর আর কেউ বাড়িতে ঢুকতেও পারবে না, বাড়ি থেকে বেরোতেও পারবে না।

—মাই গড্! বরাবর তুমি রাত নটার পর বাড়িতে ঘুমিয়ে কাটিয়েছ?

সৌম্য বললে—না না, আমি গিরিধারীকে ব্রাইব দিয়ে বরাবর নাইট-ক্লাবে গিয়ে রাত কাটিয়ে এসেছি। লন্ডনে যা করেছি এখানেও তাই করেছি বরাবর। কেউ জানতে পারেনি কখনও। লন্ডনে আয়েংগারও জানতে পারেনি—

রীটা বললে—তাহলে এখনও চলো না—

—এখন? এখন তো রাত দশটা—

রীটা বললো—রাত দশটা তো কী হয়েছে, নাইট ইজ্ স্টীল ইয়াং—

মুখার্জি বাড়ির অন্য দিকে তখন ঠাকমা-মণিকে অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছে, আর এদিকে সৌম্য আর রীটা তখন সেজে গুজে নৈশ-বিহার করতে বেরোল।

গিরিধারী কিছু বললে না। খোকাবাবু আর মেমসাহেবকে দেখে সেলাম করে গেট খুলে দিলে। আর তারপর গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লো মুখার্জি ফ্যামিলির কনিষ্ঠ বংশধর সৌম্য মুখার্জি আর তার মেমসাহেব বউ। তারপর গাড়ির চাকা গড়াতে গড়াতে গিয়ে পৌঁছুলো এক নাইট-ক্লাবে। সেখানে তখন দিন। শুধু দিন নয়, দিন-দুপুর। সেখানে তখন তীক্ষ্ম আলোর নীচে টাকা-নারী আর মদের বেচা-কেনা চলছে। লেন-দেন হচ্ছে রক্তের আর মাংসের, বৈভবের আর বিলাসের, প্রাচুর্যের আর ফূর্তির, লোভের আর লাস্যের। অনেক কাল পরে রীটার জীবন যেন আবার ফিরে গেল সেই লন্ডনে। তার জন্মভূমিতে। আর তার মন যেন খুশীর উল্লাসে জুড়িয়ে গেল!
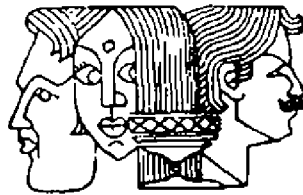
বেলুড়ের 'সান্ক্লাবি মুখার্জি' কোম্পানির অত বড় ফ্যাক্টরিটা তখন নিঃশব্দে হাহাকার করছে একমনে। অকর্মণ্যতা আর আলস্যের ভারে সমস্ত ফ্যাক্টরিটা তখন উলঙ্গ। তবু বসে বসে মাইনে পেয়ে যাচ্ছে চিফ্ অ্যাকাউন্টেন্ট নাগরাজন, ওয়ার্কস ম্যানেজার কান্তি চ্যাটার্জি, ওয়েলফেয়ার অফিসার যশোবন্ত ভার্গব, ডেপুটি ওয়ার্কস ম্যানেজার অর্জুন সরকার। তাদের বসিয়ে বসিয়ে মাইনে দিয়ে যাচ্ছেন মুক্তিপদ। আর মাইনে পাচ্ছে তাঁর ড্রাইভার বিশ্বনাথ।

কিন্তু বিশ্বনাথকে তার কর্তব্য কাজ করে যেতে হচ্ছে!

মাঝে মাঝে অর্জুন সরকার লুকিয়ে লুকিয়ে এসে মুক্তিপদর সঙ্গে দেখা করে যায়। কোনও জরুরী খবর থাকলে দিয়ে যেতে হয়।

মুক্তিপদ জিজ্ঞেস করেন—কী খবর? কিছু নতুন খবর আছে?

অর্জুন সরকার বলে—আছে। একজন ওয়ার্কার খেতে না পেয়ে আত্মহত্যা করেছে!

—কে?

—একজন ক্লাশ-ফোর স্টাফ্‌।

—বাড়িতে কে কে ছিল তার?

—ছেলে-মেয়ে বউ সবাই-ই ছিল তার।

—তারা কী করছে এখন?

—কী আর করছে, সবাই উপোষ করছে, ভিক্ষে করছে। অনেকে আবার বাজারের কাছে রাস্তার পাশে বসে তেলেভাজা বিক্রি করতে আরম্ভ করেছে। যা দু'টো পয়সা পকেটে আসে!

মুক্তিপদ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। কী আর বলবার আছে তাঁর। অর্জুন সরকার বললে—বড়প্যাথেটিক্‌ কন্‌ডিসন্‌ স্যার সকলের। দেখলে বড় কষ্ট হয়। আর শুনলে অবাক হবেন স্যার, কিছু কমবয়েসী মেয়েরা আবার লুকিয়ে লুকিয়ে...

—লুকিয়ে লুকিয়ে, কী...?

—লুকিয়ে লুকিয়ে খদ্দের ধরতে কলকাতার ফুটপাথে-ফুটপাথে ঘুরে বেড়াচ্ছে—

মুক্তিপদ জিজ্ঞেস করলেন—তাদের মনের মতি-গতি কিছু টের পেলে?

—একদিন একটা মেয়েকে স্যার ধরেছিলুম। আমাকে সে চিনতে পারেনি। একটা হোটেলে নিয়ে গিয়ে খুব পেট ভরে খাইয়েছিলুম। অনেকদিন পরে পেট ভরে খেতে পেয়ে মেয়েটা যেন বর্তে গেল স্যার। আমি তার নাম জিজ্ঞেস করলুম। পরিচয় জিজ্ঞেস করলুম। সে তখন কেঁদে ফেললে। সে কাঁদতে কাঁদতে বললে, তার বাবা কাজ করতো বেলুড়ের একটা ফ্যাক্টরিতে, সে-ফ্যাক্টরিতে ধর্মঘট চলছে বলে এ লাইনে এসেছে। তার বাবা খেতে না পেয়ে অসুখে মারা গেছে।

কথা বলতে বলতে অর্জুন সরকার কেমন যেন বিবশ হয়ে গেল।

মুক্তিপদ জিজ্ঞেস করলেন—তারপর?

অর্জুন সরকার বললে—তারপর আমি দশ টাকার একটা নোট তার হাতে তুলে দিলুম। টাকাটা পেয়ে মেয়েটা অবাক হয়ে গেল। বললে—আপনি আমায় হঠাৎ টাকা দিলেন কেন?

আমি বললাম—তোমার দুরবস্থার কথা শুনে।

মেয়েটা হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে—আপনি তো আমায় হোটেলের ঘরে নিয়ে গিয়ে শুতে বললেন না।

আমি তো অবাক। বললাম—শুতে বলবো কেন?

মেয়েটা লজ্জায় মাথা নিচু করে রইল। তারপর বললে—সবাই তো তাই বলে—

আমি বললাম—সবাই বলুক, চলো, আমার গাড়ি আছে, আমি তোমাকে তোমার বাড়িতে পৌঁছিয়ে দিয়ে আসি। আর কখনও এ-লাইনে এসো না।

মেয়েটা বোধ হয় এর আগে এরকম ব্যবহার কারো কাছ থেকে পায়নি।

মুক্তিপদ জিজ্ঞেস করলেন—তারপর? তারপর তুমি তাকে বেলুড়ে পৌঁছে দিলে নাকি?

অর্জুন সরকার বললে—না, আমার মনে হয় মেয়েটা আগে বোধহয় এ-রকম পায়নি, তাই খুব অবাক হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আমার নিজেরই খুব ভয় ছিল।

গাড়ি করে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিতে গিয়ে যদি আমাকে কেউ চিনতে পারে?

মুক্তিপদ কথাগুলো শুনে চুপ করে রইলেন। এ-রকম আরো ঘটনা ঘটছে তার সব খবর তো জানা যাচ্ছে না। কী আর করবে সে। এত দিনের তিন পুরুষের চালু ফ্যাক্টরি এমন ভাবে সবাই বন্ধ করে দিলে। এতে কার ভালো হলো? মালিকের না ওয়ার্কারদের? না পার্টির, না ইউনিয়নের লীডারদের?

মুক্তিপদ আবার জিজ্ঞেস করলেন—শ্রীপতি মিশ্রের কী খবর? কিছু জানতে পেরেছ?

অর্জুন সরকার বললে—ওদের পার্টির আরো অনেক টাকার দরকার হয়ে পড়েছে—

--কেন?

অর্জুন সরকার বললে—ওদের পার্টির কলকাতায় যে অফিস-বাড়িটা আছে তাতে আর জায়গা কুলোচ্ছে না। ওটা চারতলা করতে গেলে আরো কয়েক লাখ টাকা দরকার। সেটার জন্যে টাকা চাই—

মুক্তিপদ বললেন—সে-টাকা তো আমরা সব কলকাতার ইন্ডাসট্রিয়ালিস্টরা বরাবর দিচ্ছিই—

তাতেও ওদের কুলোচ্ছে না। গ্রামের পঞ্চায়েত-প্রধানরাও আরো টাকা চাইছে। তারাও সেই টাকা থেকে নিজেদের জন্যে বাড়ি করবে। মন্ত্রীরাও যখন বড় বড় বাড়ি বানাচ্ছে তখন পঞ্চায়েত-প্রধানরাই বা তাদের বাড়ি বানাবে না কেন? তাদের বাড়ি না বানাতে দিলে দলের ক্যাডার বাড়বে কী করে? ক্যাডাররা বলছে তারা আরো টাকা না পেলে অন্য পার্টিতে নাম লেখাবে—

মুক্তিপদ বললেন—এখান থেকে যদি সব ইন্ডাস্ট্রি সাউথ-ইন্ডিয়াতে উঠে যায় তখন কার টাকায় পার্টি চলবে?

অর্জুন সরকার বললে—সে চলে যেতে যেতেও এখনও দশ পনেরো বছর কেটে যাবে, তদ্দিনে লেবার-লীডাররা বাড়ি-গাড়ি ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্স্ সব কিছু কামিয়ে নেবে। ওদের লীডার বরদা ঘোষালেরই তো এখন পনেরো লিটার পেট্রল খরচ হয় রোজ। সে বরদা ঘোষালের ড্রাইভারের কাছ থেকেই জেনে গিয়েছে। এখন ওদের একটাই পথ —'বাংলা বন্ধ'। ও-ছাড়া ওদের সামনে টাকা উপায়ের আর কোনও রাস্তা নেই—

--তাহলে 'বাংলা বন্ধ' হবেই?

অর্জুন সরকার বললে—হবেই। না হলে আর পার্টি চলছে না। টাকা উপায়ের এখন ওই একটা রাস্তাই ওদের সামনে খোলা আছে।

—কোন্ অজুহাতে 'বাংলা-বন্ধ' হবে?

—কেন? অজুহাত তো খোলা আছে। সেন্ট্রাল টাকা দিচ্ছে না, এই অজুহাতে। দিল্লীর বিরুদ্ধে স্লোগান দেবে যে সেখানকার গভর্মেণ্ট বাঙালীদের দেখতে পারে না —তার চেয়ে যুৎসই স্লোগান তো আর হতে পারে না—

—কবে 'বাংলা বন্ধ' হবে তা কিছু শুনলে?

--সে এখনও পার্টি-প্লেনামে ঠিক হয়নি। তারপর শুনছি বাংলা-বন্ধের আগে একদিন নাকি 'পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে একটা বিরাট 'পদযাত্রা' হবে ঠিক হয়েছে। সল্ট-লেক থেকে শেয়ালদা হয়ে একেবারে হাওড়া। সব বাস-ট্রাম-লরি-ঠেলাগাড়ি-রিক্‌শা সেদিন থেমে যাবে। হাওড়া আর শেয়ালদা স্টেশনে যত ট্রেনের প্যাসেঞ্জার যাতে অফিস-কাছারিতে না যেতে পারে তার ব্যবস্থা করে পদযাত্রার রুট ঠিক হবে—

কথা বলতে বলতে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল। মুক্তিপদ বললেন—ঠিক আছে, এখন আমি একবার বিডন স্ট্রীটের বাড়িতে যাবো।

—আপনার মা এখন কেমন আছেন স্যার?

—ওই একই রকম। ই-সি-জি করা হয়েছে। এখন ডাক্তাররাও হয়েছে উকিল-এ্যাটর্নিদের মতো, কেবল টাকার খাঁই—

বলে মুক্তিপদ উঠলেন। অর্জুন সরকারও বিদায় নিয়ে চলে গেল।

রীটা রিচার্ডস এককালে লনডনের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছে। ঘুরে বেড়িয়েছে শাঁসালো কালো চামড়া খদ্দেরদের আশায়। তার মতো মেয়েরা সবাই জানতো সাদা চামড়ার লোকদের চেয়ে কালো চামড়ার লোকরাই বেশি টাকা ওড়ায়। সাদারা বড় হুঁশিয়ার। ইণ্ডিয়া যখন পার্টিশন হলো আর মিড্‌ল-ইস্ট দেশগুলো যখন তাদের দেশ থেকে ইংরেজদের তাড়িয়ে দিলে তখন সেই কালো লোকরাই আবার একদিন ব্রিটেনে এসে ভিড় করতে লাগলো বিলিতি ডিগ্রী, বিলিতি পাউণ্ড, বিলিতি চাকরি আর বিলিতি মেয়েদের লোভে।

তখন বিলেতে গিয়ে অনেকে হোটেল খুললে। ভাতের হোটেল, ফিশ্‌ কারি, তন্দুরি চিকেন, হিল্‌শা-ফিশ্‌ ফ্রাই—সব পাওয়া যেতে লাগলো লনডনে। যা-যা খানা ইণ্ডিয়া, আফ্রিকা, সিলোন, বার্মায় পাওয়া যায় সব খানাই পাওয়া যেতে লাগলো খাস ইংরেজদের রাজধানীতে। আর সংগে পাওয়া যেতে লাগলো স্কচ, হুইস্কি, জামাইকা রাম্‌, জিন্‌, ব্রাণ্ডি সব কিছু। ইণ্ডিয়া বাংলাদেশ সৌদি-আরব কোয়েত ডুবাই থেকে পর্যন্ত ছেলেরা গিয়ে ফুর্তি করতে ছুটলো লনডনে। তখন ভারি সুবিধে হয়ে গেল সৌম্য মুখার্জির মতো আইবুড়ো ছেলেদের। তারা সেই সব রেস্টুরেন্টে, সেই সব বার-এ, সেই সব হোটেলে গিয়ে ভিড় করতে লাগলো রীটাদের মতো মেয়েদের আর ওই সব খাবার-দাবারের লোভে।

সে এক নতুন বাজার তৈরি হলো লন্ডনে। আগে যারা বিয়ের আশায় রাস্তায়-রাস্তায় নতুন নতুন বন্ধু খুঁজে বেড়াতো, তারা সে-পথ ছেড়ে দিয়ে কালো চামড়ার ছেলেদের পেছনে ঘুরতে লাগলো টাকার ধান্দায়। এরা কেউ বাপের টাকায় বিলেতে পড়তে এসেছে, কেউ এসেছে কারবার করতে, কেউ এসেছে ডাক্তারি প্র্যাক্‌টিশ করতে। এসে হাতের মুঠোয় পেয়ে গেল এই সব রীটাদের। এই সব বেওয়ারিশ অভাবী মেয়েদের।

ইংলণ্ড তখন এম্‌পায়ার হারিয়ে আমেরিকার চাকর হয়ে গেছে। সেখানকার ছেলেরা চাকরি পায় না। কালোদের ঠ্যালায় ব্যবসাতেও হালে পানি পায় না। তাই মেয়েরাও তাদের পছন্দমতো সাদা-চামড়ার বর পায় না। তখন আর কী উপায়। কালো, তা কালোই সই। তাদের গায়ের রং কালো বলে তো আর তাদের পাউণ্ড-শিলিং-পেন্সগুলোও কালো নয়। তাদের সকলেরই বাজার-দর এক।

তার ওপর যদি কেউ বিয়ে করে ইণ্ডিয়া বা বার্মা বা বাংলাদেশ বা ডুবাইতে বা সৌদি-আরবে নিয়ে যেতে চায় তো যাবো। বউ হয়ে যাবো। টাকা থাকলে ক্লাইমেটও সহ্য হয়ে যাবে।

তাই যখন রীটা রিচার্ড মুখার্জি হয়ে ইণ্ডিয়ায় এলো তখন খুব আশা নিয়ে এসেছিল। কিন্তু এসে দেখলে এ এক অদ্ভুত শ্বশুর-বাড়ি। এখানে শ্বশুর বেঁচে না থাকলেও বরের গ্র্যাণ্ড-মাদার বেঁচে আছে। বিছানায় শুয়ে আছে স্ট্রোক হয়ে।

নাতির মেম বিয়ে করার জন্যেই নাকি এমন শক্ পেয়েছে যে হার্টে স্ট্রোক হয়ে মরো-মরো! তারপরে আরো শুনলো যে এ-বাড়িতে মেয়ে-বউরা নাকি বাড়ির বাইরে বেরোতে পারবে না যখন-তখন। আর শুধু মেয়ে-বউই নয়, ছেলেদেরও রাত ন'টার মধ্যে বাড়িতে ফিরতেই হবে। রাত ন'টা বাজলেই বাড়ির সদর গেট বন্ধ করে চাবি লাগিয়ে দেবে দরোয়ান।

তা তাই-ই যদি হয় তো ইন্ডিয়ায় বউ হয়ে এসে তার লাভ কী হলো?

এবাড়ির এই সব হাল-চাল দেখে রীটা প্রথমেই বেঁকে বসলো। সৌম্যকে বললে—ড্যাম্ ইট্, আমি এ-সব নিয়ম মানবো না—

সৌম্য বললে—এ-সব না মানলে আমার গ্র্যান্-মা রেগে যাবে!

—তাহলে আমার ঘরে ড্রিঙ্কস্ এনে দাও—

—ড্রিঙ্কস্?

সৌম্য একটু বিপদে পড়লো। বললে—ড্রিঙ্কস্ তো আমাদের বাড়ির ভেতরে চলবে না। গ্র্যান্-মা জানতে পারলে রেগে যাবে। বাড়ি থেকে আমাকে তাড়িয়ে দেবে। আমাকেও তাড়িয়ে দেবে, তোমাকেও তাড়িয়ে দেবে—

—কেন? ড্রিঙ্ক্ করা কি খারাপ? আমার মা তো রোজ ড্রিঙ্ক্ করে—

—তোমার মা'র কথা আলাদা। এটা তো তোমাদের লন্ডন নয়, এ ইন্ডিয়া। এখানে আমাদের বাড়ি খুব কন্‌জারভেটিভ্, এ-বাড়িতে দেখতে পাও না রোজ সন্ধ্যে-বেলা আমাদের সিংহবাহিনীর মন্দিরে পুজো হয়, কাঁসর-ঘণ্টা বাজে। ঠিক তোমাদের দেশে যেমন চার্চ আছে, সেখানে প্রেয়ার হয়, কয়ার বাজে, এখানেও তাই।

রীটা ক্ষেপে গেল। বললে—এ-সব কথা তুমি তখন আমায় বলোনি কেন?

সৌম্য বললে—তুমি তো আমাকে এ-সব কথা জিজ্ঞেস করোনি তখন?

—এ কথার আবার জিজ্ঞেস করবার কী আছে? আমার ড্রিঙ্ক না করে করে পেট ফুলে যাচ্ছে, আই এ্যাম ফীলিং আন্ইজি। তুমি যেখান থেকে পারো আমাকে হুইস্কি এনে দাও। এখুনি। হিয়ার এ্যান্ড নাউ?

সৌম্য বিপদে পড়ে গেল। বললে—এখন? এই সকাল ন'টার সময়?

—হ্যাঁ, এক্ষুণি। আজ পাঁচ দিন তুমি আমাকে ড্রিঙ্কস্ দাওনি। আমি তোমার আর কোনও কথা শুনবো না। আর তা নয় তো আমাকে নিয়ে কোনও বার্-এ চলো। হুইস্কি না খেতে পেলে আমি পাগল হয়ে যাবো!

সৌম্য বললে—এখ্খুনি আমি কোথায় হুইস্কি পাবো?

—কেন? ক্যালকাটায় হুইস্কির বার নেই?

—আছে, এত সকালে এই সকাল নটার সময়ে তো কোনও বার খোলে না। আর তা ছাড়া আজ যে বেস্পতিবার। আজ থার্স-ডে। আজ তো কলকাতায় ড্রাই-ডে!

—ড্রাই-ডে? তার মানে?

সৌম্য বুঝিয়ে দিলে—সপ্তাহে একদিন এখানে সব মদের দোকান বন্ধ থাকে। ড্রাই-ডেতে মদ বেচা আন্‌লফুল। বেআইনী।

—স্ট্রেঞ্জ! ভেরি স্ট্রেঞ্জ! তাহলে এখানকার ভদ্রলোকেরা থার্স-ডেতে কী খায়?

—খায় না!

—হুইস্কি না খেয়ে মানুষ কী করে থাকে?

সৌম্য বললে—একদিন না খেলে কী ক্ষতি হয়?

রীটা বললে—তাহলে কালকে আগে আমাকে বলোনি কেন? তাহলে আমার যে আজ শরীর খারাপ হয়ে যাবে।

—তোমার এত নেশা?

রীটা বললে—আর তোমার বুঝি নেশা নেই?

সৌম্য বললে—আমারও নেশা আছে। কিন্তু তোমার মতো অত নেশা নেই—

রীটা বললে—এ-রকম জানলে কালকে আজকের জন্যে একটা বোতল কিনে রাখলেই হতো। কথাটা আগে আমাকে বলবে তো! আজকে যদি আমার ঘুম না আসে?

—তা একটা দিন তুমি না-ই বা ঘুমোলে!

রীটা বললে—না না, চলো, যেখান থেকে পারি একটা বোতল কিনে আনি!

সৌম্য বললে সেসব চোলাই মদ। সে না-খাওয়াই ভালো—

—চোলাই মানে?

—চোলাই মানে আন্‌লাইসেন্সড্ মদ। সেগুলো বিষ?

রীটা তখন ক্ষেপে উঠেছে। বললে—চলো ডিয়ার, চলো। হোক আন্‌লাইসেন্সড, আমি তাই-ই খাবো।

শেষ পর্যন্ত সৌম্যকে যেতেই হলো। তখন নতুন এসেছে রীটা। এক সপ্তাহও হয়নি সে ইণ্ডিয়াতে এসেছে। এখানকার হাল্-চাল্ এখনও সে ভালো করে রপ্ত করেনি। ছোটবেলা থেকেই সে প্রত্যেকদিন মদ খেয়ে এসেছে। তার বাবাকেও সে রোজ মদ খেতে দেখেছে। মাকেও মদ খেয়ে আসতে দেখেছে। কিন্তু এ কী-রকম দেশ! যদি এদেশে এসে মদই খেতে পাবো না তাহলে এদেশের লোককে বিয়ে করে আমার লাভ কি হলো?

সৌম্য ঠিক জানতো না ড্রাই-ডে'তে কোথায় মদ পাওয়া যায়। তখন সন্ধ্যে হবো-হবো। সারাদিন সৌম্য রীটাকে কোনও রকমে ঠেকিয়ে রেখেছিল। গাউন্ ছাড়িয়ে শাড়ি পরতে হয়েছিল রীটাকে। রীটা প্রথম প্রথম শাড়ি পরতে চায়নি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শাড়ি পরতে তাকে বাধ্য করেছিল সৌম্য।

রীটা প্রথম প্রথম বলতো—এ কী ক্লামজী ড্রেস। এ আমি পরতে পারবো না—

অনেকদিন প্র্যাক্‌টিশ্ করবার পর তবে তার শাড়ি পরা রপ্ত হয়েছিল। কিন্তু নিজের ঘরের মধ্যে গাউন পরতেই হতো। তাই নিয়ে ঝি-মহলে কত হাসাহাসি হয়েছে। সুধা বলতো—সারাদিন সেমিজ পরে থাকে, এ কী রকম মেয়েছেলে মা। বাপের জন্মে এমন মেয়েছেলে দেখিনি—কালে কালে কত দেখবো।

বিন্দু বলতো—চুপ কর লা, চুপ কর। ঠাকমা-মণির কানে গেলে অনর্থ বাধাবে!

কিন্তু ঠাকমা-মণির অবস্থা তখন বলা-কওয়া-শোনার বাইরে। সারাদিন বিছানায় শুয়ে পড়ে থাকেন। কিন্তু ড্যাব্-ড্যাব্ করে সব চেয়ে দেখেন। সব বোঝেন। শুধু কথা বলতেই তাঁর কষ্ট হয়। এবেলা-ওবেলা বড় ডাক্তার আসে আর মুঠো মুঠো টাকা নিয়ে যায়। এত বড় শাঁসালো পার্টি পেলে কোন্ ডাক্তার এমন সুযোগ ছাড়ে।

এমন সব ওষুধ দিয়ে যায় যা সহজে কলকাতা শহরে কিনতে পাওয়া যায় না। বোম্বাই থেকে আনাতে হয়। অনেক সময় ডাক্তার এমন জরুরী ওষুধ দিয়ে যায় যা তখনি দরকার। লোক যায় বোম্বাই কিংবা দিল্লিতে প্লেনে টিকিট কেটে। আগে টাকা দেবে গৌরী সেন। মুক্তিপদর কাছে টাকার দাবী করলেই টাকা পাঠিয়ে দেয় মুক্তিপদর লোক। কিংবা মল্লিক-মশাই নিজে গিয়ে টাকা নিয়ে আসেন।

তারপর আছে দুজন মেম-সাহেব নার্স। তারা দিনে দুজনে মিলে পালা করে ডিউটি দেয়। তারা মাথাপিছু প্রত্যেকদিন নেয় পাঁচশো টাকা। কী নার্সিং করে তা কেউ জানে না। এককালে যে শাশুড়ী অত দজ্জাল ছিল তারই গলায় তখন আর কোনও শব্দ বেরোয় না।

কালিদাসী বলে একেই বলে ভগবানের মার। যখন বুড়ীর গতর ছিল তখন যেমন সকলকে জ্বালিয়েছে এখন তেমনি জব্দ!

ফুল্লরা বলে—তাই তো বলি মেয়েমানুষের অত তেজ ভালো নয় গো, ভগবানের খেরো খাতায় সব লেখা থাকে। কড়ায় গণ্ডায় তিনি সব উসুল করে নেন গো—

একদিন যারা ঠাকমা-মণির তেজ দেখেছে তারা ঠাকমা-মণির হাল দেখে সবাই খুশী হয়। একবাক্যে সবাই বলে—বুড়ি মরলে হাড় জুড়োয়—

ডাক্তার এসে যখন বলে—আর বেশি দিন ভুগতে হবে না, ইনি শিগগিরই ভালো হয়ে যাবেন, তখন সকলেরই আবার মুখ ভার হয়ে ওঠে—

সন্দীপের সে-সব দিনের কথা এখনও মনে আছে। বড় দুঃসময় চলেছে তখন বিডন্ স্ট্রীটের মুখার্জি-বাড়ির। ভেতরে-বাইরে অশান্তি। টাকার আমদানি একেবারে কমে গেছে। অথচ খরচের অন্ত নেই। কতকগুলো অফিসারদের নিয়ম করে মাইনে দিয়ে যেতে হচ্ছে। ডাক্তাররা এসে মুঠো-মুঠো টাকা নিয়ে যাচ্ছে।

মুক্তিপদ আসেন রোজই। ঠাকমা-মণির বিছানার কাছে বসেন। মুখটা ভার-ভার। সৌম্যর ঘরে যান তার সঙ্গে দেখা করতে। শোনেন সে তখনও দরজায় খিল দিয়ে ঘুমোচ্ছে। অবাক হয়ে যান শুনে। এত দেরি পর্যন্ত ঘুমোয়? আশ্চর্য হয়ে যান।

তারপর যেদিন সন্ধ্যেবেলা এসে সৌম্যর খোঁজ করেন শোনেন দুজনেই বাড়ি নেই। কোথায় বেরিয়েছে। সুধাকে জিজ্ঞেস করেন—কখন বেরিয়েছে?

সুধা বলে—এই একটু আগে—

কখন ফিরবে?

সুধা তা জানে না। জানা সম্ভব নয়। বলে—তা তো বলতে পারবো না—

রাত্তিরে বাড়িতে ফিরে খাবে না?

এবারও সুধা বলে—তা জানি না—

মুক্তিপদ সুধার ওপর রেগে যান। বলেন—তা জানিস না তো তুই আছিস কী করতে?

এরপর আর কিছু বলেন না মুক্তিপদ। সুধা মুক্তিপদর সামনে থেকে সরে গিয়ে মুক্তি পায়। অথচ সে সব জানে। কখন দাদাবাবু আর বউদিমণি বাড়ি ফেরে, বাড়িতে এসে কখনও খায় না, বাইরে থেকেই দুজনে খেয়ে আসে, বাড়ির রান্না খাবারগুলো যে নষ্ট হয়, তা সে ভালো করেই জানে। আরো জানে যে বউদিমণি আর দাদাবাবু যখন বাড়ি ফেরেন তখন তাঁদের পা টলে। তখন তাদের মাথা ঠিক থাকে না, তখন বউদিমণিকে ধরে বিছানায় শুইয়ে দিতে হয়। সবই তার জানা। কিন্তু সে-সব কথা মুখে ফুটে বলা অপরাধ, তাতে তার চাকরি চলে যেতে পারে। তাই চুপ করে থাকাই সে ভালো মনে করে। সে মুক্তিপদর সামনে থেকে পালিয়ে গিয়েই বাঁচবার চেষ্টা করে।

আর তারপর মুক্তিপদ মল্লিক-মশাইকে ডাকেন। বুড়ো মানুষ মল্লিক-মশাই তিন-তলার সিঁড়ি ঠেঙিয়ে ওপরে মুক্তিপদর সামনে এসে হাঁফান।

মুক্তিপদ বলেন হিসেবের খাতাটা এনেছেন?

মল্লিক-মশাই হিসেবের খাতাটা বাড়িয়ে দেন মুক্তিপদর দিকে। হিসেবের খাতায় তখন জমা-খরচের সব অঙ্কগুলো মন দিয়ে দেখেন মুক্তিপদ। দেখতে দেখতে হঠাৎ এক জায়গায় এসে চোখ দুটো আটকে যায় তাঁর।

বলেন—ছোটবাবুকে ছ' তারিখে তিন হাজার টাকা দিয়েছেন, তারপর আবার দশ তারিখে বারো হাজার টাকা দিয়েছেন আপনি। এত টাকা এ-মাসে ছোটবাবুকে দিলেন কেন?

মল্লিক-মশাই ভয়ে থর-থর করে কাঁপেন।

বলেন—ছোটবাবু চাইলে আমি না-দিয়ে কি পারি?

মুক্তিপদ বললেন—এবার থেকে টাকা চাইলে বলবেন মাসে পাঁচ হাজার টাকার

বেশি নিতে হলে আমার পারমিশন নিতে হবে। আমি বললে তবে টাকা দেবেন।

মল্লিক-মশাই কী আর বলবেন। বললেন —ঠিক আছে—

—হ্যাঁ, আমাদের ফ্যাক্টরি এখন বন্ধ আছে, কোনও ইনকাম নেই, এখন খরচ যতটা পারবেন কমাতে চেষ্টা করবেন। দেখছেন আপনাদের ঠাকমা-মণির অসুখের জন্যে জলের মতো টাকা খরচ হয়ে যাচ্ছে, এ-সময়ে এত খরচ কোথা থেকে আসবে?

মল্লিক-মশাই আবার বললেন—ঠিক আছে—

—আর এটা কী? এই যে রাসেল স্ট্রীটের বাড়িতে মাসে মাসে তিন হাজার টাকা খরচ দেখাচ্ছেন, এটাতে কী লাভ?

মল্লিক-মশাই বললেন—আজ্ঞে, ঠাকমা-মণি যেমন হুকুম দিয়েছিলেন তেমনিই চলে আসছে—

মুক্তিপদ বললেন—তাদের জন্যে অরবিন্দ ড্রাইভার রোজ সে-বাড়িতে যায়, তারও তো মাইনে দিতে হচ্ছে, তার জন্যে পেট্রল-খরচও তো হচ্ছে—

—আজ্ঞে, যেমন আগে হতো, তেমনিই আমি টাকা দিয়ে যাচ্ছি—

মুক্তিপদ বললেন—আর এই যে দেখছি আন্টি মেমসাহেব, জয়ন্তী, ডাক্তারী পরীক্ষায় খরচ, এও তো দেখছি বরাবর চলে আসছে। সব মিলিয়ে তো মাসে দশ-বারো হাজার টাকা খরচা হচ্ছে ওদের জন্যে...এটাও তো সমস্তই জলে যাচ্ছে—

মল্লিক-মশাই এর জবাবে আর কী-ই বা বলবেন। একটু থেমে বললেন—আজ্ঞে, আমাকে ঠাকমা-মণি যেমন হুকুম দিয়েছেন আমি তেমনি তামিল করে যাচ্ছি—

—না, এ-সব থামাতে হবে!

বলে মুক্তিপদ উঠলেন। তাঁর চেহারা দেখে মনে হলো যেন খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছেন মেজবাবু। যেতে যেতে মুক্তিপদ বললেন—ঠিক আছে, আমি কাল আসছি, এবার থেকে আমি যা বলবো তাই-ই হবে—

মেজবাবু চলে যাওয়ার পর মল্লিক-মশাইও আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে নিচেয় নামতে লাগলেন। বড়লোকের খেয়াল, কখন সোজা হয় আবার কখন বিগড়ে যায় কিছুই বোঝবার উপায় নেই।

নিচেয় তখন নিয়ম করে সিংহবাহিনীর আরতি হচ্ছিল। মন্দিরের ঝি কামিনী ঘরে এসে ঠাকুরের প্রসাদ দুটো রেকাবিতে দিতে গেল। এ রোজকার নিয়ম। কয়েকটা কলা-শসার টুকরো, সময়ের ফল আর কিছু বাতাসা। একটা মল্লিক-মশাই এর, আর একটা সন্দীপের। সন্দীপ অফিস থেকে এসে মুড়ি আর ওই প্রসাদ খায়। সন্দীপ থাকলেও দিয়ে যায়, না থাকলেও দিয়ে যায়। যেদিন ব্যাঙ্কে তার ছুটি থাকে সেদিন সে বেড়াপোতাতে মাকে দেখতে যায়। সেদিন মল্লিক-মশাই দু'টো রেকাবির প্রসাদ নিজেই খেয়ে নেন। মল্লিক-মশাই একটা রেকাবি ঢাকা রেখে দিয়ে অন্য রেকাবিটার প্রসাদ খেয়ে নিলেন।

বিডন স্ট্রীট আর রাসেল স্ট্রীটের কলকাতা যেমন এক রকমের কলকাতা নয়, তেমনি বালিগঞ্জের কলকাতাও এক কলকাতা নয়। এক-এক এলাকার এক-এক কাল-

চার, এক-এক সংস্কৃতি, এক-এক চেহারা। কারো সঙ্গে কারো মিল নেই।

তেমনি পার্ক স্ট্রীট-এর ধার ঘেঁষে রিপন স্ট্রীট, কিড্ স্ট্রীট, কলিন স্ট্রীটের কালচারও এক নয়। এদের সঙ্গে অন্য অঞ্চলের কোনও মিল নেই। এ-পাড়ায় রাত বারোটার পর সন্ধ্যে হয়। তখনই মজা ওড়ে এ-অঞ্চলে।

তখন দালালরা ঘোরাঘুরি করে নানা মতলবে। কেউ ঘোরে খদ্দেরের ধান্দায়, কেউ ঘোরে চোলাই মদের খোঁজে। রাস্তায় কোনও প্রাইভেট গাড়ির সন্ধান পেলেই পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। গলা নিচু করে বলে—প্রাইভেট্ চাই স্যার, একেবারে ফ্রেস মাল—

আবার কেউ এসে জিজ্ঞেস করে—ড্রিংকস্ আছে স্যার, রিয়্যাল স্কচ্, চাই?

আর রাস্তা দিয়ে যদি কোনও জোয়ান বয়সের ছেলে-ছোকরাকে একলা-একলা হেঁটে হেঁটে যেতে দেখে তো তার পেছু নেয়। বলে—আসুন না স্যার, আসুন না আমার সঙ্গে। আপনি যা চাইছেন তাই পাবেন—

—কী চাই আমি?

—আমি স্যার বুঝতে পেরেছি আপনি কী চান। একেবারে আনকোরা নতুন এসেছে এ-পাড়ায়। এখনও লাইনে নামেনি—

ছেলেটা যদি জিজ্ঞেস করে—কত দূরে?

লোকটা বলবে—দূরে নয় স্যার, এই বাড়িটার পাশেই। আসুন না আমার সাথে। পছন্দ না হলে চলে যাবেন, কোনও পয়সা লাগবে না। একেবারে ফ্রী...

তখন যদি ছেলেটা একটু আগ্রহ দেখায় তো লোকটার পোয়া-বারো। সে মুখে বলবে—চলে আসুন আমার পেছন পেছন—

বলে ছুটতে আরম্ভ করবে, আর ছেলেটাও তখন তার নাগাল পাওয়ার জন্যে পেছন পেছন ছুটতে আরম্ভ করবে!

কিন্তু লোকটার পেছন-পেছন ছুটে ছেলেটাও তার নাগাল পাবে না। কোন্ রাস্তা দিয়ে ঢুকে কোন্ গলিতে ঢুকে কোন্ দিকে যে সে মোড় নেবে তা জানা স্বয়ং ভগবানের পক্ষেও সম্ভব নয়। এ অনেকটা কাশীর বিশ্বনাথের মন্দিরে যাওয়ার গলির মতন। কাশীতে পান্ডারা ভক্তের পেছু ছাড়ে না, এখানে খদ্দেররা দালালদের পেছু ছাড়ে না।

এই-ই পেছু নেওয়া আর পেছু না-ছাড়ার কালচার। কলকাতা সৃষ্টির শুরু থেকেই এই কালচার চলে আসছে এখানে অনাদিকাল থেকে। হাজার সি-এম-পি-ও আর সি-এম-ডি-এ-ই আসুক, এ কালচার একেবারে আদি এবং অকৃত্রিম কালচার। একে ভাঙবার শক্তি কোনও গভর্মেন্টেরই নেই—সে কংগ্রেস গভর্মেন্টই আসুক, জনতা গভর্মেন্টই আসুক আর কমিউনিস্ট গভর্মেন্টই আসুক। এ-পাড়াতে এলে বোঝবারই উপায় নেই যে এ লন্ডন, না ম্যানহ্যাটন্, না প্যারিস্, না বার্লিন, না হংকং না ইন্ডিয়ার কলকাতা।

এখানকার রাস্তায় ক্যালকাটা কর্পোরেশনের লাইট-পোস্ট্ আছে, কিন্তু তার প্রায় সব কটাই অচল। একটা দুটো ছাড়া সব লাইট-পোস্টের বাতিগুলোই অন্ধকার। আলো জ্বলে না, আর জ্বললেও নিভিয়ে রাখা হয় বিশেষ কারণে। বিশেষ কারণটা হলো এই যে অন্ধকার থাকলে দালালদেরও সুবিধে, খদ্দেরদেরও সুবিধে।

এই অন্ধকারের মধ্যেই হঠাৎ সেদিন দমাদম বোমা-ফাটার শব্দ আরম্ভ হয়ে গেল। বোমা এ-রকম মাঝে মাঝে এ-পাড়ায় ফাটে। কিন্তু তাতে কেউ অবাকও হয় না, বোমা ফাটার কারণটাও কেউ জানতে চায় না। ধোঁয়া থাকলে যেমন আগুন থাকবেই, এই সব দালালরা থাকলে তেমনি বোমা ফাটবেই। দালালদের মধ্যেও দলাদলি আছে বলে বোমা ফাটাফাটিও আছে। এ-যুগের কলকাতায় রাজনীতি সমাজনীতি বা সাংস্কৃতিক

নীতির ক্ষেত্রে বোমা ফাটাফাটিটা অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা।

কিন্তু এ-পাড়ায় যারা নতুন খদ্দের তারা বোমা ফাটাফাটির ব্যাপারে প্রথমটায় খুব ভয় পায়। গোপাল হাজরা এ-পাড়ার হাল-চাল খুব ভালো করেই জানে। শুধু এ-পাড়ারই নয়, কলকাতার সব পাড়ার হাল-চালই তার মুখস্থ। কারণ তাকে রাতের পর রাত সব পাড়াতেই ঘুরতে হয়।

সেদিনও যখন তার জিপটা চালিয়ে সে এ-পাড়ায় এসেছে তখন যে পুলিশটা সেখানে ডিউটি দিচ্ছিল তাকে জিজ্ঞেস করলে—কে বোমা ফাটাচ্ছে রে বাচ্চু? এখানে হল্লা-গুল্লা কেন এত?

বাচ্চু বললে—ও কিছু না হুজুর। পার্টি নিয়ে হরদয়ালের সঙ্গে ফটিকের হামলা চলেছে—

পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট বাচ্চুকে দিতেই সে সেটা টুপ করে পকেটে পুরে ফেলে বললে- হুজুর, হরদয়ালের আজকাল বড় তেজ হয়েছে—

গোপাল হাজরা অবাক হয়ে গেল বাচ্চুর কথা শুনে। ফটিক বরাবর হরদয়ালেরই সাকরেদ ছিল। চোলাই মদের কারবারে হরদয়ালের কাছেই ফটিকের হাতে-খড়ি। বলতে গেলে হরদয়াল না মদত দিলে ফটিক উপোস করেই মরতো।

গোপাল হাজরা বরাবর হরদয়াল গুন্ডাকেই এ-পাড়ার লীডার বলে মনে করতো। তাই তাকেই সে তার চোলাই কারবারের ভার দিয়েছিল। কিন্তু সেই সাগরেদ ফটিক এখন হরদয়ালের দুষমণ হয়ে গেল?

গোপাল বললে—একবার ডাকো তো বাচ্চু হরদয়ালকে আমার কাছে—

বাচ্চু অন্ধকারের মধ্যেই কোথায় ডুবে গেল। তারপর হরদয়ালকে ডেকে আনলো। হরদয়াল এসেই গোপাল হাজরাকে দেখে ভক্তিভরে সেলাম করলে—কী হুজুর আমাকে তলব করেছেন?

মাথায় লম্বা-লম্বা কোঁকড়া-কোঁকড়া চুল হরদয়ালের। এক মুখ পান। মুখ থেকে ভুর-ভুর করে জর্দার সুগন্ধ বেরোচ্ছে।

গোপাল বললে—আজ এত বোমা ফাটাফাটি কীসের জন্যে রে হরদয়াল? ব্যাপারটা কী? আবার কী হলো?

হরদয়াল বললে—আপনি জানেন তো হুজুর, আমি কোনো ঝুট-ঝামেলার মধ্যে থাকি না। শালা ফটিক এককালে খেতে পেতো না। আমি তাকে শিখিয়ে-পড়িয়ে মানুষ করেছি, আর সেই ফটিক কিনা এখন আমার সঙ্গে বেইমানি করে—

—কী বেইমানি করেছে?

শালা নিজেই একটা দল করে এখন লীডার হয়েছে। শালা এমনি বেইমান যে আমার আসামীকে নিয়ে নিজের কবজায় রাখতে চায়! এত বড় হারামীর বাচ্ছা! আমাকে এখনও চেনেনি শালা। শালা বেইমানের বাচ্ছা! আমি তাকে খতম করবো তবে ছাড়বো! শালা আমাকে এখনও চেনেনি—

গোপাল হাজরা বললে—চেঁচাসনি, ভালো করে খুলে বল্ কে তোর আসামী? কোথায় সেই আসামী?

হরদয়াল বললে—ফটিক আমার আসামীকে তার ঘরে আটকে রেখেছে—

—ফটিক কোথায়?

—ফটিক জানে ফটিক কোথায়।

বাচ্চু কনস্টেবল পাশে দাঁড়িয়ে সব শুনছিল। গোপাল হাজরা বাচ্চুকে বললে—ফটিককে ডেকে নিয়ে আয় তো বাচ্চু। বল্ গিয়ে বড়বাবু এসেছে একবার ডাকছে—

বাচ্চু চলে গেল আবার সেই অন্ধকারের মধ্যে। যত বোমা ফাটাফাটিই হোক

বাচ্চুর সব জায়গায় অবাধ গতি। তাকে হরদয়াল ও ফটিক দুজনেই ভয় করে। ভয় করে বাচ্চুকে পুলিশ বলে নয়, ভয় করে বাচ্চু গোপাল হাজরার নিজের লোক বলে। কোথায় ফটিকের ডেরা তা বাচ্চু ভালো করেই জানে। বড়বাবুর নাম শুনেই ফটিক গোপাল হাজরার সামনে এসে হাজির হলো। এসেই সেলাম করলে। গোপাল হাজরা ফটিককে দেখেই বললে—কীরে, তুই নাকি হরদয়ালের সঙ্গে আবার নেমক-হারামি করেছিস ?

ফটিক বললে—কে বললে হুজুর ? আমি নেমক-হারামি করতে যাবো কেন ? ওই হরদয়ালই তো আমার সঙ্গে নেমক-হারামি করেছে—

—তোর সঙ্গে কী নেমক-হারামী করেছে হরদয়াল শুনি।

ফটিক বললে—যখন আমি আসামী যোগাড় করেছি তখন হরদয়ালকে বরাবর তার শেয়ার দিয়েছি, কিন্তু হরদয়াল যখন আসামী ধরে আনে তখন আমাকে তার শেয়ার দেয়নি। আমি তো একটা পয়সাও তার কখনও হাপিস করিনা। যে-লোক কথার খেলাফ করে তার সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই, হুজুর। আমার সাফ কথা। আমিও তাই দল ছেড়ে দিয়ে অন্য দল করেছি। এখন যদি ওর তাগদ থাকে তো ও লড়ুক আমার সঙ্গে! দেখা যাক কার কত মুরদ!

গোপাল হাজরা বললে তোরা নিজেদের মধ্যেই যদি এত লড়ালড়ি করিস তাহলে আমি কী করে তোদের সামলাবো বল ? এ-রকম করলে তো বরদা ঘোষালবাবুকে সব বলতে হবে! শেষকালে যদি তাতেও না শুনিস তো শ্রীপতি মিশ্রের কানে তুলতে হবে কথাগুলো। তাতে কি তোদের ভালো হবে বলতে চাস ? তোদের কি তখন রুজি-রোজগার থাকবে ?

হরদয়াল আর ফটিক দুজনেই চুপ। তারা ভালো করেই জানে যে একবার গোপাল হাজরার কোপে পড়লে একেবারে মন্ত্রীর লেবেল পর্যন্ত কথাটা পৌঁছে যাবে। তার চেয়ে চুপ করে থাকাই ভালো।

গোপাল হাজরা বললে তোরা দু'পয়সা করে খাচ্ছিস তাই আমি কিছু বলি না। ভাবি গরিবলোক তোরা, তোদের পেটে হাত পড়ুক এটা আমিও চাই না, বরদা ঘোষাল, শ্রীপতিবাবু কেউই তা চায় না। মাঝখান থেকে বোমা ফাটাফাটি হলে কথাটা কি চাপা থাকবে ? একবার খবরের কাগজের লোকদের নজরে পড়ে গেলে তখন তো পার্টিরই বদনাম হয়ে যাবে! তখন সারা কলকাতায় একেবারে ঢি-ঢি পড়ে যাবে! তখন তোরা খাবি কী শুনি ? যা কিছু খেতে পাচ্ছিস সে তো আমার জন্যেই! তা না হলে এই বাজারে তোরা কী করতিস ভেবে দেখ তো ?

কথাগুলো ভাববার মতো। এই কলকাতা শহরের সমস্ত পাড়ায় পাড়ায় যত হরদয়াল আর ফটিক আছে, তারা সবাই-ই তো গোপাল হাজরার দয়াতেই বেঁচে আছে। আর গোপাল হাজরা মানেই তো গভর্মেন্ট! গভর্মেন্ট যদি বিরূপ হয়ে যায় তাহলে তাদের পেট কী করে চলবে ?

গোপাল হাজরা হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে আসামী কোথায় ?

হরদয়াল বললে—খুব শাঁসালো আসামী বড়বাবু, সেই জন্যেই তো ফটিক তাদের আটকে রেখেছে ? আসামীর খুব শাঁসালো। সঙ্গে বিবিও আছে—

—সঙ্গে বিবি ? বিবি মানে ?

—বিবি মানে বউ হুজুর!

গোপাল হাজরা অবাক হয়ে গেল। বললে বউ! বলছিস কী তোরা ? বউ নিয়ে কেউ এই পাড়ায় ফুর্তি মারতে আসে ?

—হ্যাঁ স্যার, আসে!

—দূর হতভাগা। বউকে নিয়ে কে এ-পাড়ায় আসবে?

—না হুজুর, আজকাল তো অনেক বাড়ির বউরাও মাল ধরেছে। বিশ্বাস করুন!

গোপাল হাজরাও কথাটা শুনে অবাক হয়ে গেল!

বললে—তোদের কপাল তাহলে তো খুব ভালো রে! কালে কালে হলো কীরে? তোদের তো দেখছি পোয়াবারো। তা বাড়ির বউরা মাল খেতে এ-পাড়ায় আসে কেন? হোটেলে গিয়েই খেতে পারে!

ফটিক বললে—আজকে যে বেস্পতিবার হুজুর, ড্রাই-ডে—এই ড্রাই-তেই তো আমাদের বেশি আমদানি। আমদানির ভাগাভাগি নিয়েই আজ তাই তো এই বোমা ফাটাফাটি—

—ও। তাই তো বটে!

আজ যে বেস্পতিবার সে-কথাটা গোপাল হাজরার খেয়ালই ছিল না। সেই জন্যেই আজ এ-পাড়ায় এত বোমা ফাটাফাটি!

তারপর গোপাল হাজরা আবার জিজ্ঞেস করলে—আজও বুঝি বউ নিয়ে কোনও আসামী এসেছে?

—হ্যাঁ হুজুর! সেই সন্ধেবেলাই দুজন আসামী এসে হাজির। খুব শাঁসালো আসামী। নিজেদের গাড়ি চালিয়ে এসেছে। ফালতু আসামী নয়। আমিই আসামীদের পাকড়িয়েছি, তাই হরদয়ালের এত রাগ। তাই সে তার সাগরেদদের লেলিয়ে দিয়েছে আমার দলের ওপর। আমার মালের ভাগ কেন হরদয়ালকে দেব? ও কি আমাকে ভাগ দেয়?

হরদয়াল বলে উঠলো—না বড়বাবু, ওর কথা শুনবেন না, আমি তেমন বেইমানের বাচ্চা নয়। আমি আমার সব সাগরেদদের আমদানির সমান ভাগ দিই!

এ-সব কথা আর ভাল লাগছিল না গোপাল হাজরার। বললে—তোরা বোমা ফাটানো বন্ধ করে দে। আমি কাল যদি এসে দেখি যে আবার তোদের এমনি বোমা ফাটাফাটি চলছে, তাহলে বরদা ঘোষালবাবুকে বলে দিয়ে কিন্তু তোদের ঠেক বন্ধ করে দেব—

তারপর একটু থেমে আবার বললে—তা আসামীরা কোথায়?

ফটিক বললে—আমার ঠেক-এর ঘরে তাদের তালা-চাবি বন্ধ করে রেখে দিয়েছি। নইলে হরদয়ালের লোকরা তাদের দেখতে পেলেই বে-ইজ্জতি করবে—

—না, আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি, কেউ তাদের বে-ইজ্জতি করবে না।

ফটিক বললে—না হুজুর, আপনি জানেন না, তাদের গাড়িটাকে পর্যন্ত ভেঙে দিয়েছে হরদয়াল।

—কই, গাড়িটা কই?

ফটিক বললে—গাড়িটা নিয়ে ড্রাইভার কোনও রকমে প্রাণ বাঁচাতে ভেগে গেছে—আর একটু হলেই গাড়িটাও বেটা আগুন ধরিয়ে পুড়িয়ে ফেলতো—। আমি যদি তাদের ঘরের ভেতর বন্ধ না করে রাখতুম তো তাদেরও পুড়িয়ে মারতো, এত বড় খচ্চর ওই হরদয়ালটা—

—এই খবরদার, মুখ-খিস্তি করবি না বলে দিচ্ছি। ভদ্দরলোকের ছেলে তুই, মুখ খিস্তি করছিস কেন? চল, দেখি কোথায় তোর আসামী। চল, দেখা—

ফটিকের সঙ্গে সঙ্গে গোপাল হাজরাও গলির ভেতর ঢুকে পড়লো। সঙ্গে কনস্টেবল বাচ্চাও রয়েছে। পুলিশ দেখে পাড়ার মেয়েগুলোর একটু সাহস বাড়লো। তারা উঁকি-ঝুঁকি মেরে পুলিশ দেখে এতক্ষণে তাদের দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়ালো।

একটা জায়গায় এসে একটা ঘরের সামনে ফটিক দাঁড়ালো। দরজায় তালাচাবি বন্ধ। চাবিটা খুলতেই একটা মাতাল ভেতর থেকে টলতে টলতে বাইরে এসে দাঁড়ালো। সঙ্গে একজন মেয়েমানুষ।

সামনে আসতেই আলো লেগে মুখের চেহারাটা স্পষ্ট দেখা গেল।

গোপাল হাজরা মুখটা চিনতে পেরেই চমকে উঠলো—আরে—

এর বেশি আর কোনও কথা তার মুখ দিয়ে বেরোল না। পাশের মেয়েমানুষটার দিকেও চেয়ে দেখলে গোপাল হাজরা। খুব ফরসা মুখের রং। দুজনেই নেশায় টল-মল করছে।

—মিস্টার মুখার্জি না?

নেশার ঘোরে নিজের নামটা শুনেও যেন শুনতে পেলে না মিস্টার মুখার্জি। জিজ্ঞেস করলে—কে?

গোপাল হাজরা বললে—আপনি সৌম্যবাবু না?

সৌম্যবাবুর সারা শরীর তখন নেশায় একেবারে চুর অবস্থা। জড়ানো গলায় জিজ্ঞেস করলে—আপনি? আপনি কে?

—আমাকে চিনতে পারলেন না? আমি সেই গোপাল হাজরা...সেই নাইট-ক্লাব...

সৌম্যবাবুর মুখ দেখে বোঝা গেল না তিনি গোপাল হাজরা নামে কোনও লোককে চিনতে পারলেন কি না।

পেছন দিকে দাঁড়ানো মহিলাটিকে বললেন—কাম্-অন্-কাম্-অন ডার্লিং—

তারপর গোপাল হাজরার দিকে চেয়ে বললেন—ইনি হচ্ছেন আমার ওয়াইফ। মিসেস মুখার্জি, মিসেস রীটা মুখার্জি—
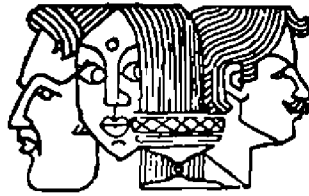
মুক্তিপদ মুখার্জি উত্তরাধিকার সূত্রে অনেক কিছুই পেয়েছিলেন। অর্থ পেয়েছিলেন, খ্যাতি পেয়েছিলেন, হাজার কয়েক লোকের হর্তা-কর্তা-বিধাতা পুরুষের পদ পেয়েছিলেন। কিন্তু যখন সে-সব পেয়েছিলেন তখন তিনি স্বপ্নেও ভাবেননি যে তাঁর ও-সব কিছু পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এত অশান্তি, এত যন্ত্রণা, এত অভিশাপ, আর এত অনিদ্রাও পাবেন।

নন্দিতা কিন্তু ও-সব ব্যাপারে নির্লিপ্ত। সে তখনও আগেকার মতো আরাম করেই ঘুমোয়, আরাম করেই সিনেমা দেখে। যেমন মা, মেয়েও ঠিক তার তেমনি। তাদের সংসারে তখন জীবন-যাত্রা আগেকার মতই তেমনি নিরুদ্বেগ, নিরুপদ্রব, নির্ঝঞ্ঝাট। অত বড় ফ্যাক্টরি যে তখন অচল সে-কথা ভাববার দায় যেন তার নেই। শুধু দায় যে নেই তা-ই নয়, যেন দরকারই নেই।

যখন নন্দিতা দেখে মুক্তিপদ কোথাও বেরোচ্ছে তখন জিজ্ঞেস করে—কোথায় বেরোচ্ছ আবার? তোমার ফ্যাক্টরি তো বন্ধ!

মুক্তিপদ বলেন—ফ্যাক্টরি বন্ধ বলে কি আমার বেরোনোও বন্ধ? আমার কোনও কাজ থাকতে পারে না?

নন্দিতা বলে—তা এখন একটু রেস্ট নাও না—রেস্ট নিলে তোমার ইন্‌সোম্‌নিয়াও

কমবে. ব্লাড্প্রেসারও নেমে যাবে!

মুক্তিপদ নিজের মনেই বলে উঠলেন—তা যদি হতো তো আমি তো বেঁচে যেতুম। আমার হাজার হাজার ওয়ার্কাররা খেতে পাচ্ছে না, ওয়ার্কারদের বেকার ছেলেরা চুরি-জোচ্চুরি করা শুরু করেছে আর মেয়েরা প্রসটিটিউশন্ করা আরম্ভ করেছে. এসব শুনে আমার রেস্ট করা সাজে। আমার শরীরটা রেস্ট পাবে. কিন্তু মন?

নন্দিতা বলে—সেই জন্যেই তো তোমাকে বলি আমার সঙ্গে একদিন সিনেমা দেখবে চলো। সিনেমা দেখলে দেখবে তুমি সব ভুলে যাবে! তা তো তুমি যাবে না! সেই জন্যেই তোমার এই ড্রাগ্-হ্যাবিট হয়েছে--

এ-কথার কী জবাব দেবেন মুক্তিপদ! যারা সব দেখেও বুঝবে না, চোখ বুজে সব ভুলে থাকবে তাদের কথার কী উত্তর দেবে সে?

—আর শুধু কি তাই?

মুক্তিপদ বললেন একদিকে ফ্যাক্টরিতে ক্লোজার, কেউ মাইনে পাচ্ছে না. প্রোভাকশন বন্ধ. আর একদিকে আমার মা মরো-মরো. তার ওপর সৌম্য ওই কাণ্ড করে বসলো। আমি একলা কোন্ দিক সামলাবো!

—তোমার সৌম্যর কাণ্ডর কথা আর বোল না। ও-ই আমাদের সকলকে ডোবাবে, এই বলে রাখছি! ঠাকুমার কাছে অত আদর পেলে সে ছেলে কখনও ভালো থাকে?

মুক্তিপদ বললেন সে কথা আর এখন বলে কী হবে?

নন্দিতা বললে—সে কথা অনেক আগেই তোমাকে আমি বলেছি. তুমি আমার কথায় তখন কান দাওনি—

– তুমি আবার কখন সে-কথা বললে আমাকে?

—কেন. পিক্‌নিক্ সব বলেছে আমাকে. তুমিও সব শুনেছ। মনে নেই তোমার সৌম্য অফিস পালিয়ে পিক্‌নিকদের স্কুলে যেত। সেই রাসেল স্ট্রীটের বাড়ির মেয়েটাকে নিয়ে কোথায় কোথায় দিন কাটাতো, তা তো আর আমার জানতে বাকি নেই! মুখে মুখে সকলেরই জানা হয়ে গেছে। মেয়েটার নাম বিশাখা না কী যেন।

কথাটা মনে পড়লো মুক্তিপদর।

নন্দিতা বললে আসলে তোমার মা'রই তো সব দোষ. দুধ-কলা দিয়ে নিজেদের টাকা খরচ করে ওদের ও-বাড়িতে পোষা কেন? তোমার মা কেন ওই ভাবে বাড়িতে সাপ পুষে রেখেছিল! তখন মনে ছিল না যে একদিন এই কেলেঙ্কারী-কাণ্ড হবে?

এরই বা কী জবাব দেবেন মুক্তিপদ! মা'র এই অসুখের সময়ে কি এ-সব কথা মা'কে বলা যায়!

মুক্তিপদর আর সহ্য হচ্ছিল না। সহানুভূতি সান্ত্বনা বা একটু মায়া-মমতা দেওয়ার মতো যে মানুষটা তাঁর ছিল তাঁকে শোনাবার সময় এখন আর নেই। তাঁর বোধকরি শোনবার ক্ষমতাও নেই আর। এখন কার কাছে গিয়ে দাঁড়াবেন মুক্তিপদ।

সেদিন বিডন-স্ট্রীটের বাড়ির সামনে গিয়ে মুক্তিপদ দেখলেন একটা ভাঙা গাড়ি বাড়ির গেটের সামনে পড়ে আছে।

গিরিধারী মেজবাবুকে দেখেই সেলাম করল।

মুক্তিপদ গিরিধারীকে জিজ্ঞেস করলেন—এটা কার গাড়ি রে গিরিধারী?

গিরিধারী বললে—খোকাবাবুকা গাড়ি হুজুর--

—সৌম্যর গাড়ি? এ-রকম ভাঙলো কী করে?

কেমন করে গাড়িটা ভাঙলো তা গিরিধারীর জানবার কথা নয়, তাই সে মালিকের কাছে কী জবাবই বা দেবে তা না ভেবে পেয়ে চুপ করে রইল।

মুক্তিপদ জিজ্ঞেস করলেন—খোকাবাবু বাড়িতে আছে?

গিরিধারী বললে—নেহি হুজুর, অভি নিকাল গিয়া মেমসাব কে সাথ—

কী করে বেরোল ? কোন্ গাড়ি নিয়ে গেল ?

গিরিধারী বললে—খোকাবাবু নয়া গাড়ি খরিদ লিয়া

মুক্তিপদ গিরিধারীর কথা শুনে অবাক হয়ে গেলেন। গাড়ি ভেঙে গেছে বলে আর একটা নতুন গাড়ি কিনে নিয়েছে? এই দুঃসময়ে সোমা কিনা নতুন গাড়ি কিনে নিয়েছে! টাকা কি সৌম্যর কাছে খোলামকুচি! ফ্যাক্টরি বন্ধ, প্রোডাকশনও বন্ধ, তাই ইন্‌কামও বন্ধ। তার ওপরে আবার নতুন গাড়ি কেনা!

মুক্তিপদ আর সেখানে দাঁড়িয়ে সময় নষ্ট করলেন না।

সোজা ভেতরে মল্লিক-মশাই-এর ঘরে ঢুকে পড়লেন।

—মল্লিক-মশাই অবাক বললেন—আসুন আসুন—বসুন—

মুক্তিপদ বসলেন না। বললেন—খোকার গাড়িটা ভাঙলো কী করে?

মল্লিক-মশাই তখন দাঁড়িয়ে উঠে বললেন কানাই বললে গুন্ডারা নাকি ওর গাড়ি ভেঙে দিয়েছিল. কানাই তাদের রুখতে গেলে ওরা তখন গাড়িতে আগুন লাগাতে আসে। তবু তার গায়েও চোট লেগেছে খুব—

—কিন্তু কানাই ? কানাই কে ?

—ওই যে খোকাবাবু যে নতুন ড্রাইভারটা রেখেছে তার নাম কানাই—

মুক্তিপদ বললেন—ও। তা তারপর?

—তারপর কানাই বুদ্ধি করে সেই আধ-ভাঙা গাড়িটা নিয়ে কোনও রকমে পার্ক স্ট্রীটের থানায় গিয়ে হাজির হয়। পুলিশের কাছে গিয়ে সব কথা বলে। কিন্তু পুলিশ তার কেস ডায়েরী নিতে রাজি হয়নি।

—কেন ? নেয়নি কেন ?

মল্লিক-মশাই বললেন—কেন নেয়নি তা তো বলতে পারবো না। আজ-কাল তো সবই পার্টির ব্যাপার। কানাই-এর কাছে মালিকের নাম-ধাম শুনে হয়ত বুঝেছে যে এরা তাদের পার্টির লোক নয়—তাই কেস ডায়েরী নিতে রাজি হয়নি।

—তাহলে খোকা বউকে নিয়ে বাড়ি ফিরলো কী করে?

মল্লিক-মশাই বললেন—খোকাবাবুর কোন্ বন্ধু নাকি সেখানে ছিল, তার নাম গোপাল হাজরা, সে নাকি সেখানে খোকাবাবুর ওই অবস্থা দেখতে পেয়ে দয়া করে ওদের দুজনকে তার জীপে করে বাড়ি পৌঁছিয়ে দিয়ে যায়।

—আর কানাই ? তাকে একবার ডাকুন তো। দেখি সে কী বলে ?

মল্লিক-মশাই বললেন—কানাই তো বাড়ি নেই। সে তো হাসপাতালে। তার শরীরের অনেক জায়গায় খুব জোরে চোট লেগেছে—

—তাহলে খোকা এখন কোন্ গাড়িতে চড়ছে ?

মল্লিক-মশাই বললেন—খোকাবাবু তো আর একটা নতুন গাড়ি কিনেছে—

—নতুন গাড়ি কিনেছে? সে কী ?

—হ্যাঁ—

—কত টাকা দাম পড়লো ?

—তা জানি না তিনি আমাকে কিছু বলেননি।

—এখন গাড়ি ড্রাইভ করছে কে ?

মল্লিক-মশাই বললেন—এখনও ড্রাইভার পাননি, নিজেই চালাচ্ছেন!

মুক্তিপদর মুখ দিয়ে একটা বিরক্তির নিরর্থক শব্দ বেরোল। তারপর তিনি আর সেখানে দাঁড়ালেন না। গট্-গট্ করে যেমন ঘরে ঢুকেছিলেন তেমনি গট্-গট্ করে আবার বাইরে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে তেতলায় ঠাকমা-মণির ঘরের দিকে উঠে গেলেন।

মল্লিক-মশাই-এর গা দিয়ে যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো। এই-ই হচ্ছে চাকরি। সারা জীবনটা এই চাকরি করেই তাঁর নষ্ট হলো। তবে সান্ত্বনার কথা এইটুকুই যে অন্য কোনও জায়গায় চাকরি করলে তো তিনি এমন ঘনিষ্ঠভাবে জীবনকে দেখতে পেতেন না। এখানে তিনি ঐশ্বর্যও দেখতে পেলেন, অন্যায়-অপব্যয়ও দেখতে পেলেন। সঙ্গে-সঙ্গে দেখতে পেলেন দারিদ্র্যকেও। শুধু আর্থিক দারিদ্র্যটাই কি বড় দারিদ্র্য? মানসিক দারিদ্র্যটা তো আর্থিক দারিদ্র্যের চেয়ে আরও ঘৃণ্য, আরও ভয়ঙ্কর, আরও কষ্টকর। সেটা এত কাছাকাছি না থাকলে কি দেখার সুযোগ মিলতো। নির্ধনতা অভিশাপ হতে পারে কিন্তু মানসিক অধঃপতনের চেয়ে সে তো আরও অনেক বরণীয়।

এটা কেন হলো?

এই প্রশ্নটা তিনি নিজেকে অনেকবার করেছেন। একবার মনে হয়েছে আর্থিক সাচ্ছল্যই এর জন্য দায়ী। কিন্তু আবার মনে হয়েছে, তা কেন? অর্থ তো অনেকেরই ছিল এবং আছে। কিন্তু তারা তো সবাই অধঃপতনে যায়নি। ভেবে ভেবে তিনি আবিষ্কার করেছেন রহস্যটা। রহস্যটা হচ্ছে বৈরাগ্যের অনুপস্থিতি। অর্থ আছে অথচ অর্থের ওপর কোনও আকর্ষণ নেই, এটা কি এমনই শক্ত জিনিস! সেটা কেন মুখার্জি বংশধরদের কারো মনের মধ্যে উদয় হলো না!

এই যে প্রতিদিন সৌম্য মুখার্জি বউ নিয়ে বাড়ির বাইরে যায়, আর তারপর সেখানে রাত কাটিয়ে স্খলিত পদক্ষেপে অজ্ঞান অচৈতন্য অবস্থায় বাড়িতে ফিরে আসে এ-ঘটনা তো দেবীপদ মুখার্জির আমলে কল্পনাও করা যেত না! তাঁর বংশের তৃতীয় পুরুষেই কেন সেই সৌভাগ্য-সূর্য এমন করে অধোগামী হলো? অথচ গুরুর কাছে দীক্ষা নেওয়া থেকে আরম্ভ করে বাড়িতে সিংহবাহিনীর নিত্য পুজোপাঠ বা ভোরবেলা নিত্য গঙ্গাস্নান, কোনওখানেই তো কারো কিছু ত্রুটি ঘটেনি! এর কারণটা তাহলে কী?

সন্দীপও তাঁকে এই প্রশ্ন করেছে।

মল্লিক-মশাই নিজের মনে নিজেকেই যে প্রশ্ন বার বার করেছেন সন্দীপও সেই একই প্রশ্ন করে বসলো। তাহলে কি বুঝতে হবে পুজো-পাঠ-দান-ধ্যান-দীক্ষা-গঙ্গাস্নানের কোনও উপযোগিতা নেই?

মল্লিক-মশাই বললেন—উপযোগিতা নেই তা বলবো না, উপযোগিতা আছে। কিন্তু সব পুজো তো পুজো নয়, সব দীক্ষা তো দীক্ষা নয়, সব গঙ্গাস্নানও তো গঙ্গাস্নান নয়—

—তার মানে?

মল্লিক-মশাই বলেছিলেন—দেখ, পুজোও তো দু'রকমের—

সন্দীপ কিছু বুঝতে পারলো না। জিজ্ঞেস করলে—দু'রকমের পুজো, তার মানে?

মল্লিক-মশাই বললেন—একটা হচ্ছে বুদ্ধিমানের পুজো, আর একটা হচ্ছে ভক্তি-মানের পুজো—

তারপর কথাটা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলেন—বুদ্ধিমান যখন পুজো দেয় তখন ঠাকুরের সামনে মাথা নিচু করে প্রণাম করে বলে—মা তোমাকে আমি সওয়া পাঁচ আনার পুজো দিলুম তার বদলে তুমি আমাকে মামলায় জিতিয়ে দাও কিংবা আমার লটারির টিকিটে পাঁচ লাখ টাকা পাইয়ে দাও—

—আর ভক্তিমানের পুজো কী রকম?

—ভক্তিমান কোনও কিছুর আশায় ঠাকুরের পুজো করে না। সে ঠাকরের কাছে আত্মনিবেদন করেই কৃতার্থ হয়। সে ঠাকুরকে পুজো করবার জন্যেই পুজো করে,

বিনিময়ে কিছু পাওয়ার আশায় পুজো করে না বলেই তার পুজো বিড়ম্বনায় পরিণত হয় না। তাই বলি ঠাকমা-মণির পুজো ছিল বুদ্ধিমানের পুজো। সেই জন্যেই তাঁর জীবনে এত বিড়ম্বনা—

কথাগুলো সন্দীপের এখনও মনে আছে। কতদিনকার আগের কথা সব। কিন্তু এখনও যেন চোখের সামনে সে-সব দৃশ্য স্পষ্ট ভাসছে।

সন্দীপ ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞেস করলে—তাহলে ওদের কী হবে? মেজবাবু কিছু বললেন?

মল্লিক-মশাই বললেন- আমি নিজের থেকে কিছু জিজ্ঞেস করিনি। তুমি যেমন চাকর, আমিও তেমনি একজন চাকর। মেজবাবুর সঙ্গে আমার শুধু মালিক-চাকরের সম্পর্ক। মালিক যা জিজ্ঞেস করবেন শুধু সেই কথাটা ছাড়া তার বাইরে অন্য কোনও কথা জিজ্ঞেস করতে নেই—

সন্দীপ বললেন—এখন তো ঠাকমা-মণির অসুখ, মেজবাবু যদি ওদের চলে যেতে বলেন?

মল্লিক-মশাই বললেন- মালিকের কথা তো আমাকে শুনতেই হবে। আমি ও-বাড়িতে টাকা পাঠানো বন্ধ করে দেব।

—তারপর? তারপর ওরা কোথায় যাবে?

মল্লিক-মশাই বললেন—সে-ভাবনা তোমারও নয়, আমারও নয়। তোমার নিজেরই কোনও থাকবার জায়গা নেই, তুমি ও নিয়ে অত মাথা ঘামাচ্ছো কেন?

সন্দীপ বললেন—মাসিমা যে খুব কান্নাকাটি করেন আমাকে দেখে—

—তা মাসিমা কান্নাকাটি করলে তোমার কী? তোমার তো ব্যাঙ্কে চাকরি হয়ে গেছে। আর তোমার কিসের ভাবনা? এখানকার চাকরি যদি যায়ও তাহলে তো তোমার বেকার হওয়ার কোনও ভয় নেই—

সন্দীপ আবার সেই একই প্রশ্ন করলে—কিন্তু বিশাখা?

মল্লিক-মশাই বললেন—বিশাখার জন্যে তোমার এত মাথা-ব্যথা কেন? তার সঙ্গে কার বিয়ে হলো কি না হলো তাতে তোমার কী এসে যায়?

আর তারপর একটু ভেবে বললেন—আর তাছাড়া এই সৌম্যবাবুর সঙ্গে বিয়ে না হয়েই তার ভালো হয়েছে! এখানে বিয়ে হলে তো সে-মেয়ে এক মাতালের হাতে পড়তো। সেটাই কি ভাল হতো বলতে চাও? এর চেয়ে একটা গরীবের ঘরের সচ্চরিত্র ছেলের সঙ্গে বিয়ে হলেই তো ভালো হয়। তার টাকা থাকুক আর না থাকুক তাতেও কিছু আসে যায় না। আর শুনেছ তো সৌম্যবাবুর কাণ্ড! গাড়িটা ভেঙে চুরমার হয়েছে, ড্রাইভারটাও খুব চোট খেয়েছে, সে যে পুড়ে মরেনি এইটেই তার সৌভাগ্য। এই রকম জামাইয়ের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে হলে সেটা কি খুব ভালো হতো?

সন্দীপও কথাটা ভাবতে লাগলো।

--কিন্তু ওদিকে মাসিমা যে কেঁদে-কেটে অস্থির হয়ে পড়ছেন, তাঁকে আমি কি করে বোঝাব? তিনি কোন্ মুখে আবার তাঁর সেই দেওরের বাড়িতে গিয়ে উঠবেন, আর কেমন করে তাঁর জা'এর লাথি-ঝাঁটা সহ্য করবেন?

মল্লিক-মশাই যেন এবার একটু রেগে গেলেন। বললেন—তাদের কী হলো না হলো তাতে তোমার কী এল গেল? তুমি তাদের কী আর তারাই বা তোমার কে? তাদের সঙ্গে তোমার কীসের সম্পর্ক? তুমি যদি পৃথিবীর সব দুঃখী মানুষের কথা ভেবে দুঃখ পাও তো তুমি তো জীবনে কখনও শান্তি পাবে না। তুমি জানো পৃথিবীর কত মানুষের কত দুঃখ আছে? তাদের সকলের সব দুঃখ তুমি দূর করতে পারবে? এটা কেউ কখনও দূর করতে পেরেছে? চেষ্টা অনেকেই করেছেন বটে! তাঁরা কিন্তু

সবাই সেই পরের দুঃখ দূর করবার জন্যে নিজেরা মহাপুরুষ হয়ে গেছেন। কিন্তু তুমি? তুমিও কি তেমনি একজন মহাপুরুষ হতে চাও? যেমন সোক্রেটিস, যীশু-খৃষ্ট, তথাগত বুদ্ধদেব সবাই এক-একজন মহাপুরুষ হয়েছেন?

সন্দীপ চুপ করে রইল। এ-কথার কোনও উত্তর দিলে না।

মল্লিক-মশাই নিজেই আবার বললেন—যদি তুমিও সেই চেষ্টা করো তাহলে কিন্তু তোমারও দুঃখ-কষ্টের শেষ থাকবে না। তাও তোমায় বলে রাখছি। তখন তুমি সেই দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে পারবে? বেশ ভালো করে ভাবো। ভেবে তারপর আমাকে উত্তর দিও—

সেদিনের কথা সন্দীপের এখনও সব মনে আছে। সেদিনকার মল্লিক-মশাইএর সব কথাগুলো বর্ণে বর্ণে পালন করেও কি সে আজ মহাপুরুষ হতে পেরেছে? সে তো সেদিন সব দুঃখ-কষ্ট-অপমান-অসম্মান মাথা পেতেই সহ্য করেছিল। তার ফলে সে তো কেবল জেলখানায় একজন কয়েদী হয়েই রইল। তার তো আর কোনও পরিচয় নেই আজ। সে তো চোর, সে তো নব্বুই লাখ টাকা তছরূপের দায়ে দাগী আসামী। আজ সমাজ-সংসার তো তাকে সেই নামেই জানে। এখন তো তার আর অন্য কোনও পরিচয় নেই!

আজ সেই মল্লিক-মশাইও নেই যে তাঁকে সে গিয়ে এ কথা জিজ্ঞেস করে। যদি তিনি বেঁচে থাকতেন তো তাঁকে গিয়ে সন্দীপ জিজ্ঞেস করতো—আমি তো আপনার সব কথা বর্ণে বর্ণে মেনেছিলাম। আমি তো পরের সব বোঝা স্বেচ্ছায় নিজের মাথায় তুলে নিয়েছিলাম। তাহলে কেন আজ আমার একমাত্র পরিচয় হলো—আমি একজন দাগী আসামী! কেন দাগী আসামী ছাড়া আমার আর কোনও অন্য পরিচয় নেই? কেন, কেন?
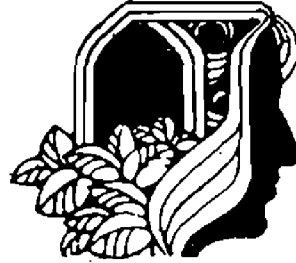
চাকরির জীবনে এমন ঘটনা খুব কমই ঘটে।

সাধারণতঃ যে যে-চাকরিতে ঢোকে তাকে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বছরে বছরে নিয়ম-মতো ইনক্রিমেণ্ট পেয়ে একটা পূর্বনির্ধারিত বিন্দুতে গিয়ে চাকরি-জীবনের ছেদ টানতে হয়। তারপর রিটায়ারমেণ্ট। তারপরই শুরু হয় তার পেনসন।

কিন্তু সন্দীপের সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য কে জানে তার বেলায় ঘটলো উল্টো।

খবরটা প্রথমে দিলে পরেশদা।

পরেশদা ডেকে পাঠিয়ে বললে—আমাকে কী খাওয়াবে বলো?

সন্দীপ প্রথমটায় বুঝতে পারেনি। বলেছিল—কী খেতে চান আপনি বলুন?

পরেশদা বললে—পরোটা আর ডিমের কারি, আর কিছু নয়—

—এ আর এমন কথা কী! সন্দীপ তখনই বললে—চলুন, ক্যানটিনে চলুন—

পরেশদা বললে—কিন্তু কেন খেতে চাইলুম তা তো কই জিজ্ঞেস করলে না—?

সন্দীপ বললে—আপনি নিজের মুখে খেতে চাইলেন আর তার ওপর আমি কী

বলতে পারি।

পরেশদা বললে—না না, একটা সুখবর আছে বলেই তোমাকে খাওয়াতে বলছি—চলো, চলো—

ক্যান্টিনের ভেতরে ঢুকে একটা কোণের টেবিলে গিয়ে পরেশদা বসলো। বললে—একটু নিরিবিলিতে বসাই ভালো, নইলে কথাটা কেউ শুনতে পাবে। এখনও সবাই জানে না।

সন্দীপ তখনও জানতো না কী এমন গোপনীয় খবর আছে পরেশদা'র যা অন্য লোকের কানে যাওয়া উচিত নয়।

পরোটা এল, ডিমের কারিও এল। পরেশদা একমনে ডিম দিয়ে পরোটা খেতে লাগলো। তারপর বললে—না হে ভায়া, আর দুটো পরোটা আর আরো এক প্লেট ডিমের কারির অর্ডার দাও—

তখন মাসের শেষাশেষি। মাইনে তখনও হয়নি সন্দীপের। পকেটে হাত দিয়ে দেখে নিলে সন্দীপ। চার—পাঁচ টাকা সঙ্গে আছে তো ঠিক!

তা তাই এল। পরেশদা আবার মন দিয়ে পরোটা খেতে লাগলো। বললে—বাঃ আজকে ডিমটা ভালো রান্না করেছে তো! তুমি খাবে না?

সন্দীপ সুখবরটা শোনবার জন্যে অধীর হয়ে উঠেছিল। বললে—না, আজকে আমার খিদে নেই তেমন, আপনি খান—

আসলে যে তার পকেটে বেশি পয়সা নেই সেটা সে গোপন করে গেল। শেষকালে আর থাকতে পারলে না। জিজ্ঞেস করলে—কই, কী সুখবর আছে তা তো বলছেন না—

পরেশদা বললে—তবে শোন, কাল তুমি বাড়ি চলে যাওয়ার পর ম্যানেজার আমাকে ডেকেছিল, আমাদের আর একটা ব্র্যাঞ্চে একজন পাসিং-অফিসারের পোস্ট স্যাংশন হচ্ছে। তার জন্যে কাকে সিলেকশন্ করা হবে সেই কথাটা জিজ্ঞেস করলে ম্যানেজার—

—তারপর? তারপর? আপনি কী বললেন?

পরেশদা আবার পরোটার একটা টুকরো মুখে পুরে চিবোতে চিবোতে বললে—আমি বলেছি আমি ভেবে দেখবো। আমি ভাবছি আমি তোমার নাম বলবো। আমি বলেছি তুমি খুব অনেস্ট আর ইনডাস্ট্রিয়াস। তোমার কখনও লেট এ্যাটেনডেন্স নেই। আমি ভাবছি আমি তোমার নামই রেকমেন্ড করবো—

সন্দীপ হঠাৎ এক কাণ্ড করে বসলো। ধপ্ করে নিচু হয়ে পরেশদার পায়ে হাত দিয়ে মাথায় ঠেকিয়ে নিলে।

—আহা করো কী, করো কী?

সন্দীপ বললে—না পরেশদা, আপনি যে আমার কী উপকার করলেন তা কী বলবো। আমি যা মাইনে পাই তাতে আমার একেবারে চলছিল না। আমি তো আপনাকে বলেছি আমি খুব গরীবের ছেলে। আমার বিধবা মা দেশে পরের বাড়িতে রাঁধুনীর কাজ করে আমাকে মানুষ করেছে। এখনও মা সেই কাজই করে চলেছে। কলকাতাতেও আমি পরের বাড়িতে তাদের ফাই-ফরমাস খাটার বদলে থাকতে খেতে পাই। আপনাকে যে আমি কী বলে ধন্যবাদ জানাবো বুঝতে পারছি না—আমি আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ হয়ে রইলুম।

কথাগুলো বলতে বলতে সন্দীপের চোখ দুটো জলে ছল্ ছল্ করে উঠলো।

পরেশদা বলতে লাগলো—ঠিক আছে ভাই, আমাকে অত বলতে হবে না। আমি নিজেও একজন গরীবের ছেলে, আমি গরীবের দুঃখ বুঝি। তুমি অত ভেবো না, আমি তোমার একটা বিহিত করে দেবোই—কিন্তু তুমি যেন এ-সব কথা কাউকে বোল না—

তারপর খাওয়ার পর আবার অফিসে ঢুকে নিজের নিজের জায়গায় গিয়ে বসলো দু'জনে।

অফিস থেকে ফিরে আসার পর আবার অন্য ভাবনা। অফিসেও যা বাড়িতেও তাই। বাড়িতে এসেই মল্লিক-মশাই-এর কাছ থেকে সব কথা শোনা! মেজবাবু বলেছেন যে রাসেল স্ট্রীটের মাসিমাদের জন্যে অকারণে পাঁচ ছ' হাজার টাকা মাসে মাসে বাজে খরচ হচ্ছে। ওটা নাকি তিনি বন্ধ করে দিতে চান, কিংবা সৌম্যবাবু বউকে নিয়ে বাড়ির বাইরে যাওয়া, সেখান থেকে বেসামাল হয়ে দু'জনের বাড়ি ফিরে আসা, আর তারপরে একদিন গাড়ি ভেঙে যাওয়া—এ সমস্ত কিছুই সন্দীপকে অস্থির করে তুলতো।

পাশেই বসতো খগেন। খগেন সরকার। সে জিজ্ঞেস করেছিল—আপনাকে পরেশদা ক্যানটিনে নিয়ে গিয়েছিল কেন বলুন তো? কী উদ্দেশ্য?

সন্দীপ বললে—না, কিছু না, এমনি—

খগেন বললে—আপনি বললেই হলো? আমার ঘাড় ভেঙেও একদিন পরেশদা ওই রকম পরোটা-ডিমের কারি খেয়েছে। আপনি পরেশদাকে চিনলেন না—

—আপনি খাইয়েছেন?

—হ্যাঁ। আমাকে যে বললেন প্যাসিং-অফিসারের প্রমোশনের জন্যে ম্যানেজারের কাছে আমার নাম রেকমেণ্ড করবেন!

সন্দীপ খগেন সরকারের কথায় অবাক হয়ে গেল।

খগেন সরকার আরো বললে—শুধু আমি নয়, ওই জিজ্ঞেস করুন ত্রিদিব ঘোষকে! ওই ত্রিদিব ঘোষ, যাদব ভট্টাচার্যি, বরেন সাহা, সবাইকে ওই এক-কথা বলে ধাপ্পা দিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে পরোটা আর ডিমের কারি খেয়েছে। আর সকলকে বলে দিয়েছে কাউকে বোল না। তোমাকেই আমি প্যাসিং-অফিসারের পোস্টের জন্যে রেকমেণ্ড করবো—

সন্দীপের তখনও জগৎ দেখা হয়নি, তাই খগেন সরকারের কথা শুনে খুব অবাক হয়ে গিয়েছিল। এমন মানুষও হয়! গোপাল হাজরাকে দেখা ছিল, তারক ঘোষকে দেখা ছিল সৌম্যবাবুকে দেখা ছিল, তপেশ গাঙ্গুলীকে দেখা ছিল। রাস্তায়-ঘাটে, বাজারে আরো অনেক লোককেও দেখা ছিল। কেউ ধর্মের নামে ধাপ্পা দিয়ে টাকা উপায় করছে কেউ নির্লজ্জভাবে মানুষকে ঠকিয়ে টাকা উপায়ের ধান্ধা করছে। এই সব মানুষ নিয়েই তো এই পৃথিবী। জনসংখ্যায় এরাই তো সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাহলে?,

সেই ছোট বয়সেই সন্দীপ জেনে গিয়েছিল যে তাকে যদি এই পৃথিবীতে টিঁকে থাকতে হয় তাহলে এদের সঙ্গে আপোষ করে নয়, এদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেই তাকে আত্মরক্ষা করে বেঁচে থাকতে হবে।

অথচ বাইরে থেকে এরা কত মার্জিত, কত ভদ্র, কত শিক্ষিত। কিন্তু কেন এরা এ-রকম করে?

এরা কি কেউ নিজের অবস্থায় সন্তুষ্ট নয় বলেই তা করে! অবশ্য কাকে এই সামান্য মানুষদেরই বা দোষ দিয়ে লাভ কী? দেশের যারা লীডার যারা মিনিস্টার, যারা আই-এ-এস যারা বি-সি-এস যারা বিরাট বিরাট ইনডাস্ট্রিয়ালিস্ট, যারা ফ্যাক্টরির ওয়ার্কস ম্যানেজার যারা এ্যাডভোকেট ব্যারিস্টার, তারাও কি পরেশদার চেয়ে কিছু কম? কেন সৌম্যবাবু সব জেনে শুনেও অমন মুরলী মেম-সাহেব বউ বিয়ে করে নিয়ে এল? তা না করলে তো ঠাকমা-মণির এমন অসুখ হতো না।

মল্লিক মশাই-এর ঘর ছেড়ে মেজবাবু সোজা তিনতলায় ঠাকমা-মণির ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। দু'জন নার্স রাখা হয়েছে পালা করে ঠাকমা-মণির সেবা করবার জন্যে!

একজন নার্স তখন ডিউটিতে ছিল। মেজবাবুকে দেখেই সাবধান হয়ে গেছে।

মেজবাবু তাকে জিজ্ঞেস করলেন—কেমন আছেন এখন পেশেণ্ট?

নার্স বললে—কালকের চেয়ে একটু বেটার—

ব্লাড রিপোর্ট, ইউরিন রিপোর্ট, আরো সব কত কী রিপোর্ট, সমস্ত কাগজ-পত্র মেজবাবুর দিকে এগিয়ে দিলে নার্স। মেজবাবু সেগুলো দেখে বুঝলেন রোগীর অবস্থা ভালোর দিকেই যাচ্ছে। প্রায় সমস্তই নর্ম্যালের দিকে যাওয়ার পথে।

মেজবাবু সেই ঘর থেকেই ডাক্তারকে টেলিফোন করলেন। কিন্তু রিসিভার তুলে ডায়াল করতেই ক্রস-কানেকশান হয়ে গেল।

প্রথমে লাইনটা ছেড়েই দিচ্ছিলেন। কিন্তু একটা কথা কানে আসতেই কান খাড়া করে দু'দিকের কথা-বার্তা শুনতে লাগলেন।

একদিক থেকে কে একজন বললে—কত হাজার দরকার?

ও-পাশ থেকে একজন বললে—অন্ততঃ ষাট হাজার—

—ষাট হাজার টাকা?

—হ্যাঁ, ষাট হাজার টাকা মাসে মাসে চাই। তা না হলে তারা ইউনিয়ন ছেড়ে দেবে। ইউনিয়ন ছেড়ে দিলে আমাদের চলবে কী করে?

ওদিক থেকে তখন প্রশ্ন হলো -তারা কারা?

- স্যাক্সবি মুখার্জি কোম্পানির সব বেকার ছেলেরা। এখন তারা সবাই বেঁকে বসেছে। তারা বলছে- আপনারা আমাদের বুঝিয়ে দিলেন যে ধর্মঘট করলে তোমাদের মাইনে বেড়ে যাবে, তাই আমরা ধর্মঘট করলুম। এখন কোম্পানি ক্লোজার হওয়ার পর আমরা মাইনে পাচ্ছি না। আমরা এখন কী করে পেট চালাই? আমরা কী করে সংসার চালাবো? আমরা ইউনিয়ন ছেড়ে দেব!

কথাগুলো শুনে ও-পাশের একজন বললেন -এখন আপনি কী বলেন?

এ-পাশের একজন বললেন—আমি ভাবছি সবাই যদি ইউনিয়ন ছেড়ে দেয় তো আমরা কী করে চালাবো? লোকগুলো খুব ক্ষেপে গেছে আমাদের ওপর!

—সেই যে 'বাঙলা-বন্ধ' ডাকবার একটা কথা উঠেছিল, সেটা ডাকলে কেমন হয়? অন্ততঃ কিছুদিন এদের ঠেকিয়ে রাখা যেত!

ওপাশ থেকে আওয়াজ এল- তাতে খুব সুবিধে হবে না স্যার। এই তো ছ'মাস আগেই একবার 'বাংলা-বন্ধ' ডাকা হয়েছিল। সেবারে নর্থ-ক্যালকাটায় জিনিসটা খুব সাকসেসফুল হয়নি। অনেকে দোকানপাট বাজার খোলা রেখেছিল!

তা মুক্তিপদ মুখার্জির অফিসাররা কী বলছে? তাদের পক্ষের কিছু খবর জোগাড় করতে পেরেছেন?

- চেষ্টা করেছি, কিন্তু এখনও কিছু খবর আদায় করতে পারিনি। তবে গোপাল হাজরার কাছে জানতে পারলুম মুক্তিপদ মুখার্জির ভাইপো বিলেত থেকে মেম বিয়ে করে এনেছে, তাতে একটু আশার আলো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে—

—কী রকম?

- অতুল চ্যাটার্জির মেয়ের সংগে তার ভাইপোর বিয়ে দেওয়ার যে-প্ল্যানটা মিস্টার মুখার্জি করেছিল সেটা ভেস্তে গেছে! এখন আর স্যাক্সবি মুখার্জির হয়ে সুবীর চ্যাটার্জি কোনও ইন্টারেস্ট দেখাচ্ছে না—

- তাহলে তো সেটা আমাদের পক্ষে একটা সুখবর!

- তা অবশ্য ঠিক। কিন্তু ওয়ার্কাররা যে বিগড়ে গেছে। তারা যে এখন মাসো-হারা চাইছে লীডারদের কাছ থেকে!

এধার থেকে উত্তর গেল—তুমি বুঝিয়ে দেবে ওদের যে একটা মাস কোনও রকমে

চালিয়ে নিক, তারপর দেখছি অন্য কোথা থেকে কী ব্যবস্থা করতে পারি। একটা কাজ করতে পারো না?

—কী কাজ?

—একদিন 'পদযাত্রা' করলে কেমন হয়। কয়েক লাখ লোক জোগাড় করতে হবে শুধু। তাতে বেশি টাকা খরচ হবে না। অথচ ওয়ার্কাররা বুঝবে যে আমরা তাদের কথা ভাবছি. তাদের জন্যে আমরা আন্দোলন করছি। একেবারে সল্ট লেক থেকে শুরু করে হাওড়ার ইণ্টিরিয়ার পর্যন্ত পদযাত্রা করতে হবে। রাস্তায় বাস-ট্রাম, ট্রাফিক সব কিছু বন্ধ করতে হবে। তাতে অন্য কিছু হোক আর না হোক ওয়ার্কাররা অন্ততঃ বুঝবে যে তাদের জন্যে লীডাররা ভাবছে—

অন্যদিক থেকে আওয়াজ এল—আইডিয়াটা খারাপ নয়। আর তাতেও যদি কিছু না হয় তখন একটা কাজ করবো স্যার?

—বলো কী কাজ?

—একবার মুক্তিপদ মুখার্জির সঙ্গে দেখা করলে কেমন হয়?

—না-না, তাতে আমাদের ইউনিয়নের ক্যাডারদের সন্দেহ হবে। খবরটা চেপে রাখা যাবে না। জানাজানি হয়ে গেলে মিছিমিছি সব ভেস্তে যাবে। তখন ইউনিয়নকে সামলানো মুশকিল হবে, তার চেয়ে আমি বলি কী—আর একটা পথ আছে—

—কী পথ?

হঠাৎ লাইনটা কেটে গেল। তারপর অনেক বার চেষ্টা করলেন মুক্তিপদ. কিন্তু ডাক্তারকে আর পাওয়া গেল না। কিন্তু ভেবে আশ্চর্য হয়ে গেলেন এই অপূর্ব যোগাযোগটা কী ভাবে কে ঘটিয়ে দিলে? এ কি দৈব। না শুধু দুর্ঘটনা! তিনি ভেবে ভেবে কিছুই ঠিক করতে পারলেন না—

তারপর তিনি আর সে-ঘরে বসে থাকতে পারলেন না। বাইরে এসে সিঁড়ি দিয়ে নেমে একেবারে সোজা তাঁর গাড়িতে উঠে বসলেন। বললে—চল্ রে. বাড়ি চল্—

বাড়িতে পৌঁছিয়ে দেখলেন কেউ নেই। শুনলেন মেমসাহেব পিক্‌নিককে নিয়ে সিনেমায় গেছে। তিনি অর্জুন সরকারকে টেলিফোনে ডাকলেন।

অর্জুন সরকার তখন বাড়িতেই ছিল। টেলিফোন পেয়েই বললে—হ্যাঁ স্যার, আমি এখুনি যাচ্ছি—পাঁচ মিনিটের মধ্যে—

বলে তখুনি এসে হাজির হলো। মুক্তিপদ তাকে সমস্ত খুলে বললেন। অর্জুন সরকার ভেতরকার সব খবরই রাখে।

মুক্তিপদ বললেন—টেলিফোনে ক্রস্-কানেকশান না হলে আমি তো এ-সব খবর জানতেই পারতুম না—

অর্জুন বললে- আপনি ঠিকই শুনেছেন স্যার। আমি কালই আপনাকে সব জানাতুম। ভাবলুম, আরো কিছু খুঁটিনাটি খবর জোগাড় করি. তবে আপনাকে সব জানাবো। আসলে এখন কী হয়েছে জানেন স্যার. অনেক মাস মাইনে না পেয়ে ওখানকার ওয়ার্কাররা সবাই খুব ডেসপারেট হয়ে গেছে। তারা এতদিন সব কষ্টই মুখ বুজে সহ্য করছিল লীডারদের মুখের দিকে চেয়ে। লীডাররাও এত কাল ধরে তাদের স্তোকবাক্য দিয়ে আসছিল. কিন্তু এবার আর তারা বিশ্বাস করছে না—

—কেন?

অর্জুন সরকার বললে—আর কতদিন বিশ্বাস করবে বলুন স্যার? বরদা ঘোষাল একদিন ওদের বোঝাতে গিয়েছিল। বলেছিল—আর কিছুদিন ধৈর্য ধ'রে থাকো, আমি তোমাদের মাইনের স্কেল বাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করবো দেখবে সকলের মাইনে বেড়ে যাবে—

সেই মীটিংএর মধ্যেই একটা ছেলে উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলে—আর কতদিন আমরা ওয়েট করবো?

বরদা ঘোষাল বললে—আর তিনটে মাস অন্ততঃ। মালিকের সঙ্গে আমার কথা চলছে। মালিকেরও তো কোটি-কোটি টাকা লোকসান হচ্ছে—

আর একটা লোক বলে উঠলো—মালিক তো কোটি কোটি টাকা কামিয়ে নিয়েছে। তারা কি আর আমাদের দুঃখ-কষ্টের কথা বুঝতে পারবে? আমরা বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে আর কতদিন উপোষ করবো বলুন?

এবার আর একজন বলে উঠলো আপনারা তো আমাদের ক্ষেপিয়ে দিয়ে নিজেরা গাড়ি চড়ে বেড়াচ্ছেন, আমাদের টাকায় বাড়ি-টাড়ি করে নিয়েছেন, আমাদের দুঃখ আপনারা কী করে বুঝবেন। এবার আমাদেরও কিছু মাসোহারা দিতে হবে—

বরদা ঘোষাল কথাটা শুনে অবাক হয়ে গেল। বললে—মাসোহারা? বলছো কী তোমরা?

—কেন মাসোহারা চাইবো না? আমাদের পার্টির তো কোটি কোটি টাকা আছে! আমাদের বিপদের দিনেই যদি-সে টাকা না খরচ করেন তো সে টাকা আপনাদের কাছে রেখে দিয়ে লাভ কী?

বরদা ঘোষাল বললে বলছো কী তোমরা? আমাদের টাকা আছে? আমাদের কোটি কোটি টাকা আছে? আমরা তো সর্বহারার পার্টি। আমার নিজের বাড়ি-গাড়ি আছে, কে বললে তোমাদের?

—হ্যাঁ, আপনাদের যে কোটি কোটি টাকা সে-কথা জানতে আর কারো বাকি নেই। সে-টাকার হিসেব দিতে হবে আমাদের। আমাদের জনাতে হবে কোন্ টাকায় আপনার বাড়ি হয়!

বরদা ঘোষাল খানিকক্ষণ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে চুপ করে থেকে বলে উঠলো—আমার বাড়ি? বলছো কী তোমরা? নিজের বলতে একটা পয়সাও নেই আমার ব্যাঙ্কে! তোমরা বলছো আমার বাড়ি আছে তোমরা কি সবাই পাগল না মাথা-খারাপ?

—আপনার বাড়ি নেই?

—না, আমার বাড়ি নেই—

লোকটা কিন্তু না-ছোড়-বান্দা। বললে- তাহলে। বেহালায় অত বড় তেতলা বাগান-বাড়িটা কার?

বরদা ঘোষাল এতক্ষণে হো-হো করে হেসে উঠলো। বললে—আরে, ওটা তো আমার শ্বশুরের দেওয়া বাড়ি। তিনি মারা যাওয়ার আগে মেয়েকে উইল করে দিয়ে গেছেন। আর এ গাড়ির কথা বলছো? এ তো পার্টির গাড়ি, আমি এই গাড়িতে শুধু চড়ে বেড়াই। এর পেট্রলের টাকা, এর ড্রাইভারের মাইনে, সব তো পার্টি দেয়—

হঠাৎ একদল ছেলে এগিয়ে এল বরদা ঘোষালের দিকে। তারা চেঁচিয়ে বললে—ওই পার্টির ফান্ড থেকেই আমাদের মাসে মাসে ষাট হাজার টাকা করে দিতে হবে! যতদিন না ধর্মঘট মেটে—

বরদা ঘোষাল এবার তাদের সকলকে বোঝাতে চেষ্টা করলে। বললে—তোমরা চুপ করো, মাথা ঠাণ্ডা করে কথা বলো। উত্তেজিত হয়ো না। যা বলবে মাথা ঠাণ্ডা করে বলো—

সবাই তখন একসঙ্গে চিৎকার করে বলে উঠলো—আমাদের এখানকার মজুরদের মাসে মাসে ষাট হাজার টাকা করে দিতে হবে। না হলে আমরা ইউনিয়ন ছেড়ে দিয়ে দু'নম্বর ইউনিয়নে জয়েন করবো—

বরদা ঘোষাল বললে—ঠিক আছে। আমি তো ফয়শলা করবার মালিক নই, আমি

পার্টির হায়ার অথরিটির কাছে কথাটা তুলবো—বলে বরদা ঘোষাল চলে গেল।

মুক্তিপদ অর্জুন সরকারের সব কথাগুলো মন দিয়ে শুনছিলেন। জিজ্ঞেস করলেন --তারপর?

—তারপর স্যার ওয়ার্কাররা দু'একটা ঢিল ছুঁড়লো বরদা ঘোষালকে লক্ষ্য করে। ঢিলগুলো গিয়ে লাগলো বরদা ঘোষালের গাড়িতে। কিন্তু তার জন্যে গাড়িটা থামলো না, বরদা ঘোষালকে নিয়ে সোঁ সোঁ করে অনেক দূরে চলে গেল।

মুক্তিপদ বললেন- সেই জন্যেই কি 'বাংলা বন্ধ' ডাকবার কথা ভাবছে ওরা?

অর্জুন সরকার বললে—হয় 'বাংলা বন্‌ধ' আর নয়তো 'পদযাত্রা'। একটা কিছু ওদের করতেই হবে, পার্টির প্রেসটিজ্ আর থাকে না—

মুক্তিপদ উঠলেন। বললেন—ঠিক আছে, যাও তুমি। যেমন যেমন ডেভলপমেণ্ট হয় তেমনি তেমনি আমায় খবর দিয়ে যাবে—

অর্জুন সরকারও উঠলো। তারপর যাওয়ার সময়ে জিজ্ঞেস করলে—স্যার, মিস্টার চ্যাটার্জির কী খবর? আপনি যে বলছিলেন তাঁর ছেলে আমাদের ফ্যাক্টরির লেবার ইউনিয়নের ভার নেবে!

মুক্তিপদ সে কথার জবাব না দিয়ে শুধু বললেন—সে-কথা পরে হবে। এখন এ-ব্যাপারে আর কিছু খবর থাকলে আমাকে তাড়াতাড়ি জানিয়ে দিও—

বলে ভেতরের ঘরের দিকে চলে গেলেন। সমস্ত বাড়িটা তখন ফাঁকা মনে হলো তাঁর কাছে। আর শুধু বাড়িটাই নয়, তাঁর সমস্ত জীবনটাই যেন ফাঁকা হয়ে গেছে। সমস্ত পৃথিবীটাই বলতে গেলে তখন ফাঁকা তাঁর কাছে। তিনি কোথায় কোন্ বইতে যেন পড়েছিলেন যে যখনই তোমার মনের মধ্যে ডিপ্রেশন্ বা নৈরাশ্য আসবে সঙ্গে সঙ্গে সেই জায়গা ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাবে। সে জায়গা যেখানে হোক, যত দূরে হোক। তখন আর একলা থাকবে না। তখন এমন লোকের সঙ্গে মিশবে যারা তোমাকে একেবারে চেনে না, যাদের কাছে তুমি সম্পূর্ণ অচেনা।

কিন্তু এই অবস্থায় দূরে তিনি চলে যাবেন কী করে? মায়ের এই মরো মরো অবস্থা, সৌম্যটার এই কেলেঙ্কারী! এই সময়ে মাকে একলা ফেলে রেখে কোথায় যাবেন তিনি? আশ্চর্য ভগবান যখন এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন তখন জীবের জন্ম সৃষ্টি করবার সঙ্গে সঙ্গে বোধহয় তার মৃত্যুরও সৃষ্টি করেছিলেন, তার পুণ্য সৃষ্টি করবার সঙ্গে সঙ্গে বোধহয় তার পাপও সৃষ্টি করেছিলেন। যেদিন ম্যাক্‌ডোনাল্ড্ সাহেব এই ফ্যাক্টরির জন্ম দিয়েছিলেন, সেই দিন থেকেই বোধহয় এই সৌম্য মুখার্জির মতো একটা ধ্বংসের বীজেরও জন্ম দিয়েছিলেন? নইলে তাঁদের বংশে এমন কুলাঙ্গার জন্মালোই বা কেন?
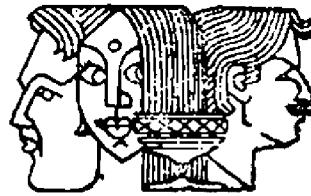
তপেশ গাঙ্গুলীর দিন-কাল বহুদিন থেকেই খারাপ চলছিল। সকলের চিরকাল ভালো চলে না। আসলে খারাপ-ভালো নিয়েই মানুষের তো জীবন। কিন্তু তপেশ গাঙ্গুলীর মতে তার মতো হতভাগা দুনিয়ায় নেই। অফিসে মাইনে বাড়ে না। আর

মাইনে বাড়লেও তাতে অভাব মেটে না। আর নিজের স্ত্রীও তেমন কাজের মানুষ নয়। মাসের মধ্যে অর্ধেক দিন তপেশ গাঙ্গুলীকে না খেয়ে অফিসে যেতে হয়।

তপেশ গাঙ্গুলী সকলকেই নিজের দুঃখের কথা শোনাতো। বলতো—আমার কপালটাই ফাটা হে, দেখ না, আজকেও না খেয়ে অফিসে আসতে হলো—

অফিসের বন্ধুরা কেউ-কেউ জিজ্ঞেস করতো—কেন?

তপেশ গাঙ্গুলী বলতো—কেন আবার, বউ-এর শরীর খারাপ, সকাল থেকে বিছানায় মাথা ধরে পড়েছে। রান্না-বান্না কিচ্ছু হয়নি। আমাকে আজকেও ক্যান্টিন থেকে খেয়ে নিতে হবে।

অনেকে বলতো—কেন, তোমার সেই বিধবা বউদি ছিলেন, তিনিই তো আগে তোমার সংসারের সব কাজ-কর্ম করতেন—

তপেশ বলতো—তবে আর ফাটা কপালের কথা বলছি কেন? সেই বউদি তো কোটিপতির শাশুড়ী—

- তার মানে?

এর পরে তপেশকে সবিস্তারে সমস্ত কাহিনীটা বলতে হলো। সকলকে বলতে বলতে গল্পটা ক্রমে সারা অফিসময় ছড়িয়ে পড়েছিল। যে গল্পটা শুনতো সেই হিংসে করতো তপেশ গাঙ্গুলীর কপালকে। অনেকে বাড়িতে গিয়ে আবার নিজের নিজের বউদের কাছেও গল্প করতো। তাদের প্রায় সকলের বাড়িতেই বিবাহযোগ্যা মেয়ে আছে। মেয়ের ভবিষ্যৎ বিয়ের কথা ভেবে অনেকেরই রাত্রের নিদ্রার ব্যাঘাত হয়। তারা সবাই ঘটনাটা শুনে কপালকে ঈর্ষা করতো। বলতো—ফাটা কপাল বলছো কেন তপেশদা; তোমার মতো ফাটা-কপাল পেলে তো আমরা বর্তে যেতুম -

অনেকে আবার তপেশদাকে ক্যান্টিনে নিয়ে গিয়ে খাওয়াতো!

তপেশ গাঙ্গুলী বলতো—শুধু চা নয় ভাই, আমার বউদি আমাকে অনেক চা, অনেক রসগোল্লা খাওয়ায়। বরং এক প্লেট মাংস খাওয়াতে পারো, তবে বুঝি! অনেক দিন মাংস খাইনি ভাই—

এক পিস্ মাংসর কারির দাম এক টাকা। তাতে কী হয়েছে! তা-ই খাওয়াতে হতো তপেশদাকে। এক প্লেট মাংসের দাম বাজারে দু'টাকা। ক্যান্টিন বলেই সস্তা দরে দেওয়া হয়। কিন্তু সাধারণতঃ এক প্লেট মাংসে তপেশদার পেট ভরে না। কখনও কখনও দু'প্লেট, তিন প্লেটও খাওয়াতে হয়। অনেকেরই ছেলে বা গলগ্রহ ভাইপো বেকার হয়ে বাড়িতে বসে আছে। স্যাক্সবী মুখার্জি কোম্পানিতে একটা চাকরি যদি পাওয়া যায় তার জন্যে দু'তিন প্লেট মাংস খাওয়াতে কারেরই কোনও আপত্তি নেই। আর তপেশ গাঙ্গুলীও কাউকে নিরাশ করবার মতো লোক নয়। তপেশ গাঙ্গুলী বলে—চাকরি দেওয়াটা আর কী এমন বড় কাজ হে, আমার ভাইঝি-জামাই তো ওই কোম্পানির ডিরেক্টর। তার কলমের একটা আঁচড়েই চাকরি হয়ে যাবে। হেল্থ্ পরীক্ষাও করতে হবে না, ইন্টারভিউও দিতে হবে না। শুধু এ্যাপ্লিকেশনের ওপর একটা সই-এর ওয়াস্তা।

এই রকম করেই এত বছর চলছিল আর সবাইকে চাকরির আশ্বাস দিয়ে চপ্-কাটলেট-মাংসর কারি খেয়ে আসছিল।

কিন্তু হঠাৎ গোল বাধলো একদিন।

শ্যামবাজারের দিক থেকে রথীন ঘোষাল 'ক্লেমস সেকশানে' কাজ করতে আসতো। সেই রথীনই একদিন হঠাৎ অফিসে এসেই বললে—তপেশদা, একটা খবর শুনেছ?

—কী? কী খবর?

—কিছু খবর শোনোনি তুমি?

—আরে, কীসের খবর সেইটেই আগে বলো না।

রথীন ঘোষাল বললে—আরে তোমার ভাইঝি-জামাই-এর খবর—

—কী খবর?

—সেই তোমার ভাইঝি-জামাই তো বিলেত থেকে মেমসাহেব বিয়ে করে এসেছে। শোনোনি তুমি?

—সে কী?

তপেশ গাঙ্গুলী স্তম্ভিত হয়ে গেল খবরটা শুনে। বললে—তুমি কোত্থেকে শুনলে খবরটা?

রথীন বললে—পাড়ার লোকের কাছ থেকেই শুনলুম। এ-রকম খবর কি আর চাপা থাকে?

আশে-পাশের সবাই লক্ষ্য করলে তপেশদার মুখটা প্রথমে একটু ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তারপরে একটু লালচে, আর তারপরে একেবারে বেগুনী!

তারপরে বললে—আমি তো এখনও শুনিনি কিছু। তা তুমি ঠিক শুনেছ তো?

রথীন ঘোষাল বললে—যে বলেছে সে তো নিজের চোখে দেখে তবে বলেছে।

—নিজের চোখে দেখেছে মানে?

—মানে মুখুজ্জে বাড়ির ছোট ছেলেকে সন্ধ্যে বেলা নতুন একটা গাড়িতে চড়ে সঙ্গে মেম-সায়েব বউকে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরোতে দেখেছে। মেম-সায়েবের সিঁথিতে সিঁদুর, পরনে বেনারসী শাড়ি, গলায় হাতে জড়োয়া গয়না—

তপেশ গাঙ্গুলী রুখে উঠলো।

বললে—তা কখ্‌খনো হতে পারে না। অসম্ভব। ওরা এত বছর ধরে আমার ভাইঝিকে পুষছে আর মাসে মাসে হাজার হাজার টাকা খরচ করে কলেজে লেখা-পড়া শেখাচ্ছে সব কি ভস্মে ঘি ঢালবার জন্যে?

—তাহলে কি বলতে চাও আমার বন্ধু আমাকে ভুল বলেছে?

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—সে ভুল বলেনি, ভুল দেখেছে। কাকে দেখতে কাকে দেখেছে তার ঠিক নেই—

—তাহ'লে বাজি রাখো।

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—নিশ্চয় বাজি রাখতে তৈরি। কত টাকা বাজি, বলো?

—একশো টাকা।

তপেশ গাঙ্গুলী এক হাজার টাকা বাজি রাখতেও তৈরি ছিল। কিন্তু একশো টাকাটাই বা কম কী? সেও রাজি হয়ে গেল। বললে—রাজি। সবাই সাক্ষী রইল, দেখলে তো? তোমরা সাক্ষী রই'ল কিন্তু···

কোথায় কার বাড়িতে কে বিলেত থেকে মেম-সাহেব বিয়ে করে আনলো তার ঠিক নেই, কিন্ত রেলের অফিসের বাবুদের মধ্যে তাই নিয়ে বাজি ধরাধরি চলতে লাগ'লা। যেন রেলের কর্তারা লোকগুলোকে এই বাজি ধরাধরির জন্যেই মাইনে দিয়ে পুষে রেখেছে—

তারপর আর দেরি নয়। সেকশনের বড়বাবুকে একটা বিশেষ ব্যক্তিগত কাজের ছুতো দেখিয়ে অফিস থেকে বেরিয়ে পড়লো। রাস্তায় বেরিয়ে এদিক ওদিক চেয়ে কোথাও বাসের টিকি পর্যন্ত দেখতে পেল না। তখন আর তর দেরি সই'ছ না। সামনে দিয়ে একটা খালি ট্যাক্সি যাচ্ছিল, তাকেই চিৎকার করে ডাকলে—এই ট্যাক্সি—

ট্যাক্সিটা থামলো। ড্রাইভার জিজ্ঞেস করলে—কোথায় যাবেন?

—রাসেল স্ট্রীট!

ট্যাক্সি-ড্রাইভার সঙ্গে সঙ্গে রাজি। লম্বা টিপ্। অনেকগুলো টাকার সওয়ারি।

তপেশ গাঙ্গুলীর পকেট কিন্তু তখন ফাঁকা। কয়েকটা খুচরো পয়সা ছাড়া আর কিছু নেই। বিশেষ করে সব মাসের শেষ সপ্তাহটা তার এই রকম টানাটানিতেই কাটে। তাতে তপেশ গাঙ্গুলীর কিছু ভাবনা নেই। বউদির কাছে ধার নিলেই হবে। বউদির কাছে এখন অনেক টাকা। এ-রকম যখনই তার পকেটে টাকার টান পড়েছে তখনই বউদির কাছে গিয়ে সে হাত পেতেছে আর বউদিও উপুড় হাত করে টাকা দিয়ে দিয়েছে। সে-ধার কখনও শোধও করতে হয়নি তপেশ গাঙ্গুলীকে। সে-টাকা বউদি কখনও ফেরতও পায়নি।

রাসেল স্ট্রীটের বাড়িতে পৌঁছতে বেশি সময় লাগলো না। ট্যাক্সি-ড্রাইভারটা হুঁশিয়ার লোক। কোথা দিয়ে ফাঁকা রাস্তা খুঁজে নিয়ে কোন গলির মধ্যে ঢুকে কোন বড় রাস্তার মোড়কে পাশ কাটিয়ে সোজা নিয়ে গিয়ে একেবারে পৌঁছিয়ে দিলে রাসেল স্ট্রীটের তিন নম্বর বাড়ির পোর্টিকোর তলায়।

তপেশ গাঙ্গুলীর তখন আর দেরি সইছে না। ট্যাক্সি থেকে নেমে পড়লো।

জিজ্ঞেস করলে—কত ভাড়া উঠেছে ভাই?

ড্রাইভার বললে—কুড়ি টাকা তিরিশ পয়সা--

তপেশ গাঙ্গুলী বললে ঠিক আছে ভাই, ওপরে আমার বউদি থাকে, বউদির কাছ থেকে টাকাটা চেয়ে নিয়ে এসেই তোমার ভাড়াটা মিটিয়ে দিচ্ছি, তুমি যেন চলে যেও না ভাই, আমি যাবো আর আসবো...

বলে লাফাতে লাফাতে সিঁড়ি দিয়ে তেতলায় উঠেই কলিং-বেল্‌টা টিপে রইলো অনেকক্ষণ ধরে।

দরজা খুলতেই তপেশ গাঙ্গুলী দেখলে শৈল। বউদির ঝি শৈল দাঁড়িয়ে রয়েছে।

তপেশ গাঙ্গুলী রেগে বললে—দরজা খুলতে এত দেরি করছিলে কেন গো? দেখছো আমি কতক্ষণ ধরে কলিং-বেল্ বাজাচ্ছি। তা বউদি কোথায়?

—ওই ঘরে শুয়ে আছে!

তপেশ গাঙ্গুলী রেগে গেল। যেন এই তাড়াতাড়ির সময়ে বউদির শুয়ে থাকাটা একটা অপরাধ।

বললে—এই অসময়ে শুয়ে আছে কেন? এত বেলা পর্যন্ত ঘুমোলে শরীর খারাপ হবে না?

শৈল বললে—মা'র জ্বর হয়েছে!

—জ্বর! চমকে উঠলো তপেশ গাঙ্গুলী। জ্বর হয়েছে? কই, দেখি, কোন্ ঘরে শুয়ে আছে? ডাক্তারকে খবর দেওয়া হয়েছে?

—না।

তপেশ গাঙ্গুলী আবার রেগে গেল। ডাক্তার তো রোজ বিশাখার হেল্‌থ চেক্-আপ করতে আসে। তাকে দেখায়নি কেন?

বলতে বলতে তপেশ গাঙ্গুলী বউদি'র শোবার ঘরে ঢুকে গেল। গিয়ে দেখলে বউদি অজ্ঞান-অচৈতন্য হয়ে বিছানার ওপর শুয়ে আছে।

তপেশ গাঙ্গুলী ডাকতে লাগলো—বউদি ও বউদি—

বউদির তরফ থেকে কোনও সাড়া শব্দ নেই।

তপেশ গাঙ্গুলী আবার ডাকলে—বউদি, ও বউদি—

তবু বউদি অজ্ঞান-অচৈতন্য। কোনও সাড়াশব্দ নেই বউদির তরফ থেকে।

তপেশ গাঙ্গুলী এবার বউদি'র কপালে হাত দিয়ে দেখলে। সঙ্গে সঙ্গে তার হাতের পাতাটা যেন পুড়ে গেল। মনে হলো একশো চার কিংবা একশো পাঁচ ডিগ্রী

যাদব বললে—এখন কী হবে? বড়সায়েব কী বলবে? আমার যে চাকরি চলে যাবে!

সন্দীপ বললে—আমি সমস্ত খাতাটা আবার নিজে লিখে দেব। যত রাতই হোক, আমি কথা দিচ্ছি, আমি সমস্ত রাত জেগে দুদিনের মধ্যে আবার সব নতুন করে লিখে দেব, আমায় ক্ষমা করুন আপনি—

ততক্ষণে অনেক লোক জড়ো হয়ে গেছে, তারা সবাই যাদব ভট্টাচার্যের সর্বনাশ দেখে 'হায়' 'হায়' করতে লাগলো। এখন কী হবে? বড়সাহেব জানতে পারলে কী হবে?

সন্দীপ বললে—বড়সাহেব জানতে পারলে আমি সব দোষ নিজের ঘাড়ে তুলে নেব। আমি বলবো আমার জন্যেই এই সর্বনাশ হয়েছে। আমাকে যা শাস্তি দেবেন তা আমি মাথায় তুলে নেব—

এখন ক্লিয়ারিং-এর সময়। তাই নিয়ে জটলা করবার ফুরসৎ তেমন কারো ছিল না আর তখন। সবাই যে-যার কাজে চলে গেল আবার।

সন্দীপ তখন এই ব্যাপারে এত বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল যে, তার যেন আর চলবার ক্ষমতাই চলে গিয়েছিল। তাড়াতাড়ি বিশাখার কাছে গিয়েই দেখলে বিশাখা তখনও শুকনো মুখে দাঁড়িয়ে আছে। জিজ্ঞেস করলে—কী হয়েছে, তুমি হঠাৎ? আমার ব্যাঙ্কের ঠিকানা কোথায় পেলে?

বিশাখা বললে—লোককে জিজ্ঞেস করে করে এলুম—

—কীসে এলে? গাড়িতে?

বিশাখা বললে—না, বাসে করে এলুম। গাড়ি কোথায় পাবো?

সন্দীপ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলে—কেন? গাড়ি নেই কেন?

বিশাখা বললে—সে অনেক কথা, এখানে দাঁড়িয়ে সব কথা বলার সময় হবে না। তুমি কি খুব ব্যস্ত?

সন্দীপ বললে—ব্যস্ত তো বটেই, ওই দেখ না তোমাকে দেখে ছুটে আসতে গিয়েই ওই ভদ্রলোকের জল খাবার গেলাসটা আমার হাতে লেগে পড়ে গিয়ে খাতা-পত্র সব ভিজে নষ্ট হয়ে গেল...

তারপর একটু থেমে বললে—তা যাক্ গে, কী খবর বলো?, তুমি নিজে আমার ব্যাঙ্কে দেখা করতে এসেছ, এ তো আমি ভাবতেই পারি না—

বিশাখা বললে—বিপদে পড়েই তোমার কাছে আসতে হয়েছে—

-কীসের বিপদ?

বিশাখা বললে—বিপদ নয়? আগে তুমি রোজ-রোজ সকালে একবার করে রাসেল স্ট্রীটের বাড়িতে যেতে, এই গেল দুমাস তোমার দেখাই নেই, তুমি চাকরি পেয়ে কি আমাদের একেবারেই ভুলে গেলে?

সন্দীপ বললে—কিন্তু তোমরা তো জানো না আমার ওপর দিয়ে কী বিপদ গেল?

—তোমার বিপদ? তোমার আবার কী বিপদ হলো?

সন্দীপ বললে আমি তো দুমাস ধরে আমাদের বেড়াপোতা থেকে ডেলী-প্যাসেঞ্জারী করেছি, বিডন স্ট্রীটের বাড়িতে যেতে পারিনি। মা'র খুব অসুখ হয়েছিল যে। আমি ছাড়া মা'কে আর কেউ দেখবার ছিল না, তাই একজন ঝি রেখে দিয়েছি, আর নিজে ডেলী-প্যাসেঞ্জারী করে চাকরি বজায় রেখেছি—কী যে বিপদ গেল এই দুমাস কী বলবো! এদিকে নতুন চাকরি, ছুটিও নিতে পারি না...অথচ আমার মনও পড়ে রয়েছে তোমাদের বাড়িতে –

বিশাখা বললে—আমাদের বাড়িতে মন পড়ে থাকলে এক মিনিটের জন্যেও অন্তত

আমাদের খবর নিতে—

সন্দীপ বললে—আমি জানি তুমি আমার কথা বিশ্বাস করবে না, কিন্তু অফিসের ভেতরে দাঁড়িয়ে সে-সব কথা বলা যাবে না, পরে দেখা হলে সব বলবো। যাক্ গে. তুমি কী জন্যে এসেছ তাই বলো?

বিশাখা বললে—বলেছি তো এসেছি বিপদে পড়ে, স্বার্থের তাগিদে—

—বিপদ কী, তাই বলো—

বিশাখা বললে—কিছু টাকার জন্যে এসেছি—

—টাকা?

—হ্যাঁ, টাকার দরকার না হলে কি কেউ কারো অফিসের কাজের সময়ে আসে?

সন্দীপ বললে—আগে বলো কত টাকা তোমার দরকার। আমার টাকা আমার এই ব্যাঙ্কেই জমা আছে। আর বেশিক্ষণ সময় নেই, বলো কত টাকা, আমি এখুনি চেক্ কেটে তুলে দিচ্ছি—

বিশাখা বললে—মা'র কাছে একটা পয়সাও নেই, তুমি যা দেবে তাই-ই আমি নেব। আমি আর কী বলবো—

সন্দীপ বললে—তুমি একটু অপেক্ষা করো—আমি এখ্খুনি টাকাটা নিয়ে আসছি—

বলে বিশাখাকে সেখানেই দাঁড় করিয়ে রেখে সোজা আবার ভেতরে চলে গেল। সন্দীপের পুরো মাইনেটাই ব্যাঙ্কে জমা থাকে। মা টাকা নিতে চায়নি কারণ মা'র কাছে না ছিল বাক্স, না ছিল সিন্দুক। মা কোথায় টাকা রাখবে? তাই সন্দীপের মাইনের সব টাকাগুলোই সে ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টে জমা রেখে দিত আর দরকার মতো যখন-তখন তুলে নিত। আর যতদিন থেকে মা'র অসুখ হয়েছিল ততদিন সন্দীপ বেড়াপোতা থেকেই যাতায়াত করতো। রান্না-বান্না তখন আর মা করতে পারতো না।

জীবনের গতি-পথ যে কত জটিল তা কেবল জীবিত লোকরাই বুঝতে পারে। মৃতদের জানবার কোনও দায় নেই, তাদের কোনও সমস্যাই থাকে না। বহুদিন আগের বইতে পড়া কথাগুলো যখন সন্দীপ হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছিল ঠিক তখনই বিশাখা এসে হাজির।

ন্যাশনাল ইউনিয়ন ব্যাংক বড় ব্যাংক, তাই তার কাজের পরিধিও যেমন বড় কাজের জটিলতাও তেমনি বড়। তারপর আছে দু'রকম ইউনিয়ন। সঙ্গে সঙ্গে আছে দুটো ইউনিয়নের অফিস। নামে ইউনিয়নের অফিস হলেও সেখানে ইউনিয়নের নামে তাস খেলা হয়, রেডিও শোনা হয়, ক্যারাম বোর্ড খেলাও হয়, আবার একটা ছোট্ট লাইব্রেরীও আছে, যেখান থেকে ডিটেকটিভ্-রহস্য-রোমাঞ্চ কাহিনীও পড়তে পাওয়া যায়।

বিশাখা তখনও চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল আর চারদিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিল।

হরেনদা জিজ্ঞেস করলে—ও মেয়েটা কে হে সন্দীপ? কে দেখা করতে এসেছে তোমার সঙ্গে?

সন্দীপের তখন তাড়া ছিল খুব। বললে—পরে এসে বলছি—

সন্দীপ বিশাখার কাছে এসে বললে—এই নাও টাকা—

বিশাখা টাকাগুলো নিজের ব্যাগের মধ্যে পুরে নিলে।

সন্দীপ বললে—ওতে পাঁচশো টাকা আছে, পরে দেখে নিও—

বিশাখা বললে—তাহলে আমি যাই- একদিন সময় পেলে যেও কিন্তু—

—নিশ্চয়ই যাবো।

বলতে বলতে সন্দীপ বিশাখাকে রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে গেল। বললে—ও-বাড়ির কোনও খবর জানো?,

—কোন্ বাড়ির?

জ্বর হবেই—

আবার বাইরে এল তপেশ গাঙ্গুলী।

ডাকলে—শৈল, ও শৈল—

শৈল আসতেই তপেশ গাঙ্গুলী বললে—তোমরা কী রকম মানুষ গো! বউদির গা তো জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে। তোমরা কেউ ডাক্তার-টাক্তার ডাকছো না? বিশাখা কোথায়? তাকে দেখছি নে যে—

—খুকুমণি বেরিয়েছে!

—বেরিয়েছে? কোথায় গেছে? কলেজে?

শৈল বললে—তা জানি নে।

—মা'র এই রকম জ্বর আর মা'কে এই অবস্থায় ফেলে মেয়ে বেরিয়ে গেছে। কী মেয়ে রে বাবা!

তপেশ গাঙ্গুলী মহাবিপদে পড়লো।

শৈলকে ডেকে বললে—শৈল, একটা কাজ করতে পারো?

—কী?

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—এই কুড়িটা টাকা তিরিশটা পয়সা আমার ট্যাক্সির ভাড়া উঠেছে। তিরিশটা পয়সা আমার কাছে আছে, কিন্তু কুড়িটা টাকা আমায় দিতে পারো, তাহলে নিচেয় গিয়ে ট্যাক্সীর ভাড়াটা মিটিয়ে দিয়ে আসি—

শৈল বললে—আমার কাছে তো কিছু টাকা নেই বাবু—

—তোমার কাছে টাকা নেই? কেন? তোমার কাছে টাকা নেই কেন গো?

শৈল বললে—গেল দু'মাসের মাইনেই তো পাইনি!

—কেন?

শৈল বললে—কেন মাইনে পাইনি তা কী করে বলবো?

সর্বনাশ! ট্যাক্সি-ড্রাইভারটা নিচেয় অপেক্ষা করছে টাকার জন্যে আর ওদিকে ট্যাক্সির মিটারের অংকও তো ধাপে-ধাপে উঠছে—

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—আচ্ছা, বউদির টাকা-পয়সা কোথায় থাকে তুমি জানো?

শৈল বললে—মা'র কাছে একটা টাকাও নেই। আজ দু'দিন টাকার অভাবে রান্নাই হচ্ছে না বাড়িতে—

তপেশ গাঙ্গুলী যেন আকাশ থেকে মাটিতে ধপাস করে বসে পড়লো! তাহলে কী হবে?

চাকরি মানেই চাকরগিরি। চাকরের যেমন ছোট-বড় নেই, চাকরিরও তেমনি ছোট-বড় কিছু নেই। তফাৎ শুধু মাইনের অংকতে। কয়েক মাসের চাকরিতেই সন্দীপ সেই কথাটা সঠিকভাবে বুঝে গিয়েছিল। অফিসে শুধু শুভাকাঙ্ক্ষী একজনই ছিল না। বলতে গেলে সবাই-ই ছিল সুপারভাইজার পরেশ ধর। সবাই-ই মুখে ছিল তার শুভাকাঙ্ক্ষী। সবাই-ই মুখে বলতো—এ বড় খারাপ জায়গা ভাই, এখানে কাউকে বিশ্বাস করো না।

প্রথম-প্রথম এই সব কথা সে মনে মনে বিশ্বাস করতো।

সবাই-ই বলতো এখানে কেউ কাউকে দেখতে পারে না। কিন্তু দেখবে বাইরে সবার সঙ্গে সবাই-এর গলাগলি ভাব! ওই যে সুপারভাইজার পরেশ ধর, ও বাইরে কত ভালো। তোমার মুখের সামনে তোমার খুব প্রশংসা করবে, কিন্তু আড়ালে?

সন্দীপ এ-সব কথা খুব আগ্রহী হয়ে শুনতো।

তারা বলতো- তোমাকে প্রমোশন পাইয়ে দেওয়ার লোভ দেখিয়ে তোমার পয়সায় যেমন মাংসের কারি খাবে, তেমনি অন্য অনেকের পয়সাতে আবার তাদেরও কাছে মাংসের কারি, ডিমের অমলেট এই সব খাবে!

ততদিনে সন্দীপের দিব্য-দৃষ্টি খুলে গেছে। অনেক দুঃখ পেয়ে, অনেক দেখে, অনেক শিখে, অনেক ভুগে, অনেক ঠকে বুঝে গিয়েছে যে মানুষের এই সংসারের মত বিচিত্র বিস্ময়-আর কিছুতেই নেই আর কোথাওই নেই। এখানকার দারিদ্র্যও সে দেখলো আর এখানকার তথাকথিত ঐশ্বর্যও সে দেখলো। কিন্তু আসল মনুষ্যত্ব দেখবার জন্যে সে তখন থেকে ছটফট্ করতে লাগলো।

কিন্তু এই ব্যাঙ্কের চাকরিতে এসেও তার সে-আশা মিটবে কি না কে জানে! হয়ত মিটবে না। চাকরির প্রথম ধাপেই তার স্বাস্থ্য-পরীক্ষার জন্যে ডাক্তারকে যে পঞ্চাশ টাকা ঘুষ দিতে হয়েছিল সে-কথা সে জীবনে কখনও ভুলতে পারবে কি না সন্দেহ।

সেদিন খগেন এসে বললে—সন্দীপদা, তোমাকে কে একজন মেয়ে ডাকছে—

—মেয়ে? আমাকে?

সন্দীপ চমকে উঠলো। বললে—মেয়ে? তার মানে?

তাকে কোন্ মেয়ে এই ব্যাঙ্কে ডাকতে আসবে? কোনও মেয়ের সঙ্গেই তো তার পরিচয় নেই। তাহলে কি তার মা কোনও বিপদে পড়ে কলকাতায় এসেছে? কলকাতায় এসে তার ব্যাঙ্কের ঠিকানা খুঁজে তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে?

খগেনকে জিজ্ঞেস করলে—কী রকম চেহারা রে খগেন? কালো মতন, খুব বয়েস হয়েছে?

- না-না, এ খুব কম বয়েস, গায়ের রং খুব ফরসা...

সন্দীপ তবু বুঝতে পারলে না। খগেন বললে- ওই তো, দেখ না। ওই যে, ওই গেটের কাছে?"

কাউন্টারে এখন অনেক লোকের ভিড়। তাদের মাথা পেরিয়ে দূরে গেটের সামনে যে-মেয়েটা দাঁড়িয়ে আছে তার দিকে চেয়েই সন্দীপ অবাক হয়ে গিয়েছে! বিশাখা দাঁড়িয়ে আছে কেন? বিশাখা কেন তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে!

তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে উঠে বাইরের দিকে চলতে গিয়েই তার হাতের ধাক্কা লেগে যাদববাবুর গেলাসটা জলসুদ্ধু সিমেন্টের মেঝের ওপর পড়ে গিয়ে চারদিকে জলে জলাকার হয়ে গেল। আর তার সঙ্গে কাঁচের টুকরোগুলো পড়ে জায়গাটা খালি পায়ে চলার পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠলো!

হঠাৎ এই দুর্বিপাকে প্রায় সমস্ত অফিসটাই যেন সচকিত হয়ে উঠেছে।

- কী হলো হে যাদব? গেলাস ভাঙলো কী করে? কে ভাঙলে?

শুধু গেলাসটা ভাঙলে তেমন ক্ষতি ছিল না। কিন্তু তার সঙ্গে যাদবের লেজারের খাতার ওপর জল পড়ে খাতায় লেখা অঙ্কগুলোও যে অপাঠ্য দুর্বোধ্য ঝাপসা হয়ে গেল সেইটেই চরম ক্ষতি।

সন্দীপ তখন অপরাধীর মত চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে! তার যেন কথা বলবার ক্ষমতাটুকুও তখন বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। ক্ষমা চাইবার ক্ষমতাও যেন তখন আর তার নেই। সে শুধু বলে উঠলো—যাদবদা, আমিই দোষ করেছি—

—ওই বারোর-এ বিডন স্ট্রীটের মুখার্জিদের বাড়ির?

বিশাখা উল্টে প্রশ্ন করলে—তুমি জানো না?

সন্দীপ বললে—এখনকার খবর জানি না, অনেকদিন মল্লিক-মশাই-এর সঙ্গে দেখা করতে পারিনি কি না। তা ছাড়া।...

বিশাখা বললে—তুমি না জানলেও আমি জানি। আমি শুনেছি—

—কী শুনেছ?

বিশাখা বললে—আমার সঙ্গে যার বিয়ে হবার কথা ছিল, সে বিলেত থেকে ফিরে এসেছে—

সন্দীপ বললে—তারপর? তারপর আর কোনও খবর দেয়নি ওরা?

বিশাখা বললে—তারপর আর কী খবর দেবে?

—তারপর থেকেই ওরা টাকা পাঠানো বন্ধ করেছে?

—হ্যাঁ—

সন্দীপ বললে—কিন্তু কেন টাকা পাঠানো বন্ধ করলে সে-সব কথা কেউ তোমাদের জানায়নি?

বিশাখা বললে—তুমিও তো সব জানতে, তুমিই বা কোনও খবর আমাদের জানলে না কেন? আসলে তোমরা সবাই-ই এক. তোমরা সবাই-ই সুখের পায়রা—

সন্দীপ বললে—তুমিও আমাকে দোষ দিচ্ছ?

বিশাখা বললে—দেব না? যখন আমাদের সুসময় ছিল তখন তুমি দুবেলা আমাদের খবর নিতে। আর এখন, যখন আমরা বিপদে পড়েছি তখন সেই আমাকেই কিনা তোমার কাছে এসে ভিক্ষে চাইতে হলো!

—ভিক্ষে? ভিক্ষে বলছো কেন?

বিশাখা বললে—ভিক্ষে বলবো না তো কী বলবো। আমার মা মনের দুঃখে মরো-মরো, একটা টাকা পর্যন্ত হাতে নেই যে ডাক্তার ডাকবো ওষুধ কিনবো—চাল-ডাল কেনা তো দূরের কথা। এই ভিক্ষে চাওয়ার পেছনে যে কী লজ্জা, কী জ্বালা তা তুমি কেন, কেউই বুঝতে পারবে না।

সন্দীপ বললে—সত্যি বলছি বিশ্বাস করো, আমি মাকে নিয়ে বড্ড ব্যস্ত ছিলুম, এতদিন রোজ দেশ থেকেই আসা-যাওয়া করছি। সেই সক্কাল বেলা ভাতে-ভাত নাকে-মুখে গুঁজে কোনও রকমে বেরোই আর বাড়ি ফিরতে ফিরতেই অন্ধকার রাত হয়ে যায়।

বিশাখা বললে—তোমার মা'র তবু তো তুমি আছো, কিন্তু আমার মা'র? আমার মা'র কে আছে? আমার যদি একটা ভাই-টাই কেউ থাকতো তাহলে কি লজ্জার মাথা খেয়ে আজ তোমার কাছে ভিক্ষে চাইতে আসি?

সন্দীপ আপত্তি করতে লাগলো।

বললে—বার বার ভিক্ষে চাওয়া কথাটা বলে আর লজ্জা দিচ্ছ কেন? আমি এত কী অপরাধ করেছি তোমার কাছে যে তুমি এমন করে আমায় ঠকচ্ছো? তুমি আর 'ভিক্ষে' কথাটা বার বার বোল না—

বিশাখা বললে—'ভিক্ষে' বলবো না তো কি 'ধার' বলবো? 'ধার' চাওয়ার কথা বললে তো আবার ধার শোধ দেওয়ার কথাও ওঠে। আমাদের কী ধার শোধ করবার ক্ষমতা আছে, না কোনও কালে সে-ক্ষমতা হবে?

তারপর বিশাখা একটু থেমে আবার বললে—যা হোক, তোমার অনেক সময় নষ্ট করে দিলুম, কিছু মনে করো না, আমি আসি—

বলে হন্-হন্ করে বাস-রাস্তার দিকে এগিয়ে গেল। আর একটা বাস আসতেই

বিশাখা তাতে উঠে বসলো।

আর সন্দীপ! সন্দীপ সেই একই জায়গায় স্থাণুর মত সেই দিকে চেয়ে নিথর-নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

মানুষের সংসার মানেই কেবল চাওয়া আর পাওয়া। সংসার কেবলই পেতে চায়। আর পেতে চাওয়ার কখনও শেষ হয় না বলেই সংসারে যত কষ্ট। যদি কেউ বলে যে সংসারে যা কিছু পাওয়ার তা আমি পেয়ে গিয়েছি, আমার যা সঞ্চয় করবার তা করে নিয়েছি, তাহলেই তার মৃত্যু। এ-সংসারে থেমে যাওয়া মানেই মৃত্যু হওয়া। কারণ মানুষের আসল ধর্মই হচ্ছে পথিক-ধর্ম। যে এই পথিক-ধর্ম ছেড়ে থেমে যাবে তাকেই সংসার থেকেই সরে দাঁড়াতে হবে। কারণ সংসার কেবলই সরে, কেবলই সরায়। এখানে হয় সরতে থাকো নয় মরতে থাকো। কোনও জিনিসই স্থির নয় এখানে।

ইতিহাসও এই সত্যের সাক্ষ্য দেয়। কত পুরোন সভ্যতা এসেছে। তারপর তা একদিন অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। কোথায় গেল সেই মহেঞ্জোদারো, কোথায় গেল সেই রোম-সাম্রাজ্য?

কিন্তু তাহলে কি কিছুই থাকে না?

থাকে একমাত্র তাই-ই যার মধ্যে চাওয়া আর পাওয়ার প্রশ্ন নেই। প্রশ্ন আছে কেবল দেওয়ার। সেই দেওয়ার নামই হলো ভালোবাসা। ভালোবাসা কেবল দিয়েই কৃতার্থ। সে কেবল বলে—নাও নাও- নাও। প্রতিদানে আমি কিছুই চাই না। শুধু তুমি নিলেই আমি ধন্য হবো।

এই দেয়ার কথাই বলে গেছেন সক্রেটিস্, বুদ্ধ, নানক, মহম্মদ, চৈতন্য, থেরো, ইমারসন্, গান্ধী, মার্টিন লুথার কিং, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ। আর সেই জন্যে এঁরা আছেন। সংসার এঁদের সরাতে পারেনি, নড়াতে পারেনি, ধ্বংস করতে পারেনি।

– কাকা- -

মুক্তিপদ গলার শব্দতেই বুঝতে পেরেছিলেন টেলিফোন করেছে সৌম্য। তাঁর ভাইপো সৌম্য মুখার্জি। বিলেত পাঠাবার আগে যে-সৌম্যকে তিনি কত করে শিখিয়ে পড়িয়ে ছিলেন, কত করে উপদেশ দিয়েছিলেন যাতে সে কোম্পানির কাজ-কর্ম বুঝে নিতে পারে, জগতে ভালো করে নিজের দাবী পেশ করতে পারে। কিন্তু তার এই অধঃপতনের পরিচয় পেয়ে তিনি যত মর্মাহত হয়েছিলেন, তার চেয়ে বেশি হয়েছিলেন বিস্মিত।

কিন্তু মুক্তিপদ কী করে জানবেন যে সংসারে যে কিছু চেয়েছে সে-ই মরেছে? কী করে জানবেন যে কিছু চাইলেই মৃত্যু তার অনিবার্য? কী করে জানবেন যে যারাই কিছু চায় সংসার তাকে সরিয়ে দেয়? আজ সৌম্য মুখার্জির যা হয়েছে একদিন মুক্তিপদ মুখার্জিরও তাই হবে, এ-কথা তাঁকে বলে দিলেও কি তিনি তা

তখন বিশ্বাস করতেন?

—কী ব্যাপার?

সৌম্য ওদিক থেকে বললে—ঠাকমা-মণি কিরকম যেন করছেন। তুমি একবার এসো এখ্খুনি—

—ঠিক আছে, আমি এখ্খুনি যাচ্ছি—

মুক্তিপদ আর দেরি করলেন না। সোজা একেবারে ডাক্তারকে নিয়েই ঠাকমা-মণির কাছে এসে পড়লেন। যেদিন থেকে সৌম্য ইণ্ডিয়াতে এসেছে সেই দিন থেকেই ঠাকমা-মণি অসুস্থ। কিন্তু এর আগে কোনও দিন সৌম্য ঠাকমা-মণির ঘরে যায়নি। একবার দেখতে পর্যন্ত যায়নি ঠাকমা-মণিকে।

সেদিন হঠাৎ বিন্দু বারান্দায় দাদাবাবুকে দেখেই বলেছিল—দাদাবাবু, ঠাকমা-মণি কেমন করছেন—

—কী রকম করছেন?

—আমার খুব ভালো মনে হচ্ছে না—

—কই দেখি,—

তারপর ঠাকমা-মণির ঘরের সামনে গিয়ে একবার উঁকি দিয়ে দেখলে। যে ঠাকমা-মণি সৌম্যকে কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছে, সেই ঠাকমা-মণির অসুখে যে তাঁকে একটু সেবা করা দরকার, তাও মনে থাকে না সৌম্যর! এই-ই হচ্ছে সংসার।

দূর থেকে একটু উঁকি মেরে দেখেই সৌম্য নিজের ঘরে ফিরে এল। রীটা তখনও বিছানায় কাত্ হয়ে পড়েছিল। আগের রাত্রে তার একটু বেশি হুইস্কি খাওয়া হয়ে গিয়েছিল।

দরজাটা খুলতেই তার চোখে একটু আলো লেগে গেছে। আর সঙ্গে সঙ্গে তার নেশার ঘোর কেটে গেল। বড় দামী নেশা। দামী নেশা যদি কারো অসাবধানতায় হঠাৎ কেটে যায় তাহলে তো সমস্ত মজাটাই মাটি! সঙ্গে সঙ্গে রীটা রেগে গেছে। জড়ানো গলায় বলে উঠলো—ব্রুট্

সৌম্য কাছে গিয়ে আস্তে আস্তে রীটার মাথায় হাত বুলোতে লাগলো। বললে—জানো রীটা, আমার ঠাকমা-মণি খুব সিক, বোধহয় বাঁচবে না—

রীটা বিরক্ত হয়ে রেগে উঠে বললে—বুড়ী মরে যাক্ না, এতদিন বেঁচে থাকে কেন?

সৌম্য খুব শান্ত গলায় বললে—ছিঃ, ও-রকম বলতে নেই, ওল্ড্ লেডী আমাকে কষ্ট করে মানুষ করেছে।

রীটার তখনও ঘোর রয়েছে নেশার। বলে উঠলো—তা ওল্ড লেডী মরে না কেন? হাউ লং সি উইল্ লিভ? বুড়ী আর কতদিন বাঁচবে?

সৌম্য বুঝতে পারলে যে রীটা তখন রেগে গেছে। রাগলে রীটার যে জ্ঞান থাকে না, তা সে লণ্ডনেই দেখে এসেছে।

বললে—তোমার মা-ও তো বুড়ী, তার বেলায়?

রীটা বললে—আমার মা'র সঙ্গে ওই ওল্ড্ ফুলের তুলনা? দ্যাট ওল্ড ফুল?

সৌম্য বুঝলে যে রীটাকে আর বেশি চটানো উচিত নয়। এ-রকম হয়। কেউ-কেউ একটুখানি পেটে পড়লেই মাতাল হয়ে পড়ে। আবার কেউ পুরো একটা বোতল খেলেও মাথা সোজা করে থাকে। লনডনে রীটারও ওই রকম হতো। এক পেগ খেলেই রীটা মাতাল হয়ে পড়তো। ভুল বকতো, আবোল-তাবোল কথা বলতো। তখন তার কিছুরই হিসেব থাকতো না। তখন তাকে কোল করে বাড়িতে নিয়ে যেতে হতো।

তখন রীটাই উল্টে সৌম্যকে দোষ দিত। বলতো—আমাকে কেন এত খাইয়ে দিলে তুমি? কেন এত খাওয়ালে?

সৌম্যও বলতো- আমি কোথায় খাওয়ালুম তোমাকে? তুমিই তো আরো খাবার জন্যে আমাকে পীড়াপীড়ি করতে লাগলে!

তখন রীটার মুখ দিয়ে গালাগালির খই ফুটতো—ব্লাডি, বাগার, বস্টার্ড...

তখন রীটা সৌম্যকে যত গালাগালি দিত সৌম্যর তত ভাল লাগতো। নেশা করে যদি মাতলামিই না করলুম তো নেশা করে লাভটা কী হলো? গালাগালি না দিলে মনে হতো শুধু শুধু টাকাগুলো নষ্ট হলো, টাকাগুলো বুঝি একেবারে জলে গেল।

সেই সব দিনগুলোর কথা তখনও মনে আছে সৌম্যর। সৌম্য কলকাতার নাইট ক্লাবেও গিয়েছে। জীবনে ফুর্তি করবার যতরকম রাস্তা আছে সব রাস্তাই মাড়িয়ে এসেছে সে! কোনও দিন তা থেকে তার ক্লান্তি আসেনি, একঘেঁয়ে লাগেনি। যত ফুর্তি করেছে তত ফুর্তির নেশা বেড়েছে। শুধু কি মদ? শুধু কি মেয়েমানুষ? আরো কত রকমের নেশা করতে পাওয়া যায় কলকাতায়। কলকাতা শহরে কী নেশাই বা না-পাওয়া যায়? হাতে পয়সা থাকলে কিছুরই ভাবনা করবার দরকার নেই। চীনে পাড়ায় বাচ্ছা সাপের ছোবলও খেতে পারো। একটা সিগারেটের কৌটো মুখের কাছে এনে ঢাকনাটা খুললেই ছোট্ট একটা সাপের বাচ্ছা তোমার জিভে ছোবল মারবে। আর সঙ্গে সঙ্গে তুমি নেশার আরামে ঢলে পড়ো। পাশেই তোমার আরামের জন্যে ধব্‌ধবে নরম গদী লাগানো বিছানা আছে, তাতে শুয়ে পড়ো। যতক্ষণ ইচ্ছে তুমি ঘুমোও, কেউ তোমাকে বাধা দেবে না, কেউ কোনও আপত্তি করবে না।

কিন্তু এ-সব অভিযানের খবর কেউ জানতে পারতো না। ঠাকমা-মণি ভাবতেন গিরিধারী কাঁটায় কাঁটায় রাত ন'টার সময় বাড়ির সদর গেট যখন বন্ধ করে দিয়েছে, তখন আর কোনও পাপ বাড়ির ভেতরে ঢুকতে পারবে না। কারণ যত পাপ তা তো সব রাত্রের অন্ধকারেই ঘটে। সুতরাং রাত নটায় সদর গেট বন্ধ করলেই নিশ্চিন্ত। দিনের সূর্য ওঠার পর থেকে রাত ন'টা পর্যন্ত পাপের আক্রমণের কোনও ভয় নেই।

তারপর কত রাত এল আর গেল, রাত ন'টার সময় গিরিধারী গেট বন্ধ করলো কি না, তা দেখবার দায় আর কারো রইলো না। যে-মানুষটা দেখতে পেতেন, সে-মানুষটা এখন অজ্ঞানে অচৈতন্য হয়ে তাঁর বিছানায় পড়ে রইলেন। এখন যেখানে যত পাপ আছে সব বাড়ির ভেতরে এসে ঢুকুক, কেউ বারণ করবার নেই, কেউ বাধা দেবার নেই, কেউ শাসন করবার নেই। সর্বত্র অরাজক অবস্থা।

কিন্তু সংসার তো বসে থাকবে না কখনও। সে নিজে সরবে, অন্যদেরও সরাবে। তাই মুক্তিপদ যখন টেলিফোনে বললেন যে তিনি ডাক্তার নিয়ে আসছেন তখন সৌম্য একটু ব্যস্ত হয়ে উঠলো।

রীটাকে ডাকলে সে। বললে—ওঠো, ওঠো, গেট্ আপ্—

রীটা বলে উঠলো—কেন উঠবো? কী হয়েছে? হোয়াট্‌স্ আপ্—

সৌম্য বললে—আমার আঙ্কল্ আসছে—

—আঙ্কল্ আসছে তো আমার কী? তুমি তোমার আঙ্কলকে ভয় পেতে পারো, কিন্তু আমি ভয় পাবো কেন? সে আমার কে?

সৌম্য দেখলে মাতালকে ঘাঁটিয়ে লাভ নেই, তাই আর দেরি না করে ড্রেসিং-গাউনটা খুলে ড্রেস করে নিলে। আয়নায় মুখটা একবার দেখে নিলে—আগের রাতের কোনও ছাপ তখনও তার মুখে চোখে লেগে আছে কিনা! আগের রাতে বাড়ি ফিরতে ভোর হয়ে গিয়েছিল একেবারে। সে-সব অত্যাচারের ছাপ অনেক সময়ে চোখে-মুখে

থাকে। সে-রকম ছাপ আছে কি না কে জানে!

বাইরে থেকে বিন্দু ডাকলে দাদাবাবু, মেজবাবু এসেছেন—

—হ্যাঁ যাই—

ততক্ষণে ডাক্তার যা দেখবার, যা বলবার, যা ব্যবস্থা করবার করে চলে গেছেন। সৌম্য যেতেই মুক্তিপদ বললেন—কী হলো, এখন ঘুম থেকে উঠলে নাকি? বিকেল পর্যন্ত ঘুমোচ্ছ কেন?

সৌম্য বললে—না, একটু রেস্ট নিচ্ছিলাম!

—ওই একই কথা। কী এত কাজ থাকে তোমার যে এই বিকেল পর্যন্ত রেস্ট নিচ্ছ? সকাল থেকে তো কোনও কাজই থাকে না তোমার! কী করো কী সারাদিন?

সৌম্য এ-কথার কী জবাব দেবে বুঝতে পারলে না। সত্যিই তো সারাদিন কোনও কাজই নেই!

—তোমার ঠাকমা-মণির এই শরীর খারাপ। আর হয়তো বেশিদিন বাঁচবেনও না। আমি কত দূর থেকে এসে মাকে দেখে যাই, আর তুমি বাড়িতে থেকেও তার একবার অবস্থাটা দেখতেও আসো না। তুমি তো আর ছেলেমানুষ নেই এখন, এখন সব বোঝবার বয়েস হয়েছে, এ-রকম করলে কী করে চলবে?

এত কড়া কথা সৌম্যকে আগে আর কখনই কেউ বলেনি। সৌম্যও এ-রকম কথা শুনতে কখনও অভ্যস্ত নয়। কী বলবে সে?

মুক্তিপদ আবার বলতে লাগলেন—আর তুমি কি জানো যে আমাদের ফ্যাক্টরিতে এখন লক্-আউট্ চলছে?

সৌম্য বললে—জানি—

—কেন লক্-আউট্ চলছে তা কি জানো?

এবার সৌম্য চুপ করে রইল।

কিন্তু মুক্তিপদ ছাড়লেন না। বললেন—চলছে তোমার জন্যে! তুমিই এর জন্যে দায়ী। আমি কত চেষ্টা করে তোমার জন্যে এমন একটা পাত্রী জোগাড় করলুম যাকে বিয়ে করলে আমাদের লেবার-ট্রাবল্ মিটে যেত। বিখ্যাত লেবার-লীডার সুবীর চ্যাটার্জির বোন সেই পাত্রী। কথা-বার্তা সব পাকা করে ফেলেছিলুম। তুমি ইণ্ডিয়াতে আসবে, তখন তোমার বিয়ে হবে আর তারপরেই আমাদের ফ্যাক্টরির লক-আউট্ মিটে যাবে। কিন্তু কোথা থেকে কাকে বিয়ে করে নিয়ে এলে, আর সঙ্গে সঙ্গে তাদের সঙ্গে মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়ে গেল। আর সেই দিনই তোমার বিয়ের খবর কানে যেতেই তোমার ঠাকমা-মণির এই স্ট্রোক! এর সব-কিছুর জন্যেই তুমি দায়ী—তা কি একবারও ভেবেছ?

সৌম্য তখনও চুপ!

মুক্তিপদ আবার বললেন—আর তোমার গাড়িটা। গাড়িটা শুনলুম ভেঙে গেছে। কী করে ভাঙলো?

সৌম্য এইবার প্রথম কথা বললে। বললে—পাব্লিক ভেঙে দিয়েছে—

—কেন? পাব্লিক ভেঙে দিলে কেন? তুমি কী করেছিলে?

—আমি কিছুই করিনি।

—তুমি কিছুই করোনি তবু পাব্লিক তোমার গাড়ি ভেঙে দিলে?

সৌম্য বললে আজকাল কলকাতায় এই রকমই হচ্ছে। গুণ্ডো-মাস্তানরা যেখানে-সেখানে যখন-তখন যা-খুশী তাই করছে।

মুক্তিপদ জিজ্ঞেস করলেন—গাড়ি যে তোমার ভাঙলো তার জন্য থানায় গিয়ে ডায়েরি করেছ?

—না।

—কেন, ডায়েরী করোনি কেন? জানো না ডায়েরী করা থাকলে ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানি থেকে পুরো খরচটা আদায় করা যায়? এ-সব যদি না বোঝ তো আমি মরে গেলে তুমি ফ্যাক্টরি চালাবে কী করে? আমি তো চিরকাল থাকবো না, তখন কী হবে? ফ্যাক্টরি উঠে যাবে? বলো ডায়েরী করোনি কেন?

সৌম্য বললে—আমার এক বন্ধু বলেছিল সে নিজে থানায় গিয়ে ডায়েরী করে দেবে।

—তোমার বন্ধু? কী নাম তোমার বন্ধুর?

সৌম্য বললে—গোপাল হাজরা। সে পার্টি করে—

—গোপাল হাজরা? সে তোমার বন্ধু? সে তো নিজেই একটা গুণ্ডা! ও-সব লোকের সঙ্গে তোমার কী করে ভাব হয়? ওই গোপাল হাজরা, বরদা ঘোষাল, ওরা তো আমার কাছ থেকে লক্ষ-লক্ষ টাকা চাঁদা নেয়! আমাদের টাকাতেই তো ওদের পার্টি চলে। ওদের সঙ্গেই তোমার পরিচয়? আশ্চর্য কাণ্ড! তুমি ওদের কথার ওপর বিশ্বাস করো? ওরাই তো আমাদের এক নম্বর এনিমি!

সৌম্য চুপ করে রইলো। মুক্তিপদ আবার বলতে লাগলেন—শুনলুম তুমি আর একটা নতুন গাড়ি কিনেছ?

সৌম্য বললে—হ্যাঁ সেকেণ্ড্ হ্যাণ্ড্—

—কোথা থেকে কিনলে?

—ওই গোপাল হাজরাই আমাকে কিনে দিলে! ও ভাঙা গাড়িটা বিক্রী করে দিলে আর তার বদলে আমি এই গাড়িটা নিলুম—

—কত টাকা তোমাকে পে করতে হলো?

—বেশি নয়, চল্লিশ হাজার টাকা!

মুক্তিপদ মনে মনে হাসলেন। ব্যঙ্গের হাসি! সৌম্যর কাছে আজ চল্লিশ হাজার টাকা বেশি নয়! জানে না তো কোথা থেকে এ টাকাগুলো এল, কারা এ টাকাগুলো দিলে, কাদের মাথার ঘাম পায়ে ঝরিয়ে এ টাকাগুলো উপার্জন করতে হয়েছে। এ টাকাগুলোর পেছনে যে কত হাজার লোকের দিনের অবসর আর রাতের ঘুম বিসর্জন দিতে হয়েছে, সে-কথা যদি সৌম্য জানতো তাহলে আর এত অবলীলায় সে আজ গাড়ি কিনতে পারতো না! অন্ততঃ কেনবার আগে হাজার বার ভাবতো!

মুক্তিপদর মনে হলো তিনি সৌম্যর গালে জোরে এক থাপ্পড় মারেন। থাপ্পড় মারলেও যেন তার রাগ মিটবে না। কিন্তু না, তিনি নিজেকে সংযত করে নিলেন। তিনি যদি রাগে বেসামাল হয়ে পড়েন তো সৌম্যর কোনও ক্ষতি হবে না, ক্ষতি হবে তাঁর নিজেরই। তাঁর নিজেরই ব্লাড্-প্রেসার বেড়ে যাবে।

সৌম্য তখনও সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

মুক্তিপদ এবার বললেন তুমি কি জানো যে আমাদের ফ্যাক্টরিতে লক্-অউট্ চলছে আমাদের কোনও আমদানি নেই?

এবার একটু থামলেন। তারপর সৌম্যকে আবার জিজ্ঞেস করলেন—কই, কিছু জবাব দিচ্ছ না যে? জানো তুমি?

সৌম্য একটু ছোট করে জবাব দিলে—জানি!

মুক্তিপদ বললেন—তাহলে কেন তুমি এত টাকা নষ্ট করে গাড়ি কিনলে?

সৌম্য বললে—গাড়ি না হলে আমার কী করে চলবে?

মুক্তিপদ বললেন—যাদের গাড়ি নেই তাদের দিন কি চলে না?

একটু থেমে নিয়ে মুক্তিপদ আবার বললেন—আর তা ছাড়া গাড়ি যদি একান্তই

জরুরী মনে করো তো ভাঙা গাড়িটা মেরামত করিয়ে নিলেই চলতো। তাতে অনেক কম টাকাই খরচ হতো!

এর জবাবে সৌম্য কোনও কথাই বললে না।

মুক্তিপদ বললেন—মানুষ তো নিজের আয় বুঝেই খরচ করে। তুমি কি জানো না যে এখন কারখানার প্রোডাকশান বন্ধ থাকার দরুন আমাদের ইন্‌কাম কমে গেছে! এ-সব কথা যদি এখনই এই বয়েসে না বোঝ তা কবে বুঝবে? আর কবে সাবালক হবে?

সৌম্য তখনও আপরাধীর মত চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

মুক্তিপদ বললেন—কই, তুমি কিছু বলছো না যে? কথা বলো, জবাব দাও?

সৌম্য তবু চুপ।

মুক্তিপদ বললেন—আর এটা তুমি কী করলে বলো তো, এই বিয়ে করা। বলা নেই কওয়া নেই, হুট করে কাকে তুমি বিয়ে করে আনলে? ও কে? কাদের বাড়ির মেয়ে?

সৌম্য তবু চুপ করে রইল।

মুক্তিপদ বললেন—তুমি জানো তোমার ঠাকমা-মণি তোমার বিয়ের জন্যে দিন-রাত ভাবনা চিন্তা করেছেন। যার-তার হাতে তোমাকে তুলে দেবেন না বলেই কত জ্যোতিষীকে গিয়ে তোমার কুষ্টি-টুষ্টি দেখাচ্ছেন। সে-সব জেনেও তুমি এই কাণ্ড করে বসলে? তুমি একবার ভেবে দেখ তোমার এই বিয়ের জন্যে তোমার ঠাকমা-মণি মনে কত বড় ধাক্কা খেয়েছেন!

হঠাৎ ভেতর থেকে একটা মেয়েলি গলায় আওয়াজ এল—সোমো, সোমো,

মুক্তিপদ বুঝলেন সৌম্যর মেমসাহেব বউ ভেতর থেকে ডাকছে।

সৌম্য বললে—কাকা, আমি যাই—

—হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি যাও—যাবে বই কি, যাও—যাও—

মুক্তিপদর সারা মনটা বিরক্তিতে তেতো হয়ে উঠলো। দায়িত্ব-জ্ঞান না থাকলে যে মানুষ কত অমানুষ হতে পারে, তারই নমুনা এই সৌম্য।

মুক্তিপদও এর পরে আর সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেন না। ডাক্তারবাবু যা বলে গেলেন তাতে জানা গেল যে মাকে আরো অনেক দিন ওই রকম পড়ে থাকতে হবে। এবং সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসাও চালিয়ে যেতে হবে। এ ছাড়া অন্য কোনও পথ নেই। 'সান্যাল মুখার্জি' কোম্পানির আজ যে অবস্থা মা'র অবস্থাও ঠিক সেই একই রকম। কোনও দিক থেকে কোনও সুরাহা হওয়ার আশা নেই। এই অবস্থায় একমাত্র উপায় এক্স্‌পেনডিচার কমিয়ে দেওয়া। যে-খরচটা কেবল না করলে নয় সেইটেই শুধু খরচ করতে হবে। বাজে-খরচ একেবারে কমিয়ে ফেলতে হবে। সমস্ত বাজে-খরচ ছাঁটাই করা দরকার।

ভাবতে ভাবতে মুক্তিপদ সিঁড়ি দিয়ে নিচেয় নেমে সদরের দিকেই যাচ্ছিলেন। কিন্তু কী ভেবে আবার সরকারবাবুর ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

মেজবাবুকে ঢুকতে দেখেই মল্লিক-মশাই উঠে দাঁড়ালেন।

মুক্তিপদ বললেন—সব বাজে-খরচ কমিয়েছেন তো সরকার মশাই?

মল্লিক-মশাই বললেন—আপনি যেমন-যেমন বলে দিয়েছিলেন তেমনি তেমনিই করেছি—

—বিধু আর ফটিককে ছাড়িয়ে দিয়েছেন তো?

মল্লিক-মশাই বললেন—হ্যাঁ, তাদের পাওনা-গণ্ডা পুরো মিটিয়ে দিয়ে ছাড়িয়ে দিয়েছি—

মেজবাবু আবার জিজ্ঞেস করলেন—আর ইলেকট্রিকের বিল? এ মাসে কত উঠেছে?

মল্লিক-মশাই বিলটা হাতে নিয়ে দেখালেন। বিলের ওপর লেখা অঙ্কটা দেখে খুশী হলেন খুব। বললেন—যাহোক তবু দেড়শো টাকার মতন কমেছে এ-মাসে-আরো অনেক খবর নিলেন মুক্তিপদ। সমস্তই খরচ কমানো সংক্রান্ত। তারপর বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু আবার হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন।

বললেন—আর সেই আমাদের রাসেল স্ট্রীটের বাড়িতে যারা ছিল, তাদের কী খবর? তারা কি এখনও সে বাড়িতে রয়েছে?

মল্লিক-মশাই বললেন হ্যাঁ—

—এখনও আছে কেন? আমি তো বলে দিয়েছিলাম ওদের উঠে যেতে বলতে। খবরটা বলেছেন ওদের?

মল্লিক-মশাই অপরাধীর মত বললেন—বলিনি এখনও—

মুক্তিপদ বললেন—কেন? বলেননি কেন? ওদের মাস-কাবারি টাকাটাও কি আগের মত দিয়ে যাচ্ছেন নাকি?

মল্লিক-মশাই বললেন—না, তা দিচ্ছি না—

—তা ওরা বাড়ি ছাড়বে কবে?

মল্লিক-মশাই বুঝতে পারলেন না এ-কথার কী জবাব তিনি দেবেন!

—আর অরবিন্দ গাড়ি নিয়ে যায় না তো ওদের বাড়িতে?

—না, সেটা আমি বন্ধ করে দিয়েছি। গাড়ি পাঠানোও বন্ধ করে দিয়েছি। মাস্টারদের পড়ানোও বন্ধ করে দিয়েছি। সে-সব খরচ এখন আর নেই।

মুক্তিপদ বললেন—কিন্তু ওরা বাড়ি না ছাড়লে ইলেকট্রিকের বিলের টাকা তো দিয়ে যেতেই হবে।

মল্লিক-মশাই বললেন—তা তো দিতেই হবে—

—এবার তাহলে ইলেকট্রিক-কোম্পানিকে লাইনটা কেটে দিতে নোটিশ দিয়ে দিন, ওরা যতদিন ও-বাড়িতে থাকবে ততদিনই তো বিলের টাকা দিয়ে যেতে হবে। সব কাজ কি আমাকে বলে দিতে হবে তবে আপনি করবেন? তাহলে আপনাকে রাখা হয়েছে কেন?

তারপর হঠাৎ যেন আরো একটা কথা মনে পড়ে গেল।

বললেন—আর হ্যাঁ, সেই ছেলেটা? আপনাদের দেশের লোক, ওদের দেখা-শোনা করবার জন্যে যাকে রাখা হয়েছিল! মাসে মাসে পনেরো টাকা করে মাসোহারা দেওয়া হতো, সে কোথায়? সে এখনও থাকে নাকি এ-বাড়িতে?

—তার মায়ের অসুখ, সে এখন দেশে গেছে।

—তার মাসোহারা বন্ধ করে দিয়েছেন তো?

মল্লিক-মশাই বললেন—হ্যাঁ। সে এখন একটা ব্যাঙ্কে চাকরি পেয়ে গেছে।

মুক্তিপদ বললেন—হ্যাঁ, কেউ চাকরি পাক আর না-পাক এখানে একটা বাজে লোককেও আর থাকতে দেবেন না। এখন দেশে খুব খারাপ অবস্থা চলছে, চারদিকে লোকদের ভিড়, চুরি-চামারি খুব বেড়ে গেছে আজকাল, আপনি তো সবই দেখতে পাচ্ছেন। জিনিসপত্তরের দামও কত বেড়ে গেছে। আর এটা তো ধর্মশালা নয় যে যে যখন আসবে তাকেই বাড়িতে রেখে জামাই-আদরে পুষতে হবে!

বলতে বলতে হঠাৎ হাত-ঘড়িটা দেখে চমকে উঠলেন। যেন কী একটা জরুরী কাজের কথা মনে পড়ে গেল। আর মনে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বাইরে নিজের গাড়িতে গিয়ে উঠলেন।

মুক্তিপদবাবু চলে যাওয়ার পরেই মল্লিক-মশাই-এর ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো। এরই নাম চাকরি। এই মনিবের হুকুম তামিল করা আর ফাঁকি দেখলেই গলা টিপে ধরা। সত্যিই এর নাম চাকর-গিরি।

সন্ধ্যেবেলার দিকেই হঠাৎ সন্দীপ এসে দাঁড়ালো।

মল্লিক-কাকা সন্দীপকে দেখে অবাক।

—আরে, তুমি? তুমি হঠাৎ? আজকে বেড়াপোতায় যাওনি? কী হয়েছে তোমার? অমন মুখটা ভার-ভার কেন?

সন্দীপকে দেখেই বোঝা গেল সে সোজা ব্যাঙ্ক থেকেই আসছে। অনেকক্ষণ ধরে তার মুখ দিয়ে কোনও কথাই বেরোচ্ছিল না।

—কী হয়েছে তোমার? মা'র অসুখ কেমন? ভালো খবর তো সব? বোস, বোস—

সন্দীপ বললে—না কাকা, এখন আমি বসবো না। মনটা খুব খারাপ হয়ে গেছে। আজকে রাত্তিরের গাড়িতে বেড়াপোতায় যাবো, এ ট্রেনটায় যাওয়া হলো না। পরে শেষ ট্রেনটায় যাবো—

মল্লিক-কাকা জিজ্ঞেস করলেন—কী হয়েছে তাই বলো না?

সন্দীপ বললে, আজ রাসেল স্ট্রীটের বাড়ি থেকে বিশাখা আমার ব্যাঙ্কে এসেছিল। আমি তো এ-সব কিছুই জানতুম না।

মল্লিক-কাকা জিজ্ঞেস করলেন—কী কথা?

সন্দীপ বললে—ওদের মাসকাবারি টাকা নাকি বন্ধ করা হয়েছে। কথাটা আমার বিশ্বাস হলো না তাই আপনাকে জিজ্ঞেস করতে এসেছি—আপনি কিছু জানেন?

মল্লিক-কাকা বললেন—জানি বই কি। মেজবাবু নিজে আমাকে মাসকাবারি টাকা পাঠাতে বারণ করেছেন। আমি তো হুকুমের চাকর, তাই আমি শুধু হুকুম তামিল করেছি। কেন বিশাখা ওদের অসুবিধের কথা তোমাকে বলতে গিয়েছিল নাকি?

সন্দীপ বললে—অসুবিধে তো হচ্ছেই। তবে সেটার চেয়ে বড় কথা হচ্ছে আমার কাছে টাকা ধার চাইতে গিয়েছিল বিশাখা।

—তুমি টাকা দিলে?

সন্দীপ বললে—আমার টাকা তো সব ব্যাঙ্কেই থাকে, ওর কাঁদো-কাঁদো মুখ দেখে আমার খুব কষ্ট হলো, তাই...

—কত দিলে?

—আপাতত পাঁচশো টাকা দিলুম ওর হাতে। বলে দিলুম ছুটির পর ওদের বাড়িতে যাবো। ভাবলুম ওদের বাড়ি যাবার আগে একবার আপনার সঙ্গে দেখা করে জেনে যাই কথাটা সত্যি কি না।

মল্লিক-কাকা বললেন—যা শুনেছ ঠিকই শুনেছ তুমি। টাকা পাঠানো তো আগেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, এবার ওদের ইলেকট্রিক লাইনটা কেটে দেবার নোটিশ দেওয়া হবে। মেজবাবুর হুকুম—

সন্দীপ বললে—আমি তো এ-সব খবর কিছুই জানতুম না। বিশাখার কাছ থেকে যখন খবরটা শুনলাম তখন আমার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হলো।

মল্লিক-কাকা জিজ্ঞেস করলেন—মেয়েটা কেন এসেছিল তোমার কাছে?

সন্দীপ বললে—আমি বললুম তো, টাকা চাইতে। আমি পাঁচশো টাকা দিলুম। তার বেশি লাগলে তাও দেব বলে কথাও দিলুম। কিন্তু কথাটা হচ্ছে এই যে এখন এই অবস্থায় ওরা যাবে কোথায়? তাহলে কি থোঁতা মুখ ভোতা করে আবার সেই মনসাতলা লেনের বাড়িতেই যাবে? আবার সেই জা'এর কাছ থেকে লাথি-ঝ্যাটা খাবে

আগের মতন?

মল্লিক-কাকা বললেন—তা যদি থায়ই তো তাতে আমিই বা কী করবো আর তুমিই বা কী করবে? আমি তো কিছু করতে পারবো না। আমার হাত-পা বাঁধা। আর তুমি কী করবে তা তুমিই ভালো জানো!

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—তা মেজবাবু কী বললেন?

—মেজবাবু আর কী বলবেন, খরচ কমাতে বললেন—বললেন যে কোনও রকম বাজে খরচ করা চলবে না। বাড়িতে ঝি-চাকরদের বরখাস্ত করে দিতে বললেন। তাঁর কথা মতো আমি বিধু আর ফটিককে ছাড়িয়ে দিয়েছি। তারা কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল।

সন্দীপ বললে—তা হলে অন্য কোনও উপায় নেই বলছেন?

মল্লিক-কাকা বললেন—ও ছাড়া আমি আর কী বলবো, আমি তো উপায় বলে দেবার মালিক নই—যাঁকে বললে কাজ হতো তিনি তো এখন মরো মরো, তিনি আর বাঁচবেন কিনা তারও কোনও ঠিক-ঠিকানা নেই।

সন্দীপ বললে—ঠিক আছে, আমি তাহলে যাই—

মল্লিক-কাকা চুপ করে রইলেন। সন্দীপ বললে—আমি এখন রাসেল স্ট্রীটের বাড়িতেই যাই. আমি তো এই অবস্থায় ওদের এই বিপদের মুখে ফেলে রেখে চলে যেতে পারি না। একটা কিছু বিহিত আমাকে করতেই হবে—

বলে সন্দীপ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।
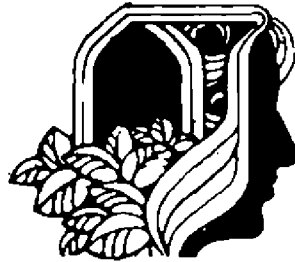
মানুষ থামতে জানে না। মানুষ থামতে ভয় করে। কারণ সে মনে করে থামা মানেই মৃত্যু। কিন্তু থামা তো মৃত্যু নয়। থামা মানে পূর্ণতা। হিমালয় থেকে বেরিয়ে নদী চলতে চলতে যেখানে সমুদ্র আছে সেখানেই গিয়ে সে থামে। এটা তার থামা নয়, পূর্ণতা।

মানুষের জীবনে ভোগও থাকে দানও থাকে। আর ভোগ বা দান যে জানে না, সে শুধু সঞ্চয়টাকেই জানে। কিন্তু যেখানে সেই সঞ্চয়টারও একটা সার্থক সমাপ্তি নেই সেখানে শুধু আছে লজ্জা। লজ্জাজনক কৃপণতা!

এই লজ্জাটাকেই সন্দীপ বরাবর ভয় করে এসেছে। সে বরাবর দেখে এসেছে যে করার আদর্শের চেয়ে হওয়ার আদর্শটাই বড়।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত কী হয়েছে সে? শেষ পর্যন্ত সে কী হতে পেরেছে? কী?

এসব পুরনো প্রসঙ্গ। সব মানুষ বোধহয় সব কিছুই হতে পারে না, কিন্তু সন্দীপের একটা মাত্র সান্ত্বনা এই যে সে কিছু হতে চেষ্টা করে এসেছে, কিছু হতে আপ্রাণ চেষ্টা করে এসেছে। সেই জন্যে নিজের কাছে অন্ততঃ সে নির্দোষ, আইনের চোখে সে যা-ই হোক না কেন, মানুষের সমাজ তার যে বিচারই করুক নিজের কাছে তো সে নিষ্পাপ!

মনে আছে সেই সেদিনকার সে-সব কথা। মল্লিক-কাকার কাছ থেকে বেরিয়ে রাসেল স্ট্রীটের বাড়ির দিকেই সে পা বাড়িয়েছিল। কিন্তু সেখানে যে তখন আর

এক নাটক চলছে তা সে কী করে জানবে?

বিশাখা সন্দীপের কাছ থেকে পাঁচশো টাকার নোটগুলো নিজের ব্যাগের মধ্যে পুরে যখন রাসেল স্ট্রীটের বাড়ির নিচেয় পৌঁছুলো তখন দেখলে একটা ট্যাক্সি মীটার নিচেয় নামিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এ-সময়ে কে এবার এল তাদের বাড়িতে? কে হতে পারে?

তর-তর করে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে শুনতে পেলে বাড়ির ভেতরে কাকার গলার আওয়াজ। দরজাটা হাট করে খোলা।

তপেশ গাঙ্গুলী বিশাখাকে দেখতে পেয়ে যেন অকূলে কূল পেয়ে গেল। বললে—তুই এসে গিয়েছিস? ভালোই হলো। আমাকে গোটা কুড়ি টাকা দে তো মা, ট্যাক্সির ভাড়াটা মিটিয়ে দিয়ে আসি—

টাকা পেতেই তপেশ গাঙ্গুলী নিচেয় নেমে গেল। তারপর আবার ওপরে এসে দেখলে বিশাখা সেখানে নেই। সেখান থেকেই তপেশ গাঙ্গুলী ডাকলে—কই রে, কোথায় গেলি তুই? ও বিশাখা?

বিশাখা মা'র ঘরে গিয়েছিল। সেখান থেকেই বললে—এই যে, আমি এখানে—

বলতে বলতে বাইরে বেরিয়ে এল।

তপেশ গাঙ্গুলী বিশাখাকে দেখেই জিজ্ঞেস করলে—হ্যাঁ রে, কী শুনছি? মুখুজ্জে বাড়ির নাতিটা নাকি বিলেত থেকে একটা মেম বিয়ে করে এসেছে?

বিশাখা বললে—হ্যাঁ, আমিও তাই শুনেছি—

—তাহলে কী হবে?

বিশাখা কোনও জবাব দিতে পারলে না। তার মাথায় তখন অনেক ভাবনা। মা'র ওই অসুখ, তার সঙ্গে টাকার অভাব আর একটু আগেই লজ্জা-সরমের মাথা খেয়ে সন্দীপের অফিসে গিয়ে পাঁচশো টাকা ধার করা। সমস্ত ঘটনাগুলোই তখন তার মনের মধ্যে প্রচণ্ড জ্বালা ধরাচ্ছিল। তার পর আবার ঠিক সেই সময়ে কাকার এ-বাড়িতে এসে পৌঁছুনো।

—কী রে, কথাটা কি সত্যি? কিছু কথা বলছিস নে যে!

বিশাখা মরীয়া হয়ে বলে উঠলো—হ্যাঁ হ্যাঁ, সব সত্যি...।

—তাহলে?

বিশাখা বললে—তা হলে আর কী? যাদের বিয়ে হয় না তারা কি বেঁচে নেই পৃথিবীতে? তাদের যা হয় আমারও তাই হবে!

তপেশ গাঙ্গুলী যেন তাতেও শান্ত হলো না। বললে—কিন্তু বিয়ে না হলে এ-বাড়িও তো একদিন তোদের ছাড়তে হবে! চিরকাল তো তোদের এ-বাড়িতে রেখে খাওয়াবে-পরাবে না।

এ-সব কথা আলোচনা করতে বিশাখার খারাপ লাগছিল। কিন্তু কিছু বলতে পারছিল না মুখে। বললে—বাড়ি ছাড়তে হলে ছাড়তে হবে। যাদের বাড়ি নেই তারা কি সবাই মরে গেছে!

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—আরে না না, তা কেন? আমার বাড়ি তো খালিই পড়ে রয়েছে, সেখানেই তোরা গিয়ে উঠবি, যেমন আগে ছিলি। আমি কি তোদের পর? আমি তখনই বউদিকে বলেছিলুম যে বড়লোকের শখের ওপর ভরসা করতে নেই। ওরা বরাবরই এই রকম। ওদের কি কখনও কথার দাম আছে!

তারপরে একটু থেমে আবার বললে—হ্যাঁ রে, তুই তো বাড়িতে একলা, আর তোর মা'রও এই কঠিন অসুখ, এই সময়ে কি তোর কাকীকে একটু পাঠিয়ে দেব? তোর কাকী তবু তোর মা'র অসুখের সময়ে একটু সেবা-টেবা করতে পারতো!

বিশাখা বললে—না কাকা, তুমি কেন আবার কষ্ট করতে যাবে! আমি একলাই কোনও রকমে সব কিছু সামলে নিতে পারবো—

—তারপর?

—তারপর মানে?

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—মানে, যখন ওরা এ-বাড়ি থেকে তোদের তাড়িয়ে দেবে তখন কোথায় যাবি?

বিশাখা বললে—সে তখনকার কথা তখনই ভাববো। এখন আমি একটু ডাক্তার-বাবুর কাছে যাবো, মা'র জন্যে ওষুধ আনতে হবে।

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—আমার সঙ্গে আবার টাকা নেই এখন, নইলে আমিও তোর সঙ্গে যেতুম—

বিশাখা বললে—তোমায় কিছু ভাবতে হবে না কাকা সেজন্যে। আমার কাছে এখন অনেক টাকা আছে—

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—মাস-কাবার হলে আমি নিজেই তোকে কিছু টাকা দিতে পারতুম। কিন্তু এখন তো আমার একেবারে হাত ফাঁকা রে—

বিশাখা শৈলকে ডাকলে। শৈল আসতেই বললে—শৈলদি, মা'কে একটু দেখো তুমি, আমি ডাক্তারবাবুর কাছ থেকে আসছি—তুমি দরজাটা বন্ধ করে দাও—

তপেশ গাঙ্গুলীও তার সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগলো। এই-ই প্রথম সেদিন কিছু মুখে না দিয়ে বাড়ি থেকে ফিরে যেতে হলো। সিঁড়ির তলায় এসে তপেশ গাঙ্গুলী বললে—তাহলে আমি যাই রে বিশাখা...

বিশাখা কাকার দিকে একবার ফিরেও তাকালে না। যেমন চলছিল তেমনই চলতে লাগলো। তপেশ গাঙ্গুলী সেই দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ! এই ক'বছরের মধ্যেই মেয়েটা বেশ স্যায়না হয়ে গিয়েছে! ঠিক আছে বাবা, যখন টাকার দরকার হবে তখন সেই আমার কাছে গিয়েই তো আবার হাত পাততে হবে, তখন তো আমারই পা জড়িয়ে ধরতে হবে তোদের! তখন? তখন কী হবে?

ডাক্তারের কাছে গিয়ে' অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো বিশাখাকে। সবাই আগে থেকে চেম্বারের সামনে অপেক্ষা করছে। যখন বিশাখার ডাক পড়লো তখন ঘড়িতে প্রায় সন্ধ্যে সাতটা। ডাক্তারবাবু কয়েকদিন ধরেই দেখতে আসছিলেন বিশাখার মাকে। ডাক্তারের যখন প্রেসক্রিপশন লেখা শেষ হলো তখন সাড়ে সাতটা বেজে গেছে। সেই প্রেসক্রিপশন দেখিয়ে দোকান থেকে যখন ওষুধ কিনে বিশাখা বাড়ি এল তখন রাত আটটা।

শৈল দরজা খুলে দিতেই বিশাখা দেখলে ভেতরে সন্দীপ বসে আছে।

বললে—এ কী? তুমি এত রাত্তিরে?

সন্দীপ বললে—ছুটির পর আমি একবার বিডন স্ট্রীটের বাড়িতে গিয়েছিলুম। এখন সেখান থেকে হয়ে সোজা এখানে আসছি—

—ও বাড়ির কী খবর?

সন্দীপ বললে—ওখানে চাকর-বাকর অনেককে ছাঁটাই করা হয়েছে।

বিশাখা বললে—তা তুমি এত রাত্তিরে যে এলে, বেড়াবোঁটায় যাবে না?

সন্দীপ বললে—এত রাত্তিরে আর কী করে দেশে যাবো?

তাহলে?

সন্দীপ বললে—মা তো এখন একটু ভালো আছে দেখে এসেছি, দেশে না গেলেও কোনও ক্ষতি হবে না। কিন্তু...

—কিন্তু কী?

সন্দীপ বললে—মল্লিক-কাকার কাছে শুনলাম এ-বাড়ির ইলেকট্রিক লাইনের লাইনও নাকি কেটে দেবার নোটিশ দেওয়া হবে -

বিশাখা কিছু কথা বললে না।

হঠাৎ সন্দীপ বললে—তোমার সঙ্গে কিছু কথা ছিল—

—কী কথা? বলো না—বলতে দোষ কী?

সন্দীপ বললে—আজ রাতটা যদি তোমাদের এখানে কাটাই তো তোমাদের তাতে কিছু আপত্তি আছে?
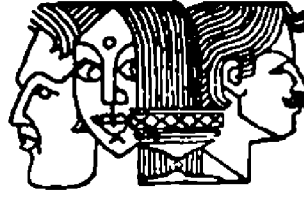
কলকাতা এক আজব শহর। একটার পর একটা আঘাত এসেছে তার ওপর আর আঘাত খেয়ে খেয়ে সে বার-বার মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। বহুদিন আগে সেই সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে যে-অঞ্চল একটা পোড়ো জমি হিসেবে চিহ্নিত ছিল, কে জানতো একদিন সেই পোড়ো জমিটার ওপরে গজিয়ে উঠবে একটা আশ্চর্যজনক শহর! সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে প্রথম যারা ভাগ্য-অন্বেষণে এখানে এসে এই ভূখণ্ডে পা দিয়েছিল তারা নিজেরাই কি জানতো যে সেই জলা জমিটাকে ঘিরেই ইতিহাসের ওঠা-নামা এমন করে তীক্ষ্ন-তির্যক হয়ে উঠবে!

সে-সব কথা ইতিহাসের পাতায় সবিস্তারেই লেখা আছে। ইতিহাসের পাত্র-পাত্রীরা দলে দলে এই মাটিতে যেমন এসেছে তেমনি আবার এখানে এই পলিমাটিতেই মিলিয়ে গেছে। তাদের সকলের মতো সন্দীপও এখানে এসেছিল ভাগ্যঅন্বেষণে। এখানে এসে পরের বাড়িতে অন্নদাস হয়েছিল আর এখানকার অন্য লোকদের মতো হেসেছিল, কেঁদেছিল। এখানকার সকলের সঙ্গে একান্তভাবে একাত্ম হয়েছিল আবার একদিন এখান থেকে চলেও গিয়েছিল। এখানকার সব সম্পর্ক ছিন্ন করে সে চলে গিয়েছিল বটে, কিন্তু এখনকার মোহ সে কাটাতে পারেনি। কেন যে সে মোহ কাটাতে পারেনি তার কারণ ওই বিশাখা!

সন্দীপ মাঝে মাঝে ভাবতো কোন্ কুক্ষণে তার সঙ্গে বিশাখার দেখা হয়ে গিয়েছিল কে জানে! যদি দেখা না হতো তাহলে তার কী-ই বা লাভ হতো আর কী-ই বা লোকসান হতো।

এক একটা মানুষ মানুষের জীবনে উপলক্ষ্য হয়েই একদিন উদয় হয়। আবার সেই উপলক্ষ্যকে অতিক্রম করে সে আবার অন্য কোনও লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্যে আর একজন উপলক্ষ্যকে আশ্রয় করে। তারপর একদিন সেই উপলক্ষ্যও আবার কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে যায় তা সে টেরই পায় না। আর তারপর যখন সেই মানুষটার বয়েস বাড়ে, যাত্রা শেষ হয়, তখন তার জীবনের উপলক্ষ্য-লক্ষ্য সব কিছু একাকার হয়ে তাকে একেবারে অন্য এক ধ্রুব-লোকে পৌঁছিয়ে দিয়ে তার ভাগ্য-বিধাতা নিশ্চিন্তের নিঃশ্বাস ছাড়ে। এইটেই তো গড় মানুষের ভাগ্যলিপি।

কিন্তু সন্দীপের বেলায় তা হলো না কেন? কেন উপলক্ষ্য তার জীবনের লক্ষ্য হয়ে একমাত্র ধ্রুবতারা হয়ে রইল?

মনে আছে মুখার্জিবাবুদের বাড়ির তখন বড় দুর্দিন। এদিকে অন্দর-মহলে

অনাবশ্যক ঝি-চাকর ছাঁটাই হচ্ছে আর ওদিকে তিন পুরুষের ফ্যাক্টরি অচল। আমদানি-রপ্তানি মাল তৈরি সব কিছু বন্ধ। সব কিছু বাতিল। বড় বড় অফিসারদের সবাইকে কাজ না করে মাইনেটা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে। দিন-দিন নিত্য-ব্যবহার্য জিনিসের দাম বেড়ে চলেছে। অফিসে-অফিসে বেকারদের চাকরির উমেদারি আর এমপ্লয়মেণ্ট-এক্সচেঞ্জের অফিসে অফিসে বেকারদের নামের তালিকার দৈর্ঘ্য সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। প্রায় তিনশো বছর পরমায়ুর কলকাতা শহরের যে একদিন এই দুরবস্থা হবে তা কি সেদিনকার কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা জোব্ চার্ণক কল্পনা করতে পেরেছিলেন?

তখনও দেওয়ালে দেওয়ালে পোস্টার মারা চলেছে একটানা। একটা পোস্টার যদিই বা দেওয়ালে কেউ এঁটে দিয়ে গেল তো আর একটা পোস্টার পড়লো ঠিক তারই ওপর তার পরদিন। রাজনীতির পোস্টারের ওপর পোস্টার পড়লো সংস্কৃতির। সংস্কৃতির পোস্টারের ওপর আবার হয়তো পোস্টার পড়লো 'দাদের মলমে'র কিংবা 'ঋতু-বন্ধের'। জীবন-জীবিকা-মৃত্যু সব কিছু একাকার হতে লাগলো একে একে।

রাত তখন অনেক। রাসেল স্ট্রীটের ওপর দিয়ে একটা গাড়ি চলাচলের আওয়াজও আসছে না।

বিশাখা চুপি চুপি সন্দীপের ঘরে এসেছে। সন্দীপ তখনও বিশাখার আসার আশাতেই জেগেছিল। বিশাখাকে ঘরে ঢুকতেই সন্দীপ বিছানার ওপর উঠে বসলো।

বিশাখা এসে সামনের চেয়ারটাতে বসে বললে এখনও জেগে আছো তুমি?

সন্দীপ সে-কথার উত্তর না দিয়ে বললে—মা কী করছেন?

বিশাখা বললে—মা এখন একটু ঘুমোল—

—জ্বর এখন কত? জ্বর দেখেছ?

—ওষুধটা খাইয়েছ?

—হ্যাঁ, ওষুধটা খেয়েই বোধহয় এখন একটু ঘুমোল। এতক্ষণ মা'র মাথায় আইস্-ব্যাগটা দিচ্ছিলুম। মাকে ঘুমোতে দেখে এখন তোমার কাছে এলুম। তা তুমি কী কথা বলতে চাইছিলে, বলো।

সন্দীপ বললে—বলছিলুম তোমাদের কথা। যা হওয়ার তা তো হয়ে গিয়েছে। এখন কোথায় তোমরা যাবে তাই বলো। এ বাড়ি তোমাদের তো ছেড়ে দিতেই হবে। বাড়ি খালি করতে হবে। এ-বাড়ির ইলেকট্রিক কানেকশনও তোমাদের কেটে দেবে ওরা। আমি আজ মল্লিক-কাকার কাছ থেকে সব খবর শুনে এলুম। এর পর কোথায় তোমরা যাবে বলো। আবার সেই খিদিরপুরের মনসাতলা লেনের বাড়িতেই যাবে?

বিশাখা বললে তা ছাড়া আর আমাদের গতি কী? কে আর কার বাড়িতে আমাদের থাকতে দেবে?

—কিন্তু সেখানে গিয়ে তো আবার সেই তোমার মাকে কবিতার গালাগালি শুনতে হবে।

এ-ছাড়া তো আমাদের আর কোনও রাস্তাই নেই—

সন্দীপ বললে—আমিও সেই তুমি আমাদের ব্যাঙ্কে যাওয়ার পর থেকেই সেই কথা ভাবছি। সেই কথা ভেবে ভেবে আমার ব্যাঙ্কের লেজারটাতে সব ভুল এণ্ট্রি করে ফেলেছি। সমস্ত এণ্ট্রি আবার নতুন করে করতে হয়েছে আমাকে। সমস্তক্ষণ কেবল তোমাদের কথা মনে পড়ছিল। তাই ছুটি হওয়ার পর চোখে মুখে জল দিয়ে সোজা গিয়েছি বিডন স্ট্রীটের বাড়িতে। সেখানে গিয়েও কোনও উপায় না পেয়ে তখন সোজা তোমাদের কাছে চলে এসেছি।

বিশাখা বললে—তুমি আমাদের কথা এত ভাবছো কেন? তোমার কীসের দায়?

সন্দীপ বললে—দায় নয়? একদিন তোমাদের বাড়িতে টাকা পাঠিয়ে দেবার জন্যেই আমার চাকরি হয়েছিল। তারপর এই রাসেল স্ট্রীটের বাড়িতে আসার পর থেকে আমার কাজই তো ছিল তোমাদের দেখা-শোনা করা। এখন তোমাদের এই বিপদে আমি কেমন করে চুপ করে থাকি বলো? এখন আমি অন্য চাকরি পেয়েছি বলে তোমরা কি রাতারাতি পর হয়ে গেলে? তা কি কখনও হয়?

বিশাখা এ-কথার জবাবে কী বলবে, তা ভেবে না পেয়ে চুপ করে রইল। তারপর বললে—এই যে তুমি আজ বাড়ি গেলে না তাতে তোমার মা খুব ভাববেন না?

সন্দীপ বললে—ভাববে তো বটেই, কিন্তু তোমাদের কথাও তো আমাকে ভাবতে হবে। আমি একলা মানুষ, কোন দিকে যাই বলো? এমনিতেই মল্লিক-কাকার সঙ্গে কথা বলতে বলতে রাত হয়ে গেল, তারপর কথাগুলো বলতে তোমাদের এখানেও আসতে হলো। তারপর তো আর ট্রেন নেই যে বেড়াপোতায় যাবো!

রাত তখন আরো গভীর হয়েছে। সন্দীপ হঠাৎ বললে—একটা কাজ করবে বিশাখা?

—কী, বলো?

—যদি কিছু মনে না করো তো তাহলে আমাদের বেড়াপোতাতে যেতে কি তোমাদের আপত্তি আছে?

—তোমাদের দেশে?

সন্দীপ বললে—অবশ্য সে তো শহর নয়। পাড়া-গাঁ। সে-বাড়ি এই রাসেল স্ট্রীটের বাড়ির মতো নয়। মাটির দেওয়াল, মাটির মেঝে। ইলেকট্রিক আলোও নেই এই এখানকার মতো, জানি খুব কষ্ট হবে তোমাদের সেখানে থাকতে...

বলে সন্দীপ চুপ হয়ে গেল। প্রস্তাবটা বিশাখা কী ভাবে নেবে তা বুঝতে চেষ্টা করলে। বিশাখা বললে—তুমি আমাদের ভার নেবে?

সন্দীপ বললে—ভার নিতে পারলে তো আমি খুশীই হবো, কিন্তু তোমরা সেখানে যাবে কিনা সেইটেই ভালো করে ভাবো—

বিশাখা বললে—একেবারে গাছতলায় গিয়ে দাঁড়ানোর চেয়ে তো সে ভালো।

সন্দীপ বললে—না, আমি নিজে তো সেখানে মানুষ হয়েছি, সুতরাং সেখানকার ওপর আমার একটা মোহ বা মায়া থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু তুমি? তুমি তো শহরেই জন্মেছ, শহরের মধ্যেই বড়ো হয়েছ। সেখানে থাকতে তোমাদের কষ্ট হবেই এও আমি আগে থেকে বলে দিতে পারি—

বিশাখার ক'দিন থেকেই রাত জাগা চলছিল। তার ওপর ছিল টাকার অভাব। সন্দীপের কথার জবাবে বললে—কতখানি কষ্ট হলে তবে মানুষ পরের কাছে টাকার জন্যে হাত পাততে পারে এ তুমি বুঝতে পারবে না। যদি বুঝতে তা হলে এ-কথা কখনও বলতে না—

সন্দীপ বললে তবু আগে থেকে কথাটা বলে রাখছি এ-জন্যে যে শেষকালে সব কষ্টের জন্যে হয়তো তখন আমাদেরই দায়ী করবে—

বিশাখা বললে—এতদিন আমার সঙ্গে মিশেও আমার সম্বন্ধে তোমার যদি এই ধারণা হয়ে থাকে তো তাহলে আমার আর কিছু বলবার নেই—

সন্দীপ বললে—তুমি ভুল বুঝোনা বিশাখা, তোমাকে আর মাসিমাকে আমি পর ভাবি না বলেই কথাটা খুলে বললাম।

তারপর একটু থেমে সন্দীপ আবার বলতে লাগলো—জানো বিশাখা, আমার মা পরের বাড়ি রান্না করে আমাকে মানুষ করেছে। সুতরাং বুঝতেই পারো কাকে বলে দারিদ্র্য, কাকে বলে উপোষ করা সে-সব ছোটবেলা থেকেই আমার দেখা আছে। কিন্তু

যে-জিনিসটা দেখা ছিল না, সেইটে দেখলুম কলকাতায় এসে—

—দেখে কী বুঝলে?

সন্দীপ বললে—শুধু কি মুখার্জিবাবুদেরই দেখলুম? ব্যাঙ্কে চাকরি করে আরো অনেক কিছু দেখলুম, যা এতদিন আমার দেখার বাকি ছিল—

বিশাখা বললে—অনেক রাত হলো, তোমার ঘুম পাচ্ছে না?

সন্দীপ বললে—আজ রাতটা জেগে জেগে তোমার সঙ্গে কথা বলবো বলেই তো দেশে না গিয়ে কলকাতায় থেকে গেলুম। তোমার যদি ঘুম পায় তো তুমি শুতে যেতে পারো—

বিশাখা বললে—তুমি নিজেকে দিয়ে অন্যকে বিচার করো বলেই তোমার মানুষ চিনতে এত ভুল হয়!

সন্দীপ বললে—তাহলে তুমি সত্যিই বলছো যে এই এত রাত পর্যন্ত জেগে-জেগে আমার সঙ্গে কথা বলতে তোমারও ভালো লাগছে?

বিশাখা বললে—মুখের কথাটা তো সব সময়ে মনের কথা নাও হতে পারে!

সন্দীপ এবার সামনের দিকে আরো ঝুঁকে বসলো। বললে—সারা জীবন এই কথাটা মনে রাখতে পারবে তো বিশাখা?

বিশাখা এবার উঠে দাঁড়ালো। বললে—না, তোমাকে নিয়ে দেখছি আর পারা গেল না। সবে তো আমার জীবন আরম্ভ হয়েছে, এখনই সারা জীবনের গ্যারাণ্টি কী করে দেব?

সন্দীপ বললে—তুমি কি ভাবছো যে তোমার কাছে সেই গ্যারাণ্টি চাইতেই আমি আজ তোমার বাড়িতে রাত কাটাতে এসেছি। আমি নির্বোধ নই।

বিশাখা বললে—নাঃ, তুমি দেখছি বড্ড সেণ্টিমেণ্টাল! এত সেণ্টিমেণ্টাল হলে মেণ্টকে অত তুচ্ছ জিনিস মনে করো না—

—কী বললে, কী বললে তুমি? আর একবার বলো?

—বললুম এত সেণ্টিমেণ্টাল হলে তুমি জীবনে সুখী হতে পারবে না—

সন্দীপ বললে—তুমি বলছো কী? সেণ্টিমেণ্টটা কি তুচ্ছ জিনিস? আমাদের পুরো পৃথিবীটাই তো সেণ্টিমেণ্টে চলছে! সেণ্টিমেণ্ট না থাকলে কি একজন রাজার ছেলে সমাজ-সংসার-স্ত্রী-রাজ্যপাট সব কিছু ছেড়ে পথে নামতে পারতো? সেণ্টি-মেণ্টকে অত তুচ্ছ জিনিস মনে করো না—

বিশাখা বললে—ওই দেখ, তুমি অমনি রাগ করলে। আমার সব কথায় যদি তুমি রাগ করো তাহলে এখান থেকে আমার চলে যাওয়াই দেখছি ভালো—

বলে উঠলো। সন্দীপ বললে—কিন্তু আসল কথা না বলেই যে তুমি চলে যাচ্ছো?

—কী তোমার আসল কথা?

সন্দীপ বললে—এখনও বুঝলে না?

হঠাৎ বাইরে শৈলর গলা শোনা গেল। শৈল বললে—দিদিমণি, মা কেমন করছে, শিগ্‌গির একবার দেখবে চলো—

কথাটা শুনেই বিশাখা বেরিয়ে মা'র ঘরের দিকে চলে গেল। সন্দীপও আর দেরি করলে না। সেও গেল তার পেছন পেছন।

মানুষের সংসারে এ-জিনিসটা নতুন নয়, এই হিংসেটা। কারোর ভালো হলে অন্যদের মনে কষ্ট হওয়াটাই স্বাভাবিক। যেদিন থেকে মানুষের সমাজটা সৃষ্টি হয়েছে, সেইদিন থেকেই এটা আছে। শুধু সমাজ কেন, বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যেও এটার অস্তিত্ব আছে। আর তা ছাড়া দেশ সম্বন্ধেও সেই একই কথা প্রযোজ্য। একটা দেশ যদি উন্নত হয় তো তার পাশের দেশ হিংসেয় জ্বলে-পুড়ে মরে। তখন সে চেষ্টা করে কখন কেমন করে তার উন্নতিকে ব্যাহত করা যায়।

এ সমাজ সৃষ্টির সেই আদিযুগ থেকেই আছে। অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় সেই পাঁচ হাজার বছর আগে থেকেই এটা হয়ে আসছে। তোমার দুঃখে আমি সহানুভূতি দেখাবো, 'আহা' বলবো। দরকার হলে সাহায্যও দেব, কিন্তু তোমার সুখের সময়ে? তোমার সুখে আমি হাসবো কিংবা আনন্দ পাবো এমন ঘটনার উদাহরণ মানুষের ইতিহাসে কোথাও পাওয়া যাবে না। এমনি করেই পৃথিবীতে দু'দুটো বিশ্বযুদ্ধ ঘটে গেল। আর এখন তো আবার আরো একটা যুদ্ধ ঘটাবার জন্যে পৃথিবী জুড়ে অস্ত্র-শস্ত্র শানানোর প্রতিযোগিতা চলেছে পুরোদম।

তপেশ গাঙ্গুলী এত বছর ধরে খুবই মন-মরা হয়েছিল। বউদির মেয়েটার কেমন একটা সুরাহা হয়ে গেল, কোনও খরচাপত্র লাগলো না, একজন কোটিপতির সঙ্গে বিয়ের কথা পাকা হয়ে গেল! আর তার বিজলী? বিজলীরও বয়েস হচ্ছে। বিশাখার পিঠোপিঠিই বয়েস তো বিজলীর। বিয়ের তো কোনও ব্যবস্থাই তখনও করতে পারেনি তপেশ গাঙ্গুলী! একচোখো ভগবানের কি এতই কুদৃষ্টি বিজলীর ওপর? ভগবানের কাছে কী এমন পাপ করেছে তপেশ গাঙ্গুলী?

অফিসে এতদিন সবাই বলেছে—তপেশদা বড় ভাগ্যবান মানুষ হে। ক'জন এমন ভাগ্য করেছে তপেশদার মতো?

তপেশ গাঙ্গুলী যে সৌভাগ্যবান পুরুষ এটা প্রথম প্রথম তপেশ গাঙ্গুলী নিজেও বিশ্বাস করতো। সত্যিই তো, তপেশ গাঙ্গুলীর পকেট থেকে একটা পয়সাও খরচ করতে হলো না, অথচ নিজের অনাথ ভাই ঝির বিয়েটাও নির্বিঘ্নে হয়ে গেল।

তারপর বড়লোকের বাড়ির সঙ্গে একটা কুটুম্বিতা যখন একবার হলো তখন যাতায়াত করতে করতে তপেশ গাঙ্গুলীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাটাও ক্রমে ক্রমে বেড়ে যাবে। তখন কাজে-কর্মে, উৎসবে-অনুষ্ঠানে তপেশ গাঙ্গুলীর নেমন্তন্নও হবে। তখন ভালো-মন্দ মুখরোচক খাওয়াটার সুযোগও তার মিলবে। আর তারপর নতুন জামাই কি তার বিজলীর বিয়ের একটা বন্দোবস্তও করবে না? আর তা ছাড়া বড়লোকের সঙ্গে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হওয়াটাই তো একটা মস্ত কথা। সে-সম্পর্কটার কথা বলতেও ভালো, শুনতেও ভালো।'

বিজলী বার বার বিশাখার সঙ্গে দেখা করবার কথা বলেছে। কতবার বাবাকে বলেছে—একবার আমাকে নিয়ে চলো না বাবা বিশাখার কাছে—

তপেশ গাঙ্গুলীও তাকে নিয়ে যেতে চেয়েছে। বড়লোক বোনের কাছে গিয়ে বিজলী কিছুদিন কাটাবে, তাতে খারাপটা কী? দিনকতক বিশাখাদের বাড়িতে গিয়ে কাটিয়ে আসুক না। ভালো-মন্দ খেতেও পাবে সেখানে গেলে, আর তার সঙ্গে গল্প

করে সময়টাও কেটে যাবে তার। কত লোকের কত যাবার জায়গা থাকে, মামার বাড়িও থাকে কত লোকের। সে-সব নেই কিছুই নেই বিজলীর। তপেশ গাঙ্গুলীর শ্বশুর-বাড়ির তিন কুলে কেউ কোথাও নেই যে মেয়ে-বউকে নিয়ে গিয়ে সে কিছুদিন সেখানে কাটিয়ে আসবে! অথচ যাওয়া-আসার ট্রেনভাড়াও তার লাগবে না—কারণ ফ্রি-পাশ পাওয়া যায় অফিস থেকে।

কিন্তু না, রাণী তাও যেতে দেবে না। রাণী নিজে তো যাবেই না. বিজলীকেও যেতে দেবে না। বলবে—বড়লোকের বাড়িতে গিয়ে কী হবে শুনি? তারা তোমাকে রাজা করে দেবে? আরো চারটে হাত-পা গজাবে?

অমন আড়বুজে বউ-ই হয়েছে তপেশ গাঙ্গুলীর জীবনের সবচেয়ে বড় অভিশাপ! নিজে তো দাঁতে একটা কুটো পর্যন্ত কাটবে না, তার ওপর যদি কেউ আগ্ বাড়িয়ে কিছু সাহায্য করতেও আসে তাতেও আবার বাগড়া দেবে।

তপেশ গাঙ্গুলীর মেজাজ এক-একবার গরম হয়ে উঠতো। বলতো -রাসেল স্ট্রীটে গেলে তোমার কী এমন আঁতে ঘা লাগে শুনি? বউদি তো তোমার পর নয়! তোমার নিজের জা—

রাণী বলতো -আমি যাবো না. তোমার ইচ্ছে হয় তুমি যাও না! আমি কি তোমাকে যেতে একবারও বারণ করেছি? যতবার ইচ্ছে তোমার যাও না—আমাকে নিয়ে যেতে তোমার এত গরজ কেন?

তপেশ গাঙ্গুলী বলতো আরে তোমার ভালোর জন্যেই যেতে বলছি। বড়লোকের সঙ্গে কুটুম্বিতা হবে, এখন থেকে একটু আলাপ-পরিচয় রাখতে দোষটা কী? বিজলীরও তো একদিন বিয়ে দিতে হবে. তখন তো ওদের সঙ্গে সম্পর্ক থাকাটার কথা আমাদের কাজে লাগবে!

রাণী বললো—তবু আমি যাবো না. তোমার ইচ্ছে হয়. তুমি যাও—

—তাহলে একলা বিজলীকে নিয়ে যাই আমি—

রাণী বললে—না, ওকেও আমি যেতে দেব না--যেতে হলে তুমি একলা যাও—

বরাবরই ওই রকম। অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়েও রাণীকে রাসেল স্ট্রীটের বাড়িতে নিয়ে যেতে পারেনি তপেশ গাঙ্গুলী।

তারপর অফিসের রথীন ঘোষালের কাছে যেদিন মুখার্জিবাবুদের নাতির মেম-সাহেব বউ বিয়ে করে আনার খবরটা কানে এল তখনও তপেশ গাঙ্গুলীর বিশ্বাস হয়নি। কিন্তু তারপর যখন কথাটা সত্যি বলে প্রমাণ হলো তখনকার মানসিক অবস্থাটা এমন অসহ্য হলো যে কথাটা রাণীকে না বলা পর্যন্ত আর শান্তি হচ্ছিল না।

তাই সোজা বাড়িতে এসেই চিৎকার করে উঠলো---ওগো. শুনছো. ওগো—

রাণী এই চেঁচামেচিতে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। বললে- কী হলো, চেঁচাচ্ছ কেন?

—আর কী হবে. যা ভেবেছি তাই হয়েছে—

- কী ভেবেছ তুমি?

তপেশ গাঙ্গুলী বললে -তখন বড্ড অহঙ্কার হয়েছিল, জানো, বড্ড অহঙ্কার হয়েছিল। তখন আমি বলেছিলুম মনে নেই মাথার ওপর দর্পহারী মধুসূদন আছেন? তখন যা বলেছিলুম এখন তাই-ই হলো!

রাণী তখনও কিছু বুঝতে পারছিল না। বিরক্ত হয়ে বললে—ব্যাপারটা কী তাই বলো না?

তপেশ গাঙ্গুলী বলে—বিশাখার সে-বিয়ে ভেঙে গেছে গো—

—ভেঙে গেছে?

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—হ্যাঁ, আমি বলিনি তোমায় যে ও-বিয়ে হতে পারে না?

রাণী কথাটা শুনে কেমন যেন হয়ে গেল। হাসবে কি কাঁদবে তা ঠিক করতে পারলে না। শুধু বললে—খবরটা তুমি কোত্থেকে পেলে? কে বললে তোমায় খবরটা?

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—কে আবার বলবে? আমাদের অফিসের রথীন ঘোষাল. সেই-ই প্রথমে খবরটা বলে আমাকে। আমার তখন বিশ্বাস হয়নি কথাটা। তার সঙ্গে একশো টাকা বাজি ধরে ফেললুম। তারপর একটা ট্যাক্সি ধরে গেলুম চলে রাসেল স্ট্রীটে। গিয়ে দেখলুম যা শুনেছি তা ঠিকই—

—কী দেখলে গিয়ে?

—কী আর দেখবো, দেখলুম বউদি জ্বরে ধুঁকছে। একেবারে বেহুঁশ হয়ে বিছানায় শুয়ে আছে। আর খানিক পরে বিশাখা এল। তার মুখ থেকেও ওই একই কথা শুনলুম। শুনলুম বাবুদের বাড়ি থেকে টাকা পাঠানোও বন্ধ হয়ে গেছে। গাড়ি পাঠানোও বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বাড়ির ঝি-টা নাকি দু'মাস মাইনেই পায়নি।

—তাহলে খাওয়া-দাওয়া চলছে কী করে ওদের?

-চলছে না।

—চলছে না মানে? উপোষ করছে সবাই?

—এক রকম তাই-ই। এই সময় তুমি একবার চলো না। তুমি গেলে তবু ওরা বুঝবে কত ধানে কত চাল! আমি তখনই বুঝেছিলুম যে অত অহঙ্কার ভালো নয়।

রাণী চুপ করে রইল। কী বলবে বুঝে উঠতে পারলে না। তারপর বললে—এখন যাওয়াটা কি ভালো দেখাবে? দিদি ভাববে যে আমি তার বিপদের দিনে মজা দেখতে গিয়েছি—

—তা ভাবলে দোষ কী?

রাণী বললে—তখন তো ওই অবস্থা দেখে এমনি চলে আসতে পারবো না। হয়তো আমাদের বাড়িতে নিয়ে আসবার জন্যে পীড়াপীড়ি করবে।

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—তা আর কী-ই বা করা যাবে! ওরা তো আমাদের পর নয়। আর তা ছাড়া তোমার শরীর খারাপ। খেটে খেটে তোমার শরীরও তো ভেঙে যাচ্ছে। একটা কাজের লোক রাখলেও তো তাকে খেতে পড়তে দিতে হতো, তার ওপর কম করেও চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকা মাইনেও দিতে হতো। এ আমাদের নিজের লোক। নিজের লোককে তো আর মাইনে দিতে হবে না। চুরি-চামারি করবে না এ। কত সুবিধে! যাবে? যাবে তো বলো?

কথাটা ভাববার মতো। বিনা মাইনেতে কাজের লোক পাওয়া কি সোজা কথা এই কলকাতা শহরে? যতদিন এ-বাড়িতে রাণীর জা ছিল ততদিন তার কোনও দুশ্চিন্তাই ছিল না। বেলা দশটার সময়েও ঘুম থেকে উঠলে সংসারের চাকা ঠিক নিয়ম করে চলতো। জা চলে যাবার পর থেকে মাসের মধ্যে অর্ধেক দিন বাড়ির কর্তা ঠিক সময়ে অফিসের ভাত খেতে পায় না। অর্ধেক দিন বিজলী কলেজে যেতে পারে না। নিয়ম করে রেশনে চাল-ডাল-তেল-চিনি আনতে তপেশ গাঙ্গুলীর অফিসে যেতে দেরি হয়ে যায়। তার ওপরে আছে বাজার।

মোটা মাইনে দিয়ে একটা কাজের লোক রেখেও ছিল তপেশ গাঙ্গুলী। ঠিকে লোক। খাওয়া-দাওয়া তার নিজের। রান্না করা আর বাজার করা আর রেশন আনা কাজ—তাতেই মাইনে নিত সত্তোর টাকা। কিন্তু তার মধ্যেও আবার অনেক দিন কামাই। বৃষ্টি-বাদলায় তিনি আসবেন না। বৃষ্টিতে ভিজলে নাকি তাঁর গায়ে-গতরে ব্যথা হয়। তার ওপরে আছে হাত-টান। বাজারে গেলে হিসেবের কড়ি মেলে না।

এই রকম লোক শুধু একটা নয়। গোটা দুই তিন লোককে রাখা হয়েছিল। কিন্তু শেষকালে তাদের সবাইকে ছাড়িয়ে দিতে হয়েছে। তব বিশাখাদের এ-বাড়িতে

আনলে তার সে-সমস্যা থাকে না। বউদি একলাই সব দিকটা সামলাবে!

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—চলো চলো, ও-নিয়ে আর ভেবো না। বউদি এলে ঝি-চাকর-চাকরানীদের হাত থেকে তো অন্ততঃ বাঁচবো—

রাণী কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে বললে—কিন্তু তুমিই তো বলছো আমার জা-এর এখন অসুখ। এখন ওই অবস্থায় এ-বাড়িতে তাকে নিয়ে এলে ওষুধ আর ডাক্তারের খরচেই তো আমরা ফতুর হয়ে যাবো। এত দিনই যখন সহ্য করেছি, তখন না হয় আরো কিছুদিন সহ্য করি। একেবারে রোগ-জারি সেরে গেলেই তাদের নিয়ে আসা যাবে—

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—তা কথাটা মন্দ বলোনি হে. একেবারে মাসটা কাবার হোক, তখন মাইনেটাও হাতে আসবে। একেবারে ট্যাক্সি করে যাওয়া যাবে।

শেষ পর্যন্ত তাই-ই ঠিক হলো। তারা দুজনে একদিন রাসেল স্ট্রীটে গিয়ে বউদি আর বিশাখাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসে এ-বাড়িতে তুলবে। যেমন অহঙ্কার করে বউদি এ-বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিল, তেমনি থোঁতা মুখ ভোঁতা করে আবার এই দেওরের বাড়িতে এসেই তাদের আশ্রয় নিতে হবে।

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—কপাল গো, কপাল সবই কপাল নইলে অমন সম্বন্ধ ভেঙে যায়—

রাণী বললে কপাল নয় গো, কপাল নয়। অহঙ্কার।

তা বটে। অহঙ্কার এই দুর্ঘটনার মূল। অফিসে যেতেই রথীন ঘোষাল জিজ্ঞেস করলে কী হলো তপেশদা? আমি যা বলেছি তা বিশ্বাস হলো তো?

তপেশ গাঙ্গুলী বাজিতে হেরে গিয়ে প্রথম থেকেই মন-মরা হয়ে গিয়েছিল। তার সঙ্গে সঙ্গে কাটা ঘায়ের ওপর যেন নুনের ছিটে লাগলো রথীন ঘোষালের কথায়। বললে—কী করে বুঝবো ভাই যে এমন হবে? অত হাজার-হাজার টাকা খরচ করলে যার জন্যে তাকে যে এমন করে হেনস্থা করবে তা কী করে বুঝবো?

ভবেশ দাস ও-পাশ থেকে বললে—তাহলে এখন তোমার বউদি আর ভাই-ঝি'র কী হবে?

—কী আবার হবে, তারা আবার আমার ঘাড়ের ওপরে চাপবে!

ভবেশ দাস বললে—তাতে তো তোমার ভালোই হলো, আর ঝি-চাকরের ঝামেলা থাকবে না—অনেক খরচও কমবে!

রথীন ঘোষাল বললে—তা আমার সেই বাজির কী হবে?

—কীসের বাজি?

—সেই যে একশো টাকা বাজি রেখেছিলে? সেটা কি বেমালুম ভুলে গেলে?

তপেশ গাঙ্গুলী যেন আকাশ থেকে পড়লো। বললে—আমি বাজি রেখেছিলুম? কখন বাজি রাখলুম?

রথীন ঘোষাল বললে—বাজি রাখোনি? এখানকার সকলে সাক্ষী আছে, সবাইকে জিজ্ঞেস করো! জিজ্ঞেস করো সব্বাইকে।

যারা আশে-পাশে বসেছিল তাদের বাজি রাখার কথা জিজ্ঞেস করলে। তারা সকলেই বললে—রথীনদার কথাই ঠিক তপেশদা। আপনি তো বাজি রেখেছিলেন—

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—আমি বাজি রেখেছিলুম? তা কখখনো হতে পারে না। আমার টাকা কোথায় যে আমি বাজি রাখতে যাবো? আমি কি পাগল?

রথীন ঘোষাল বললে—ছেড়ে দাও ভাই ছেড়ে দাও। একশো টাকার জন্য আমি গরীব হয়ে যাবো না।

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—আমিও একশো টাকার জন্য গরীব হয়ে যাবো না হে—

শেষ পর্যন্ত কথা কাটাকাটির ফলে কী হতো বলা যায় না, হঠাৎ বড় সাহেবের ঘর থেকে হৃদয় চাপরাশি এসে ডাকলো তপেশ গাঙ্গুলীকে। স্টেটমেণ্ট নিয়ে যেতে হবে সাহেবের ঘরে, কিন্তু স্টেটমেণ্ট তৈরিই হয়নি। তপেশ গাঙ্গুলী হৃদয়কে বাইরে নিয়ে গেল বারান্দার কোণের দিকে। আড়ালে গিয়ে পকেট থেকে একটা টাকা বার করে দিলে হৃদয়ের হাতে।

হৃদয় বহুদিনের চাপরাশি। জিজ্ঞেস করলে—এ টাকা কীসের জন্যে বাবু?

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—এটা তোমায় পান খেতে দিলুম। তুমি পান খেও—

হৃদয় অবাক হয়ে গেছে। বললে—এক টাকার পান? আমি তো পান খাই না গাঙ্গুলীবাবু—

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—আরে পান না খাও তো মিষ্টি কিনে খেও। রসগোল্লা কিনে খেও--কিংবা তোমার ছেলেকে দিও টাকাটা, সে যা-হোক কিছু কিনে খাবে! তুমি গিয়ে সায়েবকে বলো তপেশবাবু অফিসে এসেছিল কিন্তু পেট-ব্যথা হয়েছিল বলে বাড়ি চলে গেছে—

হৃদয় চাপরাশি সব বাবুদেরই চেনে। তবু খানিকক্ষণ হাঁ করে চেয়ে রইল তপেশ গাঙ্গুলীবাবুর মুখের দিকে। তপেশ গাঙ্গুলী বললে--আরে ,কী ভাবছো তুমি? অত ভয় পাচ্ছো কেন? মানুষের কি পেট-ব্যথা হয় না?

হৃদয় তখন টাকাটা পকেটে পুরে ফেলেছে। বললে—আমি মিথ্যে কথা বলবো বাবু? তখন যদি ধরা পড়ে যাই?

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—আরে তুমি ধরা পড়বে কেন? আমি তো এখখুনি বাড়ি চলে যাচ্ছি। আমি কাল এসে স্টেটমেণ্ট তৈরি করে দিলেই তো হলো!

তবু হৃদয় চাপরাশি কী করবে বুঝতে পারছিল না। তপেশ গাঙ্গুলী তাকে বড় সাহেবের ঘরের দিকে ঠেলতে লাগলো। বললে--আরে তুমি এতদিনের পুরোন লোক, তুমি কেন অত ভাবছো? আরে রেলের চাকা কি তোমার আমার অভাবে থেমে যাবে ভেবেছ? ও রেলের চাকা চলবেই, তা তোমার বড় সাহেব থাকুক আর না-থাকুক। যাও যাও, বড় সাহেবের কাছে ওই কথা বলো গিয়ে। বলো আমি অফিসে এসে-ছিলুম, কিন্তু পেট-ব্যথা হয়েছিল বলে চলে গিয়েছি। আর তা বলতে যদি ভয় করে তো এই নাও, আর একটা টাকা নাও—

বলে পকেট থেকে আর একটা টাকা নিয়ে হৃদয়ের জামার বুক-পকেটে গুঁজে দিলে। তারপর তাকে ঠেলতে ঠেলতে বড় সাহেবের ঘরের দিকে পাঠিয়ে দিলে। তারপর অফিসের কামরায় এসেই তাড়াতাড়ি টেবিলের দেরাজে চাবি দিয়ে চলে যাচ্ছিল।

পেছন থেকে রথীন ঘোষাল জিজ্ঞেস করলে—কী হলো তপেশদা? কোথায় যাচ্ছেন? সাহেব কী বললে?

তপেশ গাঙ্গুলীর তখন আর কথা বলার সময় নেই একেবারে। বললে—ভাই, সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে বলতে পেটটা কামড়ে উঠলো, ডাক্তারের কাছে যাচ্ছি—যাই—

বলে অফিস থেকে বেরিয়ে একেবার সোজা রাস্তায় গিয়ে পড়লো। আর সেই যে গেল তারপর আর অফিসে তপেশ গাঙ্গুলীর দেখা নেই।

রাণী বললে—কী হলো তুমি আপিস যাবে না?

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—না, অফিস থেকে ছুটি নিয়েছি, একেবারে সেই মাইনের দিনে যাবো—

সাধারণতঃ মাইনে পাওয়ার দিনে রেলের অফিসে কেউ কামাই করে না। ততদিনে অন্য লোকের ঘাড় দিয়ে স্টেটমেণ্ট তৈরি করা হয়ে গেছে। হৃদয় চাপরাশিও টাকা পেয়ে খুশী হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তপেশ গাঙ্গুলী জানে যে হৃদয় চাপরাশিকে ঘুষ দিয়ে

অফিসের বড় সাহেবকে ফাঁকি দেওয়া যায়। কিন্তু মহাকাল? সেখানকার কোনও চাপরাশিকে ঘুষ দিয়ে মহাকালকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। কিন্তু সে-কথা এখন থাক।

তখন মাইনেটা সবে হাতে এসে গেছে তপেশ গাঙ্গুলীর। মাইনে পাওয়ার পর ক'টা দিন তপেশ গাঙ্গুলীই বা কে আর নবাব খাঞ্জাখাঁ-ই বা কে। তখন তার মেজাজ একেবারে বড়-সাহেবের মতো। রাস্তা থেকেই একেবারে একটা ট্যাক্সি ডেকে এনেছে।

ওদিকে রাণীও দামী একটা শাড়ী পরে নিয়েছে। বিজলীও তাই। সবাই যাবে রাসেল স্ট্রীটে বিশাখাদের বাড়িতে। তাদের দুর্দশাটা নিজের চোখে দেখে আসবে। সুখের দিনে কেউ যায়নি, কিন্তু দুঃখের দিনে তারা গিয়ে সহানুভূতি জানাবে, 'আহা' বলবে। তারপর দরকার হলে তাদের সঙ্গে করে মনসাতলা লেনের বাড়িতে নিয়ে আসবে।

ট্যাক্সিটা হু-হু করে কলকাতার বুক চিরে চলতে লাগলো। ট্যাক্সির মীটারে টাকার অঙ্কগুলো হু-হু করে বেড়ে চলেছে। তা হোক, তপেশ গাঙ্গুলীর সব খরচের অঙ্কটা উশুল হয়ে যাবে বউদিকে বাড়ি আনার পর। তখন ঝি-এর খরচটা বেঁচে যাবে, রাণীকে আর ভোরবেলা গতর খাটিয়ে রান্নাঘরে ঢুকতে হবে না। সে শুধু বিছানায় শুয়ে শুয়ে হুকুম করবে। হুকুম করলেই সঙ্গে সঙ্গে হুকুম তামিল হয়ে যাবে। তপেশ গাঙ্গুলীকেও আর মাসের অর্ধেক দিন না খেয়ে অফিসে যেতে হবে না, বিজলীও মন দিয়ে বসে বসে নিজের কলেজের বইগুলো পড়তে পারবে, সংসারের কোনও কাজ আর তাকে করতে হবে না তখন।

সেই তখনকার আরামের কথা ভেবেই তপেশ গাঙ্গুলী মনে মনে একটু আরাম পেতে লাগলো। এমন আরাম রাণী অনেক দিন পায়নি।

ময়দানের কাছে এসে রাণী জিজ্ঞেস করলে—ওটা কী গো?

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—কোন্‌টা?

—ওই যে সাদা মতন বাড়িটা? চারদিকে বাগান রয়েছে!

—ওটার নাম ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়্যাল। ইংরেজ আমলে মহারাণীর নামে তৈরি হয়েছিল বাড়িটা।

রাণী কতদিন মনসাতলা লেনের বাড়িটা থেকে রাস্তায় বেরোতে পারেনি। চিরকাল অন্ধকার বাড়িটার ভেতরে জীবন কাটিয়েছে! তপেশ গাঙ্গুলী বললে- এইবার বউদি এলে একদিন তোমাকে নিয়ে ওই বাগানে বেড়াতে নিয়ে আসবো—

রাণী বললে—তুমি আর আমাকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছ!

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—না, তুমি দেখে নিও, এবার ঠিক তোমাকে নিয়ে বেড়াতে বেরোবো। কলকাতায় কত জিনিস দেখবার আছে, সব তোমাকে দেখাবো। বউদি এলে তখন তোমাকে আর কোনও কাজ করতে হবে না। ঝি-চাকরের খরচটা বেঁচে যাবে। সেই টাকায় তুমি যেখানে খুশী বেড়িয়ে নিও।

রাণী বললে -তুমি তো রেলে চাকরি করো, রেলের পাশ পাও, তবু কি কখনও কোথাও বেড়াতে নিয়ে গেছ?

তপেশ গাঙ্গুলী বললে এইবার ঠিক যাবো, দেখো। বউদি আর বিশাখা সংসার দেখবে আর আমরা প্রত্যেক ছুটিতে ঘুরে ঘুরে বেড়াবো। পুরী যাবো, কাশী যাবো, দার্জিলিং যাবো। সব জায়গায় যাবো। বউদি এলে তখন সে সব ঝামেলা চুকে যাবে! এমন বিশ্বাসী লোক তো হাজার টাকা মাইনে দিলেও পাওয়া যাবে না—

হঠাৎ একটা জায়গায় গিয়ে ট্যাক্সিটা আটকে গেল।

—কী হলো ভাই, কী হয়েছে? ট্যাক্সি থামালেন কেন?

ট্যাক্সি-ড্রাইভার বললে—দেখছেন না, রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে!

—রাস্তা বন্ধ? কেন?

তপেশ গাঙ্গুলী চারদিকে চেয়ে দেখতে লাগলে। শুধু তাদের ট্যাক্সিই নয়, আরো অনেক গাড়ি, বসে, টেম্পো থেমে গিয়েছে। আশে-পাশে অনেক স্কুটারও দাঁড়িয়ে আছে।

—কী হয়েছে দাদা? হয়েছেটা কী?

কেউ জানে না কী হয়েছে। আর জানার দরকারও নেই। খানিক পরেই দেখা গেল বিরাট একটা মিছিল চলেছে কী-সব স্লোগান দিতে দিতে। দমাদম পট্‌কা ফাটছে। লম্বা-লম্বা লাঠির মাথায় বড় বড় পোস্টার। পোস্টারে লেখা আছেঃ

'রথ্‌তলা ইয়ুথ্‌-ক্লাবের সরস্বতী পুজো
রজত-জয়ন্তী বর্ষ'

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—আরে, বোশেখ মাসে সরস্বতী পুজো? এ আবার কী?

পাশেই একজন স্কুটারের ওপর বসেছিল। তিনি বললেন—না মশাই, পুজো হয়েছে মাঘ মাসে, এখন ঠাকুর বিসর্জন হচ্ছে বোশেখ মাসে—

—তিন মাস ঠাকুরকে ক্লাবে রেখে দিয়েছিল?

ভদ্রলোক বললে—আরে না, তা কেন? বিসর্জন দিতেও তো টাকা লাগে! চাঁদার টাকা যা উঠেছিল, সে সব টাকা তো মদ-মাংস খেতেই ফুরিয়ে গিয়েছিল, বিসর্জন দেবার টাকা কোথায় পাবে?

—তা বলে মাঘ মাসের ঠাকুর বোশেখ মাসে বিসর্জন দেবে? এতো ধৈর্য?

এক মাইল-এর ওপর মিছিল। তার মাঝখানে লরীর ওপর সরস্বতী ঠাকুর। আর মিছিলের সবাই স্লোগান দিচ্ছে—সরস্বতী মাই-কী জয়—। কিছু ছেলে-মেয়েরা চলন্ত লরীর ওপরেই নাচছে।

সত্যিই, কলকাতা এক বিচিত্র 'শহর'। এখানে যতো দারিদ্র্য ততো আড়ম্বর: এখানে যতো অভাব, ততো জাঁকজমক। এ জিনিস মাদ্রাজে পাবে না, বোম্বাইতে পাবে না। তপেশ গাঙ্গুলী ট্যাক্সির মীটারের দিকে চেয়ে দেখলে। এরই মধ্যে তেরো টাকা উঠে গেছে। এখনও অনেকটা রাস্তা যেতে বাকি আছে যে! শেষকালে যখন রাসেল স্ট্রীটে পৌঁছোবে তখন হয়তো চল্লিশ টাকায় গিয়ে ঠেকবে। তখন কী করবে সে? তার জন্যে কাকে সে দায়ী করবে?

অনেক সময় নষ্ট হবার পর 'কলকাতা' তখন আবার নড়তে শুরু করলো, চলতে শুরু করলো। চলতে শুরু করতেই সব গাড়ি, বাস, টেম্পো, স্কুটার সকলের আগে যাবার জন্যে হুড়োহুড়ি করতে আরম্ভ করে দিলে।

শেষকালে ট্যাক্সি গিয়ে পৌঁছুলো তিন নম্বর রাসেল স্ট্রীটের বাড়ির সামনে। তপেশ গাঙ্গুলী বললে—থামো থামো, ঠিক জায়গায় এসে গেছি—

তখন মীটারে টাকার অংক চল্লিশ টাকা নয়, তিরিশ টাকায় গিয়ে ঠেকেছে। তা যাক, বউদিকে বাড়ি নিয়ে গেলে টাকাটা এক মাসেই উশুল হয়ে যাবে। টাকাটা মিটিয়ে দিলে তপেশ গাঙ্গুলী। তারপর সবাই মিলে সদর গেট দিয়ে ভেতরে যেতে গিয়েই দেখলে দরজায় তালা ঝুলছে।

—তালা কেন? তাহলে বাড়িতে কি কেউ নেই?

সামনের উঠোনের দু একটা ঘরে কারা কাজ-কর্ম করছিল। তপেশ গাঙ্গুলী তাদের মধ্যেই একজনকে বললে—ভাইয়া, এ-বাড়িতে যারা ছিল তারা কোথায় গেল?

লোকটা বললে—ও-লোগ্ চলে গেছে হুজুর।

তপেশ গাঙ্গুলী আবার জিজ্ঞেস করলে কোথায় গেছে তারা জানো?

—না হুজুর।

- আবার কবে আসবে তা জানো?

লোকটা বললে—তারা আর আসবে না হুজুর। কোঠির মালিক লোগ্ সবাইকে ঝাড়ি থেকে হটিয়ে দিয়েছে—

তপেশ গাঙ্গুলী যেন আকাশ থেকে পড়লো। সঙ্গে ছিল রণী আর বিজলী। তারাও লোকটার কথা শুনতে পেয়েছে। তাহলে কী হবে? এত দেরি করে আসার জন্যেই কি এ-রকম হলো? এমন হবে জানলে এতদিন অপেক্ষা না করে সেই দিনই আসা উচিত ছিল তাদের! মিছিমিছি এতগুলো টাকা নষ্ট হয়ে গেল, অথচ তাদের দেখা পাওয়া গেল না। এও বোধহয় নিয়তি কিংবা ভবিতব্য। আসলে তপেশ গাঙ্গুলীর কপালটাই ফাটা!!
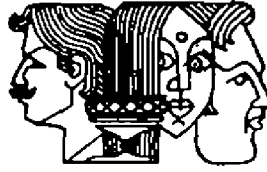
যে-পথ দিয়ে মানুষের অনবরত আনাগোনা চলে, যে-পথে কখনও কাঁটাগাছ সহজে জন্মাবার সুযোগ পায় না। জীবনও তাই। জীবনের পথে যে-মানুষ সব সময়ে চলাফেরা করে, যে-মানুষ সব সময়ে সংগ্রাম করে, বিপদ-আপদের আতংক কখনও তাকে আক্রমণ করে না। এ-সব কথা সন্দীপ বই পড়েই একদিন জানতে পেরেছিল। আর শুধু কি তাই? সে আরো জানতে পেরেছিল যে, যে-মানুষ শুধু পেতে চায় তার দুঃখ কখনও মেটে না। কিন্তু যে-মানুষ শুধু দিতে চায়, বিনিময়ে কিছু পেতে চায় না, তার জীবনের জমা-খরচের খাতায় সবটাই জমা, খরচের ঘরটা শূন্য!

সন্দীপ কি শুধু পেতে চেয়েছে? না দিতে চেয়েছে? যদি দিয়েই থাকে তো সে কী দিয়েছে? এই প্রশ্নও তাকে মাঝে মাঝে বিব্রত করতো।

সে জানতো যে প্রবৃত্তির তোড়ে সমস্তকে ছাড়িয়ে যাবার চেষ্টা করতে নেই। সকলের চেয়ে বড়ো হবো, সকলের চেয়ে কৃতকার্য হয়ে উঠবো, এইটুকেই জীবনের মূলমন্ত্র করা উচিত নয়। এ-পথে অনেক অনেক পেয়েছে, অনেকে অনেক সঞ্চয় করেছে, অনেকে অনেক প্রতাপশালী হয়েছে, তাও সে জানতো। কিন্তু এও সে জানতো যে তুমি তা চেয়ো না, তুমি তা সঞ্চয় করো না, তুমি প্রতাপশালী হয়ো না। তুমি নত হতে শেখো, তোমার মাথা নত হয়ে সেইখানে গিয়ে ঠেকুক যেখানে সংসারের ছোট-বড় সকলেই এসে মিলেছে। দিনের মধ্যে অন্তত কিছুক্ষণের জন্যেও তোমার চিত্ত এসে মিশুক সেই অনন্তে। তবেই তোমার শান্তি, তবেই তোমার মুক্তি।

সারাদিন ব্যাঙ্কের চার দেওয়ালের মধ্যে সন্দীপ তাই সমস্ত কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে চেষ্টা করতো। চেষ্টা করতো যুক্ত হয়েও মুক্ত থাকতে। অঙ্কের জটিলতার জালে জড়িয়ে গিয়েও সে নিঃসঙ্গতা অনুভব করতো। তারপর সবাই যখন ক্যান্টিনে গিয়ে উচ্ছ্বাসে-উল্লাসে-আলোচনায় মত্ত থাকতো, তখনও সে নিজেকে ভুলতে পারতো না। আশে-পাশের সবাই বলতো—তোমার কী ভাবনা? তুমি বিয়ে-থা কিছুই করলে না, শুধু আপনি আর কোপনি, ঝাড়া-ঝাপ্টা মানুষ। তোমার পয়সা কে খাবে?

সন্দীপ হাসতো। তাদের কথার কিছু জবাব দিত না। সকলকেই এড়িয়ে

যেতো। কারো সঙ্গে তর্ক নেই, বিতর্ক নেই। কারো সঙ্গে সদ্‌ভাবও নেই, আবার কারো সঙ্গে বিচ্ছেদও নেই তার। আর তারপর যখন ছুটি হতো তখন রওনা দিত হাওড়া স্টেশনের দিকে। রাস্তার কোনও দোকানে গিয়ে বলতো এক কিলো চিনি দিন তো—

কোনও দিন চিনি, কোনও দিন হলুদ, কোনও দিন লঙ্কা, বা কোনও দিন সাবান। একেবারে পুরোপুরি বাস্তব জগৎ। তার সঙ্গে সন্দীপের আদর্শের কোনও সম্পর্ক নেই। বাড়ি থেকে মা যা আনতে বলতো, তা-ই কিনে নিয়ে যেতো সন্দীপ।

আর শুধু তা-ই নয়। এ-ছাড়া আরো কত কী জিনিস কিনতে হতো তার কোনও ঠিক-ঠিকানা ছিল না। হাওড়া স্টেশনে ঢোকবার আগে ফুটপাতের ওপরে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের বাজার। আলু, পটল, কুমড়ো থেকে আরম্ভ করে চারজনের সংসারের সব কিছু। তারপর সেই বাজারের থলি এক হাতে ঝুলিয়ে ট্রেনে ওঠা। আর ঠিক সময়ে বেড়াপোতা স্টেশনে গিয়ে ট্রেন থেকে নামা। সন্দীপ জানতো বাড়িতে তিনজন প্রাণী তার পথের দিকে চেয়ে বসে থাকবে। সেই যে সকাল বেলা বাড়ি থেকে বেরোত, তারপরে সারাদিন সংসারের চাকা ঘুরবে তাকেই কেন্দ্র করে। তার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, তার ভালো-মন্দ দেখাটা তাদেরই কাজ!

মনে আছে প্রথম যেদিন মাসিমা আর বিশাখাকে নিয়ে গ্রামের বাড়িতে গিয়েছিল সেদিন মা'র কত আনন্দ। আনন্দও বটে, আবার বিস্ময়ও বটে! গরীবের বাড়িতে মা যে তাদের দুজনকে কোথায় রাখবে, কেমন করে তাদের খাতির করবে—তাই-ই ভেবে উঠতে পারেনি। মাসিমা আনন্দের আতিশয্যে প্রায় কেঁদেই ফেলেছিল। জীবনে অনেক দুঃখ, অনেক কষ্ট সহ্য করে করে তখন যোগমায়া দেবী প্রায় পাথর হয়ে গিয়েছিল। মা বলেছিল—এখানে থাকতে তোমাদের খুব কষ্ট হবে দিদি—

—কষ্ট!

মাসিমা কাঁদতে গিয়েও কাঁদতে পারেনি। বলেছিল- আপনার ছেলে যে আমাদের কী চোখে দেখেছে জানি না। সন্দীপ না থাকলে আমি হয়তো মারাই যেতুম—

মা বলেছিল—তোমরা আশীর্বাদ করো দিদি, ও যেন বেঁচে বর্তে থাকে। আর কিছু চাই নে—

মাসিমা বলেছিল—আমার নিজের দেওর ছিল, সে পর্যন্ত একবার চোখের দেখা দেখতে এল না। আমরা বেঁচে আছি কি মরে গেছি, তারও একবার খোঁজ নিলে না। শেষকালে ডাক্তার দেখানো, ওষুধ খাওয়ানো সব কিছু করলে আপনার সন্দীপ। আমি সন্দীপকে দেখবার কে? ভগবান ওকে দেখবে—

মা'র কেমন লজ্জা করছিল। এই টিনের চাল আর মাটির দেওয়ালের বাড়িতে ওদের কোথায় কেমন করে রাখবে, কোথায় শুতে দেবে, কী খেতে দেবে? ওরা কল-কাতার লোক এই অজ পাড়াগাঁয়ে থাকবে কী করে?

আর তা ছাড়া প্রশ্ন হলো বাড়ির ভেতরে এই সোমথ মেয়ে নিয়ে থাকবে কী করে? গাঁয়ের লোক কী বলবে? কাশীবাবুর বাড়িতেও মা ওদের দুজনকে নিয়ে গিয়েছিল। মা বলেছিল—এই দেখ বউদি, কাদের নিয়ে এসেছি তোমাদের বাড়ি—সেই যাদের কথা তোমাকে বলেছিলুম—

বউদি অবাক। বলেছিল—ওমা, এই বুঝি সেই ওরা?

মা মাসিমার দিকে তাকিয়ে বললে—এই এঁদের দয়াতেই আমার খোকাকে এতদিন ধরে খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করে তুলেছি। এই আমার যা-কিছু দেখছ সব এঁদের দৌলতেই হয়েছে। এঁরা যদি না দেখতেন তো কবে আমরা মায়ে-পোয়ে মারা যেতুম—

বউদি বললে—এই আপনার মেয়ে বুঝি? এখনও বিয়ে দেননি—

মাসিমার হয়ে মা-ই উত্তর দিলে—বিয়ের কথা-বার্তা চলছে. এইবার বিয়ে হবে। এর বাপ নেই কিনা তাই দেরি হচ্ছে—

বলে আর দাঁড়ায়নি সেখানে মা। মা বললে—এখন যাই বউদি। খোকা আবার এখনই এই ট্রেনে বাড়ি আসবে—

বউদি বললে—এবার তোমার ছেলেরও একটা বিয়ে দিয়ে দাও বামুনদি, এবার তো ছেলের চাকরি হয়েছে—। সারা জীবন তো কেবল খেটেই মরলে, এবার একটু বউ-এর সেবা খাও—

মা বললে—তেমন কপাল কি আমি করে এসেছি বউদি. সবই ভগবানের ইচ্ছে—

কথাটা মিথ্যে নয়। যেদিন সেই মানুষটা চলে গেলেন তখন খোকা কত ছোট। তখন কি ভাবতে পেরেছিল কেউ যে. সেই খোকা এমন ভালো চাকরি পাবে, এমন আরো দশজনের মধ্যে একজন হবে, এমন নিজের পায়ের ওপর দাঁড়াতে পারবে!

কিন্তু এ-সব কথা ভাববার সময় থাকে না মা'র হাতে। এত বছর মা বাবুদের বাড়ি চাকরি করে এসেছে. সেই মা'কে আর পরের বাড়ি রান্না করতে দেয়নি সন্দীপ। এতদিন যা কষ্ট করে এসেছে তা করেছে। এখন থেকে নিজের বাড়িতেই থাকুক মা। তখন থেকেই সন্দীপ খোঁজ করে আসছে রান্না করার বাসন মাজবার ঘর ঝাঁট দেবার একজন লোকের। যা মাইনে চাইবে সে তাই-ই দিতে রাজি। শৈল রাজি থাকলে তাকেই নিয়ে আসতো সে বেড়াপোতায়। কিন্তু কলকাতা ছেড়ে সে এই বেড়াপোতার মত অজ্ পাড়াগাঁয়ে আসতে চায়নি। আর তা ছাড়া অত মাইনেও দিতে পারতো না সে। তার চেয়ে অনেক কম টাকায় এখানে কাজের লোক পাওয়া যাবে।

সেদিনও হাওড়া পুলের ওপরের রাস্তা থেকে থলি ভর্তি করে বাজার করে ট্রেন থেকে সন্দীপ নামলো। নেমেই সোজা বিনোদ কাকার মিষ্টির দোকানে. বিনোদ কাকা তখন খদ্দের নিয়ে ব্যস্ত। খদ্দেরদের পেছন থেকেই সন্দীপ চেঁচিয়ে বললে– বিনোদ কাকা এসেছে।

বিনোদ কাকা তাকে দেখেই বলে উঠলো—এই যে কমলার-মা. এসো গো—

কমলার-মা'র কথাই বলেছিল বিনোদ কাকা। চল্লিশ টাকা মাইনে নেবে. আর খাওয়া-পরাটা দিতে হবে। কিন্তু সন্দীপের বাড়িতে থাকবার ঘর নেই বলে থাকবে তার নিজের ঝুপড়িতে। তারপর যদি সন্দীপ কখনও আর একটা ঘর বানিয়ে নিতে পারে তো তখন সে সন্দীপদের বাড়িতেই থাকতে পারবে।

কমলার-মা অনেকক্ষণ থেকেই সন্দীপের জন্যে অপেক্ষা করছিল। সন্দীপ তাকে বললে—এসো, এসো গো কমলার-মা. আজ ট্রেনটা লেট ছিল তাই আসতে দেরি হলো আমার—এসো—

কমলার-মা'র হাতে বাজার-ভর্তি থলিটা দিয়ে সন্দীপ হন্-হন্ করে বাড়ির দিকে চলতে লাগলো। পেছনে থলি হাতে ঝুলিয়ে কমলার-মা।

মা বিকেল থেকেই রোজ কান পেতে থাকে। ট্রেন আসার গম্-গম্ আওয়াজ পেলে. বলে ওঠে—ওই খোকা আসছে।

আর ঠিক সঙ্গে সঙ্গে বিশাখা বাড়ির সামনে এসে সামনের রাস্তার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। মাসিমাও এসে দাঁড়ায়। মাও তাদের পাশে এসে দাঁড়ায়। যতদূর নজরে আসে ততদূর চেয়ে দেখে কোথায় সন্দীপ. কতদূরে—

খোকার জন্যে মা ততক্ষণে জল-খাবার তৈরি করে রাখে। মাসিমা বিশাখা দু'জনেই সন্দীপের খাবার তৈরি করতে হাত লাগায়। সেই সকাল আটটায় খেয়ে বেরিয়েছে সে. আর এই সাতটা বাজছে, এখনই এসে পড়বে। তাদের জন্যে খাটুনি কি কম খাটছে সে! তাই সবাই মিলে তার পরিশ্রম একটু লাঘব করবার চেষ্টা করে।

আর তারপর সবাই সারাদিন ধরে প্রহর গোনে। এই দুটো বাজলো। এখন বোধহয় খোকার টিফিনের সময় হলো। এই পাঁচটা বাজলো, এখন বোধহয় খোকার ছুটি হলো। এখন বোধহয় অফিস ছেড়ে রাস্তায় পা বাড়ালো। এই বোধহয় তার ট্রেন ছাড়লো। এমনি রোজ।

সেদিনও সবাই—সবাই ঘর ছেড়ে বাড়ির সামনের রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছে। ট্রেনের শব্দ যখন শোনা গেছে তখন সন্দীপও নিশ্চয় এসে গেছে। এবার আর বেশি দেরি নেই। এইটুকু রাস্তা আসতে আর কতক্ষণ লাগবে। আট-দশ মিনিট বড়জোর। তারপর যা ভেবেছে তা-ই। খোকা আসছে। পেছনে থলি হাতে ঝুলিয়ে একজন মেয়েমানুষ। ওরই কথা খোকা ক'দিন ধরে বলছিল। ওই-ই বোধহয় সেই নতুন ঝি।

তারপরে খোকা বাড়িতে এসে গেল। এসেই বললে—মা, এই কমলার-মা'কে এনেছি. এখন থেকে এই কমলার-মা'ই আমাদের রান্না-বান্না কাজ-কর্ম সব করবে। এর সঙ্গে কথা বলো—

মা কমলার-মা'কে জিজ্ঞেস করলে—আমরা চার-জন লোক, রান্না-বান্নার কাজ সব করতে পারবে তো?

কমলার-মা বললে—কেন পারবো না মা, সারা জীবনই তো রান্না-বান্নার কাজ নিজের হাতে করে এসেছি—

মা বললে—তাহলে বাছা ভেতরে এসো. তোমাকে কাজ-কর্ম সব বুঝিয়ে দিই—

একটু একলা হতেই মাসিমা কাছে এল। সন্দীপ তখন হাত-মুখ ধুয়ে তৈরি হয়ে নিয়েছে। সন্দীপ বললে—মাসিমা, আজকেও পাঁচ-সাতটা চিঠি এসেছে. এই দেখুন—

বলে জামার পকেট থেকে চিঠিগুলো বার করলে।

—এই দেখুন, এগুলো আজকেই আমার ব্যাঙ্কে পাঠিয়ে দিয়েছে খবর-কাগজের অফিস থেকে। এতে একটা ভালো পাত্রের খবর আছে। পাত্ররা তিন ভাই, পদবী মুখার্জি। বড় দু'ভাই, দুজনেরই বিয়ে হয়ে গেছে। নিজেদের পৈতৃক বাড়ি কলকাতায়। কেন-টোন কিছু নেই। বাবা বেঁচে আছে। মা নেই। এইটিই ছোট। এ ইন্ডিয়া থেকে এম-এস-সি ডিগ্রী করে আমেরিকায় গেছে স্কলারশিপ নিয়ে। সেখানেই এখন চাকরি করছে। প্রায় দশ হাজার টাকার মতন মাইনে হাতে পাচ্ছে। তার বাবা চায় গরীবের লেখাপড়া জানা সুন্দরী পাত্রী। স্বাস্থ্য ভালো হওয়া চাই। পণের দাবী নেই—

মাসিমা শুনেই বললে—না বাবা, ও-সব বিলেত-ফেরত পাত্রদের কথা বোল না। বিলেত-ফেরতের ওপর আমার ঘেন্না ধরে গেছে। আমরা গরীব মানুষ, গরীবের ঘরের সঙ্গেই আমাদের সম্পর্ক করা ভালো। তুমি অন্য পাত্র দেখো গেরস্থপোষা পালটি-ঘর হলেই চলবে। আর দাবী-দাওয়া কিছু না থাকলেই হলো। আমার তো টাকা-কড়ি কিছু নেই যে মেয়েকে দেব। তবে পাত্রটি যেন সচ্চরিত্র হয়। ওইটিই আসল জিনিস বাবা। আমি আর কিছু চাই না—

সন্দীপ বললে—দাবী-দাওয়া যদি কিছু থাকে তো সে আমি ব্যবস্থা করবো। সে-ব্যাপারে আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না—

—তুমি কী ব্যবস্থা করবে?

সন্দীপ বললে—এই দেখুন না, আর একটা চিঠি আছে। পাত্র গ্র্যাজুয়েট। চক্রবর্তী। পোর্ট কমিশনার অফিসে চাকরি করে। মাইনে পায় সাতশো টাকার মতন। তার সঙ্গে বিয়ে দেবেন বিশাখার?

মাসিমা খুব খুশি হলো জেনে. বললে—কেন দেব না বাবা? তুমি এই পাত্রটিকেই

দেখ। এই রকম পাত্রই ভালো। বেশি বড়লোক খুঁজো না বাবা, বড়লোকরা ভালো হয় না। বড়লোকদের ওপর আমার ঘেন্না ধরে গেছে। তুমি এই পাত্রটিকেই দেখ—

সন্দীপ বললে—আরো অনেক চিঠি আছে, দেখুন না, আগে সবগুলো দেখে তারপর আপনি যা বলবেন তাই করবো। তার আগে অন্য চিঠিগুলোও দেখুন...

বলে সন্দীপ একে-একে অন্য চিঠিগুলোও পড়তে যাচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ বিশাখা ঘরের ভেতর ঢুকে সন্দীপের হাত থেকে চিঠিগুলো কেড়ে নিয়ে টুকরো-টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলতে লাগলো।

—এ কী করলে, এ কী করলে...এ কী...

মাসিমাও চিৎকার করে উঠেছে মেয়ের কাণ্ড দেখে। বলে উঠলো—এ কী করলি পোড়ারমুখী, এ কী করলি? তুই পাগল হয়ে গেলি নাকি পোড়ারমুখী...

বিশাখাও তখন রেগে গিয়ে চিঠিগুলো আরো কুচি কুচি করে ছিঁড়ছে। বলতে লাগলো—বেশ করেছি ছিঁড়েছি, আরো ছিঁড়বো...এই দেখ না...

মাসিমা তখন বিশাখার খোঁপাটা জোর করে টেনে ধরলে। বললে—পোড়ারমুখী, আবার তেজ দেখাচ্ছিস? কেন মরতে তুই আমার পেটে এলি...তোর মরণ হয় না, তুই...

সন্দীপ সেই অবস্থায় কী করবে বুঝতে পারার আগেই হঠাৎ মা রান্নাঘর থেকে এসে তাড়াতাড়ি মাসিমার হাতটা চেপে ধরে ফেলেছে। বললে—কী করছো দিদি, ওকে অত মারছো কেন? থামো, থামো...

মাসিমার রাগ তখনও যায়নি। বলতে লাগলো—মারবো না? মুখপুড়ি আর জায়গা পেলে না, আমার বাড়িতে মরতে এল কেন? ওকে আমি আজ খুন করে ফেলবো। তবে ছাড়বো। আমাকে ছাড়ুন, ছেড়ে দিন...ও ওর বাপকে খেয়েছে, আবার এখন আমাকে না খেয়ে ও ছাড়বে না—

মা তখন বিশাখাকে মাসিমার হাত থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে নিজের বুকের মধ্যে টেনে নিয়েছে। বিশাখা সন্দীপের মা'র বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে তখন অঝোর ধারায় কাঁদতে শুরু করেছে। মা তাকে সান্ত্বনা দিতে দিতে ঘরের বাইরে নিয়ে গেল। বলতে লাগলো—কেঁদো না মা, কেঁদো না, তুমি যখন আবার মেয়ের মা হবে তখন বুঝবে মেয়ের মা হওয়ার কত জ্বালা, কেঁদো না ছিঃ...

বলে নিজের কাপড়ের আঁচল দিয়ে বিশাখার চোখ দুটো মুছিয়ে দিতে লাগলো।

এক-এক সময় সন্দীপ ভাবতো—এ কী হলো? এ-রকম কেন হলো? মানুষের ভাগ্য-বিধাতার এ কী-রকম পরিহাস? মাসিমার ভালোই যদি বিধাতা-পুরুষ কামনা করেছিলেন তাহলে এমন করে তার সর্বনাশই বা তিনি করলেন কেন? তার মুখের সামনে খাদ্যবস্তু এনে কেনই বা তিনি তা এমন করে কেড়ে নিলেন? এতে তাঁর কোন্ মহান্ উদ্দেশ্য সিদ্ধি হলো? আর এর জন্যে যদি ভাগ্যবিধাতা দায়ী না হন্ তো কে এর জন্যে দায়ী? ঠাকমা-মণি? সৌম্যবাবু?

ভেবে ভেবে সন্দীপ কোনও সুরাহা করতে পারে না। কলকাতায় যাওয়ার পথে ট্রেনে বসে বসে সন্দীপ বাইরের দিকে চলমান গ্রাম-মানুষ-স্টেশন-গরু-মোষ-ক্ষেত-খামারগুলোর দিকে চেয়ে চেয়ে কেবল এই কথাগুলোই এক মনে ভাবে। আকাশগাছ-লোকালয়গুলোকেও তার জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে—তোমরা কেউ আমার কথাগুলোর জবাব দাও কেন এমন হলো? কেন মাসিমা আর বিশাখার এমন সর্বনাশ হলো? জবাব দাও কে তাদের এই সর্বনাশের জন্যে দায়ী?

খগেন সেইদিনই জিজ্ঞেস করেছিল—ও মেয়েটা কে সন্দীপদা?

সন্দীপ বুঝতে পারেনি। জিজ্ঞেস করেছিল—কোন্ মেয়েটা?

—ওই যে সকাল বেলা তোমাকে খুঁজতে আমাদের ব্যাঙ্কে এসেছিল? কে ও?

—আমার নিজের কেউ নয়।

—নিজের কেউ নয় মানে? নিজের কেউ না হলে ব্যাঙ্কে কেন আসে? তুমি যে ওর সঙ্গে কথা বলে এ্যাকাউন্ট্ থেকে টাকা তুললে কেন? ওকে টাকা দিলে বুঝি?

—হ্যাঁ।

কিন্তু ওইটুকু জবাবে কেউ খুশী নয়। কারণ মেয়েমানুষ দেখলে সকলেরই জিভ দিয়ে জল পড়ে। বিশেষ করে যদি আবার সে মেয়ে কমবয়েসী হয়, বিশাখার মতো সুন্দরী হয়।

খগেনও ওই ছোট জবাব পেয়ে খুশী হয়নি, বলেছিল—ও কে হয় তোমার?

সন্দীপ বলেছিল—কে আবার, কেউ হয় না আমার।

—কেউ যদি না হয় তোমার, তাহলে ও আমাদের ব্যাঙ্কেই বা এলো কেন, আর তুমিই বা ওকে টাকা দিতে গেলে কেন?

সন্দীপ বলল—খুব গরীব ওরা, খুব বিপদে পড়েই টাকা চাইতে এসেছিল।

খগেন সরকারের কিন্তু এইটুকু জবাবদিহিতে বিশ্বাস হয়নি। বলেছিল—নিশ্চয় কেউ হয়, নইলে এতো লোক থাকতে তোমার কাছেই বা টাকা চাইতে আসে কেন?

সন্দীপ বলেছিল—আমার চেনা মেয়ে তো বটেই, কিন্তু তেমন কোনও সম্পর্ক নেই আমার সঙ্গে—

খগেন কি অত সহজে ভোলে? বললে—নিশ্চয় কিছু সম্পর্ক আছে, কিছু-না-কিছু সম্পর্ক না থাকলে কেউ কি কারো কাছ থেকে টাকা চাইতে আসে?

সন্দীপ বললে—বিপদে পড়লে মানুষ কী করবে বলো? বিপদ হলে লোকে যার-তার কাছে গিয়েও হাত পাতে।

তবু খগেন নাছোড়বান্দা। বললে—চেপে যাচ্ছো কেন সন্দীপদা, আমি তো কাউকে বলতে যাচ্ছি না।

সন্দীপ বললে—বললেও আমার কোনও আপত্তি নেই। আমি এমন কিছু অন্যায় করিনি যে কাউকে বলে দিলে আমার বদনাম হবে।

খগেন বললে—কত টাকা দিলে তুমি ওকে?

সন্দীপ বললে—পাঁচশো—

খগেন আরও অবাক হয়ে গেল টাকার অঙ্কটা শুনে। এতগুলো টাকা সন্দীপদা একজন মেয়েকে দিয়ে দিলে আর তবু বলছে কি না যে মেয়েটার সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই? সেদিন হঠাৎ অনেক কাজ এসে পড়াতে ওই নিয়ে আর কথা বেশি এগোল না। সন্দীপও রেহাই পেয়ে গিয়েছিল সেদিন খগেনের জেরা থেকে।

কিন্তু অমন মুখরোচক খবর সহজে কি থামে?

দিনকতক পরেই সন্দীপের নামে অনেক খবরের কাগজ আসতে লাগলো। খবরের কাগজের পিওন এসে সন্দীপের হাতে খবরের কাগজগুলো রোজ দিয়ে যেতে লাগলো।

কারা যে এত কাগজ সন্দীপের কাছে পাঠায় তা প্রথমে কেউ বুঝতে পারেনি, এতগুলো খবরের কাগজ নিয়ে সন্দীপদা কী করবে তাও কেউ বুঝতে পারলে না। স্টেটস্‌ম্যান থেকে আরম্ভ করে যত বড় বড় দৈনিক পত্রিকা কলকাতা থেকে ছাপা হয় তার সব ক'টাই সন্দীপের কাছে এসে পৌঁছোয়। সন্দীপ একটা কাগজে সই করে দিয়ে সেগুলো নিয়ে নেয়। তার পরে আসে চিঠি। অনেক অনেক চিঠি। এক গাদা চিঠি। সবই দিয়ে যায় পিওন আর সন্দীপ সেগুলো সই করে নেয়।

প্রথম প্রথম ব্যাঙ্কের কেউ এ নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামায়নি। কিন্তু দু'তিন দিন পরেই একে একে সবাই কৌতূহলী হয়ে উঠলো।

খগেন সরকার জিজ্ঞেস করলে—এ সব কীসের চিঠি সন্দীপদা?

সন্দীপ বললে আমি বক্স নম্বর দিয়ে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলুম, এ-সব তারই কাগজ আর তারই চিঠি—

–তুমি বিজ্ঞাপন দিয়েছিলে? বক্স নাম্বার দিয়ে? কেন?

সন্দীপ বললে—একটা বিয়ের ব্যাপারে।

—বিয়ে? কার বিয়ে? তোমার নিজের বিয়ে?

সন্দীপ বললে—না-না, আমার নয়, আমার এক আত্মীয়ের মেয়ের—

সন্দীপের যে কোনও আত্মীয় ছিল না, এ-কথা অফিসের সবারই জানা ছিল। সবাই জানতো সংসারে এক বিধবা মা ছাড়া তার আর কেউ ছিল না।

সুতরাং কথাটা সন্দেহজনক।

সব ব্যাঙ্কেই কাজ যত হয় তার চেয়ে বেশি হয় অকাজ। এই অকাজের মধ্যে এটাও সেদিন রটে গেল যে সন্দীপেরও আত্মীয়ের বিবাহযোগ্যা মেয়ে আছে। টিফিনের সময়ে সেই কথা নিয়েই আলোচনা শুরু হয়ে গেল। আত্মীয়ের মেয়ে থাকা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু সেই মেয়ের বিয়ের জন্যে সন্দীপের এত টাকা খরচ করা, এত টাকা খরচ করে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়ার চেষ্টাটা কি স্বাভাবিক?

তখন থেকেই শুরু হলো সন্দেহ, তখন থেকেই শুরু হলো প্রশ্নবাণ। সবাই জিজ্ঞেস করতে লাগলো মেয়েটা কে সন্দীপদা? কে?

সন্দীপ বলতে লাগলো—মেয়েটা আমার নিজের কেউ নয়—

—তাহলে তার জন্যে তোমার এত মাথা-ব্যথা কেন?

সন্দীপ বললে—তারা বড্ড গরীব যে—

খগেন সরকার বললে—দেশে গরীব লোকের কি অভাব? তাদের সকলের জন্যে মাথা-ব্যথা না ক'রে কেবল একজন গরীব মেয়ের জন্যে তোমার এত মাথা-ব্যথা কেন শুনি? ব্যাপারটা কী বলো তো?

এ-কথার জবাব সন্দীপ কী দেবে? সে বললে—যার বিয়ের জন্যে চেষ্টা করছি এ বড় দুঃখী মেয়ে ভাই। এর এক বিধবা মা ছাড়া আর কেউ নেই। আমারও বিধবা মা ছাড়া আর কেউ নেই, কিন্তু এর সঙ্গে আমার অনেক তফাৎ। আমার তবু গ্রামে একটা পৈত্রিক ছোট-খাটো বাড়ি আছে, তার ওপর আমার একটা চাকরিও আছে, কিন্তু এর নিজেদের বাড়িও নেই, টাকা-পয়সাও নেই। ও একেবারে পরের দয়ার ওপর নির্ভর করে গলগ্রহ হয়ে আছে।

—তা এত লোক থাকতে এরই ওপর বা তোমার এত দয়া কেন?

এ-সব যুক্তি কেউ বুঝতে চায় না। এত যে দয়া-মায়া তা কীসের জন্যে তা বললেই কি কেউ কিছু বুঝবে? সবাই তো সচরাচর নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত নিজেকে কেন্দ্র করেই বিব্রত। সেই ছোট পরিধির বাইরে গিয়ে কেউ কিছু করতে গেলেই সবাই সেখানে স্বার্থের গন্ধ পায়। সবাই তখন সন্দেহ করতে আরম্ভ করে। ভাবে নিশ্চয়ই এর

পেছনে কিছু দুরভিসন্ধি আছে। সব জিনিস সহজভাবে গ্রহণ করতে সবাই ভুলে গেছে আজকাল। আগুন দেখলেই যেমন সবাই ধোঁয়ার অস্তিত্ব কল্পনা করতে চেষ্টা করে, এও যেন অনেকটা সেই রকম। কোনও মেয়েমানুষের সঙ্গে একটা পুরুষের সহজ উদারতার সম্পর্ককে, কুৎসিত কলঙ্কময় একটা দিক কল্পনা করে আনন্দ পেতে, তারা বড় ভালোবাসে। বলে—ডুবে ডুবে জল খাচ্ছো সন্দীপদা, ভেবেছ আমরা কেউ টের পারো না?

এই সবকিছুর মধ্যেও সন্দীপ কিন্তু নিজের কর্তব্য-কর্ম থেকে বিমুখ হতো না। সে শুধু নিজের পকেটের টাকাই খরচ করতো না, চিঠিও লিখতো সরাসরি। ব্যাঙ্ক ছুটি হওয়ার পর সোজা চলেও যেত সেই সব নির্দিষ্ট বাড়িতে। সোজা গিয়ে সেই সব পত্র-লেখকদের ঠিকানায় গিয়ে দেখাও করতো।

নিজের পরিচয় দিতেই সবাই আপ্যায়ন করে ঘরে বসাতো। কোথায় সেই বেহালা, কোথায় সেই কালীঘাট, কিংবা কসবার কোনও গৃহস্থ-বাড়ি। ছেলে চাকরি করে ব্যাঙ্কে কিংবা পোর্ট-কমিশনারের অফিসে। মাইনেও মোটামুটি ভালোই পায়।

সবাই-ই জিজ্ঞেস করে—মেয়েকে দেখতে কেমন?

সন্দীপ বলে—খুব সুন্দরী।

—স্বাস্থ্য?

—স্বাস্থ্য খুব ভালো।

—বয়েস?

—বয়েস আঠারো-কুড়ির মতন—

তারপর জিজ্ঞেস করতো—আপনি পাত্রীর কে?

সন্দীপ বলতো—আমি পাত্রীর কেউই নই। মেয়ের নিজের বলতে আছে এক কাকা। তাঁর নাম তপেশ গাঙ্গুলী। তিনি রেলের হেড্-অফিসে গার্ডেন-রীচে কাজ করেন। তিন নম্বর মনসাতলা লেন-এ খিদিরপুরে তাঁর বাসা। সেখানেও আপনারা খবর নিতে পারেন। আর আছে এক বিধবা মা।

—তা পাত্রীর বিধবা মা আর পাত্রী নিজের কাকার বাসায় না থেকে আপনার বেড়া-পোতার বাড়িতে আপনাদের সঙ্গে থাকে কেন?

এ-সব প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে সন্দীপের মুখ পচে যেত। কেউ বুঝতে চাইতো না যে জ্ঞাতি-শত্রুর চেয়ে বড় শত্রু পৃথিবীতে দুটি নেই। সংসার-জীবনের এর চেয়ে বড় মর্মান্তিক সত্যটা কেউ দেখে-শুনে-ভুগেও তবু বৈবাহিক-সম্পর্কটা পাতাবার বেলাতেই বিশ্বাস করতে চাইতো না। ভাবতো আপন কাকার সঙ্গেই পাত্রীদের সুসম্পর্ক নেই তখন নিশ্চয়ই কোথাও কিছু গোলমাল আছে, গলদ আছে।

তারপর জিজ্ঞেস করতো—আপনার সঙ্গে পাত্রীর কী সম্পর্ক?

সন্দীপ বলতো—কিছু সম্পর্কই নেই। ওদের দুরবস্থা দেখে আমি আমাদের বাড়িতে ওদের থাকতে দিয়েছি এইমাত্র—ওদের বড় কষ্ট। সেই কষ্ট দেখেই আমি আর আমার মা আমাদের বাড়িতে ওদের থাকতে দিয়েছি—

—দেনা-পাওনার কথা কার সঙ্গে হবে?

সন্দীপ বলতো—আমার সঙ্গেই হবে। আমি ছাড়া ওদের আর তো কেউ নেই।

তারপর একটু থেমে আবার বলতো—আর তা ছাড়া কিছু দেবার মতো অবস্থাও তো নেই ওদের—পাত্রী জন্মাবার কয়েক বছর পরেই বাবা মারা যায়, তখন থেকেই মায়ের কাছে মানুষ। তারপর এই বিয়েটা হয়ে গেলেই বিধবা মায়ের শান্তি।

—পাত্রী দেখতে কেমন?

সন্দীপ এ-ব্যাপারে একেবারে মুক্তকণ্ঠ। বলতো—অপরূপ সুন্দরী। যে দেখবে

সে আর চোখ ফেরাতে পারবে না। আপনারা যদি একবার দয়া করে বেড়াপোতায় আমাদের বাড়িতে পায়ের ধুলো দেন তো আমরা ধন্য হয়ে যাবো। পাত্রীর লেখা-পড়া স্বভাব-চরিত্র সব খবরই আপনারা খোঁজ নিলে জানতে পারবেন। ঠিক আছে। সব কিছু কথার পর সন্দীপ তাদের কাছে তার বেড়াপোতার ঠিকানাটা রেখে আসতো। আর বলতো—আমি তো রোজই কলকাতায় চাকরি করতে আসি। এই ব্যাঙ্কের ঠিকানায় চিঠিও লিখতে পারেন, কিংবা এই নম্বরে টেলিফোনও করতে পারেন আপনারা। রোববার ছাড়া আর সবদিনই অফিসে কাজের সময়ে আমায় পাবেন—

এই কথাগুলো বলে সন্দীপ একটা কাগজে ব্যাঙ্কের নাম, ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর সব কিছু লিখে দিয়ে রেখে আসতো।

এই রকম রোজ। ব্যাঙ্কের ছুটির পরেই বেরিয়ে পড়তো বিভিন্ন সম্ভাব্য পাত্রের বাড়ি। অনেকে অনেক স্তোক-বাক্য শোনাতো। কেউ-কেউ চা-বিস্কুট খাওয়াতো। আবার কেউ-বা তাও খাওয়াতো না। হতাশার কথা কেউই শোনাতো না।

কিন্তু অনেক প্রতীক্ষা করবার পরও কেউই কোনও চিঠিও লিখতো না, বা কখনও টেলিফোনও করতো না কেউ। শুধু তার পরিশ্রমই সার হতো। আর তারপর বাস-ট্রাম ধরে যখন হাওড়া স্টেশনে পৌঁছতো তখন শেষ ট্রেনটা ছাড়ে-ছাড়ে। শেষ ট্রেনটা ধরা মানে রাত বারোটার সময় বেড়াপোতায় পৌঁছনো। বিনোদ-কাকার মিষ্টির দোকানটাও তখন ঝাঁপ বন্ধ করে নিঃঝুম হয়ে পড়ে আছে।

সন্দীপের জন্যে তখন বাড়িতে সবাই না খেয়ে উপোস করে বসে আছে। অথবা বাড়ির সামনে রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে তার আসার পথের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে।

যতবার ট্রেন আসার শব্দ হয় ততবার সবাই উৎকণ্ঠ হয়ে ওঠে। ওই বুঝি সন্দীপ এল। ওই বুঝি এসে পৌঁছলো সন্দীপ।

—কী রে, এত দেরি হলো যে তোর?

সন্দীপের হাত থেকে বাজারের থলিটা নিয়ে মা তাড়াতাড়ি ছেলেকে ভারমুক্ত করে দেয়। তারপর ভেতরে যেতেই তালপাতার পাখা নিয়ে ছেলেকে হাওয়া করতে শুরু করে। সন্দীপ মা'র হাত থেকে পাখাটা কেড়ে নিয়ে বলে—থাক আমার কিছু কষ্ট হয়নি, তুমি যাও, খেয়ে দেয়ে নাও—

মাসিমা, বিশাখা তারাও জেগে থাকে।

কমলার মা তখন সন্দীপের সামনে খাবার থালায় ভাত তরকারী এনে হাজির করে।

সন্দীপ মুখ হাত-পা ধুয়ে এসে দেখে, কেবল তাকেই খেতে দেওয়া হয়েছে। বলে—সে কি, আমি একলা খাবো কেন? তোমরাও খেতে বোস, একসঙ্গেই খেতে বোস সবাই। অনেক রাত হয়ে গেছে। কাল তো আবার সেই ভোরে উঠতে হবে সকলকে। এতক্ষণ সবাই উপোস করে আছো কেন, খেয়ে নিলেই পারতে—

মাসিমা বলে—তা কি হয় বাবা! তুমি রইলে বাড়ির বাইরে আর আমরা খেয়ে নিতে পারি? আমরা পরে খাবো খন, তুমি আগে খেয়ে নাও দিকিনি।

তারপর এক সময়ে একসঙ্গে সকলেই খেতে বসে। মাসিমা খেতে-খেতে বলে—আমাদের জন্য তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে বাবা। কিন্তু কী করবো বলো, আমার কপালটাই খারাপ। বলে আঁচল দিয়ে এক ফাঁকে চোখ মুছে নেয়।

সন্দীপ বলতো—আপনি অত ভাবছেন কেন বলুন তো মাসিমা? আর কি কারো আইবুড়ো মেয়ে নেই? কত মেয়ের মা তাদের মেয়ের বিয়ের জন্যে ভেবে ভেবে কূল-কিনারা পাচ্ছে না, তা তো জানেন না! আমি তো রয়েছি। আমি যতক্ষণ আছি ততক্ষণ আপনার ভাবনা কীসের?

—আর কোথাও গিয়েছিলে? আর কোনও পাত্রের খবর-টবর পেলে?

সন্দীপ বলতো—রোজই তো ব্যাঙ্ক থেকে বেরিয়ে এদিকে-ওদিকে যাই। চেষ্টার কোনও কসুর করছি না আমি। সকলের মুখেই ওই এক কথা...

সন্দীপ বলতো—ওই দেনা-পাওনা! আমি যত মেয়ের কথা বলি। বলি যে মেয়ে একেবারে ডানা-কাটা পরী, সে-কথায় কেউ কান দেয় না। কেবল বলে পাওনা-গন্ডা কেমন দেওয়া হবে—

তারপর একটু থেমে আবার সান্ত্বনা দেবার সুরে বলতো—আপনি কিছু ভাববেন না মাসিমা, আমি এত সহজে হাল ছাড়বো না. আমি শেষ পর্যন্ত লড়ে যাবো, দেখবো দেশে এখনও মানুষ আছে কি না। মানুষ নেই এ-কথা আমি বিশ্বাস করি না। আমি মানুষ খুঁজে বার করবোই। আমি বিশ্বাস করি সব মানুষ এখনও জানোয়ার হয়ে যায়নি—

সেদিন রাত্রে হঠাৎ একটা কাণ্ড ঘটে গেল।

পাশের ঘরের মাসিমা, মা. বিশাখা সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। সন্দীপও ঘুমে তখন অসাড়। সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রমের পর তখন আর কোনও দিকে খেয়াল নেই সন্দীপের। তখন কত রাত কে জানে। হঠাৎ কে যেন নিঃশব্দে তার গায়ে হাত দিয়ে ঠেলছে বলে মনে হলো।

সন্দীপ চিৎকার করে উঠলো—কে? কে? কে?

তার মনে হলো কে যেন তার চিৎকার শুনে নিঃশব্দে তার ঘর ছেড়ে পালালো। সন্দীপ তাড়াতাড়ি উঠে হারিকেনটা জ্বালালে। কেউ কোথাও নেই! তবে কি সে স্বপ্ন দেখছিল? সে দেখলে ঘরের বাইরের দিকে যাবার দরজাটা তো খিল দিয়ে বন্ধ করাই রয়েছে। কেউ তো তার ঘরে ঢোকেনি। তাহলে কেন এমন মনে হলো তার?

সকাল বেলায় যথাসময়ে ঘুম থেকে উঠে রাত্রের ঘটনাটা আবার সন্দীপের মনে পড়লো। আশ্চর্য! কেন অমন স্বপ্ন দেখলো সে? সত্যিই তো. কে তাকে অত রাতে হাত দিয়ে ঠেলতে যাবে?

কিন্তু আসল ঘটনাটা পরে জানা গেল। তবে সে-কথা এখন না-বলাই ভালো। পরে বললেই চলবে। অন্য দিকের কথা বলা যাক এখন।

সেদিনও বিশাখার জন্য আর এক পাত্রের সন্ধানে সন্দীপ কালীঘাটের দিকে গিয়েছিল। এক ভদ্রলোক তার বিজ্ঞাপন পড়ে তাকে দেখা করবার জন্য চিঠি দিয়েছিলেন।

সেখানেও সেই একই কথা। মেয়ে তো সুন্দরী বুঝলাম, কিন্তু দেনা-পাওনার কী হবে?

ওই জায়গাটাতেই এসেই সকলের সব কথা সব আলোচনা থেমে যায়। দশ ভরি গয়না পাত্রপক্ষ মেয়েকে না দিক, তাতে কোনও ক্ষতি নেই। কিন্তু ঘর-খরচ? ঘর-খরচটা তো আর পাত্রপক্ষ নিজের পকেট থেকে করবে না। কিছু-না-কিছু-না করেও তো ছেলের বিয়েতে অন্ততঃ শ' পাঁচেক লোককে নেমন্তন্ন করতেই হবে। আজকের যুগে সে-খরচাও কি কম? ধরে রাখা যাক, হাজার দশেক তো তাতে লাগবেই। পাত্রপক্ষ সে-খরচটা নিজের পকেট থেকে কেন করতে যাবে? ছেলেটাকে এত বছর ধরে

পড়াবার খরচটা আমি নিজের ঘর থেকে করেছি, এখন তার বিয়ের খরচটাও কি আমি একলার ঘাড়েই নেব? পাত্রীপক্ষের কি কোনও দায়ই নেই? আপনিই বলুন? এই যে আপনি এখন ব্যাঙ্কে চাকরি করছেন, আপনি বিয়ের সময় কত টাকা নিয়েছেন?

সন্দীপ বললে—আমি এখনও তো বিয়েই করিনি—

—বিয়ে করেননি? কেন? বিয়ের বয়েস তো আপনার হয়ে গেছে—

নিজের বিয়ের কথা আলোচনা করতে সন্দীপের ভালো লাগে না। তবু শেষ অস্ত্র হিসাবে বললে—আচ্ছা, তাহলে আমি উঠি। দেখি মাসিমাকে গিয়ে বললে তিনি কি বলেন—

এই রকম ভাবে সব জায়গায় থেকে বিফল-কাম হয়েই ফিরতে হতো সন্দীপকে। সেই ভোরবেলা নাকে-মুখে ভাত গুঁজে বাড়ি থেকে বেরোন আর ছুটির পর সবগুলো ঠিকানায় গিয়ে পাত্রপক্ষের সঙ্গে দেখা করে সেই শেষ ট্রেনে বেড়াপোতায় ফেরা। আর মাসিমাকে সেই ব্যর্থ-ভ্রমণের বিবরণ দেওয়া। আর তার পরেই মাসিমার সেই একই ভাবে চোখের জল ফেলা। এটা এতদিনে সন্দীপের গা-সওয়া ব্যাপার হয়ে গিয়েছিল।

সেদিনও এমনি সন্দীপ বাসে চড়ে হাওড়া স্টেশনের দিকে ফিরছিল। হঠাৎ মল্লিক-কাকার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। চলন্ত বাসের মধ্যেই অতিকষ্টে দাঁড়িয়ে চলেছেন।

সন্দীপ সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে উঠে বললে—মল্লিক-কাকা?

মল্লিক-মশাইও সন্দীপকে দেখে অবাক।

—আরে সন্দীপ, তুমি কোত্থেকে?

সন্দীপ নিজের বসবার জায়গাটা দেখিয়ে বললে—আপনি দাঁড়িয়ে কষ্ট করছেন কেন? এখানে বসুন—

—তুমি দাঁড়িয়ে থাকবে?

সন্দীপ বললে—আমার দাঁড়িয়ে থাকা অভ্যেস আছে। আমি এতক্ষণ বসেই এসেছি, আপনি বসুন?

মল্লিক-কাকাকে নিজের জায়গায় বসিয়ে দিয়ে সন্দীপ বললে অনেক দিন আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারিনি, কেমন আছেন আপনারা? আমি কোনও খবরই পাচ্ছি না—

মল্লিক-কাকা জিজ্ঞেস করলেন তুমি কেমন আছো? সেই ব্যাঙ্কেই চাকরি করছো?

সন্দীপ বললে—তা ছাড়া আর কি করবো? সেই বেড়াপোতা থেকেই এখন ডেলি-প্যাসেঞ্জারি করছি। সেই ভোরবেলা বেরোই আর এখন এই রাতে হাওড়া স্টেশন থেকে ট্রেন ধরে আবার বেড়াপোতায় ফিরছি—ফিরতে ফিরতে সেই রাত এগারোটা। কোনও কোনও দিন আবার রাত বারোটাও বেজে যায়—

মল্লিক-কাকা বললেন তুমি খুব রোগা হয়ে গেছ দেখছি। অফিস থেকে বেরোতে এত দেরি হয় কেন? তোমাদের ব্যাঙ্ক তো পাঁচটার সময়েই ছুটি হয়ে যায়—

সন্দীপ বললে ব্যাঙ্ক তো পাঁচটার সময়েই ছুটি হয়ে যায়, কিন্তু তারপরে অন্য অনেক কাজ থাকে, সেই সব কাজ সারতে রাত হয়ে যায়—

—এত কী কাজ থাকে তোমার?

সন্দীপ বললে—মাসিমাদের তো আমি আমার বেড়াপোতার বাড়িতে নিয়ে গিয়ে রেখেছি, তা জানেন না বুঝি?

—তাই নাকি? কেন? ওদের দেওর সেই তপেশ গাঙ্গুলীর বাড়ি তো ছিল মনসাতলা লেন-এ, সেখানে গেলেই পারতো ওরা—

সন্দীপ বললে আপনি তো চেনেন তপেশ গাঙ্গুলী মশাইকে। আপনি সব জেনে শুনেও সেই কথা বলছেন?

মল্লিক-কাকা বললেন—তাহলে তো তোমার খুবই কষ্ট!

সন্দীপ বললে—তা কী করবো বলুন! কষ্ট বলে তো ওদের ওই রকম বিপদের মুখে ফেলে রেখে চলে যেতে পারি না—

- আর সেই বিশাখা? তার বিয়ের কী হলো? বিয়ে হয়েছে?

সন্দীপ বললে—বিয়ে কী করে হবে? সেই তার বিয়ের জন্যেই তো চারদিকে হন্যে হয়ে ঘুরছি। সবাই শুধু টাকা চায়। আর শুধু টাকা নয়, দশ ভরি, বারো ভরি গয়নাও চায় তার সঙ্গে- মাসিমা গরীব বিধবা, কোথা থেকে টাকা দেয় বলুন তো? তারপর একটু থেমে বললে—আর আপনি আমার অবস্থাও তো জানেন। আমিই বা অত টাকা কোথা থেকে পাই বলুন তো? আমাকে কেটে ফেললেও তো অত টাকা বেরোবে না--

মল্লিক-কাকা কী বলবেন বুঝতে পারলেন না। বাস তখন তীরবেগে ছুটে চলেছে। তারপর বলতে লাগলেন--আমি তোমার ভালোর জন্যেই তোমাকে কলকাতায় নিয়ে এসেছিলুম, কিন্তু সব কিছু যেন গোলমাল হয়ে গেল। কী কান্ড করতে গিয়ে কী কান্ড হয়ে গেল আর মাঝখান থেকে তোমার কপালেই এই দুর্ভোগের চাপ পড়লো! আমি কী করবো বলো? আমি তো তোমার ভালোই চেয়েছিলুম, ঠাকমা-মণিও সকলের ভালোই চেয়েছিলেন, কিন্তু কেন যে এরকম হলো কে জানে—

মনে আছে সেদিন মল্লিক-কাকা তাঁর গন্তব্যস্থলে আসতেই নেমে পড়লেন আর সঙ্গে সঙ্গে সন্দীপও সেখানে নেমে পড়েছিল।

মল্লিক-কাকা বলেছিলেন—তুমি আবার নামলে কেন?

সন্দীপ বলেছিল--আমি না-হয় লাস্ট্ ট্রেনেই যাবো। অনেক দিন পরে আপনার সঙ্গে দেখা। ও-বাড়ির সব খবর কী? ঠাকমা-মণি কেমন আছেন এখন?

ঠাকমা-মণি এ-যাত্রা বোধহয় সামলে নিলেন মনে হচ্ছে। বোধহয় ফাঁড়া কেটে গেল!

—আর সেই ওঁদের ফ্যাক্টরি?

মল্লিক-কাকা বললেন—সে-সব আর বোল না।

সন্দীপ সেদিন মল্লিক-কাকার মুখ থেকে যে কথা শুনেছিল তা বড় ভয়াবহ। অতদিনের ফ্যাক্টরি, অতদিনের কারবার তা যে এমন করে নষ্ট হতে পারে তা যেন কল্পনা করাও যায় না। মুক্তিপদ যত সামলাতে চেষ্টা করেন বিপদ যেন চারদিক থেকে ততই ঘনিয়ে আসে। শুধু যে ফ্যাক্টরির দিক থেকে তাই-ই নয়, সংসারের দিক থেকেও সহযোগিতার অভাবটা তাঁকে বড় কষ্ট দেয়।

সেদিন মুক্তিপদর সমস্তটা দিন বড় ঝামেলাতে কেটেছে। ইনকাম নেই কিন্তু ইনকাম-ট্যাক্সের ঝামেলা আছে। এ বড় বিচিত্র দেশ এই ইন্ডিয়া। ডালহৌসি স্কোয়ারের অফিস থেকে নাগরাজন টেলিফোন করেছিল- স্যার, ইনকাম-ট্যাক্স অফিস থেকে একটা নোটিশ এসেছে—

মুক্তিপদ অবাক হয়ে গেলেন। বললেন--নোটিশ? কীসের নোটিশ?

—পেনাল্টির নোটিশ!

মুক্তিপদ অবাক হয়ে গেলেন। কেন? পেনাল্টি কেন? ট্যাক্স পেমেণ্ট হয়নি?

নাগরাজন বললে- আই-টি-ও তো তাই লিখেছে—

—কী লিখেছে?

নাগরাজন বললে -আমাদের ট্যাক্স ঠিক মতো পেমেন্ট হয়নি—

মুক্তিপদ খবরটা শুনে চমকে উঠলেন। এমন তো হয় না। এ-রকম ঘটনা কখনও তো ঘটেনি সাকবি-মুখার্জি ফার্মের ইতিহাসে।

বললেন—কেন এ-রকম হলো?

নাগরাজনই চিফ্-অ্যাকাউনটেণ্ট্। তার হেফাজতেই সব হিসেব-পত্র থাকে। যেখানে কোটি-কোটি টাকার লেন-দেন হয় তার সর্বেসর্বা কর্তা নাগরাজনই। ট্যাক্স-পেমেণ্ট যদি ঠিক মতো না হয়ে থাকে তাহলে তার দায় নাগরাজনেরই।

নাগরাজন বললে—আমি এখনই দেখছি কেন এ-রকম হলো—

মুক্তিপদ বললেন—শীগগির দেখ, আর যদি দরকার হয় তো বিজয়েশবাবুকে এক-বার টেলিফোন করে জানাও। আমাদের ট্যাক্স-কন্সালটেণ্ট্ বিজয়েশবাবু—

নাগরাজন বললে—ঠিক আছে স্যার—

মুক্তিপদ টেলিফোন-রিসিভারটা রেখে দিলেন। আগেকার মতো আর শারীরিক ব্যস্ততা তাঁর নেই বটে কিন্তু মানসিক ব্যস্ততা? ওইটাই বড় কষ্টদায়ক। তা ছাড়া প্রোডাকশন নেই অথচ খরচ আছে। কোনও রকমেই খরচ কমানো যাচ্ছে না। ওয়ার্কারদের অবশ্য মাইনে দিতে হচ্ছে না, কিন্তু অফিসের অফিসারদের তো মাইনে দিতে হচ্ছে। সামনের খবরের কাগজটা আবার টেনে নিলেন। প্রথম পাতাতেই উদ্বেগ-জনক খবর। সকাল বেলায় একবার খবরের কাগজটা পড়া হয়ে গিয়েছিল। তবু সেটার ওপর আবার চোখ বোলাতে লাগলেন. ওয়েস্ট বেঙ্গলে এদের জ্বালায় আর কোনও ফ্যাক্টরি চালানো যাবে না। সব জায়গাতেই স্ট্রাইক, ক্লোজার. লক-আউট। সব জায়গাতেই লেবার-ট্রাবল। এ-রকম চললে কী করে তাঁর ফ্যাক্টরি চালাবেন তিনি? আর অর্জুন সরকারের কথা যদি সত্যি হয় তাহলে তো আরো ভয়ের ব্যাপার। সেই 'বাংলা-বন্ধ'। 'বাংলা-বন্ধ' আর আজকাল ওই আর একটা নতুন হাতিয়ার হয়েছে 'পদযাত্রা'। এও তো এক রকম লাইমলাইটে আসার চেষ্টা. এও তো এক-রকম পাবলিসিটির ফাঁদ। সমস্ত দেশটাই কি গোল্লায় যাবে এই সব কেরিয়ারিস্টদের পাল্লায় পড়ে।

নিচে থেকে হঠাৎ দারোয়ান এসে খবর দিলে একজন দেখা করতে চায় তাঁর সঙ্গে।

—কে? নাম কী?

দারোয়ান জানে না।

—কোনও কার্ড দিয়েছে?

—নেহি হুজুর—

মুক্তিপদ বললেন— নাম পুছকে আও—

দারোয়ান চলে যাচ্ছিল কিন্তু তিনি তাকে আবার বললেন—আর কী জন্যে দেখা করতে চায় সেটাও জেনে আসবি—যা—

মুক্তিপদ অনেক ভেবেও ঠিক করতে পারলেন না কে এমন সময়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চায়? উদ্দেশ্য কী তার? এমন ভাবে আগে থেকে না জানিয়ে তো তাঁর কাছে কেউ আসে না!

দারোয়ানের পেছন-পেছন একজন ছেলে এসে হাজির। একেবারে অচেনা মুখ। ছেলেটা পায়ের কাছে নিচু হয়ে প্রণাম করলে। দেখে মনে হলো ছেলেটার বয়েস কুড়ি কি বাইশ হবে বড়জোর।

মুক্তিপদ জিজ্ঞেস করলেন—কে তুমি?

তিনি ছেলেটার মুখের মন-মরা ভাব আর প্রণাম করার ভঙ্গী দেখে ভেবেছিলেন হয়তো তাঁর কাছে চাকরি চাইতে এসেছে। সাধারণতঃ সেইটেই ওয়াই স্বাভাবিক।

ছেলেটি বসলো না। তেমনি দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থাতেই বললে—আমি স্যাক্সবি মুখার্জি কোম্পানীর ইঞ্জিনিয়ার মিস্টার বেণুগোপালের ছেলে—আমার নাম রঙ্গনাথ—

—বেণুগোপালের ছেলে? কী চাও তুমি? চাকরি?

বেণুগোপালের নামটা শুনেই মুক্তিপদর সমস্ত মেজাজটা রাগে রি-রি করে

উঠেছিল।

ছেলেটি বললে—না স্যার, চাকরির নয়—

—তাহলে? তাহলে কী?

রঙ্গনাথ বললে—আমি আমার বাবার একটা চিঠি আপনাকে দিতে এসেছি—

—বেণুগোপালের চিঠি? সেই স্কাউন্ড্রেলটা আবার কী চায়? আমার সর্বনাশ করেও তার আশা মেটেনি? আবার কী চায় সে?

রঙ্গনাথ তার বাবার বিরুদ্ধে এই গালাগালি শুনে প্রথমে কেমন যেন ঘাবড়ে গেল। তারপর সে কী বলবে তা বুঝতে পারলে না।

তারপরে একটু সামলে নিয়ে প্যান্টের পকেট থেকে একটা ভাঁজকরা চিঠি বার করে সামনের দিকে এগিয়ে ধরলে।

মুক্তিপদ চিঠিটা হাতে নিলেন না। বললেন—ও চিঠি পড়বার মতো সময় নেই আমার, চিঠিতে বেণুগোপাল কী লিখেছে তাই বলো—

রঙ্গনাথ এ-কথায় একটু থতমত খেয়ে গেল। তারপর বললে—ও চিঠিতে বাবা আপনার কাছে লিখেছেন যে বাবা স্যাক্সবি মুখার্জি কোম্পানীর একটা দেড় লাখ টাকা দামের দামী মেশিন পুড়িয়ে দিয়ে খুব ক্ষতি করেছিলেন—

মুক্তিপদ বললেন—তা সে-কথা এখন স্বীকার করলে আমার কী লাভ হবে? তখন মনে ছিল না? তোমার বাবা, ওই বেণুগোপালের জন্যেই তো আমাদের ফ্যাক্টরিতে লক-আউট হলো—

রঙ্গনাথ বললে—আপনি চিঠিটা পড়লেই বুঝতে পারবেন যে বাবা স্বীকার করেছেন তাঁদের পার্টির কাছ থেকে এক লাখ টাকা ঘুষ খেয়েই ওই কাজ করেছিলেন।

মুক্তিপদ বললেন—সেটা তো সবাই জানে। আর জানে বলেই তোমাদের বাড়ি সার্চ করা হয়েছিল। কিন্তু সার্চ করেও তোমাদের বাড়ি থেকে সে-টাকা পাওয়া যায়নি—

রঙ্গনাথ বললে—পাওয়া যায়নি কারণ আপনার ড্রাইভার বাড়ি সার্চ হওয়ার আগের রাতেই আমার বাবাকে লুকিয়ে খবরটা দিয়ে গিয়েছিল—

মুক্তিপদ অবাক হয়ে গেলেন। বললেন—আমার ড্রাইভার? বিশ্বনাথ?

রঙ্গনাথ বললে—হ্যাঁ—

—তা তুমি কী করে সে-কথা জানতে পারলে?

রঙ্গনাথ বললে—আমি বাবার এই চিঠিটা পড়েই জানতে পারলুম! আর আমার বাবাও সেই জন্যে খুব দুঃখ পেয়েছেন। কারণ তিনি লিখেছেন যে আজ যে স্যাক্সবি-মুখার্জি কোম্পানীর হাজার হাজার লোকের চাকরি নেই, হাজার হাজার ফ্যামিলির লোকরা আজ যে উপোস করছে, এর জন্যে আমার বাবাই দায়ী—

মুক্তিপদ বললেন—তা তো বটেই। তোমাদের বাড়ি সার্চ হওয়ার পরেই তো কোম্পানীর সমস্ত লোক স্ট্রাইক করে বসলো—এর জন্যে তো তোমার বাবাই দায়ী—

রঙ্গনাথ বললে—সে-কথা বাবা নিজেই এই চিঠিতে লিখেছেন—

মুক্তিপদ চিৎকার করে উঠলেন। বললেন—তা সে-কথা লিখে জানিয়ে কী লাভ হবে আমার? সে-কথা জানাতে সে নিজে একবার আসতে পারলে না?

রঙ্গনাথ বললে—তিনি নিজে কী করে আসবেন? তিনি তো মারা গেছেন!

—মারা গেছে!!!

এতক্ষণে রঙ্গনাথের চোখ ফেটে যেন রক্ত বেরিয়ে এল। বললে—বাবা আত্মহত্যা করে মারা গেছেন!

মুক্তিপদ তখনও যেন কথাটা বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। বললেন—বলছো কি, বেণুগোপাল আত্মহত্যা করেছে? কবে? কখন?

—তিন দিন আগে!

—সে কী? কেন? হঠাৎ আত্মহত্যা করতে গেল কেন বেণুগোপাল?

রঙ্গনাথ বললে– ক'মাস আগে আমার দিদি নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল। স্ট্রাইকের জন্য আমরা সবাই প্রায় রোজই উপোস করছিলুম। সেই সময়ে আমার দিদি রোজ বিকেল বেলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেত। আর যখন ফিরতো তখন অনেক রাত। কোনও কোনও দিন রাত একটা দুটোও বেজে যেত দিদির বাড়ি ফিরতে। একদিন ওই রকম রাত করে বাড়ি ফেরার পর বাবা দিদিকে খুব বকেছিলেন। বলেছিলেন— এত রাত পর্যন্ত রোজ কোথায় থাকিস, বল্? বল্ কোথায় থাকিস্?

আমার দিদি কোনও জবাব দিতে পারেনি বলে বাবা তার গালে এক চড় কষিয়ে দিয়েছিল। বাবার চড় খেয়ে দিদি তার ব্যাগ থেকে কয়েকটা একশো টাকার নোট বাবার দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলেছিল—কেন আমি রাত করে বাড়ি ফিরি তা দেখ, তোমাদের মুখে পিন্ডি দেওয়ার জন্যেই আমি রাত করে বাড়ি ফিরি, আর কখনও জিজ্ঞেস করবে কেন আমি রাত করে বাড়ি ফিরি, কার জন্যে বাড়ি ফিরতে আমার এত রাত হয়...? জিজ্ঞেস করবে?

আর সেই রাতেই আমার দিদি গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে মরে যায়। আর তার পরের দিন আমার বাবাও এক শিশি ঘুমের বড়ি খেয়ে আত্মহত্যা করেন। আমরা তার ঘরে গিয়ে এই চিঠিটা পাই। এ চিঠিটা আপনাকেই লিখে গেছেন বলে আমি চিঠিটা আপনাকেই দিয়ে গেলুম—

মুক্তিপদ তখন চিঠিটা নিয়ে পড়তে লাগলেন। যে-সব কথা ছেলেটা মুখে বলেছে সেই সব কথাই বেণুগোপাল মরবার আগে তাঁকে সম্বোধন করে লিখে গেছে। শেষ-কালের দিকে লিখেছে—"স্যার, যে-সব কথা আমি ওপরে লিখেছি সব সত্যি কথা। আমার জন্যই স্যাক্সবি মুখার্জি কোম্পানীতে স্ট্রাইক হয়েছিল। আমি কোম্পানীর দেড় লাখ টাকার মেশিনটা পুড়িয়ে দিয়েছিলুম এক লাখ টাকা ঘুষ নিয়ে। ওই এক লাখ টাকার ঘুষের জন্যেই আমার বাড়ি সার্চ হলো, ওই এক লাখ টাকা ঘুষের জন্যেই আমাদের সকলের কোয়ার্টার সার্চ করা হলো, ওই এক লাখ টাকার ঘুষের জন্যেই সমস্ত ওয়ার্কাররা আজ উপোস করছে, ওই এক লাখ টাকা ঘুষ নেওয়ার জন্যেই আমার মেয়ে বেশ্যা হলো, ওই এক লাখ টাকার ঘুষের জন্যেই আমার বেশ্যা মেয়ে আত্মহত্যা করে মরলো, আর ওই এক লাখ টাকা ঘুষ নেওয়ার জন্যেই আমি আজ পুরো এক শিশি ঘুমের বড়ি খেয়ে আত্মহত্যা করলুম। আপনাদের আর আমাদের সকলেরই আমি সর্বনাশ করে গেলাম। এক লাখ টাকা ঘুষ নিয়ে যে-পাপ করেছি, কার কাছ থেকে এক লাখ টাকা ঘুষ নিয়েছি, কে আমাকে এক লাখ টাকা ঘুষ দিয়েছে, তার নাম বলে দিয়ে আর আমার পাপের বোঝা বাড়াতে চাই না। শেষ সময়ে শুধু একটাই অনুরোধ আপনার কাছে জানাই যে আপনি আমায় ক্ষমা করবেন। আমি ক্ষমার অযোগ্য, নরকেও আমার স্থান হবে না—

সন্দীপ এতক্ষণ ধরে মল্লিক-মশাইয়ের কথাগুলো এক মনে শুনছিল।

জিজ্ঞেস করলে– তারপর? মুক্তিপদবাবু চিঠি পড়ে কী বললেন?

মল্লিক মশাই বলতে লাগলেন। মুক্তিপদবাবুর চোখ দুটো জলে ভিজে এসেছিল।

রঙ্গনাথ বললে—তাহলে আমি এখন যাই স্যার?

মুক্তিপদবাবু বললেন না, একটু দাঁড়াও তুমি

বলে মুক্তিপদবাবু উঠে ভেতরে গেলেন। তারপর এক মিনিটের মধ্যে আবার ফিরে এলেন, তাঁর হাতে তখন এক তোড়া নোট।

রঙ্গনাথকে বললেন এই টাকা ক'টা নাও তুমি রঙ্গনাথ। এতে এক হাজার টাকা

আছে, পরে আরো বেশি দেব—

—টাকা?

কথাটা শুনে রঙ্গনাথের মুখটা যেন কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

মুক্তিপদ বললেন—এখন এক হাজার টাকাই নিয়ে যাও, পরে আরো বেশি টাকা দেব।

রঙ্গনাথ হঠাৎ কঠিন হয়ে উঠলো। বললে—না স্যার, আমি টাকা নিতে পারবো না। আমি ও-টাকা নেব না—

মুক্তিপদ জিজ্ঞেস করলে—কেন, টাকা নেবে না কেন? নাও টাকা। তোমাদের বিপদের সময়ে যদি টাকা না নাও তো আর কখন টাকা নেবে?

রঙ্গনাথ তবু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। বললে—আর কার জন্যে টাকা নেব?

—কেন, তোমার মা? তোমার মা তো আছে। তুমিও তো ছোট এখন...

রঙ্গনাথ বললে—আমার মা নেই। একটা বোন ছিল, সেও চলে গেছে, বাবাও চলে গেল। তাহলে আর কার জন্যে টাকা নেব?

মুক্তিপদ বললেন—তুমি তো রয়েছ। তোমারও তো ভবিষ্যৎ আছে—

রঙ্গনাথ বললে—আমার স্যার ভবিষ্যৎ নেই। আমি একলা মানুষ, যেমন করে হোক একটা পেট চালিয়ে নেব। বাবার হাতের সোনার আংটি আছে, বোনের গলার সোনার হার আছে, সেইগুলো বেচে যা টাকা পাবো তাই নিয়ে দেশে চলে যাবো। এই বাংলা দেশে আমি আর আসবো না স্যার—আমি চলি—

ছোট ছেলে। কিন্তু ওই ছোট ছেলেরই কত তেজ! মুক্তিপদর হাত থেকে টাকা না নিয়েই ছেলেটা ঘর ছেড়ে বাইরে চলে গেল।

মুক্তিপদর হাতে তখনও বেণুগোপালের চিঠিটা রয়েছে। তিনি অন্যমনস্কের মতো আবার পড়তে লাগলেন। বেণুগোপাল আত্মহত্যা করেছে বটে, কিন্তু সমস্ত চিঠিটার মধ্যে যেন ভর্ৎসনা ছড়িয়ে দিয়ে গেছে। এক হাজার টাকা দিয়ে তিনি বেণু-গোপালের ঋণ শোধ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সে মুক্তিপদর যা ক্ষতি করে গিয়েছে তা কি টাকা দিয়ে শোধ করা যায়? বেণুগোপাল তাঁর ক্ষতি করেছে, না তিনি বেণুগোপালের ক্ষতি করতে চাইছিলেন ওই হাজার টাকার খেসারত দিয়ে? কোন্‌টা ঠিক? তিনি তখনও কিছু বুঝতে পারছিলেন না।

সন্দীপ মুক্তিপদবাবুর গল্প একমনে শুনছিল।

জিজ্ঞেস করলে—তারপর? তারপর?

মল্লিক-কাকা বলতে লাগলেন—আমার কাছে এসে মেজবাবু গল্পটা বলতে বলতে থেমে গেলেন। বললেন—জানেন সরকারবাবু, আপনি হেনরি ফোর্ডের নাম শুনেছেন তো, যাঁর কোম্পানীর নাম ছিল—'ফোর্ড মোটর কোম্পানী'?

মল্লিক-মশাই বললেন- হ্যাঁ –

—সেই হেনরি ফোর্ড সাহেবের ফ্যাক্টরিতে প্রতি মিনিটে একটা করে মোটর গাড়ি তৈরি হয়ে বেরোত। তাঁর দিনে আয় ছিল সে-যুগে ষোল লাখ টাকা। বুঝে দেখুন, সেই অত টাকার মানুষটা যখন মারা গেলেন তখন কী হয়েছিল জানেন? আমি তাঁর জীবনীটা পড়ে বুঝেছি টাকায় কিছুই কেনা যায় না সরকারবাবু। সেই মানুষটা যখন মরো-মরো তখন ডাক্তারকে ডাকবার জন্যে টেলিফোন করতে গিয়ে দেখা গেল টেলিফোনটা খারাপ হয়ে গিয়েছে। শেষ পর্যন্ত অনেক দেরিতে যখন ডাক্তার এল তখন ফোর্ড সাহেবের নরদেহটাতে আর প্রাণ নেই। শুধু ওই খারাপ টেলিফোনের জন্যেই কোটিপতি মানুষটা সেদিন মারা গেলেন বিনা চিকিৎসায়—

বলতে-বলতে মেজবাবুর চোখ দুটোও জলে ভিজে আসছিল। নিজের দুর্বলতা

ধরা পড়ে যাওয়ার জন্যেই বোধহয় মেজবাবু উঠে পড়লেন। তারপর তিনি তাঁর নিজের গাড়িতে গিয়ে উঠে বাড়ি চলে গেলেন—

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—আর সেই ইনকাম-ট্যাক্সের ব্যাপারটার কী হলো? যে-চিঠিটা নিয়ে অত অশান্তি, সেই পেনাল্টি চেয়ে চিঠিটার কী হলো?

ও, সেই চিঠিটা? সেই চিঠিটা নিয়েই কি কম ঝামেলা হলো? নাগরাজন থেকে বিজয়েশ কানুনগো, ট্যাক্স-স্পেশালিস্ট, সবাই তো থর-থর করে কাঁপতে শুরু করেছিল। একদিকে প্রোডাকশন বন্ধ, আবার অন্যদিকে ইনকাম-ট্যাক্সের ঝামেলা। শেষকালে খাতা-পত্র খুঁজে দেখা গেল সব পেমেন্ট করা হয়ে গিয়েছে। তাহলে কী করে পেনাল্টি হয়।

ইনকাম-ট্যাক্স অফিস আবার ঠিক সেই সময়ে একসঙ্গে কয়েকদিন বন্ধ। দোলের ছুটি আর গুড-ফ্রাইডের ছুটি আর রবিবার একসঙ্গে পাশাপাশি পড়েছে। তার ফলে অফিসের সব কাজ-কর্ম বন্ধ। আর এদিকে তত উদ্বেগ আর তত উত্তেজনা।

শেষকালে অফিস যখন খুললো তখন নাগরাজন অফিসে গিয়ে দেখলে আসল ব্যাপারটা। সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—কী দেখলে? আসল ব্যাপারটা কী?

—আসল ব্যাপারটা হচ্ছে অফিসের ক্লার্কদের ভুল। স্যাক্সটন এ্যান্ড কোম্পানীর জায়গায় 'স্যাক্সবি মুখার্জি এ্যান্ড কোম্পানী'র নাম লিখে ফেলেছে। আর তার ফলে তিন রাত মুক্তিপদ'র রাত্রের ঘুম যে নষ্ট হলো তার খেসারত কে দেবে বলো তো তুমি? কে দেবে এর খেসারত? কাকে দায়ী করবে তুমি?

সন্দীপও বুঝতে পারলে না কার দোষের জন্যে মানুষ কাকে দায়ী করবে। সবাই ঘুষ খাবে, সবাই-ই কাজে ভুল করবে, অথচ কেউ তার দায়িত্ব নেবে না। এ রকম কাজ কি সেই ইংরেজ আমলে হতো? নাকি দেশ স্বাধীন হওয়ার এইটেই সবচেয়ে বড় অভিশাপ? তাদের ব্যাঙ্কেও সেই তো একই অবস্থা। কেউ কাজ করবে না, অথচ মাইনে বাড়াবার দাবী আদায়ের বেলায় মিছিল করবে, স্লোগান দেবে, ইউনিয়ন করবে, 'গো-স্লো' করবে।

তাদের ব্যাঙ্কের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার মালব্য সাহেবও বলতেন—পৃথিবীর কোনও দেশে এ-রকম হয় না, জানো সান্যাল। তোমাদের জন্যেই আমাকে রবিবার কি ছুটির দিনও ব্যাঙ্কের কাজে আসতে হয়। আমার কোনও ছুটি নেই জীবনে। অথচ আমিও তো একদিন তোমাদের মতোই জুনিয়ার স্টাফ ছিলুম, আমি তো আর রাতারাতি একদিনে ব্রাঞ্চ ম্যানেজার হইনি—

করমচাঁদ মালব্য বলতেন—তোমাদের বাঙালীদের মধ্যেই এই কাজ না করে মাইনে বাড়াবার প্রবৃত্তি, এমন ফাঁকি দেবার ঝোঁক আর কোনও স্টেটের মানুষদের মধ্যে নেই। এটা কেন হলো জানো? ইংরেজরা যেদিন ইন্ডিয়ার ক্যাপিট্যাল বেঙ্গল থেকে দিল্লি সরিয়ে নিয়ে গেল, সেই দিন থেকেই শুরু হলো বাঙালীদের এই অধঃপতন। ইংরেজদের অন্য অনেক গুণের মধ্যে একটা গুণ হচ্ছে—দূরদৃষ্টি। এই দূরদৃষ্টি জিনিসটা এশিয়ার কোনও জাতের মধ্যে নেই। তারা দেখেছিল এই বাঙালীদের দেশে ইন্ডিয়ার ক্যাপিট্যাল রাখলে একদিন-না-একদিন তাদের ইন্ডিয়া ছেড়ে চলে যেতেই হবে! বাঙালীরা হচ্ছে ইন্ডিয়ার মধ্যে সবচেয়ে ধড়িবাজ জাত। তাই এখান থেকে ক্যাপিট্যাল সরিয়ে নিয়ে গেলে তারা আরো কিছু বছর অন্ততঃ ইন্ডিয়ায় টিকে থাকতে পারবে। তা তাদের দূরদৃষ্টির ফল আজ ফলেছে। তাই যে-দিল্লী শহরটা একদিন ছিল কেরানীর শহর, সেটাই এখন সবচেয়ে বড় ইনডাসট্রিয়াল শহর হয়ে উঠছে, সেখানে দেশভাগের পর থেকেই যত বড় বড় ইনডাসট্রি গড়ে উঠেছে। যেমন ধরো শ্রীরাম নন্দা, মোদি, থাপার গ্রুপ… সেখানে এত স্ট্রাইক নেই, এত ক্লোজার নেই, কিছুই নেই—

করমচাঁদ মালব্য বলতেন—তুমি বাঙালী। বাঙালীদের নিন্দে শুনতে তোমার নিশ্চয়ই খুব খারাপ লাগছে। কিন্তু যা সত্যি তাই-ই আমি বলছি। একদিন এই

বেঙ্গলে যত বড় বড় ফ্যাক্টরি ছিল, যত বড় বড় ইন্ডাসট্রি ছিল, আর কোথাও তা ছিল না। কিন্তু এখন? এখন কেন এত ফ্যাক্টরি, এত ইন্ডাসট্রি বেঙ্গল ছেড়ে অন্য স্টেটে চলে যাচ্ছে?

এর কোনও সদুত্তর সন্দীপ সেদিন দিতে পারেনি। কিন্তু কথাটা নিয়ে মনে মনে অনেক ভেবেছে সে। একজন বাঙালীর যদি একটু ভালো হয় তাহলে অন্য সব বাঙালীর বুক ফেটে যায়। অথচ কোনও গুজরাটী বা মারোয়াড়ী বা পাঞ্জাবীর যদি কিছু ভালো হয় তাতে তো কোনও বাঙালীর বুকও ফাটে না, কোনও বাঙালীর চোখও টাটায় না—

সেদিন শেষ ট্রেনটা শেষ মুহূর্তে ধরে বেড়াপোতায় যেতে যেতে মুক্তিপদবাবুর কথাগুলো মনে পড়ছিল কেবল। কৌটিপতি হেনরি ফোর্ডেরও মৃত্যু হলো কিনা সামান্য একটা টেলিফোনের অচল হওয়ার ফলে। আর মনে পড়ছিল করমচাঁদ মালব্যর কথা।

করমচাঁদজী সন্দীপকে খুব ভালোবাসতেন। বলতেন—খুব মন দিয়ে কাজ করে যাও সান্যাল, একেবারে ফাঁকি দিও না। যারা বলে মন দিয়ে কাজ না করলেও লোকের ভালো হয় তারা ভুল বলে। ফাঁকির বীজ বিষের মতন। বিষের বীজের ফল দেরি করে ফলে। ওটার ফল ফলতে দেরি হয় বলে লোকে ওই কথা বলে। আসলে ভালো কাজের ফলও দেরি করে ফলে। অত অধৈর্য হতে নেই। ব্যাঙ্কে কে-কে কাজ করছে আর কে-কে ফাঁকি দিচ্ছে, সবই আমি জানি, সবই আমি দেখতে পাই। কিন্তু কিছু বলি না। না-বলার কারণ হচ্ছে যারা মনে করছে ফাঁকি দিয়েই তারা বাজিমাৎ করবে একদিন তারাই ফাঁকে পড়বে। তখন তারা কপালের দোহাই দেবে। কিন্তু তারা জানে না যে মাথার ওপর এই সূর্য, চন্দ্র, তারা, গ্রহ, নক্ষত্র এদেরও চোখ আছে, এরা ফাঁকি দেয় না বলেই এখনও আমরা বেঁচে আছি। ফাঁকি দেয় না বলেই এখনও পৃথিবীটা চলছে। কিন্তু যদি ফাঁকি দিত? ভাবো তো সেদিনের কথা!

কী জানি কেন করমচাঁদজী সন্দীপকে প্রথম দিন থেকেই সুনজরে দেখেছিলেন। কেন সুনজরে দেখেছিলেন তার কোনও কারণ সে জানতো না। তবে এটা হতে পারে যে সন্দীপ গরীব ঘরের ছেলে এটা তিনি জানতেন। কিন্তু সেটা তো সহানুভূতি। সহানুভূতি আর ভালোবাসা তো এক জিনিস নয়। ভালোবাসবেন কেন তিনি তাকে? পরে যে সন্দীপ ওই ব্যাঙ্কেরই একটা ব্রাঞ্চ ম্যানেজার হতে পেরেছিল সেটা ওই করমচাঁদজীরই রেকমেন্ডেশনে। এও তো তাঁর ভালোবাসারই ফল! টাকার ঋণ তবু শোধ করা যায়, কিন্তু ভালোবাসার ঋণ?
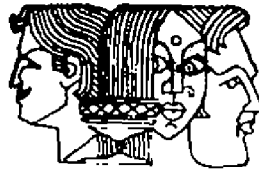
সেদিনও সেই আগেকার একটা রাতের মত ঘটনা ঘটলো।

সে তখন অঘোরে ঘুমুচ্ছে। হঠাৎ কে যেন তার গায়ে ঠেলা দিলে। আর সঙ্গে সঙ্গে সে চেঁচিয়ে উঠেছে—কে? কে?

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কে যেন তার মুখে হাত চাপা দিয়ে দিয়েছে। আর চেঁচাতে দিলে না।

সারা দিনের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর ক্লান্তিতে চোখ দুটো ঘুমে জড়িয়ে আসা কিছু অস্বাভাবিক জিনিস নয়। সেদিনও তাই হয়েছিল। একহাতে থলি ভর্তি

বাজার। সেই ভারি বোঝা নিয়ে সে হেঁটে হেঁটে লম্বা প্ল্যাটফরমটা পেরিয়ে প্রায় দৌড়তে দৌড়তে ট্রেনে উঠেছিল। তারপর বেড়াপোতা স্টেশনে যখন নেমেছিল তখন বিনোদ-কাকার মিষ্টির দোকানটাও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। মিষ্টির দোকানটার পাশেই বারোয়ারি-তলার হাট। তখন হাট উঠে গেছে। কিছু লোক আলো নিভিয়ে দিয়ে মাল-পত্র পুটলিতে বেঁধে পাশে শুয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। আর ঠিক তার উত্তরেই সেই গোপাল হাজরার তিনতলা পার্টির নামে অফিস বাড়িটা!

ওইখান দিয়ে যেতে গেলেই বরাবর তারক ঘোষের কথা সন্দীপের মনে পড়তো! আর তারক ঘোষের কথা মনে পড়লেই মনে পড়ে যেত গোপাল হাজরাকে। সন্দীপের জীবনের সঙ্গে কেমন করে যে গোপাল হাজরা আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে গিয়েছিল—সেটাই আশ্চর্য। গোপাল হাজরা ছোটবেলাতেই বলেছিল—লেখাপড়া শিখে তুই কী করবি, কলকাতাতে চলে আয়, এখানে টাকা উড়ছে—

তাহলে কি বেণুগোপালকে এক লাখ টাকা দিয়েছিল গোপাল হাজরাই?

কোথা থেকে টাকা পায় গোপাল হাজরা? কোন্ টাকায় সে বেড়াপোতায় তিন-তলা বাড়ি করে? নাইট্-ক্লাবে গিয়ে সে অত টাকা খরচ করেই বা কী করে? ফিরিঙ্গী পাড়ায় গিয়ে সে গুন্ডাদের সঙ্গেই বা অমন করে মেশে কেন? কলকাতার মোড়ে-মোড়ে পুলিশকেই বা অত টাকা দেয় সে কেন মুঠো-মুঠো? গোপাল হাজরা কি জানে না যে টাকা কখনও সঙ্গে যায় না? হেনরি ফোর্ডের কোটি-কোটি টাকা থাকা সত্ত্বেও বিনা চিকিৎসায় মারা যাওয়ার খবর সে কি কারো কাছে শোনেনি? আর দিগ্‌বিজয়ী সম্রাট আলেকজান্ডার? তাঁর কথাও কি গোপাল হাজরা শোনেনি?

সে-গল্প তো ইস্কুলের বইতেই পড়েছিল সন্দীপ! কেন ওরা পড়ে না?

বাড়িতে আসতেই অন্য দিনের মতো মাসিমা জিজ্ঞেস করেছিল—কী বাবা, আজ কিছু খবর পেলে?

সন্দীপ বলেছিল—না। সবাই ওই একই কথা বলে। সবাই-ই বলে এক-কথা—দেনা-পাওনা কী রকম হবে। আমি যত বলি মেয়ে অপরূপ রূপসী, একবার শুধু পাত্রীকে দেখে যান, তা দেখবে না। আমার বড় রাগ ধরে যায় ও-রকম কথা শুনলে—

মাসিমা সান্ত্বনা দেয়। বলে—না বাবা, তুমি রাগ কোর না—লোকে তো ও-রকম কথা বলবেই। দেশের সব লোক তো আর খারাপ হয়ে যায়নি। ভালো লোক নিশ্চয়ই আছে কোথাও না কোথাও—

সন্দীপও সে-কথায় সায় দিত। বলতো—সব লোক খারাপ হয়ে গেছে এ-কথা আমি বিশ্বাস করি না। তা না হলে পৃথিবী চলছে কেন এখনও?.

তখন আর বেশি কথা বলবার সময়ও থাকতো না কারো। সন্দীপের খাওয়া হয়ে গেলে তখন মা, মাসিমা, বিশাখা সকলে একসঙ্গে খেতে বসতো। কমলার মা-ই সবচেয়ে শেষে খেয়ে দেয়ে বাসন-কোসন মেজে তবে শুতে যেত। কিন্তু সে সব শব্দ তখন আর সন্দীপের কানে আসতো না। বিছানায় পড়া মাত্রই তার দু'টো চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসতো। ঘুমের ঠিক আগেকার মুহূর্তে কখনও মনে পড়ে যেত বিশাখা-মণির কথা, কখনও মুক্তিপদবাবুর কথা, কখনও মল্লিক-কাকার কথা, কখনও বা ক্ষেমচাঁদজীর কথা। তারপরে এক লম্বা ঘুমে রাত কাবার।

সেদিনও সন্দীপ ঘুমের সমুদ্রে আপাদ-মস্তক ডুবে গিয়েছিল আর সঙ্গে সঙ্গে কে যেন তাকে ঠেলে দিয়েছিল। সন্দীপ আচমকা ঠেলা খেয়েই চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিল—কে? কে? কে?

হঠাৎ যেন তার আগেই কে তার হাত দিয়ে মুখ চাপা দিয়ে বলেছিল- চুপ, চুপ—

—তুমি? তুমি এত রাতে কী করতে?

সন্দীপ অবাক হয়ে গিয়েছিল বিশাখার গলা শুনে।

বিশাখা বলেছিল—চুপ করো, চেঁচিও না। তোমার সঙ্গে কথা আছে—

—কী কথা?

বিশাখা বললে—একটু বাইরে এসো, এখানে কথা বললে কেউ শুনে ফেলতে পারে।

তারপর তাকে বাইরে নিয়ে গিয়ে গলা নিচু করে বললে—আমার বিয়ের জন্যে তুমি এত ঘোরাঘুরিই বা করছো কেন আর এত টাকাই বা নষ্ট করছো কেন? আমি তো বিয়ে করবো না—

সন্দীপ আরো বিস্মিত, আরো স্তম্ভিত হয়ে গেল। বললে—তার মানে?

বিশাখা বললে—হ্যাঁ যা বলছি তা ঠিকই বলছি। আমি বিয়ে করবো না। কেউ যদি বিনা পয়সাতেও আমাকে বিয়ে করতে চায় তো তাও আমি বিয়ে করবো না। তুমি যদি আমার বিয়ের আর চেষ্টা করো তো আমি গলায় দড়ি দেব। আমি কি ছাগল না ভেড়া যে সবাই মিলে আমায় এমনি করে জবাই করবে? তোমরা সবাই আমাকে কী পেয়েছ, কী? তবু যদি তুমি আমার বিয়ের জন্যে লোকেদের কাছে গিয়ে পা ধরো তো সত্যি বলছি আমি ঠিক গলায় দড়ি দিয়ে মরবো—

সন্দীপ হতবাক। খানিকক্ষণ তার মুখ দিয়ে কোনও কথাই বেরোল না। তারপর জিজ্ঞেস করলে—তা বিয়ে যদি না করো তো কী করবে তাহলে?

বিশাখা বললে—ভয় নেই, আমি তোমার পয়সায় বসে বসে খাবো না। আমি চাকরি করে নিজের টাকায় আমার আর আমার মা'র পেট চালাবো। এর চেয়ে সে অনেক ভালো।

সন্দীপ বললে—চাকরি?

বিশাখা বললে—হ্যাঁ চাকরি। কেন, তুমি চাকরি করতে পারো আর আমি মেয়েমানুষ বলে চাকরি করতে পারি না?

সন্দীপ বললে—কেন পারবে না? কিন্তু কে তোমায় চাকরি দেবে?

বিশাখা বললে—এত মেয়ে আজকাল চাকরি করছে আর আমাকে কেউ চাকরি দেবে না?

—কিন্তু কেন তুমি এত কষ্ট করতে যাবে? আমি তো রয়েছি!

বিশাখা বললে—তুমি রয়েছ বলে আমি আর আমার মা দুজনে তোমার ঘাড়ে বসে বসে খাবো, তোমার অন্ন-ধ্বংস করবো?

সন্দীপ বললে—ছিঃ, তুমি কোন্ মুখে এই কথা বলতে পারলে? তুমি কি আমাকে এতই পর ভাবলে?

বিশাখা বললে—পর নয় তো কী? তুমি আমাদের কে যে আমাদের সারা জীবন বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াবে?

সন্দীপ বললে—এত দিন এত বছর ধরে তুমি আমাকে দেখে আসছো, আর আজ তুমি কি না এই কথা মুখ ফুটে বললে? বিয়ে যদি না-ই করো তো চাকরি করবেই বা কী জন্যে? কার জন্যে?

বিশাখা বললে—অন্য লোকে যে-জন্যে চাকরি করে আমিও সেই জন্যেই চাকরি করবো। টাকার জন্যে—

—টাকার জন্যে?

—হ্যাঁ, টাকাই তো পৃথিবীতে সব। টাকার জন্যেই তো আমার মা মুখার্জিদের ছেলের সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে রাজি হয়েছিল। আমিও সেই তাদেরই দেখিয়ে দেব যে আমিও টাকা উপায় করতে পারি, আমরাও ভিখিরি নই। আমাদেরও মান-সম্মান আছে, আমাদেরও আত্ম-সম্মান বোধ আছে।

তারপর একটু থেমে বললে—আর তাছাড়া, আমি চাকরি পেয়েও গিয়েছি, শুধু ইনটারভিউটাই যা বাকি!

—কোথায় চাকরি পেয়েছ? কোন্ অফিসে? কী করে চাকরির খবর পেলে তুমি?

—খবরের কাগজ থেকে। তুমি যে-খবরের কাগজ বাড়িতে আনতে সেই খবরের কাগজ থেকে। সেই বিজ্ঞাপন দেখেই আমি এ্যাপ্লিকেশন করে দিয়েছিলুম। আর নিজের ছবিও পাঠিয়েছিলুম—

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—কীসের অফিস?

বিশাখা সন্দীপের দিকে একটা কাগজ বাড়িয়ে দিলে। বললে—এইতে সব লেখা আছে। এখন অন্ধকারে তুমি কিছু দেখতে পাবে না। কাল সকালে দেখো! আমি শুধু এই কথাটা বলবার জন্যেই তোমার ঘুম ভাঙিয়ে কষ্ট দিলুম যে, তুমি আমার বিয়ের চেষ্টা করো না। আমি বিয়ে করবো না—তা তারা যত বড়লোকই হোক—

তারপরই বললে—আচ্ছা চলি—

বলেই অন্ধকারের মধ্যে বিশাখা তার নিজের ঘরের দিকে নিঃশব্দে চলে গেল।

সন্দীপ বিস্ময়-বিমূঢ় হয়ে একলা অনেকক্ষণ সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইল। তার মনে হলো আর তার ঘুম আসবে না।
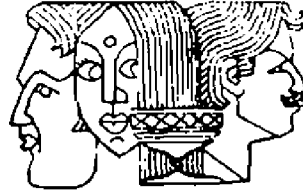
সেদিনই বিডন স্ট্রীটের মুখার্জি-বাবুদের বাড়ির ভেতরে মাঝ-রাত্রে ঠাকমা-মণির হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেছে। এমনিতে কম ঘুমোলেও এই বয়েসেও তাঁর যে-টুকু ঘুম হয় তা তাঁর পক্ষে যথেষ্ট। ভোর চারটের পর আর তাঁর ঘুম হয়ও না, ঘুমের প্রয়োজনও হয় না তাঁর। ঘুম ভাঙবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রথম মনে পরে সৌম্যর কথা। ছোটবেলা থেকে সৌম্য তাঁর কাছেই শুতো।

অল্পবয়সে সৌম্যর বাবা-মা মারা যায়। কাকে বলে জীবন, কাকে বলে মৃত্যু সে-সব বোঝবার মতো বয়েস হয়নি তার তখন। কখনও জিজ্ঞেসও করতো না তার বাবা কোথায়, কিংবা তার মা কোথায়? তাদের অভাব যাতে সৌম্য বুঝতে না পারে ঠাকমা-মণি দিন-রাত সেই চেষ্টাই করতেন। অনেকদিন গাড়িতে তুলে নিয়ে বেড়াতে নিয়ে যেতেন তাকে।

গাড়িতে যেতে-যেতে সে যা-কিছু দেখতো সব তাতেই তার কৌতূহল।

বলতো—ওটা কী ঠাকমা-মণি?

ঠাকমা-মণি বলতেন—ওটা বাড়ি—

—ওটা কী?

—ওটা খেলার মাঠ।

—কারা খেলে ওখানে?

ঠাকমা-মণি বলতেন—যত বদমাইশ ছেলেরা ওখানে খেলে—

—আমি খেলবো ওদের সঙ্গে।

ঠাকমা-মণি বলতেন—ছিঃ, ছোটলোকদের সঙ্গে মিশতে নেই—

—ছোটলোকদের সঙ্গে মিশলে কী হয়?

ঠাকমা-মণি বলতেন—ছোটলোকদের সঙ্গে মিশলে মানুষ দুষ্টু হয়—

—দুষ্টু হলে কী হয়?

ঠাকমা-মণি তারপর থেকে আর সেই সব মাঠের দিকে যেতেন না। ড্রাইভারকে বলতেন ইডেন-গার্ডেনের দিকে যেতে। কিন্তু সে-ইডেন-গার্ডেন তখন আর আগেকার মতো ছিল না। অনেক দিন পরে ইডেন-গার্ডেনের দুর্দশা দেখে তাঁর নিজেরই দুঃখ হতো। সেখানেও তখন ছোটলোকদের ছেলেদের ভিড় শুরু হয়েছে। তিনি মনে মনে ভাবতেন যে তিনি যখন থাকবেন না তখন সৌম্যর কী হবে? তখন সৌম্যকে কে ছোটলোকদের ছোঁয়া থেকে বাঁচাবে?

সৌম্য জিজ্ঞেস করতো—ছোটলোক মানে কী ঠাকমা-মণি?

ঠাকমা-মণি বলতেন—ছোটলোক মানে যাদের টাকা-কড়ি নেই, যারা লেখা-পড়া জানে না, লেখা-পড়া শেখে না, যাদের থাকবার মতো বাড়ি নেই, তারাই ছোটলোক।

তখন ঠাকমা-মণির নিজেরও ছোটলোক সম্বন্ধে এই ধারণাই ছিল। শুধু তখন নয়, এই রকম ধারণা হয়তো এখনও অনেকেরই আছে। তখন যদি ঠাকমা-মণি জানতেন, সেই যাদের তিনি ছোটলোক বলতেন তারাই দেশের রাজা হয়েছে, তাহলে আর ও-সব কথা মুখেও উচ্চারণ করতেন না। কিংবা যদি জানতেন যে সেই ছোট-লোকরাই তাঁদের ফ্যাক্টরির মালিককে একদিন বেইজ্জতি করবে, তাহলেও তিনি কখনও সে-সব কথা মুখ ফুটে বলতেন না।

তাই ঠাকমা-মণির দৃষ্টির সামনেই যখন গোটা পৃথিবীটাই বদলে গেল তখন তিনি মনে মনে কষ্ট পেলেন খুবই, কিন্তু মুখে কাউকে কিছু বললেন না। চোখের সামনে তিনি দেখতে পেলেন যে জিনিসপত্রের দাম যে হারে বাড়ছে, মানুষের হাব-ভাব চলন-চালন কথার দাম সেই হারেই কমছে। যে হারে তাঁদের ফ্যাক্টরির আয় বাড়ছে, তাঁদের সুখ-সাচ্ছন্দ্য সেই হারেই কমছে। এ সম্বন্ধে মল্লিক-মশাই-এর কাছে তিনি অভিযোগও করতেন মাঝে মাঝে। বলতেন—খরচ এ-মাসে এত বাড়লো কেন সরকারবাবু?

মল্লিক-মশাই বলতেন জিনিসপত্রের দাম যে বাড়ছে ঠাকমা-মণি।

আগে ইলেকট্রিক কোম্পানির মাসিক বিলে যতো টাকা উঠতো, আস্তে আস্তে তা ক্রমেই ডবল হতে লাগলো। তাঁর প্রথম-প্রথম মনে হতো বুঝি কেউ অকারণে অনেক রাত পর্যন্ত আলো জ্বালিয়ে রাখে, কিংবা তারের মধ্যে কোথাও হয়তো ফুটো আছে যেখান দিয়ে সব কারেন্ট বেরিয়ে গিয়ে নষ্ট হয়। তখন ইলেকট্রিক-মিস্ত্রী দিয়ে বাড়ির সব লাইন পরীক্ষা করা হলো। কিন্তু পরীক্ষা করিয়েও কোথাও কোনো দোষ পাওয়া গেল না। তখন তিনি বুঝলেন কোথাও কোনো গোলমাল নেই। আসল গোলমালটা যুগের। যুগও বদলাচ্ছে আর সঙ্গে সঙ্গে সব জিনিসের মূল্যমানও বদলাচ্ছে। শুধু যে টাকারই মূল্যমান বদলাচ্ছে তা নয়, মানুষের মনুষ্যত্বের মূল্যমানও বদলাচ্ছে।

তখন থেকেই তিনি ঠিক করলেন যে সুতো ঢিলে করলে চলবে না।

তখন থেকেই সদর দরজা রাত ন'টার মধ্যেই বন্ধ করবার হুকুম দিয়ে দিলেন গিরি-ধারীকে। বলতে গেলে সৌম্যর জন্যেই এই হুকুমটা বহাল করলেন। কারণ তিনি যখন গাড়িতে চড়ে বাইরে যেতেন তখন দেখতেন বড় বড় সোমত্থ মেয়েরা একলা-একলা রাস্তায় হেঁটে চলছে কিংবা ট্রামে-বাসে চড়ে পুরুষমানুষদের সঙ্গে গায়ে গা লাগিয়ে যাচ্ছে। ব্যাপারটা দেখে তিনি শিউরে উঠেছিলেন। তাঁর নাতি সৌম্যও তো কমবয়েসী ছেলে। সেও যদি ওই সব মেয়েদের পাল্লায় পড়ে! সেও যদি ওই সব রাক্ষসীদের খপ্পরে পড়ে।

তাই যত রকমের কড়াকড়ি করা সম্ভব তারই ব্যবস্থা করালেন। শুধু যে রাত ন'টার সময় গিরিধারীকে সদর দরজায় তালা-চাবি লাগাতে হুকুম দিলেন তা-ই নয়,

ইস্কুল বা কলেজে যাওয়ার সময়ও ড্রাইভারদের বলে দিতেন যেন তারা দেখে সৌম্য কোনো মেয়ের সঙ্গে মিশছে কি না!

কিন্তু তাঁর সেই সব সতর্কতা এত দিনে বজ্র-আঁটুনি-ফস্কা-গেরো হয়ে গেল! এ ক্ষোভ তিনি কার কাছে প্রকাশ করবেন? এ ক্ষোভ থেকে কে তাঁকে মুক্তি দেবে?

মুক্তিপদ ক'দিন ধরে দিনে একবার-দুবার করে এসে তাঁকে দেখে গেছে। দরকার হলে ডাক্তার ডেকে এনেছে। তাঁকে বাঁচিয়ে তোলবার জন্যে অনেক চেষ্টা করছে, অনেক টাকাও খরচ করেছে। মুক্তি না থাকলে কে এসব করতো?

তাঁর জ্ঞান হওয়ার পর থেকে তিনি গোড়া থেকে তাঁর নিজের সমস্ত জীবনটাকে বার-বার পরিক্রমা করেছেন। বিশেষ করে সৌম্য জন্মাবার পর থেকেই তিনি যেন এই নাতির সঙ্গে সংসারে জড়িয়ে পড়েছিলেন। সৌম্য তাঁর পাশেই শুয়ে শুয়ে ঘুমোত। তিনি ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখতেন সৌম্য কাঁদছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি জেগে উঠতেন।

কিন্তু চেয়ে দেখতেন সৌম্য তাঁর পাশে যেমন শুয়ে ছিল তেমনি শুয়েই আছে। কাঁদছেও না, কিছুই না। তাহলে তিনি অমন স্বপ্ন দেখতেন কেন?

কেন যে অমন স্বপ্ন দেখতেন তার ঠিক নেই।

একেই হয়তো বলে 'মায়া'। ঠাকমা-মণি বুঝতে পারতেন যে, যে-বয়সে মানুষের উচিত সংসারের মায়া-জাল কেটে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা করা, সেই বয়েসেই তিনি কি না মায়ার জালে আরো বেশি জড়িয়ে পড়ছেন।

সেদিনও রাত্রে সৌম্যর ঘরের দিক থেকে আওয়াজটা এলো। তিনি কান পেতে শুনতে চেষ্টা করতে লাগলেন। তারপর ডাকলেন বিন্দু—

বিন্দু বরাবর তাঁর পায়ের কাছে খাটের নিচেয় শুয়ে থাকে।

—মা!

ঠাকমা-মণি বললেন—কোথা থেকে আওয়াজ আসছে রে? ও কাদের গলার আওয়াজ?

বিন্দু সারাদিন ঠাকমা-মণির ফাই-ফরমাজ খাটতে খাটতে প্রাণ বার করে দেয়। তারপর রাতে যে একটু দু'চোখ এক করবে তারও উপায় নেই। তখনও মিনিটে মিনিটে কেবল—বিন্দু বিন্দু আর বিন্দু...

মানুষ যে দু'দণ্ড একটু ঘুমোবে তারও উপায় নেই বুড়ীর জ্বালায়।

—হ্যাঁরে বিন্দু, ও আওয়াজ আসছে কোথা থেকে?

বিন্দু সব জানে। সারা রাত যে খোকাবাবু তার বিলিতি বউ-এর সঙ্গে ঝগড়া করে এ-কথা এ-বাড়ির কারো আর জানতে বাকি নেই। শুধু ঠাকমা-মণিকেই তা জানতে দেওয়া হয় না। আর সে কি একটু-আধটু ঝগড়া? শুনলে মনে হয় যেন ভেতরে খুনোখুনি কাণ্ড চলছে দু'জনের মধ্যে। সব কথা তো সে বুঝতে পারে না। মেম-বউ-এর কথা তো একেবারেই তার বোঝার অসাধ্য।

- বেরোও, বেরোও, গেট্ আউট্, গেট্ আউট...

আমি কেন বেরোব, তুমি বেরোও, বেরোও তুমি। না বেরোলে আমি টেনে তোমাকে ঘরের বাইরে বের করে দেব।

—না, আমি যাবো না। আমার বাড়ি আমি আমার বাড়িতে থাকবো। বেরোতে হলে তুমি বেরোও—

মেমটা তখন বোধ হয় ক্ষেপে ওঠে। ক্ষেপে উঠলে তখন তার একেবারে জ্ঞান-গম্যি থাকে না। হাতের কাছে যা-কিছু পায় তাই ছুঁড়ে মারতে থাকে। দুমদাম্ শব্দ হয় তখন ঘরের ভেতর থেকে। চেয়ার-ড্রেসিং টেবিল সব কিছু ওলোট-পালোট হয়ে যায় তার ধাক্কা লেগে। অমন ভালো সাজবার আয়নাটা ভেঙে চৌচির হয়ে গেল

একদিন। সেই ভাঙা কাঁচের টুকরো মেমটার পায়ে ফুটে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোতে লাগলো। সেই অত রাত্তিরে আবার ডাক্তার এল। ওষুধ-পত্র দিয়ে ডাক্তার পায়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিয়ে তবে শান্তি।

আসলে সুধারই কপালে যত ঝক্কি। ঝ্যাটা নিয়ে সমস্ত ঘর পরিষ্কার করাই শুধু নয়, তার ওপর আবার ভিজে ন্যাতা দিয়ে সমস্ত ঘরটা মুছতে হবে ওই সুধাকেই। নইলে ভাঙা কাঁচের টুকরো কোথাও পড়ে থাকলে আবার তারই পায়ে ফুটে যেতে পারে। সে তো ঝি-ঝিউড়ি মানুষ, তার পায়ে কাঁচ ফুটে গেলে তো আর ডাক্তারও আসবে না, ওষুধও জুটবে না তার বেলায়।

তা একদিন সত্যি-সত্যিই খোকা-দাদাবাবু মেমটাকে ঘর থেকে বার করে দিয়েছিল।

তার আগে যথারীতি যেমন মাঝ রাত্রে বাড়ি ফিরে দু'জনে কথা-কাটাকাটি থেকে শুরু হয়ে গালাগালি চিৎকারে শেষ হয়, সেদিনও তেমনি প্রথমে তাই-ই হয়েছিল। সেটা সুধার কাছে মামুলি ঘটনা। ও নিয়ে আর কেউ মাথা ঘামাতো না এ-বাড়িতে।

সুধা তার আগেই খোকাদাদাবাবুর ঘর-দোর গুছিয়ে পরিষ্কার করে রেখেছিল। জগে ঠান্ডা জল রাখা তার কাজ। ময়লা তোয়ালে, বিছানার সামনে পাপোশটা—সব কিছু বদলে দিয়ে, ঝেড়ে মুছে, চাদর বালিশ তাকিয়া সাজিয়ে, গোছ-গাছ করে রাখা তার দৈনন্দিন কাজ।

সে-সব কাজ সেরে তবে তার নিজের জায়গায় গিয়ে শুয়ে পড়েছিল। তারপর হঠাৎ ডাকাডাকিতে সে ধড়-মড় করে উঠে আলো জেলে দিয়েছিল। বুঝেছিল যে খোকা-দাদাবাবুরা এসেছে। বেশির ভাগ দিনই মেমকে ধরে ধরে আনতো খোকাদাদাবাবু। মদ খেলে তার আর তখন কোনো হুঁশ থাকত না। তারপর যথারীতি তাদের চিৎকার-চেঁচামেচি-গালাগালি শুরু হয়ে গেল।

সেটাও কিছু অস্বাভাবিক নয়। এ-বাড়ির ঝি-ঝিউড়িদের কাছে সেটাও গা সওয়া হয়ে গেছে। তার জন্যে সুধাও বেশি মাথা ঘামায়নি।

ভেতর থেকে খোকাদাদাবাবু আর তার মেমসাহেবের চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কথা বলার আওয়াজও তখন কানে আসছিল। তাতেও সুধার ঘুমের তেমন কোনো ব্যাঘাত হয়নি।

কিন্তু হঠাৎ খোকাদাদাবাবুর গলা যেন কেমন বেসুরো শোনাতে লাগলো।

—আবার গালাগালি দিচ্ছ?

মেমবউ বললে—বেশ করছি গালাগালি দিচ্ছি—আই মাস্ট এ্যাবিউজ ইউ... স্কাউণ্ড্রেল—

খোকাদাদাবাবু বললে—স্কাউণ্ড্রেল কাকে বলছো—

—বলছি তোমার মতো ব্যাস্টার্ডকে—

—মুখ সামলে কথা বলবে বলে দিচ্ছি—

সব কথার মানে বুঝতে পারছিল না সুধা। শুধু এইটুকু বুঝতে পারছিল যে দু'জনের মধ্যে খিস্তি-খেউড় চলছে। তারপর অনেকক্ষণ আর কোনো শব্দ আসছিল না। সুধার' বোধহয় সেই ফাঁকে একটু তন্দ্রা এসে গিয়েছিল।

হঠাৎ খোকাদাদাবাবুর গলার শব্দে সুধার ঘুম ভেঙে গেল। সে ধড়মড় করে উঠে পড়েছে। তখন তার কানে গেল খোকাদাদাবাবুর গলার আওয়াজ।

—বাঁচা, সুধা বাঁচা আমাকে, বাঁচা—মেরে ফেললে রে—

সুধা দৌড়ে খোকাদাদাবাবুর ঘরের দিকে গেছে। গিয়ে দেখে ঘরের দরজা বন্ধ করতেও ওরা ভুলে গেছে। আলো নেভাতেও ভুলে গেছে। আর কোনো উপায় না পেয়ে সুধা দেখতে পেলে মেমবউটা খোকাদাদাবাবুকে ঘরের মেঝের ওপর শুইয়ে ফেলে তার বুকের ওপর বসে দু'হাত দিয়ে খোকাদাদাবাবুর গলা টিপে ধরেছে। আর

খোকাদাদাবাবু প্রাণপণে চিৎকার করে চলেছে—বাঁচা সুধা বাঁচা, মেরে ফেললে রে, বাঁচা—

সে-দৃশ্য দেখে সুধার মাথা থেকে পা পর্যন্ত থরথর করে কাঁপতে লাগলো। সেই অবস্থায় তার কী করণীয় তা সে কল্পনাও করতে পারলে না। একবার ভাবলে মেমসাহেবকে টেনে খোকাদাদাবাবুর বুক থেকে নামিয়ে দেয়। কিন্তু তারপরেই তার মনে হলো সে কি মেমসাহেবের সঙ্গে গায়ের জোরে পারবে!

কিন্তু উপায় কী।

তখন আর সে-সব কথা ভাববারও সময় ছিল না। সে তাড়াতাড়ি মেমসাহেবের হাতটা ধরে টেনে ফেলতে চাইছিল। কিন্তু তার আগেই মেমসাহেবটা খোকাদাদাবাবুর গলা ছেড়ে দিয়ে সুধার মাথায় এক থাপ্পর মেরে মেঝের ওপর ফেলে দিয়েছে। কিন্তু তার ভাগ্য ভালো যে বেশি লাগেনি। পড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে উঠে দাঁড়িয়ে ঘর থেকে পালিয়ে গিয়েছে।

সৌম্য সেই ফাঁকে একটু উঠে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু রীটা আবার তাকে মাটিতে শুইয়ে ফেলে তার বুকে চেপে বসে তার গলা টিপে ধরেছে। বললে—দাও, টাকা দাও—দাও টাকা-

আর সৌম্য যন্ত্রণায় ছটফট করে কোনোরকমে বলছে—বাঁচা, সুধা, আমাকে মেরে ফেললে রে—বাঁচা—

ঠাকমা-মণির ঘুমটা আগেই ভেঙে গিয়েছিল। মনে হচ্ছিল যেন তিনি স্বপ্ন দেখছেন। কিন্তু হঠাৎ বিন্দুর গলা শুনে তিনি উঠে বসলেন।

কী হয়েছে রে বিন্দু? ডাকছিস কেন? কী হয়েছে?

বিন্দু বললে—সুধা এসে কী বলছে শুনুন?

—কই সুধা? ডাক ওকে আমার কাছে—

সুধা এসে যা ঘটেছিল সবই সংক্ষেপে খুলে বললে। তারপর বললে—আপনি একবার চলুন ঠাকমা-মণি, নইলে ওই বউ খোকাদাদাবাবুকে খুন করে ফেলবে—

ঠাকমা-মণি সবে অসুখ থেকে উঠেছেন। অনেক ডাক্তার দেখিয়ে অনেক ওষুধ খেয়ে তবে একটু সামান্য সুস্থ হতে পেরেছেন। উঠতে আর পারছিলেন না, খুব কষ্ট হচ্ছিল। ওধার থেকে তখনও সৌম্যর চিৎকার কানে আসছিল—বাঁচা...বাঁচা... মেরে ফেললে রে...

—চল্, দেখে আসি- -,

ঠাকমা-মণি আগে আগে চলতে লাগলেন। পেছনে চলতে লাগলো সুধা আর বিন্দু। ঠাকমা-মণি সৌম্যের ঘরে গিয়ে যে-দৃশ্য দেখলেন তা দেখে তাঁর চক্ষুস্থির।

— খোকা!

সৌম্য যে ঠাকমা-মণির কথার জবাব দেবে সে অবস্থা তখন তার নেই। তার বউ তখন বুকের ওপর বসে সৌম্যের গলা টিপে ধরে বলছে- -দাও, টাকা দাও—দাও টাকা—

নিজেকে আর সামলাতে পারলেন না ঠাকমা-মণি। সোজা ঘরের ভেতরে ঢুকে বললেন—বিন্দু সুধা তোরা দুজনেই আয়, এই মাগীটাকে ধরে বাইরে বার করে দে তো—বাড়ির বাইরে বার করে দে—

প্রথমে বিন্দু আর সুধা দুজনেই একটু দ্বিধা করছিল। কিন্তু ঠাকমা-মণি আরো জোরে তাগিদ দিলেন—কী হলো, কানে কথা যাচ্ছে না তোদের?

তখন বিন্দু সুধা দুজনে মিলে মেমসাহেবের হাত ধরে হিড়-হিড় করে টানতে লাগলো।

ঠাকমা-মণি বললেন—টান টান, জোরে জোরে টান, তোদের গায়ে কি জোর নেই—

বলে নিজেও ওদের সঙ্গে হাত লাগালেন। তখন মেমসাহেব সৌম্যকে ছেড়ে

ঠাকমা-মণিকে ধরলে। ধরে ঠাকমা-মণির হাতটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরেছে।

কামড়াতেই ঠাকমা-মণি যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠেছেন—মরে গেলুম—মরে গেলুম—আর সঙ্গে-সঙ্গে সুধা আর বিন্দু, তারাও মেমসাহেবের ওপর চড়াও হয়েছে!

—তবে রে হারামজাদী!

বলে দুজনে একসঙ্গে মিলে মেমসাহেবকে কাবু করতেই সে ঠাকমা-মণিকে ছেড়ে দিলে। আর ঠাকমা-মণি তখন সেই ফাঁকে সৌম্যের কাছে গিয়ে তার হাতটা ধরে বললে—চল, তুই আমার ঘরে গিয়ে শুবি চল, ওই রাক্ষুসী তোকে একদিন নির্ঘাত খুন করে ফেলবে, ওর ঘরে তোকে শুতে হবে না, চল—চল তুই আমার ঘরে চল—

মেমসাহেবকে তখন বিন্দু আর সুধা দুজনে মিলে সামলাতে লাগলো।

ঠাকমা-মণি সৌম্যকে ধরে ধরে তখন নিজের ঘরের দিকে নিয়ে চলেছেন। সেই বহুকাল আগেকার সৌম্য যেন আবার শিশু হয়ে ফিরে এসেছে তার ঠাকুমার কাছে।

ঠাকমা-মণি বলতে লাগলেন—তুই এবার থেকে আমার কাছে শুবি, বুঝলি। ওই রাক্ষুসীর কাছে আর শুতে হবে না—কোনদিন দেখবি ও তোকে খুন করে ফেলেছে—

সৌম্যর তখনও মদের নেশা কাটেনি। তখনও সে টলছে। টলতে টলতেই ঠাকমা-মণির ঘরের দিকে চলতে লাগলো।

সৌম্যকে নিজের মস্ত বড় খাটটার একপাশের জায়গাটা দেখিয়ে ঠাকমা-মণি বললেন—খাটে উঠে শো—

সৌম্য খাটে উঠে নিজের জায়গাটায় শোবার পর ঠাকমা-মণিও ঘরের আলো নিভিয়ে দিয়ে তার পাশে এসে শুলেন। বাবা-মা মারা যাওয়ার পর সৌম্য যখন একলা হয়ে গিয়েছিল, তখনও ঠিক এই একই জায়গায় শুতো সে। ঠাকমা-মণি তখন তাকে এখানে শুইয়ে ঘুম পাড়াতেন, গল্প শোনাতেন। এতদিন পরে আজ যেন সৌম্য আবার সেই তার ছোট-বয়েসে ফিরে গিয়েছে। আবার যেন শিশু হয়ে গিয়েছে।

রাত তখন অনেক। ঠাকমা-মণি বলতে লাগলেন—কেন বাবা তুই অমন রাক্ষুসীকে বিয়ে করতে গেলি? তোর কপালে কি একটা ভালো মেয়ে জুটলো না?

তারপর সৌম্যর দিক থেকে কোনো জবাব না পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন—কেন তোর গলা টিপে দিচ্ছিল রে তোর বউ? কী দোষ করেছিলি তুই?

সৌম্য বললে—দেখ না ঠাকমা-মণি, রীটার বিয়ের সময়ে ওর মাকে কথা দিয়েছিলুম যে মাসে মাসে ওর মাকে আমি দুশো পাউণ্ড করে পাঠাবো, কিন্তু আজ কয়েক মাস সে-টাকা পাঠাতে পারিনি তাই...

ঠাকমা-মণি বললেন, পাঠাতে পারিস্‌নি তাতে কী হয়েছে? তুই দেখছিস তো ফ্যাক্টরির হাল। কত বছর ধরে ফ্যাক্টরিতে লক্-আউট চলছে। সমস্ত প্রোডাকশান বন্ধ। একটা পয়সা আয় নেই। কোথা থেকে টাকা পাঠাবি তুই, সেটা বোঝে না?

সৌম্য বললে—তাই রোজ আমাকে ভয় দেখায়। রোজ আমার গলা টিপে ধরে। রোজ আমাকে খুন করতে চায়। কী বলবো আমি বলো?

—তা তুই বলিস নে কেন যে আমাদের ফ্যাক্টরির এই অবস্থা, তুই এখন টাকা পাঠাতে পারবি না?

সৌম্য বললে—তা তো বলেছি। কিন্তু রীটার মুখে কেবল ওই এক কথা। ও বলে তোমাদের ফ্যাক্টরির লক্-আউট হয়েছে তাতে আমি কেন ভুগবো? আমার মা কেন ভুগবে? বলে তোমার কথা তোমাকে রাখতেই হবে! তখন যাচ্ছেতাই ভাষায় আমাকে গালাগালি দেয়। আমার গলা টিপে ধরে—

ঠাকমা-মণি এ কথার জবাবে কী আর বলবেন! খানিক চুপ করে থেকে সৌম্যর দুঃখে অন্ধকারের মধ্যেই চোখের জল ফেলতে লাগলেন। রাতের অন্ধকার বলে তাই সৌম্য

কিছু দেখতে পেলো না। দিনের বেলা হলে দেখতে পেতো। বুঝতে পারতো তার জন্যে তার ঠাকমা-মণি পর্যন্ত কত কষ্ট পাচ্ছে মনে মনে!

তারপর ঠাকমা-মণি যেন নিজের মনেই বলতে লাগলেন—সবই আমার কপাল রে খোকা সবই আমার কপাল! নইলে তোর জন্যে কত ভালো একটা পাত্রী বেছে রেখেছিলাম, দেখতে কত সুন্দরী। তাদের পেছনে কত টাকা খরচা করেছিলাম। তাদের থাকবার জন্যে বাড়ি দিয়েছিলাম। কত মাস্টারনী রেখেছিলাম তাকে লেখা-পড়া শেখাবার জন্যে। সরকারবাবুর কাছে শুনেছিলাম সে নাকি খুব ভালো ইংরিজী বলতে-কইতে পারে। আর শেষকালে তুই কিনা একটা মাতাল মেম বিয়ে করে আনলি—

সৌম্য আর কিছু না বলে যেমন শুয়ে ছিল তেমনি শুয়েই রইল।

ঠাকমা-মণি আবার বলতে লাগলেন লণ্ডন যাওয়ার সময়ে তোকে পই পই করে বারণ করলাম ওখানকার মেয়েদের সঙ্গে মিশিসনি। আর আমি যা করতে তোকে মানা করলাম তুই কিনা তাই-ই করলি? তুই আমার কথা একবার ভাবলিও না? আমি তো তোর ভালোর জন্যেই বলতুম রে, আমার আর কী? আমি তো আজ আছি, কাল নেই। একদিন তো তোকেই এই সংসার ঠেলতে হবে, তোকেই তো এই সব দেখতে হবে! তখন? তখন কী করবি? কে তোকে দেখবে?

তারপর একটু থেমে আবার তিনি বলতে লাগলেন—আহা কী চমৎকার মেয়ে ছিল সেটা। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যেত। গরীবের মেয়ে হলে কী হবে। এত বুদ্ধি বিবেচনা তার ছিল। যেমন মেয়েটা তেমনি ছিল তার মা...আমি কাশীর গুরুদেবকে তার কুষ্ঠি দেখিয়ে তবে তাকে পছন্দ করেছিলাম...

কথা বলতে বলতে কখন তাঁর নিজেরও যে তন্দ্রা এসেছিল তা তিনি বুঝতে পারেননি। যখন একটু চোখ খুললেন তখন পাশের দিকে চেয়ে দেখলেন সৌম্য নেই। কোথায় গেল সে? এই তো তাঁর পাশেই শুয়ে ছিল খোকা! সে কোথায় গেল?

—বিন্দু, বিন্দু—

সারা রাতই যদি এই রকম ডাকাডাকি হয় তাহলে মানুষ ঘুমোয় কী করে? বুড়ীর জ্বালায় কি একটু ঘুমোবার যো নেই! সারা দিন-রাত কেবল—বিন্দু আর বিন্দু। বুড়ীর মুখে ভগবানের নামও কি আসতে নেই গা? একবার তো মরতে বসেছিল। যেই একটু শরীরে জোর পেয়েছে আর সঙ্গে সঙ্গে—বিন্দু আর বিন্দু...

—কী ঠাকমা-মণি?

ঠাকমা-মণি বললেন হ্যাঁরে খোকাকে তো আমার বিছানাতে এসে শুইয়ে ছিলুম, এখন আবার কোথায় গেল সে?

বিন্দু চলে গেল। আর খানিকক্ষণ পরেই ফিরে এসে বললে—খোকাদাদাবাবু তো নিজের ঘরে চলে গিয়েছে—

সে কী? কখন চলে গেল সে?

আশ্চর্য। একটু আগেই যার নাক ডাকতে শুনেছেন সে-ই আবার তার বউএর ঘরে শুতে চলে গেল! এই ঝগড়া, আবার এই ভাব! খোকার এ কী রকম মতি গতি! এখনকার ছেলেদের হাব-ভাব দেখে তিনি আকাশ থেকে পড়লেন। এদের দেখছি বোঝাই ভার। এই এ-যুগের ছেলে-মেয়েদের...
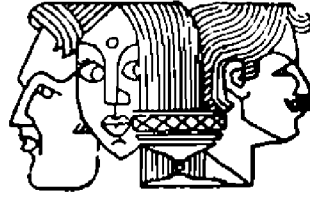
মিস্ বিশাখা গাঙ্গুলী! মিস্ বিশাখা গাঙ্গুলী।

এ এক নতুন অভিজ্ঞতা বিশাখার জীবনের। সেই ভোর বেলা ঘুম থেকে উঠে বাড়ি থেকে বেরিয়ে একই সঙ্গে বেড়াপোতার ট্রেন ধরেছিল সন্দীপ আর সে।

মা আপত্তিই করেছিল। বলেছিল—এত ধকল কি তুই সহ্য করতে পারবি মা? বেটাছেলে হলে না হয় তবু কথা ছিল। তোর শরীরে কি এত ধকল সইবে?

সন্দীপ বলেছিল—আপনিই বলুন তো মাসিমা। কলকাতা শহর হলে না হয় তবু কোনো রকমে সম্ভব হতো। কিন্তু আমি তো নিজে ডেলী-প্যাসেঞ্জারি করে দেখছি। এতে আমাদেরই কষ্ট হয়, আর ও তো মেয়েমানুষ। ও তো জানে না ডেলী-প্যাসেঞ্জারির কষ্টটা কী। তাই এই গোঁ ধরেছে—

বিশাখা বলেছিল—তা বলে কি চিরকাল আমি পরের ঘাড় ভেঙে খাবো, পরবো? লজ্জা-শরম বলে কি কিছু নেই আমার? আমি মেয়েমানুষ হতে পারি, কিন্তু একটা মানুষ তো! আমার গায়েও তো মানুষের চামড়া আছে, না কী...

ক'দিন ধরেই বাড়িতে এইরকম তর্ক-বিতর্ক চলছিল।

সন্দীপ বলতো—মাসিমা, আপনি একটু বুঝিয়ে বলুন না ওকে, আমার কথা ও শুনবে না—আমি ওকে বলেছি তো যে আমি তো রয়েছি; তোমার কিছু ভাবনা নেই—

তারপরে একটু থেমে আবার বলতো- আর তাও যদি পোস্টাফিসে, রেলে কিংবা ব্যাঙ্কের চাকরি হতো, তবু বুঝতাম। এ কোথায় কী একটা কোম্পানি, আমি তার নামও শুনিনি কখনও—

মাসিমা বলেছিল—ও এ-সব চাকরির খবর পেলে কী করে বলো তো বাবা?

সন্দীপ বলেছিল—ওই যে আমি অনেক খবরের কাগজ এনেছিলুম, সেই সব কাগজ থেকেই ঠিকানা দেখে নিজেই দরখাস্ত করেছিল। আমাকে কিছু জানায়ও নি—

—তা একটু খবর নিয়ে এলে না কেন সেটা কীসের আপিস, কী-রকম লোক তারা—

সন্দীপ বলেছিল—দেখে এসেছিলুম। সে একটা ছোট্ট আপিস। নতুন আপিস করেছে তারা। তাদের জিনিসপত্র বেচবার সেলস্-গার্লদের চাকরি।

—কতো মাইনে দেবে?

—নতুন আপিস কতো আর মাইনে দেবে। চারশো, পাঁচশো কি বড়জোর ছ'শো, আর তা ছাড়া সে-আপিস কতদিন টিঁকবে তার ঠিক নেই—

মাসিমা বলেছিল—তা হলে সে-আপিসে চাকরি করবার দরকারটা কী?

সন্দীপ বলেছিল—সেইটে আপনি ওকে বুঝিয়ে বলুন না একবার। আমার কথা তো ও গ্রাহ্যই করে না—

—তা তোমার কথা গেরাহ্যি করে না, আমার কথা গেরাহ্যি করবে? ও কি সেই মেয়ে? ওকে তুমি এতদিন ধরেও চিনলে না?

তা এ-সব কথা প্রথম দিন থেকেই চলছিল। কিন্তু বিশাখা সেই যে গোঁ ধরেছিল তা থেকে আর এক চুলও নড়েনি। সে বলেই দিয়েছিল যে সে কারো ঘাড়ে বসে খাবে না। তাতে তার আত্মসম্মানে লাগে।

—তা এতদিন মুখার্জি বাবুদের ঘাড়ে বসে খেলি, তার বেলায়?

—তখন আমি ছোট ছিলুম কিছু বুঝতুম না। তখনকার কথা আলাদা। কিন্তু

এখন আমি বড়ো হয়েছি, বুঝতে শিখেছি। এখন আর নয়।

মাসিমা বলেছিল—তা মেয়েমানুষ হয়ে জন্মেছিস, একদিন তো বিয়ে হবে, তখন?

বিশাখা বলেছিল--বিয়ে আমি কখনও করবো না।

—তা চিরকাল তুই আইবুড়ো হয়ে থাকবি? আইবুড়ো হয়ে থাকলে তোর হাতের ছোঁওয়া কেউ খাবে?

—কেন খাবে না? আমাদের কলেজের কতো প্রফেসার তো বিয়ে করেনি, তা তাদের হাতের ছোঁয়া কি কেউ খাচ্ছে না? টাকা পেলে সব শুদ্ধ হয়ে যায়, টাকার এমনি গুণ!

টাকার যে কতো গুণ, তা মাসিমার চেয়ে আর কে অমন করে টের পেয়েছে। টাকা থাকলে কি যোগমায়া নিজের দেওরের সংসারের লাথি-ঝ্যাঁটা খেয়ে জীবন কাটাতো?

মায়ে-ঝিয়ে ঝগড়ার সময়ে সন্দীপের মা মাঝখানে এসে বরাবর মিট-মাট করিয়ে দিত। বলতো—তুমি থামো দিদি, আমরা সে আমলের লোক। ওরা যা ভালো বুঝেছে করুক। দেখ না, আমার সন্দীপ যা ভালো বোঝে তাই করে। আমি তার মধ্যে নাক গলাতে যাই না--

মাসিমা বলতো—তোমার সন্দীপ তো হীরের টুকরো ছেলে। গেল জন্মে তুমি অনেক পুণ্যি করেছিলে তাই অমন ছেলে পেয়েছ। আমার বিশাখা যদি মেয়ে না হয়ে ছেলে হতো, তাহলে কি আমি এত ভাবতুম? তোমার ছেলের মতো একটা জামাই পেলে আমি বর্তে যেতুম দিদি, বর্তে যেতুম—

বলে মাসিমা আঁচল দিয়ে নিজের চোখ মুছতো। কিন্তু দুজনেই বিশ্বাস করতো যে, যার-যার ভাগ্যে যা লেখা আছে তা ঘটবেই। তাতে মানুষের কিছু করবার নেই। মাথা নিচু করে সব কিছু মেনে নেওয়ার নামই জীবন।

তারপর যেদিন বিশাখার কলকাতায় ইনটারভিউ দিতে যাওয়ার কথা সেদিন ভোর থেকেই ব্যস্ততা। তার আগের দিনই সন্দীপ বিশাখার জন্যে একটা শাড়ি কিনে নিয়ে এসেছিল। মাসিমা দেখে বলেছিল—আবার শাড়ি আনলে কেন বাবা?

সন্দীপ বলেছিল—বিশাখা কাল ইনটারভিউ দিতে যাবে। আমি দেখেছি ওর ভালো শাড়ি একটাও নেই—

--আর ওই প্যাকেটের মধ্যে আবার কী আছে?

সন্দীপ বলেছিল—ও কিছু না। ওই আজকাল মেয়েরা যা-সব ব্যবহার করে, স্নো, ক্রীম, পাউডার...এই সব...

মাসিমা বলেছিল—ও-সব আবার কিনতে গেলে কেন বাবা তুমি? মিছিমিছি কতোগুলো টাকা নষ্ট করলে কেবল...

সন্দীপ বলেছিল—তাতে কী হয়েছে মাসিমা। আমার যদি বোন থাকতো তো তাকেও তো ওই সব কিনে দিতে হতো—আজকাল তো ও-গুলো সব মেয়েরাই ব্যবহার করে—

মা সন্দীপের পক্ষ নিয়েই বলেছিল— সত্যিই তো, সন্দীপের বোন নেই তাই। নইলে বোন থাকলে তো তাকেও ও-সব কিনে দিতে হতো! কিনে ভালোই করেছে সন্দীপ—

পরের দিন ভোর বেলাই দুজনে খাওয়া-দাওয়া সেরে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল ট্রেন ধরতে। বিশাখা সেই সন্দীপের কিনে দেওয়া শাড়িটা পরেছিল। মাসিমা আর মা দুজনে সদর দরজার ওপর পর্যন্ত এসে দাঁড়ালো। মনে মনে বললে—দুগ্‌গা দুগ্‌গা—

হাওড়া স্টেশনে নেমে সন্দীপ বলেছিল -চলো, আগে তোমাকে তোমার অফিস পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়ে আসি -

বিশাখা বলেছিল—পৌঁছিয়ে দিতে হবে না। আমার কাছে তো ঠিকানাটা রয়েছে,

আমি নিজে-নিজেই খুঁজে-খুঁজে ঠিক যেতে পারবো।

সন্দীপ বলেছিল—তোমার কতক্ষণ লাগবে ইণ্টারভিউ শেষ হতে?

বিশাখা বলেছিল—কতক্ষণ আর লাগবে, বড়জোর ঘণ্টা দুয়েক। এখন তো সাড়ে ন'টা বাজে, ধরো দুপুর একটার মধ্যে সকলের ইণ্টারভিউ শেষ হয়ে যাবেই—

সন্দীপ বলেছিল—না, চলো, তোমাকে আমি পৌঁছিয়ে দিই। একলা তোমাকে ছেড়ে চলে যাওয়া আমার ঠিক হবে না।

—কেন? আমি কি একলা যেতে পারি না ভেবেছ?

সন্দীপ বলেছিল—আজকাল কলকাতার লোকদের কাউকে বিশ্বাস নেই জানো। তোমাদের মতোন মেয়েদের দেখলে তারা খুব খারাপ ব্যবহার করে। না, চলো তোমাকে আমি সেই ঠিকানাতে পৌঁছিয়েই দিয়ে যাই—

—কেন? কেন তুমি আমার জন্যে অত কষ্ট করতে যাবে?

সন্দীপ বলেছিল—কিন্তু আজকে তোমাকে সেজে-গুজে খুব ভালো দেখাচ্ছে যে। এ অবস্থায় তোমাকে একলা ছাড়া আমার উচিত হবে না। আর তাছাড়া মাসিমাই বা কী ভাববেন! বলবেন সন্দীপের ওপরে ভার দিয়ে বিশাখাকে ছেড়ে দিলুম আর সে কিনা নিজে একবার তার অফিসে পৌঁছিয়ে দিয়েও যেতে পারলে না—

বিশাখা বলেছিল—না-না, মা তা ভাববে না—

সন্দীপ বলেছিল—তুমি বললে কী হবে, তুমি তো আর নিজে বুঝতে পারছো না তোমাকে আজ কতো সুন্দর দেখাচ্ছে— তা তুমি অত সাজতে গেলেই বা কেন? আমি তো দেখছিলুম ট্রেনের মধ্যে প্যাসেঞ্জাররা সবাই তোমার দিকে কী-রকম করে চোখ দিয়ে গিলছিল।

বিশাখা বলেছিল—সে-জন্যে তোমার বুঝি হিংসে হচ্ছিল খুব?

সন্দীপ বলেছিল—না, ঠাট্টা নয়, সত্যিই আজকের দিনে তোমার এত সাজা-গোজা ঠিক হয়নি। যাক্ গে, আমি তোমাকে ঠিক জায়গায় পৌঁছিয়েই দিয়ে যাই, চলো—

বলে ঠিক জায়গাতেই গিয়ে পৌঁছুলো দুজনে। ডালহৌসি আর নেতাজী সুভাষ রোডের মোড়ের কাছাকাছি জায়গাটা। অনেক খুঁজে-খুঁজে নির্দিষ্ট অফিসটা পাওয়া গেল। অফিসটার সামনের মাথার দিকে সাইন্‌বোর্ডে লেখা আছে—'আইডিয়াল ফুড্ প্রোডাকট্স (প্রাঃ) লিমিটেড'।

অফিসটাও পাওয়া গেল এবং ঠিকানাটাও মিলে গেল। বাড়িটার দোতলায় উঠে দেখা গিয়েছিল একটা ঘরের ভেতরে কয়েকজন মহিলা বসে আছে।

সন্দীপ বলেছিল—তুমি ভেতরে গিয়ে বোস। আমি যাচ্ছি—

বলে চলে যাবার আগে আবার ফিরে এসে বলেছিল—আর একটা কথা। ইণ্টারভিউ শেষ হওয়ার পর তুমি এখানেই থেকো। আমি দুপুর একটার মধ্যেই চলে আসবো। আমি যতক্ষণ না আসি ততক্ষণ কোথাও যেও না যেন তুমি—

বিশাখা মাথা নেড়ে বললে—ঠিক আছে—

—আর একটা কথা—

বলে সন্দীপ আবার ফিরে এসে বলেছিল—এই টাকা ক'টা রেখে দাও—

বলে দশ টাকার নোটে পঞ্চাশটা টাকা দিয়েছিল। বলেছিল—তোমার কাছে কিছু টাকা থাকা ভালো, বিপদে আপদে কাজে লাগতে পারে—

তারপরে বলেছিল—আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত তুমি কোথাও যেও না যেন, বুঝলে? আমি অফিস থেকে আধ-রোজের ছুটি নিয়ে তোমার কাছে চলে আসবো—

সেই কথার পর সন্দীপ আর সেখানে দাঁড়ায়নি। তার ব্যাঙ্কে চলে গিয়েছিল।

তারপর বিশাখা সেই ঘরের ভেতরে গিয়ে একটা খালি জায়গায় বসেছিল। আরো

ছ'সাত জন মহিলাও তখন অপেক্ষা করছিল সেখানে। কেউ কাউকে চেনে না। বোঝা গেল সবাই-ই এই চাকরির জন্যে দরখাস্ত করেছিল। তাই তারা সেদিন ইন্টারভিউ দিতে এসেছে। বিশাখার পরেও আরো দু'একজন এসেছিল। সকলের সঙ্গেই কেউ-না-কেউ পুরুষ মানুষ এসেছিল। তারা মেয়েদের যথাস্থানে পৌঁছিয়ে যে-যার কাজে চলে গিয়েছিল।

বিশাখা সকলের দিকেই চেয়ে-চেয়ে দেখছিল। কেউই কাউকে চেনে না। অথচ একই উদ্দেশ্যে তারা সবাই এসেছে। সকলেরই উদ্দেশ্য স্বাবলম্বী হওয়া কিংবা টাকা উপায় করা। সকলেরই টাকা চাই। যার টাকা আছে সে' টাকা চায়, আর যার পেট-চালাবার টাকা নেই সেও টাকা চায়। ওদের মধ্যে অনেকের সিঁথিতে সিঁদুর। আবার অনেকের সিঁথিতে সিঁদুর নেই। তারা হয়তো বিশাখার মতো। চাকরি পেয়ে স্বাবলম্বী হয়ে বিধবা মা-ভাই-বোনদের খাওয়া-পরা-থাকার একটা সুরাহা করতে পারবে।

বিশাখার নিজের যেন একটু লজ্জা করতে লাগলো। আর তো কেউ তার মতো এমন সাজ-গোজ করে আসেনি। তাহলে সে কেন এত সেজে-গুজে এলো? কেউ তো তার মতো গালে-মুখে স্নো-ক্রীম-পাউডার মেখে আসেনি। তার মতো কেউ তো ঠোঁটে লিপ্‌স্টিক লাগায়নি। বিশাখার বুকটা তখনও দুর-দুর করে কাঁপছে।

মাঝে মাঝে মা'র কথাও তার মনে পড়ছিল। তার জন্যে মা সারা-জীবনই কষ্ট করে গেল। মা অনেক বার বলেছিল –তুই যদি মেয়ে না হয়ে আমার ছেলে হতিস তা হলে আমার আর এই কষ্ট হতো না। তুই কেন ছেলে হলি না?

এবার বিশাখা মাকে দেখিয়ে দেবে যে মেয়ে হয়ে জন্মেও সে ছেলের কাজ করছে। সে মেয়ে হয়ে জন্মেছে বলে মা'র কোনো দুঃখই রাখবে না। ছেলের মতোই সে মা'র সব দুঃখ ঘোচাবে। ছেলে হলে মা'র যা উপকার করতো, সে মেয়ে হয়েও মা'র সেই উপকারই করবে।

—মিসেস কনকপ্রভা সরকার—

এবার ইন্টারভিউ শুরু হলো। উপস্থিতদের মধ্যে থেকে একজন মহিলা উঠে ভেতরে গেলেন। মিনিট কুড়ি পরে তিনি বেরিয়ে এসে বাইরে চলে গেলেন।

—মিস্ শিপ্রা ঘোষ—

উপস্থিতদের মধ্যে থেকে আরো একজন উঠে ভেতরে গেলেন। তাঁর বেলায় প্রায় আধ ঘণ্টা লাগলো। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে তিনিও কাউকে কিছু না বলে বাইরে চলে গেলেন। সব মহিলাদের সঙ্গেই একজন করে পুরুষ মানুষ বাইরে অপেক্ষা করছিল। মহিলারা বাইরে যেতেই তারা এগিয়ে এসে মহিলাদের নিয়ে চলে যাচ্ছিল।

—মিসেস সুদীপ্তা সান্যাল—

আবার একজন মহিলা উঠে ভেতরে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে যথাসময়ে আবার তিনি বেরিয়ে এসে নিজের পুরুষ-সঙ্গীর সঙ্গে কথা বলতে বলতে নিচে যাওয়ার সিঁড়ি দিয়ে কোথায় চলে গেলেন।

এই রকম কতক্ষণ যে চললো তার ঠিক নেই। বিশাখা তেমন অধৈর্য হয়নি। কারণ সন্দীপ দুপুর একটার আগে আসতে পারছে না। সুতরাং সকাল-সকাল ইন্টারভিউ হয়ে গেলেও তাকে এইখানেই কোথাও অপেক্ষা করতে হবে।

—মিস্ বিশাখা গাঙ্গুলী—মিস্ বিশাখা গাঙ্গুলী—

তখন সবাই-ই চলে গেছে। কেবল সে একলাই তখন ডাকের অপেক্ষা করছিল। সে নিজের আসন ছেড়ে উঠে ভেতরে গেল। তিন জন ভদ্রলোক বসে ছিলেন। বিশাখা ঘরে ঢুকে তাঁদের সকলকেই নমস্কার করলে।

একজন তাকে সামনের দিকে ইশারা করে বসতে বললে।

—বসুন—

বিশাখা বসলো।

সামনে উল্টোদিকের ভদ্রলোকের হাতে তখন তার দরখাস্তখানা খোলা রয়েছে।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন- আপনি লরেটো থেকে বি-এ পাশ করেছেন?

বিশাখা বললে—হ্যাঁ—

—সংসারে আপনার আর কে কে আছেন?

বিশাখা বললে—আমার এক বিধবা মা ছাড়া আমার নিজের বলতে আর কেউ নেই।

—কাকা, জ্যাঠা, খুড়তুতো ভাই, জ্যাঠতুতো ভাই বোন, কেউ?

বিশাখা বললে—আমার নিজের একজন কাকা আছেন। কিন্তু তিনি আমাদের দেখেন না—আর খুড়তুতো বোন আছে আমার বয়েসী। ছোটবেলায় আমরা কাকার কাছেই থাকতুম, এখন সেখানে থাকি না—

—তা হলে এখন আপনারা কোথায় থাকেন?

বিশাখা বললে—আমরা বেড়াপোতায় থাকি- -

—সে জায়গাটা কোথায়?

—হাওড়া স্টেশনে ট্রেন ধরে যেতে হয়। হাওড়া থেকে খড়্গপুরের দিকে দেড়-দু ঘণ্টার জার্নি- -

ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন—সেখানে কি আপনাদের নিজেদের বাড়ি?

বিশাখা বললে—না, অন্য একজন ভদ্রলোক আমার মা আর আমাকে তাঁদের বাড়িতে দয়া করে থাকতে দিয়েছেন।

—তাঁদের সঙ্গে আপনাদের সম্পর্ক কী?

বিশাখা বললে—কিছুই না।

—কোনো সম্পর্ক না থাকা সত্ত্বেও কেন তিনি তাঁর বাড়িতে আপনাদের থাকতে দিয়েছেন?

বিশাখা বললে -পৃথিবীতে এখনও অনেক ভালো লোক তো আছেন! তিনিও তেমনি একজন ভালো লোক। আমাদের দুঃখ-কষ্ট দেখে তিনি তাঁর বাড়িতে থাকতে দিয়েছেন।

—তার জন্যে কি আপনাদের কোনো খরচ দিতে হয়?

বিশাখা বললে—না—

—তাহলে তাঁর স্বার্থ কী?

বিশাখা বললে—তিনি একজন নিঃস্বার্থ লোক।

—তিনি কী করেন?

বিশাখা বললে—তিনি একটা ব্যাঙ্কে চাকরি করেন।

—তাঁর সংসারে কে-কে আছেন?

—আমার মতো তাঁরও এক বিধবা মা ছাড়া সংসারে কেউই নেই। তিনি কিছু টাকা নেন না বলে আমাদের খুব লজ্জা করে। আমি বেশি দিন তাঁর গলগ্রহ হতে চাই না। তাই এ-চাকরিটা পেলে আমার খুবই উপকার হয়। যে-কোনো কাজ, যে-কোনও চাকরি, যে কোনও মাইনে হলেই আমার চলে যাবে।

—যাঁর বাড়িতে আছেন, যিনি ব্যাঙ্কে চাকরি করেন বললেন, তাঁর নামটা কী?

বিশাখা বললে—তাঁর নাম শ্রীসন্দীপ লাহিড়ী—

তারপরে আরো কয়েকটা প্রশ্ন করলেন তাঁরা। দরখাস্তের মধ্যে সব কথাই লেখা ছিল। তবু তাঁরা আরো কয়েকটা প্রশ্ন করলেন। জিজ্ঞেস করলেন—আপনি বিয়ে

করেননি কেন?

এর উত্তরে বিশাখা কী বলবে? বলতে গেলে তো বিয়ে হওয়ার পুরো ইতিহাসটাই বলতে হয়। সে-সব কথা তো এদের কাছে বলা অর্থহীন!

শুধু বললে—আমার মা খুব গরীব, আর বাবাও নেই, তাই বিয়ে হয়নি।

এর পরে তাঁরা বললেন—আচ্ছা, ঠিক আছে, আপনি আসুন। পরে আপনাকে চিঠি দিয়ে খবর জানানো হবে—

বিশাখা উঠে দাঁড়িয়ে আবার তাঁদের সবাইকে নমস্কার করে বাইরে বেরিয়ে এলো। বাইরে বেরিয়ে দেখলে ঘড়িতে তখন মাত্র বারোটা বেজেছে। অন্য যে-সব মহিলারা ইণ্টারভিউ দিতে এসেছিলেন তাঁরা অনেকক্ষণ আগেই যার-যার পুরুষ সঙ্গীদের সঙ্গে চলে গেছেন।

এখন বিশাখা কী করবে? একটা বাজতে তখন আরো একঘণ্টা বাকি। এতটা সময় সে কী করে কাটাবে? সন্দীপকে বলা আছে একটার মধ্যে আসতে। তখনই তার টিফিনের ছুটি হয়! রাস্তায় একা-একা দাঁড়িয়ে থাকাও অশোভন। সকলের কৌতূহলের পাত্রী হওয়া—সে বড় বিশ্রী। তার চেয়ে সময়টা কোনো চায়ের দোকানের কেবিনের ভেতরে কাটিয়ে দেওয়া ভালো। তার নিজের কাছে তো সন্দীপের দেওয়া অনেক টাকা রয়েছে। তাহলে আর তার ভাবনা কী?

বিশাখা ফুটপাথ ধরে একটা ভালো চায়ের দোকানের খোঁজে সোজা এগিয়ে চললো। একদিন বিশাখা এই শহরে গাড়ি চড়ে বেড়িয়েছে। আর আজ তাকেই কিনা আবার আরো দশজনের মতো পায়ে হেঁটে চলতে হচ্ছে।

পাওয়া গেল একটা রেস্টুরেণ্ট। তখনও অফিস-পাড়ার টিফিনের ভিড় শুরু হয়নি। বিশাখা তার মধ্যেই ঢুকে একটা নিরিবিলি তিন-দিক ঢাকা আর একদিকে পর্দা টাঙানো কেবিনের ভেতরে গিয়ে বসলো।

হোটেলের বয় এসে জিজ্ঞেস করলে—কী চাই?

বিশাখা যে সময় কাটাবার জন্যে এখানে এসেছে, খেতে আসেনি, তা তো বলা যায় না তাকে। তাই জিজ্ঞেস করলে—কী আছে?

—সব পাবেন। কফি-চা-অমলেট-সিঙাড়া, মোগ্‌লাই পরোটা, চপ, কাটলেট্, চিকেন ফ্রাই, তন্দুরী চিকেন, ফিস্-ফিন্‌গার...

আর শুনতে চাইলো না বিশাখা। বললে—আমার তাড়াহুড়ো কিছু নেই, চিকেন ফ্রাই-ই দাও, আর চা—

লোকটা চলে গেল অর্ডার নিয়ে। বিশাখার মনে হলো লোকটা খাবার আনতে যত দেরি করে ততই ভালো। সে তো আসলে খেতে আসেনি, সময় কাটাতে এসেছে। মা'র কথা মনে পড়তে লাগলো তার। মা বেড়াপোতার বাড়িতে বসে হয়তো এখন খুবই ভাবছে। মেয়ের চাকরি হবে, আর কারোর গলগ্রহ হতে হবে না—এর চেয়ে সম্মানের বিষয় আর কী আছে? তারপর আজকাল তো এমন অনেক পাত্র আছে যারা চাকরি করা মেয়ে বিয়ে করতে চায়। আজকাল তো একলার উপার্জনে সংসার চলে না। মা বোধহয় এ-সব ভেবেও চরম দুঃখের মধ্যে একটু আলোর ইশারা দেখতে পেয়েছে।

খানিক পরে বয়টা চিকেন ফ্রাই দিয়ে গেল, আর তার সঙ্গে ছুরির-কাঁটা।

সময় কাটাবার জন্যে আস্তে আস্তে খেতে হবে। হাতে অনেক সময় পড়ে আছে। তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ হয়ে গেলে আবার সন্দীপের জন্যে সেই রাস্তার ফুটপাথে গিয়ে অপেক্ষা করতে হবে। তার খাওয়া শেষ হয়ে গেলেও এরাও আর তাকে এক মিনিটও এখানে বসতে দেবে না। তখন অন্য খদ্দেরদের জন্যে তাকে কেবিন খালি করে দিতে হবে। আবার ঘড়ির দিকে বিশাখা চেয়ে দেখলে।

সময় যেন নড়তেই চাইছে না। সময় এত মন্থর গতি হয়ে গেল কেন হঠাৎ?

ঘড়িতে যখন পৌনে একটা তখন বিশাখা খাওয়া শেষ করে উঠলো। দাম চুকিয়ে দিয়ে আবার রাস্তায় নামলো। তখন বেশ ভিড় বেড়েছে পথে। অনেক অফিসে তখন টিফিন শুরু হতে আরম্ভ করেছে।

গলিটা পেরিয়ে সদর রাস্তায় গাড়ির ভিড়। ফুটপাথেও অনেক বেশি লোকের চলা-ফেরা।

হঠাৎ তার চমক ভাঙলো।

কে যেন এ-পাশ থেকে বলে উঠলো—এ কি মিস্ বিশাখা গাঙ্গুলী না?

বিশাখা সেদিকে তাকালো। কিন্তু ভদ্রলোককে চিনতে পারলে না।

ভদ্রলোক বললেন—আমাকে চিনতে পারলেন না?

বিশাখা দ্বিধা করতে লাগলো—আমি তো ঠিক...

—আপনি 'আইডিয়াল ফুড্ প্রোডাকটস্'-এ ইন্টারভিউ দিতে গিয়েছিলেন না? এখন চিনতে পারলেন?

বিশাখার তবু মনে পড়ল না ভদ্রলোককে।

—আপনার তো ইন্টারভিউ হয়ে গিয়েছে বেলা বারোটার সময়ে। এতক্ষণ কী করছিলেন, কোথায় ছিলেন আপনি এতক্ষণ?

বিশাখা বললে—আমি একজনের জন্য অপেক্ষা করছিলাম।

ভদ্রলোক বললেন—এদিকে আপনাকে খুঁজতে মিস্টার সন্দীপ লাহিড়ী আমাদের অফিসে এসেছিলেন। আমরা তাঁকে বলে দিলাম যে বারোটার মধ্যেই মিস্ গাঙ্গুলী বাড়ি চলে গিয়েছেন—

—তাই নাকি? তাঁর তো দুপুর একটার সময়ে আসার কথা ছিল। আমি তো সময় কাটাবার জন্যেই একটু চায়ের দোকানে গিয়েছিলুম। এত আগে এসে গেলেন তিনি?

তারপর একটু থেমে বিশাখা আবার জিজ্ঞেস করলে—তা তিনি কোথায়?

ভদ্রলোক বললেন—তা তো কিছু বলেননি তিনি। তাহলে বোধহয় তিনি আপনার খোঁজে সেই বেড়াপোতাতেই চলে গিয়েছেন—.

বিশাখা বড় বিপদে পড়লো। তাহলে কি সন্দীপ তার জন্যে আধ-রোজের ছুটি নিয়েছে? তাও হতে পারে। এমন যে হবে তা তো বিশাখা ভাবেনি। তাহলে তো এই রাস্তার ওপরেই সে সন্দীপের জন্যে অপেক্ষা করতো!

ভদ্রলোক বললেন—আপনি এখন কোন দিকে যাবেন?

বিশাখা বললে—কোথায় যাবো তাই ভাবছি—

ভদ্রলোক বললেন—আপনি যদি কোথাও যেতে চান তো আমার গাড়ি রয়েছে, আপনাকে পৌঁছিয়ে দিতে পারি আমি—

বিশাখা ভেবে ঠিক করতে পারল না কোথায় যাবে সে। তাহলে কি সন্দীপ তার ব্যাঙ্ক ফিরে গেছে? নাকি আধ-রোজের ছুটি নিয়ে বিশাখাকে না পেয়ে বেড়াপোতাতেই ফিরে গিয়েছে। বিশাখা বললে—আপনি যদি আমাকে শ্যামবাজারের ন্যাশন্যাল ইউনিয়ন ব্যাঙ্কে পৌঁছিয়ে দেন তো আমার বড় উপকার হয়—

ভদ্রলোক বললেন—তা এত কুণ্ঠিত হচ্ছেন কেন? চলুন আপনাকে ওখানে পৌঁছিয়ে দিই—

বলে পার্কিং-প্লেস থেকে গাড়িটা এনে বিশাখাকে পাশে বসিয়ে নিলেন। গাড়ি শ্যামবাজারের দিকে চলতে লাগলো। ডালহৌসী স্কোয়ার থেকে শ্যামবাজারের পাঁচ মাথার মোড়। কম দূর নয়।

গাড়ি চালাতে চালাতে ভদ্রলোক বললেন—আজকাল কলকাতা যা হয়েছে না,

এখানে পায়ে হাঁটা তো দূরের কথা, গাড়ি চালিয়ে যাওয়াই মুশ্‌কিল। এখানকার কোনও লোকের রোড-সেন্সও নেই, সিভিক-সেন্সও নেই। সব চেয়ে মিনেস্ হচ্ছে এখানকার মিনি বাসগুলো। ওরা কী করে গাড়ি চালাচ্ছে দেখছেন?

একটা মিনিবাস চলতে চলতে প্রায় ভদ্রলোকের গাড়ির ওপরেই একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়ছিল। ভদ্রলোক খুব জোর নিজেকে সামলে নিয়েছেন।

বিশাখা বললে—আপনাকে আমি খুবই কষ্ট দিচ্ছি—

ভদ্রলোক বললেন—যদি এই বিপদ থেকে আপনাকে উদ্ধার করতে পারি তবেই বুঝবো আমার কষ্ট করা সার্থক, নইলে...

ভদ্রলোক আবার রাস্তার দিকে মন দিয়ে চুপ করে গাড়ি চালাতে লাগলেন।

বিশাখা এক ফাঁকে জিজ্ঞেস করলে -আচ্ছা, একটা কথা বলবো?

—বলুন না, কী?

—আমার এ-চাকরিটা কি হবে?

ভদ্রলোক বললেন—দেখুন, এই চাকরিতে আসল যে-কোয়ালিফিকেশনটা দরকার, সেটা হলো গুড-লুকিং এ্যাপিয়ারেন্স। আজকে যাঁরা-যাঁরা ইণ্টারভিউ দিতে এসে-ছিলেন, তাঁদের মধ্যে আপনারই কেবল সেই কোয়ালিফিকেশন আছে। আপনার তুলনায় তাঁরা সবাই জিরো। তার ওপর আপনি লরেটোয় পড়া মহিলা—

বিশাখা বললে—অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। জানেন আমাদের আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ। খারাপ বলেই আমরা পরের গলগ্রহ হয়ে আছি। পরের গলগ্রহ হওয়ার মতো অপমান সংসারে আর কিছু নেই—

ভদ্রলোক বললেন—তা তো বটেই—

বিশাখা বললে—এই চাকরিটা যদি আমি পাই তো আমি চিরকাল আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো—

ভদ্রলোক বললেন—আমার আর কতটুকু ক্ষমতা বলুন। সবই সেই ওপরওয়ালার ওপর নির্ভর করছে। তাঁকে বলুন, তাঁর ওপরেই কৃতজ্ঞ থাকুন, করলে তিনিই সব কিছু করতে পারবেন। আমি কেউ না—

বিশাখা বললে—তবু তো একজন নিমিত্তের ভাগী হয়। আপনি কিছু না করলে আর কেউ কিছু করবে না—

ততক্ষণে ন্যাশন্যাল ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক এসে গিয়েছিল।

ভদ্রলোক ব্যাঙ্কের সামনে গাড়িটা পার্ক করে বিশাখাকে বললেন—আপনি বসে থাকুন, আমি ভেতরে গিয়ে মিস্টার লাহিড়ীর খবর নিয়ে আসছি—

বিশাখা গাড়ির ভেতরে বসে রইল। ভদ্রলোক কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরে এলেন।

বিশাখা জিজ্ঞেস করলে—কী শুনলেন?

ভদ্রলোক বললেন—না, মিস্টার লাহিড়ী নেই। আপনি যা ভেবেছেন তাই ঠিক। মিস্টার লাহিড়ী হাফ-ডে'র জন্য ছুটি নিয়েছেন।

তারপর গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—এখন কোথায় যেতে চান, চলুন—

বিশাখা বললে—কোথায় আর যাবো, আমাকে হাওড়া স্টেশনে একটু পোঁছে দিন দয়া করে—

ভদ্রলোক বললেন—চলুন, তার আগে কোথাও একটু গলাটা ভিজিয়ে নিই গিয়ে—

বলে ভদ্রলোক গাড়িটা নিয়ে আবার উল্টোমুখে চলতে লাগল।
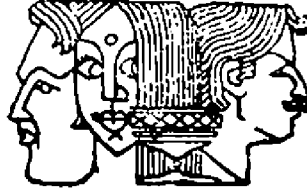
সে-সব দিনের কথা এখনও মনে আছে সন্দীপের। কতকাল আগেকার কথা সব। আজকে সেই সব দিনের প্রত্যেকটি খুঁটি-নাটি কথা মনে পড়ছে।

সেই খগেন সরকার, সেই ত্রিদিব ঘোষ, সেই যাদব ভট্চার্যি, সেই হরেন সাহা।

বিশাখা যেদিন প্রথম সন্দীপের ব্যাঙ্কে গিয়েছিল সেদিন থেকেই তারা সন্দীপকে অন্য চোখে দেখতে আরম্ভ করেছিল।

সন্দীপ সেদিন দেরি করে অফিসে গিয়েছিল। মিনিট দশেক লেট।

পরেশদা জিজ্ঞেস করেছিলেন—কী হলো, আজও ট্রেন লেট নাকি হে?

সন্দীপ বলেছিল—না, ট্রেনের দোষ নেই, আজ আমিই একটা জায়গা ঘুরে আসছি। তাইতেই দেরি হয়ে গেল।

তারপর মুখটা কাচুমাচু করে বলেছিল—আজকে আমাকে হাফ-ডে'র ছুটি দিতে হবে পরেশদা—

—কেন? হঠাৎ? একে তুমি সকালে দশ মিনিট লেট করে এসেছ, তার ওপর আবার হাফ্-ডে'র ছুটি? ব্যাপারটা কী?

সন্দীপ বলেছিল—একটা জরুরী কাজ পড়ে গেছে দাদা—

পরেশদা বললে—তাহলে কিন্তু কাল ক্যান্টিনে এক-প্লেট মাংসের কারি আর দু'টো মোগলাই পরোটা খাওয়াতে হবে—

যারা খেতে পেয়ে তুষ্ট হয় বা টাকা পেয়ে খুশী থাকে, তারা সহজ মানুষ। সংসারে তাদের নিয়ে ততো বিপদ বাধে না। কিন্তু যারা পরমার্থ চায়?

সে আর ক'জন?

কিন্তু সন্দীপ সারা জীবন ধরে দেখে এসেছে খাওয়া আর টাকা ছাড়া শতকরা নিরানব্বই ভাগ মানুষ আর কিছুই চায় না। তাদের মধ্যে কেউ-কেউ ওই খাওয়া আর টাকা দু'টোই পায়। কিন্তু তারপর? তারপর তাদের শেষও তো সন্দীপ দেখেছে।

শুধু এই যে মানুষের চাওয়াটা, এটা যে কতো ভুল চাওয়া তা সন্দীপের চেয়ে আর কে অতো ভালো করে দেখতে পেয়েছে? যে-পেটটার জন্যে পরেশদা'র এত আসক্তি সেটা তা এক সময়ে বিদ্রোহ করবে। টাকা-কড়ি, শক্তি-সামর্থ্য, কোনও কিছুই যে মিথ্যে নয় এ-কথা তো একটা শিশুও জানে। কিন্তু কেউই জানে না যে, যে-নৌকোটা স্রোতের মুখে আমাকে তর্-তর্ করে সামনের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, একদিন ভাটার টানে সেই নৌকোকেই আবার আমাকেই টানাটানি করে ঠেলাঠেলি করে মরতে হবে।

কেন এমন হয়?

হয় এই জন্যেই যে সকলের একটাই কথা। সেটা হচ্ছে—দাও দাও আর দাও—

কিন্তু এখানে কেউই তো বলে না, নাও-নাও-নাও—

যতদিন এই 'দাও দাও' থাকবে ততদিন থাকবে অশান্তি, ততদিন থাকবে অসন্তোষ, ততদিন থাকবে অসাম্য, ততদিন থাকবে অভাব—

কিন্তু যেদিন কেউ বলতে শিখবে—'নাও নাও' তখনই আসবে শান্তি, তখনই আসবে সন্তোষ, তখনই আসবে সুখ—

কিন্তু এ-সব তো পরের কথা, এ-সব এত আগে বলছিই বা কেন?

মনে আছে সেদিন ব্যাঙ্কের মধ্যে সবাই জিজ্ঞেস করেছিল—আজকে কী হলো

সন্দীপদা তোমার—এত অন্যমনস্ক কেন? অসুখ-বিসুখ কিছু করেছে নাকি?

এ-কথার জবাব দিলে তো আবার সেই একই প্রসঙ্গ উঠবে। সেই একই হাসি-ঠাট্টা টিটকিরি। তাই শুধু বললে—না, শরীরটা ঠিক ভালো নেই—

—শরীর ভালো নেই কেন? সেই মেয়েটার কথা ভেবে ভেবে?

যেদিন থেকে সবাই বিশাখাকে দেখেছে, সেই দিন থেকেই নানা-রকম গুঞ্জন শুরু হয়েছে তাকে নিয়ে। একমাত্র সন্দীপ ছাড়া আর সকলেরই বিয়ে হয়ে গিয়েছে। ব্যতিক্রম একমাত্র সে-ই অফিসের মধ্যে।

মিস্টার মালব্যকেও গিয়ে বলে এসেছিল সে তার হাফ্-ডে ছুটির কথা।

মালব্যজী বলেছিলেন—ঠিক আছে, তুমি সুপারভাইজারকে বলে যাও তোমার ছুটির কথা—

—আমি বলেছি—

তারপরে ঘড়িতে দুপুর বারোটা বাজতেই সন্দীপ ব্যাঙ্ক থেকে বেরিয়ে সোজা চলে গেল নেতাজী সুভাষ রোডে। তাও আধঘণ্টার মতো সময় লাগলো তার যেতে।

কিন্তু দৌড়াতে দৌড়তে গিয়ে যখন সে সেখানে পৌঁছোল, তখন কেউ নেই সেখানে। আগে যে-সব মহিলাদের সেখানে বসে থাকতে দেখেছিল সে-ঘর তখন ফাঁকা. একজনও সেখানে নেই। কোথায় গেল বিশাখা? বিশাখার তো থাকার কথাই ছিল ওখানে। রাস্তায় কোথাও দাঁড়িয়ে নেই তো?

শেষকালে সন্দীপ অফিসের ভেতরে ঢুকে গেল। সেখানে যাকে সামনে পেল তাকেই জিজ্ঞেস করলে,আচ্ছা, আজকে এখানে যে-সব মহিলাদের চাকরির জন্য ইনটারভিউ হওয়ার কথা ছিল, তা কি হয়ে গেছে?

ভদ্রলোক বললেন—হ্যাঁ, সে তো দুপুর বারোটার সময়েই হয়ে গেছে।

সন্দীপ আবার জিজ্ঞেস করলে—মিস্ বিশাখা গাঙ্গুলী বলে কোনও মহিলার ইন্টারভিউ হয়েছিল কিনা বলতে পারেন?

ভদ্রলোক বললেন হ্যাঁ তাঁর ইন্টারভিউ তো বারোটার মধ্যেই শেষ হয়ে গিয়েছে—তিনি চলে গেছেন। আপনি তাঁর কে?

সন্দীপ বললে- আমি তাঁর নিজের কেউই না -যদি তিনি ফিরে এখানে আসেন তো তাঁকে বলবেন আমি তাঁর খোঁজে এখানে এসেছিলুম। বলবেন—সন্দীপ লাহিড়ী তাঁর খোঁজে এখানে এসেছিল—

—আর কিছু বলতে হবে?

সন্দীপ বললে—না-

ভদ্রলোক বললেন—তিনি তো শুনেছিলাম হাওড়া লাইনে বেড়াপোতা গ্রামে থাকেন। হয়তো তিনি সোজা সেখানেই চলে গেছেন—

সন্দীপ আর কিছু বললে না। তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে দোতলা থেকে একতলায় নেমে এলো। তারপর রাস্তায় নেমে ফুটপাথের ওপর দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক চেয়ে দেখতে লাগলো। কোথাও তো বিশাখার অস্তিত্বের কোনও আভাস নেই। কত পুরুষ কত মহিলা এদিক থেকে ওদিকে চলেছে, ওদিক থেকে এদিকে আসছে। বিশাখার কোনও ক্ষীণতম একটা চিহ্নও নেই। কেন সে চলে গেল, কোথায় গেল? তবে কী সন্দীপের দেরি দেখে হাওড়া স্টেশনে ট্রেন ধরে বেড়াপোতাতেই ফিরে গেল?

প্রায় আধ-ঘণ্টা দাঁড়িয়েও যখন বিশাখার কোনও হদিস পাওয়া গেল না তখন তার ধারণা হলো নিশ্চয়ই সে বেড়াপোতায় ফিরে গেছে।

সামনের দিকে যেতে হাওড়ার একটা বাস আসছিল কোনও রকমে তাতে ঝুলতে ঝুলতে চলতে লাগলো হাওড়ার দিকে। আর সেই হাওড়া স্টেশনের সামনে গিয়ে

বাসটা থামলো, সঙ্গে সঙ্গে ছুটলো প্ল্যাটফরমের দিকে। সন্দীপ ভেবেছিল প্ল্যাট-ফরমের কোথাও না কোথাও বিশাখা থাকবেই।

হাওড়া স্টেশনে প্ল্যাটফরমের সংখ্যাও কম নয়। কত দিক থেকে কত ট্রেন আসছে, আবার কত ট্রেন হাওড়া থেকে কত দিকে যাচ্ছে। সবগুলো প্লাটফরম খুঁজে বেড়াতে কম সময় লাগে না। তার পর কোনও ট্রেনের ভেতরে কত মহিলা বসে আছে। সকলের মুখ দেখে চেনবার চেষ্টা করতে লাগলো সন্দীপ! কাউকে পেছন থেকে ঠিক বিশাখার মতো মনে হলেও, সামনে থেকে দেখলে ভুল ভাঙে। আর তাছাড়া বেছে বেছে শুধু মেয়েদের মুখ দেখবার প্রচেষ্টা অনেকের মনে সন্দেহের উদ্রেক করতে পারে। যদি কেউ বলে মেয়েদের দিকে অতো করে কী দেখছেন মশাই?

ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেল। বেড়াপোতায় যাবার একটা লোকাল ট্রেন ছাড়ছে তখন। সন্দীপ সেই চলন্ত ট্রেনের শেষের দিকে একটা কামড়ায় টুপ্ করে উঠে পড়লো। তারপর প্রত্যেকটা স্টেশনে ট্রেনটা থামে আর সন্দীপের মনে হয় ট্রেন ছাড়তে এত দেরি করছে কেন? অন্য দিনের চেয়ে ট্রেনটা অনেক বেশি মন্থর গতিতে চলেছে আজ। ব্যাঙ্কের লোকেদের মত ইঞ্জিন-ড্রাইভাররাও যেন আজকাল কাজে ফাঁকি দিতে আরম্ভ করেছে বলে তার মনে হলো। অন্যদিন তো এমন মনে হয় না তার।

স্টেশনে ট্রেনটা থামবার সঙ্গে সঙ্গে সন্দীপ নেমে পড়েছে। আর তারপরে সমস্ত রাস্তাটা প্রায় দৌড়তে দৌড়তেই যখন সে বাড়িতে গিয়ে পৌঁছলো তখন মা আর মাসিমা দুজনেই একই প্রশ্ন করলে বিশাখা, কোথায় গেল সে? সে এলো না?

সন্দীপেরও তখন সেই একই প্রশ্ন—বিশাখা আসেনি?

যখন সন্দীপ শুনলো যে বিশাখা বাড়িতে আসেনি তখন আরো অবাক হয়ে গেল। তাহলে সে গেল কোথায়? অফিসেও নেই, হাওড়া স্টেশনেও নেই, বাড়িতেও নেই, তাহলে কোথায় গেল সে?

সন্দীপ বললে—আমি তো বিশাখাকে বলে রেখেছিলুম যে আমি হাফ্-ডে ছুটি নিয়ে তার সঙ্গে দেখা করবো, সে যেন আমার জন্যে সেখানে অপেক্ষা করে। তা আমি যখন তার অফিসে গেলাম তখন খবর পেলাম যে সে নাকি তার অনেক আগেই সেখান থেকে চলে গিয়েছে—

মাসিমা বললে—হয়তো পরের ট্রেনে আসবে--

শেষ ট্রেনটাও সাড়ে দশটাতে এসে ছেড়ে চলে গেল। আস্তে আস্তে ট্রেনের শব্দটাও বাতাসে মিলিয়ে গেল। সন্দীপ, মা, মাসিমা সবাই রাস্তায় এসে দাঁড়িয়ে স্টেশনের রাস্তার দিকে চেয়ে রইল। কিন্তু না, শেষ ট্রেনেও বিশাখা এলো না।

শেষ পর্যন্ত কারোরই খাওয়া হলো না। কমলার মা নিজে খেয়ে নিয়ে এক সময়ে তার বাড়িতে চলে গেল। মা বললে—তুমি আর কতক্ষণ বসে থাকবে বাছা, তুমি তোমার বাড়ি চলে যাও, কাল আবার তোমাকে ভোরবেলাই তো কাজে আসতে হবে।

সন্দীপকে মা বললে—তুই খেয়ে নে না খোকা, তুই সেই কত সকালে খেয়ে অফিসে গেছিস খেয়ে নে তুই—আমরা না-হয় পরে খাবো'খন –

সন্দীপ বললে—না, আমি এখন খাবো না, আমার খিদে নেই। তোমরা কেন মিছিমিছি না-খেয়ে বসে থাকবে? তোমরা খেয়ে নাও তো—

শেষ পর্যন্ত কারোরই খাওয়া হলো না সেদিন। রাঁধা ভাত পড়ে রইল। রাত বারোটাও বাজলো এক সময়ে। রাত একটা বাজলো, দুটোও বাজলো, তিনটেও বাজলো। সন্দীপ, মা, মাসিমা সকলের মনে একটাই প্রশ্ন, বিশাখা গেল কোথায়? কোথায় গেল বিশাখা?

সেদিন বিডন স্ট্রীটে মুখার্জীবাবুদের বাড়িতে আবার এক অঘটন ঘটলো।

মানুষের জীবন সব সময়ে একই সুরে একই তালে চলে না, এ-কথা সবাই-ই জানে। আনাড়ী গায়ক হলে মাঝে-মাঝে যে সঙ্গীত বেসুরো হয় না, তা নয়। তবে সঙ্গে সঙ্গে বেতালা হয়ে যাওয়ার দুর্ঘটনাও যে ঘটে যেতে পারে, ইতিহাসে তার অনেক নজির আছে। কিন্তু তা বলে এখন কি লাভ?

কোনও দিন বা ঠাকমা-মণি তা জানতে পারতেন, আবার কোনও দিন বা ঠাকমা-মণি তা জানতে পারতেন না। সুধা তো খোকাদাদাবাবুর আর মেমবউদির শোবার ঘরের কাছাকাছি শুতো। যাতে ডাকলেই তার সাড়া পাওয়া যায়। এটুকু সে জানতো যে রাত্রে বাইরে থেকে ফেরবার পর তাকে উঠে দু'জনের হুকুম তামিল করতে হবে। সাধারণতঃ তাদের তখন ভালো করে দাঁড়াবার ক্ষমতাও থাকে না। কোনও কোনও দিন মেমবউদিদিকে ধরাধরি করে শোওয়াতে হয়। আর সেই অবস্থায় যদি মেমবউদি কিছু গালাগালি দেয় তো তা তাকে মুখ বুজে সইতেই হয়। আর সেইজন্যেই তো বলতে গেলে তাকে মাইনে দেওয়া হচ্ছে। তবে মেমবউদি যা-কিছু গালাগালি দেয়, তা সবই ইংরিজী ভাষায়। সুখের কথা এই যে তা সে বুঝতে পারে না। কথাগুলোর মানে বুঝতে পারলে বোধহয় চাকরি ছেড়ে দিয়ে সে দেশের বাড়িতে চলে যেত। আর এ-চাকরি সে করতো না।

দিনের বেলাটা সুধার কোনও অসুবিধে হতো না। কিন্তু যতো অশান্তি রাত্তিরে। রাত ন'টার পরে সেই যে দু'জনে একসঙ্গে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেত, ফিরে আসতো একেবারে মাঝ-রাত্তির কাবার করে।

তখন থেকেই বলতে গেলে শুরু হতো সুধার কাজ। তখন এক-একদিন গায়ে শাড়িও থাকতো না মেমবউদির। শুধু একটা সেমিজের মত শাড়ির নিচের কী পরতো, সেইটে গায়ে আটকে থাকতো। তখন সেই মেমবউদিকে ধরে দাঁড় করিয়ে রাখা কি সহজ কথা? একে মদ খেয়েছে, তার ওপর আবার মোটা মেয়েছেলে।

মেমবউদি বলতো—নাইটি—নাইটি -গিভ্ মি মাই নাইটি--

শোওয়ার সময়ে ওই 'নাইটি' পরা ছিল মেমবউদির অভ্যেস। ওই অবস্থাতেই মেমবউদিকে গায়ের সেমিজ খুলিয়ে নাইটি পরিয়ে দেওয়া কি সোজা কাজ নাকি! আর হাজার হোক, মেয়েমানুষ তো বটে। একটু লজ্জা-শরমের বালাইও কি থাকতে নেই গা? সুধা তার বাপের জন্মে ও-রকম বেহায়া মেয়েমানুষ আর কখনও দেখেনি। সেই পাতলা সেমিজ খুলতে যদি একটু দেরি হতো তো অগ্নিকাণ্ড বেধে যেত। মেম-বউদি চিৎকার করে বলতো—এই ব্লাডি বীচ্—

ভাগ্যিস সুধা ইংরিজীটা বোঝে না, তাই রক্ষে। একদিন সুধা বিন্দুকে জিজ্ঞেস করেছিল—হ্যাঁ রে বিন্দু, 'বেলাডি বীচ' মানে কী রে?

বিন্দুই কি ইংরিজী জানে ছাই যে কথাটার মানে বলে দেবে। তা যদি তারা জানতো তাহলে কি আর তারা সুদূর ধাবধাড়া গোবিন্দপুর ছেড়ে মনিবের খোঁটা

খেতে এই কলকাতায় চাকরি করতে আসতো।

আজীবন-কাল ধরে এই রকম চলে আসছে, আর আজীবন-কাল ধরে এমনিই চলে আসবে। নইলে মাথার ওপরে থাকা সেই অদৃশ্য উপন্যাস-সম্রাট কাদের নিয়ে অনাদি-অনন্তকাল ধরে তাঁর মহা-উপন্যাস লিখবেন ? তিনিই তো এই সন্দীপ, এই বিশাখা, এই মুক্তিপদ, এই যোগমায়া, এই সৌম্যপদ, এই রীটা, এই তপেশ গাঙ্গুলী, এই মল্লিক-মশাই, এই বিন্দু-সুধা-কালিদাসী-ফুল্লরা, এই গোপাল হাজরা, এদের সকলের স্রষ্টা। তাঁর অঙ্গুলী-হেলনেই তো এরা সবাই হাসছে, কাঁদছে, টাকার পেছনে দৌড়চ্ছে আর ধীরে ধীরে মহাপ্রস্থানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

আর এই যে আমি, যে-আমি দিন-রাত জেগে জেগে এই উপন্যাস 'এই নরদেহ' লিখে চলেছি, আপনি যিনি এই উপন্যাস কষ্ট করে পড়ে চলেছেন—সবাই-ই তো সেই উপন্যাস-সম্রাটের সৃষ্টি। এখানে তাঁরই নির্দেশে আমাদের মধ্যে কাউকে মরতে হয়, আবার কাউকে বাঁচতে হয়। কাউকে সংগ্রাম করে সাফল্যের চূড়ায় উঠতে হয়, আবার কাউকে সংগ্রাম করে ব্যর্থতার গহ্বরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে হয়। কোনও লৌকিক আদালতে তাঁর বিরুদ্ধে কোনও অনুরোধ, কোনও অভিযোগ, কোনও অনুযোগ করবার রীতি এখনও প্রচলিত হয়নি। আর তার বিরুদ্ধে আপিল করবার জন্যে কোনও সুপ্রীম কোর্ট এখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

তাই, এই যে মুখার্জিবাবুদের বাড়িতে মেমসাহেব-বউ আসবার পর থেকে এক চূড়ান্ত অস্বস্তিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হলো, এও সেই তাঁরই কারসাজি।

সেদিন মুক্তিপদ এ-বাড়িতে আসতেই ঠাকমা-মণি সেই কথাই তুললেন।

মুক্তিপদ এসেই জিজ্ঞেস করেছিলেন—কেমন আছো মা তুমি ?

ঠাকমা-মণি ছেলের ওপর রেগেই ছিলেন বহুদিন থেকে। বললেন—তোর ব্যাপার কী বল্ তো ? আমাদের কি তুই ত্যাগ করলি ?

মুক্তিপদ বললেন—সে কী ? তুমি বলছো কী মা ?

ঠাকমা-মণি বললেন—আমরা যে কী কষ্টের মধ্যে আছি তার খবর রাখতেও কি তোর মনে থাকে না ? তোর বউ না-হয় আমাদের ত্যাগ করেছে। সে হারামজাদী আমার অসুখের সময় একবার এ-বাড়ি মাড়ায়ওনি পর্যন্ত। তা সে পরের বাড়ির মেয়ে এ-বাড়ি মাড়ায়নি তো মাড়ায়নি, তাতে আমার বয়েই গেল ! কিন্তু তুই ? তুই তো আমার পেটের ছেলে, দশ মাস দশ দিন তোকে তো আমি পেটে ধরেছি, তুই পর্যন্ত নেমক-হারামি করবি এমন করে ? আমি তোর কাছে কী অপরাধ করেছি বলতে পারিস ?

মুক্তিপদ এই অভিযোগ শুনে যেন একেবারে আকাশ থেকে পড়লেন। বললেন—এ তুমি কী বলছো আমাকে ? আমি তো ক'দিনের জন্যে হায়দ্রাবাদে চলে গিয়েছিলাম। যাওয়ার আগে তোমাকে আমি তো এসে বলে গেলাম যে আমি হায়দ্রাবাদে যাচ্ছি। তবে এরই মধ্যে তুমি তা ভুলে গেলে ?

ঠাকমা-মণি বললেন, ওরে আমার মতো অবস্থা হলে তোরও মাথা খারাপ হয়ে যেত ! আমি যে এখনও পাগল হয়ে যাইনি, এও আমার গুরুদেবের বিশেষ দয়া ! বাড়িতে আমি আর এক দণ্ডও থাকতে পারছি নে। তুই যেমন করে পারিস আমায় কাশীতে পাঠিয়ে দে, আমি সেখানে গিয়ে মরি। এখানে থাকলে আমি মরেও শান্তি পাবো না।

মুক্তিপদ বললেন—ব্যাপারটা কী, তা তো বলবে। তোমার টাকার দরকার হয়েছে তো বলো ? আমি কিছু টাকা পাঠিয়ে দেব তোমাকে।

ঠাকমা-মণি বললেন—ওই টাকাই হয়েছে আমার কাল রে, এখন দেখছি যাদের টাকা নেই তারাই সুখে আছে। টাকা না থাকলে তোর বউও তোকে আমার কাছ থেকে

ছিনিয়ে নিতে পারতো না. আর খোকাও বিলেত থেকে ওই রাক্ষুসীকে বিয়ে করে আনতে পারতো না—

—কেন? সৌম্য আবার কী করলো তোমার?

ঠাকমা-মণি বললেন—খোকা কী করেনি তাই আমাকে জিজ্ঞেস কর। খোকা আর তার বিলিতি বউ মিলে আমার হাড়-মাস একেবারে ভাজা-ভাজা করে দিলে—

মুক্তিপদ বললেন—আবার সৌম্য তোমাকে জ্বালাচ্ছে নাকি?

—জ্বালাচ্ছে বলে জ্বালাচ্ছে! নইলে ওই মেম-মাগী বাড়িতে আসা এস্তোক আমার ঘুম-টুম কেন জলাঞ্জলি হয়ে গেল। সব সময়ে ভয়ে ভয়ে থাকি কোন দিন না থানা-পুলিশের খপ্পরে পড়ে মান-ইজ্জৎ সব খোয়া যায়।

—কেন? থানা-পুলিশের খপ্পরে পড়তে যাবে কেন?

ঠাকমা-মণি বললেন—তা বাড়িতে খুন-খারাবি হলে থানা-পুলিশ কি ছেড়ে কথা বলবে বলতে চাস?

—কি? কে কাকে খুন করবে? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না! সৌম্য?

ঠাকমা-মণি বললেন—সৌম্য কেন? ওর বিলিতি বউ। ওর বিলিতি বউ আজ খোকাকে খুন করতে চেষ্টা করেছে. শেষকালে কোন্ দিন আবার আমাকেই না খুন করে বসে!

মুক্তিপদ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। বললেন—তার মানে? সৌম্যর বউ সৌম্যকে খুন করতে চেষ্টা করেছে নাকি? কী বলছো তুমি?

ঠাকমা-মণি বললেন—খুন করতে চেষ্টা করেছে কি না তা খোকাকেই তুই জিজ্ঞেস করে দেখ না। কী বলে সে. তুই দেখ না. জিজ্ঞেস করে

তারপরে ঠাকমা-মণি বিন্দুকে বললেন—ওরে বিন্দু, সুধাকে বল্ তো খোকাকে ডেকে দিতে—

বিন্দু যথারীতি সুধাকে খবর দিলে। সুধা এসে বললে—খোকাদাদাবাবু এখন ঘুমোচ্ছে—

মুক্তিপদ অবাক হয়ে গেলেন। এই সন্ধেবেলা এত ঘুম কেন?

ঠাকমা-মণি সুধাকে বললেন—ঘুম ভাঙিয়ে ডেকে দিতে বল্। বল্ গিয়ে যে মেজবাবু এসেছেন. একবার খোকাদাদাবাবুর সঙ্গে দেখা করতে চান—

সুধা আবার চলে গেল। খানিক পরে আবর ফিরে এলো সে। বললে—মেমবউদি মানা করলেন ডাকতে—

ঠাকমা-মণি বললেন—তুই বলেছিস যে মেজবাবু এসেছেন?

—হ্যাঁ বলেছি। তবু বললেন. এখন যাবেন না. খোকাদাদাবাবু ঘুমোচ্ছেন—

মুক্তিপদর এবার রাগ হয়ে গেল। বললেন—এই বয়েসে সন্ধ্যেবেলা সৌম্য ঘুমোচ্ছে?

বলে উঠলেন। ব্যাপারটা আর সহ্য হলো না মুক্তিপদ'র। একেবারে সোজা সৌম্যর ঘরের সামনে গিয়ে ডাকতে লাগলেন—সৌম্য—সৌম্য—

কোনও সাড়া-শব্দ নেই ভেতর থেকে। ঘরের দরজা খোলা. পর্দা ঝুলছে।

মুক্তিপদ আবার ডাকলেন—সৌম্য. সৌম্য আছো?

—হুজ দ্যাট? কে?

মেয়েলি গলার আওয়াজ। সৌম্যর মেমসাহেব বউএর গলা।

মুক্তিপদ বললেন—আমি মুক্তিপদ. সৌম্যর আনকেল, সৌম্যর কাকা. ওকে একবার ডেকে দাও—

মেয়েলি গলার শব্দ এলো—ও এখন ঘুমোচ্ছে. এখন যেতে পারবে না—

মুক্তিপদ গলাটা চড়িয়ে বললেন—হ্যাঁ আসতে পারবে। ওকে ডেকে দাও তুমি—

এতক্ষণে গাউন পরা অবস্থায় পর্দা সরিয়ে বেরিয়ে এলো মেমটা। এসে বললে কেন ডিসটার্ব করছো? হি ইজ্ এ্যাস্লীপ—

মুক্তিপদর মনে হলো দিনের বেলাতেই যেন মেমটা মদ খেয়েছে। বললেন—ঘুমোক, তবু ওকে ডেকে দাও, আমার জরুরী দরকার আছে—

মেমটা বললে—থাক জরুরী, আমি ওকে এখন ডাকবো না—

মুক্তিপদর শরীরেও নীল রক্ত আছে। তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন- নো, ইউ মাস্ট্। তোমাকে ডেকে দিতেই হবে। আমার অর্ডার—

ওদিকে চেঁচামেচিতে সৌম্যর ঘুম ভেঙে গেছে। কাকার গলার আওয়াজ তার চেনা। সে ধড়মড় করে বাইরে আসতেই মুক্তিপদ বললেন—এই সন্ধ্যেবেলায় তুমি ঘুমোচ্ছ? এসো আমার সঙ্গে, তোমার ঠাকমা-মণির ঘরে এসো--

সৌম্য যেতে পা বাড়াচ্ছিল। কিন্তু তার মেমসাহেব তাকে আটকে দিলে। বললে—না, তুমি যাবে না। ইউ ওন্ট্—

কিন্তু মুক্তিপদর সামনে তার মেম-বউএর কথা শোনবার মতো সাহস তার নেই। সে বললে—না, আমি যাবো—

রীটা বললে—নো, ইউ ওন্ট্—

মুক্তিপদর পেছনে পেছনে চলতে আরম্ভ করতেই রীটা তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। বললে—তুমি যেতে পারবে না--

সৌম্য রুখে দাঁড়ালো। বললে—তুমি আমাকে বাধা দেবার কে? আমি যাবোই –

বলে রীটাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে কাকার পেছন পেছন চলতে লাগলো। তারপর একেবারে ঠাকমা-মণির ঘরে গিয়ে পোঁছতেই ঠাকমা-মণি বললেন—কী রে, এই সন্ধ্যেবেলায় ঘুমোচ্ছিস? তোকে ডাকতে গেলে তোর বউ ডেকে দেয় না কেন?

সৌম্য আর কী বলবে!

ঠাকমা-মণি আবার বললেন—সুধা বলছিল তোরা সমস্ত রাত নাকি দুজনে ঝগড়া করিস!

সৌম্যর মুখে তবু কোনও কথা নেই। মুক্তিপদ বললেন—কী নিয়ে ঝগড়া হয় তোমাদের?

তবু সৌম্যর মুখে কথা নেই। মুক্তিপদ বললে—কী হলো? কথার জবাব দিচ্ছ না কেন?

ঠাকমা-মণি আবার বললেন—কী রে, তুই কি বোবা হয়ে গেলি নাকি? কথা বল?

সৌম্যর বোধহয় ঘুমের ঘোর তখনও কাটেনি। বললে—কী বলবো আমি?

মুক্তিপদ বললেন-- বলো কেন সমস্ত রাত ঝগড়া হয় তোমাদের? তুমি তো নিজে দেখে শুনে পছন্দ করে বিয়ে করেছ। তাহলে এত ঝগড়া হয় কেন তোমাদের?

সৌম্য বললে—ও কেবল টাকা চায়—

—টাকা?

সৌম্য বললে—হ্যাঁ কেবল টাকা চায়। টাকা আর মদ ছাড়া অন্য কোনও কথা নেই ওর মুখে—

ঠাকমা-মণি বললেন—টাকা চায় কেন? খাওয়া-পরা-থাকা-পোশাক-আশাক সবই তো পাচ্ছে তোর বউ। আবার টাকা কী জন্যে চায়? মদ খাওয়া? তা সেও তুই দিচ্ছিস। তবু কী জন্যে টাকা চায়?

সৌম্য বললে—বিয়ের আগে ওকে কথা দিয়েছিলুম যে ওর মা'কে লণ্ডনে দু'শো পাউণ্ড করে মাসে পাঠাবো। অনেক দিন তা পাঠাতে পারিনি—

মুক্তিপদ বললেন—তা বলোনি কেন যে আমাদের ফ্যাক্টরি বন্ধ আছে কি করে

টাকা পাঠাবো? ফ্যাক্টরি বন্ধ আছে বলে আমাদের টাকার টানাটানি চলছে?

—বলেছি, তবু শোনে না। বলে—তোমাদের ফ্যাক্টরি বন্ধ আছে বলে আমার মা কেন ভুগবে? আমার মা'র কাছে তোমাকে টাকা পাঠাতেই হবে—

মুক্তিপদ বললেন—তাই যদি হয় তো অমন বউকে তুমি ডিভোর্স করে দাও. যে-বউ দিন-রাত টাকা-টাকা করে জ্বালাতন করে সে বউ নয়, সে কাবলিওয়ালা। ডিভোর্স করে দাও তাকে—

ঠাকমা-মণিও বললেন—হ্যাঁ, মুক্তি তো ঠিকই বলেছে। যে-বউ দিন-রাত টাকা-টাকা করে সে বউ নয়, সে কাবলিওয়ালা। তুই ওকে ডিভোর্স করে দে—

সৌম্য বললে—আমি তাও ওকে বলেছি। ও বলেছে—ওকে কুড়ি হাজার পাউন্ড দিলে তবে ও আমাকে ডিভোর্স করবে—

মুক্তিপদ সঙ্গে-সঙ্গে বলে উঠলেন—তা তাই-ই করো। কুড়ি হাজার পাউন্ড দিলে যদি ও ডিভোর্স দেয় তো তোমাকে আমি তাই-ই দেব। তুমি ওকে ডিভোর্স করে দাও। আমার যতো কষ্টই হোক, আমি যেখান থেকে পারি, কুড়ি হাজার পাউন্ড যোগাড় করে দেব। তাহলে তো আমি বেঁচে যাই। মিস্টার অতুল চ্যাটার্জির মেয়ের শুনেছি এখনও বিয়ে হয়নি। তার সঙ্গে বিয়ে হলে আমার ফ্যাক্টরিও বাঁচবে. আর ওই কুড়ি হাজার পাউন্ডও উশুল হয়ে যাবে—

ঠাকমা-মণি মুক্তিপদকে সমর্থন করে বললেন—হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই-ই কর তুই। কুড়ি হাজার পাউন্ড দিলে যদি তোর মেম-ছুঁড়ী বাড়ি থেকে বিদেয় হয় তো আমি তাই-ই দেব। তাতে তুইও বাঁচবি আর আমরাও বাঁচবো। তখন আবার না হয় একটা ভালো মেয়ে দেখে তার সঙ্গে তোর বিয়ে দেব—

মুক্তিপদ জিজ্ঞেস করলেন—কী ভাবছো? তাই করবে? বলো, কথা বলো—

ঠাকমা-মণিও জিজ্ঞেস করলেন—কথা বলছিস না কেন? ডিভোর্স করবি—

সৌম্য বললে—ঠিক আছে, তাই করবো—

ঠাকমা-মণি বললেন—খুব ভালো কথা। দুষ্টু গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো। শেষ পর্যন্ত যে তোর সুমতি হয়েছে সেটাও ভালো। আমি সরকার-মশাইকে আজকেই বলে দিচ্ছি এখনও সেই বিশাখা মেয়েটার বিয়ে হয়েছে কি না খবর নিতে—

ওতক্ষণে হঠাৎ একটা টেলিফোন এলো। ঠাকমা-মণি বললেন—এখানে এখন আমাকে আর কে টেলিফোন করবে, ও নিশ্চয়ই মুক্তির টেলিফোন—

ঠাকমা-মণি বিন্দুকে ডেকে বললেন—বিন্দু, সরকার-মশাইকে একবার ডেকে আন্ তো গিয়ে. মুক্তির সামনেই একেবারে মুখোমুখি কথা হয়ে যাক। খবর নিক সেই রাসেল স্ট্রীটের গাঙ্গুলীদের বাড়ির মেয়েটার এখনও বিয়ে হয়েছে কি না। মনে হয়, এখন সেই মনসাতলা লেনের কাকার বাড়িতেই আছে—যাবে আর কোথায়?
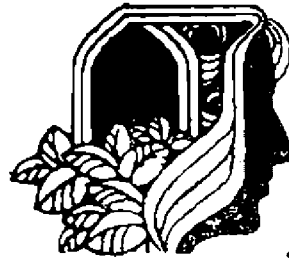
চিরকালের পৃথিবীটার চেহারা তখন খুব বদলে গেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই বলতে গেলে বেশি করে বদলে গেছে। যে-সব দেশ ততো উন্নত নয় তাদের

বদলটাই বেশি করে নজরে পড়ার মতো। প্রথম দিকে আমেরিকার মাথাতেই এই দুশ্চিন্তাটা গজায় যে এই বিশ্বব্যাপী যুদ্ধটা থেমে গেলে তখন কি আবার সেই 'গ্রেট্ ডিপ্রেশনে'র বোঝাটা আগের বারের মতোই এবারেও ভারি হয়ে উঠবে? আবার কি সব জিনিসের দাম কমে গিয়ে মানুষের ক্রয়-ক্ষমতাও কমে যাবে? আবার কি লক্ষ-লক্ষ মানুষ সেবারের মতো বেকার হবে? আবার কি সেবারের মতো সব ব্যাঙ্ক ফেল হয়ে যাবে? আবার কি সেই বাজার-ভর্তি জিনিস থৈ থৈ করবে আর সে-জিনিস কেনবার মতো খরিদ্দার থাকবে না?

সে তো ভয়ানক অবস্থা।

এবার এই মহাযুদ্ধের পর যাতে সেবারের পুনরাবৃত্তি না হয় তার জন্যেই একদিন এক সাহেবের মাথায় একটা নতুন ধরনের প্ল্যান গজালো। তাঁর নামেই প্ল্যান্‌টার নাম দেওয়া হলো--'মার্শাল এইড্ প্ল্যান'। তাতে পৃথিবীর যতো অনুন্নত দেশ তাদের কোটি-কোটি টাকা ধার দেওয়া হতে লাগলো। সে-ধার তোমাকে এখনই যে শোধ করতে হবে তার কোনও মানে নেই। কুড়ি বা পঁচিশ তিরিশ বছর পরে কিস্তিতে শোধ করলেই চলবে। এখন টাকা নাও তোমরা। ধার নিয়ে সেই টাকায় আমাদের দেশের তৈরি জিনিসগুলো কেনো। নইলে আমাদের দেশের তৈরি মালগুলো সমুদ্রের গর্ভে ফেলে দিতে হবে. আমাদের কারখানাগুলোর মালিকরাও তাদের দরজার ঝাঁপ বন্ধ করে হাত গুটিয়ে বসে থাকবে. আর আমাদের কোটি-কোটি শ্রমিকও একসঙ্গে বেকার হয়ে যাবে তাতে।

গরীব দেশগুলো তখন পশ্চিমের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর হাত থেকে সদ্য মুক্তি পেয়ে রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু তাদের ভাঁড়ে তখন মা-ভবানী। তাই তারা সবাই একসঙ্গে ভিক্ষের ঝুলি বাড়িয়ে দিলে। বললে—দাও টাকা, যত পারো টাকা দাও। আগে তো আমরা খেয়ে বাঁচি, পরে তোমাদের দেনা শোধের কথা ভাববো। পেটে খেলে আমাদের পিঠেও সইবে।

এই 'মার্শাল এইড্ প্ল্যান' দিয়েই যাত্রা শুরু হলো। তারপর এগিয়ে এল 'আন্ত-র্জাতিক মনিটারি ফান্ড', 'বিশ্বব্যাঙ্ক' প্রভৃতি সংস্থাগুলো। তারপর এলো 'P.L. 480' চুক্তি। এক-এক করে টাকার দান-ছত্র গজিয়ে উঠলো পশ্চিমের বাজারে, আর এখানকার মনুষ্যত্বের দর নেমে এসে দাঁড়ালো শূন্যেতে।

এদিকে ইন্ডিয়া-পাকিস্তান-বাংলাদেশেও একসঙ্গে রব উঠলো--দাও-দাও-দাও— ওদিকে ওরাও একসঙ্গে বলতে লাগলো. নাও-নাও-নাও। তুমি নিয়ে আমাদের ধন্য করো. আমাদের কৃতার্থ করো--

এই 'দাও' আর 'নাও'-এর টানা-পোড়েনের মাঝখানে পড়ে এখানকার মানুষের অবস্থা ত্রিশঙ্কুর মতো হয়ে উঠলো। আগে ছিল 'মিলিটারি-কন্‌কোয়েস্ট'। এবার শুরু হলো 'ইকোনমিক-কন্‌কোয়েস্ট'। সেই পুরাতনের পুনরাবৃত্তি। এখান থেকে আগেকার মতোই আমরা কাঁচামাল পাঠাতে লাগলাম. আর তার বদলে আসতে লাগলো ওখানকার গম-চাল-চিনি. আরো কত কী? বিশ্বব্যাঙ্কের 'লকারে' তখন আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার মজুত-জমায় ঘাটতি কেবল বাড়তেই লাগলো। দেশের বার্ষিক বাজেটেও বাড়তে লাগলো ঘাটতির অঙ্ক। এর প্রতিকার কেমন করে হবে?

প্রতিকার হবে কাগজের নোট ছাপিয়ে আর ব্যাঙ্কের সুদ বাড়িয়ে। যতো ঘাটতি বাজেট তৈরি হয় ততো ব্যাঙ্কের সুদ বাড়ে। তার ফলে আগে তিরিশ টাকা মাইনে পেয়ে যেমন রাজার হালে থাকা যেতো এখন তিন হাজার টাকা মাইনে পেয়েও সেই আরাম তার পাওয়া যায় না। এখন একটা টাকার দাম কমে গিয়ে এক পয়সায় এসে দাঁড়িয়েছে।

ব্যাঙ্কের সুদ বাড়ছে, তাই ব্যাঙ্কের কাজও বাড়ছে। সুতরাং আরো লোক নাও। চারদিকে ব্যাঙ্কের আরো ব্রাঞ্চ খোল। তাই সকলের আগে ব্যাঙ্কের কর্মচারীদের মাইনেই হু-হু করে বাড়তে লাগলো—তা তারা কাজ করুক আর না-করুক। ন্যাশনাল ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের শ্যামবাজার ব্রাঞ্চে একদিন এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক এসে জিজ্ঞেস করলেন—হ্যাঁ মশাই, সন্দীপ লাহিড়ীকে একবার ডেকে দিতে পারবেন?

—হ্যাঁ, কী নাম বলবো?

—বলবেন, মল্লিক-মশাই তার সঙ্গে একবার দেখা করতে চান।

—মল্লিক-মশাই বললেই চিনতে পারবেন তো তিনি?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, বলবেন বিডন স্ট্রীটের মুখার্জিবাবুদের বাড়ির মল্লিক-মশাই। এই নাম বললেই চিনতে পারবেন---

ঠাকমা-মণি বলে দিয়েছিলেন যে সেই খিদিরপুরের মনসাতলা লেনের গাঙ্গুলীদের মেয়েটার বিয়ে এখনও হয়েছে কিনা সেই খবরটা যোগাড় করতে। সৌম্যবাবু মেমসাহেব-বউটাকে ডাইভোর্স করে দেবার সঙ্গে সঙ্গে এই বিশাখা নামের মেয়েটার সঙ্গেই ঠাকমা-মণি তাঁর নাতির বিয়ে দিয়ে দেবেন। তাহলে আর তাঁর কোনও সমস্যা থাকবে না। চিরকালের মতো সব ঝঞ্ঝাট তাঁর চুকে বুকে যাবে।

মনে আছে, একদিন বাসে আসতে আসতেই সন্দীপের সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল মল্লিক-মশাইএর। তখনই সন্দীপ বলেছিল যে সে বিশাখা আর তার মা'কে বেড়াপোতাতে নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তুলেছে। সেও তো অনেক দিন আগের কথা। এখনও নিশ্চয়ই তারা সেই সেখানেই আছে। তা ছাড়া আর কোথায়ই বা যাবে।

একটা জীবনে মল্লিক-মশাই কতোই না দেখলেন। মুখার্জিবাবুদের রম-রমা অবস্থাও দেখেছেন, আবার আজকের এই পড়তি অবস্থাও দেখছেন। বেঁচে থাকলে তাঁকে আরো কত কী দেখতে হবে তাই-ই বা কে বলতে পারে?

—সন্দীপ লাহিড়ী আজ অফিসে আসেননি—

হঠাৎ মল্লিক-মশাইএর ধ্যান ভাঙলো যেন। জিজ্ঞেস করলেন—আসেননি?

—না।

মল্লিক-মশাই আবার বললেন—তিনি কি ছুটিতে আছেন? নাকি শুধু আজকেই ব্যাঙ্কে আসেন নি?

ভদ্রলোক ব্যস্ত মানুষ। আরো অনেক লোক তাঁকে তখন ঘিরে রয়েছে। বেশি কথা বলবার সময়ই তাঁর থাকবার কথা নয়। তবু যে একটুখানি কথার জবাব দিয়েছেন, তাই-ই যথেষ্ট দয়া দেখিয়েছেন। তারপর সকলে চলে যাওয়ার পরে ভদ্রলোক মল্লিক-মশাইএর দিকে চেয়ে হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন—আপনি কী চান?

মল্লিক-মশাই বললেন—আমি জানতে চেয়েছিলাম যে সন্দীপ লাহিড়ী কি ব্যাঙ্ক থেকে ছুটি নিয়েছেন?

তখন ভদ্রলোকের মনে পড়লো। বললেন—ও হ্যাঁ তিনি কালকে এসেছিলেন আমি দেখেছি। আপনি কাল আর একবার আসবেন, দেখা হবে—

মল্লিক-মশাই বললেন—তাহলে তিনি কাল এলে বলে দেবেন যে আমি আজকে এসেছিলাম। কাল আমি আবার আর একবার আসবো—

—হ্যাঁ ঠিক আছে—

ততক্ষণ আর একজন কে আসতেই তিনি তাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, আর মল্লিক-মশাই'য়ের দিকে তাঁর একবার চেয়ে দেখবার সময়ও হলো না। মল্লিক-মশাই তারপরে আবার বিডন স্ট্রীটের বাড়িতে এসে ঠাকমা-মণির সঙ্গে দেখা করলেন।

ঠাকমা-মণি সব শুনে বললেন—তাহলে কাল আর একবার সেখানে যাবেন—

চলে আসবার সময়ে ঠাকমা-মণি আবার ডাকলেন—বললেন, আর সেখানে তাকে না পেলে খিদিরপুরের সেই মনসাতলা লেনে কাকার বাড়িতে গিয়েও একবার দেখে আসতে পারেন. সেখানেও তো তারা ফিরে যেতে পারে। কিছু বলা তো যায় না..

—সেখানে গিয়ে তাঁদের কী বলবো?

প্রথমে জিজ্ঞেস করবেন এখনও তাঁদের সেই মেয়ের বিয়ে হয়েছে কিনা। যদি জানতে পারেন বিয়ে হয়নি তাহলে বলবেন বিয়েটা যেন তাঁরা কিছুদিন ঠেকিয়ে রাখেন। সৌম্যর ডাইভোর্সটা হয়ে গেলেই আবার ওই মেয়ের সঙ্গেই সৌম্যর বিয়ে দেওয়া হবে—

মল্লিক-মশাই হুকুমের চাকর। তাঁকে যেমন-যেমন বলা হবে তিনি তেমন-তেমন করবেন। তাঁকে যদি কেউ বলে পাঁঠাটাকে পায়ের দিক থেকে কাটুন তো তিনি তাই-ই করবেন। তিনি চাকর এ-বাড়ির। তাঁর কোনও স্বাধীন ইচ্ছে থাকতে নেই. তাঁর স্বাধীন ইচ্ছে থাকা অন্যায়। তাই পরের দিনও তিনি আবার গেলেন সেই ব্যাঙ্কে।

যে ভদ্রলোকের সঙ্গে মল্লিক-মশাই আগের দিন কথা বলেছিলেন সেদিন তাঁর সামনে অনেক ভিড়। সেদিন অন্য একজন লোককে ধরলেন। তাঁকেও সেই একই প্রশ্ন করলেন। ভদ্রলোক বললেন -সন্দীপদা? সন্দীপ লাহিড়ীকে খুঁজছেন?

মল্লিক-মশাই বললেন—হ্যাঁ. হ্যাঁ, আমি কালকেও এসে খবর নিয়ে গেছি তিনি আসেননি—

ভদ্রলোক বললেন—তিনি তো ক'দিন ধরেই ব্যাঙ্কে আসছেন না—

—ছুটি নিয়েছে নাকি তাহলে সে? কেন, আসছে না কেন? শরীর খারাপ-টারাপ হলো না তো?

ভদ্রলোক বললেন -তা কী করে বলবো বলুন? তিনি তো কলকাতায় থাকেন না। তিনি মফস্বল থেকে ডেলি-প্যাসেঞ্জারি করেন—

মল্লিক-মশাই তখন কী আর করবেন! চলেই আসছিলেন। চলে আসবার আগে বললেন- ব্যাঙ্কে এলে তাকে বলবেন যে বিডন স্ট্রীটের বাড়ি থেকে মল্লিক-মশাই তার খোঁজে এখানে এসেছিলেন। ভুলবেন না যেন. ঠিক বলবেন কিন্তু—

আবার সেদিন মল্লিক-মশাই বাড়ি ফিরে এলেন। আবার ঠাকমা-মণিকে গিয়ে রিপোর্ট দিলেন। ঠাকমা-মণি সব শুনে বললেন—তাহলে একবার খিদিরপুরে মনসাতলা লেনে পাত্রীর কাকার বাড়িতে গিয়ে খবর নিন। তারা সেখানেও যেতে পারে—

মল্লিক-মশাই-এর দৈনন্দিন কাজের তালিকায় এগুলো বাড়তি ঝামেলা। এতগুলো লোকের খাওয়া-পরা থাকার হিসেব রাখার কাজ তো আছেই. তার সঙ্গে এ আবার একটা নতুন কাজ এসে জুটলো। তাই পরের দিন অন্য সমস্ত কাজ তাড়াতাড়ি সেরে ফেলেই সেই মনসাতলা লেনের তপেশ গাঙ্গুলীর বাড়িতে গিয়ে পৌঁছলেন।

তারপর সদর দরজায় কড়া নেড়ে ডাকতে লাগলেন—তপেশবাবু, তপেশবাবু—

তপেশ গাঙ্গুলী সবে মাত্র তখন ভাত খেয়ে উঠে অফিসে যাওয়ার তোড়জোড় করছেন। বাইরে কার গলা শুনেই বাইরে এলেন। তারপর মল্লিক-মশাইকে দেখে একেবারে আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন। বললেন-- আপনি? কী ব্যাপার?

মল্লিক-মশাই বললেন -আপনার সেই ভাইঝি কি আপনার এখানে?

এতদিন বাদে মল্লিক-মশাইকে দেখেই অবাক হয়ে গিয়েছিলেন. তারপরে আবার বিশাখার প্রসঙ্গ শুনে তপেশবাবু আরো হতচকিত হয়ে গেলেন।

বললেন- হঠাৎ এতদিন বাদে তাদের খোঁজ করছেন, ব্যাপারটা কী বলুন তো?

মল্লিক-মশাই বললেন—আমার ওপর হুকুম হয়েছে তাদের খুঁজে বার করতে—

—কেন বলুন তো? আপনাদের বাড়ির ছেলে তো বিলেত থেকে মেমসাহেব বিয়ে করে এনেছে। তার পরেও আবার তাদের খোঁজখবর কেন?

মল্লিক-মশাই এ-সব কথার উত্তর দিতে আসেননি। তাই চুপ করে রইলেন। শুধু জিজ্ঞেস করলেন—তারা এখানে আপনার কাছে আছে কিনা তাই বলুন না। আমি সেটা জেনে নিয়ে বাড়ি চলে যাই—

কিন্তু তপেশ গাঙ্গুলীও ছাড়বার পাত্র নন।

বললেন—সত্যি বলুন না ম্যানেজারবাবু, ব্যাপারটা কী তাই বলুন না—

মল্লিক-মশাই বললেন—আমি বললুম তো তারা এখানে আছে কিনা তাই জানতেই এসেছি। এর বেশি আর কিছু জানি না—

তপেশ গাঙ্গুলী বললেন—সত্যি বলুন না ম্যানেজারবাবু—আপনি সব জানেন, শুধু বলছেন না—

মল্লিক-মশাই যতো কথাটা এড়িয়ে যেতে চান, ততো তপেশ গাঙ্গুলী পথ আটকে দাঁড়ান। বলেন—বলুন, বলুন না ব্যাপারটা কী?

—আরে, এ তো মহা মুশকিলে পড়লুম দেখছি। আপনার তো আপিসে যেতে দেরি হয়ে যাচ্ছে ওদিকে—

তপেশ গাঙ্গুলী বললেন—যাক্ গে দেরি হয়ে। ভারি তো আমার পাঁচ সিকে রোজের রেলের চাকরি—ও থাকলেও মাইনে পাবো, না-থাকলেও মাইনে পাবো—আপনি বলুন?

শেষকালে তপেশ গাঙ্গুলী ঘরের দরজার ভেতর থেকে খিল লাগিয়ে দিলেন। বললেন—না বললে আমি আপনাকে ছাড়বো না ম্যানেজারবাবু, বলুন না ব্যাপারটা কী? তাহলে কি আপনাদের নাতিবাবু দুটো বিয়ে করবেন নাকি?

—তাই যদি করেন তো আপনার তাতে কী?

তপেশ গাঙ্গুলীর চোখ দুটো জলে ভিজে ছল্-ছল্ করে উঠলো। বললেন—বিশাখার বদলে আমার বিজলীর সঙ্গে বিয়েটা দেবার ব্যবস্থা করুন না—

মল্লিক-মশাইএর রাগ হয়ে গেল আবার। বললেন আপনার কি মাথাটা খারাপ হয়ে গেল নাকি? একটা বউ থাকতে আবার একটা বিয়ে কেউ করে? আপনি নিজে মেয়ের বাপ হয়ে এই কথা বলছেন? সতীনের ঘরে মেয়ের বিয়ে দেবেন?

তপেশ গাঙ্গুলী বললেন—কেন, দোষটা কী? জামাই'এর টাকা তো আছে! বিশাখার সঙ্গে যদি বিয়ে হতে পারে তাহলে বিজলীর সঙ্গে বিয়েতে দোষ কী? আমার বিজলীর চেহারা কি বিশাখার চেয়ে কোনও অংশে খারাপ?

তারপর সেখান থেকেই চেঁচিয়ে ডাকতে লাগলো—এ্যাই বিজলী, বিজলী, এখানে এসে একটু শুনে যা তো মা—

বিজলী আসছে না দেখে তপেশ গাঙ্গুলী নিজেই বাড়ির ভেতরে চলে গেলেন। রানী তখন রান্নাঘরে ছিল। তপেশ গাঙ্গুলী বললেন—কই গো, বিজলী কোথায়?

রানী বললে—কী হয়েছে? অতো চেঁচাচ্ছ কেন?

তপেশ গাঙ্গুলী বললেন—আরে সাধ করে কি চেঁচাচ্ছি? সেই বিডন স্ট্রীটের মুখুজ্জেদের বাড়ির ম্যানেজারটা এসেছে। বিশাখা এ-বাড়িতে আছে কিনা জিজ্ঞেস করছে—

—বিজলীকে দেখাবো ম্যানেজারকে। ম্যানেজারটা নিজের চোখে দেখুক বিশাখার থেকে আমার বিজলী কোনও অংশে নিরেস নয়! কোথায় গেল সে? ঠিক কাজের সময়েই কিনা সে নিরুদ্দেশ হয়? তাকে একবার ডাকো না—

হঠাৎ কোথা থেকে বিজলী এসে হাজির হলো। তাকে দেখতে পেয়েই তপেশ গাঙ্গুলী বললেন—কোথায় থাকিস বল তো তুই, থাকিস কোথায়? নে শিগ্‌গির একটা শাড়ি পরে নে। মুখুজ্জেদের ম্যানেজারটা এসেছে, তোকে দেখবে—

তারপর রানীকে উদ্দেশ্য করে বললে—ওকে একটা ভালো শাড়ি পরিয়ে দাও না গো. আর ভালো করে চুল-টুল বেঁধে দাও ওর। দেরি কোর না।

তাই করা হলো। রানী এসে মেয়েকে একটা পোশাকী শাড়ি বার করে পরতে দিলে। তারপর খোঁপা বেঁধে দিলে।

তপেশ গাঙ্গুলী বললেন—বড্ড দেরি হয়ে যাচ্ছে. একটু তাড়াতাড়ি করো গো—

মেয়েদের সাজা বললেই কি অতো সহজে সাজা হয়? মুখে একটু স্নো-পাউডারও তো ঘষতে হবে! ঠোঁটে লিপ্-স্টিক্ও একটু ছোঁওয়াতে হবে। বার-বার আয়নায় মুখটাও একটু দেখতে হবে।

—আর ততক্ষণে তুমি চা করে দাও এক কাপ। আমি বিজলীকে নিয়ে বাইরের ঘরে যাচ্ছি—

তপেশ গাঙ্গুলী বিজলীকে নিয়ে বাইরের ঘরে গিয়েই অবাক। গেল কোথায় ম্যানেজারটা! কোথায় গেল? পালিয়ে গেল নাকি রে?

ভেতর থেকে রানী বললে—ওগো. চা নিয়ে যাও—চা তৈরি—

তপেশ গাঙ্গুলী নিজের মনেই গজরাতে লাগলেন। বেটা হারামজাদা! এইভাবে আমাকে ঠকানো! আমি এর বদলা যদি না নিই তো আমি বামুনের ছেলেই নই।

রানী ভেতর থেকে জিজ্ঞেস করলে—কী হলো গো? চা নিলে না?

তপেশ গাঙ্গুলী বললেন—জানো. আমাকে এমন করে ঠকালো ম্যানেজারটা। আমাকে বললে যে নিয়ে আসুন আপনার মেয়েকে. আমি একবার দেখবো। আর বলা-নেই-কওয়া-নেই চম্পট্...

শেষ পর্যন্ত সন্দীপকে পুলিশেরই সাহায্য নিতে হলো। কলকাতা শহরটা যে খারাপ তা সন্দীপের জানা ছিল. কিন্তু তা এত খারাপ তা কে জানতো।

সেই রাতটার কথা সন্দীপের এখনও মনে আছে। সেই বেড়াপোতাতে তারা তিন-জনে মিলে সেদিন রাত জেগেছে। প্রথমে রাত দশটা যখন বাজলো তখন সবাই ভাবলো যে এই ট্রেনে বোধহয় বিশাখা আসবে। মা. মাসিমা. সন্দীপ তিনজনেই বাড়ির বাইরে সদর রাস্তায় এসে দাঁড়ালো। ট্রেনটা এসে থামলো। তারপর আবার হুইশল বাজিয়ে এক সময়ে চলেও গেল। তারপরেও আধঘণ্টা কেটে গেল। বিশাখা এলো না।

রান্না-বান্না সমস্ত পড়ে রইলো। কেউই খেলে না কিছু।

মা বললে—হ্যাঁরে খোকা. তুই খাবি না? খেয়ে নে—

সন্দীপ বললে—তোমরা খেয়ে নাও না. আমার ক্ষিদে নেই।

সন্দীপ খেলে না. সুতরাং কারোরই খাওয়া হলো না। সব চেয়ে করুণ অবস্থা হয়েছিল মাসিমার। ক'দিন ধরে মাসিমা যেন একেবারে বোবা হয়ে গিয়েছিল। খাওয়া নেই. ঘুমোন নেই. কথা নেই. সে এক ভয়াবহ অবস্থা হয়েছিল মাসিমার।

মনে আছে পরদিন ভোরবেলার ট্রেনেই সন্দীপ বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। যাবার আগে শুধু মা'কে ডেকে বলে এসেছিল—দরজাটা বন্ধ করে দাও মা. আমি চলে যাচ্ছি—

মা শুধু জিজ্ঞেস করেছিল—কখন আসবি তুই?

সন্দীপ শুধু বলেছিল—কোনও ঠিক নেই—

তারপর একটু থেমে বলেছিল—যদি আমি রাত্তিরে বাড়িতে না আসি তো তোমরা কিছু ভেবো না—বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে প্রথমেই গিয়েছিল সেই 'আইডিয়াল ফুড প্রোডাক্টস' কোম্পানিতে—

অতো সকালে কলকাতার কোনও অফিসই খোলে না, 'মিল্ক-বুথ' বা সরকারি দুধের দোকান ছাড়া। 'ফুড প্রোডাক্টস' অফিসটাই তার জানা ঠিকানা। তাদের কাছে জিজ্ঞেস করলেই জানা যেতে পারে বিশাখা কোথায় আছে, কেন দেশে ফিরে যায়নি ইত্যাদি ইত্যাদি—

বাড়িটার সামনের সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে তবে অফিসটা। ওপরে উঠে সন্দীপ দেখলে অফিসটার দরজায় তালা ঝুলছে। ঘড়িতে তখন সকাল ন'টা। সাড়ে দশটার মধ্যেই সাধারণতঃ কলকাতার অফিসগুলোর দরজা খোলে। তার আগে নয়।

কাছাকাছি কোথাও গিয়ে বাকি সময়টা কাটাবে তা ভাবতে ভাবতেই পাশের একটা গলির মধ্যে একটা মাঝারি চায়ের দোকান পাওয়া গেল। বাড়ি থেকে কিছু খেয়েও বেরোয়নি সে। বলতে গেলে খাওয়ার স্পৃহাও তার ছিল না। বিশাখাই তার সমস্ত মনটা এমনভাবে অধিকার করে রেখেছিল যে, সেখানে অন্য কোনোও ভাবনা-চিন্তা প্রবেশ করবার কোনও সুযোগই ছিল না। তার কেবল মনে হচ্ছিল যে, সে যা অপরাধ করেছে তার যেন কোনও ক্ষমা নেই। কেন সে তাকে অমন করে একলা ফেলে রেখে চলে গিয়েছিল? তাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসে ইন্টারভিউ-এর শেষে আবার তাকে সঙ্গে করে নিয়ে বেড়াপোতাতেই না-হয় ফিরে যেত! একটা দিন ব্যাংকে না গেলে তার কী এমন ক্ষতি হতো! তা ছাড়া, সব চেয়ে বড়ো কথা বিশাখার চাকরি করার দরকারটা বা কি! কে তাকে এ মতলব দিলে? কেন সে চাকরি করবে? স্বাধীন হওয়ার জন্যে? কীসের স্বাধীনতা? কেন সে নিজেকে তার গলগ্রহ ভাবছে?

সন্দীপ অনেক বুঝিয়েছে তাকে। সন্দীপ মাসিমাকে বলেছিল—মাসিমা, আপনি একটু বুঝিয়ে বলুন ওকে। ওর কীসের দায় পড়েছে কষ্ট করে চাকরি করার? আমি তো রয়েইছি। আমার তো টাকার অভাব নেই। অফিস থেকে যা পাই তাতে তো আমাদের চারজনের সংসার হেসে-খেলে চলে যাবে—

মাসিমাও অনেক করে বলেছিল—কেন তুই চাকরি করতে চাইছিস মা? সন্দীপ তো ঠিক কথাই বলছে। চাকরি করার অনেক জ্বালা রে। তুই তো জানিস না, তাই এত গোঁ ধরেছিস। পুরুষ মানুষের কথা আলাদা, কিন্তু তুই মেয়েমানুষ হয়ে জন্মেছিস, ঘর-সংসারের কাজেই মেয়েদের মানায়। তুই কি অতো ধকল সইতে পারবি?

বিশাখা বলেছিল—তুমি জানো না, এখন আর তোমাদের আমল নেই। এখন অনেক মেয়ে রাস্তায় ট্রামে-বাসে ঘোরে। তুমি জানো না তাই বলছো—

কিন্তু এখন কী জবাব দেবে সে?

মাসিমা একটা রাতেই বিশাখাকে না দেখতে পেয়ে অসাড় হয়ে গিয়েছিল। যেন কতদিন না খেয়ে আছে, এমনি চেহারা হয়ে গিয়েছিল মাসিমার। মাসিমার দিকে চাইতেই ভয় করছিল সন্দীপের। শুধু একবার মাসিমা জিজ্ঞেস করেছিল—বিশাখা যদি আর না ফেরে তো কী হবে বাবা?

মা মাসিমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিল—তুমি এত ভাবছো কেন দিদি, আমার সন্দীপ তো রয়েছে, সন্দীপ তাকে ঠিক খুঁজে বার করবে। তুমি অতো ভেবো না—

মাসিমা কেঁদে ফেলেছিল। কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল—আমি যে ঘর-পোড়া গরু দিদি। সিঁদুরে মেঘ দেখলেই যে আমার সব কথা মনে পড়ে যায়। বিশাখা আমার

যদি মেয়ে না হয়ে ছেলে হতো তাহলে কি আমি ভাবতুম?

সন্দীপ এবার উঠলো। চা-টোস্টের দাম মিটিয়ে দিয়ে আবার সেই অফিসের দরজার সামনে গিয়ে হাজির হলো।

তখন তালা খোলা। সন্দীপ অফিসের ভেতরে ঢুকে দেখলে কে একজন ভদ্রলোক একটা চেয়ারে বসে আছেন, সন্দীপকে দেখে তিনি জিজ্ঞেস করলেন—কী চাই আপনার?

সন্দীপ বললে—আমি বিশাখা গাঙ্গুলীর খোঁজে এসেছি—

—বিশাখা গাঙ্গুলী?

নামটা শুনে যেন আকাশ থেকে পড়লেন ভদ্রলোক।

বললেন—বিশাখা গাঙ্গুলী? তিনি তো এখানে আসেন নি!

সন্দীপ মনে করিয়ে দেওয়ার জন্যে সব ঘটনাটা বলে গেল। তারপর বললে—তিনি তো কাল এখান থেকে গিয়ে বাড়ি ফেরেননি!

ভদ্রলোক বললেন—তা তো আমি বলতে পারবো না। কাল তো আরো অনেকে ইণ্টারভিউ দিতে এসেছিলেন। দুপুর বারোটার মধ্যেই সবাই চ'লে গিয়েছেন! তিনি কেন বাড়ি ফিরে যাননি, তা তো আমি বলতে পারবো না

সন্দীপ বললে—কালকেও আমি এসেছিলুম। আমি এসে দেখলুম সব মহিলারাই তার আগে চলে গেছেন। একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তিনি এই চেয়ারে বসেছিলেন। তিনি আমাকে বলেছিলেন যে তিনি মিস গাঙ্গুলীকে চলে যেতে দেখেছেন, মিস গাঙ্গুলী নাকি হাওড়া স্টেশনে ট্রেন ধরতে চলে গেছেন—তাই শুনে আমি হাওড়া স্টেশনে গেলাম। কিন্তু তিনি তো বাড়ি ফেরেন নি কাল! আমরা সারা রাত অপেক্ষা করলাম, কিন্তু তিনি যান নি। তাঁর মা খুব কান্নাকাটি করছেন দেখে আমি ভোরবেলাই এখানে চলে এসেছি—

ভদ্রলোক এর জবাবে কী-ই বা বলবেন।

শুধু বললেন—আমি এ-ব্যাপারে কী করতে পারি, বলুন?

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—কিন্তু সেই ভদ্রলোক কোথায় গেলেন?

—কোন্ ভদ্রলোক? তাঁর নাম কী?

সন্দীপ বললে—নাম তো জানি না। ফর্সা মতোন, গোঁফ-দাড়ি কামানো। গোলাপী বুশ-শার্ট পরা...

—ও, তিনি তো মিস্টার সাহা—ভবতোষ সাহা। তিনি আমাদের ডাইরেক্টার—

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—তিনি আজ অফিসে আসবেন না?

ভদ্রলোক বললেন—আসার তো কথা আছে। তবে ঠিক কখন আসবেন তা ঠিক বলতে পারছি না—এখনি আসতে পারেন, আবার আজকে নাও আসতে পারেন।

সন্দীপ কী বলবে বুঝতে পারলে না। তাহলে কি সে এখানেই ভবতোষ সাহার জন্যে অপেক্ষা করবে, না ঘণ্টাখানেক পরে আবার ঘুরে আসবে!

কিন্তু কতক্ষণ সে অপেক্ষা করবে? তারপর যদি মিস্টার সাহা আজ অফিসে না আসেন। আস্তে আস্তে অফিসের কয়েকজন কর্মী অফিসের ভেতরে ঢুকে যার-যার জায়গায় চলে গিয়ে নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। দু'চারজন মহিলাও এল। দেখে বোঝা গেল ওঁরা সবাই এই অফিসের কর্মী।

সন্দীপ বাইরে গিয়ে দাঁড়ালো। বারান্দা দিয়ে বাইরের রাস্তাটা দেখা যায়। ট্রাম-বাস গাড়ি-ট্যাক্সি হু হু করে ছুটে চলেছে। কেউ কারোর পরোয়া করছে না। এখানে কারো কাছে তোমরা দয়া-মায়া প্রত্যাশা করো না, তা হলে ঠকবে। এখানে এই মস্ত শহরে শুধু আছে প্রয়োজন। প্রয়োজনের তাগিদে আমরা শুধু ছুটছি। পৃথিবীর আমরা শান্তি চাই না, ভালোবাসা চাই না, স্নেহ-প্রীতি-প্রেম কিছুই চাই না। শুধু

চাই প্রয়োজনকে। প্রয়োজনের গরজেই আমরা সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত এই রকম হন্যে হয়ে সব জায়গায় ঘুরে বেড়াই। যদি তোমাদের কিছু দেবার থাকে তো বলো তার জন্যে আমরা তোমার চাটুকারিতা করবো, তোমাকে পুজো করবো. তোমার প্রশংসা করবো. তোমার পা চাটবো। তাই আমাদের সকলের একটা মাত্র মনের কথা—দাও—দাও—আর দাও—

হঠাৎ পেছন দিকে কার পায়ের আওয়াজ হতেই সন্দীপ ফিরে দেখলে গতকালের সেই ভদ্রলোক অফিসে আসছেন। সঙ্গে সঙ্গে সন্দীপ তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে দুই হাত তুলে নমস্কার করলে।

ভদ্রলোক থমকে দাঁড়ালেন। বললেন—হ্যাঁ, নমস্কার—কী চাই আপনার?

সন্দীপ বললে—আপনি আমাকে চিনতে পারছেন না? কালকে আপনার সঙ্গে এই অফিসে দেখা করেছিলুম। আপনার নামই তো ভবতোষ সাহা?

হ্যাঁ. কিন্তু আমি তো ঠিক...

—আমার নাম সন্দীপ লাহিড়ী। আমি আপনার কাছে মিস বিশাখা গাঙ্গুলী সম্বন্ধে জানতে এসেছিলুম। আপনি বললেন যে তিনি হাওড়া স্টেশনে চলে গেছেন! কিন্তু আমি বেড়াপোতাতে গিয়ে তো অন্য কথা শুনলুম। তিনি তো কাল বেড়া-পোতাতে যাননি।

ভবতোষ সাহা বললেন—তিনি কেন বাড়ি যান নি তা আমি কী করে বলবো?

সন্দীপ বললে—ওদিকে বিশাখা বাড়ি না ফেরাতে তার মা খুব কান্নাকাটি করছে। কাল রাত্তিরে কেউ-ই ঘুমোয়নি, কেউ-ই কিছু মুখে দেয়নি। আমি কিছু খাইনি. ঘুমোইনি। তাই ভোরবেলাই ফার্স্ট ট্রেনটা ধরে সোজা কলকাতায় চলে এসেছি আপনার সঙ্গে দেখা করবো বলে। আমি সেই দশটা থেকে অপেক্ষা করছি আপনার জন্যে...

মিস্টার সাহা বললেন—কিন্তু আমি আপনাকে কী সাহায্য করবো বুঝতে পারছি না। মিস গাঙ্গুলীকে খুঁজে বার করে দিতে পারেন একমাত্র পুলিশ। আপনি লালবাজারে পুলিশের থানায় খবর দিয়েছেন?

সন্দীপ বললে—না। আপনাদের এখানেই চাকরির ইন্টারভিউ দিতে এসেছিল বলে আপনাদের অফিসেই প্রথমে এসেছি।

—এখানে এসে কী লাভ? আমরা কি পুলিশ যে সকলের হাঁড়ির খবর রাখবো? আপনি লালবাজারে পুলিশের হেড্-কোয়ার্টারে যান. সেখানে 'মিসিং-স্কোয়াড' ডিপার্টমেণ্টে গিয়ে খবর দিন. তারা ঠিক মিস্ গাঙ্গুলীর খবর দিয়ে দেবে—অন্য মহিলাদের সঙ্গে তাদের গার্জিয়ানরা এসেছিলেন বলে তারা সবাই তাদের সঙ্গে যে-যার বাড়ি চলে গেছেন—

সন্দীপ বললে—আমিও তো এসেছিলুম মিস্ গাঙ্গুলীকে বাড়ি নিয়ে যাবো বলে—

—কিন্তু আপনি যখন এসেছিলেন তার আগে তো ইন্টারভিউ নেওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল। তার আগেই তো মিস্ গাঙ্গুলী চলে গিয়েছিলেন। আপনি আসতে অতো দেরিই বা করেছিলেন কেন? আপনি তো জানেনই যে সুন্দরী মেয়েদের পক্ষে কলকাতা শহর এখন নরক। জানতেন না?

—জানি. কিন্তু আমি শ্যামবাজারে একটা ব্যাঙ্কে চাকরি করি কিনা. তাই সেখান থেকে বেরিয়ে আমার বাস পেতে দেরি হয়ে গিয়েছিল। আমি আসা পর্যন্ত অপেক্ষা না করে তার চলে যাওয়াটাই অন্যায় হয়েছিল। কেন যে চলে গিয়েছিল একলা একলা!

মিস্টার সাহার তখন বোধহয় কাজের সময় হয়ে গিয়েছিল। বললেন—সে আপনাদের ব্যাপার আপনারা বোঝা-পড়া করবেন, আমি কী বলবো? আমি যা বললুম তাই করুন. লালবাজারে পুলিশের হেড্-কোয়ার্টারে গিয়ে 'মিসিং স্কোয়াডে'

খবর দিন—বলে তিনি চলে গেলেন নিজের অফিসে।

এখনও মনে আছে কী অসহনীয় সেই উদ্বেগ. কী যন্ত্রণাদায়ক সেই প্রতীক্ষা! সমস্ত রাত না-ঘুমনো, সমস্ত দিন না-খাওয়া. সমস্ত মনে অবসন্নতার কাতরতা. তার ওপর বিশাখার রহস্যজনক অদর্শন. তাকে যেন উন্মাদ করে দিয়েছিল! তার সে-অশান্তির কথা, সেই উদ্বেগের বিবরণ সংসারে তো কেউ কোনও দিন জানতেও পারবে না. কেউ কোনও দিন অনুভব করতেও পারবে না. কেউ কোনও দিন হয়তো কল্পনাও করতে পারবে না। লালবাজারে পুলিশের 'মিসিং স্কোয়াডে' গিয়েও কি কম সমস্যা। নানা প্রশ্ন, নানা তথ্য. নানা কৌতূহল, নানা অনুযোগ।

—হাইট কতো? অর্থাৎ লম্বায় কত উঁচু?

শুধু নাম দিয়েই রেহাই নেই। তার সঙ্গে এমন আরো অন্য তথ্য দিতে হবে যা সন্দীপের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। শুধু সন্দীপ কেন. বিশাখার মা'র পক্ষেও তা জানা সম্ভব নয়।

—ফোটো আছে?

ফোটো তো আনেনি সে। তার ফোটো সে কোথায় পাবে?

হঠাৎ মনে পড়ে গেল। মনে পড়ে গেল যে বিশাখা যখন 'আইডিয়াল ফুড প্রোডাক্টস' কোম্পানীতে চাকরির দরখাস্ত করেছিল তখন দরখাস্তের সঙ্গে সে তার একটা ফোটোও লাগিয়ে দিয়েছিল। এ-কথা বিশাখা নিজেই সন্দীপকে বলেছিল. মনে আছে!

সঙ্গে-সঙ্গে সন্দীপ বলেছিল—দাঁড়ান. আমি এক ঘণ্টার মধ্যে তার একটা ফোটো এনে দিচ্ছি—

তারপরে সেই লালবাজারে পুলিশের 'হেড্-কোয়ার্টার্স' থেকে আবার সেই 'আইডিয়াল ফুড্ প্রোডাক্টস' কোম্পানির অফিস। আবার সেই ভবতোষ সাহা।

সন্দীপ বললে—মিস্ গাঙ্গুলীর দরখাস্তের সঙ্গে তার একটা ফোটো দিয়েছিল না?

—হ্যাঁ, সকলকেই তো দরখাস্তের সঙ্গে ফোটো পাঠাতে বলা হয়েছিল। তিনিও নিশ্চয় তাঁর ফোটো পাঠিয়েছিলেন।

সন্দীপ বললে—লালবাজার সেই ফোটো একটা চাইছে—খুঁজে দেখুন না আপনাদের ফাইলটা—

তা ফাইল খুঁজে সে-ফোটো পাওয়া গেল শেষ পর্যন্ত।

মিস্টার সাহা বললেন—কাজ হয়ে গেলে ওটা আবার ফিরিয়ে দিয়ে যাবেন কিন্তু—

—হ্যাঁ. নিশ্চয়ই ফিরিয়ে দিয়ে যাবো।

তারপর আবার লালবাজার। সেখানে ফোটোটা জমা দিয়ে তখন সন্দীপের ছুটি।

—কবে আবার খবর নেব?

পুলিশের কর্তা বললেন—আপনার ঠিকানা তো রইলই. আমাদের কাছে কোনো খবর পৌঁছলেই আপনার ঠিকানায় জানিয়ে দেওয়া হবে।

সন্দীপ আবার বাইরের ট্রাম-রাস্তায় এসে দাঁড়ালো। ঘড়িতে তখন বেলা দুটো বেজে দশ মিনিট হয়ে গেছে। এখন তাদের অফিসে ক্যাশ-কাউন্টারও বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বাড়িতে এতক্ষণ কী হচ্ছে কে জানে। মা বোধহয় আজ রান্নাও করেনি। কিন্তু কমলার মা? সে তো খাবে! আর কেউ খাক আর না খাক. কমলার মা খাবেই। সে কেন উপোষ করবে? কার জন্যে উপোষ করবে সে? মাসকাবারি মাইনের সঙ্গে তার সম্পর্ক। খেতে না পেলে সে থাকবে কেন. কাজ করবে কেন?

হাওড়ার দিকে একটা ট্রাম যাচ্ছিল সামনে দিয়ে। সন্দীপ তাতেই উঠে পড়লো। খানিক দূর যাওয়ার পর হঠাৎ তার মনে পড়লো খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিলে

কেমন হয়! ওখানেই তো 'হারানো-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশে'র বিজ্ঞাপন ছাপা হতে দেখেছে সে। সঙ্গে সঙ্গে সন্দীপ চলন্ত ট্রাম থেকে নেমে পড়লো। তারপর উল্টোদিকে একটা বাসে উঠে একেবারে একটা খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন-বিভাগে গিয়ে হাজির।

বিরাট অফিস। সেখানে খোঁজ নিয়ে জানা গেল খুব কম করেও কয়েক লাইন বিজ্ঞাপনের জন্যে খরচ পড়বে একশো পঞ্চাশ টাকার মতোন।

—টাকাটা কি নগদ দিতে হবে?

—নিশ্চয়! এখানে ধারে কোনও কাজ হয় না।

—আমার কাছে এখন তো অতো টাকা নেই।

—তাহলে কালকে এই সময়ে ক্যাশ নিয়ে আসবেন। পাব্লিকের কাছ থেকে আমরা চেক্ বা ড্রাফ্‌ট নিই না।

এরপর বেড়াপোতাতে ফিরে যাওয়া ছাড়া আর কোনও উপায়ই ছিল না। সেখান থেকে আবার সেই বেড়াপোতা। বেড়াপোতাতে পৌঁছতেই সন্ধ্যে উতরে গেল।

মা তো পাগলের মতো রাস্তার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। সন্দীপকে দেখেই জিজ্ঞেস করলে—কী রে, কিছু হদিস পেলি?

সন্দীপ বললে—বিশাখা আসেনি?

মা বললেন—এ কী সব্বোনাশ হলো বল্ তো? পরের মেয়েকে কোথায় ছেড়ে এলি তুই? এখন কী হবে বল্ তো? তুইই তাকে কলকাতা থেকে এখানে এনে তুললি। এখন তো তাকে খুঁজে বার করবার সব দায়িত্ব তোরই—

—মাসিমা কী করছে?

—তোর মাসিমার তো পাগলের অবস্থা। সেই যে কাল থেকে এক ভাবে শুয়ে আছে, তারপর আর কাৎও হয়নি, বসেওনি, ওঠেওনি। দাঁতে একটু কুটো পর্যন্ত কাটেনি। কমলার মা যেমন রোজ আসে, তেমনি আজকেও এসে রান্না করে দিয়ে খাবার নিয়ে চলে গিয়েছে। দিদিকে কতো করে বললুম কিছু মুখে দিতে, কিন্তু কিছুতেই একটা দানা পর্যন্ত মুখে দেয়নি—

—আর তুমি?

—তোর মাসিমা খেলে না, তুই খেলি নে, আর আমি আক্কেলের মাথা খেয়ে পিণ্ডি গিলবো? তা কী খবর বল্?

সন্দীপ বললে—সারা দিন কেবল ঘুরে মরেছি। একবার গিয়েছি সেই অফিসে, তারা বললে সে বাড়ি চলে গেছে। তারপর গেলুম পুলিশের থানায়, সেখানে তার নাম-ধাম-ফোটো দিয়ে এসেছি। তারা যদি খবর পায় তো আমাদের খবরটা জানাবে। আমার নাম-ঠিকানা সব দিয়ে এলুম। শেষকালে গেলুম খবরের কাগজের অফিসে। ভাবলুম বিশাখার সম্বন্ধে একটা বিজ্ঞাপন দেব, যদি কেউ তাকে দেখতে পায় তো খবর দেবে। কিন্তু আমার কাছে টাকা ছিল না। তাই কালকে আবার দেড়শো টাকা নিয়ে সকালবেলাই বেরোতে হবে—

—তা তোর অফিসে যাসনি তুই?

সন্দীপ বললে—অফিসে যাওয়ার সময়টা কখন পাবো যে অফিসে যাবো! সারাদিন তো রাস্তাতে রাস্তাতেই কাটলো।

—খাওয়া?

—খাওয়ার সময় কখন পেলুম যে খাবো? একবার শুধু একজনদের অফিস বন্ধ ছিল বলে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো, তাই ওই সময় কাটাবার জন্যে একটা দোকানে ঢুকে এক কাপ চা আর দু'টো টোস্ট খেয়ে নিয়েছিলুম শুধু।

—তা এখন খাবি তো? তোর ভাত তৈরি।

—আর তুমি?

—আমার কথা ছেড়ে দে। তোর মাসিমা খেলে না, তুই খেলি নে, আমি কোন্ আক্কেলে খাবো?

সন্দীপ বললে—চলো, আমি মাসিমাকে বলছি গিয়ে। এ-রকম না-খেয়ে থাকলে কী করে চলবে? তাতে তো শরীর আরো ভেঙে যাবে। চলো, আমি গিয়ে বলছি মাসিমাকে—

আজও সন্দীপের চোখের সামনে মাসিমার সেই চোখ-মুখের চেহারাটা যেন ছবির মতো ভাসছে। দেখেই মনে হয় মাসিমা কতদিন যেন খায়নি, কতদিন যেন ঘুমোয়নি! কিন্তু শেষকালে সন্দীপ বলেছিল- মাসিমা, আপনি যদি কিছু মুখে না দেন তো আমিও কিছু মুখে দেব না। এই প্রতিজ্ঞা আমি করলুম—

মাসিমা বলেছিল—আমি আর বাঁচতে চাইনে বাবা, আমার গলাটা টিপে তুমি বরং মেরে ফেল আমাকে...তবু আমাকে খেতে বলো না...

সামান্য কয়েকটা কথা কিন্তু সেই সামান্য কথাগুলো বলতেই যেন মাসিমার গলাটা বারবার কান্নায় আটকে যাচ্ছিল।

সংসারে শোক-তাপ-দুঃখ যতো কিছুই থাক, তবু তো সংসার কারো জন্যে থেমে থাকবে না। তুমি বেঁচে থাকো আর মরেই যাও, সে তার দাবী কড়ায়-গন্ডায় আদায় করে নিয়ে তবে তোমায় মুক্তি দেবে। দিন আছে বলে কি বরাবর দিনই থাকবে, রাত হবে না? আর রাত আছে বলে তেমনি বরাবর রাতই থাকবে, ভোর হবে না? তা যদি না হতো তো মানুষ যে অসম্পূর্ণ থেকে যেতো। পৃথিবীতে জন্মে যে-মানুষ দুঃখ পেলে না, সে তো তার সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকে পুরো পাওনাটা আদায় করে নিতে পারলে না, জীবনযাত্রায় তার পাথেয়'র ভাগে যে কম পড়ে গেল!

বড়লোকের রাত যেমন কাটে, গরীবদের রাতও তেমনি একসময়েই কাটে। বড়লোক বা গরীবলোক দেখে দিন-রাতের মাপের কোনও তারতম্য হয় না, এইটেই চিরকালের নিয়ম। তাই সন্দীপের জীবনের সে-রাতটা কাটলো এক-সময়ে। যাবার সময়ে মা'কে বলে গেল—মা আমি যেমন করে মাসিমাকে খাইয়ে গেলুম, তুমিও তেমনি করে মাসিমাকে একটু খাইয়ো। বোল যে আজ না-খেলে আমি খুব রাগ করবো—

তারপর সে যথা-সময়ে হাওড়া স্টেশনে পৌঁছেছে। অন্য যাত্রীদের সঙ্গে সেও প্ল্যাটফর্ম দিয়ে বাইরের রাস্তায় পা বাড়াতেই হঠাৎ দেখা মল্লিক-কাকার সঙ্গে।

—কাকা, আপনি?

মল্লিক-মশাইও অবাক। বললেন—আরে, তুমি? তুমি কোথায় যাচ্ছো? আমি তো তোমার সঙ্গে দেখা করতেই তোমাদের বেড়াপোতাতে যাচ্ছিলুম। এই দেখ না, টিকিট কেটে ফেলেছি—

—কেন? আমার সঙ্গে দেখা করার কী এত দরকার?

মল্লিক-কাকা বললেন—তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে খুঁজে খুঁজে দু'বার তোমার ব্যাঙ্কে গিয়েছি। তোমাকে পাইনি। শেষকালে সেই খিদিরপুরের মনসাতলা লেনে তপেশ গাঙ্গুলী মশাইয়ের বাড়িতেও গিয়েছিলুম। সেখানেও কোনও খবর না পেয়ে শেষকালে এই শরীর নিয়ে আবার বেড়াপোতাতেই যাচ্ছিলুম। যাক্, ভালোই হলো তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—হঠাৎ আমাকে কেন দরকার পড়লো?

—কেন আবার, ঠাকমা-মণির হুকুম—

—কী হুকুম?

মল্লিক-কাকা বললেন—আর বলো কেন, আমার ওপর ঠাকমা-মণির হুকুম হয়েছে

যে সেই বিশাখা মেয়েটার বিয়ে এখনও হয়েছে কিনা জেনে আসতে। আর যদি বিয়ে না হয়ে থাকে তো সে-বিয়ে যেন আট-ন' মাস আটকে রাখা হয়—

—কেন?

মল্লিক-কাকা বললেন—সেই যে সৌম্যবাবুর মেমসাহেব বউ, তাকে নিয়ে মহা হুলুস্থুল হয়েছে। ঘরের ভেতরে দিন-রাত রোজ রোজ দুজনে মারামারি লাঠালাঠি হয়। একদিন তো সৌম্যবাবুর বুকের ওপর চড়ে বসে বউটা সৌম্যবাবুকে গলা টিপে খুন করতে গিয়েছিল!

—কেন?

—কেন আবার? টাকা। মাসে মাসে বিলেতে শাশুড়ীকে দুশো পাউণ্ড করে পাঠানো হচ্ছে না, তাই রোজ খুন করবার হুমকি দিচ্ছে মেম-বউ। এখন একটা ফয়শালা হয়েছে যে কুড়ি হাজার পাউণ্ড খেসারত দিলে বউ সৌম্যবাবুকে ডাইভোর্স দিয়ে দেবে—

কথাটা শুনে সন্দীপ খানিকক্ষণ নির্বাক হয়ে রইল।

মল্লিক-কাকা আবার বললেন তা সেই বিশাখা আর তার মাকে তো তোমাদের বেড়াপোতার বাড়িতে নিয়ে গিয়ে রেখেছ। সেই বিশাখার বিয়ে এখনও হয়নি তো?

সন্দীপ বললে—না—

—তারা কেমন আছে? ভালো আছে তো?

সন্দীপ বললে—সে অনেক কাণ্ড কাকা। সেই বিশাখা গত পরশু থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। তার খোঁজেই আমি এখন যাচ্ছি।

মল্লিক-কাকা শুনে অবাক হয়ে গেলেন। বললেন -বলো কী? কোথায় যাচ্ছো?

সন্দীপ বললে—কাল লালবাজারের পুলিশের থানায় খবর দিয়ে এসেছি, আজ যাচ্ছি খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে—

মল্লিক-কাকা বললেন- তোমার ব্যাঙ্কে তোমাকে না পেয়ে ভাবলুম তোমার অসুখ হয়েছে, তাই বেড়াপোতায় যাবো বলে বেরিয়েছিলুম। তা তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়ে ভালোই হলো। আমি হয়রানির হাত থেকে বাঁচলুম।...তা, তোমাকে তাহলে বলা রইলো যে বিশাখার বিয়েটা যেন তাড়াহুড়ো করে যার-তার সঙ্গে দিয়ে দিও না, বুঝলে?

সন্দীপ বললে—তা তো বুঝলুম, কিন্তু আগে বিশাখার পাত্তাটা তো পাই, তবে তো তার বিয়ে! মেয়ের নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়ার পর থেকে বিশাখার মা-ও খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করেছে। আমার মা-ও তাই। আর আমি অফিস কামাই করে এই চরকির মতো চারদিকে ঘুরপাক খাচ্ছি।

মল্লিক-কাকা বললেন—আর ওদিকে আর একটা ফ্যাচাং হয়েছে—

—কী? আবার কী হলো?

মল্লিক-কাকা বললেন জ্বালা কি আর একটা? মেজবাবু আবার তাঁদের ফ্যাক্টরিটা হায়দ্রাবাদে তুলে নিয়ে যাবেন ঠিক করেছেন!

—হায়দ্রাবাদে? এতদিনের ফ্যাক্টরি, কতো বাঙালীর ছেলে এখানে কাজ পেতো, সেটা এখান থেকে সেই হায়দ্রাবাদে তুলে নিয়ে যাবেন?

মল্লিক-কাকা বললেন—তা আর কী করবেন? বাঙালীরাই তো সব চেয়ে বেশি শত্রুতা আরম্ভ করে দিলে। বাঙালীই তো বাঙালীদের সবচেয়ে বেশি শত্রু—

সন্দীপ বললে—ঠিক আছে, আমি একদিন ফুরসৎ পেলেই আপনার কাছে গিয়ে সব শুনে আসবো—
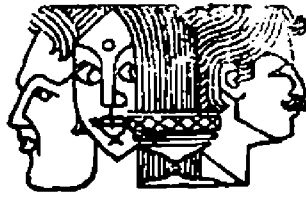
তখন অন্য রকম সময় ছিল। সে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সময়। তখন আমরা সকালে দাওয়ায় বসে তামাক খেতাম, দুপুরবেলা যেতাম কাছারিতে। তারপর সন্ধ্যে-বেলা থেকে তাস পিট্তাম বা দাবার আসরে কাঠের রাজা-মন্ত্রী-গজ নিয়ে হার-জিতের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকতাম। সে সব যুগ বেশ ছিল।

তারপর সেই ফাঁকে কখন যে ইংরেজরা এসে আমাদের কব্জা করে নিয়েছে, তা টের পাইনি। যখন হুঁশ হলো তখন অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। কাঠের তৈরি রাজা-মন্ত্রী-গজের নেশায় আমাদের রক্ত-মাংসের রাজা-মন্ত্রী-গজকে হটিয়ে দিয়ে সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে এসে বিদেশীরা আমাদের রাজা হয়ে বসেছে, তা টের পাওয়ার অবসরই আমরা পাইনি।

তখন থেকে টাকার দাম কমতে লাগলো আর দাম বাড়তে লাগলো সময়ের। তখন গ্রাম ছেড়ে আমরা সবাই শহরে আসতে লাগলুম কাজের আর টাকার আশায়। সাতদিন শহরের কোনও মেস-বাড়িতে কাটিয়ে শনিবার বিকেলের ট্রেনে রওনা হলুম গ্রামের বাড়ির দিকে। সেখানে রবিবারটা সারা দিনই তাস-পাশা-দাবা খেলে, আড্ডা দিয়ে সোমবার ভোর রাত্রে আবার রওনা দিতে লাগলুম শহরের দিকে।

তখন এই রকমই চলছিল আমাদের জীবন। তারপর যখন শহরে নানারকমের কারখানা খুললো, তখন সময় আরো সংক্ষিপ্ত হয়ে গেল। সকাল ছ'টা থেকে একদল কাজ করতে লাগলো দুপুর দু'টো পর্যন্ত। আর একদল কাজ করতে লাগলো দুপুর দু'টো থেকে রাত দশটা পর্যন্ত। আবার আর একদল কাজ করতে লাগলো রাত দশটা থেকে ভোর ছ'টা পর্যন্ত। তার ফলে সময়ের দাম আরো বাড়তে লাগলো, আর দাম কমতে লাগলো টাকার।

তারপর বিশ্ব জুড়ে যুদ্ধ বাধলো একটা। সে এক মহামারী যুদ্ধ। যারা বেকার ছিল তারা চাকরি পেতে লাগলো। তখন আর কারো হাতে বাড়তি সময় নেই। সব সময়টা খরচ হতে লাগলো টাকা উপায়ের জন্যে। ইংরেজ সরকার তখন তাদের কার-খানায় নোট ছাপাতে লাগলো হুড়-হুড় করে, আর সংগে সংগে হুড়-হুড় করে টাকার দামও পড়ে যেতে লাগলো।

এইরকম যখন অবস্থা তখন বিপাকে পড়ে ইংরেজ এ-দেশ ছেড়ে চলে গেল তল্পি-তল্পা গুটিয়ে। আমরা না-জানি রাজ্য চালাতে, আর না-জানি অফিস চালাতে। সারা জীবনভোর তো আমরা ইংরেজদের জেলের ভেতরেই ঘানি টেনেছি! তাহলে দেশ চলবে কী করে? শুধু আমরা নই, ঈজিপ্ট, ইরান, থাইল্যান্ড, কোরিয়া, ভিয়েৎনাম, বর্মা, সীলোন, পাকিস্তান, বাংলাদেশ—সকলের একই অবস্থা।

কিন্তু এই সব দেশ স্বাধীন হয়ে যাওয়াতে মুশকিল হলো ব্যবসাদারদের। সবই ট্যারিফ-বোর্ডের দেওয়াল দিয়ে আমদানি রফতানির রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে। তাহলে আমাদের পেট চলবে কী করে? আমরা যারা স্মাগলার, আমরা যারা চোরা-পথের কারবারি, আমরা যারা লুকিয়ে-লুকিয়ে এদেশ থেকে ওদেশে সোনা পাচারের ব্যবস্থা করে কোটি-কোটি টাকা উপায় করি, তারা?

তখন সারা পৃথিবীর মানুষকে শোষণ করবার এক নতুন রাস্তা আবিষ্কার হয়ে গেল হঠাৎ। সে রাস্তাটার নাম হলো 'কোকেন'।

এই কোকেন প্রথমে আবিষ্কার হয়েছিল ১৮৬০ সালে জার্মানীতে। জার্মানীর 'এ্যালবার্ট নেইল' নামে এক সাহেব এটার প্রথম আবিষ্কর্তা। তা থেকে এল হেরোইন। বারো টন ওজনের আফিম থেকে এক টন হেরোইন তৈরি হয়। সেই এক কিলোগ্রাম হেরোইনের দাম মণিপুর আর বার্মার সীমান্ত প্রদেশে পঁচিশ হাজার টাকা। আর সেই এক কিলো হেরোইন ইম্‌ফলে এলেই তার দাম হয়ে যায় এক লাখ টাকা। নেপালী টাকায় তার দাম প্রায় আড়াই লাখ টাকা।

এ এক অদ্ভুত ব্যবসা। একদিন পশ্চিমের মানুষ পৃথিবীর সব মানুষকে খৃষ্টান করবার ষড়যন্ত্র করেছিল। তাতে তারা পুরোপুরি সফল হয়নি রামমোহন রায় আর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্যে। কিন্তু এবার? এবার কে বাঁচাবে তোমাদের? এই কোকেন, হেরোইন, মারিজুয়ানা, হ্যাশিশ্‌ আর এল্‌-এস-ডি দিয়ে আমরা তোমাদের সবাইকে জয় করবো। দেখি এবার তোমাদের কে বাঁচায়?

এবার পানের মশলার সঙ্গে 'হেরোইন' মিশিয়ে দেব, ফুচ্‌কার সঙ্গে 'হেরোইন' মিশিয়ে দেব, কোল্ডড্রিঙ্কসের সঙ্গে 'হেরোইন' মিশিয়ে দেব, লজেন্স, চকোলেট-এর সঙ্গে 'হেরোইন' মিশিয়ে দেব, চা কফির সঙ্গেও 'হেরোইন' মিশিয়ে দেব। দেখি এবার তোমাদের কে বাঁচায়?

তারপরে সারা পৃথিবীতে বিশেষ করে এই সব উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ব্যাঙের ছাতার মতো সব খাবারের দোকান গজিয়ে উঠলো রাস্তার মোড়ে মোড়ে। দেয়ালের গায়ে গায়ে গজিয়ে উঠলো পানের দোকান। যে একবার সেই পান খাবে তার অন্য কোনও দোকানের পান আর মুখে রুচবে না। যে-পাড়াতেই সে থাকুক, যতো দূরেই সে থাকুক, ঘুরে ফিরে এই দোকানের পান খেতে তাকে এ-পাড়াতেই আসতেই হবে। এতো আকর্ষণ এই দোকানের পানের। কিন্তু কেন?

এই 'কেন'র উত্তর কেউই জানে না। যারা জানে তারা সবাই-ই বাইরে সুসভ্য শিক্ষিত লোক। কেউ তাদের দেখে কিছু সন্দেহ করবে না। বরং প্রণাম করবে, শ্রদ্ধা করবে, প্রশংসা করবে। সন্দীপও কি আগে এতসব জানতো? শুধু সন্দীপ নয়, মল্লিক-মশাই, মুক্তিপদবাবু, সৌম্যপদবাবু, তপেশ গাঙ্গুলী বা ন্যাশনাল ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের করমচাঁদ মালব্যজী, পরেশদা, কলকাতার কেউই জানতো না। তাহলে কে জানতো?

জানতো শুধু এ-পাড়ার হরদয়াল আর ফটিক। তাদের কথা আগেই বলেছি। হরদয়াল শুধু যে গুণ্ডা তা নয়, সে আবার বড় দরের কারবারীও বটে। ফটিকও তাই। তারা যে-পোশাকই পরেই থাকুক না কেন তারা এই কলকাতা শহরেই অগাধ সম্পত্তির মালিক। তাদেরও বউ আছে, ছেলেমেয়ে আছে। ছেলেমেয়েরা স্কুলের বাসে-চড়ে ইংরিজী স্কুলে পড়তে যায়। তারা যে-জিনিসের কারবার করে তা আসে ইন্ডিয়ার বাইরে থেকে। থাইল্যান্ডে, পেশোয়ার, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, মণিপুর, ইম্‌ফল, নেপাল হয়ে তাদের কাছে এসে পৌঁছোয়। সে-সব লাখ-লাখ টাকার কারবার নয়, সে-সব কোটি-কোটি টাকার কারবার বললেও বাড়িয়ে বলা হবে না। যারা সে-সব কারবারের মাথায় থাকে তারা অবশ্য সে-সব টাকার সিংহভাগ ভোগ করে। কিন্তু হরদয়াল আর ফটিকের ভাগেও যা আসে তাও কিছু কম নয়।

তবে তা থেকে কিছু-কিছু একে-ওকে দিয়ে সন্তুষ্ট করতে হয়।

সেদিন সকাল বেলায় হরদয়াল খবরের কাগজটা পড়েই কেমন যেন একটু সামান্য চম্‌কে উঠলো। আরে, এটা কার ছবি? এ-মেয়েটাকে যেন চেনা-চেনা মনে হচ্ছে।

ছবিটার মাথার ওপর বড় বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে 'নিরুদ্দেশ'। আর তারপর নিচেয় যে-মেয়েটার নাম লেখা রয়েছে সে-নামও কখনও শোনেনি সে! মেয়েটার বয়েস, কত হাইট, কী রকম গায়ের রং, তাও লেখা রয়েছে। বিশাখা গাঙ্গুলী মেয়েটার নাম।

হরদয়াল আর দাঁড়ালো না। অন্যদিন তবু একটু গড়িমসি করে।

সঙ্গে সঙ্গে হরদয়াল রাস্তায় গিয়ে একটা ট্যাক্সি ধরে ফেললে।

ট্যাক্সি ড্রাইভার চেনা লোক। অনেকবার হরদয়াল তার ট্যাক্সিতে আগে উঠেছে। বাবু কোথায় কোথায় যায় তাও সে জানে। রাত-বিরেতেও বাবুকে নিয়ে অনেকবার অনেক জায়গায় গিয়েছে।

—কোথায় যাবো বাবু? সোনাগাছিতে?

হরদয়াল রেগে গেল।

বললে—দূর, দিনের বেলা সোনাগাছিতে কেউ যায়? কী বলছিস রে তুই?

—তবে কি কিড্ স্ট্রীটে?

হরদয়াল বললে—না-না, একবার পার্ক স্ট্রীটে চল্, ওখান থেকে হয়ে একবার কলিন্স্ স্ট্রীটে চল্। সেখানে একটা কাজ আছে।

ট্যাক্সি-ড্রাইভার কলিন্স স্ট্রীটেও গেছে অনেকবার। অথচ বাবুর যে টাকা নেই তা তো নয়। ট্যাক্সি-ড্রাইভার গাড়ি চালাতে চালাতেই জিজ্ঞেস করলে—বাবু, আপনি গাড়ি কেনেন না কেন?

—গাড়ি? কী বল্‌ছিস তুই দুলাল? আমার গাড়ি কেনবার পয়সা কোথায় রে? গাড়ি কেনবার পয়সা থাকলে কি আমি তোর ট্যাক্সি চড়ে বেড়াই? আমাকে দেখে কি তোর মনে হয় আমি অনেক টাকার মালিক?

ট্যাক্সি-ড্রাইভার অনেক দিনের পোড়-খাওয়া মানুষ। কলকাতার অনেক বড়লোক-মধ্যবিত্ত আর গরীব লোককে তার ট্যাক্সিতে তুলে নিয়ে গিয়ে তাদের গন্তব্য-স্থানে পৌঁছিয়ে দিয়েছে। অনেক বর-কনেকে বাপের বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে শ্বশুর-বাড়িতে গিয়ে পৌঁছিয়ে দিয়েছে। নিজের জীবনে তার অভিজ্ঞতার যে-সব অভাব ছিল, ট্যাক্সিতে প্যাসেঞ্জার উঠিয়ে নিয়ে চলতে চলতে তার অভিজ্ঞতার পরিধি আরো হাজার গুণ বাড়িয়ে নিয়েছে।

এই হরদয়ালবাবুরই অবস্থা সে একদিন অন্য-রকম দেখেছে। ছেঁড়া চটি, মাথার চুল কাটবার পয়সাই থাকতো না হাতে। ট্যাক্সিতে চড়বার পয়সা দূরের কথা, বিড়িটা পর্যন্ত কেনবার পয়সাও পকেটে থাকতো না। একটা বিড়ি, তাও বার-বার জ্বেলে আর নিভিয়ে নিভিয়ে খেত পয়সা বাঁচাবার জন্যে। সেই হরদয়ালবাবুরই আবার এখন অন্য রকম অবস্থা। তাঁর হাতে সিগারেটের টিন থাকে এখন। কিন্তু এতো টাকা যে কোথা থেকে কী করে তাঁর হাতে এলো, তা সে বুঝতে পারে না। অথচ হরদয়ালবাবু চাকরিও করে না, ব্যবসাও করে না। এই ক'বছরের মধ্যেই তাঁর একটা বাড়ি হয়ে গেল কী করে?

—হরদয়ালবাবু?

হরদয়াল বললে—কী, বল্?

—সেদিন আমাকে যে চকোলেটটা দিয়েছিলেন সেই রকম চকোলেট আর নেই?

হরদয়াল বললে—কেন রে, তোর খেতে খুব ভালো লেগেছে বুঝি?

দুলাল বললে—সেদিন চকোলেটটা খেয়ে একটা অদ্ভুত কাণ্ড হয়ে গেল—

—কী কাণ্ড রে?

দুলাল বললে—ট্যাক্সি চালাতে চালাতে মুখে পুরে দিতেই মনে হলো আমি যেন স্বর্গে চলে গিয়েছি। যখন বাড়িতে পৌঁছিয়েছি তখন বউ বললে—কী হয়েছে গো তোমার আজ? আজকে তোমার মেজাজ এত খুশ্ কেন? খুব টাকা কামিয়েছ বুঝি?

—তারপর?

দুলাল বললে—টাকা কামানো দূরের কথা, সেদিন ট্যাক্সিটা নিয়ে শ্যামবাজারের

মোড়ে শুধু বসেই ছিলুম। একটা সওয়ারিও নিইনি। যে ট্যাক্সিতে চড়তে এসেছে তাকেই তাড়িয়ে দিয়েছি। বলেছি--পেট্রল নেই—

--তারপর?

—তারপর দু'দিন আর বেরোলুম না। সত্যিই মনে হলো যেন ব্যাঙ্কে আমার পনেরো লাখ টাকা আছে। আমি যেন রাজা না মন্ত্রী কী হয়ে গিয়েছি। আমাকে খেটে খেতে হবে না, পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে বসে থাকলেই মাথায় ঝর-ঝর করে টাকা ঝরে পড়বে—

—তারপর?

দুলাল বললে—তারপর দু'দিন আর কাজে বেরোলুম না। বড্ড আরাম করতে ভালো লাগলো।

এটা হরদয়ালের কাছে কিছু নতুন খবর নয়। সে জানে বলেই আজ তার অবস্থা এত ভালো হয়েছে, আজ তার বেনামিতে বাড়ি হয়েছে, বেনামিতে অসংখ্য সম্পত্তি হয়েছে। বাইরের লোক সে-সব না জানলেই হলো, কিন্তু নিজে তো সে তা জানে!

দুলাল বললে—আর একদিন দিন না বাবু সেই চকোলেট—

গাড়ি তখন কলিন্স স্ট্রীটের কাছাকাছি এসে গিয়েছিল। ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দিতে দিতে হরদয়াল বললে—দেব, আর একদিন দেব—

বলে খবরের কাগজটা নিয়ে নেমে গেল। হরদয়ালের অনেক ভাবনা, অনেক কাজ, অনেক সমস্যা, অনেক অশান্তি। এত যখন ভাবনা, অশান্তি, সমস্যা, তখন সেই চকোলেটটা খেলেই হয়। দুলালের মতো একটা চকোলেট খেয়ে নিলেই হয়। আর শুধু চকোলেটই নয়, হ্যাশিশ্ বা স্ম্যাক্ খেয়ে নিলেই হয়। বা ওই রকম ইনজেক্শান। কিন্তু না, ময়রা কখনও তার নিজের তৈরি সন্দেশ কি রসগোল্লা খায়?

তারপর বাড়িটার মধ্যে ঢুকে পড়লো হরদয়াল। এই বাড়িটাই হলো হরদয়ালের আসল সাম্রাজ্য। সেই হলো এই সাম্রাজ্যের সম্রাট। তার কথাতেই তার এখানকার প্রজারা ওঠে বসে। আর নিয়ম করে খাজনা দেয়। প্রজারা খাজনা দেয় বটে, কিন্তু কেউ এখানে বাস করে না। এখানে সবই নগদের কারবার। ফেল কড়ি মাখো তেল—তুমি কি আমার পর? এখানকার বেশির ভাগ খদ্দেররা সবাই স্টুডেন্ট। তাদের মধ্যে ছেলে স্টুডেন্টও আছে আবার মেয়ে স্টুডেন্টও আছে। তারা ট্যাঁকের পয়সা খসিয়ে মাল কেনে আর এখানেই ঘণ্টা কয়েক কাটিয়ে যায়। বিছানা-বালিশ-খাট, খাবার-জলের ব্যবস্থাও নিখুঁত। আবার যারা রাত কাটাতে এখানে আসে তাদের জন্যেও পাকা ব্যবস্থা করে দিয়েছে হরদয়াল।

কিন্তু এ-সব তদ্বির-তদারক করবার জন্যে সকলের মাথায় আছে আন্টি। আন্টি এ্যাংলো-ইন্ডিয়ান মেয়ে বটে, কিন্তু কলকাতায় জন্ম-কর্ম হওয়ায় চোস্ত্ বাংলা বলে।

এ-সব কথা পুলিশ জানে। কারণ পুলিশের নাকের ডগাতেই এ-সব হয়। কিন্তু গাই-বাছুরে ভাব থাকলে গোয়ালা কী করবে? পুলিশ আসে নিয়ম করে আর তোলাও নিয়ে যায় নিয়ম করে। আন্টি সেদিনও দৈনন্দিন কাজের তদ্বির-তদারক করছিল। হঠাৎ হরদয়াল এসে হাজির। হরদয়াল সাধারণতঃ সন্ধ্যের পরই এ-বাড়িতে আসে। আজ সকালে এসেছে দেখে অবাক হয়ে গেছে।

বললে--বাবুজী, আপনি? এত সকালে? হেল্‌থ খারাপ?

হরদয়াল বললে—না, হেলথ্ খারাপ নয়, এই খবরের কাগজটা এনেছি। দেখ—

বলে কাগজটা এগিয়ে দিলে আন্টির দিকে। আন্টি কাগজটা দেখে বললে—আরে এ যে তেরো নম্বর ঘরের আসামী—

হরদয়াল বললে—আমাদের এখানেই তো রয়েছে এই মেয়েটা? এখন কেমন আছে

এই মেয়েটা ? ছবিটা দেখেই তো আমার মনে পড়ে গেল, এ তো চেনা-চেনা মুখ, তাই কাগজটা নিয়ে সকাল-সকাল চলে এলুম—

আণ্টিও ছাপানো ছবিটা অনেকক্ষণ ধরে মন দিয়ে দেখলে। বললে—হ্যাঁ, এ তো ওই তেরো নম্বর ঘরের আসামীর ছবি বলেই মনে হচ্ছে। একই মুখ, একই রকম চোখ—

হরদয়াল বললে—হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হলো। ওকে এখানে কে এনেছিল ? একলাই এসেছিল, নাকি কারো সঙ্গে এসেছিল ?

এ- পাড়ায় অনেকে একলা আসে। অনেকে আবার দল বেঁধেও আসে।

আণ্টি বললে—একজন বাবু ওকে একদিন এখানে নিয়ে এসেছিল—তারপর আর আসেনি—

—বাবু ? বাবু কে ? কোন বাবু ?

আণ্টি বললে—তা তো জানি না। তার নাম তো জিজ্ঞেস করিনি। একটা রাত কাটাবার পর লোকটা ওকে ছেড়ে পালিয়ে গেছে।

—পেমেণ্ট করেছিল ?

—হ্যাঁ, এ্যাড্‌ভান্স পেমেণ্ট করেছিল।

হরদয়াল জিজ্ঞেস করলে—তারপর ?

আণ্টি বললে—তারপর থেকে তো আসামী এখানেই রয়ে গেছে, আর কেউ ওকে নিতেও আসেনি। সমস্ত দিন-রাতই ঘুমোচ্ছে কেবল। মনে হচ্ছে হেলথ্ খুব উইক, বিছানা ছেড়ে একেবারে উঠতেই পারছে না। কেবল ঘুমোচ্ছে। বোধহয় ডোজ বেশি হয়ে গিয়েছে—

—খায়নি কিছু ?

আণ্টি বললে—জাগলে তো উঠবে। আমি যখনই এসেছি, তখনই দেখি ঘুমোচ্ছে। ওকে নিয়ে কী করি বুঝতে পারছি না। খায়ও না, দায়ও না, জাগেও না—

হরদয়াল বললে—চলো, মেয়েটাকে একবার দেখে আসি—

আণ্টির ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দা। ভাঙা-চোরা বাড়ি। দেওয়ালে চুন-বালি খসে যাচ্ছে। জানালা-দরজায় রং মুছে গিয়ে কাঠের রং বেরিয়ে পড়েছে। ইঁটের ফাটলে আগাছা গজিয়েছে, দেওয়ালের মাঝে-মাঝে গর্ত। তাতে পায়রারা বাসা বানিয়েছে। সেকালের বাড়ি হলে যা হয়...

আণ্টির সঙ্গে সঙ্গে হরদয়ালও চলতে লাগলো তেরো নম্বর ঘরের দিকে। বললে—চলো চলো, দেখি গিয়ে কী ব্যাপার ?
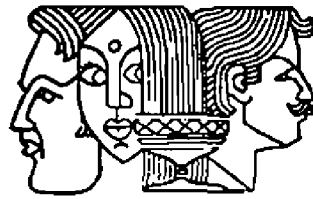
ন্যাশনাল ইউনিয়ন ব্যাঙ্কে তখন কাজের পাহাড় জমা হয়েছে। ইয়ার-ক্লোজিং-এর আগে বরাবরই এই রকম হয়। তখন ওভার-টাইমের মওকা আসে সকলের। ওভার-টাইম মানেই টাকা। যে-লোক সারা বছর কাজে ঢিলে দেয়, এই ইয়ার-ক্লোজিং-এর সময়ে সে হঠাৎ সজাগ হয়ে ওঠে। কিন্তু আশ্চর্য কাণ্ড দেবীপ লাহিড়ীর। এই সময়েই কি না সে কাজে কামাই করলে ? মাঝখানে মায়ের অসুখের বাহানা দিয়ে শুধু চিঠি

দিয়েছিল যে সেই অসুখের জন্যে ক'দিন সে অফিসে আসতে পারছে না।

ইয়ার-ক্লোজিং কেটে গেল আর ঠিক তারপরেই অফিসে এসে হাজির হলো সন্দীপ।

কিন্তু তার চেহারা দেখে সবাই অবাক। এ কী চেহারা হয়েছে তার? পরেশদা বললে—কী হে সন্দীপ, কী হয়েছিল? এ-রকম চেহারা হলো কেন তোমার?

সন্দীপ আর কী বলবে। কী হয়েছিল তার তা তো সে চিঠিতেই লিখে জানিয়েছিল। পরেশদা বললে—এখন মা ভালো আছে তো?

সন্দীপের কাছে তার মা আর মাসিমা কি আলাদা? তাই বললে—না, এখন অবস্থা আরো খারাপ। ডাক্তার দেখাচ্ছি, তিনি বলছেন আরো অনেকদিন চিকিৎসা চালিয়ে যেতে হবে!

যাদব ভট্টাচার্যি বললে—তাহলে তো তোমার খুবই অসুবিধে হচ্ছে হে। বাড়িতে রান্নাবান্না করা, তার সঙ্গে আবার রোগীর সেবা-যত্ন, ডাক্তার-ওষুধের খরচা-পাতি, সবই তো তোমার ঘাড়ে পড়েছে—

খগেন বললে—সেই জন্যেই তোমায় অতো করে বলেছিলুম একটা বিয়ে করো। বউ থাকলে তবু এই বিপদের সময়ে তোমার মাকে অন্ততঃ সেবা-যত্নটা করতে পারতো—

সন্দীপ বললে—বিয়ে না করে একজন ঝি রাখলেও তো সে-কাজ হয়।

খগেন বললে—বউ আর ঝি কি এক হলো? ঝি রাখলে তো তাকে মাইনে দিতে হবে। বউ থাকলে মাইনে দিতে হবে না। বিনে মাইনের ঝি হয়ে যাবে।

কথাগুলো কোনও দিনই সন্দীপের ভালো লাগে না। তাই ও ব্যাপারে আর কোনও কথা না বলে নিজের কাজের মধ্যে ডুবে যাবার চেষ্টা করতে লাগলো। কিন্তু বাড়ির কথা কি মন থেকে অতো সহজে মুছে ফেলা যায়? তার যে সমস্যা তা অন্য কেউ কি বুঝবে? পরের মেয়ে বিশাখা। তার সঙ্গে রক্তের সম্পর্কও নেই। তার বিপদ যে তার নিজেরই বিপদ, এ-কথা বললে কে বিশ্বাস করবে?

মনে আছে সন্দীপ সেদিন বাড়ি গিয়ে মা'কে আড়ালে ডেকে বলেছিল—জানো মা, আজ হাওড়া স্টেশনে মল্লিক-কাকার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তিনি আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে এই বেড়াপোতাতেই আসছিলেন। হঠাৎ হাওড়া স্টেশনে দেখা হয়ে যেতে ওখানেই কথা হয়ে গেল।

—কেন রে? কী ব্যাপার?

—আমাকে বলতে আসছিলেন যে বিশাখার যদি এখনও বিয়ে না হয়ে গিয়ে থাকে তো বিয়েটা যেন কয়েক মাসের জন্যে আটকে দেওয়া হয়।

মা তো অবাক। বললে—কেন রে? হঠাৎ এতদিন পরে আবার কী হলো? আবার কি তারা তাদের নাতির সঙ্গে এই মেয়ের বিয়ে দিতে চায় নাকি?

সন্দীপ বললে—তাই-ই তো বললেন মল্লিক-কাকা! আগেকার সেই মেম-সাহেব বউ-এর সঙ্গে নাকি তাদের নাতির বিয়ে ভেঙে যাচ্ছে।

কথাটা শুনে মা'র খুব আনন্দ হলো। বললে—সে না-হয় হলো কিন্তু এদিকে বিশাখা কোথায় রইলো তার কিছু সন্ধান পেলি?

সন্দীপ বললে—আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না কোথায় গিয়ে সে রইল। এখন ভাবছি কেন ওদের এখানে নিয়ে এসেছিলুম। পরের ঝামেলা নিজের কাঁধে নেওয়ার এই দেয়। নইলে আমারও এত ঘোরাঘুরি করতে হতো না, তোমারও এত ভোগান্তি হতো না।

মা বললে—আমার কথা ছেড়ে দে। আমার কষ্ট করা অভ্যেস আছে, আমি মরলে তবে আমার কপালে শান্তি হবে। কিন্তু তোর ভোগান্তি দেখেই আমার কষ্ট হচ্ছে—অফিস কামাই করে আর কতোদিন কতোদিকে ঘুরবি এমন করে?

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—আর মাসিমা? মাসিমা কেমন আছে?

মা বললে—ও-ও সেই একই রকম। মুখের কথা তো ক'দিন থেকেই বন্ধ, এখন আর খেতেও চাইছে না। আমি জোর করে আজ খাইয়েছি। কিন্তু খেতে গেলেই বমি করে ফেলছে। কিচ্ছু পেটে যাচ্ছে না। ভগবানের যে কী ইচ্ছে কে জানে।

তারপর একটু থেমে জিজ্ঞেস করলে—কাল আপিসে যাবি তো? অনেকদিন তো আপিসে যাস্‌নি! তোর চাকরিটার ওপরেই এতগুলো লোকের ভরসা। সেদিকটাও তুই ভাব—

সন্দীপ বলেছিল—হ্যাঁ, কাল যাবো—আর ভেবে কী করবো, যা হবার তা হবেই।

অফিসে এলে কী হবে। তার শরীরটাই শুধু অফিসে এসেছে, মনটা তো রয়ে গেছে বিশাখার কাছে। কোথায় যে সে গেল। অন্যদিন অফিসে আসার পর অন্যদের সঙ্গে কতো কথা হয়, অন্যদের কতো কথা কানে আসে। আজ আর কোনও শব্দ কোনও আলো তার মনের ভিতরে ঢুকছে না। ছুটির সময় যন্ত্রের মতো সকলের সঙ্গে সেও রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো। অফিসে আসার পথে লালবাজারে পুলিশের হেড্‌-কোয়ার্টারে গিয়ে আবার একবার খোঁজ নিয়েছিল। কিছু খবর কি পেয়েছেন স্যার?

পুলিশ বললে—না, খবর পেলে আপনাকে জানানো হবে—

ওই একই বাঁধা জবাব প্রতিদিন। অফিস থেকে বাড়ি যাওয়ার পথে আবার সেখানে গিয়ে সেই একই প্রশ্ন—কিছু খবর কি পেয়েছেন স্যার?

পুলিশেরও সেই একই জবাব—না, খবর পেলে আপনাকে জানানো হবে—

রোজই এই এক প্রশ্ন আর একই জবাবের পুনরাবৃত্তি। মাসিমার শরীর দিন-দিন ভাঙছে। সেদিন বাড়ি যেতেই মা বললে—ওরে, তোর মাসিমাকে আর এ-রকম ভাবে ফেলে রাখতে বড্ড ভয় করছে রে। একজন ডাক্তারকে দেখালে ভালো হয়, আমি ভালো বুঝছি নে—

মা-মেয়ের দায়িত্ব সন্দীপ যেদিন নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিল, এ-সব ঝামেলার দায়িত্বগুলোও অলিখিতভাবে নিজের কাঁধে তুলে নেওয়ার কথাও সে স্বীকার করে নিয়েছিল। এখন এর দায় সে এড়াবে কোন অজুহাতে?

বেড়াপোতা গ্রামে অবশ্য একজন ডাক্তার আছেন। কিন্তু কখনও তাঁকে ডাকবার প্রয়োজন হয়নি...বা তাঁর পরামর্শ নেওয়ার প্রয়োজনও কখনও অনিবার্য হয়নি।

এবার প্রয়োজন হলো। সব শুনে-টুনে ডাক্তারবাবু একটা প্রেসক্রিপশন লিখে দিলেন। সেইটে দেখিয়ে তাঁর ডাক্তারখানা থেকেই মিক্‌শ্চার এনে খাওয়ানো হলো।

মাসিমা একে তার মেয়ের শোকে অস্থির, তার ওপর আবার নিজের অসুখের চিকিৎসার দায় এদের ঘাড়ে চাপিয়ে সকলকে বিব্রত করায় লজ্জিত।

বললে—আমি আর ওষুধ খাবো না দিদি, আর আমাকে ওষুধ খেতে বলো না—

সন্দীপ বললে—আপনার জন্যে তো আমি কিছুই করতে পারছি না, এটুকু অন্ততঃ আমাকে করতে দিন। আমার নিজের মাসিমা থাকলে তো তাঁর জন্যে করতেই হতো। আপনি কি আমার নিজের মাসিমার চেয়ে কিছু কম?

এ-কথার পর মাসিমার আপত্তি আর টিকলো না। সন্দীপ অফিস যাওয়ার পর মাসিমা একদিন বললে—ছেলে ছিল না বলে আমার বড় দুঃখ ছিল দিদি, কিন্তু সন্দীপ আমার সে-সাধ মিটিয়েছে—

শনিবার দিন সকাল-সকাল ব্যাংক ছুটি হয়ে যায়। সেদিন লালবাজার থেকে বেরিয়েই সন্দীপ হাওড়া স্টেশনে না গিয়ে সোজা বিডন স্ট্রীটের বাড়িতে গিয়ে ঢুকলো। গিরিধারীর সঙ্গে গেটের সামনেই দেখা হয়ে গেল। সন্দীপকে দেখে গিরিধারী আগেকার মতোই সেলাম করলে। বললে—রাম রাম বাবুজী!

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—তুমি ভালো আছো গিরিধারী?

গিরিধারী বললে—অনেক দিন বাবুজীকে দেখিনি।

সন্দীপ বললে—এখন তো কলকাতায় থাকি না। দেশ থেকেই যাতায়াত করি। তোমার দেশের খবর ভালো?

—ভালো বাবুজী। রামজীর কিরপায় সব ভালো। লেকিন্ এ-বাড়ির খবর ভালো নয় বাবুজী। আপনি চলে যাবার পর সব-কুছ গড়বড় হো গয়া—

—কেন বলো তো?

—হ্যাঁ হুজুর। শুনেছি আমাদের নোকরি ভি থাকবে না।

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—সে কি?

—হ্যাঁ বাবুজী। বিধু আর ফটিকের নোকরি চলে গেছে। ফ্যাক্টরি বন্ধ আছে বহুত্ রোজ। আমদানি বন্ধ হয়ে গেছে। ম্যানেজারবাবু সব জানেন—

—ম্যানেজারবাবু ভেতরে আছেন?

সত্যিই মল্লিক-মশাই ছিলেন তখন। সন্দীপকে দেখে মল্লিক-মশাই তক্তাপোশের ওপর উঠে বসলেন। বললেন—এসো, এসো—

তারপরে বললেন—কী হলো, তার খোঁজ পেয়েছ?

সন্দীপ বললে—রোজই তো থানায় যাচ্ছি। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনও দিয়েছি। কী যে হলো বুঝতে পারছি না। ওদিকে বিশাখার শোকে তার মা'রও খুব অসুখ হয়েছিল। তার পেছনেও ডাক্তার-বদ্যি করতে হচ্ছে। দায়িত্ব যখন কাঁধে নিয়েছি, তখন তো আর পিছিয়ে এলে চলবে না। এখন এখানকার কী খবর বলুন? আপনি সেদিন বলছিলেন না যে সৌম্যবাবু মেমসাহেব বউকে ডিভোর্স করে দেবে!

মল্লিক-কাকা বললেন—এখন সেই সব কাণ্ডই তো চলেছে এ-বাড়িতে! যেমন সেই সৌম্যবাবুর বিলেত থেকে বিয়ে করে আসার পর হৈ-চৈ হয়েছিল, এখন আবার সেই রকম হৈ-চৈ শুরু হয়েছে। সেই মেম-বউ এখন এ-বাড়িতে তুমুল কাণ্ড বাধাচ্ছে—

—সে কী? কেন?

—কেন আবার? টাকা! টাকার জন্যে! একটা ওঁচা মেমকে বিয়ে করে আনলে এমন কাণ্ড হবে না? ওদের দেশে কি ভালো মেম নেই? অঢেল আছে। সে-সব ভালো মেমরা সৌম্যবাবুকে বিয়ে করবে কেন?

হঠাৎ গেটের দিক থেকে একটা গাড়ি থামার আওয়াজ হলো।

মল্লিক-মশাই তটস্থ হয়ে উঠলেন। এ আওয়াজ তাঁর চেনা। বললেন—ওই আবার মেজবাবু এসেছেন। এখুনি আবার আমার ডাক পড়বে।

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে- কেন?

—আজকাল রোজ-রোজই আসছেন মেজবাবু—

সন্দীপ আবার জিজ্ঞেস করলে—কেন?

মল্লিক-কাকা বললেন- আর বলো কেন? বাড়িতে এখন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ চলছে—সৌম্যবাবুকে খুব চেপে ধরেছে মেম-বউটা—

—কেন চেপে ধরেছে? কীসের জন্যে?

—কেন আবার? টাকার জন্যে! বলছে কুড়ি হাজার পাউণ্ড দিলে মেমটা ওকে ডাইভোর্স করবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে লণ্ডনে ফিরে যাওয়ার ভাড়াও দিতে হবে—

হঠাৎ ওপর থেকে ডাক এল—মেজবাবু ডেকেছেন, ওপরে আসুন সরকারবাবু—

মল্লিক-কাকা লাফিয়ে উঠলেন। বললেন—ওই তলব হয়েছে—যাই।

সন্দীপ বললে—তাহলে আমিও যাই—

—কিন্তু আমার কথাটা খেয়াল রেখো। বিশাখার বিয়েটা কয়েক মাস ঠেকিয়ে রেখে

দিও। বলা তো যায় না। হয়তো শেষ পর্যন্ত সেই তোমার বিশাখার সঙ্গেই সৌম্য-বাবুর বিয়েটা হবে।

সন্দীপ বললে—আর সেই যে কোন্ চ্যাটার্জিদের মেয়ের সঙ্গে সৌম্যবাবুর বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছিল। সেই পাত্রী?

মল্লিক-কাকা বললেন—আরে সে-পাত্রী কি আর এতদিন পড়ে থাকে? তার অন্য এক পাত্রের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেছে—বলেই তাড়াতাড়ি চলে গেলেন। যাবার আগে বললেন—আমার কথাটা যেন মনে থাকে, বুঝলে?

সন্দীপও আস্তে আস্তে রাস্তার দিকে পা বাড়ালো। তার মাথার ভেতরে সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে গেল। যখন বিশাখা ছিল তখন যদি খবরটা পাওয়া যেত তো মাসিমা শুনলে কতো খুশী হতো। তাহলে মাসিমার আর এতো দুর্ভোগ হতো না। বিশাখাও আর চাকরি করবার জন্যে এমন করে ক্ষেপে উঠতো না। আর তার ফলে এমন করে নিরুদ্দেশও হয়ে যেত না সে।

বহুদিন আগে, অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীতে, যখন পাশ্চাত্য দেশে যন্ত্রযুগ শুরু হলো, তখন মানুষের প্রধান হাতিয়ার হলো যন্ত্র। সেই যন্ত্র দিয়ে শুরু হলো যন্ত্রহীন পরের দেশগুলোকে আক্রমণ। তাতে সেখানকার মানুষদের পদানত করতে কিছু কষ্ট হলো না।

কিন্তু কতোদিন তারা পদানত থাকবে? একদিন তারা জানতে পেরে গেল যে পরের ক্রীতদাস হয়েই এতদিন জীবন কাটাচ্ছে তারা। সুতরাং শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করো। তাদের দেশ থেকে উচ্ছেদ করো। শত্রুদের দেশ থেকে যে সব খৃষ্টান মিশনারিরা এসেছিল তারা তখন চালাও দানছত্র খুলেছে। কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য সকলকে খৃষ্টান করা। তখন সবাই ক্ষেপে গিয়ে খুন-খারাপি শুরু করে দিলে। দেশ থেকে আক্রমণকারী বহিরাগতরা পালিয়ে বাঁচলো।

যখন কোনও দিক থেকে আর কোনও সুরাহা হলো না, তখন গরীব দেশগুলোকে টাকা ধার দেওয়া শুরু করলে। দেদার টাকা। যতো টাকা ইচ্ছে তোমরা চাও, নাও। এখনই সে-ধার তোমাদের শোধ দিতে হবে, তা নয়। পরে শোধ দিও। কুড়ি-পঁচিশ বছর পরে শোধ দিলেও ক্ষতি নেই। তখন সুদ দিও। আসল টাকা শোধ না দিলেও চলবে। এ যেন সেই আগেকার আমলের কাবুলিওয়ালাদের মতো ব্যবহার।

তারপরে হলো কি দেশের জিনিসপত্রের দাম বেড়ে গিয়ে আকাশ ছোঁয়ার চেষ্টা করতে লাগলো। তবু বাইরে থেকে ধার দেবার জন্যে ঝুলোঝুলি। তারা বলতে লাগলো—ওগো ধার নাও তোমরা, ধার নিয়ে তোমাদের দেশের লোকজনদের বাঁচাও।

তাতেও যখন কাজ হলো না, তখন অন্য পথ ধরলে তারা। কোথা থেকে আর এক নতুন জিনিস রপ্তানি করতে লাগলো তারা। সত্যিই সে এক নতুন জিনিস। আগে আফিং ছিল, কোকেন ছিল। কিন্তু এবার যে সব জিনিস রপ্তানি করলে তারা তাদের পানের মশলায়, চকোলেটের প্যাকেটে আর আরো কতো কিছুতে। এবার যার তোমরা নাম এখনও জানা যায়নি। সেই সব বিষ মিশিয়ে দেওয়া হলো চায়ের কৌটোতে। কী করে বাঁচো। দেখি তোমরা কী করে মাথা উঁচু করে দাঁড়াও। এবার আমাদের অপমান করে তাড়িয়ে দেবার প্রতিশোধ নেব, এবার আমাদের সর্বনাশ দিয়ে বেইজ্জৎ করবার বদলা নেব। এবার তোমাদের দেশের লোকদের দিয়েই আমরা তোমাদের জব্দ করবো। তাই আমরা আমাদের মালের দালাল রেখেছি তোমাদের দেশের শহরে শহরে। তারাই তোমাদের জাতের মেরুদণ্ড ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবে। তারাই হলো ভবতোষ সাহা, গোপাল হাজরা, হরদয়াল, ফটিক, বাচ্চু, কনস্টেবল, আন্টি মেমসাহেব।

সেদিনও সন্দীপ নিয়মমতো ব্যাঙ্কে এসেছে ঘড়ির কাঁটার সময় মিলিয়ে। এসে

তার নিজের কাজে মন দিয়েছে। সবাই-ই নিয়ম করে ব্যাঙ্কে আসে। শুধু খগেন সরকারের তখনও দেখা নেই। ব্যাঙ্কের কাজে একজনের সঙ্গে অন্যের কাজের যোগ-সূত্র থাকে বলে একজনের অনুপস্থিতি সকলের নজরে পড়ে, সকলে অনুভব করতে পারে। যখন শেষ পর্যন্ত খগেন এলো তখন সকলের অর্ধেক কাজ এগিয়ে গিয়েছে। খগেনকে দেখে সবাই আগ্রহী হয়ে উঠেছে।

—কী হে, এতো দেরি কেন?

ব্যাঙ্কের যে-কেউই একটু দেরি করে আসে তাকে সহকর্মীদের কাছে কিছু-না-কিছু কৈফিয়ৎ দিতেই হয়। কেউ বলে—ট্রেন লেট্। কেউ বা বলে রাস্তায় ট্র্যাফিক্ জ্যাম। অজুহাতের অভাব হয় না কখনও তাদের।

কিন্তু সেদিন খগেন সরকার যে-অজুহাত দিলে তা শুনে সন্দীপ চম্‌কে উঠলো।

খগেন সরকার বললে আমাদের বাসটা ঠিক সময়েই আসছিল, কিন্তু হঠাৎ একটা জায়গায় এসে থেমে গেল। সেখান থেকে আর সে নড়তে চায় না। সবারই তখন ঠিক সময়ে যথাস্থানে পৌঁছোবার তাড়া। সবাই চেঁচিয়ে উঠলো—বাস চলে না কেন? ও ড্রাইভার, কী হলো বাসের? চালাও না, অফিসের দেরি হয়ে যাচ্ছে যে—

কিন্তু বাস নড়বে কী করে? রাস্তার ওপর হাজার হাজার লোকের ভিড়। বাসের সামনে আরো অনেক ট্রাম-ট্যাক্সি-গাড়ি-বাসের অনড় জটলা। তারা না নড়লে বাস সামনের দিকে যাবে কী করে? অন্য রাস্তা দিয়ে ঘুরে যে গন্তব্যস্থলে যাবে তারও উপায় নেই। পেছনেও সব কিছুই অনড়। ভিড় দেখলেই ভিড় জমে। সেই ভিড় জমতে জমতে তখন মানুষের ভিড়ের পাহাড় হয়ে উঠেছে।

– তারপর?

কিন্তু কলকাতার লোকদের কাছে এ-ঘটনা নতুন কিছু নয়। যেদিন থেকে দেশ ভাগ হয়েছে, সেই দিন থেকেই কলকাতা শহরের নিত্য-নৈমিত্তিক চেহারা এটা।

আসল কথা কিন্তু তা নয়। আসল কথাটা হলো একটা মেয়ে।

- মেয়ে মানে?

খগেন বললে—বাস থেকে নেমে অনেক কষ্টে ভেতরে ঢুকে দেখি একটা মেয়ে...

—মেয়ে?

খগেন সরকার বললে—হ্যাঁ, একটা আঠারো-কুড়ি বছর বয়সের মেয়ে—

সন্দীপের কানে শব্দটা যেতেই সে সোজা হয়ে উঠলো। জিজ্ঞেস করলে—আঠারো কুড়ি বছর বয়সের মেয়ে?

খগেন সরকার বললে—হ্যাঁ—গোলাপী রং-এর শাড়ি গায়ে জড়ানো—

—গোলাপী রং-এর শাড়ি? ফর্সা গায়ের রং?

খগেন সরকার বললে—হ্যাঁ, খুব ফর্সা রং—

—তারপর? তারপর কী হলো?

খগেন সরকার বলতে লাগলো—দেখলাম মেয়েটা অজ্ঞান হয়ে রাস্তায় শুয়ে পড়ে আছে। দেখে মনে হয় মেয়েটা মরে পড়ে আছে। প্রথমে লোকেরা তাই-ই ভেবেছিল। কিন্তু দেখা গেল, না তা নয়। তখনও প্রাণ আছে মেয়েটার ধড়ে। বুকটা আস্তে আস্তে ধুক-ধুক করছে—

সন্দীপ বললে তারপর?

—তারপর আর কী? পুলিশ এসে সব লোকেদের হটিয়ে দিয়ে রাস্তা ক্লীয়ার করে দিলে। আমরাও যে-যার ট্রামে-বাসে উঠে পড়লুম। উঠে পড়ে অফিসে চলে এলুম—

—তারপর? তারপর মেয়েটার কী হলো? মেয়েটা রাস্তার ওপরেই পড়ে রইল?

খগেন সরকার বললে—মেয়েটার কী হলো তা আর জানতে পারলুম কই? আমরা

সেপাইটা সন্দীপকে দেখে বললে—ক্যা ?

সন্দীপ তাকেও সেই একই কথা জিজ্ঞেস করলে—এখানে কোনও মেয়ে পড়েছিল রাস্তায় ? এই ঘণ্টা দুয়েক আগে ?

সেপাইটা তার নিজের কাজে তখন খুবই ব্যস্ত। চারদিক থেকে তখন বাস, ঠেলাগাড়ি, ট্রাম, রিক্সা, মানুষ, সাইকেল, ট্রাক, স্কুটার সব কিছুর চলাচল নিয়ন্ত্রণ করতে বিব্রত। সন্দীপ আর একবার তার প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিলে তার দিকে।

সেপাইটা এবার একটু ফুরসৎ পেয়ে বললে—হ্যাঁ বাবুজী, একটা আওরৎ বেচৈন্ হয়ে রাস্তার মধ্যেখানে পড়েছিল অনেকক্ষণ, তখন অফিস-টাইম, তারপর পুলিশের গাড়িতে তাকে তুলে থানায় ধরে নিয়ে গেছে—

—কোন্ থানায় ?

ট্র্যাফিক পুলিশ অতো-শতো জানে না। তখন তার ডিউটি ছিল না। আগে যে ডিউটিতে ছিল সে জানতে পারে।

সেপাইটা আবার তার ট্র্যাফিক সামলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো।

সন্দীপ আবার জিজ্ঞেস করলে—কোন্ থানায় খবর নেব সেপাইজী ? কোথাকার কোন্ থানার গাড়ি তাকে তুলে নিয়ে গেল ? মেহেরবানি করে একটু বলে দাও না সেপাইজী –

সেপাইজী তার নিজের ডিউটি করবে না আজে-বাজে কথার জবাব দেবে।

পৃথিবীতে এক পাগল ছাড়া আর কারো সময় নেই। সবাই হয় ব্যস্ত ডিউটি করতে, আর না হয় টাকা কামাতে। হঠাৎ তখন একটা ভারি ট্রাক হুড়মুড় করে রাস্তার মধ্যে বেআইনী ভাবে ঢুকে পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে টনক নড়ে গেছে সেপাইটার। সে হাত বাড়িয়ে ট্রাকটার গতি অবরোধ করতে যাচ্ছিল কিন্তু ট্রাকটা তাকে ভয় করবে কেন অতো সহজে! অগত্যা সেই চলন্ত ট্রাকটার পাদানিতেই লাফিয়ে উঠে পড়লো সেপাইটা। যতদূর দেখা যায় ততদূর দৃষ্টি দিয়ে সন্দীপ দেখলে চলন্ত ট্রাকটা কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে বাঁদিকের একটা পানের দোকানের সামনে গিয়ে থেমে গেল। আর ট্র্যাফিক পুলিশটা কিছু যেন হাতে নিয়ে পকেটে পুরলো, তারপর পুলিশটা পাদানি থেকে নেমে আবার তার ডিউটির জয়গার দিকে হেঁটে হেঁটে এগিয়ে আসতে লাগলো। তার মুখে তখন আর কোনও বিরক্তির ছাপ নেই, তখন মহাখুশী সে। পকেট থেকে খইনি বার করে বাঁ হাতের পাতায় ডান হাত দিয়ে ঘষতে ঘষতে মুখে পুরে দিলে।

আর তারপর এক মহা প্রশান্তি। সন্দীপের নজর পড়লো চায়ের দোকানের ঘড়িটার দিকে। ঘড়িটা দেখেই সে চমকে উঠলো. তিনটে বাজতে দশ! সর্বনাশ, আর দশ মিনিটের মধ্যে কি সে পৌঁছোতে পারবে তাদের ব্যাঙ্কে!
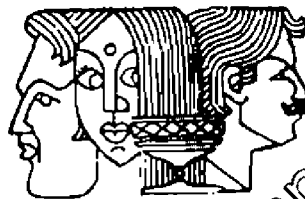
এর পরে যে-ঘটনাটা ঘটলো তাও ঠিক ওই সময়েই। ওই দিনই ভোর রাতের দিকে।

মিস্টার বরদারাজন গুরুস্বামী ইনকাম-ট্যাক্স অফিসার। তিনি থাকেন সেন্ট্রাল এ্যাভিনিউ-এর একটি ফ্ল্যাটে। তিনি রোজ ভোর রাত্রে ঠিক চারটের সময়ে ঘুম থেকে

ওঠেন। তখন ও'র প্রাতঃভ্রমণের সময়। তিনি সেণ্ট্রাল এ্যাভিনিউ থেকে বেরিয়ে বিডন স্ট্রীট ধরে কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে পড়েন। তারপরে কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট-এর ট্রাম লাইন পেরিয়ে একেবারে পড়েন কর্নওয়ালিশ স্কোয়ারে।

এ তাঁর বহুকালের অভ্যেস। সারাদিন মাথার মধ্যে হিসেবের পোকাগুলো গিজ্-গিজ্ করে। সেই পোকাগুলোকে মারবার জন্যে কিছু অক্সিজেনের দরকার। আর ভোর রাত ছাড়া কলকাতার আর কোথায় অক্সিজেন! সারাদিনই তো শুধু কার্বন-ড্রাই-অক্সাইড আর নাইট্রোজেন। বাস-গাড়ি কয়লার উনুনের ধোঁয়া আর ডিজেলের গ্যাস নাকে-মুখে ঢুকে শরীরটাকে ঝাঁঝরা করে দেয়।

সেই বিষ থেকে একটু মুক্তি পাওয়ার জন্যে মিস্টার গুরুস্বামীর এই প্রাতঃভ্রমণ।

কর্নওয়ালিশ স্কোয়ারের ভেতরে বিরাট পুকুর। পুকুরের চারদিক দিয়ে রাস্তা সেই পুকুরটাকে দশ-বারোবার পাক দিয়ে বেড়ানো তার বহুদিনের অভ্যেস।

কিন্তু সেদিন হঠাৎ একটা কাণ্ড ঘটলো।

কাণ্ড না বলে সেটাকে দুর্ঘটনা বলাই ভালো। তিনি তাঁর ইষ্ট-মন্ত্র জপ করতে করতেই চলেছেন। মনটাও তখন ইহজগৎ অতিক্রম করে ঊর্ধ্বে বিচরণ করছে। তাই রাস্তার দিকে তাঁর নজর অতো নিবদ্ধ ছিল না।

হঠাৎ তাঁর সামনে যেন একটা জীবন্ত সাপকে দেখতে পেয়ে তিনি পিছিয়ে এলেন।

—কী ওটা? ওটা কী?

তারপর ভালো করে নজর দিয়ে দেখতেই তিনি চম্‌কে উঠলেন। এ তো একটা মানুষ। একটা মানুষ পড়ে আছে তাঁর রাস্তার ওপর।

তখন চারিদিকে খুব শীত। পাড়ার লোকজন সব লেপ-কম্বল চাপা দিয়ে ঘুমে অচৈতন্য, অজ্ঞান।

কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট থেকে একটা গাড়ির হেড্-লাইটের আলো ঠিকরে এসে পড়লো মানুষটার ওপর! কিন্তু সে আধ মিনিটের জন্যে। তবু সেই অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি দেখতে পেলেন যে-লোকটা রাস্তার ওপর পড়ে আছে সে পুরুষ মানুষ নয়, মেয়ে মানুষ।

মিস্টার গুরুস্বামী ওপরের দিকে চোখ তুলে চাইলেন। দেখলেন একটা তিন-তলা বড়ো বাড়ি। সামনের রাস্তার দিকেই একটা ঝুল-বারান্দা। সেই দিকে চেয়ে তাঁর মনে হলো সেই ঝুল-বারান্দা থেকেই মেয়ে-মানুষটা যেন রাস্তায় লাফিয়ে পড়েছে. কিংবা তাকে ওপর থেকে মেরে রাস্তায় ফেলে দেওয়া হয়েছে।

তাঁর মাথাটা তখন রোমাঞ্চে, আতঙ্কে ঘুরতে আরম্ভ করেছে। তিনি কী করবেন বুঝতে পারলেন না। তাঁর মনে হলো তখনই কাছাকাছি থানায় গিয়ে খবরটা দেওয়া উচিত। কারণ তিনিই বোধহয় তখন এ-দুর্ঘটনার প্রথম প্রত্যক্ষদর্শী।

তাড়াতাড়ি বাড়িটার সামনে গিয়ে তিনি বাড়িটার ঠিকানাটা খুঁজে দেখতে চেষ্টা করলেন। দেখলেন ইংরিজীতে শ্বেতপাথরের ট্যাবলেটে মালিকের নাম ঠিকানা লেখা রয়েছে: "দেবীপদ মুখার্জি, ১২।এ, বিডন স্ট্রীট। কলকাতা।" তিনি আর দেরি করলেন না। সঙ্গে সঙ্গে ঠিকানাটা মনে করে নিয়ে কাছাকাছি থানায় চলে গেলেন।

থানায় তখন যারা ডিউটিতে ছিল তারাও তখন শীতে জড়োসড়ো হয়ে কম্বল চাপা দিয়ে টেবিলের ওপরেই ঘুমোচ্ছে। তিনি থানায় ঢুকতেই যে-লোকটা ঘুমোচ্ছিল সে মুখ থেকে কম্বল সরিয়ে আধ-ঘুমন্ত অবস্থাতেই জিজ্ঞেস করলে—কে?

মিস্টার গুরুস্বামী বললেন—আমি এফ-আই-আর করতে এসেছি, ও-সি কোথায়?

লোকটা সেইভাবে শুয়ে শুয়ে বললে—তিনি তাঁর কোয়ার্টারে আছেন। আপনি কে? একটু বেলা হলে আসবেন—

অফিসের দেরি হয়ে যাচ্ছে বলে বাসে উঠে পড়লুম, তারপরে তো এখন এই এখানে...

—মেয়েটা সেখানেই পড়ে রইল?

—হ্যাঁ। নিশ্চয়ই সেখানেই বোধহয় পড়ে আছে এখনও—

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—আমি যদি এখন সেখানে যাই তো তাকে দেখতে পাবো?

হয়তো দেখতে পাবে। ঠিক বলতে পারছি না।

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—ঠিক কোন্ জায়গায় মেয়েটা শুয়ে ছিল?

খগেন বললে—কেন? তোমার এত জানবার ইচ্ছে কেন বলো তো?

সন্দীপ বললে—না, এমনি জিজ্ঞেস করছি, কোনও কারণ নেই—

মনে মনে কিন্তু তার সন্দেহ হচ্ছিল। বিশাখা নয় তো। গোলাপী রং-এর শাড়িই তো সন্দীপ বিশাখাকে কিনে দিয়েছিল! কিন্তু বিশাখা রাস্তার মধ্যে কী করতে গেল? কে তাকে ওখানে নিয়ে গেল?

কাজ করতে গিয়ে কিন্তু কাজে মন গেল না। সমস্তক্ষণই কেবল বিশাখার মুখটা ভেসে উঠতে লাগলো তার লেজারখাতার পাতাগুলোর ওপর।

হঠাৎ ঘড়ির দিকে চোখ পড়তেই দেখলে ঘড়িতে তখন দুটো বাজতে আর দু'মিনিট মাত্র বাকি। ঠিক দুটোর সময়েই টিফিন টাইম শুরু হবে। সন্দীপের সমস্ত মনটা ছট্‌ফট্ করতে লাগলো বিশাখার জন্যে। মেয়েটা যদি বিশাখাই হয়, তাহলে কী হবে? এখন তার কী করা উচিত? সে কি একবার যাবে সেখানে—সেই ধর্মতলার রাস্তায়?

সন্দীপ খগেন সরকারের চেয়ারের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে—মেয়েটাকে ঠিক কোন্ রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখেছ বলো তো?

খগেন অবাক হয়ে গেল সন্দীপের কথা শুনে। জিজ্ঞেস করলে—কেন সন্দীপদা, সেই মেয়েটার ব্যাপারে তোমার এতো আগ্রহ হচ্ছে কেন? তোমার কেউ হয় নাকি সে?

সন্দীপ বললে—না, আমার আর কে হবে সে? এমনি জিজ্ঞেস করছি—বলো না আসল জায়গাটা ঠিক কোথায়?

খগেন বললে—না আগে বলো তোমার এতো আগ্রহ কেন?

সন্দীপ বললে—খবরের কাগজে দেখেছি একটা ওইরকম বয়েসী মেয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছে, তারও পরনে ওইরকম গোলাপী শাড়ি ছিল বলে লেখা ছিল, তাই...

খগেন কথাটা বিশ্বাস করলো কিনা কে জানে। হয়তো বিশ্বাস করলে। বললে—জায়গাটা ঠিক ওয়েলিংটন স্ট্রীট আর ধর্মতলা স্ট্রীটের মোড়ে—

—তা ওখানে মেয়েটা পড়ে ছিল কেন?

খগেন বললে কে জানে কেন পড়ে ছিল ওখানে। আজকাল সবই হচ্ছে কলকাতায়! লোকেরা বলছিল হেরোইন খেলে নাকি ওই রকম হয়।

—হেরোইন? সেটা আবার কী?

খগেন বললে হেরোইনের নাম শোনোনি? সে কী? আজকালকার ছেলেরা তো সবাই ওই সব খাচ্ছে!

—সে কী? কেন? ও খেলে কী হয়?

খগেন বললে—খেলে খুব আরাম হয়। মনে হয় একেবারে স্বর্গে চলে গিয়েছি। আজকাল চায়ের সঙ্গে, চকোলেটের সঙ্গে, পানের সঙ্গে ওই ওই সব মিশিয়ে দিচ্ছে। ও নেশা একবার ধরলে সহজে আর ছাড়ে না। ও-সব খাওয়ার 'ঠেক' আছে—

—ঠেক? ঠেক মানে?

—ঠেক মানে আড্ডা। ও বড়ো ডেঞ্জারাস জিনিস। ছেলেমেয়েরা চাকরি-বাকরি না পেয়ে ওই সব খেয়ে বুঁদ হয়ে থাকে—

সন্দীপ আর দাঁড়ালো না। ঘড়ির দিকে একবার চোখ ফিরিয়েই সোজা বাইরের

রাস্তায় গিয়ে নামলো। ঠিক কাঁটায় কাঁটায় দুটো বেজেছে। হাতে মাত্র এক ঘণ্টা সময় আছে। তার মধ্যেই ওয়েলিংটন স্কোয়ার আর ধর্মতলার মোড় থেকে ব্যাপারটা জেনে নিয়ে আসতে হবে। গোলাপী রং-এর শাড়ি পরা, ফর্সা গায়ের রং, উনিশ-কুড়ি বছর বয়েস। সমস্তই বিশাখার সঙ্গে তো ঠিক-ঠিক মিলে যাচ্ছে।

বাসের ভিড়ের মধ্যেও কথাটা মন থেকে দূর করতে পারছিল না সন্দীপ। সত্যিই যদি মেয়েটা বিশাখা হয় তাহলে সে কী করবে!

খগেনের কথাগুলো তখনও তার কানে বাজছিল। হেরোইন! 'হেরোইন' কথাটা তো এতদিন সে শোনেনি। যারা চাকরি-বাকরি পায় না, যাদের বিয়ে-টিয়ে হয় না, তারা সব ভুলে থাকবার জন্যে হেরোইন খায়! হেরোইনের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকলে মানুষ সব দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা ভুলে থাকে!

সন্দীপের কাছে তখন এ-সব নতুন কথা, নতুন খবর।

বাসটা খুব তাড়াতাড়ি গিয়ে পৌঁছোল ওয়েলিংটন স্কোয়ারের মোড়ে। কয়েকজন প্যাসেঞ্জার সেখানে নেমে গেল। সন্দীপও নামলো তাদের সঙ্গে-সঙ্গে। নেমেই রাস্তার চৌমাথার দিকে নজর দিয়ে দেখলে।

কই? কোথায় ভিড়? কোথাও তো মানুষের ভিড় নেই!

ফুটপাথ ধরে তাড়াতাড়ি হেঁটে গিয়ে সন্দীপ ঠিক জায়গাটায় পৌঁছুলো। দু'চার জন লোক তখন বাস-ট্রাম ধরবার জন্যে মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে।

সন্দীপ তাদের কাছে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে—হ্যাঁ মশাই, আপনারা কতক্ষণ এখানে অপেক্ষা করছেন?

অবাক প্রশ্ন! কতক্ষণ আবার, এই মিনিট দশ-পনেরো। কেন?

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—কিছুক্ষণ আগে কি এখানে ট্রাফিক-জ্যাম্ হয়েছিল?

একজন ভদ্রলোক বললে—ট্র্যাফিক জ্যাম্ তো কলকাতার সব সময়েই লেগে আছে। এ আর নতুন কথা কী?

সন্দীপ বললে—না, শুনলাম নাকি একটা কুড়ি-একুশ বছরের মেয়ে এখানকার রাস্তায় অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল?

ভদ্রলোক বললে—কী জানি মশাই, আমরা তো কিছুই দেখিনি—

পাশের দু'তিন জন ভদ্রলোকও বললে—তারাও নাকি কিছুই দেখতে পায়নি। তারা মাত্র দশ-পনেরো মিনিট আগে এখানে এসে দাঁড়িয়েছে। অনেক দূরে থাকে তারা।

ওই মুচিটাকে জিজ্ঞেস করুন। ওই যে ফুটপাথের ধারে বসে জুতো সারাচ্ছে।

সন্দীপও দেখলে মুচিটাকে। ঠিক মোড়ের মাথায় কোণাকুণি একটা চায়ের দোকানের সিঁড়ির নিচয় ফুটপাথের ওপর বসে জুতোয় পেরেক পুঁতছে।

সন্দীপ তার কাছে গিয়ে জানালে—ভাইয়া—

তারপর ভুল হিন্দীতে প্রশ্নটা করে দেখলে।

মুচি কলকাতা শহরে জুতো সারাবার কাজ নিয়ে পয়সা উপায় করতে এসেছে। তার অতো বাজে কথা বলে সময় নষ্ট করবার গরজ নেই। সে মাথা নিচু করে নিজের কাজ করতে করতে শুধু বলল—ক্যা জানে বাবু—

সন্দীপ আরো স্পষ্ট করে যতদূর সম্ভব শুদ্ধ হিন্দীতে আবার প্রশ্নটা করলে।

মুচি এবার বাংলায় বললে—হামার সময় নেহি বাবুজী, আপ পুলিশকে পুছুন—

সন্দীপ এবার নজর করে দেখলে—রাস্তার মোড়ে একজন পুলিশ কনস্টেবল ডিউটি দিচ্ছে। এতক্ষণ তাড়াতাড়িতে তার দিকে নজর পড়েনি আর।

সন্দীপ আস্তে আস্তে পুলিশটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। কনস্টেবলটা তখন চলন্ত বাস-ট্রাম সামলাতে ব্যস্ত। বললে—সেপাইজী।

মিস্টার গুরুস্বামী বললেন—কিন্তু খুব আর্জেন্ট কেস এটা। তাঁকে যে আমার এখনই দরকার!

লোকটা জিজ্ঞেস করলে—আপনি কে? আপনার নাম কী?

মিস্টার গুরুস্বামী বললেন—আমার নাম বরদারাজন গুরুস্বামী, আমি ইন্‌কাম ট্যাক্স অফিসার—

কথাটা বলতেই লোকটা ধড়মড় করে উঠে পড়লো। কম্বলটা ঝেড়ে ফেলে বলে উঠলো—আপনি বসুন স্যার—

বলে চেয়ারটা এগিয়ে দিলে। তারপর তাড়াতাড়ি খাতাটা নিয়ে লিখতে লাগলো।

—কী নাম বললেন আপনার?

—বরদারাজন গুরুস্বামী।

লোকটা বললে—ইন্‌কাম ট্যাক্স অফিসার? কোন্ ডিভিশন? আর আপনার বাড়ির ঠিকানা?

মিস্টার গুরুস্বামী তাঁর নিজের বাড়ির ঠিকানা বলতেই লোকটা তা নোট করে নিলে। তারপর প্রশ্ন করলে—কেসটা কী স্যার?

মিস্টার গুরুস্বামী যা-যা দেখেছিলেন সব বলে গেলেন। বিডন স্ট্রীটের বাড়িটার নম্বর বারো বাই-এ। বাড়ির মালিকের নাম দেবীপদ মুখার্জি।

—এ্যাক্‌সিডেন্ট কেস?

মিস্টার গুরুস্বামী বললেন—এ্যাক্‌সিডেন্ট, কি মার্ডার, কি সুইসাইড্ কেস তা বলতে পারবো না। দেখলাম একজন মহিলার লাশ সামনের রাস্তায় পড়ে আছে—

—মহিলাটির বয়স কতো?

মিস্টার গুরুস্বামী বললেন—তা বলতে পারবো না। আঠারোও হতে পারে আবার পঁচিশও হতে পারে।

—গায়ের রং?

তা ঠিক বলতে পারবো না। কারণ তখন সেখানে খুব অন্ধকার ছিল, ভালো করে দেখতে পাইনি। আপনারা নিজেরা গিয়েই সব দেখতে পাবেন।

এফ-আই-আর লেখা হয়ে গেলে মিস্টার গুরুস্বামী তারপর বাড়ি চলে গেলেন। সেদিন তাঁর প্রাতঃভ্রমণ করা হলো না।

মনে আছে একদিন পরে যখন সন্দীপ এই ঘটনার কথা খবরের কাগজে পড়েছিল তখন প্রথমেই তাঁর মনে পড়েছিল সেই বেড়াপোতায় দেখা 'বিল্বমঙ্গল' নাটকের কথা। 'বিল্বমঙ্গল' যাত্রা হচ্ছে। চাটুজ্জেবাবুদের বাড়ির কাশীনাথবাবু সেজেছিলেন 'চিন্তামণি'। আর নিবারণকাকা 'বিল্বমঙ্গল'। একটা দৃশ্যে থাকো আর চিন্তামণি প্রবেশ করলো। চিন্তামণি জিজ্ঞেস করলে- এই ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে তুমি কী করে সাঁতরে এলে?

বিল্বমঙ্গলবেশী নিবারণকাকা বললেন—এই কাষ্ঠখণ্ড আশ্রয় করে।

চিন্তামণিবেশী কাশীনাথ বললে—এ কী, এ যে শবদেহ—

তখন নিবারণকাকা চমকে উঠেছেন। বললেন—

এই নরদেহ
জলে ভেসে যায়
ছিঁড়ে খায় কুক্কুর শৃগাল
কিংবা চিতা-ভস্ম সম পবনে উড়ায়
এই নারী—এরও এই পরিণাম
নশ্বর সংসারে।

তবে হায় প্রাণ দিচ্ছি কারে
কার তরে শবে করি আলিঙ্গন।
দারুণ বন্ধনে ছায়ায় বাঁধিয়া রাখি
এই উষা-ও-ও ছায়া
মিথ্যা-মিথ্যা-মিথ্যা এ সকলি
হেরি আজ নিবিড় আঁধার
আমি কার, কে আছে আমার?......

খবরের কাগজ পড়তে পড়তে সন্দীপও ভাবতে লাগলো—সত্যিই তো, কেন সে বিশাখার কথা এত ভাবছে। বিশাখা তো তার কেউ নয়। বিশাখার ভালো-মন্দ নিয়ে কেন তার এত মাথা-ব্যথা! যা ইচ্ছে সে করুক, যেখানে ইচ্ছে সে যাক। সে 'হেরোইন' খাক আর সে-নেশাই করুক, সন্দীপ আর কারোর কথাই ভাববে না।

রাত্রে বাড়িতে গিয়ে মাকে খবরের কাগজটা দেখালে। বললে—দেখ মা, কান্ড?

মা তো পড়তে জানে না। বললে—কী হয়েছে রে? কী লিখেছে তুই বল্ না?

সন্দীপ বললে—সেই মুখার্জিদের বিডন স্ট্রীটের বাড়িতে কী এ্যাক্সিডেন্ট্ হয়েছে শোন। সেই সৌম্যবাবুর মেমসাহেব বউটাকে কে নাকি তেতলার ঘর থেকে খুন করে রাস্তায় ফেলে দিয়েছে। পুলিশ সন্দেহ করছে কেউ নিশ্চয়ই তাকে খুন করেছে। তাই পুলিশ সৌম্যবাবুকে গ্রেফতার করে হাজতে পুরে রেখেছে—

তারপর যেন মনে পড়ে গেল এমনি ভাবে জিজ্ঞেস করলে—মাসিমার কী খবর? এখন জ্বর কতো?

মা বললে—ডাক্তারবাবু এসে জ্বর দেখে গেছেন বিকেলবেলা। জ্বর তখন একশো পাঁচ ডিগ্রী।

—এত? ওষুধ-টষুধ কিছু দিয়েছো?

মা বললে—হ্যাঁ, আমি কমলার মাকে ডাক্তারবাবুর দোকানে পাঠিয়ে ওষুধ আনিয়ে নিয়েছি। এক দাগ ওষুধও খাইয়ে দিয়েছি।...আর বিশাখার কিছু হদিস করতে পারলি?

সন্দীপ শুধু বললে—না—
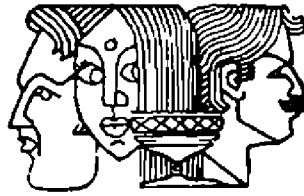
মুক্তিপদ মুখার্জি সেই সব মানুষদের মধ্যে একজন যাঁদের বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে সুখী লোক। বাইরের লোকেরা তাকে দেখলে ঈর্ষা করবে। তারা মনে করবে এঁর মতো মানুষ হতে পারলে তাদের জীবন সার্থক হবে। বেশ সব সময়ে গাড়ি চড়ে বেড়াবে, বেশ একটা বিরাট বাড়ি আর গাড়ির মালিক, সব সময়ে অধীনস্থ লোকেরা কেমন সেলাম করে।

শুধু বাইরের লোকদেরই বা দোষ দিই কেন? তাঁর কাছের লোকরাও তো তাই ভাবতো। ওয়েলফেয়ার অফিসার যশোবন্ত ভার্গব, চীফ এ্যাকাউনটেন্ট নাগরাজন, ওয়ার্কস্ ম্যানেজার কান্তি চ্যাটার্জি, ডেপুটি ওয়ার্কস্ ম্যানেজার অর্জুন সরকার—

তারাও জানতো মুক্তিপদ মুখার্জি ভাগ্যবান মানুষ। বড়লোকের বাড়ির ছেলে হয়ে জন্ম হওয়ার সুবাদে অনেক টাকার মালিকই শুধু নয়, অনেক মানুষের দণ্ড-মুণ্ডের কর্তা হওয়ার অধিকারও পেয়েছেন।

কিন্তু আসলে কি কেউ কখনও খবর রেখেছে যে মুক্তিপদ মুখার্জি রাত্রে ঘুমোন কি না, আর ঘুমোলেও কতোক্ষণ ঘুমোন?

তাদের খবর রাখতে বয়ে গেছে। তারা জানে যে ফ্যাক্টরি না চললেও তাদের বাড়িতে নিয়ম করে মাইনেটা ঠিক পৌঁছে যাবে।

কিন্তু কতোদিন? আর কতোদিন লোকসানে ফ্যাক্টরি চালাবেন ডিরেকটাররা?

সুতরাং তার জন্যে দুর্ভাবনাটা থাকলেও মুক্তিপদর দুর্ভাবনার তুলনায় তা যে কিছুই না, সেটা বুঝতে পারতো না।

মাঝে মাঝে ওয়ার্কস্ ম্যানেজার কান্তি চ্যাটার্জি আর ডেপুটি ওয়ার্কস্ ম্যানেজার অর্জুন সরকারের সঙ্গে ক্যামেরা মীটিং হতো। তাদের তিনি হায়দ্রাবাদে পাঠাতেন, মধ্যপ্রদেশেও পাঠাতেন। আরো অনেক জায়গাতেই পাঠাতেন।

মুক্তিপদ বলতেন—ওয়েস্ট বেঙ্গলে আর কোনও দিন কোনও ব্যবসা-বাণিজ্য হবে বলে আমার মনে হয় না।

কথাটাতে ওয়ার্কস্ ম্যানেজাররাও সায় দিত। বলতো—যেদিন দেশ পার্টিশান হয়েছে সেইদিন থেকেই সব সর্বনাশ হয়ে গেছে।

অর্জুন সরকার বলতেন—এ সমস্তর মূলে রাজনীতি, আর কেউ নয়—

মুক্তিপদ বলতেন—এ নিয়ে আমার সঙ্গে অনেক ফরেনারদের কথা হয়ে গিয়েছে। ইংলণ্ডে, ফ্রান্সে, ওয়েস্ট-জার্মানীতে যখন যেখানেই আমি গিয়েছি সেখানেই তারা বলেছে ইণ্ডিয়া এত বড় কান্ট্রি যে এটাকে পার্টিশন না করলে পৃথিবীর ব্যালেন্স অব পাওয়ার-এ মস্ত বড়ো একটা ঘা পড়বে। গ্রেট-ব্রিটেনের পক্ষে এটা মেনে নেওয়া সহ্য হচ্ছিল না। তাই মাউন্টব্যাটেন আর তাঁর সুন্দরী বউকে দিয়ে এই সর্বনাশটা ঘটানো হলো। আর এ-ব্যাপারে তারা যে কতো বড় ধুরন্ধর তা এখন বোঝা যাচ্ছে। তখন ইণ্ডিয়াকে পায়ের তলায় রেখে তাদের যা বিজনেস হতো, এখন তার ডবল বিজনেস করছে। তাই তাদের ইন্‌কামও এখন ডবল হয়েছে—

এ-সব কথা আলোচনা করে লাভ নেই বলেই তখন অন্য কথার আলোচনা হতো। তখন আলোচনা হতো কোথায় কোন স্টেটে ফ্যাক্টরি সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। সাউথ ইণ্ডিয়াতে না ইউ-পি-তে, না মধ্যপ্রদেশে?

কয়েকবার মুক্তিপদ নিজেই গিয়েছিলেন। কয়েকবার অর্জুন সরকারকেও পাঠিয়েছিলেন মধ্যপ্রদেশে। তাঁদের দুজনেরই অভিজ্ঞতা হলো এই যে বাঙালীদের কেউই চায় না। সবাই জেনে গেছে যে বাঙালীরা সে-রাজ্যে গেলে বাঙালীদের সঙ্গে অন্য বাঙালীরাও সেখানে যাবে। আর তারা গেলে ইউনিয়ন-বাজিও শুরু হবে। সঙ্গে সঙ্গে তাদের দেশের ছেলেদের চাকরি হওয়ার সুযোগও কমে যাবে।

এই সব সমস্যা যখন মাথা চাড়া দিয়ে ওপরে উঠতে শুরু করেছে তখন শুরু হলো আর এক নতুন সমস্যা। ঠিক সেই সময়েই সৌম্য বিলেত থেকে একটা মেম বিয়ে করে নিয়ে আসতেই মা'র স্ট্রোক হলো। আর তখন যমে-মানুষে টানাটানি শুরু হয়ে গেল।

আর সে ঝামেলাও যখন একটু কমলো তখন আর এক ঝামেলা শুরু হলো মুক্তিপদ'র জীবনে। তখন সৌম্যটার সঙ্গে তার বউ-এর ঝগড়া বেড়ে গেল টাকা নিয়ে। তখন কথা উঠলো ডিভোর্সের। কুড়ি হাজার পাউণ্ড দিয়ে যখন ডিভোর্সের মামলা শুরু হওয়ার কথা তখন মা একদিন আবার ডেকে পাঠালেন মুক্তিপদকে।

মা বললেন—তুই একবার আয়রে মুক্তি, আর আমি পারছি না—

মুক্তিপদ জিজ্ঞেস করলেন—কেন, আবার কী হয়েছে?

মা বললে—কী আবার হবে! সেই মেম-মাগীটা আবার ঝগড়া-ঝাঁটি আরম্ভ করেছে। ঝগড়ার জ্বালায় বাড়িতে আর কাক-চিল কিছু বসতে পারছে না—

—কেন? আবার ঝগড়া কেন? আমি তো বলেছি ওর কুড়ি হাজার পাউণ্ড দাবি আমি মিটিয়ে দেব! কিন্তু ডিভোর্স বললেই তো আর ডিভোর্স হয় না। উকিল-এ্যাটর্নীদের সঙ্গে বসেও তো কথা বলতে হয়ে। তাতেও তো অনেক সময় লাগবে। এদিকে ফ্যাক্টরি সরিয়ে নিয়ে যাবার কথা চলছে। একবার ভাবছি হায়দ্রাবাদে ফ্যাক্টরি সরিয়ে দেব, আর একবার ভাবছি মধ্যপ্রদেশ সরাবো। আমি একলা মানুষ, কোথায় কোন দিকে কখন দেখি—

মা বললেন—আগে তুই আমাকে বাঁচা, তারপর আমি মরে গেলে তখন তুই যা-ইচ্ছে তাই করিস। আমাকে সৌম্য বড্ড জ্বালাচ্ছে রে, আমি আর পারছি নে সহ্য করতে—

মুক্তিপদ বলেছিলেন—ঠিক আছে, পরশুদিন আমার স্টাফের মীটিং আছে। মীটিংটা শেষ হলেই তোমার সঙ্গে দেখা করছি—

কিন্তু তার আগেই সব উল্টে-পাল্টে গেল। পরের দিন হঠাৎ ভোর পাঁচটা বাজবার আগেই মুক্তিপদর টেলিফোনটা ঝন্-ঝন্ করে বেজে উঠলো।

—কে?

মা টেলিফোন করছেন—ওরে মুক্তি, আমি রে—

মুক্তিপদ অবাক। বললেন—কী হয়েছে মা তোমার? আবার অসুখ হলো নাকি?

—ওরে না, আমি মারা গেলাম...

বলতে বলতে মা কান্নায় ভেঙে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোনের লাইনটা কেটে গেল। আবার মাকে টেলিফোন করলেন। আবার ওদিকের টেলিফোনের ঘণ্টা বেজে উঠলো। বেজে উঠলো, কিন্তু কেউ তা ধরলেন না। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও যখন কেউ ধরলো না তখন মুক্তিপদর মনে হলো তাহলে বোধহয় লাইনটা বিগড়ে গেলো।

তারপরে আর মুক্তিপদর ঘুম এলো না। আর টেলিফোন করবার কথাও মনে এলো না। কিন্তু একঘণ্টা পরে আবার যখন টেলিফোনটা বেজে উঠলো তখন মুক্তিপদ আর বিরক্তিটা চেপে রাখতে পারলেন না। জিজ্ঞেস করলেন—কে?

ওপাশের একটা খাটে নন্দিতা শুয়েছিল। সেই আওয়াজে সে বিরক্ত হয়ে উঠলো। বললে—আঃ, টেলিফোনের জ্বালায় তো অস্থির হয়ে গেলাম। আর তো পারি না—

মুক্তিপদ তখন চিৎকার করছেন—মেরে ফেলেছে?

ওদিক থেকে কী কথা হলো তা নন্দিতা শুনতে পেলে না। কিন্তু মুক্তিপদ তখন আবার জিজ্ঞেস করলেন—কী বললে? পুলিশ এসেছে? আর সৌম্য? সে কী বলছে? কোথায় পড়েছে? ঠিক বাড়িটার সামনে? অচ্ছা আমি এখুনি যাচ্ছি—

বলে মুক্তিপদ টেলিফোনের রিসিভারটা রেখে দিলেন। তারপর সোজা ঘরের বাইরে চলে গেলেন।

নন্দিতা এতক্ষণে যেন বাঁচলো। আবার সে পাশ ফিরে শুলো। কার কী হলো তা সে জানে না।

কিন্তু বিডন স্ট্রীটের বাড়িতে তখন সবাই-ই ঘটনাটা জেনে গেছে। সে-বাড়িতে তখন ভয়ে সকলের মুখ শুকিয়ে গিয়েছে। সত্যিই বাড়িটার সামনেই তখনও মরে আছে জলজ্যান্ত সেই মেমসাহেবটা। রাস্তায় তখন মানুষের ভিড় আরো বেড়েছে। সকলেই খুব মজা পেয়েছে যেন। খবর পেয়েই পুলিশের গাড়ির সঙ্গে হসপিট্যালের এ্যামবুলেন্স এসে মেমসাহেবটার শরীরটাকে স্ট্রেচারে করে ভেতরে তুলে নিলে।

বাড়ির সামনে গিরিধারীর প্রাণটা তখন ধুক্-ধুক্ করছে। তার কেবল ভয়

পুলিশ যদি তাকে ধরে নিয়ে জেলে পোরে।

গিরিধারীর চব্বিশ ঘণ্টাই ডিউটি। তারই ডিউটি কে কখন বাড়ির ভেতর থেকে বেরোয় বা কে কখন বাইরে থেকে বাড়ির ভিতরে ঢোকে তা লক্ষ্য রাখা। এতো বড় একটা খুনের ব্যাপার তারই সামনে ঘটে গেল আর সে কিছুই দেখতে পেলে না, জানতে পারলে না। এ তো তারই গাফিলতি! পুলিশের ধাক্কাধাক্কিতে গিরিধারীই প্রথম জেগে উঠেছিল। ঘরের দরজা খুলেই সে পুলিশ দেখে চম্‌কে উঠেছে।

—তুমি কে? তোমার নাম কী?

গিরিধারী কাঁপা কাঁপা গলায় বললে—হুজুর, আমি গিরিধারী...

তারপর পুলিশ তাকে রাস্তার ওপর টেনে নিয়ে গেল।

—ওটা কা'র লাশ?

লাশ কথাটা শুনেই তার শরীরের রক্ত মাথায় উঠে গেল। সে মেমসাহেবকে ভালো করেই চেনে! রাতে যখন খোকাবাবুর সঙ্গে বাইরে বেরোয় তখনও সে দেখেছে আর রাত কাবার করে যখন মাতাল হয়ে বাড়িতে ফেরে তখনও সে মেমসাহেবকে দেখেছে।

—বলো, ওটা কার লাশ?

গিরিধারী যা সত্যি তাই-ই বললে। বললে—হুজুর, এ খোকাবাবুকা মেমসাহেব বহুজী—

—বহুজী? এখানে কে একে ফেললে?

গিরিধারী বললে—আমি কিছু জানি না হুজুর। আমি আমার ঘরের ভেতরে ঘুমোচ্ছিলাম হুজুর।

ততক্ষণে পুলিশের দলের অন্য লোকেরা খোলা গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকে গিয়ে একেবারে দোতলা অতিক্রম করে তেতলায় গিয়ে পৌঁছেছে। শীতের ঠাণ্ডার মধ্যে বাড়ির সবাই তখন ঘুমে অচেতন। শুধু বিন্দুর ঘুম নেই। ঠাকমা-মণির জ্বালায় তাকে ঠাণ্ডার মধ্যেই জেগে উঠতে হয়েছে। অতো লোকের বুটের আওয়াজে সে জিজ্ঞেস করলে—কে? কে ওদিকে?

ঠাকমা-মণিও ঘরের মধ্যে জপ করছিলেন এক মনে। জিজ্ঞেস করলেন—কে রে বিন্দু? কাকে বলছিস? আবার বুঝি খোকা ঝগড়া করছে বউএর সঙ্গে?

নিচের মল্লিক-মশাইএর ঘুম সকাল-সকাল ভাঙে। তবে শীতকালে একটু ঠাণ্ডা পড়লে এক-আধঘণ্টার এদিক-ওদিক হয়। কিন্তু সেদিন গিরিধারী কাদের সঙ্গে কথা বলছিল, তাইতেই একটু তন্দ্রাটা ভেঙে গিয়েছিল। তিনিও বাইরে বেরিয়ে পুলিশ দেখে অবাক।

পুলিশও তাকে ধরেছে। জিজ্ঞেস করলে—আপনি কি এ-বাড়িতে থাকেন?

ঠিক যেমন গিরিধারীকে জেরা করা হয়েছিল, তাঁকেও তেমনি।

পুলিশ মল্লিক-মশাইএর নাম-ধাম সব লিখে নিলে। এমন কি তাঁর মাইনে কতো তাও নোট করে নিলে। তারপর মল্লিক-মশাইকে বললে—আসুন, বাইরে আসুন—বলে তাঁকে নিয়ে বাড়ির সামনের রাস্তায় গেল।

সেখানে তখনও ডেড্‌বডিটা পড়ে আছে।

সেটা দেখেই মল্লিক-মশাই শিউরে উঠেছেন।

—বলুন এ কে? আপনি চেনেন একে?

মল্লিক-মশাই নিজেই তখন বিভ্রান্ত। একে চিনবেন না তো কাকে তিনি চিনবেন? সমস্ত জায়গাটা তখন রক্তে ভেসে যাচ্ছে। অন্ধকার তখনও ভালো করে কাটেনি। তবু চেহারাটা দেখে স্পষ্ট চিনতে পারা যায়। এই তো সেদিন সৌম্যবাবু বিলেত থেকে একে বিয়ে করে নিয়ে এলো! হায়, হায়, তারই এই পরিণতি! একেই তো ডিভোর্স

করার কথা উঠেছিল। এরই জন্যে মেজবাবু কুড়ি হাজার পাউন্ড দেবেন বলে কথা দিয়েছিলেন। মল্লিক-মশাইএর বুকটা কী-রকম কেঁপে কেঁপে উঠছিল।

—বলুন, আপনি কি চেনেন একে?

পুলিশের গলায় ধমকের সুর। মল্লিক-মশাই বললেন—হ্যাঁ চিনি।

আবার পুলিশের প্রশ্ন—কে এ?

মল্লিক-মশাই বললেন—ইনি এ-বাড়ির মালিকের নাতির বউ। এ-বাড়ির নাতি সৌম্যপদ এই মেমসাহেবকে বিলেত থেকে বিয়ে করে এনেছিল—

—একে কি খুন করা হয়েছে?

মল্লিক-মশাই বললেন—তা আমি কী করে বলবো?

—এদের স্বামী-স্ত্রীতে কি ঝগড়া হতো?

মল্লিক-মশাই বললো—তা আমি কী করে বলবো? আমি তো নিচের এই ঘরে থাকি। এখানেই দিনের বেলাতেও থাকি, রাত্তিরেও থাকি—

—কখনও শোনেননি এদের মধ্যে ঝগড়া হতো কিনা?

মল্লিক-মশাই এ-কথার কী জবাব দেবেন বুঝতে পারলেন না। শেষকালে কী বলতে গিয়ে তিনি কী বলে ফেলবেন, তখন তিনিও পুলিশের হ্যাঙ্গামে জড়িয়ে পড়বেন।

—বলুন, বলুন, বলুন, এদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া হতো কিনা?

মল্লিক-মশাই ভয় পেয়ে গেলেন।

—বলুন?

—হ্যাঁ, ঝগড়া হতো!

—কেন ঝগড়া হতো?

মল্লিক-মশাই বললেন—টাকার জন্যে—

—কেন, টাকার জন্যে ঝগড়া হতো কেন?

মল্লিক-মশাই বললেন—মেমসাহেব বউটা টাকার জন্যে বড্ড বিরক্ত করতো সৌম্য-বাবুকে।

বাড়ির তেতলায় তখন বিন্দু ডাকছে—ঠাকমা-মণি, ঠাকমা-মণি পুলিশ এসেছে, পুলিশ—

ঠাকমা-মণির তখনও জপ শেষ হয়নি। জপের মধ্যেই উঠে পড়লেন। পুলিশের নাম শুনে বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠলো। পুলিশ? পুলিশ কেন?

—কই? কই পুলিশ? কোথায়?

পুলিশের লোকের হাতে টর্চ ছিল। সেটা জ্বালিয়ে পুলিশটা সামনে এগিয়ে এলো।

ঠাকমা-মণি বললেন—তুমি কে বাবা? বিন্দু বলছে পুলিশ এসেছে—তুমি পুলিশ?

পুলিশ বললে—হ্যাঁ, আপনার বাড়ি আমরা সার্চ করবো—

—সার্চ করবে? কেন কী হয়েছে?

—আপনার বাড়িতে খুন হয়েছে!

—খুন?

পুলিশ বললে—হ্যাঁ, খুনের খবর পেয়ে আমরা এ-বাড়িতে এসেছি—

ঠাকমা-মণি বললেন—তা তোমরা ভেতরে ঢুকলে কী করে? গেট কে খুলে দিলে?

—আপনার বাড়ির দারোয়ান!

গিরিধারী? গিরিধারী গেট খুলে দিয়েছে? কিন্তু গিরিধারীকে তো আমার হুকুম দেওয়া আছে যে রাত ন'টার সময় থেকে সকাল ছটার মধ্যে গেট খুলবে না সে!

এখন ছ'টা বাজেনি। এখন তোমরা ভেতরে ঢুকলে কী করে?

—আপনার বাড়িতে খুন হয়েছে?

—খুন...

কথাটা বোধহয় ঠাকমা-মণির বিশ্বাস হয়নি। তিনি বাড়ির মালিক। তিনি জানতে পারলেন না, আর তার বাড়িতেই কিনা খুন-খারাপি হয়ে গেল?

বললেন—না, আমার বাড়িতে খুন হলো আমি জানলুম না, তা কি হয়?

—হ্যাঁ, আপনার বাড়িতে খুন হয়েছে। আমরা জানি।

ঠাকমা-মণি বিন্দুকে ডাকলেন—বিন্দু, ম্যানেজারবাবুকে একবার ডাক্ তো—

বিন্দু নিজেই নিচেয় চলে গিয়ে মল্লিক-মশাইকে ডেকে নিয়ে এলো। মল্লিক-মশাই তখন ভেতরে-ভেতরে ভয়ে কাঁপছেন। একে পুলিশের জেরার মুখে পড়ে তিনি কী বলতে গিয়ে কী বলে ফেলেছেন, তারই জের চলছে তখনও, তার ওপর আবার ঠাকমা-মণির তলব। তিনি ওপরে আসতেই ঠাকমা-মণি বললেন—মল্লিক-মশাই, আপনি একবার মুক্তিকে টেলিফোন করুন তো—

মল্লিক-মশাই বললেন—এত ভোরে মেজবাবুকে টেলিফোন করবো?

ঠাকমা-মণি বললেন—হ্যাঁ করুন, বলুন বাড়িতে পুলিশ ঢুকেছে—

মল্লিক-মশাই বললেন—এত সকালে টেলিফোন করলে তিনি যদি রেগে যান। তিনি তো ঘুমের বড়ি খেয়ে ঘুমোন—

ঠাকমা-মণি বললেন—না, বলুন জরুরী কাজে আমি টেলিফোন করতে বলেছি। বলুন বাড়িতে খুন হয়েছে, পুলিশ এসেছে—

পুলিশের লোক ততক্ষণে সমস্ত বাড়িটা তোলপাড় করে অনুসন্ধান করতে শুরু করে দিয়েছে। সুধাকেও তারা জেরা করতে শুরু করেছে। সুধা বেচারি ভীতু মানুষ। কখনও কোনও কাজে বাড়ির বাইরে ও বেরোয়নি। পুলিশ দেখেই সে ঘোমটায় মুখ ঢেকে ফেলছে।

—তুমি কার কাজ-কম্ম দেখা-শোনা করো?

সুধা বললে—আমি মেম-বৌদির কাজ-কম্ম করে দিই—

—তোমার মেম-বৌদি কী-রকম মানুষ?

সুধা উত্তর দিতে গিয়ে থেমে যায়।

পুলিশ বললে—বলো, বলো। কোনও ভয় নেই তোমার—বলো—

সুধার মুখে তবু কোনও কথা বেরোয় না।

—বলো বলো, কথা বলছো না কেন?

পুলিশ বললে—খুব কি বকতো তোমাকে তোমার মেম-বৌদি?

সুধা বললে—না।

—তবে? খুব খাটাতো তোমাকে?

—না।

পুলিশ বললো—যা সত্যি তা-ই বলো। তোমার কোনও ক্ষতি হবে না—

সুধা বললে—রাত্তিরে খোকাদাদাবাবুর সঙ্গে খুব ঝগড়া হতো—

সুধা বললে—আমি ইন্‌জিরি তো বুঝতে পারি না, তাই কী নিয়ে ঝগড়া হতো আমি বলতে পারবো না হুজুর।

—তোমার সঙ্গেও কি ঝগড়া হতো?

সুধা বললে—হ্যাঁ খুব মদ খেলে আমাকেও গালাগালি দিত।

—কী বলে গালাগালি দিত?

—বলতো 'বলাডি বিচ্'—

পুলিশ বললে—ব্লাডি বীচ? তুমি ব্লাডি বীচ কথাটার মানে জানো?

—না হুজুর। আমি ইন্‌জিরি বুঝিনে। আমি বিন্দুকে কথাটার মানে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তা ও-ও তো ইন্‌জিরি জানে না! ও কী করে মানে বলবে?

পুলিশ জিজ্ঞেস করলে—তা কাল রাত্তিরে কি আবার ঝগড়া হয়েছিল?

সুধা বললে- হ্যাঁ, কালকে রাত্তির বেলা বাড়ি এসে দুজনে খুব ঝগড়া করছিল। মনে হয় কাল রাত্তিরে একটু বেশী মদ খেয়েছিল দুজনে। তাদের ঝগড়ার শব্দে আমার ঘুমই হয়নি ভালো করে।

পুলিশ জিজ্ঞেস করলে—তারপর? তারপর কী হলো?

সুধা বললে -তারপর এই একটু আগে বিন্দু আমাকে ডাকলে। তার কাছ থেকে আমি সব শুনলুম -

—তোমার খোকাদাদাবাবু এখন এই ঘরে আছে?

- হ্যাঁ। দরজাটা ভেতর থেকে খিল দেওয়া রয়েছে। আপনারা দরজাটা ঠেলুন—

পুলিশ দরজাটাতে ধাক্কা দিতে লাগলো। কিন্তু কেউ সাড়া দিলে না। শেষকালে কোথা থেকে একটা শাবল না কী একটা নিয়ে এসে তাই দিয়ে দরজায় ঘা লাগাতে লাগলো। অনেকক্ষণ ধরে ধাক্কা দিতে দিতে দরজাটা ভেঙে পড়লো।

দরজা ভাঙার পর দেখা গেল...

কিন্তু ঠিক তখনই মুক্তিপদ এসে হাজির।

বললেন—কী হয়েছে এখানে? আপনারা এ-বাড়িতে এসেছেন কী করতে?

পুলিশের ও-সি অন্য ঘরে কাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছিলেন। তিনিও সেই সময়ে এসে পড়লেন। দরজা ভাঙার হুকুম দিয়ে তিনি অন্য কাজে চলে গিয়েছিলেন। যখন এলেন তখন দরজা ভাঙা হয়ে গিয়েছে। একজন সার্জেণ্ট পিস্তল উঁচিয়ে ভেতরে ঢুকছে।

মুক্তিপদ বাধা দিতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু ও-সি এসে পড়াতে তিনি জিজ্ঞেস করলেন--আপনি কি এ-বাড়িতে থাকেন?

মুক্তিপদ বললেন—না, আমি এখুনি টেলিফোনে খবর পেয়ে এলুম। আমি সৌম্যপদ মুখার্জির কাকা মুক্তিপদ মুখার্জি। আপনারা...

ও-সি বললেন—আপনাদের বাড়ির সামনের রাস্তায় একজন মেয়েমানুষের ডেড্‌-বডি পড়ে থাকতে দেখা গেছে। আমাদের সন্দেহ তাকে মার্ডার করা হয়েছে।

—ডেড্‌-বডিটা কোথায়?

- তাকে হস্‌পিট্যালে পাঠানো হয়ে গিয়েছে। এখন কালপ্রিটকে ধরতে এসেছি আমরা। আপনার ভাইপোই সেই কাল্‌প্রিট—

মুক্তিপদ জিজ্ঞেস করলেন—কীসে বুঝলেন আমার ভাইপোই সেই কাল্‌প্রিট?

ও-সি বললেন—আপনার ভাইপো ছাড়া আর কোনও পুরুষ মানুষ তো থাকে না এখানে। তা ছাড়া আমি সকলকে ক্রস্‌ করেছি। সকলেরই এক মত যে ওরা হাজ-ব্যান্ড আর ওয়াইফ। দুজনেই রোজ বাইরে থেকে ড্রিংক করে অনেক রাতে বাড়ি ফিরতো। আর ড্রিংক করে বাড়িতে ফিরে সমস্ত রাতে ঝগড়া করতো। এ-বাড়ির মেড্‌-সার্ভেণ্টরা সবাই সেই রকম এভিডেন্স দিয়েছে।

সার্জেণ্ট ভদ্রলোক ততক্ষণে সৌম্যর হাতে হ্যান্ড-কাফ্‌ পরিয়ে দিয়েছে। বাড়িসুদ্ধ লোকের মুখ তখন ভয়ে থম্‌-থম্‌ করছে। কোথাও কোনও টু-শব্দ নেই। একটা যাদুদণ্ডে কে যেন সকলকে নির্বাক করে দিয়েছে।

মুক্তিপদ বললেন -আমার ভাইপো'র জন্য জামিন দেবার এ্যাপ্লিকেশন করবো?

ও-সি বললেন—কালকে আমরা কোর্টে নিয়ে যাবো মিস্টার মুখার্জিকে, তখন

তখনই সে বিশ্ব-শান্তির যজ্ঞের জন্যে চাঁদা দেয়নি। আর এখন তো সে-প্রশ্নই ওঠে না। তবু এমন কতো লোক আছে যারা ভবিষ্যতের বিপদের ভয়ে পকেট থেকে পাঁচটা টাকা ধার করে বই কিনে ফেলছে।

বাস রাস্তার কাছে আবার গিয়ে দাঁড়ালো সে।

হঠাৎ নজরে পড়লো এক ভদ্রলোক সেই বইটা পড়তে পড়তে তার দিকেই আসছে। ফুটপাথের ওপরে বইটার দিকে চোখ রেখেই সামনের দিকে এগিয়ে আসছে। ফুটপাথ জুড়ে হকাররা পসরা সাজিয়ে বসেছে। সে-সব দিকে লোকটার নজর নেই। নজর কেবল সেই বই-এর পাতার ওপর। ফুটপাথের ওপর মানুষের সঙ্গে যে ধাক্কা লাগতে পারে সে-সব দিকে তার কোনও খেয়ালই নেই, এমন গভীর মনোযোগ।

কাছে আসতেই সন্দীপ এগিয়ে গেল।

বললে কী হলো, আপনিও ফোর-টোয়েন্টির হাতে পড়লেন ?

ভদ্রলোক প্রথমে অচেনা লোককে দেখে চম্‌কে উঠলেন। বললেন—আপনি ?

সন্দীপ বললে—ওখানে একটা লোক বই বেচছিল যে !

ভদ্রলোক বললেন—হ্যাঁ—

—আপনি তো ওখান থেকেই বইটা কিনলেন !

—হ্যাঁ, তা আপনি জানলেন কী করে ?

সন্দীপ বললে—আমি তো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব শুনছিলাম এতক্ষণ। আপনি কেন কিনলেন ? ও তো ফোর-টোয়েনটি ব্যাপার—

ভদ্রলোক সন্দীপের কথা শুনে হো-হো করে হাসতে লাগলেন।

তারপর বললেন—আপনি কী করে বুঝলেন যে ফোর-টোয়েন্টি ?

সন্দীপ বললে—ফোর-টোয়েন্টি না হলে কি কেউ বলে যে সূর্য পৃথিবীর চার-দিকে ঘোরে ?

ভদ্রলোক আবার হাসতে লাগলেন। বললেন—কেন ? এককালে কোপারনিকাস আর গ্যালিলিওকেও তো পাগল বলেছিল। তার বেলায় ?

সন্দীপ বললে—আপনি কার সঙ্গে কার তুলনা করছেন ? এ লোকটা তো একটা আস্তো জোচ্চোর। চেহারা দেখে বুঝতে পারলেন না ?

ভদ্রলোক তখনও মিট্-মিট্ করে হাসছেন।

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—আপনি হাসছেন ? লোকটা আপনাকে পাঁচটা টাকা ঠকিয়ে নিলে তবু আপনার মুখ দিয়ে হাসি বেরোচ্ছে ?

ভদ্রলোক এবার যেন একটু ধাতস্থ হলেন। বললেন—হাসবো না ? লোকটা যে আমাদের চেনা।

—আপনি চেনেন লোকটাকে ? তবু পাঁচটা টাকা দিয়ে ওই রাবিশ বইটা কিনলেন ?

ভদ্রলোক বললেন—আমি তো পাঁচ টাকা দিয়ে কিনিনি। ও টাকা তো ওরই দেওয়া। ওরই দেওয়া পাঁচটা টাকা ওকেই আবার ফিরিয়ে দিলুম—

সন্দীপ হতবাক হয়ে গেল কথাটা শুনে। বললে—ওরই দেওয়া টাকা মানে ?

—মানে ও-লোকটা খুব অভাবী লোক। চাকরি-বাকরি নেই, টাকার অভাবে খেতে পরতে পায় না। কিছু টাকা উপায় করবার জন্যে ওই ফন্দি আবিষ্কার করেছে। মানুষ তো সহজে বই কেনে না। তাই ও কোপারনিকাস্ আর গ্যালিলিওর নাম ভাঙিয়ে ওই বই বিক্রি করে কিছু পয়সা কামাবার মতলোব করেছে। আমাদের বন্ধু-বান্ধবদের প্রত্যেককে ও পাঁচটা করে টাকা দিয়েছে। আমরা কয়েকজন বই কিনছি দেখলে আরো কিছু বাইরের লোক বই কিনবে, তাই এই ফন্দি এঁটেছে—

সন্দীপ আরো অবাক হয় ভদ্রলোকের কথায়। বললে—তাতে বই বিক্রী হচ্ছে ?

ভদ্রলোক বললেন—বলছেন কী মশাই? গেল মাসে ওই বোগাস বই বেচে ওর তিনশো টাকা পকেটে এসেছিল। ও বললে এ-মাসে নাকি পাঁচশো টাকা আয় হবে ওর।

সে কী? কলকাতায় কি এত বোকা লোক আছে?

ভদ্রলোক বললেন—বোকা লোক নেই? কলকাতায় বোকা লোক থাকবে না তো কোথায় এত বোকা লোক থাকবে? পাকিস্তান হওয়ার পর ঢাকা থেকে যে লাখ-লাখ লোক কলকাতায় এসেছে, তারা এখানে কী করে পেট চালাবে? তাই এই রকম করে মানুষকে ধাপ্পা দিয়ে তারা পেট চালাচ্ছে। ও লোকটাও তো ঢাকা না টাঙ্গাইলের লোক। এক-কাপড়ে এখানে এসে এই ধাপ্পাবাজির রাস্তা ধরেছে। এখানে এই কলকাতায় যতো ধাপ্পাবাজ লোক আছে, ততো বোকা লোকও আছে। জানেন, এই কলকাতায় কতো রকমের বোগাস ব্যবসা আছে?

কথাগুলো শুনতে সন্দীপের খুব মজা লাগছিল। জিজ্ঞেস করলে—কী রকম?

ভদ্রলোকের বয়েস হয়েছে। তিনিও যেন কথা শোনাতে পেরে আনন্দ পাচ্ছিলেন। বলতে লাগলেন—শনিবারে-শনিবারে ঠনঠনের কালীবাড়ি যাবেন। দেখবেন হাজার-হাজার লোক মাকে প্রণামী চাঁদা দিচ্ছে। প্রত্যেক শনিবারে হাজার-হাজার টাকা আয় হচ্ছে পুজুরীদের। সেটা লোক-ঠকানো ব্যবসা নয়? যতো দোষ করলো আমাদের এই নিবারণ?

—নিবারণ? নিবারণ কে?

ওই যে-লোকটা ওই পাঁচ টাকা দামের বইটা বিক্রী করছে, তার নামই নিবারণ। লোকটা যদি ধাপ্পাবাজি করেই থাকে তো দোষটা তার কোথায়? আর কালীবাড়ির পুজুরীরাই খাঁটি সত্যবাদী যুধিষ্ঠির? আর অতো কথা বলছেন কেন? আপনি শনিবার দিন কালীঘাটে গিয়ে দেখবেন গঙ্গার ধার ঘেঁষে অন্ততঃ এক হাজারটা শনি-পুজো হচ্ছে। শনি-ঠাকুরের পুজো করে পুরুতরা কয়েক হাজার টাকা কমাচ্ছে! লোকে যদি বোকা হয় তো পুজুরীদের কী দোষ?

ভদ্রলোকের কথাগুলো শুনতে সন্দীপের খুব ভালো লাগছিল।

ভদ্রলোক আবার বলতে লাগলেন—ওরা না হয় গরীব। ওই নিবারণের মতোই গরীব। আর বড়োলোকরা কী করছেন, তা জানেন?

না, সন্দীপ জানে না বড়লোকরা কী করছে।

—বড়লোকরা যাদের অনেক টাকা আছে, তারা কলকাতাময় দেয়ালে যতো পানের দোকান আছে তার মালিক। তারা পানের সঙ্গে কোকেন মিশিয়ে দিচ্ছে। চা-এর সঙ্গে কোকেন মিশিয়ে দিচ্ছে। তাতে এমন নেশা হয়ে যাচ্ছে ওই দোকানের পান কিংবা ওই ব্রান্ডের চা না হলে তাদের চলবে না। আর চকোলেট?

একটু থেমে ভদ্রলোক আবার বলতে লাগলেন আবার চকোলেট তৈরি করছে এমন সব কোম্পানি যারা বড়ো-বড়ো নাম দিচ্ছে। আইডিয়াল ফুড্ প্রোডাক্টসের নাম শুনেছেন?

—আইডিয়াল ফুড্ প্রোডাক্টস্? হ্যাঁ হ্যাঁ, নাম শুনেছি। তার কী হয়েছে?

দেখেননি রোজ খবরের কাগজের পাতায় বড়ো-বড়ো বিজ্ঞাপন দিতো?

সন্দীপ যেন ঘুম থেকে জেগে উঠলো। বললে—কই, না তো...

—তাদের কোম্পানি তো উঠে গেছে। তাদের কর্তাদের পুলিশ এ্যারেস্ট করেছে। তারা জ্যাম তৈরি করতো, জেলি তৈরি করতো, কোল্ড-ড্রিংকস্ তৈরি করতো। তারা নাকি তাদের ফুড্ প্রোডাক্টস্-এর মধ্যে ওই সব হেরোইন, হ্যাশিশ, চরশ সব কিছু মিশিয়ে দিতো। সব দোষ ওই নিবারণদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে লাভ কী? যারা বড়ো বড়ো ফার্ম খুলে লোক ঠকাচ্ছে তাদের তো কেউ কিছু বলছে না। শনিঠাকুরের নাম

আপনার লইয়ারকে আপনি আপনার সাইড্ থেকে দাঁড়াতে বলবেন—

বলে সদলবলে সৌম্যকে নিয়ে চলে গেল। মুক্তিপদ যেন স্তম্ভিত হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন সেখানে, তারপর বিন্দু এসে দাঁড়াতেই যেন তাঁর ধ্যান ভাঙলো।

বললেন—হ্যাঁরে, ঠাকমা-মণি কী করছেন?

বিন্দু বললে—শুয়ে আছেন। শুয়ে শুয়ে কাঁদছেন—

মুক্তিপদ বললেন—চল্, আমি যাচ্ছি—

বলে ঠাকমা-মণির ঘরের দিকে পা বাড়ালেন।

সেদিনও যথারীতি সন্দীপ সকাল-সকাল অফিসে যাওয়ার জন্যে বাড়ি থেকে বেরোচ্ছিল। মা পেছন থেকে এসে বললে ওরে, তোর মাসিমার জ্বরটা আবার বেড়েছে রে—

আবার জ্বর বাড়লো! কথাটা শুনে সন্দীপের মুখটা আবার কালো হয়ে উঠলো! বললে—ঠিক আছে, আমি আবার অফিস থেকে ফেরত আসবার সময়ে ডাক্তারবাবুর কাছে হয়ে আসবো। জ্বরটা কতো বেড়েছে?

মা বললে—কাল এই সময়ে একশো তিন ছিল, আজ হয়েছে দেখলুম একশো পাঁচ—

সন্দীপের মনটা খারাপ হয়ে গেল। তিন দিন হয়ে গেল মাসিমার জ্বর হচ্ছে, মোটেই ছাড়ছে না। প্রথমে মনে হয়েছিল হয়তো সর্দি-জ্বর। তার মানে ইনফ্লুয়েঞ্জা। একটা সাধারণ ওষুধ দিয়েছিল ডাক্তারবাবু। কিন্তু তাতে কোনও কাজ হয়নি। জ্বর কেবল বেড়েই চলেছিল।

ব্যাঙ্কে গিয়ে কাজের মধ্যেও মাসিমার কথাটা বার-বার মনের মধ্যে উঁকি দিতে লাগলো। মানুষের জীবন মানেই তেঁতো বড়ি। যে মানুষ হয়ে পৃথিবীতে জন্মেছে তাকেই সারা জীবন এই তেঁতো বড়ি খেয়ে বেঁচে থাকতে হয়েছে। বেঁচেও থাকবো আবার তেঁতো বড়িও খাবো, এ তো সব চেয়ে বড় অভিশাপ। অনেক দিন আগে কোন এক বইতে কথাগুলো পড়েছিল সে। কথাটার মানে তখন সে ভালো করে বোঝেনি, বুঝছে এখন। আজ কোথায় রইলো তার স্বপ্ন, কোথায় রইলো তার সেই আশা! আগে মনে হতো একটা চাকরি পেলেই তার সব আশা মিটে যাবে। আগে মনে হতো বিশাখার একটা বিয়ে হয়ে গেলেই তার সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। তারও আগে মনে হতো মা কাশীনাথবাবুর বাড়ি থেকে মুক্তি পেলেই সব সমস্যা শেষ হয়ে যাবে! কিন্তু এখন?

এখন তার মা অন্যের বাড়ির দাসীবৃত্তি থেকে মুক্তি পেয়েছে। সেও একটা মোটা-মুটি রকমের ভালো চাকরি পেয়ে গেছে। বাকি রইলো বিশাখা। সেই তাকেও সে সুখী করতে পারলে না। মাসিমার দুঃখও সে দূর করতে পারলে না। তাহলে কি চিরকালই তার সমস্যা থাকবে?

ব্যাঙ্কে তার আশে-পাশে কাজ করতে করতে অন্য বন্ধুরা কতো রকমের সব গল্প করছে। কতো বার তারা ক্যান্টিনে গিয়ে চা খেয়ে আসছে। কখনও খেলার গল্প করছে, কখনও পলিটিক্স্ নিয়ে তর্ক করছে।

কিন্তু সন্দীপ একেবারে একলা চুপ করে কাজ করে যাচ্ছে।

হঠাৎ ঘড়ির দিকে চাইতেই চমকে উঠলো। একেবারে পাঁচটা বেজে গেছে!

সেই সব দিনের কথা ভেবে সন্দীপের গায়ে এখনও কাঁটা দিয়ে ওঠে। অত কষ্ট অত যন্ত্রণা কোন মানুষ সহ্য করতে পারে?

অফিস থেকে বেরিয়ে বাস-স্ট্যান্ডের দিকে যেতে গিয়ে দেখলে একটা গলির মোড়ের ওপর তখন অনেক মানুষের ভিড় জমেছে। কীসের ভিড়? কী হচ্ছে ওখানে? সামান্য একটু কৌতূহলের বশে। সন্দীপ সেখানে উঁকি মেরে দেখতে গেল।

হঠাৎ একটা মানুষের গলার তীক্ষ্ণ আওয়াজ কানে এল। লোকটার গলায় খুব জোর আছে বলতে হবে। লোকটা বলে চলেছে—আপনারা দেখে বুঝে চলুন, ভবিষ্যতে আপনাদের সামনে এক মহাবিপদ ঘনিয়ে আসছে। খুব সাবধানে চলা ফেরা করুন—

সন্দীপ সামনের একজন লোককে জিজ্ঞেস করলে—এখানে কী হচ্ছে মশাই? এত ভিড় কেন?

অচেনা ভদ্রলোকটি তখন একমনে ভেতরের লোকটার কথা শুনছেন। সন্দীপের কথা তাঁর কানে গেল না। আবার সন্দীপ আর একজন ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করলে-- হ্যাঁ মশাই, কী হচ্ছে এখানে বলতে পারেন?

কিন্তু কে কার কথা শোনে? একমনে তখন সবাই সেই লোকটার কথা শুনছে।

সত্যিই কলকাতা এক আজব-শহর। এখানে লোক জড়ো করা এত সহজ বলেই এখানে এত প্রতিবাদ-মিছিল হয়, এত শান্তি-মিছিল হয়, এত গণ-মিছিল হয়। এখানকার জনতা এত হুজুগে বলেই এখানে এত পার্টি-বাজি হয়, এত পার্টি-ভাঙাভাঙি হয়। এখানে একজন অন্য আর একজনের উন্নতিতে এত ক্ষুব্ধ হয় যে সবাই মিলে তাকে কতক্ষণে মাটির ওপরে ধুলোয় নামিয়ে দিতে পারবে সেই চিন্তাতেই সব সময়ে বিভোর হয়ে থাকে।

হঠাৎ সন্দীপর কানে একটা শব্দ ঢুকলো--বিংশ-শতাব্দীর এ এক আশ্চর্য আবিষ্কার! আপনারা সাবধান হোন, আপনারা হুঁশিয়ার হোন। নইলে ভীষণ বিপদে পড়বেন আপনারা। আমাদের আর্যভট্ট যা বলে গেছেন তা উল্টে যাচ্ছে এবার। কোপারনিকাস, গ্যালিলিও যা কিছু বলে গেছেন, সব মিথ্যে হয়ে যাচ্ছে এবার,

ওদিকে রাস্তায় তখনও হাওড়ায় যাবার বাসের দেখা নেই। সন্দীপ ভিড় ঠেলে আরো ভেতরে ঢুকলো।

—আগে সূর্যের চারদিকে পৃথিবী ঘুরতো এখন পৃথিবীর চারদিকে সূর্য ঘুরতে আরম্ভ করবে। আপনারা সাবধান। এই বইটা পড়লেই আপনারা জানতে পারবেন, এই বিপদ থেকে রক্ষে পাওয়ার উপায়। জানতে হলে এই বইটা কিনুন। মাত্র পাঁচ টাকা। মাত্র পাঁচ টাকায় আপনাদের অমূল্য জীবন ফিরে পাবেন। বিফলে মূল্য ফেরত।

আর সবচেয়ে আশ্চর্য—দু'একজন মানুষ পাঁচ টাকা দিয়ে বইটা কিনছে।

লোকটার চেহারা সাজ-পোশাকটাও বড় অদ্ভুত। একটা কালো প্যান্ট পরনে। প্যান্টটা পায়ের গোড়ালি থেকে গুটিয়ে গুটিয়ে ওপর দিকে হাঁটু পর্যন্ত তোলা। গায়ে একটা হাত-কাটা স্পোর্টস-শার্ট। একই কথা বার-বার বলছে আর বইটা সামনের দিকে বাড়িয়ে ধরছে। সকলকেই বলছে—খুব সাবধানে থাকবেন আপনারা। বড় খারাপ দিন আসছে পৃথিবীর মানুষদের। মাত্র পাঁচ টাকায় বই কিনে পাঁচ লাখ টাকা লাভ করুন—

সন্দীপ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ মজা দেখলে। তার সামনেই কয়েকটা বই বিক্রী হয়ে গেল। অনেক দিন আগে বিশ্ব-শান্তির জন্যে প্রস্তুত করবার চাঁদা চাওয়া হতো রাস্তার মোড়ে মোড়ে। এও কি সেই রকম আর এক ভণ্ডামি নাকি?

সন্দীপ অবশ্য তখন বেকার ছিল। মুখার্জিবাবুদের বাড়িতে পনেরোটা টাকা মাইনেতে পেট চালাবার মতো একটা চাকরি করতো। থাকা আর খাওয়াটা ছিল ফ্রী।

জিজ্ঞেস করতে তার উত্তর দিতে পারলে না। নাম-ঠিকানা ঠিকমতো বলতে পারলে না। পাগল ছাড়া তাহলে তাকে আমরা কী বলবো? তাই অকে আমরা জেলখানায় পাঠিয়ে দিয়েছি।

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—তাহলে এখন আমি কী করি?

পুলিশ ভদ্রলোক বললেন—তাহলে আর কী করবেন, এখন প্রেসিডেন্সী জেলে যান। একজন উকিলকে নিয়ে কোর্টে যান। কোর্টে গিয়ে একটা দরখাস্ত দিন। জজ যদি রাজি হন তো আপনার উকিল আপনার বিশাখা গাঙ্গুলীকে জেল থেকে বার করে নিয়ে এসে জেরা করবেন। যদি প্রমাণ হয় যে বিশাখা গাঙ্গুলী পাগল নয় তো তখন কোর্ট তাকে ছেড়ে দেবে—

সন্দীপ বললে—তা এখন তো কোর্ট বন্ধ হয়ে গেছে।

ভদ্রলোক বললে—এখন কোর্ট বন্ধ হয়ে গেছে তো কী হয়েছে। কালও যেতে পারেন, পরশুও যেতে পারেন। যেদিন আপনার খুশী।

সন্দীপের মাথা তখন ঘুরছে। কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ালো। অফিস থেকে ছুটি নেওয়াটা এমন কিছু শক্ত ব্যাপার নয়। কিন্তু সমস্যা তো সেটা নিয়ে নয়। সমস্যা হলো টাকার। কোর্টে যাওয়া মানেই তো কালো-কোটদের পাল্লায় পড়া। তারা তো সবাই মিলে তাকে ছিঁড়ে খাবে। তারা তো ওখানে সবাই ওৎ পেতে বসে আছে মক্কেলদের গিলে খাবার জন্যে। একবার তাদের খপ্পরে পড়লে আর রেহাই নেই।

সন্দীপ লালবাজার পুলিশ অফিস থেকে বেরিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ালো। দেখতে পেলে হাজার-হাজার লক্ষ-লক্ষ লোক কতো মতলোব নিয়ে ধূমকেতুর মতো দৌড়চ্ছে। তাদের সকলেরই কি সন্দীপের মতো সমস্যা? না, তা কেন হবে? কারো টাকার সমস্যা, কারো স্বাস্থ্যের সমস্যা, কারো মামলার সমস্যা, কারো আবার হয়তো দাম্পত্য সমস্যা, কারো হয়তো মেয়ের বিয়ের সমস্যা, কারো আবার হয়তো বাড়ির ভাড়াটের সমস্যা। কতো রকমের সমস্যা নিয়ে সবাই বিব্রত, বিপর্যস্ত।

কিন্তু সে? কিন্তু সন্দীপ?

সন্দীপ তো সাধ করে পরের সমস্যা ঘাড়ে তুলে নিয়েছে। তার নিজের বলতে গেলে তো কোনও সমস্যাই ছিল না। কেন সে তাহলে ঘাড় পেতে মাসিমার সমস্যা, বিশাখার সমস্যা নিতে গেল?

কিন্তু মানুষ হয়ে যখন সে জন্মেছে তখন নিজেকে নিয়ে বেঁচে থাকা তো ঠিক বাঁচা নয়। তাকে তো ঠিক বাঁচা বলে না। পরের বিপদের দিনে যদি তাদের পাশে গিয়ে না দাঁড়াই তবে মানুষ হয়ে জন্মেছি কেন? তার নামই তো মনুষ্যত্ব!

লোকটা পাগল হোক, ফন্দিবাজ হোক, জোচ্চোর হোক, যে-কথাগুলো সে বলেছিল তা তো ভুল নয়। এমন করে তাহলে সব বদলে গেল কেন? পৃথিবীর ভালো মানুষগুলো সব এমন করে অদৃশ্য হয়ে গেল কেন? অথচ কতো মহাপুরুষ তো কতো ভালো ভালো কথা বলে গিয়েছিলেন। তাঁদের কথা এমন করে সবাই ভুলে গেল কেন? তাহলে কি সত্যি সত্যিই সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘুরতে আরম্ভ করেছে? এই বিরাট বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডটাও কি তাহলে তার চিরাচরিত নিয়ম ভঙ্গ করে উল্টো পথে পরিক্রমা করতে আরম্ভ করেছে?
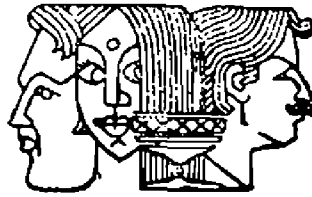
সব মানুষেরই মনে অতীতের ওপর একটা আকর্ষণ থাকে। তাই সবাই-ই বলে—ওঃ, সেকালে কতো ভালো ছিলুম। কতো সস্তা-গণ্ডার দিন ছিল তখন। মানুষ তখন কতো ভালো ছিল, মানুষ কতো সৎ ছিল। আর এখন?

এই এখনকার সবই খারাপ। এখনকার দেশ, এখনকার মানুষ, এখনকার ইতিহাস, সমস্তই মানুষের অপছন্দের জিনিস। সকলের মুখে এই একই কথা। কিন্তু সন্দীপের বেলায় ঠিক তার উল্টো। অতীতের কথা মনে পড়লেই তার মনে আতঙ্কের অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। যদি আবার তার অতীতটা কখনও ফিরে আসে? যদি আবার কখনও তার সেই অতীতটা আর একবার এসে উদয় হয়ে তাকে গ্রাস করে? যদি আবার তার সৃষ্টি-কর্তা তাকে সেই সময়ে সেই যুগে ফিরিয়ে নিয়ে যান?

খবরটা শুনে মা অবাক হয়ে গেল। বললে জেলখানাতে? বিশাখাকে জেলে শুইয়ে রেখেছে? কেন রে কী করেছিল সে?

সন্দীপ নিজের মুখে আঙুল চাপা দিয়ে বললে—চুপ চুপ, অতো জোরে কথা বোল না, ও-ঘরে মাসিমা রয়েছে, শুনতে পাবে।

মা'রও সেদিকে খেয়াল ছিল না। বিশাখা জেলখানায় রয়েছে শুনে মা এত চমকে উঠেছিল যে মাসিমা যে পাশের ঘরে অসুখে পড়ে আছে, সে-কথা একেবারে ভুলে গিয়েছিল। তারপর গলাটা নিচু করে জিজ্ঞেস করলে জেলখানায় আছে কেন রে?

সন্দীপ বললে—আমি সে-সব কিছু বলতে পারবো না মা কালকে গিয়ে খবর নেব, তারপর জানতে পারবো—শুনলাম তার নিজের নাম-ধাম কিছু বলতে পারছিল না, তাই পুলিশ তাকে জেলখানায় পাঠিয়ে দিয়েছে, যাতে তার কোনও বিপদ-টিপদ না হয়—

তারপর একটু থেমে জিজ্ঞেস করলে—তা মাসিমা আজকে কেমন আছে?

মা বললে—সেই রকমই।

—আজ বুকের ব্যাথাটা কেমন?

মা বললে—দুপুর বেলায় ব্যথাটা খুব বেড়েছিল, ছট্‌ফট্ করছিল। তখনই তোর ডাক্তারের ওষুধটা খাইয়ে দিয়েছিলুম, তাতেই ব্যথাটা একটু কমলো। তখন থেকে এখন পর্যন্ত ঘুমোচ্ছে, আমি আর ডাকিনি—

সন্দীপ একটু ভাবনায় পড়লো। ডাক্তার নিজেও মাসিমার অসুখটা ভালো করে ধরতে পারেনি। বলেছিলেন—আর কিছুদিন দেখা যাক, যদি এই ওষুধেও না সারে তাহলে কলকাতায় গিয়ে একটা এক্স্-রে করিয়ে নিতে পারলে ভালো হয়—

সন্দীপ জিজ্ঞেস করেছিল—এই ব্যথাটা কেন হচ্ছে এত? কিছুতে কমছে না কেন? এটা কি কোন গ্যাস্ট্রিক পেইন্?

ডাক্তারবাবু বলেছিলেন—এতদিন তো গ্যাস্ট্রিকের ওষুধই দিচ্ছিলুম, তাতেও যখন কোনও উপকার হলো না, তখন এক্স্-রে করলে বোঝা যাবে রোগটা কি?

সন্দীপ ভয়ে-ভয়ে জিজ্ঞেস করেছিল—ম্যালিগন্যান্ট টিউমার হতে পারে নাকি?

ডাক্তারবাবু বলেছিলেন—তা কী করে বলবো, সব কিছুই হতে পারে। এক্স্-রে প্লেট দেখলে বলতে পারা যাবে—

সে যে কতো ভয়ঙ্কর দিন গেছে তখন সন্দীপের! সে-সব কথা ভাবতেও এখন তার

করে যারা লোক ঠকাচ্ছে তাদের তো কই গভর্মেণ্ট্ কিছু বলছে না। শনি পুজো তো কেউ বন্ধ করতে বলছে না—

আরো কথা শুনতে ইচ্ছে হচ্ছিল সন্দীপের। কিন্তু দূরে তার বাসটা আসতে দেখা গেল।

সে তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করলে—আইডিয়াল ফুড্ প্রোডাক্টস্-এর কোম্পানিটা বন্ধ হয়ে গেছে তাহলে?

ভদ্রলোক বললেন—হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনি জানতেন না? আপনি কোথায় থাকেন?

সন্দীপ বললে—আমি থাকি বেড়াপোতায়—ডেলী প্যাসেঞ্জারি করি। আপনি ঠিক জানেন কোম্পানিটা বন্ধ হয়ে গিয়েছে?

বাসটা আসতেই সন্দীপ সিঁড়ির পাদানির ওপর লাফিয়ে উঠে পড়লো।

পেছন থেকে ভদ্রলোকের গলা শোনা গেল—আপনি কোথায় আছেন? সূর্যটা যে এখন পৃথিবীর চারদিকে ঘুরতে আরম্ভ করেছে—

বাস ছেড়ে দেওয়ার অনেকক্ষণ পর পর্যন্ত কথাগুলো সন্দীপের কানের কাছে ঘুর-ঘুর করতে লাগলো। সত্যিই, কথাটা বোধহয় ঠিকই বলেছে নিবারণ। আগেকার মতো পৃথিবীটা আর সূর্যের চারদিকে ঘুরছে না। কোপারনিকাস্, গ্যালিলিও, আর্যভট্ট যা বলে গেছেন সব ভুল। সূর্যটাই এখন আমাদের পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে। নইলে চারদিকে এমন সব উলটো-পালটা ঘটনা ঘটছে কেন? কেন সৌম্যবাবুর মেমসাহেব বউ-এর সঙ্গে ডিভোর্স হয়ে যাচ্ছে? কেন বিশাখার বিয়েটা এমন করে হঠাৎ আটকে গেল? কেন মাসিমার এমন হঠাৎ অসুখ হলো? কেন বিশাখা এমন হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে গেল?

ভদ্রলোকের কথাগুলো তখনও মাথার মধ্যে ঘুর-ঘুর করছিল। শনিঠাকুরের নাম করে কেন এমন হাজার-হাজার টাকা লুঠ করা হচ্ছে? কেন পানের দোকানে-দোকানে পানের সঙ্গে কোকেন মেশানো হচ্ছে। কেন চায়ের কৌটোর ভেতরে চায়ের সঙ্গে কোকেন মেশানো হচ্ছে? আর আইডিয়াল ফুড্ প্রোডাক্টস্ কোম্পানির লোকদের গ্রেফ্‌তার করা হয়েছে? তাহলে ওদের তৈরি জ্যাম-জেলি-আচার-কোল্ড্-ড্রিঙ্কস্-এর সঙ্গেও কি হেরোইন মেশানো হচ্ছিল?

বাসটা লালবাজারের সামনের রাস্তায় আসতেই সন্দীপ বাস থেকে নেমে পড়লো। তারপর ভেতরে ঢুকে 'মিসিং-স্কোয়াড' ডিপার্টমেণ্টের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে—স্যার, সেই বিশাখা গাঙ্গুলীর কেস্‌টার কিছু হদিস পেলেন?

কত বিশাখা গাঙ্গুলী কলকাতায় রোজ হারিয়ে যাচ্ছে তার হিসেব রাখা কি সহজ? রোজ কতো জন্মাচ্ছে, রোজ কতো লোক মরছে, তার হিসেব রাখা যেমন অসম্ভব, এও তেমনি! এই কলকাতায় রোজ কতো লোক নিরুদ্দেশ হচ্ছে তার সঠিক হিসেব রাখাও কি সহজ?

—কেস নম্বর কতো?

সন্দীপ আমতা-আমতা করতে লাগলো। কেস নম্বর তো তার মনে নেই।

মুখে বললে—কেস নম্বরটা তো মনে পড়ছে না ঠিক। আপনি দয়া করে একটু খুঁজে দেখুন না। নামটা তো বললুম বিশাখা গাঙ্গুলী...

পুলিশ ভদ্রলোক বললেন—কেস নাম্বার না বললে কি খোঁজা সহজ? এখন সবাই বাড়ি চলে গেছে, এত দেরি করে এলেন কেন?

সন্দীপ বললে—দেখুন না একটু খুঁজে...

ভদ্রলোক বললেন—তাহলে কিছু খরচা লাগবে—

—খরচা? কত?

পুলিশ ভদ্রলোক বললেন—পঞ্চাশ টাকাই দিন—

—পঞ্চাশ? অতো টাকা তো আমার কাছে নেই। দেখি কতো টাকা আছে—

তারপর পকেটটা পরীক্ষা করে দেখলে মাত্র পনেরোটা টাকা আছে। সেই টাকাগুলো পুলিশ ভদ্রলোকের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললে—এই পনেরো টাকা নিন। এর বেশি এখন আমার কাছে নেই, কোনও রকমে বলে দিন বিশাখা গাঙ্গুলীর কোনও পাত্তা পেয়েছেন কিনা—

সন্দীপের মনে হলো ভদ্রলোকটি বেশ ভালো। আগে মুখে যতটা কাঠিন্য ছিল, ততোটা আর নেই। বললেন—আপনারা বড্ড অসুবিধেয় ফেলেন আমাদের।

বলে সন্দীপের দেওয়া টাকাগুলো নিয়ে পকেটে পুরতে পুরতে আবার বললেন—আচ্ছা দেখি, কী করতে পারি আপনার জন্যে। এদিকে অফিসের সব লোক চলে গিয়েছে--

সন্দীপ কাউন্টারে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো ভদ্রলোক কী করছেন। ভদ্রলোক একবার এ-কাগজটা দেখেন একবার সে-কাগজটা। কোথাও খুঁজে পাচ্ছেন না সেই বিশাখা গাঙ্গুলী সংক্রান্ত ফাইলটা। শেষকালে অতি কষ্টে পাওয়া গেল আসল কাগজটা। বোধহয় পনেরোটা টাকা পেয়েই অত তাড়াতাড়ি পাওয়া গেল সেটা।

—এই যে পেয়েছি মশাই—পেয়েছি--

সন্দীপও খুশী হলো খবরটা শুনে। জিজ্ঞেস করলে—পেয়েছেন? আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ—

ভদ্রলোক বললেন—আরে আপনার বিশাখা গাঙ্গুলীকে শেষ পর্যন্ত কোথায় পাওয়া গেছে তা জানেন?

—কোথায়?

—ওয়েলিংটন স্ট্রীট আর ধর্মতলা স্ট্রীটের মোড়ের কাছে একদিন অজ্ঞান-অচৈতন্য অবস্থায় আপনার বিশাখা গাঙ্গুলীকে প্রথমে পাওয়া যায়। সেই খবর পেয়ে পুলিশ তাকে মুচিপাড়া থানায় নিয়ে আসে। তারপরে দেখছি লালবাজার থেকে প্রেসিডেন্সী জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। আপনার বিশাখা গাঙ্গুলী এখন সেখানেই আছে—

সন্দীপ অবাক হয়ে গেল খবরটা শুনে। বললে—প্রেসিডেন্সী জেলে আছে বিশাখা?

—হ্যাঁ, এই তো এই ফাইলে লেখা রয়েছে। এই দেখুন না আপনি

বলে ভদ্রলোক ফাইলটা সন্দীপের দিকে এগিয়ে দিলে।

সন্দীপও ভালো করে চেয়ে দেখলে—ভদ্রলোক যা বলেছেন তা সবই সত্যি।

—আপনাদের অফিসে যখন আমি বিশাখা গাঙ্গুলীর নিরুদ্দেশের খবর দিয়ে গিয়েছিলুম তখন আমার ঠিকানাও আপনাদের কাছে দিয়ে গিয়েছিলুম। আপনারা বিশাখার খবর আমাকে না দিয়ে তাকে প্রেসিডেন্সী জেলে পাঠালেন কেন?

পুলিশ ভদ্রলোক এবার রেগে গেলেন। বললেন আপনি কী বলছেন মশাই? আমাদের কি একজন বিশাখা গাঙ্গুলীকে নিয়ে মাথা ঘামালে চলে? আমাদের কাছে ও-রকম হাজার-হাজার বিশাখা গাঙ্গুলীর খবর আসে। একজনকে নিয়ে মাথা ঘামালে আমাদের চলে না। এ মশাই আপনাদের সরকারী অফিসের চাকরি নয় যে কোনও রকমে বাসে গুঁতোগুঁতি করে অফিসে গিয়ে পৌঁছোলুম আর কাজ-কম্ম না করে সারা মাসের মাইনে পেয়ে গেলুম। আমাদের অফিসে এসে খেটে খেতে হয়।

আর একটু থেমে আবার বললেন—আর আপনার বিশাখা গাঙ্গুলী তো একটা আস্ত পাগল মেয়ে—

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে কী করে বুঝলেন সে পাগল?

—কী করে আবার বুঝবো? তার চাল-চলন দেখেই বুঝলুম। কোনও কথা

চম্‌কে উঠলো।

—এতক্ষণ ডাকছি, শুনতে পাচ্ছেন না?

ভদ্রলোক তার গায়ে হাত দিয়ে ঠেলছেন। সন্দীপ দাঁড়িয়ে উঠে বললে—অ্যাঁ?

ভদ্রলোক আবার বললেন—আমি অনেকক্ষণ থেকে আপনাকে ডাকছি, আপনি কী ভাবছিলেন?

সন্দীপ লজ্জায় পড়লো। বললে—আমি একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলুম।

ভদ্রলোক বললেন—বুঝতে পেরেছি। বিপদে পড়লে সকলেরই এই রকম হয়। আপনি আসুন আমার সঙ্গে। আপনার ভাবনা করবার কিছু নেই। আপনাকে এক প্লীডারের কাছে নিয়ে যাচ্ছি। তিনিই আপনার সব কিছু ঠিক করে দেবেন—

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—তাকে কতো দিতে হবে?

ভদ্রলোক বললেন—যা আপনার খুশী তাই-ই দেবেন। তিনি খুব পরোপকারী প্লীডার। আর টাকা না দিলেও চলবে—

ভদ্রলোকের সঙ্গে সঙ্গে সন্দীপ চলতে লাগলো। ভদ্রলোক যেখানে সন্দীপকে নিয়ে গেলেন সেটা বার-লাইব্রেরী। অনেক কালো রং-এর কোট পরা এ্যাডভোকেট সেখানে বসে আছেন। ভদ্রলোক সন্দীপকে নিয়ে একজন প্রবীণ লোকের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিলেন। যা সন্দীপের কাছ থেকে শুনেছিলেন তাই-ই বলে গেলেন।

তারপর কী থেকে যে কী হয়ে গেল তা এক অলৌকিক কাণ্ড! বিস্তার করে বললেও কেউ বিশ্বাস করবে না।

প্লীডার ভদ্রলোক বললেন—চলুন আমার সঙ্গে।

বলে নিজে আগে আগে চলতে লাগলেন। সন্দীপও চলতে লাগলো তাঁর পেছনে পেছনে। কিন্তু কোথায় সে যাচ্ছে? স্বর্গের দিকে? নাকি নরকের দিকে? বিশাখাকে কি সত্যি খুঁজে পাওয়া যাবে?

আজও মনে আছে সে-কটা দিনের সেই উত্তেজনা, সেই উদ্বেগ আর সেই উদ্দেশ্যবিহ্বল অস্বস্তিকর মুহূর্তগুলোর কথা। বিপদ যখন আসে তখন সে তো কোনও নোটিশ দিয়ে আসে না। সমস্ত পৃথিবীটাই তখন তার কাছে বিস্বাদ হয়ে যায়। ওই অবস্থাতে পড়লেই তো মানুষ তখন আত্মহত্যা করতে যায়। সন্দীপ যে কেন তখন আত্মহত্যা করেনি তার কারণটা সে আজও আবিষ্কার করতে পারেনি।

বাড়িতে গেলেই মা বলতো—ওরে, তোর মাসিমাকে দেখে আমার তো বড় ভয় করছে রে। এ-রকম না খেয়ে-খেয়ে মানুষের শরীর আর কতদিন টিকবে!

সন্দীপ বলতো—তা আমি কী করবো বলো? আমি তো একলা মানুষ, এই অবস্থায় আমি আমার অফিস সামলাবো না বিশাখার খোঁজ নেব? এখন যদি আমার কোনও বিপদ-আপদ হয় তখন কে তোমাদের দেখবে? কার মুখ চেয়েই বা তোমরা বাঁচবে বলো তো!

এ কথার উত্তরে মা কী বলবে? মা'র মুখ দিয়ে তখন কোনও কথাই বেরোত না।

এ এক অদ্ভুত সংসার। চারটি মাত্র প্রাণীর সংসার। তার মধ্যে একজনের মারাত্মক রোগ, অন্যজন নিরুদ্দেশ। কার সেবা কে করবে? অথচ তারা দুজনেই এ-সংসারের কেউই নয়, তারা দুজনেই বাইরের লোক। সেই দুই বাইরের লোকের জন্যে বাকি দুজনের অক্লান্ত আর প্রাণান্তকর পরিশ্রম!

সন্দীপ বাড়ি থেকে খেয়ে-দেয়ে সকাল-সকাল বেরিয়ে যেত। আর শেষ ট্রেনে এসে বাড়ি ফিরতো একবারে চূড়ান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে। যাবার সময়েও সেই একই প্রশ্ন আর একই উত্তর, আর ফেরার সময়ও সেই একই প্রশ্ন আর একই উত্তর। এ একেবারে ধরা-বাঁধা গৎ হয়ে গিয়েছিল সন্দীপ আর সন্দীপের জীবনে।

সন্দীপ বাড়িতে এসেই প্রথম প্রশ্ন করতো—মাসিমা আজ কেমন আছে?

মা উত্তর দিত সেই একই রকম -

বাড়ি থেকে বেরোবার সময় রোজই মা জিজ্ঞেস করতো- আজও কি তোর বাড়ি ফিরতে দেরি হবে?

সন্দীপ বলতো -আজও অফিসে হাফ-ডে ছুটি নিয়ে আলিপুর কোর্টে যেতে হবে।

—তাহলে বিশাখা কবে বাড়িতে আসবে?

সন্দীপ বলতো—রোজই তো উকিলবাবু বলেন জজ-সাহেব আজই অর্ডারে সই করবেন। কোর্টের ব্যাপারই সব আলাদা।

এ-কথার পর মা আর কী বলবে? সন্দীপই বা কী করতে পারে! কেন যে বিশাখা সেদিন রাস্তায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিল, আর কেনই বা পুলিস তাকে জেলে পুরে রেখে দিলে, তার জবাবদিহি দেবারও কেউ নেই। এর দায়িত্ব কে নেবে? গভর্ণমেণ্ট না পাবলিক? এ প্রশ্ন সে কাকে করবে? তবে কি সত্যিই সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে?

না, সেদিন সত্যিই জজ সাহেব হুকুম জারি করলেন। হুকুম হয়ে গেল যে বিশাখা গাঙ্গুলীকে পুলিস যেন যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব কোর্টে হাজির করে।

এই হুকুম জারি করলেই যথেষ্ট নয়, সেই হুকুম পুলিসের কাছে পৌঁছতেই কল্পকাল লেগে যাবে। উকিলবাবু যখন দেখলেন যে পুলিস কোনও দিকে কান দিচ্ছে না, তখন বললেন --আপনাকে আর আমার সঙ্গে আসতে হবে না, এবার আমি নিজেই সব ঠিক করে দেব—

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—তাহলে আমি আবার কবে আপনার সঙ্গে দেখা করবো?

উকিলবাবু বললেন -আসছে মঙ্গলবার আসুন। মনে হয় তার মধ্যেই আপনাদের মেয়েটিকে আমি কোর্টে হাজির করতে পারবো—

ঠিক তাই-ই হলো। সেদিন সন্দীপ ব্যাঙ্ক থেকে হাজিরা খাতায় সইটা করেই সোজা চলে এলো কোর্টে। খোঁজ-খবর নিয়ে সন্দীপ যখন জজের এজলাসে ঢুকলো তখন দেখলো সত্যিই বিশাখা তার কাঠগড়ার মধ্যে রয়েছে। একটা চেয়ারে তাকে বসতে অনুমতি দিয়েছেন জজ। তখন জেরা করা শেষ হয়ে গিয়েছে।

উকিলবাবু তখন সন্দীপকে দেখিয়ে দিয়ে জজকে বললেন—স্যার, এই যে, বিশাখার রিলেটিভ্ এসে গেছেন। এঁরই নাম সন্দীপ লাহিড়ী—ইনিই ক্লেমেণ্ট, শ্রীমতী বিশাখার গার্জিয়ান—

জজ এবার এক-নজরে সন্দীপকে দেখে নিয়ে বিশাখাকে জিজ্ঞেস করলেন- আপনি ভালো করে ও'র দিকে চেয়ে দেখুন, আপনি কি ও'কে চেনেন?

বিশাখা সন্দীপকে দেখে বললে—হ্যাঁ—

—ও'র নাম কী?

হৃৎকম্প হয়। তবু অসীম ধৈর্য নিয়ে সন্দীপ সব দিক একলা সামলিয়েছে। একদিকে সংসারের মানুষের খাওয়া-পরার যোগান দেওয়া, তার সঙ্গে আবার মাসিমার ওই অসুস্থতা। তার ওপর বাড়তি ভাবনা বিশাখাকে নিয়ে। অনেক সময় তার মনে হতো কেন সে ওদের দুজনকে এই বেড়াপোতায় নিয়ে এলো। ওদের বেড়াপোতাতে না নিয়ে এলে তো মাকে নিয়ে আরামেই থাকতে পারতো।

মা কিন্তু ওদের নিয়ে আসার জন্যে কোনও দিন এতটুকু অনুযোগ করেনি। একদিনও বলেনি যে—তুই আবার ওদের নিয়ে এলি কেন বাবা এখানে? ওদের জন্যে যে সন্দীপের অনেক টাকা বাজে-খরচ হচ্ছে, সে-কথাও কোনওদিন মা'র মুখ থেকে বেরোয়নি। সত্যিই, তার মা'র কাছ থেকে সে যা পেয়েছে তার জন্যে ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। তার মা ছাড়া অন্য যে-কোনও মা হলে নিশ্চয় ছেলের ইচ্ছেকে অস্বীকার করতো, কিন্তু সন্দীপের মা কেবল সন্দীপের মা বলেই সন্দীপ আজ সন্দীপ হতে পেরেছে।

কোথায় প্রেসিডেন্সী জেল, আর কোথায় আলিপুর কোর্ট! উকিল-ব্যারিস্টারদের সঙ্গে মেশবার বা তাদের জানবার কোনও সুযোগ কখনও হয়নি তার, এক কাশীনাথবাবু ছাড়া। সেই কাশীনাথবাবুর কাছ থেকেই সন্দীপ একদিন শুনেছিল যে হাইকোর্ট নাকি তার 'চরিত্র' হারিয়ে ফেলেছে। সেই জন্যেই তিনি ওকালতি করা ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই সন্দীপকেই যে আবার একদিন সেই কোর্টেই যেতে হবে তা সেদিন সে ভাবেনি।

কোর্টে কাউকেই সে চেনে না। কোর্টের ভেতরে আগে সে কখনও ঢোকেনি। আগে যখন সে কাশীনাথবাবুকে দেখে উকিল হতে চেয়েছিল তখন কোর্ট সম্বন্ধে তার অন্য ধারণা ছিল। কিন্তু সেদিন উকিলদের সেরেস্তার চেহারাগুলো দেখে সে তাজ্জব হয়ে গেল। সে যদি উকিল হতো তো এই ভাঙা ঝুপড়ির মধ্যেই তো তাকে সারাজীবন কাটাতে হতো। তাহলে কে তাকে বাঁচিয়েছে? কে?

সবাই তাকে দেখে বুঝতে পেরে গিয়েছিল যে সে একজন উকিলের খোঁজে এসেছে।

ঝুপড়ির ভেতর থেকে কে একজন লোক জিজ্ঞেস করলে—কিছু চাই? উকিলবাবুকে খুঁজছেন? কিন্তু এখন তো তিনি এজলাসে গেছেন...

সন্দীপ সেদিন হন্যে হয়ে ঘুরেছিল সমস্ত কোর্টময়। সব উকিলই ব্যস্ত। কারো সময় নেই। সবাই টাকার ধান্ধায় চরকির মতো ঘুরছে। তাদের সকলেরই একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান টাকা। টাকা ছাড়া আর কোনও কিছু কাম্য তাদের কাছে নেই। ঘুরতে ঘুরতে হয়রান হয়ে শেষে সে একটা চালাঘরে গিয়ে একটা খালি টুলের ওপরে বসলো তাদের ব্যাঙ্কে যে-সব লোকদের সে দেখেছে তাদেরও প্রায় সকলেই টাকার কাঙাল। এক-একজন মানুষ আবার তিন-চারজনের মিথ্যে নামে টাকা রাখে। একই লোক তিন-চারটি নামে টাকা গচ্ছিত রাখে। মাঝে-মাঝে তার মনে হয় এই উকিলগুলোর মতো সেই লোকগুলোকেও সে জিজ্ঞেস করে এত টাকা-টাকা করে কেন তারা? এই জীবনের পরে তো সকলকেই একদিন-না-একদিন অন্য এক দেশে চলে যেতে হবেই। কিন্তু সে-দেশে কি এ-দেশের টাকা চলবে? সে-দেশে কি ব্যাঙ্ক আছে? এ-দেশের ব্যাঙ্কের এ্যাকাউন্ট কি সে-দেশে ট্রানসফার করা যায়?

ওদিকে দেরি হয়ে যাচ্ছে। সন্দীপ সোজা গিয়ে একটা জজের এজলাসে ঢুকলো। সেখানে তখন অনেক ভিড়। কালো-কালো পোশাক পরে দুজন উকিল কী সব কথা বলছে। আর জজ-সাহেব একলা বসে বসে একটা কাগজের ওপর কী সব লিখছে। আর যারা ঘরে রয়েছে তারা উকিল দুজনের কথা চুপ চাপ শুনে যাচ্ছে। সন্দীপ জীবনে সেই-ই প্রথম কোর্টে যেতে বাধ্য হয়েছিল। তার আগে কখনও কোর্টে যায়নি। পরেও

কখনও যায়নি। কিন্তু পরে সে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছে—হে ভগবান, তুমি আমাকে আর যা-কিছু অভিশাপ দাও, আমি কিছু বলবো না। কিন্তু আমাকে যেন কখনও কোর্টে যেতে না হয়—

কিন্তু না, সে-কথা এখন থাক...

শেষকালে জজ-কোর্টের অফিসে ঢুকে দেখলে একটা চেয়ারে এক ভদ্রলোক বসে বসে কী লিখছেন। তাঁর কাছে সন্দীপ গিয়ে দাঁড়ালো।

ভদ্রলোক মুখ তুলে জিজ্ঞেস করলেন—কী চাই?

সন্দীপ তার নিজের কোর্টে আসার কারণটা বললে। তারপরে বললে—এখন আমার কী করণীয় তা বুঝতে পারছি না। আপনি যদি দয়া করে একটু সাহায্য করেন। খরচ-পত্র যা লাগে আমি তাই-ই দেব—

ভদ্রলোক বললেন—কী নামটা বললেন?

সন্দীপ বললে—বিশাখা গাংগুলী।

—কুমারী, না বিবাহিতা?

সন্দীপ বললে—কুমারী—

তারপর একটু থেমে আবার বললে—বিশাখার আপন বলতে কেউ-ই নেই। যাঁরা আছেন তাঁরাও তাদের দেখেন না। আর তার মা আছেন। তিনি বিধবা। তিনিও বলতে গেলে রোগী। ডাক্তাররা সন্দেহ করছেন তাঁর ক্যানসার হয়েছে—

ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন—আর আপনি? আপনি তাঁদের কে হন?

সন্দীপ বললে—আমি তাঁদের কেউ নই।

—আপনি কোথায় থাকেন?

—বেড়াপোতাতে। আমি একটা ব্যাঙ্কে চাকরি করি। ডেলি-প্যাসেঞ্জারি করি বেড়াপোতা থেকে কলকাতায়।

ভদ্রলোক এবার যেন একটু নড়ে বসলেন। জিজ্ঞেস করলেন—এই বিশাখা যদি আপনার কেউ না হন, তাহলে এঁদের জন্যে আপনি এত করছেন কেন?

সন্দীপ বললে—কেন করছি তার কোনও জবাব দিতে পারবো না আমি। বলতে পারেন ভগবানই বোধহয় তাঁদের সংগে আমার যোগাযোগ ঘটিয়ে দিয়েছেন। নইলে এঁরা মা-মেয়ে দুজনেই একদিন জলে ভেসে যেতো—

তারপর একটু থেমে বললে—আমার সঙ্গে এঁদের যোগাযোগ একটা দৈব-ঘটনা। সে গল্প বলতে অনেক সময় লাগবে। আমি না-হয় কোনও একদিন এসে আপনাকে সব বলে যাবো। আমি লালবাজারের পুলিশের মিসিং-স্কোয়ার্ড' অফিস থেকে খবর পেলাম যে বিশাখাকে প্রেসিডেন্সী জেলের হাজতে রাখা হয়েছে। তাঁরাই আমাকে এই কোর্টে এসে পিটিশন্ করতে বলে দিলে। আমি জীবনে কখনও কোর্টে আসিনি। আমি কোর্টের নিয়ম-কানুন কিছুই জানি না। আপনি যদি এ-ব্যাপারে একটু সাহায্য করেন তো আমি চিরকালের জন্যে আপনার কেনা হয়ে থাকবো—

কথায় আছে ভাগ্যবানের বোঝা ভগবান বয়।

কিন্ত সন্দীপ তো ভাগ্যবান নয়। তাহলে তার কপালে এমন পরোপকারী লোক জুটলো কী করে। ভদ্রলোকের মনে কী হলো কে জানে। তিনি বললেন—আপনি একটু বসুন এখানে দেখি আমি কী করতে পারি—

বলে তিনি বেরিয়ে গেলেন। আর সন্দীপ সেই ঘরে একলা বসে রইলো। সেখানে বসে বসেই তার মনে হলো সে যেন অনন্তকাল ধরে বসে আছে তার তার চোখের সামনে দিয়ে দিন-মাস-বছর-যুগ-কল্পলোক সমস্ত একে একে দূরে চলে যাচ্ছে। শেষকালে যখন যুগ-যুগান্ত অতিবাহিত হলো তখন কার গলার আওয়াজ শুনে সে

বিশাখা বললে—সন্দীপ লাহিড়ী—

জজ আবার জিজ্ঞেস করলেন—আপনি ও'র সঙ্গে যেতে চান?

বিশাখা এবারও বললে—হ্যাঁ—

জজ সাহেব ঘচ্-ঘচ্ করে কী সব লিখছিলেন। এবার মুখ তুলে একটা কাগজে কী লিখে তাঁর পেশকারের দিকে এগিয়ে দিলেন।

উকিলবাবু তখন বেঞ্চ-ক্লার্কের কাছে গিয়ে কী সব কথা বলতে লাগলেন। তার-পর সন্দীপকে কাছে ডাকলেন। সন্দীপকে একটা জায়গায় সই করতে বললেন। উকিলবাবু বললেন—নিচেয় তারিখটা দিন—

সন্দীপের হাতের আঙুলগুলো তখন থর-থর করে কাঁপছে। সন্দীপের পর বিশাখাকেও ডাকলেন তিনি। বললেন—আপনিও সন্দীপ লাহিড়ীর নামের নিচেয় একটা সই করুন।

বিশাখার হাতের আঙুলগুলোও তখন কাঁপছে! উকিলবাবু বললেন—ভয় পাচ্ছেন কেন? সই করুন। নামের নিচেয় তারিখ দিন। অতো ভয় পাওয়ার কী আছে? এখন আনন্দ করুন। এখন তো আর ভয়ের কিছু নেই।

তারপর যখন সব কিছু শেষ হলো তখন জজ-সাহেব অন্য আর একটা মামলা আরম্ভ করে দিয়েছেন। বেঞ্চ-ক্লার্কের লোক আবার অন্য আসামীর হাজিরার জন্যে হাঁক শুরু করে দিয়েছে।

বাইরে আসতেই সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—এবার কোথায় যেতে হবে?

সঙ্গে বিশাখাও ছিল। উকিলবাবু বললেন—কোথায় আবার যাবেন? বাড়ি যান এবার—

—বাড়ি?

উকিলবাবু বললেন—হ্যাঁ-হ্যাঁ বাড়ি, বাড়ি যাবেন না তো কোথায় যাবেন?

সন্দীপ বলতে গেল—কিন্তু...

—আবার 'কিন্তু' কীসের? আর 'কিন্তু' নেই।

সন্দীপ বললে—আপনি আমার জন্যে এত কিছু করলেন, আপনাকে কিছু...

উকিলবাবু বললেন—না। টাকার কথা বলছেন? এ-কেসে আমি কিছু নেব না...আপনি বাড়ি যান, সুখে থাকুন, আমি যাই। আর একটা ঘরে আমার একটা হিয়ারিং আছে, আমি যাই...

বহুদিন আগে কাশীনাথবাবুর কাছে শুনেছিল যে কোর্ট নাকি তার 'চরিত্র' হারিয়েছে বলেই তিনি তাঁর প্র্যাকটিশ ছেড়ে দিয়েছেন। কিন্তু এই উকিলবাবু তো তার কাছ থেকে কোনও টাকাও দাবী করলেন না। সন্দীপ তাই তাঁর নামটা এখনও মনে করে রেখে দিয়েছে। কেশবচন্দ্র ঘোষ। এ্যাডভোকেট। কাশীবাবু তারক ঘোষের ব্যাপারে গোপাল হাজরার বিরুদ্ধে কোনও উপকার করতে ব্যর্থ হয়েই সন্দীপকে উকিল হতে বারণ করেছিলেন। আর এই কেশবচন্দ্র ঘোষ! শুরু থেকে তার জন্যে এত কান্ড করে গেলেন, এত পরিশ্রম করলেন, এত সময় দিলেন, অথচ কোনও একটা টাকাও দাবী করলেন না! তা হলে তো পৃথিবীতে এখনও ভালো লোক আছে! এখনও কেশববাবুর মতো মানুষ আছে বলেই হয়তো এই পৃথিবীটা এখনও চলছে; এই পৃথিবীটার চলা হয়তো তাই এখনও থামেনি!

সন্দীপ কিছুক্ষণের জন্যে একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল। এবার হঠাৎ তার খেয়াল হলো যে বিশাখা তার পাশে রয়েছে। বিশাখাকে দেখেই বোঝা গেল যে সে তখন আর যেন দু'পায়ের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না।

সন্দীপ তাড়াতাড়ি বিশাখার একটা হাত ধরে ফেললে। হাতটা ধরে না ফেললে

হয়তো সে পড়েই যেতো। জিজ্ঞেস করলে—কী হলো শরীর খারাপ লাগছে?

বিশাখার চোখের দৃষ্টিটা যেন কেমন ঘোলাটে-ঘোলাটে। সন্দীপের কথার জবাব না দিয়ে বললে—আমি কোথায়?

সন্দীপ বুঝতে পারলে বিশাখা ঠিক যেন প্রকৃতিস্থ নেই। অথচ কোর্টের ভেতরে তাকে দেখে তো তা বোঝা যায়নি। জজের প্রশ্নের জবাবে বিশাখা তো ঠিক-ঠিক উত্তরই দিয়েছে।

সন্দীপ আবার জিজ্ঞেস করলে—আমাকে চিনতে পারছো তো ঠিক?

বিশাখা বললে—হ্যাঁ—

সন্দীপ আবার জিজ্ঞেস করলে—আমি কে বলো তো? আমার নাম কী?

বিশাখা হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠলো।

সন্দীপ খুব বিপদে পড়ে গেল। জিজ্ঞেস করলে—কাঁদছো কেন?

বিশাখা বলে উঠলো—আমার কী হবে?

সন্দীপ বুঝতে পারলে যে এতদিন জেলখানার মধ্যে থেকে বিশাখার মাথায় কিছু গোলমাল দেখা দিয়েছে। আগেকার মতো বাসে বা ট্রামে হাওড়া স্টেশনে আর সে যেতে পারবে না। তাড়াতাড়ি একটা খালি ট্যাক্সি দেখতে পেয়ে তাতেই বিশাখাকে তুলে নিয়ে বললে—চলো, হাওড়া স্টেশন—

তখনও বিশাখা এক দৃষ্টিতে বাইরের দিকে চেয়ে আছে। পাশেই যে সন্দীপ বসে আছে, সে খেয়ালও যেন তার নেই।

সন্দীপ বিশাখার কাঁধে হাত দিয়ে তার ধ্যান ভাঙালে। বললে—কই, তুমি কিছু বলছো না যে! কিছু কথা বলো!

বিশাখা সে-কথার জবাবে বললে—আমার মা কোথায়?

সন্দীপ বললে—বেড়াপোতাতে। যেখানে ছিলেন সেখানেই তোমার মা আছেন—

কথাটা শুনে বিশাখা যেন একটু শান্ত হলো। বললো—আমার মা'র কাছে আমাকে নিয়ে চলো না। মাকে দেখতে আমার খুব ইচ্ছে করছে—

সন্দীপ বললে—তোমার মা'র কাছেই তো তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি—

বিশাখা বলে উঠলো—ওরা আর আমাকে ধরে নিয়ে যাবে না?

—কারা? কারা তোমাকে ধরে নিয়ে যাবে? আমি থাকতে কেউ তোমাকে ধরে নিয়ে যাবে না।

বিশাখার চোখে-মুখে তখনও ভয়ের চিহ্ন! সন্দীপ বিশাখার দিকে চেয়ে বললে—কে তোমাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল? কার ভয় করছো তুমি? তার নাম কী?

বলতে গিয়েও বিশাখা যেন ভয় পেয়ে আর বলতে পারলো না।

সন্দীপ বললে—বলো, বলো, তার নাম কী বলো? কিছু ভয় পাওয়ার দরকার নেই। দেখলে না, তোমাকে কী-রকম জেল থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে এলুম।

কথাটা শুনে বিশাখা যেন আকাশ থেকে পড়লো। বললে—আমার জেল হয়েছিল? কেন? আমি কী করেছিলুম?

সন্দীপ বললে—তুমি কী করেছিলে তা তুমিই জানো। কিন্তু তুমি ছিলে জেলখানায়—

বিশাখা যেন এবার সব কিছু মনে করতে পারলে। বললে—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার সঙ্গে আরো দশ বারোটা মেয়ে ছিল।

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—তাদের জেল হয়েছিল কেন? কী দোষ করেছিল তারা?

বিশাখা বললে—তা জানি না। কয়েকজন বাংলা দেশের মেয়েও ছিল।

—তারা কী করেছিল?

বিশাখা বললে—চাকরির লোভে তারা সবাই ইণ্ডিয়ায় এসেছিল—

ট্যাক্সিটা তখন হু-হু করে চলেছে। আর বিশাখা তখনও ঘোলাটে-দৃষ্টি দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে দেখছিল। হঠাৎ বললো—এইটে গড়ের মাঠ না?

সন্দীপ বললে—হ্যাঁ। তুমি চিনতে পেরেছ তো ঠিক—

হঠাৎ বিশাখা বলে উঠলো—আমাকে একটা চকলেট কিনে দেবে?

সন্দীপ চমকে উঠলো। বললো—কী বলছো?

বিশাখা বললে—চকলেট। আমার চকলেট খেতে খুব ভালো লাগে—

সন্দীপ চকলেট-এর কথা শুনে অবাক হয়ে গেল। এত জিনিস থাকতে বিশাখা চকলেট খেতে চাইছে কেন? তবে কি বিশাখার খুব ক্ষিধে পেয়েছে? সকালবেলা তুমি কিছু খেয়েছ?

বিশাখা বলল—না—

সন্দীপ বললে—তাহলে আমরা এখানে নামি। আগে কিছু খেয়ে নাও, বাড়িতে পৌঁছতে তো অনেক দেরি হবে, ততক্ষণ তুমি না-খেয়ে থাকবে কী করে

ট্যাক্সিটা থামিয়ে সন্দীপ তার ভাড়া মিটিয়ে দিলে। তারপর বিশাখাকে ধরে ধরে রাস্তা পার করে একটা রেস্টুরেন্টে নিয়ে গেল।

—কী খাবে বলো? মোগলাই পরোটা খাবে?

বিশাখা বললে—না, চকলেট কিনে দাও—

সন্দীপ বুঝতে পারলে না চকলেট খাওয়ার জন্যে বিশাখা এত পীড়াপীড়ি করছে কেন? আগে তো বিশাখা এমন ছিল না। হঠাৎ চকলেট খাওয়ার এত নেশা হলো কেন তার?

বিশাখার কথা না শুনে শুধু একজনের খাবারের অর্ডার দিলে সন্দীপ। খাবারও যথাসময়ে এসে গেল। খেতে খেতে বিশাখা আবার বলে উঠলো—কই, চকলেট দিলে না তো আমাকে?

সন্দীপ বললে—বার-বার চকলেট খেতে চাইছো কেন বলো তো?

বিশাখা বললে—চকলেট খেতে আমার খুব ভালো লাগে যে—

কথাটা শুনে সন্দীপের মনে কেমন একটা সন্দেহ হলো। জিজ্ঞেস করলে—আগে তো তোমার চকলেট খাওয়ার এত নেশা ছিল না। এখন চকলেটের ওপর এত নেশা হলো কেন?

বিশাখা বললে—মিস্টার সাহা আমাকে চকলেট খেতে দিয়েছিল। সে কী চমৎকার খেতে। সেটা খেলেই আমার খুব আরাম হতো। মিস্টার সাহার পর হরদয়ালবাবুও আমাকে চকলেট খেতে দিত—

—মিস্টার সাহা? হরদয়ালবাবু? তারা কারা?

হঠাৎ সন্দীপের সমস্ত মনে পড়ে গেল। সেই 'আইডিয়াল ফুড্ প্রোডাক্টস্' কোম্পানির মিস্টার ভবতোষ সাহা! সেইখানেই তো বিশাখা চাকরির জন্যে ইন্টারভিউ দিতে গিয়েছিল। তারপর সন্দীপ তার অফিস থেকে এসে তাকে আর দেখতে পায়নি। তখন থেকেই বিশাখা নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিল। আর তারপরে এতদিন বাদে সন্দীপ আবার উদ্ধার করে নিয়ে এসেছে। তাহলে তারাই কি বিশাখার এই দশা করেছে?

সন্দীপ জিজ্ঞেস করল—তুমি তো 'আইডিয়াল ফুড প্রোডাক্টস্' কোম্পানির অফিসে চাকরির জন্যে ইন্টারভিউ দিতে গিয়েছিলে। তোমার কি সে-সব কথা মনে আছে? বলো, সে-সব কথা কি মনে আছে তোমার?

বিশাখার চোখে-মুখে যেন একটা কেমন অস্থিরতার ভাব ফুটে উঠলো। যেন একটু-একটু করে পুরনো কথা মনে পড়তে লাগলো তার। বললে—আমি কি করবো

এখন ?

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—বলো, আমি তোমার জন্যে কী করতে পারি! আমি তো হাজারবার চাকরি না-করতে তোমাকে বারণ করেছিলুম। তাহলে কেন তুমি আমাকে না-জানিয়ে ওই জায়গায় চাকরির দরখাস্ত করলে ?

বিশাখা সে-কথার কোনও জবাব দিলে না।

সন্দীপ বললে—বলো তো, তারপরে কী হলো ? একটু মনে করতে চেষ্টা করো না। আমি তো তোমাকে বলেছিলুম আমি আমার অফিস থেকে ছুটি নিয়ে তোমাকে নিতে আসবো। বলেছিলুম মনে আছে ?

—হ্যাঁ।

—তাহলে কেন তুমি আমার জন্যে একটু অপেক্ষা করলে না ? কে তোমায় অফিস থেকে বেরিয়ে যেতে বললে ? কার সঙ্গে তুমি বেরিয়ে গেলে ?

বিশাখা বললে—মিস্টার সাহা, এখন মনে পড়ছে ভবতোষ সাহা—

—তিনি কে ?

—আমি তো তাঁর কাছেই ইন্টারভিউ দিয়েছিলুম। ভাবলুম তিনিই তো চাকরি দেবার মালিক, তাই তাঁর কথা শোনা ভালো—

—তারপর ?

—তারপর তিনি বললেন, তাঁর গাড়ি করে হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে দেবেন।

—তারপর ?

—তারপর...বলতে বলতে আবার সব কিছু যেন মাথার ভেতর গোলমাল হয়ে গেল।

সন্দীপ বললে—বলো, তারপর কী হলো বলো ? মনে করতে চেষ্টা করো!

বিশাখা বললে—তারপর গাড়িতে ওঠার পর তিনি আমাকে অনেক জায়গায় নিয়ে গেলেন। আমি বললুম—আমাকে হাওড়া স্টেশনে নিয়ে চলুন। কিন্তু তিনি বললেন না, আগে কোথাও একটু খেয়ে নেওয়া যাক্। তিনি আমাকে একটা হোটেলে নিয়ে গেলেন। কিন্তু সেটা হোটেল নয়, একটা বাড়ি--

—একটা বাড়ি ?

—হ্যাঁ, একটা বাড়ি। সেটা দোকান নয়। সেখানে নিয়ে যেতেই একটা মেয়েমানুষ সামনে এলো। তাকে আণ্টি বলে ডাকে সবাই। সেই আণ্টি আমাদের জন্যে অনেক খাবার নিয়ে এলো। সেই খাবার খেয়েই আমি ঘুমিয়ে পড়লুম। তখন আর আমার কিছু জ্ঞান নেই।

বলতে বলতে বিশাখা যেন একটু ঝিমিয়ে পড়লো।

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—তারপর ? তারপর কী হলো, বলো ?

—তারপর আর জানি না।

—জানি না মানে ? জানতে চেষ্টা করো। মনে করতে চেষ্টা করো না।

বিশাখা বললে—তারপরে আর কিছু মনে পড়ছে না যে!

সন্দীপ বললে—তবু চেষ্টা করো মনে করতে—

বিশাখা বললে—মনে করতে তো চেষ্টা করছি। ...হ্যাঁ, এখন একটু-একটু মনে পড়ছে। সেখানে হরদয়ালবাবু রোজ আমার কাছে আসতো। আর আমাকে চকোলেট খেতে দিত।

—চকোলেট ?

—হ্যাঁ। সেই চকোলেট খেলেই কেমন একটা ঝিমুনি আসতো। আর খানিক পরেই আমি একেবারে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়তুম। তখন খুব আরাম লাগতো আমার। তারপর আর জানি না কী হলো। আমি একদিন দেখলুম হরদয়ালবাবু এসেছেন

একটা খবরের কাগজ হাতে নিয়ে। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন—আপনার নাম কী? আমি আমার নাম বলতেই তিনি যেন চমকে উঠলেন। তারপরে খবরের কাগজের একটা ছবির সঙ্গে আমার চেহারা মিলিয়ে নিতে লাগলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, —ভবতোষ সাহা আপনার কে হন?

আমি বললাম—কেউ না—

তারপরে তারা আমাকে আবার একটা চকলেট খেতে দিলে। আমি আবার ঘুমিয়ে পড়লুম। তারপর কতোদিন যে ঘুমিয়েছিলুম তা মনে নেই। যখন জ্ঞান হলো তখন দেখলুম...

—তখন কী দেখলে?

বিশাখা বললে—তখন দেখলুম আমি জেলখানায়...

ততক্ষণে খাওয়াও শেষ হয়ে গেছে। সন্দীপ দোকানের দাম মিটিয়ে দিলে। বললে —চলো, একটা ট্যাক্সি ধরে হাওড়া স্টেশনে যাই। মাসিমা খুব ভাবছে তোমার জন্যে—

বিশাখা উঠলো। বললে—চলো—

রাস্তায় বেরিয়ে একটা খালি ট্যাক্সি ধরতে হবে। পথে খুব ভীড়। তখনও বিকেল হয়নি। আর একটু পরেই অফিস ছুটি হয়ে যাবে। তখন আরো বাড়বে। তখন হাজার চেষ্টা করেই ট্যাক্সি পাওয়া যাবে না।

বিশাখা হঠাৎ চিৎকার করে উঠলো—ওই যে হরদয়ালবাবু—

—কই?

বিশাখা চিৎকার করে ডাকতে লাগলো—ও হরদয়ালবাবু—

বিশাখার দৃষ্টিকে অনুসরণ করে দেখলে রাস্তার ওপারে দু'জন ভদ্রলোক হাঁটতে হাঁটতে একটা জিপ্ গাড়িতে গিয়ে উঠলো। তাদের দু'জনের মধ্যে একজনকে দেখে সন্দীপ চিনতে পারলে। সে গোপাল হাজরা। তার সঙ্গে অচেনা আর একজন ভদ্রলোক। তাকে সন্দীপ চিনতে পারলে না।

সন্দীপ বিশাখার মুখে হাত চাপা দিয়ে দিলে। বললে—চুপ করো, ডেকো না—

বিশাখা তখনও ডাকতে চেষ্টা করছে। কিন্তু সন্দীপ বিশাখার মুখটা আরো জোরে চেপে ধরলে। ততক্ষণে জিপ্‌টা স্টার্ট দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে।

সন্দীপ হাতটা টেনে নিয়ে বললে—কাকে ডাকছিলে? কে হরদয়ালবাবু?

বিশাখা বললে—হরদয়ালবাবু। আমাকে অনেক চকলেট খেতে দিয়েছে—

সন্দীপ নামটা শুনে অবাক হয়ে গেল। হরদয়ালবাবু যে-ই হোক, গোপাল হাজরার সঙ্গে তার কী যোগাযোগ? গোপাল হাজরার সঙ্গেই বা ওই হরদয়ালবাবুর এত ঘনিষ্ঠতা কেন? গোপাল হাজরা জিপ্ চালিয়ে চালিয়ে সারা রাত পুলিসদের হাতে অতো টাকা দিয়ে বেড়ায়ই বা কেন? কীসের স্বার্থ সে সিদ্ধি করে পুলিসদের ঘুষ খাইয়ে খাইয়ে? তবে কি সে-স্বার্থের সঙ্গে হরদয়ালবাবুর স্বার্থও জড়িয়ে আছে? বিশাখাকে অতো চকলেট খাইয়ে সে গোপাল হাজরার স্বার্থই সিদ্ধি করে নাকি?

আর 'আইডিয়াল ফুড্ প্রোডাক্টস'-এর ভবতোষ সাহারও কোনও স্বার্থ আছে নাকি এ-ব্যাপারে? সন্দীপ অবাক হয়ে গেল গোপাল হাজরাকে দেখে। সব ব্যাপারটাই যেন রহস্যজনক ঠেকলো সন্দীপের চোখে। সেই তাঁদের বেড়াপোতার ছেলে গোপাল হাজরার এত দাপট! অথচ সে তো কোনও লেখা-পড়া শেখেনি। সে তখন কতোবার সন্দীপকে বলেছে লেখা-পড়া করে নাকি মানুষের কোনও উপকার হয় না। তাহলে কীসে মানুষের উপকার হয়?

গোপাল হাজরা বলতো—মানুষ লেখা-পড়া করে কীসের জন্যে? টাকা উপায় করবার জন্যেই তো! যদি টাকা উপায় করাই মানুষের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য হয়

তাহলে তার জন্যে অনেক রাস্তা খোলা আছে। তুই কলকাতায় চলে যা, সেখানে গিয়ে দেখবি যারা সেখানে অনেক টাকার মালিক তারা কেউই জীবনে কোন' রকম লেখা-পড়া করেনি। তোদের ধারণা ভুল রে সন্দীপ, ভুল! লেখা-পড়া করে সময় নষ্ট না করে আমার মতোন টাকা উপায়ের ধান্দাই দেখ্। তাহলে দেখবি তোর অনেক টাকা হবে! আর যেই তুই অনেক টাকার মালিক হবি তখন দেখবি জীবনে যা-কিছু তুই কামনা করেছিলি সমস্তই তোর পায়ের তলায় এসে লুটোপুটি খাচ্ছে। যা-কিছু, দেখবি তুই সবার ভালোবাসা পাবি, সবাই তোর কাছে এসে হাত-জোড় করে দাঁড়াবে। দেখবি সবাই তোকে শ্রদ্ধা করছে, ভয় করছে, ভক্তি করছে।

সন্দীপ গোপাল হাজরার কথাগুলো মন দিয়ে শুনতো। কথাগুলো হয়তো সে কিছুটা বিশ্বাসও করতো। সন্দীপ ভাবতো সে কলকাতায় গিয়ে অনেক টাকা উপায় করলে তার মাকে সে সুখে-স্বচ্ছন্দে রাখতে পারবে। মাকেও আর কোনও কষ্ট করতে হবে না, পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে মা তখন আরাম করে চাকর-বাকরদের ওপর কেবল হুকুম চালাবে।

কিন্তু বিডন স্ট্রীটের মুখার্জি বাবুদের বাড়িতে আসার পর থেকেই সে গোপাল হাজরার কথার অসামঞ্জস্য বুঝতে পারলো। বুঝতে পারলে টাকাটাই সংসারে সব অনর্থের মূল। বেশি টাকা থাকা যে কতো বিপদের তা সৌম্যবাবু আর মুক্তিপদবাবুকে না দেখলে সে বুঝতেই পারতো না। সে তাদের অত কাছে-কাছে না থাকলে জানতেই পারতো না সে টাকার পেছনে কত বিনিদ্র রাতের গ্লানি জড়িয়ে থাকে, ইনকাম-ট্যাক্সের কতো অত্যাচার তাদের অম্লান-বদনে সহ্য করে যেতে হয়, লেবার ইউনিয়নের কতো বীভৎস দাবী জীবনকে বিভীষিকাময় করে তোলে। সত্যিই তো টাকা দিয়ে বিছানা কেনা যায় বটে, কিন্তু ঘুম তো কেনা যায় না, ওষুধ কেনা যায় বটে, কিন্তু টাকা দিয়ে স্বাস্থ্য কি কেনা যায়? টাকা দিয়ে বই কেনা যায় বটে কিন্তু প্রতিভা কি কেনা যায়? টাকা দিয়ে বাড়ি কেনা যায় বটে, কিন্তু গৃহসুখ? টাকা দিয়ে কি গৃহসুখ কেনা যায়?

আজ সেই টাকার সঙ্গে সঙ্গে আর এক উপদ্রব এসে হাজির হয়েছে। সে হলো এই 'চকলেট'। শুধু চকলেট নয়। তার সঙ্গে এসে হাজির হয়েছে 'ফুচকা', এসে হাজির হয়েছে 'পানের মশলা', তার সঙ্গে যে আরো কতো উপদ্রব এসে হাজির হয়েছে তারও গোনাগুন্তি নেই। সে উপদ্রবের আর এক শিকার এই বিশাখা। সেই গরীব, অর্থলোভী তপেশ গাঙ্গুলীর ভাইঝি এই বিশাখা।

সন্দীপ সেই গোপাল হাজরা আর হরদয়ালের জিপ্‌টার দিকে চেয়ে চেয়েই ভাবলো শুধু ওরাই যে উপদ্রবটাকে জীইয়ে রেখেছে তাই-ই নয়, এই পৃথিবীর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সমস্ত মানুষরাই এর জন্যে দায়ী। সবাই কেবল প্রয়োজনটাকে নিয়েই হিম-শিম খেয়ে যাচ্ছে। প্রীতিটা নিয়ে কারো মাথা-ব্যথা নেই। সবাই কেবল ক্ষণকালটা নিয়েই মেতে আছে, চিরকালটা নিয়ে কারো দুশ্চিন্তা নেই।

একটা খালি ট্যাক্সি সামনে আসতেই সন্দীপ হাত তুলে তাকে থামালে। তারপর বিশাখাকে গাড়িতে তুলে নিজেও ভেতরে উঠে বসলো। বললে—চলুন হাওড়া স্টেশন—

মুক্তিপদবাবু যখন মিস্টার দাশগুপ্তের চেম্বারে এলেন, তখন রোজকার মতো সে-ঘরে অন্য অনেক মক্কেলের ভিড় ছিল। কিন্তু নীরদবাবু একে-একে সকলকে বিদায় করে দিলেন। তখন ঘড়িতে বাজে সাড়ে আটটা। এক ঘণ্টার মধ্যেই নীরদবাবুকে কোর্টে বেরোতে হবে। মুক্তিপদবাবুর চেহারা দেখে নীরদবাবু অবাক হয়ে গেলেন। বললেন—এ কী? এ-রকম চেহারা হয়েছে কেন আপনার?

মুক্তিপদবাবু বললেন—তা না হলে আপনার কাছে আসি? এখন আপনিই আমাকে এ বিপদ থেকে বাঁচাতে পারেন—বলে আগাগোড়া সব ঘটনাটা বলে গেলেন।

শেষকালে বললেন—বলুন, আমি এখন কী করবো? আমার মা'র যা অবস্থা দেখে এসেছি, তাতে খুব ভয় ধরে গেছে। শেষ জীবনে আর বোধহয় বাঁচানো যাবে না মা'কে।

নীরদবাবু বললেন—আপনি মা'কে বাঁচাবার জন্যে যা করবার করুন, আমি এদিকের ব্যাপারটা দেখছি।

বলে নিজের স্টেনোগ্রাফারের দিকে চেয়ে কী একটা ফর্ম চেয়ে নিয়ে মুক্তিপদবাবুর দিকে এগিয়ে দিলেন। বললেন—আপনার মা'র কাছ থেকে এই জায়গায় একটা সই করিয়ে আনুন। আপনার ভাইপো তো তার ঠাকুমা'র কাছেই থাকতো?

—হ্যাঁ!

—আর একটা কথা, আপনার ভাইপোর সঙ্গে যে মেমটার বিয়ে হয়েছিল সে দেশে তার নিজের বলতে কে-কে আছে? বাবা, মা, কি ভাই-বোন...

—শুনেছি তার বিধবা মা ছাড়া আর কেউ নেই। তাকে মাসে-মাসে দুশো পাউন্ড পাঠাবার কন্‌ডিশন্ ছিল। তা ঠিক মতো পাঠানো হয়নি বলে প্রায়ই রোজ দু'জনের মধ্যে কথা কাটাকাটি হতো। একদিন নাকি মেমটা ঘুমন্ত সৌম্যর বুকের ওপর উঠে তার গলা টিপে ধরে তাকে খুন করতে গিয়েছিল...

—সে কী? তারপর?

—তারপর আর কী? সৌম্যর চেঁচামেচিতে ঝি-চাকররা টের পেয়ে হৈ-চৈ করে ওঠে। তখন মা-মণি সৌম্যকে ধরে টেনে নিয়ে এসে তাকে সে-রাতের মতো নিজের ঘরে শুইয়ে রেখেছিল। সে-রাত্রে সৌম্য আর তার বউ-এর সঙ্গে এক বিছানায় শোয়নি।

—তারপর?

—তারপর মা-মণি আমাকে খবর দেন। আমি গিয়ে আমার ভাইপোর সঙ্গে কথা বলি। সে বললে—মেমটা নাকি তাকে ডিভোর্স করতে রাজি আছে যদি তাকে কুড়ি হাজার পাউন্ড কম্‌পেন্‌সেশন্ দেওয়া হয়। আমি তাতেও রাজি হয়ে যাই। কুড়ি হাজার পাউন্ড দিলেই যদি আপদ দূর হয় তো যেমন করে পারি তা আমি দেব।

—তারপর?

মুক্তিপদবাবু বললেন—সেইসব কথাই চলছিল, এমন সময় এই কাণ্ড ঘটলো। ওই খবর শুনে আমি ভোরবেলাই বিডন স্ট্রীটের বাড়িতে গিয়ে দেখি পুলিস এসে বাড়িতে চাকর-বাকর-ঝি সকলের স্টেট্‌মেণ্ট নিচ্ছে। আমার ভাইপোকেও তারা এ্যারেস্ট করে নিয়ে গেল। তখন মনে পড়ে গেল আপনার কথা। ভাবলাম আপনি ছাড়া এই বিপদে আর কে আমাকে বাঁচাতে পারবে! তাই আপনাকেই টেলিফোন করলাম—

ওদিকে ঘড়িতে তখন সাড়ে নটা বাজে। নীরদবাবুর তখন কোর্টে যাওয়ার সময় হতে চলেছে। তিনি ঘড়ির দিকে চাইতেই মুক্তিপদবাবু বললেন—আমি উঠি, আপনার দেরি হয়ে যাচ্ছে—তাহলে বলুন এখন আমার কী কর্তব্য?

নীরদবাবু বললেন—আপনাকে কিছুই করতে হবে না। সব করবো আমি। আপনার কথাগুলো সমস্ত আমি জট্-ডাউন্ করে নিয়েছি। আমি আজ আপনার ভাইপোর

জন্যে জামিনের এ্যাপ্লিকেশন করে দেব।

—মার্ডার-কেস-এ জামিন পাওয়া যাবে?

নীরদবাবু বললেন—সেটা আপনার ভাববার ব্যাপার নয়। সেটা ভাববো আমি। ড্যানিয়েল ডিফো-র একটা কথা আমি আমার সব ক্লায়েন্টদের বলি: 'every man is innocent in his own eyes', এখন বেল্-এ্যাপ্লিকেশনটা তো করে দিই, তারপর দেখি কী হয়।

মুক্তিপদবাবু নমস্কার করে বাইরে বেরিয়ে গিয়ে গাড়িতে উঠে বসলেন। ড্রাইভারকে বললেন—বাড়ি চলো—
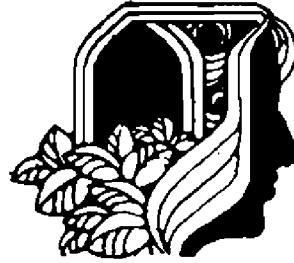
যেখানে মানুষ দল বেঁধে কাজ করে সেখানে ফাঁকি দেওয়া চলে। যেমন অফিস। অফিসে সবাই দল বেঁধে কাজ করে। তার মধ্যে কে ফাঁকি দিচ্ছে, কে কাজ করছে, তা ধরা বড়ই শক্ত। দশজনের মধ্যে একজন অনুপস্থিত হলে তা কারো বড়ো একটা নজরে পড়ে না। একজনের অভাব অন্য ন'জন কাজ করে সেটা পুষিয়ে দেয়।

কিন্তু সংসারে এমন অনেক লোক থাকে যারা বাইরের সমাজে দশজনের সঙ্গে মিলে-মিশে থাকলেও, আসলে একলা। বাইরে থেকে তাদের বোঝা না গেলেও তারা একেবারে নিঃসঙ্গ। রাজনীতি একজনকে নিয়ে করা যায় না। সিনেমাও একজনকে নিয়ে হয় না। খেলাধুলোও তাই। ওগুলো সমস্তই দলবদ্ধ কাজ।

কিন্তু কবি? দার্শনিক? একলা চলাই তাদের বিধিলিপি! তাদের কেউ চিনবে না, তাদের কেউ উৎসাহ দেবে না, তাদের কেউ সঙ্গ দেবে না, জীবনের কণ্টক-কুটিল পথে বিচরণ করে তারা ক্ষয় হয়ে যাবে, তবু কারোর সঙ্গে তারা হাত মেলাবে না। তবু তারা একলাই তাদের সংগ্রাম চালিয়ে যাবে। কারোর সঙ্গে আপোস করবে না।

এই সন্দীপ সেই মুষ্টিমেয় কয়েকজনের মধ্যেই একজন। তার সংগ্রাম একক-সংগ্রাম। তার সংগ্রামে তাই ফাঁকি নেই। নইলে কেন সে বিশাখা আর তার বিধবা মা'কে নিয়ে এসে তার নিজের বাড়িতে তুললে? তাতে কি তার কোনও স্বার্থ ছিল? সে নিজেও নিজেকে এই প্রশ্ন বার-বার করেছে। কিন্তু সে-প্রশ্নের একটা উত্তরই পেয়েছে। সে উত্তরটা হলো 'না'।

রাত্রের ট্রেনে বিশাখাকে নিয়ে যখন সে বেড়াপোতার বাড়িতে ফিরলো তখন অন্য-দিনের মতো মা ছেলের জন্যে একলা অপেক্ষা করছিল।

ছেলের গলা পেয়েই মা লাফিয়ে উঠেছে। দরজাটা খুলে দিয়েই কী বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই সন্দীপ বলে উঠলো—এই দেখ মা, কাকে এনেছি—

মা বিশাখাকে দেখেই তাকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরেছে।

বললে—ওরে, এ কী চেহারা হয়েছে মেয়ের? মেয়ের এমন দশা কে করলে?

বিশাখাও মাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে আরম্ভ করেছে। মা বললে—কাঁদছো কেন মা? কোথায় ছিলে তুমি এত দিন? এমন দশা কে করলে তোমার?

সংসারে যারা নিশ্চিন্তে, নির্বিঘ্নে, নিরুপদ্রবে বাঁচতে চায় তারা নিজের বাড়ির চারদিকে পাঁচিল তুলে দিয়ে জানালা-দরজা বন্ধ করে বসবাস করে। উদ্দেশ্য হলো সব কিছু আবিলতা থেকে নিজেদের রক্ষা করা। আসলে তারা তাদের ঘরকে ভালোবাসে না।

কিন্তু আসলে তারাই ঘরকে ভালোবাসে যারা দরজা-জানালা বন্ধ না রেখে বাইরের আলো-বাতাস-জল-তাপকে ভেতরে ঢুকতে দেয়। বাইরের সঙ্গে ভেতরের যতো আদান-প্রদান হয় ততোই গৃহস্থের পক্ষে কল্যাণকর—এ-কথা তারা একবারও ভাবে না।

ঠাকমা-মণি নিজের বাড়ির সদর-দরজা রাত ন'টার মধ্যে বন্ধ করবার আদেশ দিয়েই ভেবেছিলেন তিনি নিশ্চিন্ত। বাড়ির বাইরে থেকে কিছু আর পাপ ভেতরে ঢুকবে না। কিন্তু তাতে যে বাড়ির আবহাওয়াও দূষিত হয়ে উঠবে তার দিকে তিনি নজর দেবার সময়ও পাননি।

তার মানেই তিনি ঘরকে ভালোবাসেননি। তাই যখন সেদিন ভোরবেলায় পুলিস এসে তাঁর নাতিকে খুনের অপরাধে ধরে নিয়ে গেল তখন নিজের নির্বুদ্ধিতায় নিজেই নিজের কপাল চাপড়াতে লাগলেন। তারপর এক সময়ে তিনি অজ্ঞানও হয়ে গেলেন।

তখন মুক্তিপদবাবুর অবস্থা সহজেই কল্পনা করে নেওয়া যায়।

সঙ্গে সঙ্গে তিনি টেলিফোনে তাঁর ডাক্তারকে খবর দিয়ে বাড়িতে আনিয়ে নিলেন। ডাক্তার এসে সমস্ত অবস্থা বুঝে কী ওষুধ দিলেন তা বাইরের লোক কিছু জানতে পারার কথা নয়। তাই কেউ তা জানতে পারলেও না। কিন্তু ওষুধ খেয়েই তিনি বিছানায় সেই যে শুয়ে অজ্ঞান হয়ে রইলেন, সেই ঘোর তিন দিন ধরে তাঁর আর কাটলো না।

তাঁর শুয়ে থাকলে মুখার্জি-বাড়ির লোকজনদের চলে, কিন্তু মুক্তিপদবাবুর তো চলে না। তাঁকে একলাই সব দিকগুলো সামলাতে হবে। তাঁর ফ্যাক্টরি গোল্লায় যাক, তাঁর কোম্পানি রসাতলে যাক, সে-সব নিয়েও যেমন ভাবতে হবে, তার সঙ্গে নিজের স্ত্রী আর মেয়ের ঝামেলাও তেমনি সহ্য করতে হবে। আবার তার সঙ্গে মা-মণি আর সৌম্যর কথাও তাঁকে একলাই ভাবতে হবে। হাজার-হাজার-লক্ষ-লক্ষ টাকার মালিক হলেও তাঁকে সাহায্য করার জন্যে একটা লোকও তাঁর নেই।

পুলিস তো সৌম্যকে ধরে নিয়ে চলে গেল। এখন এর পর তো তাঁকে হাত গুটিয়ে চুপ করে বসে থাকলে চলবে না। তাঁকে তো কোর্ট-পুলিস-এ্যাডভোকেটদের কাছে পরামর্শ নিতে যেতেই হবে। কিন্তু কোন এ্যাডভোকেটের কাছে যাবেন তিনি?

হঠাৎ মনে পড়ে মিস্টার দাশগুপ্তের কাছে। বড় ব্যস্ত মানুষ এই মিস্টার দাশ-গুপ্ত। মিস্টার এন. আর. দাশগুপ্ত। অনেক কাল আগে একটা বিশেষ মামলার সূত্রে এক ক্লাবে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল তাঁর। মুক্তিপদ তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন —আপনি এত ব্যস্ত মানুষ, ক্লাবে আসবার সময় পান কী করে?

নীরদবাবু হাসতে-হাসতে বলেছিলেন—সময় কি কেউ পায়, সময় করে নিতে হয়।

—কী করে সময় করে নেন?

নীরদবাবু বলেছিলেন—ভুলে গিয়ে!

—ভুলে গিয়ে মানে?

নীরদবাবু বলেছিলেন—আমাদের হিন্দুদের অসংখ্য দেবতার মধ্যে একটা দেবতার

নাম হচ্ছে 'শিব'। তিনি সব কিছু ভুলে থাকেন বলে তাঁর আর একটা নাম 'ভোলানাথ'। ভুলতে পারাও তো একটা আর্ট। ভোলবার জন্যে তিনি সিদ্ধি-ভাঙ্ খেয়ে ধুতুরোর ফল খেয়ে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের যন্ত্রণা ভুলে থাকতেন। আমিও তাই করি। আমি কাজ করবো, চব্বিশ-ঘণ্টা যদি মক্কেলের কথা ভাববো আর আমার ঘুম হবে? তাই কখনও হয়? তাই ওই ভোলানাথ যা খেতেন, এখন আমি তাই খাই—

—আপনিও সিদ্ধি-ভাঙ্ খান?

নীরদবাবু বলেছিলেন—সিদ্ধি-ভাঙ্ খাবো কেন, আমি তারই মডার্ণ সংস্করণ খাই। বলে হো-হো করে হেসে উঠেছিলেন। তারপর হাসি থামিয়ে বলেছিলেন—আগেকার চেয়ে মানুষের জীবন আরো কমপ্লেক্স হয়ে উঠেছে। এখন আরো বেশি লন্‌জিভিটি পেয়েছে মানুষ। আধুনিক কালের মানুষের জীবন এত জটিল হওয়া সত্ত্বেও কেন তার পরমায়ু বাড়লো। বাড়লো তার কারণ মানুষ সব কিছু ভুলে থাকার জন্যে ল্যাবরেটরিতে নতুন ধরনের সিদ্ধি-ভাঙ্ আবিষ্কার করেছে। আমি তাই খাই—

—কী-কী ওষুধ খান?

নীরদবাবু বললেন—যেদিন যতটুকু ঘুমুতে চাই, সেদিন ততটুকু খাই। আর তার চেয়ে বেশি ঘুমোতে চাইলে ওষুধের মাত্রা বাড়িয়ে দিই।

মুক্তিপদবাবু বলতেন—তার মানে?

নীরদবাবু বলতেন—আসলে আপনাকে খুলেই বলি— এই যে এসেছি, এও আমার এক রকম পালিয়ে আসা। যে-টুকু বিশ্রাম নিই তা ছুটির সময়ে ইন্ডিয়া থেকে বিদেশে পালিয়ে গিয়ে। তখনই বলতে গেলে আমার আসল ছুটি। তখন একেবারে নিজেকে ভুলে যাই—

মুক্তিপদবাবু জিজ্ঞেস করতেন—আপনি নিজেকে ভুলতে পারেন?

নীরদবাবু বলতেন—ভুলতে যে পারি তা বলবো না। ভুলতে চেষ্টা করি, এই-ই—

তাও যে নীরদবাবু রোজই ক্লাবে আসতেন তা নয়। দু'মাস কি তিন মাস পরে হয়তো কোনও একটা শনিবার একটু শখ করে ক্লাবে এলেন, আর সকলের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা করে সময় কাটিয়ে চলে গেলেন। কারণ শনিবারগুলো ছিল তাঁর সাপ্তাহিক ছুটির দিন। সেদিন মক্কেলদের জন্যে তাঁর চেম্বার বন্ধ।

সৌম্যর এ্যারেস্ট হওয়ার পরে তাঁর কথাই মুক্তিপদবাবুর প্রথম মনে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে গাইড্ থেকে নম্বর খুঁজে তাঁকেই টেলিফোন করলেন।

ওধার থেকে নীরদবাবুর সাগ্রহ কণ্ঠস্বর ভেসে এল আপনি? এত দিন পরে?

মুক্তিপদ বললেন—বড়ো বিপদে পড়েছি, বিপদে পড়ে আপনার শরণাপন্ন হয়েছি—আমাকে বাঁচাতে হবে।

—সে কী? আপনাকে বাঁচাবো আমি? আমার কি এত ক্ষমতা?

মুক্তিপদবাবু বললেন—হ্যাঁ, সেক্‌শন থ্রি-হানড্রেড্-টু'র মামলা। আপনি ছাড়া আমার আর কেউ নেই—কখন যাবো তাই বলে দিন—

নীরদবাবু বললেন—আপনার জন্যে সব সময় আমার সময়।

—ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি।

নীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত মানেই ইন্ডিয়ান পেনাল কোডের এনসাইক্লোপিডিয়া। হেন আইন নেই যা তাঁর মুখস্থ নয়। প্র্যাকটিশ করতে-করতে তাঁর আইনের আগা-পাশ-তলা জানা হয়ে গেছে। বিশেষ করে ক্রিমিন্যাল কোড্। তিনি বরাবর মক্কেলদের বলতেন, আমরা যখনই কোনও ব্রীফ নিই আমরা প্রথমেই ধরে নিই যে 'every man is innocent in his own eyes', তারপরে 'এভিডেন্স'। এই 'এভিডেন্স' যার বিরুদ্ধে পাওয়া যাবে তারই নাম হলো 'জাস্টিস্'।

উত্তর দিতে গিয়ে বিশাখা আরো কেঁদে উঠলো।

শুধু একবার জিজ্ঞেস করলে—আমার মা কোথায়? মা নেই?

মা বললে—তোমার মা পাশের ঘরে শুয়ে আছে।

কথাটা শুনেই বিশাখা পাশের ঘরের দিকে যাচ্ছিল. কিন্তু সন্দীপ তাকে বাধা দিলে। বললে—তোমার মা এখন ঘুমোচ্ছে, তুমি গেলে মাসিমার ঘুম ভেঙে যাবে।

বিশাখা বললে—কিন্তু আমার যে মা'কে খুব দেখতে ইচ্ছে করছে—

সত্যিই তখন ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে মাসিমাকে।

বিশাখা জিজ্ঞেস করলে—ওষুধ খাইয়ে মা'কে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে কেন? মা'র কী হয়েছে? মা'র কি অসুখ? তুমি তো আমাকে আগে কিছুই বলোনি।

সন্দীপ বললে- তোমার জন্যে ভেবে-ভেবেই তো মাসিমার শরীর খারাপ হয়ে গিয়েছিল। মেয়েকে খুঁজে-খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না, সেই অবস্থায় মা'র মনে ভাবনা হয় না? তুমি তো জানো না তোমার জন্যে আমরা সবাই কতো ভাবনা ভেবেছি। কতদিন আমার অফিস কামাই হয়েছে তোমার জন্যে। সারা কলকাতাময় আমি তোমার জন্যে কতো ঘুরে বেড়িয়েছি। কতবার লালবাজারের পুলিশের দরজায় গিয়ে ধর্না দিয়েছি। এত হেনস্থা যে আমার হয়েছে. তা সবই তোমার গোয়ার্তুমির জন্যে!

বিশাখা বললে—আর আমি বুঝি কষ্ট পাইনি! আমার কতো কষ্ট হয়েছিল তা তো তোমাকে আগেই বলেছি—

সন্দীপ বললে--তা তুমি যে কষ্ট পেয়েছ, তার জন্যে তো তুমিই দায়ী. তুমিই তো বার-বার বললে যে তুমি কারো গলগ্রহ হয়ে থাকতে চাও না! তুমি আমার বাড়িতে থাকলে কি আমার গলগ্রহ হয়ে থাকা বলে? তুমি কি আমার পর? আমার নিজের বোন থাকলেও তো তার দায়িত্ব আমায় নিতে হতো—

তারপর একটু থেমে বললে—থাক্, এখন যখন তোমাকে খুঁজে পাওয়া গেছে তখন আর তা নিয়ে তর্ক করে লাভ নেই। আজ সারাদিন খুব কষ্ট গেছে তোমার. এখন খেয়ে নিয়ে রাতটা একটু ভালো করে ঘুমিয়ে নাও—

হঠাৎ পাশের ঘর থেকে মাসিমার গলা শোনা গেল—ওরে বিশাখা. তুই এসেছিস মা? এসেছিস?

মা'র গলা শুনেই বিশাখা চমকে উঠলো। বললো—ওই তো. মা জেগে উঠেছে-- মা—মা—

বলতে বলতেই বিশাখা পাশের ঘরে ঢুকে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সন্দীপও পাশের ঘরে চলে গিয়েছে। মাসিমা মেয়েকে দেখতে পেয়েই তাকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরেছে। বিশাখাও মা'র কোলে মুখ গুঁজে হাউ-হাউ করে কাঁদতে লাগলো। বললে—কতো দিন তোমায় দেখিনি মা, তোমার জন্যে আমার খুব মন-কেমন করছিল। তোমার কী হয়েছে মা?

মাসিমাও মেয়েকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলো—ওরে তুই এতদিন কোথায় ছিলি? তোর জন্যে কেঁদে কেঁদে আমি যে একেবারে পাগল হয়ে গিয়েছিলুম রে...

সন্দীপ মাসিমা আর বিশাখার এই কান্না দেখে ভয় পেয়ে গেল। ডাক্তারবাবু বলে দিয়েছিলেন যে রোগী যেন খুব শান্ত থাকে। উত্তেজনা হওয়া রোগীর পক্ষে খুব খারাপ। রোগীকে যতক্ষণ সম্ভব বিশ্রাম নিতে হবে। একটা ওষুধও দিয়েছিলেন ঘুমের জন্যে। বলেছিলেন—একটু যন্ত্রণা বা উত্তেজনা হলেই এই ওষুধটা দেবেন—

সন্দীপ বললে—বিশাখা. ওঠো ওঠো. মা'র শরীর খারাপ. মাকে একটু ঘুমোতে দাও—

কিন্তু কে শোনে সন্দীপের কথা। ওদিকে মা'ও ব্যাপারটা দেখতে ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়েছে। মা আর মেয়ের এই কান্ড দেখে মা'র মনেও ভয় হয়ে গেল। আবার

যদি রোগীর বুকে সেই ব্যথাটা হয়! আবার যদি ডাক্তারবাবুকে ডাকতে হয়!

মা বলতে লাগলো—ও দিদি, দিদি, বিশাখাকে ছাড়ুন, বিশাখাকে ছাড়ুন—আপনার শরীর খরাপ হবে, ছাড়ুন বিশাখাকে...

শেষকালে কিছুতেই যখন কেউ কথা শুনলো না তখন মা ছেলেকে বললে—ওরে, সেই ঘুমের ওষুধটা খাইয়ে দে দিদিকে, ডাক্তারবাবু বলে দিয়ে গেছে—

সন্দীপ তখন আর কী করবে, শেষ পর্যন্ত আর কোনও উপায় না পেয়ে জোর করে একটা ওষুধের বড়ি গলায় ঢুকিয়ে দিলে। বললে—মাসিমা, এটা খান, আপনার ওষুধ খাওয়ার সময় হয়ে গিয়েছে—

ওষুধের গুণ কিনা কে জানে, ওষুধটা খাওয়ার পরেই মাসিমা যেন একটু শান্ত হলো। মা বললে—বিশাখা, এইবার ওঠো, মা এখন একটু ঘুমোক—

বিশাখা শুনলো মা'র কথাটা। উঠে দাঁড়ালো। বললে—মা'র এমন অসুখ ছিল না—

সন্দীপ বললে—তোমার জন্যে। তোমার জন্যেই মাসিমার এই অসুখ। তোমার ভাবনা ভেবে-ভেবেই মাসিমা কিছু খেত না। না খেয়ে-খেয়েই এই অসুখ হয়েছে—

—কবে থেকে এ-অসুখ হয়েছে?

সন্দীপ বললে—যেদিন থেকে তুমি নিরুদ্দেশ হয়েছ সেই দিন থেকেই তো মাসিমা খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিয়েছিল। বলে-বলেও মাসিমাকে কিছু খাওয়ানো যায়নি।

যখন দেখলে মা ঘুমিয়ে পড়েছে তখন বিশাখাও যেন একটু শান্ত হলো। মা বললে—এবার তুমি খেয়ে নাও মা। সারাদিন তোমার খুব ধকল গেছে। শেষকালে তুমিও যেন আবার অসুখ বাধিয়ে বসো না—তাহলে আর আমরা বাঁচবো না—

কমলার মা সমস্ত দিন কাজ-কর্ম করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। সেও এবার খাবার নিয়ে বাড়ি চলে যাবে। তাকেও আবার পরের দিন ভোরবেলা আসতে হবে।

বিশাখা বললে—মা যে ঘুমিয়ে পড়লো, মা কিছু খাবে না?

মা বললে—সে তোমায় ভাবতে হবে না, আগে তুমি তো খেয়ে নাও। শেষকালে তুমি যদি আবার অসুখে পড়ে যাও তো তাহলে আমরা মরে যাবো—

রাত তখন আরো অনেক গভীর হলো। খাওয়া-দাওয়ার পর কমলার মা খাবার নিয়ে তার নিজের বাড়িতে চলে গেল। বিশাখাকেও অনেক বলে-কয়ে খাইয়ে দিয়ে, ঘুমোতে রাজি করিয়েছে মা।

সন্দীপও ঘুমিয়ে পড়তে যাচ্ছিল। হঠাৎ মা ঘরে এসে ঢুকলো। বললে—ওরে খোকা, তোর একটা চিঠি এসেছিল রে, আমি তোকে দিতে ভুলে গিয়েছিলুম—

চিঠি! সন্দীপ অবাক। তাকে আবার কে চিঠি দিতে যাবে, সে তো সারা জীবনই নিঃসঙ্গ। কারো সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা হয়েছে, বন্ধুত্ব হয়েছে, এমন কথা তো মনে পড়ে না। একমাত্র সামান্য একটু বন্ধুত্ব হয়েছিল তারক ঘোষের সঙ্গে। কিন্তু সে তো দুঃখে-কষ্টে শরীরের রক্ত বেচে-বেচে নিঃশেষ হয়ে মারা গেছে। আর একজন ছিল হাজরা-বাড়ের ছেলে গোপাল হাজরা। সে তো এখন অনেক টাকার মালিক হয়ে গেছে তাকে টপকে। এখন সে সন্দীপের চেয়ে অনেক বড়লোক হয়ে গেছে। যাকে বলে একেবারে ভি-আই-পি। এখন সে সন্দীপকে মানুষ বলেই মনে করে না। তাহলে আর কে তাকে চিঠি লিখতে পারে?

না, তার কোনও বন্ধু তাকে চিঠি লেখেনি। চিঠি লিখেছেন মল্লিক-কাকা। তার বাবার বন্ধু। তিনি লিখেছেন—

"বাবাজীবন সন্দীপ,

আশা করি তোমাদের সর্বাঙ্গীণ কুশল। এদিকে মুখার্জিবাবুদের বাড়িতে বড়োই বিপদ চলিতেছে। তুমি বোধহয় সংবাদ-পত্রে পড়িয়াছ যে সম্প্রতি এ-বাড়িতে পুলিশ

আসিয়া খুনের অপরাধে সৌম্যবাবুকে গ্রেফ্‌তার করিয়া থানায় লইয়া গিয়াছে। উক্ত ঘটনায় মা-মণিও শয্যাশায়ী হইয়া পড়িয়া আছেন। তাঁহার এখনও জ্ঞান ফিরিয়া আসে নাই। মেজবাবু ডাক্তার এবং উকিল লইয়া বড়োই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহারও শরীর ভালো না। তাঁহার ফ্যাক্টরি এখনও খোলে নাই। তিনিও অসুস্থ। এই অবস্থার মধ্যে আমি যে কী বিপদের মধ্যে দিন কাটাইতেছি, তাহা আমিই জানি। তবে তার সঙ্গে এও জানি যে বিপদে পড়িয়া ভয় পাইলে চলিবে না। কর্তব্য-কর্ম করিয়া যাইতেও হইবে।

এখন যে-জন্য এই চিঠি লিখিতেছি তাহা বলি। তোমার বাড়িতে তপেশ গাঙ্গুলী মহাশয়ের বউদিদি ও ভাইঝি বিশাখা রহিয়াছেন। এখনই বিশাখার বিবাহের জন্যে অন্য কোথাও দেখা-শোনা বা চেষ্টা-চরিত্র করিও না। ঈশ্বরের কী ইচ্ছা তাহা জানি না। শুধু এইটুকুই জানি যে তিনি মঙ্গলময়। সেই মঙ্গলময়ের যা ইচ্ছা তাহা মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিলেই আমাদের পক্ষে মঙ্গল। তুমি আমার আশীর্বাদ গ্রহণ করিবে ও তোমার মাকেও আমার শুভেচ্ছা জানাইবে। ইতি আশীর্বাদক, তোমাদের—

পরমেশচন্দ্র মল্লিক
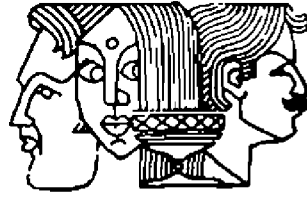
ইউনিয়ন ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক ছোট ব্যাঙ্ক নয়। হাজার-কোটি টাকা ডিপোজিট হয় প্রত্যেক বছরে। তবু স্টাফের মাসকাবারি মাইনে নিয়ে অভিযোগ আছে। মাঝে-মাঝে ইউনিয়নের সভা হয় তাই নিয়ে। সেখানে স্লোগান দেওয়া হয় ম্যানেজারকে শুনিয়ে-শুনিয়ে। মাঝে-মাঝে ধর্মঘটও হয়। তখন মিছিল করে রাস্তায় গাড়ি-বাস-ট্রাম আটকেও দেওয়া হয়। অফিসে সন্দীপ চাকরি করে তাই অফিস-সংক্রান্ত সব ব্যাপারেই সন্দীপকে জড়িয়ে থাকতে হয়।

পরেশদা সেদিন ডাকলে। বললে– কী হে, তোমার যে আর দেখাই পাওয়া যায় না, ব্যাপারটা কী? বাড়িতে সব ভালো তো?

সন্দীপ বললে—না, তেমন ভালো নয়—

পরেশদা বললে–তুমি আগেকার মতো আর মাংস-টাংস কিছু খাওয়াচ্ছো না, তোমার ভালো যাবে কী করে? সেদিন বাসে যেতে-যেতে দেখলাম রবিবারেও তুমি মেডিক্যাল কলেজের সামনে ঘোরাঘুরি করছিলে?

সন্দীপ বললে– আমার খুব বিপদ চলছে কিনা—

—বিপদ? তোমার আবার কিসের বিপদ?

সন্দীপ বললে—আমার বাড়িতে একজনের খুব অসুখ চলছে—

—অসুখ? কার অসুখ হে? তোমার বাড়ি বলতে তো শুধু তুমি আর তোমার মা। তুমি তো বেড়ে ঝাড়া-হাত-পা মানুষ। তোমার মতো সুখী মানুষ আর কে আছে বলো? পুরো মাইনেটাও তো খরচ হয় না, একদিন যে একটু মাংস-টাংস খাওয়াবে, তাও খাওয়াও না। আজ চলো না একবার টিফিনের সময়ে ক্যান্টিনে—

সন্দীপ বললে—না পরেশদা, আজ সত্যিই খুব বিপদে আছি—আজকে আর সময় নেই—

বলে সন্দীপ নিজের কাজটুকু শেষ করে নেয় মাথা নিচু করে। আর কোনও দিকে কারো সঙ্গে কথা বলবার সময়ও হয় না, ইচ্ছেও হয় না তার। শুধু সকাল বেলা অফিসে আসতে হয় তাই আসা আর অফিসের ছুটির সঙ্গে-সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে পড়া। অফিসের কাজের চাইতে অফিসের বাইরেই তার বেশি কাজ থাকে।

সেদিন হঠাৎ বহুদিন পরে সুশীলের সঙ্গে আবার দেখা। সুশীল সরকার।

—এ কি, আপনি? আপনি এদিকে?

সন্দীপ বললে—আপনি এদিকে কী করতে?

সুশীল সরকার যখন তার সঙ্গে ল' কলেজে পড়তো তখন কী চমৎকার চেহারা ছিল তার। পার্টির কাজ করতো। পার্টির যে খুব ভক্ত সে তা নয়, শুধু চাকরি পাওয়ার আশায় পার্টির মেম্বার হয়েছিল। সন্দীপকেও পার্টির মেম্বার হতে বলেছিল। তখন সন্দীপও খুব চাকরির খোঁজে চরকির মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে চারদিকে। কিন্তু ঘটনাচক্রে সে একটা চাকরি পেয়ে গিয়েছিল। তাই আর কোনও পার্টির মেম্বার হওয়ার দরকার হয়নি তার। তারপরে একবার দেখা হয়েছিল ময়দানে। পার্টির মিছিলের দলের সঙ্গে সে এসেছিল। তখন অবশ্য তার সঙ্গে কোনও কথা হয়নি। শুধু দূর থেকে সন্দীপ তাকে দেখেছিল। আজ আবার তার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

সুশীল বললে—আমার এক আত্মীয় আছে এই হাসপাতালে—আমার খুব ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, তাকে দেখতে এসেছিলুম। আপনার এখানে কী কাজ?

সন্দীপও বললে—আমার এক আত্মীয়কে এখানে ভর্তি করতে চাই, তাই জিজ্ঞেস করতে এসেছি। কত টাকা লাগবে!

সন্দীপ বললে—কিছু বুঝতে পারা যাচ্ছে না। ডাক্তাররাও কিছু বলতে পারছে না। বলেছে কোনও হাসপাতালে রাখলে ভালো হয়, কিংবা কোনও 'নার্সিং-হোমে'। কিন্তু নার্সিং-হোমে বড্ড খরচ, অতো টাকা আমি দেব কী করে?

সুশীল বললে আপনি কোন্ পার্টিতে আছেন এখন?

সন্দীপ বললে—আমি তো কোনও পার্টির মেম্বার হইনি এখনও—

সুশীলের মুখে চোখে হতাশার মেঘ ছেয়ে এলো। বললে—এখানকার স্টাফ এসোসিয়েশন তো বামপন্থী, লেফ্‌ট্ পার্টি না হলে জেনারেল বেড্ পাবেন না।

সন্দীপ বললে—এখানেও?

—তবে ডাক্তারদের যে এসোসিয়েশন আছে তারা কংগ্রেসী। তাদের কাছে ফেবার পেতে হলে আপনার কোনও পার্টি-মেম্বার না হলেও চলবে!

মনে আছে সন্দীপ অতোদিন কলকাতায় ছিল, তবু সে ওই খবরগুলো রাখতো না। কোথা দিয়ে কলকাতা শহরটা রাতারাতি বদলে যাচ্ছিল। প্রথমে ডাক্তারবাবু মাসিমার অসুখের জন্যে নানা-রকম ওষুধ লিখে দিয়েছিলেন। সব ওষুধ খাইয়েও যখন রোগ সারলো না, তখন বললেন রক্তটা পরীক্ষা করিয়ে আনতে। তাতেও জানতে পারা গেল না রোগটা কী। শেষকালে অনেক রকম ওষুধের ইনজেকশন্ দেওয়া হলো। বাজারে যতো রকম ওষুধ পাওয়া যায় তার প্রায় সবগুলোই ইনজেকশন্ দেওয়া হতে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে নানারকম ভিটামিনের বড়ি।

কিন্তু তাতেও কোনও রকম উন্নতির লক্ষণ দেখা গেল না। প্রত্যেক দিন অফিসে যাওয়ার পথে সন্দীপ ডাক্তারবাবুর সঙ্গে দেখা করে রোগীর অবস্থার কথা জানাতো। আর তা শুনে ডাক্তারবাবু আরো কিছু নতুন ওষুধের নাম লিখে দিতেন। আর ব্যাঙ্ক থেকে বেরিয়ে সেই ওষুধ কিনে নিয়ে বাড়ি ফিরতো সে। সঙ্গে করে আবার হাওড়া স্টেশনের রাস্তা থেকে আলু-কুমড়ো-পটল মশলাপত্র কিনে বাড়ি ফিরতো।

মা আর বিশাখা সন্দীপের পথ চেয়ে সদর-দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকতো। ছেলে

আসতেই মা তাড়াতাড়ি তার হাত থেকে বাজারের থলিটা নিয়ে নিত। জিজ্ঞেস করতো--কী রে, ডাক্তারবাবু কী বললেন?

সন্দীপ বলতো--ডাক্তারবাবু আর কী বলবেন, আবার নতুন ওষুধ লিখে দিলেন—

—এই নাও, সারাদিনে খাওয়ার পর তিন বার এই ওষুধ খেতে বললেন—

বলে ওষুধের প্যাকেটটা বিশাখার হাতে দিত। মা'কে জিজ্ঞেস করতো—আজ মাসিমা কেমন আছেন?

মা বলতো—কেমন আবার থাকবেন, সেই একই রকম—

সত্যিই, মাসিমার অসুখের কোনও উন্নতিও হতো না, আবার খুব একটা অবনতিও হতো না। সারা শরীরে খুব দুর্বলতা। আর সেই সঙ্গে অক্ষিধে। কোনও খাবারে রুচি ছিল না। বলতে গেলে খিদেই ছিল না একেবারে। সারা দিন-রাত কেবল শুয়ে থাকা ছাড়া আর কোনও কাজ করার শক্তিও ছিল না।

সন্দীপ কাছে গেলেই মাসিমা কেবল কাঁদতো। বলতো- আমি আর বাঁচবো না বাবা, তুমি আমার মেয়েটার যা-হোক কিছু একটা গতি করে দাও, আমি যাবার আগে দেখে মরে যাই—

সন্দীপ মাসিমাকে আর কতো মিথ্যে সান্ত্বনা দেবে! সে তো বিশাখার জন্যে অনেকবার অনেক কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছে, অনেক পাত্রপক্ষের সঙ্গে কথাও বলেছে। তবু কিছু সুরাহা হয়নি। শেষকালে বিশাখা যখন তেজ দেখিয়ে চাকরির খোঁজে গেল তখনই বিপত্তি বেধে গেল। সে-বিপদ থেকে যে শেষ পর্যন্ত তাকে উদ্ধার করা গেছে এই-ই যথেষ্ট। সে যে বেঁচে ফিরে এসেছে, এর জন্যেই তো ভগবানের ওপর তাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

সন্দীপ মাসিমাকে বলতো -বিশাখার ভাবনাতেই তো আপনার অসুখ হয়েছিল। এখন তো সেই বিশাখাকে আমি আপনার কাছে নিয়ে এসেছি। এখন তো আর আপনার কোনও কষ্ট নেই। এখন আপনি উঠে বসুন, এখন আপনি একটু ভালো করে খাওয়া-দাওয়া করুন—

মাসিমা তবু কাঁদতো। বলতো- আমার গলা দিয়ে যে ভাত নামে না বাবা। আমি কী করে খাওয়া-দাওয়া করি। তুমি আমার বিশাখার একটা গতি করো বাবা। আমি আর ওর আইবুড়ো চেহারা চোখে দেখতে পারি না—

সন্দীপ বলতো—আপনি কিছু ভাববেন না মাসিমা আমি বিশাখার বিয়ের একটা ব্যবস্থা করবোই, আমি নিজে আপনাকে কথা দিচ্ছি।

সেদিন বিশাখাকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললে—শেষ পর্যন্ত তুমি কী ঠিক করলে বিশাখা। তোমাকে তো আমার মল্লিক মশায়ের চিঠিটা পড়িয়েছি। ও-সম্বন্ধে তুমি কিছু ভেবেছ?

বিশাখা বললে--আমি আর কী ভাববো?

সন্দীপ বললে—তুমি ভাববে না তো কে ভাববে? আমি ভাববো?

বিশাখা এ-কথার জবাবে কিছু বলতো না। চুপ করে থাকতো।

সন্দীপ বললে—তুমি চুপ করে রইলে কেন? কিছু জবাব দাও—

তবু বিশাখা বোবা হয়ে রইল। সে-কথার কোনও জবাব দিলে না।

সন্দীপ বললে—কই, জবাব দিচ্ছ না কেন? এখনও ভেবে কিছু ঠিক করতে পারোনি এই তো? তা না হয় তুমি আরো ভাবো। আমি তোমাকে আরো ভাববার সময় দিচ্ছি।

তারপর একটু থেমে আবার বললে—মল্লিক-কাকার চিঠির তো একটা জবাব দিতে হবে। তোমার কাছ থেকে জবাব পেলে আমি সেই কথা মল্লিক-কাকাকে জানাবো। মল্লিক-কাকা যে আমার চিঠির জন্যে অপেক্ষা করছে—

বিশাখার মুখ থেকে এতক্ষণে কথা বেরোল। সে বললে—তুমি লিখে দাও আমি ওদের সৌম্যপদকে বিয়ে করবো না—

সন্দীপ বললে—কেন? কেন সৌম্যবাবুকে বিয়ে করবে না? তোমার সঙ্গে বিয়ে দেবার জন্যে তো ঠাকমা-মণি সবই ঠিক করে রেখেছিল। তোমাকে নিজেদের বাড়িতে রেখে লেখা-পড়া শিখিয়ে মানুষ করেছিল তো ওরাই। তোমার পেছনে তো হাজার-হাজার টাকা খরচ করেছিল ওই ঠাকমা-মণিই। নেহাৎ সৌম্যবাবু বিলেত থেকে মেম বিয়ে না করে আনলে তো এতদিনে তোমাদের দুজনের বিয়ে হয়েও যেত। কিন্তু সে মেম মরে গিয়ে তো সব সমস্যা এখন দূর হয়ে গিয়েছে। এখন আর তাকে বিয়ে করতে তোমার আপত্তি কীসের?

বিশাখা বললে—আমি বিয়ে করবো না, চাকরি করবো।

সন্দীপ বললে—তবু চাকরি করবে? চাকরি করার জ্বালা তো একবার দেখলে। তবু বলছো তুমি চাকরি করবে?

বিশাখা বললে—চাকরি করবো কারণ আমি তোমার গলগ্রহ হয়ে থাকতে চাই না—

সন্দীপ বললে—আমার গলগ্রহ হতে চাইছো না, সে তো ভালো কথা। কিন্তু সৌম্যবাবুকে বিয়ে করলে তো আর আমার গলগ্রহ হয়ে থাকতে হয় না। আর তা ছাড়া আমার কথা উঠছেই বা কেন? আমি কে? আমি চাই তুমি সুখী হও। মাসিমাও তাই-ই চান। মাসিমার মুখের দিকে চেয়েও অন্ততঃ তোমার সৌম্যবাবুকে বিয়ে করতে রাজি হয়ে যাওয়া উচিত—

বিশাখা বললে—কোন্ কাজটা করা উচিত আর কোন্ কাজটা করা উচিত নয় তা তোমার কাছে আমাকে শিখতে হবে না—

সন্দীপ কথাটা শুনে একটু গম্ভীর হয়ে গেল। বললে—এতই যদি তোমার উচিত-অনুচিত জ্ঞান তাহলে ওই ভবতোষ সাহা আর হরদয়ালদের হাত থেকে ওই সব জিনিস খেতে গেলে কেন?

—কোন্ জিনিস আমি খেয়েছি?

সন্দীপ বললে—ওই হেরোইন! জানো না আজকাল যার-তার হাত থেকে কারো কোনও খাবার খেতে নেই! জানো না কলকাতায় আজকাল মেয়েদের খুব বিপদ! বিশেষ করে সেই সব মেয়েদের, যারা তোমার মতো সুন্দরী!

বিশাখা কী জবাব দেবে বুঝতে পারলে না। সন্দীপ তখনও বলে চলেছে—ভেবে দেখো তো তোমার জন্যে আমি কতো নাস্তানাবুদ হয়েছি। দিনের পর দিন লালবাজারে, কোর্টে কতো ঘোরাঘুরি করতে হয়েছে আমাকে। কতদিন আমার অফিস কামাই হয়েছে, তার জন্যে আমার অফিসের মাইনে পর্যন্ত কাটা গিয়েছে।

তারপর একটু থেমে বললে—যাক্ গে, যা হয়ে গেছে তার জন্যে আর ভেবে কোনও লাভ নেই। আমার যা ক্ষতি হয়েছে তা হোক, কিন্তু মাসিমার স্বাস্থ্যের

কথাটাও তো তুমি একবার ভাববে। তোমার জন্যেই তো তোমার মা'র এই অসুখ! তাঁর অসুখের জন্যে কতো ডাক্তার-ওষুধ খরচ হচ্ছে, সেটাও তো ভেবে দেখা উচিত।

বিশাখা বললে—কিন্তু যে-লোকটা তার বিয়ে করা বউকে খুন করতে পারে তাকে আমি বিয়ে করি কী করে? সব জেনে-শুনেও তুমি একজন খুনীকে বিয়ে করতে বলো আমাকে?

সন্দীপ বললে- সে বউ কি সত্যিকারের বউ? তাকে সৌম্যবাবু খুন করেছে, বেশ করেছে। সেই মেয়েটা তো সৌম্যবাবুকে বিয়ে করেছিল ব্ল্যাকমেল করবার জন্যে। ব্ল্যাক্‌মেলারকে খুন করা কি অন্যায়!

বিশাখা বলে উঠলো—কোন্‌টা ন্যায় আর কোন্‌টা অন্যায়, তা তোমার কাছে আমাকে শিখতে হবে না—

হঠাৎ কথার মাঝখানেই সে-ঘরে মা ঠিক সেই সময়ে ঢুকে পড়লো। বললে—কী রে খোকা, তুই বিশাখাকে অতো বকছিস কেন?

বলে বিশাখাকে দুই হাত বাড়িয়ে বুকে টেনে নিলে। বললে- দেখছিস মেয়েটার শরীর ভালো নয়, এই অবস্থায় তুই ওকে কথা শোনাচ্ছিস? এসো মা, এসো, লক্ষ্মী মেয়ে। তুমি খেয়ে নেবে চলো। আমার ছেলে ওই রকম, কখন কাকে কী-কথা বলতে হয় তা জানে না।

সন্দীপ বললে—তুমি কেবল আমারই দোষ ধরো। আমি কী অন্যায়টা বলেছি ওকে। তুমি তো জানো মল্লিক-কাকা আমাকে চিঠিতে কী লিখেছেন। সে-চিঠির জবাব দিতে হবে না? তাঁর চিঠির জবাবে আমি কী লিখবো তুমি বলে দাও— বিশাখা বলছে ও সৌম্যবাবুকে বিয়ে করবে না।

মা বললে—ও-তো অন্যায় কিছু বলেনি। খুনী মানুষকে ও কী করে বিয়ে করে, তুই-ই বল্‌?

সন্দীপ বললে তা বিয়ে না করলে কী করবে ও? ওর জন্যে ভেবে ভেবেই তো মাসিমার এই অসুখ। ওর বিয়ে না হলে তো মাসিমার অসুখ সারবে না। আর এদিকে ও কেবল বলছে চাকরি করবে। চাকরির জ্বালা তো ও বুঝলো। তবু এখনও বলছে চাকরি করবে। আমার কথা ও কিছুতেই বুঝতে চাইছে না! আমি ওকে নিয়ে কী করবো তাই বলো তো?

বিশাখা মা'র বুক থেকে মাথাটা তুলে বললে- তা আমি যদি তোমার এতই বোঝা হই তো আমাদের এ-বাড়িতে এনে তুললে কেন? আমরা কি তোমাকে মাথার দিব্যি দিয়েছিলুম আমাদের এখানে এনে তুলতে? আমরা কি রাস্তায় পড়েছিলুম? আমাদের কি ঘর-বাড়ি ছিল না?

সন্দীপ বললে—তোমাদের বাড়ি বলতে তো সেই মনসাতলা লেনের কাকার ভাড়াটে বাড়ি। সেখানে যে তোমাদের কী লাথি-ঝাঁটা খেতে হতো তা কি আমি জানি না বলতে চাও? এর পরেও কি আমি তোমাদের সে-বাড়িতে পাঠিয়ে দিতে পারি? তোমরা কি তাই-ই চাও?

মা বাধা দিয়ে বললে—তা তুই ওর চাকরি করাতে বাধা দিচ্ছিসই বা কেন? আজকাল তো শুনি মেয়েরা সবাই-ই চাকরি করছে! চাকরি করলে দোষটা কী?

সন্দীপ বললে তা সেই কথাটা মাসিমাকে একবার গিয়ে বোঝাও না। মাসিমা যে আমাকে কেবল ওর বিয়ে দেওয়ার কথা বলে! মাসিমা যদি ওকে চাকরি করে দিতে বলে তাহলে আমার কোনও আপত্তি থাকবে না। যেমন করে হোক আমি একটা চাকরি করে দেব ওর। কিন্তু তার আগে মাসিমা সে-কথা বলুক...

তারপর একটু থেমে আবার বললে—আর মা, তোমাকেও বলি তুমি তো জানো

না চাকরি করার কী জ্বালা। আমি নিজে চাকরির জ্বালা বুঝছি বলেই তাই বলছি। আমাদের অফিসেও তো মেয়েরা চাকরি করছে। তারাই বলে অন্য কোনও উপায় নেই বলেই তারা চাকরি করছে। উপায় থাকলে তারা আর চাকরি করতো না। বাসে-ট্রেনে-ট্রামে আমরা যে কী ভাবে যাতায়াত করি তা তো তুমি দেখোনি। আমাদেরই যদি এই অবস্থা হয় তো মেয়েদের কী অবস্থা তা তোমাকে আর কী বলবো!

মা বললে— তা তোর সে-সব কথা ভেবে লাভ কী? ও যখন চাকরি করতে চাইছে, তখন ওকে চাকরি করতে দে—

সন্দীপ বললে—তারপর যদি কিছু এ্যাকসিডেন্ট্ হয় তখন তো সেই আমাকেই সামলাতে হবে! এখন তো আর তোমাদের আমল নেই! ওই তো ভবতোষ সাহা, ওকে চাকরি করে দেবে বলে কী সব ছাই-ভস্ম খাইয়েছিল, তারপর ওকেই জিজ্ঞেস করো না কী কান্ড! ট্রাম রাস্তায় একদিন তোমার ওই মেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। সেখান থেকে তুলে নিয়ে পুলিশ ওকে জেলখানায় পুরে রেখে দিয়েছিল। আমি না থাকলে চিরকাল ওই জেলখানাতেই পড়ে থাকতো!

—ও মা, তাই নাকি? জেলে পুরে রেখেছিল কেন? কী করেছিলে মা তুমি? কীসের জন্যে তোমার জেল হয়েছিল?

বিশাখা তখন লজ্জায় মা'র বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে ফেলেছে। সে কোনও জবাব দিলে না। তার হয়ে সন্দীপই বললে—সে বললে তুমি ভয়ে চম্‌কে উঠবে মা। আজ-কাল সব খাবার জিনিসে লোকে নানা-রকম বিষ মিশিয়ে দিচ্ছে...

মা চম্‌কে উঠলো—বিষ? বলিস কী তুই?

সন্দীপ বললে—হ্যাঁ মা বিষ। তুমি চা খাবে দোকানে, তাতেও বিষ, পান খাবে, তাতেও বিষ, চকলেট খাবে, তাতেও বিষ। বিষে বিষে সব খাবার এখন বিষিয়ে উঠেছে।

মা বললে—বিষ? বিষ খেলে তো মানুষ মরে যায় রে!

সন্দীপ বললে—না মা, এ বিষ সে-বিষ নয়। এ বিষ খুব মিষ্টি। এই মিষ্টি মেশানো খাবারে দেশ একেবারে ছেয়ে গেছে। এ খেলে খুব নেশা হয়। খাবার পরই মানুষের খুব আরাম হয়। আর যদি কেউ সে বিষ বেশি খায় তো তিন-চারদিন আরাম করে ঘুমিয়ে পড়ে। তখন আর তার কোনও জ্ঞান থাকে না, তখন জেগে উঠে আবার সেই বিষ খেতে চায়। তোমার মেয়েকে কে একজন সেই বিষ খাইয়ে দিয়েছিল, আর তারপর ট্রাম-রাস্তার ওপর ফেলে রেখে চলে গিয়েছিল। বেড়াপোতার হাজরা-বুড়োর কথা তোমার মনে আছে? সেই যে হাটে বসে লাউ-কুমড়ো বেচতো? তার ছেলে গোপাল হাজরা আমার সঙ্গে পড়তো, তুমি যার সঙ্গে মিশতে বারণ করতে আমাকে! সেই গোপাল এখন কী হয়েছে জানো?

মা বললে—কী? কী হয়েছে?

—কোটিপতি হয়েছে। এখানে তারক ঘোষেদের বাড়িটা তো সে-ই পুড়িয়ে দিয়ে এখন সেই জমিতে নতুন তিনতলা বাড়ি তুলেছে। সে তো তুমি জানো!

মা জিজ্ঞেস করলে—অতো টাকা সে পেলে কোথায়? কে তাকে টাকা দিলে?

সন্দীপ বললে—কে আবার দেবে? ওই বিষ বেচেই তার অতো টাকা। পাকিস্তানে এক কিলোগ্রাম বিষের দাম তিরিশ হাজার টাকা, আবার আমাদের বোম্বাইতে এসেই তার দাম হয়ে যায় এক লাখ টাকা, সেই একই বিষ আবার আমেরিকায় বিক্রি হয় সাড়ে বারো লাখ টাকায়। কতো লাভ হয় বলো তো? গোপাল হাজরা সেই বিষের ব্যবসা করে এত টাকা কামাচ্ছে। তাই তো আমি অফিসে টিফিনের সময় কেবল মুড়ি চিবোই। আবার কবে মুড়ির মধ্যেও গোপাল হাজরারা সেই বিষ মিশিয়ে দেবে তা জানি না, তখন ওই মুড়ি খাওয়াও ছেড়ে দিতে হবে।

হঠাৎ কমলার মা এসে বললে—মা, দিদিমা কেমন করছে, শিগগির এসো—

—কী করছে রে?

কমলার মা বললে—দিদিমা শুয়ে শুয়ে ছট্‌ফট্‌ করছে—মুখ দিয়ে ফ্যানা উঠছে, কথা বেরোচ্ছে না—

মা বললে—ওমা সে কী রে? এই তো দেখে এলুম, চুপ করে শুয়ে ঘুমোচ্ছে—

মা ভয় পেয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বিশাখাকে নিয়ে পাশের ঘরের দিকে পা বাড়ালো।

সন্দীপও তাদের সঙ্গে পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকলো। বিছানার ওপর তখন মাসিমা ছট্‌ফট্‌ করছে, তার মুখ দিয়ে কোনও কথাও বেরোচ্ছে না, কেবল ফ্যানা উঠছে—

মা সন্দীপকে বললে—ওরে এখখুনি একবার ডাক্তারবাবুকে খবর দে, আমি ভালো বুঝছি না। কী হচ্ছে দিদি, কী হচ্ছে? কী কষ্ট হচ্ছে?

সন্দীপ আর দাঁড়ালো না সেখানে। কোনও রকমে জামাটা গায়ে চড়িয়ে ডাক্তারের বাড়ির দিকে ছুটলো...

যে-মানুষ সংসারে প্রয়োজনটাকেই বড়ো করে দেখে, সে কেবল নিজেকে ছোট করে তোলে। আর যে-মানুষ ভালোবাসাকে বড়ো করে দেখে, সে কেবল নিজেকে বড়ো করেই তোলে। প্রয়োজন মানুষকে ছোট করে আর ভালোবাসা মানুষকে বড়ো করে। যে ছোট সে অহংকারে মাথা উঁচু করে থাকে, যে বড়ো সে প্রীতি আর ভক্তিতে মাথা নত করে। প্রয়োজন মানুষকে উদ্বিগ্ন করে, প্রেম ভক্তি আর ভালোবাসা মানুষকে শান্ত করে। যেখানে মাথা নত করার স্থান সেখানে নত হওয়ার নামই মনুষ্যত্ব।

মুক্তিপদ মুখার্জির গৃহিণী নন্দিতার ছিল প্রয়োজনের প্রতি লোভ। তার সব চাই। শুধু শাড়ি, টাকা, গয়না হলেই চলবে না। তার সঙ্গে ছিল সব রকমের চাহিদা। বাড়ি তো চাই-ই, কিন্তু তার সঙ্গে বাড়ির যা-যা সাজ-সরঞ্জাম বাজারে বিক্রী হয় তাও তার চাই। মুক্তিপদ মুখার্জির সঙ্গে বিয়ে হওয়ার পরই সে বুঝেছিল যে সে তার শাশুড়ীর অধীন। তাই সেদিন থেকেই সে ঘর ভাঙতে চেষ্টা করতে লাগলো। তারপর নানা চেষ্টায় নানা কৌশলে সংসার থেকে আলাদা হওয়ার সাধ একদিন তার মিটলো বটে, কিন্তু তখন আরো নতুন-নতুন সাধ তার জন্ম হতে লাগলো।

কিন্তু সেখানেই সে নিরস্ত হলো না। তার আরো অনেক জিনিসের প্রয়োজন ছিল। প্রয়োজন তাকে পাগল করে তুললো। সে ইন্ডিয়ার বাইরে বেড়াতে চাইলো। একদিন সে-আশাও তার মিটলো। কোনও আশা মিটতে তার বাকি রইলো না আর। তখন সে অপেক্ষা করে রইলো কবে আরো কী-কী ভোগের জিনিস বাজারে এসে হাজির হবে। টাকা তো সে কোনও দিন উপার্জন করেনি, উপার্জন করবেও না। মুক্তিপদ যতদিন আছেন ততদিন তার টাকা উপার্জন করবার দরকারও নেই। কিন্তু বাজারে সুখের উপকরণ আরো বিক্রী হচ্ছে না কেন এই ক্ষোভ তার রয়ে গেল।

তাই সেদিন থেকে 'ম্যাক্কাবি মুখার্জি কোম্পানী'তে ধর্মঘটের ফাটল ধরলো সেই দিন থেকেই নানা তার জীবনে প্রয়োজনটা আরো মাথা চাড়া দিয়ে ওপরে উঠতে চাইলো।

তখন আর তার বাড়িতে মন টেঁকে না। তখন আরো সিনেমা, আরো থিয়েটার দেখবার জন্যে তার মন ছট্‌ফট্‌ করতে লাগলো। তখন আরো বেশি রাত পর্যন্ত ক্লাবে গিয়ে সময় কাটাতে লাগলো। ক্লাবে ক্লাবে তাস খেলার আসর আরো জম্‌-জমাট্‌ হতে লাগলো। তার হাতে থাকতো 'ক্রেডিট্‌-কার্ড', সেই 'ক্রেডিট্‌-কার্ড' দেখালে কোনও জিনিস কিনতে পয়সা লাগবে না। যতো টাকার জিনিসই কেনো, টাকা দেবে গৌরী সেন। মিস্টার মুখার্জির ব্যাঙ্কের পাশ-বই থেকে ডেবিট হবে। ক্লাবে সেদিন মিসেস আহুজা বললে- আরে, শুনলাম আপনাদের ফ্যাক্টরিতে নাকি 'লক্‌-আউট' চলছে!

নন্দিতা বললে—একি, এ তো অনেক পুরনো খবর। আপনি কি ইণ্ডিয়ার বাইরে ছিলেন নাকি এতদিন!

মিসেস আহুজা বললে--হ্যাঁ, আমরা তো এতদিন ব্যাংককে ছিলাম, আপনি জানতেন না?

—কেমন লাগলো দেশটা?

মিসেস আহুজা বললে- অতো ভ্যারাইটির ড্রিঙ্ক্‌স্‌ আমি আর কোথাও খাইনি। কী ওয়াণ্ডারফুল দেশ। প্লীজ আপনি একবার ওখানে যান। আমি লণ্ডন গিয়েছি, প্যারিস গিয়েছি, বার্লিন গিয়েছি, নিউ-ইয়র্ক গিয়েছি, কিন্তু ব্যাংকক্‌ আমাকে চার্ম করে দিয়েছে- সো ওয়াণ্ডারফুল এ কাণ্ট্রি...

সেদিন অনেক রাতে নন্দিতা দেখলে মুক্তি তখনও বাড়ি আসেননি। পিক্‌নিক খেয়ে নিয়ে তখন তার ঘরে বিছানায় গা এলিয়ে দিয়েছে। মুক্তির জন্যে আর দেরি করে লাভ নেই। সে ডিনার খেয়ে নিয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দিলে। আর তারপরেই ঘুমিয়ে পড়লো। পরদিন সকাল সাড়ে ন'টার সময় যখন তার ঘুম ভাঙলো তখন দেখলে মুক্তি বাড়িতে নেই। বিছানার সংগে লাগানো কলিং-বেলটার বোতামটা টিপতেই আবদুল এসে হাজির হয়ে সেলাম করলে—জী মেমসাব? চা...

নন্দিতা জিজ্ঞেস করলে—হ্যাঁরে, সাহেব কোথায়?

আবদুল বললে—হুজুর বেরিয়ে গেছে, মেমসাব।

নন্দিতার নিয়ম সকাল বেলা কলিং-বেল্‌টা বাজালেই আবদুল গরম চা এনে হাজির করবে। চায়ে চুমুক দিয়েই নন্দিতা জিজ্ঞেস করলে—সাহেব কাল কতো রাত্তিরে এসেছিল রে?

আবদুল বললে—রাত বারোটার সময়ে!

—কখন বেরিয়ে গেছে?

—এই আধা ঘণ্টা আগে।

—চা-নাস্তা খেয়ে গেছে সাহেব?

—জী হাঁ।

—আবার কখন ফিরবে? বলেছে কিছু?

—না, সাহেব কিছু বলে যাননি!

—তুই আমার নাস্তা করে দিয়ে চলে যা—

আবদুল খালি কাপ নিয়ে চলে গেল। তারপর নন্দিতা বাথরুমে গিয়ে ঢুকলো। আজকাল মুক্তিপদ'র সংগে তার বেশি দেখা হয় না। বিশেষ করে সেই ইংরেজ মাগীটা খুন হওয়ার পর থেকে। আগে তো মুক্তিপদ ব্যস্ত থাকতেন তাঁর ফ্যাক্টরি নিয়ে। তার সংগে ছিল ট্যাক্সের ঝক্কি-ঝামেলা। কিন্তু ওই খুনের মামলাটা হওয়ার পর থেকেই তাঁকে আর দেখতে পাওয়া যায় না।

একদিন দেখা হতেই নন্দিতা জিজ্ঞেস করেছিল—ও-বাড়ির খবর কী?

মুক্তিপদ বলেছিলেন—খবর খুবই খারাপ। মাকে কোনও রকমে বাঁচিয়ে তুলেছি,

কিন্তু সৌম্যকে বোধহয় আর বাঁচাতে পারবো না—

নন্দিতা বলেছিল—ওর ফাঁসি হওয়াই উচিত।

মুক্তিপদ বলেছিলেন—তুমি পর, তাই ও-কথা বলতে পারছো। কিন্তু যতদিন মা বেঁচে আছেন, ততদিন তাঁকে বাঁচাতে চেষ্টা করে যেতে হবে আমাকে। আমি তো সব জেনে চুপ করে থাকতে পারি না।

নন্দিতা বলেছিল—চেষ্টা করেও কিছু হবে না, শুধু টাকাই নষ্ট হবে। আমি হলে চুপ করে হাত গুটিয়ে বসে থাকতুম! তোমার নিজের হেলথ্ না তোমার ভাই-পো'র জীবন, কোন্‌টা বড়ো?

মুক্তিপদ বলেছিলেন—আমি কি তা জানি না বলতে চাও? সবই জানি। কিন্তু আমার মা'র কথাও একবার ভাবো তো! এই বুড়ো বয়েসে তাঁর দিকটা একবার কল্পনা করো তো? একদিন তো আমরাও বুড়ো হবো, তখন?

নন্দিতা বলেছিল—তুমি বুড়ো হতে পারো, কিন্তু আমি বুড়ি হবো না—

—সে কি? তুমি বুড়ি হবে না? কী বলছো তুমি?

নন্দিতা বলেছিল—আমি অতো দিন বাঁচবোই না। বুড়ি হওয়ার আগেই আমি মরে যাবো— বলে সেদিন নন্দিতা বেরিয়ে চলে গিয়েছিল।

পেছন থেকে মুক্তিপদ জিজ্ঞেস করেছিলেন—কোথায় যাচ্ছো?

মুক্তিপদ জানতেন নন্দিতা রোজ এই সময়েই 'বিউটি-পার্লারে' যায়। সেখানে গিয়ে 'স্লিমিং' করে আসে, 'ম্যাসাজিং' করে আসে। মুক্তিপদর যে চারদিক থেকে এই বিপদ ঘনিয়ে আসছে, তা ভাববার দায় যেন নেই নন্দিতার। ততক্ষণ সে তার 'বিউটি-পার্লার' নিয়ে ব্যস্ত থাকবে, ক্লাব নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। মুক্তিপদ গোল্লায় যাক, মুক্তি-পদ'র মা গোল্লায় যাক, মুক্তিপদর ভাইপো গোল্লায় যাক, তা নিয়ে তার দুশ্চিন্তা করতে বয়েই গিয়েছে। সে ততক্ষণ তার প্রয়োজনের কথা ভাববে। প্রয়োজনটাই নন্দিতার কাছে বড়ো। প্রীতির দাম তার কাছে শূন্য। মুক্তিপদর জীবনে এও এক-রকমের অভিশাপ। আর তাঁর মেয়ে? প্রীতিময়ী? পিপি? পিক্‌নিক?

রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে চোখের ওপর কত সব দৃশ্য ভেসে যাচ্ছিল। লোক-জন, গাড়ি, বাস, ট্রাম, হকারের ঝুপড়ি; আরো কত কী। কিন্তু তাঁর মনে হলো ও-গুলো যেন সব জলছবি। ও-গুলো তার মনে কোনও স্থায়ী ছাপ রেখে যেতে পারছিল না। তাঁর চোখের সামনে ও-সব অতিক্রম করে কেবল ভেসে উঠছিল নন্দিতার চেহারা, মায়ের চেহারা, সৌম্য'র চেহারা, পিক্‌নিকের চেহারা, ফ্যাক্টরির চেহারা। যত দিন যাচ্ছে ততই যেন বেশি ওই ছবিগুলো স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছে।

হঠাৎ একটা জায়গায় আসতেই গাড়িটা থেমে গেল। মুক্তিপদও আবার বাস্তবে ফিরে এলেন। দেখলেন সামনে যতোদূর দেখা যায় ততোদূর কেবল মানুষ আর মানুষ। মানুষের আদিগন্ত মিছিল। আর তার সামনে লাল রং-এর ফেস্টুন। তার ওপর সাদা সাদা অক্ষরে কী-সব লেখা রয়েছে, তা পড়তে পারা যাচ্ছে না। তা পড়বার ইচ্ছেও তাঁর হলো না।

কলকাতার লোকদের কাছে এ-সব মিছিল গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে। তারা জেনে গিয়েছে যে কলকাতা শহরে বেঁচে থাকার মানেই হচ্ছে মাসের মধ্যে ক'টা দিন মিছিলের মুখোমুখি হয়ে হেনস্থা হওয়া।

মুক্তিপদ ঘড়িটার দিকে চেয়ে দেখলেন। কিন্ত দেখেই শিউরে উঠলেন। এর মধ্যে সাড়ে দশটা বেজে গেল। মিস্টার তারাপদ ঘোশালকে যে সময় দেওয়া আছে সকাল এগারোটা। —এগারোটার সময়ে তাঁর সঙ্গে যে দেখা করার কথা। তিনি হোটেলে এসে উঠেছেন।

মুখে ড্রাইভারকে বললেন—ওরে, আর কতক্ষণ এখানে আটকে থাকবি? আমার যে গ্র্যান্ড হোটেলে সকাল এগারোটায় যোশী সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে হবে রে—

বিশ্বনাথ সামনের দিকে চেয়ে দেখলে। সামনে যতদূর দেখা যায়, ততদূর কেবল জনসমুদ্র। সবাই বিক্ষোভ জানাচ্ছে স্লোগান দিয়ে দিয়ে। এ-সব মিছিলের উৎপাত নিয়ে মাথা ঘামালে কলকাতার মানুষদের চলে না। কলকাতা এতদিনে মিছিল-প্রুফ হয়ে গিয়েছে। মিছিলের উৎপাত সেই ব্রিটিশ-আমল থেকেই শুরু হয়েছিল বটে, কিন্তু যতো দিন যাচ্ছে ততোই তো তার প্রকোপ বাড়ছে। তার সঙ্গে এসে আবার জুটেছে পাতাল-রেলের উৎপাত। পাতাল-রেল হোক, কলকাতার মানুষের ভালো হোক। মুক্তিপদ তাই-ই চান। কিন্তু মুক্তিপদর নিজের তো তাতে কোনও লাভ নেই, কারণ তিনি তো ততোদিন বাঁচবেন না।

মিস্টার যোশী বলেছিলেন—তার চেয়ে আপনি 'স্যাক্সবি মুখার্জি' কোম্পানিকে নিয়ে রাজস্থানে চলুন। সেখানে গেলে আপনার কোম্পানিও বাঁচবে, আপনিও বাঁচবেন। সেখানকার ক্লাইমেট ভালো, জলও ভালো, আর সেখানে লেবার-ট্রাবলও নেই—

মুক্তিপদ বলেছিলেন—আর পাওয়ার? পাওয়ার শর্টেজ্?

মিস্টার যোশী বলেছিলেন—আমাদের ওখানে এ-রকম লোড্ শেডিং নেই। আর সব চেয়ে বড়ো কথা আমরা পাঁচ বছর ধরে আপনাকে ট্যাক্স থেকেও রেমিশন্ দেব—

প্রথমে চিঠি লেখালেখি দিয়ে শুরু হয়েছিল। তারপরে যোশী একবার এসে প্রাথমিক কথা-বার্তা বলে গিয়েছিলেন। জমির ব্যবস্থা করে দেবে রাজস্থান সরকার। রাজস্থান সরকার চায় যে ওয়েস্ট-বেঙ্গলের কিছু ইনডাস্ট্রি তাদের স্টেটে যাক। তাতে এখানকার ইনডাসট্রির বাঙালী মালিকদের যেমন সুবিধে হবে, রাজস্থানের বাসিন্দারাও তেমনি কিছু এমপ্লয়মেন্ট পাবে। একদিন রাজস্থানের লোকরাই এই বেঙ্গলে এসে ইনডাস্ট্রি করেছিল, আবার এখন বাঙালী ইনডাসট্রিয়ালিস্টরাও যাবে রাজস্থানে। রাজস্থানের সব চেয়ে বড়ো সুবিধে হচ্ছে সেখানে এখনও লেবার-ট্রাবল নেই—

—কিন্তু জল? জলটা তো ইনডাস্ট্রির পক্ষে একটা ইম্পর্ট্যান্ট ফ্যাক্টার!

মিস্টার যোশী বলেছিলেন—আমরা তার ব্যবস্থাও করেছি। আপনি একবার রাজস্থানে চলুন না কষ্ট করে। আমরা জলের জন্যে কী বিরাট প্রোজেক্ট করেছি তা নিজের চোখেই দেখে আসবেন।

এসব কয়েক মাস আগেকার কথা। তারপর মিস্টার যোশী আবার এসেছেন সেই ব্যাপারে কথা বলবার জন্যে। এ-সম্বন্ধে ওয়ার্কস ম্যানেজার শান্তি চ্যাটার্জী, নাগরাজন, যশোবন্ত ভার্গব—চীফ এ্যাকাউনটেন্ট, অর্জুন সরকার—ডেপুটি ওয়ার্কস ম্যানেজার, সকলের সঙ্গেই আলোচনা করেছেন মুক্তিপদ। সকলেরই অভিমত ওয়েস্ট-বেঙ্গলে আর শিল্প গড়ে তোলবার মতো ক্লাইমেট নেই। যদি ওয়েস্ট-বেঙ্গল ছেড়ে চলে যেতেই হয় তো সাউথ-ইন্ডিয়াতেই যাওয়া উচিত। কারণ সাউথ-ইন্ডিয়াতে জলের কোনও প্রবলেম নেই। এতদিন তাদের সঙ্গেই চিঠি চালাচালি চলছে, হঠাৎ তার মধ্যেই রাজস্থানের আবির্ভাব। হোটেলে মিস্টার যোশীর ঘরে যখন মুক্তিপদ কার্ড পাঠালেন তখন ঘড়িতে দুপুর বারোটা।

মিস্টার যোশী রাজস্থান সরকারের কমার্স মিনিস্টারের সেক্রেটারি। আগেও একবার কলকাতায় এসেছিলেন এখানকার ব্যবসায়ীদের রাজস্থানে আমন্ত্রণ জানাবার জন্যে। অনেকের সঙ্গেই কথা বলেছেন, সুযোগ-সুবিধের প্রসঙ্গ ভেবে দেখতে বলেছেন। এবারের উদ্দেশ্যও সেই একই। সেই সূত্রে এক-এক করে অনেককেই ডেকেছেন। সবাই একে-একে এসেছেন। শেষকালে মুক্তিপদ মুখার্জির ডাক পড়েছে। তাঁর সঙ্গে দেখা করেই চলে যাবেন।

মুক্তিপদও সেই একই কথা আর একবার উত্থাপন করলেন। বললেন—আমি আমার কোম্পানির অফিসারদের সঙ্গে কথা বলেছি, কিন্তু সকলেরই এক কথা। তাঁরা বলছেন—আমাদের যা প্রোডাকশন তাতে জলটাই হলো সব চেয়ে জরুরী জিনিস। সেটা কলকাতাতে প্রচুর আছে, কিন্তু কলকাতার সব চেয়ে খারাপ হলো লেবার প্রবলেম। আপনাদের ওখানে ঠিক উল্টো। আপনাদের লেবার-ট্রাবল্ নেই, কিন্তু জলের সাপ্লাই কম! সাউথ্-ইণ্ডিয়াতে লেবার-ট্রাবল্ও নেই, জলও অফুরন্ত। এই অবস্থায় সম্ভব হলে সাউথ্-ইণ্ডিয়াতে যাওয়াই আমরা প্রেফার করছি—

মিস্টার যোশী বললেন—ঠিক আছে, আমি আজকেই চলে যাচ্ছি। কলকাতায় এসেছিলুম। তাই ভাবলুম যখন এসেছি তখন আপনার সঙ্গে একবার দেখা করে যাই..

তারপর জিজ্ঞেস করলেন—আর সব খবর ভালো তো? সেবার মিসেস মুখার্জির সঙ্গে আলাপ করে খুব খুশী হয়েছিলুম, কেমন আছেন তিনি? অল্‌রাইট?

সেবারে মিস্টার যোশীকে ক্লাবে একটা পার্টি দিয়েছিলেন মিস্টার মুখার্জি আর মিসেস মুখার্জি।

বললেন—অল্‌রাইট, থ্যাংকস্—তিনি এখনও আপনাকে মনে রেখেছেন—

মিস্টার যোশীও বিদায় দিতে গিয়ে বার-বার বলতে লাগলেন—আমার থ্যাঙ্কস্ পাঠিয়ে দেবেন তাঁর কাছে, ও-কে, বাই...

মুক্তিপদ সারা জীবনটাই এই সব বিলিতি ভদ্রতা করে কাটিয়ে দিলেন। মনের ভেতর হাজারটা অশান্তির আগুন যতোই জ্বলুক, বাইরে কেউ যেন তা না জানতে পারে, এমনভাবে হাসতে হবে। এই অভিনয়ের নামই বিলিতি ভদ্রতা। মুক্তিপদ হাজার বিপদের মধ্যেও সারা জীবন এমনি করেই হেসে এসেছেন। এবারও সেই একই কায়দায় হাসলেন। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে নিচেয় নামবার জন্যে লিফ্‌টে উঠলেন। রাস্তার উল্টোদিকে বিশু গাড়ি পার্ক করে রেখেছিল। গেটের কাছে সাহেবকে দেখেই গাড়িটা ঘুরিয়ে নিয়ে সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। মুক্তিপদ বললেন—একবার মিস্টার দাশগুপ্তের চেম্বারের দিকে চল, হাইকোর্টে—
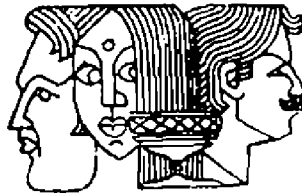
বিডন স্ট্রীটের বাড়িতে যখন সন্দীপ পৌঁছোল তখন শেষ বিকেল। গিরিধারী তখনও গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল। সন্দীপকে দেখেই সেলাম করলে। কিন্তু সে যেন ঠিক সেলাম নয়, কান্না। তার মুখে যেন কথা আটকে গেল। বলতে গিয়েও কান্নার তোড়ে কথা বলতে পারলে না।

সন্দীপ যথা-নিয়মে জিজ্ঞেস করলে—কেমন আছো তুমি গিরিধারী?

গিরিধারী কী-ই বা বলবে! বলবার ক্ষমতা থাকলে তবে তো সে কথা বলবে! সন্দীপের অনুপস্থিতিতে কতো কী বিপদ ঘটে গেছে সে-সব বলতে গেলে তো লম্বা মহাভারত হয়ে যাবে।

সন্দীপ নিজে থেকেই বললে—আমি সবই শুনেছি গিরিধারী। তোমার ছোটবাবুকে যে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে, তা আমি শুনেছি, আমি সব শুনেছি—

গিরিধারী বললে—মেম-ভাবী ওইখানে পড়েছিল বাবুজী, ওইখানে। ওই জায়গাটা

দেখুন, ওই জায়গাটায়—আমি তখন নিজের ঘরে নিদ্ করছিলাম, আমি কিছুই জানতে পারিনি বাবুজী— বলে হাতের আঙুল দিয়ে নির্দিষ্ট জায়গাটা দেখিয়ে দিলে।

বললে—আপনি থাকলে দেখতে পেতেন কতো খুন গিরেছিল ওখানে। খুন গিরে গিরে রাস্তাটা তামাম লাল হয়ে গিয়েছিল।

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—পুলিশ এসে তোমায় কিছু জিজ্ঞেস করেছিল ?

গিরিধারী বললে—হ্যাঁ বাবুজী, আমাকে সব কুছ পুছেছিল। আমি যা জানি সব বলেছি। আমি তো নোকর বাবুজী। মাসকাবারি মাইনে পাওয়া নোকর।

তুমি বলেছ যে রাত্রে ছোটবাবু ভাবীজীকে নিয়ে বাড়ি থেকে বাইরে যেতো ?

—হ্যাঁ বলেছি !

—আর রাত দুটো-তিনটের সময় মদ খেয়ে বাড়ি ফিরতো ? তাও বলেছ তো ?

—হ্যাঁ বাবুজী তাও বলেছি।

সন্দীপ বললে—তাহলে তো তুমি সত্যি কথাই বলেছ। তোমার তো কোনও ভয় নেই।

হঠাৎ মল্লিক-কাকা বাইরে এলেন। বললেন তোমার গলা শুনে আমি বেরিয়ে এলাম। আমার চিঠি পেয়েছিলে ?

বলতে বলতে আবার নিজের ঘরের দিকে চলতে লাগলেন। সন্দীপ তাঁর পেছন-পেছন চলতে চলতে বললে—হ্যাঁ, পেয়েছিলাম, তাই জন্যেই তো এলুম—

ঘরে ঢুকে মল্লিক-কাকা বললেন—বোস—কী খবর সব, বলো—

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—শুনলাম সব গিরিধারীর কাছে। তা হঠাৎ সৌম্যবাবু নিজের বউকে খুন করতে গেল কেন ?

মল্লিক-কাকা বললেন—কী আর বলবো ! ও-সব এখন বাসি খবর হয়ে গেছে। একদিন কর্তার আমলে কতো জাঁক-জমক দেখেছি, আবার আজ এত দিন পরে এও দেখলুম। তুমিও তো এককালে এখানে থাকতে, এখানকার সব ব্যাপারই তুমি জানো। এর পরেও তুমি জিজ্ঞেস করলে সৌম্যবাবু কেন তার বউকে খুন করতে গেল ?

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—আর ঠাকমা-মণি ? তাঁর কী খবর ?

মল্লিক-কাকা বললেন— প্রথম দিকে তো অনেক দিন জ্ঞানই ফেরেনি। এখন একটু সামলে নিয়েছেন। আসলে বেশি দিন বেঁচে থাকাই এক অভিশাপ ! কার কপালে যে কী আছে তা কেউ বলতে পারে না। অনেক শক্ত হার্ট বলেই এখনও সব সহ্য করতে পারছেন। এখনও আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে আমার কাছে হিসেব বুঝে নেন। মেজবাবু রোজই আসেন একবার করে। এসে মা-মণির খবর নিয়ে যান।

—আর ওঁদের সেই ফ্যাক্টরি ?

· সে যেমন বন্ধ ছিল, তেমনি বন্ধই চলছে। এখন কারখানার কথা আর কেউ ভাবছে না। ভাবছে কেবল সৌম্যবাবুর কথা। সৌম্যবাবুকে এতদিনে জামিনও দেয়নি হাকিম, পুলিশ-হাজতে রেখে দিয়েছে। পুলিশ-হাজতে থাকার মানে কী জানো তো ? কথা আদায় করার জন্যে সব রকম শাস্তির ব্যবস্থা থাকে সেখানে। মেজবাবুর উকিল তাকে জেল-হাজতে রাখবার জন্যেও অনেক পিটিশান করেছেন, কিন্তু হাকিম শোনেনি !

—তাহলে শেষ পর্যন্ত কী হবে ?

মল্লিক-কাকা বললেন—সেই কথা ভেবে-ভেবেই তো ঠাকমা-মণির চোখের ঘুম চলে গেছে। মেজবাবুও তো রোজ এসে মা-মণিকে দেখে যাচ্ছেন। মা-মণিকে রাত্রে রোজ ঘুমের বড়ি খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হচ্ছে।

তারপরে একটু থেমে জিজ্ঞেস করলেন তোমার মার কী খবর বলো ?

সন্দীপ বললে—মা মোটামুটি এক-রকম আছে...

—তোমার চাকরি ?

—সরকারি চাকরি, তাই আছে।

—আর বিশাখারা ?

সন্দীপ বললে —বিশাখার কাণ্ড আপনাকে বলা হয়নি। সে আমাকে খুব ভাবিয়ে তুলেছিল। সেই যে তাকে আর মাসিমাকে বেড়াপোতায় নিয়ে গিয়েছিলুম, তখন থেকেই আমি তার বিয়ের জন্যে ঘোরাঘুরি করেছিলুম। কিন্তু বিশাখা এখন আর বিয়ে করতেই চায় না।

মল্লিক-কাকা বললেন—কেন, বিয়ে করতে চায় না কেন ?

সন্দীপ বললে—বলে বিয়ের ওপর তার নাকি ঘেন্না ধরে গেছে। সৌম্যবাবুর সঙ্গে বিয়ে ভেঙে যাবার পর সে এখন কেবলই বলছে চাকরি করবে!

—চাকরি ?

—হ্যাঁ, একবার নিজে থেকেই একটা অফিসে চাকরির দরখাস্ত করেছিল। আমি কিছু জানতেই পারিনি। শেষকালে তারা কী একটা খাইয়ে দিয়েছিল, তার নেশার ঘোরে একদিন একেবারে রাস্তার মোড়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল...

বলে সমস্ত ঘটনাটা গোড়া থেকে শেষপর্যন্ত বলে গেল। সবটা শুনে মল্লিক-মশাই বললেন— আমি এতো জানতুম না, তাহলে আজকাল এইরকম হচ্ছে নাকি ?

সন্দীপ বললে—আমিও জানতুম না এই সব হচ্ছে। পরে কোর্টে গিয়ে আমার সব জানা হয়ে গেল। সারা ইন্ডিয়া জুড়ে নাকি এই রকম মেয়ে ধরবার জাল পাতা হচ্ছে। যিনি আমার উকিল ছিলেন তাঁর নাম কেশবচন্দ্র ঘোষ। তিনি বললেন জেলের ভেতরে নাকি বিশাখার মতো আরো পনেরো-ষোলোজন অবিবাহিতা মেয়ে আছে। তারা সবাই নাকি ওই নেশার শিকার হয়েছে...

মল্লিক-কাকা কথাটা শুনে খানিকক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে রইলেন। তারপর বললেন—তবু তোমায় বলে রাখছি, আর কিছুদিন বিশাখার বিয়েটা ঠেকিয়ে রাখো, এদিকে সৌম্যবাবুর কী হয় সেটা দেখে তারপর যা বোঝ তা কোর। ঠাকমা-মণির বড়ো সাধ ছিল ওই বিশাখাকেই নাত-বউ করে ঘরে আনবেন, কাশীর গুরুদেব তো কুষ্ঠি দেখে তাই-ই বলে দিয়েছিলেন—

সন্দীপ বললে—কিন্তু বিশাখার মা'র যে আর কিছুতেই দেরি সইছে না। তিনি যে ওদিকে বড় পীড়াপীড়ি লাগিয়েছেন ; আর ডাক্তারও তো মাসিমার রক্ত পরীক্ষা করতে বলেছেন।

মল্লিক-কাকা বললেন - কেন ? রক্ত পরীক্ষা করতে বলেছেন কেন ? রোগটা কী ?

—ডাক্তার তো বলছেন সব কিছু পরীক্ষা করে নেওয়া ভালো। সব রকমের পরীক্ষা হয়ে গেছে। এখন একবার 'বায়োপ্সি' করার কথা বলছেন--

—তার মানে ?

সন্দীপ বললে— তার মানে ডাক্তার সন্দেহ করছেন ক্যান্সার—

—ক্যান্সার ?

সন্দীপ বললে— সেই ব্লাড নিয়েই তো মেডিক্যাল কলেজে একদিন গিয়েছিলাম। দেখি তারা কী রিপোর্ট দেয়—সেই রিপোর্ট দেখে তবে কী রকম ট্রিটমেণ্ট করা হবে। এখন সেই রিপোর্টের জন্যে অপেক্ষা করছি আমি...

যতদিন সন্দীপ ছোট ছিল ততদিন ভাবতো সে যেদিন এই পৃথিবীতে জন্মেছে সেই-দিনই এই পৃথিবীর জন্ম হয়েছে। তার জন্মের আগে এই পৃথিবীর কোনও অস্তিত্ব ছিল না। আর শুধু সে একলা কেন, তার বন্ধু গোপাল হাজরা, তারক ঘোষ, তাদেরও সেই একই ধারণা ছিল। আর সে-পৃথিবীর আকার আর আয়তনও ছিল ছোট। অনেক দিন তারা তিন জনে বেড়াতে বেড়াতে অনেক দূরে চলে যেত। হাঁটতে হাঁটতে যখন তারা মাঠের প্রান্তে গিয়ে পৌঁছতো তখন দেখতো আকাশটা যেখানে মাঠের ওপরে ঝুঁকে পড়েছে সেখানে আর কোনও বাড়ি নেই, বসতি নেই, শুধু জঙ্গল আর জঙ্গল।

সন্দীপ বলতো-চল্, ওদিকে এগিয়ে চল্—

তারক বরাবর ভীতু মানুষ। বলতো—না রে, ওদিকে বাঘ আছে, যাস্‌নি—

কিন্তু গোপাল বরাবর ডানপিটে ছেলে ছিল। সে বলতো—দূর, বাঘ-টাঘ বাজে কথা। চল্, আমি যাচ্ছি সঙ্গে, তোদের কোনও ভয় নেই—

গোপাল যতই বলুক, যতই অভয় দিক, তারক আর সন্দীপ তার কথায় কান দিত না। যারা ক্ষেত-খামারে কাজ করতো তাদের সঙ্গে রাস্তায় দেখা হয়ে গেলে সন্দীপ জিজ্ঞেস করতো—ওদিকে কী আছে গো? ওই জঙ্গলের ওপারে?

লোকরা তাদের কম বয়েস দেখে ভয় দেখাতো। বলতো—ওদিকে বাঘ আছে খোকা, ওদিকে যেও না।

তাদের কথা শুনে আরো ভয় হতো তারকের আর সন্দীপের মনে। গোপালও আর একলা দূরে যেতে সাহস পেত না। তারা তিন জনেই তখন আবার বাড়ির দিকে ফিরতো। তখন থেকেই দূর সম্বন্ধে তিন জনের মনেই একটা আগ্রহ যেমন ছিল, ভয়ও ছিল তেমনি। তারকেরই সব চেয়ে বেশি ভয় ছিল দূরকে। আর আশ্চর্য, তিন জনের মধ্যে প্রথম সে-ই কিনা সব চেয়ে দূরে চলে গিয়ে ফার্স্ট হয়ে গেল।

বাকি রইল কেবল গোপাল আর সে। গোপাল মাঝে-মাঝে বলতো— তারকটা আমাদের হারিয়ে দিলে ভাই—

অথচ তারককে তো গোপালই দূরে ঠেলে পাঠিয়ে দিলে। তারকের দূরে চলে যাওয়ার কারণই তো গোপাল হাজরা। তারপর গোপালও একদিন কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। পরে যখন তার সঙ্গে একদিন সন্দীপের হঠাৎ দেখা হয়ে গেল তখন গোপালই বললে যে সে কলকাতায় চলে গেছে। তখন গোপালের কথাতেই সে জানতে পারলে যে কলকাতায় না গেলে মানুষ জানতেও পারে না যে পৃথিবীটা কতো বড়। সেই কলকাতার মানুষরা নাকি খুব বড়লোক। সেখানকার মানুষদের নাকি অনেক টাকা। আরো বললে যে যাদের টাকা নেই তারা মানুষ নয়, জানোয়ার। কলকাতায় টাকা কেবল উড়ছে। শুধু কুড়িয়ে নিতে পারলেই হলো। কলকাতায় না গিয়ে বেড়া-পোতাতে থাকলে কেউ নাকি কোনও দিন কখনও মানুষ হতে পারবে না, সে চিরকাল জানোয়ার হয়েই থাকবে।

গোপালই তাকে সেদিন বলেছিল—যদি মানুষ হতে চাস তো কলকাতায় চলে যা।

সেই কলকাতায় সে কি সহজে যেতে পেরেছিল? অনেক চেষ্টার পর মল্লিক-কাকাকে চিঠি লিখেই তবে কলকাতায় যাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল! কিন্তু কলকাতায় গিয়ে সে কী দেখলে? দেখলে মানুষের চেহারা নিয়ে যারা সেখানে ঘুরে বেড়ায় তারা ঠিক মানুষও নয়, জানোয়ারও নয়, অন্য আর এক তৃতীয় বস্তু। যারা তার ব্যাঙ্কে টাকা রাখতে আর টাকা তুলতে আসে, তাদের নামগুলোও তাদের আসল নাম নয়। বিভিন্ন ব্যাঙ্কে তাদের বিভিন্ন নাম। একজনের এক ব্যাঙ্কে যদি নাম রমেশচন্দ্র সেন হয় তো অন্য আর একটা ব্যাঙ্কে তার নাম হয়ে যায় কালিদাস ব্যানার্জী। অন্য পনেরো-ষোলটা ব্যাঙ্কে আবার একই লোকের আরো পনেরো ষোলটা নাম।

শ্রীকৃষ্ণের শত-সহস্র নামের মতো কলকাতার বড়লোকদেরও শত-সহস্র নাম। প্রথম প্রথম সন্দীপ এটা জানতো না। একদিন একটা ঘটনা দেখে সন্দীপ আরও অবাক হয়ে গিয়েছিল। যাদবদাকে জিজ্ঞেস করেছিল—এই লোকটাই তো সেদিন রমেশচন্দ্র সেন-এর নামে চেক জমা দিয়েছিল যাদববাবু! ব্যাপারটা কী?

যাদববাবু বলেছিল—তাতে কী হয়েছে, দু'জন লোকের চেহারা কি এক রকমের হতে পারে না? ঠিকানাটা তো আলাদা?

সন্দীপ বলেছিল—হ্যাঁ, তা আলাদা—

যাদববাবু বলেছিল—তাহলেই হলো। তার বেশি আর তোমার নজর দেওয়া উচিত নয়—

এর বেশি আর সেদিন কথা হয়নি এর বেশি কথা হওয়ার সুযোগও হয়নি। কিন্তু সন্দীপ লক্ষ্য করতো যেদিনই সেই রমেশচন্দ্র সেন বা কালিদাস ব্যানার্জী আসতেন সেদিনই পরেশদা'কে নিয়ে চলে যেতেন ক্যানটিনে। সেই ভদ্রলোক পরেশদাকে মাংস-পরোটা খাওয়াচ্ছেন। আর পরেশদা'ও মাংস খেয়ে মেজাজ খুশ করছে।

সেদিন ডাক্তারবাবুর কাছে গিয়ে সন্দীপ ব্লাড-রিপোর্টটা দেখালে। এমনিতে গ্রামের ডাক্তার। কিন্তু রোগী তাঁর কম নয়। সব সময়েই তাঁর ডাক্তারখানায় ভিড় থাকে। তাঁর কাছে গেলে কথা বলবার সুযোগ পেতেও অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়।

ব্লাড-রিপোর্টটা তিনি দেখে অনেকক্ষণ ভাবলেন। তারপর বললেন—আচ্ছা, আমি ওষুধটা লিখে দিচ্ছি, এটা সাতদিন খাওয়ান, দেখুন কী হয়--

পঁচিশটা টাকা দিতে হলো ডাক্তারের ওইটুকু পরিশ্রমের জন্যে। তার ওপর আছে ওষুধের দাম। সেও কম করে দশ-পনেরো টাকার মতো। সেই ওষুধ নিয়ে বাড়িতে আসতেই মা জিজ্ঞেস করলেন—কীরে, ডাক্তারবাবু কী বললেন?

সন্দীপ বললে—এখনও বুঝতে পারছেন না। আরও একটা ওষুধ লিখে দিলেন। বললেন- দেখুন কী হয়...এই নাও ওষুধটা। দিনে তিনবার খেতে বলেছেন—সকালে, দুপুরে আর রাত্তির ঘুমোতে যাওয়ার আগে—

মা বললে—আর ঘুমের ওষুধ?

সন্দীপ ঘুমের ওষুধটা অন্য পকেটে রেখেছিল। বললে—ওঃ, এই নাও—

মা বুঝতে পারলে ছেলের অজস্র পয়সা খরচ হচ্ছে! কিন্তু আর কিছু করবার তো নেই। তারপর আছে এতগুলো লোকের খাওয়া-পরার দাবী। সকলের সব দাবীই মেটাতে হবে তবে সংসারে শান্তি থাকবে। আর সেই দাবী মেটাবে মাত্র একটা মানুষ। তার একলার রোজগারে এতগুলো লোকের সংসার চলবে।

মা মুখে কিছু বলে না। জীবনে সংসার করার জ্বালা-যন্ত্রণা বোঝবার আগেই সন্দীপের বাবা মারা গিয়েছিলেন। তখন সম্পত্তি বলতে শুধু এই বাড়িটা। আর কিছুই ছিল না। তিনি খাতা লিখতেন চ্যাটার্জিবাবুদের বাড়িতে। তাতে তিরিশ-চল্লিশ টাকা যা পেতেন তাতে সংসারটা এক রকম করে চলে যেতো। তখন জিনিস-

পত্রের দাম কম ছিল। সেই তিরিশ-চল্লিশ টাকাতেই সব অভাবটুকু মিটে যেতো। কিন্তু হঠাৎ মারা যাওয়াতেই সব হিসেব বেহিসেব হয়ে গেল। তখন চ্যাটার্জিবাবুরাই তাঁদের বাড়ির রান্না-বান্নার কাজ দেখাশোনা করবার ভার মা'র ওপরে ছেড়ে দিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল তাদের পরিবারকে একটু সাহায্য করা।

লাহিড়ী বংশের ইতিহাসে কোনও মেয়ে যা কখনও করেনি সন্দীপের মা তা-ই করতে হলো শুধু ওই ছেলেটার মুখ চেয়ে। সন্দীপ তখন ছোট। খুবই ছোট। চ্যাটার্জিবাবুরাই তাকে ভর্তি করে দিয়েছিলেন স্কুলে। তার অবস্থা বিপর্যয়ের কথা ভেবে তাকে মাইনে দেওয়ার দাপ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল।

সন্দীপ একটু বড় হতেই নিজেদের সংসারের অবস্থা বুঝতে পেরেছিল। বুঝতে পেরেছিল যে তারা গরীব। তারা পরের দয়ার ওপর নির্ভর করেই জীবন কাটাচ্ছে।

মা-ও ছেলেকে বলতো—আমরা গরীব বাবা, মন দিয়ে লেখা-পড়া করো। একটু বুঝে-সুঝে চল। একদিন তোমার ওপরেই এই সংসারের সমস্ত ভার পড়বে। তখন নিজের সংসার হবে। তখন যেন আর আমাকে পরের বাড়িতে গতর খাটাতে না হয়—

সেই সন্দীপ আজ বড়ো হয়েছে। এখন আর তার মাকে পরের বাড়িতে ঝি-গিরি করে সংসার করতে হয় না। এখন সন্দীপ মল্লিক-কাকার দয়ায় কলকাতায় থেকে বি-এ পাশ করেছে। শুধু তা-ই নয়, একটা ভালো চাকরিও পেয়েছে।

কিন্তু তবু তার মা এখনও একটু সুখের মুখ দেখতে পেলে না। কোথায় মা ছেলের বিয়ে দিয়ে পুত্রবধূর হাতে সংসারের ভার তুলে দিয়ে একটু আরাম করবে তারও উপায় নেই। কমলার মা আছে বটে, কিন্তু সংসারের অনেক কাজই এখনও নিজের হাতে করতে হয়। বাবা যখন বেঁচে ছিলেন তখনও যেমন মা নিজের হাতে একটা পয়সাও ছোঁয়নি, এখন ছেলে চাকরি করছে, মাইনে পাচ্ছে, তবু একটা পয়সাও মা কখনও নিজের হাত দিয়ে ছোঁয়নি। সন্দীপ যা মাইনে পেতো তা সমস্তই নিজেদের ব্যাংকে রেখে দিত কারেন্ট-এ্যাকাউন্টে। যখন কিছু দরকার পড়তো তখন চেক্ কেটে টাকা তুলে নিত। এই রকমই চলছিল বরাবর। বরাবর মানে যতদিন বিশাখা আর তার মা এই বেড়াপোতাতে আসেনি।

আর আশ্চর্য, যখন ছেলে একটা চাকরি পেলো, তখন যে মা একটু আরাম করবে, তাও তার হলো না। অথচ তার মা আগেকার মতোই প্রাণ দিয়ে তাদের দু'জনকেই বাড়িতে রেখে সেবা করছে। তখনও মা সন্দীপের কাছ থেকে একটা পয়সাও চেয়ে নেয়নি। মাসিমার চিকিৎসার জন্যে যে ছেলের এত কষ্টের টাকা জলের মতো খরচ হয়ে যাচ্ছে তার জন্যে কারো কাছে এতটুকু অনুযোগও কখনও করেনি। অথচ এরা তার কে? কেউই না। বলতে গেলে এরা কেউই নয় তার। বরং উল্টে ছেলেকে বলেছে ওরে তোর মাসিমার খাওয়ার জন্যে ফল-টল কিছু আনলিনে?

যেন মাসিমা মা'র কতো আপন-জন।

একদিন কাশীনাথবাবুর গৃহিণী এসেছিলেন। মা তাকে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। বললে—এ কি বউমা তুমি? আমার কী ভাগ্যি!

কাশীবাবুর স্ত্রী বললেন- তোমরা কেমন আছো সব, তাই দেখতে এলুম বামুনদি—

—এসো বউমা, বোস। এখনও যে তোমরা আমাদের মনে রেখেছ এই-ই ঢের।

সেই সময় বিশাখা সেখানে এসে পড়তেই চাটুজ্জে-গিন্নী বললেন—এটি কে?

মা বললে—এটি আমার আর এক মেয়ে, এই একে নিয়েই তো তোমাদের বাড়ি গিয়েছিলাম বউমা। মনে নেই?

—ও, হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। মনে পড়েছে...তা তুমি তো লেখা-পড়াজানা মেয়ে। তোমার মাও তো ছিল। মা কোথায় তোমার?

মা বললে—ওর মা পাশের ঘরেই রয়েছে। খুব অসুখ তাঁর।

—খুব অসুখ? কী হয়েছে?

মা বললে—কী জানি বউমা, এখেনে এসে এস্তক ভুগছে, মোটে সারছে না অসুখ। খোকা তো তার জন্যেই অফিস থেকে বেরিয়ে ডাক্তার-বদ্যি করে বেড়াচ্ছে। গাদা গাদা টাকা খরচ হচ্ছে খোকার। কী যে করি বুঝতে পারছি না—

চাটুজ্জে-গিন্নী বললেন—তা মা'র অসুখ বলে কি মেয়েও চিরটাকাল আইবুড়ো হয়ে বসে থাকবে! তুমিই এর একটা বিয়ে দিয়ে দাও না বামুনদি!

মা বললে—আমিই কি বিয়ে দেওয়ার মালিক বউমা? যিনি মালিক তিনি তো ওপর থেকে সব দেখছেন শুনছেন। আমি তো তাই তাঁকে দিন-রাত ডাকছি। বলছি, তুমি যা-হোক একটা হিল্লে করে দাও মেয়েটার—আর খোকা নিজেও কতো চেষ্টা করছে, কিন্তু ভবিতব্য কে খণ্ডাবে বউমা!

চাটুজ্জে-গিন্নী বললেন—তা অন্য পাত্তোর না পাও, তোমার নিজের খোকাই তো রয়েছে! ওরাও তো তোমাদের পাল্টি-ঘর। এ মেয়েকে কি তোমার খোকার পছন্দ হয় না? অবিশ্যি দেওয়া থোয়ার কথা আমি বলতে পারি না। তোমার খোকা যদি বিয়ে করতে চায় তো এখখুনি অনেক মেয়ের বাপ কাঁড়ি-কাঁড়ি টাকা আর গয়না-গাঁটি নিয়ে দৌড়িয়ে আসবে! হাজার টকা মাইনে পাওয়া সোনার টুকরো ছেলে তোমার, তার জন্যে কি আর দেশে মেয়ের আকাল পড়েছে, তুমিই বলো—

হঠাৎ দুজনেরই খেয়াল হলো বিশাখা কখন নিঃশব্দে ঘর থেকে সরে পড়েছে, কেউই জানতে পারেনি।

চাটুজ্জে-গিন্নী গলাটা নামিয়ে বললেন—আমার কথায় মেয়েটা রাগ করলো নাকি?

মা বললে—না, হয়তো লজ্জা হয়েছে। নিজের বিয়ের কথা শুনলে লজ্জা তো হবেই। আর তা ছাড়া লেখা-পড়া জানা মেয়ে, বয়েস হয়েছে—

চাটুজ্জে-গিন্নী বললেন—তা তোমার খোকার সঙ্গে ওর বিয়ে দিতে তোমার আপত্তিটা কীসের?

মা বললে—আমার আপত্তি হবে কেন বউমা, ওই-ই তো বিয়ে করতে চায় না—

চাটুজ্জে-গিন্নী অবাক হয়ে গালে হাত দিলেন—ওমা, সে কী কথা? বিয়ের বয়েস হয়েছে মেয়ের তবু বিয়ে করতে চায় না? বিয়ে না করে চিরকাল আইবুড়ো হয়ে থাকবে?

মা বললে—না, তা নয় বউমা, বলে চাকরি করবে...

—চাকরি করবে? ওমা সে কী কথা?

মা বললে—খোকা বলে কলকাতায় আজকাল নাকি মেয়েরা ছেলেদের সঙ্গে এক টেবিলে বসে চাকরি করছে। খোকাদের ব্যাঙ্কেও নাকি মেয়েরা ওর সঙ্গে চাকরি করে।

চাটুজ্জে-গিন্নী ভয়ে যেন আঁতকে উঠলেন। বললেন—তাহলে আর দেরি করো না বামুনদি। যেমন করে হোক দুজনের হাত এক করে দাও, তাতে তুমিও বাঁচবে, তোমার খোকাও বাঁচবে। তোমার এই মেয়েটাও বেঁচে যাবে। খবরদার, খবরদার, মেয়েকে চাকরি করতে দিও না, মারা পড়বে!

মা বললে—কিন্তু ও কারো কথা শুনবে না বউমা, ও যে কী এক গোঁ ধরেছে, চাকরি ও করবেই। খোকা কতো বারণ করেছে, কতো বিয়ের পাত্তোর খুঁজে বেড়িয়েছে, কিন্তু ও নাছোড়বান্দা। চাকরি ও করবেই—

চাটুজ্জে-গিন্নী উঠে যেতে-যেতে বললেন—তুমি কখখনো ওকে চাকরি করতে দিও না বামুনদি—কখখনো দিও না চাকরি করতে—

মা কিছু বলবার আগেই হঠাৎ বলা-নেই-কওয়া-নেই সন্দীপ ঘরে ঢুকে পড়েছে।

চেহারা উসকো-খুসকো, ঘেমে নেয়ে উঠেছে সমস্ত শরীর। সামনে কাশীনাথবাবুর স্ত্রীকে দেখেই চিনতে পেরে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে। বললে—ভালো আছেন?

—হ্যাঁ বাবা, তুমি কেমন আছো?

—ভালো। কাশীনাথবাবু ভালো আছেন তো? অনেক দিন আপনাদের বাড়ি যেতে পারিনি—

—হ্যাঁ, একদিন এসো বাবা, চলি—

বলে চাটুজ্জে-গিন্নী নিজের বাড়ির দিকে চলে গেলেন। মা বললে—হঠাৎ তুই অফিস থেকে এত সকাল-সকাল? অফিস ছুটি হয়ে গেল বুঝি?

—না মা, আজ অফিস থেকে ক্লিয়ারিং-এর পর ছুটি নিয়ে বেরিয়ে সোজা চলে গিয়েছিলুম কোর্টে—

মা অবাক। বললে—কোর্টে? কোর্টে গিয়েছিলি কী করতে? কোনও মামলা-টামলা ছিল নাকি তোর?

সন্দীপ বললে—হ্যাঁ, সেই বিডন স্ট্রীটের মুখুজ্জেদের সৌম্যবাবুর মামলা ছিল—

ও-ঘর থেকে বিশাখা তখন আবার এ-ঘরে এসে ঢুকলো।

মা বললে—সৌম্যবাবুর মামলা? হাকিম রায় দিলে নাকি আজ?

সন্দীপ বললে—হ্যাঁ মা, সেই রায় শুনেই মনটা আমার খুব খারাপ হয়ে গেল। এতক্ষণ ও-বাড়িতে কী হচ্ছে কে জানে। আমি কেবল ঠাকমা-মণির কথাই ভাবছি তখন থেকে—ঠাকমা-মণির কী হবে? ঠাকমা-মণির ওই নাতি নিয়েই তো যতো সমস্যা ছিল। সারা জীবন-ভোর ওই নাতিকে নিয়েই ছিল তাঁর একমাত্র দুশ্চিন্তা! এখন কী হবে? এখন আর বোধহয় ঠাকমা-মণি বাঁচবেন না। আর শুধু কি তাই? ওদিকে ওদের কারখানাতেও তো ধর্মঘট চলছে কিনা—

মা বললে—ওমা, ধর্মঘট তো অনেক দিন আগে থেকেই চলে আসছিল। সে-সব এখনও মেটেনি নাকি?

সন্দীপ বললে—না মা।

—তা হলে ওদের চলছে কী করে?

সন্দীপ বললে—জমানো টাকা খরচ করে চলছে। আমরা ভাবি বড়লোকদের বুঝি খুব আরাম! তাদের মনে খুব শান্তি আছে, আমাদের মতো গরীব লোকদের জীবনেই যতো অশান্তি। ওদের বাড়িতে না গেলে তো বুঝতেই পারতুম না টাকা থাকার কী জ্বালা। টাকা না-থাকার জ্বালার চেয়ে টাকা থাকার জ্বালাই বেশি মা।

মা জিজ্ঞেস করলে—তা এই রকম করে ক'দিন চালাবে ওরা?

সন্দীপ বললে—কে জানে, কতোদিন চালাবে! কুঁজোর জল গড়িয়ে গড়িয়ে খেলে কি চিরকাল কারো চলে? একদিন তো সেই জল ফুরোবেই—

মা বললে—তা ভেবে ভেবে তুই আর তোর শরীর খারাপ করিস নি। এই যে চাটুজ্জে-গিন্নীকে দেখলি, এদেরও তো অনেক টাকা। কিন্তু এদের যে কতো জ্বালা তা তো জানি। টাকা তো এদেরও কিছু কম নেই—তুই খেয়ে নে, তোর খাবার তৈরি—

সন্দীপ বললে—আমার এখন খিদে নেই মা—

মা বললে—এখন পরের ভাবনা ভেবে আর তুই কী করবি? ওদের কথা ভাববার অনেক লোক আছে—

সন্দীপ বললে—না মা, যতোদিন ওদের কারখানা চালু ছিল ততোদিন ওদের অনেক আত্মীয়-বন্ধু ছিল। ওদের কথা ভাববার অনেক লোক ছিল। কিন্তু যেদিন থেকে ওদের খারাপ সময় পড়েছে সেদিন থেকে ওদের কেউ নেই। মল্লিক-কাকার কাছ থেকে আমি শুনে এসেছি—

তারপর একটু থেমে আবার বললে—মল্লিক-কাকার কাছে আরো শুনে এলুম যে মেজবাবু নাকি ওদের কারখানা কলকাতা থেকে দক্ষিণ ভারতে তুলে নিয়ে যাচ্ছেন—

—কেন ?

—কেন আবার, এখানে রোজ-রোজ ধর্মঘট হলে কী করবে! ওদিকে কারখানা সরিয়ে নিয়ে গেলে সে দেশের লোক মেজবাবুকে অনেক সুবিধে-সুযোগ দেবে! মেজবাবু যদি কলকাতা ছেড়ে চলে যান তাহলে সৌম্যবাবুর মামলা কে চালাবে ?

মা বললে—ওরে ওরা অনেক বড়লোক, ওদের কথা ভাববার অনেক লোক আছে। কিন্তু তোর কথা কে ভাবে তাই আগে ভাব্। তোর ঘাড়ে চেপে আমরা এতগুলো লোক খাচ্ছি-পরছি, এ-কথা ভুলে যাসনে। তোর নিজের স্বাস্থ্যটার দিকে আগে নজর দে—আমি খাবার তৈরি করে দিচ্ছি, আগে তুই খেয়ে নে--

--না মা, আমি আজ কিছু খাবো না।

তবু মা খাবার তৈরি করতে গেল। বিশাখা তখনও দাঁড়িয়ে ছিল। বললে—তুমি খাবে না কেন ? আমার ওপর রাগ করে ?

সন্দীপ বললে- বলেছি তো আমার মনটা ভালো নেই। কোর্টে গিয়ে আজ মাথা ধরে গেছে—আর তোমার ওপর রাগ করতে যাবোই বা কেন ? তুমি কী অপরাধ করেছ ?

বিশাখা বললে—আমি সৌম্যপদকে বিয়ে করতে রাজি হইনি বলে!

সন্দীপ বললে—আমি তোমাকে আর সে-অনুরোধ করবো না।

—কেন ? হঠাৎ তোমার মতি বদলালো কেন ?

সন্দীপ বললে কারণ এখন আর সে-প্রশ্ন ওঠে না—

—কেন ? সে-প্রশ্ন এখন ওঠে না কেন ? এমন কী ঘটলো যাতে সে-প্রশ্ন ওঠে না ?

সন্দীপ বললে—আজ ব্যাংকশাল কোর্টে সৌম্যবাবুর ফাঁসির অর্ডার দিয়েছেন জজ।
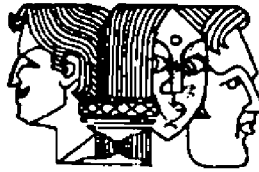
পৃথিবীতে মানুষ আছে তিন জাতের।

প্রকৃতিকে অনুসরণ করে যারা চলে, যারা এই পৃথিবীতে একদিন জন্মায়, একদিন বড়ো হয়, একদিন বিয়ে করে বা কোনও ব্যবসা করে, তারপরে একদিন ছেলে-মেয়ে হয়, তারপর নিজস্ব একটা ফ্ল্যাট কেনে বা বাড়ি তৈরি করে, তারপর কাজ থেকে অবসর নিয়ে একদিন মারা গিয়ে হারিয়ে যায়, চলতি কথায় তাদের বলা হয় ছা-পোষা মানুষ।

সন্দীপ বরাবর মনে করতো সেও এমনি একজন ছা-পোষা মানুষ। নিজেকে ছা-পোষা মানুষ বলে চিহ্নিত করতে তার অবশ্য খুব লজ্জা করতো। তবু তার চেয়ে ঊর্ধ্বে ওঠার ক্ষমতা তার ছিল না বলে মনে-মনে খুব কষ্টও হতো। অথচ পৃথিবীর শতকরা একশোজন মানুষই তো এই ছা-পোষা জাতের। তারা এর বেশি আর কিছু হতে চায়ও না হতে জানেও না, হতে পারে না।

এই প্রকৃতিকে অনুসরণ করার ব্যর্থতায় আবার কেউ-কেউ বিকৃতিকেও অনুসরণ করে। তারা বিকৃতিকে অনুসরণ করে বলেই তাদের কেউ হয় মাতাল, কেউ হয় বেশ্যা, কেউ হয় গুন্ডা, মাস্তান। আবার এদেরই মধ্যে কেউ কেউ হয় দেশের ডিক্টেটর, দেশ-দ্রোহী কিংবা সমাজবিরোধী। তখন হয় তারা নিজেদের দলের বন্দুকের গুলিতে প্রাণ

দেয়, আর নয় তো রাষ্ট্র তাদের ফাঁসি-কাঠে ঝোলায়।

এর পরে আছে সংস্কৃতি। সংস্কৃতিকে যাঁরা অনুসরণ করেন তাঁরা সৃষ্টি করেন নতুন পৃথিবী, নতুন সমাজ, নতুন সভ্যতা, নতুন আদর্শ, নতুন মানুষ, নতুন সাহিত্য, নতুন বিজ্ঞান, নতুন সব কিছু। তাঁরাই হলেন বুদ্ধদেব, সক্রেটিস, যিশুখৃষ্ট, শংকরাচার্য, চৈতন্যদেব, বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণদেব, রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতি—

সন্দীপ এ-সব জানতো। ছোটবেলা থেকেই জানতো। তার কেবল মনে হতো কেন সে প্রকৃতিকে অনুসরণ করে ছা-পোষা মানুষ হতে যাবে? তার আশেপাশে যাদেরই সে দেখেছে তারা সবাই-ই তো ছা-পোষা মানুষ। ওই 'স্যাক্সবী মুখার্জি কোম্পানি'র মুক্তিপদবাবু থেকে আরম্ভ করে তপেশ গাঙ্গুলী, মল্লিক-কাকা, কাশীনাথবাবু, তারক ঘোষই শুধু নয়, তার ব্যাঙ্কের ম্যানেজার করমচাঁদ মালব্যজী, পরেশদা, সুশীল সরকার, মন্ত্রী শ্রীপতি মিশ্র, গোপাল হাজরা সবাই, সবাই ছা-পোষা মানুষ ছাড়া আর কিছু নয়। তারা সবাই টাকা পেয়েই খুশি। শুধু খেতে পাওয়া, শুধু ভালো করে সকলকে টেক্কা দিয়ে বেঁচে থাকা ছাড়া আর কিছুই তারা চায় না। তাদের আগেও আরো কোটি কোটি এমন ছা-পোষা লোক জন্মেছে, ভবিষ্যতেও তাদের মতো আরো কোটি-কোটি ছা-পোষা লোক জন্মাবে আর একটা নির্দিষ্ট বয়সে মরে যাবে জেনেও তারা কিন্তু তাদের স্বভাব বদলাবে না। তারা শুধু পৃথিবীর বোঝা বাড়ানো ছাড়া আর কোনও কাজই করবে না। কোনও কাজ করবার চেষ্টাও করবে না।

সেদিন তাদের ম্যানেজার করমচাঁদজী তাকে ডেকে পাঠালেন। তখন বিকেল তিনটে বেজে গেছে। কাজের চাপও কমে গেছে তখন।

সন্দীপ তাঁর ঘরে যেতেই করমচাঁদজী বললেন—বসুন, আপনি আবার ছুটির দরখাস্ত করেছেন কেন? এত ছুটির আপনার দরকার কী?

সন্দীপ এর কী আর উত্তর দেবে।

করমচাঁদজী আবার বললেন—আপনি তো এখনও বিয়েই করেননি।

সন্দীপ বললে—না, বিয়ে করিনি। বিয়ে করবার মতো আর্থিক সঙ্গতি নেই—

করমচাঁদজী বললেন—সে কী? আপনাদের নিজের বাড়ি, সংসারে শুধু বিধবা মা ছাড়া আপনার আর কেউ নেই বলে জানি। তাহলে আপনার মাইনের টাকায় কুলোচ্ছে না কেন? আপনি তো অনেক টাকা মাইনে হাতে পান। আপনি এত 'লোন্'ই বা নেন কীসের জন্যে? কেন এত দেনা হয় আপনার?

সন্দীপ কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই করমচাঁদজী বললেন—এত কথা জিজ্ঞেস করছি বলে কিছু মনে করবেন না যেন। আমি তো এতদিন ধরে এই ব্রাঞ্চে আছি। সকলকেই আমি দেখেছি। সকলে কে কী-রকম কাজ করে তা-ও আমার জানা। কিন্তু একমাত্র আপনিই তার মধ্যে এক্‌সেপ্‌শন্ মানে ব্যতিক্রম! কিন্তু আপনি এখন এত কামাই করছেন কেন? এতে তো আপনার সারভিস্-রেকর্ড খারাপ হয়ে যাচ্ছে! আর সেই কথাটা বলবার জন্যেই আমি আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছি—

সন্দীপ মাথা নিচু করে রইলো কিছুক্ষণ!

করমচাঁদজী আবার বললেন- কী হলো? চুপ করে রইলেন কেন?

সন্দীপ মুখটা তুললো এতক্ষণে।

বললে—আপনি এমন একটা প্রশ্ন করলেন যার জবাব এক কথায় দেওয়া যায় না।

—তার মানে?

সন্দীপ বললে—এ বলতে অনেক সময় লাগবে। অত সময় কি আপনি নষ্ট করতে পারবেন?

করমচাঁদজী বললেন—আমি আপনার স্বার্থেই এ-কথাগুলো বলছি। বলছি

আপনারই ভালোর জন্যে। আমার এ-ব্যাপারে কোনও স্বার্থই নেই—

সন্দীপ চুপ করে রইলো আবার।

হঠাৎ করমচাঁদজী বলে উঠলেন— কী, আপনি কাঁদছেন? আপনি কাঁদছেন কেন? কাঁদবার মতো কোনও কথা তো আমি আপনাকে বলিনি!

সন্দীপ তাড়াতাড়ি পকেট থেকে রুমাল বার করে চোখ দুটো মুছে ফেললে।

করমচাঁদজী আবার বললেন—আপনি দেখছি বড্ড সেন্টিমেন্টাল!

সন্দীপ কিছু বলবার আগেই করমচাঁদজী আবার বললেন—অবশ্য সেন্টিমেন্টাল হওয়াটা যে খারাপ তা আমি বলছি না। আমাদের এই পৃথিবীটাই তো সেন্টিমেন্টে চলছে। কিন্তু জীবন তো অতো সরল বা সোজা নয়। এখানে কেউ আপনার সেন্টিমেন্টের দাম দেবে না। আপনাকে আপনার প্রাপ্যটা জোর করে কেড়ে নিতে হবে। এখানে যে মাথা নিচু করে থাকবে তার মাথাটা সবাই মিলে জোর করে নিচুই করিয়ে দেবে! মাথা উঁচু করুন, মাথা উঁচু করুন আপনি—

সন্দীপ মাথা উঁচু করে আবার তখনই মাথা নিচু করে ফেললে।

বললে—আপনি যে আমাকে এত ভালোবাসেন তা আমি আগে জানতে পারিনি!

করমচাঁদজী বললেন মনে রাখবেন পৃথিবী বড্ড কঠিন জায়গা। তার মধ্যে বিশেষ করে আবার ক্যালকাটা বা এই ওয়েস্ট-বেংগল। এই বেংগলীরা যেমন একদিকে খুব ভালবাসতে পারে, তেমনি আবার আঘাতও দিতে পারে। এখানে যখন ইংরেজ আমল ছিল তখন বাঙালীরা তাদের যতো আঘাত দিয়েছে ততো আঘাত কি ইন্ডিয়ার অন্য স্টেটের লোকেরা তাদের দিতে পেরেছে? আবার অন্যদিকে বাঙালীরা যতো ইংরেজদের পা চাটতে পেরেছে অন্য স্টেটের লোকরা কি অতো পা চাটতে পেরেছে?

সন্দীপ এ-কথার কোনও উত্তর না দিয়ে মাথা নিচু করে রইলো।

করমচাঁদজী বললেন—যাহোক, আপনার মতো ছোট সংসারে এতো টাকা প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে ধারই বা নিতে হয় কেন আর এতো ছুটিই বা নিতে হয় কীসের জন্যে?

সন্দীপ বললে—যখন ছোট ছিলাম তখন ভেবেছিলুম একটা চাকরি পেলে আমার সব দুঃখ বুঝি ঘুচে যাবে, কিন্তু চাকরি পাওয়ার পরেই বুঝলুম যে নিজের দুঃখটাকে বড়ো করে দেখাই ভুল। দেখলাম আমার চেয়ে আরো অনেক লোকের এমন অনেক দুঃখ আছে, যা আমার দুঃখের চেয়ে হাজার গুণ বেশি। তখন থেকে প্রাণপণে সেই পরের দুঃখ ঘোচাতেই আমাকে এত টাকা ধার করতে হচ্ছে, এত ছুটি নিতে হচ্ছে— আর তার জন্যেই আমার সার্ভিস-রেকর্ড খারাপ হচ্ছে—

করমচাঁদজী কিছুই বুঝতে পারলেন না। জিজ্ঞেস করলেন—পর মানে? তারা আপনার কেউ নয়?

সন্দীপ বললে—না। তারা আমার কেউ নয়?

—তারা যদি আপনার কেউ না হয় তো কেন আপনি তাদের জন্যে নিজের এত ক্ষতি করছেন?

সন্দীপ বললে—এই কথা আমি কাউকে বোঝাতে পারি না, বোঝালেও কেউ বুঝতে পারবে না—

করমচাঁদজী বললেন—ভেরি স্ট্রেঞ্জ! আপনি আমাকে বলতে পারেন, আমি অন্ততঃ বুঝতে চেষ্টা করতে পারবো...

সন্দীপ একেবারে গোড়া থেকে তার জীবনের সমস্ত ঘটনাগুলো বলতে লাগলো। কেমন করে সে পিতৃহারা হয়ে একদিন কলকাতায় এসেছিল। উঠেছিল একজন বড়-লোকের বাড়িতে। সেখানে কী কাজ তাকে করতে হোত সেই কাজের জন্যে কতো টাকা সে মাসোহারা পেতো। তার পরে কী রকম করে সে-বাড়ির নাতি বিলেতে গিয়ে

একজন মেমসাহেবকে বিয়ে করে নিয়ে এলো, তার ফলে বিশাখাদের সে কেমন করে নিজেদের বাড়িতে এনে তুললো, তারপর চাকরি করার ইনটারভিউ দিতে গিয়ে বিশাখা কী-রকম বিপদে পড়লো...সমস্ত সমস্ত...

করমচাঁদজী সব শুনলেন মন দিয়ে। জিজ্ঞেস করলেন—এর পরে কী করবেন?

সন্দীপ বললে—ডাক্তাররা বলছেন মাসিমার অপারেশন করে 'বায়োপ্সি' করতে করতে হবে। তখন বোঝা যাবে রোগটা আসলে কী, ম্যালিগন্যান্ট না অর্ডিনারি টিউমার...

করমচাঁদজী বললেন—সেও তো অনেক খরচের ব্যাপার—

সন্দীপ বললে—আমিও তো তাই ভাবছি, জানি না শেষ পর্যন্ত কী হবে। আর অপারেশন যদি শেষ পর্যন্ত করতেই হয় তো কোথায় করাবো। আজকালকার ডাক্তারদের ওপরেও যে আর ভরসা করতে পারছি না। তারাও এখন বদলে গিয়েছে। আর তার ওপর সেই সৌম্যপদবাবুর আবার খুনের অপরাধের মামলা চলছে ব্যাংকশাল কোর্টে। যদি সৌম্যপদবাবুর ফাঁসির অর্ডার হয়ে যায় তাহলে ঠাকমা-মণি কি বাঁচবেন? তার জন্যেও আমার দুঃখ হয়—

করমচাঁদজী বললেন—তাদের কথা আবার ভাবছেন কেন? তাদের সঙ্গে তো এখন আপনার আর কোনও সম্পর্কই নেই—

সন্দীপ বললে—এখন নেই, কিন্তু আগে তো ছিল। একদিন আমার বিপদের দিনে তো তাঁরা আমায় আশ্রয় দিয়েছিলেন! তা কি ভোলা যায়, না ভোলা উচিত!

করমচাঁদজী বললেন—আপনার কপালে অনেক দুঃখ আছে মিস্টার লাহিড়ী। এই এত লোকের কথা যদি আপনাকে ভাবতে হয় তাহলে কিন্তু জীবনে কখনও সুখী হবেন না। হাজার-হাজার লক্ষ-লক্ষ টাকা মাইনে পেলেও আপনার দুঃখ কোনওদিন ঘুচবে না—

সন্দীপের আজও মনে আছে করমচাঁদজীর সেই কথাগুলো। তিনি অমন করে তাকে ভালো না বাসলে ওই সব কথাগুলো সেদিন বলতেন না। কিন্তু তখন আর বেশি কথা বলবার সময়ও ছিল না তাঁর হাতে। তাড়াতাড়ি ছুটি নিয়ে সন্দীপ সোজা চলে গিয়েছিল ব্যাংকশাল কোর্টে। কিন্তু সেখানে পৌঁছতেই তার অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল।

তখন কোর্ট থেকে সবাই বেরিয়ে আসছিল। এক একে অনেক কালো-কোর্ট পরা এ্যাডভোকেট দিনের কাজ শেষ করে বাড়ি ফিরে যাচ্ছে। তাদের কাউকেই সে চেনে না। অথচ একদিন সন্দীপ নিজেই পরবর্তী জীবনে উকিল হবে এই আকাঙ্ক্ষাই করেছিল। কিন্তু কাশীনাথবাবুর কথাতেই সে শেষ পর্যন্ত ও-পথে যায়নি।

কাশীনাথবাবুই বলেছিলেন—জানো বাবা, তোমার মতো আমারও বাসনা ছিল একদিন বড়ো হয়ে আমি এ্যাডভোকেট হবো। আমি তাই হয়েও ছিলুম। কিন্তু এ্যাডভোকেট হয়ে আমি এখন বুঝতে পারছি যে কোর্টে ঢোকবার সময় দেখেছিলাম এখানে আসবার হাজার-হাজার দরজা খোলা আছে, কিন্তু বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে একটা রাস্তাও নেই—

সন্দীপ জিজ্ঞেস করেছিল—কেন? ও-কথা বলছেন কেন?

কাশীনাথবাবু বলেছিলেন—দেখ বাবা আমি যখন কোর্টে ঢুকি তখন হাইকোর্টে মাত্র বারোজন জজ ছিল, কিন্তু এখন উনচল্লিশজন জজও কাজ করে কুলিয়ে উঠতে পারছেন না—

—কেন?

কাশীনাথবাবু বলেছিলেন—রোজ-রোজ পার্লামেন্টে নতুন নতুন আইন হচ্ছে প্রতি বছর কত হাজার হাজার ছেলে ওকালতি পাশ করে কোর্টে বেরোচ্ছে এতেও তো কাজ

ভালো করে এগোচ্ছে না। একবার যে-লোক এই কোর্টে এসেছে সে তো আর কোনও-দিন বাইরে বেরোতে পারবে না—

এ-সব কথা কাশীনাথবাবুর কাছ থেকে অনেক আগে শোনা। তার পরে কত দিন কেটে গেছে, এখন উকিল-এ্যাডভোকেটদের সংখ্যা বেড়ে গেছে। মামলাও অনেক বেড়ে গেছে. তাতে সত্যের মানেও বদলে গেছে, মিথ্যের মানেও বদলে গেছে—তবু তাই নিয়েই দেশ চলছে। দেশও চলছে, ইতিহাসও চলছে। চলছে বটে, কিন্তু সে সামনে এগিয়ে চলছে না পেছনে এগিয়ে চলছে তা কে বলবে :

সন্দীপ তাড়াহুড়ো করে সামনে এগিয়ে যেতেই দেখলে মেজবাবু তাঁর নিজের গাড়িতে উঠতে যাচ্ছেন, আর তাঁর পেছন-পেছন মল্লিক-কাকা তাঁর সঙ্গে কী যেন কথা বলছেন। মেজবাবুর গাড়িটা চলে যেতেই সন্দীপ পেছন থেকে ডাকলে—কাকা—

মল্লিক-কাকা সন্দীপকে দেখে বললেন—তুমি এসেছো ? আর একটু আগে এলেই সৌম্যবাবুকে দেখতে পেতে। সৌম্যবাবু বড় রোগা হয়ে গেছে। মুখ-চোখ সব শুকিয়ে গেছে এই ক'দিনের মধ্যেই। দেখে বড্ড কষ্ট হলো, জানো—

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—কিছু কথা হলো ?

মল্লিক-কাকা বললেন- কী করে কথা হবে! কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে পুলিশ-পাহারায় ছিল। তাকে দেখে ঠাকমা-মণিও খুব কাঁদছিলেন। তাই দেখে মেজবাবু তাঁকে তাড়া-তাড়ি বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। পুলিশ-হাজতে থাকা মানে যে কতো কষ্টের তা তো শোনা ছিল। সেখানে কথা আদায় করবার জন্যে যে আসামীকে কতো অত্যাচার করা হয় সে তো সবাই-ই জানে। তা দেখে আমারই কান্না আসছিল তো ঠাকমা-মণি!

সন্দীপ বললে—তা ঠাকমা-মণি ওই শরীর নিয়ে কেন কোর্টে এসেছিলেন ? নাতিকে দেখবার জন্যেই এসেছিলেন নাকি ?

—না. না, সাক্ষী হয়ে এসেছিলেন। তাঁকে তো সাক্ষী হতেই হবে।

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—ঠাকমা-মণি কী বললেন ?

মল্লিক-কাকা বললেন—কী আর বলবেন, বলতে বলতে এমন কেঁদে ভাসিয়ে দিলেন যে তাঁকে আর বেশি কথা জিজ্ঞেস করা গেল না। মেজবাবু জজের অনুমতি নিয়ে তাঁকে বাড়িতে পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন—

তারপর সন্দীপ আরো যা শুনলো তাও বড়ো দুঃখের। বাড়ির ঝি-চাকর-বাকর অনেকেই নাকি কোর্টে দাঁড়িয়ে বলেছে যে তারা খোকাবাবুকে মদ খেয়ে মাতলামি করতে দেখেছে। বিন্দুকে উকিলবাবু জিজ্ঞেস করেছিল—তুমি কি এই আসামীকে মদ খেয়ে বউ-এর সঙ্গে ঝগড়া করতে দেখেছ ?

বিন্দু নিজেই তখন ভয়ে থরথর করে কাঁপছিল। কী উত্তর দিতে কী উত্তর দেবে. তা-ই ভেবে উঠতে পারছিল না। আবার প্রশ্ন হলো—কই. কোনও জবাব দিচ্ছ না যে ? বলো. বউ-এর সঙ্গে এই আসামীকে কখনও মদ খেয়ে ঝগড়া করতে দেখেছ ?

বিন্দু ভয়ে বলে উঠলো—হুঁ—

· ভালো করে বলো—দেখেছি ·

বিন্দুও বলে উঠলো—দেখেছি—

সব চেয়ে যে বেশি ঘনিষ্ঠভাবে আসামী আর তার মেম-বউকে জানতো. সে সুধা। সে-ই বলতে গেলে ওদের নিজস্ব ঝি। সুধাই ওদের ঘর পরিষ্কার করে দিত. বিছানা পেতে দিত কাপড়-চোপড় কেচে দিত. মশারি টাঙিয়ে দিত। ঘরের ভিতরের সব কাজের ভারই ছিল সুধার ওপর। তাকে জিজ্ঞেস করলেই জানা যেত দাদাবাবু ও মেমবউদি কখন বাড়ি থেকে বেরোল আর কখন রাতে তারা বাড়ি ফিরলো।

তাকেও সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হলো। তাকেও জিজ্ঞেস করা হলো—যেদিন

তোমার মেমবউদি মারা গেল সেদিন কত রাতে দাদাবাবু বাড়িতে ফিরেছিল?

সুধা বললে—তখন রাত তিনটে পেরিয়ে গেছে—

—সেই দিন কি তোমার দাদাবাবু খুব বেশি মদ খেয়েছিল?

সুধা বললে—তা কী করে জানবো বাবু, বেশি খেয়েছিল কি কম খেয়েছিল, তা ঠিক বলতে পারবোনি।

—তুমি কখনও মদ খেয়েছ?

—না বাবু, আমি কখনও মদ খাইনি। শুনেছি মদ খেলে নাকি মানুষের জ্ঞান-গম্যি কিছু থাকে না।

—মদ খেয়ে কি তারা তোমাকে বকাঝকা করতো?

—হ্যাঁ বাবু, বকাঝকা করতো।

—কী বলে বকা-ঝকা করতো?

—বলতো বেলাডি-বিচ্—

—তারপর? যে-রাত্তিরে তোমার মেম-বউদি আর দাদাবাবু ঝগড়া করেছিল সে-রাতে শেষ পর্যন্ত কী হলো?

—আজ্ঞে দু'জনে তো রোজ রাতেই ঝগড়া করতো। সেদিনও তাই হলো।

—আর সেই ঝগড়ার সময় তুমি কী করতে?

—আমি ঝগড়া শুনতে-শুনতে ঘুমিয়ে পড়তুম।

—কোনও দিন কি এমন হয়নি যে ঝগড়ার শব্দে তোমার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল?

—একদিন ঘুম ভেঙে গিয়েছিল আমার। সেদিন মেম-বউদি দাদাবাবুর বুকের উপরে উঠে দাদাবাবুর গলা টিপে ধরেছিল।

—তারপর?

—তারপর সেই শব্দ শুনে আমি ঠাকমা-মণিকে গিয়ে ডাকলুম। তখন ঠাকমা-মণি এসে দাদাবাবুকে দরজা খুলিয়ে নিজের খাটে শুইয়ে রাখলেন।

—আর যেদিন তোমাদের বাড়িতে পুলিশ এলো সেদিন তুমি কিছু ঝগড়ার শব্দ শুনতে পেয়েছিলে?

—হ্যাঁ, শুনেছিলুম। কিন্তু সে-রকম ঝগড়া তো রোজই হতো।

—পুলিশ এসে তোমাকে কী জিজ্ঞেস করলে?

—পুলিশ এসে ওই একই কথা জিজ্ঞেস করলে যে আমি কিছু জানি কি না—

শুধু বিন্দু কি সুধা নয়, মুখুজ্জে-বাড়ির যে যেখানে ছিল তাদের সকলেরই পরীক্ষা হলো সেদিন। সব চেয়ে কঠিন অত্যাচার হলো ঠাকমা-মণির ওপর। ঠাকমা-মণির সংগে একজন ডাক্তারবাবুও ছিলেন। যখন কথা বলতে বলতে ঠাকমা-মণি অজ্ঞান হয়ে গেলেন তখন ডাক্তারবাবুই তাঁকে দেখা-শোনা করতে এগিয়ে গেলেন।

সমস্ত কোর্ট-ঘর তখন দম-বন্ধ করে দেখতে লাগলো ঠাকমা-মণিকে। ওই বয়েসে ও-রকম আঘাত কি কোনও মানুষ সহ্য করতে পারে!

জজ-সাহেবেরও বুঝি দয়া হলো। তিনিও তো মানুষ। সাক্ষী দেওয়ার যন্ত্রণা থেকে তিনিও ঠাকমা-মণিকে অব্যাহতি দিলেন। বললেন—ওনাকে বাড়ি পাঠিয়ে দিন—

মেজবাবুই তখন ঠাকমা-মণিকে গাড়িতে তুলে নিয়ে গিয়ে বাড়িতে পৌঁছিয়ে দিতে চলে গেলেন।

মল্লিক-কাকার কাছ থেকে সেদিনকার সমস্ত বিবরণ শুনতে শুনতে সন্দীপ যেন একেবারে পাথর হয়ে গিয়েছিল।

জিজ্ঞেস করলে—আর সৌম্যবাবু? তাঁর তখন কী-রকম অবস্থা?

—তাঁর কথা আর জিজ্ঞেস করো না। সাধারণ মানুষ তো আর কাজ করবার সময়

অগ্র-পশ্চাৎ কিছু ভাবে না। ঘরকে না জানলে যেমন ঘরের উঠোনকেও জানা যায় না, প্রতিবেশীকে না জানলে যেমন পাড়া বা সমাজকেও জানা যায় না, জীবনকে না জানলে তেমনি জীবনের ভালো বা মন্দটাও জানা যায় না। আমাদের সৌম্যবাবুরও হয়েছে তাই। তুমি বা আমি হচ্ছি ছা-পোষা মানুষ। আর তুমি বা আমিই নয়, এই কলকাতা বা আমাদের এই জন্মভূমির সব মানুষই ছা-পোষা মানুষ। এখানকার জজ-এ্যাডভোকেট-ডাক্তার-ইঞ্জিনীয়ার-মন্ত্রী-লেবার-লীডার, আমরা সবাই-ই এখানকার ছা-পোষা মানুষ।

কিন্তু সৌম্যবাবু?

সৌম্যবাবুরা হচ্ছেন বিকৃতির শিকার। তাদের নিয়েই আমাদের চলতে হয়। দেশের যারা কর্তা তারাও চায় যে তারা বরাবর ওই রকম বিকৃতির শিকার হয়েই থাকুক। তাতেই তাদের সুবিধে। কর্তারা চায় যে তাদের কোনও স্বাধীন চিন্তার বালাই যেন না থাকে। কর্তারা আরো চায় যে তারা যখন বলবে—'বন্দে মাতরম্', তখন ওই বিকৃতির শিকার হওয়া মানুষগুলোও যেন সকলের সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলে—'বন্দে মাতরম্'। কিংবা তারা যখন বলবে 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ', তখন সেই মানুষগুলোও যেন সকলের সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলে 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ'। সেই বিকৃতির শিকার হওয়া মানুষগুলোও তাই পৃথিবীর সব দেশের কর্তারা পরম যত্নে জীইয়ে রাখে। এ একটা কিছু নতুন জিনিস নয়। মহাভারতের কিংবা রামায়ণের যুগেও তাই ছিল, এখনকার যুগেও তাই আছে। এরাই মেজরিটি। যে এদের সঙ্গে গলা মিলায়নি তাকেই দেশের কর্তারা জেলে পুরেছে কিংবা ফাঁসি দিয়েছে। আমি কোর্টের ভেতরে বসে বসে এই সব কথাই ভাবছিলুম।

তারপর একটু থেমে মল্লিক-কাকা আবার বললেন—দেশের কর্তারা এদের প্রশ্রয় দিলেও বাড়াবাড়ি করলে তারাই আবার একদিন তাকে ক্ষমা করে না। তারা সক্রেটিশকে একদিন খুন করেছে, যীশুখৃষ্টকে একদিন খুন করেছে, গান্ধীকেও একদিন খুন করেছে। খুন করার কারণ হচ্ছে তারা তাদের স্লোগানের সঙ্গে গলা মেলায়নি বলে। কিন্তু এই সৌম্যপদরা তা নয়। এরা হচ্ছে বিকৃতির শিকার। এরা বাড়াবাড়ি করেছে বলেই এদের তারা শাস্তি দেয়। মৃত্যুদণ্ড দেয়। এরা মরে। আর সক্রেটিশকে বা যীশুকে বা গান্ধীকে খুন করলেও তারা আরো হাজার গুণ জীবন নিয়ে বেঁচে ওঠে। তখন তাদের বলা হয় সংস্কৃতির শিকার। তাই বলছিলাম—প্রকৃতির শিকার হলে তাকে বলা হয় ছা-পোষা মানুষ। আর সৌম্যপদবাবুরা হচ্ছে বিকৃতির শিকার।

কিন্তু সংস্কৃতি?

সক্রেটিশ, যীশুখৃষ্ট, গান্ধীরাই হচ্ছেন সংস্কৃতিবান মানুষ। তাই তাঁরা মরে গিয়েও চিরকাল অমর হয়ে বেঁচে থাকেন—আর তোমরা আমরা সবাই হচ্ছি ছা-পোষা মানুষ সন্দীপ, আর কিছুই নই—

কী কথা থেকে কী কথা এসে গেল। সন্দীপ বললে—তাহলে এখন আমি যাই কাকা—প'রে যা-হয় আমি আপনাকে জানাবো!

মল্লিক-কাকা জিজ্ঞেস করলেন—তোমাদের কথা তো কিছুই জানা হলো না। তোমার মা কেমন আছেন?

সন্দীপ বললে—মা তো ভালোই আছে, কিন্তু মুশকিল হয়েছে মাসিমাকে নিয়ে—

—রক্ত-পরীক্ষার রিপোর্ট দেখিয়েছিলে ডাক্তারকে?

সন্দীপ বললে—দেখিয়েছিলুম। কিন্তু ডাক্তারবাবু বলছেন অপারেশন না করলে কিছুই বোঝা যাবে না। আমাদের বেড়াপোতাতে তো কোনও হাসপাতাল নেই। অপারেশন করতে হলে সেই কলকাতাতেই কোনও হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে। আমি একলা মানুষ, কোন দিকটা যে সামলাই তা বুঝতে পারছি না।

মল্লিক-কাকা জিজ্ঞেস করলেন—ডাক্তাররা কী বলছেন? ক্যানসার?

—'বায়োপ্সী' না করলে তো বোঝা যাবে না যে ক্যানসার কি না। সেই-ই তো মুশকিল হয়েছে। কেউই শান্তিতে নেই কাকা। এতদিন কলকাতায় আছি, চাকরির সূত্রেও এতকাল কলকাতায় রয়েছি, দেখছি কেউই শান্তিতে নেই। মুখুজ্জেবাবুদের বাড়িতে এই খুনের মামলা, আর আমাদের মতো গরীব লোকের বাড়িতে আবার এইরকম অসুখ। দুই-ই সমান টাকা থাকলেও যা, টাকা না থাকলেও তাই...
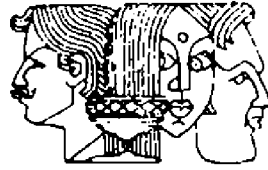
কতোকাল আগেকার এ-সব কথা। এতদিন পরে তার সব মনে পড়ছে। কোথা দিয়ে যে কী হয়ে গেল তা ভাবলেও অবাক হতে হয়। সেই মল্লিক-কাকা, সেই সৌম্য-পদবাবু, সেই ঠাকমা-মণি, সেই মুক্তিপদবাবু, সেই স্যাক্সবী মুখার্জি কোম্পানি, সেই গোপাল হাজরা, সেই বিশাখা, সেই হরদয়াল। তাকে কেন্দ্র করে সবাই যেন এখন একসঙ্গে পরিক্রমা করছে।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা হরদয়াল সবে কলিনস্ স্ট্রীটের বাড়িতে গিয়ে পৌঁছেছে, হঠাৎ দেখলে কতকগুলো ছেলে দরজার কাছে গিয়ে ডাকছে—আন্টি, আন্টি—

এ-সব দৃশ্য নতুন কিছু নয় হরদয়ালের কাছে। ওরা এ-রকম প্রায় রোজই আসে। তারা আসা মানেই হরদয়ালের টাকা আমদানি হওয়া। সবাই জানে না এ-ঠিকানা।

তাদের এড়িয়ে হরদয়াল বাড়ির ভেতরে ঢুকলো।

এ-সব অঞ্চল বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অন্ধকার থাকে। রাত হলেও রাস্তার আলোগুলো জ্বলে না। যদিও বা জ্বলে তো সেগুলো তাড়াতাড়ি নিভিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা থাকে।

হরদয়াল ঢুকতেই আন্টি এগিয়ে এল। হরদয়াল খুব খুশী। বললে—বাইরে কারা ডাকছে তোমাকে।

আন্টিরও খুব হাসি-হাসি মুখ। বললে—হ্যাঁ, ওরা রোজই এই সময়ে আসে—

হরদয়াল বললে—দেখে তো মনে হয় ওরা বেশ পয়সাওয়ালা লোকের ছেলে

আন্টি বললে—আগে একজন-দুজন আসতো, এখন ওরা দলে ভারি হয়েছে—ওদের সঙ্গে কয়েকজন মেয়েও আছে—

—মেয়েও আছে?

—হ্যাঁ, এক-একটা পুরিয়া নেয় পাঁচ টাকা করে। তাও প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশটা পুরিয়া রোজ বিক্রী হয়—

খবরটা শুনে হরদয়ালের মুখে আরো খুশীর আমেজ ছড়িয়ে গেল।

বললে—ওদিকে ফটিক শালা বেশ গুছিয়ে নিয়েছে। শুনলাম আর একটা বাড়ি নাকি কিনেছে দমদমে। শুনেছি কাল ও এক-একটা পুরিয়া দশ টাকা দরে বেচেছে—

আন্টি বললে—আমরাও দর বাড়িয়ে দশ টাকা করতে পারি—

হরদয়াল বললে—তাতে যদি বিক্রী-বাটা কমে যায়! শুনলাম তো সেই 'আইডিয়াল ফুড প্রোডাক্টস' কোম্পানিটা নাকি পুলিশ বন্ধ করে দিয়েছে—

—পুলিশ কেন বন্ধ করে দিলে? তারা তো ঠিক সময়ে তাদের পাওনা-গণ্ডা পেয়ে যাচ্ছিল!

হরদয়াল বললে—পুলিশের মধ্যেও যে ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে গোলমাল চলছিল। সব লাভের গুড়টা কি নিজে খেলে চলে? পুলিশের মধ্যেও যে ভাগীদার বেড়ে গেছে। অতো হইচই করে কাগজে বিজ্ঞাপন দিলে চলে? তারপর কোর্টে মামলাও চললো একটা মেয়েকে নিয়ে—

—কোন্ মেয়েটাকে নিয়ে?

হরদয়াল বললে—যে-মেয়েটাকে আমরা এখান থেকে বার করে নিয়ে গিয়ে রাস্তায় ফেলে দিয়ে এসেছিলুম। বিশাখা গাংগুলী না কী যেন নাম তার। যার ছবি দিয়ে কাগজে 'নিরুদ্দেশ' কলমে বিজ্ঞাপন বেরিয়েছিল—

আণ্টি বললে—তাই নাকি? তাকে পাওয়া গেছে?

—হ্যাঁ—হ্যাঁ, সেই যে একটা লোক তাকে নিয়ে এই বাড়ির তেরো নম্বর ঘরে ফেলে রেখে দিয়ে গিয়েছিল! শেষ পর্যন্ত তাকে পাওয়া গিয়েছিল প্রেসিডেন্সি জেলে। সে-খবরের কাগজেও বেরিয়েছিল। তোমার মনে নেই?

—তারপর?

—তারপর জানা গেল যে আলিপুরের জেলখানায় নাকি ওই রকম পুরিয়া-খাওয়া মেয়ে আরো পনেরো-ষোল জন রয়েছে। আর ঠিক তার পরেই তো ওই 'আইডিয়াল ফুড্ প্রোডাক্টস্' কোম্পানি তল্পি-তল্পা গুটিয়ে হাওয়া হয়ে গেল।

আণ্টি বললে—তাই নাকি? আমি তো এ-সব খবর কিছুই জানতে পারিনি!

হরদয়াল বললে—আমি কিন্তু খবর রেখেছি ঠিক। একদিকে ইন্কামও করবো আবার ওদিকে পুলিশকেও বেশি ভাগ দেব না, তা করে কি বিজ্‌নেস চলে? বেআইনী ব্যবসাতেও একটা অনেস্টি মানতে হয়। তা না মানলে তো ওই রকম কারবার গুটিয়ে তল্পি-তল্পা নিয়ে হাওয়া হয়ে যেতে হয়।...আর তোমাকেও বলি: এখন থেকে অচেনা লোক দেখলে সহজে তাকে বাড়িতে ঢুকিও না। আজকাল শুনেছি পুলিশেরও নাকি একটা নতুন 'সেল্' হয়েছে এই 'হেরোইন' ধর-পাকড়ের জন্যে।

আণ্টি বললে—তা ভাগ তো আমরা পুলিশকে দিয়েই থাকি বরাবর—

হরদয়াল বললে—দিলে কী হবে, এখন তো ভাগীদার আরো বাড়লো, এবার থেকে তাদের আরো বেশি ভাগ দিতে হবে—

যারা পুরিয়া খেতে এসেছিল তারা পাশের ঘরে এতক্ষণ ধরে গোলমাল করছিল। তাদের গোলমাল কানেও আসছিল। হরদয়াল জিজ্ঞেস করলে—ওরা সব কা'রা?

আণ্টি বললে—ওরা সব স্টুডেন্ট। ওরা সবাই কলেজে পড়ে।

—তা তুমি চেনো তো ওদের?

—চিনবো না? ওরা তো আমার রেগুলার কাস্টোমার। ওদের সঙ্গে অনেক মেয়েও আসে। প্রথম-প্রথম একজন-দু'জন আসতো, তারপর এখন তারাই আবার নিজেদের বন্ধু-বান্ধব জুটিয়ে আনছে। পুরিয়ার সঙ্গে ওরা যা-যা খাবার খেতে চায় সবই যোগানো হয়।

—মেয়েরাও আসে নাকি?

আণ্টি বললে—তা ছেলেরা এলে মেয়েরা আসবে না? ওরা সবাই যে একই কলেজে পড়ে। ওদের মধ্যে আবার অনেক বড়লোকের ছেলে-মেয়েরাও আছে। অনেকে আবার গাড়ি করে আসে। গাড়িগুলো পার্ক স্ট্রীটে পার্ক করে রাখে—তারপর সেখান থেকে এখানে হেঁটে হেঁটে আসে।

হরদয়াল খবরটা শুনে খুশী হয়। মনে মনে সে স্বপ্ন দেখে তার পুরিয়ার দাম পাঁচ থেকে বেড়ে কুড়ি টাকা হয়েছে। সেই টাকায় সে আরো বড়লোক হয়েছে। এখন ফটিকের চেয়ে আরো বড়লোক হবে। তার নিজের এখন একটা বাড়ি। এখন ফটিকের

মতো সে আর একটা বাড়ি তৈরি করবে। তারপর আরো একটা বাড়ি। তারপর আরো একটা। ফটিককে দেখিয়ে দেবে যে তার সংগে নেমকহারামি করলে সেও তার বদ্‌লা নিতে পারে।

খানিক পরে পাশের ঘরের চেঁচামেচি কমে এলো। আণ্টি বললে—ওই, এখন সবাই নেশার ঘোরে এলিয়ে পড়েছে—আর ওদের কোনো সাড়া-শব্দ নেই।

হরদয়াল বললে—ঘর ভাড়াটা দিয়ে দিয়েছে তো?

—হ্যাঁ, সেটা আমি আগেই নিয়ে নিয়েছি। ঘণ্টায় দশ টাকা ঘরের ভাড়ার রেট করে দিয়েছি—দু'ঘণ্টা থাকলে কুড়ি টাকা। ওরা বলেছে আজ এক ঘণ্টা থাকবে, তার বেশি নয়। তাই দশ টাকা ঘর ভাড়া আগাম নিয়ে নিয়েছি। ছ'জন আছে ওরা। পাঁচ-ছয়ে তিরিশ টাকা পুরিয়ার দাম আর দশ টাকা ঘর ভাড়া ; মোট চল্লিশ টাকা নিয়ে রেখে দিয়েছি। আর খাবার-দাবার সব বাইরে থেকে নগদে মিটিয়ে দিয়েছে।

আণ্টির সব কাজ পাকা-পোক্ত। এত দিন এ-কাজ চালিয়ে এসেছে, কোনও দিন তার হিসেবের এতটুকু গড়বড় হয়নি। হরদয়ালও নেমকহারাম নয়। তার যেমন-যেমন আয় বেড়েছে তেমনি-তেমনি আণ্টির মাইনেও বাড়িয়ে দিয়েছে সে। কিন্তু মাইনে বাড়িয়ে দেওয়ার চেয়ে আরো লাভ হতে লাগলো আণ্টির কমিশন-সিস্টেম বন্দোবস্ত করে দিয়ে। যতো আয় হবে তার ওপর দশ পার্সেণ্ট কমিশন। সেই সিস্টেম করে দেওয়ার পর থেকেই আণ্টিরও বেশি আয় হতে লাগলো। বেশি আয় হতে লাগলো হরদয়ালেরও।

যেই এক ঘণ্টা কাবার হলো তখনই ঘর খালি করে দেওয়ার কথা। আণ্টির মাইনে করা লোক সে সব খেয়াল রাখে। ওরা ঘর খালি করলে তবে তো অন্য খদ্দের এসে ঘর ভাড়া নিতে পারবে। তাই তাগাদা দিয়ে ঘর খালি করে দরজায় চাবি দিয়ে সে-চাবি আবার আণ্টির হাতে গচ্ছিত রাখতে হয়। এইটেই আণ্টির এ-বাড়ির নিয়ম।

আণ্টির হাতে চাবি জমা দিয়ে লোকটা চলে গেল।

ঘর থেকে বেরিয়ে ছেলে-মেয়েরা চুপ-চাপ চলে যাচ্ছিল। হঠাৎ আণ্টি বলে উঠলো—ওই দেখুন বাবু, ওই দেখুন। সামনে যে ফর্সা মেয়েটা যাচ্ছে, তাকে দেখুন—

হরদয়াল দেখলে। বললে—ও কে?

আণ্টি বললে—ও খুব বড়লোকের মেয়ে। ওর নাম পিক্‌নিক্—

—কী করে জানলে ও বড়লোকের মেয়ে?

আণ্টি বললে—ওর নেশাখোর বন্ধুরাই বলেছে, বেলুড়ের 'স্যাক্সবী মুখার্জী' কোম্পানির' যে মালিক, তারই মেয়ে ও।

হরদয়াল বললে—ওর মালিকের নাম তো মুক্তিপদ মুখার্জি, এখন তো সে-কার-খানায় লক্-আউট চলছে। হাজার-হাজার লোক ওদের সবাই বেকার হয়ে পড়েছে। ও তারই মেয়ে? তার শেষকালে এই দশা?

আণ্টি বললে—হ্যাঁ, ওর নাম পিক্‌নিক্—

কথাটা শুনে হরদয়ালের মতো গুণ্ডা-সর্দারও ছি-ছি করে উঠলো। বললে—ইস্-স্—সব শালারা মিলে দেশটাকে দেখছি একেবারে গোল্লায় নিয়ে গেল রে—

অতো দিনকার আগের কথা ভেবে অনেক মানুষ অনেক আনন্দ পায়। অতীতটা সকলেরই ভাবতে ভালো লাগে। কারণ তখন দুঃখের ঘটনাগুলো ভুলে গিয়ে শুধু সুখের অংশটাই মানুষের মনে থাকে। কিন্তু সুখ বলে কি কোনও জিনিস সন্দীপ জীবনে কখনও পেয়েছিল? সন্দীপের জীবনে বর্তমানের মতো অতীতটাও ছিল শুধু দুঃখে ভরা! সত্যিই সন্দীপ নিজের জীবনে যেমন কখনও কোনও সুখ পায়নি তেমনি হাজার চেষ্টা করেও কাউকে সুখী করতেও পারেনি।

কিন্তু প্রশ্নটা হলো—সুখ কী? 'সুখ' শব্দটা কি তাহলে শুধু ডিক্সনারীতে আবদ্ধ হয়ে থাকারই বস্তু? একে একে সন্দীপের আপন বলতে যারা ছিল তারা সবাই চলে গেছে। তারা যখন ছিল তখনই কি তার সুখ ছিল? সুখের ব্যাখ্যার জন্যে সে কতো বই পড়েছে, কতো লোককে জিজ্ঞেস করেছে, কতো দেশ ঘুরেছে, আকাশের সূর্যের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করেছে কতোবার। বলেছে—হে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র আমাকে বলে দাও সুখ কী? কী পেলে আমি সুখী হবো?

সূর্য আজ পর্যন্ত তার সে-প্রশ্নের কোনও উত্তর দেয়নি।

কার্ল মার্কস্‌কে একবার জিজ্ঞেস করা হয়েছিল--সুখ কী?

কার্ল মার্কস্‌ উত্তর দিয়েছিলেন--'Struggle'.

'Struggle' যদি সুখ হয় তাহলে সে সুখী নিশ্চয়। কিন্তু সে তো কই বুঝতেই পারছে না যে সে সুখী!

হরিদ্বারের একজন সাধুকে সে জিজ্ঞেস করেছিল ওই একই কথা। সাধুবাবা খুব জ্ঞানী মানুষ। তিনি বলেছিলেন জগতের ভেতরে যে-মানুষ জগদীশ্বরকে দেখতে পায় আর আত্মার মধ্যে যে পরমাত্মার সন্ধান পায় সেই মানুষই সুখী।

কথাগুলো সন্দীপ সেদিন বুঝতে পারেনি, এতদিনের পরেও সে বুঝতে পারেনি সেই কথাগুলোর মানে।

সুখের সন্ধান করতে করতে সে একটা বইএর পাতায় এর উত্তর খুঁজে পেয়েছিল। সেখানে লেখা ছিল একটা সংস্কৃত শ্লোক। শ্লোকটা হলো—'নাল্পে সুখমস্তি, ভূমৈব সুখম্'। অর্থাৎ অল্পে সুখ নেই, ভূমাতেই সুখ।

কিন্তু ওই 'ভূমা'র মানেটা কী?

'ভূমা'র মানে 'বৃহৎ' বা 'মহৎ'। লোকে কিন্তু বৃহৎ বা মহৎ কিছু চায় না। সে চায় টাকা, চায় বাড়ি গাড়ি, চায় সমস্ত ভোগের উপকরণ, চায় ছেলের চাকরি, মেয়ের বিয়ে, চায় রোগ থেকে মুক্তি, চায় দামী জামা কাপড়, চায় সুন্দরী স্ত্রী, এই রকম আরো কতো ছোট-ছোট জিনিস, এ-সব জিনিস মানুষকে সুখী করে না, কারণ এগুলো একবার পেলে তার চাওয়া-পাওয়া ফুরিয়ে যায়। কিন্তু এমন জিনিসও সংসারে আছে যা পাওয়ার পরেও মনে হয় সবটুকু যেন পেলাম না। আরও পেলে যেন ভালো হতো। ক্ষিধে পেলে কিছু খেতে পেলেই চাওয়াটা শেষ হয়ে যায়।

কিন্তু পৃথিবীতে কী এমন জিনিস আছে যা পেলেও মনে হয় যেন সম্পূর্ণটা পাওয়া হলো না?

এতদিন জেলখানায় থেকে থেকে তার মন সেই অতীতের দিকেই কেবল পরিক্রমা করতো। সন্দীপ তো কখনও নিজে সুখী হতে চায়নি। সে সকলকে সুখী করবার

চেষ্টায় বার-বার নিজেকে উৎসর্গ করেছে। বার-বার চেয়েছে, যেখানে যে আছে তারা সবাই সুখী হোক। সে বিশ্বাস করেছে যে নেওয়ার মধ্যে সুখ নেই, সুখ আছে কেবল দেওয়ার মধ্যেই। তাই যখনই গোপাল হাজরা তাকে টাকা-পয়সা সম্বন্ধে উপদেশ দিয়েছে তখনই সন্দীপ তার নিজের বিচার আর বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চেয়েছে। কারণ বিডন স্ট্রীটের মুখার্জিবাবুদের বাড়িতে কয়েক বছর কাটিয়ে সে বুঝতে পেরেছে যে সুখের ব্যাখ্যা আলাদা। সুখের সঙ্গে টাকা-পয়সার কোনও সম্পর্ক নেই, তাই যে-পথটা ভুল বলে তার মনে হয়েছে সে-পথটা সে সযত্নে পরিহার করেছে। অথচ চোখের সামনে গোপাল হাজরার দৃষ্টান্তটা দেখেও তা কখনও তার বিশ্বাসের মূলে গিয়ে আঘাত করতে পারেনি। ও গাড়ি চড়ুক, টাকা উপায় করুক, যতো ইচ্ছে নেশা করুক, মিনিস্টারদের সঙ্গে যতো ইচ্ছে ঘনিষ্ঠতা করুক, সে তার নিজের বিশ্বাস নিয়ে আজীবন দৃঢ় থাকবে—এই সিদ্ধান্তেই সে বরাবর অটল থেকেছে।

কিন্তু এইবার যেন তার বিশ্বাসের ভিতটা একটু নড়ে উঠলো। তার মনে হলো সে বোধহয় এতদিন ধরে ভুল করে এসেছে। গোপাল হাজরাই ঠিক, দোষ তারই। ওই 'আইডিয়াল ফুড প্রোডাক্টস'-এর ভবতোষ সাহা আর হরদয়ালরাই হচ্ছে আসল বুদ্ধিমান। ওদের অবজ্ঞা করে সে নিজের ক্ষতিই করেছে কেবল। প্রমাণ হয়ে গেছে যে সে নির্বোধ!

'নার্সিং-হোম' থেকে রাস্তায় বেরিয়ে চারদিকের ভূগোলটা যেন তার চোখের সামনে ঘুরতে লাগলো। মনে হলো রাস্তায় পা দিলেই যেন সে গাড়ি চাপা পড়বে।

পেছন থেকে যেন কে একজন তাকে ধরে ফেললে।

সন্দীপ পেছন ফিরে দেখলে একেবারে অচেনা লোক। আগে কখনও কোনও দিন তাকে দেখেনি সে।

ভদ্রলোক বললে—কী হয়েছে আপনার? শরীর খারাপ নাকি?

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—আপনি কে?

ভদ্রলোক বললে—আমি কেউ না। রাস্তায় চলতে চলতে মনে হলো আপনি যেন টলছেন। তা আপনার ব্লাড্-প্রেশার আছে নাকি?

সন্দীপ বললে—না তো—

—তা হলে? তা হলে টলছিলেন কেন? দেখে মনে হলো আপনি যেন এক্ষুণি টলে রাস্তায় পড়ে যাবেন, তাই তাড়াতাড়ি আমি ধরে ফেললুম—

সন্দীপ কী বলবে বুঝতে পারলে না। আশ্চর্য, সে নিজেও তো কই জানতে পারেনি যে সে টলছে।

—আমি আপনাকে বাড়ি পৌঁছিয়ে দেব?

সন্দীপ বললে—না, আমি একলাই বাড়ি যেতে পারবো—

ভদ্রলোক বললে—কিন্তু এভাবে একলা আপনি বাড়ি যাবেন কী করে? আপনার বাড়ি কোথায়?

সন্দীপ বললে—সে অনেক দূরে, বেড়াপোতায়।

ভদ্রলোক বললে—সেখানে যাবেন কী করে?

সন্দীপ বললে—সে যেমন করে হোক যাবো। আপনি ভাববেন না—

ভদ্রলোক যে কে, কোথায় যে ভদ্রলোকের বাড়ি তাও সন্দীপের জানা ছিল না। বিপন্ন মানুষকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসার এমন দৃষ্টান্ত সন্দীপ জীবনে আর কখনও দেখেনি।

ভদ্রলোক বললে—বাসে-ট্রামে বাড়ি যাবেন না। যদি বলেন তো একটা ট্যাক্সি ডেকে দিতে পারি...

সন্দীপ বললে—না. তার দরকার হবে না, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আমি নিজেই চলে যেতে পারবো।

ভদ্রলোক চলে গেলেন। সন্দীপ খানিকক্ষণ সেখানেই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। রাস্তা দিয়ে তখন অসংখ্য লোক আর ট্রাম-বাস-ট্যাক্সি ছুটে চলেছে। কারো দিকে চেয়ে দেখবার সময় নেই কারো। সকলের একই উদ্দেশ্য—হয় কার্য-সিদ্ধি আর নয় তো টাকা রোজগার। এ-দুটো ছাড়া কলকাতার মানুষের জীবনের আর কোনও উদ্দেশ্যই নেই—বরাবর এই ধারণাই ছিল সন্দীপের। কিন্তু আজ হঠাৎ এই ভদ্রলোকের ব্যবহার দেখে সন্দীপ অবাক হয়ে গিয়েছিল! এও তো একটা ব্যতিক্রম!

ডাক্তারবাবুর কথাটা তখনও মাথার মধ্যে ঘুরছিল। তাহলে এতদিন এত টাকা খরচ করে এত চিকিৎসা করার পর সমস্তই কি এমন করে ব্যর্থ হয়ে যাবে?

সন্দীপ ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞেস করেছিল—তাহলে আমি কী করবো ডাক্তারবাবু?

ডাক্তারবাবুর কাছে সময় বড়ো মূল্যবান। তার কাছে সময় মানেই টাকা। বাইরে অনেক রোগী তাঁর পরামর্শের জন্যে প্রতীক্ষা করে আছে। সন্দীপ ঘর থেকে বেরোলেই তারা ঢুকবে।

ডাক্তারবাবু বললেন—কী আর করবেন, ট্রিট্‌মেন্ট করাবেন।

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—তা ক্যানসার কি সারে?

ডাক্তারবাবু বললেন—ক্যানসার সারে না বলে তো আর হাত গুটিয়ে বসে থাকলে চলে না। আগে টাকার ব্যবস্থাটা করে ফেলুন।

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—কত টাকা খরচ হতে পারে?

ডাক্তার বললেন—রোগী আপনার কে হয়?

সন্দীপ বললে—আমার কেউ না—

—তার মানে? আপনার নিজের কেউ নয় তো তার জন্যে আপনি এত কষ্ট করছেন কেন? এঁর নিজের বলতে কে আছেন?

সন্দীপ বললে—কেউ নেই—

—কেউই নেই? আশ্চর্য তো!

সন্দীপ বললে—একজন অবশ্য আছে. সে এঁর মেয়ে! কিন্তু সেই মেয়ের এখনও বিয়ে হয়নি। সেই মেয়েও এখন আমার গলগ্রহ।

ডাক্তারবাবু তবু কিছু বুঝতে পারলেন না। আর অতো কথা জিজ্ঞেস করবার সময়ও ছিল না তাঁর তখন। অন্য অনেক রোগী তখন তাঁর জন্যে অনেকক্ষণ থেকে অপেক্ষা করছিল।

বললেন—ঠিক আছে. আপনি কী ঠিক করলেন তা জানালে আমি সেই মতো ব্যবস্থা করবো।

সন্দীপ আবার জিজ্ঞেস করলে—তাহলে আপনি বলছেন রোগীর একটা পা কেটে ফেলে দিতে হবে?

—হ্যাঁ।

—কতো খরচ পড়বে?

ডাক্তারবাবু বললেন ওই তো বললুম. আমার নিজের অপারেশন ফিস্ হচ্ছে দু'হাজার ছ'শো. আর নার্সিং হোমের খরচ প্রতিদিন তিন শো টাকার মতোন। ধরে রাখুন সব মিলিয়ে কুড়ি হাজার টাকার মতোন তার বেশী নয়—

এই কথার পরে সন্দীপের আর কিছু মনে নেই। কখন সে ডাক্তারের চেম্বার থেকে বেরিয়েছিল. কখন রাস্তায় এসে নেমেছিল. কখন সে রাস্তা পেরিয়ে উল্টোদিকের রাস্তায় যেতে চেষ্টা করেছিল কিছুই তার মনে পড়ছিল না। ওই অচেনা ভদ্রলোক

তাকে না ধরে ফেললে হয়তো সে গাড়ি চাপা পড়ে যেতো। কিন্তু যিনি তাকে বাঁচালেন তিনি কে? কে তাঁকে পাঠালে? তাহলে কি তার ঈশ্বর চান সে বেঁচে থাকুক?

সন্দীপ চুপ করে সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলো। কেন তাকে ঈশ্বর বাঁচালেন? এখন কুড়ি হাজার টাকা সে কোথা থেকে পাবে? কে তাকে কুড়ি হাজার টাকা দেবে? যদি সে কাবুলিওয়ালার কাছ থেকে টাকাটা ধারও করে তাহলে কতো সুদ দিতে হবে তাকে? সে-টাকা সে কী করে শোধ করবে?

আবার চারদিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলো সে। আবার মনে হলো তার মাথা ঘুরছে।

এখন সমস্যা হলো—এই শরীর নিয়ে কী করে সে বেড়াপোতাতে যাবে? কী করে সে এ-কথা তার মা'কে বলবে? বিশাখাকে সে কী বলবে? মাসিমাকেই বা সে কী বলে বোঝাবে?

তার ওপর আছে আবার টাকার প্রশ্ন। অনেকগুলো টাকা সে ধার করেছে প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড থেকে। সে ধারই এখনও সে শোধ করতে পারেনি। ওদিকে দিন-দিন জিনিস-পত্রের দাম হু-হু করে বেড়ে চলেছে। অথচ সমস্ত সংসারটার বোঝা তারই একলার মাইনের ওপর নির্ভর করে চলছে। এই অবস্থায় আবার কুড়ি হাজার টাকার বোঝা সে কেমন করে বইবে?

এতক্ষণ সে ফুটপাথের ওপর একটা জায়গাতেই চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। এবার যেন সে আবার বাস্তব জগতে ফিরে এলো। চারদিকে চেয়ে দেখলে প্রতিদিনের মতো ট্রাম-বাস-ট্যাক্সি ছুটে চলেছে। সূর্যটাও ঠিক অন্য দিনের মতো নিয়ম করে ডুবে গেছে, রাস্তার আলোগুলোও জ্বলছে প্রতিদিনের যান্ত্রিক নিয়মে। কোথাও কোনও ব্যতিক্রম নেই। শুধু সন্দীপই কেবল স্থাণু হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা জায়গায়।

ডাক্তারবাবুর কথাগুলো তখনও কানের কাছে গুন-গুন করতে লাগলো—কুড়ি হাজার টাকার মধ্যেই আপনার সব কাজ আমি করে দেব। আপনি কিছু ভাববেন না। অন্য কেউ হলে আমি তিরিশ হাজার বলতুম। কিন্তু আপনি যখন বলছেন পেশেণ্ট আপনার নিজের কেউ নয়...

ডাক্তারবাবু তিরিশ হাজার টাকা না নিয়ে দয়া করে কুড়ি হাজার টাকার মধ্যে সব কিছু ঠিক করে দিচ্ছেন, এর জন্যে সন্দীপের তো খুশী হওয়াই উচিত। কতো দয়ালু ডাক্তার! এ-রকম দয়ালু ডাক্তার আর কোথায় সে পাবে? এই রকম ডাক্তারের কাছে তো তার কৃতজ্ঞ থাকাই উচিত।

সন্দীপ কতো লোকের মুখ থেকে শুনেছে যে উকিল আর ডাক্তারের খপ্পরে পড়লে কারোর আর রেহাই নেই। তারা একবার মক্কেল কিংবা রোগীকে হাতের মুঠোয় পেলে তাকে একেবারে রাস্তার ভিখিরি করে ছাড়বে।

কিন্তু কই, আলিপুর কোর্টের এ্যাডভোকেট শিবকুমার ঘোষ তো বিশাখাকে জেলখানা থেকে ছাড়িয়ে আনবার জন্যে একটা পয়সাও নিলেন না।

কথাটা শুনে সেবার মা'ও অবাক হয়ে গিয়েছিল। জিজ্ঞেস করেছিল—কতো টাকা খরচ হলো রে তোর বিশাখাকে ছাড়িয়ে আনতে?

সন্দীপ বলেছিল—একটা পয়সাও আমার খরচ হয়নি

মাও কথাটা শুনে প্রথমে অবাক হয়ে গিয়েছিল। বলেছিল—সে কী রে? কোনও খরচই হয়নি তোর?

সন্দীপ বলেছিল—না মা, একটা পয়সাও খরচ হয়নি আমার বিশ্বাস করো, আমার একটা পয়সাও খরচ হয়নি—

মা বলেছিল—এও ভগবানের অশেষ দয়া রে অশেষ দয়া। তুই তাঁকে নিজে থেকে

কিছু দিলিনে কেন?

সন্দীপ বললে—তখন আমি বিশাখাকে নিয়ে এত ব্যস্ত যে সে-সব কথা আমি ভাববার সময়ই পাইনি, মনে নেই কী-রকম 'চকোলেট' 'চকোলেট' বলে চেঁচাচ্ছিল! কতোদিন জেলখানায় না-খাইয়ে উপোষ করে রেখে দিয়েছিল। তখন আমি কোর্ট থেকে বেরিয়ে একটা রেস্টুরেন্টে ওকে পেট ভরে খাওয়াতে তবে ও ঠান্ডা হয়—

মা বললে—যাক্ গে, পরে একদিন দোকান থেকে এক বাক্স সন্দেশ কিনে নিয়ে উকিলবাবুকে দিয়ে আসিস।

কিন্তু এবার?

কে জানে কী-রকম মানুষ এই ডাক্তারবাবু। বাজারে তো খুব নাম-ডাক এঁর। এঁর চেম্বারে রোগীদের ভিড়ও খুব। যাকেই জিজ্ঞেস করেছে সন্দীপ সে-ই বলেছে—আরে, ডাক্তার লাহিড়ী? ও তো একেবারে ধন্বন্তরী। অমন ডাক্তার হয় না।

ব্যাঙ্কেরও অনেককে সন্দীপ জিজ্ঞেস করেছে। ডাক্তার বিকাশ লাহিড়ীর নাম শুনেই সবাই একবাক্যে ডাক্তার লাহিড়ীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছে। এক-কথায় ডাক্তার লাহিড়ী আর স্বয়ং ভগবান যেন একই মানুষ। সকলেরই কেউ-না-কেউ আত্মীয়-স্বজনের চিকিৎসা করিয়েছে ওই ডাক্তার লাহিড়ীকে দিয়ে। তাঁর নার্সিং-হোমে ভর্তি হয়ে সবাই-ই ভালো হয়ে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে এসেছে। ডাক্তার লাহিড়ী যখন বলেছেন 'ক্যান্সার' তখন আর তাতে কোনও সন্দেহ নেই। ওঁকে আপনি নির্ভয়ে দেখাতে পারেন। এক-কথায় ওঁর কাছে রোগীকে নিয়ে যাওয়া মানে ভগবানের কাছে নিয়ে যাওয়া। ওঁকে আর বেশিদিন বাড়িতে ফেলে রাখবেন না মশাই, ফেলে রাখলে সমস্ত শরীরে স্প্রেড করে যাবে।

ডাক্তার লাহিড়ীর চেম্বারে যেদিন সন্দীপ মাসিমাকে প্রথম দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল সেদিনই তিনি বলে দিয়েছিলেন ওটা ক্যান্সার—

ক্যান্সার!!!

কথাটা শুনেই সন্দীপের মাথা থেকে পা পর্যন্ত সর্বাঙ্গ আতঙ্কে শিউরে উঠেছিল।

ডাক্তার লাহিড়ী আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলেছিলেন—আপনার মাসিমাকে যেন এখন এ-সব কথা কিছু বলবেন না। তার মানে আপনার মা কিংবা ওঁর মেয়ে কাউকেই কিছু বলবার দরকার নেই। তারা অহেতুক ভয় পেয়ে যাবেন। আমি আছি, ভয় কী?

সন্দীপ বলেছিল—কিন্তু এ-রোগ ওর সারবে তো?

ডাক্তার লাহিড়ী বলেছিলেন—নিশ্চয়ই সারবে! আমি কতো রোগীকে সারিয়েছি।

সন্দীপ পকেট থেকে দশটা পাঁচ টাকার নোট সামনের দিকে এগিয়ে দিয়েছিল। আর ডাক্তার লাহিড়ীও সে-নোটগুলো না গুণেই প্যান্টের পকেটে গুঁজে রেখে দিয়েছিলেন। তারপরে মাসিমাকে আবার সে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিল। রোগী মানুষকে সঙ্গে করে বেড়াপোতা থেকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া আর আবার তাকে সেখান থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসা কি সহজ কথা? উদ্বেগ পয়সা খরচের কথা ছেড়ে দিলেও রোগীর শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্য-অস্বাচ্ছন্দ্যের কথাও তো ভাবতে হয়। যে-মানুষ পায়ের ব্যথায় বাড়ির ভেতরে এক-পা'ও হাঁটতে পারে না তাকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে ডাক্তার দেখিয়ে আবার ফিরিয়ে আনা কি সোজা।

পায়ে ব্যথা! পায়ে কীসের ব্যথা কেন ব্যথা আর তার সঙ্গে কেন যে অত জ্বর, তা কোনও ডাক্তারই ধরতে পারেনি, ধরলেন প্রথম ডাক্তার লাহিড়ী। আগে যাদের দেখানো হয়েছে তারা সবাই-ই বলেছে—ওটা কিছু নয়। পেটের ট্রাবল থেকে এসেছে। দু'চারটে বড়ি খাইয়ে দিলেই ঠিক হয়ে যাবে।

এই রকম করেই বহুকাল চলছিল। প্রথম-প্রথম মাসিমা বলতো—চলতে গেলে

বাঁ-পায়ে কেমন যেন একটা কষ্ট হয় বাবা—

প্রথম প্রথম ওই সামান্য ব্যথা নিয়ে কেউই মাথা ঘামায়নি। সবাই ভাবতো বিশাখার ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবতে-ভাবতেই তার যতো কিছু অসুখ। তাই ঘুমের বড়ি খাইয়ে খাইয়ে তাকে রাখা হতো। শেষকালে বিশাখাকে যখন খুঁজে পাওয়া গেল তখনও কিন্তু মাসিমার শরীরের কোনও উন্নতি হলো না। দিন-দিন স্বাস্থ্যের কেবল অবনতিই হতে লাগলো। তখন দেখা গেল বাঁ পায়ের হাঁটুর নিচেয় একটা জায়গা ফুলে উঠেছে. সেখানটা টিপলে ব্যথা লাগে। তারপরে সেই ফোলা জায়গাটা আরো একটু বেশি ফুলে উঠলো। তখন গাঁয়ের ডাক্তারকে দেখিয়ে কিছু ওষুধ খাওয়ানো হলো। তাতেও ব্যথার কোনও তারতম্য হলো না।

তখন সবাই মনে মনে একটু ভয় পেয়ে গেল।

সব দেখে শুনে মা একদিন ছেলেকে আড়ালে ডেকে বললে—ওরে খোকা, আমি কিন্তু বেশ ভালো বুঝছি নে—

সন্দীপ বললে—কেন মা? কী হয়েছে?

—ওরে তোর মাসিমার বাঁ পায়ের সেই ফোলাটা যেন আরো বেড়ে যাচ্ছে -

সন্দীপ তখন সারাদিন গাধার খাটুনি খেটে সবে মাত্র বাড়িতে ঢুকেছে। তার শরীর. মন সব কিছুর তখন অবশ অবস্থা। বললে আমি আর কী করবো. কতো করবো! কতো ডাক্তারকেই তো আমি দেখালুম, কেউ তো কিছু করতে পারছে না।

মা বললে—ও-কথা বললে তো এখন চলবে না বাবা। একটা কিছু তো করতে হবে। আর তুই না করলে কে করবে। আর কে আছে আমাদের? তোর ওপরে ভরসা করেই তো এ সংসার চলছে—

এ-রকম শুধু একদিন নয়. দিনের পর দিন মা'র এই অনুযোগ. অভিযোগ শুনতে শুনতে সন্দীপ যেন কেমন বিরক্ত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু বিরক্ত হলে তো তার চলবে না। পরের দায়িত্ব যখন স্বেচ্ছায় নিজের ঘাড়ে তুলে নিয়েছে তখন তো অমৃতের সঙ্গে সঙ্গে বিষটাকেও তাকে হাসিমুখে গিলতে হবে। বিষ গিলতে অস্বীকার করলে তো সে অমানুষ বলে গণ্য হবে।

তারপরেই সে এ-ডাক্তার. সে-ডাক্তার. সমস্ত ডাক্তারের খোঁজ-খবর করতে লাগলো। অনেক ডাক্তারের কাছেই সে মাসিমাকে দেখালে। এক-এক ডাক্তার এক-এক রকম মতামত দিলে। সকলেই নিজের-নিজের নার্সিং-হোমে ভর্তি করাবার পরামর্শ দিলে।

আর সরকারী হাসপাতাল?

সবাই-ই বললে—হাসপাতালে পাঠিও না হে. ওখানে সুস্থ লোককে রাখলে সেও অসুস্থ হয়ে পড়বে। সেও মরে যাবে। হাসপাতালের মালিক ডাক্তার নয়. আসল মালিক হলো গিয়ে হাসপাতালের মেথর আর ঝাড়ুদাররা। তাদের ঘুষ না দিলে রোগীকে সেখানে ভর্তি করাও যাবে না—এই-ই হচ্ছে এখানকার হাসপাতাল—

এই রকম করে একদিকে চাকরি আর অন্য দিকে সংসারের জাঁতা ঘোরাতে ঘোরাতেই সন্দীপ তার জীবনটা ক্ষয় করে ফেলছিল। ঠিক এই সময়ে সাক্ষাৎ হলো ডাক্তার বিকাশ লাহিড়ীর সঙ্গে। তিনিই প্রথমে বললেন -ক্যান্সার।

তারপর যখন তিনি খরচের অঙ্কটা বললেন—তখনই সন্দীপের মাথাটা ঘুরে গেল। ডাক্তার লাহিড়ীর চেম্বার থেকে বেরিয়েই তার মাথাটা কেমন যেন ঘুরতে লাগলো। কুড়ি হাজার টাকা! কুড়ি হাজার টাকা সে কেমন করে. কার কাছ থেকে যোগাড় করবে?

হঠাৎ চোখটা খুলতেই সন্দীপ দেখলে অনেকগুলো মানুষ তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। তার মধ্যে একজন বললে এখন কেমন আছেন?

কথাটা কার মুখ দিয়ে যেন বেরোল। সন্দীপ চোখ বুলিয়ে চারদিকটা একবার

পড়বে! শুধু তো সৌম্যপদ নয়, মুক্তিপদ মুখার্জিই কি তা কল্পনা করতে পেরেছিলেন? কতো চেষ্টা তো তিনি করেছিলেন তাঁর 'স্যাক্সবী মুখার্জি' কোম্পানীকে বাঁচাতে। কতো টাকা তো তিনি দু'হাতে বিলিয়েছিলেন সব সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্তাদের, ইউনিয়নের নেতাদের তিনি কতো লাখ-লাখ টাকাও দিয়েছিলেন, যাতে তাঁর ফ্যাক্টরি এখানে থাকে! কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেন তাঁর ফ্যাক্টরি নিয়ে তাঁকে বেঙ্গল থেকে চলে যেতে হলো?

তখন সৌম্যপদকে নিয়ে মামলা চলছে। একমাত্র নাতি খুনের আসামী। এই সময়ে ঠাকমা-মণি যদি বাড়ির ভেতরে বিছানায় শুয়ে পড়ে থাকেন, তাহলে মামলা চালাবে কে? মামলা চালবার লোক তো উকিল-ব্যারিস্টার-সলিসিটার, কিন্তু সেই উকিল-ব্যারিস্টার-সলিসিটারদের কে চালাবে?

ঠাকমা-মণির তখন আর বিশ্রাম নেওয়ার সময় নেই। তাঁর তখন ভোরবেলায় গঙ্গাস্নান করবার নিয়ম ত্যাগ করতে হয়েছে। তার ফলে বিন্দুরও একটু আরাম হয়েছে। তখন আর তাকে রাত সাড়ে তিনটের সময় উঠতে হয় না। তখন একটু দেরি হয় সকাল হতে।

কিন্তু সকাল হতে দেরি হলে কী হবে, ওদিকে রাতও যে হয় দেরি করে। তখন গিরিধারীকেও আর রাত ন'টার সময় সদর গেট বন্ধ করতে হয় না। অন্য সব নিয়মের মতো সে-নিয়মটাও তখন বন্ধ হয়ে গেছে। তখন গিরিধারী গেটের সামনেই রাত দশটা কি কখনও রাত এগারোটা পর্যন্ত হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

অনেক দিন থেকে আছে গিরিধারী এ-বাড়িতে। এসেছিল ছোটবেলায় এ-বাড়ির চাকরি নিয়ে। তারপর কতো কান্ড দেখতে পেলে সে। তারই চোখের সামনে ইতিহাসের পাতা উল্টোতে-উল্টোতে এখন সে বুড়ো হতে চললো। কবে সে ছুটি নিয়ে দেশে গিয়েছে মনেও পড়ে না তার। যখন সে দেশে গেছে তখন কাজ চালাবার জন্যে বদ্‌লা লোক দিয়ে গেছে। দেশ থেকে লোক এসে তার জায়গায় কাজ চালিয়ে দিয়ে আবার দেশে চলে গেছে। শুধু মাত্র কয়েক দিনের ছুটি। সেই ছুটির সময় দেখা হয়েছে বউএর সঙ্গে। কতো মাস কতো বছর পরে দেশে যাওয়া। কিন্তু সেখানে গিয়েও তার মন পড়ে থাকতো কলকাতায়। মাঝে-মাঝে হঠাৎ মাঝ-রাত্রে তার ঘুম ভেঙে যেত। হঠাৎ ঘুমের ঘোরে স্বপন দেখতো খোকাবাবু বাড়িতে ফিরে এসে বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে আর সে তখনও ঘুমোচ্ছে।

ঘুমের ঘোরের মধ্যেই গিরিধারী চেঁচিয়ে উঠতো—হুজৌর...

পাশে শুয়ে থাকা বউএর ঘুমও ভেঙে যেত গিরিধারীর সেই চিৎকারে।

গিরিধারীকে বলতো—কী হয়েছে? কী হয়েছে তোমার? চেঁচাচ্ছো কেন?

গিরিধারীর ঘুম ভেঙে যেত বউএর ঠেলাঠেলিতে। বলতো—হ্যাঁ...

বউ বলতো—ঘুমোতে-ঘুমোতে তুমি এতো চেঁচাচ্ছিলে কেন?

বউ-এর গলার শব্দ পেয়ে গিরিধারী বুঝতে পারতো সে স্বপ্ন দেখছিল এতক্ষণ। বুঝতে পারতো যে সে কলকাতার চাকরি করতে-করতে ছুটি নিয়ে দেশে এসেছে, দেশে এসে নিজের বাড়িতে তার বউ-এর পাশে শুয়ে আছে।

তারপরে যখন সে আবার কলকাতায় আসতো তখন তার দেওয়া লোকটাকে তার পাওনা টাকা-কড়ি মিটিয়ে নিজে আবার তার টুল বসতো। আর রাত্রে যখন সমস্ত কলকাতা নিস্তব্ধ হয়ে যেত তখন সে 'রাম-চরিত-মানস'খানা নিয়ে উচ্চারণ করে পড়তো। কিন্তু তখন আগেকার সেই কলকাতা যেমন ছিল না, তেমনি আগেকার মুখার্জি বাবুদের হাল-চালও সে-রকম ছিল না, কয়েকজন পুরনো চাকর-বাকরকেও তখন হটিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

আগে ভোর তিনটে-চারটের সময় ঠাকমা-মণি গাড়ি নিয়ে বিন্দুর সঙ্গে গঙ্গায় চান করতে যেতেন। সেই গঙ্গায় চান করতে যাওয়া তখন পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তার বদলে সিংহ-বাহিনীর পুজোর পরেই ঠাকমা-মণি ম্যানেজারবাবুকে নিয়ে উকিল-সাহেবের বাড়িতে যেতেন। বাড়ি ফিরতে ফিরতে তাঁর অনেক দিন রাত এগারোটাও বেজে যেত।

সেই জন্যেই অতো রাত পর্যন্ত জেগে থাকতে হতো গিরিধারীকে। ঠাকমা-মণি বাড়ি ফিরে এলে তখন গিরিধারী নিশ্চিন্ত। গিরিধারী তখন গিয়ে ঘুমোত নিজের বিছানায়। একদিন মাইনে নিতে গিয়ে গিরিধারী ম্যানেজারবাবুকে জিজ্ঞেস করেছিল—আচ্ছা হুজুর, একটা বাত্ জিজ্ঞেস করবো আপনাকে?

ম্যানেজারবাবু বলেছিলেন—কী কথা?

গিরিধারী বলেছিল—খোকাবাবুর নামে তো মামলা হচ্ছে—

—হ্যাঁ হ্যাঁ, হচ্ছে. কেন? কী জানতে চাও তুমি?

—খোকাবাবু কি খালাস হবে?

ম্যানেজারবাবু চটে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন—সে-ব্যাপারে তোমার অতো মাথা-ব্যথা কেন? তোমার কাজ মাইনে পাওয়া। এখন মাইনে পেলে, মাইনে নিয়ে তুমি চলে যাও। মালিকদের ব্যাপারে তোমার আমার কারো নাক গলানো ঠিক নয়. যাও—

শুধু গিরিধারীই নয়, বাড়ির অন্য লোকেরাও ওই একই প্রশ্ন করেছে মল্লিক-মশাইকে। সবাইকেই তাদের মাসকাবারি মাইনে নিতে আসতে হয় মল্লিক-মশাইএর কাছে। আর শুধু বাড়ির ঝি-চাকর-বাকররাই নয়. পাড়ার লোকজনেরাও সুযোগ পেলেই মল্লিক-মশাইকে ওই একই কথা জিজ্ঞেস করতো। রাস্তা দিয়ে যদি কখনও মল্লিক-মশাই যেতেন. দু'একজন চেনা-মানুষ কাছে এসে জিজ্ঞেস করতো কেমন আছেন ম্যানেজারবাবু?

প্রশ্নটা ছিল উপক্রমণিকা। আসল প্রশ্নটা করার আগে ওটা এক-রকমের ভূমিকা।

তারপরেই আসল প্রশ্নটা বেরিয়ে আসতো—হ্যাঁ. ভালো কথা, আপনাদের বাড়ির সেই খুনের মামলাটার কী হলো ম্যানেজারবাবু? কিছু ফয়শলা হলো?

মল্লিক মশাইএর ইচ্ছে হতো ভদ্রলোকের গালে ঠাস করে একটা চড় কষিয়ে দেন। সকলের মনোগত গোপন ইচ্ছেটা চেপে রেখে বাইরে আত্মীয়-বন্ধুর খোলস পরে অভিনয় করার চেষ্টাটা মল্লিক-মশাইএর একেবারে ভালো লাগতো না। তিনি তাদের সব কৌতূহল আর প্রশ্নের উত্তর দিতে একটা কথায়. বলতেন—দেখা যাক কী হয়—

মল্লিক-মশাই ছিলেন হুকুমের চাকর। তিনি অনেক জেনে, অনেক শিখে তখন জ্ঞানী হয়ে গিয়েছিলেন। তার ফলে যখনই কেউ জিজ্ঞেস করতেন তখনই বলতেন—দেখা যাক কী হয়

অতো বড়ো বংশ. অতো টাকার মালিক হওয়া সত্ত্বেও যখন তার অতো অধঃপতন হলো তখন ওই কথা বলা ছাড়া আর কী-ই বা উপায় ছিল তাঁর। তাই তিনি সকলের সব জিজ্ঞাসার উত্তরে ওই একটা কথাই বলতেন—দেখা যাক কী হয়—

কিংবা হয়তো তখনও তাঁর আশা ছিল মুখার্জিবাবুরা আবার একদিন তার পূর্ব-গৌরব ফিরে পাবে। হয়তো সৌম্যপদবাবু খুনের মামলা থেকে মুক্তি পাবে. মুক্তি পেয়ে সেই আগেকার পছন্দ করে রাখা মেয়ের সঙ্গেই তার বিয়ে হয়ে।

তা সেদিনও অনেক রাতে ফিরলেন ঠাকমা-মণি আর ম্যানেজারবাবু।

সেদিনও গাড়ির পেছনের দরজা দিয়ে নামলেন ঠাকমা-মণি। তারপর সামনের সীট থেকে নামলেন ম্যানেজারবাবু।

সেদিন দুজনেরই গাড়ি থেকে নামতে একটু বেশি রাত হয়ে গিয়েছিল। অন্যদিন

দেখে নিলে। এ কোথায় রয়েছে সে? কারা তার দিকে এমন করে একদৃষ্টে চেয়ে আছে? ওরা কারা? এটা কোন্ জায়গা? তার কী হয়েছে? তার মুখ দিয়ে কোনও কথা বেরোচ্ছে না কেন? সে কেন শুয়ে আছে এখানে? কেন সে উঠে দাঁড়াতে পারছে না? কেন কেউ তার কথার জবাব দিচ্ছে না?

আবার সেই একই প্রশ্ন—এখন কেমন আছেন?

সত্যিই সেখানে তখন অনেক মানুষের ভিড়। মানুষের ভিড়ে ফুটপাথটা আটকে গেছে। ভিড়ই ভিড় টানে। পেছন থেকে কে একজন কাকে জিজ্ঞেস করলে—এখানে কী হয়েছে মশাই? এত ভিড় কেন?

জবাবে একজন ভদ্রলোক বললে—একজন লোক এখানে অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন—

—কে? ভদ্রলোকের নাম কী?

ভদ্রলোক উত্তর দিলে—কী করে বলবো, ভদ্রলোক তো কথাই বলতে পারছেন না, একেবারে তো অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন—

পৃথিবীতে উপদেশ দেওয়ার লোকের কোনও যুগে কখনও, কোথাও অভাব হয় না। শহরে, গ্রামে, গঞ্জে ভিড় জমাবার মতো অকর্মা লোকেরও অভাব হয় না কোনও যুগে। তাই সেদিন সেই দুপুর তিনটের সময় দিনের আলোর তলায় সন্দীপের অজ্ঞান শরীরটাকে ঘিরে ব্যস্ত শহরটাও হঠাৎ যেন একেবারে স্তব্ধ স্থাণু হয়ে গেল। সকলের মুখে একই প্রশ্ন—এ কে? এর বাড়ি কোথায়? এ কেন এই অবস্থায় পড়ে আছে? এর নাম কী?

এক ভদ্রলোক ভিড়ের ভেতর সন্দীপকে উঁকি মেরে দেখে বলে উঠলো—আরে, এই তো, এই লোকটাকে আমি একটু আগেই এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টলতে দেখেছিলুম। তখনও সন্দেহ হয়েছিল এ-লোকটার নিশ্চয় কিছু অসুখ-টসুখ হয়েছে—

—কখন দেখেছিলেন আপনি? কতক্ষণ আগে?

ভদ্রলোক বললে—এই তো ঘণ্টা দুয়েক আগে আমি এখান দিয়ে যাচ্ছিলাম। আমি একে না ধরলে তো তখনই ইনি পড়েই যাচ্ছিলেন।

—তারপর?

—তারপর আর কী করবো, আমি এঁকে সুস্থ হতে দেখে নিউ মার্কেটে গিয়েছিলাম জিনিস-টিনিস কিনতে। তারপর এখন ফেরার পথে এই কাণ্ড দেখে আমি তো অবাক হয়ে যাচ্ছি—

এ-ব্যাপারে কী যে করণীয় তার হদিস কেউ দিতে পারছে না। অথচ একজন এইভাবে এখানে বেঘোরে মারা যাবে, তাও কারোর কাম্য নয়, তাহলে কী হবে এখন?

একজন বললে—একবার থানায় খবর দিলে হয়। তাহলে পুলিস এসে কিছু একটা স্টেপ্ নিতে পারে, কিংবা বাড়িতে পৌঁছিয়ে দিতে পারে।

একজন বললে—আরে ছেড়ে দিন, এখনকার পুলিসের কথা। পুলিসকে খবর দিলে কিছুই হবে না, শুধু শুধু পণ্ডশ্রম। তার চেয়ে হাসপাতালে খবর দিয়ে দেখুন, যদি তারা এ্যাম্বুলেন্স পাঠাতে পারে—

তাতেও কারো সায় নেই। হাসপাতাল, ডাক্তার, এ্যাম্বুলেন্স, পুলিস, সব কিছুই দেশে আছে, কিন্তু তারা মানুষের জন্যে থেকেও মানুষের উপকারে নেই। তারা আছে শুধু মাসকাবারি মাইনে পাওয়ার জন্যে। মাসের প্রথমে তারা হাতে মাইনে নিয়েই খালাস, তার বেশি কারো কোনও দায়-দায়িত্ব যেন নেই।

কিন্তু কথায় আছে যার কেউ নেই তার ভগবান আছে। হঠাৎ কোথা থেকে যেন সেই ভগবানই সশরীরে সেখানে এসে হাজির হলো। গাড়িতে যেতে-যেতে হঠাৎ যেন তিনি ফুটপাথের ভিড় দেখে একটু থেমে গেলেন। তার ভিড়ের ফাঁক দিয়ে সন্দীপের আধ-

খানা মুখ দেখে গাড়ি থেকে নেমে পড়লেন। সকলের ভিড় ঠেলে সন্দীপের পুরো মুখটা দেখেই বলে উঠলেন—আরে, এ ভদ্রলোককে তো আমি চিনি. উনি এখানে পড়ে আছেন কেন?

অনেকের চোখে-মুখেই একটা আশার আলো ফুটে উঠলো। তারা জিজ্ঞেস করলে—আপনি এঁকে চেনেন? এঁর বাড়ি কোথায়?

ভদ্রলোক বললেন—বাড়ি চিনি না. কিন্তু ইনি কোথায় চাকরি করেন তা জানি—

—কোথায়? কোথায় চাকরি করেন?

ভদ্রলোক বললেন- ন্যাশন্যাল ইউনিয়ন ব্যাঙ্কে আমি এঁকে দেখেছি চাকরি করতে। ওখানে আমার এ্যাকাউণ্ট আছে যে—প্রায়ই ওখানে যেতে হয় আমাকে—

তারপর নিজেই বললেন—আপাততঃ আমি সেই ব্যাঙ্কেই পাঠিয়ে দিতে পারি. একে কেউ ধরে আমার গাড়িতে তুলে দেবেন...

সঙ্গে সঙ্গে কিছু লোক তাকে ধরতে এগিয়ে গেল। তারা সেই অজ্ঞান-অচৈতন্য সন্দীপকে চ্যাংদোলা করে ভদ্রলোকের গাড়িতে তুলে দিল। ভদ্রলোক সকলকে ধন্যবাদ দিতেই গাড়িটা সামনের দিকে এগিয়ে চলতে লাগলো।

ভদ্রলোক ড্রাইভারকে বললেন—চলো, শ্যামবাজার—

কোনও লোক যখন কাউকে অভিশাপ দেয় তখন বলে—তোর ঘরে মামলা ঢুকুক—পৃথিবীতে এর চেয়ে চরম শাস্তি আর কেউ কল্পনা করতে পারে না বলেই বোধহয় এই প্রবাদ বা অপবাদের সৃষ্টি। সন্দীপ যখন চাকরিতে ঢোকেনি তখন একটা বইতে পড়েছিল ফ্রান্সিস্ বেকনের কথা। তিনি অত বড়ো পণ্ডিত আর বিজ্ঞ মানুষ হয়েও ঘুষ নেওয়ার মামলায় জড়িয়ে পড়েছিলেন। তিনিই লিখে গিয়েছিলেন—There is no worse torture than the torture of law.

কথাটা শুনে সন্দীপ কাশীনাথবাবুকে জিজ্ঞেস করেছিল—কথাটা কি সত্যি?

কাশীবাবু বলেছিলেন—ওই কথাটার মতো সত্যি কথা আর দ্বিতীয় নেই। আমাদের দেশের সুভাষ বোসের ওপর যে বিচার হয়েছে সেটাও কি সুবিচার? সবাই জানে মহাত্মা গান্ধীর জন্যেই আমাদের দেশ স্বাধীন হয়েছে, সেটাই কি সত্যি? কংগ্রেসই কি ইণ্ডিয়ার স্বাধীনতা এনেছে. না জিন্না সাহেব স্বাধীনতা এনেছে? কোর্টের আইনও তো সেই ব্রিটিশদেরই তৈরি আইন। এখন দেশে ইংরেজরা নেই. কিন্তু কালো চামড়ার ইংরেজদের তো তারা এখানেই রেখে গেছে।

কী কথা থেকে কী কথা এসে গিয়েছিল। সত্যিই জীবন বড়ো জটিল। আর তার চেয়েও আরো জটিল মানুষের তৈরি কোর্ট। বিডন স্ট্রীটের মুখার্জিবাবুদের বাড়িতে গিয়ে সন্দীপ সেই কথাই ভাবতো। একদিন যখন এই বংশ দেবীপদ মুখার্জির সময়ে উন্নতি ও মর্যাদার চরম শিখরে উঠেছিল. তখন কি তিনি কল্পনাও করতে পেরেছিলেন যে একদিন তাঁর বংশের তৃতীয় কি চতুর্থ প্রজন্মে এসে এরা এমন দুর্ভোগে জড়িয়ে

রাত এগারোটার মধ্যেই দু'জনেই বাড়ি ফিরে আসেন। কিন্তু সেদিন রাত প্রায় বারোটা বেজে গিয়েছিল।

গাড়ি থেকে নেমেই ঠাকমা-মণি বললেন—হ্যাঁ, একটা কথা, আপনি সেই মনসতলা লেনের সেই বিশাখা মেয়েটার কোনও খবর পেয়েছেন নাকি?

মল্লিক-মশাই বললেন—না, তারপর তো আর কোনও খবর রাখবার সময় পাইনি। এই মামলার কাজেই ব্যস্ত হয়ে পড়েছি—

ঠাকমা-মণি বললেন—সামনে কোর্টের একটা ছুটির দিন আছে। সেদিন তো আর আমাদের বেরোতে হবে না। সেই দিন আপনি গিয়ে একটু দেখা করুন—

মল্লিক-মশাই বললেন—হ্যাঁ, আমি ভোরবেলার ট্রেনেই বেড়াপোতায় যাবো—

—হ্যাঁ, তাই-ই যাবেন।

তারপর বললেন—আমি আর একটা কাজ করতে পারি?

—কী কাজ?

—আমি কলকাতায়ও খবরটা পেতে পারি!

—কলকাতায় কী করে খবর পাবেন?

মল্লিক-মশাই বললেন সেই যে-ছেলেটা আমার কাছে কাজ করতো, সেই সন্দীপ লাহিড়ী তো এখন কলকাতাতে একটা ব্যাঙ্কে কাজ করে। আমি তার সেই ব্যাঙ্কে গিয়েও দেখা করতে পারি। বিকেল পাঁচটায় ব্যাঙ্ক ছুটি হবার আগেই তার সঙ্গে দেখা করে আসবো—তা তাকে গিয়ে কী বলবো?

—বলবেন যে সেই মেয়েটার বিয়ে যেন এখন না দেওয়া হয়। আর কিছুদিন যেন বিয়েটা আটকে রাখে—

কথাটা বলেই ঠাকমা-মণি দোতলার সিঁড়ি দিয়ে ওপরে চলে গেলেন। আর ম্যানেজারবাবুও নিজের ঘরের দিকে চলে যাচ্ছিলেন। গিরিধারী তাড়াতাড়ি তাঁর পেছন-পেছন গিয়ে তাঁকে ধরে ফেললে। তাকে দেখেই মল্লিক-মশাই বললেন—কী গিরিধারী, তুমি কিছু বলবে?

গিরিধারী বললে—একটা কথা বলছিলাম হুজুর...

মল্লিক-মশাই বললেন—কী বলছিলে, বলো না—

গিরিধারী নিচু গলায় বললে—খোকাবাবুর কি ফাঁসি হয়ে যাবে ম্যানেজারবাবু?

ম্যানেজারবাবু বললেন—কেন, এ-কথা জিজ্ঞেস করছো কেন? কেউ কি কিছু বলেছে তোমায়?

গিরিধারী একটু আম্‌তা-আম্‌তা করতে লাগলো। ম্যানেজারবাবু জিজ্ঞেস করলেন—বলো না, অতো ভয় পাচ্ছো কেন বলতে? বলো না, কে তোমাকে কী বলেছে—

গিরিধারী বললে—আমি তাদের চিনি না বাবুজী। তারা রাস্তার লোক, এখান দিয়ে যেতে যেতে তারা বলাবলি করছিল, এই বাড়িটার দিকে চেয়ে চেয়ে বলছিল এই বাড়ির একটা ছেলে তার বউকে খুন করে ফেলেছিল বলে তার ফাঁসি হবে।

ম্যানেজারবাবু বললেন—ও-সব কথায় তুমি কান দিও না গিরিধারী। তুমি তোমার নিজের কাজ করে যাও। মাথার ওপর ভগবান আছেন, তিনি যা করবেন তাই-ই হবে। তুমি আমি কেউই কিছু নই, আমরা মাইনে নিচ্ছি, কাজ করে যাচ্ছি, যেদিন চাকরি চলে যাবে, সেদিন আমরাও চলে যাবো। আমরা কেউই তো চিরকাল থাকতে আসেনি। আমাদের সকলকেই একদিন চলে যেতে হবে এই কথাটা মনে রেখো...

সে তো ঠিকই বাত্—বলে গিরিধারী আবার তার নিজের ঘরের দিকে চলে গেল।

মল্লিক-মশাইও নিজের ঘরের দিকে চলে গেলেন। কিন্তু প্রতিদিনের মতো তখনও তাঁর মাথার মধ্যে সৌম্যবাবুর কথাগুলো ঘোরাঘুরি করতে লাগলো। সেদিন জজের

অনুমতি নিয়ে ঠাকমা-মণির সঙ্গে জেলখানার হাজতে সৌম্যবাবুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল।

অনেক দরখাস্ত করার পর তবে তার সঙ্গে দেখা করবার অনুমতি মিলেছিল। কতকাল পরে নাতির সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হবে—ঠাকমা-মণি দুপুর বেলা থেকেই সেই কথাই ভাবছিলেন। মল্লিক-মশাইকে বলেই রেখেছিলেন ঠিক সময়ে তৈরি হয়ে থাকতে। মাত্র আধ ঘণ্টা সময়ের জন্যে দেখা হবে। তারই মধ্যে এত কথা কী করে শেষ হবে? আর খোকাই বা তার কী জবাব দেবে?

তবু দুজনে গিয়েছিলেন। ঠিক দুপুর দুটোর সময়ে দেখা হওয়ার কথা। দেরি হওয়ার চেয়ে আগে যাওয়াই ভালো। তাই দুপুর বারোটা থেকেই তাগাদা আসছিল মল্লিক-মশাইএর কাছে। বিন্দু বারোটার সময়েই এসে ঠাকমা-মণির হুকুমটা শুনিয়ে গিয়েছিল তাকে। বলেছিল—আপনি তৈরি তো ম্যানেজারবাবু?

মল্লিক-মশাই জানতেন ঠাকমা-মণির মনের অবস্থা। এতকাল পরে নাতির সঙ্গে দেখা হবে, সুতরাং তার ব্যস্ততা তো থাকবেই। বলেছিলেন—হ্যাঁ গো, ঠাকমা-মণিকে বলে দাও গে আমি তৈরি—

শুধু তিনিই নন, অরবিন্দকেও তৈরি হয়ে থাকতে বলা হলো। সেও গাড়ি নিয়ে তৈরি হয়ে বসেছিল। বিন্দু তাতেও নিশ্চিত হয়নি। বলেছিল—গাড়িতে তেল ভরা আছে তো? ভালো করে দেখে নাও!

অরবিন্দ বললে—হ্যাঁ, তেল ভর্তি করে নিয়েছি—

কিন্তু ঠিক সাড়ে বারোটার সময়েই সেই বিন্দু আবার এলো। আবার বললে—আপনি তৈরি আছেন তো ম্যানেজারবাবু?

সেবারও মল্লিক-মশাই বললেন—হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি তো বলেইছি যে আমি তৈরি। তুমি ঠাকমা-মণিকে গিয়ে বলো।

মল্লিক-মশাই বুঝতে পেরেছিলেন ঠাকমা-মণি আসলে নিজেই নাতির সঙ্গে দেখা করবার ব্যস্ততায় নিজের তাল আর সামলাতে পারছেন না। একবার একটা সেমিজ পরেন তো সেটা বদলে অন্য একটা সেমিজ পরেন। পাশে বিন্দু দাঁড়িয়ে সব তদারকি করছিল। আবার ঠাকমা-মণি বললেন—ওরে বিন্দু, একবার দেখে আয় ম্যানেজারবাবু তৈরি হয়েছে কি না—

তখন দুপুর একটাও বাজেনি, তখনই ঠাকমা-মণি বিন্দুর সঙ্গে নিচেয় নেমে এলেন। মল্লিক-মশাই ঘরের বাইরেই দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলেন। ঠাকমা-মণির পেছন-পেছন গিয়ে গাড়িতে উঠলেন। বিন্দু আর ঠাকমা-মণি গাড়িতে পেছনের সীটে বসলেন, আর অরবিন্দের পাশে বসলেন মল্লিক-মশাই।

যখন জেলখানায় গাড়ি গিয়ে পৌঁছুলো তখন দুপুর দেড়টা। মল্লিক-মশাই গাড়ি থেকে নেমে চারদিকে ঘোরাঘুরি করতে লাগলেন। সঙ্গে কোর্টের অর্ডার আর জেলারের চিঠি। কেউই কিছু শুনতে চায় না। সকলেই ব্যস্ত। এ বলে ওখানে যান, ও বলে সেখানে যান। শেষকালে যখন ভেতরে যাওয়ার অনুমতি পাওয়া গেল তখন দুটো বেজে পাঁচ মিনিট হয়ে গিয়েছে। ঠাকমা-মণি তখন মনে মনে বিরক্ত হয়ে গেছেন মল্লিক-মশাইএর ওপর। কেউ কোনও কাজের লোক নয়. পাঁচ মিনিট দেরি হওয়ার জন্যে যেন মল্লিক-মশাই-ই দায়ী। অনেক পথ ঘুরে যেখানে গিয়ে সবাই পৌঁছলেন সেখানে ও-পাশে সৌম্যবাবু দাঁড়িয়ে আর এ-পাশে ঠাকমা-মণি, বিন্দু আর মল্লিক-মশাই।

সৌম্যকে দেখে ঠাকমা-মণি অবাক। বললেন—এ কী চেহারা হয়েছে রে তোর খোকা?

বলতে বলতে তিনি কেঁদে ফেললেন।

সৌম্যর মুখেও তখন একগাল দাড়ি-গোঁফ। প্যাকাটির মতো রোগা লিক্‌লিকে চেহারা হয়েছে তার। সেও ঠাকমা-মণিকে দেখে কেঁদে ফেললে।

—বাবা, এখানে তোকে পেট ভরে খেতে-টেতে দেয়?

বলে গরাদের মধ্যে হাত গলিয়ে সৌম্যর গালের জল মুছে দিতে লাগলেন।

—কী রে, কথা বলছিস নে যে, কিছু কথা বল্?

সৌম্য কথা বলবে কী, সে তখন আরো কাঁদতে আরম্ভ করেছে।

—এরা তোকে খেতে দেয়?

সৌম্য মাথা নাড়লে।

ঠাকমা-মণি আবার জিজ্ঞেস করলেন—কতোদিন তোকে দেখিনি খোকা, জানিস, তোর জন্যে ভেবে ভেবে রাত্তিরে আমার ঘুম হয় না। আজ এতদিন পরে তোকে দেখলুম আর তুই এমনি চুপ করে থাকবি? ওরে, তুই একটু কথা বল্ রে—

তবু সৌম্যর মুখে কোনও কথা নেই।

ঠাকমা-মণি গরাদের ভেতর দিয়ে হাত গলিয়ে সৌম্যর হাত দুটো জোর করে ধরে আছেন। বললেন—এত রোগা হয়ে গেছিস কেন বাবা? রাত্তিরে ঘুম হয়?

সৌম্য তার মাথাটা আবার নাড়ালে।

ঠাকমা-মণি বললেন—ঘুম হয় না? কেন রে? ঘুম হয় না কেন রে? ভাবনায়?

সৌম্য আবার তার মাথাটা নাড়লে।

ঠাকমা-মণি বললেন—তাহলে কেন এমন কাজ করলি বাবা? কে তোকে এমন কাজ করতে বলেছিল? আর বিয়েই বা করতে গেলি কেন অমন রাক্ষুসীকে?

সৌম্য এবারও কোনও কথার উত্তর দিলে না।

—তুই কিছু ভাবিসনে বাবা। তোর জন্যে আমি কলকাতার সেরা উকিলকে লাগিয়েছি। লাখ-লাখ টাকা খরচ করছি তোর জন্যে। তুই কিছু ভাবিস নে। তোর জন্যে আমার সব সম্পত্তি বেচে দিয়ে মামলার খরচ চালাবো। তুই ভেবে ভেবে শরীর খারাপ করিস নে।

তারপর সৌম্যর চোখ দুটো আবার নিজের হাত দিয়ে মুছিয়ে দিলেন।

বললেন—আমারও ঘুম হয় না রে তোর কথা ভেবে ভেবে। এবার জেল থেকে বেরিয়ে এলে তোকে একটা ভালো মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেব রে, কুষ্ঠি দেখিয়ে রাজযোটক মিল করিয়ে তবে তোর বিয়ে দেব। তোর কিছু ভাবনা নেই খোকা, কিছু ভাবনা নেই। আমি তো আছি। আমি তো এখনও মরিনি রে—

এত কথার পরও সৌম্যপদর মুখ থেকে কোনও কথা বেরোল না। সে যেন কানে শুনতে পাচ্ছে সব, কিন্তু তার মুখ থেকে যেন কোনও কথা বেরোচ্ছে না। শুধু দু'চোখ বেয়ে ঝর-ঝর করে জল পড়ছে।

—তুই কোনও কথা বলবি নে? তাহলে আমি তোর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে এত চেষ্টা কেন করলুম? ওরে, তুই ছাড়া যে আজকে আমার কেউ-ই নেই রে। তোর কাকাও আমাকে ছেড়ে এখন বাইরে চলে গেছে। যাওয়ার সময়ে আমার সঙ্গে একবার দেখা পর্যন্ত করে যায়নি। আসলে সংসারে টাকা আমদানিও এখন বন্ধ হয়ে গিয়েছে যে। আমি এখন কী করি বল্ তো, তুইও যদি এমনি করে চুপ করে থাকিস তাহলে আমি কী করে বাঁচি, কী নিয়ে বাঁচি? কার আশায় বুক বেঁধে আমি সংসার করি? তুই ছাড়া যে কেউই নেই রে আমার—

সৌম্য তখনও পাথরের মূর্তির মতো চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে আর তার দু'চোখ বেয়ে জলের ধারা দর দর করে ঝরে পড়ছে—

এতক্ষণে পুলিসটা সামনে এগিয়ে এলো। বললে—আধঘণ্টা উতরে গেছে

মাঈজী, এখন চলে যান। আর সময় দেওয়া হবে না—

ঠাকমা-মণি অনুনয় বিনয় করে বলতে লাগলেন—আর একটু সময় দাও সেপাই-বাবা, দেখছো তো আমার একমাত্তর বংশের পিদমের সলতে, এ ছাড়া আমার নিজের বলতে আর কেউ নেই যে বাবা—

পুলিসটা বললে—আর সময় দেওয়া যাবে না মাঈজী, আধ ঘণ্টার ওপর হয়ে গেছে—আমার নোকরি চলে যাবে!

—লক্ষ্মী বাপ আমার—বলে ঠাকমা-মণি মল্লিক-মশাইএর দিকে চেয়ে বললেন—দুটো টাকা দিন তো ম্যানেজারবাবু এই সেপাইবাবাকে—

পুলিসটা হঠাৎ বললে—না মাঈজী, ও ঘুষ আমি নেবো না, আমার চাকরি চলে যাবে। আপনারা বেরিয়ে যান, বেরিয়ে যান এখান থেকে—

বলে হাতের লাঠিটা উঁচু করতে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে সৌম্যপদ লোহার গরাদের ওধার থেকে সিংহের মতো গর্জন করে উঠলো—এ্যাই শুয়োর কে বাচ্ছা, হুঁশিয়ার, সামাল্‌কে বাত কর-

এতক্ষণ যে-লোকটার মুখে কোনও কথা ফোটেনি, হঠাৎ তার নীল-রক্ত যে অমন করে গরম হয়ে উঠলো কে জানে! পুলিসটাও আসামীর এই আচমকা ব্যবহারে একেবারে হতভম্ব। সে আর কোনও উপায় না পেয়ে তার পকেট থেকে একটা বাঁশি বার করে বাজিয়ে দিলে আর তার একটু পরেই জেলখানার ভেতরে তোলপাড় পড়ে গেল। সঙ্গে কোথা থেকে কে যেন জেলখানার পাগলা-ঘণ্টি বাজিয়ে দিতেই আরো অনেক সশস্ত্র সেপাই এসে সেখানে জড়ো হলো। ঠাকমা-মণি, বিন্দু আর মল্লিক-মশাই তখন আতঙ্কিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। ভেতর থেকে কে যেন হঠাৎ এসে সৌম্যবাবুর দুহাতে হাত-কড়া লাগিয়ে দিয়ে ধরাধরি করে ভেতরে টেনে নিয়ে গেল। তারপর আর তাকে দেখতে পাওয়া গেল না।

মুহূর্তের মধ্যে এমন একটা তুমুল কাণ্ড ঘটে গেল যে ঠাকমা-মণি, মল্লিক-মশাই কিছুই বুঝতে পারলেন না। ঠাকমা-মণিই প্রথম বলে উঠলেন—চলুন ম্যানেজারবাবু, আমরা চলে যাই এখান থেকে

বলে তিনজনেই হাইকোর্টে উকিলের চেম্বারের দিকে গেলেন। সেখান থেকে বেরিয়ে চলে গেলেন আর একজনের চেম্বারে। সেখানেও অনেক দেরি হয়ে গেল। তারপর সারা দিনের পর যখন রাত্রে বাড়িতে ফিরলেন তখন রাত এগারোটা।

আর যখন খাওয়া-দাওয়ার পাট সেরে মল্লিক-মশাই নিজের বিছানায় গিয়ে শুলেন তখন রাত প্রায় বারোটা। ঘুম আসবার আগেও তাঁর চোখে তখনও ভাসছে সৌম্যপদ'র সেই মুখটা। কখনও সে মুখটা কান্নায় ছল্‌-ছল্‌, আবার কখনও রাগে কঠোর। কেন এমন হলো? তবে এর মূলে কি টাকা? মানুষের সংসারে টাকা যখন একমাত্র কাম্য হয়ে ওঠে তখনই বোধহয় সে সমস্ত অ-টাকাকে এমনি করেই তাচ্ছিল্য করতে আরম্ভ করে। তাচ্ছিল্য করতে আরম্ভ করে তার সত্যকে, তাচ্ছিল্য করতে আরম্ভ করে তার মনুষ্যত্বকে, তাচ্ছিল্য করতে আরম্ভ করে তার সমস্ত কিছু অপার্থিব পদার্থকে। আর তখনই বোধহয় তার সৌম্যপদ'র মতো অবস্থা হয়। যারা সারা জীবন টাকা উপায় করাটাকেই জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজ বলে মনে করে তারাই বোধহয় শেষকালে এই রকম এক-একজন সৌম্যপদ হয়...এই রকম এক-একজন সৌম্যপদ হয়ে কাঁদে আর অক্ষমের মতো সেই সৌম্যপদরা ক্রোধেরও শিকার হয়...

সমস্ত দিন অক্লান্ত পরিশ্রমের পর মল্লিক-মশাই ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন।

সেদিন যখন সন্দীপ চোখ মেললো তখন প্রথমেই দেখতে পেলে করমচাঁদজীকে। দেখলে তাদের ব্যাঙ্কের ম্যানেজার করমচাঁদ মালব্যজী তার দিকে চেয়ে আছেন।

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—আমি কোথায়...?

শুধু করমচাঁদজী নয়, পাশে একজন ডাক্তারও ছিলেন, আরো ছিলেন একজন নার্স।

সন্দীপ দেখে বুঝতে পারলে সে একটা হাসপাতালে বা নার্সিংহোমে রয়েছে।

বললে—আমাকে হাসপাতালে এনেছেন কেন? আমার কী হয়েছে?

করমচাঁদজী বললেন—তুমি চুপ করো—

সন্দীপ তবু একবার জিজ্ঞেস করলে—বলুন না আমি কোথায়...

সন্দীপের প্রশ্নের জবাব কেউই দিলে না। সবাই যেন বড়ো ভীত, সবাই যেন বড়ো বিরত, সবাই যেন বড়ো সতর্ক।

এতক্ষণে ডাক্তারবাবু বললেন—ঠিক আছে, আমি এখন যাচ্ছি—

সামনের দিকে নার্স মহিলাটি এগিয়ে এসে বললে—এবার এইটে খেয়ে নিন—

সন্দীপ কোনও কথা না বলে নার্সের দেওয়া কী একটা জিনিস খেয়ে নিলে।

করমচাঁদজী এবার কাছে এসে দাঁড়ালেন। বললেন—আমি এবার আসি লাহিড়ী, অফিসে আমার অনেক কাজ পড়ে আছে।

সন্দীপ বললে—বলুন না, আমি এখানে কী করে এলুম, এই হাসপাতালে...?

করমচাঁদজী বললেন, আপনি যে বেঁচে গেছেন এই-ই যথেষ্ট, আমাদের সকলের খুব ভয় হয়ে গিয়েছিল—

—কী হয়েছিল আমার?

করমচাঁদজী বললেন—আপনি রাস্তায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিলেন। এক ভদ্রলোক আপনাকে নিজের গাড়িতে তুলে আমাদের ব্যাঙ্কে পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিলেন। নেহাৎ দৈবযোগেই আপনি বেঁচে গেছেন আপনি কিছু ভাববেন না, আপনার বাড়িতে আমি খবর পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছি—

এতক্ষণে যেন আস্তে আস্তে সমস্ত কথা মনে পড়তে লাগলো। ডাক্তারের চেম্বার থেকে বেরিয়েই তার মাথাটা কেমন বোঁ-বোঁ করে ঘুরে উঠেছিল। এক ভদ্রলোক তাকে ধরে না ফেললে হয়তো তখনই সে সেখানে পড়ে যেত! আর তার ফলে সে তো গাড়ি চাপা পড়ে মারা যেতো। কিন্তু কেন যে তার মাথাটা ঘুরে উঠেছিল, তা-তো কেউ-ই জানে না। তার মতো গরীব লোকের কাছে ডাক্তারের কুড়ি হাজার টাকা দাবিটা কি কম দুশ্চিন্তার কারণ! কোথাকার কে মাসিমা, তারই অসুখের দায়ে তাকে কুড়ি হাজার টাকার দেনা ঘাড়ে নিতে হবে! আর দেনাটা ঘাড়ে তুলে যদি নিতেই হয় তো কোথা থেকে সে অতোগুলো টাকা যোগাড় করবে! আর কেমন করেই বা সে সে-দেনাটা শোধ করবে?

নার্সটা আবার এল। বললে—একজন মহিলা আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান, তাঁকে আসতে বলবো?

সন্দীপ বললে—মহিলা? কে তিনি?

নার্স বললে—তিনি তিন দিন থেকে এখানেই আছেন।

তিন দিন থেকে এখানেই আছেন? আমি তিনদিন থেকে আছি এখানে?

নার্স বললে—আজ নিয়ে তো আপনি সাত দিন ধরে এখানে আছেন...
—সাত দিন?
নার্সটি বললে—চার-পাঁচ দিন পরে তিনি খবর পেয়েই এখানে এসেছেন। এখানে তিনি নার্সদের কোয়ার্টারে আছেন। তিন দিন ধরে তিনি খাচ্ছেন না, ঘুমোচ্ছেন না, সব সময়ে তিনি কেবল আপনার কথা জিজ্ঞেস করছেন...ডাক্তারবাবু তাকে রোগীর কাছে আসতে বারণ করেছিলেন। তাঁকে আসতে বলবো? এখন আপনার শরীরটা একটু ভালো আছে বলে ডাক্তারবাবু আসতে পারমিশন্ দিয়েছেন—
সন্দীপ বললে—হ্যাঁ-হ্যাঁ, তাঁকে আসতে বলুন, আমি তো বুঝতে পারছি না ঠিক...
তারপর ঘরের ভেতরে যে এলো তাকে দেখে সন্দীপ চম্‌কে উঠলো।
—তুমি?
বিশাখার চোখে-মুখে ভয়ের চিহ্ন। এ কী চেহারা হয়েছে বিশাখার?
সন্দীপ উত্তেজনায় উঠে বসতে যাচ্ছিল, কিন্তু বিশাখা কাছে সরে এসে বাধা দিলে। বললে—উঠো না, উঠো না, শুয়ে থাকো—
সন্দীপ বললে—তুমি তিন দিন থেকে এখানে না-খেয়ে, না-ঘুমিয়ে পড়ে আছো আর আমাকে কেউ সে-খবরটা দেয়নি।
বিশাখা সন্দীপের দুটো হাত ধরে বললে—তুমি উঠে বোস না, শুয়ে পড়ো, লক্ষ্মীটি উঠে বোস না--
সন্দীপ বসে বসে বললে--কিন্তু শুনলুম তুমি নাকি তিন দিন ধরে এখানে আছো, কিছু নাকি মুখেই দাওনি, ঘুমোওনি। ব্যাপারটা কী?
বিশাখা বললে—তোমার অসুখ, তুমি অসুখে বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছো আর আমি খাবো, আমি ঘুমোব, তুমি বলছো কী?
সন্দীপ বললে—তুমি দেখছি আমাকে এই অবেলায় না-কাঁদিয়ে ছাড়বে না—
বিশাখা সন্দীপের কপালে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললে--তুমি রাগ করো না, তুমি ছাড়া আমাদের আর কে আছে, বলো? তোমাদের ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের চিঠি না পেলে তো আমরা জানতেই পারতুম না যে তোমার এই বিপদ। সেই চিঠি পাওয়ার পরই আমি দৌড়ে এসেছি
—কিন্তু আমার না হয় অফিস আছে, তারা আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। কিন্তু তুমি? তোমার অসুখ করলে কে দেখবে?
হঠাৎ একজন নার্স ঘরে ঢুকে বললে—এবার আর নয়, টাইম ওভার হয়ে গেছে, আপনি এবার যান—
সন্দীপ বললে—সে কি, আর একটু থাকুক না ও—
নার্স বললে—না, মেট্রন এসে গেছেন, তিনি দেখতে পেলে আপত্তি করবেন।
বলতে বলতে বিশাখাকে নিয়ে বাইরে চলে গেল নার্স। যাওয়ার সময়ে সন্দীপকে বলে গেল—আপনি শুয়ে পড়ুন, আমি থার্মোমিটার নিয়ে আসছি, মেট্রন এসে ফিভার চার্ট দেখতে চাইবে—

কে যেন একবার বলেছিল—অতীতটা শুধু স্মৃতি আর ভবিষ্যৎটা শুধু স্বপ্ন। জেলখানার মধ্যে বসে বসে সন্দীপ কথাটার মানে আরো স্পষ্ট করে বুঝতে পেরেছিল। বুঝতে পেরেছিল যে তার সামনে যে ভবিষ্যৎটা আছে সেটা স্বপ্ন ছাড়া আর কিছু নয়. নিছক স্বপ্ন। স্বপ্ন মানেই হলো অলীক। মিথ্যে। সে-স্বপ্নটা সত্যি হতেও পারে, আবার না-ও হতে পারে। কিন্তু অতীতটা?

যাদের বয়েস হয়েছে তাদের কাছে অতীতটার মতো সত্যি আর কিছুই নেই। সেই অতীতটা কখনও তাকে হাসায়, কখনও আবার কাঁদায়, কখনও আবার ভাবায়ও। জেলখানার যে ওয়ার্ডারটা তার দেখা-শোনা করতো সেও সন্দীপকে দেখে মাঝে-মাঝে অবাক হয়ে যেত। জিজ্ঞেস করতো—ম্যানেজারবাবু, আজ যে আপনি খেলেন না কিছু? রান্না কি খারাপ হয়েছে?

সন্দীপকে লোকটা 'ম্যানেজারবাবু' বলে ডাকতো। সে শুনেছিল একদিন এই কয়েদী নাকি কোন্ ব্যাঙ্কের একজন ম্যানেজার ছিল। পনেরো লক্ষ টাকা তছরুফের দায়ে আসামী হয়ে জেল খাটছে। এটা জেনেও কিন্তু সে সন্দীপকে খুব খাতির করতো। সে বলতো—একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করবো ম্যানেজারবাবু?

সন্দীপ বলতো- কী জিজ্ঞেস করবে, বলো না!,

লোকটা বলতো--আচ্ছা, শুনেছি আপনি নাকি ব্যাঙ্কের টাকা তছরুফ্ করেছিলেন? আমার কিন্তু কথাটা বিশ্বাস হয় না। আপনার মতোন ভদ্রলোক এ-কাজ করতে পারেনই না। আমি এতদিন ধরে তো এত লোককে দেখে আসছি—

সন্দীপের বেশ মজা লাগলো কথাটা শুনে। বললে—কেন বলো তো? আমি কি দেখতে অন্য রকম?

লোকটা বললে—অন্য রকমই তো! চোর, গুন্ডা, নেশাখোর ভদ্দরলোক, কাউকে দেখতে তো আমার আর বাকি নেই। আমিই তো কতো কয়েদীকে বাইরে থেকে মদ কিনে এনে দিয়েছি, আফিং কিনে এনে দিয়েছি। কতো চিঠি আর কতো চিঠির উত্তর বাইরে দিয়ে এসেছি আবার বাইরে থেকে নিয়েও এসেছি, তার ঠিক-ঠিকানা নেই। কিন্তু এই প্রথম দেখছি আপনি সে-রকম নন। তাই আপনি কী করে টাকা চুরি করলেন সেটাই ভেবে পাচ্ছি না—

সন্দীপ এ-কথার উত্তরে আর কী বলবে। বললে—মানুষ চেনা যদি অতো সহজ হতো তাহলে আর ভাবনা থাকতো না সহদেব

ওয়ার্ডারটার নাম সহদেব। সন্দীপের বেশ ভাব হয়ে গিয়েছিল সহদেবের সঙ্গে। সহদেব অনেকবার অনেক রকমের প্রলোভন দেখিয়েছে সন্দীপকে। বাইরে থেকে অনেক কিছু নিষিদ্ধ জিনিস ভেতরে আনিয়ে দেবার প্রস্তাবও দিয়েছে, কিন্তু সন্দীপ বরাবর তা নিতে অস্বীকার করেছে। বলেছে- আমি গরীব লোক সহদেব, আমাকে তুমি ও-সব লোভ দেখিও না—

—বলেন তো আমি আপনার জন্যে বিলিতি মদও এনে দিতে পারি ম্যানেজারবাবু, আপনার কোনো টাকাও খরচ করতে হবে না তার জন্যে

তবু সন্দীপ রাজি হয়নি বলে সহদেব খুব অবাক হয়েছে।

সন্দীপ বলেছে—আমি তো বড়োলোকের ছেলে নই সহদেব, আমি জীবনে কখনও

কোনও রকম বিলাসিতা করিনি—বলতে গেলে আমি খুবই গরীব লোক। আমার জন্যে তোমাকে স্পেশ্যাল কিছু করতে হবে না—

সহদেব বলেছে—তাহলে আপনি যে ব্যাঙ্কের পনেরো লাখ টাকা চুরি করেছেন বলে আপনার জেল হয়েছে, সেটা কি মিথ্যে?

সন্দীপ তার উত্তরে বলেছে—না, সেটা মিথ্যে নয়, আমি চুরি করেছি—

-- কিন্তু আপনাকে দেখে তো তা বোঝা যায় না।

সন্দীপ হেসে বলেছে—সেইটেই তো মজা সহদেব, মানুষের মুখ দেখে যদি মানুষকে চেনা যেত তাহলে তো পৃথিবীতে এত গণ্ডগোল থাকতো না, আর গভর্নমেণ্টকেও এত উকিল-ব্যারিস্টার, জজ্‌-ম্যাজিস্ট্রেটদের কাউকেই এমন করে পুষতে হতো না—

এ-কথাতে সহদেব খুশী হয়নি। খুশী হওয়ার কথাও নয়। সে তার সহজ বুদ্ধিতে যা বুঝেছিল তাই-ই বলেছিল। আর সহদেবকে বলেই বা কী হবে, পৃথিবীর সমস্ত লোকই তো এক-একজন মূর্তিমান সহদেব। যারা মুক্তিপদ মুখার্জিকে দেশ থেকে তাড়ালো, যারা এত হাজার-হাজার লোককে বেকার করলে, তারা নিজেরাই কি জানতো যে মুক্তিপদ মুখার্জির 'স্যাক্সবী এ্যান্ড মুখার্জি' কোম্পানীকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিয়ে নিজেদেরই কবর খুঁড়লো?

চিরকাল তো সব মানুষকে বোকা বানিয়ে রাখা যায় না। একদিন-না-একদিন কোনও একজন মানুষ সে ধাপ্পা ধরে ফেলবেই। তখন? তখন যে সুদে আসলে তাকেই শুধু নয়, তার দেশকে, তার জাতিকেও পুরোপুরি শোধ করতে হবে। ইতিহাস তো তাই-ই বলে। ১৭৫৭ সালের লর্ড ক্লাইভের পাপ লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে শোধ করতে হয় ১৯৪৭ সালে ১৫ই আগস্টে। আর সেই পাপের ফল এখনও শোধ করে যাচ্ছে সেই গ্রেট-ব্রিটেন আমেরিকার লেজুড় হয়ে।

একদিন যারা স্যাক্সবী এ্যান্ড মুখার্জিকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে সুদূর মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে পাঠিয়ে দিলে তারা আবার কাদের লেজুড় হবে তা এখনও কেউ দেখতে পাচ্ছে না। কিন্তু ইতিহাস তাদের পাপেরও তো একদিন প্রতিশোধ নেবে।

সেদিন ঠাকমা-মণি তাই-ই ভাবছিলেন। ভাবছিলেন প্রথম জীবনে তো তাঁর এ-সব সমস্যা ছিল না। শেষ বয়েসে এসে তাঁকে এ-সব সহ্য করতে হচ্ছে কেন?

মুক্তিপদবাবু তখন আর রোজ-রোজ মা-মণিকে দেখতে আসতে পারছিলেন না। মা-মণি তখন বলতেন—হ্যাঁ রে, তুই চলে গেলে আমি খোকার মামলা-মোকর্দমা কী করে চালাবো?

মুক্তিপদবাবু বলতেন—আমি চলে গেলেও তোমার কিছু অসুবিধে হবে না মা, আমি নীরদবাবুকে সব বলে-কয়ে গেলাম। আর ইন্দোরে চলে গেলাম বলে কি কলকাতায় আমাকে আসতে হবে না? ইন্ডিয়াতে ব্যবসা করতে গেলে যেমন দিল্লীতে যেতে হবে তেমনি বোম্বে, ম্যাড্রাস, কলকাতাতেও আসতে হবে। একবার সেখানে গিয়ে ভালো করে ফ্যাক্টরিটা চালু করে দিলে তখন ইন্দোরে সব সময়ে না-থাকলেও চলবে।

মা-মণি বুঝলেন কি বুঝলেন না তা বোঝা গেল না।

মা-মণি বললেন—তা তুই যা ভালো বুঝবি তাই করবি। আমি তো কেউই না আমাকে তুই আর কিছু বলতে আসিসনি—

মুক্তিপদ বুঝতেন এসব অভিমানের কথা। বললেন—মা, তুমিও যদি অবুঝ হও তাহলে আমি কোথায় যাবো। কার কাছে গিয়ে দাঁড়াবো?

মা-মণি এবার রেগে গেলেন। বললেন—তুই তোর বউএর কাছে যা, সে তোকে যা করতে বলবে তা-ই করবি। আমার কাছে তুই আসিস কেন?

মুক্তিপদ বললেন—বিয়ে তো আমি করিনি, তোমরাই আমার বিয়ে দিয়েছ তাই

বিয়ে করেছি—

মা-মণি বললেন—যা, তুই এখন যা। ও-সব কথা শোনবার সময় নেই আমার এখন। আমি মরে গেলে তুই ঠিক খবর পাবি। তখন যদি মনে করিস তো শ্রাদ্ধ করিস, আর ইচ্ছে না হলে শ্রাদ্ধ করিসনি।

বলে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন—আমি এখন যাই, আমার হাতে এখন অনেক কাজ. তুই যা এখন—

মুক্তিপদও উঠলেন। গাড়িতে বসে বসে মুক্তিপদ'র মনে হলো তিনি এখন একেবারে নিঃসংগ। তাঁর কাছে তাঁর মাই ছিল একমাত্র আপনজন। সেই মা-ও যদি তাঁর ওপর বিমুখ হন তাহলে তাঁর আর কে রইলো? নন্দিতা থেকেও নেই। সে তার নিজস্ব জগৎ নিয়ে থাকুক। সেখানে মুক্তিপদর স্থান নেই। পিক্‌নিকও বড়ো হয়েছে। তার কাছেও মুক্তিপদর প্রয়োজন এখন ফুরিয়ে গিয়েছে। অথচ মুক্তিপদর জন্যেই তারা যে এখনও বেঁচে আছে, তাদের নিজস্ব জগতে যে তারা সগৌরবে মাথা উঁচু করে টিঁকে আছে, সে-কথাটা কেউই আজ পর্যন্ত স্বীকার করে না।

নাগরাজন মাঝে মাঝে কলকাতায় আসে। আবার মাঝে মাঝে ইন্দোরে চলে যায়। ইন্দোরে তারা নতুন ফ্যাক্টরি বসাচ্ছে। মাঝে-মাঝে মুক্তিপদও সেখানে যান।

মুক্তিপদ গিয়ে সব সরেজমিনে দেখে আসেন। নাগরাজনকেই তিনি সমস্ত কাজেব ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছেন। যতোদিন বাড়ির বাইরে থাকেন অতোদিনই একটু শান্তি। যখন কলকাতায় থাকেন তখন বেলুড়ের পুরনো ফ্যাক্টরিতে গিয়ে দাঁড়ান। আর সমস্ত জায়গাটার দিকে দেখতে দেখতে চোখে জল এসে যায়। কিন্তু তিনি এই ফ্যাক্টরির মালিক, তাঁকে কাঁদতে নেই। তাঁকে কাঁদতে দেখলে সবাই হাসবে, সবাই-ই খুশী হবে। শুধু নিজের বাড়ির লোকরাই নয়, সমস্ত দেশটাই তাঁর শত্রু হয়ে গেছে। আশেপাশের বাড়ির লোকরা সবাই জানালা দিয়ে তাঁর দিকে চেয়ে দেখে। যারা চেয়ে চেয়ে দেখে তারা হয়তো ভেতরে ভেতরে খুশীই হয়। তাদের মধ্যে অনেকেই একদিন নিজেদের আত্মীয়স্বজনদের জন্যে চাকরি চাইতে এসেছিল। চাকরি না-পাওয়ায় অনেকেই মুক্তিপদর ওপর রেগে গিয়েছিল। কিন্তু সে-রাগ তখন মুখে প্রকাশ করতে পারেনি। আজ তারা মন খুলে মুক্তিপদর পতন দেখে খুশী।

মুক্তিপদ যখন কাজ-কর্ম দেখতে আসে তখন তারা দূর থেকে তাঁকে দেখে। সামনে অবশ্য কিছু বলে না তারা। একটা বাঙালী পরিবারের যে পতন হলো তা দেখে তারা মনে মনে খুশীই হয়। বলে—বেশ হয়েছে ব্যাটাদের, তখন যেমন অহঙ্কার ছিল, তেমনি এখন জব্দ!

একজন বাঙালী অন্য কোনও বাঙালীর সর্বনাশ দেখলে যেমন খুশী হয়, এ-ক্ষেত্রেও তাই হলো। পাড়ার দু-চারজন প্রবীণ একত্র হলে ওই একই আলোচনা শুরু হতো। একজন প্রতিবেশীর সংগে অন্য এক প্রতিবেশীর দেখা হলেই কথাটা পাড়তো।

পাড়ার প্রবীণ বৃদ্ধ ঘোষাল মশাই রাস্তায় যেতে যেতে সরকার মশাইকে দেখতে পেয়েই ডাকেন—ও সরকার মশাই, কোথায় চললেন?

সরকার মশাই পেছু-ডাক পেয়ে দাঁড়ালেন। বললেন—যাচ্ছি একটু বাজারের দিকে—

ঘোষাল মশাই বললেন—দেখছেন তো মুখুজ্জেদের কোম্পানীর হালচাল—

সরকার মশাই বললেন—আমি তো দেখেছি, এখন আপনারা সবাই দেখুন—

ঘোষাল মশাই বললেন—কেন, আমি তো আগেই দেখেছি, এখন আপনাকে দেখতে বলছি। আমি যখন প্রথম বলেছিলুম তখন আমার কথা শুনে সবাই হেসেছিল, এখন কী হলো? গরীবের কথা বাসি হলে ফলে মশাই, টাট্‌কা-টাট্‌কা ফলে না।

সরকার মশাই বললেন—আরে মশাই, অহঙ্কারের পতন একদিন-না-একদিন হবেই,

এ-কথা আমরা ছেলেবেলাতেই পড়েছি। আমরা তখন বলতুম—অতি বাড় বেড়ো না, ঝড়ে পড়ে যাবে! শেষকালে কি না তাই-ই হলো?

যতো দিন যায় ফ্যাক্টরির মেশিনগুলো একে একে খুলে নিয়ে যাওয়া হয়, বিরাট আকারের যন্ত্রপাতি আসে। কান-ফাটানো শব্দে পাড়াটা দিন-দিন অসাড় হয়ে ওঠে।

তখন আসে কিছু উট্‌কো লোক। তারা দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে। মনে মনে হিসেব করে। হিসেব করে জমিটা কতো লাখ টাকা দিয়ে কিনলে কতো লাখ টাকার প্রফিট হতে পারে!

এক-একবার মিস্টার মুখার্জির বেলুড়ের বাড়িতে এসে খবর নেয় তিনি কলকাতায় আছেন কিনা। বাড়ির দরোয়ান বলে—সাব ঘরমে নেহি হ্যায়—

তারা জিজ্ঞেস করে—সাহেব কবে আসবেন?

দরোয়ান বলে—মালুম নেহি—

—কাঁহা গয়া?

—জী, উও ভি মালুম নেহি—

দরোয়ান মাস মাইনের কর্মচারী। সে শুধু জানে তার ডিউটি কী! ডিউটি বাড়ি পাহারা দেওয়া। তার বেশি তার জানবার অধিকারও নেই।

কবে একদিন সে চাকরিতে ঢুকেছিল, তারপর অনেক কাল কেটে গেছে। সে সারা-জীবন কেবল বাড়ি পাহারা দিয়েই চলেছে। বিডন স্ট্রীটের বাড়ির দরোয়ান গিরিধারীর মতো সেও পাহারা দিয়ে চলেছে বাড়িটা। গিরিধারীরই দেশের লোক সে। গিরিধারীরা শুধু জানে ডাকাত-চোর-গুণ্ডার হাত থেকে মুখার্জি সাহেবদের বাঁচাতে। তার বেশি কিছু তারা জানে না। কিন্তু কখন কোন ফাঁক দিয়ে যে বাড়ির লক্ষ্মী বাড়ির ভেতর থেকে বাইরে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল, তা জানা তাদের ডিউটি নয়। সাহেবের গতি-বিধির খবর যেমন সে জানে না, তেমনি মেমসাহেবের খবরও সে জানে না।

তার পরে আছে মিসিবাবা। এক-একদিন মিসিবাবার খোঁজেও আসে কিছু লোক। মেমসাহেব যেমন অনেক দিন রাত করে বাড়ি ফেরে, তেমনি মিসিবাবার বাড়ি ফিরতেও এক-একদিন রাত হয়ে যায়।

সাহেব যখন কলকাতায় থাকে না, তখন মেমসাহেব আর মিসিবাবারও বাড়ি ফিরতে রাত হয়ে যায়। কিন্তু যখন সাহেব বাড়িতে থাকে তখন তারাও আবার সকাল-সকাল বাড়ি ফেরে। তখন যেন বাড়ির নিয়ম-কানুন আবার বদলে যায়।

কিন্তু তারা ঠিক সময়ে বাড়ি ফিরুক আর না ফিরুক তাকে তার ডিউটি করে যেতেই হয়। সেই জন্যেই তাকে রাখা হয়েছে, সেই জন্যেই তাকে নিয়ম করে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর মাইনে দেওয়া হচ্ছে।

আর যেদিন থেকে সাহেবের কারখানা উঠে যেতে শুরু হয়েছে সেই দিন থেকেই নানা রকমের লোকজন আসা শুরু হয়েছে। তখন থেকেই সবাই বাড়ির সামনে এসে গাড়ি থেকে নেমে এসে জিজ্ঞেস করে—মুখার্জি সাব হ্যায়?

সে বলে—সাব ঘর মে নেহি হ্যায়—

—সাব কব্ আয়েংগে?

সে বলে—মালুম নেহি সাব।

তখন প্রশ্ন আসে—কাঁহা গয়া?

সে আবার বলে—জী, উও ভি মালুম নেহি—

তারা আবার জিজ্ঞেস করে—ইন্দোরমে গয়া হ্যায়?

—মালুম নেহি সাব।

তখন প্রশ্ন হয়—ইন্দোর কা পাতা মালুম হ্যায়?

—জী নেহি—

এই রকম করেই চলছিল মুক্তিপদ মুখার্জির সংসার। দরোয়ান পাহারা দেয় রোজকারের মতো। সাহেব হঠাৎ একদিন এসে হাজির হন, আবার দু'একদিন থেকেই সাহেব একদিন কোথায় উধাও হয়ে যান। সে শুধু এইটুকু বুঝতে পারে যে সাহেবের অনেক কাজ। আগে যখন সাহেবের ফ্যাক্টরি কলকাতায় ছিল তখন এত ব্যস্ততা ছিল না। বড়জোর বছরের মধ্যে এক মাস, দু'মাসের জন্যে বাইরে চলে যেতেন। কোম্পানীর বড়ো বড়ো অফিসারকে সাহেব বাড়িতে ডেকে আনতেন। তাদের সঙ্গে কথা বলার পরে তারা আবার নিজের-নিজের কাজে চলে যেত।

কিন্তু এবার সাহেব এসে পৌঁছবার পরদিনই একজন সাহেব এসে পৌঁছলেন। এসে জিজ্ঞেস করলেন—সাহাব হ্যায়?

—জী, হুজুর।

বলেই সদর-গেটটা খুলে দাঁড়িয়ে সেলাম করলে।

মুক্তিপদ মুখার্জির সঙ্গে টেলিফোনেই সব কথা পাকা হয়ে গিয়েছিল। তবু মুখোমুখি সাক্ষাতই এ-সব ব্যাপারে অনিবার্য। সাহেব ভেতরে ঢুকতেই মুক্তিপদ হাসিমুখে করিডোরের দিকে এগিয়ে এলেন। তিনি আগে থেকেই তৈরি ছিলেন। বললেন—আসুন, আসুন—

মিস্টার চ্যাটার্জি বললেন—আর একদিন এসে আমি ফিরে গিয়েছি। তখন অবশ্য টেলিফোন করে আসিনি।

দু'জনেই ভেতরের পার্লারে গিয়ে বসলেন। মিস্টার চ্যাটার্জি বললেন—আমার একমাত্র মেয়ে বিনীতার বিয়ে, পার্টিতে আপনার পুরো ফ্যামিলিকেই যেতে হবে—

মুক্তিপদ রঙিন চিঠিটা পড়তে লাগলেন। মনে পড়ে গেল অতীতের সব কথা। এই মেয়ের সঙ্গেই একদিন সৌম্যর বিয়ের সমস্ত ব্যবস্থা পাকা হয়ে গিয়েছিল। এখানে বিয়ে হলে তখন আর কোনও সমস্যা থাকতো না, তাঁর ফ্যাক্টরিটা বাইরে তুলে নিয়ে যাবার দুর্ভোগ সইতে হতো না। এই বিনীতার এখন বিয়ে হচ্ছে অন্য আর এক পাত্রের সঙ্গে। এ পার্টিও অর্থ-কৌলিন্য, বংশ-গৌরব আর খ্যাতি-কীর্তিতে সমাজে সুচিহ্নিত। অথচ...

—আপনি সকলকে নিয়ে যাবেন কিন্তু।

মুক্তিপদ বললেন—নিশ্চয়ই যাবো—অবশ্য যদি কলকাতায় থাকি...

মিস্টার চ্যাটার্জি বললেন—আপনাদের সেই মার্ডার-কেস্‌টার কদ্দুর?

মুক্তিপদ বললেন—সে চলছে—তবে আমি তো আর সব সময়ে কলকাতায় থাকতে পারছি না, আমার বুড়ো মা-ই সব ট্যাকল্ করছেন। আমি যদি ওই সব নিয়ে মাথা ঘামাই তাহলে আমার ফ্যাক্টরি কে দেখবে?

মিস্টার চ্যাটার্জি জিজ্ঞেস করলেন—কেমন বুঝছেন?

মুক্তিপদ বললেন—কেমন আর বুঝবো, ক্যাপিট্যাল পানিশ্‌মেণ্ট হবে—

—সে কী?

মুক্তিপদ বললেন—মাকে অবশ্য আমি সে-কথা বলিনি। বললে মা খুবই মুষড়ে পড়বেন। বিশেষ করে এই বয়েসে!

মিস্টার চ্যাটার্জির গলায় সহানুভূতির সুর বেজে উঠলো। বললেন তা তো বটেই—

তারপর একটু থেমে আবার জিজ্ঞেস করলেন—তা ওদের দু'জনের মধ্যে ঝগড়াটা হতো কেন? কী নিয়ে?

মুক্তিপদ বললেন—আবার কী নিয়ে হবে, টাকা! টাকা নিয়েই রোজ গণ্ডগোল হতো। একদিন তো মেয়েটা সৌম্যর বুকের ওপর বসে গলা টিপে ধরে ওকে খুন

করতে গিয়েছিল। আমার মা গিয়ে পড়ে তখন ওকে বাঁচায়। তা না হলে সেই দিনই সৌম্য মারা যেত।

—তা তখন ডিভোর্সের ব্যবস্থা করে দিলেন না কেন?

মুক্তিপদ বললেন—তাও তো সাজেস্ট্ করেছিলুম। মেয়েটা বলেছিল, পঁচিশ হাজার পাউন্ড দিলে ও সৌম্যকে ডিভোর্স দিয়ে দেবে। আমি তাও দিতে রাজি হয়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু নেশা-ভঙ্ করলে যা হয় তা-ই হলো আর কী!

তারপর একটু থেমে আবার বললেন—তা যাক্, যা হবার তা হয়ে গেছে। এদিকে আমি আজকাল একবার ইন্দোর যাচ্ছি, আর একবার কলকাতায় আসছি। ফ্যাক্টরিটাই এখন আমার ওন্‌লি হেডেক্ হয়েছে, মামলার ঝক্কিটা আমি আর আমার মাথায় রাখছি না। ওটা পুরোপুরি মার ওপর ছেড়ে দিয়ে আমি আমার ফ্যাক্টরি নিয়ে আছি। আমার এখন এইটুকু সান্ত্বনা যে ইন্দোরে গেলে লেবার-ট্রাবল্‌টা থেকে অন্ততঃ আমি মুক্তি পাবো—তবে পশ্চিমবঙ্গে আর আসা নয়—

মিস্টার চ্যাটার্জি এবার উঠলেন। তাঁর এখন অনেক কাজ। বললেন—বাঙালীরা এমন হলো কেন বলুন তো! বিদ্যাসাগর, রবি ঠাকুর, বিবেকানন্দর মতো লোকদের পর্যন্ত বাঙালীরা কেন এত গালাগালি দিয়েছিল বলুন তো! অথচ আপনি তো পৃথিবীর সব দেশেই গিয়েছেন, সেখানে অনেকদিন থেকেওছেন, কিন্তু এ-রকম হতচ্ছাড়া জাত কোথাও দেখেছেন! এমন কি দিল্লী, বোম্বে, মাড্রাস, কেরল, সে-দেশেও তো গিয়েছি, কোথাও এমন তো দেখিনি। এখানে প্রত্যেক বাঙালী সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠেই সবচেয়ে প্রথম ভাবে—আজকে কার সর্বনাশ করবো—

কিন্তু এখন এ-সব কথা আলোচনা করবার মতো সময় দুজনের কারোরই ছিল না। মিস্টার চ্যাটার্জি আর দাঁড়ালেন না বাইরে পা বাড়িয়ে বললেন—যাবেন কিন্তু, হোল্ ফ্যামিলি নিয়ে যাবেন, কক্‌টেলের ব্যবস্থা থাকবে—

মিস্টার চ্যাটার্জি চলে যাওয়ার পর অনেকক্ষণ ধরে মুক্তিপদর মনে পড়তে লাগলো সেই সব পুরনো দিনের কথা। সেই বিনীতার আজ বিয়ে হতে চলেছে। অথচ একদিন তাকে ঘিরেই তিনি কতো স্বপ্ন দেখেছিলেন। সেই মেয়েটি যদি সেদিন সৌম্যর বউ হয়ে আসতো তো আজ আর তাঁকে বেংগল ছেড়ে সুদূর মধ্যপ্রদেশে চলে যেতে হতো না। মাকেও এখানে একলা ছেড়ে চলে যেতে হতো না।

মুক্তিপদ ডাকলেন—এই, কে আছিস রে?

কোথা থেকে বৈজু সামনে এসে হাজির হলো।

মুক্তিপদ বললেন—কী রে, মেমসাহেব কোথায়?

বৈজু বললে—মেমসায়েব ঘুমিয়ে আছেন হুজুর।

—এত বেলা পর্যন্ত ঘুমিয়ে? সে কী রে?

বলে নন্দিতার ঘরের দিকে নিজেই গেলেন। ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। তিনি দরজা ঠেলতে ঠেলতে ডাকতে লাগলেন—নন্দিতা, নন্দিতা—

ভেতরে নন্দিতার চোখে তখন বোধহয় মাঝ-রাতের ঘুম। অনেক ঠেলাঠেলির পর তখন বোধহয় জেগে উঠলো। মুক্তিপদ হতাশ হয়ে তখন বৈজুকে জিজ্ঞেস করলেন—আর মিসিবাবা? মিসিবাবা কোথায়?

বৈজু বললে—মিসিবাবা তো কাল রাতে বাড়ি ফেরেনি হুজুর—

—বাড়ি ফেরেনি? তার মানে?

তিনি যেন খবরটা ঠিক বিশ্বাস করতে পারছিলেন না।

পেছনে নন্দিতার ঘরের দরজা খোলার শব্দ পেয়েই সেই দিকে গেলেন। নন্দিতা তখন আবার শোবার ব্যবস্থা করছে। সামনে মুক্তিপদকে দেখে অবাক। বললে—এ

কি, তুমি? তুমি হঠাৎ? কখন এলে?

—আমি তো ভোর পাঁচটায় ল্যানড্ করেছি। এখন তো ঘড়িতে দশটা বেজেছে। এখনও তুমি ঘুমোচ্ছ?

নন্দিতা বললে—কাল বাড়ি ফিরতে দেরি হয়ে গিয়েছিল...

—কেন?

—কাল লাস্ট্ শো'তে একটা সিনেমা দেখতে গিয়েছিলুম, সেখান থেকে ফিরতে দেরি হয়ে গিয়েছিল।

মুক্তিপদ বললেন—আর পিক্‌নিক? সে কোথায় গিয়েছে?

নন্দিতা বললে—কেন? সে আসেনি?

মুক্তিপদ বললেন—মেয়ে বাড়িতে আসেনি, তুমি তার মা হয়ে সে-খবরটাও রাখো না, আর আমি বাইরে বাইরে থাকি, আমি সে-খবর রাখবো?

নন্দিতা বললে—আমার তখন খুব ঘুম পেয়েছিল, তাই আমি খেয়ে নিয়েই বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছি, আমি ভেবেছি সে খেয়ে নিয়ে তার ঘরে শুয়ে পড়েছে।

মুক্তিপদর রাগ হয়ে গেল। বললেন—তা তো ভাববেই! আমি কলকাতায় নেই বলে তোমরা মা-মেয়ে দুজনেই সাপের পাঁচ-পা দেখেছ। এই জন্যেই তো আমার মা'র সঙ্গে তোমার বনে না!

—কী বললে?

নন্দিতা সাপের মতো ফণা তুলে উঠলো।

মুক্তিপদ বললেন—হ্যাঁ, ঠিকই বলেছি! আজ যদি তুমি বিডন স্ট্রীটের বাড়িতে থাকতে তো আমার মেয়ে এমন করে বাড়ি ছেড়ে বাইরে রাত কাটাতে পারতো না।

নন্দিতা বললে—তোমার মা'র কাছে কি কোনও মানুষ থাকতে পারে? তোমার মা'র কাছে থাকলে শেষকালে আমাকেও একদিন খুন হতে হতো—

মুক্তিপদ বললেন—চুপ করো, যা জানো না তা নিয়ে কথা বোল না—

নন্দিতা বলে উঠলো—কেন, চুপ করবো কেন? আমি কি কারো খাই না পরি!

মুক্তিপদ বললেন—পাগলের মতো কথা বোল না! দেখছি তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে—

নন্দিতা বললে—আমার মাথা খারাপ হয়নি, মাথা খারাপ হয়েছে তোমার। তোমার মাথা যদি ঠিক থাকতো তা হলে কারখানাটা কলকাতা থেকে উঠিয়ে জঙ্গলে নিয়ে যেতে হতো না—

মুক্তিপদ বললেন—কী বললে? ইন্দোরটা জঙ্গল?

—ইন্দোর জঙ্গল নয় তো কী? সেখানে কি ভদ্দরলোক আছে? সেখানে কি কলকাতার মতো এত ক্লাব আছে? সেখানে কি কলকাতার মতো এত বার আছে? সেখানে কি...

নন্দিতার কথার মাঝখানেই মুক্তিপদ বাধা দিলেন। বললেন—ক্লাব আর বার থাকাটা সভ্যতার নমুনা নয়। ইন্দোরে সত্যিকারের মানুষ আছে, কলকাতার মতো এত জানোয়ার সেখানে নেই, কথায় কথায় সেখানে এত মিছিল করে 'যুগ-যুগ-জিও' হয় না। সেখানে মানুষরা সকাল দশটার সময় ঘুম থেকে ওঠে না, সেখানকার আনম্যারেড মেয়েরা সারা রাত বাড়ির বাইরে কাটায় না—তুমি আমায় কলকাতা দেখিও না, কলকাতা আমার ঢের দেখা আছে—

নন্দিতা বাধা দিয়ে মুক্তিপদকে থামিয়ে দিলে। বললে—যাও যাও, বেরিয়ে যাও আমার ঘর থেকে—বেরিয়ে যাও, গেট্ আউট—

মুক্তিপদ বাইরে বেরিয়ে এলেন। তাঁদের স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়ার শব্দ বাড়ির চাকর-

ঝাকর-ঝি, সবাই শুনতে পাচ্ছে। আর বেশিক্ষণ ঝগড়া চললে তারাও হাসাহাসি আরম্ভ করে দেবে—

বাইরে এসে মুক্তিপদ ড্রইং-রুমে গিয়ে পুলিশকে টেলিফোন করতে লাগলো। বাড়ির মেয়ে বাড়ির বাইরে রাত কাটাবে আর বাপ হয়ে মুক্তিপদ তা সহ্য করবেন সেটা ভালো কথা নয়। টেলিফোনে ডায়াল করতে যাবে এমন সময়ে বৈজু পেছন থেকে বললে—হুজুর, মিসিবাবা এসেছে—

—এসে গেছে? টেলিফোন রেখে দিয়ে মুক্তিপদ জিজ্ঞেস করলেন—কই? কোথায়?

মুক্তিপদ চিৎকার করে ডাকলেন—পিক্‌নিক—

করিডোর দিয়ে সোজা নিজের ঘরের দিকে যেতে যেতে পিক্‌নিক থেমে গিয়ে পেছন ফিরলো। মুক্তিপদকে দেখে বললে—বাবা, তুমি কখন এলে?

মুক্তিপদর মুখটা রাগে কঠোর হয়ে উঠলো। বললেন—সমস্ত রাত কোথায় ছিলে?

পিক্‌নিক প্রথমে একটু ভয় পেয়ে গেল। বললে—কেন, কিষেণ কিছু বলেনি?

মুক্তিপদ বললেন—কিষেণ কী বলবে? আমি তো বাড়ি ছিলুম না, আজ এসেছি।

পিক্‌নিক বললে—আমি তো কিষেণকে বলেছিলুম মাকে বলতে যে আজকে আমার বাড়ি ফিরতে দেরি হবে, আমাদের ক্লাবে অনেক রাত পর্যন্ত ফাংশান হবে—

—কীসের ফাংশন?

—নানা রকম নাচ-গান ফাংশান—

মুক্তিপদ রেগে উঠলেন। বললেন—সমস্ত রাত ধরে নাচ-গানের ফাংশন?

—হ্যাঁ, বোম্বে থেকে অনেক আর্টিস্টরা আমাদের চ্যারিটির ফাংশানে—

—চ্যারিটি? কীসের চ্যারিটি?

পিক্‌নিক বললে—বারে, বন্যা-ত্রাণের জন্যে যে আমাদের ক্লাব থেকে চ্যারিটি করা হবে। গভর্মেণ্ট থেকে রিকোয়েস্ট এসেছিল ফাদারের কাছে, তাই তো...

মুক্তিপদ গভর্মেণ্টের নাম শুনেই চটে গেলেন। বলে উঠলেন—গভর্মেণ্ট? রাবিশ! যে-গভর্মেণ্ট হাজার-হাজার লোককে বেকার করে দেয়, যে-গভর্মেণ্ট এখানকার ইন্ডাস্ট্রিকে কিক্ আউট করে, সে-গভর্মেণ্ট থাকলেই বা কী আর গেলেই বা কী? তার আবার রিকোয়েস্ট, তার আবার চ্যারিটি—

বলে একটু দম নিয়ে আবার বললেন—ঠিক আছে, তোমাকে এখানে আর পড়তে হবে না, এবার তোমাকে ইন্দোরের কলেজে ভর্তি করে দেব, যাও—

বলে তিনি নিজের ঘরের দিকে চলে গেলেন। তাঁর মনে হলো বেঙ্গলের সবাই যেন তাঁর সর্বনাশ করবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে! ঠিক আছে, তিনিও দেখে নেবেন সবাই তাঁকে কী ভাবে চেপে রাখে। ঠিক আছে...
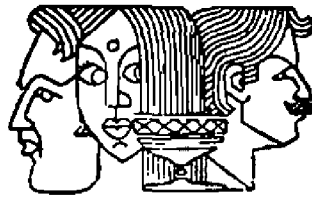
—কী রে খোকা, আজ কেমন আছিস?

যেদিন থেকে সন্দীপ বেড়াপোতার বাড়িতে এসেছে সেদিন থেকেই প্রত্যেক দিন

সকাল বেলা মা ছেলেকে এই একই প্রশ্ন করেছে। এ শুধু সন্দীপের মা'র প্রশ্নই নয়, চিরকালের সব সন্তানদের কাছে চিরকালের সব মায়েদেরই এই একই প্রশ্ন। কিন্তু সব মায়েরাই কি সন্দীপের মা'র মতো মা?

অসুস্থ শরীর নিয়ে সন্দীপ এই সব কথাই শুয়ে শুয়ে ভাবতো। সে যদি সেদিন ফুটপাথে না পড়ে রাস্তায় পড়ে যেত তাহলে তো গাড়ি চাপা পড়েই মারা যেত। সেদিন সে মারা গেলে এদের কী হতো? এদের কে দেখতো? কে তার সংসার চালাতো? কে মাসিমার চিকিৎসার খরচ যোগাতো?

এর উত্তর সেদিন সে পায়নি। সে প্রশ্নের উত্তর এখনও সে পায়নি। হয়তো কোনওদিন সে এর উত্তর পাবেও না। হয়তো এর উত্তর কোনওদিন কেউ পায়ও না। তবু তো থেমে থাকলে মানুষের চলে না। সমস্ত বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে লড়াই করে চলার নামই তো সংসার। এই সংসারে থাকতেও হবে আবার এই সংসারের নানা বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে লড়াই করে বাঁচবার চেষ্টাও করতে হবে—এই-ই মানুষের বিধিলিপি।

তাহলে? তাহলে কি নিশ্চিত পরাজয় জেনেও লড়াই চালিয়ে যেতে হবে? তাহলে কি 'শান্তি' কথাটা শুধু অভিধানেই ছাপার অক্ষরে বিরাজ করবে? না কি লড়াইটারই আর এক নাম 'শান্তি'?

—কী রে খোকা, আজ কেমন আছিস, ভালো আছিস?

সেই একঘেয়ে প্রশ্ন আর সেই-ই একঘেয়ে উত্তর—'হ্যাঁ।'

সেদিন আর সন্দীপ শুয়ে থাকতে পারলে না, শুয়ে থাকতে চাইলে না। এ-ভাবে চুপ-চাপ বেঁচে থাকার কোনও মানে নেই। হয় সে লড়াই করে খতম হয়ে যাবে, আর নয় তো সমস্ত বিরুদ্ধ শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করে অমর হবে। কারণ শুয়ে থাকা মানেই তো আপোষ করা। কারো সঙ্গে আপোষ করা তো সন্দীপের ধাতে নেই। সে গোপাল হাজরা নয়, তারক ঘোষও নয়। কিংবা সুশীল সরকারও নয় সে। তার লড়াই একলার লড়াই। পার্টি বা দল বা প্রতিষ্ঠানের আশ্রয় নিলে তাতে ফাঁকি থাকে। জীবনে সে ফাঁকি দেয়নি কখনও আর ফাঁকি দেবেও না। সুতরাং বিছানায় শুয়ে-শুয়ে দুঃখ করা মানেই তো ফাঁকি দেওয়া।

—কী রে, উঠছিস কেন? কোথায় যাবি?

সন্দীপ বললে—আমি আজ অফিসে যাবো মা—

—সে কী রে? এই সেদিন জ্বরটা কমলো, আর এরই মধ্যে আপিস যাওয়ার ধকল সহ্য করতে পারবি?

—হ্যাঁ, পারবো।

মা বললে—এই শরীর নিয়ে অতো দূরে যেতে গিয়ে যদি কিছু একটা হয়, তখন?

সন্দীপ বললে—না মা, শুয়ে থাকলেই মনে হয় আমি মরে গেছি। এত সহজে মরতে আমি চাই না—

সত্যিই, সন্দীপ অনেক দিন আগেকার একটা বইতে পড়া কথা বার বার ভাবতো। কে যেন বলেছিল—মরচে পড়ে মরার চেয়ে ক্ষয়ে ক্ষয়ে ধ্বংস হয়ে যাওয়া অনেক ভালো। শুয়ে থাকা মানেই তো মরচে পড়া। বললে—কী হবে মা?

মা বললে—কী আবার হবে, তুই ভালো হয়ে যাবি—

সন্দীপ বললে—না, সে-কথা বলছি না, আমি কুড়ি হাজার টাকা কোথা থেকে পাবো?

মা বললে—সে-কথা ভেবে ভেবে তুই মন খারাপ করিসনি।

সন্দীপ বললে—আমি ভাববো না তো কে ভাববে, তুমিই বলো? আমার কি আর কেউ আছে?

--আর কেউ থাক আর না-ই থাকুক, আমি তো আছি!

--তুমি? তুমি কী করে অতো টাকা যোগাড় করবে? তোমার তো সোনার গয়না একটাও নেই যে তাই বাঁধা রেখে টাকা যোগাড় করবে--

মা বললে—গয়না আমার না থাক, আমার এই বাড়িটা তো আছে। বাড়িটা বাঁধা রেখে হোক আর নয় তো বিক্রি করে হোক ও-টাকার যোগাড় হয়ে যাবেই—

সন্দীপ বললে--সত্যি মা, তুমি তাই করতে বলছো?

--ও মা, শোন ছেলের কথা, সত্যি বলছি না তো কি তোর মন-রাখা কথা বলছি?

—তাহলে কোথায় থাকবো আমরা?

—সে যেমন করে হোক একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে রে। তার জন্যে ভাবিস কেন? আগে মানুষের জীবন, না আগে বাড়ি! যাদের বাড়ি নেই তারা কি সবাই রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে? তারাও তো বেঁচে আছে রে। না হয় তুই একটা ঘর ভাড়া করবি। সেই একটা ঘরেই না হয় আমরা সবাই গুঁতোগুঁতি করে থাকবো। তুই থাকতে পারবি না? কষ্ট হবে তোর?

সন্দীপ আনন্দে নিজেকে সামলাতে পারলে না। বললে—মা, তুমি এত ভালো?

কথা বলতে গিয়ে সন্দীপের চোখ দিয়ে ঝর-ঝর করে জল পড়তে লাগলো। মা কাপড়ের আঁচল দিয়ে ছেলের চোখ দুটো মুছিয়ে দিতে দিতে বললে—ওরে খোকা, কাঁদিস নে। আমার তো তুই ছাড়া আর কেউ নেই, তোর সুখেই আমার সুখ, তোর কষ্ট হলে যে আমার কী কষ্ট হয়, তা তুই বুঝবি নে। যেদিন কলকাতায় তোর অফিস থেকে তোর অসুখের চিঠি এল, সেদিন থেকেই আমি ভগবানকে ডাকছি। বিশাখা ছিল বলেই তবু বেঁচে গেলাম রে। সেদিন বিশাখা না থাকলে আমরা কী করতুম বল তো! ওইটুকু মেয়ে, ও বললে—আপনারা বসে থাকুন মাসিমা, আমি যাচ্ছি--বলে চলে গেল

সন্দীপ তখনও কথাগুলো কান পেতে শুনছে।

মা আবার বললে--ও না থাকলে সেদিন কী হতো বল্ তো। সত্যি, ও মেয়ে হলে কী হবে, আমার পেটের ছেলের চেয়েও বেশি ও—

সন্দীপ এ-কথা শুনলো, কিন্তু কিছু বললে না। একটু পরে বললে—তাহলে তাই করি। এই বাড়িটাই বিক্রি করে দেবার ব্যবস্থা করি।

মা বললে—তা কর, সেই টাকায় দিদির চিকিৎসাটা অন্ততঃ হোক, তারপর বাঁচা-মরা, সে-সব ভগবানের হাত—

মায়ের কথা শুনে সন্দীপ শরীরে মনে যেন নতুন শক্তি পেয়ে গেল। বললে—না মা, তোমার কথা শুনে আমার সাহস ফিরে এসেছে, আমার সব রোগ সেরে গেছে এবার, আমি আজকেই বাড়িটা বিক্রির ব্যবস্থা করে ফেলবো—

--কিন্তু তার আগে তোর আপিসের কাছাকাছি একটা বাড়ি দেখ্, এ-বাড়ি ছেড়ে কোথায় উঠবো তার তো একটা বন্দোবস্ত করতে হবে--

সন্দীপ বললে—তা আমি দেখছি, কিন্তু একটা কথা, মাসিমা কি বিশাখা যেন জানতে না পারে যে এই বাড়িটা তার অসুখের চিকিৎসার জন্যে বিক্রি করছি—

—না তা বলবো না।

সন্দীপ বললে--বিশাখা কোথায়?

—সে ঘুমোচ্ছে, তোর অসুখের সময় তো তার শরীরের ওপর দিয়ে অনেক ধকল গেছে, তার ওপর আজকাল তার খাওয়াও কমে গেছে—

সন্দীপ বললে—কেন? বিশাখা খাচ্ছে না কিছু?

—খাবে কী করে? তোর অসুখ, বাজারই বা করবে কে, আর রান্নাবান্নাই বা

করবে কে? ওই বিশাখাই তো বাজারে যায় রোজ কেনা-কাটা করতে। ওইটুকু মেয়ে, ও-ই বা একলা কতো করবে! মাকে সেবা করবে, না বাজার-হাট করবে, না রান্না-বান্না দেখা-শোনা করবে!

বলে আর দাঁড়ালো না। বললে—আমি আর দাঁড়াবো না, কমলার মা এখনও আসেনি. আমি তার আগেই উনুনে আঁচ দিই গে, আজ তুই আপিসে যাবি, তুই তৈরি হয়ে নে, ভাত চড়িয়ে দিই গে—

বাড়ির ভেতরে যেতেই হয়তো মা'র পায়ের শব্দ শুনতে পেয়েছিল বিশাখা ঘুম ভাঙতেই মাসিমাকে দেখে সে বিছানার ওপর উঠে বসলো। বললে—আমাকে ডেকে দেননি কেন মাসিমা? ক'টা বাজলো?

মা বললে—তুমি ঘুমোও না মা! উঠছো কেন? আমি উনুনে আঁচটা দিতে যাচ্ছি, কমলার মা এখনও আসেনি, তুমি আর একটু ঘুমোও। আজ খোকাকে সকাল-সকাল ভাত দিতে হবে. ও বলছে আপিসে যাবে—

—অফিসে যাবে?

বিছানা থেকে উঠেই সোজা পাশের ঘরে চলে গেল বিশাখা। দেখলে ঘরের বিছানা-পত্র সব তোলা হয়ে গেছে। বিশাখাকে দেখে সন্দীপ বললে—তুমি? কেমন আছো? শুনলাম তোমার নাকি শরীর খারাপ—

বিশাখা বললে—কে বললে?

সন্দীপ বললে—কে আবার বলবে, মা-ই বললে—

বিশাখা বললে—আমার কথা ছেড়ে দাও, সত্যিই তুমি আজ অফিসে যাবে?

সন্দীপ বললে—অনেক দিন কামাই হয়ে গেল। মাইনেও তো কাটা যাচ্ছে, আর কতোদিন এভাবে চুপ-চাপ শুয়ে পড়ে থাকবো?

বিশাখা বললে—যেতে পারবে?

সন্দীপ বললে—যেতে পারি আর না-পারি, সংসার তো আমার শরীর খারাপ বললে শুনবে না—

তারপর একটু থেমে বললে—শুনলাম তোমাকেই নাকি এখন বাজার-হাট সব করতে হচ্ছে!

—কে বললে?

—কে আবার বলবে, মা-ই বললে। আমি রাসেল স্ট্রীটের বাড়ি থেকে একদিন এখানে নিয়ে এসেছিলুম তোমাদের একটু শান্তি দিতে। তা খুবই শান্তি দিলুম বটে! যা কখনও নিজের হাতে করোনি, আজ তাই-ই করতে হচ্ছে তোমাকে। এই-ই আমার শান্তি দেওয়ার নমুনা।

বিশাখা বললে—শান্তি কি কেউ কাউকে দিতে পারে? আমিই কি তোমাকে একটু শান্তি দিতে পেরেছি?

—ইচ্ছে করলেই তুমি আমাকে শান্তি দিতে পারো।

—কী করে?

সন্দীপ বললে—একটা বিয়ে করে।

—ওই তোমার এক কথা! যারা বিয়ে করেছে তারা কি সবাই-ই শান্তিতে আছে?

সন্দীপ বললে—কিন্তু তাদের মা'রা তো সহায়-সম্বলহীন বিধবা নয়!

—হ্যাঁ-হ্যাঁ, বলো, আরো বলো! শুধু সহায়-সম্বলহীন বিধবা নয়, পরের গলগ্রহ নয় তারা! পরের গলগ্রহ হওয়া যে কতো কষ্টের তা যদি তুমি বুঝতে তাহলে আর ও-কথা বলতে না।

সন্দীপ বললে—আমি কি সে-কথা কখনও তোমাকে বলেছি?

—মুখে বললেই কি বলা হয়? মনে মনে বলাটা কি বলা নয়?

সন্দীপ বললে—আমার বুকের ওপর কান পাতলে শুনতে পেতে কী আমার মনের কথা।

—কারো বুকের ওপর কান পাতবার অধিকার কি সবাই সবাইকে দেয়? সে অধিকার অর্জন করতে হয়! গলগ্রহদের সে অধিকার থাকে না—

হঠাৎ বাইরে থেকে মা'র গলার আওয়াজ শোনা গেল। মা বললে—ওরে খোকা, এখনও চান করে নিলি নে? আমি যে ভাত চাপিয়ে দিয়েছি—

সন্দীপ বললে—এই চান করে নিচ্ছি মা—

বিশাখা বললে—যাও, তুমি চান করে নাও গে—আমি চলি—

সন্দীপ বললে—হ্যাঁ, গলগ্রহদের যা কাজ তাই করো গে—

বিশাখা বললে—ওই বলে তুমি আমার ওপর প্রতিশোধ নিতে চাইছো। কিন্তু আমার কপালই এমনি যে কারো প্রতিশোধের জবাবে আমি কারও ওপর কোনও প্রতিশোধই নিতে পারলুম না—

সন্দীপ বললে—তবু চেষ্টা করে যাও, একদিন-না-একদিন আমার ওপর প্রতিশোধ নিতে পারবেই—

বিশাখা চলে যেতে যেতে বললে—পুরুষ মানুষ হয়ে জন্মালে একদিন-না-একদিন তা হয়তো নিতে পারতুম, কিন্তু ভগবান যে আমাকে মেয়েমানুষ করে গড়েছে। মেয়েমানুষ হয়ে জন্মানো যে কী পাপ, তা তুমি বুঝবে না—

বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল বিশাখা।
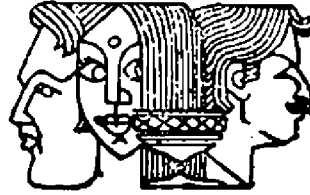
যুক্তি-তর্কের দিক থেকে জীবনটাকে একটা সোজা লাইনে টেনে নিয়ে যাওয়া যায়। আদালত বা কোর্টই তার প্রমাণ। সেখানে সৎ-অসৎ বা সত্যি-মিথ্যের কোনও বালাই নেই। অনেক নিরপরাধ মানুষও শাস্তি পেতে পারে, এমন নজির ভুরি-ভুরি আছে। যদিও কোর্টের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে পক্ষ-বিপক্ষের সব সাক্ষীকেই বলতে হয়—আমি সত্য বই মিথ্যা বলিব না—

কিন্তু যা সত্যিকারের সত্য? যা ট্রুথ?

সত্য কখনও সোজা পথে চলতে জানে না। সে এঁকে-বেঁকে গলি-ঘুঁজি দিয়ে গিয়ে ঘুরে একটা অন্তিম-লগ্নে পৌঁছে গোলাকৃতি হয়ে তবে সে সত্য হয়ে ওঠে। জন্ম থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত পৌঁছে সে আবার জন্মতে এসে মেশে। যেখান থেকে যাত্রা শুরু করে সেখানে এসে মিশেই সে সম্পূর্ণ হয়।

এই সন্দীপও তাই। আর শুধু এই সন্দীপ একলাই নয়, এই ঠাকমা-মণি, এই পরমেশ মল্লিক, এই মুক্তিপদ, নন্দিত, পিক্‌নিক, মাসিমা, এই সৌম্যপদ, বিশাখা, গোপাল হাজরা, তপেশ গাঙ্গুলী, দাস-দাসী, ঝি-চাকর, ড্রাইভার যারাই এই উপন্যাসে যাত্রা শুরু করেছে, তারা সবাই-ই এই পৃথিবীর প্রতীক, সত্যের প্রতীক। এই উপন্যাসে তারা যদি শেষ পর্যন্ত গোল হয়ে ওঠে, অর্থাৎ সত্য হয়ে ওঠে, তাহলেই এই উপন্যাস

সার্থক হয়ে উঠবে, নইলে না।

কিন্তু মানুষকে তো তা বলে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকলে চলবে না। তাকে প্রতিনিয়ত শেষের দিক লক্ষ্য করে রুদ্ধশ্বাসে দৌড়তে হবে। তাই মুক্তিপদ কলকাতায় থাকুক আর না-থাকুক, তাদের ফ্যাক্টরি কলকাতায় থাকুক আর না-থাকুক, ঠাকমা-মণিকে তাঁর নিজের কাজ করে যেতেই হবে। হতাশ হয়ে হাত-পা গুটিয়ে ঘরের মধ্যে বসে থাকলে তাঁর চলবে না। তাই যতটুকু তাঁর প্রাণ-শক্তি শরীরে ছিল ততটুকু নিয়েই তিনি কোর্টে যেতেন, এ্যাডভোকেটের চেম্বারে যেতেন। দরকার হলে কোর্টে গিয়ে সাক্ষী দিতেন, উকিলদের সঙ্গে শলা-পরামর্শ করতেন। যার যা প্রাপ্য তা যথাসময়ে মিটিয়ে দিতেন। কিন্তু তবু তাঁর পূর্ব-জন্মার্জিত পাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা করেও ঠিকমতো মুক্তি পেতেন না। বিন্দুকে বলতেন—আর জন্মে অনেক পাপ করেছিলুম, তাই এ-জন্মে এত কোর্ট-ঘর করতে হচ্ছে—

মল্লিক-মশাই সান্ত্বনা দিতেন। বলতেন—কী করবেন ঠাকমা-মণি, এও সেই সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরের ইচ্ছে ছাড়া আর কিছু নয়—

ঠাকমা-মণি বলতেন—শেষ জীবনে এ আমার কী শাস্তি বলুন তো, ছেলে রইলো দেশ-ছাড়া, নাতি রইলো জেলখানায়, আর আমাকে এই বুড়ো বয়েসে কিনা কোর্টে আসতে হচ্ছে। পাপ না করলে কি কেউ কখনও কোর্টে আসে?

এ-কথার জবাবে মল্লিক-মশাই আর কী বলবেন। তিনি তো এ-বাড়ির উত্থানের প্রায় আদি যুগ থেকেই দেখে আসছেন। তখন তিনি এ-বাড়ির ঐশ্বর্য দেখেছেন, এখন তিনি এ-বাড়ির বিপর্যয়ও দেখছেন। তাঁর চোখের সামনেই একদিন এ-বাড়ির কর্তার দেহান্ত হওয়া দেখেছেন, আর বড় ছেলে আর বড় পুত্র-বধূর মৃত্যুও দেখেছেন। আবার পাশাপাশি বিয়ে কিংবা পুজো কিংবা পারিবারিক কোনও উৎসবের সমারোহও তিনি দেখেছেন। সুখে-দুঃখে, বিপদে-আপদে সব কিছুর সাক্ষীও হয়েছেন তিনি বরাবর।

কিন্তু সমস্ত কিছুর যোগ-বিয়োগের শেষে এখন ফলাফলটা দাঁড়ালো কী?

সেটাও তাঁর হিসেবের খাতায় লেখবার সময় বোধহয় এখনও আসেনি। তাই তিনি যখন ঠাকমা-মণির সঙ্গে উকিল-ব্যারিস্টার-এ্যাটর্নীদের বাড়ি যান তখন বাইরে থেকে সব কিছু লক্ষ্য করলেও মনে ভেতরে তিনি সরব, মনের ভেতরে তিনি মুখর। সেখানে তিনি নিজেকেই কেবল প্রশ্ন করেন আর নিজেই তিনি তাঁর প্রশ্নের জবাব দেন।

তিনি নিজেকে জিজ্ঞেস করেন—এত দেখার পর তুমি কী পেলে?

নিজেই তিনি সে-প্রশ্নের জবাব দেন—নিরাসক্তি।

বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি যেন ক্রমেই সব ব্যাপারে আরো নিরাসক্ত হয়ে উঠতেন। তিনি বলতেন—ভগবান, আমাকে এ-সব দেখিয়ে তুমি তোমার কী উদ্দেশ্য সাধন করতে চাও?

ভগবানের হয়ে তিনিই উত্তর দেন—নিরাসক্তি। নিরাসক্তিই তো সুখ রে। সংসারে ওর চেয়ে বড়ো সুখ আর কিছু নেই—

—কিন্তু আমার তো নিজের সংসার বলে আর কিছু নেই। তুমি তো আমাকে কখনও সংসার বলে কিছু দাওনি—

—তোকে সংসার না দিলেও তুই তো সংসারেই জড়িয়ে আছিস। সংসার না-থাকার জন্যে কি এখন তোর মা কোনও দুঃখে আছে?

—না।

—যাতে তোর কোনও দুঃখ না থাকে, সেইজন্যেই তো তোকে সংসার দিইনি। তোর নিজের কোনও সংসার না দিলেও তোকে অন্য সংসারের সঙ্গে এই জন্যেই জড়িয়ে রেখেছি, যাতে তোর মনে কোনও ক্ষোভ না থাকে। সংসারে যুক্ত থেকেও মুক্ত থাকার

সাধনার ফল তুই কতো অনায়াসে পেয়ে গেলি। এত ফল তো সহস্র বছর সাধনা করলেও কেউ পায় না। তার জন্যে আমার কাছে তো তোর কৃতজ্ঞ থাকা উচিত!

উকিল-এ্যাটর্নী-ব্যারিস্টারদের কাছাকাছি থাকলে মানুষের শ্মশান-বাসের সৌভাগ্য-লাভ হয়। তাহলে কেন যে তান্ত্রিকরা শ্মশানে গিয়ে সাধনা করেন তা কে জানে। শ্মশানে না গিয়ে তারা যদি উকিল-ব্যারিস্টারদের চেম্বারে গিয়ে বসতেন তাহলে আরো সহজে বৈরাগ্য অর্জন করতে পারতেন। মানুষ যে কতো লোভী আর কতো দয়ালু হতে পারে, মানুষ যে কতো নিষ্ঠুর আর কতো নির্লোভ হতে পারে, মানুষ যে কতো অসৎ আর কতো মহৎ হতে পারে, মানুষ যে কতো ধনী আর কতো নির্ধন হতে পারে, মানুষ যে কতো বিষয়াসক্ত আর কতো বৈরাগী হতে পারে, তা জানতে গেলে উকিল-ব্যারিস্টারদের চেম্বারে গেলেই সম্পূর্ণ উপলব্ধি হয়।

মল্লিক-মশাই-এরও তা জানা হয়ে গিয়েছিল ঠাকমা-মণির সঙ্গে বছরের পর বছর উকিল-ব্যারিস্টারদের চেম্বারে গিয়ে গিয়ে। তাঁরা যা বলতেন মল্লিক-মশাই তা মন দিয়ে সমস্ত শুনতেন আর তাঁর মনে হতো তিনি যেন ভাগবত-পাঠ শুনছেন। মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বিশ্বরূপ দর্শন করিয়েছিলেন। মল্লিক-মশাইএরও মনে হতো উকিল-ব্যারিস্টাররা যেন তাঁকে বিশ্বরূপ দেখিয়ে দিচ্ছেন।

ঠাকমা-মণির কথাগুলো তাঁর মনে পড়তো। ঠাকমা-মণি বলতেন—শেষ জীবনে আমার এ কী শাস্তি বলুন তো! ছেলে রইলো দেশ-ছাড়া, নাতি রইলো জেলখানায়, আর আমাকে কি না এই বুড়ো বয়েসে কোর্টে আসতে হচ্ছে, অনেক পাপ না করলে কি কেউ কোর্টে আসে?

এই সব মনের দুঃখের কথা তিনি যেমন মল্লিক-মশাইএর কাছে বলতেন, তেমনি মল্লিক-মশাইও আবার সন্দীপকে কাছে পেলে তাকেও বলতেন।

সন্দীপ বলতো—জানেন কাকা, এ শুধু আমাদের দেশেই নয়, আইন সম্বন্ধে বিদেশেও নাকি এই রকম অনেক লোক অনেক দুঃখের কথা বলে গেছেন। ফ্রান্সিস্ বেকন বলে গেছেন—No torture is worse than the torture of law. আর শুনেছি মহাত্মা গান্ধী বলে গেছেন—Lowyers' frofession is a liars' profession. সত্যি-মিথ্যে জানি না—

সন্দীপ আরো বলতো—জানেন কাকা, কাশীনাথবাবু একদিন আমাকে একটা গল্প বলেছিলেন সেই গল্পটা আপনাকে বলি, শুনুন—

এক ভদ্রলোক একদিন একটা কবরখানার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ দেখলেন একটা কবরের ওপরে একটা সাদা পাথরের স্মৃতি-ফলকের ওপর দুটো লাইন কালো অক্ষরে লেখা রয়েছে—

Here lies a lawyer
And
An honest man

ভদ্রলোক বার দুয়েক লাইন দুটো পড়লেন কিন্তু তার মানে বুঝতে পারলেন না। ভাবলেন একটা কবরের মধ্যে দুজন লোককে একসঙ্গে কেন কবর দেওয়া হলো?

তা এই-ই হচ্ছে আদালত আর আইন-জীবীদের সম্বন্ধে সাধারণ লোকের ধারণা। আইন-জীবীদের সম্বন্ধে যেমন এই সব কথা এই সব গল্প প্রচলিত আছে, তেমনি রাজনীতিবিদদের সম্বন্ধেও অনেক কথা চালু আছে। যেমন স্যামুয়েল জনসন বলে গেছেন—Politics is the last resort of a scoundrel. তার মানে শয়তানদের শেষ আশ্রয় হচ্ছে রাজনীতি!

অথচ রাজনীতিক আর আইনবিদ—এদের বাদ দিয়ে কি আধুনিক পৃথিবী চলতে

পারে? সংসারে বাস করে এদের হাত এড়িয়ে কি বেঁচে থাকা সম্ভব?

ঠাকমা-মণিকে নিয়ে যখন মল্লিক-মশাই কোর্টে বা উকিল-এ্যাটর্নীদের চেম্বারে যেতেন, তখন এই সব কথাগুলো তাঁর মনে তোলপাড় করতো।

সৌম্যপদর খুনের মামলাটা ব্যাংকশাল কোর্ট থেকে গেল চিফ্-প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে। এই যাওয়ার গতি এত মন্থর, এত জটিল, এত উদ্বেগ-জর্জর, যে তা একজন লোককে উন্মাদ করে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু ঠাকমা-মণির মতো শক্ত-সমর্থ মানুষ বলেই তিনি তা সহ্য করতে পারতেন। অন্য যে-কোনও লোক হলে হয়তো সে আত্মহত্যা করে যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার পথ খুঁজে নিত।

ঠাকমা-মণি একদিন তাঁর এ্যাডভোকেটকে জিজ্ঞেস করলেন--কীরকম বুঝছেন?

মিস্টার দাশগুপ্ত বললেন—ভালো বুঝছি না—

—তার মানে? আমরা কি তাহলে হেরে যাবো?

মিস্টার দাশগুপ্ত বললেন—মনে হচ্ছে, সেটাই সম্ভব—

—তার মানে?

মিস্টার দাশগুপ্ত বললেন—আপনি তার জন্যেই তৈরি থাকুন—

—কেন?

—এভিডেন্স আমাদের বিরুদ্ধে—

—তার মানে সৌম্যর ফাঁসি হয়ে যাবে?

মিস্টার দাশগুপ্ত বললেন—সব রকম অবস্থার জন্যে তৈরি হয়ে থাকার নামই হচ্ছে মনুষ্যত্ব। সুখে বিতস্পৃহ আর দুঃখে অনুদ্বিগ্ন হয়ে থাকার উপদেশ দিয়ে গেছেন আমাদের মুনি-ঋষিরা। যে তা থাকতে পারে তাকেই বলা হয় স্থিতধী মানুষ!

—আপনি বলছেন কী? আপনি থাকতে আমি আমার নাতির মৃত্যু দেখবো। তাহলে আমি কী নিয়ে বাঁচবো? আমার এত টাকা-কড়ি, আমার এত বিষয়-সম্পত্তি কিছুই কাজে আসবে না?

মিস্টার দাশগুপ্ত বললেন—অন্য ল'ইয়ার হলে তিনি আপনাকে হয়তো সে-আশ্বাস দিতেন, কিন্তু আমি আপনাকে স্তোক-বাক্য দিয়ে বিভ্রান্ত করতে পারবো না—

—তাহলে এর প্রতিকার কী?

মিস্টার দাশগুপ্ত বললেন--প্রতিকার আর কী? একমাত্র প্রতিকার আপনি সব কিছু দুর্ঘটনার জন্যে তৈরি থাকুন, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করুন, কিংবা মন্দিরের দেবতার কাছে গিয়ে পুজো দিন, মানত করুন! মানুষ তার চেয়ে বেশি আর কী করতে পারে?

ঠাকমা-মণি বললেন—তা-ই যদি করবো, তাহলে এত লোক থাকতে আপনাকে উকিল দিলুম কেন? আপনাকে এত হাজার-হাজার টাকা দিলুমই বা কেন?

মিস্টার দাশগুপ্ত বললেন—আমি তো আর ঠাকুর-দেবতা নই, আমি বড়জোর চেষ্টা করতে পারি। তার চেয়ে বেশি কিছু করার ক্ষমতা আমার নেই—

তারপর একটু থেমে তিনি আবার বললেন--আর একটা কাজ করতে পারেন?

ঠাকমা-মণির এবার যেন একটু আশা হলো--জিজ্ঞেস করলেন--কী কাজ?

মিস্টার দাশগুপ্ত আবার বললেন--আমি যা বলবো আপনি তা করতে পারবেন কিনা তাই-ই বলুন। সে-কাজটা কি করতে পারবেন আপনি?

মল্লিক-মশাইও পাশে বসে এবার একটু উত্তেজিত হয়ে উঠলেন।

ঠাকমা-মণি বললেন– বলুন কী কাজ?

মিস্টার দাশগুপ্ত বললেন--আপনার নাতির বিয়ের ব্যবস্থা করতে পারবেন?

ঠাকমা-মণি শিউরে উঠলেন। উকিলবাবুর কি মাথা-খারাপ হয়ে গেল নাকি?

বললেন—আমার নাতির বিয়ে? আপনি বলছেন কী?

মিস্টার দাশগুপ্ত বললেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি ঠিকই বলছি. আপনার তো একটিই নাতি! তার বিয়ের ব্যবস্থা করতে পারবেন?

ঠাকমা-মণি মল্লিক-মশাই দু'জনেই তখন স্তম্ভিত হয়ে গেছেন।

ঠাকমা-মণি বললেন—কিন্তু আমার নাতি তো একজন ফাঁসির আসামী। তাকে কে বিয়ে করবে? কোন্ মা-বাবা তার মেয়ের সঙ্গে ফাঁসির আসামীর বিয়ে দিতে রাজি হবে?

মিস্টার দাশগুপ্ত বললেন—কেন রাজি হবে না? টাকার জন্যে এ-যুগের মানুষ সব কিছু করতেই রাজি হয়—তা তো জানেন!

ঠাকমা-মণি বললেন—হ্যাঁ, তা অবশ্য হয়, কিন্তু তা বলে টাকার জন্যে ফাঁসির আসামীর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে কেউ জেনেশুনে দিতে রাজি হবে?

মিস্টার দাশগুপ্ত বললেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ, রাজি হবে। আমি এতদিন ধরে কোর্টে ওকালতি করছি। আমি বলতে পারি বাপ হয়ে যদি মানুষ নিজের ছেলেকে খুন করতে পারে, তখন টাকার জন্যে মানুষ ফাঁসির আসামীর সঙ্গেও নিজের মেয়ের বিয়ে দিতে পারে! আর তা যদি না পারেন তাহলে আপনার নাতিকে বাঁচাতে পারা যাবে না—
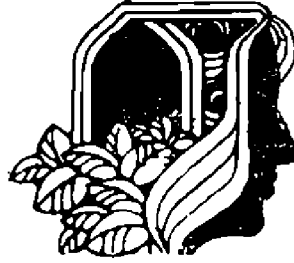
মানুষের জীবন একদিন যেখান থেকে শুরু হয়, একদিন আবার ঘুরে-ফিরে সেখানে এসেই শেষ হয়। যদি তা শূন্য থেকে শুরু হয় তো আবার তা শূন্যে এসেই শেষ হয়।

এইটেই শতকরা নিরানব্বইজন মানুষের জীবনের অঙ্ক।

কিন্তু এর ব্যতিক্রমও আছে। কিন্তু সে আর সংসারে ক'জন? ক'জন তেমন সৌভাগ্যবান? সোক্রেটিসের জীবন আরম্ভ হয়েছিল শূন্য থেকে, কিন্তু শেষ হলো পুরো একশো নম্বরে। রাজপুত্র সিদ্ধার্থও তাই। আরম্ভ হয়েছিল সিদ্ধার্থতে, শেষ হলো তথাগত বুদ্ধদেব-এ। ঠিক তেমনি করে একদিন কামারপুকুরের গদাধর শূন্য থেকে যাত্রা করে শেষ হয়েছিল দক্ষিণেশ্বরের রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব-এ পৌঁছে।

এঁদের সংখ্যা একটা মানুষের দশটা আঙুলে গোনা যায়।

এঁদের কাছে সন্দীপ কতোটুকু? অত্যন্ত নগণ্য মানুষ হয়েই সে জন্মেছিল।

কিন্তু শেষে এসে?

এখন তো তার শেষ হওয়ার লগ্ন আসন্ন। এখন জেল থেকে বেরিয়ে সে দেখছে শূন্য থেকে আরম্ভ করে সে এখন বলতে গেলে শূন্যে এসেই পৌঁছোতে চলেছে।

অথচ তখন কতো আশা ছিল তার, কতো ছিল অভিলাষ, কতো আনন্দ, কতো উৎসাহ, কতো আদর্শ!

কিন্তু বড়ো আনন্দ হলো তার যখন অনেক দিন পরে তার ব্রাঞ্চের ম্যানেজার করমচাঁদ মালব্যজী তাকে নিজের ঘরে ডেকে পাঠালেন।

ঘরে যেতেই মালব্যজী বললেন—বোস লাহিড়ী।

এ-রকম করে মালব্যজী আগে তাকে কখনও বসতে বলেননি।

সন্দীপ তাঁর সামনের একটা চেয়ারে বসলো।

মালব্যজী জিজ্ঞেস করলেন- এখন কেমন আছো তুমি ?

এর উত্তরে সন্দীপ কী বলবে? শুধু বললে—ভালো।

—বাড়ির খবর ?

সন্দীপ বুঝতে পারলে না এর জবাবে কী-কথা বললে ম্যানেজার সাহেব খুশী হবেন। তার উত্তর দেওয়ার আগেই মালব্যজী বললেন—তোমার বাড়ির খবর ভালো নয় তা আমি জানি, তবু কথাটা আমি জিজ্ঞেস করছি।

সন্দীপ তখনও বোবা হয়ে রইলো। মালব্যজী বললেন, ঠিক আছে, আমার কথার জবাব তোমাকে দিতে হবে না। এবার অন্য একটা কথা জিজ্ঞেস করছি।

—বলুন ?

—তোমার অসুখের সময়ে আমি তোমার নার্সিং-হোমে প্রায় রোজই গিয়েছি। তুমি তা জানতে পারতে না। শেষের দিকে তুমি দু'একদিন তা জানতে পেরেছ—আর তা ছাড়া আমি চাইনি যে আমার উপস্থিতি তুমি টের পাও। নার্সিং-হোমের ডাক্তার-বাবুও বলে দিয়েছিলেন যে কেউ যেন গিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা না করে। তাতে তোমার অসুখ বাড়তে পারে!

হঠাৎ মালব্যজী বলে উঠলেন—এ কী, তুমি কাঁদছো কেন?

সন্দীপও তাড়াতাড়ি পকেট থেকে রুমাল বার করে চোখ দুটো মুছে ফেললে। কিন্তু তবু যেন তার কান্না আর থামতে চায় না।

- আবার কাঁদছো ?

এবার সন্দীপ অনেক কষ্টে তার কান্না সম্বরণ করতে চেষ্টা করতে লাগলো।

মালব্যজী বললেন—তা কাঁদো কাঁদো। আমি তোমাকে কাঁদতে বাধা দেব না। তোমাদের একজন বাঙালী মহাপুরুষ নাকি বলে গিয়েছেন যে কাঁদা ভালো। কাঁদলে নাকি কুম্ভক হয়।

তারপর একটু থেমে আবার বললেন—শুনেছি যারা গুন্ডা, যারা মস্তান, যারা মাফিয়া, তারা নাকি কখনও কাঁদে না। তারা যদি একটু কাঁদতে পারতো তাহলে তারা আর গুন্ডা মাস্তান বা মাফিয়া থাকতো না। তোমার কান্না দেখে তাই আমার ভালো লাগছে---

তারপর আবার একটু থামলেন।

থেমে নিয়ে আবার বলতে লাগলেন--কিন্তু জীবনটা তো আর শুধু কান্না নয়, জীবনটা হলো কান্না আর হাসির যোগফল। শুনেছি সংস্কৃত ভাষাতে একটা শব্দ আছে। শব্দটা হচ্ছে 'কল্যাণ'। পৃথিবীর আর কোনও দেশের কোনও ভাষায় এমন শব্দ নেই। 'কল্যাণ' মানে সুখ নয়। অথচ নিছক সুখই সবাই চায়। কিন্তু নিছক সুখ তো ইতিহাসে কেউই পায়নি. যখন কেউ কাউকে আশীর্বাদ করে. তখন কেউ কাউকে বলে না--'তুমি সুখী হও'। বলে—'তোমার কল্যাণ হোক।' সুখ আর দুঃখ মিলিয়েই তো আমাদের এই পৃথিবী. আমাদের এই জীবন। তাই 'কল্যাণ' মানে সুখ আর দুঃখের সমন্বয়। তাই আমাদের ব্যাঙ্কে যখন সবাইকে দেখি. তাদের দেখে আমার বড়ো দুঃখ হয়। ভাবি এরা কেউ ইতিহাস পড়লে না. পৃথিবী দেখলে না. জীবনও দেখলে না। আমার মনে হয় এরাও কেউ মানুষ নয়. মানুষের অপভ্রংশ। তুমিই আমার মনে হয় একমাত্র মানুষ!

এবার সন্দীপ চমকে উঠলো। মালব্যজী বললেন--না, তুমি চমকে উঠো না। আমি তোমার সম্বন্ধে সব কিছু জেনে গিয়েছি!

সন্দীপ আরো হতবাক হয়ে গেল। সে কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু মালবাজী তাকে বাধা দিলেন।

বললেন—নার্সিং-হোমে আমি যদি না যেতুম তো আমি তোমার আসল পরিচয়ও জানতে পারতুম না। সেও এক কান্ড! একজন নার্সই একদিন আমাকে জানালে যে একজন মহিলা নাকি তোমার জন্যে তিন দিন না খেয়ে ওদের কাছে পড়ে আছে। কথাটা শুনে আমি প্রথমে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম—

আমি নার্সটিকে জিজ্ঞেস করলাম—সে কে? সে কি রোগীর মা?

নার্সটি বললে—না, মা নয়।

—তাহলে?

নার্সটি জবাব দিলে—পেশেন্টের সঙ্গে তার কোনও সম্পর্কই নেই। সে একজন আনম্যারেড মেয়ে! তার এখনও বিয়েই হয়নি—

আমি বললাম—সে কোথায়? তাকে আমার কাছে একবার ডেকে আনতে পারেন?

আমার কথা শুনে নার্সটি বললে—সে তাদের কোয়ার্টারেই আছে। তিন দিন ধরে কিছু না-খেয়ে আর না-ঘুমিয়ে একেবারে কাহিল হয়ে পড়েছে। আপনি যদি একবার আমাদের নার্সেস্ কোয়ার্টারে যান তো তাকে দেখতে পারেন। তার হেঁটে আসবার ক্ষমতাও নেই।

তা কী আর করা যাবে! নার্সদের কোয়ার্টারে বাইরের পুরুষ-মানুষদের যাওয়ার অধিকার নেই। তবু বিশেষ ব্যাপার বলে আমাকে যেতে হলো। গিয়ে দেখলাম একটা বিছানায় একটি মহিলা শুয়ে আছেন। দেখেই বোঝা গেল মহিলাটি বড় দুর্বল। উঠে বসবার ক্ষমতাও নেই। নার্সটির ডাকে মেয়েটি চোখ খুললো। চোখ খুলে সামনে আমাকে দেখে উঠে বসবার চেষ্টা করলে। কিন্তু নার্সটি বাধা দিলে। বললে—তোমাকে উঠতে হবে না ভাই, শুয়ে থাকো, আমি এঁকে ডেকে এনেছি। মিস্টার লাহিড়ী যে-ব্যাঙ্কে চাকরি করেন ইনি সেই ব্যাঙ্কের ম্যানেজার। ইনিই মিস্টার লাহিড়ীকে আমাদের নার্সিং-হোমে পাঠিয়েছিলেন। আমি তোমার কথা বলাতে তোমাকে দেখতে এসেছেন—

মেয়েটি কথাগুলো শুনে কোনও উত্তর দিলে না। জিজ্ঞেস করলাম—আপনি কে?

মেয়েটি কোনও উত্তর দিলে না।

আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম—আপনি সন্দীপ লাহিড়ীকে দেখতে এসেছেন?

মেয়েটি এবার মাথা নেড়ে জান্যলে—হ্যাঁ।

আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম—আমিই সন্দীপ লাহিড়ীর অসুখের খবরটা ওর দেশের ঠিকানায় জানিয়ে দিয়েছিলাম। আপনারা সে-চিঠি পেয়েছিলেন?

মেয়েটি এবার বললে—সেই চিঠি পেয়েই তো আমি এখানে এসেছি—

—সন্দীপের মা এ-খবর জানেন?

মেয়েটি বললে—হ্যাঁ, জানেন।

—তা আপনাদের বাড়িতে সন্দীপের আর কেউ থাকে না?

—আমি আর আমার মা'ও সে-বাড়িতে থাকি। কিন্তু তাঁদের তো অনেক বয়েস হয়েছে। তাই আমিই চলে এসেছি। সন্দীপ ছাড়া আর কেউ যে নেই আমাদের। সন্দীপের যদি কিছু হয় তাহলে আমাদের কী হবে কে দেখবে আমাদের? সেই ভাবনা ভেবে-ভেবেই আমি পাগল হয়ে এখানে দৌড়ে এসেছি। সন্দীপ ছাড়া আর তো কোনও পুরুষ মানুষ নেই আমাদের বাড়িতে।

আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম—কিন্তু আপনাদের সংগে সন্দীপের কী সম্পর্ক? সন্দীপ আপনাদের কে?

মেয়েটি বললে—কেউ না—

—যদি কেউই না হয় তাহলে আপনারা তাদের বাড়িতে আছেন কেন?

প্রশ্নটা শুনে মেয়েটি অনেকক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর বললে—পৃথিবীতে রক্তের সম্পর্কটাই কি বড় হলো? আর কোনও সম্পর্ক কি থাকতে নেই সংসারে?

এর প্রশ্নের কোনও জবাব আমি দিতে পারলুম না। তাই চুপ করে রইলাম।

এবার মেয়েটি নিজেই বলতে লাগলো—আপনি কোনও রকমে সন্দীপকে বাঁচিয়ে দিন, আমি আপনার পায়ে পড়ছি। সন্দীপের কিছু খারাপ হলে আমরা মারা যাবো। আমার মা'র ক্যানসার হয়েছে। সন্দীপ চাকরি করে যে মাইনে পায়, তা সবই মায়ের চিকিৎসাতে খরচ হয়ে যায়। বাকি যা থাকে তাই দিয়ে আমরা কোনও রকমে ভাতে-ভাত খেয়ে বেঁচে আছি—

আমি মেয়েটির কথা শুনে নির্বাক হয়ে গেলাম। খানিকক্ষণের জন্যে আমার মুখ দিয়ে কোনও কথা বেরোল না। তখন আমার মনে পড়ে গেল তোমার কাছ থেকে আমি এ-সব কথা আগেই শুনেছি। তুমিই আমার কাছে একদিন এসব কথা বলেছিলে। তারপর আমি মেয়েটিকে আবার বললাম—তা আপনি এখানে না-খেয়ে এমন করে পড়ে আছেন কেন? আপনি এমন করে না-খেয়ে থাকলে কি আপনাদের সন্দীপ সুস্থ হয়ে উঠবে মনে করেন? শেষকালে যদি আপনারও কোনও অসুখ হয় তখন সন্দীপের কী হবে বলুন তো? এঁকে তো সে আপনার মা'র ক্যানসারের চিকিৎসার ভাবনায় অস্থির হয়ে আছে। তার ওপর যদি আবার আপনার অসুখ হয় তাহলে তার অবস্থাটা কী হবে ভাবুন তো?

আমার কথা শুনে মেয়েটি প্রথমে কোনও জবাব দিলে না। তারপর বললে—আমি ঠাকুরের কাছে রোজ মানত করি যে—

—মানত করেন, মানে?

—এই বলে মানত করি যে সন্দীপ যতোদিন সুস্থ না হয়ে ওঠে, ততোদিন আমি জলগ্রহণ করবো না।

মেয়েটির কথা শুনে আমার মনে হলো এ-মেয়ে তো সাধারণ মেয়ে নয়। এ মেয়েকে টলানো তো সোজা কাজ নয়, আমি তো জীবনে এমন মেয়ে আগে কখনও দেখিনি। আর শুধু আমিই নই, হয়তো কেউ-ই দেখেনি।

সন্দীপ মালব্যজীর কথাগুলো এক মনে শুনছিল।

মালব্যজী আবার বললেন—একদিন আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে তুমি অফিস থেকে অতো লোন নাও কেন, তা তুমি তোমার নিজের পারিবারিক সমস্যার কথা বলেছিলে, এরাই কি সেই তারা?

সন্দীপ মাথা নেড়ে বললে—হ্যাঁ স্যার!

মালব্যজী জিজ্ঞেস করলেন—এরই নাম কি বিশাখা?

সন্দীপ আবার বললে—হ্যাঁ স্যার।

—এরই মায়ের কি ক্যান্সার?

—হ্যাঁ স্যার।

—এরই বিয়ের জন্যে কি তুমি চারদিকে এত ঘোরাঘুরি করছো?

—হ্যাঁ স্যার।

—এদের নিজের লোক বলতে আর কেউ নেই?

—না, সে-সব কথা তো সবই বলেছি আপনাকে। তার ওপরে আবার ওর মায়ের ক্যান্সার হয়েছে বলে ডাক্তাররা সন্দেহ করছেন। এ অবস্থায় আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি—কী যে করবো কিছুই বুঝতে পারছি না। যারা তার আত্মীয় তাদের কাছে পাঠাতেও ভরসা পাচ্ছি না।

মালব্যজী বললেন—তা-এ অবস্থায় তো তুমিই বিশাখাকে বিয়ে করতে পারো।

প্রস্তাবটা শুনে সন্দীপ যেন চমকে উঠলো। বললে—আমি?

মালব্যজী বললেন—কেন? কথাটা শুনে তুমি অতো চমকে উঠলে কেন? ওকে বিয়ে করতে তোমার আপত্তি কীসের? ওকে বিয়ে করলে তো ওদেরও উপকার করা হবে, আর তোমার মায়ের ঘাড় থেকে সংসারের কাজের বোঝাও একটু কমবে। তোমার মায়েরও তো বয়েস হচ্ছে। আর সংসারে কেউই তো চিরকাল বেঁচে থাকতে আসেনি। সেই সব কথাও একবার ভাবো। তখন তোমাকেই বা দেখবার কে থাকবে?

এ-কথার কী জবাব দেবে সন্দীপ!

মালব্যজী আবার বললেন—আর তা ছাড়া তোমারও তো বিয়ের বয়েস হয়ে গেছে—শেষ পর্যন্ত তো একদিন তোমাকে বিয়ে করতেই হবে, তা যদি করতেই হয় তাহলে এখন বিয়ে করলেই বা দোষটা কী?

এবারও সন্দীপ কোনও উত্তর দিলে না।

ব্যাঙ্কের কাজ তখন পুরো দমে চলেছে। ক্লায়েন্টরা আসছে যাচ্ছে। টাকাও লেন-দেন চলছে তখন। সবাই নিজের নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত।

কিন্তু যিনি সেই প্রতিষ্ঠানের কর্তা তিনি তখন তাঁর নিজের চেম্বারের মধ্যে সন্দীপকে নিয়ে যে কী কাজে ব্যস্ত, তা কেউ বুঝতে পারছে না। এমন তো কখন হয় না। আর সন্দীপের মতো অন্যতম তুচ্ছ একটা কর্মচারীর চিকিৎসার জন্যে সেই প্রতিষ্ঠানের কর্তা এত হাজার হাজার টাকা খরচ করলেনেই বা কেন? সন্দীপ লাহিড়ী তো সামান্য একজন অধস্তন কর্মচারী। তাকেই বা নার্সিং-হোমে পাঠিয়ে আরোগ্য লাভ করানোর জন্যে ব্যাঙ্কের এত টাকা খরচ করার সার্থকতা কী?

এ-সব প্রশ্নের উত্তর তখন কেউই পাচ্ছে না। অথচ এ-সব প্রশ্ন তখন সকলকেই বিব্রত করে তুলছিল। পরেশদা বললে—আমি জানি হে, সবই জানি।

সবাই জিজ্ঞেস করলে—কী কারণ পরেশদা? কী জানেন আপনি?

পরেশ ধর অতো সহজে অতো সস্তায় উত্তর দেওয়ার লোক নয়।

তবু অন্য পক্ষ থেকে পীড়াপীড়ির শেষ নেই। তারা জিজ্ঞেস করতে লাগলো—বলুন না পরেশদা, কী কারণ?

পরেশদা বললে—তাহলে তোরা কথা দে চাঁদা করে আমাকে তোরা মোগলাই পরোটা, কষা মাংস খাওয়াবি?

—হ্যাঁ পরেশদা, কথা দিচ্ছি খাওয়াবো!

—কথা দিচ্ছিস তো?

—হ্যাঁ পরেশদা, কথা দিচ্ছি আপনাকে পর-পর চারদিন ধরে আমরা সবাই মিলে মোগলাই পরোটা আর কষামাংস খাওয়াবো।

পরেশদা বললে—শেষকালে কথা খেলাপ করবি না তো কেউ?

না, কথার খেলাপ করবো না।

পরেশদা বললে—তাহলে টিফিন টাইমে আজ খেতে খেতে বলবো এর রহস্য—

ওদিকে তখনও মালব্যজী সন্দীপকে বোঝাচ্ছেন—সত্যি বলো তো বিয়ে করতে তোমার আপত্তিটা কী?

সন্দীপ তখনও কথাটার কোনও যুক্তি-সঙ্গত উত্তর দিতে পারছে না। কী উত্তরই বা সে দেবে? কোন উত্তরটাইবা তার ঠিক হবে।

শেষকালে যে-উত্তরটা তার মাথায় এলো সেইটে বলতে যাচ্ছিল: এমন সময় একটা টেলিফোন এলো। টেলিফোনটা আসতেই মালব্যজী অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। খুবই জরুরী টেলিফোন। হেড-অফিস থেকে ফোনটা এসেছে।

সন্দীপ বুঝতে পারলে টেলিফোনে এমন-সব কথা হচ্ছে যা ব্যাংক সংক্রান্ত এবং যা খুব কনফিডেনশিয়াল। আরো বুঝতে পারলে যে সন্দীপের সেখানে বসে থাকা উচিত নয়। সে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে উঠে চেম্বারের বাইরে চলে গেল।
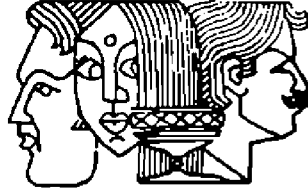
এক-একটা মানুষের জীবনও ঠিক ওই ব্যাংকের ম্যানেজারের চেম্বারের মতো চারদিকে দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। সেখানে সে নির্জন, সেখানে নিঃসঙ্গ। বাইরের সকলের সঙ্গে সে নানাভাবে যুক্ত এবং ঘনিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও তার সেই নিঃসঙ্গতার চেম্বারে কারো প্রবেশাধিকার নেই।

সন্দীপও ছোটবেলা থেকে কতো লোকের সংস্পর্শে এসেছে। কতো লোকের সঙ্গে তার ভাবনার আদান-প্রদান ঘটেছে। কিন্তু তার সেই নিঃসঙ্গ গোপন চেম্বারে কখনও কাউকে কি সে প্রবেশাধিকার দিয়েছে। এমন কি তার মা'ও কি ছেলের নিভৃত-কক্ষে প্রবেশ করতে পেরেছেন! সেখানে সে স্বাধীন, সেখানে সে স্বার্থপর। সেই একলার জগতে সে প্রজাহীন সম্রাট।

তাহলে কেন মালব্যজীকে সে তার গোপন চেম্বারে প্রবেশ করতে দেবে?

রামচন্দ্রের ওপর চৌদ্দ বছরের বনবাসের শাস্তি বিধান দেওয়া হয়েছিল। সঙ্গে ছিল সীতা আর লক্ষ্মণ। রামায়ণের যুগ থেকে এ-কাহিনী সকলেরই জানা আছে। কিন্তু কারো কি জানা আছে সেই সময়কার রামচন্দ্রের নিঃসঙ্গ মানসিকতার খবর?

সে-খবর তুলসীদাসের রামচরিতমানসেও লেখা নেই, কৃত্তিবাসের রামায়ণেও লেখা নেই, লেখা নেই বাল্মীকির সংস্কৃত রামায়ণেও।

রামচন্দ্রের মনের কথা জানা ছিল একমাত্র রামচন্দ্রেরই। তাঁর মনের চেম্বারে ঢুকবে এমন মানুষ কেউ-ই ছিল না। চৌদ্দ বছরের বনবাসের সময়েও সীতা রামচন্দ্রকে চিনতে পারেননি। চিনতে পারলে রাম-রাবণে যুদ্ধও হতো না, সীতা-হরণও হতো না, সীতার পাতাল-প্রবেশও হতো না। তার ফলে রামায়ণের গল্পও অন্য রকম লেখা হতো!

সন্দীপকে যেমন বিশাখা বুঝতে পারতো না, তেমনি তার মা'ও ছেলেকে বুঝতে পারতো না।

নার্সিং-হোম থেকে বাড়ি যাওয়ার পর মা'ও বলতো—কীরে, তোর চেহারা এমন হয়ে গেল কেন? ভাবনায়? অতো ভাবিস'নে তুই। যা হওয়ার তা তো হবেই। শুধু ভেবে ভেবে শরীর নষ্ট করে লাভ কী? বিধির বিধান তো কেউ খণ্ডাতে পারবে না।

সন্দীপ বলতো—বিধির যে কী বিধান তাই জানতেই তো ভেবে ভেবে মরছি—

মা বলতো—তা যদি কেউ জানতো তাহলে তো পৃথিবী উল্টিয়ে যেতো রে! যখন হাজার চেষ্টা করলেও তা জানা যাবে না তখন ভাবা ছেড়ে দে—

সন্দীপ বলতো—তা যদি পারতুম মা তাহলে কি আমার এই অসুখ হতো! না আমি ভালো চাকরি পাবার পরও তোমাকে এই বুড়ো বয়েসে এত কষ্ট করতে হতো! আমি তো তোমাকে এতটুকু আরামও দিতে পারলুম না—

মা বলতো—ওরে আমার কথা ভাবা তুই ছেড়ে দে। আমার তো তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে। আমি তো যেতে পারলেই বাঁচি! তুই আমার কথা ভাবিসনি—

সন্দীপ বলতো—তুমি ও-রকম কথা বোল না মা। তোমরা জানো না মা যে তোমার কথা ভেবে ভেবে রাত্তিরে আমার ঘুমও আসে না। নার্সিং-হোমে শুয়ে শুয়েও কেবল তোমার কথাই আমি ভাবতুম। আমি কেবল ভাবি কেন আমি তোমার ছেলে হয়ে তোমাকে একটু শান্তি দিতে পারলুম না—

মা বলতো—এত বয়েস হলো তোর, তবু দেখছি তোর পাগলামি গেল না। তুই দেখছি এখনও সেই আমার কোলের ছেলে হয়ে আছিস—

সন্দীপ বলতো—আমি চিরকাল তোমার সেই কোলের ছেলে হয়েই থাকতে চাই মা, আমি আর বড়ো হতে চাই না।

মা বলতো—কী যে বলিস তুই তার ঠিক নেই। তুই চিরকাল আমার কোলের ছেলে হয়ে থাকতে চাইলে কী হবে, আমাকে তো একদিন মরে যেতেই হবে। তুই কি মনে করিস আমি চিরকাল বেঁচে থাকবো? দূর পাগলা ছেলে! মা-বাপ কি কারো চিরকাল বেঁচে থাকে, না বেঁচে থাকা উচিত!

সন্দীপ বলতো—না মা, ও-কথা তুমি বোল না। আমার বাবা মারা গেছে যাক, কিন্তু তুমি চিরকাল বেঁচে থেকো মা। তুমি মরে গেলে আমি কাকে নিয়ে থাকবো, কে আমাকে দেখবে, কে আমার কথা ভাববে? তুমি চিরকাল বেঁচে থেকো মা, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি চিরকাল বেঁচে থেকো—

মা হাসতো—তুই দেখছি একটা আস্ত পাগল! তুই একদিন বিয়ে করবি না? চিরকাল তুই এই-রকম আইবুড়ো হয়ে থাকবি নাকি? তোরও যে একদিন সংসার হবে রে, তোরও একদিন বিয়ে দিয়ে আমি বউকে আনবো—আমার কত দিনের সাধ।

নার্সিং-হোম থেকে ফিরে আসার পর মা'র সঙ্গে ছেলের এই সব কথা প্রায়ই হতো। বহুকাল পরে ছেলে মা'র কাছাকাছি রয়েছে। এ-রকম সুযোগ তো আগে কখনও আসেনি। ছোটবেলাতেই পরমেশ-ঠাকুরপোর কাছে চলে গিয়েছিল খোকা। তখন থেকে চাটুজ্জেবাবুরাই তাদের বাড়ির একজন করে নিয়েছিল মাকে। যদিই বা কখনও ছেলে বেড়াপোতাতে আসতো তো সেও একদিন বা এক রাতের জন্যে। এসেই একেবারে তার পরদিনই আবার কলকাতায় ফিরে যেত। তাই-ই ছিল খোকার তখনকার জীবন-যাত্রার নিয়ম।

তারপর মা চাটুজ্জে-বাবুদের বাড়ির কাজ ছেড়ে দিয়েছে। ছেলেও বেড়াপোতায় থেকে রোজ কলকাতায় চাকরি করতে যাচ্ছে। এর চেয়ে বড়ো সুখ আর কী-ই বা হতে পারে মানুষের!

কিন্ত হঠাৎ যে কী হলো! সমস্ত কিছু যেন এক নিমেষে ওলোট-পালোট হয়ে গেল। বিশাখাকে অনেক দিন কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল কিনা জেলখানায়।

তাও যদি বা খুঁজে পাওয়া গেল তখন হলো তার মায়ের অসুখ। আর সে এমন এক অসুখ যাকে রাজ-রোগ বললেই ঠিক বলা হয়। রাজ-রোগই তো! ও-সব রোগ রাজা-রাজড়াদের ঘরেই মানায়। কুড়ি হাজার টাকা খরচ করলেও ও-রোগ সারতেও পারে আবার না-সারতেও পারে।

—বিশাখা কোথায় মা?

মা বলতো—সেও তোর জন্যে ভেবে ভেবে ভেঙে পড়েছে রে! পাশের ঘরে শুয়ে পড়ে রয়েছে।

সন্দীপ বললে—নার্সিং-হোমের নার্সদের কাছে শুনলুম আমার যতোদিন জ্ঞান

হয়নি, ততোদিন বিশাখাও নাকি খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল।

মা বললে—যতোদিন তোর খবর পাওয়া যায়নি, ততোদিন খুব ছটফট করছিল। যেদিন তোর ব্যাংকের ম্যানেজারের চিঠি এলো সেদিন সঙ্গে সঙ্গে তোকে দেখবার জন্যে এক-কাপড়ে সকালের ট্রেনে কলকাতায় চলে গেল। আমাদের কারো কথা শুনলে না—

সন্দীপ বললে—তোমরা কেউ ওকে বাধা দিতে পারলে না? ও-ও যদি অসুখে পড়ে যেত তাহলে কী হতো বলো দিকিনি? তখন যে উল্টো উৎপত্তি হয়ে যেতো—

মা বললে—আমি ওই মেয়েকে আটকাবো? ওই রকম জেদী মেয়েকে বাধা দেওয়া কি আমার কাজ। ও কি কারো কথা শোনবার মতো মেয়ে? তুই ওকে চিনিস নে?

সন্দীপ বললে—তাই তো আমি ভাবছি মা। শেষকালে যদি আবার কলকাতায় গিয়ে সেই সব নেশাখোরদের পাল্লায় পড়তো। ভগবান আমাকে খুব জোর বাঁচিয়ে দিয়েছে। তাদের খপ্পরে পড়লে তখন কে ওকে বাঁচাতো? আমি একলা মানুষ, আর কতোদিকে দেখবো?

একটু থেমে সন্দীপ বললে—এত দিন কে বাজার করতো মা তোমাদের?

মা বললে—ওই কমলার মা, আর কে করবে?

সন্দীপ বললে—আর রান্না-বান্না?

মা বললে—আমি একলাই যা-পারি করতাম! রান্না করতে আমার কষ্ট হয় না। সারা জীবন তো ওই একটা কাজই করে এসেছি। তোর জন্যেই কেবল সারা দিন-রাত ভেবেছি আর ভগবানকে ডেকেছি। সে-সব যে কী দিন গেছে আমার, তা কেবল আমিই জানি আর ভগবান জানে।

তারপর আবার বললে—যাই, তোর দুধটা আনি। দুধ খাবার সময় হয়েছে তোর—

সন্দীপ বললে—না, তুমি বোস আমার কাছে, আমি দুধ খাবো না—

—ও মা, দুধ খাবিনে কেন? দুধে কী দোষ করলো?

সন্দীপ বললে—তার চেয়ে তুমি আমার পাশে একটু বোস মা, তোমার সঙ্গে একটু গল্প করতে পারলেই আমি শীগগির ভালো হয়ে উঠবো। তুমি ছোটবেলায় আমাকে পাশে শুইয়ে তখন কতো গল্প করতে, তা তোমার মনে আছে মা?

মা বললে—ওরে, সে-সব দিনের কথা ছেড়ে দে। তখন তুইও কতো ছোট ছিলি, আর দিন-কালও তখন অন্য রকম ছিল। তখন ভাবতুম তুই বড়ো হলে আমার সব দুঃখ ঘুচবে। কিন্তু মানুষ ভাবে এক আর হয় অন্যরকম--

বলে ঘরের বাইরে বেরিয়ে গিয়ে বাটিতে করে দুধ নিয়ে এল। বললে—এই নে, এটা খেয়ে নে—

এবার সন্দীপ আর দুধ খেতে আপত্তি করলে না। মা কাপড়ের আঁচল দিয়ে সন্দীপের মুখটা মুছিয়ে দিলে। সন্দীপ বললে--দেখ মা, টাকার অভাবে আমি তোমাকে একটু দুধ খেতে দিতে পারি না, আর স্বার্থপরের মতো আমি দুধ খাচ্ছি—

মা বললে--তুই থাম্, তোর যতো অলুক্ষণে কথা। তুই মাথার ঘাম ফেলে টাকা রোজগার করছিস, আর তোকে উপোষী রেখে আমি দুধ খাবো? কোনও মা কি তা পারে? আর যদি কখনো ও-কথা মুখে আনিস তো দেখবি—

সন্দীপ মা'র হাত দুটো খপ করে ধরে ফেললে। বললে—না মা, তুমি যেও না, আমার কাছে একটু বোস—

মা বলে উঠলো--এ তো আচ্ছা পাগল দেখছি, আমার কি সংসারে আর কোনও কাজ নেই, তোর কাছে বসে থাকলেই আমার চলবে? হাত ছাড়, ওরে হাত ছেড়ে দে--

হঠাৎ ঘরের ভেতরে ঢুকলো বিশাখা। হাতে এক গেলাস জল!

মা বললে—ওমা, তুমি আবার কষ্ট করে এলে কেন? আমি তো আছি। এই

খোকাকে একটু দুধ খাইয়ে দিয়ে গেলাম—

বিশাখা বললে—এখন সন্দীপের ওষুধ খাওয়ার সময় হয়েছে যে—ওষুধ এনেছি—

মা বললে—আমাকে বললেই হতো, তোমারও তো শরীর খারাপ, তুমি আবার কষ্ট করতে গেলে কেন?

বিশাখা বললে—আমার আর কী কষ্ট মাসিমা।

মা বললে—দাও দাও. আমাকে ওষুধটা আর জলের গেলাসটা দাও, আমি ওষুধ খাইয়ে দিচ্ছি। তুমি শুয়ে ছিলে শুয়ে থাকো গিয়ে—

বিশাখা একটু ম্লান হাসি হাসলো। বললে—না না, আমি ভালো হয়ে গিয়েছি। আমার জন্যে আপনি ভাববেন না—

বলে সন্দীপের কাছে এসে ওষুধের বড়িটা এগিয়ে দিয়ে বললে—নাও, হাঁ করো—

সন্দীপ অন্যদিনের মতো হাঁ করতেই বিশাখা বড়িটা মুখের মধ্যে ফেলে দিলে। তারপর জলের গেলাসটা সন্দীপের দিকে বাড়িয়ে দিলে।

সন্দীপ জলটা খেয়ে নিয়ে বললে—কাল থেকে আর ওষুধ দিও না আমাকে—

বিশাখা বললে—কেন, ওষুধ খাবে না কেন?

মা-ও জিজ্ঞেস করলে—কেন রে. ওষুধ খাবি না কেন?

সন্দীপ বললে—আমি এখন ভালো হয়ে গিয়েছি, আর কতোদিন ওষুধ খাবো?

বিশাখা বললে—শুনেছেন মাসিমা. আপনার ছেলে কী বলছে?

মাও সন্দীপের দিকে চেয়ে বললে—কোথায় তুই ভালো হয়েছিস? তুই নিজে তো দেখতে পাচ্ছিস না তুই কতো রোগা হয়ে গিয়েছিস!

সন্দীপ বললে—আর কতো দিন ওষুধ খাবো? আর কতো দিন শুয়ে থাকবো? চিরকাল শুয়ে থেকে থেকে শুধু ওষুধ খেলেই চলবে? আপিসে তো আমার মাইনে কাটা যাচ্ছে। কী করে সংসার চলবে? আসছে মাসে তো হাতে কিছু মাইনেই পাবো না। তখন কী করে চলবে সেটা তো আমাকেই ভাবতে হবে। আমি ছাড়া আর কে ভাববে তা?

কথা বলতে বলতে সন্দীপ বড় ক্লান্ত হয়ে পড়তো।

বিশাখা বললে—মাসিমা. আপনার ছেলেকে কথা একটু কম বলতে বলুন না।

মা বললে—আমি বললেই কি খোকা শুনবে?

বিশাখা বললে—আসবার সময়ে ডাক্তারবাবু আমাকে বার-বার বলে দিয়েছেন. রোগী যেন বেশি কথা না বলে। আমরাও যেন ওর সঙ্গে যতোটা সম্ভব একটু কম কথা বলি।

মা বললে—ও-কথা তো আমিও বলি ওকে। কিন্তু ও কি আমার কথা শুনবে?

সন্দীপ বললে—কথা কি সাধ করে বলি? বলি তোমাদের সকলের কথা ভেবে!

মা বললে—আমাদের কথা তোকে ভাবতে হবে না। আমরা মরি-বাঁচি সে আমরা বুঝবো! আর কপালে যা আছে তা তো আর কেউ খণ্ডাতে পারবে না, তুই তো হাজার ভেবেও তার কিছু সরাহা করতে পারবি না—

সন্দীপ বললে—তা-ই যদি হয় তাহলে বিশাখা কেন তাড়াতাড়ি কলকাতার নার্সিং-হোমে গিয়ে তিন-দিন তিন-রাত অমন না-খেয়ে না-ঘুমিয়ে পড়ে রইলো? আর এখন যদি ওর কিছু অসুখ-বিসুখ হয়, তাহলে সেই তো আমাকেই ওষুধ-ডাক্তারের ঝামেলা পোয়াতে হবে। তার বেলায় তো আর কেউ সাহায্য করবারও নেই বাড়িতে—

বিশাখা বললে—চলুন. আমরা ঘরের বাইরে চলে যাই। আমরা থাকলেই আপনার খোকা কেবল ওই সব আবোল-তাবোল কথা বলবে আর নিজের শরীর আরো খারাপ করবে—চলুন চলুন—

বলে সে মাসিমাকে নিয়ে ঘরের বাইরে চলে গেল।

কথা না-হয় সে না-ই বললে, কিন্তু মন? মনকে কী বলে চুপ করাবে সে? মানুষের মনের তো বিশ্রাম হয় না। যতক্ষণ না কারো ঘুম আসে ততক্ষণ সে তাকে জ্বালায়। অতীত বর্তমান ভবিষ্যতের ভাবনা নিয়ে সে নিজের সঙ্গে কেবল কথা বলে চলে! নিজের মনের হাত দিয়ে সে যা গড়ে, নিজের মনের পা দিয়ে সে তা ভাঙে। আর যারা মন-সর্বস্ব মানুষ তারাই সংসারে সবচেয়ে দুঃখী মানুষ। তাদের শান্তি দেবে এমন বিধাতাপুরুষের সৃষ্টি কে করবে?

এমনি করে আস্তে আস্তে সন্দীপ ওষুধে-সেবায়-বিশ্রামে একটু একটু করে সেরে উঠছিল। তখন আর বেশি অফিস-কামাই করা চলে না। কামাই করলে পরের মাসে সকলকেই উপোষ করতে হবে। মা প্রথমে একটু ভয় পেয়েছিল। বলেছিল—এখনই যাবি? আরো কিছুদিন বিশ্রাম নিলে পারতিস! তাহলে শরীরটা পুরোপুরি সারতো!

সন্দীপ বলেছিল—একমাসের ছুটি নিয়েছিলুম প্রথমে. তার ওপর আরো একমাস বাড়িয়ে নিলুম। আর ছুটি নিলে তোমাদের সকলকে নিয়ে উপোষ করতে হবে।

শেষকালে মা আর কী বলবে! মনে মনে ঠাকুরকে ডাকতে লাগলো। কথাটা বিশাখাও শুনলো। মাসিমার কানেও গেল কথাটা। মাসিমা সারা দিন রাত শুয়ে শুয়েই কাটাতো। অফিসে যাওয়ার আগে মাসিমা সন্দীপকে ডেকে পাঠালো।

সন্দীপ মাসিমার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। জিজ্ঞেস করলে—আমাকে ডেকেছেন?

মাসিমা বললে—হ্যাঁ বাবা, আজ তুমি অফিসে যাচ্ছো?

সন্দীপ বললে—হ্যাঁ মাসিমা, আর কতোদিন কামাই করবো! ছুটির মেয়াদ যে ফুরিয়ে গিয়েছে!

মাসিমা বললে—যাও বাবা, আপিসে যাও. আপিস থেকে এসে আমাকে যদি দেখতে না পাও, তাই শেষ দেখা দেখবার জন্যে তোমাকে একবার ডেকে পাঠিয়েছি—

সন্দীপ বললে—ও-কথা বলবেন না মাসিমা. আপনি বেঁচে থাকবেন। নিশ্চয় বেঁচে থাকবেন। আমি আপনাকে বাঁচিয়ে রাখবো! আপনি কিছু ভাববেন না—

মাসিমা বললে—আমার আর বাঁচতে ইচ্ছে নেই বাবা। যেদিন তোমার মেসোমশাই আমাকে ছেড়ে চলে গেলেন সেইদিন থেকেই আমি জেনে গেছি যে আমার কপালে আর জীবনে সুখ নেই—

বলতে বলতে তিনি কাঁদতে লাগলেন। তখন মাসিমার কাছে গিয়ে কিছু কথা বললেই তিনি কেঁদে ভাসিয়ে দিতেন। আর সন্দীপও তাঁকে সান্ত্বনা দিত. স্তোকবাক্য শোনাতো। সান্ত্বনা আর স্তোকবাক্য ছাড়া সন্দীপের আর দেবার মতো কিছু ছিলও না।

সেদিন কিন্তু মাসিমা এক আজব কাণ্ড করে বসলেন। বললেন—তোমার ওই মন-রাখা কথায় আর আমি ভুলছিনে বাবা, আজ পাকা কথা না দিলে আর আমি তোমাকে ছাড়ছি নে। তুমি আজ কথা দাও বাবা যে তুমি আমার বিশাখার ভার নেবে—

সন্দীপ বললে— সে-ভার তো আমি আপনি না বলতেই নিয়েছি—

মাসিমা বললেন— সে-রকম ভার নেওয়া নয় বাবা. বলো তুমি আমার বিশাখাকে বিয়ে করবে। তুমি কথা না দিলে আমি আজ তোমাকে ছাড়বো না বাবা. আমি আজ আর তোমায় ছাড়বো না—

অসুখ হলে মানুষ বোধহয় এমনই অবুঝ হয়ে যায়। সন্দীপ বললে—কিন্তু এখন তো আমি সবে অসুখ থেকে উঠলুম মাসিমা। এখন আগে অফিসে যাই. সেখানে গিয়ে দেখি অফিসের কি হাল : আমি পরে আপনাকে কথা দেব'খন—

মাসিমার সেই একই গোঁ। বললেন—না-না বাবা, আমি তোমার ওই মুখ-রাখা

কথায় আর ভুলছিনে। তোমায় এখনই কথা দিতে হবে. আমার সামনে দাঁড়িয়ে কথা দিতে হবে--

ততক্ষণে গোলমাল শুনে মাও ঘরের ভেতরে এসে দাঁড়িয়েছে।

—কি রে, দিদি কি বলছে?

মাসিমা তখনও সন্দীপের হাত দুটো ধরে রেখেছেন। বলছেন--দাও বাবা, কথা দাও যে তুমি আমার বিশাখাকে বিয়ে করবে। কথা দাও--

সে এক কাণ্ড চলেছে তখন ঘরের ভেতরে। এক পক্ষ জিদ ধরেছে তার মেয়েকে বিয়ে করতে. আর এক পক্ষ তখন সমানে স্তোক-বাক্য দিয়ে চলেছে।

সেই রকম অবস্থায় মা বললে--দিদি, এখন আর ওকে আটকে রেখো না, ও আজ প্রথম অসুখ থেকে উঠে আপিসে যাচ্ছে. আর দেরি হলে ট্রেন ফেল করবে। ওকে এখন ছেড়ে দাও দিদি, আপিস থেকে এলে যা বলবার ওকে বোল। এখন ছেড়ে দাও ওকে. ও বোধহয় ট্রেন ফেল করবে—

তখন বোধহয় মাসিমা একটু নরম হলেন। সন্দীপের হাত দুটো ছেড়ে দিতেই সে ঊর্ধ্বশ্বাসে স্টেশনের দিকে দৌড়লো।

মা তবু দরজা পর্যন্ত এগিয়ে এসে সাবধান করে দিয়ে বললে--ওরে. অতো দৌড়সনি রে. অসুখ থেকে সবে উঠেছিস। এখন একটু সাবধানে আস্তে আস্তে পা ফেলে যা বাবা--আস্তে আস্তে—

যতোদূর দেখতে পাওয়া গেল ততোদূর মা ছেলের পথের দিকে চেয়ে রইল এক-দৃষ্টে। তারপর যখন সন্দীপ চোখের আড়ালে চলে গেল তখন চোখ দুটো বুজিয়ে দুটো হাত জোড় করে অদৃশ্য দেবতাকে উদ্দেশ্য করে মনে মনে প্রাণের প্রার্থনাটা জানিয়ে দিলে। বললে- মা. তুমি আমার খোকাকে একটু দেখো, আমার খোকাকে একটু দেখো মা তুমি--ওর কেউ নেই, তুমি একটু দেখো ওকে—

ট্রেনে যেতে যেতেও সন্দীপের মনে পড়তে লাগলো মাসিমার কথাগুলো। শুধু মাসিমার কথা নয়। সকলের কথাই তার মনে পড়তে লাগলো। এই তার একটা দোষ। সব সময়ে পরের কথা কেন সে ভাবে? সেই তপেশ গাঙ্গুলী. সেই ঠাকমা-মণি. সেই মুক্তিপদ মুখার্জি. সেই সৌম্যপদ, সেই গোপাল হাজরা, সেই মাসিমা. সেই বিশাখা— সবাই কেন তাকে এমন করে ভাবায়? অথচ তার নিজের কথা ভাববার কেউ-ই নেই। আছে কেবল তার মা। অথচ সেই মাকেও সে সুখী করতে পারলে না। চাকরি পাওয়ার আগেও তা সে পারেনি. চাকরি পাওয়ার পরেও না।

এই সব কথা ভাবতে ভাবতে নানা চিন্তা তার মাথায় ঢোকে। মাথায় ঢোকে মানুষের কথা। মানুষের জন্ম কেন হয়। মানুষ জন্মের আগে কোথায় ছিল. কেন কোন কাজ করতে সে পৃথিবীতে এসেছে. মৃত্যুর পরে সে কোথায় যাবে?

সন্দীপ ছাড়া আগে আর কেউ কি এ-সব কথা ভেবেছে?

হ্যাঁ ভেবেছে। বহুদিন আগে সন্দীপ টমাস কার্লাইলের লেখা একটা কবিতা পড়ে-ছিল. তখন সে দেখলে কার্লাইল সাহেবও এই নিয়ে একটু ভেবেছিলেন। সেই কবিতার কয়েকটা লাইন তার তখনও মনে ছিল। লাইন কটা হচ্ছেঃ

What is Man? A foolish baby,
Daily strives, and fights, and frets
Demanding all, deserving nothing
One small grave is what he gets.

মানুষের মতো নির্বোধ শিশু আর নেই। দিনরাত কেবল ঝগড়া করে. কেবল মারামারি করে. কেবল রাগ করে। অত ঝগড়া মারামারির আর রাগ করবার কারণটা কি?

কারণটা হলো তা যোগ্যতা থাক আর না থাক, তার সব কিছু চাই। তার বদলে সে কি পায়? পায় শুধু তিন হাত মাপের একটা কবর। আর কিছু নয়।

অফিসে যাওয়ার পরেই মালব্যজী যখন খবর পেয়ে গেলেন যে সন্দীপ অফিসে এসেছে তখনই তিনি তাকে নিজের ঘরে ডেকে পাঠালেন। আর সন্দীপ তাঁর ঘরে যেতেই অনেক কথা বলতে আরম্ভ করলেন। বিশেষ করে বলতে লাগলেন বিশাখার কথা। তিনি যতোক্ষণ কথা বলতে লাগলেন ততোক্ষণ সন্দীপ চুপ করে বসে রইলো। সেদিন যদি হঠাৎ টেলিফোনে কলটা না আসতো তাহলে বিশাখার কথা আরো অনেকক্ষণ চলতো।

ম্যানেজার সাহেবের ঘর থেকে বেরিয়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গে সারা অফিসের সবাই সন্দীপের সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়লো।

সবারই এক প্রশ্ন। সাহেব এতক্ষণ ধরে সন্দীপকে কি কথা বলছিল। নিজের কাজ ক্ষতি করে সাহেব তো অন্য কারো সঙ্গে এমন করে কথা বলে না। তাহলে...?

সন্দীপ প্রশ্নগুলো এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করলে। কিন্তু তারাও নাছোড়-বান্দা।

বললে—বলো না সন্দীপদা, এমন কি কথা ছিল তোমার সঙ্গে?

একদিকে সন্দীপও তা বলবে না, আর অন্যদিকে তারাও তাকে ছাড়বে না।

ব্যাঙ্কের কাজ যেগুলো না করলে নয় তা করতে হবেই। তারই ফাঁকে ফাঁকে চললো জেরা। জেরায় জেরায় একেবারে জেরবার হয়ে গেল সন্দীপ। তবু সে মুখ খুললো না। সবাই ঠিক করলে ছুটির আগে যখন একটু হাত-খালি হবে তখন তারা অক্ষৌহিনী সেনার মতো সন্দীপকে ঘিরে ধরবে, ঘেরাও করবে।

কিন্তু তাদের সব সংকল্প, সব প্ল্যান ভেস্তে গেল।

ছুটির একঘণ্টা আগে হঠাৎ আবার মালব্যজী সন্দীপকে ডেকে পাঠালেন।

মালব্যজী সন্দীপকে ডেকে বললেন—বোস, তখন আমাদের কথায় বাধা পড়লো টেলিফোনটা এসে। এখন বলো তুমি কি করবে? তুমি কি ওই মেয়েটিকে বিয়ে করতে পারবে?

সন্দীপ বললে—আমি তো তা নিয়ে ভাববার সময়ই পাইনি এতদিন—

—আর কবে ভাববে? তোমার বয়েসও বাড়ছে, তোমার ওই বিশাখার বয়েসও বাড়ছে। আমি তো মেয়েটিকে ক'দিন দেখলুম। আমার মনে হলো এ যুগে অমন মেয়ে দুর্লভ। আর যখন লেখাপড়াও জানে!

সন্দীপ বললে—কিন্তু বিয়ে করলে আমি সংসার চালাবো কি করে? আমি কতো মাইনে পাই তা তো আপনি জানেন। তার ওপর ওর মা'র অসুখ। তার চিকিৎসার জন্যে ডাক্তার কুড়ি হাজার টাকা খরচের লিস্ট দিয়েছে। সে-সব খরচ আমি চালাবো কি করে? অবশ্য আমার নিজের বাড়ি ভাড়া লাগে না—

মালব্যজী একটু ভেবে বললেন—আমি যদি তোমার মাইনে বাড়িয়ে দিই?

—তা আপনি কি করে মাইনে বাড়াবেন?

মালব্যজী বললেন—সে আমার ব্যাপার, আমি বুঝবো। মাইনে বাড়ালে তুমি বিয়ে করবে কিনা তাই বলো।

সন্দীপ তখনও একটু দ্বিধা করতে লাগলো। সকালবেলাই মাসিমা এই একই ব্যাপারে জিদ ধরেছিল। বিশাখাকে বিয়ে করবার জন্যে সন্দীপের কাছে পাকা কথা আদায় করতে চেষ্টা করেছিল। তখনও সে কিছু কইতে দিতে পারেনি। মা ঘরে ঢুকেছিল বলে কোনো রকমে সে এড়িয়ে চলে আসতে পেরেছিল। বলতে গেলে সেও তার এক রকম পালিয়ে আসা!

কিন্তু সন্দীপ মালব্যজীকে এড়িয়ে পালাবে কি করে?

মালব্যজী আবার বললেন—বলো, আমার কথার উত্তর দাও। তোমার মাইনে বাড়িয়ে দিলে তুমি কি বিয়ে করতে পারবে?

সন্দীপ বললে—কিন্তু মা'র সঙ্গে কথা না বলে আমি বিয়ে করি কি করে?

—তাহলে মাকে বোল যে আমি তোমার মাইনেটা বাড়িয়ে দেবার ভারটা নিচ্ছি।

সন্দীপ বললে—কিন্তু আমার ওপর আপনার এত কৃপা কেন?

মালব্যজী বললেন—কৃপাটা তোমার ওপরে নয়, কৃপাটা ওই মেয়েটির ওপর। ওই মেয়েটির সঙ্গে কথা বলে আমার ধারণা হয়েছে যে একে বিয়ে না করে যদি অন্য কোনো মেয়েকে বিয়ে করো, তাহলে তুমি ঠকবে। তোমার ভালোর জন্যেই বলছি, তুমি এই বিশাখাকে বিয়ে করো।

সন্দীপ বললে—কিন্তু আপনি আমার মাইনে কি করে বাড়িয়ে দেবেন?

মালব্যজী বললে—তোমাকে একটা কনফিডেনসিয়াল কথা বলছি, কাউকে এখন কথাটা বোল না। খুব শীগ্‌গিরই আমাদের ব্যাঙ্কের একটা নতুন ব্রাঞ্চ খোলা হচ্ছে। আমি তোমাকে সে ব্রাঞ্চের ম্যানেজার করে দিতে পারি। সে ক্ষমতা আমার আছে। এখন তুমি বলো তুমি ওই মেয়েটিকে বিয়ে করবে?

বিয়ে! বিয়ের দিনই সেই দুর্ঘটনাটা ঘটলো। সারা পৃথিবী জুড়ে প্রতিদিন কোটি-কোটি বিয়ে সম্পন্ন হচ্ছে। তুমি যে কোনও দেশের লোকই হও, আর যে কোনও ধর্মের লোকই হও, বিয়ে করার ব্যাপারে কোথাও কোনও নিষেধাজ্ঞা নেই। আদিবাসী, তথাকথিত অশিক্ষিত মানুষদের মধ্যেও বিবাহ-বিধি প্রচলিত আছে।

সন্দীপের তখন প্রমোশন হয়েছে। হাওড়ায় তাদের ব্যাঙ্কের নতুন ব্রাঞ্চের সে এখন ম্যানেজার। এত লোক থাকতে তাকেই ম্যানেজার করা হয়েছে। এতে গাত্র-দাহ হয়েছে অনেক সহকর্মীদের মধ্যে। ওটা স্বাভাবিক। বিশেষ করে বাঙালীদের মধ্যে।

পরেশদা বলেছে—সন্দীপ যে ডুবে ডুবে জল খেত তা তো টের পাইনি কখনও—

কিন্তু বাইরে মুখ ফুটে কিছু বলবার উপায় নেই কারো। কারণ এই প্রমোশনের জন্যে যথারীতি পরীক্ষা হয়েছে। যারা যারা দরখাস্ত করেছিল, তারা সকলেই পরীক্ষা দিয়েছিল নিয়মমাফিক। কেউ বলতে পারবে না যে কারো ওপর কোনও পক্ষপাতিত্ব করা হয়েছে। পরীক্ষায় প্রথম হওয়া গৌরব হয়েছে একমাত্র সন্দীপের। এ সন্দীপের জীবনে একটা উল্লেখযোগ্য অধ্যায়।

নতুন ব্রাঞ্চের ম্যানেজার হওয়া মানে মাইনে বাড়া। পাওনা মাইনের ওপর প্রায় দু'হাজার টাকা আরো উপরি আয়। মা বললে—এইবার একটা বিয়ে কর বাবা তুই—

সন্দীপ বললে—কিন্তু মাসিমার চিকিৎসা? তাতে যে কুড়ি হাজার টাকা খরচ হবে! সেটা এখন কোথা থেকে আসবে?

মাসিমা বললে—না বাবা, আমার চিকিৎসা এখন থাক। বিশাখার বিয়েটা হয়ে গেলে আমার মরে যেতেও কোনও দুঃখু নেই।

তারপর একটু থেমে আবার বললে—বিশাখার যদি বিয়েটাই না হলো তাহলে আমার রোগ ভালো হয়ে কী লাভ হবে? আমার অসুখের জন্যে তোমার তো গণ্ডা-গণ্ডা পয়সা খরচা হয়ে যাচ্ছে। শুয়ে শুয়ে তো আমি সবই দেখতে পাচ্ছি। আমার কপালে যদি সুখই থাকবে তো বিশাখার বাবা অমন করে মারা যাবেই বা কেন?

কথাগুলো বলতে বলতে মাসিমা কেঁদে ফেলতো। সে কান্না তখন থেকে আর থামতেই চাইতো না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা এক নাগাড়ে চলত সেই কান্না।

মা'র কাছে এখন মাসিমার ওই কান্না গা-সওয়া হয়ে গিয়েছিল। যে মানুষ নিত্য রোগী তার সেবাতে মানুষ এক সময়ে ঢিলেই দেয়।

আর যার সঙ্গে বিয়ে হওয়ার কথা? সেই বিশাখা?

সেই বিশাখা যেন পাথর হয়ে গিয়েছে।

একদিন খাওয়ার সময় সন্দীপ বিশাখাকে ডাকলে—শোন বিশাখা।

বিশাখা তখন সংসারের কাজকর্মেই বেশি ব্যস্ত থাকতো। সন্দীপের ডাক শুনে দাঁড়ালো। বললে—কিছু বলবে?

সন্দীপ বললে—তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা ছিল—

—কী কথা?

সন্দীপ বললে—আমাদের বিয়ের কথা—

বিশাখা বললে—সে কথা শুনতে তো অনেক সময়ের দরকার। এখন তো তুমি অফিসে যাচ্ছো, এখন তো তোমারও কথা বলবার সময় নেই—

—তা কখন তুমি শুনবে? কখন তোমার সময় হবে?

বিশাখা বললে: তুমি যা বলবে তা আমার জানা আছে।

—কী জানো, বলো দিকিনি?

বিশাখা বললে—তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করবে, এ বিয়েতে আমার মত আছে কিনা—

সন্দীপ বললে—তুমি ঠিকই ধরেছ! হিন্দুদের বিয়েতে অবশ্য কনের মতামত নেওয়া হয় না। শুধু পুরুষের মতামতটাই বিচার করা হয়!

বিশাখা বললে—এ-সব আমি জানি।

সন্দীপ বললে—তবু তোমাকে জিজ্ঞেস করছি এই বিয়েতে তোমার অমত নেই তো?

বিশাখা বললে—এ বিয়েতে অমত করবো এমন রাস্তাও তো নেই। তুমি মা'র চিকিৎসার জন্যে হাজার-হাজার টাকা খরচ করবে, আমার সাধ্য কি এতে অমত করি?

সন্দীপ বললে—শুধু ওই কারণেই তুমি আমাকে বিয়ে করতে রাজি হচ্ছো? আর কোনও কারণ নেই?

বিশাখা বললে—না, এ শুধু লেন-দেন-এর ব্যাপার।

সন্দীপ বললে—শুধু লেন-দেন? আর কিছু নয়?

বিশাখা বললে—না।

সন্দীপ বললে—কিন্তু আমাকে বিয়ে না করলেও কিন্তু আমি তোমার মায়ের চিকিৎসার ব্যবস্থা করে যাবো—এমন কোনও বাধ্য-বাধকতা নেই। আমার কাছে আমার মা যা, আমার মাসিমাও তাই।

বিশাখা বললে—তাও আমি জানি!

সন্দীপ বললে—আর শুধু তাই-ই নয়, আমাদের ব্যাঙ্কের কর্তা, যিনি আমাকে চাকরিতে প্রমোশন দিয়েছেন, তাঁর বিশেষ অনুরোধ আমি তোমাকে বিয়ে করি।

বিশাখা জিজ্ঞেস করলে—কেন, আমাদের বিয়েতে তাঁর কী স্বার্থ?

সন্দীপ বললে—তা জানি না, তবে তিনি তোমাকে দেখেছেন।

—আমাকে দেখেছেন তিনি?

সন্দীপ বললে—হ্যাঁ, শুধু দেখেনই নি, তোমার সঙ্গে কথাও বলেছেন।

—কোথায় তিনি দেখেছেন আমাকে?

সন্দীপ বললে—নার্সিং-হোমে, আমি অজ্ঞান হয়ে শুয়ে পড়ে ছিলুম। আর তারপর থেকেই তিনি আমাকে প্রায়ই তাগিদ্ দিতেন তোমাকে বিয়ে করতে। বলতেন—ওকে বিয়ে না করলে শেষকালে তুমি পস্তাবে।

বিশাখা এ কথার কোনও জবাব দিলে না। বললে—তারপর?

সন্দীপ বললে—তারপর যাতে আমার বিয়ের পর আমার আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয়, যাতে আমার আয় বাড়ে, তাই তিনি আমাকে নতুন হাওড়া ব্রাঞ্চের ম্যানেজার করে দিয়েছেন। এই সমস্ত কিছুর মূলে তুমি।

বিশাখা সরাসরি সে কথার জবাব না দিয়ে বলে উঠলো—তোমার কিন্তু অফিসে যাওয়ার দেরি হয়ে যাচ্ছে। তুমি ট্রেন ফেল করবে—

সন্দীপ বললে—এইটাই কি আমার কথার জবাব হলো?

বিশাখা বললে—আমি যদি এ কথার জবাব দিতে যাই তো সত্যিই কিন্তু অফিসে যেতে লেট্ হয়ে যাবে।

সন্দীপ বললে—তোমায় বেশি কথা বলতে হবে না। শুধু 'হ্যাঁ' কিংবা 'না' বলে দিলেই চলবে।

বিশাখা চুপ করে রইল। হঠাৎ মা ঘরে ঢুকে দুজনকে এই অবস্থায় দেখে বললে—কী রে খোকা, এখনও খাওয়া হলো না? শেষকালে ট্রেন ফেল করবি যে!

সন্দীপ বললে—আমি বিশাখাকে জিজ্ঞেস করছিলুম, আমাকে বিয়ে করতে ওর আপত্তি আছে কি না?

মা বললে—এ আবার কী রকম কথা! বিশাখার মনের কথা বুঝতে পারিস না? ও কি সে-রকম মেয়ে যে হাটে দাঁড়িয়ে সকলকে শোনাবে যে ওগো আমাকে তুমি বিয়ে করো। কোনও মেয়ে কি মুখ ফুটে কাউকে এ কথা বলতে পারে?

সন্দীপ আর কী বলবে। তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করে নিলে। তারপর হাত-মুখ ধুয়ে তাড়াহুড়ো করে জামাটা গায়ে দিয়েই রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো। সে যখন ব্যাঙ্কের ম্যানেজার, তখন তার দেরি করে অফিসে গেলে চলে না। অফিসে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে নানারকম আর্জি নিয়ে নানারকম লোক এসে হাজির হয়। সেই যে তার কাজ আরম্ভ হয় সকাল দশটা থেকে তা শেষ হতে যার নাম সন্ধ্যে সাতটা সাড়ে সাতটা। তারপর সবকিছু চাবি বন্ধ করে তবে ছুটি। বাড়ি যাওয়া সেই লাস্ট ট্রেনে। বাড়ির সমস্ত লোক সন্দীপের আসার পথের দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকে।

যখন বাড়িতে এসে পৌঁছোয় তখন ক্লান্তিতে একেবারে বিপর্যস্ত, বিভ্রান্ত।

মা জিজ্ঞেস করে—কী রে, আজকাল তোর আসতে এতো দেরি হয় কেন রে?

সন্দীপ বলে—আমার প্রমোশন হয়েছে, মাইনে বেড়েছে, দেরি হবে না? আমিই যে অফিসের কর্তা। সব কাজকর্ম বুঝিয়ে দিয়ে তবে তো আসবো—

মা জিজ্ঞেস করলে—কিছু খেয়েছিস?

সন্দীপ বললে—না মা, আজকে একটার পর একটা এমন কাজে পড়ে গেল যে খাওয়ার আর সময়ই পেলুম না—

—তাহলে আর কথা নয়, আগে তোর খাবারের যোগাড় করি গে—

বলে বিশাখাকে ডাকলে, বললে—এসো তো মা, আটাটা একটু মেখে দেবে, আমি তাড়াতাড়ি রুটিটা সেঁকে নেব—এসো।
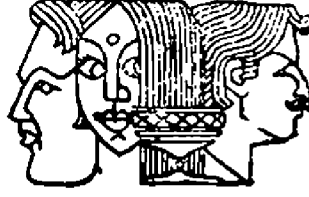
সেদিন ভোরবেলাই ঠাকমা-মণির ঘরে টেলিফোন বেজে উঠলো।

বরাবরের মতো বিন্দুই ধরলে টেলিফোনটা। গলাটা শুনেই ঠাকমা-মণিকে দিলে। বললে—ঠাকমা-মণি, দাদাবাবু টেলিফোন করছে ইন্দোর থেকে—

ঠাকমা-মণি রিসিভারটা হাতে নিয়েই বললে—মুক্তি? কী খবর রে? তুই ভালো আছিস তো?

ওদিক থেকে মুক্তিপদ বললে—সৌম্যর খবর কী?

ঠাকমা-মণি বললে—খবর খুব খারাপ রে—

—কেন? খারাপ কেন?

—তোর এ্যাডভোকেট দাশগুপ্ত বলেছে খোকাকে নাকি বাঁচানো যাবে না।

—কেন?

ঠাকমা-মণি বললে—এভিডেন্স নাকি সৌম্যর বিরুদ্ধে। ও নাকি ঠাণ্ডা মাথায় নিজের বউকে খুন করেছে।

—তাহলে কী হবে?

—সেই জন্যেই দাশগুপ্ত সাহেব বলছিলেন—সৌম্যর বিয়ে দিলে ভালো হয়।

মুক্তিপদ বললে—মিস্টার দাশগুপ্ত কি পাগল নাকি? ফাঁসির আসামীর সংগে কে তার মেয়েকে জেনে-শুনে বিয়ে দেবে?

ঠাকমা-মণি বললেন—দাশগুপ্ত সাহেব বললেন দেবে দেবে। টাকার জন্যে যখন বাপ হয়ে নিজের ছেলেকে খুন করতে পারে, তখন টাকার জন্যে লোকে নিজের মেয়ের সংগে ফাঁসির আসামীরও বিয়ে দিতে রাজি হবে। তিনি এতকাল কোর্টে ওকালতি করছেন আর এইটে তিনি জানবেন না?

মুক্তিপদ এ-কথার জবাবে কী বলবে বুঝতে পারলে না।

ঠাকমা-মণি বললেন—তোদের ইন্দোরে ভালো জ্যোতিষী কেউ আছে?

—জ্যোতিষী আছে কিনা জানি না। কেন? জ্যোতিষী দিয়ে কী হবে?

ঠাকমা-মণি বললেন—এমন একটা আইবুড়ো মেয়ের কুষ্ঠী চাই, যার কপালে বৈধব্য-যোগ নেই!

মুক্তিপদ অবাক হয়ে গেল মা-মণির কথা শুনে। ঠাকমা-মণি আবার বললেন—যদি কোনও ভালো জ্যোতিষী থাকে তো খোঁজ নিয়ে আমাকে জানাস তো।

কথা বলতে বলতেই তিন-মিনিট শেষ হয়ে গিয়েছিল। মুক্তিপদ কলটা আরো তিন-মিনিট বাড়িয়ে নিলে।

ঠাকমা-মণি বললেন—জ্যোতিষীদের কাছে তো অনেক লোক মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে কুষ্ঠী নিয়ে যায়, তেমন কুষ্ঠী থাকলে আমায় জানাস তুই। সে মেয়ে কানা হোক, খোঁড়া হোক, যে কোনো জাত হোক, বামুন হতেই হবে তারও কোনো কথা নেই। মেথরের মেয়ে হলেও চলবে। মোটমাট মেয়ের কুষ্ঠীতে বৈধব্য-যোগ না থাকলেই হলো।

মুক্তিপদ হতবাক হয়ে ঠাকমা-মণির কথাগুলো শুনছিল।

শুধু বললে—তুমিও কি পাগল হয়ে গেলে নাকি মা?

ঠাকমা-মণি বললে—ওরে, পাগল আমি হইনি। পাগল হয়ে গেলে তো বেঁচে

যেতুম রে। এরপর আর বেশিদিন মামলা চললে শেষ পর্যন্ত আমাকে পাগল হয়ে গলায় দড়ি দিয়ে মরতে হবে। তখন আমিও বাঁচবো, তোরাও বাঁচবি!

মুক্তিপদ বলে উঠলো—মা, তুমি ও-রকম করে কথা বলছো কেন?

ঠাকমা-মণি বললেন—তা বলবো না? তুই যদি আমার পেটের ছেলে হয়ে আমাকে এই নরকের মধ্যে একলা ফেলে রেখে চলে যেতে পারিস, তাহলে কার ভরসায় আমি বাঁচবো বল? এই বুড়ো বয়েসে আমার কপালে এত কষ্ট হবে, তা আগে জানতে পারলে কবেই আমি গলায় দড়ি দিতুম, তাহলে আর তোর সঙ্গে এত কথাও বলতে হতো না, তাতে তোরাও বাঁচতিস, আমিও বাঁচতুম—

তারপর প্রসঙ্গ বদলে বললেন—তা যাক গে, তুই একটা জ্যোতিষী দেখিস, এ-দিক থেকে আমিও জ্যোতিষী খুঁজে-খুঁজে বেড়াচ্ছি, দেখি কী হয়!

—তা শুনেছি ভাটপাড়া বলে একটা জায়গা আছে, সেখানে নাকি অনেক জ্যোতিষী-টোতিষী আছে, সেখানেও তো একবার যেতে পারো—

ঠাকমা-মণি বললেন—তা কি আর যেতে বাকি রেখেছি! তারা সবাই-ই কেবল টাকা খসিয়ে নিয়েছে। কেউ কাজের কাজ কিচ্ছু করেনি।

—কাশীতেও তো শুনেছি অনেক জ্যোতিষী আছে। সেখানে তো তোমার গুরুদেব আছেন! সেখানেও সে একবার খোঁজ নিতে পারো!

ঠাকমা-মণি রেগে গেলেন। বললেন—তোর লজ্জা করে না এই বুড়ী মানুষকে হুকুম করতে! তোর মতো সেয়ানা ছেলে থাকতে আমি কিনা এই বয়সে হিল্লী-দিল্লী করে বেড়াবো! তাহলে তোকে আমি পেটে ধরেছিলুম কেন? আমার একটা উপকারও তো তোকে দিয়ে হলো না।

মুক্তিপদ এবার নিজের দুঃখের কথা বলে মাকে ঠান্ডা করতে চাইলে। বললে—মা, তুমি যদি জানতে আমি কতো কষ্টে আছি! আমাকে সাহায্য করবার মতো একটা লোকও নেই, যার ওপর বিশ্বাস করে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি।

ঠাকমা-মণি বললেন—কেন, তোর মাগ্ কোথায় গেল? তুই তো মাগের ভেড়ুয়া। সে থাকতে তোকে দেখবার লোকের অভাব? আর আমার কথা একবার ভাব তো!

—সব বুঝি মা, সব বুঝি। তা না হলে এই ভোরবেলা তোমাকে টেলিফোন করি? আমাকে দেখবার একটা লোকও নেই। মা, একটা লোকও নেই। আমারও অবস্থা ঠিক তোমার মতো। আমারও কেউ নেই—

ঠাকমা-মণি বললেন—কেন? বৌমা কি শুধু বসে বসে ভাত গেলে আর ঘুমোয়!

—না মা, কেবল সিনেমা দেখে মা, কেবল সিনেমা দেখে। প্রত্যেক সপ্তাহে চোদ্দ-পনেরোটা সিনেমা দেখে—

—সে কী রে?

—আর তারপর বাকি সময়টা বিউটি-পার্লারে!

—বিউটি-পার্লার? সেটা আবার কী রে?

মুক্তিপদ বললে—সে তো নিজের হাতে খোঁপা বাঁধে না। 'বিউটি পার্লারে' গিয়ে নিজের খোঁপা বেঁধে আসতে হয়। গা-হাত-পা ডলাই-মালাই করিয়ে আনতে হয়। এখানকার বড়ো বড়ো লোকের বউ-ঝি'রা অনেকেই তাই করে থাকে—

ঠাকমা-মণি বললেন—তার জন্যে তারা টাকা নেয় তো?

—টাকা নেবে না? সেটাই তো তাদের ব্যবসা। রোজ একশো টাকা করে চার্জ করে। আর মা'র দেখাদেখি পিকনিকও তাই ধরেছে এখন—সব মিলিয়ে রোজ দু'শো টাকা খরচ পড়ছে শুধু চুল বাঁধবার জন্যে—

ঠাকমা-মণি ঘটনা শুনে বিরক্ত হয়ে উঠলেন। বললেন—আর বলিসনি, আর

বলিনি। ও শোনাও পাপ...

কথা শেষ হওয়ার আগেই টেলিফোনের লাইনটা খুট্ করে কেটে গেল। ঠাকমা-মণি রিসিভারটা রেখে দিলেন।

সকালবেলায় আগেকার মতো আর গঙ্গাস্নানে যাওয়া হয় না ঠাকমা-মণির। কারণ উকিল-এ্যাডভোকেটদের বাড়ি থেকে ফিরতে এক-একদিন অনেক রাত হয়ে যায়। তারপর ঘুম আসতেও দেরি হয়ে যায় অনেক। আজকাল গৃহদেবতা সিংহবাহিনীর আরতির সময়ও থাকা সম্ভব হয় না। মল্লিক-মশাইকেও সঙ্গে রাখতে হয়।

আর তার ওপর জুটেছে অন্য একটা কাজ। জ্যোতিষীদের সন্ধান করা।

মল্লিক-মশাইএরও কাজ আগের চেয়ে অনেক বেড়ে গেছে। সমস্ত খবরের কাগজে জ্যোতিষীদের যে-সব বিজ্ঞাপন বেরোয়, তা তাঁকে পড়তে হয়। পড়ে ঠিকানাগুলো খাতায় লিখে রাখতে হয়। তারপরে বাইরের ঠিকানা হলে সেই-সেই জ্যোতিষীর কাছে চিঠি-পত্র লিখতে হয়। আর কলকাতার ভেতরে বা কলকাতার আশে-পাশে হলে সেখানে সোজা চলে যেতে হয়। তারপর দর-দাম ঠিক করে ঠাকমা-মণিকে নিয়ে সেখানে যেতে হয়। কোনও জ্যোতিষীর সঙ্গে দেখা করবার সময় করা থাকে সকাল সাড়ে দশটায়, কারো বা সময় করা থাকে সন্ধ্যে সাতটায় কিংবা রাত আটটায়। কারো দক্ষিণা দশ টাকা, কারো বা পঁচিশ টাকা, কারো বা একশো টাকা, দেড়শো টাকা।

প্রশ্ন শুধু একটাই। সেটা হচ্ছে এমন কোনও অবিবাহিতা কন্যা আছে কিনা, যার কোষ্ঠীতে বৈধব্য-যোগ নেই। অর্থাৎ কোষ্ঠীতে লগ্নের সপ্তম-স্থান বা সপ্তম-পতির অবস্থান শুভ-দ্যোতক্। তার সঙ্গে সৌম্যপদর কোষ্ঠী-পত্রও দেখাতে হয় এবং সমস্ত ঘটনাটা বিস্তারিত বলতে হয়।

আবার এদিকে হাতে সময়ও বড়ো কম। চূড়ান্ত দিন ঘনিয়ে আসছে। সৌম্যপদর মাথার ওপর মৃত্যুর খাঁড়া ঝুলছে। যে কোনও সময়ে সেই খাঁড়াটা মাথার ওপরে এসে পড়তে পারে।

সমস্ত জ্যোতিষীরই এক কথা। 'মহা মৃত্যুঞ্জয় কবচ' নাকি এ ব্যাপারে অব্যর্থ। কোনও রকমে পাত্রের হাতে বা গলায় যদি পরিয়ে দেওয়া যায় তো তার ফাঁসির হুকুম রদ করা যাবে। দাম বেশি নয়! মাত্র এক হাজার এক টাকা।

কিন্তু ফাঁসির আসামীকে সে কবচ কে পরাতে যাবে? পরাবেই বা কেমন করে?

আসলে জ্যোতিষীর কাছে যাওয়ার উদ্দেশ্যটা কেউ-ই বুঝতে পারে না।

মল্লিক-মশাই সকলকেই বুঝিয়ে দেন কথাগুলো।

তিনি বলেন—ও-সব মাদুলী বা কবচের জন্যে আমরা কিন্তু আসিনি। আমরা শুধু এমন একজন অবিবাহিতা কন্যার সন্ধান চাই যার কপালে বৈধব্য-যোগ নেই।

অনেকেই কথাগুলো শোনে কিন্তু বিশেষ কোনও সমাধান দিতে পারে না।

তখন আবার যেতে হয় এ্যাডভোকেটের কাছে।

এ্যাডভোকেট দাশগুপ্ত সব শুনে বলেন কিন্তু এটা না হলে তো আমি কিছু করতে পারবো না। আপনারা আরো খুঁজুন। আর যতো তাড়াতাড়ি পারেন খুঁজুন—

মল্লিক-মশাই বাড়িতে এসে ঠাকমা-মণিকে খবরটা দেন। ঠাকমা-মণি কথাটা শুনে চুপ করে খানিকক্ষণ ভাবেন। বলেন—তাহলে কী হবে? আপনি আরো খোঁজ নিন—

মল্লিক-মশাইএরই হয়েছে যতো জ্বালা। এক বিয়ে কি দু' বিয়ে মাটি খোঁড়া সোজা কাজ। কিন্তু ভালো জ্যোতিষী খুঁজে পাওয়া কি সহজ কর্ম?

কলকাতার যতোগুলো জুয়েলারি দোকান আছে, সেখানে গিয়েও খোঁজা গেল। এক-একটা জুয়েলারির দোকানে আট-দশটা করে জ্যোতিষী কোষ্ঠী বিচার করে মানুষের সমস্যার সমাধান করে দেয়। আর দরকার হলে রত্ন-ধারণ করতে উপদেশ দেয়। কাউকে

দেয় হীরে, কাউকে পান্না, কাউকে চুনী। আবার কাউকে মুক্তো। তাতে দোকানের আয় বাড়ে। জ্যোতিষীরাও দু'পয়সা কামায় সেই সঙ্গে।

কলকাতার যতো জ্যোতিষ-প্রতিষ্ঠান আছে, সবগুলোই দেখা হয়ে গেল। কখনও বউবাজার, কখনও শ্যামবাজার, আবার কখনও গড়িয়াহাট অঞ্চল। টাকা যেমন ব্যয় হচ্ছে, ব্যয় হচ্ছে সময়ও। আর বুড়ো মানুষ মল্লিক-মশাই-এর ততো হয়রানি হচ্ছে।

দু'একজন অমন পাত্রীর সন্ধান দেয় বটে, কিন্তু মল্লিক-মশাই সেই ঠিকানায় গিয়ে দেখেন ছ'মাস আগেই সে-পাত্রীর বিয়ের পর্ব চুকে গিয়েছে। তখন শুধু টাকা খরচ আর পরিশ্রমই সার হয়েছে। ঠাকমা-মণিকে এসে প্রতিদিনই অনেকবার রিপোর্ট দিতে হয়। দুপুরে, বিকেলে, সন্ধ্যেবেলা—যা কিছু মল্লিক-মশাই শোনেন, দেখেন, বোঝেন তার পূর্ণ বিবরণ দিয়ে যান ঠাকমা-মণিকে।

সেদিন পেছন থেকে কে একজন তাঁর নাম ধরে ডাকতে লাগলো—ও মল্লিক-মশাই,

মল্লিক-মশাই তখন বাস থেকে নেমে সবে একটা দোকানের দিকে লক্ষ্য রেখে যেতে আরম্ভ করেছেন। হঠাৎ তাঁর নাম ধরে কে ডাকছে দেখতে গিয়ে পেছন ফিরলেন। যে লোকটা তাঁকে ডাকছিল সে তখন তাঁর দিকেই তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে আসছিল।

হঠাৎ আর একটু হলেই লোকটা গাড়ি চাপা পড়ে যেত।

কিন্তু কাছে আসতেও মল্লিক-মশাই তাকে চিনতে পারলেন না। কাছে এসে লোকটা হাঁপাচ্ছিল। মল্লিক-মশাই জিজ্ঞেস করলেন—আমাকে ডাকছেন?

লোকটা বললে—আপনি আমাকে চিনতে পারলেন না ম্যানেজারবাবু?

- কে বলুন তো আপনি? আমি তো ঠিক চিনতে পারলুম না—

লোকটা বললে—আপনিই তো বিডন স্ট্রীটের মুখুজ্জেদের বাড়ির ম্যানেজারবাবু? আমাকে চিনতে পারলেন না আপনি?

মল্লিক-মশাইএর তাড়া ছিল। বললেন—কে বলুন তো আপনি?

লোকটা বললেন—এ কি ম্যানেজারবাবু, এই বুদ্ধি নিয়ে আপনি ম্যানেজার-গিরি করছেন? এত ভুলো মন হলে ম্যানেজারি কাজ চালান কী করে?

মল্লিক-মশাই বললেন—আমার একটু তাড়া আছে...

লোকটা বললে—তাড়া তো সকলেরই আছে মশাই। শুধু একলা আপনারই তাড়া? আর আমার বুঝি তাড়া নেই? আমাদেরও তাড়া আছে ম্যানেজারবাবু, আমাদেরও কাজ-কম্ম করে খেতে হয়। আমাদেরও বাপের জমিদারি-টমিদারি কিছু নেই—

মহা মুশকিল হলো মল্লিক-মশাইএর। বললেন—আমি বুড়ো হয়ে গিয়েছি, আপনাদের বয়েসের তুলনায় আমার বয়েস অনেক বেশি—ভুল তো হবেই—

লোকটা এতক্ষণে বললে—বলি তপেশ গাঙ্গুলীর নামটা মনে পড়ে?

তপেশ গাঙ্গুলী! মল্লিক-মশাই যেন আকাশ থেকে পড়লেন।

বললেন—আরে, সেই তপেশ গাঙ্গুলী আপনি? তা এরকম চেহারা হয়েছে কেন আপনার? কোনো অসুখ-বিসুখ হয়েছিল নাকি আপনার?

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—সারা জীবনই তো অসুখ-বিসুখে ভুগছি আমি—

মল্লিক-মশাই বললেন—কই, আগে তো কোনও অসুখ-বিসুখ দেখিনি আপনার।

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—সে অসুখ তো বাইরে থেকে দেখা যায় না ম্যানেজারবাবু। সে শরীরের ভেতরের অসুখ।

—শরীরের ভেতরের অসুখ মানে?

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—আপনি তো জানেন সব। টাকার অভাবের চিহ্নটা তো বাইরে থেকে দেখা যায় না।

মল্লিক-মশাই বললেন—ঠিক আছে। আমি এখানে একটা জরুরী কাজে এসেছি।

দেরি হলে আবার দোকান বন্ধ হয়ে যাবে!

—কীসের দোকান?

মল্লিক-মশাই বললেন—জুয়েলারির দোকান।

—জুয়েলারির দোকান? গয়না-গাঁটি কিনবেন বুঝি?

মল্লিক-মশাই বললেন—আরে না না, গয়না-গাঁটি কিনবো আমি? আমার কি অতো টাকা আছে? আর সোনার যা দাম, তাতে গয়না-গাঁটি ক'টা লোকই বা কিনতে পারে? আমি এসেছি জ্যোতিষীর সঙ্গে পরামর্শ করতে—

—জ্যোতিষী? জ্যোতিষী কী করবে?

মল্লিক-মশাই বললেন—একজন কুমারী মেয়ের কোষ্ঠীর সন্ধান চাই—

—কুমারী মেয়ের কোষ্ঠীর সন্ধান চাই? কেন?

—একটা বিয়ের ব্যাপারে।

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—কার বিয়ে?

—একজন পাত্রের।

—কী জাত?

মল্লিক-মশাই বললেন—যে কোনও জাত।

—যে কোনও জাত মানে?

—মানে জাত-বিচার নেই পাত্রের। যে-কোনও জাতির পাত্রী হলেই চলবে—

তপেশ গাঙ্গুলী বললে. তা আমারই তো নিজের মেয়ে আছে। আমার একমাত্র মেয়ে। দেখতেও সুন্দরী। যাকে বলে একেবারে ডানা-কাটা পরী।

মল্লিক-মশাই জিজ্ঞেস করলেন—তা আপনার মেয়ের কুষ্ঠী আছে?

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—হ্যাঁ, কুষ্ঠী আছে। বলেন তো কাল আপনাদের বাড়িতে গিয়ে দেখিয়ে আনতে পারি—

মল্লিক-মশাই বললেন—কিন্তু কুষ্ঠীতে বৈধব্য-যোগ থাকলে চলবে না।

—তার মানে?

মল্লিক-মশাই বললেন—তার মানে পাত্রীর স্বামীর যেন কখনও মৃত্যু না হয়। মৃত্যু তো একদিন-না-একদিন সকলেরই হবে, কিন্তু পাত্রীর জীবদ্দশায় যেন পাত্রের না হয়—

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—আমার মেয়ে বিজলীকে তো আপনি দেখেছেন মল্লিক-মশাই। বলুন বিজলী রূপসী কি না?

মল্লিক-মশাই বললেন—সে তো অনেক আগের কথা। এখন কি আর তা মনে আছে?

তপেশ গাঙ্গুলী বললেন—তা এখন আর একবার দেখবেন? আমি আবার একদিন আপনাকে দেখাতে পারি। বলুন না কবে দেখবেন?

মল্লিক-মশাই কিছু বলবার আগেই তপেশ গাঙ্গুলী বললে—দেখে বুঝবেন সেই বিশাখার চেয়ে আমার বিজলী এখন আরো সুন্দরী হয়েছে। আপনি কষ্ট করে একদিন আমার মনসাতলা লেনের বাড়িতে আসুন না—

মল্লিক-মশাই বললেন—যদি সময় পাই তো যাবো. আজকাল বড় ব্যস্ত আছি!

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—তাহলে আমিই বিজলীকে নিয়ে একদিন যাবো আপনার বিডন স্ট্রীটের বাড়িতে—

—না. না. ও কাজ করবেন না। আমি আজকাল কখন বাড়িতে থাকি. কখন থাকি না তার ঠিক নেই। আমাকে ঠাকমা-মণিকে সঙ্গে নিয়ে অনেক সময়ে সমস্ত দিন বাইরে থাকতে হয়—

তপেশ গাঙ্গুলী তবু নাছোড়বান্দা। বললে—না. ম্যানেজারবাবু, আমি ভোর পাঁচটার আগেই বিজলীকে নিয়ে যাবো! অতো সকালে তো আপনারা বেরোন না।

—আরে না না, আপনার মেয়েকে নিয়ে যেতে হবে না। আপনি আপনার মেয়ের কুষ্ঠীটা নিয়ে গেলেই চলবে। শুধু জ্যোতিষীদের দেখাবো যে আপনার মেয়ের কুষ্ঠীতে বৈধব্যযোগ আছে কি নেই—

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—না ম্যানেজারবাবু, আপনি আমার মেয়েকে শুধু একবার দেখে বলবেন সে রূপসী কি না—

মল্লিক-মশাই বললেন---আরে, এ তো মহা মুশকিল হলো দেখছি। বলছি যে আমাদের সৌম্যপদ একজন ফাঁসির আসামী। ফাঁসীর আসামীর সঙ্গে আপনি আপনার একমাত্র মেয়ের বিয়ে দেবেন?

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—হ্যাঁ হ্যাঁ, ফাঁসির আসামী হলেই বা তাতে ক্ষতি কি? পাত্রের টাকা তো আছে। কোটি-কোটি টাকা তো আছে পাত্রের। পাত্রের না হয় ফাঁসি হয়ে গেল, কিন্তু টাকাটা তো তার সঙ্গে যাচ্ছে না। পাত্রের কোটি-কোটি টাকা তো তার নামে ব্যাঙ্কেই থেকে যাচ্ছে—

মল্লিক-মশাই যতো তাকে এড়িয়ে যেতে চান তপেশ গাঙ্গুলী ততো তাঁর রাস্তা আটকে দাঁড়ায়। শেষকালে মল্লিক-মশাই তাকে একরকম ঠেলে সরিয়ে দিয়ে নিজের রাস্তা করে নিতে গেলেন।

কিন্তু তপেশ গাঙ্গুলী তখন একটা কান্ড করে বসলো। মল্লিক-মশাইএর সামনে উপুড় হয়ে পড়লো। আর তাঁর দু'টো পা দুই হাত দিয়ে প্রাণপণে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলো। বলতে লাগলো—আপনাকে এ উপকারটা করতেই হবে ম্যানেজারবাবু, আমি এই আপনার পা দু'টো জড়িয়ে ধরলুম, দেখি আপনি কথা না দিয়ে কী করে চলে যেতে পারেন। দিন, কথা দিন এই বামুনের ছেলেকে- দিন, কথা দিন একবার—

মল্লিক-মশাইএর তখন ত্রিশঙ্কুর মতো অবস্থা। না পারেন দাঁড়িয়ে থাকতে আর না পারেন চলে যেতে। ততক্ষণে, এক-একজন করে মজা দেখতে চারদিকে লোক জড়ো হতে আরম্ভ হয়ে গেছে। সকলেরই আকুল প্রশ্ন—কী হয়েছে মশাই? কী হয়েছে?

প্রশ্ন করবার লোক আছে অনেক, কিন্তু প্রশ্নের উত্তর দেবে কে?

মল্লিক-মশাই তখনও তপেশ গাঙ্গুলীর হাত থেকে পা দু'টো ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে চলেছেন। কিন্তু তপেশ গাঙ্গুলী প্রাণপণে তাঁর পা দু'টো জড়িয়ে ধরে আছে। কিছুতেই মল্লিক-মশাইকে চলে যেতে দেবে না।

চারপাশের ভীড়ের মানুষের সেই একই প্রশ্ন—কী হয়েছে মশাই, কী হয়েছে?

শেষকালে পৃথিবীর সমস্ত মানুষের যিনি বিপদ-তারণ, সেই তিনিই শেষ পর্যন্ত মল্লিক-মশাইকে রক্ষা করলেন। কোথা থেকে যমদূতের মতো একটা মিনি-বাস বাঁধা রুট ছেড়ে একেবারে বে-লাইনে এসে পড়তেই মানুষের ভীড় ছত্রখান হয়ে পড়লো। যে যেদিকে পারলো প্রাণ হাতে নিয়ে পালাতে লাগলো।

আর সেই সুযোগে মল্লিক-মশাই তপেশ গাঙ্গুলীর হাতের বেড়ি ছাড়িয়ে ঊর্ধ্ব-শ্বাসে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলেন তা আর কেউ ঠিক করতে পারলে না।

তপেশ গাঙ্গুলী তখন উঠে দাঁড়িয়েছে। জামা কাপড় রাস্তার ধুলোয় ধুলোময় হয়ে গিয়েছে। সেগুলো ঝেড়ে ফেলে সামনে যাকে পেলে তাকেই জিজ্ঞেস করতে লাগলো—কোথায় গেল মশাই সেই ভদ্রলোক?

—কোন ভদ্রলোক? কার কথা বলছেন?

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—ওই যে ভদ্রলোকের পা জড়িয়ে ধরেছিলুম আমি, গায়ে সাদা পাঞ্জাবি কালো, রোগা, বুড়োমানুষ। তিনি কোন দিকে গেলেন?

কলকাতা শহর বড়ো নির্দয়, নিষ্ঠুর শহর। শুধু কলকাতা কেন, পৃথিবীর সমস্ত বড়ো শহরের মানুষরাই তাই। সেখানে কার ছেলের চাকরি হচ্ছে না, কার

মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না, কে খেতে না পেয়ে উপোষ করে মরছে, তা দেখবার সময় নেই কারো। কোথাও কোনও রাস্তার মোড়ে কারা মাইক্রোফোনে লেকচার বাজি করছে, তা দেখতে মানুষের ভীড়ের অভাব হবে না এই সব শহরে। আবার কেউ যদি গাড়ির তলায় চাপা পড়ে মারা যায় তো সঙ্গে সঙ্গে গাড়িকে ধরে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দেবারও লোকের অভাব হবে না এখানে।

তপেশ গাঙ্গুলী তখনও গরু খোঁজার মতো মল্লিক-মশাইকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। কোথায় গেল মল্লিক-মশাই? গেল কোথায় ম্যানেজারবাবু?

—হ্যাঁ মশাই, কোথাও দেখেছেন ম্যানেজারবাবুকে?

কে দেখবে কাকে? কেউ তো কারো নয় কলকাতা শহরে। আমরা নিজের পাশের বাড়ির লোকের খবর রাখবার সময় পাই না, আর আমরা খবর রাখবো তোমার ম্যানেজারবাবুর? যাও যাও, ভাগো এখান থেকে? ভাগো!

ঠিক আছে! এখন এখান থেকে পালিয়ে তুমি বেঁচে গেলে। কিন্তু বিডন স্ট্রীটের ঠিকানা তো জানা আছে। সেখানে যাবো। দেখবো তুমি কেমন করে পালাও।

তপেশ গাঙ্গুলী আস্তে আস্তে একটা ট্রামের স্টপেজে গিয়ে দাঁড়ালো। সামনে দিয়ে একটা-একটা করে দুটো ট্রাম চলে গেল। কিন্তু বেশি ভিড় নেই। ফাঁকা ট্রামে তপেশ গাঙ্গুলী কখনও ওঠে না। ফাঁকা ট্রামে উঠলেই টিকিট কাটতে হয়।

কিন্তু ভীড়ের মধ্যে ট্রামে উঠলে টিকিট কাটবার দায় থাকে না। খানিক দূরে গিয়ে নেমে পড়লেই হলো। নেমে আর একটা ট্রামে ওঠো। এই রকম করে একটার পর একটা ট্রাম বদলে নিজের আস্তানায় চলে যাও, তোমার টিকিট কাটতে হবে না।

ট্রামটায় উঠে তপেশ গাঙ্গুলী কোনও বেঞ্চির ওপর বসবে না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বা ঝুলতে ঝুলতে যাওয়াটাই পছন্দ করে তপেশ গাঙ্গুলী। তাতে একদিকে অসুবিধে থাকলেও, পয়সার দিক থেকে সুবিধে হয়। পয়সা খরচ করতে হয় না। এই রকম একটা ট্রামে উঠতেই দেখলে সামনের সীট-এ বসে আছে মল্লিক-মশাই।

তপেশ গাঙ্গুলী ভিড় ঠেলে ঠেলে একেবারে ম্যানেজারবাবুর সামনে গিয়ে দাঁড়ালো।

বললে—আরে, আপনি এখানে? আর আমি যে আপনাকে গরু-খোঁজা করে বেড়াচ্ছি

মল্লিক-মশাই তপেশ গাঙ্গুলীকে এড়িয়ে যেতেই চাইছিলেন। প্রথমে কিছু কথা না বলে যেমন জানালার বাইরের দিকে চেয়েছিলেন তেমনি সেই দিকেই চেয়ে রইলেন। কিন্তু তপেশ গাঙ্গুলী অতো সহজে ছাড়বার লোক নয়।

বললে—ও ম্যানেজারবাবু, কই, একবার চেয়ে দেখুন। আমি তপেশ গাঙ্গুলী। চেয়ে দেখুন একবার আমার দিকে—

মল্লিক-মশাই খুব বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন তপেশ গাঙ্গুলীর ওপর। তাই তার দিকে একবার চেয়েও দেখলেন না।

কিন্তু মল্লিক-মশাইএর সময়টা বোধহয় খুবই খারাপ যাচ্ছিল। একে ঠাকুমা-মণির সমস্ত কাজ তাঁরই ঘাড়ে পড়েছিল। তার ওপর এই তপেশ গাঙ্গুলীর অত্যাচার!

পাশে বসা লোকটির বোধহয় গন্তব্যস্থল এসে গিয়েছিল, তাই তিনি হঠাৎ উঠে দাঁড়াতেই তপেশ গাঙ্গুলী থপ্ করে সেইখানে বসে পড়লো। বসে পড়েই মল্লিক-মশাই-এর পায়ে হাত দিয়ে তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করতে লাগলো—ও ম্যানেজারবাবু, একবারটি এদিকে ফিরুন না, ও ম্যানেজারবাবু—

মল্লিক-মশাই বেগতিক দেখে বললেন—মশাই, আমি তো বার বার বলেছি আপনাকে যে ফাঁসির আসামীর সঙ্গে আপনার মেয়ের বিয়ে দেবেন না, তাতে দুদিন বাদে আপনার মেয়ে বিধবা হবে। তবু আপনি আমার পেছনে লেগে আছেন কেন?

তপেশ গাঙ্গুলী বলতে লাগলো—ম্যানেজারবাবু আমি তো বলছি মেয়ে বিধবা

হলেও ক্ষতি নেই, আমার মেয়ের শুধু টাকা হলেই হলো—

মল্লিক-মশাই বললেন—মশাই আপনি বাপ না কষাই? আপনার এত টাকার লোভ?

তপেশ গাঙ্গুলী এবার আগেকার মতো মল্লিক-মশাইএর দুটো পা ধরতে গেল।

কিন্তু মল্লিক-মশাই তখন অসহ্য হয়ে উঠেছেন। তাড়াতাড়ি সীট ছেড়ে উঠলেন। উঠে ট্রাম থেকে নামবার জন্যে দরজার দিকে এগিয়ে যেতে লাগলেন। তারপর যেই ট্রামটা এসে এক জায়গায় থামলো, আর তখনই রাস্তায় নেমে পড়লেন।

কিন্তু তপেশ গাঙ্গুলী তখনও তার পেছু ছাড়েনি। সেও সঙ্গে সঙ্গে ট্রাম থেকে নেমে ডাকতে আরম্ভ করেছে—ও ম্যানেজারবাবু, ম্যানেজারবাবু, দাঁড়ান, দাঁড়ান।

মল্লিক-মশাই কিন্তু দাঁড়ালেন না। সামনে একটা খালি ট্যাক্সি দেখতে পেয়েই তাতে উঠে পড়ে বললেন—চলো ভাই শ্যামবাজার—

ট্যাক্সি হু-হু করে সামনের দিকে দৌড়তে লাগলো। কিন্তু তপেশ গাঙ্গুলীর আওয়াজ তখনও মল্লিক-মশাইএর কানে আসছিল—ও ম্যানেজারবাবু, ম্যানেজারবাবু—

সেদিন হঠাৎ সন্দীপের চেম্বারে ঢুকে পড়েছে গোপাল হাজরা। বললে—আরে তুই?

গোপাল হাজরা বললে—তুই তো আমার খবর রাখিস না, কিন্তু গোপাল হাজরা অত নেমকহারাম নয় রে, অতো নেমকহারাম নয়।

—কী ব্যাপার তোর? হঠাৎ যে আমার ব্যাঙ্কে?

—তুই এই ব্রাঞ্চের ম্যানেজার হয়েছিস এ-খবরটা কানে আসতেই তোর সঙ্গে দেখা করতে চলে এলুম। তোকে তো এই ব্র্যাঞ্চের ডিপোজিট বাড়াতে হবে।

সন্দীপ বললে—ডিপোজিট তো বাড়াতে হবেই—

—তা তুই যে হঠাৎ ম্যানেজার হয়ে গেলি, তাতে তোর কতো টাকা খসলো?

সন্দীপ কথাটার মানে বুঝতে পারলে না। বললে—খসলো মানে?

গোপাল হাজরা বললে, খসলো মানে কতো টাকা 'কিক্-ব্যাক্' দিতে হলো?

—কিক্-ব্যাক? কিক্-ব্যাক্ মানে?

গোপাল হাজরা বললে—এ্যাদ্দিন ব্যাঙ্কে চাকরি করছিস, ব্যাঙ্কের ম্যানেজার হয়েছিস আর 'কিক্-ব্যাক্' কথাটার মানে জানিস না? দালালি রে দালালি। যাকে সে-কালের ভাষায় বলা হতো ঘুষ!

সন্দীপ বললে—ও তাই বল্! কিন্তু চাকরিতে প্রমোশন তো হয়েছে এগজামিন দিয়ে, পরীক্ষা দিয়ে। কাউকে ঘুষ দিতে হবে কেন?

গোপাল হাজরা যেন আকাশ থেকে পড়লো। যেন এমন কথা জীবনে সে এই-ই প্রথম শুনলো। বললে—সে কী রে, কী বলছিস তুই? তোর চাকরিতে প্রমোশন হবে, তোর আয় বাড়বে, আর 'কিক্-ব্যাক' দিতে হবে না? তুই বলছিস কী? তুই তো দেখছি এ-চাকরিতে উন্নতি করতে পারবি না!

সন্দীপ বললে—যদি চাকরিতে উন্নতি না করতে পারি তো যেখানে যে-পোস্টে আছি সেই পোস্টেই থাকবো। চাকরি তো যাবে না।

গোপাল হাজরা বললে—দেখছি এত দিন কলকাতায় থেকে তুই কিছুই শিখিসনি,

সেই তেমনি পাড়াগেঁয়েই থেকে গিয়েছিস!

সন্দীপ বললে—আমার কথা ছেড়ে দে—

—কেন ছাড়বো কেন? শহরে এত দিন আছিস, এখান থেকে কিছু কামিয়ে নে। তা না হলে কলকাতায় এসে তোর লাভ কী হলো? কিছু মাল-কড়ি জমিয়েছিস?

সন্দীপ বললে—খরচের ঠ্যালাতেই অস্থির, উল্টে অনেক টাকা লোন হয়ে গিয়েছে।

—সে কী রে? সবাই জানে কলকাতায় টাকা উড়ছে, শুধু ধরে নিতে জানলেই হলো, আর তোর কি না লোন হয়ে গেছে? কীসের জন্যে লোন হলো?

সন্দীপ বললে, অসুখ-বিসুখের জন্যে। বাড়িতে অসুখ, নিজেরও অসুখ! কলকাতায় একবার ডাক্তারদের খপ্পরে পড়লে তো রেহাই নেই। আমারও হয়েছে তাই।

সব শুনে গোপাল হাজরা বললে—না, তোর দেখছি কোনও কালে কিছু হবে না। দেখ্ তো মাড়োয়ারিরা লোটা-কম্বল নিয়ে এসে কী করে কোটিপতি হয়ে ওঠে। পাঁচ হাজার লাগিয়ে সেই টাকাটাকে কী করে পাঁচ লাখে দাঁড় করায়। আর বাঙালীরা?

সন্দীপের তখন অনেক কাজ হাতে জমে ছিল। বললে—তা তোর কী খবর বল?

গোপাল হাজরা বললে—আমি তো তোর খবর জানতেই এলুম রে। ভাবলুম দেখি সন্দীপটা একটু সেয়ানা হয়েছে কি না! ব্যাংকের ম্যানেজারের কাজ তো সোজা কাজ নয়, সে-কাজটা সন্দীপ ঠিক মতো চালাতে পারছে কি না তাই দেখতে এলুম—

বলে একটু থামলো। তারপর বললে—তোর বন্ধু হিসেবে তোকে একটা পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছি, বেশ মন দিয়ে শোন। টাকা জিনিসটা হলো আগুনের মতো, যতোদিন টাকাকে চাকরের মতো রাখবি ততোদিন সে তোর উপকার করবে, তোর কথায় উঠবে-বসবে, কিন্তু সেই টাকাকে যদি মাথায় তুলে রাখিস তো সে তোর সর্বনাশ করে ছাড়বে।

সন্দীপ কথাগুলো বুঝতে পারলে না। জিজ্ঞেস করলে—তার মানে?

গোপাল হাজরা বললে—কথাগুলো একজন ভদ্রলোক বহুদিন আগে আমাকে শিখিয়েছিল। Money is like fire—it is a good servant but a bad master. বুঝলি কিছু?

সন্দীপ বললে—হ্যাঁ।

গোপাল বললে—তুই নতুন ম্যানেজার হয়েছিস, এখন তো তোর ডিউটি হবে ব্যাংক ডিপোজিট বাড়ানো। তুই ডিপোজিট বাড়াবি কেমন করে?

সন্দীপ বললে—পাড়ার বড়ো-বড়ো লোকদের কাছে যাবো, গিয়ে তাদের বলবো আমাদের ব্যাংকে টাকা ডিপোজিট রাখতে।

—তুই বললেই তারা তোর ব্যাংকে টাকা ডিপোজিট রাখবে?

সন্দীপ বললে—যাতে রাখে সেই চেষ্টা করবো।

বললে—চেষ্টা করলেও কিছু হবে না। কিস্-সু হবে না—

—তা হলে কী করবো?

গোপাল হাজরা বললে—টাকা না ছাড়লে টাকা আমদানি হবে না।

—টাকা?

গোপাল হাজরা বললে—হ্যাঁ রে হ্যাঁ, টাকা। ওই 'কিক্-ব্যাক'। আমায় যদি তুই কিছু 'কিক্-ব্যাক' দিস তো আমি তোর ব্যাংকে ডিপোজিট বাড়িয়ে দিতে পারি—

সন্দীপ বললে—কিন্তু সে আমি দেব কেমন করে? তা দিতে হলে তো হেড-অফিস থেকে অনুমতি নিতে হবে। সে-অনুমতি তারা দেবে কেন?

গোপাল হাজরা বললে—তাহলে তুই যা পারিস কর। তোর দ্বারা বড়লোক হওয়া হবে না কোনও কালে! তুই চিরকাল গরীব হয়েই ভুগে মরবি। আজকাল 'কিক্-ব্যাক' ছাড়া কোনও কাজই হয় না। বিয়ে করতে হলে চিরকাল মেয়ের বাপকে 'কিক্-ব্যাক'

দিতে হয় ছেলের বাপকে। এ তো চিরকালের নিয়ম রে। এখন ওটা অন্য সব জায়গাতেও চালু হয়েছে। সে বিয়েই হোক, চাকরিই হোক, আর যাই-কিছু হোক। তুই যদি বড়ো সাধু হতে চাস তাহলেও 'কিক্-ব্যাক' দিতে হবে। একদিন প্রফেসর রজনীশ ওই 'কিক্-ব্যাক্' দিয়েছিল বলেই আজ ভগবান রজনীশ হতে পেরেছে, তা জানিস—

বলে গোপাল হাজরা উঠলো। সে বুঝলো যে এখানে সময় নষ্ট করে তার কোনও লাভ নেই। যেখানে থাকলে টাকা পাওয়ার কোনও আশা নেই, গোপাল হাজরারা সেখানে বসে থেকে সময় নষ্ট করে না।

গোপাল হাজরা চলে যাচ্ছিল। কিন্তু বোধহয় কী একটা কথা মনে পড়ে যাওয়াতে দাঁড়িয়ে পড়লো। বললে—হ্যাঁ রে, সেই মুখুজ্জেদের খবর কী রে? তুই আগে যাদের বাড়িতে থাকতিস্? সেই স্যাক্সবী মুখার্জী এ্যান্ড কোম্পানী?

সন্দীপ বললে—তারা তো এখন আর কলকাতায় নেই। তোদের জ্বালায় তো দেশ ছেড়ে মধ্যপ্রদেশে চলে গেছে তারা। ইন্দোরে গিয়ে হয়তো একটু শান্তিতেই আছে।

—শান্তি?

বলে গোপাল হাজরা আবার হো-হো করে হাসতে লাগলো।

বললে—শান্তি? তুই বলছিস তারা শান্তিতে আছে? তুই জানিস না তাই বলছিস! ইন্দোরকে বলে সেকেন্ড বোম্বাই। ওরে আমাদের লোক সেখানেও গেছে। সেই মুক্তিপদ মুখুজ্জে ভেবেছে কলকাতা থেকে পালিয়ে গিয়ে বাঁচবে! কিন্তু এই-টুকু শুনে রাখ যে সেখানেও মেহনতি মানুষরা আছে, সেখানেও তারা এখন ইউনিয়ন করেছে। সেখানেও তারা চিরকাল আর এ-রকম শোষণ সহ্য করবে না! ভুলে যাসনি বাঁচার লড়াইতে তারাও বেশিদিন পেছিয়ে থাকবে না। এই বলে দিয়ে গেলুম—

সেদিন যথারীতি অফিস থেকে বেরিয়ে সন্দীপ রোজকার মতো দু'একটা জিনিস হাওড়ার বাজার থেকে কিনে শেষ ট্রেনে বাড়ি ফিরেছে।

কিন্তু বাড়িতে পা দিতেই সে চমকে উঠেছে। অন্য দিন সন্দীপের ফেরার সময় মা কিংবা বিশাখা সদর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে উদ্‌গ্রীব হয়ে। সেদিন কিন্তু সে-রকম কাউকেই দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল না।

সন্দীপ প্রথমে অবাক হয়ে গিয়েছিল বটে, কিন্তু ভেতরে ঢুকেই দেখলে সামনের ঘরে কেউই নেই। সবাই মাসিমার ঘরে গিয়ে জড়ো হয়েছে। সকলেরই মুখের চেহারা গম্ভীর, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত! মাঝখানে মাসিমা অচৈতনা হয়ে শুয়ে আছে। আর পাড়ার ডাক্তারবাবু কানে স্টেথিসকোপ লাগিয়ে মাসিমার বুক পরীক্ষা করছেন।

সন্দীপ যে ঘরে ঢুকেছে তা যেন কেউ লক্ষ্যই করলে না। অফিস থেকে ফিরে আসায় ওরা যে আশ্বস্ত হয়েছে এমন কোনও লক্ষণই প্রকাশ পেল না তাদের কারো মুখ-চোখের ভঙ্গীতে।

পাড়ার ডাক্তারবাবু তখন তাঁর পরীক্ষা শেষ করেছেন। স্টেথিসকোপটা কানে থেকে খুলে নিয়ে বাক্সের ভেতরে রাখতে রাখতে বললেন—আমি ভালো বুঝছি না, আমার মনে হয় রোগীকে এখনি যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব হসপিট্যালে বা কোনও নার্সিং-হোমে পাঠানো উচিত—খুব সিরীয়াস্ কেস্—

সে রাতটা যে বাড়ির লোকেদের কী ভাবে কেটেছে তা বর্ণনা করা সম্ভব নয়। শুধু অনুমান করা যায়।

মা'রও তো বয়েস হয়েছে। যে-বয়েসে মানুষের সেবা পাওয়া অপরিহার্য হয়, মা'র তখন সেই বয়সই হয়েছে। অথচ বুড়ো বয়েস পর্যন্ত মা'র সেই সৌভাগ্য হলো না। তাকে কোনওদিন কেউ সেবা করতে এগিয়ে এলো না।

সন্দীপ দাঁড়িয়ে ছিল। মা বললে—ওরে, তুই কেন জেগে আছিস? শুগে যা, কাল

টাকা দিলে? কার দৌলতে তোমার বাড়ি, গাড়ি, শাড়ি, গয়না হয়েছে শুনি? তোমার স্বামী রোজগার করে কিনেছে? এখুনি বেরিয়ে যাও বাড়ি থেকে, বেরিয়ে যাও—

তখন বউমা চুপ করে গেল।

মুক্তিপদ তখন মায়ের পায়ে হাত দিয়ে বললেন—মা, তুমি রাগ করো না। তুমি ছাড়া আমার আর কে আছে বলো? কেউ তো নেই আমার তুমি ছাড়া—

—পা ছাড়, ছাড় পা—

বলে ঠাকমা-মণি নিজের পা ছাড়িয়ে নিতেই মুক্তিপদ মা'র সামনে হাত জোড় করে বলতে লাগলেন—মা, তুমি ছাড়া আমার যে কেউ নেই—তুমি একবার গিয়ে দাঁড়াবে না—

—কেউ নেই মানে? তোর তো বৌ রয়েছে। তুই তো তোর বৌয়ের চাকর। তুই তার পা জড়িয়ে ধরে থাকিস, সে দাঁড়ালেই হবে! আমি তোর কে? আমি তোর বাড়িতে জীবনেও যাবো না, এই কথাটা শুনে রাখ তুই—

—এ তোমার রাগের কথা হলো মা!

ঠাকমা-মণি বললে—এ রাগ আর তুই কতোটুকু দেখলি? তোর বাপ বেঁচে থাকলে তোকে ত্যাজ্য-পুত্তুর করে ছাড়তো। আমি বলে তাই সহ্য করলুম। এখন আমার সামনে থেকে বেরিয়ে যা—আমি আর তোর মুখ দেখতে চাই না, যা, চলে যা আমার সামনে থেকে। নইলে গিরিধারীকে দিয়ে তোকে লাঠি মেরে বাড়ি থেকে বার করে দেব—

এতদিন পরে যখন মুক্তিপদ কলকাতা ছেড়ে ইন্দোরে চলে গেছে, যখন সৌম্যপদর মামলা নিয়ে নাজেহাল হয়ে যাচ্ছিল, তখন আবার সেই পুরনো কথাগুলো মনে পড়তো।

সঙ্গে থাকতেন মল্লিক-মশাই। মল্লিক-মশাই-এরও বয়েস হয়েছে। ঘোরাঘুরি করতে তাঁরও কষ্ট হতো। কলকাতার কোনও জ্যোতিষী আর বাদ নেই। মল্লিক-মশাই একলাই সব জ্যোতিষীদের দরজায়-দরজায় ঘুরেছেন। মোটা টাকার দর্শনীও দিতে হয়েছে সকলকে। মল্লিক-মশাইয়ের নিবেদন মাত্র একটিই। আর সেটা হচ্ছে এই যে, এমন একটি অবিবাহিতা জাতিকার কুষ্ঠী চাই যার সপ্তম স্থানটি শুভ। এক-কথায় যার ভাগ্যে বৈধব্য-যোগ নেই।

সব জ্যোতিষীই একটা কথা বলেন—কারো কুষ্ঠী তো আমাদের কাছে থাকে না, আপনি যদি কোনও জাতিকার জন্মপত্রিকা এনে দেন তাহলে আমরা তা দেখে বলে দিতে পারি, সেই জাতিকার বৈধব্য-যোগ আছে কিনা।

সে-রকম জাতিকা কোথায় পাবেন মল্লিক-মশাই? বাড়িতে ঠাকমা-মণিকে রিপোর্ট দেন। সব খবর বলেন। কিন্তু তেমন জাতিকার কুষ্ঠী কোথায় পাওয়া যাবে?

কিন্তু তা বলে তো হাত কোলে করে বসে থাকলে চলবে না? চেষ্টা চালিয়ে যেতেই হলো। এ্যাডভোকেট দাশগুপ্তের কাছে যান ঠাকমা-মণি। গিয়ে বলেন—সে-রকম কুষ্ঠী পাওয়া যাচ্ছে না—

দাশগুপ্ত বলেন—সে-রকম কুষ্ঠী যেমন করে হোক পেতেই হবে। কলকাতায় না পাওয়া যায়, কলকাতার বাইরে খুঁজে বার করতে হবে। দরকার হলে সমস্ত ইণ্ডিয়ায় যেখানে যতো জ্যোতিষী আছেন, সকলের সঙ্গে কথা বলতে হবে। এ ব্যাপারে কোনও কার্পণ্য করলে চলবে না। মানুষের জীবন নিয়ে যখন সমস্যা তখন উকিল যা বলবেন তা-ই করতে হবে।

ঠাকমা-মণি মল্লিক-মশাইকে বললেন—আপনি একবার কাশীধামে যান, সেখানেও তো অনেক জ্যোতিষী আছেন।

মল্লিক-মশাই তাই-ই করলেন। একদিন পকেটে কয়েক হাজার টাকা নিয়ে তল্পী-তল্পা গুছিয়ে কাশী রওনা দিলেন। ধর্মশালায় থাকলে টাকাকড়ি চুরি হতে পারে। তাই হোটেলে ওঠাই ভালো।

সেখানে গিয়ে সকাল বেলা থেকেই জ্যোতিষীদের ডেরায়-ডেরায় ঢুঁ মারতে লাগলেন।

টাকা ঢাললে কী-ই না হয়! অনেক জাতিকার কোষ্ঠী পাওয়া গেল। তাদের কারো বৈধব্য-যোগ নেই। তাদের ঠিকানাও পাওয়া গেল।

একজন জ্যোতিষী বললেন—মীরাটে যেতে পারবেন আপনি?

মল্লিক-মশাই বললেন—কেন যেতে পারবো না? আপনি ঠিকানা বলে দিন—

ঠিকানা চাইলেই কেউ খালি হাতে দেয় না। তার জন্যেও দক্ষিণা দিতে হয়। আর সে দক্ষিণাও নেহাৎ সস্তা নয়। এক-একটা ঠিকানার জন্যে পঞ্চাশ টাকার দক্ষিণা।

মল্লিক-মশাই অনেক টাকা সঙ্গে করে নিয়ে গেছেন। অর্থাভাবে কাজ যেন আটকে না যায়। আর প্রতিদিন টেলিগ্রাম করে ঠাকমা-মণিকে জানাতে হয় সারা দিনে কী-কী কাজ তিনি করলেন। কোথায় মীরাট, কোথায় শাহারানপুর, কোথায় টিহরি-গাড়োয়াল, উত্তর ভারতের যে-যে জায়গার ঠিকানা তিনি পেলেন, সব জায়গাতেই তিনি গেলেন।

বেশির ভাগ জাতিকারই বিয়ে আগেই হয়ে গিয়েছে। যাদের বিয়ে তখনও হয়নি তারা মল্লিক-মশাই-এর প্রস্তাব শুনে হতবাক। তারা রেগে যায়। অনেকে আবার চিৎকার করে বলে—বেরিয়ে যান, বেরিয়ে যান বাড়ি থেকে, বেরিয়ে যান—

মল্লিক-মশাই বলেন—আপনারা যতো টাকা চান সমস্ত আমরা দেব। তিন লাখ চার লাখ, কি পাঁচ লাখ চাইলেও দেব। অতো রাগছেন কেন?

যে-যে কন্যার পিতারা দুঃস্থ, নিঃসম্বল, টাকার অভাবে যে-সব মেয়েদের বিয়ে হচ্ছে না, তাদের বাপ-মা'র কাছেই মল্লিক-মশাই টাকার টোপ্ ফেলেন। লক্ষ লক্ষ টাকার লোভ দেখান।

কিন্তু হলে হবে কী, পাত্র ফাঁসির আসামী শুনেই সবাই পেছিয়ে যায়, সবাই অপমান করে। অনেকে জুতো নিয়ে মারতে আসে।

প্রতিদিনই সময় করে মল্লিক-মশাই পোস্টাফিসে গিয়ে কলকাতায় ঠাকমা-মণিকে ঘটনাক্রম টেলিগ্রামে জানিয়ে দেন।

আর কলকাতায় বসে ঠাকমা-মণি ম্যানেজারবাবুর টেলিগ্রামের জন্যে আকুল হয়ে অপেক্ষা করেন। কোনও কোনও দিন টেলিগ্রাম আসেই না একেবারে। যেদিন টেলিগ্রাম আসে না, বা কোনও চিঠিও আসে না, সেদিন ঠাকমা-মণির মেজাজ বিগড়ে যায়। সকলকে বকা-ঝকা শুরু করে দেন। পোস্টাফিসে লোক পাঠিয়ে খবর নেন। তাঁর ধারণা হয়, ম্যানেজারবাবু ঠিকমতো টেলিগ্রাম বা চিঠি পাঠাচ্ছেন, কিন্তু পোস্টাফিসের লোকদের গাফিলতির জন্যেই তিনি তা পাচ্ছেন না। টেলিগ্রামে বেশি কথা লেখা যায় না, তাই ঠাকমা-মণি সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদিন চিঠিও দিতে বলে দিয়েছিলেন।

আর ওদিকে মল্লিক-মশাই কোনও অচেনা শহরে নেমেই কোনও শিক্ষিত লোক দেখলেই জিজ্ঞেস করেন—এখানে কোনও জ্যোতিষী আছেন?

প্রথমে লোকেরা প্রশ্নটা শুনে অবাক হয়ে বলে—জ্যোতিষী?

মল্লিক-মশাই বলেন—হ্যাঁ হ্যাঁ, জ্যোতিষী।

তখন কেউ বলে, আপনি এখানকার বাজারের দিকে যান, সেখানে জ্যোতিষী-টোতিষী থাকলেও থাকতে পারে!

—বাজারটা কোন দিকে?

—এই স্টেশন থেকে বাস ছাড়ছে, ওই বাসে উঠে বলে দেবেন যে আপনি বাজারে যাবেন। তাহলেই তারা আপনাকে বাজারে নামিয়ে দেবে।

বেনারস থেকে ব্যর্থ হয়ে তখন যান এলাহাবাদের দিকে। এলাহাবাদে গিয়েও তাই। সেখানে গিয়েও হোটেলের ঘর-ভাড়া নিতে হয়। সস্তা হোটেলে উঠলে চলে না। সেখানে চুরি-চামারির ভয় থাকে। সঙ্গে প্রচুর টাকা-কড়ি আছে, সুতরাং সাবধানে

তো তোকে আবার সকাল থেকে ছোটাছুটি করতে হবে, একটু বিশ্রাম নিগে যা। এদিকটা তো আমরা সামলাচ্ছি।

অনেক পীড়াপীড়ি করে সন্দীপ নিজের ঘরে গেল।

কিন্তু ঘুম? ঘুম বড়ো জবরদস্ত দাবিদার। তার দাবি কড়ায়-গণ্ডায় না মেটালে সে কখনও কারো কাছে মাথা নিচু করে না। সে তুমি রাজাই হও আর প্রজাই হও। আমার কাছে রাজা-প্রজা সবাই-ই এক। যে ঘুমের জন্যে আমাকে অবহেলা করবে, তাকে আমি শাস্তি দেবই। আর সে এমন এক শাস্তি যা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সে ভুলতে পারবে না।

আর ঘুম না হলেই যতো রাজ্যের খারাপ ঘটনাগুলোই মাথার মধ্যে ঘুর-ঘুর করে। ঘুর-ঘুর করে সৌম্যবাবুর মামলা, মুক্তিপদবাবুর ফ্যাক্টরির দুর্ঘটনা। আরও ঘুর-ঘুর করে বিশাখার কথা! আর সকলের আগে ঘুর-ঘুর করে টাকার চিন্তা।

মাসিমাকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে যদি চিকিৎসা করাতে হয় তাহলে চিকিৎসার খরচা কোথা থেকে আসবে? এত টাকা সে কোথা থেকে যোগাড় করবে? যদি টাকা ধার করতে হয় তো সে-ধার কে দেবে? আর যদি কেউ দেয়ও তাহলে সে-ধার সে কী করে শোধ করবে? এখনই তো তার নেওয়া লোন্-এর টাকা প্রতিমাসে তার মাইনে থেকে কেটে নেওয়া হচ্ছে। কতো দিনে যে সে-ধার শোধ হবে তারও হিসেব নেই। তার ওপর আর ধার নিলে তো হাতে সে কিছুই পাবে না। তখন এই চারজন মানুষের এই সংসার চলবে কী করে?

হঠাৎ মা'র কথা মনে পড়লো। মা বলেছিল—এই বাড়িটা বাঁধা রাখলে বা বিক্রি করলে অনেক টাকা হাতে আসবে। কিন্তু তখন তারা থাকবে কোথায়? কার কাছে বাড়ি বন্ধক রাখবে? কে বাড়িটা বন্ধক রেখে টাকা দেবে?

হঠাৎ মনে হলো অন্ধকারের মধ্যে কে যেন ঘরে ঢুকলো। পাছে তার ঘুম ভেঙে যায় তাই আলো জ্বালেনি।

কে তার ঘরে ঢুকতে পারে? যে ঘরে ঢুকেছে সে খুব নিঃশব্দে নিজের কাজ করছে। ঘরের একপাশে একটা তোরঙ্গ থাকে। সেই তোরঙ্গটা খোলবার শব্দ হলো।

—কে?

উত্তর দিলে মা। বললে—কী রে, তুই এখনও ঘুমোসনি?

সন্দীপ বললে—ঘুম আসছে না মা।

মা বললে—ঘুমোতে চেষ্টা কর। সারাদিন খেটে-খুটে এসে রাতটায় যদি একটু বিশ্রাম না নিস তো কাল সারাদিন আবার যুঝবি কী করে?

সন্দীপ বললে—তোমার কথা ভাবছি। তুমিই বা এত কষ্ট সহ্য করবে কী করে?

মা বললে—আমার কথা ভাবিসনি তুই। মেয়েমানুষের প্রাণ অতো সহজে কাবু হয় না। আমার কথা তুই আর ভাবিসনি, তাহলে আর বাঁচবিনে তুই। তুই আছিস্ বলে তবু আমরা এখনও খেতে পাচ্ছি। এখনও বেঁচে রয়েছি। তুই ঘুমো, আমি চললুম—

সন্দীপ বললে—না মা, তুমি যেও না। তোমার সঙ্গে দুটো কথা বলি—

মা বললে—কী কথা, বল্?

সন্দীপ বললে—অনেক দিন আগে তুমি বলেছিলে আমাদের এই বাড়িটা বাঁধা রেখে টাকা নিয়ে মাসিমার চিকিৎসা করতে! মনে আছে তোমার?

মা বললে—হ্যাঁ, বলেছিলুমই তো! কেন? সে-কথা এখন কেন?

সন্দীপ বললে—কার কাছে বাঁধা রাখবো? কে বাড়ি বাঁধা রেখে টাকা দেয়?

মা বললে—এখন সে-কথা ভাবছিস কেন? সে-সব কথা কাল সকালে ভাবিস!

সন্দীপ বললে—কিন্তু মাসিমাকে তো কালই কলকাতায় নিয়ে গিয়ে হাসপাতালে

ভর্তি করতে হবে। এখন তো মাসের শেষ, আমি টাকা কোথায় পাবো?

মা বললে—সে জন্যে ভাবিসনি তুই। আমার পুরনো এক জোড়া সোনার বালা ছিল, সেইটে বিক্রি করলে তুই অনেক টাকা পাবি।

সন্দীপ বললে—তোমার ছেলে হয়ে মাকে কোথায় গয়না গড়িয়ে দেব, তা নয়, বাবার দেওয়া গয়না আমি বিক্রি করবো? এ আমি পারবো না মা, তুমি যা বলো আর তাই বলো।

মা বললে—না রে খোকা, অবুঝের মতো কথা বলিসনি. ওদের কেউ নেই। আমি সব শুনেছি রে। চাকরিতে উন্নতি হলে আবার সোনার বালা গড়িয়ে দিস—

বলে একজোড়া সোনার বালা ছেলের দিকে এগিয়ে দিলে। বললে—এইটে নিয়েই তুই এখনকার মতো কাজ চালিয়ে নে। তারপর এই বাড়িটা তো রইলোই। এটা বিক্রি করলে বা বাঁধা রাখলে পঁচিশ ত্রিশ হাজার টাকা পাওয়া যাবেই। তোর মাসিমার ডাক্তারি খরচটা তাতেই উঠে যাবে।

সন্দীপের তরফ থেকে কোনও উচ্চ-বাচ্য শোনা গেল না।

বোধহয় ছেলে ঘুমিয়ে পড়েছে এই ভেবে মা-ও আর সেখানে দাঁড়ালো না। যেমন টিপি-টিপি পায়ে এসেছিল. তেমনই আবার পা টিপে টিপে পাশের ঘরে চলে গেল।

ঠাকমা-মণির জীবনে তখন মহা দুর্দিন চলেছে। যেদিন থেকে তিনি বিধবা হয়েছেন. সেই দিন থেকেই বলতে গেলে তাঁর দুর্দিন শুরু হয়েছে। স্বামীর মৃত্যুর শোক তিনি সহ্য করতে পেরেছিলেন ছেলেদের আর একমাত্র নাতির মুখের দিকে চেয়ে।

তারই মধ্যে বড় ছেলে শক্তিপদ মারা গেলেন। কিছুদিন পরে মারা গেল শক্তিপদর বউও। সে-মৃত্যু সহ্য করতে পেরেছিলেন সৌম্যপদকে কোলে নিয়ে। সেই ছিল তাঁর একমাত্র অবলম্বন। তিনি ভেবেছিলেন সৌম্যপদই তাঁর সমস্ত অভাব পূরণ করবে।

তার পরে মুক্তিপদ বেঁচে থেকেই তাঁর কোনও অভাব পূর্ণ করতে পারলেন না। বউএর কথায় সেই মুক্তিপদ একদিন নতুন বাড়ি করে উঠে চলে গেলেন।

মুক্তিপদ গৃহ-প্রবেশের দিন মাকে নিয়ে যেতে এসেছিলেন মুক্তিপদর সাহস দেখে ঠাকমা-মণি রেগে আগুন হয়ে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন—তোর সাহস তো কম নয় মুক্তি! তুই এসেছিস আমাকে তোর নতুন বাড়ি দেখাতে!

মুক্তিপদর বউও অনুরোধ করেছিল। বলেছিল—মা, আজকে একবারটি আপনি চলুন। আজকে পুরুত-মশাই আসবেন, পুজো হবে. অনেক গণ্য-মান্য লোককে নেমন্তন্ন করা হয়েছে। সবাই-ই আসবেন। এই সময়ে আপনি না গেলে সব পণ্ড হয়ে যাবে—

—বউমা. তুমি থামো!

হুংকার দিয়ে উঠেছিলেন ঠাকমা-মণি। বলেছিলেন—বউমা, তুমি থামো। তোমার লজ্জা করে না কথা বলতে! আমার পেটের ছেলেকে পর করে দিয়ে এখন এসেছ গৃহ-প্রবেশের নেমন্তন্ন করতে! আমি যদি তেমন শাশুড়ী হতুম তো এখুনি তোমার মুখে ঝামা ঘষে দিতুম। তুমি আমার সামনে থেকে এখুনি চলে যাও। তুমি আমার রাগ দেখনি তাই কথা বলতে এসেছ! কার টাকায় তোমার বাড়ি হলো শুনি? কে তোমাদের

উকিলবাবুও চিঠিটা পড়লেন। পড়ে আশান্বিত হলেন।

ঠাকমা-মণি বললেন— আপনি আর কিছুদিন মামলার শুনানিটা ঠেকিয়ে রাখুন। আমার মনে হয় এই পাত্রীর সঙ্গে আমার নাতির বিয়ে দিতে পারবো শেষ পর্যন্ত—

উকিলবাবুও রাজি হয়ে গেলেন। আর রাজি না হয়েই বা তাঁর উপায় কী! তাঁর হাতে তো মামলা নয়। হাকিম যা করবেন তাই-ই হবে। তিনি শুধু চেষ্টা করে যাবেন।

সেদিন থেকে ঠাকমা-মণি যেন একটু অন্য রকম হয়ে গেলেন। আগে তাঁর মেজাজটা সব সময়ে তিরিক্ষে হয়ে থাকতো। সামান্য কথায় জ্বলে-পুড়ে উঠতেন। বাড়ির সবাইকে সব সময়ে বকা-ঝকা করতেন। উঠতে-বসতে গাল-মন্দ করতেন সকলকে। ঠিক সময়ে কল বন্ধ করা হলো কিনা, ঠিক রাত ন'টার সময়ে সদর-গেট গিরিধারী চাবি-বন্ধ করলো কিনা, তা নিয়েও হৈ-চৈ বাধিয়ে দিতেন।

এবার মল্লিক-মশাই-এর চিঠিটা পেয়ে যেন একটু শান্ত হলেন। সেদিন বিন্দু এসে খবর দিলে, কে যেন এক ভদ্রলোক ঠাকমা-মণির সঙ্গে দেখা করতে চায়।

ঠাকমা-মণি বললেন—বলে দে দেখা হবে না—

বিন্দু সেই কথাই গিরিধারীকে জানিয়ে দিলে। গিরিধারীও তাই জানিয়ে দিলে সেই ভদ্রলোককে। ভদ্রলোক বললে—ম্যানেজারবাবু কোথায়?

গিরিধারী বললে—ম্যানেজারবাবু বাহার গিয়া—

ভদ্রলোক বললে—তাহলে আমি একটু বসছি—

গিরিধারী বললে—আপনি কতোক্ষণ বসে থাকবেন?

ভদ্রলোক বললে—যতোক্ষণ না ম্যানেজারবাবু ফিরে আসেন, ততোক্ষণ আমি বসে থাকবো। তিনি তো বাড়িতে খেতে আসবেন!

—না, তিনি খেতে আসবেন না।

—কেন?

গিরিধারী বললে—উনি কলকাতার বাইরে গেছেন। তাঁর ফিরতে দেরি হবে।

—কত দেরি হবে?

গিরিধারী বললে—তা আমি বলতে পারি না।

ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলে— কে বলতে পারবে?

গিরিধারী বললে—বাড়ির মালিক বলতে পারে।

—তা তোমার মালিককে জিজ্ঞেস করে এসো না ম্যানেজারবাবু কবে কলকাতায় ফিরে আসবেন। আমার খুব জরুরী কাম আছে দারোয়ানজী, খুব জরুরী কাম!

শেষকালে ভদ্রলোক খুব পীড়াপীড়ি করতে লাগলো ম্যানেজারবাবুর খবর জানবার জন্যে পকেট থেকে এক টাকার একটা নোট বার করে গিরিধারীর দিকে এগিয়ে দিতে গেল। গিরিধারী টাকাটা দেখে অবাক। বললে এ কীসের টাকা বাবুজী?

ভদ্রলোক বললে—তুমি টাকাটা নাও না, ওটা বখশিস। পান খাওয়ার জন্যে দিচ্ছি তোমাকে, তুমি কিছু মনে করো না যেন দারোয়ানজী, বুঝলে?

তারপর টাকাটা পেয়ে গিরিধারী বোধহয় খুশীই হলো। আর মুফ্‌ৎ টাকা পেলে পৃথিবীতে কে না খুশী হয়। টাকাটা ট্যাঁকে গুঁজে রেখে সে ভেতরে গেল। যাওয়ার সময় বলে গেল—আপনি এখানে একটু দাঁড়ান বাবুজী, আমি বিন্দুকে জিজ্ঞেস করে আসি। বিন্দুই তো আমার মালকিনের খাস ঝি।

তারপরে ভেতরে গিয়েও ফিরে এসে বললে—বাবুজী, আপনার নামটা কী বলবো?

ভদ্রলোক বললে—আমার নাম হলো তপেশ গাঙ্গুলী। ঠিক মনে থাকবে তো বাবা? তপেশ গাঙ্গুলী। বলো তো কী নাম বললুম?

গিরিধারী বললে—তইপেশ গোঙ্গুলী!

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—হ্যাঁ, তপেশ গাঙ্গুলী, ঠিক হয়েছে। গিয়ে তুমি বলবে আমি একটা মেয়ের ভালো কুষ্ঠী এনেছি। সে-মেয়েটার বিধবা হওয়ার যোগ নেই। বুঝলে? ঠিক বুঝলে তো? সে-মেয়েটির কুষ্ঠীতে বিধবা হওয়ার যোগ নেই—

গিরিধারী বুঝলো কি বুঝলো না, তা বোঝা গেল না, খানিক পরে একলাই ফিরে এলো। বললে—ম্যানেজারবাবু ফিরে এলে আপনি তার সঙ্গে দেখা করবেন বাবুজী। মালিকন এখন দেখা করবেন না—

—দেখা করবেন না?

গিরিধারী বললে—না।

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—ঠিক বলছো দেখা করবেন না?

গিরিধারী বললো—হ্যাঁ বাবুজী, মালিকনের এখন সময় নেই!

—সময় নেই? দেখা করবার সময় নেই?

তপেশ গাঙ্গুলী মনে মনে রাগতে লাগলো। তপেশ গাঙ্গুলী জানে যে রাগলে সে কারোর নয়। রাগলে সে লঙ্কা-কান্ড বাধিয়ে দিতে পারে. তাই রাগটা সে হজম করে নিলে। তখন সে আবার বাড়ির দিকেই ফিরছিল। কিন্তু না, আবার গিরিধারীর কাছে ফিরে গেল। বললে—তাহলে যে তোমাকে বখশিস দিয়েছিলুম সেটা ফিরিয়ে দাও। ফিরিয়ে দাও সেই টাকাটা...

গিরিধারী প্রথমে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিল।

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—ভাবছো কী অমন বোকার মতোন? আমার যখন কোনও কাজ হলো না তোমাকে দিয়ে, তখন তোমায় বখশিস দিয়ে আমার কী লাভটা হলো? বলো না, চুপ করে রইলে কেন? আমার কি কিছু লাভ হলো?

গিরিধারী বললে—না।

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—তাহলে আমার টাকাটা আমাকে ফিরিয়ে দাও—

যুক্তিটা গিরিধারী বুঝলো। বুঝতে পারলে যে টাকাটা নেওয়া তার অন্যায় হয়েছে। ওটা বাবুজীকে ফিরিয়ে দেওয়াই উচিত।

সে ট্যাঁক থেকে টাকাটা বার করে বাবুজীর হাতে ফিরিয়ে দিলে। তপেশ গাঙ্গুলী তখন খুশী হলো। আর একটু হলেই তার টাকাটা গচ্চা যেতো। টাকাটা নিয়ে তার বুক-পকেটের ব্যাগের মধ্যে রেখে দিলে।

তারপর ট্রাম-রাস্তায় গিয়ে চলন্ত ট্রামে উঠে পড়লো। দিনটাই তার নষ্ট হলো। ট্রামটা খিদিরপুরের পুল পেরিয়ে যেই মোড়ে এসে পৌঁছেছে, সেইখানেই টপ্ করে নেমে পড়লো। আর দাঁড়ালো না, সোজা চলতে লাগলো নিজের বাড়ির দিকে।

'মহাকালী-আশ্রম' নাম-করা জ্যোতিষ-কার্যালয়। জ্যোতিষ-মহারাজ তখন একলা খদ্দেরের আশায় রাস্তার দিকে চেয়ে বসেছিলেন। তপেশ গাঙ্গুলীকে আসতে দেখে ডাকতে লাগলেন—ও তপেশবাবু, তপেশবাবু, আসুন আসুন, ভেতরে আসুন।—

ডাকাডাকিতে তপেশবাবু ভেতরে ঢুকলেন। জ্যোতিষী বললেন—মশাই, আপনার তো দেখাই নেই। সেই যে আমার কাছ থেকে আপনার মেয়ের কুষ্ঠী করিয়ে নিয়ে গেলেন, তারপর থেকে তো আর আপনার টিকিটি দেখা যায় না। কী ব্যাপার?

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—সেই মেয়ের তো এখনও বিয়েই হয়নি! আগে মেয়ের বিয়ে হোক তবে তো টাকা দেব!

—সে কী মশাই! আপনার মেয়ের যদি বিয়ে নাই-ই হয় তো টাকা পাবো না?

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—আমি তো আপনাকে বলেইছি যে মেয়ের বিয়ে হলেই আমি আপনার টাকা মিটিয়ে দেব, আর একদিনও টাকা ফেলে রাখবো না।

জ্যোতিষী তো অবাক। বললে—সে কী মশাই আপনার মেয়ের বিয়ে যদি না-ই

চলা-ফেরা করতে হয়।

সেখানেও সেই এলাহাবাদেও কোনও সুরাহা হয় না। জ্যোতিষী সেখানেও আছে, তবে সংখ্যায় কম। বিবাহ-যোগ্যা বৈধব্য-যোগহীন কন্যার সন্ধান দিতে পারে না।

সেখান থেকে যান হরিদ্বারে। হরিদ্বারে অসংখ্য মন্দির। যেখানে মন্দির বেশি, বুঝতে হবে সেখানকার মানুষ বেশি ভগবানে বিশ্বাসী। আর তা ছাড়া বাইরে থেকে ভগবানে বিশ্বাসী তীর্থ-যাত্রীদেরও সেখানে আমদানি বেশি।

কারো সন্তান হয় না, কারো মেয়ের বিয়ে হয় না, কারো চাকরি হয় না, বা কারো দুরারোগ্য ব্যাধি। সব মানুষেরই সমস্যা আছে। সব মানুষই সমস্যা-পীড়িত, তাদের সমস্যা দূর করতে পারবে কে?

দূর করতে পারবে দুজন। এক -মন্দিরের বিগ্রহ, আর দুই- জ্যোতিষী।

মন্দিরের বিগ্রহ তো কথা বলতে পারেন না। মন্দিরের পান্ডারাই সমস্ত প্রণামী নিজেদের ট্যাঁকে পোরে। দেবতার নৈবেদ্য পুরোহিত আর পান্ডা-মশাইরা চুরি করে পেট-পুজো করে। কিন্তু জ্যোতিষী?

জ্যোতিষী কথা বলতে পারেন। জন্মক্ষণ, তারিখ আর স্থান বললে তাঁরা জাতক-জাতিকার জন্ম-পত্রিকা তৈরি করে দেন, মন্দিরের বিগ্রহের মতোন মূক-বধির নন।

মল্লিক-মশাই সেই হরিদ্বারে গিয়েও জ্যোতিষীর শরণাপন্ন হন। সেখানেও তিনি তাঁর আর্জি জানান। এবং তাঁর সমস্যার সমাধান হলে তিনি জ্যোতিষীকে মোটা রকমের প্রণামী দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন।

সব জ্যোতিষীই প্রণামীর লোভে অনেক বিবাহ-যোগ্যা, বৈধব্য-যোগহীন জাতিকার জন্ম-পত্রিকা এবং ঠিকানা দেন। সেই ঠিকানা সংগ্রহ করে মল্লিক-মশাই আবার সেই সেই ঠিকানায় গিয়ে পাত্রীদের অভিভাবকদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করেন।

সেখানে গিয়েও একই কথা শোনেন। শোনেন কোনও জাতিকার দু'বছর আগেই বিবাহ-সম্পন্ন হয়ে গেছে।

আর যাদের হয়নি, তারা মল্লিক-মশাই-এর প্রস্তাব শুনে তেড়ে মারতে আসে।

এত বড় আস্পর্ধা! আমরা অনূঢ়া মেয়ের বাবা হয়েছি বলে কি পিশাচ বলতে চান? তার চেয়ে মেয়ের গলায় কলসী বেঁধে তাকে নদীতে ডুবিয়ে মারবো। আমরা গরীব লোক বলে কি আমাদের মায়া-দয়াও থাকতে নেই।

একটা পাত্রীর ঠিকানায় গিয়ে মল্লিক-মশাই একটু আশার আলো দেখতে পেলেন।

যেদিন মল্লিক-মশাই সেই ঠিকানায় গিয়ে পৌঁছলেন, সেই দিনই পাত্রীর বাবার দেহান্ত হয়েছে। সবাই শোকগ্রস্ত। সেই মৃত্যুকে ঘিরেই সবাই তখন বিহ্বল। তখন কথা বলবার সময় বা মানসিক অবস্থা তাদের নেই।

পাত্রীর পাকা একটা বাসযোগ্য বাড়িও নেই। মাটির দেওয়াল, আর ওপরে খাপরার চাল। পাত্রীর ভাই চাকরি পেয়ে বেহারে চলে গেছে। সেখানে গিয়ে নিজে পছন্দ করে একটা বিয়ে করেছে। বাড়িতে খবরও দেয়নি। বিধবা মা আর অবিবাহিত বোন দেখা করতে গিয়েছিল সেখানে। ছেলে অপমান করে মা আর বোনকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

বাপের মৃত্যুর খবর ছেলেকে টেলিগ্রাম করে জানানো হয়েছে। ছেলে বাবার মৃত্যুর খবর পেয়ে বাড়ি আসবে কিনা তারও ঠিক নেই।

মল্লিক-মশাই-এর একটু আশা হলো মনে।

সেইদিনই টেলিগ্রাম করে জানিয়ে দেওয়া হলো ঠাকমা-মণিকে। যতোদিন না মৃতের শ্রাদ্ধ-শান্তি হয়, ততো দিন তিনি অপেক্ষা করবেন। হরিদ্বারের জ্যোতিষী মহারাজ বলে দিয়েছেন বিশেষ করে যে এই পাত্রী অত্যন্ত সৌভাগ্যবতী। এ-মেয়ের বৈধব্য-যোগ তো নেই-ই, উপরন্তু অনেক সৌভাগ্য-যোগ এর আছে।

জ্যোতিষী-মহারাজ আরো বলে দিয়েছিলেন যে এই জাতিকার অনেকগুলো ভালো যোগ আছে। যেমন অখণ্ড-সাম্রাজ্য-যোগ, গজ-কেশরী-যোগ, লক্ষ্মী-যোগ, দীর্ঘায়ু-যোগ, সুনফা-যোগ, চির-আয়ুষ্মতী-যোগ, কণক-দণ্ড-যোগ, অধি-যোগ প্রভৃতি।

এই জাতিকার ঠিকানা দেওয়ার সময় জ্যোতিষী-মহারাজ বলেছিলেন যে যদি এই কন্যার এখনও বিবাহ না হয়ে থাকে, তাহলে এই পাত্রীর সঙ্গে যে-কোনও পাত্রের বিবাহ হলে বিবাহের পর পাত্রের পুনর্জীবন লাভ হবে।

মল্লিক-মশাই খুশী হয়ে এই জ্যোতিষী-মহারাজকে নগদ একশো টাকা দক্ষিণা দিয়েছিলেন। বলেছিলেন--যদি এখানে পাত্রর বিবাহ হয় তো তখন আরো পাঁচশো টাকা নগদ দক্ষিণা দেবেন জ্যোতিষী-মহারাজকে। কারণ এত ভালো পাত্রীর সন্ধান আগে আর কোনও জ্যোতিষীই দেননি।

কিন্তু যখন সেই পাত্রীর ঠিকানায় গিয়ে পৌঁছলেন তখন পাত্রীর আর্থিক দুর্দশা দেখে মল্লিক-মশাই অবাক হয়ে গেলেন। এতগুলো শুভ যোগ যে জাতিকার তার এমন দারিদ্র্য-যোগ কেন? অনেক সময় এমন হয় যে বিবাহের আগে পাত্রী খুব দারিদ্র্যের ঘরে জন্মে অর্থকষ্টে ভোগে, কিন্তু বিবাহের পরে ভাগ্যের অভাবনীয় পরিবর্তন হয়। এই পাত্রীরও বোধহয় সেই রকম জন্ম-পত্রিকা। বিবাহের পর এর ভাগ্যোদয় হবে।

বড় আশা নিয়ে মল্লিক-মশাই একটা ধর্মশালায় উঠলেন। একেবারে অজ পল্লীগ্রাম! এক মাইল দূরে একটা মন্দির আছে. আর সেই মন্দিরের সুবাদে একটা ছোট ধর্মশালাও তৈরি করে দিয়েছেন গ্রামের জমিদার পুণ্যার্থীদের জন্যে।

তিনি ঠিক করলেন, শ্রাদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত তিনি সেইখানেই কয়েক রাত কাটাবেন। সেই মর্মে টেলিগ্রামও করে দিলেন ঠাকমা-মণিকে। আর ধীরে সুস্থে একটা বড়ো চিঠিও পাঠিয়ে দিলেন তাঁকে। সেই চিঠিতে তিনি জানিয়ে দিলেন যে কন্যাটি পিতৃহীনা এবং গরীব বটে. কিন্তু জ্যোতিষী-মহারাজের কৃপায় এই অসাধারণ জাতিকার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। আমি এই জন্য জ্যোতিষী-মহারাজকে একশত টাকা প্রণামী দিয়াছি। পরে বিবাহ হইলে আরো পাঁচশত টাকা প্রণামী দিব. কবুল করিয়াছি। এই জাতিকার জন্ম-পত্রিকাতে নানা রকম শুভ যোগ আছে—যেমন লক্ষ্মী-যোগ. অখণ্ড-সাম্রাজ্য-যোগ, কণকদণ্ড-যোগ, গজ-কেশরী-যোগ. দীর্ঘায়ু-যোগ, সুনফা-যোগ, চির-আয়ুষ্মতী যোগ, অধিযোগ প্রভৃতি। এখন কন্যার পিতার মৃত্যুর পর তাঁহার পরলোকগত পিতার আত্মার শান্তি-কামনার জন্য শ্রাদ্ধের আয়োজন চলিতেছে। এই অনুষ্ঠান মিটিয়া গেলে আমি জাতিকার মাতার কাছে আমার প্রস্তাব পেশ করিব। তাহারা অত্যন্ত গরীব। তাহাদের মাথা গুঁজিবার মতো একটা পাকা গৃহও নাই। জাতিকার একমাত্র ভ্রাতা চাকরি গ্রহণ করিয়া দূর দেশে বিবাহ করিয়া মা এবং ভগ্নীকে পরিত্যাগ করিয়াছে। একটা পত্র লিখিয়াও তাহাদের সংবাদ রাখে না। পিতৃ-শ্রাদ্ধের সংবাদও তাহার কাছে পাঠানো হইয়াছে। কিন্তু সে বোধহয় পিতৃ-শ্রাদ্ধে যোগদান করিতে আসিবে না। আমি সেই সুযোগ গ্রহণ করিয়া কন্যার মাতাকে অর্থের লোভ দেখাইব। আমার মনে হয়. এত অর্থের লোভ কন্যার মাতা দমন করিতে পারিবে না। যাহাই হউক, আমি আপনাকে যথা-সত্বর পত্রযোগে জানাইব। আপনি আমার প্রণাম গ্রহণ করিবেন। ইতি—সেবক পরমেশ মল্লিক। তাং...।

চিঠিটা ঠাকমা-মণি যথা-সময়েই পেলেন। চিঠিটা বার-বার পড়লেন। মনটা একটু শান্ত হলো চিঠিটা পড়ে। এতদিন যতো চিঠি মল্লিক-মশাই লিখেছেন তাতে কোনও নির্দিষ্ট আশার কথা জানাতে পারেননি। এই-ই প্রথম মল্লিক-মশাই-এর চিঠি পেয়ে ঠাকমা-মণি মনে একটু আশা পেলেন।

সেই দিনই সন্ধেবেলায় ঠাকমা-মণি তার উকিলের চেম্বারে গিয়ে চিঠিটা দেখালেন।

রেখে দিয়েছিলেন। টাকাটা নিয়ে রবিবারেই ডাক্তারবাবুর কাছে যাওয়ার কথা। কিন্তু মাসিমা বলেছিল—আমি কিছুতেই হাসপাতালে যাবো না। আমার বিশাখার বিয়ে না দেখে আমি ডাক্তারের কাছে যাবো না।

সন্দীপ বলেছিল—কিন্তু আপনার জীবনটা আগে, না বিশাখার বিয়েটা আগে?

মাসিমা বলেছিল—আমার বিশাখার বিয়েটা আগে।

সন্দীপ বলেছিল—কিন্তু বিয়ে তো এক কথায় হয় না মাসিমা। তার জন্যে তোড়-জোড় করতেও তো সময় লাগবে। ততোদিন আপনি কতো কষ্ট ভোগ করবেন?

মাসিমা কথা বলছিল আর কাঁদছিল। বলেছিল—বিশাখার বিয়েটা হয়ে গেলে আমার মরেও সুখ। বিশাখা আমার গলার কাঁটা। যতোদিন তার বিয়ে না হবে, ততোদিন আমার বেঁচে থেকেও সুখ হবে না। আমি ওই মেয়েকে নিয়ে অনেক জ্বলেছি বাবা, জ্বলে জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে গিয়েছি। আমি আর সে জ্বালা সহ্য করতে পারছি না—

সন্দীপ এবার বিশাখার কাছে গেল। গিয়ে গলা নিচু করে বললে—তুমি তোমার মা'কে একটু বুঝিয়ে বলো না। তোমার কথা মাসিমা অগ্রাহ্য করতে পারবে না। মাসিমা আমাদের কারো কথা শুনছে না। তুমি বলো গিয়ে যে আমি বলেছি তোমাকে বিয়ে করবো।

মাও বললে—হ্যাঁ মা, তুমি একটু বুঝিয়ে বলো তোমার মা'কে। এরকম অবুঝ হলে কি চলে? হুট বললেই তো আর বিয়ে হচ্ছে না। তাতেও তো কিছু সময় লাগবে। তুমি নিজে বললে তোমার মা শুনতে পারে। আমাদের কারোর কথা তো দিদি শুনছে না।

বিশাখা শেষ পর্যন্ত মা'র বিছানার পাশে গেল। বললে—মা, শুনছো? ও মা?

মাসিমা চোখ খুললো।

বিশাখা মা'র মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বললে—মা, আমি বিশাখা বলছি।

মা বোধহয় মেয়েকে চিনতে পারলে। বিশাখাকে দেখে মা'র চোখ দিয়ে ঝর-ঝর করে জল পড়তে লাগলো।

বিশাখা নিজের শাড়ির আঁচল দিয়ে মা'র চোখ দুটো মুছিয়ে দিলে।

বললে—মা, তুমি আমার বিয়ে নিয়ে অতো ব্যস্ত হচ্ছো কেন? আগে তুমি ভালো হয়ে ওঠো, তারপরেই আমার বিয়ে হবে। সন্দীপ আমাকে কথা দিয়েছে যে সে আমাকে বিয়ে করবে। তোমার অসুখটা ভালো হয়ে গেলেই আমাদের বিয়ে হয়ে যাবে। সন্দীপ আমাকে কথা দিয়েছে—

মা রেগে গেল। আরো জল পড়তে লাগলো তার দু'চোখ দিয়ে।

বললে—মুখপুড়ী, তুই বেরো আমার সামনে থেকে। বেরিয়ে যা, বেরিয়ে যা। তোর আইবুড়ো মুখ দেখলে আমার গা জ্বলে যাচ্ছে, আমার সামনে থেকে বেরিয়ে যা—

বলে আরো কাঁদতে লাগলো।

বিশাখা এরপর কি করবে বুঝতে পারলে না। সন্দীপের কাছে এলো। সন্দীপের মা'ও সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল। তারাও দূর থেকে সব শুনেছে, সব দেখেছে।

বিশাখা মুখ কালো করে এসে দাঁড়ালো। বললে—মা তাড়িয়ে দিলে আমাকে—

কথাগুলো বাহুল্য। কারণ মাসিমা বিশাখাকে কি বলেছে তা দুজনেই শুনেছে।

সন্দীপ মা'র দিকে ফিরলো।বললে—মা, এখন কি করি বলো তো?

মা বললে—কি আর করবি। দিদি যখন একবার জিদ ধরেছে তখন কারো সাধ্যি নেই তাকে রাজি করায়। তাহলে বিয়েটাই আগে হোক, চিকিৎসা না হয় পরেই হবে।

সন্দীপের মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরোল না সেই মুহূর্তে। সেও তখন নির্বাক

হয়ে গেছে। সন্দীপের মুখেও তখন কথা নেই, বিশাখার মুখেও তখন কোনও কথা নেই। সন্দীপের মা'র মনে হলো, মানুষের এই পুরনো পৃথিবীটাও যেন হঠাৎ সব ব্যাপার দেখে শুনে নির্বাক, নিঃশব্দ, নিঃস্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। পৃথিবীটাও যেন এই অদ্ভুত কান্ড দেখে কথা বলতে ভুলে গেছে।
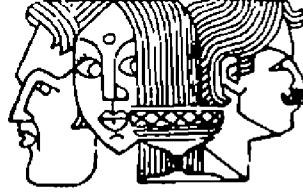
এখন এতদিন এত বছর পরে সন্দীপের মনে হয় সে নিজেই অপরাধী। পরের ওপর অপরাধের বোঝা চাপিয়ে সকলেই তো অপরাধ-মুক্ত হতে চায়। নিজের শাস্তির বোঝাটাকে হালকা করার জন্যে পরের কাঁধে দোষ চাপিয়ে সকলেই নিজের বিবেকের কাছে নিষ্পাপ থাকতে চায়। সেইটেই তো নিয়ম। সেইটেই তো সব চেয়ে সোজা পথ। তাতে বাইরের লোকের কাছে নির্দোষ থাকা যায়।

কোর্টে দাঁড়িয়েও তো সে জজের সামনে সেই কথাই বলেছিল। সে স্বীকারই করেছিল যে তার অপরাধের জন্যে সে কাউকেই দোষী মনে করে না। কাউকেই সে দায়ী মনে করে না। আসল অপরাধী সে নিজেই।

সরকারী উকিল জিজ্ঞেস করেছিলেন—কেন এত টাকা চুরি করেছিলেন?

সন্দীপ বলেছিল- যে-জন্যে মানুষ চুরি করে, আমিও সেই জন্যেই করেছিলুম।

—কী জন্যে মানুষ চুরি করে?

সন্দীপ বলেছিল—লোভের জন্যে মানুষ চুরি করে, আবার নিজের দরকারের জন্যেও মানুষ টাকা চুরি করে--

সরকারী উকিল জিজ্ঞেস করেছিলেন--আপনি তো একলা মানুষ। আপনার স্ত্রী নেই, ছেলে-মেয়ে নেই। বলতে গেলে আপনার সংসার বলতেও কিছু নেই। তাহলে আপনি এত টাকা চুরি করতে গেলেন কেন?

সন্দীপ সেই আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বলেছিল—চুরি করেছিলুম আমার লোভের জন্যে। টাকার ওপরে আমার লোভ ছিল।

সেদিন সন্দীপ সেখানে দাঁড়িয়ে যে-কথাগুলো বলেছিল, আজ এতদিন পরে সেই দৃশ্যটা তার চোখের সামনে ভেসে উঠছিল, সেই কথাগুলোও তার কানে প্রতিধ্বনি তুলছিল। তখনও সে জানতো যে সে অপরাধী, এখনও সে জানে যে সে অপরাধী। সে তার অপরাধের পাপ কারো ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে নিজের মুক্তি চায়নি।

কিন্তু কী সেই অপরাধ?

মানুষকে ভালোবাসা যদি অপরাধ হয়, তাহলে সে তো অপরাধীই বটে। মানুষের শুভ-কামনা করা যদি অপরাধ হয়, তাহলেও তো সে অপরাধী। তার অপরাধের কি কিছু ক্ষমা আছে? তার অপরাধের কি কিছু যুক্তি আছে? তার অপরাধের কি কিছু প্রায়শ্চিত্ত আছে?

জেলখানাতে সে যতোদিন বন্দী ছিল ততোদিন সে মোটামুটি একটু শান্তিতে ছিল। কিন্তু এখন সেই বারোর-এ বিডন স্ট্রীটের বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে সেই সব পুরনো কথাগুলো মনে পড়ছিল। সেই একেবারে গোড়া থেকে সমস্ত কথাগুলো। সেই বেড়াপোতা থেকে একেবারে অনাথ অবস্থায় এক কাপড়ে কপর্দকশূন্য অবস্থায়

হয় তো আমি আমার হক্‌কের টাকা পাবো না? আপনিই তো বলেছিলেন নতুন মাসের মাইনে পেয়েই সব শোধ-বোধ করে দেবেন।

তপেশ গাঙ্গুলী বলে উঠলো—আমি তো আমার মেয়ের বিয়ের জন্যে আপনাকে দিয়ে কুষ্ঠী করিয়েছিলুম। তা আগে তার বিয়েটা হোক, আপনি তো দেখছি বড়ো বে-আক্কেলে লোক মশাই! বিয়ে না হতেই টাকার তাগাদা আরম্ভ করে দিয়েছেন।

জ্যোতিষী-মহারাজ বললে—আমি আপনার কাজ করে দিলুম আর আমার মেহনতের মজুরী পাবো না? টাকার তাগাদা করতেই বে- আক্কেলে লোক হয়ে গেলুম! আপনার মেয়ের কুষ্ঠী করতে আমাকে কি কম মেহনত করতে হয়েছে, ভাবুন তো। আপনার মেয়ের কুষ্ঠীতে যাতে বৈধব্য-যোগ না থাকে তার জন্যে আপনার মেয়ের বয়েস ভাঁড়িয়ে বৃহস্পতিকে লগ্নের সপ্তমে বসিয়ে দিয়েছিলুম, লগ্নপতিকে তুঙ্গে করে দিলুম, নবমপতিকে নবমস্থানে করে দিলুম। তার বেশি আমি আর কী করতে পারি?

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—তাহলে আমার মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না কেন?

জ্যোতিষী বললে—আপনার মেয়ের বিয়ের দেরি আছে! আপনার মেয়ের আসল কুষ্ঠীতে এখন বিবাহ-যোগ নেই!

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—যাতে আমার মেয়ের কুষ্ঠীতে বিবাহ-যোগ এখন থাকে, সেইটে করে দিন। তা না হলে আপনি কীসের জ্যোতিষী? আপনার 'মহাকালী আশ্রমে'র সাইন-বোর্ডে তাহলে কেন লেখা আছে যে পুত্র-কন্যার বিবাহের ব্যাপারে আপনি সাহায্য করতে পারেন।

জ্যোতিষী বললে—সাহায্য করতে পারিই তো! আপনার মেয়ের আসল কুষ্ঠীতে সপ্তমে 'মঙ্গল' আছে, তা জানেন? আমি সেটা বদলে সেখানে 'বৃহস্পতি' বসিয়ে দিয়েছি। আসলে তো আপনার মেয়ের কুষ্ঠীতে 'ভৌম-দোষ' আছে—

—ভৌম-দোষ? তার মানে?

জ্যোতিষী বললে—'ভৌম-দোষ' মানে বিয়ে হওয়ার কিছুদিন পরেই স্ত্রী-জাতিকা পতিহীন হবে আর পুরুষ জাতক বিপত্নীক হবে!

তপেশ গাঙ্গুলী ভয়ে যেন শিউরে উঠলো। বললে—আমার মেয়ের কুষ্ঠীতে তাই আছে নাকি?

—হ্যাঁ মশাই, হ্যাঁ—

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—তা মেয়ে বিধবা হোক ক্ষতি নেই, কিন্তু টাকা হবে তো মেয়ের? বিধবা হলেও বড়লোক স্বামীর টাকা তো উত্তরাধিকারী হওয়ার সূত্রে পায়। সেই টাকা হবে তো আমার মেয়ের?

জ্যোতিষী বললে—আপনি বলছেন কী? বাপ হয়ে মেয়ের বৈধব্যের চেয়ে টাকাটাকেই বড়ো বলে মনে করছেন? এ কী-রকম বাপ মশাই আপনি?

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—কেন? আমি অন্যায়টা কী বলেছি? টাকার চেয়ে আর কোনও বড়ো জিনিস আছে নাকি দুনিয়াতে?

তারপর একটু থেমে আবার বললে—এই যে আপনি, এই 'মহাকালী-আশ্রম' খুলে লোক-ঠকানোর দোকান করেছেন, এ কীসের জন্যে? টাকা উপায়ের জন্যেই তো? আর এই যে আমি রেলের অফিসে চাকরি করছি, মাসের অর্ধেক দিন তো অফিসেই যাই না, এ কীসের জন্যে? টাকার জন্যেই তো! ওই যে সামনে একটা সিনেমা-হাউস রয়েছে ওটা কীসের জন্যে? টাকার জন্যেই তো! ওই যে সমস্ত লোকগুলো ঘোড়া-গাধার মতো বাসে-ট্রামে বাদুড়ের মতো প্রাণ হাতে করে ঝুলতে ঝুলতে যাচ্ছে, ও কীসের জন্যে? টাকার জন্যেই তো!

জ্যোতিষী-মহারাজ এবার রেগে গেল।

বললে—এতই যদি আপনার টাকা-টাকা বাতিক, তাহলে আপনি বিয়ে করলেন কেন মশাই ? বিয়ে না করলে তো আপনার মেয়েও হতো না, আর মেয়ের বিয়ের জন্যে নকল কুষ্ঠীও করাতে হতো না ! আর টাকার জন্যে তাগাদাও দিতে হতো না।

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—কপাল মশাই, সবই কপাল। অথচ বাজারে গিয়ে দেখেছি এক-একজন চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকা কিলো দামের মাছ দর-দাম করছে না, রোজ এক কিলো-দেড় কিলো করে কিনে নিয়ে যাচ্ছে। কোত্থেকে যে তাদের এতো টাকা আসছে, তাও বুঝতে পারি নে। সবই বোধহয় কালো টাকা—

জ্যোতিষী বললে—তাহলে আমাকে আমার টাকাটা কবে দিচ্ছেন?

তপেশ গাঙ্গুলী পকেট থেকে মানি-ব্যাগটা বার করে তার থেকে একটা টাকা বার করে জ্যোতিষীর দিকে এগিয়ে দিলে, সে-টাকাটা সে গিরিধারীর কাছ থেকে ফিরিয়ে নিয়েছিল। বললে—দরকার নেই অতো কথার, এই নিন আপনার টাকা—

—মাত্র একটা টাকা?

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—এখন একটা টাকাই নিন, পরে মেয়ের বিয়েটা হয়ে গেলে আপনার সব টাকা সুদে-আসলে শোধ করে দেব! যান—

বলে আর সেখানে দাঁড়ালো না, সোজা মনসাতলা লেনের দিকে পা বাড়ালে।

মানুষ যখন জন্মায় তখন তার ওপরে তার হাত থাকে না। কিন্তু মৃত্যু? মৃত্যুর একটা ইতিহাস আছে। ক্রোধের ঔরসে তার বোন হিংসার গর্ভে নাকি কলির জন্ম। আবার কলিও নিজের বোন দুরুক্তিকে বিয়ে করলো। তাদের দুটো সন্তান হলো। ছেলেটির নাম ভয় আর মেয়েটির নাম মৃত্যু। এ সমস্তই শোনা কথা। মানে কিংবদন্তী।

কিন্তু তাহলে কি সত্য, ত্রেতা বা দ্বাপরে মৃত্যু ছিল না?

ছিল বৈকি! কিন্তু সে অন্যরকম মৃত্যু। সে মৃত্যুর নাম জীবনের অবলুপ্তি! কিন্তু এ তো নয়। আজকের সমস্ত মৃত্যুই অপঘাত মৃত্যু। এই অপঘাত মৃত্যুর সমস্ত কারণটাই মানুষ নামক পশুর তৈরি। যে-ইনজেকশান দেওয়া উচিত নয়, সেই ইনজেকশান দিতেই হবে। যে-অস্ত্রোপচার অপরিহার্য নয়, সেই অস্ত্রোপচার এখন করতেই হবে। যে-ওষুধ না খেলেই মঙ্গল, সে-ওষুধ এখন খেতেই হবে। এতে রোগীর ভালো হোক আর না হোক, ওষুধ কোম্পানীর পক্ষে লাভজনক এবং সেই সঙ্গে ডাক্তারের পক্ষেও লাভজনক।

সমস্ত টাকার দায়িত্বটা নিয়েছিলেন চাটুজ্জে বাড়ির বউমা। তিনি বলেছিলেন—সে কী কথা বামুনদি, টাকার অভাবে মানুষের চিকিৎসা হবে না, তাই কখনও হয়?

কিন্তু সন্দীপ শুধু হাতে কিছুতেই টাকা নেবে না। বলেছিল—আমার যদি নিজের বলে কিছু থাকে, তা কেবল এই পৈতৃক ভাঙা বাড়িটা। আপনাকে এটাকে বন্ধক রাখতেই হবে। তার বদলে আপনি আমাকে আপাততঃ কুড়ি হাজার টাকা দিন। ওই টাকাটা পেলেই ডাক্তারবাবু চিকিৎসা করতে রাজি হবেন।

চাটুজ্জে গিন্নীও আপত্তি করতে পারেননি। সেই হাত-চিঠিটা নিজের কাছে

এখানকার মল্লিক-মশাইএর কাছে এসে ওঠা। এখানে সামান্য অর্থের বিনিময়ে মুখার্জি-বাবুদের বাড়িতে আশ্রয় পাওয়া আর সেই সূত্রে বিশাখাদের সঙ্গে পরিচিত হওয়া, আর তারপর ব্যাঙ্কে চাকরি পাওয়া। এও তো এক-রকমের পদ-যাত্রা!

সে কলকাতায় এসে যেমন জীবন দেখতে পেলে তেমনি মৃত্যুও দেখতে পেলে, যেমন অফুরন্ত অর্থ দেখতে পেলে তেমনি অফুরন্ত অনর্থও দেখতে পেলে। সে এসেই জানতে পারলে যে অর্থ না-থাকার যে যন্ত্রণা, অর্থ থাকার যন্ত্রণা তার চেয়ে কোনও অংশে কম নয়। তার মনে পড়তে লাগলো সেই দিনটার কথা। সেই যেদিন তার জীবনে আবার সে নতুন করে জন্ম নিলে।

হ্যাঁ, সেদিনই তো তার আবার নতুন করে জন্ম হলো। বলতে গেলে সেদিন তার যে শুধু নব-জন্ম হলো তাই-ই নয়, সেদিন থেকেই সে এক অন্য মানুষ হয়ে গেল! হ্যাঁ অন্য-মানুষই বটে। তার জীবনের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ শুরু হয়ে গেল সেই দিন থেকেই। আর সেই দিন থেকেই এ-উপন্যাসের মোড় ঘুরে গেল।

মনে আছে করমচাঁদ মালব্যজী একদিন টেলিফোন করেছিলেন তাকে। বলেছিলেন —জানো লাহিড়ী, আমাদের বোম্বের হেড্ অফিস তোমার ব্রাঞ্চের রেজাল্ট দেখে খুব খুশী। আমার সিলেকশান যে ভুল হয়নি, তুমি তার প্রমাণ দিয়েছ। সেই জন্যেই আমার খুব আনন্দ হয়েছে।।

নতুন ব্রাঞ্চ! বেশির ভাগই নতুন স্টাফ। কিন্তু প্রত্যেককে খুব ভালো করে পরীক্ষা করে নেওয়া হয়েছে। যারা বাইরে থেকে প্রমোশন নিয়ে এসেছে তাদের মধ্যে সব চেয়ে যে বেশি কাজের লোক সে হচ্ছে হাশেম। মুহম্মদ হাশেম হয়েছে তার ডেপুটি। হাশেম না থাকলে তাদের ব্রাঞ্চ অত তাড়াতাড়ি অত উন্নতি করতে পারতো না। যখনই অফিসের কাজে কোনও প্রবলেম গজিয়ে উঠতো, তখনই সন্দীপ সবাইকে হাশেম সাহেবের কাছে পাঠিয়ে দিত। আর হাশেম সঙ্গে সঙ্গে অবলীলায় তার সমাধান বাতলে দিত। সন্দীপের সব চেয়ে বড়ো দায়িত্ব ছিল ব্যাঙ্কের ফিক্সড্-ডিপোজিট বাড়ানো। এক বছরে যে তা দেড় কোটির বিন্দুতে গিয়ে পৌঁছেছে, তার সমস্ত কৃতিত্বটা ওই মুহম্মদ হাশেমের।

হেড্-অফিস থেকে প্রশংসার চিঠি এলো সন্দীপের কাছে। তার প্রশংসনীয় পরিচালনার আর উদ্যোগের জন্যেই ন্যাশনাল ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের হাওড়া শাখার এই কৃতিত্ব। ব্যাঙ্কের আয় যতো বাড়বে ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের ততো উন্নতি।

কিন্ত সন্দীপ হাশেমকে ডাকলে। বললে এটা তোমার জন্যেই হলো হাশেম সাহেব। তুমি পার্টিদের সঙ্গে যে-রকম মিষ্টি ব্যবহার করেছ, তার ফলেই এই ডিপোজিট বেড়েছে। অথচ সুনাম হলো আমার। হয়তো এর জন্যে প্রমোশনও পাবো আমি। এটা কিন্ত আমার ভালো লাগছে না--

হাশেম বললে--কিন্তু আপনিই তো এ-ব্রাঞ্চের ম্যানেজার। আপনার প্রশংসা হবে না তো কার হবে?

সন্দীপ বললে—না, আমি তা জানি না। তুমি না থাকলে আজ এ-ব্রাঞ্চের এত উন্নতি হতো না। আমি জানি তুমি অফিসের ছুটির পর পার্টিদের বাড়ি-বাড়ি গিয়ে আমাদের ব্রাঞ্চের জন্যে ক্যান্ভাসিং করেছ।

কথাটা শুনে চলে গেল হাশেম তার নিজের কামরায়।

কিন্তু তার দিন পনেরো পরে হাশেমই হঠাৎ হাতে একটা চিঠি নিয়ে এসে হাজির হলো। এসে বললে—এ কী করেছেন স্যার আপনি?

—কী করেছি?

হাশেম বললে—আপনিই তো আমাকে এ-চিঠি পাঠিয়েছেন।

সন্দীপ বললে—তোমাকে পাঠাবো না তো কী করবো ? ও তো তোমারই স্পেশ্যাল গ্রেড-প্রমোশনের ব্যাপার। ওটা তুমি এস্‌ট্যাব্‌লিশমেন্ট-সেকশানে পাঠিয়ে দাও। পরের মাসের স্যালারি-বিলের সঙ্গে আরো পাঁচশো টাকা করে যোগ হয়ে যাবে। তোমার পার্সোনাল-ফাইলে ওটা থাকবে।

হাশেম অবাক হয়ে চেয়ে রইলো ম্যানেজার-সাহেবের দিকে। এ-যুগে কি এ-ও সম্ভব! এ কী রকম মানুষ এই ম্যানেজার ? বললে—স্যার, ইণ্ডিয়ার কোনও ব্যাঙ্কের ইতিহাসে কিন্তু এ-রকম আগে কখনও হয়নি। আপনি ম্যানেজার, প্রমোশন হলে তো আপনারই হবে। আমার কেন গ্রেড্‌-প্রমোশন হবে ?

সন্দীপ বললে—আমি খুব কড়া করে হেড্‌-অফিসে চিঠি লিখে পাঠিয়েছিলুম। লিখেছিলুম যে যে-লোকটার জন্যে এই অভাবনীয় ডিপোজিট জমা হলো তাকে স্বীকৃতি না দিলে স্টাফেরা উৎসাহিত বোধ করবে না। তাদের এনকারেজমেন্ট দেওয়া উচিত—

—আপনি লিখেছিলেন ?

সন্দীপ বললে—বাঃ, লিখবো না ? কাজ করলে তুমি আর প্রমোশন নেব আমি ?

হাশেম সাহেব বললে—কিন্তু সেইটেই তো সব জায়গার নিয়ম। সেই রকমই তো আমাদের ব্যাঙ্কে চলে আসছে—

সন্দীপ বললে—শুধু এই ব্যাঙ্কেই নয়, এত দিন সব ব্যাঙ্কেই এই রকম নিয়ম চলে আসছিল। আর শুধু ব্যাঙ্কেই নয়, সর্বত্র। এই সংসারেও তো এতদিন এই সব নিয়মই চলে আসছে। একটা অন্যায় চিরকাল ধরে চলে আসছে বলেই কি সেটা ন্যায় বলে চালানো উচিত ? তুমিই বলো ?

হাশেম চুপ করে রইল, কী জবাব দেবে বুঝতে পারলে না।

—কী হলো, চুপ করে রইলে কেন ?

হাশেম বললে—এ-রকম ঘটনা পৃথিবীতে কখনও ঘটেছে বলে আমি জানি না স্যার।

সন্দীপ বললে—দেখ হাশেম সাহেব, আমাদের হিন্দুদের মধ্যে একটা কথা চালু আছে যে, দেবতার নৈবেদ্য যদি পুরুত-মশাই চুরি করে খেয়ে নেয় তো সে-নৈবেদ্য আর দেবতার ভোগে লাগে না। কিন্তু আমাদের এই পৃথিবীতে তো তাই-ই চলে আসছে বরাবর। এই যে আমাদের ইণ্ডিয়া। এ-ইণ্ডিয়া যার জন্যে স্বাধীন হলো সেই লোকটার নাম হলো সুভাষ বোস। সেই সুভাষ বোসের যোগ্য সম্মান কি আমরা দিয়েছি ? তুমিই বলো, দিয়েছি ?

তারপর একটু থেমে আবার বলতে লাগলো—না, সম্মান দিই নি। আমরা পুরুত হয়ে দেবতার নৈবেদ্য চুরি করে খেয়ে নিয়েছি। আর সেই জন্যেই আজ আমাদের দেশের এই দুর্দশা। আমরা কাউকে তার প্রাপ্য সম্মান দিইনি। তাই প্রসন্ন হওয়ার বদলে আমাদের দেশের যিনি দেবতা তাঁর অভিশাপ আমরা পেয়েছি আর এখনও পাচ্ছি—

—কিন্তু এ-সময়ে আপনার তো ভীষণ টাকার দরকার। আমি সব শুনেছি।

সন্দীপ বললে—শুধু আমার নয়, আমাদের প্রত্যেকেরই টাকার দরকার। পৃথিবীতে এমন একটা লোককে তুমি খুঁজে বার করতে পারবে যে বলবে তার টাকার দরকার নেই ? পারবে তেমন লোক খুঁজে বার করতে ? বলো হাশেম, উত্তর দাও, চুপ করে থেকো না—

হাশেম সাহেব তখনও কোনও উত্তর না দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

সন্দীপ আবার বলতে লাগলো—দেখ, টাকার দরকার সকলেরই আছে। যার টাকা নেই তার তো টাকার দরকার থাকবেই, কিন্তু যার বেশি টাকা আছে, তারও বেশি টাকা চাই। এটা কেন হয় ? টাকা আমারও দরকার, টাকা তোমারও দরকার। কিন্তু যে যতো পাওয়ার যোগ্য তাই-ই তো তার পাওয়া উচিত। কিন্তু আজকের পৃথিবীতে কি তা হয় ? যে-লোক অযোগ্য সেই-ই সব কিছু পেয়ে যায়, আর যে-লোক যোগ্য তার

কপালে কিছুই জোটে না--

তখনও হাশেম সাহেব দাঁড়িয়ে আছে দেখে সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—কী হলো? তোমার কথার উত্তর পাওনি?

হাশেম সাহেব বললে—কিন্তু এখন তো আপনারও টাকার দরকার?

--স্বীকার করছি যে আমার টাকার দরকার, কিন্তু তুমি তোমার প্রাপ্য পাবে না কেন? আসলে তো তোমার জন্যেই ব্রাঞ্চে এত ডিপোজিট বেড়েছে। আর কেউ তা না-জানুক, আমি তো সেটা ভালো করেই জানি। আমি হেড্-অফিসে সেই কথাই লিখে জানিয়েছিলুম, তাই তোমার এই প্রমোশন--

হাশেম সাহেব আর কিছু না বলে ঘরের বাইরে চলে গেল।

তখন আবার সন্দীপের নিজের কাজ করার পালা। কাজ তো একটা নয়। বাড়িতে গেলেও সেই দুশ্চিন্তা, অফিসে এলেও সেই একই অবস্থা। তবু অফিসটায় এলেই তুলনামূলক ভাবে যেন একটু শান্তি। এখানে কাজ যেমন আছে, কাজের ঝামেলাও আছে তেমনি। কিন্তু কাজের ফাঁকে-ফাঁকে কেবল বাড়ির কথা মনে পড়ে যায়। মনে পড়ে যায় মাসিমার কথা, বিশাখার কথা, মনে পড়ে যায় কুড়ি হাজার টাকায় তার বাড়ি বাঁধা রাখার কথা। আরো কত কথা মনে পড়ে যায়।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার সচেতন হয়ে যায় সে। না, অফিসে বসে বাড়ির কথা ভাবা বে-আইনী। অফিসের চেয়ারে বসে বাড়ির ভাবনা মানে কাজে ফাঁকি দিয়ে মাসকাবারি মাইনে নেওয়া।

সঙ্গে সঙ্গে সে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে বসে। সকাল থেকেই কাজের পাহাড় জমে থাকে তার টেবিলের ওপর। একদিন এই ব্যাঙ্কেরই শ্যামবাজার ব্রাঞ্চে সে প্রথম চাকরি পেয়ে জীবন আরম্ভ করে। আর তারপর আজ সে নিজের খানিকটা যোগ্যতা আর করমচাঁদ মালব্যজীর দয়ায় এই চেয়ারে এসে বসেছে। আজ তার মাইনে বেড়েছে বটে কিন্তু আর্থিক দিক থেকে তার ভাগ্যের অবনতি ঘটেছে।

বেলা দুটোর পর থেকে তখন একটু হালকা থাকে তার কাজ। সেই সময়ে সবে সে একটু হাঁফ ছেড়েছে হঠাৎ শ্যামবাজার ব্রাঞ্চের মালব্যজী তার ঘরে এসে হাজির।

মালব্যজীকে দেখেই সন্দীপ উঠে দাঁড়ালো। বললে—স্যার, আপনি? হঠাৎ?

মালব্যজী বললেন—বোস, বোস—

বলে নিজেও সামনের চেয়ারে বসলেন। বললেন না এসে কী করবো? টেলিফোন করে করেও তোমাকে পেলাম না। টেলিফোন ভালো থাকলে আমাকে আর এখানে তোমার কাছে আসতে হতো না, কমপ্লেন করে দিয়েছ তো?

—হ্যাঁ। কিন্তু আপনি ডেকে পাঠালেই পারতেন! কষ্ট করে কেন আসতে গেলেন?

মালব্যজী বললেন--না এসে যে পারলুম না। মুহম্মদ হাশেমের খবরটা জানে এলো। তাই তো এলুম। তুমি হাশেমের মাইনে বাড়াতে হেড-অফিসে লিখেছিলে?

--হ্যাঁ স্যার। আমি ওকে দুটো ইনক্রিমেণ্ট দিতে রেকমেণ্ড করেছিলুম—

--কিন্তু তুমিই যখন ব্রাঞ্চের ম্যানেজার, তখন তোমারই তো দুটো ইনক্রিমেণ্ট হওয়া উচিত। কে তোমাকে হাশেমকে রেকমেণ্ড করতে বলেছিল? হাশেম?

সন্দীপ বললে--না স্যার না। হাশেম সে-রকম লোক নয়। বরং উল্টো। একটু আগেই সে এসেছিল সেই কথা বলতে। ও বলছিল যে আমিই যখন এ-ব্রাঞ্চের ম্যানেজার তখন ক্রেডিটটা আমারই পাওয়া উচিত। কিন্তু আমি বললাম—না, আসলে যে মানুষটার জন্যে এই রেকর্ডটা ভাঙলো সে আমি নই, সে ওই হাশেম। হাশেমই এই পাড়ায় ঘুরে সমস্ত বড়ো লোকদের মিষ্টি কথায় অনুরোধ করেই অসম্ভবটাকে সম্ভব করেছে। সুতরাং যা-কিছু বেনিফিট তার সবটা ওরই পাওয়া উচিত!

মালব্যজী বললেন—কিন্তু তোমার সংসারের অবস্থাটা যে আমি জানি। তোমার সংসারের প্রয়োজনের কথাটা তো আমার চেয়ে বাইরের আর কেউ বেশি ভালো করে জানে না। ওই পাঁচশো টাকা পেলে এই বিপদের সময়ে অনেক কাজে লাগতো—

সন্দীপ বললে—তা অবশ্য খুবই কাজে লাগতো!

—আর তা ছাড়া লোন নেওয়ার ফলে পুরো মাইনেটাও তো তুমি তোমার হাতে পাও না। তা থেকে অনেক টাকা তোমার মাইনে থেকে মাসে-মাসে কেটে নেওয়া হয়। সমস্তই তো আমি জানি। আর জানি বলেই তো আমি তোমাকে এই ব্রাঞ্চের ম্যানেজার করে দেওয়ার জন্যে নিজে বোম্বে অফিসে গিয়ে তদ্‌বির করেছিলুম।

সন্দীপ বললে—তার জন্যে আমি আপনার কাছে চির-জীবন কৃতজ্ঞ থাকবো। সে-কথা আমি আমার মা'কে বলেছিলুম। আমার মা'ও সে-জন্যে আমাদের গাঁয়ের কালী-মন্দিরে গিয়ে আপনার নামে পুজো দিয়েছিলেন।

মালব্যজী বললেন—কিন্তু তোমার দু'টো ইনক্রিমেন্ট হলে তোমার নিজের অনেক উপকার হতো। তোমার দেনার বোঝাটাও কিছুটা হালকা হতো।

সন্দীপ তা স্বীকার করলে। বললে—আমি সবই বুঝি স্যার। কিন্তু ওই টাকাটা নিলে আমার এই বিপদের সময়ে হয়তো খুবই কাজে লাগতো, কিন্তু বিবেক? আমার বিবেককে আমি কী বলে সান্ত্বনা দিতুম?

এ-কথার কোনও উত্তর দিলেন না মালব্যজী। হয়তো তিনি এ-কথার কোনও উত্তর খুঁজেই পেলেন না। একটু পরে বললেন—ঠিক আছে, তুমি যেটা ভালো বুঝেছ তাই করেছো। এ-ব্যাপারে আমি আর কী বলবো।

তারপর একটু থেমে জিজ্ঞেস করলেন—ওদিকে তোমার মাসিমা? মাসিমার কী রকম অবস্থা?

সন্দীপ বললে—অবস্থা সেই একই রকম। কোনও উন্নতি নেই—

—হাসপাতালে পাঠিয়েছ?।

—না স্যার। তিনি তাঁর চিকিৎসা করাবেন না।

—কেন?

সন্দীপ বললে—তিনি চান না যে তাঁর চিকিৎসার জন্যে অতো টাকা খরচ করি।

মালব্যজী বললেন—সে কী?

সন্দীপ বললে—হ্যাঁ স্যার, আমি মাসিমার চিকিৎসার খরচের জন্যে আমাদের ছোট বাড়িটা কুড়ি হাজার টাকায় বন্ধকও রেখেছি।

—বাড়িটা বন্ধক রেখেছ?

—হ্যাঁ স্যার।

মালব্যজী বললেন—তাহলে সেই কুড়ি হাজার টাকার জন্যে মাসে-মাসে সুদও তো তোমাকে দিয়ে যেতে হবে।

সন্দীপ বললে—সুদ তাঁরা অবশ্য নেবেন না। বাড়িটাও তাঁরা বাঁধা রাখতে চাননি। কিন্তু আমি খালি হাতে টাকা নেব না বলে তাঁদের একটা হাত-চিটে লিখে দিয়েছি। আর মাসে-মাসে ফাইভ পার্সেন্ট সুদও দিয়ে যাবো ঠিক নিয়ম করে। কারণ বাইরের লোকের কাছে টাকা ধার চাওয়া আমার প্রিন্সিপালের বিরুদ্ধে—

—তা টাকা যখন পাওয়া গিয়েছে তখন চিকিৎসা করাতে এতো দেরি করছো কেন? আর যতো তাড়াতাড়ি তিনি সেরে উঠবেন ততো তাড়াতাড়ি তো তুমি তাঁর মেয়েকে বিয়ে করে তাঁকে কন্যা-দায় থেকে উদ্ধার করতে পারবে।

সন্দীপ বললে—না স্যার, আমার মাসিমা চান যে আগে আমি তাঁর মেয়েকে বিয়ে করবো, তবে তা দেখে তিনি চিকিৎসা করাবেন। তিনি বলতে চান যে তাঁর জীবনের

চেয়ে তার মেয়ের বিয়েটা বেশি জরুরী. তার মেয়ের বিয়েটা নিজের চোখে আগে তিনি দেখে যেতে চান। তার পরে তিনি বাঁচুন বা মরুন তাতে তাঁর কিছুই আসে যায় না—

—তাহলে? তাহলে কী ঠিক করলে?

সন্দীপ বললে—আমার মা বলেছে—তাহলে তুই বিয়েটাই আগে কর—

—তা তুমি কী ঠিক করেছ?

সন্দীপ বললে- মা'র কথাই আমি পালন করবো. ঠিক করেছি। ঠিক করেছি আগে আমি বিয়েটাই করবো. তারপরে মাসিমার চিকিৎসা করবো। ততোদিনে আমার অফিসের দেনাটাও শোধ হয়ে যাবে—তার জন্যে আমার কুড়ি হাজার টাকা তো আছেই—

মালব্যজী বললেন—কিন্তু বিয়ে করারও তো একটা খরচ আছে! সে-খরচ?

সন্দীপ বললে—মা বলেছে এ-বিয়েতে কোনও খরচ করার দরকার নেই। লোকজন খাওয়ানোরও দরকার নেই। সোনার গয়না-টয়নারও কিছু দরকার নেই। মা'র এক-জোড়া সোনার বালা আছে, তাই দিয়েই মা বউকে আশীর্বাদ করবে—

মালব্যজী বললেন- ঠিক. তোমার মা'র পরামর্শ মেনেই চলবে। আর লোক-জন-আত্মীয়-স্বজনদের খাওয়ানোর কোনও বন্দোবস্ত করবে না। বাঙালী আর মারওয়াড়িদের ওই একটা বদ্ অভ্যেস আছে। তা কবে বিয়েটা হবে?

সন্দীপ বললে- বিয়ের দিনটা এখনও ঠিক হয়নি। সেটা একটা ছুটির দিন কিংবা রবিবার দেখে ঠিক করতে হবে. যাতে অফিস কামাই করতে না হয়—

মালব্যজী বললেন—একদিনে তো হবে না। যদি দরকার হয় তো আরো দুটো দিন ছুটি নিও। তাতে তোমার অসুবিধে হবে না। ছুটি তো তোমার পাওনা আছে?

সন্দীপ বললে—না স্যার. আমার অসুখের সময়ে অনেক ছুটি নষ্ট হয়ে গিয়েছে—

মালব্যজী এবার উঠলেন।

বললেন—আমি এবার উঠি, তোমার অনেক কাজ পড়ে রয়েছে—

তারপর চলে যেতে গিয়েও একটু থামলেন। বললেন- শুধু এক বাত্। কবে তোমার বিয়েটা ঠিক হলো. আমাকে জানাবে। আমি উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করবো—

মালব্যজী আর দাঁড়ালেন না। সন্দীপও ব্যাঙ্কের সদর দরজা পর্যন্ত তাঁকে এগিয়ে দিয়ে এল। মনে হলো—আশ্চর্য, এমন মানুষও সংসারে থাকে। অথচ এই পৃথিবীতে যেমন গোপাল হাজরারা আছে. তপেশ গাঙ্গুলীরা আছে. তেমনি এই মালব্যজীরাও তো আছে। আর আছে শিবপ্রসাদ ঘোষের মতো উকিলরা। যে-শিব-প্রসাদবাবু বিশাখাকে জেল থেকে বার করবার জন্যে কোর্টের হাকিমের সামনে দাঁড়িয়ে আর্জি করলেন. তাকে মুক্ত করিয়ে এনে সেদিন সন্দীপ লাহিড়ীর হাতে তুলে দিলেন. অথচ খরচ-খরচা বাবদ তার কাছ থেকে একটা পয়সাও নিলেন না। এরা না থাকলে পৃথিবীটা কী করে চলতো?

সেদিন ভোরবেলাই মুক্তিপদ মুখার্জি ঠাকমা-মণিকে ইন্দোর থেকে টেলিফোন করলে। টেলিফোনটা ধরেছিল বিন্দু।

—মা-মণি আছে? আমি ইন্দোর থেকে বলছি।

ঠাকমা-মণি তখন একমনে জপ করছিলেন। গুরুদেবের দেওয়া দীক্ষা-মন্ত্র তিনি তখন আরো মনোযোগ দিয়ে জপ করতেন। তাঁর যতো বয়েস বাড়ছে, তাঁর বিপদ যতো ঘনিষ্ঠ হয়ে আসছে, তিনি ততোই মনোযোগ দিয়ে জপ করতে আরম্ভ করেছেন। রাত্রের দিকে জপ-তপ-আহ্নিক করবার মতো সময় থাকে না তাঁর। উকিল-ব্যারিস্টারদের বাড়ি থেকে ফিরতে ফিরতে অনেক দিন অনেক দেরি হয়ে যায়। তখন আর নিয়ম করে জপ-তপ-আহ্নিক ভালো করে করবার সময় বা সুযোগ থাকে না।

কিন্তু সকাল বেলাটাই তাঁর ও-সব করবার পক্ষে প্রশস্ত সময়।

আগে রাত তিনটের সময় তাঁর ঘুম ভেঙে যেত। তখন তিনি মুখ-হাত-পা ধুয়ে তৈরি হয়ে নিতেন। বিন্দুকে ডাকতেন। বিন্দুও তৈরি হয়ে নিতো।

তখন ছিল গঙ্গা-স্নানের পাট। বিন্দুকে নিয়ে গঙ্গা-স্নানে চলে যেতেন।

সেই গঙ্গা-স্নানের সময়েই প্রথম একটা ছোট মেয়েকে দেখে তিনি ওই মেয়েটির সঙ্গে তাঁর নাতির বিয়ে দেওয়ার সংকল্প করেছিলেন।

সে কতোকাল আগেকার কথা।

তাঁরই কপাল! তাঁর কপাল খারাপ না হলে এমন হবে কেন? সেই কচি মেয়েটাকে দেখেই তাঁর মন যেন সেদিন বলে উঠেছিল—এই-ই তাঁর লক্ষ্মী! এই কচি মেয়েটিকে যদি তিনি তাঁর বাড়িতে নাত-বউ করে আনতে পারেন তো তা তাঁর বাড়িতে মা-লক্ষ্মী আসার মতো সৌভাগ্য হবে। আবার তাঁর বাড়িতে মা-লক্ষ্মীর আবির্ভাব হবে।

সত্যি সে কতোকাল আগের কথা।

তখনই ঠাকমা-মণি সেই গঙ্গার ঘাটেই বিন্দুকে দিয়ে তাঁদের বাড়ির ঠিকানা যোগাড় করে ম্যানেজার-বাবুকে তাদের বাড়িতে পাঠিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য মেয়েটির জন্ম-সাল-তারিখ-স্থান সব কিছু সংগ্রহ করা। আর শুধু কি তাই?

সেই মেয়ের কুষ্ঠী নিয়েই তিনি কাশীতে গুরুদেবের কাছে চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর নিজের নাতির কুষ্ঠী করানো ছিল না। কারণ নাতির জন্ম হওয়ার পরই তার মা অসুখে পড়ে। তাই তাকে নিয়েই সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, নাতির ভবিষ্যতের দিকে কারো আর নজর দেবার বা তার কথা ভাববার সময় হলো না কারো।

তারপর গুরুদেবের কথায় তিনি সেই মেয়েকে মাসোহারা দিতে লাগলেন। লেখা-পড়া শেখাবার ব্যবস্থা করলেন. কিন্তু যখন দেখলেন যে তাঁর মাসোহারা দেওয়ার টাকা বাড়ির অন্য সবাই নিজেদের ভোগে লাগাচ্ছে, তখন তিনি সেই মেয়ে আর তার বিধবা মাকে এনে তুললেন তাঁরই রাসেল স্ট্রীটের খালি বাড়িটাতে। আর সেইখানে রেখেই তিনি সেই মেয়েকে লেখাপড়া শেখানো থেকে আরম্ভ করে বড়লোকদের বাড়ির বউ হওয়ার যোগ্য করে তুলতে লাগলেন। আর তাদের দেখাশোনা করবার জন্যে মল্লিক-মশাই-এর দেশের একজন গরীব ছেলেকে মাইনে দিয়ে রেখে দিলেন।

সত্যিই সে-সব কতোকাল আগেকার কথা!

—কেমন আছো তুমি মা-মণি?

ঠাকমা-মণি বললেন—আমার কথা এখনও মনে আছে তোদের? খুব ভালো।

—বলো না কেমন আছো? মামলার কতোদূর?

ঠাকমা-মণি বললেন—নরকে আছি রে মুক্তি, নরকে আছি। নরক-বাস করছি—

—এখনও মামলা মেটেনি?

ঠাকমা-মণি বললেন—কী করে মামলা মিটবে? এ কি তোর ফ্যাক্টরির যে স্ট্রাইক হলো আর ফ্যাক্টরির বাইরে তলে নিয়ে গেলুম। সে যাক, তোরা কেমন আছিস?

মুক্তিপদ বললে -পিক্‌নিক্ তোমার কাছে এসেছি।

ঠাকমা-মণি ছেলের কথা শুনে আকাশ থেকে পড়লেন। বললেন—পিক্‌নিক্?

তোর মেয়ে? আমার কাছে? কলকাতায়? বলছিস কী তুই?

—হ্যাঁ, ক'দিন থেকে সে বাড়ি আসছে না। বোম্বেতে ট্রাঙ্ক-কল্ করেছি, ইন্দোরে নেই। দিল্লীতে খবর পাঠিয়েছি। সেখানেও খোঁজাখুঁজি চলছে। ভাবলাম হয়তো কলকাতায় তোমার কাছে গেছে, তাই...

ঠাকমা-মণি বললেন—তাকে আর কোথাও খুঁজে পাবি না—

—কেন? খুঁজে পাবো না কেন?

—যার মার সংসারের দিকে নজর দেবার সময় নেই তার মেয়ে বাড়ি থেকে পালাবে না তো কী করবে?

এর উত্তরে মুক্তিপদর আর কিছু বলবার থাকতে পারে না। কিন্তু সে কিছু বলবার আগেই ঠাকমা-মণি বললেন—তুই কোনও জ্যোতিষীর খোঁজ পেয়েছিস?

—জ্যোতিষী? আমি সময় পাইনি মা—

ঠাকমা-মণি বললেন- তা সময় পাবি কেন? তাতে যে আমার ভালো হবে!

—না মা, অনেক ঝামেলা চলছে আমার। সে তুমি বুঝবে না, সবাই কেবল মাইনে বাড়াতে চায়, কিন্তু কাজের বেলায় কেউ হাত নাড়তে চায় না। তার ওপর আছে ঘুষ!

—ঘুষ?

—হ্যাঁ, মালের অর্ডার আনতে গেলেই সবাই ঘুষ চায়।

ঠাকমা-মণি বললেন—ঘুষ তো এখানেও দিতে হতো। সে আর নতুন কথা কী?

মুক্তিপদ বললে -ওখানে তবু লেবার-ইউনিয়নের লোকে ঘুষ নিত, কিন্তু এখানে মিনিস্টাররাও ঘুষ চায়। একেবারে খোলাখুলি ভাবে ঘুষ চায়। চক্ষুলজ্জা বলেও কোনও জিনিস নেই। আগে ভাবতুম ওয়েস্ট বেঙ্গলেই বুঝি কেবল ঘুষের কারবার চলে, কিন্তু এখানে এসে দেখছি ঘুষের আরো খোলা-বাজার। তার ফলে জিনিস-পত্তোরের দাম বেড়ে চলেছে, আর ইউনিয়ন-লীডাররও লেবারের মাইনে বাড়াবার জন্যে ঘুষ চাইছে। আমি এখন কী করবো বুঝতে পারছি না মা, এবার বোধহয় আমি পাগল হয়ে যাবো—

ঠাকমা-মণি বললেন—তা তুই ফ্যাক্টরি বন্ধ করে দে না—

মুক্তিপদ বললেন—ফ্যাক্টরি বন্ধ করলে খাবো কী, আর তুমিই বা কী খাবে?

এ-কথার আর কোনও উত্তর দেওয়া হলো না। হঠাৎ টেলিফোনের লাইনটা কেটে যেতেই যোগাযোগটা বন্ধ হয়ে গেল।

ঠাকমা-মণি এধার থেকে চিৎকার করতে লাগলেন—হ্যালো, হ্যালো—

ওদিক থেকে মুক্তিপদও চিৎকার করতে লাগলো—হ্যালো, হ্যালো—

এ-যুগে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কও এমন যান্ত্রিক হয়ে গেছে যে সেখানেও হঠাৎ-হঠাৎ আত্মীয়তার সূত্র বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় আর হাজার চেষ্টা করেও সে-সম্পর্ক জোড়া লাগে না। কোথায় এক বাড়িতে একটা ছেলে জন্মালো, আর বড়ো হয়ে সে নিজের মাকে ছেড়ে কতো দূরে বিচ্ছিন্ন হয়ে রইলো। সে এতো দূরে যে ইচ্ছে হলেও কাছে পাওয়া যায় না। তাকে আর কাছে রাখা যায় না। এ-রকম কেন হলো?

এও বোধহয় যন্ত্রের জন্যে। যন্ত্র মানুষকে অনেক রকম আরাম যেমন দিয়েছে, তেমনি দিয়েছে আবার অনেক যন্ত্রণাও। মাঝখান থেকে শুধু একজন মানুষ আর একজন মানুষের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দিয়ে নিজেরা দিন-দিন বিচ্ছিন্ন হয়ে নির্বাসনদণ্ড ভোগ করে যচ্ছে। এ-ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। এ-যন্ত্রকে রাখাও যায় না আবার ছাড়াও যায় না। রাখতে গেলেও লাগে আবার ছাড়তে গেলেও বাজে।

হঠাৎ টেলিফোনটা আবার ঝন্-ঝন্ করে বেজে উঠলো।

—কে রে? মুক্তি?

ওধার থেকে মুক্তিপদ বললে—হ্যাঁ, লাইনটা হঠাৎ কেটে গিয়েছিল। আজকাল তোমাদের কলকাতার টেলিফোন এমন হয়েছে যে লাইন পাওয়াটাই দুর্লভ। লাইন পেতে গেলে ঘুষ দিতে হয়। পিক্‌নিকের জন্যে টেলিফোনে খোঁজ নিতে গিয়ে আমার এরই মধ্যে সাত হাজার টাকা খরচ হয়ে গেছে।

—সে পালালো কেন? সে কি ছেলেদের সঙ্গে খুব মেলামেশা করতো?

—সে তো করতোই।

—তা কেন সে-সব করতে দিতিস? জানিস না, এখন দিনকাল খারাপ? সৌম্যরও তো তাই হয়েছে। তাকে যদি তুই বিলেত না পাঠাতিস তাহলে কি আজ এই কাণ্ড হতো? তোর জন্যেই আমাকে আজ এত ঝামেলা-ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হচ্ছে। পারিস তো তাড়াতাড়ি একটা বিয়ে দিয়ে দে—

মুক্তিপদ বললে—পিক্‌নিককে পেলে তবে তো বিয়ে দেব। আর আজকাল এই ইন্দোরে তেমন ভালো পাত্রই বা কোথায় পাবো? তুমি একটা পাত্র দেখে দাও না।

—আমি?

ঠাকমা-মণি মুখ-ঝামটা দিয়ে উঠলেন। বললে—আমাকে তুই তোর মেয়ের পাত্র খুঁজে দিতে বলছিস? আমি একটা নাতির বিয়ে দিতে গিয়ে নাজেহাল হচ্ছি, তার ওপর আবার একটা নাতনির বিয়ের ঝামেলা ঘাড়ে নেব? শেষকালে যদি আর একটা ঝামেলা হয় তখন তোর বউই কি আমায় আস্ত রাখবে? ও-সব আমার দ্বারা হবে না। তার চেয়ে তুই বরং কলকাতায় একবার আয়, তুই নিজে খোঁজ-খবর নে, আমাকে আর ওর মধ্যে জড়াসনি।

সে-প্রসঙ্গ বন্ধ করে বললেন—আর হ্যাঁ, আমাকে কিছু টাকা পাঠিয়ে দিস্—

—কতো?

—এই লাখ খানেকের মতো!

মুক্তিপদ বললে—এই যে সেদিন দু'লাখ পাঠালুম তোমাকে—

—সে কবে শেষ হয়ে গিয়েছে। সৌম্যর পাত্রী খুঁজতে গিয়ে হরির লুঠের মতো টাকা খরচা হচ্ছে। জ্যোতিষীদের খাঁই মেটাতেই আমি ফতুর হয়ে গেলুম—

মুক্তিপদ বললে—ওই সব ঝাড়-ফুঁকে তুমি এখনও বিশ্বাস করো? ওদের পাল্লায় পড়লে তুমি শেষকালে যে একেবারে জের-বার হয়ে যাবে বলে দিচ্ছি। ও-সব বন্ধ রাখো।

—তা কী করবো বল্? সৌম্যর ফাঁসি হয়ে যাক, এইটেই কি তুই চাস?

মুক্তিপদ বললে—তা কেন চাইবো!

—তাহলে? আমি একা বুড়োমানুষ যা পারি করে যাচ্ছি। ম্যানেজারবাবুকে পাঠিয়েছি। তিনি তো কাশী-মথুরা-বৃন্দাবন-হরিদ্বার সব জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। জ্যোতিষীরা যা-টাকা চাইছে দিচ্ছেন। যা টাকা চেয়ে পাঠাচ্ছেন তাই পাঠাচ্ছি। যে-যা বলছে তাই-ই করছি। এবার ম্যানেজারবাবুকে দক্ষিণ-ভারতে পাঠাবো। এদিকে হাতে সময় নেই। উকিলবাবু কেবল তাগাদা দিচ্ছেন, তার আপিসে গেলেই কেবল জিজ্ঞেস করছেন—হলো? পাওয়া গেল?

মুক্তিপদ বললে—আমি আর ও-সব কথা ভাবতে পারি না। আমার পিক্‌নিককে নিয়ে আমি এত ব্যস্ত যে আমি আর কোনও দিকে কিছু ভাবতে পারছি না—

—কলকাতায় কবে আসবি?

—দেখি কবে সময় করে উঠতে পারি।

—তোর এখন ঘুম হচ্ছে?

মুক্তিপদ বললে—ও আর হবে না, ও-সব কথা ছেড়ে দাও—

—কেন? ছেড়ে দেব কেন? আগে তো শরীরটার দিকে দেখবি তুই। তুই নিজে

বাঁচলে তবে তো সবাই বাঁচবে।

মুক্তিপদ আবার বললে—জানো মা, আমার কুলীরাই হলো আসল সুখী। তারা যেমন সব কিছু খেয়ে হজম করে তেমনি আবার ভোঁস-ভোঁস করে ঘুমোয়। তাদের দেখে আমার হিংসে হয়। ভাবি ওরা কতো ভাগ্যবান—

—তোর সেই অর্জুন সরকার আছে? আর নাগরাজন—ছেলে দুটো খুব ভালো—

—হ্যাঁ আছে, আমি শীগ্‌গিরই কলকাতায় যাবো, ছাড়ি—

আবার একদিন মল্লিক-মশাই ফিরলেন। তিনি একবার করে কলকাতায় আসেন, তারপর আবার চলে যান। কোথাও গিয়ে কোনও সুরাহা করতে পারেন না।

সেবার আসতেই তপেশ গাঙ্গুলী এসে ধরেছে। এসেই মল্লিক-মশাইকে পাকড়েছে। মল্লিক-মশাই জিজ্ঞেস করলেন—কী হলো? আবার কী?

—সেই কুষ্ঠী...

—আবার কুষ্ঠী?

তপেশ গাঙ্গুলী পকেট থেকে পাকানো একটা হলদে কাগজ বার করে বললে—এ একেবারে খিদিরপুরের "শ্রীশ্রীমহাকালী আশ্রম" থেকে তৈরি করিয়ে এনেছি নগদ দু'শো টাকা খরচ করেছি এর জন্যে। একেবারে খাঁটি কুষ্ঠী। দেখুন সপ্তম-স্থানটা কী রকম মজবুত। এর সঙ্গে যাঁরই বিয়ে হবে তারই ভাগ্য একেবারে চড়চড় করে উঠে দাঁড়াবে। এই গ্যারান্টি দিয়েছে জ্যোতিষী-মশাই—

মল্লিক-মশাই বললেন—আরে, আপনাকে তো বলেই দিয়েছি, আমি আর কুষ্ঠী চাই না। আমি এই মাত্র দু'মাস পরে কলকাতায় আসছি। এখনও হাতে মুখে জল দেওয়া হয়নি। আর ঠিক এই সময়েই আপনাকে আসতে হয়?

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—আমি রোজ আসি ম্যানেজারবাবু। আমি রোজ এসে খবর নিয়ে যাই আপনি কবে আসবেন। আপনার জন্যে আমার কতোদিন অফিস-কামাই হয়ে গিয়েছে তার ঠিক নেই। রেলের চাকরি বলেই সেটা এখনও আছে, নইলে এ্যাদ্দিন কবে চলে যেত—আপনি এই গরীবের দিকে একবার তাকান—একবার তাকান। ভগবান আপনার ভালো করবেন।

মল্লিক-মশাই সারা রাত ট্রেনে জেগে এসেছেন। রিজার্ভেশন পাননি। টিকিট-চেকারের হাতে দশটা টাকা পুরে দিয়ে তবে কামরার মেঝের ওপরে কোনও রকমে বসতে পেয়েছিলেন। হাওড়া স্টেশনে পৌঁছিয়েই সোজা ট্যাক্সি ধরে বাড়িতে এসে পৌঁচেছেন। আর তখনই তপেশ গাঙ্গুলীর হামলা।

—আমি এখন কোনও কথা শুনবো না। আপনি বাড়ি যান—

তপেশ গাঙ্গুলীও কম না-ছোড়বান্দা নয়। বললে—আপনি অতো রাগ করছেন কেন? আপনি-না-হয় একটু জিরিয়ে নিন, আমি ততোক্ষণ না-হয় বসে থাকি—

—আরে, আপনি বসে থাকলে আমার কাজ-কম্ম হবে?

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—আপনি একমনে জিরোন না মশাই! আমি এখানে চুপ করে বসে থাকলেও আপনার আপত্তি আছে?

তখন মল্লিক-মশাই তাঁর শেষ অস্ত্র ছাড়লেন।

বললেন—তবে শুনুন, আমি যা চাইছিলুম তা পেয়ে গিয়েছি।

—তার মানে?

—মানে ফাঁসির আসামীর জন্যে আমার দরকার ছিল এমন একটি অবিবাহিতা কন্যার কুষ্ঠীর, যার বৈধব্য-যোগ নেই। তা সে আমি পেয়ে গিয়েছি।

—পেয়ে গেছেন?

মল্লিক-মশাই বললেন—হ্যাঁ, পেয়ে গিয়েছি—

কথাটা শুনেই তপেশ গাঙ্গুলীর চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে এলো। আবার জিজ্ঞেস করলে—পেয়ে গিয়েছেন?

—হ্যাঁ।

তপেশ গাঙ্গুলীর যেন কথাটা তখনও বিশ্বাস হলো না।

জিজ্ঞেস করলে—কতো টাকা নিলে পাত্রীপক্ষ? এক লাখ না দু'লাখ?

মল্লিক-মশাই বললেন—তিন লাখ—

—তি-ন-লা-খ?

মল্লিক-মশাই বললেন—হ্যাঁ, চার লাখ, চার লাখ করছিল, অনেক দর-দস্তুর, অনেক টানা-হ্যাঁচড়ার পর তিন লাখে রাজি হয়ে গেল পার্টি। আমিও তিন লাখ টাকা দিয়ে দিলুম তাদের—

—তারপর?

তপেশ গাঙ্গুলীর গলায় তখন কান্নার যন্ত্রণা। বললে—তিন লাখ দিয়ে দিলেন—

তার কথার সুরে মনে হলো কেউ যেন তার জামার পকেট থেকে তিন লাখ টাকা চুরি করে নিয়েছে। বললে—কী জাত?

—কী জাত আবার...বামুন। স্বজাতি।

—ফাঁসির আসামীকে তাহলে জামাই করতে রাজি হলো?

মল্লিক-মশাই তখন তপেশ গাঙ্গুলীর কথায় বিরক্ত হয়ে উঠেছেন?

বললেন—কেন রাজি হবে না? টাকা দিলে কী-ই না হয়?

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—তাহলে আমার মতো হতভাগা লোক দেখছি দুনিয়ায় আরো আছে?

তখনও তপেশ গাঙ্গুলী বসে আছে দেখে মল্লিক-মশাই বললেন—আরে, উঠুন আপনি, উঠুন। আমি মুখে-হাতে-পায়ে এখনও জল দিইনি—

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—আমি ভাবছি, আমার কী হবে?

মল্লিক-মশাই বললেন—আপনি এখন ধীরে-সুস্থে বাড়ি যান। এখানে বসে বসে সময় নষ্ট করে কী হবে? ভাবলে তো কোনও সুরাহা হবে না।

তপেশ গাঙ্গুলী তখন সত্যি সত্যিই কাঁদতে আরম্ভ করে দিয়েছে।

এবার মল্লিক-মশাইএরও একটু দয়া হলো।

বললেন—ভেবে ভেবে শরীর খারাপ করে লাভ কী? এবার বাড়ি যান আপনি—

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—আর কোনও ফাঁসির আসামীর খোঁজ আছে আপনার কাছে?

মল্লিক-মশাই বললেন—এখন তো আমি জানি না। পরে খোঁজ পেলে আপনাকে আমি জানাবো।

—জানাবেন তো ঠিক?

—নিশ্চয়ই জানাবো।

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—আপনি কাজের লোক, আমাকে জানাতে ভুলে যাবেন। তার চেয়ে আমিই বরং মাঝে মাঝে এসে আপনার কাছ থেকে খবর নিয়ে যাবো।...আর একটা কথা...

—কী কথা? বলুন?

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—তিন লাখ টাকা যদি না-ও দেয়, আমি দু'লাখ টাকা পেলেই রাজি হয়ে যাবো। কপালে অনেক দুর্ভোগ থাকলে তবে মানুষ মেয়ের বাপ হয়—বলে রুমাল দিয়ে নিজের চোখ দু'টো মুছে নিলে।

তারপর আবার বলতে লাগলো—এখন ভাবি, কেন যে মরতে বিয়ে করতে গেলুম, তাহলে আর আমার এই মেয়েও হতো না, আর সেই মেয়ের বিয়ের জন্যে আমাকে এত পরের পা জড়িয়ে ধরে কান্নাকাটিও করতে হতো না। আপনি বিয়ে করেননি ম্যানেজারবাবু, খুব ভালো করেছেন। আপনি খুব বেঁচে গেছেন। আপনি খুব বেঁচে গেছেন...

মল্লিক-মশাই বলতে লাগলেন—আরে, এ তো মহা মুশকিল হলো দেখছি, উঠুন উঠুন বলছি, উঠুন, আমার কাজ কম্ম আছে। উঠুন।

তপেশ গাঙ্গুলী কিন্তু তখনও বলে চলেছে—আর ভগবান যদি মেয়েই দিলে তো পকেটে টাকা দিলে না কেন? কেন পকেটে টাকা দিলে না?

মল্লিক-মশাই তখন আর সহ্য করতে পারলেন না। গিরিধারীকে ডাকলেন। গিরিধারী আসতেই বললেন—গিরিধারী, ইন্‌কো ঘর সে বাহার নিকাল দেও তো, একদম গেট কা বাহার—
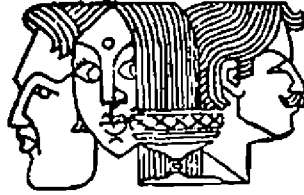
প্রত্যেক ব্যাঙ্কের মতো সন্দীপদের ন্যাশন্যাল ইউনিয়ন ব্যাঙ্কেও 'সেফ-ডিপোজিট-ভল্ট' বলে একটা বস্তু ছিল। ব্যাঙ্কের যারা পৃষ্ঠপোষক এবং ডিপোজিটার তারা তাদের মূল্যবান কাগজ-পত্র দলিল, সোনা-দানা, হীরে-জহরৎ, তারই ভেতরে লুকিয়ে রাখতো। সেটা মূল্যবান জিনিসের পক্ষে নিরাপদ স্থান, সেখানে বাইরের লোকদের প্রবেশ নিষেধ। তার জন্যে একটা নির্দিষ্ট মূল্য ধার্য আছে সর্বত্র।

প্রত্যেক মানুষের মনের ভেতরেও তেমনি একটা 'সেফ-ডিপোজিট-ভল্ট' থাকে। সেখানকার গোপন সম্পত্তির তথ্য বাইরের কোনও লোকের জানার অধিকার নেই। সেখানে সে নিজে ছাড়া অন্য সকলের প্রবেশ নিষেধ।

সন্দীপের মনেও সেই রকম একটা গোপন 'সেফ-ডিপোজিট-ভল্ট' ছিল। সেখানকার খবর তার মা'র কাছেও নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু এবার?

এবার তো তার বিয়ে হচ্ছে। এখনও কি সে তার মনের 'সেফ-ডিপোজিট-ভল্টে'র নিরাপত্তা বজায় রাখতে পারবে? অর্থাৎ বিশাখা কি তার সত্যিকারের সুখ-দুঃখের ভাগীদার হতে পারবে! সত্যিকারের সুখ-দুঃখের ভাগীদার হতে দিলে তো তার সেই 'সেফ-ডিপোজিট-ভল্টে'র নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে, তার ওপর তার একচেটিয়া

স্বত্ব বিলুপ্ত হতে পারে।

আশ্চর্য! যখন সে তার একচেটিয়া স্বত্ব বিলুপ্ত হওয়ার ভয়ে শিউরে উঠছিল, তখনও জানতো না যে অদূর-ভবিষ্যতে আরো কতো বড়ো আতঙ্ক তাকে গ্রাস করবে বলে ওৎ পেতে আছে।

মনে আছে মালব্যজী বার-বার বলে দিয়েছিলেন—বিয়েতে লোকজন খাওয়ানোর কোনও আয়োজন করবে না। ঠিক তো? কথা দিচ্ছ?

কথাটার উত্তর দিতে প্রথমে একটু দ্বিধা করেছিল সন্দীপ।

মালব্যজী আবার বলেছিলেন—মনে রেখ, অন্য লোকেদের বিয়ের মতো তোমার বিয়ে নয়। তোমার এ বিয়ে ভোগের নয়, আত্মদানের। আত্মদানের মধ্যে দিয়েই তোমার নিজের তৃপ্তির আস্বাদ তোমাকে পেতে হবে। পাওয়া নয়, দেওয়া। এ এমন দেওয়া যার মধ্যে নেওয়ার কোনও সম্পর্ক নেই। তুমি এই সংসারে পাওয়ার জন্যে আসোনি, এসেছ শুধু দেওয়ার জন্যে—

সামান্য একজন ব্যাঙ্কের সিনিয়ার ম্যানেজার। সাধু-মহাত্মা-মহাপুরুষ, কিছুই নন। সাধারণ চেহারার মানুষের মধ্যে যে এ-রকম অসাধারণ মন লুকিয়ে থাকে এ সন্দীপ পরবর্তী জীবনে অনেক দেখেছে। সন্দীপের অপার সৌভাগ্য যে চাকরির সেই প্রথম-জীবনে অমন একজন শুভাকাঙ্ক্ষী পেয়েছিল।

শুধু লোক-জন খাওয়ানোর ব্যাপারই নয়, গয়না বা বেনারসীর বিলাসিতাও নয়, যেটা না হলে নয় শুধু, সেটুকুর ব্যবস্থাই যথেষ্ট। যেমন ফুলের মালা, ধান-দূর্বা আর একজন কুলপুরোহিত। তার উচিত দক্ষিণা।

কথা শুনে মা বলেছিল—পুরুতমশাইকে ডেকে আনতে বলবো কমলার মাকে—তিনি যেমন যেমন বলেন তেমনি ব্যবস্থা করা যাবে—

বিয়ের তারিখটা আজও মনে আছে সন্দীপের ১৩ই ফাল্গুন। শনিবার।

সেদিন শনিবার ছুটির দিন ছিল। তার পরেই রবিবার। শুক্রবার মাঝ-রাতে বিয়ে। শুক্রবারেও ছুটি নেয়নি সন্দীপ।

তাকে শুক্রবার অফিসে আসতে দেখে হাশেমও অবাক হয়ে গিয়েছিল। বলেছিল—এ কী স্যার, আপনি আজকেও অফিসে এসেছেন? আজ যে আপনার বিয়ে!

—বিয়ে তো সেই মাঝ-রাত্তিরে আজকে। অনেকগুলো জরুরী কাজ পড়ে আছে, তাই এলুম। সেগুলো সেরেই আমি চলে যাবো—

শুধু হাশেম নয়, অফিস সুদ্ধু স্টাফ অবাক হয় সেদিন তাদের ম্যানেজার মিস্টার লাহিড়ীর ব্যাপার-স্যাপার দেখে। কিন্তু তারা তো জানে না যে এ তার আত্মদান। এ তার আত্মদানের বিয়ে। এ তার পাওয়া নয়, আত্মদান। এ তার নেওয়া নয়, দেওয়া। নিজেকে দেওয়ার মধ্যে দিয়েই নিজের জীবনের সার্থকতার সাধনা করতে হবে। নিজেকে দেওয়ার মধ্যেই প্রত্যেক মানুষের জীবনের সার্থকতা নিহিত আছে!

দুপুর বেলাই সন্দীপ হাশেম সাহেবকে বাকি কাজ বুঝিয়ে দিয়ে বাড়ি চলে গিয়েছিল। যাওয়ার সময়েই বলে গিয়েছিল—আমি সোমবার অফিসে আসছি, তুমি আজকের বাকি কাজটা সামলে নিও—

কন্যা-সম্প্রদানের কাজটা কাশীবাবু আগে থেকেই সামলে নেওয়ার ভারটা স্বেচ্ছায় ঘাড়ে তুলে নিয়েছিলেন। তাঁর অনেক বয়েস হয়েছে এখন। কন্যা-সম্প্রদানের জন্যে তাঁকে অনেক রাত পর্যন্ত অভুক্ত থাকতে হবে। ওদিকে সন্দীপকেও অনেক ভোরে ঘুম থেকে উঠতে হয়েছে। তখন হয়েছে 'গায়ে হলুদ' অনুষ্ঠান। সে অনুষ্ঠান সেরে তাকেও কিছু না খেয়ে অফিসে চলে যেতে হয়েছিল।

মা বলেছিল—ওরে, আজকেও তুই আপিসে যাবি? আজকে আপিসে না-গেলে

তোর চলে না?

মা কী করে অফিসের দায়িত্বের কথা বুঝবে? ওই চাকরিটা আছে বলেই তো তাদের পাঁচ জনের খাওয়া-পরা আর চিকিৎসার খরচ চলছে। অফিসটা না-থাকলে কী হতো!

গায়ে-হলুদের তত্ত্ব দুপুর বেলাই কনের বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়ার কথা। তার সমস্ত দায়িত্বের ব্যবস্থা সন্দীপই করে রেখেছিল আগের দিন।

অফিস থেকে যখন সন্দীপ বাড়ি ফিরলো তখন বেলা গড়িয়ে গিয়েছে। মা হাঁ করে ছেলের জন্যে অপেক্ষা করছিল।

বললে—হ্যাঁরে খোকা, এত দেরি করতে হয় আজ?

—আজ ট্রেন লেট ছিল মা...মাসিমা কেমন আছে?

বলে সোজা বাড়ির ভেতরে গিয়ে মাসিমার কপালে হাত ছুঁইয়ে দেখলে।

মাসিমা শুয়ে ছিল। সন্দীপের হাতের ছোঁওয়া পেয়ে চোখ দুটো খুললো।

সন্দীপ মাসিমার মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বললে—মাসিমা, আমি অফিস থেকে এসে গেছি। আজ আমি বিশাখাকে বিয়ে করছি, কিছু ভাববেন না। বিয়েটা হয়ে গেলেই আমি আপনাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবো। আপনি কিছু ভাববেন না। আপনি এবার তাড়াতাড়ি সেরে উঠুন—

মাসিমা এর জবাবে কিছুই বললে না। শুধু তার চোখ দিয়ে দর-দর করে জল পড়তে লাগলো। সন্দীপ পকেট থেকে রুমাল বার করে মাসিমার চোখ মুছিয়ে দিলে।

ওঠবার আগে সন্দীপ আবার বললে—আবার বলছি মাসিমা, আপনি কিছু ভাববেন না। আজ আপনার বিশাখাকে আমি বিয়ে করছি। আমি আপনার কথা রেখেছি। আজকেই আপনার বিশাখার বিয়ে, চাটুজ্জে মশাই কন্যা-সম্প্রদান করবেন।' বিশাখা এখন চাটুজ্জে মশাইদের বাড়িতেই গিয়েছে। ওখানে ওই বাড়িতেই বিয়ে হবে তার। আজকে মাঝ-রাত্তিরে ওঁদের বাড়িতে আমাদের বিয়ে হবে—

মাসিমা কী বুঝলে কে জানে। কিন্তু তখন আর অতো কথা বলবার সময় নেই।

কিন্তু এ কী রকম বিয়ে! মাসিমা বোধহয় মনে মনে কষ্ট পাচ্ছিল। কোনও বাজনা নেই, নহবৎ-সানাই-এর শব্দ নেই। অতিথি-নিমন্ত্রিতদের ভিড় নেই। কজন লোক খাটা-খাটনি করছে, তারাই খাবে। কমলার মা একলাই সব সামলাচ্ছে।

রাত হলো। রাত তখন আটটা তখনও সন্দীপ মনে-মনে অস্বস্তি বোধ করছিল। কোথায় এই বিশাখার বিয়ে হবে কোন বিরাট ধনীর বাড়িতে, আর শেষকালে কিনা সন্দীপের ওপরেই ভার পড়লো তাকে উদ্ধার করার জন্যে।

মা কাছে এসে বললে—কী রে, কী ভাবছিস? চাটুজ্জে-মশাইদের বাড়ি থেকে যে লোক এসেছে ডাকতে। তুই যেতে দেরি করলে যে ওদের সকলের খাওয়া-দাওয়া করতে দেরি হবে। যা—

চাটুজ্জে-মশাইদের বাড়ি যেতে আর কতোই বা সময় লাগবে! পাঁচ মিনিটেরও কম হেঁটে গেলে। —কীসে যাবি?

সন্দীপ বললে—কীসে আবার যাবো, হেঁটেই যাবো—এই টুকুন তো রাস্তা—

মা বললে—তা কি হয়? বর কখনও হেঁটে হেঁটে বিয়ে করতে যায়?

সন্দীপ বললে—হ্যাঁ হ্যাঁ যায়। নাপিত কোথায় গেল? কানাই? আর পুরুত-মশাই-তারা সত্যিই তখন তৈরি হয়ে বসে আছে। দেরি হলে তাদেরও কষ্ট হবে!

না, সন্দীপ আর দেরি করবে না। সেও তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিলে। বিয়ের সময় গরদের পাঞ্জাবি পরতে হয়। সেটা তৈরি করাই ছিল আগে থেকে। আর গরদেরও ধুতি পরে নিলে একটা। সেই অবস্থাতেই সন্দীপ বেরিয়ে যাচ্ছিল।

কিন্তু মা বারণ করলে। কানাই নাপিতকে একটা রিকশা ডেকে আনতে বললে।

শেষ পর্যন্ত সেই রিকশায় চড়ে যখন পুরুত-মশাই আর কানাইকে নিয়ে সন্দীপ চাটুজ্জে-মশাইএর বাড়িতে পৌঁছুলো তখন রাত ন'টা বাজে।

কাশীবাবু নিজের জানা-শোনা কিছু-কিছু ভদ্রলোককে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। তাঁরা সবাই তখন এসে গেছেন। তাঁরা অভুক্ত আছেন। আর কতক্ষণ তাঁরা অপেক্ষা করবেন?

রাত দশটা থেকে শুভ-বিবাহের লগ্ন আরম্ভ হওয়ার সময়।

কাশীবাবুও সারাদিন অভুক্ত আছেন। তাঁর বয়েস হয়েছে। সবাই তাঁর জন্যেই চিন্তিত। কিন্তু তবু কন্যার পিতা বা অন্য কোনও অভিভাবক নেই বলে তিনিই স্বেচ্ছায় এই ভার নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন।

কাশীবাবু বললেন—আর দেরি করা নয় পুরুতমশাই, আরম্ভ করে দিন,—

বর-বেশ পরে সন্দীপ ভেতরে গেল। পাড়ার মেয়েরা সমস্বরে হুলু-ধ্বনি দিয়ে বরকে অভ্যর্থনা জানালে। সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলো শাঁখও একসঙ্গে বেজে উঠলো।

বিশাখাকে সারা সন্ধ্যাবেলাটা ধরে সাজিয়েছেন চাটুজ্জে-গৃহিণী। সারা মুখে গালে চন্দনের টিপ্ পরানো হয়েছে। চাটুজ্জে-গৃহিণী নিজের টাকা দিয়ে বেনারসী কিনে দিয়ে তাকে পরিয়ে দিয়েছেন। বিশাখার মা'র বহু বছরের সাধ আজ মিটতে চলেছে। সন্দীপও আজ মাসিমার কাছে তার কথা রাখতে পেরেছে বলে নিশ্চিন্ত।

অন্য সব মেয়েলি-আচার-ধর্ম শেষ হয়ে গেল নির্বিঘ্নে। এর পর সম্প্রদানের পালা।

কাশীবাবু বসলেন কন্যা সম্প্রদান করতে। তাঁর এক পাশে বিশাখা, আর এক পাশে বর সন্দীপ। আর তাঁর মুখোমুখি কুলপুরোহিত নিবারণ ভট্চার্যি-মশাই।

তোড়জোড় করতে করতেই রাত প্রায় দশটা বেজে গেল।

একটু আগেই সন্দীপের সঙ্গে বিশাখার 'শুভদৃষ্টি'র অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গিয়েছে।

এটা আনুষ্ঠানিক 'শুভদৃষ্টি'। বলতে গেলে সন্দীপ যেদিন মল্লিক-মশাইএর সঙ্গে বিশাখাদের খিদিরপুরের বাড়িতে গিয়েছিল, সেই দিনই তাদের শুভদৃষ্টি সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল। তখন তো কল্পনাও করতে পারেনি যে তাকেই একদিন বিয়ে করে তাকে সে তার অঙ্কলক্ষ্মী করবে! একদিন যে 'সেফ-ডিপোজিট-ভল্ট' খুলে সে তার ভেতরে তার সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা-বাসনা-কামনাকে সকলের অগোচরে গচ্ছিত রেখে-ছিল, সেই ভল্টের চাবি আবার একদিন সেই বিশাখার হাতেই তুলে দিতে হবে।

সন্দীপ আর বিশাখা তখন হাতে হাত মিলিয়ে মন্ত্রোচ্চারণ করতে যাবে, আর তখনই সেই দুর্ঘটনা ঘটলো। সেই তার জীবনের চরমতম দুর্ঘটনা।

আর সে এমন এক দুর্ঘটনা যা পৃথিবীর ইতিহাসে কারো জীবনে হয়তো ঘটেনি!

এখন তার মনে হয় সে-দুর্ঘটনা যে তার জীবনে ঘটেছে, তা ভালোই হয়েছে। তা না ঘটলে সে তো পৃথিবীকে এমন ভালো করে জানতেও পারতো না। এই পৃথিবীতে দেওয়াতে যে এত সুখ আর পাওয়াতে যে এত দুঃখ, এটা সে বুঝতো কেমন করে?

ভালোই হয়েছে যে সেদিন সেই দুর্ঘটনা ঘটেছে। আর একটু পরে ঘটলে হয়তো তার সর্বনাশ হয়ে যেত। মনে আছে, তখনও সম্প্রদানটা পুরো হয়নি। তার আগেই বাইরে হঠাৎ হৈ-চৈ শব্দ শুরু হয়ে গিয়েছিল।

—এখানে সন্দীপ বলে কেউ থাকে না? এইটেই তো সন্দীপ লাহিড়ীর বাড়ি? হরিপদ লাহিড়ীর ছেলে সন্দীপ লাহিড়ী?

সন্দীপের মা গাড়ির শব্দ শুনে বাইরে এসেছিল।

তাঁকে দেখে মল্লিক-মশাই চিনতে পারলেন। বললেন—আমি পরমেশ মল্লিক বৌঠান। আমি সন্দীপকে খুঁজতে এসেছি। সে কোথায়?

মা বললে—সে তো এখন বাড়িতে নেই ঠাকুরপো, তার যে আজ বিয়ে।

—বিয়ে? কোথায় বিয়ে করতে গেছে? কলকাতায়?

মা বললে—না ঠাকুরপো. ওই কাশীবাবুদের বাড়িতে। আপনি তো চেনেন ওদের।

—এখানেই সেই বিশাখা গাঙ্গুলী আর তার মা থাকতো না? তারা কি বাড়িতে আছে এখনও?

মা বললে—না, সেই বিশাখার সঙ্গেই তো আজ খোকার বিয়ে। কাশীবাবুদের বাড়িতে এখন বোধহয় কন্যা-সম্প্রদান হতে আরম্ভ করেছে—

—সে কী? তাহলে তো সব্বোনাশ হয়ে যাবে—

বলে ড্রাইভারকে গাড়ি ঘোরাতে বললেন মল্লিক-মশাই। সঙ্গে আরো তিনটে গাড়ি ছিল। মল্লিক-মশাই যে-গাড়িতে বসে ছিলেন সেই গাড়িতেই পেছনের দিকে এক বুড়ী মহিলাও বসে ছিলেন। অনেক বয়েস হয়েছে তাঁর। দেখে তাই-ই মনে হলো।

সে গাড়িতে পেছনে আরো দুটো বড়ো গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। সে-গাড়িতে অনেক পুলিশ ভর্তি। সে দুটো গাড়িও মল্লিক-মশাইএর পেছন-পেছন চলতে লাগলো। মল্লিক-মশাই হঠাৎ গাড়ি নিয়ে বেড়াপোতাতে এসে হাজির হলেন কেন? গাড়িতে ওই মহিলাটিই বা কে? আর অতো পুলিশই বা কেন?

বিয়ে বাড়ি বটে, কিন্তু তখন মা আর মাসিমা ছাড়া আর কেউ নেই। সবাই চাটুজ্জে-মশাইদের বাড়িতে চলে গেছে। সেখানেই রাত্রে তারা বিয়ে-বাড়ির ভোজ খাওয়া-দাওয়া করবে। সন্দীপের মা'র কেমন যেন ভয়-ভয় করতে লাগলো। কোনও অঘটন ঘটবে না তো। হঠাৎ এত বছর পরে ঠাকুরপো এ-বাড়িতে আসতে গেল কেন? আর যদি এলোই তো সঙ্গে অতো পুলিশের দল-বলই বা কেন আনলো?

পাশের ঘরে যেতেই বিশাখার মা জিজ্ঞেস করলে- তুমি কাদের সঙ্গে কথা বলছিলে গো? কে এসেছিল?

মা বললে—ও মল্লিক-মশাই!

—মল্লিক-মশাই? সেই কলকাতার মুখুজ্জে-বাবুদের বাড়ির ম্যানেজারবাবু?

—হ্যাঁ।

বিশাখার মা বললে—তারা হঠাৎ এখন এসেছিল কেন? কী জিজ্ঞেস করছিল?

মা বললে- জিজ্ঞেস করছিল বিশাখা আর তার মা এ-বাড়িতে আছে কিনা!

আমি বললুম, আজকে বিশাখার বিয়ে হচ্ছে। বিশাখা সেই চাটুজ্জে-বাবুদের বিয়ে-বাড়িতে আছে। বলতেই তারা আর দাঁড়ালো না। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি ঘুরিয়ে চাটুজ্জে-বাবুদের বাড়ির দিকে চলে গেল। সঙ্গে আবার দু'গাড়ি পুলিশ—

—পুলিশ? পুলিশ কেন? পুলিশ কী করতে এসেছে?

মা বললে—কে জানে পুলিশ কী করতে এসে—

বলে মা মনে মনে ইষ্টনাম জপ করতে লাগলো। হে ঠাকুর তুমি খোকাকে দেখো। আমি ছাড়া খোকার আর কেউ নেই। সে বড়ো দুঃখী। তুমিই তো মানুষের দুঃখ হরণ করো, তাই তো তোমার আর এক নাম দুঃখ-হরণ। আমার খোকার ভালো করো ঠাকুর। ভালো করো সে কোনও দোষ করেনি, সে কারো কোনও ক্ষতি করেনি। তার বিয়েটা যেন ভালোয়-ভালোয় হয়ে যায় ঠাকুর...

দ্বিতীয় পর্ব সমাপ্ত

তৃতীয় পর্ব

তৃতীয় পর্ব

যারা ভাগ্য মানে না তারা কিন্তু জীবন মানে। মানুষের জীবনেরও যে একটা অর্থ আছে, সেটা তারা মানে। তারা মানে যে জীবন ঠিক নদীর মতো। কোথাও সরু, কোথাও মোটা, কোথাও গভীর, আবার কোথাও অগভীর, কোথাও নীল, কোথাও হলদে, কোথাও ঠাণ্ডা, কোথাও গরম। তা সে নদী যে-রকমই হোক তারা সবাই কিন্তু সচল। সব নদীরই উদ্দেশ্য সামনে এগিয়ে চলা। সব নদীরই উদ্দেশ্য সামনে এগিয়ে গিয়ে সমুদ্রের সঙ্গে মেশা। সমুদ্রের গিয়ে বিলীন হওয়া, সমুদ্রে গিয়ে সম্পূর্ণ হওয়া। অনন্তের সঙ্গে মিশে অনন্ত হওয়া। অন্তর্লীন হওয়া।

কিন্তু মানুষ?

মানুষও তাই। কিন্তু একটা জায়গায় মানুষের সঙ্গে নদীর তফাৎ আছে। নদী যখন চলে তখন সে চায় তার আশে-পাশের জমি সরস হোক, তাতে ফসল ফলুক, সেখানকার অধিবাসীরা পেট ভরে সেই ফসল খেয়ে বাঁচুক, তারা সুখী হোক।

মানুষ কিন্তু তার বিপরীত। মানুষ বলে—তোমার ভালো হোক কি খারাপ হোক, আমার তা দেখবার দায় নেই। তুমি পেট ভরে খেতে পেলে কি না, তুমি বাঁচলে কি মরলে, তুমি সুখী হলে কি হলে না, তা নিয়ে আমার মাথা-ব্যথা নেই। আমি আমাকে নিয়েই বাঁচবো। আমার বাড়ি-ঘর, আমার খাওয়া-পরা, আমার পরিবারের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য মিটে গেলেই আমি নিশ্চিন্ত। আর জীবনের শেষে আমি অমৃত পেলুম কি পেলুম না, তা নিয়ে এখন থেকে ভেবে বর্তমানের আরামটা আমি নষ্ট করতে চাই না। আমার কাছে বর্তমানটাই সত্যি। অতীত আর ভবিষ্যৎটা ভাববার সময় নেই আমার। কালকের কথা কাল ভাববো, আজ কী আছে তোমার কাছে দাও, আমি সেগুলো ভোগ করি।

কোটি কোটি মানুষের মধ্যে একজনই বলেছিল—যা নিয়ে আমি অমৃতা হবো না তা নিয়ে আমি কি করবো? অর্থাৎ "যেনাহং নামৃতাস্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্"।

এ-কথা যিনি বলেছিলেন তিনি হচ্ছেন ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের স্ত্রী মৈত্রেয়ী।

কিন্তু যখন পৃথিবীতে ঝড়-তুফান হয় তখন সেই শান্ত নদীই আবার ফুলে-ফেঁপে বন্যায় সমস্ত জনপদ ডুবিয়ে ভাসিয়ে মানুষের অনেক কষ্টে চাষ করা ফসল নষ্ট করে, মানুষকে হত্যা করে। প্রবল আঘাত দিয়ে সে তার প্রতিবাদ জানায়। এ প্রতিবাদ কিসের?

প্রতিবাদ তার ওপর মানুষের অনাচার-অত্যাচারের, প্রতিবাদ তার ওপর মানুষের অবহেলার। প্রতিবাদ তার ওপর মানুষের অবিচারের।

মানুষ কি নদীর ওপর কম অনাচার-অত্যাচার, অবিচার-অবহেলা করেছে? মানুষ কি নদীর ওপর কম জঞ্জাল, কম ময়লা, কম নোংরা ফেলেছে? সুতরাং নদী যদি তার প্রতিবাদ করে, নদী যদি তার প্রতিশোধ নেয়, তাহলে কি নদীর কোনও অপরাধ হয়? তোমরা নদীকে কি কখনও ভালোবেসেছ? তোমাদের সঙ্গে নদীর তো শুধু প্রয়োজনের সম্পর্ক! তোমরা তো নদীকে কখনও প্রীতি দাওনি। কখনও ভালোবাসা দাওনি।

সেই যাজ্ঞবল্ক্যের স্ত্রী-মৈত্রেয়ীর বাণীর মতো বাণী সংসারে আর কে বলেছে?

যাঁরা বলেছেন তাঁদের সকলকেই মানুষ খুন করেছে। তাঁদেরই মানুষ হত্যা করে, নিঃশেষ করে দিয়ে কৃতার্থ হতে চেয়েছে। কিন্তু ইতিহাস?

সন্দীপও তখন সেই ইতিহাসের কথাই ভাবছিল। সে তো বিশাখাকে বিয়ে করে মাসীমার জীবনের একমাত্র ইচ্ছেকে সাকার করতে চেয়েছিল। পরের উপকারের জন্যে নিজের সর্বস্ব বিসর্জন দিতে চেয়েছিলেন। আর তারজন্যে নিজের পৈতৃক বাড়িটা পর্যন্ত বন্ধক রেখে দিয়েছিল। তাহলে কেন এমন হলো?

সমস্ত বিয়ে-বাড়িটা তখন উত্তেজনায় থর-থর করে কাঁপছে। আশে-পাশের বাড়ি থেকেও সবাই তখন ছুটে এসেছে এই অপ্রত্যাশিত কান্ড-কারখানা দেখতে। সবাই তখন সবাইকে জিজ্ঞেস করছে—কি হয়েছে দাদা? বিয়ে-বাড়িতে এত পুলিশ কেন?

কে এ-কথার জবাব দেবে? যে জবাব দিতে পারতো, সে তো সন্দীপ। সন্দীপ তখন মানুষের আর পুলিশের হাতে বন্দী। বৃদ্ধ চ্যাটার্জিবাবু তখন কন্যা সম্প্রদান করতে গিয়ে মাঝপথে বাধা পেয়েছেন। তিনিও ঘটনার আকস্মিকতায় তখন হতভম্ব।

সন্দীপের সামনে তখন ঠাকমা-মণি দাঁড়িয়ে।

তিনি বলছেন—তুমি সরো, সরে দাঁড়াও-এ বিয়ে হবে না।

মল্লিক-মশাই তখন চুপ করে দাঁড়িয়েছিলেন। সন্দীপ তাঁর দিকেই স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। চোখের দৃষ্টিতে তার আকুল প্রশ্ন। মল্লিক-মশাইও সন্দীপকে বললেন—হ্যাঁ, তুমি সরে দাঁড়াও সন্দীপ—

সন্দীপ তখনও কিছুই বুঝতে পারছিল না। বললে—এ-সব কী কান্ড, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না কাকা—

ঠাকমা-মণি তখন গাড়ি থেকে নামিয়ে নিয়ে এসেছেন সৌম্যপদকে।

সন্দীপ সৌম্যবাবুর দিকে চেয়ে দেখলে। কোথায় গেল তাঁর চেহারা? কোথায় গেল তাঁর সেই যৌবন? জেলে থাকার জন্যেই কি তাঁর এই পরিণতি?

সন্দীপ উঠে দাঁড়াতেই মল্লিক-মশাই তার আসনের ওপরে সৌম্যপদকে বসিয়ে দিলেন। প্রায় সাত-আটজন পুলিশ ঘিরে দাঁড়ালো তাকে। যেন সে কোথাও পালিয়ে যেতে না পারে।

পুরোহিত মশাইও তখন হতভম্ব। কোনও কথাই তখন তাঁর মুখ দিয়ে বেরোচ্ছে না।

হয়তো আপত্তি করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু মল্লিক-মশাই বললেন—এখন এই নতুন পাত্রের হাতেই কন্যা সম্প্রদান করুন পুরুতমশাই। দেরি করবেন না, হাতে বেশি সময় নেই—

কিন্তু চ্যাটার্জিবাবু আপত্তি করে দাঁড়িয়ে উঠলেন। বললেন—এসব কি হচ্ছে আপনাদের?

তারপরে মল্লিক-মশাই-এর দিকে চেয়ে তাঁর মনে হলো তিনি যেন তাঁকে চিনতে পেরেছেন। বললেন—মনে হচ্ছে আপনাকে যেন আমি চিনি—

মল্লিক-মশাই বললেন—হ্যাঁ, আমি পরমেশ। আমি এই বেড়াপোতারই লোক। আমি এই সন্দীপের বাবা হরিপদ লাহিড়ীর বন্ধু। আমার নাম পরমেশ মল্লিক—

—তা হঠাৎ এসব কি কান্ড করছেন আপনারা? এই কন্যার সঙ্গে সন্দীপের বিয়েতে আমিই সম্প্রদান করছি। আর আপনারা কাকে বসিয়ে দিলেন বরের আসনে? এ কে?

ঠাকমামণি বললেন—এ আমার নাতি—

—তা পাত্র আপনার নাতি হতে পারে, কিন্তু এ-বিয়েতে বাধা দেওয়ার অধিকার কে দিলে আপনাদের? আমি এ-অন্যায় কিছুতেই সহ্য করবো না—আমি কোর্টে আইন ভাঙার অপরাধে কেস ঠুকে দেব আপনাদের বিরুদ্ধে—

ঠাকমা-মণি বললেন—আপনার যদি সে অধিকার থাকে তো তা করুন—কিন্তু আমরা এ-বিয়ে দেবই—

চ্যাটার্জিবাবু বললেন—দেখি আমি থাকতে এ-বিয়ে কি করে ভাঙে? এই কন্যার মা ক্যানসারের রোগী, সেই মায়ের ইচ্ছেতেই সন্দীপ তাকে বিয়ে করছে।

ঠাকমা-মণি বললেন—সেই ক্যানসারের চিকিৎসার যা খরচ লাগে তার সব খরচ আমি দেব। কিন্তু আমার নাতির সঙ্গে এই মেয়ের বিয়ে আমি দেবই। এই মেয়ের সঙ্গে আমার নাতির বিয়ে দেওয়ার জন্য ছোটবেলা থেকে আমি একে খাইয়ে-পরিয়ে মানুষ করেছি। ওই সন্দীপ সব জানে। ডাকুন সন্দীপকে -

চ্যাটার্জিবাবু কথাটা শুনে অবাক হয়ে গেলেন।

বললেন—আপনি এই বিশাখাকে খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করেছেন?

—হ্যাঁ, বিশ্বাস না হয় তো এই পাত্রীকেই জিজ্ঞেস করুন না। এই বিশাখাও সব জানে। আপনি জিজ্ঞেস করুন বিশাখাকে!

চ্যাটার্জিবাবু নিচু হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—কি মা, উনি যা বলছেন সব সত্যি? উনিই তোমাকে ওঁর নাতির সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার জন্যে খাইয়ে-পরিয়ে মানুষ করেছেন?

ঠাকমা-মণি বললেন—শুধু খাইয়ে-পরিয়ে নয়। আমার নিজের টাকা খরচ করে ওই পাত্রীকে বি. এ. পাশ করিয়েছি। আমার নিজের সাহেব পাড়ার বাড়িতে বিনা ভাড়ায় ওদের মা-মেয়েকে রেখে, ঝি-ড্রাইভার রেখে ওকে বড় করেছি। তাতে আমার কয়েক লাখ টাকা খরচও হয়েছে।

চ্যাটার্জিবাবু বললেন—তাহলে ওঁরা মা-মেয়ে সেই বাড়ি ছেড়ে এই বেড়াপোতাতে গরীবের বাড়িতে এলো কেন?

—তা সেটা ওই পাত্রীকেই জিজ্ঞেস করুন না। ও তো আপনার সামনেই বসে আছে। ওকে জিজ্ঞেস করুন!

চ্যাটার্জিবাবু বিশাখার দিকে চেয়ে বললেন—কি মা, উনি যা বলছেন সব সত্যি?

সেই যে তখন থেকে বিশাখা মাথা নিচু করে বসেছিল, তখনও তেমনিই মাথা নিচু করে বসে রইলো। কোনও কথার জবাব দিলে না। চ্যাটার্জিবাবু আবার জিজ্ঞেস করলেন কিছু বলছো না কেন? কথার জবাব দাও। কিছু বলো তুমি.....

তখনও বিশাখা চুপ করে বসে আছে দেখে ঠাকমা-মণি অধীর হয়ে উঠলেন। বললেন—একটু তাড়াতাড়ি করুন, আমাকে আবার বউ নিয়ে কলকাতায় ফিরে যেতে হবে...পুরুতমশাই, আপনি আর দেরি করবেন না—

চ্যাটার্জিবাবু বলে উঠলেন—কোথায়? সন্দীপ কোথায় গেল??

আশে-পাশে তখন বাইরের ভেতরের নিমন্ত্রিত-অনিমন্ত্রিত, অনাহূত-রবাহূত মেয়ে পুরুষের ভিড়। তারা আগে অনেক বিয়ে-বাড়ির উৎসব অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছে, কিন্তু কেউ কখনও এমন ঘটনা দেখেওনি, এমন ঘটনার কথা শোনেওনি। তখন তারা সবাই বরকে খুঁজতে ব্যস্ত। বর মানে সন্দীপ। সন্দীপ কোথায় গেল? এ ব্যাপারে তার অনুমতি দরকার। সে কোথায়? কোথায় সে?

চ্যাটার্জিবাবু একজন চেনা মানুষ দেখতে পেয়ে বললেন—ওরে কার্তিক, সন্দীপকে ডেকে আন তো! কোথায় গেল সে?

ইন্দোর থেকে সকালবেলার প্লেনে মুক্তিপদর কলকাতায় এসে পৌঁছোবার কথা। কিন্তু কোথায়, কি যেন যান্ত্রিক গোলযোগের জন্যে তা এসে পৌঁছুলো বিকেল পাঁচটার সময়ে।

আগেই বিডন স্ট্রীটের বাড়িতে মাকে টেলিফোন করে কথাটা জানিয়ে দিতে চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু টেলিফোনের লাইনটা খারাপ ছিল বলে সেটা সম্ভব হয়নি। দমদম এয়ারপোর্টে নেমে কিছু খেয়ে নিলেন তিনি।

আগে কথা বলা থাকলে বাড়ি থেকে গাড়ি আসতো। যাওয়া-আসার পক্ষে অসুবিধে হতো না। কিন্তু কি আর করা যাবে! এয়ারপোর্ট থেকে ট্যাক্সিই করতে হলো।

একেবারে সোজা কালিন্স্ স্ট্রীট। কোথায় সকালবেলা আসবেন তা নয়, একেবারে সন্ধ্যে সাতটা হয়ে গেল। রাস্তা ফাঁকা থাকলে আরো একঘণ্টা আগে আসা যেত। তাঁর জন্যে হয়তো মিস্টার হাজরা অপেক্ষা করে করে এতক্ষণে চলে গেছেন। কাজের লোক যারা তাদের সময়ের দাম আছে। তারা আর কতোক্ষণ অপেক্ষা করবে?

তিনি যেতেই হরদয়াল এগিয়ে এলো। বললে—আসুন স্যার—আমার নাম হরদয়াল—

মুক্তিপদ জিজ্ঞেস করলেন—মিস্টার হাজরা কোথায়?

হরদয়াল বললে—তিনি আপনার জন্যে অপেক্ষা করে করে এই একটু আগে চলে গেলেন।

পার্টি অফিসে আজ তাঁর মিটিং আছে বিকেলবেলা—

মুক্তিপদবাবু বললেন—আমার প্লেন যে রাস্তায় বিগড়ে গেল তাই দেরি হয়ে গেল। তা এখন পার্টি অফিসে তাঁকে টেলিফোন করা যায়?

—তা করা যায়। তবে পাব কী না জানি না।

—আচ্ছা আমি বসছি, দেখুন পাওয়া যায় কি না!

—দেখছি আমি—

বলে হরদয়াল টেলিফোন করতে চলে গেল। তিনি একলা ঘরে বসে রইলেন।

খানিক পরেই একজন মহিলা এক কাপ কফি নিয়ে এল। বললে—কফিটা খান ততক্ষণ।

হরদয়াল তখন টেলিফোন করছে পার্টি অফিসে:

—গোপালদা আছে ওখানে? আমি হরদয়াল বলছি—

—একটু ধরুন—

'ধরুন' বলেও অনেকক্ষণ দেরি হলো। গোপালবাবু ব্যস্ত মানুষ। হরদয়াল রিসিভারটা কানে লাগিয়েই অপেক্ষা করতে লাগলো।

আসলে মন্ত্রী শ্রীপতি মিশ্রের দুটো হাত। একটা হাত হচ্ছে লেবার লীডার বরদা ঘোষাল, আর অন্য হাতটা হচ্ছে গোপাল হাজরা। এরা দুজন না হলে শ্রীপতি মিশ্রের অবস্থা অচল হয়ে পড়ে। তাই পার্টি মিটিং-এ এদের অবস্থান বিশেষ জরুরী।

গোপাল হাজরা না হলে শ্রীপতি মিশ্রের যেমন চলে না, তেমনি গোপাল হাজরা না থাকলে দেশও চলে না। দেশের কল-কারখানা, চাষ-বাস, খাওয়া-পরা, স্কুল-কলেজ সবই যে চলছে, এ কেবল গোপাল হাজরা আর বরদা ঘোষালের জন্যেই। কে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির ভাইস-চ্যান্সেলার হবে, কে রবীন্দ্র-পুরস্কার পাবে, বা কে বিদ্যাসাগর বা বঙ্কিম-পুরস্কার পাবে, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সমস্ত ব্যাপারে এই দুজনই দেশের শেষ কথা, এই বরদা ঘোষাল আর এই গোপাল হাজরা।

কিন্তু গোপাল হাজরার একটা গুণ আছে। সে-গুণটা হলো এই যে সে কখনও সামনে আসতে চাইবে না। মিনিস্টারের পোস্ট দিলেও সে কখনও তা নেবে না। সে বুদ্ধিমানের মতো আড়ালে থাকতেই ভালোবাসে। আড়াল থেকে কল-কাঠি নাড়াতেই সে ভালোবাসে। তার বাঁধা কোনও ঠিকানাও কিছু নেই, কেউ জানেও না তা। তাঁকে খুঁজে পাওয়া বড় শক্ত। কারণ কখন যে সে কোথায় থাকে, তা জানা স্বয়ং ঈশ্বরের পক্ষেও অসম্ভব।

এমন যে মানুষ তাকে যে মুক্তিপদবাবু খুঁজে পেয়েছেন এ তাঁর অশেষ সৌভাগ্য। অবশ্য খুঁজে পাওয়ার একমাত্র কারণ মিস্টার এ সি চ্যাটার্জির সহযোগিতা। এ সেই এ সি চ্যাটার্জি, বা অতুল চ্যাটার্জি, যাঁর ছেলে সুবীর চ্যাটার্জি, লেবার লীডার, আর যাঁর মেয়ে বিনীতা, যার সঙ্গে সৌম্যপদ'র বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। তিনি সারা পৃথিবীময় ঘুরে বেড়ান নানান কাজে। সেই সূত্রে একদিন তিনি ইন্দোরে যান এবং সেখানেই পিকনিকের কথা ওঠে।

কোন প্রসঙ্গে অতুলবাবু বলেছিলেন আপনি গোপাল হাজরাকে চেনেন?

মুক্তিপদ বলেছিলেন—অনেকের কাছে নাম শুনেছি—

অতুলবাবু বলেছিলেন—আসলে পুরো কলকাতাটাই গোপাল হাজরার কন্ট্রোলে।

—কী রকম?

অতুলবাবু বলেছিলেন—হ্যাঁ, যা ঠিকই বলছি। বরদা ঘোষাল লেবার লীডার, আর এই গোপাল হাজরা, ওই দুজনই এখন কলকাতা চালাচ্ছে—

—কিন্তু আমি ওই বরদা ঘোষালকে যে কতো লাখ টাকা দিয়েছি তার ঠিক নেই। তবু কেন আমাকে ফ্যাক্টরি ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে মধ্যপ্রদেশে তুলে আনতে হলো?

অতুল চ্যাটার্জি "চ্যাটার্জি ইন্টারন্যাশনাল এন্টারপ্রাইজের" প্রতিষ্ঠাতা আর তিনি অত্যন্ত গরীব অবস্থা থেকে উঁচুতে উঠেছেন। তাঁর কথা অবহেলা করবার নয়।

তিনি বলেছিলেন—মধ্যপ্রদেশে ফ্যাক্টরি উঠিয়ে নিয়ে এসেছেন ভালোই করেছেন। কিন্তু

গোপাল হাজরার সঙ্গে আপনি এবার যোগাযোগ করুন, তাহলে আর একটা ফ্যাক্টরি করতে পারবেন ওয়েস্ট বেঙ্গলে।

মুক্তিপদবাবু বলেছিলেন—সে আর এখন এত তাড়াতাড়ি হবে না। সে পরে দেখা যাবে। এখন প্রবলেম হলো পিক্‌নিককে নিয়ে। আমার মেয়ে—

—কেন? আপনার মেয়েকে নিয়ে আবার কী প্রবলেম?

মুক্তিপদ বলেছিলেন—তাকে কয়েক দিন হলো খুঁজে পাচ্ছি না।

—কেন? তার কী হলো? পুলিশে খবর দিয়েছেন?

—আজকালকার পুলিশ কি আর আগেকার পুলিশের মতো আছে?

অতুলবাবু বলেছিলেন—তা না হলো, আপনি নিজে কিছু খোঁজ নিয়েছেন?

—হ্যাঁ, খোঁজ নিচ্ছি বই কি! বাপ হয়ে কে চুপ-চাপ বসে থাকতে প্যারি? আমি বোম্বে গিয়েছিলাম। আমার এজেন্ট সেখানে আছে। তারাও চেষ্টা চালাচ্ছে, কোনও ট্রেস পাইনি।

অতুলবাবু জিজ্ঞেস করেছিলেন—আর ক্যালকাটা?

—ক্যালকাটাতেও সব পার্টিকে জানিয়েছি। তারাও চেষ্টা করে কিছু পাচ্ছে না।

—গোপাল হাজরার সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন?

—না তো!

অতুলবাবু বলেছিলেন—তাহলে তো আসল লোকের সংগেই যোগাযোগ করেননি। ওর সঙ্গে যোগাযোগ করুন!

—তা ঠিকানা কোথায় পাবো?

অতুলবাবু বলেছিলেন—ঠিক আছে। সুবীর তার পাত্তা দিতে পারবে! আমি এবার কলকাতায় গেলে তার কাছ থেকে গোপাল হাজরার ঠিকানা নিয়ে আপনাকে জানাবো।

এই কথা হয়েছিল মিস্টার চ্যাটার্জির সঙ্গে। তিনিই ওই কলিন্‌স্ স্ট্রীটের ঠিকানা জানিয়েছিলেন। সেই ঠিকানা পেয়ে মুক্তিপদ আর দেরি করেননি। সোজা একটা টেলিফোন করেছিলেন। তারপরেই দিনক্ষণ ঠিক করে ইন্দোর থেকে একেবারে উড়ে চলে এসেছিলেন কলিন্‌স্ স্ট্রীটের ঠিকানায়।

কিন্তু তখন কে জানতো যে প্লেন এমন বিশ্বাসঘাতকতা করবে? নইলে তো সমস্তই ঠিক-ঠাক ছিল। গোপাল হাজরার মতো ব্যস্ত-বাগীশ লোকের পক্ষে ছ'টা ঘণ্টা নষ্ট করা সম্ভব নয়। তাই সে পার্টির মিটিং-এ চলে যেতে বাধ্য হয়েছে।

অনেকক্ষণ রিসিভারটা ধরে রাখার পর গোপাল হাজরার সময় হলো টেলিফোনটা ধরতে। জিজ্ঞেস করলে—কে? হরদয়াল?

—হ্যাঁ স্যার। মিস্টার মুখার্জি আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে এখানে বসে রয়েছেন। ইন্দোরের প্লেন কলকাতায় পৌঁছতে ছ'ঘণ্টা লেট হয়ে গিয়েছিল। তাই......

গোপাল হাজরা বললে—ওঁকে বসতে বলো, আমি আসছি—

বলে দু'দিকের রিসিভারই দু'জনে রেখে দিলে।

মুক্তিপদ জিজ্ঞেস করলেন—গোপালবাবু আসছেন?

হরদয়াল বললে—হ্যাঁ স্যার, আপনি একটু বসুন—

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। গোপাল হাজরা কলিন্‌স্ স্ট্রীটের বাড়িতে এসে পৌঁছুলো। এসেই বললে—কিছু মনে করবেন না স্যার। পার্টি অফিসে জরুরী মিটিং-এই দেরি হয়ে গেল। বলুন, এবার আপনার কথা শুনি—

মুক্তিপদবাবু মিস্টার চ্যাটার্জির কথা বললেন। অতুল চ্যাটার্জি। তাঁর কাছ থেকেই মিস্টার হাজরার ঠিকানাটা আর টেলিফোন নম্বর পেয়েছেন, তাও বললেন।

গোপাল হাজরা এতক্ষণে বললে—এখন বলুন মিস্টার মুখার্জি, আমি আপনার কী উপকার করতে পারি?

মুক্তিপদবাবু বললেন—আমার মেয়ে আজ দশ-বারো দিন হলো ইন্দোরের বাড়ি থেকে

উধাও হয়ে গেছে। কোথাও তার ট্রেস্ পাচ্ছি না। মিস্টার চ্যাটার্জি বলেছিলেন যে আপনার সংগে কনট্যাক্ট করলে আপনি তাকে উদ্ধার করে দিতে পারেন।

—আপনি মধ্যপ্রদেশ কি বোম্বাই, দিল্লী, ম্যাড্রাস, ও-সব জায়গায় খুঁজে দেখেছেন? কিংবা ও-সব জায়গার পুলিশের নজরে এনেছেন?

—হ্যাঁ, সেই দিনই তাদের কাছে আমার কেস্ প্রেজেণ্ট করেছি। কিন্তু আমার মনে হয় সে এই ক্যালকাটাতেই আছে।

কেন?

—কারণ ক্যালকাটার 'সেণ্ট জেভিয়ারস্ কলেজে'ই সে পড়তো। এখানেই তার যতো বন্ধু-বান্ধবরা একসংগে পড়েছে। যখন সে শুনলো যে ক্যালকাটা ছেড়ে ইন্দোর চলে যেতে হবে, তখনই সে খুব আপত্তি করেছিল। বলেছিল, সে ইন্দোরে যাবে না, এখানকার 'স্টুডেণ্টস্ হোস্টেলে' থেকে পড়াশোনা চালিয়ে যাবে।

গোপাল হাজরা বললে—আপনি ঠিকই বলেছেন, আপনার মেয়ে কলকাতাতেই আছে। আপনার টেলিফোন পেয়েই আমি কলকাতার সব আড্ডায় খবর নিয়েছিলুম! কিন্তু মুশকিল হয়েছে একটা।

মুক্তিপদর মুখটা আশা-আনন্দ-বিস্ময়ে অধৈর্য হয়ে উঠলো।

—তাহলে পিক্‌নিককে পাওয়া গেছে?

—হ্যাঁ, তাকে আমি এখুনি আপনার কাছে এনে দিতে পারি। কিন্তু ওই যে বললুম, একটা মুশকিল হয়েছে।

—এখানকার গুণ্ডাদের আজকাল বড্ড টাকার খাঁকতি হয়েছে। টাকা না ফেললে তারা কথাই বলতে চায় না।

—টাকা? টাকা তো আমি সংগে করে এনেছি। কতো টাকা?

গোপাল হাজরা বললে—ওরা তো 'তিন লাখ' বলে চেঁচাচ্ছে। বলছে, তিন লাখ না পেলে ছাড়বে না। কিন্তু আমি বলেছি, পঞ্চাশ হাজারের এক পয়সা বেশি দেব না।

মুক্তিপদ বললেন—এখন আমার কাছে তো তিন লাখ টাকা নেই। ইন্দোর গিয়ে পাঠিয়ে দিতে পারি। এমন হলে পিক্‌নিকের জন্যে আমি তিন লাখ কেন, চার লাখও দিতে পারি। আপনি আমার মেয়েকে ফিরিয়ে দিতে বলুন—

গোপাল হাজরা বললে—এখন আপনি কতো টাকা দিতে পারবেন?

মুক্তিপদ বললেন—আমি তো আমার সংগে পঞ্চাশ হাজারই এনেছি—ক্যাশ—

গোপাল হাজরা বললে—তাহলে তাই-ই দিন, দেখি বেটাদের আমি পঞ্চাশ হাজার টাকায় রাজী করাতে পারি কিনা।

মুক্তিপদ আর দেরি করলেন না। ব্রিফকেসটা টেনে নিয়ে তা থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা বার করে গোপাল হাজরার হাতে দিলেন। বললেন—আপনি গুনে গুনে নিন মিস্টার হাজরা—

গোপাল হাজরা বললে—আপনার টাকা আমি গুণে নেব? আপনি বলছেন কী?

তারপর চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠলো। বললে—আপনি একটু বসুন। আমি এখুনি ফ্রী-স্কুল স্ট্রীটে বেটাদের আড্ডায় যাই, দেখি ভজিয়ে-ভাজিয়ে ওদের রাজী করাতে পারি কিনা। আমি এক ঘণ্টার মধ্যে আসছি—

বলে ঘরের বাইরে চলে গেল। সিঁড়ির কাছে হরদয়াল আর আণ্টি দাঁড়িয়ে ছিল।

গোপাল হাজরা গলা নিচু করে—পিক্‌নিক্ কেমন আছে? কথা বলছে?

আণ্টি বললে—হ্যাঁ স্যার। একটু আগেই ঘুম থেকে উঠেছে—

গোপাল হাজরা বললে—আমি মিস্টার মুখার্জিকে বলেছি সে ফ্রী-স্কুল স্ট্রীটের গুণ্ডাদের আড্ডায় আছে! মেয়েটাকে একটা ভালো শাড়ি পরিয়ে দাও, আর খানিকটা গরম দুধও খাইয়ে দাও। আর চোখ-মুখ ধুইয়ে মুখে স্নো-পাউডার মাখিয়ে দাও। আমি এক ঘণ্টা পরে আসছি, মিস্টার মুখার্জি যেন জানতে না পারে যে পিক্‌নিক্ এখানে আছে—

বলে আর দাঁড়ালো না সেখানে। তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে রাস্তায় নিজের গাড়িতে গিয়ে উঠলো।

সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি চলতে লাগলো ফ্রী-স্কুল স্ট্রীটের দিকে। রাত হতে আরম্ভ করেছে। একটু পরেই যতো রাত হবে, ততোই এ-পাড়া ফুর্তির নেশায় জম-জমাট হয়ে উঠবে। তখন যারা ডিউটিতে থাকে তারা দুটো পয়সা কামাবার আশায় এদিকে-ওদিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখে। বিশেষ করে গাড়িওয়ালা মানুষ দেখলে তারা চেঁচায়—এ্যাই, রোখকে—

গাড়ি থামিয়ে দিয়ে তারা গাড়ির লাইসেন্স দেখতে চাইবে, 'ট্যাক্স-টোকেন' দেখতে চাইবে। যদি কেউ বলে যে 'ট্যাক্স-টোকেন' বাড়িতে আছে তাহলে তার আর রেহাই নেই। তাহলে মাসুল দাও, রুপেয়া দাও।

যারা এ-পাড়ায় রাতে আসে তারা সাধারণতঃ মাল খেতে আসে, মেয়েমানুষ ভোগ করতে আসে। তারা হাঙ্গামা-হুজ্জুৎ চায় না। টাকা দিয়ে মুক্তিই পেতে চায় সবাই। তখন মুক্তি পেয়ে কোনও বাড়িতে ঢুকে পড়ে দরজা বন্ধ করে দেয়। আর একবার ঢুকে পড়লে তখন হরদয়াল কিংবা ফটিকের হাতের মুঠোর মধ্যে তুমি চলে গেলে। তখন পয়সার জন্য খুনোখুনি পর্যন্ত হয়ে যায়: খুনোখুনি হলেও কিছু ভয় নেই। কারণ গোপাল হাজরা আছে। হরদয়াল আর ফটিক—এই দু'জনের ওপরই এই এলাকার ভার দেওয়া আছে। তারা গুন্ডামি করে যা রোজগার করে, তার ওপরে পার্সেণ্ট পাওনা হয় গোপাল হাজরার।

সামনের পুলিশটা পাহারা দিচ্ছিল। সাহেবকে চিনতে পারেনি—এ রোখকে—

বলবার সঙ্গে সঙ্গে ভুল বুঝতে পেরেছে বাচ্চু। বুঝতে পারার সঙ্গে-সঙ্গে হাত তুলে সেলাম জানিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে নিয়ে বলেছে—সেলাম হুজুর—

গোপাল হাজরা বললে—কী রে, বাচ্চু, ভালো আছিস?

সেই বাচ্চু! যে বাচ্চুর জন্যে ফটিক আর হরদয়াল কলকাতার মতো শহরে ক্যালকাটা করপোরেশনকে ফাঁকি দিয়ে বেনামীতে পাকা বাড়ি করতে পেরেছে, যে বাচ্চুর জন্যে গোপাল হাজরা এ পাড়ায় একচ্ছত্রাধিপতি সম্রাট হয়ে এতকাল রাজত্ব করছে।

গোপাল হাজরার প্রশ্নের জবাবে বাচ্চু বললে—আপকা মেহেরবানি সাহাব—

—সব ঠিক-ঠাক চলছে তো?

—জী হুজুর!

ওইটুকুই যথেষ্ট! জমিদারি দেখতে এলে প্রজারা যেমন জমিদারবাবুকে সেলাম করে, এও ঠিক তেমনি। এই কলকাতা যেন গোপাল হাজরারই জমিদারি।

—ফটিক কোথায় রে?

বাচ্চু বললে—এখনও আসেননি বাবুজী!

বাচ্চু জানে যে গোপাল হাজরা সাহেব যদি বেঁকে বসে তো কলকাতার এই পাড়ার স্বর্গ থেকে সে কবে একদিন কোন্ নরকে বদলি হয়ে যাবে। তখন তার মাইনে কেউ-ই আটকাতে পারবে না, কিন্তু উপ্রি? উপ্রি আয়েতেই তো কলকাতার বাচ্চুদের সংসার চলে।

জমিদারি দেখতেই গোপাল হাজরার এক ঘণ্টা সময় কেটে গেল। হাতের ঘড়িটা দেখে সে বুঝলো যে ফেরবার সময় হয়েছে। আর দেরি না করে গোপাল হাজরা তখন আবার কলিন্স্ স্ট্রীটের দিকে গাড়ি চালাতে শুরু করলো।

যখন হরদয়ালের বাড়িতে এসে পৌঁছুলো তখন ঘড়িতে রাত দশটা বেজেছে।

আসতেই আণ্টিকে জিজ্ঞেস করলে—মুখার্জি সাহেব এখনও বসে আছেন?

—হ্যাঁ, আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।

—কিছু বলছিলেন?

—হ্যাঁ, বলছিলেন যে এত দেরি হচ্ছে কেন আসতে।

—তোমাকে জিজ্ঞেস করছিলেন, না হরদয়ালকে জিজ্ঞেস করছিলেন?

হরদয়ালবাবুকে জিজ্ঞেস করছিলেন। আমি ও'র সামনে যাইনি।

গোপাল হাজরা বললে—যাওনি, ভালোই করেছ—এখন মেয়েটাকে পরিষ্কার-পরিষ্কার

করেছ? কেমন আছে সে?

আণ্টি বললে—আসুন না, দেখে যাবেন, কেমন সাজিয়েছি তাকে—দোতলা পেরিয়ে তিন তলাতেই রাখা হয় বাইরের মেয়েদের। সেখানে তাদেরই রাখা হয় যারা পয়সাওয়ালা বাপ-মায়ের ছেলেমেয়ে। ওষুধ খাইয়ে-খাইয়ে সবকিছু তাদের ভুলিয়ে দেওয়া হয়। তারা ভুলে যায় তাদের নিজের নাম। যখন দেখা যায় কেউ তাদের দাবীদার নেই, তখন তাদের দূরে কোথাও মোটা দামে বিক্রি করে দেওয়া হয়, কিংবা যেখানে পারে সেখানেই ভাগাড়ে ফেলে দেওয়া হয়। এই নিয়মই এতদিন চলে আসছে এ-বাড়িতে।

তেতলায় একটা ঘরের চাবি খুললে আণ্টি। গোপাল হাজরা ভেতরে ঢুকে দেখলে মেয়েটা বিছানায় জড়ো-সড়ো হয়ে শুয়ে আছে। আণ্টি কাছে গিয়ে ডাকলে—ওঠো মা, ওঠো—

মেয়েটাকে একটা ধোপ্-দুস্তর ফরসা শাড়ি পরিয়ে দেওয়া হয়েছে, মুখে পাউডার-স্নো মাখিয়ে দিয়ে সুস্থ দেখাবার চেষ্টা করা হয়েছে।

হরদয়ালও পেছনে ছিল। আণ্টি আর হরদয়াল দু'জনে মিলে মেয়েটাকে ধরে তুলে দাঁড় করালো। মেয়েটা চারদিকে চেয়ে বললে—আমি কোথায়?

গোপাল হাজরা বললে—তুমি কলকাতায়, ফ্রী-স্কুল স্ট্রীটে—

মেয়েটা বললে—আমি এখানে কেন?

গোপাল হাজরা বললে—তোমার অসুখ করেছে, তাই তোমাকে এই ফ্রী-স্কুল স্ট্রীটের বাড়িতে রাখা হয়েছে।

মেয়েটা বললে—আমায় চকোলেট দিন না—

—না, আর চকোলেট খায় না। এখন চলো, তোমার বাবা এসেছে—

—আমার বাবা?

বাবার কথাটা মনে পড়ে যেতেই মেয়েটার মুখে হাসি বেরোল। স্মৃতিশক্তি তার বিশ্বাস-ঘাতকতা করলে না। তিনতলা থেকে তাকে ধরে ধরে দোতলায় নামিয়ে আনা হলো। তারপর মুক্তিপদবাবু যে ঘরে বসেছিলেন সেই ঘরে আনা হলো পিক্‌নিক্‌কে।

পিক্‌নিক্‌কে ধরে ঘরে আনতেই মুক্তিপদবাবু আতঙ্কে শিউরে উঠলেন।

বললেন—পিক্‌নিক্......

—বাবা......

সামান্য একটা কথাতেই ঘটনার সাংঘাতিক ট্র্যাজিক দিকটা যেন ছবি হয়ে ফুটে উঠলো। মেয়ে তখন বাবাকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে আরম্ভ করেছে। আর সেই সঙ্গে মুক্তি-পদবাবুর চোখ দুটোও উঠেছে সজল হয়ে।

গোপাল হাজরার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন—কোথায় পেলেন একে?

গোপাল হাজরা বললে—যেখানে বলেছিলুম, সেই ফ্রী-স্কুল স্ট্রীটে গুণ্ডাদের আড্ডায়।

—পঞ্চাশ হাজারে রাজী হলো?

গোপাল হাজরা বললে—হবে না বললেই হলো? কেবল বলছিল আরো এক লাখ চাই, তা আমি বললুম সে পরে হবে, এখন এই পঞ্চাশ হাজারে একে ছেড়ে দিতে হবে। আমার কথার ওপরে তো কথা বলতে পারে না। শেষে জোর করে নিয়ে এলুম একে।

মুক্তিপদ মেয়েকে পেয়ে খুব খুশী। বললেন—এইবার একটা ট্যাক্সি ডেকে দিতে বলুন কাউকে—আমি উঠবো—

পিক্‌নিক্‌ তখনও বাবাকে জড়িয়ে ধরে আছে। বললে—বাবা, আমাকে চকোলেট কিনে দাও না—

কিন্তু দারোয়ান ততোক্ষণে একটা ট্যাক্সি ডেকে এনে দিয়েছে। অনেকক্ষণ ধরে বসে-বসে মুক্তিপদও যেন একেবারে অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। তিনি বিডন স্ট্রীটের বাড়িতে যেতে পারলেই বাঁচেন। পিক্‌নিক্‌কে এতদিন পরে খুঁজে পেয়েছেন, এতে মনে অনেকটা শান্তি পেয়েছেন তিনি। ট্যাক্সিতে বসেই বললেন—বিডন স্ট্রীটে চলো ভাই—

ট্যাক্সিতে বসেও পিক্‌নিক্ ছটফট করছিল। মুক্তিপদ তাকে জিজ্ঞেস করলে—হ্যাঁরে, তুই এখানে কী করে এলি? কে তোকে এখানে নিয়ে এলো? তুই তো কলেজে গিয়েছিলি? সেখান থেকে এই এত দূরে কলকাতায় এলি কী করে?

পিক্‌নিক্ যেন কেমন আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে তখন। কথাগুলো বলতে যেন তার জিভটা জড়িয়ে যাচ্ছে। বললে—আমাকে চকোলেট কিনে দাও না বাবা?

মুক্তিপদ বললে—চকোলেট খেয়ে কী হবে?

পিক্‌নিক্ বললে—চকোলেট খেতে ইচ্ছে করছে যে বড়ো—

মুক্তিপদ বললেন—এত রাত্তিরে যে দোকান-টোকান সব বন্ধ হয়ে গেছে। কাল সকালে তোকে চকোলেট কিনে দেব। এখন আগে ডিনার খেয়ে নিবি চল্ বিডন স্ট্রীটের বাড়িতে—

তবু পিক্‌নিক্ কেমন যেন বিড়-বিড় করতে লাগলো। যেন তার ঘুম পাচ্ছে খুব, যেন বিছানায় শুইয়ে দিলে এখনি সে ঘুমিয়ে পড়বে।

মুক্তিপদ মেয়ের ব্যাপার-স্যাপার দেখে কেমন যেন ভয় পেয়ে গেলেন। আগে তো এমন ছিল না পিক্‌নিক্। এই ক'দিনের মধ্যেই যেন সে অনেক বদলে গিয়েছে। ইন্দোর থেকে কলকাতা তো কাছে নয়। এত দূরে কেমন করে একলা এলো সে?

ট্যাক্সিটা বিডন স্ট্রীটের মধ্যে ঢুকতেই খানিকদূরে তাঁর বাড়ি। হয়তো মা এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে। সদরের গেট রাত ন'টার মধ্যেই বন্ধ করে দেওয়ার হুকুম আছে মা'র।

কিন্তু না, তখনও গেট খোলা রয়েছে দেখা গেল। কী হলো? এখন তো প্রায় রাত এগারোটা বাজে! এমন তো হয় না। এখনও তাহলে গেট খোলা রয়েছে কেন?

ট্যাক্সি ড্রাইভারকে মুক্তিপদ বললেন—এখানে থামাও সর্দারজী—

গিরিধারী তখনও নিজের ডিউটি করছে নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে।

মালিককে দেখেই সে এগিয়ে এসে সেলাম করলে। মুক্তিপদ ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে গেটের কাছে এলেন। পিক্‌নিক্‌কে ধরে ঘরে নিয়ে এলেন। সে তখনও টলছে।

গিরিধারীকে জিজ্ঞেস করলেন—এত রাত পর্যন্ত গেট খোলা রেখেছিস কেন রে? মা'জীকে খবর দে, বল্ আমি এসেছি—

গিরিধারী বললে—মা'জী তো কোঠিতে নেই হুজুর—

—নেই? এত রাত্তিরে কোথায় গেছে?

—তা জান না হুজুর।

মুক্তিপদ আবার জিজ্ঞেস করলেন—কখন বেরিয়েছে মা'জী?

গিরিধারী বললে—সেই দুপুর নাগাদ—

—তাহলে ম্যানেজারবাবুকে ডেকে দে—

গিরিধারী বললেন—ম্যানেজারবাবু ভি কোঠি মে নেহি হ্যায়

—কোথায় গেছে ম্যানেজারবাবু?

ম্যানেজারবাবু ভি মা'জীর সঙ্গে বেরিয়েছেন!

—কোথায় গেছে দুজনে?

গিরিধারী বললে—মালুম নেহি মালিক—

মুক্তিপদ সেই ভোরবেলা ইন্দোরের বাড়ি থেকে বেরিয়ে প্লেন ধরেছিলেন। তারপর সারাদিন মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে কেটেছে। তারপর দমদম এয়ারপোর্টে এসে পৌঁছিয়েছেন সন্ধেবেলা। তারপর রাত সাড়ে দশটা পর্যন্ত কেটেছে সেখানে। এখন এই রাত এগারোটার সময়ে বাড়িতে এসে শুনছেন বাড়িতে কেউ নেই। মেজাজটা আগে থেকে বিগড়েই ছিলো। এখন আরো বিগড়ে গেল খবরটা শুনে। বললেন—বিন্দু আছে তো?

গিরিধারী বললে—জী হুজুর—

মুক্তিপদ বললেন—তাকে খবর দে গিয়ে। বল্ গে আমি এসেছি পিক্‌নিক্‌কে নিয়ে। এখানে আমাদের দু'জনের খাবারের ব্যবস্থা একটু তাড়াতাড়ি যেন করে। যা—

গিরিধারী দৌড়তে লাগলো ভেতর দিকে। বিন্দুর সঙ্গে কথা বলতে গেলে সোজা

একেবারে তেতলায় উঠতে হবে। সে তিনতলার চার্জের ঝি।

বিন্দু তখন আরাম করে ঘরের মেঝের ওপরেই একটু গড়িয়ে নিচ্ছিল। এমন সুযোগ তো তার সাধারণতঃ হয় না। সারাক্ষণই ঠাকমা-মণির হুকুম তামিল করতে-করতে প্রাণান্ত হতে হয় তাকে। সেদিন একটু সময় পেয়েই সে গড়িয়ে নিতে গিয়ে একেবারে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঠিক সেই সময়েই গিরিধারী গিয়ে তাকে ডাকলো।

—এ বিন্দু, বিন্দু, এ বিন্দু—

বিন্দু ধড়মড় করে ঘুম ভেঙে উঠে পড়েছে। সব্বোনাশ হয়েছে, বোধহয় ঠাকমা-মণি এসে পড়েছে।

—কী রে? কী হয়েছে? ঠাকমা-মণি এসে গেছে?

—আরে নেহি নেহি, মেজবাবু আ গয়া। মেজবাবু—

—মেজবাবু!!

বিন্দু তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠে পড়েছে। এত রাত্তিরে মেজবাবু এসে পড়লো? এখন কী হবে?

গিরিধারী বললে—মেজবাবু খেয়ে আসেনি। খানা বানাতে হবে।

--খানা?

বিন্দুর মাথার ওপরে যেন বাজ ভেঙে পড়লো। তাড়াতাড়ি নিচেয় ছুটতে যাচ্ছিল ঠাকুরকে খবর দিতে। এত রাত্রে ঠাকুরকে রান্না চড়াতে হবে।

কিন্তু হঠাৎ একেবারে মুখোমুখি পড়ে গেছে মেজবাবুর সঙ্গে। তাকে দেখেই মেজবাবু বললেন—কী রে বিন্দু, মা-মণি কোথায়?

বিন্দু মাথার ঘোমটা টেনে দিলে। বললে—ঠাকমা-মণি তো বেরিয়ে গেছে—

—কোথায় গেছে?—

—তা তো তিনি বলে যাননি, ম্যানেজারবাবুকে সঙ্গে নিয়ে গেছেন। আমি ঠাকুরকে আপনাদের খাবার রান্না করতে বলি গিয়ে—

পিক্‌নিক তখনও ঘুমে ঢুলছে, মুক্তিপদবাবু তাকে মা-মণির বিছানায় শুইয়ে দিলেন। সকাল থেকে তাঁর নিজের প্রচণ্ড ব্যস্ততার মধ্যে কেটেছে, একেবারে এক মুহূর্তের জন্যেও বিশ্রাম পাননি তিনি। বাথরুমের শাওয়ারের তলায় দাঁড়িয়ে তিনি সেই কথাটাই ভাবতে লাগলেন। কেমন করে তিনি তাঁর জীবন আরম্ভ করেছিলেন, আর কেমন করে সে-জীবনটা শেষ হতে চলেছে। এখন আর কটা দিনই বা বাঁচবেন তিনি, তাঁর বাবা পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে মারা গিয়েছিলেন, আর দাদা শক্তিপদ মারা গিয়েছিল পঁচিশ বছর বয়েসে। তিনি তো তাঁদের চেয়েও ভাগ্যবান।

কিন্তু এ কী-রকম বাঁচা। একে কি বাঁচা বলে? বাইরের লোক হয়তো তাঁকে হিংসে করে, হিংসে করে তাঁর টাকাকে। তাঁর ফ্যাক্টরির ভেতরে তিনি যখন ঢোকেন তখন দেখেন তাঁরই কুলিরা স্যাকা ভুট্টা আস্ত-আস্ত চিবিয়ে খাচ্ছে। কিংবা কখনও দেখেন তাঁর ড্রাইভার তাঁর গাড়ির মধ্যে পাঁচ মিনিটের মধ্যে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ে নাক ডাকাচ্ছে। এ দৃশ্য দেখে তাঁর মনে কী প্রতিক্রিয়া হয় তা বাইরের কেউ জানতে পারে না। বাইরের কারো তা জানতে ইচ্ছেও হয় না।

স্নানটা করে তাঁর যেন মানসিক একটু আরাম হলো। তিনি আবার কলটা খুলে দিয়ে জলের তলায় আরো অনেকক্ষণ বসে রইলেন।

গিরিধারী তখনও সদর গেটের সামনে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছিল। রাত আরো বেড়েছে। রাস্তায় লোকজন চলাচল কমে এসেছে।

কিন্তু বাড়ির একজন মালিক আজ বাড়িতে রয়েছে, আর ঠাকমা-মণি আর ম্যানেজারবাবু তখনও বাড়িতে ফেরেনি, এই অবস্থায় গিরিধারী কী করে বিশ্রাম করতে যেতে পারে?

সে এই বাড়ির ভেতরেই কতো পরিবর্তন দেখলে, কতো বছর তার এ-বাড়িতে কেটে গেল। কতো ঘটনা, কতো দুর্ঘটনা সে দেখতে পেলে এখানে তারই হিসেব কষতে বসে

সবকিছু তাঁর গোলমাল হয়ে গেল। কর্তাবাবুর মৃত্যু সে দেখেছে, বড়ো দাদাবাবুর মৃত্যুও সে দেখেছে, খোকাবাবুর বিবিকে ভি খুন হতে দেখতে পেলে সে। এই নোকরিতে থাকলে সে আরো কতো ঘটনা দেখতে পাবে তার কোনও ঠিক নেই।

হঠাৎ গিরিধারীর তন্দ্রা ছুটে গেল।

সে দেখতে পেলে ঠাকমা-মণির গাড়িটা এসে গেটের সামনে ব্রেক কষে থেমে গেল।

গিরিধারী দৌড়ে গিয়ে গাড়ির পেছনের দরজাটা খুলে দিলে। খুলতেই খোলবার সঙ্গে সঙ্গে ঠাকমা-মণি নামলেন। নেমে কাকে যেন ডাকলেন। বললেন—এসো, নেমে এসো বউমা—

ভেতর থেকে একজন বউও তাঁর সঙ্গে নেমে এলো। রাতের অন্ধকারে তাঁকে ভালো করে চেনা গেল না।

সামনের সীট থেকে ম্যানেজারবাবু আগেই নেমে পড়েছিলেন। তিনি ঠাকমা-মণির পেছনে-পেছনে বাড়ির ভেতরের দিকে চলতে লাগলেন। সবাই ভেতরে চলে যাওয়ার পর গিরিধারী ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করলেন—এত দেরি কেন ড্রাইভারজী? কাঁহা গ্যায়ে থে?

—বহোত্ দূর গিরিধারী, বহোত্ দূর। বেড়াপোতা—

—ক্যা থে উঁহা?

—সাদি-বাড়ি—

—সাদি—বাড়ি? কিস্‌কে সাদি?

ড্রাইভারজী বললে—খোকাবাবুকো—

—খোকাবাবুকো সাদি? দোবারা সাদি?

গিরিধারী কথাটা শুনে অবাক হয়ে গেল। বলল—তা খোকাবাবু কোথায় গেল?

ড্রাইভার বললে—পুলিশরা খোকাবাবুকে নিয়ে চলে গিয়েছে।

—কোথায় নিয়ে চলে গিয়েছে?

—জেলখানা মে—

গিরিধারীর চোখের সামনে রহস্যটা যেন আরো জটিল আরো কুটিল হয়ে উঠলো।

ওদিকে ঠাকমা-মণির আসার খবর তখন বিন্দু জানতে পেরেছে। জানতে পেরেই সে দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে নিচেয় নামতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই ঠাকমা-মণি সিঁড়ি দিয়ে ওপরে এসে গেছেন। ঠাকমা-মণিকে দেখেই বিন্দু বললে—ঠাকমা-মণি, মেজবাবু এসে গেছেন!

—কে? মুক্তি?

বিন্দু বললে—হ্যাঁ, মেজবাবু আর তাঁর পিকনিক্—

—সে কী, কখন এলো সে? হঠাৎ?

মুক্তিপদও তৎক্ষণে সিঁড়ির কাছে এসে গেছেন। ঠাকমা-মণি তাঁকে দেখে বলে উঠলেন—কী রে, তুই হঠাৎ? তুই এই এত রাতে?

মুক্তিপদ জিজ্ঞেস করলেন—আমি হঠাৎ একটা বিশেষ কাজে এসেছি। তা তুমি এই রাত বারোটা পর্যন্ত কোথায় ছিলে?

ঠাকমা-মণির পেছনে বেনারসী-পরা একজন মেয়েকে দেখে অবাক হয়ে গেলেন মুক্তিপদ।

ঠাকমা-মণি নিজের ঘরের দিকে চলতে-চলতে বললেন—আমার কি কম জ্বালা রে। এই বুড়ো বয়েসে যে একটু ভগবানের নাম করবো, তারও উপায় নেই—

মুক্তিপদ জিজ্ঞেস করলেন—তোমার সঙ্গে এ কে মা?

ঠাকমা-মণি বললেন—আমার বউমা—

—বউমা? বউমা মানে?

ঠাকমা-মণি বললেন—খোকার বউ—

—সৌম্যর বউ? তা সে কোথা গেল?

ঠাকমা-মণি বললেন—পুলিশরা খোকাকে নিয়ে জেলখানায় চলে গেল। কোর্টের থেকে মাত্র আট ঘণ্টার জন্যে জজসাহেব খোকাকে 'প্যারোলে' বিয়ে করবার জন্যে ছুটি দিয়েছিল। আট ঘণ্টা হয়ে গেছে, তাই তারা আবার যেখান থেকে এনেছিল, আবার সেখানেই নিয়ে গেল।

ঘরের ভেতরে ঢুকে ঠাকমা-মণি দেখলেন তাঁর বিছানায় পিক্‌নিক্‌ শুয়ে আছে।

বললেন—একে খুঁজে পেয়েছিস শেষ পর্যন্ত? কোথায় পেলি একে?

মুক্তিপদ বললেন—ফ্রী-স্কুল স্ট্রীটের গুণ্ডা-পাড়ায়—

—সেখান থেকে এ গুণ্ডা-পাড়ায় কী করতে এসেছিল? কে নিয়ে এসেছিল একে?

মুক্তিপদ বললেন—সে-সব অনেক ব্যাপার মা, পরে সব তোমাকে বলবো। এখন খোকার কথা বলো। খোকার যে বিয়ে দিলে তুমি, তা ফুলশয্যা, বৌভাত, সেটা কী করে হবে? কোথায় হবে?

ঠাকমা-মণি বললেন—সে সব বেড়াপোতাতে ওই এক সঙ্গেই হয়ে গিয়েছে।

মুক্তিপদ জিজ্ঞেস করলেন—ওই একসঙ্গে কী করে হলো?

ঠাকমা-মণি বললেন—যেরকম বিয়ে তার সেইরকমই ফুলশয্যা আর বৌভাত হবে—

তারপর বৌমার দিকে ফিরে বললেন—এসো বৌমা, এই ঘরেই আজ শোবে তুমি। তার আগে খাওয়া-দাওয়া করে নাও।

মুক্তিপদ নতুন বউ-এর দিকে চেয়ে দেখলেন। তার মাথার সিঁথিতে জবজবে টাটকা সিঁদুর লেগে আছে। ভয়ে যেন জড়োসড়ো হয়ে কারো দিকে চেয়ে দেখতে তার ভয় হচ্ছে। হয়তো ভেতরে ভয়ে থর-থর করে কাঁপছেও।

ঠাকমা-মণি জিজ্ঞেস করলেন—তোদের খাওয়া হয়েছে?

মুক্তিপদ বললেন—না, আমিও খাইনি, পিক্‌নিক্‌ও কিছু খায়নি—

—তাহলে খেয়ে নে এখন।

তারপর বিন্দুর দিকে চেয়ে ঠাকমা-মণি বললেন—ওরে বিন্দু, ঠাকুরকে খাবার আনতে বল্‌ গিয়ে—
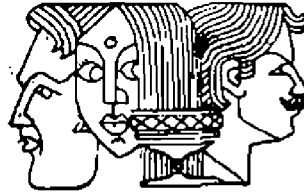
আজ এত কাল পরেও সেই সব কথা, সেই সব ঘটনা, সেই সব স্মৃতি সন্দীপের মনে আছে। অমন দুর্যোগ, অমন বিপর্যয়, অমন বিভ্রান্তি সত্ত্বেও সে তো এখনও বেঁচে আছে। সে তো এখনও মরেনি। তার প্রাণবায়ু তো এখনও সচল আছে।

কেন সে সচল আছে? কেন সে বেঁচে আছে?

বেঁচে আছে, কারণ সে 'এক'কে বিশ্বাস করে। 'এক' মানে কী?

ফুলের যে মালা হয়, তাকে কে ঐক্য-সূত্রে বাঁধে? বাঁধে একটা সুতো। সেই সুতোটা ঠিক থাকলে মালাটা আর বিচ্ছিন্ন হয় না। ওলোট-পালট হয় না।

যেমন সমুদ্র। সমুদ্রের ওপর অবিশ্রান্ত ঢেউএর চঞ্চলতা। সে ঢেউ এতই চঞ্চল যে তা দেখলেও ভয় করে। সে চঞ্চলতা দেখে মানুষ আতঙ্কে শিউরে ওঠে। কিন্তু তাতে কি সমুদ্র কখনও বিচ্ছিন্ন হয়?

না, তাতে সমুদ্রের কোনও হের-ফের হয় না। হের-ফের যে হয় না তার কারণ সমুদ্র স্থির থাকতে জানে বলেই ঢেউ তার কোনও ক্ষতি করতে পারে না। সে নিশ্চল, সে নিরুদ্বেগ, সে নিরুত্তাপ।

এই রকম নিশ্চল, নিরুদ্বেগ, নিরুত্তাপ হওয়ার তার কারণ কী? কারণ হলো, সে জানে অনন্ত হলো 'এক'। সেই 'এক'কে যে জেনেছে, সেই 'এক'কে যে বিশ্বাস করেছে, তার আর কোনও ভয় নেই। সেই 'এক' হলো অকূল সমুদ্রে পায়ের তলার মাটি। চারদিকের জলের মধ্যে যে পায়ের তলার মাটিকে বিশ্বাস করতে পেরেছে সে সেই 'এক'কে জেনেছে।

মুহম্মদ হাশেম পরের দিন সন্দীপকে ঠিক সময়ে অফিসে দেখে হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছে। বললে—স্যার, আপনি? কাল আপনার বিয়ে ছিল আর আজকে আপনি অফিসে এলেন?

সে-কথার জবাব না দিয়ে সন্দীপ বললে—আজকে আমাদের উইক্লি স্টেটমেণ্ট পাঠাবার তারিখ না?

হাশেম বললে—সে আমার তৈরি হয়ে গেছে স্যার।

—ঠিক আছে। তাহলে আমার কাছে সেটা পাঠিয়ে দিও, আমি সই করে দেব'খন—

বলে অন্য একটা দরকারী ফাইল টেনে নিয়ে সন্দীপ সেই দিকে মন দিলে। কালকের দুর্যোগের কাঁটাটা তখনও তার মাথার মধ্যে বার-বার খোঁচা দিচ্ছিল। কাঁটার জ্বালা যখন শরীরে সর্বব্যাপী হয়, তখনই সেই কাঁটা আবার গোলাপে রূপান্তরিত হয়। সেই গোলাপে রূপান্তরিত হওয়ার মধ্যেই কাঁটার যা-কিছু গৌরব।

নিজেকে স্থির রাখা কি সহজ? অনেক অধ্যবসায়, অনেক সংযম করলে তবে মনের যন্ত্রণা ভোলা যায়। সন্দীপ সমস্ত সময়টাতে নিজেকে ব্যস্ত রেখে আগের রাত্রের বিপর্যয়টাকে ভুলে থাকতে চেষ্টা করতে লাগলো। মুহম্মদ হাশেম মাঝখানে এসে একবার উইক্লি স্টেটমেণ্টটা রাখলে। সন্দীপ বললে—এটা ভালো করে দেখে দিয়েছ তো?

হাশেম বললে—হ্যাঁ।

—তাহলে আমি এটাতে নিশ্চিন্তে সই করি?

বলে উত্তরের অপেক্ষা না করেই সন্দীপ নিচে একটা সই করে দিলে।

এ-রকম হয়। পারস্পরিক বিশ্বাসের ওপরেই ব্যাঙ্কের কাজ চালাতে হয়। না হলে ব্যাঙ্কের বাঁধা সময়ের কাজ অচল হয়ে যায়। সন্দীপ সই করছে কিন্তু তখনও আগের রাত্রের ঘটনাগুলো মনের মধ্যে তোলপাড় করতে আরম্ভ করেছে। তখনও মল্লিক মশাইএর কথাগুলো তার কানে বাজছে—বিশাখার মায়ের চিকিৎসা করতে তোমার কতো খরচ লাগবে বলো? দশ হাজার টাকা?

সন্দীপ জবাব দিয়েছিল—ডাক্তার লাহিড়ী বলেছিলেন—কুড়ি হাজার টাকা।

মল্লিক-মশাই বলেছিলেন—কুড়ি হাজার বলছো কেন? পঞ্চাশ হাজার টাকা হলে তোমার চলবে? আর তাতেও যদি না হয় তো এক লাখ টাকা?

সন্দীপ কী বলবে তা বুঝতে পারছিল না। ওদিকে পাশের ঘরে মা-মাসিমা সকলেই উদ্‌গ্রীব হয়ে মুহূর্ত গুনছে।

—আচ্ছা, ধরো এক লাখ টাকায় না কুলোয় তো দু'লাখ। দু'লাখ চাইলে তুমি দু'লাখই পাবে! জীবনের চেয়ে তো আর টাকার দাম বেশি নয়, অনেক কম। মুখ ফুটে তুমি যা চাইবে, ঠাকমা-মণি তাই-ই দেবে! টাকা ঠাকমা-মণি জীবনে অনেক দেখেছে, অনেক টাকা হাতে এসেছে ঠাকমা-মণির জীবনে। টাকা গেলে আবার টাকা আসতে পারে, কিন্তু মানুষের জীবন? একবার গেলে তো আর ফিরে আসবে না।......

এ-সব কথা তখন কিছুই কানে ঢুকছে না সন্দীপের। করমচাঁদ মালবাজী, ঠাকমা-মণি, মুক্তিপদবাবু, গোপাল হাজরা, সৌম্যপদ, তারক ঘোষ, বরদা ঘোষাল, শ্রীপতি মিশ্র, সবাই যেন তখন একসঙ্গে এসে তাকে আক্রমণ করতে উদ্যত হলেন। হাতে আর সময় নেই আমাদের। আর দেরি করলে লগ্ন পেরিয়ে যাবে। বলো-বলো, আমাদের কথার জবাব দাও; আমাদের এক হাতে টাকা, আর এক হাতে বিশাখা, এক হাতে অর্থ আর এক হাতে পরমার্থ, এক হাতে মৃত্যু আর এক হাতে অমৃত। তুমি কোনটা বেছে নেবে, বলো? জবাব দাও, আমিই তো একদিন তোমাকে কলকাতায় গিয়ে থাকা-খাওয়া-পরা আর চাকরির ব্যবস্থা করিয়ে দিয়েছিলাম। তখন তোমার মা পরের বাড়ি রাঁধুনী-গিরি করতো। আমি তোমাকে মানুষ হওয়ার সব সুযোগ-সুবিধে করে দিয়েছিলাম বলেই এখন তুমি স্বাবলম্বী হয়েছো, এখন তুমি এই ব্যাঙ্কটার ব্রাঞ্চ-ম্যানেজার হয়েছো। আমি সেদিন সে সুযোগ-সুবিধে না দিলে কি তা হতো? এখন আমার সে ঋণ তুমি পরিশোধ করো। তোমার বিপদের দিনে আমরা তোমাকে সব রকমের সহযোগিতা দিয়েছিলাম, এখন

আমাদের বিপদের দিনে কি তোমার কিছু করণীয় নেই? বলো-বলো, আমাদের এসব প্রশ্নের জবাব দাও? চুপ করে আছো কেন, বলো? কথা বলো?

নাম কী?

সন্দীপ বললে—যোগমায়া গাঙ্গুলী।

—বয়েস?

সব খুঁটিনাটি তথ্য খাতায় লেখা হলে ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন—টাকা?

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—কতো টাকা দিতে হবে আমাকে?

—কুড়ি হাজার। আর ডাক্তারবাবুর ফী-জ্‌টা তাঁকে আলাদা দিতে হবে।

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—সেটা কতো?

—সেটা ডাক্তারবাবুকেই জিজ্ঞেস করবেন।

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—ডাক্তারবাবু কি এখন নিজের ঘরে আছেন?

ভদ্রলোক আরো অনেক খাতা-পত্র নিয়ে জড়িয়ে পড়েছিলেন। কাজ করতে-করতেই বললেন—ডাক্তারবাবু হয়তো এখন অপারেশন থিয়েটারে আছেন। আপনি ওঁর ঘরের চাপ্‌-রাশিকে জিজ্ঞেস করুন গিয়ে।

সন্দীপ সেই দিকেই যাচ্ছিল, কাউণ্টারের ভদ্রলোক বললেন—রসিদটা নিয়ে গেলেন না?

সন্দীপ আবার ফিরে এসে রসিদটা নিলে, কুড়ি হাজার টাকার রসিদ। সন্দীপের মনে হলো, ওটা যেন কুড়ি হাজার টাকার রসিদ নয়, ওটা যেন তার ফাঁসির পরোয়ানা। ওই পরো-য়ানাটা ডাক্তারবাবুর কাছে পোঁছে দিলেই তিনি তাকে ফাঁসি দেবেন।

কিন্তু তা হোক, অতো ভয় পেলে চলবে না, কারণ নার্সিংহোমে আসা মানেই তো ফাঁসি হওয়া। যেদিন ডাক্তার লাহিড়ী তাকে প্রথম বলেছিলেন যে নার্সিং-হোমে ভর্তি হওয়ার সময়েই কুড়ি হাজার টাকা এ্যাড্‌মিশন ফী দিতে হবে, সেই দিনই তো রাস্তার ওপর অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল।

ডাক্তার লাহিড়ী তখন তাঁর চেম্বারে ছিলেন না দেখে সন্দীপ বাইরে দাঁড়িয়ে রইলো।

অপারেশন থিয়েটার থেকে ফিরলেই ডাক্তারের সঙ্গে দেখা হবে।

ওদিকে ট্যাক্সির ভেতরে মাসিমাকে শুইয়ে রেখে দিয়ে এসেছে সে। সেই বেড়াপোতায় ট্রেনে চাপিয়ে প্রথমে হাওড়া স্টেশনে আসা। সেখানে কুলীদের সাহায্যে তাকে ধরে-ধরে এনে ট্যাক্সি ডাকা। অনেকক্ষণ পরে ট্যাক্সি পাওয়া গেলে তাতে উঠিয়ে নিয়ে এই নার্সিং-হোমে আনা কি সহজ কাজ? আর নিয়ে এসে যদি বা ঠিক জায়গায় পোঁছলো তো ডাক্তারের জন্যে আবার অপেক্ষা করা!

কাজটা ভাবা যতো সহজ, আসলে তা করা কি অতো সোজা? আসবার সময়ে মা কিছু বলেনি। সেই দুর্যোগের দিনটার পর থেকেই মা যেন কেমন বোবা হয়ে গিয়েছিল। ছেলের সামনে কাঁদলে পাছে ছেলে মনে কষ্ট পায়, তাই ছেলের সামনে আসতেই চাইতো না মা। কেবল আড়ালে আড়ালে থাকতো। মা, কতো দিনের শখ ছেলে মানুষ হয়ে দাঁড়াবে, ছেলের বিয়ে দেবে, বিয়ে দিয়ে সংসার পাতবে। মনের মতো করে সেই সংসার সাজাবে-গুছোবে, এ ছাড়া মা, মনে তো আর কোনও সাধ-আহ্লাদ ছিল না। আর ভগবান কি না মায়ের সেই একমাত্র সাধ-আহ্লাদেই বাদ সাধলো!

আর শুধু কি মা? বেড়াপোতার যতো লোক নিমন্ত্রণ পেয়ে বাড়িতে এসেছিল তারা সবাই-ই কাণ্ড-কারখানা দেখে সেদিন হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল। এমন ঘটনা তো সচরাচর

হয় না। এমন ঘটনা দেখবার বা শোনবার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যও ভূ-ভারতে কারোর হয় না।

সকলের মুখে-চোখে একটাই প্রশ্নঃ ওরা কারা? কারা এমন করে অন্য একজনের হৃদ্‌-পিণ্ড ছিনিয়ে নিয়ে গেল? এর কারণটা কী? হাজার প্রশ্ন করেও কেউ এর একটা সদুত্তর খুঁজে পেলো না। ওরা কি নিজের ছেলের জন্যে আর কোনও পাত্রী জোটাতে পারলে না? আর কারো কন্যা? নাকি সন্দীপ ওদের পছন্দ করে রাখা পাত্রীকে লুকিয়ে নিয়ে এসে বিয়ে করতে উদ্যত হয়েছিল?

কেউ বললে—আরে না, টাকা! আসলে টাকাতে সবই সম্ভব!

—টাকা? তার মানে?

—তার মানে টাকা চেনো না? রুপো দিয়ে তৈরি গোল-গোল টাকা। সেই টাকা।

তবুও কেউ বুঝতে পারলে না। টাকার সঙ্গে বিয়ের সম্পর্ক কী?

একজন বললে—দেখলে না কতো বড় গাড়ি ওদের? বড়লোক না হলে অতো বড় গাড়ি কারো থাকে?

- কিন্তু পুলিশ কেন? বিয়ের সঙ্গে পুলিশের কী সম্পর্ক?

—আরে, তাও বুঝলে না? পাছে বর-পক্ষ বাধা দেয় সেইজন্যে সঙ্গে করে পুলিশ এনেছে! টাকা ফেললে শুধু পুলিশ কেন, পুলিশের বাবা পর্যন্ত আসবে। তুমি আমাকে টাকা দাও না, আমি তোমার কাছে সকলকে এখানে এনে হাজির করবো? টাকার জোর কি কম জোর হে!

এ-ধরনের কতো কথা তার কানে এসে পৌঁছেছিল। যখন ওরা সবাই মিলে বিশাখাকে সৌম্যবাবুর সঙ্গে জোর-জবরদস্তি করে বিয়ে দিয়ে বেড়াপোতা ছেড়ে চলে গিয়েছিল, তখন অনেক রাত। সেদিন আর বাড়িতে ঘুম আসেনি কারো। শুধু সন্দীপদের বাড়িতেই নয়, চ্যাটার্জিবাবুদের বাড়িতেও কেউ ঘুমোয়নি সেদিন।

যাওয়ার সময়ে মল্লিক-মশাই বলে গিয়েছিলেন—সন্দীপ, তোমার বাকি টাকাগুলো আমি কালকেই দিয়ে দেব। আজকে ঠাকমা-মণির কাছে যা আছে, তাই নাও।—

সন্দীপ চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। একটা কথাও বলেনি।

—কই, নাও, এই পঞ্চাশ হাজার টাকা এখন নাও, কাল বাকিটা পাবে।

তবু সন্দীপ টাকা নেওয়ার জন্যে তার হাত বাড়ায়নি।

—কী হলো? টাকা নেবে না? আমাদের যেতে দেরি হয়ে যাচ্ছে যে, নাও—

সন্দীপও যে মানুষ, সে কথাটা বিচক্ষণ মানুষ হয়েও মল্লিক-মশাই কেন সেদিন ভুলে গিয়েছিলেন?

তখনও সন্দীপকে চুপ করে থাকতে দেখে বলেছিলেন—তুমি যখন নিচ্ছ না তখন টাকা-গুলো বৌঠানকে গিয়েই দিয়ে আসতে হবে—

বলে আর সেখানে দাঁড়িয়ে সময় নষ্ট করেননি। একেবারে সোজা চলে গিয়েছিলেন তাদের বাড়িতে। সেখানে মাকে ডেকে বলেছিলেন—বৌঠান, আমি আপনার কাছেই এলুম টাকা দিতে—

মা বোধহয় তখনও কাঁদছিল। মা জিজ্ঞেস করেছিল—কীসের টাকা?

মল্লিক-মশাই বলেছিলেন—এই টাকাগুলো সন্দীপকেই দিতে চেয়েছিলুম, কিন্তু ও তো নিলে না। তাই আপনাকেই দিতে এলুম—

মা আবার জিজ্ঞেস করলে—কীসের টাকা?

মল্লিক-মশাই বললেন—সন্দীপের বিয়ে তো ভেঙে দিলুম। দেখলুম ওর মন খুব ভেঙে গেছে। বুঝি যে ওর মনের অবস্থা এ-রকম হওয়া অন্যায় নয়। আমার হলে আমিও ওই-রকম দুঃখ পেতুম। আর ওরও অনেক টাকা খরচ হয়ে গিয়েছে এই বিয়ের জন্যে। সেদিকটাও তো আমাদের দেখা উচিত!

মা চুপ করে রইল। মল্লিক-মশাই আবার বললেন—নিন, এতে পঞ্চাশ হাজার টাকা আছে, আপনি গুনে নিন—

মা বললে—ওরই বিয়ে, ওরই টাকা। টাকাগুলো আপনি ওকেই দিন, আমাকে কেন টাকা দিতে এসেছেন?

মল্লিক-মশাই বললেন—ও-ও যা, আপনিও তাই। সন্দীপ তো আপনারই ছেলে, আপনাকে টাকা দিলেই সন্দীপকে টাকা দেওয়া হবে। নিন—নিন—

মা বললে—দয়া করে আমাকে আপনি টাকা নিতে পীড়াপীড়ি করবেন না—

কেন? আপনিই তো ওর মা?

মা বললে—আমি মা হলেও, সন্দীপ যদি টাকা নিতে আপত্তি করে তাহলে আমি কী করে সে-টাকা নিই?

মল্লিক-মশাই বললেন—মনে করবেন না মাত্র পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়েই এর ক্ষতি-পূরণ করা হচ্ছে। আমি সন্দীপকে বলেছি যে এখন পঞ্চাশ হাজার টাকা আমাদের কাছে আছে, তাই পঞ্চাশ হাজারই দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু আমাদের বাড়িতে গেলে সন্দীপ যা চায় তা-ই দেওয়া হবে। দু'লাখ, তিন লাখ, চার লাখ, সমস্ত দেবেন আমাদের ঠাকমা-মণি। বিশাখার মা'র ক্যানসারের চিকিৎসার জন্যেও তো অনেক টাকার দরকার হবে। ঠাকমা-মণি সব টাকা দিতে প্রস্তুত। ঠাকমা-মণি আমাদের অতো অবুঝ নন—সন্দীপ যা চায় তাই-ই দেওয়া হবে। আমি আপনাকে এখানে দাঁড়িয়ে কথা দিয়ে যাচ্ছি—আমাকে নিশ্চয়ই আপনি বিশ্বাস করবেন—

মা বললে—আপনি তো সন্দীপকে ভালো করেই চেনেন। আমি আর আপনার কাছে তাকে নতুন করে কী চেনাবো। সুতরাং......

মল্লিক-মশাই বললেন—আর তা ছাড়া ঠাকমা-মণির একমাত্র নাতির কথাটাও আপনি একবার ভাবুন বৌঠান। সে ফাঁসির আসামী, কোর্টে জজের রায় দেওয়ার সময় হয়ে এসেছে......এখন......

মা জিজ্ঞেস করলে—ফাঁসির আসামী? কে?

মল্লিক-মশাই বললেন—আমার মনিবের একমাত্র নাতি! সে এখন তার নিজের মেম-সাহেব বউকে খুনের অপরাধে ফাঁসির আসামী। তার সঙ্গে বিশাখার বিয়ে দেবার জন্যেই আমরা এসেছি—

মা কথাগুলো শুনে অবাক হয়ে গেল। বললে—বিশাখার সঙ্গে ফাঁসির আসামীর বিয়ে দিচ্ছেন আপনারা? বিশাখা এ বিয়েতে রাজী হয়েছে? তার মত নিয়েছেন কি আপনারা?

মল্লিক-মশাই বললেন—বিশাখার সঙ্গে আমাদের সৌম্যবাবুর বিয়ের কথা তো আগেই ঠিক ছিল, এ তো নতুন কিছু নয়।

মা বললে—কিন্তু তখন তো আপনাদের সৌম্যবাবু ফাঁসির আসামী ছিলেন না। ফাঁসির আসামীকে বিশাখা কি বিয়ে করতে রাজী হবে?

মল্লিক-মশাই বললেন—বিশাখার রাজী হওয়ার বা রাজী না হওয়ার কোনও প্রশ্নই উঠছে না। কারণ যে-জ্যোতিষী বিশাখার কুষ্ঠি দেখেছিলেন তিনিই আমাদের বলে দিয়েছেন যে এই জাতিকার সঙ্গে বিয়ে দিলে সৌম্যবাবুর ফাঁসি হবে না—

মা বললে—সে কী? কেন?

মল্লিক-মশাই বললেন—হ্যাঁ, জ্যোতিষী বার-বার এ-কথা বলে দিয়েছেন যে এই জাতিকার সঙ্গে যদি কোনও ছেলের বিয়ে দেওয়া হয় তো এই জাতিকা কখনও বিধবা হবে না। মাথার সিঁথিতে সিঁদুর নিয়ে সে মৃত্যুবরণ করবে। তার সিঁথির সিঁদুর অক্ষয় হবে—

মা জিজ্ঞেস করলে—তিনি বিশাখার কুষ্ঠি কোথায় পেলেন?

মল্লিক-মশাই বললেন—অনেক কাল আগে বিশাখার কুষ্ঠি নিয়ে ওর মা বেলেঘাটার এক বিখ্যাত জ্যোতিষীর কাছে ওর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জানতে গিয়েছিলেন, সেই তাঁর খাতায় বিশাখার জন্ম-পত্রিকা ছিল। তিনিই ঠাকমা-মণিকে ওই বিশাখার নাম-ঠিকানা দিয়েছেন।

সেই বিশাখার নাম-ঠিকানা পেয়েই আমরা এখানে এসেছি—

এ-কথা শোনার পর মা আর কী বলবে।

শুধু বললে-খোকা এ-বিয়েতে রাজী হয়েছে?

—রাজী কি হয় কেউ? রাজী হয়নি। তাকে টাকা দিতে গেলুম, তাকে বলতে গেলাম যে বিশাখার মা'র তো ক্যান্‌সার হয়েছে, এই টাকা দিয়ে সে বিশাখার মা'র চিকিৎসা করুক। তা সে টাকাও নিলে না, কোনও কথাও বললে না, তখন আমি আর কী করবো! তাই এখন আমি আপনার কাছে এসেছি—

মা বড়ো দ্বিধায় পড়লো, খোকাকে না বলে মা কী করে হাত পেতে টাকা নেয়? এই মল্লিক-মশাইএর জন্যেই তো খোকা মানুষ হয়েছে, সংসারে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, পরের বাড়ি তাকে দাসী-বৃত্তি করা থেকে বাঁচিয়েছে। আর শুধু তাই-ই নয়, মা এতকাল পরে শেষ বয়েসে একটু সুখের মুখ দেখতে পেয়েছে, ঠিক এমন সময়ে কিনা এই বিপত্তি!

মা বলল—আমার খোকা কোথায়?

মল্লিক-মশাই বললেন—সে ওই বিয়ে বাড়িতেই রয়েছে।

—ওকে একবার আমার কাছে ডেকে আনুন না।

মল্লিক-মশাই বললেন—আপনি ওর মা, সন্দীপও যা আপনিও তাই বৌঠান। আপনাকে টাকা দিলেই সন্দীপকে টাকা দেওয়া হলো।

মা বললে—না ঠাকুরপো, ওর বয়েস হয়েছে। ও লেখা-পড়া জানা ছেলে, আমি তো টাকা-কড়ি কিছু বুঝিও না। আমি ওর টাকা নিতে পারবোও না। ও ব্যাঙ্ক থেকে যে-মাইনে পায়, তাও আমি ছুঁই নে। মাইনের টাকা সমস্তটা ও ব্যাঙ্কেই রেখে দেয়। হপ্তায়-হপ্তায় ও সংসার খরচের টাকাটা তুলে আমাকে দেয়। তার বেশি আমি কিছু জানি না।

—তাহলে বিশাখার বিধবা মা তো রয়েছেন, তাঁরই তো অসুখ। তাঁর হাতেই দিয়ে যাই টাকাটা।

মা বললে—তাঁর শরীর বড়ো খারাপ, ডাক্তার ওষুধ খাইয়ে তাঁকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে দিয়েছে।

এমন সময়ে বাইরে থেকে কে যেন ডাকতে লাগলো—ম্যানেজারবাবু, ও ম্যানেজারবাবু—

—ওই, ওই, আমাদের ড্রাইভার আমাকে ডাকছে, আমি আসি বৌঠান। বোধহয় বিয়েটা শেষ হয়ে গেল...

তারপরে পঞ্চাশ হাজার টাকার নোটগুলো মা'র পায়ের সামনে মেঝের ওপরে রেখে দিয়েই বললেন—টাকাগুলো রইলো বৌঠান, সন্দীপকে বলবেন সে যেন নেয়। আমি এখন আসি—

বলে চলে যেতে গিয়েও আবার ফিরলেন।

বললেন—এত কম টাকাতে বোধহয় ক্যান্‌সারের চিকিৎসা হবে না, হয়তো আরো টাকা লাগবে। তা যতো টাকা লাগবে, সব টাকা ঠাকমা-মণি দেবেন। এক লাখ, দু'লাখ, তিন লাখ, চার লাখ, যা খরচ লাগবে সব দেবেন ঠাকমা-মণি। সন্দীপ একবার খবর দিলেই আমি নিজে এসে টাকা দিয়ে যাবো। সন্দীপ তার জন্যে টাকা চাইতে যেন লজ্জা না করে।

নোটগুলো তখন মার পায়ের সামনেই পড়ে রইলো।

মল্লিক-মশাই ঘর থেকে বাইরে চলে গেলেন। সেখানে তখন বর-কনে ঠাকমা-মণি পুরোহিত নাপিত—সবাই মল্লিক-মশাইএর অপেক্ষা করছিলেন।

তিনি গাড়িতে গিয়ে উঠতেই গাড়ি ছেড়ে দিলে। সামনে একটা পুলিশের গাড়ি, পেছনেও আবার আর একটা পুলিশের গাড়ি। তারা সবাই বেড়াপোতা ছেড়ে কলকাতার দিকে রওনা দিলে।

তখনও মা'র চোখে বিস্ময়ের আর উদ্বেগের ঘোর কাটেনি। চুপ করে তখনও মা সেই এক জায়গাতেই, দাঁড়িয়ে ছিল। হঠাৎ একটা শব্দতে যেন তার জ্ঞান ফিরে এল।

—এ কি? মা,—

এ-গলার আওয়াজ সন্দীপের। সন্দীপকে দেখে মা একেবারে ভেঙে পড়লো। কোনও কথাই দু'জনের কারো মুখ দিয়ে বেরোল না। কে কাকে কী বলবে তা ভেবে পেলে না—দু'জনেই। বাইরে গভীর রাত। অন্ধকারে পৃথিবীর সমস্ত কিছু ঢাকা পড়ে আছে। কিন্তু দু'জনেরই মনে হলো তাদের মনের ভেতরের বিপর্যয়ের অন্ধকার যেন তার চেয়ে আরো গাঢ়, আরো ভয়াল, আরো বেদনাবহ।

হঠাৎ পায়ের কাছে কী একটা ঠেকতেই সন্দীপ লক্ষ্য করে দেখলে—কতকগুলো নোট।

—এখানে এত টাকা এলো কেন মা?

মা'র চোখ দিয়ে তখনও জলের ধারা নেমে চলেছে।

সন্দীপ আবার জিজ্ঞেস করলে—এখানে কীসের টাকা পড়ে আছে মা?

মা তাড়াতাড়ি নিজের আঁচল দিয়ে চোখ দুটো মুছে নিয়ে, কোনও রকমে বললে—তোর মল্লিক-কাকা দিয়ে গেল?

সন্দীপ উত্তেজনায় যেন ফেটে পড়লো। বললে—ও-টাকা তুমি নিলে? তুমি ছুঁলে ও-টাকা?

মা'র মুখে কোনও জবাব নেই।

সন্দীপ আর থাকতে পারলে না। সঙ্গে সঙ্গে সব নোটগুলো দু'হাত দিয়ে কুড়োতে লাগলো। কুড়োতে কুড়োতে বললে—এই মেয়ে-বেচা টাকা আজ পুড়িয়ে ছাই করে তবে আমি থামবো—

টাকাগুলো তখনও সন্দীপ কুড়োতে ব্যস্ত। মা সঙ্গে সঙ্গে সন্দীপের হাত দুটো চেপে ধরলে। বললে—ওরে খোকা, থাম্ থাম্, ও টাকা নষ্ট করিস নে—ও তোর জন্যে দেয়নি মল্লিক-কাকা,—

সন্দীপ বললে—আমাকে দেয়নি তো কাকে দিয়েছে?

মা বললে—ওটা দিয়েছে বিশাখার মা'র অসুখের চিকিৎসার জন্যে। বলেছে—বিশাখার মায়ের চিকিৎসার জন্যে যদি আরো টাকার দরকার হয় তো তাও দেবে। তুই মল্লিক-কাকার কাছে গিয়ে চাইলেই দেবে।

সন্দীপের হাতের মুঠোর মধ্যে টাকাগুলো তখনও তাকে অসহ্য খোঁচা দিচ্ছে। বললে—মল্লিক-কাকা বললেন ওই কথা? দরকার হলে আমি ও-বাড়িতে টাকা চাইতে যাবো?

মা ছেলের হাত থেকে টাকাগুলো নিতে গেল। বললে—দে, টাকাগুলো দে আমাকে—নষ্ট করিস্‌নি। ওগুলো তোর টাকাও নয়, আমার টাকাও নয়, দিদির চিকিৎসার টাকা—

সন্দীপ টাকাগুলো মা'র হাতে দিয়ে দিলে। বললে—মল্লিক-কাকার কথার উত্তরে তুমি কী বললে?

মা বললে—আমি আর কী বলবো, আমি চুপ করে রইলুম।

—তারপর?

মা আবার বললে—বললে তুই টাকা চাইতে যেন লজ্জা না করিস। দরকার হলে এক লাখ, দু'লাখ, তিন লাখ টাকাও তোকে দিতে পারে।

সন্দীপ বললে—সবাই ভেবেছে কী, বলো তো মা? ভেবেছে কি সবাই ভিখিরী? টাকা দরকার তা আমি মানি, কিন্তু সেই টাকার জন্যে আমি অতো নিচে নামবো?

মা বললে—না রে, না, ওদের অবস্থাটা একবার ভেবে দেখ্। নাতি ফাঁসির আসামী, তাও একমাত্র নাতি! এই অবস্থায় কি কারো মনে শান্তি থাকে? ওই অবস্থা যদি আমাদের হতো তাহলে আমাদের দশা কী-রকম হতো বল্ তো?

তারপর একটু থেমে আবার বললে—তুই তো সারাদিন উপোস করে আছিস, আমি খাবার এনে দিচ্ছি, কিছু খেয়ে নে—

বলে মা চলে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ জানালার বাইরে চোখ পড়তেই বললে—ওরে দেখছি

একেবারে সকাল হয়ে গেছে—

সন্দীপও বাইরের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে গেছে। সত্যিই তো, কখন উত্তেজনার মধ্যে সময় কেটে গেছে দু'জনের কেউই তা টের পায়নি। মা ছেলে কারোরই ঘুমের কথা মনেই ছিল না। হঠাৎ কমলার মা বাইরে থেকে এসে ঢুকলো। কাল ভাত-তরকারি নিয়ে বাড়িতে যেতে তার অনেক রাত হয়েছিল। ভালো করে তারও ঘুম হয়নি বোধহয়। তাই অন্য দিনের চেয়ে আজ একটু সকাল-সকাল চলে এসেছে।

সন্দীপ বললে—মা, এখন আর কিছু খাবো না। কমলার মা'কে আজ একটু সকাল-সকাল ভাত চড়াতে বলো, আমি অফিস যাবো।

—কেন? আপিসে যাবি কেন? আজ তো তোর ছুটি!

সন্দীপ বললে—যখন বিয়েটাই বন্ধ হয়ে গেল তখন আর ছুটিটা এই অবস্থায় নষ্ট করি কেন?

মা বললে—সারা রাত তোর ঘুম হলো না, আজ একটু বিশ্রাম করলে পারতিস!

সন্দীপ বললে—তাতে উল্টো ফল হবে, তার চেয়ে বরং অফিসে গিয়ে কাজের মধ্যে ডুবে থাকলে মাথাটা ঠান্ডা হবে—

মা বললে—ঠিক আছে। যা ভালো বুঝিস তাই কর। মিছিমিছি তোর খুব হেনস্থা হলো।

সত্যিই হেনস্থা! সে তো মাসিমার পীড়াপীড়ির জন্যে বিশাখাকে বিয়ে করতে রাজী হয়েছিল। মানুষের উপকার করাও যদি পাপ হয় তাহলে সে অপরাধে যদি তার কোনও রকম শাস্তিও হয়, সে তাহলে সেই শাস্তিটাও মাথায় তুলে নিতে প্রস্তুত।

তাই নার্সিং-হোমে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সেই কথাই ভাবছিল। সেই বিশাখা তখন আর বেড়াপোতায় নেই। সে তার শ্বশুরবাড়িতে চলে গেছে। সেখানে তার কী-রকম করে দিন কাটছে তা সে-ই জানে। কিন্তু মাসিমা শারীরিক সুখ না পেলেও মনের দিক দিয়ে যে একটু শান্তি পেয়েছে! সেটা বুঝতে পেরে সন্দীপ নিজেও খুশী হয়েছে।

গাড়িতে আসতে-আসতে মাসিমা সামান্য-সামান্য কথা বলেছে। মাসিমার মুখে কেবল সেই একই কথা। শুধু বিশাখা আর বিশাখা। একবার জিজ্ঞেস করলে—বিশাখার খবর কিছু পেয়েছ তুমি বাবা? সেখানে গিয়ে একটা চিঠিও তো সে দিতে পারতো!

সন্দীপ মাসিমাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে বললে—নিশ্চয় ভালো আছে সে। আপনি বেশি ভাববেন না। সে ভালোই আছে।

—তুমি কি তার শ্বশুরবাড়িতে গিয়েছিলে?

সন্দীপ আর কী বলবে, শুধু বললে—হ্যাঁ মাসিমা, আমি গিয়েছিলুম।

—গিয়েছিলে? কেমন দেখলে তাকে? ভালো আছে সে?

সন্দীপ জানতো এই মিথ্যে কথায় কোনও অন্যায় নেই। রোগীকে সুস্থ করতে সত্য-মিথ্যার বিচার করতে নেই।

—হ্যাঁ, খুব ভালো আছে।

—আমার কথা কিছু বলছিল?

সন্দীপ বললে—হ্যাঁ, আপনার কথা বার-বার বলছিল। জিজ্ঞেস করছিল—মা কেমন আছে—

—তুমি কী বললে? আমার অসুখের কথা বলোনি তো?

—না, বললুম তোমার মা ভালোই আছে।

ভালোই করেছ। সে সুখী হয়েছে, তাই-ই আমার সৌভাগ্য বাবা। এখন আমি মরে গেলেও আমার আর কোনও দুঃখু নেই—তারপর একটু থেমে মাসিমা আবার জিজ্ঞেস করলে—আর আমার জামাই?

সন্দীপ বললে—সৌম্যপদবাবুও ভালো আছে।

—বিশাখার তো বিয়ে হয়ে গেল, এবার তুমি একটা বিয়ে করো বাবা। তোমার মা'রও

তো বয়েস হলো, এখন তোমার বউ এসে তোমার মা'কে একটু সেবা করুক। আর কতোদিন তোমার মা হাত পুড়িয়ে রান্না করবে—

আসবার সময়ে মা বলেছিল—দুর্গা—দুর্গা—

যাত্রারম্ভে 'দুর্গা' নাম স্মরণ করলে শোনা গেছে শুভ হয়। কিন্তু তাহলে সন্দীপের এত অশুভ হলো কেন? কেন সন্দীপকে সারা জীবন সব রকমের দুর্ভোগ ভোগ করতে হলো? কেন, কীসের জন্যে তাকে এত বছরের জেল খাটতে হলো?

মনে আছে, অতো যন্ত্রণার মধ্যেও মাসিমার মুখে একটু হাসি ফোটাতে পেরেছে সে, এইটুকু ছিল তার মনের সান্ত্বনা।

সেই ভোরবেলা বেড়াপোতা ছেড়ে কলকাতায় এসে সে যখন পৌঁছলো তখন বেশ বেলা হয়ে গেছে। ক্ষিধেও পেয়েছিল তখন খুব। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সন্দীপের পা দুটোও তখন ব্যথা করতে আরম্ভ করেছে। বাইরে ট্যাক্সিতে মাসিমাও আধ-শোয়া অবস্থায় রয়েছে।

প্রায় এক ঘণ্টা পরে ডাক্তারবাবু অপারেশন থিয়েটার থেকে ফিরলেন। সন্দীপকে দেখে চিনতে পারলেন ডাক্তার লাহিড়ী। জিজ্ঞেস করলেন—পেশেন্টকে এনেছেন?

সন্দীপ বললে—হ্যাঁ স্যার—

—পেশেন্ট কোথায়?

—বাইরে ট্যাক্সিতে শুয়েই রেখে দিয়েছি।

ডাক্তারবাবু আবার জিজ্ঞেস করলেন—টাকা জমা দিয়েছেন?

—হ্যাঁ স্যার, এই যে—বলে সন্দীপ টাকার রসিদটা পকেট থেকে বার করে দেখালে।

ডাক্তারবাবু রসিদটা নিয়ে ভালো করে দেখলেন।

তারপরে বললেন—বারো নম্বর কেবিনে রেখে আসুন—

কিন্তু কী করে রোগীকে বারো নম্বর ঘরে নিয়ে যাবে তা কেউ বলছে না।

—আমার ফীজ্‌টা এনেছেন?

সন্দীপ বললে—হ্যাঁ, এনেছি। কতো টাকা স্যার?

ডাক্তার লাহিড়ী বললেন—এখন আড়াই হাজার দিলেই চলবে—

সন্দীপ পকেট থেকে টাকা বার করে গুনে ডাক্তার লাহিড়ীর দিকে এগিয়ে দিতেই তিনি নিয়ে পকেটে পুরলেন।

সন্দীপ বললে—স্যার, টাকাটা গুনে নিলেন না?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক আছে।

বলে টেবিলের ওপর রাখা একটা বেল্‌-এর সুইচ টিপলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে একজন চাপরাশি এসে সেলাম করলে।

ডাক্তারবাবু বললেন—স্ট্রেচার নিয়ে এসে পেশেন্টকে বারো নম্বর কেবিনে উঠিয়ে নিয়ে যেতে বল্‌—

তারপর সন্দীপের দিকে চেয়ে বললেন—পঞ্চাশটা টাকা দিন কাউন্টারে, ওরা আপনাকে রসিদ দেবে। যান—

আর তারপর মাসিমাকে ট্যাক্সি থেকে স্ট্রেচারে তুলে নিয়ে নার্সিং-হোমের বারো নম্বর কেবিনে গিয়ে তুলে দেওয়া হলো। মাসিমাকে বিছানায় শুইয়ে দেওয়ার পর সন্দীপকে বললে—মাসিমা, আমি তাহলে এখন আসি—

মাসিমার চোখ তখন জলে ছল্‌-ছল্‌ করছে। সেই অবস্থাতেই বললে—তুমি চলে যাবে? আমি একলা কী করে থাকবো এখানে?

সন্দীপ বললে—আমার ব্যাঙ্কের ছুটির পর আমি আবার এসে আপনার সঙ্গে দেখা করে যাবো। আপনি কিছু ভাববেন না। যা দরকার হয় আপনি এখানকার নার্সকে বলবেন, সে সব কিছু করে দেবে—কিছুছু ভাববেন না—

কথাগুলো বলে সন্দীপ চলেই যাচ্ছিল, কিন্তু মাসিমা আবার বললে—বাবা, আর একটা

কথা। তুমি একবার বিশাখার খবরটা নিও, সে বিয়ের পর কেমন আছে, শ্বশুরবাড়ি কেমন আছে, তা আমার বড়ো জানতে ইচ্ছে করছে—

সন্দীপ বললে—ঠিক আছে, আমি আসি—

বলে সন্দীপ বেরিয়ে ব্যাঙ্কে গেল। আধ-রোজের ছুটি নেওয়া ছিল আগে থেকে। হাশেম সাহেব বললে—স্যার, মালব্যজী টেলিফোন করেছিলেন, আমি তাঁকে বলে দিয়েছি যে আপনি হাফ্-ডে'র ছুটি নিয়েছেন। আরো জিজ্ঞেস করছিলেন আপনার বিয়ে হয়ে গেছে কিনা—

—তুমি কী বললে?

—আমি বলেছি যে, হ্যাঁ, বিয়ে হওয়ার পরদিনই আপনি ব্যাঙ্কে এসেছিলেন। আমার কথা শুনে তিনি অবাক হয়ে গেলেন। তারপরে বললেন—তিনি আবার আধ ঘণ্টা পরেই আপনাকে টেলিফোন করবেন—

সন্দীপ বললে—ঠিক আছে, তুমি যাও—

আর আধ ঘণ্টা পরেই করমচাঁদজী টেলিফোন করলেন। বললেন—তুমি নাকি বিয়ের পরদিনই অফিসে এসেছিলে!

সন্দীপ বললে—হ্যাঁ স্যার—

—কেন, এত তাড়াতাড়ি অফিসে আসার কী দরকার ছিল? এখনও তো তোমাদের অনেক ফাংশান বাকি রয়েছে। সেগুলো শেষ হওয়ার আগেই অফিসে এলে কেন?

সন্দীপ বললে—না স্যার, আমার বিয়ে হয়ওনি—

করমচাঁদজী আকাশ থেকে পড়লেন—বিয়ে হয়নি? তার মানে?

সন্দীপ বললে—সব গোলমাল হয়ে গেল। আমি বিয়ে করতে তো রাজী ছিলুম। কিন্তু সেই আপনাকে বলেছিলুম মুখার্জিবাবুদের কথা...

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে আছে।

সন্দীপ বললে—সেই তাঁরাই বেড়াপোতাতে এসে সব গোলমাল করে দিলেন।

—কেন?

সন্দীপ বললে—সে অনেক কথা স্যার, আমি একদিন আপনার কাছে গিয়ে সব বলবো। এখন খুব বিপদ চলছে আমার। সেই বিশাখার মাকে নার্সিং-হোমে ভর্তি করতে হলো। ক্যান্সার হয়েছে তাঁর। আমি তো আপনাকে সব বলেছিলুম—

—ঠিক আছে, তোমাকে আসতে হবে না। আমি তোমার কাছে যাবো একদিন—বলে তিনি টেলিফোনটা ছেড়ে দিলেন।
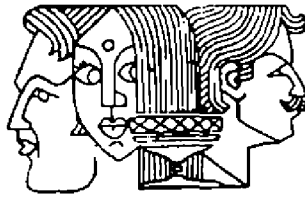
মানুষের সবচেয়ে আনন্দ কীসে? মানুষ হয়ে, না অমানুষ হয়ে?

কেউ টাকা উপায় করে আনন্দ পায়, কেউ খ্যাতি পেয়ে আনন্দ পায়। কেউ আবার শুধু খেয়ে-পরে-বেঁচে আনন্দ পায়, কেউ তোষামোদ পেয়েও আনন্দ পায়। কেউ নিজেকে জেনে আনন্দ পায়। আবার কেউ বা নিজেকে জানিয়েও আনন্দ পায়। অনেক লোক তাকে আনন্দ বলে স্বীকার করে না। কিন্তু আসল আনন্দ কোনটা?

আর এক রকম আনন্দ আছে। সে আনন্দ নিয়ম মানার আনন্দ, কিংবা নিয়ম ভাঙার আনন্দ। নিয়ম-শৃংখলা ভেঙে অনেকে মদ খেয়ে রাস্তায় গড়াগড়ি দিয়ে আনন্দ পায়।

কিন্তু কোনটা আসল আনন্দ?

আসল আনন্দ নিহিত আছে 'হওয়ায়'। পাখি একদিন বললে—আমি আকাশকে পেতে চাই। এই বলে সে তার নীড় ছেড়ে উড়তে শুরু করলে। সারা দিন সারা জীবন আকাশে উড়ে উড়েও সে বললে—'আমার আকাশ পাওয়া হলো না।' আকাশকে পেয়েও আকাশ পাওয়া যায় না। কারণ আকাশ অনন্ত। তাই মানুষ বলে আমি এমন কিছু চাই যাকে পাওয়া যায় না। যাকে পেয়েও মনে হয় কিছুই পেলুম না।

কিন্তু যা পাওয়ার জন্যে আমার এত আগ্রহ, সেই পাওয়ার আগ্রহটা কি কিছু না? সে চেষ্টাটাও কি মিথ্যে? না, সেই আকুলতা, সেই আগ্রহটা, সেই চেষ্টার নামই হলো 'হওয়া'। সেই 'হওয়াটা'র জন্যেই পৃথিবীর যতো মহাপুরুষ, যতো সাধুসন্ত, যতো অমর শহীদরা সারা জীবন সংগ্রাম করে গেছেন। সেই 'হওয়া'র সংগ্রামই মানুষের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সার্থকতা।

এখনও মনে আছে সন্দীপের কানে শোনা সেই সেদিনকার হাইকোর্টের সেই ঘটনা-গুলোর কথা। সেদিন সৌম্যপদবাবুর জীবনের শেষ বিচারের দিন। সেদিন কতো লোকের উদ্‌গ্রীব প্রতীক্ষার অবসান হবে। সেদিন কতো লোকের কতো বিনিদ্র রাতের যন্ত্রণার উপশম হবে। ঠাকুমা-মণির একলার নয়, মুক্তিপদবাবুর একলার নয়, এমন কি মল্লিক-কাকারও একলার নয়, 'স্যাক্সবী মুখার্জি' কোম্পানির কোন স্টাফেরও একলার নয়। সকলের সব শুভ-ইচ্ছার পরিণতি দেখবার আগ্রহের নিষ্পত্তি হবে।

তারপর আছেন এ্যাডভোকেট দাশগুপ্ত। তিনি যদি এই মামলার শুভ পরিণতি দেখতে পান তো উকিল-ব্যারিস্টার মহলে তাঁরও খ্যাতি আকাশচুম্বী হবে। আর সকলের বাস্তব ব্যক্তিত্বের অন্তরালে এসে দাঁড়িয়েছেন আরো অনেক অশরীরী আত্মা। সেই দেবীপদ মুখার্জি, যিনি এই বংশের সার্থক প্রতিষ্ঠাতা। তিনিও এসে দাঁড়িয়েছেন সকলের অগোচরে।

আর দাঁড়িয়েছেন শক্তিপদ মুখার্জি। তাঁর আগ্রহ থাকাও তো স্বাভাবিক। কারণ সৌম্যপদর ফাঁসির হুকুম তো তাঁরও অপমৃত্যুর মতো মর্মান্তিক।

আর তাঁর পাশে-পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন সৌম্যপদর মা। তাঁর উদ্বেগও কম নয়। তাঁর গর্ভজাত সন্তানই তো সৌম্যপদ!

আর বাকি রইল কোর্টের বেঞ্চ-ক্লার্ক, চাপরাশি, পেয়াদা। তারা বহুদিন থেকে এই মামলার প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী। তাদের সকলেরই কৌতূহল—কী হবে, কী হবে? একজন হত্যাপরাধীর বিচারের শেষ অঙ্কের শেষ দৃশ্যে কেমন ভাবে যবনিকা নেমে আসবে?

আর দর্শকের আসনে? সমস্ত কলকাতা লোক এসে ভেঙে পড়েছে যেন জজের এজলাসে। সকলের নজর কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে একটি মাত্র বিন্দুতে।

—কে রে ও?

সকলেরই এক প্রশ্ন—ও কে? ওই বউটা?

সবাই সবাইকে ওই একই প্রশ্ন করে চলেছে নিঃশব্দে। প্রশ্নটা জারী রয়েছে, কিন্তু উত্তরটা কেউ জানে না। উত্তর জানেন শুধু ঠাকমা-মণি, মুক্তিপদ মুখার্জি, মল্লিক-মশাই, এ্যাডভোকেট মিস্টার দাশগুপ্ত। ও'রা।

আর জানেন হাকিম-সাহেব।

কিন্তু বেশিক্ষণ উত্তরটা গোপন থাকলো না। একে একে সবাই জেনে গেল। এ-কান থেকে ও-কানে গেল কথাটা। তখন সবাই মন দিয়ে দেখতে লাগলো। গায়ের রং দুধে-আল্‌তা। লাল টক্‌টকে নতুন বেনারসী শাড়ি পরা একটি বউ। দেখেই মনে হয়, সবেমাত্র নতুন বিয়ে হয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে যেটা আগে নজরে পড়ে তা হচ্ছে মাথার সিঁথিতে নতুন লাগানো দগদগে জবজবে সিঁদুর।

যাকে দেখার জন্যে সবাই উদ্‌গ্রীব তার কিন্তু কোনও দিকে দিকপাত নেই, কোনও দিকে লক্ষ্য নেই। সে অচঞ্চল স্থির হয়ে এক জায়গায় বসে রয়েছে একেবারে সামনের সারিতে।

পৃথিবীতে যারাই বাঁচতে চায়, যারাই অত্যাচার থেকে মুক্তি পেতে চায়, তারাই এখানে এই ন্যায়াধীশের এজলাসে এসে ধর্না দেয়, তারাই নিজেদের আর্জি পেশ করে, তারাই প্রার্থনা করে—আমাকে অনুগ্রহ করে মুক্তি দিন ধর্মাবতার, আমি নিরপরাধ, আমি নতজানু হয়ে আপনার কাছে ন্যায়বিচার প্রার্থনা করছি—

মিস্টার দাশগুপ্ত তখন আইনের নানা যুক্তি, আইনের নানা ধারা উল্লেখ করে সেই একই প্রার্থনা করছিলেন। তিনি বলছিলেন—মিথ্যা দিয়ে সাময়িক কালকে বিভ্রান্ত করা যায়। যেমন মেঘ। মেঘ কিছুক্ষণের জন্যে সূর্যকে ঢেকে দিতে পারে। তখন মনে হতে পারে—মেঘই সত্য, সূর্য মিথ্যে। কিন্তু অংশকে সম্পূর্ণ বলে ভুল অন্য যে-কেউ করুক, ধর্মাবতার নিশ্চয় তা করবেন না। আমার মক্কেল কলকাতার এমন এক বংশোদ্ভব সন্তান যিনি কোনও অন্যায় করতে পারেন না। অন্যায় তাঁর স্বভাব-বিরুদ্ধ। তা যদি হতো তা হলে কোনও মা খুনের অপরাধে অপরাধী আসামীর সঙ্গে কি নিজের গর্ভজাত মেয়ের বিয়ে দিতেন? ধর্মাবতার, সামনের দিকে দয়া করে দৃষ্টিপাত করে দেখুন, আমার মক্কেলের সদ্য-বিবাহিতা ধর্মপত্নীর চোখে জলের ধারা বইছে। তাঁর বিয়ের পর এখনও আটচল্লিশ ঘণ্টাও অতিক্রম করেনি। রায় দেবার আগে ধর্মাবতার অনুগ্রহ করে আমার মক্কেলের সহধর্মিণীর কথা একটি বার বিবেচনা করে দেখবেন। সেই সদ্য বিবাহিতা তার অবস্থার কথা কি একবারও ধর্মাবতারের মনে উদয় হবে না? আমাদের ধর্মে তো ক্ষমাকে সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম বলে স্বীকার করা হয়েছে। ধর্মাবতার, বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি নোবেল পুরস্কারে ভূষিত রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা আমি আংশিক আবৃত্তি করছি। অনুগ্রহ করে শুনতে আবেদন করছি।

বলে পাশ থেকে 'সঞ্চয়িতা' বইটি হাতে তুলে নিলেন। তারপর বললেন—আমি ধর্মাবতারকে রবীন্দ্রনাথের 'গান্ধারীর আবেদন' নামের কবিতা থেকে লাইন পড়ে শোনাচ্ছি। এখানে গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রকে বলছেন—

"......প্রভু, দণ্ডিতের সাথে
দণ্ডদাতা কাঁদে যবে সমান আঘাতে
সর্বশ্রেষ্ঠ সে-বিচার। যার তরে প্রাণ
কোনো ব্যথা নাহি পায় তারে দণ্ডদান
প্রবলের অত্যাচার। যে দণ্ডবেদনা
পুত্রেরে পারো না দিতে সে কারে দিও না,
যে তোমার পুত্র নহে তারো পিতা আছে,
মহা অপরাধী হবে তুমি তার কাছে
বিচারক।......"

চারদিকে পুলিশ পরিবেষ্টিত হয়ে সৌম্যপদ মুখার্জি আসামীর কাঠগোড়ায় লোহার খাঁচার মধ্যে দাঁড়িয়ে তখন সব শুনছে। কিন্তু কোনও প্রতিক্রিয়া নেই, নির্বিকার-নিরুদ্বেগ, নিরুত্তাপ দৃষ্টি।

ঘড়িতে তখন দুপুর একটার সঙ্কেত। জজ-সাহেব এ্যাডভোকেট মিস্টার দাশগুপ্তের সব কথাগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খ শুনেছেন আর মাঝে মাঝে তাঁর সামনে রাখা কাগজের ওপর কী সব নোট করছেন। কারণ মানুষের জীবন নিয়ে যখন প্রশ্ন তখন সতর্ক হয়ে রায় দিতে হবে।

কাঁটায় কাঁটায় দুপুর একটার সময় জজ-সাহেব উঠলেন। তখন তাঁর আধ ঘণ্টার জন্যে ছুটি।

মিস্টার দাশগুপ্তের করণীয় কর্তব্য শেষ। এখন জজ-সাহেবের রায়ের ওপর সব কিছু নির্ভরশীল। দাশগুপ্ত সাহেব তাঁর চেম্বারের দিকে চলতে লাগলেন। ঠাকমা-মণি, মুক্তিপদ, মল্লিক-মশাইও চলতে লাগলেন, পেছনে পেছনে। তাঁদের সঙ্গে নতুন বউ বিশাখাও চলেছে।

ঠাকমা-মণি মিস্টার দাশগুপ্তকে জিজ্ঞেস করলেন—কেমন বুঝলেন মিস্টার দাশগুপ্ত?

মিস্টার দাশগুপ্ত মুখে কিছু না বলে আকাশের দিকে হাত তুলে ইঙ্গিতে কী যেন বোঝাতে চাইলেন। তার মানে—ওপরওয়ালাকেই জিজ্ঞেস করুন—

সব জিনিসের শেষ আছে, কিন্তু মৃত্যুর কি শেষ আছে?

এই কথাটাই জেলখানার ভেতরে সন্দীপ কেবল ভাবতো। আকাশের শেষ আছে, সমুদ্রের শেষ আছে। কিন্তু মৃত্যুর?

সহদেবই সুযোগ পেলে কাছে আসতো। বলতো—বাবুজী, পেট ভরেছে তো?

সন্দীপ জিজ্ঞেস করতো—কেন? ও-কথা কেন বলছো?

—বলছি এই জন্যে যে এখানে কেউ পেট ভরে খেতে পায় না—

সন্দীপ আবার জিজ্ঞেস করলে—কেন?

সহদেব বললে—এখানে সবাই চোর বাবুজী—সবাই চোর।

সন্দীপ এ-কথার কোনও উত্তর দিলে না। সহদেবই আবার কথা বলতে আরম্ভ করলে। বললে—আমিও তো চোর। আমি চুরি করেছি বলেই তো আমার জেল হয়েছে—

সহদেব বললে—আপনি চোর কি না তা বলবার অধিকার আমার নেই বাবুজী। কিন্তু জেলখানার ভেতরে যারা কাজ করছে, তাদের যদি কোনও দিন বিচার হতো তাহলে তারা সবাই জেল খাটতো—

—তাই নাকি?

সহদেব বলতো—হ্যাঁ। এখানে যে চালের ভাত আপনার খাবার কথা সে-চাল বাইরে চলে যায়। সে চাল মোটা দামে বাইরে বিক্রি করে সস্তা দামের চাল কিনে কয়েদীদের খেতে দেওয়া হয়।

—এ-সব কারা করে?

সহদেব বলতো—বাবুজী, কে করে না, তাই বলুন! জেলখানার যে কর্তা সেই মানুষটার যদি কোনও দিন বিচার হয় তাহলে তারই প্রথমে জেল খাটা উচিত।

সহদেব কথাটা বলে তারপর গলাটা একটু নিচু করতো।

বলতো—আপনাকে বলতে দোষ নেই, আমিও চুরি করি!

সন্দীপ আশ্চর্য হয়ে যেত সহদেবের কথা শুনে।

বলতো—তুমিও?

সহদেব বলতো—হ্যাঁ বাবুজী, আপনার কাছে বলতে লজ্জা নেই। যখন প্রথম আমি এখানে এলুম, তখন চুরি করতুম না। কিন্তু পরে যখন দেখলুম ওপর থেকে নিচু তলা পর্যন্ত সবাই চুরি করে তখন আমি চুরি করা শুরু করলুম—

সন্দীপ বললে—তুমি কী চুরি করো?

সহদেব বললে—যা পাই তা-ই চুরি করি।

—মানে?

সহদেব বললে—আপনাদের যা-কিছু দেওয়ার কথা তা কি আপনাদের দেওয়া হয়? যে-দুধ আপনাদের দেওয়া হয়, তাতে অর্ধেক জল মিশিয়ে বাকিটাকে কে বাইরে বেচে দেয়? আমি।

—তুমি দুধে জল মেশাও?

সহদেব বলে—এখানে যদি চুরি না করি তাহলে আমার চাকরি চলে যাবে।

—সে কী?

সহদেব বললে—হ্যাঁ বাবু, আমি যখন প্রথম-প্রথম এসেছিলুম তখন আমি চাইতুম ভালো হতে। যা হুকুম হতো তা-ই মেনে চলবার চেষ্টা করতুম। তাই দেখে সবাই আমার শত্রু হয়ে গেল। সবাই আমায় দলছাড়া করে দিলে। তারপর আমি আমার ভুল বুঝতে পারলুম। তারপর থেকে আমি তাদের তালে তাল দিতে শুরু করলুম। তাই এখানে এখন সবাই আমার বন্ধু।

তারপর একটু থেমে বললে—বাবুজী, যদি আফিম্-টাফিম্ খেতে চান তো সাপ্লাই করে দিতে পারি। কিংবা মদ......

—মদ? এখানে কি মদও পাওয়া যায় নাকি?

সহদেব বললে—কি মদ? কী চান আপনি তাই বলুন না। আপনি আমাকে আপনার বাড়ির ঠিকানা দিন না, আপনার যা-কিছু দরকার সেখান থেকে চেয়ে এনে আপনার কাছে তা পেশ করতে পারি। শুধু কী চাই তাই বলে দিন।

সন্দীপ বললে—আমি যা চাই তা তুমি আমাকে এনে দিতে পারবে না সহদেব -

—সে কী? আপনি বলছেন কী? আপনি একবার আমাকে বলেই দেখুন না আমি তা এনে দিতে পারি কিনা—

তারপর একটু থেমে আবার বললে—ঠিক আছে, আপনাকে এখুনি বলতে বলছি না; আপনি ভাবুন। বেশ করে ভেবে নিয়ে আমাকে বলবেন। আমি তখনই তা সাপ্লাই করবো—

সহদেব প্রায়ই কথাটা বলতো। মাঝে মাঝে এসে কথাটা আবার মনে করিয়েও দিত।

কিন্তু কী চাইবে সন্দীপ? কী পেলে তার মনের কামনা পূর্ণ হবে? কী পেলে তার সব চাওয়া সার্থক হবে? সংসারে এমন কী বস্তু আছে যা পেলে মানুষ বলতে পারে—আর আমার কিছু চাওয়ার বাকি নেই?

সত্যিই তো, সংসারে চাওয়ার বস্তুর কি অভাব আছে? ঠাকমা-মণির অতো টাকা থাকা সত্ত্বেও তাঁর চাওয়ার তো কখনও শেষ হয়নি। তিনি তখনও চাইতেন তাঁর নাতি বিয়ে-থা করে সংসারী হোক। মল্লিক-কাকাও চাইতেন যে তাঁর চাকরিটা বজায় থেকে তিনি বহাল-তবিয়তে জীবন কাটিয়ে দিন। মেজবাবু চাইতেন তাঁর মেয়ে-স্ত্রী সুস্থ জীবন-যাপন করে তাঁর সংসার আলো করে বেঁচে থাকুক আর তাঁর কারখানার কর্মীরা সৎভাবে কাজ করে তার সমৃদ্ধি ঘটাক। গোপাল হাজরাও তাই। সেও চাইতো সে সব রকম নেশার জিনিস বিক্রি করে আরো অনেক টাকার মালিক হয়ে পৃথিবীটাকে করতলগত করুক।

আর তপেশ গাঙ্গুলী? তপেশ গাঙ্গুলীর চাহিদা বড়ো অল্প। কিন্তু সেই অল্প চাহিদাকেই সে পাহাড়-পরিমাণ করে নিজেকে উঞ্ছবৃত্তির ধারক ও বাহক করে তুলতে চাইতো সারা জীবন।

জেলখানার ভেতরে বসে বসে জেলখানার বাইরের দেখা জগৎটাকেই সন্দীপ একাগ্র মনে বিচার-বিশ্লেষণ করতো। একটা মানুষও সে খুঁজে পেত না যে কিছু চায় না। মাসিমা কেবল চাইতো তার বিশাখার একটা ভালো শুধু নয়, একজন বড়োলোক পাত্রের সঙ্গে বিয়ে হোক।

কারোর আশা-আকাঙ্ক্ষা কি এ-জীবনে মিটেছে? আশা-আকাঙ্ক্ষা কি কারো মেটে?

সেদিনও সহদেব এসে বললে—কেমন আছেন বাবুজী?

সন্দীপ বললে—ভালোই তো আছি—

তারপর সহদেব বললে—আপনার কি কিছু চাই বাবুজী?

সন্দীপ বললে—না—

সহদেব বললে—এ কী রকম মানুষ আপনি বাবুজী? এখানে সব কয়েদীরা কিছু-না-কিছু চায়ই। আপনিই শুধু কিছু চান না। আপনার কি কিছুই দরকার নেই?

সন্দীপ বললে—যা আমার দরকার তা তো তোমরা দিচ্ছই। ভাত ডাল তরকারি, রুটি,

কম্বল, লোটা সবই দিচ্ছে। আবার কী দরকার হয় বলো তো একটা মানুষের?

সহদেব বললে—কিছু নেশার জিনিস......

সন্দীপ বললে—আমি তো কিছু নেশা করি না ভাই—

—পান, বিড়ি, সিগারেট, খইনি, গুন্ডি, দোক্তা—

সন্দীপ বললে—আমি চা-ই খাই না, তার ওপর আবার পান বিড়ি সিগারেট......বেঁচে থাকতে গেলে কি ও-সব জিনিস খেতেই হবে?

—তাহলে সবাই খায় কেন ওসব?

সন্দীপ বললে—আগে বলো সবাই মানুষ কিনা? দুটো হাত, দুটো পা, দুটো চোখ, আর দুটো কান থাকলেই কি তাকে মানুষ বলা যায়?

এ-কথার জবাব সহদেবের মতো লোকদের কাছ থেকে আশা করা অনুচিত। সহদেব জেলখানার ভেতরে যাদের দেখেছে তাদেরই মানুষ বলে ভেবে নিয়েছে। কিন্তু তা বলে তাকে দোষ দেওয়াও চলে না। সে নিজেকেও তো একজন মানুষ বলেই মনে করে। সত্যিই কি সে মানুষ?

তবু সে প্রশ্ন করা বন্ধ করে না। মাঝে মাঝে এসে সে ওই একই প্রশ্ন করে। শেষ-কালে সন্দীপ ওই একই প্রশ্নের উত্তরে বললে—আমি যা চাইবো তা তুমি দিতে পারবে না সহদেব!

সহদেব বললে—বলুন না, সেটা কী? ডিম? মাংস? ইলিশ মাছ?"

সন্দীপ বললে—না—

সহদেব বললে—চপ, কাটলেট, চিকেন-রোস্ট?

সন্দীপ তখনও বললে— না, ও-সব কিছুই নয়। আমাকে যদি কিছু দিতে হয় তাহলে এমন কিছু দাও, যা কোনও কালে হারাবে না, যা কোনও কালে নষ্ট হবে না—

সহদেব অনেকক্ষণ ভাবতে লাগলো। কিন্তু ভেবেও কিছু কূল-কিনারা পেলে না। বললে—সেটা কী বাবুজী?

সন্দীপ বললে—তুমি একটু ভাবো না। ভালো করে ভাবলেই পেয়ে যাবে। এমন একটা জিনিস আছে যা কখনও মড়ে না—

সহদেব বললে—সেটা কী জিনিস বুঝতে পারছি না ঠিক।

সন্দীপ বললে—সেই জিনিসটা কিন্তু কেউ চায় না।

তবু সহদেব বুঝতে পারতো না। কোন জিনিসটা কেউ চায় না, অথচ সেইটেই সবচেয়ে দামী জিনিস? সেটা কী?

শেষকালে সন্দীপ বুঝিয়ে দিয়েছিল সেটা কী! সন্দীপ বলেছিল—সেটা হচ্ছে মৃত্যু। সংসারে মৃত্যুর মতো অমর জিনিস আর কিছু নেই। অথচ সেটা কেউ কামনা করে না। যদি কারো ফাঁসির হুকুম হয় তো তাকে বাঁচাবার জন্য সে জীবনের সর্বস্ব জলাঞ্জলি দিতে তৈরি হয়। কারো জন্মতে মানুষ হাসে, আর কারো মৃত্যুতে মানুষ কাঁদে। আমি তো মরলে বেঁচে যাই—

সহদেব সন্দীপের কথাগুলোর মানে বুঝতে পারতো না।

সন্দীপ বলতো— আমার যদি তেমনি করে কখনও মৃত্যু হয় তো তখন আমি হাসতেই চেষ্টা করবো। যারা পৃথিবীতে আজও অমর হয়ে আছেন তাঁরা কেউই মৃত্যুর সময়ে কাঁদেননি। বরং তাঁদের আশেপাশে সকলকে হাসতে বলেছেন, আনন্দ করতে বলেছেন। সে রকম মৃত্যু ক'জনের হয় বলো তুমি?

সত্যিই সহদেব এ-সব কথার মানে বুঝতে পারতো না। ভাবতো বাবুজী নিশ্চয়ই পাগল। পাগল না হলে এমন কথা কেউ বলে? সিগারেট-বিড়ি-পান খায় না, চপ-কাটলেট-চিকেন রোস্ট খায় না, এমন লোকও তাহলে আছে এই পৃথিবীতে! কিন্তু একটা কথা সে কিছুতেই বুঝতে পারতো না যে এমন লোক কেন তাহলে জেল খাটছে? পনেরো লক্ষ-টাকা চুরির অভিযোগে কেন এমন লোককে আদালতে হাকিম জেল খাটার শাস্তি চাপিয়ে দিয়েছে?

তখন মাসিমার চিকিৎসা চলছে ডাক্তার লাহিড়ীর নার্সিংহোমে। ওষুধের ফিরিস্তির বিল দেখে সন্দীপ চমকে উঠতো। কতো টাকা যে খরচ হয়ে গেল একমাসের মধ্যেই তার ঠিক নেই। আরো কতো যে খরচ হবে তারও কোনও আগাম হিসেব ডাক্তারবাবু দিতেন না।

তীর্থের কাকের মতো সন্দীপ ডাক্তারবাবুর পথ চেয়ে বসে থাকতো। কিন্তু ডাক্তারবাবুর সাক্ষাৎ পাওয়া কি অতো সহজ? মানুষের ভগবানের দেখা পাওয়াও হয়তো সোজা। কিন্তু ডাক্তার লাহিড়ীর দেখা পাওয়া অসম্ভব। যা বলবার তা কাউন্টারে ক্লার্ককে বলো।

ভদ্রলোক খুব ব্যস্ত মানুষ। একা সব দিক সামলানো তাঁর পক্ষে দুষ্কর। তিনি বললেন—শুনুন। আপনার একটা বিল আছে—

—কতো টাকা বিল?

—আশি টাকার।

—আশি টাকা!? এই তো সেদিন তিনশো টাকা সন্দীপ মিটিয়েছে।

—এটা কীসের বিল?

—আপনার আত্মীয়ার ব্লাড-প্রেশার চেক করা হয়েছে। আর ইউরিন পরীক্ষা করা হয়েছে সেই বাবদ।

—কিন্তু সেদিন যে তিনশো টাকা শোধ করলুম ব্লাড-প্রেশার চেক করার জন্যে আর ইউরিন পরীক্ষার জন্যে। আরো যেন সব কী কী লেখা ছিল তাতে।

ভদ্রলোক বললেন—একবার চেক করলেই কি হয়? বারবার চেক করবার দরকার হয়। আপনার আত্মীয়ার কেস তো সহজ নয়, খুব সিরিয়াস কেস। খুব ভালোভাবে পরীক্ষা না করলে যে চলে না—

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—ডাক্তারবাবুর সঙ্গে একবার দেখা করলে ভালো হতো—

ভদ্রলোক একটা খাতা এগিয়ে দিলেন। বললেন—তাহলে এইখানে আপনার নাম আর ঠিকানাটা লিখে রেখে যান. তারপরে আপনি জেনে যাবেন কবে আপনার সঙ্গে দেখা হবে। তিনি দিনক্ষণ তারিখ জানিয়ে দেবেন।

সন্দীপ খাতাটা খুলে দেখলো তাতে অনেক লোকের নাম লেখা আছে। সবাই ওয়েটিং-লিস্টের মধ্যে নাম লিখে দিয়ে গিয়েছে। শেষ নম্বর হচ্ছে একান্ন। তার নম্বর হবে বাহান্ন। একান্ন জন মানুষকে দেখবার পর সন্দীপকে দেখবেন তিনি। তখন তাঁর দেখা করা বা কথা বলার সময় হবে। আর দেখা মানেই তো পঁচাত্তর টাকার ধাক্কা। পঁচাত্তর টাকা আগে জমা দিয়ে তবে কথা।

কাউন্টার-ক্লার্কের কাছে খাতাটা জমা দিয়ে সন্দীপ রাস্তায় বেরোল। ব্যাঙ্কের টিফিন টাইমে নার্সিং-হোমে এসেছিল সে। আবার তাড়াতাড়ি ব্যাঙ্কে ফিরে যাবে। একটা বাস ধরে তাতেই সন্দীপ উঠে পড়লো। বসবার জায়গা নেই কোথাও, তাতে তার ক্ষতি নেই। দাঁড়িয়ে যাওয়া অভ্যেস হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু মুশকিলটা হলো টাকা নিয়ে। মল্লিক-কাকার দেওয়া পঞ্চাশ হাজার টাকা হু হু করে খরচ হয়ে যাচ্ছে। এই হারে যদি টাকাটা খরচ হয়ে যায় তাহলে কী হবে? তাহলে কি আবার মল্লিক-কাকার কাছে গিয়ে হাত পাততে হবে?

বাড়িতে গিয়ে মা'র কাছে আবার টাকা চাইতে হতো। মা জিজ্ঞেস করতো—কতো টাকা?

সন্দীপ বলতো—এখন একশো টাকা দিলেই চলবে—

মা বলতো—এই তো সেদিন চারশো টাকা নিয়ে গেলি। আবার একশো টাকা?

সন্দীপ বলতো—টাকা কি আমি নিজের জন্যে চাইছি? আমি তো তোমায় বলেই ছিলুম, একবার ডাক্তারখানায় গিয়ে পড়লে আর তাদের হাত থেকে মুক্তি নেই। রোজই একটা না একটা অজুহাতে টাকার বিল হাতে ধরিয়ে দেবে।

মা নিজের বাক্স থেকে একটা একশো টাকার নোট বার করে ছেলের হাতে দিত।

ছেলে সেই টাকাটা পকেটে পুরে নিয়ে অফিসে বেরিয়ে যেত। আর তারপর মা সারাদিন একলা বাড়িতে কাজ করতে করতে ছেলের কথাই ভাবতো। আগে তবু বিশাখা ছিল, বিশাখার মা ছিল, কোনও রকমে সময় কেটে যেত। কিন্তু তারপর থেকে মা'র আর কোনও কাজই থাকতো না বলতে গেলে। কমলার মা যেমন এসে বাড়ির কাজগুলো করে দিয়ে যেত তেমন এখনও করে চলে যেত। তখন ছেলের বাড়ি ফেরার জন্যে অপেক্ষা করা ছাড়া আর যেন কোনও কাজই থাকতো না বলতে গেলে।

সন্দীপও ভাবতো মা'র কথা। কিন্তু অফিসে গিয়ে পৌঁছুলে অবশ্য কোথা দিয়ে যে সময় কেটে যেত তা সে বুঝতে পারতো না। হঠাৎ ঘড়ির দিকে নজর পড়লেই সে চমকে উঠতো। কোন ফাঁকে কখন যে দুটো বেজে যেত তা তার খেয়াল থাকতো না। তখন আধ ঘণ্টা এক ঘণ্টার জন্যে একটু বিশ্রাম। আর তারপরেই আবার কাজের পাহাড়। কাজের পাহাড়টা যেন তার মাথার ওপর তখন চেপে বসে থাকতো।

আর তারপর যখন ছুটি হতো তখন অন্য ধান্দা। তখন একটা ট্যাক্সি ধরে ডাক্তার লাহিড়ীর নার্সিং-হোম। তখনই আরম্ভ হতো টাকার চাপ। আজ তিনশো, কাল আশি, পরশু পাঁচশো, তার পরদিন দেড় হাজার। টাকার যেন বন্যা বয়ে যেত দিনের পর দিন। মা বলতো—হ্যাঁরে খোকা, টাকা যে ফুরিয়ে যাচ্ছে রে, আর কতো টাকা লাগবে?

সেদিন যথারীতি সন্দীপ নার্সিং-হোমে পৌঁছিয়েছে। পৌঁছিয়েই সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে যাবে, এমন সময়ে সামনে পড়ে গেছে অনেক লোকে ভিড়।

ভিড় কেন? খানিক পরে বোঝা গেল ওরা কোন একজনের মৃতদেহ খাটে তুলে নিয়ে বাইরে বার করছে। কে, বুঝি মারা গিয়েছে! এই নার্সিং-হোমেই তার চিকিৎসা চলছিল ছ'মাস ধরে। আজ মারা গেল।

সন্দীপ চেয়ে দেখলে মৃতদেহটার দিকে। মহিলাকে দামী বেনারসী শাড়ি পরানো হয়েছে। যারা খাটটাকে তুলে নিয়ে বেরোচ্ছে তাদের চেহারা দেখেই বোঝা যায় তারা বড়োলোক। বাইরের রাস্তায় অনেকগুলো দামী দামী নতুন নতুন গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। বোধহয় মারোয়াড়ী মহিলার মৃতদেহ। সকলেরই পোশাকে-পরিচ্ছদে আভিজাত্যের চিহ্ন স্পষ্ট। এরা কোটি কোটি টাকার কম টাকাকে টাকা মনে করে না। তবু রোগভোগ এদের অব্যাহতি দেয়নি।

সেই দৃশ্যটা দেখতে দেখতেই তার মনে পড়ে গেল অনেক দিন আগেকার সেই যাত্রার দৃশ্যটা। নিবারণ কাকার সেই 'বিল্বমঙ্গলে'র অভিনয়টা। তার সেই কথাগুলো অনেক দিন পরে আবার তার কানে বাজতে লাগলোঃ

এই নরদেহ
জলে ভেসে যায়
ছিঁড়ে খায় কুক্কুর শৃগাল—
এই নারী, এরও এই পরিণাম......

প্রত্যেক দিন মাসিমা যা জিজ্ঞেস করে সেদিনও সেই একই কথা জিজ্ঞেস করলে। জিজ্ঞেস করলে—তুমি কাল তো আসোনি বাবা—

সন্দীপ বললে—আমি এসেছিলুম, তখন আপনাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছিল। তাই আমাকে দেখতে পাননি—

—তা বিশাখা কেমন আছে? কী বললে সে? কবে আমাকে দেখতে আসবে?

সন্দীপ বললে—আমি বিশাখাকে দেখতে যেতে সময় পাইনি।

—সে কী? তুমি যে আমাকে কথা দিয়েছিলে কাল তার কাছে যাবে?

সন্দীপ বললে—সময় পাইনি যেতে। দেখি, আজ কি কাল যাবো। তবে আমার সঙ্গে

তার দেখা হবে কিনা জানি না—

—কেন দেখা হবে না কেন?

সন্দীপ বললে—সে তো এখন বড়োলোকের বাড়ির বউ। আমার মতো লোকের সঙ্গে কি তাকে দেখা করতে দেবে তারা?

মাসিমা বললে—কেন দেখা করতে দেবে না? তুমি আমার কথা বোল। সে তো জানে, আমার অসুখ। আমার সঙ্গে একবার দেখা করতে তো তার আসা উচিত! বড়-লোকের বাড়িতে বিয়ে হয়েছে বলে কি মা মেয়ের কাছে পর হয়ে যাবে?

সন্দীপ এ-কথার কী জবাব দেবে? বললে—যদি পারি তো দেখা করতে বলবো।

মাসিমা বললে—আর আমার মেয়েই বা কী রকম বলো তো? বিয়ের পর তো মায়েরও ইচ্ছে হয় একবার মেয়েকে দেখতে! আর তা ছাড়া আমার জামাই-ই বা কী রকম? এতদিন হলো বিয়ে হয়ে গেছে, একটা চিঠি দিলেও তো পারতো!

সন্দীপ সান্ত্বনা দিয়ে বললে—তারা ভালোই আছে, আর দু'জনে মিলে খুব আরাম করছে। তাদের কথা ভেবে আপনি মিছিমিছি শরীর খারাপ করবেন না। এখন আপনার মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। এখন সে সুপাত্রের হাতে পড়েছে, এখন আপনার আর ভাবনা কী? আপনি শুধু এখন নিজের কথা ভাবুন।

মাসিমা বললে—তা কি পারি বাবা? আমার তো মায়ের প্রাণ, মেয়ে-জামাইকে তো একবার দেখতেও ইচ্ছে করে!

তারপর একটু থেমে আবার জিজ্ঞেস করলে—তুমি কি বিশাখাকে বলেছ যে আমি হাসপাতালে আছি? বলেছ তুমি?

সন্দীপ বললে—বলিনি। শুনলে পাছে কষ্ট পায় তাই তাকে কিছুই জানাইনি। আপনি যদি বলেন তাহলে তার শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে তাকে সব বলবো—

মাসিমা কিছুক্ষণ নিজের মনেই কিছু ভাবলে। তারপর বললে—না বাবা, তাহলে আমার অসুখের কথা আর তাকে বলবার দরকার নেই। তুমি শুধু দেখে এসো গিয়ে যে সে কেমন আছে, তাহলেই হবে। সে সুখে আছে, এই খবরটা জানতে পারলেই আমার সুখ হবে—

সন্দীপ সেই কথা শুনেই সেদিন চলে এসেছিল।

কিন্তু কী করে সে যাবে বিশাখার শ্বশুরবাড়ি। সেখানে গিয়ে সে কী বলবে? সারা রাস্তা ভেবে ভেবেও সে কিছু ঠিক করতে পারলে না। সারাদিন অফিসের খাটা-খাটুনির মধ্যে এ-সব কথা মনে পড়ে না। তাই কাজের মধ্যে ডুবে থাকলে শরীর যেমন সুস্থ হয়, তেমনি সুস্থ থাকে মনও। মনটাকে নিয়েই মানুষের যতো কিছু সমস্যা। তাই মনকে একাগ্র করবার জন্যেই মুনি-ঋষিদের এত প্রচেষ্টা, এত নিষেধাজ্ঞা। এই যে ট্রেনের ইঞ্জিনটা চলছে, এ যদি একবার অন্যমনস্ক হয় তাহলে কী হবে! ইঞ্জিনটা যে চালায় তারও কি অন্যমনস্ক হওয়া চলে?

কিন্তু সন্দীপের স্বভাবটাই এই যে সব সময়ে সকলের কথাই তার মনে পড়ে। তাদের সুখে সে সুখ পায়, তাদের দুঃখে সে দুঃখ পায়। এই ধরনের বিরল লোকগুলোকে নিয়েই ইতিহাসের যতো কিছু মাথাব্যথা। তাই সন্দীপ ভাবে আমি কি শুধু একলা আমারই? আমি আমাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকলে অবশ্য খুব আরাম পাওয়া যেত। কিন্তু আমি তো একলা আমার নয়। আমি তো সকলের। ফল কি শুধু ফলেরই? গাছের নয়? গাছের ডাল পাতা শেকড় সব কিছুর সঙ্গে জড়িত থাকাতেই তো তার অস্তিত্ব! তাদের বাদ দিয়ে তো তার আলাদা কোনও অস্তিত্ব নেই।

সন্দীপও তেমনি। সে যেমন তার মা'র, তেমনি সে তো মাসিমারও। মাসিমাকে সে না দেখলে কে তাকে দেখবে? আর শুধু মাসিমারই নয়, সে তো বিশাখারও। আবার মল্লিক-কাকা, ঠাকমা-মণি, মুক্তিপদবাবু, সৌম্যপদবাবুরও তো সে। বলতে গেলে সমস্ত পৃথিবীর তো সেও একজন শরিক! তাই পৃথিবীর সমস্ত মানুষের ভালো-মন্দের সঙ্গেই তো তার নিজের ভালো-মন্দের সম্পর্ক-সূত্র জড়িত। যতক্ষণ সে একলা থাকে ততক্ষণ

তার এইসব চিন্তা। বাড়িতে এলেই মা উদ্‌গ্রীব হয়ে ছেলের জন্যে অপেক্ষা করতো। বলতো—কী রে, আজ কেমন দেখলি দিদিকে?

সন্দীপ বলতো—সেই একই রকম।

—খাবার খেতে পাচ্ছে?

সন্দীপ বলতো—না। এখনও খাবার খেতে পারার মতো অবস্থা হয়নি। এখনও সেই রকম গ্লুকোজ ইনজেকশন দেওয়া চলেছে।

—আর সেই পায়ের ব্যথাটা?

—সেটা ওষুধ দিয়ে অসাড় করে রাখা হয়েছে। তিনি বুঝে গেছেন যে তিনি আর বেশিদিন বাঁচবেন না। তাঁকে তো বলা হয়নি যে বিশাখার সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয়েছে এক ফাঁসির আসামীকে। মেয়েকে দেখবার জন্যে তিনি খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। তিনি কেবল মেয়েকে দেখতে চাইছেন। আমি কী করি বলো তো?

ছেলের সঙ্গে মা কথা বলতো, সঙ্গে সঙ্গে খেতেও দিত। খেতে খেতেই কথা হতো দু'জনের। সেই কোন সকালে সন্দীপ অফিসে বেরোত আর হাসপাতালে মাসিমার সঙ্গে দেখা করে বাড়ি ফিরতে অনেক রাত হয়ে যেত। তখন কথা বলে ছেলেকে আর বিরক্ত করতে চাইতো না মা। সন্দীপ জিজ্ঞেস করতো—বিশাখার ব্যাপারে কী করি বলো তো মা? বিশাখাদের বাড়িতে কি যাবো একবার? তুমি কী বলো?

মা কী বলবে তা নিজেই বুঝতে পারতো না। একটু ভেবে বলতো—মল্লিক ঠাকুরপো তো বলে গিয়েছিল যে দরকার হলে আরো টাকা দেবে।

সন্দীপ বলতো—তোমার কাছে যে পঞ্চাশ হাজার টাকা ছিল, তাও তো কেবল খরচই হয়ে যাচ্ছে।

মা বলতো—ডাক্তারের চিকিৎসার জন্যে তো জলের মতো সব খরচ হয়ে যাচ্ছে, টাকা থাকবে কী করে?

সন্দীপ বললে—কী যে করি। এদিকে মাসিমার যখনই জ্ঞান হচ্ছে তখনই কেবল বিশাখার কথা। বিশাখার শ্বশুরবাড়িতে গেলে মল্লিক-কাকা ভাববে টাকা চাইতে গেছি—

মা বলতো—যাক গে এ-সব কথা। এ-সব নিয়ে ভাবলে শেষকালে তোর শরীরটা আবার ভেঙে না পড়ে। তোর মাসিমাকে তবু দেখবার লোক আছে। বিশাখাকেও তবু দেখবার লোক আছে, কিন্তু তুই যদি পড়ে যাস তাহলে তোকে দেখবে কে? যা শুগে যা। কাল ভোরবেলা তোকে আবার উঠতে হবে—

কিন্তু বিছানাতে শুয়েও ওই কথাগুলো কেবল তার মনে পড়তো। মনে পড়তো সমস্ত অতীতটার ঘটনাগুলো আর মানুষগুলোর কথা। তারপর ক্লান্তিতে কখন সে ঘুমের কোলে অচৈতন্য হয়ে পড়তো। তখন আর কিছু মনে পড়তো না, তখন শুধু মনে হতো এ ঘুম যেন তার আর কখনও না ভাঙে।
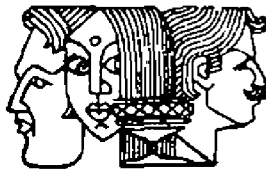
মেজবাবু অল্পতে কাউকে ছেড়ে দেবেন না। এ তাঁর বরাবরের স্বভাব। তাঁর পৈতৃক ফ্যাক্টরির ক্ষতি হচ্ছে দেখে তিনি যেমন একদিন কলকাতা থেকে ফ্যাক্টরি ইন্দোরে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, তেমনি তাঁর মেয়ের ব্যাপারেও তিনি বড়ো চিন্তিত হয়ে উঠলেন। খবর নিয়ে তিনি বুঝতে পারলেন যে শুধু তাঁর মেয়েই নয় এমন বহু লোকের ছেলে-মেয়েরা ঠিক বিকেল চারটের সময় একটা বাড়িতে জমায়েৎ হয়, আর তারপর সবাই রাত আটটার সময়েই সেখান থেকে যে যার বাড়ি চলে যায়।

এই চার ঘণ্টা ধরে সেখানে সেই ছেলে-মেয়েরা কী করে?

তখন তাদের দেওয়া হয় হ্যাসিশ, মারিজুয়ানা, গাঁজা, চরস—নানা রকম সব নেশার খোরাক। সে-সব পয়সা তাদের কে দেয়। দেয় ছেলে-মেয়েরাই নিজেদের পকেট থেকে।

বাবা এক-একটা প্রশ্ন করে আর পিক্‌নিক এক-এক করে উত্তর দেয়।

—তা তুই ইন্দোর থেকে এখানে এলি কী করে? কে তোকে ইন্দোর থেকে এখানে নিয়ে এলো?

পিক্‌নিক বললে—আমি নিজেই এসেছি, কেউ আমাকে নিয়ে আসেনি।

—এদের সঙ্গে তোর জানা-শোনা হলো কী করে?

—আমরা এক কলেজে পড়তুম। তখনই জানাশোনা হয়েছিল তাদের সঙ্গে।

—তাদের সকলের নাম কী?

—সে কী একজন? কতো নাম বলবো?

—তবু দু'একজনের নাম-ধাম বল্। তাদের বাবা-মা'র নাম ঠিকানা যা কিছু মনে পড়ে তা বল্।

পিক্‌নিক কিছুক্ষণ ভাবলে। তখনও তার শরীর ভালো হয়নি। সে কারো নাম-ধাম বলতে পারলে না। মুক্তিপদ বললেন—কই বল্? কারো নাম মনে পড়ছে না?

পিক্‌নিক বললে—না—

—তাহলে ওই নেশার জিনিসের জন্যে টাকা তো দিতে হতো? কে তোকে টাকা দিত?

—আমি।

—তোর অতো টাকা কোথা থেকে আসতো?

পিক্‌নিক বললে—ব্যাঙ্কের চেক-বই আমার কাছে রয়েছে। আমি চেক কাটতুম।

—দেখি তোর চেক-বই? কোথায় রেখেছিস? তোর হ্যান্ডব্যাগে?

বলে নিজেই মেয়ের হ্যান্ড-ব্যাগটা খুলে দেখলেন। মুক্তিপদ এতদিন মেয়ের হ্যান্ড-ব্যাগটা খুলে দেখেননি। এবার ব্যাগটা খুলে দেখলেন। দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। কী নেই তাতে? ব্যাঙ্কের পাস-বই, চেক-বই সব রয়েছে। কয়েকশো ক্যাশ টাকা। আর তার সঙ্গে কয়েকটা কনট্রাসেপটিভ, আর অসংখ্য পিল। খাবার ছিল। ওগুলোও কি কনট্রাসেপটিভ পিল?

—এসব ওষুধ কীসের?

পিক্‌নিক বললে—জানি না। আণ্টি দিয়েছে।

—আণ্টি? আণ্টি কে?

—আণ্টি, আণ্টি—

মুক্তিপদ ভয়ে আতঙ্কে মনে মনে শিউরে উঠলেন। তিনি নিজের কাজ, নিজের ইনকাম, ইনকাম-ট্যাক্স, ফ্যাক্টরির প্রোডাকশন আর সেলস নিয়েই এতদিন ব্যস্ত ছিলেন, তার আড়ালে এই সব কান্ড চলছিল? তিনি যদি সব কিছু ছেড়ে দিয়ে এই সব মেতে থাকতেন তাহলে তাঁর ফ্যাক্টরির দিকটা কে দেখতো? তাঁর কাছে কোনটা বড়ো? তাঁর ফ্যামিলি, না তাঁর ফ্যাক্টরি? কোন্‌টা? কোন্‌টা তাঁর কাছে বেশি জরুরী? টাকা উপায় করতে গেলে কোন দিকে তাঁর বেশি নজর দেওয়া উচিত ছিল? তাই যদি হয় তাহলে তাঁর মিসেসের কী কাজ? মিসেস কী তাঁর শুধু ঘরের শোভা?

বিন্দু এসে ডাকলে—মেজবাবু, ঠাকুমা-মণি আপনাকে একবার ডাকছেন।

—বল্, যাচ্ছি—

বলে পিক্‌নিককে বললেন—তুই এখানে বসে থাক্, ঘর থেকে বেরোবি না। আমি বাইরে থেকে ঘরে শেকল বন্ধ করে দিয়ে যাচ্ছি। ঠাকুমা-মণি কী বলে শুনে আসি—

বলে দরজা বন্ধ করে শেকল দিয়ে চলে এলেন।

ওদিকে ঠাকুমা-মণি তখন নিজের ঘরে বিশাখাকে সামনে নিয়ে বসে ছিলেন। অনেক দিন আগে তিনি নিজের নাতির জন্যে এই বিশাখাকেই পছন্দ করে রেখেছিলেন। তারপর কতো বাধা কতো বিঘ্ন এসে ঠাকুমা-মণিকে বিভ্রান্ত করে দিয়েছিল। কোথায় কোন মনসাতলা লেনের কোন গলি থেকে একেবারে রাসেল স্ট্রীটের ফ্ল্যাটে তাকে এনে তুলে

রেখেছিলেন। তারপর আবার সেখান থেকে একেবারে কোন্ অজ পাড়াগাঁ বেড়াপোতাতে গিয়ে আবিষ্কার করেছিলেন। সেই বিশাখাই আজ কোন ঘটনাচক্রে পড়ে তাঁর নাত-বউ হয়ে তাঁরই সামনে বসে রয়েছে!

মেজবাবু ঘরে ঢুকে বললেন—আমাকে ডাকছিলে মা?

ঠাকমা-মণি বললেন—হ্যাঁ, এই দ্যাখ্ না, এ-বাড়িতে এসে পর্যন্ত নাত-বউ কেবল কাঁদছে। এসে পর্যন্ত এর কান্না আর থামছে না।

সত্যিই সেই মাঝ-রাত্রে বেড়াপোতার বাড়িতে বিয়ে হওয়ার পর থেকেই বিশাখা কাঁদতে শুরু করেছিল। মানুষের অনেক রকমের কান্না আছে। কেউ কাঁদে বাপ-মাকে ছেড়ে শ্বশুরবাড়িতে আসার সময়ে। একটা গাছের চারাকে যখন জমি থেকে তুলে অন্য জমিতে গিয়ে পোঁতা হয়, তখন প্রথম কয়েকদিন গাছটা শুকিয়ে যায়। পাতাগুলো নিষ্প্রাণ হয়ে আসে। ফুলের কুঁড়ি ধরা দূরে থাকুক, সোজা হয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতেও পারে না। কিন্তু যখন একবার জমির সঙ্গে শেকড়ের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়ে যায়, তখন আবার সতেজ হয়ে ওঠে সে।

ঠাকমা-মণি জানতেন মেয়েদের ব্যাপারেও সেই একই নিয়ম। শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে একবার আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে উঠলে তখন বাপের বাড়ির কথা সেই মেয়েই একেবারে ভুলে যাবে। তিনি নিজের কথাও ভেবেছেন। তিনিও যখন এ-বাড়িতে প্রথম বউ হয়ে এসেছিলেন তখন কতো কান্নাই না কেঁদেছিলেন। কিন্তু এখন?

প্রথম দিন বিশাখাকে তিনি পাশে নিয়েই শুয়েছিলেন। সে-রাত্রে বিশাখারও ঘুম হয়নি, তাঁরও ঘুম হয়নি।

—বউমা?

বিশাখা বললে—হ্যাঁ।

—ঘুম আসছে না তোমার?

—না।

ঠাকমা-মণি বললেন—একটু চেষ্টা করো, ঘুম আসবেই—

বলে পাশ ফিরে শুলেন। শুলে কি হবে, মনটা পড়ে রইল সেই বউমার দিকে।

খানিক পরেই বোঝা গেল বউমা উস-খুস করছে। এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। স্বাভাবিক বিয়ে হলেও প্রথম দু'তিন রাত কোনও বউ-এর ঘুম আসে না। আর এ তো এক রকমের অস্বাভাবিক বিয়েই বলতে হবে। হাইকোর্টে আট ঘণ্টার জন্যে প্যারোলে ছুটির হুকুম দিয়েছিল হাকিম সাহেব। সঙ্গে পুলিশ পাহারা থাকবে যাতে আসামী পালিয়ে যেতে না পারে। হাইকোর্ট থেকে সমস্ত রকমের পাকা হুকুমই বেরিয়েছিল। দাশগুপ্ত সাহেব বলেছিলেন—না-ই বা হলো ফুলশয্যা, না-ই বা হল বউ-ভাত, মন্ত্র পড়ে বিয়ে তো হবে, তাতেই আপনার নাতি বেঁচে যাবে। ফাঁসির হুকুম রদ হয়ে যাবে, দেখবেন।

সত্যিই কিন্তু তাই হলো। হাকিম সাহেবও তো মানুষ। তাঁরও তো হয়তো সংসার আছে। তাঁরও তো ছেলে, ছেলের বউ কিংবা নাতি, নাতির বউ সবই আছে। আসামীকে ফাঁসির হুকুম দিতে তারও তো হাত একটু কাঁপবে। যে গেছে সে তো গেছেই, সে তো আর বেঁচে উঠবে না। তাহলে আসামীকে ফাঁসি দিয়ে কি লাভ? সে যদি মনে মনে অনুতাপ করে, তাতেই তো তার সমস্ত পাপ স্খলন হয়ে যাবে।

মিস্টার দাশগুপ্ত তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভাষায় দয়া-ভিক্ষার আর্জি জানিয়েছিলেন যে আসামী একদিন আগেই বিয়ে করেছে। তাকে শাস্তি দেওয়া মানে তার নব-বিবাহিত স্ত্রীকেও শাস্তি দেওয়া। এইসব বুঝে আসামীকে মুক্তি দিলে প্রকৃত ন্যায়বিচার করা হবে। সুতরাং আমি ধর্মাবতারের কাছে প্রার্থনা করি যে তিনি যেন আসামীর নব-বিবাহিতা পত্নীর কথা বিবেচনা করে আসামীকে মুক্তি দেন—

তা ধর্মাবতার তাই-ই করেছিলেন। এও তো একরকমের মুক্তি দেওয়া। সামান্য কয়েক বছরের কারাদণ্ড। যা দেখতে দেখতে কেটে যাবে। তখন আবার স্বামী-স্ত্রীর সুখী দাম্পত্য জীবন আরম্ভ হবে। এখন নতুন বউ শ্বশুরবাড়িতে একলা কাটাক। পরে

স্বামীর মুক্তির পর না হয় নিয়মমতো ফুলশয্যা হবে, বউ-ভাত অনুষ্ঠিত হবে। ততোদিন বিশাখা দিদি শাশুড়ীর সঙ্গে একই বিছানায় একই ঘরে দিন কাটাত, রাত কাটাক, জীবন কাটাক।

কিন্তু কথাটা তো তা নয়। কথাটা হচ্ছে এই বিশাখা তো বলতে গেলে সৌম্যবাবুর জন্যে বাগ্‌দত্তাই ছিল। বাগ্‌দত্তা মানেই তো একরকম বিয়ে হয়ে যাওয়া। অনুষ্ঠানটা বড়ো কথা নয়, সেটা গৌণ। কথা দেওয়াটাই প্রধান। সেই বাগ্‌দান যখন অনেক দিন আগেই হয়ে গিয়েছিল সুতরাং বিশাখা এ-বাড়ির বউই হয়ে গিয়েছিল তখন থেকে। সেদিন সেই ১৩ই ফাল্গুন তারিখে বিশাখার বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর থেকেই সে কেঁদে ভাসাচ্ছিল।

ঘটনাচক্রে মেজবাবুও হঠাৎ কলকাতায় ঠিক সেই সময়ে এসে হাজির হয়েছিলেন। সমস্ত ঘটনাটা শুনে মুক্তিপদ বলেছিলেন—মিস্টার দাশগুপ্ত যখন এই এ্যাডভাইস দিয়েছেন তখন এর ফল খারাপ হবে না, ভালোই হবে। দেখবে সৌম্য ঠিক ছাড়া পেয়ে যাবে।

মা-মণি বললেন—দেখি, এখন ভগবানের মনে কি ইচ্ছে আছে! আমি তো দিন-রাত তাঁকেই মনে মনে ডাকছি।

মুক্তিপদ জিজ্ঞেস করলেন—তা এই জ্যোতিষীর ঠিকানা তুমি কেমন করে পেলে?

—বেলেঘাটায়।

মুক্তিপদ আশ্চর্য হয়ে গেলেন—বেলেঘাটায়?

মা-মণি বললেন—হ্যাঁ রে। আমি হাজার হাজার টাকা খরচ করলুম কতো জ্যোতিষীর জন্যে, মল্লিক-মশাইকে কতো দেশে পাঠালুম। তাতেই আমার প্রায় পনেরো-কুড়ি হাজার টাকার বেশি খরচ হয়ে গেল। কাশী, হরিদ্বার, মথুরা, বৃন্দাবন, কানপুর, জলন্ধর, হোশিয়ারপুর—কোথায় না গেছে মল্লিক-মশাই। আমি তো সৌম্যর জন্যে পয়সা খরচের কোনও অন্ত রাখিনি। শেষকালে এই মেয়ের কোষ্ঠী-ঠিকুজি পেলাম বেলেঘাটার এক জ্যোতিষীর কাছে।

—বেলেঘাটার জ্যোতিষী বউমার কোষ্ঠী-ঠিকুজি পেল কি করে?

মা-মণি বললেন—যখন বউমাকে আর তার মা'কে আমাদের রাসেল স্ট্রীটের বাড়িতে থাকতে দিয়েছিলুম, তখন বউমার মা নাকি বউমার কোষ্ঠী-ঠিকুজি নিয়ে ওই বেলেঘাটার জ্যোতিষীর কাছে গিয়েছিল। আমি সেই সেখানেই যেতেই জ্যোতিষী এই কোষ্ঠীটা দেখালে। বললে—এই জাতিকার যদি এখনও বিয়ে না হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে এর সঙ্গে আপনার নাতির বিয়ে দিন, আপনার নাতির মৃত্যু হবে না।

মেজবাবু শুনে অবাক হয়ে গেলেন। বললেন—জ্যোতিষী বলে দিলে? তারপর?

—তারপর জাতিকার নাম শুনেই বুঝলাম যে এ তো আমারই সেই পছন্দ করা পাত্রী! সেই বিশাখা। তখনই দাশগুপ্ত সাহেবের কাছে গেলাম। তিনি হাকিমকে বলে আসামীর আট-ঘণ্টার ছুটির ব্যবস্থা করে দিলেন, আর এক গাড়ি পুলিশের ব্যবস্থাও করে দিলেন। মল্লিক-মশাই আর আমি তখুনি ছুটলুম সৌম্যকে নিয়ে সেই বেড়াপোতাতে। তখন বউমা'র বিয়ের সম্প্রদান শুরু হয়ে গিয়েছে অন্য এক পাত্রের সঙ্গে। আমাদের সেখানে যেতে আর দশ মিনিট দেরি হলেই সব্বোনাশ হয়ে যেত।

মুক্তিপদ সব শুনেছিলেন। বললেন—আশ্চর্য, কলিযুগে এও হয়?

মা-মণি বললেন—এ যে হয় তা তো তুই চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছিস। এখন আমার বউমাকে আমি কি বলে ঠান্ডা করি। এ তো সারা রাত আমার পাশে শুয়ে শুয়ে কেঁদেছে। এখন একে কি করে সামলাই বল্ তো? এ বেড়াপোতায় যাওয়ার জন্যে কেবল ছটফট করছে—

মুক্তিপদ কি বলবেন বুঝতে পারলেন না। তাঁর নিজেরও তো হাজারটা সমস্যা। তাঁর ফ্যাক্টরির সমস্যা তো আছেই। তার ওপর আবার স্ত্রীকে নিয়ে মেয়েকে নিয়ে এখন হাজারটা সমস্যা।

মা-মণি বললেন—তুই চুপ করে আছিস যে! আমাকে একটা কিছু পরামর্শ দে। আমি তো আর পারছিনে। আজ এক বছরের ওপর ভেবে ভেবে আমার পাগল হয়ে যাবার মতো অবস্থা হয়েছে, তার ওপর আবার আমার ক'বছর ধরে ঘুম নেই। এখন আমার আর বাঁচতে ইচ্ছে করে না। মনে হয় মরে গেলেই বাঁচি—

মুক্তিপদ বললেন—মা-মণি, তুমি মরে গেলে আমিও মরে যাবে। আমারও আর বাঁচতে ইচ্ছে করে না—

—তুই ও-কথা বলিস না। তুই আছিস বলে তবু এখনও বেঁচে আছি, তা জানিস?

—মা-মণি, যারা আমাকে দূর থেকে দেখে তারা আমার ভাগ্যকে হিংসে করে। আমার বাড়ি দেখে, আমার গাড়ি দেখে ভাবে আমি কতো ভাগ্যবান। কিন্তু যদি কখনও তারা আমার ভেতরটা দেখতে পেতো—

মা-মণি বললেন—ওসব কথা ছাড় তুই, ওসব অনেক শুনেছি। এখন বউমার কি করি, তাই বল্। এরকম দিনের পর দিন যদি কেবল কাঁদতেই থাকে, তাহলে ও বাঁচবে কি করে? তুই একটু ওকে বুঝিয়ে বল্ না—

মুক্তিপদ বললেন—আমাকে কে বুঝিয়ে বলে বলো তো মা? সবাই ভাবে যে তার মতো দুঃখী মানুষ বুঝি সংসারে আর কেউ নেই, তারা সবাই আমার কাছে আসে একটু শান্তির আশায়। শুনে হাসি পায়। ভাবি তারা যদি আমার ভেতরটা দেখতে পেতো।

মা-মণি বলে উঠলেন—ছাড় তুই ওসব কথা। ওসব আমি অনেক শুনেছি! এখন আমি কী করি বল্। বউমাকে কী করে ঠাণ্ডা করি তাই আমাকে বলে দে!

মুক্তিপদ বললেন—তুমি বউমাকে নিয়ে কিছুদিনের জন্যে আমার ওখানে চলো না। এখন মামলার ঝঞ্ঝাট নেই! তাতে তোমারও বিশ্রাম হবে, বিশ্রাম হবে বউমা'রও। শরীরটা সারবে দুজনেরই—

মা-মণি বললেন—রক্ষে করো বাবা, তোর সংসারে যেন কখনও আমাকে যেতে না হয়। তার চেয়ে আমার মরণও ভালো।

মুক্তিপদ বললেন—তা তুমি যদি আমার ওখানে না যাও তো কাশীতে যাও, সেখানে তো তোমার গুরুদেবের আশ্রম রয়েছে। তুমি তো অনেক টাকা দিয়ে গুরুদেবের আশ্রমের মন্দির করে দিয়েছে। সেখানে গেলেও তোমার আর বউমা'র একটু বিশ্রাম হতো!

ঠাকমা-মণি বিশাখার চিবুকে হাত দিয়ে তার মুখটা নিজের দিকে ফেরালেন। বললেন—কী রে, তুই যাবি? কাশী যাবি আমার সঙ্গে? কাশী তো তুই যাসনি কখনও। যাবি আমার সঙ্গে?

বিশাখা এতক্ষণ কোনও রকমে নিজের কান্না চেপে রেখেছিল। কিন্তু এবার আর থাকতে পারলে না। ঠাকমা-মণির বুকের মধ্যে মুখটা লুকিয়ে হাউ-হাউ করে কেঁদে ভাসিয়ে ফেললে।

—ওরে থাম্ থাম্, আর কাঁদতে হবে না। ঠিক আছে, ঠিক আছে, তোকে কোথাও যেতে হবে না, আমিও কোথাও যাবো না, এই কলকাতাতেই থাকবো। হলো তো?

বলে ঠাকমা-মণি দুই হাতে বিশাখাকে জড়িয়ে ধরে তাকে সান্ত্বনা দিতে লাগালেন।

মুক্তিপদ জিজ্ঞেস করলেন—তুমি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলে কেন? কী বলছিলে?

মা-মণি বললেন—কি জন্যে আবার, এই নাত-বউ-এর জন্যে। এ এত কাঁদছিল যে আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম। সমস্ত রাত ধরেই যদি কাঁদে তাহলে একে বাঁচাবো কি করে?. যাক গে, তোর পিক্‌নিক এখন কেমন আছে?

—এখন একটু ভালো।

মা-মণি জিজ্ঞেস করলেন—কি হয়েছিল তার?

মুক্তিপদ বললেন—কী আবার হবে! কলকাতায় সকলের যা হচ্ছে তাই-ই হয়েছে! এখানে যে তোমরা এখনও বেঁচে আছো এইটেই আশ্চর্য।

মা-মণি বললেন—ওর একটা বিয়ে দিয়ে দে না। তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

তোরও ওর দিকে দেখবার সময় নেই, তোর বউ-এর সময় নেই ওর দিকে দেখবার। সে ক্ষেত্রে ওর বর তবু ওকে দেখবে। তেমন একটা ভালো পাত্তোর-টাত্তোর দেখে বিয়ে দিয়ে দে। তখন আর কোথাও পালাতে পারবে না—

মুক্তিপদ বললেন—তেমন পাত্র পাচ্ছি কোথায়?

—খুঁজলে নিশ্চয় পেয়ে যাবি। আসলে বাপ-মা খারাপ হলে ছেলে-মেয়ে কখনও ভালো হয়? এই আমি কী করে সৌম্যর পাত্রী খুঁজে বার করলুম, ভেবে দেখ্ তো? সৌম্যর জন্যে আমি কাঁহা-কাঁহা ঘুরে বেড়িয়েছি তা কল্পনা করতে পারিস? অতো চেষ্টা করেছিলুম বলেই তো আজ এই পাত্রী পেয়েছি।

এ-কথার উত্তরে মুক্তিপদ আর কি বলবে!

শুধু বললেন—সবই ভাগ্য মা, সবই ভাগ্য! নইলে আমাকে কেন কলকাতা থেকে ফ্যাক্টরি গুটিয়ে নিয়ে ইন্দোরে চলে যেতে হলো? নইলে এখানে কি অন্য কারো ফ্যাক্টরি চলছে না? তাদের ওখানে কি লেবার ট্রাবল নেই? তাহলে?

—তা পাপ করলে পাপের ফল ভোগ করতে হবে না?

মুক্তিপদ বললেন—এ তোমার কেমন কথা হলো মা? আর কেউ পাপ করলে না, পাপ করলুম শুধু আমিই......?

—তুই ছাড়া আর কে তোর মতো অতো পাপ করেছে? বল্, তুই বুকে হাত দিয়ে বল্? পাপ করিসনি তুই?

—কী পাপ করেছি বলো তুমি?

মা-মণি বললেন—তুই যে বউ-মেয়ে সকলকে নিয়ে বাড়ি ছেড়ে আলাদা হয়ে গেলি, সেটা পাপ নয়? তাতে আমার মনে তুই কতো কষ্ট দিয়েছিস, একবার ভাব্ তো—

মুক্তিপদ বললেন—এও আমার ভাগ্য মা, এও আমার ভাগ্য!

—ওরে, সব ব্যাপারে ভাগ্যের দোহাই দিলে কি ভগবান তোকে রেহাই দেবে ভেবেছিস? এখন তোর আর হয়েছে কী, আরও কতো ভোগান্তি তোর কপালে আছে, তা আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। তখন আমার কথা মনে করিস।

হঠাৎ সুধা এসে ডাকল—দাদাবাবু, খুকুমণি কান্নাকাটি করছে, একবার শীগ্‌গির আসুন—

মুক্তিপদ চঞ্চল হয়ে উঠলেন। বললেন—আমি আসছি, দেখি আবার কী কাণ্ড করলে পিক্‌নিক—

বলে ঘর থেকে নিজের ঘরের দিকে চলে গেলেন।
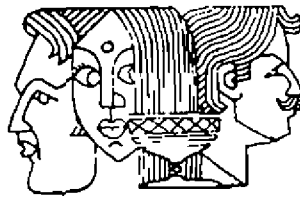
—সন্দীপের এখনও মনে আছে সেই অবিস্মরণীয় ঘটনাটা। অবিস্মরণীয় এই জন্যে যে সেদিনই প্রথম সে বুঝতে পেরেছিল যে মানুষকে নিজেই নিজেকে সম্পূর্ণ করে তুলতে হয়। এই আকাশ, এই সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, এই পশু-পাখী সবকিছুই সম্পূর্ণ হয়েই সৃষ্টি হয়। যেমন ভাবে তাদের একদিন সৃষ্টি হয়, তেমনি ভাবেই একদিন তাদের শেষও হয়। লয় হওয়ার সময় তারা বলে যায়—আমরা শেষ হলুম।

কিন্তু মানুষই একমাত্র সৃষ্টি, যার শুরু হয় অসম্পূর্ণতায়। তাকে সম্পূর্ণ করে তৈরি করেন তার সৃষ্টিকর্তা। সৃষ্টি করার পর তাকে তিনি বলে দেন—এখন থেকে তুমি সম্পূর্ণ হতে চেষ্টা করো। তাই জন্মের পর থেকেই মানুষের শুরু হয়

সম্পূর্ণ হওয়ার সংগ্রাম। সেই সংগ্রামের শেষে কী নিয়ে গেলাম তার চেয়ে বড়ো কথা কী দিয়ে গেলাম। পাওয়ার চেয়ে দেওয়ার মধ্যেই মানুষের জীবনের সার্থকতা। যাওয়ার সময় যে বলে যেতে পারে—আমি কিছুটা অজ্ঞানতা দূর করতে পেরেছি, কিছুটা অভাব মিটাতে পেরেছি, সেই মানুষই তো সম্পূর্ণ। যে বলতে পারে আমি কিছু মানুষের চোখের জল মোছাতে পেরেছি, আমি কিছু মানুষের দুঃখের ভার লাঘব করতে পেরেছি, সেই মানুষই তো সার্থক।

কিন্তু সম্পূর্ণ সার্থক মানুষ ক'জন সংসারে জন্মেছেন? বা ক'জন মানুষ তেমন সম্পূর্ণ সার্থক হতে চেষ্টা করেছেন?

কথাগুলো তখন সব সময়ে সন্দীপের মাথার ভেতরে ঘুরঘুর করতো। কী সে হতে চেয়েছিল আর কী সে হয়েছে, তার হিসেব করতে গেলে জমার খাতায় সে কেবল শূন্যই দেখতে পেত! সত্যিই তো, সে যেদিন পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবে সেদিন কী সে বলে যেতে পারবে যে মানুষের এই পৃথিবীতে আমি স্বর্গের একটু আভাস রেখে গেলাম? তা যদি না বলে যেতে পারে তাহলে তো তার সম্পূর্ণ হওয়ার সংগ্রামে সে হেরে গেল!

মনে আছে, সেই ১৩ই ফাল্গুন তারিখটার কথা। যখন তাকে বিয়ের পিঁড়ি থেকে সরিয়ে দিয়ে সেই জায়গায় সৌম্যবাবুকে বসিয়ে দিয়ে বিশাখার সঙ্গে তার বিয়ে দেওয়া হচ্ছিল, তখন বিশাখার চোখ দিয়ে টপ্-টপ্ করে জল পড়ছিল। সেখানে যারা সেই অবিস্মরণীয় ঘটনার নির্বাক সাক্ষী ছিল, তাদের দৃষ্টিতেও তা এড়িয়ে যায়নি।

সন্দীপ কিন্তু বিশাখার কান্নার কারণটা বুঝতে পারেনি। তবে কী বিশাখা ও বিয়েতে খুশী নয়? যদি খুশী না হয়ে থাকে তো প্রতিবাদ করেনি কেন? কেন উঠে দাঁড়িয়ে বলেনি—আমি এ বিয়ে করবো না—

কিংবা বিয়েবাড়ি থেকে পালিয়ে যায়নি সে কেন?

তবে কী দু'গাড়ি পুলিশ দেখে সে ভয় পেয়েছিল?

মা মাঝে মাঝে অন্য কথার সঙ্গে জিজ্ঞেস করতো—হ্যাঁ রে খোকা, বিশাখার কী খবর? তুই জানিস কিছু?

সন্দীপ কিছু জানলে তবে তো এ-কথার উত্তর দেবে। মা'রও উদ্বেগের কোনও শেষ ছিল না। যে টাকা সে মাইনে পেতো সেই টাকাগুলো সমস্তই মা'র হাতে তুলে দিত সন্দীপ। তারপর আবার মা'র কাছ থেকে সে তা চেয়েও নিত।

মা আবার জিজ্ঞেস করতো—কী রে, কথা বলছিস নে যে? বিশাখার কিছু খবর জানিস? ও-বাড়িতে তুই আর গিয়েছিলি?

সন্দীপ বলতো—না।

মা বলতো—একবার সময় করে যাস না। সেই যে মেয়েটাকে নিয়ে ওরা চলে গেল, তারপর কেমন আছে, সেটা তো আমাদের জানতে ইচ্ছে করে।

সন্দীপ অফিসে বেরোবার মুখে বলতো—যাবোখন একদিন সময় করে।

বলে অফিসে বেরিয়ে যেত। তারপর ব্যাঙ্কে সেই একই কাজের পুনরাবৃত্তি, সেই একই মুখ প্রতিদিন দেখা, সেই একই ট্রেনে ডেলি প্যাসেঞ্জারি করা। আর প্রতিদিন অফিসের ছুটির পর সেই ডাক্তার লাহিড়ীর একই নার্সিং-হোমে গিয়ে মাসিমাকে গিয়ে দেখে আসা, আর বিশাখা সম্বন্ধে মাসিমার সেই একই প্রশ্ন। মাসিমা জিজ্ঞেস করতো—বিশাখা শ্বশুরবাড়িতে কেমন আছে বাবা? আমার অসুখের কথা তাকে বলোনি তো?

সন্দীপ বলতো—না-না মাসিমা, তাই কখনও বলি?

—হ্যাঁ, আমার অসুখের কথা শুনলে সে আবার ছটফট করবে। সে শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে ভালো থাকুক, তাই-ই আমি চাই। তা কী রকম দেখলে তাকে? খুব হাসি-হাসি মুখ? আমার কথা কিছু জিজ্ঞেস করলে সে?

সন্দীপ বলতো—এই তো কালই দেখা করে এলুম। আপনার কাছ থেকে বেরিয়েই বিশাখার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলুম—

—তখন বিশাখা কী করছিল?

সন্দীপ বলতো—সৌম্যবাবুর সঙ্গে সিনেমা দেখে বোধহয় তখন সবে বাড়ি ফিরেছে।

—এখন আর আগেকার মতো কান্নাকাটি করে না তো?

সন্দীপ বলতো—এখন তো দেখলাম খুব হাসি-হাসি মুখ। আমাকে আবার খাওয়ালে।

সন্দীপ বলতো—দুটো রসগোল্লা, একটি কেক আর চা এক কাপ! আরো দিতে চাইছিল, কিন্তু আমি আপত্তি করতে তখন থামলো।

এইসব কথা মাসিমার শুনতে খুব ভালো লাগতো। যতো শুনতো ততো চোখ দিয়ে জল গড়াতো। তার মেয়ের যে এমন সৌভাগ্য হয়েছে, এ আনন্দ আর লুকিয়ে রাখতে পারতো না। সেই সমস্ত আনন্দ যেন জল হয়ে চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে ঝরে পড়তোই সেদিন অফিসে কাজ করতে করতে সন্দীপ একেবারে কাজের মধ্যে ডুবে গিয়েছিল, হঠাৎ হাশেম সাহেব ঘরে এসে ঢুকলো। বললে—স্যার, আপনার চিঠি—

আমার চিঠি! অবাক হয়ে গেল তার নামের প্রাইভেট চিঠি দেখে। অফিসের ঠিকানায় কে তাকে চিঠি লিখলে? চিঠিটা এসেছিল তার ব্যাঙ্কের শ্যামবাজার ব্র্যাঞ্চের ঠিকানায়। লোক মারফৎ পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেই ব্রাঞ্চ থেকে চিঠিটা এই হাওড়া ব্রাঞ্চে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। সন্দীপ বললে—যে-লোকটা চিঠিটা এনেছে সে আছে?

হাশেম বললে—আছে—

—তাকে একবার ডেকে আনো তো?

লোকটা ভেতরে আসতেই সন্দীপ চিনতে পারলে—সে গিরিধারী। সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—ম্যানেজারবাবু ভালো আছেন গিরিধারী?

—হ্যাঁ বাবুজী। ভালো।

—বাড়ির খবর সব ভালো?

গিরিধারী বললে—হ্যাঁ বাবুজী, সব ভালো।

বাড়ির ভেতরের খবর গিরিধারী আর কী-ই বা জানবে?

সন্দীপ বললে—ঠিক আছে, তুমি যাও—

সন্দীপ মল্লিক-কাকার চিঠিটা আগেই পড়ে নিয়েছিল। এবার আবার একবার পড়তে লাগলো—

"বাবাজীবন সন্দীপ, আশা করি ভগবানের কৃপায় তোমাদের সবই কুশল। অনেক দিন তোমার সঙ্গে দেখা হয় নাই। আমিও নানা কাজে-কর্মে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে পারি নাই। তোমার সঙ্গে দেখা হওয়া অত্যন্ত জরুরী হইয়া উঠিয়াছে। এই পত্র পাওয়ার পর তুমি যতো শীঘ্র সম্ভব যদি আমাদের বাড়িতে আসো তবে ঠাকুমা-মণি অত্যন্ত খুশী হইবেন। তোমার আসার আশায় রহিলাম। আশা করি তোমার মা ভালো আছেন। আমার আন্তরিক আশীর্বাদ জানিবে—

আশীর্বাদক:
শ্রীপরমেশচন্দ্র মল্লিক"

চিঠিটা পড়ে আবার তার মনে পড়লো সেই সব পুরনো দিনের কথা। সন্দীপ ভেবেছিল সে সব ভুলে যাবে। সেই সব অতীতের ঘটনাকে মন থেকে মুছে ফেলবে। মুছে ফেলে আবার নতুন করে তার নতুন জীবন আরম্ভ করবে। একবার যা ঘটে গেছে তা নিয়ে তার জীবনে আর নতুন করে কোনও বিড়ম্বনা সে বাড়াবে না। অশান্তিকে অস্বীকার করে যে শান্তি, সেই শান্তিরই উপাসনা সে করবে। কিন্তু হঠাৎ তার সব পরিকল্পনা বদলে গেল। হাশেম বললো—স্যার, আপনি চলে যাচ্ছেন?

সন্দীপ হাশেমের দিকে তাকালে। বললে—আমি আজকের সব কাজই সেরে রেখে দিয়ে গেলাম, চাবিটা আমার কাছেই থাক। আমার একটা জরুরী কাজ আছে—আমি

চলি—

তারপর আর কোনও দিকে না চেয়ে সন্দীপ বাইরে বেরিয়ে গিয়েই একটা খালি ট্যাক্সি পেলে। তাতেই উঠে পড়ে বললে—চলুন, বিডন স্ট্রীট—

গেটের সামনেই পাওয়া গেল গিরিধারীকে। সে যথারীতি সেলাম করলে। সন্দীপও তাকে সেলাম করলে। তারপর সোজা একেবারে ভেতরে ঢুকে গেল। মল্লিক-কাকা তাকে দেখেই উঠে দাঁড়ালেন। বললেন—তুমি আজকেই এসে গেলে?

সন্দীপ বললে—আপনি যে আমাকে আসতে বলেছিলেন! কী জরুরী ব্যাপার?

মল্লিক-মশাই বললেন—এদিকে অনেক কান্ড হয়ে গেছে! ঠাকমা-মণি তোমাকে একবার ডাকতে বলেছিলেন তাই তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলুম—

—কেন? ব্যাপারটা কী?

মল্লিক-মশাই বললেন—এই একটু আগে মেজবাবু তাঁর মেয়েকে নিয়ে চলে গেলেন। তুমি ঠিক সময়েই এসে গেছ। ঠাকমা-মণিকে গিয়ে তোমার আসার খবর দিয়ে আসি—

মল্লিক-মশাই বললেন—ওই বিশাখাকে নিয়েই সমস্যা হয়েছে।

—বিশাখাকে নিয়ে? কী সমস্যা?

মল্লিক-মশাই বললেন—সৌম্যবাবুর সমস্যাটা মেটাবার জন্যেই বিশাখাকে বাড়ির বউ করে নিয়ে আসা হলো, আর এখন বিশাখা নিজেই এক সমস্যা হয়ে উঠেছে—

—সে কী? কেন?

—মল্লিক-মশাই বললেন—সে খাচ্ছে না, দাচ্ছে না। মুখে একটু জল পর্যন্ত দিচ্ছে না, কেবল কেঁদে ভাসাচ্ছে—

—কেন?

—কেন কে জানে! তাই ঠাকমা-মণি তোমাকে খবরটা দিয়ে ডেকে পাঠাতে বলেছিলেন।

সন্দীপ বললে—সে খাচ্ছে না, কেবল কাঁদছে, তাতে আমি কী করবো?

—তুমি তাকে খেতে বলো একবার। তুমি বললে ও শুনবে। এ-রকম করে উপোষ করে থাকলে সে ক'দিন বাঁচবে? এ-রকম করে দিন-রাত না ঘুমিয়ে কাটালে ক'দিন তাকে বাঁচিয়ে রাখা যাবে? এত খরচ করে তাকে বিয়ে দিয়ে এনে তাহলে কী লাভটা হলো? সৌম্যবাবু যখন জেল থেকে ছাড়া পেয়ে বাড়ি ফিরে আসবে, তখন এ-সংসারের কী গতি হবে?

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—সৌম্যবাবু ক'বছর পরে জেল থেকে ছাড়া পাবে?

মল্লিক-মশাই বললেন—আট বছরও হতে পারে, ন'বছরও হতে পারে। উকিলবাবু তো তাই-ই বলেছেন অতো দিন বউমাকে কী করে বাঁচিয়ে রাখা যাবে? এই অবস্থায় তুমিই একমাত্র বউমাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারো। তুমি ওকে একটু বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বলো। তুমি বুঝিয়ে বললেই ও শুনবে, আর কারো কথা শুনছে না।

সন্দীপ মহাবিপদে পড়লো। বিশাখা আর কারো কথা শুনছে না, কেবল তার কথাই শুনবে? এ-ধারণাটা ঠাকমা-মণির হলো কী করে? কে এ-ধারণা ঢুকিয়ে দিলে ঠাকমা-মণির?

কিন্তু যদি বিশাখা সন্দীপের কথা না শোনে? যদি বিশাখা তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দেয়?

তখন মল্লিক-মশাই ওপরে ঠাকমা-মণির সঙ্গে কথা বলতে চলে গেছেন। খবর পেয়েই ঠাকমা-মণি জিজ্ঞেস করলেন—সন্দীপ এসেছে? তাকে ওপরে নিয়ে আসুন—

তাড়াতাড়ি নিচেয় এসে মল্লিক-মশাই সন্দীপকে বললেন—চলো সন্দীপ, ঠাকমা-মণি ডেকেছেন, চলো—

জীবনে অনেকবার সন্দীপের উত্থান-পতন হয়েছে। সে জানতো, পুণ্যের পথ যতো বিঘ্ন-বহুল, পাপের পথ ততো মসৃণ। সমস্তই সে জানতো। বইতেও তা পড়েছে,

লোকের মুখেও তা শুনেছে।

কিন্তু সেদিন সে বুঝতে পারছিল না যে সে কোথায় চলেছে, পুণ্যের পথে না পাপের পথে? কোথায়? যে তার স্ত্রী হতে চলেছিল, কিন্তু মাঝপথে বাধা পেয়ে পরস্ত্রী হয়ে গিয়েছে তার সঙ্গে দেখা করা কি পুণ্য, না পাপ!

একেবারে তিনতলায় গিয়ে মল্লিক-মশাই ডাকলেন—ঠাকমা-মণি...

বিন্দু ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। মল্লিক-মশাই তাকে দেখে বললেন—এই যে সন্দীপকে নিয়ে এসেছি—

মল্লিক-মশাই সন্দীপকে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। ঠাকমা-মণি বললেন—এসো বাবা, এই বিশাখা কী রকম কান্না-কাটি করছে দেখ, তুমি ওকে একটু বুঝিয়ে বলো। মুখে কিছু দিচ্ছে না, এক ঢোক জল পর্যন্ত পেটে যায়নি। একে নিয়ে আমি কী করে বলো তো?

তারপর বিশাখার দিকে চেয়ে বললেন—ও বউমা, বউমা, এই দ্যাখ কে এসেছে, চোখ মেলে দ্যাখ একবার। ও বউমা—

এতক্ষণে বিশাখা সন্দীপের দিকে চোখ তুলে চাইলো। সন্দীপের মনে হলো, এই ক'দিনের মধ্যেই বিশাখার শরীরটা যেন আধখানা হয়ে গেছে। আর চোখ দুটো যেন জবা-ফুলের মতো লাল আর সে-চোখে রাগ, ঘেন্না, ভয়, বিদ্রোহ, সব কিছু একাকার হয়ে হঠাৎ আগ্নেয়গিরির মতো যেন একসঙ্গে ফেটে পড়লো সন্দীপের ওপর। চিৎকার করে বিশাখা বলে উঠলো—কেন এসেছ তুমি? কী দেখতে এসেছ?

ঠাকমা-মণি কথার মাঝখানে বলে উঠলেন—ও কী বউমা, তুমি কাকে কী বলছো? ও যে সন্দীপ! আমি যে ওকে ডেকে পাঠিয়েছি...

বিশাখা বলে উঠলো—না, ও আসবে না। এ-বাড়িতে আসবে না ও। কেন ওকে ডেকে পাঠালেন? আমি বলছি ও এ-বাড়িতে আসবে না—

তারপর উঠে বসে বলতে লাগলো—যাও, এ-বাড়ি থেকে চলে যাও, তোমার লজ্জা করলো না এ-বাড়িতে আসতে? বেরিয়ে যাও বলছি, যাও বেরিয়ে...

ঠাকমা-মণি আবার বললেন—ওকে চলে যেতে বলছো কেন? আমি নিজে ওকে ডেকে পাঠিয়েছি, ও যাবে না!

—হ্যাঁ যাবে, আমি এ-বাড়ির বউ, আমারও এ-বাড়ির ওপর একটা অধিকার আছে। আমি বলছি ও চলে যাবে...এখনও তুমি দাঁড়িয়ে আছো? যাও, বেরিয়ে যাও...

সন্দীপ যেন তখন পাথর হয়ে গেছে, পাথরের মতো নিষ্প্রাণ হয়ে সে সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই একদৃষ্টে বিশাখাকে দেখতে লাগলো। আর বিশাখা তখন উত্তেজনায় কান্নায় আবেগে অস্থির হয়ে একেবারে ভেঙে পড়লো। তারপর বালিশে মুখ গুঁজে হাউ-হাউ করে কেঁদে বিছানা-বালিশ সব কিছু ভাসিয়ে দিতে লাগলো...
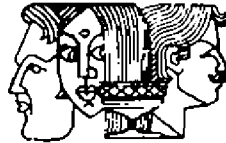
গাছের আসল প্রাণশক্তিটা আসে তার বাইরের আলো, হাওয়া বা রোদ থেকে নয়, সেটা আসে তার মূল থেকে, শেকড় থেকে। সেই শেকড়টা কেটে দিলেই গাছ তার প্রাণ হারায়।

তেমনি মানুষের পৃথিবীতেও মানুষের প্রাণশক্তি মানুষের সমাজের মধ্যেই জড়িয়ে থাকে। সেই সমাজটাকে যদি কোনও মানুষ অস্বীকার করে বাঁচতে চেষ্টা করে তো তার প্রাণশক্তিটাও সে হারিয়ে ফেলে। তার ফলে দুটো হাত, দুটো পা, দুটো চোখ থাকলেও মানুষের পদবাচ্য বলে কেউ তাকে গণ্য করে না।

এদের সংখ্যাই মনে হয় সংসারে বেশি। অথচ তারাই নিজেদের মানুষ বলে প্রচার

করে। তাদের অত্যাচার থেকে বাঁচবার জন্যে মানুষের এত আইন-কানুন, এত নিষেধ-বিধি, এত শঙ্কা, এত অনুশাসন।

সন্দীপ যখন একলা থাকতো, যখন নিজের মধ্যে সে একেবারে একলা হয়ে যেত, তখন ভাবতো—কেন সে সকলের কথা ভাবে? যারা কাছের লোক তারাই শুধু নয়, যারা দূরের লোক তাদের ভালো-মন্দের সঙ্গে তার কিসের যোগাযোগ? কেন সে তাদের কথা ভাবে? সেই কবে এক ক্লাশে একসঙ্গে পড়তো তারক্ ঘোষ, তার কথাও মনে পড়তো। মনে হতো কেন তাকে অমন নিষ্ঠুরভাবে নিজের রক্ত বিক্রি করে করে মরে যেতে হলো? কেন তার উপর অতো অত্যাচার করতো গোপাল হাজরা? তার কথা মনে পড়তেই চোখের সামনে ভেসে উঠতো মল্লিক-কাকার মুখটা। মল্লিক-কাকা তাকে সাহায্য না করলে তো তার সঙ্গে বিশাখার পরিচয়ও হতো না। আর বিশাখার সঙ্গে তার পরিচয় না হলে তো এই পৃথিবীটাকেও সে এমন করে চিনতে পারতো না। এই পৃথিবী আর এই পৃথিবীটার ভালো-মন্দ-সুন্দর-কুৎসিত সব রকম মানুষ গুলোর সঙ্গেও তার পরিচয় এমন করে ঘনিষ্ঠ হতো না।

মনে আছে চ্যাটার্জিবাবু বেড়াতে বেড়াতে সন্দীপদের বাড়িতে এসে হাজির হয়েছিলেন। সন্দীপ চ্যাটার্জিবাবুকে দেখে হতবাক হয়ে গিয়েছিল। কারণ তাঁকে তো সন্দীপ কোনও দিন তাদের বাড়িতে আসতে দেখেনি। বললে-আপনি?

তখন কোথায় যে সন্দীপ বসাবে, কেমন করে খাতির-অভ্যর্থনা করবে, তাই ভেবেই বিব্রত হয়ে পড়েছিল। কিছু ব্যবস্থা করবার আগেই চ্যাটার্জিবাবু সন্দীপের বিছানার ওপরেই বসে পড়েছিলেন। বসে বললেন—তুমি নাকি কুড়ি হাজার টাকাটা ফেরৎ দিয়ে দিয়েছ, বাড়িতে শুনলাম—

ইতিমধ্যে খবর পেয়ে মা-ও ঘরে এসে চ্যাটার্জিবাবুর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে। বললেন, থাক্ থাক্ বামুনদি, আমি সন্দীপের সঙ্গে একটু কথা বলতে এসেছি। অন্য দিন তো ওর অফিসে খোলা থাকে, আজকে ওর অফিস নেই, তাই ভোরবেলাই এলাম।

মা খানিক পরেই ভেতরে চলে গেল। চ্যাটার্জিবাবু সন্দীপকে বললেন—তুমি বোস, তোমার সঙ্গেই কথা আছে। তুমি যে কুড়ি হাজার টাকা ফেরৎ দিলে, তাতে তোমার অসুবিধে হবে না?

সন্দীপ বললে—অসুবিধে হলেও ওটা তো বাড়ি-বন্ধকীর দেনা। আমি কারো কাছে দেনা রেখে মরতে চাই না।

—তাহলে এই নাও তোমার বন্ধকীর তমসুকটা। ওটা তোমাকে ফেরৎ দিয়ে দিচ্ছি।

সন্দীপ কাগজটা নিজের হাতে নিলে। নিয়ে চুপ করে রইলো। চ্যাটার্জিবাবু বললেন—ওই টাকাটা যে বাড়ি-বাঁধা রেখে তুমি তোমার মাসিমার চিকিৎসার জন্যে নিয়েছিলে, সে-চিকিৎসার খরচ এখন কোথা থেকে পাচ্ছো? তোমার মাসিমার চিকিৎসা তো এখনও শুনলাম হচ্ছে, কিন্তু খরচের টাকা এখন কোথা থেকে আসছে?

সন্দীপ বললে—আপনি তো জানেন বিশাখার বিয়ের দিনের দুর্ঘটনার কথা। আপনার সেসব কথা নিশ্চয়ই মনে আছে। সেদিন বিডন স্ট্রীটের সেই পরলোকে মল্লিক-কাকা ক্ষতি-পূরণ হিসেবে আমাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে গিয়েছিলেন। সেই পঞ্চাশ হাজার টাকা থেকে আপনার কুড়ি হাজার টাকা ফেরৎ দিয়েছি। বাকি রইলো তিরিশ হাজার টাকা।

—কিন্তু তিরিশ হাজার টাকায় কি ক্যানসারের মতো ভারী রোগের চিকিৎসা হবে?

সন্দীপ বললে—তার সঙ্গে তো আমার চাকরির মাইনের টাকাও আছে। মাইনের শেষ কপর্দকটি পর্যন্ত আমি সেই চিকিৎসার জন্যে খরচ করবো।

—যদি তাতেও না কুলোয়?

—যদি না কুলোয় তো আবার এই বাড়িটা বন্ধক রাখবো, কিংবা বিক্রি করে দেব!

চ্যাটার্জিবাবু জিজ্ঞেস করলেন—বাড়ি বেচে দিলে থাকবে কোথায়?

সন্দীপ বললে—যাদের বাড়ি নেই তারা যেখানে থাকে, আমি মা'কে নিয়ে সেখানেই

থাকবো।

চ্যাটার্জিবাবু বললেন—তোমার কথাটা বলতে ভালো, শুনতেও ভালো, কিন্তু কাজে করাটা অতো সোজা নয়—

সন্দীপ এ-কথার কোন জবাব দিলে না।

চ্যাটার্জিবাবু একটু চুপ করে থেকে বললেন—তুমি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম তো শুনেছ।

সন্দীপ বললে—তাঁর নাম কে না শুনেছে—

—তিনি যা মুখে বলতেন, তা কাজেও করতেন, তা জানো? সংসারে একদল লোক থাকে যারা সারাজীবন পরের উপকার করেই যাবে, আর তার প্রতিদানে পররা তাদের ক্ষতিই করে যাবে। তুমি যে মানুষের এত উপকার করে যাচ্ছো, তাতে কি আশা করো তারা তোমার ওপর কৃতজ্ঞ থাকবে?

সন্দীপ বললে—ফলের আশা করে যারা কাজ করে তারা তো মানুষ নয়, ব্যবসাদার। আমি ব্যবসাদার হতে চাই না, আমি মানুষ হতে চাই—

এ-কথা শোনার পর চ্যাটার্জিবাবু আর বসলেন না। উঠে দাঁড়ালেন। বললেন—মনে রেখো, পৃথিবীতে ভালো লোকরাই সবচেয়ে বেশি কষ্ট পায়। কারণ the world does not tolerate absolute truth.

কথাগুলো বলে আর দাঁড়ালেন না। ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরে নিজের বাড়ির দিকে চলে গেলেন। সন্দীপ তাঁর দিকে একদৃষ্টে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলো। তারপর হঠাৎ নজরে পড়লো তার হাতের বন্ধকী-তমসুকখানার দিকে। সঙ্গে সঙ্গে সে সেটাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে বাইরের রাস্তায় ফেলে দিয়ে যেন মনের সমস্ত যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়ে গেল।
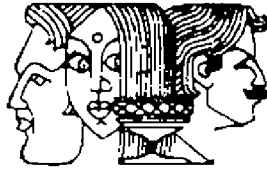
বিডন স্ট্রীটের মুখার্জিদের বাড়ির ভেতরে তখন কয়েক দিন ধরে অন্য নাটক চলছে। সত্যিই, নাটকই বটে। সন্দীপের সমস্ত জীবনটা যেন একটা নাটকের মতো প্রথম অংক থেকে শেষ অঙ্কে এসে যবনিকা পতনে সমাপ্ত হয়েছে।

হ্যাঁ, যবনিকাই তো আজ পড়তে চলেছে তার জীবন-নাটকে। এত দিন পরে সেই কথাগুলো আবার যেন নতুন করে তার চোখের সামনে ভেসে উঠলো! মুক্তিপদ মুখার্জি সে-কালের শিল্পপতিদের শেষ বংশধর। তিনি জন্মিয়েই দেখেছেন যে, তিনি টাকার পাহাড়ের ওপরে হেঁটে বেড়াচ্ছেন। সে এত টাকা যে অধস্তন সাত পুরুষ পর্যন্ত খেয়ে উড়িয়ে দিলেও তা ফুরোবে না। এত টাকার মালিক হবার জন্যে তাঁকে কোনও পরিশ্রম করতে হয়নি, তাঁকে কারো পায়ে তেল-মালিশ করতে হয়নি, কলেজের অন্য সহপাঠীদের মতো চাকরির জন্যে কারো উমেদারি করতে হয়নি। ক্লাশের ছেলেরা তাঁকে সে-জন্যে হিংসেই করেছে বরাবর। কিন্তু এখন?

মুক্তিপদ শুনেছিলেন 'লর্ড মাউন্টব্যাটেন' নামে একজন বড়লাট নাকি ইণ্ডিয়াকে স্বাধীন করে দিয়েছিলেন ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট তারিখে। মুক্তিপদ মুখার্জিদের কাছে সে-খবর ইতিহাস। কারণ আজকের দিনের খবরের কাগজের প্রথম পাতায় যা হেড লাইন, কালকে তা ইতিহাস। সেই সময়ে নাকি এই কলকাতা শহরে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গায় রক্তের বন্যা বয়ে গিয়েছিল। সেসব বইতে পড়া খবর। যদি তিনি তা দেখেও থাকেন তা মনে নেই। ইংরেজরা চলে যাওয়ার পর থেকে তিনি এই শহরকে দেখে আসছেন, কিন্তু যতোই

দেখেছেন ততোই কেবল মনে হয়েছে ইংরেজরা চলে গিয়ে ভালো হয়েছে, না খারাপ হয়েছে? এ-প্রশ্ন তিনি নিজেকেও করেছেন, অন্যদেরও এ-প্রশ্ন করেছেন। কিন্তু কেউ এর কোনও সদুত্তর দিতে পারেনি আজ পর্যন্ত!

পৈতৃক কারবার 'স্যাক্সবি মুখার্জি' কোম্পানিতে তিনি যখন ঢুকেছেন তখন অনেক কম বয়েস তাঁর। বাবা মারা গিয়েছিলেন তাঁর পঁয়তাল্লিশ বছর বয়েসে। দাদা মারা গেছে পঁচিশ বছর বয়েসে। তাঁর জন্মের পর থেকেই বোধহয় ইন্ডিয়া জাহান্নমে গেল! দমদম এয়ার-পোর্টে বসে মাইক্রোফোনে ঘোষণা শুনলেন প্লেন ছাড়তে ছ'ঘণ্টা লেট হবে। তা হলে এতক্ষণ কী করবেন তিনি?

পিক্‌নিকও কথাটা শুনেছিল। সেও শুনে চমকে উঠলো। বললে—ছ'ঘণ্টা লেট মানে কি সেই বিকেল পাঁচটায় প্লেন ছাড়বে? তাহলে লাঞ্চের কী হবে?

মুক্তিপদ বললেন—চল্ শ্যামবাজারের কোনও হোটেলে গিয়ে লাঞ্চ খেয়ে আসা যাক—

গাড়িটা ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। এতক্ষণে সে বোধহয় বিডন স্ট্রীটে পৌঁছে গেছে। বাইরে গেলেই ট্যাক্সি পাওয়া যাবে। পিকনিককে নিয়ে তিনি এয়ার-পোর্টের বাইরে বেরোলেন। ট্যাক্সিতে উঠে বললেন—শ্যামবাজার—

ট্যাক্সি ফাঁকা রাস্তা পেয়ে হু-হু করে আবার ফিরে চললো শ্যামবাজারের দিকে। একটু আগেই এই রাস্তা দিয়ে তিনি এয়ার-পোর্টে এসেছিলেন। আগে এ-সব দিকে তো বাড়ি-ঘর হয়নি। লোকজন এদিকে অতো আসতোও না। বাবা-মার সঙ্গে অনেক-বার এই রাস্তা দিয়ে এসে এয়ার-পোর্টে পৌঁছেছেন বিলেত যাওয়ার জন্যে। কখনও গেছেন ইংল্যান্ডে। সেখান থেকে গেছেন ইয়োরোপের আরো অনেক জায়গায়। 'স্যাক্সবি মুখার্জি' কোম্পানীর তখন গোড়াপত্তনের যুগ। কোম্পানির বিদেশী মালিকেরা তখন তাদের কতো খাতির করতো। সেখানে গেলে তারা তাদের কতো পার্টি দিত। তখন খুব কম বয়েস তাঁর। স্কুলের বন্ধু-বান্ধবরা কতো হিংসে করতো মুক্তিপদকে। তাঁরও গর্ব হতো মনে মনে।

হঠাৎ পিক্‌নিক বাবার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলে—তুমি কলকাতা ছেড়ে ইন্দোরে চলে গেলে কেন?

মুক্তিপদ বললেন—কেন, তোর ইন্দোর জায়গাটা ভালো লাগে না?

পিক্‌নিক বললে—না—

—কেন রে? ভালো লাগে না কেন?

পিক্‌নিক বললে—ইন্দোরের লাইফ বড়ো স্লো!

—স্লো-লাইফই তো ভালো রে।

পিক্‌নিক বললে—আমার স্লো-লাইফ ভালো লাগে না। আমার ফ্রেন্ডরাও আমাকে বলে—তুই ইন্দোরে চলে গেলি কেন? কলকাতার লাইফ কতো ফাস্ট বল তো। এখানে দেখতে দেখতে কোথা দিয়ে সময় কেটে যায়, তা বোঝাই যায় না। আর ইন্দোরে যেন দিন কাটতেই চায় না—

মুক্তিপদ বললেন—আর একটু বয়েস হোক তোর, তখন বুঝবি স্লো-লাইফ হেলথের পক্ষে কতো ভালো। লাইফ যতো ফাস্ট হবে, মৃত্যুও ততো কাছে এগিয়ে আসবে। তাই কলকাতার লোকেরা এত তাড়াতাড়ি মারা যায়। আমার বাবা মারা গিয়েছিলেন পঁয়তাল্লিশ বছর বয়েসে, আমার দাদা মারা গিয়েছিলেন পঁচিশ বছর বয়েসে। ইন্দোরে থাকলে তাঁরা আরো অনেক দিন বাঁচতেন!

পিক্‌নিক বললে—রাবিশ! লাইফ যদি এনজয় না করতে পারলুম তো বেশি দিন বেঁচে থেকে লাভ কী?

মুক্তিপদ বললেন—হুইস্কি আর কক্‌টেল পার্টি না হলে কি জীবনে আনন্দ পাওয়া যায় না?

পিক্‌নিক বললে—ওটা তোমার মিড্‌ল্-ক্লাশ মেন্টালিটি বাবা—

মুক্তিপদ বললেন—ওরে, তোর মতো বয়েসে আমিও তাই ভাবতুম। ও ধারণাটা তখনকার দিনের ইংরেজদের কাছ থেকে এসেছে। ইউরোপের লোকেরা বলে তারা হলো সুখবাদী আর ইন্ডিয়ানরা হলো দুঃখবাদী। গৌতম বুদ্ধ, মহাবীর, চৈতন্যদেব, তাঁরা সবাই সংসার ত্যাগ করে মোক্ষ পেতে চেয়েছিলেন বলে ইউরোপের লোকেরা ওই কথা রটিয়েছে। কিন্তু আসলে ইন্ডিয়ানরা হলো আনন্দবাদী—

পিক্‌নিক জিজ্ঞেস করলে—আনন্দবাদী? তার মানে?

—মানে মহাবীর, বুদ্ধ, চৈতন্যদেব যে সংসার ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন, তা দুঃখের সন্ধানেও নয়, কিংবা সুখের সন্ধানেও নয়, আনন্দের সন্ধানে। সেই আনন্দের সন্ধান যখন তাঁরা পেলেন, তখন বললেন—ওরে মন, এবার আমি আমার আসল ঘর পেয়ে গিয়েছি, তুই এখন দূর হয়ে যা—

ততক্ষণে ট্যাক্সিটা শ্যামবাজারের একটা হোটেলের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। নাম-করা হোটেল। ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে মুক্তিপদ পিক্‌নিককে নিয়ে একটা নিরিবিলি ঘেরা কেবিনের মধ্যে বসলেন। তারপর খাবারের অর্ডারও দিলেন।

খাবার আসতে দেরি হলো না। তখন হোটেল মানুষের ভিড়ে ভর্তি। এই সময়-টুকুর মধ্যে বিডন স্ট্রীটে গিয়ে খেয়ে এলেও চলতো, সে সময়ও হাতে ছিল। কিন্তু সেখানে গেলে মা-মণির সেই একই অভিযোগ, সেই একই কমপ্লেন শুনতে শুনতে তাঁকে বিব্রত হতে হতো। তার চেয়ে এই-ই ভালো। এই নিরিবিলিতে বসে পিক্‌নিককে একটু সঙ্গ দেওয়া। যে-মেয়ে মায়ের সঙ্গ পায় না, বাপের সঙ্গ পায় না, সে তো বিগড়ে যাবেই। সম্ভব হলে মুক্তিপদ স্ত্রী আর মেয়েকে তো সঙ্গ দিতে পারতেন। কিন্তু তাঁর সময় কোথায়? ফ্যাক্টরির চিন্তাতে তো তিনি দিন-রাত ব্যস্ত থাকেন। বাড়ির কথা যে তিনি ভাববেন তার সময় কোথায় তাঁর।

নন্দিতা বলে—তুমি কী ভাবছিলে?

মুক্তিপদ বলেন—আমি অন্যমনস্ক ছিলুম।

আশ্চর্য! নন্দিতাও কথাটা শুনে আশ্চর্য হয়ে যায়, মুক্তিপদ নিজেও আশ্চর্য নিজেও হয়ে যান।

বলেন—জানো, কালকে ফ্যাক্টরির একটা বয়লার ফেটে গেছে, সেটা আজ সকালে মেরামত হয়ে যাবার কথা। আমার মনটা ছিল সেই দিকে—

নন্দিতা বলে—তুমি যদি সমস্তক্ষণ তা-ই ভাববে, তাহলে বাড়িতে আসো কেন? শুধু ঘুমোতে? তুমি তো ফ্যাক্টরিতেই ঘুমোতে পারো। সেখানে তোমার এয়ার-কন্ডিশনড ঘর আছে, সব রকমের আরামের ব্যবস্থা আছে। বাড়িতে আসো কেন?

মুক্তিপদ বলেন—একটু মুক্তি আর শান্তি পাওয়ার জন্যেই তো বাড়িতে আসি। তা ছাড়া আর কী!

নন্দিতা বলে—দিন দিন তুমি মেশিন হয়ে যাচ্ছো—

মুক্তিপদ বলেন—বাড়িতে আসবো কী করতে? বাড়িতে তুমিও থাকো না, পিক্‌নিকও থাকে না। তাহলে বাড়িতে এসে আমি একা কী করবো?

নন্দিতা বলে—তুমি বাড়িতে থাকো না বলেই তো ক্লাবে যাই, 'বিউটি পারলারে' যাই।

—আর পিক্‌নিক?

—তুমিও বাড়িতে থাকো না, আমিও বাড়িতে থাকি না। সুতরাং একা পিক্‌নিক বাড়িতে কী করতে থাকবে? সেও বেরিয়ে যায়।

এই হচ্ছে ইন্দোরে মুক্তিপদ মুখার্জির জীবন-যাপন। ঠিক এই সময়ে একদিন পিক্‌নিক হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। একদিন গেল, দু'দিন গেল, তিন দিন গেল, তার পাত্তা পাওয়া গেলো না। তখন চারদিকে তোলপাড় শুরু হলো পিক্‌নিককে খুঁজে বার করার জন্যে।

—এই পিক্‌নিক, তুই?

পিক্‌নিক বলে উঠলো—ডোণ্ট টক্ ননসেন্স! বাজে কথা বোল না। এখন থেকে 'ফিউচার' ভেবে ভেবে আমি 'বর্তমান'কে নষ্ট করবো বলতে চাও? আমি তেমন ইডিয়ট নই—

মুক্তিপদ বললেন—ফিউচারের কথা ভাবাটা কি বোকামি?

—নিশ্চয়। ফিউচারের কথা ভেবে ভেবে যে বর্তমানটা নষ্ট করে, সে ইডিয়ট ছাড়া আর কী?

মুক্তিপদ মেয়ের এই কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। আজকালকার ছেলে-মেয়েরা কি তা'হলে কেবল বর্তমান নিয়েই ব্যতিব্যস্ত। তারা কি তাহলে ভবিষ্যতের কথা ভাবেও না?

মুক্তিপদ গাড়িতে যেতে যেতে চুপ করে রঞ্জিত সরকারের কথাগুলোই কেবল ভাবতে লাগলেন। তাহলে কেন তিনি ফ্যাক্টরি চালাবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করে চলেছেন? শুধু খেয়ে-পরে সচ্ছলভাবে বেঁচে থাকার জন্যে? আর কিছুর জন্যে নয়? দেশের কথা থাক, শুধু নিজের বংশধরদের কথা চিন্তা করেই কি তিনি এত পরিশ্রম করে চলেছেন? এত অশান্তি, এত উদ্বেগ, এত নিষ্ঠা কি শুধু স্বার্থসিদ্ধির জন্যে?

কিন্তু এ থেকে তিনি মুক্তি পাবেন কী করে? তাঁর মৃত্যুর পরে কে তাঁর ফ্যাক্টরি চালাবে? কে সেটার দেখা-শোনা করবে?

ফ্যাক্টরির জন্যে তিনি অনেক দিন অনেক রাত ভেবে অস্থির হয়েছেন। ভেবেছেন, তাঁর ফ্যাক্টরি বাঁচলেই তিনি বাঁচবেন। ফ্যাক্টরি টি'কে থাকলেই তিনি বা তাঁর ফ্যামিলিও টি'কে থাকবে। প্রত্যেক বছর যখন যখন তাঁর ফার্মের 'অডিট্' হয়, যখন ব্যালেন্স শীট্ তৈরি হয়, তখন সে-ক'দিন তাঁর ঘুম থাকে না, মেজাজ ঠিক থাকে না। সে-ক'দিন তিনি আর মানুষ থাকেন না, একেবারে মেশিন হয়ে যান। তখন তাঁর স্ত্রীও আর তাঁর থাকেন না, তাঁর মেয়েও তখন আর তাঁর মেয়ে থাকে না।

তিনি পাশের দিকে চেয়ে দেখলেন। পিক্‌নিক একদৃষ্টে বাইরের দিকে চেয়ে আছে। কিন্তু তিনি বুঝতে পারলেন কলকাতা ছেড়ে চলে যেতে তার কষ্ট হচ্ছে। জিজ্ঞেস করলেন—কীরে, কলকাতা ছেড়ে চলে যেতে কষ্ট হচ্ছে?

পিক্‌নিক বললে—কষ্ট হবে না?

মুক্তিপদ বললেন—কীসের জন্যে তোর কষ্ট হবে? এখানে কী আছে? এখানে তো কেবল শব্দ আর ধোঁওয়া, কেবল প্রোসেসন আর ভিড়। এখানে এই অ্যাটমোসফেয়ারে কি মানুষ বাঁচতে পারে?

পিক্‌নিক বললে—বাঁচবার দরকার কী?

—তার মানে?

—বেশিদিন বেঁচে থেকে লাভ কী? যে-ক'দিন বাঁচবো, ভোগ করে বাঁচবো, সেইটেই তো ভালো। নইলে আশী বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকবো অথচ ভোগ করবার ক্ষমতা থাকবে না, সেটাকে কি বাঁচা বলে?

মুক্তিপদ এ-কথায় কোনও মন্তব্য না করে। বললেন—এ-সব কথা তোকে শিখিয়েছে কারা?

পিক্‌নিক বললে—কে আবার শেখাবে? এ জিনিস জানতে গেলে তো কোনও বই পড়ে শিখতে হয় না। চারদিকে যা দেখছি তা থেকেই শিখছি। বুড়োরা বেঁচে আছে কিসের জন্যে? তারা তো মরে গেলেই পারে! কেন ভিড় বাড়াচ্ছে?

কথাগুলি শুনে মুক্তিপদ আরো অবাক হয়ে গেলেন। পিক্‌নিক আবার বলতে লাগলো—এই দেখ না, যেখানেই যাবো একটু ফুর্তি করতে, সেখানেই বুড়োদের ভিড়। রাস্তায় একটু যে আরাম করে হাঁটবো, তারও উপায় নেই। সেখানেও দেখি লাঠি হাতে নিয়ে বুড়োরা খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলেছে। এত যে 'পপুলেশন এক্সপ্লোসন' নিয়ে রব উঠেছে, এর জন্যে কারা দায়ী?

মুক্তিপদ এবার কিছুই বললেন না। বুঝতে পারলেন তাঁর চরম সর্বনাশ ঘটে গিয়েছে তাঁর নিজের বাড়িতেই। পিক্‌নিককে দোষ দিয়ে লাভ কী? দোষ আর কারো নয়, দোষ তাঁর নিজেরই—

ট্যাক্সিটা এয়ার-পোর্টে এসে থামলো, তিনি ভাড়াটা মিটিয়ে দিয়ে মেয়েকে নিয়ে ভেতরে ঢুকলেন। তিনি যদি এয়ারপোর্টেই লাঞ্চ খেয়ে নিতেন তাহলে আর এ-যুগের ছেলে-মেয়েদের ভেতরকার মনোভাবটা জানতে পারতেন না। নিজের বাড়ির ভেতরে যে-সর্বনাশটা হয়ে গিয়েছে তাও টের পেতেন না তিনি।

বারের-এ বিডন স্ট্রীটের বাড়িতে তখন যেন শোকের নিস্তব্ধতা নেমে এসেছে। মুক্তিপদ যে-ক'দিন বাড়িতে ছিল ততোদিন তবু যেন একটু প্রাণের সঞ্চার ছিল। তবু একটু কথা বলে শান্তি পেতেন ঠাকমা-মণি। কিন্তু তারপর?

তখনও ঠাকমা-মণি সেদিনকার কথা যেন ভুলতে পারছিলেন না। সেই রাতটার কথা। সেই ১৩ই ফাল্গুনের সৌম্যের বিয়ের রাতটার কথা। একটুর জন্যে তিনি বেঁচে গেছেন। আর একটু দেরি হলেই তাঁর জীবনে চরম সর্বনাশ নেমে আসতো। সৌম্য চিরকালের মতো তাঁর কাছ থেকে হারিয়ে যেত।

বিয়ের পর গাড়িতে এক-মিনিটের জন্যে ঠাকমা-মণির সঙ্গে দেখা হয়েছিল সৌম্যর। তখন সৌম্য পাথরের মতো নীরব নিশ্চল। ঠাকমা-মণিকে দেখেও সে কিছু কথা বললে না। ঠাকমা-মণির মুখ দিয়েও কোনও কথা তখন বেরোচ্ছে না। কোন রকমে ঠাকমা-মণি নিজের চোখের জল আটকে রেখেছিলেন। জিজ্ঞেস করেছিলেন—কীরে কেমন আছিস?

সৌম্য সে-কথার কোনও জবাব দেয়নি। শুধু একদৃষ্টে ঠাকমা-মণির দিকে অপলক দেখেছিল।

—ভালো আছিস তো?

ঠাকমা-মণির চোখ দুটো তখন কান্নায় ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল। আর কিছু শব্দ তাঁর মুখ দিয়ে বেরোবার আগেই আটজন পুলিশ সৌম্যকে গাড়িতে তুলে নিয়ে হু হু করে চলে গেল।

তখন মাঝ-রাত্তির। ঠাকমা-মণির গাড়িতে তখন নতুন-নাত বউ। সমস্ত মুখটা বেনারসী শাড়ির ঘোমটায় ঢাকা। তার মুখেও কোনও কথা নেই। সে এখন কাঁদছে কি ভাবছে, তা বোঝারও উপায় নেই।

সামনে চলেছে পুলিশের গাড়িটা। তাতে সৌম্য আছে আর আছে আটজন রাইফেল-ধারী পুলিশ। বেড়াপোতা ছাড়িয়ে গাড়িটা তীরবেগে চলেছে কলকাতার দিকে, আর তার ঠিক পেছনে পেছনে চলেছে ঠাকমা-মণির গাড়িটা। সে-গাড়িটাতে আছেন তিনি নিজে আর মল্লিক-মশাই। আর আছে নাপিত কানাই আর বাড়ির পুরুতমশাই। আর ঠাকমা-মণির পাশে আছে বিশাখা।

কারোর মুখেই তখন কোনও কথা নেই। মাইলের পর মাইল গাড়িটা রুদ্ধশ্বাসে চলেছে দুটো গাড়িরই লক্ষ্য কলকাতা। কলকাতা তাদের সকলেরই রক্ষকও যেমন, তেমনি ভক্ষকও বটে। পাপ করতে গেলেও তাই সকলকে যেমন কলকাতাতে আসতে হয়, পুণ্য করতে গেলেও তেমনি সকলকে আসতে হয় এই কলকাতাতেই। কতো অত্যাচার, কতো অনাচার, কতো ভালোবাসা, কতো ত্যাগ, কতো বিশ্বাসঘাতকতা, কতো হিংসা, কতো নিষ্ঠা, কতো খুন, কতো অকৃতজ্ঞতা, কতো শোষণ হজম করে কলকাতা নীলকণ্ঠ হয়ে এখনও বেঁচে

—আরে রজত? তুই কোত্থেকে?

রজত বললে—তুই তো ইন্দোরে চলে গিয়েছিলি! কবে এলি?

পিক্‌নিক নিজের জায়গা ছেড়ে তখন কেবিনের বাইরে চলে গিয়েছে। বললে—অনেক দিন হলো এসেছি, আজকেই ইন্দোরে চলে যাচ্ছি—

—কখন? ক'টার সময়?

পিক্‌নিক বললে—এই তো এখনই এয়ার-পোর্টে যাবো, পাঁচটায় প্লেন ছাড়ার কথা।

রজত জিজ্ঞেস করলে—কেবিনের ভেতরে কে রয়েছে রে?

—আমার ড্যাডি—

মুক্তিপদ পর্দার ফাঁক দিয়ে ছেলেটার দিকে চেয়ে দেখলেন। ওরই সঙ্গে পিক্‌নিক একসঙ্গে পড়েছে। এরাই পিক্‌নিকের বন্ধু?

মুক্তিপদ দেখলেন ছেলেটার ঠোঁটে একটা সিগারেট আটকে আছে। পকেট থেকে একটা সিগারেটের প্যাকেট বার করে পিক্‌নিকের দিকে এগিয়ে দিলে ছেলেটা বললে—খা—

পিক্‌নিক বললে—না রে, এখন চলবে না রে, ভেতরে ড্যাডি রয়েছে—

—তাতে কী হয়েছে? সিগারেটে একটা টান দিয়ে ফেলে দে না তুই, তাতেই হবে!

পিক্‌নিক বললে—না না, সেটা ঠিক হবে না। ড্যাডি আমার মুখে গন্ধ পাবে!

তারপরে কী যেন মনে করে পিক্‌নিক বললে—চল্‌, তোর সঙ্গে ড্যাডির আলাপ করিয়ে দিই—

—চল্‌—

বলে ছেলেটা মুখের জ্বলন্ত সিগারেটটা মেঝের ওপর ফেলে জুতো দিয়ে মাড়িয়ে নিভিয়ে দিলে। তারপর পিক্‌নিকের পেছনে-পেছনে সোজা কেবিনের ভেতরে এসে দাঁড়ালো।

—বাবা, এই হচ্ছে আমার ক্লাশ ফ্রেন্ড রজত সরকার, আমার সেন্ট-জেভিয়ার্স কলেজে এক ক্লাশে পড়েছি—

সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটা টেবিলের ভেতরে মাথা গলিয়ে মুক্তিপদের দু'পায়ের পাতায় হাত ঠেকিয়ে মাথায় ছোঁয়ালো। তার মুখে-চোখে নম্রতা আর পবিত্রতার ছাপ।

মুক্তিপদ বললেন—বোস, বোস—

ছেলেটা বসলো পিক্‌নিকের পাশের চেয়ারে।

—মুক্তিপদ বললেন—কি খাবে?

—না, আমি লাঞ্চ খেয়ে নিয়েছি।

মুক্তিপদ জিজ্ঞেস করলেন—এখন কী করছো?

পিক্‌নিকই রজতের হয়ে উত্তর দিলে। বললে—ওদের পেটোর্ন্যাল বিজনেস ইলেক-ট্রনিক গুড্‌স্‌-এর। এখন তাই দেখছে।

মুক্তিপদ বললেন—তোমার ড্যাডি আছেন?

রজত সরকার বললে—হ্যাঁ, তিনিই তো হেড অব দ্য ফ্যামেলি। আমরা দু'ভাই, আমি একজন ডিরেক্টার—আমার মা-ও একজন ডিরেক্টার।

মুক্তিপদ শুনলেন সব কথা। জিজ্ঞেস করলেন—তুমি কি বিয়ে করেছ?

পিক্‌নিক বললে—ও বিয়ে করবে কী করে? ওর তো এখনও বিয়ের বয়েসই হয়নি। ওর আর আমার বয়েস একই! ও তো আমার মোস্ট ইনটিমেট্‌ ফ্রেন্ড—

মুক্তিপদ বললেন—ঠিক আছে, আমরা এখন যাই—

বলে পিক্‌নিককে বললেন—খাওয়াটা শেষ করো—

হঠাৎ রজত জিজ্ঞেস করলে—আঙ্কেল, আপনি ক্যালকাটা ছেড়ে মধ্যপ্রদেশে চলে গেলেন কেন?

মুক্তিপদ বললেন—কেন গেলুম? কারণ এখানকার লাইফ বড়ো ফাস্ট—ইন্দোরের লাইফ এখনও স্লো আছে, কিন্তু বেশিদিন স্লো থাকবে না।

রজত বললে—ফাস্ট লাইফই তো ভালো আঙ্কেল!

—তোমাদের বয়েসে তোমরা তাই-ই ভাবছো বটে। কিন্তু একটু বয়েস হলেই বুঝবে যে লাইফ যতো ফাস্ট হবে, ততোই মানুষের অশান্তি বাড়বে। রোমান এম্পায়ার যে অতো তাড়াতাড়ি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, তার কারণও হচ্ছে তাই। অন্ততঃ হিস্টোরিয়ান কার্লাইল তাই বলে গেছেন। সেই জন্যেই তো গ্রেট ব্রিটেন আর আমেরিকার কর্তারা এখন খুব ভয় পেয়ে গেছে। এখন ওখানে ফিফ্‌টি পার্সেন্টের বেশি ডিভোর্স রেশিও চলেছে। ওখানে সব জিনিসের বিচার টাকা দিয়েই হচ্ছে, এটাই ভয়ের কথা!

—কেন কাকাবাবু। টাকা দিয়ে সব জিনিসের বিচার হলে ক্ষতি কী?

মুক্তিপদ বললেন—সে-কথার উত্তর দিতে গেলে অনেক সময় লাগবে। একটা সুইচ টিপলেই একটা আলো জ্বালানো সম্ভব, সঙ্গে সঙ্গে সব অন্ধকার দূর হয়ে যাবে, কিন্তু একটা ফুলের সুগন্ধকে দাঁড়ি-পাল্লায় ওজন করে কি বলা সম্ভব হবে গন্ধটার ওজন কত?

রজত সবটা শুনলো। কিন্তু কিছু বললে না। ততক্ষণে দু'জনেরই খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল। মুক্তিপদ হোটেলের বিল শোধ করে উঠে দাঁড়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে পিক্‌নিকও উঠে দাঁড়ালো। বললে—এই রজত, তুই একবার ইন্দোরে আয় না—রজত বললে—তোদের ঠিকানা কী?

পিক্‌নিক বললে—আমাদের ঠিকানা না জানলেও ক্ষতি নেই, শুধু আমার ড্যাডি এম. পি. মুখার্জি লিখলেই আমি চিঠি পেয়ে যাবো—

বলেই বাইরে বেরিয়েই ট্যাক্সি ধরলো। ট্যাক্সিটা ছুটতে ছুটতে চললো দমদম এয়ার-পোর্টের দিকে। এখনও হাতে অনেক সময় আছে। মুক্তিপদর মনটা তখন খুব ভারি হয়েছে। এতক্ষণ যার সঙ্গে তিনি কথা বললেন, এরাই পিক্‌নিকের বন্ধু! এদের সঙ্গে মিশেই তাঁর মেয়ে আনন্দ পায়। যে-জীবন ভোগের, সেই 'ফাস্ট' লাইফই কি ওরা চায়? ওদের কাছে কি এইটেই আদর্শ?

ট্যাক্সিতে বসে বসে মুক্তিপদ মেয়েকে জিজ্ঞেস করলেন—ওই ছেলেটা যে সব কথা বলছিল, ওগুলো কি তুইও বিশ্বাস করিস?

পিক্‌নিক বললে—শুধু কি আমি? আমরা সবাই-ই তো তাই বিশ্বাস করি!

মুক্তিপদ অবাক হয়ে গেলেন পিক্‌নিকের কথা শুনে।

পিক্‌নিক বললে—শুধু আমরা নয়, আমাদের প্রফেসাররাও তাই বিশ্বাস করে—তারা তো আর আমাদের মতো ইয়ং নয়!

মুক্তিপদ মেয়ের কথা শুনে আরো অবাক হয়ে গেলেন! তিনি মনে মনে ভাবলেন, তবে কি তিনি সত্যিই বুড়ো হয়ে গেছেন। একেই কি বলে জেনারেশন গ্যাপ। তা হলে তো তিনি ভালোই করেছেন কলকাতা ছেড়ে চলে গিয়ে, ইন্দোরে যাওয়া তো তা হলে তাঁর পক্ষে আশীর্বাদ হয়ে গেছে! তাঁর নিজের মেয়ে কিনা তার বাবার আদর্শে বিশ্বাস করে না! এ তো তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড়ো ট্র্যাজেডি। তিনি ফ্যাক্টরি নিয়ে সারাজীবন মেতে আছেন। ভেবেছেন তিনি তাঁর নিজের ডিউটি করে যাবেন, ফ্যামিলিকে দেখবার ডিউটি করে যাবে তাঁর স্ত্রী।

হঠাৎ আবার জিজ্ঞেস করলেন—হ্যাঁরে, তুই বড়ো হয়ে কী হবি?

পিক্‌নিক একটু ভেবে নিয়ে বললেন—এখনই তো আমি বড়ো বাবা।

—কোথায় বড়ো তুই? এখনও তো তুই ছোটই আছিস!

পিক্‌নিক বললে—কোথায় ছোট আমি?

—ছোট নোস্? তোর কি বিয়ে হয়েছে? তুই কি মা হয়েছিস? তোর মাথায় কি কিছু দায়িত্ব চাপিয়েছে কেউ? আমি টাকা উপার্জন করছি, আর তুই খাচ্ছিস। কিন্তু একদিন তো এমন হবে যেদিন আমি থাকবো না? সেদিন? সেদিন তুই কী করবি? কার ওপরে তুই নির্ভর করবি? কে তোকে দেখবে?

রয়েছে, এবং আরো কতো কাল বেঁচে থাকবে তার ইয়ত্তা নেই। তাই সকলেরই লক্ষ্য এই কলকাতা, তাই সকলেরই আশ্রয়দাতা এই কলকাতা।

হঠাৎ কলকাতাতে এসেই সামনের গাড়িটা বাঁ দিকে ঘুরলো। সেই দিকেই জেলখানা। সেই জেলখানাতেই সৌম্য গিয়ে উঠবে। সেই জেলখানাতেই সে তার জীবন কাটাবে।

আর তার নতুন বিয়ে করা বউ?

তার কথা তখন কেউ ভাবছে না। সৌম্যর জেল-বাসই তখন সকলের মন অধিকার করে নিয়েছে। সে-ই যেন সকলের একমাত্র লক্ষ্যস্থল। আর বিশাখা? সে যেন কেবল-মাত্র নিমিত্ত। সে তখন তার সমস্ত জীবনটা কেবল পরিক্রমা করে চলেছে। সেই মনসা-তলা লেনে জীবনের শুরু থেকে বর্তমানের কঠোর বাস্তব পর্যন্ত সমস্ত পথটা।

—নামো বউ-মা। বাড়ি এসে গেছি।

বাজাতে বাজাতে সেতারের একটা তার ছিঁড়ে গেলে যেমন হয়, এও যেন ঠিক তেমনি। একদিন এ-বাড়ির নাত-বউ হওয়ার জন্যেই সে মনে মনে তৈরি হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত তাই-ই হলো। কিন্তু সে কি এইরকম আসা? এই-ই কি বধূবরণ? তার ভাগ্যবিধাতা কি এইরকম করেই তার মায়ের মনের বাসনা পূর্ণ করলেন?

যখন ঠাকমা-মণি বিডন স্ট্রীটের বাড়িতে বিশাখাকে নিয়ে ফিরলেন তখন ঘড়িতে কটা বাজে তা দেখবার মানসিকতা ছিল না। বোধহয় মাঝ-রাত।

সেই রাত্রে হঠাৎ ইন্দোর থেকে তার মেজ শ্বশুর তাঁর মেয়েকে নিয়ে কলকাতায় এসেছিলেন। রাত্রে ঠাকমা-মণি বিশাখার পাশেই শুয়ে ছিলেন। সমস্ত রাত কেবল ঠাকমা-মণি উসখুস করেছেন আর জিজ্ঞেস করেছেন—বউমা, ঘুম আসছে না?

বিশাখা বলেছে—না—

—কেন বউমা, ঘুম আসছে না কেন? তুমি না ঘুমোলে যে আমি ঘুমোতে পারছি নে। ঘুমোতে চেষ্টা করো—

এ-কথার কোনও উত্তর দেয়নি বিশাখা। আর কি উত্তরই বা দেবে সে? কি উত্তরই বা দিতে পারতো সে তখন? তার তখন কেবল মনে হচ্ছিল—এ কেমন বিয়ে তার? এ কেমন শ্বশুরবাড়ি? বাসরশয্যা কোথায়? বউ-ভাত কোথায়? ফুলশয্যা কবে হবে? বিধাতা তাকে এ কোথায় এনে ফেললেন?

ঠাকমা-মণি তখনও বলে চলেছেন—একটু ঘুমোতে চেষ্টা করো বউমা! তুমি না ঘুমোলে যে আমিও ঘুমোতে পারছি নে—কাল যে আবার তোমাকে কোর্টে গিয়ে জজের সামনে হাজির হতে হবে—

আবার কোর্ট?

যদিও বা তার ঘুম একটু আসতো, তো কোর্টের নাম শুনে তাও উড়ে গেল। জিজ্ঞেস করেছিল—কোর্টে যেতে হবে কেন?

ঠাকমা-মণি বলেছিলেন—সেই জন্যেই তো তোমাকে আনা বউমা! জজসাহেবের সামনে তুমি সেজেগুজে সিঁথিতে সিঁদুর দিয়ে বসে বসে কাঁদিবে, তাতেই জজসাহেবের মন গলে যাবে, তাহলে আর জজসাহেব খোকাকে ফাঁসির হুকুম দেবে না—

ফাঁসির হুকুম? ফাঁসির হুকুম মানে কী? মানুষকে খুন করলেই তো খুনীদের ফাঁসির হুকুম দেয় জজসাহেবরা। তাহলে কি...

এর চেয়ে আর বেশি কিছু ভাবতে পারছিল না বিশাখা। ভাবতে গেলেই কান্নার বেগে তার বুকটা আরো ঢিপ-ঢিপ করছিল। চোখের জলে বালিশটা আরো বেশি করে ভিজে যাচ্ছিল। আর যতো কান্নার বেগ আসছিল, ঠাকমা-মণি পাশ থেকে ততো বল-ছিলেন—একটু ঘুমুতে চেষ্টা করো বউমা, একটু চেষ্টা করো ঘুমোতে—নইলে তোমার শরীর যে একেবারে ভেঙে পড়বে—

তবু ঘুম আসছিল না দেখে ঠাকমা-মণি আরো বেশি করে, আরো মিণ্টি করে সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন। বলছিলেন—তুমি এখনও কাঁদছো বউমা? তুমি ভালো করে ভেবে

দেখ কত টাকার মালিক হলে তুমি!

তাতেও বিশাখার কান্না থামে না দেখে ঠাকমা-মণি আরো বলেছিলেন—আরো ভেবে দেখ বউমা, তুমি এ-বাড়ির বউ হয়েছ বলে জীবনে কখনও তোমার খাওয়া-পরার কোনও অভাব থাকবে না! নিজের হাতে তোমায় কোনও কাজকম্মও করতে হবে না, সারাজীবন তুমি পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে শুধু হুকুম করবে, আর চাকর-বাকর-ঝি-ঝিউড়িরা তোমার সেই কাজ-কম্ম করতে পেরে ধন্য হয়ে যাবে। ভালো করে ভেবে দেখ বউমা এ-সুখ কজন বউ পায়—

মনে আছে ঠাকমা-মণি সমস্ত রাত কানের কাছে কেবল এইসব কথাই বলে চলেছিলেন। ঠাকমা-মণির এইসব কথা বিশাখার তখন কানে কিছু কিছু ঢুকছিল, আবার কিছু কিছু ঢুকছিল না। তখন তার মনে পড়ছিল কেবল মার কথা, কেবল সন্দীপের কথা। কেবল মনে পড়ছিল সেই বেড়াপোতার কথা, সেই মনসাতলা লেনের দিনগুলোর কথা, সেই বিজলীর কথা, সেই রাসেল স্ট্রীটের বাড়ির দিনগুলোর কথা, সেই শৈলর কথা ...সেই তার কাকার কথা। বেশি করে মনে পড়ছিল কেবল মা'র কষ্টের কথা।

অনেক দিন বিশাখা দেখেছেন তার মা লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদছে আর কাপড়ের আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছছে। সেই ছোটবেলায় মা'কে কাঁদতে দেখে বিশাখা খুব অবাক হয়ে যেত। বলতো—ওমা, মা, তুমি কাঁদছো কেন? তোমার কী হয়েছে?

মা তাড়াতাড়ি নিজের চোখ দুটো আঁচলে মুছে নিয়ে বকে উঠতো। বলতো—আবার তুই আমার সামনে এসেছিস মুখপুড়ী, যা, আমার সামনে থেকে চলে যা—

সেই ছোটবেলায় বিশাখা বুঝতেই পারতো না কেন তার মা অতো কাঁদে, কিসের অতো কষ্ট মা'র। বুঝতে পারতো না তার কাকীমার সঙ্গে মা'র কেন অতো ঝগড়া হয়, মা'র ওপর কাকীমা কেন অতো রাগ করে। যে মা বিশাখার ওপর রাগ করে 'মুখপুড়ী' বলে অতো গালাগালি দিত সেই মাই আবার রাত্রে বিছানায় পাশাপাশি শুয়ে কতো আদর করতো তাকে। বলতো—তোকে খুব বকেছি, না রে? কিছু মনে করিসনি। সব সময় কি মাথার ঠিক থাকে রে, মাঝে-মাঝে বড় রাগ হয়ে যায়, তাই তোকে বকি—

বলে আবার আদর করতে আরম্ভ করতো। মা বকতেও যেমন, আদর করতেও তেমনি। মা যখন বকতো তখন বিশাখা যেমন কেঁদে ফেলতো, তেমনি মা যখন আদর করতো তখন আবার গলে যেত।

তখন আবার বিশাখা মা'কে জড়িয়ে ধরে বলতো—মা, তুমি কতো ভালো, কতো ভালো মা তুমি—বিশাখা যতো মাকে জড়িয়ে ধরতো, মা'ও বিশাখাকে ততো জড়িয়ে ধরতো, কিন্তু পরের দিন মা আবার অন্য রকম হয়ে যেত। রাত্রের মা দিনের বেলা একেবারে পুরোপুরি বদলে যেত।

সেই বিডন স্ট্রীটের শ্বশুর-বাড়িতে শুয়ে শুয়ে কেবল ভাবতে লাগলো সেই সব দিনের কথা।

হঠাৎ যেন মনে হলো ঠাকমা-মণি ঘুমিয়ে পড়েছেন। খুব আস্তে তাঁর নাক-ডাকার শব্দ শোনা যাচ্ছে। বিশাখা মনে মনে তখন যেন একটু শান্তি পেলে। তখন তার হঠাৎ মনে হলো যদি সে এ-বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়? পালিয়ে গিয়ে সে যদি আবার কোনও রকমে বেড়াপোতায় গিয়ে তার মা'র কাছে গিয়ে ওঠে?

সমস্ত বাড়িটা যেন নিঃঝুম হয়ে ঘুমিয়ে আছে। কোথাও কারো এতটুকু সাড়াশব্দ নেই। খুব আস্তে আস্তে সে তার বিছানার ওপর উঠে বসলো। সত্যিই ঠাকমা-মণি তখন ঘুমে অসাড়। ঘরের দরজার সামনে বিন্দু ঝিটা শুয়ে আছে। সেও তখন ঘুমে অচৈতন্য। দরজাটা ভেজানো।

বিশাখা খুব সাবধানে বিছানা থেকে উঠে ঘরের ভেতরে দুটো পা রাখলো। ঘরের বাইরেই ঢাকা বারান্দা। এ-বাড়িতে আসবার সময়েই সে দেখে নিয়েছিল। এই-ই তার এখানে প্রথম আসা নয়। এর আগে একবার ঠাকমা-মণির সত্যনারায়ণ পুজোর সময়ে

এসেছিল।

তারপর মনে হলো কোনও রকমে যদি সে তেতলা থেকে একবার দোতলায় নেমে যেতে পারে তাহলে আর তার কোনও ভয় নেই। আর তারপরেই একতলা। সেখানেও নিশ্চয়ই সবাই ঘুমোচ্ছে। এত রাত্তিরে কে আর সাধ করে জেগে থাকবে? কার আর অতো দায় পড়েছে। কে আর তার মতো বিপদে পড়েছে? আর তার বিয়েটা?

কিন্তু সত্যিই কি তার বিয়ে হয়েছে এ-বাড়ির নাতির সঙ্গে। সৌম্যপদ মুখার্জি কি সত্যি তার স্বামী? স্বামী যদি হতো তাহলে তো সম্প্রদানের পর 'কালরাত্রি' হতো, তার 'বউভাত' হতো, 'ফুলশয্যে' হতো। 'বাসর-শয্যা'রও অনুষ্ঠান তার হতো। যা সকলের বিয়েতেই হয়ে থাকে।

তা যদি না হয় তাহলে তার বিয়েটা কি সত্যি? ১৩ই ফাল্গুনের পর ১৪ই ফাল্গুন হলো 'কালরাত্রি'। তারপর ১৫ই ফাল্গুন 'বউ-ভাত' আর 'ফুলশয্যা'। সে-সব কিছুই তো হলো না। আর হবেও না। তাহলে?

তাহলে কি চিরকাল সে এই অভিশপ্ত জীবন নিয়েই বেঁচে থাকবে? সারাজীবন নতুন লাগানো সিঁথির এই সিঁদুর, আর তার নতুন-পরা এই 'নোয়া'র গৌরব নিয়েই সে স্বামীহীন শ্বশুরবাড়িতে ব্যর্থ জীবন কাটাবে? টাকার পাহাড়ের ওপর শুয়ে তাহলে কি সে চিরকাল এই রকম নিদ্রাহীন জীবন কাটাবে? এ-রকম কেন হলো? এ-রকম দুর্ঘটনা কেন ঘটলো?

এখানে তার নিজের বলতে কেউ নেই। এখানে যারা আছে তারা তার নিজের কেউ নয়। তারা সবাই তার পর। যার সঙ্গে তার বিয়ে হলো সে-ও কেউ নয় তার। কলেজে একবার দেখা হওয়ার পর সেই লোকটা তাকে নিয়ে একদিন একটা হোটেলে গিয়ে উঠেছিল। কিন্তু সেদিনকার সেই বিশাখা তো আজকের বিশাখা নয়। সে তো ছিল অন্য বিশাখা।

আজ ঘটনাচক্রে সেই লোকটাই তার স্বামী হয়েছে, তার ভাগ্যের পরিচালক হয়েছে। এ ঘটনাটাকে সে কেমন করে স্বীকার করে নেবে? কেমন করে এ-বাড়িটাকে সে তার শ্বশুরবাড়ি বলে মাথা পেতে স্বীকার করে নেবে?

তার চেয়ে এ-বাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়াই ভালো। পালিয়ে গেলে কে আর তাকে ধরবে!

তারপরে সে যদি কোনও রকমে একবার বেড়াপোতায় গিয়ে পৌঁছতে পারে তো তখন সেখানে সন্দীপ আছে। সোজাসুজি তাকেই সে গিয়ে বিশাখাকে বাঁচাতে বলবে। তাকে বলবে—তুমি আমাকে বাঁচাও সন্দীপ, যে-কোনও রকমে তুমি আমাকে বাঁচাও—

সেটুকু উপকার কি সন্দীপ করবে না?

সন্দীপ হয়তো বলবে—আমি কী করে তোমাকে বাঁচাবো, তোমার যে সৌম্যবাবুর সঙ্গে বিয়ে হয়ে গিয়েছে—

বিশাখা বলবে—কিন্তু শুধু মাথার সিঁথিতে সিঁদুর লাগলেই কি বিয়ে হয়ে যায়? বাসর-ঘর হলো না, বউ-ভাত হলো না, ফুলশয্যা হলো না—কিছুই তো হলো না। সেগুলো না হলে কি সেটাকে বিয়ে বলা যায়?

সন্দীপ বলবে—সে তো আগে থেকেই জানতে? তাহলে যখন সম্প্রদান চলছে তখন তুমি আপত্তিও করলে না কেন?

বিশাখা বললে—আমি তো মেয়েমানুষ, তুমিও তো সেখানে হাজির ছিলে, তুমি কেন আপত্তি করলে না? তুমি কেন আমাকে জোর করে ছিনিয়ে নিলে না? পুরুষ মানুষ হয়ে তুমি যা করতে পারলে না, আমি মেয়েমানুষ হয়ে তাই করবো? তুমি এত ভীরু? তোমার কি এতটুকু অধিকার-বোধ নেই? এত কাপুরুষ তুমি?

এ-কথার উত্তরে সন্দীপ হয়তো বলবে—আমি কী করে বুঝবো যে তুমি বড়লোকের বাড়ির বউ হওয়ার চেয়ে আমার মতোন গরীব লোকের বউ হয়ে খুশী হবে?

বিশাখা এ-কথা শুনে বলবে—এই-ই কি তোমার মনের কথা? এই জন্যেই কি তোমার অসুখের সময় আমি নার্সিং-হোমে তিন দিন না খেয়ে উপোষ করে কাটিয়েছিলাম?

সন্দীপ খানিকক্ষণ চুপ করে হয়তো বলবে—আমি তোমাকে ঠিক চিনতে পারিনি বিশাখা—

—তা এখন তো চিনলে, এখন আমার জন্যে কিছু করো!

সন্দীপ হয়তো বলবে—এখন তো তোমার বিয়ে হয়ে গেছে, এখন তোমার জন্যে আমি কী করতে পারি?

বিশাখা বলবে—আমি তো তোমাকে বলেইছি যে সে বিয়েটা আমার বিয়েই নয়। হিন্দু মতে যাকে বিয়ে বলে তো পুরোপুরি আমার হয়নি। তাই সে-বিয়েটা আমার অসিদ্ধ।

সন্দীপ হয়তো এ-কথার পর আবার কিছুক্ষণ ভেবে বলবে—তুমি কি এই কথা বলতেই শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে এখানে চলে এসেছ?

—হ্যাঁ, আমি পালিয়ে এসেছি!

সন্দীপ বলবে—তুমিই বলো, আমি এখন এ-ব্যাপারে কী করতে পারি?

বিশাখা বলবে—তুমি তো এ-ব্যাপারে কোর্টে অন্ততঃ যেতে পারো।

—হ্যাঁ, কোর্টে গিয়ে আমার তরফ থেকে বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলার ব্যবস্থা করতে পারো!

—ডিভোর্সের মামলা? তুমি সৌম্যবাবুর বিরুদ্ধে বিয়েটা নাকচ করবার মামলা করতে চাও?

তিনতলা থেকে বিশাখা তখন দোতলায় নেমে এসেছে। একেবারে অচেনা বাড়ি, এর আগে সত্যনারায়ণ পুজো উপলক্ষ্যে শুধু একদিন মা'র সঙ্গে এ-বাড়িতে এসেছিল সে! মনে আছে, সেদিন সে গুনে দেখেছিল এটা তেতলা বাড়ি। দ্বিতীয়বার এসেছিল কাল রাত্রে, তখন চারিদিকে আলো জ্বলছিল। এখন অন্ধকার। শুধু উঠোনের মধ্যে টিমটিম করে একটা আলো জ্বলছে। সে-আলোতে স্পষ্ট করে কিছু দেখা যায় না। তবু অতি সাবধানে দোতলা থেকে সে একতলার দালানে এসে দাঁড়ালো।

কিন্তু এবার কোন্ দিকে সে যাবে? কোন্ দিকে গেলে সে বাড়িটার বাইরে যাওয়ার সদর-রাস্তা পাবে?

অন্ধকার হাতড়াতে হাতড়াতে বিশাখা একবার ডান দিকে যাবার চেষ্টা করলে। সেদিকে দরজা নেই। কেবল দেওয়াল। দেওয়ালের বাধা দিয়ে রাস্তা বন্ধ। তারপর বাঁ দিকে যতোদূর যাওয়া যায় ততোদূর গিয়ে বিশাখা দেখলে একটা লোহার গেট। গেটের ফাঁক দিয়ে বাইরের রাস্তার ক্ষীণ আলো ভেতরে এসে পড়েছে। কিন্তু গেটের মাঝখানে একটা তালা ঝুলছে। তালাটা পরীক্ষা করতে গিয়ে একটু শব্দ হলো। আর সঙ্গে সঙ্গে কে যেন বলে উঠলো—কে?

মনে আছে তখন সন্দীপের জীবন যে-পথে চলেছে সে-পথ কেবল নানা সমস্যায় কণ্টকাকীর্ণ। যে যে-কাজটা করে আনন্দ পায় সে ঘুরে ঘুরে সেই কাজটার মধ্যেই কেবল ডুবে থাকতে চায়। কেউ আনন্দ পায় কবিতা পড়ে, কেউ আনন্দ পায় খেলার মধ্যে, কেউ কেউ বা সঙ্গীতে, আবার কেউ বা টাকা উপায় করে।

ভাগ লোক চরম আনন্দ আস্বাস পায়। কিন্তু সন্দীপ?

শেষের কাজটার দিকেই সকলের ঝোঁক বেশি। টাকা উপায় করেই সংসারের বেশির ভাগ লোক চরম আনন্দ আস্বাস পায়। কিন্তু সন্দীপ?

কেন এ-রকম হয়েছিল তা সে জানতো না। কিন্তু তার এই সংসারের সমস্তের সঙ্গে যুক্ত থাকতেই বেশি ভালো লাগতো। নিজের ভালো-থাকাকেই সে তার চরম আনন্দ বলে মনে করতো না। মনে হতো সংসারের সকলেই ভালো থাকুক, সকলেই নিজের নিজের লক্ষ্যে পৌঁছোক। অথচ এই ইচ্ছে তো অনেক মানুষেরই ছিল। বুদ্ধ, মহাবীর, হজরত মহম্মদ, গুরু নানক, চৈতন্যদেব, যীশু খৃষ্ট—কার না সে ইচ্ছে ছিল? সবাই চেয়েছিল সমস্ত জীব-জগৎ আনন্দে থাকুক। কিন্তু...

সেদিন হাশেম বললে—আপনার শরীর খারাপ নাকি স্যার?

সন্দীপ বললে—কই না তো—

—আপনাকে কেমন শুকনো-শুকনো দেখাচ্ছে যে।

সন্দীপ বললে—ক'দিন ভালো ঘুম হচ্ছে না, তাই হয়তো অমন দেখাচ্ছে—

হাশেম বললে—তাহলে একবার ডাক্তারকে দেখান না। আপনার ঘুম না হওয়ার কারণটা কী? বাড়িতে কারো অসুখ নাকি?

সন্দীপ এ-কথার কোনও উত্তর দিলে না। হাশেম বুঝবে না। সন্দীপ যদি তার ঘুম-না-হওয়ার কারণটা মুখ ফুটে খুলেও বলে তবু হাশেম বুঝবে না। শুধু হাশেম সাহেব না, পৃথিবীর কোনও মানুষই বুঝবে না। শেষকালে সন্দীপ বললে—জানো হাশেম, আগে যখন চাকরি পাইনি, তখন ভাবতুম একটা চাকরি পেলেই বুঝি আমি সুখী হবো। তারপর একটা চাকরি পেলুম, কিন্তু তবু সুখ পেলাম না। তখন ভাবলুম চাকরিতে একটা প্রমোশন পেলেই আমি সুখী হবো। একদিন চাকরিতে প্রমোশনও পেলুম, তবু আমার সুখ হলো না। এখন মনে হচ্ছে আরো মাইনে বাড়লেই বোধহয় আমার সুখ হবে। কিন্তু আমার সন্দেহ হচ্ছে তাতেও আমার সুখ হবে না।

—কেন এরকম মনে হচ্ছে আপনার?

সন্দীপ বললে—মনে হচ্ছে এই ভেবে যে আসলে 'সুখ' বলে কোনও জিনিস পৃথিবীতে নেই। 'সুখ' কথাটা কেবল ডিক্সনারীতেই থাকার জিনিস।

হাশেম সাহেব সন্দীপের কথাটা কিছুই বুঝতে পারলে না। সে আর কিছু জিজ্ঞেসও করলে না। সন্দীপ বুঝতে পারলো যে হাশেম সাহেব কিছুই বুঝতে পারলো না। হাশেমের দোষ নেই। পৃথিবীর কোনো মানুষই তো একথা বুঝতে পারবে না। মিছিমিছি হাশেমের সঙ্গে কথা বলে সময় নষ্ট করে লাভ নেই।

এখন অফিসে পুরোদমে কাজ আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। সন্দীপ বললে—আমার কথার মানে বুঝলে তুমি হাশেম?

হাশেম সাধারণ সাংসারিক লোক। সে অকপটভাবে বললে—না—

সন্দীপ বললে—তোমার দোষ নেই হাশেম। শুধু তুমি কেন, কেউই বুঝবে না আমার কথা। তোমার অনেক কাজ পড়ে রয়েছে, তুমি কাজ করোগে যাও, পরে সময় হলে বলবো 'সুখ' কথাটা কেন কেবল ডিক্সনারীতেই থাকার জিনিস—

তারপর কাজের চাপে সন্দীপ আর চোখে কিছু দেখতে পেলে না—

বেলা দুটো পর কাজের চাপ একটু কমলো।

হঠাৎ চাপরাশি এসে বললে—হুজুর, একজন বুড়োবাবু আপনার সঙ্গে মুলাকাত করতে চায়। বোলাউঙ্গা?

বুড়োবাবু? কে, বুড়োবাবু? যারা ব্যাঙ্কে কাজের জন্যে আসে তাদের হাশেম সাহেবই সামলায়। সন্দীপ বললে—হাশেম সাহেবকে বোলাও—

হাশেম সাহেব ঘরে এলো, এসে বললে—কে এসেছে আমার সঙ্গে দেখা করতে হাশেম? আমাদের কোনো ক্লায়েন্ট?

হাশেম বললে—স্যার, তাঁর নাম পরমেশ মল্লিক—

নামটা শোনবার সঙ্গে সঙ্গেই সন্দীপ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। জিজ্ঞেস করলে—কোথায় তিনি? তোমার টেবিলে?

তারপর আর দাঁড়ালো না সন্দীপ। সোজা চেম্বার ছেড়ে বাইরে এলো। সবাই ম্যানেজারবাবুকে দেখে একটু গল্প-গুজব থামিয়ে দিলে। তটস্থ হলো। সন্দীপ দূরে থেকে মল্লিক মশাইকে দেখতে পেয়ে সেই দিকে এগিয়ে গেল। বললে—মল্লিক-কাকা, আপনি? হঠাৎ কী খবর? আসুন আসুন আমার ঘরে আসুন। খবর ভালো তো?

মল্লিক-মশাই বললেন—খবর বড়ো খারাপ সন্দীপ খুব খারাপ খবর—

সন্দীপ মল্লিক-কাকার কথা শুনে চমকে উঠে বললে—খারাপ খবর মানে? বিশাখার কিছু হয়েছে?

মল্লিক-কাকা বললেন—হ্যাঁ, কিন্তু এখন তো তুমি তোমার কাজ নিয়ে ব্যস্ত। খুব জরুরী কাজ না থাকলে কি তোমার অফিসে আমি আসি?

—বলুন না বিশাখার কী হয়েছে? বিশাখা ভালো আছে তো?

মল্লিক-কাকা বললেন—হ্যাঁ, ভালো আছে। সেই কথা বলতেই আমি আজ তোমার কাছে এসেছিলুম। কিন্তু তুমি তো এখন খুবই ব্যস্ত। একবার আমাদের বাড়িতে তুমি আসতে পারবে? ধরো, আজই সন্ধেবেলা?

সন্দীপ বললে—আমি তো সেদিন গিয়েছিলুম। বিশাখা তো প্রায় আমাকে তাড়িয়েই দিলে—

মল্লিক-কাকা বললেন—না, সেদিন তোমাকে সব কথা বলা হয়নি। আরো অনেক কথা বলবার ছিল। বিশাখা তোমাকে সেদিন তাড়িয়ে দেওয়াতে ঠাকমা-মণির খুব মন-খারাপ হয়ে গিয়েছিল।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ, তোমাকে বলা হয়নি, বিশাখা প্রথম দিন বাড়িতে আসার পরই মাঝরাত্তিরে পালিয়ে যাচ্ছিল—

সন্দীপ বললে—সে কী? কোথায় পালিয়ে যাচ্ছিল?

মল্লিক-কাকা বললে—কে জানে! তখন সবাই শেষ রাত্তিরের দিকে একটুখানির জন্যে ঘুমিয়ে পড়েছিল। আর সেই ফাঁকে বিশাখা বিছানা ছেড়ে উঠে একেবারে রাস্তায় বেরিয়ে পড়তে যাচ্ছিল—

—তারপর?

—তারপর আর কী! তারপর ভাগ্যিস্ গিরিধারী সদরে তালা-চাবি বন্ধ করে রেখেছিল, তাই সব জানাজানি হয়ে গিয়েছিল—

মল্লিক-কাকা কথাটা বলেই দাঁড়িয়ে উঠলেন। বললেন—না, আর তোমার সময় নষ্ট করবো না। তুমি তোমার কাজ করো। আমি চলি। সন্ধ্যেবেলা তুমি আমাদের বাড়ি গেলে সব জানতে পারবে!

সন্দীপ তখন অস্থির হয়ে উঠেছে বিশাখার কথা শোনবার জন্যে। বললে—না না, আপনি বলুন। আমার কাজ তো সব সময়েই থাকবে। আপনি বলুন তারপরে কী হলো? বিশাখা ধরা পড়ে গেল?

—হ্যাঁ।

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—কে তাকে ধরলে?

—সে সমস্ত কথা তোমাকে বলবো। তুমি যদি পারো তো আজ অফিসের ছুটির পর একবার আমাদের বাড়িতে এসো।

সন্দীপ আবার জিজ্ঞেস করলে—তা এখন আর বিশাখা পালাতে চেষ্টা করে না তো?

মল্লিক-কাকা বললেন—এখন আর পালাবে কী করে?

—কেন?

মল্লিক-কাকা বললেন—এখনও পালাবার চেষ্টা করে। কিন্তু ঠাকমা-মণি গিরিধারীকে সমস্ত দিন সদর-গেটে তালা-চাবি দিয়ে বন্ধ রাখতে বলে দিয়েছে। যদি কেউ বাড়িতে আসে বা বাড়ির বাইরে যেতে চায় তো গিরিধারী তালা-চাবি খুললে তবে সে বাড়ির

ভেতরে বা বাইরে যেতে-আসতে পারবে।

...তুমি তাহলে আজ আসছো তো?

সন্দীপ বললে—আমার কথা কি বিশাখা শুনবে?

—বিশাখা তোমার কথা শুনবে না তা জানি! তবু তোমাকে ডাকছি—

—কেন?

মল্লিক-মশাই বললেন—ঠাকমা-মণি তোমার সঙ্গে কথা বলবেন।

—ঠাকমা-মণি? ঠাকমা-মণি আমার সঙ্গে কী-কথা বলবেন?

—সে অনেক কথা। বউমা'র ব্যাপারে তিনি তোমার সঙ্গে পরামর্শ করবেন।

—আমার সঙ্গে পরামর্শ করবেন ঠাকমা-মণি? কীসের পরামর্শ?

মল্লিক-কাকা বললেন—সে তুমি তাঁর মুখ থেকেই শুনো—

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—আমি বুঝতে পারছি না আমার সঙ্গে তাঁর কীসের পরামর্শ?

—কীসের আবার, ওই বউমা'র ব্যাপারেই নানা পরামর্শ করবেন।

সন্দীপ বললে—আমি তো তাঁর কথা—মতোই সেদিন বিশাখার কাছে গিয়েছিলুম। কিন্তু তিনি তো দেখেছেন বিশাখা আমাকে প্রায় তাড়িয়েই দিলে. বিশাখা তো আমার কোনও কথাই শুনলে না। তবু কী জন্যে আমাকে ডেকেছেন?

মল্লিক-কাকা বললেন· তিনি বউমা'কে নিয়ে অস্থির হয়ে পড়েছেন। কী করবেন কিছুই বুঝতে পারছেন না। ঠাকমা-মণিরও তো বয়েস হয়েছে। তিনি আর কতো দিন না-ঘুমিয়ে কাটাবেন?

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—ঠাকমা-মণিরও অনিদ্রা রোগ হয়েছে নাকি?

মল্লিক-কাকা বললেন—অনিদ্রা-রোগ হবে না? নিজের নাত্-বউ যদি কেবল বাড়ি থেকে পালিয়ে যেতে চেষ্টা করে তো তিনি কী করে রাত্তিরে ঘুমোবেন? একটু চোখ বুজলেই ভয় হয় ওই বুঝি তাঁর নাত্-বউ বাড়ি থেকে পালিয়ে গেল—

সন্দীপ কথা বললে না। কী সে বলবে তাও বুঝতে পারলে না। মল্লিক-কাকা আবার বললেন—জানো, ঠাকমা-মণির একদিন মনে হলো বউমা তো গরীব-ঘরের মেয়ে। হয়তো গয়না-গাঁটি পেলে খুশী হবে। তাই বাড়ির স্যাকরাকে ডেকে পাঠালেন বউমার জন্যে গয়না গড়বার জন্যে।

—তারপর? তারপর কী হলো? গয়না গড়ানো হলো?

মল্লিক-কাকা বললেন—হ্যাঁ, প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচা করে বউমা'র জন্যে গয়না গড়ানো হলো। সে কি একটা গয়না? আমি তো সংসারী মানুষ নই যে অতো গয়নার নামধাম জানবো? গলার হার, বালা, রুলী, চুড়ি, কঙ্কণ—কতো রকমের সব গয়না। সমস্ত গড়ানো হলো ওই নাত্-বউমা'র জন্যে...

—তারপর?

মল্লিক-কাকা বললেন—পরের কথা পরে শুনো—আজকে সন্ধ্যায় ঠিক যেও কিন্তু...

এই বলে তিনি চলেই যাচ্ছিলেন, কিন্তু একটু দাঁড়িয়ে গেলেন। যেন আর একটা কথা তাঁর মনে পড়ে গেছে। বললেন—বিশাখার মা'র অসুখ হয়েছিল, তিনি এখন কেমন আছেন?

সন্দীপের মুখটা এবার আরো গম্ভীর হয়ে গেল। বললে—সে অনেক কাণ্ড!

—ডাক্তাররা কী বলছে?

—ডাক্তাররা কিছুই বলছে না। তিনি তো এখনও নার্সিং-হোমে। কেবল টাকাই খরচ হয়ে যাচ্ছে জলের মতো।

মল্লিক-কাকা বললেন—তোমাকে বিয়ের দিন তো পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়েছিলাম। সে টাকা সমস্ত খরচ হয়ে গিয়েছে, না কিছু বেঁচেছে?

সন্দীপ বললে—খরচ তো হচ্ছেই। কতো খরচ হয়েছে আর কতো আমার কাছে পড়ে আছে, তা জানি না।

—তুমি জানো না তো কে জানে?

সন্দীপ বললে—আমার মা জানে! আমি সে-সমস্ত টাকা মা'র কাছে রেখে দিয়েছি। যখন টাকার দরকার হয়, তখন মা'র কাছ থেকে চেয়ে নিই—

মল্লিক-কাকা বললেন—তা টাকা থাকুক আর না-ই থাকুক, তুমি যতো টাকা চাও তা সমস্তই আমাদের ঠাকমা-মণি দেবে—সন্দীপ চুপ করে রইলো। মল্লিক-কাকা আবার বললো—তুমি আজ অফিসের ছুটির পর আমাদের ওখানে যাচ্ছো তো?

সন্দীপ বললে—আমি আগে যাবো 'নার্সিং-হোমে' মাসিমাকে দেখতে, তারপর সেখান থেকে আপনাদের বাড়িতে যাবো—

তারপর একটু থেমে গিয়ে আবার জিজ্ঞেস করলে—কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না ঠাকমা-মণি আমার সঙ্গে কেন দেখা করতে চাইছেন? কী জানো? কারণটা কী?

মল্লিক-কাকা বললেন—ওই যে তোমাকে বললুম, বউমা'র জন্যে, বিশাখার জন্যে!

সন্দীপ বললে—আপনি আমার জন্যে একদিন অনেক কষ্ট করেছেন, অনেক চেষ্টা করেছেন, আপনি সেদিন সে-সব না করলে আমি আজ না-খেতে পেয়ে মরে যেতুম। আর আমার মা'কে তাহলে চিরকাল পরের বাড়িতে রাঁধুনী-গিরি করেই জীবন কাটাতে হতো। আপনি যখন যা করতে বলবেন তাই-ই আমি করবো।

—তাহলে আমি যাই? তুমি ঠিক আসছো তো?

সন্দীপ বললে—নিশ্চয়ই যাবো, প্রণাম—

মানুষ কতো সাধ করে এই সংসার সৃষ্টি করে। সুখের সাধ, অর্থের সাধ, অমরত্বের সাধ। মানুষের সাধ-আহ্লাদের কি শেষ আছে? মানুষ আশা করে একদিন এই সংসার আমাকে আদর দেবে, ভালোবাসা দেবে, সম্মান দেবে, শ্রদ্ধা দেবে—তার সঙ্গে সঙ্গে আমি যাচাই সমস্তই আমাকে দেবে। আর আমি তাই নিয়েই আজীবন সুখে কাটাবো।

কিন্তু তা কি সত্যিই হয়?

হয় না বলেই মানুষ নিজের গড়া জালে জড়িয়ে পড়ে সে-জাল কেটে বাইরে বেরোবার জন্যে হাহাকার করে। তখন মানুষ মুক্তির আশায় মন্দিরে ঠাকুর-দেবতার কাছে গিয়ে প্রার্থনা করে। বলে আমাকে মুক্তি দাও ঠাকুর, আমাকে একটু শান্তি দাও—

আর মন্দিরের ঠাকুর?

ঠাকুর তো চিরকালই বোবা। মানুষের হাতে গড়া পাথর বা মাটির ঠাকুর তো কথা বলতে পারে না, কথা শুনতেই পারে না। তবু মানুষ সেই বোবা-কালা ঠাকুরকেই পুজো করে, মানত করে। সামর্থ্য অনুযায়ী টাকা দিয়ে দেবতার কৃপা আকর্ষণ করবার চেষ্টা করে। কখনও দুর্গম পাহাড়ে গিয়ে, কখনও বা গরম কুণ্ডের জলে স্নান করে দেবতার আশীর্বাদ পাওয়ার চেষ্টা করে।

কিন্তু তাতেও যখন কোনও ফল হয় না, তখন নিজের গড়া জালে জড়িয়ে পড়ে একদিন ভব-লীলা সাঙ্গ করতে বাধ্য হয়। এই সমস্ত কষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টাতেই এক-একজন মহাপুরুষের সৃষ্টি হয়। তাঁরাই বলে যান যে শান্তি বা মুক্তির আশায় বনে-জঙ্গলে বা পাহাড়ে গেলে কোনও লাভ হবে না। এর জন্যে স্বার্থ ত্যাগ করে সর্বভূতে দয়া প্রসারিত করে, অন্তর থেকে কামনা-বাসনা ত্যাগ করলেই তবে মানুষের মুক্তি হয়।

শুনতে এটা খুবই সহজ কথা। কিন্তু এই সহজ কথাটা উপলব্ধি করতে গিয়ে একজন রাজার ছেলেকে রাজ্য-পাট স্ত্রী-পুত্রকে পরিত্যাগ করে রাস্তার ধুলোয় এসে

দাঁড়াতে হয়েছিল। সে-সব আড়াই হাজার বছর আগেকার কথা।

কিন্তু এই আড়াই হাজার বছর পরেও কি কেউ সেই স্বার্থ ত্যাগ করতে পেরেছে? কেউ সর্বভূতে দয়া বিস্তার করতে পেরেছে? কেউ কামনা-বাসনা পরিত্যাগ করতে পেরেছে?

শুধু ঠাকমা-মণিকে দোষ দিয়ে লাভ নেই, সন্দীপ নিজেই কি তা করতে পেরেছে? সন্দীপের জানা-চেনা পরিধির মধ্যে কেউ-ই তো পারেনি! সন্দীপ তো কোনও সাধারণ মানুষের ঊর্ধ্ব-স্তরে নয়। সেই তেরোই ফাল্গুন তারিখে বিশাখার বিয়ের পরদিন থেকেই নিজের জীবনটার পরিক্রমা করে করে কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে পারছিল না।

প্রথম দিন থেকেই ঠাকমা-মণির দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। নতুন বউ তখন সবে মাত্র বাড়িতে এসেছে। তিনি নাত্-বউকে পাশে নিয়ে ঘুমোচ্ছিলেন। ঘুম তো তাঁর ছিলই না কোনও দিন। সেদিনও তাঁর ঘুম আসেনি। অনেকক্ষণ ধরে পাশে বউকে শুইয়ে কেবল সান্ত্বনা দিয়েছিলেন। শেষকালে কখন পোড়া চোখে ঘুম এসে গিয়েছিল কে জানে?

হঠাৎ বিন্দুর ডাক ডাকিতে তাঁর তন্দ্রা ভেঙে গেল—ঠাকমা-মণি, ও ঠাকমা-মণি—

হঠাৎ বিন্দু তাঁকে ডাকে কেন? নজর পড়লো পাশের দিকে। কই, বউমা কোথায়? বউমা কোথায় গেল? এই তো বউমা তাঁর পাশেই এতক্ষণ শুয়েছিল!

বিন্দু তখনও ডাকছিল—ঠাকমা-মণি, সর্ব্বোনাশ হয়েছে—উঠুন—উঠুন—

ধড়মড় করে বিছানা থেকে উঠে পড়লেন তিনি। বললেন—কী হয়েছে রে? আমার বউমা কোথায় গেল?

বিন্দু বললে—এই যে ঠাকমা-মণি, এই যে—

ঠাকমা-মণি চেয়ে দেখলেন—বিন্দু বউমা'র হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে তাঁর চোখের সামনেই। বিন্দু বললে—বউমা'কে ধরে এনেছি ঠাকমা-মণি, এই যে আপনার বউমা—

ঠকমা-মণি বললেন—ধরে এনেছিস? তার মানে? বউমা কোথায় ছিল?

বিন্দু বললে—নিচেয়—

—নিচেয় মানে?

—নিচেয় মানে, একতলায়। গিরিধারী জানতে পেরে বউমা'কে আটকে ধরে রেখেছিল।

ঠাকমা-মণি অবাক হয়ে গেলেন। বিশাখার দিকে চেয়ে বললেন—সত্যি? বিন্দু যা বলছে তা সত্যি? তুমি পালিয়ে যাচ্ছিলে?

বিশাখা তখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছে।

—বলো বউমা, তুমি পালিয়ে যাচ্ছিলে? বলো, কথা বলো, কথার উত্তর দাও? তুমি সত্যিই পালিয়ে যাচ্ছিলে?

বিশাখা কাঁদতে কাঁদতেই মাথা নিচু করলে। তারপর বললে—হ্যাঁ—

ঠাকমা-মণি বিশাখাকে জড়িয়ে ধরে বুকের মধ্যে টেনে নিলেন। তারপর নিজের খাটের ওপর তাকে বসিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—কেন বউমা? তোমার এ-বাড়িতে থাকতে কষ্ট হচ্ছে?

—বিশাখা বললে—হ্যাঁ—

—কেন তোমার কীসের কষ্ট হচ্ছে? বলো, কষ্টটা কীসের?

বিশাখা বললে—আমি জানি না।

ঠাকমা-মণি বললেন—তুমি কাঁদলে তো আমার স্বামীর অকল্যাণ হবে বউমা। তার ভালোর জন্যেই তো তোমাকে এ-বাড়িতে বউ করে এনেছি। তবু তুমি জেনে শুনে এমন করে কাঁদছো কেন?

একটু থেমে ঠাকমা-মণি আবার বলতে লাগলেন—জানো, কাল খোকার মামলা আছে, সেই সময়ে তোমাকে জজসাহেবের সামনে গিয়ে বসতে হবে। তোমাকে সাজিয়ে-গুজিয়ে

আমি নিয়ে যাবো। এই সময়ে যদি তোমার শরীর খারাপ হয়ে যায়, তখন কী হবে? বলো, তখন কী হবে?

এবারও বিশাখার মুখ দিয়ে কোনও কথা বেরোল না।

ঠাকমা-মণি আবার বললেন—এই যে দেখছো, এই বিরাট বাড়ি, এই পাশের স্টীলের আলমারিটার ভেতরে লাখ লাখ টাকা আছে, এ সমস্তই তোমার। আমি আর ক'দিন বউমা, আর বড় জোর এক-বছর কি দু'বছর। তারপর? তারপর তো এই সব-কিছুই তোমার হবে। একবার ভাবো তো তখন কতো সুখে তুমি জীবন কাটাবে?

তখন রাত শেষ হয়ে আসছিল। ঠাকমা-মণি বললেন—নাও বউমা, এবার তুমি শুয়ে পড়ো। দেখ না চেষ্টা করে যদি একটু ঘুম আসে। আমি পাখাটা জোর করে ঘুরিয়ে দিচ্ছি, তুমি একটু ঘুমোবার চেষ্টা করো—

বলে ঠাকমা-মণি বিশাখাকে ধরে বিছানার ওপর শুইয়ে দিলেন, আর উঠে দাঁড়িয়ে পাখার রেগুলেটারটা আরো বাড়িয়ে দিলেন।

বললেন—নাও, ঘুমোও, ঘুমোতে চেষ্টা করো। আমরা দরজা বন্ধ করে বাইরে চলে যাচ্ছি। তারপর ভোর হলে তোমাকে ডেকে দেব। তুমি কিছু ভেবো না—

বলে ঠাকমা-মণি ঘরের দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে বাইরে চলে গেলেন। সারাটা দিন ঠাকমা-মণির ওপর দিয়ে অনেক ঝক্কি গিয়েছে। কোথায় বেড়াপোতা, কোথায় পুরুত, কোথায় নাপিত, কোথায় পুলিশের পাহারা, সমস্ত দিকে নজর রাখতে গিয়ে তাঁর বুড়ো শরীরের ওপর অনেক চাপ পড়েছিল। তারপর রাত্রে যে তিনি একটু ঘুমিয়ে আরাম করবেন তারও উপায় রইলো না।

তিনি বিশাখাকে একলা রেখে নিজে ঘুমোতে গেলেন বটে কিন্তু ঘুম এলো না। মানুষের ঘুম কি বাজারের আলু-পটল যে পয়সা ফেললেই কিনতে পাওয়া যাবে? অনেকক্ষণ চেষ্টা করেও যখন তাঁর ঘুম আর এলো না, তখন তিনি উঠে পড়ে তৈরি হয়ে নিলেন।

সকাল দশটার মধ্যেই হাইকোর্টে গিয়ে হাজির হতে হবে। কতো কাজ এখন তাঁর সামনে। তিনি বিশাখার ঘরে গিয়ে দেখলেন বউমা তখন জেগেই আছে। জেগে জেগে কাঁদছে। কেঁদে দুটো চোখ একেবারে ফুলিয়ে ফেলেছে। বললেন—এ কী বউমা, তুমি ঘুমোওনি? এখনও কাঁদছো। নাও নাও, তৈরি হয়ে নাও, সকাল দশটার মধ্যে যে কোর্টে হাজিরা দিতে হবে! আর দেরি করো না—

বলে চলেই যাচ্ছিলেন, কিন্তু তাতেও বউমা'র দিক থেকে কোনও উদ্যোগের লক্ষণ না দেখে বললেন—কী হলো? আমার কথাগুলো তোমার কানে যাচ্ছে না? ওঠো, তৈরি হয়ে নাও—

তাতেও কাজ না হওয়াতে তিনি বিন্দুকে ডাকলেন। বিন্দু প্রস্তুতই ছিল। তাকেই বললেন বিশাখাকে তৈরি করিয়ে নিতে। বিশাখা কিন্তু তখনও এক নাগাড়ে কেঁদে চলেছে।

ঠাকমা-মণি আবার তাগাদা দিলেন। বললেন—কই, উঠছো না যে?

শেষ পর্যন্ত বিশাখা উঠলো। ঠাকমা-মণি বিন্দুকে বললেন—বউমা'কে নতুন বেনারসীটা পরিয়ে দিস, জানলি? বেনারসীর ব্লাউজটা আলমারির থেকে বার করে নিবি। যাও বউমা, যাও—

বিশাখা আর কোনও প্রতিবাদ করলে না। বিন্দুর সঙ্গে ঘরের বাইরে চলে গেল।

তখন মুক্তিপদ এসে মা'কে বললেন—তোমার বউমা তৈরি তো?

ঠাকমা-মণি বললেন—হ্যাঁ, তুই তৈরি?

মুক্তিপদ বললেন—আমি তো তৈরি, কিন্তু পিক্‌নিককে কার কাছে রেখে যাই? ওকে একা ছেড়ে যেতে ভয় করছে—

ঠাকমামণি বললেন—হ্যাঁ, তা তো বটেই—তার জন্যে কিছু ভাবিসনি। আমার বিন্দু রইলো, সুধা রইলো, তারা ওর ওপর নজর রাখবেন—

শেষ পর্যন্ত ঠিক সময়েই সবাই বাড়ি থেকে বেরোলেন। আজ অগ্নিপরীক্ষা। একলা শুধু সৌম্যপদরই অগ্নিপরীক্ষা নয়, তার সঙ্গে ঠাকমা-মণি, মুক্তিপদ, বিশাখা, সকলের জীবনেরই অগ্নিপরীক্ষা আজ।

তবে সকলের চেয়ে ঠাকমা-মণিরই বেশি উদ্বেগ। তাঁর এত দিনের সব সাধ, সব আশঙ্কা, সব আকাঙ্ক্ষা মিটতে চলেছে। এখন যদি তার এতটুকু পদস্খলন হয় তাহলেই সর্বনাশ। তখন ঠাকমা-মণির আত্মহত্যা করা ছাড়া আর কোনও রাস্তা খোলা থাকবে না।

তখনও বিশাখা একটানা কেঁদে চলেছে। সেই যে বিয়ের লগ্ন থেকে সে কাঁদতে শুরু করেছিল, তা এখনও থামেনি। বিশেষ করে যখন পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে সে গিরিধারীর হাতে ধরা পড়ে গিয়েছিল, তখন থেকেই তার কান্না যেন সহস্র গুণ বেড়ে গিয়েছিল।

মুক্তিপদ সাহস দিয়েছিলেন ঠাকমা-মণিকে। বলেছিলেন— ভালো হলো মা, ভালোই হলো। বউমা যতো কাঁদবে, জজের মন ততো ভিজবে, ততো গলবে, সৌম্যর ফাঁসির হুকুম আর দেবে না।

সবই ঈশ্বরের ইচ্ছে! ঠাকমা-মণি তাই যতোক্ষণ জেগে থাকতেন ততোক্ষণই ঈশ্বরকে ডাকতেন, গুরুমন্ত্র জপ করতেন।

জজসাহেবের এজলাসে এ্যাডভোকেট দাশগুপ্ত যখন সৌম্যপদ'র পক্ষে যুক্তি দিয়ে জবানবন্দী দিচ্ছিলেন তখন জজসাহেব এক-একবার বিশাখার কাঁদো কাঁদো মুখের দিকে এক সেকেণ্ডের জন্যে নজর দিচ্ছিলেন। বিশাখার সেই বেনারসী শাড়ি আর মাথার সিঁথিতে নতুন লাগানো সিঁদুরের দিকেও বোধ হয় তাঁর দৃষ্টি পড়ছিল। তারপর যখন সব জবানবন্দী শেষ হলো তখন জজসাহেব তাঁর ঘরে চলে গেলেন, আর সৌম্যকেও কয়েদীর কাঠগড়া থেকে পুলিশরা বাইরে নিয়ে চলে গেল।

ঠাকমা-মণি নাত্-বউকে নিয়ে মিস্টার দাশগুপ্তর চেম্বারে গেলেন। মিস্টার দাশগুপ্ত ঠাকমা-মণিকে দেখে হাসলেন। বললেন—এবার খুশী তো? আমি কী বলেছিলুম আপনাকে? আপনি তো মিছিমিছি কান্নাকাটি করছিলেন কতো—

ঠাকমা-মণি বললেন—কিন্তু এখনও তো রায় বেরোয়নি।

মিস্টার দাশগুপ্ত বললেন—কী রায় বেরোবে আমি বলে দিতে পারি। আমি তো জেনে-শুনেই ওই জজের ঘরে কেস্‌টা তুলেছি! ও'র নিজের ছেলেরই তো বিয়ে হলো এক মাস আগে! উনি তো বার-বার চেয়ে দেখছিলেন আপনার বউমা'র মাথার সিঁথির সিঁদুরের দিকে। আপনি নজর করেননি?

ঠাকমা-মণি জিজ্ঞেস করলেন—কবে নাগাদ রায় বেরোবে?

মিস্টার দাশগুপ্ত বললেন—এক সপ্তাহের মধ্যে বেরিয়ে যাবে! আমি আপনাকে খবর দেব—

ঠাকমা-মণি বললেন—কিন্তু আমার এই বউমা বিয়ে হওয়া এস্তক কাঁদছে। আপনি একে একটু বুঝিয়ে বলুন তো যেন আর না কাঁদে!

মিস্টার দাশগুপ্ত বিশাখার দিকে চেয়ে বললে—অতো কাঁদছো কেন তুমি বউমা? জজসাহেবের সামনে বসে কেঁদেছো, তা ঠিক আছে! এখন আর কাঁদছো কেন? এখন হাসো। প্রাণ খুলে হাসো। তোমার সিঁথির সিঁদুর অক্ষয়, কেউ তোমার কিছু ছু করতে পারবে না। তুমি গরীব ঘরের বাপ মরা মেয়ে, আমি সব শুনেছি, এখন এতো বড়োলোকের বাড়ির বউ হতে পারলে, সেটা মনে রেখো। এখন চোখ মোছ। শুনলাম কাল সারারাত তুমি নাকি একেবারে ঘুমোওনি, কেবল কেঁদেছো, আবার বাড়ি থেকে পালিয়ে যাবার চেষ্টাও করেছো। কিন্তু এখন তো তুমি নিশ্চিন্ত হলে, আজকে রাতে প্রাণ ভরে ঘুমোও তো, যাও—

এরপর সবাই মিলে আবার বিডন স্ট্রীটের বাড়িতে ফিরে এলো। বাড়িতে এসেও কিন্তু বিশাখার কান্না থামলো না।

তখন বহুদিনের উদ্বেগ শেষ! ঠাকমা-মণি আবার বিশাখাকে বললেন—তুমি এখনও কাঁদছো বউমা? নিজের চোখে সবকিছু দেখেও তোমার কান্না থামলো না? মিস্টার দাশগুপ্ত অতো করে তোমাকে বোঝালেন তবু তুমি কাঁদছো? তাহলো তো বউমা, তোমার কিসের কষ্ট? কি জন্যে এতো কাঁদছো? কার কথা ভেবে এতো মন খারাপ করছো। যদি বলো তো আমি তাকে ডেকে পাঠাই—বলো না, তোমার কি চাই?

ওদিকে মুক্তিপদ তাঁর মেয়েকে নিয়ে ইন্দোরে চলে যাওয়ার জন্যে তৈরি। তাঁরও গেলেন ছাড়বার সময় হয়ে এলো।

—মা, আমরা যাই তাহলে?

ঠাকমা-মণি তখনও বিশাখাকে নিয়ে ব্যস্ত। বললেন—দেখলি তো, কি অশান্তির মধ্যে আমার দিন কাটছে!

মুক্তিপদ বললেন—বউমা এখনও কাঁদছো? কান্না থামছে না?

—না, সেই এক নাগাড়ে কেবল কেঁদেই চলেছে? কি করি বল তো বউমা'কে নিয়ে?

মুক্তিপদ বললেন—আমি আর কি বলবো? তুমিই তো দেখলে আমি সম্পত্তি নিয়ে কিরকম ভুগছি। তার ওপর এই পিকনিক। আমি আমার ফ্যাক্টরি দেখবো, না ফ্যামিলি দেখবো? এ পৃথিবীতে বেঁচে থাকাটাই বোধহয় পাপ!

ঠাকমা-মণি বললেন—তুই যা, চলে যা। আমি আমার নিজের ভাগ্য নিয়েই অস্থির। তার ওপরে আর তোর ঝামেলার কথা ভাবতে পারি নে! তুই যা—গিয়ে চিঠি দিস—

মুক্তিপদ চলে যাওয়ার পর তিনি আবার বিশাখকে নিয়ে পড়লেন।

ঠাকমা-মণি বলতে লাগলেন—তোমার খিদে পেয়েছে বউমা, কিছু খাবে?

বিশাখা এবার আরো জোরে কেঁদে উঠলো। তখন ঠাকমা-মণি বললেন—আচ্ছা, ঠিক আছে, তোমাকে আর কাঁদতে হবে না। কিন্তু কেন কাঁদছো তাই বলো? টাকা নেবে? গয়না নেবে?

তবু বিশাখা কোনও জবাব দিলে না। জবাবে শুধু আরো কাঁদতে লাগলো।

ঠাকমা-মণি বললেন—না না, আর কাঁদতে হবে না, এসো আমার সঙ্গে—

বলে ঠাকমা-মণি বিশাখার একটা হাত ধরে টানলেন। বললেন- এসো বউমা, আমার সঙ্গে এসো—

বিশাখা প্রথমে একটু অবাক হয়ে গেল ঠাকমা-মণির কথা শুনে। তারপর ঠাকমা-মণির সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগলো।

ঠাকমা-মণি বিশাখাকে নিয়ে তাঁর নিজের ঘরে ঢুকলেন। তারপর ঘরের দরজায় খিল বন্ধ করে বললেন—এই দেখ বউমা, তোমাকে দেখাই, এসো—

বলে ঘরের ভেতরের একটা স্টীলের আলমারির পাল্লা দুটো খুললেন। খুলতেই বিশাখা দেখলে আলমারির দুটো তাক কেবল টাকায় ভর্তি। নোটগুলো থাক থাক করে সাজানো রয়েছে। কতো যে টাকা তা আন্দাজ করা শক্ত। কিন্তু দেখলেই বোঝা যায় যেন কয়েক লাখ টাকা হবে ওগুলো, কিংবা হয়তো তার চেয়েও বেশি। এক জায়গায় এত টাকা বিশাখা আগে আর কখনও কোথাও দেখেনি! এদের এত টাকা! এত টাকা এদের কোথা থেকে এলো? কে এত টাকা রোজগার করলে? কত পুরুষের জমানো টাকা এগুলো, নাকি সমস্তই এক পুরুষ?

—দেখলে বউমা? কতো টাকা? এত টাকা কখনও তুমি একসঙ্গে দেখেছ?

বউমা'র মুখের দিকে চেয়ে ঠাকমা-মণির মনে হলো যেন ওষুধে কাজ হয়েছে। মনে হলো এবার বোধহয় বউমা'র কান্না থেমে যাবে। বললেন—বলো বউমা এত টাকা তুমি একসঙ্গে কোথাও দেখেছো? এরও কোনও জবাব নেই বউমা'র দিক থেকে। ঠাকমা-মণি এবার তাঁর হাতের শেষ তাসটা সামনে ফেলে দিলেন। বললেন—এসব টাকা কার

বল তো বউমা?

বিশাখা তবু কোনও জবাব দিলে না। আবার বললেন—বলো, এত টাকা কার?

বিশাখা এতক্ষণে মুখ খুললো। বললে—আপনার—

ঠাকমা-মণি বললেন—না, আমার নয়, তোমার—সব টাকা তোমার।

তারপর আবার বললেন—আরো দেখবে?

এবার আর একটা চেম্বার খুললেন। আলমারির ভেতরেই আর একটা আলমারির মতো। সেটা খুলতেই বিশাখার চোখ মুখ সবকিছু যেন ঝলসে উঠলো। বললেন—দেখেছো, কতো গয়না? দেখো, দেখো—

ঠাকমা-মণি লক্ষ্য করতে লাগলেন বিশাখার চোখ-মুখের দিকে। দেখতে লাগলেন বউমা'র চোখে-মুখে কোনও প্রতিক্রিয়া হয় কি না। কিন্তু না, সেখানে কোনও প্রতিক্রিয়ার লক্ষণ নেই—

আবার ঠাকমা-মণি জিজ্ঞেস করলেন—এ সব কার?

বিশাখা সেই একই সুরে বললে—আপনার—

ঠাকমা-মণি বললেন—না, আমার নয়, সবই তোমার—আমি বিধবা মানুষ, আমি এসব নিয়ে কি করবো? আর আমি বুড়ি হয়ে গিয়েছি, আমি আর ক'দিনই বা বাঁচবো। এই যা কিছু তুমি দেখলে, এ-সবই তোমার। তুমিই এ-সব কিছুর মালিক—

কিন্তু তখনও বউমা'র চোখে-মুখে কোনও প্রতিক্রিয়ার লক্ষণ ফুটে উঠলো না। তবে বউমা'র কান্নাটা তখন একটু থেমে এসেছে। চোখের জলটা তখন একটু যেন শুকিয়ে এসেছে মনে হলো।

তারপর ঠাকমা-মণি আর একটা তুরুপের তাস ছাড়লেন। নিজের থান-ধুতি থেকে চাবিটা খুলে নিয়ে বিশাখার শাড়ির আঁচলে বেঁধে দিলেন। বললেন—চাবিটা তোমার আঁচলেই বাঁধা থাকলো বউমা, সাবধানে রেখো ওটা, যেন হারিয়ে না যায়—

বিশাখা কোনও বাধা দিলে না, চাবিটা তার আঁচলেই বাঁধা রইলো। তারপর বিকেল হলো, সন্ধ্যে হলো। মুক্তিপদ তখন পিক্‌নিককে নিয়ে এয়ারপোর্টে চলে গেছে। বিশাখার ঘরে এসে ঠাকমা-মণি দেখলেন বউমা বিছানার ওপর উপুড় হয়ে আবার কাঁদতে শুরু করেছে। ঠাকমা-মণি আবার বউমা'র পাশে গিয়ে বসলেন। বললেন—তুমি আবার কাঁদছো বউমা? আবার কি হলো? এই তো তোমাকে আমি বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঠাণ্ডা করিয়ে গেলাম। এর মধ্যে আবার কি হলো?

বিশাখা এ-কথার কোনও উত্তর দিলে না। যেমন কাঁদছিল তেমনিই কাঁদতে লাগলো। ঠাকমা-মণি বড়ো বিব্রত হয়ে পড়লেন। এই একটু আগেই আলমারির ভেতরকার লক্ষ-লক্ষ টাকা তিনি বউমা'কে দেখিয়েছেন। দেখিয়েছেন তাঁর গয়নার বাক্স। নিজের আঁচলের চাবিটাও বউমা'র শাড়ির আঁচলে বেঁধে দিয়েছেন। তবু কেন আবার কাঁদে বউমা? সব মেয়েরাই তো গয়না আর টাকা পেলেই খুশী হয়! তাহলে কি বউমা আলাদা জাতের মেয়ে?

—ও বউমা, বউমা, শোন, শোন—

এবার মুখে প্রথম কথা ফুটলো। বিশাখা বললে—আপনি আমার কেন এই সর্ব্বোনাশ করলেন?

ঠাকমা-মণি বললেন—আমি তোমার সর্ব্বোনাশ করলুম, বলছো কি তুমি? সেই ছোটবেলা থেকেই তো তোমাকে আমার নাত্‌-বউ করবো বলে পছন্দ করে রেখেছিলুম। তাই তো তোমাদের মা-মেয়েকে মনসাতলা লেনের বাড়ি থেকে তুলে এনে আমার রাসেল স্ট্রীটের বাড়িতে রেখেছিলুম, আর আজ তুমি আমাকে এই কথা বলছো?

তখনও কথার উত্তর দিচ্ছে না দেখে ঠাকমা-মণি আবার বললেন—বলো বলো, আমার কথার জবাব দাও?

তখনও বউমা'কে চুপ করে থাকতে দেখে ঠাকমা-মণি আবার বললেন—চুপ করে

আছো কেন বউমা? আমার কথার জবাব দাও? আমি তোমাদের মা-মেয়েকে রাসেল স্ট্রীটের বাড়িতে এনে রাখিনি?

এবার বিশাখা তুবড়ির মতো ফোঁস করে ফেটে গেল।

বললে—আমাদের জন্যে টাকা খরচ করেছেন বলে আপনি আমাদের কিনে নিয়েছেন?

ঠাকমা-মণি এবারে বউমা'র কথা শুনে চমকে উঠলেন। বললেন—এসব কি বলছো তুমি বউমা? তোমাদের কিনে নেওয়ার কথা আজ উঠছে কেন? আমার নাতির সঙ্গে তোমার বিয়ে দেওয়ার সাধ কি আমার আজকের- যখন তুমি ছোট ছিলে, মার সঙ্গে গঙ্গায় স্নান করতে আসতে, তখন থেকেই তো আমি তোমাকে নাত্-বউ করবো বলে পছন্দ করে রেখেছিলুম। সে সব কথা কি তুমি সব ভুলে গেলে?

বিশাখা বললে—ভুলিনি। সে-সব কথা আমি কিছুই ভুলিনি। কিন্তু আপনার *সেদিনকার নাতি কি আজকের এই নাতি? এ নাতি তো খুনের আসামী!*

বউমা'র কথা শুনে ঠাকমা-মণি একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ তাঁর মুখ দিয়ে আর কোনও কথাই বেরোল না। বললেন—পেটে-পেটে তোমার এতো শয়তানি বুদ্ধি?

বিশাখা বলে উঠলো—কি বললেন?

—বলছি, এ কথা তোমার মুখ দিয়ে বেরোল বলে আজ আমি কিছু বললুম না, কারণ তুমি এখন আমার নাত্-বউ! কিন্তু অন্য কেউ বললে আমি তার মুখে ঝামা ঘষে দিতুম!

বিশাখা বললে এখনও তাই করুন না! আমার মুখে ঝামাই ঘষে দিন না—

বলে আবার হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠলো।

ঠাকমা-মণি এবার নিজেকে অতি কষ্টে সম্বরণ করে নিলেন। তারপর নিজের থান-ধুতি দিয়ে বউমা'র চোখ-মুখ মুছিয়ে দিতে দিতে বলতে লাগলেন—রাগ করো না বউমা। আমি বুড়ো মানুষ, নাতির শোকে আমার মাথার ঠিক নেই, কি বলতে কি বলে ফেলেছি। তুমি কিছু মনে করো না।...তা তোমার ক্ষিধে পেয়েছে? কিছু খাবে?

বিশাখা বললে—না।

তারপর একটু থেমে বললে—এই নিন, আপনার আলমারির চাবিগুলো নিন—

—চাবি?

বিশাখা তার আঁচল থেকে দু' গোছা চাবি খুলে নিয়ে ঠাকমা-মণির দিকে হাত বাড়িয়ে এগিয়ে দিলে। বললে- হ্যাঁ, আপনার টাকা আর গয়নার আলমারি দুটোর চাবি আপনি ফিরিয়ে নিন। টাকা দিয়ে আর কখনও মানুষের মন কিনতে চেষ্টা করবেন না—

ঠাকমা-মণি বললেন—কি বলছো তুমি বউমা?

বিশাখা বলে উঠলো—হ্যাঁ, ঠিকই বলছি। টাকা দিয়ে আর যা-ই কেনা যাক মানুষের মন কিনতে চেষ্টা করবেন না।

—কি বললে? কি বললে তুমি?

ঠাকমা-মণি প্রথমটায় চমকে উঠেছিলেন, তারপর কিছুক্ষণ মুখ দিয়ে কোনও কথা বেরোল না। তারপর আবার বললেন—তুমি যা বললে তা আবার বলো?

—বললাম টাকা দিয়ে মানুষের মন কিনতে চাইবেন না—

—ঠাকমা-মণি বললেন কে বললে টাকা দিয়ে তোমার মন কিনতে চাইছি? তুমি গরীব ঘরের মেয়ে, টাকার খুব অভাব ছিল তোমার। তাই ভেবেছিলাম যে এ-বাড়ির বউ হয়েছো বলে তোমাদের টাকার কষ্ট কখখনো থাকবে না। এইটুকুতেই তুমি রেগে গিয়ে কিনা বললে টাকা দিয়ে তোমার মন কিনতে চাইছি? এত নীচ তোমার মন? এতদিন তোমাকে লেখাপড়া শিখিয়ে আজ তার এই ফল হলো?

বিশাখা কথাগুলো শুনে আবার কাঁদতে লাগলো। সে-কান্না আর যেন তার থামতেই চায় না।

—কেন, কাঁদছো কেন? আমার কথার জবাব দাও? মানুষের জীবনে টাকার কি কোনও দাম নেই? টাকা দিয়ে মানুষের মন কেনা না যাক, কিন্তু মানুষের জীবনে বিপদে-আপদে টাকার কি কোনও দাম নেই? টাকা কি এতই ফ্যালনা জিনিস? বলো, আমার কথার জবাব দাও তুমি?

বিশাখা তখন বলে উঠলো—যান, আপনি আমার সামনে থেকে চলে যান, আমি আর আপনার সঙ্গে কোনও কথা বলতে চাই না—

ঠাকমা-মণি বললেন—আমি কেন চলে যাবো? এ আমার বাড়ি, আমি এখানেই থাকবো। আমি যতোদিন বাঁচবো ততোদিনই আমি এ-বাড়িতে থাকবো। কারো কথাতে আমি এ-বাড়ি ছাড়বো না।

বিশাখা বললে—তাহলে আমাকে আমার বাড়িতে পৌঁছিয়ে দিন—

—তুমি তো এ-বাড়ির বউ, এ-বাড়ি তো তোমার শ্বশুরবাড়ি। তোমার শ্বশুরবাড়িতে তুমি থাকবে না?

—না। এ-বাড়ি আমার শ্বশুরবাড়ি নয়।

—কেন, এ-বাড়ি তোমার শ্বশুরবাড়ি নয় কেন? এ-বাড়ির ছেলের সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়নি?

—না, আপনার নাতির সঙ্গে আমার বিয়ে হয়নি।

—বিয়ে হয়নি মানে?

বিশাখা বললে—যা হয়েছে তাকে বিয়ে বলে না।

—বিয়ে বলে না তো কি বলে?

বিশাখা বললে—জোর-জবরদস্তি করে বিয়ে দেওয়াটাকে বিয়ে বলে না।

ঠাকমা-মণি স্তম্ভিত হয়ে গেলেন বউমা'র কথা শুনে।

—বললেন—তোমার সঙ্গে সৌম্যর জোর-জবরদস্তি করে বিয়ে দিয়েছি?

হ্যাঁ, আমার সঙ্গে তো সন্দীপের বিয়ে হচ্ছিল। তাকে জোর করে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে আমার সঙ্গে আপনার নাতির বিয়ে দিয়ে দিলেন। সেটাকে জোর-জবরদস্তি বলে না তো কি বলে?

ঠাকমা-মণি তখন পাথর হয়ে গেছেন বউমা'র কথা শুনে। বললেন—এখন তুমি এই কথা বলছো? অথচ বিয়ের মন্ত্র পড়েই তো তোমাদের বিয়ে হলো! সে-বিয়ের সাক্ষীও তো ছিল সবাই—

—হ্যাঁ সাক্ষী ছিল বটে! কিন্তু পুলিশ ছাড়া আর কে সাক্ষী ছিল?

ঠাকমা-মণি বললেন—শুধু কি পুলিশ? সম্প্রদান যিনি করলেন তিনি তো শুনেছি একজন উকিল মানুষ। তিনিও সাক্ষী ছিলেন। আর সন্দীপ ছোকরাও তো ছিল সেখানে, যার সঙ্গে তোমার বিয়ে হতে যাচ্ছিল।

—কিন্তু ফুলশয্যা, গায়ে হলুদ, বউভাত?

ঠাকমা-মণি বললেন—এই-ই যদি তোমার মনে ছিল, তাহলে তুমি তোমার সিঁথিতে সিঁদুর লাগাতে দিলে কেন? কেন তুমি তখন তাহলে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলে না?

বিশাখা বলে উঠলো—প্রতিবাদ? প্রতিবাদ করলে কি আপনি আমাকে আস্তো রাখতেন?

—কেন, আস্তো রাখতুম না কেন?

বিশাখা বললে—যাতে আস্তো থাকি তার জন্যে তো আপনি কোর্ট থেকে আটজন পুলিশ নিয়ে গিয়েছিলেন। সে-সব কথা আপনার না মনে থাকতে পারে, কিন্তু আমার সব মনে আছে।

—কিন্তু কোর্টে? কেন সেই বিয়ের বেনারসী পরে সিঁথিতে জবজবে সিঁদুর পরে জজের সামনে গিয়ে হাজির হয়েছিলে? কেন জজের সামনে গিয়ে বললে না যে আসামীর সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়নি। তারপর আমার অ্যাডভোকেট মিস্টার দাশগুপ্ত

চেম্বারে গিয়েও তো সে-কথা বলোনি? বলোনি তো যে সে-বিয়ে তোমার বিয়েই নয়? বলোনি তো যে সে-বিয়ে অসিদ্ধ?

তারপর একটু থেমে আবার বলতে লাগলেন—আর টাকা? ওই সন্দীপ ছোকরা। যার সঙ্গে তোমার বিয়ে প্রায় হয়েই যাচ্ছিল, সে? সে কতো টাকা নিয়েছে তা জানো?

—সন্দীপ? সন্দীপ টাকা নিয়েছে?

ঠাকমা-মণি বললেন—টাকা নেয়নি? তুমি কি মনে করো সে তোমাকে ওমনি-ওমনি ছেড়ে দিয়েছে? সন্দীপকে কি সোজা ছেলে মনে করো? সে তো পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়েছে।

বিশাখা যেন কথাটা বিশ্বাস করলে না। বলে উঠলো—সন্দীপ পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়েছে?

—হ্যাঁ শুধু পঞ্চাশ হাজার টাকাই নয়। প্রথম কিস্তিতে পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়েছে। এর পর যতো টাকা সে চাইবে ততো টাকাই আমি তাকে দেব! দরকার হলে দু'-তিন-চার লাখ টাকাও সে নেবে! যা সে চাইবে তাই-ই তাকে দেব! টাকা না দিলে কি সে তোমাকে ওমনি-ওমনি ছেড়ে দিয়েছে?

বিশাখা আবার জিজ্ঞেস করলে—কি বললেন? সত্যিই সন্দীপ আমাকে বিক্রি করে দিয়েছে? আপনি সত্যিই বলছেন?

ঠাকমা-মণি বললেন—আমার কথা যদি তোমার বিশ্বাস না হয় তো তুমি সন্দীপকেই জিজ্ঞেস করতে পারো। আমি তোমাকে মিথ্যা কথা বলতে যাবো কেন?

বিশাখা কি বলবে বুঝতে পারলে না! জিজ্ঞেস করলে—সন্দীপ কোথায়?

—সে তো বেড়াপোতাতে! তুমি কি তার সঙ্গে কথা বলতে চাও?

বিশাখা বললে—আমি যে কথাটা বিশ্বাস করতে পারছি না। কি করবো আমি তাও বুঝতে পারছি না—

ঠাকমা-মণি বলেন—ঠিক আছে, আমি তাকে সরকারবাবুকে দিয়ে ডেকে পাঠাচ্ছি—

তারপর মল্লিক-মশাই সেদিনই সন্দীপকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। সন্দীপ ব্যাঙ্কের ছুটির পর এসেছিল। কিন্তু আসার পর সন্দীপের মনে হয়েছিল বিশাখার শ্বশুরবাড়িতে না এলেই বুঝি ভালো হতো।

যখন সন্দীপ এলো তখন ঠাকমা-মণিকে জিজ্ঞেস করেছিল—আমাকে ডেকে পাঠিয়ে-ছিলেন কেন ঠাকমা-মণি?

ঠাকমা-মণি বলেছিলেন—না ডেকে কি করবো বাবা, বউমা যে কেবল কাঁদছে। কান্না আর তার থামছে না। সন্দীপ জিজ্ঞেস করেছিলেন—কেন, কাঁদছে কেন? কি হয়েছে?

—তা কি করে জানবো বলো? তা যদি জানতুম তো তোমাকে কি ডেকে পাঠাতুম? কান্নাও থামাচ্ছে না, কিছু খাচ্ছেও না। এ-রকম করে থাকলে আমি তো বউমাকে আর বাঁচাতেও পারবো না। তুমি একটু বুঝিয়ে বলো ওকে—

—কই? ও কোথায়, কোন্ ঘরে?

এখনও সন্দীপের মনে আছে যখন সন্দীপ সেদিন বিশাখার ঘরে পৌঁছিয়েছিল তখন সে বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে-শুয়ে কাঁদছিল। ঠাকমা-মণি ঘরের ভেতরে ঢোকেননি।

সন্দীপ ঘরে ঢুকেই বিশাখার নাম ধরে ডেকেছিল। সন্দীপের গলার আওয়াজ পেয়ে বিশাখা যেন আরো জোরে জোরে কেঁদে উঠেছিল। সন্দীপ বললেন—ও বিশাখা, বিশাখা, আমি সন্দীপ। চেয়ে দেখ, ও বিশাখা—

সন্দীপের গলা শুনে বিশাখা কোথায় মুখ তুলে দেখবে, তা নয়। সে আরো জোরে কাঁদতে আরম্ভ করেছিল। সন্দীপ তখন কি করবে বুঝতে পারছিল না। বলেছিল—ও বিশাখা, আর কেঁদো না, থামো, থামো। আমি সন্দীপ—আমার দিকে চেয়ে দেখ—

তখন যেন প্রথম সন্দীপের কথাগুলো তার কানে গিয়েছিল। বিশাখা কাঁদতে-কাঁদতে বলেছিল—তুমি কেন এসেছো? কেন তুমি এসেছো?

সন্দীপ বলেছিল—আমি তোমাকে দেখতে এসেছি বিশাখা। দেখতে এসেছি কেমন আছো তুমি!

এ-কথাতে যেন আগুনে ঘি পড়েছিল। বিশাখা বলে উঠেছিল—তুমি চলে যাও, বেরিয়ে যাও আমার সামনে থেকে, বেরিয়ে যাও—

সন্দীপ বলেছিল—কি বলছো তুমি: আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছ তুমি? আমি তোমাকে দেখতে এসেছি কেমন আছো তুমি?

তারপর যতোবার সন্দীপ বিশাখাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়েছিল ততোবার সে সন্দীপকে গালাগালি দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে বলেছিল। বলেছিল—যাও, বেরিয়ে যাও—তোমাকে আর কখনও এ-বাড়িতে আসতে হবে না—

সন্দীপ বলেছিল—আমি তো তোমার ভালোর জন্যেই এসেছিলুম—

—আমার ভালো আর তোমায় দেখতে হবে না। আমাকে নরকের মধ্যে ঠেলে দিয়ে এখন আমার ভালো করতে এসেছো?

সন্দীপ বলেছিল—তোমাকে আমি নরকের মধ্যে ঠেলে ফেলে দিয়েছি? বলছো কি তুমি?

বিশাখা চিৎকার করে বলে উঠলো—নরক নয়? এটা কি স্বর্গ?

সন্দীপ বলেছিল—জীবনে কখন তোমার খাওয়া-পরার জন্যে ভাবতে হবে না। সারা জীবন পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে আরাম করবে, একে যদি তুমি স্বর্গ না বলো তো আর কাকে তুমি স্বর্গ বলবে?

এবার আর বিশাখা নিজেকে সামলে নিতে পারলো না। বিছানার ওপরে উঠে বসলো। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে সন্দীপকে ধাক্কা দিয়ে ঘরের বাইরে ঠেলে দিয়ে বলেছিল—যাও, যাও, তোমাকে আর মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা দিতে হবে না। যাও, বেরিয়ে যাও আমার ঘর থেকে—

হৈ-চৈ শুনে ঠাকমা-মণি ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়েছিলেন। বলেছিলেন—ও কি করছো বউমা? ও কি করছো? সন্দীপকে তুমি তাড়িয়ে দিচ্ছ কেন? ওকে তো আমিই ডেকে এনেছি—আমার কথা শুনেই তো সন্দীপ এ-বাড়িতে এসেছে—

—কেন ডেকে এনেছেন? কি জন্যে?

—আর কি জন্যে? তোমার ভালোবাসার জন্যে। তুমি না খেয়ে-দেয়ে কান্নাকাটি করছো, দিন-রাত তোমার ঘুম নেই, এ-রকম করলে কি তুমি বাঁচবে?

বিশাখা বলে উঠেছিল—আমাকে ফাঁসির আসামীর সঙ্গে বিয়ে দিয়েও আপনার আশ মিটলো না, আবার আমাকে বাঁচাতেও চাইছেন? আমাকে বাঁচিয়ে রেখে দগ্ধে দগ্ধে মারতে চাইছেন আপনারা? আমি আপনার কি ক্ষতি করেছি বলুন? আমি কি এমন ক্ষতি করেছি যে আমাকে এমন দগ্ধে দগ্ধে মারবেন আপনি?

ঠাকমা-মণি আর বেশি কথা বললেন না। সন্দীপকে শুধু বললেন—তুমি যাও বাবা, আমার বউমা'র মাথা খারাপ হয়ে গেছে—তুমি এসো এখন—আমার কপালে সুখ নেই, তুমি কি করবে?

এর পর সন্দীপ আর সেখানে দাঁড়ায়নি। সোজা চলে এসেছিল বাড়িতে।

কিন্তু যে বিশাখা এমনি করে তাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল সেই তার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে আবার কেন ডাক পড়লো তার? তবে কি তার মন এখন একটু শান্ত হয়েছে? কে জানে?

অফিসের ছুটি হওয়ার পরেই সন্দীপ উঠলো। মুহম্মদ হাশেমের ঘরে ঢুকলো। হাশেম তখনও কাজ করছিল নিজের টেবিলের কাছে বসে।

সন্দীপ বললে—আমি এখন যাচ্ছি হাশেম, আমার একটা জরুরী কাজ আছে—

বলে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো।

পুরাণে লেখা আছে যে 'কাশী' পৃথিবীর বাইরে। সন্দীপও ভাবে সে নিজেও বোধহয় পৃথিবীর বাইরে। সে নিজে এই পৃথিবীতে থেকেও সকলের সঙ্গে কেন তাহলে খাপ খাওয়াতে পারে না? অথচ কেন সকলের সুখ-দুঃখ তার নিজের সুখ-দুঃখ হয়ে ওঠে? যদি সে পৃথিবীর বাইরেই হয়, তাহলে মাসিমার চিকিৎসার জন্যে কেন সে এত ভেবে মরে? কেন বিশাখার সঙ্গে সে ফাঁসির আসামী সৌম্যবাবুর বিয়েতে আপত্তি করলে না? কেন সেদিন সে বিদ্রোহ করলে না? কেন সে ঠাকমা-মণির মুখের ওপর বললে না যে—এ-বিয়েতে তার আপত্তি আছে। কেন বললে না—সে নিজেই বিশাখাকে বিয়ে করবে।

নিজেকে এক একবার খুব সুখী মনে হয় সন্দীপের। সবকিছু হারিয়েও সবকিছু পাওয়ার যেমন একরকম সুখ আছে, এ যেন সেই রকমের সুখ! সুখ যে শুধু পাওয়ার মধ্যেই আছে, তা তো নয়। দেওয়ার মধ্যেও তো সুখ আছে। কেউ পেয়ে সুখ পায়, কেউ বা সুখ পায় দিয়ে। মহাপুরুষেরা তো বলেন দেওয়ার মধ্যে যে সুখ আছে সেই সুখটাই তো সত্যিকারের সুখ!

কিন্তু তাহলে সন্দীপের মনে মাঝে মাঝে কষ্ট হয় কেন? কেন সে সেই জন্যে মাঝে মাঝে মন-খারাপ করে? সেই মন-খারাপের সময়ে সে মাঝে মাঝে কোনও মানুষের দরকারের অতিরিক্ত কাউকে দিয়ে ফেলে? হাশেমকে কেন সে প্রমোশন পাইয়ে দিলে? কেন সে সেদিন হাওড়া স্টেশনের বাইরে এক অন্ধ ভিখিরিকে একটা আস্ত দশ টাকার নোট দিয়ে ফেললে? এ-সব কেন করে সে? এর কারণটা কি?

পরের প্রয়োজনটা যে তার নিজের প্রয়োজনের চেয়ে আরো বড়ো, তা তো নয়। ভিখিরিটা অন্ধ। সাধারণতঃ দশ পয়সা বিশ পয়সা পেতেই সে অভ্যস্ত। তাই হাত দিয়ে যখন লোকটা বুঝতে চেষ্টা করছিল ওটা কিসের কাগজ, তখন সন্দীপই বলে দিয়েছিল—ওটা দশ টাকার নোট। কেউ কেড়ে নিতে পারে, একটু সাবধানে রেখো—

তারপরে সন্দীপ আর সেখানে দাঁড়ায়নি। বিশাখার বিয়ে হওয়ার আগে সন্দীপ একরকম মানুষ ছিল, কিন্তু বিশাখার বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর থেকেই সন্দীপ একেবারে অন্যরকম মানুষ হয়ে গিয়েছিল। তখন থেকে সে পৃথিবীটাকে অন্য দৃষ্টি দিয়ে দেখতে আরম্ভ করেছিল। যতোদিন সে চাকরি পায়নি, যতোদিন তার নিজের অর্থাভাব ছিল ততোদিন সে ছিল খানিকটা স্বার্থপর। কিন্তু বিশাখার বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর থেকেই সে যেন হঠাৎ মুক্তহস্ত হয়ে গেল, নিজের ওপর তার বিশ্বাস বেড়ে গেল। নিজেকে সে সমস্ত পৃথিবীতে বিস্তার করে দিলে। নিজেকে বিস্তার করে দেওয়ার পর থেকেই সে নিজেকে পেয়ে ঐশ্বর্যশালী হয়ে উঠলো।

বিডন স্ট্রীটের বাড়িতে গিয়ে যখন সে পৌঁছুল তখন দেখলে বাড়ির সামনে দু তিনটে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। অনেক দিন পরে গিরিধারী সামনে এসে বরাবরের মতো সেলাম করলে। সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—বাড়িতে কারা এসেছে গিরিধারী?

গিরিধারী বললে—ডাগ্‌দার লোগ্‌ আয়া হ্যায় হুজুর।

ডাক্তার? ডাক্তার বাড়িতে আসা মানে নিশ্চয়ই বাড়িতে কারো অসুখ হয়েছে?

—কার অসুখ হলো আবার গিরিধারী? বউরাণীর?

গিরিধারী বললে—নেহি, মাল্‌কিন্‌ কো হুজুর।

—মাল্‌কিন্‌?

সন্দীপ তাড়াতাড়ি সোজা বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়লো। কিন্তু মল্লিক-কাকার সেরেস্তার সামনে গিয়ে দেখলে সেরেস্তার দরজায় তালা ঝুলছে। কোথায় গেলেন

মল্লিক-কাকা? মল্লিক-কাকা তো সারাদিন বাড়ির ভেতরে থাকেন। কালে-ভদ্রে জরুরী কাজে বাইরে বেরোন। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পরই মল্লিক-কাকা ব্যস্ত হয়ে নিচের এলেন। বললেন—তুমি এসে গেছ?

সন্দীপ বললে—হ্যাঁ, আপনিই তো আসতে বলেছিলেন—

সেরেস্তার তালা খুলে মল্লিক-কাকা ভেতরে ঢুকলেন, সঙ্গে সঙ্গে সন্দীপও ঢুকলো। ক্যাশবাক্স খুলে মল্লিক-কাকা একগাদা নোট বার করলেন। নোটগুলো ভালো করে গুণলেন। তারপর টাকাগুলো ফতুয়ার পকেটে রেখে আবার বাইরে চলে গেলেন। বললেন —আমি আসছি, তুমি বোস। বাড়িতে হঠাৎ খুব বিপদ চলেছে—

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—কি বিপদ?

মল্লিক-কাকা বললেন—ভীষণ বিপদ। ঠাকমা-মণি হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গেছেন—

—অজ্ঞান হয়ে গেছেন? কিন্তু দুপুরবেলা আপনি যখন আমার ব্যাঙ্কে গিয়েছিলেন তখন তো কিছু বললেন না।

মল্লিক-কাকা বললেন—তুমি বোস, আমি এসে সব বলছি!

বলে আবার বাড়ির ভিতরে চলে গেলেন। সমস্ত বাড়িটা তখন যেন ঝিমোচ্ছে। একটু পরেই 'সিংহবাহিনী'র আরতি শুরু হলো। আগে যখন সন্দীপ এ-বাড়িতে থাকতো তখন ঠাকমা-মণি রোজ তিনতলা থেকে মন্দিরে এসে আরতি দেখতেন, দুই হাত জোড় করে 'সিংহবাহিনী'র দিকে চেয়ে প্রণাম করতেন। ঘরে ঘরে প্রসাদ পাঠিয়ে দেওয়া হতো। মল্লিক-কাকার ঘরেও পাঠিয়ে দেওয়া হতো সে-প্রসাদ।

সন্দীপ সেরেস্তার ভেতরে একলা বসে ছিল। আগেকার মতো মল্লিক-কাকার জন্যে সেদিনও একজন কলাপাতার ওপরে সিংহবাহিনীর প্রসাদ রেখে দিয়ে চলে গেল। বাড়িতে যদি বাড়ির মালিকের অসুখও হয়, তাহলেও বাড়ির বাঁধাধরা নিয়ম-কানুন বদলায় না। সমস্ত নিয়ম-কানুন একইরকম করে চলবে, শুধু এক পুরুষের পর আর এক পুরুষ বদলাবে। পৃথিবীতে কতো মহারাজা-রাজা-প্রেসিডেন্ট-প্রাইম মিনিস্টার এসেছে আবার একদিন চলেও গেছে, কিন্তু এই সূর্যটা? এই সূর্যটা উঠতে আর অস্ত যেতে কি কখনও জায়গা বদল করেছে?

মল্লিক-কাকা তখনও আসছেন না। যখন শেষ পর্যন্ত এলেন তখন প্রায় আধঘণ্টা সময় কেটে গেছে। এসেই বললেন—প্রসাদটা দিয়ে গেছে বুঝি? খেয়ে নাও—

—আপনি খান।

—না না, তুমি আপিস থেকে এসেছো, সেই কোন সকালে ভাত খেয়ে বেরিয়েছো তুমি। খাও, তুমিই খাও—আমি তো বাড়িতেই রয়েছি—

তারপর একটু থেমে বললেন—এই এতক্ষণে ডাক্তাররা চলে গেল। আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম।

—কেমন আছেন ঠাকমা-মণি!

মল্লিক-কাকা বললেন—অবস্থা ভালো নয়।

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—হঠাৎ এমন হলো কেন? ডাক্তাররা কি বলেছে?

মল্লিক-কাকা বললেন—আরে, আমি দুপুরবেলা যখন তোমার ব্যাঙ্কে গিয়েছিলুম তখনও তো কিছুই হয়নি, তোমার ওখান থেকে বাড়িতে এসেই শুনি ঠাকমা-মণি হঠাৎ নাকি অজ্ঞান হয়ে গেছেন—

—তারপর?

—তারপর আর কী? আমি সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারবাড়ি ছুটলুম। ডাক্তারবাবুরা এসে পরীক্ষা করলেন। এই এতক্ষণ ধরে তাঁরা পরীক্ষা করছিলেন। দু'জন পাড়ার নামকরা ডাক্তার।

—কি বললেন তাঁরা।

—কি আর বলবেন। দু'জনেরই এক মত। বললেন—কেস সিরিয়াস! ওষুধপত্র

লিখে দিলেন। আমি বাজার থেকে সে-সব ওষুধ কিনে আনলুম। সেই ওষুধ খাইয়ে দেওয়া হলো ঠাকমা-মণিকে। একঘণ্টা ধরে সেই ওষুধের ফলাফল দেখে ডাক্তারবাবুরা এখন চলে গেলেন।

সন্দীপ বললে—ওষুধে কিছু উন্নতি হলো?

—না এখনও সেই রকমই অজ্ঞান হয়ে একভাবে শুয়ে আছেন। নাড়ির গতি খুব নেমে এসেছে। খুবই ভয়ের ব্যাপার। চোখ চাইছেন না। কোনও কথায় সায় দিচ্ছেন না। ডাক্তারবাবুরা আবার কালকে সকালবেলাই আসবেন। ওদিকে মেজবাবুকে ট্রাঙ্ক-কল করে ঠাকমা-মণির সব খবর দিয়েছি। তিনি বাড়িতে ছিলেন না। খবরটা মেজ বউমাকে দিয়ে বলেছি মেজবাবু বাড়িতে এলেই যেন তাঁকে সব জানানো হয়।

—ঠাকমা-মণিকে এখন কে দেখছে? নার্স রাখা হয়েছে?

মল্লিক-কাকা বললে—না, শেষ পর্যন্ত নার্স রাখতেই হবে বোধহয়। এখন দেখাশোনা করছে বউমাই। বউমা ছাড়া বাড়িতে আর তো কেউ নেই—

—বউমা? বউমা দেখাশোনা করছে? তার মানে?

—হ্যাঁ। আমাদের বিশাখা!

সন্দীপ অবাক হয়ে গেল কথাটা শুনে। বিশাখা তো নিজেই একজন রোগী। সে আবার কি করে ঠাকমা-মণির দেখাশোনা করছে?

মল্লিক-কাকা বললেন—ওই বউমা'র জন্যেই তো ঠাকমা-মণির শরীর এমন খারাপ হলো। মানুষ কতো দিন আর না ঘুমিয়ে থাকতে পারে? সৌম্যবাবুর জন্যে ভেবে ভেবে ঠাকমা-মণির শরীর আগের থেকেই তো খারাপ হচ্ছিল, তারপর সেই পুলিশ পাহারা-ওয়ালা নিয়ে বেড়াপোতায় গিয়ে নাতির বিয়ে দিয়ে নিয়ে আসা! সেও কি কম ঝামেলা? তারপর যে মনে একটু শান্তি পাবেন তাও তো নয়। তখন নতুন বউ খায় না দায় না, কান্নাকাটি করে, দিনে রাতে ঘুমোয় না। এত ধকল ওই বুড়ো শরীরে সইবে কেন? তারই ফল এটা—কোথায় বউ শাশুড়ীর সেবা করবে, না শাশুড়ী বউ-এর সেবা করতে করতে অস্থির!

সন্দীপ চুপ করে কথাগুলো ভাবতে লাগলো। তারপর বললে—তাহলে আমি আজ উঠি। আপনাদের বাড়ির এই বিপদের সময়ে আমি আর বসে থেকে কি করবো?

—কেন, তুমি বউমা'র সঙ্গে দেখা করবে না?

সন্দীপ বললে—আর কি করতে দেখা করবো? সেদিন তো বিশাখা আমাকে তাড়িয়েই দিয়েছিল। আজও যদি আমাকে আবার তাড়িয়ে দেয়?

—না, না, এসেছো যখন তখন একবার দেখা করে যাও। এসো, আমার সঙ্গে এসো—

বলে তিনি সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগলেন, আর সন্দীপও তাঁর পেছনে পেছনে চললো। তারপর তেতলায় উঠে গলাটা নিচু করে ডাকতে লাগলেন—বিন্দু, ও বিন্দু—

বিন্দু আসতেই মল্লিক-কাকা বললেন—বউমা কোথায় রে?

বিন্দু বললে—ঠাকমা-মণির মাথার কাছে বসে আছে—

মল্লিক-কাকা বললেন—বউমা'কে একবার ডেকে দে, বল গিয়ে বেড়াপোতার সন্দীপ এসেছে—বউমা'র সঙ্গে একবার দেখা করবে—

পৃথিবীর একটা অমোঘ নিয়ম আছে। সে-নিয়মটা হলো এই যে কতো পরস্পর বিরোধী
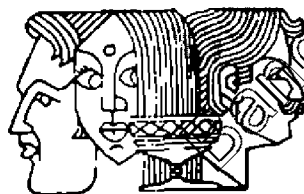
জিনিস বরাবর একসঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে থাকে। যদি আলো থাকে তো অন্ধকার থাকবেই। দিন থাকলেই রাত থাকবে, সুখ থাকলেই দুঃখ থাকবে। যদি মিলন থাকে তো বিরহ থাকবেই। জন্ম থাকলেই মৃত্যু থাকবে। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির মতো এ-নিয়মও অমোঘ। একে অস্বীকার করবে এমন শক্তি পৃথিবীর কোনও মানুষেরই নেই।

কিন্তু এই চরম সত্যটা সন্দীপ অনেক মূল্য দিয়ে তবে আয়ত্ত করতে পেরেছিল। আর এ তো সকলেরই জানা আছে যে যে-কোনও মহান সত্যকে জানতে গেলেই একটা মহান মূল্য দিতে হয়। কারণ কিছু মূল্য না দিলে তো কিছু পাওয়া যায় না।

আমাদের এই উপন্যাসের নায়ক সন্দীপের জীবন-কাহিনী হলো সেই চরম মূল্য দেওয়ারই কাহিনী।

কিন্তু সেই চরম মূল্য দেওয়ার পরিণতিতে সন্দীপ কী পেয়েছিল? তাতে তার কী লাভ হয়েছিল? কোটি কোটি মানুষের সংসারে কিন্তু এমন অল্পসংখ্যক মানুষও আছে যারা কেবল দিয়েই যায়, আর তার বদলে কী পায় তারা? কী পায়?

কিন্তু সে-কথা এখন থাক। তার আগে বলে নেওয়া যাক সেই দিনের কথা যেদিন হঠাৎ ঠাকমা-মণি অসুস্থ হয়ে পড়ে সমস্ত সংসারটা অচল করে দিয়েছিলেন।

শুধু কি অচল? সেই অচলতার মধ্যে পড়ে বাড়ির সমস্ত মানুষগুলো পর্যন্ত কেমন যেন বিকল হয়ে পড়েছিল। মল্লিক-কাকা কখনও সহজে ভেঙে পড়ে না। বিন্দু, সুধা, কামিনী থেকে আরম্ভ করে বাড়ির দারোয়ান গিরিধারী পর্যন্ত সেই দুর্ঘটনায় সেই বিপদের আশঙ্কায় যেন সমূলে নাড়া খেয়ে বিহ্বল হয়ে পড়েছিল।

সকলেরই মনে একটা প্রশ্ন—এবারে কী হবে?

ঠাকমা-মণির অসুস্থতা যেন সমস্ত বাড়িটার অসুস্থতা। বিশাখা বাড়িটার প্রত্যেক ইঁটটা থেকে আরম্ভ করে ভিতটা পর্যন্ত থরথর করে কাঁপতে আরম্ভ করেছিল। ইঁট-গুলো যেন নিঃশব্দে আর্তনাদ করে বলছিল—এবার আমাদের কী হবে? আমরা এবার কার ওপর নির্ভর করবো?

মল্লিক-কাকা বললেন—তুমি থাকো, আমি যাই এখন, আমার কাজ আছে নিচে—

সন্দীপ একলা বিশাখার অপেক্ষায় চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। আজ আবার বিশাখা তার সঙ্গে কী রকম ব্যবহার করবে কে জানে! যদি সেদিনকার মতো তাকে তাড়িয়ে দেয়? আজও যদি বলে—তুমি বেরিয়ে যাও, কেন এসেছ আবার?

সন্দীপ তার উত্তরে কী বলবে? সে কি বলবে যে তাকে মল্লিক-কাকা ডেকে পাঠিয়ে-ছিলেন বলেই সে এসেছে?

—এ কি, তুমি?

বিশাখাকে বোধহয় বলা হয়নি যে সন্দীপ এসেছে। তাই একটু এলোমেলো আগোছোলা চেহারা তার। সন্দীপকে দেখেই বললে—এ কি, তুমি?

সন্দীপ আর কী বলবে? তাই শুধু বললে—হ্যাঁ—

খানিকক্ষণের জন্যে দু'জনের মুখেই কোনও কথা নেই, তাও মাত্র এক মুহূর্ত! তারপর সন্দীপ নিজে থেকেই বললে—আমি খুব খারাপ দিনে এসে পড়েছি—

—খারাপ দিন? কেন?

সন্দীপ বললে—মল্লিক-কাকা আমার অফিসে গিয়ে আমাকে আসতে বলেছিলেন

—কেন আসতে বলেছিলেন?

সন্দীপ বললে—বলেছিলেন তুমি নাকি এ-বাড়িতে আসা পর্যন্ত খাচ্ছো না, দাচ্ছো না, ঘুমোচ্ছো না। আরো বলেছিলেন, আমি এসে তোমাকে বুঝিয়ে বললে তুমি নাকি তোমার কান্না থামাবে, তুমি আবার খাওয়া-দাওয়া শুরু করবে আমার সব কথা নাকি তুমি শুনবে!

—আর কী বলেছিলেন?

সন্দীপ বললে—কিন্তু তুমি তো জানো, সেবার আমি ও-সব কথা বলাতেই তুমি রেগে গিয়ে আমাকে গালাগালি দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছিলে!

বিশাখা বললে—আমার সব মনে থাকে, আমার সব মনে আছে। কিন্তু এবার তাহলে আবার এলে কেন?

সন্দীপ বললে—মল্লিক-কাকা যে আবার আমাকে ডাকলেন, তাই আসতে হলো! কিন্তু এসে দেখছি আজ না-এলেই বুঝি ভালো করতুম।

—কেন?

সন্দীপ বললে—এসেই মল্লিক-কাকার কাছে শুনলুম তোমার দিদি-শাশুড়ীর হঠাৎ অসুখ হওয়ার কথা! কিন্তু তোমার শ্বশুর-বাড়ির এই বিপদের মধ্যে আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাইনি। আমি চলেই যাচ্ছিলুম, কিন্তু মল্লিক-কাকা ছাড়লেন না। বললেন—না, তা হবে না, তুমি যখন এসেছ, তখন একটু দেখা করে যাও বউমার সঙ্গে—

তারপর একটু থেমে বললে—তোমার দিদি-শাশুড়ী এখন কেমন আছেন?

বিশাখা বললে—এখনও সেই রকম অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন—

—ডাক্তাররা কী বলে গেলেন?

বিশাখা বললে—তারা বললেন—স্ট্রোক!

—কেন স্ট্রোক হলো?

বিশাখা বললে—অনিয়ম করে করে। আর মেণ্টাল টেনশনও তো ছিল তার সঙ্গে।

হঠাৎ ঘরের ভেতর থেকে বিন্দু এসে কাছে দাঁড়ালো। বললে—বউদিমণি, ওষুধটা এখন খাইয়ে দেব ঠাকমা-মণিকে?

বিশাখা বললে—না, আমি যাচ্ছি, ঠাকমা-মণি কি চোখ খুলেছেন?

বিন্দু বললে—না। কিন্তু তিন ঘণ্টা অন্তর-অন্তর তো ওষুধ খাওয়ানোর কথা। তাই জিজ্ঞেস করছি—

বিশাখা বললে—তুই যা, আমি যাচ্ছি, আমি ওষুধ খাওয়াচ্ছি গিয়ে—

বলে আবার সন্দীপের দিকে চেয়ে বললে—তুমি একটু আমার ঘরে গিয়ে বোস। আমার ঘরটা চেনো তুমি।

—না, আমি কী করে চিনবো?

—বাঃ, সেদিন যে তুমি আমার ঘরে ঢুকেছিলে! চলো, আমি তোমাকে আমার ঘরে বসিয়ে দিয়ে আসছি—এসো—

ঠাকমা-মণির ঘরের সামনের বারান্দা দিয়ে খানিকটা এগিয়ে গেলেই বিশাখার ঘর।

সন্দীপকে সে-ঘরে বসতে বলেই আবার বাইরে গেল। যাওয়ার সময় বলে গেল—তুমি একটু বোস এখানে, আমি দিদি-শাশুড়ীকে ওষুধ খাইয়েই এখুনি আসছি—

বলে বিশাখা চলে গেল।

সন্দীপ আগের বারেও এ-ঘরে এসেছিল। এইটেই সৌম্যপদবাবুর ঘর। কিন্তু সেবার ঘরের ভেতরটা ভালো করে মন দিয়ে দেখেনি। এইখানেই সৌম্যপদ আর তার মেম-সাহেব বউ একদিন একসঙ্গে একই বিছানায় শুতো। এইখানেই দুজনে মদ খেয়ে একদিন অজ্ঞান হয়ে পড়ে থেকেছে। এই ঘরেই সৌম্যপদ তার বিলিতি-বউকে গলা টিপে মেরে জানালা দিয়ে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। এই সেই আশ্চর্য ঘর।

আর আশ্চর্য, এই ঘরটাই এখন বিশাখার শোবার ঘর। এই ঘরেই এখন বিশাখা রাত কাটায়! এই ঘরে বিশাখা কী করে থাকে কে জানে! এবং এই ঘরে একলা সারা জীবন সে কাটাবে কী করে?

ঘরের মধ্যে একটা ড্রেসিং-টেবিল, আর একটা মেমসাহেবের ছবি দেয়ালে টাঙানো রয়েছে। কার ছবি ওটা? মেমসাহেব বউ-এর? নাকি মেম-সাহেবের মা'র? ঘরের ভেতরের একটা ডবল-বেড্। এই খাটেই একদিন সৌম্যপদ আর তার মেম-সাহেব বউ মদ খেয়ে বদ্ধ মাতাল হয়ে শুয়ে থেকেছে, আর এই খাটেই এখন বিশাখা একলা শোয়।

হঠাৎ একজন মেয়েমানুষ ঢুকলো। হাতে একটা রুপোর ডিশে চারটে সন্দেশ নিয়ে টেবিলের ওপরে রাখলো। আর একটা রুপোর গেলাসে জল। গেলাসটা রুপোর একটা ঢাকনা দিয়ে ঢাকা। বললে—বউদিমণি আপনাকে এটা খেতে বলে দিয়েছে—

বলে বাইরে চলে গেল। তারপরেও অনেকক্ষণ সময়ও কেটে গেল। চেয়ারে বসে সন্দীপ ঘটনাটা ভাবতে গিয়ে অবাক হয়ে গেল। এ-বাড়িতে বিশাখা বউ হয়ে সুখী হবে তো!

—এ কি? তুমি এখনও সন্দেশ খাওনি? আমি যে সুধাকে দিয়ে পাঠিয়ে দিলুম!

সন্দীপ বললে—ও-সব ফরম্যালিটি আবার করতে গেলে কেন?

—না, তুমি অফিস থেকে আসছো, নিশ্চয়ই ক্ষিধে পেয়েছে তোমার। খেয়ে নাও—

বলে রুপোর ডিশটা হাতে নিয়ে সন্দীপের সামনে ধরলো।

একটা সন্দেশ হাত দিয়ে তুলে নিয়ে সন্দীপ মুখে দিয়ে বললে—আর খাবো না।

বলে জলের গেলাসটা তুলে নিলে। বিশাখা বললে—নাও, ও-সন্দেশগুলোও খেয়ে নাও—

সন্দীপ বললে—কেন? এ-সব ঝঞ্ঝাট আবার কেন করতে গেলে?

বিশাখা বললে—ঝঞ্ঝাট কেন বলছো? এ-বাড়িতে একটা জিনিস ছাড়া আর সব আছে। টাকা আছে, কাজের লোকজন আছে, সব আছে--

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—কোন জিনিসটা নেই?

—সুখ!

সন্দীপ ভালো করে তীক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে বিশাখার দিকে চেয়ে দেখলে। বিশাখা কি মিথ্যে কথা বলছে, না সত্যি কথা? এই ক'দিনের মধ্যেই বিশাখা কী করে বুঝতে পারলে যে এ-বাড়িতে সুখ নেই!

সন্দীপ বললে—এ-বাড়িতে যে সুখ নেই তা এই ক'দিনের মধ্যেই জানলে কী করে?

বিশাখা বললে—আমার দিদি-শাশুড়ীই আমাকে তা বলেছে--

—তোমার দিদি-শাশুড়ী বলেছেন?

বিশাখা বললে—হ্যাঁ। তখন দিদি-শাশুড়ীর শরীর ভালো ছিল। উনিই আমাকে বলেছিলেন যে এ-বাড়িতে আর সব কিছু আছে। টাকা, পয়সা, সোনা-রুপো, বংশের সুনাম, কোনও জিনিসের অভাব নেই। কিন্তু সুখ ছিল না। তাই সুখের জন্যেই নাকি আমাকে এ-বাড়ির বউ করে এনেছেন।

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—শুনে তুমি কী বললে?

—আমি আর কী বলবো, শুধু শুনলুম।

—তারপর?

বিশাখা বললে—তারপরে আলমারি খুলে দেখলেন কতো টাকা আছে তাঁর।

—টাকা? কতো টাকা দেখলে?

বিশাখা বললে—অনেক টাকা। থাক্-থাক্ করে সাজানো রয়েছে। অতো টাকা শুধু আমি কেন, কেউই বোধহয় জীবনে দেখেনি। কতো লাখ টাকা তা আমি জিজ্ঞেস করিনি।

—তারপর?

বিশাখা বললে—তারপর আর কী, টাকাগুলো দেখিয়ে বললেন ওই সমস্ত টাকার মালিক নাকি আমি।

—তারপর?

বিশাখা আবার বললে—তারপর আমার দিদি-শাশুড়ী আলমারির আর একটা চেম্বার খুললে। দেখলাম সেটা শুধু গয়নায় ভর্তি। কতো রকমের যে গয়না তা বলতে পারবো না আমি, তার দাম যে কতো তাও বলতে পারবো না।

—তারপর?

বিশাখা আবার বললে—তারপর নিজের আঁচল থেকে দুটো চাবির গোছা আমার শাড়ির আঁচলে বেঁধে দিলেন। বেঁধে দিয়ে বললেন—এ চাবির গোছাও তোমার কাছে থাক। যা-যা তোমার দরকার তা সব তুমি যখন ইচ্ছে খরচ করতে পারো, যে-গয়নাটা তোমার পরতে ইচ্ছে করে তা পরতে পারো—

সন্দীপ আবার জিজ্ঞেস করলে—তারপর? তারপর কী হলো?

বিশাখা বললে—তারপর থেকে চাবির গোছা দুটো আমার আঁচলেই বাঁধা রয়েছে, এই দেখ—

বলে আঁচলে বাঁধা চাবির গোছা দুটো নিয়ে সন্দীপকে দেখালে। বললে—দেখছো?

সন্দীপ বললে—তাহলে প্রথম দিকে তুমি অতো কান্নাকাটি করছিলে কেন? তুমি যা চেয়েছিলে তা তো পেয়েছে?

বিশাখা বললে—আমি কী চেয়েছিলুম?

—তুমি অগাধ টাকা-কড়ি, সম্পত্তি, দামী গয়না, এই সবই তো চেয়েছিলে?

বিশাখার মুখের চেহারা এক মুহূর্তের মধ্যে বদলে গেল। বললে—কী বললে? আমি অগাধ টাকা-কড়ি, অগাধ সম্পত্তি, দামী গয়না, এই সব চেয়েছিলুম?

সন্দীপ বললে—চাওনি তুমি?

—কীসে বুঝলে তুমি আমি ওই সব চেয়েছিলুম?

—ওই সব পাবে বলেই তো তুমি আমাকে না বলে চাকরির দরখাস্ত করেছিলে! চাকরির জন্যে ইনটারভিউও দিতে গিয়েছিলে!

বিশাখা রেগে উঠলো। বললে—কে বললে আমি অগাধ টাকা-কড়ি পাবো বলেই চাকরি করতে গিয়েছিলুম?

—তুমি নিজেই বলেছিলে। নইলে আর কে বলবে?

বিশাখা বললে—মিথ্যে কথা। আমি সেদিন তোমাকে বলেছিলুম, আমি পরাধীনতা চাই না বলেই চাকরি করতে গিয়েছিলুম, অগাধ টাকা-কড়ি পাওয়ার জন্যে চাকরির ইনটারভিউ দিতে যাইনি। তুমি এত মিথ্যে কথা বলতে শিখলে কবে থেকে?

সন্দীপ বললে—মিথ্যে কথা যে বলিনি তা প্রমাণই তো তোমার মুখ!

—তার মানে?

—তার মনে তোমার মুখই বলে দিচ্ছে তুমি টাকা-কড়ি গয়না-গাঁটি পেয়ে সুখী হয়েছ! তোমার মুখের চেহারাই তা বলে দিচ্ছে!

বিশাখা বললে—মুখের চেহারা দেখে যারা মানুষকে বিচার করে তাদের আর যাই বলা যাক, বুদ্ধিমান বলা যায় না।

সন্দীপ বললে—যারা সারা জীবন অভাবের মধ্যে কাটায় তারা যদি হঠাৎ অগাধ টাকা-কড়ি বা দামী গয়না-গাঁটি পেয়ে যায় তো তাকে সুখী বলবো না তো কী বলবো?

বিশাখা বললে—তোমার বোধহয় মনে নেই একদিন তুমিই বলেছিলে 'সুখ' কথাটা শুধু ডিক্সনারিতে পাওয়া যায়—

সন্দীপ বললে—কিন্তু সুখের ব্যাখ্যা তো সকলের কাছে একরকম নয়।

কথার মাঝখানেই কে একজন ঘরে ঢুকলো। বোধহয় বাড়ির ঝি। বললে—বউদিমণি, ঠাকমা-মণি চোখ খুলেছেন, বোধহয় তোমাকে খুঁজছেন—

বিশাখা বললে—তুমি যাও বিন্দু, আমি এখুনি আসছি—

বলে সন্দীপের দিকে চাইলো। বললে—তুমি একটু বোসো, আমি দিদি-শাশুড়ীকে দেখেই এখ্‌খুনি আসছি। চলে যেও না যেন—

বলে বিশাখা ঘর ছেড়ে চলে গেল। সন্দীপ অবাক হয়ে ভাবতে লাগলো—এ কী রকম মেয়ে বিশাখা! আগে যেদিন সন্দীপ বিশাখার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল তখন একেবারে অন্যরকম। কেঁদে-কেটে একেবারে অস্থির হয়ে গিয়েছিল এই একই বিশাখা। তাকে জোর করে গালাগালি দিয়ে শেষ পর্যন্ত বাড়ি থেকে তাড়িয়েই দিয়েছিল!

এই কি সেই বিশাখা? এই বিশাখাই যদি সেই বিশাখা হয়, তাহলে কেন এমন হলো? কেন এমন হয়?

তবে কি টাকা? অগাধ টাকা আর অগাধ টাকার গয়না? নাকি দিদি-শাশুড়ীর অসুস্থতায় বিশাখার সমস্ত মানসিকতাটা একেবারে আমূল বদলে গেল? কই, একবারও তো বেড়াপোতার কথাটা উল্লেখ করলো না! মাসিমা বা মা কেমন আছে সে-কথাও তো উল্লেখ করলে না বিশাখা!

সন্দীপের মনটা বড়ো বিষিয়ে গেল।

তবে কি বিয়ের পর সব মেয়েরই এই রকম হয়? বাপের বাড়ির কথা এমন করে তারা ভুলে যায়?

সন্দীপ অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে করে এক সময়ে অধৈর্য হয়ে উঠলো। তারপর সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এলো। বারান্দা থেকে তিন-তলার নিচের রাস্তাটার দিকে সে একবার চেয়ে দেখেই বুঝলে এখান থেকেই সেই মেমসাহেব বউকে ফেলে দিয়েছিল সৌম্যপদবাবু। তাহলে এ-দৃশ্যটা নিশ্চয়ই রোজ বিশাখার নজরে পড়ে। তাহলে কি টাকা আর গয়নার জৌলুসে বিশাখা একেবারে নিষ্প্রাণ হয়ে গিয়েছে!

তখনও বিশাখার দেখা নেই। সন্দীপ আর দাঁড়ালো না সেখানে। সিঁড়ি দিয়ে দোতলা পেরিয়ে একেবারে সোজা একতলায় চলে এল। সেখানে মল্লিক-কাকার সেরেস্তায় ঢুকে দেখলে তিনি তখন খাতা-পত্রে হিসেব লিখতে ব্যস্ত। সন্দীপকে দেখে বললেন—বসো! বউমার সঙ্গে দেখা হলো?

—হ্যাঁ, দেখা হলো।

সন্দীপ বললে—হ্যাঁ, কয়েকটা কথা হলো।

—কী রকম দেখলে? আগের বারের মতো তোমাকে তাড়িয়ে দিলে?

সন্দীপ বললে—না, একবার দেখলুম অনেক প্র্যাক্‌টিক্যাল হয়েছে!

—তাই নাকি? মা'র কথা কিছু জিজ্ঞেস করলে?

সন্দীপ বললে—একেবারে না। বিয়ে হলে বোধহয় মেয়েদের এইরকমই হয়। অনেক টাকা, অনেক গয়নার মালিক হলে সকলের যা হয় তাই হয়েছে দেখলুম। তারপর আমাকে জলখাবারও খাওয়ালে!

কথাগুলো শুনে মল্লিক-কাকা যেন খুশী হলেন বলে মনে হলো। বললেন—যাক্, ঠাকমা-মণির একটা ভাবনা চুকলো। ও'র বরাবর ভয় ছিল ও'র একটা অসুখ-বিসুখ কিছু হলে সংসার বুঝি ভেঙে পড়বে! কিছু দেখবার-শোনবার কেউ থাকবে না...... আর তা ছাড়া আমিও নিশ্চিন্ত।

—কেন?

মল্লিক-কাকা বললেন—বউমা না থাকলে তো আমার আরো দায়িত্ব বেড়ে যেত।

—কীসের দায়িত্ব?

—এই লাখ-লাখ টাকার দায়িত্ব। টাকার দায়িত্বই তো সবচেয়ে বড়ো দায়িত্ব। বউমা না থাকলে আমি কার কাছে টাকার হিসেব দিতুম? কে আমার হিসেব বুঝে নিতো? যাক, আমার দুর্ভাবনা কেটে গেল।

তারপর বললেন—দাঁড়াও, এই হিসেবটা পুরো করে নিই—

বলে আবার হিসেবের খাতা-পত্রের মধ্যে ডুবে গেলেন।

সন্দীপের মাথার মধ্যে তখন অনেক দুর্ভাবনা। অফিসের কাজের ভাবনা তো আছেই। তার ওপর বিশাখার ভাবনা একটা ছিল। সেটাও আজ দূর হয়ে গেল। বিশাখা সুখে থাকলেই সন্দীপ সুখী। এখন শুধু মাসিমার চিকিৎসার ভাবনাটা রইলো। তার সঙ্গে চিকিৎসার খরচের ভাবনা। অসুখের যন্ত্রণাটা রোগীর নিজের। কিন্তু তার পেছনে অসুখের, চিকিৎসার ভাবনা যাকে ভাবতে হয় তার যন্ত্রণাটাই তো বেশি কষ্টকর। আসলে

সব মানুষের আসল ভাবনাটা তো শরীর নিয়ে। মানুষও বলতে গেলে পশুর মতো। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই তার আহারের চিন্তা। আহারের উপকরণ যোগাড় করতে গেলেই তো টাকার প্রয়োজন। টাকা না হলে সে-উপকরণ কিনবে কি দিয়ে? সে চাষাই হোক আর শহরের লোকই হোক। সকলেরই চিন্তা তাই অর্থকে কেন্দ্র করে। আর সেই অর্থ কীসের জন্যে প্রয়োজন? শরীরের জন্যে। এই আমাদের শরীরের জন্যে। এই নরদেহের জন্যে। যা কিছু আমরা করি, যা কিছু আমরা ভাবি, যা কিছু আমরা ভোগ করি তার মূল কারণ এই দেহ, এই নরদেহ!

এতক্ষণে মল্লিক-কাকার কাজ বোধহয় শেষ হলো। তিনি মাথা তুললেন। সন্দীপের দিকে চেয়ে বললেন– এতক্ষণে হাত খালি হলো, এইবার বলো তোমার কী খবর?

সন্দীপ বললে—এত কী কাজ আপনার? এখন তো আর ঠাকমা-মণির কাছে গিয়ে রোজ হিসেব দেওয়ার দায় নেই—

—কে বললে দায় নেই? ঠাকমা-মণি বদি পড়ে থাকেন তা বলে তার জন্যে হিসেব তো আর পড়ে থাকবে না। হিসেব তার বোল আনা দাঁড়ি কড়ায়-গন্ডায় মিলিয়ে নেবেই—

—কার কাছে গিয়ে হিসেব দেবেন?

মল্লিক-কাকা বললেন—হিসেব দেব বাড়ির মালিকের কাছে।

—মালিক? বাড়ির মালিক এখন কে? তিনি তো অসুস্থ হয়ে পড়ে আছেন।

মল্লিক-কাকা বললেন—ঠাকমা-মণি অসুখে পড়ে থাকলেও মালিক এখন বউমা-মণি! তাঁর কাছেই হিসেব বুঝিয়ে দিয়ে আসতে হবে।

মল্লিক-কাকা বললেন—ঠাকমা-মণি অসুখে পড়বার আগেই আমাকে বলে রেখেছিলেন যে এখন থেকে সমস্ত হিসেব-টিসেব সব কিছু তাঁর বউমাকে রোজ বুঝিয়ে দিয়ে আসতে হবে—

—তাই নাকি?

মল্লিক-কাকা বললেন—হ্যাঁ, বউমা-মণিকে নাত-বউ করবার জন্যে তো ঠাকমা-মণির অনেক কালের সাধ ছিল, সে-সব তো তুমি জানো। বউমাকে বি-এ পর্যন্ত পাশও করিয়েছিলেন। তাই বউমা আসবার পরদিনেই আমাকে ওই কাজটার ভার দিয়েছিলেন—

তারপর একটু থেমে বললেন—হ্যাঁ, ভালো কথা। তোমার মাসিমা কেমন আছেন, বউমা-মণির মা......

সন্দীপ বললে—তিনি তো সেই নার্সিং-হোমেই পড়ে আছে। দেদার টাকা খরচ হচ্ছে। বোধহয় আর বেশিদিন চিকিৎসা চালিয়ে যেতে পারবো না—

—কেন? তোমার কি আরো টাকার দরকার? তোমাকে যে টাকা দিয়েছিলেন ঠাকমা-মণি, সে-টাকা কি ফুরিয়ে গিয়েছে?

সন্দীপ বললে—প্রায় ফুরিয়ে এলো...

—তাহলে তো তোমার আরো টাকার দরকার! এখন তো ঠাকমা-মণি শয্যায় পড়ে আছেন, যা করবার বউমা-মণিই করবেন। টাকার কথা বউমা-মণিকে বলবো? তুমি বলো তো বলি—

সন্দীপ বললে—না কাকা, আপনি টাকার কথা বিশাখাকে কিছু বলবেন না।... আমি চলি—আমাকে আবার এখনি একবার মাসিমাকে দেখতে নার্সিং-হোমে যেতে হবে!

বলে উঠলো। তারপর সোজা গেট পেরিয়ে রাস্তায় গিয়ে পড়লো।

হঠাৎ ওপর থেকে বিন্দু এসে ঢুকলো মল্লিক-মশাই-এর ঘরে। ঢুকেই বললে— ম্যানেজারবাবু, বউদিমণি সন্দীপবাবুকে একবার ওপরে ডাকছেন—

—সন্দীপবাবুকে? তিনি তো এখখুনি চলে গেলেন। কেন, কিছু দরকার আছে?

বিন্দু বললে—হ্যাঁ, বউদি-মণি তাঁকে নিজের ঘরে বসিয়ে রেখে ঠাকমা-মণিকে একটু দেখতে গেছেন, আর এদিকে সন্দীপবাবু বউদি-মণিকে কিছু না বলেই চলে গেছেন--

মল্লিক-মশাই বললেন—কিন্তু তিনি তো এই এখখুনি চলে গেলেন, এখনও পাঁচ

তপেশ গাঙ্গুলীর মনে হলো তার মতো হতভাগা মানুষ দুনিয়ায় আর একটাও নেই।

তারপর বাড়িতে গিয়েই চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ডাকতে লাগলো—ওগো, কোথায় গেলে? ও রানী, ওরে বিজলী, শোনো, শুনে যাও, কোথায় গেলি তোরা? শুনে যা তোরা—

রানী এগিয়ে এসে সামনে দাঁড়ালো। বললে—ষাঁড়ের মতো অতো চেঁচাচ্ছো কেন? কী, হলো কী?

তপেশ বললে—আর বলবো কী? ওদিকে সব্বোনাশ হয়ে গিয়েছে—

—কী সব্বোনাশ? কার সব্বোনাশ?

তপেশ বললে—শুনে এলুম তোমার বড়ো জায়ের মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে—

—বিয়ে? কার বিয়ে? বিশাখার?

—হ্যাঁ গো, তবে আর বলছি কী? তোমার বড়ো জা' এমন নেমক-হারাম জাঁহাবাজ মেয়ে-মানুষ যে আমাদের একবার নেমন্তন্নও পর্যন্ত করলে না।

রানী জিজ্ঞেস করলে—কোথায় বিয়ে হলো?

তপেশ বললে—সেই কোটিপতির নাতির সঙ্গে।

—সে তো ফাঁসির আসামী, তার সঙ্গেই বিয়ে হলো?

তপেশ বললে—হোক ফাঁসির আসামী। কিন্তু অনেক টাকা তো আছে তার। ফাঁসির আসামীর ফাঁসি হতে পারে, কিন্তু টাকার তো আর ফাঁসি হবে না। বিশাখা তো কোটিপতি হয়ে গেল।

রানী খবরটা শুনে স্তম্ভিত হয়ে রইল খানিকক্ষণ! বিজলীও সেখানে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ সব শুনছিল। সে বললে—আমি বিশাখার শ্বশুর-বাড়িতে যাবো বাবা!

তপেশ বললে—হ্যাঁ হ্যাঁ, যাবি, যাবি। আমরাও যাবো। আমরা তিনজনেই একসঙ্গে মিলে যাবো। আজকে রাত হয়ে গেছে। এখন আর গিয়ে কাজ নেই। কাল সকালবেলাই বেরিয়ে পড়বো। একেবারে সমস্ত দিনটা একসঙ্গে বিশাখার বাড়িতেই কাটাবো! দেখবি, কতো খাওয়াবে আমাদের—

তারপর রানীর দিকে চেয়ে বললে—তোমার ভালো শাড়িটাড়ি আছে তো? বড়োলোকের বাড়িতে যাচ্ছো। একটা ভালো শাড়ি-টাড়ি পরে গেলে খুব খাতির করবে।

রানী বললে—ভালো শাড়ি কি তুমি আমাকে কিনে দিয়েছ যে তাই পরে যাবো?

—তাহলে কী হবে?

বিজলী বললে—আমারও একটা ভালো শাড়ি নেই বাবা—

সত্যিই চিন্তার কথা! যার-তার বাড়ি নয়, একেবারে কোটিপতির বাড়ি। সেজে-গুজে না গেলে নিন্দে হবে। তাহলে? নতুন শাড়ি কিনতে গেলেও তো টাকার দরকার। এখন মাস-কাবারের সময় হাতে একটা টাকাও যে নেই। আপিস খোলা থাকলে না হয় আপিস থেকে টাকা ধার করা সম্ভব হতো। তাহলে তো আর ভোরবেলা শাড়ি কেনা যাবে না। দোকান তো খুলবে সেই বেলা সাড়ে দশটার পরে।

হঠাৎ মাথায় বুদ্ধি এলো। বললে—তোমার সোনার গয়না তো আছে গো?

রানী বললে—হ্যাঁ, তা তো আছে। কেন? বিক্রি করবে নাকি?

তপেশ বললে—বিক্রি নয়, সেটা বাঁধা রেখে সেই টাকাতে তোমাদের দু'জনের দু'টো শাড়ি কিনতে পারা যায়। আবার পরের মাসে আপিসের মাইনেটা পেলেই তোমার গয়নাটা ছাড়িয়ে নেব। দেবে?

টাকার লোভ আজকের যুগে পৃথিবীতে সবচেয়ে বড়ো লোভ। বিশাখার বিয়ে হয়েছে বড়লোকের নাতির সঙ্গে। স্বামী থাকুক আর না থাকুক, টাকা তো আছে। ইচ্ছে হলে বিশাখা তাদের টাকা দিয়েও উপকার করতে পারে। তার সঙ্গে দেখা করার এমন সুযোগ ছাড়াটা উচিত হবে না।

রানী রাজী হয়ে গেল। বললে—তাহলে আজকে একজোড়া বালা দিচ্ছি, সেটা নিয়ে যাও, গিয়ে বাঁধা রেখে এসে—

রানী ভেতরে গিয়ে তার বালা-জোড়া নিয়ে এসে তপেশকে দিলে। তপেশ সেটা নিয়েই বাইরে দৌড়লো। বললে—যাই, দেখি স্যাকরার দোকান খোলা আছে কিনা—

কিন্তু তখন অনেক রাত। সব দোকানই প্রায় তখন বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আবার বাড়ি ফিরে এলো। রানী বললে—কী হলো?

তপেশ বললে—দোকান-পাট সব এখন বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কাল ভোরে আবার বেরোব, তখন চেষ্টা করবো—তারপর দশ-এগারোটার পর বেরোব।

সে-রাত্রে তিনজনেই তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়লো। কিন্তু মনে যখন উদ্বেগ থাকে তখন কি মানুষের ঘুম হয়? তাই বিছানায় শোবার পরও তপেশ গাঙ্গুলীর মাথার মধ্যে দুশ্চিন্তাগুলো তাকে কুরে-কুরে খেতে লাগলো।

আস্তে-আস্তে রানী আর বিজলীও এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়লো। তাদের নিশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দের ওঠা-নামায় তা তপেশ স্পষ্ট বুঝতে পারলে। একদিন তার বউদি আর ওই বিশাখা তারই গলগ্রহ হয়ে বাড়িতে থাকতো। তখন রানী তাদের ওপর অনেক অত্যাচার করেছে। সংসারের যতো কাজের ভার রানী সেই বউদির ওপরেই চাপিয়ে দিয়েছে। বউদি সবই সহ্য করেছে মুখ বুজে। এতটুকু প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ করেনি। অথচ সেই বিশাখার কাছেই এখন যেতে হচ্ছে করুণা আকর্ষণ করবার উদ্দেশ্যে!

রানী বরাবর তপেশকে গঞ্জনা দিয়েছে। বরাবর বলেছে—সব লোকেরই মাইনে বাড়ে, আর তোমারই বা মাইনে বাড়ে না কেন?

এ-কথার কি কোনও জবাব আছে?

একটা অফিসে অনেকেই চাকরি করে থাকে। সবাই একই ধরনের কাজ করে সেখানে। কিন্তু তারই মধ্যেই হঠাৎ এক একজনের মাইনে বেড়ে যায়। সকলকে টপ্‌কে গিয়ে কেন একজন সকলের মাথায় উঠে বসে?

এর জবাব মেয়েমানুষরা বোঝে না। তাই রানীর কথার জবাবে তপেশ বলে—তুমি ও-সব বুঝবে না। যারা অফিসে কাজ করে তারাই বুঝবে।

কাজের সঙ্গে যে প্রমোশনের কোনও সম্পর্ক নেই তা বউকে বোঝানো যাবে না।

যেমন বিজলী! বিজলীকে তো বিশাখার চাইতেও দেখতে ভালো। তাহলে বিশাখার ওপরেই বা মুখুজ্জে-বাড়ির গিন্নীর নেক-নজর পড়লো কেন?

তপেশ গাঙ্গুলী বলতো--সবই ভাগ্য গো, সবই ভাগ্য! বুঝলে? নইলে বিজলী মেয়ে না হয়ে ছেলে হয়ে জন্মাতে পারতো!

সবাই ঘুমোচ্ছে কিন্তু তপেশের মাথায় এই সব ভাবনাগুলোই কেবল সারারাত গজ্‌গজ্‌ করতে লাগলো। সবে একটু তন্দ্রার মতোন এসেছে কি আসেনি, তখনই সে বিছানা থেকে উঠে পড়লো। সকলকে ডাকতে লাগলো—ওগো ওঠো ওঠো, বিজলী, ওঠ্‌রে ওঠ্‌, বেলা, হয়ে গিয়েছে!

বলে নিজে তৈরি হয়ে নিলে। রানী তপেশের এই ডাকাডাকিতে রেগে উঠলো। বললে—এত হৈ-চৈ করছো কেন?

তপেশ বললে—হৈ-চৈ করছি কি সাধে? মনে নেই আজকে বিশাখার শ্বশুর-বাড়িতে যেতে হবে?

রানীর ঘুম অসময়ে ভেঙে যাওয়ার জন্যে প্রথম থেকেই রেগে গিয়েছিল। বললে—এই জন্যেই তো চাকরিতে তোমার প্রমোশন হয় না! তুমি তোমার নিজের কাজ করে নাও না। কেবল ভোর থেকে আমার পেছনে টিক্‌টিক্‌ করা? তুমি নিজের চরকায় তেল দাও তো গিয়ে—আমার ব্যাপার আমি বুঝবো—

তপেশও রেগে গেল। বললে—তোমার এই স্বভাবের জন্যেই তো আমার ছেলে হয় না, কেবল মেয়ে বিয়োও তুমি।

শেষ পর্যন্ত রানী উঠলো, বললে—যাও যাও, সকাল বেলা তোমার মুখ দেখাও পাপ। কাজের নামে ঢু-ঢু, কেবল কথায় পঞ্চমুখ—

মিনিটও হয়নি—

তারপর গিরিধারীকে ডাকলেন। গিরিধারী আসতেই বললেন—গিরিধারী, এই এখখুনি সন্দীপবাবু এ-বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন। এখনও বোধহয় বাস-রাস্তা পর্যন্তও যাননি, তুমি দৌড়ে একবার যাও তো। দেখো তো তাঁকে পাও কিনা। যদি দেখতে পাও তো ডেকে নিয়ে এসো। বলো, বউদি-মণি তাঁকে একবার ডাকছেন!

গিরিধারী দৌড়লো বাস-রাস্তার দিকে। কিন্তু কোথাও পাওয়া গেল না তাঁকে। সন্ধ্যের অন্ধকারে সব মানুষকে স্পষ্ট দেখা যায় না। তবু গিরিধারী প্রত্যেকটা মানুষের কাছাকাছি গিয়ে মুখগুলো ভালো করে দেখতে লাগলো। না, সন্দীপবাবু নয়, অন্য লোক। অনেকক্ষণ চেষ্টা করেও যখন সন্দীপবাবুকে দেখতে পেলে না, তখন হতাশ হয়ে বাড়ি ফিরে এলো।

মল্লিক-মশাই তখন ঘর থেকে বেরিয়ে সন্দীপের জন্যে বাইরে গেটের কাছে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করেছিলেন। তখন গিরিধারী এলো। বললে—না ম্যানেজারবাবু, সন্দীপ বাবুজীকে কোথাও পেলুম না—

—পেলে না? ভালো করে খুঁজেছ তো?

—হ্যাঁ ম্যানেজারবাবু, সব লোকের মুখ খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখেছি। বাবুজীকে দেখতেই পেলুম না কোথাও—

তখন অফিসের ছুটির পরে মানুষের ভিড় বাসে-ট্রামে উপচে পড়ছে। তারই মধ্যে সন্দীপ কোনও রকমে একটা বাসের মধ্যে জায়গা করে নিয়েছিল। বাসের ছাদের ওপরে লাগানো রড্‌টা ধরে সে কোনও রকমে আত্মরক্ষা করছিল। কিন্তু তাতে তার কোনও কষ্ট হচ্ছিল না। কষ্ট মনে করলেই কষ্ট। না, তার কোনও কষ্ট নেই। সে ভালো চাকরি করছে, মাইনে পাচ্ছে। অথচ এই শহরেই কতো লক্ষ-লক্ষ লোক বেকার হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। 'স্যাক্সবী-মুখার্জি' কোম্পানীর মতো কতো ফ্যাক্টরী ক্লোজড্ হয়ে গিয়েছে। কতো মিল্ লক-আউট হয়ে পড়ে আছে। এই লক্ষ-লক্ষ বেকারের মধ্যে সে তো তবু চাকরি করছে। মাস-কাবারি মাইনে পাচ্ছে। সুতরাং সে তো সুখীই।

আর বিশাখা? বিশাখা গাঙ্গুলী নয়, বিশাখা এখন বিশাখা মুখার্জি হয়েছে। কতো টাকার মালিক হয়েছে। কতো গয়নার মালিক হয়েছে। সুতরাং তাকে তো সুখী বলতেই হবে।

অথচ এই একটু আগেই বিশাখা বলছিল—তার শ্বশুরবাড়িতে সুখ ছাড়া আর সমস্ত কিছুই আছে।

আসলে টাকাই যে সুখের একমাত্র মূল সেটা তো সবাই বলে। তাহলে বিশাখা কেন বললে, তার শ্বশুরবাড়িতে মোটেই সুখ নেই। অথচ তারই কাকা তপেশ গাঙ্গুলী মশাই কেন টাকার পেছনে ঘোরেন?

হঠাৎ পেছন থেকে কার যেন গলা শোনা গেল—ভায়া, কী খবর, ও ভায়া—

সন্দীপ যে-দিক থেকে কথাগুলো আসছিল সেই দিকে চেয়ে দেখলে। আশ্চর্য, যার কথা সে ভাবছিল সেই তপেশ গাঙ্গুলীকেই দূরে দেখলে। বললে—আরে আপনি?

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—তুমি কোথা থেকে? অফিস থেকে?

সন্দীপ বললে—অফিস থেকে বাড়ি যাচ্ছি। আপনি কোথা থেকে?

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—আমি আর কোথায় যাবো ভাই, মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ করতে গিয়েছিলুম। সেখান থেকেই ফিরছি। কতো জ্যোতিষীকে দেখালুম, কত সাধু-

সন্ন্যাসীর কাছে মেয়ের হাত দেখালুম, কিছুতেই কিছু হচ্ছে না—

এর উত্তরে সন্দীপ কী-ই বলবে, কী-ই বা করতে পারে সে? তখনও বিশাখার কথাই মনের ভেতরে গুঞ্জন করছিল।

তপেশ গাঙ্গুলী এবার জিজ্ঞেস করলে—বউদির কী খবর?

সন্দীপ বললে—তাঁর অসুখের কথা শুনেছেন তো?

—কই, না তো!

—হ্যাঁ, তিনি তো অনেক দিন ধরেই ভুগছিলেন, এখনও সেরে ওঠেননি। চিকিৎসা হচ্ছে সেই নার্সিং-হোমে!

কারো অসুখের কথা শোনবার মতো লোক তপেশ গাঙ্গুলী নয়। আর বাসের ভিড়ের মধ্যে সে-সব কথা বলবার সুযোগও নেই। কোনও লোক অগাধ টাকার মালিক হয়ে থাকে তো তার কথা বলো, শুনি। এমন লোকের কথা বলো যার কাছে অনেক টাকা আছে।

—হ্যাঁ ভালো কথা, সেই বিশাখা এখন কোথায়? তা বিয়ে-টিয়ে হয়েছে?

সন্দীপ বললে—সে কী, আপনি কি কিছুই শোনেননি?

—কী শুনবো?

—কেন, বিশাখার কথা? তার তো কবে বিয়ে হয়ে গিয়েছে!

তপেশ গাঙ্গুলী আকাশ থেকে পড়লো। বললে—বিয়ে হয়ে গিয়েছে? কই, আমাকে তো কেউ নেমন্তন্ন করেনি! কবে বিয়ে হলো? বলো বলো শুনি, কবে বিয়ে হলো?

সন্দীপ বললে—সে তো অনেক দিন হয়ে গেল। আপনি শোনেননি? আপনি তো বিশাখার নিজের কাকা!

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—হ্যাঁ, আমি তো বিশাখার স্বামীর আপন খুড়-শ্বশুর হলুম! তার বিয়ে হলো আর আমিই বাদ পড়লুম? তুমি সে-বিয়েতে গিয়েছিলে? কী-কী খাইয়েছিল? মাংস করেছিল? মিষ্টি ক'রকম করেছিল? রাবড়ি? রাবড়ি করেছিল?

সন্দীপ সে-সব কথার জবাব না দিয়ে বললে—আমি তো এখন সেই বিশাখার কাছ থেকেই আসছি!

—বিশাখার কাছ থেকে, মানে? বিশাখার শ্বশুর-বাড়ি থেকে?

—সন্দীপ বললে—হ্যাঁ—

—তার শ্বশুর-বাড়িটা কোথায়? তারা বড়লোক না গরীব লোক? বিশাখার স্বামী কী চাকরি করে? কতো টাকা মাইনে পায়?

তপেশ গাঙ্গুলীর মুখে এক ঝুড়ি প্রশ্ন। সব প্রশ্নগুলোই একটা বিষয়কেই কেন্দ্র করে। সেটা হলো টাকা।

—কী হলো? বলো না, বিশাখার শ্বশুর-বাড়িটা কোথায়? কতো টাকা মাইনে পায় তার বর?

সন্দীপ বললে—তার শ্বশুরবাড়ি বিডন স্ট্রীটে—

—সে কী? সেই মুখুজ্জে-বাড়ি? বিয়ে হয়ে গেছে? কিন্তু কই, আমি তো মেয়ের কাকা, আমাকে তো নেমন্তন্ন করলো না?

—হয়তো ভুলে গেছে।

—এখন গেলে তাকে পাবো? না, কাল সকালে যাবো? সকালে যাওয়াই ভালো, কী বলো? একেবারে বিজলীকে সঙ্গে নিয়েই যাবো। তাই ভালো—বুঝলে?

বলে আর দাঁড়ালো না। সেখানেই তাকে নামতে হবে। বললে—আমি এখানে নামছি—

এখনও চারদিকে ভিড়। কলকাতার লোকের ভিড় যেন পোকার ভিড়। একেবারে পোকার মতোই চারদিকে থিক্-থিক্ করছে। শুধু পোকার ভিড়ই নয়, তার সঙ্গে চারদিকে ঘামেরও গন্ধ। পোকার গরমে সবাই ঘামছে আর চারদিকে সেই ঘামেরই দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। এমন একটা বিয়ে হলো আর আশ্চর্য, তাকে কিনা নেমন্তন্নও করলে না?

প্রায় প্রতিদিন ঝগড়া দিয়েই দু'জনের দিন শুরু হয়। যতোদিন বিশাখার ছিল ততোদিন ঝগড়াটা একটু কম ছিল। কিন্তু বিশাখারা চলে যাওয়ার পর থেকেই এ-বাড়িতে এই ঝগড়া নিত্যকার ঘটনা।

কিন্তু বিশেষ করে আজকে ঝগড়াটা যেন মাত্রা ছাড়িয়ে গেল। তপেশ আর কোনও কথা না বলে সোজা একটা স্যাকরার দোকানে চলে গেল। দোকান তখনও খোলেনি। দোকানের ঝাঁপ বন্ধ।

অনেকক্ষণ পরে দোকানদার যখন এলো তখন বেলা পুইয়ে গেছে। দোকানদারকে দেখে বললে—এ কী, এতো লেট কেন মশাই? ভোরবেলা থেকে আপনার দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে আমার পায়ে ব্যথা হয়ে গেছে। দোকানদার তো অবাক। বললে—কে আপনি?

—আমি? আমার নাম তপেশ গাঙ্গুলী, আমি মনসাতলা লেনে থাকি।

দোকানদার জিজ্ঞেস করলে—আপনি কী কিনবেন?

ততক্ষণে দোকানের দরজার তালা-চাবি খুলে দোকানদার ধুনো-গঙ্গাজল ছিটিয়ে গণেশের মূর্তির দিকে প্রণাম করছে। প্রণাম শেষে জিজ্ঞেস করলে—আপনি কী চান?

তপেশ বললে—আমি চাই না কিছুই।

দোকানদার অবাক।

বললে—চান না? তাহলে এসেছেন কেন?

--আমি একজোড়া সোনার বালা বাঁধা রাখতে এসেছি—

—সোনার বালা? কই, দেখি—

তপেশ পকেট থেকে সোনার বালা-জোড়া বার করে বললে—দেখুন, ভালো করে চেয়ে দেখুন। গিল্‌টি নয়, একেবারে খাঁটি সোনার গয়না। দোকানদার বললে—দেখছি--

বলে দোকানের ভেতরে চলে গেল। তপেশ বাইরে থেকে চেঁচাতে লাগলো—ও মশাই, কই? কোথায় গেলেন?

ভেতর থেকে স্যাকরা বললে—আসছি—

তপেশ বললে—আর কতোক্ষণ দাঁড়াবো মশাই, আজ যে আমার ভাইঝির শ্বশুর-বাড়িতে নেমতন্ন আছে, সেখানে যেতে হবে—না গেলে চলবে না—

দোকান খোলবার সঙ্গে সঙ্গেই কোনও দোকানদার তার দোকানে মাল কেনা-বেচা শুরু করে না। তার আগে তার দিক থেকে কিছু মাঙ্গলিক কাজ-কর্ম করে নেওয়া অনিবার্য হয়। শুধু গণেশ নয় সব রকম দেব-দেবতার পুজো করা তার দিন আরম্ভ করার আগে প্রাত্যহিক কর্ম। দোকানদার তখন তাই-ই করছিল। তার একমাত্র উদ্দেশ্য দিনটা যেন শুভ হয়, যেন তার ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রচুর লাভ হয়। যেন অনেক টাকা আমদানি হয় তার।

তপেশের পীড়াপীড়িতে দোকানদার এবার ভেতর থেকে বাইরে এসে বসলো। তারপর ক্যাশ্‌-বাক্সটাকে প্রণাম করলে। প্রণাম সেরে তপেশ গাঙ্গুলীর দিকে চেয়ে বললে—এবার বলুন, কী চাই আপনার?

তপেশ আগে থেকেই রেগেছিল। বললে—এত দেরি করে দিলেন মশাই! কী করছিলেন এতক্ষণ?

দোকানদার বললে—একটু পুজো-আচ্চা না করে কি ব্যবসার আরম্ভ করা যায়?

তপেশ বললে—তা আগে খদ্দের, না আগে দেব-দেবতা? খদ্দেরই তো লক্ষ্মী?

দোকানদার বললে—না মশাই, না! এই যে আপনি এত দোকান থাকতে আমার দোকানে এসেছেন, এ তো মা-লক্ষ্মীরই দয়ায়।

কথাটা শেষ হওয়ার আগেই তপেশ বললে—ছাই, মশাই, ছাই! ও-সব লক্ষ্মী কিছু নয়। দুনিয়ায় টাকাটাই হলো সব। টাকা থাকলে ও-সবই আপনার হাতের মুঠোয় চলে আসবে!...যাক গে, আগে আমি আমার কাজের কথা বলি...

বলে সোনার বালা দু'টো সামনে এগিয়ে দিলে। বললে—এই দু'টো বালা আপনার কাছে বাঁধা রাখতে এসেছি!

দোকানদার খানিকটা হতাশ হয়ে গেল। বললে—বাঁধা রেখে টাকা চান?

স্যাকরারা গয়না-গাঁটি বিক্রি করার চেয়ে বাঁধা রাখতেই বেশী আগ্রহী হয়। বললে—দাঁড়ান মশাই, আগে ওজন করি এ-দু'টো—

বলে নিক্তিতে ওজন করে ঘষে মেজে দেখে নিয়ে বললে—এটা কবে ছাড়িয়ে নেবেন? ছ'মাসের মধ্যে ছাড়িয়ে নেবেন তো?

তপেশ বলে উঠলো—ছ'মাস? বলছেন কী? পরশু দিনই ছাড়িয়ে নেব।

—পরশু দিন?

তপেশ বললে—হ্যাঁ, পরশু দিনই ছাড়িয়ে নেব। মাসের শেষ বলেই আমার একটু টাকার টানাটানি চলছে। জানেন, এই টাকাটা কেন নিচ্ছি? আপনি 'স্যাক্সবি-মুখার্জি কোম্পানী'র নাম শুনেছেন?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, খুব শুনেছি।

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—সেই 'স্যাক্সবি-মুখার্জি কোম্পানী'র বাড়ির বউ হলো আমার আপন ভাইঝি—

দোকানদার বললে—খবরের কাগজে যেন পড়েছিলুম সেই 'স্যাক্সবি-মুখার্জি কোম্পানী'র এক নাতির ওপর নাকি ফাঁসির হুকুম হয়েছে?

—ফাঁসির হুকুম হয়েছে তো কী হয়েছে?

দোকানদার বললে—সেই নাতি নাকি তার বউকে খুন করেছিল?

তপেশ বললে—হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন! সেই খুনের আসামীর সঙ্গেই তো আমার আপন ভাইঝির বিয়ে হয়েছে।

—দ্বিতীয় পক্ষের বিয়ে?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, দ্বিতীয় পক্ষের বউ-ই হলো আমার ভাইঝি।

—কিন্তু সেই আসামীর ফাঁসি হয়ে গেলে আপনার ভাইঝি তো বিধবা হবে। জেনে-শুনেও আপনারা সেই লোকের সঙ্গে নিজের ভাইঝির বিয়ে দিলেন?

তপেশ হো হো করে হেসে উঠলো। বললে—মশাই, আপনি আমাকে হাসালেন। মানুষটার না-হয় ফাঁসি হলো। কিন্তু টাকা? তার টাকাগুলোর তো ফাঁসি হবে না মশাই! একদিন সেই টাকাগুলোর মালিক তো হবে আমার বিধবা ভাইঝি! তখন?

দোকানদার খদ্দেরের কথা শুনে একেবারে হতবাক। তপেশ বললে—তখন ইচ্ছে করলে আবার অন্য কাউকেও তো বিয়ে করতে পারবে! তখন?

দোকানদার বললে—আপনি তো তাজ্জব মানুষ মশাই! টাকার ওপর আপনাদের এত লোভ?

তপেশ বললে—আপনি তাহলে স্যাকরার ব্যবসা করছেন কেন? টাকার জন্যেই তো?

দোকানদার বুঝলো—এর সঙ্গে কথা বলাও পাপ। বললে—আপনাকে এই গয়নার বদলে সাতশো টাকা দেব।

—সাতশো টাকা মাত্র?

কত ভরি সোনাতে কতো টাকা দাম, তার হিসেব করার সময়ও নেই তখন তার। সে তখন তার বউ আর মেয়ের জন্যে নতুন শাড়ি কেনার কথাই ভাবছে। বললে—জানেন, সেই ভাইঝির বাড়িতে আজ বউ-মেয়ে নিয়ে নেমন্তন্ন খেতে যেতে হবে, তাই হাতে বেশি সময় নেই এখন। এখন আপনি টাকা দিলে তবে দোকানে গিয়ে তাদের শাড়ি কিনতে যাবো। ওটা হাজার টাকা করে দিন—

দোকানদার বললে—না, আমি হিসেব করে দেখেছি, সাতশো টাকার এক পয়সাও বেশি দেওয়া যায় না—

শেষ পর্যন্ত সাতশো টাকাই সই। সাতশো টাকা নিয়েই তপেশকে খুশী থাকতে

হলো। বললে—তা তা-ই দিন, সাতশো টাকাই দিন। বিপদে না পড়লে কি কেউ আপনাদের কাছে গয়না বাঁধা রাখতে আসে, বলুন? আর দরাদরি করতে গেলে ওদিকে আবার ভাইঝির বাড়িতে যেতে দেরি হয়ে যাবে! এখন আবার শাড়ির দোকানে যেতে হবে—

বলে তপেশ উঠলো। তারপর ছুটলো শাড়ির দোকানের দিকে। সেখানেও তখন সবে দোকানের ঝাঁপ খুলেছে। তপেশই সে-দোকানের প্রথম খদ্দের। বললে—দু'খানা শাড়ি দিন তো মশাই। আমার বউ আর মেয়ের জন্যে। সাতশো টাকার মধ্যে দু'খানা শাড়ি দিতে হবে। বড়লোকের বাড়িতে খাবারের নেমন্তন্ন। একটু চটপট করবেন, আমার তাড়া আছে—

দোকানদার ভদ্রলোক বেছে বেছে চার-পাঁচটা শাড়ি বার করলেন। শাড়ির ব্যাপারে তপেশ গাঙ্গুলী আনাড়ি! তবু তারই মধ্যে দু'খানা বেছে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—এ দুটোর দাম কতো?

দোকানদার বললে—আমাদের দোকানে সব জিনিসেরই ফিক্সড্ দাম। ছ'শো তিরিশ টাকা পড়বে দুটো শাড়ি মিলিয়ে—

তবু তপেশ জিজ্ঞেস করলে—এ শাড়ি পরে বড়োলোকের বাড়িতে নেমন্তন্নে খেতে যাওয়া যাবে তো?

দোকানদার ভদ্রলোক একটু অবাক হলেন খদ্দেরের প্রশ্ন শুনে। বললেন—নিশ্চয়ই যাওয়া যাবে।

—নিন্দে হবে না?

—আমার দোকানের শাড়ি পরলে কেউ নিন্দে করবে না মশাই, আপনি নিশ্চিন্তে কিনে নিয়ে যান—

তপেশ গাঙ্গুলী তবু জিজ্ঞেস করলে—শেষকালে যদি নিন্দে হয় তখন কিন্তু আপনাকে নিন্দে করে যাবো, হ্যাঁ—

দাম চুকিয়ে দিয়ে শাড়ির বাণ্ডিলটা নিয়ে তপেশ গাঙ্গুলী যখন বাড়ি ফিরে এলো তখন ঘড়িতে সাড়ে দশটা বেজে গেছে। একে তো বেশ দেরি হয়ে গেছে, তার ওপর আবার বাড়িতে এসে দেখলে উনুনে ভাত রান্না হচ্ছে। তপেশ চেঁচিয়ে উঠলো। বললে—এ কী, তুমি রান্না করছো যে?

রানী বললে—কেন, রান্না না করলে তুমি আপিস যাবে কী করে?

তপেশ বললে—আমি আজ অফিসে যাবো, তা কে বললে তোমাকে?

—কেন? আপিসে যাবে না তুমি?

তপেশ বললে—এত কাণ্ডর পরে তুমি বলছো সীতা কার বাপ? কাল তোমাকে বললুম না যে বিশাখা আমাদের তিনজনকে খেতে নেমন্তন্ন করেছে।

—কোথায় নেমন্তন্ন করেছে?

তপেশ বললে—আরে তোমায় বললুম না যে বিশাখা তার শ্বশুরবাড়িতে আমাদের খেতে নেমন্তন্ন করেছে! তাই তো আজ সকালবেলায় তোমার সোনার বালা-জোড়া বাঁধা রেখে তোমাদের দু'জনের শাড়ি কিনে আনলুম। তুমি বোধহয় ঘুমের ঘোরে কিছু বুঝতে পারোনি। এই দেখ না, শাড়ি দুটো একবার দেখ না।

বলে প্যাকেটটা খুলে রানীকে শাড়ি দুটো দেখালো। রানীও দেখলে, তার সঙ্গে বিজলীও দেখলে। নতুন শাড়ি! দেখেই বিজলী বলে উঠলো—বাঃ, চমৎকার! মনে হলো রানীরও বেশ পছন্দ হয়েছে। বললে—তাহলে আমি ভাতটা উনুন থেকে নামিয়ে রাখি!

তপেশ বললে—নিশ্চয়ই! বিশাখা আমাকে পই-পই করে বলে দিয়েছে যেন সবাইকে নিয়ে আমি ওদের বাড়ি ঠিক যাই।

তারপর বিশাখার বাড়ি যাওয়ার জন্যে সকলের তৈরি হয়ে নেওয়ার পালা। অতো তাড়াতাড়ি কি তৈরি হওয়া সম্ভব? বিশেষ করে মেয়েদের পক্ষে। মেয়েদের তো শাড়ি

পরতেই আধঘণ্টা। তারপর মুখে পাউডার-স্নো-ক্রীম মাখা। সে-সবেও সময় কম লাগে না।

বাইরে থেকে তপেশ চিৎকার করতে থাকে—ওগো, হলো?

রানী বললে—এই হচ্ছে...আর একটু বাকি...

'একটু বাকি' বললেও সে 'বাকি'টা আর শেষ হয় না কখনও। ওদিকে ঘড়ির কাঁটার দিকে চেয়ে আবার চমকে ওঠে তপেশ গাঙ্গুলী।

—কই গো, হলো?

এবার আর কোনও উত্তর নেই। তপেশ আবার চেঁচায়—কই রে বিজলী, তোদের হলো?

বিজলীর ছোট্ট জবাব—আর একটু দেরি বাবা—

তপেশ বলে উঠলো—আশ্চর্য, তোরা এত কী সাজ-গোজ করছিস রে বাবা, বিশাখা কী ভাবছে বল তো? সে খাবার-দাবার তৈরি করে পথের দিকে চেয়ে চেয়ে কী ভাবছে বল্ দিকিনি। একটু তাড়াতাড়ি কর না মা! ওদিকে যে অনেক দূর পথ রে, যেতেও তো ঘড়িতে একটা বেজে যাবে!

শেষ পর্যন্ত বিজলী সেজে-গুজে নতুন শাড়ি পরে বেরোল।

বললে—আমাকে ভালো দেখাচ্ছে বাবা?

তপেশ বললে—খুব ভালো দেখাচ্ছে। এখন তোর মা বেরোলে হয়।

বিজলী বললে—মা এখন পায়ে আলতা পরছে।

তপেশ বললে—তুই আলতা পরিসনি কেন? তোর মা যখন আলতা পরেছে তখন তুইও আলতা পরতে পারতিস।

—আলতা পরবো আমি?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, আলতা পরে আয়। দেরি এমনিতেও হয়েছে, অমনিতেও হবে। আমি ভেবেছিলুম বাসে করে যাবো। এখন দেখছি ট্যাক্সি করেই যেতে হবে আমাদের। মিছিমিছি ক'টা টাকা বাজে খরচ হয়ে যাবে।

তা যা হোক, শেষ পর্যন্ত রানী যখন ঘর থেকে বাইরে বেরোল তখন সাড়ে এগারোটা বাজতে চলেছে। তপেশ বললে—চলো-চলো, আর দেরি নয়।

রানী বললে—দরজায় তালা-চাবি দিতে হবে তো—

তপেশ বললে—তা তো দিতেই হবে। তাড়াতাড়ি করো, তোমাদের মা-মেয়ের সাজতে-গুজতেই তো বেলা পুইয়ে গেল। বিশাখা বোধহয় এতক্ষণে খুব রাগ করছে আমার ওপর!

রানী জিজ্ঞেস করলে—তুমি আজ আপিসে যাবে না তো আগে বললে না কেন?

তপেশ বললে—অফিসে না গেলেই হলো। সরকারী অফিসে কে গেল আর কে গেল না, তার হিসেব কেউ রাখে? তুমি এতদিন আমাকে দেখছো, তবু ওই কথা বলছো?

বলতে বলতে বাড়ির সদর-দরজায় তালা-চাবি লাগিয়ে সবাই রাস্তায় বেরোল।

পাড়ার এক ভদ্রলোকের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল হঠাৎ। ভদ্রলোক বাজার থেকে ফিরছিলেন। তপেশ গাঙ্গুলীকে সপরিবারে বেরোতে দেখে বললেন—কী? কোথায় যাচ্ছেন এত বেলায়?

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—আমার ভাইঝি-জামাই-এর বাড়িতে, সেখানে নেমন্তন্ন আছে—আপনি তো বিশাখাকে চিনতেন?

—বিশাখা? আপনার সেই ভাইঝি, বিশাখা? তার কোথায় বিয়ে হয়েছে?

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—সে কী? আপনি জানেন না? বিডন স্ট্রীটের মুখুজ্জেদের বাড়ি। সে এক বিরাট বড়লোকের বাড়ি, সেই বাড়ির বিলেত-ফেরত নাতি আমার ভাইঝি-জামাই। অঢেল টাকা তাদের, জানেন! সেই ভাইঝিই আমাদের নেমন্তন্ন করেছে। সেই-খানেই যাচ্ছি। সে আমাদের নিয়ে যাওয়ার জন্যে গাড়ি পাঠাবে বলেছিল। কিন্তু

আমি বলেছি যে না, আমি ট্যাক্সি করেই যাবো!

সেইজন্যেই বুঝি আজ অফিসে যাননি?

—হ্যাঁ—

বলেই তপেশ গাঙ্গুলী রাস্তায় একটা চলন্ত খালি ট্যাক্সি দেখে ডাকলে—এই ট্যাক্সি, ট্যাক্সি—

মানুষ যখন সংসারের মধ্যে জড়িয়ে থাকে তখন তার লক্ষ্য থাকে কেবল চলার দিকে। কেবল দূরের দিকে। পেছনের কথা ভুলে যায় সে, পেছনের কথা ভাবতে চায়ও না সে। কেবল চলো, কেবল এগিয়ে চলো। আমি আরো দূরে যাবো, আমি আরো এগিয়ে যাবো। সকলকে অতিক্রম করে, সকলকে পরাজিত করে আমার চলা বরাবর অব্যাহত থাকবে। এইটেই তাকে সাহস যোগায়, এই চিন্তাটাই তাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। বলে—চলো চলো, এগিয়ে চলো। আরো অনেক দূরে যেতে হবে তোমাকে, তুমি এখানেই থেমে যেও না, কারণ একদিন যে তোমাকে দশজনের মাথায় উঠতে হবে, একদিন যে তোমাকে বিশ্ববিজয়ী হতে হবে।

শোনা যায়, বিশ্ববিজয়ী আলেকজান্ডারও এই কথা ভেবেছিলেন। অল্পবয়সেই তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর আগে তিনি একবার বলেছিলেন, একটা পৃথিবী জয় করে তাঁর আশা মিটলো না, আর একটা পৃথিবী থাকলে তিনি সেটাকেও জয় করে, তাঁর মনের আশা মেটাতেন। এরই নাম যৌবন।

কিন্তু বার্ধক্য? বার্ধক্য শুরু হওয়ার সময় থেকেই সে তখন অন্য মানুষ হয়ে যায়। সে তখন বলে—আর না, এবার আমি থামি, এবার আমি সঞ্চয় করি। যা কিছু উপার্জন করেছি, এবার সেটা রক্ষা করার দিকে নজর দিই। শেষ জীবনটা যাতে আমার শান্তিতে কাটে, সেই দিকটাতেই আমি দৃষ্টি দিই।

সেই শেষ জীবনের কথাগুলো প্রথম জীবনে কারো মনে পড়ে না। মনে পড়ে না যে সংসার বড়ো নিষ্ঠুর। সে কাউকেই পরোয়া করে না। সে বরাবর এক নাগাড়ে বলে যায়—তুমি চিরকাল সংসারে থাকতে আসনি, আমার রাজ্যে চিরকাল কারো ঠাঁই নেই। একদিন তোমাকে সরতে হবেই, একদিন তোমাকে আমি সরিয়ে দেবোই। তাই এখন থেকে তুমি তৈরি হও—

কিন্তু যৌবনে এ-কথা শোনবার লোক কোথায় পাবো? যারা শোনে, যারা শুনতে পায়, তারাই মহাপুরুষ হয় পরবর্তীকালে। তারাই প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে যায়, তাদের আর মৃত্যু হয় না।

তাই ঠাকমা-মণিও যথা-নিয়মে একদিন সঞ্চয় করতে শুরু করেছিলেন। তিনিও সকালে গঙ্গাস্নান করতে গিয়েই বিশাখাকে দেখে ঠিক করেছিলেন যে তাঁর নাতির সঙ্গে এই মেয়েরই বিয়ে দেবেন, বিশাখার সঙ্গে নাতির বিয়ে দিয়েই তিনি তাঁর বংশ-ধারাকে অক্ষয় করে রেখে যাবেন; তাঁর বংশ, তাঁর সম্পদ, তাঁর সঞ্চয়কে অক্ষয় করে রেখে যাবেন।

সেই জন্যেই তিনি রাত ন'টার সময়ে গিরিধারীকে বাড়ির সদর গেট বন্ধ করে দেবার পাকা হুকুম দিয়ে দিয়েছিলেন। সেই জন্যেই কোথায় কলের জল নষ্ট হচ্ছে, কোথায় কে মাইনে নিয়ে কাজে ফাঁকি দিচ্ছে, সেই দিকেই তিনি তাঁর অপ্রাণ দৃষ্টি নিয়োগ করতেন।

কিন্তু এত কড়াকড়ি করেও কি তিনি তাঁর গৃহলক্ষ্মীকে অচলা করে রাখতে পারলেন? তিনি তাঁর গৃহ-বিগ্রহ সিংহবাহিনীকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাখতে পারলেন? কেন পারলেন না?

পারলেন না, কারণ সংসার কাউকেই মৌরুশী-পাট্টা দিয়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের স্বত্ব দেয় না। সংসার কেবলই বলে—তুমি সরো, নইলে আমি কোতোয়াল দিয়ে তোমায় সরিয়ে দেব।

বেহুঁশ অবস্থায় যখন তিনি নিজের বিছানায় পড়ে থাকতেন তখন এ-সব কথা তাঁর মনে পড়তো কিনা কে জানে! কিন্তু বিশাখার মনে পড়তো। সে কেবল ভাবতো, এত টাকা, এত গয়না থাকা সত্ত্বেও কেন মানুষটা এত নিঃসহায়! কেন এত নিঃসম্বল!

সে দিদি-শাশুড়ীর বিছানার পাশে বসে বসে নিঃশব্দে এই সব কথাগুলোই ভাবতো, আর ভেবে অবাক হয়ে যেত যে তার দিদি-শাশুড়ীর মতো এমন জাঁদরেল টাকাওয়ালা মানুষটা কীভাবে আস্তে-আস্তে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে। যে মানুষটার ভয়ে সমস্ত বাড়িটা একদিন তটস্থ হয়ে থাকতো, তাঁর এই অসুস্থতার সুযোগে বাড়িতে কে জল নষ্ট করছে, কে অকারণ আলো জ্বালিয়ে রাখছে, আর কে রাত ন'টার সময়ে বাড়ির সদর-গেট বন্ধ করছে, তা দেখবার মতো লোকও কেউ আছে কিনা তা সে-মানুষটার খেয়াল রাখবার মতো অবস্থা নেই।

হঠাৎ এক-এক সময়ে একটু হুঁশ ফিরে এলেই দিদি-শাশুড়ী বিশাখাকে চিনতে পেরেই তার হাত দুটো জোরে চেপে ধরতেন। আস্তে আস্তে বিশাখাকে বলতেন—বউমা—

বিশাখা দিদি-শাশুড়ীর মুখের কাছে মুখ নিচু করে বলতো—আমি ঠাকমা-মণি, আমি, কিছু বলবেন আমাকে?

মুখ দিয়ে কথা বলতে চেষ্টা করলেও সব সময়ে কথা বলতে পারতেন না।

বিশাখা বলতো—বলুন ঠাকমা-মণি, বলুন?

দিদি-শাশুড়ী আবার কথা বলতে চেষ্টা করতেন, কিন্তু বলতে পারতেন না।

বিশাখা তবু নিচু হয়ে বলতো—বলুন-বলুন, আমি বিশাখা—

—তু...তু...তুমি...

—বলুন ঠাকমা-মণি বলুন, আমি শুনেছি, বলুন?

তখন যেন একটু জ্ঞান ফিরে আসতো, বলতেন—বউমা...

—বলুন ঠাকমা-মণি মা, বলুন?

দিদি-শাশুড়ী আবার কিছু বলবার চেষ্টা করতেন। কিন্তু কথা বলতে না পারার জন্যে দু'চোখ বেয়ে জলের ধারা বেরিয়ে আসতো।

—বিশাখা বলতো—বলুন ঠাকমা-মণি মা, বলুন!

দিদি-শাশুড়ী খানিকক্ষণ আবার বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকতেন। যে নার্সটাকে রাখা হয়েছিল সেবা করবার জন্যে সেও তখন কী করবে বুঝতে পারতো না। দিনের পর রাতের ডিউটি করবার জন্যে নার্স পালা করে দিদি-শাশুড়ীর সেবা করতো। দিদি-শাশুড়ী যখন মাঝে মাঝে চোখ খুলতেন, নার্স দু'জনকে দেখে তিনি যে খুশী হতেন না তা বোঝা যেত। কিন্তু বিশাখা যখন সামনে যেত তখন অন্যরকম। বোঝা যেত, তিনি যেন খুশী হতেন এবং আবার কথা বলতে চাইতেন।

—বলুন ঠাকমা-মণি, কিছু বলতে চাইছেন আমাকে?

দিদি-শাশুড়ী নিজের হাত দিয়ে বিশাখার একটা হাত চেপে ধরতেন। কথা বলতে চেষ্টা করতে চাইতেন। মনে হতো তিনি বিশাখার সঙ্গে বিশেষ কিছু কথা বলতে চাইছেন।

—বউমা...তুমি...চলে...যেও...না...

বিশাখা কথাটার মানে বুঝতে পারতো। বলতো—না ঠাকমা-মণি, আপনি কিছু ভাববেন না, আমি কখনও আপনার বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাবো না। আমি এ বাড়ির বউ, আমি কোথাও যাবো না—কিছুছু ভাববেন না। আপনাকে কথা দিচ্ছি...

বিশাখার কথাগুলো বোধহয় দিদি-শাশুড়ীর খুব ভালো লাগতো। তিনি কথা

বলতে না পারুন, বোধহয় শুনতে পেতেন। তাই বারবার দিদি-শাশুড়ীর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলতো—না মা, আপনি মিছি-মিছি ভয় করছেন, আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, আমি জীবনে কখনও এ-বাড়ি ছেড়ে চলে যাবো না—

কথাগুলো শোনবার পর দিদি শাশুড়ী বোধহয় খুব তৃপ্তি পেতেন। মুখ চোখের চেহারা দেখেই সেটা বুঝতে পারতো। বিশাখাও কথাগুলো দিদি-শাশুড়ীকে শোনাতে পেরে মনে মনে খুব তৃপ্তি পেত। ওই অবস্থার মধ্যেও মল্লিক-মশাই এসে ডাকতো—বউদি-মণি—

বিশাখা বুঝতে পারতো মল্লিক-মশাই তাকে দৈনন্দিন খরচের হিসাব বোঝাতে এসেছেন। খাতাটা নিয়ে মল্লিক-মশাই পড়ে যেতেন। ইলেকট্রিকের বিল কত টাকা দেওয়া হয়েছে, চাকর-ঝিদের মাইনে কাকে কতো টাকা দিতে হয়েছে, বাজার-খরচ কত টাকা। যাবতীয় খরচার হিসেব বলে বলে যেতেন মল্লিক-মশাই আর বিশাখা দিদি-শাশুড়ীর পাকা হিসেবের খাতায় তা তুলে নিত। দিদি-শাশুড়ীর আমল থেকে এ-কাজ চলে আসছিল। তিনি অসুখে পড়বার পর থেকে কাজটা বিশাখার ওপরেই বর্তেছে।

কাজ শেষ হওয়ার পর মল্লিক-মশাই বললেন—ঠাকমা-মণি আজ কেমন আছেন?

বিশাখা বললে—আজ ঠাকমা-মণি কথা বলেছেন—

—তাই নাকি? তাহলে তো ডাক্তারবাবুর ওষুধে কাজ হয়েছে। কথা বললেন?

বিশাখা বললে—আজ উনি আমাকে বললেন, আমি যেন এ-বাড়ি ছেড়ে কোথাও চলে না যাই।

—তার মানে?

বিশাখা বললে—তাঁর ভয় হয়েছে আমি যদি এ-বাড়ি ছেড়ে চলে যাই।

—তা, শুনে তুমি কী বললে?

বিশাখা বললে—আমি বললাম আমি কথা দিচ্ছি, এ-বাড়ি ছেড়ে আমি কখনও কোথাও যাবো না। আমার কথা শুনে উনি খুব খুশী হলেন মনে হলো—

কথার মধ্যিখানে হঠাৎ বিন্দু এসে ঘরে ঢুকলো। বললে—বউদিমণি, গিরিধারী খবর দিয়ে গেল মেজবাবু এসেছেন।

—মেজবাবু?

ঠাকমা-মণির অসুখের কথা জানিয়ে মেজবাবুকে অবশ্য 'ট্রাঙ্ক-কল্' করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি যে কখন কবে আসছেন তা তিনি জানাননি।

খবরটা শুনেই মল্লিক-মশাই দৌড়ে নিচেয় নেমে গেলেন। সদরে গিয়ে তিনি দেখলেন মেজবাবু গাড়ি থেকে নামছেন। সঙ্গে হাতে সুটকেস নিয়ে আসছে গিরিধারী। মল্লিক-মশাই তার হাত থেকে সুটকেসটা নিয়ে বললেন—তুমি থাকো, আমি ওটা নিয়ে যাচ্ছি—

মেজবাবু মল্লিক-মশাই-এর আগেই তর-তর করে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে গেলেন। পেছনে মল্লিক-মশাই আস্তে আস্তে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ পেছন থেকে গিরিধারী ডাকলে—ম্যানেজারবাবু, ম্যানেজারবাবু, কোন্ বাবু এসেছেন দেখুন—

মল্লিক-মশাই আবার সদর-গেটএর দিকে গেলেন। সেখানে গিয়ে দেখলেন—সেই তপেশ গাঙ্গুলী দাঁড়িয়ে আছে। আর মনে হলো, তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে বোধহয় তার স্ত্রী আর মেয়ে।

মল্লিক-মশাই তাঁদের দেখেই বলে উঠলেন—আপনারা কী করতে এসেছেন? আমাদের বাড়িতে এখন খুব বিপদ চলেছে।—ঠাকমা-মণির অসুখ, মেজবাবু অসুখের খবর পেয়ে এখখুনি এসেছেন—এখন কারোর সময় নেই আপনাদের সঙ্গে কথা বলার। আপনারা এখন আসুন, পরে একদিন আসবেন।

তপেশ গাঙ্গুলীর মুখটা তখন শুকিয়ে গেছে।

বললে—আমি আমার ভাইঝির সঙ্গে দেখা করতে এসেছি—

—কে আপনার ভাইঝি?

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—আমার ভাইঝির নাম বিশাখা। সে এ-বাড়ির বউ-সে আমাদের সকলকে খাওয়ার নেমন্তন্ন করেছে, তাই এসেছি। আপনি একবার তাকে খবরটা দিন যে আমরা সবাই মিলে এসেছি।

মল্লিক-মশাই বললেন—এখন আপনাদের সঙ্গে কথা বলবার সময় নেই আপনার ভাইঝির। এখন সে ব্যস্ত। বাড়ির গিন্নীর এখন মরো-মরো অসুখ। আপনারা পরে আসবেন—

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—আমরা যে অনেক খরচ-পত্তোর করে এসেছি—

মল্লিক-মশাই সে কথায় কান না দিয়ে গিরিধারীকে বলেন—গিরিধারী, এ'দের বাড়িতে ঢুকতে দিও না। গেট বন্ধ করে দাও—

বলে তিনি ভেতরে ঢুকে গেলেন। তারপর সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগলেন।

আজ এতদিন পরে মনে পড়ছে সেই মুক্তিপদ মুখার্জির কথা। তাঁর নামটা যিনি রেখেছিলেন তিনি কি আগে থেকেই জানতেন যে সেই মুক্তিপদ জীবনে কখনও মুক্তি পাবেন না? সব কিছুর সঙ্গে যুক্ত থেকেও যে মুক্ত থাকার একটা দুর্লভ শক্তি দরকার, সেটা মুক্তিপদ আয়ত্ত করতে পারবে না বলেই বোধহয় ওই রকম নাম রাখা। যেমন তাঁর দাদার নাম। তাঁর দাদার নাম রাখা হয়েছিল শক্তিপদ। তিনি কি সত্যিই শক্তিমান ছিলেন? যদি তিনি শক্তিমানই হবেন তা হলে কেন তিনি তাঁর সাঁইত্রিশ বছর বয়েসে মারা গেলেন?

তাই যখন মুক্তিপদ সংসারের নানা অশান্তির মধ্যে জড়িয়ে গিয়ে ছট্‌ফট্ করতেন তখন মাঝে-মাঝে অদৃশ্য কাকে উদ্দেশ্য করে তিনি নিঃশব্দে প্রশ্ন করতেন—তুমি যদি আমাকে মুক্তিই দেবে না তাহলে কেন তুমি আমার নাম রাখলে মুক্তিপদ? কেন আমাকে বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়ার কৌশলটা শিখিয়ে দিলে না?

অথচ তাঁর স্টাফরা কতো সুখে আছে! তারা মাসের শুরুতে মাসকাবারি মাইনে পেয়েই নিশ্চিন্ত! তিনি দেখেছেন তারা নিজেদের মধ্যে কতো হাসি-ঠাট্টা করে, বন্ধু-বান্ধব নিয়ে ক্লাবে টেনিস খেলে। মাঝে মাঝে ফীস্ট করে। বছরের এক মাস ছুটি নিয়ে কতো জায়গায় বেড়িয়ে আসে।

আর মুক্তিপদ? তারা কল্পনা করতেও পারে না যে যে-লোকটা এই সমস্ত কিছুর মালিক তাঁর রাতে ঘুম হয় কি না, ইনকাম-ট্যাক্স নিয়ে তাঁর মন স্থির থাকে কিনা!

কোথায় যেন তিনি কোন বইতে পড়েছিলেন, 'যে কেবল সব সময়ে নিজেকে দেখে সে আর কাউকে দেখতে পায় না। আর যে সব-সময়ে অন্য সবাইকে দেখে সে নিজেকেও দেখতে পায়।'

কিন্তু কথাটা কি সত্যি? মুক্তিপদ তো সব সময়ে তাঁর স্টাফ-এর সুখ-সুবিধের দিকেই নজর দেয়। কে কাজ করছে, কে ফাঁকি দিচ্ছে, কে কোম্পানীর ভালো চাইছে, কে কেবল নিজের পাওনা-গণ্ডা কথাই ভাবছে। কিন্তু তবু কেন তিনি তাদের মধ্যে নিজেকে খুঁজে পান না? কেন তাহলে তিনি মনে করেন তিনি ছাড়া আর সবাই সুখী? এমন কি তাঁর চাকর, ড্রাইভার সকলকেই কেন তিনি তাঁর চেয়ে বেশি সুখী মনে করেন?

যেদিন কলকাতা থেকে মল্লিক-মশাই তাঁকে টেলিফোনে মা'র অসুখের খবরটা জানালেন সেই দিনই যেন তিনি মাথায় বজ্রাঘাতের ব্যথা পেলেন! তারপর যখন একটু সম্বিত ফিরে পেলেন তখনই তাঁর মনে হলো তিনি যেন মাতৃহীন হয়ে গেলেন।

একদিকে তাঁর ফ্যাক্টরি আর একদিকে তাঁর ফ্যামিলি। এই দুই-এর চাপে পড়ে

তিনি যেন নিশ্চিন্ত হয়ে গেলেন। টেলিফোনে মল্লিক-মশাইকে বললেন—আমি আজই কলকাতায় যাচ্ছি—

বলে তো দিলেন, কিন্তু সত্যিই কাজ ছেড়ে কলকাতায় যাওয়া কি অতো সহজ? ছেড়ে দিয়ে যেতে তো ইচ্ছে হয়, কিন্তু পেছনেও যে কেবল পেছু-টান বলে—মা'র মৃত্যুতে অতো কাতর হলে চলবে না। মৃত্যুটা তো শেষ, কিন্তু আমরা যে শুরু। আমরা থাকবো, তাই আমাদের কথাও তোমার আগে ভাবা উচিত। তুমি আমাদের কর্তা, তাই তুমি চলে গেলে আমাদের কথা কে ভাববে?

ফ্যাক্টরির সকলেই জেনে গেল যে ম্যানেজিং-ডিরেক্টার ইন্দোর থেকে কলকাতায় চলে যাচ্ছেন কিছুদিনের জন্যে।

নন্দিতা জিজ্ঞেস করলে—তুমি ক'দিনের জন্যে যাচ্ছো?

মুক্তিপদ বললেন—তা কি আমি এখন বলতে পারি? মা'র অসুখের অবস্থাটা দেখলে তবে বলতে পারবো। আমি টেলিফোনে তোমাকে সব জানাবো।

তারপর বাড়ি থেকে বেরোতে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ পিক্‌নিকের কথা মনে পড়লো। জিজ্ঞেস করলেন—পিক্‌নিক কোথায়?

—সে তো ঘুমোচ্ছে—

—ঘুমোচ্ছে? এত দেরি করে ওঠে নাকি ও? কাল দেরি করে ঘুমিয়েছিল নাকি?

নন্দিতা বললে—তা কী করে বলবো?

মুক্তিপদ বললেন—তুমি তার কোনও খবর না রাখলে কে খবর রাখবে? ওকে একলা কোথাও ছেড়ো না। তোমাকে তো সব বলেছি।

—সেই জন্যেই তো তোমাকে বলেছিলুম ওর একটা বিয়ে দিয়ে দাও—

মুক্তিপদ বললেন—আজকাল কি ছেলে-মেয়ের বিয়ে দেওয়া সোজা নাকি? তুমি তো দেখছো আমি কতো চেষ্টা করছি। বিয়ে দেওয়ার আগে পাত্রের 'পেডিগ্রী' দেখতে হবে না?

নন্দিতা বললে—'পেডিগ্রী' দেখতে দেখতেই পিক্‌নিক বুড়ী হয়ে যাবে।

—তা হোক, নইলে পিক্‌নিকেরও ওই তোমাদের সৌম্যপদর অবস্থা হয়ে যাবে।

কথা বাড়ালেই কথা বাড়ে। তাই এ-কথার কোনও উত্তর না দিয়ে মুক্তিপদ সোজা বাইরের রাস্তায় দাঁড়ানো গাড়িটাতে গিয়ে বসলেন। বললেন—চলো এয়ারপোর্ট—

সারা রাস্তা মুক্তিপদ কেবল তাঁর নিজের জীবনটার কথা ভেবেছেন। কোথায় ছিল তখন এই ফ্যাক্টরি, কোথায় ছিল তখন এই নন্দিতা, আর কোথায় ছিল এই পিক্‌নিক! তখন ওই মা'ই ছিল তাঁর একমাত্র খেলার সঙ্গী। মা তাঁকে যে কতো আদর করতেন তার ঠিক নেই। সব সময় নিজের কাছে বসিয়ে খাওয়াতেন। চাকর-ঝি'র ওপরে তাঁকে ছেড়ে দিতেন না কখনও। বড়ো ছেলের দিকে মা অতো দেখতেন না। শক্তিপদর চেয়ে মুক্তিপদকেই মা যেন একটু বেশি ভালোবাসতেন। রাতে মা'র কাছে না শুলে মুক্তি-পদ'র ঘুম আসতো না।

মা যখন বাবার সঙ্গে কন্টিনেন্টে চলে যেতেন তখন মুক্তিপদর চোখ দিয়ে ঝর-ঝর করে জল আসতো। বলতেন—মা, আমি যাবো তোমার সঙ্গে, তোমার সঙ্গে যাবো—

মা যাওয়ার আগে শক্তি-মুক্তির জন্যে চকোলেট-এর দু'টো তিনটে বাক্স কিনে দিয়ে যেতেন। বলতেন—তোরা কিছু ভাবিসনি, আমি পাঁচ-ছ'দিনের মধ্যেই চলে আসবো।

শেষের দিকে আর মা'র কথা বিশ্বাস হতো না কারো। পাঁচ-ছ'দিন বলে মা একমাস বিদেশে কাটিয়ে আসতেন। তখন প্রায় রোজই মা বাইরে থেকে টেলিফোনে তাঁদের সঙ্গে কথা বলতেন। বলতেন—আর আমি দেরি করবো না, এই বার যাচ্ছি। ফেরার টিকিট কিনতে পেলেই কলকাতায় ফিরে যাবো, আর দেরি হবে না। কথা দিচ্ছি—

কিন্তু সে-কথা মা কোনও দিনই রাখতে পারতেন না। তবু কথা রাখতে না পারার খেসারৎ সঙ্গে করে নিয়ে আসতেন। কোনও বার ঘড়ি, কোনও বার ক্যামেরা, কোনও

বার টেনিস র‍্যাকেট। নানান্ রকম জিনিস কিনে মা তাঁদের ঘুষ দিতেন।

মা'র সম্বন্ধে অনেক দিন আগেকার কথা সব মনে পড়তে লাগলো মুক্তিপদর। যেদিন দাদা মারা গেলেন তখন দাদার বিয়ে হয়ে গিয়েছে। সৌম্য তখন সবে জন্মেছে। মনে আছে, সেদিন মা শোকে একেবারে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন। মা'র জন্যেই আবার নতুন করে ডাক্তার ডাকতে হয়েছিল সেদিন।

আজ এতদিন পরে সেই মা নিজেই অসুস্থ হয়ে পড়ে আছেন।

এয়ার-পোর্ট থেকে নেমে মুক্তিপদ সোজা বিডন স্ট্রীটের বাড়িতে যেতে যেতে বেশ বেলা হয়ে গেল। ঘড়িতে তখন প্রায় বারোটা বাজে। বাড়ির সামনে গিয়ে পৌঁছতেই মুক্তিপদ দেখলেন একজন ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গিরিধারীর সঙ্গে কী-সব কথা বলছে। তার সঙ্গে বোধহয় তার স্ত্রী আর অবিবাহিতা এক মেয়েও রয়েছে।

গিরিধারী তাদের সঙ্গে কথা বলতেই এত ব্যস্ত ছিল যে মুক্তিপদকে দেখতেই পায়নি। সেই ভদ্রলোকও বাড়িতে ঢুকতে চায় আর গিরিধারীও তাদের ঢুকতে দেবে না। আর যেই গিরিধারী মুক্তিপদকে দেখতে পেয়েছে তখনই সঙ্গে সঙ্গে স্যালিয়ুট আর দৌড়ে গিয়ে বিন্দুকে খবরটা দিয়েছে।

গিরিধারী তখন ভদ্রলোকের সঙ্গে বচসা চালিয়েছে। দেব না ভেতরে যেতে, বুড়ী মাঈজীর বেমার। দেব না যেতে—

ভদ্রলোক তখন বলছে—আরে দরোয়ানজী, আমার ভাই-ঝি এ-বাড়ির নতুন বউ, সেই নতুন বউ আমাদের খেতে নেমন্তন্ন করেছে, তুমি বহুরানীকে গিয়ে খবরটা দিয়ে এসো গে—

এর পর মল্লিক-মশাই এসে পড়াতে আর কথা কাটাকাটি কানে এলো না।

ওপরে যেতেই বিন্দু সামনে এসে গড় হয়ে প্রণাম করলে।

মেজবাবু জিজ্ঞেস করলেন—কী রে, মা-মণির খবর কী?

এর একটু পরেই আর একজন বউ সামনে এসে দুই হাতে তাঁর পা ছুঁয়ে প্রণাম করতেই তিনি থমকে দাঁড়ালেন।

জিজ্ঞেস করলেন—এ কে রে বিন্দু?

বিন্দু বললে—আমাদের বউদি-মণি—

—ও—

বলে সোজা মা-মণির ঘরের দিকে পা বাড়ালেন। ততক্ষণে মল্লিক-মশাইও মেজবাবুর স্যুটকেসটা নিয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে এসে হাজির।

মল্লিক-মশাইকে দেখে মেজবাবু জিজ্ঞেস করলেন—মা-মণি কেমন আছে এখন?

বলতে বলতে মা-মণির ঘরে ঢুকে দেখলেন একজন নার্স মা-মণির মাথা টিপে দিচ্ছে—

মা-মণির অবস্থা দেখে মেজবাবু সেখানেই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। অনেক পুরনো দিনের কথা বোধহয় তাঁর মনে পড়তে লাগলো। আশ্চর্য, এই-ই নরদেহ, এই-ই নারী-দেহ!

একদিন যে-মা-মণির কাছে কতো আবদার করেছেন, একদিন যে-মা-মণির কাছ থেকে কতো বকুনি খেয়েছেন, সেই মা-মণিরই আজ এই দশা! জীবনে একদিনের জন্যেও এই মা-মণি কখনও শান্তি পাননি। স্বামীর মৃত্যু দেখেছেন, এই মা-মণি, ছেলের মৃত্যু দেখেছেন, বড়ো পুত্রবধূর মৃত্যুও দেখেছেন। শেষকালে একমাত্র নাতির কারাদণ্ডও দেখে যেতে হয়েছে।

মা-মণিকে দেখতে দেখতে নিজের কথাও মনে পড়তে লাগলো মুক্তিপদ'র। খানিক-ক্ষণের জন্যে তিনি যেন স্থান-কাল-পাত্র সমস্ত কিছু ভুলে গেলেন। তিনি যেন তখন মা-মণিকে দেখছেন না, দেখছেন যেন নিজেকেই।

অনেকক্ষণ পরে তাঁর মুখ দিয়ে শব্দ বেরোল। মল্লিক-মশাই পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। মুক্তিপদ জিজ্ঞেস করলেন—শেষ কবে মা-মণির জ্ঞান ফিরেছিল?

মল্লিক-মশাই বললেন—গতকাল এক মিনিটের কি দু'মিনিটের জন্যে বউদি-মণির সঙ্গে কথা বলেছিলেন। তারপর থেকে আর কথা বলতে পারেননি!

—কী বলেছিলেন বউমাকে?

পেছনেই দাঁড়িয়ে ছিল বিশাখা। মল্লিক-মশাই তার দিকে চেয়ে বললেন—বলুন না বউদি-মণি? মা-মণি আপনাকে কী বলেছিলেন?

বিশাখা বললে—কালকে আমি পাশে বসেছিলুম, হঠাৎ একবার ও'র চোখ দু'টো খুলে গেল। তা দেখেই আমি জিজ্ঞেস করলাম—কিছু বলবেন ঠাকমা-মণি? ঠাকমা-মণির চোখ দু'টো দিয়ে ঝর-ঝর করে জল পড়তে লাগলো...

মেজবাবু জিজ্ঞেস করলেন—তারপর?

—তারপর আমি আঁচল দিয়ে ঠাকমা-মণির চোখ দুটো মুছিয়ে দিলুম। তখন মনে হলো উনি বোধহয় আমাকে চিনতে পেরেছেন তাই কাঁদছেন—

—তারপর?

বিশাখা বলতে লাগলো—তারপর আমার মনে হলো তাঁর ঠোঁট যেন একটু নড়ে উঠলো—মনে হলো তিনি যেন কিছু বলতে চাইছেন! আমি জিজ্ঞেস করলাম—আমায় কিছু বলবেন ঠাকমা-মণি? আমার কথাটা বোধহয় তাঁর কানে গেছে।

মুক্তিপদ জিজ্ঞেস করলেন—তারপর?

—তারপর তিনি হঠাৎ আমার একটা হাত চেপে ধরে বলতে লাগলেন—বউমা, তুমি এ-বাড়ি ছেড়ে কখনও কোথাও চলে যাবে না, কথা দাও? আমি তাঁর জবাবে বললাম—আমি কথা দিচ্ছি আমি এ-বাড়ি ছেড়ে কখনও কোথাও যাবো না—

—তারপর?

বিশাখা বললে—সেই-ই তাঁর শেষ কথা। তারপর থেকে আর উনি কথা বলেননি!

মুক্তিপদ আবার মা-মণির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে দেখতে লাগলেন।

হঠাৎ মুক্তিপদ'র ধ্যান ভাঙলো বিশাখার গলার শব্দে। তিনি বিশাখার দিকে চেয়ে দেখলেন। বিশাখা একটা ডিশ্ তাঁর দিকে বাড়িয়ে ধরেছে, ডিশের ওপর জল-খাবার। বিশাখা বললে—এইটে খেয়ে নিন্—

মুক্তিপদ বললেন—আবার এ-সব করতে গেলে কেন তুমি বউমা?

বিশাখার বদলে বিন্দু কথা বলে উঠলো। বললে—আপনি কোন সকালে বেরিয়েছেন, এত বেলায় এসে পৌঁছেছেন, খেয়ে নিন—

মুক্তিপদ বললেন—আমি তো প্লেনে ব্রেকফাস্ট খেয়েই এসেছি, আবার কেন তুমি অসুখের বাড়িতে এ-সব করতে গেলে?

ঠাকমা-মণির গলা দিয়ে তখন কী রকম একটা গোঙানির শব্দ বেরোতে লাগলো।

বিশাখা বললে—ঠাকমা-মণি আপনার গলা শুনতে পেয়েছেন, চিনতে পেরেছেন আপনাকে—

মুক্তিপদর তখন খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছে। তিনি নিচু হয়ে মা-মণির একটা হাত ধরে বলতে লাগলেন—মা-মণি, আমি মুক্তিপদ। আমি এসে গিয়েছি। তুমি ভালো হয়ে যাবে এবার। আমি এসে গিয়েছি...

হঠাৎ মা-মণির মুখ দিয়েও একটা বিচিত্র অস্পষ্ট শব্দ বেরোতে লাগলো—এসে গিয়েছি, এসে গিয়েছি, এসে গিয়েছি...

আশ্চর্য, এই-ই হচ্ছে বোধহয় সব মানুষের পরিণতি। অথচ যখন মা-মণির জ্ঞান ছিল তখন এই মানুষটাই কতো কড়া কথা শোনাতেন মুক্তিপদকে। টেলিফোনেও কতো গালাগালি দিতেন ছেলেকে। আর শুধু মুক্তিপদকেই নয়, সমস্ত বাড়িটাই তখন মা-মণির ভয়ে তটস্থ হয়ে থাকতো। যে-কেউ কাজে গাফিলতি করতো তাকেই তিনি নানা-রকমে শায়েস্তা করতেন। বলতে গেলে সমস্ত বাড়িটাই তাঁর ভয়ে তখন সন্ত্রস্ত হয়ে

থাকতো। কিন্তু সেই মানুষটাই এখন একেবারে অসহায়, অচৈতন্য, অনড় হয়ে শুয়ে পড়ে আছেন। এখন পরের করুণার পাত্রী হয়েই তাঁকে দিন কাটাতে হচ্ছে। তবু মানুষের পৃথিবীতে কতো অহংকারের বাগাড়ম্বর চলেছে প্রতিদিন, কতো অত্যাচারের হুংকারে পৃথিবীর কতো মানুষ থরথর করে কতোবার কেঁপে উঠেছে।

মুক্তিপদ বিশাখার দিকে চেয়ে দেখলেন।

বললেন—দেখি, ডাক্তারের প্রেসকিপশনটা কোথায়, দেখি একবার—

নার্সের কাছ থেকে প্রেসকিপশনটা নিয়ে বিশাখা মুক্তিপদের হাতে দিলে। সেখানা নিয়ে মুক্তিপদ দেখলেন। তারপর সেটা আবার বিশাখার হাতে ফেরৎ দিলেন।

বললেন—আমি একবার এই ডাক্তারের কাছে যাচ্ছি—

বলে মল্লিক-মশাইকে বললেন—একবার ড্রাইভারকে গাড়ি বার করতে বলুন তো। আমি এখুনি বেরোব—

মুক্তিপদর পেছন-পেছন মল্লিক-মশাইও যাচ্ছিলেন।

বিশাখা বললে—মল্লিক-মশাই, আজকে হিসেবটা নেওয়া হয়নি, আমি আপনার জন্যে বসে রইলুম—

আর একটু পরেই মল্লিক-মশাই খাতা-পত্র নিয়ে এসে হাজির হলেন। প্রত্যেক দিনের সমস্ত খরচ-পত্রের হিসেব রাখতে হয় বিশাখাকে। এটা সকাল-বেলারই নিয়ম-করা কাজ। কিন্তু ঠাকমা-মণির অসুখের জন্য সেই কাজটা ঠিক-সময়ে করা হয়ে ওঠে না রোজ।

বিশাখাও দিদি শাশুড়ীর হিসেবের খাতাটা নিয়ে সামনে বসলো। মল্লিক-মশাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন—বাজার সত্তোর টাকা পঁচাত্তর পয়সা—

বাজার মানে কাঁচা বাজার। তারপর তেল, মশলা-পাতি, টেলিফোনের বিল, ঠাকমা-মণির ওষুধ-পত্র, ডাক্তার-খরচ, বিন্দুর জন্যে গামছা, কালিদাসীর জন্যে থান-ধুতি এক-জোড়া আরো এই রকম অনেক টুকিটাকি—

সমস্ত হিসেব লেখা হয়ে যাওয়ার পর মল্লিক-মশাই বললেন—আমার কাছে তহবিলে জমার অঙ্কটা লিখুন বউদি-মণি—

বিশাখা বললে—বলুন—

—জমা ছিল সতেরো হাজার টাকা, তার মধ্যে এখন রয়েছে দু'হাজার তেইশ টাকা। আজ আমাকে আরো কুড়ি হাজার টাকা দিলেন, মোট জমা পড়বে বাইশ হাজার তেইশ টাকা। ওই টাকাটা আমার নামে জমা করে দিন—

বিশাখা উঠলো। তারপর ঠাকমা-মণির ঘরে গিয়ে আঁচল থেকে চাবির গোছাটা নিয়ে আলমারির পাল্লাটা খুলে গুনে গুনে কুড়ি হাজার টাকা বার করলে। অনেক-গুলো টাকা একবার গুনলে ভুল হতে পারে। তাই দু'বার তিনবার করে গুনলো। তারপর আবার আলমারিটায় চাবি বন্ধ করে টাকাগুলো নিয়ে বাইরে এসে মল্লিক-মশাইএর হাতে দিলে। বললে—বেশ ভালো করে গুণে নিন—

মল্লিক-মশাই বার দুই গুনে বললে—ঠিক আছে।

তারপর নোটগুলো ফতুয়ার পকেটে পুরে বললেন—টাকাগুলো আমার নামে জমা করে নিয়েছেন তো?

বিশাখা বললে—হ্যাঁ, এই দেখুন—

বলে ঠাকমা-মণির খাতাটা বাড়িয়ে ধরলে বিশাখা। মল্লিক-মশাই বললেন—কই, তারিখটা তো বসাননি বউদি-মণি! আজকের তারিখটা ওখানে বসিয়ে দিন।

বিশাখা জমা টাকার নিচেয় তারিখটা বসিয়ে দিলে। মল্লিক-মশাই চলেই যাচ্ছিলেন। হঠাৎ কী মনে পড়ে যাওয়ায় আবার ফিরে এলেন।

—হ্যাঁ, আর একটা কথা বলতে ভুলে যাচ্ছিলুম...

—কী বলুন?

মল্লিক-মশাই বললেন—ব্যাঙ্কের বইতে ঠাকমা-মণির সই দিলেই তবে টাকা তোলা যেতো. কিন্তু এখন তো উনি অথর্ব হয়ে পড়ে আছেন। সই করবার ক্ষমতাও তো ও'র নেই। এর পরে কী হবে?

বিশাখা বললে—আপনিই বলুন কী করতে হবে?

মল্লিক-মশাই বললেন—আপনি যদি ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলতে চান তাহলে তো আপনাকে চেক্ কাটতে হবে।

বিশাখা বললে—আপনি আমায় দেখিয়ে দেবেন কী করে চেক্ কাটতে হয়।

মল্লিক-মশাই বললেন—তা হলে আপনাকে ব্যাঙ্কে গিয়ে জানাতে হবে যে আপনি টাকা তোলবার অধিকারী!

—আমাকে ব্যাঙ্কে গিয়ে জানাতে হবে?

মল্লিক-মশাই বললেন—তা তো যেতেই হবে! নইলে আপনার চেক্ তো তারা ক্যাশ করবে না। সেই জন্যেই বলছি আপনাকে নিজে ব্যাঙ্কে গিয়ে আপনার সইটা তাদের সামনে একবার করে আসতে হবে। আপনার চেকের সই-এর সঙ্গে সেই সই মিলে গেলে তখন আপনার চেক্ ক্যাশ হবে।

বিশাখা বললে—তাহলে বলুন কবে আমাকে ব্যাঙ্কে নিয়ে যাবেন?

—একটু তাড়াতাড়িই যেতে হবে। কারণ ঠাকমা-মণি কবে যে সেরে উঠবেন তার তো কোনও ঠিক নেই!

বিশাখা বললে—আপনি যেদিন বলবেন সেদিনই আমি যেতে তৈরি।

মল্লিক-মশাই বললেন—ঠিক আছে। আজ-কালের মধ্যে আমি আপনাকে নিয়ে যাবো। বলে তিনি আবার নিচেয় চলে গেলেন।
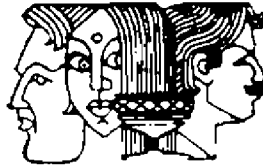
মানুষের পৃথিবীতে যেখানে জীবন সৃষ্টি হয় সেখানেই মৃত্যু শুরু থেকে তার পেছনে ধাওয়া করে। এ নিয়ম সব জীবের পক্ষেই সত্যি। পশু-পাখী, গাছপালার মতো মানুষের বেলাতেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম নেই। চোখের সামনে প্রতিদিন এই সত্যটা প্রত্যক্ষ করলেও কেউই কল্পনা করে না যে এমন একটা দিন আসছে যেদিন তাকেও এই নিয়মের অধীন হয়ে পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিতে হবে। যখন বিদায় নেওয়ার পালা আসে তখন বড়ো দেরি হয়ে গিয়েছে। তখন খেয়াল হয় যে এখনও তার অনেক করণীয় কাজ বাকি পড়ে আছে। তখন মনে পড়ে যায় যে জীবনটা বড়ো বাজে কাজে খরচ হয়ে গেছে। তখন মনে পড়ে যায় যে যা করবার জন্যে তার জন্ম হয়েছিল তা আরম্ভই করা হয়নি, যা পরে করবো বলে বাকি ফেলে রেখে দিয়েছিল তা বকেয়াই পড়ে রয়েছে। পাথেয় বলে যা হাতে আছে, তা কেবল শূন্য।

আজ এতদিন পরে সেই কথাগুলোই কেবল সন্দীপের মনে পড়তে লাগলো। তারও তো যাওয়ার সময় হলো। যা করতে তার আসা, দেশের কাজ করবে বলে সে সঙ্কল্প করেছিল, তাও তো অপূর্ণ রয়ে গেল। মা-ও বলেছিল—এতদিন যে তুই চাকরি করলি তাতে আমারই বা কী লাভ হলো আর তোরই বা কী লাভ হলো?

মা'র এ-কথার কোনও জবাব সেদিন দিতে পারেনি সন্দীপ, আর মা বেঁচে থাকলে আজও সে-কথার জবাব সে দিতে পারতো না।

সত্যিই তো সমস্ত মানুষ যা চায় তা ছাড়া আর তো কিছুই চায়নি। ছোটবেলায় সবাই যা চায় সে তাই-ই চেয়েছিল। একটা ছোট-মোট পাকা চাকরি। সে এমন একটা চাকরি যা পেলে সে মা'র দুঃখ-কষ্ট দূর করতে পারে।

তখনকার দিনে ওর চেয়ে আর বেশি কিছু সে চায়নি। যখন পরের বাড়ির উচ্ছিষ্ট খেয়ে সে বেঁচেছিল তখন তার বেশি চাওয়াও তো তার কাছে অন্যায় বলে মনে হয়েছিল। সেই চাকরি পাওয়ার সূত্রপাত হওয়ার সূত্রেই তো দেখতে পেয়েছিল "স্যাক্সবী-মুখার্জি কোম্পানি"র বাড়ির ভেতরকার ঐশ্বর্য। আর সেই ঐশ্বর্যের পাশাপাশিই দেখেছিল তাদের বাড়ির জীবন-যুদ্ধের পঙ্কিল আবর্ত।

আর তার সঙ্গে সঙ্গে দেখেছিল আর একটা জীবন। সে জীবনটা হলো বিশাখা। সন্দীপ বিশাখাকে দেখেই একটু কৌতূহলী হয়ে উঠেছিল। কৌতূহলটা কীসের জন্যে? বিশাখার রূপ? নাকি বিশাখার স্বভাব-চরিত্রের মাধুর্য?

না, তা নয়। তার রূপও নয়, তার স্বভাব-চরিত্রের মাধুর্যও নয়।

অনেক দিন আগে সন্দীপ কালীঘাটের মন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিল একবার। পুজো দিতে গিয়েছিল তার চাকরির জন্যে। যাতে তার চাকরি হয় সেই জন্যে। মন্দির থেকে বেরিয়ে আসতেই দেখেছিল বাইরের পাথর-বাঁধানো উঠানের একটা জায়গায় অনেক মেয়ে-পুরুষের ভিড়। সন্দীপও ভিড় দেখে এগিয়ে গিয়েছিল। এত ভিড় কেন ওখানে? কেন এত ভিড় ওখানে?

ভেতরে উঁকি মেরে সন্দীপ সেদিন দেখেছিল সেখানে পাঁঠাবলি হচ্ছে। একটা পাঁঠাকে দড়ি দিয়ে তার চারটে পা'কে বেঁধে হাড়িকাঠে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর এমনভাবে পাঁঠার গলাটাকে আটকে দেওয়া হয়েছে যাতে সে চেঁচাতে না পারে। আর একজন কামার হাতের খাঁড়াটা মাথার ওপর উঁচু করে ধরেছে। একটু পরেই সেই খাঁড়াটা কখন পাঁঠার গলার ওপর পড়বে। তারই অপেক্ষায় রয়েছে সমস্ত দর্শক।

আর যখন সত্যি-সত্যিই খাঁড়াটা পাঁঠাটার ঘাড়ের ওপর পড়লো তখন পাঁঠার মুণ্ডুটা ধড় থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে অনেক দূরে ছিটকে পড়লো।

সেই মুণ্ডুটার দিকে চেয়ে সন্দীপ দেখলে পাঁঠার চোখ-দুটো তখনও যেন পিট-পিট করে নড়ছে, আর ধড়টা তখনও মিনিট খানেক ধরে ছট্-ফট্ করতে করতে এক সময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল।

তারপর বহুকাল ধরে সেই দৃশ্যটা তার পেছু নিয়েছিল। শয়নে, স্বপনে তাকে অনুসরণ করেছিল। কেন যে পেছু নিয়েছিল আর কেন যে অনুসরণ করেছিল তা সে বুঝতে পারেনি। তারপরে সে সেটা একেবারে ভুলে গিয়েছিল। কিন্তু যদি কোনও সূত্রে মাংস খেত তখনই তার মনে পড়ে যেত সেই দৃশ্যটার কথা আর সঙ্গে সঙ্গে তার খাওয়ার ইচ্ছেটাও চলে যেত। শরীরে বমি-বমি ভাব আসতো। আর সঙ্গে সঙ্গে সে খাওয়া ছেড়ে উঠে পড়তো।

মা জিজ্ঞেস করতো—কী রে, আর খাবি নে?

সন্দীপ বলতো—না মা, আর খাবো না—

—কেন রে? কী হলো তোর? তুই যে মাংস খেতে অতো ভালোবাসিস?

সন্দীপ বলতো—আজ আমার ক্ষিধে নেই মা—

মা বলতো—তোর কথা ভেবেই তো আমি মাংস রান্না করেছিলুম, আর তুই-ই তা খেলি নে?

সন্দীপ মা'কে বলেছিল—তুমি কখনও মাংস রান্না করো না মা। তুমি যা খাবে আমিও তাই খাবো। নিরিমিষ তরকারি খেতেই আমার বেশি ভালো লাগে আজকাল—

ছেলের কথা শুনে মা-ও অবাক হয়ে যেত। যে ছেলে মাছ-মাংস খেতে অতো ভালোবাসতো সেই ছেলেই বা হঠাৎ মাছ মাংস খেতে অতো অনিচ্ছুক হয়ে গেল কেন তা মা বুঝতে পারতো না।

প্রত্যেক দিনই ছেলে আপিস থেকে বাড়ি ফিরে এলে মা জিজ্ঞেস করতো—আজ মাসিমাকে দেখতে গিয়েছিলি?

সন্দীপ বলতো হ্যাঁ, গিয়েছিলুম—

—কী রকম দেখলি?

সন্দীপ সেই একই সংক্ষিপ্ত জবাব দিত—সেই একই রকম!

মা আবার জিজ্ঞেস করতো—একই রকম মানে? আর কতোদিন হাসপাতালে থাকতে হবে?

সন্দীপ বলতো—তা তো কেউ বলছে না!

—এদিকে টাকাও তো ফুরিয়ে আসছে রে। যদি আরো কিছুদিন হাসপাতালে থাকতে হয় তখন কী করে চলবে?

এ-কথার জবাব দিত না সন্দীপ। মা'র আরও প্রশ্ন—তা মল্লিক-ঠাকুরপোর কাছে একবার যা না তুই, গিয়ে বল না যে আপনি যে আরো টাকা দেবেন বলেছিলেন, তার কী হলো?

সন্দীপ বলতো—টাকা চাইতে আমার লজ্জা করে মা—

—ও মা, লজ্জা করলে আমাদের চলবে কী করে?

সন্দীপ সে-কথার জবাব দিত না।

মা বলতো—এত মুখচোরা হলে কি চলে? আর তা ছাড়া ওই মুখুজ্জেদের তো টাকার শেষ নেই। ওদের টাকায় তো শ্যাওলা পড়ছে। মুখ ফুটে চাইতে কী দোষ?

সন্দীপ বলতো—দেখি...ভাবি...

মা ছেলের কথা শুনে হতাশ হয়ে যেত। বলতো—দেখতে দেখতে আর ভাবতে ভাবতেই তোর মাসিমা ওদিকে মরে যাবে! জানিস, ঠাকুরপো আমাকে নিজের মুখে বলে গিয়েছিল বিশাখার মা'র জন্যে দরকার হলে দু'তিন লাখ টাকা পর্যন্ত দেবেন মুখুজ্জেরা—

তারপর একটু থেমে আবার বলতো—যাক্ গে, মানুষ চেনা হয়ে গেল! ওইটেই লাভ! টাকা দেওয়া-নেওয়া নিয়েই মানুষের আসল রূপটা চেনা যায় রে—

এ-কথারও জবাব দিত না সন্দীপ।

সেদিনও টিফিনের সময়ে রোজকার মতো সন্দীপ বেরিয়েছিল অফিস থেকে। ওই সময়েই সে রোজ নার্সিং-হোমে গিয়ে মাসিমাকে দেখে আসতো। নার্সিং-হোমে গিয়েই বোঝা যেত কাকে বলে সংসার। আগে সংসারের স্বরূপটা বোঝা যেত হাসপাতালে গেলে, হাসপাতাল যে একবার গেছে, সে আর ফিরে আসবে না, এইটেই ছিল সে-যুগের মানুষের অভিজ্ঞতা। কিন্তু সেই হাসপাতালের মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার জন্যেই একদিন নার্সিং-হোমের ওপরে মানুষের শ্রদ্ধা বাড়তে আরম্ভ করলো। লোকের ধারণা হলো হাসপাতালে গেলে আর বাঁচবো না, কিন্তু নার্সিং-হোমে গেলে নির্ঘাৎ বেঁচে ফিরে আসবো। একটু বেশি টাকা খরচ হবে, এই যা তফাৎ। এই বিশ্বাস থেকেই কলকাতায় ব্যাঙের ছাতার মতো নার্সিং-হোম গজিয়ে উঠতে লাগলো একের পর এক। আর তার পর থেকেই হাসপাতাল আর নার্সিং-হোম একাকার হয়ে যেতে লাগলো। জন্ম আর মৃত্যুর সমারোহ দেখতে গেলে আগে যেমন হাসপাতালে যেতে হতো, এখন থেকে তা দেখতে পাওয়া যেতে লাগলো নার্সিং-হোমেও। আর তারই ফলে নার্সিং-হোমগুলো হয়ে যেতে লাগলো 'স্ট্যাটাস-সিম্বল্'। হাসপাতালে যদি কোনও মহিলা সন্তান-প্রসবের উপলক্ষ্যে যেত তাহলে তার যতটা ইজ্জত চলে যেতে লাগলো, আর নার্সিং-হোমে যদি কেউ সেই উপলক্ষ্যে যেত তাহলে তার ইজ্জত ততটা বেড়ে যেতে লাগলো।

কিন্তু সন্দীপ মাসিমাকে 'নার্সিং-হোমে' চিকিৎসার জন্যে পাঠিয়েছিল অন্য কারণে। সেই কারণটা হলো 'নার্সিং-হোমে' পাঠালে তার ব্যাঙ্কের কাছে হবে আর অফিস থেকে যাওয়া-আসা আর দেখা-শোনার ব্যাপারে সময়ও কম লাগবে।

নার্সিং-হোমে ভর্তি হওয়ার সময়েই ডাক্তার লাহিড়ী কুড়ি হাজার টাকার প্রাথমিক একটা হিসেব দিয়েছিলেন। সন্দীপ তাতেই রাজী হওয়াতে মাসিমাকে নিয়ে একদিন

তাঁর 'নার্সিং-হোমে' ভর্তি করে দিয়েছিল। আর টাকারও অতো অভাব তখন ছিল না। তার। কারণ মল্লিক-মশাই সেদিক থেকে ভরসা দিয়েছিলেন যে তিন লাখ বা চার লাখ টাকা যা-ই লাগুক তা ঠাকমা-মণি দিয়ে দেবেন খেসারৎ হিসেবে। প্রথম কিস্তিতেই সেই বিয়ের রাত্রে তাকে দিয়ে গিয়েছিলেন পঞ্চাশ হাজার টাকা।

কিন্তু তারপর সেই চ্যাটার্জি-বাবুদের কাছ থেকে বাড়িটা বাঁধা রাখার কুড়ি হাজার টাকা ফিরিয়ে দিয়ে হাতে রইলো তখন মাত্র তিরিশ হাজার টাকা। সেই তিরিশ হাজার টাকার প্রায় সবটাই খরচ হয়ে গিয়েছে। এর পর যদি ডাক্তার লাহিড়ী আরও টাকা দাবি করে বসেন তখন কী হবে? আবার কি সে বাড়িটা বাঁধা রাখতে হবে?

তার ওপর আছে তার ব্যাঙ্ক থেকে লোন নেওয়ার জন্যে মাসে মাসে তার মাইনে মোটা টাকা কেটে নেওয়ার চাপ! যদি আরও লোন নেওয়ার দরকার হয়, তখন? তখন দু'টো প্রাণীর সংসার কেমন করে চলবে? শুধু মাত্র ডাল-ভাত খেতেও তো আজকাল কম খরচ লাগে না। সব জিনিসেরই তো দাম বাড়ছে লাফিয়ে লাফিয়ে।

এক-এক সময়ে সন্দীপের মনে হয় এ-সব কথা আর ভাববে না সে! কী হবে ভেবে? তার পক্ষে তো আর ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তছরূপ করা সম্ভব নয়! তাহলে?

রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে চারদিকের যান-বাহন-মানুষ-কোলাহল-আলো- অন্ধকার সব কিছু একাকার হয়ে যায়। তার মনে হয় তার আশে-পাশে কেউ কোথাও নেই, মনে হয় তার আশে-পাশে কোনও কিছুই নেই। শুধু আছে সে আর তার সঙ্গে আছে তার একমাত্র সঙ্গী নিঃসঙ্গতা।

আবার এক-এক সময়ে একেবারে অন্য রকম। তখন সে মা'র কোলের শিশুর মতোন পরম সম্পদশালী একজন সুখী মানুষ। তখন সে ভাবতো তার কী ভয়? তার যখন মা আছে তখন তার আর কীসের ভাবনা? মা থাকাই মানে তো সব থাকা!

মা'র গম্ভীর মুখ দেখলেই সন্দীপ মা'র হাত দু'টো জোরে আঁকড়ে ধরে ঝাঁকুনি দিত।

'বলতো—আবার তুমি মুখ গম্ভীর করেছ? হাসো, হাসো তুমি? বলছি একটু হাসো -

মা ছেলের কান্ড দেখে কেঁদে ফেলতো। বলতো—ওরে, ছাড় ছাড়, ছেড়ে দে—

--ছাড়বো যদি তুমি একটু হাসো—বলছি হাসো। তুমি না হাসলে আমি ছাড়বো না তোমাকে, আগে তুমি হাসো। আমার সামনে তুমি কখনও মুখ গম্ভীর করতে পারবে না—

মা তখন হাসতে চেষ্টা করতে গিয়ে আরো কেঁদে ফেলতো।

বলতো—ওরে পাগল, আমি কি সাধ করে কাঁদি? আমারও তো হাসতে ইচ্ছে করে রে, কিন্তু তোর কষ্ট দেখে না কেঁদে যে থাকতে পারি না। আর কতো কষ্ট করবি তুই? পরের বোঝা আর কতো বইবি তুই?

সন্দীপ বলতো—ও মা, তুমি বুঝি ওই কথা ভাবছো? কিন্তু ওদের তো আমি পর মনে করি না মা। ওরাও যে আমার আপনার মানুষ! আমি যে কাউকেই পর বলে মনে করতে পারি না।

মা তখন ছেলেকে দুই হাতে ধরে জোর করে বিছানায় শুইয়ে দিত। বলতো— তুই এখনও ছেলেমানুষ হয়েই রয়ে গেলি, তোর এত বয়েস বাড়লো তবু তোর ছেলে-মানুষী গেল না। সারাদিন খেটে-খুটে এলি, এখন ঘুমো তুই—কাল আবার তোকে সকালে উঠে আপিসে যেতে হবে!

রাস্তায় চলতে চলতে সেই সব কথাই সন্দীপের মনে পড়তো। আর মা'র কথা মনে পড়লেই আর সব কথা ভুলে যেত। তখন আর কারো কথা মনে পড়তো না তার। আর সকলের কথা তার মন থেকে একেবারে দূর হয়ে যেত। নার্সিং-হোমে গিয়ে মাসিমার সঙ্গে কথা বলবার সময়ও তার মনে হতো সে যেন তার মা'র সঙ্গেই কথা

বলছে।

—সন্দীপ, সন্দীপ—

নিজের নামটা শুনেই সন্দীপ ফিরে চাইলো। এখানে আর কে তাকে ডাকতে যাবে? তাহলে সে ভুল শুনেছে নাকি? কে? কে তোকে ডাকলে? কোথায় কে?

অথচ কোনও দিকে কাউকেই দেখা গেল না। হয়তো ভুল শুনেছে সে। তাই ভেবে সে আবার তার গন্তব্যের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো...

—সন্দীপ, ও সন্দীপ—

সন্দীপ আবার ফিরে তাকাতেই দেখে অবাক হয়ে গেল।

—আরে, মল্লিক-কাকা? আপনি কোথা থেকে?

মল্লিক-মশাই বললেন—তুমি তো শুনতেই পাচ্ছিলে না। কী ব্যাপার? কোথায় যাচ্ছো হন্-হন্ করে?

সন্দীপ বললে—আমার টিফিনের সময়ে একটু...

হঠাৎ নজরে পড়লো দূরে ফুটপাতের ওপর বিশাখা দাঁড়িয়ে আছে! বিশাখা তার দিকেই চেয়ে আছে। সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—বিশাখাকে আপনি নিয়ে এসেছেন নাকি? বিশাখার কিছু কাজ আছে বুঝি?

মল্লিক-কাকা বললেন—হ্যাঁ, বিশাখাই তো তোমাকে প্রথম দেখতে পেয়েছিল। ও-ই আমাকে প্রথম দেখলো। তোমাকে কতো ডাকলুম, তুমি শুনতেই পাচ্ছিলে না। তাই তো রাস্তা পার হয়ে দৌড়িয়ে এসে ডাকছি—তোমার কি কানে কালা লেগেছে নাকি?

সন্দীপ বললে—আমি একটু অন্যমনস্ক ছিলুম—

মল্লিক-মশাই বললেন—চলো, বিশাখা তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায়—

—চলুন—

রাস্তায় তখন ট্রাম-বাসের জটলা। রাস্তা পার হতে একটু দেরি হলো। যখন কাছে গিয়ে পৌঁছলো তখন সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—কী হলো, তুমি এখানে?

মল্লিক-মশাই বললেন—এই বউদিমণিকে ব্যাঙ্কে নিয়ে এসেছিলুম।

সন্দীপ বললে—ব্যাঙ্কে কেন?

মল্লিক-মশাই বললেন—বউদিমণিকে নিয়ে একটু ব্যাঙ্কে এসেছিলুম ও'র সইটা খাতায় বসিয়ে দিতে। কারণ ঠাকমা-মণি তো এখন আর নিজের হাতে সই করতে পারবে না—তাই ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের সামনে বউদি-মণি নিজের সইটা করে দিলে!

—কেমন আছেন ঠাকমা-মণি?

মল্লিক-মশাই বললেন—সেই একই রকম! মাঝে মাঝে হঠাৎ কথা বলে উঠছেন, তারপর আবার অনেকক্ষণ একেবারে চুপ।

—ডাক্তাররা কী বলছেন?

মল্লিক-মশাই বললেন—তাঁরা আর কী বলবেন, তাঁরা কিছুই ভরসা দিতে পারছেন না—

হঠাৎ বিশাখা বলে উঠলো—তুমি সেদিন অমন করে না-বলে চলে গেলে কেন? আমি ফিরে এসে দেখলুম তুমি ঘরে নেই!

সন্দীপ বললে—তুমি তখন তোমার দিদি-শাশুড়ীকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লে। তাই ভাবলুম ও-রকম অবস্থায় আমার আর বসে থাকা উচিত নয়।

বিশাখা বললে—আমি তারপরে বিন্দুকে দিয়ে তোমাকে ডাকতে পাঠালুম, কিন্তু খবর পেলুম তুমি নাকি তার আগেই চলে গেছ—

মল্লিক-মশাই বললেন—সময় পেলে আর একদিন এসো না—

সন্দীপ কী আর বলবে! ভদ্রতার খাতিরে বললে—যাবো।

বিশাখা বললে—হ্যাঁ, তুমি আর এসেছ! তোমাকে তো আমি ভালো করে চিনি! রাগ হলে আর তোমার জ্ঞান থাকে না।

হঠাৎ মল্লিক-মশাই বললেন—ওই যাঃ, আমার ব্যাগটা আমি ভুলে ম্যানেজারের ঘরে ফেলে এসেছি—তুমি দাঁড়াও, আমি এখুনি আসছি।

বলেই তিনি আবার ব্যাঙ্কের ভেতরে ঢুকে গেলেন।

সন্দীপ হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে—কেমন আছো তুমি?

বিশাখা বললে—কেমন দেখছো আমাকে?

সন্দীপ বললে—আমি তো দেখছি তুমি আরো সুন্দরী হয়েছ!

বিশাখা বললে—আমি আর কবে অসুন্দরী ছিলুম?

সন্দীপ বললে—না, না, তা বলছি না। সুন্দরী তুমি বরাবরই ছিলে, কিন্তু এখন বিয়ের পর দেখছি তুমি আরো সুন্দরী হয়েছ!

বিশাখা বললে পরের স্ত্রীর দিকে নজর দেওয়া কি ভালো?

সন্দীপ বললে—পরের স্ত্রী তুমি তা স্বীকার করছি, কিন্তু সেইটেই কি তোমার একমাত্র পরিচয়? আর কিছু পরিচয় কি তোমার নেই?

—আমার আর কী পরিচয় আছে, বলো?

সন্দীপ বললে—কেন, আমি গরীব লোক আর তুমি বড়লোক। আজ সেটাও তো তোমার আর একটা মস্তো বড়ো পরিচয়!

বিশাখা বললে—আজ যে আমার এত টাকা হয়েছে সেটাও তো তোমার জন্যে।

—আমার জন্যে? বলছো কী?

সন্দীপ অবাক হয়ে গেল! আবার জিজ্ঞেস করলে—আমার জন্যে তোমার টাকা হলো? বলছো কী?

বিশাখা বললে—হ্যাঁ, আর আমার জন্যেও তো তোমার অনেক টাকা হলো, হলো না?

কী করে?

বিশাখা বললে—আমার বদলেই তো আমার দিদি-শাশুড়ীর কাছ থেকে তুমি বিনা পরিশ্রমে পঞ্চাশ হাজার টাকার মালিক হয়ে গেলে! মোটা খেসারৎ পেয়ে গেলে।

—তার মানে?

কিন্তু তার জবাব বিশাখার কাছ থেকে আর পাওয়া হলো না। কারণ তখন ওদিক থেকে মল্লিক-মশাই তাঁর ব্যাগটা নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছেন। মল্লিক-মশাই হিসেবের কাগজপত্র ব্যাঙ্কের পাশবই সব কিছু তাঁর ব্যাগের মধ্যে রেখে সেটা হাতে নিয়েই বরাবর বেরোন। সেদিনও তাই বেরিয়েছিলেন। কিন্তু মনের ভুলে সেটা ম্যানেজারের ঘরে ফেলে রেখে চলে এসেছিলেন।

—ব্যাগটা পেলেন?

মল্লিক-মশাই বললেন—হ্যাঁ, না পেলে মুশকিল হতো!

বিশাখা গাড়িতে উঠতে গেল। ওঠবার আগে বললে একদিন আবার এসো সময় করে—

মল্লিক-মশাই জিজ্ঞেস করলেন—তোমাদের বাড়ির খবর কী?

—একই রকম চলছে।

বিশাখাও হঠাৎ মুখটা ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করলে—জ্যাঠাইমা কেমন আছেন?

সন্দীপ বললে—ভালোই...

হঠাৎ বোধহয় নিজের মা'র কথাও মনে পড়লো। বললে—আর আমার মা?

সন্দীপ বললে—মাসিমাও ভালো আছেন।

—আমার কথাও বোলো!

—কী বলবো?

বিশাখা বললে—বোলো আমিও ভালো আছি।

মল্লিক-মশাই বললেন—হ্যাঁ, তিনি হয়তো ভাবছেন। বলে দিও বউদি-মণি শ্বশুর বাড়িতে খুব ভালো আছেন। আর সময় করে তুমি একদিন এসো, বুঝলে?

বিশাখাও চলে যাওয়ার আগে বললে—হ্যাঁ, তুমি আর একদিন এসো—

কথা বলবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের গাড়িটা ধুলো ওড়াতে ওড়াতে চলে গেল।

কিছুক্ষণের জন্যে সন্দীপ সেই রাস্তার ওপরেই যেন বিমূঢ় হয়ে একলা দাঁড়িয়ে রইলো। মনে হলো সত্যিই পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো শিক্ষক হচ্ছে অতীত! সেই অতীত যদি না থাকতো তাহলে কোথায় কার কাছ থেকে আমরা সান্ত্বনা পেতাম?

সে আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগের কথা।

সেই আড়াই হাজার বছর আগে গ্রীস দেশে এমন একজন লোক বাস করতেন যাঁর মুখের চেহারা ছিল সবচেয়ে কুৎসিত। অমন কুৎসিত মানুষ পৃথিবীতে আর কেউ কখনও দেখেনি।

কিন্তু তাঁর মনটা?

তাঁর মনের মতো অতো সুন্দর মনও বোধহয় আর কোথাও কারও ছিল না। তিনি দেশের সমস্ত মানুষকেই অন্তর দিয়ে ভালোবাসতেন! তিনি বলতেন, মানুষের মনের ভেতরেই ভগবান বিরাজ করেন। নিজেকে জানতে পারলেই সেই ভগবানকে জানা যাবে। সুতরাং প্রথমে নিজেকে জানো।

এ-কথা সন্দীপ আগেই জেনেছিল। কিন্তু কী করে সে নিজেকে জানবে তা তার জানা ছিল না। বই পড়ে? গান গেয়ে? সংসার করে?

অনেক ভেবেও সে সে-রাস্তাটা জানতে পারেনি। কী করে জানতে পারবে সে তার নিজেকে? কে তার নিজেকে জানিয়ে দেবে?

সে-কথা নিজের জানা-শোনা অনেক প্রবীণ লোককে সে প্রশ্ন করেছিল। কিন্তু কেউ তার প্রশ্নের সঠিক জবাব দিতে পারেনি। কিংবা সে-জবাব সে ভালো মতো বুঝতে পারেনি।

কিন্তু এতদিন পরে বিশাখার জীবনটা দেখেই বোধহয় সে তার জবাব খানিকটা বুঝতে পারলে।

সেই সোক্রেটিস সংসারের দিকে কোনও দিন মন দেননি। কেবল নিজেকে জানবার প্রচেষ্টাতেই সারা দেশ ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন। বাড়িতে ফিরে এলেই স্ত্রীর কাছে গঞ্জনা শুনতে হতো।

একদিন তাঁর শিষ্যদের নিয়ে তাঁর বাড়িতে ফিরছেন। হঠাৎ সবাই লক্ষ্য করলেন বাড়ির ছাদ থেকে কে যেন ময়লা জল ঢেলে ফেলেছে। কে ময়লা জল ফেলেছে?

কেউই কিছু বুঝতে পারলে না। শিষ্যরা জিজ্ঞেস করলে—আপনার বাড়ির ছাদ থেকে কে এমন করে ময়লা জল ফেললে?

সক্রেটিস বললেন আমার স্ত্রী—

সবাই অবাক। বললে—সে কী? আপনার স্ত্রী?

—হ্যাঁ—

শিষ্যরা বললে—আপনার স্ত্রী আপনার গায়ে ময়লা জল ফেললেন?

—হ্যাঁ।

শিষ্যরা বললে—আপনি আপনার স্ত্রীকে কিছু বলতে পারেন না?

সেক্রেটিস বললেন—না হে না, ময়লা জল ফেলে আমার স্ত্রী আমার খুব উপকার করছে।

—উপকার করছেন? কী করে?

সোক্রেটিস বললেন—আমার সহ্য করবার শক্তিটা বড়ো কম। আমার স্ত্রী আমার সহ্য-ক্ষমতা বাড়িয়ে দিচ্ছে!

সোক্রেটিসের সহ্য-ক্ষমতা ছিল কম। তাঁর স্ত্রী তাঁর শত্রুতা করেই তাঁকে কষ্টসহিষ্ণু করে তুলেছিল, এই কথাটাই তিনি বলতে চেয়েছিলেন।

একলা থাকলেই সন্দীপের এই সব কথাগুলো মনে পড়তো। জীবন তাকে যতো কষ্ট দিত, ততোই সে এই সব কথাগুলো মনে করে সান্ত্বনা পেত।

মনে পড়তো মহাভারতের কুন্তীর কথা। কুন্তীর ডাকে শ্রীকৃষ্ণ এলেন কুন্তীর কাছে। জিজ্ঞেস করলেন—বলো কুন্তী, তুমি কী জন্যে আমায় ডাকছিলে?

কুন্তী বললেন—তোমাকে দেখবার জন্যে!

কৃষ্ণ বললেন—তুমি কী বর চাও, বলো? তুমি যা বর চাও আমি তোমাকে তা-ই দেব!

কুন্তী বললেন—আমি এই বর চাই যে আমি যেন বরাবর দুঃখ পাই। তুমি আমাকে দুঃখের আশীর্বাদ করো।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—সে কী! সবাই তো আমাকে ডাকে সুখ পাওয়ার জন্যে। তুমি আমার কাছে দুঃখ চাইছো কেন?

কুন্তী বললেন—আমি সুখ চাইছি না এই জন্যে যে সুখ পেলে তোমাকে তো আর স্মরণ করবো না। কিন্তু দুঃখ চাইছি এই জন্যে যে তাহলে সব সময়ে আমি তোমার নাম স্মরণ করবো!

এও এক অদ্ভুত সত্য! সত্যিই তো, সন্দীপের অতো দুঃখ ছিল বলেই তো সে অতো কষ্ট সহ্য করতে পারতো। সুখ থাকলে তো আর সে তার অতো যন্ত্রণা সহ্য করতে পারতো না।

নার্সিং-হোমে গিয়ে মাসিমার সামনে সে অন্য কথা বলতো। বেশির ভাগ দিনই মাসিমা কথা বলতে পারতো না। অজ্ঞান-অচৈতন্য হয়ে চুপচাপ শুয়ে থাকতো।

কিন্তু যেদিন মাসিমা কথা বলতে পারতো সেদিন প্রথমেই জিজ্ঞেস করতো—আমার বিশাখা কেমন আছে বাবা? তার সঙ্গে দেখা হয়েছে তোমার?

সন্দীপ বলতো হ্যাঁ, রোজই বিশাখাকে আমি দেখতে যাই—

মাসিমা জিজ্ঞেস করতো—কেমন আছে সে?

সন্দীপ বলতো—খুব সুখে আছে!

—আর আমার জামাই?

—সেও খুব সুখী! দু'জনের বিয়ে রাজ-যোটক হয়েছে।

মাসিমা জিজ্ঞেস করতো আমার কথা কিছু বলে তারা?

সন্দীপ বলতো—রোজই আপনার কথা জিজ্ঞেস করে। আপনার কি মেয়ে-জামাইকে দেখতে ইচ্ছে করে?

মাসিমা বলতো—না না, তারা সুখে-শান্তিতে আছে এই জেনেই আমি খুশী। আমি জীবনে অনেক কষ্ট পেয়েছি। তাই তারা সুখে আছে জানতে পারলেই আমার সুখ। নিজে মা হয়ে মেয়েকে আর কষ্ট দিতে চাই না বাবা। তার সুখ হলেই আমার সুখ।

বলতে বলতে মাসিমা কেঁদে ফেলতো। আর সন্দীপ মাসিমার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে সান্ত্বনা দিত। তারপর ঘণ্টা বাজতেই সন্দীপ ডাক্তার লাহিড়ীর সঙ্গে দেখা করবার জন্য তাঁর চেম্বারে গিয়ে ঢুকতো।

কিন্তু কোনও দিনই দেখা মিলতো না তাঁর। যদিই বা কোনওদিন দেখা পাওয়া যেত তো অনেক লোকের ভীড়ে কথা বলবার সুযোগ পাওয়া যেত না। সন্দীপ ভিড়ের ভেতরে গিয়ে জিজ্ঞেস করতো—ডাক্তারবাবু, আমার মাসিমাকে দেখেছেন? তাঁর অবস্থা এখন কেমন?

কা'র মাসিমার কী রোগ হয়েছে, কোন ঘরে কোন রোগী রয়েছে, তার কিছুই হদিশ

থাকতো না ডাক্তার লাহিড়ীর। খবর রাখা সম্ভবও ছিল না। কারণ ডাক্তারবাবু সাধারণ ডাক্তারবাবু নন, স্পেশালিস্ট। যাঁরা স্পেশালিস্ট ডাক্তার তাঁদের পেছনেই রোগী আর রোগিণীদের যতো ভিড়। রোগীদের সম্বন্ধে তাঁদের যতো না আগ্রহ, তাঁদের নিজেদের টাকার অঙ্কটা সম্বন্ধে তাঁদের বেশি আগ্রহ। সেই টাকার হিসেব নিয়ে তাঁরা বেশি ব্যস্ত। তাই ডাক্তার লাহিড়ী বলতেন—পরে আসবেন—

কিংবা বলতেন—আমার জুনিয়ারের সঙ্গে দেখা করুন গিয়ে—

ডাক্তারের চেয়ে ডাক্তারের জুনিয়ারদের কাছে আরো বেশি ভিড়। কিন্তু যে-বিষয়ে নার্সিং-হোমের ডাক্তারবাবুদের সবচেয়ে বেশি নজর, সেটা হচ্ছে পেমেণ্ট। টাকার অঙ্কের বিলটা দেবার বেলায় তাঁর স্টাফরা খুব হুঁশিয়ার।

সন্দীপ কাউণ্টারে গেলেই সন্দীপকে চেপে ধরতো তারা।

তারা বলতো—পেমেণ্ট করবেন?

পেমেণ্টের খাতা-পত্র সামনেই মজুত। সেটা টেনে নিয়ে তারা কলম হাতে নিয়ে বলতো—দিন টাকা দিন—

সন্দীপ বলতো—টাকা তো আনিনি—

—কেন? টাকা আনেননি কেন?

সন্দীপ বলতো—কীসের টাকা তা আমি বুঝতে পারিনি—

কাউণ্টার-ক্লার্ক বলতো—কেন? আপনার পেশেণ্টের কাছে তো আমরা সব কিছু জানিয়ে দিয়েছি!

—কী জানিয়ে দিয়েছেন?

—তিরিশ দিনের জ্বর দেখবার চার্জ, ফুড্ আর ইনজেকশন্ যা কিছু খরচা হয়েছে আমাদের সব ফিরিস্তি তাতে লেখা ছিল।

সন্দীপ বলতো—কিন্তু এই যে সেদিন একটা চেক্ দিয়ে গেলুম। সাতশো তিরিশ টাকার চেক—আবার কীসের পেমেণ্ট করতে হবে?

কাউণ্টার-ক্লার্ক বলতো—দূর মশাই, সেটা তো গেল মাসের এ্যাকাউণ্ট! এবার কারেণ্ট বিলটার পেমেণ্ট চাইছি—

সন্দীপ বলতো—কিন্তু এখনও তো মাস শেষ হয়নি। আপনারা কি এ্যাডভান্স পেমেণ্ট চাইছেন?

—না, এবার চাইছি পেশেণ্টের 'ইউরিন-টেস্ট' আর 'ইউরিন-কালচারে'র টাকা।

সন্দীপ এ-সব হিসেব-পত্র কিছুই বুঝতো না। তার পকেটে যা কিছু থাকতো সব টাকা দিয়ে দেনা শোধ করে দিত। সে ভাবতো তার যতো দুঃখ যতো অভাবই হোক সে তো সৎ কাজেই টাকাটা খরচ করছে! নেশা-ভাঙ করে তো সে টাকা ওড়াচ্ছে না। অভাব যদি হয়ই তো নিজের কাছে কৈফিয়ৎ দেবার মতো একটা যুক্তি থাকবে তার। সে তখন বলতে পারবে যে সে অকারণে কোনও অপব্যয় করেনি। মা আর তার মাসিমা কি আলাদা? অসুখটা মাসিমার না হয়ে তার মা'রও তো হতে পারতো! তখনো তো আর তার বিরুদ্ধে টাকা অপব্যয়ের অভিযোগ উঠতো না! তবে?

এই রকম যখন তার মনের অবস্থা ঠিক তখনই দেখা হয়ে গেল বিশাখার সঙ্গে।

বিশাখাকে দেখে মনে হলো সত্যিই সে তখন আরো সুন্দরী হয়েছে। মানুষের মনে যখন সুখ আসে তখন তার মুখের চেহারাতেও সেই সুখের প্রতিফলন ফুটে ওঠে। বিশাখারও বোধহয় তাই হয়েছিল। সে বোধহয় চিরকাল টাকাই চেয়েছিল। স্বামী চায়নি, সংসার চায়নি, স্বাস্থ্য চায়নি, ভালোবাসা চায়নি, শুধু টাকা চেয়েছিল। তাই, যেই টাকা পেয়েছে আর সঙ্গে সঙ্গে তার মুখের চেহারাতে মনের সুখের প্রতিচ্ছবি ফুটে বেরিয়েছে। তাই যতোক্ষণ কথা হলো ততোক্ষণ একবারও সে অন্য মা'র কথা জিজ্ঞেস করলে না। টাকা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এমন অকৃতজ্ঞ হয়ে উঠলো।

রাস্তা পার হয়ে উল্টোদিকের ফুটপাথে যেতেই একটা গাড়ি থেকে কে যেন তাকে

ডাকলে এই সন্দীপ? সন্দীপ—

সন্দীপ সেদিকে চাইতেই দেখলে গোপাল হাজরা।

জিজ্ঞেস করলে—কোথায় যাচ্ছিস?

সন্দীপ বললে—তুই কোন দিকে?

গোপাল বললে—ভেতরে উঠে আয়।

—আমি তো আমার ব্যাঙ্কে যাবো। ন্যাশন্যাল ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের হাওড়া ব্র্যাঞ্চ। তুই তো একবার গিয়েছিলি আমাদের ব্র্যাঞ্চে—

সন্দীপ উঠতেই জিপ্‌টা ছেড়ে দিলে। বললে কোথায় গিয়েছিলি?

—ডাক্তার লাহিড়ীর নার্সিং-হোমে। ওখানে মাসিমাকে ভর্তি করে দিয়েছি।

গোপাল বললে—তোর আবার মাসিমা কোথা থেকে এলো? তোর বিধবা মা ছাড়া তোর আর কেউ ছিল না তোর। কোথাকার মাসিমা?

সন্দীপ বললে—সেই যে বিশাখা, বিশাখার কথা তোকে তো বলেছিলুম। সেই বিশাখার মা'কে আমি মাসিমা বলি। তারই অসুখ।

—কী অসুখ?

সন্দীপ বললে—ডাক্তাররা তো বলছে ক্যান্‌সার!

—ক্যানসার্? তুই বলছিস কী? সে তো অনেক টাকার ধাক্কা রে। সে খরচ তুই একলা কী করে সামলাবি?

সন্দীপ বললে—আমার অফিস থেকে লোন নিয়েছি।

গোপাল বললে—সে আর ক'টা টাকা? তা, সব খরচা কি একলা তোকেই যোগাতে হবে? তোর মাসিমার আর কেউ নেই?

—মাসিমা তো বিধবা মানুষ। এক দেওর ছিল, সে তো বিধবা বউদিকে ঘাড় থেকে নামিয়ে দিয়েছে। তখন থেকে মাসিমা আর মাসিমার মেয়েকে তো আমিই দেখা-শোনা করছি। সেই বিশাখার খবর তো তোকে আগেই বলেছি।

—হ্যাঁ সে সব তো আমি শুনেছি।

সন্দীপ বলতে লাগলো—সেই বিশাখা এখন খুব বড়লোক। এখন সে কোটি-কোটি টাকার মালিক।

—কী করে অতো টাকা হলো?

সন্দীপ বললে—সে অনেক কান্ড! তুই বিডন স্ট্রীটের মুখুজ্জেদের চিনিস তো? 'স্যাক্সবী-মুখার্জি' কোম্পানীর মালিক! তাদের ছেলে সৌম্যপদকেও তো তুই চিনিস।

—সেই ফাঁসির আসামী? যে তার মেমসাহেব বউকে খুন করে রাস্তায় ফেলে দিয়েছিল?

—হ্যাঁ! পরে হাইকোর্টে যার যাবজ্জীবন-দন্ড হয়েছিল। লাইফ্-ইম্প্রিজনমেণ্ট...

—হ্যাঁ, তাও খবরের কাগজে পড়েছি। তারপর?

সন্দীপ বললে—তারপর আর কী, তারপর সেই সৌম্যপদ মুখার্জির সঙ্গেই বিশাখা বিয়ে হয়ে গিয়েছে।

—সে কী রে? ফাঁসির আসামীর সঙ্গে বিশাখার বিয়ে হয়ে গেল? কেন?

সন্দীপ বললে—টাকার জন্যে!

কথাগুলো শুনে গোপাল হাজরার মুখ দিয়ে খানিকক্ষণ কোনও কথা বেরোল না। তারপর বললে—যাক, ভালোই হলো! মেয়েটার একটা হিল্লে হয়ে গেল। সারাটা জীবন সুখে কাটাতে পারবে।

গোপাল হাজরার কথা শুনে সন্দীপ অবাক হয়ে গেল। বললে—সারা জীবন বিশাখা সুখে কাটাতে পারবে? তুই বলছিস কী? টাকা থাকলেই সুখ পাওয়া যায়?

গোপাল বললে—হ্যাঁ রে হ্যাঁ, আমার কথাটা শুনে রাখ্ হাঁদা টাকা থাকলেই মানুষ সুখ পায়। এই দেখ না আমাকে। আমি তো তোদের মতো লেখা-পড়া শিখিনি। কিন্তু

আমার মতো এত সুখী কে? আমার যা টাকা আছে তা তোদের মুখুজ্জেদের আছে? আমি আজ পাঁচ-ছ' কোটি টাকার মালিক, তা জানিস? আজ আমি সুখী নই তো কে সুখী, বল্?

সন্দীপ বললে—তা তোর যদি এত টাকা তাহলে তো তোকে অনেক টাকা ইন্‌কাম-ট্যাক্স দিতে হয়!

সন্দীপের কথা শুনে গোপাল হাজরা রেগে গেল। বললে—ইন্‌কাম-ট্যাক্স? ইন্‌কাম-ট্যাক্স কেন দেব? তুই বলছিস কী? শালারা নিজেরা মদ খাবে, মাগীবাজি করবে, রোজ-রোজ আমেরিকায় বেড়াতে যাবে, সেখানে গিয়ে ফুর্তি করবে, আর আমি আমার মেহনত করে উপায় করা টাকা তাদের পেছনে খরচ করবো? আমি অতো বোকা নই—

সত্যিই, ইন্‌কাম-ট্যাক্সের নাম শুনেই তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলো।

সন্দীপও আর ওই নিয়ে তাকে ঘাঁটালো না। হঠাৎ মুখ থেকে একটা প্রশ্ন বেরিয়ে গেল—অতো টাকা নিয়ে তুই কী করবি? গোপাল হাজরা বললে—লোকে টাকা নিয়ে যা করে, আমিও তাই করবো—

—লোকে টাকা নিয়ে কী করে?

—কী আর করে, টাকা নিয়ে ফুর্তি করে, ওড়ায়। টাকা হচ্ছে বুকের বল। টাকা—থাকলে বেঁচে থেকে সুখ হয়।

সন্দীপ বললে—কিন্তু আমাদের দেশে কতো লোক যে না-খেতে পেয়ে মরে যায়! তাদের দিলে পারিস।

—দূর, আমি মাথার ঘাম পায়ে ফেলে টাকা রোজগার করবো আর সেই টাকা দিয়ে খাবার কিনে তাদের গেলাবো? আমার বাবা যে না-খেতে পেয়ে মারা গিয়েছিল, তাকে কি কেউ খেতে দিয়েছিল?

অদ্ভুত যুক্তি গোপাল হাজরার।

সন্দীপ আবার জিজ্ঞেস করলে—তা এত টাকা তুই কী করে করলি?

গোপাল বললে—আমি তো তোকেও বলেছিলুম তুই লেখাপড়া না করে কলকাতায় চলে আয়, এখানে লাখ-লাখ টাকা হাওয়ায় উড়ছে। তুই আমার কথা না শুনে বি-এ পাশ করতে গেলি। তাতে কী লাভ হলো তোর? সেই তো বাঁধা চাকরি। চাকরি করে কি কেউ কখনও বড়োলোক হতে পেরেছে? এই যে শ্রীপতি মিশ্র, দু'বার ম্যাট্রিক করে এখন মিনিস্টার হয়েছে। দিনে কতো উপায় করে জানিস?

সন্দীপ আর শুনতে চাইছিল না। গোপাল হাজরার কথাগুলো শুনতে তার খারাপ লাগছিল। সে ভাবছিল কেন গোপাল হাজরার গাড়িতে উঠতে গিয়েছিল সে। না উঠলেই বুঝি ভালো হতো।

গোপাল হাজরা আবার বলতে লাগলো—এই যে তোদের বিশাখা তার ভাগ্যটা কতো ভালো, বল দিকিনি। একটা কোটিপতির ঘরে বিয়ে হয়ে গেল!

সন্দীপ বললে—বিশাখার সঙ্গে তো আমারই বিয়ে হতে যাচ্ছিল...হঠাৎ বাধা পড়লো।

গোপাল হাজরা বললে—তোর সঙ্গে? তোর সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেলে মেয়েটার জীবন তো নরক হয়ে উঠতো একেবারে। হয়নি, খুব ভালো হয়েছে—

—কেন?

গোপাল হাজরা বললে—তোর সঙ্গে বিয়ে হলে তুই বিশাখাকে গাড়ি চড়াতে পারতিস? তুই বিশাখাকে জড়োয়া গয়না কিনে দিতে পারতিস? কলকাতা শহরে একটা বাড়ি কিনে দিতে পারতিস? বউ-এর পছন্দ মতো শাড়ি কিনে দিতে পারতিস? সব মেয়েরা তো শাড়ি, বাড়ি, গাড়ি, গয়না-ই চায়। তুই তবু যদি বউকে দিতে পারতিস?

—কিন্তু যে-মেয়ের স্বামী জেল খাটছে তার জীবনটার কথা একবার ভাব!

গোপাল হাজরা বলে উঠলো—চুলোয় যাক্‌গে স্বামী। সে-স্বামী জেলই খাটুক আর তার ফাঁসিই হয়ে যাক, তাতে বিশাখার ক্ষতিটা কী? সে তো চিরকাল টাকার পাহাড়ের

ওপর শুয়েই জীবন কাটিয়ে দিতে পারবে। সেই টাকাগুলোর তো আর ফাঁসি হচ্ছে না। সে-টাকাগুলো তো তার সিন্দুকের মধ্যেই থেকে যাবে। তা তো আর কেউ কেড়ে নিতে পারবে না।

এবার আর সন্দীপ থাকতে পারলে না। বললে—আমি নামি রে এখানে—

—সে কী? এখানে নামবি কেন? তোর ব্যাঙ্ক তো এখান থেকে আরো দূরে।

সন্দীপ বললে—তা হোক, এখানে আমার একটা জরুরী কাজ আছে—

বলে সন্দীপ সেখানেই নেমে গেল। গোপাল হাজরার জিপ্-এ আর বেশিক্ষণ বসে থাকা তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠেছিল।

তারপর অফিস থেকে যখন সন্দীপ বেড়াপোতার বাড়িতে গিয়ে পৌঁছলো তখন অন্য দিনকার মতো রাত হয়ে গিয়েছে। মা ছেলের জন্যে রাস্তার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। ছেলের জন্যে মা বরাবরই তার পথ চেয়ে অপেক্ষা করে। সেদিনও মা যথারীতি জিজ্ঞেস করলে—কী রে, কিছু খবর আছে?

সন্দীপও যথারীতি বললে—না—

—হাসপাতালে গিয়েছিলি? তোর মাসিমা কেমন আছে?

সন্দীপ বললে—ভালো—

কিন্তু খেতে বসে সন্দীপ হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে—আচ্ছা মা, তোমার এক জোড়া সোনার বালা ছিল না?

মা বললে—হ্যাঁ, কেন?

—সেটা আমাকে দিতে পারবে?

—কেন রে? আবার কী হলো?

সন্দীপ বললে—নার্সিং-হোমে আবার দেড় হাজার টাকার বিল্ শোধ করতে হবে।

—কেন? কী হয়েছে? কীসের জন্যে আবার দেড় হাজার টাকা লাগবে?

সন্দীপ বললে—সে-সব জানি না। চেয়েছে, তাই দিতে হবে। আমার ব্যাঙ্কেও টাকা নেই আর।

মা বললে—বালা-জোড়া আমি দিয়ে দিতে পারি। কিন্তু সেই তোর মল্লিক-কাকা যে বলে গিয়েছিল তোর মাসিমার ডাক্তারি-খরচের জন্যে যা-টাকা লাগবে সব দেবে। এক লাখ দু'লাখ যা লাগে দেবে।

—তা এখন তুই একবার তোর সেই মল্লিক-কাকার কাছে যা না—

সন্দীপ বললে—আমি টাকা চাইতে পারবো না—

মা বললে— আরে ওদের কাছে দেড় হাজার টাকা কিছুই নয়। চাইলে দোষ কী? তুই তো আর টাকা ধার চাইছিস্ না। তখন টাকা দেবেন বলেছিলেন সেই কথাটা একবার তাঁকে মনে করিয়ে দিতে দোষ কী?

সন্দীপ বললে—না মা, কারোর কাছে টাকা চাইতেই আমার লজ্জা করে। আমি টাকা চাইতে পারবো না—তুমি যদি সোনার বালা জোড়া দিতে পারো তো ভালো, নইলে...

—নইলে কী?

সন্দীপ বললে—নইলে কী করবো তা ভেবে দেখবো...

বলে খাওয়ার জায়গা থেকে উঠে পড়ে হাত-মুখ ধুতে উঠোনের দিকে গেল।

মুক্তিপদ মুখার্জি কলকাতায় আসা পর্যন্ত ব্যস্ততার মধ্যে জড়িয়ে পড়েছিলেন। উদ্দেশ্য, মাকে দেখা, মা'র চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত করা। কিন্তু সমস্ত কাজের মধ্যেও তাঁর

ইন্দোরের ফ্যাক্টরির কথা ভোলেননি। ভোলেননি তাঁর বাড়ির কথা, ভোলেননি তাঁর নন্দিতার কথা, ভোলেননি তাঁর পিক্‌নিকের কথা।

তাই তিনি মা-মণিকে দেখতে এসে রোজ ইন্দোরে টেলিফোন করতেন। টেলিফোন করতেন রাত্রে। তিনি জানতেন পৃথিবীতে বেশির ভাগ পাপ ঘটে রাত্রে। জানতেন এই রাতের বেলাতেই মানুষ অন্যায় করতে বেশি প্রশ্রয় পায়। রাত্রের অন্ধকারই পাপের পক্ষে প্রকৃষ্ট সময়। দিনের বেলা এখন চারিদিকে আলোর প্রকাশ থাকে তখন নিজেকে ঢেকে রাখবার প্রয়োজন অনিবার্য হয়। কারণ তখন সকলের দৃষ্টি থেকে আত্মগোপন করবার সুযোগ কিংবা অবসর থাকে না।

কিন্তু যেই রাতের অন্ধকার নেমে আসে তখন মনের গর্ত থেকে অবদমিত ইচ্ছেগুলো, সাপের মতো বাইরে এসে ফণা তুলে ধরে। তখনই মানুষ একলা হয়। দিনের বেলা যে মানুষ হয়তো সাধু, রাত্রিতে আবার সে মানুষটাই হয়তো চোর। মানুষকে চিনতে হলে তাই তার রাত্রের চেহারাটাই দেখা উচিত।

—কে? ও তুই? বিশ্বনাথ? মেমসাহেব কোথায়?

—হুজুর বাড়ি নেই।

—কোথায় গেছেন?

—তা বলে যাননি।

—আর পিক্‌নিক্? মিসিবাবা?

এখন ঘুমোচ্ছেন!

মেয়ে বাড়িতে ঘুমোচ্ছে আর মেমসাহেব হয়তো তখন ক্লাবে বা সিনেমায় নাইট-শো দেখছে। আশ্চর্য! শুধু কি মুক্তিপদ মুখার্জি? ইংরেজরা কবে চলে গেছে, কিন্তু তারা যা রেখে গেছে তারই শিকার হয়েছে এই মুক্তিপদ মুখার্জিরা। তার মধ্যে শুধু এইটুকুই তফাৎ যে আগে ক্লাবে স্যুট না পরে গেলে ভেতরে ঢুকতে দেওয়া হতো না, আর এখন সেখানে ধুতি-কুর্তা পরলেও ঢুকতে দেওয়া হয়।

মানুষ সারা জীবন ধরে কেবল একটা কাজই করে যা বাঘ-ভাল্লুকরাও করে। সেই কাজটা হলো জীবিকা-অর্জন। কীসে আরো টাকা উপার্জন করবে, কীসে আরো ভালো করে বাঁচবে তারই সন্ধান করে মানুষ সমস্ত জীবনটা নষ্ট করে। কিন্তু একমাত্র মৃত্যুর মুখোমুখি এসে দাঁড়ালেই সে হঠাৎ সচেতন হয়ে ওঠে। তখন সে ভাবে—'তাই তো, এত-দিন তো শুধু টাকা উপার্জনের ধান্দাতেই জীবনটা কেটে গেল; তাছাড়া আর তো কিছু করা হলো না।' কিন্তু তখন বড়ো দেরি হয়ে গিয়েছে। তখন তার বিদায় নেওয়ার লগ্ন এসে গেছে।

মা-মণির অবস্থা দেখে মুক্তিপদরও তাই মনে হলো! সত্যিই তো বড় দেরি হয়ে গিয়েছে! এতগুলো বছর তিনি কী করলেন, কী নিয়ে মেতে থাকলেন, কার কতোটা ভালো করলেন, দেশের বা কী উপকার করলেন! শুধু ভেবেছেন নিজের কথা, নিজের পরিবারের সুখ-সমৃদ্ধির কথা, আর তো কিছুই ভাবেননি তিনি! আর যদি বা কিছু ভেবেছেন তো তা হলো ইন্‌কাম-ট্যাক্সের কথা! হিসেবের কথা, লাভ-লোকসানের কথা!

কিন্তু সারা জীবনটা তিনি কি শুধু সেই কাজেই কাটিয়ে দেবেন? সেই কাজ করতেই কি তিনি পৃথিবীতে জন্মেছেন? তাহলে কেন এই ভূতের বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছেন? তাঁর নিজের বলতে কে আছে? তাহলে কাদের জন্যে তিনি এইসব করছেন? তাঁর নিজের জন্যে? তাঁর স্ত্রী, তাঁর মেয়ের জন্যে? দেখতে দেখতে তাঁর বয়েস তো অনেক হলো! এতদিনে তাদের তিনি চিনে নিয়েছেন। তারা সবাই কেবল নিজের নিজের আরাম আর সুবিধে ভোগ করতেই অভ্যস্ত। সেখানে এতটুকু ওজন কমলেই তারা প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠবে। তারা বলতে আরম্ভ করবে—তোমার ফ্যাক্টরি বন্ধই হয়ে যাক আর উঠেই যাক, তা আমাদের দেখবার দায় নেই, আমাদের দাবি তোমাকে মেটাতেই হবে, আমরা তোমার কোনও আপত্তিও শুনতে চাই না।

এইসব কথা তিনি আগে কখনও তেমন করে ভাবেননি। ভাবেননি তার কারণ তখন তিনি এত ব্যস্ত ছিলেন যে এসব কথা ভাববার সময়ই পাননি। কিন্তু আজ?

আজ ইন্দোর থেকে কলকাতায় এসে মা-মণিকে দেখার পর থেকে এইসব কথাগুলোই মুক্তিপদর আবার মনে পড়তে লাগলো। যে মা-মণি তাকে পালন করেছে, শাসন করেছে, সেই মানুষটাই আবার এই অবস্থায় অসাড়-অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। সংসারে কোথায় কোথায় অপচয় কোথায় অপব্যয় হচ্ছে তা দেখবার আর কেউ নেই। সে-জন্যে কাউকে শাসন বা শাস্তি দেওয়ারও কেউ নেই এখন। তবু তো পৃথিবী চলছে, তবু তো এখনো দিন আর রাত, সূর্যোদয় আর সূর্যাস্ত হচ্ছে। পৃথিবীর কোথাও তো তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না। তাহলে মুক্তিপদর মৃত্যুর পরও কি তাই-ই হবে?

নিশ্চয় তাই-ই হবে। সমস্তই এইরকম করে চলবে, শুধু মুক্তিপদই চলে যাবে। পৃথিবী থাকে, শুধু মানুষই চলে যায়। তাই-ই যদি হয় তাহলে কেন এই মায়া, কেন এই মমতা, কেন এই আকর্ষণ!

ডাক্তারবাবুকে মুক্তিপদ জিজ্ঞেস করলেন—কেন এমন হলো? এর কি কোনও প্রতিকার নেই?

ডাক্তারবাবুর কাছে এসব প্রশ্ন পুরনো জিনিস। তিনি অনেক জন্ম দেখেছেন, অনেক জীবন দেখেছেন, আবার অনেক মৃত্যুও দেখেছেন। দিন-রাত তিনি এইসব নিয়েই আছেন। আর ওসব যদি না থাকবে তাহলে তিনি খাবেন কী? কোথা থেকে তাঁর খাওয়া-পরা আসবে?

ডাক্তারবাবুর একটা কথা মনে পড়লো। তিনি বলেছিলেন—আমরা তো জীবন দিতে পারি না, আমরা শুধু এমন ওষুধ দিতে পারি যাতে মৃত্যুর সময় মানুষ কষ্ট না পায়। এর বেশি আমরা কিছুই করতে পারি না—

এর পর মুক্তিপদর আর কিছুই করবার থাকে না। তিনি উঠে বাইরে চলে আসেন। তারপর সোজা একেবারে বাড়ি। এই বাড়িটাও যেন আর এক নতুন চোহারা নিয়ে তাঁর সামনে উদয় হলো। তাঁর মনে হলো এমন একদিন আসবে যখন এই বাড়িটাও আর এমনি করে দাঁড়িয়ে থাকবে না। অথচ তাঁর বাবা কতো টাকা খরচ করে একদিন এই বাড়িটা তৈরি করেছিলেন। তখন হয়তো তিনিও ভেবেছিলেন যে এ-বাড়িটা চিরকাল থাকবে।

গিরিধারী যথারীতি সেলাম করলে মেজবাবুকে। মুক্তিপদ এবার তার দিকে ভালো করে চেয়ে দেখলেন। বললেন—গিরিধারী—

—হুজুর!

—তোমার চাকরি কতদিন হলো?

—সো মালুম নেহি হুজুর।

এরাই সংসারে সুখী। এই গিরিধারীরা। এরা আছে বলেই 'সুখ' শব্দটা ডিক্সনারীতে এখনও আছে। এরা যেদিন থাকবে না, সেদিন ডিক্সনারী থেকেও শব্দটা উধাও হয়ে যাবে। এ লেখাপড়া শেখেনি, বেশি টাকার মালিকও হয়নি এ। তবু ওকে দেখে মুক্তিপদর একটু হিংসে হতে লাগলো।

মনে পড়লো হেনরি ফোর্ডের কথা। বিরাট বড়োলোক মানুষ তিনি। প্রতি ঘণ্টায় একটা করে গাড়ি তৈরী হতো তাঁর ফ্যাক্টরিতে। তখনকার দিনে তাঁর প্রতিদিন আয় হতো ষোল লক্ষ টাকা।

একদিন সেই হেনরি ফোর্ড তাঁর কারখানায় ঢুকেছেন। তখন টিফিন-টাইম। তাঁর স্টাফরা তখন টিফিন খাচ্ছে গোগ্রাসে। তাদের দেখে হেনরি ফোর্ড-এর খুব হিংসে হলো। তাঁর মনে হলো কতো সুখী তাঁর স্টাফরা। অথচ ওরা কত কম মাইনে পায়।

সেই হেনরি ফোর্ড তাঁর ডায়েরিতে লিখে গেছেন—"আমি কাল একটি ডিম খাইয়াছিলাম এবং তাহা হজম হইয়াছে।"

এই গিরিধারীকে দেখেও মুক্তিপদর ঠিক তেমনি হিংসে হলো। তিনি আর কিছু

না বলে সোজা ওপরে উঠে গেলেন। দেখলেন ম্যানেজারবাবুও সেই সিঁড়ি দিয়ে তখন নিচে নামছেন। বললেন—ম্যানেজারবাবু, একবার আমার কাছে আসুন তো—

মল্লিক-মশাইয়ের আর নিচেয় নামা হলো না। তিনিও মেজবাবুর পেছন পেছন ওপরে উঠতে লাগলেন। শেষে তাঁর ঘরে গিয়ে বসতেই মল্লিক-মশাইও সেখানে গিয়ে হাজির হলেন। মুক্তিপদ বললেন—আমি ডাক্তারবাবুর কাছ থেকে আসছি—

মল্লিক-মশাই একথা শুনলেন কিন্তু কিছু বললেন না। মুক্তিপদ আবার বলতে লাগলেন—আমি ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞেস করলাম মা-মণি বাঁচবেন কিনা। তা তিনি তেমন কোনও ভরসা দিতে পারলেন না।

এবারও মল্লিকমশাই কোনও কথা বললেন না। মেজবাবু হুকুমের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলেন। মেজবাবু আবার বলতে লাগলেন—তা, এই যখন অবস্থা তখন শোক করার চেয়ে আরো জরুরী কাজ এখন আমাদের করতে হবে। মা-মণিকে যখন আমরা আর বাঁচিয়ে রাখতে পারবো না, তখন আগে আমাদের আর কী কাজ করতে হবে তা ভাবতে হবে। সৌম্য জেল খাটছে, সুতরাং এখন আর সে আমাদের কোম্পানির ডিরেক্টার নেই। তাই তার নাম এখন ডিরেক্টারদের লিস্ট থেকে কাটা হয়ে গেছে—

এ কথা মল্লিক-মশাইয়ের মাথায় আসেনি। জিজ্ঞেস করলেন—তাই নাকি?

মেজবাবু বললেন—হ্যাঁ, তাই। আইন তাই-ই বলেই আমি ডিরেক্টার বোর্ডের মিটিং-এ সেই কথাটা তুলেছিলুম। আমাদের এ্যাটর্নি সেই পরামর্শ দিয়েছিলেন।

মল্লিক-মশাই তখনও দাঁড়িয়ে ছিলেন। জিজ্ঞেস করলেন—তারপর?

মেজবাবু আবার বলতে লাগলেন—এবার যদি কপাল খারাপ হয় তো আমাদের মা-মণির ডিরেক্টারশিপ্‌ও কাটা যাবে।

—তাহলে কি হবে?

মেজবাবু সে-কথার উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—বউমা কোথায়?

মল্লিক-মশাই বললেন—ঠাকমা-মণির ঘরে।

—কেন? ঠাকমা-মণির ঘরে কেন?

মল্লিক-মশাই বললেন—তিনি ঠাকমা-মণির সেবা করছেন—

—কেন? নার্স নেই?

হ্যাঁ, দিন-রাত্তিরের নার্স তো রয়েছে। দু'জন নার্স দিবা-রাত্তির পালা করে ডিউটি দেয়। তাদের সঙ্গে বউদি-মণিও সমস্ত দিন-রাত ঠাকমা-মণির সেবা করেন।

মেজবাবু যেন আকাশ থেকে পড়লেন। বললেন—রাত্তিরেও বউমা থাকে?

—হ্যাঁ।

—কেন? ও-রকম রাত জাগলে তো বউমার শরীর খারাপ হয়ে যাবে। আপনি বারণ করেন না কেন?

মল্লিক-মশাই বললেন—আমি বারণ করেছিলুম, কিন্তু উনি আমার কথা শোনেন না। তারপর একটু থেমে আবার বললেন—আর শুধু তাই-ই নয়। তিনি আমার কাছ থেকে রোজকার জমা-খরচের হিসেব লিখে নেন তাঁর খাতায়।

—সে কী!

—হ্যাঁ। ঠাকমা-মণি যা-যা করতেন বউদি-মণিও এখন ঠিক সেইরকম ভাবেই এই সংসার চালাচ্ছেন। সমস্ত নিয়ম পালন করে চলেছেন...

—করে চলেছেন?

মল্লিক-মশাই বললেন—ঠিক সেইরকম নিয়ম করে সিংহবাহিনীর পুজো-আচ্ছা চালিয়ে যেতে বলেছেন। ঠিক রাত ন'টার সময়ে সদর গেট বন্ধ করতে বলে দিয়েছেন গিরিধারীকে, সিঁড়ি আর উঠোনের সব আলোগুলো রাত দশটার সময়ে বন্ধ করবার হুকুম দিয়ে দিয়েছেন ঠিক ঠাকমা-মণির সময়ে যা-যা করা হতো, এখনও সেইরকম করার হুকুম দিয়ে দিয়েছেন। এর ওপর আছে দিন-রাত জেগে ঠাকমা-মণির অসুখে সেবা করা।

ঠাকমা-মণির সিন্দুক আর আলমারির সব চাবির গোছা, সবকিছু এখন বউদি-মণির হেফাজতে।

কথাগুলো শুনে মেজবাবু খানিকক্ষণ গুম হয়ে রইলেন। তারপর খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বললেন—কিন্তু বউমা যদি সে টাকা বাপের বাড়ির লোকদের দিয়ে দেয়?

মল্লিক-মশাই বললেন—বউদি-মণির বাপের বাড়িতে এক বুড়ি বিধবা মা ছাড়া নিজের বলতে তো আর কেউ নেই। তা তাও আবার তিনি অসুস্থ। বেশিদিন বাঁচবেনও না। কাকে দেবেন?

তা বটে! কথাটা শুনে মেজবাবু যেন একটু আশ্বস্ত হলেন। বললেন—বউমাকে একবার আমার কাছে এখন ডাকুন তো আপনি!

বিশাখা তখন ঠাকমা-মণিকে গরম জলে স্নান করাচ্ছিল। এটা ডাক্তারবাবুর নির্দেশ। স্নান করানো মানে 'স্পঞ্জ' করানো। সঙ্গে নার্সও ছিল। হঠাৎ বাইরে থেকে মল্লিক-মশাইয়ের ডাক শুনে কাজ বন্ধ রেখে বিশাখা বাইরে এল। জিজ্ঞেস করলে—আমাকে ডাকছেন?

মল্লিক-মশাই বললেন—হ্যাঁ, মেজবাবু এসেছেন, আপনাকে একবার তিনি ডাকছেন—

—আমাকে? কেন?

মল্লিক-মশাই বললেন—আপনার সঙ্গে একবার কথা বলতে চান মেজবাবু—

—মেজবাবু?

মেজবাবুর নাম শুনেই বিশাখার মুখের চেহারাটা এক মুহূর্তে কেমন বদলে গেল। তারপর একটু ভেবে নিয়ে বললে আমি কাপড়টা বদলে এখুনি আসছি—

বলে আবার ঘরের ভেতরে চলে গেল। তারপর পরা-কাপড়টা ছেড়ে আর একটা কাচা কাপড় পরে আয়নাতে নিজের মুখের চেহারাটা একটু দেখে নিয়ে বাইরে এল।

তারপর মেজবাবু যে ঘরে ছিলেন সেই ঘরে ঢুকলো। মেজবাবু বিশাখাকে দেখেই বললেন—এসো বউমা, তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম। তোমার সঙ্গে কিছু কথা আছে, বোস, বোস—

—বিশাখা ঘরে ঢুকে সোজা মেজবাবুর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে। মেজবাবু বললেন—এই একটু আগে ম্যানেজারবাবুকে বলছিলাম সব। আমি ডাক্তারবাবুর সঙ্গে দেখা করে এলাম। ডাক্তারবাবু আমাকে স্পষ্টই বলে দিলেন যে মা-মণির আয়ু আর বেশিদিন নেই। আর কিছুদিন বাঁচলেও তাঁর কর্মক্ষমতা বেশিদিন থাকবে না। তাই আমাদের কাজ-কর্মের সব ব্যবস্থা আগে থেকেই করে রাখতে হবে।

বলে তিনি পকেট থেকে কয়েকটা কাগজ পত্র বার করলেন। সেগুলো পরপর সাজিয়ে বললেন—এই দেখ, আমি ফেরবার সময় আমার এ্যাটর্নির অফিসেও গিয়েছিলাম। তোমাকে সৌম্যর জায়গায় ডিরেক্টার করে নেওয়া হবে। তিনি সেই পরামর্শই দিলেন। তারপরে মা-মণি চলে গেলে কি করতে হবে তা তিনি পরে বলে দেবেন—এখন তুমি এই চারটে জায়গায় সই করে দাও—

বিশাখা অন্য ঘর থেকে কলম আনতে যাচ্ছিল। কিন্তু মেজবাবু বললেন—এই নাও, আমার এই কলমটা নিয়ে তুমি সই করো—

বলে নিজের কলমটা বিশাখার দিকে বাড়িয়ে দিলেন। বললেন—এই, এই জায়গায় তুমি সই করো—আর তারিখ দাও—

বিশাখাকে চারটে কাগজে সই দিতে হলো। মেজবাবু বললেন—এখন থেকে তুমি বছরে কম-বেশি চার লাখ টাকা করে পাবে। আর বাড়তি কিছু টাকা, মানে হিসেবের বাইরে যদি কিছু টাকা দেবার থাকে তো তাহলে আমি তা নিজে এসে দিয়ে যাবো। বুঝলে?

ঘটনাটা এমন আকস্মিকভাবে ঘটলো যে বিশাখার মুখ দিয়ে এ সম্বন্ধে কোনও উত্তর

বেরোল না। তার চোখের সামনে যেন সব কিছু অন্ধকার হয়ে গেল। মাথার ভেতরে শুধু ভোঁ-ভোঁ করে শব্দ হতে লাগলো। মনে হলো সে যেন তখনই সেখানে পড়ে যাবে। তখনও তার কানের কাছে কথাগুলা কেবল গুঞ্জন করতে আরম্ভ করেছে—চার লাখ টাকা .চার লাখ টাকা...

—কী হলো? আমার কথাগুলো তুমি বুঝেছ? কথা বলছো না যে?

হঠাৎ আচমকা তার বিয়ে হয়ে যাওয়া, হঠাৎ গয়না আর টাকা ভর্তি আলমারির চাবির গোছা পাওয়া, হঠাৎ ঠাকমা-মণির অসুস্থ হওয়া, হঠাৎ শ্বশুরবাড়ির কোম্পানির ডিরেক্টার হয়ে বছরে চার লাখ টাকার মালিক হয়ে যাওয়া, এ-সব কী হচ্ছে তার জীবনে তা সে ভালো করে ভাবতে গিয়ে একেবারে নির্বাক হয়ে গেল। সত্যিই, সে কি স্বপ্ন দেখছে, না ভুল শুনছে! সে কি রূপকথার নায়িকা, না সিনেমার অভিনেত্রী, এ-সব ঘটনা তো সিনেমাতেই দেখা যায়, এ-সব ঘটনা তো রূপকথার কাহিনীতেই লেখা থাকে। মা, তুমি জীবনে কতো দুঃখ পেয়েছ, আমি তা দেখেছি। আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে কতোদিন তুমি কেঁদেছ, তাও আমার মনে আছে। তোমাকে একদিন এ-বাড়িতে নিয়ে এসে দেখাবো মা আমার আলমারিতে কতো গয়না আছে, আমার সিন্দুকে কতো টাকা আছে। বছরে চারলক্ষ টাকা আমার আয় আছে।

আর আমার স্বামী? তোমার জামাই? সে তো খুনের আসামী হয়ে জেলখানায় ঘানি ঘোরাচ্ছে। কিন্তু তাতে কী? চিরকাল তো আর তোমার জামাই জেল খাটবে না। সে তো একদিন জেল থেকে ছাড়া পাবে। সাত বছর বা আট বছর বা আট বছর পরে সে তো আবার বাড়িতে ফিরে আসবে! তখন? তখন তুমি কতো সুখে কাটাবে, তা ভাবো তো! তখন আর তোমাকে পরের বাড়িতে ঝি-গিরি করে দিন কাটাতে হবে না, পরের মুখনাড়া শুনতে হবে না। তখন তুমি পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে শুধু হুকুম করবে। তুমি শুধু বিছানায় শুয়ে শুয়ে বিন্দু-সুধা-কালিদাসীদের হুকুম করবে। তারা সবাই তোমার হুকুম তামিল করবে। আর তারা তোমার মুখের কাছে ভাতের থালা এনে দেবে। তোমাকে আর কখনও হাত পুড়িয়ে রান্নাও করতে হবে না, ছাই ঘষে ঘষে এঁটো থালা বাসন মাজতে হবে না...

—এ কি বউমা, তুমি কাঁদছো?

হঠাৎ বিশাখার যেন হুঁশ ফিরে এল. সে সামনের দিকে চেয়ে দেখলে সেখানে তার খুড়-শ্বশুর বসে আছেন। মল্লিক-মশাই দাঁড়িয়ে আছেন। মা কোথায় তার? তাহলে কার সঙ্গে সে এখন কথা বলছিল? তার মা তো...

-বউমা, তুমি এখন এসো! তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে বুঝতে পারছি, যাও তুমি—

বিশাখা চলে যাওয়ার পর মেজবাবু মল্লিক-মশাইয়ের দিকে চাইলেন। বললেন—সৌম্যটার স্ত্রী-ভাগ্য ভালো তো—

বোধ হয় তিনি নিজের স্ত্রীর সঙ্গে সৌম্যর স্ত্রীর তুলনা করেই কথাগুলো বললেন।

মল্লিক-মশাই বললেন—বউদি-মণি যে ঠাকমা-মণির কতো সেবা-যত্ন করছেন, তা নিজের চোখে না দেখলে কেউ বিশ্বাস করবে না। লোকে নিজের বাপ-মাকেও কেউ অমন করে সেবা-যত্ন করে না!

মেজবাবু বললেন—সেই জন্যেই তো বলছি সৌম্য নিজে একটা হারামজাদা, কিন্তু বউটা পেয়েছে ভালো। যাক, সব সুখ তো সকলের কপালে হয় না—

কথাটা কতকটা স্বগতোক্তির মতো শোনালেও তাঁর মনের কথাটাই হয়তো মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো। বললেন—আমি আজকেই যাচ্ছি, আপনি রইলেন, সব কিছু সামলে চলবেন/ আমি আর আপনাকে কী বলবো! ওদিকে আমাকে দেখবার তো কেউ নেই, আমাকে একলাই ঘর-বার সব কিছু সামলাতে হয়। এখন সেই ইন্দোরও আর সেই ইন্দোর নেই। সেখানে এখন এখানকার মতো পার্টিবাজি শুরু হয়ে গিয়েছে। সেখানেও এখন পলিটিক্স্ নিয়ে মাতামাতি। আর আছে স্পোর্টস। যেদিন খেলা থাকবে সেদিন আর

অফিসে কেউ কাজ করবে না। মিনিস্টাররাও কাজকর্ম ফেলে রেখে সমস্ত দিন ধরে খেলা দেখবে। আগে কলকাতাতে এই রকম হতো, এখন পুরো ইন্ডিয়াতেই এই রকম চলছে—

তারপর হঠাৎ বললেন—হ্যাঁ, ভালো কথা! একবার ইন্দোরে একটা ট্রাঙ্ককল্ বুক করে রাখুন তো—
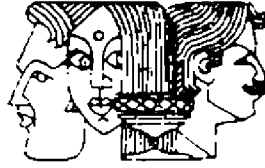
এই-ই কলকাতা, এই-ই পৃথিবী! শুধু আজকের পৃথিবীই নয়, চিরকালের পৃথিবীই এই রকম। বিশেষ করে যেদিন থেকে পৃথিবীতে শহর-সভ্যতা সৃষ্টি হয়েছে। তার মানে পাঁচ হাজার বছর আগে থেকে। একদিকে সন্দীপরা, আর একদিকে মুক্তিপদ মুখার্জিরা। তাদের দু'দলই এই শহর-সভ্যতা চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

আর তাদের বাইরে যারা গ্রামের লোক? তারা?

ওদের কথা ভাববার সময় নেই আমাদের। আমরা যারা শহরে থাকি তারা তো গ্রামের লোকদের খাটিয়েই পেট চালাই। যারা আমাদের খাবার জন্যে ধান-গম, আলু-বেগুন-কলা-মুলো চাষ করে, তাদের কথা ভোটের আগে ভাববো। ওদের সবাইকে এনে তখন জড়ো করবো ময়দানে। মাথা পিছু সকলকে কিছু-কিছু টাকা দেব তাদের হাত-খরচের জন্যে। তারা বিনা-টিকিটে ট্রেনে চড়ে কলকাতায় আসবে, তারপর সারাদিন ধরে মিউজিয়াম দেখবে, কালীঘাটের মন্দিরে যাবে, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল দেখবে আর তাদের মধ্যে কিছু কিছু লোক ময়দানে মিটিং গুলজার করবে। আর আমরা যখন নির্দেশ দেব তখন তারা সবাই বক্তৃতা শুনতে শুনতে জোরে জোরে হাততালি দেবে! আমরা যখন বলবো—বলো, বন্দে মাতরম্—

তারাও তখন সবাই গলায় গলা মিলিয়ে বলবে—বন্দে মাতরম্—

আবার আমরা যখন বলবো—বলো, ইনক্লাব জিন্দাবাদ—

তারাও তখন সবাই গলায় গলা মিলিয়ে বলবে—ইনক্লাব জিন্দাবাদ—

সে সামন্ততন্ত্রের যুগেই হোক আর গণতন্ত্রের যুগেই হোক, আজ পাঁচ হাজার বছর আগে থেকেই এই-ই চলে আসছে। আমরা যখন যাদের দরকার মনে করেছি তখনই তাদের ফাঁসি দিয়েছি, কিংবা ওদের ধরে জেলে পুরেছি। আর যখন দরকার হয়েছে তখন তাদের 'রায়-সাহেব' 'রায়-বাহাদুর' উপাধি দিয়েছি। আবার যখন সিংহাসন বদল হয়েছে তখন তাদেরই বংশধরদের 'পদ্মশ্রী', 'পদ্মভূষণ' কিংবা 'ভারতরত্ন' উপাধি দিয়ে তাদের হাতের মুঠোর মধ্যে রেখেছি। আর গ্রাম-গঞ্জ থেকে শহরে ডেকে এনে যাদের মিটিং-এ সামিল করেছি, তারা?

তারা জাহান্নমে যাক্, ভোট দেওয়ার পর তাদের দিকে আর আমরা ফিরে তাকাইনি। কারণ তারা বড়ো নোংরা, তারা বড়ো অশিক্ষিত, তারা বড়ো নেমকহারাম! তারা একটু লেখাপড়া শিখলেই মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে চায়। তারা বলে—আমরাও মন্ত্রী হবো, কিংবা এম-পি, এম-এল-এ হবো। আমরাও রায়-সাহেব হবো, রায়-বাহাদুর হবো। কিংবা 'পদ্মশ্রী', পদ্মভূষণ' হবো—

আর একবার যদি মন্ত্রী হয়ে যাই তখন আর আমাদের পায় কে? তখন আমরা আর কারও পরোয়া করি। একবার মন্ত্রী হয়ে গেলে তবেই আমাদের অধঃস্তন চতুর্দশ পুরুষ ধরে সেই একই ট্রাডিশন ভোগ করতে পারবো। দরকার হলেই আমরা কথায়-কথায় রাশিয়াতে যেতে পারবো, বিলেতে যেতে পারবো। অসুখ-বিসুখ হলে ওয়াশিংটন বা মসকোয় গিয়ে অপারেশন করিয়ে আনতে পারবো।

এমনি করেই একদিন বরদা ঘোষাল এসেছিল গ্রাম থেকে। সে থাকতো একটা অজ

গাঁয়ে। শ্রীপতি মিশ্রও দু'বার ম্যাট্রিক ফেল করে এমনি করে গ্রাম থেকে এসেছিল। আর তারপর এসেছিল গোপাল হাজরা। তারা সবাই-ই এসেছিল কলকাতায় পার্টির মিটিং-এ বিনা-টিকিটে রেল-গাড়ি চড়ে। এসে কেউ নেমেছিল হাওড়া স্টেশনে, কেউ বা নেমেছিল শেয়ালদা স্টেশনে। তারপর দল বেঁধে মিছিল করে পায়ে হেঁটে ময়দানে গিয়েছিল লীডারদের বক্তৃতা শুনতে। পার্টির লোকরা সকলের হাতে হাতে দিয়েছিল মাথা-পিছু দুটো করে হাতে-গড়া রুটি, আর থাবা খানেক গুড়। সেই খেয়েই সমস্ত দিন মিটিং শুনেছিল।

একজন লীডার বলে দিয়েছিল—এইবার হাত-তালি দে সবাই—

আর সঙ্গে সঙ্গে সবাই চট্‌পট্‌ হাত-তালি দিয়েছিল। বেড়াপোতা, মালদা কিংবা অন্য সব জায়গা থেকে যারা-যারা বিনা-টিকিটে রেলে চড়ে এসেছিল, তারা সবাই আবার সন্ধ্যেবেলা ট্রেনে উঠে যে-যার গ্রামে চলে গিয়েছিল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ সেই মিটিংএও যায়নি। সোজা চলে গিয়েছিল চিড়িয়াখানায়, কেউ কেউ আবার চলে গিয়েছিল কালী-ঘাটের মা-কালীর মন্দিরে।

কিন্তু শেষকালে তারা যখন সবাই যার-যার গ্রামে চলে গিয়েছিল, ওই তিনজন আর তাদের বাড়ি ফিরে যায়নি। তাদের মধ্যে একজন গোপাল হাজরা, একজন বরদা ঘোষাল, আর একজন দু'বার ম্যাট্রিক ফেল করা ছেলে শ্রীপতি মিশ্র।

অথচ এদের তিনজনের মধ্যে কেউ-ই অন্যদের কাউকে চিনতো না।

সেই যে গোপাল হাজরা কলকাতার স্বাদ পেয়ে গেল, তারপর আর বেড়াপোতায় ফিরে যায়নি। এখানেই রয়ে গেল তখন থেকে। আর একবার কলকাতার জল পেটে পড়লে যা হয়, তাই-ই হলো। গোপাল হাজরা বেড়াপোতার কথা একেবারে ভুলে গেল!

ওই গোপালের যা দশা হলো, বরদা ঘোষাল আর শ্রীপতি মিশ্রেরও সেই একই দশা হলো। তারা চিরকালের মতো গ্রাম ছেড়ে দিয়ে স্থায়ীভাবে কলকাতার নাগরিক হয়ে গেল। আর তাদের পাকা ঠিকানা হয়ে গেল কলকাতা।

প্রথমে থাকতে লাগলো বস্তিতে। বস্তির মানুষদের সঙ্গে মিশে তারা সরাসরি বস্তির মানুষ হয়ে গেল। কিন্তু পেশা?

একটা কিছু পেশা তো চাই, নইলে খাবো কী? নইলে পেট চলবে কী করে? নইলে পরবার কাপড়-চোপড় কে যোগাবে?

কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যে তারও একটা হিল্লে হয়ে গেল। 'সন্তোষী মা'র পুজো দিয়েই শুরু হলো। শহরে 'দুর্গা পুজো', 'সরস্বতী পুজো', 'কালী পুজো'গুলো আগে থেকেই চালু ছিল। সেগুলোর মধ্যে ঢুকতে গেলে তেমন পাত্তা পাওয়া মুশকিল। সে-সব ক্লাবে তখন প্রেসিডেন্ট, ভাইস-প্রেসিডেন্ট আর সেক্রেটারীরা আগে থেকে তাদের আসন পাকা করে রেখে দিয়েছে। সেখানে বাইরের লোকের পক্ষে ঢোকা মুশকিল, পাত্তা পাওয়াই শক্ত।

তখন বাজারে নতুন ধরনের একটা পুজো শুরু হয়ে গিয়েছে। সে পুজোটার নাম 'সন্তোষী মা'র পুজো। আগেকার পুজোর মতো সে-পুজো দু'তিন দিনের মধ্যে শেষ হয় না। একবার 'সন্তোষী মা'র পুজো শুরু হলে লম্বা চোদ্দ-পনেরো দিন ধরে টেনে নিয়ে যাওয়া যায়। পুজো যতোদিন চলবে ততদিন টাকা-পয়সা আদায় হবে। পুজোর পর তখন আবার উপোস!

তাই গোপাল হাজরা ভাবলে সে 'সন্তোষী মা'র পুজো দিয়েই তার জীবন আর জীবিকা শুরু করবে/ শেষ পর্যন্ত তা-ই হলো। আর নিজের পুজো কমিটির প্রেসিডেন্ট সে নিজেই হলো। আর তার ফলে পাড়ায় যা-কিছু চাঁদা আদায় হলো তার সবটা তারই হাতে এসে জমা হলো। এও পলিটিক্যাল পার্টির কায়দায় চলতে লাগলো তখন থেকে।

বেকার ছেলেরা তাকে 'গোপালদা' বলে খাতির করতে লাগলো তখন থেকে। একটা

ছোট্ট প্রেস থেকে বাকিতে বিল্-বই ছাপানো হলো। পুজোর চাঁদা আদায় হওয়ার পর প্রেসের ধার শোধ করা হবে—এই কথা হলো ছাপাখানার-মালিকের সংগে।

তারপর সেই বিল্-বই নিয়ে পাড়ার সেই বেকার ছেলের দল হৈ-হৈ করে রাস্তায় নেমে পড়লো। বাড়ি-বাড়ি গিয়ে বিলের রসিদ নিয়ে জমা দিতে লাগলো। পাড়ার লোকরা তো পুজোর নাম শুনে অবাক। বললে—এ সময়ে আবার কীসের পুজো রে?

ছেলেরা বললে—এ নতুন এক রকমের পুজো মাসিমা। এর নাম 'সন্তোষী-মা'র পুজো।

পাড়ার লোকরা বললে—এ পুজোর নাম তো আগে কখনও শুনিনি ভাই!

ছেলেরা বললে—নাম শুনবেন কী করে মাসিমা? এ-ঠাকুর তো আগে ছিল না। এ-ঠাকুর নতুন এসেছে আমাদের দেশে।

পাড়ার লোকেরা আর কী-ই বা করবে। যার যেমন সাধ্য তা দিলে ছেলেদের হাতে। তারা সেই সব টাকা-পয়সা নিয়ে পুজো-কমিটির প্রেসিডেণ্ট গোপাল হাজরার কাছে গিয়ে জমা করে দিলে। প্রেসিডেণ্ট গোপাল হাজরা দেখলে তখন বেশ টাকা-পয়সা আদায় হচ্ছে। সে তখন একটা নতুন নিয়ম জারী করে দিলে। বলে দিলে—যে যতো টাকা চাঁদা তুলে দিতে পারবে সে সেই চাঁদার টাকার ওপরে দশ পার্সেণ্ট কমিশন পাবে।

ছেলেরা অবাক হয়ে গেল গোপালদার কথা শুনে। বললে—কতো কমিশন পাবো?

গোপাল হাজরা বললে—দশ পার্সেণ্ট। তার মানে টাকা পিছু দশ পয়সা। দশ টাকা চাঁদা তুললে তোদের মাথা-পিছু দেব এক টাকা। তোরা যে এত খাটছিস তার জন্যে দালালি পাবি নে?

তখন ছেলেদের উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখে কে? তারা দ্বিগুণ উৎসাহে উঠে পড়ে লেগে গেল চাঁদা আদায় করতে। রাস্তার মাঝপথে মালবোঝাই লরি-টেম্পো কিংবা ট্রাক্ দেখলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে তার ওপর। তাদের সামনে গিয়ে পথ অবরোধ করে। রসিদে টাকার অঙ্ক বসিয়ে এগিয়ে দেয় ড্রাইভারের দিকে।

তারপর ঝামেলা এড়াবার ভয়ে, তাদের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে দু'চার টাকা ফেলে দিয়ে তারা আবার ছুটে যায় সামনের দিকে। তারপর থেকে সে ক'দিন আর তারা সে-রাস্তা মাড়ায় না।

কিন্তু ততদিনে অনেক টাকা জমা হয়ে গেছে প্রেসিডেণ্ট গোপাল হাজরার হাতে। মোট প্রায় হাজার পাঁচেকের মতো। গোপাল হাজরা তখন থেকে কলকাতায় স্থিতু হয়ে গিয়েছিল।

এই রকম করে পরের বছরে আরো জাঁক-জমক করে পুজো হলো। দশ পার্সেণ্ট কমিশনের লোভে মেম্বার-সংখ্যা আরো বেড়ে গেল। সবাই মেম্বার হওয়ার জন্যে পীড়াপীড়ি করতে লাগলো। সে এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করে ফেললে গোপাল হাজরা। বলতে গেলে সেই সময় থেকেই শুরু হয়ে গেল গোপাল হাজরার জীবনের নতুন পরিচ্ছেদ।

তখন থেকে গোপাল হাজরার মাথায় টাকা উপায় করবার নতুন-নতুন ফন্দী গজাতে লাগলো। পয়সা উপায়ের নানা ফাঁদ—

'সন্তোষী মা'র পুজো তো রইলোই, তার সংগে এসে জুটলো 'গুণীজন-সম্বর্ধনা'।

এই নতুন পুজোটা গোপাল হাজরার একটা মৌলিক আবিষ্কার। গোপাল হাজরার আগে এই পুজোটার কথা আর কারো মাথাতেই উদয় হয়নি। ছোকরেদেরা প্রথমে ব্যাপারটা বুঝতে পারেনি।

জিজ্ঞেস করলে—'গুণীজন-সম্বর্ধনা' মানেটা কী গোপালদা?

গোপাল হাজরা তার প্ল্যানটা ছেলেদের বিশদভাবে বুঝিয়ে দিলে। কলকাতায় নাকি মহাজ্ঞানী আর মহাগুণীদের অভাব নেই। তাঁরা এই শহরেই অবহেলিত, অবজ্ঞাত, অবাঞ্ছিত হয়ে বাস করছেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজা রামমোহনের অনেক উত্তরসূরী এখানে এই কলকাতাতেই রয়েছেন। তাঁরা আমাদের মধ্যেই বাস করছেন, অথচ আমরা

তাঁদের চিনি না, আমরা তাঁদের মর্যাদা দিই না। এর জন্যে কারা দায়ী? দায়ী আমরা। আমরা যদি তাঁদের মর্যাদা না দিই তাহলে সেটা আমাদেরই ক্ষতি। আমাদের এই স্বাধীন দেশের সরকার তাঁদের দিকে কখনও নজর দেননি। আমরা চাই যে তাঁদের জীবনের আদর্শ আমাদের মতো সাধারণ লোকদেরও আদর্শ হোক। যাতে তাঁদের আদর্শকে অনুসরণ করে আমরা মানুষের মতো মানুষ হতে পারি সেই জন্যেই আমাদের কাজ হবে তাঁদের সম্বর্ধনা দেওয়া, তাঁদের মহত্ত্ব জন-সাধারণের মধ্যে প্রচার করা।

ছেলেরা বললে—সে-রকম লোক কোথায় পাবো?

গোপালদা বললে—তোরা তাঁদের চিনিস না, কিন্তু আমি তাঁদের চিনি—আমি তাঁদের ডেকে এনে হাজির করবো। আমি তাঁদের নেমন্তন্ন করবার ভার নিলাম। তাঁদের আমরা সম্বর্ধনা দেব—

তা পরের বছরেও 'সন্তোষী মা'র পুজো যখন হলো তখন সেই 'গুণীজন-সম্বর্ধনা' উৎসব পালন করা হলো। সেবারে পুজোর প্যাণ্ডেল আরো বড়ো করে করা হলো। আরো জোরে ভালো-ভালো হিন্দী-ফিল্মের গান মাইক্রোফোনে বাজানো হতে লাগলো। পাড়ার লোকের কান সেই শব্দে আরো ঝালাপালা হতে লাগলো। সেই শব্দের অত্যাচারে তারা পুলিশের কাছে আরো তীব্র প্রতিবাদ করলে।

কিন্তু যাঁদের সম্বর্ধনা জানানো হলো তাঁরা আরো প্রভাবশালী লোক। তাঁদের মধ্যে কেউ খবরের কাগজের সহ-সম্পাদক, কেউ সরকারী ঠিকাদার, কেউ উঠতি কবি, কেউ বা সন্ন্যাসী।

সুতরাং কারো প্রতিবাদ পুলিশ কানে তুললো না।

যে-ছেলেটা একদিন বেড়াপোতা থেকে বিনা-টিকিটে ট্রেনে চেপে কলকাতার ময়দানে এসেছিল সেই ছেলেটাই আবার একদিন কলকাতার স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গেল। পাড়ার ছেলেদের মাথায় উঠে তাদের মাতব্বর হয়ে উঠলো।

তারপর এলো ভোটের হিড়িক। সেই ভোটের হিড়িকেই বোঝা গেল গোপাল হাজরা মোটেই নাড়ুগোপাল নয়, একেবারে জাত-লীডার। লীডারি করবার জন্যেই তার জন্ম হয়েছে পৃথিবীতে।

'গুণীজন-সম্বর্ধনা' উপলক্ষ্যে তখন গোপাল হাজরার পকেটে আগেই অনেক টাকা এসে গিয়েছিল। সরকারী ঠিকাদার থেকে আরম্ভ করে তেলের মজুতদার পর্যন্ত সবাই তখন 'গুণীজন-সম্বর্ধনা'র সুবাদে দেশের লোকের কাছে 'গুণী' আখ্যা পেয়ে গেল আর তার ফলে গোপাল হাজরাকে তারা মুঠো মুঠো টাকাও দিয়ে দিলে। তখন আর বেড়াপোতাকে কে মনে রাখে! জাহান্নমে যাক বেড়াপোতা, বেঁচে থাক্ কলকাতা। তখন থেকে কলকাতাই হয়ে গেল গোপাল হাজরার স্থায়ী পীঠস্থান।

আর এরই সুবাদে আরো দু'জন গোপাল হাজরার সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেল তার। তাদের মধ্যে একজনের নাম হলো বরদা ঘোষাল আর একজনের নাম হলো শ্রীপতি মিশ্র। তারাও যখন শুনলো যে এই গোপাল হাজরাও তাদের মতো কলকাতায় একজন বিনা-টিকিটের আগন্তুক তখন আর একাকার হতে দেরি হলো না। মিলে-মিশে তারা এক-সঙ্গে কলকাতা উদ্ধার করতে বদ্ধপরিকর হয়ে উঠলো। তারা ঠিক করলে—এই মরা কলকাতাকে বাঁচিয়ে তুলতে হবেই।

প্রথমেই লক্ষ্য পড়লো কলকাতার লেবারদের ওপর। কলকাতার লেবাররা সবাই বিহার থেকে এসেছে। তাদের উদ্ধার করতে টাকা-পয়সা লাগবে। কিন্তু কে সেই টাকা যোগাবে?

টাকা যোগাবে লেবাররাই। তাদের নিয়ে ইউনিয়ন করলেই হুড়-হুড় করে টাকা এসে পকেটে ঢুকবে! তাই সেই ভারটা নিলে বরদা ঘোষাল। সে বললে—কুছ-পরোয়া নেই। আমি লেবার-ফ্রন্টটা দেখাশোনা করবো।

কিন্তু কলকাতার কল-কারখানাগুলোর মালিকানা সবই মারোয়াড়িদের হাতে এলেও,

কুলি-মজুররা প্রায় সবাই এসেছে পাশের প্রদেশ বিহার থেকে। আর বাঙালী বাবুরা?

বাঙালী বাবুরা না-পারে ব্যবসা করতে, আর না-পারে কুলি-মজুরদের মতো খাটা-খাটুনি করতে। তারা শুধু জানে কেরানী-গিরি। কেরানী-গিরিই তাদের জাত-পেশা। আর পারে লিখতে।

এই রকম অবস্থায় আমাদের কী করা উচিত? এই আমরা, যারা বিনা-টিকিটের যাত্রী হয়ে আগন্তুক হয়ে কলকাতায় এসেছি?

আমাদের উচিত এক হওয়া। বরদা ঘোষাল, শ্রীপতি মিশ্র, আর গোপাল হাজরা, সবাই আমরা মিলে মিশে কাজ করবো। তাহলেই আমরা নিজেদের পায়ে ভর দিয়ে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবো। সেই নিজেদের পায়ের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়াতে গেলে কোথা থেকে কাজ শুরু করতে হবে?

এই তিনজনের মধ্যে গোপাল হাজরারই অভিজ্ঞতা ছিল সবচেয়ে বেশি: কারণ সে এখনও তার বস্তিতে 'সন্তোষী মা'র পুজো করে নিজের কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে ফেলেছে। এবং কিছু টাকারও মালিক হতে পেরেছে। সে বুঝে নিয়েছে যে লোককে বোকা বানাতে গেলে কোনও রকম লেখা-পড়া শেখবার দরকার নেই। লেখা-পড়া না করেই যদি অনেক টাকার মালিক হতে পারা যায়, তাহলে স্কুলে-কলেজে গিয়ে মাইনে দিয়ে মিছিমিছি সময় নষ্ট করা কেন?

তখন থেকেই সে দেখে এসেছে যে লেখা-পড়া শিখে আই-এ-এস পরীক্ষায় পাশ করে মাসে আট-দশ হাজার টাকার মাইনের চাকরিই শুধু পাওয়া যায়। তার বেশি আর কিছু পাওয়া যায় না। এমন কি তার কোনও ক্ষমতাই থাকে না।

কিন্তু সেই সব আট-দশ হাজার টাকা মাইনে পাওয়া শিক্ষিত মানুষরা যাদের অধীনে চাকরি করে, তারা?

তারা হলো জনগণের প্রতিনিধি। তাদের লেখা-পড়ার ডিগ্রীরও দরকার নেই, লেখা-পড়া শেখবারও দায় নেই। তাদের একমাত্র গুণ হলো যে তারা জনগণের প্রতিনিধি।

জনগণ মানেটা কী?

গণতন্ত্রের বিশেষত্ব হলো যে যে-কোনও রকমে আঠারো বছর বয়েসের ওপর সমস্ত মানুষের ভোট পাওয়া। গণতন্ত্রের দেশে সকলেরই একটা করে ভোট থাকে। তা তুমি একজন কোটিপতিই হও আর সেই কোটিপতির বাড়ির একজন নিরক্ষর ঝি-ই হও।

আর তার সঙ্গে তুমি যদি কোনও দিন জেল-খেটে থাকো তো সেই বিদ্যেটা আমেরিকার হার্বার্ড-ইউনিভার্সিটি থেকে পাওয়া 'পি. এইচ-ডি' ডিগ্রীর চেয়ে বেশি মূল্যবান। সবাই জানবে যে তুমি দেশের এবং মানুষের জন্যে আত্মত্যাগ করেছ। আত্মবলি দিয়েছ। সুতরাং তার চেয়ে বড়ো ত্যাগ আর কী আছে?

এই-ই যখন অবস্থা তখন তোমাকে ভোট দেব না কি আমি ওই স্বার্থপর আই-এ-এস বা আই-পি-সি ডিগ্রী পাওয়া মানুষের ভোট দেব?

গোপাল হাজরারা দেখতে পেলে যে সরকারী সব চেয়ে বড়ো আমলারা যদি মাসে আট-দশ হাজার টাকা মাইনে পেয়ে থাকে তো তাদের মাথার ওপরে যারা বসে থাকে তাঁদের মাসিক আয় হয় আট-দশ লাখ টাকা। সেই মন্ত্রীদের হুকুম পালন করবার জন্যে সেই লেখা-পড়া করা অফিসারগুলো সব সময়ে হাত-জোড় করে ভয়ে-ভয়ে কাঁপে। আর এক-বার মন্ত্রীদের হুকুম তামিল করতে পারলে তারা ধন্য হয়ে যায়!

কয়েক বছর বস্তিতে কাটিয়ে 'সন্তোষী মা'র আর গুণীজন-সম্বর্ধনা' পুজো করে করে গোপাল হাজরার এই জ্ঞান হয়ে গেল যে লেখা-পড়া না করেও গণতন্ত্রের টাকা উপায় করার অনেক পথ খোলা আছে।

সুতরাং যে-পথে বেশি টাকা উপায় করা যায় সেই পথটা অনুসরণ করাই ভালো। আমরাও সেই একই পথে যাবো। তাহলে আমরাও একদিন মানুষের চোখে প্রাতঃস্মরণীয়

হয়ে উঠবো। একদিকে অনেক টাকার মালিক হবো, আবার অন্যদিকে জনগণের কাছে প্রাতঃস্মরণীয়ও হয়ে উঠবো।

গোপাল হাজরা সেই জন্যেই একদিন বেড়াপোতায় গিয়ে সন্দীপকে বলেছিল—তুই লেখাপড়া শিখে সময় নষ্ট করে কী করবি, তার চেয়ে কলকাতায় চল্। দেখবি কলকাতায় রাস্তাঘাটে টাকা উড়ে বেড়াচ্ছে। কেবল কুড়িয়ে নিতে জানলেই হলো।

তাই গোপাল হাজরার যখন অনেক শিষ্য-প্রশিষ্য হলো তখন সে সেই শিষ্যদের নিয়ে একটা পার্টি তৈরি করলে। যে-সব পার্টি তখন বাজারে চালু ছিল, সে-সব পার্টিতে সে যোগ দিলে না। কারণ সে-সব পার্টিতে গেলে তো সেখানে সে প্রেসিডেন্ট হতে পারবে না। বড়জোর সামান্য একটা পদাতিক হয়ে থাকতে হবে তাকে চির-জীবন। কিন্তু নতুন পার্টি করলে সে নিজেই তার প্রেসিডেন্ট হতে পারবে।

কিন্তু না, প্রেসিডেন্ট সে হলো না। সে প্রেসিডেন্ট হলো না বটে, কিন্তু কলকাতার যতো গুন্ডা, চোর, ডাকাত, দাঙ্গাকারী আর সমাজবিরোধী, তাদের মধ্যে সে ফিল্ড-ওয়ার্কার হয়ে রইলো। কলকাতার যতো গুন্ডা-বদমায়েস, দাঙ্গাকারী-ড্রাগ-এর কারবারীরা তার কথায় উঠতে বসতে লাগলো। তাদের মধ্যে সে হয়ে রইলো মধ্যমণি। তাকে জিজ্ঞেস না করে কোনও গুন্ডাকে গ্রেপ্তার করা পুলিশের পক্ষেও অসম্ভব। কারণ অলিখিত চুক্তি।

আর বরদা ঘোষাল?

সে গেল পার্টির লেবার-ফ্রন্টে। তার কারবার শুধু কলকাতা বা পশ্চিম-বাংলার কল-কারখানার কুলি-মজুর নিয়ে। সে ইচ্ছে করলে ফ্যাক্টরি উঠিয়েও দিতে পারে কিংবা পারে স্ট্রাইকও করিয়ে দিতে।

আর শ্রীপতি মিশ্র?

শ্রীপতি মিশ্র দু'বার ম্যাট্রিক ফেল করলে কী হবে। সে বেছে নিলে এডুকেশন্। শিক্ষা-দফ্তর।

শিক্ষা-দফ্তর হাতে থাকলে রাজা হওয়ার সাধ মেটে। কারণ সবগুলো ইউনিভার্সিটি তারই দান-দাক্ষিণ্যে বেঁচে থাকে। কোটি-কোটি টাকার গ্র্যান্ট পাইয়ে দেবার মালিক হলো শিক্ষামন্ত্রী। মানে এডুকেশন মিনিস্টার।

আর শুধু টাকাই নয়, সঙ্গে থাকে স্টুডেন্টদেরও ভোট। ওয়েস্টবেঙ্গল তাদের সংখ্যা কম নয়। তাদের যদি কোনও রকমে আমি ডিগ্রী পাইয়ে দিই, তাহলে তারা সবাই আমার গুণ গাইবে, তারা সবাই আমাকে ভোট দেবে। তারা লেখাপড়া শিখলো কি শিখলো না, তা দেখার দরকার নেই আমার। তারা আমাকে ভোট দিলেই আমি খুশী।

আর একটা কথা। পার্টির নাম কী হবে?

তিন জনে মিলে পার্টির নাম দিলে ডেমোক্রেটিক এ্যাকশন পার্টি। তার মানে, সংক্ষেপে 'ডি-এ-পি'।

বরদা ঘোষাল বললে—ডি-এ-পি কেন? 'ডি-এস-পি' নাম দিলে হয় না?

—'ডি-এস-পি' মানে?

বরদা ঘোষাল বললে—'ডেমোক্রেটিক এ্যাকশন পার্টির' বদলে 'ডেমোক্রেটিক সোস্যালিস্ট পার্টি' অর্থাৎ 'ডি-এস-পি'।

না, তাতে রাজী হলো না গোপাল হাজরা আর শ্রীপতি মিশ্র। তারা আপত্তি তুললে এই বলে যে তাহলে আমরা দুর্গা পুজো, কালী পুজো, ওগুলো আর চালিয়ে যেতে পারব না। আমাদের দেশ হলো ভক্তি-মার্গের দেশ। ভক্তি-মার্গের দেশে 'সোস্যালিজম্' কথাটা কেউ ভালোভাবে নেবে না। কারণ সোস্যালিস্টরা ভগবানকে মানে না। ও নাম দিলে আমাদের দেশের লোকেরা আমাদের দলে নাম লেখাবে না।

শেষ পর্যন্ত নাম হলো 'ডি-এ-পি'। মানে ডেমোক্রেটিক এ্যাক্শন পার্টি। তখন

থেকে বছরে বছরে বার্ষিক সম্মেলন হতে লাগলো 'ডি-এ-পি'র। যারা একদিন পাড়ায় পাড়ায় বিভিন্ন পুজোর অনুষ্ঠান করে এসেছে, বিভিন্ন জায়গায় 'গুণীজন-সম্বর্ধনা'র অনুষ্ঠান করে এসেছে, তারা তখন থেকে 'ডি-এ-পি'র নামে রাস্তায় রাস্তায় মিছিল করতে লাগলো। বড়ো-বড়ো পোস্টার নিয়ে পথ-সভা করতে লাগলো! বড়ো গলায় স্লোগান দিতে লাগলো—ডেমোক্রেটিক অ্যাকশন পার্টি জিন্দাবাদ!

সেই স্লোগানের সঙ্গে গলা মিলিয়ে ভলান্টিয়াররা বলতে লাগলো—জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ।

আর গোপাল হাজরা? গোপাল হাজরা তখন পার্টির সংগঠন নিয়ে উদ্দাম হয়ে উঠেছে। পার্টির টাকায় জিপ্ কিনে ফেলেছে। যা ছিল একটা বস্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ তা তখন মহীরুহে পরিণত হয়েছে। যেখানে যত গুন্ডা, ফেরিওয়ালা, দাঙ্গাবাজ, পকেটমার, তাদের সবাইকে সে কব্জা করে ফেলেছে।

পার্টির সংগঠন একেবারে গ্রামে-গঞ্জে ঢুকে পড়েছে। তখন গোপাল হাজরার শ্যেন-দৃষ্টি পড়লো 'স্যাক্সবি-মুখার্জি এ্যান্ড কোম্পানি'র ওপর। ওদের কোম্পানিতে তখনও পর্যন্ত কোনও দিন কোনও গোলমাল হয়নি। ফ্যাক্টরির লেবাররা মোটা বোনাস পায়, ভালো কোয়ার্টার পায়। মালিক মুক্তিপদ মুখার্জির ওপরে সবাই খুশী। মালিক সব পার্টিকেই যথারীতি দান-দক্ষিণা দেন। তাঁর কাছে হাত পেতে কেউ খালি হাতে ফেরে না।

সেই সময়েই হঠাৎ একদিন রাস্তায় গোপাল হাজরার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল সন্দীপের।

দেখা হতেই গোপাল অবাক! জিজ্ঞেস করলে—তুই? তুই কোত্থেকে।

সন্দীপ বললে—আমি তো এখন কলকাতায় থাকি!

—সে কী রে? কলকাতায়? কেন? কী জন্যে? ঠিকানা কী? কোথায় থাকিস?

সন্দীপ বললে—বিডন স্ট্রীটে। মুখার্জিবাবুদের বাড়িতে।

গোপাল হাজরা জিজ্ঞেস করলে—কোন্ মুখার্জি?

—মুক্তিপদ মুখার্জি। 'স্যাক্সবি-মুখার্জি এ্যান্ড কোম্পানি'র মালিক।

গোপাল জিজ্ঞেস করলে—ও-বাড়ির সঙ্গে তোর কী সম্পর্ক?

সন্দীপ বললে—বেড়াপোতার মল্লিক-কাকাকে তুই চিনিস তো? সেই মল্লিক-কাকাই ওই মুখার্জিবাবুদের বাড়ির ম্যানেজার। তিনিই আমাকে ওই বাড়িতে খাওয়া-পরা-থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। ওখানে থাকি আর কলেজে বি-এ পড়ি—

—তোকে কী কাজ করতে হয়?

সন্দীপ বললে—কী আর কাজ! রাসেল স্ট্রীটে মুখার্জিবাবুদের একটা বাড়ি আছে, সেখানে এক মা আর মেয়ে দু'জন থাকে, তাদের দেখা-শোনা করতে হয়। তার বদলে পনেরো টাকা মাইনে পাই—

—তারা কারা?

সন্দীপ বললে তারা মুখার্জিবাবুদের কেউ না। ওই বাড়িটার মেয়েটার সঙ্গে মুক্তিপদবাবুর ভাই-পো'র বিয়ে হবে।

—সে ভাই-পো'র নাম কি সৌম্যপদ?

—হ্যাঁ, তুই কী করে জানলি?

গোপাল হাজরা বললে—আরে, সে তো চৌরঙ্গীর একটা নাইট-ক্লাবের মেম্বার। সে তো রোজ রাত্তিরে মেয়ে-মানুষ আর মদের বোতল নিয়ে ওখানে ফুর্তি করতে যায়।

—তাকে তুই কী করে চিনলি?

গোপাল বললে—তাকে চিনবো না? আমিও তো সেই ক্লাবের মেম্বার রে!

সন্দীপ গোপালের কথা শুনে অবাক। সেই বেড়াপোতার হাজরা বুড়োর ছেলে গোপাল হাজরা কলকাতায় এসে এত লায়েক হয়ে গিয়েছে?

বললে—তুই ক্লাবের মেম্বার হয়েছিস কী করতে?

গোপাল বললে—তুই দেখছি কলকাতায় এসেও এখনও সেই গেঁয়ো ভূতই হয়ে আছিস! ক্লাবের মেম্বার না হয়ে হাজার বছর কলকাতায় কাটালেও মানুষ হতে পারবি না।

—কেন?

গোপাল বললে—আরে, তুই যে দেখছি আনাড়ির মতো কথা বলছিস! কলকাতায় বাস করছিস অথচ কোনও ক্লাবের মেম্বার হোস্‌নি, এ-কথা কাউকে যেন তুই বলিস্‌নি! লোকে শুনলে হাসবে!

সন্দীপ আবার জিজ্ঞেস করল—কেন?

গোপাল হাজরা বললে—হাসবে না? কলকাতার যতো বড়ো বড়ো লোক সবাই-ই সব ক্লাবের মেম্বার।

—ক'টা ক্লাবের মেম্বার তুই?

গোপাল হাজরা বললে—আমি সব ক'টা ক্লাবের মেম্বার। ক্যালকাটা ক্লাব, সাউথ ক্লাব, ওয়েস্টার্ন ক্লাব, হেস্‌টিংস ক্লাব, ক্যালকাটা সুইমিং ক্লাব, এ্যান্ডার্সন ক্লাব, কতো ক্লাবের নাম করবো?

—এ-জন্যে তো তোকে মোটা টাকার চাঁদা দিতে হয়। সে-টাকা তুই কোত্থেকে পাস?

গোপাল হাজরা বললে- সব টাকা আমাদের পার্টি দেয়।

—কী পার্টি?

গোপাল হাজরা বললে—'ডি-এ-পি', মানে 'ডেমোক্রেটিক এ্যাকসন পার্টি'।

কথাগুলো সন্দীপ শুনছিল আর ভেবে অবাক হয়ে যাচ্ছিল। এতদিন সন্দীপ কলকাতায় রয়েছে, অথচ এ-সব ক্লাবের তো নাম কখনও শোনেনি সে।

—আমাদের সৌম্যবাবুও কি এই সব ক্লাবের মেম্বার?

গোপাল হাজরা বললে—শুধু কি তোদের সৌম্যপদ? কলকাতার যতো রেইশ আদমী আছে, যতো বড়ো-বড়ো মানুষ আছে, তারা সবাই-ই সব ক্লাবের মেম্বার। ইংরেজরা কলকাতা ছেড়ে চলে গেছে বটে, কিন্তু ক্লাবগুলো তো এখানে ফেলে রেখে গেছে। এখন সেইগুলো আমরা দখল করে নিয়েছি, এখন আমরাই এই সব ক্লাবগুলো চালাচ্ছি—

তারপর একটু থেমে জিজ্ঞেস করলে—তোদের মুক্তিপদবাবু কী রকম লোক রে?

সন্দীপ বললে—আমি তো বেশিদিন তাঁকে দেখিনি, তবে যে দু'একবার দেখেছি তাতে মনে হয়েছে ও-রকম মানুষ হয় না। মুক্তিপদবাবু কোনও দিন কোনও ক্লাবের মেম্বার নয় বোধহয়। বোধহয় কোনও দিন মদই খাননি। তুই কোনও দিন তাঁকে কোনও ক্লাবে দেখেছিস? কখনও তাঁকে মদ খেতে দেখেছিস?

গোপাল হাজরা স্বীকার করলে। বললে—না, মুক্তিপদ মুখার্জিকে কোনও দিন কোনও ক্লাবে দেখিনি ভাই। হয়তো মেম্বার সব ক্লাবেরই, কিন্তু বেশি কাজের জন্যে বোধহয় সময় পান না ক্লাবে যেতে। বিজ্‌নেস করবো, অথচ ক্লাবের মেম্বার হবো না, এ তো কখনও হতে পারে না।

তখন সন্দীপের হাতে বেশি সময় ছিল না। গাড়িটা তাদের বাড়ির কাছে এসে গিয়েছিল।

বললে—আমি এখানে নামবো ভাই, গাড়িটা একটু থামা এখানে।

সেই তখন থেকেই গোপাল হাজরার কানে এসেছিল 'স্যাক্সবি-মুখার্জি কোম্পানি'র নামটা। এতদিন কেন সে-কোম্পানির নামটা শোনেনি, সেইটেই আশ্চর্য!

তখন একদিন 'ডি-এ-পি'র গোপন মিটিং-এ কথাটা প্রথম উঠেছিল। গোপাল হাজরা বলেছিল—আচ্ছা, 'স্যাক্সবি-মুখার্জি কোম্পানি' এই কলকাতার বুকে বসে ফ্যাক্টরি চালাচ্ছে, আর আমরা চুপ করে বসে আছি। এটা কেমন করে আমরা সহ্য করছি শ্রীপতিদা? 'ডি-এ-পি'র তরফ থেকে তো কিছু করা উচিত! বেশি দেরি হলে তো সর্বনাশ হয়ে যাবে—

শ্রীপতিদা বললেন—স্যাক্সবি-মুখার্জি কোম্পানি? সেটা কোথায়?

গোপাল হাজরা বললে—বেলুড়।

বরদা ঘোষালও সেখানে ছিল। বরদা বললে—আমি নাম শুনেছি। কিন্তু ওদের ওখানে কোম্পানির নিজস্ব ইউনিয়ন আছে। অন্য কোনও ইউনিয়ন এখনও গজায়নি।

শ্রীপতিদা বললেন—তুমি একবার খবর-টবর নাও না বরদা। ওদের ওখানে অতো-গুলো লোকের ভোটও তো আছে। তাদের ভোটগুলোও তো আমরা পেতে পারি।

গোপাল হাজরা বললে—তা তো পেতে পারেন। সেই জন্যেই তো আমি আপনাকে বলছি।

শ্রীপতিদা বললেন—স্টাফ কতো হবে?

বরদা ঘোষাল বললে—ব্রিটিশ ফার্ম। ইণ্ডিয়া প্যার্টিশন হওয়ার পরে ব্রিটিশরা ওটা মুখার্জিদের কাছে বিক্রি করে দিয়ে চলে গেছে।

শ্রীপতিদা গোপালকে জিজ্ঞেস করলেন—তা তুমি এ-খবরটা কোথায় পেলে?

গোপাল হাজরা বললে—পেলাম একটা বন্ধুর কাছ থেকে—

—কে বন্ধু?

—আমাদের বেড়াপোতার একটা ছেলে। তার সঙ্গে আমি বহুকাল আগে এক স্কুলে একই ক্লাসে পড়েছি। সে দেখি না হঠাৎ কলকাতায়। শুনলাম সে ওই মুখুজ্জেদের বাড়িতেই থাকে। বাড়ির কাজ-কর্ম করে আর খায়। তার কাছ থেকেই ওবাড়ির খবরা-খবর পেলুম। সে-ই বললে যে ওদের নাকি অনেক টাকা, আর মুক্তিপদ মুখার্জি লোকটাও নাকি খুব ভালো।

বরদা বললে—ঠিক আছে, আমি খবর নিয়ে সব জানাবো!

আর তারপর থেকেই বরদা ঘোষাল 'স্যাক্সবি-মুখার্জি কোম্পানি' সম্বন্ধে সব খবরা-খবর যোগাড় করবার জন্যে উঠে পড়ে লেগে গেল। কলকাতায় কারখানার লেবারদের দুঃখ-দুর্দশা আর অভাব-অভিযোগ দূর করবার জন্যে মানুষের অভাব নেই। তাদের চোখের জল মুছিয়ে দেবার জন্যে সেই সব মানুষদের রাত্রে ভালো করে ঘুমও হয় না। আর সেই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্যে তারা নিজের স্বার্থ ত্যাগ করে দিন-রাত বস্তিতে বস্তিতে ঘুরে বেড়ায়। আর ময়দানে বক্তৃতা দিয়ে দিয়ে তাদের মুখও ব্যথা হয়ে যায়।

সেই সব লীডারদের দলে তখন থেকে আর এক লীডার যোগ দিলে। সে হলো 'ডি-এ-পি'র বরদা ঘোষাল। বরদা ঘোষালের লেকচার শুনতে শুনতে কারখানার কুলী-মজুরদের রক্ত গরম হয়ে ওঠে। তারা তাদের দু'হাত মুঠো করে আকাশের দিকে তুলে চেঁচায়। বলে—কমরেড বরদা ঘোষাল জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ।

এমনি করেই একদিন মুক্তিপদর 'স্যাক্সবি-মুখার্জি কোম্পানী'র মধ্যে 'ডি-এ-পি'র ইউনিয়ন আসন গেড়ে বসলো। তারা জানতেও চাইলে না যে বরদা ঘোষালের সংসার কোন টাকায় চলে, কোথা থেকে তার টাকা আসে, কে তার টাকা যোগায়! কোন্ টাকায় তৈরি হয় তার বাড়ি, তার গাড়ির পেট্রল খরচের টাকা কোথা থেকে আসে!

আর যদিও বা কেউ তা জানতে চায় তো তার জন্যে বরদা ঘোষালের কৈফিয়ৎ তৈরি থাকে। সে দেখিয়ে দেয় পার্টিকে। তার পার্টিই তার সংসার চালাচ্ছে, তার পার্টিই তার গাড়ির পেট্রল যোগাচ্ছে, তার পার্টিই তার অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের গ্যারাণ্টি দিয়ে দিয়েছে। তার পার্টিই তাকে বলে দিয়েছে যে তুমি দেশের মানুষের সেবা করে যাও, মেহনতি মানুষের দুঃখ-দুর্দশা দূর করার কাজে আত্মবলি দাও, আমরা তোমার পেছনে আছি।

এর পরের ইতিহাস সবাই জানে। সে-ইতিহাস টাকার দাম কমে যাওয়ার ইতিহাস, সে-ইতিহাস এক স্টেট থেকে কল-কারখানাগুলো অন্য এক স্টেটে চলে যাওয়ার ইতিহাস, সে-ইতিহাস মসজিদ আর মন্দির নিয়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ইতিহাস, সে-ইতিহাস হরিণ-ঘাটা থেকে দুধের বদলে পিটুলিগোলা জল খাওয়ানোর ইতিহাস, সে-ইতিহাস লোককে

চকোলেট, ফুচকা আর পান-মশলার ভেতরে হেরোইন আর ব্রাউন-সুগার খাওয়ানোর ইতিহাস, সে-ইতিহাস...

সে-ইতিহাস বলতে গেলে একটা উপন্যাস, হাজার-হাজার পাতার উপন্যাসে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। আর সারা ইতিহাসটা বলতে গেলে একটা হাজার পাতার উপন্যাসেও কুলোবে না। হাজার-হাজার উপন্যাস লিখলেও সব বলা শেষ হবে না।

তাই 'স্যাক্সবি-মুখার্জি কোম্পানি'র কারখানা কলকাতা থেকে ইন্দোরে চলে যাওয়ার ইতিহাসটা বলেই এখানে ইতি করি। এখন বলি বিশাখার কথা।

সব মানুষের জীবনেই অন্ততঃ একটা বয়েস আসে যখন সে নিজেকে নিয়ে বড়ো বিব্রত বোধ করে। তখন কারোর কথা তার মনেও পড়ে না, আর কারোর কথা সে ভাবেও না।

বিশাখারও তখন তাই হয়েছিল। সারা দিনের মধ্যে সে কেবল নিজেকে নিয়েই তখন বিব্রত থাকতো। বিশাখা এই বাড়িতে আসার পর থেকেই দেখে আসছিল যে দিন-দিন কেবল তার দায়িত্বই বেড়ে চলেছে। সবাই কেবল তার হুকুমের প্রতীক্ষাতেই থাকে।

ম্যানেজারবাবু এসে জিজ্ঞেস করেন—বউদি-মণি, হিসেব নেবেন এখন?

বিন্দু এসে জিজ্ঞেস করে—বউদি-মণি, আপনি এখন খাবেন?

সবাই কেবল তার হুকুম তামিল করতেই ব্যস্ত। অথচ বিশাখা কী জানে? বিশাখা কতোটুকু জানে? আর ঠাকমা-মণি?

একজন নার্স এসে বলে—বউদি-মণি, আমি একটু নিচেয় যাচ্ছি, আপনি কি একটু পেশেণ্টকে দেখবেন?

এ-বাড়িতে আসার পর থেকেই সে যেন একটা মেশিন হয়ে গেছে।

সে-মেশিনটাতে দম দিলেই হলো।

আর সেই মেশিনটাতে দম দেওয়া থাকতো সমস্ত দিন ধরে। তাই তার নিজস্ব অস্তিত্ব বলে কিছুই ছিল না।

তবু তা থেকে সে হাজার চেষ্টা করেও মুক্তি পেত না।

প্রতিদিন সকাল থেকে সংসারের মধ্যে দিয়ে তার জীবন আরম্ভ হতো, আর শেষ হতো ঘুরে-ফিরে আবার সেই সকাল বেলাতেই এসে। পৃথিবী নাকি সূর্যকে কেন্দ্র করে অনবরত ঘুরেই চলেছে। কিন্তু পৃথিবীর মানুষ সেই ঘূর্ণমান পৃথিবীকে চোখে না দেখতে পেলেও সে নিজের ধান্ধাতেই কাজে-অকাজে ঘুরে চলেছে। সে কীসের জন্যে অমন করে ঘুরেছে তা সে নিজেও কোনও দিন জানতে পারে না। বিশাখার বেলাতেও ঠিক তাই হয়েছিল।

সকাল বেলাই বিন্দু সামনে এসে জিজ্ঞেস করতো—চা এনে দেব বউদি-মণি?

বিশাখা বলতো—এখনও পুজো করা হয়নি যে, এখনি চা খাবো? আগে পুজো-টুজো করি।

যতোদিন স্বাস্থ্য ভালো ছিল ততোদিন এই পুজো-করাটাই ছিল ঠাকমা-মণির নিত্য কর্ম। যখন ঠাকমা-মণির সামর্থ্য ছিল তখন তিনি ভোর পাঁচটার সময়ে বিন্দুকে নিয়ে বাবুঘাটে গঙ্গা-স্নান করতে যেতেন। তার পরে শরীরে যখন তাও কুলোল না, তখন বাড়িতে বসেই তিনি গঙ্গা-স্তোত্র আবৃত্তি করতেন। বিশাখাকেও তাই করতে বলে দিয়েছিলেন। তাই অতীতে ঠাকমা-মণি যা-যা করণীয় কাজ করতেন, তখন থেকে তার সমস্ত কিছুর ভার

পড়ে গিয়েছিল একলা বিশাখার ওপর। সবাই ধরে নিয়েছিল যে বিশাখাই এই মুখার্জি বাড়ির বর্তমান মালিক. তারই হুকুমে এ-বাড়ির কাজকর্ম পরিচালিত হবে, তারই নির্দেশে এ-বাড়ির ঘড়ির কাঁটা ঘুরবে তা সে বিন্দুই হোক, সুধাই হোক, কালিদাসীই হোক, ঠাকুরই হোক, আর ফুল্লরাই হোক। সবাই-ই সকাল বেলা এসে হাজির হবে বউদি-মণির কাছে।

—আজকে কী-কী রান্না হবে বউদি-মণি?

—আজকে ধোপাকে কী-কী কাপড়-চোপড় ধুতে দিতে হবে বউদি-মণি?

—বাজার থেকে আজ কী-কী আনতে হবে বউদি-মণি?

—আজকে আরো কিছু টাকা দিতে হবে বউদি-মণি।

—আজকে ব্যাঙ্কে যেতে হবে টাকা জমা দিতে। যাবো বউদি-মণি?

—আজকের জমা-খরচের হিসেবটা এখন নেবেন বউদি-মণি?

এত বড় বাড়িতে মালিক বলতে তো মাত্র তিনটি প্রাণী। তার মধ্যে একজন জেলখানায়। আর একজন তো অসুখে মৃত্যুশয্যাশায়ী। আর যে-কোনও সময়ে তিনি মারা যেতে পারেন। আর বাকি রইলো মাত্র একজন। সে হলো এই বিশাখা। সেই বিশাখার কাছে গিয়েই বাড়ির প্রত্যেকটা কাজের অনুমতি নিতে হবে। যেমন ঠাকমা-মণির আমলে অনুমতি নেওয়ার নিয়ম ছিল। ঠিক এখনও সেই নিয়ম মেনে চলা চাই।

—হ্যাঁ রে সুধা, কালিদাসীকে একবার জিজ্ঞেস করতো গিরিধারী সদর গেট বন্ধ করেছে কিনা দেখে আসতে—

—উঠোনের বড়ো আলোটা এখনও নেভায়নি কেন রে ফুল্লরা? যেদিকে দেখবো না, সেই দিকেই গাফিলতি! তাহলে ফুল্লরাকে বলে দিবি অমন গাফিলতি করলে এবার থেকে মাইনে কেটে নিতে বলবো। এ-কথা যেন মনে থাকে।

কাজের কোনও শেষ নেই এ-বাড়িতে। একটা মাত্র প্রাণীর জন্যে এ-বাড়িতে হাজারটা লোক যেন প্রাণ-পাত করবার জন্যে মাইনে করে রাখা হয়েছে।

সেদিন ম্যানেজারবাবু এসে ডাকলেন। বিশাখা ঘরের ভেতরে ঠাকমা-মণির সেবা করছিল। এসেই জিজ্ঞেস করলে—ব্যাঙ্কে গিয়েছিলেন? টাকা জমা দিয়ে এসেছেন?

—হ্যাঁ, এই নিন পাশ-বই।

বলে ম্যানেজারবাবু পাশ-বইটা বিশাখার দিকে এগিয়ে দিলেন। পাশ-বইটা নিয়ে বিশাখা আবার ঘরের ভিতরেই যাচ্ছিল। কিন্তু ম্যানেজারবাবু বললেন—একটা কথা ছিল বউদি-মণি—

—কথা? আমার সঙ্গে? কী কথা?

মল্লিক-মশাই বললেন—আমাদের ব্যাঙ্ক থেকে ফিরে আসার পথে একবার সন্দীপের ন্যাশনাল ইউনিয়ন ব্যাঙ্কে গিয়েছিলুম—

—গিয়েছিলেন? বেশ ভালোই করেছেন! সন্দীপ কী বললে?

মল্লিক-মশাই বললেন—সন্দীপের সঙ্গে দেখা হলো না—

—দেখা হলো না? কেন? কী হলো? অফিসে আসেনি?

মল্লিক-মশাই বললেন—না—

—কেন?

মল্লিক-মশাই বললেন—জানি না সত্যি কিনা, শুনলুম তার নাকি খুব অসুখ। তার অসুখের জন্যে নাকি সে এক মাসেরও ওপর অফিসে আসছে না।

বিশাখা খুব চিন্তিত হয়ে বললে—কী অসুখ তা কেউ বলতে পারলে না?

মল্লিক-মশাই বললে—না। শুনলুম সে নাকি একেবারে মরো মরো—

—তাই নাকি? তাহলে কী হবে?

বিশাখা বললে—তার অসুখ, না অন্য কারো অসুখ?

—শুনলাম তো তারই অসুখ।

খানিকক্ষণ ভেবে নিয়ে বিশাখা বললে—তাহলে এক কাজ করুন, আপনি আজ নিজেই একবার বেড়াপোতাতে যান। আজ বিকেল বেলাই চলে যান! ফিরে এসে আমাকে খবরটা জানাবেন।

মল্লিক-মশাই আবার নিচেয় তাঁর ঘরে চলে গেলেন। তারপর নিজের কাজ-কর্ম সারতে একটু সময় লাগলো। তারপর অন্য দিনের চেয়ে একটু তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া সেরে নিলেন। তারপর তৈরি হতে হতে বেলা গড়িয়ে গেল। যাওয়ার আগে আর একবার ওপরে গিয়ে ডাকলেন—বিন্দু, ও-বিন্দু—

বিন্দুর বদলে বিশাখা নিজেই বাইরে বেরিয়ে এলো।

মল্লিক-মশাই বললেন—তাহলে আমি আসি বউদি-মণি?

বিশাখা বললে—ঠিক আছে, এসে আমাকে কিন্তু জানাবেন খবরটা—

ঠিক আছে। তাই-ই জানাবেন তিনি। মল্লিক-মশাই আস্তে আস্তে নিচেয় চলে আসছিলেন। ততক্ষণে প্রায় একতলাতে চলে এসেছেন, এমন সময়ে ওপর থেকে বউদি-মণি আবার ডাকলেন—ম্যানেজারবাবু, ম্যানেজারবাবু—

আবার কী জন্যে বউদি-মণি তাঁকে ডাকছেন কে জানে!

মল্লিক-মশাই আবার দোতলা পেরিয়ে তিন-তলায় গিয়ে উঠলেন।

বউদি-মণি তাঁকে দেখেই বললেন—ম্যানেজারবাবু, আপনি একটু অপেক্ষা করুন। আমিও আপনার সঙ্গে যাবো। আজ ঠাকমা-মণি একটু ভালো আছেন। আপনি নিতাইকে গাড়ি বার করতে বলুন! আমি এখখুনি আসছি—

আবার একতলায় চলে এলেন মল্লিক-মশাই। নিতাইকে হুকুম দিতেই সে গাড়ি বার করলো। আর খানিকক্ষণের মধ্যে বউদি-মণিও নিচেয় নেমে এলেন।

বিয়ের পর এই-ই প্রথম বিশাখা বাড়ির বাইরে যাবে। মাঝখানে শুধু কয়েক ঘণ্টার জন্যে মামলার খাতিরে একদিন কোর্টে হাজিরা দিতে ও আরেক দিন ব্যাঙ্কে সই দিতে বাড়ির বাইরে বেরিয়েছিল। তারপর আজ এই প্রথম।

বউদি-মণিকে দেখে গিরিধারী ভক্তিভরে সেলাম করলে। নিতাই গাড়ি নিয়ে হাজিরই ছিল। বউদি মণি গাড়ির ভেতরে উঠে বসলেন, মল্লিক-মশাইও গাড়িতে উঠে নিতাই-এর পাশে গিয়ে বসলেন। বললেন—চলো বেড়াপোতা—

নিতাই ইঞ্জিনে স্টার্ট দিলে।

হঠাৎ একটা কাণ্ড ঘটে গেল। সে এক বিপর্যয় কাণ্ড। চারজন রাইফেলধারী পুলিশ নিয়ে একটি জাল-ঘেরা কালো রং-এর গাড়ি বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালো। আর তা থেকে জেলখানার পোশাক পরা আসামী সৌম্যপদ নামলো। কী ব্যাপার?

মল্লিক-মশাই সৌম্যবাবুকে দেখে আবার গাড়ি থেকে নেমে সেদিকে এগিয়ে গেলেন। বললেন—কী ব্যাপার? আপনি?

সৌম্যপদ বললেন—ঠাকমা-মণির খুব নাকি অসুখ। এখন কেমন আছেন?

মল্লিক-মশাই বললেন—প্রায় ছ'মাস ধরে বিছানায় শুয়ে পড়ে আছেন। কোনও জ্ঞান-ট্যান নেই, লোকও চিনতে পারেন না, কথা বন্ধ।

সৌম্যপদ বললে—তাঁকে দেখবার জন্যে আমি দরখাস্ত করেছিলুম। তাই আমাকে চার ঘণ্টার জন্যে প্যারোলে ছুটি দেওয়া হয়েছে। তাই এই পুলিশরা আমার সঙ্গে এসেছে। এদের একটু খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করে দিন। এরা আমার সঙ্গে খুব ভালো ব্যবহার করছে। আমি আবার চার ঘণ্টা পরেই চলে যাবো!

গাড়ির ভেতরে বসে বসে বিশাখা একদৃষ্টে সৌম্যপদ'র দিকে চেয়ে দেখছিল! এই লোকটা তার স্বামী নাকি! যার সঙ্গে তার শুধু আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়েটাই হয়েছে, কিন্তু বাসর-ঘরও হয়নি, ফুল-শয্যাও হয়নি, বৌভাতও হয়নি! তবু বিশাখা লোকটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে দেখছিল।

আর ওদিকে তখন মল্লিক-মশাইয়ের কথাগুলোও কানে বাজছিল—শুনলুম সন্দীপ এক মাস ধরে ব্যাঙ্কে আসেনি। সে নাকি অসুখে মরো মরো...

সন্দীপের জীবনে যতো লোকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল তার মধ্যে যিনি তাকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছিলেন তিনি হচ্ছেন বেড়াপোতার কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়। তাই তাঁর কথা সন্দীপের এখনও মনে আছে। বরাবর তাঁর কথা মনে রাখবে সে। তাঁকে কখনও ভুলতে পারবে না সন্দীপ। তিনি বহুকাল ধরে হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করতে করতে একদিন হঠাৎ প্র্যাকটিস ছেড়ে দিলেন। সন্দীপ জিজ্ঞেস করেছিল—আপনি ওকালতি ছেড়ে দিলেন কেন?

কাশীবাবু বলেছিলেন—ছেড়ে দিলুম, কারণ নিজেকে আর মানিয়ে নিতে পারলাম না।

—তার মানে?

কাশীবাবু বলেছিলেন—তুমি তো তারক ঘোষকে চিনতে। তোমাদের সঙ্গেই একই স্কুলে একই ক্লাসে সে পড়তো। গোপাল হাজরা তাদের বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছিল। তা তো তুমি জানো। আমি কোর্টে তার পক্ষে দাঁড়িয়ে হাকিমের কাছে সুবিচার চেয়েছিলুম। সে-জন্যে তার কাছে আমি একটা পাই-পয়সা পর্যন্ত দাবি করিনি। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও যখন সুবিচার পেলুম না, তখন ভাবলুম আমি শুধু আমার সময়ই নষ্ট করছি, আমি শুধু লোক ঠকানো ছাড়া আর কিছু করছি না। এই রকম আরো দু'-চারটে কেস করে যখন হতাশ হয়ে গেলুম তখন প্র্যাকটিস ছাড়া ভিন্ন আমার আর কোনও গত্যন্তর রইলো না।

এর পরের ইতিহাস তো বেড়াপোতার মানুষ সবাই জানে। কাশীবাবু আর একদিন বলেছিলেন—তুমি এখন জীবন আরম্ভ করছো। আর আমার জীবনের এখন শেষ পরিচ্ছেদ চলছে। জীবনের পথে চলতে গেলে তুমি কী করে বুঝবে বলো তো যে তুমি ঠিক পথে চলছো না ভুল পথে চলছো?

সন্দীপ এ-প্রশ্নের জবাব দিতে পারেনি। কাশীবাবু নিজেই নিজের প্রশ্নের জবাব দিয়েছিলেন। বলেছিলেন—সুভাষ বোসের নাম শুনেছো তো তোমরা? যাঁকে তোমরা নেতাজী বলো? আমাদের মনে আছে একদিন জওহরলাল নেহরু থেকে আরম্ভ করে মহাত্মা গান্ধী পর্যন্ত সবাই তাঁর শত্রুতা করেছিল। সেই সুভাষ বসু তখনই বুঝে গিয়েছিলেন যে তিনি ঠিক পথেই চলছেন। এই এখনকার 'স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকার মালিক তখন ছিল ইংরেজরা। সুভাষ বোসের একটা কথা আমার এখনও মনে আছে। তিনি একদিন বলেছিলেন যে যতোদিন স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকা তাঁর কুৎসা করবে ততোদিন তিনি বুঝবেন যে তিনি ঠিক রাস্তাতেই চলেছেন। তুমি নিন্দে-প্রশংসা সমস্ত কিছু অগ্রাহ্য করে সামনে এগিয়ে যাও, কে কী বলছে বা বলবে তা নিয়ে কখনও মাথা ঘামিও না। তুমি ভালো কাজ করেছো না মন্দ কাজ করেছো তা তোমার মৃত্যুর পর বিচার হবে! সেই বিচারই হবে আসল বিচার, সেই বিচারই হবে শ্রেষ্ঠ বিচার!

সেই কাশীবাবুই তার বিয়েতে কন্যা-সম্প্রদানের সমস্ত ভার নিজের হাতে তুলে নিয়েছিলেন। কিন্তু যখন সেই বিয়েতে অমন দুর্ঘটনা ঘটে গেল তখন তিনিও প্রথমে মর্মাহত হয়েছিলেন। পরের দিন নিজে সন্দীপের কাছে এসেছিলেন।

জিজ্ঞেস করেছিলেন—কী ব্যাপার হলো বলো তো সন্দীপ? আমার জীবনে এমন ঘটনা আগে কখনও ঘটতে দেখিনি! কখনও শুনিওনি এরকম ঘটনার কথা। ব্যাপারটা কী?

সন্দীপ সেদিন তার জীবনের গোড়া থেকে সমস্ত কিছু বলে গিয়েছিল।

সব শোনার পর কাশীবাবু কিছুক্ষণ চুপ করে ছিলেন। তারপর জিজ্ঞেস করে-ছিলেন—তাহলে ওই পঞ্চাশ হাজার টাকাই তোমার সম্বল?

সন্দীপ বলেছিলেন—হ্যাঁ। আর বলে গিয়েছেন মাসিমার চিকিৎসার জন্যে যতো টাকা লাগবে, তা সবই ওঁরা দেবেন। দরকার হলে দু'তিন লাখ টাকাও দেবেন বলেছেন।

—তা তুমি কী বললে?

—আমি আর কী বলবো। আমার বলবার কিছু নেই। আমি যে বিশাখাকে বিয়ে করতে যাচ্ছিলাম, তা তো ওই মাসিমাকে চিন্তামুক্ত করবার জন্যেই। আমি যাতে বিশাখাকে বিয়ে করি তার জন্যে তো মাসিমা দিন-রাত পীড়াপীড়ি করতেন। তাই করতে গিয়েই তো ওই কাণ্ড হলো!

কাশীবাবু বলেছিলেন—তা পঞ্চাশ হাজার টাকার মধ্যে কুড়ি হাজার টাকা তুমি আমাকে তো ফিরিয়েই দিলে। এখন তোমার হাতে তো রইলো মাত্র তিরিশ হাজার টাকা। তাতে যদি তোমার মাসিমার চিকিৎসার খরচ না কুলোয়? তখন? তখন কি তুমি ওদের বাড়িতে গিয়ে আবার হাত পাতবে?

সন্দীপ বলেছিল—না, হয়তো তা চাইতে পারবো না—

কাশীবাবু বলেছিলেন—তা হলে? তা হলে কী করে চিকিৎসার খরচ চালাবে?

এ-কথার জবাব সন্দীপ সেদিন দিতে পারেনি। তখন কাশীবাবু একটা গল্প বলে-ছিলেন। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনকুবের এ্যানড্রু কার্ণেগীর জীবনের গল্প। পৃথিবীর মানুষ যতো টাকার কল্পনা করতে পারে সেই ততো টাকার মালিক ছিলেন এ্যানড্রু কার্ণেগী। কোটি টাকা বললে কম বলা হয়। কত হাজার কোটি বললেও কম বলা হয়। কয়েক লক্ষ অর্বুদ টাকার মালিক ছিলেন বললেই বোধহয় কিছুটা ঠিক বলা হয়।

যখন তাঁর বয়েস ষাট হলো তখন তিনি এমনই একটা অসুখে পড়লেন যে মনে হলো তিনি বোধহয় এবার মারা যাবেন। তখন থেকে তিনি দান করা শুরু করলেন। তার মানে—দাতব্য। সারা পৃথিবীতে তাঁর দাতব্য প্রতি-ষ্ঠান মানুষের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মনুষ্যত্বের ব্যাপারে জাতি-ধর্ম-নির্বিচারে সকলকে উপকৃত করতে আরম্ভ করলো। আর তারপর থেকেই আবার তাঁর স্বাস্থ্য ভালো হতে লাগলো। ষাট বছর বয়েসে যাঁর মৃত্যু আসন্ন হয়ে উঠেছিল, সেই মানুষটাই আবার নব্বই বছর বয়েস পর্যন্ত বেঁচে রইলো। তাঁর নাম সারা পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হয়ে গেল। তোমার যদি অসুখ হয় তো তুমি যে-দেশেরই বাসিন্দা হও, যাও কার্ণেগী ফাউণ্ডেশনের হাসপাতালে। চিকিৎসার জন্যে একটা পয়সাও খরচ করতে হবে না। কিংবা যদি তোমার বেশি লেখা-পড়া করতে ইচ্ছে হয়, অথচ তা করবার জন্যে যে-পয়সার দরকার তা তোমার নেই, তাহলে কার্ণেগী ফাউণ্ডেশনের দফতরে দরখাস্ত করো, তোমার লেখা-পড়ার সমস্ত খরচের ভার তারাই নেবে।

সন্দীপ কাশীবাবুর কথাগুলো শুনছিল। জিজ্ঞেস করলে—তারপর?

কাশীবাবু আবার বলতে লাগলেন—এ্যানড্রু কার্ণেগীর জীবনী তো শুনলে। এবার আর একজন মানুষের কথা বলি। সে ভদ্রলোক যীশু খৃষ্টের জন্মের চারশো নিরেনব্বই বছর আগে জন্মেছিলেন। গ্রীক দেশের মানুষ তিনি। তাঁর টাকা-কড়ি কিছুই ছিল না। বলতে গেলে টাকার দিক থেকে তিনি ছিলেন কপর্দকহীন মানুষ। একদিন দেশের রাজার হুকুমে তাঁকে গ্রেফতার করা হলো। তাঁর অপরাধ কী?

তাঁর অপরাধ হলো এই যে তিনি সকলকে বলতেন—রাজা মন্ত্রী কেউ কিছু নয়। তুমি তোমার নিজেকে চেনো। নিজেকে চিনতে পারলেই নিজের চেয়ে যিনি বড় তাঁকে চিনতে পারবে!

সত্যিই তো বড়ো গুরুতর অপরাধ। রাজাকে এমন করে ছোট করা মানে রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা। সুতরাং তাঁকে চরম শাস্তি পেতে হবে। চরম শাস্তি মানে তখনকার দিনে মৃত্যু-দণ্ড। একদিন সেই মৃত্যুদণ্ডের সময় ঘনিয়ে এলো।

তখনকার দিনে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হতো আসামীকে বিষ খাইয়ে। সেই বিষই তাঁকে খাওয়ানো হলো। তাঁর অনেক শিষ্য সেই মৃত্যুর সময় সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আসন্ন মৃত্যুর আগে তিনি তাঁর শেষ কথা বলে গেলেন তাঁর এক শিষ্যকে।

তিনি কী কথা বলে গেলেন?

বলে গেলেন—শোন, একটা কাজ তোমায় করতে হবে—

শিষ্য তখন সেই দৃশ্য দেখে অঝোর-ঝরে কাঁদছেন। জিজ্ঞেস করলেন—বলুন প্রভু, কী কাজ?

গুরু বললেন—আমি একজনের কাছ থেকে একটা মুরগী কিনেছিলাম।। সেই মুরগীটার দাম দেওয়া হয় নি। আমার ধার রয়ে গেছে তার কাছে। তুমি আমার হয়ে সেই ধারটা শোধ করে দিও—

তা এই মানুষটার নাম কী?

নাম হলো সক্রেটিস!

গল্পটা শেষ করে কাশীবাবু বলেছিলেন—এই দু'জন লোকের গল্প তোমাকে বললাম। একজন হচ্ছেন ধনকুবের আর একজন হলেন নির্ধন। এখন বলো তো এঁদের মধ্যে কোন মানুষটাকে তোমার পছন্দ হয়? তোমার জীবন-চর্যায় কাকে তুমি আদর্শ মানুষ বলে বেছে নেবে? বলো তো?

এ-সব বহুদিন আগের কথা। এই প্রশ্নের উত্তর সেদিন সেই মুহূর্তে সন্দীপ দিতে পারেনি। কাশীবাবুও আর সে-উত্তরের জন্যে বেশি পীড়াপীড়ি করেননি তাকে সেদিন। চলে যাওয়ার সময়ে শুধু বলে গিয়েছিলেন—এর জবাব তোমাকে এখুনি দিতে হবে তার কোনও কথা নেই, পরে ভেবে চিন্তে উত্তর দিলেই চলবে। তুমি ভাবো, আমি এখন চলি—

একদিকে একজন ধনকুবের আর অন্যদিকে আর একজন একেবারে কপর্দক শূন্য মানুষ। এঁদের মধ্যে কাকে সে আদর্শ মানুষ বলে বেছে নেবে, এর উত্তর দেওয়া কি অতো সহজ? বিশেষ করে সেই ১৩ই ফাল্গুন তারিখে, যখন বিশাখার সঙ্গে বিয়ে হতে গিয়েও হলো না। তখন সে কি মানসিকভাবে স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল?

আর, তা ছাড়া আরো একটা কথা! বিশাখা তো জীবনে শুধু টাকাই চেয়েছিল! আর শুধু বিশাখা কেন, কে পৃথিবীতে টাকা চায় না? পৃথিবীতে যতো ছেলের সঙ্গে সে মিশেছে তারা সকলেই শুধু টাকাটাই চিনেছে, আর তো কিছু চেনেনি।

তাহলে? সে কি তাহলে সকলের চেয়ে আলাদা?

আলাদা নইলে বিশাখার সঙ্গে তার বিয়ে হয়নি বলে সে তো কোনও কষ্ট পায়নি। তাতে তো তার ঘুমের কোনও ব্যাঘাত হয়নি। বরং মাসিমার অসুখের জন্যে তার অনেক বেশি কষ্ট হয়েছে। যখন সে ডাক্তার লাহিড়ীর নার্সিং-হোমে গিয়েছে তখনই মাসিমার কষ্ট দেখে তার কান্না পেয়েছে। মনে মনে প্রার্থনা করেছে—আর কেন মাসিমাকে এত কষ্ট দিচ্ছ ভগবান। হয় ওকে তুমি সারিয়ে দাও, আর না-হয় তো সরিয়ে নাও। মাসিমার কষ্ট যে আর চোখে দেখা যায় না।—

কিন্তু মানুষের ঈশ্বর অতো সহজ, অতো সরল নন। তাঁকে টলাতে পারবে এমন শক্তি পৃথিবীতে কারো নেই। তিনি বড়ো নির্দয়, আবার বড়ো কোমল। তিনি বড়ো নির্ভীক, আবার বড়ো নিরপেক্ষ। তাঁকে যে ভালোবাসে, তাঁকে যে পুজো করে তাকেই তিনি বড়ো কষ্ট দেন। কষ্ট দেন তাকে পরীক্ষা করবার জন্যেই।

তোমাকে যে আমি পরীক্ষা করবো তার অবকাশ তুমি দেবে না? তোমাকে পরীক্ষা না করে আমি তোমাকে প্রেম দেব কী করে? আমার প্রেম কি অতো সস্তা? আমার প্রেম পাওয়ার জন্যে তোমাকে যে অশেষ মূল্য দিতে হবে! সেই মূল্য দিতে কি তুমি প্রস্তুত?

এই সব প্রশ্ন সন্দীপকে দিন-রাত বিব্রত করে রাখতো। মনে হতো কে যেন তাকে অনবরত তাড়া করে আসছে পেছন থেকে। প্রত্যেক দিন গিয়েই ডাক্তারবাবুকে কিংবা নার্স,

যাকে সামনে পেতো তাকেই জিজ্ঞেস করতো—মাসিমা কেমন আছেন আজ?

উত্তর সেই একই—মোটামুটি একই রকম—

—আর কোনও উন্নতি হয়নি?

—না।

সেই একই প্রশ্ন আর একই উত্তর। এই একই প্রশ্ন করে করে আর একই উত্তর শুনে শুনে সন্দীপ ক্রমেই যেন বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল। আর সঙ্গে সঙ্গে নার্সিং-হোমের তরফ থেকে টাকার তাগাদা। টাকার ভাবনায় সে অস্থির হয়ে উঠতো।

মা ছেলের শরীরের অবস্থা দেখে ভয় পেতো। মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করতো—ওরে, তুই কিছুদিন ছুটি নে। তোর আপিসে ছুটি পাওয়া যায় না? দু'দিন ছুটি নিয়ে বিশ্রাম নে না!

সাধারণত সন্দীপ মায়ের এ-সব কথার জবাব দিত না। কিন্তু বার-বার এ-সব কথা শুনে বলতো—কই, তুমি যে কী বলো, তার ঠিক নেই। আমার শরীর তো খারাপ হয়নি!

মা বলতো—আয়নাতে তোর চেহারাটা একবার দেখ দিকিনি। সেই ভোর বেলা ঘুম থেকে উঠে পড়ি-মরি করে আপিসে যাস আর আসিস সেই রাত দশটায়! এমন করলে কি কারো শরীর থাকে! একটু ভালো খাওয়া-দাওয়া করবি তো!

এ-সব কথায় কান দিলে কি সংসার চলে? সন্দীপের জীবন তখন টাকার চিন্তায় জেরবার হয়ে যেতে বসেছে।। নার্সিং-হোমের বিল মেটাতেই তার প্রাণান্ত হওয়ার যোগাড়। সে তখন ভাবতো আমেরিকার ধনকুবের এ্যানড্রু কার্নেগী আর গ্রীসের সোক্রেটিসের কথা। ভাবতো—বেশি টাকা থাকাও যা, আর টাকা না থাকাও তাই। তারা তো কবেই মারা গিয়েছেন। তাহলে সে এত কাল পরে তাঁদের কথা ভাবছে কেন?

সেদিন মা ছেলের জন্যে চুপ করে অপেক্ষা করছে। শেষ ট্রেনটা তীব্র হুইশলের শব্দ করে বেড়াপোতায় এসে পৌঁছুলো। সাধারণত এই ট্রেনেই সন্দীপ আসে।

মা যথারীতি বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। রাস্তার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে ছেলেকে আসতে দেখা যায়। সেদিন কিন্তু তা দেখা গেল না। মা সদর-দরজা ছাড়িয়ে আরো সামনের দিকে চেয়ে দেখলে। কিন্তু কই, খোকাকে তো দেখা যাচ্ছে না। ট্রেনটা তখন আবার একটা তীব্র হুইশল্ বাজিয়ে বেড়াপোতা ছেড়ে চলে গেল। এবার হয়তো খোকা আসবে।

রাস্তাটা ক্রমে ফাঁকা হয়ে এলো। যাদের একটু টাকা-কড়ি আছে তারা সাইকেল-রিকশায় চড়ে বাড়ি ফেরে। খোকাকে কতোদিন মা সাইকেল-রিকশায় চড়ে আসতে বলেছে। হয়তো দুটো পয়সা খরচ হবে, কিন্তু আগে শরীর, না আগে পয়সা!

খোকা বলে—না মা, অতো বাবুয়ানি ভালো নয়। এইটুকু তো পথ, এটুকু হেঁটে আসতে পারবো না? আমি কি বুড়ো হয়ে গিয়েছি?

কিন্তু খোকা তো বুঝবে না যে মা'র কতো ভাবনা হয় ছেলের জন্যে!

মা তখনও অন্ধকারের মধ্যে ছেলের রাস্তার দিকে চেয়ে আছে। কোথায় খোকা, কোথাও তো ছেলেকে দেখা যাচ্ছে না। তবে কি খোকার অসুখ-বিসুখ হলো সেই সেবারকার মতো।

কমলার মা তখন কাজ-কর্ম সেরে বাড়ি চলে যাবে ভাত-তরকারি নিয়ে। মা বললে—তুমি আর কতোক্ষণ দাঁড়াবে, বাড়ি চলে যাও—বরং কাল একটু সকাল-সকাল এসো—মা তাকে ভাত-ডাল-তরকারি বেড়ে দিতেই কমলার মা তার বাড়ির দিকে চলে গেল।

বললে -তুমি যদি খোকাকে রাস্তায় দেখ তাহলে একটু পা চালিয়ে আসতে বোল তো—

কমলার মা চলে গেল। তখনও মা চেয়ে রইলো ছেলের বাড়ি আসবার রাস্তার দিকে চেয়ে।

তারপর...

তারপর আরো রাত হলো। বেড়াপোতার স্টেশনের কাছে বিনোদ-কাকার মিষ্টির দোকানের আলোটাও এক সময়ে নিভে গেল। তারপর সমস্ত অন্ধকার। হাটের সামনে তারকদের জমির ওপর যে নতুন তিনতলা বাড়িটা হয়েছে, তার ভেতরকার আলোগুলোও এক সময়ে নিভে গেল। তখন একেবারে অন্ধকার। খোকা তখনও আসেনি! বাড়িতে একজন লোক নেই যে তার সঙ্গে একটু পরামর্শ করে। তাহলে কি খোকা হাসপাতালে তার মাসিমাকে দেখতে গিয়েছে। মাসিমার অসুখ কি তবে বাড়াবাড়ি হলো?

এর পরে তো আর কোনও ট্রেন নেই। আর সে-সব ট্রেন আছে তা বেড়াপোতাতে থামে না। যে-সব ট্রেন থামে না সেগুলো চলে যায় সোজা পশ্চিম দিকে। সুতরাং তার-পরে আর খোকার জন্যে অপেক্ষা করার কোনও অর্থ হয় না।

এখন কী হবে? কার কাছে গিয়ে মা খোকার খোঁজ নেবে? কাশীবাবুর বাড়িতে গিয়ে কথাটা পাড়লে হয়। কিন্তু তখন বোধহয় কাশীবাবুর বাড়িতে সবাই ঘুমিয়ে পড়েছেন।

সে-রাত্রের কথা পরে সন্দীপ মা'র কাছ থেকে সমস্ত শুনেছে। অনেকের জীবনেই এ-রকম ঘটনা অনেকবার ঘটেছে। সন্দীপের জীবনেও এ-রকম ঘটনা কম ঘটেনি। তখন তার মনে হয়েছে সেই দিনটা বা সেই রাতটা বোধহয় আর কাটবে না। কিংবা সেই সপ্তাহটা বা সেই মাসটা। তবু তো সে আজও বেঁচে আছে, তবে তো সে আজও বেঁচে থেকে সে-সব দিনের কথা স্পষ্ট ভাবতে পারছে! স্মৃতি তো এখনও তার সঙ্গে বিশ্বাস-ঘাতকতা করছে না!

সে-রাতটা কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেটেছিল। সারা রাত উপোস করে না ঘুমিয়ে কেঁদে কেঁদে কাটালেও যখন সবে মাত্র একটু ভোর হয়েছে কে যেন সদর দরজার কড়া নাড়তে লাগলো। বাইরে থেকে যেন কার গলার শব্দ শোনা গেল—মা আছেন?

মা হুড়মুড় করে উঠে বাইরে আসতেই দেখলে কে একজন অচেনা ছেলে দাঁড়িয়ে আছে।

—মা, আপনি আমাকে চিনবেন না। আমি হাশেম। আমি সন্দীপদার অফিসে চাকরি করি। সন্দীপদা আমাকে পাঠিয়েছেন।

মা তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিলে। বললে—আমার খোকা পাঠিয়েছে? খোকা কোথায়? খোকা কেমন আছে?

হাশেম বললে—তিনি ভালো আছেন, কিন্তু নার্সিং-হোমে তাঁর মাসিমার অবস্থা খুবই খারাপ। টেলিফোনে আমাকে বেড়াপোতাতে এসে আপনাকে খবরটা দিতে বলেছিলেন। কিন্তু খবরটা যখন পেলাম তখন খুব দেরি হয়ে গিয়েছে। বেড়াপোতায় আসবার শেষ ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। তাই আজ সকালের ট্রেন ধরেই চলে এসেছি—

মা খবরটা শুনে কী বলবে প্রথমে বুঝতে পারলে না। তাই কিছুক্ষণ হতভম্বের মতো চুপ করে রইলো। তারপর বললে—খোকা ভালো আছে তো?

হাশেম বললে—তা তো ঠিক বলতে পারবো না। কারণ কথা হয়েছিল টেলিফোনেই। আপনাকে ভাবতে বারণ করেছিলেন। তারপর আর জানি না। আমি এখন চলি—

—না বাবা, তুমি এত দূর থেকে এলে, কিছু খেয়ে যাবে না? তুমি ভিতরে এসে একটু বোস, আমি বাড়িতে যা-কিছু আছে, তোমাকে কিছু খেতে দিই। তুমি এত কষ্ট করে এলে। মুড়ি খাবে তুমি বাবা?

হাশেম বললে—আমার খাওয়ার সময় নেই মা, আপনি কিছু ভাববেন না। আপনি সন্দীপদার মা, আমারও মা। সন্দীপদার মতো মানুষ হয় না। তাঁর জন্যেই আমি চাকরিতে প্রমোশন পেয়েছি। আপনি হয়তো জানেন না, তাই বলছি—যে প্রমোশন তাঁর নিজের পাওয়ার কথা, সেইটে তিনি আমাকে পাইয়ে দিয়েছেন। আমার কাছে তিনি আমার নিজের ভাই-এর চেয়েও বড়ো। তাঁর দয়া আমি জীবনে কখনও ভুলবো না। আমি চলি মা, এখখুনি একটা ট্রেন আছে। সেই ট্রেনটা ধরে আমাকে আবার অফিসে যেতে হবে। সন্দীপদা নেই, আমাকে একলাই অফিস চালাতে হচ্ছে। আসি—

বলে হাশেম মা'র পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে চলে গেল।

মা সেখানে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে ছেলেটার কথাগুলো ভাবতে লাগলো। রাত্রে একেবারেই ঘুম হয়নি মা'র। খাওয়াও হয়নি। এ কী হলো? এমন তো কখনও হয় না। চাকরিতে ঢোকার পর থেকে খোকা তো কখনও বাড়ি ছেড়ে বাইরে রাত কাটায়নি। তাহলে নিশ্চয়ই দিদির অসুখটা বেড়েছে।

একটু পরে কমলার মা এলো। সে বাসন মাজতে গিয়ে এঁটো থালা-বাসন দেখে অবাক হয়ে গেল। বললে—এ কী, মা। তুমি খাওনি? দাদাবাবুও তো খায়নি দেখছি। কী হলো মা? খাওনি কেন?

মা তখন বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়েছে। মা'র তখন কথা বলতেই ভালো লাগছে না। একে সারা রাত ঘুম হয়নি, তার ওপর উপোস। তার ওপরে এই খারাপ খবর।

—কী হলো মা? খাওনি কেন?

মা বললে—তুমি ও গুলো খেয়ে নাও, আমি খাবো না। আর যদি না খেতে পারো তো রাস্তায় ছড়িয়ে দাও, কাকে খেয়ে নেবে'খন!

সত্যিই তখন আর কিছু কথা বলতে ইচ্ছে হচ্ছিল না মা'র। সমস্ত পৃথিবীটা তখন মা'র কাছে যেন বিস্বাদ হয়ে গিয়েছে। তারপর যখন একটু তন্দ্রা আসতে আরম্ভ করেছে তখন হঠাৎ কমলার মা'র কথায় তন্দ্রা ভেঙে যেতেই কমলার মা জিজ্ঞেস করলে—আজ কী রান্না হবে মা?

মা বললে—তুমি যা খাবে তাই রান্না করো, আমি খাবো না—

—সে কী, মা? রান্না হবে না?

মা বলে উঠলো—কে খাবে যে রান্না হবে?

—কেন? দাদাবাবু খাবে না?

—দাদাবাবু বাড়িতে থাকলে তবে তো খাবে! আমি খাবো না, আমার ক্ষিধে নেই!

কমলার মা অবাক হয়ে গেল। বললে—দাদাবাবু বাড়িতে নেই? কেন মা?

মা বললে—দাদাবাবু কাল বাড়িতে আসেইনি তো আমি কী করে খাই? ছেলে উপোস করে রইলো আর আমি রাক্ষুসীর মতো পেট ভরে খাবো? তোমার মেয়ে কমলা যদি না খেয়ে থাকে তো তুমি কি তার মা হয়ে নিজে খেতে পারো? বলো?

এর জবাবে কমলার মা আর কীই বা বলবে!

মা আবার বললে—তুমি নিজে রান্না করে নাও কমলার মা। চাল-ডাল, তেল-নুন কোথায় আছে তা তো তুমি সব জানো। আমি খাবো না। আমার চাল তুমি নিও না।

তবু কমলার মা আবার জিজ্ঞেস করলে—তুমি একবারে খাবে না?

—না রে না, কতোবার বলবো এক কথা?

আজও সন্দীপের মনে পড়ে সেই সব দিনের কথা! জীবনে কতো কষ্টই যে সে মা'কে দিয়েছে। বাবা মারা যাওয়ার পর সম্পত্তি বলতে রেখে গিয়েছিলেন শুধু ওই মাত্র একটা ছোট বাড়ি। সেটাকে বাড়ি বললেও ভুল হয়। বলা উচিত মাথা গোঁজবার মতো একটা আশ্রয়। তা দিয়ে কি ছেলে মানুষ করা যায়?

তাই শেষ পর্যন্ত শুধু ছেলের ভবিষ্যতের দিকে চেয়েই মা'কে রাঁধুনির কাজ নিতে হয়েছিল পাশের চাটুজ্জে-বাবুদের বাড়িতে। তারপর সেই ছেলে কলকাতায় গিয়ে একটা আস্তানা পেয়েছিল এক বড়োলোকের বাড়িতে খাওয়াও পেতো সেখানে। আর তার ওপর পনেরো টাকা মাসিক আয়ের ওপর নির্ভর করেই সেদিন লেখা-পড়া চালিয়ে গিয়েছিল বলে সে আজ নিজের পায়ের ওপর দাঁড়াতে পেরেছিল। তখন পাড়ার লোকে মা'কে বলতো—এবার ছেলের একটা বিয়ে দাও দিদি। আর কতোদিন পরের বাড়িতে রাঁধুনি-গিরি করবে?

মা বলতো—তা কি আমার কপালে আছে মা?

তারা বলতো—আছে দিদি। তুমি বলো তো আমরা একটা পাত্রীর খোঁজ করি।

মা বলতো—তা করো না। তা করতে কি আমি বারণ করেছি? আমি তো তাহলে বেঁচে যাই মা। আমি নাতির মুখ দেখে মরে যেতে পারলে আর কিছু চাই না।

এ-সব মা'র অনেক কালের পুরনো সাধ। তারপর সেই ছেলে একদিন চাকরি পেলে কলকাতায়। মা সেই খবর পেয়ে 'মা মঙ্গল চণ্ডীতলা'র মন্দিরে গিয়ে পুজোও দিয়ে এলো। তখন থেকেই মা'র আবার বাঁচতে ইচ্ছে হলো। তখন থেকেই অনেক অপূর্ণ আশার স্বপ্ন দেখতে লাগলো মা।

তারপর খোকা কোথা থেকে এক মাসিমা আর তার মেয়ে বিশাখাকে নিয়ে এসে বাড়িতে তুললো। চাটুজ্জে-গিন্নি বিশাখাকে দেখে বলতো—এই মেয়ের সঙ্গেই তোমার খোকার বিয়ে দাও না বামুনদিদি। এরাও তো তোমাদের স্বজাতি! এমন ঘর আলো করা পাত্রী থাকতে আর কোথায় পাত্রী খুঁজতে যাবে?

মা'ও ভাবতো কথাটা মিথ্যে নয়। যতো দিন যেতো ততোই বিশাখাকে দেখে আর বিশাখার ব্যবহারে মা মনে আকাশ-কুসুমের স্বপ্ন দেখতো। তারপরেই বিশাখার মা পড়লো অসুখে। আর বলতে গেলে সেই মাসিমা অসুখের পরেই খোকার সঙ্গে বিশাখার বিয়েটা পেকে উঠলো। তখন মা'র সে কী উৎসাহ, সে কী আনন্দ! আর তারপর?

তারপরেই সব কিছু ওলোট-পালোট হয়ে গেল। কোথায়ই বা রইলো সেই বিয়ের পাত্রী আর কোথায়ই বা রইলো সেই পাত্রীর মা। সব কিছু স্বপ্ন, সব কিছু সাধ এক নিমেষে যে নিঃশেষ হয়ে গেল। আর সেই খোকা?

সেই খোকাও কোথায় পড়ে রইলো, তারও ঠিক রইলো না। সেই খোকা ক'দিন ধরে আর বাড়ি এলো না। কমলার মা প্রতিদিনই আসে। সংসারের সামান্য যা-কিছু কাজ-কর্ম থাকে তা করে আর ভাত-তরকারি নিয়ে বাড়ি চলে যায়। কমলার মা বলে—তুমি যে অসুখে পড়ে যাবে দিদি, কিছু মুখে দাও—

অনেক পীড়াপীড়িতে মা কিছু মুখে দেয় বটে, কিন্তু সে-খাওয়া পাখির খাওয়া। তাতে মানুষ বাঁচতে পারে না।

আর তার দু'দিন পরে হঠাৎ খোকার একটা চিঠি এলো মা'র নামে। জীবনে কখনও মা লেখা-পড়া করেনি। সেই চিঠিটা পেয়েই মা অবাক। পোস্টাফিস থেকে যে পিওন চিঠি এনেছিল, সেই তাকেই মা জিজ্ঞেস করলে—এ কীসের চিঠি বাবা? কে লিখেছে?

পোস্টম্যান বুঝতে পারলে যে মহিলা লেখা-পড়া জানেন না। এ-রকম ঘটনা তার কাছে নতুন নয়। সে এ-রকম ঘটনা আগেও অনেকবার ঘটতে দেখেছে। সে-সব ক্ষেত্রে সে শুধু চিঠি বিলিই করেনি, চিঠিটা পড়েও দিতে হয়েছে তাকে।

চিঠিটা সেই হাশেমই লিখেছে। লিখেছে যে সন্দীপদা কয়েকদিনের শারীরিক অত্যাচারে অসুস্থ হয়ে নার্সিং-হোমেই পড়ে আছেন। ব্যাঙ্কের সহকর্মীরা সবাই চাঁদা করে টাকা তুলে তাঁর চিকিৎসা করাচ্ছে। আপনি কিছু ভাববেন না। আমরা সন্দীপদাকে দেখা-শোনা করছি। একটু সুস্থ হলেই আপনার বাড়িতে তাঁকে পৌঁছে দিয়ে আসবো।

চিঠির পুরো বক্তব্য শুনে মা'র ধড়ে যেন প্রাণ ফিরে এলো।

পোস্টম্যানের হাতে তখন আরো অনেক কাজ। ঘুরে ঘুরে আরো অনেক বাড়িতে তাকে চিঠি বিলি করতে হবে। আর তার আসল কাজ চিঠি বিলি করা, চিঠি পড়ে দেওয়া নয়।

একে ক'দিন ধরে উপোষ আর অনিদ্রা, তার ওপর আবার এই দুঃসংবাদ। মা যেন হঠাৎ একেবারে দিশেহারা হয়ে গেল। খবরটা কাকে বলবে, কার কাছে সাহায্য চাইবে, কোথায় গেলে পরিত্রাণ পাবে, মা'র কাছে তখন সেই সমস্যাই প্রধান হয়ে উঠলো। খোকা অসুখে পড়ে আছে কলকাতায়, আর মা পড়ে রইলো বেড়াপোতাতে, এ অবস্থায় কার কাছে গিয়ে মা পরামর্শ চাইবে?

চিঠিখানা হাতে নিয়ে মা সেইখানেই অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। পিওন তো চিঠিটা দিয়ে অনেকক্ষণ আগে চলে গিয়েছে। আর হয়তো কখনও সে আসবে না।

অথচ চিঠিটা আবার কাউকে দিয়ে পড়াবার চেষ্টা করলে ভালো হতো। কিন্তু কে পড়ে দেবে?

হঠাৎ মাথায় একটা বুদ্ধি এলো। আগে যখন খোকা কলকাতা থেকে চিঠি লিখতো তখন তো ওই চাটুজ্জে-বাড়িতে গিয়ে বউদিদির কাছ থেকেই তা পড়িয়ে নিয়ে এসেছে।

কথাটা মনে পড়ে যেতেই মা কমলার মা'কে বললে--কমলার মা, তুমি সদর দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে যাও, আমি একটু চাটুজ্জে বাড়িটা ঘুরে আসি—

বলে যেমন অবস্থায় মা ছিল সেই অবস্থাতেই মা বেরিয়ে গেল।
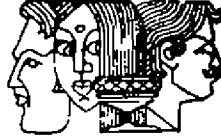
মুখার্জিবাবুদের বাড়িতে তখন আর একটা লড়াই চলেছে। সে-লড়াই মৃত্যুর সঙ্গে জীবনের লড়াই। একই বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে এমন লড়াই আগে কেউ কখনও দেখেনি বা কেউ শোনেওনি। এই যে বাড়িটা, এখানে আগে অনেকবার অনেক মৃত্যু ঘটেছে।

দেবীপদ মুখার্জি যখন বেঁচে ছিলেন তখন এখানেই তিনি প্রথম বাঁচার লড়াই করে একদিন জিতেছিলেন। এ-বাড়ির প্রত্যেকটা ইঁটের সঙ্গে তাঁর জীবন-যুদ্ধের সম্পর্ক জড়িয়ে ছিল। তিনি জানতেন কী করে বাঁচতে হয়। যখন তাঁর পঁয়তাল্লিশ বছর বয়েস তখন তিনি হঠাৎ একদিনের অসুখে মারা যান। মৃত্যুর আগেই তিনি বুঝেছিলেন যে তাঁর যাওয়ার সময় হয়ে এসেছে। তিনি ঠাকমা-মণিকে কাছে ডেকেছিলেন।

ঠাকমা-মণি তখন কান্নায় চোখ ভাসাচ্ছিলেন। দেবীপদ মুখার্জি তখন ইঙ্গিতে তাঁকে বলেছিলেন—তুমি কেঁদো না। আমি চলে যাচ্ছি বটে, কিন্তু তোমার কোনও দুঃখ রেখে যাইনি। আমি তোমার ভরণ-পোষণের জন্যে অগাধ টাকার সম্পত্তি রেখে গেলাম।

কথাগুলো শুনতে শুনতে ঠাকমা-মণি মুখ-চোখ কান্নায় ভাসিয়ে দিয়েছিলেন।

দেবীপদ মুখার্জি আরো বলেছিলেন—টাকাই হচ্ছে বুকের বল। টাকা থাকলে মানুষের কাউকে ভয় করবার থাকে না। টাকা থাকলে সবাই তোমাকে ভয় করবে ভক্তি করবে—এটা মনে রেখো!

এ-সব কথা ঠাকমা-মণি যে জানতেন না তা নয়। তবু তাঁর দুঃচোখ ফেটে অঝোর-ধারায় জল ঝরে পড়ছিল। দেবীপদ আরো বলেছিলেন—আর তার সঙ্গে রেখে গেলাম শক্তি আর মুক্তিকে। তারাই তোমার দুটো হাত। অগাধ টাকা আর তার সঙ্গে দুটো শক্ত হাত থাকতে তোমার আর দুঃখ কীসের? তুমি কেঁদো না।

তা বলে স্বামীর অভাব কি টাকা আর দুটো শক্ত-সামর্থ্য ছেলে দিয়ে পুরণ হয়!

দেবীপদ মুখার্জি আরো বলেছিলেন—শুধু শক্তি আর মুক্তিই নয়, তার সঙ্গে তোমাকে আমার কোম্পানির ডিরেক্টারও করে দিয়ে গিয়েছি। ছেলেরা একদিন তোমাকে ছেড়ে গেলেও লিমিটেড কোম্পানি তো আর উঠে যাবে না। সে চিরকাল থাকবে।

তারপর ঠাকমা-মণির জীবদ্দশাতেই শক্তি চলে গেল। তখন তার বয়েস মাত্র সাঁইত্রিশ বছর। তখনই ঠাকমা-মণির একটা হাত নষ্ট হয়ে গেল। তারপর গেল শক্তির বউ।

তারপর মুক্তিপদর বিয়ে হওয়ার পর সে পৈত্রিক বাড়ি ছেড়ে বেলুড়ে আলাদা বাড়ি করে সংসার থেকে আলাদা হয়ে গেল। তখন রইলো শুধু শক্তির একমাত্র সন্তান সৌম্য। সেই সৌম্যকে নিয়েই তখন ঠাকমা-মণির সংসার। তাকে বুকে নিয়েই ঠাকমা-মণি জীবন-মৃত্যুর লড়াই চালিয়ে যেতে লাগলেন।

তারপর কতো ঝড় কতো ঝাপটা মাথার ওপর দিয়ে ঠাকমা-মণিকে উপড়ে ফেলতে চাইলো। কতোবার কতো বিপদ তাঁকে ভূমিসাৎ করতে চাইলো। কিন্তু তিনি সমস্ত

কিছু বিপদ-আপদ সহ্য করে মাথা উঁচু করে রেখেছিলেন। সেই সৌম্যকে বাঁচাবার জন্যে ঠাকমা-মণি কি কম পরিশ্রম করেছিলেন? ইণ্ডিয়ার যতো তীর্থক্ষেত্র আছে সমস্ত জায়গায় গিয়ে তিনি সৌম্যর জন্যে মানত করেছেন, পুজো দিয়েছেন, কল্যাণ কামনা করেছেন। দু'হাতে টাকা খরচ করতে কোনওদিন কোনও কার্পণ্য করেননি তিনি। তার বিয়ের জন্যে তিনি কতোকাল আগে থেকে বিয়ের কনে পর্যন্ত পছন্দ করে রেখেছিলেন।

কিন্তু তারপর? তারপর তার ফল কী হলো?

আজ সেই তাঁর নাতি খুনের আসামী। খুনের আসামী হওয়ার পর কোনও রকমে তাকে বাঁচানো গিয়েছে বিশাখার সঙ্গে বিয়ে দিইয়ে। তাই সেই বিশাখা এখন তাঁর নাত-বউ।

এখন যদি ঠকমা-মণির জ্ঞান থাকতো তাহলে কি তিনি তাঁর নাতিকে দেখে খুশী হয়ে অভ্যর্থনা করতেন, না অঝোর ধারায় কাঁদতেন?

ঠাকমা-মণির দিকে তখন একদৃষ্টে চেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল সৌম্যপদ।

ঠকমা-মণির নার্স মেয়েটিও একদৃষ্টে চেয়ে দেখছিল সৌম্যপদর দিকে। তার কাছে সৌম্যপদ ছিল একজন মূর্তিমান বিস্ময়। আগে থেকেই তার শোনা ছিল যে রোগীর অসুখের একমাত্র কারণ তাঁর এই নাতি। এই নাতির কথা ভেবে ভেবেই তিনি আজ এই রকম অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন। আর শুধু তাই-ই নয়, এই নাতির সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার জন্যে তিনিই আঠারো-কুড়ি বছর ধরে ওই পুত্রবধূকে পছন্দ করে বাড়িতে পুষে রেখেছিলেন।

দু'জন নার্সই জানতো কেমন করে বিশাখার সঙ্গে নিজের নাতির বিয়ের সব বন্দো-বস্ত করে রেখেও বানচাল হয়ে গিয়েছিল একটা খুনকে কেন্দ্র করে। শুধু নার্স দু'জনই নয়, পাড়ার অনেক লোকও তা জেনে গিয়েছিল। আর শুধু পাড়ার লোকদের কথাই বা বলি কী করে। খবরের কাগজের দৌলতে কলকাতার অনেক লোকেরও তা জানতে বাকি ছিল না।

আজ সেই খুনের আসামী, সেই যাবজ্জীবন জেল খাটা কয়েদী এ-বাড়িতে এসেছে চার ঘণ্টার ছুটি নিয়ে অসুস্থ ঠাকমা-মণিকে দেখতে—এটা নার্সদের কাছে একটা সংবাদ। যার কথা এতদিন তারা শুধু কানেই শুনে এসেছিল সেই লোকটা আজ সশরীরে এসে হাজির হয়ে তাদের চোখের সামনে ,এটা সকলের বলবার মতো খবর, এটা সকলকে শোনানো আর শোনাবার মতো খবরও বটে!

নার্স মেয়েটি যতো সৌম্যপদ'র দিকে চেয়ে দেখছিল ততোই অবাক হয়ে যাচ্ছিল। একে তো অন্য মানুষদের মতোই দেখতে, অন্য সকলের মতোই এর চেহারা। সেই একই রকম দুটো হাত, দুটো পা, দুটো চোখ, দুটো কান। এ কী করে নিজের বউকে খুন করতে পারলো!

ঠাকমা-মণি সামনের বিছানার ওপর অজ্ঞান অচৈতন্য হয়ে শুয়ে পড়েছিলেন আর সৌম্যপদ সেই দিকে একদৃষ্টে চেয়েছিল। মল্লিক-মশাইও পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

বললেন—একবার বউদি-মণির সঙ্গে দেখা করবেন না সৌম্যবাবু?

কথাটা শুনে সৌম্যবাবুর যেন চমক ভাঙলো। যেন হঠাৎ এতক্ষণে মনে পড়ে গেল যে তার স্ত্রী বলে কেউ এ-বাড়িতে আছে। বললে—সে-কোথায়?

মল্লিক-মশাই বললেন—আপনার ঘরে!

—আচ্ছা চলুন।

একতলায় গাড়ি থেকে উঠতে গিয়ে সে সৌম্যপদকে প্রথম দেখেছিল। তখন তাকে সে প্রথমে চিনতেই পারেনি। তার বিয়ের রাতে এমন বিপর্যয় ঘটে গিয়েছিল যে সুস্থ-ভাবে কোনও চিন্তাও সে করতে পারেনি। কার সঙ্গে তার বিয়ে হওয়ার কথা আর আচমকা কার সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে গেল। তারপর কোর্টে গিয়েও সে সমস্তক্ষণ মাথায় ঘোমটা দিয়ে মুখটা ঢেকে রেখেছিল। পাশে ঠাকমা-মণি বসে ছিলেন। তিনি বারবার

তাগিদ দিচ্ছিলেন ঘোমটা খুলে মুখটা হাকিম সাহেবকে দেখাতে। যাতে সাহেবের মনে একটু দয়ার উদ্রেক হয়। দয়ার উদ্রেক হলে তবেই তো হাকিম সাহেব তার স্বামীকে ফাঁসির হুকুমের বদলে অন্য কোনও লঘু শাস্তি দেবেন।

তারপরে তো তর স্বামীর সঙ্গে আর তার দেখা হয়নি।

সৌম্যপদ ঠাকমা-মণির ঘরে গিয়ে ঢুকতেই বিশাখা তার নিজের ঘরে গিয়ে আত্মগোপন করেছিল।

শেষ পর্যন্ত মল্লিক-মশাই বিশাখার ঘরেই সৌম্যকে নিয়ে এলেন। বাইরে থেকে মল্লিকমশাই ডাকলেন—বউদি-মণি, এই দেখুন কাকে এনেছি আপনার ঘরে।

ঘরের দরজা খোলাই ছিল। আগে ঢুকলেন মল্লিক-মশাই, তারপর সৌম্যবাবু। বিশাখা ঘরের এক কোণে মাথায় ঘোমটা দিয়ে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

—এই যে বউদি-মণি, চেয়ে দেখুন এদিকে—

তারপর সৌম্যবাবুকে মল্লিক-মশাই জিজ্ঞেস করলেন—আপনার কতোক্ষণের ছুটি?

সৌম্যবাবু বললে—চার ঘণ্টার মতোন। চার ঘণ্টার মধ্যেই আবার আমাকে জেলখানায় ফিরে যেতে হবে—

কথাটা বলেই আবার একটু থেমে বললে—আপনি একটা কাজ করতে পারবেন ম্যানেজারবাবু?

—বলুন, কী কাজ?

সৌম্যপদ বললে—আমার জন্যে এক বোতল হুইস্কি আনিয়ে দিতে পারবেন? অনেক দিন ভাল হুইস্কি খেতে পাইনি।

মল্লিক-মশাই বললেন—বলুন, কোন্ হুইস্কি আনবো? দিশী না বিলিতি? কী নাম?

—বিলিতি হুইস্কিই আনবেন। কিং-অব্-কিংস্—

নামটা শুনে মল্লিক-মশাই বিশাখার দিকে চেয়ে বললেন—বউদি-মণি, আমার কাছে টাকা ফুরিয়ে গেছে। আরো কিছু টাকা দিন তো—

বিশাখা বললে—বলুন, কতো টাকা দেব?

মল্লিক-মশাই বললেন—বেশি নয়, এখন শ' পাঁচেক দিলেই চলবে!

বিশাখা বললে—আমি ও-ঘর থেকে টাকা এনে দিচ্ছি, একটু দাঁড়ান—

বলে সে চলে গেল।

সৌম্যপদ মল্লিক-মশাই-এর দিকে চেয়ে বললে—ম্যানেজারবাবু, বাইরে আমার সঙ্গে যে চারজন এসেছে তাদের কিছু দেবেন তো! খেতে পেলে ওরা খুশীই থাকবে—

মল্লিক-মশাই বললেন—আমি দোকান থেকে হুইস্কি কিনে আনবার সময় ওদের জন্যেও খাবার কিনে আনবোখন।

বিশাখা এই সময়ে ঘরে ঢুকলো। পাঁচটা একশো টাকার নোট মল্লিক-মশাই-এর হাতে দিতেই তিনি তা নিয়ে চলে গেলেন। সৌম্যপদ বললে—তোমার কাছে আরো টাকা আছে?

বিশাখা প্রশ্নটা শুনে অবাক হয়ে গেল। বললে—টাকা?

সৌম্যপদ বললে—হ্যাঁ, টাকা। কতো টাকা আছে তোমার কাছে?

বিশাখা বললে—আপনার টাকার কি দরকার?

—হ্যাঁ, টাকা থাকলে জেলখানার ভেতরে আমার খুব সুবিধে হয়। সবাই আমার কাছ থেকে টাকা চায় ওখানে।

বিশাখা বললে—বলুন, কতো টাকা আপনার দরকার?

—তুমি যা দিতে পারো তাই-ই দাও এখন!

বিশাখা বললে—এ তো আমার নিজের টাকা নয়। সবই ঠাকমা-মণির টাকা।

সৌম্যপদ বললে—ঠাকমা-মণি তো এখন মরো-মরো। আর বেশিদিন হয়তো বাঁচবেনও

না। আর তুমি এ-বাড়ির বউ। ঠাকমা-মণি মরে গেলে ওই সব টাকা তো তোমারই হয়ে যাবে।

বিশাখা বললে—আমার কেন হয়ে যাবে। ও-টাকা তো সব আপনারই। আপনিই তো এ-বাড়ির একমাত্র নাতি!

সৌম্যপদ বললে—আমার কথা ছেড়ে দাও, আমি তো জেলখানার মধ্যেই পচে মরবো। ও-টাকা তো আমার ভোগেও আসবে না কোনও দিন।

—ও কথা কেন বললেন? একদিন তো আপনি জেলখানা থেকে ছাড়া পাবেন। চিরকাল তো আর আপনি জেলের ভেতরে থাকছেন না। তখন?

সৌম্যপদ বললেন—তখনকার কথা তখনই ভাববো। এখন আসল যৌবনটাই যদি জেলের ভেতরে কেটে যায় তাহলে বুড়ো বয়েসে টাকা পেলেও যা আর না-পেলেও তাই—তখন তো আর ভোগ করবার ক্ষমতাও আমার থাকবে না।

কথাগুলো বলতে বলতে সৌম্যপদ'র গলাটা হতাশায় যেন করুণ হয়ে উঠলো।

তারপর নিজেকে একটা সামলে নিয়ে আবার বললে—আচ্ছা, একটা কথা বলবে?

বিশাখা বললে—কী, বলুন?

সৌম্যপদ বললে—বলছি, তুমি তো জানতে যে আমি একজন ফাঁসির আসামী। আমি আমার বউকে খুন করেছি। তাহলে কেন তুমি এই অপদার্থ লোকটাকে বিয়ে করলে? সমস্ত জেনে শুনেও কেন তুমি এই কাজ করতে রাজী হলে, বলতে পারো?

বিশাখা প্রশ্নটা শুনে কী উত্তর দেবে বুঝতে পারলে না। সৌম্যপদ যে তাকে এমন সময়ে একটা কূট প্রশ্ন করে বসবে, তা সে কল্পনাই করতে পারেনি।

সৌম্যপদ আবার জিজ্ঞেস করলে—কই, তুমি আমার কথার জবাব দিচ্ছ না যে?

—কী জবাব দেব বলুন?

—তবু তুমি কি কখনও এ-সব নিয়ে ভাবোনি?

বিশাখা বললে—ভাবিনি যে তা নয়। ভেবেছি। কিন্তু ভেবে ভেবেও কোনও জবাব পাইনি।

সৌম্যপদ বললে—জেলখানার ভেতরে একলা বসে বসে শুয়ে শুয়ে যখন আর সময় কাটতে চাইতো না, তখন কিন্তু আমি অনেক ভেবেছি। ভাবতে ভাবতে তোমার মুখটা আমার চোখের ওপরে ভেসে উঠতো। আর সেই সময় মনে হতো কেন বিশাখা আমার মতন খুনের আসামী একটা অপদার্থ লোককে বিয়ে করতে রাজী হলো?

বিশাখা জিজ্ঞেস করলে—তারপর? ভেবে ভেবে কিছু উত্তর পেয়েছিলেন?

সৌম্যপদ বললে—না, উত্তর পাইনি বলেই তো এখন তোমায় কথাটা জিজ্ঞেস করছি! তুমিই বলো না, কারণটা কী?

বিশাখা বললে—আপনার সঙ্গে আমার বিয়ে তো ছোটবেলা থেকেই ঠিক করে রাখা হয়েছিল। সেই জন্যেই তো আমাদের মা আর মেয়ের ভরণ-পোষণ আর লেখা-পড়ার খরচের জন্যে হাজার-হাজার টাকা খরচও করেছিলেন আপনার ঠাকমা-মণি। এ-সব কথা তো অনেকেই এখনও জানে। যারা জানতো না, তারাও এখন অন্যদের কাছে শুনেছে—

—শুধু এইটুকু, আর কিছু নয়?

বিশাখা এ-কথার কোনও উত্তর দিলে না।

সৌম্যপদ আবার জিজ্ঞেস করলে—কই, উত্তর দিচ্ছ না যে?

বিশাখা বললে—কী উত্তর দেব বুঝতে পারছি না।

সৌম্যপদ কী যেন বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু বলতে গিয়ে বাধা পড়লো। বাইরে থেকে মল্লিক-মশাই-এর গলার শব্দ এলো। বিশাখা চেয়ার থেকে উঠে দরজাটা খুলে দিয়ে বললে—আসুন—

মল্লিক-মশাই এক বোতল হুইস্কি নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। বোতলটা টেবিলের ওপর রেখে দিলেন। তারপর বললেন—আর কিছু চাই?

সৌম্যপদ বললে—সোডা আনেননি? সোডার বোতল? সোডা না মিশিয়ে আমি হুইস্কি খাবো কী করে?

মল্লিক-মশাই জীবনে এ-সব স্পর্শ করেননি। শুধু তিনিই নন, তাঁর উর্ধ্বতন চতুর্দশ পুরুষও কখনও এ-সব ছোঁননি। বললেন—আমি এখ্খুনি সোডা আনছি, কাছেই সোডার দোকান, বেশি দেরি হবে না—

বলে চলে যাচ্ছিলেন, কিন্তু সৌম্যপদ আবার ডাকলেন—সঙ্গে কিছু স্ন্যাকস্ও নিয়ে আসবেন—

—স্ন্যাকস্?

—হ্যাঁ, চপ, কি কাটলেট, কি ফিন্গার-চিপস্...যা পান...

মল্লিক-মশাই আর দাঁড়ালেন না সেখানে। সেই বুড়ো শরীর নিয়ে দশবার সিঁড়ি দিয়ে তেতলায় ওঠা-নামার পরিশ্রমে তিনি তখন হাঁফাচ্ছিলেন। কিন্তু চাকরি বজায় রাখতে গেলে শরীরের দিকে তাকাতে গেলে চলবে না।

সৌম্যপদ বললে—একটা গেলাস দিতে পারো আমাকে?

বিশাখা গ্লাস এনে দিলে সৌম্যপদ বোতলটা খুলে খানিকটা 'কিং-অব্-কিংস্'-এর তরল পদার্থ গেলাসে ঢাললে। বললে—সোডা আনতে এত দেরি কেন ম্যানেজারবাবু?

তারপর কী যেন মনে পড়তে বললে—হ্যাঁ, ভালো কথা। তুমি তো কই টাকা দিলে না আমাকে?

বিশাখা জিজ্ঞেস করলে—কতো টাকা চাই?

সৌম্যপদ বললে—যা পারো, দশ হাজার, বারো হাজার...টাকা না পেলে জেলখানায় কেউ কথা শোনে না। যদি আরো বেশি টাকা দিতে পারো তাহলে আরো ভালো হয়—জেলের ভেতরে সকলের টাকার বড় খাঁকতি—

—আচ্ছা, আমি এনে দিচ্ছি—

বলে ঠাকমা-মণির ঘরে চলে গেল। নার্স ঠাকমা-মণির বিছানার পাশে বসে ছিল। ঠাকমা-মণি তখনও বরাবরের মতো অজ্ঞান-অচৈতন্য হয়ে শুয়ে পড়েছেন। আলমারিটা তাঁর বিছানার পাশে। বিশাখা নার্সকে জিজ্ঞেস করলে—ঠাকমা-মণির জ্বর কতো এখন?

নার্স বললে—সেই একইরকম, একশো তিন ডিগ্রী—

—আর পালস্-বীট?

—সেই একই। নাইনটি ফাইভ্—

বিশাখা বললে—ফিগারটা লিখে রাখবেন। ডাক্তার ব্যানার্জি এলে তাঁকে জানাতে হবে। ওই লিকুইড্ ওষুধটা খাইয়েছেন তো?

—হ্যাঁ—

বিশাখা সে-কথা শুনে আর কিছু বললে না। আঁচল থেকে চাবির গোছাটা নিয়ে আলমারিটা খুলে টাকা বার করলে। কতো টাকা সে দেবে? দশ হাজার, না বারো হাজার। বারো হাজার টাকার কথা যখন বলেছেন তখন বারো হাজার টাকাই তাঁকে দেওয়া উচিত। টাকাগুলো তো তাঁরই। তাঁর নিজের টাকা, তিনি যেমন ইচ্ছে তেমনি খরচ করবেন, তাতে তার কী বলবার থাকতে পারে!

টাকা নিয়ে যখন বিশাখা ঘরে ঢুকলো তখন সৌম্যপদর সামনে হুইস্কির বোতল প্রায় আধখালি। সামনের ডিশের ওপর সোডার বোতলও রয়েছে। আর তাদের সঙ্গে চিংড়ি মাছের কাটলেট। মল্লিক-মশাই বোধহয় দোকান থেকে সমস্ত কিছু কিনে দিয়ে তখন চলে গেছেন। বললে—এই নিন টাকা!

সৌম্যপদ ডান হাতটা এগিয়ে দিলে বিশাখার দিকে। বিশাখা বললে—আপনি যা চেয়েছিলেন তাই-ই দিয়েছি, বারো হাজার টাকা আছে এখানে। একটু গুনে নিন—

সৌম্যপদ গেলাসটায় চুমুক দিয়ে টাকাগুলো পকেটে রাখতে রাখতে বললে—গুনে আর নেব কী, তুমি কি আর কম দেবে আমাকে?

বলে গেলাসে একবার চুমুক দিয়ে আবার বললে—এর বেশি টাকা সঙ্গে থাকা ভালো নয়। কেউ কেড়ে নিতে পারে।

বিশাখা তখনও দাঁড়িয়ে ছিল। সৌম্যপদ বললে—দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বসো—

চেয়ারে বসে বিশাখা বললে—জেলখানার মধ্যে কে আর টাকা কেড়ে নেবে?

সৌম্যপদ আবার এক চুমুক খেয়ে বললে—না, তুমি জানো না, ওখানে সবাই চোর।

বিশাখা বললে—জেলখানার ভেতরেই চোর?

—জেলখানা তো চোর-ডাকাতেরই আড্ডা তা জানো না? জেলখানাতে যতো চোর ডাকাতের আড্ডা অতো চোর-ডাকাত জেলখানার বাইরেও নেই।

—তাহলে টাকাগুলো কোথায় রাখবেন?

সৌম্যপদ বললে—জেলারের কাছেই রাখবো।

—জেলার? জেলার মানে?

—জেলার মানে জেলের খোদ কর্তা। তাঁর কাছেই টাকাগুলো রাখবো! যদি আমার হুইস্কি-টুইস্কি দরকার হয় তো এই টাকা দিয়ে তিনি তা কিনে দেবেন!

সৌম্যপদর বোতলটা তখন প্রায় শেষ হয়েছিল। আর একটু বাকি ছিল তখনও।

সৌম্যপদ সেটুকু নিঃশেষ করে দিয়ে বললে—আর একটা বোতল আনতে বললে ভালো হতো। ম্যানেজারবাবুকে একটু ডেকে দেবে?

বিশাখা বললে—আর না-ই বা খেলেন...

সৌম্যপদ বললে—অনেক দিন এটা খাইনি, তাই...

বিশাখা বললে—শুনেছি মদ খাওয়া নাকি স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো নয়।

সৌম্যপদ জিজ্ঞেস করলে—কে বললে?

বিশাখা বললে—লোকে বলে, তাই বলছি। আমি কী করে জানবো?

সৌম্যপদর তখন বেশ নেশা ধরে গেছে। মুখের কথাগুলো বেশ জড়িয়ে যেতে আরম্ভ করেছে। চোখ দুটোকে একটু ঢুলু-ঢুলু দেখাচ্ছে মনে হলো। তাকে দেখে বিশাখার একটু কেমন যেন ভয়-ভয় করতে লাগলো। যদি এইভাবে বসে থেকে-থেকে পড়ে যায়, তাহলে?

চিংড়ির কাটলেটগুলো তখন একেবারে শেষ হয়ে গিয়েছে। প্লেটের ওপর কাঁচা পেঁয়াজের কুচিগুলো যা পড়ে ছিল সে-গুলোও খেয়ে শেষ করে দিয়েছে মানুষটা। বিশাখা জিজ্ঞেস করলে—আপনার কী ক্ষিধে পেয়েছে? আর কিছু আনবো? সন্দেশ কি রসগোল্লা?

সৌম্যপদ বললে—দূর তুমি কিছু বোঝ না। ও-গুলো কি ভদ্দরলোকে খায়?

তারপরে একটু দম নিয়ে সৌম্যপদ আবার বললে—যদি আর এক বোতল 'কিং-অব্-কিংস' আনিয়ে দিতে পারো, তো দেখ! প্লীজ—

বিশাখা বললে—ও আর খাবেন না!

—কী যা-তা বলছো? কতোদিন ও-সব খাইনি বলো তো!

বিশাখা বললে—না না, ওটা আর খাবেন না আমার কথা শুনুন—এখন আপনি বসে টলছেন! এর পর আরো খেলে আর জেলখানায় ফিরতে পারবেন না।

সৌম্যপদ বলে উঠলো—হ্যাঙ্ ইয়োর জেলখানা, আমি আর জেলখানায় ফিরে যাবো না!

বিশাখা বুঝলে মানুষটা প্রলাপ বকতে শুরু করেছেন। কী যে সে করবে তা বুঝতে পারলে না। বাইরের সদরে চারজন পুলিস বসে তখনও যে পাহারা দিচ্ছে, আর চার ঘণ্টার মধ্যে মানুষটাকে যে তারা আবার জেলখানায় ফেরৎ নিয়ে যাবে সেদিকে যেন তার খেয়ালই নেই। বিশাখা একটু সাবধান করে দেওয়ার জন্যে বললে—আপনার সঙ্গের পুলিশরা কিন্তু আপনার জন্যে এখনও নিচেয় অপেক্ষা করছে।

সৌম্যপদ তখন চোখ দুটো বুজিয়ে ছিল। হঠাৎ বিশাখার গলার আওয়াজে যেন তার ঘুম ভেঙে গেল। বললে—ও ব্যাটাদের কথা রাখো। ওরা তো আমার মাইনে করা চাকর। আমি টাকা দিয়ে ব্যাটাদের মুখ বন্ধ করে দিতে পারি। তা জানো?

বিশাখা এ-কথার কোনও জবাব দিলে না।

সৌম্যপদ আবার বলে উঠলো—কই জবাব দিচ্ছ না যে? জানো কি বলো?

বিশাখা এবার বললে—জানি।

সৌম্যপদ আবার বললে—আর বলো তো আমি কে? বলো, কে আমি?

বিশাখা এ-প্রশ্নের আর কোনও জবাব দিলে না।

—আর, বলো আমি কে? জবাব দিচ্ছ না কেন?

বিশাখা চুপ। সৌম্যপদ বললে—তুমি জানো না তো আমি কে? এবার আমি কে আমি বলে দিচ্ছি। আমি হলুম স্যাক্সবি-মুখার্জি কোম্পানীর ডাইরেক্টার মিস্টার এস. পি. মুখার্জি—

—আপনার নেশা হয়ে গেছে। আপনি একটু চুপ করে থাকুন।

সৌম্যপদ রেগে গেল এবার। বললে—আমাকে চুপ করতে বলার তুমি কে? হু আর ইউ?

বিশাখা চুপ করে রইলো।

—উত্তর দাও। উত্তর দিতেই হবে তোমাকে। দাও উত্তর। বিশাখা বললে—আমি বিশাখা।

—পুরো নামটা বলো। তোমার পুরো নামটা কী বলো?

—বিশাখা মুখার্জি!

সৌম্যপদ আবার জিজ্ঞেস করলে—হ্যাঁ, ঠিক হয়েছে! কিন্তু আগে তোমার নাম কী ছিল। বলো? আমার সঙ্গে বিয়ে হওয়ার আগে তোমার নাম কি ছিল, বলো?

বিশাখা মনের ভেতর তখন একটু-একটু করে রাগ জমা হচ্ছিল। উঃ, এই মানুষটার সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে? কথাটা ভাবতে গিয়েও তার সমস্ত মনটা বিষিয়ে উঠলো।

সৌম্যপদকে একলা ঘরে রেখে বিশাখা বাইরে বেরোল। সামনে সুধাকে দেখতে পেয়ে বললে—সুধা, মল্লিক-মশাইকে একবার এখ্খুনি ডেকে দে তো, বলবি আমি ডাকছি। এখ্খুনি যেন একটু আসেন। খুব জরুরী দরকার—

বলে সেই রেলিং-ঘেরা বারান্দার ধারে দাঁড়িয়ে রইলো। মল্লিক-মশাইও খবর পেয়ে পাঁচ মিনিটের মধ্যে এসে হাজির হলেন। বললে—আপনি ডেকেছেন বউদি-মণি?

বিশাখা বললে—হ্যাঁ, আমার ঘরে এসে দেখুন আমাদের ঠাকমা-মণির নাতি কী কাণ্ড করছে—

—কী কাণ্ড করছেন?

বিশাখা বলে—আমি আর কী বলবো, নিজের চোখেই সব দেখে যান না।

বলে মল্লিক-মশাইকে নিয়ে বিশাখা তার ঘরের ভেতরে ঢুকলো। ঘরে ঢুকে যা দেখলে তা আরো কুৎসিত। মল্লিক-মশাই যতোটা আন্দাজ করতে পেরেছিলেন, সৌম্যপদ যে তার চেয়েও বীভৎস কাণ্ড বাধিয়ে বসবে তা তিনি কল্পনা করতেই পারেননি।

কিন্তু ঘরে ঢুকে দুজনেই হতবাক। ঘরের মেঝের ওপর সৌম্যপদ উপুড় হয়ে পড়ে আছেন আর বমি করে সমস্ত ঘরটা ভাসিয়ে দিয়েছেন। সেই বমির গন্ধে সমস্ত ঘরের হাওয়া বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। বিশাখা আর মল্লিক-মশাই দুজনেই সে দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ হয়ে নাকে কাপড় চাপা দিতে বাধ্য হলো। কিন্তু যে-মানুষটা বমি করেছে তার যেন কোনও বিকার থাকতে নেই। সে তখন সেই নিজের ক্লেদাক্ত বমির ওপরেই আত্ম-সমর্পণ করে পরম নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ে আছে।

এ আবার কেমন স্বামী, এ আবার কেমন স্ত্রী, এ আবার কেমন বিয়ে? পৃথিবীর কোনও ধর্ম-শাস্ত্রেও তো এ-রকম বিয়ের বিধান নেই। বেদেও নেই, পুরাণেও নেই! তাহলে?

তাহলে কি এই বিশাখা, এই সৌম্যপদ, এরা সৃষ্টিছাড়া? একজন ফাঁসি থেকে মুক্তি পাওয়া যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আসামী, আর একজন তার স্ত্রী! তার অফুরন্ত টাকা তবু সে স্ত্রী হয়েও স্ত্রী নয়, স্বামী থেকেও তার স্বামী নেই।

এ-রকম স্বামী-স্ত্রীর কথা কেউ কখনও শুনেছে? এ-রকম স্বামী-স্ত্রীর কথা কেউ কোনও বইতে পড়েছে? এ-রকম স্বামী-স্ত্রী কেউ কখনও দেখেছে?

এত দিন পরে, এত বছর পরে সন্দীপ আজ সেই সব দিনের কথাগুলোই ভাবছিল। এই-ই তো কলকাতা। যে-কলকাতা গোপাল হাজরার কাছে অতো প্রিয় ছিল, যে-কলকাতাতে আসবার জন্যে গোপাল হাজরা তাকে কতোবার তাড়া দিয়েছে। যে-কলকাতায় থাকা-খাওয়া-পড়ার জন্যে মল্লিক-মশাই বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন। সেই কলকাতা তো এখনও রয়েছে। অথচ কলকাতার সেই মানুষগুলো কোথায় গেল? সেই নিবারণ?

নিবারণের কথাও মনে পড়লো সন্দীপের। সেই নিবারণ যে পাঁচ টাকা দামের একটা বই ছাপিয়ে বিক্রি করতো। তার বিশ্বাস হয়ে গিয়েছিল যে সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে। তখনকার দিনে পাঁচ টাকা দিতে কারো গায়ে লাগতো না, তাই সে বইগুলো ঝট্-ঝট্ করে বিক্রি হয়ে যেত!

কিন্তু আজ, এতদিন পরে সন্দীপের মনে হলো নিবারণের কথাটা একেবারে নিছক যে মিথ্যে, তাও নয়। নইলে সমস্ত কলকাতাটাই বা এত বছর পরে এমন বদলে গেল কেন? এখানে আগেও মিছিল ছিল, এখনও মিছিল প্রোসেশান আছে, কিন্তু আগে মিছিলে তো এত লোক হতো না। আগে রাস্তায় তো এত গাড়ি চলতো না। এখন যেন রাস্তায়-রাস্তায় গাড়িরও মিছিল চলেছে। অন্য এক-রকমের বাসও চলেছে। লোকে বলে ওগুলো নাকি 'মিনি' বাস! আগে তো ও-সব ছিল না। এখন তাহলে নিশ্চয়ই শহরে লোক বেড়েছে। কেন লোক বাড়লো? হঠাৎ কি মানুষের জন্ম-হার বাড়লো, না মানুষের মৃত্যু-হার কমলো?

দূর থেকে একদল লোক চিৎকার করে আসছিল। নিশ্চয়ই মিছিল করতে বেরিয়েছে ওরা। হঠাৎ তাদের মধ্যে থেকে একজন লোক একেবারে সন্দীপের সামনে এসে থমকে দাঁড়ালো।

সন্দীপকে দেখে জিজ্ঞেস করলে—এ কি? আপনি সন্দীপ লাহিড়ী না?

লোকটাকে সন্দীপ চিনতে পারলে না।

লোকটা আবার জিজ্ঞেস করলে—আপনিই তো সন্দীপ লাহিড়ী? চিনতে পারছেন?

সন্দীপ চিনতে পারলে না। ফ্যাল্-ফ্যাল্ করে চেয়ে রইলো তার দিকে। মিছিলটা তখন এগিয়ে চলছিল। লোকটা আবার জিজ্ঞেস করলে—আপনি জেল থেকে কবে ছাড়া পেলেন?

সন্দীপ এবার চমকে উঠে বললে—আপনি কে? আমি তো ঠিক চিনতে পারলুম না।

—আমি সুশীল সরকার। এখন মনে পড়েছে? আপনি তো ন্যাশনাল ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের হাওড়া ব্রাঞ্চের ম্যানেজার ছিলেন! অতো বড়ো চাকরি পেয়েও আপনি পনেরো লাখ টাকা চুরি করতে গেলেন কেন?

ইতিমধ্যে একটা গাড়ি কী ভাবে মিছিলের পাশ দিয়ে দুজনের মধ্যে ঢুকে পড়ে লোকটাকে দূরে সরিয়ে দিলে। তারপরে এমন একটা অবস্থা হলো যে ভিড়ের মধ্যে লোকটাকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না। কোথায় যেন সুশীল সরকার মানুষের ভিড়ের মধ্যে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। মিছিলটা তখন হৈ-হৈ করে স্লোগান দিতে দিতে কলকাতা কাঁপিয়ে অনেক দূরে চলে গেছে। কিন্তু সন্দীপ সেখানে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে ভাবতে লাগলো—কেন এমন হলো? সেই সুশীল সরকার যে চাকরি পাওয়ার জন্যে কেবল পার্টি বদলাতো, সে এখন আবার কোন পার্টিতে যোগ দিলে?

এত বছর জেলখানায় কাটিয়ে সন্দীপ ভেবেছিল আগেকার মতো কলকাতায় বোধহয়

আর মিটিং হয় না। মিছিল হয় না। আগেকার মতো পার্টিবাজিও বোধহয় হয় না।

তারপর সন্দীপ আর সেখানে দাঁড়ালো না। জেলখানা থেকে বেরিয়েই সে হাঁটতে আরম্ভ করেছিল নিরুদ্দেশের উদ্দেশ্যে। কোথায় গিয়ে রাত কাটাবে তা তার ঠিক ছিল না। কিন্তু সুশীল সরকারের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতেই সে বুঝতে পারলে যে সন্দীপের জেল-খাটার খবরটা তার জানাশোনা সমস্ত লোকরাই জানতে পেরে গেছে। এখন তার আত্মগোপন করবার আর কোন রাস্তা নেই!

অথচ একটা জায়গায় গিয়ে তো তাকে আশ্রয় নিতে হবে। যে-আশ্রয়টা তার ছিল সেটা তো একটা ভাড়াবাড়ি। সে যখন ভাড়াটে ছিল তখনই সেই বাড়ি ছেড়ে সে জেলে চলে গিয়েছিল। সে-বাড়িটা কি তার এখনও আছে? কতো বছর ভাড়া বাকি থাকার জন্যে বাড়িওয়ালা কি সেটা এখনও খালি ফেলে রেখে দিয়েছে?

সমস্ত কলকাতাটা সন্দীপের চোখে আরো নোংরা হয়েছে বলে মনে হলো। কলকাতা শহরটা বরাবরই নোংরা ছিল। কিন্তু সেটা যেন এখন আগেকার চেয়ে আরো নোংরা হয়েছে বলে মনে হলো। আর শুধু বাইরের চেহারাটাই নোংরা হয়েছে? ভেতরের মানুষগুলোর চেহারা নোংরা হয়নি?

মনে আছে তখন অনেকবার তার বিশাখার কথা মনে পড়তো। কে জানে তার কথা কেন মনে পড়তো! অথচ বিশাখা তো তার জীবন থেকে চিরকালের মতো হারিয়ে গিয়েছিল! জেলখানার চার দেয়ালের মধ্যে বন্দী হয়েও বিশাখার কথা মনে পড়ার মধ্যে কোনও যুক্তি ছিল না।

তখন কি সে জানতো যে বিশাখার সঙ্গে আবার একদিন তার দেখা হবে! বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর থেকেই তো বিশাখার পর হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু তা হলো না।

বিশাখা তখনও তার শ্বশুর-বাড়ির শেকলে আরো জড়িয়ে গিয়েছে। সকাল বেলা থেকেই তার কাজ আরম্ভ হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু ঠাকমা-মণির অসুখে পড়ে যাওয়ার পর থেকে তখন সমস্ত রাত সমস্ত দিনই তার কাজ। ডাক্তারবাবুকে সে অনেক বার জিজ্ঞেস করেছে—আর কতোদিন এ-রকম চলবে ডাক্তারবাবু?

ডাক্তারবাবু আগেও যা বলেছেন তার পরেও তাই-ই বলতেন।

বলতেন—ওঁর তো বয়েস হয়েছে অনেক। তাই যতোদিন এইভাবে চলে ততোদিন চলবে। যদি বেঁচে ওঠেন তাহলে বুঝতে হবে সেটাই ঈশ্বরের অসীম করুণা!

বিশাখা জিজ্ঞেস করতো—আজ কেমন দেখলেন?

ডাক্তারবাবু বলতেন—সেই একই রকম!

প্রতিদিন একই রকম অবস্থা! সেই একই রকম অর্থ-ব্যয়, সেই একই প্রশ্ন আর একই উত্তর। তারপর আসতেন মল্লিক-মশাই। সেই প্রতিদিন হিসেব দেওয়া-নেওয়ার কাজ। আদিকাল থেকেই এ-নিয়ম চলে আসছিল এ-বাড়িতে। সেই যেদিন দেবীপদ মুখার্জি এই কারবার পত্তন করেছিলেন। পাপ-পুণ্যের হিসেব নয়, ধর্ম-অধর্মের হিসেব নয়, ভালো-মন্দের বা খ্যাতি-অখ্যাতির হিসেব নয়, নিতান্তই টাকা লেনদেন আর আয়-ব্যয়ের হিসেব।

—বউদি-মণি!

ওই গলার আওয়াজটা শুনলেই বিশাখা বুঝতো ওই সংসারের আরো অন্যান্য অপরিহার্য কর্মের মতো আর একটা অবশ্যকরণীয় কাজ।

তারপরই শুরু হতো বাজারের হিসেব, চাকর-ঝিদের মাইনের হিসেব, দেনা-পাওনার হিসেব আর মাসকাবারির চাল-ডাল-তেল-নুনের হিসেব। কিন্তু এই সমস্ত হিসেবের মধ্যে হঠাৎ সেদিন আর একটা নতুন আইটেমের হিসেব এসে খাতার পাতায় ঢুকে পড়লো।

—এই আড়াইশো টাকা কীসে খরচ হলো?

মল্লিক-মশাই বললেন—সেই যে বউদি-মণি, সৌম্যপদবাবুর জন্যে আপনি পাঁচশো টাকা দিলেন। সেই টাকা হুইস্কির বোতল আর চিংড়ির কাটলেট আনলুম। আর তার

সঙ্গে চারজন পুলিশ এসেছিল, তাদের জল-খাবার!

—ও—

ব্যাপারটা মনে পড়লো বিশাখার। খরচটা খাতায় উঠলো। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনেও পড়ে গেল ঘটনাটা সে কী বীভৎস দৃশ্য! সমস্ত ঘরময় বমির স্রোত। আর সঙ্গে সঙ্গে তার দুর্গন্ধ! এই-ই কি তার স্বামী? এরই কি স্ত্রী সে?

মল্লিক-মশাইও তো দেখে বিভ্রান্ত! কী যে করবেন তা প্রথমে বুঝতে এক মিনিট সময় লাগলো।

তারপর সুধাকে ডাকলেন। বিন্দুকে ডাকলেন। আরো যে যেখানে ছিল সকলকেই ডাকলেন। সবাই-ই দৃশ্যটা দেখলে। যে-বাড়িতে এর আগে খুন-খারাপি হয়ে গেছে, মাতলামির চূড়ান্ত হয়ে গেছে, সে-বাড়িতেও এ-রকম দৃশ্য কখনও তারা দেখেনি।

অথচ যে-মানুষটা বাড়ির মালিক তার বিরুদ্ধে কিছু মন্তব্য করা অন্যায়। তাদের সব অপরাধের বিরুদ্ধে কোনও কিছু প্রতিবাদ করাও বে-আইনী। কিন্তু একজন শক্ত-সামর্থ্য জোয়ান অচৈতন্য মানুষকে কে ধরে তুলবে? কার গায়ে এত জোর আছে?

মানুষ যখন অজ্ঞান-অচৈতন্য হয়ে যায় তখন বোধহয় তার শরীরের ওজন আরো ভারি হয়ে ওঠে।

মল্লিক-মশাই সুধাকে বললেন—ওরে সুধা, এক বালতি জল নিয়ে আয় তো—

এক বালতি জলে কি অত বড়ো মেঝে আর অত বড়ো শরীরটা ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করা যায়? তাই সবাই মিলে কয়েক বালতি জল নিয়ে এলো। সমস্ত ঘরটার ভেতরে বালতি-বালতি জল ঢালা হতে লাগলো। তাতে সৌম্যপদবাবুর জামা-কাপড়ও জলে ভিজে গেল। দুর্গন্ধ কিছুটা দূর হলো। বিশাখা দূরে দাঁড়িয়ে সব দেখছিল।

তার মনে হলো মানুষটা নিজের অসুস্থ ঠাকমা-মণিকেই দেখতে এসেছিল, আর এসে কিনা নিজেই অসুস্থ হয়ে পড়লো। আর এই লোকটাই কিনা তার স্বামী। তার বিবাহিত স্বামী। একেই সে মন্ত্র পড়ে বিয়ে করেছে, আর এরই হাতের দেওয়া সিঁদুর তার সিঁথিতে এখনও জ্বল-জ্বল করে জ্বলছে!

মল্লিক-মশাই বললেন—ওরে সুধা, আমি এদিকটা ধরছি, তুই ওদিকটা ধর, আর কালি-দাসী, তুমি পাশে পাশে থাকো।

সবাই মিলে সেই অচৈতন্য দেহটাকে ধরতেই সৌম্যপদবাবুর যেন একটু জ্ঞান-ফিরলো। চিৎকার করে বললে—কে? কে তুই?

মাতালের কথায় কে আর জবাব দেবে? কিন্তু তখন সৌম্যপদবাবুর হাত-পা ছোঁড়া শুরু হয়েছে। তার হাত-পা ছোঁড়ার আঘাতে মল্লিক-মশাই হঠাৎ বেসামাল হয়ে পড়ে গেলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে সৌম্যপদবাবুও আবার পড়ে গেলেন জলে-ভেজা মেঝের ওপর। বিশাখাও সেই দৃশ্য দেখে ঘৃণায় আতঙ্কে উদ্বেগে একেবারে পাথর হয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে রইলো।

তপেশ গাঙ্গুলীরা সেই জাতীয় লোক যারা কখনও হতাশ হয় না। কিংবা হতাশ হলেও যারা কখনও ভেঙে পড়ে না।

অফিসের লোকের মুখ থেকে একদিন শুনতে পেলে—আরে তপেশদা, শেষকালে আমাদের আপনি ত্যাগ করলেন? আমাদের একেবারে খবরটাই দিলেন না?

তপেশ গাঙ্গুলী অবাক হয়ে গেল কথাটা শুনে। বললে—কী-রকম?

—আরে আপনার ভাই-ঝি'র বিয়ে হয়ে গেল, আর আপনি কিনা আমাদের একটু

প্রত্যেকের হাতে পান-মশলা দিতে লাগলো গিরিধারী।

তপেশ গাঙ্গুলী অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল। কেন যে পুলিশরা এসেছে, গিরিধারী কেনই বা তাদের অতো খাতির করছে তাও সে কল্পনা করতে পারলে না।

খানিক পরে কে যেন ওপর থেকে ডাকলে—গিরিধারী।

আর ডাক পেয়ে সে সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো—আয়া ম্যানেজারবাবু—বলে সোজা চলে গেল ভেতরে।

আশেপাশে আরো কয়েকজন রাস্তার লোক সেখানে এসে ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল। বাড়ির সামনে পুলিশের ভ্যান দেখে তাদেরও কৌতুহলী দৃষ্টি পড়েছিল পুলিশদের ওপর। হঠাৎ বাড়িটার সামনে অতো পুলিশ কেন?

একজন লোক তপেশ গাঙ্গুলীকে জিজ্ঞেস করলে—এত পুলিশ কেন মশাই এখানে? কী হয়েছে?

প্রত্যেকেই প্রত্যেককে প্রশ্নটা করে। কিন্তু কেউ আসল ঘটনাটা জানলে তবে তো তার উত্তর দেবে। অথচ যারা আসল ঘটনাটা জানে সেই পুলিশদের জিজ্ঞেস করতে কারো সাহস হয় না। তারা তখন খাওয়া-দাওয়া সেরে মুখে পান চিবোচ্ছে।

হঠাৎ একটা কাণ্ড ঘটলো। ভেতর থেকে একদিকে ম্যানেজারবাবু আর একদিকে গিরিধারী একজন মানুষকে পাঁজা-কোলে করে বাইরে নিয়ে এসে ধরাধরি করে পুলিশের ভ্যানের মধ্যে পুরে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে চারজন পুলিশও তৈরি হয়ে নিলে। তারাও ভ্যানের মধ্যে গিয়ে ঢুকলো। তপেশ গাঙ্গুলীও অবাক হয়ে সেই দিকে চেয়ে রইলো। লোকটা কে? কাকে এমন করে ধরে গাড়ির ভেতরে তুলে দিলে? কেউ মারা গেল নাকি? যদি মারা গিয়ে থাকে তো কেন মারা গেল? কী হয়েছিল লোকটার?

যারা সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল তাদের সকলের মনেই এই একই প্রশ্ন। এই একই কৌতূহল! কিন্তু কে তাদের এই প্রশ্নের উত্তর দেবে? কে মেটাবে তাদের এই কৌতূহল?

ততক্ষণে আরো অনেক লোকের ভিড় জমেছে সেই বাড়িটার সামনে। আরো অনেক লোকের জটলা। তারা সকলেই জানতে চায় সেখানে মানুষের ভিড় কেন?

মানুষটাকে গাড়িতে তোলার পর ম্যানেজারবাবু আর গিরিধারী একটু সরে এসে দূরে দাঁড়ালো। তপেশ গাঙ্গুলী তখন ম্যানেজারবাবুকে একলা পেয়ে জিজ্ঞেস করলে—কী হয়েছে ম্যানেজারবাবু? ব্যাপারটা কী? কাকে তুলে দিলেন গাড়িতে?

ম্যানেজারবাবু অন্যমনস্ক ছিলেন। তপেশ গাঙ্গুলীকে দেখে চিনতে পেরে বলে উঠলেন—আপনি?

—হ্যাঁ, আপনি খুব ব্যস্ত আছেন বুঝতে পারছি—

—হ্যাঁ, আমি খুব ব্যস্ত আছি! আপনি এখন এলেন কেন?

—তাহলে আপনিই বলুন কখন আসবো?

মল্লিক-মশাই বললেন—কী দরকার আপনার, আগে তাই বলুন?

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—আমি আগে তো এসেছিলুম একদিন। আপনি তো সবই জানেন!

মল্লিক-মশাই বললেন—আপনি আগে এসেছিলেন?

—হ্যাঁ, আমি বউ-মেয়ে নিয়ে এখানেই এসেছিলুম মাস খানেক আগে।

মল্লিক-মশাই বললেন—হ্যাঁ, তা হবে! কী জন্যে এসেছিলেন?

—বিশাখার সঙ্গে একবার দেখা করতে এসেছিলুম। কিন্তু সেদিন আপনি ঢুকতে দেননি। ঠিক সেই সময়েই বিশাখার শ্বশুরমশাই এসে পড়েছিলেন...

কথাটা মনে পড়লো মল্লিক-মশাই-এর।

বললেন—তা আপনি বেছে বেছে অমন সময়েই বা এসেছিলেন কেন?

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—আমি কী করে জানবো ঠিক সেই সময়েই হঠাৎ আপনাদের

মেজকর্তা এসে পড়বেন? তা আজকে দেখা হবে বিশাখার সঙ্গে—

মল্লিক-মশাই বললেন—আজও দেখা হবে না—

—দেখা হবে না?

—কী করে দেখা হবে বলুন? আজকে বাড়িতে ভীষণ কাণ্ড হয়েছে। আজকেও দেখা হবে না। বউদি-মণি খুব ব্যস্ত আছেন।

বলে ভেতরের দিকে চলে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তপেশ গাঙ্গুলী আবার পিছন থেকে ডাকলে—ও ম্যানেজারবাবু, ও ম্যানেজারবাবু—

কিন্তু ম্যানেজারবাবু তপেশ গাঙ্গুলীদের মতো যার-তার কথায় কান দেওয়ার মতো মানুষ নন। তিনি সদর গেট বন্ধ করে দিয়ে আবার ভেতরে চলে গেলেন। আস্তে আস্তে বাড়ির সামনের রাস্তা থেকে মানুষের ভিড়ও এক নিমেষে মিলিয়ে গেল।

মল্লিক-মশাই-এর দৈনন্দিন কাজ সারতে সেদিন দেরি হয়ে গেল। সকালের দিকেই তাঁর কাজ বেশি থাকে। সংসারের এতগুলো লোক খাবে। কে কী খাবে তার হিসেব রাখতে হয় মল্লিক-মশাইকে। তার পরে আছে মাসকাবারি বাজার। সেটার হিসেব আগে। ঠাকমা-মণির অসুখের আগে থেকেই সে-কাজটা মল্লিক-মশাই-এর ঘাড়ে এসে পড়েছিল। বলতে গেলে ঠাকমা-মণির অসুখের আগে থেকেই মল্লিক-মশাই-এর কাজ বেড়ে গিয়েছিল। সেটা ঠিক যেদিন বাড়ির মেম-সাহেব বউ খুন হয়েছিল সেই দিন থেকেই বেড়েছিল। তখন ঠাকমা-মণির কোনও কাজ করবার মতো মানসিক অবস্থা ছিল না। কোথায় উকিল ব্যারিস্টার, কোথায় নাতি! তাঁর কি তখন মাথা ঠিক রাখবার মতো অবস্থা ছিল!

সেদিনও তাই মল্লিক-মশাই ওপরে গেলেন খরচ-পত্রের হিসেব দেওয়ার জন্যে।

বাইরে থেকে ডাকলেন—বউদি-মণি।

ঠাকমা-মণির ঘর থেকে বিন্দু বেরিয়ে এলো। বললে—বউদি-মণি তো এ-ঘরে নেই!

—নেই?

বিন্দু বললে—কাল থেকেই বউদি-মণি আর এ-ঘরে আসছেন না।

—কেন? এ-রকম তো হয় না। তিনি তো রোজ রাত্তিরে এই ঘরেই কাটাতেন।

বিন্দু বললে—সেদিন ছোট দাদাবাবু চলে যাওয়ার পর থেকেই আর এ-ঘরে আসছেন না।

—কেন? অসুখ-বিসুখ কিছু হলো নাকি?

বিন্দু বললে—তা বলতে পারবো না।

মল্লিক-মশাই আবার জিজ্ঞেস করলেন—রাত্তিরে কী খেয়েছেন?

বিন্দু বললে—খাবার নিয়ে রাত্তিরে সুধা ডেকেছিল, কিন্তু বউদি-মণি কিছু খানওনি, উত্তরও দেননি। সেই থেকে উনি খানওনি, আর দরজাও খোলেননি।

চিন্তায় পড়লেন মল্লিক-মশাই! কী করবেন তা ঠিক বুঝতে পারলেন না। তারপর বউদি-মণির ঝি সুধার খোঁজ করলেন। বললেন—সুধা কোথায়? তাকে তো দেখছি না!

বিন্দু বললেন—সুধা তো এখুনি এখানেই ছিল। দেখি কোথায় গেল সে। বলে একবার নিচেয় দোতলায় গেল! সেখান থেকে একেবারে একতলায়। একেবারে এক তলায় চাকর-ঠাকুর-ঝি'দের কল-ঘর।

সুধা, সুধা আছিস?

সুধা কল-ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

—কী রে, তোকে যে মল্লিক-মশাই ডাকছেন

সুধা বললে—চলো, আমি যাচ্ছি!

বলে শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখ দু'টো মুছে নিয়ে আবার বললে—দিন, আপনার হিসেবটা দিন—

তারপর পাশের টেবিল থেকে তার হিসেবের খাতাটা নিয়ে হিসেব লিখতে লাগলো। হিসেব মানেই সেই গতানুগতিক দৈনন্দিন জমা-খরচের লম্বা তালিকা। কোথা থেকে টাকা আসছে আর কে সে-টাকা ভোগ করছে, তার কোনও হিসেব নেই। শুধু আছে রোজকার জীবনধারণের উপকরণের আয়-ব্যয়ের উল্লেখ। ঠাকমা-মণি শুরু থেকে এই অভ্যেস করে এসেছিলেন আদিকাল থেকে, এখন তারই জের চলেছে বিশাখার ওপর দিয়ে। এক সময়ে হিসেবের পালা শেষ হলো। মল্লিক-মশাই বললেন—শরীরটার দিকে একটু নজর রাখবেন বউদি-মণি—

বিশাখা বললে—এ-শরীর কার জন্যে রাখতে যাবো বলুন তো ম্যানেজারবাবু?

মল্লিক-মশাই বললেন—ও-কথা বলবেন না বউদি-মণি। ঠাকমা-মণি নেই, এখন তো আপনিই এ-সংসার চালাচ্ছেন। আপনি না থাকলে এ-সংসার কী করে চলবে বলুন তো?

বিশাখা বললে—কিন্তু এই-ই কি সংসার? একেই কি সংসার বলে? আপনিই বলুন? এর নামই কি সংসার?

মল্লিক-মশাই সান্ত্বনা দিলেন। বললেন—কী করবেন বলুন? এমনি করেই তো আদি-কাল থেকে মানুষের সংসার চলে আসছে।

—কী বললেন আপনি? এমনি করেই মানুষের সংসার চলে আসছে? পৃথিবীতে এমন একটা সংসার দেখান তো যেখানে বাড়ির কর্তা জেলখানার কয়েদী, বাড়ির গিন্নী অসুখে অজ্ঞান-অচৈতন্য, আর সেখানে বাড়ির বউ দিন-রাত জেগে দিদি-শাশুড়ীর সেবা করছে? দেখান এমন একটা সংসার।

মল্লিক-মশাই এর জবাবে আর কী বলবেন!

তবু বললেন—তা বলে কাল রাত্তিরে খেলেন না কেন? কেন না খেয়ে দরজায় খিল দিয়ে শুয়ে রইলেন? এতে তো আপনার নিজেরই খারাপ হবে! আপনার শরীর খারাপ হলে কে তখন আপনাকে দেখবে বলুন তো?

বিশাখা বললে—মরে গেলে তো বেঁচে যাই ম্যানেজারবাবু—

—ও-কথা বলবেন না বউদি-মণি! ও-কথা বলবেন না।

বিশাখা বললে—কাল বিকেলবেলা এই ঘরে যে-কাণ্ড হয়ে গেল তার পরেও আপনি এ-কথা বলতে পারছেন? জেল থেকে ছুটি নিয়ে বেরিয়ে এসে নিজের বউ-এর সামনে বসে অমন করে কেউ মদ খায়? অমন করে কেউ বমি করে ঘর ভাসায়?

মল্লিক-মশাই-এর মুখ দিয়ে কোনও কথা বেরোল না।

বিশাখা বললে—আপনি কী ভাবছেন জানি না। কিন্তু ওই ঘটনা দেখার পর আমার মনে হলো এর পর আর আমার বেঁচে থেকে কোনও লাভ নেই। সঙ্গে সঙ্গে আমার সন্দীপের কথা মনে পড়লো, আমার মা'র কথা মনে পড়লো...

মল্লিক-মশাই বউদি-মণির দিকে চেয়ে দেখছিলেন। তাঁর মনে হলো কথাগুলো বলতে বউদি-মণির মুখের চেহারাটা যেন বদলে যেতে লাগলো। তারপর কথা বলতে গিয়ে যেন কথাগুলো মুখেই আটকে গেল।

বিশাখা বললে—তারপর ভাবলাম এ আমি কার সংসার করছি, কীসের সংসার করছি! আমার স্বামীর সংসার কি এটা? না, আমার ঠাকমা-মণির সংসার, নাকি আমার নিজের সংসার? তারপর হঠাৎ মনে হলো এরপর আর আমার বেঁচে থাকার কোনও দরকার নেই। তখন আপনার ওপরেই আমার রাগ হলো। আপনিই তো সেদিন সন্দীপকে বিয়ের পিঁড়ি থেকে উঠিয়ে আমাকে এই মাতালটার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন—

কথাগুলো শুনে মল্লিক-মশাই বললেন—আমার ঘাট হয়েছে বউদি-মণি, সত্যিই আমার ঘাট হয়েছে! আমায় ক্ষমা করুন আপনি...আমি এ-বাড়ির চাকর, এ-বাড়ির চাকর ছাড়া তো আমি আর কিছু নই!...

বিশাখা তখনও বলে যেতে লাগলেন—তারপর, কথাটা মনে পড়তেই আমি আমার দিদি-শাশুড়ীর ঘরে চলে গেলুম। আমি জানতুম সেখানে ঠাকমা-মণির ঘরের টেবিলে ঘুমের ওষুধ আছে। সেই ওষুধটার দু তিনটে বড়ি মুখে পুরে দিলুম। ভাবলুম এর পরে আর আমার বেঁচে থেকে কোনও লাভ নেই—আমি মরলে কোনও ক্ষতি নেই—

মল্লিক-মশাই সব শুনছিলেন। বউদি-মণি আবার বলতে লাগলেন—তারপর এই ঘরে এসে দরজায় খিল দিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লুম। তারপর আর কিছু জানি না—

বউদি-মণি একটু থেমে আবার বললেন—তারপর আজ সকালে আপনি দরজায় ধাক্কা দিতেই আমার ঘুমের ঘোর কেটে গেল। আমি বুঝতে পারলুম আমি মরিনি, বুঝতে পারলুম আমি এখনও বেঁচে আছি—

বলে বিশাখা আবার শাড়ির আঁচল দিয়ে নিজের চোখ দুটো মুছে নিলে। সব শুনে মল্লিক-মশাই-এর তখন যেন বাক-রোধ হয়ে গিয়েছে। বললেন—আমি আর আপনাকে বিরক্ত করবো না, আপনি বিশ্রাম নিন, আপনি শুয়ে পড়ুন। আমি আসি। আর সুধাকে বলে যাচ্ছি, সে যেন আপনাকে অকারণে কোনও রকম বিরক্ত না করে। আপনি শুয়ে পড়ুন, আমি চলি—

—না, একটু দাঁড়ান—

মল্লিক-মশাই যেতে গিয়েও একটু দাঁড়ালেন। বিশাখা বললে—কালকে হঠাৎ রাত্তিরে মা'কে স্বপ্নে দেখলুম। সঙ্গে সঙ্গে এতদিন পরে বেড়াপোতার কথা মনে পড়ে গেল। আপনি বলেছিলেন সন্দীপের নাকি অসুখ। সেদিন তো যেতে যেতেও বাধা পড়লো।

মল্লিক-মশাই জিজ্ঞেস করলেন—আর একদিন যাবেন আপনি?

—হ্যাঁ, যেতে পারি।

—তাহলে আপনার শরীরটা একটু সারুক! নাকি কালই যাবেন?

বিশাখা বললে—যতো তাড়াতাড়ি যেতে পারি ততোই ভালো। আমার মা'কে দেখতে বড়ো ইচ্ছে করছে—

—তাহলে কালই চলুন। আমি নিতাইকে বলে রাখবো—অনেক দূর যেতে হবে তো।

বলে মল্লিক-মশাই হিসেবের খাতা-পত্র নিয়ে নিচেয় চলে গেলেন।

কলকাতার কোন রাস্তা কখনও ফাঁকা থাকবে, কোন রাস্তা কখন ভিড়ে জম-জমাট হয়ে যাবে, তা মানুষ তো দূরের কথা, আগে থেকে দেবতারাও জানতে পারেন না।

আর তা ছাড়া কোন মিছিলটা কোন পার্টির তাও মিছিলের মানুষদের মুখ দেখে বোঝা যাবে না। কোনও মিছিলের মানুষের পোশাক ভদ্রলোকদের মতো, আবার কোনও মিছিলের মানুষরা গ্রামের গরীব মানুষ দিয়ে ভরা। তারা যে গরীব তা তাদের পোশাক দেখেই বোঝা যায়। বোঝা যায় তারা ক্ষেত-খামারের কাজ শেষ করে শহর ঘুরতে এসেছে।

'ডি-এ-পি' নতুন পার্টি হলেও এই শহরের বস্তির মানুষের ওপরেই তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি বেশি। এ-পার্টি গোপাল হাজরা, বরদা ঘোষাল আর শ্রীপতি মিশ্র—এই তিনজনের হাতে গড়া দল। তাদের হাতেই এ-পার্টির মানুষরা আত্মসমর্পণ করে কৃতার্থ হয়েছে। তারা জেনে গেছে যে এই লীডারদের কৃপাকণার ওপরেই তাদের জীবনের ভূত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ সব কিছু নির্ভর করছে। তাদের মজুরি বাড়াতে গেলে তাদের নেতাদের কথাতেই উঠতে-বসতে হবে। তাদের ইচ্ছে অনুযায়ী চলতে-ফিরতে হবে। তাদের কথাতেই কখনও বলতে হবে 'বন্দে মাতরম', কখনও বলতে হবে 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ'। তাদের নির্দেশ মতোই কখনও চেঁচাতে হবে 'স্যাক্‌রা-মজুর্জি কর্মী সংঘ জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ'।

এই রকম স্লোগান দিতে দিতে কতো ফ্যাক্টরি কতো জুটমিল, কতো কাগজের কল বন্ধ হলো, কতো মানুষ বেকার হলো তার হিসেব কেউ রাখেনি, তার হিসেব কেউ রেখো না। আমরা যা বলি তা-ই করো। আমরা যা আদেশ দিই তাই শোন, তাহলে তোমরা বাঁচবে, তাহলেই তোমাদের অধঃস্তন চতুর্দশ পুরুষ উদ্ধার পেয়ে যাবে। কে জানতো

বলে তর-তর করে আবার সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগলো। বিন্দু পেছন-পেছন উঠছিল। জিজ্ঞেস করলে—বউদি-মণি এখনও ঘরের দরজা খোলেনি কেন রে?

সুধা বললে—আমি তো বউদি-মণির দরজা ঠেলেছিলুম। দরজা না-খুললে আমি কী করবো?

বলতে বলতে দুজনেই ওপরে উঠে এলো। তখনও মল্লিক-মশাই তেতলায় হাতে হিসেবের খাতা-পত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সুধা তাঁকে দেখেই বললে—বউদি-মণি এখনও দরজা খোলেননি। ভেতর থেকে দরজায় খিল বন্ধ রয়েছে—

মল্লিক-মশাই জিজ্ঞেস করলেন—আর কাল রাত্তিরে?

সুধা বললে—কাল যখন আপনি ছোট দাদাবাবুকে নিয়ে পুলিশের গাড়িতে তুলে দিতে গেলেন, তারপর বউদি-মণি সেই যে ঘরের ভেতরে ঢুকে খিল বন্ধ করে দিলেন, আর দরজা খোলেননি তারপর থেকে—

—রাত্তিরে খাওয়ার সময় বেরোননি?

—না, আমি খাবার জন্যে দরজা ঠেলেছিলুম, কিন্তু কোনও সাড়া পাইনি।

মল্লিক-মশাই বুঝতে পারলেন না তিনি কী করবেন! তাঁর মনে পড়লো কী রকম অবস্থার মধ্যে কাল সৌম্যপদবাবুকে বমির মধ্যে পড়ে থাকতে দেখেছিলেন। শুধু তো বমি নয়, তার সঙ্গে চিংড়ি মাছ আর মদের দুর্গন্ধ। বালতি-বালতি জল ঢেলে ঘরের মেঝে পরিষ্কার করা হয়েছিল। তারপর গিরিধারী আর তিনি দুজনে মিলে পাঁজাকোলা করে সেই তেতলা থেকে একতলায় নামিয়েছিলেন।

মল্লিক-মশাই ভাবলেন এখন কী করা কর্তব্য! কিন্তু কিছু ভেবে উঠতে না পেরে আবার একতলায় নিজের সেরেস্তায় চলে গিয়েছিলেন। সকাল বেলার হিসেবটা না দিলে তাঁর কোনও কাজ সম্পূর্ণ হয় না। কতো বছর ধরে তিনি সেই কাজ করে আসছেন। কতো রকম বিপদ-আপদের ঝক্কি গিয়েছে তাঁর ওপর দিয়ে। তবু তা বন্ধ থাকেনি, কখনও। আজ প্রথম তাতে বাধা পড়লো। তারপর আরো-অনেক বেলা হলো। আরো অনেক কাজ শেষ করলে তিনি। কিন্তু হিসেবটাই তো সবচেয়ে জরুরী।

বউদি-মণির ঘরের সামনে গিয়ে সুধা ডাকতে লাগলো—বউদি-মণি, বউদি-মণি—

ভেতর থেকে কোনও সাড়া-শব্দ নেই। সুধা আবার ডাকতে লাগলো—বউদি-মণি, বউদি-মণি—ও বউদি-মণি, আমি সুধা বলছি, দরজা খুলুন। ও বউদি-মণি—

মল্লিক-মশাই বললেন—দরজার কড়া নাড়ো সুধা! বউদি-মণি বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছেন—

এবার সুধা দরজার কড়া নাড়তে লাগলো। কড়া নেড়ে ডাকতে লাগলো—বউদি-মণি, আমি সুধা বলছি, ও বউদি-মণি—

তবু কোনও সাড়া-শব্দ নেই ভেতর থেকে। মল্লিক-মশাই বিপদে পড়লেন। কোনও দুর্ঘটনা ঘটলো নাকি? এমন তো হয় না বউদি-মণির। এত দিন বউদি-মণি এ-বাড়িতে এসেছেন, কিন্তু এমন করে তো দরজা বন্ধ করে ঘরে থাকেননি। কী হলো?

শেষকালে কী মনে হলো, সুধাকে বললেন—সুধা, তুমি সরে যাও। আমি দেখছি—

বলে কড়া নেড়ে দরজায় ধাক্কা দিতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে ডাকতে লাগলেন—বউদি-মণি, ও বউদি-মণি—বউদি-মণি—

তবু প্রথম বারে কোনও সাড়া পাওয়া গেল না। দ্বিতীয় বারে দরজায় ধাক্কা দেওয়াতে দরজাটা খুললো। এতক্ষণে মল্লিক-মশাই-এর ধড়ে প্রাণ এলো। বউদি-মণির চোখে-মুখে তখন ক্লান্তির ছাপ। দেখে বোঝা গেল তিনি তখনও পর্যন্ত ঘুমোচ্ছিলেন।

সুধা বললে—এতক্ষণ ঘুমোচ্ছিলেন বউদি-মণি? আমরা কতোক্ষণ ধরে ডাকছি—

মল্লিক-মশাই জিজ্ঞেস করলেন—শরীর ভালো আছে তো আপনার? আমি তো ভয়ে ভাবনায় অস্থির হয়ে পড়েছিলাম—

তারপর একটু থেমে আবার বললেন—আমি হিসেবের খাতা-পত্র নিয়ে এসেছিলুম।...

তাহলে হিসেবের ব্যাপারটা আজ থাক, কালই হবে!

—না না, আমি এখুনি তৈরি হয়ে নিচ্ছি—আপনি একটু পরে আবার কষ্ট করে আসুন!

—না, আর কষ্ট কী? আপনি ততোক্ষণে তৈরি হয়ে নিন আবার আসবো'খন—

বলে আবার একতলায় নিজের সেরেস্তায় চলে এলেন। কতোকাল হলো তিনি এ-বাড়িতে রয়েছেন। কতো আপদ-বিপদ তাঁর চোখের ওপর দিয়ে ঘটে গেল। জীবন দেখলেন, মৃত্যুও দেখলেন। মিলন দেখলেন, বিচ্ছেদও দেখলেন। জীবন-মৃত্যু-মিলন-বিচ্ছেদের সমন্বয়ে যে মহাজীবন, তাও তিনি দেখলেন। বেশিদিন বেঁচে থাকার তো এই-ই সৌভাগ্য বা এই-ই দুর্ভাগ্য। যার শুধু দেখা যায় তার শেষটাও দেখতে পাওয়া যায়। হয়তো এরই নাম দর্শন! তিনি সেই ছোটবেলায় এখানে এই বাড়িতে না এলে তো এই মহাজীবন দর্শন করতে পারতেন না। তাঁর নিজের সংসার বলতে কিছু নেই। কিন্তু নিজের সংসার থাকলে কি আর এই বাড়িটাতে এসে যা দর্শন করলেন তা তিনি দেখতে পেতেন?

ঘণ্টা খানেকও কাটেনি, তার মধ্যেই আবার তিনতলা থেকে তাঁর ডাক এলো!

খাতা-পত্র নিয়ে আবার তিনি বউদি-মণির ঘরে গেলেন। বউদি-মণি তারই মধ্যে তৈরি হয়ে নিয়েছেন। তাঁকে দেখে বউদি-মণি বললেন—আজকে আপনাকে অনেক কষ্ট দিলুম ম্যানেজারবাবু—

মল্লিক-মশাই বললেন—না, কষ্ট আর কী? আপনারই বরং কষ্ট হলো। একদিন হিসেব-পত্র না নিলে কী আর এমন ক্ষতি! আমি তো রোজই হিসেব রাখি।

বউদি-মণি বললেন—না, কিন্তু এটা তো আমারই কাজ! আমাকেই তো এ-কাজের ভার দিয়েছেন ঠাকমা-মণি।

—তা মানুষের শরীর কি সব ঠিক থাকে? আপনি ঠাকমা-মণির যা সেবা করছেন, নিজের সন্তানরাও তা করতে পারবে না। আমি তো নিজের চোখে সবই দেখছি!

বিশাখা বললে—কী করবো বলুন? যে মানুষটা ছোটবেলা থেকে আমাকে পছন্দ করে রেখেছিলেন আমাকে এ-বাড়ির বউ করবেন বলে, যাঁর দয়ায়, যাঁর টাকায় আমি এতদিন বেঁচে আছি, লেখা-পড়া শিখেছি, মানুষ হয়েছি, তাঁর অসুখের সময়ে যদি আমি সেবা না করি তো তাহলে যে আমি মহাপাতকী হবো ম্যানেজারবাবু—

মল্লিক-মশাই বললেন—আপনি যা করছেন তা তো আমরা নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছি বউদি-মণি!

বিশাখা বললে—আমার আর কতটুকু ক্ষমতা ম্যানেজারবাবু—

—আপনার অনেক ক্ষমতা! কিন্তু নিজের শরীরটার দিকেও একটু দেখবেন আপনি, এইটুকুই শুধু আমি বলতে চাই!

বিশাখা বললে—কিন্তু আর যে পারছি না আমি!

মল্লিক-মশাই বললেন—যেটুকু পারছেন তা-ই বা ক'জন পারে!

বিশাখা বললে—এর পরেও কি আরো পারতে বলেন? কাল তো নিজের চোখেই দেখলেন আপনি এই ঘরে হঠাৎ কী কাণ্ডটা ঘটে গেল!

মল্লিক-মশাই বললেন—মাথার ওপরে যিনি আছেন তাঁর ওপরে নির্ভর করা ছাড়া আর আমাদের কী উপায় আছে বউদি-মণি!

—কিন্তু আমি যে আর সহ্য করতে পারছি না।

মল্লিক-মশাই বললেন—যে-টুকু সহ্য করতে পেরেছেন আপনি, অন্য কেউ হলে তাও পারতো না—

বিশাখা বললে—কিন্তু কালকে ওই ঘটনার পর একেবারে অসহ্য হয়ে উঠেছিল। আপনি না থাকলে আমি যে কী করতুম তা বলতে পারছি না। আমার সব সময়ে মনে হচ্ছিল এ আমি কোন বাড়িতে এসেছি, এ কার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে!

শেষ ট্রেনে আসবে!

কমলার মা'কে দিয়েই হয়তো মাসিমা বাজারের দোকান থেকে মিষ্টি কিনে আনাবে। বলবে—এইটুকু খেয়ে নাও মা। গরীবের বাড়িতে এলে, আমি আর কী করে তোমার মতো বড়োলোকের বউকে খাতির করবো! খাও, খেয়ে নাও—

—মল্লিক-মশাই, আপনি কোত্থেকে?

হঠাৎ যেন ধ্যান ভেঙে গেল বিশাখার। চেয়ে দেখলে বেড়াপোতার রেল-লাইনের লেভেল-ক্রসিং-এর কাছে এসে গেছে তারা।

—বিনোদ, কেমন আছো তোমরা?

বিনোদ কাকার মিষ্টির দোকানের সামনে দিয়ে গাড়িটা যাচ্ছিল।

বিনোদ কাকা বললে—ভালো। আপনি এখানে কোথায় এসেছেন?

মল্লিক-মশাই বললেন—এসেছি সন্দীপকে দেখতে। শুনেছি তার নাকি খুব অসুখ।

বিনোদ কাকা বললে—সন্দীপ তো বাড়িতে নেই। সে তো এখন শ্মশানে!

—শ্মশানে! শ্মশানে কী করতে?

—আপনি জানেন না কিছু?

মল্লিক-মশাই আরো অবাক হয়ে গেলেন। বললেন—না তো! কিছু জানি নে তো!

বিনোদ বললে—বাড়িতে তার মাসিমা ছিল না একজন জানেন তো?

মল্লিক-মশাই বললেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাঁর কী হয়েছিল?

বিনোদ বললে—তাঁর ক্যানসার হয়েছিল। সেই তার মাসিমা এতদিন পরে মারা গেছেন। তাঁকে নিয়েই সন্দীপ শ্মশানে গিয়েছে।
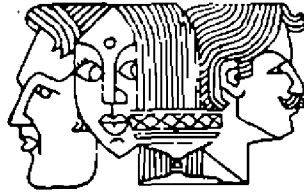
নদী যখন আপন মনে এগিয়ে চলে তখন সে কেবল পেতে পেতে যায়। পেতে পেতেই সে আনন্দে মুখরিত হয়ে ওঠে। দু'কূলের নতুন নতুন ক্ষেত্রকে পেয়ে সে পুলকিত হয়ে ওঠে বলেই সে কল্‌-কল্‌ শব্দ করে নিজের আনন্দ প্রকাশ করে থাকে।

যখন এমনি করে যেতে যেতে সে সমুদ্রকে পেয়ে যায় তখন সে নতুন কিছু পায় না, পায় পুরনোকে। পায় পুরনো সমুদ্রকে। পুরনো চিরকালের সমুদ্রকে পেলেই সে দিতে শুরু করে। তখন তার আর নেওয়ার পালা নয়, দেওয়ার পালা। এই নিজেকে দিয়ে দেওয়ার নামই সম্পূর্ণ হওয়া।

সন্দীপেরও তাই হয়েছিল। প্রথম যখন সে বিডন স্ট্রীটের মুখুজ্জে বাড়িতে এসেছিল তখন তার নেওয়ার পালা। নদীর মতো নতুন-নতুন ক্ষেত্রকে সে তখন দেখছে। মনসা-তলা লেনের বাড়ির সেও এক দৃশ্য। সেও তার একরকম নেওয়া। মনসাতলা লেন থেকে নিতে নিতে তার থলি ভর্তি হয়ে গিয়েছিল। অভাব মানুষকে যে কতো নীচ করে তোলে তারই নমুনা দেখে তারও নেওয়ার ইচ্ছে বেড়ে গিয়েছিল।

কিন্তু যেতে যেতে যখন বিডন স্ট্রীটের ক্ষেত্র এসে গেল তখন দেখলে সেও এক নতুন ক্ষেত্র। সেখানে যতো সচ্ছলতা ততো অশান্তি। সেখানে যতো পুণ্য ততো পাপ, সেখানে যতো শৃঙ্খলা ততো বিশৃঙ্খলা। সেখানে মনসাতলা লেনের বাড়ির মতো অর্থের অসচ্ছলতা নেই বটে, কিন্তু অর্থের প্রাচুর্যে অস্বাভাবিক অনর্থের সৃষ্টি জমা হয়েছে।

তারপর আরো নতুন ক্ষেত্র দেখতে পেলে সে। দেখলে গোপাল হাজরাকে। দেখলে ডি. এ. পি. পার্টির মিছিলের উচ্ছৃঙ্খলতা। মানুষকে শান্তি দেবার নাম করে কেমন করে

অশান্তির রাজত্ব কায়েম করতে হয় তারই মহড়া চলছে সেখানে। আর চলছে চকোলেটের নাম করে হেরোইন-গাঁজার লাগাতার ব্যবসা। যাতে কোটি-কোটি টাকার লেন-দেন চলছে।

কলকাতায় থাকার অভিজ্ঞতায় সন্দীপ বুঝে নিয়েছিল যে আর যা-ই হোক কলকাতা হচ্ছে নেওয়ার শহর। দু'চোখ খুলে দু'হাত পেতে কেবল নাও আর নাও। কেবল নিয়ে যাও। নেওয়ার মধ্যেই পরমার্থ লুকিয়ে আছে। কলকাতায় যে শুধু নিতে পারবে সে-ই জিতবে। ঠিক নদীর মতো।

কিন্তু ঠিক সেই নদী যখন সমুদ্রে মিশবে তখনই তার সম্পূর্ণকে পাওয়া হয়ে যাবে। তখন তার নেওয়ার পালা ফুরিয়ে গেছে, তখন কেবল দেওয়া। তখনই তার আসক্তি থেকে মুক্তি। তখন তার প্রেম শুরু হবে। তখনই সে শেষের বদলে সম্পূর্ণ হবে।

সন্দীপের জীবনে যে-টুকু অসম্পূর্ণতা ছিল, মাসিমার মৃত্যুতে সেটুকুও আর রইল না। সে সম্পূর্ণ হয়ে গেল। সন্দীপের চোখে তখন কোনও ব্যথা নেই, কোনও বিচ্ছেদ নেই, কোনও অশ্রুপাত নেই।

ঘটনাটা দেখে যারা উপস্থিত ছিল তারা সবাই আশ্চর্য হয়ে গেল। যে-মানুষটা এত-দিন ধরে অমানুষিক সেবা করলো, অশেষ অর্থ খরচ করলো, দিন-রাত যার দুশ্চিন্তায় কাটলো, তার যেন কোনও ভাবান্তরই নেই।

এক সময়ে চিতা নিভে এলো, সন্দীপ নদী থেকে মাটির কলসী করে জল এনে চিতা নিভিয়ে দিতে লাগলো। সঙ্গে চ্যাটার্জিবাবু ছিলেন। বৃদ্ধ হয়েছেন। তবু সন্দীপের বিপদের দিনে বাড়িতে একলা বসে থাকতে পারেননি। অথর্ব শরীর নিয়েও এসেছিলেন সন্দীপের শেষকৃত্যে সাহায্য করতে। শেষকৃত্যটুকু তখনও করা বাকি ছিল। মৃতার নাভি-কুণ্ডটি নিয়ে মাটি দিয়ে ঢেকে নদীর জলে ফেলে দিতে হয়। সেটা নদীতে যথারীতি ফেলে দিতে গিয়ে সোজাসুজি চ্যাটার্জিবাবুর সঙ্গে দেখা। সেই কাশীনাথ চ্যাটার্জি।

—আপনি? আপনি এখনও আছেন? রাত দুটো বাজে যে!

চ্যাটার্জিবাবু অত্যন্ত বৃদ্ধ হয়েছেন তখন। বললেন—তোমাদের বিপদের দিনে থাকবো না তো কখন থাকবো?

—না না, আপনি এখন বাড়ি যান। সব কাজ তো আমার শেষ হয়ে গিয়েছে! আপনি বাড়ি যান, নইলে শরীর খারাপ হবে আপনার—

চ্যাটার্জিবাবু বললেন—তুমি যা করলে বাবা, এ দেখেও আনন্দ। নিজের পেটের ছেলেও কারো এমন করে না—

তারপর বললেন—কলকাতায় খবর দিয়েছ?

সন্দীপ বললে—বিশাখার কথা বলছেন তো? সে এখন বড়লোক হয়ে গেছে খুব। চার-পাঁচ লাখ টাকা বছরে আয়...তাকে খবর দিয়ে কী হবে—

বলতে-না-বলতে হঠাৎ সেই রাত দুটোর সময় মনে হলো শ্মশানের এক প্রান্তে যেন কাদের একটা গাড়ি এসে দাঁড়ালো। আর দাঁড়াতেই এক মহিলা এসে নামলো। আর তার সঙ্গে একজন বৃদ্ধ লোক। প্রথমে অন্ধকারে ভালো স্পষ্ট দেখা গেল না। শেষে চেনা গেল। মল্লিক-মশাই আর বিশাখা। বিশাখা কান্নায় তখন ভেঙে পড়েছে। সন্দীপ নিজের হাত দিয়ে তাকে ধরে না ফেললে হয়তো মাটিতে পড়ে যেত। সন্দীপ সান্ত্বনা দিয়ে বললে—কেঁদো না—

বিশাখা কাঁদতে কাঁদতে সন্দীপের বুকে মুখ গুঁজে বললে—তুমি কাউকে একটা খবর পর্যন্ত দিতে পারলে না সন্দীপ—

সন্দীপ বললে—আমি তো জানি তুমি সুখে আছো, তাই বিরক্ত করিনি তোমাকে—

ফোঁস করে উঠলো বিশাখা—আমি সুখে আছি?

বললে—তুমি সব জেনেও এ-কথা বলতে পারলে? জানো আমার দিদি-শাশুড়ীর মরো মরো অসুখ।

যে ঠিক এই দিনে এই সময়েই এই মিছিল বেরোবে। আর রাস্তায় মিছিল বেরোন মানেই কলকাতা অচল হয়ে যাওয়া। কিছুক্ষণের জন্যে মানুষের এগিয়ে যাওয়ার পথ বন্ধ হওয়া।

অসংখ্য গাড়ি, অসংখ্য লরি, অসংখ্য মানুষ মিছিলের পিছনে আটকে গিয়ে বিব্রত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কাউকে হাসপাতালে যেতে হবে, কাউকে হাওড়া স্টেশনে গিয়ে ট্রেন ধরতে হবে, কাউকে অফিসে কাছারিতে গিয়ে কাজ সামলাতে হবে। অথচ সামনে রাস্তা জুড়ে মিছিল চলেছে ধীর গতিতে। মানুষের সুবিধে-অসুবিধে দেখবার দায় আমাদের নেই, আমরা সর্বহারা মানুষদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করতে চলেছি, সুতরাং আমরা কারো কথা শুনবো না। আমরা কারো বাধা মানবো না। আমরা কারো সুবিধে-অসুবিধে দেখবো না।

—আর কতোক্ষণ এখানে আটকে থাকবো ম্যানেজারবাবু?

অনেক গাড়ির মধ্যে বিশাখাদের গাড়িটাও একভাবে অনেকক্ষণ ধরে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিল। অনেক দিন পরে বিশাখা চলেছে তার মাকে দেখতে। বলতে গেলে বিয়ের পর মা'র সংগে তার এই-ই প্রথম দেখা হবে। তার বিয়ে নিয়ে তার মা অনেক দিন অনেক রাত বিনিদ্র কাটিয়েছে। বলতে গেলে বিশাখাই ছিল মা'র গলার কাঁটা।

সেই বিশাখার বিয়ে হয়েছে মুখুজ্জেদের মতো বড়লোকের বাড়িতে। অথচ এতদিন নানা ঝামেলায় সেই মা'র কাছেই কিনা সে যেতে পারেনি। তখনও গাড়িটার নড়বার নাম নেই।

মল্লিক-মশাই-ই বা কী করবেন। বললেন—নিতাই, অন্য রাস্তা দিয়ে যাওয়া যায় না? এ তো দেখছি আমাদের বেড়াপোতা পৌঁছতে একেবারে রাত কাবার করে দেবে।

কথাটা অবশ্য মিথ্যে নয়। সেই দুপুর দু'টোর সময় বাড়ি থেকে বেরিয়েছে আর বেলা চারটে বেজে গেল, এখনো হাওড়াতেই পৌঁছনো গেল না। বেড়াপোতা তো আরো অনেক দূরে। মল্লিক-মশাই বললেন—এ-রাস্তা দিয়ে কেন এলে তুমি? বালি-ব্রিজের রাস্তা দিয়ে গেলেই পারতে।

নিতাই বরাবর কম-কথা বলবারই লোক। সেও বলে উঠলো—আমি কী করে জানবো যে এই দুপুর বেলায় রাস্তায় এমন মিছিল বেরোবে!

—তাহলে অন্য রাস্তা ধরো। গাড়ি ঘুরিয়ে নাও—

নিতাই বললে—ঘোরাবো কী করে? পেছনে পাশে সামনে সব দিকে যে গাড়ির জট্ বেঁধে গিয়েছে।

—তাহলে উপায়?

অপেক্ষা করা ছাড়া তখন আর কোনও উপায় ছিল না। মিছিল যে কোন দিকে যাচ্ছে, কোথায় তার গন্তব্য স্থল, তাও কেউ জানে না। তোমাদের কাজ-কর্ম গোলায় যাক, আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধি হলেই আমি খুশী। মল্লিক-মশাই নিতাইকে আবার বললেন—অন্য কোনও রাস্তা দিয়ে গেলে হতো না নিতাই?

নিতাই কী বলবে! তখন আর উদ্ধার পাওয়ার কোনও রাস্তাই খোলা নেই। আরো হাজারটা গাড়ির যে অবস্থা নিতাই-এর গাড়ির সেই একই অবস্থা!

বিশাখাও পিছনের সীটে বসে সেই একই কথা ভাবছিল। এ কী হলো? যেদিন তার সব চেয়ে বেশি জরুরী কাজ, সেই দিনই কি এই অনর্থ ঘটতে হয়! আগেও বিশাখা এ-রকম ঘটতে দেখেছে। তখন সে বাসে-ট্রামে চড়ে বেড়িয়েছে। কোথাও গাড়ি-ঘোড়া ট্রাম-বাস চলা বন্ধ হয়ে গেলে সে রাস্তা দিয়ে হেঁটে পার হয়ে গন্তব্য-স্থলে গিয়ে পৌঁছিয়েছে।

কিন্তু এখন আর তার সে-উপায় নেই। এখন সে বড়োলোকের বাড়ির বউ। এখন রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলা-ফেরা করলে শ্বশুরবাড়ির অমর্যাদা হবে, বংশের ইজ্জৎ যাবে!

কিন্তু সব জিনিসেরই যেমন একটা শেষ আছে, মিছিলের জ্যাম-জটেরও তেমনি একটা শেষ আছে। কিন্তু যে-সময়টুকু নষ্ট হলো তার ক্ষতিপূরণ কে করবে? সেই সময়ের

মধ্যে তারা বেড়াপোতার আরো কাছাকাছি পৌঁছিয়ে যেত। আস্তে আস্তে যখন মিছিল রাস্তা ছেড়ে অন্য রাস্তার দিকে মোড় ঘুরলো, তখন গাড়িগুলো আবার সচল হলো।

মল্লিক-মশাই নিতাইকে তাগাদা দিলেন। বললেন—এবার একটু তাড়াতাড়ি চলো নিতাই, নইলে বেড়াপোতায় পৌঁছতে রাত পুইয়ে যাবে—

তা নিতাই কাজের লোক আছে বলতে হবে। সন্ধ্যে হতে আরম্ভ করেছে। কিন্তু নিতাই অন্য সব বাধা-বিঘ্ন, অন্য সব গাড়ি, অন্য সব জটলা কাটিয়ে, অন্য সবাইকে অতিক্রম করে সকলের আগে গাড়িটাকে চালিয়ে নিয়ে চললো।

এক-একটা করে গ্রাম জনপদ পেরিয়ে যায় আর সকলের আশঙ্কা হয় যেন বড় দেরি হয়ে যাচ্ছে বেড়াপোতাতে পৌঁছতে। কেবল মনে হয় শেষ পর্যন্ত বেড়াপোতাতে পৌঁছতে পারবে তো! নাকি সামনে আরো কিছু বাধা-বিঘ্ন তাদের বাধা দিতে হাঁ করে অপেক্ষা করে আছে?

আস্তে আস্তে পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করে চারদিকে সন্ধ্যে ঘনিয়ে এলো। তখন সবাই একই গাড়ির ভেতরে একেবারে নিঃসঙ্গ। কোথায় সেই জন-বহুল কলকাতা শহর আর কোথায় এই নিরিবিলি গ্রাম-গঞ্জ-অন্ধকার-নৈঃশব্দ! সময় যেন আর কাটতে চায় না। এই রাস্তায় আগে কতোবার সে ট্রেনে চড়ে যেতে যেতে দেখেছে, আর আজকে সেই রাস্তা দিয়ে সে চলেছে গাড়ি করে। আর সে-গাড়িও তার নিজের। যে-মানুষটা গাড়িটা চালাচ্ছে তার মাইনে সে নিজে মেটায়। যে-লোকটা নিতাই-এর পাশে বসে আছে, সেও তার কাছ থেকে মাসে মাসে মাইনে পায়। এত সব সম্পত্তির মালিক হয়েও বিশাখার মন পড়ে আছে মা'র কাছে। তার বিয়ের পর আজই তার সঙ্গে মা'র প্রথম দেখা হবে। মায়ের স্বপ্ন সার্থক হয়েছে, কিন্তু বিশাখার?

বিশাখা আজ বড়োলোকের বাড়ির বউ। অনেক টাকার মালিক।

তাকে দেখে মা বোধহয় মনের আনন্দে তাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরবে।

বলবে—হ্যাঁ রে, এতদিন পরে আমার কথা তোর মনে পড়লো?

উত্তরে বিশাখা কী বলবে? উত্তর দেবার আগেই মা বলবে—তা তুই সুখী হয়েছিস, তাই-ই ভালো। এর পর আর আমার মরতেও কষ্ট নেই।

তারপর? তারপর হয়তো একদিনের জন্যে মা বিশাখাকে থেকে যেতে বলবে। বলবে—একদিন থাকলে কি জামাই রাগ করবে নাকি রে?

—এ-কথার উত্তরে বিশাখা কী বলবে? বললেও মা নিশ্চয়ই কিছু বুঝবে না।

—তোর দিদি-শাশুড়ী কেমন আছে রে?

বিশাখা বলবে—খুব ভালো।

—তোকে খুব পছন্দ হয়েছে তো তার?

—হ্যাঁ মা। আমাকে কোনও কাজ করতে দেন না। বলেন—তুমি আমার গৃহলক্ষ্মী। তোমায় কোনও কাজ-কর্ম করতে হবে না। তুমি আমার নাতিকে শুধু একটু যত্ন করো।

—জামাই কেমন আছে?

—খুব ভালো আছে।

মা হয়তো বলবে—আমার জামাইকে বড্ড দেখতে ইচ্ছে করে রে।

বিশাখা বলবে—তোমার জামাই বলছিল একদিন তোমাকে প্রণাম করতে আসবে।

—কেন আবার অতো কষ্ট করতে আসবে! তোরা ভালো থাকলেই আমি খুশী। এখানে কষ্ট করতে আর আসতে হবে না। অতো বড়লোকের ছেলে, এ-বাড়িতে এলে তার অনেক কষ্ট হবে! এখানে এলে তাকে কোথায় বসাবো, কী খেতে দেব বল তো। সে আবার আর এক ভাবনা। তার চেয়ে তুই মাঝে-মাঝে আমাকে চিঠি লিখিস, তাতেই আমি নিশ্চিন্ত থাকবো।

—সন্দীপকে দেখছি না যে! শুনেছিলুম সন্দীপের নাকি খুব অসুখ হয়েছিল!

—অসুখ হয়েছিল। কিন্তু এখন ভালো আছে! সে এখনও অফিস থেকে আসেনি।

সন্দীপ বললে—জানি বলেই তো তোমাকে বিরক্ত করতে চাইনি।

—তা বলে আগে জানতে পারলে মাকে একবার চোখের দেখা দেখতে পেতুম...

সন্দীপ বললে—সত্যিই বিশ্বাস করো, আমি ইচ্ছে করেই তোমাকে খবরটা দিইনি। খবর দিলে তুমি সে-যন্ত্রণা দেখলে সহ্য করতে পারতে না—

তারপর বললে—চলো, বাড়ি চলো, মা'র সঙ্গে একবার দেখা করবে চলো—

বিশাখা তখন যেন মা'র মৃত্যুতে একেবারে ভেঙে পড়েছে।

শ্মশান থেকে সন্দীপের বাড়ি অনেক দূরের রাস্তা। সন্দীপ বিশাখাকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে গাড়িতে তুললো। মল্লিক-কাকাও সামনের সীটে উঠে বসলেন। তারপর সন্দীপও গিয়ে উঠলো বিশাখার পাশের জায়গায়। উঠে দুই হাতে বিশাখাকে ধরে রইলো। নইলে শোকে টলে পড়ছিল বিশাখা। বিশাখার মুখে তখন কেবল একই কথা—আমি মা'কে একবার দেখতে পেলুম না শেষ সময়ে—সন্দীপ তুমি এটা কী করলে...

সন্দীপও সান্ত্বনা দিতে লাগলো।

কিন্তু তাও মামুলী সান্ত্বনা। তবু মামুলী সান্ত্বনা দেওয়া ছাড়া আর কী-ই বা করবার ছিল সন্দীপের।

সন্দীপের বাড়িতে এসে গাড়িটা পৌঁছলো। সেখানেও এক শোকের পালা শুরু হলো। বিশাখাকে দেখে মা-ও জড়িয়ে ধরলো তাকে। মা'র বুকে মাথা গুঁজে হাউ-হাউ করে খানিক কাঁদতে লাগলো বিশাখা। বলতে লাগলো—একটা খবর দিলেন না মাসিমা। শেষ সময়ে একবার মা'র মুখ দেখতে পেলুম না। আপনার সন্দীপ একটা খবরও দিতে পারলে না কষ্ট করে—

মা বললে—আমার সন্দীপের ওপর দিয়ে যে কী ঝঞ্ঝাট গেল তা তো তোমরা কেউ জানতে পারলে না। তোমার মা যে এতদিন বেঁচে ছিলেন সমস্ত ওই সন্দীপের জন্য—তবু তারই মধ্যে বেচারী অফিস করেছে, বাজার করে এনেছে, আমাকে সেবা করেছে। দেখছো না ওর শরীর কেমন আধখানা হয়ে গেছে—

পাশে মল্লিক-কাকা দাঁড়িয়ে ছিলেন। সবই শুনছিলেন তিনি। সন্দীপকে কাছে ডেকে আড়ালে চুপিচুপি জিজ্ঞেস করলেন—কতো টাকা তোমার খরচ হলো সন্দীপ!

সন্দীপ বললে—সে-কথা এখন থাক কাকা—

সন্দীপ কোনও উত্তর না দিতে মল্লিক-কাকা আবার জিজ্ঞেস করলেন—সত্যি বলো না, বউদি-মণির মা'র অসুখের জন্যে কতো টাকা খরচ-খরচা হলো?

রাত তখন প্রায় তিনটে বেজে গেছে। সবাই যেমন শোকে মুহ্যমান তেমনি ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন। মল্লিক-কাকাই বললেন—বলো না সন্দীপ কতো খরচ-খরচা হয়েছে, বউদি-মণি তা সব মিটিয়ে দেবেন, ঠাকমা-মণি তো সেই রকম কথাই দিয়েছিলেন বিয়ের সময়।

সন্দীপ বললে এখন কি সেই সব কথা বলার সময় কাকাবাবু? পরে হবে সব কথা, আমি তো মরে যাচ্ছি না এত তাড়াতাড়ি—

—ছি ছি, বালাই ষাট! ও-কথা বলতে নেই। তবু শ্রাদ্ধ-শান্তিতেও খরচ-খরচা তো কিছু লাগবে তোমার—

সন্দীপ বললে—শ্রাদ্ধ-শান্তি কি না করলেই না। তা কি করতেই হবে চ্যাটার্জি-বাবুকে বলে যা হোক কিছু নমঃ-নমঃ করে করলেই চলবে!

মল্লিক-কাকা ডাকলেন বউদি-মণিকে। বললেন—এদিকে যা হওয়ার তা তো হয়ে গেল। শ্রাদ্ধ-শান্তি তো করতে হবে বউদি-মণি। কে করবে?

বউদি-মণি বললে—কেন, সন্দীপও তো মা'র ছেলের মতোই ছিল। সন্দীপই তো শেষ-কালে মুখাগ্নি করেছে—

—কিন্তু খরচ-খরচা?

—খরচ-খরচা যা লাগবে সব আমরাই দেবো।

—মা'র এতদিনের চিকিৎসার খরচও তো আছে। তাও তো দিতে হবে।

—কত দেবো?

—ক্যানসারের চিকিৎসায় তো মোটা খরচও আছে। সব মিলিয়ে দু'তিন লাখ টাকা তো হবেই কম করে।

সন্দীপ কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। বললে—সে-খরচ আমি যোগাড় করে নিয়েছি—

—কী করে যোগাড় করলে?

অফিস থেকে লোন করেছিলাম আর বাড়িটাও আমি আবার চ্যাটার্জিবাবুদের কাছে বাঁধা রেখেছি—

বিশাখা বললে—আমি বাড়ি যাচ্ছি, সেখান থেকে তোমায় সব টাকা পাঠিয়ে দিচ্ছি। সবসুদ্ধ কতো টাকা বলো আমি পাঠিয়ে দেব।

সন্দীপ বললে—না, তার দরকার হবে না। তোমার যেমন মা আমারও তো তেমনি মাসিমা। মাসিমা কি কারো পর হয়? কারো বোন-পো কি পর হয়?

মল্লিক-কাকা সেখানেই দাঁড়িয়েছিলেন। বললেন—কিন্তু ঠাকমা-মণির সঙ্গে আমি যে কথা দিয়েছিলুম যে বউদি-মণির মা'র অসুখের খরচ সবই আমরা দেবো—

—কেন দেবেন? তার বিপদের দিনে সে-কথা আপনাদের মনে ছিল না? তখন যে আমার কী কষ্ট গেছে তার খোঁজ তো আপনারা কেউই রাখতেন না। আমার মায়ের হাতের একজোড়া সোনার রুলি ছিল সে-জোড়াও আমাকে ডাক্তারের খরচের জন্যে বেচতে হয়েছে। তখন তো আপনারা একবারও মাসিমা কেমন আছেন তার খোঁজ নেননি।

মল্লিক-কাকা বললেন—আমাদের বাড়িতে তখন ঠাকমা-মণিকে নিয়ে কী ঝামেলা চলছে তার যদি তুমি খবর রাখতে তাহলে আজ এ-কথা বলতে না—

সন্দীপ বললে—বিপদ কোন বাড়িতে নেই! তা বলে নিজের মায়ের খবর রাখা কি একবার উচিত ছিল না বিশাখার?

বিশাখা বললে—আমার কথা বলছো? বাড়িতে অমন একটা দিদি-শাশুড়ী, তার একেবারে যায়-যায় অবস্থা, তার ওপর বাড়ির নাতি জেল থেকে প্যারোলে ছুটি নিয়ে এসেছে ঠাকমা-মণিকে দেখতে, কতো ঝঞ্ঝাটের কথা বলবো! সেসব তো তুমি জানলে না। টাকা থাকলেই কি সব বিপদের সুরাহা হয়? তোমার যেমন টাকার অভাব, আমাদেরও তেমনি টাকার প্রাচুর্যও যে কতো বিপজ্জনক তা যদি তুমি জানতে—

সন্দীপ বললে—টাকা বেশি থাকলে ও-সব কথা খুব মানায়।

বিশাখা বললে—তাহলে তোমার পোজিসনের সঙ্গে আমার টাকার প্রাচুর্যের এক্সচেঞ্জ করতে চাও?

সন্দীপ বললে—না তা সম্ভবও নয়, তার দরকারও নেই। আমি যেমন আছি তেমনিই থাকতে চাই। তোমার টাকার সঙ্গে তোমার ঝঞ্ঝাট চিরকালই থাক। আমাকে আশীর্বাদ করো আমার যেমন আছে যেন তেমনই থাকে।

বিশাখা বললে—আমি যে আজ বড়লোক হয়েছি তা কি ইচ্ছে করে?

—ইচ্ছে করে না তো কি?

মল্লিক-মশাই বললেন—যা হয়ে গেছে তা নিয়ে আর মাথা ঘামাচ্ছো কেন? চুপ করো না সন্দীপ—

সন্দীপ বললে—আপনি আমারই দোষ দেখলেন মল্লিক-কাকা! বিশাখা কি ভেবেছে আমি গরীব বলে বিশাখার কাছে গিয়ে হাত পাতবো। বলবো—আমার টাকার দরকার হয়েছে, টাকা দাও। সে আমি জীবন থাকতে করতে পারবো না। তাতে আমি উপোস করেই মরি আর অসুখেই অথর্ব হয়ে পড়ি। সে স্বভাব আমার নয়।

হঠাৎ মল্লিক-কাকার খেয়াল হলো যে বাইরে সকাল হয়েছে। রোদ উঠে গেছে। বললেন—যা, ভোর হয়ে গেল, এবার উঠুন বউদি-মণি। খুব দেরি হয়ে গেল। উঠুন। তর্কের আর শেষ হবে না। শ্রাদ্ধের দিন আবার আসছি।

বলে চলে যাচ্ছিলেন। বিশাখা তখনও সন্দীপের মাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে চলেছে।

আর মা সান্ত্বনা দিচ্ছে তাকে। বললে—আর কেঁদে কী করবে মা। তিনি তোমার সুখের বিয়ে দেখে গেছেন।

—আমার কি সুখের বিয়ে? আমার স্বামী রইলেন জেলে আর কোথায় রইল আমার সুখ!

মা বিশাখার চোখ দুটো নিজের আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিতে দিতে বললে—তবু চিরকাল তো আর জেলে থাকবে না মা তোমার স্বামী। একদিন-না-একদিন তো ছাড়া পাবেই—

—তার আগে যেন আমার মৃত্যু হয় মাসিমা!

—ও-কথা বলতে নেই মা, সে তোমার সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে দিয়েছে, সে যেমনই হোক, তোমার সোয়ামী তো বটে!

বিশাখা বললে—সব ব্যাপার তো আপনি জানেন না মাসিমা। সব জানলে আপনি অমন আশীর্বাদ করতেন না।

—ও-কথা কেন বলছো মা, সোয়ামী যেমনই হোন তিনি জন্ম-জন্মান্তরের সোয়ামী। তিনিই তোমার ইহকাল-পরকাল সব। তাই তো তোমার মা ভাগ্যবতী, তোমাকে যোগ্য পাত্রের হাতে তুলে দিয়ে স্বগ্যে গেছেন। তোমার মায়ের তো ওই একটা বাসনাই ছিল। দেখতে না পান, খোকার কাছে তো সব শুনে গিয়েছেন। খোকা সব বলেছে তোমার মাকে। বলেছে, দুজনে সুখে আছে। মা হয়ে আর কী চাই বলো। তোমার মা তো সারাজীবন তাই-ই চেয়েছিলেন। যাবার সময়ও মা তাই জেনে গেলেন। সতী-লক্ষ্মী মা ছিলেন তোমার। তাই যাওয়ার সময় অতো সুখ পেলেন। তুমি অতো কেঁদো না—

বিশাখা তখন অঝোর-ধারায় কাঁদছিল। বললে—কিন্তু মা যদি আসল ব্যাপারটা জেনে যেত তো মরেও বোধহয় শান্তি পেত না—

মা বললে—স্বামী তো পুরুষ মানুষ মা, পুরুষ মানুষ একটু অবুঝই হয়। তুমি মেয়েমানুষ হয়ে জন্মেছ, ক'দিন সহ্য করে যাও। সহ্য করা ছাড়া মেয়েমানুষের তো কোনও গতি নেই। আমার কথাটাও একবার ভাবো। সারাজীবন কতো কষ্ট করছি বলো তো! অল্প বয়েসে বিধবা হয়েছি, পরের বাড়িতে তখন চাকরের কাজ করে লাথি-ঝ্যাটা খেয়েছি। তারপর এখন ছেলের চাকরিটা হয়েছে বলে তবু একটু সুখের মুখ দেখতে পাচ্ছি। তোমার তো তা নয় মা, তুমি ভগবানের দয়ায় রাজরানী হয়েছ। নাই বা থাকল স্বামী। একদিন-না-একদিন তো সে স্বামী জেল থেকে ছাড়া পাবেই, তখন? তখনকার কথা একবার ভাবো তো?

বিশাখা তখনও কেঁদে চোখ মুখ ভাসাচ্ছিল। মা আবার সান্ত্বনা দিতে লাগলো। বললে—ছেলে-মেয়ের আগে বাপ-মা মারা যাওয়াই তো ভালো। ছেলে-মেয়ে মারা গেলে, তারপরে যদি বাপ-মা মারা যায় তো সে কী করুণ অবস্থা ভাবো তো একবার—তবু তো তোমার মা বেঁচে থেকে দেখে গেলেন মেয়ের বড়োলোকের বাড়িতে বিয়ে হয়েছে, মেয়ে রাজরানী হয়েছে—

তারপর আঁচল দিয়ে বিশাখার চোখ-মুখ আবার মুছে দিয়ে বললে—সারা রাত তো কেঁদে- কেটেই কাটালে, এখন কিছু মুখে দেবে মা?

বিশাখা বললে—না মাসিমা, এখন এই অবস্থায় আর মুখে কিছু রুচবে না। আমরা যাই। ওদিকে দিদি-শাশুড়ীর বাড়িতে কী অবস্থা চলছে তার ঠিক নেই। গিয়ে হয়তো দেখবো তিনি চোখ উল্টিয়ে পড়েছেন—আমার কি একটা জ্বালা মাসিমা। আমি পাশে না থাকলে তিনি একেবারে ছট্‌ফট্ করতে আরম্ভ করেন—

মল্লিক-কাকা পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। সব শুনে বললেন—হ্যাঁ, যাওয়া যাক, আবার শ্রাদ্ধের দিন তো সবাইকে আসতে হবে। বেশি ঘটা করবেন না বৌঠান। নমঃ নমঃ করে সারবেন। এ তো সুখের যাওয়া নয়। যিনি গেলেন তিনি তো হাসি-মুখে চলে গেলেন। জানতেও পারলেন না মেয়ের কতো কষ্টে দিন কাটছে—

তারপর সন্দীপকে কাছে ডাকলেন।

বললেন—কই বাবা সন্দীপ, তুমি তো কিছু বলছো না।

সন্দীপ বরাবর গম্ভীর হয়েই ছিল। বললে—আমি আর কী বলবো মল্লিক-কাকা। আমার দুঃখু রইল আমি অনেক চেষ্টা করেও মাসিমাকে বাঁচাতে পারলুম না—

মল্লিক-কাকা বললেন—ভগবান যাকে মারবে তুমি তাকে কী করে বাঁচাবে বাবা। তবু ভালো যে তোমার মাসিমা আসল খবরটা জেনে যেতে পারলেন না। সেটা হলে আরো কষ্ট পেতেন।

সন্দীপ বললে—হাসপাতালে মাঝে মাঝে মাসিমা মেয়ে-জামাইকে দেখতে চাইতেন। কিন্তু আমি মিথ্যে কথা বলে তাঁকে শান্ত করতুম। বলতুম তারা দু'জনে এখন খুব সিনেমা-থিয়েটার দেখে বেড়াচ্ছে।

মাসিমা খুশী হতো কথাগুলো শুনে। বলতো—তা দেখুক বাবা, সিনেমা-থিয়েটার দেখে বেড়াক। এরপর ছেলে-পুলে হয়ে গেলে তো ও-সব পাট চুকে-বুকে যাবে। এখন বয়েস থাকতে থাকতে একটু আরাম করে নিক—

ততক্ষণে বেড়াপোতাতে সত্যিই বেশ রোদ উঠে গেছে চারদিকে। মল্লিক-কাকা তাগাদা দিলেন। বললেন—আর দেরি নয় বৌঠান। আবার বাড়িতে আরেক রোগীকে ফেলে এসেছি, যাই শ্রাদ্ধের দিন আসবার চেষ্টা করবো—

বলে উঠে দাঁড়ালেন। যাওয়ার আগে বিশাখা মাসিমাকে আর একবার জড়িয়ে ধরে কেঁদে নিলে। তারপর তাদের গাড়ি কলকাতার দিকে রওনা দিলো। তারা চলে যাওয়ার পর সন্দীপ মাকে বললে—তাহলে আমিও অফিসে যাই মা একবার—

মা বললে—তা বলে আজকেও অফিসে যাবি?

সন্দীপ বললে—অনেক দিন যাইনি, একবার খানিকক্ষণের জন্যে ঘুরে আসি। অনেক কাজ বাকি পড়ে আছে—

—তোর শরীরে সইবে এত ধকল? কাল সারারাত ঘুমোসনি। একটা দিন বিশ্রাম নে না। সকলেই তো তাই চায়—

সন্দীপ বললে—না মা, আমি যাই, সকাল সকাল ফিরে আসবো।
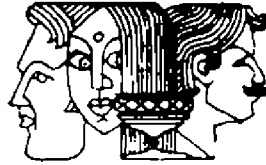
বিপ্লব যখন দেশে আসে তখন তা বড়ো চুপি চুপি আসে। বাইরের সাধারণ লোক কানা-ঘুষোতে শুনতে পেলেও সহসা তা বিশ্বাস করতে চায় না। স্বাভাবিক জীবন-যাত্রা বাইরে থেকে স্বাভাবিক ভাবেই চলে। লোকে ঠিক সময়েই অফিসে কাছারিতে যায়। জিনিস-পত্রের দামেরও কোনও তারতম্য হয় না। লোকে সকালবেলা নিয়ম করে প্রাতঃ-ভ্রমণে যায়, আনাজপত্র কিনতে বাজারে যায়। দৈনন্দিন কাজ-কর্মের কোনও হেরফের হয় না।

হঠাৎ আচমকা খবর রটে যায় যে রাজার গলা কাটা গেছে। হঠাৎ রটে যায় যে জেলখানার তালা ভেঙে সব কয়েদীদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

এই রকম করে হঠাৎই ফরাসী দেশে বিপ্লব এসেছিল।

এ সব অনেক কাল আগেকার ব্যাপার। বেশির ভাগ লোকেই তা ভুলে গেছে। এ-সব কথা এখন এই ভাবে জানতে হয়। কিন্তু যখন ঘটনাটা ঘটেছিল তখনকার মানুষের কথা কি আজ কেউ কল্পনা করতে পারবে।

সেদিন বিডন স্ট্রীটের মুখার্জিবাবুদের বাড়িতেও ঠিক এইরকমের ঘটনাই ঘটলো। হঠাৎ মল্লিক-মশাইএর নামে টেলিগ্রাম এলো—ইন্দোরের স্যাক্সবি-মুখার্জি কোম্পানীতে লক-

আউট ঘোষণা হয়ে গেছে। কাজকর্ম সব বন্ধ।

খবরটা মল্লিক-মশাইএর নামে ছাড়া আর কার কাছেই বা আসবে? আর কে বাড়িতে আছে যে মুক্তিপদ তাকে জানাবেন?

খবরটা যে কতো সাংঘাতিক তা মল্লিক-কাকা হাড়ে হাড়ে টের পেলেন। বুঝতে পারলেন আর একটা মোক্ষম বিপদ এসে ঘাড়ে চাপলো।

কলকাতায় যেবার কোম্পানীর ওপর লক-আউটের কোপ পড়েছিল। তখন মেজবাবু কলকাতায়। যা সামলাবার তা মেজবাবু একলাই সামলিয়ে ছিলেন। ইউনিয়নের কর্তাদের লাখ-লাখ টাকা দান-খয়রাত করে সে-যাত্রা রক্ষে হয়েছিল।

তারই ফলে কোম্পানীকে ইন্দোরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ভাবা গিয়েছিল যে ইন্দোরে বেঙ্গলের মতো ইউনিয়ন-বাজি নেই। তখন ফ্যাক্টরি সেখানে নির্বিঘ্নে আর নিশ্চিন্তে চলবে!

কিন্তু সেখানেও তাহলে ইউনিয়ন আছে! সেখানেও আছে গোপাল হাজরার দল! হাজির হয়েছে ডি-এ-পি পার্টি?

টেলিগ্রামটা নিয়ে মল্লিক-কাকা বার কয়েক পড়লেন। কিন্তু কোনও কূল-কিনারা করতে পারলেন না। কারো সঙ্গে যে পরামর্শ করবেন তারও উপায় নেই। ঠাকমা-মণি শয্যাশায়ী। তিনি বেশি দিন বাঁচবেন না আর। সুতরাং তাঁর কাছে পরামর্শ চাওয়া বৃথা। আর আছে বউদি-মণি।

বউদি-মণি এ-সবের কী বুঝবেন। গরীবের ঘরে মানুষ। তার ওপর এই ক'দিন আগে তাঁর মাতৃ-বিয়োগ হয়েছে। রোজকার নিয়ম মতো মল্লিক-মশাইএর কাছে দৈনন্দিন বাজার খরচের হিসেবও নিচ্ছেন না। কাছে গেলেই বলেন—আজ থাক, কাল হবে—

আবার কাল গেলে বলেন—আজ থাক, কাল হবে—

অথচ সংসার তো তার জন্যে বসে থাকবে না। সে তার দাবি মিটিয়ে নেবেই কড়ায়-ক্রান্তিতে। সেখানে হিসেবের ভুল সহ্য করবেন না মনিব।

আসলে মল্লিক-কাকা তো মনিব নয়। মল্লিক-কাকারও তো মনিব আছে। ঠাকমা-মণিরও মনিব আছে, মুক্তিপদবাবুরও মনিব আছে। এই পৃথিবীতে যতো মানুষ আছে, সকলেরই মনিব আছে। সকলকেই হিসেবের আয়-ব্যয় বুঝিয়ে দিতে হয়, সেই সবচেয়ে বড়ো মনিব, তাকে। এখন কী হবে?

ক'দিন পরেই বউদিমণির মায়ের শ্রাদ্ধ। বেড়াপোতাতে। সেখানে বউদি-মণিকে নিয়ে যেতে হবে। সঙ্গে কিছু মিষ্টি আর সন্দীপের জন্যে নতুন ধুতি। এ-সব টাকা কে দেবে? এ-সব টাকা এর পর কোথা থেকে আসবে?

তার ওপর আছে সন্দীপের দেনা। বউদি-মণির মা'র ক্যানসারের চিকিৎসার খরচ। তা-ও দু-তিন লাখ টাকার কমে কি হবে?

কোম্পানী লক্-আউট হলে এ-সব খরচ-খরচা চলবে কী করে!

যেন মল্লিক-কাকারই যতো কিছু ভাবনা। অথচ মল্লিক-কাকা এ-বাড়ির কে? বেতন-ভুক্ কর্মচারী বই তো কিছু নন।

কথাটা কেমন করে বউদিমণির কানে তুলবেন সেইটেই হলো সমস্যা।

একবার সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠলেন। ঠাকমা-মণির ঘরে তখনও বউদি-মণি ঠায় বসে আছেন। মল্লিক-মশাইকে দেখে বাইরে এলেন। জিজ্ঞেস করলেন—কিছু বলবেন মল্লিক-মশাই আমাকে? হিসেব তো সকালেই বুঝে নেওয়া হয়ে গিয়েছে।

মল্লিক মশাই কী বলবেন যেন ঠিক করতে পারলেন না।

বললেন—ঠাকমা-মণি কেমন আছেন তাই একবার দেখতে এলুম—

বিশাখা বললে—কেমন আর থাকবেন, সেটা একই রকম। আমার হাতটা জোর করে ধরে আছেন। বলছেন—আমি যেন এ-বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে না যাই—

—ডাক্তারবাবু এসেছিলেন?

—হ্যাঁ, তিনি যেমন রোজ নিয়ম করে আসেন তেমনি এসেছিলেন।

—কী বলে গেলেন?

—সেই একই কথা। বেঁচে ওঠারও আশা নেই! শুধু টাকা নিয়ে গেলেন।

—ডাক্তার ডেকে তাহলে আর কী লাভ?

বিশাখা বললে—তবু তো ডাক্তারবাবুকে ডাকতে হবে। মেজবাবুই তো সব ব্যবস্থা করে গেছেন। বলে গেছেন টাকার জন্যে যেন কোনও চিকিৎসার অবহেলা না হয়।

মল্লিক-মশাইএর এ-কথা শোনবার পর আর কিছু বলবার থাকে না। কিন্তু যে-কথা তিনি বলতে এসেছিলেন তা বলতে গিয়েও আর বলতে পারলেন না। বলতে গিয়েও কথাটা মুখে আটকে গেল। ইন্দোরের ফ্যাক্টরির আয়েতেই যে এই সংসারের রেলগাড়িটা চলছে তা সবাই-ই জানে। এমনকি বাড়ির নতুন বিয়ে হওয়া নাত্-বউও তা জানে।

কিন্তু জানিয়ে লাভ কি? মিছিমিছি বিব্রত হবে নতুন নাত্-বউ।

তিনি আর সেখানে দাঁড়ালেন না। দাঁড়িয়ে থাকলে যদি কথাটা মুখ ফস্কে বেরিয়ে পড়ে; তখন?

তিনি তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে আবার নিচেয় তাঁর সেরেস্তায় নেমে এলেন। এসে দেখলেন—তখন সেখানে তপেশ গাঙ্গুলী দাঁড়িয়ে আছে।

মল্লিক-মশাই সেই রকম মানসিক অবস্থায় তপেশ গাঙ্গুলীকে দেখে খুশী হলেন না।

জিজ্ঞেস করলেন—কী হলো, আপনি হঠাৎ?

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—একটা খবর দিতে এলুম—

—কীসের খবর? বিজলীর বিয়ে পাকা হয়ে গেল নাকি?

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—আরে না ম্যানেজারমশাই, বিজলীর কপাল কি আর বিশাখার মতন? কোথায় পাত্র পাচ্ছি বিজলীর? আপনি একটা খোঁজ-খবর দিন না। গরীবের মেয়ের একটা হিল্লে হয়ে যাক!

তারপর নিজেই নিজের কথাটা থামিয়ে বললে—আপনারা কি চান আমি পাগল হয়ে যাই?

ম্যানেজারবাবু বললেন—দেখুন তপেশবাবু, আমরা এখন খুব বিপদের মধ্যে আছি, আমাদের খুব বিপদ চলছে। আপনার সঙ্গে কথা বলবার মতো মনের অবস্থা আমার নেই এখন—

—তাহলে আপনি এখন আমাকে চলে যেতে বলছেন?

মল্লিক-মশাই বললেন—আপনার মতো ভদ্রলোককে আমি তা কী করে যেতে বলি—

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—আমি হয়তো কিছু সাহায্য করতে পারি!

মল্লিক-মশাই বললেন—আপনি সাহায্য করতে পারবেন না। আপনি এখন যান—

—আমাকে আপনি তাড়িয়ে দিচ্ছেন?

মল্লিক-মশাই বললেন—ভদ্র ভাষায় আমি তা আপনাকে কী করে বলি। তাই আমি বলছি আপনি দয়া করে এখন আসুন। সত্যিই আমাদের বাড়িতে এখন খুব বিপদ চলছে—

—শুনি না কী রকম বিপদ?

মল্লিক-মশাই বললেন—আপনার ভাইঝি বিশাখা, তার মা দু'দিন আগে মারা গেছেন—

—বউদি? বউদি মারা গেছেন? কীসে মারা গেলেন?

—ক্যানসারে।

—ক্যানসারে মারা গেছেন? আহা, তাহলে তো বড়ো কষ্ট পেয়ে মারা গেছেন। কতো টাকা খরচ হলো ডাক্তারের পেছনে?

মল্লিক-মশাই বললেন—সে বলতে পারে সন্দীপ—

—সেই সন্দীপ? যে সেই ন্যাশন্যাল ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের হাওড়া ব্র্যাঞ্চের ম্যানেজার?

মল্লিক-মশাই বললেন—হ্যাঁ—

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—তা তার টাকার অভাব নেই। রেলের চাকরির চেয়ে ব্যাঙ্কের চাকরিতে মাইনে অনেক বেশি। ক্যানসার রোগ সারাবার মতো তাদের অনেক

পয়সা আছে। তা বউদির ক্যানসারের খরচ সন্দীপ দিলে কেন? তার নিজের মেয়েই তো রয়েছে, তার তো টাকার শেষ নেই। ব্যাঙ্কে লাখ লাখ টাকা পচছে।

তারপর একটু থেমে নিজেই বললে—তা বউদির শ্রাদ্ধ হবে না?

মল্লিক-মশাই বললেন—হওয়া তো উচিত!

—কোথায় হবে? এই বাড়িতে?

—এই বাড়িতে কেন? যে-বাড়িতে মারা গেছেন সেই বাড়িতে হবে।

—শ্রাদ্ধে কী-কী খাওয়ানো হবে!

মল্লিক-মশাই বললেন—সে সন্দীপ জানে। সন্দীপই তো মুখাগ্নি করেছে।

—খাওয়া-দাওয়া হবে তো?

—তা সন্দীপের সাধ্যমত হবে!

—ব্রাহ্মণ-ভোজন!

এবার মল্লিক-মশাই রেগে গেলেন। বললেন—সে-সব কথা আমাকে জিজ্ঞেস করছেন কেন? সে-সব সন্দীপ জানে। তার যেমন সাধ্য তেমনি করবে। তার অনেক টাকা খরচ হয়ে গিয়েছে চিকিৎসা করতে, শ্রাদ্ধ করবার খরচ কোত্থেকে পাবে সে!

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—কিন্তু ক'জন ব্রাহ্মণ-ভোজন তো করাতেই হবে। তা তো বাদ দেওয়া চলবে না। নিয়ম-রক্ষে না করলে তো চলবে না। হাজার হোক হিন্দু তো আমরা।

মল্লিক-মশাই বললেন—সে নিয়ম মানবে কিনা তা আমি কী করে বলবো। আমি তো বামুন নই।

· শ্রাদ্ধটা হবে কোথায় বললেন?

মল্লিক-মশাই বললেন—এ-বাড়িতে তো ঠাকমা-মণির ভীষণ অসুখ, তাই নিয়েই বউদি-মণি ব্যস্ত খুব। হবে সেই বেড়াপোতাতেই নিশ্চয়—

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—বেড়াপোতাতে হলেও আমার কোনও অসুবিধে নেই। আমি রেলের চাকরি করি, আমার তো আর টিকিট কাটতে হবে না।

—যদি আপনার নেমন্তন্ন না হয়?

—শুভ কাজে আবার নেমন্তন্নর কী দরকার? খবর পেলেই যেতে হয়। বিজলীকেও নিয়ে যাবো। রানীকেও নিয়ে যাবো। দু'বেলার খাই-খরচটা বেঁচে যাবে, কী বলেন?

এমনিতেই মল্লিক-মশাই মনে মনে বিরত হয়ে ছিলেন, আর তার ওপর তপেশ গাঙ্গুলীর সঙ্গে বাজে-কথার আলোচনা। লোকটা বিদায় হলে তখন বাঁচেন। কিন্তু কথার মাঝখানে হঠাৎ বাধা পলো।

লোকটা অচেনা। উর্দি পরা। বললে—আমি জেলখানার লোক কয়েদী সৌম্যপদ মুখার্জির কাছ থেকে আসছি—তিনি এই চিঠিটা দিয়েছেন—

মল্লিক-মশাই চিঠিটা নিলেন। দেখলেন চিঠির ওপর বউদি-মণির নাম লেখা রয়েছে। মল্লিক-মশাই বললেন—এ চিঠি তো সৌম্যবাবুর স্ত্রীর নামে লেখা। আমি বউদি-মণিকে এ চিঠি দিয়ে আসি—

তারপর লোকটাকে বললেন—সৌম্যবাবু জেলখানায় আছেন কেমন?

লোকটা বললে—ভালো নেই বাবুজী—

—কেন? ভালো নেই কেন?

লোকটা বললে—খাওয়া-দাওয়া যে ভালো হয় না বাবুজী, কী করে ভালো থাকবে?

—খাওয়া-দাওয়া খারাপ?

—জেলখানার খাবার কখনও কি ভালো হয় বাবুজী? সব যে ভেজাল। জল মেশানো দুধ, মোটা চালের ভাত, ঘি'তে ভেজাল, জল মেশানো ডাল। তারপর কাঁচা পাঁউরুটি, তাতে মাখন নেই। মুখে রুচবে কেন? মুখে রুচবে তবে তো শরীর ভালো থাকবে! আর সৌম্যবাবু তো বড়োলোকের বাড়ির ছেলে। তার ওপর মদ খেতে

পাচ্ছেন না—

—মদ? মদও দেওয়া হয় নাকি জেলখানায়?

—না। তবে পয়সা দিলে বাজার থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে মদ আনিয়ে দেওয়া হয়। মদ না খেয়ে রোগা হয়ে গেছেন খুব। আপনি সৌম্যবাবুর স্ত্রীকে চিঠিটা দিয়ে আসুন—

মল্লিক-মশাই আর দাঁড়ালেন না। সোজা চলে গেলেন ওপরে।

বউদি-মণি বসেছিলেন ঠাকমা-মণির কাছে। আর দু'জন নার্সও ছিল ঘরে। মল্লিক-মশাইকে দেখেই বউদি-মণি বাইরে এলেন। বললেন—কিছু খবর আছে?

মল্লিক-মশাই বললেন—জেলখানা থেকে লোক এসেছে। সৌম্যবাবু তার হাত দিয়ে একটা চিঠি পাঠিয়েছেন—

বউদি-মণি চিঠিটা পড়লেন। জিজ্ঞেস করলেন—আপনি চিঠিটা পড়েছেন?

মল্লিক-মশাই বললেন—না, আপনার চিঠি আমি পড়বো কী করে?

—এই নিন, পড়ুন!

বলে মল্লিক-মশাইকে চিঠিটা পড়তে দিলেন। বলতে গেলে চিঠিতে বিশেষ কিছুই তেমন লেখা নেই। শুধু লেখা আছে—এখানে আমার টাকার খুব অভাব চলছে। এই লোকটির হাতে এখনকার মতো সত্তোর হাজার টাকা পাঠিয়ে দেবে। আমি খুব ভালো নেই। খাওয়া-দাওয়ার খুব অসুবিধে চলছে। স্কচ্ হুইস্কি খেতে পাচ্ছি না অনেক দিন ধরে। লোকটি আমার খুব বিশ্বাসী। ইতি—

পড়া হয়ে গেলে বউদি-মণি জিজ্ঞেস করলেন—কী ভাবছেন?

মল্লিক-মশাই আর কী ভাববেন। কিছুই মন্তব্য করলেন না।

বউদি-মণি বললেন—টাকাটা পাঠাবো কী? আপনি কী বলেন?

মল্লিক-মশাই বললেন—যিনি টাকার মালিক তিনি নিজেই যখন টাকা চেয়ে পাঠিয়েছেন তখন আর আমাদের বলবার কী আছে!

—তবে পাঠাবো?

মল্লিক-মশাই বললেন—তবে একটা কথা আছে। আপনাকে বলা হয়নি—

—কী কথা? বলুন না।

মল্লিক-মশাই বললেন—ইন্দোর থেকে আজ সকালে মেজবাবু হঠাৎ টেলিগ্রাম করেছেন আমাকে।

—টেলিগ্রাম? আপনাকে? আমাকে তো বলেননি কিছু আপনি?

মল্লিক-মশাই বললেন—টেলিগ্রামটা পাওয়ার পরই আপনার কাছে বলতে গিয়েছিলাম। তখন আপনি ঠাকমা-মণির মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলেন। তাই বলতে গিয়েও বলতে পারিনি।

—খবরটা কী?

খবরটা খুবই দুঃসংবাদ। ওই সময়ে দুঃসংবাদটা বলতে একটু দ্বিধা হয়েছিল।

বিশাখা বললে—কী এমন খবর যা শুনে আমার মনে কষ্ট হবে?

—না, এই মাত্র সেদিন আপনার মায়ের দেহত্যাগের খবরটা পেলেন, তার পরেই আবার এমন দুঃসংবাদটা দেবো, তাই...

বিশাখা খবরটা জানবার জন্যে আরো উদ্গ্রীব হয়ে উঠলো—না, শীগ্গির বলুন—সন্দীপের কোনও খারাপ খবর আছে? সন্দীপ অসুস্থ, বলুন? আমি এখন সব দুঃসংবাদের জন্যে তৈরি করে নিয়েছি নিজেকে। নিজের সম্বন্ধেও আমার আর কোনও আশা রাখি না. বলুন শুনি আর কতো কষ্ট আছে আমার কপালে...

মল্লিক-মশাই বললেন—মেজবাবু জানিয়েছেন তাঁর ইন্দোরের ফ্যাক্টরিতেও লক্-আউট করা হয়েছে—কবে খুলবে কোনও আশা নেই।

বিশাখা খবরটা শুনে পাথর হয়ে গেল। খানিকক্ষণ তার মুখ দিয়ে কোনও কথা

বেরোল না। শুধু বললে—আবার?

—হ্যাঁ। মেজবাবু আমায় 'তার' করেছেন। সব কাজ অচল হয়ে গেছে সেখানে।

বিশাখা বললে—তাহলে কি আবার সেই রকম হবে? সব লোকের চাকরি যাবে?

—মনে তো হচ্ছে তাই!

—তাহলে এই সংসার চলবে কী করে?

মল্লিক-মশাই-এর মুখ দিয়ে এর কোনও জবাব বেরোল না। আর শুধু কি এই সংসার? ঠাকমা-মণির এই দীর্ঘস্থায়ী চিকিৎসার খরচ কে জোগাবে? তারপর বাড়ির এই চাকর-চাকরানীদের পাল? এদের মাইনের খরচ কি কম?

তারপর মল্লিক-মশাই নিজে। নিজের মাইনেটা না হয় নিলেন না। কিন্তু জামা-কাপড়, গামছা, খাই-খরচা? এগুলো কোথা থেকে আসবে!

খানিকক্ষণ কারো মুখ থেকে কোনও শব্দই বেরোল না। এত বড়োলোক দেখে মা তাকে এ-বাড়িতে বিয়ে দিয়েছিল। শেষকালে কি তার এই পরিণতি? মা বেঁচে থাকলে কথাগুলো তাকে জিজ্ঞেস করতো সে। বলতো—এত বড়োলোকের বাড়িতে বিয়ে দেওয়ার লোভ কেন হয়েছিল মা'র? এখন কী হলো? এখন কী উত্তর দিত মা?

—জেলখানার লোকটা কি এখনও নিচেয় দাঁড়িয়ে আছে?

মল্লিক-মশাই বললেন—হ্যাঁ—

বিশাখা জিজ্ঞেস করলে—এই সত্তোর হাজার টাকা কি এখনই চায়?

- হ্যাঁ!

বিশাখা বললে আপনি গিয়ে বলুন যে টাকাটা আমি নিজের হাতে গিয়ে দিয়ে আসবো কাল। আজ এখন আমার ক্যাশ টাকা নেই—

মল্লিক-মশাই বললে—ক্যাশ টাকা নেই তা কি লোকটা বিশ্বাস করবে?

—আপনি গিয়ে বলে দেখুন না একবার? দেখুন না কী বলে?

মল্লিক-মশাই বললেন—জেলখানার লোকগুলো বড় বদমাশ হয়। আমার কথা কি সে শুনবে? টাকা না পেলে যদি সৌম্যবাবুকে জেলখানায় খুব কষ্ট দেয়, ঘানিতে ঘোরায়?

বিশাখা বললে—আপনি একবার বলেই দেখুন না—

মল্লিক-মশাই বললেন—আপনি বউ মানুষ, আপনার কথা শুনলেও শুনতে পারে—

বিশাখা বললে—আচ্ছা ঠিক আছে। আপনি একবার তাকে ডাকুন এখানে—

মল্লিক-মশাই বললেন—তাই বলি গিয়ে—

বলে নিচেয় নেমে গেলেন। তারপর যমদূতের মতো চেহারার লোকটাকে ওপরে ডেকে নিয়ে এলেন। বিশাখা সিঁড়ির কাছে অপেক্ষা করছিল। লোকটার চেহারা দেখেই বিশাখা চমকে উঠলো। বললে—তুমি এই চিঠি নিয়ে এসেছ?

লোকটা বললে—হ্যাঁ মেমসাহেব, আমিই সাহেবের দেখভাল করি।

—তোমার সাহেব কেমন আছেন?

—তবিয়ত খুব খারাপ। মদ খেতে পাচ্ছেন না তাই বড়ো তক্‌লিফ হচ্ছে। জেলখানায় তো শরাব দেওয়ার কানুন নেই। তা যারা মদ খায় তারা বাড়ি থেকে টাকা আনিয়ে মদ খায়।

বিশাখা জিজ্ঞেস করলে—সবাই মদ খান?

লোকটা বললে—যারা রেইস আদমি তারা মদ খান। এখন ওঁদের টাকা ফুরিয়ে গেছে বলে আপনার কাছ থেকে মদ কেনবার টাকা চাইতে পাঠিয়েছেন—

বিশাখা বললে—তুমি মদ খেতে বারণ করতে পারো না?

লোকটা বললে—সাহেব শোনে না যে—

বিশাখা বললে—তাহলে আমি যাবো, সাহেবকে বুঝিয়ে বলবো। সাহেব আমার কথা শুনবে। আমি যাবো?

—আপনাকে তো জেলখানার ভেতরে যেতে দেবে না জেলার সাহেব।

বিশাখা বললে—আগে থেকে যদি দরখাস্ত করি তাহলেও দেখা করতে দেবে না?

লোকটা বললে—না, দেখা করতে দিলেও সঙ্গে কিছু জিনিস পত্র নিয়ে যেতে দেবে না? অথচ জেলের খাবার তো সাহেবের মুখে রোচে না। সাহেবের নেশার জিনিস কিছু নিয়ে যেতে দেবে না। জেলের সেই পচা ভাত আর জল মেশানো ডাল খেতে দেবে। সে কি সাহেবের গলা দিয়ে গলবে?

তারপর লোকটা বললে—আর তা ছাড়া আমি তো সব কয়েদীদের বাড়ি থেকেই টাকা নিয়ে আসি। সবাই টাকা দেয়।

বিশাখা খানিক একটু ভাবলে। বললে—সাহেব ভালো আছে তো?

লোকটা বললে—ভালো থাকবে কি করে? হাতের টাকা তো সব ফুরিয়ে গিয়েছে। আপনি টাকা দিলে আরো কয়েক মাস টিকবে। তারপর আবার হাত খালি। একটা বোতলেরই দাম তো আড়াইশো টাকা। তারপর ঘুষ আছে।

—কে ঘুষ নেয়?

লোকটা বললে—সবাই ঘুষ নেয়। ঘুষ না দিলে সাহেবের খেতে না পেয়ে শরীরটা খারাপ হয়ে যাবে।

কথাটা যুক্তিসঙ্গত। যে-মানুষ বাড়িতে অতো আরামে থাকতো, রাত্রে বাড়ি থেকে বেরিয়ে ক্লাবে গিয়ে বরাবর শেষ রাত্রে ফিরতো, সে-লোক সারাদিন জেলখানার মধ্যে আটকে থাকলে শরীর তো খারাপ হয়ে যাবে।

—সত্তোর হাজারই দিতে হবে এখনই?

—সাহেব তো তাই-ই চিঠিতে লিখেছেন।

বিশাখা বললে—এখন তো আমাদের সময় খুব খারাপ চলছে। সাহেবকে বোল আমাদের ইন্দোরের ফ্যাক্টরিতে লক্-আউট চলছে। আমদানি এখন বন্ধ। এত টাকা এক-সঙ্গে দেবো কী করে? সাহেবকে একটু বুঝিয়ে বলতে পারবে না? তারপর বলো বাড়ির গিন্নীরও খুব মরো মরো অসুখ চলছে। এখন যায় তখন যায়। সাহেবকে তুমি সব বলো গিয়ে, আমাদের টাকার এখন খুব টানাটানি চলছে। অত টাকা এখন দিতে পারবো না।

—কতো দিতে পারবেন?

বিশাখা বললে—এখন পঞ্চাশ হাজার টাকার মতোন কোনও রকমে দিচ্ছি। তারপরে মেজকর্তা ইন্দোর থেকে এলে তাঁর সঙ্গে কথা বলে যা পারবো তাই করবো—

লোকটা বললে—সাহেব কিন্তু খুব রেগে যাবে শুনে। খুব রাগী মানুষ তো, তা আপনি তো জানেন!

লোকটা বললে—সাহেব মদ না পেলে খুব মারামারি করে। একদিন মদ ফুরিয়ে গিয়েছিল, আমি খবর রাখিনি। মদ না খেতে পেয়ে আমাকে খুব মেরেছিল। এই দেখুন না আমার ডান হাতটা ভেঙে গিয়েছে। শেষকালে ডাক্তার দেখিয়ে ওষুধ খেতে হয়েছিল।

বিশাখা বললে—জেলার সাহেবকে বলতে পারো না?

—বাবা, জেলার সাহেবকে বললে কয়েদীকে খুব মারবে। তিন দিন কিছু খেতে দেবে না। তখন আমি বাজার থেকে লুকিয়ে খাবার এনে দিই, তবে খেতে পান সাহেব, তবে প্রাণ বাঁচে। সাহেব লোক খুব ভালো। কিন্তু ওই একটা দোষ, মদের নেশা একেবারে ছাড়তে পারবে না—

বিশাখা বললে—তাহলে তোমার আর দেরি করিয়ে দেবো না। আমার কাছে বেশি টাকা নেই। তোমাকে আমি পঞ্চাশ হাজার টাকা দিচ্ছি। কিছুদিন তাতেই চালিয়ে নিও, পরে আবার দেবো—তুমি আমাদের অবস্থাটা সাহেবকে বুঝিয়ে বলো—

বলে আলমারি খুলে টাকা এনে লোকটাকে দিলে। লোকটা টাকাগুলো গুনে নিয়ে চলে গেল। বিশাখা জিজ্ঞেস করলে—তোমার নামটা কী বলে গেলে না তো?

—আমার নাম হামিদ!
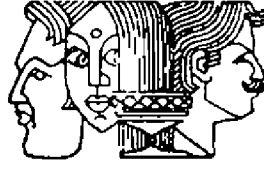
বেড়াপোতা স্টেশনে তখন সবে বিকেল হয়েছে। তপেশ গাঙ্গুলীর সঙ্গে তখন রানী রয়েছে, বিজলী রয়েছে। অচেনা জায়গা। ট্রেন থেকে নেমে একটা মিষ্টির দোকান। তপেশ গাঙ্গুলী সেখানে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে—এখানে সন্দীপ লাহিড়ীর বাড়িটা কোথায় বলে দেবেন?

দোকানদার বললে—এই পশ্চিম দিক বরাবর চলে যান। আধ মাইলটাক গিয়ে ডান দিকে একটা গলি পাবেন। সেইটাই সন্দীপ লাহিড়ীর বাড়ি। সেখানে তো আজ সন্দীপের মাসিমার শ্রাদ্ধ।

—শ্রাদ্ধ না জ্ঞাতি-ভোজন।

—শ্রাদ্ধ হয়ে গেছে। আজ জ্ঞাতি-ভোজন। আমার দোকান থেকে মিষ্টি গেছে।

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—কী কী মিষ্টি গেছে?

লোকটা বললে—পান্তুয়া, রাজভোগ, ল্যাংচা, আর দই রাবড়ি—

বাঃ, তাহলে তো সন্দীপ অনেক রকম আয়োজন করেছে। আর মাছ-মাংস কী করেছে?

দোকানদার বললে—সেও এলাহি ব্যাপার করেছে সন্দীপ। মুরগী, পাঁঠার মাংস, চপ কাটলেট...

আর শুনলে না তপেশ গাঙ্গুলী। রানীকে তাগাদা দিলে। বললে—চলো, শীগ্‌গির, সব খাবার ফুরিয়ে যাবে, একটু পা চালিয়ে চলো। বড়োলোকের বাড়ি নেমন্তন্ন, অনেক লোক নেমন্তন্ন করেছে—

রানী বললে—আমাদের তো নেমন্তন্ন করেনি। শেষকালে যদি সন্দীপ চিনতে না পারে!

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—ইয়ার্কি নাকি। আমার নিজের বউদির শ্রাদ্ধ, আমার হক আছে নেমন্তন্ন খাবার। আমরা হলুম জ্ঞাতি। আমাদের যদি যেতে না দেয় তো মামলা করবো না? দেখি কী করে তাড়ায়। এত খরচপত্তর করে এলুম। চলো চলো, একটু পা চালিয়ে চলো, শেষকালে সব খাবার ফুরিয়ে যাবে।
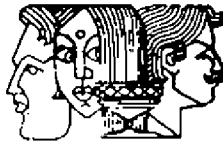
—সন্দীপবাবু আছেন, সন্দীপবাবু?

লোকটা আরও অনেকবার এসেছে সন্দীপের কাছে। যখনই লোকটার কিছু টাকার দরকার হয় তখনই লোকটা সন্দীপের কাছেই এসেছে। মাঝখানে অনেক বছর আর টাকার দরকার হয়নি তার। ঐ-রকম একটা লোক শুধু নয়। টাকা চাইবার আরও অনেক লোক আছে সন্দীপের জীবনে।

মা বলতো—কী রে, লোকটা কী করতে এসেছিল তোর কাছে?

সন্দীপ বলতো—টাকা চাইতে—

—দিলি তুই টাকা?

সন্দীপ বলতো—কী বলবো, লোকটার খুব অভাব যে! দিলুম পাঁচটা টাকা।

—এ মাসটা তুই চালাবি কী করে? টাকা তো আর নেই হাতে।

সন্দীপ বলতো—একটু কষ্ট করে চালিয়ে নাও, আর ক'দিন পরেই তো নতুন মাস পড়ছে। তখন হাতে নতুন মাসের মাইনে পাবো।

মা বলতো—বিপদ-আপদ হলে তো কিছু টাকা জমিয়ে রাখতে হয়। তখন তো অন্য কারও কাছে হাত পাততে পারবি না। তুই যা লাজুক—

মানুষ এই পৃথিবীতেই স্বর্গ তৈরি করতে চায়। তাই সে তার সব কিছু দিয়ে মন্দির তৈরি করে, মসজিদ তৈরি করে, গীর্জা তৈরি করে। ভাবে ওইগুলোই স্বর্গ। তাই সে কত কষ্ট সহ্য করে পাহাড়ে ওঠে মন্দিরে প্রণাম করবার জন্যে, মন্দিরের দেবতাকে পুজো দেবার জন্যে।

কিন্তু স্বর্গ তো কোথাও নেই। তিনি বলেছেন, তোমাদের নিজেদের মধ্যেই স্বর্গ তৈরি করতে হবে। মানুষের সংসারেই তাঁকে আসতে হবে। তাহলে এই সংসারই স্বর্গ হয়ে উঠবে। মা শুনে বলতো—তাহলে মানুষ তীর্থ করতে পুরী-বৃন্দাবন-মথুরাতে অত পয়সা খরচ করে অত কষ্ট করে যায় কেন?

সন্দীপ বলতো—ভুল করে।

মা ছেলের কথা বিশ্বাস করতো না, পছন্দও করতো না।

লোকটা জানতো, সংসারে টাকা চাইলেই যার কাছে কিছু-না-কিছু পাওয়া যেত সে হলো বেড়াপোতার সন্দীপ। তাই দরকারের সময়ে তার কাছেই আসতো।

তাই অনেক দূর থেকে সেদিনও এসেছে সন্দীপের খোঁজে। তাই বাড়ির বাইরে থেকে ডাকছিল—সন্দীপবাবু আছেন? সন্দীপবাবু—

পাড়ার কতকগুলো ছেলের নজরে পড়তেই তারা বলে উঠলো—কাকে ডাকছেন, সন্দীপকে?

লোকটা বললে—হ্যাঁ—

—তিনি তো নেই এখানে!

—তিনি নেই তো তাঁর বিধবা মা তো আছেন।

ছেলেরা বললে—সন্দীপদার মাও নেই, মা তো মারা গেছেন। মা যেতেই সন্দীপদা বাড়ি ছেড়ে কলকাতায় চলে গেছেন।

—কলকাতায় চলে গেছেন?

—তাঁর ব্যাঙ্কে যান না। তিনি তো কলকাতার ব্যাঙ্কে চাকরি করেন। ন্যাশন্যাল ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের শ্যামবাজার ব্রাঞ্চের ম্যানেজার।

—বাড়ির ঠিকানা?

ছেলেরা বললে—নেবুবাগান লেন। পাঁচ নম্বর।

ভদ্রলোক আর দাঁড়ালো না। এই ক'বছরে কত কী বদলে গেল। বরাবর বেড়াপোতা থেকে সন্দীপ ডেলি-প্যাসেঞ্জারি করেছে। এখন মা নেই তাই বেড়াপোতার বাড়ি ছেড়ে দিয়ে কলকাতার বাসিন্দা হয়ে গেছে। বোধহয় বিয়ে-থাও করেছে।

লোকটা আর দাঁড়ালো না। সকালবেলার দিকে আর একটা কলকাতার ট্রেন আছে। তাইতে গেলে টিফিনের আগে পৌঁছে যাবে সে।

তা বেড়াপোতা থেকে বাগবাজারের নেবুবাগানে যেতে বেশি সময় লাগে না। লোকটা যখন ঠিকানা খুঁজে খুঁজে নেবুবাগান লেনে পৌঁছোল তখন ঠিকানা খোঁজাই দায় হয়ে উঠলো। কেবল গলি আর গলি। শেষ পর্যন্ত পাড়ার লোকের সাহায্যে যদিই বা পাওয়া গেল তখন বিকেল পেরিয়ে যায় যায়। বাইরে একটা কাদের গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে। দেখে মনে হয় কোনও বড়লোকের গাড়ি। সামনের সীটে ড্রাইভার বসে আছে। লোকটা তাকেই জিজ্ঞেস করলে—এইটেই ভাই পাঁচ নম্বর নেবুবাগান লেন?

লোকটা বললে—হ্যাঁ—আপনি দরজার কড়া নাড়ুন—

লোকটা দরজার কড়া নাড়াতে লাগলো—সন্দীপবাবু বাড়ি আছেন? সন্দীপবাবু?

ভেতর থেকে কে একজন মেয়েলী গলায় জিজ্ঞেস করলে—কে?

সন্দীপের মা তো মারা গেছে। তাহলে মেয়েলী গলাটা কার?

—আমি সন্তোষ!

সঙ্গে সঙ্গে দরজার পাল্লা দুটো খুলে গেল। যে-মহিলাটি দরজা খুলে দিলে তাকে দেখে সন্তোষ অবাক হয়ে গেল। একেবারে অচেনা মুখ। মহিলাটি সন্তোষকে চিনতে পারলে না। জিজ্ঞেস করলে—কাকে চাই?

—আমি সন্দীপ লাহিড়ী মশাইকে চাই—

মহিলাটি বললে—সন্দীপ লাহিড়ীর এখন অসুখ। তিনি এখন দেখা করতে পারবেন না। পরে আসবেন—

সন্তোষ বললে—আপনি একবার দয়া করে তাঁকে বলুন যে সন্তোষ এসেছে। আমি অনেক আশা করে অনেক পয়সা খরচ করে এসেছি। একবার দেখা করে একটা কথা বলেই চলে যাবো—

ভেতর থেকে সন্দীপের গলা শোনা গেল। বললে—কে? সন্তোষ? এসো, এসো! আমার শরীরটা খারাপ চলছে ক'দিন ধরে। বিশাখা, ওকে ভেতরে আসতে দাও, ও আমার চেনা লোক—

বিশাখা বললে—কিন্তু ডাক্তারবাবু যে তোমাকে চুপচাপ শুয়ে থাকতে বলেছে—

সন্দীপ বললে—তা বলুক, সন্তোষ আমার চেনা লোক। ওর টাকার দরকার হয়েছে, তাই এসেছে। ওকে দরজা খুলে দাও। ও আসুক—

সন্তোষ ঘরের ভেতরে এসে সন্দীপ লাহিড়ীর পায়ে হাত দিয়ে মাথায় ছুঁলো।

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—তোমার বাড়ির খবর কি?

সন্তোষ বললে—ভালো নয়—ছোট ছেলেটার টাইফয়েড হয়েছে—

—কতো টাকা তোমার দরকার?

সন্তোষ বললে—টাকা পঁচিশেক হলেই এখন চলে যাবে।

—আর ট্রেন ভাড়া? তোমাকে তো ট্রেনে করে বাড়ি ফিরে যেতেও হবে?

—হ্যাঁ, তা তো হবেই।

—তাহলে পঁচিশ টাকাতে কী করে হবে? পঞ্চাশ টাকার কমে হবে না। দাও তো বিশাখা, আমার পকেট থেকে পঞ্চাশ টাকা বার করে সন্তোষকে দাও তো—

বিশাখা কী আর করবে। বললে—পঞ্চাশ টাকা দিলে পকেটে থাকবে কী?

সন্দীপ শুয়ে শুয়েই বললে—সে যা হয় তখন দেখা যাবে। এখন সন্তোষের ছেলে তো ভালো হয়ে উঠুক। আর ক'দিন পরেই তো আমার মাইনে হবে, কিন্তু সন্তোষ তো চাকরি করে না। আগে ওর দরকার—

বিশাখা সন্দীপের জামার পকেট থেকে পার্স বার করে পঞ্চাশটা টাকা সন্তোষকে দিলে। টাকা ক'টা পেয়ে সন্তোষ আবার সন্দীপের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে মাথায় ঠেকালো। সন্দীপ বললে—এর পর থেকে ছেলেকে একটু ভালো খেতে দেবে। আর জল ফুটিয়ে খাওয়াবে। এই দেখ না, আমি কলকাতায় থেকেও জল ফুটিয়ে খাই। কেন ফোটাই? কারণ আমার কেউ নেই। আমি কারো কাছে গিয়ে টাকার জন্যে হাত পাতবো এমন কোনও সন্দীপ নেই পৃথিবীতে। আমার কথা ভাববার কেউ নেই। এক মা ছিল তা সেই মা-ও মারা গেল হঠাৎ।

সন্তোষ তখন টাকা পেয়ে গেছে। সে আর দাঁড়ালো না, চলে গেল। বিশাখা বললে—এই রকম করে টাকা বিলিয়ে দিলে তোমার কী করে চলবে সন্দীপ? শুধু একটা চাকরি তো তোমার ভরসা—

সন্দীপ বললে—আমার একটা পেট কোনও রকমে চলে যাবে—

বিশাখা বললে—কিন্তু এই রকম অসুখ-বিসুখ হলে চাকর কী করে দেখবে তোমাকে?

সন্দীপ বললে—আমার জীবনের আর দাম কী বলো? গেলেও যা থাকলেও তাই—

—ও-কথা বোল না। জীবন অতো সস্তা নয়।

সন্দীপ বললে—আমার জীবন সস্তা। আমার জীবনের কোনও দামই নেই কারো কাছে। আমি চলে গেলে আরো একটা লোক চাকরি পাবে ব্যাঙ্কে—

—কিন্তু সে কি তোমার মতো হবে?

সন্দীপ বললে—পৃথিবীতে কি কেউ কারোর মতো হয়?

—এই দেখ না, কোথাকার কোন সন্তোষ, তার ছোট ছেলের অসুখ, আর কোথায় কত দূর থেকে এসে তোমার কাছে পঞ্চাশটা টাকা ধার করে নিয়ে গেল। ও-টাকা কি আর ও শোধ দিতে পারবে?

সন্দীপ বললে—কেউ কি কারোর ধার শোধ দিতে পারে?

—কেউ শোধ দেয় না?

সন্দীপ বললে—তুমিই কি শোধ দিয়েছ?

বিশাখা বললে—আমি কবে তোমার কাছে কি ধার করেছি?

—সে তুমি ভেবে দেখ।

বিশাখা বললে—আট-দশ বছর আগেকার কথা কি মনে থাকে?

সন্দীপ বললে—যারা মনে রাখতে পারে না তারা নিরাপদ। তাদের স্বাস্থ্য ভালো থাকে।

বিশাখা বললে—আমি কিন্তু তোমার সঙ্গে আজ ঝগড়া করবো না। এই আট-দশ বছর যে আমার কী ভাবে কেটেছে তা যদি তুমি জানতে পারতে?

সন্দীপ বললে—জানি না বলতে চাও? তোমার সঙ্গে দেখা হয়নি বটে কিন্তু আমি একলা-একলা সব খবর রেখেছি—

—কী খবর রেখেছ, বলো।

সন্দীপ বললে—তোমরা সেই বিডন স্ট্রীটের বাড়ি বিক্রি করে দিয়েছ।

—তাও জানো তুমি?

—জানবো না? আমি যে ছোটবেলায় সেই বাড়িতেই মানুষ হয়েছি। আরো জানি তোমার দিদি শাশুড়ী মারা গেছেন—

কথাটা শুনে বিশাখার চোখ দুটো আবার ছলছল করে উঠলো। দিদি শাশুড়ীর মৃত্যুর খবরটা শুনেই সমস্ত কথা নতুন করে যেন তার মনে পড়ে গেল। বললে—তিনি ছিলেন বাড়ির লক্ষ্মী। তিনি চলে যেতেই সব তছনছ হয়ে গেল। কোথা থেকে যে কী হয়ে গেল তা আর টের পেলুম না।

—তোমাদের নতুন বাড়িটা ভালো?

বিশাখা বললে—তুমি তো একবার দেখতে গেলেও না।

—যাবো কী করে বলো? মা চলে যাওয়ার পর যে একেবারে অনাথ হয়ে গিয়েছি। ওই রতনই ভরসা। রতন নতুন এসেছে, কতো দিক সে দেখবে? তার ভরসায় বাড়ি খালি রেখে যেতেও পারি না। তা তুমি তো মাঝে মাঝে আসতে পারো।

বিশাখা বললে—আমারও তো সেই একই দশা। ঝি-এর হাতে ভরসা করে তো বাড়ি ছেড়ে আসতে পারি না। আগে বিন্দু ছিল সুধা ছিল, কালিদাসী ছিল। কতো ঝি ছিল বিডন স্ট্রীটের বাড়িতে। তাদের মাইনে দিয়ে রাখতে পারার মতো ক্ষমতা নেই আর এখন। এখন নিজের হাতে আমাকে রাঁধতে হয়। যা কিছু আমার ছিল সব হামিদকে যোগাতে যোগাতেই শেষ হয়ে গেল—

—আর ইন্দোরে মুক্তিপদবাবুর খবর কী?

—তাঁদের আর কোনও খবর নেই। ফ্যাক্টরিও বন্ধ হয়ে রয়েছে আজ আট-দশ বছর। একটা টাকাও সেখান থেকে আসে না। তাঁরাও আর কিছু খবর রাখেন না—

—তাহলে গাড়িটা রেখেছ কেন? ও হাতিটা পুষে কী লাভ?

বিশাখা বললে—ভালো দর পেলেই বেচে দেব।

তারপর বললে—হঠাৎ তোমার অসুখ হলো কেন?

—একটা বাসের ধাক্কা লেগে পড়ে গেলুম যে। শুনলাম রাস্তার কতকগুলো ছেলে আমাকে তুলে নিয়ে হাসপাতালে দিয়ে এসেছিল। সেখানে প্রায় একমাস শুয়ে থাকতে হয়েছিল। তবে ভাগ্য ভালো যে হাড়-টাড় ভেঙে যায়নি। তা হলে আর দেখতে হতো না। মরেই যেতুম একেবারে।

—ও কথা বোল না। তুমি চলে গেলে, আমাকে কে দেখবে? তুমি ছাড়া আমার যে আর কেউ নেই। এক ছিল মা, সেও নেই এখন।

—কেন? তোমার কাকা? তপেশ গাঙ্গুলী? তাঁর কাছে গিয়ে তো থাকতে পারো?

বিশাখা বললে—তাঁকে তো তুমি চেনো, তাঁর কথা বলছো কী বলে? সংসারে টাকা ছাড়া তিনি আর কী বোঝেন? আমার বাড়িতে তিনি অনেকবার এসেছেন আমাকে তাঁদের মনসাতলার বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। তার মানে আমার কাছে আগেকার মতো অনেক টাকা আছে এইটেই তিনি ভেবেছেন।

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—সত্যিই তোমার কাছে এখন আর আগেকার মতো টাকা নেই?

বিশাখা বললে—টাকা থাকবে কী করে তুমিই বলো? আমি তো চাকরি-বাকরি কিছু করি না। কোম্পানীর যত দিন ডিরেক্টর ছিলুম তত দিন আমার কাছে লাখ-লাখ টাকা থাকতো। তা সবাই জানে। কিন্তু জেলখানাতে কর্তার কাছে হাজার হাজার টাকা পাঠাতেই সে-সব টাকা ফতুর হয়ে গেল। হামিদকে কি কম টাকা দিয়েছি এই ক'বছরে? কখনও সত্তোর হাজার, কখনও আশী হাজার, কখনও এক লাখ। যতো হীরের গয়না, জড়োয়া গয়না ছিল সব বিক্রি করে ফেলতে হলো। বাকি টাকা যা কিছু ছিল তাই দিয়ে একটা পুরনো বাড়ি কিনে তাতেই আমি কোনও রকমে—

তারপর অনুযোগের সুরে বললে—তুমি তো আর কোনও খবরই রাখো না আমার—

সন্দীপ বললে—খবর রাখবার কি সময় পাই? মাসিমার ক্যানসারের চিকিৎসার জন্যে টাকার যোগাড় করতে করতেই ফতুর। তারপর নিজের মায়ের অসুখ গেল। এ ক'টা বছর যে কী করে কেটেছে তা আমি জানি আর করমচাঁদজীই জানে।

তারপর জিজ্ঞেস করলে—তুমি আমার এ-বাড়ির ঠিকানা জানলে কী করে?

—বেড়াপোতায় গিয়ে।

—তুমি বেড়াপোতায় গিয়েছিলে?

—না গেলে এই নেবুবাগান লেনের ঠিকানা জানলুম কী করে? সেখানে গিয়েই শুনলুম তুমি এই ঠিকানায় বাড়ি ভাড়া নিয়েছ।

সন্দীপ বললে—বাড়ি ভাড়া না নিয়ে করবো কী! পৈতৃক বাড়িটা আর রাখতে পারলুম না, দেনার দায়ে মা'র মৃত্যুর পর বিক্রি করে দিতে হলো।

—বাড়ি বিক্রি করে দিলে?

—হ্যাঁ, দিলুম। তোমাদের অতো বড় বাড়ি বিক্রি করে দিলে টাকার অভাবে আর আমারও তাই! এখন এই কলকাতাতেই ভাড়াটে হয়ে আছি।

—তোমার তবু চাকরি আছে একটা, আর আমার তাও নেই। তোমার ঠিকানাটা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি—কিন্তু এসে যা কান্ড দেখছি এর পরে তো আর বাড়ি ফিরে যেতেও ইচ্ছে করছে না—

সন্দীপ বললে—আমার কথা ভেবো না। আমি একটা মানুষ বেঁচে থাকলেই বা কী আর মারা গেলেই বা কী? আমি মারা গেলে কাঁদবারও কেউ থাকবে না।

—ও-কথা বোল না। আমারই বা কে আছে?

সন্দীপ বললে—তোমার তো তবু স্বামী আছেন। আমার কে আছে বলো?

বিশাখা বললে—তাকে কি থাকা বলে?

—থাকা বলে না?

—তুমি তো জানো সব। জেনেও ও-কথা বলছো?

সন্দীপ বললে—তবু ইচ্ছে করলেই তো তাঁর সঙ্গে তুমি দেখা করতে পারো।

—আমি তো দেখা করি না।

—কেন?

—দেখা করলেই তো ওই কেবল একটাই কথা—টাকা। টাকা ছাড়া মুখে মানুষটার অন্য কোনও কথা নেই। কেবল টাকা চাইবেন—

—অতো টাকা নিয়ে কী করবেন তিনি?

—কী আর করবেন, মদ খাবেন। তা আমার কি টাকার গাছ আছে যে গাছ থেকে পাড়বো আর দেব?

—জেলখানায় কি মদ খেতে দেয়? শুনেছি তো বাইরে থেকে কোনও কিছুই আনতে দেওয়া হয় না।

বিশাখা বললে—আমিও তো তাই জানতুম। কিন্তু সব কিছুই বাইরে থেকে আনতে পারা যায়। শুধু পয়সা খরচ করতে পারলেই হলো।

—যাক্, আর তো বেশি দিন নেই, এবার তো ছাড়া পাওয়ার টাইম হলো।

বিশাখা বললে—সেই জন্যেই তো খুব ভাবনায় পড়েছি—

—কেন?

বিশাখা বললে—বাড়িতে এলে তো কারো কথাই শুনবেন না—

—কিন্তু টাকা? তুমি তো বলছো তোমাদের টাকার আমদানি নেই। ইন্দোর থেকে টাকা আমদানি বন্ধ হয়ে গিয়েছে—

বিশাখা বললে—মাতাল কি কখনো মদের নেশা ছাড়তে পারবে?

সন্দীপ বললে—নেশাখোর লোক টাকার অভাবে বাজারে কাবুলিওয়ালার কাছে টাকা ধার করবে!

বিশাখা বললে—সবই তো বুঝি! কী করবো বুঝতে পারছি না। তাই ভাবছি যতো দিন তিনি জেলখানায় আছেন ততোদিনই শান্তিতে আছি। বাড়ি ফিরে এলে কী যে হবে তাই ভাবছি—

সন্দীপ বললে—তোমার একটু শক্ত হওয়া উচিত।

বিশাখা বললে—আমি কি শক্ত হইনি বলতে চাও?

—শক্ত হলে হামিদকে টাকা দাও কেন?

বিশাখা বললে—আজকাল হামিদকে সত্যি কথাই বলে দিয়েছি। বলেছি, আমার হাতে টাকা নেই।

—হামিদ তোমার কথা শোনে?

—শোনে না তো। হল্লা করে। হল্লার ভয়ে কিছু কিছু দিতে হয়। জেলখানার লোকগুলো যে কতো খারাপ হয় তা হামিদকে দেখেই বোঝা যায়।

সন্দীপ এ-কথার কোনও জবাব দিলে না। বিশাখা বললে—থাক্ গে, এ-সব কথা তিনি যখন আসবেন তখন ভাববো। আগে থেকে সে-কথা ভেবে কী লাভ। গাড়িটা না-হয় তখন বেচে দেব। গাড়ি চড়া অভ্যেস হয়ে গিয়েছে হঠাৎ সেটা ছাড়তেও কষ্ট হবে খুব।।

তারপর বললে—আমি এবার আসি।

—সময় পেলে মাঝে মাঝে এসো।

বিশাখা বললে—আসতে তো সব সময়েই ইচ্ছে করে। বাড়িতে কাজের লোকটাকে রেখেছি, কিন্তু দু'জনের রান্না ছাড়া আর তার কোনও কাজ নেই। সেও চুপ করে বসে থাকে, আমিও তাই। ভাগ্যিস খবর পেলাম যে তুমি এ-বাড়িতে আছ তাই এলুম. তবু

জন্যেই মানুষ টাকা চায়, বাড়ি চায়, সন্তান চায়। যাতে বার্ধক্যের দিনে সে আশ্রয় পায়, খেতে পায়, মৃত্যুর সময়ে সেবা পায়।

কিন্তু সন্দীপ এইটে ভেবেই অবাক হয়ে গিয়েছিল যে সেদিন মল্লিক-কাকার সেই আদিম কামনাটাও কি থাকতে নেই?

—তারপর?

বিশাখা গোড়া থেকেই সব কথাগুলো শুনেছিল। সন্দীপ বললে—তারপর তোমাদের বারোর-এ নম্বর বাড়িটা বিক্রি হয়ে গেল। সম্পত্তি বিক্রি হয়ে ভাগাভাগি হয়ে গেল। এখন মল্লিক-কাকারও চাকরি চলে গেল। আমি তখন তাঁকে বেড়াপোতাতে আমার বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তুললুম। তোমার মা তখন মারা গিয়েছেন। বাড়িতে আমার মা আর মল্লিক-কাকা দু'জনকেই দেখাশোনা করতে লাগলুম। দু'জনেই বুড়ো মানুষ। দু'জনেই এক-দিন মারা গেলেন। প্রথমে আমার মা আর তারপর মল্লিক-কাকা। তাঁদের শেষ দিন পর্যন্ত আমি সেবা করে এসেছি। ঠিক যেমন করে সেবা করে এসেছি মাসিমাকে। মানে তোমার মাকে...

বিশাখা হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে—আমার মা'র শেষ পর্যন্ত কী হয়েছিল?

সন্দীপ বললে—ক্যানসার। ডাক্তাররা অন্ততঃ তাই-ই বললে—

বিশাখা বললে—শুনেছি সে তো ভীষণ যন্ত্রণার রোগ।

সন্দীপ বললে—মাসিমার যে সে কী ভীষণ কষ্ট হতো তা তোমাকেও জানাইনি, পাছে তুমি কষ্ট পাও—

—সে চিকিৎসার তো অনেক খরচ! কোথা থেকে সে-খরচের টাকা পেলে তুমি?

সন্দীপ বললে—আমার ব্যাঙ্ক থেকে টাকা ধার করেছিলাম। সে ধার এখনও শোধ করে চলেছি। সবটা শোধ হয়নি এখনও—

—কোথায় ক্যানসার হয়েছিল?

—প্রথমে পায়ে। তারপর সেই ক্যানসার পা থেকে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়েছিল। সে-চিকিৎসার খরচ কি কম? প্রথমে তো মল্লিক-কাকা তোমার বিয়ের দিনে কথা দিয়ে-ছিলেন দু'তিন লাখ টাকা যা খরচ লাগবে তা তোমার দিদিশাশুড়ী দেবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমার কথা সবাই ভুলে গিয়েছিল। আর সব চেয়ে আশ্চর্য তুমি নিজেও তখন তোমার দিদিশাশুড়ীকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলে—

বিশাখার চোখ দু'টো জলে ভরে এলো। বললে- আমায় তুমি ক্ষমা করো সন্দীপ! তখন যে আমার কী-রকম ভাবে দিন কেটেছে তা কেবল আমিই জানি, আর একজন জানতেন—তিনি তোমার মল্লিক-কাকা—এখন তিনি নেই। তাই সে-সব কথা জানি আমি একাই—

তারপর একটু থেমে বললে—আমার মা'র জন্যে সত্যিই তোমার কতো টাকা দেনা হয়েছে বলো না—

সন্দীপ সোজাসুজি মুখ তুলে চাইলে বিশাখার দিকে। কিন্তু কিছু বললে না। বিশাখা আবার বললে—সত্যি বলো না, কতো টাকা তোমার দেনা হয়েছিল মা'র অসুখের জন্যে?

সন্দীপ বললে—কেন? তুমি কি সেই দেনা শোধ করে দেবে নাকি?

বিশাখা বললে—একসঙ্গে না পারি, কিছু কিছু করে কিস্তিতে শোধ করতে চেষ্টা করতে পারি।

সন্দীপ রেগে গেল। বললে—আর কাটা ঘায়ের ওপর নুনের ছিটে দিতে যেও না।

বিশাখা বললে—না না, তুমি ও-কথা বোল না। শুধু বলো আমার মা'র জন্যে তোমার কতো টাকা দেনা হয়েছে।

সন্দীপ বললে—তুমি তোমার ঋণের টাকা শোধ করতে চাও?

বিশাখা বললে—ঋণ বলছো কেন? তোমার বিপদে আমি শুধু একটু সাহায্য করতে চাই—

সন্দীপ বললে—মাসিমার রোগের চিকিৎসা করেছি কি আমি তোমার কথা ভেবে? আমি ভেবে নিয়েছিলাম তোমার মা'র বিপদ মানে আমার নিজের মা'র বিপদ! আমি তো তোমাকে কখনও পর মনে করিনি।

বিশাখা বললে—এটা তোমার মহানুভবতা।

সন্দীপ বললে—না, এ মহানুভবতা নয়, মানবতা। আমি এইটেই করমচাঁদ মালব্যজীর কাছ থেকে শিখেছি। যাঁর কথা তোমাকে বলছিলুম। কিন্তু সে-কথা যাক, তুমি আমার এই ঠিকানা পেলে কী করে?

—বললুম তো বেড়াপোতাতে আমি গিয়েছিলুম তোমার খোঁজে। সেখান থেকেই তোমার কলকাতার ঠিকানা জানতে পেরেছি। তোমার ব্যাঙ্কেও যাওয়ার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু বেড়াপোতাতে যাওয়ার একটু দরকার ছিল।

—কেন?

—ভেবেছিলুম ব্যাঙ্কে গেলে তোমার কাজের ভিড়ের মধ্যে মনের কথাগুলো তো মন খুলে বলা যাবে না। তাই একটা ছুটির দিন দেখে তোমাদের বেড়াপোতাতেই গিয়েছিলাম।

সন্দীপ বললে—বলো না তোমার মনের কথাগুলো কী?

—মনের কথা কী হতে পারে তুমি বুঝতে পারো না?

সন্দীপ বললে—আমি কী করে বুঝবো?

—যদি বুঝতেই না পারবে তাহলে যখন রাসেল স্ট্রীটের বাড়ি থেকে আমাদের তাড়িয়ে দেওয়া হলো তখন আমাদের খিদিরপুরের মনসাতলা লেনের বাড়িতে ফেরত না পাঠিয়ে দিয়ে তোমাদের বেড়াপোতার বাড়িতে নিয়ে তুলেছিলে কেন? সেটা কি শুধু পরোপকার? আর কিছু নয়?

—আর কী হতে পারে?

বিশাখা বললে—সেই জবাবটা কি তুমি আমার মুখ থেকেই শুনতে চাও?

হঠাৎ কথার মধ্যিখানে বাধা পড়লো।

—কী, কেমন আছো আজ?

বলে করমচাঁদ মালব্যজী ঘরে ঢুকলেন।

সন্দীপ বললে—আজ একটু ভালো।

—পায়ের ব্যথাটা?

সন্দীপ জবাব দেবার আগেই মালব্যজী বিশাখার দিকে চাইলেন। চেয়ে দেখেই চোখ দুটো বিশাখার ওপর আটকে রইল। সন্দীপ বললে—ইনি হচ্ছেন বিশাখা মুখার্জি, আমার অ্যাক্সিডেন্টের খবর পেয়ে আমাকে দেখতে এসেছেন—

মালব্যজী বললেন—আমি যেন এঁকে আগে কোথায় দেখেছি বলে মনে হচ্ছে—

তারপর নিজেই বললেন—হ্যাঁ, মনে পড়েছে। সেই নার্সিং হোমে যেখানে তোমার চিকিৎসা হচ্ছিল। ইনি তোমার জন্যে উপোস করে ছিলেন। ক'দিন কিছুছু খাননি। নার্সদের কোয়ার্টারে একলা থাকতেন—

বিশাখা লজ্জায় মাথা নিচু করলে।

মালব্যজী আবার বললেন—এঁরই সঙ্গে তো তোমার বিয়ের কথা হয়েছিল?

সন্দীপ বললে—হ্যাঁ, আপনি তো সবই জানেন। আপনাকে তো সবই বলেছিলুম।

—এঁরই মা'র ক্যানসারের চিকিৎসার জন্যে তো তোমার অনেক টাকা লোন হয়ে গেল!

সন্দীপ এ-কথার কোনো জবাব দিলে না।

—এঁর তো অন্য লোকের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গিয়েছে, না?

এ-কথার কীই বা জবাব হতে পারে!

কিছুটা সময় কাটলো। কিন্তু কিছুদিন পরেই ভালো হয়ে উঠলে তুমি তো আবার অফিসে যেতে শুরু করবে। তখন আমার সময় কী করে কাটবে!

—আমার কি সারাদিনই অফিস বলতে চাও? সন্ধ্যেবেলায় তো বাড়িতে থাকবো।

—তুমি যদি বলো তাহলে কখন তোমার কাছে আমি আসতে পারি।

সন্দীপ বললে—ইচ্ছে হলে তুমি যখন-তখন আসবে। আমি বাড়িতে না থাকলেও আসতে পারো। রতনকে তো তুমি চিনে গেলে। সেও তোমাকে চিনে গেল। তুমিও একলা—আমিও একলা। কোনো বাধা নেই কোনও দিক থেকে। তোমার দিদি-শাশুড়ী নেই। তোমার কর্তা থেকেও নেই। এখন তো আমরা স্বাধীন। আমরা দু'জনে যা ইচ্ছে করতে পারি, যখন ইচ্ছে দেখা করতে পারি। পারি না?

—হ্যাঁ, তা তো পারি। কিন্তু সিঁথিতে সিঁদুর দিয়ে তাঁর সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে, সে-কথা ভুলে যাচ্ছো কেন?

সন্দীপ বললে—তোমার সঙ্গে মিশে আমি যা ইচ্ছে তাই করবো, এ-কথা তোমাকে কে বললে? আমার কি কোনও কান্ড-জ্ঞান নেই?

বিশাখা বললে—তা আছে বলেই তো আমি এমন নিঃসঙ্কোচে তোমার ঠিকানা খুঁজে এসেছি। নইলে কি আসতুম?

সন্দীপ বললে—তুমি যে পরের স্ত্রী তাও আমি জানি। আর সেই জন্যেই একটা কথা নিঃসঙ্কোচে বলতে চাই। বলবো?

—বলো?

সন্দীপ বললে—তোমার আর্থিক অবস্থা তো আমি জানি। আর তুমিও জানো আমার আর্থিক অবস্থা। যদি কখনও তোমার টাকার দরকার হয় তা আমাকে বলতে সঙ্কোচ কোর না।

বিশাখা বললে—আজ চোখের সামনেই তো দেখলুম কে একজন লোক তোমার কাছে এসে ধার চেয়ে নিয়ে গেল।।

সন্দীপ বললে—তোমার ভুল ধারণা। ধার নয়, দান—

—কিন্তু এ-রকম করে দান করলে যে একদিন ফতুর হয়ে যাবে!

সন্দীপ বললে—যতোদিন আছে দিয়ে যাই। জানো দেশের মানুষগুলো বড়ো অভাবী। যে-ভাবে জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে তাতে তাদের তেমন দোষও দেওয়া যায় না—

—কিন্তু এদের মধ্যে কি সবাই সৎ?

সন্দীপ বললে—সৎ বলে মেনে নেওয়াই স্বাস্থ্যকর। তাতে মনের শান্তি বজায় থাকে।

—কিন্তু এ-রকম বিচার না করলে যে একদিন তোমাকে পয়সার অভাবে রাস্তায় দাঁড়াতে হবে।

সন্দীপ বললে—আমার পয়সার কি কম অভাব ভাবছো? আমার ব্যাঙ্কে একটা টাকাও নেই—

—সে কি, তুমি ব্যাঙ্কের ম্যানেজার আর ব্যাঙ্কে তোমার টাকা নেই, বলছো কী তুমি?

সন্দীপ বললে—শুধু তুমি নও, কেউ-ই কথাটা বিশ্বাস করে না। জানে একমাত্র আমার একজন শুভাকাঙ্ক্ষী করমচাঁদ মালব্যজী—

—তিনি কে?

—তাঁকে তো তুমি দেখেছো, আমার অসুখের সময়। তাঁরই আণ্ডারে আমি চাকরিতে ঢুকি। তিনিই বলতে গেলে আমাকে মানুষ করেছেন। তিনি আমার অভিভাবক—

বিশাখা বললে—তিনিই বলে দিয়েছেন সকলকে টাকা দিতে?

—না, বলেছেন দেওয়াটাই হচ্ছে প্রেম আর নেওয়াটা হচ্ছে স্বার্থপরতা। স্বার্থপর মানুষ মানুষ নয়—পশু। পশুরা কেবল নিতেই জানে, দিতে জানে না—

—সেই জন্যেই তুমি লোকটাকে টাকা দিলে?

—হ্যাঁ।

বিশাখা বললে—কিন্তু তোমার অভাবের সময়ে?

সন্দীপ বললে—আমার অভাবের সময়ে আমি উপোস করে মরবো!

বিশাখা বললে—মরতে তোমার ভয় করে না?

সন্দীপ বললে—মরতে আমার ভয় করবে কেন? আমার নিজের বলতে কে আছে যে আমার জন্যে কাঁদবে? আমি তো একলা মানুষ। মা যতোদিন ছিল অতোদিন মা'র জন্যে ভাবনা ছিল। এখন তো নির্ভয়।

—আমি?

সন্দীপ বললে—তুমি?

—হ্যাঁ, তোমার মতো আমারও তো কেউ নেই। মা চলে গেছে, দিদিশাশুড়ী মারা গেছেন। অতো বড়ো বাড়ি, অতো সম্পত্তি, সে-সব কিছুই নেই। ফ্যাক্টরিও নেই যে সেখান থেকে টাকা আসবে।

—এখনও ফ্যাক্টরি খোলেনি?

বিশাখা বললে—না, সে-ফ্যাক্টরি লক্-আউটের পর এখন বিক্রি হয়ে গেছে। আমার ভাসুর সেখানেই থাকেন। আর সম্পত্তি ভাগ হয়ে যাওয়ার পর তিনি সেখানেই থেকে গেছেন। আর কলকাতাতে আসেন না।

সন্দীপের জানা ছিল সে-সব দিনের কথা। সে কতোকাল আগের ঘটনা। এখনও সে-সব স্মৃতি জ্বলজ্বল করছে তার চোখের সামনে। মেজবাবুও এসেছিলেন মায়ের মৃত্যুর খবর শুনে। শোকের বাড়িতে যা হয় তাই হয়েছিল। কিন্তু তাতে তেমন আন্তরিকতা ছিল না। নিতান্তই যেন নিয়ম-রক্ষার ব্যাপার। খবর পেয়ে হাজার কাজের মধ্যেও সন্দীপ অনিমন্ত্রিত হয়েও সে-অনুষ্ঠানে গিয়েছিল। সব কিছুই দেখেছিল চুপ করে। সবচেয়ে শোচনীয় অবস্থা হয়েছিল মল্লিক-কাকার। ঠাকমা-মণি মারা যাওয়ার সময়েই মল্লিক-কাকা বুঝে নিয়েছিলেন যে তাঁরও আশ্রয় চিরকালের মতোই চলে গেল। তিনি তাঁর জীবন-যৌবন ইহকাল-পরকাল যা-কিছু সব মানুষের থাকে তা সবই দিয়েছিলেন এই মুখার্জি বাড়ির জন্যে। অথচ ভবিষ্যৎ বলতে তাঁর আর কিছু রইল না। মল্লিক-কাকার মুখের দিকে চেয়ে থেকেও কিছু বলতে পারেনি সন্দীপ মুখ ফুটে। মল্লিক-কাকাই শেষ-কালে জিজ্ঞেস করেছিলেন—কী দেখছো?

সন্দীপের চোখে তখন জল ছলছল করছে। মুখে কিছু বলতে পারছে না। চুপ করে কেবল কাকার দিকেই চেয়ে আছে।

মল্লিক-কাকা আবার জিজ্ঞেস করেছিলেন—কই, কিছু বলছো না যে?

সন্দীপ বলেছিলেন—আমি শুধু আপনার কথাই ভাবছি।

মল্লিক-কাকা বলেছিলেন—আমার কথা ভেবে কী হবে? ঠাকমা-মণি মারা গেলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে আমার আসক্তির বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়ে গেলুম। এইটেই তো বড়ো কথা—

মল্লিক-কাকার কথা শুনে সেদিন সন্দীপ প্রথমে খুব অবাক হয়ে গিয়েছিল। আসক্তির বন্ধন কেটে যাওয়াটা কি তাহলে মুক্তি? সেই বন্ধন যদি কেটেই গেল তাহলে মল্লিক-কাকা কোথায় আশ্রয় পাবেন? কেমন করে তাঁর পেট চলবে? কে তাঁকে তাঁর গ্রাসাচ্ছাদন যোগান দেবে?

সব মানুষের তো একই চিন্তা। কেবল ওই গ্রাসাচ্ছাদনেরই চিন্তা। সেই চিন্তার

তারপর সন্দীপের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন—আজ কেমন আছো তাই দেখতে এলুম—

সন্দীপ বললে—একটু ভালো—

—জ্বরটা গেছে?

—হ্যাঁ, ডাক্তারবাবু সকাল বেলাই এসে দেখে গেছেন। আজ ভাত খেতে বলেছেন!

মালব্যজী চেয়ারে বসেছিলেন। এবার উঠে দাঁড়ালেন। বললেন—উঠি, আজকে আবার আমার অনেক কাজ জমে আছে। কবে অফিসে জয়েন করছো?

—ডাক্তারবাবু বললেই জয়েন করবো।

মালব্যজী বললেন—এবার থেকে রাস্তায় চলবার সময়ে একটু সাবধানে চারদিকে দেখে শুনে চলবে। কলকাতায় আজকাল দিন-দিন গাড়ির ভিড় বাড়ছে, অথচ রাস্তা বড়ো হচ্ছে না সেই অনুপাতে। যাই, আবার একদিন আসবো—

বলে মালব্যজী চলে গেলেন। বিশাখা এতক্ষণ চুপ করে বসেছিল। এবার জিজ্ঞেস করলে—এঁরই কথা তুমি একটু আগে বলছিলে?

—হ্যাঁ, ইনিই আমায় শিখিয়েছিলেন দেওয়া-নেওয়ার তফাৎটা। ইনিই আমাকে বলেছিলেন মানুষ যখন নিজের আত্মীয়কে পর করে তখন সে পরের চেয়েও পর করে!

বিশাখা বললে- আমাকে তো ঠিক চিনতে পেরেছেন উনি! অতোদিন আগেকার কথা কী করে মনে রাখলেন!

সন্দীপ বললে—তোমার ব্যাপারটা যে আমি সবই ওঁকে বলেছি।

—সব বলতে গেলে কেন?

—বাঃ, উনি যে এখন আমার নিজের থেকেও আপন। ওঁকে বলবো না?

—তা বলে তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্কের কথাটা বলতে গেলে কেন?

সন্দীপ বললে—বারে, তুমি বলছো কী? আমি অতো টাকা ব্যাঙ্ক থেকে ধার করেছি দেখে উনিই যে একদিন জিজ্ঞেস করলেন—এত টাকা লোন নিচ্ছ কেন? তোমার সংসারে তোমার মা ছাড়া তো আর কেউ নেই, তাহলে এত টাকা কার জন্যে দরকার হয়? তখন আমাকে সবই বলতে হলো!

—আমাদের বিয়ে ভেঙে যাওয়ার কথাও বলেছ?

—বলবো না?

বিশাখা বললে—আমাদের বিয়ে কী রকম করে ভেঙে গেল, কেন ভেঙে গেল, সেই সব কথাও বলেছ?

—সব, সবই বলেছি। কোনও কথাই লুকোইনি!

বিশাখা খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বললে—আমার বড়ো লজ্জা করছে শুনে। তুমি সব কথা বলতে গেলে কেন? সব কথা না বললে চলতো না?

সন্দীপ বললে—কেন, লজ্জা কীসের?

বিশাখা বললে—লজ্জা হবে না। ফাঁসির আসামীর সঙ্গে বিয়ে হওয়াটা কি কেউ কল্পনা করতে পারবে?

সন্দীপ বললে—মালব্যজী সে-রকম মানুষ নন।

—কিন্তু সেই আমাকে এখানে তোমার কাছে দেখে কী রকম অবাক হয়ে গেলেন, ভাবো তো?

সন্দীপ বললে—কেন অবাক হতে যাবেন কেন? উনি তো জানেন যে তোমার স্বামী একদিন-না-একদিন জেল থেকে ছাড়া পাবেনই। তখন তোমরা দু'জনে সুখে-শান্তিতে সংসার করবে। তোমাকে বিয়ে করার জন্যে একজন মানুষের জীবন তো বেঁচে গেল; এটা কি কম পুণ্যের কথা!

—পুণ্য? তুমি বলছো কী?

সন্দীপ বললে—পুণ্য নয়?

বিশাখা বললে—তোমরা বাইরে থেকে ভাবছো পুণ্য! কিন্তু আমি তো ভুক্তভোগী! আমার কাছে এটা তো অভিশাপ!

—অভিশাপ? অভিশাপ কেন?

বিশাখা বললে—একে অভিশাপ বলবো না তো কী বলবো? যখন ও-বাড়িতে বিয়ে হলো তখন ভেবেছিলুম কতো টাকার মালিক আমি, আমার কতো চাকর-ঝি-ম্যানেজার, বড়ো বাড়ি আমার, কতো বড়ো ফ্যাক্টরির ডিরেক্টর আমি, তখন দু'দিনের মধ্যেই আমি সমস্ত কিছু ভুলে গেলুম। কিন্তু তারপর?

বলতে বলতে বিশাখা থেমে গেল। নিজের শাড়ির আঁচল দিয়ে নিজের চোখ দুটো মুছে নিলে। সন্দীপ বললে—থাক, আর বলতে হবে না।

বিশাখা বললে—তোমার সঙ্গে অনেক বছর বাদে দেখা হলো, এখন বলবো না তো কখন বলবো, কবে বলবো? যদি আর না বাঁচি—

সন্দীপ বললে—সবাই নিজের দুঃখটাকেই বড়ো করে ভাবে। ভাবে তার মতো আর দুঃখী আর বিশ্বভুবনে নেই। আবার এমন লোককেও দেখেছি যে ভাবে তার মতো সুখী মানুষ আর বিশ্বভুবনে নেই। আবার সেই সুখী মানুষকেই একদিন কাঁদতে দেখেছি। তুমি তো তোমার দুঃখের কথাই বলতে এসেছ। কিন্তু মনে রেখো পৃথিবীতে তোমার চেয়েও দুঃখী মানুষ আছে—

বিশাখা বুঝতে পারলে না সন্দীপের কথাটা। জিজ্ঞেস করলে—আমার চেয়েও দুঃখী মানুষ তুমি দেখেছ?

সন্দীপ বললে—হ্যাঁ, দেখেছি—

—কোথায় দেখেছ?

সন্দীপ বললে—কেন ,আমাকে দেখতে পাচ্ছ না?

—তুমি? তোমার কীসের দুঃখ? তুমি পুরুষ মানুষ। তুমি ব্যাঙ্কে মোটা মাইনের অফিসার...তোমার কিসের দুঃখ?

সন্দীপ বললে—সে দুঃখ তুমি বললেও বুঝবে না—

—তবু শুনি!

—তুমি বলছো আমি ব্যাঙ্কের মোটা মাইনের অফিসার। হ্যাঁ, আমি স্বীকার করছি আমি ব্যাঙ্কের মোটা মাইনের অফিসার। যখন ব্যাঙ্কে চাকরিতে ঢুকেছিলুম তখন আমার মাইনে ছিল দেড়-শো টাকা। দেড়-শো টাকাতেই চারজনের সংসার কোনও রকমে চালিয়ে নিতুম!. তাতেই আমি মাসিমার পীড়াপীড়িতে তোমাকে বিয়ে করতে রাজী হয়েছিলুম! কিন্তু তারপর?

—তারপরে কী?

সন্দীপ বললে—তারপরের কথা তো সবই তুমি জানো। আমার মুখে আর শুনতে চাইছো কেন? তারপর সেই তোমারই সিঁথিতে অন্য লোক সিঁদুর লাগিয়ে দিলে, তাও দেখলুম। তারপর তুমি তোমাদের ফ্যাক্টরির একজন ডাইরেক্টর হলে, অনেক টাকার মালিক হলে, তাও দেখলুম। যে-তুমি একদিন খিদিরপুরের মনসাতলার লেনের বাড়িতে বিধবা মায়ের কাছে চরম অবহেলায় মানুষ হচ্ছিলে তাও দেখেছি, আবার সেই তুমিই একজন কোটিপতি ফাঁসির আসামীকে বিয়ে করে রাজরানী হলে, তাও দেখলুম। আজ আবার সেই তোমাকেই এখন দেখছি। এখন শুনছি তোমার নাকি কেউ নেই, কেউ নাকি আর তোমাকে দেখে না। এখন শুনছি তুমি নাকি একেবারে একলা। সেই বারোর এ বিডন স্ট্রীটের বাড়ি ছেড়ে দিয়ে তুমি একটা ছোট বাড়ি কিনে একলা বাস করছো—

বিশাখা বললে—তুমি যা বলছো সবই সত্যি। আমি স্বীকার করছি তার এক বর্ণও মিথ্যে নয়—

সন্দীপ বললে—কিন্তু সারা জীবন তো তোমাকে একলা থাকতে হবে না। একদিন তো সৌম্যপদবাবু জেলখানা থেকে ছাড়া পাবেন। তখন? তখন তো একজন দেখা-শোনা

করবার লোক পাবে, কথা বলার মতো সঙ্গী পাবে। তখন?

বিশাখা বললে—শুনেছি খুব শীগ্‌গিরই নাকি তিনি ছাড়া পাবেন—

—তাই নাকি? তাহলে তো তোমার জীবন আবার সুখের হয়ে উঠবে। কে দিলে এ-খবরটা?

বিশাখা বললে—হামিদ—

সন্দীপ আর কিছুই বলল না। বিশাখা বললে—একদিন তো ঠাকমা-মণির অসুখের জন্যে প্যারোলে ছুটি নিয়ে এসেছিলেন, আর তারপর ঠাকমা-মণির শ্রাদ্ধের দিনেও এসে-ছিলেন। সে-দু'দিন যে কী-সব কাণ্ড করে গেলেন, তা কী বলবো—

—কী কাণ্ড?

বিশাখা বললে—কী আর কাণ্ড, ওই বোতল-বোতল মদ খাওয়া। সত্যি, লজ্জাও নেই, ঘেন্নাও নেই সে-জন্যে! জেলখানাতে গিয়েও নেশাটা ছাড়তে পারলেন না। অথচ আমি ভেবেছিলাম জেলখানাতে থাকতে থাকতে হয়তো নেশাটা ছাড়তে পারবেন!

—তা হামিদকে অতো টাকা দাও কেন? না দিলেই পারো!

বিশাখা বললে—আমি টাকা না-দেবার কে? টাকা তো ও'রই। ও'র টাকা আমি ও'কেই দিচ্ছি! হামিদ যে বলে মদ না-খেতে পেলে উনি জেলখানার ভেতরে ছটফট করেন। খাওয়া-দাওয়া সব বন্ধ করে দেন। তাই তো বাধ্য হয়ে টাকা দিই—

সন্দীপ বললে—তাহলে টাকা দিয়ে তো তুমি ও'র ক্ষতিই করো—

—কিন্তু কী করবো বলো। হাজার হোক আইনতঃ তাঁর সঙ্গেই তো আমার বিয়ে হয়েছে। তিনিই তো আমার স্বামী, তা তিনি জেলখানাতেই থাকুন আর জেলখানার বাইরেই থাকুন! আর তুমিই বলো না, তোমার যদি আমার মতো অবস্থা হতো তো তুমি কী করতে?

সন্দীপ এর কী-ই বা জবাব দেবে? শুধু বললে—যখন জেলখানা থেকে ছাড়া পেয়ে বাড়িতে আসবেন, তখন তুমি ও'র নেশাটা ছাড়াবার চেষ্টা করো—

—এতদিনের নেশা কি আর ছাড়তে পারে মানুষ!

সন্দীপ বললে—তুমি বুঝিয়ে বলবে। এ সমস্ত তোমার ওপর নির্ভর করবে!

বিশাখা বললে—দেখ, এও আমার বোধহয় কপাল। আমার দিদিশাশুড়ীর গুরুদেব আমার 'বিশাখা' নাম বদলে 'অলকা' নাম রাখতে বলেছিলেন। নাম বদলালে বোধহয় কপালটা ফিরতো! কিন্তু তা তো হয়নি। হয়নি বলেই বোধহয় এই দুর্ভোগ।

—এখনও তো তোমার নামটা বদলাতে পারো!

বিশাখা বললে—জীবনের অর্ধেকটা তো কেটেই গেল! এখন আর আশা করবার বয়স কি থাকে? এই রকম করেই বাকি জীবনটা কেটে যাবে মনে হয়। এই দশটা বছরে আমার সব আশা ভরসা নিঃশেষ হয়ে গেছে তা জানো?

সন্দীপ বললে—অতো সহজে হতাশ হতে নেই! হতাশ হওয়া পাপ। এ কথা মালব্যজী আমাকে শিখিয়েছেন। সৌম্যবাবু জেল থেকে ফিরে এলে তুমি নতুন জীবন ফিরে পাবে, এই আশা আমি করি।

বিশাখা বললে—তাহলে কি তুমি বলতে চাও আমি সুখী হবো?

সন্দীপ বললে—নিশ্চয়ই হবে? আমি বলে দিচ্ছি তুমি সুখী হবে। সৌম্যবাবু জেলখানা থেকে বেরিয়ে এলেই তাঁর অনুতাপ হবে। তখন তিনি নিশ্চয় অন্য রকম মানুষ হয়ে যাবেন! তুমি দেখে নিও—

—বলছো কী তুমি? যে-মানুষ জেলখানায় গিয়েও স্বভাব বদলাতে পারে না,

সন্দীপ বললে—নিশ্চয় বদলাবে। তুমি একটু চেষ্টা করলেই তা সম্ভব হবে—

বিশাখা বললে—যদি না বদলায়?

সন্দীপ বললে—তখন আমি বলবো। তখন তুমি আমাকে ডেকো, তখন আমি বুঝিয়ে বলবো—

—তুমি যাবে আমাদের বাড়ি?

—শরীর ভালো থাকলে নিশ্চয়ই যাবো।

—আমার ঠিকানা তো তোমাকে বলেছি। পাঁচ নম্বর ভুবন গাঙ্গুলী লেন—

—সে আমি ঠিক চিনে নেব।

বিশাখা বললে—এটা নতুন বাড়ি। যা কিছু টাকা আমার কাছে ছিল তাই দিয়েই আমি এই বাড়িটা কিনেছিলাম। তারপর যা কিছু ছিল সব জেলখানার হামিদ এসে চেয়ে নিয়ে চলে গেছে।

—কবে সৌম্যবাবু ছাড়া পাবে বললে?

বিশাখা বললে—হামিদ তো বলছে—খুব শিগ্গিরই নাকি ছাড়া পাবেন।

—এত তাড়াতাড়ি কী করে ছাড়া পাবেন?

বিশাখা বললে—যাবজ্জীবন বন্দীদের তো কিছু বছর মকুব করে দেওয়া হয়। আর তার ওপর যদি ওপরওয়ালাদের খুশী করে দেওয়া হয় তো তারও আগে ছেড়ে দেওয়ার নিয়ম আছে!

—কী করে খুশী করা হয়?

—ঘুষ দিয়ে! টাকা দিয়ে!

—কতো টাকা?

বিশাখা বললে—তার কি কিছু লেখা-পড়া আছে? হামিদের হাত দিয়ে যে কতো লাখ টাকা দিয়েছি তার কোনও হিসেবই নেই।

—তাহলে সব টাকা তুমি নষ্ট করে ফেললে?

বিশাখা বললে—নষ্ট ঠিক করিনি। স্বামীর কষ্টের কথা মনে করে হামিদকে টাকা দিতে হয়েছে। আর বাড়িটা কিনতেও আড়াই লাখ টাকা লেগেছিল। সেই সব ঝামেলার মধ্যেই তো তোমার কথা একেবারে ভুলে গিয়েছিলুম। তারপর হঠাৎ একদিন কী মনে হলো ভাবলাম তুমি কেমন আছো দেখে আসি। তাই তো বেড়াপোতায় গিয়েছিলুম। গিয়ে শুনলাম তোমার মা মারা যাওয়ার পর তুমি নাকি বাড়িটা বেচে দিয়ে কলকাতায় এই ঠিকানায় এসে উঠেছ। ঠিকানাটা খুঁজেই তাই এখন তোমার কাছে এসে হাজির হয়েছি। তা ভাগ্যিস তুমি বাড়ি ছিলে তাই তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল!

সন্দীপ বললে—তুমি তো জানো আমি কোন ব্যাঙ্কে চাকরি করি। সেখানে গেলেই আমার এই নতুন ঠিকানা জানতে পারতে!

—তাও কি যাইনি মনে করেছ? গিয়েছিলুম। গিয়ে শুনলুম তুমি নাকি হাওড়া ব্রাঞ্চ থেকে প্রমোশন হয়ে বদলি হয়ে গেছ। তাই বেড়াপোতাতেই গিয়েছিলুম—

সন্দীপ বললে—এখানেই তো কয়েক বছর কেটে গেল! এখন আমার প্রমোশন হয়েছে, মাইনে বেড়েছে, দায়িত্ব বেড়েছে—

—কিন্তু তা বলে তুমি আমাদের কথা এমন করে ভুলে যাবে? অথচ ভাবো তো সেই খিদিরপুরে মনসাতলা লেনের বাড়ির কথা, ভাবো তো সেই রাসেল স্ট্রীটের বাড়ির কথা, আরো ভাবো তো সেই বারোর এ বিডন স্ট্রীটের বাড়ির কথা। আর সেই আমার শ্বশুর শ্বশুর-বাড়ির ঐশ্বর্যের কথা। সে সব কোথায় গেল? সত্যি এমনি করে আমাকে ভুলে যেতে হয়?

সন্দীপ একটু সময় নিলে এ-কথাটার জবাব দিতে। তারপর লম্বা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললে—সত্যিই যদি তোমাকে ভুলে যেতে পারতুম! আসলে তুমিই তো আমাকে ভুলে গিয়েছিলে!

বিশাখা বললে— হ্যাঁ, ঠিক, ঠিকই বলেছ, আমি তোমাকে ভুলে গিয়েছিলুম। শুধু তোমাকে নয়, আমার মা'কেও ভুলে গিয়েছিলুম। হঠাৎ অতো টাকা, অতো গয়না অতো ঐশ্বর্য, ওইগুলোই আমাকে সব কিছু ভুলিয়ে দিয়েছিল। সত্যি বলছি সন্দীপ আমিই

অপরাধী। আমাকে তুমি ক্ষমা করো।

—ক্ষমা?

—হ্যাঁ, এখন সব হারিয়ে আমি বুঝেছি আমি নিজেই অন্যায় করেছি। এ অন্যায়ের কি সত্যিই কোনও ক্ষমা নেই? যদি না থাকে তাহলে তুমি যা শাস্তি দেবে আমি তাই-ই মাথা পেতে নেব।

সন্দীপ এ কথার কোনও জবাব দিলে না। বিশাখা বললে—কী হলো, আমার কথার জবাব দিচ্ছ না যে?

সন্দীপ বললে—বলো, কী জবাব দেব?

বিশাখা বললে—আচ্ছা, জবাব না-হয় না-ই দিলে, আমার একটা অনুরোধ রাখবে?

—কী অনুরোধ?

বিশাখা বললে—আমার অনুরোধ তুমি একটা বিয়ে করো!

—বিয়ে?

—হ্যাঁ, তোমার জীবনটা ব্যর্থ হতে দেখলে আমি যতোদিন বেঁচে থাকবো ততোদিন মনে এই দুঃখটা থাকবে যে আমার জন্যেই তুমি জীবনে কোনও সুখ পেলে না।

সন্দীপ বললে—বিয়ে করলেই কি মানুষ সুখী হয়?

—তা নয়। কিন্তু তোমার সঙ্গেই তো আমার বিয়ে হতে যাচ্ছিল, আর তুমি তো আমাকে বিয়ে করতে রাজী হয়ে গিয়েছিলে! আর একটু দেরি হলেই তো তুমি আমার স্বামী হয়ে যেতে!

সন্দীপ বললে—তোমাকে যে বিয়ে করতে রাজী হয়েছিলুম সে তো মাসিমার মুখ চেয়ে।

—শুধু কি সেইটেই একমাত্র কারণ? আর কিছু নয়? মনে মনে কি আর কিছু কারণ ছিল না?

সন্দীপ বললে—দেখ, সে-সব অনেক কাল আগেকার কথা। অতোকাল আগেকার কথা এখন আর আমার মনে নেই। এখন সেই আমি নেই, সেই তুমিও আর সেই তুমি নেই। ও-সব কথা আর এতদিন এত বছর পর পরে তুলছো কেন?

বিশাখা বললে—কিন্তু আমি যে আর সেই সব কথা ভুলতে পারছি না—

—কিন্তু এত বছর তো ভুলে থাকতে পেরেছিলে।

বিশাখা বললে—আমার মরণ-দশা হয়েছিল তাই ভুলে গিয়েছিলুম। ভুল তো সব মানুষেরই হয়। কিন্তু সেই ভুলের জন্যে যদি অনুতাপ হয় তো তার কি কোনও প্রায়শ্চিত্ত নেই?

সন্দীপ বললে—কী ভাবে তার প্রায়শ্চিত্ত করবে তুমি বলো?

বিশাখা বললে—তুমি বিয়ে করলেই তবে আমার সেই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করা হবে।

কথার মাঝখানেই বাধা পড়লো। সদর-দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হতেই সন্দীপ বললে—কি এই সময়েই আবার কে এলো?

রতন গিয়ে দরজা খুলে দিতেই যে-লোকটা ঘরে ঢুকলো তাকে দেখে দু'জনেই চমকে উঠেছে। সে তপেশ গাঙ্গুলী।

—আরে আপনি?

তপেশ গাঙ্গুলীও বিশাখাকে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছে।

বিশাখা হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়েছে। বলে উঠলো—আমি উঠি—

বলে ঘর ছেড়ে বাইরে চলে গেল। তপেশ গাঙ্গুলী সেই দিকে চেয়ে বললে—যে চলে গেল ও বিশাখা না?

সন্দীপ বললে হ্যাঁ—

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—ও তোমার কাছে এসেছিল কেন?

সন্দীপ বললে—এমনি!

—ওর স্বামী জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে নাকি?

—না এবার ছাড়া পাওয়ার সময় হয়ে এল।

তপেশ গাঙ্গুলী জিজ্ঞেস করলে—তুমি শুনেছ তো ওদের সব গেছে। সেই বিডন স্ট্রীটের বাড়ি বিক্রি হয়ে গেছে। দিদিশাশুড়ী মারা যাওয়ার পর ওদের ফ্যাক্টরি উঠে গেছে। ওরা এখন পথের ভিখিরি হয়ে গেছে। শুনেছ তো?

—হ্যাঁ।

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—এ সমস্তই অহঙ্কারের ফল ভায়া। বড়লোকের বাড়ির বউ হয়ে ওর বড় অহঙ্কার হয়েছিল। মানুষকে আর মানুষ বলেই মনে করতো না। জানো আমি একদিন আমার বউ আর মেয়েকে নিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করার জন্যে ওদের বাড়ি গিয়েছিলুম, কিন্তু পয়সার গরমে আমার সঙ্গে দেখাই করেনি। এত অহঙ্কার হয়েছিল! এখন যা হয়েছে, ভালোই হয়েছে, এখন বুঝছে কতো ধানে কতো চাল! দর্পহারী মধুসূদন বলে একজন মাথার ওপরে আছেন ভায়া। তিনি সেখানে বসে বসে সব দেখছেন—

তারপর হঠাৎ কথা থামিয়ে বললে—তোমার শরীরটা খারাপ নাকি?

সন্দীপ বললে—হ্যাঁ। আপনি হঠাৎ আমার কাছে এলেন কী করতে? কোনও জরুরী কাজ আছে?

—হ্যাঁ, আমার বিজলীর বিয়ে এত দিন পরে ঠিক করতে পেরেছি। তুমি কিছু টাকা ধার দিতে প্যারো আমাকে?

সন্দীপ বললে—টাকা?

—হ্যাঁ ভায়া, হাজার বিশেক টাকা হলেই আমার কাজ চলে যাবে। তুমি তো বিজলীকে দেখেছ। কতো বছর ধরে বিজলীর বিয়ের চেষ্টা করে আসছি, কিছুতে একটা পাত্র ঠিক করতে পারিনি টাকা যোগাড় করতে পারিনি বলে। এখন তো বিজলীর অনেক বয়েস হয়ে গিয়েছে। শেষ পর্যন্ত একটা পাত্র যোগাড় করতে পেরেছি। তবে দ্বিতীয় পক্ষের পাত্র। আগে একটা বিয়ে হয়েছিল, কিন্তু সে-বউ দুটো মেয়ে রেখে মারা গিয়েছে।

সন্দীপ বললে—ওই রকম পাত্রের সঙ্গে নিজের একমাত্র মেয়ের বিয়ে দিচ্ছেন কেন?

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—পাত্র কোথায় পাবো বলো, তোমার মতোন টাকা কি আছে আমার? যতো পাত্র দেখেছি সবাই কেবল তিরিশ হাজার চল্লিশ হাজার নগদ টাকা চায়। তার সঙ্গে গাড়ি, ফ্রিজ্ সব কিছু চায়। মেয়ের বাপ হয়ে আর কতোদিন আইবুড়ো মেয়েকে ঘরে পুষে রাখি, বলো—

তারপর একটু থেকে বললে—এখন এ বিপদ থেকে তুমিই কেবল আমাকে বাঁচাতে পারো ভায়া, আমার আর কেউ নেই। আমার স্ত্রী এত দিন ছিল, সেও মারা গেছে—

—বিজলীর মা মারা গেছে?

—হ্যাঁ ভায়া, সেও এক দুর্ঘটনা। হঠাৎ স্টোভ জেবলে রান্না করতে করতে শাড়িতে আগুন ধরে যায়, আমি তখন অফিসে। আমি খবর পেয়ে দৌড়তে দৌড়তে যখন বাড়ি এলুম তখন সব শেষ।

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—তাহলে বিজলীর বিয়ে হলে আপনি কোথায় থাকবেন?

—কেন, জামাই-এর বাড়িতে। জামাই-এর বাড়িতে মেয়েও থাকবে, আর আমিও থাকবো। আর তুমি তো জানো আমার রেলের চাকরি, রেলে চড়তে পয়সা লাগে না। জামাই-এর বাড়িতে থাকবো, একটা পয়সা ভাড়া দিতে হবে না। আর বিনা পয়সায় দেশ-ভ্রমণ করবো। এখন মেয়ের বিয়েটা হয়ে গেলেই ঝাড়া হাত-পা। দাও ভায়া, লক্ষ্মী ছেলে, আমাকে হাজার বিশেক টাকা ধার দাও, আমি প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকা পেলেই তোমার ধার সব শোধ করে দেব—দাও ভাই, দাও—

সন্দীপ চুপ করে রইলো। তপেশ গাঙ্গুলী আবার বললে কী ভায়া, কথা বলছো না যে! বিশাখার কপালটা তো দেখলে। তোমার কাছে বিশাখা নিশ্চয়ই টাকা চাইতে এসেছিল। বললুম যে এ আর কিছু নয়, অহঙ্কার। বড্ড অহঙ্কার হয়েছিল বিশাখার আর বউদিদির। ভেবেছিল কোটিপতির বাড়িতে মেয়ের বিয়ে হচ্ছে, হাতে একেবারে আকাশের চাঁদ পেয়ে গেছে। কিন্তু কোথায় গেল সেই টাকা? এখন কোথায় গেল সেই টাকা? রইলো? স্বামী তো জেলখানায়, আর টাকাও তো সব ফক্কা হয়ে গেল। বিয়ে হওয়ার পর বিশাখা আমাদের আর মানুষ বলেই মনে করতো না। তা এখন?

সন্দীপ তখনও চুপ করে রয়েছে। তপেশ গাঙ্গুলী আবার বললে—কই ভায়া, কথা বলছো না যে? হাজার বিশেক টাকা তোমার কাছে হাতের ময়লা। তুমি ব্যাঙ্কে চাকরি করো। তোমাদের তো আর আমাদের মতো অবস্থা নয়। তোমার মা-ও নেই, আর বিশাখার মা-ও নেই যে তোমার টাকা খরচ হবে। সব টাকাটাই তোমার ব্যাঙ্কে জমছে। তোমার বউও নেই, ছেলে মেয়েও নেই, তোমার তো ঝাড়া হাত-পা। আমার কথার জবাব দিচ্ছ না কেন? দাও!

সন্দীপ তখনও নির্বাক। তার মুখ দিয়ে কোনও কথা বেরোচ্ছে না—

তপেশ গাঙ্গুলী আবার বলতে লাগলো—বিশাখার মা'র শ্রাদ্ধের খবর পেয়েই সেবার বউ আর মেয়েকে নিয়ে বেড়াপোতায় চলে এসেছিলুম। তুমি আমাদের নেমন্তন্নই করোনি। তা নেমন্তন্ন করোনি তো করোনি। আমি শুনেছিলুম তুমি আমাদের অনেক কিছু খাওয়াবে। শুনেছিলুম তুমি ভূরিভোজের আয়োজন করেছ—মুরগী, পাঁঠার মাংস, চপ, কাটলেট, পান্তুয়া, রাজভোগ, ল্যাংচা, দই, রাবড়ি—কিন্তু সব ভাঁওতা। তুমি ডাল ভাত মাছের ঝোল খাওয়ালে। আমরা অতোদূর থেকে গেলুম শুধু তোমার ওই ডাল ভাত আর মাছের ঝোল খেতে? যাক গে সে-সব, কতো বছর আগেকার কথা, কিন্তু সেই সব কথা আমি এখনও ভুলিনি, যদি বুঝতে পারতুম তুমি অতো কিপ্পন তো তাহলে আমরা কি বেড়াপোতায় এতো কষ্ট করে যেতুম? তা যাক্ গে যাক্, সে-সব পুরনো কাসুন্দি ঘেঁটে লাভ নেই, এখন আমায় হাজার বিশেক টাকা তোমাকে দিতেই হবে, আমাকে এ-বিপদ থেকে তোমাকে বাঁচাতেই হবে। তোমার কোনও আপত্তি আমি আর শুনছি না।

সন্দীপ এ-সব কথা শুনেও যেমন নির্বাক হয়েছিল, তেমনি নির্বাক হয়েই রইলো। তার মুখ দিয়ে কোনও কথা বেরোল না......

এত দিন পরে আবার সেই সব কথা মনে পড়তে লাগলো। সেই সব সময়, সেই সব ঘটনা। এত দিন পরে জেল থেকে বেরিয়ে আবার চোখের সামনে ভাসতে লাগলো সেই সব ছবি! সত্যিই সমস্ত পৃথিবীটা যেন বদলে গিয়েছে। আজ তার চোখের সামনে সে যেন এক নতুন কলকাতা দেখতে পেলে। কতো নতুন নতুন বাড়ি উঠেছে শহরে। বারোর এ বিডন স্ট্রীটের বাড়িটা যেমন বদলে গিয়েছে, সমস্ত পাড়াটাও যেন তেমনি বদলে গিয়েছে। আজ যদি কোনও চেনা লোক তাকে দেখে সেও সন্দীপকে চিনতে পারবে না। আজ তার মুখভর্তি গোঁফ-দাড়ি। এত বছর জেলখানাতে থেকে সে নিজেও নিজেকে চিনতে পারবে না হয়তো। সেও নিশ্চয়ই বদলে গিয়েছে। কলকাতা শহর আর কলকাতা শহরের মানুষগুলোও যখন বদলে গিয়েছে তখন সে সেই এক রকমই আছে, তা কি হতে পারে?

দূর থেকে একটা বিরাট মিছিল আসছিল। লম্বা মিছিল। বোধহয় আট মাইলটাক লম্বা। কীসের মিছিল?

সামনে লাল শালুর ওপর কী যেন লেখা রয়েছে। দূর থেকে কিছু পড়া গেল না। শুধু একটা লেখা পড়া গেল—বিজয় উৎসব।

কোন একটা 'জুট-মিল'-এর শ্রমিক ইউনিয়নের ধর্মঘটের বিজয় উৎসব-এর মিছিল চলেছে। তারই নিচেয় লাল শালুর ওপরেই বড়ো বড়ো হরফে লেখা—'ডেমোক্রেটিক এ্যাকশান পার্টি'।

সন্দীপ রাস্তার একপাশে সরে দাঁড়ালো। রাস্তার সমস্ত জায়গা জুড়ে পার্টির মিছিল চলছে। শ্রমিক-কর্মচারীদের মুখে আনন্দের উচ্ছ্বাস। সবাই এক সুরে চিৎকার করছে—গোপাল হাজরা জিন্দাবাদ, গোপাল হাজরা জিন্দাবাদ।

এখানেও গোপাল হাজরা!

একটা জিপ গাড়ি মিছিলের সামনে আস্তে আস্তে আসছিল। সন্দীপ দেখল সামনে যে-লোকটা দাঁড়িয়ে দুই হাত জোড়া করে কপালে ঠেকিয়ে নমস্কার করছে, সেই মানুষটাই গোপাল হাজরা। গোপাল হাজরাকে অনেক দিন পরে দেখল সন্দীপ। সেই ডেমোক্রেটিক এ্যাকশন পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা গোপাল হাজরা। বেড়াপোতার হাজরাবুড়োর একমাত্র ছেলে। যে-মানুষটা কতো মানুষের সর্বনাশ করেছে, কতো লোককে ড্রাগের নেশা ধরিয়ে খুন করেছে, 'স্যাক্সবী মুখার্জি' কোম্পানী'র কতো হাজার কর্মীকে বেকার করেছে, সেই লোকটাই আজ হাজার হাজার মানুষের জয়ধ্বনি পাচ্ছে। আজ যদি সন্দীপের এক মুখ দাড়ি-গোঁফ না থাকতো তাহলে তাকেও বোধহয় চিনতে পারতো।

আর চিনতে না পারলেও কী-ই বা ক্ষতি। শুধু কি গোপাল হাজরা। তার সঙ্গে শ্রীপতি মিশ্র। তিনবার ম্যাট্রিক ফেল মিনিস্টারও তো ছিল! কতো লাখ টাকা ঘুষ নিয়েছে মুক্তিপদ মুখার্জির কাছ থেকে। তবু শ্রমিক-কল্যাণের অজুহাত সব শ্রমিকদের চাকরি গেছে, তারা ফকির হয়েছে, সর্বস্বান্ত হয়েছে। তাদের সঙ্গে চাকরি গেছে ওয়েলফেয়ার অফিসার যশোবন্ত ভার্গবের, চীফ এ্যাকাউনটেন্ট নাগরাজনের, ওয়ার্কস্ ম্যানেজার কান্তি চ্যাটার্জির, ডেপুটি ওয়ার্কস্ ম্যানেজার অর্জুন সরকারের। আর শুধু তাই-ই নয়। একটা প্রখ্যাত বংশ নয়-ছয় হয়ে গেছে। ঠাকমা-মণির সাধের সংসার গোল্লায় চলে গেছে এই গোপাল হাজরা, শ্রীপতি মিশ্র আর বরদা ঘোষালের চক্রান্তে। আজ এতদিন পর নতুন একটা 'স্যাক্সবী মুখার্জি' কোম্পানী'র সর্বনাশ করবার জন্যে এখন বিজয় উৎসব। বিজয় উৎসব কাদের তা সন্দীপ ভালো করেই জানে। এত বছর জেলখানায় কাটাবার পরেও তা সন্দীপের জানতে বাকি নেই। এই ক'বছরের মধ্যে পৃথিবী এতটুকুও বদলায়নি। বরং গোপাল হাজরাদের অনাচার আরো বেড়েছে।

সত্যিই এত দিন পরে নিবারণের কথাটাই তার সত্যি বলে মনে হলো। সূর্যের চার-দিকে পৃথিবীটা এত দিন হয়তো ঘুরছিল, কিন্তু এবার থেকে সূর্যটাই যেন পৃথিবীর চারদিকে ঘুরতে আরম্ভ করেছে। নইলে মুক্তিপদ, সৌম্যপদ, বিশাখারা এত বড়লোক থেকে এত গরীব হয়ে গেল কেন, আর শ্রীপতি মিশ্র, বরদা ঘোষাল, আর গোপাল হাজরারাই বা এত গরীব থেকে এত বড়লোক হয়ে গেল কেন?

হঠাৎ এক মুহূর্তে যেন সন্দীপ প্রায় কুড়ি বছর পেছনে ফিরে গেল। তখন কতো কাজ তার। বাসের ধাক্কা লেগে মরতে মরতে বেঁচে গিয়েছিল সে। এখন মনে হয় সেদিন মারা গেলেই বোধহয় ভালো হতো। তাহলে মানুষের জীবনের এমন অধঃপতন আর এমন অবমূল্যায়ন দেখতে হতো না। আর তার সঙ্গে সঙ্গে এমন অবক্ষয়।

অথচ একদিন কতো আশা নিয়ে সে কলকাতায় এসেছিল একটা এঁদো গ্রাম থেকে। মল্লিক-কাকা তাকে প্রথম দিনেই বলেছিলেন—জানো সন্দীপ, তুমি যাদের বাড়িতে এসে উঠলে তারা ভীষণ বড়লোক। তোমার মনে যদি কখনও এদের মতো বড়লোক হওয়ার ইচ্ছে থাকে, তাহলে সমস্ত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে যাও। তার পরেও যদি তোমার বড়লোক হওয়ার ইচ্ছে থাকে তাহলে তুমি বড়লোক হওয়ার চেষ্টা করো।

এ-কথার কোনও জবাব দেয়নি সেদিন সন্দীপ।

মল্লিক-কাকা আবার বলেছিলেন—পৃথিবীতে যাঁরাই মহাপুরুষ বলে আজো প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে আছেন, তাঁরা কিন্তু কেউই বড়লোক ছিলেন না। যাঁরা কিছু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করে পৃথিবীর মুখের চেহারা বদলে দিয়েছেন তাঁরা কিন্তু সবাই গোড়ায় গরীব লোকই ছিলেন। একমাত্র ব্যতিক্রম হচ্ছেন বুদ্ধদেব। রাজার ছেলে হয়েও তিনি গরীব হয়ে রাস্তায় নেমে গরীবিয়ানা বেছে নিয়েছিলেন। কেন? বলো তো কেন?

সব কথাগুলো শুনে সন্দীপ একটা কথা শুধু জিজ্ঞেস করেছিলেন—আপনি কীসের আশায় এ-বাড়িতে এত দিন চাকরি করছেন?

মল্লিক-কাকা বলেছিলেন—তুমিই বলো না কীসের জন্যে?

সন্দীপ বলেছিল—আশ্রয়ের জন্যে কিংবা টাকার জন্যে!

মল্লিক-কাকা বলেছিলেন—এখন তোমার এ-প্রশ্নের উত্তর দেব না আমি—

—কবে উত্তর দেবেন?

—যখন তুমি বড়ো হবে, চাকরি করবে, অনেক টাকা উপায় করবে তখন তুমি নিজেই এ-প্রশ্নের উত্তর পাবে!

তারপর সে সৌম্যপদবাবুকে দেখেছিল, ঠাকমা-মণিকে দেখেছিল, মুক্তিপদবাবুকে দেখেছিল, তাঁর স্ত্রী নন্দিতাকে দেখেছিল, পিক্‌নিককে দেখেছিল। নিজেও যখন সে ব্যাঙ্কে চাকরি পেয়েছিল, মাসিমার ক্যানসার রোগের যন্ত্রণা দেখেছিল, গোপাল হাজরা, বরদা ঘোষাল, শ্রীপতি মিশ্রকে দেখেছিল, ব্যাঙ্কের সংস্পর্শে এসে অনেক কোটিপতিকেও দেখেছিল। তারপর ঠাকমা-মণির শ্রাদ্ধের দিনে অনিমন্ত্রিত হয়েও গিয়েছিল বারোর এ বিডন স্ট্রীটের বাড়িতে তখন তার ঘটার বহরও দেখেছিল।

কিন্তু সব চেয়ে বেশি অবাক হয়েছিল মল্লিক-কাকাকে দেখে। মুখের চেহারার মধ্যে কোথাও কোনও বিকার না দেখে সন্দীপ অবাকই হয়েছিল। ঠাকমা-মণির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে যে তিনি বেকার হয়ে গেলেন, এ-বাড়ির সমস্ত পাট চুকিয়ে দেবার যে সময় হয়ে গেল তার জন্যেও তো তাঁর মনে মুখে যে ছাপ পড়বার কথা তার তো কোথাও কোনও চিহ্ন দেখা যায়নি।

শেষ পর্যন্ত মল্লিক-কাকাকে একলা পেয়ে সে জিজ্ঞেস করেছিল—আচ্ছা মল্লিক-কাকা, একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করবো?

—কী, বলো?

এবার তো আপনার চাকরি চলে যাবে। এবার হয়তো এ-বাড়িও একদিন বিক্রি হয়ে যাবে। তা সে-কথা ভেবে আপনার ভয় হচ্ছে না?

—ভয়? কীসের ভয়?

সন্দীপ বলেছিল—এত বছরের একটা নিশ্চিন্ত আশ্রয় যে আপনার চলে গেল, তার জন্যে অপনার কোনও দুশ্চিন্তা হচ্ছে না?

মল্লিক-কাকা হাসতে হাসতে জবাব দিয়েছিলেন—দুশ্চিন্তা কেন হবে? এই বাড়িতে না এলে, এদের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠতা না হলে কি জানতে পারতুম উত্থান থাকলে পতনও থাকবে, ওঠা থাকলে নামাকেও স্বীকার করে নিতে হবে, জন্ম থাকলে মৃত্যুকেও মেনে নিতে হবে। এ-সব কথাগুলো এমন সত্য করে কী জানতে পারতুম—

—এর পর?

—এর পর যা হবে তার জন্যে তৈরিই রইলুম। এর পরে আমি কোথায় থাকবো, কার কাছে গিয়ে আশ্রয় নেব তা নিয়ে আর ভাববার কিছু রইলো না। এর পর যা কিছু হবে তার জন্যে তৈরি হয়েই রইলুম। আর আমার কোনও দুশ্চিন্তা রইলো না। এইবার জানতে শিখলুম আমি এখন মুক্ত। কোনও কিছুতে যে আসক্তি থাকতে নেই এই প্রত্যক্ষ জ্ঞানটাই আমার লাভ হলো—

—কে?

কুড়ি বছর আগেকার গলার আওয়াজ এতদিন পরে সন্দীপের কানে এসে পেঁছলো। মেয়েলি গলায় জবাব এল—আমি বিশাখাদি, রতন! আজকের এই গোপাল হাজরার বিজয়োৎসব, আগেকার সেই ঠকমা-মণির শ্রাদ্ধের বাসর আর প্রায় কুড়ি বছর পেছনকার বিশাখার গলার আওয়াজ—সব কিছু যেন এক নিমেষে একাকার হয়ে গেল।

—আপনি বসুন না, দাদাবাবু এখনও অফিস থেকে আসেননি।

—আজকে অফিস থেকে আসতে তোমার দাদাবাবুর এত দেরি হচ্ছে কেন?

রতন বললে—আজকাল অফিসের কাজ নাকি একটু বেড়েছে। অফিস থেকে আসতে একটু দেরিই হয়। আপনি বসবেন একটু?

—তোমার বাবুর বাড়ি আসতে কতো দেরি হবে?

রতন বললে—আর ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই হয়তো এসে যাবেন। আপনি একটু বসুন না। আমি চা করে দেব?

বিশাখা বললে—না, তার দরকার নেই, তুমি বলে দিও আমি এসেছিলুম একটা বিশেষ জরুরী কাজে—আমি এখন যাচ্ছি। পরে একদিন আবার আসবো—

বলে বিশাখা চলে গেল। সন্দীপ এক ঘণ্টা পরে যখন বাড়ি ফিরে এলো তখন রতনের কাছে খবরটা শুনলো। বললে—বিশেষ জরুরী কী কাজ তা বলেনিনি?

—না। আমি বসতে বলেছিলুম, চা করে দেব কি না তা-ও বলেছিলুম। কিন্তু বসলেন না। চলে গেলেন।

সন্দীপ অফিসের কাজে সারাদিন খুব পরিশ্রম করেছে। হাজারটা লোকের হাজারটা আর্জি শুনেছে। হাজারটা হুকুম করেছে হাজারটা লোককে। আগেকার মতো আর কাজ করতে চায় না কেউ। এখন যেদিকে একটু নজর না দেবে সেদিকেই গাফিলতি করবে সবাই। অফিসের ছুটির ঘণ্টা বাজলেই সবাই কাঁটায় কাঁটায় বাড়ি চলে যাবে।

কিন্তু সন্দীপকে থাকতে হয় অফিসে। সারাদিন যে-কাজগুলো দেখবার সময় হয় না, সেই কাজগুলো নিয়ে বসে। তখন দরোয়ানও থাকে। তার জন্যে তাকে ওভার-টাইমও দিতে হয়। আর শুধু কি তাই?

রবিবারগুলো তো ছুটির দিন। সেদিন সন্দীপ ছাড়া আর সকলেরই ছুটি। সন্দীপ সেই রবিবারগুলোতেও অফিসে আসে। আর অনেক বাকি কাজগুলো করতে হয়। না হলে অফিস অচল হয়ে যাবে। মানুষের কাজের ক্ষতি হবে। সব কাজগুলোকে সে এগিয়ে রেখে দিতে চায়। স্টাফদের জন্যে ফেলে রেখে দিলে চলে না।

তাই সেদিন সে অফিস থেকে আসতে দেরি করেছিল। কিন্তু বাড়িতে এসে যখন শুনলে বিশাখা তার বাড়িতে এসেছিল কী একটা জরুরী কাজে, তখন আর অপেক্ষা করলে না। রতনকে বললে—রতন, আমি একটু আসছি। আমি এসে খাবো—

বলে সন্দীপ বাড়ি থেকে বেরিয়ে সোজা বড়ো রাস্তায় গিয়ে পড়লো। ভুবন গাঙ্গুলী লেন তার চেনা। বাড়ি থেকে বেরোলে পাঁচ নম্বর ভুবন গাঙ্গুলী লেন-এ বিশাখার বাড়িতে পেঁছতে এক ঘণ্টার মতো সময় লাগে। অনেক দিন যাবো যাবো করেও বিশাখার বাড়িতে যাওয়া হয়নি। আর তা ছাড়া আরো একটা কথা আছে। বিশাখা একলা। সে হলো পরস্ত্রী। অর্থাৎ স্বামী বাড়িতে না থাকায় তার কাছে বেশি যাওয়া-আসা লোকে ভালো চোখে দেখবে না। অথচ তার এই বিপদের সময়ে সন্দীপ তাকে না দেখলে কে-ই বা দেখবে? বিশাখার তো আর কেউ নেই যাকে সে আপন-জন বলে মনে করতে পারে।

কলকাতা শহরের সব মানুষ তো ঠিক মানুষ নয়। কলকাতার মানুষের বিপদের সময় তো কেউ কারো নয়। তার সুখের দিনে হিংসে করবার লোক অনেক আছে।

সন্দীপ যখন ঠিক ঠিকানায় পেঁছলো তখন বাড়ির জানালা-দরজা বাইরে থেকে সব বন্ধ। অন্ধকারে দেয়ালের গায়ে লেখা নম্বরটা মিলিয়ে নিয়ে সন্দীপ দরজার কড়া নাড়তে লাগলো। ভেতর থেকে মেয়েলি গলার আওয়াজ এলো—কে?

বাইরে থেকে সন্দীপ বললে—আমি সন্দীপ, বেড়াপোতার সন্দীপ লাহিড়ী। বিশাখা-

দেবী বাড়িতে আছেন?

মেয়েলি কণ্ঠ বললে—না, বউদি-মণি বাড়িতে নেই—

—কখন আসবেন?

—তাঁর আসতে দেরি হবে।

সন্দীপ বললে—আপনি কে?

—মেয়েলি কণ্ঠ বললে—আমি এ-বাড়ির কাজের লোক।

সন্দীপ বললে—তুমি দরজাটা খুলে দাও না। আমি তোমার বউদি-মণির সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। তিনি এলে তাঁর সঙ্গে একটু কথা বলবো। তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে একটু বসে থাকবো, আমার বিশেষ কথা আছে তাঁর সঙ্গে—

মেয়েলি কণ্ঠ বললে—বউদি মণি কাউকে ভেতরে ঢুকতে মানা করে দিয়ে গেছেন। আমি দরজা খুলতে পারবো না।

সন্দীপ আর কী-ই করবে এই কথার পর। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করাই ভালো। এত দূর এসে কি আবার বাড়ি ফিরে যেতে পারে?

চারিদিকে রাত্রের অন্ধকার ঘন হয়ে আসছে। পাড়াটাও ক্রমশ নির্জন হয়ে যাচ্ছে। রাস্তার লোকজনও বা কী ভাববে? হয়তো মনে মনে নিজেদেরই প্রশ্ন করবে, এ-লোকটা এখানে এমন করে ঘোরাঘুরি করছে কেন? এর উদ্দেশ্য কী?

—এই যে, তুমি এখানে?

সন্দীপ দেখলে তপেশ গাঙ্গুলী তার মেয়েকে নিয়ে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে। সন্দীপ তাদের এড়িয়েই যেতে চাইছিল। কিন্তু ধরা পড়ে গিয়ে কথা বলতেই হলো। বললে—আপনি এখানে কোথায় গিয়েছিলেন?

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—এই তো আমার বিজলীকে নিয়ে বিশাখার নতুন বাড়িতে এসেছিলাম। কিন্তু বিশাখা বাড়িতে নেই। কোথায় নাকি বেরিয়েছে। তার ঝি'টা দরজা খুললেই না। বললে বউদি-মণি দরজা খুলতে বারণ করে গেছে। ভেবে দেখ, এখন সর্বস্ব গেছে তবু কতো অহঙ্কার। আমি আমার পরিচয় দিলাম তবু দরজা খুললে না ভায়া। অথচ আমার নিজেরই ভাইঝি সে। আজ কিনা তার ঝি'কে দিয়ে আমাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিলে—

সন্দীপ বললে—আপনি মাঝে মাঝে আসেন বুঝি বিশাখার এই নতুন বাড়িতে?

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—বিশাখা আমার আপন ভাইঝি, আসবো না? আর আমারও যে জ্বালা হয়েছে আমার বিজলীকে নিয়ে। এত বড়ো সোমত্ত মেয়েকে একলা বাড়িতে কার কাছে রেখে আমি অফিসে যাই বলো তো? তাই মাঝে মাঝে বিশাখার কাছে বিজলীকে রেখে যাই। বিজলী যদি আমার মেয়ে না হয়ে ছেলে হতো তাহলে কি আমার ভাবনা?

—কেন, আপনার বিজলীর বিয়ে হয়নি? আপনি যে বলেছিলেন বিজলীর বিয়ের সব ঠিকঠাক।

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—আরে, সে-বিয়ে আর হলো কই? হলে তোমার কাছ থেকে কুড়ি হাজার টাকা ধার নিতুম না?

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—তা সে পাত্র'র কি বিজলীকে শেষ পর্যন্ত পছন্দ হলো না?

—আর না, সেই পাত্রের দাদার এক আইবুড়ো শালী ছিল, তাকেই পছন্দ করে ফেললে শেষ পর্যন্ত। চেনা-শোনা বংশের মধ্যে সম্পর্কটা রেখে দিতে চাইলে আর কি?

তারপর একটু থেকে বললে—যাই ভায়া, এখন সেই খিদিরপুর মনসাতলা লেনেই ফিরে যাই। আসবার সময় তো আর ভাবিনি যে বিশাখা বাড়িতে থাকবে না। ভেবেছিলাম আজ রাতটা এখানেই থাকবো, এখানেই খাওয়া-দাওয়া করবো। তা যখন হলো না, তখন তাড়াতাড়ি যাই। বাড়িতে গিয়ে আবার রান্না-বান্না চাপাতে হবে, যাই। বিশাখা কোথায় গেছে, কখন আসবে, আর তো কোনও ঠিক-ঠিকানা নেই—তার ভরসায় বসে থাকলে তো চলবে না, আমার যে আবার কাল অফিস আছে—

বলে বিজলীকে নিয়ে হনহন করে বড়ো রাস্তার দিকে চলতে লাগলো।

সন্দীপও বাড়িতে ফেরবার কথা ভাবছিল। কাল সকালবেলা থেকে কাজের তাড়া শুরু হয়ে যাবে। তারপর চলতে চলতে তপেশ গাঙ্গুলীবাবুর কথাটাও মনে পড়লো। টাকার জন্যে ভদ্রলোক সমস্তটা জীবন হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তবু টাকা হয়নি। আর তারপর মেয়ে। মেয়ের বিয়ের জন্য কতো জায়গাতেই না ধর্না দিয়েছে, তবু মেয়ের বিয়ে হয়নি।

—ও ভায়া, ও ভায়া—

হঠাৎ পেছন থেকে তপেশ গাঙ্গুলীর গলা শোনা গেল। সন্দীপ বিশাখার আশা ছেড়ে দিয়ে বাড়ির দিকেই যাচ্ছিলো। হঠাৎ তপেশ গাঙ্গুলীর গলার শব্দ পেয়ে পেছন ফিরে দাঁড়ালো। বিজলীকে নিয়ে দৌড়তে দৌড়তে কাছে এসে দাঁড়ালো। বললে—মেয়ের বিয়ের কথা ভাবতে ভাবতে আমার মাথাটা বিগড়ে গিয়েছে ভায়া। আসল কথাটা বলতেই ভুল হয়ে গিয়েছে। তা তোমার মা তো মারা গেছেন শুনেছি। তোমার রান্না-বান্না কে করছে এখন?

সন্দীপ বললে—বাড়িতে একজন কাজের লোক আছে, সে-ই সব করে।

—চাকর রেখেছ? তা সে তো চুরি করে তোমার সব ফাঁক করে দিচ্ছে—

সন্দীপ বললে—না, সে খুবই বিশ্বাসী লোক—

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—তা তুমি তো আমার বিজলীকে বিয়ে করতে পারো। তার মতো বিশ্বাসী লোক তো আর তুমি কোথাও পাবে না—

সন্দীপ কী বলবে বুঝতে পারলে না। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা বিজলীর দিকে চেয়ে দেখলে। সে তখন বাবার কথাগুলো শুনে লজ্জায় মাথা নিচু করে রয়েছে। তপেশ গাঙ্গুলী তার মেয়েকে জিজ্ঞেস করলে—কী রে, তুই এতো মাথা নিচু করে আছিস কেন? সন্দীপকে তো তুই ছোটবেলা থেকে চিনিস? তার সামনে মুখ তুলে চাইতে তোর অতো লজ্জা কেন? কথা বল্? আমার কথার উত্তর দে—

তবু বিজলী মুখ নিচু করেই রাখলে। কোনও উত্তর দিলে না। তপেশ গাঙ্গুলী সন্দীপকে বললে—জানো ভায়া, আমার বিজলীকে বিয়ে করলে তোমার বাড়িতে ঝি-চাকর রাখতে হবে না, ও কাজ করতে পারে। ও ওর মা'র চেয়েও ভালো রান্না করে। তারপর কাপড়-চোপড় কাচা থেকে আরম্ভ করে ঘর ঝাঁট দেওয়া, বাসন মাজা সব করে দেবে। তোমার কোনও ভাবনা থাকবে না। করবে বিয়ে?

সন্দীপের তখন তপেশ গাঙ্গুলীর কথাগুলো অসহ্য লাগছিল। বললে—আমার বিয়ে হয়ে গেছে—

—তোমার বিয়ে হয়ে গেছে? বলছো কী তুমি? কবে হলো? আমাদের তো নেমন্তন্ন করোনি তুমি!

—না, সত্যিই আমার বিয়ে হয়ে গেছে!

—কিন্তু কবে? আমরা তো তা কেউ-ই জানতে পারলুম না। একবার তো বিশাখার সঙ্গে বিয়ের পিঁড়ীতে বসেও উঠে পড়তে হয়েছিল। তা আমরা সবাই জানি। মাঝখান থেকে তোমার কয়েকশো টাকা নষ্ট হয়ে গেল। তারপর আবার কবে তোমার বিয়ে হলো?

সন্দীপ বললে—একজন মানুষ ক'বার বিয়ে করে?

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—আরে সেটা তো আর বিয়ে নয়। বিয়ে করতে গিয়ে বাধা পড়ে গিয়ে হঠাৎ বিডন স্ট্রীটের মুখুজ্জে-বাড়ির ফাঁসির আসামী নাতিটার সঙ্গে বিশাখার বিয়ে হয়ে গেল। তা সেটা কি বিয়ে? সেটাকে কি তুমি বিয়ে হওয়া বলো?

সন্দীপ বললে—হ্যাঁ, সেটাকে আমি বিয়েই বলি—

—কিন্তু তা হলে তুমি কি সারা জীবন একা-একাই কাটাবে? বিয়ে করবে না?

সন্দীপ বললে—আমি তো বললাম আমার বিয়ে হয়ে গেছে! একজন লোক ক'বার আর বিয়ে করে? আমার বিয়ে হয়েই গেছে ধরে নিন না।

—তুমি তাহলে আমার বিজলীকে বিয়ে করবে না বলতে চাও? এই তো দেখছো বিজলীকে। একে নিয়ে আমি এখন কী করি? আর তুমি যদি বিয়ে না করো তো তোমাদের অফিসে তো তোমার আন্ডারে আরো অনেক লোক চাকরি করে। তাদের মধ্যে কাউকে একজন পাত্রের খোঁজ দাও না। এক-বরে হোক, দো-বরে হোক, আমাদের কোনও কিছুতেই আপত্তি নেই, শুধু খাওয়া-পরার অভাব নেই, এই রকম বামুন হলেই চলবে—

—সন্দীপ বললে—আচ্ছা, দেখবো—

—তাহলে এখন আমরা আসি। আমাদের অনেক দূরে যেতে হবে, গিয়ে রান্না চড়াতে হবে, চলি—পরে তোমার সঙ্গে একদিন দেখা করবো—

বলে মেয়েকে নিয়ে তপেশ গাঙ্গুলী চলে গেল।
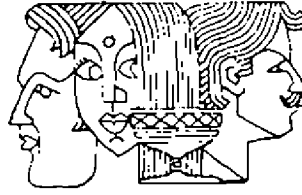
—কে?

রতনের গলার আওয়াজ সন্দীপের কানে এলো। সত্যিই, এত রাত্রে কে আবার তার বাড়িতে এলো! বিশাখা বললে—আমি, বিশাখা। তোমার বাবু আছেন?

বার্টান্ড রাসেল বলে গিয়েছেন যে ইতিহাসের পাতা খুঁজলে দেখা যাবে যে পৃথিবীতে মাত্র দুটো যুগ ঘুরে ঘুরে আসে। একটা বিশ্বাসের যুগ, আর তারপর অবিশ্বাসের যুগ। বিশ্বাসের যুগে মানুষ বিশ্বাস করে যে পুণ্য করলে মানুষের শুভ হয়। আর অবিশ্বাসের যুগে মানুষ বিশ্বাস করে যে পুণ্য-টুন্য সব বাজে কথা। আসল শুভ হলো আপাতত লাভ। আপাত লাভটাই হলো বড়ো কথা। ভবিষ্যতের কথা সিকেয় তোলা থাকে। আজ কী পাবো সেইটের জবাব আগে দাও।

কিন্তু বিশ্বাসের যুগে মানুষের সন্দেহ থাকে না সততার ওপর, পুণ্যের ওপর, প্রীতির ওপর। বিশ্বাসের যুগে মানুষ অমানুষ হতে ভয় পায়, বলে—আমার জন্যে তোমার ক্ষতি হোক এটা আমি চাই না। বলে—আমি তোমার কী উপকার করতে পারি তা আমাকে বলো, আমি যথাসাধ্য সেটা করতে চেষ্টা করবো।

বিশ্বাসের যুগের পরেই ফিরে আসে অবিশ্বাসের যুগ। তখন মানুষ বলে—ও লোকটার কেন এত ভালো হলো? ওর বদলে আমার কেন ভালো হলো না? সুতরাং ওর ক্ষতিসাধন করতে চেষ্টা করে যাও।

কিন্তু অবিশ্বাসের যুগেও এমন-এমন জন্মায় যারা বিশ্বাস করবার জন্যে প্রাণপাত করে। যারা বলে—গাছ থেকে যে ফল মাটিতে পড়ে তার নিশ্চয় কারণ আছে। কারণ ছাড়া যখন কার্য হয় না, তখন গাছের ফল মাটিতে পড়ার মধ্যেও নিশ্চয় কোনও কারণ আছে। লোকে তাদের পাগল বলে। কিন্তু তাদের বিশ্বাসে ফাটল ধরাতে পারে না। তারা সব বিপরীত স্রোতের মধ্যেও সামনে এগিয়ে যায়। তাই গাছের সব কুঁড়ি অবস্থাতেই বেশির ভাগ ফুল বা ফল গাছে থাকাকালেই শুকিয়ে মাটিতে অকালে ঝরে পড়ে। যে ক'টা প্রত্যয়ের ক্ষমতা নিয়ে টিঁকে থাকে তারাই মানুষকে শক্তি যোগায়।

এই অবিশ্বাসের যুগেই সবাই বলতো সমুদ্রের ওপারে কোনও তীর নেই। কিন্তু কলম্বাস বলে একজন মানুষ বললে—তা হতে পারে না। ওপারে নিশ্চয়ই কোনও তীর আছে যেখানে মানুষ আছে। তাই নির্ভয়ে অকূল সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়লো পালতোলা নৌকো নিয়ে। আর প্রমাণ করলে শেষ পর্যন্ত বিশ্বাসেরই জয় হয়।

সন্দীপও এমনি একজন মানুষ। সে বিশ্বাস করত গোপাল হাজরা বা বরদা ঘোষাল বা শ্রীপতি মিশ্রের মতোই পার্টিক্যাডার থাক তাদের পথ ঠিক পথ নয়। সে জানতো

যে তার মনের মধ্যে কোথাও কোনও গলদ আছে। যতোই এটা অবিশ্বাসের যুগ হোক, যেখানে বিশ্বাস আছে কলম্বাসের মতো সে সমুদ্রের ওপারে কোনও তীর খুঁজে পাবেই।

সন্দীপ জানতো যে দেশটা স্বাধীন হওয়ার আগে পর্যন্ত ছিল বিশ্বাসের যুগ। তখন মানুষকে মানুষ বিশ্বাস করতো, মানুষকে মানুষ শ্রদ্ধা করতো। তখন একটা আদর্শ বলে জিনিস ছিল যাকে সবাই মনে মনে শ্রদ্ধা করতো। তার ফলেই ক্ষুদিরাম থেকে আরম্ভ করে যতীন দাশ, ভগৎ সিং নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করেছে দেশের ভালোর জন্যে, সকলকে পরাধীনতা থেকে মুক্তি দেবার জন্যে।

কিন্তু ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্টের পর?

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্টের পরে দেশ যেই স্বাধীন হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কে ফাটল ধরলো। তারক ঘোষদের বাড়িগুলো পুড়িয়ে দিলে গোপাল হাজরারা, বিচার তার চরিত্র হারিয়ে ফেললো বলে কাশীবাবুরা প্র্যাকটিশ ছেড়ে দিলেন। আর এদিকে ব্যাঙ্কগুলোতে একই লোক অনেকগুলো নামে এ্যাকাউন্ট খুলতে লাগলো। আর আইডিয়াল ফুড্ প্রোডাক্টস প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী চাকরি দেওয়ার নাম করে বিষের বড়ি মিশিয়ে দিতে লাগলো চকোলেটের ভেতরে আর কিড্ স্ট্রীটে হরদয়াল আর আন্টি মেমসাহেবরা নতুন মেয়েমানুষের ব্যবসার ফাঁদ পেতে বসলো। আর এই সব কিছু অবিশ্বাসের মধ্যে সন্দীপও কলম্বাসের মতো বিশ্বাস করেছে যে সমুদ্রের ওপারেও নিশ্চয় কোনও একটা তীর আছে যেখানে কোনও নতুন পৃথিবী আছে, আর যেখানে একটা নিশ্চিন্ত আশ্রয় পেতে পারবে।

—এ কি তুমি?

সন্দীপের সমস্ত নিভৃত চিন্তার জগতের মধ্যে হঠাৎ বিশাখার আবির্ভাব হলো।

রতন বিশাখাকে একেবারে সন্দীপের শোবার ঘরের মধ্যেই পৌঁছিয়ে দিয়ে গেল। সন্দীপ বললে—চলো চলো, বাইরের ঘরে চলো। আমি তো তোমার ভুবন গাঙ্গুলী লেনের বাড়ি থেকেই ফিরছি। ফিরে খেয়ে নিয়ে এই শুতে এসেছি—চলো বাইরের ঘরে বসবে চলো—

বিশাখা ততক্ষণে কোণে রাখা একটা চেয়ারে বসে পড়েছে।

বললে—কেন, তোমার শোবার ঘরে বসলে আপত্তি কী?

সন্দীপ বললে—বাইরে আরাম করে বসতে পারতে!

বিশাখা বললে—অতো আরাম করার দরকার নেই, এইবার থেকে কষ্ট করার দিন এসে গেল—

—কেন?

বিশাখা বললে—কাল ছোটবাবু বাড়ি ফিরছেন।

—কে? সৌম্যপদবাবু? বাড়ি ফিরছেন? জেল থেকে ছাড়া পাচ্ছেন? কে বললে তোমাকে?

বিশাখা বললে—সেইটে জানতেই তো আমি গিয়েছিলাম হামিদের বাড়িতে।

—হামিদ? হামিদ কে?

বিশাখা বললে—হামিদের কথা তোমাকে তো আগে আমি বলেছি। সে একজন দালাল। সেই দালালের হাত দিয়েই তো আমি টাকা-কড়ি পাঠাতাম। সেই হামিদই তো ও-বাড়িতে বরাবর টাকা নিতে আসতো। দালালের হাত দিয়েই তো টাকাগুলো গিয়ে পৌঁছতো জেলখানায়। সেখানেই সবাই টাকা ভাগাভাগি করে নিত। সেই হামিদই আজকে আমার বাড়িতে জানিয়ে গিয়েছিল যে ছোটবাবু কাল জেলখানা থেকে বাড়ি ফিরছেন। আমি তখন বাড়িতে ছিলাম না। আমার ব্যাঙ্কে গিয়েছিলাম। মঙ্গলাকে বলে গেছে—

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—মঙ্গলা কে?

বিশাখা বললে—মঙ্গলা আমার বাড়ির কাজের লোক। আমি তাকে বলে গিয়েছিলাম, যদি কেউ আসে বাড়িতে তাকে যেন ঢুকতে না দেয়। কিন্তু তুমি যে হঠাৎ আমার বাড়িতে

যাবে তা কী করে জানবো!

সন্দীপ বললে—শুধু আমিই নয়, তোমার কাকা তপেশ গাঙ্গুলী মশাই আর তাঁর মেয়ে বিজলীও গিয়েছিল। তাঁদেরও তোমার মঙ্গলা আমার মতন ঢুকতে দেয়নি।

বিশাখা বললে—তাদের জন্যেই আমি মঙ্গলাকে ওই কথা বলে গিয়েছিলাম—

—কেন?

—তারা তো আমাকে জ্বালিয়ে খেলে। বলা নেই কওয়া নেই যখন-তখন আমার কাকা বিজলীকে নিয়ে এসে আমার বাড়িতে থাকে। ওদের জ্বালায় আমি মঙ্গলাকে ওই কথাই বলে গিয়েছিলাম। তার মধ্যে তুমি হঠাৎ আমার বাড়িতে গিয়ে হাজির হবে, আমি কী করে জানবো? তাই হামিদকে টাকা-কড়ি দিয়ে বাড়ি এসে শুনি তুমি আমার বাড়িতে এসেছিলে! সেই কথা শুনেই আমি সঙ্গে সঙ্গে তোমার বাড়িতে ছুটে এলুম—

সন্দীপ বললে—তা কে তোমাকে বললে যে সৌম্যবাবু কাল বাড়ি আসছে?

—আমি হামিদের কাছে গিয়েই শুনলাম। তারপর সেখান থেকে গেলুম জেল-সুপারিনটেনডেন্টের কোয়ার্টারে। তিনি কি সহজে দেখা করেন? অনেক কাকুতি-মিনতির পর তাঁর দেখা পেলুম। তিনিই বললেন—ছোটবাবুর জেল-কেরীয়ার খুব ভালো বলে অনেক বছর রেমিশন দেওয়া হয়েছে। ওঁকে কালকে ছেড়ে দেওয়া হবে। আমাকে তৈরি হয়ে যেতে বলেছেন কাল সকাল দশটার সময়ে—

তারপর একটু থেমে বললে—আসলে আমি বুঝতে পারলুম রেমিশন দেওয়ার কারণ হলো—টাকা! কত লাখ টাকা যে আমার ঘুষ দিতে হয়েছে তার ঠিক নেই। সেই সব টাকা সবাই মিলে ভাগাভাগি করে নিয়েছে এতদিন। তারই ফলে এই রেমিশন—

সন্দীপ বললে—খুব সুখবর দিলে তুমি আমাকে। যাক্ এত দিনে তোমার ভোগান্তির শেষ হলো।

বিশাখা বললে—কে জানে আমার ভোগান্তির শেষ হলো না আবার শুরু হলো। মাতালদের ওপর আমার বিশ্বাস নেই। যা'হোক তুমি শুয়ে পড়ো, আমি যাই—

বলে উঠতে গিয়ে উল্টোদিকে দেয়ালের দিকে নজর পড়ায় বিশাখা হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো। বললে—ওটা কী? ওটা আমার ছবি না?

সন্দীপ বললে—হ্যাঁ, ওটা তোমারই অনেককাল আগেকার ছবি। আমি তোমার ছবিটা ফ্রেমে বাঁধিয়ে দেওয়ালে টাঙিয়ে রেখেছি-

—ও ছবি তুমি কোথা থেকে পেলে?

—মনে নেই তুমি যখন 'আইডিয়াল ফুড প্রোডাক্ট' অফিসে ইণ্টারভ্যু দিতে গিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিলে—

—হ্যাঁ, মনে আছে!

—সেই তখন আমি লালবাজারে পুলিশের কাছে গিয়েছিলাম তোমার খোঁজে। তারা তোমার একটা ফটোগ্রাফ কোথায় পাবো। তখন মাসিমা বেঁচেছিলেন। তিনি ওই ফটোটা আমাকে দেন। বিডন স্ট্রীটের ঠাকমা-মণি তোমার ওই ফটোগ্রাফটা তুলিয়েছিলেন। তারই একটা কপি ছিল মাসিমার কাছে। তিনি সেটা আমাকে দেন পুলিশের কাছে দেবার জন্যে। যখন তোমাকে ওয়েলিংটন স্কোয়ারের রাস্তার মধ্যে অচেতন অবস্থায় পাওয়া গেল তখন আর সেটা পুলিশকে দেওয়ার দরকার হলো না। তখন থেকে ওটা আমার কাছেই রেখে দিয়েছিলাম। তারপর যখন সৌম্যবাবুর সঙ্গে হঠাৎ বিয়েটা হয়ে গেল তখন আমি ওটা বড়ো করে নিয়েছিলাম। এই বাড়িতে এসে সেই ছবিটাই রঙিন করে ফ্রেমে বাঁধিয়ে আমার শোবার ঘরে টাঙিয়ে রেখেছি।

—কেন?

সন্দীপ বললে—আমার বিশ্বাসের প্রতীক ওটা।

—তার মানে?

সন্দীপ বললে—তোমার মনে আছে একদিন রাসেল স্ট্রীটের বাড়িতে তুমি আমায়

বলেছিলে 'হাঁদা গঙ্গারাম', আমি সেই কথাটা এখনও মনে রেখেছি। আমি বিশ্বাস করেছি যে সত্যিই আমি 'হাঁদা গঙ্গারাম'। বিশ্বাস করেছি যে সত্যিই আমি বোকা। আমি বোকা না হলে তোমার সঙ্গে কখনও সৌম্যবাবুর বিয়ে হতো না। বিয়ে হতো আমার সঙ্গেই। ওই ছবিটা সব সময়েই মনে করিয়ে দেয় যে সত্যিই তুমি যা বলেছিলে আমি তাই-ই, আমি সত্যিই বোকা।

বিশাখা আপত্তি করে উঠলো। বললে—না না, তুমি বোকা নও, আমিই বোকা। আমি বলেই সেদিন সৌম্যবাবুর সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছিল। আমি আজ স্বীকার করছি তোমার কাছে যে আমিই বোকা, তুমি বোকা নও। ও ফটোটা তুমি ভেঙে ফেলো। কিংবা আমাকে দাও আমি ভেঙে ফেলছি—

সন্দীপ বললেন—না, তা আর হয় না বিশাখা, তা আর হয় না। আমি রোজ শোবার সময়ে ওই ছবিটার দিকে চেয়ে দেখে ঘুমোতে যাই। তোমার ছবিটার দিকে চাইলে আমার মনে বিশ্বাস ফিরে আসে—

তারপর একটু থেমে বললে—এবার তুমি বাড়ি যাও, অনেক রাত হয়েছে। কাল ছোট-বাবু বহু বছর পরে প্রথম বাড়ি ফিরবেন। তোমার আবার নতুন জীবন শুরু হবে, তুমি এখন যাও—

বিশাখা উঠলো। বললে—ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি। কিন্তু তুমি কথা দাও যে তুমি আমার ভুবন গাঙ্গুলী লেনের বাড়িতে নিয়ম করে আসবে।

সন্দীপ বললে—ঠিক আছে, সময় পেলেই যাবো। কিন্তু সৌম্যবাবু কি তোমার বাড়িতে আমার যাওয়া পছন্দ করবেন?

বিশাখা বললে—সে ভার আমার ওপর ছেড়ে দাও। আমাকে শুধু কথা দাও যে তুমি যাবে!

—কেন ও-কথা বলছো আমাকে? তুমি তো সব জানো। তোমার স্বামী ফিরে আসার পর কি তোমার বাড়িতে আমার ঘন ঘন যাওয়া ভালো দেখাবে?

—হ্যাঁ, বলছি ভালো দেখাবে, তাতে কিছু অন্যায় হবে না—

কথা আদায় করে নিয়ে বিশাখা চলে গেল। যাওয়ার সময়ে শুধু জিজ্ঞেস করলে—ঠিক যাবে তো?

সন্দীপ বললে—হ্যাঁ, কথা দিলাম, ঠিক যাবো। আমি চাই সৌম্যবাবু বাড়ি ফিরে এলে তোমার জীবন সুখী হোক!

তখন সন্দীপ আবার পায়ে পায়ে চলতে আরম্ভ করেছে। এত দিন পরে, এত বছর পরে সেই কলকাতাটা যেন তার কাছে আবার নতুন লাগছে। এই কলকাতাকে সে কতোদিন ধরে দেখে আসছে। দিনে-রাতে কতো রকম ভাবে দেখে আসছে এই কলকাতাকে কিন্তু তার মনে হচ্ছে যেন সে এক নতুন কলকাতাকে দেখছে। সেই জেলে যাওয়ার আগে যে-কলকাতাকে সে দেখেছিল এ যেন সে-কলকাতা নয়। এ যেন অন্য শহর, অন্য দেশ। সেই সব দোকানের সাইন-বোর্ডগুলো বদলে অন্য সাইন-বোর্ড লাগানো হয়েছে। এই ক'বছরের মধ্যে এত পরিবর্তন হতে পারে?

অথচ জেলখানার মধ্যে বসে সে ভাবতো সব কিছু সেই একই রকম আছে। সেই বারোর-এ বিডন স্ট্রীটের বাড়িটা ঠিক সেই একই রকম আছে। কিন্তু আসলে তা তো নয়। সে-বাড়িটা যারা কিনে নিয়েছিল তারা সেটাকে ভেঙে ফ্ল্যাট-বাড়ি করে আরো উঁচু করেছে, আরো বাহারি করেছে। যারা সেখানে এখন বাস করছে তারা জানেও না তার

পুরনো ইতিহাস। তারা জানে না যে একদিন ওই বাড়িতেই ঠাকমা-মণি নামে একজন দুঃখী মানুষ জীবন কাটিয়ে গেছেন। তারা জানে না যে সেই অগাধ টাকাওয়ালা মানুষের দীর্ঘনিঃশ্বাস সমস্ত বাড়িটার হাওয়ায় মিশে আবহাওয়া বিষাক্ত করে দিত। আরো জানে না যে সেই বাড়িটাতেই একদিন একজন মানুষ একজন মেমসাহেবকে খুন করে ফাঁসির আসামী হয়েছিল। আরো জানে না যে একদিন ওই ফাঁসির আসামীর সঙ্গেই বিশাখা নামের একটা গরীব মেয়ের বিয়ে হয়েছিল। আর বিয়ে হওয়ার পর থেকেই সে বড়ো কষ্টের জীবন কাটিয়েছিল।

সহদেব মাঝে মাঝে আসতো আর দেখতো সন্দীপ কেমন অন্যমনস্ক হয়ে রয়েছে। সহদেব একদিন বলেছিল—আপনি সব সময়ে এত কী ভাবেন? বাড়ির কথা?

সন্দীপ বলতো—আমার তো বাড়ি নেই সহদেব—

—বাড়ি নেই মানে?

—বাড়ি নেই মানে আমার নিজের বলতে কেউ নেই—

সহদেব বলতো—বাড়ি না থাকলেও আত্মীয়-স্বজন তো কেউ আছে। তাদের ঠিকানা দিন না। আপনি যা চাইবেন তাদের কাছ থেকে আমি তাই-ই চেয়ে আনবো।

সন্দীপ বলতো—না, আমার কিছুরই দরকার নেই—

সহদেব বলতো—কিছুর দরকার নেই, তা কখনও হতে পারে? আমাদের লোক আছে বাইরে, একবার হুকুম দিলেই তারা তা এনে দিতে পারে!

এ-সব কথা বিশাখার কাছ থেকে শুনেছিল সে। হামিদ বলে জেলখানার কে একজন দালাল বিশাখার কাছে আসতো টাকা চাইতো। এক টাকা দু'টাকা চাইতো না একেবারে সত্তর হাজার আশি হাজার টাকা চাইতো। বিশাখাও টাকাটা দিয়ে দিত। দিত এই ভরসায় যে জেলখানায় সৌম্যপদ একটু আরাম পাবে, একটু পেট ভরে খেতে পাবে। বিশাখাকে হামিদ বলেছিল যে সেই টাকা নাকি সবাই মিলে ভাগ করে ভোগ করবে।

একেবারে ওপরওয়ালা থেকে নিচুতলা পর্যন্ত সবাই তার ভাগ পাবে।

সহদেব বলতো—কী ভাবছেন?

সন্দীপ বলতো—না সহদেব, আমার কিছুরই দরকার নেই। আমার নিজের সংসার বলে কিছুই নেই।

সত্যিই কি সন্দীপের কিছুই ছিল না?

ছিল। সে শুধু একটা ফোটো। ফোটোগ্রাফ। বিশাখার তখনও বিয়ে হয়নি। সেই সময়ে ঠাকমা-মণি বিশাখার একটা ফোটো তুলে রাখতে চেয়েছিলেন। সন্দীপই বাজারের একজন ফোটোগ্রাফারকে ডেকে সেই ফোটো তুলেছিল। ফোটোটা সন্দীপ ঠাকমা-মণিকে দিয়ে দিয়েছিল। সেটা ঠাকমা-মণি তাঁর কাশীর গুরুদেবকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য এই কন্যার ভবিষ্যৎ কী হবে তাই জানা। আর কিছু নয়।

সেই ফোটো দেখে ঠাকমা-মণির গুরুদেব কী ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তা সন্দীপের জানার কথা নয়। তবু মল্লিক-কাকাকে একদিন সন্দীপ জিজ্ঞেস করেছিল—গুরুদেব ফোটোটা দেখে কী ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন মল্লিক-কাকা?

মল্লিক-কাকা বলেছিলেন—তোমার ও-সব খবরে কী দরকার? তুমি হলে শুধু হুকুমের চাকর, ঠাকমা-মণি হুকুম করবেন তাই-ই তালিম করবো। তুমি যা লেখা-পড়া করছো শুধু মন দিয়ে তাই-ই করে যাও, যাতে একটা ভালো চাকরি পাও। আর কোনও দিকে কান দেবার দরকার নেই তোমার—

তা তো বটেই। সন্দীপের তো অন্যদিকে মন দেওয়ার দরকার নেই। তবু সেই ফোটোগ্রাফারের কাছ থেকে সেই সময়েই সেই ফোটোর একটা কপি নিজের পকেটের টাকা দিয়েই করিয়ে নিয়েছিল। তারপর সেটা সে নিজের জামা-কাপড় রাখবার টিনের স্যুটকেসের মধ্যে রেখে দিয়েছিল। সে-কথা পরে একেবারে ভুলে গিয়েছিল। তারপর?

তারপর বহুদিন আর সন্দীপের সে-ফোটোটার কথা মনে ছিল না।

বহুদিন পরে যখন মা মারা গেলেন, তখন বেড়াপোতা ছেড়ে কলকাতায় চলে এসে নেবুবাগানে বাড়ি ভাড়া করেছিল। সেই সময়ে একদিন পুরনো স্যুটকেস পরিষ্কার করতে করতে সেই ফোটোটা আবিষ্কার করে মনের ভেতরে একটা অলৌকিক আনন্দ অনুভব করেছিল। কী থেকে যে কী হয় কে বলতে পারে?

সেই ফোটোটাই একদিন সন্দীপ এনলার্জ করে ফ্রেমে বাঁধিয়ে শোবার ঘরের দেওয়ালে টাঙিয়ে রেখেছিল। এমন জায়গায় টাঙিয়ে রেখেছিল যে যাতে বিছানায় শুয়ে শুয়েও ফোটোটা স্পষ্ট দেখা যায়। বিশাখার সঙ্গে আর কোনওদিন যে তার দেখা হবে তা সে কল্পনাও করতে পারেনি। কারণ সৌম্যপদবাবুর সঙ্গে বিশাখার বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর আর কোনও গরজও ছিল না তার। বিশাখা তো তার পর।

কিন্তু যদি তার পরই হয় তাহলে কেন সে বিশাখার ফোটোটা নিজের ঘরের দেওয়ালে টাঙিয়ে রেখেছিল?

আর ফোটোটা তো টাঙিয়ে রেখেছিল নিজে দেখবে বলে। সে তো কখনও চায়নি যে বিশাখা জানুক যে সন্দীপ তার শোবার ঘরের দেওয়ালে ফোটোটা টাঙিয়ে রেখেছে। আর আশ্চর্য, বিশাখা সেদিন হঠাৎ তার ঘরে আচমকা ঢুকতেই বা গেল কেন? আর ঢুকলোই যদি তাহলে ফোটোটা সে ফেরত নিতে চাইলোই বা কেন?

সে-সব কতোদিন আগেকার কথা! জেলখানায় যাওয়ার অনেক দিন আগের সে-কথা সেই-ই প্রথম বিশাখা জানতে পারলে যে সন্দীপ তার ফোটোটা নিজের শোবার ঘরের দেওয়ালে টাঙিয়ে রেখেছে। সেই-ই প্রথম বিশাখা বলেছিল—তুমি আমার ফোটোটা টাঙিয়ে রেখেছে কেন?

সন্দীপ বলেছিল—বেড়াপোতা থেকে যখন চলে এসেছিলুম তখন সমস্ত জিনিস-পত্র কলকাতায় নিয়ে এসেছিলুম। তারপর জিনিসপত্রগুলো যখন পরিষ্কার করছিলুম তখন ওই ফোটোটা দেখতে পেলুম। তখন ওটা পাছে আবার হারিয়ে যায় তই দেওয়ালে টাঙাতে বললাম রতনকে—

—ওটা আমাকে দাও না। আমি বাড়ি নিয়ে যাই—

সন্দীপ বলেছিল—না, ওটা তুমি ফেরৎ চেও না—

—কেন, ফেরৎ চাইলে দোষের কী?

সন্দীপ বলেছিল—ওটা ফেরৎ দিলে আমার আর থাকলো কী? ওটা ফেরৎ দিলে আমি কী নিয়ে থাকবো? আমার নিজের বলতে তো আর কিছু থাকবে না—

এর পর কিছুক্ষণ আর কোনও কথা বিশাখার মুখ দিয়ে বেরোয়নি।

খানিক পরে বলেছিল—তুমি একটা বিয়ে করে ফেল না—

—বিয়ে?

—হ্যাঁ, তোমাকে বিয়ে করতেই বলছি। তুমি বিয়ে করে সুখী হও, আমি তাই-ই দেখতে চাই!

সন্দীপ কী যেন বলতে গিয়েছিল, কিন্তু বলতে গিয়েও বলতে পারলে না। কথা মুখে আটকে গেল। বিশাখা বলেছিল—কী হলো, কথা বলছো না যে?

—বলবো?

—হ্যাঁ, বলো না—আমি তোমার মুখ থেকেই জবাবটা শুনতে চাই—

তখন সন্দীপ বলেছিল—তোমার অনেক রাত হয়ে যাচ্ছে, এর উত্তর শুনতে গেলে তোমার অনেক সময় নষ্ট হয়ে যাবে!

বিশাখা বলেছিল—তা হোক, আমি সামান্য একটা মানুষ, তার আবার সময়। আমার তো অফুরন্ত সময়। আমার সময়ের আর দাম কী? আমার তো সময় কাটতেই চায় না।

সন্দীপ বলেছিল—এখুনি তো তুমি বলছিলে আমাকে বিয়ে করে সুখী হতে দেখতে চাও! বিয়ে তো তুমিও করেছ। তুমি কি সুখী হয়েছ?

বিশাখা বলেছিল—আমার কথা ছেড়ে দাও। আমি যে বিয়ে করে সুখী হইনি তার

জন্যে তো তুমি দায়ী।

—আমি?

—তুমি না তো কে দায়ী? তুমিই তো একটা মাতাল ফাঁসির আসামীর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিলে আমার?

সন্দীপ বলেছিল—আজকে আমার ঘরে তোমার ফোটো টাঙানো দেখে তুমি এই কথা বলছ? আগে তো তা বলোনি!

—তাহলে কেন আমার ফোটো তোমার শোবার ঘরে টাঙিয়ে রেখেছ? বলো কী জন্যে?

—এর উত্তর তুমি চাও?

—হ্যাঁ, আজই চাই। এখনই—

সন্দীপ সত্যি কথাটা বলবে কিনা ভাবছিল। সত্যি কথাটা বললে হয়তো বিশাখা অখুশী হবে. কিন্তু তবু সন্দীপের মুখ দিয়ে সত্যি কথাটা বেরিয়ে গিয়েছিল।

বলেছিল—আমি বিশ্বাস করি তুমি আসলে টাকাকেই ভালোবাসো—

বিশাখা বলেছিল—আমি টাকাকে ভালোবাসি? তুমি আজ এ-কথা বলতে পারলে?

সন্দীপ বলেছিল—আজ এত কাণ্ডের পরে তুমি হয়তো বিশ্বাস করতে চাইবে না। টাকাকে না ভালোবাসলে তুমি যখন বেড়াপোতাতে ছিলে তখন নিজে চাকরির দরখাস্ত করেছিলে কেন? সেই 'আইডিয়াল ফুড প্রোডাক্টস্' নামের অফিসের কথা ভাবো! তার-পর তুমি ওয়েলিংটন স্ট্রীটের ওপরে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলে একদিন। সে-সব কথা কি তোমার মনে আছে? সেদিন কে তোমাকে উদ্ধার করেছিল? বলো?

—সে তো আমার মনে আছে! কিন্তু টাকাকে আমি ভালোবাসি সে-কথা তোমায় কে বললে?

সন্দীপ বলেছিল—আমাকে কি তুমি এতই বোকা ভেবেছ? আমি কি কিছুই বুঝতে পারি না ভেবেছ? তারপর একটু থেমে সন্দীপ বলেছিল—তোমার মা'রও তো ইচ্ছে ছিল যে তোমার বিয়ে বড়োলোকের ছেলের সঙ্গে হোক। তাই তো আমি আমাদের বিয়ের আসরে তোমার পথের বাধা হয়ে না থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলুম।

বিশাখার চোখ দিয়ে তখন জল গড়িয়ে পড়ছিল। সে তার শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখ দুটো মুছে নিয়েছিল। সন্দীপ বললো—কী হলো. কথা বলছ না যে?

বিশাখা বলেছিল—না, এর পরে আর আমার কিছু বলবার নেই—

সন্দীপ জিজ্ঞেস করেছিল—এ-কথায় তুমি খুব কষ্ট পেলে তো?

বিশাখা বলেছিল—না, আমি কষ্ট পেলেই বা তাতে তোমার কী এসে যায়? তুমি তো বেশ আরামেই আছ—

বলে আর দাঁড়ায়নি, কথাটা বলেই চলে গিয়েছিল।

রাস্তায় চলতে চলতে সেই আগেকার সমস্ত কিছুই মনে পড়ছিল। আর চারদিকের কলকাতা শহরটাকেই চেয়ে চেয়ে দেখছিল। কী বিরাট শহর আর কী বিরাট তার পরিবর্তন। ভূগোলে লেখা থাকতো পৃথিবীটা নাকি গোল। কিন্তু পৃথিবীটা যে এত পরিবর্তনশীল তা তার জানা ছিল না। যতোদিন জেলখানার ভেতরে ছিল সে ততদিন বুঝতে পারেনি যে কলকাতার এত পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। সে তখন ভাবতো কলকাতা বুঝি সে আগেকার মতোই আছে। সেই আগেকার মতোই এই শহরের মানুষ পাশের বাড়ির মানুষকে চেনে. জানে. বুঝতে পারে. বুঝতে অন্ততঃ চেষ্টা করে।

কিন্তু এখন যেন অন্যরকম। এখন কেউ কারোর জন্যে ভাবে না। কারো সুখদুঃখের পরোয়া করে না। আশেপাশের বাস-ট্রামগুলো ছুটছে আর এক এক জায়গায় যখন থামছে তখন তাতে ওঠবার নামবার জন্যে লোকের হুড়োহুড়ি আরো বেড়েছে। কে নামতে গিয়ে পড়ে গেল কিংবা কে আগে নামবে আর কে আগে উঠবে তারই জন্যে পরস্পর রেষারেষি চালাচ্ছে। গাড়ির লোক সবাই নামলে তখন যে উঠতে হবে তার দিকে কারো খেয়াল নেই—

এই সব কিছু দেখতে সন্দীপ হেঁটে হেঁটে রাস্তা দিয়ে চলছিল।

হঠাৎ কে যেন পেছন থেকে ডাকলে—এই সন্দীপ—সন্দীপ—

এতদিন পরে কে তাকে ডাকবে? সে পেছন দিকে ফিরে দেখলে। এক ভদ্রলোক তার দিকে এগিয়ে এসেই পেছিয়ে গেল। বললে—না, কিছু মনে করবেন না, আমি ভেবেছিলুম আমার বন্ধু সন্দীপ লাহিড়ী—

সন্দীপ বললে—আমার নামও তো সন্দীপ লাহিড়ী—

—না, সে অন্য লোক—

বলে অন্যদিকে চলে গেল। একই নামের দুজন মানুষ থাকা এমন কিছু বিচিত্র নয়। কিন্তু এ কী রকম ভুল! তাকে অন্য একজন লোকের মতো দেখতে হবে, অথচ পদবী হবে একই, এও সম্ভব নাকি?

কিন্তু সন্দীপের তো অনেক বয়েস হয়েছে। জেলখানার ভেতরে এত বছর কাটিয়ে তার বয়েস তো অনেক বেড়ে গেছে। নিয়ম করে ঠিক পছন্দমতো খাওয়া-দাওয়াও হয়নি। জেলখানার মতো অখাদ্য খাওয়া খেয়ে, সে তো আরো অনেক বুড়ো হয়েছে। নিয়ম করে দাড়িটা অনেক দিন কাটাও হতো না। তার মাথার অর্ধেক চুলও পেকে গিয়েছে। তাহলে এমন ভুল লোকটার কেন হলো?

সেই কোন দুপুরের আগে সে জেল থেকে ছাড়া পেয়েছিল। তখন বোধহয় বেলা বারোটা। জেলার ভদ্রলোকের কাছ থেকে ডাক এসেছিল। সহদেব বলেছিল—চলুন, আজকে আপনি ছাড়া পাবেন, বড়ো সাহেব আপনাকে ডেকেছেন—

কথাটা জানাই ছিল যে সেদিন সে জেলখানা থেকে ছাড়া পাবে। কিন্তু ঠিক কখন ক'টার সময়ে ছাড়া পাবে তা সহদেব জানাতে পারেনি। সকালবেলায় যা জলখাবার দেবার কথা তা অন্যদের সঙ্গে তাকেও দেওয়া হয়েছিল।

তারপর দুপুরের সময় সহদেবের সঙ্গে সে জেলার সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছিল। বিরাট একটা ঘর। সেটা জেলখানার একটা অফিস। চারদিকে নানা রকমের জিনিস-পত্র সাজানো। সেখানে আরো কিছু কেরানী ধরনের লোক বসেছিল। তারা যে-যার টেবিলে বসে কাজ করছে।

সন্দীপ সহদেবের সঙ্গে ঢুকতেই একজন জিজ্ঞেস করলে—কতো নম্বর?

সহদেব নম্বরটা জানতো। সে নম্বরটা বলতে তার নম্বরের ফাইলটা বার করলে। তারপর ফাইলটা মিলিয়ে দেখে নিয়ে খুশী হয়ে জিজ্ঞেস করলে—আপনার নাম তো সন্দীপকুমার লাহিড়ী?

সন্দীপ মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো। লোকটা তারপর একজন পিওনকে নম্বরটা বলতেই সে পাশের ঘর থেকে একটা থলি নিয়ে এলো। বললে—এইটে আপনার তো?

সন্দীপ কী বলবে? বললে—হ্যাঁ—

—না ভালো করে দেখে নিন।

সন্দীপ কী আর দেখবে? তার কি মনে থাকার কথা যে কতো বছর আগে সে কী-কী জিনিস নিয়ে জেলখানায় ঢুকেছিল?

—তবু ভালো করে দেখে নিন। জিনিসগুলো একটা প্যাকেটে বাঁধা ছিল।

কেরানী ভদ্রলোক বললে—প্যাকেটটা খুলে ভালো করে দেখে নিয়ে থলিটা ফেরৎ দিন—

সন্দীপ খবরের কাগজে মোড়া প্যাকেটটা তুলে নিয়ে থলিটা বাবুটার হাতে ফেরৎ দিলে। বললে—প্যাকেটটা খুলে ভালো করে দেখে নিন। আর যে-সব জিনিস-পত্র আপনি জেলখানায় ঢোকবার সময়ে সঙ্গে এনেছিলেন তা সব ঠিক আছে কিনা দেখে নিন। মিলিয়ে নিন। ওর মধ্যে আপনার জামা প্যান্টও আছে, সেগুলো পরে নিয়ে জেলখানার প্যান্ট-জামাগুলো ফেরৎ দিন।

সন্দীপ কী করে প্যান্ট-জামা বদলাবে ভাবছিল। কেরানী ভদ্রলোক বললে—এই এ-পাশের ঘরে চলে যান, প্যান্ট-শার্ট বদলাবার ঘর আছে—

সন্দীপ তাই-ই করলে। প্যান্ট-শার্ট বদলে সন্দীপ আবার অফিস ঘরে ঢুকলো। জেলখানার পোশাক ফেরৎ দিতে গেল। একজন ওয়ার্ডার সেগুলো হাতে করে নিয়ে যথাস্থানে রাখবার জন্যে নিয়ে গেল।

- প্যাকেটটা খুলে দেখলেন না?

—ও দেখে দরকার নেই!

ভদ্রলোক বললে—না দেখে নিন, আমাদের সামনে খুলুন!

সন্দীপ বললে—না, আমি জানি ভেতরে কী ছিল। শুধু একটা মহিলার ছবি ছিল, আর কিছু খুচরো টাকা!

—খুচরো কতো টাকা?

সন্দীপ বললে—তা মনে নেই—

ভদ্রলোক বললে—তবু গুণে নিন আমাদের সামনে। আমাদের দেখা ডিউটি—

অগত্যা প্যাকেটটা খুলতে হলো সন্দীপকে। টাকা পয়সা যা ছিল তা ছিলই। সঙ্গে বিশাখার সেই ছবিটাও বেরিয়ে এলো।

ছবিটার দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে দেখে সন্দীপের সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল সেই সব দিনের কথা। সেই বারোর-এ বি-ডন স্ট্রীটের বাড়ি, সেই মনসাতলা লেনের কথা, সেই রাসেল স্ট্রীটের তেতলা ঘর, সেই বেড়াপোতায় মা'র কথা। আর তারপর সেই নেবুবাগান লেন, আর শেষকালে সেই পাঁচ নম্বর ভুবন গাঙ্গুলী লেনের বাড়িতে বিশাখার অঝোর ধারায় কান্না...

—শুনুন, শুনুন, কোথায় যাচ্ছেন?

সন্দীপ বললে—আমি তো আমার জিনিস-পত্র সব পেয়ে গিয়েছি—

—মাইনে নেবেন না?

—মাইনে কীসের?

ভদ্রলোক বললে—বাঃ, এত বছর আমাদের এ্যাকাউন্টস্ ডিপার্টমেন্ট কাজ করেছেন, তার মাইনেটা নেবেন না?

—আমার দরকার নেই সে-টাকার!

ভদ্রলোক বললে—না, এ্যাকাউন্টস্ ডিপার্টমেন্টে যান—মাইনেটা নিতে হবে. সব রেডি—

বলে সহদেবকে বললে—কয়েদীকে নিয়ে যা তো ওখানে—

সহদেবই নিয়ে গেল সন্দীপকে এ্যাকাউন্টস্ ডিপার্টমেন্টে। সেখানে বোধ হয় আগে থেকেই খবর দেওয়া ছিল। সন্দীপ কতো বছর ওখানে কাজ করেছে। সকলেরই মুখ চেনা। ন্যাশনাল ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের ম্যানেজার ছিল সন্দীপ। সেখানে অতো বছর কাজ করে এ্যাকাউন্টের নাড়ী-নক্ষত্র সব কিছু তার জানা।

তারা সবাই সন্দীপের দিকে চেয়ে অভ্যর্থনার হাসি দিয়ে আপ্যায়ন করলে। বললে—বসুন বসুন, সন্দীপবাবু—

সন্দীপ বললে—না, আর বসবো না—আমি চলেই যাচ্ছিলুম, ও'রা আমাকে এই ঘরে একবার আসতে বললেন মাইনে নেবার জন্যে!

—হ্যাঁ, আপনার রিলিজের কথা তো আমরা আগেই পেয়ে গিয়েছিলুম। আপনার টাকা তো তৈরি।

তারপর একটু থেকে আবার বললে—এক কাপ চা দিতে বলি?

আর তারপরই আবার নিজের ভুল বুঝতে পেরে বললে—ও, আপনি তো আবার চা-বিড়ি-সিগ্রেট কিছুট খান না—

—হ্যাঁ।

ভদ্রলোক সিন্দুক খুলে টাকা বার করে গুনতে লাগলো।

তারপর টাকাগুলো সন্দীপের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো—তিন হাজার টাকা, গুণে নিন—

সন্দীপ নোটের তাড়াটা নিয়ে প্যাকেটের মধ্যে রেখে দিলে।

ভদ্রলোক বললে—কই, টাকাগুলো গুণে নিলেন না?

সন্দীপ বললে—না, আপনারা কি আর আমাকে ঠকাবেন?

ভদ্রলোক বললে—সে কী? টাকাই তো সবাই সবাইকে ঠকায়। এত বছর ব্যাঙ্কে চাকরি করে এটা জানেন না? আপনিও তো ঠকিয়েছেন অন্য লোককে—

—আমি ঠকিয়েছি? কে বললে আপনাকে?

ভদ্রলোক বললে—না ঠকালে জেলখানায় এলেন কেন? কেন এত বছর জেল খাটলেন!

সন্দীপ বললে—তা তো বটেই, লোককে ঠকানোর জন্যেই তো আমার জেল হয়েছিল—

—বাড়িতে আপনার কে-কে আছেন? তাঁরা কেউ জানেন না যে আপনি জেল থেকে আজ ছাড়া পাবেন?

সন্দীপ বললে—কী জানি!

—সে কী, আপনি ব্যাঙ্কের এত বড় একজন অফিসার, আর আপনি বলছেন নিজের লোক কেউ নেই?

সন্দীপ বললে—আছে, একজন, আছে, কিন্তু...

বলতে গিয়েও থেমে গেল। বললে—না থাক, আমার নিজের বলতে কেউ-ই নেই মানে নেই। সকলের কি নিজের বলতে কেউ থাকে?

জেলখানার লোকদের অতো কথা বলবার সময়ও নেই। ভদ্রলোক বললে—বুঝতে পেরেছি, দিন, এখানে একটা সই করে দিন—

সন্দীপ রসিদের ওপর একটা সই করে দিলে। তারপর দরজার দিকে পা বাড়ালে। সেদিকে বড়ো গেট বা প্রধান গেট। গেটটা বন্ধই থাকে বরাবর। ভেতর থেকে কেউ বাইরে বেরোবার পাস দেখালে খুলে দেওয়া হয়।

সন্দীপ বাইরে বেরোতেই মুক্তির নিঃশ্বাস ছাড়লো। কেউ তাকে অভ্যর্থনা করতে কোথাও দাঁড়িয়ে নেই। হাতে টাকা রয়েছে, সামনে রয়েছে অফুরন্ত সময়। ঠিক সৌম্য-বাবুও একদিন এইভাবে জেল থেকে বাইরে বেরোবার জন্যে অনুমতি পেয়েছিলেন।

কিন্তু সেদিন কী হলো? সেদিন ছিল সম্পূর্ণ অন্যরকম অবস্থা।

সেদিনও ছিল সকালবেলা। সেদিন সকাল, কিন্তু ছিল অন্য রকম অবস্থা। জেল-খানার বাইরে সেদিন কিন্তু অনেকেই গেটের কাছে সৌম্যবাবুর জন্যে অপেক্ষা করছিল। বিশাখা আগের দিন রাত্রেই হামিদের কাছ থেকে খবর পেয়েছিল যে সৌম্যবাবু আজই ছাড়া পাবে। তাই খবরটা পেয়েই তৈরি হয়ে ছিল। মঙ্গলা বলেছিল—বউদি-মণি তপেশ-বাবু বিজলীদিকে নিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। আমি তাদের বাড়িতে ঢুকতে দিইনি—

—ঢুকতে দিসনি তো?

—না—

—বেশ করেছিস! আর কেউ এসেছিল?

মঙ্গলা বলেছিল—হ্যাঁ, আর একজন এসেছিল—

—কে?

মঙ্গলা বলেছিল—আমি তাঁকে চিনি না।

—নাম বলেননি তিনি?

—হ্যাঁ, নাম বলেছিল। আমার মনে পড়ছে না ঠিক।

তারপরেই বললে—হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে, সন্দীপ। সন্দীপবাবু, সন্দীপকুমার লাহিড়ী—

—সে কী? তাকে তুই ঢুকতে দিসনি? তুই তো জানিস আমি একটু পরেই আসবো। তাকে বসতে বললি না কেন?

মঙ্গলা বললে—তুমি যে বলেছিলে কাউকে ঢুকতে না দিতে! তপেশবাবু ঝোলাঝুলি করছিল বাড়িতে ঢোকবার জন্যে। আমি তবু তাদের ঢুকতে দিইনি—

—তা বেশ করছিস, কিন্তু সন্দীপকে ঢুকতে দিলি না কেন?

—তুমি যে ঢুকতে দিতে বারণ করে গিয়েছিলে!

বিশাখা বললে—তা বলে যে-লোকটা কখনও এ-বাড়িতে আসেনি সেই লোকটাই এই প্রথমবার এলো আর তাকেই তুই ঢুকতে দিলি নে? চেহারা দেখেই তো তোর বোঝা উচিত ছিল যে সে মানুষটা ভদ্রলোক। তাকে অপেক্ষা করতেও বলতে পারতিস! তুই তো জানতিস আমি দেরি হলেও বাড়িতে আসবোই...

—তা বলে অচেনা লোককে বাড়িতে ঢুকতে দেব?

বিশাখা বললে—কে ভদ্রলোক আর কে অভদ্রলোক চেহারা দেখে তুই যদি চিনতে না পারবি তো মানুষ হয়ে জন্মেছিলি কেন?

—তা তপেশবাবুও তো ভদ্রলোক!

—দূর। তপেশবাবু ভদ্রলোক কে বললে? দেখিস নে কী রকম ব্যবহার করি আমি তার সঙ্গে। দেখিস নে কী রকম টাকা চায় রোজ রোজ। কী রকম বিজলীদিকে এ-বাড়িতে একলা ছেড়ে দিয়ে নিজে বাড়ি চলে যায়। তারপর টাকা ফুরিয়ে গেলে তখন আবার আসে। আবার এসে টাকার জন্যে ধরাধরি করে! এটা কি ভদ্রলোকের লক্ষণ! তাকে তুই ঢুকতে দিসনি, বেশ করেছিস। কিন্তু সন্দীপবাবু এ-বাড়িতে কখনও আসে না, তাকে তুই বাড়িতে না ঢুকতে দিয়ে খুব অন্যায় করেছিস।

তারপর একটু থেমে আবার বললে– তা তোরই বা দোষে কী। তুই-ই বা কী করে চিনবি তাকে। সে মানুষ তো কখনও আসে না। তাকে আমিই কাল আমার বাড়ির ঠিকানা দিয়েছিলাম। আর আমিই তাকে কাল একদিন এ-বাড়িতে আসতে বলেছিলাম, আর তাকেই কিনা তুই তাড়িয়ে দিলি! তা তোরও কিছু দোষ নেই, এখন আমাকেই এর প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে! আমিই এখন তার বাড়িতে যাই—

বলে ড্রাইভারকে ডেকে আবার গাড়িতে উঠে বসলো! বললে—কাল যে-বাড়িতে গিয়েছিলুম, সেই বাড়িতেই আবার চল একবার—

রাত অনেক হলেও ড্রাইভার গাড়িতে স্টার্ট দিলে। তারপর ঠিক বাড়িটার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই বিশাখা তাড়াতাড়ি বাড়ির সামনের সদর দরজার কড়া নাড়তে লাগলো।

রতন দরজা খুলতেই বিশাখা জিজ্ঞেস করলে—তোমার বাবু কি শুয়ে পড়েছেন?

রতন বললে—না—

কথাটা শোনবার সঙ্গে সঙ্গেই বিশাখা আর কোনও কথা না বলে একেবারে সোজা সন্দীপের শোবার ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়েছিল।

তারপর অনেকক্ষণ ধরে কথা হয়েছিল মনে আছে। সন্দীপের শোবার ঘরের দেওয়ালের ওপর বিশাখার সেই রঙীন ছবিটা টাঙানো রয়েছে দেখতে পেয়েছিল।

তারপর আর বিশেষ কষ্ট দেয়নি সন্দীপকে। শুধু বলেছিল—তোমাকে অনেক বিরক্ত করে গেলাম কিছু মনে কোর না। তোমাকে আমার বাড়িতে ঢুকতে না-দেওয়ার জন্যে

আমি মঙ্গলাকে আজকে অনেক বকেছি—

সন্দীপ বলেছিল—কেন, বকলে কেন মিছিমিছি, সে তো আমায় চেনে না—

বিশাখা বলেছিল—আমি কল্পনাও করতে পারিনি যে তুমি আজই আমার বাড়িতে যাবে। আসলে আমার ভয় ছিল যে আমার কাকা বিজলীকে নিয়ে যেমন প্রায়ই আসে তেমনি আসবে!

—কেন তপেশবাবু বিজলীকে নিয়ে এলে তোমার ভয় কী?

বিশাখা বলেছিল—না, তুমি ভালো করে চেনো না আমার কাকাকে। বিজলীকে আমার নতুন বাড়িতে নিয়ে এসে মাঝে- মাঝে একমাস দু'মাস রেখে দিয়ে চলে যায় কাকা—আমার তা ভালো লাগে না। আমার শ্বশুর বাড়িতে নিয়ে যেতে সাহস করতো না। কিন্তু এ-বাড়িতে আমাকে একলা পেয়ে সুবিধে হয়েছে। যখন-তখন আমার বাড়িতে আসে। আর বিজলীকে আমার কাছে রেখে দিয়ে চলে যায়—

—তাতে ক্ষতি কী? তুমিও তো একলা। তোমারও একজন সঙ্গী পাওয়া হয়!

—না, আমি অমন সঙ্গী চাই না।

—কেন চাও না?

বিশাখা বলেছিল—বিজলীর যে এখনও বিয়ে হয়নি। এই সময়ে বাড়ির কর্তা এত বছর পরে জেল থেকে কাল ছাড়া পাচ্ছে, এখন কি এক বাড়িতে বিজলীকে রাখা ভালো। কর্তার স্বভাবচরিত্র তো তুমি সবই জানো। শুধু কি মদ? মদের সঙ্গে অন্য আনুষঙ্গিকও তো পুরুষ মানুষের থাকে। এখন যদি বিজলী আমার বাড়িতে থাকে তো কী হবে ভাবো তো—

তারপরই বিশাখা উঠে দাঁড়িয়েছিল। বলেছিল—যাই, তোমাকে অনেক বিরক্ত করে গেলাম—

বলে বিশাখা চলে গেল। রতন সদর দরজা বন্ধ করে দিলে। কিন্তু তারপর কি সন্দীপের ঘুম এসেছিল? আর শুধু সন্দীপ কেন, বিশাখারও কি সে-রাত্রে ঘুম এসেছিল?

এই যে জেলখানা থেকে সন্দীপ বেরিয়ে এলো এই জেলখানার এই গেট দিয়েই একদিন সৌম্যবাবুও বেরিয়ে এসেছিল।

সেও অনেক বছর আগেকার কথা। তার বেরিয়ে আসার সঙ্গে কিন্তু সৌম্যবাবুর বেরিয়ে আসার কোনও সম্পর্ক নেই। সৌম্যবাবুর ঠাকমা-মণি না থাক, কাকা না থাক, বিরাট সম্পত্তি না থাক, ব্যাঙ্কে অগাধ টাকা না থাক, 'স্যাক্সবি মুখার্জি কোম্পানীর ফ্যাক্টরিও না থাক, স্ত্রী বিশাখা তো ছিল। স্ত্রী থাকা মানেই তো লক্ষ্মী থাকা! স্ত্রী মানেই তো গৃহলক্ষ্মী! তাই আগে থেকে খবর পেয়ে ভোরবেলাই বিশাখা তৈরি হয়ে নিয়েছিল।

বাড়ির মালিক এতদিন পরে জেলখানা থেকে বাড়ি আসছে, সুতরাং তার জন্যে তো সব আয়োজন করে রাখতে হবে। মঙ্গলাকে বাজারে পাঠিয়ে নানান রকম রান্নার আয়োজন করে ফেললে। হাতে বেশি সময় নেই। আর সে-রান্না কি সাধারণ রান্না? ভালো চাল ডাল, ভালো তরি-তরকারি, ভালো মাছ। যা খেতে মানুষটা ভালোবাসে সেই সব রান্নার আয়োজন করলে দু'জনে। মানুষটা যে কী খেতে ভালোবাসে, তা বিশাখার জানা ছিল না। তারপর?

তার পরের কথাটা ভাবতে গিয়েই বিশাখা ভয়ে শিউরে উঠলো। যদি মদ খেতে চায়? যে-ক'দিন জেলখানা থেকে প্যারোলে কয়েক ঘণ্টার জন্যে বাড়িতে এসেছে সে-ক'দিনই তো

মদের বোতল কিনে আনবার হুকুম হয়েছে। একবার দু'বার তো বমি করে ঘর ভাসিয়েও দিয়েছে! এবার যদি তারই হুকুম হয়, তখন?

আর কোথায় যে মদের দোকান, তাও বিশাখার জানা নেই। জানা থাকলে তাও কিনে এনে রাখতো! এত বছর পরে বাড়ির মালিক ফিরছে, সুতরাং অভ্যর্থনার বা আপ্যায়নের যথাযোগ্য আয়োজন করা হলো না বলে মনে একটা দুঃখ থেকে গেল বিশাখার! কিন্তু কী করবে সে?

যা পারলে তাই-ই শেষ করে যখন বিশাখা বেরোবার জন্যে তৈরি হয়ে নিলে তখন ঘড়ির দিকে চেয়ে চমকে উঠলো। মঙ্গলা কর্তার ব্যাপারে কিছুই জানতো না। তার কানে কেউ কিছু বলেনি।

জিজ্ঞেস করলে—কর্তা কোথায় গিয়েছিলেন বউদি-মণি! কোথা থেকে আসছেন আজ? বিলেত থেকে?

কী করে তার বিলেতের কথা মাথায় এলো কে জানে! বিশাখার সুখ-দুঃখের ইতিহাস সে কিছুই জানে না। মঙ্গলা জানেও না যে বাড়ির মালিক হয়েও বিশাখা মঙ্গলার চেয়েও দুঃখী মানুষ। গৃহ লক্ষ্মীরও যে কোনও দুঃখ থাকতে পারে, তা অনেক মঙ্গলারাই জানে না। ড্রাইভার তৈরিই ছিল গাড়ি নিয়ে। বিশাখা গাড়িতে বললে—চল, আলিপুর জেলখানা—

ড্রাইভার বিশু জেলখানায় আগে কখনও যায়নি। তবু সে চমকালো না। কারণ সে হুকুমের চাকর। সে হুকুম পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে দিলে। জেলখানায় পোঁছতে পোঁছতে সাড়ে দশটা বেজে গেল।

কিন্তু গেটটার সামনে গিয়ে পোঁছতেই বিশাখা চমকে উঠলো। দেখলে সেখানে আগে থেকেই হাজির হয়ে আছে কাকা আর বিজলী।

বিশাখা দেখে তপেশ গাঙ্গুলী সামনের দিকে এগিয়ে এলো। বললে—এতো দেরি হলো যে তোর আসতে? আমরা সবাই সাড়ে দশটা থেকেই এসে বসে আছি। দেরি করলি কেন এতো?

বিজলীকে দেখে মনটা আগেই খারাপ হয়ে গিয়েছিল, তাই সে-কথার কোনও জবাব না দিয়ে বিশাখা জেলখানার গেটের দিকে এগিয়ে গেল। হামিদ আগে থেকেই বলে রেখে দিয়েছিল যে দশটার সময়েই ছোটবাবু জেলখানা থেকে ছাড়া পাবে।

কিন্তু কোথায় হামিদ? সে-ই তো ছোটবাবু আর বিশাখার মধ্যে একমাত্র সংযোগ-সূত্র। বরাবর তার মাধ্যমেই সৌম্যবাবুর সমস্ত খবরাখবর পেয়ে এসেছে! শেষে সে নিজেই কিনা এসে পোঁছতে দেরি করলে।

হঠাৎ তাকে দেখতে পাওয়া গেল। সে জেলখানায় গেটের ভেতর থেকেই বাইরে বেরিয়ে এলো। যে সেপাইটা গেট পাহারা দিচ্ছিল সে সসম্মানেই তাকে ছেড়ে দিলে।

সে সোজা এগিয়ে এলো বিশাখার দিকে। আশেপাশে তপেশ গাঙ্গুলী আর বিজলীকে দেখে বললে—মাঈজী, একটা কথা ছিল, আপনি এদিকে আসুন। একটা ঝামেলা বেধেছে—

সন্দীপ তখন তার ব্যাঙ্কে নিজের চেম্বারে সামনে কাগজ-পত্র নিয়ে বসেছিল, কিন্তু তার মনটা পড়ে ছিল জেলখানার গেটটার ওপর। সে যেন ছবি দেখতে পাচ্ছিল সেই জেলখানাটার। দেখতে পাচ্ছিল বিশাখা জেলখানাটার গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সৌম্যবাবুর জন্যে অপেক্ষা করছে।

খানিক পরেই জেলখানার গেটটা খুলে দিলে একটা সেপাই। আর সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে বেরিয়ে এলো সৌম্যবাবু! সামনে বিশাখাকে দেখতে পেয়েই দু'হাতে তাকে জড়িয়ে ধরলো। আর রাস্তার হাজার লোকের ভিড়ের মধ্যে বিশাখা যেন কেমন লজ্জায় পড়লো। তার মানে হলো সমস্ত পৃথিবীর মানুষ যেন তাদের দিকে হাঁ করে চেয়ে আছে। তাদের গিলে খাচ্ছে।

বিশাখা বললে—এ কী করছো তুমি? এ কী করছো? ছাড়ো, ছাড়ো! যা করবার

বাড়িতে গিয়ে করো, এখন ছাড়ো, এখন ছেড়ে দাও—

—না না—বলে সৌম্যবাবু যেন তাকে আরও জোরে জড়িয়ে ধরলো।

কল্পনায় সমস্ত দৃশ্যটা দেখতে পেয়ে সন্দীপের মনটা আনন্দে যখন আত্মহারা হয়ে উঠেছে তখন হঠাৎ ঘরে ঢুকলো ব্যাঙ্কের চাপরাশিটা। আর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত স্বপ্নটা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। আর এদিকে হামিদ তখন বিশাখাকে একপাশে নিয়ে গিয়ে বলছে—মাঈজী, একটা ঝামেলা হয়ে গিয়েছে জেলখানায়—

—আবার কী ঝামেলা? সাহেব ছাড়া পাবে না আজ?

হামিদ বললে—হ্যাঁ, ছাড়া পাবে, তবে আরও কিছু টাকা দিতে হবে বাবুদের!

—আবার কেন টাকা?

হামিদ বললে—বাবুরা এত আগে ছেড়ে দিচ্ছে তাই মিষ্টি খাবার বক্‌শিস চাইছেন—

—কতো টাকার মিষ্টি?

—দশ হাজার টাকা দিলেই সবাই খুশী হবে, এখ্‌খুনি সাহেব ছাড়া পাবে—

দশ হাজার টাকা? অতো টাকা তো সঙ্গে করে আনেনি বিশাখা! বললে—অতো টাকা তো সঙ্গে করে আনিনি। আমার ব্যাগে তো অতো টাকা এখন নেই হামিদ—

—তাহলে এখ্‌খুনি বাড়ি থেকে নিয়ে আসুন, নইলে সাহেবকে ছাড়বে না বাবুরা—ছাড়া পেতে আবার দেরি হয়ে যাবে!

বিশাখার মুখটা শুকিয়ে গেল। কিন্তু বাড়িতেই কি অতো টাকা আছে! কে জানে! যা টাকা ছিল তার সবটাই তো সৌম্যবাবুর জন্যে ঘুষ দিতে হয়েছে।

কিন্তু এই অবস্থায় এ-সব কথা ভাবলে চলবে না। বাবুরা যখন একবার মুখ ফুটে চেয়েছে তখন যেমন করে হোক তা যেখান থেকে পারে দিতেই হবে। তার জন্যে ধার করতে হলেও কারো কাছে হাত পাততে হবে! তার জন্যে যা সুদ দিতে লাগবে তাও দিতে হবে!

আর তারপর সন্দীপ তো আছেই। কোথাও টাকা যোগাড় করতে না পারলে শেষ কালে সন্দীপই ভরসা। এতদিন সন্দীপই তার সঙ্গে সম্পর্ক রেখে এসেছে, সন্দীপের ঘরের দেওয়ালে তার ছবি টাঙিয়ে রেখেছে। সে এই বিপদে বিশাখাকে বাঁচাবেই। সন্দীপই সৌম্যবাবুকে ফাঁসির হাত থেকে বাঁচিয়েছে। এবারও নিশ্চয়ই বাঁচাবে। দরকার হলে বিশাখা সোজা তার ব্যাঙ্কে চলে যাবে।

বিশাখা হামিদকে বললে—আচ্ছা, এক কাজ করো হামিদ, তুমি আমার গাড়িতে ওঠো, দেখি বাড়িতে গিয়ে অতো টাকা আছে কি না।

বলে গাড়িতে উঠে বলল—চল বিশু, একবার আবার বাড়িতে যেতে হবে—

হামিদ গিয়ে গাড়ির সামনের সীটে বসে দরজা বন্ধ করে দিতেই বিশু গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে দিলে। গাড়িটা চলতে লাগলো। পেছন থেকে তপেশ গাঙ্গুলী এই অঘটন দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল। সেও বিজলীকে রেখে গাড়ির পেছনে-পেছনে দৌড়তে দৌড়তে বলতে লাগলো—ওরে বিশাখা, ওরে, কোথায় যাচ্ছিস? আমাদেরও নিয়ে যা—

তাদের পেছনে ফেলে রেখে গাড়িটা তখন অনেক দূরে এগিয়ে গেছে।

ঠাকমা-মণি বিশাখাকে প্রায়ই বলতো বিশাখাই তার গৃহলক্ষ্মী। সে-সব কথা অনেকদিন পর্যন্ত বিশাখার মনে ছিল। ঠাকমা-মণি আরো বুঝিয়ে বলতো "লক্ষ্মী" শব্দটার মানে কী!

লক্ষ্মীই নাকি স্বর্গের দেবীদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরী। এবং সর্বগুণসম্পন্না। অর্থাৎ সুন্দরীই শুধু নন। লক্ষ্মীর আরো অনেক নাম আছে। লক্ষ্মীই হলেন সব কিছু। জন্ম, বিকাশ, আভরণ, প্রকাশ, লাবণ্য, সৌভাগ্য এবং সমৃদ্ধি একাধারে সব। লক্ষ্মী সঙ্গে সঙ্গে আবার চঞ্চলা, চপলা, অস্থির, ভঙ্গুর, হিংসুক এবং কলহপ্রিয়া। লক্ষ্মী জগজ্জননীই হোন আর লোকমাতাই হোন, তিনি লক্ষ্মীরূপে বন্ধ্যা। পারিবারিক সুখ থেকে বঞ্চিতা। ধনধান্য, মণি-মুক্তা, পতি-বন্ধু-বান্ধব থাকা সত্ত্বেও গৃহ-কলহ অনিবার্য। লক্ষ্মীর বাহন প্যাঁচা। সেই জন্যে যে মানুষ লক্ষ্মীর দ্বারা উপকৃত হবে তার মধ্যে কিছু-না-কিছু প্যাঁচার স্বভাব থাকবেই। লক্ষ্মী পদ্মাসনা। আর পদ্মর তো পাঁকের মধ্যেই জন্ম। তাই লক্ষ্মীকে পেলে তার সঙ্গে পাঁকের সম্পর্ক স্বীকার করে নিতেই হবে। লক্ষ্মীর মধ্যে গঙ্গার পবিত্রতা, অদিতির শান্তি, পার্বতীর নিস্পৃহতা, উমার ত্যাগ, দুর্গার বৈশিষ্ট্য, গণেশের বিঘ্ননাশক ক্ষমতা, রাধার নিঃস্বার্থতা, সরস্বতীর প্রজ্ঞা এবং বিবেক থেকে অনেক দূরে লক্ষ্মীর অবস্থান...

এ-সব কথা কাশীর গুরুদেব ঠাকমা-মণিকে বুঝিয়ে দিয়েছিল। বলেছিল—এর জন্যে দুঃখ করো না বউ-মা। এই সব নিয়েই সুন্দরী মেয়েদের জীবন। খোকা যদি কোনও অন্যায়ও করে কোনও দিন, তা তুমি শান্ত মনে তাকে ক্ষমা করো। তুমি হলে লক্ষ্মী, তাই ও-সব তোমাকে সহ্য করতেই হবে। এ-সব কথা আমি আমার গুরুদেবের কাছ থেকেই শুনেছি—

এ-সব কথা সন্দীপ জানতো। বিশাখাই নিজে এ-সব কথা সন্দীপকে বলেছিল। সন্দীপ ব্যাঙ্কের চেয়ারে বসে কাজ করতো, কিন্তু তার মনের মধ্যে এ-সব কথা গুণগুণ করে সব সময়ে গুঞ্জন করতো। খানিক পরেই ভাবতো এ-সব কথা কেন সে ভাবছে। সত্যিই তো বিশাখা তার কে? সে তো এখন সব বন্ধন থেকে মুক্ত। সমস্ত কিছু দায়িত্ব থেকে সে মুক্তি পেয়েছে। তাহলে সব সময়ে কেন সে বিশাখার কথা ভাবছে? কথাটা মনে পড়তেই সে আবার তার নিজের চাকরির দিকে মন দিত! কিন্তু রাত্রে?

রাত্রে যখন খাওয়া-দাওয়ার পর সে বিছানায় গা এলিয়ে দিল তখন হঠাৎ বিশাখার ছবিটার দিকে চোখ পড়লেই আবার বিশাখার মধ্যে বিলীন হয়ে যেত! তার মনে পড়ে যেত অতীতের সমস্ত ঘটনা। অতীতের প্রত্যেকটা খুঁটিনাটি কথা অতীতের দৈনন্দিন জীবনের সমস্ত তার মনে পড়ে যেত।

অবশ্য তার আর কী ভাববারই বা ছিল? কারো ওপর তার দায় বা দায়িত্ব তো আর নেই। মা নেই, মাসিমা নেই, মল্লিক-কাকাও নেই। এমন কি বেড়াপোতার সঙ্গেও সমস্ত সম্পর্ক তার ছিন্ন হয়ে গেছে। সে এখন পরের বাড়ির ভাড়াটে। বাগবাজারের নেবুবাগানের বাসিন্দা। তবু কোথাও যেন একটা ক্ষীণ বন্ধন আছে। সেই বন্ধনটার জন্যেই ওই ছবিটা টাঙিয়ে রেখে দিয়েছে তার দেয়ালে।

সেদিন অফিসে গিয়েই তাই মনে পড়তে লাগলো আলিপুরের জেলখানার কথা। আজ এখনই বোধহয় সৌম্যবাবু ছাড়া পেয়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছে। আর বেরোবার সঙ্গে সঙ্গেই একেবারে মুখোমুখি দেখা হয়ে গেছে বিশাখার সঙ্গে।

দেখা হলে প্রথমে কে কথা বলবে?

বিশাখাই হয়তো প্রথমে কথা বলবে। জিজ্ঞেস করবে—কেমন আছো?

বিয়ের দিন তো আর তাদের বেশি কথা হয়নিই, ফুলশয্যাও হয়নি, বাসরশয্যাও হয়নি, বউ-ভাতও হয়নি। হিন্দুদের বিয়েতে যা-যা হওয়া নিয়ম তার কিছুই হয়নি। যা কিছু দেখা বা কথাবার্তা হয়েছে, তা অনেক পরে, যখন প্যারোলে জেলখানা থেকে ছুটি নিয়ে সৌম্যবাবু দু-একবার বাড়িতে এসেছে তখন। তাও তো মদের ঘোরে, প্রায় অচৈতন্য অবস্থায়।

কিন্তু এবার আর তা নয়। এত বছর পরে স্বামীর সঙ্গে দেখা। একেবারে স্থায়ী-ভাবে দেখা। গাড়িতে উঠেই সৌম্যবাবু ভালো করে দেখলে বিশাখার দিকে। বললে—

'ভালো আছি—

বিশাখা বললে—তুমি খুব রোগা হয়ে গেছ।

—আমাকে রোগা দেখাচ্ছে?

—হ্যাঁ, তুমি বুঝতে পারোনি যে তুমি রোগা হয়ে গেছ?

—না। কী করে বুঝবো আমি যে রোগা হয়ে গিয়েছি? আমি তো কতোকাল আয়নায় নিজের মুখ দেখিনি।

বিশাখা অবাক হয়ে গেল।

—সে কী! জেলখানাতে কি তারা আয়নাও দেয়নি তোমাকে?

সৌম্য বললে—আয়না কে দেবে?

—সে কী! আমি যে কতো হাজার হাজার লাখ লাখ টাকা পাঠিয়েছি তোমার জন্যে! যাতে তোমার কোনও কষ্টও না হয়। সে-টাকা তো তোমার জন্যেই দিতুম যাতে তোমার কোনও কষ্ট না হয়?

সৌম্য বললে—এত কাল আমাকে সব জঘন্য খাবার খাইয়েছে ওখানে। আমার পেট ভরতো না কোনও দিন!

বিশাখা বললে—কিন্তু তোমার যাতে কষ্ট না হয় সেই জন্যে তো আমার কাছে যতো টাকা চেয়েছে সব দিয়েছি!

—কার হাতে টাকা দিয়েছ?

—হামিদের হাত দিয়ে পাঠিয়েছি—

সৌম্য বললে—কে হামিদ? আমি তো তাকে চিনি না!

—সে জেলখানার ভেতরের কেউ নয়, বাইরের কেউ। ভেতরে যারা জেলখানায় থাকে তাদের কাছ থেকে তাদের বাড়ির ঠিকানা নিয়ে টাকাকড়ি-জিনিসপত্র লেন-দেন করে। তা তুমি তাকে চিনবে কী করে? সে তো বাইরের লোক। সে সেই তাদের বাড়ি থেকে টাকা নিয়ে জিনিসপত্র কিনে ভেতরে চালান করে। তুমি তা জানো না?

—না আমি তো কিছুই জানি না।

—লোকটা যে ওই বলে আমার কাছে কতো লাখ টাকা নিয়েছে তার ঠিক নেই! তুমি তোমার খাবার জিনিস-টিনিস কিছুই পাওনি?

সৌম্য বললে—সবাই যা খায় আমিও তাই খেতাম।

—মদ?

সৌম্য বললে—হ্যাঁ, সেটা অনেক বলা-কওয়ার পর তবে এক-একদিন দিত! তাও খুব কম!

বিশাখা বললে—ভালোই তো! ওটার নেশা যতো কম করা যায় ততোই ভালো। ওটা আর খেও না—

সৌম্য বললে—একটু একটু খাবো—

তারপর চারদিকে চেয়ে বললে—এ কোন্ দিকে চলেছ? বিডন স্ট্রীট তো ছাড়িয়ে এসেছ, এ কোন দিকে যাচ্ছো?

বিশাখা বললে—আমাদের সে-বাড়ি তো বিক্রি হয়ে গেছে!

—সে কী? কেন?

বিশাখা বললে—তোমাকে সব বলবো। তুমি আগে বাড়ি চলো। ধীরে সুস্থে সব বলবো।

—না না। এখনই বলো?

বিশাখা বলল—তোমাদের সেই ফ্যাক্টরি সেই বিডন স্ট্রীটের বাড়ি, সব কিছু বিক্রী হয়ে গিয়েছে—আর তোমার ঠাকমা-মণি মারা গেছেন সে তো তুমি জানোই। সে-সময়ে তাঁর শ্রাদ্ধতে তুমি তো ছুটি নিয়ে বাড়ি এসেছিলে—

সত্যিই সে সব কত কাল আগেকার কথা। এখন ইতিহাস হয়ে গেছে সে-সব। তবু

সৌম্যর সমস্ত আবার মনে পড়ে গেল। কত বছর পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিল সে। বলতে গেলে তার যেন মৃত্যুই হয়ে গিয়েছিল। এখন যেন সে আবার জীবন ফিরে পেয়েছে। আবার নতুন দৃষ্টি দিয়ে দেখছে নতুন এক পৃথিবীকে। তার যেন নতুন করে জন্ম হয়েছে আর এক নতুন পৃথিবীতে। চারিদিকের এ কলকাতাকে তো চেনে না। যেখানে খালি জমি পড়ে ছিল সেখানে নতুন চার-তলা পাঁচ-তলা বাড়ি গজিয়ে উঠেছে। মানুষে ভর্তি হয়ে গিয়েছে কলকাতা।

পাশেই বসেছিল বিশাখা। সে জিজ্ঞেস করলে—কী দেখছো অমন করে?

সৌম্য বললে—দেখছি কতো মানুষের ভিড়। আগে তো এমন ছিল না। এত মানুষ হঠাৎ কোত্থেকে এল? আর এত গাড়ি কাদের?

বিশাখা বললে—এখন তো দুপুর, এর পর যখন অফিস ছুটি হবে তখন দেখবে এই শহরের অন্য রকম চেহারা। আমি যে কী কষ্টের মধ্যে আছি তা যদি তুমি কল্পনা করতে পারতে!

—তুমি কী রাস্তায় বেরোও?

—বেরোব না? না বেরোলে চলবে কেন? আমাকে একলাই তো সব কাজ করতে হয়!

সৌম্য বললে—কী এমন কাজ তোমার?

—সংসারের কাজ কম নাকি?

সৌম্য বললে—রান্না করার জন্যে একজন লোক রাখলেই পারো। সেই ঠাকুরটা কোথায় গেল? আর বিন্দুও তো আছে। বিন্দু আছে, কালিদাসী আছে, একতলার ফুলরা, কামিনী, সুধা, গিরিধারী দরোয়ান আছে। তারাই তো কাজ করতে পারে। তাদের বলো না কেন কাজগুলো করে দিতে। তারা মাইনে নেবে আর কাজ করবার বেলায় তুমি!

বিশাখা বললে—তুমি কি স্বপ্ন দেখছো নাকি?

—কেন আমি অন্যায়টা কী বলেছি? কতগুলো লোক বাড়িতে, আর সমস্ত কাজ তোমাকে একলা করতে হবে? কেন, ম্যানেজারবাবু মল্লিক-মশাইও তো আছেন!

—মল্লিক-মশাইও তো নেই!

—কেন? তাঁকেও ছাড়িয়ে দিয়েছ?

—হ্যাঁ। বাড়ি বিক্রি হয়ে যাওয়ার পর সন্দীপ তাঁকে নিয়ে গিয়েছিল। তিনি মারাও গেছেন।

সৌম্য জিজ্ঞেস করলে—কে? সন্দীপ? সে কে?

বিশাখা বললো—সন্দীপকে চেনো না?

—না।

বিশাখা বললে—ওই যে যার সঙ্গে আমার বিয়ে প্রায় হয়েই যাচ্ছিল এমন সময়ে তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়ে গেল! মনে নেই? আমি তখন বেড়াপোতায় থাকতুম। মনে পড়ছে না?

—না!

বিশাখা বললে—তোমার কিছুই মনে নেই? কী আশ্চর্য! জেলখানায় থাকলে কি মানুষ নিজের বিয়ের কথাও ভুলে যায়? আমার সঙ্গে যে তোমার বিয়ে হয়েছিল তা মনে আছে তো?

—হ্যাঁ, তা মনে আছে।

বিশাখা বললে—আমার তখন বিয়ে হচ্ছিল সন্দীপের সঙ্গে, হঠাৎ সেই সময়ে সেখানে গিয়ে হাজির হলে তুমি। সঙ্গে তোমার ঠাকমা-মণি, মল্লিক-মশাই আর একদল পুলিশ-পাহারা! মনে পড়ছে?

—হ্যাঁ, এখন মনে পড়ছে!

ততক্ষণে গাড়িটা বাড়ির কাছে এসে পড়েছে। বিশাখা বললে—এই আমাদের নতুন বাড়ি। এই বাড়িটাই আমি আড়াই লাখ টাকা দিয়ে কিনেছি। এই ক'বছরে জমি-জায়গার দাম অনেক বেড়েছে। শুধু জমি-জায়গা নয়, চাল-ডাল সব জিনিসের দামই বেড়েছে।

সৌম্যও নামলো। নেমে বাড়িটার দিকে চেয়ে দেখলে। দেখে মনে হলো যেন বাড়িটা তার পছন্দ হলো না। বললে—এখানে বাড়ি কিনতে গেলে কেন? এ-পাড়ায় কি থাকতে পারবো?

বিশাখা বললে—এই বাড়ি যে পেয়েছি তাই-ই যথেষ্ট, আজকাল বাড়ির টানাটানি যে কতো তা কী বলবো!

সৌম্য বললে—কিন্তু সেই আমাদের রাসেল স্ট্রীটের বাড়িটায় গিয়ে উঠলে পারতে! সে বাড়িটা তো ভালো ছিল—

—সেটা কি আছে নাকি?

—কেন? কী হলো সে বাড়িটার?

বিশাখা বললে—তোমার কাকাই তো সেটা বিক্রী করে দিলেন।

—আমার কাকা? মুক্তিপদ মুখার্জি?

—হ্যাঁ

সেও অনেক কান্ড! টাকা-কড়ির ব্যাপার। সম্পত্তির তো তিনিও একজন ভাগীদার।
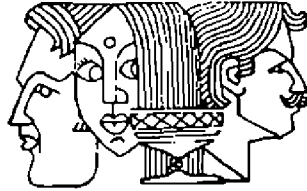
কতো বছর আগেকার কথা এখন সে-সমস্ত মনে পড়তে লাগলো।

মাথার ওপর সূর্যটি গরম হয়ে উঠেছে। সকাল থেকে কিছু খাওয়াও হয়নি। রাস্তার পাশে একটা হোটেলের মতন ঘর। সামনে মাথার ওপর সাইনবোর্ড টাঙানো দেখা গেল। সেইটে দেখেই বোঝা গেল ওটা হোটেল।

সামনে গিয়ে সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—খাবার পাওয়া যাবে?

—হ্যাঁ, নিরামিষ-আমিষ সব পাওয়া যায় এখানে

—আমাকে শুধু ডাল-ভাত আর যা তরকারি আছে দাও—

জেলখানা থেকে আসবার সময়ে তিন হাজার টাকা তখনও তার ঝোলা-ব্যাগের মধ্যে রয়েছে। তার চাকরিটা চলে গিয়েছে জেল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে।

সবটাই পেট ভরে খেলে সে। অনেক দিন পরে রাস্তার হোটেলে এই খাওয়া তার জিভে যেন অমৃতের মতন লাগলো। তার রতনের রান্নাও ভালো ছিল। কিন্তু মা'র রান্নার যেন তুলনা ছিল না। মা দুঃখ করে বলতো—যখন তুই চাকরি করবি তখন তোকে কতো রকম রান্না করে খাওয়াবো দেখিস।

কিন্তু সন্দীপের যখন অবস্থা ভালো হলো, চাকরিতে মাইনে বাড়লো তখন আর মা রইলো না। সন্দীপের কপালেও আর কখনও ভালো খাওয়া জুটলো না।

মা'র কথা ভাবতে ভাবতে আবার সমস্ত অতীতটা চোখের সামনে ভাসতে লাগলো। প্রথমেই মনে পড়লো সৌম্যবাবুর কথা। সৌম্যবাবুকে সন্দীপ 'ছোটবাবু' বলেই ডাকতো। বলতো—ছোটবাবু আপনি মদ খাওয়াটা ছেড়ে দিন না—'

ছোটবাবু বলতো—কেন, মদ কী দোষ করলো? মদ তো ভালো জিনিস। পৃথিবীর সভ্য দেশের সব লোকই তো মদ খায়। মদের ওপর আপনার এত রাগ কেন? মদ কি দোষ করলো?

সন্দীপ বলতো—যে-জিনিস খেলে মাথার ওপর মানুষের কনট্রোল থাকে না, সে জিনিস

খেয়ে লাভ কী?

ছোটবাবু প্রতিবাদ করতো। বলতো—কে বলে মদ খেলে মাথার ওপর কন্‌ট্রোল থাকে না? আমার তো কন্‌ট্রোল থাকে!

—তবে যে রাস্তায় দেখেছি মদ খেয়ে লোকে আবোল-তাবোল বকছে?

ছোটবাবু বলতো—আমি তো মদ খেয়ে আবোল-তাবোল বকছি না—

কথার মাঝখানে বিশাখা প্রতিবাদ করতো। বলতো—হ্যাঁ, সন্দীপ তো ঠিকই বলছে। তুমি তো মাঝে-মাঝে আবোল-তাবোল বকো!

ছোটবাবু রেগে যেত বিশাখার কথা শুনে। বলতো—যে-সম্বন্ধে তুমি কিছু জানো না তা নিয়ে কথা বলছো কেন? তুমি কখনও মাতাল দেখেছ?

—হ্যাঁ, দেখেছি।

—কোথায় দেখেছ বলো? বলো কোথায় দেখেছ তুমি? তোমাকে বলতেই হবে কোথায় তুমি মাতাল দেখেছ? বলো?

বিশাখা বলতো—তুমি, তোমাকেই তো মাতাল হতে দেখেছি আমি—

না, কিন্তু কথাটা বলতে গিয়েও থেমে যেত বিশাখা। তার মুখ দিয়ে কথাটা বেরোতে গিয়ে আটকে যেত।

অনেক দিন আগেকার কথাগুলো ভাবতে গিয়েও যেন সন্দীপের একটু আটকে যেতে লাগলো। অতীত যেন তাকে আক্রমণ করতে লাগলো, যেন ব্যঙ্গ করতে লাগলো। কিন্তু অতীতের আগেও তো অতীত আছে। যেমন বর্তমানের পরেও বর্তমান থাকবে, ভবিষ্যতের পরেও যেমন ভবিষ্যৎ থাকবে। তাই সেই অতীতের আগের অতীতের কথাও তাকে ব্যঙ্গ করতে লাগলো।

—কী রে এখনও তৈরি হোস্‌নি। কখন পৌঁছবো সেখানে তাই ভাবতো!

তপেশ গাঙ্গুলীর গলায় তখন রাগের সুর।

—আমি তোকে পই-পই করে বলে গেলুম যে অফিস থেকে তাড়াতাড়ি ফিরবো, তুই তৈরি হয়ে থাকিস। আর তুই এখনও সেজে-গুজে তৈরি হয়ে থাকিসনি?

বিজলী বললে—আমি ওখানে যাব না বাবা—

—কেন? যাবি নে কেন? কীসের আপত্তি তোর বিশাখার বাড়িতে যেতে? ওদের খাওয়া খারাপ, না থাকার অসুবিধে! ব্যাপারটা কী?

বিজলী বললে—ওখানে থাকতে আমার ভালো লাগে না।

—কেন? ভালো লাগে না কেন, সেটা বল্‌বি তো?

বিজলী বললে—আমাদের নিজেদের বাড়ি থাকতে কেন বিশাখার বাড়িতে থাকবো?

—আমাদের বাড়িতে কে আছে যে তোকে দেখবে? আমি তো অফিসে চলে যাই, তখন তোকে তো একলা থাকতে হয়। তোর মা বেঁচে থাকলে না-হয় কথা ছিল, কিন্তু তোর মতো বাড়ন্ত বয়সের মেয়ে সারাটা দিন বাড়িতে একলা থাকা কি ভালো? পাড়াটা তো আবার ভালো নয়। কার মনে কী আছে কে বলতে পারে? তোর মা যখন ছিল তখন আলাদা কথা, কিন্তু এখন? আর তা ছাড়া এখানে তো রান্না করা থেকে আরম্ভ করে বাসন-মাজা, ঝাঁট দেওয়া, সমস্ত কাজ একলা করতে হয়, আর সেখানে ঝি-চাকর আছে, বিশাখা আছে। তবু একটা কথা বলার মতো লোক পাবি সেখানে। দু বোনে আরাম করে থাকবি গল্প করবি, কতো সুখ! চল্ চল্—

বিজলী বললে—আর তুমিও সেখানে থাকবে?

—কেন তুই থাকলে আমার থাকতে দোষ কী? বিশাখাও তো আমার নিজের মতোন। নেই নেই করেও এখনও তার অনেক টাকা আছে। আমাদের দু'জনের জন্যে আর বাড়তি কী-ই বা খরচ হবে! চল্ চল্ -

এমন করেই মনসাতলা লেনের বাড়িতে তালা-চাবি লাগিয়ে তপেশ গাঙ্গুলী বিজলীকে নিয়ে গিয়ে একদিন হাজির হতো বিশাখার ভুবন গাঙ্গুলী লেনের বাড়িতে, আর একটানা থেকে যেত বিশাখার বাড়িতে। তাতে মাস-কাবারি মাইনেটাতে আর হাত পড়তো না তপেশ গাঙ্গুলীর। শুধু খিদিরপুরের বাড়িভাড়াটা গুনতে হতো। সে আর ক'টা টাকাই বা।

শুধু মাসের শেষের দিকে তপেশ গাঙ্গুলী হাত পাততো বিশাখার কাছে। বলতো—ওরে বিশাখা, গোটা বিশেক টাকা ধার দিতে পারিস আমাকে, বড়ো টানাটানি পড়েছে আমার।

প্রথম প্রথম বিশাখা দিত। কখনও বিশ, কখনও পনেরো, আবার কখনো বা পঁচিশ টাকা। কিন্তু বিজলীর লজ্জা করতো। আড়ালে বাবাকে বলতো—তুমি আবার টাকা চাও কেন বাবা? আমার লজ্জা করে যে—

বাবা বলতো—চাইলেই বা, লজ্জা কীসের? জানিস, মুখুজ্জে-বাড়ির কত লাখ টাকার সম্পত্তি পেয়েছে বিশাখা? অতো টাকা ও কী করবে? শেষ পর্যন্ত তো সব ভূতের পেটে যাবে—আমাকে দিলে তবু সদ্ব্যয় হবে। ছেলে নেই পুলে নেই, ও-টাকা ও কার পেছনে খরচ করবে?

আর শুধু কি তাই, বিশাখার কাছে যতোদিন থাকতো বাজার করবার কাজটা নিজের হাতে নিত। মাছ, মাংস থেকে আরম্ভ করে রসগোল্লা, সন্দেশ, দই সব কিনতো তপেশ গাঙ্গুলী।

বিশাখা বাজার করবার ঘটা দেখে অবাকও হতো, বিরক্ত হতো। কিন্তু মুখে কিছু প্রকাশ করতো না। শুধু বলতো—এত মাছ, মাংস, রসগোল্লা কেন আনতে গেলে কাকা? এ-সব কে খাবে?

কাকা বলতো—কেন, তুই খাবি। এ-সব খেলে তোর শরীর ভালো হবে! তুই যা রোগা, এ-সব খেলে একটু মোটা হবি। যখন জেলখানা থেকে জামাই ফিরে আসবে তখন তোকে দেখে খুশী হবে। তোর গায়ে একটু মাংস-টাংস লাগা দরকার। দিন দিন জামাই-এর কথা ভেবে তুই বড্ড রোগা হয়ে যাচ্ছিস, তোর পক্ষে মাছ-মাংস খাওয়া একান্তই দরকার—

আসলে বিশাখা তার কাকাকে চিনতো। জানতো কাকার খাওয়ার খুব লোভ আছে। তাই আর কিছু বলতো না। চুপ করে সমস্ত সহ্য করে যেত। কিছু দিন পরে কিন্তু বিশাখা বলতো—কাকা, তোমাকে আর বাজার করতে হবে না, তুমি একটু বিশ্রাম নাও। আজ আমার মঙ্গলা বাজারে যাবে—

আর তারপর থেকে তপেশ গাঙ্গুলীর আর খেয়ে সুখ হতো না। সেই একঘেয়ে ডাল চচ্চড়ি আর ছোট-মাপের কিছু মাছ। যতো সস্তার খাবার। যদি এই সবই খাবে তাহলে বিশাখার বাড়িতে এসেছ কী করতে? এই সব শাক-চচ্চড়ি খেতে?

মাঝে মাঝে বলতো—হ্যাঁ রে বিশাখা, কই জলখাবারের তো সেই একঘেয়ে রুটি-তরকারি ছাড়া আর কিছু করিস না? কেন বাজারে কি রসগোল্লা পান্তুয়া পাওয়া যায় না?

বিশাখা বলতো—মঙ্গলা কখন যায় বলো? তার সময় কোথায়?

কাকা বলতো—মঙ্গলার সময় না থাকতে পারে। তার না হয় অনেক কাজ, কিন্তু আমার তো সময় আছে, আমি তো বাজারে যেতে পারি, আমাকে টাকা দে না—

বিশাখা বলতো—না কাকা, তোমাকে কষ্ট করতে হবে না. তোমার রান্না হয়ে গিয়েছে, তুমি খেয়ে দেয়ে অফিসে চলে যাও—

—দূর, আমার আবার অফিস! আমার তো সরকারী চাকরি, আমার অফিসে না গেলেও চলে। তুই আমাকে টাকা দে—

এমনি অবস্থা হলেই বিজলী বাবাকে আড়ালে ডেকে বলতো—বাবা, তুমি কেন এখানে আমাকে নিয়ে এলে? মনসাতলাতে আমাদের নিজেদের বাড়িতে তো আমরা ভালোই ছিলাম। কেন এখানে এলে তুমি? চলো, সেখানেই ফিরে চলো তুমি—

বাবা বলতো—কেন? তোর কী অসুবিধে হচ্ছে এখানে?

বিজলী বলতো—হ্যাঁ, আমার খুব অসুবিধে হচ্ছে—

—কীসের অসুবিধে?

—অসুবিধে নয়, লজ্জা করছে!

বাবা বলতো—লজ্জা কীসের? বেশ তো আমাদের কতো খরচ বেঁচে যাচ্ছে বল্ তো? এখানে দু'জনের খাওয়া খরচ লাগছে না। সেটা কি কম কথা?

বিজলী বলতো—না, এ-সব আমার ভালো লাগে না—

—কেন, তোকে কেউ কি কিছু বলেছে?

বিজলী বলতো—না মুখে বিশাখা কিছু বলেনি কিন্তু ওর ঘাড়ে বসে বসে খাচ্ছি, এটা তো ও বুঝতে পারছে! ও মুখে কিছু না বললেও ওর হাব-ভাবে তা আমি বুঝতে পারি। চলো আমরা চলে যাই—

বাবাও বলতো—তা হলে তাই-ই চল।

তখন তপেশ গাঙ্গুলী আর বিজলী মনসাতলা লেনের বাড়িতে আবার চলে আসতো।

দু'তিন মাস মনসাতলা লেনের বাড়িতে থেকে আবার একদিন বাপ মেয়েকে নিয়ে বিশাখার বাড়িতে গিয়ে উঠতো। আবার নানারকম ভালো-মন্দ খাবার খেয়ে মনের সাধ মেটাতো।

এই রকম বছরের পর বছর। বছরের মধ্যে প্রায় ছ'সাত মাস বিশাখার বাড়িতে গিয়ে থেকে আসতো দু'জনে। সেদিন হঠাৎ তপেশ গাঙ্গুলী দৌড়োতে দৌড়োতে এলো বাড়িতে। এসেই বললে—ওরে বিজলী, একটা সুখবর আছে—

—কী?

—বিশাখার বর জেল থেকে কাল ছাড়া পাচ্ছে। কাল সকাল বেলা। তোকে নিয়ে জেলখানার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবো!

—কাল কখন?

—সকাল বেলা। বেলা দশটার আগে ছাড়বে না নিশ্চয়ই। আমরা ঠিক তার আগেই গিয়ে জেলখানার গেটের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবো। বিশাখা নিশ্চয়ই সেখানে সেই সময়ে যাবে!

সেদিন তাই আর অফিসে যাওয়ার প্রশ্ন নেই। তবু যাওয়ার সময়েও বিজলী বাবাকে জিজ্ঞেস করলে—ঠিক সেই সময়ে জামাইবাবু ছাড়া পাবে তো?

বাবা বললে—ওরে জেলখানার নিয়ম বড়ো কড়া। একেবারে ঘড়ি দেখে কাঁটায় কাঁটায় ছাড়বে। এতটুকু নড়-চড় হবে না কথার—

—তুমি ঠিক শুনেছ তো?

—হ্যাঁ রে, আমি একেবারে আসল জায়গা থেকে খবরটা পেয়েছি। এত বছর থেকে আমি খোঁজ রেখে আসছি আর যেটা আসল জিনিস সেটাই ভুল করবো?

ঠিক তাই-ই হলো! ঠিক সময়েই দু'জনে দাঁড়িয়ে রইলো জেলখানার গেটের সামনে। বেশ আগে আগেই দু'জনে গিয়েছিল যাতে ঘটনাটা চোখ এড়িয়ে না যায়।

ঠিক কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে ন'টার সময়ে গিয়ে হাজির হলো দু'জনে। বিজলী বাবার পাশাপাশি দাঁড়িয়েছিল। অধীর অপেক্ষা দু'জনেরই। গেটের মুখে একজন সেপাই পাহারা দিচ্ছিল।

তপেশ গাঙ্গুলী তার কাছে গিয়েই জিজ্ঞেস করলে—সেপাইজী, একটা কথা জিজ্ঞেস করবো?

—বোলিয়ে!

—একজন আসামী আজকে সকালে জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার কথা। সে কি ছাড়া পেয়েছে? তুমি জানো কিছু?

সেপাই বোধহয় তার নিজের ডিউটি নিয়েই ব্যস্ত। বললে—নেহি মালুম—

হঠাৎ তপেশ গাঙ্গুলীর নজর পড়লো রাস্তার দিকে। দেখলে একটা গাড়ি এসে সেখানে থামলো আর বিশাখা গাড়ি থেকে নেমে এদিক-ওদিক চেয়ে কাকে যেন খুঁজতে লাগলো।

বিজলীও বিশাখাকে দেখতে পেয়েছে। তপেশ গাঙ্গুলীও দেখেছে। দু'জনেই তার দিকে এগিয়ে গেল।

কিন্তু বিশাখার সঙ্গে কথা বলবার আগেই কে একজন লোক কোথা থেকে এসে বিশাখাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে কী-সব বলতে লাগলো গুজ-গুজ করে আর বিশাখা তাই শুনেই আর দাঁড়ালো না। আবার গিয়ে গাড়িটাতে উঠলো। আর সেই অচেনা লোকটাও গাড়িটার সামনের সীটে বসতেই গাড়িটা ঊর্ধ্বশ্বাসে উল্টোদিকে ছুটে বেরিয়ে গেল।

তপেশ গাঙ্গুলী আর বিজলী চোখ মেলে সেই দিকে হাঁ করে দেখতে লাগলো। তপেশ গাঙ্গুলী মেয়েকে বললে—দেখলি তো, তোর নিজের জ্যাঠতুতো বোন একবার তোর সঙ্গে কথাও বললে না, তোর দিকে একবার ফিরে চেয়েও দেখলে না—

বিজলী বললে—তুমিই তো। তোমাকে বার-বার বলি তবু তুমি আমাকে ঠেলে-ঠুলে বিশাখার বাড়ি পাঠাবে। শুধু পাঠাবে না আবার নিজেও সেখানে থাকবে—

বাবা বললে—আর সাধ করে কি তোকে পাঠাই? তোরই ভালোর জন্যে পাঠাই—ওখানে গেলে তোকে হাত পুড়িয়ে রান্না করতেও হয় না, বাসন-কোসন মাজতেও হয় না। তোর আরামের জন্যে পাঠাই তোকে—এটা বুঝিস না!

বিজলী বললে—আমার কপালে আরাম না থাকলে আমিই বা কী করবো আর তুমিই বা কী করবে? আমাকে তুমি আর বিশাখার বাড়িতে যেতে বোল না। আমার কপালে আরাম নেই—

বাবা বললে—তুই ঠিকই বলেছিস রে, তুই ঠিকই বলেছিস! নইলে এত জায়গায় চেষ্টা করছি, এত লোক তোকে দেখে গেল, তবু তোর হিল্লে করতে পারলুম না কেন? কেন তোর মা-ও অমন করে হঠাৎ মারা গেল! এ সবই আমার কপাল। অথচ দেখ্ বিশাখার বাপ নেই, আমিই তাকে মানুষ করেছি, সে কেমন একটা বর পেয়ে গেল। হোক ফাঁসির আসামী, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তো তার ফাঁসি হলো না। এও কপাল ছাড়া আর কিছু নয়—

তারপর তপেশ গাঙ্গুলী একটু থেকে আবার বললে—চল্, এবার বাড়ি চল্। তাহলে বোধহয় আমি খবরটা ভুল শুনেছিলুম। তবে আমি ছাড়ছি না। শেষ পর্যন্ত লড়ে যাবো, তবে আমার নাম তপেশ গাঙ্গুলী। বাড়ি চল্। মিছিমিছি আজ অফিসটা কামাই হয়ে গেল। বাড়িতে গিয়ে তোকে আবার রান্না চাপাতে হবে—

বলে দু'জনেই রাস্তার দিকে পা বাড়ালো।
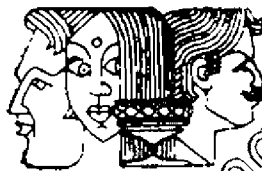
সন্দীপ বরাবর জানতো যে দেশ আর ব্যক্তির জীবন প্রায় একই গতিতে চলে। কখনও বিপ্লব আর কখনও আবার শান্তি। বিপ্লবের আগে যেমন কেউ জানতে পারে না যে অশান্তি রুদ্র রূপ ধরে আসন্ন, তেমনি ব্যক্তিও আগে থেকে জানতে পারে না যে কখন তার জীবনে কী বিপ্লব ঘনিয়ে আসছে।

প্রকৃতির মধ্যেও সেই একই নিয়ম। চারদিকে যখন বেশ খটখটে রোদ, শুকনো

আবহাওয়া, এমন সময়ে হঠাৎ কোথা থেকে পৃথিবীর এক কোণে এক নিম্নচাপের সৃষ্টি হলো আর শহর গ্রাম জনপদ দুর্যোগের আক্রমণে হঠাৎ সব কিছু বিপর্যস্ত হয়ে গেল কয়েক ঘণ্টার মধ্যে!

বিশাখার জীবনও অনেকটা তাই। সৌম্যপদবাবু জেলখানার চৌহদ্দীর মধ্যে যতো-দিন একটা নিশ্ছিদ্র সেলের মধ্যে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে বাস করছিল ততদিন হাজার দুর্যোগের মধ্যেও বিশাখার একটা আশার ক্ষীণ আলো তাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল যে একদিন-না-একদিন তার সুদিন ফিরে আসবে, একদিন-না-একদিন ছোটবাবু জেলখানা থেকে ছাড়া পাবে, একদিন-না-একদিন তার সিঁথির সিঁদুর সার্থক হবে। সেই আশা নিয়েই সে এত বছর নিশ্চিন্তে জীবন কাটাচ্ছিল। বিনিদ্র রাত্রির পর আবার তার জীবনে সার্থক উষার উদয় হবে।

সত্যি সত্যিই দিন এসে গিয়েছিল। তার স্বপ্নও সত্যি হয়েছিল। কিন্তু...

কিন্তু কয়েকদিন কাটবার পরই সৌম্যপদ কেমন মন-মরা হয়ে গেল।

বললে—সারাদিন ঘরের মধ্যে আটকে থাকতে থাকতে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে।

বিশাখা বললে—বাইরে কোথায় যাবে?

সৌম্যপদ বললে—এতদিন তো জেলখানার মধ্যে একলা-একলা কাটিয়েছি। এখন বাড়িতেও একলা-একলা থাকতে আমার ভালো লাগছে না—

—তাহলে কোথায় যাবে বলো? সিনেমা দেখতে যাবে?

—দূর সিনেমা দেখে কী হবে?

বিশাখা বুঝতে পারলে না কী করলে স্বামীকে খুশী করা যায়।

বললে—আমি তো পাশে রয়েছি তবু তোমার একলা-একলা লাগছে? বলো না কী করলে তোমার ভালো লাগবে? তার চেয়ে তুমি এই ইজি চেয়ারটায় একটু হেলান দিয়ে শোও, আমি তোমার গা-হাত-পা টিপে দিই—

সৌম্যপদ হো-হো করে হেসে উঠলো। বললে—আমি কি ছেলেমানুষ যে গা-হাত-পা টিপে দিলে আরাম পাবো?

বিশাখা হতাশ হয়ে বললে—কতো দিন কতো বছর পরে তুমি বাড়ি এলে, এখন আমি কী করলে তুমি খুশী হবে, বলো? আমি তো তোমার পাশে রয়েছি তবু তোমার ভালো লাগছে না?

সৌম্য বললে—আমার কিছুই ভালো লাগছে না। আমার মনে হচ্ছে আমি এখনও সেই জেলখানাতেই রয়েছি—

কেন? জেলখানাতে তো বললে তারা কিছুই খেতে দিত না। এখানে তো আমি রোজ-রোজ কতো রকম নতুন নতুন খাবার রান্না করে দিচ্ছি। তবু তোমার তা ভালো লাগছে না?

সৌম্যপদ বললে—খাওয়াতেই কি মানুষের সুখ হয়?

—তা হলে কীসে তোমার সুখ হবে বলো? আজকে আবার মঞ্জরীকে মাংস রান্না করতে বলবো?

সৌম্য বললে—এ ক'দিন তো মাংস খেলুম।

—তাহলে কী করলে তোমার ভালো লাগবে বলো? সিনেমা দেখতে বেরোবে? আমি তোমার সঙ্গে যাবো'খন।

সৌম্য বললে—তোমার গাড়িটা দাও, আমি একলা বেরোই—

—গাড়ি নিয়ে কোথায় যাবে?

—ক্লাবে!

বিশাখা বললে—বুঝতে পেরেছি তুমি নাইট-ক্লাবে গিয়ে আবার হুইস্কি খাবে!

সৌম্য বললে—এত বছর হুইস্কি খাইনি, একটু খেলে ক্ষতি কী? আমি তো রোজ রোজ খাচ্ছি না!

বিশাখা বললে—তুমি যদি ক্লাবে যাও, তাহলে আমিও তোমার সঙ্গে যাবো। তোমাকে একলা যেতে দেব না—একলা গেলে তুমি অনেক মদ খেয়ে ফেলবে!

সৌম্য বললে—না, তোমার বাড়িতে অনেক কাজ, তুমি যেও না। আমি একলা যাই। এখুনি ফিরে আসবো—

--না, তুমি একলা যাবে না। আমি তোমাকে একলা যেতে দেব না। একলা গেলে তুমি আবার কী সর্বনেশে কান্ড করে বসবে, কে জানে!

—কেন? ও-কথা বলছো কেন?

বিশাখা বললে—বেশি মদ খেলে কী হয়, তা তুমি জানো না?

—কী হয়, তুমিই বলো না?

বিশাখা বললে—বলবো?

—হ্যাঁ বলো!

বিশাখা বললে—বেশি মদ খেয়ে মাতাল হয়ে তুমি একবার একজনকে খুন করে ফেলেছিলে। এবার কি আবার আমাকেও খুন করতে চাও?

—কী বলছো তুমি?

বিশাখা বললে—হ্যাঁ, ঠিকই বলছি। আমার কেউ নেই বলে তুমি আমার ওপরেও সেই-রকম অত্যাচার করতে চাও? আমার বাবা নেই, মা এককালে ছিল, এখন তাও নেই। নিজের বলতে এখন শুধু তুমিই আছো। এখন তুমি যদি আমাকে খুন করতে চাও তো আমার আর বলবার কিছুই নেই। করো, এখনই তুমি আমাকে খুন—

সৌম্য বললে—আমি হুইস্কি খেলে কি তোমাকে খুন করা হবে?

—তা ছাড়া আর কী? সেই জন্যেই তো বলছি যে যদি তোমার মদ না খেলে না চলে, তাহলে আমাকে তোমার সঙ্গে নিয়ে চলো। আমি সঙ্গে থাকলে তুমি বেশি খেতে পারবে না, আমি তোমাকে সামলাতে পারবো!

বিশাখার কথা শেষ হওয়ার আগেই সদর দরজায় কড়া নাড়বার শব্দ হলো। ভেতর থেকে মঙ্গলা জিজ্ঞেস করলে—কে? বিজলীর গলা। বিজলী বললে—আমি মঙ্গলা, আমি আর বাবা এসেছি—বাবার খুব অসুখ। বাবাকে হাসপাতাল থেকে নিয়ে এসেছি—

বিশাখার কাছে এসে মঙ্গলা জিজ্ঞেস করলে—বিজলীদি এসেছে, সঙ্গে বাবা এসেছে, খুব অসুখ বলছে। দরজা খুলবো?

মানুষের জীবন কখনও জটিল আবার কখনও সরল। আবার এমন লোকও সংসারে আছে যার জীবন জটিলতা আর সরলতায় মিলে মিশে অসমতল ভূমির মতন অসমান। এই অসমান জীবনের অধিকারীদের আমরা সবাই দেখেছি বুঝেছি জেনেছি। কিন্তু বিশাখার জীবন?

বিশাখার জীবনের মতো জটিল জীবন সন্দীপ চোখেও দেখেনি, ইতিহাসেও পড়েনি। শেষের দিকে বিশাখা সন্দীপের কাছে অনেক বার অভিযোগ করেছে—আমার এই দুঃখের জন্যে তুমিই দায়ী সন্দীপ, তুমিই দায়ী, আর কেউ দায়ী নয়—

সন্দীপ অবাক হয়ে যেত—আমি?

—তুমি নয়তো কে?

—আমি কী করে দায়ী হলুম?

—তুমি দায়ী নও? সব জেনে শুনে তুমি নিজের মুখে এই কথা বলছো?

সন্দীপ এ-কথার পর কী বলবে বুঝতে পারতো না।

শুধু বলতো—তোমার সব দুঃখের জন্যে যদি আমিই দায়ী হই তাহলে তুমি যে-শাস্তি দেবে তা আমি মাথায় তুলে নেব। দাও, কী শাস্তি তুমি দিতে চাও আমাকে—দাও—

—শাস্তি কি তোমায় কম দিচ্ছি?

—কী শাস্তি দিচ্ছ?

বিশাখা বলতো—এই যে তোমার কাছে এসে আমি বারবার টাকা চাইছি। এমনি করেই তো তোমাকে শাস্তি দিচ্ছি—

সন্দীপ হাসতো। বলতো—এমনি করে তুমি আমাকে জন্ম-জন্ম শাস্তি দিলেও আমার কোনও কষ্ট হবে না! বলো আর কতো টাকা তোমার দরকার?

বিশাখা বলতো—এতদিন কতো টাকা আমাকে দিয়েছ বলো তো? এ-সব টাকা তো কোনও দিন তোমাকে শোধ দিতে পারবো না—

সন্দীপ বলতো—তুমি ছাড়া আর তো আমার আপন-জন বলতে কেউ নেই। আমার আপন-জন বলতে একমাত্র তুমিই। আমার নিজের কেউ থাকলে তো তাকেই আমার সব দিতে হতো—

বিশাখা বলতো—না, আমি তোমার কেউ নই, আমি কেবল একজন পরস্ত্রী। আমি কথা দিচ্ছি সামর্থ্য হলে একদিন আমি তোমার সব ধার শোধ করে দেব।

সন্দীপ বলতো—একে ধার বলে মনে করো না বিশাখা, আমি কেবল তোমার মুখের দিকে চেয়েই দিচ্ছি, আর কারো মুখ চেয়ে নয়। আমার কেবল আনন্দ হয় এই ভেবে যে তুমি আমাকে আপন-জন বলে মনে করো—

একটু থেমে সন্দীপ আবার বললো—আর একটা কথা, এই যে তোমাকে এত টাকা দিচ্ছি এ-টাকার সুদও চাইবো না। শুধু তোমাকে দিয়েই আমার আনন্দ—তুমি নিলেই আমি খুশী হবো—

এ-কথার পর বিশাখা আবার খানিকক্ষণ চুপ করে থাকতো। এক-একবার শাড়ির আঁচল দিয়ে নিজের চোখ দুটো মুছে নিত। তারপর বলতো—এতই যদি আমার ওপর টান তাহলে সেদিন বিয়ের পিঁড়ির ওপর থেকে কেন উঠে পড়লে? কেন জোর করে তুমি আমাকে বিয়ে করলে না?

—আজ এত বছর পরে আবার সেই একই কথা জিজ্ঞেস করছো?

—এ-কথা জিজ্ঞেস না করে যে থাকতে পারছি না—

সন্দীপ বলতো—এ-কথার জবাব আমি দেব না; জীবনে কখনও আমার কাছ থেকে এ-কথার উত্তর পাবে না। এখন অন্য কথা বলো। বলো সৌম্যবাবু এখন কেমন আছেন?

বিশাখা বলতো—তিনি ভালো থাকলে কি এমন করে তোমার কাছে টাকা চাইতে আসি?

—এখন হুইস্কি খাওয়া ছেড়েছেন?

বিশাখা বলতো—তিনি হুইস্কি ছাড়লে যে আমার সুখ হবে!

—এখনও ক্লাবে যান?

—গেলেও আমি সঙ্গে থাকি। বেশি খেতে দিই না, বাড়িতেও বোতল নিয়ে এসে জমিয়ে রাখি না। খুব পীড়াপীড়ি করলে একটা বোতল নিয়ে আসি। তাও ছোট বোতল! আমি নিজেই গেলাসে ঢেলে দিই। অনেক দিন না খেয়ে খেয়ে এখন জেল থেকে ছাড়া পেয়ে খুব খেতে ইচ্ছে করে। ডাক্তার ডেকে এনে দেখিয়েছিলুম। তিনি বলে গেছেন সামান্য এক পেগ দু'পেগ খেলে দোষ নেই—

তারপর আরো অনেক কথা বলতো বিশাখা। একদিন এসে বললে—জানো, আর এক বিপদ হয়েছে—

—বিপদ? কী বিপদ?

বিশাখা বললে—আমার কাকাকে নিয়ে বিজলী আবার আমাদের বাড়িতে এসে উঠেছে—

—সে কী? কেন?

বিশাখা বললে—কাকার ভীষণ অসুখ। বাড়িতে সেবা করবার কেউ নেই, তাই অসুস্থ কাকাকে নিয়ে মনসাতলা লেনের বাড়ি ছেড়ে আমার এখানে এসে উঠেছে—

—তারপর?

—তারপর আর কী? সেই কাকার সমস্ত চিকিৎসা-খরচ আমার ঘাড়ে এসে পড়েছে। আমি নিজের ঝামেলা নিয়েই ব্যতিব্যস্ত, তার ওপর আবার কাকা আর বিজলী দু'জনেই আমাদের ঘাড়ে!

সন্দীপ বললে—এ তো অনেক খরচের ব্যাপার!

—সেই জন্যেই তো এখন তোমার স্বারস্থ হয়েছি। তুমি ছাড়া আর তো আমার আপন-জন বলতে কেউ নেই—

সত্যিই বিশাখার বাড়িতে তখন অশান্তির চরম অবস্থা চলছিল। বাড়িটা ছোট। মাত্র ক'খানা ঘর। অথচ মঙ্গলাকে নিয়ে লোক পাঁচজন। তারই একটাতে তপেশ গাঙ্গুলী শুয়ে থাকতো। শুয়ে শুয়েই দিনরাত কাটাতো। শুয়ে শুয়েই বিজলী কিংবা বিশাখার সঙ্গে কথা বলতো।

ডাক্তার ডেকে আনা হতো মাঝে মাঝে। সমস্ত শরীরটা পরীক্ষা হওয়ার পর তপেশ গাঙ্গুলী জিজ্ঞেস করতো—আমি সেরে উঠবো তো ডাক্তারবাবু?

ডাক্তারবাবু প্রেসক্রিপশন লিখতে লিখতে বলতেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ, বাঁচবেন না কেন, নিশ্চয়ই বাঁচবেন—

তারপর বিজলী দশটা টাকা দিত ডাক্তারবাবুর হাতে। টাকাটা নিয়ে ডাক্তারবাবু নিয়মমতো চলে যেতেন। তপেশ গাঙ্গুলীর অসুস্থ হওয়ার পর থেকে বিজলী গিয়ে অফিস থেকে বাবার মাইনেটা নিয়ে আসতো। কিন্তু সে তো মাত্র ছ'টা মাস। তারপরেই শূন্য হাত। তখন আর হাতে টাকা নেই। তখন হাত পাততে হতো বিশাখার কাছে। বিজলী বিশাখার কাছে গিয়ে বলতো—কী করবো বিশাখাদি, বাবার অফিস থেকে তো আর মাইনে পাচ্ছি না। এখন ডাক্তার-ওষুধের খরচা চলবে কী করে?

বিশাখা বলতো—তুই কিছু ভাবিসনি, আমি তো আছি। কাকার চিকিৎসার যা-কিছু খরচ আমি দেব—

তপেশ গাঙ্গুলীর অসুখ দিন দিন খারাপ দিকে মোড় নিতে লাগলো। শরীরের রোগ যতো বাড়তে লাগলো তার মনেও ততো ক্ষোভ জমতে লাগলো। এতদিন ধরে সে কী করলে? সামান্য একটা মেয়ের বিয়েও সে দিয়ে যেতে পারলে না? দশটা নয়, তার একটা মাত্র মেয়ে। অথচ বাঙালী হয়ে জন্মে অনেকে অনেক কিছু করে গেছে। তারই সঙ্গে কতো লোক কাজ করেছে। তারা আর কিছু না করতে পারুক, ছেলে-মেয়ে নিয়ে কষ্টে সুখে আছে। অনেকে কলকাতা শহরে একটা বাড়িও করে ফেলেছে। কিন্তু সে? সে কেন তার মেয়েটার বিয়ে দিয়ে যেতে পারলে না?

মাঝে মাঝে চোখ খুলে দেখতো বিজলী তার দিকে হাঁ করে চেয়ে আছে। বাবাকে জাগতে দেখেই বিজলী জিজ্ঞেস করতো—এখন কেমন বোধ করছো বাবা?

বাবা বলতো—তুই আমার কাছে বসে কী করছিস?

বিজলী বলতো—আমি তোমাকে দেখছি—কেমন আছো এখন?

বাবা রেগে যেত। বলতো—আমার কথা আর ভাবিসনে তুই, তোর নিজের কথা ভাব। তোর কথা ভেবে-ভেবেই তো আমি অসুখে পড়েছি—

—আমার কথা আর ভেবো না তুমি বাবা।

বাবা বলতো—তোর কথা ভাববো না তো আমি কার কথা ভাববো? তুই-ই তো আমার গলার কাঁটা।

—তা সে-জন্যে আমার কী দোষ?

বাবা বলতো—তা তুই ছেলে হয়ে জন্মালি নে কেন? তোকে মেয়ে হয়ে জন্মাতে কে বলেছিল? তুই যদি ছেলে হয়ে জন্মাতিস তো আজকে আমার ভাবনা?

এ-সব কথা বাবা বলতো আর কাঁদতো। বাবার কান্না দেখে বিজলীও কাঁদতো। সেদিকে নজর পড়তেই বাবা আরো রেগে যেত। বলতো—তুই কাঁদছিস কেন? তুই চুপ কর—

বাবা বিজলীকে চুপ করতে বলতো বটে, কিন্তু নিজের কান্না বন্ধ করতে পারতো না। শেষকালে বিজলী বলতো -বাবা, সবাই শুনতে পাবে যে, এবার থামো, আমার বড় লজ্জা করছে—

যে মানুষটা একদিন কলকাতা শহরটা দাপিয়ে বেড়িয়েছে, তাকে এই রকম শুয়ে থাকতে দেখে মেয়েও অবাক হয়ে যেত। মেয়ের বিয়ের জন্যে বাবা কী-ই না করেছে একদিন। নিজের ওপরও বিজলী লজ্জা হতো। সত্যিই তো কেন সে মেয়ে হয়ে জন্মালো। মেয়ে হয়ে যদি জন্মালোই তো কেন তার বিয়ে হলো না। যতদিন মা বেঁচে ছিল ততদিন তবু একটা কথা বলবার, কথা শোনাবার লোক ছিল। কিন্তু মা মারা যাওয়ার পর থেকেই বিজলী অনাথ। তার বিয়ের জন্যে বাবা কারো হাতে-পায়ে ধরতেও বাকি রাখেনি। কেন তার বিয়ে হলো না? সে কি দেখতে খারাপ? কিন্তু খারাপ দেখতে মেয়েদেরও তো বিয়ে হচ্ছে। জানালা দিয়ে বাইরের রাস্তার দিকে চেয়ে অনেক সময় কতো মেয়েদের দেখা যায়। তাদের চেহারা কদাকার, কিন্তু মাথায় ঘোমটা, সিঁথিতে সিঁদুর। তাহলে তাদেরও সংসার আছে, স্বামী আছে, সন্তান আছে, বাড়ি-ঘর আছে। আর বিশাখা?

বিশাখা আর সে তো একই বাড়িতে মানুষ। বিশাখার বাবা ছিল না, মা বিধবা। কিন্তু কী অলৌকিক উপায়ে তার বিয়ে হয়ে গেল। একটা পয়সাও খরচও হলো না। উল্টে শ্বশুর-বাড়ি থেকেই তার দেদার টাকা আসতে লাগলো।

সমস্তই বিজলীর চোখের সামনে ঘটতে লাগলো। মাসে মাসে বরাদ্দ টাকা আসতে লাগলো শ্বশুর-বাড়ি থেকে। আর তারপর বাড়ি থেকে জ্যাঠাইমা বিশাখাকে নিয়ে চলে গেল একেবারে সাহেব-পাড়ায়!

সেখানে গিয়েও বিজলী দেখেছে কতো সুখ কতো আরাম বিশাখাদির। ঝি-চাকর-গাড়ি সমস্ত কিছু মজুত। একজন ইংরেজী শেখাবার মাস্টার, একজন বাংলা শেখাবার, একজন অঙ্ক শেখাবার। সেই সাহেব-পাড়ার বাড়িতে যখনই বাবার সঙ্গে সে গিয়েছে, তখনই বিশাখারা কতো রকম খাবার খাইয়েছে, কতো রকম আরাম দেখেছে তাদের।

বাবা বরাবর খেতে ভালোবাসতো। আর জ্যাঠাইমাও বাবাকে পেট ভরা খাবার খেতে দিত। বাড়ি ফেরবার সময়ে বাবা বিজলীকে সান্ত্বনা দিত। বলতো—দুঃখ করিস্ নে বিজলী। তোরও বিয়ে হলে তোরও ওই রকম আরাম হবে দেখিস। তুই তো বিশাখার চেয়েও সুন্দরী। দেখিস তোরও বর খুব বড়লোক হবে!

তারপর কতো দিন গেছে, কতো মাস গেছে, কতো বছর গেছে, কতো বার কতো লোক তাকে পছন্দ করতে এসেছে। যাবার সময়ে কতো লোক বলে গিয়েছে—পরে খবর দেব—

কিন্তু পরে কেউই আর খবর দেয়নি। আসল কথা হচ্ছে রূপ নয়, গুণ নয়, টাকা। দেনা-পাওনার ব্যাপারটাই প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে বরাবর। সেই টাকা চাইবার জন্যেই কতো-বার বাবা গিয়েছে বিশাখাদের রাসেল স্ট্রীটের বাড়িতে। বউদিকে গিয়ে কতোবার তপেশ গাঙ্গুলী বলেছে—আমাকে কিছু টাকা দিতে পারো বউদি?

বউদি বলেছে—কতো টাকা বলো?

তপেশ গাঙ্গুলী বলেছে—আমার বিজলীর বিয়ের জন্যে চাইছি—

বউদি বলেছে—সে তো অনেক টাকা! পাঁচ-দশ টাকা হলে দিতে পারি। তার বেশি টাকা তো আমার হাতে থাকে না—

—কেন, মুখুজ্জে গিন্নীর তো অনেক টাকা। তাদের তো টাকার শেষ নেই—

বউদি বলতো—তাদের অনেক টাকা, কিন্তু তারা আমাকে টাকা দেবে কেন? যদি জিজ্ঞেস করে কী জন্যে টাকার দরকার তখন কী জবাব দেব?

—তুমি বলবে তোমার দেওর-ঝি'র বিয়ের জন্যে!

বউদি বলতো—তাই কখনও বলা যায় মুখ ফুটে! আমার আর বিশাখার যা খরচা লাগে সে-খরচটা ছাড়া কোনও খরচ কি আমি মুখ ফুটে চাইতে পারি! তুমিই বলো না, আমি চাইতে পারি? আমি কোন মুখে চাইবো বলো?

তপেশ গাঙ্গুলী বলতো—কেন, ধার বলে চাইবে!

—ধার? তুমি বলছো কি ঠাকুরপো? এখনও তো বিশাখার সঙ্গে ও-বাড়ির নাতির বিয়ে হয়নি, এরই মধ্যে ধার চাইবো? আগে কুটুম্বিতে হোক, আগে বিশাখা ও-বাড়ির নাত-বউ হোক। তখন হয়তো বিশাখা অনেক টাকার মালিক হবে, তখন তোমাকে বিশাখা নিজেই জামাই-এর কাছ থেকে টাকা চেয়ে দিতে পারবে—

তপেশ গাঙ্গুলী বলতো—তখন বিজলীর কথা তোমার মনে থাকবে তো?

বউদি বলতো—কী বলছো তুমি? মনে থাকবে না? তুমি আমার বিপদের দিনে কী করেছিলে, কী রকম ভাবে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছিলে, তা কি আমি ভুলে যেতে পারি? আর বিজলীও তো আমার মেয়ের মতোই—

তপেশ গাঙ্গুলী বলতো—সংসারে সে-সব কথা তো কেউ মনে রাখে না বউদি। তুমি বলে তাই মনে রেখেছ। তা, ঠিক যেন মনে থাকে বউদি, তখন যেন ভুলে যেও না—

—না, না, তা কখনও ভুলবো না, তুমি দেখে নিও—

এসব কতোকাল আগেকার কথা। তপেশ গাঙ্গুলীর কিন্তু সেই সব আগেকার কথা-গুলো সমস্ত মনে আছে।

তারপর কী-রকম অদ্ভুত সব কাণ্ড ঘটে গেল সংসারে। প্রথমে তো সকলের ধারণাই হয়ে গিয়েছিল যে বিশাখার বিয়েটা বুঝি ঠিক লোকের সঙ্গে হলো না। কিন্তু তার কপালের এমনই জোর যে ঘুরে ফিরে সেই সৌম্যবাবুর সঙ্গেই বিয়েটা হলো। কিন্তু তারপর বহু বছর কাটলো তার জেলখানায়। জেলখানা থেকে ছাড়া পেয়ে আবার এখন বিশাখা সেই স্বামীর সঙ্গেই সংসার করছে। সেই আগেকার বিরাট বাড়ি আর ফ্যাক্টরি নেই বটে, কিন্তু তবু তো বিশাখার নিজের টাকায় কেনা একটা বাড়ি আছে, গাড়ি আছে, ড্রাইভার আছে। বড়লোকদের যা-যা থাকলে মানুষ তাদের বড়লোক বলে তা তো বিশাখার সবই আছে। নেই নেই করেও সৌম্যবাবুকে পরের আপিসে তো চাকরি করতে হয় না, জমানো টাকা ভাঙিয়ে খাওয়া-পরাটা চলে যায়, তাতে ঠাট্ও বজায় থাকে। তার মতো পরের বাড়িতে থেকে ইজ্জত খোয়াতে হয় না।

মাঝে মাঝে বাবা বিজলীকে জিজ্ঞেস করে—হ্যাঁ রে, ওদিকে কারো গলার শব্দ শুনছি নে, ওরা কেউ বাড়িতে নেই বুঝি?

বিজলী বলে—না—

—কেন আজকেও ক্লাবে গেছে?

—হ্যাঁ।

—বিশাখাও সঙ্গে গিয়েছে বুঝি?

বিজলী বলে—হ্যাঁ—

হঠাৎ তপেশ গাঙ্গুলী বলে—তা ওখানে গিয়ে বিশাখারা কী করে-রে? মদ খায় বুঝি?

বিজলী বলে—না—

—তাহলে তোকেও নিয়ে যায় না কেন?

বিজলী বলে—আমাকে নিয়ে যাবে কেন? আমাকে নিয়ে গেলে তুমি রুগী মানুষ, তোমাকে দেখবে কে?

—না, আমাকে কারো দেখবার দরকার নেই। আমি বুড়ো-হাবড়া মানুষ, আমার বেঁচে

থাকার দরকার নেই, আমি মরে গেলেই বাঁচি। কিন্তু তুই কেন ভুগতে যাবি আমার জন্যে? তুইও ওদের সঙ্গে ক্লাবে যাবি! আমার জন্যে কাউকে ভাবতে হবে না—

বিজলী বলে—কিন্তু আমাকে ওরা ক্লাবে নিয়ে যাবে কেন? জামাইবাবু আর বিশাখাদি দু'জনের মধ্যে আমাকে সঙ্গে নেবে কেন?

—নেবে, নেবে। তুই একবার বলেই দেখিস না!

বিজলী বললে—না না, আমি তা বলতে পারবো না। ও-সব আমাকে বলতে বোল না তুমি। শেষকালে যদি জামাইবাবু আমাকে মদ খেতে বলে?

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—তা খাবি, মদ খাবি!

—আমি মদ খাবো? বলছো কী তুমি?

—কেন, দোষ কী? মদ খেলে যদি তোর একটা হিল্লে হয়ে যায়, তো মদ খেতে দোষটা কী? আমি বাপ হয়ে তোর তো কিছুই করতে পারলুম না, তোর একটা বিয়েও দিয়ে যেতে পারলুম না, এমন হতভাগা বাপ আমি তোর—

বলে তপেশ গাঙ্গুলী হাউ হাউ করে কাঁদতে আরম্ভ করলে। বিজলী ভয়ে শিউরে উঠলো। বললে—বাবা কেঁদো না, কেঁদো না বাবা তুমি। ওদিকে মঙ্গলা রান্নাঘরে রান্না করছে, শুনতে পাবে, চুপ করো—চুপ করো তুমি—

কিন্তু কে কার কথা শোনে। বাবা আরো জোরে গলা চড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগলো—ওরে, আমি এমন হতভাগা বাপ তোর যে একটা হিল্লে পর্যন্ত করতে পারলুম না রে। আমি যে মরেও সুখ পাবো না। হা ভগবান, আমি কী এমন পাপ করেছিলুম যে পাঁচটা নয়, দশটা নয়, সামান্য একটা মেয়েকে পথে বসিয়ে চলে গেলুম—

বলে আবার বোধহয় কোন অদৃশ্য ভগবানের উদ্দেশ্যে গলা চড়িয়ে কাঁদতে লাগলো। আর বিজলী লজ্জায় আতঙ্কে শিউরে উঠে তাড়াতাড়ি ঘরের দরজাটায় খিল লাগিয়ে দিলে। শব্দটা বাইরে গেলে জানাজানি হয়ে যাবে।

কিন্তু ততক্ষণে যা সর্বনাশ হবার তা হয়ে গেছে। মঙ্গলা বাইরে থেকে চেঁচিয়ে বলতে লাগলো—দিদিমণি, ও দিদিমণি, কী হলো? দরজা বন্ধ কেন, খোল, দরজা খোল—

বার দুয়েক ধাক্কা দেবার পর বিজলী দরজা খুলতেই দেখলে মঙ্গলা রান্নাঘর থেকে এসে সামনে দাঁড়িয়ে আছে। বিজলীকে দেখে মঙ্গলা জিজ্ঞেস করলে—বাবু অমন করে চেঁচিয়ে উঠলেন কেন? অসুখ বেড়েছে? ডাক্তারবাবুকে ডাকতে হবে?

বিজলী বললে—না, ও কিছু নয়। ডাক্তারবাবুকে ডাকতে হবে না। অসুখের কষ্ট হচ্ছে বলেই বাবা অমন চেঁচাচ্ছেন। তুমি তোমার কাজ করোগে যাও—

বলে দরজা আবার বন্ধ করতে যাচ্ছিল, কিন্তু বন্ধ না করেই বললে—মঙ্গলা শোন—

মঙ্গলা জিজ্ঞেস করলে—কী?

—তোমার বউদিমণি আর দাদামণি এখনও ফেরেননি?

—না—

—ঠিক আছে। তুমি তোমার কাজ করোগে যাও—

বলে আবার দরজাটা বন্ধ করে দিলে।

ফিরে আসতেই বাবা জিজ্ঞেস করলে—কী রে? কে?

—কে আবার, মঙ্গলা। ভেবেছে তোমার অসুখ খুব বেড়েছে, তাই বলছিল ডাক্তার ডাকতে হবে কিনা। আমি বলেছি—না।

বাবা বললে—ঠিক বলেছিস। ওরা কী করে বুঝবে যে আমার কী অসুখ! ওরা তো জানে না আমার রোগ কোনও ডাক্তার সারাতে পারবে না। এক ভগবান ছাড়া আমার এ রোগ আর কেউ সারাতে পারবে না।

বিজলী বললে—তুমি অতো আমার জন্যে ভাবছো কেন বাবা? কতো মেয়েরই তো বিয়ে হয় না। তাতে ক্ষতি কী? আজকাল কতো মেয়ে তো সারা জীবন বিয়ে করে না, আইবুড়ো থাকে! তারা কি সবাই মরে গেছে, বেঁচে নেই?

বাবা বললে—ওরে, তুই যদি মেয়ের বাপ হতিস তাহলে তুই আমার কষ্টটা বুঝতিস!

বিজলী বললে—আমি আগে বুঝতুম না, এখন বুঝি! কিন্তু তোমাদের সে-যুগ বদলে গেছে বাবা। এখন কতো মেয়ে বিয়ে না করে চাকরি করছে। চাকরি করে বাপ মা'কে খাওয়াচ্ছে। আমি শুনেছি—

—কিন্তু তোর সে-পথ কি আমি রেখেছি? সে-পথ থাকলে কি আজ আমার ভাবনা? আমি যতোদিন বেঁচে আছি ততোদিন না হয় পেনসন পাচ্ছি। কিন্তু আমি মারা গেলে? আমি মারা গেলে ওই মাসকাবারি তিনশোটা টাকাও তো বন্ধ হবে। তখন? তখন তো একমুঠো ভাতের জন্যে ওই বিশাখার ঝি-গিরি করতে হবে, তা ভাবছিস না কেন? আর...

কথা বলতে বলতে তপেশ গাঙ্গুলী হাঁফিয়ে উঠেছিল। একটু থামলো। থেমে আবার বলতে লাগলো—তখন যদি তোকে বিশাখার মতোন লেখা-পড়া শেখাতুম, আজকে সেই বিদ্যে নিয়ে একটা চাকরি-বাকরি কিছু করতে পারতিস। নিজের পেটটা চালানোর মতো কাজ পেতিস! কিংবা আমার আপিসেও একটা কিছু চাকরি পেতিস। আমার আপিসেও কতো মেয়েকে চাকরিতে ঢুকতে দেখলুম। কিন্তু আমি যে সেকালের লোক, ভাবতুম তোর একটা ভালো বর দেখে বিয়ে দেব। মেয়ে হয়ে বেটাছেলেদের সঙ্গে চাকরি করা কি ভালো! আর আমার ভাগ্য কে খণ্ডাবে বল্? আর সকলের মাইনে বাড়লো, প্রমোশন হলো,, আমারই বা মাইনে বাড়লো না কেন বল্ তো!

বলে তপেশ গাঙ্গুলী এক হাতে নিজের কপালটা ছুঁতো। বলতো—সবই আমার কপাল, তোর কপাল, তোর মা'রও কপাল। নইলে তোর মামার বাড়িই বা নেই কেন বল্? সকলের তো মামা-মামী থাকে!

বাবার কথাগুলো বিজলী সব কেবল চুপ করে শুনতো, কিন্তু কিছু বলতো না। কিছুক্ষণ পরে যেন ঘুম থেকে জেগে ওঠার মতো তপেশ গাঙ্গুলী বলে উঠলো—একটা কাজ করতে পারিস তুই বিজলী?

বিজলী বললে—কী কাজ?

—তোর জামাইবাবুর সঙ্গে তুই একটু ভাব করতে পারিস না?

বিজলী অবাক হয়ে গেল বাবার কথা শুনে।

বললে—জামাইবাবুর সঙ্গে ভাব? ভাব তো আছেই—

—তোকে আগেও বলেছি এ-কথা। সে-রকম ভাব নয় রে, সে-রকম ভাব নয়। জামাই-বাবুর সঙ্গে যেমন তোর বিশাখাদি ক্লাবে যায়, সে রকম! সেই রকম এক-একদিন তুই যেতে পারিস না তোর জামাইবাবুর সঙ্গে?

—আমি?

বিজলী চমকে উঠলো। বললে—আমি? জামাইবাবুর সঙ্গে ক্লাবে যাবো?

—কেন? ক্ষতি কী যেতে?

বিজলী আবার বললে—তুমি বাবা হয়ে এই কথা বলছো?

—বলবো না? আমি যখন থাকবো না তখন ওই বিশাখাদি ছাড়া আর কেউ দেখবার থাকবে না তোকে। তখনকার কথা তুই একবারও ভেবেছিস? তখন কে তোকে দেখবে? ওই বিশাখাদি? দেখবি তখন তোকে ঝি-এর মতো খাটাবে। তখন দেখবি আমার কথা ফলে কিনা। আমি তো সারা দিন-রাত কেবল সেই কথাই ভাবি। তখন তোর কী দশা হবে তাই ভেবেই আমার ঘুম হয় না। এখন থেকে তাই জামাইবাবুর সঙ্গে একটু ভাব করে রাখ না। দেখবি তোর একটা হিল্লে হয়ে যাবেই। একবার যদি তুই তার সুনজরে পড়ে যাস তো......

বিজলী বললে—তার মানে কী বাবা? তুমি কী বলতে চাও, খুলে বলো—

—তার মানে তুই বুঝতে পারলি নে? বুঝবি আমি মরে গেলে তখন বুঝবি—বলে তপেশ গাঙ্গুলীর চোখ দিয়ে আবার ঝর-ঝর করে জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো।

তারপর একটু চুপ করে থেকে আবার বলতে লাগলো—তোর বাপ হয়ে আমি নিজের

মুখে এর বেশি আর কী বলতে পারি? আমি মরে গেলে তুই নিজের চোখেই সব দেখতে পাবি! তখন আমাকে আর নিজের মুখে কিছুই বলতে হবে না—

বিজলী তবু বললে—তুমি এখনই বলো না, শুনে তবু একটু সাবধান হতে পারবো।

—শুনবি? তবে শোন্! আমি মরে গেলে কী হবে শোন্। তখন ছোটবাবু ওই মঙ্গলাকে ছাড়িয়ে তোকে দিয়ে রান্না করা বাসন মাজা কাপড় কাচা সব কিছু করাবে। মঙ্গলাকে তবু আশী টাকা মাইনে দিতে হয়, কিন্তু তোকে বিনে পয়সার ঝি হিসেবে রেখে দেবে! অথচ তুই কিছু আপত্তিও করতে পারবি নে!......এইবার বুঝলি?

বিজলী তো অবাক বাবার কথা শুনে। বললে—বলছো কী তুমি?

—হ্যাঁ রে, হ্যাঁ। তুই তো বাইরের জগতের সঙ্গে মিশলি না, তাই দুনিয়াটা চিনলি না। আমি দুনিয়াটা দেখে হদ্দ হয়ে গিয়েছি। কোথাও মানুষ নেই পৃথিবীতে। এখানে সবাই যার-যার ধান্দায় ঘুরছে, কেউ কারো দিকে চাইছে না, কারো কথা ভাবছে না, কেবল নিজের কাজ গুছিয়ে নেবার মতলবে ঘুরছে সবাই। তাই বলছি আমি মরে গেলে তুই তখন আমার এই কথাগুলোর মর্ম বুঝবি—

—তা আমি এ-অবস্থায় কী করবো তাই এখন তুমি বলে দাও—

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—তুইও সৌম্যবাবুর সঙ্গে এখন থেকে একটু ভাব-সাব করবার চেষ্টা কর। নিজের আখের গুছিয়ে নেওয়ার চেষ্টা কর। নইলে...

বিজলী জিজ্ঞেস করলে—কী করে ভাব করবো?

—তোকে কি ছলা-কলাও শিখিয়ে দিতে হবে? তুই জানিস না কী করে পুরুষ মানুষের মন ভোলাতে হয়? গরীবের মেয়ে বলে কি ভগবান তোকে তাও শেখায়নি? আমাকেই তা শেখাতে হবে?

বলতে বলতে তপেশ গাঙ্গুলীর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো আর গলাটাও যন্ত্রণায় আটকে গেল। বিজলী বললে—বাবা, তোমার কষ্ট হচ্ছে, আর কথা বলতে হবে না তোমাকে। আমার কপালে যদি দুর্ভোগ থাকে তো তা কে খণ্ডাতে পারবে? কেউ না! তুমি চুপ করো বাবা, নইলে তোমার অসুখ আরো বেড়ে যাবে। তুমি চুপ করো বাবা—

হঠাৎ বাইরে থেকে বিশাখার গলার আওয়াজ এলো—মঙ্গলা, দরজা খোল—

বিজলী বললে—ওই ওরা এলো ক্লাব থেকে—

তপেশ গাঙ্গুলী বলে উঠলো—যা যা, দরজা খুলে দিয়ে আয়, যা—

বিজলী বললে—এখন সামনে যাবো না, ছোটবাবু এখন মদ খেয়ে এসেছে—

তপেশ গাঙ্গুলী উত্তেজিত হয়ে উঠেছে তখন। বলে উঠলো—যা-যা, এখনি যা, এখন মদের নেশায় চুর হয়ে আছে। এই সময়েই যাওয়া ভালো—যা—যা—

কথাটা শুনে বিজলী আর অপেক্ষা করলে না। তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়েই সদর দরজাটা খুলে দিলে। খুলতেই দেখলে বিশাখাদির পেছনেই ছোটবাবু দাঁড়িয়ে। বিশাখা বললে—তুই দরজা খুলে দিলি কেন? কে তোকে দরজা খুলতে বললে? মঙ্গলা কোথায়?

বিজলী বললে—সে রান্না করছে বলেই আমি দরজা খুলে দিলুম।

পেছন থেকে ছোটবাবু আবার বললে—এ কে?

বিশাখা সে-কথার উত্তর না দিয়ে বললে—ও কেউ নয়, তুমি এসো। দেখো, কাল এখানটায় তুমি হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়েছিলে। একটু সাবধানে এসো, আমি ধরছি তোমাকে, এসো—

বিজলী সঙ্গে সঙ্গে সামনে এগিয়ে গিয়ে ছোটবাবুর হাতটা ধরলে।

বললে—আমি ধরছি, এইখানটায় একটা সিঁড়ি আছে—

—তুই হাত ছাড়—

বলে বিশাখা জোর করে বিজলীর হাতটা ছাড়িয়ে দিলে।

তারপর বিজলীর দিকে চোখ ফিরিয়ে বললে—তুই কেন এলি? মঙ্গলাই তো বরাবর দরজা খুলে দেয়। তোকে কে দরজা খুলতে বলেছে?

ছোটবাবু তখনও বিজলীর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে।

বললে—এ কে? আমাদের বাড়িতে একে কখনও দেখিনি তো?

বিশাখা ধমক দিয়ে উঠলো। বললে—তুমি চলে এসো তো, ওদিকে দেখতে হবে না। আমার হাত ধরো—

বলে ছোটবাবুকে ধরে বাড়ির ভেতর নিয়ে চলে গেল। চলে গেল একেবারে শোবার ঘরে। বিজলী অপমানে সঙ্কুচিত হয়ে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল। তারপর আস্তে আস্তে আবার বাবার ঘরে চলে গেল। তার চোখ দুটো কান্নায় ছল-ছল করছে। বাবা জিজ্ঞেস করলে—কী রে, কী হলো? কাঁদছিস?

বিজলী কান্না থামিয়ে বললে—বাবা, তুমি আর ছোটবাবুর সামনে আমায় যেতে বোল না—

—কেন রে? কী হলো?

বিজলী সব ঘটনাটা বললে। তারপর বললে—আমার বিয়ে যদি না হয় তাহলে কী ক্ষতি? মেয়েমানুষের কি বিয়ে ছাড়া কোনও গতি নেই? মেয়েমানুষদের কি বিয়ে হতেই হবে? ওই তো মঙ্গলা রয়েছে। মঙ্গলার তো বিয়েই হয়নি। ও কি খুব কষ্ট পাচ্ছে?

—আরে, ওর সঙ্গে তুই নিজের তুলনা করছিস? ওরা ছোটলোক, লেখাপড়া শেখেনি, তাই পরের বাড়ি ঝি-গিরি করছে! ওর সঙ্গে তুই নিজের তুলনা করছিস? তোকে তো আমি কিছু লেখাপড়া শিখিয়েছি। ও আর তুই এক হলি? বলছিস কী তুই?
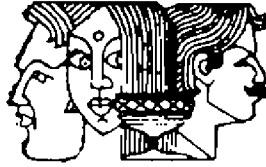
সন্দীপ তখনও হেঁটে হেঁটে চলেছে। তার মনে হলো কলকাতার রাস্তাগুলো যেন আগেকার চেয়ে আরও সরু হয়ে এসেছে। যে-রাস্তায় যা আগে ছিল তা যেন আর নেই। তার জায়গায় নতুন দোকান-ঘর নতুন মালিক, নতুন সাইনবোর্ড বসেছে।

সত্যিই এই ক'বছরের মধ্যে তার জীবন যেমন বদলে গিয়েছে তেমনি পৃথিবীটাও যেন বদলে গিয়েছে। কোথায় গেল সেই 'বিশ্ব-শান্তি-যজ্ঞে'র সাইনবোর্ডগুলো? অনেক জায়গায় তখন সেগুলো দাঁড় করানো থাকতো আর সামনের থালায় খুচরো পয়সা ছড়ানো থাকতো। তার জায়গায় বাড়িগুলোর দেওয়ালে দেওয়ালে লটারির দোকান হয়েছে। যেখানে ঝোপ-জঙ্গল পড়ে ছিল সেখানে বস্তির জমজমাট ঝুপড়ি বসে গেছে। কলকাতা শহরকে এই ক'বছরের মধ্যে আর যেন চেনা যায় না।

—দাদা, মনসাতলা লেনটা কোন দিকে বলতে পারেন?

মনসাতলা লেন? সন্দীপ আবার ফিরে গেল সুদূর অতীতে। তখন সে সবে মাত্র কলকাতায় এসেছে। মল্লিককাকা তাকে সঙ্গে নিয়ে সেই বিডন স্ট্রীট থেকে বাসে চড়ে এসেছিল ওই তপেশ গাঙ্গুলীর ওই মনসাতলা লেনের বাড়িতে। সেই তখন থেকেই সে মনেপ্রাণে জড়িয়ে গিয়েছিল ওই বিশাখার সঙ্গে।

তারপর সেখান থেকে তিন নম্বর রাসেল স্ট্রীট। রাসেল স্ট্রীটের তিন নম্বর বাড়িটাতে গিয়েই সে বিশাখার সঙ্গে বেশি করে জড়িয়ে গিয়েছিল। তারপর হলো তার চাকরি। চাকরিটা ব্যাঙ্কের। সেখানে গিয়েও কতো রকম লোকের সংস্পর্শে এসেছিল। হাশেম শুধু তার শুভাকাঙ্ক্ষীই ছিল না। সন্দীপের অনেক কাজই সে করে দিত। আর তাতে হাশেমের কোনও উপকার হতো না, হতো সন্দীপের। তার ফলে সুনাম শুধু নয়, চাকরিরও প্রমোশন হতো তার।

—কোন রাস্তাটা বললেন?

—মনসাতলা লেন!

—কতো নম্বর?

—সাত নম্বর—

—আপনি কাকে চান? তপেশ গাঙ্গুলীকে?

আশ্চর্য! সন্দীপের কি মতিভ্রম হলো নাকি? কবে কতো বছর আগে তপেশ গাঙ্গুলী বিজলীকে নিয়ে সাত নম্বর মনসাতলা লেনের বাড়ি ছেড়ে পাঁচ নম্বর ভুবন গাঙ্গুলী লেনের সৌম্যবাবুর বাড়িতে গিয়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে নিয়েছিলেন, তা কি সে ভুলে গিয়েছে? আর সেখানে গিয়েই তো তপেশ গাঙ্গুলী......

কিন্তু সে-কথা এখন থাক!

—না, আমি চাই অবনীনাথ বসুকে। আমার কাকা তিনি। নতুন ভাড়াটে হয়ে সাত নম্বর মনসাতলা লেনের বাড়িতে এসেছেন—

সন্দীপ বললে—তাহলে সোজা ট্রাম রাস্তা ধরে ডান দিকে ঘুরে যাকেই জিজ্ঞেস করবেন সে-ই বলে দেবে।

কী অদ্ভুত মতিভ্রম! কখন ঘুরতে ঘুরতে সে কিনা সেই তার জীবনের প্রথম পরিচ্ছেদে এসে পৌঁছে গিয়েছে। কিন্তু কে তাকে এমন করে এখানে নিয়ে এলো? এখানে তার আসার তো কথা নয়!

আবার সন্দীপ তার সজ্ঞানে নিজের মধ্যে ফিরে এলো। একেবারে নিজের অস্তিত্বের গভীরে। আর কেউ তাকে চিনতে পারবে না। এখন একমুখ দাড়ি। জেলে ঢোকবার পর থেকে আর দাড়িতে ক্ষুর ছোঁয়ায়নি সে। এখন যদি তার কোনও ক্লায়েন্ট বা তার কোনও স্টাফ তাকে দেখতে পায় তো তাকে চিনতেই পারবে না। আর যে-ঘটনা ঘটে গেছে তারপর আর তাকে চিনতে না পারাই ভালো। চিনতে পারলেই তাকে চোর বলে সনাক্ত করবে। বলবে—এই লোকটাই ব্যাঙ্কে চাকরি করতো, এই লোকটাই ব্যাঙ্ক থেকে টাকা চুরি করবার জন্যে জেলে গিয়েছিল। তারপর দশজনকে ডেকে সকলের সামনে তাকে অপমান করবে। তার চেয়ে এই-ই ভালো। এই দাড়ির আড়ালে আত্মগোপন করে থাকা।

কিন্তু কতদিন? কতদিন সে এমনি করে আত্মগোপন করে রাখবে নিজেকে? কোথায় আত্মগোপন করবে?

চারদিকে কড়া রোদ। দিন যতো বাড়ছে রোদের তেজ ততো বাড়ছে। অসহ্য লাগছে রোদের উত্তাপ। কোথায় সে আশ্রয় পাবে? কে জেলের আসামীকে আশ্রয় দেবে?

খানিক দূর যেতেই একটা বিরাট অশ্বত্থ গাছের তলায় এসে একটু আরাম হলো। পাশেই একটা পুরনো বাড়ি ভাঙা হচ্ছে। সেই বাড়িটা ভেঙে বোধহয় নতুন কোনও সাত-আট তলা ফ্ল্যাট-বাড়ি উঠবে। একটা লোক আগে থেকেই সেখানে বসে ছিল। সন্দীপকে সেখানে বসতে দেখে লোকটা একটু সরে বসলো। তারপর জিজ্ঞেস করলে—আপনি কে?

সন্দীপ বললে—আমি এখানে একটু বিশ্রাম নিতে এসেছি—আপনি কে?

লোকটা বললে—আমিও আপনার মতো একটু জিরিয়ে নিচ্ছি—জানেন, এই যে বাড়িটা ভাঙা হচ্ছে, এই বাড়িটার কোণে আমার তেলেভাজার দোকান ছিল। সেই তেলেভাজা বিক্রি করেই আমার পেট চলতো। আমার তেলেভাজার দোকানটাও ওরা ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। এখন আমার পেট চলে কী করে বলুন তো? শুনছি এখানে নাকি একটা বারোতলা বাড়ি হবে! তখন আমরা কোথায় যাবো?

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—আপনার বাড়ি কোথায়?

—আমি ফরিদপুরের লোক। দেশ ভাগ হওয়ার পর এক-কাপড়ে কলকাতায় চলে এসেছি। আমার ছেলে-মেয়ে-বউ সব খুন হয়ে গেছে। আমি কোনও রকমে এখানে একটা ঝুপড়ি বানিয়ে তেলেভাজা ভেজে পেট চালাচ্ছিলুম। কিন্তু এখন তাও গেল!

—আপনার নাম?

—গণেশ সরকার! অথচ দেখুন কতো লোক ওদেশ থেকে এখানে এসে পরের জমি জবর-দখল করে দোতলা-তিনতলা বাড়ি হাঁকিয়ে দিব্যি বহাল তবিয়তে রয়েছে, আর আমার

কপালেই যতো দুর্ভোগ!

তারপর একটু থেমে আবার বললে—কাল থেকে আমার ভাত খাওয়া হয়নি. একটা টাকা ভিক্ষে দেবেন আজ্ঞে?

—ভিক্ষে?

—ভিক্ষে ছাড়া আর কী বলবো? তেলেভাজা ভেজে যা দু'তিন টাকা পেতুম তাইতেই আমার দুবেলা পেট চলতো। এখন সে ঝুপড়িও নেই আর তেলেভাজার দোকানও নেই।

সন্দীপ বললে—আজকাল এক টাকায় কি পেট ভরে?

—যেটুকু ভরে তাইতেই চালিয়ে নিতে হবে। তার বেশি আর কে ভিক্ষে দেবে?

সন্দীপ বললে—আমি দেব!

লোকটা চমকে উঠেছে কথাটা শুনে। লোকটা আবার একবার সন্দীপের দাড়ি-গোঁফ-ওয়ালা মুখের দিকে চেয়ে দেখলে ভালো করে। সে ভুল শুনছে নাকি?

সন্দীপ তখন তার থলির ভেতর থেকে একটা পাঁচ টাকার নোট বার করেছে। নোটটা গণেশ সরকারের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললে—আজকের দিনটা এই পাঁচটা টাকা নিয়ে চালান, তারপর কাল আবার দেব। যতোদিন আবার আপনার তেলেভাজার দোকান না হয়, ততো-দিন টাকা দিয়ে যাবো—

লোকটা যেন তখনও নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না। টাকাটা নিয়ে সে একদৃষ্টে দেখতে লাগলো সন্দীপের মুখের দিকে। সন্দীপ বললে—যান, টাকাটা নিয়ে খেয়ে আসুন। আমার দিকে চেয়ে দেখছেন কী?

লোকটা হঠাৎ নিচু হয়ে সন্দীপের পা দুটো ছুঁয়ে মাথায় ঠেকালো। বললে—আপনি মানুষ নন, দেবতা। এতটা বয়েস হলো, আমি অনেক লোক দেখেছি, কিন্তু এমন মানুষ দেখিনি। সত্যিই আপনি মানুষ নন, দেবতা। সাক্ষাৎ দেবতা......

সন্দীপ বললে—না, আমি চোর, আমি ডাকাত......যান খেয়ে আসুন......বেলা হয়ে গিয়েছে......

—তাহলে আমার এই ঝোলাটা আপনার কাছে রেখে দিন, আমি ততক্ষণ হোটেল থেকে খেয়ে আসি!

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—এ ঝোলার মধ্যে কী আছে?

—কী আর থাকবে! হাতা-খুন্তি-সাঁড়াশি-হাতুড়ি, এই সব। একটা লোহার কড়াও ছিল ওর সঙ্গে। সেটা পুলিশ নিয়ে নিয়েছে—আমি আসছি—

বলে লোকটা খেতে দৌড়লো।
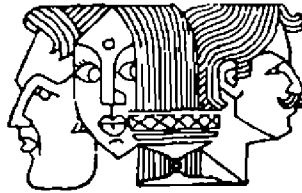
—কে?

অনেক বছর আগেকার অতীত থেকে কে যেন কথা বলে উঠলো। কথাটা প্রতিধ্বনির মতো শোনালো। ও রতনের গলা। সদর দরজার কড়া নাড়ার শব্দ পেলেই রতন রান্না করতে করতে সাড়া দিত—কে?

অতো রাত্রে এক বিশাখা ছাড়া আর কে আসবে?

—রতন! আমি বিশাখা। তোমার বাবু বাড়ি ফিরেছেন?

—হ্যাঁ, দরজা খুলছি। বাবু ফিরেছেন।

রতন নয়, সন্দীপ নিজেই গিয়ে দরজাটা খুলে দিয়েছিল। বিশাখা দাঁড়িয়ে ছিল। বিশাখা ভেতরে ঢুকতেই দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে খিল লাগিয়ে দিলে সন্দীপ। বিশাখা

বললে—অফিস থেকে কতোক্ষণ এসেছ?

সন্দীপের সেদিনের কথাগুলো এখনও মনে আছে। সন্দীপ বলেছিল—তোমার আসতে এত দেরি হলো কেন? তোমার জন্যে আমি আজ অনেক সকাল সকাল বাড়ি এসেছি। এসো, ভেতরের ঘরে এসো. তোমার টাকা এনেছি—

—এনেছ?

ভেতরের ঘরের দিকে যেতে যেতে বিশাখা বললে—আমার দেরি হলো মিস্টার হাজরার জন্যে। মিস্টার হাজরা আজ আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন—

—মিস্টার হাজরা? মিস্টার হাজরা কে?

—গোপাল হাজরা।

সন্দীপ জিজ্ঞেস করেছিল—গোপাল হাজরাকে তুমি কী করে চিনলে?

বিশাখা বলেছিল—ক্লাবে গিয়ে। আমি তো ছোটবাবুর সঙ্গে নাইট-ক্লাবে যাই। সেখানেই ছোটবাবু মিস্টার হাজরার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন—

বলতে বলতে সন্দীপ বিশাখাকে নিয়ে তার ঘরে ঢুকেছিল।

সেদিনের কথা এতকাল পরে এখনও সন্দীপের স্পষ্ট মনে আছে। সেই তাদের বেড়াপোতার হাজরা-বুড়োর ছেলে গোপাল হাজরা। কতো কাল পরে আবার সে মঞ্চে এসে হাজির হয়েছে।

ঘরে ঢুকে সন্দীপ বলেছিল—বোস, তোমার টাকা তুলে এনেছি—

তারপর আলমারি খুলে একটা প্যাকেট বার করে বিশাখার হাতে দিয়েছিল। বলেছিল—এই নাও টাকা—

—এতে কতো টাকা আছে?

সন্দীপ বলেছিল—এক লাখ—

বিশাখা প্যাকেটটা নিয়ে তার হাত-ব্যাগের মধ্যে রাখলে।

সন্দীপ বললে—টাকা গুণে নিলে না?

বিশাখা বললে—আগে কি কখনও গুনে নিয়েছি?

—আরো কতো টাকার দরকার বলো?

বিশাখা বললে—তা বলতে পারি না। মিস্টার হাজরা বলতে পারবেন।

—কেন? তিনি কে? তোমাদের কতো টাকা দরকার তা তিনি কী করে জানবেন?

বিশাখা বললে—বাঃ, তিনিই তো সব।

—তিনিই সব? তার মানে?

বিশাখা বললে—মিস্টার হাজরা তো আজকে সেই সব কথাই বলছিলেন। বলছিলেন আবার স্যাক্সবি-মুখার্জি কোম্পানির ফ্যাক্টরিটা খুলতে। আমার খুড়শ্বশুর মুক্তিপদ মুখার্জি এসেছিলেন। তিনি বললেন—ইন্দোরের ফ্যাক্টরিটা ভালো চলছে না। সে-ফ্যাক্টরিটা তুলে দিয়ে আবার এখানেই কারখানাটা চালু করবেন!

—কিন্তু আবার যদি ইউনিয়ন-বাজি হয়? আবার যদি ডি-এ-পি পার্টি আন্দোলন আরম্ভ করে?

বিশাখা বললে—মিস্টার হাজরা কথা দিয়েছেন, আর তাঁরা গোলমাল করবেন না। এবার আর স্ট্রাইক হবে না। আমার খুড়শ্বশুরও সব কথা শুনে খুশী হয়েছেন। তিনি বলেছেন—এখন ছোট করে আরম্ভ করবেন—

—তাতে তুমি সুখী হবে তো?

বিশাখা বললে—মনে তো হচ্ছে ছোটবাবুকে আমি ফেরাতে পারবো। এখনই তিনি হুইস্কির নেশা অনেকটা কমিয়ে দিয়েছেন। আমি তো সব সময়ে সঙ্গে থাকি, তাই নেশা অনেকটা কমে গেছে। এখন তিন পেগে নামিয়ে এনেছি। এখন রাতে সকাল সকাল বিছানায় শুইয়ে দিই—

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—অমন লোককে পোষ মানালে কি করে?

বিশাখা বললে—মানুষটা ভালো, জানো সন্দীপ। শুধু খারাপ সংগীদের সঙ্গে মিশে ওই রকম হয়ে গিয়েছিলেন। আজকাল আমি সব সময়ে ছোটবাবুকে চোখে চোখে রাখি। তবে......

—তবে কী?

—ভয় বিজলীকে নিয়ে!

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—কেন?

বিশাখা বললে—সে সব সময়ে সেজেগুজে ছোটবাবুর সামনে ঘোরাঘুরি করে। আমি কতোবার বারন করেছি তাকে, সে-যেন ছোটবাবুর সামনে না বেরোয়।

বলে দাঁড়িয়ে উঠলো। বললে—আমি যাই, এই তো আমি তোমার এখানে এসেছি, গিয়ে হয়তো দেখবো সে সেজেগুজে ছোটবাবুর ঘরের ভেতর ঢুকে গুজুর ফুসুর-ফুসুর করছে। তাকে নিয়েই আমার যতো জ্বালা!

সন্দীপ বললে—কেন! তার জন্যে তোমার অতো ভাবনা কেন? সে তো তোমার ছোট বোন হয়!

—তাহলে কী হবে? তার বাবা যে তাকে লেলিয়ে দেয়।

সন্দীপ অবাক। বললে—নিজের বাবা হয়ে নিজের মেয়েকে ছোটবাবুর দিকে লেলিয়ে দেয়? এটা তো ভাবা যায় না—

—আর শুধু কি লেলিয়ে দেয়? ছোটবাবুকে হাত করবার জন্যে মেয়েকে মদও খেতে বলে।

সন্দীপ আরো অবাক বললে—সত্যি বলছো? আমার তো বিশ্বাসই হয় না—

বিশাখা বললে—নিজের চোখে না দেখলে আমিও বিশ্বাস করতাম না। শুনলে আরো অবাক হবে, আমি যতোরকম ভাবে ছোটবাবুকে আগলে রাখছি, আর সুযোগ পেলেই বিজলী ততো ছোটবাবুকে মদ খাইয়ে মাতাল করে তুলতে চাইছে—

—বিজলী কোথা থেকে মদের টাকা পায়?

বিশাখা বললে—বাবার পেনশন থেকে যে ক'টা টাকা পায় তার থেকে।

—বাবার পেনশনের টাকা নিয়ে তোমাকে কিছু দেয় না?

বিশাখা বললে—না। অথচ আমি কাকার ওষুধের খরচা, দুজনের খাই-খরচা সবই যোগাচ্ছি। আজকালকার যুগে সে খরচটাও কি কম! আর আমার টাকা মানেই তো তোমার টাকা। আমি যে টাকা জমিয়ে ছোটবাবুকে দিয়ে আবার কারখানা চালু করাবো তারও উপায় নেই। ওদের দু'জনকে খাওয়াতে পরাতে আর কাকার চিকিৎসাতেই সব টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে। অথচ অসুস্থ কাকা, বাড়ি থেকে চলে যেতেও বলতে পারছি না।

সন্দীপ বললে—তোমার কাকাকে তো অনেকদিন ধরেই চিনি। বরাবরই দেখেছি ও'র টাকার ওপর বড়ো লোভ—

বিশাখা বললে—এখন এই অবস্থায় আমি কী করি বলো তো?

—কী আর করবে? মেজোবাবু যখন আবার বেলুড়ে কারখানা করতে রাজী হয়েছেন তখন আরো কিছুদিন সহ্য করে যাও।

বিশাখা বললে—এতদিন পরে মনে হচ্ছে কারখানাটা শেষ পর্যন্ত হবে!

—কেন মনে হচ্ছে?

বিশাখা বললে—মনে হচ্ছে এই জন্যে যে মিস্টার হাজরা নিজে কথা দিয়েছেন যে কারখানা খুললে আর কোনও লেবার-ট্রাবল হবে না। মিস্টার হাজরা তো ডি-এ-পি'র লীডার। ও'দের বরদা ঘোষাল শ্রীপতি মিশ্র সবাই কথা দিয়েছেন। মেজকর্তা তো সেই জন্যেই এসেছিলেন। তাঁর ইন্দোরের ফ্যাক্টরি আর চলছে না। তিনিও আবার কারখানাটা কলকাতাতেই আরম্ভ করে দিতে চান—সবাই তাঁকে কথা দিয়েছেন যে এবার তাঁরা আর কোনও গণ্ডগোল করবেন না—

তারপর একটু থেমে বললে—হ্যাঁ, একটা কথা, তুমি যে এই লাখ-লাখ টাকা দিচ্ছ এর

সব হিসেব রাখছো তো?

—হিসেব?

—হ্যাঁ, হিসেব।

সন্দীপ বললে—ও-কথা জিজ্ঞেস করছো কেন?

বিশাখা বললে—কারখানা খোলবার পর তো এ-সব ধার আমাদের শোধ করতে হবে!

সন্দীপ বললে—এ তো ধার নয়। আমি ধার বলে দিচ্ছি না এ-সব টাকা। তুমি তো জানো এ-পৃথিবীতে নিজের বলতে এক তুমি ছাড়া আর কেউ নেই। যাতে তোমার সুখ হয় তাতেই আমার সুখ।

—এত টাকা তুমি কি জমিয়ে রেখেছিলে এত দিন?

সন্দীপ হাসলো। বললে—এত টাকা নেওয়ার পর তুমি এই কথা আজ জিজ্ঞেস করছো? তুমি তো জানো আমার স্বভাব! আমি জীবনে কখনও টাকা চাইনি। চাইতো আমার মা। তা আজ মা-ই যখন নেই তখন কার জন্যে আর টাকা জমাবো?

বিশাখা বললে—আমার বিপদের সময়ে তুমি আমাকে যে দেখছো, এ-কথা যতোদিন আমি বাঁচবো ততোদিন আমি মনে রাখবো? কিন্তু তোমার যদি কখনও বিপদ হয় তখন কে দেখবে তোমাকে, তা কি কখনও ভেবেছ?

সন্দীপ বললে—যাদের সংসার আছে, যাদের পরিবার ছেলে-মেয়ে বউ আছে, তারা তা ভাববে। আমার কী আছে? আমার কে আছে?

এ-কথার জবাব বিশাখার মুখে হঠাৎ যোগালো না। সন্দীপ বললে—দেখ বিশাখা, আমাদের এই শরীরটার জন্যেই আমরা সবাই সব কিছু করি। আমরা জন্মাবার পর থেকে কেবল এই শরীরটা নিয়েই ভাবনা-চিন্তা করি, এই শরীরটা কী করলে বাঁচে, কী খেলে আমাদের জিভের তৃপ্তি হয়, কী পোশাক পরলে আমাদের শরীরটাকে ভালো দেখায়—এই সব কথাই সবাই ভাবি। কিন্তু এই শরীরটা কি সত্যিই অজয় অক্ষয় অমর? জীবন চলে গেলে কেউ এই শরীরটাকে ফেলে দেয় ভাগাড়ে, কেউ বা মাটির তলায় পুঁতে দেয়, আবার কেউ বা শ্মশানে নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে ফেলে। যেমন আমি মল্লিক কাকাকে পুড়িয়ে ফেলেছি, যেমন আমি তোমার মা'কে পুড়িয়ে ফেলেছি, যেমন আমার মা'কেও পুড়িয়ে ফেলেছি। কিন্তু শরীরটা ধ্বংস হলেও দয়া-মায়া, স্নেহ-ভালোবাসাও কি পুড়ে ছাই হয়ে যায়? তাঁরা কি সবাই আমার মন থেকে মুছে গেছেন?

বিশাখা কোনও উত্তর দিলো না।

—না, মুছে যাননি। মুছে যাবেনও না কখনও। আমি জানি একদিন আমি মারা গেলেও সবাই আমাকে শ্মশানে নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে ফেলবে। কিন্তু শরীরটা পুড়ে ছাই হয়ে গেলেও আমার মনের মধ্যে থেকে কি মুছে যাবে? যতোদিন আমার মনটা থাকবে, যতোদিন আমার আত্মা বেঁচে থাকবে ততোদিন আমি তোমার কথা ভাববো!

বিশাখা স্তম্ভিত হয়ে গেল সন্দীপের কথা শুনে। খানিকক্ষণের জন্যে কোনও কথা তার মুখ দিয়ে বেরোল না। তারপর বললে—আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি তোমার কথা শুনে। তুমি আমার কথা এত ভাবো?

সন্দীপ বললে—আমি তো পাথর নই, মানুষ। ভাববো না?

বিশাখার চোখ দিয়ে ঝর-ঝর করে জল গড়িয়ে পড়ছে। সন্দীপ বললে—আর দেরি করো না বিশাখা, তোমার অনেক দেরি করিয়ে দিয়েছি বাজে কথা বলে। আর তোমায় দেরি করিয়ে দেব না। ওদিকে ছোটবাবু বোধহয় ভাবছেন তোমার জন্যে। এবার এসো......

বিশাখা শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সন্দীপ চেয়ে দেখলো দেওয়ালে টাঙানো বিশাখার ছবিটার দিকে। তারপর বিছানার ওপর গা এলিয়ে দিলে। চোখের ওপর বিশাখার চেহারাটার ছবি জ্বলজ্বল করতে লাগলো। তারপর ঘরের আলোটা নিভিয়ে দিয়ে আবার শুয়ে পড়লো।

এই রকম ঘটনা কি একবার? বার বার সন্দীপের জীবনে এই রকম ঘটনা ঘটেছে।

হঠাৎ স্বপ্ন ভেঙে গেল। সন্দীপ দেখলে সে খিদিরপুরের রাস্তার ধারে একটা অশ্বত্থ গাছের তলায় একলা বসে আছে। তার নিজের থলিটা তার হাতে রয়েছে। তার পাশে আর একটা ঝোলা পড়ে আছে। ওটা কার?

মনে পড়ে গেল লোকটার নাম গণেশ সরকার। সন্দীপ তাকে পাঁচ টাকার একটা নোট দিয়েছিল খেতে। তেলেভাজার দোকান আর ঝুপড়ি থেকে তাকে উচ্ছেদ করা হয়েছিল।

কিন্তু খেতে কি এত সময় লাগে?

আরো অনেকক্ষণ সন্দীপ অপেক্ষা করতে লাগলো। কিন্তু কোথাও তার ফিরে আসবার কোনও রকম লক্ষণ নেই। কোথায় কোন হোটেলে খেতে গেছে গণেশ সরকার তাও জানা হয়নি।

কিন্তু সন্দীপ যদি চলে যায় তাহলে ঝোলাটা কোথায় রেখে দেবে? কাকে দিয়ে যাবে? তার ঠিকানা কী? ঝোলার ভেতরে যা-যা আছে তা এমন কিছু মূল্যবান নয়। লোহার হাতা-খুন্তি-সাঁড়াশী-হাতুড়ি ছাড়া আর কিছুই নেই। কিন্তু এ নিয়ে সে কী করবে?

প্রায় বিকেল হতে চললো অথচ লোকটার দেখা নেই। আশেপাশে এমন কেউ নেই যার কাছে ঝোলাটা বিশ্বাস করে সে দিয়ে যেতে পারে।

শেষকালে সন্দীপকে উঠতেই হলো। কারণ আরো অনেক জায়গায় যেতে হবে। পাঁচ নম্বর ভুবন গাঙ্গুলী লেনে বিশাখার বাড়ি যেতে হবে। সেখানে গিয়ে দেখতে হবে নব্বুই লাখ দিয়ে যার সুখ কিনতে চেয়েছিল, সেই বিশাখা সত্যিই সুখী হয়েছে কিনা।

আর তার আগে যেতে হবে বেলুড়ে। বেলুড়ের সেই স্যাক্সবি-মুখার্জি কোম্পানীর ফ্যাক্টরি কতো বড়ো হয়েছে তাও গিয়ে দেখতে হবে! গোপাল হাজরা যাদের সহায় তাদের আর ভয় কী? তারা তো বড়ো হবেই—

সন্দীপ উঠে দাঁড়ালো। উঠে দাঁড়িয়ে যতো দূর চোখ যায় ততো দূরে দেখতে লাগলো। কোথাও কোনও দিকেই সেই গণেশ সরকারের দেখা নেই।

শেষ পর্যন্ত সন্দীপ নিচু হয়ে নিজের থলিটা আর গণেশ সরকারের ঝোলাটাও নিয়ে নিলে। তারপর আরো অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো সেখানে চুপ করে। কই, গণেশ সরকার তো আসছে না। খেতে কি এতক্ষণ লাগে মানুষের।

অথচ এমন কেউ নেই যাকে সে ঝোলাটা দিয়ে যেতে পারে। চলতে চলতে একটা বাড়ির রোয়াকের ওপর একজন মানুষকে দেখতে পেলে। লোকটার সামনে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে—এখানে কোথাও হোটেল-টোটেল আছে ভাই?

লোকটা তো অবাক। হোটেল?

—আপনি হোটেলে যাবেন?

—হ্যাঁ, খাবার জন্যে নয়। একটা লোককে খুঁজতে।

লোকটা বললে—ওই গলিটা দিয়ে ঢুকে যান, দেখবেন একটা হোটেল আছে। সামনে সাইনবোর্ড টাঙানো আছে—

—ঠিক আছে—

বলে সন্দীপ লোকটার নির্দেশমতো গলিটাতে ঢুকলো। সত্যিই একটা বাড়ির দেয়ালে লেখা রয়েছে হোটেলের নাম। নাম দেখে ভেতরে ঢুকলো। একজন লোক সামনে কাঠের ক্যাশ-বাক্স নিয়ে বসে আছেন।

জিজ্ঞেস করলে—কী খাবেন আপনি?

সন্দীপ বললে—আমি খাবো না কিছু, একজন লোককে আমি খুঁজতে এসেছি। দেখতে এসেছি সে এখানে এসেছে কিনা—

—কী রকম চেহারা তার?

—কালো মতোন, রোগা, এই বছর পঁয়তাল্লিশ বয়েস হবে?

হোটেলওয়ালা বললে—লোকটা কি এই হোটেলে বরাবর খায়?

সন্দীপ বললে—তা বলতে পারবো না, তবে এখানে যে বড়ো-বাড়িটা ভাঙা হচ্ছে ওইখানে ঝুপড়ি বানিয়ে থাকতো আর তেলেভাজা বিক্রি করতো। সে এই ঝোলাটা আমার কাছে রেখে হোটেলে খেতে এসেছিল। তারপর আর আসছে না দেখে আমি তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি—

—না মশাই, ও-রকম কোনও লোক আমার এখানে খেতে আসেনি। তার নামটা কী বলতে পারেন?

সন্দীপ বললে—হ্যাঁ, গণেশ সরকার—

না। ও-রকম নামের কোনও লোক সে-হোটেলে খেতে এসেছে, এমন কোনও প্রমাণ পাওয়া গেল না।

সন্দীপ এদিক-ওদিক আরো কয়েকটা হোটেল খুঁজলো। কিন্তু কেউই তার কোনও হদিস দিতে পারলে না।

সবাই-ই বললে—না মশাই, এ তেলেভাজাওয়ালাদের খাবার হোটেল নয়, এখানে ভদ্রলোকেরা খেতে আসে—

শেষ পর্যন্ত সন্দীপ হতাশ হয়ে ঝোলাটা নিয়ে আবার রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো। তাকে এখন অনেক দূর বেলুড় যেতে হবে। বেলুড়ে গিয়ে দেখতে হবে সেই স্যাক্সবি-মুখার্জি কোম্পানীর ফ্যাক্টরিটা। দেখতে হবে, জানতে হবে কেমন চলছে তাদের ফ্যাক্টরিটা। তারপর দেখবে সৌম্যপদবাবুর বাড়িটা। দেখবে বিশাখার বাড়িটাই। দেখবে কতো সুখে আছে বিশাখা।

সন্দীপের নিজের দুরাবস্থার কথা কোনও দিন সে ভাবেনি। কিন্তু বিশাখা সুখী হোক, তার আবার স্বামী-সুখ হোক—এই কথাটাই সে কেবল সারা জীবন ভেবে এসেছে। যখনই তার মনে নিজের জন্যে কষ্ট হয়েছে তখনই সে ভেবেছে বিশাখার কথা। জেলখানার বন্দী-জীবনটা বিশাখাই পূর্ণ করে রেখেছিল বরাবর।

সেই রামপ্রসাদের গানটার কয়েকটা লাইন সে মনে মনে আওড়াতো। সেই কাশীবাবুদের বাড়ির লাইব্রেরীতে বসে পড়া বইটাঃ

মন কেন রে ভাবিস এতো
যেন মাতৃহীন বালকের মতো।
ভবে এসে ভাবছো বসে
কালের ভয়ে হয়ে ভীত
ওরে, কালেরও কাল যে মহাকাল
সে-কাল মায়ের পদানত..

সন্দীপ সেই গানের লাইনগুলো মনে মনে আওড়াতে-আওড়াতে সামনের রাস্তার দিকে পা বাড়ালো।

একদিন শ্রমিক-অশান্তির জন্যেই বেলুড়ের 'স্যাক্সবি-মুখার্জি' কোম্পানীর ফ্যাক্টরিটা কলকাতা থেকে উঠে ইন্দোরে চলে গিয়েছিল। তার জন্যে কারা দায়ী সে-প্রশ্নের উত্তর কোনও দিন মিলবেও না।

মাঝখান থেকে মুখার্জি-পরিবারে অনেক দুর্ভোগ নেমে এসেছিল। দেবীপদ মুখার্জি যে-ব্যবসা প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছিলেন, তা দ্বিতীয় পুরুষেই নিঃশেষ হয়ে গিয়ে-

ছিল। তার জন্যে দায়ী ছিল শ্রমিক-অশান্তি নয়। প্রধান দায়ী ছিল শ্রীপতি মিশ্র, বরদা ঘোষাল আর গোপাল হাজরাদের ডি-এ-পি পার্টি। সেই রাজনৈতিক কারণটাই ছিল তখন প্রধান। মুক্তিপদর মা-মণি যদি সৌম্যর সঙ্গে এ-সি চ্যাটার্জির এম. এ. পাশ করা মেয়ের বিয়ে দিতেন তাহলে সৌম্যপদকেও ফাঁসির আসামী হতে হতো না, ফ্যাক্টরিতেও লেবার ট্রাবল হতো না, আর সন্দীপকেও ব্যাঙ্ক থেকে নব্বই লাখ টাকা তছরুপ করার দায়ে জেল খাটতে হতো না। আর বিশাখার মা'কেও অকালে ক্যানসার রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ দিতে হতো না।

আসলে সমস্ত কিছুর মূলে ছিল বিশাখা। কেন, কোন অবস্থায়, কীভাবে সন্দীপের জীবনের মঞ্চে বিশাখার আবির্ভাব হয়েছিল তা সমস্ত তার জানা ছিল। সত্যিই তো দুঃখীর জন্যে যদি কারো মনে সমবেদনা না জাগে তো সে কি মানুষ!

আর সন্দীপ তো সারা জীবন মানুষ হতেই চেয়েছিল! মানুষ হওয়া মানে শুধু একটা চাকরি পাওয়া, সে-চাকরিতে উন্নতি করা, তারপর চাকরির শেষে ভালো মাসোহারা পেন্‌সন পাওয়া। তা সন্দীপ মেনে নেয়নি বলেই তার জীবনে এত দুঃখ, এত দুর্ভোগ।

কিন্তু সেই দুঃখটা কি সত্যিই দুঃখ? তার মধ্যে কি পরমার্থ নেই? সন্দীপ যদি বিশাখার দুঃখের কথা চিন্তা না করে নিজের সুখ-সুবিধে, নিজের স্বার্থ-চিন্তা করতো, তাহলেই কি সে মানুষ পদবাচ্য হতো?

বিশাখা প্রায়ই আসতো তার নেবু বাগানের বাড়িতে। বেশ রাত করেই আসতো।

বলতো—বার-বার তোমার কাছে টাকা চাইতে আমার খুব লজ্জা করে সন্দীপ, কিন্তু কী করবো বলো? আমি কিন্তু তোমার সব টাকা একদিন শোধ করে দেব, এই বলে রাখছি—

সন্দীপ বলতো—তোমাদের ফ্যাক্টরি যে এত বছর পরে আবার খুলেছে, এইটেই আমার কাছে একটা সুখবর—

বিশাখা বলতো—কিন্তু সবটাই তোমার জন্যে সম্ভব হলো, তা ছোটবাবুও স্বীকার করেছে—তা একদিন যে তুমি আমাদের বাড়ি যাবে বলেছিলে তার কী হলো?

—আমি যাবো? আমাকে যেতে বলছো তুমি? সত্যিই যেতে বলছো?

—সত্যি না তো কি মিথ্যে? তোমার সব পরিচয় আমি ছোটবাবুকে দিয়ে রেখেছি। তুমি গেলে ছোটবাবু খুব খুশি হবে, জানো—

বার-বার বলাতে সন্দীপ বলেছিল—আচ্ছা, আমি যাবো একদিন। এত করে তুমি যখন বলছো তখন আমি নিশ্চয় যাবো—

—কবে যাবে?

—সন্ধ্যেবেলা যাবো, না বিকেল বেলা অফিস ফেরৎ, কখন?

বিশাখা বলেছিল—যেদিন ফ্যাক্টরির ছুটি থাকে সেদিন গেলেই ভালো হয়—মঙ্গলবার ফ্যাক্টরির ছুটি—

সন্দীপ বলেছিল—তাহলে একদিন মঙ্গলবার দেখেই যাবো। অফিস থেকে ফেরার পথে—

—তাই যেও—

কিন্তু ব্যাঙ্কের কাজে অনেক ঝামেলা। 'ন্যাশনাল ইউনিয়ন ব্যাঙ্কে'র হেড অফিস বোম্বাইতে। সেখান থেকে যে সব চিঠিপত্র আসে তার জবাব তাড়াতাড়ি দিতে হয়। মান্থলি-স্টেটমেন্ট যাচ্ছে কিনা তা তদারক করতে হয়। কাজের শেষ নেই ম্যানেজারের, মাঝে-মাঝে পার্টিদের সঙ্গেও কথা বলতে হয়। কাজ কি কম! ব্যাঙ্কে যাতে ফিক্সড্-ডিপোজিট বাড়ে তার দিকে নজর দিতে হয়। সারা জীবনই কাজের মধ্যেই ডুবে থেকেছে সন্দীপ। সাংসারিক নানা ঝামেলার মধ্যেও ব্যাঙ্কের কাজে কখনও গাফিলতি করেনি সে। যখনই সময় পেয়েছে তখনই কাজে ডুবে থেকেছে। সন্দীপকে সবাই কাজ-পাগলা লোক বলতো। মাঝে মাঝে যখনই একটু ফুরসুৎ পেয়েছে নিজের চেম্বার ছেড়ে সেক্-

শানটা ঘুরে এসেছে। কোনও কাউণ্টারে যদি কখনও ভিড় দেখতো তো সেখানে গিয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

স্টাফরাও সন্দীপকে খুব ভয় করতো। শুধু ভয় নয়, তার সঙ্গে শ্রদ্ধাও করতো তারা। অফিসে কে ভালো মনোযোগী কর্মী আর কে-কে ফাঁকিবাজ, তা সব মুখস্থ ছিল সন্দীপের। কে নিয়ম করে দেরিতে অফিসে আসে আর কে-কে নিয়ম করে কাঁটায় কাঁটায় ঠিক সময়ে অফিসে হাজিরা দেয় তাও তার মুখস্থ ছিল। হাজিরা খাতাটা সময় পেরিয়ে গেলেই সন্দীপের কাছে চলে আসতো। কেউ দেরি করে এলে তাকে তার ঘরে এসে সেটাতে সই করতে হতো, পাশে সময় লিখে দিতে হতো। মানুষটাকে দেখেই সন্দীপ জিজ্ঞেস করতো--আজও লেট্?

মানুষটা আম্‌তা-আম্‌তা করে জবাব দিত—স্যার, ট্র্যাফিক জ্যামের জন্যে মাঝ-রাস্তায় আটকে গিয়েছিলুম—

সন্দীপ বলতো—বাড়ি থেকে একটু আগে বেরোন না কেন? যারা দূর থেকে আসে তারা তো দেরি করে আসে না। আপনি তো কলকাতায় থাকেন! আপনার কেন দেরি হয়?

তিন দিন লেট্ হলেই একদিনের ছুটি কাটা যায়। তবু কারো হুঁশ হয় না। যেদিন থেকে ব্যাঙ্ক সরকারী-নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে সেদিন থেকেই কাজে ঢিলেমি শুরু হয়েছে।

অথচ যখন ব্যাঙ্কিং-কারবারটা প্রাইভেট-সেক্টরে ছিল তখন লোকে নিয়ম করে অফিসে হাজির হতো, লোকের সব রকম সুখ-সুবিধে মিটতো। সে-সময়েও সন্দীপ ব্যাঙ্কে কাজ করেছে, আবার পরেও কাজ করছে। কিন্তু সমস্ত জিনিসের চেহারাটা বদলে গেছে। কিংবা হয়তো পৃথিবীটাই বদলে গিয়েছে তাই তাদের ব্যাঙ্কের কাজ-কর্মের চরিত্রটাও বদলে গেছে।

বছরে একদিনের জন্যে একটা সম্মেলন হয়। সেদিন গান-বাজনার ব্যবস্থা থাকে। তারপর থাকে কোনও একজনকে সম্বর্ধনা দেওয়ার ব্যবস্থা। ব্যাঙ্কের কোনও স্টাফকে কিংবা বাইরের কোনও খ্যাতনামা মানুষকে। তার সঙ্গে থাকে এলাহী খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা। সেটা কাজের দিন হলেও শনিবার দেখে ব্যবস্থাটা হয়, যাতে অফিসের পরেও সবাই থাকতে পারে!

ব্যাপারটা আরম্ভ করে দিয়েছিলেন সেই আগেকার ম্যানেজার করমচাঁদ মালব্য সাহেব। তিনি কতোদিন আগে রিটায়ার করে গেছেন কিন্তু তিনি চলে যাওয়ার পরেও চলে আসছে। সেদিন সবাই এসে ধরেছিল সন্দীপ লাহিড়ীকে। বলেছিল—এবার স্যার আপনাকে সম্বর্ধনা দেওয়ার ঠিক করেছি—

উত্তরে সবাই বলেছিল—আমাদের কমিটির মতে আপনার মতো এত অনেস্ট পাঙ্‌-চুয়াল ম্যানেজার আগে কখনও পাইনি আমরা—

শুনে সন্দীপ অবাক হয়ে গিয়েছিল। বলেছিল—এ-রকম করবেন না আপনারা। আমার এতে সায় নেই। শুনলে সবাই বলবে আমি এখানকার ম্যানেজার বলেই আপনারা আমাকে সম্বর্ধনা দিচ্ছেন। এটা একটা ব্যাড্ প্রিসিডেণ্ট হয়ে থাকবে।

সবাই বলেছিল—না স্যার, এখানে আমাদের ক্লাশ ফোর স্টাফরা পর্যন্ত সবাই আপনাকে রেস্‌পেক্ট করে। আমরা অনেক ম্যানেজার দেখেছি, কিন্তু মালব্যজী আর আপনার মতো অনেস্ট ম্যানেজার কেউ আর আগে দেখেনি—

আজ অবশ্য ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়! কিন্তু তার কয়েক বছর পরে?

যখন পুলিশ এসে তাকে গ্রেফতার করলে নব্বই লাখ টাকা তছরূপ করবার অপরাধে, তখন? তখন সেই তারাই আবার কী ভাবলে?

কিন্তু সে-কথা এখন থাক্। যথাসময়ে সে-সব বলা যাবে।

এখন মনে পড়ছে সেই দিনটার কথা। সেদিন মঙ্গলবার। মঙ্গলবার স্যাক্সাবি মুখার্জি কোম্পানীর বেলুড়ের ফ্যাক্টরির ছুটির দিন। ছুটির দিনে সৌম্যবাবু বাড়িতে থাকেন

সে-কথা বিশাখা আগেই জানিয়ে রেখেছিল।

কিন্তু সেই যাওয়া যে অতো মর্মান্তিক যাওয়া হবে তা কে জানতো?

মনে পড়তে লাগলো ব্যাঙ্কের সেই সম্বর্ধনায় তাকে দেওয়া মানপত্রে লেখা হয়েছিল, সে নাকি অত্যন্ত সৎ অত্যন্ত শ্রদ্ধেয়, অত্যন্ত কর্মঠ, অত্যন্ত সহৃদয়, অত্যন্ত নিরপেক্ষ। শুধু তাই-ই নয়, সে দয়ালু, সে আলস্য-বিমুখ পরোপকারী ম্যানেজার। এবং ব্যাঙ্কের অপরিহার্য অফিসার। এবং তার জন্যে তারা গর্বিত। সন্দীপ বলেছিল—আপনারা এ-সব কেন লিখেছেন? তারা বলেছিল—না স্যার, আপনি নিজেকে জানেন না বলেই এ-কথা বলছেন। আমরা তো আরো অনেকে ম্যানেজারকে দেখেছি, অনেক ম্যানেজারের আন্ডারে কাজ করেছি কিন্তু আপনার, মতো ম্যানেজারের সঙ্গে কাজ করে যে আনন্দ পেয়েছি তা আর কারো সঙ্গে কাজ করে পাইনে—

প্রথমে কেউ বুঝতেই পারেনি যে সন্দীপের মতো লোক বিনা নোটিশে পাঁচ নম্বর ভুবন গাঙ্গুলী লেনের বাড়িতে আসতে যাবে।

তাই ভেতর থেকে প্রশ্ন এলো—কে?

—আমি সন্দীপ লাহিড়ী!

আর তার উত্তরের সঙ্গে দরজাটা খুলে গেল। মঙ্গলা বোধহয় তারই নাম। মঙ্গলা ভেতর দিকে দৌড়ে গিয়ে ডাকলে—বউদিমণি, দেখবেন আসুন কে এসেছেন—

ভেতরে বোধহয় অনেক লোকজন ছিল তখন। সেখানেই বোধহয় ব্যস্ত ছিল সবাই। প্রথমেই বিশাখার বদলে এগিয়ে এল সেই অপেশ গাঙ্গুলীর মেয়ে বিজলীই। তার হাতে তখন খাবারের ট্রে, ট্রে'র ওপর কাটলেট। কাটলেট থেকে ধোঁওয়া উঠছে তখনও।

—ওমা, তুমি?

বাইরে একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকাতেই সন্দীপ বুঝে নিয়েছিল কোনও বিশেষ অতিথি বাড়িতে এসেছে। বিজলীর কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিশাখা দৌড়ে এসেছে। এসেই বললে—আমার কী সৌভাগ্য, এই এখ্খুনি তোমার কথা হচ্ছিল—

—আমার কথা?

বলতেই বিশাখা বিজলীর হাত থেকে কাটলেটের ট্রে-টা নিয়ে বললে—তোকে ও-ঘরে যেতে হবে না, তুই বরং মঙ্গলাকে একটু হেল্প করগে যা—

বলে সন্দীপকে বললে—আজ আমাদের কী সৌভাগ্য। এখ্খুনি তোমার কথা হচ্ছিল আর সঙ্গে সঙ্গে তুমি এসে গেলে—

—আমার কথা কী হচ্ছিল? কেন হচ্ছিল? কার সঙ্গে হচ্ছিল? কেউ এসেছে নাকি?

বিশাখা বললে—হ্যাঁ—

—কে এসেছে? আজ তো মঙ্গলবার। তোমাদের ফ্যাক্টরি তো মঙ্গলবার বন্ধ থাকে। তুমি তো মঙ্গলবার দেখেই আসতে বলেছিলে আমাকে!

বিশাখা বললে—মঙ্গলবার বলেই তো মিস্টার হাজরাকে আজ ছোটবাবু নেমন্তন্ন করেছিল—অন্যদিন তো সময় হয় না।

সন্দীপ অবাক! সে কিনা দেখে দেখে আজকেই ব্যাঙ্কের সব কাজ ফেলে রেখে এ-বাড়িতে এসে পড়েছে?

—চলো, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী ভাবছো?

সন্দীপ বললে—না, আজ তাহলে এসে ভুল করেছি, বরং অন্য একদিন মঙ্গলবার দেখে আসবো।

বিশাখা বললে—না না, আজকে ঠিক দিনেই এসেছ তুমি। তুমিও কিছু খেয়ে যাবে খন্। আর মিস্টার হাজরা তো তোমার ক্লাশ ফ্রেন্ড বলেছিলে। তোমরা তো একই গ্রামের মানুষ। উনিও তোমাকে দেখে খুশী হবেন। তোমার আর মিস্টার হাজরার সাহায্যেই তো ফ্যাক্টরিটা খুললো। চলো চলো, ডাইনিং-রুমে চলো। ওখানেই মিস্টার হাজরা

আছেন—

অনিচ্ছা সত্ত্বেও সন্দীপকে ডাইনিং-রুমের দিকে যেতে হলো। ঘরে ঢুকতেই গোপাল হাজরা অভ্যর্থনা জানালো হাত বাড়িয়ে, বললে—আরে তুই? তুই কী করে জানলি আমি আজ এই সময়ে এখানে এ-বাড়িতে আসবো?

সন্দীপ কিছু বলবার আগেই বিশাখা সৌম্যবাবুর দিকে চেয়ে বললে--এ কে জানো? এ হচ্ছে সেই সন্দীপ, সন্দীপ লাহিড়ী। যার কথা তোমাকে অনেকবার বলেছি। সন্দীপ এখন 'ন্যাশনাল ইউনিয়ন ব্যাঙ্কে'র ম্যানেজার। ইনি না থাকলে আমি উপোষ করতুম—

—কেন? কেন মিসেস মুখার্জি? গোপাল হাজরা জিজ্ঞেস করলে।

—ইনিই তো আমাকে টাকা সাপ্লাই করলেন। যা-কিছু প্রপার্টির ভাগ আমি পেয়েছিলুম তার সবই তো এই বাড়ি কিনতে বেরিয়ে গেল, আর সবটাই ঠকিয়ে নিলে হামিদ।

—হামিদ কে?

বিশাখা বললে—সে একজন দালাল! জেলখানার দালাল! আমিও তাকে বিশ্বাস করে কখনও পঞ্চাশ হাজার, কখনও সত্তর হাজার টাকা দিয়ে দিয়ে একেবারে ফতুর হয়ে গেলাম।

গোপাল হাজরা বললে—তার মানে?

সৌম্যপদ বললে—অথচ আমি কিছুই জানি না মিস্টার হাজরা। বিশাখা বিশ্বাস করে তাকে লাখ-লাখ টাকা দিয়েছে! বলে দিয়েছে আমার যেন কোনও কষ্ট না হয়। কিন্তু আমি যে সে-ক'বছর কী কষ্টে কাটিয়েছি তা আমিই জানি—

মিস্টার হাজরা বললে—সেই সব টাকা সাপ্লাই করেছে কি এই সন্দীপ?

তারপর সন্দীপের দিকে চেয়ে বললে—তুই টাকা সাপ্লাই করেছিস?

সন্দীপ মুখে 'হ্যাঁ' 'না' কিছু বললে না। চুপ করে রইল।

সৌম্যপদ গোপাল হাজরাকে জিজ্ঞেস করলে—আপনি এ'কে চেনেন মিস্টার হাজরা? আপনি কী করে চিনলেন?

গোপাল হাজরা বললে—আমি চিনবো না? একই গ্রামে তো আমাদের দু'জনের বাড়ি ছোটবেলায় এক সঙ্গে একই ক্লাসে তো আমরা পড়েছি—

সৌম্যপদ সন্দীপের দিকে চেয়ে বললে—আপনি দাঁড়িয়ে আছেন কেন, বসুন সন্দীপবাবু। বিশাখা আপনার সম্বন্ধে আমাকে সবই বলেছে। কী খাবেন বলুন? হুইস্কি, না রাম? আপনি সন্ধ্যেবেলা কোন্‌টা খান?

বিশাখা বাধা দিয়ে বলে উঠলো—ওকে কিছু খেতে বোল না, ও ও-সব কিছুই খায় না!

গোপাল হাজরাও বলে উঠলো—না না, ও গুড্ বয়, ও ও-সব কিছুই ছোঁয় না।

তারপর সন্দীপকে জিজ্ঞেস করলে—কী রে, তুই এখন ন্যাশনাল ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের ম্যানেজার হয়েছিস? কোন্ ব্র্যাঞ্চ-এর?

বিশাখা বললে—বড়োবাজার ব্র্যাঞ্চের!

গোপাল হাজরা বললে—ওরে বাব্বা! ওটাই তো ওদের সব চেয়ে বড়ো ব্র্যাঞ্চ রে। ও ব্র্যাঞ্চের এ্যাসেট্ কতো এখন?

সন্দীপ কিছু জবাব দেওয়ার আগেই হঠাৎ বিজলী আর একটা ট্রেতে তিনটে কাটলেট নিয়ে ঘরে ঢুকেছে। তাকে দেখেই বিশাখা যেন ক্ষেপে উঠলো। বললে—আবার এসেছিস এ-ঘরে? বলেছি না যে মঙ্গলাকে দিয়ে পাঠিয়ে দিবি! যা এখান থেকে—যা তুই—

বলে কাটলেটের ট্রে-টা নিয়ে তাকে ঠেলে বাইরে বার করে দিলে। সন্দীপ বিজলীর দিকে চেয়ে দেখে অবাক! সেই বিজলী এই বিজলী হয়েছে এখন! মুখে স্নো-ক্রীম পাউডার কিছু একটা মেখেছে নিশ্চয়ই, নইলে তাকে অতো সুন্দরী দেখাচ্ছে কেন?

—জানেন মিস্টার মুখার্জি, এই সন্দীপ আর আমি ছোটবেলায় একই ক্লাশে পড়তুম।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ, তারপর আমি লেখা-পড়া ছেড়ে কলকাতায় এসে পলিটিকস্-এ ঢুকলুম, আর ও গ্রামেই রয়ে গেল। তার বহু বছর পরে একদিন কলকাতার রাস্তায় দেখা। তখন ওর মুখ থেকেই শুনলুম ও নাকি আপনাদের বিডন স্ট্রীটের বাড়িতে থেকে কলেজে পড়ে। আরে, কলেজে পড়ে বি. এ এম. এ পাশ করলেই যদি লোকে মানুষ হতো তাহলে আজকাল তো সবাইই মানুষ! আমি ওকে বলেছিলুম আমার সঙ্গে পলিটিকস্-এ আসতে, কিন্তু ও রাজী হয়নি। পলিটিকস্-এ এলে ওকে তাহলে আর এখন পরের চাকরি করে পেট চালাতে হতো না!

হঠাৎ বিশাখা কথার মাঝখানে বললে—না মিস্টার হাজরা সন্দীপ ছিল বলেই আমরা এখনও বেঁচে আছি, সন্দীপ ছিল বলেই মিস্টার মুখার্জি জেল থেকে এত তাড়াতাড়ি ছাড়া পেলেন, সন্দীপ ছিল বলেই আমাদের 'স্যাকসবি মুখার্জি' কোম্পানীর ফ্যাক্টরি এত বছর পরে আবার খুললো—এ-সব কথা বাইরের আর কেউ না-জানলেও আমি নিজে তো জানি!

গোপাল হাজরা বললে—কিন্তু আমাদের হেল্প না পেলে কি আপনাদের ফ্যাক্টরি খুলতো? আমাদের ডি-এ-পি পার্টি হেল্প্?

তারপর একটু থেমে আবার বললে—শুধু টাকার কথাই বা বলছেন কেন? শুধু টাকা দিলেই কি ব্যাবসা চলে? ট্যাক্ট চাই না? সন্দীপের কী সেই ট্যাক্ট জানা আছে? আমি তোকে বলিনি সন্দীপ যে তুই আমাদের পার্টিতে জয়েন্ কর? বলিনি? তুই কতো মাইনে পাস? কতো মাইনে পাস তুই ব্যাঙ্কের ম্যানেজার হয়ে? দশ হাজার? বারো হাজার? কুড়ি হাজার? তার চেয়ে বেশি নয় নিশ্চয়? আর আমার মাসে কতো আয় জানিস? আমার কথা ছেড়ে দে, আমাদের পার্টি-সেক্রেটারি বরদা ঘোষালের কতো আয় কল্পনা করতে পারিস? আচ্ছা আয়ের কথা না-হয় ছেড়েই দে। তিরিশটা ফ্যাক্টরির ইউনিয়ন মিস্টার ঘোষালের কনট্রোলে। মিস্টার ঘোষালের প্রতিদিন গাড়ির পেট্রোল খরচ কতো বল্ দিকিনি? কতো লিটার? একটু আন্দাজ কর?

সন্দীপের এ-সব আলোচনা ভালো লাগছিল না। সে যদি জানতো যে গোপাল হাজরা আজ এখানে আসবে তাহলে কি সে এ-বাড়িতে আসতো?

গোপাল হাজরা বললে—আন্দাজ করতে পারলি না তো? তবে শুনে রাখ্, মিস্টার ঘোষালের আয় মাসে পঞ্চাশ হাজার টাকার কম নয়। আর আমার?

ব্যাপারটা অন্য দিকে গড়াচ্ছে দেখে সন্দীপ বললে—আমি এখন উঠি ভাই, আমার বাড়িতে যেতে অনেক দেরি হয়ে যাবে। আমি অফিস থেকে সোজা আসছি...উঠি—

বিশাখা আর বাধা দিলে না। শুধু বললে—তুমি কিছু খেলে না, চলে যাচ্ছো না খেয়ে—

সৌম্যপদও বললে—এক পেগ খেয়ে যাও না ভাই...অন্তত একটা কাটলেট...

সন্দীপ তখন প্রায় উঠে দাঁড়িয়েছে। বললে—না, মিস্টার মুখার্জি, এখন খেলে বাড়িতে আমার খাবার নষ্ট হবে। আমি যাচ্ছি...

গোপাল হাজরাও বললে—না না, ওকে খেতে বলবেন না মিস্টার মুখার্জি, ও পেট-রোগা লোক, ওর মতোন লোকের পেটে অমৃত হজম হবে না। ওকে যেতে দিন—

তারপরেই আবার বললে—হ্যাঁরে, তুই বিয়ে করলি, আমাকে তো খবর দিলি না—

সন্দীপ বলতে-যাচ্ছিল—একজন লোকের কতোবার বিয়ে হয়?

কিন্তু বলবার আগেই বিশাখা বললে—কে বললে সন্দীপ বিয়ে করেছে? আপনাকে কে বললে সন্দীপের বিয়ে হয়েছে? ও তো বিয়ে করেনি—

গোপাল হাজরা বললে—বিয়ে করিসনি? তাহলে অতো হাজার টাকা মাইনের চাকরি করিস তো তোর টাকা কে খায়? জমাস্ বুঝি?

—না—

—তাহলে অতো টাকা নিয়ে করিস কী? কলকাতায় প্রপার্টি কিনেছিস?

সন্দীপ বললে—না, তাও না—

—তাহলে? বেড়াপোতাতে তো তোদের নিজেদের বাড়ি ছিল একটা, সেটা কী করলি?

—সেটা বিক্রি করে দিয়েছি—

গোপাল হাজরা জিজ্ঞেস করলে—তাহলে কলকাতায় কোথায় আছিস? ব্যাংকের কোয়ার্টারে?

—না, কলকাতায় ঘর-ভাড়া করে আছি।

—গোপাল হাজরা বললে—তুই বিয়েও করলি না, বাড়িও করলি না, তোর এত টাকা কে খাবে রে? তা গাড়ি কিনেছিস?

—না।

গোপাল হাজরা বললে—তাহলে বাসে-ট্রামে অফিসে যাতায়াত করিস?

সন্দীপ চলে যেতে গিয়েও যেতে পারছে না। গোপাল হাজরার একটার পর একটা প্রশ্ন। প্রশ্নগুলোর কী জবাব দেবে তা সে বুঝতে পারবার আগেই বিজলী হঠাৎ ঘরে ঢুকলো। বললে—বিশাখাদি, বাবা একবার সন্দীপকে ডাকছেন—

সন্দীপ যেন বেঁচে গেল বিজলীর আবির্ভাবে। বললে—চলো, তপেশবাবু কোথায়? কোন্ ঘরে?

বিজলী বললে—আসুন, আসুন আমার সঙ্গে—

সন্দীপ পেছনে-পেছনে গিয়ে একটা ঘরে ঢুকলো। বিশাখাও চললো। বিছানার ওপর ময়লা চাদর, ময়লা বালিশ। সন্দীপকে দেখেই উঠে বসবার চেষ্টা করতে লাগলো।

সন্দীপ বললে—উঠবেন না, উঠবেন না, শুয়ে থাকুন—

বলে একেবারে তপেশ গাঙ্গুলীর বিছানার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো।

তপেশ গাঙ্গুলী বললেন—দেখছো তো ভায়া আমার অবস্থা, আমি আর বেশি দিন নেই। তুমি আমার একটা গতি করো—

সন্দীপ বললে—আপনি ভালো হয়ে যাবেন, অতো ভাবছেন কেন?

তপেশ গাঙ্গুলী বললেন—ভাবি কি সাধে বাবা, সারা দিন রাতই কেবল এই সব কথাই ভাবি। তোমার গলা শুনতে পেয়েই তোমাকে ডাকলুম। আমি চলে গেলে দুঃখ নেই! ভাবনা শুধু বিজলীর জন্যে। তার একটা কিছু গতি করে যেতে পারলুম না।

সন্দীপ এ-কথায় কী আর সান্ত্বনা দেবে। মামুলি একটা সান্ত্বনা দিতে হয় তাই বললে—ভগবানের ওপর ভরসা রাখুন, সব ঠিক হয়ে যাবে—

—ভগবান?

'ভগবান' শব্দটা শুনেই একেবারে ক্ষেপে উঠলো তপেশ গাঙ্গুলী। বললে—কী বললে? ভগবান? ভগবান বলে যদি কিছু থাকতো তো আমার এই দুর্দশা হতো? ব্যাটা ভগবানকে পেলে একবার জিজ্ঞেস করতুম, এত লোকের মেয়ের বিয়ে হয় আর আমার মেয়ের কেন বিয়ে হলো না? আমি কী অপরাধ করেছি?

বলে খানিকক্ষণ হাঁপাতে লাগলো। তারপর আবার বলতে লাগলো—কেন এমন হলো বলো তো ভায়া? আমি কী অপরাধ করেছি? দেখ না বিশাখার বিয়ে হয়ে গেল এক ফাঁসির আসামীর সঙ্গে আর সেই ফাঁসির আসামী জেল থেকে খালাস পেয়ে আবার সংসার করতে আরম্ভ করলে। তাদের ফ্যাক্টরি আবার খুলে গেল। তাদের কোথা থেকে কে আবার টাকার যোগান দিলে আর সঙ্গে সঙ্গে বিশাখার জীবনও কেমন সুখের হয়ে উঠলো। আর আমার বিজলী, বিজলীর দশা দেখছো, নিজের জাড়তুতো বোনের বাড়ির ঝি-গিরি করে মরছে? আর আমিও শেষ জীবনে এই নিজের ভাইঝি-জামাইএর বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে রোগে ভুগছি। আবার পেনসনটা আছে বলে তবু দু'মুঠো খেতে পাচ্ছি, কিন্তু আমি মরে গেলে পেনসন্ বন্ধ হয়ে যাবে তখন ওই মেয়ের কী হবে...

বলতে বলতে আর বলতে পারলে না। কান্নায় কথা আটকে গেল।

সন্দীপ বাধা দিয়ে বললে—আপনি থামুন, আর বলতে হবে না...থামুন,

তপেশ গাঙ্গুলী বলতে লাগলো—কেন থামবো? এখন যদি না বলি তো কখন বলবো, কাকে বলবো? আমার এই দুর্দশার কথা কে শুনবে? বিশাখা শুনবে? তার কি শোনবার সময় আছে এখন? সে তো আমার জামাইকে সামলাতেই ব্যস্ত। আমি তো দেখতে পাই না কিছু, এই ঘরে শুয়ে পড়ে আছি। কিন্তু কানে তো সব আসে। ও-ঘরে মদ খাওয়া চলছে তাও বুঝতে-পারছি। কিন্তু বিজলী? আমার বিজলী? সে তো এ-বাড়ির ঝি। সে এ-বাড়িতে ঝি-এর কাজ করতেই ব্যস্ত। কিন্তু তার দুঃখ কে বুঝবে? আমাকে সে কিছু মুখে বলে না বটে, কিন্তু বাপ হয়ে আমি তো সব বুঝতে পারি। আমার মরণ কেন হয় না বলতে পারো? বিজলীর বিয়ে হয় না কেন বলতে পারো?...

সন্দীপ তখনও দাঁড়িয়ে সব শুনছিল। সান্ত্বনা দেওয়া ছাড়া আর কী করতে পারে সে? বললে—আপনি কেঁদে কী করবেন? মনকে শক্ত করুন—

—মনকে শক্ত করতে বলছো তুমি? কেন, তোমার হাতে উপায় নেই? তুমিই তো আমাকে উদ্ধার করতে পারো। তুমি বিজলীকে বিয়ে করতে পারো না? আমাকে এই কষ্ট থেকে উদ্ধার করতে পারো না? এই একটা উপকার করে আমাকে বাঁচাতে পারো না?

সন্দীপ কী জবাব দেবে এ-কথার?

বললে—আমি তো একবার বিয়ে করেছি তপেশবাবু, মানুষ কি দু'বার বিয়ে করে?

—কোথায় বিয়ে করলে? কবে? প্রথম বারের বিয়েতে তো তোমার বাধা পড়লো। সে-সব তো আমি জানি! এখন বিয়ে করতে তোমার আপত্তি কী?

হঠাৎ ভেতর থেকে সৌম্যবাবুর গম্ভীর গলার ডাক এলো—বিজলী, বিজলী কোথায় গেল?

বিজলী দৌড়ে ভেতর দিকে যাচ্ছিলো, কিন্তু বিশাখা বাধা দিয়ে বললে—তুই থাম, আমি যাচ্ছি—

বলে ভেতরে চলে গেল।

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—দেখলে তো ভায়া, তুমি নিজের চোখেই তো সব দেখলে। আমার মেয়েকে ছোটবাবু ডাকলে আর বিশাখা তাকে যেতে না দিয়ে নিজে গেল। ছোট-বাবুর কাছে বিশাখা কিছুতেই আমার বিজলীকে যেতে দেবে না, আমার বিজলীর ওপরেই বিশাখার যতো রাগ—

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—কেন? রাগ কেন?

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—রাগ হবে না?

—কেন? রাগ হবে কেন?

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—বিজলী যে বিশাখার চেয়ে সুন্দরী! তাই বিশাখা চায় না যে বিজলী থাকুক এ-বাড়িতে। চায় না যে বিজলী ছোটবাবুর সামনে সেজে-গুজে বেরোক। বিজলী সাজলে-গুজলে বিশাখা বকে।...আমি যে কী বিপদে পড়েছি তা কী বলবো। মেয়েটার জন্যে ভেবে ভেবে আমি আরো দুর্বল হয়ে পড়েছি। কী করা যায় বলো তো? আমি যখন মরে যাবো তখন বিজলীর কী হবে, বলো তো? তুমি তো তোমার নিজের চোখেই সব দেখলে? তুমি বিজলীকে বিয়ে করো ভায়া। আমি শুনেছি তুমি বিশাখাকে অনেক টাকা যুগিয়েছ। তোমার টাকা দশ ভূতে লুটে পুটে খাচ্ছে, তোমার সব টাকা মদের পেছনে ঢালছে। তোমার বউ ছেলে মেয়ে কেউ নেই জেনে সেই টাকা বিশাখা যাকে তাকে ডেকে বিলোচ্ছে। আজ তো তুমি নিজের চোখে সব দেখে গেলে। অথচ বিজলীকে বিয়ে করলে তোমার টাকাগুলো এমনি করে নয়-ছয় হতো না। একজন অনাথা মেয়ের উপকারে লাগতো। এই বুড়ো লোকের কথা এখন তোমার শুনতে ভালো লাগবে না জানি। কিন্তু একদিন যখন আমার মতো তোমার বয়স হবে, তখন বুঝবে। তখন আমার মতো তোমাকেও দেখবার কেউ থাকবে না—

সন্দীপ এবার বললে—আমি এবার আসি তপেশবাবু, আমি অফিস থেকে সোজা

এখানে এসেছি, বড্ড দেরি হয়ে গেল। পারলে আর একদিন আসবো—

বলে সোজা ঘর থেকে বেরিয়ে আসছিল। পাশের ঘর থেকে তখনও মদের গন্ধ আর গোপাল হাজরার গলার আওয়াজ কানে আসছে।

সন্দীপ রান্নাঘরের দিকে মুখ করে ডাকলে—মঙ্গলা—এই মঙ্গলা—

মঙ্গলার বদলে সামনে এলো বিশাখা। বললে—তুমি যাচ্ছো?

সন্দীপ বললে—হ্যাঁ—

বিশাখা বললো—তুমি এমন দিনে এলে যেদিন মিস্টার হাজরা এসে পড়েছেন—

—গোপাল হাজরা আসবে জানলে আমি আসতুম না।

বিশাখা বললে—এত দিন পরে তুমি এলে, তোমার সঙ্গে ভালো করে কথাও বলতে পারলুম না। আমি ছোটবাবুকে সামলাতেই কেবল সমস্তক্ষণ কাছে ছিলুম। যদি একটু সামনে থেকে সরে যাই, তখুনি আবার খেতে চাইবেন—

কথা বলতে বলতেই ঘরের ভেতর থেকে ডাক এলো—কই বিজলী, বিজলী কোথায় গেলি? আর এক পেগ করে দিয়ে যা না—

বিজলী সঙ্গে সঙ্গে বোতল আনতে ছুটছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিশাখা তাকে বাধা দিলে। বললে—তুই যা, তোকে যেতে হবে না, আমি যাচ্ছি—

বলে সন্দীপকে বললে—তুমি একটু দাঁড়াও, যেও না, আমি এখুনি আসছি—

সন্দীপ দাঁড়িয়ে রইলো সেখানেই। তার কানে আসতে লাগলো সব কথা। বিশাখা ঘরের ভেতরে ঢুকে বললে—আর তো মদ নেই—

সৌম্যবাবু অবাক হয়ে গেল শুনে। বললে—আর নেই? তার মানে?

বিশাখা বললে—না, আর নেই। আবার কিনে আনতে হবে—

—তা মঙ্গলাকে পাঠাও না, কিনে আনতে!

বিশাখা বললে—এখন যে দোকান বন্ধ হয়ে গেছে, কী করে আনবে?

সৌম্যবাবু বললে—আজ মিস্টার হাজরা এসেছেন আর আজকেই মদ ফুরিয়ে গেল?

বিশাখা গোপাল হাজরার দিকে চেয়ে বললে—মিস্টার হাজরা আপনি একটু বুঝিয়ে বলুন না মিস্টার মুখার্জিকে। ডাক্তার ওঁকে বেশি খেতে বারণ করেছে। দু'পেগ কি বড়জোর তিন পেগের বেশি কিছুতেই চলবে না—

গোপাল হাজরাও বললে—হ্যাঁ হ্যাঁ, ডাক্তার যখন বলেছে তখন আর বেশি খাওয়া উচিত নয়। আমারও আজ যথেষ্ট খাওয়া হয়ে গিয়েছে। আর থাক আজকে—

বিশাখা আর বেশিক্ষণ দাঁড়ালো না সেখানে। কথা শেষ করেই বাইরে সন্দীপের কাছে এলো। বললে—শুনতে পেলে তো? সব সময়েই ওই রকম। এত বছর না খেয়ে খেয়ে কোথায় নেশাটা কেটে যাবে, তা নয়। নেশা আরো বেড়ে গেছে। তোমাকে আর কী বলবো, জীবনে একটা দিনের জন্যেও শান্তি পেলাম না। এখন দেখছি সেই ছোটবেলাটাই বেশ ছিল।

সন্দীপ বললে—তাহলে আসি এবার—

—আবার আসবে তো?

—আসবো।

—আর একটা মঙ্গলবার এসো। শুনছি ফ্যাক্টরি থেকে আমাদের জন্যে আর একটা বাড়ি তৈরি হবে!

সন্দীপ বললে—সে কী? তোমরা এ-বাড়িতে থাকবে না?

বিশাখা বললে—ছোটবাবুর এ-বাড়ি আর ভালো লাগছে না।

—কেন?

—এ-বাড়িটা তো ছোট। মেজকর্তা তো এখন কলকাতায় এসে আবার বেলুড়ে তাঁর নিজের বাড়িতে উঠেছেন, তাই ছোটবাবুর জন্যেও কোথাও একটা বড়ো বাড়ি চাই। এ-বাড়িতে থাকলে নাকি তাঁর ইজ্জৎ থাকছে না—

—কেন?

বিশাখা বললে—ওই বলে কে? এ-বাড়িতে ভালো ড্রয়িংরুম নেই, এ-বাড়িতে ভালো ডাইনিং-রুম নেই, এ-বাড়িতে পার্লার নেই, ভিজিটার্স ওয়েটিং-রুম নেই। এ-বাড়িতে কাউকে ইনভাইট করবার মতো, থাকতে দেবার মতো ব্যবস্থা নেই, যা মেজকর্তার বাড়িতে আছে। এখান থেকে নাইট-ক্লাবে যেতে বড্ড সময় লাগে!

সন্দীপ বললে—সে-বাড়ি কিনতে তো কয়েক লাখ টাকা লাগবে। মিছি-মিছি খরচ বাড়িয়ে লাভ কী?

—ওই যে ইজ্জতের প্রশ্ন। ছোটবাবুও তো কোম্পানীর একজন পুরো-দস্তুর ডাই-রেকটার। তার পক্ষে কি এই ছোট বাড়ি মানায়? যাক, যা হবার তো হবে! সেই সব কথাই তো হচ্ছিল এতক্ষণ মিস্টার হাজরার সঙ্গে। মিস্টার হাজরারও ইচ্ছে যে ছোটবাবুরও ঠিক মেজকর্তার মতো একটা বড়ো বাড়ি হোক, আরও একটা গাড়ি হোক?

সন্দীপ বললে—কেন এই ঝামেলা বাড়াতে চাইছেন ছোটবাবু?

—এই দেখ না আমি এই বাড়িটা তখন কিনেছিলুম আড়াই লাখ টাকা দিয়ে। তখন ভেবেছিলুম এখানে আমাদের বেশ কুলিয়ে যাবে। কিন্তু কোথা থেকে আমার কাকা বিজলীকে নিয়ে এসে জুটলো আর দুজনেই আমার কাঁধে চেপে বসলো। এখন অসুখে ভুগছে আর যাতে বিজলীকে ছোটবাবুর সামনে ভিড়িয়ে দিতে পারে কেবল সেই চেষ্টা করছে!

সন্দীপ বললে—ছোটবাবু তাতে ভুলছেন?

—ভুলবেন না? কী বলছো তুমি? মদের ওপর আর মেয়েমানুষের ওপর ওঁর লোভ সেই আগেকার মতোই আছে। শুধু আমি আছি বলে একটু সামলে আছেন, নইলে কী যে হতো তা ভাবলেই আমার ভয় হয়!

সন্দীপ বললে—তুমি এ-বাড়ি ছেড়ো না—ছোট বাড়িই ভালো। সব দিকটা দেখা-শোনা যায়। বড়ো বাড়ি হলে কোথায় কী ঘটছে তা দেখা সম্ভব নয়।

—ওই যে বললাম, ইজ্জৎ। তুমি আসার আগে মিস্টার হাজরা তো ছোটবাবুকে সেই ভুজুং-ই দিচ্ছিলেন।

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—তাতে গোপাল হাজরার কী স্বার্থ?

—বা, তা বুঝি জানো না! বড়ো বাড়ি যদি ফ্যাক্টরি বানিয়ে দেয়, তাহলে মিস্টার হাজরারই তো লাভ?

—কী লাভ?

বিশাখা বললে—লাভ নেই? লাভ ছাড়া মিস্টার হাজরা কি অন্য কোনও কথা ভাবে? বাড়ি কিনতে যতো লাখ টাকা লাগবে মিস্টার হাজরার তো ততো পার্সেন্ট কমিশন পাওনা হবে। মিস্টার হাজরার কি শুধু লেবার নিয়ে কারবার? আরো কতো কারবার আছে তা জানো?

সন্দীপ বললে—হ্যাঁ, জানি...

সন্দীপ আগে জানতো না। কিন্তু পরে সবই জেনেছে। এককালে নেশা করবার পিল-এর ব্যবসা করতো। তার জন্যে সারা রাত ঘুরে-ঘুরে রাস্তার মোড়ে-মোড়ে পুলিশদের ঘুষ দিয়ে বেড়াতো। তারপর 'আইডিয়াল ফুড প্রোডাক্টস' কোম্পানী করেছিল। তারপর কলকাতার ছেলে মেয়েদের অবাধ মেলামেশার সুবিধে দেওয়ার জন্যে ফ্রী-স্কুল স্ট্রীটের একটা বাড়িতে আড্ডা দেওয়ার জায়গা করে দিয়েছিল। সেখানেও ঘটনাক্রমে এই বিশাখাই একদিন গিয়ে পড়েছিল। তারপর কে না আটকে পড়েছে সেখানে? মেজকর্তার মেয়ে পিক্‌নিকও সেখানে দিনের পর দিন গিয়ে জুটতো। সে-সব কী দিনই না গেছে বিশাখা-সন্দীপের জীবনে! সেই গোপাল হাজরারাই একদিন লেবারদের ক্ষেপিয়ে দিয়ে স্ট্রাইক করিয়ে 'স্যাক্সবি-মুখার্জি' কোম্পানীর গেট বন্ধ করিয়ে দিয়েছিল, ইন্দোরে চলে গিয়েছিল ফ্যাক্টরি। আবার এই গোপাল হাজরারাই ফ্যাক্টরিকে কলকাতায় আনিয়ে নিজেরা

টাকা উপায়ের নতুন রাস্তা বার করে নিয়েছে। আবার সেই হাজরারাই সৌম্যপদকে নতুন বাড়ি কেনবার মতলব দিচ্ছে—

—কী কথা বলছো না যে?

সন্দীপ বললে—তাই ভাবছি—

—কী ভাবছো?

সন্দীপ বললে—গোপাল হাজরাদের হাত থেকে দেখছি তোমরা কিছুতেই মুক্তি পেলে না। তোমার মনে আছে, ধর্মতলার 'আইডিয়াল ফুড প্রোডাক্টস' কোম্পানীর কথা? যেখানে তুমি চাকরি পেয়েছিলে? তারপর ফ্রী-স্কুল স্ট্রীটের সেই আন্টির কথা? ওয়েলিংটন স্ট্রীটের মোড়ে তুমি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলে? তুমি নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়াতে মাসিমার কাছ থেকে তোমার ফোটো চেয়ে নিয়ে কাগজে ছাপাবার জন্যে দিয়েছিলাম? সে-সব কথা মনে আছে? তোমার ফোটো দেখে ঠাকমা-মণির গুরুদেব কী ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন?

—সেই ফোটোটাই বুঝি তুমি তোমার ঘরে টাঙিয়ে রেখেছো?

—হ্যাঁ। তোমার সে-সব কথা মনে না থাকতে পারে, কিন্তু আমার সব মনে আছে বিশাখা! আমি কিছু ভুলতে পারি না। আমার সব মনে থাকে!

বিশাখা বললে—আমারও সব মনে থাকে!

—তোমার মনে থাকলে আজকে গোপাল হাজরাকে বাড়িতে ডেকে এত খাতির করতে না, এত দামী মদও খাওয়াতে না—

বিশাখা বললে—কী করবো বলো, মিস্টার হাজরাই তো আবার আমাদের ফ্যাক্টরিটা খুলিয়ে দিলে! মিস্টার হাজরা না থাকলে কি এই ফ্যাক্টরি খুলতো? ছোটবাবুর ভবিষ্যৎ ভেবেই তো আবার তাকে বাড়িতে নেমন্তন্ন করতে হয়েছে।

—তোমার খুড়-শ্বশুর, মুক্তিপদবাবুও তো কলকাতায় এসেছেন?

বিশাখা বললে—হ্যাঁ, তিনিও এসেছেন। তাঁর সঙ্গে তাঁদের ফ্যামিলিও এসেছে। তাঁরাও একদিন এ-বাড়িতে এসেছিলেন। তাঁরাও বললেন, এ-পাড়াতে থাকা 'স্যাক্সবি-মুখার্জি' কোম্পানী'র একজন ডাইরেকটারের পক্ষে লজ্জার বিষয়।

—সে কী? বাড়ি দিয়ে মানুষের বিচার হবে? তার কাজ দিয়ে নয়? ওই কথা বললেন মেজবাবু?

বিশাখা বললে—হ্যাঁ।

সন্দীপ বললে—তাহলে এতদিন যা শিখে এসেছি, যা বলে এসেছি, সমস্ত মিথ্যে?

এ-কথার জবাবে বিশাখা কিছু না-বলাতে সন্দীপ আবার বললে—এত কাণ্ডের পরেও সৌম্যবাবুরও শিক্ষা হলো না, মেজবাবুরও শিক্ষা হলো না? এ কোন যুগে তুমি আমি বাস করছি? এ-সব দেখে শুনে আর বাঁচতেও আমার ইচ্ছে করে না—

বিশাখা বললে—না না, তুমি এমন করে মানুষের ওপর বিশ্বাস হারিও না। তুমি কি জানো না মানুষের ওপর বিশ্বাস হারানো পাপ?

—জানি, সব জানি, কিন্তু আমি এ-সব কথা বলছি শুধু তোমার কথা ভেবেই। তুমি শেষ পর্যন্ত লড়াই করে যাও। তুমি মানুষটাকে ফেরাবার চেষ্টা করো!

—কিন্তু এতগুলো শক্তির বিরুদ্ধে কী করে আমি লড়াই করবো?

সন্দীপ বললে—তুমি যাতে শক্তি পাও সেই জন্যেই তো আমি তোমাকে এত টাকা দিলুম। কী করে যে তোমাকে এত টাকা দিলুম, তা আমি ছাড়া আর কেউই জানে না—

—সত্যিই বলো না? কোথায় পেলে এত টাকা?

সন্দীপ বললে—তোমার সুখের জন্যে আমি ন্যায়-অন্যায় সব রকমের কাজ করতে পারি তা জানো? ফুলের তোড়া তৈরি করতে গেলে কি কাটাকে ভয় করলে চলে?

হঠাৎ ভেতর থেকে সৌম্যবাবুর গলা শোনা গেল—ও বিজলী—বিজলী—

—ওই আবার ডাক পড়েছে...মুখপুড়ীর...

বিশাখার মুখটা আবার ফ্যাকাশে হয়ে উঠলো। বললে—আমি যাই। তোমার সাথে

আজ ভালো করে কথা বলাও হলো না। আর একদিন এসো—

বলে বিশাখা ভেতরে চলে গেল। সন্দীপও আর দাঁড়ালো না। মঙ্গলাকে দরজাটা ভেজিয়ে দিতে বলে বাইরে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো।

আস্তে-আস্তে সমস্ত কথাগুলোই মনে পড়েছিল সন্দীপের। সে-সব দিনের প্রত্যেকটা ছোট-খাটো খুঁটি-নাটি কথা। বিশেষ করে বিশাখার কথাগুলোই আজ বেশি করে মনে পড়ছে। বিশাখাকে সুখী করবার জন্যে সন্দীপ কী-ই না করেছে। নিজের ইজ্জৎ, নিজের নিরাপত্তা, নিজের জীবিকা, সব কিছু জলাঞ্জলি দিয়েছিল সে বিশাখার জন্যে!

সেই বিশাখার জীবনই বা কী বিচিত্র। কোথায় কোন কলকাতার এক নগণ্য কোণে জীবন কাটাচ্ছিল, তারপর কী বিচিত্র ঘটনাচক্রে একেবারে রাজরানী হয়ে উঠলো রাতারাতি। রাতারাতি কোটি-কোটি টাকার মালিক হয়ে গেল। কিন্তু অতো টাকার মালিক হয়ে কী লাভ হলো।

তার চেয়ে বিধবা হলেই তো ভালো ছিল!

কিন্তু তার সিঁথির সিঁদুরের বিনিময়ে সে স্বামীকে পেলে না, পেলে স্বামীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড! কোনওরকমে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে সে ফিরিয়ে আনলে তার স্বামীকে!

তারপর একদিন স্বামী জেলখানা থেকে মুক্তি পেলে! কিন্তু ততোদিনে সে অর্থের দিক থেকে ফতুর। তখন তার নতুন সংসার। নতুন আশা, নতুন সংকল্পের সিদ্ধির জন্যে এসে হাত পাতলো সন্দীপের কাছে টাকার আশায়।

—টাকা? কতো টাকা?

—যা তুমি দিতে পারো। আমি ছোটবাবুকে আবার নিজের পায়ে দাঁড় করাবো। যেমন করে হোক! তুমি তো তোমার সর্বস্বই পরের জন্যে দান করেছো, এখন আমার জন্যেও কিছু করো—

—তোমার জন্যে আমি সব কিছু করতে পারি। বলো কতো টাকা?

বিশাখা বললে—একটা খোঁড়া কোম্পানীকে দাঁড় করাতে গেলে কতো টাকা লাগে তা তুমিই জানো। তুমি ব্যাঙ্কে চাকরি করো, সে-সব জানো। তোমরা তো বিভিন্ন কোম্পানীকে টাকা লোন দাও। তুমি বলতে পারো কতো টাকা লোন দিলে একটা খোঁড়া কোম্পানীকে দাঁড় করানো যায়। আমি মেয়েমানুষ হয়ে কী করে তা বলবো?

সন্দীপ বললে—কিন্তু আবার যদি সে-কোম্পানীতে লেবারট্রাবল্ হয়, আবার তো সে-কোম্পানী উঠে যাবে!

—যাতে তা না হয় তার চেষ্টা করতে হবে!

—কে চেষ্টা করবে?

বিশাখা বললে—সে ছোটবাবুই করবে। দরকার হলে আমি সঙ্গে থাকবো।

—কিন্তু তা করতে গেলেও তো আবার সেই গোপাল হাজরার হাতে পড়তে হবে, সেই যে-মানুষটা একদিন তোমাদের কোম্পানীটা এখান থেকে ইন্দোরে পাঠিয়ে দিয়েছিল—

বিশাখা বললে—গোপাল হাজরা মানেই তো ডি-এ-পি পার্টি। সেই গোপাল হাজরা, বরদা ঘোষাল, আর শ্রীপতি মিশ্রকেই আবার না হয় ধরতে হবে—

—কিন্তু তাহলেই তো আবার নাইট-ক্লাবে যেতে হবে ছোটবাবুকে—

বিশাখা বললে—তা তার জন্যে আমি আছি। আমি ছোটবাবুর সঙ্গে থাকবো,

আমিই ছোটবাবুকে সামলাবো—

সন্দীপ বললে—ঠিক আছে। আমি হেড্-অফিসকে বলে ছোটবাবুকে ব্যাঙ্ক-লোন পাইয়ে দেব। আর যদি না পাই তো আমি নিজে যতোটা পারি তোমাদের দেব।

—তুমি কথা দিলে তো?

—হ্যাঁ!

বিশাখা বললে—তোমার মুখের কথাই আমার কাছে বেদবাক্য। আমি আজই গিয়ে ছোটবাবুকে কথাটা বলি। দরকার হলে ছোটবাবুকে নিয়ে তোমাদের বড়বাজার ব্রাঞ্চের অফিসে যাবো—

সন্দীপ বললে—না, তা কোর না, আমি চাই না জিনিসটা নিয়ে হৈ-চৈ হোক, যা করবার তা আমিই করবো।

এই-ই হয়েছিল সূত্রপাত। তারপর যেমন-যেমন কথা হয়েছিল তেমনিই হলো। কেউ জানলে না যে কোথা থেকে কেমন করে টাকা দিতে লাগলো সন্দীপ। লাখ-লাখ টাকা। তার ফলে আবার 'স্যাক্সবি-মুখার্জি' কোম্পানী ইন্দোর থেকে চলে এলো বেলুড়ে। আবার মুক্তিপদ মুখার্জি চলে এলেন কলকাতায়। তাঁর সঙ্গে এলো চীফ এ্যাকাউন্টেট নাগ্‌রাজন, এলো ওয়ার্কস্ ম্যানেজার কান্তি চ্যাটার্জি, এলো ওয়েলফেয়ার অফিসার যশোবন্ত্ ভার্গব, এলো ডেপুটি ওয়ার্কস্ ম্যানেজার অর্জুন সরকার, এলো শিফ্‌ট্-ইনচার্জ বেণুগোপাল। সবাই এলো। মুক্তিপদ মুখার্জির সঙ্গে এলো নন্দিতা আর তার মেয়ে পিকনিক্। তার সঙ্গে ফ্যাক্টরি আবার চালু হয়ে গেল। আবার তৈরি হতে লাগলো ফিশ্ প্লেট, ব্রাশ, ওয়াগন কনটেন্টস্, ট্র্যাক-ফিটিংস, রেলওয়ে স্লীপার্স। আর কোথাও কোনও গণ্ডগোল নেই। কারণ তার সঙ্গে সঙ্গে এলো শ্রীপতি মিশ্র, বরদা ঘোষাল, আর গোপাল হাজরা।

সঙ্গে সঙ্গে বেলুড়ে আবার আসর গুলজার হয়ে উঠলো। আর তার সঙ্গে এলো এ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট সন্দীপ লাহিড়ীর নামে। 'ন্যাশনাল ইউনিয়ন ব্যাঙ্কে'র বড়বাজার ব্রাঞ্চের ম্যানেজার নব্বুই লাখ টাকার জালিয়াতি করার দায়ে!

পুলিশ সার্জেন্ট বললে—আপনাকে লোক্যাল থানায় যেতে হবে, গাড়িতে উঠুন—

তারপর?

এই কাহিনী আমার নিজের দেখা নয়, আমার কল্পনা করা কাহিনীও নয়। এ-কাহিনীর সমস্তটাই আমার পরের মুখ থেকে শোনা। সন্দীপ লাহিড়ীকে আমি কখনও চোখেও দেখিনি। সৌম্যপদ মুখার্জিকেও কখনও দেখিনি আমি, দেখিনি বিশাখা মুখার্জিকেও। এমন কি বিজলী গাঙ্গুলীকেও আমি দেখিনি কখনও। বলতে গেলে আমি আমার পরিবার-পরিজন ছেড়ে বাইরের কোনও মহিলার সঙ্গেও যাকে মেশা বলে সে-রকম ভাবে কখনও মিশিনি।

শুনেছি সমস্ত শ্রীযুক্ত অজয়কুমার বসুর কাছ থেকে। সোজা কথায় মিস্টার এ. কে. বসুর কাছ থেকে। অজয়বাবু ছিলেন শেষ বয়েসে আমার প্রতিবেশী। তিনি ছিলেন বিডন স্ট্রীটের ঠাকমা-মণির মামলায় সরকারের তরফের স্ট্যান্ডিং কাউন্সেল। তাঁর হাতেই ছিল সৌম্যপদ জীবন-মৃত্যুর নিশ্চয়তা। আর সেই মামলায় ঠাকমা-মণির পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন ব্যারিস্টার নীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত। সেই মামলার সূত্রে ওই দু'জন সমস্ত ব্যাপারটাই জানতেন।

অজয়বাবুর সঙ্গে রোজই লেকের ভেতরে বেড়াতাম। জিজ্ঞেস করলাম—তারপর?

অজয়বাবু বললেন—আমি পরের ঘটনাগুলো শুনেছি হামিদের কাছ থেকে—

—হামিদ? কোন্ হামিদ?

অজয়বাবু বললেন—ওই যে-হামিদের কথা আপনাকে বলেছি সেই হামিদ।

—সেই হামিদের সঙ্গে আপনার কী করে পরিচয় হলো? আপনিই তো বলেছেন সে ছিল জেলখানার দালাল।

অজয়বাবু বললেন—হ্যাঁ, ওই দালালি করে করে শেষ জীবনে সে কয়েক লাখ টাকার মালিক হয়েছিল। আমাদের বাড়ির কাছে বিরাট তিন-তলা একটা বাড়ি করেছিল। তার তখন অনেক বয়েস হয়েছে। গোড়াটা তো আমার নিজের জানাই ছিল সেই মামলার সূত্রে বাকিটা সমস্ত শুনেছিলাম হামিদ সাহেবের কাছ থেকে।

বললাম—এখন তার সঙ্গে একবার দেখা করা যায়?

—কী করে দেখা হবে? তিনি তো মারা গেছেন।

—মারা গেছেন?

অজয়বাবু বললেন—হ্যাঁ, মারা গেছেন, এখন তাঁর ছেলে-বউ নাতি-নাতনি আছে, তাদের অবস্থা এখন ভালো হয়েছে। এখন তাদের সকলের এক-একখানা করে গাড়ি—

আমি হামিদের বংশধরদের ঐশ্বর্যের কথা শুনে অবাক হয়ে গেলাম। অজয়বাবু বললেন—অবাক হচ্ছেন কেন? উকিল ডাক্তার আর পুলিশের কাছ থেকে বরাবর একশো হাত দূরে থাকতে চেষ্টা করেছি, যদিও নিজে সারাজীবন ওকালতি করেছি। তাদের মধ্যে ভালো কি নেই? কিন্তু দূরে থাকবেন কী করে? তাদের নিয়েই আমাদের চলতে হবে—

বললাম—তারপর কী হলো বলুন?

—তারপর?

প্রতিদিন ভোরবেলা অজয়বাবু আর আমি লেকে গিয়ে জলের ধারে বেড়াই আর দুজনে চলতে চলতে গল্প করি। তারপর যখন একটু ক্লান্তি বোধ করি, একটা সুবিধে মতো বেঞ্চির ওপর গিয়ে বসি—

তারপর সন্দীপ লাহিড়ীর হাতে হাত-কড়া না পড়লেও রাইফেল-ধারী চারজন পুলিশ তাকে ঘিরে রইলো চারদিকে।

সন্দীপ বোধহয় জানতো একদিন তার এই অবস্থা হবে।

বললে—একটু সময় দিন আমাকে।

পুলিশ-সার্জেণ্ট বললে—না, আপনাকে সময় দেওয়া হবে না। কেন সময় চাচ্ছেন?

—আমি জানি আমি কী অপরাধ করেছি। জানি আমার জেল হবে তাই আমি একটা জিনিস সঙ্গে নিতে চাই।

—কী জিনিস?

সন্দীপ বললে—একটা ফ্রেমে বাঁধানো ফটোগ্রাফ।

—কোথায় আছে সেটা?

সন্দীপ বললে—আমার শোবার ঘরের দেওয়ালে টাঙানো আছে। সেইটে আমি সঙ্গে নিয়ে যাবো।

এমন সময় রতন বাবুর এই অবস্থা দেখে কেঁদে ফেললে।

সন্দীপ বললে—তুই কাঁদিসনি রতন, তুই অন্য কোথাও চাকরির চেষ্টা করিস—

—সে কী বাবু? আপনি আর আসবেন না?

সন্দীপ বললে—না রে, আমি আর ফিরবো না। এখন থেকে কতো বছর পরে ফিরি তার ঠিক নেই—আমি বাড়িওয়ালার এ-মাসের ভাড়া মিটিয়ে দিয়েছি। তুই এখন থেকে অন্য কোথাও একটা চাকরি যোগাড় করে নিস—

—তাহলে আপনার এই সব জিনিস-পত্তোরের কী হবে?

সন্দীপ বললে—ও-সব গোল্লায় যাক, কিছু ক্ষতি নেই। আমি জীবনে যা চেয়েছিলুম তা পেয়ে গেছি। এখন আমার জেলই হোক আর ফাঁসিই হোক, আমার কোনও ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই। দিদিমণি যদি কোনও দিন আসে আমার বাড়িতে তো বলে দিস টাকা চুরির দায়ে আমার জেল হয়ে গেছে—

ততক্ষণে রতন সন্দীপের শোবার ঘর থেকে বিশাখার সেই ছবিটা পেড়ে এনে বাবুকে দিয়েছে। সন্দীপ বললে—এখানা নেব কীসে রে? একটা ঝোলা-টোলা কিছু দে আমাকে, না' হলে তো এটা তো হারিয়ে যাবে। আমি এটা সঙ্গে রাখতে চাই।

রতন দৌড়ে গিয়ে একটা থলি এনে দিলে। বিশাখার ফোটোটা তার ভেতরে ভরে নিয়ে সন্দীপ পুলিশ-সার্জেন্টকে বললে- চলুন, এবার আমি তৈরি—

পুলিশের জিপ-গাড়ির ভেতরে গিয়ে ঢুকলো সন্দীপ। বাইরে তখনও হতভম্ব হয়ে রতন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অঝোরধারায় কাঁদছে। সন্দীপ তার দিকে চেয়ে বললে—কাঁদিসনি রতন, দিদিমণি যদি আসে তো তাকে বলে দিস আমি যা চেয়েছিলুম তা পেয়েছি—বুঝলি?

গাড়িটা তখন চলতে আরম্ভ করেছে। দূর থেকে তখনও সন্দীপ বলছে—যদি দিদিমণি না আসে তাহলে তুই গিয়েও তাকে বলে আসিস খবরটা। বলে আসিস আমার জন্যে যেন দিদিমণি ভাবনা না করে। দিদিমণি সুখে আছে এইটে জেনেই আমি সুখী...আমার মনে আর কারো বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ নেই, আমার নিজের মনে আর কিছুর জন্যে কোনও ক্ষোভ নেই, আর যদি বেঁচে থাকি তো আবার ফিরে এসে দেখা করবো, আমার জন্যে দিদিমণি যেন কোনও ভাবনা না করে!

গাড়ি চলতে লাগলো, আর এক সময়ে রতন সন্দীপের চোখ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল।
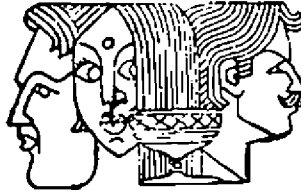
সমস্ত মনে ছিল সন্দীপের। এখন আর তার প্রত্যাশা নেই। নিবারণকাকা সেই ছেলেবেলাতেই শিখিয়ে দিয়েছিলেন কথাগুলো। বলেছিলেন পৃথিবীর সমস্ত মানুষের জীবনে এমন একটা সময় আসে যখন নিজের সমস্ত অতীতটা পরিক্রমা করতে ইচ্ছে হয়। অতীতটা তখনই মানুষের মনে পড়ে যখন তার কাছে ভবিষ্যৎটা ছোট হয়ে আসে। যৌবনে তার কাছে ভবিষ্যৎটাই আসল। তখন সেই কম বয়েসে সে সব কিছু কামনা করে বসে। কামনা করে বসে সুখ-সমৃদ্ধি-সৌভাগ্য। সব কিছু দুর্লভ কামনা করার মধ্যে একটা বলিষ্ঠ প্রত্যাশা তাকে সমস্ত বাধা-বিঘ্নকে অতিক্রম করতে শেখায়, সমস্ত কিছুকে তাচ্ছিল্য করতে শেখায়।

কিন্তু যেই আধখানা জীবন ফুরিয়ে যায় তখনই আসে প্রত্যয়। তাই এই পৃথিবীর সব মানুষের জীবনই প্রত্যাশা আর প্রত্যয়ের সমন্বয়। প্রত্যাশাকে অতিক্রম করে যে প্রত্যয়ে পৌঁছতে পারে সে-ই পরিত্রাণ পায়।

ছোটবেলায় কথাগুলো বলেছিলেন নিবারণকাকা। তখন সন্দীপ এ-সব কথার প্রকৃত মানে বুঝতে পারেনি। আজ খানিকটা বুঝতে পারছে, আজ এই এত বছর পরে।

এতদিন পরে রাস্তায় চলতে চলতে আবার সেই দিনের কথা মনে পড়তে লাগলো যেদিন তাকে পুলিশ ধরে নিয়ে গিয়েছিল। ধরে নিয়ে গিয়েছিল নব্বই লাখ টাকা ব্যাঙ্ক থেকে তছরূপ করবার জন্যে।

সত্যি বলতে কী সে-জন্যে তার মনে একটুকু গ্লানি বোধ হয়নি। হ্যাঁ, সে টাকা চুরি করেছে। কোর্টে যখন তার বিচার হচ্ছিল তখনও সে আত্মপক্ষ সমর্থন করেনি।

বিচারক জিজ্ঞেস করেছিলেন—আপনি কি সত্যিই এত টাকা চুরি করেছিলেন?

সন্দীপ জবাব দিয়েছিল—হ্যাঁ—

—সন্দীপবাবু স্বীকার করছেন যে আপনি চুরি করেছিলেন?

—হ্যাঁ, স্বীকার করছি!

বিচারক জিজ্ঞেস করেছিলেন—এই স্বীকার করার পরিণতি কী তা আপনি জানেন?

—হ্যাঁ, আমি জানি চুরি করা মহাপাপ—

বিচারক আবার প্রশ্ন করেছিলেন—আপনি জেনেশুনে সেই পাপ করেছিলেন? তাহলে আপনাকে দীর্ঘকাল কারাবাস করতে হবে। বিচারে আপনার চরম শাস্তি হবে।

—তা হয় যদি হবে। আমি তার জন্যে প্রস্তুত!

কোর্টের বিচার কখনও একদিনে হয় না। কিন্তু এ ক্রিমিন্যাল কেস। এর বিচার হতে বেশি দিন সময় লাগে না।

কিন্তু এ-বিচারক একটু আলাদা প্রকৃতির মানুষ। তিনি ভাবলেন ভদ্রলোক বোধহয় একটু বিকৃত-মস্তিষ্ক। এত বড়ো অপরাধের দায়িত্ব অকপটে স্বীকার করছে কেন? সুস্থ-মস্তিষ্কে বিবেচনা করবার একটু সময় একে দেওয়া দরকার। ততোদিন জেলের হেফাজতেই থাকুক।

তাই-ই হলো। এক-মাস ভাববার সময় দেওয়া হলো আসামীকে। কিন্তু এক মাস পরে যখন আবার আসামীকে হাকিমের সামনে হাজির করা হলো তখনও ওই একই জবাব। কোনও পরিবর্তন নেই।

বিচারক আবার প্রশ্ন করলেন—আপনি কি এখন আপনার পাপের জন্যে অনুতপ্ত?

আসামী তখন, ওই একই জবাব দিলে—না, আমি এতটুকুও অনুতপ্ত নই।

—আপনি এত টাকা নিয়েছিলেন কী জন্যে?

আসামী বললে—সেটা আমার নিজস্ব ব্যাপার। সে-কথার উত্তর দিতে আমি বাধ্য নই।

বিচারক আবার প্রশ্ন করলেন—কী করে টাকাগুলো চুরি করতেন?

আসামী বললে—আমি যখন বড়বাজার ব্র্যাঞ্চের ম্যানেজার তখন দেখতাম এক-একজন বড়লোক পার্টি ইনকাম-ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়ার জন্যে দশ-বারোটা নামে টাকা রাখে। একই লোকের অনেক নামে অ্যাকাউন্ট থাকে। কোনও কোনও অ্যাকাউন্ট বছরের পর বছর কোনও ট্র্যানজ্যাকসন হয় না। তাদের যেমন টাকা থাকে তার ওপরেই ইন্টারেস্ট কষা হয়। সেই সব পার্টির অ্যাকাউন্ট আমার নখ-দর্পণে থাকতো—আমি সেই অ্যাকাউন্ট থেকেই টাকা তুলে নিতাম—

—সে অ্যাকাউন্ট আর কেউ চেক করতো না?

আসামী বললে—কে চেক করবে? যাদের মিথ্যে নামে টাকা থাকতো তাদের কাছে এত টাকা ছিল যে তারা কেউ সে-অ্যাকাউন্ট নিয়ে মাথাও ঘামাতো না। তাদের টাকা ব্যাঙ্কে পচতো। তাদের মিথ্যে ঠিকানা সব আমার জানা ছিল। আর তা ছাড়া আমি ছিলাম ম্যানেজার, আমার কাজ-কর্ম কেউই চেক করতো না। ব্যাঙ্কে কেউই তো সত্যি-কারের কাজ করে না, শুধু মাইনে নেওয়াই এখন নিয়ম—

বিচারক প্রশ্ন করেছিলেন—কাজ না করে কী করে দেশ চলছে?

—দেশ তো চলছে না। তাই আমি টাকাগুলো নিয়েছিলুম এমন একটা কাজে লাগাতে যাতে একজন সুখী হয়।

—কে সে?

আসামী বললে—আমি তার নাম-ঠিকানা কিছুতেই বলবো না। সে বড়ো দুঃখী লোক। এতো দুঃখী লোক যে সে টাকা পেলে শুধু নিজেই যে সুখী হবে তাই-ই নয়, তাতে হাজার-হাজার লোকের চাকরি হবে, হাজার-হাজার লোক জীবন ফিরে পাবে!

হাকিমের অনেক কাজ। বাজে কথা বলে নষ্ট করবার মতো তাঁর সময় নেই। সঙ্গে

সঙ্গে হাকিম নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকলেন। আসামীকে আট বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দিয়ে তাঁর নিজের কর্তব্য শেষ করলেন।

তখন থেকে সন্দীপের নির্বাসন-দণ্ড শুরু হলো। সত্যিই সে এক কঠোর নির্বাসন। পৃথিবী থেকে, সমাজ থেকে, মানুষ থেকে, এমন কী তার নিজের থেকেও নির্বাসন শুরু হলো। সেই নির্বাসনের দিন থেকেই সে যেন এক পরম শান্তি অনুভব করতে লাগলো। অতো বড়ো চাকরি চলে যাওয়ার জন্যে তার এতটুকু দুঃখ, এতটুকু ক্ষোভ রইলো না। সে অনুভব করলে যে তার মুক্তি হয়েছে। এতদিন সন্দীপ একটা গাছ হয়ে বেঁচে ছিল। এবার সে গাছে ফুল ফুটেছে। আর এখন হয়েছে ফল। তা ফলই তো সমস্ত গাছের চরম পরিণতি। সেই পরিণতিতে পৌঁছতে পারলে চাইবার তো আর কিছু থাকে না।

'এতদিন পরে সেদিন জেলখানার ভেতরে বসে বসে সন্দীপের কেবল তাই মনে হতো সে যেন সেই পরিণতিতেই পৌঁছিয়ে গিয়েছে। তার আর চাইবারও কিছু নেই আর পাওয়ারও কিছু নেই। শুধু আছে পরিণতিতে পৌঁছবার আনন্দ। তখন যে আনন্দ হয়, সেই আনন্দের অপর নামই তো হলো প্রেম। সেই প্রেম বেঁধে রাখে না। সেই প্রেম কেবল টেনে নিয়ে যায়। নির্মল নির্বোধ প্রেম। সেই প্রেমই মুক্তি। সমস্ত রকম আসক্তির মৃত্যু। সেই মৃত্যুরই সৎকারমন্ত্র হচ্ছে—

মধুবাতা ঋতায়তে,
মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ...

একবার যখন আসক্তির বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেছে, তখন জল-স্থল-আকাশ, জড়-জন্তু-মানুষ সমস্তই অমৃতের পরিপূর্ণ—তখন সে-আনন্দের কি শেষ আছে?

তাই সন্দীপের আচরণ দেখে সবাই অবাক হয়ে যেত। তাই সহদেব প্রায়ই জিজ্ঞেস করতো—আপনার মতো লোক কেমন করে নব্বই লাখ টাকা চুরি করতে পারে তা আমরা কল্পনাই করতে পারি না লাহিড়ীবাবু!

জেল-সুপার নিজেও এসে মাঝে-মাঝে জিজ্ঞেস করে যেতেন—কেমন আছেন মিস্টার লাহিড়ী?

সন্দীপ তাঁর প্রশ্ন শুনে অবাক হয়ে যেত। জেলের কয়েদীকে জেল-সুপার কেন এত সম্মান দিতেন? তবে কি জেল-সুপার সব ঘটনা জানতেন? তার যে সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছে তা সবাই জানতো। তবু তাকে শ্রম-সাধ্য কাজ কোনও দিন কেউ দেয়নি। বরং তাকে অফিসের কাজ দেওয়া হতো। সেই অফিসের কাজের মধ্যেও সন্দীপের মন চলে যেত সেই পাঁচ নম্বর ভুবন গাঙ্গুলী লেন-এর বাড়িটাতে। তপেশ গাঙ্গুলী এতদিন নিশ্চয় আর বেঁচে নেই। বিজলীরও বোধহয় এতদিনে কারো সঙ্গে বিয়ে হয়ে গিয়েছে।

বাড়িতে শুধু দুটো প্রাণী—সৌম্যপদ আর বিশাখা।

সৌম্যপদ নিশ্চয়ই মদ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। বিশাখা তো বলেই ছিল যে ছোট-বাবুকে সে কোনও রকম ভাবে আবার স্বাভাবিক করে তুলবেই। ভালবাসা দিয়ে কী-ই না সম্ভব হয়? প্রেমই তো মৃত্যুকে অতিক্রম করে অমৃতে পৌঁছিয়ে দেয়।

তার তা ছাড়া এতদিনে কি সংসার শুধু দুজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ আছে? কোনও তৃতীয় জনের আবির্ভাব হয়নি? নিশ্চয়ই হয়েছে। তা না হলে সন্দীপের এই কারা-বরণ যে মিথ্যে হয়ে যাবে! তা কি সম্ভব? আর গোপাল হাজরা?

গোপাল হাজরারাই তো এখন ক্ষমতায় আসীন। তাদের জয়ধ্বনিই তো রাস্তার মিছিলে তারস্বরে উৎক্ষিপ্ত হয়। জেলখানার ভেতরেও সে-শব্দের প্রতিধ্বনি শোনা যায়।

তাই যতোদিন গোপাল হাজরা আছে ততোদিন 'মুখার্জি-মুখার্জি' কোম্পানীর কোনও ভয় নেই।

মিস্টার হাজরা, ডাক্তার বেশি লিকার খেতে বারণ করে দিয়েছেন—

—বারণ করে দিয়েছে? তাই নাকি? তাহলে আর খাবেন না মিস্টার মুখার্জি। আমিও খাবো না। আমারও লিভারটা ক'দিন ধরে ট্রাবল্ দিচ্ছে—আমি তো আপনাকে

কমপ্যানি দেবার জন্যেই খাই! মিসেস মুখার্জি যখন বলছেন তখন আমিও আর খাবো না আজ থেকে!

মদ খাওয়া বন্ধ হলো বটে, কিন্তু টাকা?

টাকা দিতে আপত্তি নেই মুক্তিপদ মুখার্জির। মুক্তিপদ মুখার্জিরা তো বরাবর টাকা দিতেই চেয়েছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও সবাই উঠে পড়ে লেগেছিল কোম্পানীকে কলকাতা থেকে উচ্ছেদ করতে। তাতে সমস্ত ওয়ার্কাররা বেকার হয়ে পড়বে। আর তারা বেকার হয়ে গেলেই পার্টির ক্যাডার বাড়বে। আর পার্টির যতো ক্যাডার বাড়বে লীডারদের ততোই লাভ। ততোই তাদের বৈভব বাড়বে। গাড়ি বাড়ি টাকা ইঞ্জং সব কিছু বাড়বে।

তখন কেউ-ই জানবে না এই সমৃদ্ধি, এই সুখ, এই ঐশ্বর্যের পেছনে সন্দীপের কতটুকু অবদান ছিল। কেউ মনে রাখবে না যে সন্দীপ বলে কেউ একজন ছিল, যে এই 'স্যাক্সবি-মুখার্জি' কোম্পানীর উন্নতির পেছনে থেকে লাখ-লাখ টাকা জুগিয়েছিল, জানবে না যে সৌম্যপদবাবুর বহুদিনের নিষিদ্ধ জিনিসের ওপর নেশা থেকে মুক্তি দিয়েছিল। লোকে শুধু 'স্যাক্সবি-মুখার্জি' কোম্পানীর নাম জানবে। প্রতিদিনকার মতো আবার সেখানে চিমনি থেকে ধোঁওয়া উঠবে, সকালে ফ্যাক্টরি খোলার সময়ে ভোরবেলায় তারস্বরে ভোঁ বাজবে আগেকার মতো, আর যথাসময়ে কারখানা বন্ধ হওয়ার সময়েও ঠিক একই রকম করে আবার ভোঁ বাজবে বিকেল বেলা। কেউ জানবে না যে তার পেছনে যে-লোকটা কোম্পানীর শুরুতে প্রদীপের সলতেতে তেল জুগিয়েছিল সে লোকটা তখন জেলখানার এক কোণে বেঁচে মরে আছে।

সত্যিই এতদিন সন্দীপ বেঁচে থেকেই মরে ছিল। বলতে গেলে সে ভুলেই গিয়েছিল যে কবে তার মুক্তির ডাক আসবে। কারণ জেল থেকে বেরিয়ে সে কোথায় যাবে? কোথায় গিয়ে সে আশ্রয় নেবে? তার সেই বেড়াপোতার বাড়ি তো বহু আগেই বিক্রি করে দিয়েছিল। আর নেবুবাগানের সেই ভাড়াটে বাড়ি নিশ্চয়ই আবার বাড়িওয়ালা কেড়ে নিয়েছে! কেড়ে নিয়ে আরো অনেক বেশি টাকায় নতুন ভাড়াটে বসাবে।

আর এখন এই অবস্থায় তার বাড়ির দরকারই বা কী? কলকাতা শহরে এত লোক আছে, এদের সকলেরই কি বাড়ি আছে? রাস্তাতেই তাদের জন্ম হয়, রাস্তাতেই তারা বড়ো হয়, আবার রাস্তাতেই তাদের একদিন মৃত্যু হয়। তাদেরই একজন হয়ে সন্দীপ কিছুদিন বেঁচে থাকবে, তারপর একদিন নিঃশব্দে বিলুপ্ত হয়ে যাবে আরো অন্য সকলের মতো।

এখন বেলা বাড়ছে। প্রথমে কোথায় যাবে সে?

প্রথমে যাবে বেলুড়ে। বেলুড়ের সেই 'স্যাক্সবি-মুখার্জি' কোম্পানীর ফ্যাক্টরিতে। সেখানে গিয়ে দেখে আসা ভালো যে যে-কারখানার জন্যে সন্দীপ এতদিন টাকা জুগিয়ে এসেছে, সে-কারখানা কেমন চলছে?

কিন্তু বেলুড় কি এখানে! সেখানে পৌঁছতেই তো কয়েক ঘণ্টা সময় লাগবে।

তবু প্রথমে সেখানে যাওয়াই ভালো। যদি ফ্যাক্টরি চলছে দেখতে পায় তাহলেই বুঝবে যে বিশাখা ভালো আছে, বিশাখা সুখে আছে।

একটা বাস আসছিল সামনে। বাসের নম্বর দেখেই বুঝলো যে সেটা হাওড়া যাবে। সেটা সামনে এসে থামতেই তাতেই উঠে পড়লো সে। ভেতরে খুবই ভিড়। আগেকার মতো ফাঁকা থাকে না বাস-ট্রামগুলো। এই আট বছরে মানুষ এত বেড়ে গেছে শহরে? এত মানুষ কলকাতায় কোথা থেকে এলো?

তাকে দেখে যেন সবাই একটু বিরক্ত হলো। সারা মুখে দাড়ি, মাথায় বড়ো বড়ো চুল। আট বছর ধরে চুল কাটা হয়নি, আট বছর ধরে দাড়িও কামানো হয়নি। ইচ্ছে করেই কামায়নি। কামালেই তো সবাই চিনে ফেলবে। বুঝতে পারবে

এই লোকটাই একদিন 'ন্যাশন্যাল ইউনিয়ন ব্যাঙ্কে'র বড়বাজার ব্রাঞ্চের ম্যানেজার ছিল। টাকা তছরুপের দায়ে এই লোকটারই তো একদিন আট বছরের জেল হয়েছিল।

অবশ্য বেশির ভাগ লোকই তো গরীব। অনেকেই তো ব্যাঙ্কে টাকা রাখে না। ব্যাঙ্কে টাকা ক'জনেরই বা থাকে! বিশেষ করে বড়বাজার অঞ্চলের ব্রাঞ্চে।

তবু সাবধানে থাকা ভালো! কোর্টে যখন মামলা হয়েছিল তার বিরুদ্ধে তখন অনেকেই তাকে কাঠগড়াতে আসামী হিসেবে দেখেছে। কৌতূহল মেটাতেও অনেকে গিয়েছে কোর্টে। তখন অনেকে দেখেছে তাকে। তারা এখন হয়তো চিনে ফেলতে পারে। তাই মুখে দাড়ি-গোঁফ রাখাটা ভালোই হয়েছে। তাই দাড়ি-গোঁফ রাখাটা আশীর্বাদ হয়েছে তার কাছে।

অনেকে ময়লা ঝোলাটা দেখে যতোটা সম্ভব দূরে সরে যাবার চেষ্টা করলে। কিন্তু মুখে আপত্তি করতে পারলে না। বলতে গেলে গণেশ সরকারের দেওয়া ঝোলাটাই তাকে খানিকটা বাঁচালো।

হাওড়া স্টেশনে যখন সন্দীপ পৌঁছলো তখন ঝাঁ-ঝাঁ দুপুর। বেলা গড়িয়ে আসছে।
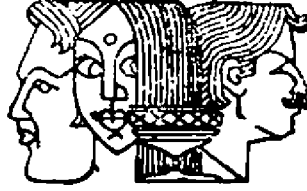
মুক্তিপদ মুখার্জি সকালবেলার দিকটায় নেতাজী সুভাষ রোড-এর হেড অফিসে বসেন। বাড়ি থেকে সকালবেলাই বেরিয়ে সোজা চলে আসেন কলকাতার হেড অফিসে। কতকাল ফ্যাক্টরি বন্ধ ছিল। যেদিন থেকে কলকাতার ফ্যাক্টরি খুলেছে, সেই দিন থেকেই আবার ব্যস্ততা বেড়েছে। আবার মন দিয়ে কাজ আরম্ভ করেছেন।

আগে মাঝে মাঝে মা টেলিফোন করে বিরক্ত করতো। যেদিন থেকে নন্দিতা শাশুড়ীর সঙ্গে ঝগড়া করে বেলুড়ে নতুন বাড়ি করে চলে এসেছিল সেই দিন থেকেই মা'র সমস্ত রাগ গিয়ে পড়েছিল বউ-এর ওপর।

নন্দিতা শাশুড়ীকে বেশি আমল দিত না বলে রাগটা উলটে মুক্তিপদর ওপর গিয়ে পড়েছিল। তার জন্যে মুক্তিপদর মনে ক্ষোভ জন্মা হতো কিন্তু ছেলে হয়ে মা'কে অস্বীকারও করতে পারতেন না। তাই হাজার কাজ থাকলেও বিডন স্ট্রীটের বাড়িতে প্রায়ই গিয়ে হাজিরা দিতেন।

গেলেও নন্দিতার নিন্দে কান পেতে শুনতে হতো। মুক্তিপদ সে-সব কথার কোনও প্রতিবাদ করতেন না। মুখ বুজে সব মাথা পেতে সহ্য করে যেতেন। একদিকে ছিল ফ্যাক্টরিতে লেবার-ট্রাবলের ঝামেলা, আর একদিকে মায়ের গঞ্জনা—দুটো দিক সামলে নিয়ে চলার জন্যে শরীরের ওপরেই চাপটা বেশি পড়তো। তার ওপর ছিল সৌম্যপদর বিয়েটার ভাবনা। কোথা থেকে কোন এক ঘুঁটে-কুড়ুনী বাপ-মরা মেয়ের সঙ্গে সৌম্যপদর বিয়ের সম্বন্ধ করে সমস্ত ব্যাপারটা আরো জটিল করে তুলেছিল।

অথচ মিস্টার চ্যাটার্জির এম-এ পাশ করা মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হলে এ-সব কিছুই হতো না। কিন্তু তারপরেই যতো গণ্ডগোল বাধলো। বউকে খুন করার অপরাধে ফাঁসির আদেশ জারি হওয়ার উপক্রম হলো সৌম্যপদর ওপর। আর তারপরেই বিয়ে হয়ে গেল সেই ঘুঁটে-কুড়ুনীর মেয়ের সঙ্গে। তারপর মুক্তিপদকে তল্পি-তল্পা গুটিয়ে চলে যেতে হলো ইন্দোরে। কিন্তু সেখানে গিয়েও শান্তি নেই। সেখানেও নানান রকম ঝামেলা। মা তখন বেঁচে। তবু সব দিক বজায় রাখতে গিয়ে মুক্তিপদর প্রাণান্তকর অবস্থা। ফ্যাক্টরি একটা প্রভিন্স থেকে অন্য প্রভিন্সে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া

কি সোজা কথা? এর থেকে ফাঁসিতে ঝুলে প্রাণ দেওয়া অনেক সোজা।

ঠিক সেই সময়েই কলকাতা থেকে ট্রাংককল গিয়ে পৌঁছলো সৌম্যপদর।

বললে—আঙ্কেল, একবার এখানে এসো, অনেক কথা আছে—

মুক্তিপদ বললেন—তুই আয় না আমার এখানে। আমার যে অনেক কাজ—

সৌম্যপদ বললে—ফ্যাক্টরি কলকাতায় শিফ্‌ট্ করে নিয়ে এসো—

মুক্তিপদ বললেন—তুই কি পাগল হয়েছিস? ওখানকার লেবার ট্রাবল্ কে সামলাবে?

সৌম্যপদ বললে—লেবার-ট্রাবল্ এবার আমি সামলাবো।

—তুই? তুই সামলাবি? তুই কি পাগল হয়েছিস?

সৌম্যপদ বললে—লেবার-ট্রাবলের যারা পান্ডা তাদের আমি হাত করেছি—

—তাই নাকি? কী করে হাত করলি?

—কী করে আবার! টাকা, টাকা দিয়ে!

মুক্তিপদ জিজ্ঞেস করলেন—টাকা কোথায় পেলি তুই অতো?

—সব বিশাখা! আমার বউ বিশাখা দিয়েছে।

—কাদের হাত করলি?

সৌম্যপদ বললে—ডি-এ-পিকে। যারা আমাদের ফ্যাক্টরিতে লেবার-ট্রাবল বাধিয়ে দিয়েছিল। সেই বরদা ঘোষাল, গোপাল হাজরা, শ্রীপতি মিশ্র—সবাইকে হাত করেছি—

—কতো টাকা দিতে হলো?

এপাশ থেকে সৌম্যপদ বললে—প্রায় আশী-নব্বই লাখ টাকা খরচ করতে হলো।

—একসঙ্গে দিতে হলো?

সৌম্যপদ বললে—না, একসঙ্গে নয়, খেপে খেপে—তুমি শীগগির চলে এসো—

ওধার থেকে মুক্তিপদ বললেন—ঠিক আছে, আমি কালই স্টার্ট করছি। গ্র্যান্ড হোটেলে টেলিফোন করলেই আমাকে পাবি। ওদের তিনজনকেই ডেকে আনিস আমার হোটেলে। ওখানেই কথা হবে।...ছাড়ছি...

এই-ই হলো বেলুড়ের 'স্যাক্সবি-মুখার্জি' কোম্পানীর কলকাতায় পুনঃপ্রতিষ্ঠার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। এমনি করেই শুরু হলো সন্দীপের মহাযাত্রা।'

সত্যিই, এ সন্দীপের মহাযাত্রাই বটে। মুক্তিপদ মুখার্জি কল্পনাই করতে পারেননি, আশি-নব্বই লাখ টাকা বিশাখা কোথা থেকে দিলে। ভেবেছিলেন বিডন স্ট্রীটের সম্পত্তি ভাগ-বাঁটোয়ারার সময়ে বিশাখা যে টাকা পেয়েছিল তা থেকেই আশি-নব্বই লাখ টাকা দিয়েছে বিশাখা। সে-টাকা যে সমস্তই দালাল হামিদের পেটে চলে গেছে তা মুক্তিপদ কেমন করে জানবেন? কে জানে যে সে-কথা বলবে?

তারপর সত্যিই সে-মীটিং হয়েছিল মুক্তিপদর হোটেলের কামরায়। খুব গোপনীয় সে মীটিং। খবরের কাগজের রিপোর্টাররা কেউই জানতে পারেনি সে মীটিং-এর কথা। এমন কী স্যাক্সবী-মুখার্জি কোম্পানীর চীফ্ অ্যাকাউন্টেন্টও না। সেই রকমই নির্দেশ ছিল শ্রীপতি মিশ্র, বরদা ঘোষাল আর গোপাল হাজরার।

সেখানে কত টাকায় ডি-এ-পি'র কর্তাদের সঙ্গে 'স্যাক্সবী-মুখার্জি' কোম্পানীর কর্তাদের রফা হলো তাও কেউ জানতে পারলে না। এমন কী সন্দীপও জানতে পারলে না, জানতে পারলে না, যার টাকায় এত বড় গুরুত্বপূর্ণ একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো সেও।

সেদিন পাঁচ নম্বর ভুবন গাঙ্গুলী লেনের বাড়িতে ফিরতে সৌম্যপদর একটু বেশি রাত হলো।

বিশাখা বিজলী দু'জনেই অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছিল। জিজ্ঞেস করলে—এত রাত হলো যে ফিরতে? আবার হুইস্কি খেতে বসে গেলে বুঝি?

সৌম্যপদ বললে—না না, হুইস্কি খেতে যাবো কেন? হুইস্কি খেলে কি কন্‌ফারেন্স চলে?

বিশাখা জিজ্ঞেস করলে—সব মিটমাট হয়ে গেল?

—হ্যাঁ 'স্যাক্সবি-মুখার্জি' কোম্পানী আবার খোলা হচ্ছে। ডি-এ-পিও রাজী, আমরাও রাজী। আর কোনও গণ্ডগোল হবে না। সই-সাবুদ সব হয়ে গেছে—

বিজলীও দাঁড়িয়ে কথাগুলো শুনছিল। এতক্ষণে বিশাখার খেয়াল হলো সে দিকে। বললে—তুই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী করছিস এখানে? তুই তোর ঘরে যা না—

এই হলো সূত্রপাত! এই ভাবেই 'স্যাক্সবী-মুখার্জি কোম্পানী' আবার আস্তে আস্তে ইন্দোর থেকে ফিরে এলো কলকাতায়। বাইরের কাক-পক্ষীতেও জানতে পারলে না সেদিন হোটেলের কামরায় কী চুক্তি হলো দু'পক্ষে। যখন ফ্যাক্টরি আবার আস্তে আস্তে আরম্ভ হলো তখনই খবরের কাগজের পাতায় খবর বেরোল যে বেলুড়ের স্যাক্সবী-মুখার্জি কোম্পানী আবার খুললো। ইন্দোর থেকে ফ্যাক্টরি আবার কলকাতায় ফিরে এলো। কিন্তু কেন ফিরে এলো, কার সঙ্গে কী রফা হলো তা কেউ জানতে পারলো না। ফ্যাক্টরির অফিসের মুক্তিপদ মুখার্জির চেম্বারের দরজার ওপর পেতলের পাতের ওপর আবার লেখা হলো মিঃ এম. পি. মুখার্জি, ম্যানেজিং ডাইরেক্টার আর তার পাশের ঘরের দরজায় পেতলের পাতের ওপর লেখা হলো মিঃ এস. পি. মুখার্জি ডাইরেক্টার।
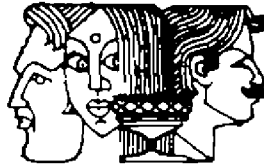
সাধারণতঃ বিশাখা বিজলীকে বাড়িতে একলা রেখে কোথাও যায় না। কারণ বিজলীকেই বিশাখা সবচেয়ে বেশি ভয় করে। কাকা মারা যাওয়ার পর থেকেই বিজলীর যেন সাজ-গোজ আরো বেড়েছে। চুলটা ভালো করে বেঁধে সুন্দরী হওয়ার চেষ্টা করে। যখন সৌম্যপদ ফ্যাক্টরি থেকে বাড়িতে আসে তার সাজগোজের ঘটা আরো বেড়ে যায়। মুখে বেশি করে সাবান ঘষে। এমন করে সাজে যাতে পুরুষের মন আকৃষ্ট করতে পারে।

এটা বিশাখার ভালো লাগে না। অনেক বছর অপেক্ষা করে, অনেক ত্যাগ স্বীকার করে স্বামীকে তার অপমৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে বাড়ি ফিরিয়ে আনতে পেরেছে। এত বড়ো সাধনার ধনকে সে আবার অপমৃত্যুর হাতে ফিরিয়ে দেবে?

অথচ বিজলীরও কোনও অপরাধ নেই। তারও তো সংসার, সন্তান পাওয়ার বাসনা থাকতে পারে! তারও তো স্ত্রী হতে ইচ্ছে হতে পারে, তারও তো মা হতে ইচ্ছে করতে পারে।

আর বিশাখা?

বিশাখারই বা আপনজন বলতে সৌম্যপদ ছাড়া আর কে আছে? সৌম্যপদ তো তার একলার। সেখানে ভাগ বসাতে সে অন্যকে কেন অধিকার দেবে?

আর সন্দীপ?

সন্দীপ নিজের জন্যে কিছুই চায় না। তারও কেউ নেই। সে নিজের মধ্যেই আর একজনের সন্ধান পেয়েছে বলে তাই নিয়েই সে সন্তুষ্ট। শুধু একটা ছবি। বিশাখার ছবিটা সে দেওয়ালে টাঙিয়ে রেখেই সব পাওয়ার আনন্দে বিভোর হয়ে থাকে। তার আর কিছু চাওয়ারও নেই, পাওয়ারও নেই। কিছু না পেয়েই সে সব পাওয়ার আনন্দে মশগুল।

তাই কোনও সুযোগ পেলেই সে সন্দীপের কাছে ছোটে।

সেদিন অফিসে যাওয়ার সময় সৌম্যপদ বলে গেল—আজ আমাদের ডিরেক্টার বোর্ডের মিটিং আছে, আসতে অনেক রাত হবে। তুমি যেন কিছু ভেবো না।

—সেখানেও কি কক্‌টেল-পার্টি আছে নাকি?

সৌম্যপদ বললে—না না, তুমি অতো ভাবছো কেন? তোমাকে তো কথা দিয়েছি,

তোমাকে না জিজ্ঞেস করে কোথাও কোনও পার্টিতে যাবো না। আর তা ছাড়া আমার আরো একটা জরুরী কাজ আছে দুপুর বেলা।

—কী এমন জরুরী কাজ?

সৌম্যপদ বললে—কাকা বলছিল একটা রিভলবারের লাইসেন্স নিতে। কাকাও একটা নিয়েছে—

—রিভলবার? মানে পিস্তল?

সৌম্যপদ বললে—হ্যাঁ। কলকাতায় এখন পার্টিতে পার্টিতে ঝগড়া চলেছে। ডি-এ-পি পার্টির ইউনিয়নের ওপর সকলের খুব রাগ হচ্ছে—

—কেন?

সৌম্যপদ বললে—কলকাতার সব ফ্যাক্টরি যখন বন্ধ হয়ে গেছে ইউনিয়নের রেষারেষিতে তখন কেবল আমাদের ফ্যাক্টরির প্রোডাকশন বাড়ছে। এবারে আমাদের কোম্পানী লোকসান কভার করে দু'কোটি টাকার ওপর প্রোডাকশান বাড়িয়েছে। এতে অন্য ইউনিয়নের লীডারদের রাগ হবে না?

বিশাখা জিজ্ঞেস করলে—তাতে অন্য ইউনিয়নের লীডারদের রাগ হবে কেন?

সৌম্যপদ বললে—তাদের পকেটে আমদানি কম হলেই রাগ হয়। তাই মিস্টার হাজরাই কাকাকে আর আমাকে দুটো রিভলবারের লাইসেন্স নিতে বলেছে। আর নিজেরাও নিয়েছে।

বিশাখা বললে—তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি না। আমি তো তেমন গোলমাল কিছু দেখতে পাচ্ছি না—

—তুমি-আমি দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু নাকি ভেতরে ভেতরে নক্‌শাল-পার্টির মতো আর একটা পার্টি গড়ে তোলবার চেষ্টা হচ্ছে। আবার সেই আগেকার মতো গোলমাল পাকিয়ে তোলবার ব্যবস্থা হচ্ছে। হঠাৎ নাকি একদিন তা দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠবে!

বিশাখা বললে—কী জানি, যা ভালো বোঝ, আমি আর কী বলবো? খবরের কাগজে তো আমি তার কোনো আভাস পাচ্ছি না—

সৌম্যপদ বললে—যখন ঝড় ওঠে তখন কি আগে থেকে নোটিশ দিয়ে আসে? ওরা আগে থেকেই টের পায়, ওই মিস্টার হাজরা আর মিস্টার ঘোষালরা—ওরা দেশের ভেতরের নাড়ী-নক্ষত্রের খবর রাখে যে—

তারপর হঠাৎ হাতের ঘড়ির দিকে নজর পড়তেই চমকে উঠেছে সৌম্যপদ।

বললে—যাই, কথা বলতে বলতে অনেক দেরি হয়ে গেল। আজকে সারা দিনটাই কাজে ব্যস্ত থাকতে হবে। তুমি কোথাও যাবে-টাবে নাকি? বলো, তাহলে গাড়িটা পাঠিয়ে দিতে পারি—

বিশাখা বললে—আমার কোথাও যাওয়ার নেই। যদি কাজ না থাকে তাহলে সন্ধ্যের পর গাড়ি পাঠিয়ে দিও। অনেক দিন নিউ মার্কেটে যাওয়া হয়নি। সন্ধ্যেবেলা আধ ঘন্টার জন্যে সেখানে গিয়ে কিছু কেনাকাটা করতে পারি!

সৌম্যপদ চলে যাওয়ার পর বিশাখা একটু স্থির হলো। যতোক্ষণ সৌম্যপদ বাড়িতে থাকে ততক্ষণ স্বস্তি থাকে না বিশাখার মনে। কখন যে বিজলী সৌম্যপদর ঘরে ঢুকে পড়বে তার ঠিক নেই। আর সৌম্যপদ মানুষটাও তেমনি। মেয়েমানুষ দেখলেই গলে যাবে, বিশেষ করে সে মেয়ে যদি একটু সুন্দর দেখতে হয় আর কমবয়েসী হয়। এই স্বভাবটা নিয়েই জন্মেছে সে। এইটেই তার প্রথম এবং প্রধান দুর্বলতা। এই করেই নিজের সর্বনাশ করেছে এবং এই করে বিশাখার জীবনেও সর্বনাশ ডেকে এনেছে।

ঠিক সন্ধ্যেবেলাই গাড়িটা বাড়িতে পাঠিয়ে দিলে সৌম্যপদ। সন্ধ্যে মানে চারদিকে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। এতক্ষণে নিশ্চয়ই ব্যাঙ্ক থেকে বাড়ি ফিরে এসেছে সন্দীপ।

বিশু বললে—ছোট সাহেব দু'ঘন্টার জন্যে গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন। আপনার যদি কোথাও যাবার থাকে তো সেখানে যেতে বলেছেন—দু'ঘন্টা লাগবে তাঁর মিটিং শেষ হতে—

ভবে এসে ভাবছো বসে
কালের ভয়ে হয়ে ভীত
ওরে, কালেরও কাল যে মহাকাল
সে-কাল মায়ের পদানত।

বেলুড়ে গিয়ে যখন সন্দীপ পৌঁছলো তখন বেশ বিকেল হয়ে গেছে। সূর্য পশ্চিম দিকে হেলে পড়েছে।

হঠাৎ কারখানা থেকে একটা বিকট লম্বা ভোঁ শব্দ উঠলো। এটা প্রথম ভোঁ শব্দ। তার মানে আর পাঁচ মিনিট পরেই আর একটা ভোঁ শব্দ হবে। তখন ছুটি। হাতে দুটো ঝোলা নিয়ে সন্দীপ গেটের সামনে দাঁড়িয়ে রইলো।

পাঁচ মিনিট মাত্র বাকি। তারপরেই কারখানার গেটটা খুলে যাবে। আর পিল্‌ পিল্‌ করে বাইরে বেরিয়ে বেরিয়ে আসবে পাল-পাল লোক। তাদের সামনে দাঁড়াতে কোনও লজ্জা নেই সন্দীপের। কারণ তার মুখময় দাড়ি-গোঁফ। তাকে দেখে কেউ-ই জানতে পারবে না যে সে-ই একদিন ছিল ন্যাশন্যাল ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের বড়বাজার ব্রাঞ্চের ম্যানেজার। কেউই জানতে পারবে না যে ব্যাঙ্ক থেকে নব্বুই লাখ টাকা চুরির দায়ে তার আট বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছিল। তাকে দেখে কেউই বুঝতে পারবে না যে সে আজকেই জেলখানা থেকে ছাড়া পেয়েছে।

আর কথাটা যে সত্যি তা তো তার গায়ে লেখা নেই। আট বছরের ব্যবধানে সবাই তো সে-কথা ভুলে গিয়েছে। আট বছর সময় কি কম? এই আট বছরে পৃথিবীর মানচিত্রে কত দেশের রং বদলে গিয়েছে, তার হিসেব কি কেউ রেখেছে? এই আট বছরে কতো কোটি-কোটি মানুষের যেমন মৃত্যু হয়েছে, তেমনি আবার কতো কোটি-কোটি নতুন মানুষ জন্মও নিয়েছে, তার হিসেবই বা কে রেখেছে?

সেই দিনকার কথাও তার মনে পড়লো। তার জীবনে সেই অবিস্মরণীয় দিন। যেদিন সে কোর্ট-এর মধ্যে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছিল।

কোর্টের মধ্যে সরকারী উকিল হাকিমের সামনেই তাকে জেরা করেছিল। জিজ্ঞেস করেছিল—আপনি ব্যাঙ্কের ম্যানেজার হয়ে স্বীকার করছেন যে আপনি পাবলিকের জমা দেওয়া নব্বুই লক্ষ টাকা চুরি করেছেন?

সন্দীপ বলেছিল—হ্যাঁ, আমি স্বীকার করছি—

সরকারী উকিল জিজ্ঞেস করেছিল—কেন চুরি করলেন?

সন্দীপ বলেছিল—টাকার ওপর আমার লোভ হয়েছিল।

—কিন্তু আপনার তো সংসার নেই, আপনার বাপ-মা-ভাই-বোন-বউ-ছেলে-মেয়ে কেউই নাই, তাহলে টাকার ওপর আপনার এত লোভ হয়েছিল কেন?

সে-কথার জবাবে সন্দীপ কিছুই উত্তর দেয়নি। টাকার ওপর লোভ কি শুধু বাপ-মা-ভাই-বোন-বউ-ছেলে-মেয়ে থাকলেই হয়? মানুষ তো সংসারে সব কিছুই পেতে চায়। তা সে প্রয়োজন থাকুক আর না-ই থাকুক। লোভও তো ছ'টা রিপুর মধ্যে একটা।

—বলুন, জবাব দিন আমার কথার।

সন্দীপ বলেছিল—হিটলারেরও তো কেউ ছিল না। বাপ-মা-ভাই-বোন-বউ-ছেলে-মেয়ে কেউই ছিল না, তাহলে তাঁর এত বড় যুদ্ধটা বাধিয়ে এক দেশ জয় করবার লোভ হয়েছিল কেন?

এর পর স্ট্যাণ্ডিং কাউন্সিল জিজ্ঞেস করেছিল—আচ্ছা, আর একটা কথা জিজ্ঞেস করি, ঠিক-ঠিক জবাব দেবেন—

—বলুন?

সরকারী উকিল জিজ্ঞেস করলে—মিসেস [illegible] ওঁকে অলকাদেবীকে কি আপনি চেনেন?

সন্দীপ বলেছিল—হ্যাঁ—

—সেই বিশাখাদেবীর সঙ্গে আপনার কী সম্পর্ক?

সন্দীপ বলেছিল—আমি বিডন স্ট্রীটের মুখার্জীবাবুদের বাড়িতে এককালে চাকরি করতুম, সেইখানেই বিশাখাদেবীর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়—

—কী রকম পরিচয়?

—বিশাখাদেবীর বিধবা মা আর তাকে দেখা-শোনার ভার আমার ওপর পড়েছিল।

উকিল আবার জিজ্ঞেস করলে—তার জন্যে কি আপনি মাস মাইনে পেতেন?

—হ্যাঁ।

—কতো মাইনে পেতেন?

—পনেরো টাকা আর থাকা-খাওয়া-পরা।

—সেই কাজের সূত্রেই কি আপনার সঙ্গে বিশাখাদেবীর মন দেওয়া-নেওয়া হয়ে গিয়েছিল? আর শুধু তাই-ই নয়, শেষ পর্যন্ত তার সঙ্গেই সাত পাক ঘুরে কি আপনার বিয়ে হয়েছিল?

সমস্ত কোর্টঘর তখন নিস্তব্ধ। একটা পিন পড়লেও শব্দ শোনা যাবে এমন নিস্তব্ধতা। প্রথমটায় সন্দীপ এই প্রশ্নে একটু বিব্রত বোধ করেছিল। তারপর একটু সাহস সঞ্চয় করে বলেছিল—আমি এ-প্রশ্নের উত্তর দেব না—

উকিল হাকিমের দিকে উদ্দেশ্য করে বলেছিল—মিঃ লর্ড, দেখুন আসামী আমার আসল প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে যাচ্ছেন। আমি প্রমাণ করতে চাইছি এই নব্বুই লাখ টাকা তছরুপের সঙ্গে আরো অনেকে জড়িত আছে—

হাকিম তখন সন্দীপের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন—আপনি এই প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন না কেন?

সন্দীপ বললে—আমি হুজুরের প্রতি সসম্মানে অনুরোধ রাখছি যে আমাকে এ প্রশ্ন করবেন না। আমি সজ্ঞানে সুস্থ চিত্তে বহাল তবিয়তে এই টাকা চুরি করেছি। এর জন্যে পৃথিবীর অন্য কেউ দায়ী নয়। এর জন্যে মাননীয় আদালত যে শাস্তি আমাকে দেবেন তা আমি মাথা পেতে নেব। কারোর বিরুদ্ধে আমার কোনও অভিযোগ নেই, এই চুরির পেছনে অন্য কারোর কোনও উস্কানি নেই, কারোর কোনও প্ররোচনা নেই, আর কোনও ব্যক্তি এর সঙ্গে জড়িত নেই।

সেদিন কোর্টে যখন সন্দীপের বিরুদ্ধে আট বছর সশ্রম কারাদণ্ডের হুকুম হলো, তখন সন্দীপ যেমন অবিচল ছিল, আজও এই নিঃসম্বল অবস্থায়ও তেমনি অবিচল আছে। সেদিন তার কিছু বা কেউ না থেকেও যেমন সব ছিল, সবাই ছিল, আজও তেমনি তার সব আছে, সবাই আছে। এখনই প্রকৃতভাবে সে সকলের সঙ্গে একাকার হতে পেরেছে। যতদিন আশ্রয় ছিল তার ততদিন সে নিরাশ্রয় ছিল। যতদিন মাথার ওপর তার ছাদ ছিল ততদিন তার পায়ের তলার মাটিও ছিল না। যতদিন সে সংসারে ছিল ততদিন সে সংসারী ছিল না, যখন সে সবকিছু ত্যাগ করে বৈরাগী হলো, তখনই যেন সে তার আসল সংসার ফিরে পেলে। এ এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। জ্ঞান যখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অখণ্ড নিয়মকে আবিষ্কার করে, যখন মানুষ দেখে যে কার্য-কারণের মধ্যে কোথাও কোনও ছেদ নেই, তখন সে মুক্তিলাভ করে—এ-কথা নাকি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলে গিয়েছিলেন। কথাগুলো কাশীবাবুর কাছে সে যখন শুনেছিল, তখন কিন্তু সে এর মানে বোঝেনি। এতোদিন পরে, আজ কথাটা তার কাছে যেন সত্য হয়ে উঠলো।

লোকগুলো কারখানা থেকে পিল্‌পিল্‌ করে বেরোচ্ছে ছুটির আনন্দে! কিন্তু ওরা জানে না যে কালই আবার ওদের নতুন করে বন্দীদশা শুরু হবে। আবার ছুটি হবে কালও, কিন্তু তার পরদিন আবার বন্দীদশা শুরু হবে। এমনি করেই বরাবর চলবে।

কিন্তু সন্দীপ? সন্দীপ এখন চিরকালের জন্যে মুক্ত। বিশ্ব-ভুবনে তার মুক্তি ছড়িয়ে আছে আকাশে বাতাসে অনন্ত নীল আকাশের তলায়। কাউকে জবাবদিহি করার দায় তার নেই, তাকে যদি কেউ ফাঁসি দেয় তাহলে আকাশ বাতাস অনন্ত নীলিমাকেই

বিশাখা বিজলীকে ডাকলে। বিজলী তখন রান্নাঘরে মঙ্গলাকে রান্নার কাজে সাহায্য করছিল। বললে—বিজলী, আমি একটু বেরোচ্ছি, আধ ঘণ্টার মধ্যেই আবার ফিরে আসবো—

বলে শাড়ি-শায়া-ব্লাউজ বদলে গাড়িতে গিয়ে উঠলো। উঠেই বললে—চল্ সন্দীপ-বাবুর বাড়ি—

বিশু আগে অনেকবারই গিয়েছে সেখানে। জানা ঠিকানা। সুতরাং বেশি কথা বলতে হলো না। বিশু যখন নেবুবাগানের গলির মুখে পৌঁছিয়েছে তখন সেখানে প্রচুর মানুষের ভিড়। গাড়ি সেখানে ঢুকবে না।

হঠাৎ এমন কী হলো এখানে যে এত মানুষের ভিড় হয়েছে?

বিশু বললে—আর ভেতরে ঢোকা যাবে না বউদিমণি—

বিশাখাও সেই ভিড়ের দিকে চেয়ে দেখছিল। আগে তো কতোবার এ-গলিতে এসেছে সে. কিন্তু কখনও তো এমন ভিড় এখানে দেখেনি। গাড়ি তো একেবারে সোজা বাড়ির সামনে গিয়েই দাঁড়িয়েছে।

কয়েকটা ছোকরা-ছেলে বিশাখার গাড়ির কাছে দাঁড়ালো। বললে—গাড়ি ঘুরিয়ে নাও ভাই, গাড়ি ভেতরে যাবে না—

বিশু বললে—আমি গিয়ে দেখে আসবো বউদিমণি, কী হয়েছে?

বিশাখা বললে—না, দরকার নেই, চল্ ফিরেই চল্, বরং অন্য আর একদিন আসা যাবে'খন্—আজকে থাক্—

বিশু বললে—না, আমি একটু গাড়িটা সাইড করে রাখছি, আপনি চুপ করে বসে থাকুন. আমি দেখে আসি ভেতরে গিয়ে কীসের এত ভীড়—

বলে বিশু চলে গেল তো চলেই গেল। আর ফিরে আসবার নাম নেই! বিশাখা আগেও অনেকবার এসেছে। একেবারে সোজা সন্দীপের বাড়ির দরজা পর্যন্ত গিয়ে গাড়ি দাঁড় করিয়েছে।

কিন্তু আজ এমন কী ঘটলো যে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছনো গেল না, গলির মোড়েই দাঁড়িয়ে যেতে হলো? গলির ভিড় যেন আরো বাড়ছে। আশে-পাশের সব বাড়ির লোক বারান্দা থেকে ঝুঁকে পড়ে ভিড়ের কারণটা বোঝবার চেষ্টা করছে। গাড়ির ভেতরে বিশাখা চুপ করে বসে ছিল অধীর আগ্রহ নিয়ে। বিশু ফিরে আসতে এত দেরি করছে কেন?

ঠিক তখনই বিশু হন্তদন্ত হয়ে ফিরলো। তখনও সে হাঁফাচ্ছে। তার সঙ্গে রতন।

রতনকে দেখে বিশাখা ভয়ে আঁতকে উঠেছে। জিজ্ঞেস করলে—কী হয়েছে রতন? তোমাদের রাস্তায় এত গোলমাল কীসের?

রতন তখন কাঁদতে আরম্ভ করেছে।

কোনও রকমে বললে—আমার বাবুকে ধরে নিয়ে গেছে—

—কে ধরে নিয়ে গেছে?

—পুলিশে।

—কেন?

রতন বললে—বাবু নাকি ব্যাঙ্ক থেকে নব্বই লাখ টাকা তছরূপ করেছে—

—সে কী? কী বলছো তুমি?

রতন তখনও তেমনি অঝোর ধারায় কাঁদছে। কাঁদতে কাঁদতে এক সময়ে গলা আটকে এলো। বিশাখার তখন পাগলের মতো অবস্থা। বললে—কে বললে তোমার বাবু ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তছরূপ করেছে?

—আমাদের বাড়িওয়ালা।

—বাড়িওয়ালা কী করে জানলে?

রতন বললে—থানা থেকে খবর নিয়ে এসেছে, পুলিশও বলেছে বাড়িওয়ালাকে। তাই

বলছে আমাকে বাড়ি খালি করে দিতে হবে। আমি এখন কী করি? আমি এখন কোথায় যাই? বাড়ির মালপত্র ছেড়ে কী করে যাই?

বিশাখা বললে—তুমি কিছু ভেবো না। আমি তো আছি। শেষ পর্যন্ত বাড়িওয়ালা যদি তোমাকে বাড়ি ছেড়ে দিতে বলে তো তুমি আমার বাড়িতে থাকবে। তোমার কিছু ভাবনা নেই।

তারপর একটু ভেবে বললে—তোমার বাবুর ঘরে আমার যে ছবিখানা দেওয়ালে টাঙানো থাকতো সেটা আমাকে দিতে পারো? ওটা আমি নিয়ে যেতে চাই—

রতন বললে—না, ওটা নেই—

—নেই? নেই কেন?

রতন বললে—সেটা বাবু যাবার সময়ে সঙ্গে করে নিয়ে গেছেন—

বিশাখা বললে—ঠিক আছে, আমি এখন আসছি। তোমার যদি কোনও খবর থাকে তো আমার বাড়িতে গিয়ে জানিও, আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করে থাকবো—

বলে আর দাঁড়ালো না, বিশুকে বললে—বিশু, এবার বাড়ি চল—

বিশু গাড়ি ছেড়ে দিলে। তারপর বিশাখার আর মাথার ঠিক রইলো না। সমস্ত মাথাটা শক্ত পাথর হয়ে গেল। শুধু মাথাটাই নয়, সমস্ত শরীরটাও। গাড়ি কোন রাস্তা দিয়ে কোথায় চলেছে তারও কোনও হদিস্ রইল না তার। সমস্ত শরীর-মন-মেজাজ যেন একটা যন্ত্র হয়ে তার নিজের অভ্যস্ত ক্রিয়া করতে লাগলো।
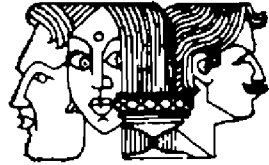
নিজের জীবনের পরিণামকে কে দেখতে চায়? কার এত সময় আছে? সবাই তো বর্তমান নিয়েই ব্যস্ত। শুধু ব্যস্ত নয়, একেবারে ব্যতিব্যস্ত। যখন আমরা টিকিট কেটে ট্রেনে উঠি তখন শুধু বাঁ দিকের স্টেশনগুলোর দিকেই চেয়ে চেয়ে মত্ত হয়ে উঠি, ডান দিকগুলোর দিকে চেয়েও দেখি না।

কিন্তু বাঁ দিকে তো সমস্তই অন্ধকার, সমস্তই কুয়াশাচ্ছন্ন। কিছুই দেখতে পেলুম না। আমাদের জন্ম ব্যর্থ হলো। ডান দিকেই তো জীবনের পরম উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে, সেইখানেই তো আমাদের আনন্দ-যজ্ঞ। সেইখানেই তো আমাদের নিমন্ত্রণ!

সেই আনন্দ-যজ্ঞের আয়োজনে আমাদের যাওয়া হলো না। তাই আমরা ক্ষুব্ধ, তাই আমরা হতাশাগ্রস্ত, তাই আমরা দুঃখী!

কিন্তু যদি আমরা ডান দিকটা দেখতে পেতাম?

সন্দীপের জীবনে তাই হতাশার স্থান নেই। সে জন্ম থেকেই জীবনের ডান দিকটা দেখতে পেয়েছে। সে জেনে গেছে পাওয়ার মধ্যে পরমার্থ নেই, পরমার্থ আছে দেওয়ার মধ্যে। যে দিতে পারে সে নিজেকে পায়, আর যে নিজেকে দিতে পারে, সে নিজেকেও পায় আর পরকেও পায়। আপনপর তার কাছে একাকার হয়ে যায়। তার পরমার্থ প্রাপ্তি হয়।

সন্দীপ সারা জীবন সেই পরমার্থ পাওয়ার জন্যেই লালায়িত হয়েছিল। তাই তার ভালো লাগতো কাশীবাবুকে, তাই তার ভালো লাগতো ধীরক-কাকাকে। তাই তার ভালো লাগতো রামপ্রসাদকে।

রামপ্রসাদের সেই গান তার এখনও মনে আছে—

মন কেন রে ভাবিস এত?
যেন মাতৃহীন বালকের মত।

ফাঁসি দেওয়া হবে, যা কখনও কারো পক্ষেই সম্ভব নয়।

সকলের হাতে একটা করে সাদা কাগজের প্যাকেট। সবাই প্যাকেট হাতে নিয়ে আনন্দে ডগমগ। সন্দীপের মনে হলো বড় অল্পতে ওরা খুশী। কাল যে আবার কাজের শৃংখলে বন্দী হবে এ-কথা এখন যেন আর ওদের মনে পড়ছে না।

কাছেই একটা চায়ের দোকান। সন্দীপ সেইখানে দোকানের ভেতরে গিয়ে বসলো। যতদিন ফ্যাক্টরি বন্ধ ছিল ততদিন এখানকার সব দোকান-পাট বন্ধ হয়ে পড়েছিল। বহু-দিন ধরে দোকানদারদের পেটে অন্ন ছিল না; মুখে হাসি ছিল না, রোজগার ছিল না। মেয়েরা দেহ বিক্রি করে জীবন চালিয়েছে, পুরুষরা শহরে গিয়ে ফুটপাতে তেলেভাজা বিক্রি করে আয় করবার আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। আবার এখন যখন ফ্যাক্টরি খুলেছে, তখন দোকানদাররাও আবার সকলের সঙ্গে যার-যার নিজেদের ঘরে ফিরেছে।

—কিছু খাবেন?

সন্দীপের ক্ষিধে পায়নি, তবু সকাল থেকে হেঁটে হেঁটে একটু ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিল।

বললে—কী খাবার আছে?

দোকানদার বললে—মুড়ি আছে, তেলেভাজা আছে। বাতাসা আছে, মুড়কী আছে। কী চাই আপনার বলুন না—

সন্দীপ যা চাইলে দোকানদার তাই-ই দিলে। তারপর বললে—জল দেবেন তো?

খেতে খেতে সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—ফ্যাক্টরিটা কবে খুললো ভাই?

—এই তো বছর অষ্টেক হলো। অনেকদিন কারখানাটা বন্ধ ছিল বলে বিক্রিবাটা একেবারে ছিল না—

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—এতদিন পরে কারখানা আবার খুললো কেন?

ভগবান জানে! কারখানাও খুললো আর আমাদেরও কপাল ফিরলো। শুনেছি কারখানার মালিক এখন খুব ভালো হয়ে গিয়েছে, মদ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। অনেকদিন জেলখানায় ছিল তো—

—জেলখানায় ছিল কারখানার মালিক? কেন?

দোকানদার বললে—নিজের বউকে খুন করেছিল বলে—

—খুন করেছিল কেন?

—সে কী? আপনি জানেন না কিছু? মালিকের স্বভাব-চরিত্তির খুব খারাপ ছিল মশাই। তাই আর একবার বিয়ে হয় মালিকের। এ বউটা ভালো। বরকে অনেক করে বলে কয়ে মদ ছাড়িয়েছে। তাই এখন কারবারে মন দিতে পেরেছে। মালিকের কাকা কারখানা তুলে নিয়ে ইন্দোরে চলে গিয়েছিল। তারাও আবার বেলুড়ে ফিরে এসেছে। তাই কারখানা আবার খুললো, তাতে হাজার-হাজার লোকের বরাত ফিরলো—

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—যারা কারখানা থেকে বেরোচ্ছে ওদের সকলের হাতে কাগজের প্যাকেট কেন ভাই? ওতে কী আছে?

দোকানদার বললে—মিষ্টি—

—মিষ্টি? কেন মিষ্টির প্যাকেট কে দিলে?

দোকানদার বললে—কারখানার বড়ো মালিক।

—কেন মিষ্টির প্যাকেট দিলে সবাইকে? রোজই দেয় নাকি?

—না, আজকেই প্রথম দিলে—

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—কেন দিলে?

দোকানদার বললে—দিলে মনের খুশীতে। বড়ো মালিকের মেয়ের বিয়ে যে আজকে।

—বড়ো মালিকের মেয়ের বিয়ে? বড়ো মালিক কে?

দোকানদার বললে—সে অনেক কথা!

—বড়ো মালিকের নাম কী বলো তো?

দোকানদার বললে—নাম বললে কি আপনি চিনতে পারবেন? বড়ো মালিকের নাম হলো মুক্তিবাবু। আসল নাম মুক্তিপদ মুখোপাধ্যায়। তাঁর মেয়ের ডাকনাম পিক্‌নিক্—

পিক্‌নিক্? বড়ো বিচিত্র নাম তো! এমন নাম তো হামেশা শোনা যায় না। তারপর?

দোকানদার বললে—সে সবই আমার শোনা কথা। সেই মেয়ে বিয়ের আগে নাকি বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছিল।

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে পালিয়ে গিয়েছিল মানে? কোথায় পালিয়ে গিয়েছিল?

—বিলেতে। সে মেয়েও আবার তেমনি। বড়োলোকের মেয়ে হলে যা-হয় আর কী? ছোটবেলায় মায়ের কাছ থেকে লাই পেয়ে পেয়ে নেশা-ভাঙ করতে আরম্ভ করেছিল। বাবা একদিন বকুনি দিয়েছিল বলে সে বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছিল—

—তারপর?

দোকানদারটা অনেক খবর রাখে। তারই কাছ থেকে জানা গেল কোন এক বড়লোকের ছেলের সঙ্গে নেশা-ভাঙ করতো বাপ-মা'কে না জানিয়ে। ইন্দোরে চলে যাবার পরেও মাঝে-মাঝে নাকি লুকিয়ে লুকিয়ে কলকাতায় আসতো। তখন শুরু হতো মুক্তিপদবাবুর ভাবনা। মেয়ে বাড়ি না ফিরলে কোন বাপ-মা চুপ করে থাকতে পারে? তখন খবর যেত থানায়। তখন কারখানার কাজ-কর্ম ফেলে মুক্তিপদবাবু ছুটতেন কলকাতায়, ছুটতেন মাদ্রাজ, বোম্বাই, সব জায়গায়। সব জায়গায় পুলিশের হেড্-কোয়ার্টারে গিয়ে ডায়েরী করতেন। ফ্যাক্টরির কাজে ঢিলে পড়তো। কারবার তখন লাটে উঠতো।

শেষ পর্যন্ত খোঁজ পাওয়া গেল লন্ডন থেকে। মুক্তিপদ সোজা চলে গেলেন লন্ডনে। মেয়ে সরোজ সরকার বলে একটা ছেলের সঙ্গে একসঙ্গে ঘর করছে। দুটো ছেলেমেয়েও হয়ে গেছে।

এদিকে কলকাতায় ফ্যাক্টরি খুলে গেছে, ওদিকে মেয়ের ওই অবস্থা। একলা মানুষ তখন কোনদিকে নজর দেবেন। সৌম্যপদের ওপর ভরসা করা যায় না।

তখন গোপাল হাজরাই ভরসা।

গোপাল হাজরাই বললে—আপনি চলে যান মিস্টার মুখার্জি। এদিকে কোনও গোল-মাল হবে না, আমি কথা দিচ্ছি—

সত্যিই মিস্টার হাজরা কথা রেখেছিলেন। কোনও গোলমাল হয়নি। ডি-এ-পি পার্টি শুরু থেকেই চুক্তিমতো কথা রেখেছে।

মুক্তিপদ লন্ডনে চলে গেলেন। আর দুদিন পরেই ছেলে-মেয়ে সমেত পিক্‌নিক্ আর সরোজ সরকারকে বেলুড়ে নিয়ে এলেন।

বললেন—তোমরা একসঙ্গে আছো তাতে কোনও আপত্তি নেই আমার, কিন্তু একটা আনুষ্ঠানিক বিয়ে করবো না, এ কী রকম কথা? আমি তোমাদের এখুনি বিয়ের ব্যবস্থা করবো—

ছেলের বাবাও রাজী। তিনিও বললেন—হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন, পারিবারিক বিয়ে একটা করা উচিত ছিল তোমাদের—

দোকানদার সবই জানে দেখা গেল। বললে—আজই সে-বিয়ে হলো। সেই জন্যেই আজ ফ্যাক্টরির সব লোককে এক প্যাকেট করে মিষ্টি দেওয়া হয়েছে—

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—তাহলে ফ্যাক্টরিতে আর কোনও গন্ডগোল নেই আর এখন?

দোকানদার বললে—না, এখন গোলমাল আর নেই বলেই তো আবার এ-পাড়ার সব দোকানী আমরা দুটো পয়সার মুখ দেখতে পাচ্ছি। শুনছি এবার নাকি ফ্যাক্টরির মাল তৈরি দু'কোটি টাকার বেশি হয়েছে—

ওদিকে তখন সূর্য ঢলে পড়েছে। দাম মিটিয়ে দিয়ে সন্দীপ উঠলো। আর বেশিক্ষণ দেরি করা চলবে না। অনেক দূরে যেতে হবে তাকে। বাগবাজার কি এখানে!

দোকানদার হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে—বাবু কোথায় থাকেন?

সন্দীপ বললে—থাকি মানে?

প্রশ্নটা সন্দীপের কাছে অদ্ভুত লাগলো। একটাই তো সব মানুষের থাকবার জায়গা। সবাই তো একটা জায়গাতেই থাকে। একটাই তো পৃথিবী, একটাই তো জীবন। শুধু তাই-ই নয়। একটাই তো সূর্য, একটাই তো চাঁদ। সব মানুষের তো একটাই আশ্রয়।

তবু কথাটার উত্তর দিতে হলো। উত্তর না দিলে খারাপ দেখায়।

বললে—আমি এখানকারই মানুষ, অনেকদিন এখানে আসিনি, তাই এদিকে দেখতে এলুম। কেন, এ-কথাটা জিজ্ঞেস করছো কেন ভাই?

—জিজ্ঞেস করছি এই জন্যেই যে শুনেছি কে একজন নাকি ব্যাঙ্ক থেকে নব্বুই লাখ টাকা চুরি করে এদের কোম্পানীকে দিয়েছিল, তাই ফ্যাক্টরিটা খুলেছে। সত্যি-মিথ্যে জানি না। শুনেছি তার নাম কী যেন লাহিড়ী, আপনি শুনেছেন নাকি? তার নাকি আট বছর আগে জেল হয়ে গিয়েছিল—

—তা হবে, আমি তাকে চিনি না। সে কেন টাকা দিয়েছিল? দোকানদার বললে—শুনি তো অনেক কথা। সব কথা বিশ্বাস হয় না—

সন্দীপ বললে—হ্যাঁ, তা হতেও পারে। কতো রকম পাগল আছে পৃথিবীতে, বোধহয় সেও একজন পাগলের কান্ড! সে যে টাকা দেবে তাতে তার স্বার্থ কী বলো? স্বার্থ ছাড়া কেউ কি কোনও কাজ করে দুনিয়ায়?

দোকানদার বললে—হ্যাঁ, আমিও তাই ভাবি। স্বার্থ ছাড়া কে আর কোন কাজ করে? যতো সব নিন্দুকদের দল। বাঙালীদের কেউ কারো নিন্দে করতে পারলে আর ছাড়ে না। আসলে বাঙালীরাই হলো বাঙালীদের সবচেয়ে বড় শত্রু বাবু—

দোকানদার লোকটা অশিক্ষিত, সাধারণ মানুষ। তবু বোধহয় অনেক ভুগেই এমন কথা তার মুখ দিয়ে বেরিয়েছে—

—যাই—বলে সন্দীপ উঠলো।

তারপর বাস রাস্তার দিকে চলতে লাগলো। চলতে চলতে আবার সেই রামপ্রসাদের গানটা মনে পড়লো—

মন কেন রে ভাবিস এত?
যেন মাতৃহীন বালকের মত।
ভবে এসে ভাবছো বসে
কালের ভয়ে হয়ে ভীত
ওরে, কালেরও কাল যে মহাকাল
সে-কাল মায়ের পদানত।
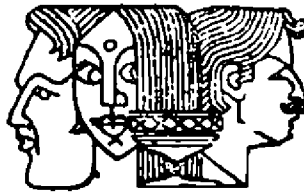
—রতন, ও রতন—

কতোকাল বাদে আবার এই নেবুবাগানে আসা। সেই যে সেই একদিন পুলিস এসে তাকে ধরে নিয়ে গেল, তারপর এই আজই প্রথম আবার তার বাড়িতে আসা।

কে একজন ভেতর থেকে বললে—কে?

একেবারে অচেনা গলা। এ-বাড়িতে তাহলে রতন আর নেই বোঝা যাচ্ছে। এখানে যদি না থাকে তাহলে কোথায় গেল সে! হয়তো যেখান থেকে এসেছিল সেখানেই চলে গেছে আবার।

একজন অচেনা ভদ্রলোক দরজা খুলে দিলেন। বললেন—কাকে চাই?

সন্দীপ বললে—রতন। রতন আছে?

—কে রতন?

সন্দীপ বললে—এ বাড়িতে কাজ করতো—

ভদ্রলোক বললেন—সে তো বহুকাল আগের কথা। আগে যিনি এ-বাড়িতে থাকতেন তাঁর চাকর ছিল সে—

—আগে কে ছিলেন?

ভদ্রলোক বললেন—আগে যিনি ছিলেন তাঁর নামটা ঠিক মনে পড়ছে না। তিনি নাকি একটা ব্যাঙ্কের ম্যানেজার ছিলেন। লাখ লাখ টাকা চুরির দায়ে তাঁর কয়েক বছরের জেল হয়। তারপর থেকে বাড়িটা খালি পড়েছিল। আমি ছ'বছর এখানে আছি—শুনেছি আমার আগে নাকি অন্য লোক এ-বাড়িতে ছিল—

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—যার জেল হয়েছিল তার আত্মীয়-স্বজন কেউ ছিল না?

—তা বলতে পারবো না আমি—

সন্দীপ আর দাঁড়ালো না সেখানে। এবার একবার ভুবন গাঙ্গুলী লেনে বিশাখার বাড়িতে গিয়ে দেখলে হয় কেমন আছে তারা। ফ্যাক্টরিটা যখন অতো ভালো চলছে তখন বিশাখারাও নিশ্চয় ভালো আছে। নিশ্চয়ই সুখেই কাল কাটাচ্ছে তারা। এতদিন পরে তাকে দেখলে নিশ্চয়ই সে খুশী হবে। বিশাখা তো জানে কী জন্যে তার জেল হয়েছিল। যা কিছু সন্দীপ করেছে সমস্তই তো বিশাখার সুখের জন্যে। আর সত্যি বলতে কী এখন বিশাখা ছাড়া আর কে-ই বা আছে তার? যারা আপন বলতে ছিল সবাই-ই তো চলে গেছে। বাবাকে সে দেখেনি কখনও। ছিল শুধু মা। মা চলে যাওয়ার পর আর কা'র জন্যে সে ভাববে? কে আছে তার আপন জন? আপন-জন বলতে আছে কেবল বিশাখা। অথচ একদিক থেকে দেখতে গেলে বিশাখা তার কেউ-ই নয়। এই মা মারা যাওয়ার পর বিশাখাকেই সে আপন-জন বলে মনে করতো। তার সুখের কথা ভেবেই সে ব্যাঙ্ক থেকে অতো টাকা চুরি করেছিল।

মনে আছে একদিন এই বাড়িতেই হঠাৎ এসে হাজির হয়েছিল বিশাখা। রতন যথারীতি দরজা খুলে দিতেই বিশাখাকে দেখে সন্দীপ অবাক।

সন্দীপ বলেছিল—তুমি হঠাৎ?

বিশাখা হাসতে হাসতে বলেছিল—আমি একা নই, আমার সঙ্গে কে এসেছে, দেখ—

বলতে বলতে যে লোকটা সামনে এগিয়ে এলেন তাঁকে দেখে সন্দীপ অবাক। দেখেই সঙ্গে সঙ্গে চেয়ার থেকে দাঁড়িয়ে উঠেছে।

বললে—আরে, আপনি? কী সৌভাগ্য আমার, বসুন বসুন—

সৌম্যপদ বললেন—আমাকে ডেকে নিয়ে এলো এ—

বলে বিশাখার দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে।

বিশাখাও তখন একটা চেয়ারে বসে পড়েছে। বললে—হ্যাঁ, আমিই ডেকে আনলুম। বললুম—চলো, সন্দীপের বাড়িতে চলো, দেখে আসবে চলো সেই মানুষটাকে যে এত-দিন ধরে আমাকে টাকা দিয়ে আসছে।

তারপর ছোটবাবুর দিকে চেয়ে বললে—জানো, এই সন্দীপ ছিল বলেই এত বছর আমি বেঁচেছিলুম। তুমি জেলখানাতে, বাড়ি-টাড়ি বেচে যা টাকা পেয়েছিলুম, সবই তো হামিদের পেটে চলে গেল। তারপর যে টাকাগুলো দিয়ে তোমাদের ফ্যাক্টরি খুললো তা সমস্ত এই সন্দীপের জন্যে।

ছোটবাবু একটু হাসলেন। দেখে মনে হলো কৃতজ্ঞতার হাসি।

বললেন—আমি সব শুনেছি।

সন্দীপ বললে—আমি বহুদিন আপনাদের অন্ন খেয়েছি, তাই...

বিশাখা বললে—না, সেটা বড়ো কথা নয়, আমাদের বিপদের দিনে তুমি না থাকলে কী হতো বলো দিকিনি। হাজার হাজার লোক বেকার, ফ্যাক্টরি বন্ধ। ওদিকে লেবার-ট্রাবল। সেই সময়ে চারদিকে যখন অন্ধকার দেখছি, তখন তুমি টাকা না দিলে কী হতো বলো তো!

ছোটবাবু বললেন—আমাদের আরো কয়েক লাখ টাকা দরকার। টাকা না দিলে পার্টি-লীডাররা খুশী হবে না! তারা আরো টাকা চাইছে। আমার কাকাও রাজী হয়েছে টাকা দিতে—আপনাদের ব্যাঙ্ক থেকে যদি আরো কিছু টাকা পাই তাহলে আমাদের আরো উপকার হয়!

সন্দীপ বললে—আমি যথাসাধ্য করবো। যত শীঘ্র পারি আমি বিশাখাকে টাকা দিয়ে আসবো! আপনারা আমাকে একটু সময় দিন—

ইতিমধ্যে রতন বলা-নেই কওয়া-নেই দু'কাপ চা করে এনে—সামনের টেবিলে রাখলো।

ছোটবাবু বললেন—আবার চা কেন?

সত্যিই তো! সন্দীপ বললে—না না, সত্যিই তো আবার চা দিলে কেন? আমি তো বলিনি চা করতে। না খেতে ইচ্ছে করে তো আর চা খেতে হবে না—

বিশাখা বললে—না খাবো, কেন মিছিমিছি চা'টা নষ্ট করবে, খেয়ে নাও—

আশ্চর্য! ছোটবাবু বিশাখার কথা শুনে সত্যি-সত্যিই চায়ে চুমুক দিলেন। এও, বোধহয় এরকম কৃতজ্ঞতার প্রকাশ বা ভদ্রতা। যার কাছে প্রত্যাশা করে মানুষ, তার দান অস্বীকার করার অর্থ তাকে অপমান করা।

সন্দীপ বললে—আমি রতনকে চা করতে বলিইনি, তবু করেছে—

সৌম্যবাবু বললেন—তা করুক, ওকে কিছু বলবেন না, চা খেতে ভালোই লাগছে—

বিশাখাও বললে—হ্যাঁ; আমারও খেতে ভালো লাগছে—

সন্দীপ বললে—টাকাটা আপনাদের কবে চাই?

সৌম্যবাবু বললেন—যতো তাড়াতাড়ি পাওয়া যায় ততোই ভালো। মাসকাবার আসছে, সকলকে আবার মাইনেও দিতে হবে, আবার প্রোডাকশন্ বাড়াতেও হবে। তার-পর বরদা ঘোষাল আর গোপাল হাজরাও টাকার জন্যে তাগাদা দিচ্ছে—

—আগেও তো তাদের টাকা দিয়েছেন। এখন আরো চাই? সৌম্যবাবু বললেন—যতোদিন ফ্যাক্টরি থাকবে, বরাবর তাদের টাকা দিয়ে যেতে হবে। এইটেই নিয়ম, তা না হলেই লেবার-ট্রাবল্ শুরু হয়ে যাবে। ফ্যাক্টরি চালাতে গেলে সকলকেই টাকা দিয়ে যেতে হবে। এইবার রেলওয়ে মিনিস্ট্রিকেও ধরতে হবে। রেলওয়ে আমাদের মস্ত বড়ো একটা পার্টি। যখন আউটপুট বাড়বে তখন তাদের কমিশন দিতে হবে। কমিশন না দিলে কোনও কাজই আমরা পাবো না। আর তারপর যখন ইন্‌স্‌পেকটাররা আসবে মাল ইন্‌স্‌পেক্‌শনের জন্যে তখন তাদের ঘুষ দিতে হবে, নইলে মাল 'পাস' করবে না। এই-ই হচ্ছে বেঙ্গলের ফ্যাক্টরির এখনকার হাল। তার ওপর পুলিশ আছে—পুলিশকেও চাঁদা দিতে হবে—

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—এখন কতো টাকা আপনার দরকার?

সৌম্যবাবু বললেন—এখন আড়াই লাখ হলেই চলবে।

সন্দীপ বললে—আচ্ছা, কাল পরশুর মধ্যেই আমি টাকাটা নিজেই গিয়ে দিয়ে আসবো—

সৌম্যবাবু বললেন—ঠিক আছে, আমি কাল বাড়িতেই থাকবো, আপনার জন্যে অপেক্ষা করবো, এখন উঠি। মিস্টার হাজরার আজকে রাত্তির দশটার মধ্যে আবার আসবার কথা আছে—

সৌম্যবাবু উঠে দাঁড়ালেন। বিশাখা বললে—জানো সন্দীপ...

বলে সৌম্যবাবুর দিকে চাইলে। বললে—সেই কথাটা বলি সন্দীপকে?

—কোন্ কথাটা?

—সেই তোমার রিভলবার কেনার কথাটা?

বলে সন্দীপের দিকে চেয়ে বললে—জানো সন্দীপ, আমার শ্বশুর-শ্বশুর আর ছোট-বাবু দু'জনেই দুটো রিভলবার নিয়েছেন।

—সে কী? কেন?

—মিস্টার হাজরা পরামর্শ দিয়েছেন। অন্য পার্টির ইউনিয়ন নাকি খুন-খারাপি-কাণ্ড করতে পারে, তাই। কেউ চাইছে না যে ডি-এ-পি পার্টি এত বড়ো হোক। এখন নিজেদের মধ্যেই ঝগড়া বেধে গেছে। ডি-এ-পি পার্টির অনেক শত্রু হয়েছে।

সন্দীপ বললে—না, রিভলবার নেওয়া ভালোই হয়েছে। আজকাল চারদিকে কথায় কথায় খুনোখুনি হতে আরম্ভ করেছে, এ-সময়ে একটু সাবধানে থাকা ভালো—

বিশাখা বললে—কিন্তু যদি কোনও এ্যাক্সিডেন্ট হয়?

সন্দীপ বললে—এ্যাক্সিডেন্ট যদি হবার হয় তো রিভলবার না থাকলেও হতে পারে। আপনি ঠিকই করেছেন ছোটবাবু।

বিশাখা আপত্তি করে উঠলো। বললে—সে কী, তুমি সাপোর্ট করছো? ও-সব জিনিস বাড়িতে না রাখাই তো উচিত।

সন্দীপ বললে—গরীব লোকদের ও-সব কিছু রাখার দরকার নেই, কিন্তু আজকাল তো টাকাওয়ালা লোকেদের ওপরেই সকলের রাগ। প্রত্যেক মিনিস্টার প্রত্যেক ফিল্ম-স্টারদের কাছে শুনেছি রিভলবার থাকে! থাকলে কোনও দোষ নেই। একটা প্রোটেক-শন থাকা ভালো—

সৌম্যবাবু এতক্ষণ কথাগুলো শুনছিলেন। এবার বলে উঠলেন—আর নয় সন্দীপ-বাবু, এবার চলি। মিস্টার হাজরা হয়তো এসে বসে থাকবেন আমার জন্যে...

এতক্ষণ সমস্ত অতীতটাই যেন গ্রাস করে রেখেছিল সন্দীপকে। কোথায় গেল সেই সব দিন, কোথায় গেল সেই সব ঘটনা। অতীত যেন এতক্ষণ হামাগুড়ি দিয়ে তার দিকে এগিয়ে আসছিল।

সেই ছোটবাবু এখন আবার 'স্যাক্সবী-মুখার্জি' কোম্পানীর ডেপুটি ম্যানেজিং ডাইরেক্টার হয়েছেন। ভালোই হয়েছে। কিন্তু এটাও তো ভালো নয় যে পলিটিক্যাল পার্টিকে চাঁদা দিতে হবে, পুলিশকে চাঁদা দিতে হবে, আবার সঙ্গে সঙ্গে গুণ্ডাদেরও চাঁদা দিতে হবে। এত চাঁদা কেন দিতে হবে? সে-চাঁদার কথা তো ইনকাম-ট্যাক্স্-এর খাতায় লেখা থাকবে না!

কিন্তু চাঁদা না দিলে তো ব্যবসা করাও চলবে না। এই যে সন্দীপ সৌম্যবাবুকে এত টাকা দিয়েছিল তার রেকর্ড তো কোথাও নেই। কোথাও লেখা থাকবে না সে-সব কথা। ইনকাম-ট্যাক্স অফিস যদি জানতে চায় যে এ-সব টাকা কোথা থেকে এলো তখন কোম্পানী কী জবাব দেবে? কিন্তু যদি ঘুষ দেওয়া হয় তাহলে কেউ আর জবাবদিহি চাইবে না। টাকা দিতে পারলেই সবাই বন্ধু, আর টাকা না দিতে পারলেই সবাই শত্রু। এমনি করেই এখনকার কলকাতা চলছে, এমনি করেই এখনকার কলকাতা চলবে।

তাহলে কি পৃথিবীতে 'সুখ' বলে শব্দটা শুধু 'ডিকস্নারী'তেই থাকবে? বাস্তব জগতে বেঁচে থেকে কি সুখ পাওয়া যাবে না?

সন্দীপ আট বছর ধরে জেলখানার ভেতরে বসে বসে কেবল এই সব কথাগুলোই ভেবেছে। ভেবেছে কী করলে মানুষ সুখী হবে? পুণ্য করলেই কি সুখ পাওয়া যাবে? স্বয়ং ঈশ্বরেরও কি ব্যাঙ্ক আছে? পুণ্য কি একটা 'ডিম্যাণ্ড ড্রাফট', যে সেটা যে-কোনও একটা ব্যাঙ্কে জমা দিলেই ঈশ্বরের কাছ থেকে সুখের আশীর্বাদ পাওয়া যাবে?

মনে পড়ে গেল পাঁচ নম্বর ভুবন গাঙ্গুলী লেনের বাড়িটার কথা! বাড়িটা বেশি দূর নয়। আস্তে আস্তে সেই দিকেই পা বাড়িয়ে দিলে সন্দীপ। রাস্তায় লোকজনের ভিড় বেড়ে চলেছে। এখন কাছারির বন্ধ হওয়ার সময়। চারদিকে চেয়ে দেখতে লাগলো সে।

আট বছর বাদে আবার এ-পাড়ায় আসছে। মনে পড়লো তখন দেওয়ালের গায়ে যে-সব স্লোগান লেখা থাকতো এখনও সেগুলো লেখা রয়েছে। তফাতের মধ্যে এই যে সেগুলো একটু ঝাপসা হয়ে এসেছে। কিন্তু তবু স্পষ্ট পড়া যায়—

"হলদিয়াতে জাহাজ নির্মাণ
কারখানা
করতে হবে"

আর একটা দেয়ালে লেখা রয়েছে—

"কেন্দ্রের কল-কারখানায় কেন্দ্রীয়
পুলিশ বাহিনী
রাখা চলবে না"

আর একটা জায়গায় সেই পুরনো স্লোগান লেখা—

"কেন্দ্রের আয়ের শতকরা
পঁচাত্তর ভাগ
রাজ্য সরকারকে দিতে হবে"

আর একটা স্লোগান—

"খুনী সি. পি. এম'কে
আর একটাও ভোট নয়"

আর একটা জায়গায় লেখা রয়েছে—

"ডাইরেক্ট এ্যাকশান পার্টি
জিন্দাবাদ"

সন্দীপ অবাক হয়ে গেল সেই সব পুরনো লেখাগুলো দেখে। এতদিন পরেও লেখাগুলো কেউ মুছে দেয়নি। এখনও সেই কলকাতা একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে একই চেহারা নিয়ে, অথচ কত বছর গড়িয়ে গেল নিঃশব্দে। এখানকার মানুষগুলোও কি স্থাণুর মতন সেই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে? এদের কি কোনও পরিবর্তন হতে নেই এত বছরে? তাহলে কি যারা ক্ষমতা আঁকড়ে দেশের মাথায় বসেছিল, সেই তারাও এখনও সেখানে বসে আছে?

আশ্চর্য! সন্দীপ আশ্চর্য হয়ে গেল চারদিকের আবহাওয়া দেখে! এই মানুষ-গুলো কি কখনও মানুষ হবে না? তাহলে সেই আগেকার মতো পলিটিক্স নিয়েই এখনও সবাই উন্মত্ত হয়ে আছে?

সন্দীপের ইচ্ছে হলো বিশাখা আর সৌম্যবাবুকে দেখতে। তারা কেমন আছে তাই জানতেও ইচ্ছে হলো। সে নিজের সর্বস্ব খুইয়ে যাদের জীবনে সুখ ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিল তা পেরেছে কিনা তা-ও দেখতে ইচ্ছে হলো। তারা যদি সুখী হয় তাহলে তার আর কোনও দুঃখ থাকবে না। সে তাহলে বুঝবে যে তার বেঁচে থাকা সার্থক হয়েছে। তার মানুষ জন্ম সফল হয়েছে।
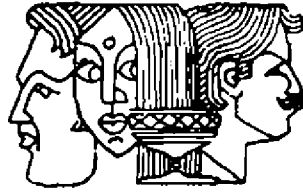
আমি বললাম—তারপর?

অজয়বাবু রোজ একটু একটু করে সন্দীপের জীবন-কাহিনী বলতেন আবার পরের দিনের জন্যে কাহিনীটি বাকি রাখতেন।

আমি একদিন জিজ্ঞেস করলাম—এত কথা সব হামিদ সাহেব আপনাকে বলেছে?

অজয়বাবু বললেন—হ্যাঁ। একদিনে বলেনি। আমি হাইকোর্টের এ্যাড্‌ভোকেট আর হামিদ সাহেব খুব ছোট অবস্থা থেকে বড়োলোক হয়েছিল। মানুষ একবার বড়োলোক হয়ে গেলে তখন অতীতের অপকর্মের কথা বলতে আর সঙ্কোচ করে না।

হামিদ সাহেব বলতো—আমি শুধু একলাই নই, আমাদের দলে তখন অনেক লোক ছিল। আমাদের সকলের ওইটেই ছিল পেশা। এখন বড়োলোক হয়েছি বটে, কিন্তু ও-পথ ছাড়া আমাদের অন্য কোনও পথ ছিলও না। আমার বাবারও ছিল ওই পেশা। কিন্তু বাবা ও-পেশাতে বড়োলোক হতে পারেননি। আমি বড়োলোক হওয়ার পর ও-পেশা ছেড়ে দিয়েছি। আর কার জন্যেই বা ও-সব করবো। আমার তিন ছেলে। তিন ছেলেই বড়ো বড়ো চাকরি করে, তারা তিনজনই অনেক টাকা মাইনে পায়, তারা আমার অতীতটা জানে না। আর আমিও তাদের ও-সব কথা জানাইওনি। আর শুধু তারাই নয়, কেউই জানে না। আপনি সৌম্যপদ মুখার্জির মামলাটা জানেন বলেই এক আপনাকেই সবটা বলছি। আর সন্দীপ লাহিড়ী যখন জেল খাটতেন তখন তাকেও দেখেছি। তাকেও চিনি। শেষ পর্যন্ত তাকে দেখেছি আমি—

—কী দেখেছে হামিদ সাহেব?

অজয়বাবু বললেন—তাঁর শেষটাও বলেছে হামিদ সাহেব—শেষটা বড়ো প্যাথেটিক—

—শেষটা কী?

অজয়বাবু বললেন—নেবুবাগান লেনের বাড়ি থেকে সন্দীপ লাহিড়ী গেলেন ভুবন গাঙ্গুলী লেনের বিশাখাদেবীর বাড়িতে।

মনে আছে সন্দীপের জীবনে সে এক মর্মান্তিক সিদ্ধান্ত। কেন সে গেল সেদিন বিশাখার সঙ্গে দেখা করতে? আসলে বিশাখার সঙ্গে দেখা করাটা বড়ো কথা নয়, বড়ো কথা হলো বিশাখা সুখী হয়েছে কিনা সেইটে জানা। অর্থাৎ তার এত দিনের জেল খাটা সার্থক হয়েছে কিনা তাই দেখা।

ভুবন গাঙ্গুলী লেনের বাড়িতে আট বছর আগে সন্দীপ অনেক বার এসেছে। সৌম্য-বাবু জেল থেকে ছাড়া পাবার পরেও অনেকবার এসেছে। সৌম্যবাবুর সঙ্গে গল্প করে গেছে। অত রাশভারি লোক, তবু সন্দীপের সঙ্গে ভালো ব্যবহারও করেছে। তবে সে-সব অনেক কাল আগের কথা। তখন সন্দীপ ব্যাঙ্ক থেকে লাখ লাখ টাকা দিতে আরম্ভ করেছে। তখন সন্দীপকে খুব খাতিরও করেছে সৌম্যবাবু।

সে-সব কি আজকের কথা? আট ন'বছর হয়ে গেছে তারপর।

সন্দীপ আস্তে আস্তে সদর দরজার কড়া নাড়লো। এত বছরেও বাড়িটার কোনও পরিবর্তন হয়নি। পুরনো বাড়িই কিনেছিল বিশাখা। তারপরে বাড়িটার গায়ে আর রং করা হয়নি। তার ওপর দিয়ে কতো গ্রীষ্ম গেছে, কতো বর্ষা গেছে, কতো শীত গেছে, তবু এখনও বাড়িটার কোনও অদল বদল, কোনও পরিবর্তন হয়নি।

কড়া নাড়ার পরেও অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো। তারপর দরজা খুললো।

—কে?

মঙ্গলাকে চিনতে পারলে সন্দীপ।

সন্দীপ বললে—মঙ্গলা না?

মঙ্গলা বললে—হ্যাঁ, আজ আর আমাদের কয়লা দরকার নেই...

সন্দীপ বললে—আমি কয়লাওয়ালা নই, আমায় চিনতে পারছো না তুমি?

তবু মঙ্গলা চিনতে পারলে না। কিন্তু খানিকক্ষণ পরেই যেন জ্ঞান ফিরে পেয়েছে। বলে উঠলো—ও, দাদাবাবু, আপনি? আমি চিনতে পারিনি প্রথমে। কিন্তু এ কী চেহারা হয়েছে আপনার? জেল থেকে কবে ছাড়া পেলেন?

সন্দীপ বললে—আজই সকালে।

মঙ্গলা বললে—আসুন, ভেতরে আসুন—

—তোমার দাদাবাবু বাড়িতে আছেন?

সন্দীপ ততক্ষণ বাড়ির ভেতরে পা দিয়েছে।

মঙ্গলা বললে—দাদাবাবু এ-বাড়িতে তো থাকে না—

সন্দীপ অবাক হয়ে গেছে কথাটা শুনে। বললে—এ-বাড়িতে থাকেন না? তাহলে কোথায় থাকেন? বউদি-মণি কী করছেন?

মঙ্গলা বললে—বউদি-মণির অসুখ, ঘরে শুয়ে আছেন। চলুন—

বলে পাশের শোবার ঘরে নিয়ে যেতেই সন্দীপ দেখলেন বিশাখা বিছানার ওপর একলা শুয়ে আছে। ঘরের জানালা দরজা সব বন্ধ। চারদিকে অন্ধকার।

সন্দীপের পায়ের শব্দ পেয়ে বিশাখা চোখ চেয়ে দেখলে। কিন্তু কাউকে চিনতে পারলে না যেন। জিজ্ঞেস করলে—কে?
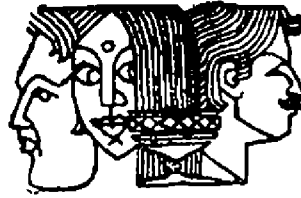
সন্দীপ বললে—আমি—

—আমি কে?

সন্দীপ আবার বললে—আমি সন্দীপ। ...তোমার কী হয়েছে?

সন্দীপের নাম শুনেই বিশাখা কী করবে যেন বুঝতে পারলে না, বিছানা থেকে কোনও রকমে উঠতে চেষ্টা করতে লাগলো।

বললে- তুমি কবে জেল থেকে ছাড়া পেলে?

—আজই সকালে। কিন্তু তোমার এ-রকম চেহারা হলো কী করে বলো বিশাখা? আর ছোটবাবুই নাকি বাড়িতে থাকে না শুনলুম। তিনি কোথায়?

বিশাখা একসঙ্গে এতগুলো প্রশ্নের কী উত্তর দেবে বুঝতে না পেরে যেন কেঁদে ফেলবার উপক্রম করলে। মুখ দিয়ে কিছু কথা বলতে পারলে না।

সন্দীপ বললে—কথা বলছো না কেন? কী হলো? তোমার অসুখ করেছে? তুমি শুয়ে থাকো! আমি পরে আসবো, এখন না হয় চলে যাচ্ছি—

—না না, তুমি চলে যেও না। এত বছর পরে তুমি এলে, তোমার সঙ্গে যে আমার অনেক কথা ছিল। বোস, ওই চেয়ারটাতে বোস তুমি—

সন্দীপ বললে—আমার জন্যে তোমায় ভাবতে হবে না। তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যেই আমি তোমার বাড়িতে এসেছি। তোমার কী অসুখ? ডাক্তার দেখিয়েছ?

বিশাখা বললে—ডাক্তার দেখিয়ে কী হবে? আমি আর বাঁচতে চাই নে, এখন আমার মরাই ভাল। কেন তুমি আমাদের অতো টাকা দিতে গেলে? আর টাকা দিলে বলে

তুমি আট বছর জেল খাটলে। ও-টাকাতে তো আমার কোনও উপকারই হলো না। তার চেয়ে অতো টাকা না দিলেই ভালো হতো! কেন তুমি অতো টাকা দিতে গেলে? তাতে কার কী লাভ হলো? শুধু শুধু তুমি মাঝখান থেকে জেল খাটতে গেলে—

সন্দীপ বললে—আমার কথা ছেড়ে দাও, তুমি তোমার কথা বলো—

বিশাখা বললে—আমার আর কী কথা। আমি তো মরতে বসেছি—আর-জন্মে বোধ-হয় অনেক পুণ্য করেছিলুম তাই আজ তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল—

সন্দীপ বললে—বারবার অতো মরে যাওয়ার কথা বলছো কেন, কী হয়েছে তাই বলবে তো? সত্যি বলো না কী হলো তোমাদের? আমি এখানে আসবার আগে তো তোমাদের বেলুড়ের ফ্যাক্টরিতেও গিয়েছিলুম, সেখানে গিয়ে তো দেখলুম ফ্যাক্টরি বেশ ভালোই চলছে, মুক্তিপদবাবুর মেয়ের বিয়ে হয়েছে, ফ্যাক্টরির সব স্টাফকে মিষ্টির প্যাকেট বিলানো হয়েছে। আমি ভেবেছিলুম তুমিও সুখী হয়েছো। তাই দেখতেই তোমাদের বাড়িতে এসেছিলুম। কিন্তু তোমার এমন অবস্থা কেন হলো? এ তো আমি কল্পনা করতেও পারিনি—

বিশাখা বললে—আমার কপালেরই দোষে সন্দীপ! সব দোষ আমার কপালেরই। আমার দিদি-শাশুড়ীর গুরুদেব আমার 'বিশাখা' নামটা বদলে 'অলকা' রাখতে বলে-ছিলেন। তাঁর কথামত তো নাম বদলানো হয়ে ওঠেনি—বদলালে হয়তো আমার এমন অবস্থা হতো না—

বলে চাদরে মুখে ঢেকে হাউ-হাউ করে কাঁদতে লাগলো।

সন্দীপ বিশাখার সামনে গিয়ে চাদরটা মুখের ওপর থেকে আস্তে আস্তে তুলে দিয়ে বললে—ছি, কাঁদতে নেই। যারা বোকা তারাই কাঁদে। কেঁদো না, আমি তো আছি। আমি তোমাকে সুখী করবো, আমাকে বলো কী হয়েছে তোমার? ছোটবাবু তোমাকে এই অবস্থায় ফেলে চলে গেলেন কন? কোথায় গেলেন?...

বিশাখার কান্নার আবেগ তখনও কাটেনি। বললে—ওই রাক্ষুসীটার জন্যে—

—রাক্ষুসী? রাক্ষুসীটা কে?

—ওই বিজলী। তুমি তো জানো তাকে, আমার খুড়তুতো বোন! সেই বিজলীই ছোটবাবুকে বশ করেছে—

—বশ করেছে মানে?

বিশাখা বললে—আমার হাত থেকে ছোটবাবুকে ছিনিয়ে নিয়েছে—

—ছিনিয়ে নিয়েছে?

—হ্যাঁ, ছিনিয়ে নিয়েছে সন্দীপ, ছিনিয়ে নিয়েছে। তুমি তো জানো ছোটবাবুর নেশার কথা। নেশা করতে পেলে ছোটবাবু আর কিছু চায় না।

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—নেশা? কীসের নেশা? মদ? মদের কথা বলছো?

বিশাখা বললে—শুধু কি মদ? সব রকম নেশা। তুমি তো জানো সন্দীপ, আমি সব সময়ে ছোটবাবুকে সামলে সামলে রাখতুম! আমি অনেকদিন ছোটবাবুকে মদ না খাইয়েও রেখেছি। তখন দেখেছি তার শরীর বেশ ভালো হচ্ছে, একটু একটু করে উন্নতি হচ্ছে, কিন্তু সমস্ত গোলমাল করে দিলে ওই রাক্ষুসী। ওর একটা বিয়েও দিতে পারলে না কাকা! ও-ই ছোটবাবুকে গ্রাস করে বসলো—

—কী করে?

বিশাখা বললে—কাকা বেঁচে থাকতেই ওকে ওসকানি দিত, শেষকালে যখন কাকা মারা গেল তখন একেবারে বেপরোয়া হয়ে গেল ও। আমি একটুখানির জন্যে বাইরে কোথাও গেলেই বিজলী ছোটবাবুর ঘরে ঢুকে পড়তো। তারপরে যখন ফিরে আসতুম দেখতুম দুজনে খাটের ওপর জড়াজড়ি করে শুয়ে আছে...

—তারপর?

বিশাখা বললে—তারপর আর কী? কান্না...কেবল কান্না...শেষকালে একদিন ওকে

বাড়ি থেকে রাস্তায় বার করে দিয়ে সদর দরজায় খিল লাগিয়ে দিলুম। তখন বাইরে থেকে পাড়া কাঁপিয়ে কান্না আরম্ভ করে দিলে...

—তারপর? ছোটবাবু কিছু বলতেন না?

বিশাখা বললে—তখন ছোটবাবুর অন্য মূর্তি। ছোটবাবু একদিন আমাকে রিভলবার উঁচিয়ে খুন করতে এলো। আমি তখন দরজা খুলে দিলুম। পাড়ার মধ্যেও খুব হৈ-চৈ পড়ে গেল। সবাই দল বেঁধে ছোটবাবুর বিরুদ্ধে কেচ্ছা করতে লাগলো। সবাই বলতে লাগলো ভদ্রলোকের এসব কেলেঙ্কারী করা চলবে না—

—সে কী? তুমি কী করলে?

বিশাখা বললে—আমি মেয়েমানুষ, কী করবো। মাঝে-মাঝে বাড়িতে ঢিল পড়তো। রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে অনেকে গালাগালি দিয়ে উঠতো ছোটবাবুর নাম করে।

—তারপর?

বিশাখা বললে—তারপর একদিন ছোটবাবু বাড়ি ছেড়ে দিয়ে অন্য পাড়ায় চলে গেল। তারপর থেকে আমি এ-বাড়িতে একলা পড়ে আছি। আমাকে কেউ দেখবার নেই।

—ছোটবাবু তোমাকে ছেড়ে চলে গেলেন? কোথায় চলে গেলেন?

বিশাখা বললে—পার্ক স্ট্রীটে—

—পার্ক স্ট্রীটে? নতুন বাড়ি কিনলেন?

—হ্যাঁ—

—সে কী? কতো নম্বর বাড়ি? ঠিকানা কী?
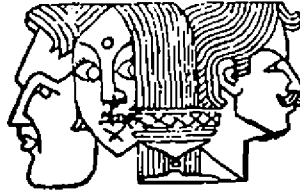
—সেও এক বিচিত্র কাহিনী। স্যাক্সবী-মুখার্জি কোম্পানীর প্রোডাকশন তখন আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। চারদিক থেকে প্রচুর অর্ডার আসছে। মাল কেনবার আগে ইন্‌সপেকটাররা আসছে মাল পরীক্ষা করবার জন্যে। তারা পাস্ করে দেবার আগে তাদের 'কমিশন' বা ঘুষ দিতে হবে। তাদের থাকা-খাওয়ার জন্যে খরচও হচ্ছে প্রচুর।

তাতে মালিক-পক্ষের কোনও আপত্তি নেই। মিস্টার মুখার্জি এসব ব্যাপারে বরাবরের মতোই মুক্তহস্ত। তাঁর আগেও দেবীপদ মুখার্জিও ঘুষ দিয়ে এসেছেন। শক্তিপদ মুখার্জিও ঘুষ দিয়ে এসেছেন। এখন মুক্তিপদ মুখার্জিও ঘুষ দিচ্ছেন। যতো ঘুষ দেওয়া হবে ততো অর্ডার বাড়বে।

তবে অন্যদিকে অন্য খরচটা একটু বেড়েছে। সেটা ইউনিয়নের উৎপাত। আগে ওটা এত ছিল না। এখন লেবার ট্রাবল্ এড়াতে চাইলে এই পার্টি-লীডারদেরও কমিশন দিতে হবে। আগে গোপাল হাজরা ছিল না। এখন তাদের দাপট সামলাতে গেলে টাকা খরচ করতে হবে। যতো দিন যাচ্ছে ততো তাদের পেছনে খরচের বহর বাড়ছে।

তা হোক, গোপাল হাজরাদের খাঁই, ইন্‌সপেক্‌টারদের খাঁই বাড়লেও লোকসান নেই, মালের দাম বাড়িয়ে দিলেই লাভের অঙ্ক বেড়ে যাবে। তাতে পরোয়া নেই মালিকদের। পাবলিক ভুগলে আমাদের ক্ষতি নেই। আমাদের পকেট ভর্তি হলেই হলো।

গোপাল হাজরাও এই কথাই বলে। বলে—মালের দাম বাড়িয়ে দিন না মিস্টার মুখার্জি। টাকা তো দেবে গভর্মেণ্ট। আপনি অত ভাবছেন কেন? গভর্মেণ্ট তো আর নিজের পকেট থেকে টাকা দিচ্ছে না। রেলের টিকিটের দাম বাড়িয়ে দিয়ে সব লোকসান উসুল করে নেবে। মরবে পাবলিক। পাবলিকের তো কোনও বুদ্ধি-সুদ্ধি নেই, তাদের রেলে চড়তেই হবে। আজ যে স্টেশনের টিকিটের ভাড়া ছিল তিন টাকা

সেই স্টেশনের রেলের ভাড়া হয়েছে এগারো টাকা। তাতেও কি রেলের টিকিটের বিক্রি কমেছে? সব জিনিসেরই তো এখন দাম বাড়ছে। আর রেলের টিকিটের ভাড়া বাড়লেই দোষ? আর দেখুন না হুইস্কির দাম কত ছিল আর কত বেড়েছে। তাতে কি হুইস্কি খাওয়া কমেছে? দাম বেড়েছে বলে আমি কি হুইস্কি খাওয়া কমিয়ে দিয়েছি? না, আপনি কমিয়ে দিয়েছেন? কেউই কমাইনি। যতোই হুইস্কির দাম বাড়ুক, আমরা কেউই হুইস্কি খাওয়া কমাবো না—হুইস্কি খাওয়া ছাড়াবও না—

এই আলোচনা হওয়ার মধ্যেই একদিন বাড়ির জানালার ওপর ঢিল পড়লো। ঢিল পড়বার শব্দ পেয়ে গোপাল হাজরা চমকে উঠেছে—

—ওটা কীসের শব্দ?

সৌম্যপদ বললে—এই রকম মাঝে মাঝে কারা ঢিল ছোঁড়ে—

গোপাল হাজরা জিজ্ঞেস করলে—কারা ছোঁড়ে?

সৌম্যপদ বললে—কে ছোঁড়ে, কী জানি! ছোটলোকের পাড়া তো এটা, তাই এখানে থাকলে এইসব সহ্য করতেই হয়।

—কেন সহ্য করেন? পাড়ার ও-সিকে খবর দিলেই পারেন—

—খবর দিয়েছি, ডায়েরীও করেছি। কিন্তু পুলিশও কাউকে ধরতে পারেনি।

গোপাল হাজরা বললে—তাহলে পাড়া ছাড়ুন। আপনি এই কোম্পানীর ডিরেক্টার-বোর্ডের ভাইস-প্রেসিডেন্ট, এ-সব পাড়ায় থাকেন কেন? পাড়ার ছেলেরা চাকরির জন্যে তো আপনাকে ছিঁড়ে খাবে! সকলকে চাকরি দিতে পারলে তবে এ-পাড়ায় থাকতে পারবেন আপনি। তা কি পারবেন?

সৌম্যপদ বললে—আমাদের তো বাড়ি ছিল রাসেল স্ট্রীটে, সে-বাড়ি তো বিক্রি হয়ে গিয়েছে—

—তা হলে পার্ক স্ট্রীটে বাড়ি কিনুন। আমি আপনাকে পার্ক স্ট্রীটে বাড়ি যোগাড় করে দেব। কিনবেন?

সৌম্যপদ বললে—হ্যাঁ, কিনতে পারি—

গোপাল হাজরা বললে—ঠিক আছে, আমি আজ থেকে পার্ক স্ট্রীটে বাড়ি খুঁজতে আরম্ভ করছি।

তা এ-ই হলো সূত্রপাত। এর পরেই ডিরেক্টার-বোর্ডের বার্ষিক মিটিং বসলো। ডিরেক্টার-বোর্ডের সবাই এসে জড়ো হলো। খাওয়া-দাওয়া হলো। ম্যানেজিং ডিরেক্টার-বোর্ডের প্রেসিডেন্ট এম-পি মুখার্জি মিটিং-এ রেজোলিউশন্ পেশ করলেন ভাইস-প্রেসিডেন্ট মিস্টার এস-পি মুখার্জির জন্যে পার্ক স্ট্রীটে চল্লিশ লাখ টাকায় একটা বাড়ি কেনা হোক। কারণ তাঁর ভুবন গাঙ্গুলী লেনের বাড়িতে জায়গার অভাব। তাঁর জন্যে কোম্পানীর কাজের অসুবিধে হচ্ছে। কোম্পানীর মঙ্গলের জন্যে তাঁকে নতুন বাড়ি কিনে দিতে খরচ হবে চল্লিশ লাখ টাকা। আর তার সংগে ফার্নিচারের খরচ।

প্রস্তাবটা সঙ্গে-সঙ্গে পাস হয়ে গেল।

—তারপর?

—তারপর একদিন কোথা থেকে একদল লোক বাড়িতে এসে জিনিস-পত্র সরাতে আরম্ভ করল। যেখানকার খাট সেখানেই রইল। সোফা-সেট, চেয়ার, টেবিল কোনও কিছুতেই হাত দিলে না তারা। শুধু নিয়ে গেল ফাইলের গাদা আর যতো দরকারী কাগজ-পত্র।

বিশাখা জিজ্ঞেস করলে—এ-সব কোথায় নিয়ে যাচ্ছ তোমরা?

তারা বললে—সাহেবের হুকুম—

—সাহেবের কী হুকুম?

তারা বললে—সমস্ত কাগজ-পত্র ফাইল-টাইল সব এ-বাড়ি থেকে নিয়ে যাবার হুকুম

হয়েছে।

—নিয়ে কোথায় যাবে?

তারা বললে—সাহেবের নতুন বাড়িতে—

—নতুন বাড়ি? নতুন বাড়ি কোথায়?

—তা আমরা জানি না মেমসাহেব।

বাইরে টেম্পো দাঁড়িয়ে ছিল। তাতেই সব তোলা হলো। আর তারপর সব হাওয়া। মঙ্গলাও সব হাঁ করে দেখছিল। বিশাখাও দেখছিল সব হাঁ করে। সকলের মুখে-চোখে বিস্ময়, সকলের মুখে-চোখে কৌতূহল, সকলের মুখে-চোখে প্রশ্ন।

বিশাখা সঙ্গে সঙ্গে অফিসে টেলিফোন করলে। টেলিফোনে ভাইস-প্রেসিডেন্টকে চাইলে।

অপারেটার যথারীতি তার নিজের কর্তব্যও করলে। কিন্তু কর্তব্য করলে কী হবে, কোনও উত্তর নেই ভাইস-প্রেসিডেন্টের ঘর থেকে। বললে—কে কথা বলছেন?

বিশাখা বললে—আমি মিসেস মুখার্জি—

অপারেটার বললে—তিনি অফিসে নেই, অফিস থেকে বেরিয়ে গেছেন—

বিশাখা ফোন ছেড়ে দিয়ে বিছানায় গিয়ে উপুড় হয়ে পড়লো। সেই যে সে পড়লো, আর উঠলো না। মঙ্গলা এসে ডাকলে—বউদিমণি, বউদিমণি—

বিজলীও পাশে এসে ডাকলে—বিশাখাদি, ও বিশাখাদি ওঠো, ওঠো—

তারপর রাত বাড়লো। ঘড়িতে ন'টা বাজলো, দশটা বাজলো, এগারোটা বাজলো। তবু সৌম্যপদ বাড়ি ফিরলো না।

দিন বা রাত কারো জন্যেই থেমে থাকে না। তাই রাতও থেমে থাকলো না। সে আরো গভীর হলো। মঙ্গলা আর বিজলী সারা রাত পাশে বসে কাটালো।

কিন্তু রাত ফুরোলেও সৌম্যপদ ফিরলো না।

তারপর আবার দিন হলো। আবার পূর্বদিকের আকাশে সূর্য উঠলো। কিন্তু সেদিনও সৌম্যপদ বাড়িতে ফিরলো না। বাড়িতে খাওয়া-দাওয়ার পাট নেই। রাতারাতি যেন বাড়িটা শ্মশানে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছে।

আস্তে আস্তে সমস্তই স্বাভাবিক হয়ে আসছিল ক্রমশঃ। হয়তো অমনি করেই চলতো আরো কিছুদিন। বিশাখা তার পরদিনই আবার টেলিফোন করলে অফিসে। কিন্তু কোনও রিং হলো না। আবার করলে, তাতেও উত্তর পাওয়া গেল না।

তারপর একদিন সদর দরজার কড়া নাড়ার শব্দ শোনা গেল।

মঙ্গলা দরজা খুলে দিলে। জিজ্ঞেস করলে—কে?

লোকরা বললে—আমরা টেলিফোন অফিস থেকে এসেছি, লাইন কাটবার হুকুম হয়েছে—

—কে হুকুম দিয়েছে?

তারা বললে—অফিস—

তারা শেষ পর্যন্ত টেলিফোনের তার কেটে দিয়ে চলে গেল। রিসিভারটাও নিয়ে চলে গেল। তখন গাড়িও নেই, টেলিফোনও নেই, যোগাযোগের সমস্ত রাস্তাই বন্ধ হয়ে গেল। সৌম্যপদর সঙ্গে বিশাখার সব সম্পর্ক শেষ হয়ে গেল।

তারপর একদিন আরও এক বিচিত্র কাণ্ড ঘটলো।

হঠাৎ একদিন নিরুদ্দেশ হয়ে গেল বিজলী। বিজলী রাত্রে কখন উধাও হয়ে গেছে কেউ টের পেলে না।

বিশাখা জিজ্ঞেস করলে—মঙ্গলা, তোর দিদিমণি কোথায় গেল রে?

মঙ্গলা বললে—সকাল থেকে তো বিজলী দিদিমণিকে দেখতে পাচ্ছি না—

—তা হলে কী হলো? কোথায় গেল?

কোথায় গেল বিজলী তা দু'জনের কেউ জানতে পারলে না। তারপর একদিন

একটা লোক এসে হঠাৎ পাঁচশো টাকা দিয়ে গেল।

—কে টাকা পাঠালো?

লোকটা বললে—ছোট সাহেব!

—কোথাকার ছোট সাহেব?

—অফিসের ছোট সাহেব!

—ছোট সাহেব কোথায় থাকে?

তা সে জানে না।

একদিন মরিয়া হয়ে বিশাখা মঙ্গলাকে নিয়ে বেলুড়ে ছোটবাবুর অফিসে গেল। বিশাল কারখানা। এ-কারখানায় আগে কখনও আসেনি বিশাখা।

গেটের কাছে গিয়ে একজন দরোয়ানের কাছে ভেতরে ঢুকতে চাইলে।

—কাকে চাই?

—ছোটবাবুকে—

—কোন ছোটবাবু?

—মুখার্জি সাহেব।

দরোয়ান জিজ্ঞেস করলে—বড়ো মুখার্জি সাহেব, না ছোট মুখার্জি সাহেব?

—ছোট মুখার্জি সাহেব।

দরোয়ান বললে—ঠাহ্‌রিয়ে, আগে পুছিয়ে আসি ছোট মুখার্জি সাহেবকে

বলে গেট বন্ধ করে দিলে। তারপর কোথায় চলে গেল। বাইরে বিশাখা আর মঙ্গলা দাঁড়িয়ে রইলো।

খানিক পরে দরোয়ান ফিরে এসে বললে—এখন ছোট-মুখার্জি সাহেব দেখা করতে পারবেন না। খুব ব্যস্ত, কাজ করছেন—

পারবেন না। কাজ করছেন—

হঠাৎ কে একজন গাড়িতে করে এলো। সে ভদ্রলোকও ভেতরে ঢুকবে। দরোয়ান তাকে দেখেই লম্বা সেলাম করলো একটা। সেলাম করে দরজা ফাঁক করে দিলে আর গাড়িটা গড়-গড় করে ভেতরে ঢুকে গেল। গেটটা আবার বন্ধ করে দিলে দরোয়ান।

বিশাখা চিনতে পারলে ভদ্রলোককে। মিস্টার হাজরা। গোপাল হাজরা বিশাখাকে দেখতে পেয়েও চিনতে পারলে না। মিস্টার হাজরার জন্যে সব সময়েই মুক্তদ্বার।

বিশাখার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়বার উপক্রম হয়েছে।

এখন বিশাখা কী করবে?

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে মঙ্গলাকে বললে—চল্, বাড়ি চল্ মঙ্গলা—
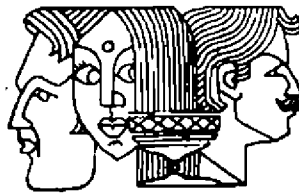
—তারপর? তারপর শেষকালে কী হলো?

অজয় বসু বললেন—শেষটা আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না। শেষটা বড়ো প্যাথেটিক—

বললাম—শেষটা যদি ভালো হয় তাহলে আমি ওই সন্দীপকে নিয়ে উপন্যাস লিখবো।

অজয় বসু বললেন—তা লিখুন না। হামিদ সাহেব আমাকে সব বলেছেন। শেষ জীবনে হামিদ সাহেবের খুব অনুতাপ হয়েছিল। তিনি পাকিস্তান থেকে এক-কাপড়ে

ইণ্ডিয়ায় এসেছিলেন। প্রথমে ঘুঙুর পায়ে নেচে নেচে চানাচুর বিক্রি করে পেট চালাতেন। অতিকষ্টে তাঁর দিন কেটেছে। শেষকালে অনেক ঘাটের জল খেয়ে জেলখানার ওই দালালী ব্যবসায় প্রচুর টাকা কামিয়েছেন। কিন্তু অত বড়লোক হয়েও এখনও সন্দীপ লাহিড়ীর কেসটা ভুলতে পারেননি। জেলখানায় যতো বড়োলোক কয়েদী সবাই তাঁকে দালালী দিয়েছে। সকলেই তাঁকে দালালী দিয়ে আরাম ভোগ করেছে, কিন্তু ওই একটি লোক হাজার অনুরোধ সত্ত্বেও কোনও আরাম চাননি। যারা মদ চায় তাদের মদ জুগিয়েছেন, জেলখানায় থেকেও জেলখানার খানা খেতে হয়নি। কিন্তু সন্দীপ লাহিড়ীকে কখনও মদ খাওয়াতে পারেননি হামিদ সাহেব। সে ওই জেলখানার লপ্‌সী খেয়েই আটটা বছর কাটিয়েছে। বিড়ি নয়, সিগারেট নয়, কোনও রকম বিলাসিতাও নয় তার জন্যে। সে একমনে কেবল বিশাখার সুখ কামনা করেছে, বিশাখার দাম্পত্য-জীবনের সমৃদ্ধি কামনা করেছে। নিজের জন্যে সে কিছুই চায়নি একদিনের জন্যেও। হামিদ সাহেবের দালালী জীবনে এ-রকম দ্বিতীয় মানুষ আর একজনকেও দেখেননি। অথচ হামিদ সাহেব নিজে সারাজীবন জেলখানার দালালী করে একটা পয়সাও ইনকাম ট্যাক্সও দেননি।

জিজ্ঞেস করলাম—শেষ পর্যন্ত বিশাখা ছোটবাবুর দেখা পেলে?

অজয় বসু বললেন—পেলে। আপ্রাণ চেষ্টা করলে কী-ই না পাওয়া যায়? যে লোকটা পাঁচশো টাকা আনতো, সে-মাসেও সে ভুবন গাঙ্গুলী লেনের বাড়িতে এলো টাকা দিতে।

সেবার বিশাখা জিজ্ঞেস করলে—হ্যাঁ বাবা, তুমি আমার একটা উপকার করতে পারো?

লোকটা বললে—বলুন, কী উপকার?

বিশাখা আবার তার সেই পুরেনো প্রশ্নটাই করলে—তোমাদের ছোট সাহেবের পার্ক স্ট্রীটের বাড়ির ঠিকানাটা বলতে পারো? বললে এই পাঁচশো টাকা তোমাকেই আমি দিয়ে দেব।

লোকটা হয়তো প্রতি মাসে নিজেই টাকাগুলো নিয়ে নিত। এবার প্রশ্নটা শুনে একটু অবাক হয়ে গেল।

বিশাখা বললে—দাও, আমি এবার রসিদে সই করে দেব—দাও রসিদটা—

লোকটার হাত থেকে রসিদটা নিয়ে তার ওপর একটা সই করে দিলে। তারপর টাকাগুলো নিয়ে লোকটার দিকে বাড়িয়ে দিলে।

বললে—এই নাও, এই পাঁচশো টাকা তুমি নাও। এইবার বলো তোমাদের ছোট সাহেবের বাড়ি ঠিকানাটা—

লোকটা প্রথমে টাকাগুলো নিতে একটু দ্বিধা করেছিল, তারপর কী ভেবে টাকাগুলো নিয়ে নিলে।

বিশাখা বললে—আমি জানি যে তুমি ছোট সাহেবের বাড়ির ঠিকানা জেনেও আমাকে বলো না। আজকে বলো!

কথা বলতে বলতে বিশাখার চোখ দুটো বোধহয় জলে ছল্‌-ছল্‌ করে উঠেছিল। লোকটার মনে বোধহয় দয়া হলো।

বললে—ছোট সাহেবকে যেন আপনি না বলেন যে আমি ঠিকানাটা বলেছি। কারণ আপনাকে ঠিকানা বলতে বারণ আছে।

—না, কথা দিচ্ছি আমি বলবো না, তুমি বলো।

ঠিকানা বলে লোকটা টাকা নিয়ে চলে গেল। আর সেই দিনই সন্ধেবেলা মঙ্গলাকে নিয়ে বিশাখা ট্যাক্সি ধরে ছোটসাহেবের পার্ক স্ট্রীটের বাড়ির দিকে রওনা দিলে। বিরাট রাস্তা পার্ক স্ট্রীট। তবু নম্বর জানা থাকলে ঠিক ঠিকানায় পৌঁছতে কষ্ট কী?

ছোটবাবুর বাড়ির সামনে গিয়ে বিশাখা সদর দরজার কড়া নাড়তে লাগলো। কেউ জবাব দিলে না।

দেখা গেল একটা কলিং-বেলের সুইচ রয়েছে। সামনে নেমপ্লেট-এ ছোটবাবুর পুরো নাম লেখা। বেলটা বাজাতেই কে একজন দৌড়ে এসে দরজাটা খুলে দিলে। জিজ্ঞেস

করলে—কাকে চাই?

—সৌদাপাদ মুখার্জি অফিস থেকে এসেছেন?

—আপনার নাম?

বিশাখা নিজের নাম বলতেই লোকটা ভেতরে চলে গেল। বিশাখা আর দেরি করলে না। তার পেছনে পেছনে সোজা চলে গেল ভেতরে। বিরাট সাজানো-গোছানো ঘর। এক-একটা ঘর পেরিয়ে আর একটা ঘর। তারপরে আর একটা ঘর। বিশাখা দেখলে লোকটা গিয়ে একজন লোকের সামনে দাঁড়িয়ে কী বলছে। যার সঙ্গে লোকটা কথা বলছে তাকে দেখেই চমকে উঠলো বিশাখা। ওই তো ছোটবাবু। ছোটবাবুর সামনে একটা মদের গেলাস।

—কী হলো, তুমি কেন এসেছ?

ছোটবাবুর সামনে একজন মহিলা পেছন করে বসেছিল। সে এতক্ষণে মুখ ফেরালো। বিশাখা তাকে দেখে অবাক। বিজলীও বসে বসে ছোটবাবুর সঙ্গে একটা গেলাসে মদ খাচ্ছে।

—বিশাখাদি। তুমি?

—বিজলী, তুইও? তুই আমার এ-সর্বনাশ করলি?

ছোটবাবু ততক্ষণে চিৎকার করে উঠেছে—তুমি কেন এলে? টাকা সময়মতো পাওনি?

উত্তরে বিশাখা বললে—আমার এ-বাড়িতে আসা কি অন্যায়?

—হ্যাঁ, অন্যায়।

বিশাখা বললে—তাহলে কেন তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছিল? কেন আমি তোমার স্ত্রী হয়েছিলুম?

ছোটবাবু বললে—কে তোমায় এ-বাড়িতে ঢুকতে দিয়েছে?

বিশাখা বললে—এ-শুধু তোমার বাড়ি নয়, আমারও বাড়ি। আমার নিজের বাড়িতে আমার ঢোকবার অধিকার নেই বলতে চাও?

ছোটবাবু বললে—না, নেই। কোনও অধিকার নেই। তুমি আমার কেউ নও—

বিশাখা বললে—তুমি এখন যা খাচ্ছো তাতে তোমার মাথার ঠিক নেই। তুমি স্বাভাবিক থাকলে বুঝতে পারতে তুমি কী বলছো!

—আবার আমার কথার ওপরে কথা? বলছি তুমি আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাও—

বিশাখা বললে—না, চলে যাবার জন্যে আমি আসিনি!

ছোটবাবু বললে—তাহলে তুমি কি চাও আমি দরোয়ান দিয়ে তোমাকে বাড়ি থেকে দূর করে দিই?

বিশাখা বললে—আমি চলে যাবার জন্যে কিন্তু আসিনি।

—তোমাকে তো আমি ডাকিনি, তাহলে কেন তুমি এলে?

—নিজের স্বামীর বাড়িতে আসা কি অন্যায়?

ছোটবাবু বললে—তোমার ভুবন গাঙ্গুলী লেনের বাড়ি থেকে তো আমি তোমাকে তাড়িয়ে দিইনি। সেখানে তো আমি তোমাকে থাকতে দিয়েছি।

বিশাখা বললে—তাহলে তুমি সেখানে থাকো না কেন?

—থাকি না কেন?

—হ্যাঁ, তুমি সে-বাড়িতে থাকো না কেন? সে-বাড়ি কী দোষ করলো?

ছোটবাবু বললে—যে-পাড়ায় লোকে বাড়িতে ঢিল ছোঁড়ে, সে-পাড়ায় কি থাকা যায়?

—আমি কী করে আছি সে-বাড়িতে?

ছোটবাবু বললে—বলছো কী তুমি? তুমি আর আমি কী এক হলুম?

—এক নই? স্বামী আর স্ত্রী কি আলাদা?

ছোটবাবু বললে—পাড়ার ছেলেরা চাকরি চাইবে আমার কারখানায় আর আমি

তাদের চাকরি দিতে পারবো না। এ-রকম অবস্থায় বাড়িটা থেকে চলে আসা ছাড়া আর উপায় কী ছিল আমার বলো?

—কিন্তু আমি? আমাকে ছাড়লে কেন? আমি কী দোষ করলাম?

ছোটবাবু বললে—এ কথারও জবাব দিতে হবে?

—হ্যাঁ।

—তুমি তো আমার কথামতো চলো না। আমি রাত করে বাড়ি ফিরি তুমি আপত্তি করো। আমি মদ খাই, তাতে তুমি আপত্তি করো। মদ খাওয়া কি খারাপ বলতে চাও? কতো বড়ো বড়ো শিক্ষিত সভ্য মানুষ মদ খায়, তা জানো—

বিশাখা বললে—আমি যদি তোমার মদ খাওয়াতে আপত্তি না করি তাহলে আমাকে তোমার সঙ্গে থাকতে দেবে?

ছোটবাবু এবার একটু ভাবলে। তারপর বললে—তোমাকে আমার বিশ্বাস হয় না—

—কেন বিশ্বাস হয় না? একবার আমি তোমাকে ফাঁসির হাত থেকে বাঁচিয়েছি, সে-কথা কি তুমি এত শীগ্‌গির ভুলে গেলে?

ছোটবাবু বললে—বেশি মদ খেয়ে পাছে তোমাকেও খুন করে ফেলি এই তোমার ভয়, না?

বিশাখা বললে—এই যে এখন আমাকে ত্যাগ করে এই বিজলীকে নিয়ে আলাদা বাড়িতে আছো, এটাও কি এক রকমের খুন নয়? একে কি বাঁচিয়ে রাখা বলে? এর চেয়ে একেবারে গলা টিপে মেরে ফেলাও তো ভালো। আমার কী কষ্ট তা আমি তোমাকে কী করে বোঝাবো?

—তা আমি তো মাসে পাঁচশো টাকা তোমাকে পাঠাই। তা তুমি পাও না? তাতে তোমার সংসার চলে না?

বিশাখা এবার গলা চড়িয়ে দিলে।

বললে—সংসার চলাটাই কি সব? মেয়েমানুষ কি আর কিছু চায় না? সে কি মা হতে চায় না? তার কি আর কোনও সাধ-আহ্লাদ থাকতে নেই? টাকা পেলেই কি তার চাওয়া-পাওয়া মিটে যায়? বলো, জবাব দাও। চুপ করে আছো কেন?

তবু ছোটবাবুর মুখে কোনও কথা নেই। বিশাখা এবার হঠাৎ এক কাণ্ড করে বসলো। হঠাৎ ছোটবাবুর সামনে মেঝের ওপর বসে পড়ে ছোটবাবুর পা দুটো জড়িয়ে ধরলো।

পা দুটো জড়িয়ে ধরে বলতে লাগলো—আমাকে দয়া করে তোমার বাড়িতে থাকতে দাও, আমাকে এমন করে আর দগ্ধে দগ্ধে মেরো না। তোমার পা জড়িয়ে ধরে বলছি, আমি আর তোমায় মদ খেতে বারণ করবো না। তুমি যতো ইচ্ছে মদ খেও, আমি একটুও বারণ করবো না—

ছোটবাবু বললে—কিন্তু তুমি আমার সঙ্গে মদ খেতে পারবে? এই বিজলী যেমন করে খায় তেমনি করে খেতে পারবে?

হঠাৎ বিজলী কথা বলে উঠলো। এতক্ষণ সে কিছু কথা বলেনি। এবার সে সামনে এগিয়ে এসে বললে—এই বিশাখাদি, পা ছাড়ো না, একি কাণ্ড করছো—

তারপর হঠাৎ চিৎকার করে ডাকলে—বচন্, এই বচন্—

বচন্ ডাক পেয়েই দৌড়ে এল। বিজলী বললে—এই বচন্, কোথায় থাকিস? এখখুনি এদের গলাধাক্কা দিয়ে বাড়ির বার করে দে—

বিশাখা বিজলীর কথা শুনে অবাক। সেই বিজলীর এত সাহস! তাদের গলাধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দিতে বলছে!

বিশাখা বিজলীর দিকে চেয়ে বললে—আরে রাক্ষুসী, তোর এত তেজ? আমাকে গলাধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দিতে বলছিস? এতদিন কাকাকে আর তোকে বাড়িতে রেখে-

ছিলুম, মা দুধ-কলা দিয়ে সাপ পুষেছিলাম। আজ তার এই ফল? তুই আজ আমার বাড়ি থেকে আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছিস!

তাড়িয়ে দেব না? দেখছো মানুষটা সারাদিন খেটে-খুটে বাড়িতে এসে একটু জিরোচ্ছে আর ঠিক এই সময়টা এসে বিরক্ত করতে হয়?

কথা বলতে তোর লজ্জা করছে না? মানুষটার জন্যে দেখছি আমার চেয়ে তোর দরদ বেশি! তুই কোথাকার কে যে আমাদের কথার মধ্যে তুই কথা বলিস? তুই এ-বাড়ির থেকে বেরিয়ে যা। এটা আমার স্বামীর বাড়ি, তুই কেন এখানে এসে জুটেছিস? এখুনি তুই এ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যা---

কী বললে?

ছোটবাবু গর্জন করে উঠলো—বিজলী কেন বেরোবে? বেরোবে তুমি।

তারপর বচনের দিকে ফিরে বললে—এই বচন, তুই হাঁ করে কী দেখছিস? এখুনি এদের ঘাড় ধরে বাড়ির বার করে দে—বার করে দে বলছি!

বচন বড়ো মুশকিলে পড়লো। মেয়েমানুষদের গায়ে কী করে সে হাত দেবে? তাই বিশাখার দিকে চেয়ে বললে—চলিয়ে বাহার চলিয়ে, চলিয়ে বাহার—

তখনও বিশাখা ছোটবাবুর পায়ের কাছে বসেছিল দেখে মঙ্গলা বললে—বউদিমণি চলো, বাড়ি চলো—

বলে বিশাখার পিঠে হাত দিয়ে ডাকতে লাগলো।

কিন্তু বিশাখা তখন কান্নায় ভেঙে পড়েছে। তবু শেষ পর্যন্ত কোনওরকম ভাবে উঠে দাঁড়ালো। তারপর চোখ মুছতে মুছতে বাইরের দিকে চলতে লাগলো। তারপর সিঁড়ি দিয়ে নেমে একেবারে খোলা রাস্তায় এসে পড়লো।

মঙ্গলা ছিল তাই রক্ষে। মঙ্গলা একটা ট্যাক্সি ডেকে কোনওরকমে আবার তার পাঁচ নম্বর ভুবন গাঙ্গুলী লেনের বাড়িতে এসে নামালো।

তারপর বাড়িতে এসে সেই যে বিছানায় শুয়ে পড়লো, তারপর তিন দিন আর বিছানা থেকে ওঠেনি, মুখেও কিছু দেয়নি! মঙ্গলা ছিল বলে সব সময়ে পাশে পাশে থেকেছে, নইলে সেই দিন বাড়িতে এসেই গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করতো।

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—তারপর?

বিশাখা বললে—তারপর এই তো দেখছো আমাকে। আমি এতদিন গলায় দড়ি দিইনি কেন, তা জানি না। গলায় দড়ি দিলেই হয়তো বেঁচে যেতাম। কপালে আমার কত দুর্ভোগই ছিল! তুমি কেমন ছিলে?

আমি? আমার কথা বলছো? এই তো আজ সকালেই জেলখানা থেকে বেরিয়েছি। বেরিয়ে প্রথম গিয়েছিলাম সেই বারোর-এ বিডন স্ট্রীটের বাড়িতে। সেখান থেকে গেলাম সেই তোমাদের মনসাতলা লেনের বাড়িতে। সে-বাড়িটা একবার দেখতে ইচ্ছে হলো। সেখানে একটা হোটেলে গিয়ে খেয়ে নিলাম। সেখানে গিয়ে জুটলো এই বোঝাটা। একটা লোক এই ঝোলাটা আমাকে দিয়ে কোথায় চলে গেল, আর ফিরে এলো না। কতক্ষণ আর তার জন্যে অপেক্ষা করবো। সেখান থেকে হাওড়া। হাওড়া থেকে বেলুড়। বেলুড়ে গিয়ে তোমাদের ফ্যাক্টরিটা দেখলুম। ফ্যাক্টরিটা এখন খুব বড় হয়েছে। দেখে মনে হলো খুব ভালো চলছে ফ্যাক্টরি। ফ্যাক্টরিটার ছুটি হলো তখন। দেখলুম সকলের হাতেই একটা করে মিষ্টির প্যাকেট। শুনলাম আজ নাকি মুক্তিপদবাবুর মেয়ে পিকু-

নিকের বিয়ে। কোন্ এক সরোজ সরকারের সঙ্গে নাকি বিয়ে হচ্ছে। সে এক অদ্ভুত বিয়ে। আমার বিয়ের চেয়েও নাকি সে অদ্ভুত বিয়ে—

—হ্যাঁ, আমি তো পিক্‌নিককে চিনি। সেও নাকি ড্রাগ খেত। একবার আমি যেমন ড্রাগের পাল্লায় পড়ে কলকাতার রাস্তায় অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলুম। মনে আছে?

সন্দীপ বললে—মনে থাকবে না? তোমার সঙ্গে আমার যতদিনের পরিচয়, তত-দিনের সব ঘটনা আমার মুখস্থ আছে। এই দেখ না আমার এই ঝোলার ভেতরে তোমার সেই ফটোটা আছে। এই দেখ—

বলে সন্দীপ তার থলি থেকে বিশাখার ছবিটা বার করে দেখালো।

—একি, এটা এখনও তোমার কাছে রেখেছ?

সন্দীপ বললে—এটা নিয়েই তো আমি জেলখানায় গিয়েছিলুম। এটা আজীবন আমার সঙ্গে থাকবে। মরবার দিন পর্যন্ত! এটা তাই সঙ্গে নিয়ে ঘুরছি—

বিশাখা চুপ করে রইল। বললে—মরবার কথা মুখে এনো না। তুমি না থাকলে আমার মরবার সময় আমাকে কে দেখবে? তুমিই তো আমার সব। তুমি ছাড়া আজ আমার আর কেউ নেই পৃথিবীতে। তুমি এবার থেকে আমার বাড়িতেই থাকো!

সন্দীপ বললে—তা আর হয় না বিশাখা—তোমার বিয়ে হয়ে গেছে সোমাপদবাবুর সঙ্গে। তারপরে আর আমাদের এক বাড়িতে থাকা চলে না—

—কিন্তু জেল থেকে আজ বেরিয়েছ তুমি, তোমার চাকরিও তো আর নেই। আর তোমার থাকবার বাড়িও নিশ্চয়ই নেই। কোথায় থাকবে?

সন্দীপ বললে—আমি সেই আমার নেবুবাগান লেনের বাড়িতেও গিয়ে দেখে এসেছি, বাড়িওয়ালা এখন সেখানে অন্য ভাড়াটেকে বসিয়েছেন—আর রতনও নেই।

—না, রতন আমার বাড়িতে এসেছিল। তোমার খাট আলমারি চেয়ার টেবিল সব জিনিস সে আমার বাড়িতে তুলে দিয়ে দেশে চলে গেছে—ওগুলো তুমি নিয়ে যাও—

—ওসব তোমার কাছেই থাক। ও আমার চাই না।

বিশাখা বললে—কিন্তু আমি রেখে কী করবো? তোমার জিনিস তুমিই নিয়ে যাও—

সন্দীপ বললে—সে-সব কথা পরে ভাববো। এখন বলো তুমি কেমন করে সংসার চালাচ্ছো? সোমাপদবাবু তোমাকে মাসে-মাসে টাকা ঠিকমতো পাঠাচ্ছেন?

—পাঠাতেন, কিন্তু আমি নিতুম না বলে আর টাকা পাঠান না।

—তাহলে কী করে তোমাদের দুজনের সংসার চলছে?

বিশাখা বললে—বাড়িটার অর্ধেকটা ভাড়া দিয়েছি। সেই আয়েতেই কোনও রকমে চালাচ্ছি—

সন্দীপ গম্ভীর হয়ে গেল সব শুনে। অনেকক্ষণ ভাবতে লাগলো। তারপর বললে—এখন তুমি আমার সঙ্গে যেতে পারবে?

বিশাখা জিজ্ঞেস করলে—কোথায়?

—সেই ছোটবাবুর পার্ক স্ট্রীটের বাড়িতে। এখন নিশ্চয়ই ছোটবাবু বাড়ি এসে গেছেন।

বিশাখা বললে—পাঁচ বছর আগে গিয়েছিলাম। তখনই তো ছোটবাবু তার চাকর দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু তার কাছে আবার যাওয়া কি ভালো হবে? যদি সত্যিই এবার গলা-ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেয়?

সন্দীপ বললে—দেখিই না গিয়ে। দেখিই না ছোটবাবু কী বলেন? আমি গিয়ে শুনতে চাই এ-ব্যাপারে কী বলেন।

—আমি ভাবছি তোমার কথা।

—আমার কথা আবার কী ভাবছো?

বিশাখা বললে—দেখ ছোটবাবু আমাকে অপমান করলে আমি তা মুখ বুজে সহ্য

করেছি। আমি মেয়েমানুষ। মেয়েমানুষরা সব সহ্য করতে পারে। কিন্তু তুমি? তোমাকে অপমান করলে আমি কী করে তা সহ্য করবো?

সন্দীপ বললে—আমার কথা তোমাকে ভাবতে হবে না। আমি নিজে কখনও নিজের জন্যে সুখ চাইনি, আমি চেয়েছি সবাই সুখী হোক, আরো চেয়েছি তুমিও সুখী হও। আর তার জন্যে যা-কিছু কষ্ট সব আমি নিজে সহ্য করবো। তোমার ছোটবাবু যদি আমাকে অপমান করেন তাতে আমি কোনও দুঃখ পাবো না। এটা জেনে রাখো যে তোমার সুখেই আমার সুখ—দেখি না একবার শেষ চেষ্টা করে!

কথাগুলো শুনে বিশাখার চোখ দিয়ে আবার জল পড়তে লাগলো। সন্দীপ বললে—আর দেরি করো না, দেরি করলে হয়তো বিজলীকে নিয়ে কোথাও বেরিয়ে যাবেন, তখন আর ছোটবাবুর দেখা পাওয়া যাবে না—

বিশাখা বললে—কিন্তু পাঁচ বছর ধরে এই বিছানাতেই প্রায় সারাদিন শুয়ে আছি। উঠে দাঁড়ালে মাথা ঘুরে যায়। আমি কি যেতে পারবো?

সন্দীপ বললে—আমি আজ তোমায় ধরে ধরে নিয়ে যাবো, ভয় কী?

—এত দিন পরে তুমি জেল থেকে বেরোলে, আজ একটু বিশ্রাম নেবে না? একদিন পরে গেলে দোষ কী? ছোটবাবু তো পালিয়ে যাচ্ছে না—

সন্দীপ বললে—না, তোমার এ অপমান আমার আর সহ্য হচ্ছে না। যার জন্যে আমি এত করলাম তাকেই কিনা এত কষ্ট দিলেন তোমার ছোটবাবু? চলো, তৈরি হয়ে নাও, মঙ্গলাকে বলো সে দরজাটা বন্ধ করে দেবে। আমি দেখি একটা ট্যাক্সি ডেকে আনতে যাই। ততোক্ষণে তুমি তৈরি হয়ে নাও। আর দেরি করো না। সারাদিন অনেক ঘুরেছি। আমি চলি।

বলে হাতের ঝোলা দুটো নিয়ে বাড়ির বাইরে চলে গেল—

খানিক পরেই ট্যাক্সি নিয়ে সন্দীপ ফিরে এলো।

বাড়ির বাইরে থেকেই সন্দীপ ডাকতে লাগলো—কই বিশাখা, এসো বিশাখা—

তখনও আসছে না দেখে সন্দীপ বিশাখাকে ডাকতে ডাকতে বাড়ির ভেতরে ঢুকলো।

—কই বিশাখা, কই? কোথায় গেলে তুমি?

তখনও সাড়া নেই বিশাখার। সন্দীপ তখন মঙ্গলাকে ডাকলে—মঙ্গলা, মঙ্গলা—

বিশ্ব-সংসারে আমরা সবাই যা চাইছি তা পাচ্ছি। বর্ষাকালে জল পাচ্ছি, গ্রীষ্মকালে আমরা উত্তাপ পাচ্ছি, শীতকালে আমরা নানা রকম ফসল পাচ্ছি, প্রত্যেক ঋতুতে আমাদের সব রকম দাবি মেটাচ্ছে প্রকৃতি।

কিন্তু প্রকৃতির পেছনে যে শক্তিটা নিয়ম করে অহরহ অবিরাম কাজ করে চলেছে সেই শক্তিটার কথা কি কখনও আমরা ভেবেছি?

একটু বড়ো হয়েই সন্দীপ পরিচয় পেয়েছিল বিশাখার। তখন থেকে যে-শক্তিটা তাকে বরাবর প্রেরণা যুগিয়ে এসেছে তার কথা কিন্তু কখনও সন্দীপ ভাবেনি। সে ভেবেছে তার চাকরি পাওয়া, তার চাকরিতে উন্নতি করা, তার বেঁচে থাকা, তার চলাফেরা সমস্ত কিছুর পেছনেই তার নিজের কর্মক্ষমতা বা তার নিজের ভাগ্য। কিন্তু আসলে কি তাই-ই?

এই আট বছর জেলখানার মধ্যে থেকে তার উপলব্ধি হয়েছে যে আসলে সে নিজে কিছুই নয়। সে উপলক্ষ মাত্র। যে আসলে আড়ালে থেকে তাকে প্রেরণা যুগিয়েছে সে হচ্ছে অন্য একটা শক্তি। সেই শক্তিটাকে সে গত আট বছর ধরে সৃষ্টি করেছে। সেইটেই

তার প্রেম। সেই প্রেমই তাকে সারা কলকাতা ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। সেই প্রেমের প্রেরণাতেই সে একেবারে শুরু থেকে দৌড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। তাই সে প্রথমেই গিয়ে হাজির হয়েছিল বিডন স্ট্রীটের বাড়িতে। তারপর গিয়েছিল খিদিরপুরের মনসাতলা লেনের বাড়িতে। যেখানে একদিন প্রথম দেখা হয়েছিল বিশাখার সঙ্গে। তারপর গিয়েছিল বেলুড়ে। যেখান থেকে শুরু হয়েছিল সংঘর্ষ। তারপর গিয়েছিল নেবুবাগান লেনের বাড়িতে। যেখানে ঘন-ঘন আসতো বিশাখা আর সৌম্যবাবু টাকার প্রয়োজনে। তারপর ভুবন গাঙ্গুলী লেনের বিশাখার বাড়িতে। যেখানে সৌম্যপদবাবু আর বিশাখা সুখের সংসার গড়ে তুলেছিল। এই ভুবন গাঙ্গুলী লেনে না এলে তো সন্দীপ জানতেও পারতো না যে তার সমস্ত স্বপ্ন-সৌধ ভেঙে গুঁড়িয়ে ধুলো হয়ে গেছে।

তখনই সন্দীপের বুকে চরম আঘাত লাগলো। তার জীবনের সমস্ত প্রেরণার মূলে যে এমন করে আঘাত লাগবে তা সে কল্পনা করতে পারেনি। তখনই তার মনে হলো তার সমস্ত নিষ্ঠা, সমস্ত ত্যাগ, সমস্ত কারাবরণ, তার সমস্ত শক্তির মূলে কে যেন কুঠারাঘাত করেছে!

তাহলে কি তার সমস্ত প্রেরণা মিথ্যে? সে সারাজীবন তাহলে কেবল মরীচিকার পেছনে ঘুরেছে?

তাহলে কার ছবিটাকে সে সঙ্গে করে নিয়ে বেড়াচ্ছে? প্রত্যেক রাত্রে সে কার ছবিটার দিকে চেয়ে চেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে? সবই তাহলে কি মরীচিকা?

বিশাখার ইচ্ছে ছিল না। পাঁচ বছর আগের অভিজ্ঞতা তখনও তার মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। সে বললে—আমার কিন্তু খুব ভয় করছে সন্দীপ—

সন্দীপ বললে—ভয় করলে তো চলবে না। তোমার যদি কিছু অপমান হয় তো সে আমার অপমান মনে করবো। তাহলে সঙ্গে আমি যাচ্ছি কেন?

—কিন্তু যদি তোমাকেও ছোটবাবু অপমান করে তাহলেও তো সে আমার অপমানই মনে করবো—

সন্দীপ বললে—আমার অপমানের কথা ভাবলে তোমাকে আমি ছোটবাবুর বাড়িতে নিজে সঙ্গে করে নিয়ে যেতুম না। যেদিন তোমার ভালোর জন্যে ছোটবাবুর হাতে লাখ-লাখ টাকা ব্যাঙ্ক থেকে তুলে দিয়েছিলুম সেইদিনই আমার মান-অপমানের পালা শেষ হয়ে গেছে। মান কার কাছে চাইবো? আমার নিজের মান সম্মান নিজের কাছে থাকলেই যথেষ্ট—

—কিন্তু......

সন্দীপ বললে—আর 'কিন্তু' বোল না। যেদিন টাকা চুরির দায়ে পুলিশ আমাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল সেইদিনই আমার মান-অপমানের পালা চুকে গেছে। এখন চেষ্টা করে দেখি তোমার অপমানের শোধ আমি তুলতে পারি কিনা। তোমার মান রাখতে পারলেই আমার অপমানের শোধ তুলে নিতে পারবো—

চারদিকে দোকান-পাটে জ্বল-জ্বল করে আলোর মালা ঝুলছে। এ ভুবন গাঙ্গুলী লেন নয়। এটা পার্ক স্ট্রীট। এখানে কলকাতাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। এখানে লন্ডন নিউ-ইয়র্ককে খুঁজে পেলেও পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু ইন্ডিয়াকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। ইংরেজরা ইন্ডিয়া ছেড়ে চলে গেলেও এই পার্ক স্ট্রীটেতে তারা সগর্বে বিরাজ করছে। এখানে যারা বাস করে তারা সকালবেলা জলখাবার খায় না, ব্রেকফাস্ট খায়। দুপুরবেলা তারা ভাত খায় না, লাঞ্চ খায়। এরা রাত্রে রুটি তরকারি খায় না, ডিনার খায়, ব্রেড খায়। হুইস্কি খায়—

—কত নম্বর বাড়ি বললে?

বিশাখা বললে—সাতাত্তর নম্বর—

নম্বর কি বাইরে থেকে দেখা যায়? বিশাখা এখানে একবারই এসেছিল। তখন

সঙ্গে ছিল মঙ্গলা। এখন আছে সন্দীপ। এই সন্দীপ কলকাতাকে দেখেছে। সে চেনে এ-সব অঞ্চল। কাছেই রাসেল স্ট্রীট। এককালে বিশাখা সেই রাসেল স্ট্রীটে থাকলেও ঠাকমা-মণির গাড়িতে কলেজে গেছে, গাড়িতেই কলেজ থেকে ফিরেছে। কিন্তু সন্দীপ পায়ে হেঁটে বেড়ানোর দলে—

সে বললে—আমি চিনে বার করছি সাতাত্তর নম্বরের বাড়ি—

সৌম্যপদ মুখার্জি নিয়ম করেই রোজ অফিসে যায়। যেদিন কলকাতার অফিসে বেশি কাজ থাকে সেদিন দুপুর পর্যন্ত কলকাতায় কাটিয়ে বিকেলবেলার দিকে বেলুড়ের ফ্যাক্টরিতে গিয়ে পৌঁছোয়।

কিন্তু সেদিন ইয়ার-ক্লোজিং-এর জন্যে কলকাতার হেড-অফিসে ডিরেক্টার-বোর্ডের মিটিং ছিল। ব্যালেন্স-শীট তৈরি হয়ে পাশ হওয়ার কথা। সব ডিরেক্টাররাই হাজির ছিল। মুক্তিপদ হাজির ছিলেন। চীফ এ্যাকাউন্টেন্ট নাগরাজন সমস্ত রিপোর্টটা পড়লে।

তাই নিয়েই বোর্ডে অনেকক্ষণ আলোচনা হলো তর্ক-বিতর্ক হলো। দেখা গেল লাস্ট-ইয়ারে কোম্পানীর প্রোডাকশন বেড়েছে ফিফটিন পার্সেন্ট। তার জন্যে কোম্পানীর নেট প্রফিট হয়েছে টোটাল দু'কোটি টাকা। স্টাফের মাইনে আর আরো বেশী স্টাফের এ্যাপয়েন্টমেন্ট হওয়াতে এস্ট্যাবলিশমেন্ট খরচা বাড়লেও দু'কোটি টাকার প্রফিট দেখে সব ডিরেক্টাররাই খুশী।

বিজয়েশ কানুনগোও হাজির ছিল। ট্যাক্স কনসালটেন্ট বিজয়েশ কানুনগো। তিনি হিসেব করে দেখিয়ে দিলেন যে ট্যাক্স দিয়েও ওভার-অল প্রফিট দু'কোটি সওয়া-দু'-কোটি কেউ আটকাতে পারবে না।

সরোজ সরকার, মুক্তিপদ মুখার্জির একমাত্র জামাই, নতুন ডিরেক্টার হয়েছে।

সে প্রস্তাব করলে—তাহলে শেয়ার-হোল্ডারদের ডিভিডেন্ডের পার্সেন্টেজ কিছু বাড়ালে বাজারে 'স্যাক্সবী-মুখার্জি' কোম্পানীর আরো গুড্-উইল বাড়বে। আর তার ফলে শেয়ার-মার্কেট আরো শেয়ার-হোল্ডার বাড়বে। লোকে কোম্পানীর আরো শেয়ার কিনবে।

কথা বলতে বলতে লাঞ্চের টাইম হয়ে গেল। গ্রান্ড হোটেল থেকে এলাহি লাঞ্চ এলো। লাঞ্চের পরও আবার মিটিং চলতে লাগলো।

তাতে ম্যানেজিং ডিরেক্টারের স্যালারি কুড়ি হাজার থেকে বেড়ে পঁচিশ হাজার করার প্রস্তাব গৃহীত হলো। মাইনে বাড়লো ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টারেরও। অর্থাৎ সৌম্য-পদ মুখার্জির। তিনি পাচ্ছিলেন পনেরো হাজার, তাঁর স্যালারি বেড়ে হলো কুড়ি হাজার টাকা। ডিরেক্টার সরকারেরও মাইনে বাড়লো। মাইনে বাড়লো মিস্টার নাগরাজনেরও।

সকলের মাইনে যেটা বাড়লো, তার ওপর এ্যালাউন্সও বেড়ে গেল দশ গুণ। ফ্রী-মেডিক্যাল ট্রিটমেন্ট, কার এ্যালাউন্সও বাড়লো। কারণ দেখানো হলো ওষুধের আর পেট্রলের দাম বেড়েছে। তার ওপর আছে প্রফিট-লস সারচার্জ-প্রফারেনশিয়াল শেয়ার হোল্ডারদের কথা। প্লাস্ ডিরেক্টারদের ছুটিতে ছুটিতে বিলেতে বেড়াতে যাওয়ার সমস্ত খরচ কোম্পানী বেয়ার করবে। তার জন্যেও বাজেটে প্রভিশন রাখা হলো। ফ্রী হলিডে-ট্রাভেল্।

সমস্ত ঝামেলা যখন মিটলো তখন বিকেল পাঁচটা। মুক্তিপদ বেশিক্ষণ থাকলেন না।

তাঁর মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছিল আগেই. কিন্তু রিসেপ্‌শনটা বাকি ছিল। তিনি প্রস্তাব করলেন যে প্রত্যেক স্টাফকে এক প্যাকেট মিষ্টি ফ্রী দেওয়া হয়েছে কোম্পানীর খরচায়। সেটাও এক্সপেন্ডিচারের আইটেমে জোড়া হবে। সেটা যোগ করা হবে মিস্‌লেনিয়াস কলামে। সেটাও পাশ হয়ে গেল বিনা তর্কে। সবাই সই করলে ব্যালেন্স-শীটের নিচে সব ডিরেক্টাররা। তারপর ছুটি।

মুক্তিপদ গাড়ি হাঁকিয়ে চলে গেলেন নিজের বেলুড়ের বাড়িতে। সেখানে সবাই তখন তাঁর অপেক্ষায় রয়েছে। তাঁর নাতিরা পর্যন্ত। নন্দিতা পিক্‌নিক্ তারাও অপেক্ষা করে আছে মিস্টার মুখার্জির। আর সৌম্যপদ?

সৌম্যপদ প্রতিদিনই সন্ধ্যের পর বাড়ি আসে। ড্রাইভার গাড়িটা নিয়ে এসে রাখে বাড়ির সামনে। তারপর সাহেব গাড়ি থেকে নেমে গেলে গাড়িটা তুলে ফেলে গ্যারেজে।

সাহেবকে দেখতে পেলেই বচন্ সাহেবকে সেলাম করে। সাহেব সে দিকে ফিরে না তাকিয়েই সোজা ওপরে চলে যায় গটগট করে। তখন বিজলী তৈরি হয়েই থাকে। সৌম্যপদ ঘরে ঢুকলেই বিজলী এগিয়ে আসে। জিজ্ঞেস করে—মিটিং হলো?

গায়ের কোট খুলতে খুলতেই সৌম্যপদ বলে—হ্যাঁ, হলো—

একটু থেমে বলে—জানো, এবার আর দিল্লী যাবো না, কাশ্মীরও যাবো না বেড়াতে। এবার চলে যাবো সুইডেনে—ও দেশটাতে কখনও যাইনি!

—সুইডেনে যাবে? ঠিক ঠিক করলে?

সৌম্যপদ বললে—এবার ডিরেক্টার-বোর্ডের মিটিং-এই ঠিক হলো ডিরেক্টাররা ফরেনে ট্র্যাভেল করতে পারবে উইথ্ ফ্যামিলি। সব খরচ কোম্পানী দেবে। অনেক দিন তো কোথাও যাইনি। এবার কোম্পানীর দু'কোটি টাকা প্রফিট হয়েছে, তাই এই স্পেশ্যাল বেনিফিট্ দিচ্ছে আমাদেরকে—

—কবে যাবে?

সৌম্যপদ বললে—সামারে যাওয়াই ভালো। তখন কলকাতার ক্লাইমেটটা আমার বড় অসহ্য লাগে। তখন ওখানে শীত—

বিজলী বললে—আজকেই তো পিক্‌নিকের বিয়ে হলো না?

সৌম্যপদ বললে—বিয়ে হলে কী হবে, বিয়ে হওয়ার আগেই তো ওদের ছেলে হয়ে গেছে দুটো। আজকে ফ্যাক্টরির সব স্টাফকে এক প্যাকেট করে মিষ্টি বিলোতে হয়েছে—

একটু থেমে সৌম্যপদ বললে—দেখ, আজকে আর বাড়িতে ডিনার খাওয়া নয়, চলো 'মোকাম্বো'তে গিয়ে ডিনারটা সেরে আসি।

—আর কক্‌টেল?

সৌম্যপদ বললে—কক্‌টেলটা বাড়িতেই সারি। বাজেট পাশ হয়ে গেছে. এটা সেলিব্রেট করা যাক্ বাড়িতে। বাড়িতে কী আছে?

বিজলী বললে—তোমার ফেবারিট ড্রিঙ্কস্ তো 'কিং-অব্-কিংস'। সেটা ফুরিয়ে গেছে! 'রাম' খাবে?

সৌম্যপদ বিরক্তির ভঙ্গী করলো। বললে—'রাম' তো ঘোড়ারা খায়। 'রাম' খেলে আজকের মেজাজটাই নষ্ট হয়ে যাবে।

—তাহলে 'হোয়াইট হর্স' খাবে আজকে?

সৌম্যপদ জিজ্ঞেস করলে—'হোয়াইট্ হর্স' স্টকে?

বিজলীর কাছে স্টকের চাবি ছিল। সে-ই খবর রাখে কোনটা কতখানি আছে।

সে সোফা থেকে উঠে গিয়ে স্টকের আলমারির চাবি খুললো। সেখান থেকে একটা বোতল নিয়ে এলো।

বললে—ততক্ষণে 'হোয়াইট্ হর্স' একটু চালাও, আমি বচন্‌কে পাঠাচ্ছি 'কিং-অব্-কিংস' আনতে।

তা মন্দ নয়। 'হোয়াইট হর্স' দিয়ে 'পেগ' তৈরি করে 'কিং-অব্-কিংস্' দিয়ে শেষ করবো, তারপর বাইরে গিয়ে ডিনার খেলে হয়।

তারপর সৌদামিনীর গেলাসে খানিকটা 'হোয়াইট হর্স' ঢেলে দিলে। কিচেনে গিয়ে অর্ডার দিয়ে এলো বাবুর্চিকে কিছু স্ন্যাক্‌স্ তৈরি করে দিতে।

বড় আরাম হয় এই সময়টায়। সারা দিনের পরিশ্রমের পর একটু রিলাক্স করতে হলে কক্‌টেল-এর জুড়ি নেই। সৌদামিনী ডাকলে—বচন্—

বচন্ এলো সাহেবের কাছে।

সাহেব বললে এক বোতল 'কিং-অব-কিংস্' আন্ তো—

বিজলী টাকা বার করে দিলে লকার থেকে। বচনের সব জানা আছে। এটা বলতে গেলে সাহেবের নিত্য-নৈমিত্তিক কাজ। তারপর সন্ধ্যেবেলায় কোনও কোনও দিন সাহেব আর মেম-সাহেব দু'জনে গাড়ি নিয়ে বাইরে বেরোবে। গাড়ি চালাবে বিশু। বিশুও সব জানে কোথায় যায় সাহেব আর মেম-সাহেব। কখন কত রাতে ফিরবে দু'জনে তার ঠিক নেই। বিশুও বচনের মতো হুকুমের চাকর। তার ওপর যা হুকুম হবে তাই-ই সে তামিল করবে। বিশু একদিন বিশাখা মেম-সাহেবের গাড়ী চালিয়েছে। বিশাখা মেম-সাহেবকে নিয়েও কতদিন কত জায়গায় গিয়েছে। এখন কোথায় রইলো সেই বিশাখা মেম-সাহেব আর কোথা থেকে এলো নতুন এই বিজলী মেম-সাহেব।

এককালে বড়ো মুখার্জি সাহেবের গাড়িও সে চালিয়েছে। বলতে গেলে সে আজীবন এই মুখার্জি পরিবারদেরই বরাবর সেবা করে আসছে। তাঁদের সেবা করেই সে জীবন কাটিয়ে দিলে। সে এই পরিবারের এত উত্থান আর এত পতন দেখলে যে তার দেখবার যেন আর শেষ নেই। দেখতে দেখতে সে বিডন স্ট্রীট, বেলুড়, ভুবন গাঙ্গুলী লেন থেকে এসে ঠেকেছে এই পার্ক স্ট্রীটের বাড়িতে। আগেও যা চলতো, এখনও তাই চলছে। কিন্তু এখনও পুরনো হলো না তার দেখা। যতক্ষণ সে ডিউটিতে থাকত তত-ক্ষণ সে যন্ত্র। বাকি সময়টাতে সে মানুষ। যদিও সাহেব মেম-সাহেবরা তাকে মানুষ বলে কখনও মনেও করে না। আসলে সত্যিই সে একটা যন্ত্র মাত্র, তার মনুষ্যত্ব যেন থাকতে নেই—

বিশু জানে সাহেবের এখন মৌজ করবার সময়। এখন সাহেব মেম-সাহেবের সঙ্গে মৌজ করতে বসেছে। এখন সাহেব কোথাও যাবে না। এখন সে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারে। আবার যখনই তার ডাক পড়বে তখনই সে গ্যারাজ থেকে গাড়ি বার করে ডিউটি করবার জন্য তৈরি থাকবে। আর তারপর কত রাত পর্যন্ত তাকে ডিউটি করতে হবে তা সে যেমন জানে না, তেমনি তার সাহেব বা মেম-সাহেব কেউই জানে না।

আগে যখন পুরনো মেমসাহেব ছিল তখন একটা বাঁধা ডিউটি ছিল। সে মেম-সাহেব মদ খেতো না। তাই বরাবর সাহেবকে সামলে নিয়ে চলতো। কিন্তু এ-মেম-সাহেব আসার পর থেকে অন্য রকম হয়ে গেল। এ মেমসাহেব সাহেবের মতোই [illegible] খেয়ে ফেলে। এক একবার এ-মেমসাহেবকে ধরে ধরে বাড়িতে উঠিয়ে দিতে হয়, নইলে পড়ে যাওয়ার ভয় থাকে। সাহেবও যতো খায়, এ-মেম-সাহেবও ততো খায়। তাই এখন বিশুর দায়িত্বটা একটু বেড়েছে। তাই যতোটা সময় হাতে পায় সবটাই ঘুমিয়ে কাটায়।

পার্ক স্ট্রীটের নতুন বাড়িতে আসার পর বিশু ভালো ঘর পেয়েছে। ঠিক গ্যারাজের মাথার ওপরেই। সেদিনও তখন কারখানা থেকে সাহেবকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়েই গাড়িটা গ্যারাজে তুলে নিজের ঘরে উঠে ঘুমোতে শুরু করেছিল। বুঝতে পেরেছিল সাহেব একটু বিশ্রাম করেই আবার যথাসময়ে ডাকবে। তখন শুরু হবে তার নৈশ ডিউটি। তার আগেই বচন এসে রোজকার মতো তাকে ডেকে ঘুম ভাঙিয়ে দেবে। বলবে—বিশু ওঠ্ ওঠ্, সাহেব বেরোবে—

সেদিন বাড়ির ভেতরে শুরু হয়েছে ছোটবাবুর বিশ্রামের পালা। বিশ্রাম মানে শরীরের নার্ভগুলোকে শিথিল করা। সেই শিথিল করার একমাত্র উপায় হলো হুইস্কি।

ছোটবাবু প্রথমে খেতে ভালোবাসতো 'হোয়াইট হর্স'। কিন্তু কিছুদিন পরেই সেটা পুরনো হয়ে গেল। তখন বাজারে বেরিয়েছে 'কিং-অব কিংস'। তখন থেকে 'হোয়াইট হর্স' ও চলতে লাগলো, তার সঙ্গে 'কিং-অব-কিংস'। দুটোই পছন্দ, কিন্তু বেশি পছন্দ 'কিং-অব-কিংস'।

'হোয়াইট হর্স'-এর সঙ্গে তখন বাবুর্চি স্ন্যাকস্ ও দিয়ে গেছে। সেটাও চলছে।

ছোটবাবু বললে—জানো আজ কোম্পানীর শেয়ারের ডিভিডেন্ড্ ডিক্লেয়ার করা হয়ে গেল।

বিজলী বললে—প্রফিট কত হলো কোম্পানীর এবার?

—নেট আড়াই কোটি—

—মন্ত্রিপদবাবু খুশী?

ছোটবাবু বললে—শুধু কাকা কেন, সবাই খুশী। তার ওপর পিক্‌নিক্‌কে নিয়ে মনে একটা অশান্তি ছিল, তারও এতদিন পরে বিয়েটা হয়ে গেল, তাতেও খুশি—

—আর ওদের কী খবর?

—কাদের?

—মিস্টার হাজরার?

ছোটবাবু মদের গেলাসে চুমুক দিতে দিতে বললে—মিস্টার হাজরারও কমিশন বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আগে তিন লাখ দিতে হতো এখন তা বাড়িয়ে সাড়ে তিন লাখ করা হলো। ওটা মিসলেনিয়াস্ এ্যাকাউন্টের মধ্যে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। বাইরের কেউ আগেও টের পায়নি এখনও কেউ টের পাবে না। নইলে লেবার ট্রাবল হতো!

বিজলী জিজ্ঞেস করলে—আর লেবার?

ছোটবাবু বললে—তাদের সামান্য বেড়েছে। কিছু না বাড়ালে তারা মিস্টার হাজরার পার্টি ছেড়ে অন্য পার্টিতে চলে যেতো! এখন তো পার্টিবাজিরই যুগ! যে-লোক কোনও পার্টিতে থাকবে না তার কপালে অনেক দুঃখ! তার জীবনে কিছুই হবে না!

—তাহলে সকলেই এখন সুখী?

ছোটবাবু বললে—হ্যাঁ, আমরাও সুখী! সেইজন্যেই তো আমি এই দিনটা সেলিব্রেট করতে চাই 'মোকাম্বো'তে গিয়ে ডিনার করে—

বলেই স্ন্যাকস্ তুলে নিয়ে মুখে পুরে দিলে। তারপর ঘড়িটার দিকে চেয়ে দেখলে। নাইট ইজ্ স্টীল ইয়াং—

হঠাৎ ছোটবাবুর মনে হলো ঘরের ভেতরে যেন ভূত দেখলে। বললে—কে?

ছোটবাবু যেন স্বপ্ন দেখে চমকে উঠেছে। আবার বললে—কে?

ভূতটা বললে—আমি......আমরা......

একমুখ দাড়ি-গোঁফ, ময়লা জামা-কাপড়। তার সঙ্গে আর একজন কে রয়েছে যেন। ভূতটা তাকে ধরে ধরে আনছে ঘরের ভেতরে।

—কে তুমি? কী চাই?

—আপনার সঙ্গে দেখা করতে!

—আমার সঙ্গে? কার পারমিশনে ঘরের ভেতরে ঢুকেছ?

—কার পারমিশন্ নেব? কেউ তো বাইরে ছিল না।

ছোটবাবু জিজ্ঞেস করলে—দরজায় কলিং বেল্ টিপলে না কেন? জানো আমি এখন রিল্যাক্স করি। এই কি ভিক্ষে চাইবার সময়? ভিক্ষে চাইতে হলে ভেতরে ঢোকে ভিখিরীরা?

ভূতটা বললে—আমি ভিক্ষে চাইতে আসিনি।

—ভিক্ষে না চাইতে হলে ভেতরে ঢুকেছ কেন? এখন আমি কারো সঙ্গে দেখা করি না।

—বলছি তো আমি ভিক্ষে চাইতে আসিনি। দেখাও করতে আসিনি।

ছোটবাবু বললে- তাহলে বাড়ির ভেতরে ঢুকেছ কী করতে!

ভূতটা বললে—দেখতে---

ছোটবাবু বললে—কাকে দেখতে?

—আপনাকে! যাকে আমি সম্পূর্ণ লাখ টাকা দিয়েছিলুম—

—সম্পূর্ণ লাখ টাকা আমাকে দিয়েছিলে? কবে?

—প্রায় আট বছর আগে!

—আট বছর আগে?

—হ্যাঁ, আমি তখন ছিলুম ন্যাশনাল ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের ম্যানেজার, গড়িয়াহাট ব্রাঞ্চে। সেই টাকা চুরির জন্যে আমার আট বছর জেল হয়েছিল। আজ আমি সকালবেলা জেল থেকে বেরিয়েছি। বেরিয়েই আমার সেই সব পুরনো জায়গাগুলো দেখে বেড়াচ্ছি। আমি আপনাদের বেলুড়ের ফ্যাক্টরিটাও দেখে এসেছি। দেখলুম ফ্যাক্টরি খুব ভালোই চলছে—

ছোটবাবু এতক্ষণে যেন একটু নরম হলো। বললে—তাহলে তোমার নাম সন্দীপ লাহিড়ী?

সন্দীপ বললে—তবু ভালো যে আমাকে আপনি এতক্ষণে চিনতে পেরেছেন! চিনতে না পারাই স্বাভাবিক। যার কাছ থেকে মানুষ উপকার পায়, পরে তাকে কেউই চিনতে পারে না। আপনি আমাকে চিনতে পেরেছেন, এ জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ!

—তুমি জেল থেকে আজকেই ছাড়া পেয়েছ?

সন্দীপ বললে—হ্যাঁ।

—তোমার চাকরি কি আছে?

সন্দীপ বললে—কী করে থাকবে? চুরি করলে কি কারো কখনও চাকরি থাকে?

—তাহলে কী করবে এখন? কী করে জীবন কাটাবে?

সন্দীপ বললে—সে-কথা এখনও ভাববার সময় পাইনি। সে-কথা ভাববো তখন যখন আমার সব কথার জবাব আমি পাবো।

—তোমার কী কথা?

সন্দীপ এবার সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে নিলে। বললে—একদিন আপনি আমার কাছে গিয়ে সাহায্য চেয়েছিলেন, মনে আছে? টাকা চেয়েছিলেন?

—হ্যাঁ, তাতে কী হয়েছে?

সন্দীপ আবার বললে—একদিন আমার সঙ্গে এই বিশাখার বিয়ে হতে চলেছিল, মনে আছে?

ছোটবাবু এ-কথার জবাব দিলে না। সন্দীপ আবার বলতে লাগলো—সেই বিয়ের আসরে হঠাৎ আপনি আমার বাড়িতে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন, মনে আছে? আপনার সঙ্গে পুলিশ পাহারা ছিল, মনে আছে?

ছোটবাবু এ-কথারও কোনও জবাব দিলে না।

—সেই বিয়ের পিঁড়ি থেকে আমাকে উঠিয়ে দিয়ে আপনিই সেই বিয়ের পিঁড়িতে বসেছিলেন, সেদিন আপনার সঙ্গেই এই বিশাখার বিয়ে হয়ে গিয়েছিল, মনে আছে? তারপর যখন বিয়ে হয়ে গেল তখন আপনি আবার সেখান থেকে জেলে চলে গিয়েছিলেন, মনে আছে?

এবারও ছোটবাবু কোনও কথার জবাব দিলে না। সন্দীপ বললে—আমার কথার জবাব দিচ্ছেন না কেন? জবাব দিন। বলুন আমি ঠিক বলছি কিনা?

ছোটবাবু এ-কথারও কোনও জবাব না দিয়ে শুধু বললে—তাতে হয়েছেটা কী?

সন্দীপ বললে—কী হয়েছে তা পরে বলছি, এখন আপনাকে শুধু সব কথা মনে পড়িয়ে দিচ্ছি।...তারপর আপনার মামলা আমার উঠলো হাইকোর্টে। আপনার ফাঁসি হবে কি হবে না তারই বিচার শুরু হলো। মনে আছে?

ছোটবাবু তখনও চুপ। সন্দীপ একটু থেমে আবার বললে—না, আপনার এ-সব কথা

মনে পড়বে না। আপনি এখন স্যাক্সবি মুখার্জি কোম্পানীর ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টার। আপনার ও-কথা মনে পড়তে নেই। একবার টাকার চুড়োয় উঠলে পুরনো দিনের অভাব, পুরনো দিনের দুঃখ-দুর্দশার কথা মনে রাখতে নেই। তবু আমি আপনাকে সব ঘটনা মনে করিয়ে দিতে চাই, তাতে আপনার লাভ না হোক, আমার লাভ আছে, এই বিশাখারও লাভ আছে—

ছোটবাবুর ততক্ষণে বিরক্তি এসে গিয়েছিল। বললে—যা বলবার তাড়াতাড়ি বলে নাও, আমার কাজ আছে অনেক—

—কাজ? কাজের কথা বলছেন? কাজ কার নেই? আজকাল একটা বেকারেরও কাজ আছে। আর আমার? আমার মতো জেল থেকে ছাড়া পাওয়া লোকেরও কাজ আছে—আমি কাজের কথা বলতেই তো এসেছি—

—আবার আমার সময় নষ্ট করছো? যা বলবার বলে যাও—

সন্দীপ বললে—একদিন আপনি এই বিশাখাকে নিয়ে আমার নেবুবাগান লেনের বাড়ি গিয়েছিলেন, মনে আছে? না, মনে নেই?

ছোটবাবু বললে—বলে যাও যা বলবার আছে—

—সেদিন কিন্তু আপনি অন্য মানুষ ছিলেন। সেদিন আমি ছিলুম ন্যাশন্যাল ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের বড়বাজার ব্রাঞ্চের ম্যানেজার আর আপনি আজকের আমার মতো বেকার—

—তারপর?

—তারপর আপনি আমার কাছে কয়েক লাখ টাকা ধার চেয়েছিলেন! মনে আছে?

—তারপর?

সন্দীপ বললে—সঙ্গে ছিল বিশাখা দেবী। আমি সেদিন আপনাকে বলেছিলুম আপনার স্ত্রী এই বিশাখা দেবীর জন্যে আমি সব কিছু করতে পারি। মনে আছে? আমি করেও ছিলুম তাই। আমি আপনাকে লাখ-লাখ টাকা দিয়েছিলুম। আর তারই ফলে আমার হয়েছিল আট বছরের জেল আর আপনি স্যাক্সবি মুখার্জি কোম্পানী আবার চালু করেছেন বেলুড়ে। এখন আপনি হয়েছেন তার ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টার!

ছোটবাবু তখন বোধহয় সহ্যের সীমা অতিক্রম করে গিয়েছিল। বললে—তাতে এখন হয়েছেটা কী?

সন্দীপ বললে—তাতে কিছুই হয়নি আপনি মনে করেন?

—কী হয়েছে? হ্যাঁ আমি স্বীকার করছি আমি কোম্পানীর ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টার হয়েছি। তাতে হাজার হাজার লোক আবার সেখানে চাকরি পেয়েছে। তাতে খারাপটা কী হয়েছে?

সন্দীপ বললে—তাতে খারাপ কিছুই হয়নি। তাতে অনেক লোকেরই ভালো হয়েছে স্বীকার করছি। আপনার নিজেরও ভালো হয়েছে। কিন্তু......

ছোটবাবু কথাটা লুফে নিলে যেন।

বললে—কিন্তু তুমি কি এই কথা বলতেই আমার কাছে এই অসময়ে এসেছ?

সন্দীপ বললে—কিন্তু আর কখন আসবো আপনার কাছে বলুন? আজকেই তো প্রথম ছাড়া পেলাম জেলখানা থেকে। আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্যেই তো আপনাদের ফ্যাক্টরিতে গিয়েছিলুম। কিন্তু সেখানে তখন কারখানা ছুটি হয়ে গেল। আমি ঢুকতে চাইলুম কিন্তু ঢুকতে দিলে না—

—কিন্তু ওই ওকে নিয়ে এলে কেন?

এতক্ষণে বিজলী একবার চেয়ে দেখলে বিশাখার দিকে।

বিশাখা তখন ভয়ে কাঁপছে। একবার চরম অপমান পেয়ে এই বাড়ি থেকেই কাঁদতে কাঁদতে গিয়েছে। আজ এতদিন পরে সন্দীপের সঙ্গে এসেও তার ভয় যায়নি। কেবল

ভয় হচ্ছে আবার যদি তাদের অপমান করে ছোটবাবু! আবার যদি সেবারের মতো অপমান করে তাড়িয়ে দেয় ছোটবাবু!

চুপি চুপি সন্দীপের হাত ধরে টানলে। বললে—চলো, চলে যাই—

সন্দীপ বললে—তুমি চুপ করে থাকো। দেখি না ছোটবাবু কী করে অপমান করে আবার!

তারপর ছোটবাবুর দিকে ফিরে বললে—আপনি একে, এই বিশাখাকে একদিন বিয়ে করেছিলেন কিনা বলুন?

ছোটবাবু বললে—সেই কথা জানতেই বুঝি বিশাখাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছ?

সন্দীপ বললে—হ্যাঁ—

ছোটবাবু বললে—তাহলে শুনে রাখো আমার খুশী। সেবারে আমার বিয়ে দেওয়া হয়েছিল। বিয়ে দিয়েছিল আমার ঠাকমা-মণি। এখন আমার খুশী আমি ওকে ত্যাগ করেছি। সেবার দরকার ছিল বলে আমি বিশাখাকে বিয়ে করেছিলাম আর এবার আমার খুশী হয়েছে বলে ওকে ছেড়ে দিয়েছি—আমার বিশাখার সঙ্গে বিয়েই শুধু হয়েছিল, কিন্তু বিয়ের আনুষঙ্গিক অন্য কোনও অনুষ্ঠান হয়নি।

—তাহলে বিশাখা কোথায় যাবে?

ছোটবাবু বললে—তুমি কি আমার কৈফিয়ৎ চাইছ!

সন্দীপ বললে—মনে করুন না তাহলে তাই-ই। আমি আপনার কাছে সেই কৈফিয়ৎ চাইছি!

—তুমি কিনা আমার কাছে কৈফিয়ৎ চাইছ? তুমি কে? হু আর ইউ?

সন্দীপ বললে—আমার কৈফিয়ৎ চাইবার অধিকার আছে বলেই আমি আপনার কাছে সেই কৈফিয়ৎ চাইছি!

—হ্যাঙ্ ইওর অধিকার! তুমি এ-ঘর থেকে বেরিয়ে যাও—

সন্দীপ এতক্ষণ একটুও উত্তেজিত হয়নি। এবারও উত্তেজিত হলো না। শান্ত গলায় বললে—আমার চলে যেতে আপত্তি নেই, কিন্তু বিশাখাকে এ-বাড়িতে থাকবার অধিকার আপনাকে দিতে হবে, বিশাখাকে আপনার স্ত্রীর মর্যাদা দিতে হবে!

ছোটবাবু বরাবর উত্তেজিতই ছিল, এবার আরো উত্তেজিত হয়ে উঠলো। বললে—স্কাউন্ড্রেল কোথাকার—

সন্দীপ বললে—স্কাউন্ড্রেলই বলুন আর লোফার যা-ই বলুন আমি আপনার কথায় রাগও করবো না, উত্তেজিতও হবো না। আপনি বলুন আপনি বিশাখাকে বাড়িতে থাকতে দেবেন কিনা?
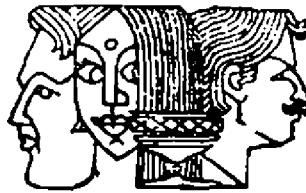
অজয়বাবু এই পর্যন্ত বলে থামলেন। জিজ্ঞেস করলাম—তারপর? তারপর কী হলো?

অজয়বাবু সারা জীবন হাইকোর্টে প্র্যাকটিশ করেছেন। শুধু প্র্যাকটিশই করেননি, অনেকদিন স্ট্যান্ডিং কাউন্সিলও ছিলেন। শেষকালে জাস্টিস্ও হয়েছিলেন। তখন রোজ সকালবেলা বেড়াতে যেতেন লেকে। বাড়ি থেকে গাড়িতে এসে নামতেন লেকের সামনের গেট-এ। তারপরে জলের পাশের রাস্তা দিয়ে হাঁটতেন আর গল্প করতেন।

আমি তাঁর গল্প শোনবার জন্যে প্রতিদিন ছটফট করতাম। এক একটা দিন গল্পটা আংশিক শুনতাম আর পরের অংশটা শোনবার জন্যে উদ্গ্রীব হয়ে থাকতাম দিনের পর দিন।

তিনি বলতেন—আজ তো দেখছেন মানুষ কী রকম টাকার পেছনে হন্যে হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে। পয়সাই আজকাল মানুষের কাছে পরমেশ্বর হয়ে উঠেছে। আজও সেই 'স্যাক্সবী-মুখার্জী' কোম্পানী আছে। সেই কোম্পানীর শেয়ারের দাম দিনকে দিন বেড়ে বেড়ে আকাশ পর্যন্ত ছুঁয়েছে। তবু লোকে সেই শেয়ার কেনবার জন্যে হাঁ করে বসে থাকে। কবে এক টাকা দাম কমলো কি এক টাকা দাম বাড়লো তার হিসেব রাখে মনে মনে। আর শুধু কি তাই! মানুষকে দোষ দিয়েই বা কী লাভ? আমাদের গভর্মেন্ট? আমাদের গভর্মেন্টও তো দিন-দিন টাকার পেছনে দৌড়চ্ছে—

জিজ্ঞেস করলাম—কী রকম?

—দেখছেন না, গভর্মেন্ট চাইছে মানুষ টাকার পেছনে দৌড়োক্। গভর্মেন্ট চাইছে মানুষ জুয়া খেলুক। অথচ আমরা ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি জুয়া খেলা পাপ। আমাদের সময় যে জুয়া খেলতো তাকে আমরা বলতাম রেসুড়ে। তখন রেস খেলাটা ছিল নিন্দের। এখন আমরা সবাই রেসুড়ে—

আবার জিজ্ঞেস করলাম—কী রকম? সবাই তো আজকাল রেস খেলে না—

—রেস খেলে না। কিন্তু সাট্টা খেলে। সাট্টা খেলা গভমেন্ট বে-আইনী করে দিয়েছে বটে, কিন্তু গভর্মেন্ট নিজেই তো সাট্টা খেলছে।

আমি তো শুনে অবাক। বললাম—কীভাবে?

অজয়বাবু বললেন—গভর্মেন্ট সাট্টা খেলছে না? তাহলে লটারির ব্যবসাটা কী? ইংরেজ আমলের আদিযুগে তারা লটারির সৃষ্টি করেছিল শহর উন্নতি করবার জন্যে। শহরের উন্নতি হয়ে গেলে সেই লটারি-সিস্টেম তুলে দিয়েছিল। এই যে ঘোড়ার রেস হয়। তা থেকে গভর্মেন্ট ট্যাক্স আদায় করে। যারা ঘোড়দৌড় নিয়ে বাজি ধরে তাদের কিন্তু সমাজের লোক নিচু নজরে দেখে। সমাজের চোখে তারা নিচু শ্রেণীর। কিন্তু আজ?

বলে অজয়বাবু একটু থেমে আবার বলতে লাগলেন—কিন্তু আজ? দেশে লোকসংখ্যা বাড়ছে, তাই শহরে গ্রামে গঞ্জে আজ দোকান-পাটও বাড়ছে। তার মধ্যে কীসের দোকান বেশি বাড়ছে? সোনার আর লটারির দোকান! কেন বাড়ছে? রাস্তায় চলতে চলতে আজকাল কোনও মহিলাকে খাঁটি সোনার গয়না পরে যেতে দেখেছেন? না। আজ এই চুরি-বাটপাড়ির যুগে সবাই গিলটির গয়না পরছে। তাহলে সোনার গয়নার দোকান বেড়ে চলেছে কেন? বলুন, কেন?

আমি চুপ করে রইলাম।

অজয়বাবু বলতে লাগলেন—এর কারণ ইনকাম-ট্যাক্স। ইংরেজ আমলে ইনকাম-ট্যাক্সের এত বালাই ছিল না। যার যা দেবার তা তারা মিটিয়ে দিত। যারা ট্যাক্স দিত না তাদের সংখ্যা কম ছিল। এখন ট্যাক্স না-দেওয়া লোকের সংখ্যা বেড়েছে। তারা সোনায় টাকা ইনভেস্ট করে। সোনায় টাকা ইনভেস্ট করলে ধরা শক্ত। যদি ধরাও পড়ে তখন জবাবদিহি হবে পৈতৃক আমলের গয়না। কেউ প্রমাণ করতে পারবে না যে কবেকার গয়না তৈরি। এ-যুগে কালো টাকা রাখবার সবচেয়ে নিরাপদ উপায় হচ্ছে তা সোনায় লগ্নী করা। দেশে কালো টাকার পাহাড় জমেছে বলে সোনার দোকানের সংখ্যা এত কম-জমাট। আর লটারি...

আমি তখন অধৈর্য হয়ে উঠেছিলাম। বললাম—তারপর সন্দীপের কী হলো তাই বলুন—

অজয়বাবু বললেন—বলছি, কিন্তু তার আগে এই কথাগুলো না বললে সন্দীপের ট্র্যাজেডিটা ঠিক বুঝতে পারবেন না। আগে লটারির কথাটা বলে নিই। লটারির দোকানের সংখ্যাও বাড়বার একটা কারণ আছে। বিনা পরিশ্রমে টাকা উপার্জন করবার ধান্দাতেই এখন সবাই ব্যস্ত। সাতষট্টি সালে কেরলেই প্রথম সরকারী লটারির সৃষ্টি হলো। তারপর সারা ইন্ডিয়াতে এখন সরকারী লটারির সংখ্যা একশো চার। এ-ছাড়া আছে বে-সরকারী থেকে লটারি। তাও কম নয়। এখন এমন একটা সরকারী লটারী আছে যারা এখন পাঁচটা ফার্স্ট প্রাইজ দেয়। ফার্স্ট প্রাইজগুলোর টাকার অঙ্ক এখন এক-একটা পাঁচ লাখ টাকা করে।

এটা কীসের লক্ষণ? এটা কি ভালো? সবাই যদি এত টাকা চায় তাহলে নীতি কোথায় থাকবে? মর্যালভ্যালুর দিকে কে নজর দেবে?

আবার বললাম—তারপর সন্দীপের কী হলো তাই বলুন।

অজয়বাবু বললেন—আমি ভাবি হামিদ সাহেবের কথা। হামিদ সাহেব দালালি করে লাখ লাখ টাকা কামিয়েছে, কামিয়ে এখন গ্যাঁট হয়ে সাধু হয়ে বসেছে, কিন্তু সেই হামিদ সাহেবের মতো লোকও সন্দীপ লাহিড়ীর প্রশংসা করে।

বলে—অমন মানুষ আর হয় না, হবেও না। উনি যখন জেলখানায় ছিলেন তখন কতো লোভ দেখিয়েছি, কত বলা হয়েছে আপনি যা চাইবেন তাই-ই আপনাকে পাইয়ে দেওয়া হবে। বলা হয়েছে—আপনার আত্মীয়-স্বজন কারো নাম করুন, কারো ঠিকানা দিন। সেখান থেকে আপনাকে সব কিছু সাপ্লাই করা হবে। বিড়ি সিগারেট মদ হুইস্কি, সব কিছু আনিয়ে দেওয়া হবে। জেলখানার ভেতরেই আপনাকে হোম-কমফোর্ট পাইয়ে দেওয়া হবে। তাতেও উনি কোনওদিন কারো কোনও ঠিকানা দেননি। উনি বরাবর বলেছেন—আমার কিছুরই দরকার নেই, আমার কোনও আত্মীয়-স্বজন নেই, আমার কোনও শুভাকাঙ্ক্ষী নেই। আমি একলা, পৃথিবীতে আমার আপন বলতে কেউই নেই। কেবল একজন ছাড়া...

লোকেরা জিজ্ঞেস করেছে—কে সে একজন? তার নাম ঠিকানা বলুন না—

তবু সন্দীপ কখনও কারো নাম ঠিকানা বলেনি।

এ শুধু একদিন নয়, হাজার-হাজার দিন জিজ্ঞেস করেও কেউ কোনও উত্তর পায়নি তার কাছ থেকে। সন্দীপ ল্যাহিড়ী কেবল জেলের মধ্যে নিজের মনে কাজ করে গেছে। কোনও দিন কারো কাছ থেকে কোনও দয়া বা করুণা ভিক্ষা করেনি। সন্দীপ জানতো যে দয়া ভিক্ষে করার মধ্যে একটা মানসিক নীচতা আছে। সন্দীপ আরো জানতো যে যে-কারণের জন্যে সে জেল খাটছে তা নিন্দের, তা মহা অপরাধের। কিন্তু উদ্দেশ্যটা যদি মহৎ হয় তাহলে যত নিন্দনীয় কাজই হোক, তা ক্ষমার যোগ্য। পরের জন্যে শুধু প্রাণ বা জীবনই নয়, জীবনের সর্বস্ব দেওয়াও তো একটা ধর্ম। সেই ধর্মই সে পালন করে যাচ্ছে একমনে।

সেই ধর্মই সে পালন করে যাবে বরাবর। যার জন্যে সে ধর্ম পালন করে যাবে সে হচ্ছে বিশাখা। তার কাছে তো শুধু একজন স্ত্রীলোকই নয়, বিশাখাই তার কাছে সর্বস্ব। বিশাখার কাছ থেকে কিছু প্রতিদান পাওয়ার আশা সে করে না, চায়ও না। শুধু এক-তরফাভাবে সে তাকে দিয়েই যাবে। পাওয়ার ইচ্ছেও তার কিছু নেই, পাওয়ার আশাও তার কিছু নেই। এই একতরফা দিয়ে যাওয়ার মধ্যেই তার আনন্দ। তাই নিজের শোওয়ার ঘরের মধ্যে যখন সে দেওয়ালে টাঙানো বিশাখার ছবিটার দিকে চেয়ে থাকতো তখন মনে মনে একটা কামনাই করতো—তুমি সুখী হও, তুমি সার্থক হও। মানুষের জীবনে যা পেলে সুখ আসে তুমি তাই পাও। তাতেই আমার সুখ, তাতেই আমার সার্থকতা, তাতেই আমার পারমার্থিক লাভ। সারা জীবন তুমি দুঃখ অবহেলা পেয়েছ, এবার যেন ছোটবাবু জেলখানা থেকে ফিরে এলে আমি তোমাকে সুখী দেখতে পাই।

এইসব ভাবতেই কখন একসময়ে সন্দীপ ঘুমিয়ে পড়তো আর তারপর এক ঘুম রাত কাটিয়ে ভোরবেলা আবার বিছানা থেকে উঠে পড়তো। তারপর উঠে সব কাজ শেষ করে অফিসে চলে যেত। সেখানে গিয়ে তার লাখ-লাখ টাকার হিসেব-নিকেশ শুরু হয়ে কিন্তু তখনও রাত্রে যে-ছবিটা দেখতে দেখতে চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসতো সেই ছবিটাই আবার তার চোখের সামনে ভেসে উঠতো।

ব্যাঙ্কের অ্যাকাউনটেন্ট থেকে আরম্ভ করে যারাই তার ঘরে আসতো তারাই ম্যানেজারকে দেখে অবাক হয়ে যেত। ম্যানেজার সাহেব যেন লেজার বই-এর ওপরে ধ্যানস্থ হয়ে বসে আছেন।

স্টাফরা বলতো—ম্যানেজার সাহেব এখন ব্যস্ত আছেন, এখন কেউ তাঁর কাছে

যেয়ো না। টিফিনের পরে যাবে—

ম্যানেজারের হুকুমেই সমস্ত অফিসটা চলতো বটে কিন্তু তিনি কর্তা হলেও সবাই শ্রদ্ধা করতো তাঁকে। এই-ই হচ্ছে সন্দীপ, এই-ই হচ্ছে সন্দীপ লাহিড়ী।

হামিদ সাহেবের মতে—সন্দীপ লাহিড়ীর মতো সৎ মহানুভব মানুষ খুব কমই জেলখানায় কয়েদী হয়ে এসেছে আর সন্দীপ লাহিড়ীর মতো খুব অসাধু অপরাধী মানুষ জেলখানায় খুব কমই এসেছে!

সেদিন একজন মুখময় দাড়ি-গোঁফওয়ালা মানুষ হঠাৎ পার্ক স্ট্রীটের থানায় ঢুকে পড়তেই সবাই অবাক হয়ে গিয়েছে। এমন করে দৌড়ে লোকটা আসছে কেন? লোকটা কে?

লোকটাকে দেখে মনে হলো যেন সে খুব বিপদে পড়েছে। লোকটা তখনও হাঁফাচ্ছিল। দেখে মনে হলো লোকটার কিছু জরুরী কাজ আছে। যেন দৌড়তে দৌড়তে এসে থানায় পৌঁছিয়েছে। ডিউটিতে যে সব কনস্টেবল ছিল তারা জিজ্ঞেস করলে—কাকে চাই?

—থানার ও-সি আছেন?

ডিউটির লোকেরা বললে—হ্যাঁ, আছেন—

—কোন ঘরটায়?

তারা হাত বাড়িয়ে নির্দেশ করে দিয়ে বললে—এখান থেকে সোজা গিয়ে শেষের বাঁ দিকের ঘরে যান। ওখানে লোক আছে, দেখিয়ে দেবে।

লোকটা আর দাঁড়ালো না। কথাটা শুনেই তাড়াতাড়ি সোজা সামনের দিকে চলতে লাগলো। তারপর বাঁদিকে ফিরতেই একজন জিজ্ঞেস করলে—কী চাই?

—থানার ও-সি আছেন?

লোকটা জিজ্ঞেস করলে—কী নাম আপনার?

সন্দীপ বললে—আমার নাম সন্দীপ লাহিড়ী, কিন্তু নাম বললে চিনবেন না আমাকে—

লোকটা ভেতরে চলে গেল। বোধহয় সাহেবের অনুমতি চাইতে..

অজয়বাবু বললেন—সেদিন এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছিল পার্ক স্ট্রীটের সাতান্ন নম্বর বাড়িতে। সে-ঘটনাটা না বললে এই পার্ক স্ট্রীট থানার ঘটনাটা স্পষ্ট হবে না। আশ্চর্য মানুষ ওই হামিদ সাহেব। তার কাছে যে কীভাবে খবরগুলো আসতো তা ভেবে পাই না। হামিদ সাহেবের কাছেই শুনেছি যে এখন নাকি ওইরকম আরো অনেক দালাল জুটেছে। আগে অতো ছিল না। দিন-কাল যতো খারাপ হচ্ছে ওই হামিদ সাহেবের দল নাকি আরো অনেক বাড়ছে। শুধু জেলখানাতেই নয়, সব জায়গায়। আপনি কোনও অফিসে চাকরি চাইতে যান, সেখানেও আপনাকে হামিদ সাহেবরা ধরবে। আপনি ট্রেনে টিকিটের রিজার্ভেশন করতে যান, সেখানেও আপনাকে ধরবে হামিদ সাহেবরা। তারা সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। তারা যে কী করে সব খবর যোগাড় করে সেও এক আশ্চর্যের ব্যাপার। হস্পিটালে ভর্তি হবেন তাতেও দালাল লাগবে।

তা সেদিন যখন পার্ক স্ট্রীটের সোমাবাবুর বাড়িতে সন্দীপ বিশাখাকে নিয়ে গিয়ে ছোট-বাবুর সঙ্গে তুমুল কথা কাটাকাটি চালাচ্ছে তখন সন্দীপ রেগে গিয়ে বলে উঠলো—আপনি বলুন বিশাখাকে আপনার বাড়িতে থাকতে দেবেন কিনা? বলুন থাকতে দেবেন কি দেবেন না? বলুন বিশাখাকে স্ত্রীর মর্যাদা দেবেন কি না...

ছোটবাবুও অন্য মূর্তি ধরল। বললে—কী, তুমি আমায় ভয় দেখাচ্ছো নাকি?

সন্দীপ বললে—আপনি যদি আপনার স্ত্রীকে বাড়িতে থাকতেই না দেবেন তাহলে আমি কার জন্যে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা চুরি করলুম? কার জন্যে আট বছর জেল খাটলুম? আপনার জীবনের সুখের জন্যে?

—তুমি কার জন্যে টাকা চুরি করলে তা আমি কী করে জানবো?

বিজলী এগিয়ে সামনে এলো। বললে—কেন তুমি ওর সঙ্গে তর্ক করছো? ও তো একজন জেল-ফেরৎ আসামী!

সন্দীপ বললে—আমি জেল-ফেরৎ আসামীই তো! কিন্তু কার জন্যে জেল খেটেছিলুম? আমি কার জন্যে আসামী হয়েছিলুম?

ছোটবাবু বললে—সে তুমিই জানো! আমাকে জিজ্ঞেস করছো কেন?

সন্দীপ বললে—আপনি ভালো করেই জানেন আমি কার জন্যে টাকা চুরি করে জেলে গিয়েছিলুম!

বিশাখা এতক্ষণ সন্দীপের পেছনে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল আর কাঁদছিল। সে এবার সন্দীপের হাতটা ধরে টানলে। বললে—তুমি কেন এখানে নিয়ে এলে? চলো, চলে যাই...

সন্দীপ তার দিকে চেয়ে বললে—কেন চলে যাবো? চলে যাবার জন্যে কি তোমাকে নিয়ে এসেছি? এ-বাড়িতে তোমার থাকবার অধিকার আছে। তুমি ভয় পাচ্ছো কেন?

বিশাখা বললে—না না সন্দীপ, আমার জন্যে তুমি অনেক ভুগেছ, আর নয়, চলো এবার ফিরে যাই—

সন্দীপ বললে—না, কিছুতেই আমি ফিরে যাবো না।

বিশাখা বললে—না সন্দীপ, তোমার পায়ে পড়ছি, আমি আর পারছি না, তুমি ফিরে চলো, সারাদিন তোমার অনেক ভোগান্তি হয়েছে—

বিজলী বিশাখার দিকে চেয়ে বললে—হ্যাঁ হ্যাঁ ফিরে যাও, আর কখনও এ-বাড়িতে এসো না—

সন্দীপ বিশাখার হয়ে বললে—না, কথা হচ্ছে ছোটবাবুর সঙ্গে, তুমি কেন মাঝখান থেকে বাধা দিচ্ছ। ও থাকবে, তুমি এ-বাড়ি ছেড়ে চলে যাও—

এবার বিশাখাও বিজলীর দিকে চেয়ে বললে—চুপ কর রাক্ষুসী, তোকে আমি বাড়িতে থাকতে দিয়েছিলুম আমার এই সর্বনাশ করবার জন্যে?

সৌম্যপদ বললে—খবরদার বলছি বিজলীকে কিছু বোল না তুমি! আমি ওকে নিজে থেকে এ-বাড়িতে এনে রেখেছি—

সন্দীপ বললে—এটা আপনি অন্যায় করেছেন। সামাজিক অন্যায়।

ছোটবাবু বললে—অন্যায়?

সন্দীপ বললে—হাজার বার অন্যায়!

ছোটবাবু বললে—চুপ করো। কোনটা ন্যায় আর কোনটা অন্যায় তা বোঝবার মতো যথেষ্ট বয়েস হয়েছে আমার—

সন্দীপ বললে—আপনার বিয়ে করা বউকে ত্যাগ করা অন্যায় নয়? কী বলছেন আপনি?

বিশাখা বলে উঠলো—না সন্দীপ, ভুল করছো তুমি, আমার বিয়ে হয়নি ওর সঙ্গে—

সন্দীপ বললে—কী বাজে কথা বলছো তুমি, ছোটবাবুর সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়নি?

বিশাখা বললে—না, বিয়ে হয়নি—

সন্দীপ অবাক হয়ে গেল বিশাখার কথা শুনে। বললে—বিয়ে হয়নি মানে?

বিশাখা বললে—না, সত্যিই বিয়ে হয়নি!

সন্দীপ বললে—আমি যে নিজের চোখে দেখলুম তোমাদের দুজনের বিয়ে হলো। তাহলে কি আমি ভুল দেখলুম? তাহলে ঠাকমা-মণি কেন তোমাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন? তোমার হাতে কেন সিন্দুকের চাবি দিলেন? হিসেবের খাতা তুলে দিলেন?

বিশাখা বললে—না সন্দীপ, না। বিশ্বাস করো আমার বিয়ে হয়নি ছোটবাবুর সঙ্গে—

—তার মানে?

বিশাখা বললে—তার মানে বিয়ে হয়নি! শুধু সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে দিলেই কি বিয়ে করা হয়?

সন্দীপ বললে—আজ তুমি আমাকে এত দিন পরে এই কথা বললে? মাথায় সিঁদুর পরিয়ে দিলেই বিয়ে হয় না? তাহলে ছোটবাবুর সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়নি বলতে চাও?

বিশাখা বললে—না, হয়নি। সে শুধু লোক-ঠকানো অনুষ্ঠান। তাহলে কি আজকে আমার এই দুর্ভাগ্য হয়? স্ত্রী-আচার কোথায় হলো, গায়ে-হলুদ কোথায় হলো, বাসর-ঘর কোথায় হলো, ফুল-শয্যা কোথায় হলো, কখন হলো?

সন্দীপ বললে—তা না হোক, তোমার সঙ্গে ছোটবাবুর বিয়ে হয়েইছে। ঠাকমা-মণি মেনে নিয়েছিলেন, পুরুত-মশাই মেনে নিয়েছিলেন, সমাজও মেনে নিয়ে ছিল। সুতরাং ছোটবাবুর সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়েই গেছে। ছোটবাবুই তোমার স্বামী। ছোটবাবু যদি তোমাকে নিতে রাজী না হয় তো ছোটবাবুই অপরাধী। সেই অপরাধের শাস্তি ছোট-বাবুকে পেতেই হবে।

ছোটবাবু হুঙ্কার দিয়ে উঠলো। বললে—কখখনো না। বিশাখা আমার স্ত্রী নয়। এই বিজলী আমার স্ত্রী। আমি একে রেজিস্ট্রী করে বিয়ে করে ফেলেছি—

—সে কী! বিয়ে করেছেন!

ছোটবাবু বললে—বিয়ে না করে কি বিজলীকে নিয়ে একই বাড়িতে থাকতে পারতুম?

সন্দীপের সমস্ত শরীর রাগে থর-থর করে কাঁপতে লাগলো। বললে—স্কাউণ্ড্রেল, এতক্ষণ আমি ভদ্র ব্যবহার করে এসেছি আপনার সঙ্গে, এতক্ষণ ভদ্রভাবে কথা বলে এসেছি, কিন্তু আর আমি সহ্য করবো না...

হঠাৎ বিশাখা ঢলে পড়ে গেল মেঝের ওপর। সন্দীপ বললে—এবার যদি বিশাখার কোনও ক্ষতি হয় তো তার জিম্মেদারী কে নেবে?

ছোটবাবু আর সামলাতে পারলে না নিজেকে। তাড়াতাড়ি পাশের আলমারি থেকে তার পিস্তলটা বার করে এনে সন্দীপের দিকে তাক্ করে বলে উঠলো—আমাকে স্কাউণ্ড্রেল বলা! আমি এ-বাড়ির মালিক—এই দেখ...

বিজলী সঙ্গে সঙ্গে ছোটবাবুর সামনে এসে তার হাতটা চেপে ধরে ফেলেছে। আর সঙ্গে সঙ্গে একটা বিকট শব্দ করে পিস্তলটা থেকে আগুনের গোলা বেরিয়ে গেছে।

হঠাৎ ঠিক সেই সময়ে বচন ঘরে ঢুকেছে হুইস্কির বোতল নিয়ে—কী হলো, কী হলো?

সেও এই অপ্রত্যাশিত ঘটনার জন্যে তৈরি ছিল না তখন। স্তম্ভিত হয়ে সে ছোটবাবুর দিকে চেয়ে রইলো। কিন্তু সন্দীপ ততক্ষণে যা করবার তা করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

পার্ক স্ট্রীট থানার ও-সি একটু আগেই তাঁর দৈনিক রাউণ্ড থেকে ফিরে এসেছিলেন।

হঠাৎ তার ডিউটি এসে ঘরে ঢুকলো। বললে—স্যার। একজন আদমী এসেছে আপনার সঙ্গে মুলাকাত্ করবার জন্যে—

—আমার কাছে কেন? পাশের ছোট সাহেবের ঘরে যেতে বল্—

—না, আদমী বলছে—আপনার সঙ্গেই মুলাকাত্ করবে—

—কিছু নাম বলেছে?

—জী হাঁ, সন্দীপ লাহিড়ী।

—আচ্ছা, ডাক্—

সন্দীপ লাহিড়ী ও-সি'র ঘরে ঢুকলো। ও. সি. বললেন—কী চাই?

সন্দীপ বললে—আমাকে এ্যারেস্ট করুন স্যার।

—কেন, আপনি কী করেছেন?

সন্দীপ বললে—আমি মানুষ খুন করেছি—

—কে আপনি? কাকে খুন করেছেন? কখন খুন করেছেন? কেন খুন করেছেন?

আমি উদ্‌গ্রীব হয়ে শুনছিলাম অজয়বাবুর গল্প।

জিজ্ঞেস করলাম—কেন? সন্দীপ লাহিড়ীকে লক্ষ্য করে ছোটবাবু পিস্তলের গুলি ছুঁড়লেন। তাতে সন্দীপ কী করে থানায় গেল?

ও-সি আবার জিজ্ঞেস করলেন—কাকে খুন করেছেন?

—শ্রীমতী বিজলী দেবীকে।

—কে তিনি?

সন্দীপ বললে—তিনি সাতাত্তর নম্বর পার্ক স্ট্রীটের মালিক সৌম্যপদ মুখার্জীর স্ত্রী।

—কখন খুন করলেন?

—এই এখনই। আমি সেখান থেকেই সোজা আসছি। আমাকে দয়া করে এ্যারেস্ট করুন। আমি খুনী।

ও-সি জিজ্ঞেস করলেন—কেন খুন করলেন?

সন্দীপ কিছু বলবার আগেই বচন ঘরে ঢুকে পড়লো হুড়মুড় করে।

—কে তুমি?

—স্যার, আমি এই রাস্তার মুখার্জী সাহেবের বাড়ির দরোয়ান। আমার নাম বচন সিং—

—তুমি কেন এসেছো?

বচন বললে—এই আদমী আমার মেম-সাহেবকে খুন করেছে। খুন করেই পালিয়ে যাচ্ছিল, তাই আমিও এর পেছন-পেছন দৌড়ে আসছি।

—এ তোমার মেম-সাহেবকে তোমার সামনে খুন করেছে? তুমি খুন করতে দেখেছো?

—হ্যাঁ, হুজুর। আমি আধ-ঘণ্টার জন্যে দোকানে গিয়েছিলুম সাহেবের জন্যে মাল খরিদ করতে, আর সেই ফাঁকে এই আদমী বাড়িতে ঢুকে মেম-সাহেবকে খুন করেছে—

—তুমি নিজের চোখে দেখেছ?

—হ্যাঁ হুজুর, আমি নিজের চোখে দেখেছি। মেম-সাহেব এখনও ঘরের মেঝেতে পড়ে আছেন। গুলিটা মাথায় লেগেছে, রক্তে ভেসে যাচ্ছে। খানসামা বাবুর্চি সবাই হল্লা শুনে যে-যার ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে। সাহেবের ড্রাইভার বিশু গেছে ডাক্তার ডাকতে। টেলিফোন খারাপ তাই ডাক্তার সাহেবকে টেলিফোনে পাওয়া গেল না। আপনি একবার আমাদের বাড়িতে চলুন হুজুর। সব দেখতে পাবেন—

ও-সি সঙ্গে সঙ্গে 'ডিউটি'কে ডেকে গাড়ি আনালেন। তারপর সন্দীপ লাহিড়ীর হাতে হ্যান্ড্-কাফ্ লাগানো হলো। সন্দীপ এতটুকু প্রতিবাদ করলে না। প্রতিবাদ তো দূরের কথা, বরং সাগ্রহে দুটো হাত সামনের দিকে বাড়িয়ে দিলে।

ততক্ষণে থানায় হৈ-চৈ পড়ে গেছে। এ-রকম ঘটনা তারা আগে কখনও দেখেনি। খুনের আসামী নিজে এসে থানায় ধরা দিলে, এটা বড় বিরল ঘটনা। শুধু বিরল নয়, এ-থানার ইতিহাসে এমন ঘটনা আসে কখনও ঘটেনি। তাই ও-সি'র ঘরের ভেতরে কনস্টেবল, ছোট দারোগা, ডিউটিরা, সবাই সেখানে এসে ভিড় করেছে আর আসামীকে নিরীক্ষণ করছে। আসামীর হাতে একটা পিস্তল!

তারপর এক সময়ে জীপ সকলকে নিয়ে সাতাত্তর নম্বর পার্ক স্ট্রীটের বাড়িটার দিকে রওনা দিলে। সৌম্যপদ মুখার্জীর বাড়িটা দূরে নয়, কাছেই। বেশি সময় লাগলো না যেতে। ও-সি আগে নেমে পড়লেন। তারপরে নামলো বচন। তারপর দুজন কনস্টেবল হাত-কড়া বাঁধা সন্দীপকে নামিয়ে নিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকলো।

বাড়ির দোতলায় উঠতেই মানুষের ভিড় দেখা গেল। বাড়ির ঝি-চাকর বিশু খানসামা বাবুর্চি সবাই একজনকে ঘিরে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। তারা পুলিশের লোককে দেখে জায়গা করে দিলে। ও-সিকে সামনের দিকে নিয়ে গিয়ে বচন সৌম্যপদ মুখার্জীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলে। বললে—এই আমার মালিক হুজুর, মুখার্জী সাহেব—

মুখার্জী সাহেব ও-সিকে নমস্কার করলে। ও-সিও মাথা হেঁট করলে সসম্ভ্রমে।

জিজ্ঞেস করলেন—আপনার নামই সৌম্যপদ মুখার্জী ?

—হ্যাঁ—

—এই লোকটাকে চেনেন ?

ছোটবাবু বললেন—চিনি।

—এ বলছে এ নাকি এই মহিলাকে খুন করেছে রিভলবার দিয়ে। এটা কার রিভলবার ?

ছোটবাবু বললেন—আমার।

—আপনার রিভলবার এ কী করে পেল ?

ছোটবাবু বললেন—রিভলবারটা আমার আলমারিতে ছিল, সেখান থেকে নিয়ে আমার স্ত্রীকে গুলি করেছে। করে এখান থেকে পালিয়ে গিয়েছে।

ও-সি বললে—পালিয়ে যায়নি, আমার থানায় গিয়ে সারেণ্ডার করেছে। এ স্বীকার করছে যে ও আপনার স্ত্রীকে মার্ডার করেছে। সেইটেই আমি এন্‌কোয়ারী করতে এসেছি।

ততক্ষণে বিশু ডাক্তারবাবুকে ডেকে নিয়ে এসেছে। ডাক্তারবাবু রোগীর পালস্‌টা দেখবার জন্যে হাতটা টানতে গিয়ে থমকে গেলেন। একেবারে বরফের মতো ঠাণ্ডা হাত। তারপর কপালে হাত দিলেন। সেটাও ঠাণ্ডা। বললেন—পেশেন্ট হ্যাজ্‌ ডায়েড্‌—

অজয়বাবু থামতেই আমি অধৈর্য হয়েই বললাম—তারপর ?

অজয়বাবু বললেন—আমাদের পৃথিবীতে যারা ভালো মানুষ তারাই কষ্ট পায়। যারা ট্যাক্স ফাঁকি দেয়, যারা মিথ্যাচারী, যারা পরের সর্বনাশ করার চিন্তায় সব সময়ে অধীর, যারা আত্মকেন্দ্রিক তারাই সুখে থাকে। সুখ তাদের একচেটিয়া। তারা বাড়ি করে, গাড়ি করে, ঐশ্বর্যবান হয়, বিলাসের মধ্যেই কাটায়। যেমন হামিদ সাহেব। তিনি সেই অর্থে চরম সুখভোগ করছেন। মানুষ যা-যা চায় তা তাঁর হয়েছে। আরামে আছেন, ছেলে-মেয়েরাও সুখে আরামে কাটাচ্ছে।

আর সৌম্যপদ মুখার্জী ? স্যাক্সবী-মুখার্জী কোম্পানীর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর মুক্তিপদ মুখার্জী মারা যাওয়ার পর এখন স্যাক্সবী-মুখার্জী কোম্পানীর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর হয়েছে সৌম্যপদ মুখার্জী। তাঁর কোম্পানীর শেয়ার এখন লাফিয়ে লাফিয়ে আকাশ ছুঁতে চাইছে। সেই কোম্পানীর শেয়ার কিনে লাভবান হওয়ার জন্যে শেয়ার-মার্কেটে হুড়োহুড়ি পড়ে যাচ্ছে। সেই বিজলীর পরে তিনি এখন জুলী নামে একজন এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ক্রিশ্চান মেয়ের সঙ্গ-সুখ উপভোগ করছেন।

তারপর বাকি রইলো গোপাল হাজরা, বরদা ঘোষাল, আর শ্রীপতি মিশ্ররা। তারা কেমন আছে ? এক কথায় এর উত্তর—তারা এখন সমাজের, দেশের, রাষ্ট্রের সৌধ-শিখরে। তাদের সেবা করবার, সমীহ করবার, সেলাম করবার লোকের সীমা নেই। তারাই এ-যুগে বেদ-কোরান-বাইবেল। তারাই এ-যুগে গীতা-রামায়ণ-মহাভারত। তাদের পুজো করলে ইষ্টলাভ হয়। সুতরাং তাদের ভজনা করো, তাদের সেবা করো, তাদের সমীহ করো, সেলাম করো। ডি-এ-পি পার্টির মেম্বার হও। তাতেই তোমাদের মোক্ষলাভ হবে।

তাই সমস্ত পৃথিবীটাই রাতারাতি একেবারে আমূল বদলে গেল। এখন মানুষ কিছু ভাবতে চায় না, কেবল কী করলে আরো টাকা উপার্জন করা যায় সেই দিকেই সকলের লক্ষ্য। আগে দেশের একজন গোপাল হাজরা ছিল, এখন কোটি কোটি গোপাল হাজরাতে পৃথিবী ভরে গেছে। টাকা চাই, আরো টাকা চাই, আরো টাকা চাই। টাকা হলে আরো সুখ-ভোগ করতে পারবো। আরো আরাম করতে পারবো।

কিন্তু সুখ পেতে গেলে যে কর্তব্য পালন করতে হয় সে তোমরা পালন করো। আমি গোপাল হাজরা হতে চাই। গোপাল হাজরার মতো বড়লোক হতে গেলে কী করতে হবে সেই পথটা আমাকে বাতলে দাও। নেশার মাল বিক্রি করলে যদি বড়লোক হওয়া যায় তো তাও করতে রাজী। তার জন্যে আমরা হরিদয়াল আর ফটিক হয়েও গোপাল হাজরার

ভজনা করবো। মোট কথা, পরের ভালো মন্দ যা হয় হোক, আমরা টাকা চাই।

বললাম—কিন্তু বিশাখা? বিশাখার কী হলো?

অজয়বাবু বললেন—বলছি, সবই বলছি। ওদিকে সন্দীপ লাহিড়ীর কথাও বলছি।

বলে একটু থামলেন। তারপর আবার বলতে লাগলেন—প্রেম আর ত্যাগ দুটো আলাদা জিনিস নয়। প্রেমহীন ত্যাগ যেমন হয় না, তেমনি ত্যাগহীন প্রেমও হওয়ার নয়। ত্যাগ মানেই প্রেম আর প্রেম মানেই ত্যাগ। আজ এই পৃথিবীর সংসার থেকে প্রেম আর ত্যাগ দুটো জিনিসই উঠে গেছে। এখনকার সংসার ও দুটো জিনিসকে তাই আর খুঁজে পাওয়া যায় না। এখন ও দুটোর কথা বললে লোকে উন্মাদ বলবে।

হাইকোর্টে তাই যখন সন্দীপ লাহিড়ীর নারীহত্যার মামলাটা উঠলো তখন বিশাখা ঠিক আগেকার মতোই তার পাঁচ নম্বর ভুবন গাঙ্গুলী লেনের বাড়িটার ভেতরে বিছানার ওপর অজ্ঞান হয়ে শুয়ে আছে। মঙ্গলা এসে বলে—বউদিমণি, ওষুধটা খেয়ে নাও—

অনেক ডাকাডাকির পর বিশাখা একটু সাড়া দেয়।

বলে—আর ওষুধ খেয়ে কী হবে, আর ওষুধ খাবো কার জন্যে?

তারপরে জিজ্ঞেস করে—হ্যাঁরে, আর কিছু খবর পেলি?

—কীসের খবর?

—সন্দীপের খবর—

মঙ্গলা ভাড়াটেদের কাছে যা খবর পায় তাই জানিয়ে দেয়। বলে—সন্দীপ দাদাবাবুর মামলা চলছে। দাদাবাবু খোলাখুলি বলে দিয়েছে যে তিনিই বিজলী দিদিমণিকে পিস্তল দিয়ে খুন করেছেন—

বিশাখা বলে—কিন্তু খুন তো করলো ছোটবাবু, আমি যে নিজের চোখে দেখেছি। আমাকে তুই একবার কোর্টে নিয়ে যেতে পারবি? আমি তাহলে হাকিমকে গিয়ে কথাটা বলি, আমার কথা কি হাকিম শুনবে না?

মঙ্গলা বলে—কিন্তু তোমার এ অবস্থায় এ-সব কথা হাকিমকে গিয়ে বলবে কী করে?

—আমাকে একবার ট্যাক্সি করে নিয়ে যেতে পারিস না তুই?

মঙ্গলা বলে—তোমার এই রকম একশো পাঁচ ডিগ্রী জ্বর। ডাক্তারবাবু তোমাকে নড়া-চড়া করতে বারণ করে দিয়েছেন যে—

বিশাখা বলে—হ্যাঁরে, খবরের কাগজে আর কী খবর বেরিয়েছে? একবার বল্ না, কী খবর বেরিয়েছে?

মঙ্গলা বলে—শুনলাম সন্দীপ দাদাবাবু হাকিমের সামনে বলেছেন যে বিজলী দিদি-মণিকে তিনিই গুলি করে মেরেছেন—

বিশাখা গলাটা উঁচু করে বলে—ওরে, তা তো নয় রে। আমি যে সে-ঘরে হাজির ছিলুম তখন। আমি যে সব দেখেছি।

বিশাখা বলে—ওরে ছোটবাবু আলমারি থেকে পিস্তলটা বার করে সন্দীপকে মেরে ফেলতে তার দিকেই গুলি ছুঁড়লে, আর ঠিক সেই সময়েই বিজলী রাক্ষসী 'কী করছো' 'কী করছো' বলে সামনে এগিয়ে বাধা দিতে গেছে। তখন পিস্তলের গুলিটা গিয়ে লাগলো সন্দীপের মাথায় নয়, বিজলীর মাথায়, আর সঙ্গে সঙ্গে বিজলী মাটিতে পড়ে গেল—

—তারপর?

বিশাখা বললে—সন্দীপ বিজলীকে ওই অবস্থায় মারা যেতে দেখেই ছোটবাবুর হাত থেকে পিস্তলটা কেড়ে নিয়ে সোজা বাইরে বেরিয়ে গেল। নইলে ছোটবাবুরই তো মানুষ খুন করার দায়ে আবার ফাঁসি হয়ে যেত—

তারপর একটু দম নিয়ে বিশাখা আবার বলতে লাগলো—ওরে, সন্দীপ শুধু আমার জন্যেই সমস্ত দোষ নিজের মাথায় তুলে নিলে রে। ভাবলে ছোটবাবু শেষ পর্যন্ত আমাকে নিয়েই ঘর করবে, আমাকে সুখী করবার জন্যেই সন্দীপ এই কাজ করলে। আর কিছু নয়। কিন্তু তা কি হলো? সন্দীপ আমাকে সুখী করবার জন্যে মিছিমিছি প্রাণটা দিতে

গেল—ছোটবাবু কি শেষ পর্যন্ত আমাকে নিলে?

বলে এবার অঝোর ধারায় হাউ-হাউ করে কাঁদতে লাগলো। বলতে লাগলো—আমাকে একবার হাকিমের কাছে নিয়ে চল্ তুই—আমি গিয়ে সব খুলে বলবো! বলতে বলতে আবার অজ্ঞান অচৈতন্য হয়ে গেল। তখন মঙ্গলা আর কী করবে। তাড়াতাড়ি ডাক্তারবাবুকে ডাকতে বাইরে ছুটে বেরিয়ে গেল। সদর দরজায় তালা লাগিয়ে দিয়ে আর দাঁড়ালো না।

* * *

আর ওদিকে ফাঁসি-সেলের মধ্যে তখন অনেক রাত। তখন ফাঁসির হুকুম জারি হয়ে গেছে তার ওপর। কাঁটায় কাঁটায় সকাল আটটার সময়েই তার ফাঁসি হবে। এক মিনিট আর এদিক-ওদিক হবে না। পৃথিবী যদি উলটিয়েও যায় তবু কেউ তা রোধ করতে পারবে না। সন্দীপের বড়ো আনন্দ লাগছিল মরতে। এমন সুখের আরামের আর পরিতৃপ্তির মৃত্যু বোধহয় আগে কেউ অনুভব করেনি। এই সন্দীপের কথা ভেবেই বোধহয় কবি লিখে গেছেন—'মরণ রে তুহুঁ মম শ্যাম সমান'। সেই কবিই আরো লিখে গেছেন—প্রেম ছাড়া ত্যাগ হয় না। আবার ত্যাগ ছাড়া প্রেম হতে পারে না। যা আমাদের কাছ থেকে প্রয়োজনের তাগিদে কেড়ে নেওয়া হয়, অত্যাচারের তাড়নায় ছিনিয়ে নেওয়া হয়, সে ত্যাগই নয়, আমরা প্রেমের দায়ে যা দিই তাই সম্পূর্ণ দিই, কিছুই তার আর রাখিনে, সেই দেওয়াতেই দানকে সার্থক মনে করি। কিন্তু এই যে প্রেম এও ত্যাগের সাধনাতেই শেষে আমাদের কাছে ধরা দেয়। যে-লোক চিরকাল কেবল আপনার দিকে টানে, নিজের অহংকারকেই জয়ী করবার জন্যে ব্যস্ত, সেই দাম্ভিক ব্যক্তির মনে প্রেমের উদয় হয় না—প্রেমের সূর্য একেবারে কুহেলিকায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকে।

আবার মল্লিক-কাকার কথাগুলোও মনে পড়ে গেল। মল্লিক-কাকা বলতেন—এখন তোমার বয়েস কম, এখন তুমি কেবল আশা করে যাও। এখন কেবল তোমার প্রত্যাশা। এই প্রত্যাশাই কেবল তোমাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। এখন এই বয়েসে তুমি সব কিছু প্রত্যাশা করবে। প্রত্যাশা করবে সুখ সমৃদ্ধি সৌভাগ্য, সব কিছু। সমস্ত কিছু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করতে শেখাবে এই প্রত্যাশাই। পৃথিবীর সব মানুষের জীবনের প্রথম দিকে এই প্রত্যাশাই তাকে একদিন প্রত্যয়ে পৌঁছিয়ে দিয়েই পরিত্রাণে পৌঁছিয়ে দেবে। সেই প্রত্যাশা আর প্রত্যয়ের সমন্বয়ই হচ্ছে পৃথিবীর সমস্ত মানুষের পরিত্রাণ।

তাহলে কি আজ সে প্রত্যয়ে এসে পৌঁছিয়েছে? হ্যাঁ, আজ সন্দীপ তার ফাঁসির দিনে অকপটে বলতে পারে যে সেই এই প্রত্যয়ে এসেই পরিত্রাণ পেতে চলেছে।

—তুমি কি দোষী মনে করো নিজেকে?

সন্দীপ বলেছিল—হ্যাঁ—

—তুমি বিজলী দেবীকে খুন করে কোনও অপরাধ করোনি বলে মনে করো?

সন্দীপ বলেছিল—হ্যাঁ।

—কেন 'হ্যাঁ' বলছো?

সন্দীপ বলেছিল—বলছি এই জন্যে যে অন্যায়ের প্রতিবাদ করা বা প্রতিবিধান করা প্রত্যেক সৎ মানুষের কর্তব্য!

আর এর পরেই তার মাথার ওপর ভারতীয় পেনাল-কোডের চরম দন্ড নেমে এসেছিল। আজ তার সেই চরম দন্ড মাথা পেতে নেবার লগ্ন।

তারপর সকাল হলো। তখনও তার মনে কোনও ক্ষোভ নেই। বিশাখা সুখী হয়েছে। বিশাখাকে গ্রহণ করেছেন সৌম্যপদ মুখার্জী। এর চেয়ে বড় সুখ সন্দীপের কাছে আর কী থাকতে পারে। তোমার সুখেই আমার সুখ। সেই-ই আমার পরিত্রাণ, সেই-ই আমার পরমার্থ! শুধু একটাই দুঃখ রয়ে গেল সন্দীপের মনে।

জেলার জিজ্ঞেস করেছিলেন—তোমার শেষ কোনও ইচ্ছে আছে?

সন্দীপ বলেছিল—আমার শেষ ইচ্ছে এই যে আমাকে ফাঁসি দেবার সময় যেন আমার

কাছে বিশাখা দেবীর যে ছবিটা ছিল সেই ছবিটা ফাঁসির সময়ে যেন আমার সঙ্গে থাকে। আমি সেই ছবিটা সঙ্গে নিয়ে মরতে চাই—

জেলার আপত্তি করেছিলেন। বলেছিলেন—না, আমাদের জেলখানার সে নিয়ম নেই। তোমার নিজেকে ছাড়া আর কাউকে আর কিছুকে সঙ্গে রাখবার আইন নেই।

তাই যখন তার ভোরবেলা ডাক পড়লো তখন সে স্বাধীন। তৈরি তো সে আগে থেকেই ছিল। ওই সামান্য একটু দুর্বলতা। তা সেটুকুও যখন গেল তখন আর নিজের বলে তার কিছু রইল না। যা রইল সেটা তার দেহ, সেটা তার নরদেহ!!! সে তখন একেবারে স্বাধীন। যিনি প্রেম-স্বরূপ তাঁর সঙ্গে মিলতে গেলে আমাদের স্বাধীন হতে হবে। স্বাধীন ছাড়া স্বাধীনের সঙ্গে আদান-প্রদান চলতে পারে না। তাই সেই কবিই বলে গেছেন —সেই প্রেম-স্বরূপ আমাদের বলে রেখেছেন তুমি মুক্ত হয়ে আমার কাছে এসো—যে ব্যক্তি দাস তার জন্যে আমার আম-দরবার খোলা আছে বটে, কিন্তু সে আমার খাস-দরবারে প্রবেশ করতে পারবে না। এক সময়ে মনের আগ্রহে তাঁর সেই খাস-দরবারের দরজায় ছুটে যাই, কিন্তু দ্বারী বার-বার আমাদের ফিরিয়ে দেয়। বলে—তোমার নিমন্ত্রণ-পত্র কই? নিমন্ত্রণ-পত্র খুঁজতে গিয়ে দেখি আমার কাছে যে-কটা নিমন্ত্রণ-পত্র আছে সে ধনের নিমন্ত্রণ, যশের নিমন্ত্রণ, অমৃতের নিমন্ত্রণ নয়। সুতরাং প্রেম-স্বরূপের খাস-দরবারে প্রবেশ করা আমাদের হলো না।

তারপরে একসময়ে তার ডাক এলো। হাত দুটো পেছন দিকে বাঁধা হলো, বাঁধা হলো পা দুটোও। বধ্যভূমিতে ফাঁসির মঞ্চের ওপর তাকে তোলা হলো। সেখানে আগে থেকেই হাজির ছিলেন জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট, জেল-সুপার, আর আরো যাঁদের থাকবার কথা তাঁরা। সন্দীপের মাথায় তখন টুপি পরানো হয়ে গিয়েছে। সে তখন আর কাউকেই দেখতে পাচ্ছে না। সেখানে দাঁড়িয়েই সন্দীপ মনে মনে প্রার্থনা করতে লাগলো—হে প্রেম-স্বরূপ, ছোট-বেলা থেকেই আমি অনেক কিছু পাওয়ার কামনা করেছিলুম, তুমি সে-সব কিছু থেকে আমাকে বঞ্চনা করে আমাকে পুনর্জীবন দিয়েছিলে। তোমার এই নিষ্ঠুর করুণাই আমার ইহ-জীবন ও পর-জীবনের পরম পাথেয় হয়ে রইল...

জেল-সুপারের নির্দেশের জন্যে তখন সবাই অপেক্ষা করছেন। তিনি ঘড়ি দেখছেন। আর তারপর যখন ঠিক কাঁটায় কাঁটায় আটটা বাজলো, তখন তাঁর গলায় স্বর শোনা গেল —হ্যাঙ্, আনটিল ডেথ্—

বলে তাঁর হাতের রুমালটা মাটিতে ফেলে দিলেন। যেমন কথা তেমনি কাজ। তখনও সন্দীপের মনে বিল্বমঙ্গলের সেই কথাগুলো ভেসে উঠলো—

এই নরদেহ
জলে ভেসে যায়
ছিঁড়ে খায় কুকুর শৃগাল
কিংবা চিতাভস্ম সম পবন উড়ায়...

হঠাৎ জেলখানার গেটের বাইরে একটা ট্যাক্সি এসে থামলো। ভেতরে দুজন মহিলা বসে ছিল। একজন আর একজনকে ধরে ধরে জেলখানার গেটের সামনে নিয়ে এসে বললে—সেপাইজী, আজকে কি এখানে সন্দীপবাবুর ফাঁসির দিন?

সেপাইটা বললে—হ্যাঁ—

—আমরা কি সন্দীপবাবুর সঙ্গে একটু দেখা করতে পারবো?

সেপাই বললে—আসামীর তো ফাঁসি হয়ে গেছে—

—হয়ে গেছে! বলার সঙ্গে সঙ্গে একজন মহিলা হঠাৎ মাথা ঘুরে অজ্ঞান হয়ে রাস্তার ওপরেই পড়ে গেল।

মঙ্গলা ডাকতে লাগলো—বউদিমণি, ও বউদিমণি, কী হলো? ওঠো, কথা বলো বউদি-

মণি! কথা বলো—ও বউদিমণি...

ততক্ষণে তাদের চারপাশে অনেক রাস্তার লোক জড়ো হয়ে গেছে। চারদিকে অনেক মানুষের ভিড়। একজন আর একজনকে জিজ্ঞেস করলে—কী হয়েছে মশাই এখানে?

ভদ্রলোক বললে—একজন মেয়েমানুষ হার্ট-ফেল করে মারা গেছে!

শুনে অন্য লোকটি বললে—সে কী? মরবার আর জায়গা পেলে না! এই জেলখানার সামনে এসে মরতে গেল!

ভদ্রলোক বললে—বোধহয় জেলখানার ভেতরে ওর কেউ নিজের লোক ছিল, শুনলাম আজ নাকি একটু আগে তার ফাঁসি হয়ে গেছে। সেই শুনেই...

* * *

ওদিকে প্রেম-স্বরূপের দরবারে তখন সন্দীপ পৌঁছে গিয়েছে। দরবার-ঘরের সামনের গেটে দ্বারী দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছিল। সন্দীপ গিয়ে সামনে দাঁড়াতেই দ্বারী জিজ্ঞেস করলে—নিমন্ত্রণ-পত্র আছে?

সন্দীপ বললে—হ্যাঁ—

—দেখি? টাকার নিমন্ত্রণ-পত্র, না খ্যাতির নিমন্ত্রণ-পত্র? দেখি?

সন্দীপ নিমন্ত্রণ-পত্রটা দেখালে।

দ্বারী বললে—এখানে নয়। এটা আম-দরবার। ওদিকে যান—

সন্দীপ সোজা সামনের দিকে চলতে লাগলো। সেদিকেও আর একটা দরজা। সেখানেও একজন দ্বারী দাঁড়িয়ে আছে। সন্দীপকে দেখেই জিজ্ঞেস করলে—নিমন্ত্রণ-পত্র আছে? এটা প্রেম-স্বরূপে খাস-দরবার—

সেখানেও সেই একই প্রশ্ন—দেখি! টাকার নিমন্ত্রণ-পত্র, না খ্যাতির নিমন্ত্রণ-পত্র?

সন্দীপ তার নিমন্ত্রণ-পত্রটা বার করে দেখালে। বললে—অমৃতের নিমন্ত্রণ-পত্র।

—দেখি—

সঙ্গে সঙ্গে খাস-দরবারের দরজাটা খুলে গেল। সন্দীপ দেখলে ভেতরে তখন মন্ত্রপাঠ হচ্ছে। তখন মন্ত্রের পাঠ শেষ হবার লগ্ন। সমবেত কণ্ঠে তখন শেষ হচ্ছে মন্ত্রপাঠঃ ওম্ মধুবাতা ঋতায়তে মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ
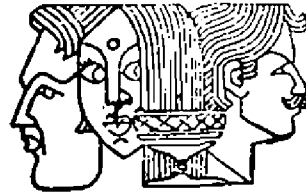
অজয়বাবু থামলেন। বললেন—এই হলো এ-যুগের শেষ সং মানুষটার গল্প। সংসারের মানুষ সন্দীপ লাহিড়ীকে ব্যাঙ্কের টাকা চুরি করার দায়ে আট বছরের জেল-খাটা মানুষ বলেই জানলো। আরো জানলো একজন নারীকে খুন করার দায়ে ফাঁসির আসামী বলেই। কিন্তু সত্যিই কি তাই? সন্দীপ লাহিড়ীর চলে যাবার পরেও সেই প্রেম-স্বরূপের কাছে একদিন সবাই-ই যাবে। তাদের কারো কাছে হয়তো টাকার নিমন্ত্রণ-পত্র থাকবে, কারো কাছে হয়তো থাকবে খ্যাতির নিমন্ত্রণ-পত্র। তারা সবাই-ই আশ্রয় পাবে প্রেম-স্বরূপের আম-দরবারে। কিন্তু খাস-দরবারে? সেখানে প্রবেশের জন্যে অমৃতের নিমন্ত্রণ-পত্র চাই। তা ক'জন পাবে? মনে হয় সন্দীপ লাহিড়ীর পর প্রেম-স্বরূপের খাস-দরবারের দরজা চিরকালের মতো রুদ্ধ হয়ে গেল। সন্দীপ-লাহিড়ীই বোধহয় একমাত্র সেই খাস-দরবারের শেষ অভিযাত্রী।

—ঃ ওঁ শান্তিঃ—